সাপ্তাহিক বসুমতী

"ক্ষমতায় এসেই কর্পোরেশনের নতুন মেয়র শ্রীপ্রশান্ত সুর দৈনিক একটি করে দুর্নীতির আখড়ায় ঘা দিচ্ছেন।......দৃপ্ত পদক্ষেপে পুরাতনকে ভেঙে চুরমার করে ফেলার চেষ্টায় এগিয়ে যাচ্ছেন—ত্রাহি ত্রাহি ডাক উঠেছে জানবাজারের লালবাড়ির বাস্তুঘুঘুদের। আর রাইটার্স বিল্ডিংসের বাস্তুঘুঘুরা পরম শান্তিতে নিজেদের নীড়ে দুর্নীতির চক্র-চক্রান্তের ডিম্ব প্রসব করে চলেছেন।"

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY.

ম সংখ্যা বৃহস্পতিবার, ১১ই আষাঢ়, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [74 year, No. 1, 26th June, 1969

270699

Cule H05261-26-270699

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৩
আজকের মানুষ		৪
সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— শঙ্করীপ্রসাদ বসু	৫
বই-বাছাই—বাংলা বইয়ের মেলা	— হরপ্রসাদ মিত্র	১০
রোজাটা খুলে দাও (কবিতা)	— দুর্গাদাস সরকার	১৩
জলের জীবন খুঁজে (কবিতা)	— বীতশোক ভট্টাচার্য	১৩
…দর্শন		১৪
…বতদর্শন		১৮
…আন্তর্জাতিক		২০
…তাহের বোঝা	— কৃত্তিবাস ওঝা	২২
…নিমযুগের একটি অধ্যায়	— অনন্ত সিংহ	২৫
…ফ্রন্ট সরকার সমীপেষু	— শ্রীসর্বদর্শী	২৯

যে কোন
গয়না
আর
আসল
গ্রহরত্ন
কেনার
দক্ষিণ কোলকাতায়
নামকরা প্রতিষ্ঠান
ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সন অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ডসন্স অব লেট
এম. বি. সরকার

সূচীপত্র

বিষয়		লেখক		
স্বাস্থ্যদপ্তরের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনুন		— মনোরঞ্জন হাজরা	...	...
গ্রন্থমেলা	...	...	...	...
সাগর সঙ্গমে (ধারাবাহিক উপন্যাস)	...	— সুশীল জানা	...	...
তিনটি ফুলের জন্য (কবিতা)	...	— জয়ন্তী সেন	...	...
গ্রামবাংলার মন্দির ভাঙছে	...	— অসীম মুখোপাধ্যায়	...	...
তিমির প্রান্ত ছুঁয়ে	...	— অগ্নিবর্ণ	...	...
অন্তিম-তমসা (গল্প)	...	— জ্যোতিশ্চন্দ্র চক্রবর্তী	...	...
পাঠকমন	...	...	...	...
মহানায়ক লেনিন (নাটক)	...	— অশোক সেন	...	...
রঙ্গজগৎ	...	...	...	...
খেলাধূলা	...	— শান্তিপ্রিয়	...	...

॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥

বহুকাল পরে আবার পাওয়া যাচ্ছে।

ম হা ক বি

গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচনাবলী

প্রথম খণ্ড : প্রফুল্ল, ম্যাকবেথ, ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে চারটি প্রবন্ধ, তিনখানি গীতিনাট্য ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১২॥ মূল্য দশ টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড : সিরাজউদ্দৌলা ; য্যায়সা ক্যা ত্যায়সা ; জনা ; দোললীলা ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫৮। মূল্য দশ টাকা।

তৃতীয় খণ্ড : পাণ্ডবগৌরব, বলিদান, আবুহোসেন ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫২। মূল্য দশ টাকা।

চতুর্থ খণ্ড : চৈতন্যলীলা, ভ্রান্তি, মলিনাবিকাশ, হীরার ফুল, বিবিধ রচনা ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০২। মূল্য দশ টাকা।

পরমহংসদেব শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত-শিরোমণি অতি প্রিয় নেটো গিরিশকে বলেছিলেন —"অভিনয়ের প্রয়োজন আছে বৈ-কি—ওতে লোকশিক্ষা হবে। আর তোমার লেখা—ও যে ভারি ভাল হয়েছে।"

প্রতিটি খণ্ড বোর্ডে বাঁধাই। মূল্যবান কাগজে ছাপা।

রচনাবলী সম্পাদনা : শ্রীরমেন চৌধুরী

অবিলম্বে অর্ডার পেশ করুন।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

৭৪ বর্ষ ঃ ১ম সংখ্যা—মূল্য ঃ ৩০ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ১১ই আষাঢ়, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 26th June, 1969

যুক্তফ্রন্টের শিক্ষানীতি

যুক্তফ্রন্টের শিক্ষানীতি সম্বন্ধে যুক্তফ্রন্ট বলেছেন যে, "বর্তমানে সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা আগাগোড়া লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যহীনতার দিক্‌ভ্রান্তির পথে। এ এক বিশৃঙ্খল, অসঙ্গত এবং অসংবদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা। যুক্তফ্রন্টের প্রধান এবং অবিলম্বে কর্তব্য হবে, এই সব অসংবদ্ধ ব্যবস্থাকে সুসংহত করে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও আদর্শের পথে চালিত করা।"

ইতিমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সরকার অগ্রসর হবার সঙ্কল্প গ্রহণ করেছেন, কাজও এগোচ্ছে, এমন কি প্রাথমিক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক দেবার ব্যবস্থাও হবে। এই রাজ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সাধারণ শিক্ষা অবৈতনিক করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে এরই মধ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক স্ত্রী-শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছে। বলাবাহুল্য, যুক্তফ্রন্ট সরকারের আগে শিক্ষার ক্ষেত্রে এই জাতীয় প্রগতিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় নি—যদিও সংবিধানে সাধারণের শিক্ষালাভের সুযোগের জন্য সংকল্প লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। তবে ভারতের দুটি অকংগ্রেসী সরকার—মাদ্রাজ এবং কেরল রাজ্য ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলিকে পিছিয়ে দিয়ে সমগ্র মাধ্যমিক ব্যবস্থা অবৈতনিক বলে ঘোষণা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারের লক্ষ্যও তাই। এই কারণে কিছুদিন আগে শিক্ষামন্ত্রী নতুন পদ্ধতিতে শিক্ষাক্রম স্থাপন করা প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন।

কিন্তু কোনো কিছু পরিবর্তন বা নতুন কিছু করার সংকল্প নিলেই হয় না। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত একটি পত্রিকায় সম্ভবত সেইজন্য বলা হয়েছে, "শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারী ও বেসরকারী এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করার প্রথা রদ করতে হবে। বেসরকারী পরিচালন ব্যবস্থার দোষগুলির পরিসমাপ্তি ঘটাতে হবে এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানের আমলাতান্ত্রিক কার্যধারার পরিবর্তে প্রবর্তন করতে হবে উন্নত গণতান্ত্রিক রীতি।"

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে এই ধরনের ব্যবস্থা ও পরিবেশই কাম্য। কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে এখন রাজনীতির কলুষ হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করার ব্যবস্থা সম্বন্ধে চিন্তা করা হলেও সরকারী বেসরকারী ভেদাভেদ দূর করা কি সম্ভব হবে? তাছাড়া এখনো বহু বিদ্যালয় মিশনারীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ঐ সব বিদ্যালয়ের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যাপারে আমরা কোনো রকম মন্তব্য করতে চাই না। এতদ্‌সত্ত্বেও একথা না বলে উপায় নেই যে, ভারতরাষ্ট্র ধর্মের ব্যাপারে নিরপেক্ষ হলেও ঐ সব বিদ্যালয়ের বহু অংশে এখনো পর্যন্ত বিশেষ ধর্মের ব্যক্তিকে ছাড়া প্রধান পদটি দেওয়ার নিয়ম নেই। অথচ যুক্তফ্রন্টের নীতি—"শিক্ষার লক্ষ্য হবে সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতার"। তবে এই পঙক্তি থেকে অন্তত এই মর্ম উদ্ধার করা যায় যে, শিক্ষাক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ভারতে নেই, সে সম্বন্ধে যুক্তফ্রন্ট সচেতন। সুতরাং আশা করা যায়, যুক্তফ্রন্ট সরকার এই বিষয়ে যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

দীর্ঘদিনের অব্যবস্থা রাতারাতি দূর করা সম্ভব, এমন কথা আমরা বলছি না। তবে শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন সঙ্কটের সৃষ্টি হলে পালনীয় কর্তব্য থেকে বিচ্যুতি ঘটাও অসম্ভব নয়।

সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্যপ্রিয় রায় বিদ্যালয়গুলিকে পুনর্গঠন করার কথা জানিয়েছেন। এই পুনর্গঠন সম্ভব হলে বিদ্যালয়গুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা হবে। প্রথমে দশম শ্রেণী পর্যন্ত, তারপর একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী; এরপর কলেজীয় শিক্ষার প্রথম পর্ব সুরু হবে।

একথা আমরা বলতে বাধ্য যে, পূর্বের দশম শ্রেণীর পর একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত যে সব বিদ্যালয় উন্নীত হয়েছে—তাদের বহু ভাগেরই অবস্থা বেদনাদায়ক। শিক্ষামন্ত্রীর এ ঘটনা অজানা নয়। এবং বিদ্যালয়গুলিকে 'বহুমুখী' করার যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল তা নিদারুণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। কলেজগুলিতেও তিন বৎসরের ডিগ্রি কোর্স চালু হওয়ার পর ঐ সব শিক্ষায়তনেও সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছে। এই সব পরিবর্তনের দ্বারা লাভ কিছুই হয় নি একথা অনায়াসে বলা যায়। এই কারণে এখন অনেকেই পুরাতন ব্যবস্থায় ফিরে যাবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন।

যাহোক, শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, পরিকল্পিত একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর (মাত্র দুটি শ্রেণীর) বিদ্যালয়গুলি (সংখ্যায় মোট ৫০০, এবং ১৫।১৬ বছরের মধ্যে বছরে ৩০টি হারে স্থাপিত হবে) কেন্দ্রীয় উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় বলে পরিগণিত হবে। আমরা জানতে চাই এগুলি কোন্ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন হবে? কিন্তু যুক্তফ্রন্টের অভিমতে—"শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে সরকারী ও বেসরকারী এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করার প্রথা রদ করতে হবে।" কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি কোঠারী শিক্ষা কমিশনের নির্দেশিত প্রস্তাবে প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প শিক্ষামন্ত্রী গ্রহণ করলেও নতুন সঙ্কট যাতে সৃষ্টি না হয়, সেটাই আমাদের কাম্য। তবে পুনর্গঠন, পুনর্বিন্যাস বা ঐ ধরনের কোনো কাজ করার আগে আমরা মনে করি, এখন যে সব গলদ শিক্ষাক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর বাধার সৃষ্টি করছে, সেগুলি প্রথমে দূর করা হোক। অন্যথায় নতুন কিছু করতে গেলে গলদগুলি অপসারণ করা সহজ হবে না। শিক্ষামন্ত্রীর প্রস্তাব এখনো যদিও মন্ত্রিসভার অনুমোদনযোগ্য ব্যাপার, তবু সামান্য যে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, তা শিক্ষাদরদীদেরও কিছুটা বিচলিত করেছে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমান যে গলদগুলি রয়েছে, সেগুলিকে দূর করার জন্যই শিক্ষামন্ত্রী সর্বাগ্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

রাজনীতিতে এই-ই হয়, আজ যেমন ব্রহ্মানন্দ রেড্ডিকে নিয়ে হচ্ছে। অর্থাৎ ভারতের রাজনীতিতে আজ তোলপাড় হচ্ছে এই ভদ্রলোকটিকে নিয়ে। একদল রাজনীতিক বলছেন, ব্রহ্মানন্দ তুমি যাও, মুখ্যমন্ত্রীর গদি ছেড়ে বিশ্রামানন্দ লাভ করো গে। ব্রহ্মানন্দ স্বয়ং এক-একবার বলে ফেলছেন, বৃহত্তর স্বার্থে যেতে তিনি গররাজি নন। আরেক দল ব্রহ্মজ্ঞানীর মত চীৎকার ছুড়েছেন, ব্রহ্মানন্দকে খেদিয়ে দিয়ে তুরীয়ানন্দ হবে কোন্ পাষণ্ডের!

অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর গদিতে ব্রহ্মানন্দ বসে আছেন ১৯৬৪ সাল থেকে। শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি তাঁর পথ পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন, নিরুপদ্রবে রাজত্ব দিব্যি চালাচ্ছিলেন। কিন্তু সম্প্রতি তেলেঙ্গানার কিছু লোক তাঁকে জ্বালিয়ে মারছে। তেলেঙ্গানা অঞ্চলের আর্থিক উন্নয়নের জন্যে নাকি তাঁর সরকার কিস্যু করেন নি! পিছিয়ে-পড়া তেলেঙ্গানায় আজ হঠাৎ এমন উঁচিয়ে ওঠার এত সাহস হয়তো হতো না যদি তাঁরই বন্ধুবান্ধবরা তাঁকে পথে বসাবার সঙ্কল্প না নিতেন।

অন্ধ্রপ্রদেশ গঠিত হবার সময় চুক্তি হয়েছিল রাজ্য সরকার তেলেঙ্গানা অঞ্চলের জন্যে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম নেবেন। কিন্তু সরকার এ পর্যন্ত তা নেন নি, অঞ্চলটা অনুন্নত থেকে গিয়েছে, এখানকার শত শত যুবক চাকরি-বাকরি না পেয়ে রাস্তায়-রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তেলেঙ্গানাবাসীরা এ অবস্থার অবসান চায়। তাদের নেতা জুটে গেছেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী চেন্না রেড্ডি, প্রাক্তন রাজ্য সরকারের মন্ত্রী কোণ্ডা লক্ষ্মণ বাপুজী, কোকা রাও, রামচন্দ্রন প্রমুখ রাজনীতিক।

ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি অবিশ্যি এখন বলছেন, তেলেঙ্গানার উন্নয়ন হয় নি, চুক্তি পালিত হয় নি—হবে। তা নিয়ে এত হৈ-চৈ করার কী আছে। কিন্তু এ স্তোকবাক্যে তেলেঙ্গানার নেতারা ভোলেন নি। তাঁরা রাজ্য সরকারের

ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি

ঔদাসীন্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল করেছেন, বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছেন। আন্দোলনের চেহারা দিনকে-দিন রূপ পাল্টাচ্ছে। ব্রহ্মানন্দের সরকারও শক্ত হাতে সে আন্দোলন দমন করতে চেয়েছেন। একদিকে ট্রেন পুড়েছে, সরকারী অফিস, পরিবহন জ্বলেছে, অন্যদিকে শত শত লোককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, লাঠি-পেটা করা হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে চেন্না রেড্ডি কোণ্ডা লক্ষ্মণ দাবি করে বসলেন : ব্রহ্মানন্দ সরকারের কাছে কিছুই প্রত্যাশা করা চলে না, তাঁরা তেলেঙ্গানা অঞ্চলকে আলাদা রাজ্য হিসেবে দেখতে চান। পুলিশী অত্যাচার দেখে অন্ধ্রপ্রদেশের অন্য কংগ্রেস নেতা, কমিউনিস্টরাও শ্লোগান তুললেন : ব্রহ্মানন্দ গদি ছোড়ো!

কিন্তু এক সময় অন্ধ্রপ্রদেশ রাজ্যের অখণ্ডতার স্বার্থে গদি ত্যাগে স্বীকৃত হলেও শ্রীব্রহ্মানন্দ রেড্ডি পরে নিজের সে কথাকে গিলে নিয়ে বলেছেন যে, স্থিতাবস্থার পরিবর্তন করলে মুখ্যমন্ত্রীকে গদিচ্যুত করলে সমস্যার সমাধান হবে না। স্বাতন্ত্র্যকামীদের প্রধান কয়েকটা দাবি ছিল, মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ব্রহ্মানন্দ রেড্ডির অপসারণ, রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তন এবং স্বতন্ত্র তেলেঙ্গানা। নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সমস্যাটির সূত্র সন্ধানে ব্যস্ত।

ব্রহ্মানন্দকে ছাড়তে ওয়ার্কিং কমিটিও রাজী নন, যদিও অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও প্রাক্তন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট ডি সঞ্জীবায়া চান যে ব্রহ্মানন্দ যান। কিন্তু তাঁর চাওয়ার ধার কি ব্রহ্মানন্দ ধারেন? রাজনীতি ব্রহ্মানন্দও কিছু কম বোঝেন না। সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত তিনি ১৯৩৬ সাল থেকে, যখন তিনি গুন্টুর জেলা বোর্ডের প্রেসিডেন্ট। তারপর থেকে তর-তর করে রাজনীতির সিঁড়ি বেয়ে ক্রমশ ওপরেই উঠেছেন। মাদ্রাজ বিধানসভার সদস্য ছিলেন তিনি ১৯৪৬—৫২ সাল পর্যন্ত, অন্ধ্রপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক পদ পান '৫৫ সালে। অন্ধ্রপ্রদেশ মন্ত্রিসভায় তাঁর যোগদান ঘটে '৬০ সনে অর্থমন্ত্রীর পদে, দু'বছর বাদে পান অর্থ ও সমবায় দপ্তর। তারপর ১৯৬৪ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর গদিই দখল করে বসলেন, যেখান থেকে নড়বার ইচ্ছে ৬০ বছরের ব্রহ্মানন্দের মোটেই নেই। তেলেঙ্গানা রইল কি গেল তাতে কী যায়-আসে!

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

হরিপুরা ভাষণ—মূল্যবান দলিল—(২)

দীর্ঘদিন পরে সক্রিয় রাজনীতিতে প্রত্যাবৃত্ত এবং অবিলম্বে কংগ্রেসের সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত সুভাষচন্দ্র তাঁর সভাপতির ভাষণে কী বলেন, তা স্বতঃই দেশের বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতি-সচেতন মহলে আগ্রহের বিষয় হয়েছিল। একদিকে ছিল সুভাষচন্দ্রের উগ্র রাজনৈতিক মতের পটভূমিকা, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ইউরোপীয় রাজনৈতিক জীবনকে কয়েক বৎসরের ঘনিষ্ঠ পর্যবেক্ষণ, তদুপরি লেখক হিসাবে তাঁর প্রতিষ্ঠা এবং সমাজতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য, অন্যদিকে ছিল ভারতীয় পটভূমিকায় গান্ধী কংগ্রেসের অহিংসনীতির প্রতি তাঁর আনুগত্য ঘোষণা এবং গান্ধী-আশীর্বাদসহ রাষ্ট্রপতির সিংহাসনে আরোহণ। সুভাষচন্দ্র কি অবিচলিত, অব্যাহত থাকবেন, না কি গান্ধী সেবাসংঘের ভ্যাটিক্যান দলের 'গরু' হয়ে দাঁড়াবেন? বিক্ষিপ্তভাবে সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য নানা বক্তৃতায় বা রচনায় পাওয়া গেছে, কিন্তু কংগ্রেস অধিবেশনের বৃহৎ সভাতলে প্রায়-বৃদ্ধ ও বৃদ্ধ নেতাদের শীতল দৃষ্টিতে শাসিত সুভাষচন্দ্র কোন্ বিচক্ষণ বুদ্ধি দেখান তা জানতে সকলেই উৎসুক ছিল। সত্যই কি সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের নীতির সঙ্গে মিলিয়ে চলতে পারবেন, তাঁর রক্তের আগুন খাদিতে ঢাকা থাকবে, না কি রাষ্ট্রপতির রাজ-সাজ তাঁর রণসাজকে ঢাকা দেবার ছলনা—সতর্ক বুদ্ধি সে প্রশ্ন না করে পারে নি।

প্রশ্নটি বেশি করে করেছিল—সুভাষচন্দ্র যাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ ছিলেন সেই ইংরেজ শাসকসমাজের মুখপত্রগুলি। সন্দিগ্ধ আশঙ্কায় পূর্ণ ছিল ঐ সব পত্রিকার বিভিন্ন রচনা।

দেশীয় সংবাদপত্রগুলি সাধারণভাবে প্রশংসার মনোভাব দেখিয়েছিল, যদিও অবিমিশ্র প্রশংসা নয়, কারণ সুভাষচন্দ্র তাঁর এই ভাষণে সর্বজনগ্রাহ্য কোনো আহার্য পরিবেশন করতে চান নি। হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের কাছে হরিপুরা-ভাষণ অবশ্যই *'A Remarkable Speech'* (২০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮), দৃষ্টির ব্যাপ্তি এবং তাত্ত্বিক পটভূমিকার জন্য তা অসাধারণ, সেই সঙ্গে বাস্তবমুখিতা ও গঠনমূলক আদর্শবাদের জন্যও বটে।১ অমৃতবাজারের কাছে (২০ ফেব্রুয়ারী) ভাষণটির উচ্ছ্বাসহীন তীক্ষ্ণতা, প্রাঞ্জলতা, আন্তরিকতা এবং অভিজ্ঞতার গভীরতা প্রশংসনীয় মনে হয়েছিল।২ সুভাষচন্দ্রের ভাষণে এই গুণগুলি এতই স্পষ্ট যে, মডার্ন রিভিউ পত্রিকা একই কথা না বলে পারে নি।৩ এই প্রশংসা ভারতবর্ষীয় রাজনৈতিক নেতাদের

---

১ "It was a remarkable speech......remarkable as much for its breadth of vision and ideological background as for its practical bias and constructive idealism." (H. S., feb. 20, 1938).

২ "There is no attempt at oratorical flight in Sj. Bose's Presidential address. Not a superfluous world has been said. No where sense has been sacrificed to sound. Altogether it is a remarkably lucid speech, sincere in its untone and bearing on it the impress of experience, sound judgement and deep and careful thought." (A. B. P., feb. 20. 1938).

৩ "In his Presidential address Mr. Subhas Chandra Bose has very clearly and ably expressed his views on the topics dwelt upon therein. It contains no purple patches, no flights of oratory. Nor is there any attempt at timid or diplomatic mystification. What he thinks and believes he has stated plainly and boldly. Whether one agrees with him or not, one must recognise and appreciate this quality of his speech. Perhaps we agree with him more than we disagree." (*Modern Review* : Notes, March, 1938).

সম্বন্ধে কত বড় প্রশংসা না বললেও চলে। এদেশে বহু-ভাষণ নেতৃত্বের প্রধান গুণের মধ্যে গণ্য। সুভাষচন্দ্রের রচনায় অপরপক্ষে খাঁটি ঐতিহাসিকের বিষয়নিষ্ঠা আশ্চর্যজনকভাবে বর্তমান ছিল, রোমা রোলাঁর উক্তিতে পাঠক পূর্বেই তা লক্ষ্য করেছেন।

সুভাষচন্দ্রের ভাষণের বিষয়মূল্য অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রগুলির পক্ষেও অগ্রাহ্য করা সম্ভব হয় নি। ফলে কিছু অনিচ্ছার প্রশংসা তিনি পেয়েছিলেন, যদিও কুটিল সন্দেহ এবং মাত্রাতিরিক্ত মুরুব্বিয়ানায় তাকে ঢাকা দেবার চেষ্টা কম ছিল না। বোম্বাইয়ের অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান দৈনিক 'টাইমস অব ইণ্ডিয়া' *Mr. Bose's vision* নামক সম্পাদকীয় রচনা (২৩ ফেব্রুয়ারী) শেষ করেছিল এই বলে—

"With a good deal of Mr. Bose's vision one can readily agree ; What is now required is to harness his idealism to practical politics."

মাদ্রাজের অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সান্ধ্য দৈনিক 'মাদ্রাজ মেল'-এর ১৯শে ফেব্রুয়ারীর সম্পাদকীয়ের (*Congress aims and plans*) শেষ প্যারাগ্রাফে পাই—

"Mr. Bose has given the reader much to think about. There are inconsistencies in his speech, exaggerations and unjustified conclusions, but there is also much that is deserving of close cons.deration. It indicates the policy on which Congress policy may be expected to develop, and throws further light upon the character of the dictatorship to which that policy is tending, or, perhaps, it might more truly said, is being consciously directed."

কলকাতার ইংরাজ স্বার্থের প্রধান মুখপত্র স্টেটসম্যানেও ভাষণটির সরাসরি কোনো নিন্দে নেই (*Musings on Haripura*, Feb. 23.) বরং ক্ষেত্রবিশেষে প্রশংসাই ছিল (*One speech, one script*, Feb. 26, 1938)।

আগেই বলেছি, দেশীয় কাগজগুলি সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য সমর্থন করে নি। অমৃতবাজারের মতে, (*Presidential Address*, Feb. 20) তাঁর অনেকগুলি বক্তব্য সমর্থিত হবার সম্ভাবনা থাকলেও অবশ্যই তর্ক উঠবে কয়েকটি ক্ষেত্রে, যেমন ভলাণ্টিয়ার দল গঠনের প্রস্তাব, বা কংগ্রেস কর্তৃক কিষাণ ও শ্রমিক প্রতিষ্ঠানগুলির যৌথ স্বীকৃতির প্রশ্নে তাঁর সমর্থনের মনোভাব।

—"The sudden and swift radicalisation of the Congress by the grant of collective affiliation to workers' and peasants' organisations is feared by many on the ground that it will lead to a class war and divert the national energy from the fight against imperialism."

অমৃতবাজার অবশ্য বৈদেশিক প্রচারের ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রের অভিমতের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছিল।

হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড সংখ্যালঘু প্রশ্নে সুভাষচন্দ্রের মতের মৃদু সমালোচনা না করে পারে নি. এবং রোমান লিপি প্রবর্তন-প্রস্তাব সম্বন্ধে আস্তে ধমক দিয়ে বলেছিল, উনি ব্যস্ত মানুষ, এসব বিষয়ে মাথা না ঘামিয়ে বিশেষজ্ঞদের হাতে ছেড়ে দিলেই ভাল করবেন।

মডার্ন রিভিউ অধিকাংশ বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে একমতের কথা জানিয়ে আপত্তির কথাও যথেষ্টভাবে বলেছিল। তার প্রধান একটি হল, রাষ্ট্রভাষার জন্য রোমান লিপি প্রবর্তনের প্রস্তাব, যার বিরুদ্ধে হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের আপত্তির কথা উপরে জানিয়েছি। 'হিন্দুস্থানী' ভারতের রাষ্ট্রভাষা হবে, এই কথা ধরে নেওয়াতেই মডার্ন রিভিউয়ের আপত্তি। দক্ষিণ ভারতে উত্তর ভারতীয় ভাষা সম্বন্ধে প্রতিরোধের কথা এই পত্রিকা উত্থাপন করেছিল। সুভাষচন্দ্র রোমান লিপি প্রবর্তনের প্রস্তাব করে বারংবার ব্যাপারটির সঙ্গে *Scientific* শব্দটি যুক্ত করায় সম্পাদক আপত্তি জানিয়ে বলেছেন, 'কি অর্থে কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে জানি না, তবে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়, রোমান লিপি নাগরী লিপির তুলনায় কম বৈজ্ঞানিক।' রোমান লিপি বৃহত্তর বিশ্বের সঙ্গে ভারতকে যুক্ত করবে, সুভাষচন্দ্রের এই কথাতেও আপত্তি জানিয়ে পত্রিকাটি লিখেছিল, একথা ঠিক নয়, কারণ রাশিয়া বা জার্মানীর লিপি মোটেই এক নয়. এবং এশিয়ার নানাস্থানে অন্য লিপি চলিত।

এই লিপির ব্যাপারেই অন্যদিকে সুভাষচন্দ্র উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেছিলেন রোমান লিপিতে ছাপা স্টেটসম্যান পত্রিকা থেকে। সুভাষচন্দ্র যে, স্টেটসম্যানের এতখানি প্রশংসা পেতে পারেন, তা ঐ অংশটি পড়ার আগে কল্পনা করাও শক্ত ছিল। পত্রিকাটি দুঃখের সঙ্গে জেনেছিল, ভারতবর্ষ বড়ই বিভক্ত, তা বহু ভাষার দেশ, ভাষার সংখ্যা কমপক্ষে ২০০; খুশি হয়ে লিখেছিল, এতৎসত্ত্বেও দেশটি ঐক্যের দিকে এগিয়ে চলেছে ইংরেজ শাসনের কল্যাণে। কিন্তু সম্পূর্ণ সমাধান ইংরেজদের পক্ষেও করা কঠিন। অনেকের মতে সমাধান হল,—শিক্ষিতদের মধ্যে ভাববিনিময়ের ভাষা হবে ইংরেজী, অশিক্ষিতদের মধ্যে হিন্দী বা উর্দু কিন্তু এখানেও গণ্ডগোল—মাদ্রাজ কি হিন্দী উর্দু বুঝবে? এই ঝঞ্ঝাটের পরিস্থিতিতে, শাদা মানুষের দায়িত্বে ক্লান্ত শাদা মানুষদের পত্রিকাটি প্রায় আনন্দে কেঁদে ফেলল, যখন দেখল, দুর্ধর্ষ জাতীয়তাবাদী, বিদেশীর শত্রু-চূড়ামণি শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু বিদেশী লিপি প্রবর্তনের পক্ষে সজোরে ওকালতি করছেন

—"A Congress President has grapsed this thorny matter once again, and in an especially courageous manner. An Indian, standing and fighting for everything that he considers national, a champion of India's spirit against what he holds to be alien, agressive and injurious influences. Mr.

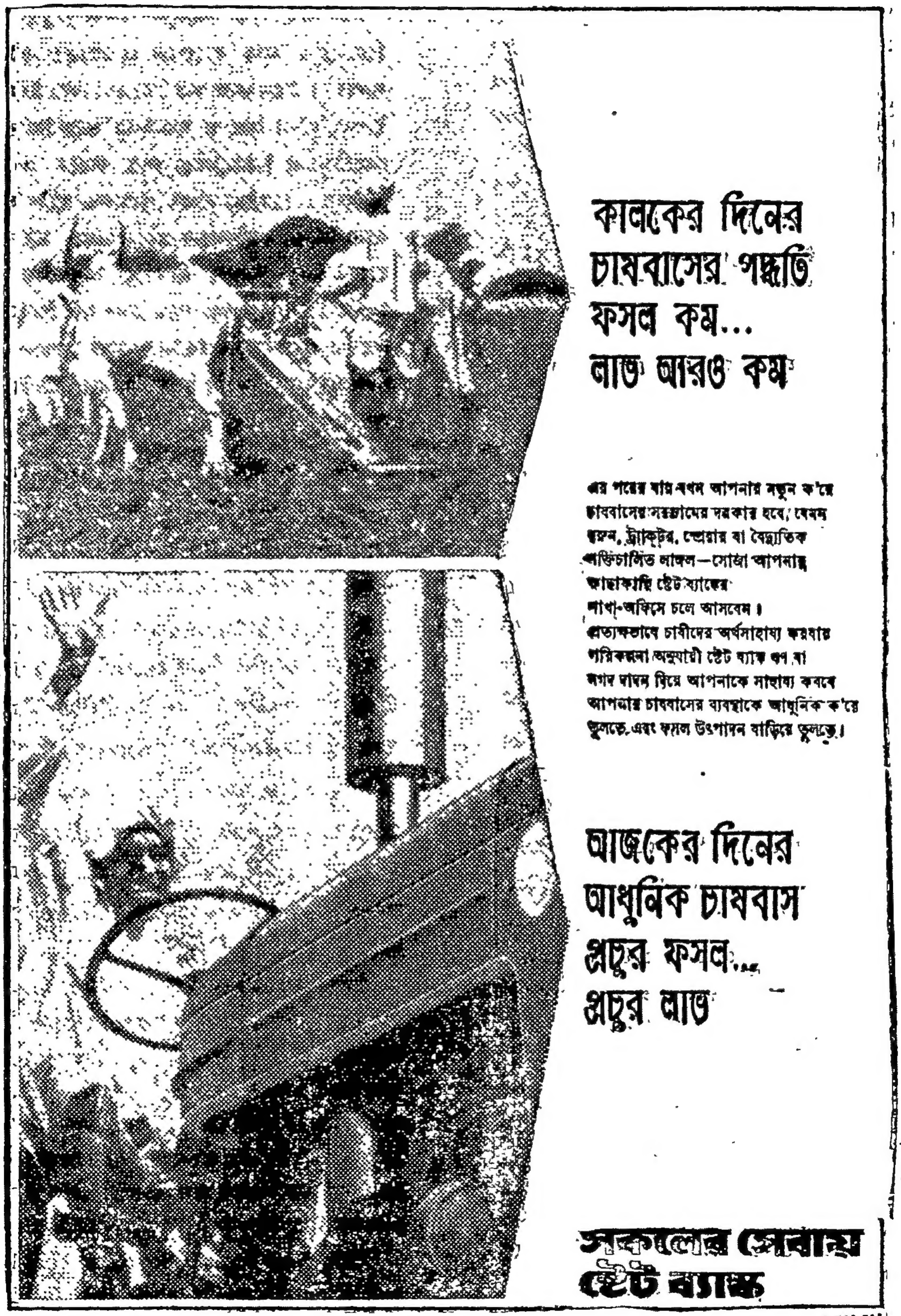

কালকের দিনের
চাষবাসের পদ্ধতি
ফসল কম...
লাভ আরও কম
এর পরের বার যখন আপনার নতুন ক'রে চাষবাসের সরঞ্জামের দরকার হবে, যেমন পাম্প, ট্রাক্টর, স্প্রেয়ার বা বৈদ্যুতিক শক্তিচালিত লাঙল—সোজা আপনার কাছাকাছি স্টেট ব্যাঙ্কের শাখা-অফিসে চলে আসবেন।
প্রত্যক্ষভাবে চাষীদের অর্থসাহায্য করবার পরিকল্পনা অনুযায়ী স্টেট ব্যাঙ্ক ঋণ বা নগদ দাদন দিয়ে আপনাকে সাহায্য করবে আপনার চাষবাসের ব্যবস্থাকে আধুনিক ক'রে তুলতে এবং ফসল উৎপাদন বাড়িয়ে তুলতে।
আজকের দিনের
আধুনিক চাষবাস
প্রচুর ফসল...
প্রচুর লাভ
সকলের সেবায়
স্টেট ব্যাঙ্ক

3.390 BN

Subhas Bose has nevertheless told his great audience at Haripura, and all over India, that this country would do well to adopt the Latin script......The distinction between Hindi and Urdu he thinks artificial ....Their scripts, he implies, emphasize and exaggerate what difference there are."

রোমান লিপিতে ভারতের ঐক্য আসবে, অবশ্যই, কিন্তু তাকে নেওয়ানো যাবে কি ? এক্ষেত্রে অনেক সংস্কারের ছেদন প্রয়োজন। লিপি যে ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত। তুলসী-দাসের রামায়ণ রোমান লিপিতে, হে ঈশ্বর।—ভারতীয়দের মনোভাব।

কিন্তু তা হলেও লোককল্যাণের চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া দরকার। গোড়ায় মন বাধা পেলেও ক্রমে সবই সয়ে যাবে। সুভাষচন্দ্রের মনোভাবের সমর্থনে চমৎকারভাবে পত্রিকাটি লিখল, (যতখানি সুন্দরভাবে সুভাষচন্দ্রও নিজের মতের পক্ষে লিখতে পারতেন কি না সন্দেহ!)

—"Ways of speech and writing do not easily bend to commends and precepts. Yet much can be done by inspiration and determination, for language if a phenomenon of nature is also an instrument of human purpose." ইউরোপে ভাষা নিয়ে নানা পরীক্ষা ও পরিবর্তন করা হয়েছে বলার পরে সুভাষচন্দ্রের উল্লেখসহ লেখা হল—"Nor is it unimportant that, as the Congress President observed, familiarity with it makes communication easier with the thought and opinion of Europe. Roman Urdu and Roman Hindi are worth thinking about, not for the convenience of Europeans (they have tested their convenience already), but as useful social and educational equipment for India." (*One Speech One Script*).

২৩শে ফেব্রুয়ারী স্টেটসম্যান *Musings on Haripura* নামে যে সম্পাদকীয় লিখেছিল, তার মধ্যে দেখতে পাই, এই পত্রিকা সুভাষচন্দ্রের ভাষণে বৈদেশিক প্রচার সম্বন্ধীয় প্রস্তাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছে, এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের প্রস্তাবটিকেও। এক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্রের সচেতনতা সাধুবাদ পেয়েছে, সেইসঙ্গে সন্দেহ করা হয়েছে জমিদারী উচ্ছেদ, ঋণ মকুব, সমবায়ের বিস্তার, বা শিল্পকে রাষ্ট্রায়ত্ত করলেই দেশের দারিদ্র্য দূর করা যাবে কি না।

এইখানেই আসল কথাগুলি বেরিয়ে পড়েছে। ঐসব বিষয়গুলির সঙ্গে শাসকস্বার্থ যে জড়িত। স্টেটসম্যান ব্যাপারটির উল্লেখ করেই সরে গিয়েছিল, কিন্তু টাইমস অব ইণ্ডিয়া, মাদ্রাজ মেল বা লখনৌ-এর পায়োনীয়ারের মূল সমালোচনা ঐ বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করেই। ফেডারেশন পরিকল্পনা, প্রাদেশিক মন্ত্রিত্ব, সমাজতন্ত্র, বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদের চেহারা, কৃষিশিল্পায়ন প্রভৃতি বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের মতামত ঐসব অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সংবাদপত্রের তীক্ষ্ণ আক্রমণের লক্ষ্য হয়—তার দ্বারা প্রমাণ হয়ে গিয়েছিল যে, সত্যকার জনস্বার্থমূলক কোনো প্রয়াসের সপক্ষে ইংরেজ শাসকদের সমর্থন কদাপি মিলবে না, এবং ভারতীয় ধনিক স্বার্থের সমর্থনও নয়।

টাইমস অব ইণ্ডিয়ার ২১শে ফেব্রুয়ারীর সম্পাদকীয় রচনা অনুযায়ী সুভাষচন্দ্রের ভাষণের মূল কথা ফেডারেশন-বিরোধিতা। সামাজিক ও রাজনৈতিক পুনর্গঠনের ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গি পূর্ববর্তী সভাপতি জহরলালের মতই, পত্রিকাটি লিখল, যে কথা মাদ্রাজ মেলও লিখেছিল এবং বিষাক্ত মন নিয়ে উল্লেখ করেছিল সুভাষচন্দ্রের এই উক্তিটি—"The clay feet of the British Empire now stands exposed." সুভাষচন্দ্র টোটালিটেরিয়ান স্টেট-এর ধারণাকে বরখাস্ত করেছেন, এতে পত্রিকাটি আনন্দ প্রকাশ করে বিশেষ মুরুব্বিয়ানার সঙ্গে জানিয়েছিল, বৃটিশ রক্ষণে থেকেই ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের দিকে এগুনো সম্ভবপর, ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদের কোনই প্রয়োজন নেই।

কিন্তু সমাজতন্ত্র—সর্বনাশ—বোম্বাইয়ের কোটিপতি কংগ্রেসীদের বন্ধু আতঙ্কে আঙুল উঁচিয়ে বলেছিলেন—লোকটি বলছে কি? সমাজতন্ত্র কথাটার মানে বুঝে ব্যবহার করছে তো। আরও মারাত্মক, যেসব ব্যবসায়ী দেশপ্রেমিকদের কাঁধে ভর করে লোকটি হরিপুরার কংগ্রেস সভাপতি, তারা কি জানে সমাজতন্ত্র এলে কী দুর্গতি ঘটবে তাদের? সং-শিক্ষা এবং সতর্কবাণীতে পূর্ণ রচনাটির (*Mr. Bose's vision*) কিছু অংশ—

"Mr. Bose regards Socialism as India's goal after she had attained her freedom. Here one would welcome a little enlightenment as to what sort of Socialism Mr. Bose

হরিপুরা কংগ্রেসে কৃপালনী ও প্যাটেলের সংগে
আলোচনারত সুভাষচন্দ্র

demands. *Is the type of people who financed the Congress in the past to be sacrificed by the Congress of the future? Are the industrialists and businessmen, in whose hands rests India's economic welfare, to be ground out of existence by Mr. Bose's leftist friends?* It may truly be said that Great Britain is moving towards Socialism, but the pace is a slow one and is calculated to achieve its object without disrupting the countrie's social and economic life. *Many people in India would like an assurance the Congress ideal is the same."*

(বক্রলিপি লেখকনির্দেশে)

মাদ্রাজ মেলের আশঙ্কাও টাইমস অব ইণ্ডিয়ার অনুরূপ। ঐ কাগজটির প্রশ্ন, কংগ্রেসের সমর্থক সবাই কি সমাজতন্ত্রের গোটা রূপ জানে? জহরলালও সমাজতন্ত্রের কথা বলে থাকেন, কিন্তু জহরলালকে এই সব স্বার্থ-মহল ডরায় না, কারণ তারা জানে, জহরলাল বলতে ভালবাসেন, কিন্তু সুভাষচন্দ্র করতে চান। হরিপুরা-ভাষণে সুভাষচন্দ্র শুধু সমাজতন্ত্রের আদর্শের কথাই বলেন নি, কিভাবে তাকে আনতে হবে, তার পথও নির্দেশ করেছিলেন, সে ব্যাপারটি মাদ্রাজ মেলের চোখ এড়িয়ে যায় নি।

"Mr. Bose seems to have encountered such distorted views of Socialism for h... urges the Party to pay mon... the education and trai...

এইখানেই মহাভয়। এ পদ্ধতি তো গান্ধীজীর নয়, অহিংসার নয়। এ পদ্ধতি তো 'স্বাধীনতার' নয়। ধনিকের 'স্বাধীনতা' কোথায় থাকবে যদি কৃষক-শ্রমিককে শোষণের স্বাধীনতা সে না পায়, বা কৃষক-শ্রমিকেরা স্বদেশীয়দের হাতে শোষিত হবার স্বাধীনতা হারিয়ে ফেলে। সুভাষচন্দ্র বলেছেন, স্বাধীনতার পরে কংগ্রেসকে ভেঙে দেবার কথাই ওঠে না, কংগ্রেসই পরবর্তী পুনর্গঠনের দায়িত্ব নেবে। সে পার্টি, সুভাষচন্দ্রের মতে, আভ্যন্তরীণ গঠনে গণতান্ত্রিক। সে কথায় পত্রিকাটির একেবারেই আস্থা নেই।

—"The Congress Party....has even in present conditions....swept all oppositions out of its way with a ruthlessness that no Nazi or fascist totalitarian could exceed."

এহেন কংগ্রেস পুরো ক্ষমতা পেলে না জানি কি দশাই ঘটবে!

—"Mr. Bose may see things differently, but his forecast of the Congress Party's plan of action....will no doubt appear to most people as pure and unadulterated totalitarian autocracy."

সুভাষচন্দ্র বলেছেন, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাগুলির উপরে আরো বেশি কর্তৃত্ব করতে হবে, তাকে হয়ে উঠতে হবে স্বাধীন ভারতের 'ছায়া মন্ত্রিসভা',—মাদ্রাজ মেলের মতে, এর মধ্য থেকেই 'party dictatorship'-এর চেহারা উঁকি দিচ্ছে। ভলাণ্টিয়ার দল গঠনের প্রস্তাবে পত্রিকাটি সবচেয়ে ভীত—

"Such a corps ("a disciplined volunteer corps, manned by trained officers") are the means whereby totalitarian caucuses maintain themselves in office. What ... pose can they serve in ind... ....If Mr. Boses fu...

হরপ্রসাদ মিত্র

বই-বাছাই

বাংলা বইয়ের মেলা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বই-বাছাইয়ের ভাবনা ক্রমেই দুর্ভাবনা হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের ভাষা-সম্পর্কিত এই মন্তব্য শুনে আনন্দ তখন কিছুই বলে নি। এসব সে আগেই জানতো। সে বলেছিল—গত দেড় শ' কি পৌনে দু-শ' বছরের বাংলায় লেখা প্রধানত সাহিত্য-সম্পর্কিত বইগুলির নির্বাচিত একটি তালিকা তৈরি করা এবং সেইসব বইয়ের কিছু কিছু বিবরণ পরিবেশন করাই তো তোমার সংকল্প? সে-কাজে প্রবেশের আগে এতোসব দুর্ভাবনা টেনে আনছো কেন?

আমি বলেছিলুম—কারণ, আমার পাঠকরা আমার এই নির্বাচনের সমস্যাগুলো অনুগ্রহ করে আগেই কিঞ্চিৎ অনুভব করুন—এই আমার অভিপ্রায়। পাঠক-সমাজের ব্যাপ্তির দিকে নজর রেখেই ভাষা-ঘটিত এই সমস্যার প্রসঙ্গ প্রথমে তুললুম।

বলেছিলুম—রামরাম বসু বা মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার,—তারিণীচরণ মিত্র বা হরপ্রসাদ রায়,—রামমোহন—বা রাজীবলোচন বা উনিশ শতকের প্রথম পঁচিশ বছরের অন্য কোনো লেখকের কোনো বই যদি আমার এই তালিকায় ধর্তব্য হয়, তাহলে একালের পাঠক-সমাজ কি সে-বইয়ের উপভোগ্যতা সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে আমার কথা পাড়তে রাজী হবেন? রাম-[illegible] হাতে বাংলা গদ্য কী রকম জটিল এবং আড়ষ্ট এবং [illegible] ধারায় বিদ্যমান ছিল মনে আছে তো? [illegible] ছিল সে-কথা। সে রামমোহনের এই [illegible] স্মরণ করেছিল—

বলেছিল—এ রামমোহনের বেদান্ত-গ্রন্থের ভাষা।—কিন্তু এসব কথায় মনকে বেশি উদ্বিগ্ন করে তুললে কাজে নামবে কখন? আসল কাজটা ভুলে যাও নি তো? কিছু শুনে কোরো না—উপেন্দ্রকিশোরের লেখা সেই কেবলহাটির কানাই-কুঁজোর সৌভাগ্য,—এবং কানাইয়ের পথে চলতে গিয়ে আসল গান-ভুলে-যাওয়া মানিকের হায়রানির কথা মনে পড়ছে। তোমার মনে আছে সে গল্প?

এই বলে সে গল্প আরম্ভ করে—

গরিব কানাইয়ের পিঠে মস্তো একটা কুঁজ ছিল। ঝুড়ি বেচে দিন কাটাতো সে। এই অবস্থায় একদিন পুরনো একটা বাড়ির সামনে, তাকে পথেই বসে পড়তে হয়। তারপর রাত হয়ে যায়। হঠাৎ কানাইয়ের কানে আসে অদৃশ্য সব ভূতের গান—'লুন হ্যায়, তেল হ্যায়, ইমলী হ্যায়, হীং হ্যায়।' সেই গান শুনে ভোঁ হয়ে যায় কানাই। ভারি ভালো লাগে তার। সেও গলা ছেড়ে গান জুড়ে দেয়—'লসুন হ্যায়, মরীচ হ্যায়, চ্যাং ব্যাং শুটকি হ্যায়।'

ভূতেরা সেই গান শুনে ভারি খুশি হয়ে কানাইয়ের কুঁজ সারিয়ে দেয়। অতঃপর হিংসুটে মানিক কানাইয়ের সেই অভিজ্ঞতা শুনে নিয়ে, ঠিক সেই বাড়িটারই সামনে গিয়ে বসে নিজের কুঁজ সারাবার আগ্রহে। ভূতেরা যথারীতি গান ধরলো মানিক কিন্তু তাদের সেই 'লুন হ্যায়, তেল হ্যায়, ইমলী হ্যায়' শুনেই গেয়ে ওঠে—'গবুচরণ ময়রার দোকানের কাঁচাগোল্লা হ্যায়।'

উপেন্দ্রকিশোর বলেছেন—এর ফলে, গানের তাল ভেঙে তো গেলই, কাঁচাগোল্লার নাম শুনে অনেক ভূতের বমি পর্যন্ত হতে লাগল। ভূতেরা এসব জিনিসকে বড্ড ঘৃণা করে, এর নাম অবধি শুনতে পারে না।

তাই রেগে গিয়ে, তারা কানাইয়ের সেই পরিবর্জিত কুঁজটা এনে মানিকের কুঁজের ওপর বসিয়ে এমন করে জুড়ে দিল যে, সেটা আর কিছুতেই তোলা যায় নি।

আনন্দ বলে—বই-বাছাইয়ের পরিকল্পনা ভাবা দরকার বটে, কিন্তু সেটুকু সংক্ষেপে জানিয়ে রাখা চাই,—সেই আসল কাজ ভুলে গেলে লেখকের কপালে মানিকের দশা ঘটতে কতোক্ষণ?

এই গল্পের পরেই হাতজোড় করে আনন্দ বলেছিল—ভাই, আমি কখনোই এ-কথা বলতে চাই নি যে, 'তুমি সেই মানিক'। —আর, কোনো দেশের কোনো পাঠক-সমাজকে মনুষ্যেতর জীব বলার অমার্জনীয় ধৃষ্টতা প্রকাশ করাও এ-গল্প শোনানোর নিহিত অভিপ্রায় নয়। আমি শুধু তোমাকেই সতর্ক করে দেবার জন্যে ঐ কাঁচাগোল্লার কথাটা তুললুম। কালানুক্রম রক্ষার দিকে বেশি মনোযোগ দেওয়া,—ভাষা কখন আড়ষ্ট ছিল, সে-প্রসঙ্গ নিয়ে বেশি মাথা-ঘামানো—বাংলা সাহিত্যের মাস্টারমশাইদের কাছে এসব কাঁচাগোল্লার মতো যতোই রসনা-রুচিকর মনে হোক, রচনায় যাঁরা স্বাদুতা খোঁজেন, তাঁদের কাছে এসব কচকচির আদর নেই। পাঠককে তুমি উৎপীড়িত করবে না তো?

[illegible] ছিলুম—ভাষাতত্ত্ব, ব্যাকরণ, বাদবিতণ্ডা [illegible] এ আলোচনায় কখনোই আনতে চাই

যা, কিন্তু কোন্ বই আমার কেন ভাল লেগেছে, সেটা তো বলা দরকার। বিশেষত রামমোহনের সাহিত্যিক দিক কিছু ছিল কি না, সে-কথা ভাবতে গেলে তাঁর ভাষার প্রসঙ্গ উহ্য রাখা কি সম্ভব?

সে বলেছিল—যা বলতে ইচ্ছে করো, যা প্রাসঙ্গিক, যা অনিবার্য, তা অবশ্যই বলতে হবে। কিন্তু 'ভুতো আর ঘোঁতো'র গল্পটাও এই সূত্রে মনে রেখো। এই বলে উপেন্দ্রকিশোরের দ্বিতীয় এই গল্পটি সে-আমাকে সংক্ষেপে শুনিয়ে দেয়—

শেয়ানা ভুতো ছিল বেঁটে, আর বোকা ঘোঁতো ছিল ঢ্যাঙা। দুজনে একদিন কুল খেতে যায় কুলতলায়। কুল-গাছটা ঘোঁতোর নাগালের মধ্যে,—তাই সে শুধু কুল পাড়ে, আর ভুতো শুধু গেলে। ঘোঁতো যখন কুল পাড়া শেষ করে নিজে কিঞ্চিৎ খেতে চেয়েছে, তখন দেখে কুলের চিহ্নও নেই। সে রেগে গিয়ে কুলগাছ কেটে ভুতোকে মারবার মতন লাঠি বানাতে যেতেই কুলগাছ তাকে বলে—'কী দিয়ে কাটবে? কুড়ুল কই?' কুড়ুল তাকে শান দেবার পাথর আনতে পাঠায়,—পাথর পাঠায় ভেজাবার জল আনতে,—জল পাঠায় হরিণের খোঁজে, কারণ হরিণ এসে জলে গা ভেজাবে, তবেই তো জল নেওয়া চলবে,—হরিণ পাঠায় তাকে ধরবার যোগ্য কুকুর আনতে,—কুকুর পাঠায় হরিণ-ধরার আগে নখ ভিজিয়ে নেবার মাখন আনতে,—মাখন বলে, 'তবে বেড়াল আনো, চেটে তুলুক',—বেড়াল বললে, 'দুধ দাও তবে, খাই আগে',—দুধের খোঁজে গরুর কাছে যেতে হয়েছিল ঘোঁতো-কে; গরু বলেছিল—'খড় আনো তবে, খাই আগে',—খড় খুঁজতে গিয়ে ঘোঁতো-কে শুনতে হয়েছিল চাষার দাবি—'আটা আনো, পিঠে খাবো',—মুদী একটি চালুনি দিয়ে অবশেষে ঘোঁতো-কে আটা ভেজাবার জল আনতে বলে নদী থেকে।

এই দ্বিতীয় গল্প শুনে আমি যৎপরোনাস্তি লজ্জিত হয়ে আনন্দকে বলেছিলুম—ভাই, সমালোচনার চালুনি আমি তবে রসের নদীতেই ফেলে দিলুম। কাজ নেই আমার বই-বাছাইয়ের পেডেন্ডায়।

আনন্দ বলেছিল—একটু ভয় থাকা ভাল, কিন্তু এতো লজ্জা কোরো না। রঘুবংশের তৃতীয় শ্লোকটি মনে আছে তো?—কালিদাসের মতন প্রতিভাধর ব্যক্তিকেও বলতে হয়েছিল—

মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ

অর্থাৎ, আমি মূর্খ হয়েও কবিযশ কামনা করেছি, অতএব দীর্ঘাঙ্গী পুরুষের পক্ষে যে ফল অধিগম্য, বামন যেমন লোভের বশবর্তী হয়ে সেই ফল পাড়তে হাত বাড়ায় এবং উপহাসের বিষয় হয়ে ওঠে, আমিও তেমনি উপহসিত হবো।—কালিদাস তা বলেছিলেন বটে, কিন্তু তবু তো 'রঘুবংশম্' রচনা স্থগিত থাকে নি।

অতএব ছেড়ে দিও না—শুরু হোক আধুনিক বাংলা সাহিত্যের বই-বাছাই। বলা, ভাষা-সমস্যার দিকও—হাঁ, হাঁ, রবীন্দ্রনাথের মত তো ঠিকই।

আমি বললুম—আমি শুধু বাংলা গদ্যের সৃষ্টিপর্বের আদি-অধ্যায় সম্পর্কেই যে এ-চিন্তা প্রাসঙ্গিক মনে করি তা নয়। আরো একটা ভাবনা আছে। কোনো কোনো পণ্ডিত বন্ধু আমাকে এভাবে এ-আলোচনায় নামতেই নিষেধ করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন তত্ত্বচিন্তা এবং তথ্যপরিবেষণ যে প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, তার পক্ষে রসরচনার ঢঙ মোটেই অনুকূল নয়। সেটিই আমার এই পরিকল্পনা পরিবেষণের মধ্যে স্বীকার্য তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা। এই চিন্তার ভাষা-প্রকৃতি এবং রচনা-রীতি দুই-ই গণ্য, দুই-ই বিবেচ্য।

—অর্থাৎ তোমার দ্বিতীয় চিন্তা আর তৃতীয় চিন্তার মধ্যে এই যোগ দেখা যাচ্ছে যে, একযুগের মন যে-ভাষায় আপনার চিন্তা-অনুভূতি-অভিজ্ঞতার কথা লিখে গেছে, সেই চিন্তা-অনুভূতি-অভিজ্ঞতার গুরুত্ব যাই হোক, উত্তরকাল তো সেইখানেই দাঁড়িয়ে নেই,—ভাষার সেই স্তর থেকে সময় সরে যায় অন্য সময়ে, অন্য স্তরে। তাই অতীতের চিন্তা ইত্যাদির আবেদন মোটেই ভাষা-নিরপেক্ষ ব্যাপার নয়। সেকালের ভাষা একালের বাছাইয়ে টিকবে কি টিকবে না, সে এক ধর্তব্য বিচার বটে। এই কারণেই বর্তমান ক্ষেত্রে রামমোহনের কোন্ রচনার কথা উল্লেখ করা দরকার, কিংবা তাঁর সমসাময়িক যাঁরা তাঁদেরই বা কোন্ কোন্ বইয়ের প্রসঙ্গ ধর্তব্য, সেটা ভাবনার বিষয়।

আমি বললুম—ঠিক।

সে বললে—তোমার তৃতীয় চিন্তা যেটি, সেটি বিতর্কের বিষয় বটে, তবে বিতর্ক যদি সঙ্কল্পকে স্থানচ্যুত করে দেয়, তাহলে বুঝতে হবে তুমি সমুচিত না ভেবেই এরকম রচনার অভিপ্রায় প্রকাশ করেছ।

আমি বললুম,—অভিপ্রায়কে সঙ্কল্পে পরিণত হতে দেবার জন্যেই তো পরিকল্পনার চিন্তা।

সে বলে—যেমন লিখিত ভাষার সঙ্গে কথিত ভাষার ভেদ আছে, তেমনি স্বীকৃত, অভ্যস্ত সাহিত্য-রীতির সঙ্গে নতুন প্রবর্তনার ব্যবধান থাকবেই। হরিমোহন, দীনেশ সেন, হারাণচন্দ্র রক্ষিত, রামগতি, সুকুমার সেন—এঁরা প্রত্যেকেই প্রতিষ্ঠিত রীতিতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখে গেছেন। আধুনিক পর্বে পৌঁছে, হরিমোহন তো রামমোহন, কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেব, হরপ্রসাদ কর (রায়), চণ্ডীচরণ সেন, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, রামরাম বসু ইত্যাদি এক-একটি নাম ধরে দু'-চার কথা লিখে গেছেন মাত্র। ওয়ায়েন স্মিথ, হাণ্টার, লং ইত্যাদির প্রসঙ্গও এইভাবে দেখা দিয়েছে। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, কাশীপ্রসাদ ঘোষ ইত্যাদিও দেখা দিয়েছেন। এ রীতি স্বীকৃত বটে, কিন্তু এ তো কেবল বিবরণ। এতে আলোচক নিজে বড়োই দূরস্থিত। তাঁর নিজের পাঠকমন প্রায় অনুপস্থিত।

আবার, রামগতি 'আদ্য', 'মধ্য', 'ইদানীন্তন'—এই তিন পর্বে তাঁর আলোচনা ভাগ করে নিয়ে 'ইদানীন্তন'-এর মধ্যে ভারতচন্দ্রের প্রসঙ্গও ধরেছেন,—'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী'-র দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়ের কথাও লিখেছেন। তিনি ১৮২৮ থেকে ১৮৩৩ অবধি একটি 'মানব যুগ' দেখিয়েছেন—

নিধুবাবু, রাম বসু, হরু ঠাকুর প্রভৃতি তাঁর আলোচনায় এই পর্বেই সূচিত,—যদিও তিনি লিখেছেন হরু ঠাকুর ১৭৩৯ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮১৪-তে তাঁর মৃত্যু হয়,—রাম বসুর আয়ুষ্কাল দেখিয়েছেন ১৭৮৬ থেকে ১৮২৮,—নিধুবাবুর ১৭৪১ থেকে ১৮৩৪। ঠিক এই প্রসঙ্গের পরেই রামগতি 'ইংরেজদিগের কৃত বাঙ্গালা ভাষার উন্নতি' শিরোনাম দিয়ে,—ন্যাথানিয়েল ব্রাসি, হ্যালহেড, সার চার্লস উইলকিন্স, উইলিয়ম কেরি,—মার্শম্যান,—ফকালব্রুক,—জোন্স ইত্যাদির প্রসঙ্গ ছুঁয়ে, রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য-চরিত্র' এবং 'লিপিমালা'-র কথায় এগিয়েছেন। তারপর রাজীবলোচন, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার,—রামমোহন রায়ের কথা আছে। রামমোহনের 'গৌড়ীয় ভাষার ব্যাকরণ'-এর কথা তো আছেই, তাছাড়া বাংলা সাহিত্যের দিক থেকে তিনি রামমোহনের এই দুটি দিক উল্লেখ করেন—'ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, রামমোহন রায়ের সময়েই তাঁহার রচিত......গ্রন্থসকল এবং তদুত্তরে পৌত্তলিকমতাবলম্বী ভট্টাচার্য মহাশয়দিগের রচিত গ্রন্থ ও পত্রিকা সকলের দ্বারাই বিশুদ্ধভাবে বাঙ্গালা গদ্য রচনার রীতি প্রথম প্রবর্তিত হইয়াছিল।' এ হোলো প্রথম দিক। দ্বিতীয় দিক—'রামমোহন রায়ের যে আর একটি মহতী শক্তি ছিল, এ পর্যন্ত তাহার উল্লেখ করা হয় নাই। তিনি অত্যুৎকৃষ্ট গান রচনা করিতে পারিতেন।' এই দ্বিতীয় গুণের উদাহরণ দিতে গিয়ে যে কয়েক ছত্র উদ্ধৃতি ব্যবহার করা হয়, সেগুলি বাঙ্গালীর খুবই পরিচিত বটে, কিন্তু তাতে কোন্ মহতী সাহিত্যশক্তি যে ব্যক্ত হয়েছে, একালের পাঠকের পক্ষে তা বড়োই সংশয়ের বিষয়। রামমোহনের সেই গানে মানুষের ভয়াবহ পরিণতির কথা ছিল বটে—

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর।
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু, তুমি রবে নিরুত্তর'
যার প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র কিবা জায়া
তার মুখ চেয়ে তত, হইবে কাতর।

গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ,
দৃষ্টিহীন নাড়ী ক্ষীণ, হিম কলেবর।
অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান,
বৈরাগ্য অভ্যাস কর, সত্যেতে নির্ভর।

না, না,—হরিমোহন বা রামগতি—এঁদের একজনও আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লেখেন নি ঠিক। এঁরা ইতিহাসের কিছু কিছু মালমশলা সাজিয়ে গেছেন। সেই সব মালমশলার কিছু কিছু সকলেরই কাজে লাগবে নিশ্চয়। কিন্তু বই-বাছাইয়ের এই বর্তমান পরিকল্পনা আদৌই সে রকম নয়।

আসল কথা, ব্যাকরণ সম্বন্ধে শ্রদ্ধা রেখেও যেমনএকথা মানতে হয় যে, ব্যাকরণ হোলো ভাষাকে বেঁধে রাখবার একটি ব্যর্থ আয়োজন,—অংশত ব্যর্থ তো বটেই,—সাহিত্য আস্বাদনের এবং তা প্রকাশের পথও তেমনি 'সাহিত্যের ইতিহাস'-এর পরিচিত রাজপথ যে হবেই, তার কোনো মানে নেই। অনেকেই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখেছেন,—আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আস্বাদন-ধর্মী টুকরো টুকরো আলোচনাও কিছু কিছু বিদ্যমান,—যেমন ইংরেজিতে লেখা শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর 'অ্যান একর অফ গ্রীন গ্রাস'। কিন্তু '১৮০০ থেকে আধুনিক কাল অবধি ধারাটি মনে রেখে,—কালক্রম বজায় রাখা,—ভাষারীতির পরিবর্তন সত্ত্বেও অতীতের বইগুলির নিহিত গুরুত্ব উপেক্ষা না করা,—অবান্তর প্রসঙ্গ এড়িয়ে যাওয়া,—চর্বিতচর্বণ পরিত্যাগ করা—এই সবই এই পরিকল্পনার অঙ্গীভূত।

রবীন্দ্রনাথের রচনা ধরেই বুদ্ধদেববাবু তাঁর আলোচনা শুরু করেছেন—তিনি প্রাক্-রবীন্দ্র ধারাটি ধরেন নি। তাঁর বইয়ের ষষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথমেই তিনি যা লিখেছেন তার মূল ইঙ্গিত এই—

> রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশকে ইউরোপের একটি অংশ করে দিয়ে গেছেন—বাঙালীকে তিনি বিশ্বভূমির বাসিন্দা করেছেন। আরো ঠিক ঠিক বলতে হলে কথাটা এইভাবে বলা যায় যে এদেশে বৃটিশ শক্তির প্রতিষ্ঠা থেকে অদ্যাবধি (তাঁর এই বই বেরোয় ১৯৪৮ খৃস্টাব্দে) যে মননস্তরগুলি চলে আসছে, রবীন্দ্রনাথ হচ্ছেন তারই শীর্ষবিন্দু। তিনিই সম্রাট—কিন্তু তাঁর সেই সাম্রাজ্যের জন্যে যেসব যুদ্ধের দরকার ছিল, সেরকম বড়ো বড়ো যুদ্ধ তাঁর পূর্বগামী রামমোহন এবং বিদ্যাসাগর এসে জয় করে গেছেন।

আমার চতুর্থ চিন্তা এই যুদ্ধ-বৃত্তান্তের পরিমাপ-সম্পর্কিত। অর্থাৎ, এইসব যুদ্ধের কথা কতোটা জায়গা পেতে পারে এ লেখায়—সেই চিন্তাই এ পরিকল্পনার চতুর্থ সমস্যা। বাঙালীর অধিগম্যতার সীমার মধ্যে 'আধুনিক মন' কথাটা আজ যা বুঝিয়ে থাকে—ভারতচন্দ্রের পরে রামমোহনের সময়ে পৌঁছে যে 'আধুনিকতা'র আমরা প্রথমে সাক্ষাৎ পাই,—এবং কালক্রমে দেশ স্বাধীন হবার ঘটনা পর্যন্ত সেই চেতনাকে যতোরকম পরিবর্তন বা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে এগুতে হয়েছে, সে-সব কথা বিশদভাবে আলোচনা করাও এখানকার অভিপ্রায় নয়। উনিশ-বিশ শতকের বাঙালী জীবনের পর্যালোচনা নয় এ লেখা। বাংলাভাষায় সে চেষ্টা অংশত অনেকেই করেছেন। শিবনাথ শাস্ত্রী, রাজনারায়ণ বসু, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল, শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ ইত্যাদি অনেক আলোচকের নাম মনে পড়ে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, কেশব সেন, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, সার আশুতোষ, চিত্তরঞ্জন, সুভাষচন্দ্র, শ্যামাপ্রসাদ ইত্যাদি কতো যে মনীষী নেতা দেখা দিয়েছেন এই সময়ে। কিন্তু বই-বাছাই তো মনীষী-গণনা নয়। 'বই-বাছাই' মানে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে যাবতীয় ঐতিহাসিক ঘটনা-নিরীক্ষাও নয়। রাখাল-দাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী,—

দরোজাটা খুলে দাও

দুর্গাদাস সরকার

সংসারের দরোজাটা খোলো; হে পৃথিবী, আমি ঘুরি
দিনরাত্রি। সব কিছু ধরা যায় তোমার যদিও,
শুধু সেই দরোজাটা খুলে দাও—দাঁড়িয়ে তুমিও
যেখানে রয়েছ। সবাই প্রবেশ করি। ছুরি ছুরি
প্রশংসার বাণী পেয়ে প্রতিদিন শাণিয়েছ ছুরি,
খন্ড খন্ড করে আমি বর্ণনায় অনির্বচনীয়—
সম্মান পেয়েছি বহু; অনেকেই করেছে সমীহ।
তবু জানি, সমুদ্রে অস্থির আজো পাথরের নুড়ি।

দিনরাত্রি বিভক্ত ঘন্টায়, পলে অনুপলে, মন
খন্ডীকৃত তিলে তিলে। সব ফুল দগ্ধ রৌদ্রে জ্বলে।
শুধু রঙের বাহারে কিংবা মুষ্টিভিক্ষা অন্নে ষোল-
কলা পূর্ণ হয় কবে? প্রত্যেকেই অন্ধ গৃহকোণ
জুড়ে ভাবে যেন এটাই সংসার। ছদ্ম সেই ছলে
আমি ঘুরি। হে পৃথিবী, সংসারের দরোজাটা খোলো।

জলের জীবন খুঁজে

বীতশোক ভট্টাচার্য

মাটির ঘটের নিচে মুখ পেতে রাখে নিজে, ঘাট ও আঘাট
খুঁজে দ্যাখে ঠা-ঠা রোদে; দুহাতে সরায়, খোঁড়ে বালি;
গোরুর ক্ষুরের মতো যেখানে সামান্য কুন্ড, চিহ্নে সাঁওতালি
অথবা তৃষার্ত পশু, সেখানেও বুক ঘষে : শুধু শাদামাটা
জলের জীবন খোঁজে, আটপৌরে কলসীর ভঙ্গুর কানাট
অসম্ভব ব্যঙ্গ করে; দুদন্ড ছায়ার পরে যেন বনতালী
খর রৌদ্রে রুক্ষতর—ঈর্ষা লাগে তাই যদি নদী পয়োনালা
হয়ে যায়; সূর্যাস্তেও মেঘ আসে, কুকুরের জিভে লাল, চাটা।

কেঁচো ও ক্রিমির কাছে কিছু কিছু ভিক্ষা নয়; ঝড় চায় : ঝড়ে
উড়বে ধুলো ও বালি, ছিন্নমূলে গর্ত হবে, ছুঁতে নাও ছুঁতে
জলচল এসে যাবে; ভেজাবে সে ভালোবাসা, অদৃশ্য ফল্গুতে
সপ্রাণ আনবে টান, বান, গান জীবনের বৃষ্টির নির্ঝরে;
বিষুবরেখার কাছে যৌবনের মতো সব উষ্ণ ঘটনাতে
অবিশ্বাস নেই বলে অবশ্য ভেঙেও পড়ে বর্ষণে, কান্নাতে।

যদুনাথ সরকার এঁদের ধীশক্তির উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাই। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার বা নীহাররঞ্জন রায়, বিমানবিহারী মজুমদার বা নীরদচন্দ্র চৌধুরী—এঁদের বীক্ষাশক্তি পরমাশ্চর্য। কিন্তু প্রত্যেকের পথ পৃথক।

আনন্দ বলেছিল—ঢের হয়েছে, এইবার ইতিবাচক ইঙ্গিত চাই। বলো স্পষ্ট করে—মোটামুটি সময়ের ক্রম অনুসরণ করে, গদ্য পদ্য গল্প নাটক,—এমন কি বিজ্ঞান, দর্শন,—রাজনীতি, ইতিহাস—বাংলায় লেখা যেসব বই তুমি পড়তে পেরেছ এবং পড়ে যা ভাল লেগেছে, সেই সব রচনার উল্লেখযোগ্য লক্ষণগুলি তুমি লিখে রাখতে চাও—এই তো?

আমি বললুম—কথাটা তুমি এমন গদ্যে বললে যে আর আমার লিখতে ইচ্ছে করছে না।

সে বললে—আবার মুষড়ে পড়লে তো? না, না, লিখতে আরম্ভ করে দাও। লেখকের কাজ লেখা, পাঠকের কাজ পড়া,—সমালোচক একাধারে লেখক এবং পাঠক।

আমি বললুম—তুমি ভুল করছো। মনে নেই, সমালোচনার চালুনী সেই যে নদীতে ফেলে দিলুম?

আনন্দ বললে—সেটা কি একটা বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা: লেখকরা লেখেন এক অবস্থায়,—পাঠকরা পড়েন অন্য অবস্থায় আসীন থেকে। ভেতরকার সমালোচক-মন নিজের মতন করে ব্যাখ্যা জুগিয়ে যায়। তুমি এই বই-বাছাইয়ের কাজে যেভাবেই নামো, ফল হবে সেই সমালোচনাই। সমালোচনার কি একটিমাত্র চাল? রবীন্দ্রনাথের চালের সঙ্গে কি বঙ্কিমচন্দ্রের চাল মেলে? রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' আর সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'পরিচয়' কি একইভাবে পুস্তক-পরিচয় চালিত করেছিল? মোহিতলাল মজুমদার আর বুদ্ধদেব বসু কি একই রীতির সমালোচক? শশাঙ্কমোহন সেন আর অতুলচন্দ্র গুপ্ত কি একই রীতির লেখক? সেকালের দেবেন্দ্রবিজয় বসু, ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য, পূর্ণচন্দ্র বসু, কালীপ্রসন্ন ঘোষ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, জ্ঞানেন্দ্রলাল রায, অক্ষয়চন্দ্র সরকাব,—হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রিয়নাথ সেন এবং অন্যান্য যাঁরা ছিলেন,—তাঁদের সঙ্গে একালের প্রবীণ গুণী শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টি কি একই লক্ষ্যে বাঁধা?

আনন্দ বলেছিল—বাংলা সাহিত্যে সমালোচকও অনেক দেখা দিয়েছেন—পারো তো, তোমার বই-বাছাইয়ের কাজে এগিয়ে এ-পথেও 'এক' আর 'অনেক'-এর তত্ত্ব যে বিদ্যমান, সেটা দেখিয়ে দিও।

আমি এতো কথা আগে ভেবে দেখি নি। আনন্দের সঙ্গে এই আলাপেব ফলে সত্যিই আমি চিন্তিত হই। তাই দেখে সে আমাকে যৎপরোনাস্তি উৎসাহ দিয়েছিল। বলেছিল—দুজনের কথা আমার বিশেষভাবে মনে পড়ছে যাঁরা তোমারও প্রিয় লেখক—একজন অন্নদাশঙ্কর রায়, দ্বিতীয় ব্যক্তি প্রমথনাথ বিশী। ওঁদের এক ধরণেব বইয়ের ভঙ্গি তো রম্যরচনারই ভঙ্গি—তোমার সেই পন্ডিত বন্ধুরা কি ওঁদের লেখা পড়েন নি? হোক্ রম্য-রচনা তবু 'বিনুর বই' কি চমৎকার নয়,—'বাংলা সাহিত্যের নর-নারী'—'চিত্র ও চরিত্র'—এসব কি চমৎকার নয়?

[ক্রমশ]

বর্ষ দর্শন

বস্তুত কেন্দ্রীয় সরকার যে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে কোনপ্রকার সহযোগিতাই করবেন না, বরং সুযোগ পেলে বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করবেন, একথা নতুন করে প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। যুক্তফ্রন্ট সরকার ভূমিষ্ঠ হবার পর থেকেই তার ভূরি ভূরি নিদর্শন পাওয়া গেছে। সম্প্রতি দুটি ঘটনায় তা আবার প্রমাণিত হয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে কলকাতায় চক্রবেড় রেল প্রসঙ্গে কেন্দ্রের কথার খেলাপ। প্রকাশিত সংবাদের ভিত্তিতে মোটামুটি এই সিদ্ধান্তে আসা গিয়েছিল যে, কলকাতায় চক্রবেড় না হলেও অর্ধ-চক্রবেড় রেলপথ শীঘ্রই স্থাপিত হচ্ছে, এ-বিষয়ে রেলদপ্তর রাজী হয়েছেন এবং কাজকর্মও নাকি শুরু হয়ে গেছে। এখন দেখা যাচ্ছে ও শুধু কথারই কথা, ওসব নিয়ে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রীর কোনপ্রকার মাথাব্যথাই নেই। দ্বিতীয় বিষয়টি হচ্ছে স্যাক্সবী কারখানার মালিকানা প্রসঙ্গ। সকলেই জানেন যে, এই কোম্পানী রেলের অত্যন্ত মূল্যবান সিগন্যালিং এবং ব্রেকিং-এর যন্ত্রপাতি তৈরি করেন। সম্প্রতি রেলের অর্ডার তেমন না পাওয়ায় কোম্পানী উঠে যাবার অবস্থায় এসে পৌঁচেছে। বিষয়টি অত্যন্ত জরুরী এবং বহু লোকের রুটি-রুজির সঙ্গে সম্পর্কিত হবার দরুণ রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, কেন্দ্র যদি ওই কোম্পানীর মালিকানায় অংশগ্রহণ করেন, তাহলে রাজ্য সরকার স্যাক্সবী কারখানার ভার নেবেন।

এই বিষয়ে উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর সঙ্গে রেলদপ্তরের উপ-মন্ত্রী শ্রীপরিমল ঘোষের সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা হয় দীর্ঘকাল ধরে। বিগত এক মাসের মধ্যে শ্রীপরিমল ঘোষ ক্যাবিনেট সাব-কমিটির সঙ্গে কয়েক দফা মিটিং করে শেষ বৈঠকে লিখিত প্রতিশ্রুতি দিয়ে যান যে, কেন্দ্রীয় সরকার এই কোম্পানীর মালিকানায় অংশগ্রহণ করবেন। এই প্রতিশ্রুতির পর হাওয়া অন্যখাতে প্রবাহিত হতে থাকে। রেলওয়ে বোর্ড তথা রেলমন্ত্রী ডঃ রামসুভগ সিং-এর সঙ্গে শ্রীপরিমল ঘোষের একটি টানাপোড়েন চলতে থাকে। ইতিমধ্যে রেলমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কে এক পত্রে সাফ জানিয়ে দিয়েছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার তথা রেলদপ্তর স্যাক্সবী কারখানার মালিকানায় অংশগ্রহণ করবেন না। এই দুটি ঘটনা থেকে একটি সিদ্ধান্তেই আসা যায়। তা হচ্ছে এই যে, কেন্দ্র বরাবরই পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে অসহযোগিতা করে যাবে। যুক্তফ্রন্ট নেতারা যে বলেন, কেন্দ্রের সঙ্গে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালিয়ে না গেলে কিছুই হবে না, কথাটা মোটেই মিথ্যা নয়।

পাট

ভারতীয় পাটের অর্ধেকের বেশি উৎপন্ন হয় পশ্চিমবঙ্গে। এবারে পাটের ফলন ভাল হবারই সম্ভাবনা আছে, কিন্তু পাটচাষীর ভাগ্য যে তাতে ফিরবে তেমন কোন সম্ভাবনা নেই। কৃষিমন্ত্রী শ্রীকানাই ভট্টাচার্য সম্প্রতি বলেছেন যে, পাট উৎপাদনের দায়িত্ব রাজ্য সরকারের, কিন্তু তার মূল্য ধার্য করবে কেন্দ্রীয় সরকার, এই দ্বৈত নীতিই পশ্চিমবঙ্গের পাটচাষ ও পাটশিল্প উভয়েরই ক্ষতি ডেকে আনছে। কেন্দ্রীয় সরকার উদ্বৃত্ত পাট ৪০ টাকা মণ দরে ক্রয় করতে চাইছেন, কিন্তু এই দর পাটচাষীর পক্ষে লাভজনক হবে না বলেই পশ্চিমবঙ্গের কৃষিমন্ত্রীর বিশ্বাস। পাট ভারতের সর্বাধিক বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী পণ্য, কিন্তু পাটচাষীদের অবস্থা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আছে। যে বছর পাটের উৎপাদন কম হয়, সে বছর পাটচাষীরা পাট চাষে সামান্য কিছু লাভ করে থাকেন বটে (যেমন গত বছর হয়েছিল), তবে পরের বছর পাটের ফলন ভাল হলে তাদের লোকসানে পড়তে হয়, কেন না তখন আর পাটের ন্যায্য দাম পাওয়া যায় না। পাট চাষের ব্যয় ইদানীং ভীষণভাবে বেড়ে গেছে। এবারে পাটে উদ্বৃত্ত ফলনের সম্ভাবনা আছে দেখে ইতিমধ্যেই পাট নিয়ে নানা ফাটকাবাজি শুরু হয়েছে, উদ্দেশ্য চাষীকে তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করা। সরকার উদ্বৃত্ত পাট ক্রয় করার সিদ্ধান্ত করেছেন বলে শোনা গেছে, কিন্তু এই সিদ্ধান্তের কথা চাষীদের কাছে প্রচারিত হয় নি।

পাটের দালালরা ইতিমধ্যেই গ্রামাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে এবং যতদূর সম্ভব কম দরে বায়না দিচ্ছে। পাট ক্রয়-বিক্রয়ের প্যাচে প্রতি বছর মোটা মুনাফা মিল মালিকদের ঘরে আসছে। তারা যে-দরে পাট ক্রয় করে, তার চেয়ে অনেক বেশি দর খাতায় লিখে রাখে, এই বাড়তি টাকাটা কোম্পানীর প্রধান পরিচালকদের ঘরে গিয়ে ঢোকে। গতবারে পাটের ফলন ভাল না হওয়ার অজুহাতে বিভিন্ন চটকলে ব্যাপক ছাঁটাই হয়েছে। অর্থাৎ এককথায় যে শিল্প ভারতবর্ষকে বৈদেশিক মুদ্রা যোগায়, তার উৎসস্বরূপ পাটচাষ ও পাটচাষীদের প্রতি কোন দায়িত্ব পালন করার বোঝা বইতে কেন্দ্রীয় সরকারও নারাজ, কলওয়ালারাও নারাজ। স্বার্থের বেলায় তাঁরা, লোকসানের বেলায় পাটচাষী এই নীতিই শেষ পর্যন্ত সর্বনাশ ঘটাবে। পাটচাষী যদি ভাল দাম না পায়, তার পক্ষে পাটচাষ করার কোন সার্থকতাই নেই, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে যখন পাটচাষের জমিকে অন্য প্রয়োজনেও ব্যবহার করা যায়। পশ্চিমবঙ্গের কৃষিমন্ত্রী তাই সঙ্গতভাবেই দাবি করেছেন যে, পাটের সর্বনিম্ন মূল্য ৪০ টাকার পরিবর্তে মণ-প্রতি ৫০ টাকা করা হোক। এতে পাটচাষীদের স্বার্থ বহুলাংশে রক্ষিত হবে।

ঘেরাও প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী

গতবারের তুলনায় এবারে ঘেরাও-এর সংখ্যা কম। ঘেরাও নিয়ে নানা ধরণের বিতর্ক প্রচলিত আছে এবং এ-বিষয়ে একটি নির্দিষ্ট সরকারী নীতিও স্থির হওয়া দরকার। কিন্তু ঘেরাও যত না বিপজ্জনক, ঘেরাও নিয়ে অতিকথন তার চেয়েও বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছে গেছে এবং বেশ কয়েকটি সংবাদপত্র এই বিষয়ে উৎসাহী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সাম্প্রতিক একটি সাক্ষাৎকারে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ঘেরাও সম্পর্কে অত্যন্ত সুচিন্তিত অভিমত জ্ঞাপন করেছেন। তাঁর মতে কেন্দ্রে যতদিন পর্যন্ত কংগ্রেস সরকার থাকবে, ততদিন পর্যন্ত আমরা ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার হাত থেকে মুক্ত

নাম্বার টেন সিগারেটের পরম তৃপ্তি-দায়কতার মূলে
মাত্র একটি সমীচীন কারণঃ
নিবিড় স্বাদে ও গন্ধে পরিপূর্ণ নাম্বার টেন
ভারতের সমশ্রেণীয় সিগারেটের মধ্যে
সবচেয়ে বেশী মিঠে আমেজ জোগায়—মধুর আবেশ জাগায়।
তাই তো হওয়ার কথা,—
নাম্বার টেন-এ আছে দেশের উৎকৃষ্ট ভার্জিনিয়া তামাক
—যা সংগ্রহ; পরিপক্ক এবং ব্লেণ্ড করার দায়িত্ব নিয়েছেন অভিজ্ঞ তামাক বিশেষজ্ঞরা।
মিঠে আমেজের বিলাসে...
নাম্বার টেনের
পরিচয়
মূল্যের পূর্ণ মর্যাদা দেয়
NUMBER TEN
VIRGINIA
ACI/NTH-60B

হতে পারছি না। ফলে শিল্পে শ্রমিক ও মালিক দুই পক্ষই থাকছে। এই অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার দুর্বলপক্ষ অর্থাৎ শ্রমিকপক্ষ সমর্থন করতে বাধ্য। কাজেই ঘেরাওকে আইন করে নিষিদ্ধ করা শ্রমিক স্বার্থের প্রতিকূলে কাজই হবে। তবে শ্রীমুখোপাধ্যায়ের মতে যাতে রাজ্যের জনসাধারণের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি পায়, সেদিকেও গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন এবং এই দিকটা বিবেচনা করেই শ্রমিক-মালিক বিরোধ মীমাংসার জন্য স্থায়ী সংস্থা গড়া দরকার। তিনি চান যে মালিকপক্ষ বা শ্রমিকপক্ষ এমন কিছু করবেন না যাতে উৎপাদন ব্যাহত হয়। ঘেরাও আইনসঙ্গত কি-না, তা নিয়ে বিতর্ক আছে। কিন্তু ধর্মঘট তো আইনসঙ্গত। ধর্মঘট হোক এটাও তিনি চান না। সঙ্গে সঙ্গে ছাঁটাই, লে-অফ, সাসপেনশন প্রভৃতি শ্রমিক-বিরোধী ব্যবস্থারও তিনি বিরুদ্ধে। মুখ্যমন্ত্রীর মতে বর্তমানে শ্রমিকপক্ষকে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণের দিকে ঠেলে দিয়ে আইনের সাহায্যে দাবি আদায় করতে বহু সময় লেগে যায়। শ্রমিক সংগঠনে অত্যন্ত জোরদার না হলে শ্রমিকেরা বহু অর্থ ব্যয় করে আইনের সুযোগ নিতে পারে না। বস্তুত প্রচলিত আইন শ্রমিককে তার দাবি আদায়ে কোন অধিকারই দেয় নি এবং শ্রমিককে প্রবঞ্চিত করার "আইনানুগ" বহু সুযোগই মালিকপক্ষের আছে। ট্রাইব্যুনালের রায় মালিকের বিপক্ষে গেলেও মালিক তার প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করতে পারে। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের কথা বাদ দিলেও, এমন কি উন্নত বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলিতে মালিকশ্রেণী যে চরিত্র ও মনোভাবের দ্বারা চালিত হয়, এদেশের মালিকদের মনোভাবের সঙ্গে তার তুলনা করা চলে না। সেখানে যে শোষণ চলে তার প্রকৃতি কিছুটা রিফাইন্ড, এখানে তা একেবারেই ক্রুড। কাজেই শ্রমিক আন্দোলনও যদি ঘেরাও-এর মত ক্রুড ফর্ম নেয়, সেখানে আপত্তি করার কোন নৈতিক কারণ নেই। তবে শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, যত্রতত্র ব্যবহারে যে-কোন অস্ত্রেরই গুণ নষ্ট হয়ে যায়, কাজেই ঘেরাও একটু সতর্কতার সঙ্গে প্রয়োগ করাই বাঞ্ছনীয়। তবে অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, শিল্পক্ষেত্রে ঘেরাও গতবারের তুলনায় এবারে অনেক কম।

কিন্তু শ্রমবিরোধের ক্ষেত্র ছাড়া অন্য কোথাও ঘেরাও চলবে না বা চলা উচিত নয়। বিভিন্ন শিক্ষায়তনে যে ঘেরাও চলছে, তা বন্ধ করতে হবে। জোর করে পদত্যাগপত্র লিখিয়ে নেওয়ার জন্য ঘেরাও এবং অপরাপর দলগত, পাড়াগত, ব্যক্তিগত কারণে ঘেরাও, যেগুলি সম্প্রতি অত্যন্ত ব্যাপক হয়েছে তা দৃঢ়তার সঙ্গে বন্ধ করা দরকার।

মূল্যবৃদ্ধি ও যুক্তফ্রন্ট

অত্যাবশ্যক পণ্যের পাইকারী ব্যবসায়ীদের রাইটার্স বিল্ডিংসে ডাকিয়ে খাদ্যমন্ত্রী শ্রীসুধীন কুমার পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন যে, আগামী তিন সপ্তাহের মধ্যে যদি তেল, ডাল, মশলা ইত্যাদির দাম না কমানো হয়, তবে সরকার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হবেন। একই কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় ও উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু। খাদ্যমন্ত্রী পরিসংখ্যানের সাহায্যে দেখিয়েছেন যে, গত বছরের জুন মাসের তুলনায় এ-বছরে সরিষার দাম কুইন্টাল প্রতি প্রায় ২৫-৩০ টাকা বেড়ে গেছে। দুমাস আগেও প্রতি কুইন্টাল সরিষার দাম ছিল ১৫২-১৫৪ টাকা, কিন্তু এখন তা ১৭৯-১৮৫ টাকায় চড়ে গেছে। এছাড়া মুগ, মুসুর ও ছোলার ডাল, ধনে, জিরে, গোলমরিচ ইত্যাদি মশলার দামও অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে গেছে। এই জিনিসগুলির বেশির ভাগই পশ্চিমবঙ্গের বাইরে থেকে আসে এবং এগুলির মূল্যবৃদ্ধির পিছনে পাইকারদের কারসাজি ছাড়া আর কোনই কারণ নেই। সোজা কথা বড়বাজারই হচ্ছে এই দর বাড়ানোর ব্যাপারে একমাত্র নিয়ামক। সরকার ব্যবসায়ীদের ন্যায্য মুনাফা দিতে যে অনিচ্ছুক নন, শ্রীকুমার ব্যবসায়ী সমিতিগুলির প্রতিনিধিদের তা-ও জানিয়েছেন, কিন্তু তাঁরা চান যে, ব্যবসায়ীরা যাতে সীমা ছাড়িয়ে না যান। কিন্তু কথা হচ্ছে যে, সরকারের এই অনুরোধে কর্ণপাত যদি ব্যবসায়ীরা না করে, তাহলে সরকার কি করবেন? এ-বিষয়ে নরম মনোভাব অবলম্বন করলে হবে না। অত্যাবশ্যক পণ্যসমূহের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের পি-ডি অ্যাক্টে গ্রেপ্তার করা দরকার। আসলে শাস্তির ভয় না থাকলে শুধু উপদেশ দিয়ে কোন কাজ হবে না।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থসঙ্কট

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীহীরেন মজুমদার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিনিধিদের নিকট বিশ্ববিদ্যালয়ের শোচনীয় আর্থিক দুরবস্থার কথা উল্লেখ করে জানিয়েছেন যে, আগামী পুজোর আগে অন্তত ষাট লাখ টাকা না পেলে বিশ্ববিদ্যালয় চালানোই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। বিশ্ববিদ্যালয় তার আয় ও ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের সঙ্গে তাল রাখতে পারছে না। ১৯৬৯-৭০ সালের বাজেটে দেখানো হয়েছে যে, বিশ্ববিদ্যালয়কে আয়ের তুলনায় ১ কোটি ৯ লক্ষ টাকা বেশি ব্যয় করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাহায্যে বিভিন্ন বিভাগের সম্প্রসারণ ঘটানো হয়েছে এবং সাহায্যের সর্ত অনুসারে পাঁচ বছর খরচ চালিয়ে যাবার পর কমিশন এখন ওইসব সম্প্রসারিত বিভাগের দরুণ বাড়তি খরচ আর দিচ্ছেন না। রাজ্য সরকারের অনুমতি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞানের ছয়টি বিষয়ে এবং কলা ও বাণিজ্যের চারটি বিষয়ে যেসব নতুন সেকশন খুলেছিলেন, সেগুলির দরুণ এক বছর সাহায্য দেবার পর রাজ্য সরকার হাত গুটিয়ে নিয়েছেন, যার ফলে পৌনে চার লক্ষ টাকা বাড়তি ব্যয়ের দায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘাড়ে চেপেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাবৃদ্ধি ইত্যাদি ব্যাপারেও ব্যয়ের বোঝা বেড়েছে, অথচ আয়ের সূত্র বাড়ে নি। সতের বছর আগে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ১৬ লক্ষ টাকার বার্ষিক বরাদ্দ রাজ্য সরকার করেছিলেন, আজও সেই অঙ্ক একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা এখন বোধ হয় ভারতের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় হতাশাজনক, যদিও এখানে পঠন-পাঠনের মান ভারতের যে-কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনায় উঁচু। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রপিছু ব্যয় গড়ে মাত্র ৭২ টাকা, ভারতের যে-কোন বিশ্ববিদ্যালয়েই এর পরিমাণ কলকাতার তুলনায় দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, এমন কি চতুর্গুণ। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান আর্থিক দুরবস্থার জন্য প্রশাসনিক গাফিলতি কিছুটা দায়ী হলেও সরকারী অবহেলাই বোধ হয় সবচেয়ে বেশি দায়ী। গত বিশ বছরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গচ্ছেদ করা হয়েছে, নতুন নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমাকে সঙ্কুচিত করা হয়েছে, কিন্তু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি যে দায়িত্ব রাজ্য সরকারের পালন করা উচিত ছিল, তা কোনদিনই করা হয় নি বলেই এই প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে শোচনীয় অবস্থায় উপনীত হয়েছে। সীমাবদ্ধ আর্থিক সঙ্গতিতে হাত-পা বাঁধা যুক্তফ্রন্ট সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্থিক সমস্যা সমাধানের জন্য কি করবেন জানি না, হয়ত সাহায্যের পরিমাণ কিছুটা বাড়াবেন, কিন্তু তাতে সত্যিকারের সমস্যার সমাধান হবে না।

দুর্গাপুর কর্মীদ্বয়ের অনশন

দুর্গাপুরে প্রোজেক্টস্-এর দুজন কর্মী কলকাতা থেকে অফিস স্থানান্তরকরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে আমরণ অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন। এই সংবাদ লেখার সময়ে উক্ত

অনশনের একাদশতম দিবস অতিক্রান্ত হয়েছে। শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীসুশীল ধাড়া এ ব্যাপারে এক অনমনীয় মনোভাব নিয়েছেন। অথচ মনে হয় সামগ্রিক অবস্থাটা এ'দের সামনে বিশ্লেষণ করে দিলে, বা সত্যই যদি অফিস স্থানান্তরকরণ বন্ধ করা একান্তই অসম্ভব না হয়, সেইমত ব্যবস্থা অবলম্বন করলে এই অস্বস্তিকর অবস্থাটা সহজেই এড়ানো যেত। এই বিষয়টির নিষ্পত্তি হওয়া এই মুহূর্তেই প্রয়োজন। এখানে নিশ্চয়ই কোন প্রকার মান-মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত নেই। যে সরকার নিজেকে শ্রমিকদরদী বলে পরিচয় দেন, তার পক্ষে বিষয়টিকে ঝুলিয়ে না রেখে যথাবিহিত ব্যবস্থা এই মুহূর্তেই করা উচিত।

শিক্ষায়তনে ঘেরাও

শিক্ষায়তনে ঘেরাও সম্প্রতি একটি নতুন ব্যাধিরূপে উপস্থিত হয়েছে এবং সচরাচর বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকা এই ঘেরাও-এর কবলিত হচ্ছেন। ঘেরাও করে, অর্থাৎ জবরদস্তি করে তাঁদের কাছ থেকে পদত্যাগপত্র লিখিয়ে নেওয়া হচ্ছে। প্রায় ২৫টি স্কুলে ঘেরাও-এর দ্বারা প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকাকে নাকি পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হয়েছে। এই সকল ঘেরাও এবং পিছনে রাজনৈতিক মতলববাজী যে থাকে তাতে কোন সন্দেহ নেই। শুধু প্রধান শিক্ষক বা শিক্ষিকাই নন, ম্যানেজিং কমিটির সদস্যদের ঘেরাও করে তাঁদের কাছ থেকে জোর করে পদত্যাগপত্র লিখিয়ে নেওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। আমাদের জিজ্ঞাস্য এ বিষয়ে সরকারী নির্দেশ কি এবং শিক্ষামন্ত্রী কি ভাবছেন? এ জাতীয় বর্বরতা চলতে দেওয়া যে বাঞ্ছনীয় নয় সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না। শ্রমশিল্পে ঘেরাও-এর হয়ত কোন সার্থকতা থাকতে পারে, কিন্তু শিক্ষায়তনে এভাবে ঘেরাও-এর দ্বারা রাজনৈতিক মতলববাজী সিদ্ধ করা একটা ক্রিমিনালিটি। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বেশির ভাগ স্কুল-কলেজই রাজনীতির আখড়ায় পরিণত হয়েছে এবং এগুলির পিছনে কিছুসংখ্যক শিক্ষক সংশ্লিষ্ট আছেন, যাঁরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ছাত্রদের উস্কানি দিয়ে এই সব কাণ্ড ঘটাচ্ছেন। যে-সব স্কুলের ম্যানেজিং কমিটি ভিন্ন রাজনৈতিক দলের কবলিত সেখানে ঘেরাও মারফৎ সেই কমিটিকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। এই অপকর্মগুলি সম্পর্কে রাজ্য সরকার এখনো উদাসীন রয়েছেন। আমরা আশা করব যে, শিক্ষামন্ত্রী বিষয়টির গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হয়ে এই উৎপাত বন্ধ করার জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশ জারী করবেন।

দুর্গাপুর প্রোজেক্টস্-এর কর্মীদের অনশন : শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীধাড়ার অনমনীয় মনোভাব।

স্বাস্থ্য ও পূর্তমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ

পশ্চিমবঙ্গ হাসপাতাল কর্মচারী সমিতির সম্পাদক সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশের জন্য একটি পত্র পাঠিয়েছেন, যা আমরা স্বাস্থ্য ও পূর্তমন্ত্রীদ্বয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য এখানে প্রকাশ করছি:

"ইডেন হসপিট্যাল রোডের ডি ব্লকে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের কোয়ার্টার্সের অনাময় ব্যবস্থার (স্যানিটেশন) অব্যবস্থার এক গুরুতর অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে অবহেলিত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কোয়ার্টার্সের চার তলা থেকে নিচের ঘর পর্যন্ত ময়লা নিষ্কাশনের সিমেন্টের মোটা পাইপগুলি এমন ভগ্ন ও জরাজীর্ণ অবস্থায় ঝুলছে যে, যে-কোনও সময় ঐগুলি পড়ে গিয়ে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটতে পারে, যার ফলে বহু লোকের প্রাণহানি হতে পারে। সিমেন্টের পাইপগুলি জঞ্জাল জমে বহুদিন ধরে অকেজো হয়ে পড়ে আছে। এ ছাড়া নিচে যেখানে খাবার জল পাম্প করে ওপরে তোলা হয়, সেখানে মাঝে মাঝে ময়লা জল পরিশ্রুত জলের সঙ্গে মিশে যায়, ফলে ঐ জল পান করে কর্মচারীরা নানা রকমের অসুখে ভুগছেন। সিঁড়ির কাঁচের আবরণগুলি ভেঙে যাওয়ায় বর্ষার সময় ঘরগুলি জলে ভেসে যায়। এদিকে আবার খোদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মধ্যে গ্রীন ওয়ার্ডের পিছনে যে পায়খানা ও প্রস্রাবাগারটি আছে, তা দীর্ঘদিন মেরামতের অভাবে একটা নরককুণ্ডে পরিণত হয়ে রয়েছে, সেখানে বিজলীবাতি জ্বলে না। ফ্লাসটি অকেজো, ময়লা জল নিষ্কাশনের কোনও ব্যবস্থা নেই। দরজার কপাটগুলি নেই বললেই চলে। পায়খানার মধ্যে মল-মূত্র প্রায় সবসময় মেঝেতে ভাসে। ইডেন হাসপাতাল ও গ্রীন ওয়ার্ডের যাবতীয় ময়লা ঐ পায়খানাটির পাশে একটা ঠেলাগাড়িতে জমা করে রাখা হয়, ফলে সবরকম দুর্গন্ধ গ্রীন ওয়ার্ডের রুগীদেরও অতিষ্ঠ করে তোলে। অথচ গ্রীন ওয়ার্ড ও ইডেন হাসপাতালের রুগীদের, নিউ ও ওল্ড নার্স কোয়ার্টার্সের আবাসিক নার্সদের আত্মীয়স্বজন, হাসপাতালের অনেক কর্মচারী এবং বাইরের জনসাধারণের এই পায়খানা ও প্রস্রাবাগারটি ব্যবহার করা ছাড়া গত্যন্তর নেই।"

(২১।৬।৬৯)

ভারত দর্শন

রাজ্যের [illegible] ক্ষমতা

শুধু দুটি কমিউনিস্ট রাজ্যের চীৎকার নয়, রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে তাঁর প্রতিবেদন পেশ করেছেন প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের চেয়ারম্যান শ্রী কে হনুমন্তিয়া।

প্রশাসন সংস্কার কমিশনও মনে করেন, রাজ্যের হাতে অধিকতরভাবে প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা দান করা একান্ত প্রয়োজন। এই প্রয়োজন ১৯৬৭ সালের আগে দেখা দেয় নি, কারণ কেন্দ্রে রাজ্যে ছিল একই দলভুক্ত সরকার। আজ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন হয়েছে। সুতরাং বস্তুতপক্ষে কেন্দ্রের হাতে ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার পুঁজিপতি মনোভাব কেন্দ্রকে ত্যাগ করতেই হবে। ইদানীংকালের এই সমালোচনাকেই সম্ভবত হনুমন্তিয়া কমিশন উপলব্ধি করেছেন আর তাই কমিশনের প্রতিবেদনে এই পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে তাল রাখার পরামর্শও প্রদত্ত হয়েছে।

কমিশন মনে করেন, রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা থাকলে কেন্দ্রের সঙ্গে সহজ সমঝোতা সৃষ্টির সহায়কই হবে। বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে একটি আন্তঃরাজ্য পর্ষদ গঠন প্রয়োজন। ঐ পর্ষদের চেয়ারম্যান হবেন প্রধানমন্ত্রী। আর সদস্য থাকবেন অর্থ এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কোন বিশেষ বিষয় সংক্রান্ত আলোচনায় সংশিলষ্ট কেন্দ্রীয় মন্ত্রীকেও এবং মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানানোর পরামর্শ আছে।

নিঃসন্দেহে এই প্রস্তাবটি যথার্থ বাস্তব দৃষ্টিসম্ভূত। 'ল' এণ্ড অর্ডারের অধিকর্তা এবং কেন্দ্রীয় পুঁজির মালিক অর্থমন্ত্রী না থাকলে কোন ব্যাপারের ফয়সালাই হতে পারে না। এঁদের থাকার তাই বিশেষ প্রয়োজন।

পরিকল্পনা রূপায়ণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সাহায্যের চরিত্র কেমন হবে, এ সম্পর্কে কমিশনের সুপারিশও যথার্থ সমস্যার প্রতি দৃকপাতে উন্মুখ। সুপারিশটি হল, যে খাতে রাজ্যকে ঋণ দেওয়া হবে, সেই খাতে আয়ের প্রতি দৃষ্টি রেখে ঋণ পরিশোধের শর্ত স্থির করা দরকার। উৎপাদনমূলক কর্মসূচীতে ঋণ; কিন্তু উৎপাদন বহির্ভূত বড় প্রকল্প রূপায়ণের ক্ষেত্রে দেওয়া উচিত মূলধনী সাহায্য। এমন কি অতীতে গৃহীত ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রেও কমিশন একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের প্রস্তাব রেখেছেন। সাহায্য বণ্টনের নীতিনিয়ামক হবেন অর্থ কমিশন; কোন মন্ত্রক নয়। কমিশনের এই সুপারিশটিও উল্লেখযোগ্য।

রাজ্যপালের ক্ষমতার সীমা

অকংগ্রেসী সরকার ভাঙার খেলায় রাজ্যপাল অংশ গ্রহণ করার পর এতাবৎকাল (১৯৬৭-র আগে স্বাধীন ভারতে) পুতুল রাজ্যপালক সম্বন্ধে সকলেই সচেতন হয়ে উঠেছেন। প্রশাসন সংস্কার কমিশনও এ সম্পর্কে সুপারিশ নথিবদ্ধ করলেন। রাজ্যপালের ক্ষমতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশাত্মক নীতি থাকা দরকার, সেই নীতি কেন্দ্র গ্রহণ করবে এবং রাষ্ট্রপতির নামে তা প্রচারিত হবে এবং এই নীতিসমূহ সংসদে উত্থাপনও করা যাবে।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর ব্যাপারে অবাধ সুপারিশ

শৃঙ্খলা রক্ষা ও কেন্দ্রীয় সম্পত্তি রক্ষার ব্যাপারে শিল্পরক্ষী বাহিনী নিয়োগ করার ক্ষেত্রে কেন্দ্রের অবাধ সুযোগ থাকা উচিত—এই মর্মে প্রশাসন সংস্কার কমিশনের সুপারিশটি গোলমেলে। একদিকে এই কমিশন রাজ্যের হাতে অধিক ক্ষমতা দানের প্রস্তাব করেছেন আবার অন্যদিকে চাইছেন রাজ্যের প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও থাক কেন্দ্রের খবরদারির অবাধ সুযোগ। আপাতযুক্তি অবশ্য এমনভাবে সাজানো যে, বলা যায় না কেন্দ্রীয় সশস্ত্র রক্ষী বাহিনীগুলি রাজ্যের ক্ষমতা খর্ব করতে উদ্যত। কিন্তু সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী শিল্পরক্ষী বাহিনী সম্পর্কে কোন কোন রাজ্যের মন্ত্রিসভা ইতিপূর্বেই প্রতিবাদ রেখেছেন। এই প্রতিবাদ কংগ্রেসী মন্ত্রীদের তরফ থেকেও উঠেছিল।

কেন্দ্রীয় রিজার্ভ বাহিনীর হস্তক্ষেপের ফলে রাজ্যের পরিস্থিতি কতদূর জটিল হতে পারে অকংগ্রেসী রাজ্যে তারও কিছু পরিচয় ইতিমধ্যেই পাওয়া গেছে। অতঃপর শিল্পরক্ষী বাহিনী যে কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ককে আরও তিক্ত করবে তা অনুমান করা শক্ত নয়। কিন্তু প্রশাসনিক কমিশন এই প্রশ্নটির বিচিত্র জটিলতার ওপর তেমন গুরুত্ব আরোপ করেন নি। কেন্দ্রের হাতে ঢালাও ক্ষমতা রক্ষা করারই প্রস্তাব রেখেছেন। রাজ্য-কেন্দ্রের শিল্পনীতির সংঘাত ভবিষ্যতে অবস্থা জটিলতর করবেই আর সেক্ষেত্রে ঘন ঘন কেন্দ্রীয় শিল্পরক্ষী বাহিনীর হস্তক্ষেপ ঘটবে। আলোচ্য বিষয়টিতে কমিশন সুতরাং যথেষ্ট দূরদৃষ্টির প্রয়োগ করেছেন, এমন কথা অনেকেই হয়ত স্বীকার করবেন না।

বিহারে কংগ্রেস কোয়ালিশনের পতন

সরকারপক্ষে ১৪৩ আর বিপক্ষে ১৬৪ ভোট—তাও আবার ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুরীর দাবির ওপর। সুতরাং সরকার আর টেকে না। সভা মুলতুবী হয়ে যায়। একশ পনের দিনের মুখ্যমন্ত্রীর গদি ছেড়ে নেমে আসেন সর্দার হরিহর সিং। রাজ্যপাল কানুনগোর হাতে তুলে দেন পদত্যাগপত্র।

বিহার রাজ্য কংগ্রেসেই তাঁর বিরুদ্ধে একাংশের বিক্ষুব্ধ প্রশ্নাদি জমে উঠছিল। কংগ্রেস নেতৃত্ব চাইলেই হরিহর সিং সরে দাঁড়াবেন, এমন আশ্বাসও তিনি দিয়েছিলেন। কিন্তু অতটা আর গড়াতে হল না। বিরোধীরাই জোরচেষ্টার শোষিত দল এবং হুল ঝাড়খণ্ড ও নিখিল ভারত ঝাড়খণ্ড দলের যোগসাজসে ভোটাভুটির সময় ভেঙে দিলেন ১১৫ দিনের কংগ্রেসী কোয়ালিশন। বিকল্প ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত শ্রীসিং-ই কাজ চালিয়ে যাবেন বটে, তবে বাজেট বরাদ্দ পাশ করানোর জন্য আপাতত কোনও টালবাহানা সম্ভব হবে না। বিকল্প মন্ত্রিসভা গঠন করতে হবে। আর সেজন্য রাজ্যপাল তিনটি বিরোধী দলের নেতাদের ডেকেও পাঠিয়েছেন।

বিরোধী দল পুনরায় ক্ষমতায় এলে সম্ভবত নেতৃত্বের আসনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভোলা পাশোয়ান শাস্ত্রীকেই

পুনশ্চ বসানো হবে। তবে কংগ্রেসীরা বলছেন, সে মন্ত্রিসভাও টিকবে না। একক বৃহত্তম দল কংগ্রেসই কোয়ালিশনে টিকল না, অন্যে পরে কা কথা।

বিহার কংগ্রেস মন্ত্রিসভার পতন সেই পুরাতন প্রবাদ গল্পটিই স্মরণ করিয়ে দেয়—দুধকলা দিয়ে সাপ পোষার গল্প। মহামায়া মন্ত্রিসভা পতনের উদ্দেশ্যে কংগ্রেসই জন্ম দিয়েছিল শোষিত দলের। তারপর এই শোষিত দলকে হরিহর সিং-এর মন্ত্রিসভায় যথাসাধ্য গদিবণ্টন করে লালন-পালন করা হতে থাকে। কিন্তু প্রেতের খেলায় সর্বনাশ এইভাবেই হয়। প্রেত তার খেলোয়াড়কেই একদিন পথে বসায়। শোষিত দল প্রতিপালক খেলোয়াড় কংগ্রেসকেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে আবার 'মেষে পাল্টেছে'। মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ ও দপ্তর বণ্টন ও'দের খুশি করতে পারে নি। এবার বিরোধীদের সঙ্গে একটু তালু-ঝাঁকিয়ে আরও একটু ব্যবসায়িক পসার বাড়াবার ফিকির। প্রকাশ, শোষিত দলের সদস্য, যিনি হরিহর সিং মন্ত্রিসভার নদী উপত্যকা প্রকল্প মন্ত্রীর গদি পেয়েছিলেন, তিনি রাষ্ট্রমন্ত্রী জগদেও প্রসাদের সঙ্গে দলীয় সদস্যদের নিয়ে বিরোধী পক্ষে ভোট দিয়েছেন এবং কাৎ করেছেন হরিহর সিংকে। এছাড়া ঝাড়খণ্ড এবং হুল ঝাড়খণ্ডের কয়েকটি ভোটও সরকার পক্ষের বিরুদ্ধে প্রদত্ত হয়। নিজেদের সরিয়ে রেখে অর্থাৎ ভোটদানে বিরত থেকে একরকম 'প্যাসিভ সাপোর্ট' দিয়েছেন জনতা পার্টির নেতা কামাখ্যা-নারায়ণ, রামগড় রাজ ও শ্রীযুত জামাল-উদ্দিন।

মালাপ্পুরম

গত ১৬ই জুন কেরালার একটি বিতর্কিত জেলার সৃষ্টি হল—মালাপ্পুরম। কেরালা যুক্তফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী নাম্বুদ্রিপাদ এই জেলার সমর্থনে প্রশাসনিক প্রয়োজনীয়তার যুক্তি উত্থাপন করলেও দলমত নির্বিশেষে এই নবসৃষ্ট জেলাটিকে সকলে মেনে নিতে অক্ষম। ফলে মালাপ্পুরম-বিরোধী বক্তব্যকে যেমন মালাপ্পুরম-সমর্থকগণ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি-প্রসূত বলে সমস্ত বিরোধী আলোচনাকে স্তব্ধ করে দিতে চাইছেন; অপর পক্ষেও তেমনি বিরোধীরা বলছেন, মালাপ্পুরম সৃষ্টির দ্বারা একটি কমিউনিস্ট-প্রধান ফ্রন্ট সরকার ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ নীতি বিসর্জন দিয়ে ফ্রন্ট-শরিক মুসলিম লীগকে একটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলা উপহার দিলেন। মুসলিম লীগ এই জেলাটির জন্য প্রবল দাবি উত্থাপন করে চাপ সৃষ্টি করছিলেন। স্বভাবতই তাই সাধারণের প্রশ্নঃ কেরল ফ্রন্ট সরকারের অন্যতম বড় শরিক মুসলিম লীগকে তুষ্ট করার জন্য শেষে কি ধর্মীয় গোঁড়ামি-বর্জিত মার্ক্সীয় নীতির পতাকাবাহক নাম্বুদ্রিপাদই ধর্মীয় গোঁড়ামিসৃষ্ট একটি সাম্প্রদায়িক দলের দাবির কাছে নতি স্বীকার করলেন। এমন সন্দেহ এবং অভিযোগ শুধু জনসঙ্ঘেরই নয়, এমন সন্দেহ জেগেছে কেরলের উগ্রপন্থী কমিউনিস্টদের মনেও। সর্বোদয় নেতা শ্রী কে কেলাপ্পন খোলাখুলি উপরোক্ত মর্মে অভিযোগ করেছেন এবং তৈরি হচ্ছেন, নবসৃষ্ট জেলাটিকে ভেঙে দেবার পক্ষে জোরদার আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য। জনসঙ্ঘ ইতিমধ্যেই বিক্ষোভ ও আন্দোলনের পথে নেমে পড়েছেন। সুদূর বিহার থেকে জনসঙ্ঘের একদল সত্যাগ্রহী ছুটে গেছেন কালিকটে। আলোড়ন ক্রমেই দানা বাঁধছে।

প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সুবিধার ভিত্তিতেই যে জেলাটি গঠিত হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী নাম্বুদ্রিপাদের এই যুক্তির সারবত্তা চ্যালেঞ্জ করেছেন উগ্রপন্থী দলের রাজ্য শাখার সম্পাদক শ্রী কে পি আর গোপালন। তাঁর বক্তব্য, অর্থনৈতিক সুবিধার কথা কিংবা অনগ্রসর অঞ্চলের উন্নতির মানসে জেলা গঠনের ব্যাখ্যাটা যথার্থ নয়। যদি অনগ্রসর এলাকার উন্নতিকল্পেই জেলা গঠিত হয়ে থাকে, তবে তো আগে এ ব্যবস্থা অন্যত্র গ্রহণ করা উচিত ছিল। কালিকট আর কেন্নোনোড় রাজ্যের দুটি বড় জেলা। এই জেলা দুটি ভেঙে শ্রীগোপালনের মতে, সর্বাগ্রে গঠন করা উচিত ছিল উইনাড়-তোলচেঙ্গী নিয়ে একটি জেলা।

পার্বত্য এলাকা উইনাড-এর আদিবাসীরা বিক্ষুব্ধ। উগ্রপন্থী নেতৃত্বে এই বিক্ষোভ ইতিপূর্বে ফেটে বেরিয়েছে। তাছাড়া শ্রীগোপালন অনগ্রসর এলাকা কেন্নোনোড় ও তালিপারাম্বা অঞ্চলেরও উল্লেখ করে বলেছেন এই সব অনগ্রসর এলাকার কী হযেছে। এগুলির উন্নয়নের জন্য এগুলিকে নিয়ে আগেই তো জেলা গঠন করার দরকার ছিল। কিন্তু তা তো হয় নি। যা হয়েছে তা হল একটি সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলেব চাপে একটি মুসলিম-প্রধান জেলার সৃষ্টি। নাম্বুদ্রিপাদ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধির পিঠে হাত বুলিয়ে চলার ন্যক্কারজনক নীতি গ্রহণ করেছেন বৃটিশ ডিভাইড এণ্ড রুল পলিসির অনুকরণে।

বলা বাহুল্য, গোপালনের ঐ তীক্ষ্ম সমালোচনায় মার্ক্সীয় নীতি-প্রেমিক নাগরিকবৃন্দ থমকে ভাবতে বাধ্য হবেন, তবে কি যে-রাজনৈতিক দর্শন ধর্মীয় গোঁড়ামিকে আফিম চণ্ডু চরসের সঙ্গে তুলনা করেছে, নাম্বুদ্রিপাদ সেই আফিমই প্রয়োগ করছেন অন্যতম বড় শরিক মুসলিম লীগকে তুষ্ট করে ফ্রন্ট বজায় রাখার জন্য। যদি তাই হয়, তবে তা যে চূড়ান্ত রকম মার্ক্সীয় নীতির বিরুদ্ধাচরণ। অবশ্য কমিউনিস্টরা (দুই কমিউনিস্ট পার্টি) যখন একটি গোঁড়া ধর্মীয় দলের সঙ্গে মোর্চা গঠন করতে পিছপাও হন নি, তখন এক সময় না এক সময় যে সেই গোঁড়ামির সঙ্গে সরাসরি আপোষ করতেই হবে তাতে আর আশ্চর্য কী। তাহলে প্রশ্ন হ'ল, তফাৎ কোথায়? ধর্মীয় গোঁড়ামিকেও যদি কেরলী কমিউনিস্টরা ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার প্রশ্নে আলিঙ্গন করে, খাঁটি কমিউনিস্ট তাহলে কেমন করে তাঁদের নেতৃত্বকে মেনে নেবেন? নাম্বুদ্রিপাদের অবশ্য দোষ ধরতে পারেন না মাও-পন্থী উগ্র কমিউনিস্টরা। কেন না নাম্বুদ্রিপাদ দেখেছেন, মাওপন্থী চীন গোঁড়া ধর্মীয় রাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিল, আয়ুবের হাত শক্ত করেছিল একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রকে কাবু করার মানসে। নাম্বুদ্রিপাদ সেদিক দিয়ে মুসলিম লীগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এমন কোন অন্যায়টা আর করেছেন। উগ্রপন্থী শ্রীগোপালনকে এই প্রশ্ন করলে, তিনি কী জবাব দেবেন?

খাঁটি কমিউনিস্ট কোন আপোষ মানেন না বলেই শোনা যায়। তাহলে এসব ঘটনাবলীর চরিত্র কি নাম্বুদ্রিপাদ-গোপালন-অভিধানে আব একরকমভাবে উল্লিখিত আছে? হবেও বা।

নাম্বুদ্রিপাদের উল্টো চাপ

ছয় শতাংশ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী নিয়ে নাম্বুদ্রিপাদ মুসলিম লীগের চাপেই যে জেলা গঠন করেছেন, জনসঙ্ঘ সেই বক্তব্যে জোর দিয়ে আন্দোলন করছেন। তবে তাঁরা ওখানে নিতান্তই সংখ্যালঘিষ্ঠ। তাই কায়দা বিশেষ করে উঠতে পারবেন না। নাম্বুদ্রিপাদ তা জানেন। জানেন যে, কেরালায় মুসলিম লীগের একটা পজিশন আছে। জানেন, সাম্প্রদায়িক দল হিসেবে চিহ্নিত জনসঙ্ঘকেই উল্টো সাম্প্রদায়িক জিগির তোলার অপরাধে অপরাধী করাও কষ্টকর নয়। মুখ্যমন্ত্রী নাম্বুদ্রিপাদও তাই চুপ করে নেই' বলেছেন, তিনি জনসঙ্ঘের হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার মোকাবিলা করবেন উপযুক্তভাবেই।

সাধারণ মানুষের প্রশ্নঃ কেরলে এই 'মোকাবিলা'টা কোন্ ধাঁচের হবে? মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা দিয়ে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার মোকাবিলা? তাহলে তো সোনায় সোহাগা! আর এই খেলাটার নাটের গুরু হবেন নাম্বুদ্রিপাদ। সুতরা বাকি ভারত কি 'কেয়া বাত্' বলে সেই খেল দূর থেকে উপভোগ করবে না?

—২১।৬।৬৯

ক্যুভ দ্য মারভিলের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট পম্পিদু

বিশ্ব কমিউনিস্ট সম্মেলনের সমাপ্তি

বিশ্ব কমিউনিস্ট শীর্ষ সম্মেলন শেষ হয়েছে। ৫ই জুন থেকে ১৭ই জুন পর্যন্ত মস্কোয় এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্বের মোট ৮৮টি দেশের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে ৭৫টি পার্টির প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেন। তিন শ'র ওপর প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। যে ১৩টি দেশের কমিউনিস্ট পার্টি সম্মেলনে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে নি, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল চীন, যুগোশ্লাভিয়া, আলবানিয়া, উত্তর ভিয়েতনাম ও উত্তর কোরিয়া। কয়েকটি দেশের নিষিদ্ধ কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিও সম্মেলনে প্রকাশ্যভাবে যোগ দিয়েছিলেন, এ'দের মধ্যে নেপাল ও ফিলিপাইনসের প্রতিনিধিও ছিলেন।

ন'দিনব্যাপী দীর্ঘ আলোচনার পর কমিউনিস্ট সম্মেলনে সমবেত প্রতিনিধিরা সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার কথা ঘোষণা করে মূল প্রস্তাব গ্রহণ করেন। এটিই হল সম্মেলনের প্রধান ঘোষণা। ঘোষণায় বলা হয়েছে: বিশ্ব সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণী ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। প্রস্তাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রধান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। অদূরভবিষ্যতে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী একটি বিশ্ব সম্মেলন আহ্বানের কথাও প্রস্তাবে বলা হয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংহত করার কথা বলা হলেও, বিশ্ব কমিউনিস্ট সম্মেলন আহ্বানের প্রধান উদ্দেশ্য এটা ছিল না। সোভিয়েট য়ুনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে এই সম্মেলন আহ্বান করা হয়েছে। অনেকদিন ধরে এই সম্মেলনের প্রস্তুতি চলছিল। কমিউনিস্ট দুনিয়ায় অনেকে এই সম্মেলন আহ্বানের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছিলেন। তথাপি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

চীন-সোভিয়েট বিরোধ শুরু হবার পর থেকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে যে বিভেদের সৃষ্টি হয়েছে, তা দূর করে কমিউনিস্ট আন্দোলনে ঐক্য ফিরিয়ে আনা এই সম্মেলন আহ্বানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। যদি সকলের মধ্যে ঐক্য স্থাপন সম্ভব না-ও হয়, তাহলেও অন্তত অধিকাংশের বক্তব্যের মধ্যে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা করতে হবে। চীনের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টিগুলিকে ব্যবহার করা এবং চীন-বিরোধে সোভিয়েট নেতৃত্বের প্রতি সমর্থন আদায়ও সম্মেলনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। গত বৎসর চেকোশ্লোভাকিয়ার ওপর সোভিয়েট য়ুনিয়ন ও ওয়ারশ' শক্তিজোটের অন্যান্য কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের সামরিক হস্তক্ষেপের ফলে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে যে বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে, সে সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের ইচ্ছাও ছিল। মোট কথা, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে সোভিয়েট নেতৃত্বের শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যই এই সম্মেলন ডাকা হয়েছিল।

এই উদ্দেশ্য নিয়েই সোভিয়েট য়ুনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক ও কমিউনিস্ট শীর্ষ সম্মেলনের প্রধান নায়ক লিওনিদ ব্রেজনেভ তাঁর ভাষণে চীনের কঠোরতম সমালোচনা করেছেন। চীন আজ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে মিতালী করছে, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এবং সাম্যবাদের বিরুদ্ধে কাজ করছে। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টি করে, সোভিয়েট য়ুনিয়নের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান চালিয়ে এমন কি সোভিয়েট-বিরোধী আক্রমণাত্মক কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করে চীন সাম্যবাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। এই ছিল ব্রেজনেভের ভাষণের মূল বক্তব্য।

কিন্তু সোভিয়েট য়ুনিয়নের এই চীন-বিরোধিতার বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় বক্তব্য রেখেছেন রুমানিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি-জেনারেল নিকোলাই সোসেস্কু এবং ইতালীর কমিউনিস্ট প্রতিনিধিদলের সহকারী নেতা এনরিকো বারলিনগার। সোসেস্কু বলেন, চীনের বিরুদ্ধে কোন বক্তব্যের সঙ্গে তাঁরা একমত হবেন না। চীন-সোভিয়েট বিরোধে তাঁর পার্টি ও দেশ নিরপেক্ষ। তাঁরা চান, চীনের সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে ফেলার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক। অকারণ চীনকে গালাগাল করে কোন লাভ হবে না। সোসেস্কু এ-ব্যাপারে এত কড়া কথা বলেছিলেন যে, অনেকের মনে হয়েছিল যে সোভিয়েট য়ুনিয়ন ও অন্য কয়েকটি দেশের প্রতিনিধিরা যেভাবে চীনের সমালোচনা করছিলেন, তাতে হয়তো রুমানিয়ার প্রতিনিধিরা সম্মেলন বর্জন করেই চলে যাবেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য রুমানিয়ার প্রতিনিধিরা সম্মেলন বর্জন করেন নি, তবে তাঁদের উপস্থিতির ফলে চীন-সমালোচনার সুর কিছুটা নরম হয়েছিল এবং সম্মেলনে গৃহীত মূল দলিলে প্রত্যক্ষভাবে চীনের সমালোচনা করা হয় নি।

চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনা নিয়েও সোভিয়েট নেতৃত্বকে তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়। অস্ট্রেলিয়া, বৃটেন, আফ্রিকা, সুইজারল্যান্ড, বেলজিয়াম, সুইডেন, স্পেন প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিরা চেকোশ্লোভাকিয়ার ওপর সোভিয়েট হস্তক্ষেপের কঠোর সমালোচনা করে বক্তৃতা

করেন। এ-ব্যাপারে অবশ্য সোভিয়েট যুনিয়ন তথা ওয়ারশ' গোষ্ঠীর সমর্থনে সবচেয়ে জোরালো বক্তব্য রাখেন চেকো-শ্লোভাকিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান সম্পাদক গুস্তাভ হুজাক। হুজাক বলেন, চেকোশ্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান ঠিকই হয়েছিল।

আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সম্মেলনে এর আগে কখনও এভাবে সোভিয়েট নেতৃত্বের সমালোচনা শোনা যায় নি। এবার এই জিনিস হয়েছে। বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ সোভিয়েট নীতির নানা দিক নিয়ে সমালোচনা করেছেন। সোভিয়েট নেতাদের তা গলাধঃকরণ করতে হয়েছে। এবং তার পরেও তাঁদের বলতে হয়েছে, সম্মেলনের ফলে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট ঐক্য আরও শক্তিশালী হয়েছে।

সোভিয়েট জোটের বাইরে বৃহত্তম কমিউনিস্ট পার্টি ইতালীর কমিউনিস্ট পার্টির নেতা এনরিকো বারলিনগার যথার্থই বলেছেন: "বর্তমানে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে কোন প্রধান কেন্দ্র নেই, বা কোন প্রধান পার্টি নেই।" আগেকার একক নেতৃত্বের যুগ এখন গেছে। কমিউনিস্ট আন্দোলনে এ এক নতুন পরিণতি, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

প্রেসিডেন্টরূপে পম্পিদুর কার্যভার গ্রহণ

জর্জ পম্পিদু ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯শে জুন তারিখে ফরাসী সাধারণতন্ত্রের ১৯তম প্রেসিডেন্ট-রূপে পম্পিদু কার্যভার গ্রহণ করেছেন।

এগারো বছর একটানা প্রেসিডেন্ট থাকার পর গত ২৭শে এপ্রিল ফ্রান্সের সাম্প্রতিক ইতিহাসের সবচেয়ে রোমাঞ্চকর নেতা চার্লস দ্য গল পদত্যাগ করেন। সেনেট সংস্কার ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত প্রশ্নে দ্য গল প্রস্তাবিত গণভোট ফরাসী ভোটদাতারা প্রত্যাখ্যান করায় দ্য গল প্রেসিডেন্ট পদে ইস্তফা দেন।

দ্য গলের জায়গায় প্রেসিডেন্ট হলেন জর্জ পম্পিদু। পম্পিদু দ্য গলের দলেরই প্রার্থী। দ্য গলের প্রধানমন্ত্রীরূপে তিনি ছ' বছর কাজ করেছেন। গত বছর ছাত্র ও শ্রমিক অসন্তোষের পর দ্য গলের সঙ্গে তাঁর মতভেদ হয় এবং প্রকৃতপক্ষে বলতে গেলে দ্য গল পম্পিদুকে 'পদচ্যুত' করে ক্যুভ দ্য মারভিলকে প্রধানমন্ত্রীর পদে নিয়োগ করেন।

১লা জুন প্রেসিডেন্ট পদের জন্য যে নির্বাচন হয়, তাতে পম্পিদু অপর ছ'জন প্রার্থীর তুলনায় অনেক বেশি ভোট পেলেও, প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৫০টির বেশি ভোট পান নি বলে ফরাসী নির্বাচনী আইন অনুযায়ী তিনি নির্বাচিত হতে পারেন নি। ১৫ই জুন দ্বিতীয় পর্যায়ের ভোট (সেকেণ্ড ব্যালট) গ্রহণ করা হয়। গতবারের নির্বাচনের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রার্থীর মধ্যেই কেবল এবার ভোট গ্রহণ করা হয়। প্রার্থীরা হলেন জর্জ পম্পিদু এবং অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট অ্যালেন পোহের।

সেনেটের সভাপতিরূপে পোহের দ্য গলের পদত্যাগের পর অস্থায়িভাবে প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করেন। মধ্যপন্থী পোহেরের জয়ের আশা কম থাকলেও তিনি খারাপ লড়াই করেন নি। ভোটের চূড়ান্ত ফল প্রকাশের পর দেখা যায়, পম্পিদু পেয়েছেন মোট ৯,৭৩৪,৩৩৬টি ভোট, অর্থাৎ মোট প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৫৭·৮৩ ভাগ। আর পোহের পেয়েছেন ৭,১১০,৬৬২, অর্থাৎ প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৪২·১৭ অংশ।

প্রথম বারের নির্বাচনে কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী জাঁ দুক্লো তৃতীয় স্থান অধিকার করেছিলেন এবং পোহেরের চেয়ে তিনি অল্প কিছু কম ভোট পেয়েছিলেন। কমিউনিস্ট পার্টি ও অপর কোন কোন মহল থেকে চেষ্টা হয়েছিল, যাতে পোহের না দাঁড়ান এবং পম্পিদুর বিরুদ্ধে দুক্লো দাঁড়াতে পারেন। তাহলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরও তীব্র হত। কিন্তু পোহের এই প্রস্তাবে রাজী হন নি। শেষ পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টি ভোট বয়কটের আহ্বান জানিয়েছিল। তাদের মতে, পম্পিদু ও পোহের দু'জনেই প্রতিক্রিয়াশীল। হিসাবে দেখা যায়, মোট ফরাসী ভোটদাতার শতকরা ২৫ ভাগের মত ভোটদানে বিরত ছিল।

পম্পিদু গলপন্থী হলেও দ্য গলের সঙ্গে তাঁর তফাৎ আছে। প্রাক্তন শিক্ষক ও ব্যাঙ্ক-মালিক পম্পিদু দ্য গলের মত বিরাট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন না হলেও ফরাসী রাজনীতিতে সুপরিচিত এবং দায়িত্বশীল নেতা। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্নে তিনি রীতিমত কঠোর।

পম্পিদু-র জয়ের পেছনে দলের মধ্যপন্থী ও সমাজতন্ত্রী উভয় অংশেরই সমর্থন আছে। পম্পিদু-র শাসনে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক নীতির ক্ষেত্রে কিছু কিছু পরিবর্তন হয়তো দেখা যাবে। পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা, আরব-ইজরায়েল বিরোধের প্রশ্নে দ্য গলের অনুসৃত নীতির কিছুটা পরিবর্তন হবে। নতুন সরকার আরও বেশি ইজরায়েল-ঘেঁষা হবে। ১৯৬৭ সালে আরব-ইজরায়েল সংঘর্ষের পর দ্য গল ইজরায়েলকে সামরিক উপকরণ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। ৫০টি মিরেজ জেট ফ্রান্সের ইজরায়েলকে দেবার কথা ছিল। দ্য গল তা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। সম্ভবত এবার তা দেওয়া হবে। পম্পিদুর আমলে ফরাসী-মার্কিন সম্পর্কেরও উন্নতি হবে বলে অনেকে মনে করছেন। দ্য গল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একজন বড় সমালোচক ছিলেন। বৃটেনের কমন মার্কেটে প্রবেশও হয়তো সহজ হবে। ফ্রান্সই এতদিন এ-ব্যাপারে সবচেয়ে বড় বাধা ছিল।

নির্বাচনে জয়ের পর অবশ্য পম্পিদু যে বিবৃতি দিয়েছেন, তাতে তিনি বলেছেন, বড় রকমের কোন পরিবর্তন হবে না। 'ন্যাটো' সম্পর্কেও পুরনো নীতি অনুসরণ করা হবে।

ইতিমধ্যে পম্পিদু জাঁ স্যবন-দেলমাসকে প্রধানমন্ত্রীর পদে নিয়োগ করেছেন। ৫৪ বৎসর বয়স্ক স্যবন-দেলমাস গত যুদ্ধের একজন বীর এবং বর্তমান ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলীর স্পীকার। পম্পিদুর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে আর যাঁরা নতুন শাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন, তাঁরা হলেন মাইকেল দেবরে, ভ্যালেরী গিসকার্ড দ্য স্তাঁও ও জাঁ দহামেল।

বৃটেনে কৃষ্ণাঙ্গবিরোধী অভিযান

বৃটেনে আবার কৃষ্ণাঙ্গবিরোধী অভিযান শুরু হয়েছে। এবারও এই অভিযানের নেতা ফাসিস্ত ওসওয়াল্ড মোসলের সুযোগ্য শিষ্য এনক পাওয়েল।

রক্ষণশীল দলভুক্ত পার্লামেন্ট-সদস্য এনক পাওয়েল সর্বত্র বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন, বৃটেন থেকে বহিরাগত কৃষ্ণকায়দের বিতাড়ন করতে না পারলে ৫০ বৎসর পর তারাই এদেশে আধিপত্য করবে। দেশবাসীর কাছে তাঁর আহ্বান: বৃটেনকে সাদা রাখো। তিনি দাবি করেছেন, এখনই ৭ লক্ষ কৃষ্ণকায়কে বৃটেন থেকে তাড়াতে হবে।

গত সপ্তাহে এনক পাওয়েল তাঁর নির্বাচনকেন্দ্র উলভারহ্যামটনে এক জনসভায় বর্ণবৈষম্যের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। বৃটেনের ভারতীয়, পাকিস্তানী এবং কিছু আফ্রিকীয় নাগরিক উলভারহ্যামটনের জনসভায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

পাওয়েল ইতিমধ্যেই তাঁর বক্তব্যের স্বপক্ষে রক্ষণশীল দলের অধিকাংশের সমর্থন লাভ করেছেন। পাওয়েলের সাহস এত বেড়ে গিয়েছে যে, তিনি দলের নেতা এডওয়ার্ড হিথকে সরিয়ে নিজে নেতা হবেন ভাবছেন। এতটা সম্ভব না হলেও পাওয়েলের সমর্থন দলের মধ্যে যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

কেবল রক্ষণশীল দল কেন, শ্রমিক দলের মধ্যেও অনেকে পাওয়েলের মতকে সমর্থন করছেন। (২২-৬-৬৯)

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

কালহরণ আর কাল করবো ভেবে কাজ করতে গেলে বহু সময় কালে পেয়ে বসে—এটা হল মহাজনবাক্য। মহাজনবাক্য আমরা আর মনে রেখে কাজ করি না—কারণ বহু মহাজনই আজ অনেকের কাছে ব্যাক ডেটেড হয়ে গেছেন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের নবগঠিত যুক্তফ্রন্ট সরকার মহাজন নয়—নিজেদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে যদি কাজ করতেন, তাহলেও কি পরিস্থিতি এমন হতো? ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার পতনের সময় ও পরে রাজ্যের পদস্থ আমলা ও পুলিশের যে আচরণ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, সেই অভিজ্ঞতাও তো কাজে লাগালেন না। এই কথার অর্থ এই নয় যে, ক্ষমতা পেয়েই সকলের 'হাতে মাথা কাটতে' হবে। অথবা একটা নৈ-নৈত্য কাণ্ড সৃষ্টি করা হবে: কিন্তু একটা কাজ করতে তো বাধা ছিল না? সেটা হলো—পদস্থ আমলা আর পুলিশকুলকে বুঝিয়ে দেওয়া যে, গত বিশ বছর যেভাবে চলেছে, এখন আর সেভাবে চলবে না। এটা তো বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারতো যে, ১৯৬৭ সালের যুক্তফ্রন্ট সরকার পতনে পুলিশের ভূমিকা তাঁরা মনে রেখেছেন। অথচ মনে রাখবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। মনে আছে ১৯৬৭ সালের ২২শে নভেম্বর ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে যখন যুক্তফ্রন্ট সরকারের দুইজন মন্ত্রী শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীঅমরপ্রসাদ চক্রবর্তীকে নির্মম প্রহার করা হয়, কাল রাজ্যের বিচার, আইন বা সেচমন্ত্রী ছিলেন বলে পুলিশ যাঁদের সামান্য ক্ষমা করে নি, সেই সঙ্গে শ্রীঅরুণ ঘোষ, শ্রীনরেন দাস, শ্রীস্বরাজবন্ধু ভট্টাচার্য প্রমুখকেও নির্মমভাবে প্রহার করা হয়, তখন আজকের সেচমন্ত্রী (এবং সেই দিনও প্রাক্তন সেচমন্ত্রী ছিলেন) শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় চিৎকার করে বলেছিলেন—'আমরা আবার ফিরে আসছি, সেইদিন তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হবে।' শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় সত্যি আবার ফিরে এসেছেন এবং রাজ্যের সেচমন্ত্রী হয়েছেন, কিন্তু ভুলে গেছেন সেই-দিন ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডের প্রতিশ্রুতি, ভুলে গেছেন এসপ্ল্যানেড ইস্ট রাজপথে গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম, ভুলে গেছেন উত্তরপাড়া কলেজে ছাত্রহত্যার নৃশংস কাহিনী—যেখানে ছাত্রহত্যা করে পুলিশ দেওয়ালে রক্তের ছাপ রেখে গেছিল এই কথা মনে করে যে, এই রক্তের পাঞ্জা দেখে ছাত্ররা যেন মনে রাখে পুলিশের অবাধ্য হলে কি পরিণতি হয়। ঠিক সেই একই পরিণতি কি দুর্গাপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে হল না? একই রক্তের ছাপ কি উত্তরপাড়া প্যারিমোহন কলেজের মত দুর্গাপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের দেওয়ালে রেখে গেল না? তাহলে কি তফাৎ হয়েছে—উত্তরপাড়া থেকে দুর্গাপুর পর্যন্ত আসতে পুলিশের আচরণের? কি পরিবর্তন হয়েছে পি, ডি, এফ সরকারের ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, রাজ্যপাল ধর্মবীর ও শ্রীঅজয় মুখার্জীর আমলে। দুর্গাপুরের ঘটনা নিয়ে তদন্ত হচ্ছে। কোন কথা বলা উচিত ও শোভন নয়, তবে উত্তরপাড়া ও দুর্গাপুর এই দুই ঘটনার তুলনা করতে গিয়ে একটি নীতিগত প্রশ্ন শুধু তুলতে চাই। সেটা হল—উত্তরপাড়াতেও সেইদিন পুলিশের ছাত্র দমনে যে ভূমিকা ছিল, যে যুক্তি ছিল, কাল-সময়, সব পরিবর্তনের পরেও পুলিশের পক্ষে সেই একই যুক্তির আশ্রয় নেওয়া সম্ভব হয় কেন? পুলিশের যুক্তি হল—ছাত্ররা উৎপাত করে, অত্যাচার করে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি যুক্তির খাতিরে না হয় এই অভিযোগও মেনে নিতে রাজী যে, দুর্গাপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্ররা হয়ত দীর্ঘদিন ধরে পুলিশের প্রতি নানা উৎপাত করে আসছিল—হয়ত এ কথাও সত্যি যে, ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের একটা শ্রেণীর ছাত্রদের দমন করা হোক—এই ব্যাপারে স্থানীয় প্রভাবশালী যুক্তফ্রন্ট শরিক দলের নৈতিক অনুমোদন ছিল, কিন্তু মূল প্রশ্ন হল: পুলিশ কি কখনও প্রতিহিংসাপরায়ণ হতে পারে? ধরে নিলাম—ছাত্ররা পুলিশের ওপর খুবই অত্যাচার করেছিল, কিন্তু যে পুলিশের হাতে সরকার মারণাস্ত্র তুলে দিয়েছেন শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য, জীবনহানি রোধে প্রয়োগের জন্য, সেই পুলিশ কি সেই মারণাস্ত্র প্রয়োগ করে শান্তি-শৃঙ্খলা বিপন্ন করতে পারে? জীবনহানি রোধের পরিবর্তে জীবনহানিতে শরিক হতে পারে? কাজেই প্রশ্নটা হল নীতির, প্রশ্নটা হল মানসিকতার, প্রশ্নটা হল সময়োচিত নির্দেশ ও সংযম রক্ষার। সাম্প্রতিককালে যে ঘটনাগুলি ধরা পড়েছে এবং যার পরিণতিতে আজ পুলিশও রাজনীতিতে নেমেছে এবং রাজনৈতিক দলগুলোও পুলিশ নিয়ে রাজনীতি করতে শুরু করেছে—এ হল তারই একটি সঠিক ও সম্ভাব্য পরিণতি, আর 'প্রিজনার অফ ইনডিসিশনের' আর একটি লক্ষণ। রাজ্যের নবগঠিত যুক্তফ্রন্ট সরকার খুবই হা-হুতাশ করছেন পুলিশের নানা ষড়যন্ত্র সম্পর্কে, কালোবাজারী ও ব্যবসায়ীদের চক্রান্ত সম্পর্কে। কিন্তু এই সরকার কি এই কথা ভেবেই যাত্রা শুরু করেছিলেন যে, তাঁরা ক্ষমতায় আসার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের চরিত্র বদল হয়ে যাবে? পুলিশ সাধারণ মানুষের স্বার্থের অনুকূলে কাজ করবে, চোরাবাজারী-কালোবাজারীরা সব রাতারাতি 'তুলসীদাস-কবীর' বনে যাবে? তা যদি না ভেবে থাকেন, তবে ক্ষমতায় এসে কী পথ ও নীতি গ্রহণ করেছিলেন, যার দ্বারা আজ পুলিশ এবং কালোবাজারীদের চক্র ও চক্রান্ত থেকে নিজেকে মুক্ত রাখতে পারেন? শুনতে খারাপ লাগতে পারে, বললেও অনেকে দোষারোপ করতে পারেন, কিন্তু এই কথা সত্য যে, গত বিশ বৎসর একটা অলিখিত নীতি ও রীতি প্রচলিত হয়েছে: সেটা হল—মানুষ যেমন বায়ু ছাড়া বাঁচে না, মাছ যেমন জল ছাড়া বাঁচে না, ঠিক তেমনি ব্যবসায়ীরা বেশি ও অসৎ মুনাফা অর্জন ছাড়া এবং পুলিশ ঘুষ ছাড়া বাঁচে না। দীর্ঘদিন ধরে অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করে. অন্য আরো অনেক সম্প্রদায়ের মত পুলিশবাহিনীও তাদের জীবনযাত্রার মান এমন একটা জায়গায় উন্নীত করেছে—যার সঙ্গে আইনমাফিক আয় সরকারী বেতনের সঙ্গে কোন সঙ্গতি নেই। একদা আমাদের দেশে জামাই হিসেবে দারোগা-জামাই ছিল কন্যাপক্ষের কাছে সবচেয়ে লোভনীয় ও কাম্য—কিন্তু দেশ স্বাধীন হওয়ার বিশ-বাইশ বৎসর পরে সেই সত্যই আরো সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বৈ হ্রাস পায় নি। রাজ্যের ষাট-সত্তর হাজার পুলিশ একটা ঐক্যের বাঁধনে বাঁধা আছে—সে ঐক্য কোন উচ্চ আদর্শে গড়ে ওঠে নি, সে ঐক্য ন্যায়-নীতি শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ববোধের ভিত্তিতে গড়ে ওঠে নি, সে ঐক্য গড়ে উঠেছে তাদের জীবনযাত্রার মানরক্ষার তাগিদে অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জনের আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে। কাজেই পুলিশ

সম্পর্কে আজ জেলায় জেলায় ঘুরেই হোক, আর ফাঁড়িতে, থানাতে গিয়েই হোক, বক্তৃতা দিয়ে ও নীতিকথা শেখাবার চেয়ে অনেক বেশি প্রয়োজন ছিল দৃষ্টি-ভঙ্গির পরিবর্তন। কিন্তু নবগঠিত সরকার তার বিষাক্ত ফণায় এই দুষ্টচক্রকে দংশন করল না—এমন কি ফণা তুলে ছোবল মারতে পারি এমন ভঙ্গিটিও নিল না বা দংশন না করি, ফণা না তুলি একটু ফোঁস পর্যন্ত করল না। তাই দেখা গেল কংগ্রেস আমলে বা পি, ডি, এফ আমলে বা রাজ্যপালের আমলে যাঁরা শাসকশক্তির কাছে জামাই-আদর পেতেন, যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলেও তাঁরা একই আদরে প্রতিষ্ঠিত হলেন। ফল হল—এই পুলিশের মধ্যে যাঁরা কিছুটা ব্যতিক্রম চিন্তার ছিলেন, প্রো-পিউপিল ছিলেন, অথবা কিছুটা ন্যায়-নীতি মেনে চলবার পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁরা পিছিয়ে পড়লেন। কাজেই দীর্ঘদিনের অভ্যস্ত নীতিতে পুলিশ পূর্ণমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত থাকবার সুযোগ পেল। পুলিশ ও প্রশাসনে নতুন কোন হাওয়াই লাগল না।

রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকারের সংগে সদ্য-দখল হওয়া দুর্গ কলকাতা কর্পোরেশনের কর্তাদের যদি কর্মকান্ড ও চিন্তাধারার কিছুটা তুলনা করি, তবে ধরা পড়বে রাজ্যের

যুক্তফ্রন্ট সরকার কত শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন পুলিশ ও প্রশাসনে নতুন বাতাবরণ সৃষ্টি করতে। কলকাতা কর্পোরেশন একদিকে রাইটার্স বিল্ডিংস অপেক্ষা অনেক বড় দুর্নীতির চক্র-চক্রান্ত ও লাল-ফিতে বন্ধনের ঘাঁটি। রাইটার্স বিল্ডিংসের বর্তমান ঐতিহ্য (?) গড়ে উঠেছে ১৯৪৬ সালের 'মধ্যবর্তী সরকার' গঠনের পর থেকে। সেদিক থেকে লালদীঘির লাল-বাড়ি অপেক্ষা জানবাজারের ঐতিহ্য অনেক বেশি বনিয়াদী। কারণ সে ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে ৪৫ বছর ধরে। কিন্তু ক্ষমতায় এসেই কর্পোরেশনের নতুন মেয়র শ্রীপ্রশান্ত সুর দৈনিক একটি করে দুর্নীতির আখ-ড়ায় ঘা দিচ্ছেন। দৈনিক একটি করে সংবাদের শিরোনাম হচ্ছেন। দৃপ্ত পদক্ষেপে পুরাতনকে ভেঙে চুরমার করে ফেলবার চেষ্টায় এগিয়ে যাচ্ছেন—ত্রাহি ত্রাহি ডাক উঠেছে জানবাজারের লালবাড়ির বাস্তু-ঘুঘুদের। আর রাইটার্স বিল্ডিংসের বাস্তুঘুঘুরা পরম শান্তিতে নিজেদের নীড়ে দুর্নীতির চক্র-চক্রান্তের ডিম্ব প্রসব করে চলেছেন। গত বিশ বৎসর ধরে কত অভিযোগ শোনা গেছে পদস্থ সরকারী আমলাদের সম্পর্কে, পুলিশ সম্পর্কে, কংগ্রেসী মন্ত্রী সম্পর্কে। কিন্তু মেয়র শ্রীপ্রশান্ত সুর ক্ষমতা গ্রহণ করে প্রথম দিনের কিছু না পারুন, প্রাক্তন আই-জি'র বাড়ির নক্সা বাতিল করলেন, কয়েক লক্ষ টাকা চুরি অথবা হিসাবের গরমিল ধরলেন, কিন্তু রাজ্যের অতিপ্রত্যাশার স্বরাষ্ট্র ও পুলিশমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু এই জাতীয় একটি ঘটনারও নজীর স্থাপন করতে পেরেছেন কি? কালোবাজারীদের, চোরাকারবারীদের তিনি না হয় ল্যাম্প-পোস্টে ঝুলিয়ে ফাঁসি দিতে না-ই পারলেন, কিন্তু একজন প্রাক্তন কংগ্রেসী মন্ত্রী, একজন দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী অফিসার, একজন মিলমালিক, চোরাকারবারীকে কি আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারলেন? পারেন নি, এটা বাস্তব সত্য। না পারার হয়ত অজস্র সঙ্গত যুক্তি, সঙ্গত কারণ আছে এ-কথাও সত্য। কিন্তু এই সত্যকে যদি মেনে নিতে হয়, তবে নতুনত্বের স্বাদ মানুষ পাবে কোথা থেকে? নতুন সরকারের সঙ্গে প্রাক্তনের তফাৎ বুঝবে কোন্ গুণে? সবকিছুর পিছনে শুধু চক্র ও চক্রান্ত আছে অথবা জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সর্বভূতে পরম জগদীশ্বরের মত সি, আই, এ আছে এই শুকনো কথায় চিরকাল চিঁড়ে ভিজবে কিভাবে?

বেদনা কিন্তু শুধু এইখানে নয়—বেদনা আরো বেশি হয়, যখন দেখা যায়—চক্র-চক্রান্ত ভাঙতে গিয়ে সরকার সেই চক্র ও চক্রান্তের শিকার হয়ে পড়ছেন। দুর্গাপুরের ঘটনা ঘটে ১লা জুন আর ২রা জুন রাত্রে রাজ্য সরকার প্রেস নোট দিতে গিয়ে কম করে তা দুবার বদল করেন। সেই প্রেস নোটে কি ছিল দেখুন, আর পরে এই ঘটনা সম্পর্কে যেসব সংবাদ বেরিয়েছে, সেটা সকলেরই জানা আছে। ২রা জুন রাত্রে সরকারী প্রেস নোটে বলা হল "কলেজ প্রাঙ্গণের মধ্যে পুলিশ পিকেট আক্রান্ত হলে তারা কোনক্রমে বেরিয়ে আসে, কিন্তু তারপরেও তাদের ওপর তীব্র আক্রমণ চালিয়ে একজন ইন্সপেক্টর ও একজন কনস্টেবলকে গুরুতর আহত করে, পুলিশ তারপর হাঙ্গামাকারী ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করতে গুলীবর্ষণ করলে একজন নিহত ও পাঁচজন আহত হয়।" (৩রা জুন কালান্তর) আর এইদিন স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু কি বলছেন—"তিনি প্রাথমিক রিপোর্ট পেয়েছেন, তাতে এইদিন সকালে ছাত্ররা আবার পুলিশ ফাঁড়ি আক্রমণ করে, কলেজের মধ্যেও পুলিশ পিকেট চড়াও হয় এবং পুলিশকে মার-ধোর করা হয়। একজন কনস্টেবল ও একজন ইন্সপেক্টর গুরুতর আহত হন। শ্রীবসু বলেন, মারমুখী ছাত্রদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ গুলী চালায়।" (আনন্দ বাজার, ৩রা জুন)।

অনুমান করুন দুর্গাপুর কলকাতা থেকে হাজার মাইল দূরে নয়—বলতে গেলে নাকের ডগায়, সেখানে ঘটনা ঘটলো ১লা জুন সকালে তারপর ২রা জুন সকালে। সেই ঘটনা সম্পর্কে সরকারী ভাষা ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাষ্য। এই ভাষা সত্য কি অসত্য সেই কথা বলতে চাই না, কিন্ত পরবর্তীকালে এই ঘটনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ বিপরীত কথাই বলতে শোনা গেছে। শুধু তাই নয়—ঘটনার দিন কয় রাউণ্ড গুলী চলেছিল, তারও সঠিক খবর বলতে পারে নি রাইটার্স বিল্ডিংস। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীবসু ঘটনার বিবরণ দিয়ে প্রথম দিন বা দ্বিতীয় দিন যে কথা বলেছিলেন, সেই কথা তিনি স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে বলেন নি—তাঁকে তাঁর দপ্তর যা ব্রিফ করেছিল, তাই বলেছিলেন। নিশ্চয়ই একই কারণে সরকারী প্রেস নোটেও পরিবর্তন করতে হয়েছিল—কিন্তু কেন? এই ব্রিফই বা কার করে, আর ভুল তথ্য দিয়েও বা কারা ভুল প্রেস নোট তৈরি করায়। আর এক-জন দায়িত্বশীল মন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্তী ২রা জুন মহাকরণে সাংবাদিকদের জানা-লেন—শ্রীগদাধর রায় নামে একজন কর্মী ২৪ পরগনার জেলিয়াখালি গ্রামে খুন হয়ে-ছেন—গোসাবা থানায় খবর দেওয়াতেও পুলিশ আসে নি (আনন্দবাজার ৩রা জুন)।

পরে দেখা গেল—শ্রীরায় খুন হন নি। বেশ সুস্থ হয়েছেন, হাসপাতালে আছেন। এই হল আর এক রং ব্রিফের নমুনা। সম্প্রতি প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দা কলকাতায় বলে-ছেন—১৯৬৪ সালে কম্যুনিস্টদের গ্রেপ্তারের সময় তিনি রং ব্রিফড্ হয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে কিছুদিন আগে 'গণশক্তি'-তে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল যে, শ্রীনন্দার কম্যুনিস্টদের বিরুদ্ধে শ্বেতপত্র রচনায় যিনি মাল-মশলা দিয়েছিলেন, তিনি নাকি পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের একজন পদস্থ পুলিশ অফিসার এবং তিনি কলকাতা পুলিশেরই একজন কর্তা। সেই পুলিশ অফিসারের নাম করে পুরো এক পৃষ্ঠা লেখা হয়ে-ছিল। 'গণশক্তি'-র সম্পাদক জানেন কিনা জানি না এবং গণশক্তিতে প্রকাশিত অভি-যোগ সত্য কি না, সে সম্পর্কে আমার বিন্দুবিসর্গও জ্ঞান নেই, তবে অতি-সীমিত জ্ঞানে আমি এইটুকু জানি—সেই উল্লিখিত পুলিশ অফিসার শ্রীজ্যোতি বসু রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হবার পর দীর্ঘ-দিন প্রবাসজীবন যাপন করে কলকাতায় ফিরে এসেছেন এবং উপযুক্ত মর্যাদায় শ্রীবসুর পুলিশদপ্তরেই উচ্চপদে নিযুক্ত রয়েছেন এবং কাজও করছেন। এই ছোট্ট নজিরটি উপস্থাপিত করলাম এই কারণে যে, শ্রীবসুর দলীয় পত্রিকাতেই একজন অফিসার সম্পর্কে সুস্পষ্ট অভিযোগ সহ নিবন্ধ রচনা করা এ যেমন সত্য, আবার শ্রীবসুর এই অফিসার সম্পর্কে অভিযোগ প্রমাণে সামান্য আগ্রহী কি না, সেকথা জানা যায় না এ-কথাও সত্য। এই যে নীতি—এই নীতি সরকারের সামনে আজ নানারূপ সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। কী পুলিশ, কী চোরাকারবারী, কী খাদ্য-ব্যবসায়ী, সকলের সম্পর্কে সরকারের শীতল মনোভাব অন্যায় দুষ্কৃতকারী ও সরকারী নীতি-ভঙ্গের উৎসাহ দিয়েছে। 'গুরু, সর্প হইয়া দংশো তুমি—ওঝা হইয় ঝাড়ো'—বাউলের গানে এই নীতি ধ্বনিত হওয়া এককথা, আর সরকারী প্রশাসন পরি-চালনায় এই নীতি প্রতিফলিত হওয়া আর এককথা। হয় সাপ হয়ে দংশন করতে হবে, অথবা সর্প দংশনে আহতকে ওঝা হয়ে ঝাড়তে হবে—এর যে-কোন একটা নীতি বেছে নেওয়া সম্ভব। দুই নীতিতে চলার অর্থ দুই নৌকোয় পা রেখে চলা। রাজ্যের সর্বাপেক্ষা প্রত্যাশার প্রতীক শ্রীজ্যোতি বসু স্বরাষ্ট্র, পুলিশ ও প্রশাসনযন্ত্র পরি-চালনায় যদি এই নীতির আশ্রয়ী হন, তবে রাজ্যের যুক্তফ্রন্ট সরকার দুই নৌকোয় পা রেখে চলার যাত্রীই হবেন, আর সেই যাত্রীর ভবিষ্যৎ কী সে-কথা আমি না বললেও কারো বুঝতে বাকী থাকবে না।

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সরকারী দলিলগুলো কী প্রমাণ বহন করে ?

গত সপ্তাহে "বসুমতীতে" BLM's Minute থেকে ১ নম্বর ও ২ নম্বর প্যারাগ্রাফের ইংরেজী উদ্ধৃতি দিয়েছি। BLM's Minute-এ' সেরকম আরও ছটি প্যারাগ্রাফ আছে। প্রতিটি প্যারাগ্রাফের হুবহু ইংরেজী নকল আমি উদ্ধৃত করবো এবং এইগুলির বিষয়বস্তু বোঝবার সুবিধের জন্য বাংলায় সামান্য একটু বর্ণনা দিয়ে যাবো:

[তিন নম্বর প্যারাগ্রাফে আইনের মূল ধারার ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, হাইকোর্টের Revisional Power (পুনর্বিচারের ক্ষমতা) বা সরকার পক্ষের সাজা বৃদ্ধি করার আপীল—কোনটাই ফলপ্রসূ হবে না। পরিসমাপ্তিতে বলা হচ্ছে—আইনসভা ইচ্ছে প্রকাশ করে নি যে, হাইকোর্ট Revisional Power প্রয়োগ করুক।]

"BLM's Minute Contd.

3. Apart from the other consideration, the inclusion of revisional powers would lead to a lifelong results. It is obvious that Government cannot appeal from an order of acquittal by the Tribunal. If revisional powers be conceded to the H-C—it can deal with cases of acquittal as if the Government had applied. This would be contrary to the intention of the legislature as disclosed in section 3 of the Supplementary Act. Again, the Legislature by limiting the powers, conferred on the H-C—, to Chapter XXXI clearly intended that the sentences should not be enhanced. This intention would be defeated if the H-C—exercises revisional powers under Chapter XXXII. Similarly, by limiting the right of appeal to convicted persons, the Legislature denied the Government the right of appeal even in a case of conviction so as to permit an alteration of the nature of the sentence. This intention would also be defeated by the High Court exercising revisional powers. The conclusion, therefore is that, the Legislature did not intend that the H-C—should exercise revisional powers."

[৪ নম্বর প্যারাগ্রাফেও বিভিন্ন আইনের ধারা উদ্ধৃত করে ও সেগুলির বিশদ ব্যাখ্যা করে বলা হচ্ছে, হাইকোর্টের Revisional Power প্রয়োগের ক্ষমতা নেই।]

"4. In the face of express provisions of Section 3 of the Supplementary Act, there is no warrant for the inference that the H.-C. can exercise revisional powers merely because of the General wording of section 435 Cr.-P-C. In my opinion, the expression "inferior Criminal Court" in section 435 means inferior in the graduation laid down in section 6, Cr.-P-C. In the case of other courts contemplated in section 6, the regulating law will be the law under which such other courts are constituted and not the Cr.-P-C. In respect of such courts, the H-C. would only have such powers has such other law confers."

[৫ নম্বর প্যারাগ্রাফে ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের Revisional Power অথবা সাজা বৃদ্ধির জন্য হাইকোর্টে দরখাস্ত করার আইনগত কোনো অধিকার সরকারপক্ষের আছে কি-না—এই সব প্রশ্নের ভিত্তিতে ট্রাইব্যুনালের বিশিষ ক্ষমতার পরিধি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং শেষ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে সরকার বা হাইকোর্টের আর কিছু করবার আইনগত কোনো সুযোগই নেই।]

"5. It may be noticed that in Section 476B, the expres-

sions "Superior Court" and "Court Subordinate to it" are used in the sense of the former being a court "to which appeals ordinarily lie from the sentences of the latter court." That sense however, is limited to the purpose of Section 195, as Sub-Section (3) of the Section 195 shows. If by analogy, "inferior court" be taken to mean a court, from whose sentence of appeals ordinarily lie to a superior Court, even then it is open to contention whether the limited appeal given by Section 3 of the Supplementary Act comes under the category of *Ordinary*. In any case the meaning attached to the words "Superior" and "Subordinate" on the test of appeal is not of general application, but is confined to the purposes of Section 195. Subordination for a single specific purpose does not involve subordination for all purposes. Although in a popular sense 'The Special Tribunal' is Court inferior in status to the H.C. I am not prepared to attach the popular sense to the word "inferior" in Section 435."

[৬ নম্বর প্যারাগ্রাফে Revisional Power ও আপীলের ক্ষমতা নিয়ে আইনগত আলোচনা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে Revisional Power-এরই অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত অধিকার আছে।]

"6. Powers of revision are more extensive than powers in appeal. The express grant in restricted powers in appeal in a specified class of cases only cannot, in my opinion, carry with it wider powers of revision in all cases."

[৭ নম্বর প্যারাগ্রাফে আছে Government of India Act-এর ১০৭ ধারার ভিত্তিতে হাইকোর্ট Revisional Power-এর অধিকারী নয়।]

"7. The power of superintendence under section 107, Government of India Act, is confined to the purposes mentioned in the section and cannot include revisional powers.'

[৮ নম্বর প্যারাগ্রাফে বলা হচ্ছে, জনৈক বিশেষ সদস্যও মনে করেন আইন-সংক্রান্ত যেসব প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে সেগুলো অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ও আলোচনাসাপেক্ষ।]

"8. Having expfessed my views, I agree that question under consideration is important and arguable, and I endorse the suggestion that the A.G. be consulted.

BLM [itter] 23.4.32."

[হোম ডিপার্টমেণ্ট থেকে লিখছে: Mr. S. N. Roy ও Mr. Emerson-এর টীকা এখানে বাদ দেওয়া হয়েছে। Mr. H. G. H.-এর টীকা উদ্ধৃত করা হয়েছে।

Mr. H. G. H.-এর টীকায় তাঁর মনের গভীর আক্রোশ প্রকাশ পাচ্ছে। তিনি Secretary ও Law Member-এর সঙ্গে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, হাইকোর্টের Revisional Power নেই। এই ক্ষেত্রে তাঁর মতে বাংলা সরকারের অভিমত চাওয়া প্রয়োজন। যদি বাংলা সরকারও তাঁদের মত এইরূপ বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তবে সরকারের হস্ত দৃঢ় করার জন্য আইনগতভাবে B-C-L-A-Act-এর বিশেষ পরিবর্তন করতে হবে। তাঁর বিক্ষুব্ধ মনের অভিব্যক্তিতে প্রকাশ পাচ্ছে যে, এই Act-এর ছোট ছোট সংশোধনের পক্ষপাতী তিনি নন, তিনি চান—ব্যাপক সংশোধন। Law Member-এর কাছ থেকে তিনি যা জেনেছেন তাতে তাঁর ধারণা হয়েছে, হাইকোর্টকে সেইরূপ Revisional Power দিলে সরকারই বিশেষ বিপদের সম্মুখীন হবেন। সেহেতু পুনর্বিচারের জন্য 'ফাইলটি' তিনি Law Member-এর কাছে পাঠাবার অনুরোধ জানাচ্ছেন।]

"Home Dept.

[Note of S. N. Roy (26.4.32); Emerson (27.4.32) omitted.]

I have discussed with Secretary and have also some talk with the Hon'ble Law Member. It seems pretty clear that it would not be held that the H.C.—has revisional Powers. If we ask the Bengal Government to obtain a definite opinion on this point and the opinion is adverse, then I think we must expect a renewal that we should amend the B-C-L-A-A. so as to provide these powers. On general grounds I am very definitely opposed to small amendments to these highly controversial Acts. I think we are likely to have our hands quite full enough with major measures. I also gather from the Hon'ble Law Member that there might be from our point view, dangers in extending the authority of the H-C-in these cases. The file should be sent again to the Hon'ble Law Member in connection with this point.

H. G. H. [aig]
1.5.32."

[এই Hon'ble Law Member-ও ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের Revisional Power-এর বিপক্ষে অভিমত প্রকাশ সমর্থন করেন। যুক্তি হিসেবে তিনি জানাচ্ছেন যে, ট্রাইব্যুনাল বিচারের উদ্দেশ্য হচ্ছে মামলা দ্রুত শেষ করা; যদি Revisional Power হাইকোর্টের হস্তে ন্যস্ত থাকে তবে তার সুযোগ নি… মামলায় বিলম্ব ঘটানোর পথ সর্ব… উন্মুক্ত থাকে। যদিও B-C-L-A …-এর ধারায় আসামী পক্ষকেই আপীলের সুযোগ দেওয়া আছে, তবু সাক্ষ্য গৃহীত হওয়া ও রায়দান পর্যন্ত মামলার দ্রুত সমাপ্তির পথে বাধা সৃষ্টি করে মামলা বিলম্বিত করার কোনো আশঙ্কা থাকে না। সন্ত্রাসবাদীদের মামলায় এরকম বিলম্ব ঘটাবার সুযোগ দেওয়া কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ তারা সেই সুযোগ পেলে তাদের দ্বারা সাক্ষীদের গায়েব করে ফেলার ও প্রাণনাশের যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। হাইকোর্টের Revisional Power থাকলে তা প্রয়োগের জন্য যে-কোনো সময়েই প্রার্থনা করা যায়। সেহেতু হাইকোর্টের Revisional Power থাকা সরকারের পক্ষে যে বিশেষ অসুবিধাজনক তাতে সন্দেহ নেই। পরিসমাপ্তিতে বলা হয়েছে, সন্ত্রাসবাদীদের মামলা দ্রুত সমাপ্তির পথে বিলম্ব ঘটাবার কোনো কৌশলই যেন তারা অবলম্বন করতে না পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখে হাইকোর্টের Revisional Power না থাকা উচিত।

এই প্যারাগ্রাফের শেষ লাইনটিতে তাঁদের স্বরূপ প্রকাশ পাচ্ছে যেখানে তাঁরা বলছেন যে, এইরূপ বিশেষ অবস্থান পরিপ্রেক্ষিতে যে পথ অনুসরণ করতে হবে তা বাংলা সরকারই করবে।]

"The Hon'ble Law Member.

I am definitely opposed to the grant of revisional powers to the High Court over Tribunal, set up under B.C.L.A.A. One of the main purposes of these Special Tribunals is speediness of trial. The right of appeal given by the Supplementary Act does not interfere with the trial during its progress. It can be exercised only after the witnesses have been examined and judgement has been pronounced. No mis-chief is done then. But if revisional powers be given, the possible advantage of the Government exercising the right in rare cases will be overwhelmingly counterbalanced by the risk of the accused going up to the H.C.

at frequent intervals, if only for the purpose of delay. The revisional power of the H-C- can be invoked *at any stage.* Delay is frequently part of the defence tact'cs, generally to gain time for getting at, if not doing away with, prosecution witnesses. There would be no means of preventing the accused from going up to the H-C-on plansible, even though frivolous, grounds. The inevitable resnlt would in most cases be holding up of the trial. This is a real danger. Unbroken speed is the essence of a trial in the terrorist cases and we cannot afford to admit of delay or periodical coppages.

B.L.M [itter]
2.5.32."

[Mr. H. Williamson, Director of Intelligence Bureau অন্তরের দারুণ বিক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছেন, এই সমস্ত বিষয়-সংক্রান্ত সব কাগজপত্রই তিনি দেখেছেন এবং বুঝতে পারছেন যে, এই অবস্থায় এ সম্বন্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা করার যেন আর কিছুই নেই। Mr. H. Williamson-এর মতে বাস্তব প্রতিকার হিসেবে ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট ও কমিশনার নিযুক্ত করার ব্যাপারে ভবিষ্যতে তাঁদের খুব সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে—এ'রা যেন নির্ভীক-চিত্তে ও দৃঢ়তার সঙ্গে উপযুক্ত দণ্ড দিতে দ্বিধাগ্রস্ত না হন; প্রয়োজন হলে ট্রাই-ব্যুনালের জন্য অন্য প্রদেশ থেকেও যোগ্য বিচারক নিয়োগের ব্যবস্থা থাকা উচিত।]

"Seen and returned with thanks. The remedy in future (there is no remedy applicable to the 12 murdered and unavenged policemen and soldiers) is to appoint judges, men who will not flinch from their duty. I have suggested elsewhere that the field of recruitment for such tribunals should be extended to other provinces.

H. Williamson.
4.5.32.
Director Intelligence
Bureau."

এ পর্যন্ত যে-সমস্ত সরকারী দলিল উদ্ধৃত করলাম তাতে পাঠকবর্গের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, সেই সব বিষয়বস্তু আমার পূর্ব বক্তব্যের বিপক্ষে আত্মঘাতী মহাস্ত্রের মত প্রযোজ্য হচ্ছে। পূর্বে আমি বলেছি, সরকার আমাদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন ট্রাইব্যুনালের বিচারে আমাদের কাউকেই তাঁরা প্রাণদণ্ড দেবেন না। এই যে গোপন চুক্তির কথা উল্লেখ করেছি তার আনুষঙ্গিক ও বাহ্যিক ঘটনাবলীর পরি-প্রেক্ষিতে প্রমাণ করেছিলাম, সরকার আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন এবং ট্রাইব্যুনাল বিচারের রায়ে ফাঁসির হুকুম জারী না করার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়েছিলেন। কিন্তু ওপরে উদ্ধৃত দলিলের মর্ম—আমার গোপন চুক্তির বিষয়টিকে সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করার জন্য সরকার পক্ষের লিখিত প্রমাণ।

দলিলের মূল বক্তব্য ও সিদ্ধান্তগুলি এই ধরণের :

(১) সরকার আমাদের বিরুদ্ধে ট্রাই-ব্যুনালের রায় দেখে খুব বিচলিত হয়েছেন—কারও প্রাণদণ্ড না হওয়াতে আশ্চর্য হয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন—ট্রাইব্যুনালের বিচারকদের ভীরুতা ও দ্বিধা-গ্রস্ততার সমালোচনা করেছেন।

(২) সরকার নানা স্তরের আইনগত প্রশ্ন নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছেন এবং হাইকোর্টে সর-কারের পক্ষ থেকে আপীল করে দণ্ডবৃদ্ধির উপায় আছে কি না এ্যাডভোকেট জেনারেলের কাছ থেকে জানতে চেয়েছেন।

(৩) হাইকোর্ট স্বয়ং ক্ষমতায় ট্রাই-ব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে Revisional Powers (পুন-র্বিচারের অধিকার) প্রয়োগ করতে পারে কি-না, এ্যাডভোকেট জেনারেলের কাছে তাও সরকার জানতে চেয়েছেন।

(৪) এই দুটি আইনের প্রশ্ন আলো-চনার পর সরকারের পক্ষ থেকে দণ্ডবৃদ্ধির আপীল করা বা হাইকোর্টের নিজস্ব ক্ষমতায় Revisional Powers প্রয়ো-গের আইনগত কোনো পথ যে নেই সরকার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন।

(৫) এইরূপ সিদ্ধান্তের পরে হতাশ হয়ে সরকার ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে B-C-L-A-Act-এর সংশোধনী আইন প্রণয়ন করে হাইকোর্টের শক্তি বৃদ্ধির জন্য সুস্পষ্ট অভিমত প্রকাশ করছেন।

(৬) সরকারী বিভিন্ন স্তরের আইন সংক্রান্ত আলোচনার মাধ্যমে এও সুস্পষ্টভাবেই প্রকাশ পেয়েছে যে, আপীলের অধিকার কেবলমাত্র দণ্ডিত আসামীরই আছে—ট্রাই-ব্যুনাল রায়ের দণ্ডাদেশ বৃদ্ধি করতে হাইকোর্ট পারে না। কারণ, ট্রাইব্যুনাল বিচারে আসামী পক্ষ জুরীদের বিচারের সুযোগ হতে বঞ্চিত হয়েছে।

(৭) সরকার পক্ষের আপীল হাইকোর্ট সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করবে। কারণ, B-C-L-A-Act অনু-যায়ী ট্রাইব্যুনাল গঠিত হওয়ার মূল উদ্দেশ্য—সন্ত্রাসবাদীদের মামলার দ্রুত সমাপ্তি।

(৮) ভারত সরকারের Chief of Intelligence Bureau সব দিক থেকে যখন বুঝলেন যে, প্রতিকারের আর কোনো পথই নেই, তখন অন্য কোনো পথে কিছু করার উপায় উদ্ভাবনের দায়িত্ব বাংলা সরকারের ওপর ন্যস্ত করেছেন।

সরকারী দলিল মারফৎ এখন পর্যন্ত যা যা পেলাম তাতে আপাতদৃষ্টিতে প্রমাণ হচ্ছে, আমাদের ফাঁসি না দেওয়ার জন্য সরকার পক্ষ কখনই চুক্তিবদ্ধ হন নি এবং তাঁদের এই মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে মনে হচ্ছে আমাদের ফাঁসি না দেওয়ার জন্য চুক্তিবদ্ধ হবার কোনো কারণই তাঁদের ছিল না।

পাঠকবর্গ এই ভেবে হয়ত ধৈর্য হারিয়ে ফেলছেন যে, আমাদের ফাঁসি দেওয়ার সরকারী চক্রান্তকে ব্যর্থ করায় রণধীরের যে অপরিহার্য ভূমিকার কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি তার যৌক্তিকতা কোথায়? সরকারী দলিল মারফৎ বাহ্যত প্রমাণ হচ্ছে—সরকার আপীল করতে পারেন না, Revisional Powers হাইকোর্টের নেই এবং আসামী পক্ষের আপীলের সুযোগ থাকলেও হাইকোর্ট সেই আপীলের ক্ষেত্রেও দণ্ডবৃদ্ধি করতে পারে না। তবু এই ক্ষেত্রে রণধীর বা অন্য কোনো "দণ্ডিত আসামী" সরকারী ষড়যন্ত্র বানচাল করে-ছিল—এইরূপ কাহিনীর অবতারণা করা আমার পক্ষে হাস্যকর ও অপরাধমূলক নয় কি?

যে দুটি প্রশ্ন আমি নিজেই নিজের বক্তব্যের বিরুদ্ধে তুলে ধরলাম, তার সদুত্তর আমাকেই দিতে হবে। সুদীর্ঘ উত্তর না দিলেও প্রয়োজনীয় অংশটুকু প্রমাণ ও যুক্তি দিয়ে বলার সুযোগ আমাকে দিতে হবে। পাঠকবর্গের ধৈর্যহানি না করে যতদূর সম্ভব সংক্ষেপে তা বলবার চেষ্টা করবো॥

[ক্রমশ]

যুক্তফ্রণ্ট সরকার সমীপেষু

আমলাতন্ত্রের দুর্নীতি দূর করার কথা যুক্তফ্রণ্ট দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বারংবার ঘোষণা করেছে। ৩২ দফা কর্মসূচীতে এ কথা অত্যন্ত স্পষ্ট করে জনসমক্ষে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু যুক্তফ্রণ্টের গত সাড়ে তিন মাসের শাসনকালে আমলাতন্ত্রের দুর্নীতি দূর করার মত কোন একটা ব্যবস্থা কি গ্রহণ করা হয়েছে।

সাধারণ প্রশাসনের দায়িত্বে আছেন যুক্তফ্রণ্ট সরকারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু। শ্রীবসু আর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের কাছে বিশেষভাবে এবং সাধারণভাবে সমগ্র যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিমণ্ডলীর কাছে একটি প্রশ্ন করতে চাই—আমলাতন্ত্রের দুর্নীতি এবং স্বজনপোষণ ব্যবস্থা দূর করার জন্য তাঁরা আজ পর্যন্ত কি করেছেন জনসাধারণের সামনে সে কথাটা কি তুলে ধরবেন তাঁরা। আমলাতন্ত্রের ত্রিকোণ মঞ্চের শীর্ষবিন্দুতে যে কয়জন সৌভাগ্যবান আই-সি-এস আই-এ-এস অফিসাররা নৈবেদ্যের মণ্ডার মত শোভা পাচ্ছেন তাঁদের ক্ষমতা, স্বৈরাচার, বন্ধুপোষণের মাধ্যমে আত্মপুষ্টির যে ব্যবস্থা কংগ্রেস আমল থেকে চালু হয়ে আছে তাতে কি বিন্দুমাত্র বাধার সৃষ্টি করা হয়েছে।

যুক্তফ্রণ্ট সরকারের কাছে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা রাইটার্স বিল্ডিংসের ঘরে ঘরে স্টেট সিভিল সার্ভিসের কর্মীদের মধ্যে যে অসন্তোষ আর বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে তার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা কি তাঁরা করেছেন। উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবসুর কাছে প্রায় দু'মাস আগে স্টেট সিভিল সার্ভিসের অফিসাররা যে স্মারকলিপি পেশ করেছিলেন দক্ষ প্রশাসক শ্রীজ্যোতি বসু তাঁর কোন একটি দফার প্রতি কি নজর দিয়েছেন। তিনি কি খবর রাখেন বিশেষ বিশেষ অফিসারদের বিশেষ বিশেষ উপায়ে মনোরঞ্জন করতে না পারায় তাঁরা প্রমোশনের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে যে মর্ম-বেদনায় ভুগছেন—তার বিন্দুমাত্র উপশম হয়েছে কি?

যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রিসভা কি জানেন এই সব বঞ্চিত স্টেট সিভিল সার্ভিসের অফিসাররা ছাত্র হিসাবে খ্যাতিলাভ করে-ও তাঁদের থেকে নিম্নযোগ্যতা তো বটেই, এমন কি তাঁদের জুনিয়ার অফিসারদের থেকেও পিছনে পড়ে রয়েছেন মর্যাদার ক্ষেত্রে, বেতনের ক্ষেত্রে। যুক্তফ্রণ্ট সরকার এলে সুবিচার হবে এই আশায় যাঁরা বুক বেঁধেছিলেন, তাঁরাও যে কংগ্রেস আমলের সেই কায়েমীস্বার্থ আজো দোর্দণ্ড প্রতাপে বিরাজ করছেন দেখে হতাশায় ভেঙে পড়ছেন, সে খবর কি মন্ত্রিসভার সদস্যদের কাছে কেউ পৌঁছে দেয় নি।

আমলাতন্ত্রের মাথার মুকুটেরা আজো সর্বক্ষমতাসম্পন্ন। তাঁদের কাজ-কর্মের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতির বীজ। ওপর থেকে এই বিষ-বীজ নিচুতলা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে সমস্ত প্রশাসন ব্যবস্থাকে জনস্বার্থবিরোধী করে রেখেছে তত্ত্ব হিসাবে একথা জানা সত্ত্বে-ও আজো সরকারী হস্তক্ষেপ ঘটছে না কেন? প্রমোশনের বিশেষ অস্ত্র হাতে রেখে উর্ধ্বতন মুষ্টিমেয় কয়েকজন অফিসার যে সর্বময় কর্তৃত্ব দখল করে আছেন, যার জোরে তাঁরা মন্ত্রিসভার নির্দেশ পর্যন্ত অমান্য করার সাহস পান তাঁরা কি নির্বিবাদে কায়েম হয়ে থাকবে।

সংবিধানের কথা বলে তো চুপ করে থাকলে চলবে না। এই সব আই-এ-এস, আই-সি-এস, আই-পি-এসদের চাকরি খতম করার অধিকার রাজ্য সরকারের নেই, কিন্তু তাঁদের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে নির্বিষ ভুজঙ্গে পরিণত করার অধিকার তো আছে। উপ-মুখ্যমন্ত্রী বলবেন কি এসব পথ কেন তাঁরা গ্রহণ করছেন না।

বিশেষ করে উপমুখ্যমন্ত্রী এবং সাধারণভাবে যুক্তফ্রণ্ট সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কতকগুলো উদাহরণ তাঁদের সামনে তুলে ধরছি।

রাজ্যের সিভিল সার্ভিস অফিসার-দের মধ্যে এমন কয়েকজন সৌভাগ্যবান ব্যক্তি আছেন ডেপুটি কালেক্টর পদের নিম্নতম পর্যায়ে থাকার সময় থেকেই, এমন কি ঐ সার্ভিসে নিয়োগের দিন থেকেই বিশেষ বেতনের পদ অধিকার করে আছেন। তাঁদের অনেকেই ঐ পদে থেকেই আই-এ-এস ক্যাডার পদে প্রমোশন পান। তাঁরা বিশেষ বিশেষ কারণে যে সব বিশেষ বিশেষ অনুগ্রহ পেয়েছেন তাতে তাঁরা অনেক সিনিয়র-দের ডিঙিয়ে আই-এ-এসে উন্নীত হন। স্বভাবতই এতে বাকী শতকরা ৯০ জন অফিসারের মনোবল ভেঙে পড়ে।

বেকার সমস্যার সমাধান ?

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে !!

বাঙলা দেশে বেকার সংখ্যা নাকি আনুমানিক এক কোটি। এই ভয়াবহ বেকার সমস্যার সমাধানে ক্ষুদ্র মূলধনের ব্যবসা হিসাবে মুর্গী উৎপাদন বা পোলট্রি ফার্মিং অধুনা অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায় রূপান্তরিত হয়েছে—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে। বেকার ব্যক্তিদের পোলট্রি ফার্মিং ব্যবসা পরিচালনার বিশদ নির্দেশলাভের সুবিধার জন্য বসুমতী থেকে আত্মপ্রকাশ করলো।

রয়েজ পেডিগ্রী পোলট্রি ফার্মের অধিকর্তা

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ রায়

জি, পি (আমেরিকা), এফ, এস, পি, আই, পি, এইচ (লণ্ডন)

লিখিত সচিত্র

আধুনিক পোলট্রি ফার্মিং

মূল্য মাত্র চার টাকা। ডাকমাশুল এক টাকা।

অবিলম্বে অর্ডার পেশ করুন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ ॥ কলিকাতা-১২

সর্বশ্রী এস্ এম্ বোস, কে এন্ চ্যাটার্জী, এম্ কে চক্রবর্তী, এ কে রায় ডেপুটি কালেক্টর পদে যতদিন চাকরি করেছেন ততদিন-ই তাঁরা বিশেষ বেতনের সুযোগ পেয়েছেন। রাজ্য সরকার নিশ্চয়-ই এই ব্যবস্থা বন্ধ করতে পারেন। বিশেষ বেতনের পদ সিনিয়র অফিসার হিসাবে দেওয়ার বিধান করার এক্তিয়ার কি রাজ্য সরকারের নেই? বিশেষ বেতনের পদ্ধতির পরিবর্তে সিনিয়রদের জন্য একটি উন্নীত বেতনের হার নির্ধারণ করলে এই বিশেষ অনুগ্রহ বিতরণের ব্যবস্থা বন্ধ হতে পারে।

স্টেট সিভিল সার্ভিস থেকে আই-এ-এসে উন্নীত করার বর্তমান পদ্ধতি বদলে দিলে অনেক গলদ দূর হতে পারে। বর্তমানের নিয়ম অনুসারে আই-এ-এসদের সিলেক্ট তালিকা যেভাবে তৈরি করা হয়, তাতে তালিকা প্রণেতাদের অনুগ্রহের ওপর সব কিছু নির্ভর করে। এই তালিকাটি প্রণয়ন করেন চীফ সেক্রেটারী, রেভিনিউ বোর্ডের সদস্য এবং তিনজন বিভাগীয় কমিশনার। বিভাগীয় কমিশনার সর্বশ্রী রঘু ব্যানার্জী আর রঞ্জিত ঘোষ আর স্বর্গত সুব্রিটা সাহেবের কৃত তালিকা এখনো বর্তমান। সুব্রিটা সাহেবের জায়গায় এসেছেন সুনীল ব্যানার্জী। এঁদের কিভাবে খুশি করা হয়, যুক্তফ্রন্টের নেতাদের তা অজ্ঞাত নয়।

এঁরা কিভাবে আই-এ-এস ক্যাডারে উন্নীত করেছেন তার দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। শ্রী বি দত্ত তাঁর সমসাময়িক অর্থাৎ তাঁর ব্যাচের অফিসারদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা কম শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন। ১৯৬২ সালের নির্বাচনের পর শ্রী বি দত্তকে একটা মহকুমার দায়িত্ব দেওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন বলে মনে করা হয় নি—কিন্তু তাঁর ব্যাচের অন্য সকলকেই মহকুমার ভার দেওয়া হয়। কিন্তু হঠাৎ ১৯৬৫ সালে তাঁকে এত বেশি যোগ্য বলে বিবেচনা করা হোল যে, তাঁর ব্যাচের তিনজন সিনিয়র অফিসারকে ডিঙিয়ে তাঁকে তালিকাভুক্ত করা হোল। শেষ পর্যন্ত ১৯৬৭ সালে তিনি প্রমোশন পেলেন।

শ্রী এস এম্ বোস মুখ্যমন্ত্রীর সেক্রেটারিয়েটে কাজ করছিলেন। তিনি ছিলেন একজন অস্থায়ী সাব ডেপুটি। এই একই পদে থেকে ১৯৬৮ সালের মধ্যে দু-দুটো প্রমোশন পেলেন। শ্রী এম কে চক্রবর্তীকে অতিরিক্ত জেলা শাসকের পদ দেওয়া হয়। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটদের অভিজ্ঞতার চেয়ে স্বভাবতই তাঁর বেশি অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। কারণ এ ডি এম তাঁদের থেকে বেশি জ্ঞানী বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু চক্রবর্তী সাহেব তখন পর্যন্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না। উপ-মুখ্যমন্ত্রী একটু তদন্ত করলেই জানতে পারবেন কি কারণে ওপরের কর্তাব্যক্তিরা এ সব প্রমোশন দিয়ে থাকেন। নানা পথে কর্তাদের খুশি করতে পারলেই হোল আর যাঁদের কিছুটা আত্মসম্মানজ্ঞান ও বিবেকবোধ আছে তাঁরা বিরাগভাজন হতে বাধ্য, আর দেবতাদের কৃপাদৃষ্টি লাভ করতে না পারলে প্রমোশন "নৈব নৈব চ"।

—শ্রীসর্বদর্শী

[চলবে]

স্বাস্থ্যদপ্তরের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনুন

মনোরঞ্জন হাজরা

॥ দুই ॥

গত ৩রা এপ্রিলের সাপ্তাহিক বসুমতীতে 'স্বাস্থ্যদপ্তরের স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনুন' শীর্ষক যে প্রবন্ধটি লিখেছিলাম, জানতে পারলাম সেটি কাটিং করে মন্ত্রিমহাশয় তদন্তের আদেশ দিয়েছেন। আশা করব এবারেও যেটি লিখছি, মন্ত্রিমহাশয় সে সম্পর্কেও তদন্তের আদেশ দেবেন এবং তদন্ত হবে স্বাস্থ্যদপ্তরের কোন হোমরা-চোমরাকে দিয়ে নয় —অন্য কোন বিভাগের সৎ অফিসারকে দিয়ে। কেন না প্রবাদ আছে কাক কাকের মাংস খায় না। ঠিক এই কারণেই স্বাস্থ্যদপ্তরে যাঁরা হোমরা-চোমরা, তাঁরা কোন অফিসারকে যে দোষী সাব্যস্ত করবেন, তা মনে হয় না। তাছাড়া এ'রা সকলেই প্রায় একজোট। মন্ত্রী আসবেন, মন্ত্রী যাবেন, অর্থাৎ বিদায় নেবেন। কিন্তু এ'রা জানেন, এ'রা থেকেই যাবেন এবং ঠিক সেইজন্যেই এ'রা নিজেদের সযত্নে লালিত চক্রটিকে যেমন করেই হোক অক্ষত রাখবার চেষ্টা করবেন। তাই তদন্ত সম্পর্কে এই সাধারণ জানা কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিতে হচ্ছে।

বর্তমানে যে ভদ্রলোকের কথা লিখছি এখন তিনি স্বাস্থ্যদপ্তরের ডেভেলাপমেন্ট এ্যান্ড প্ল্যানিং বিভাগে আছেন। মজা এই সিভিল লিস্টে ভদ্রলোকের নাম তন্ন তন্ন করেও খুঁজে পাওয়া যাবে না। স্বরাষ্ট্র বিভাগের এক ভদ্রলোক যদিও সিভিল লিস্ট নিয়মিত তৈরি করার জন্য মাসে মাসে অতিরিক্ত দুশো টাকা করে পান, কিন্তু দুঃখের বিষয় গত তিন বছর ধরে তিনি এর একখানি আংশিক সংস্করণ ছাড়া আর কিছু প্রকাশ করতে পারেন নি। এ যদি তাঁর অক্ষমতা হয়, তবে তাঁর অতিরিক্ত দুশো টাকা এখনই বন্ধ করে দেয়া উচিত। আর যদি বিভিন্ন দপ্তরে চক্রব্যূহজাত পেটোয়াদের কারোকে ডিঙিয়ে কিংবা ল্যাং মেরে কোথায় কার অবস্থিতি ঘটল, সেটা গোপন করার একটা অব্যর্থ প্রয়াস হয়, তাহলে তাঁর জন্য অন্যরকম ব্যবস্থা হওয়া দরকার। যাই হোক্ স্বরাষ্ট্রদপ্তরের এই অব্যবস্থা আপাতত আমার আলোচনার বিষয়বস্তু নয়। তবে দপ্তরের চক্রব্যূহ কোন্ কোন্ স্ট্র্যাটেজিক পজিশন দখলে রাখলে নিরংকুশভাবে নিজেদের কারবার চালাতে পারবেন, এই সিভিল লিস্টের ব্যাপারে সে কথা মনে পড়ে যেতে পারে বলেই শুধু উল্লেখ করলাম।

স্বাস্থ্যদপ্তরে উন্নীত হবার যোগ্যতা।

স্বাস্থ্যদপ্তরের 'ডেভালপমেন্ট এ্যান্ড প্ল্যানিং' বিভাগে আলোচ্য ভদ্রলোকটি আসবার আগে কি অসাধারণ যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েছেন তার কিছু নমুনা দেওয়া যাক। সে ১৯৫৭—৬২ সালের কথা। ভদ্রলোক বর্ধমান জেলার সদরে এস-ডি-এইচ-ও ছিলেন।

প্রথমত: ভদ্রলোক কিভাবে নিজের কর্তব্যে ফাঁকি দিয়ে ব্যক্তিগত ব্যাপারে কর্মস্থল থেকে অনুপস্থিত থাকতেন তা শুনলে আশ্চর্য হতে হবে। ভদ্রলোক পেটোয়া লোকের কাছে ছুটির দরখাস্ত রেখে কলকাতায় বাড়ি চলে যেতেন। কয়েকদিন পরে কর্মস্থলে এসে পেটোয়া লোকটিকে জিজ্ঞাসা করতেন, 'ওপর থেকে কেউ আসে নি তো?' যখন শুনতেন ওপর থেকে কেউ আসেন নি তখন নিশ্চিন্ত মনে ভদ্রলোক দরখাস্তখানি ছিঁড়ে ফেলতেন। এবং এটা যে কিভাবে তিনি ম্যানেজ করতেন তা তাঁর নিজের ও তাঁর বন্ধুর স্বহস্তলিখিত দুখানি চিঠিতে জানতে পারা যাবে। ভদ্রলোক লিখছেন:—

My dear Ganguli,

Please let we know how (কোন ছেলে) has done in mathematics.

I may be away from H.Q. on 4th, 5th & 6th instant.

I shall be thankful if you kindly look after any emergency that may arise during my abseuce.

Thanking you,

Yours s'ncerely

....

3.4.58

ভদ্রলোকের বন্ধু লিখছেন:—

My dear Dr.......

Arun has done some how in mathematics, Let us hope for the best.

You needn't worry about work here during your absence more when we meet.

Yours sincerly

....

3.4.58

বর্ধমানের মস্ত একটা সমৃদ্ধশালী জনবহুল শহরে এস-ডি-এইচ-ওর মত একটা দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত একজন ডাক্তারের এইভাবে কর্মস্থল পরিত্যাগ করে যাওয়া যেমনিই অপরাধমূলক তেমনিই সরকারী অর্থের এইভাবে অপব্যয় হতে দেওয়াও মারাত্মক।

ট্রান্সফার অর্ডারের ব্যবসা

দ্বিতীয়ত: ভদ্রলোক অফিসে ট্রান্সফার অর্ডারের ব্যবসা করতেন। এজন্য সর্বাগ্রে তিনি রিসিভ রেজিস্টারটি নষ্ট করে দিলেন। তারপর কর্মচারীদের কাছ থেকে কিছু আদায় করে স্বাস্থ্যদপ্তর থেকে তদ্বির করে মনোমত 'বদলীর আদেশ' এনে পরিবেশন করতেন। নিচের এই অর্ডারগুলি দেখলেই বোঝা যাবে:—

বর্ধমানের জনৈক হেলথ এ্যাসিস্টান্টকে বদলী করা নিয়ে এই অর্ডারগুলি ঘটেছিল। ভদ্রলোকের নাম আমি উল্লেখ করছি না। শুধু অর্ডার নম্বরগুলি উল্লেখ করছি। প্রথম বদলীর আদেশ হল ১৫।১০।৫৮ তারিখে। বদলী করা হল বর্ধমান থেকে বীরভূমের সাঁইথিয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। আদেশ নম্বর ডি-এইচ-এস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এইচ-সি) ৫।৮।৫৭/ ১২৫৯১(৫) স্বাক্ষর পি বসু—পশ্চিমবঙ্গ স্বাস্থ্যদপ্তরের ডিরেকটরের পক্ষে। কিন্তু এই হেলথ এ্যাসিস্টান্টটি এস-ডি-এইচ-ওর বড়ই প্রিয় এবং দলের লোক। একে বীরভূমে পাঠিয়ে না দিয়ে পাঠাতে হবে অন্যত্র অর্থাৎ তাঁর বাড়ির কাছে। কিন্তু একেবারে সে অর্ডার কি করে করা যায় তাই পুনরায় একটা মাঝামাঝি অর্ডার করানো হল। অর্ডারটা এইরকম:

Shri.......Banerji Health Assistant Relief Camp under Assistant Chief Medical Officer of Health, Alipur was transfered and posted at Burdwan Sadar Sub division vice Shri... (আলোচ্য হেলথ এ্যাসিস্টান্ট) under order of transfer as per. D.H.S. order No. HPH/E/2H-38. 58/322 dater 14.1.59.

এখানেই এঁর যাওয়ার দরকার ছিল। এই আদেশের নম্বর হচ্ছে ডি-এইচ-এস, এ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এইচ-সি) জে৩—৫৮/৭২২/১(৫) তাং ১৯-১-৫৯। এখানে সবাচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে ১৯৫৮ সালের ১৫ই অক্টোবর থেকে ১৯৫৯ সালের ১৯শে জানুয়ারীর মধ্যে মাত্র ১০১ দিনের ব্যবধানে একটি লোক সম্পর্কে তিন-তিনবার ট্রান্সফার অর্ডার করানোর ক্ষমতা অর্জন করতে হলে ওপরতলায় কতখানি সংযোগ রক্ষা করতে হয় আর যাতায়াত করতে হয়, তা বোধ করি অনুমান করা কঠিন নয়। তাছাড়া মাননীয় মন্ত্রি-মহাশয়কে আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করতে অনুরোধ জানাবো যে, কোন ক্ষেত্রেই কিন্তু প্রিভিয়াস অর্ডারকে নাকচ করে নতুন অর্ডার ইস্যু হচ্ছে না।———

ট্রান্সফার অর্ডার দ্বারা ব্ল্যাকমেল

তৃতীয়ত এই ট্রান্সফার অর্ডার ব্যবসায় প্রসঙ্গে ভদ্রলোকের আরেকটি গুণ ছিল—ট্রান্সফার অর্ডার ম্যানুফাক্চার করা। মানুষ যখন ট্রান্সফার অর্ডার ম্যানুফাক্চার করে তখন তা নিশ্চয়ই কোন সদুদ্দেশ্যে করে না—তা করে অন্যকে ব্ল্যাকমেল করার জন্য, ভয় দেখানোর জন্য, জোর করে উৎকোচ আদায়ের জন্য। এবং এর দ্বারা এই এস-ডি-এইচ-ও যে কি না করেছেন তা বলা যায় না। প্রবন্ধের শেষ দিকে সেই কথা তুলে আমি এই প্রবন্ধের পূর্ণচ্ছেদ টানবো। তার আগে দু-একটা নমুনা দিই :—

প্রথম সাধারণ নির্বাচনের পরে ডাঃ অমূল্য মুখার্জী স্বাস্থ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীঅমিয় মুখার্জী এঁর অধীনে হেলথ্ এ্যাসিস্টান্ট ছিলেন। ভদ্রলোক তাঁকে কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না। তাঁকে কিভাবে ভয় দেখিয়ে কম্পণ দিতেন এই নমুনাটি তারই প্রমাণ।

ORDER

1. Shri Amiya Kumar Mukherji, Govt. Health Assistant, Burdwan P.S., Sadar, Burdwan is hereby transferred to Galsi P.S. under Sadar Sub division, Burdwan.

2. Sm....Mukherji, Lady Health Assistant Galsi P.S. Burdwan is hereby transferred to Burdwan P.S., Burdwan Sadar.

Shri Amiya Kumar Mukherji will move first.

The transfer is in the interest of Public Service.

S.D.H.O.

এই আদেশপত্রটি আমার কাছে আছে। অর্থাৎ যে কথা আমি বলতে চাইছি, সেটা হচ্ছে এই যে, নিচে এই সব যে অপকর্ম তিনি করতেন—দলের লোক বলে, ওপরে চোখ বুজে তাইতেই ছাপ দেওয়া হত এবং স্বাস্থ্যদপ্তরে এই চক্রব্যূহ আজকের নয়, বহুদিনকার : অমিয়বাবু বেঁচে থাকলে আরও অনেক কথা আমি লিখতে পারতাম। কিন্তু তা না হলেও এই অফিসারটির নিজের হাতের লেখাতেই উক্ত আদেশপত্রটি রচিত এবং আমার হাতে তার ওরিজিন্যালটাই আছে।

ফল্স টি-এ ও ডি-এর কাহিনী

চতুর্থত ভদ্রলোক কিভাবে সরকারী অর্থ নিজে আত্মসাৎ করার চেষ্টা করেছেন এবং তাঁর একান্ত বশম্বদদের কিভাবে তা পাইয়ে দেরার চেষ্টা করেছেন তার কিছু কিছু নমুনা আমার হাতে আছে। বিনা

এরপর এই ভদ্রলোককেই আবার বদলীর আদেশ দেওয়া হল হাওড়া জেলার নবগ্রাম হেলথ সেন্টারে যাবার জন্য। কারণ তথ্যে প্রবন্ধ লেখা বা অহেতুক কোন লোককে আক্রমণ করা আমার অভ্যাস নেই। তাই শুধু যেগুলি একেবারে অকাট্য ব্যাপার সেগুলিই আমি উল্লেখ করছি।

(১) ২৮।৫।৫৭ তারিখে তিনি পিচকুড়িতে গিয়ে স্বচক্ষে যে কাজগুলি প্রত্যক্ষ করেছিলেন বলে টি-এ বিলের টাকা গ্রহণ করেছিলেন, সেই টাকা নেয়া তাঁর একেবারে বে-আইনী। তিনি এ সময়ে কখনই ওখানে যান নি। যাঁর সঙ্গে তিনি গিয়েছিলেন, বা যাঁর সঙ্গে তিনি ঐ কাজগুলি পরিদর্শন করেছিলেন বলে তাঁর ব্যাপারটা আইনানুগ করতে চেয়েছিলেন, তিনি জেনেশুনেই তা লেখেন নি। এজন্য সে ভদ্রলোককে তাঁর কোপে পড়তে হয়েছে, তবু তিনি তা লেখেন নি। এই প্রসঙ্গে এস-ডি-এইচ-ওর নিকট প্রেরিত ঐ ব্যক্তির মেমো নং ৮১ তাং ১।৬।৫৭ দেখলেই এই ফাঁকিটা ধরা পড়বে।

(২) ভদ্রলোক নতুন ডিসপেন্সারীকে লাইসেন্স দেওয়ার ব্যাপারে অভিনব পন্থা অবলম্বন করতেন। তিনি কোনদিনই নিজে তদন্তে যেতেন না (এ সময়ে তিনি এ-সি-এম-ও-এইচ)। বশম্বদদের দিয়ে ব্ল্যাংক প্রোফর্মা ভর্তি করাতেন। তারপর তাদের দ্বারাই তদন্ত করিয়ে পরে নিজে তদন্ত করেছি বলে টি-এ বিল করতেন।

(৩) এরপর বশম্বদদের সরকারী টাকা বে-আইনীভাবে পাইয়ে দেবার কয়েকটা প্রচেষ্টা উল্লেখ করছি। শ্রী......দাস নামে জনৈক কর্মচারীকে ২৭।৯।৫৭ তারিখে ৫৬·২৫ পয়সা ফল্স্ টি-এ ও ডি-এ নিতে সাহায্য করেছেন তিনি। ১৯৫৬ সালে বন্যাত্রাণ কার্যে সরাইটিকর থেকে বর্ধমানে কাজ করেছেন বলে এই টাকা নিতে তাঁকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অথচ শ্রী......দাস আদালতে এক জবানবন্দীতে বলেছেন, ১৯৫৯ সালের জানুয়ারী মাসের আগে তিনি কখনও সরাইটিকরে যান নি। এই যদি ঘটনা হয় তাহলে ১৯৫৭ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তিনি কি করে পূর্বোক্ত টি-এ ও ডি-এ বিল পেতে পারেন? ঘটনাচক্রে এই প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনা উল্লেখ করছি। মোবাইল মেডিক্যেল ইউনিটে মেডিসিন কেরিয়ার শ্রী......(কোন ব্যক্তি) গত ১৯৫৬ সালের অক্টোবর ও নভেম্বর মাসের বন্যার সময় ভেদিয়ায় না গিয়েই ৯।৪।৫৯ তারিখে ৩৩·১২ পয়সা টি-এ ও ডি-এ পেয়েছিলেন এই অফিসারটিরই কৃপায়। অথচ এই ব্যক্তিটি অফিসার মহোদয়ের বাসায় বাসায় রান্নার কাজ করার জন্য নাকি নিযুক্ত হয়েছিলেন। এ সম্পর্কে "মেমো নং ১১-ই-৭/৫১৪/পি-এইচ তাং ২৬।৩।৫৮ এস-ডি-এইচ-ও বর্ধমান" দ্রষ্টব্য

মাসিক ১০, টাকার কিস্তিতে লাভ করুন অল ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড ট্রানজিস্টর (জাপান মেক) জনপ্রিয় মূল্য ৩০০,। দেশব্যাপী খ্যাতি আছে। ডবল স্পীকার ৩ ব্যান্ড, ৮ ট্রানজিস্টর। নাইট-ল্যাম্প ফিট করা। কেবল ইংরেজী বা হিন্দিতে যোগাযোগ করুন।

Allied Trading Agencies
(B.C.) P.B. 2123, Delhi-7.

ফল্‌স্‌ টি-এ বিলের টাকা ফেরৎ

এখন আলোচ্য অফিসারটি সম্পর্কে আমি শুধু অহেতুক কতকগুলি অভিযোগ করে যাচ্ছি বলে স্বাস্থ্যদপ্তরের চক্রবন্ধ ব্যক্তিরা মন্ত্রিমহাশয়কে হয়তো বোঝাতে চেষ্টা করতেন এবং ঠিক সেইজন্যেই মুখ্যমন্ত্রীর কোন ফাইল থেকে যে উদ্ধৃত আমি এখানে দেবো, সেটা যেন সংশ্লিষ্ট সকলেই একটু ভেবে দেখেন। ভদ্রলোক এইরকম ফল্‌স্‌ টি-এ বিলে টাকা নিয়ে যে মুস্কিলে পড়েছিলেন সে কথা এর মধ্যে উল্লিখিত আছে এইভাবেঃ

"In 1962 the said officer Dr. ....had to deposit the sum of money to the Burdwan Treasury for drawing false payment of his T.A. Bill No. 34 dated 25.5.59 and Bill No. 76 dated 4.8.59......"

এই প্রসঙ্গে মাননীয় মন্ত্রিমহাশয়কে আমি বলতে চাই—চোর চোরাই মাল ফেরৎ দিলেই তার অপরাধ স্খালন হয় না এবং শুধু তাই নয় এগুলি ধরা পড়েছিল তাই ফেরৎ দিয়েছেন। কিন্তু যেগুলি ধরা পড়ে নি, সেগুলির বিষয়ে কি হবে? তদন্ত হবে কি?

দুই অরুণের কাহিনী

ইতিপূর্বে বলে এসেছি এই অফিসারটি কি না করেছেন তার পূর্ণচ্ছেদ টানবো প্রবন্ধের শেষ দিকে। বর্তমানে আমি সেই কথাই বলছি। অফিসারটির এই কার্যকলাপকে জাতীয় সরকারের মুখ চেয়ে যিনি বারে বারে কর্তৃপক্ষের নজরে এনেছেন, তাঁকে ইনি, নিতান্ত গায়ের জোরে আর ওপরতলার সহযোগিতায় চাকরি থেকে অন্যায়ভাবে সরিয়েছেন। প্রথমে তাঁর মাসিক বেতন বন্ধ করে দিয়েছেন এই অফিসারটি। মাননীয় মন্ত্রিমহাশয় পে-রেজিস্টার দেখলে বুঝতে পারবেন, ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের বেতন দেওয়া হয়েছিল ১৯৫৯ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখে। জিজ্ঞাসা করি কেন এমন হয়? কে এ অধিকার দিয়েছিল এই অফিসারটিকে? ফেব্রুয়ারী মাসে যখন সেপ্টেম্বরের বেতন দেওয়া হচ্ছে, তখন কেন অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারী প্রভৃতি মাসগুলির বেতন তাকে দেওয়া হল না? এর মধ্যে দিয়ে কোন মানবিকতার প্রকাশ পেয়েছিল অফিসারটির? প্রতিহিংসাপরায়ণতায় সিদ্ধহস্ত এই অফিসারটি কেন সেদিন পার পেয়ে গিয়েছিলেন তা বোঝা কিছু কঠিন নয়—কারণ একদিকে তখন ছিল কংগ্রেসী শাসন, আরেকদিকে ছিল স্বাস্থ্যদপ্তরে শয়তানীচক্র। তাই কোন কর্মচারী সৎ হলে তাকে গলা টিপে মারা তখনকার দিনে রেওয়াজ ছিল। এতেও যখন হয় নি, তখন এই অফিসারটি কি করেছিলেন তারও দু-একটা ঘটনা এখানে উল্লেখ করা দরকার। ট্রান্সফার অর্ডার ম্যানুফ্যাকচার করা ভদ্রলোকের অভ্যাস আগেই ছিল। তিনি এক ট্রান্সফার অর্ডার দিয়ে বসলেন উক্ত কর্মচারীটিকে। কিন্তু ঐ ট্রান্সফার অর্ডার যে ঠিকানায় দেওয়া হল, সে ঠিকানা অনেক পূর্বেই কর্মচারীটি পরিত্যাগ করে নতুন ঠিকানায় চলে গিয়েছিলেন এবং অফিসে সে নতুন ঠিকানাও তিনি জানিয়ে গিয়েছিলেন। স্বভাবতই ট্রান্সফার অর্ডার সার্ভ করা গেল না। অন্যদিকে ট্রান্সফার অর্ডার মানেন নি বলে তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে একথা দপ্তরে লিখে রাখা হল। আশ্চর্যের বিষয় এ বরখাস্তের চিঠিও তিনি পেলেন না। অথচ ঐ একই সময়ে রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে তাঁর নতুন ঠিকানায় চিঠি ঠিক পৌঁছুচ্ছিল। তার প্রমাণও আমার হাতে রয়েছে।

আরও অনেক কথা বলা যেত, কিন্তু প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হয়ে যাবে বলে এবং পরবর্তী সময়ে আদালতে কাজে লাগতে পারে বলে সে সব কথা আমি এখানে উল্লেখ করছি না। সেই থেকে আজ দশটা বছর কর্মচারীটিকে বেকার করে রাখা হয়েছে, অথচ তার চাকরি কোনদিনই আইনত যায় নি। যুক্তফ্রন্টের আমলে সেই অফিসারটিই রাইটার্স বিল্ডিংস-এ ডেভেলাপমেন্ট এ্যাণ্ড প্ল্যানিং এ এসে বসেছেন। বহুবার অন্যায়ভাবে বরখাস্ত হওয়া কর্মচারীটি স্বাস্থ্যদপ্তরে আবেদন জানিয়েছেন। কিন্তু চক্রবন্ধ সেই অফিসারটি এমন জাল বিস্তার করে রেখেছেন যে, তাঁর আবেদন অরণ্যে রোদনের সামিল হয়ে যাচ্ছে। উক্ত অফিসারটি তাঁর একান্ত স্নেহভাজন 'অরুণ' অংকে কিরকম উত্তর লিখেছে, তা জানবার জন্য কর্মকেন্দ্র থেকে পালিয়ে গেছেন ম্যানেজ করে—একথা ইতিপূর্বে বলা হয়েছে, হয়ত সে অরুণকে ডাক্তারী পড়াবার ইচ্ছা ছিল তাঁর। তাই অংকের জন্য তাঁর অতো চিন্তা, হয়ত সে অরুণ আজ ডাক্তারীও পড়ছে, কিংবা ডাক্তার হয়ে বেরিয়েছে— কিন্তু যে কর্মচারীর তিনি চাকরি খেয়েছেন, তার অরুণেরা কি করছে তা কি হৃদয় দিয়ে কোনদিন তিনি অনুভব করতে পারেন? না, চক্রে তাঁর যাঁরা পৃষ্ঠপোষক তাঁরা একথা ভাবতে পারেন? কিন্তু আমি প্রতিদিনই এই অন্যায়ভাবে বরখাস্ত কর্মচারীটির হাড়জিরজিরে, শিশুসন্তানদের অভাব, দৈন্য ও শিক্ষা থেকে বঞ্চিত অবস্থায় পথে পথে ঘুরতে দেখি। যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় মানুষ আছে—তাই কর্মচারীটি বারে বারে আবেদন জানিয়েছেন, কিন্তু স্বাস্থ্যদপ্তরে আদমখোর কয়েকটি মানুষের চক্রের মধ্যে পড়ে ন্যায়বিচারের সে আশাও তাঁর ধূলিসাৎ হয়ে গেছে। মন্ত্রিমহাশয় এদিকে একটু দৃষ্টি দিলে আমি তাঁকে সাহায্য করতে পারি।

সদ্য প্রকাশিত হইল!

বাঙলা সাহিত্যের অদ্বিতীয় হাস্যরসিক

শিবরাম চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত

(১) মনের মত বৌ
(২) মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী
(৩) প্রেমের পথ ঘোরালো
(৪) প্রেমের বিচিত্র গতি
(৫) রক্তের টান
(৬) যখন তারা কথা বলবে

পৃষ্ঠা ২৪০

মূল্য মাত্র চার টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ।। কলিকাতা-১২

গ্রন্থমেলা

কালিকট থেকে পলাশী : শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়। সাহিত্য সংসদ, ৩২এ, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড; কলকাতা—৯। মূল্য—ছয় টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

সতীন্দ্রবাবুর গ্রন্থটির পটভূমি ব্যাপক। মধ্যযুগে য়ুরোপের বিভিন্ন জাতি ধন-রত্নের লোভে কেমন করে প্রাচ্যে অভিযান করেছিলেন, তারপর বাণিজ্যিক সাফল্য থেকে আরম্ভ করে কেমন করে তাঁরা রাজনৈতিক সাফল্যও অর্জন করেছিলেন, প্রধানত সে-সব কথাই লেখক আলোচনা করেছেন। ইংরাজ, বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষই তাঁর এই রচনায় প্রাধান্য লাভ করেছে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের বাণিজ্যের পটভূমিকা, পোর্তুগীজ পর্ব, ওলন্দাজ পর্ব, ফরাসী, দিনেমার ও বেলজিয়াম পর্ব, বিদেশীর চোখে বাংলা, ইংরেজ পর্ব ইত্যাদি অধ্যায়গুলিতে স্বল্পপরিসরে এবং সহজ ভাষায় জানবার মত অনেক কথাই লেখক বলেছেন। বিভিন্ন অধ্যায়ের সঙ্গে যে সব মানচিত্র মুদ্রিত করা হয়েছে সেগুলি গ্রন্থটিকে আরও চিত্তাকর্ষক করে তুলেছে। প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে এ গ্রন্থটি সমাদৃত হওয়া উচিত।

ক্রান্তি (বাংলা ত্রৈমাসিক), দ্বিতীয় বর্ষ, ১ম ও ২য় যুগ্ম সংখ্যা। সম্পাদক : বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। ক্রান্তি পরিষদের পক্ষে সুনীল দাস কর্তৃক ৮বি, কলেজ রো, কলকাতা—৯ থেকে প্রকাশিত। মূল—এক টাকা।

শিল্প, সাহিত্য, নন্দনতত্ত্ব, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও অন্যান্য কয়েকটি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধাবলী প্রকাশ করে 'ক্রান্তি' পত্রিকাটি অতি অল্প দিনের মধ্যেই খ্যাতি অর্জন করেছে। বর্তমান সংখ্যায় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের 'গান্ধীজীর উত্তরাধিকার' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে ইতিহাস ও সমাজ-বিবর্তনের প্রক্রম সম্পর্কে গান্ধীজীর কি পরিমাণ আগ্রহ ছিল, সে সম্পর্কে সুন্দরভাবে আলোকপাত করেছে। 'উনিশ শতকের ও বিশ শতকের প্রারম্ভে মধ্য এশীয় সাহিত্যে গণতান্ত্রিক প্রবণতা' একটি সুখপাঠ্য ও তথ্যসমৃদ্ধ রচনা। কেমন করে মধ্য এশিয়ায় ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রবণতার প্রস্ফুটন ও বিকাশের অনুকূল এক উর্বর ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছিল লেখক সে বিষয়ে বহু তথ্য পরিবেশন করেছেন। ভিয়েতনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে মারিও দ্য আঁদ্রেদে, আঁদ্রে পিয়ের দ্য মান্দিয়ার্নাস, পলমারী লাপয়েঁত প্রমুখ যোলজন মনীষীর প্রতিবাদ আমাদের মনের গভীরতর চিন্তাগুলিকে জাগিয়ে তোলে। পরিশেষে এ কথাই বলব যে, ক্রান্তির মত পত্রিকাগুলিই বাংলা প্রবন্ধ-সাহিত্যকে ক্রমান্বয়ে উন্নীত করে তুলছে।

রাষ্ট্র (রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনার ত্রৈমাসিক মুখপত্র); অষ্টম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা : কার্তিক-পৌষ ১৩৭৫ : সম্পাদক—শ্রীনির্মল বসু। কার্যালয়—৪৭/২এ, বদ্রিদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলকাতা—৪। দাম—এক টাকা।

'ভারতে পার্লামেন্টারী শাসনের অন্তরায়' প্রবন্ধটিতে ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার অন্যান্য নানা বিষয়ের মধ্যে এদেশের পেশাদারী রাজনীতিবিদ্‌গণের দল ভাঙাভাঙি সম্পর্কে যে আলোচনা করেছেন তা অনেকদিন মনে থাকবে। শ্রীবিমলেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কৌটিল্যের দৃষ্টিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক' এবং ডঃ অক্ষয়কুমার ঘোষালের 'জেলা প্রশাসনের রূপান্তর'—দু'টি উল্লেখযোগ্য রচনা। শ্রীপবিত্র গুপ্তের 'কমিউনিজম ও জাতীয়তাবাদ' প্রবন্ধটিতে যে সব প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন সেগুলি ভেবে দেখবার মত। মিলের Consideration on Representative Government-এর বঙ্গানুবাদ এবং 'পশ্চিমবঙ্গ যুক্তফ্রন্টের কার্যসূচী' রাজনৈতিক দলিল হিসাবে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে উৎসাহী পাঠকদের আনন্দ দান করবে।

চিত্রবীক্ষণ (মার্চ-এপ্রিল '৬৯) : সম্পাদক—জয়সুন্দর গুপ্ত : সিনে সেন্ট্রাল কলকাতা, ২, চৌরঙ্গী রোড কলকাতা—১৩ হতে প্রকাশিত। দাম ১·৫০।

বাংলা ভাষায় প্রকাশিত তথাকথিত সিনে জার্নালের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। এদের একমাত্র উদ্দেশ্য সুপরিকল্পিতভাবে ব্যবসা চালানো। তাই এরা উঠতি বয়সের যুবক-যুবতীদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে, কোন স্টারের কুলীন ঠিকুজী কি, তারা কি খায়, কেমন করে ওঠে-বসে, প্রাত্যহিক ক্রিয়া-কর্ম করে এ সব তথ্য পরিবেশনের দ্বারা বাজার মাৎ করে। তারপর ব্যবসায় ফলাও হলে তখন অপেক্ষাকৃত বেশি নজরানা দিয়ে নামকরা সাহিত্যিকদের রচনা দু'-চারটে পরিবেশন করে একটা খিচুড়ী পত্রিকা আকারে সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতির পণ্য বেসাতি করে।

আলোচ্য পত্রিকাটির উপরোক্ত সিনে জার্নালগুলি থেকে গুণগত কত তফাৎ তা পাঠকমাত্রই উপলব্ধি করবেন। সিনে জার্নালের দ্বিমুখী কর্তব্য হওয়া উচিত। প্রথমত প্রযোজনা-পরিচালনা-উৎপাদন প্রদর্শন ব্যাপারে গবেষণামূলক বৈজ্ঞানিক চিন্তার রসদ যোগানো এবং দ্বিতীয়ত পোস্ট রিলিজ সেন্সার-এর যন্ত্র হিসেবে কাজ করা—অর্থাৎ রিলিজড ও ছবির এমনি স্বচ্ছ দৃষ্টিসম্পন্ন গঠনমূলক সমালোচনা করা, যাতে দর্শকদের সুস্থ রুচিবোধ জাগে এবং প্রতিটি চিত্রের সঠিক মূল্যায়ন করতে পারে। এর অভিব্যক্তি গিয়ে পড়বে বক্স অফিসের ওপর এবং তখনই প্রযোজকেরা সাবধান হয়ে চিত্রোৎপাদন করতে যত্নবান হবেন। চিত্রবীক্ষণ পত্রিকাটি এই দ্বিবিধ কর্তব্য সম্পাদনের সূচনা দেখিয়েছেন সন্দেহ নেই। প্রবন্ধগুলির প্রত্যেকটি এই কর্তব্যের দিকে দৃষ্টি রেখে সন্নিবেশিত হয়েছে।

বিভিন্ন দেশ-বিদেশের, বিশেষ করে, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে এই বিরাট সম্ভাবনাময় শিল্পটির ক্রমবিবর্তন—বর্তমান পরীক্ষা-নিরীক্ষা কিভাবে চলছে তার একটা সুস্পষ্ট রেখাচিত্র তুলে ধরা হয়েছে প্রবন্ধগুলির ভিতর। তেমনি আছে বাংলা ছবির ওপর গঠনমূলক সমালোচনা।

প্রচ্ছদ সুন্দর। কিন্তু অসংখ্য ছাপার ভুল এবং বেশ কিছু বানান ভুল পত্রিকাটির সৌষ্ঠব ক্ষুণ্ণ করেছে। জনৈক তুষার রায়ের রচনায় ভাষার দৌর্বল্য অমার্জনীয়—বাক্য গঠনে ভুলও রয়ে গেছে। একটি উন্নতমানের পত্রিকায় এসব ত্রুটি লজ্জাজনক।

সর্বশেষে বলা যায় বাংলার সিনে জার্নালিজমে 'চিত্রবীক্ষণ' আশার আলো এনেছে। আমরা এর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

জিগীষা (তৃতীয় সংকলন) : সম্পাদক—রানা চট্টোপাধ্যায় ও স্বজিত ভাদুড়ী। ১৪ডি ঠাকুরবাড়ি রোড। কলকাতা—২৬। দাম : পঞ্চাশ পয়সা।

আলোচ্য পত্রিকায় রয়েছে গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ। ছোট পত্রিকা হলেও পত্রিকাখানি সাহিত্য পত্রিকা পড়ার আনন্দ দেয়।

[পূর্বানুবৃত্তি]

মুকুন্দকে দেখিয়ে মহেশ আবার বললে, "মুকুন্দের দশা দেখ। হাতটা বোধ হয় মুচড়ে ভেঙেই দিয়েছে, একটা পায়ে চোট, গলা চেপে প্রায় মেরেই ফেলেছিল কালু মাঝির ব্যাটা।"

"ভলু মাঝি! সেই বাবরী চুল!" গুপী বলে উঠল, "তোমাকে বলতে ভুলে গেছি ছোট মণ্ডল। লোকটাকে আমি একদিন মুকুন্দের ঘরের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি। তখন অনেক রাত। মোর গলার সাড়া পেয়ে সাপটে চলে গেল। কাঁধে ইয়া লম্বা লাঠি। তা চৌকিদারের তো এখন সাত খুন মাপ—কি আর বলব!"

"অকে আমিও দেখেছি। তখন চিনতে পারি নি, থানায় যেয়ে সব জানতে পেরেছি। মোদের চরে অর নতুন আড্ডা—আর সেইখেন থেকে মোদের এই দুর্দশা।" মহেশ বিড়বিড় করে বললে, "সে আমি একবার চরে ঘুরে যাই—এর শোধ তুলব। এর বদলা হবে।"

সুবল গুপী—ওরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে—আড্ডাটা কার বাড়িতে, ঠিক বুঝতে পারলে না বোধ হয়। মুকুন্দের মুখের দিকে তাকাল।

মুকুন্দ বললে, "যমুনা।"

"যমুনা!" সুবল বলল, "হাই দেখ, কাল থেকে তাকে যে মুকুন্দের ঘরে ক'বার আসতে যেতে দেখলম গো। সকালবেলা জিজ্ঞেস করতে বললো—ভিখ্ মাগতে এসেছিলম। ফের আজ দুপুরবেলায় খেয়েদেয়ে সবাই যখন গা গড়াচ্ছে তখন দেখলম।"

"মোর বাড়িতে!" মুকুন্দ চমকে উঠল।

"তাই তো দেখলম।" সুবল বলল, "তোর বৌয়ের সঙ্গে কথা বলছিল। মোকে দেখে চোখ মটকে চলে গেল।"

"সব্বনাশী ডাইনী আবার কি বিপদ ঘটাচ্ছে রে!" মহেশ বলে উঠলো, "অর আড্ডায় একপাল ভাণ্ডড়-গুলিখোরদের নিয়ে ওই ভলু মাঝি আজ আবার গেল বাজারের আবগারী দোকানের দিকে—সঙ্গে সেপাই দারোগা। সেখানেও যে এখন কি রক্তগঙ্গা বয়ে যাচ্ছে কে জানে!" একটু থেমে মহেশ আবার বললে, "মোর কেমন সন্দেহ হচ্ছে—চরে মোদের আরও কি অঘটন ঘটে যাবে রে সুবল। চল্—চল্, পা চালিয়ে চল।"

মন চললেও পা চলে না। একজনের চোট-খাওয়া কোমর, একজনের চোট-খাওয়া পা। দু'জনের কাঁধ ধরে, ঘষটে ঘষটে হাঁটছে মহেশ আর মুকুন্দ।

ওদিকে হেমন্তের শেষবেলা দেখতে দেখতে অন্ধকার হয়ে এল। চরের কাছা-কাছি পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধ্যে।

জেলা বোর্ডের চওড়া সড়ক ছেড়ে চরের বাঁধ রাস্তা ধরে কিছুটা যেতে-না-যেতে ওদের দেখা হয়ে গেল হাবুর দলের সঙ্গে। দলে হবে পাঁচ-ছজন। ওদের দেখে থমকে দাঁড়াল।

"এসে গেলে ছোট মণ্ডল! মুকুন্দ-কেও ছেড়ে দিয়েছে!" হাবু খুশি খুশি গলায় বললে, "হাই দেখ—মোরা নিয়ে যাচ্ছিলম আজ বোতলে করে।" একটা কালো বোতল তুলে দেখালে হাবু—চাপা গলায় বললে, "কেরোসিন তেল। থানার পাকা ঘর—কি আর করতে পারি মোরা বল ছোট মণ্ডল। অদের রসুই ঘরটা খড়ের চালা—আজ দিতম শালার জ্বালিয়ে। যা থাকে কপালে।—তা আর কাজে লাগল নি।"

"কাজে লাগবে হাবু।" মহেশ এক-দিকে আঙুল দেখিয়ে বললে, "মোদের চরে হোই যে একটা মহাপাপের ঘাঁটি আছে—যমুনার টঙ্, ওটা পুড়ে ছাই করবার জন্য কাজে লাগবে। দে মোকে বোতল।"

হাবু সব কথা জানে না। ভ্যাবা-চ্যাকা খেয়ে বলল, "যমুনার টঙ! জ্বালিয়ে দেবে?"

"ওটা আজ শেষ করে গা ধুয়ে ঘরে ঢুকবো।" মহেশ খ্যাপা গলায় বললে, "ওইখেন থেকে মোদের এই হাল হয়েছে। আরও কার কি হবে কে জানে! দে বোতল।"

"মোদের বলো না।" গুপী বললে, "মোরা যাচ্ছি।"

"তোদের বিশ্বাস নাই।" তেমনি খ্যাপা গলায় মহেশ বললে, "ও হারামজাদীর বেটি যাদু জানে। মোদের চরের দু'-চারটে ছোঁড়া ওদিকে যেয়ে ছোঁক্ ছোঁক্ করে—আমি জানি।"

গুপী অবাক হয়ে বললে, "আমি গেছি?"

হাবু বললে, "মোকে সন্দেহ করছ ছোটমণ্ডল!"

কিন্তু হাবুর দলের দু'-একটি ছোকরা ঘাড় হেঁট করলে। অন্ধকারে দেখা না গেলেও খোদ মহেশ মণ্ডলের ব্যাটা বলরামের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

মহেশ বললে, "ওই পাপের বাসা বহুদিন থেকে মোর মনে খচ্‌খচ্ করে বিঁধছে হাবু। আজ সুযোগ পেয়েছি—শেষ করে যাব। মোর হাতে বোতল দে—চল্ মোর সঙ্গে।"

জগন্নাথ বলরাম দু'পাশ থেকে দুজন বাপকে ধরে রেখেছিল। বলরামের মুঠো আলগা হয়ে গেল। জগন্নাথ বললে, "তুমি কোমর সোজা করে হাঁটতে পর্যন্ত পারছ না। অরা যাচ্ছে—যা করবার করবে। তুমি ঘরে চল।"

হাবু বললে, "মোদের বিশ্বাস করে ঘরে যাও মণ্ডল। এই তোমার গা ছুঁয়ে দিব্যি করছি। ঘরে বসে তুমি দেখতে পাবে—ওই যমুনার চালায় লাল ঘোড়া ছুটছে।"

"শুধু তাই লয়।" মহেশ দাঁতে দাঁত চেপে বললে, "ঘাড়ে ধরে ওর ওই খোলাবুলি, হাঁড়ি-কলসী সব টেনে হিঁচড়ে একেবারে ওকে খালের পার করে দিতে হবে। পারবি?"

"তাই হবে ছোট মণ্ডল—সে ভার আমি নিলাম।" সুবল বললে, "তুমি আর মুকুন্দ ঘরে যাও।"

ওরা দলবল নিয়ে এগিয়ে গেল চরের সেই এক প্রান্তে—দল-ছুট একটা কুঁড়ের দিকে, জংলী গাছ-গাছালির দলা বাঁধা অন্ধকারে যেটা আর তখন দেখা যাচ্ছে না, শুধু টিম্‌টিম্ করছে একটা লালচে আলোর ফোঁটা।

মহেশ মণ্ডল সেইদিকে একদৃষ্টে কটমট করে চেয়েছিল—মুকুন্দ গায়ে একটু ঠেলা দিয়ে বললে, "চল ছোটমণ্ডল—মোরা যাই।"

"চল।" বলে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেললে। তারপর নিজের মনে বিড়বিড় করে কি বলল—বোঝা গেল না।

জগন্নাথকে ধরে ঘষটে ঘষটে এগিয়ে চলল ওরা ঘরের দিকে। আঁকা-বাঁকা বাঁধ রাস্তা—আবাদের ভেতর দিয়ে ঘুরে ঘুরে চলে গেছে ওদের কিষাণ বসতির দিকে। সেইটুকু পথ আসতে আসতে থমকে থমকে দাঁড়িয়ে অন্তত পাঁচবার ঘুরে ঘুরে দেখলে—চরের একটা প্রান্ত লাল হয়ে উঠল কি!

না, সাড়া নেই—শব্দ নেই, পথের দু'পাশে একটানা ঝিঁঝির ডাক আর ধানক্ষেতে ঢেউতোলা বাতাসের সর্‌সর্ শব্দ। সারা আবাদ জুড়ে ঘনঘোর হয়ে আছে হেমন্ত সন্ধ্যার ঠাণ্ডা অন্ধকার। তার মাঝখানে ওদের বসতির দিকে লালচে আলোর ফোঁটাগুলো যেন আরাম আর বিশ্রামের হাতছানি দিচ্ছে। গৃহকোণের উত্তাপ মনের ওপরে যেন ছড়িয়ে পড়ছে ধীরে ধীরে।

মহেশ হঠাৎ আবার দাঁড়িয়ে পড়ল।

মুকুন্দ আর পারছে না। ক্লান্ত গলায় বললে, "কি হলো ছোটমণ্ডল!"

"হেই ভগবান!" সভয়ে ঈশ্বর-নাম স্মরণ করে অদূরের একটা বস্তুকে দেখিয়ে দিলে।

জগন্নাথ জিজ্ঞেস করলে, "কি?"

"দেখচিস না—শেয়াল! ডানদিকে।" মহেশ বললে, "ডান দিকে ভালো লয়—অমঙ্গল। বাঁ দিকে তাড়িয়ে দে দেখি।"

অমঙ্গল! মুকুন্দের মনটা হঠাৎ যেন কেমন করে উঠল। সুবলের কথাগুলো তার বুকের মধ্যে তোলপাড় শুরু করে দিলে। অমঙ্গল কার হতে পারে?—নয়নের?

জগন্নাথ শেয়ালটাকে তাড়া করলে। সে ভয়ে ডান দিকের ধানক্ষেতের আরো ভেতরে ঢুকে গেল।

মহেশ থমথমে গলায় বললে, "দেখ, কিছুতেই ডানদিক ছাড়ল না।" একটু থেমে আবার বললে, "হাবু, গুপী অরা গেল—ওদের কোনো সাড়াশব্দ নাই কেন?"

অধীর গলায় মুকুন্দ বললে, "অদের আমি জানি ছোটমণ্ডল, অরা তোমার কাজ ঠিক হাসিল করবে। চলো। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।"

ঘরের কাছাকাছি এসে সমস্ত শরীর যেন ওর শিথিল হয়ে আসছে, ঝিমিয়ে আসছে এতক্ষণের সতর্ক সজাগ স্নায়ুগুলো। মুখে দাগা বিষণ্ণ ক্লান্তি—লাল দুটো চোখের পাতা ভারি হয়ে যেন বুজে আসছে। ফুলে ওঠা ভাঙা কব্জিটা কোনোরকমে তুলে ধরে রেখেছে বুকের কাছে। চোটখাওয়া ডান পা-টা যেন ছিঁড়ে পড়ছে যন্ত্রণায়। সব বেদনার আভাস ফুটে উঠেছে চোখে-মুখে।

মহেশ চলতে চলতে বললে, "কি ঝড়টাই না গেল তোর ওপর দিয়ে রে মুকুন্দ! মনে রাখিস্—বদলা নিতে হবে, বদলা নিতে হবে। না হলে মোর মন ঠাণ্ডা হবে নি।"

জগন্নাথের কাঁধ ধরে ঘষটে ঘষটে এক সময়ে ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল মুকুন্দ।

ঘর অন্ধকার। সাড়াশব্দ নেই।

মহেশ গলা উঁচু করে ডাক দিল, "অ মুকুন্দের মা! তোমার মুকুন্দ এল যে গো!"

সাড়া পেয়ে অন্ধকার ঘরের ভেতর দিকে ছুটে এল হরিদাসী।

"ফিরে এলি! হে ভগবান!...সত্যি ছেড়ে দিল?" বলতে বলতে হরিদাসী ডুকরে কেঁদে উঠল, "সব মোর কপালের দোষ! একজন পড়ে রইল কোথায় না কোথায়। আবার তোকেও—"

মহেশ থামিয়ে দিয়ে বললে, "দু' দিন অর ঘুম হয় নি মুকুন্দের মা, পেটেও কিছু পড়ে নি। আগে অকে খেতে দাও—ঘুমাতে দাও।" বলতে বলতে মহেশ চলে গেল জগন্নাথের সঙ্গে।

মুকুন্দ দরজার সামনেই বসে পড়ল। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, "আগে এক ঘটি জল দে।"

হরিদাসী জল এনে দিল।

নয়নের জন্য মুকুন্দের চোখ এদিক-ওদিক ঘুরে এল—তাকে কোথাও দেখা গেল না।

হরিদাসীই বললে কথাটা, "তা হ্যাঁরে, তোরা চলে এলি—বৌ আবার কোথায় গেল?"

"তার মানে!" ছ্যাঁৎ করে উঠল মুকুন্দের বুকের ভেতরটা।

"হেই যে যমুনা এসে তাকে সাজিয়ে-গুজিয়ে নিয়ে গেল—তোদের খালাস করতে!"

হরিদাসীর কথা শেষ হলো না—মুকুন্দ বলে উঠল, "এইরকম কিছু একটা হবে—আমি জানতম...আমি জানতম। মোর মন বলছিল—" বলতে বলতে মুকুন্দ আবার টলতে টলতে প্রায় উঠে দাঁড়াল।

"বৌয়ের সঙ্গে তা হলে তোদের দেখা হয় নি!"

"তুই যেতে দিলি কেন? তুই সর্বনাশ করে দিলি মা!"

"যমুনা কত করে বলল—তার কে জানাশোনা লোক আছে। হায় ভগবান! এ যে আমি কিছু বুঝতে পারছি নি রে!" হরিদাসী ছেলের মূর্তি দেখে ঘাবড়ে গেল।

"দে—মোর লাঠিটা, তাড়াতাড়ি দে।"

হরিদাসী হাউমাউ করে উঠল। আবার কি বিপদ ঘনিয়ে এল তার কপালে।

"লাঠটা দে—" মুকুন্দ চাপা গলায় গর্জন করে উঠল।

হরিদাসী কাঁদতে কাঁদতে লাঠি এনে দিলে। মুকুন্দ সেই লাঠি ঠুকে ঠুকে আবার এসে দাঁড়াল ভেড়ি বাঁধের ওপরে।

চরের সেই জমাট ঠান্ডা অন্ধকারে দপ্ করে একটা আলো এসে লাগল চোখে। রাঙা আলো। আবাদের একটা প্রান্ত তখন রক্তিম হয়ে উঠেছে আগুনের আভায়। ক্ষীণ একটা গোলমাল কানে এসে লাগে। কি একটা অন্ধ শক্তি যেন তাকে এক পা এক পা করে ঠেলে নিয়ে চললো সেই দিকে।

খানিকটা যেতে-না-যেতে মুকুন্দ থমকে দাঁড়াল। ওই দেখ, সামনের ধানক্ষেত ভেঙে কে যেন পড়িমরি করে ছুটে আসছে সরু আলপথ দিয়ে। বাঁধে উঠল। একটা মেয়েলোক।—ছুটে আসছে এই দিকে। একেবারে সামনে এসে পড়ল।

"নয়ন!"

"তুমি!" গলা শুনে চমকে উঠল নয়ন, থমকে দাঁড়াল। কয়েকটি মুহূর্তের স্তব্ধতা। তারপর যেন অন্ধ আবেগে ছুটে এসে একেবারে মুকুন্দের চওড়া বুকের ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে উঠল, "তুমি এলে... তোমাকে ছেড়ে দিলে।"...

"উহই...উহই...হাত ভাঙা মোর... হাত ভাঙা"...মুকুন্দ ভাঙা হাতটা একপাশে তুলে ধরলো।

"হাত ভাঙা! কি করে ভাঙলো?" হাত ধরে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে নয়ন কাঁদ কাঁদ হয়ে বললে, "ইস্—এ যে ভীষণ ফুলে উঠেছে গো! কেমন করে ভাঙল— করে ভাঙলো? এবং কে ভাঙলো, কেন ভাঙলো ইত্যাদি নানা নির্বোধ প্রশ্নের তলব। শেষমেস কেঁদে ফেললে বোকা মেয়েটা—বললে, "কি করেছি মোরা ওদের?"

ওর রকম-সকম দেখে আর বোকা বোকা কথা শুনে এত দুঃখেও মুকুন্দের হাসি পায়। বললে, "কেন, নুন তৈরি করিস নি!"

"তা বলে হাত ভেঙে দিবে!" ভেজা চোখ ওর জ্বলে উঠল।

"দিবে বৌ—দিবে। হাত ভেঙে দিবে, পা ভেঙে দিবে, বুকের ওপর বুটজুতা পরে চলবে, তেষ্টায় বুক ফেটে গেলে তোকে ভাঙা গেলাসে পেচ্ছাপ এনে দেবে।" মুকুন্দ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, "তা তুই ছুটে এলি কোথা থেকে?"

"তোমাকে খালাস করতে গেছলম গো। যমুনা বলল—তার কে চিনা-জানা লোক আছে, তার কাছে কেঁদে-কেটে পড়লে তোমাকে ছেড়ে দিতে পারে।"

"আমাকে ছাড়াতে গেছলি?" বোকারীর বোকা বোকা ভয়পাওয়া মুখটার দিকে মুকুন্দ কৃপার দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

"হ্যাঁ গো!" সভয়ে চাপা গলায় নয়ন বললে, "তা দেখ বিপদের ওপর বিপদ। যমুনার ঘরে আগুন লেগে গেল। ও মোকে জলার মাঝখানে ছেড়ে দিয়ে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে ছুটে চলে গেল। ভয়ে আমি পালিয়ে এলম। হাই দেখ—ওর ঘর পুড়ছে।"

ঘরটা পুড়ছে। চরের এক প্রান্তের কালো অন্ধকার রাঙা করে তাল তাল শাদা ধোঁয়ার মাঝখানে লক্‌লক্ করছে অগ্নিশিখা। সে রাঙা আলোর ঝিলিক এসে লেগেছে ওদের দুজনের চোখে-মুখে।

মুকুন্দ দেখছিল আর ভাবছিল। ওই আগুনে তার জীবনের কি একটা দুর্ঘটনা হয়তো পুড়ে আজ ছাই হয়ে গেল। বোকা বৌটা হয়তো তার কিছুই জানে না। তাকে সবটা বলতেও ইচ্ছে করে না—হয়ত আরও ভয় পেয়ে যাবে।

ঘরে ফেরার পথে শুধু জিজ্ঞেস করল, "যমুনার সেই চিনা-জানা লোকটা কে বৌ—জানিস?"

ডাগর চোখ ভরে ভয় আর বিস্ময়—নয়ন বললে, "তা তো জানি নি!"

"নাম-টাম বলে নি?"

"না তো!" নয়ন ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, "সে কে গো!"

মুকুন্দ বললে, "সে তুই জানবি নি। ভুলু মাঝি বলে একটা চৌকিদার।"

মুকুন্দ লক্ষ্যও করল না—নামটা শোনা মাত্র নয়নের মুখ কেমন করে শুকিয়ে গেল। নয়নের কাঁধে ভর দিয়ে যেমন সে অন্যমনস্কের মত হাঁটছিল—তেমনি হাঁটতে লাগল পা ঘষটে ঘষটে।

হঠাৎ নয়ন ফুঁপিয়ে উঠল কি ভাবতে ভাবতে—কে জানে। বলে উঠল, "চল মোরা চর ছেড়ে চলে যাই—যেমন সুন্দরবনে ছিলম"...

মুকুন্দ হেসে বললে, "কেন বৌ। —ভয় পেলি?"

"আবার যদি তোমার কোনো বিপদ হয়?—তার চেয়ে চলো মোরা চলে যাই।"

"তাই কি হয় নয়ন।" মুকুন্দ বলল, "ঘরে মোর বাপ নাই—মা একলা। এই চাষ-বাস, বলদ-গরু, মোর বন্ধু স্বজন—মোর জমিন ঘর, এ ছেড়ে কোথায় যাব! মরতে হলে এইখানে মরব।"

নয়ন আর কোনো কথা বললে না।

ওই তো টঙের মত একটু কুঁড়ে। সে আর পুড়ে ছাই হতে কতক্ষণ লাগে। চেঁচাবার কেউ নেই—দেখবার কেউ নেই। যমুনা ঘরে ছিল না—এক ছিল ভাণ্ডড়দাস। বাবাজী তখন বৈকালীন একদলা ভাঙবাটা এবং কয়েক ছিটে গুলি সেবনের পর নিশ্চিন্তে চোখ বুজে ঝিমোচ্ছিল। আগুন যখন মটকার ওপরে—গুপী গিয়ে চেঁচামেচি করে বললে, "পালাও বাবাজী—তোমার মটকায় আগুন।"

হঠাৎ এই অবাঞ্ছিত চেঁচামেচিতে বাবাজী বোধ করি বিরক্ত হয়েই একবার চোখ খুলে আবার বন্ধ করলে এবং নিরুদ্বিগ্নচিত্তে শুধু বললে, "কাদের আগুন!"

"হেই লাও—বলে কাদের আগুন!" পালাবে তো পালাও, না হলে পুড়ে মরবে।" বলে গুপী হাত ধরে মারলে এক ঝটকা।

প্রচণ্ড এরকম একটা দৈহিক পীড়নে মুহূর্তের জন্য বোধ করি ভাণ্ডড়দাসের নেশার ঘোর কেটে গেল—এবং আগুনের চিরকালের সেই ভীতিকর রক্তিমাভা তাকে হঠাৎ বিহ্বল করে দিলে। দিশাহারার মত দাওয়ায় এদিক-ওদিক সে ছুটোছুটি করতে করতে বলতে লাগল, "হাই রে বাবা, মোর ঝোলা কোথায়, মোর গোপীযন্ত্র...আঁটকুড়ীর বেটি সব রাক্ষস কোথায় গো!"

গুপী বললে, "সব বাইরে টেনে দিয়েছি বাবাজী—এখন পালাও প্রাণ নিয়ে।"

বাবাজী সেই যে তার ঝোলা আর গোপীযন্ত্র নিয়ে জেলা সড়কের ধারে এক বটগাছের তলায় এসে বসেছে—আর নড়ে নি। যমুনা একাই চোখের জল মুছতে মুছতে তার ঝোলা, খঞ্জনী, একতারা, সংসারের সামান্য ঘটি-বাটি, হাঁড়ি-কলসী বয়ে বয়ে এনে গাছের তলায় জড়ো করলে। চরের কেউ তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল না।

এগিয়ে এল শুধু ভুলু মাঝি। শিকার হাত-ছাড়া; প্রতারিত ক্রুদ্ধ বাঘের মত সে গর্ গর্ করতে লাগল। যমুনাকে বললে, "চল থানায়—ডাইরী লেখাবি। কে কে ছিল?"

যমুনা কাঁদতে কাঁদতে বললে, "আমি কি দেখেছি—সে সব বাবাজী জানে। আমি তো গেলম তোমার সেই নয়নকে আনতে। হায়, আমি কি পাপ করলম গো!" যমুনা ডুকরে উঠল।

ভাণ্ডড়দাসের হাত ধরে টান মেরে বললে, "চলো তুমি—ডাইরী দেবে। কে কে ছিল"—

তিনটি ফুলের জন্যে

বসন্তী সেন

(১)

তিনটি ফুলের জন্যে হন্যে হয়ে বাগান চষেছি,
তিনটি সামান্য ফুল, পাতাগুলো সরিয়ে নাড়িয়ে
ডালপালা ঘেঁটেঘুটে—কুঁড়িদের বুক চিরে নিয়ে
কোথাও পাই নি খুঁজে—! তারপর ঘরে ফিরে গেছি।
তিনটি ফুলের জন্যে শৌখিন গোধূলিকে ডেকে
ধূসর রাত্রির মুখ পাওনাদারের মত হাসে,
জানালা ভেজিয়ে শেষে ঘরের সীমার আশেপাশে
অন্ধের বিশ্বাসে ঘুরি; যদি হাতে কোন কিছু ঠেকে—
ফুলের বিকল্প নাম; যা নিয়ে ঈশ্বর আজো নিজে
একচ্ছত্র রাজ্যপাটে অনায়াসে ভুলেই থাকেন!
বস্তুর প্রাচুর্য নিয়ে এতকাল করে লেনদেন
নিজের বুকের কাছে জমা দিতে কিছু পারি নি যে।

বাগান আমার আছে—একথাও হয়তো ধারণা
সে সব হৃদয়বৃত্তি গিল্টিকরা—যা ভেবেছি সোনা।

(২)

লোকটা নির্বোধ বলে অবহেলা নীরবে কুড়িয়ে
পর্দার ওধারে গেলো। তারপর সম্রাটের সাজে
মঞ্চে উঠে এলো যারা, প্রতিদিন কথায় ও কাজে
তাদের সম্ভ্রম করি। গল্প যায় যদি বা ফুরিয়ে
তখনই বিচারসভা; জীবনের দুর্বোধ্য হিসাব
জটিল প্রশ্নের মালা সমাধানে আগ্রহী প্রখর
সমালোচকের ভিড়ে হাজার তর্কের ওঠে ঝড়,
মহামান্য চরিত্রের ভালোমন্দ, স্বভাব অভাব।

যে গড়ে নিয়তি, তাঁর ইশারায় চোখ থাকে ফিরে—
কল্পনার মুখ জাল বোনা হয় বেদীমূর্তি ঘিরে।
সুকঠিন পরিণতি ক্ষমতার নিরর্থ বিলাস
তারই তুচ্ছ ব্যক্তিগত লাভালাভে সৃষ্ট ইতিহাস।
অথচ নির্বোধ সেই পরাজিত মানুষের কাছে
যোগসূত্র খুঁজে পেয়ে সেই অর্থে গল্প বেঁচে আছে

"হায় রে বাপ্!" ভাণ্ডড়দাস বললে, "ছিল বলে বেঁচে গেলম। না হলে এতক্ষণে ওই আগুনের মধ্যে দাঁত ছিরকুটে মরে পড়ে থাকতাম রাজা। নেশাভাঙ করি, গুলি খাই, গাঁজা খাই—তাদের নামে ডাইরী দিব কি!"

"তবে মর।"

খোঁচা খাওয়া হিংস্র জানোয়ারের মত গোঁ গোঁ করতে করতে ভলু মাঝি চলে গেল।

যমুনা জানে—সন্ধ্যেবেলা জগৎ ডাক্তারের ডিসপেনসারিতে সানো চৌধুরীর আড্ডা। সেখানে গিয়ে হাউমাউ করে কেঁদে পড়ল, "গরীব বৈরাগী-বোষ্টম, মাথা গুঁজে ছিলম চরে সানো কত্তা। গান গেয়ে ভিখ মেগে খাই। চরের মানুষগুলান মোর সর্বনাশ করে দিল।"

সানো চৌধুরী বাইরে চেয়ার টেনে বসেছিল। গম্ভীর গলায় বললে, "তা তুই জলে বাস করে কুমীরের পেছনে লাগলি কেন?"

"আমি কি পিছনে লাগলম সানো কত্তা!"

"মুকুন্দ পাইক আর মহেশ মণ্ডলকে থানায় ধরে নিয়ে গেল কেন? মহেশ মণ্ডল বাড়ুয়া—এ কথা তুই বলেছিস?"

"হেই সানো কত্তা—এই পা ছুঁয়ে বলছি, উ সব কাম, উ সব কথার মধ্যে আমি একদম নাই।"

"চৌকিদার ভলু মাঝি তোর আড্ডায় যায়?"

"যায়।"

"কেন যায়?"

যমুনা থমকে গেল। কোনো কথার জবাব না দিয়ে শুধু কাঁদতে লাগল।

সানো চৌধুরী মুখ গোমড়া করে বসে রইল চুপ করে।

ইনিয়ে-বিনিয়ে যমুনা আবার বলতে লাগল, "আপনারা মালিক, আপনারা রাজা। গরীবদের ঘর পুড়িয়ে দিল—চর থেকে বার করে দিল। তার একটা বিচার হবে নি! হায় ভগবান।"...

হঠাৎ সানো চৌধুরী ক্ষেপে গেল—মুখ-চোখ লাল হয়ে উঠল। বোধ করি চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে নিজেকে সংযত করে নিলে। চাপা গলায় ফুঁসে উঠল, "বিচার!" চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে শুধু বললে, "আয় দেখবি।"

যমুনা সভয়ে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল।

"উঁকি মেরে একবার ডাক্তারখানার ভিতরটা দেখ।"

যমুনা সভয়ে চেয়ে রইল। সেই ইস্কুল কলেজের ছেলেগুলো—কেউ বসে আছে মাথা গোঁজ করে, কেউ শুয়ে। জামা-কাপড় রক্তে রাঙা। কারুর মাথায় ফেট্টি বাঁধা হয়েছে, কারুর হাতে। জগৎ ডাক্তার এদিকে পেছন ফিরে তাদের ড্রেস করছে।

সানো চৌধুরী আস্তে আস্তে বললে, "তোর আড্ডার নেশাড়ীদের নিয়ে ভলু মাঝি আজ বাজারে গেছলো? সেই আবগারী দোকানে?"

যমুনার মুখ দিয়ে আর কোনো কথা বার হলো না—মুখ নামিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর খানিকবাদে ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলে ফিরে গেল আবার সেই গাছতলায়।

ভাণ্ডড়দাস তার ঝোলাঝুলি আঁকড়ে গুটিসুটি মেরে বসেছিল—যমুনাকে দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, "চিত্তে আর সুখ নেই যমুনে।"

যমুনা নীরব।

ভাণ্ডড়দাস বললে, "তোদের এখেনে বড়ই অশান্তি। সাধন-ভজনে বড় বাধা।"

যমুনার বলার কিছুই নেই এত কাণ্ডের পর।

ভাণ্ডড়দাস আবার বললে, "তাই ভাবছি—কাল সকালে উঠে একবার তীর্থ ঘুরে আসি।"

যমুনা তখনো নীরব।

না, একলা তার ভয় করে না। একলা একলা তার ঢের দিন গেছে এই চরে—এই চরের মানুষের মধ্যে। এদের দেখে সে ছোট থেকে বড় হয়েছে, মা মরেছে। বাপ কে—জানে না। তাই ভয় তার করে না। শুধু অবস্থাগতিকে পড়ে গেছে থানা আর চরের মানুষের মধ্যে। চুপ করে বসে বসে সে সেই কথাটাই ভাবছিল।

[ক্রমশ]

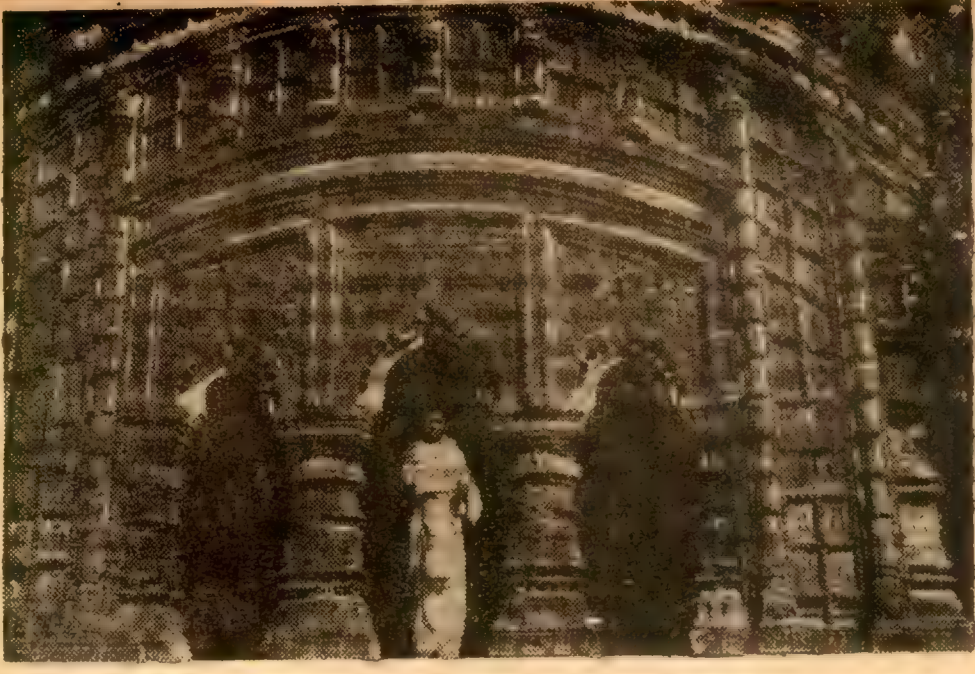

গ্রাম বাংলার মন্দির ভাঙছে / অসীম মুখোপাধ্যায়

জেলায় জেলায়, গাঁয়ে গাঁয়ে মন্দির ভাঙছে, ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে। দেবতার বুক ফাটছে কি-না জানি না, তবে এটা বুঝি যে হিসেবের খাতাগুলো সব এলোমেলো হয়ে গেল। আগামীকাল যারা আসবে তারা যদি শুধোয়, "কি আমাদের ছিল, কি তোমরা দিলে, আর আমরাই বা যাব কোন্ পথে", তখন কি যে তাদের বলব! পুরনো দিনকে নিয়ে মায়া বাড়াতে চাই না—কিন্তু সেদিন কোথায় ছিলুম, আজকে কোথায় আছি, আর পরে কোথায় থাকব,—এই যে হিসেব কষা, এই যে যোগ-বিয়োগ, এই তো আমাদের কম্পাস। এই কম্পাস নিয়েই তো অকূলান পথে চলব। পুরনো দিনের স্মৃতিটুকু তাই যত্নে তুলতে হবে, রাখতে হবে গুছিয়ে।

অতীতের সংস্কৃতি আর আজকের,—দুই-এর বদল দু'রকম তা জানি, কিন্তু মূল্যায়নের প্রশ্ন যদি ওঠে? কি বলব তবে? সেদিন যা ছিল তা' একান্তই ঘরোয়া, ঘরের পাশে, বাগানে ফোটা ফুল। তার পাপড়িতে ছড়ানো ছিল পরিচিত জল, মাটির গন্ধ, তাই বিদেশীরা তার গন্ধ উজাড় করে নিয়ে গেছে, নিঙড়ে নিয়েছে তার রস। শুধু তাই নয়, যে মাটিতে ফুটেছিল সে ফুল, তারা তাও তুলেছে খুবলে। আজ যা আছে তা' মোটেই ঘরোয়া নয়, তা বাইরের,—বাইরেই থাকবে। তাকে ঘরোয়া করবই বা কি করে? সে ক্ষমতা যে হারিয়ে ফেলেছি আমরা! সংস্কৃতি "ডিসটিল্‌ড্ ওয়াটার" নয়, তা জানি। অতীতেও ছিল না। কিন্তু আপন করে নেওয়ার ক্ষমতা সেদিন ছিল। খুব বেশি করেই ছিল। পেছনের দিকে তাকিয়ে শুধু এটুকু জানলেই অনেক জানা হল।

বাংলার মন্দিরকে দেখব শিল্পীর চোখ দিয়ে। জমিদারের চোখ দিয়ে নয়, পূজারীর চোখ দিয়ে নয়, ভক্তের চোখ দিয়েও নয়। সারাটা দেওয়াল জুড়ে আমাদেরই যুগার্জিত সাহিত্য ধরা দিয়েছে। মহাকাব্যের নারী-পুরুষেরা জমিয়েছে ভিড়, সমাজের এ-কোণ, ও-কোণের মানুষ সামনে এসে দাঁড়িয়েছে, শতাব্দীর শত ইতিহাসের পাতা গেছে খুলে। শাক্তের পাশে গাণপত্য, শৈবের পাশে সৌর, হিন্দুর পাশে মুসলমান, দেবতার পাশে মানুষ, সাধুর পাশে গণিকা,—সবই শিল্পীর দুটি চোখের দৃষ্টিতে একাকার হয়ে গেছে। ধর্ম নিয়ে ওরা মাথা ঘামায় নি মোটেই। ভাল লেগেছে বলেই রেখেছে, শিল্পীর মন দিয়ে দেখেছে! পণ্ডিত, অ-পণ্ডিতের চোখ দিয়ে দেখে নি।

বিচিত্র গঠন, বিচিত্র সজ্জা ও বিচিত্র সৌন্দর্যের বৈচিত্র্য নিয়েও বাংলার মন্দির আজ উপেক্ষিত। চলার পথে থমকে দাঁড়াতে হয়। বন-বাদাড়ে উপেক্ষিত কত চিরকালের বিস্ময়, কত আশ্চর্য সৃষ্টি হানাবাড়ি হয়ে গেছে। পুরনো খাতাটা ছিঁড়ে ফেললে আগামীকালের হিসেব মেলানো কঠিন হবে, কিন্তু কেউ তা ভাবছে না!

জোলো বাতাসের দেশে কিছুই তেমন টেকে না। বিশপ হেবার তাই রসিয়ে বলেছিলেন—"বুড়োর দেশ, বাড়ি বানাও, দেখবে ক'টা বছর যেতে-না-যেতেই 'সেকেলে' হয়ে যাবে।" বাজে কথা বলেন নি কিছু। নোনা ধরে পলেস্তারা খসবে। তারপর বেরুবে ইঁট। মাঝে মাঝে বট, তেঁতুল, নিম, অশত্থ মাথার ওপরে বা আনাচে-কানাচে জন্ম নেবে। দেওয়াল ভেঙে শেকড় নামবে নিচে। পাকে পাকে জড়াবে। তারপর ডালপালার ভিড়ে কিছুই দেখা যাবে না, বোঝা যাবে না। কেবল গাঁয়ের লোক আঙুল তুলে দেখাবে "এখানে একটা মন্দির ছিল", ("এখানে ইঁটের গায়ে একটা স্বপ্ন আঁকা ছিল")।

প্রকৃতিকে বাদ দিলে মানুষও কিন্তু কম যায় না। এমন অনেক মন্দির দেখেছি যা এখন গোয়ালঘর। ভেতরটা খড়ে বোঝাই। বাইরে ঘুঁটে। পোড়ামাটির বিচিত্র নক্সার ওপর ঘুঁটে! পূর্বসূরীদের ঋণ শোধ! মালিকপক্ষকে শুধাই—"অবজ্ঞা করছেন কেন?" তাঁরা বলেন,—"কি আর হবে? দেবতা তো আর নেই!" অর্থাৎ,—মন্দির ততদিন, যতদিন দেবতা। কোথাও আবার মন্দিরেই মানুষ ঘর বেঁধেছে। ধোঁয়া, তেল, কালি আর শিশুর নোংরায় ইঁটগুলো বিবর্ণ। কাজে

যাওয়ারও উপায় নেই, "বাইরের লোক" যে!

বর্ষাকাল এলো তো মন্দিরের গা থেকে ইঁট খুলে ফেল। মাটিতে পেতে দাও। জল-কাদায় হাঁটার সুবিধে হবে। ওদের বাড়ির ছেলেরাই আবার সুর করে ইতিহাস পড়ে—"আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের ঐতিহ্য আমাদের গর্বের বস্তু"—ইত্যাদি!

একশ্রেণীর লোক দেখি তারা হাবে-ভাবে গত শতকের "নব্যবাবু"-দের মত। ঘরোয়া কিছুই ভাল লাগে না এদের। "মন্দিরে" কি হবে? বা "পুরনো জিনিস নিয়ে ঘাঁটার কি দরকার"—এই সব প্রশ্ন এদের জিভের ডগায় লেগেই আছে। এরা অর্থবলে দরিদ্র প্রতিবেশীর জমি-জমা কিনে যাবতীয় "পুরনো" সাংস্কৃতিক চিহ্ন নষ্ট করে কারখানা গড়ে, বাড়ি বানায়। হালিসহরে দেখলুম, ঐরকম এক বাবু বালি দিয়ে দুটো মন্দির ঢেকে দিয়েছেন। হালিসহরের লোক দেখছে, কিছুই করছে না।

মন্দির রাখতে গিয়েও মন্দির নষ্ট করে অনেকে। সাংস্কৃতিক চেতনা তাঁদেরও নেই। তাঁদের যেটা আছে তা বাপ-ঠাকুর্দার প্রতি শ্রদ্ধা। তাই পয়সা হাতে এলে একটু সারাই-টারাই করা, একটু-আধটু রঙ দেওয়া। কিন্তু এই সারাই করতে গিয়ে বা রঙ দিতে গিয়ে মন্দিরের চেহারা বদলে যায়। চুনের লেপ ভীষণ ক্ষতি হয়। চুনে মূর্তিগুলোর মুখ-চোখ, ঠোঁট কিছুই বোঝা যায় না! সোনার হাত থেকে মন্দিরটা বাঁচে, তবে সৌন্দর্য আর থাকে না।

এসব ছাড়াও আছে আর এক উৎপাত, তা হোল "ভদ্রচোরের।" এই "ভদ্রচোর" দেশীও হয়, আবার বিদেশী হতেও বাধা নেই। এরা মন্দির থেকে নক্সা তুলে নেয়। পুজারীকে বা দরিদ্র গৃহস্থকে টাকার লোভ দেখায়। তারপর কাজ হাসিল করে। শুনেছি দশ টাকাতেও মন্দির বিক্রি হয়েছে! তবুও আমরা পেছনে তাকাব না! যদি লোকে নিন্দে করে? ওদিকে যে ভাঁড়ার ফাঁক হচ্ছে সে-খবর কে রাখে!

ও-পারের খবর জানি না। পূর্ব-বাংলার কথা বলছি, যাওয়ার ইচ্ছে তো ষোল আনাই আছে কিন্তু উপায় নেই। তাই এ-পারের খবর দিচ্ছি। জেলার খবর, গাঁয়ের খবর। যে মন্দিরগুলো ভেঙে গেছে আর যেগুলো ভাঙব-ভাঙব করছে তাদের খবর।

বাঁকুড়া—মন্দির দিয়ে ভরা এই জেলা। বাংলার অবহেলিত প্রতিভারা এখানে রেখে গেছে তাদের অনেক স্মৃতি। আমাদের চোখ নেই, মনও নেই, তাই আমরা বলি "রাজা-রাজড়ার স্মৃতি।" "শিল্পীদের স্মৃতি", একথা কখনও বলি না!

দেউল থেকে শুরু করে চালা রত্ন, সব মন্দিরই আছে এ জেলায়। দেউলের মধ্যে বাহুলাড়া সোনাতোপল, হাড়মাসড়া, ধরাপাট, প্রায় সব ক'টিই সমান উপেক্ষিত। বাহুলাড়া প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সংরক্ষিত বটে, কিন্তু কতটা? তাছাড়া এ দেউলটির জন্য যে বিশেষ যত্ন নেওয়া দরকার তা নেওয়া হয়েছে কি?

বিষ্ণুপুর নিয়ে এত গর্ব। কেউ কি খুটিয়ে দেখেছে "শ্যামরায়ের" মন্দিরের ছাদে ফাটলগুলো বেড়েছে না কমেছে। ইঁটগুলো টানলেই খুলে আসে, বিশেষ করে রত্নের ইঁট। "ভদ্রচোর"-রা এ সুযোগ নেবেই।

সুবিখ্যাত রাসমঞ্চেরও অনুরূপ অবস্থা। এখানে-সেখানে ফাটল দেখা দিয়েছে। সময় থাকতে নজর না দিলে পরে আয়ত্তের বাইরে চলে যাবে। সলদার গোকুলচাঁদের মন্দির,—"মাকড়া পাথরের বুকে সঙ্গীত" বললেও অত্যুক্তি হয় না! কিন্তু গভীর জঙ্গলে নির্বাসিত!

আর এক মজার ব্যাপার। যে ইঁটগুলো দিয়ে মন্দির সারাই করা হচ্ছে সেগুলো এত হাল্কা যে সামান্য উঁচু থেকে পড়লেই গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে। একি, সংরক্ষণ, না উপহাস?

বীরভূম—সবাই বলে "মন্দির দেখতে হলে বাঁকুড়া চল", কিন্তু বীরভূমে এসে মত পাল্টাতে হবে। সৌন্দর্য ও বৈচিত্র্যের অসংখ্য অনবদ্য উদাহরণে বীরভূম অতুলনীয়। কিন্তু এই বীরভূমেই মাত্র দশ টাকায় মন্দির বিক্রি হয়েছিল। সিউড়ির

আটপুরের মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির কাজ। সেকেলে সাহেব (বাঁদিকে) বাঈজীর গান শুনছে, ডানদিকে যুদ্ধযাত্রা ও ওপরে কৃষ্ণলীলা।

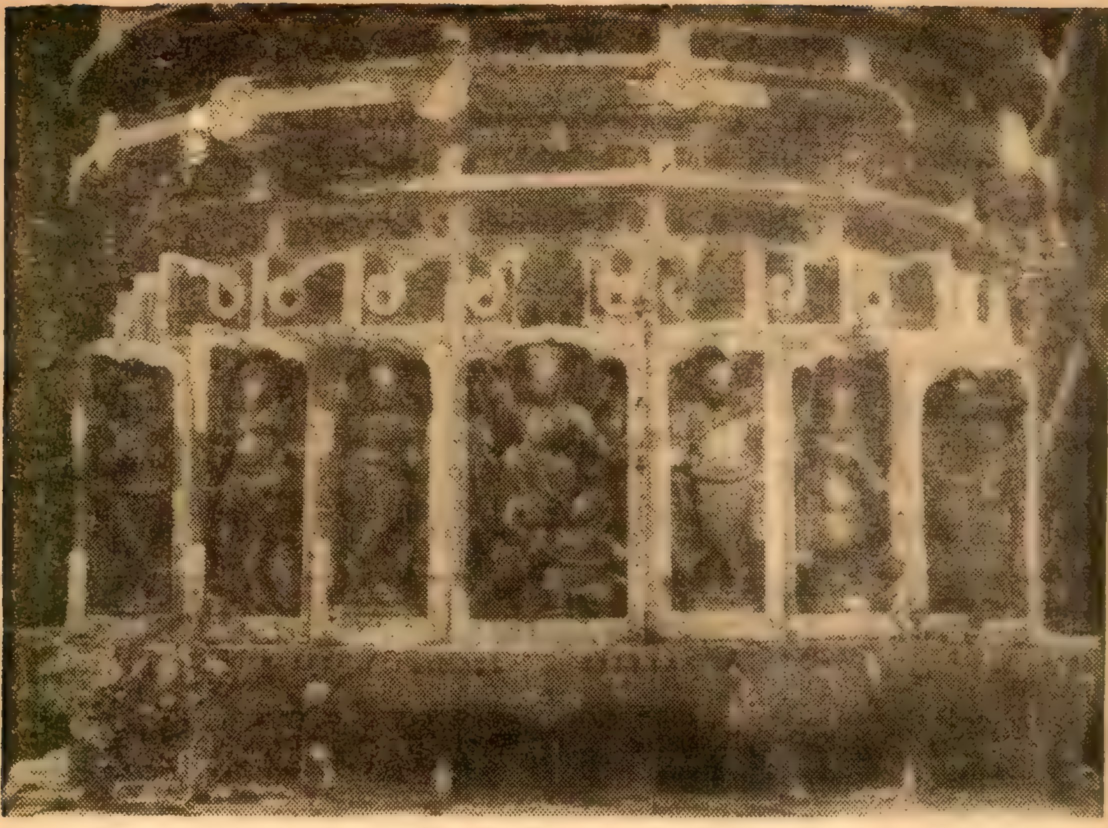

আটপুরে দশভুজা মন্দিরের অলঙ্করণ

…স্থহ রায়পুর। এইখানেই একটা শিব-মন্দির মাত্র দশটি টাকায় কোন "ভদ্রচোর" কিনে নেয়। আরও অনেক মন্দির নষ্ট হচ্ছে। কির্ণাহারের কাছে জুবুতিয়ায় একটি সুন্দর মন্দির চুনকামের পর আর চেনাই যায় না। গায়ের কাজগুলো আবছা হয়ে গেছে! সুপুরের একটি উল্লেখযোগ্য মন্দিরও একইভাবে গুরুত্ব হারিয়েছে। ১৮৯৮ সালে মন্দিরটি তৈরি হয়। এত পরে খুব কম মন্দিরেই পোড়ামাটির কাজ দেখা গেছে, কিন্তু স্থানীয় লোকরা এতসব বুঝলে তো? ইলমবাজারের কাছেই ঘুড়িষার বিখ্যাত রঘুনাথ মন্দির। ১৬৩৩ খৃস্টাব্দের এই মন্দিরে বাংলার পোড়ামাটি-অলংকরণ এক বিমূর্ত সৌন্দর্যের জন্ম দিয়েছে, কিন্তু উপেক্ষায়, ঔদাসীন্যে রঘুনাথ মন্দির আজ পতনের দিন গুণছে। সুরুলের মন্দিরগুলোও প্রায় একই অবস্থায়। খিলানের গায়ে ফাটল। ফলকগুলো খোপ থেকে বেরিয়ে আসছে। সংরক্ষণ প্রয়োজন এবং এখনই। গণপুরের মন্দিরগুলো হয়তো অনেকেই দেখে নি। ফুল পাথরের গায়ে বীরভূমের শিল্পীরা ফুলই ফুটিয়েছিল, কিন্তু যত্নের অভাবে ফুলের সৌন্দর্য ম্লান হয়ে আসছে।

বর্ধমান—কাঞ্চননগরের জোড়-বাংলোটি ছিল গোটা বর্ধমানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মন্দির। কিন্তু কয়েক বছর আগে অধিকাংশ ইঁট উধাও হয়েছে। কে করল, কারা করল কিছুই জানি না। স্থানীয় লোকদের শুধোতে একজন বলেই বসল, "আছে, আছে, ছিল, ছিল—মাথা ঘামিয়ে কি হবে?" এর পরও সাহস করে কিছু বলা যায় কি? বৈদ্যপুর, যাউগ্রাম বা মেমারি কলকাতা থেকে এমন কিছু দূরে নয়। ছুটি-ছাটায় অনায়াসেই ঘুরে আসা যায়, অবশ্য যদি মন চায় তবেই......। এখানেও একই অবস্থা। বৈদ্যপুরের পঞ্চরত্ন আজ অবহেলিত। মেমারির কাছে আহমদপুরের গোপালদেবের মন্দির বা যাউগ্রামের রাধাকান্তের মন্দির আর কতদিন টিকবে! আগাছার জঙ্গলে মাথা ঢেকে মন্দিরগুলো দাঁড়িয়ে আছে। "দেবতা"-র প্রতি শ্রদ্ধা দেখাতেও যদি কেউ গাছগুলো কাটতো? কিন্তু এখানেও "শাস্তর" আছে, সুবিধেবাদের শাস্তর, মন্দিরের মাথায় উঠতে মানা। সর্বনাশ! ঠাকুরের মাথায় পা! তবে হ্যাঁ—নষ্টামী করতে মানা নেই, এমন কি মন্দিরেও না।

আমড়াগড়ে যাঁরা গেছেন তাঁরা নিশ্চয়ই দেখে এসেছেন তার সুন্দর পঞ্চরত্নটি। দেখে মনে হয় না কি নিরস ইঁটের বুকে স্বপ্ন সৃষ্টি হয়েছে? কিন্তু এই অমূল্য কীর্তি টিকিয়ে রাখার দায়িত্ব কি পালন করা হচ্ছে তেমন করে? আর ইছাই ঘোষের দেউল? অবহেলিত গন্ডগ্রামে ঝোপ-ঝাড় পার হয়ে যখন বিশাল দেউলের কাছে গিয়ে দাঁড়াবেন,—তখন মনে হবে এটা কঙ্কাল ছাড়া আর কিছুই নয়। জটার দেউল, বাহুলাড়া, ইছাই ঘোষ ইত্যাদি বিখ্যাত মন্দিরগুলো নামেমাত্র সংরক্ষিত।

মুর্শিদাবাদ—লোকশিল্পের আর এক তীর্থক্ষেত্র। শহর ছাড়িয়ে সামান্য দূরেই রত্নেশ্বর মন্দির। এক অনবদ্য পঞ্চরত্ন, কিন্তু মানুষের উপেক্ষায় দ্রুত ভাঙনের মুখে এগিয়ে চলেছে। একটি রত্নের গা ঘেঁষে বেড়েছে বট, নিচের দিকে শেকড় নামছে। ইঁটগুলো শ্যাওলা মাখা, কতগুলো আবার ক্ষয়ে গেছে,—যেমন হয়ে থাকে সর্বত্র! ভিতটাও প্রায় ঢাকা, এতই জঙ্গল! যে লোকটি সাথে ছিল, সে আর এগোতে দিল না, যদি সাপ থাকে। তবু সাপই ভরসা, যতক্ষণ সে আছে, "ভদ্রচোরে"-র দল কাছে আসবে না।

বড়নগরের আটকোণা মন্দির, তাও আজ ভাঙছে। ছাদের পলেস্তারা খসে ইঁট বেরিয়ে আছে। আসে-পাশে জঙ্গল,—ঝোপ-ঝাড়। দেহ-পরিকল্পনায় মন্দিরটি

আকর্ষণীয়! কিন্তু আজ তার দুরবস্থার একশেষ!

কিরীটেশ্বরীর মন্দিরের কাছে-পিঠে, কয়েকটা চারচালা পরিত্যক্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে। কোনটা গাছে ঢাকা, কোনটা শ্যাওলায় বিবর্ণ, কোনটায় হয়ত শেয়ালও থাকে, কিছুই বিচিত্র নয়! দোহালিয়া, কাগ্রাম, রূপপুর সব গাঁয়েই ঘুরে-ফিরে একই দৃশ্য দেখি। বছরের পর বছর কাটছে, মেলা-মহোৎসবের অনুষ্ঠানও হচ্ছে ঠিক-মত, কিন্তু ভুল করেও কেউ ভাঙা মন্দিরের দিকে তাকায় না!

নদীয়া—নাকাশীপাড়া, শিবনিবাস, কামালপুর, দেবপাড়া, শান্তিপুর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, চাকদা, বলতে গেলে নদীয়ার আনাচে-কানাচেই আছে মন্দির। কিন্তু অন্যান্য জেলাতে যা ঘটছে এখানেও ঠিক তাই। শিবনিবাসের আটকোণা শিবমন্দিরটি খেয়ালী শিল্পীর এক অদ্ভুত সৃষ্টি। অলংকরণের সৌন্দর্যকে অতিক্রম করেছে গঠন। কিন্তু মাথাটা বোধ হয় ভেঙেই পড়বে। আস্তরণ খসে গেছে বহুদিন। ছাদে গাছও জন্ম নিয়েছে অনেক। গ্রামবাসীদের ভাবনা নেই তবু।

নাকাশীপাড়া আর বাগআঁচড়ার মন্দিরগুলো অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। কিন্তু আগাছার জঙ্গলে প্রায় ঢাকা পড়ে গেছে। যত্ন দেওয়া-না-দেওয়া সমান কথা।

মেদিনীপুর—"পোড়ামাটি"-র মন্দিরের সংখ্যা কোন্ জেলাতে বেশি এমন প্রশ্ন যদি কখনও ওঠে তবে হয়ত মেদিনীপুরই প্রথম হয়ে যাবে। কাঁসাই নদীর ধারে ধারে, অজানা-অচেনা গাঁয়ে অসংখ্য অলংকৃত মন্দির আজও দেখা যাবে। যেখানে মালিকপক্ষ এখনও অবস্থাপন্ন এবং গাঁয়েই থাকেন, সেখানে মন্দির টিকে আছে, আর যেখানে তাঁরা নেই সেখানে মন্দির ভাঙছে। বাদাড়-গোপীনাথপুর, চিত্রাপুর ঝিকুড়িয়া, পুয়াপাট, গোলগ্রাম, জগদী, মাংলোই, লোয়াদা;—গাঁয়ে, গাঁয়ে মন্দির ছড়ানো। গঠন প্রায় একই কিন্তু বিষয়-বৈচিত্র্যে অনন্যসাধারণ। বিশেষ করে মিথুনের বিভিন্ন ভঙ্গিমা অবাক করে দেয়। সত্যি বলতে কি, কোণারক, খাজুরাহোও ম্লান হয়ে যায় মিথুনের বৈচিত্র্যে। জীর্ণ মন্দিরগুলো দাঁড়িয়ে আছে, প্রকৃতির মুখের হাঁ-টা বড় হচ্ছে ক্রমশ, একদিন গিলে ফেলবে। মাঝে-মধ্যে বাবুরা আসেন, তারিফ করে ইঁট তুলে নিয়ে যান। গাঁয়ের লোকের সাথে গল্প করেন—"আহা কি জিনিস, এমনটি আর হয় না"—কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তার বেশি নয়!

চন্দ্রকোণা আর দাসপুরের পাড়ায় পাড়ায় মন্দির। অপূর্ব দৃশ্য! যেন ধৈর্য, শ্রম, নিষ্ঠা আর অভিজ্ঞতা ঘামের সাথে মিশে গিয়ে তৈরি করেছে রূপকথার দেশ। যেন ওগুলো নিছক ইঁট নয়, নয় সামান্য চুন-সুরকীর স্তূপ। সেই দৃষ্টিই প্রতি মুহূর্তে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে!

হাওড়া, হুগলী—হাওড়ায় আমতায় এমন দু'-একটি মন্দির আছে যা বাঁকুড়া, বীরভূম বা মেদিনীপুরের শ্রেষ্ঠ মন্দিরগুলোর সাথে পাল্লা দিতে পারে। আমরাখাড়ির গজলক্ষ্মী, দধিমাধব ঝিকিড়ার সীতানাথ ইত্যাদি মন্দিরের কারুকার্য নিঃসন্দেহে কোন অভিজ্ঞ শিল্পীর রচনা। দধিমাধবের মন্দিরে বিরাট গাছ ডালপালা মেলেছে, গজলক্ষ্মীর মন্দির আজ গোয়ালঘর! "কেরানী রায়"-দের সুপ্রাচীন আটচালা বা মহিষামুড়ির মন্দির চুনে, রঙে গাম্ভীর্য হারিয়ে বসেছে।

বাগনানে মেল্লকের গোপাল মন্দির, কল্যাণপুরে দামোদর মন্দির গঠনে, সজ্জায় অভিনব! কিন্তু এমন সৌন্দর্য নিয়েও কেন মন্দিরগুলো প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারল না? এ কোন্ হট্টমালার দেশ?

হুগলীর অনেক মন্দিরই আজ আশু সংস্কারের দাবি রাখে, সোমড়ার নবরত্ন, কালি-দেওয়ানগঞ্জের জোড়-বাংলো, দ্বারহাট্টের রাজরাজেশ্বর, ভগ্ন পোড়ামাটি-শিল্পের সাক্ষী। আঁটপুরের "রাধা-গোবিন্দ", জাঙ্গীপাড়ার "দামোদর"—এসব মন্দিরে মহাকাব্য, পুরাণ উপ-পুরাণ, মঙ্গলকাব্য জীবন্ত হয়ে উঠেছে। আঁটপুর সংরক্ষিত,—কিন্তু সংরক্ষিত নয় এমন মন্দির অনেক আছে।

যত্নের অভাবে চোপার সুন্দর মন্দির ও দুর্গাদালান আজ নগণ্য ভগ্নস্তূপ। সময়মত সংরক্ষণের চেষ্টা করলে এমন অবস্থা হয়ত হত না।

শ্রীপুর গ্রামে দু'টি পঞ্চরত্ন অলংকৃত হলেও উপেক্ষিত। কিছু অংশ ভেঙে পড়েছে, আরও কিছু ভাঙবে। স্থানীয় অধিবাসীরা "রাস" উপলক্ষে জাঁকিয়ে পুজো করেন। মন্দির দু'টির দিকে যদি একবার তাকাতেন!

বাঁশবেড়িয়ার বাসুদেবের মন্দির পোড়ামাটি—শিল্পের এক অন্যতম উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। কিন্তু মন্দিরটি সংরক্ষণের কোনও প্রকৃত চেষ্টা হয় নি। যার যখন ইচ্ছে হয় ফলকের ওপর কাদা ফেলে ছাঁচ তুলে নেয়। কুমারটুলিতে আবার এ-সব ছাঁচ বিক্রি হয়। কুমারটুলির কুমোররা নাকি শিল্পী? শিল্পীরাও এ সব করতে পারেন নাকি? ধারণা ছিল না!

বেশ কিছু ফলক ভেঙে গেছে। বোধহয় যাঁরা "বেড়াতে" আসেন তাঁদের কেউ কেউ "বাইরের ঘর" সাজাবার কথা ভেবেছিলেন!

চব্বিশ পরগনা—প্রকৃতির বিরোধিতায় চব্বিশ পরগনায় বহু মন্দিরই ইতিমধ্যে নষ্ট হয়ে গেছে। আজ তাই তুলনামূলক বিচারে এই জেলা পিছিয়ে আছে। কিন্তু অলংকৃত মন্দির এখানেও কম ছিল না। হালিশহর, ভাটপাড়া, বনগাঁ, মন্দিরবাজার গোবিন্দপুরে, রাজারামপুর, জয়নগর ইত্যাদির ভাঙাচোরা মন্দিরগুলো আজও তা প্রমাণ করে। চব্বিশ পরগনার বহড়ুর মন্দির যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীরচিত্র বাংলার মন্দিরে বিরল। অথচ বহড়ুর শ্যামসুন্দর মন্দিরের প্রাচীরচিত্র যত্নের অভাবে ম্লান হয়ে গেছে। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এক্ষেত্রেও উদাসীন।

"মন্দির রক্ষার দায়িত্ব সরকার তেমন করে পালন করছেন বলে মনে হয় না। যে সাহায্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা পান তা অনিয়মিত তো বটেই, অকিঞ্চিৎকরও বলা যায়। দুস্থ পূজারী বা সেবায়েতদের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থাও তাতে হয় না। মাত্র ক'দিন হোল চব্বিশ পরগনার পাটদায় গিয়েছিলাম। বিরাশী বছরের বুড়ো পূজারী, আর তাঁর প্রায় পঙ্গু স্ত্রী একরকম না খেয়েই আছেন। পুজো-পাট বন্ধ হয়ে আসছে, মন্দির রক্ষা তো পরের কথা। এঁদের কথা সরকার ভাবছেন কই?

তবুও শেষ পর্যন্ত আমাদের সংস্কৃতি রক্ষার দায়িত্ব আমাদেরই,—আর কারো নয়। এ-কথাটির সাথে আরও একটি কথা মনে রাখতে হবে যাকে পুরনো ভাবি তা নেহাৎ পুরনো নয়, তার হিসেব মনে না রাখলে নতুন পথে দিগ্‌ভুল হবে;—দিগ্‌ভ্রান্ত আমরা জীবনের যাত্রায় পিছিয়ে পড়ব!*

---

*আলোকচিত্র : লেখক কর্তৃক গৃহীত

পঞ্চতরঙ্গ রসেন্দ্রসার :

(দুর্লভ তান্ত্রিক গ্রন্থ। মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ।) মূল্য—৩'০০ টাকা।

পঞ্চতীর্থ মাহাত্ম্য :

শ্রীকাশীমাহাত্ম্যম্ শ্রীগয়ামাহাত্ম্যম্, শ্রীকেদারনাথ মাহাত্ম্যম্, শ্রীপ্রয়াগ মাহাত্ম্যম্, শ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম্যম্। মূল সংস্কৃত ও পণ্ডিতপ্রবর শ্রীকালীপ্রসন্নকৃত বঙ্গানুবাদ। মূল্য—৩'০০ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

তিমির প্রান্ত ডুয়ার্স

অগ্নিবর্ণ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ বাইশ ॥

বছরের পর বছর একটানা অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চলেছিল ভুটানের সঙ্গে।

সে সব কথা এখন ইতিহাস হয়ে গিয়েছে।

দিনের পর দিন। আর রাত্রির পর রাত্রি অবিরাম গুলীগোলার শব্দে প্রতিধ্বনিত হয়েছে আকাশ। রাত্রির অন্ধকার মাখামাখি হয়েছে আগুনের আলোয়। দিগন্তে নিষ্ঠুর প্রতিশব্দগুলি দ্রুত অট্টহাসের মত ছড়িয়ে পড়েছে।

তবু হার মানে নি ভুটান।

দুর্ধর্ষ শক্তিতে বারবার ঝাঁপিয়ে পড়েছে মরণ পণ করে। তাদের সামনে আর কোন আদর্শ ছিল না। আর কোন লক্ষ্য ছিল না। ইতিহাস জানে লুণ্ঠন, অত্যাচার ও পরপীড়নই ছিল সে যুগে তাদের ধর্ম। দেশের অভ্যন্তরেও তার জীবনে ছিল না নিশ্চিন্ততা ও নিরাপত্তার বিন্দুতম লেশটুকু। সে ইতিহাস শুনেছিলাম হপকিন্স সাহেবের মুখে। কিন্তু তা পরে বলা যাবে। শুধু বিস্ময় নিয়ে পিছনের দিকে তাকাই বারবার।

নতুনের দিকে তাকাতে এসে বারবার দৃষ্টি চলে যাচ্ছে পিছনের দিকে। ডুয়ার্সে ঘুরেছি কতদিন থেকে। কত জায়গা দেখা হল। কত মানুষ। কত বিচিত্রবর্ণ। তাদের কতই না রকমারী জীবিকা। নতুন মানুষ হাসছে, খেলছে, গল্প করছে। খেলার মাঠে জমেছে। বাজার-বন্দরে। শিশুর হাসিমুখ দেখছি নতুন কালের বাঁধান রাজপথে। ফুলের বাগান। শস্যক্ষেত্র। তবু বারবার চলতে-চলতে মন অতীতের দিকে তাকায় কেন? চোখ বুজে বসে থাকতে থাকতে দ্রুত অশ্বখুরের শব্দ শুনে চমকে উঠি।

খটাখট খট...খটাখট খট...খটাখট খটাখট খটাখট...

একরাশ ধুলোর ঝড় উড়ছে। পিছনে ধুলোর ঝড়ে দেখা কিছু যায় না।

খটাখট খটাখট খট...

দ্রুত লুকিয়ে যাচ্ছি একদিকে। একটা গাছের আড়ালে। প্রকাণ্ড হরতুকি গাছ। মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে আকাশে। নিচে বুনো ঘাস। প্রায় তলা দিয়ে বয়ে চলেছে কালজানি নদীর স্রোত।

তাকিয়ে দেখি চলেছে ইংরাজ সৈন্য। সুশৃঙ্খলাবদ্ধ সাহসী সৈন্যশ্রেণী। লাল মুখ। শিরস্ত্রাণ। হয়ত বা আবার ভুটানীরা কোথাও আক্রমণ করেছে। সীমান্ত চৌকির অবিরাম প্রহরা এড়িয়ে হয়ত বনের মধ্য দিয়ে ঢুকে পড়েছে কোনদিকে। হয়ত বা পূর্ব সীমান্তে দিওয়ানগিরির সুদৃঢ় রক্ষাব্যূহ ভেদ করেছে তারা। পশ্চিমপ্রান্তের ডালিংকোট রক্ষাব্যূহ শুনেছি আরও দুর্ভেদ্য। সেদিক দিয়ে হয়ত আক্রমণ হয় নি। তাজাগাঁও রক্ষাব্যূহের দিকে আক্রমণ চালিয়েছেন ইংরাজ সেনাপতি টিটলার। জেনারেল টম্ব রয়েছেন দিওয়ানগিরির দিকে।

চতুর্দিকে ঘোর অশান্তির আগুন। সৈন্যবাহিনীর খুবই ছোটাছুটি শোনা যায়।

বছরের পর বছর চলেছে এই যুদ্ধ। রাত্রির সীমান্তে ফেটেছে কামানের গোলা। ইতিহাস বলছে, একশ বছরের বেশি সময় ধরে এই যুদ্ধ চলেছিল।

ভুটানীদের অস্ত্রবল কম। সৈন্যদলও তত নেই। তবু তাদের সঙ্গে যুদ্ধে টিকে উঠতে পারছিল না ইংরাজরা। অসমসাহসী দুর্ধর্ষ ভুটানীরা। অপরিসীম তাদের মনোবল। দুশ বছরের অন্ধকার দিগন্ত পেরিয়ে আজো তাদের দেখতে পাই যেন। ডুব দিয়ে হারানো অতীতের মধ্যে কান পেতে শুনি।

খট খট...খট খট...খটাখট খট..

ধুলো। শিরস্ত্রাণে ঝলকাচ্ছে রোদ। ধারালো কিরীচের ডগা জ্বলছে ঝিকঝিকিয়ে।

আঁতিপাতি করে খুঁজছে ইংরাজ সেনা। বনের মধ্যে লুকিয়ে পড়েছে ভুটানীরা। হয়ত বা কোনো পার্বত্যগুহার অন্ধকারে। যার খবর ইংরাজদের পক্ষে পাওয়া সম্ভব নয়। ঘাসের মধ্যে শুয়ে পড়েছে। বিষাক্ত পোকার দংশন উপেক্ষা করে। সাপ-খোপের ভয় করে না ভুটানীরা। হিংস্র জীবজন্তুদের মুখোমুখি লড়তে পারে। প্রকৃতি তাদের করেছে অসমসাহসী। ঝিলেজঙ্গলে ঝোরায় আত্মগোপন করে থাকবার কষ্টসহিষ্ণু প্রতিভা তাদের সহজাত। সুযোগমত প্রতি-আক্রমণ চালাতে তৎপর।

নিষ্ঠুর ক্রোধে ও প্রতিহিংসার আগুনে তাদের চোখ ঝলমল করে জ্বলে। পরিচ্ছদ বড় নয়, খাদ্য-ঔষধ ও সমরোপকরণ বড় নয় তাদের কাছে। দুর্জয় শক্তির হার-না-মানা পণে তারা দৃঢ়বদ্ধ।

বারবার তারা ঝাঁপিয়ে পড়েছে এই মাটিতে। লুণ্ঠন করেছে, হত্যা করেছে। ইংরাজ শক্তিকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে বারে বারে।

আরো আগে থেকেই শাসকপদে তখন ইংরাজের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত। বাংলাদেশে সিরাজদ্দৌলার পতন ঘটেছে অনেকদিন। ১৭৭২ খৃস্টাব্দে ইংরাজেরা সর্বপ্রথম ভুটানীদের সংস্পর্শে আসেন। তার পাঁচ বছর আগে স্বজাতীয়দের জন্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে পুরোপুরি দেশে ফিরে গিয়েছেন রবার্ট ক্লাইভ। সেটা ১৭৬৭ খৃস্টাব্দের জুন মাস। ক্লাইভের পর ভেরেলেস্ট কোম্পানীর গভর্নর হন। ১৭৬৭ থেকে ১৭৬৯ খৃস্টাব্দ। ভেরেলেস্টের পর কার্টিয়ার ১৭৭২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত। কার্টিয়ারের অবসর গ্রহণের পরেই ওয়ারেন হেস্টিংস হলেন কোম্পানীর গভর্নর। ক্লাইভের মতই তিনিও কোম্পানীর কেরানী হয়ে এসেছিলেন এদেশে। ইতিমধ্যে ১৭৭৩ খৃস্টাব্দে পার্লামেন্টে রেগুলেটিং আইন নিবন্ধ হয়েছে। ফলে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার জন্য হেস্টিংস হলেন সর্বপ্রথম গভর্নর জেনারেল।

ইতিহাস। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস।

আবার অতীতের ইতিহাসে ডুব দিয়ে হারিয়ে যাচ্ছে মন। তারিখ সাল শতাব্দী নয়। খুলে যাচ্ছে অন্ধকার দিগন্তের যবনিকা।

সেরাত্রে ঘুম নেই গভর্নর জেনারেল হেস্টিংস সাহেবের চোখে। ভয়ে ভয়ে উঁকি দিয়ে দেখছি। তন্দ্রা ভেঙে-ভেঙে যাচ্ছে বারবার। হেস্টিংস সাহেবের দু' চোখে গাঢ়তম দুশ্চিন্তার কাজল ঘনিয়ে উঠছে। রাত্রি জাগরণের প্রলেপে।

আলিপুরের বেলভেডিয়ার প্রাসাদের সুরম্য কক্ষের অগণিত ঝাড়বাতির আলোগুলি কিন্তু তখনো ঝলমল করছে। বাইরে প্রহরারত সিপাই-সান্ত্রী। হেস্টিংস কি আজ ভয়ানক রকম অনামনস্ক? মাঝে মাঝে পদচারণা করছেন থেমে-থেমে। বিড়বিড় করছেন। ছুটে এসে দাঁড়িয়ে আছেন সুন্দরী ম্যারিয়ান্। দুই চোখে বিস্ময় নিয়ে। অভিমানে গোলাপের পাপড়ির মত ঠোঁট দুখানি অল্প-অল্প কেঁপে কেঁপে উঠছে।

এ কি ভীষণ রকমের অবিচার? কত রাত শুয়ে শুয়ে তিনি অপেক্ষা করেছেন পালংকে। কই, কোথায় এলেন তিনি? এখন প্রতীক্ষার শেষ প্রহরে ধরে ধরে অভিমান নিয়ে উঠে এসেছেন ম্যারিয়ান। দীর্ঘদিন দীর্ঘদিন দেখছেন। এরই জন্যে কি তিনি তাঁর দরিদ্র জার্মান স্বামীকে পরিত্যাগ করে এসেছিলেন? জাহাজে বিপত্নীক হেস্টিংসের ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে হৃদয় নিবেদন করেছিলেন? নিঃশব্দে যেমন এসেছিলেন তেমনি পায়ে-পায়ে ফিরে গেলেন ম্যারিয়ান। সুরম্য প্রাসাদকক্ষের শয্যায় গিয়ে লুটিয়ে পড়লেন।

কিন্তু দোষ ছিল না হেস্টিংসের। ভুটানীদের সঙ্গে যুদ্ধের ফলাফল তাঁকে চিন্তিত করে তুলেছিল। ১৭৭২ খৃস্টাব্দে কোম্পানীর গভর্নর থাকা অবস্থায়ই তাঁর কাছে পৌঁচেছিল মিত্ররাজ্য কুচবিহারের করুণ আবেদন। কুচবিহার রাজ্য শুধু আক্রান্তই হয় নি, বারবার ভুটানীদের হাতে লাঞ্ছিত এবং নিপীড়িতও হচ্ছে। রাজাকেও অসম্মানিত হতে হয়েছে। মহাশয় ইংরাজের সহায়তা চাই। নইলে কুচবিহারের অস্তিত্বই বিপন্ন হতে চলেছে। হেস্টিংসের নির্দেশে ছুটে এসেছিল ইংরাজ সৈন্য। ভুটানীদের তাড়িয়েও দিয়ে এসেছিল। কিন্তু তবু দমানো যায় নি তাদের। তারপরও গভর্নর জেনারেল হিসেবে বারবার তাকে সীমান্তযুদ্ধের সেই অনিশ্চয়তার কথা শুনতে হয়েছে। ১৭৭৪ খৃস্টাব্দে তিব্বতের শাসকশক্তির অগ্রহে ও হস্তক্ষেপে ভুটানের সঙ্গে একটা সন্ধিসূত্রও স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু চোরাবালির বাঁধের মত তা ভাঙতে দেরি হয় নি। ভুটানের পার্বত্য-প্রান্তরের নিম্নতলবর্তী অঞ্চলগুলির নানা স্থানে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে তাদের লুণ্ঠন অবাধ অরাজকতা ও ত্রাস দূর করা যায় নি। ১৭৮৩ খৃস্টাব্দে ইংরাজ সৈন্য একদিকে যখন দ্বিতীয় মহীশূর যুদ্ধে লিপ্ত, সেই বছরেই ভুটানের সাথে দৃঢ় বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে তোলার আগ্রহে ডুয়ার্সের এই সীমান্তে ক্যাপ্টেন টার্নারকে পাঠানো হয়েছিল ভুটানে। কিন্তু তাঁর দৌত্য সফল হয় নি। তিক্ততার অবসান ঘটে নি কিছুতেই।

শুধু হেস্টিংসই বা কেন, দীর্ঘকাল ধরে এই বিরোধ চলেছে উভয়পক্ষে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে পাকাপাকিভাবে ইংরাজদের হাতে পরাজয় পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকতে হয়েছে এজন্যে।

কিন্তু সে পরাজয়ের জন্যও কম দাম দিতে হয় নি ইংরাজকে।

শেষ পর্যন্ত কঠোর যুদ্ধ চলেছে উভয় দলে। মাসের পর মাস ধরে রক্তক্ষয়কারী যুদ্ধ। জয়-পরাজয়ের কোনো লক্ষণই নেই। আক্রমণ ও প্রতিআক্রমণ। ইংরাজের শিবির ও ছাউনিগুলি থেকে ছুটেছে বৃষ্টিধারার মত গোলাগুলী। প্রতিপক্ষের কোন শব্দ নেই। ক্লান্ত হয়ে যখন বিশ্রাম করছে সবাই, তখন হয়ত অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ভুটানীরা। দলে দলে প্রাণ দিয়েছে ইংরাজ সৈন্য। অজস্র গোলাবারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিয়ে পালিয়ে গেছে। গা ঢাকা দিয়েছে বনেজঙ্গলে।

বারবার আক্রমণে ক্ষতবিক্ষত ও ক্লান্ত ইংরাজ সৈন্য। ইতিমধ্যে খবর পাওয়া গেল ভুটানের অজ্ঞাত কোন পার্বত্য অঞ্চলে নদীর জলে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে তারা।

ঠিক এ জাতীয় আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না ইংরাজ। নদীর জল পান করে শত শত ইংরাজ সৈন্যের অতর্কিত মৃত্যু।

কল্পনায় দেখতে পাচ্ছি, বর্তমান আলিপুরদুয়ারের নিকটবর্তী বক্সা রোডের পশ্চিম প্রান্তে একটি দেশীয় পদাতিক সৈন্যবাহিনীর ছাউনিতে উৎকণ্ঠিতভাবে পায়চারি করছেন কর্নেল হেদায়েৎ আলি খান। দেশীয় পদাতিক বাহিনীর নেতৃত্ব তাঁর হাতে।

দুশ্চিন্তার রেখা পড়েছে হেদায়েৎ আলির ললাটে। অন্যান্য ইংরাজ সেনাপতিদেরও মুখ চুন। সমস্যার মোকাবিলা যে-করে-হোক করতেই হবে। অথচ তাদের উপস্থিতির ঠিকানাও যে পাওয়া যাচ্ছে না। আক্রমণকারীদের সঠিক ঠিকানা চাই-ই চাই।

শোনা যায়, রাত্রির অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে এসেছিল এক চর। খবর পৌঁছে দিতে এসেছিল হেদায়েৎ আলির কাছে। চর পাঠিয়েছিলেন এতদঞ্চলেরই এক প্রখ্যাত পরিবারের কর্তা। ভুটানীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের সম্পর্ক ছিল গভীর। বৈষয়িকতা সূত্রে পরিচিত ছিলেন তাদের পথ-ঘাট ও অলি-গলির সঙ্গে।

অকারণে সময়ক্ষেপণ করেন নি হেদায়েৎ আলি। রাত্রির অন্ধকারেই আক্রমণ পরিচালনা করেছিলেন হেদায়েৎ আলি। গিয়ে সময়মত আঘাত করেছিলেন শত্রুপক্ষকে। অতর্কিত এই আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না ভুটানীরা। পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল বাধ্য হয়ে।

কৃতজ্ঞতা স্বীকারে কুণ্ঠিত হয় নি ইংরাজ। উপযুক্ত পুরস্কারে সম্মানিত করেছিল হেদায়েৎ আলিকে। আর আলি সাহেবের নাম থেকেই আলিপুরের সৃষ্টি। তার সঙ্গে দুয়ার শব্দ মিলে আলিপুরদুয়ার। বর্তমান পশ্চিম বাংলার এক অবিস্মরণীয় নাম। একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। উত্তরবাংলার সাথে আসামের যোগাযোগের বিখ্যাত লাইনটি গেছে তারই উপর দিয়ে।

এক সাবডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে আলিপুরদুয়ার নামকরণের নেপথ্য ইতিহাসটি ব্যক্ত করেছিলাম। খাস কলকাতার লোক। শুনে তিনি বলেছিলেন, আলি সাহেবকে ভাগ্যবান বলতে হবে।

বলেছিলাম, বাকিটাও শুনুন তাহলে। ইংরাজ শাসকদের বাইরে একমাত্র তিনিই প্রথম Extra Assistant Commissioner হয়েছিলেন। ডুয়ার্সেও তিনি ইংরাজ সরকারের কাছ থেকে প্রচুর জমি পেয়েছিলেন।

কিন্তু থাক সে কথা।

ডুয়ার্সের ভুটানীদের অতীত নিয়ে আলোচনা করছিলাম।

অনেক যুগ অতীত হয়ে গেছে ইতি-

১৯৬৯ তে আপনার ভাগ্য

যে-কোন একটি ফুলের নাম লিখিয়া আপনার ঠিকানাসহ একটি পোস্টকার্ড আমাদের কাছে পাঠান। আগামী বারমাসে আপনার ভাগ্যের বিস্তারিত বিবরণ আমরা আপনাকে পাঠাইব. ইহাতে পাইবেন ব্যবসায়ে লাভ লোকসান, চাকুরিতে উন্নতি, বদলী, জন্ম, বিবাহ ও সুখ-সমৃদ্ধির বিবরণ; আর থাকিবে দুষ্টগ্রহের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষার নির্দেশ। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

PT. DEV DUTT SHASTRI
RAJ JYOTISHI (B. M. W)
P. B. 86, JULLUNDUR CITY

মধ্যে। নতুনকালের মাটিতে বসে পুরনো-কালের কথা মনে হয়। পথেঘাটে নতুন-কালের ভুটানীদের দেখি। সহজ সাধারণ হাসিখুশি মানুষগুলি। বর্তমান যুগে ভারতবর্ষের সঙ্গে ভুটানের সম্পর্ক গভীর।

অতীত ইতিহাসসূত্রে প্রাচীন ভুটানী-দের অনেক পরিচয় ছড়িয়ে আছে ডুয়ার্সে। একটু অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলেই তাদের বুঝতে কষ্ট হয় না।

নন্দকিশোরের কথা মনে হয় আমার। সে রাত্রে অনেক কথা প্রসঙ্গে সে বলেছিল, জানেন কি দাদা ডুয়ার্সের বিভিন্ন অঞ্চলে আজও ভুটানীদের অনেক চিহ্ন আছে?

আছে না কি? আমি অবাক হয়ে বলেছিলাম।

নন্দকিশোর বলেছিল, এই দেখুন দাদা, শুনুন আপনি। কোন্ জায়গা থেকে কেন টুকে রেখেছি। আলিপুরের কাছা-কাছি কুমারগ্রাম শব্দটির সৃষ্টিই ভুটানী-দের কোঙ্গ্যারগাঁও থেকে, সে তো আপনি জানেনই। পুকারিগাঁও বলে একটি জায়গা আছে—ওই কুমারগ্রামেরই কাছা-কাছি। কলিয়া পাত্র নামে এক ব্রাহ্মণ সেখানে একটি পুকুর খনন করেন বলে ভুটানীরা জায়গাটির এই নাম দিয়েছিল। আলিপুরের কাছাকাছি চকোয়াক্ষেতি বলে একটি জায়গা আছে। কিছুদিন আগে সেখানে একটি হেল্থ সেন্টার খোলা হয়েছে জানেন নিশ্চয়। চকোয়া নিশ্চয় কারুর নাম ছিল। তার ক্ষেত ছিল ওই অঞ্চলে। ভুটিয়াদের কাছে তাই জায়গাটিরও নাম হয়েছিল এই রকম। জিৎপুর বলে পরিচিত অঞ্চলটির নামই এসেছে জিতো ভুটিয়ার নাম থেকে। লোকটি থাকত ওই অঞ্চলে। শোভাগঞ্জ নামটি দেখা যায়। এটিও ভুটিয়াদের কাছ থেকে এসেছে। একালের শোভা কোন সুন্দরী কন্যার নাম বা প্রাকৃতিক শোভা-সৌন্দর্য থেকে আসে নি। এসেছে ভুটিয়া সুব্বা থেকে। That is, the place where the Bhutia Subahs used to reside. ভাটিবাড়ি এ-অঞ্চলের একটি পরিচিত নাম। আলিপুরদুয়ার থেকে কামাখ্যা-গুড়ির রাস্তায়। এখানে বর্তমানে একটি ভালো স্কুল আছে। এ সম্পর্কে সরকারী প্রাচীন একটি নোট দেখছি। Bhati অর্থে Low এবং বাড়ি অর্থে Homestead. The Bhutias used to halt at this place as the last post within their jurisdiction. কালাকাটা এলাকার ভুটনিরঘাট নাম-করণটিও এই প্রসঙ্গে মনে আনবার। Bhutni means a Bhutia Woman এবং ঘাট অর্থে Ferry. In the time of the Bhutias a Bhutia woman was the farmer of Mujnai ferry. The taluk is, therefore, named after her. খিরারকোট সম্পর্কে বলা হয়েছে, In the time of the Bhutia Govt. one Khira Das dug a moat round his homestead. The taluk is named after him. ময়নাগুড়ি অঞ্চলের ভাঙ্গামালি সম্পর্কে দেখা যাচ্ছে, There is an old Bhutia road running through the taluk. It is broken in several place, hence the name. বাসুসুবা সম্পর্কে—The taluk where the Bhutia Subahs used to rest or halt before the Duars were annexed. ময়নাগুড়ির কাছাকাছি ডাম্‌ডিম্‌-এর পূর্ববর্তী নাম ছিল ঢম্‌ঢম্‌। ড্রাম পেটাবার শব্দের কথা মনে করিয়ে দেয়। The name has been changed to Dam Dim since the Duars were annexed by the British government.

শুনতে শুনতে অবাক বিস্ময়ে তাকাচ্ছিলাম।

[illegible]

অন্তিম অন্বেষণ

জ্যোতিশ্চন্দ্র চক্রবর্তী

ওয়ার্ড বয় ঠিক করে স্ট্রেচারটা ইমার্জেন্সির মেঝেয় রাখল, আর কেশব পণ্ডিত হাত জোড়করে চেঁচিয়ে উঠল; —"আমায় তাড়াতাড়ি ছেড়ে দেবেন, সন্ধ্যা-আহ্নিক-পুজো সব পড়ে আছে।"

একসঙ্গে দশ কণ্ঠের ধমকে পণ্ডিত চুপ করে গেলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁকে পরীক্ষা করা হলো, তারপর আবার স্ট্রেচারে তোলা হল। নানা ধরণের চেঁচামেচির মধ্যে পণ্ডিত ডাক্তারের নির্দেশ শুনতে পেলেন,—

—মেনিনজাইটিস ইনডোর, কুইক...

তারই আধ ঘণ্টা পরে রেইল-কটের ধপধপে বিছানায় শুয়ে কেশব পণ্ডিত চিন্তা করছিলেন, কিসে কি হলো।

ফতুল্লাপুর হাই স্কুল থেকে ছুটির ঘণ্টা পড়তেই তিনি মাঠ পার হয়ে বাড়ির দিকে রওয়ানা হয়েছিলেন। অনেক তাড়া ছিল; সন্ধ্যে লাগতেই দুটি বাড়িতে গৃহদেবতার পুজো সেরে ঘরে ফিরে ইষ্টদেবীর পুজো করে শয়ন দিতে পারলেই নিত্যকর্মের ফাঁসটা একটু আলগা হবে। আবার সেই ভোরে উঠে দুটি টিউসনি সেরে নাকেমুখে ভাত দিয়ে ইস্কুলে ছুটতে হবে। কিন্তু মাথাটা যে টিপ টিপ করছে, একটু জ্বরও বোধহয় হয়েছে। জোরে পা চালালেন।

কিন্তু স্টেশন পার হয়ে বাড়ির কাছাকাছি আসতেই তাঁর মনে হলো, মাথাটা বোধহয় ছিঁড়ে পড়বে।

বাড়ি পৌঁছে দেখলেন, বড় ছেলে প্রবীর তখনো ফেরে নি। তিনি জানতেন, ইস্কুলের শেষে একটা কোচিং ক্লাশে পড়িয়ে বাড়ি ফিরতে রাত আটটা হবে। তবুও ছেলেকে তিনি আজ আশা করেছিলেন।

বৌমা ও গৃহিণী দুজনেই অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। কারণ, মাথা ধুইয়ে, টিপে দিয়েও কোন ফল হচ্ছিল না। শেষে ডাক্তার এলেন, তাঁর গায়ে একটা ইনজেকসন ফুটিয়ে দেওয়া হলো। তারপর সোজা হাসপাতাল।

কিন্তু এখন তো মাথার সেই অসহ্য যন্ত্রণাটা নেই; তবু কেন ওরা তাঁকে ভর্তি করল? মেনিনজাইটিস না হাতী! মাঝখান থেকে শুধু শুধু নানা দিকে ক্ষতি আর হয়রানি।

তাঁর ঘুম নেই, দেহে একটা অস্বস্তি। মনে একটা অতলান্ত শূন্যতা। পাশের বেডে একটা রোগী খুব চিৎকার করছে। আজ কেন যেন সবার কথা মনে পড়ছে। অথচ কিছুক্ষণের মধ্যে নিশ্চয়ই স্ত্রী, ছেলে আর বৌমা তাঁকে দেখতে আসবে। কিন্তু আসবে না দুজন—এরা কোনদিনই আসবে না বোধহয়। কেশব পণ্ডিতের বুক চিরে একটা আগুনের হলকা বেরিয়ে আসে।

বড় ছেলে সত্যনিষ্ঠ পরোপকারী, স্বাস্থ্যবান আনন্দময় পুরুষ। বৌমা দারিদ্র্যের মধ্যেও সদা হাস্যমুখী স্বামী-প্রেমে গরবিনী। স্ত্রী তো তাঁর কায়ার ছায়ার সমান। এদের সম্পর্কে তাঁর কোন অভিযোগ নেই।

কিন্তু ছোট ছেলেই তাঁর সমস্ত যন্ত্রণার প্রতীক—তাঁর আদর্শের প্রতি বিদ্রূপ। ছেলেবেলা থেকেই সে দুর্দান্ত। দশম শ্রেণীতে উঠেই নকল-ধরার অপরাধে শিক্ষককে অপমান করে চিরকালের জন্য পড়া ছেড়েছে। সিনেমা, টেরিলিন, টেরিকটের পয়সার জন্য মা'র বাক্স ভেঙেছে, দাদার পকেট হাতিয়েছে। বোধ হয় একটু নেশা-টেশাও সুরু করেছিল। একদিন সন্দেহ করে মারধোর করায় সেই যে বাড়ি থেকে পালিয়েছে—সে আজ পাঁচ বছরের কথা।

সবার ছোট একমাত্র মেয়ে তনিমা। কেশব পণ্ডিত নিজের মাকে আবিষ্কার করেছিলেন মেয়ের মধ্যে, তার দয়া, মায়া সস্নেহ অনুযোগ অনুশাসনের আতিশয্যে।

স্কুল ফাইনাল পাশ করে কলেজে ভর্তি হতে পারে নি তনিমা টাকার অভাবে। অবশ্য বড় ছেলে প্রবীর তাকে ভর্তি করে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু মেয়ে জেদ ধরল, আগে চাকুরি, তার পর নাইটে পড়বে। সংসারে যতটুকু পারে সাহায্য করবে। এই ব্যাপারে তাকে উৎসাহ যুগিয়েছিল, তাঁর এক প্রাক্তন ছাত্র ধনী ব্যবসায়ীর একমাত্র সন্তান সুকান্ত। নিজের চেষ্টায় স্বাবলম্বী হয়ে যশস্বী হবে, এই ছিল তার পণ।

কেশব পণ্ডিত দূর থেকে তনিমা-সুকান্তের চোখে সোনালী দীপ্তি দেখেছিলেন; আর মনে মনে আশার, আনন্দের জাল বুনেছিলেন।

ঠিক তার পরই এলো বজ্রাঘাত। সেদিন ব্রহ্মরন্ধ্র বুঝি ফেটে যাবার উপক্রম হয়েছিল কেশব পণ্ডিতের।

সুকান্ত তনিমাকে নিয়ে গিয়েছিল একটা চাকুরির চেষ্টায়। রাত দশটার সময় সে বিশৃঙ্খল বেশবাস, গায়ে মারধোরের চিহ্ন নিয়ে একলাই ফিরে এসেছিল। চাকুরিতে ভাল ইণ্টারভিউ দিয়ে তারা দুজনে ইডেনে বেড়াতে গিয়েছিল। সেখানে গুণ্ডার দল ফাঁদ পেতে দুজনকেই ধরে নিয়ে গিয়েছিল। তাকে মারধোর করে ছেড়ে দিয়েছে, তনিমাকে জোর করে কোথায় নিয়ে গেছে গুণ্ডারা।

কেশব পণ্ডিত সেদিন কপাল ঠুকবেন না ডুকরে চিৎকার করবেন, কিছুই ঠিক করে উঠতে পারছিলেন না। সমস্ত দিন থানা-পুলিশ করে রাত্রিতে ঠাকুরঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে ছিলেন। কত সন্দেহের লেলিহান শিখা বারংবার মনকে দগ্ধ করতে চাইছিল, তিনি বহু কষ্টে নিজকে দমন করার চেষ্টা করছিলেন। সুকান্তরই কোন সাজানো।... না, না, না। সুকান্ত সন্দেহের বাইরে। গুণ্ডারাই করেছে তাঁর এ সর্বনাশ। গুণ্ডারা! চকিতে মনে

পড়ে যায় আর এক ইতিহাস—তাঁর ছোট ছেলে প্রণব, দুর্নীতিপরায়ণ উচ্ছৃঙ্খল প্রণবের ঘর-পালানোর ইতিহাস। ঘর-পালিয়ে সে নিশ্চয় গুণ্ডাই হয়েছে— ওর মত ছেলের যা স্বাভাবিক পরিণতি। তাঁর দুই ছেলে যেন দুই মায়ের সন্তান। দিতির সন্তান প্রণব আজ যেন তার চেলা-চামুণ্ডা নিয়ে সংসার ছেয়ে ফেলেছে। হ্যাঁ, তারই হাতে নয়ত তার দলবলের হাতেই হয়ত আজ তনিমা লাঞ্ছিতা! উঃ, ভাবা যায় না!

পণ্ডিত আগাগোড়াই সংসারে কিছুটা অনাসক্ত থাকার চেষ্টা করতেন। তবু সন্তানদের মধ্যে বোধহয় মেয়েকেই স্নেহ করতেন সবচেয়ে বেশি। অকস্মাৎ প্রচণ্ড আঘাতে তিনি বিদীর্ণ হলেন, বিপর্যস্ত হলেন। কঠিন প্রস্তরের গর্ভ থেকে ফাল্গু আত্মপ্রকাশ করায় তিনি নিজের মনকে শাসন করতে চাইলেন। কিংবা হয়ত অক্ষমতার লজ্জাকে ঢাকতে গিয়ে নিরাসক্তির কঠিন তুষারে হৃদয়কে ঢেকে দিতে চেষ্টা করতে লাগলেন।

যথানিয়মে ঘুরতে থাকল পৃথিবী। অবচেতন মনে চাপা রইল পণ্ডিতের যাতনার ইতিহাস।

—"উঃ," কেশব পণ্ডিত মৃদু আর্তনাদ করে উঠলেন। একটি নার্স এসে কি একটা ইনজেকসন করে গেল।

তিনি চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন। নার্সটি অন্য রোগীদের বেডে মশারি গুঁজে দিচ্ছে। এককোণের খাটের ওই ছেলেটি একটানা চেঁচিয়ে যাচ্ছে। আশ্চর্য! নিজের মধ্যে এত ডুবে ছিলেন, এ সমস্ত একদম চোখ-কানের গোচরে আসে নি। মনটা এখন অদ্ভুত নরম হয়ে পড়েছে। তাঁর বড় ছেলে প্রবীর পুজো সেরে তাঁর ইষ্টদেবীর সামনে পদ্মাসন করে বসেছে। হয়ত আবৃত্তি করছে:

মহামেঘপ্রভাং দেবীম্
কৃষ্ণবস্ত্র পিধায়িনীম্
লোলজিহ্বাং ঘোরদংষ্ট্রাং
কোটরাক্ষীং হসন্মুখীম্।

প্রবীরের চোখে নিশ্চয়ই জল এসে গেছে। তাঁরও আসত। মনে হতো জীবনের দৈন্য ম্লানিমা এই জগৎ জোড়া আলোর পায়ে আলোর পদ্ম হয়ে ফুটে উঠছে।

তিনি হাত জোড় করে প্রণাম করলেন: তারপর ঘুমিয়ে পড়লেন।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল পণ্ডিতের।

ভারি সুন্দর সকাল। মৃদুমৃদু হাওয়া দিচ্ছে। জানলা দিয়ে মাখনের মত নরম রোদ বিছানায় লুটিয়ে পড়ছে। ওয়ার্ড নার্স, জমাদারের ছোটাছুটি কর্মব্যস্ততা। সেই কোণের বেডের ছেলেটিও চুপ করে আছে। সবকিছু মিলিয়ে শান্ত পরিবেশে তিনি পারিবারিক জীবনের উষ্ণতা অনুভব করলেন। ভাবলেন, কাল হয়ত ছেলে বৌমা দেখা করতে পারে নি। তিনি ভর্তি হয়েছেন ভিজিটিং আওয়ারের পরে। আজ নিশ্চয়ই তারা আসবে। গৃহিণীও আসবেন।

হঠাৎ তাঁর মনে পড়ল, কোষ্ঠীতে এই মাসে তাঁর মৃত্যুযোগ ছিল। যদি তাই হয় তবে তাঁর ভাবনার কি আছে? ছেলে-বৌমা-স্ত্রী এদের জন্য কোন চিন্তা নেই। এরা পৃথিবীকে চিনেছে, শক্তিকা যত উষরই হোক না কেন, জীবনরস এরা আহরণ করে বাঁচবেই। কিন্তু আর দুটো উপগ্রহ, যারা জীবনের কক্ষপথ থেকে ছিটকে পড়েছে, তারা কোথায় আছে, কেমন আছে কে জানে! তাঁর বুকটা যেন মচড়ে মচড়ে উঠছে। দীপ নেভাবার আগে জীবনদেবতা কি এতটুকু করুণা করবেন না? তাঁর দুই চোখ বারংবার জলে ভরে আসতে লাগল।

বেলা বাড়তেই তাঁর মাথার যন্ত্রণা বাড়তে লাগল। যেন খুলির ভেতর অসংখ্য বোলতা হুল ফোটাচ্ছে। কেশব পণ্ডিত নিজেকে নৈর্ব্যক্তিক করতে চাইলেন। আর কি আশ্চর্য! তাঁর মনে হল তাঁর মননশক্তি চতুর এল্লার কিসের মত চেতন সমুদ্রের গভীর থেকে গভীর-স্তরে নামতে লাগল।

এক সময় তাঁর মনে হল, দেহ শান্ত হয়েছে, পরিপার্শ্ব ঘষা কাচের মত বিবর্ণ। গভীর রাত্রির মত স্তব্ধ হয়ে গেছে। আর দরজায় কার ছায়া পড়েছে।

তিনি ভাল করে তাকালেন, আর বিস্ময়ে নির্বাক হয়ে গেলেন।

তাঁর ছোট ছেলে প্রণব, পাঁচ বছর আগেকার সেই ঘর-পালানো ছেলে। কী চমৎকার স্বাস্থ্য আর দামী পোষাক। সংযত লাবণ্য আর কাঠিন্যের অপূর্ব সংমিশ্রণ! তিনি মুগ্ধ হয়ে গেলেন। সস্নেহ গর্বে তাঁর অন্তর ভরে গেল।

ছেলে খুব সাবধানে প্যান্টের ভাঁজ এতটুকু না ভেঙে, গলার টাই যাতে স্থানচ্যুত না হয় তা লক্ষ্য রেখে মাথার কাছে টুলের ওপর বসল। ফলের একটা প্যাকেট লকারের ওপর রাখল।

—কেমন আছ বাবা? তোমার অসুখ শুনে দেখতে এলুম।

কেশব পণ্ডিত উঠবার ব্যর্থ চেষ্টা করলেন। নিজের শিথিল হাতটা কোন-প্রকারে ছেলের হাতের ওপর রাখলেন।

—প্রণব, তুই এসেছিস। এতদিন কোথায় ছিলি রে? বাপ-মাকে অমন করে ভুলে থাকতে হয়?

—ছিলুম অনেক জায়গায় বাবা। পয়সার পিছনে ছুটতে হয়েছে। পয়সা কি আর অমনি ধরা দেয়?

—তাহলেও একটু খবর দিতে হয়। তা হ্যাঁ রে, তোর বোনের খবর জানিস? দুটি বছর ধরে তাকে আমরা খুঁজে পাচ্ছি না। গুণ্ডারা ধরে নিয়ে গেছে।

প্রণব একটু চুপচাপ থেকে বলল, —তা আমি কি করে জানব বল? আছে কোথাও নিশ্চয়। ফেরার হয়ত ইচ্ছে নেই।

পণ্ডিত কেঁদে উঠলেন,—তা কি হয়! আমার তনু, সে যে আমায় না দেখে থাকতে পারে না। গুণ্ডারা নিশ্চয়ই তাকে মেরে ফেলেছে। তুই একটু খোঁজ করবি বাবা?

—তা না হয় দেখব, কিন্তু কিছু লাভ হবে কি?

—তা না হোক, এ তোর কর্তব্য। তা, তুইও তো একবার দেখা করতে পারতিস!

—তা পারতুম, কিন্তু তুমি দুঃখ পাবে তাই আসি নি।

—কি বলছিস তুই, আমার ছেলে মানুষ হয়েছে, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, আর আমি দুঃখ পাব?

—থাক বাবা, ওসব কথা। যদি শুনে সুখী হও তবে বলতে পারি। কলকাতা শহরে আমার বাড়ি হয়েছে দুখানা, রানাঘাটে বিঘে পঞ্চাশ ধানী জমি বাগান কিনেছি, গাড়ি হয়েছে, দুটি ব্যবসা চলছে। মন্ত্রীদের সঙ্গেও কাজ-কারবার আছে। আরও কিছু সম্ভাবনা আছে। দিন তো পড়ে আছে।

পণ্ডিত অবাক হয়ে গেলেন। ঘর-পালানো দশম মানের ছেলে, তাঁকে রূপকথা শোনাচ্ছে।

আনন্দিতকণ্ঠে বললেন—বাঃ বেশ ছেলে, বাহাদুর ছেলে! সৎপথে থেকে প্রচুর উপার্জনের চেষ্টা কর, আর সৎপথে প্রচুর খরচ কর। তবেই না অর্থের সার্থকতা। তুই বল, আমি

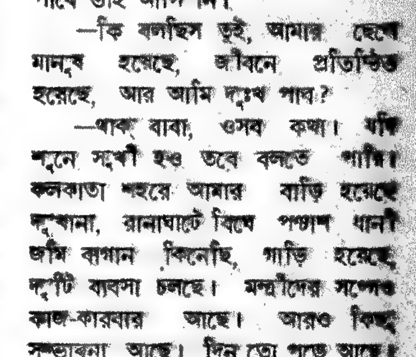

শুনব তোর জীবনের নানা বিপর্যয়ের কথা। কেমন করে তুই দারিদ্র্যের অভিশাপকে জয় করেছিস। বলব আমি তোর কথা ইস্কুলের ছেলেদের কাছে। তুই একটা ইনস্টান্স্ হয়েছিস।

কেশব পণ্ডিতকে অবাক করে দিয়ে তাঁর ছেলে এমন জোরে হো হো করে হেসে উঠল যে,—পণ্ডিতের মনে হলো—তা যেন প্রগল্ভতাকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। একটু আহত হয়ে শুনলেন, ছেলে বলছে,—ও বাবা, তুমি ওটি করো না ছেলেদের কাছে। তোমার চাকুরি থাকবে না। সারা জীবন স্কুলে মাস্টারী করছ, তাই বুঝতে পারছো না, পাঁচ বছরের মধ্যে তিন লাখ টাকার সম্পত্তি, তোমার সত্য-মার্কা জীবনযাপনে হয় না। একটু প্র্যাকটিকাল্ হলেই বুঝতে পারতে সোজা আঙুলে ঘি কোনকালেই উঠত না, আজও ওঠে না।

পণ্ডিত রেগে গেলেন,—তার মানে?

—মানে খুবই সোজা। আমার বাড়ি-বাড়ির সংবাদ শুনে যতটা খুশি হয়েছ, তার চেয়ে বেশি দুঃখ পাবে তা অর্জনের ইতিহাস শুনে। তাই আমি বলতে চাই নি। তুমি ভাবতে পার, তোমার ইস্কুল-পালানো ছেলে, দশটা নামকরা মস্তানের ওস্তাদ? রাহাজানি, ছিনতাই, ওয়াগন ভাঙা, এমন কাজ নেই যা আমরা করি না। খুব বিপদে পড়লে খুন-খারাপ যে করতে হয় না তা নয়। অবশ্য বড় বড় কাজেই আমি যাই। এতে কী যে থ্রীল আর সম্মান তা তুমি বুঝবে না। পলিটিক্যাল লীডার বল, কোটি-পতি ব্যবসায়ী বল, আর পুলিশের হোমরা-চোমরাই বল, মাঝে মাঝে আমার কাছে তাদের আসতে হয় লেনদেনও হয়।

ঘৃণায় মুখ বিকৃত করে পণ্ডিত বললেন—অর্থাৎ, কুখ্যাত গুণ্ডা।

—তা যাই বল।

—তবে...তবে কি,—কেশব পণ্ডিতের অবচেতন মনে মুখ-লুকানো সেই সাপটা হিস হিস করে উঠল,—তুই-ই করেছিস তোর বোনের সর্বনাশ! আমার আদরের তনিমাকে চুরি করেছে তোর-ই দলবল! শয়তান!

বাবা তুমি অনর্থক রেগে যাচ্ছ। ওই ব্যাপারটা আমি জানতাম না। আব্দুল আমায় ভুল রিপোর্ট দিয়েছিল। যখন জানলাম তখন আর করার কিছু ছিল না। আর ভেবে দেখো, পাপ-পুণ্য, ধর্ম-অধর্ম—এ সবের কি কোনো মানে আছে? তনির হাল এখন এমন কি খারাপ? যোধপুরে শীগ্‌গির তার বাড়ি উঠবে। তুলসীতলায় পিদিম দেওয়া, ছেঁড়া কাপড় পরা হাড়-বার-হওয়া গেরস্থ বৌ-এর চেয়ে অনেক সুখে, অনেক প্রতিপত্তি নিয়ে বাস করছে সে। ইচ্ছে করলে তোমায়—

পণ্ডিত গর্জে উঠলেন,—বেরিয়ে যাও, বেরিয়ে যাও, ইতর পশু, নরক—

আকণ্ঠ ঘৃণায় তাঁর বাকরুদ্ধ হয়ে গেল।

প্রণব ভারিক্কী চালে উঠে দাঁড়াল, কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল,—বেশ আমি যাচ্ছি। থাকো তোমরা শামুকের মত সত্যের খোলের ভিতর।

প্রণব বেরিয়ে যেতে পণ্ডিতের চেতনা যেন আরও গভীর বিস্মৃতির তমিস্রায় অসহায় আর্তিতে হাতড়াতে লাগল একটু আলোর আশ্রয়......

সহসা আবার ভেসে উঠল কার যেন ছায়া ছায়া মূর্তি। হ্যাঁ, এবার স্পষ্ট হয়েছে। বড় ছেলে প্রবীর উদ্বিগ্নমুখে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে। ধুতি-পাঞ্জাবী পরা দীর্ঘদেহী পুরুষ। শান্ত মুখশ্রীতে উদ্বিগ্নতা সত্ত্বেও আনন্দের আভা বিচ্ছুরিত হচ্ছে।

—একি বাবা, তুমি কাঁদছ? অসুখ কি কারো হয় না?

পণ্ডিত বড় ছেলেকে হাত ধরে টুলের ওপর বসালেন,—

—জানিস প্রবীর, প্রণব এসেছিল, সে কুলাঙ্গার গুণ্ডা হয়েছে। চুরি-ডাকাতি-খুন—কোনটাই তার বাদ নেই।

প্রবীর বাবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল—সব জানি বাবা, তুমি দুঃখ পাবে বলে এতদিন বলি নি।

পণ্ডিত উত্তেজিত হয়ে পড়লেন।

—কিন্তু ওই জানোয়ার 'তনির' কতবড় সর্বনাশ করেছে জানিস?

—সব জানি বাবা, ও-কথা মনে করে আর দুঃখ পেয়ো না তুমি। 'তনি' বোধ হয় এখন আসতে পারলেও আসতে চায় না।

কেশব পণ্ডিত চোখ বুজে পড়ে রইলেন। আবার চোখদুটি ভিজে উঠতে লাগল।

—হ্যাঁ রে প্রবীর, দেখছিস তো দিনকাল যা পড়েছে অবিমিশ্র সত্যনিষ্ঠায়, ন্যায়পরায়ণতায় কত কষ্ট। যারা বিবেককে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছে তাদের কত লাঞ্ছনা! আমার দিন তো শেষ হয়ে আসছে। তোর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে চিন্তা করার প্রয়োজন তোর আছে। তাই বলছি, তোর ইচ্ছা যায় না, মনের চোখে যুগধর্মের ঠুলি পরিয়ে, যেভাবেই হোক বেশি অর্থ উপার্জন করে আরামে, প্রতিপত্তি নিয়ে বাস করতে?

প্রবীর প্রাণখোলা হাসতে লাগল।

—তুমি ওরকম পার?

—না।

—কেন নয়? তা কি তোমার—যেনাহং নামৃতা স্যাম কিমহং তেন কুর্যাম্ অথবা তোমার ওই পাথরের বিগ্রহ—যাকে সত্য এবং ন্যায়ের প্রতীক এবং ইহকাল-পরকালের একমাত্র শরণাগতি বলে মান—তাকে ভালবেসে ফেলেছ বলে?

কেশব পণ্ডিত চুপ করে রইলেন। অনেককিছু বলার ছিল বলেই কিছু বলতে পারলেন না।

প্রবীর হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পণ্ডিতের মুখের কাছে মুখ এনে চাপাস্বরে বলল,—জান বাবা, প্রতি গভীর রাত্রিতে পৃথিবী যখন ঘুমিয়ে পড়ে, মানুষ, গাড়ি, জীবজন্তু-কীটপতঙ্গ যখন স্তব্ধ নীরব হয়ে যায়, তখন একটা কান্নার শব্দ শুনতে পাই। প্রাণ ফেটে গুমরে গুমরে অসহ্য সে কান্না—মনে হয় সব বাড়ি-ঘরের দেওয়াল ভেদ করে সমস্ত চরাচরব্যাপী ওই কান্নার সমুদ্র একাকার হয়ে যাচ্ছে। প্রথম মনে হতো এ 'তনি'র কান্না। পরে বুঝলাম এ একই জাতের কান্না। দুর্নীতি, লোভ, অত্যাচার আর লালসার ঘূর্ণিপাকে যে অসহায় প্রাণগুলি

সদ্য প্রকাশিত হইল!

বহুকাল পরে পুনর্মুদ্রণ

সায়ন মাধবাচার্য্য বা বিদ্যারণ্য মুনি বিরচিত

বেদান্ত-গ্রন্থ

বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহঃ

বেদান্ত শাস্ত্রের একখানি অতীব দুরূহ ও উপাদেয় গ্রন্থ

অনুবাদক

পণ্ডিতপ্রবর প্রমথনাথ তর্কভূষণ

মূল্য চার টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা ১২

তলিয়ে যাচ্ছে, তারা পর্যুদস্ত হতে হতে কেঁদে কেঁদে শেষবারের মত কার কাছে নালিশ জানাচ্ছে—ভাষাহীন প্রাণান্তকর সে গোঙানী।

পণ্ডিত উত্তেজিত হয়ে ফিসফিস করে বললেন,—ঠিক বলেছিস তুই, রাতে যখন ধ্যানে বসি তখন মাঝে মাঝে এমনি কান্না শুনতে পাই। ওই একই গোঙানীর শব্দ। প্রাণ আমার ফেটে যেতে চায়। একি তুই আমি ছাড়া আর কেউ শোনে মা?

প্রবীর বোধ হয় সামলে উঠল, বলল,

—থাক বাবা ওসব কথা। তুমি চুপ কর। উত্তেজিত হলে তোমার ক্ষতি হবে। পরে কথা হবে, আজ উঠি।

প্রবীর যেন কোথায় মিলিয়ে গেল। একটা অস্ফুট কান্না আশাবরী রাগের সূক্ষ্ম মীড়ের মত পণ্ডিতের মনের আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াতে লাগল। কোন চিন্তাই ভাল লাগছে না। মনটা অকারণে বিবর্ণ হেমন্তের দীর্ঘশ্বাস হতে চাইতে।

সহসা ও-কি! ও কার মূর্তি? কে ও?

কেশব পণ্ডিত চীৎকার করে উঠলেন,—তনিমা, তুই এসেছিস? তনিমা তাঁর সেই পূজো ঘরের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে রইল। চকচকে চোখে জিজ্ঞাসা করল,—ভাল আছ বাবা?

পণ্ডিত ছেলেমানুষের মত কেঁদে উঠলেন,—এতদিন কোথায় ছিলি মা তুই বুড়ো বাপকে ছেড়ে? কাছে আয় মা, তোকে কত খুঁজেছি!

তনিমা শক্ত করে দরজাটা আঁকড়ে ধরে রইল। চোখের কোল বেয়ে বেদনা ঝরে পড়তে লাগল।

—আমি আর কোনদিন তোমার কাছে যাব না বাবা। তুমিও ডেকো না। যদি খুব ইচ্ছা করে দূরে থেকে দেখে যাব।

পণ্ডিত কিছু বলতে পারলেন না। কে যেন গলাটা শক্ত মুঠিতে চেপে ধরল।

দরজায় নখ খুঁটতে খুঁটতে তনিমা বলল,—একটা কথা জিজ্ঞাসা করব বাবা, রাগ করো না। সুকান্ত কেমন আছে? তাকে তুমি দোষ দাও নি তো?

—না মা, ওর কোন দোষ নেই। ওই পাগল ছেলেটা হঠাৎ কাউকে কিছু না বলে নাগা হিলসে চাকরি নিয়ে চলে গেছে।

—জানো বাবা, সত্যিই ওর কোন দোষ নেই। চাকুরিতে খুব ভাল ইণ্টারভিউ দিয়ে ইডেনে সন্ধ্যায় ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্ন দেখছিলুম দুজনে। হঠাৎ একজন পুলিশ অফিসার মিথ্যে অশ্লীলতার অভিযোগে আমাদের গাড়িতে নিয়ে তুলল। তারপর একটা বাড়িতে নিয়ে সুকান্তকে আটকে রেখে খুব মারধোর করে ভয় দেখিয়ে ছেড়ে দিল। আর আমায় জোর করে......

—থাক মা, ওসব কথা আমি শুনতে পারছি না।

তনিমা হঠাৎ রেগে গেল, নাসা বিস্ফারিত হল। চোখের সমুদ্রে ফস-ফরাস জ্বলে উঠল।

—জানো বাবা, পরে জেনেছি, ওসব জাল পুলিশ সাজা তোমার গুণধর ছোট-ছেলের সাকরেদদের কীর্তি। ও নাকি এ সব জানত না। জানোয়ার। পয়সার জন্য ও সব পারে। তোমার কাছে ও এই শিক্ষা পেয়েছিল?

কেশব পণ্ডিত হাজার বছরের মমির মত পড়ে রইলেন।

তনিমা বিদীর্ণকণ্ঠে, চোখের অজস্র ধারায় সারা গাল ভিজিয়ে বলতে লাগল,

—জানো বাবা, তারপর কী লাঞ্ছনা, কী জঘন্য জীবন? অর্থের বিনিময়ে ওরা আমার সব নিয়েছে, সব শেষ করে দিয়েছে।

পণ্ডিত আর্তনাদ করে উঠলেন,—ওরে চুপ কর, চুপ কর! আমি আর সইতে পারছি না।

তনিমার কণ্ঠে বাঘিনী গর্জন করে উঠল,

—কেন চুপ করব? বাবা হয়ে মেয়ের লাঞ্ছনার প্রতিকার করতে পার নি? তোমার ঠাকুর ওই পাথরের ডেলা আমায় বাঁচাতে পারল না? পারল না, দুটি ভাত-কাপড়ের সঙ্গে একটি সামাজিক সম্ভ্রান্ত জীবন দিতে? তার ভাণ্ডার কি এতই দেউলে হয়ে গেছে? তাহলে কেন অত ফুল জল দিচ্ছ? ওই ডেলা পূজো না করে ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দাও।

কেশব পণ্ডিত আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। সামনের কোশাটা ছুঁড়ে মারলেন মেয়ের দিকে। তনিমার চোখের নিচটা কেটে দরদর করে রক্তের ধারা গড়াতে লাগল। তারপর কী রক্ত! কী রক্ত! ঐটুকু মেয়ের দেহে এত রক্ত! সেই অবিশ্রান্ত রক্তের ধারা মেঝে ভাসিয়ে দিয়ে লাফিয়ে নিচে পড়ল। তারপর মুহূর্তের মধ্যে ফুলে কেঁপে সদম্ভ লক্ষশীর্ষ হয়ে উত্তাল সমুদ্রের মত মানুষ-জীবজন্তু-বাড়িঘর-দি ক দি গ সব ভাসিয়ে নিয়ে যেতে লাগল।

সেই মহামৃত্যুর কোলাহলে কেশব পণ্ডিত মহানন্দে ঘুমিয়ে পড়লেন—যে ঘুম কোন দিন ভাঙে না।

শঙ্করাচার্যের গ্রন্থমালা :

পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত। সুবিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিবৃতি সন্নিবেশিত।

প্রথম খণ্ড—৫'০০ টাকা।

তৃতীয় খণ্ড—৪'০০ টাকা।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ :

(সমগ্র সপ্তকাণ্ড। কবির জীবনী-সম্বলিত)

আদি কবির মহাকাব্যের বাঙালীর সংস্করণ। সোনার বাংলার ভক্তি-অর্ঘ্য। পদানুসারে। রাজসংস্করণ। সচিত্র। রেক্সিন ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—৮'০০ টাকা।

উপনিষদ গ্রন্থাবলী :

১ম খণ্ড : ঐতরেয়, কৈবল্য, কাঠকো নৃসিংহতাপনী।

২য় খণ্ড : শ্বেতাশ্বতর, পরমহংস, সন্ন্যাস, নীলরুদ্রচুলিক, আরুণেয়, কণ্ঠশ্রুতি, জাবাল, পিণ্ড, আত্ম, ষটচক্র, ভৃগু, শিক্ষা, ব্রহ্মবিদ, নারদ, পরিব্রাজক, পৈঙ্গলা, তুরীয়াতীত, বাসুদেব, শাণ্ডিলা, নারায়ণ (ক), নারায়ণ (খ)।

৩য় খণ্ড : ঈশ, কেন, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, পাশুপত-ব্রহ্ম, প্রাণাগ্নিহোত্র, ভাবন, গরুড়, শ্রীরামপূর্বতাপনীয়, শ্রীরামোত্তর-তাপনীয়, পঞ্চব্রহ্ম, কালাগ্নিরুদ্র, যাজ্ঞবল্ক্য, রামরহস্য, গোপাল-পূর্বতাপনীয়, গোপালোত্তরতাপনীয় কৌষীতকী, অমৃতবিন্দু, কালিকা গর্ভসার ও অমৃতনাদ। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য : প্রতি খণ্ড—৪'০০ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

পাঠক মন

সাপ্তাহিক বসুমতী প্রসঙ্গে

গত ২৯শে মে তারিখের পত্রিকায় শ্রীবেণু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা একটি চিঠি পড়লাম। সাপ্তাহিক বসুমতীর গুণগ্রাহী পাঠক হিসারে উক্ত চিঠিটি সম্পর্কে আমরা কয়েকটি কথা বলতে চাই।

শ্রীবেণু বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর চিঠিতে সরাসরি সপ্তাহিক বসুমতীকে যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রচারের মাধ্যম বলে অভিযোগ এনেছেন। শুধু তাই নয়, তাঁর মতে সাপ্তাহিক বসুমতী একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের দলীয় নীতি প্রচারের নাকি বাহন। এবং সেই রাজনৈতিক দল যে সি-পি-এম একথাও তাঁর চিঠি পড়ে বুঝতে কষ্ট হয় না। সাপ্তাহিক বসুমতী প্রগতিশীল পত্রিকা এটা শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো আমরাও জানি। কিন্তু সেটা কোনো রাজনৈতিক দলের মুখপত্র—এটা সম্ভবত শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় একাই জেনেছেন। আমরা আশঙ্কা করছি তিনি এই পত্রিকার নিয়মিত পাঠক কি-না। কারণ আমাদের বিশ্বাস, এই পত্রিকার সঙ্গে যাদের নিয়মিত সম্পর্ক আছে তাঁরা কিছুতেই এই মন্তব্য করতে পারেন না। কাজেই তাঁর এই মন্তব্যের পেছনে সম্ভাব্য দুটি কারণ থাকতে পারে বলে আমাদের মনে হয়।

(১) পত্রিকাটির সঙ্গে হয় তাঁর সম্পর্ক নিয়মিত নয় এবং তিনি নিজে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল সম্পর্কে খুবই পক্ষপাতের মনোভাব পোষণ করেন।

(২) না হয় লেখকগোষ্ঠীর কারো কারো প্রতি তাঁর কোনো ব্যক্তিগত আক্রোশ থাকতে পারে।

আমরা জানি না, শ্রীবীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কিংবা সাগর বিশ্বাসের ওপর তাঁর কোনো ব্যক্তিগত আক্রোশ আছে কি-না। তবে শ্রীচট্টোপাধ্যায় সম্পর্কে অভিযোগটা ব্যক্তিগত আক্রোশমূলক বলেই আমাদের মনে হয়। আর সাগর বিশ্বাসের ধারাবাহিক প্রবন্ধগুলি যদি তিনি আদ্যোপান্ত পড়ে থাকেন, তাহলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগগুলি হয়তো করতে পারতেন না। "নির্বাচনের পরে" এই পর্যায়ের শেষ রচনায় শ্রীবিশ্বাস গোড়াতেই যা বলেছেন তার মধ্যেই শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর প্রশ্নের কিছু উত্তর পাবেন। সি-পি-এম এম-এল-এ-দের সম্পর্কে শ্রীবন্দোপাধ্যায়ের বক্তব্য অত্যন্ত স্থূল। বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের বিধানসভায় সি-পি-এম-এর প্রভাব ও সংখ্যাধিক্যকে কি শ্রীবন্দোপাধ্যায় অস্বীকার করতে পারেন? তা যদি না পারা যায়, তবে "নির্বাচনের পরে" যে জাতীয় রচনা তার মধ্যে সি-পি-এম সদস্যদের সংখ্যাধিক্য থাকাটাই কি স্বাভাবিক নয়?

চিঠি দীর্ঘ করে লাভ নেই, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের কথা বলতে গেলে সব লেখাকে নিয়েই এটা হতে পারে। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে যে লেখা মূল্যহীন, অন্যের কাছে হয়তো তা অনেক মূল্যবান—এবং তাদের সংখ্যা শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে কম নয়। কিন্তু একটি প্রগতিশীল পত্রিকার নীতির প্রতি কটাক্ষ করে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যমূলক এই জাতীয় চিঠির গুরুত্ব না দেওয়াই বোধ হয় যুক্তিসংগত।

—শ্রীপান্নালাল চক্রবর্তী
শ্রীতুষারকান্তি ভট্টাচার্য
দেশপ্রাণ শাসমল রোড
কলকাতা

•

সম্প্রতি প্রকাশিত শ্রীবেণু বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্রটির প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। শ্রীবেণু বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি সাপ্তাহিক বসুমতী এবং তার লেখকদের বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ এনেছেন। এই অভিযুক্তদের মধ্যে আমাকেও স্থান দেওয়া হয়েছে। তাই কর্তব্য ও দায়িত্বের খাতিরে কিছু কথা বলবার প্রয়োজন হয়েছে। প্রয়োজন হয়েছে এই জন্যেই যে, পাছে বিভ্রান্তিটা ব্যাপক হয়ে পড়ে! শ্রীবেণু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমেই অভিযোগ করেছেন, "সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রগতিশীলতার নামে জোর করে একটি বিশেষ দলীয় নীতিকেই যেন কৌশলে প্রচার করা হচ্ছে।" তাঁর এই বক্তব্যের সমর্থনে উদাহরণস্বরূপ 'নির্বাচনের পরে' শীর্ষক ধারাবাহিক রচনাটির উল্লেখ করেছেন। সকলেই জানেন, 'নির্বাচনের পরে' সাক্ষাৎকার জাতীয় রচনা (অনেকে অবশ্য আমাকে জানিয়েছেন, এটা তাঁদের কাছে নিছক সাক্ষাৎকারের মত শুকনো মনে হয় নি)। কিন্তু কেউই দলীয় প্রচার বলে অভিযোগ করেন নি। রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমি গত ১৩ই মার্চ যা লিখেছিলাম তারই পুনরাবৃত্তি করেছিলাম ১লা মে। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় যদি পত্রিকাটির সত্যিই নিয়মিত উৎসাহী পাঠক হন তাহলে সে কথা তাঁর না জানবার কথা নয়। একজন মন্ত্রী তাঁর দপ্তর সম্পর্কে সরকারী নীতি ব্যক্ত করতে পারেন সত্য, কিন্তু পারেন কি অতীন্দ্র মিশ্রের মত স্থানীয় সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাতে কিংবা অনেক শিক্ষক এম এল এ-র মত শিক্ষা সম্পর্কে সরকারী ভাবনার উল্টো কথা বলতে? শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণ থাকতে পারে যে, রাজ্যের মাধ্যমিক শিক্ষা-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে একাদশ শ্রেণীর পরিবর্তে দ্বাদশ শ্রেণীর কথা শিক্ষামন্ত্রী ভেবেছিলেন। কিন্তু সাধারণ শিক্ষক এম এল এ-রা কেউই এ-নীতি সমর্থন করেন নি। যাঁরা প্রত্যেকেই বরং দশম শ্রেণীর কথা বলেছেন ('নির্বাচনের পরে' দ্রষ্টব্য)। সম্প্রতি শিক্ষা-বিভাগ ত' সেই দশম শ্রেণীর কথাই ভাবছেন (যদিও নতুন অবস্থায় শিক্ষার কণ্ট্রোলের কিছু অভাব পাওয়া যাচ্ছে)। এই কণ্ট্রোল সম্পর্কে এখনও কিছু বলার সময় আসে নি, কিন্তু প্রয়োজন হলে নতুন শিক্ষা-ব্যবস্থার স্বরূপও আলোচনা করবো)। আমার বিশ্বাস, এই জানা এবং সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কিছু বলা—এর যথার্থ মূল্যায়ন শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় করতে পারেন নি। দলীয় প্রচারের অভিযোগে তিনি কেবল ক্ষুব্ধ হয়েছেন সি পি এম সদস্যদের (বিধানসভার) কথা বেশি বলায়। কিন্তু একটু সতর্ক হলে দেখতে পেতেন যে, সমগ্র রচনাটির মধ্যে ২৩ জন এম এল এ-র মধ্যে ৮ জন মাত্র সি পি এম অতএব "সি পি এমই বেশি" নয়। সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে তাঁদের সংখ্যাধিক্য থাকলেও তা স্বাভাবিক। আর শুধুমাত্র যুক্তফ্রন্ট সদস্যদের নেবার কারণও আমি ব্যাখ্যা করেছিলাম ১লা মে (শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের আসল ক্ষোভ এইখানে নয়ত?)। জনতার দৃষ্টি ত' আজ যুক্তফ্রন্টের ওপর—কংগ্রেসের কথা এখন তাঁদের না শুনলেও যে চলবে! তবু বলেছিলাম সময়ান্তরে তাঁদের (বিরোধীদল) কথা জানবারও চেষ্টা করবো (১লা মে)। সাপ্তাহিক বসুমতীর পাঠক হয়েও এত কথা শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টি এড়ালো কি করে?

শ্রীযুক্ত "বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখাগুলি যেন জোর করে কাউকে গাল দিতে হবে বলেই লেখা"—এ মন্তব্য কোনো নিরপেক্ষ সমালোচকের মন্তব্য হতে পারে না। সত্য কথা সইবার ক্ষমতা হয়ত অনেকের থাকে না—তাই বলে সত্যের অস্তিত্বটাকেও আর অস্বীকার করা যায় না! শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়রা হয়তো তাকে অস্বীকার করতে পারলে খুশি হন, কিন্তু এটুকু কি অস্বীকার করতে পারেন যে, সংসারে 'গালাগালি' দেবার মত লোকের বড় অভাব নেই। 'গালাগালি' যার প্রাপ্য তাকে সেটা পেতেই হবে তা যেখান থেকেই হোক না কেন। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের লেখনীর তীক্ষ্ণতাই আসলে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে একটা ইলিউশান সৃষ্টি করেছে বলে মনে হয়। এই ইলিউশান বোধ হয় স্বয়ং সম্পাদককে আক্রমণ করবারও কারণ হয়েছে। ২৪শে এপ্রিল সম্পাদকীয় স্তম্ভে কি বক্রোক্তি করা হয়েছে তা আমার জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত। আমি শুধু জানি, সেই সম্পাদকীয় বাংলা দেশের কিছু

সর্বাধিক প্রচারিত 'জাতীয়তাবাদী' সংবাদপত্রের কণ্ঠে কণ্ঠ না মিলিয়ে সামাজিক স্খলন ও অধঃপতনের কারণ নির্ণয় করেছিল। সেই সম্পাদকীয় হয়তো 'নারী কা অপমান কে লিয়ে' কোন মায়া-কান্না কাঁদতে পারে নি—পারে নি হয়তো 'অরন্ধন দিবস' পালনের নির্লজ্জ আহ্বান জানাতে—কিন্তু রবীন্দ্র সরোবরের সেদিনের ঘটনার গুরুত্ব হ্রাস না করেও সামাজিক অবক্ষয়ের মর্মান্তিক ইতিহাস দেখাতে কি ব্যর্থ হয়েছিলো? তবে শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ কিসের? কোনো উদ্দেশ্য এ অভিযোগের পেছনে ইন্ধন যোগায় নি ত'?

শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বশেষ অভিযোগ হলো "অধিকাংশ লেখাই ছাপা হয় কোনো একটি রাজনৈতিক দলের লেখকদের।" "প্রতিটি লেখাই যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রচারের হাতিয়ার।" এই ধরণের অজ্ঞতাপ্রসূত কিংবা নিছক কল্পনানির্ভর অভিযোগের জবাব দেওয়াও বিড়ম্বনা বিশেষ। আমি শুধু প্রশ্ন করতে চাই, অধ্যাপক শ্রীশঙ্করীপ্রসাদ বসু, মনোজ বসু, শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃত্তিবাস ওঝা, শিলালি, অসীম মুখোপাধ্যায়, সাগর বিশ্বাস এঁরা কি সেই রাজনৈতিক দলের লেখক? শ্রীযুক্ত অশোক সেন কিংবা শমীক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাগুলিও কি যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রচারের হাতিয়ার?

অতিরেক পত্রের পরিসর বাড়িয়ে লাভ নেই। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় যদি খোঁজ নেবার মতো কষ্ট স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকেন, তাহলে হয়তো তাঁর নিজের বক্তব্য নিজেকেই লজ্জা দেবে। অজস্র উদাহরণ দিয়ে আমি দেখাতে পারি শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগগুলি কত ভ্রান্ত! কিন্তু তার আর অবকাশ নেই। একটা কথা আমরা প্রায়শই মনে রাখতে ভুলে যাই যে, নীতিটাকে না বুঝে শুধু একটি স্পর্শকাতরতাকে প্রশ্রয় দিলে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সমালোচনা নিছক আক্রমণ হয়ে ওঠে। আশা করি, শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় এটা অস্বীকার করবেন না। চিঠি লিখতে মানা নেই। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, সেখানে লজিক এবং মরালিটিকে অমান্য করতে হবে।

—সাগর বিশ্বাস

সপ্তাহের বোঝা : একটি প্রতিবাদ

গত ১২ই জুন তারিখে প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র (৭৩ বর্ষ : ৫১শ সংখ্যা) 'সপ্তাহের বোঝা' শীর্ষক প্রবন্ধে ছদ্মবেশী কৃত্তিবাস ওঝা মহাশয় মন্তব্য করেছেন—'...রাজ্যের শ্রমিক ও কৃষক ফ্রন্টে যদি যুক্তফ্রন্ট শরিক দলগুলি নিজেদের মধ্যে খুনোখুনি করেন, তবে সরকার সুস্থভাবে চলবে কাকে নিয়ে? রাজ্যে বাকি থাকে স্কুলমাস্টার আর সরকারী কর্মচারীরা। এই দুই সম্প্রদায় সম্পর্কে এক কথায় বলা যায় তাঁরা চলেন রাজ্যের সবচেয়ে বড় খিচনেওয়ালা পার্টি—তাঁদের দাবি অনেক, চাহিদা অসংখ্য—সেই দাবি পূরণ না হলে মুর্দাবাদ ধ্বনি তুলতে তাঁরা সবচেয়ে পটু, কিন্তু সরকার চালনায় তাঁদের কোন সহযোগিতা পাওয়া যাবে না। তাঁদের দাবি আছে, দাবি আদায়ের নানা চেষ্টা আছে, নেই শুধু দায়িত্ব। তাই তাঁদের কথা বলা অর্থহীন এবং সত্য কথা বলতে টাকা পয়সা ছাড়া অন্য কোন প্রভাব এই দুই সম্প্রদায়ের উপর কারও নেই।...'

সুস্থ মনে, নিরপেক্ষ বিচারে ওঝা মশায়ের এই উক্তিকে সমর্থন করতে পারছি না। অপ্রিয় সত্য ভাষণ অসুবিধাজনক হলেও দোষের নয়। কিন্তু সত্যনিষ্ঠার লেবেল এঁটে যদি প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্যে বা নিছক উগ্র যুক্তফ্রন্টপ্রেমের অন্ধ আবেগে যুক্তিহীন, ভিত্তিহীন গরম গরম মিঠেকড়া বুলি কপচান যায়, তবে তা নিঃসন্দেহে আপত্তিকর, দুর্ভাগ্যজনক।

রাজ্যের শিক্ষক ও সরকারী কর্মচারীদের সকলকেই ওঝা মশায় খিচনেওয়ালা পার্টি'র খিঁচ মাখিয়ে দিয়েছেন। তাঁর ধারণা, শিক্ষক ও সরকারী কর্মচারীরা বেশ মোটা অংকের টাকা প্রতি মাসে পকেটে পুরছেন—কাজের বেলা অষ্টরম্ভা। কিন্তু প্রবন্ধকারের হয়তো মনে নেই যে, কিছুদিন আগেও আজকের যুক্তফ্রন্ট সরকারের শরিক দলগুলো বিরোধী ভূমিকায় থাকার সময় রাজ্য সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষক সম্প্রদায়কে আরও টাকার দাবিতে পথে নামাবার জন্যে দিনরাত ঐ দুই শ্রেণীর কর্মীদের সেন্টিমেন্ট ও প্রচ্ছন্ন অভিমানে কতই না সুড়সুড়ি দিয়েছেন! আজ তথাকথিত গণদরদীগণকে গদীতে বসতে দেখে ঐ কর্মীরা সুস্থ জীবনযাপনের আশায় যদি কিছু দাবি করেন, তবে তা কি ভুল বা অন্যায় হবে? আন্দোলন মানেই যদি অসহযোগিতা হয়, তবে বলা যেতে পারে, কংগ্রেস সরকার দীর্ঘ একুশ বছরের শাসনে বিরোধী দলগুলোর কাছ থেকে পায় নি কোন সহযোগিতা—সহানুভূতি—সংসদীয় গণতন্ত্রে যা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আর এটাও তো মিথ্যা নয়, রুটির দাবিতে যে মিছিলকারীরা 'জিন্দাবাদ' ধ্বনি তোলে, সেই বাঁচার অধিকার অপমানিত হলে চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে সেই মিছিল থেকেই জেহাদী শ্লোগান ওঠে—'মুর্শিদাবাদ'। এ তো ইতিহাসের সহজ শিক্ষা।

আর একটা কথা, ওঝা মশায় ঐ কর্মীদের সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়ার জন্যে একটা ধারাল বাণ ছুঁড়েছিলেন—'তাঁদের দাবি আছে, দাবি আদায়ের নানা চেষ্টা আছে; নেই শুধু দায়িত্ব।' এখন প্রশ্ন জাগে মনে, সরকারী কর্মচারী

তবে সে দোষটা কার? ঊর্ধতন মোটা বেতনভুক আমলারা তো ইচ্ছা করলে জাতির স্বার্থে এই দায়িত্ববোধহীনতার বিরুদ্ধে উপযুক্ত ওষুধ প্রয়োগ করতে পারেন! আর মুষ্টিমেয় কিছু কর্মচারীর মধ্যে যদি কাজে গাফিলতি ধরা পড়ে, তবে আমার মনে হয় তার কারণ, রাজনৈতিক দলগুলোর অহরহ পার্টি প্রচার ও প্রভাব বিস্তারের অপচেষ্টা। তবে এটাও ঠিক যুক্তফ্রন্টী দলগুলো শিক্ষক-সমাজের কর্তব্যপরায়ণতার স্বীকৃতি হিসাবেই বোধহয় এম-এল-এ না হওয়া সত্ত্বেও সত্যপ্রিয় রায়কে শিক্ষামন্ত্রীর পদ উপহার দিয়েছেন। ওঝা মশায় দপ্তর বণ্টনের সময় যদি দয়া করে শিক্ষক-সমাজের মুখোশ খোলার জন্যে মুখরোচক বিশেষণ ও অলংকারযোগে নিন্দা সরবরাহের বোঝা কাঁধে তুলে নিতেন, তবে মনে হয় যুক্তফ্রন্টী শরিকদের দিব্যজ্ঞান লাভ হত।

কংগ্রেসী রাজত্বে বাঁচার আন্দোলনকে যুক্তফ্রন্টের শাসনেও সোচ্চার হতে দেখে বুমেরাং-এর আতঙ্কে ওঝা মশায় কিছুটা সন্ত্রস্ত-বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছেন বুঝি? এই পথে ওঝা মশায় বিষ নামাতে পারবেন তো?

—পাঁচুগোপাল বক্সী
শিক্ষক, পঞ্চাননতলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়
তাঁতীপাড়া, কাটোয়া (বর্ধমান)

কবি নজরুল প্রসঙ্গে

শ্রীমিলনকুসুম ভট্টাচার্য নজরুল প্রসঙ্গে যা বলেছেন আমিও তাঁর সাথে একমত। নজরুলের তথাকথিত বন্ধু, যাঁরা আজ নজরুলের জন্য মায়াকান্না করছেন এবং সবকিছুর জন্য সরকারের কাঁদছেন এবং সবকিছুর জন্য সরকারের জিজ্ঞাসা করি, তাঁরা তো সবই সাহিত্যক্ষেত্রে বহুদিন থেকে প্রতিষ্ঠিত, তাঁরা কী করেছেন এতদিন প্রিয় বন্ধুর জন্যে? এ ব্যাপারে তাঁদের করণীয় কি কিছুই নেই বা ছিল না? হঠাৎ আজ তাঁদের এ কুম্ভীরাশ্রু কেন? কারণ স্বার্থে ঘা লেগেছে। এঁরা চেয়েছিলেন নজরুলকে ভাঙিয়ে খেতে এবং এতদিন করেও এসেছেন তাই। এঁরা সুবিধাবাদী। তাই আজ যখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার এগিয়ে এসেছেন নজরুল-কীর্তিকে অবলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে, তখন আবার এলেন এঁরা Lime Light-এ—রবীন্দ্র সদনের পাদপ্রদীপের আলোয় আবার এঁরা দেখা দিলেন বন্ধুর ছদ্মবেশে। "সত্য সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ!" পশ্চিমবঙ্গ সরকার না চিনলেও আমরা যেন এঁদের চিনতে ভুল না করি।

—এস. ধীরকুমার সাহা

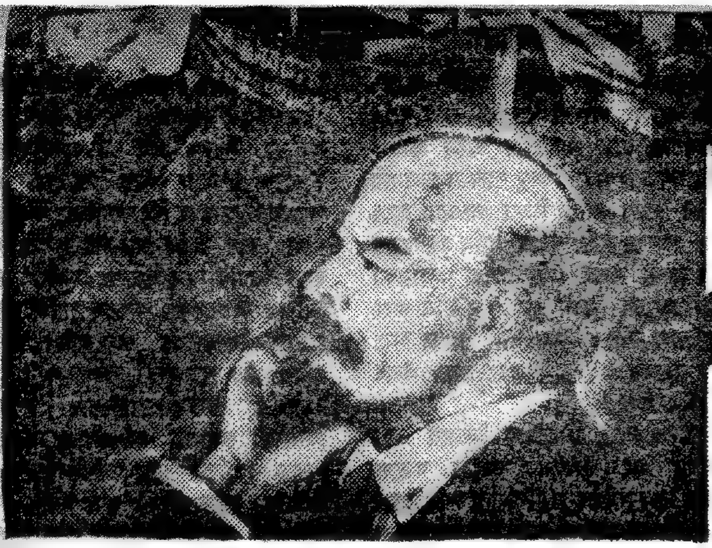

যুগনায়ক লেনিন

অশোক সেন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

[আলো জ্বললে দেখা যাবে কথক এসে স্টেজের সামনে দাঁড়িয়েছেন ঃ]

কথক—ভ্লাডিমির ইলিচ আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিলেন এই শ্রমিক বিপ্লব সম্প্রসারিত হবে সারা রাশিয়াতে, সুতরাং এর পরিচালনা এবং কর্ম-পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য, অবিলম্বে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টির সভা আহ্বানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। ১৯০৫-এর এপ্রিলে লণ্ডনে আহূত হল আর এস ডি এল পি-এর তৃতীয় কংগ্রেস মেনশেভিকরা এ কংগ্রেস বর্জন করে জেনিভাতে নিজেদের সভা ডাকলেন। বলশেভিক কংগ্রেসের সভা-পতি নিযুক্ত হলেন লেনিন—তাঁরই ওপর ন্যাস্ত হল কংগ্রেস পরিচালনার ভার। লেনিন বললেন ঃ

[ব্ল্যাক আউট। কথক সরে যাবেন এবং লেনিন স্টেজের ওপর এসে দাঁড়াবেন। তাঁর মুখের ওপর স্পটলাইট ফেলা হবে এবং লেনিন বক্তৃতার ভঙ্গিতে বলতে থাকবেন—তাঁর কণ্ঠস্বরে থাকবে আবেগ। মাঝে মাঝে ডান হাতটা এগিয়ে দিয়ে ডান দিকে নাড়বেন ঃ]

লেনিন—আমাদের কর্মপন্থায় ঠিক করা হয়েছে যে প্রলেতেরিয়াত দেশের সমস্ত কৃষকদের সহযোগে একসঙ্গে বিপ্লবের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়বে। আমাদের উদ্দেশ্য—সশস্ত্র বিপ্লবের দ্বারা, স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটানো। পার্টি সংগঠনগুলোকে অস্ত্রসংগ্রহ করে শ্রমিকদের ভেতর তা বিতরণ করতে হবে। সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য তাদের প্রস্তুত করতে হবে। তারই ফলে প্রলেতেরিয়াতের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে সশস্ত্র গণবিপ্লব শুরু হবে আর দেশের সমস্ত কলকারখানায় যাতে ব্যাপকভাবে ধর্মঘটের আন্দোলন দেখা দেয় সে বিষয়েও পার্টিকে তৎপর হতে হবে।

[দপ করে আলো নিভে যাবে। আবার আলো জ্বললে দেখা যাবে কথক এসে দাঁড়িয়েছেন ঃ]

কথক—লেনিন যা বলেছিলেন ঠিক তাই ঘটল। ১৯০৫ সালের অক্টোবরে—সারা রাশিয়াতে বিরাটভাবে রাজ-নীতিক ধর্মঘট শুরু হল। কাজ বন্ধ হল ফ্যাক্টরী এবং মিল-গুলোতে, পোস্ট এবং টেলিগ্রাফের সমস্ত অফিসে। দেশের কর্মজীবন যেন হঠাৎ গতিহীন হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো এক জায়গায়। ১৭ই অক্টোবর জার একটি ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করে প্রতিশ্রুতি দিলেন, এখন থেকে ব্যক্তি-স্বাধীনতা। খবরের কাগজের নিজস্ব মতামতের স্বাধীনতা এবং অন্যান্য সিভিল-রাইটস যাতে অব্যাহত থাকে সেদিকে জার-সরকার নজর দেবেন। লেনিন দেশবাসীকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বললেন—"জারের কথায় বিশ্বাস কোরো না! কারণ সুযোগ পেলেই জার এ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করবেন!"

[আলো নিভে যাবে। অন্ধকারের ভেতর মাইকভয়েসে শোনা যাবে ঃ]

মাইকভয়েস—এই বিপ্লবের সময়েই জন্ম নিল কতকগুলো রাজনীতিক জন-সংগঠন। তাদের নাম দেওয়া হল 'সোভিয়েটস-অভ-ওয়ার্কার্স - ডেপুটিজ'। লেনিন তখনই বলেছিলেন ঃ

[লেনিনের মূর্তি দেখা যাবে—তাঁর মুখে স্পটলাইট ঃ]

লেনিন—ভবিষ্যতে রাশিয়ায় মেহনতী মজদুর এবং কৃষকদের প্রতিনিধি হয়ে, এই সোভিয়েটগুলোই করবে রাষ্ট্রশাসন, সারা দেশে হবে শান্তির প্রতিষ্ঠা।

[স্পটলাইট মিলিয়ে যাবে—এবং অন্ধকারের ভেতর থেকে আবার মাইক-ভয়েস শোনা যাবে ঃ]

মাইকভয়েস—শ্রমিক আন্দোলন এবং বিপ্লব ক্রমশ স্ফীত হয়ে উঠল। দেশের বাইরে থেকে এ সবের পরিচালনা করা সম্ভব নয় দেখে, নভেম্বরের প্রথম দিকে লেনিন ফিরে এলেন সেইণ্ট পিটার্স-বার্গে, এসেই নিজের ওপর তুলে নিলেন পার্টির নেতৃত্ব এবং বৈপ্লবিক সংগ্রামের পরিচালনভার। দলের সাংগঠনিক কাজে একাগ্রভাবে মনো-নিবেশ করলেন লেনিন। পার্টির কাগজ নোভায়া ঝিনে অনেক প্রবন্ধ লিখলেন—নির্দেশ দিলেন কিভাবে বলশেভিকদের কাজ করতে হবে। রাশিয়ার নানা জায়গা থেকে কর্মীরা আসতো আলোচনা করতে। পার্টির মিটিং এবং কনফারেন্সেও বক্তৃতা দিতে হোত অনেক সময়—এইভাবেই চলছিল বিপ্লবের আন্দোলন। বলশেভিকদের প্রতি কড়া দৃষ্টি ছিল জার সরকারের, তাই লেনিন এবং অন্যান্য নেতারা আত্মগোপন করে থাকতেন—বাসস্থান বদলাতে হোত প্রায়ই, মাঝে মাঝে লেনিন ফিনল্যাণ্ডেও যেতেন। মস্কোর শ্রমিকদের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের বিপ্লব শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছল ডিসেম্বর মাসে। সেইণ্ট পিটার্সবার্গ থেকে জারের সৈন্যদল এসে তাদের দমন করলো। এরপর একে একে অভ্যুত্থান হতে লাগলো নানা জায়গায়, নিজনি—নোভ-গোরোডে, রস্টভ-অন-ডনে। নোভোরো-সিস্কে, একাটেরিনোশ্লাভে, ক্র্যাস-নয়ার্স্কে; চিটা এবং অন্যান্য শহরে। কিন্তু এসব বিপ্লবের ভেতর কোন যোগসূত্র ছিল না, পশুশক্তিসম্পন্ন জারিস্ট সরকার সহজেই তাদের দমন করলো।

[ব্ল্যাক আউট। কথক সরে যাবেন। সিনেমাটোগ্রাফীর সাহায্যে এখানে নানা জায়গার শ্রমিক বিদ্রোহের ছবি দেখানো

হবে। তারপর আলো জ্বলতে দেখা যাবে ফিনল্যান্ডে একটি কুটীরে লেনিন, আনা এবং ক্রুপস্কায়া আলোচনারত।]

আনা—ডিসেম্বর বিপ্লবের অসাফল্যে মেনশেভিকরা জোর গলায় বলে বেড়াচ্ছে যে, এ সময় আন্দোলন শুরু করাটাই ভুল হয়েছে। তারা নাকি আগে থাকতেই বুঝতে পেরেছিল প্রলেতেরিয়াতের শক্তি ঠিকমত গড়ে ওঠে নি।

লেনিন—প্রথমত আমি ওদের কথা মানতে রাজী নই যে, এ বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছে। রাশিয়ান প্রলেতেরিয়াতের এই সংগ্রাম শ্রমিক আন্দোলনকে যে কতোটা এগিয়ে দিয়েছে তা ধারণা করবার মত কল্পনাশক্তি মেনশেভিকদের নেই।

ক্রুপস্কায়া—প্লেখানভ ঘোষণা করেছেন যে প্রলেতেরিয়াতের অস্ত্র নিয়ে সংগ্রামে নামাটা উচিত হয় নি।

লেনিন—তাহলে কি ব্লাডি সানডেতে সেইন্ট পিটার্সবার্গে নিরস্ত্র জনতাকে যেভাবে গুলী খেয়ে কুকুর বেড়ালের মত মরতে হয়েছিল তারই পুনরাবৃত্তি চাইছিলেন প্লেখানভ?

আনা—(ঈষৎ হাসির সঙ্গে) সশস্ত্র সংগ্রাম করতে যাওয়াটা উচিত হয় নি, বলেছেন প্লেখানভ—কিন্তু কি করা উচিত ছিল সে বিষয়ে কিছু বলেন নি।

লেনিন—একথা প্লেখানভেরা কেন বুঝতে পারেন না যে শ্রমিকেরা এবার যুদ্ধ করেছে—মার খেয়েছে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মেরেছেও। আমার তো মনে হয় আরও বেশি অস্ত্র সংগ্রহ করে দৃঢ়প্রতিজ্ঞভাবে এবং প্রাণপণ করে আমরা যদি আক্রমণাত্মক লড়াই করতে পারতাম, তবে আজ ফল হোত অন্যরকম।

আনা—আচ্ছা ভ্ল্যাডিমার, যারা পিসফুল স্ট্রাইকের জিগির দেয়, তারা কি সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করে যে এভাবে শ্রমিক আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে?

লেনিন—নিজেরাও ওরা সেকথা বিশ্বাস করে না। ওভাবে ভাঁওতা দিয়ে ওরা আন্দোলনের সর্বনাশ করতে চায়। আসলে ওরা হচ্ছে ধনতন্ত্রবাদীদের দালালের দল—বিশ্বাসঘাতক, শয়তান এবং ভণ্ড।

ক্রুপস্কায়া—কিন্তু প্লেখানভকে তো ও দলে ফেলা যায় না!

লেনিন—না, প্লেখানভ সত্যিই শ্রমিকদরদী। শ্রমিক আন্দোলনে তাঁর অবদানও কম নয়। তবে প্রধানতই উনি থিওরিস্ট—দেশের সঙ্গে বহুদিন বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকাতে আন্দোলনের বাস্তবতার দিকটা উনি আজকাল ঠিকমত বুঝতে পারেন না, সে কথা

১৯০৫-এর শ্রমিক বিপ্লব

তো তোমাকে আগেও বলেছি। তাছাড়া ওঁর ভেতর একটা অফন্তরিজম ভাব আছে—নিজে যেখানে নেতৃত্ব নিতে পারছেন না, সেখানে ত্রুটিগুলোই ওঁর বেশি করে চোখে পড়ে।

আনা—এখন বলশেভিকদের কর্তব্য কি?

লেনিন—জনগণকে আমাদের আরও ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে যে শান্তিপূর্ণ ধর্মঘটে কোন কাজ হয় না—হতে পারে না। চাই অস্ত্র—যত অস্ত্র সংগ্রহ করা যাবে ততই আমাদের পক্ষে হবে সুবিধা। সৈন্যদলে ভাঙন ধরাতে হবে, পুলিশদের করে তুলতে হবে বলশেভিকদের প্রতি, জনগণের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। এক কথায় এদেরও বিদ্রোহী করে তুলতে হবে। তাছাড়া কৃষকরা যাতে শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দিয়ে একসঙ্গে সংগ্রামে নামে সেদিকে আরও ভালভাবে মন দিতে হবে। আর আত্মরক্ষার মনোবৃত্তি ত্যাগ করে প্রলেতেরিয়াতকে প্রস্তুত হতে হবে আক্রমণাত্মক সংগ্রামের জন্য।

ক্রুপস্কায়া—ভ্ল্যাডিমার ইলিচ, পুলিশ বা সৈন্যদলে বিদ্রোহের আগুন জ্বালানো কি সম্ভব হবে বলে মনে হয়?

লেনিন—কেন সম্ভব হবে না ক্রুপস্কায়া? সৈনিক, নাবিক বা পুলিশের লোকও তো মানুষ—সুতরাং অসহায় নরনারীর দুঃখদৈন্য দেখে দেখে তাদের মনেও ক্রমে ক্রমে মানবিকতাবোধ জেগে উঠতে বাধ্য। স্বৈরাচারী সরকার অর্থ এবং পদবৃদ্ধির প্রলোভন দেখিয়ে ওদের অফিসারের দলকে নিজেদের পোষা কুকুরের মত, অসহায় বঞ্চিত মেহনতী মানুষের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে কার্যসিদ্ধি করতে পারে—তাও যে-সব অফিসারের নীতিবোধ আছে, মানবিকতাবোধ আছে, তারা দেখবে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে শেষ পর্যন্ত। আর একথা আমি জোর গলায় বলতে পারি, সাধারণ সৈনিক, সাধারণ নাবিক বা সাধারণ পুলিশের দল বেশিদিন তাদের কর্তাদের আদেশ বিনা বিচারে মেনে চলবে না। স্বৈরাচারী জার সরকার যদি ভেবে থাকে যে বারবার কৃষক, শ্রমিক, মজদুরদের আন্দোলনকে তারা সৈনিক-পুলিশের বন্দুকবাজিতে শায়েস্তা করে ফেলবে—তার থেকে বড় ভুল আর কিছু নেই। ঐসব সৈনিক পুলিশ একদিন তাদের সমস্ত বন্দুক নিয়ে জনগণের স্বপক্ষে হয়েই স্বৈরাচারী সরকারের উৎপাটনে উদ্যত হবে।

আনা—ডিসেম্বরের বিপ্লবের অসাফল্যের দিকটাকেই মেনশেভিকরা এত উঁচু করে তুলে ধরতে চায় কেন বুঝি না! এই আন্দোলনের থেকে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাও তো অর্জন করেছে বিপ্লবীরা!

ক্রুপস্কায়া—শুধু অভিজ্ঞতা নয়—ভবিষ্যতের আন্দোলন কিভাবে পরিচালনা করতে হবে সে বিষয়েও যথেষ্ট শিক্ষালাভ করেছেন বলশেভিকরা এই ডিসেম্বর বিপ্লব থেকে।

লেনিন—তা তো বটেই! তাছাড়া যে আগুন সারা দেশের বুকে জ্বলে উঠেছে, তাকে নির্বাপিত করবার ক্ষমতা জারিস্ট সরকারের নেই। বন্দুক, কামানের সাহায্যে গণ-আন্দোলনকে সাময়িকভাবে স্তিমিত করা যেতে পারে—কিন্তু তাতে চিরতরে সমূলে

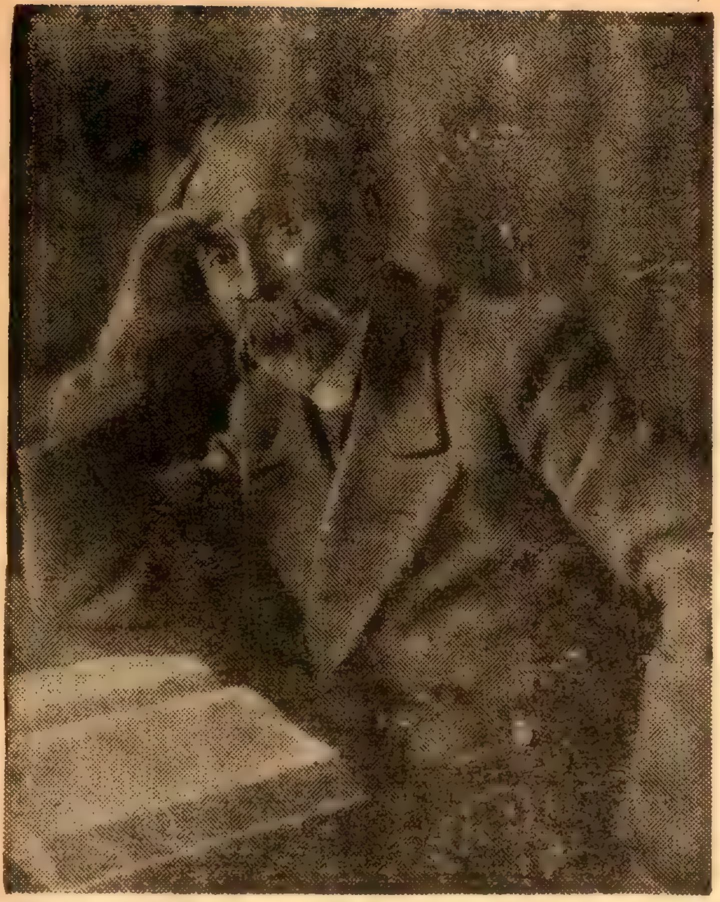

গ্রেখা নন্ত

উৎপাটিত করবার ক্ষমতা স্বৈরাচারী সরকারের ক্ষমতার বাইরে।

আনা—সারা রাশিয়ার শ্রমিক, কৃষক, মজদুরেরা আজ জেগে উঠেছে—

লেনিন—এখন বলশেভিকদের কাজ তাদের সঙ্ঘবন্ধ করে তোলা, তাদের লড়াইয়ের হাতিয়ার সরবরাহের ব্যবস্থা করা—তাদের সুসংবন্ধভাবে পরিচালনা করা।

দুপস্কায়া—মেহনতী মানুষ আজ বুঝতে শিখেছে বিশ্বাসঘাতক স্বৈরাচারী সরকারের পতন ঘটাতে না পারলে তাদের মুক্তি নেই।

আনা—একথাও তাদের আজ অজানা নেই যে প্রতিদিন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে তারা যে সব ধনসম্পদ উৎপাদন করছে, তার সবটাই চলে যাচ্ছে ক্যাপিটেলিস্ট-দের হাতে। জারের সরকার যে ধন-তন্ত্রবাদীদেরই সরকার একথা আজ মেহনতী মানুষ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে শিখেছে।

লেনিন—জারের এবং ধনতন্ত্রবাদীদের শাসন থেকে সেই জন্যই আমরা মুক্তি চাই। জারের দয়ায় সে মুক্তি আসবে না—মুক্তিকে আদায় করে নিতে হবে সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা। আর্মি এবং নেভীর ভেতরেও বিদ্রোহের আগুন জ্বালিয়ে তোলবার কাজে লাগতে হবে এখন থেকেই। তাহলেই আমাদের আগামী সংগ্রামে তারাও আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে—একসঙ্গে যুদ্ধ করে আমরা প্রতিষ্ঠা করবো ডিক্টেটরশিপ অভ দি প্রলেতেরিয়াতের।

[আলো নিভে যাবে। পেছনের পর্দা নেমে যাবে। আলো জ্বললে দেখা যাবে কথক এসে দাঁড়িয়েছেন ঃ]

কথক—১৯০৬ সালের এপ্রিল মাসে লেনিন গেলেন স্টকহমে আর-এস-ডি-এল-পি'র চতুর্থ কংগ্রেসে যোগ দিতে। এ কংগ্রেসের ইতিহাস হল বলশেভিক এবং মেনশেভিকদের আত্মকলহ। এরপর পঞ্চম কংগ্রেসে কিন্তু বল-শেভিকরা সম্পূর্ণভাবে জয়ী হলেন। লেনিনকে নির্বাচিত করা হল সেণ্ট্রাল কমিটিতে। ১৯০৭ সালে লেনিন ফিরে এলেন রাশিয়ায়। ফিনল্যাণ্ডেই তাঁর থাকবার ব্যবস্থা হল। এতদিনে বোঝা গেল যে শ্রমিক বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছে সাময়িকভাবে। স্বৈরাচারী জার সরকার এবার ভয়াবহ আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণ করলো, চারদিকের হতাশা এবং পরাজয়ের গ্লানি যেন বিপ্লবীদের দমিয়ে ফেলেছিল। সরকার লেনিনকে ফিনল্যান্ড থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্য তৎপর হয়ে উঠলো। তাদের টিক-টিকির দল সব সময় লেনিনের গতি-বিধি লক্ষ্য করছিল। বাধ্য হয়ে ভ্ল্যাডিমার ইলিচ চলে গেলেন ফিন-ল্যাণ্ডের অভ্যন্তরে। কিন্তু সেখানে গিয়েও বিপদ কাটলো না, লেনিন বুঝলেন আবার তাঁকে দেশত্যাগী হতে হবে। গোয়েন্দাদের চোখে ধুলো দিয়ে কোনরকমে ১৯০৮ সালের জানুয়ারীতে তিনি পালিয়ে এলেন জেনিভাতে। রাশিয়ার প্রথম শ্রমিক বিপ্লব আড়াই বছর ধরে চলেছিল—সফল হয়নি বটে তবে স্বৈরাচারী সরকারের শাসনে ফাটল ধরিয়েছিল।

[ব্ল্যাক আউট—অন্ধকারের ভেতর থেকে মাইকভয়েস শোনা যাবে ঃ]

মাইকভয়েস—এরপরে সরকার চালিয়েছিল অমানুষিক অত্যাচার, শ্রমিক, মজদুর-দের ওপর। শ্রমিকদের মন থেকে তারা কিন্তু এভাবে বিদ্রোহের আগুন নেভাতে পারে নি। অনেক সময়েই সন্ধ্যাবেলায় কোন কোন শ্রমিকের কুটিরে তাদের সহযোগিরা জড় হয়ে আলোচনা করতো তাদের আগামী সংগ্রামের কথা—বা একসঙ্গে বসে বিপ্লবের গান গাইতো। এমনি একটি সমবেত গানের দৃশ্য এবার দেখানো হবে।

[আলো জ্বলে উঠবে। দেখা যাবে একজন শ্রমিকের বাড়ীর একটি ঘরে বসে কয়েকজন শ্রমিক গান করছে ঃ

শ্রমিকদের গান ঃ

কমরেড শোনো বিউগল ঐ হাঁকছেরে
তোল কাঁধে নে জঙ্গী হাতিয়ার
আর আজাদীর ভক্ত লড়ি চল ডর ছেড়ে
চল এগিয়ে রাস্তা করি বার॥

দিনমজুরের ঘরে যে তোর জনম ভাই
খুন বিকিয়ে ভুখ মিটে না তোর
ভাই ব্রাদারি দোস্তী একাই আজাদী
এই লড়াই-এর কায়দারে মজদুর॥

হুকুমতের তক্ত জুড়ে রয় যারা
কিসের জোরে লাল করে ভাই আঁখ
কামান কার্তুজ আর বেয়নেট
আমরাই তো গড়ি লাখে লাখ॥

ভুখ-মিছিলের শক্ত বাঁধন তোর তরে
ছাড় দেখি ভাই দীন ভিখিরীর ভেক
উড়ারে আজ লালঝাণ্ডা দিল ভরি
আজাদী তোর দোরগোড়ে ঐ দেখ॥

[উপরের গানের রচয়িতা শ্রীজ্যোতির্ময় নন্দী—গানটি শ্রীহেমাঙ্গ বিশ্বাসের সৌজন্যে পাওয়া গেছে।]

যবনিকা

রঙ্গজগৎ

'রোমিও এণ্ড জুলিয়েট' ছবিতে অলিভিয়া হুসে।

শুভবুদ্ধির পরিচায়ক

২০শে জুন থেকে সিনেমা শিল্পে যে ধর্মঘট হবার কথা ছিল তা স্থগিত রাখা হয়েছে। সিনেমা শিল্পের তিনটি সংগঠন এই ধর্মঘটের কথা ঘোষণা করেছিল। ধর্মঘট স্থগিত রাখার কারণ মালিকপক্ষ ছাঁটাই কর্মচারীদের পুনর্নিয়োগ করছেন এবং বেতন স্কেল নির্ধারণে আলোচনায় বসতে রাজী আছেন। ইতিপূর্বে সরকারী উপদেষ্টা কমিটিতে অংশ গ্রহণ সম্পর্কে যে বাধা-নিষেধ ছিল— মালিকদের সংগঠন তাও তুলে নিয়েছে এবং নিজেরাও কমিটিতে অংশ গ্রহণ করছে। বিরোধটা আপাতত এভাবে মিটে যাওয়ায় এবং ধর্মঘট স্থগিত হওয়ায় আমরা উভয়পক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমরা আশঙ্কা করেছিলাম ২০ তারিখের প্রতীক ধর্মঘট ক্রমে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটের দিকে যাবে এবং এই ধর্মঘট দীর্ঘস্থায়ী হবে। কারণ প্রত্যেকটি শিল্পে মালিকদের যেরূপ মনোভাব দেখা যাচ্ছে এবং ইতিপূর্বে সিনেমামালিকরা যে মনোভাব দেখিয়েছিলেন তাতে মনে হয়েছে সহজে মীমাংসার পক্ষপাতী তাঁরা নন। কিন্তু এবার মালিকদের সংগঠন বাস্তব অবস্থা যেভাবে উপলব্ধি করেছেন তাতে বিরোধ আপাতত বেশিদূর গড়াল না, এটা সিনেমা শিল্পের পক্ষে খুবই ভাল কথা। এই ঘটনায় প্রমাণিত হল আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে মীমাংসা করা যায়, তবে কিছুটা আন্তরিক ইচ্ছা থাকা প্রয়োজন। এবার ধর্মঘট হলে তা কেবল সিনেমা হাউসগুলোতে সীমাবদ্ধ থাকত না, ক্রমে তা স্টুডিও, ল্যাবরেটরি থেকে পরিবেশকদের অফিসে বিস্তারলাভ করত। এতে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প একেবারে অচল হয়ে শত শত মানুষের রুজি-রোজগার বন্ধ হয়ে যেত। মালিকদের লোকসানও যথেষ্ট হত। এই লোকসানের থেকে বাংলার চলচ্চিত্র শিল্প রক্ষা পেল মালিক এবং কর্মচারী ও শিল্পীদের সংগঠনের শুভবুদ্ধিতে। আশা করা যায় প্রতিটি ছাঁটাই কর্মচারী কাজ পাবে এবং সন্তোষজনকভাবে পে-স্কেল নির্ধারিত হবে, যা উভয়পক্ষের কাছে গ্রহণীয় হবে।

সম্প্রতি কলকাতায় এবং বর্ধমানে ছাত্র ও যুবকরা 'সত্তরঙ্গ' ছবির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলেন। শোনা গেছিল এই বিক্ষোভ আরো বিস্তার লাভ করতো, ছবির পরিবেশক ছবিটির প্রদর্শন বন্ধ করেছেন। জনমতের রায় এভাবে স্বীকার করে নিয়ে পরিবেশক শুভবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু বোম্বাইয়ের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কোন সংগঠনের জনৈক মুখপাত্র এর জন্য যথেষ্ট ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাঁর বক্তব্য সেন্সর বোর্ড যখন মঞ্জুরী দিয়েছেন তখন অন্যদের আপত্তি শুনবো কেন? কিন্তু ভদ্রলোক ভুলে যাচ্ছেন সেন্সর বোর্ডের ওপরেও সেন্সর বোর্ড আছে। এই সেন্সর বোর্ড জাগ্রত জনসাধারণ এবং সচেতন ছাত্র ও যুবসমাজ। সরকারী সেন্সর বোর্ড নাইট সিরিজের ছবিকেও মঞ্জুরী দিয়েছিল, কিন্তু জনমতের চাপে শেষ পর্যন্ত এক বছর পরে মঞ্জুরী প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছিল। এক্ষেত্রে ছাত্র ও যুবকরা এক বছর অপেক্ষা না করে সক্রিয় পথ গ্রহণ করায় কাজটা শীঘ্র হয়েছে। —সুজন।

'রাণুর প্রথম ভাগ' ছবিতে নীতা মালিয়া। ছবিটি পরিচালনা করছেন নব্যেন্দু চ্যাটার্জী।

চিত্র আলোচনা

পরিণীতা

শরৎচন্দ্রের 'পরিণীতা' বহুপূর্বে বাংলায় এবং তারপরে হিন্দীতে চিত্ররূপ লাভ করেছে। হিন্দীচিত্ররূপ দিয়েছিলেন খ্যাত পরিচালক বিমল রায়। পরিচালক অজয় কর ও বিমল দের প্রযোজনায় পরিণীতা আবার বাংলা চলচ্চিত্ররূপ লাভ করল। অজয় কর বাংলার প্রথম শ্রেণীর পরিচালকদের অন্যতম, এ কারণে ছবিটি সম্পর্কে জনসাধারণের বেশ ঔৎসুক্য রয়েছে। পরিচালক অজয় কর যথেষ্ট যত্ন নিয়ে ছবিটি করেছেন। যদিও ক্লোজ ও মিডিয়াম সটে ছবির চরিত্রগুলির আত্মিক দিকটা দর্শকের ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে, কিন্তু তাঁর বর্ণনারীতি পুরাতনধর্মী। ষাট দশকের শেষভাগে, যখন বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্প কলাকৌশলের দিক থেকে অনেক উন্নত হয়েছে, এবং দেশ-বিদেশের ছবির অভিজ্ঞতায় পরিচালক ও চিত্রধারকদের দৃষ্টি ও শিল্পরুচি বিকাশ লাভ করার সুযোগ হয়েছে, তখন আমরা আরো আধুনিক শিল্প প্রয়োগরীতি আশা করেছিলাম। চিত্রগ্রহণে অজয় করের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা রয়েছে—এই ছবির ক্ষেত্রে তাঁর অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া গেছে—পরিচ্ছন্ন কাজে।

শরৎচন্দ্রের 'পরিণীতা'র কাহিনী নতুন করে বলার প্রয়োজন হয় না। এই কাহিনী প্রায় সকলেরই পড়া রয়েছে এবং দুটি পূর্ববর্তী ছবির সহায়তায় চাক্ষুষ পরিচয় ঘটেছে। কাহিনীর দুটি মুখ্য চরিত্র ললিতা ও শেখর। কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিক্ষণে ললিতা যে মালা শেখরকে পরিয়ে দিয়েছিল আর শেখর মালা বদল করেছিল, কিন্তু সমাজ আর পরিবেশ তাদের মিলনের প্রতিবন্ধক হয়ে উঠল। বাইরের প্রতিবন্ধকতা কিন্তু দুটো মনকে কি বিচ্ছিন্ন করতে পারল? বাইরের পরিচয় যাই হোক, মনের দিক থেকে ললিতা শেখরের পরিণীতা এই উপলব্ধি তার জীবনে এক সংঘাত সৃষ্টি করে। নারীমনের অন্তঃসলিলা বেদনা এখানে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে এক জীবনের পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষায়। তাই এই কাহিনীর আবেদন প্রতিটি ঘরে ঘরে।

'আয়া সাওন ঝুমকে' ছবিতে আশা পারেখ ও ধর্মেন্দ্র

ললিতার চরিত্রে মৌসুমী চট্টোপাধ্যায় সংযত অভিব্যক্তিতে তার অন্তঃসলিলা আবেগকে সার্থকভাবে প্রকাশ করেছে। শেখরের তুলনায় কিছুটা খাটো মনে হলেও অভিনয় প্রশংসনীয়। শেখররূপে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নিপুণভাবে চরিত্র প্রকাশ করেছেন। গুরুচরণের ভূমিকায় বিকাশ রায়, নবীন রায়ের চরিত্রে কমল মিত্র এবং অন্যান্য চরিত্রগুলিতে ছায়া দেবী, অনুভা দেবী, যমুনা সিংহ, গীতা দে, শৈলেন মুখার্জী, বঙ্কিম ঘোষ, বিজন ভট্টাচার্য প্রমুখ অভিনয় করেছেন। গিরিনের ভূমিকায় সমিত ভঞ্জের অভিনয় অপেক্ষাকৃত দুর্বল। সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। অতুলপ্রসাদের একটি গান সহ গানগুলি সুগীত।

নাটকের কথা

রক্তকরবী

কাঁটায় কাঁটায় সাতটায় শুরু হোল 'রক্তকরবী'। কলামন্দির-এ ঠাসবুনুনির মতো বসে আছেন দর্শকরা। বাইরে তখনো টিকিটের জন্য ব্যর্থ আবেদন। কিন্তু ঠাঁই নেই, ঠাঁই নেই। অত বড় 'হল' ভরে গেছে এবং বাংলা নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা প্রকল্পে সমিতি যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন—এইভাবে নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করলে মনে হয় তা সম্পূর্ণ সাফল্য লাভ করবে। আর সেই মঞ্চ প্রতিষ্ঠার জন্য বাংলাদেশের স্বনামধন্য

নটনটীদের সঙ্গে আগ্রহী দর্শক-শ্রোতারাও স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

'রক্তকরবী'কে মঞ্চ উপস্থাপনায় দীর্ঘকাল ধরে "বহুরূপী" এক উল্লেখযোগ্য কাজ করে এসেছেন। বাংলা ও বহির্বাংলার সমঝদার দর্শকের প্রশংসাভিনন্দনে তাঁরা ধন্য। কারণ রক্তকরবীর মতো নাটককে মঞ্চসফল করে তোলা প্রায় অসাধ্য ব্যাপার ছিল। বস্তুত রাজার জালের জানলা কি, তা নিয়ে ভাবনা-চিন্তার অন্ত ছিল না। রবীন্দ্রনাথই বলেছেন, "জানলাটি যে কি রকম তা সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করা অসম্ভব, যারা তার কারিগর তারাই তার কলাকৌশল বোঝে।" রূপদক্ষশিল্পী ও কবি-কল্পনার অংশভাগী না হলে বোধ হয় সেই জানলাটি এবং যক্ষপুরীকে কেউ বাস্তবে রূপায়িত করে তুলতে পারে না। তবু তা সম্ভব হয়েছে এবং কলাভবনের মঞ্চে মকররাজের যক্ষপুরীকে যেন সত্যিই যক্ষপুরীতে রূপান্তরিত করে তুলেছিলেন বাংলা নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠা সমিতি তাঁদের রক্তকরবী অভিনয়ে। এ ছাড়া আরো একটি ঘটনার প্রমাণ হাতে-নাতে পাওয়া গেল বাংলা দেশের প্রতিষ্ঠিত নাট্যসংস্থা ও নটনটী সমন্বয়ে অপূর্বকে আরো অপূর্ব, চমৎকারকে আরো চমৎকার কিভাবে করা যায়।

'রক্তকরবী' আগে যাঁরা দেখেছেন, এখন তাঁরা তার আরো উৎকর্ষ দেখে বিস্মিত হবেন। এবং একমাত্র এই কারণেই মনে হবে, এদের অভিনয় কলার গৌরব সর্বজনের কাছে সুলভ করার মহৎ আদর্শেই সর্বসাধারণ দর্শকদের পক্ষে নাটমঞ্চ প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রণী হওয়া উচিত।

এবার রক্তকরবীর রাজা : শম্ভু মিত্র, নন্দিনী : তৃপ্তি মিত্র, বিশু : সবিতাব্রত দত্ত (৬৯৬), অধ্যাপক : গঙ্গাপদ বসু, ফাগুলাল : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় (৪৭ফ) এবং মাটির তলা থেকে সোনা তোলার কাজে: শ্রমিকদল।

রাজার নেপথ্য কথোপকথন প্রথম দিকে কিছুটা ধীর হলেও ক্রমগতিতে সর্বাঙ্গসুন্দর। মঞ্চে সঙ্গীত ও সেই সঙ্গে অভিনয়ে, বোধ হয় সবিতাব্রতর জুড়ি নেই। দূরের বাঁশি বাজলো, বাজলো—এখনো কানে অনুরণিত হয়।

ফাগুলাল, চন্দ্রা, বড় সর্দার, মেজ সর্দার, ছোট সর্দার, অধ্যাপক, ডাক্তার, গোঁসাইজী, এমন কি ছোটখাটো অভিনয়েও যাঁরা অংশ নিয়েছেন, তাঁদের প্রত্যেকেই প্রায় নিখুঁত।

বেশবাসও সুপরিকল্পিত। যেমন নন্দিনীর পরিধানে সবুজ শাড়ি; আবার সুড়ঙ্গ খোদাইকরদের ধূলিমলিন বেশভূষাও তাঁদের বেদনা ও বিদ্রোহের সঙ্গে অপরূপ রূপক হয়ে উঠেছে—যদিও কবি রক্তকরবীকে রূপক বলতে চান নি এবং রঞ্জন হেঁয়ালি হয়েই থাকে মৃত্যুকে বুকে নিয়ে। তাকে সবাই পেয়েও সবার ধরার বাইরে সে।

"শর্মিলা" নাটকের শততম অভিনয়

আগামী ২৮শে জুন শনিবার সন্ধ্যা ৬টায় স্টার থিয়েটারে "শর্মিলা" নাটকের শততম অভিনয়ের স্মারক-উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রবীণ অভিনেতা নটসূর্য শ্রীযুক্ত অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের ডি-লিট উপাধি প্রাপ্তিতে তাঁকে থিয়েটারের পক্ষ থেকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে। রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী মহোদয়া সভানেত্রী ও প্রবীণ কথাশিল্পী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত প্রবোধকুমার সান্যাল মহোদয় প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করবেন। এতদুপলক্ষে স্টার থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শ্রীসলিলকুমার মিত্র, নাট্যকার-পরিচালক, শিল্পী ও মঞ্চের অন্যান্য কর্মীদের পুরস্কৃত করার ব্যবস্থা করেছেন।

রঙমহলে—কথা কও

রঙমহলে মাসে একদিন করে অভিনীত হয় "কথা কও"। আগামী ২৬ জুন এই মাসের ঐ দিনটি। এক খবরে জানা গেল সম্পূর্ণ নতুনভাবে সাজান হচ্ছে ঐ নাটকটি। এবং এখন থেকে "কথা কও" নাটকে অংশগ্রহণ করবেন—হরিধন, অজিত চট্টোঃ, মৃণাল, অমরনাথ, ইন্দ্রজিৎ, মানস, মিন্টু, সুজিত, বাসুদেব, দীপক, সঞ্জয়, বামদেব, জিতেন, সত্য দে, মঞ্জু, মমতা বন্দ্যোঃ, কমলা, ইন্দিরা ও বাসবী নন্দী। মাসের প্রতি বৃহস্পতি, শনি, রবি ও ছুটির দিন যথারীতি হাসির নাটক "সেমসাইড" অভিনীত হবে। সেমসাইড-এর চরিত্রলিপিতে যথারীতি আছেন জহর

নির্মল দে'র অসমাপ্ত ছবি 'সমান্তরাল'-এর একটি দৃশ্যে মাধবী মুখার্জী ও মাঃ মজার। ছবিটি পরিচালনা করছেন গুরু বাগচী।

উৎপলদীর 'দুই মহল' নাটকের একটি দৃশ্যে নিত্যানন্দ মুখার্জী, অনিতাভ অধিকারী ও মন্দিরা দাস।

রায়, হরিধন, সত্য বন্দ্যোঃ, অজিত চট্টোঃ, মৃণাল, অমরনাথ, মিন্টু, ইন্দ্রজিৎ, সুজিত, মানস, সমরজিৎ, কার্তিক, ইন্দিরা দে, বাসবী নন্দী ও সরযূ দেবী। "সেমসাইড"-এর জনপ্রিয়তা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

স্টুডিও খবর

অগ্নিযুগের কাহিনী

ইংরেজ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের রক্তরাঙা অধ্যায়-এর পটভূমিকায় রচিত বীরেন রায় এম পি-র "খেয়ালী" উপন্যাসের চিত্ররূপ "অগ্নিযুগের" কাহিনী নবযুগ চিত্র প্রতিষ্ঠানের পরিবেশনায় শহর ও শহরতলীর একাধিক চিত্রগৃহে আসন্ন মুক্তি প্রতীক্ষায়। দি নিউ এরা পিকচার্স ছবিটির প্রযোজক। চিত্রনাট্য রচনা করেছেন বিপন্নপালক বসু। পরিচালনা করেছেন—ভূপেন রায়, আর সুর দিয়েছেন গোপেন মল্লিক। নেপথ্য সঙ্গীতে আছেন—সন্ধ্যা মুখার্জী, মান্না দে, মঞ্জুশ্রী বসু, অশোকতরু ব্যানার্জী। রূপায়ণে আছেন—বিকাশ রায়, মাধবী মুখার্জী, অজিতেশ বন্দ্যোঃ, দিলীপ রায়, অজয় গাঙ্গুলী, জহর রায়, বিজন ভট্টাচার্য, সুতপা চৌধুরী, গীতা দে প্রভৃতি।

রূপসী

অস্মিতার ছবির প্রযোজক অরুণ রায়চৌধুরী বহির্দৃশ্য প্রধান গীতিবহুল ছবি "রূপসী"র কাজ নিয়ে রীতিমত ব্যস্ত বলে জানা গেল। শ্রীরায়চৌধুরীর এ আর সি প্রোডাকসন্সের এটি দ্বিতীয় ছবি। রূপসীর কাহিনী রচনা, চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন তরুণ প্রতিভাবান পরিচালক বালুচরী, দাদু প্রভৃতি খ্যাত অজিত গাঙ্গুলী, সুর দিচ্ছেন অনিল বাগচী। নায়িকা চরিত্রে আছেন সন্ধ্যা রায়। এক খবরে জানা গেল পরিচালক তাঁর ইউনিট ছবির বহির্দৃশ্য গ্রহণের জন্য শীগগির বাংলার গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে যাবেন। বাংলার মাটির দরদ, বাংলার মাটির সুর, বাংলার মাটির গন্ধ এই ছবির সমস্ত অংশ জুড়ে থাকবে। ছবির ইতিহাসে সৃষ্টি করবে নতুন ছন্দ "রূপসী"।

মুক্তিস্নান

কার্তিক বর্মন প্রযোজিত রাধারাণী পিকচার্সের চতুর্থ ছবি "মুক্তিস্নান"-এর চিত্রগ্রহণ কাজ প্রায় সমাপ্তিপথে। জানা গেল দু-এক দিনের সামান্য চিত্রগ্রহণের পরই "মুক্তিস্নান" সম্পাদকের টেবিলে যাবে। কাহিনী রচনা করেছেন—শক্তিপদ রাজগুরু। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা করেছেন বালুচরী খ্যাত অজিত গাঙ্গুলী। রাজেন সরকার সুর দিয়েছেন। ছবির বিভিন্ন চরিত্রে আছেন—সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, কমল মিত্র, পাহাড়ী সান্যাল, গঙ্গাপদ বসু, হরিধন, জহর রায়, মৃণাল, সমর, মিন্টু, অজয় গাঙ্গুলী, কামু, শ্যামল ঘোষাল, কালী ব্যানার্জী, ছায়া দেবী, গীতা দে, শোভা সেন, মাঃ মলয় ও ললিতা চ্যাটার্জী।

নর্মদা চিত্র ছবিটির পরিবেশন স্বত্ব গ্রহণ করেছেন।

সত্যজিৎ রায়ের বার্লিন যাত্রা

বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসবে সত্যজিৎ রায়ের ছবি 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' প্রদর্শিত হবে। এই উপলক্ষে শ্রীরায় বার্লিন যাত্রা করেছেন। তাঁর বার্লিন যাত্রা উপলক্ষে গত ১৫ই জুন পশ্চিম জার্মানীর কনসাল জেনারেলের দপ্তরের উদ্যোগে এক প্রীতি অনুষ্ঠান হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে সস্ত্রীক সত্যজিৎ রায়, ছবির প্রযোজক সস্ত্রীক নেপাল দত্ত ও অসীম দত্ত উপস্থিত ছিলেন। ২৫শে জুন থেকে ৬ই জুলাই বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হবে।

ফস্টাস

প্রসাদনীর আগামী প্রযোজনা ক্রিস্টোফার মার্লোর "ডাঃ ফাউস্টাস" অবলম্বনে "ফস্টাস" সেপ্টেম্বর মাসে মঞ্চস্থ হবে।

অনুবাদ ও নাট্যরূপ : অগ্নিমিত্র। নির্দেশনা : গোবিন্দ গাঙ্গুলী। মঞ্চ : রমেন্দ্রনাথ সরকার।

শোক-সংবাদ

শিল্পী বিষ্ণু রাভার জীবনাবসান

আসামের বিখ্যাত লোকশিল্পী বিষ্ণু রাভা এম-এল-এ গত ১৯শে জুন তেজপুর সিভিল হাসপাতালে মারা গেছেন। তিনি ক্যান্সার রোগে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। তিনি সঙ্গীতজ্ঞ, নৃত্যশিল্পী এবং অভিনেতা ছিলেন। রাজনীতিক্ষেত্রেও তিনি বিস্ময়কর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। আসামের চলচ্চিত্র শিল্পে তিনি অন্যতম পথিকৃৎ।

সোভিয়েট ইউনিয়নের কাজাক রিপাবলিকান ভ্যারাইটি আর্ট স্কুলের 'কারা জোরজা' নৃত্যে তিনজন শিক্ষার্থী শিল্পী।

কয়েকটি ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন এবং সংগীত উপদেষ্টারূপে কাজ করেছেন। আসামের লোকসংগীত ও লোকনৃত্যকে বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচিত করবার ব্যাপারে তাঁর বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। বাংলা-আসামে বিষ্ণু রাভা এক সুপরিচিত নাম। তিনি অসংখ্য গান, অসমীয়া সংস্কৃতি সম্পর্কে ছয়টি বই এবং একটি উপন্যাস লিখে-ছেন।

রাজনীতিক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বিপ্লবী। বি· এ পরীক্ষা দেবার সময় কোচবিহার কলেজ থেকে বহিস্কৃত হয়ে সম্পূর্ণভাবে রাজনীতিতে আত্মনিয়োগ করেন। পাঁচবার তিনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন ১৯৪৮-৫০ সালে আর-সি-পি-আই-এর সদস্যরূপে তিনি আসামে সশস্ত্র বিপ্লব প্রচেষ্টা করেছিলেন, সে সময় তাঁকে ধরার জন্য দশ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষিত হয়েছিল। পরে বিষ্ণু রাভা ভারতের কমিউনিস্ট পার্টিতে (দক্ষিণ) যোগদান করেন।

তাঁর তিন সন্তান বর্তমান। বহুমুখী প্রতিভাবান এই শিল্পী ও দেশকর্মী প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায় মারা গিয়েছেন।

ইতিহাসের পাতা থেকে

চলচ্চিত্রের পুনর্জন্ম

॥ যোল ॥

ছবিতে শব্দ সংযোজন এক বিপ্লবী পরিবর্তন ঘটালো। শব্দ, চিন্তা ও ভাবপ্রকাশের সহায়ক হয়ে ছবিকে সম্পূর্ণতার দিকে এগিয়ে আনল, যা এতদিন কেবলমাত্র সাহিত্য আর নাটকের বিশেষ অধিকার হিসাবে ছিল। কিন্তু ১৯২৮ সালে সেগেই আইজেনস্টাইন, ভি, পুডোভকিন, গ্রিগরি আলেকজান্দ্রভ 'সবাক চিত্রের ভবিষ্যৎ' নামক প্রবন্ধে তাঁরা মঞ্চ নাটকের কপি করার মত ছবি করার বিরুদ্ধে সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছিলেন। সত্যিই এটা একটা বিপদ। এ কারণেই প্রথম প্রথম অনেক দেশে সবাকচিত্রকে মানুষ গ্রহণ করে নি। শুরু থেকে সোভিয়েট চিত্র নির্মাতারা স্বতন্ত্র পথ নিয়েছিলেন। নির্বাক ছবির কালেই ভাবপ্রকাশের ক্ষেত্রে শব্দ প্রয়োগে সমন্বয় কখন কিভাবে হবে তা আবিষ্কৃত হয়েছিল।

প্রথম সাফল্য অভাবনীয়। ১৯৩১ সালে আমরা নিকোলাই এক্-এর 'দি রোড টু লাইফ' ছবি দেখলাম। এই ছবিটি সারা দুনিয়ার দর্শক ও পর্যালোচকদের প্রশংসালাভ করেছে এবং এই ছবিকে অনুকরণ করে অনেক ছবি দেশে দেশে তৈরি হয়েছে, আজো হচ্ছে। এই ছবিতে এক্ সমাজের বিপথগামী ছেলেদের (আজকালকার ভাষায় মস্তান, অনুবাদক) পুনঃশিক্ষার এক প্রামাণিক ঘটনাবলী দেখিয়েছেন। ছবিতে সঙ্গীত এবং শব্দ ছবির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে রয়েছে—যাতে ঘটনাবলীর যৌক্তিক পটভূমি রচিত হয়েছে এবং চরিত্রগুলির মনের গভীরে পৌঁছতে সাহায্য করেছে সংলাপ।

একই বছরে সের্গেই ইয়ুৎকোভিচ্ 'গোল্ডেন মাউনটেন' ছবি করেন। ছবির বিষয় ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় রাশিয়ার শ্রমিকদের বিপ্লবী সংগ্রাম। বিশ দশকে চলচ্চিত্র কীর্তি-কাহিনীর সঙ্গে যেমন আইজেনস্টাইনের 'স্ট্রাইক', পুডোভকিনের 'য়েণ্ড অব সেণ্ট পিটার্সবার্গ' এই ছবিটি আর একটি নতুন গুণের অধিকারী যা ঐ ছবিগুলিতে নেই। এই ছবির চরিত্রগুলি কেবলমাত্র শ্রমিক কৃষকের প্রতিনিধি—প্রকৃতির নয়, তাদের একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও জীবন রয়েছে। ভাবপ্রকাশের নতুন রীতি এখানে বিস্ময়করভাবে প্রকাশ করা হয়েছে বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে। সংযত সংলাপ, মূকাভিনয় এবং অঙ্গভঙ্গী চরিত্রকে প্রকাশ করতে এক চমৎকার সমন্বয় সাধন করেছে। এবং এই ছবিতে যেভাবে সঙ্গীত ব্যবহৃত হয়েছে তা নাটকীয় বিষয় প্রকাশে এক অভিনব পদ্ধতি বলা যায়—সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন ডিমিট্রি সস্টাকোভিচ্।

—ক· ম· গ

মাসিক ৫৲ টাকা কিস্তিতে

স্ট্যাণ্ডার্ড ডবল স্পীকার ৩ ব্যাণ্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টার। যে কোন স্থানে পাঠান যায়।

Tokyo Agencies, (W.B.C.)
Post Bag No. 11, New Delhi-1.

খেলা ধুলা

দেখে শেখা

খেলার ধারা দেখে প্রথম থেকে যে কথা মনে হয়েছিলো, খেলার চূড়ান্ত ফলাফলে সেই ধারণাই অভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হলো। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট ম্যাচে বিশ্রীভাবে হেরে গেছে। কোন রকমে তারা এড়িয়েছে ইনিংসে পরাজয়ের শোচনীয় ফলাফল। কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ঐ দশ উইকেটে পরাজয়ও বিশ্ব ক্রিকেটের দরবারে তাদের অনেকখানি পিছিয়ে নিয়ে গেলো। মাত্র ক' বছর আগেও ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ছিলো বিশ্বের অঘোষিত চ্যাম্পিয়ান দল। ব্যাটিং, বোলিং, ফিল্ডিং সব দিক দিয়েই তারা ছিলো শ্রেষ্ঠ। ওরেল পরিচালিত ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের মতো স্পোর্টিং এবং দুর্ধর্ষ ক্রিকেট দল সমস্ত পৃথিবীতে তখন আর একটাও ছিলো না। ওরেলের পর সোবার্স নিলেন দল পরিচালনার ভার। প্রথম প্রথম সোবার্সের দলও মারাত্মক খেলা খেলতে লাগলো। তাদের সামনে বিশ্বের অন্য কোন দেশ ঠিকমতো দাঁড়াতেই পারতো না। শক্তির প্রচণ্ডতায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ তখন অজেয়। কিন্তু ওরেলের সময় যে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা, যে অকল্পনীয় ডিসিপ্লিন ছিলো দলের মধ্যে এবং দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে—সোবার্সের সময় তা ধীরে ধীরে ভেঙে পড়তে লাগলো। ওরেলের সময় যা কোনদিন ভাবাও যায় নি সোবার্সের সময় হতে লাগলো সেই সব কাণ্ড কারখানা। মদ খাওয়ার মাত্রা গেলো বেড়ে। বেহেড মাতাল হয়ে শেষ রাত্তিরে খেলোয়াড়রা ফিরতে লাগলেন হোটেলে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিগত অস্ট্রেলিয়া ভ্রমণের সময় মাতাল হয়ে হল হোটেলের কাঁচের দরজা খোলা মনে করে ঢুকতে গিয়ে দরজা-টরজা ভেঙে একাকার কাণ্ড করে বসলেন। বিশ্রীভাবে আহত হলেন হল। ভাগ্যজোর বেঁচে গেলো চোখ দুটো। জানাজানি হয়ে গেলো সব কিছু। পৃথিবীসুদ্ধ সকলেই জেনে গেলো ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়দের মাতলামি থেকে আরম্ভ করে অন্য সব অসভ্যতার কথা॥

এর জন্যে অবশ্য ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক সোবার্সকেই দায়ী করা যায় অনেক অংশে। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে, আপনি আচরি ধর্ম অপরে শিখাও। অর্থাৎ নিজে করে দেখাও, নিজে নিজেকে দিয়েই আগে একটা উদাহরণ তৈরি করো, তারপর অন্যদের সেই মতো কাজ করতে বলো। সোবার্স কিন্তু এ সব কিছুই মানলেন না। মানার প্রয়োজনও বোধ করলেন না। যা খুশি তাই করে চললেন। মদ থেকে আরম্ভ করে কিছুই বাদ গেলো না। আর প্রত্যেক দেশেই অঞ্জু মহেন্দ্রর মতো মেয়েরা আছেন। সুতরাং সোবার্সের মতো খেলোয়াড়দের পোয়া বারো। তাঁরা যা খুশি তাই করে দলনায়ক হিসেবে দলের খেলোয়াড়দের কাছে যে নজীর সৃষ্টি করেন, তাতে শিক্ষণীয় কিছু না থাকলেও ঐ সব নোংরা ব্যাপারে দলের খেলোয়াড়রা যথেষ্ট উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। আর রাত দুপুর অবধি অসভ্যতা আর নিষিদ্ধ পানীয় গ্রহণের ফলে পরের দিন খেলার মাঠে নেমে তাঁরা সরষের ফুল দেখেন চোখে। ফলে চট করে আউট হয়ে যান, ঠিকমতো বোলিং করতে পারেন না আর ফিল্ডিং-এর কথা বোধহয় না তোলাই ভালো। তা ছাড়া ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের খেলোয়াড় নির্বাচনও বোধহয় এবার খুব ভালো হয় নি। নার্সের মতো খেলোয়াড়কে দল থেকে বাদ দেবার যে কি কারণ থাকতে পারে জানি না। যাক ও কথা। ওদের কথা ছেড়ে ঘরের কথায় আসা যাক। আমরা চাই যে, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের এই শোচনীয় পরিস্থিতি থেকে আমাদের ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ড, আমাদের অধিনায়ক এবং খেলোয়াড়রাও কিঞ্চিৎ শিক্ষা লাভ করুন। কারণ ওঁরাও কিছু আর ধোয়া তুলসী পাতা নন। কিন্তু একটু পরিচ্ছন্ন এবং একটু ডিসিপ্লিনড থাকতে দোষ কি? তাতে মনে হয় ভারতীয় দলের খেলার মান ভালোই হবে। দেখা যাক নিউজিল্যাণ্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলার সময় ভারতীয় খেলোয়াড়দের মাঠে-এবং মাঠের বাইরের হাল কেমন হয়......

—শান্তিপ্রিয়॥

ফুটবল ফুটবল

কলকাতার লীগ ফুটবলের আয়ু শেষ হয়ে এলো। আর মাত্র এক সপ্তাহ অর্থাৎ জুলাই মাসের ৫ তারিখের মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে এই মরশুমের প্রথম লীগের খেলা। আর তারপরই বসবে সুপার লীগের আসর।

তবে এ বছর সুপার লীগে যে কোন্ পাঁচটি দল খেলবে তা নিয়ে দেখা দিয়েছে যথেষ্ট সন্দেহ। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল খেলবেই, তবে আর কোন তিনটি দলের ভাগ্যে যে এ সম্মান জুটবে তা নির্ভর করছে লীগের বাকী খেলাগুলোর ওপর। তবে কলকাতা ময়দানের তিন প্রধানের এক প্রধান মহামেডান স্পোর্টিং এবার সুপার লীগে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে কি না সে বিষয়ে আজ দেখা দিয়েছে যথেষ্ট সন্দেহ।

গত বছর সুপার লীগে খেলার সুযোগ পেয়েছিল মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান স্পোর্টিং আর এরিয়ান্স দল। এ বছর চারটে নয়, পাঁচটা দল খেলবে সুপার লীগে। তাই মনে হচ্ছে মহামেডান স্পোর্টিং যদি শেষ পর্যন্ত প্রয়োজনীয় পয়েণ্ট সংগ্রহ করতে না পারে তাহলে হয়তো দু'-একটি তথাকথিত ছোট দলই শেষ পর্যন্ত পাবে সুপার লীগে খেলার সুযোগ। দেখা যাক শেষ অবধি কি হয়!

থাক ও কথা। এ বছরের খেলার কথায় আসা যাক। এবার মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান স্পোর্টিং, এরিয়ান্স প্রভৃতি দলগুলো কোনদিনই তাদের সমর্থকদের সন্তুষ্ট করতে পারে নি। আর যাই হোক এ বছর কলকাতা ময়দানে ফুটবল খেলার মান খুব যে একটা ভালো এ কথা কিছুতেই বলা যাবে না। অতো টাকা খরচ করে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, মহামেডান স্পোর্টিং-এর মতো ক্লাবগুলো ফুটবল দল গঠন করে—কিন্তু তাদের ঐ রকম শোচনীয় খেলার হাল দেখে মনে হয় যে, সব কিছুই বুঝি অরণ্যে রোদন।

তা ছাড়া এ বছর মহামেডান স্পোর্টিং দলের খেলার শেষে শোচনীয় ফলাফলের জন্যে যে ধরণের গোলমাল হচ্ছে তার তুলনা মেলা ভার। কিন্তু শুধু গোলমাল আর মারামারির পথেই কি বাংলা দেশে ফুটবল খেলার উন্নতি করা যাবে...? আজ এই বিষয়ে বিশেষভাবে চিন্তা করে দেখার সময় এসেছে।

গল্প হলেও সত্যি

"অনিশ্চয়তা ও অবিশ্বাস্য ঘটনার নজিরে ভরা 'খেলার রাজা ক্রিকেট'। এমনি একটি ঘটনার কথা বলছি। ইংল্যাণ্ডের মিডল্যাণ্ডে একটি প্রদর্শনী খেলা চলছিল ডিসেওয়ার্থ একাদশ বনাম কেগওয়ার্থ একাদশের মধ্যে। খেলাটিতে প্রথমোক্ত দলটি প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সর্বসাকুল্যে মাত্র এক রান করে তাদের ইনিংস শেষ করল। মজাটা কিন্তু এখানেই নয়। প্রতিপক্ষ কেগওয়ার্থ দলটি যখন ব্যাট করতে নামল, তখন সকলেই দলটির জয়লাভ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়! কেগওয়ার্থ দলটির এগারোজন মিলে তাদের ইনিংসে কোন রানই সংগ্রহ করতে পারল না। ফলে ডিসেওয়ার্থের একাদশই তাদের ইনিংসের মোট মাত্র ওই একটি রানেই বিজয়ী হল।"

—সোমনাথ গঙ্গোপাধ্যায়,
হালিশহর, গোলাবাড়ি
২৪ পরগনা।

কলকাতা ময়দানের দলগুলো কবে যে কেমন খেলবে তা বোধহয় স্বয়ং বিধাতাও বলতে পারবেন না। আজ যে দল শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালাচ্ছে কালই হয় তো সে বিশ্রীভাবে হেরে যাবে কোন দুর্বল দলের কাছে। ধরা যাক কালীঘাটের কথা, ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে তারা সেদিন হেরে গিয়েছিল এক গোলে। কিন্তু তার পরই একটার পর একটা খেলায় তারা দিতে লাগলো শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয়। ছবিতে ইস্টবেঙ্গলের নাগাতুল্লাকে দেখা যাচ্ছে কালীঘাটের বিরুদ্ধে একমাত্র গোলটা করতে।

মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে অধিনায়ক ববি মুর বিশ্বকাপ জিতে এনেছিলেন

ফ‍ুটবল না ক্রিকেট?

মাত্র ক' বছর আগে ইংলণ্ডের ফ‍ুটবল অধিনায়ক ববি ম‍ুরের কাছে এই প্রশ্নটা খ‍ুব বড় হয়ে দেখা দিয়েছিলো। ববি ফ‍ুটবল তো ভালো খেলেনই, ক্রিকেটেও তিনি কম যান না। একদিকে তাঁর সামনে তখন এসেক্স কাউণ্টি দলে খেলার আহ্বান আর একদিকে ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড দলের পক্ষে ফ‍ুটবল খেলার আমন্ত্রণ।

এমন বিপদেও কি মান‍ুষে পড়ে? কোন্‌টা বেছে নেবেন ববি—ফ‍ুটবল না ক্রিকেট। অথচ দ‍ুটো খেলাই তাঁর পরম প্রিয় আর দ‍ুটি খেলাতেই তিনি বোধহয় তখন ছিলেন সমান পারদর্শী। তাই কি করবেন ভেবে পান না ববি—কোনটাকে ছেড়ে কোনটাকে নেবেন? একদিকে ক্রিকেট তাঁকে আকর্ষণ করে, ব্যাটবলের মধ‍ুর কলতান তাঁকে উন্মনা করে তোলে, আর একদিকে ফ‍ুটবলের হাতছানি।

শেষ পর্যন্ত ফ‍ুটবলের হাতছানিতে সাড়া না দিয়ে পারলেন না ববি। ছেড়ে দিলেন শ‍ুধ‍ু মাত্র এসেক্স কাউণ্টি দলের পক্ষে নয়, ইংলণ্ড দলের পক্ষে ক্রিকেট খেলার স‍ুযোগ। ববি ম‍ুর যোগ দিলেন ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড দলে ফ‍ুটবল খেলোয়াড় হিসেবে। ক্রিকেট খেলায় তুখোড় হলেও ছোটবেলা থেকেই ববির কাছে ফ‍ুটবল ছিলো প্রিয় খেলা।

১৯৫০ সালের কথা—তখন ববির বয়েস মাত্র দশ-এগারো বছর হবে। ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড সেবার ছোট ছোট ছেলেদের ফ‍ুটবল খেলার কোচিং-এর ব্যবস্থা করলো। অনেক কাঠ-খড় প‍ুড়িয়ে ববি স‍ুযোগ পেলো সেই কোচিং-এ যোগ দেবার।

প‍ুরো দ‍ু' বছর ধরে চললো একটানা কোচিং, সেই সঙ্গে তাল দিয়ে ববি চালাতে লাগলো পড়াশোনা। বয়েস খ‍ুব কম হলে কি হবে? দ‍ু' বছরের কোচিং যখন ববি শেষ করলো তখন সে একজন পাকা ফ‍ুটবল খেলোয়াড়। ওয়েস্ট হ্যাম ইউ-নাইটেডের বড়দের দলে খেলার স‍ুযোগ পেলো ববি। সেই সঙ্গে গ্রহণ করলো পেশাদার ব‍ৃত্তি।

আর ছেড়ে দিলো ক্রিকেট খেলোয়াড় হিসেবে নিজেকে স‍ুপ্রতিষ্ঠিত করার স‍ুযোগ। অথচ ববিই ছিলো ইংলণ্ডের স্কুল ক্রিকেট দলের অধিনায়ক। প্রাক্তন টেস্ট খেলোয়াড় ও ইংলণ্ডের খেলোয়াড় নির্বাচক কমিটির চেয়ারম্যান ডক ইনসোন চেয়েছিলেন ফ‍ুটবল নয় ববি ক্রিকেটই খেল‍ুক—খেল‍ুক তাঁর দল এসেক্সে।

কিন্তু ক্রিকেট নয়, ববি ততোদিনে বেছে নিয়েছে ফ‍ুটবলকেই। ওয়েস্ট হ্যামে ফ‍ুটবল খেলতে নামলেন ববি ম‍ুর। কিন্তু প্রতিভা এমনই জিনিষ যে, যাকে স্পর্শ করে তাকে খ‍ুব তাড়াতাড়ি সজীব করে তোলে। ববির ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম হলো না। খ‍ুব তাড়াতাড়ি ববি পেয়ে গেলেন ইংলণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সম্মান।

তাই ১৯৬৩ সালে মাত্র ২৩ বছর বয়েসে ববি ম‍ুর মনোনীত হলেন ইংলণ্ড ফ‍ুটবল দলের অধিনায়ক। ৫ ফ‍ুট ১০ ইঞ্চি লম্বা ছিপছিপে চেহারার তর‍ুণ খেলোয়াড় ববির ওপর পড়লো সব ভার। ঐ গ‍ুর‍ুদায়িত্ব হাতে নিয়ে কিন্তু এতোট‍ুকুও বিব্রত হলেন না ববি। বরঞ্চ অনাগত বিশ্ব কাপ ফ‍ুটবল প্রতিযোগিতার দিকে তাকিয়ে নিজেদের মেজে-ঘষে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ালেন।

[শেষাংশ ৬৩ প‍ৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

ক্রিকেটের খবর

ক্রিকেটের খবরের কথা বলতে গেলে এখন সাগর পারের দেশ ইংলণ্ডে অনুষ্ঠিত ইংলণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের টেস্ট খেলার কথাই বলতে হবে। ক্রিকেটের হট নিউজ বলতে এখন ঐ একটাই। প্রথম টেস্টে ওয়েস্ট ইন্ডিজ দশ উইকেটে হেরে গেছে। বড় বিশ্রী ঐ পরাজয়।

মরশুমের তিনটি টেস্টের প্রথমটিতে জিতে ইংলণ্ড দল ইতিমধ্যেই রাবার জয়ের পথে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচও শুরু হলো। এই টেস্টের ফলাফল যে কি হবে তা আগে থেকে বলা অসম্ভব। তবে ইংলণ্ড যদি জেতে তাহলে তারাই লাভ করবে এই মরশুমের রাবার, ড্র হলে ইংলণ্ডেরই সুবিধে বেশি হবে আর যদি শেষ পর্যন্ত ওয়েস্ট ইন্ডিজ জেতে তাহলে শেষ অর্থাৎ তৃতীয় টেস্ট ম্যাচে রাবারের ভাগ্য নির্ণয়ের জন্যে দুটি দলকেই চালাতে হবে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

তবে ইলিংওয়ার্থের ভাগ্য নেহাৎই ভালো। প্রথম টেস্টে জেতার পর অতি প্রত্যাশিতভাবেই ইলিংওয়ার্থের ওপর পড়েছে ইংলণ্ড দল পরিচালনার ভার। ইলিংওয়ার্থ বাকী দুটি টেস্টেও মনোনীত হয়েছেন ইংলণ্ডের অধিনায়ক।

প্রথম টেস্ট ম্যাচ দু' দলের খেলার ধারা দেখে মনে হয়েছে যে, দলগত শক্তির বিচারে ওয়েস্ট ইন্ডিজের চেয়ে ইংলণ্ড বোধহয় সব দিক থেকে শ্রেষ্ঠ। ব্যাটিং, বোলিং এবং ফিল্ডিং—তিনটি বিভাগেই ইংলণ্ডের প্রাধান্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। আর তারই পুনরাবৃত্তি যদি বাকী দুটি খেলায় দেখা যায় তাহলেও ক্রিকেট-রসিকদের অবাক হবার খুব একটা কিছু থাকবে না। কারণ ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল এখন ভেঙে তছনছ হয়ে গেছে। সোবার্স হাজার চেষ্টা করেও কিছুতেই সেই ভাঙা নৌকার হাল ধরতে পারছেন না।

॥ গ্রেভনী ॥

প্রথম টেস্টের বিরতির দিনে নিজের নামে অনুষ্ঠিত বেনিফিট ম্যাচে অংশ গ্রহণ করায় গ্রেভনী হারিয়েছেন আগামী তিনটি টেস্ট খেলার সুযোগ। ফলে গ্রেভনী ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে বাকী দুটি ও নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে খেলতে পারবেন না।

প্রথম টেস্টে টসে জিতে ইংলণ্ড লাভ করে ব্যাটিং করার সুযোগ। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ধারহীন বোলিং আর দুর্বল ফিল্ডিং-এর সুযোগ পুরোপুরিভাবে নিয়ে করলো ৪১৩ রান। এর মধ্যে বয়কট করলেন সেঞ্চুরী (১২৮), গ্রেভনী ৭৫, এডরিচ ৫৮ আর ডলিভেরা করলেন ৫৭ রান। বোলিং-এ ওয়েস্ট ইন্ডিজের শেফার্ড ১০৫ রানের বিনিময়ে ৫টি উইকেট পান। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ১৪৭ রানের মধ্যে বুচার ৩১, ডেভিস ৩৪, [illegible] ৩২, [illegible] ৩১, [illegible] ৪টি উইকেট ও জে স্নো ৫৪ রানে ৪টি উইকেট লাভ করেন।

ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটসম্যানেরা কিন্তু তাদের প্রথম ইনিংসে নিদারুণ শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয়—মাত্র ১৪৭ রানে তাদের প্রথম ইনিংস শেষ হওয়ায় দেখা দিলো ইনিংসে পরাজয়ের সম্ভাবনা। শেষ পর্যন্ত দ্বিতীয় ইনিংসে ২৭৫ রান করায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল ইনিংস পরাজয় এড়ালো বটে কিন্তু হারলো দশ উইকেটে।

[৬২ পৃষ্ঠার পর]

তারপর দেখতে দেখতে এসে গেলো ১৯৬৬ সাল। বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতি-যোগিতার চূড়ান্ত পর্যায়ের খেলার আসর বসলো ইংলণ্ডে। একটার পর একটা খেলায় জিতে ইংলণ্ড এগিয়ে চললো ফাইন্যালের দিকে।

ববি মুরের পরিচালনায় ইংলণ্ড দল তখন অজেয়। দলের খেলোয়াড়দের আদর্শ বস। ববির নেতৃত্বে তরুণ ইংলণ্ড দল উঠলো বিশ্ব কাপের ফাইন্যালে। ওদিক থেকে ফাইন্যালে উঠেছে পশ্চিম জার্মানী।

তারপর দেখতে দেখতে এসে গেলো ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসের সেই দিনটি। বৃষ্টি-ভেজা ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে আরম্ভ হলো বিশ্ব কাপের ফাইন্যাল—ইংলণ্ড বনাম পশ্চিম জার্মানীর খেলা। ইংলণ্ড জিতলো সে খেলায়। ববি মুরের দল ৪—২ গোলে হারিয়ে দিলো পশ্চিম জার্মানীকে। ইংলণ্ড সেই সর্বপ্রথম লাভ করলো বিশ্ব কাপ।

লাভ করলো ইংলণ্ডের তরুণ অধি-নায়ক পঁচিশ বছরের ছেলে ববি মুরের অনবদ্য ক্রীড়ানৈপুণ্যের জন্যে। খেলার শেষে ববিকে কাঁধে তুলে তার সহ খেলো-য়াড়দের সেই উদ্দাম উল্লাসের দৃশ্যের কথা ফুটবলরসিকরা বোধহয় কোনদিনও ভুলতে পারবেন না।

[illegible] (জোড়াবাগান [illegible], কলকাতা-৭)

উত্তর : আপনার চিঠির উত্তর তো [illegible] দিয়েছি। আপনারা চাইলে আমাকে তো লেখা দিতেই হবে।

তপনকুমার রায় (গোবরডাঙ্গা), **প্রশান্ত বসু** (আসানসোল), **প্রকাশ, হিরন্ময় ও চিন্ময়লাল** (পঞ্চাননতলা কলকাতা-৪৪)

প্রশ্ন : গত ৫১ সংখ্যায় প্রথম প্রশ্নের উত্তর ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে ডাবল সেঞ্চুরীকারীর তালিকায় দিলীপ সারদেশাই-এর নাম দেখলাম না। কিন্তু দিলীপ সারদেশাই ১৯৬৫ সালে বোম্বাই টেস্টে নিউ-জিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ২০০ রান করে অপরাজিত ছিলেন।

উত্তর : আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ। ভুলক্রমে সারদেশাই-এর নামটা বাদ পড়ে গিয়েছিল।

অনন্তকুমার মিত্র ও সুনীল দাস (গঙ্গাজলঘাটী, বাঁকুড়া)

প্রশ্ন : গোলাম আমেদের রিপোর্টের ওপর নির্ভর করে কি নিউজিল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতীয় দলের খেলোয়াড় নির্বাচন করা হবে?

উত্তর : মনে তো হয় না—তবে শেষ পর্যন্ত যে কি হবে কে জানে।

হীরেন্দ্রমোহন ভদ্র (সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি)

উত্তর : আশা করি আগের সংখ্যায় দুরানীর বিষয়ে সঠিক উত্তর দেখেছেন, গ্রো ইন সম্বন্ধে গত বছর ছবির সাহায্যে আলোচনা করা হয়েছিল, দেখেছিলেন নিশ্চয়ই। আপনি আর একটা লেখা পাঠান।

নীলিমা শইকীয়া (বৈরাগী মঠ, ডিব্রুগড়, আসাম)

উত্তর : আমাদের মতে প্রেমেন্দ্র মিত্র।

অমিতাভ মুখোপাধ্যায় (রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম, রহড়া)

প্রশ্ন : ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত কলকাতার প্রথম ডিভিসান ফুটবল লীগের সর্বোচ্চ গোলদাতার নাম ও গোল সংখ্যা জানতে চাই।

উত্তর :

১৯৬০	আপ্পালারাজু	(বি এন আর)	— ১৬টি গোল
১৯৬১	বলরাম	(ইস্টবেঙ্গল)	— ২৩ „ „
১৯৬২	মঙ্গল পুরকায়স্থ	(মোহনবাগান)	— ১৫ „ „
১৯৬৩	আপ্পালারাজু	(বি এন আর)	— ২৩ „ „
১৯৬৪	অসীম মৌলিক	(ইস্টবেঙ্গল)	— ২১ „ „
১৯৬৫	অশোক চ্যাটার্জী	(মোহনবাগান)	— ১৫ „ „
১৯৬৬	রাজেন্দ্রমোহন	(বি এন আর)	— „ „
১৯৬৭	পাপ্পানা	(মহামেডান)	— ২০ „ „

প্রশ্ন উত্তর

সুভাষচন্দ্র কুণ্ডু (বালিয়াপাতা, ঘুণ্টেশ্বর, বালেশ্বর)

প্রশ্ন : দূরের পাঠক হিসেবে আমি অনুরোধ জানাই যে, বর্তমান মরশুমে ফুটবল লীগ খেলার ফলাফল দয়া করে যদি খেলাধুলা বিভাগে প্রতি সপ্তাহে প্রকাশ করেন তাহলে বিশেষ উপকৃত হই। এছাড়া যে সমস্ত ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় অনুষ্ঠিত হয় তার স্কোর বোর্ড যদি ছাপার ব্যবস্থা করেন তাহলে বেশ ভালো হয়।

উত্তর : আপনার অসুবিধার বিষয়টি বেশ বুঝতে পারছি। কিন্তু জায়গার অভাব এতো বেশি যে, কি করে আপনার দাবি পূর্ণ করবো ভেবে পাচ্ছি নে। যাই হোক চেষ্টায় থাকলাম। দেখি শেষ পর্যন্ত কি করা যায়।

আর আপনার প্রশ্নটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। আপনি ভালো করে লিখে পাঠাবেন।

এই সপ্তাহে তিন প্রধানের খেলা

২৬শে জুন—মোহনবাগান : এরিয়ান্স
২৮শে জুন—ইস্টবেঙ্গল : মহামেডান স্পোর্টিং
৩০শে জুন—ইস্টবেঙ্গল : উয়াড়ী
১লা জুলাই—মোহনবাগান : বালী প্রতিভা
মহামেডান স্পোর্টিং : পুলিশ
২রা জুলাই—ইস্টবেঙ্গল : পোর্ট কমিশনার্স
৩রা জুলাই—মোহনবাগান : বাটা
৪ঠা জুলাই—ইস্টবেঙ্গল : খিদিরপুর
মহামেডান : জর্জ টেলিগ্রাফ
৫ই জুলাই—মোহনবাগান : রাজস্থান।

বিমলচন্দ্র রায় (শিলাপানি, গোয়ালপাড়া, আসাম)

উত্তর : সাধারণভাবে ডাকযোগে কিম্বা রেজিঃ পোস্টেও আপনি লেখা পাঠাতে পারেন।

বিশ্বরূপ সরকার (বীরনগর, রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর)

প্রশ্ন : আচ্ছা বলতে পারেন ইস্টবেঙ্গলের 'এ' দলে কতোজন খেলোয়াড় আছেন?

উত্তর : পারি না।

প্রশ্ন : আমি ফুটবল রাইট সাইডে খেলতে পারি, কিন্তু লেফট সাইডে খেলতে পারি না কেন? এমন বিমুখ কেন হলো, এটা কি কোন প্রবাদ?

উত্তর : প্রবাদ নয়, অপবাদ...!

সুধীর, চিন্ময়, কেশব ও বিজন (জেলিয়াপাড়া রোড, বদরতলা, কলকাতা—৪৪)

প্রশ্ন : ইডেনে কম্পোজিট স্টেডিয়াম প্রসঙ্গে বাংলা ক্রীড়াবিদদের মতামত প্রকাশ করার জন্যে অরুণবাবু এবং আপনাকে আমরা ধন্যবাদ জানালাম।

উত্তর : ধন্যবাদ। আপনাদের অপর প্রশ্নটির উত্তর বেশ কয়েকবার ছাপা হয়েছে, তাই আর উত্তর দিলাম না। আর প্রশ্ন-উত্তরের জন্যে পাতা বাড়ানো বোধহয় এখন সম্ভব হবে না।

সুকুমার সরকার (মারকনী এ্যাভিনিউ, দুর্গাপুর—৫)

উত্তর : এ বছরের উইসডেন এখনো কলকাতায় আসে নি। পরিচীয়তে বিভাগে অতীতের টেস্ট খেলোয়াড়দের জীবনী ক্রিকেট খেলার সময় প্রকাশ করার চেষ্টা করবো।

মিতান মুখোপাধ্যায় (আর বি ঘোষ রোড, খোসবাগান, বর্ধমান)

উত্তর : দ্রুততম অর্ধ সেঞ্চুরী করার রেকর্ড দুরানীরই—নিউজিল্যাণ্ডের রস টেলারের নয়।

পরিতোষকুমার নাগ (বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি)

উত্তর : ফুটবল খেলোয়াড়দের জীবনী প্রকাশ করা আরম্ভ হয়েছে দেখেছেন নিশ্চয়ই।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাপ্তাহিক বসুমতী

"অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী বহু রক্তপাত ঘটিয়ে অতঃপর মন্ত্রিসভা ছেড়ে বানপ্রস্থে যাওয়ার অভীপ্সা প্রকাশ করেছেন। অবশ্য যাওয়ার আগে মনের ঝাল মিটিয়ে যাচ্ছেন, তেলেংগানা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে. ....হাজতে চালান করে ব্রহ্মানন্দজী সমস্যাকীর্ণ রাজ্যের মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে এখন মানে মানে সরে দাঁড়াতে চাইছেন।"

৭৪ বর্ষ : ২য় সংখ্যা বৃহস্পতিবার, ১৪ই আষাঢ়, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [74 year, No. 2, 3rd July,

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৬৭
আজকের মানুষ		৬৮
সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	শঙ্করীপ্রসাদ বসু	৬৯
বই-বাছাই—বাংলা বইয়ের মেলা	হরপ্রসাদ মিত্র	৭২
ঢেউ ও ঢল (কবিতা)	অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত	৭৫
বঙ্গদর্শন		৭৬
ভারতদর্শন		৭৯
আন্তর্জাতিক		৮২
সপ্তাহের বোঝা	কৃত্তিবাস ওঝা	৮৪
রামরাজত্ব	উলুখড়	৮৬
ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন	শ্রীউৎফুল্ল রায়	৮৮

যে কোন
গয়না
আর
আসল
গ্রহরত্ন
কেনার
দক্ষিণ কোলকাতায়
নামকরা প্রতিষ্ঠান

ফোন: ৪৬-৬২৫৮

সন অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ডসন্স
এস. বি. সরকার

এ. সরকার এণ্ড সন্স
রাসবিহারী এভিনিউ

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	— অনন্ত সিংহ	৯০
মরম আরো কি তবে বাড়বে? (কবিতা)	— সত্যেন্দ্রনাথ বড়াল	৯৩
যুক্তফ্রন্ট সরকার অভিপ্রায়	— শ্রীসর্বদর্শী	৯৪
আজকের বিজ্ঞান	— ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	৯৭
রেসারেকশন (গল্প)	— অনিলকুমার দলুই	৯৯
তিমির প্রান্ত ভূস্বর্গ	— অগ্নিবর্ণ	১০০
সাগর সংগমে (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— সুশীল জানা	১০৮
মহানায়ক লেনিন (নাটক)	— অশোক সেন	১১৩
পাঠকমন		১১৭
রূপজগৎ		১১৯
খবর বলছি	— অশ্ববাহন	১২৩
খেলাধুলা	— শান্তিভ[illegible]	১২৪

সদ্য বেরিয়েছে ॥ বহুকাল পরে পুনর্মুদ্রণ ॥ নামমাত্র মূল্য

দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগ ঃ নীলদর্পণ। জামাই বারিক। বিয়ে পাগলা বুড়ো। নবীন তপস্বিনী। কমলে কামিনী।
২য় ভাগ ঃ সধবার একাদশী। যমালয়ে জীবন্ত মানুষ। পোড়া মহেশ্বর। কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ। লীলাবতী। সুরধুনী কাব্য। দ্বাদশ কবিতা। পদ্য সংগ্রহ। তৎসহ লেখকের জীবনী ও ভূমিকা।

(দুই ভাগে সম্পূর্ণ)

মূল্য প্রতি ভাগ চার টাকা।

বিদ্যারণ্য মুনি রচিত
বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ
মূল্য চার টাকা

স্তবকবচমালা
মূল্য আট টাকা

যোগশাস্ত্র
মূল্য পাঁচ টাকা

গিরায়ন
মূল্য তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা-১২

CENTRAL LIBRARY

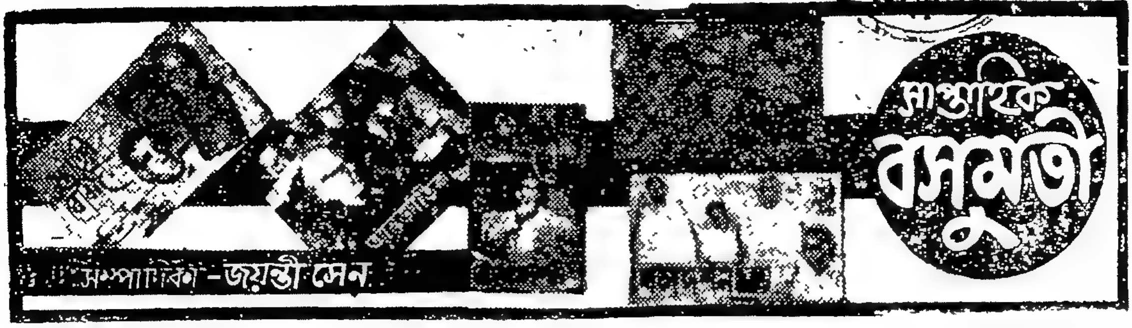

৭৪ বর্ষ ঃ ২য় সংখ্যা—মূল্য ঃ ৩০ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ১৮ই আষাঢ়, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 3rd July, 1969

খরা, বন্যা ও কলকাতায় সম্ভাব্য বন্যা

আষাঢ় এসেছে। বর্ষা এখনো পুরোদমে নামে নি। ইতিমধ্যে জলপাইগুড়ির অর্ধেক ভেসেছে। উত্তরবঙ্গের অবস্থা যে ঐ রকম হবে, তা অজানা থাকার কারণ নেই। গতবারের ভয়াল বন্যার পর উত্তরবঙ্গকে বাঁচাবার জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকারের উদ্যোগের অভাব না থাকলেও অর্থাভাবে ঐ অঞ্চলকে বন্যার জলে গ্রাসের হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। আশা ছিল, কেন্দ্রীয় সরকার সাহায্য দেবেন। যে উত্তরবঙ্গের কাছ থেকে প্রাপ্ত অর্থে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থাগারের মোটা অংশ পূর্ণ হয়, সেই অঞ্চলটিকে বন্যার গ্রাস থেকে রক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এখনো সদয় হস্ত সম্প্রসারণ করছেন না দেখে আমরা বিস্মিত হচ্ছি, সেই সংগে বেদনাহতও।

তবে আরো বেদনার ব্যাপার এই যে, উত্তরবঙ্গের বন্যায় বিপদপাতের কথা নতুন নয়। বহু জ্ঞাত এই বিপদকে দূর না করে, বিপদ উপস্থিত হলে তার জন্য কিছু আর্থিক সাহায্য দিয়ে ও শোকবার্তা পাঠিয়ে কি লাভ? তদ্দ্বারা কি জনসাধারণের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতির সাক্ষ্য পাওয়া যায়?

উত্তরবঙ্গে বর্ষার সূচনার সঙ্গে পার্বত্য নদীগুলিতে বন্যা দেখা দিলেও পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণাঞ্চল এখন শুকনো ঠা ঠা করছে। বিশেষত দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে নিদারুণ জলাভাব এবং দামোদর পরিকল্পনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করলেই চলে। আশা করি, রাজ্য সরকার ঐ অঞ্চলের মানুষগুলির তৃষ্ণা নিবারণের জন্য একটা স্থায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

এই তো হোল মোটামুটি গ্রাম বাংলার বন্যা ও খরার নিত্য নৈমিত্তিক কাহিনী।

এবার শহর কলকাতা পুরো বর্ষার সময় ডুববে—এমন আশঙ্কা অনেকেই করছেন। কলকাতার জল নিকাশের ব্যাপারে পৌরপিতারা স্থায়ী সমাধানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বরাবরই মুখে বলে আসছেন। কিন্তু প্রতিবারই কলকাতা ডুবতে ডুবতে শেষ পর্যন্ত ভেসে ওঠে এবং আমরা কলকাতা পৌরসংস্থার সুনাম কীর্তন করি। এবার বর্ষা নামলে সেই সুনাম কীর্তনের সুযোগটুকু আর হয়তো পাবো না। ইতিমধ্যে যে খবর প্রকাশ পেয়েছে তাতে মনে হয় যে, বর্ষার জল বের হবার সমস্ত পথ রুদ্ধ হয়ে গেছে। নামমাত্র যা বৃষ্টি হয়েছে তাতেই দেখা গেছে যে, কলকাতার কোনো কোনো অঞ্চলে জল জমে গেছে।

কলকাতার পৌরসংস্থা পরিচালনার ভার নাগরিকরা এবার দিয়েছেন যুক্তফ্রন্টের হাতেই। মেয়র শ্রীপ্রশান্ত সুর প্রশংসনীয় কাজও দেখিয়েছেন। এতোকাল ধরে পৌরসংস্থার শাসনে আসল কাজের পরিবর্তে যে ধরণের ফাঁকির কাজ হয়েছে, তার ফলে সত্যিকারের আসল কাজ কি হয়েছে—তা আর জানার বা বোঝার উপায় নেই। মোট কথা, এতো দিন ধরে নাগরিকদের কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় করাটাই ছিল পৌরসংস্থার মুখ্য কাজ, নাগরিকদের সুখ-সুবিধা দেখা ও তাঁদের স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করা শাসকপক্ষের দায়িত্ব ও কর্তব্যের অন্তর্গত ছিল বলে মনে হয় না। অথচ এই পৌরসংস্থার অধীনে রয়েছে বহু জনকল্যাণকর কাজের প্রধান দায়িত্ব। এবং ঐ সব জনকল্যাণকর কাজের সঙ্গে অসংখ্য নাগরিকের জীবন-মরণের প্রশ্ন জড়িত। কলকাতাকে সুন্দর করে তোলার কলরব যাঁরা তুলেছিলেন, তাঁরা প্রতিদিন কুৎসিত কর্মকাণ্ডে কলকাতাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গেছেন। আর সুন্দরী কলকাতার পরিকল্পনা যাঁরা করেছিলেন, তাঁরা তো কোনোদিন পৌরভবনের বাইরের দেয়ালের গা থেকে নগ্ন চিত্র ও বিকৃত রুচির পুস্তিকা বিক্রয় বন্ধ করতে পারেন নি। এ থেকেই বোঝা যায়, তাঁদের অভিরুচি কি ছিল।

থাক এসব কথা। কিন্তু কলকাতা বোধ হয় এবার ডুবছেই। বৃষ্টির জলে কলকাতার গা ধুয়ে দিয়ে যদি পুরাতন কলঙ্কগুলিকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তাতে বোধ হয় নাগরিকরা আনন্দিতই হবেন। কিন্তু সেখানেই কি শেষ? নাগরিকরাও যে এবার ডুববেন। তার আগে কলকাতার সাইরেন বাজলেও তাঁদের যাবার পথ কোথায়? তাই মেয়রের কাছে আমাদের অনুরোধ, এই মুহূর্তেই বর্ষাজনিত বৃষ্টির জল নিকাশের জন্য তিনি জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ করুন এবং পৌরপিতারা স্ব স্ব অঞ্চলে ঐ ব্যাপারে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন তা জেনে সমস্ত নাগরিকদের অবিলম্বে অবগত করান। নতুন মেয়র নতুন উদ্দীপনায় এগিয়ে এলে কলকাতা হয়তো সম্ভাব্য ভরাডুবি থেকে রক্ষা পাবে। আশা করি, যুক্তফ্রন্ট সরকারও নীরব দর্শক হয়ে থাকবেন না। মূলত গোটা পশ্চিমবঙ্গ রক্ষার ভার তো তাঁদের ওপরেই।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

একটা ভয়ানক কোন অস্বাভাবিক বা অভিনব কিছু না করলে বা না বললে রাতারাতি নাম কেনা শক্ত। আর এ-ব্যাপারে রাজনীতিকরা যে-সুবিধে ভোগ করেন, এমনটি বোধ হয় পৃথিবীর আর কেউ নয়। নতুন কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার করলে বিশ্বখ্যাতি জুটে যায় সত্যি, কিন্তু সে-আবিষ্কার বড় রকমের এবং মানবজীবন-সম্পর্কিত বা জনহিতকর না হলে খ্যাতিটা সংশ্লিষ্ট আবিষ্কারকের দেশের ভৌগোলিক সীমানার মধ্যেই সীমিত থাকে, কিম্বা বড় জোর সেই ক্ষেত্রের বিজ্ঞানী, ছাত্র বা আগ্রহী মানুষদের মধ্যে। কিন্তু রাজনীতি আজ মানুষের জীবনের ওপর তার এতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে যে, দেশের রাজনৈতিক সমুদ্রের জলে যদি কোন কারণে তরঙ্গোচ্ছ্বাস ঘটে, তবে তার দোলায় সাধারণ মানুষও আন্দোলিত হয়ে ওঠে। কীর্তিনিধি বিস্তা ঠিক সেরকমই এক উক্তি করেছেন যা ভারত-নেপালের রাজনৈতিক জগতে প্রবল আলোড়ন তুলেছে। শ্রীবিস্তা বলেছেন যে, ভারত-নেপাল সীমান্তের চেকপোস্টে এবং নেপালে যে ভারতের সামরিক প্রহরা এবং সামরিক প্রশিক্ষকবাহিনী রয়েছে তাকে প্রত্যাহার করে নেওয়া উচিত, ভারত-নেপাল চুক্তি বাতিল করা হোক ইত্যাদি।

শ্রীকীর্তিনিধি বিস্তা নেপালের প্রধানমন্ত্রী, কাজেই তিনি যা বলবেন সেটাই নেপাল সরকারের অভিমত বলে মেনে নিতে হবে, হলই বা প্রধানমন্ত্রী দাবিটা পার্লামেণ্টে করেন নি, করেছেন নেপালের ইংরাজী দৈনিক সংবাদপত্রের প্রতিনিধির কাছে। বলেছি, ভারত-নেপাল উভয় দেশেই শ্রীবিস্তার মন্তব্য ঝড় তুলেছে। ভারতের রাজনীতিকদের এ-উক্তি আহত, ক্ষুব্ধ করেছে। নেপালের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীহৃষীকেশ শাহর অভিযোগ, প্রধানমন্ত্রী এত বড় রাষ্ট্রীয় নীতির বিষয়টি পার্লামেন্টকে জানাবার আগে বাইরের সাংবাদিকের কাছে ফাঁস করে অধিকার ভঙ্গ করার অপরাধে অপরাধী হয়েছেন। তিনি নাকি ১৯৬৫ সালে ভারত-নেপাল চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে বলে জানতেন না।

এই সেদিন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীদীনেশ সিং নেপাল সফর করে এসেছেন, রাজা মহেন্দ্র এবং প্রধানমন্ত্রী বিস্তার সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্যমূলক আলোচনা এবং মত বিনিময় হয়েছে বলেও সংবাদপত্রে ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে। শ্রীদীনেশ সিং কাঠমাণ্ডুতে একাধিকবার এ-কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে, ভারত ও নেপালের মধ্যে বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। এবং সেদিন এই বিশেষ সম্পর্কটি কী, তা নিয়ে কোন প্রশ্ন ওঠে নি, কারণ সকলেই জানে কথাটা বর্ণে বর্ণে সত্য এবং প্রশ্নাতীত। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শ্রীবিস্তা আজ বলছেন যে, নেপালের সার্বভৌমত্বের বিনিময়ে কারো সঙ্গে কোনো 'বিশেষ সম্পর্ক' থাকতে পারে না, যেন ভারত নেপালের সার্বভৌমত্বে সন্দেহ প্রকাশ করেছে!

শ্রীকীর্তিনিধি বিস্তা

নেপালে শ্রীকীর্তিনিধির যথেষ্ট কীর্তি রয়েছে। তিনি শুধু কীর্তিনিধিই নন, গুণনিধিও বটেন। তাঁর গুণপনার পরিচয় পেয়েই নেপালের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ তুলসী গিরি একদিন তাঁকে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে হাজির করেছিলেন। অবশ্য খোদ নৃপতি মহেন্দ্রেরও আস্থা তিনি অর্জন করেছেন। রাজা মহেন্দ্র তাঁকে ১৯৬০ সালে প্রথম এক গুরুত্বপূর্ণ কাজের দায়িত্ব দেন, রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থার পরিদর্শন এবং তদারকীর ভার। সে-দায়িত্ব কীর্তিনিধি কৃতিত্বের সঙ্গে পালন করেছিলেন বলেই প্রধানমন্ত্রী ডঃ গিরি তাঁকে সহকারী শিক্ষামন্ত্রীর পদ দিয়ে তাঁর জীবনের গতিতে মোড় ফিরিয়ে দেন। বহু শক্ত এবং গুরুত্বসম্পন্ন কাজ দিয়ে শ্রীবিস্তার কর্মদক্ষতা, বুদ্ধি এবং উদ্যোগের পরীক্ষা করা হয়েছে, সুচতুর তরুণ প্রতিবারই তাতে সাফল্য অর্জন করেছেন।

তাই এই করিৎকর্মা লোকটির পদোন্নতি ঠেকানো যায় নি, যায় নি বেশিদিন তাঁকে ক্যাবিনেটের বাইরে রাখা। মন্ত্রিসভাতেও একটার-পর-একটা দপ্তর দিয়ে তাঁর বিচক্ষণতা ও কর্মনৈপুণ্যের পরখ করা হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৬৭ সালে ক্যাবিনেটের দুনম্বর (উপ-প্রধানমন্ত্রীর) পদে পর্যন্ত ঠেলে উঠেছেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, অথচ রাজনীতি করেন—এমন নিস্পৃহ, দার্শনিক মনোভাবাপন্ন রাজনীতিক কজন আছেন? যতজনই থাকুন কীর্তিনিধি বিস্তা সে-দলের দলী নন। রাজতন্ত্রের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার শীর্ষে ওঠার যখন বিস্তার মাত্র একটি ধাপ বাকি, তখন যেন প্রধানমন্ত্রী থাপার চৈতন্যোদয় হল, তিনি বিস্তার রাশ টেনে ধরতে চাইলেন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ তুলসী গিরির সঙ্গে তিনি কীর্তিনিধিকেও গ্রেপ্তার করালেন, তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলেন রাষ্ট্র-বিরোধী কার্যকলাপের।

কিন্তু যেখানে রাজাই সর্বেসর্বা এবং মন্ত্রিসভা কেবল গণতন্ত্রের ঠাট বজায় রাখার জন্যে নিযুক্ত, সেখানে রাজার আশীর্বাদধন্য কীর্তিনিধিকে জেলে পচাবার ক্ষমতা রাখে কোন্ সরকার? শ্রীবিস্তাকে মুক্তি দিলেন রাজা মহেন্দ্র এবং শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রীর পদ দিয়ে তাঁর কারাভোগকে পুরস্কৃত করলেন।

একথা ঠিক যে, শ্রীবিস্তার খ্যাতি আছে উদারনীতিক বলে। বিরোধী এবং তরুণদের মতামত তিনি ধৈর্যের সঙ্গে শোনেন, তাঁদের কাছে পরামর্শ চাইতেও তিনি কুণ্ঠাবোধ করেন না। সবচেয়ে বড় কথা, শ্রীবিস্তা রাজা মহেন্দ্রের খুবই বিশ্বাসভাজন, রাজা জানেন যে, বিস্তা তাঁর সীমানা সম্পর্কে সচেতন। অর্থাৎ বিস্তা প্রধানমন্ত্রিত্ব পেয়েই খুশি, কখনই তিনি রাজতন্ত্র উচ্ছেদের বা সরকারের জন্যে অধিকতর ক্ষমতার দাবি করবেন না।

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

হরিপুরা ভাষণ : মূল্যবান দলিল—(৩)

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকাগুলির মধ্যে লখনৌ-এর (আগে ছিল এলাহাবাদে) 'পায়োনীয়ার' সবচেয়ে খেঁকি। তার ফলে পত্রিকাটির পেট থেকে আসল কথাটা সহজেই বেরিয়ে আসত ক্রুদ্ধ চীৎকারের সঙ্গে। এইকালে শাসক ইংরাজস্বার্থ এবং দেশীয় জমিদারস্বার্থ, উভয়ের অতিবড় সমর্থক ছিল কাগজটি। সুতরাং সে ভারতীয় জাতীয়তার নিতান্ত শত্রু, বিশেষত সেই জাতীয়তার সঙ্গে যদি বামপন্থা ও সমাজতন্ত্র যুক্ত থাকে। এক্ষেত্রে সুভাষচন্দ্র বলাই বাহুল্য, এর এক নম্বর শত্রু। সেকথা পত্রিকাটি গোপন করতও না। সুভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতিপদে নির্বাচিত হওয়া মাত্র পত্রিকাটি আর্তনাদ তুলেছিল। *The New Congress President* (Jan. 20) নামক সম্পাদকীয়তে যদিও গোড়ার দিকে সুভাষচন্দ্রের নির্বাচনকে তুচ্ছ করবার চেষ্টা করে বলা হয়েছিল, এটি ভারতবর্ষের পক্ষে বিশেষ অর্থপূর্ণ কিছু নয়, এতে শুধু বাংলার কংগ্রেসীরা খুশি হবে, কিন্তু তার পরেই সুভাষচন্দ্রের নির্বাচন কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ তা প্রতি লাইনে প্রকাশিত আশঙ্কায় ফুটে উঠেছিল। প্রাদেশিক মন্ত্রিত্ব গ্রহণের বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্রের মনোভাবই এই পত্রিকাটির ঘৃণা ও বিরক্তির আশু কারণ, যারা পিছনে ছিল সুভাষচন্দ্রের ফেডারেশন বিরোধিতা। বৃটিশ স্বার্থবাহী সংবাদপত্রগুলি তখন ফেডারেশনের পক্ষে জোর প্রচারকার্য চালাচ্ছে, ভারতীয় জাগ্রত জাতীয়তার শ্রেষ্ঠ প্রতিষেধক তখন তাদের কাছে বিভাগজনক ফেডারেশন পরিকল্পনা, সেই সঙ্গে তারা মন্ত্রিত্ব-মহিমাও প্রচারে ব্যাপৃত, কারণ তারা ভেবেছিল, একবার মন্ত্রিত্বরস মন্দ হলে সে-ব্যাপারে ব্রহ্মচর্য প্রায় অসম্ভব ব্যাপার, আর, প্রাদেশিক মন্ত্রিত্বের যমজ-কন্যাটি হল ফেডারেশন। সুভাষচন্দ্রের উপর প্রাদেশিক স্বার্থবুদ্ধি যথেষ্ট পরিমাণে আরোপ করে পত্রিকাটি বোঝাবার চেষ্টা করেছিল, সুভাষচন্দ্র যে প্রদেশের অধিবাসী সেই প্রদেশে যেহেতু কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা কায়েম হয় নি, তাই তিনি চাইবেন কংগ্রেস যেন অন্যত্র মন্ত্রিত্ব না নেয়। বাংলাদেশে মুসলিম লীগ-প্রজা পার্টি কোয়ালিশনে হক মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে, তার বিরোধিতা করতে গিয়ে সুভাষচন্দ্র সাম্প্রদায়িক মনোভাব দেখাবেন, এমনও লেখা হয়েছিল।

ঐ সম্পাদকীয়টির সবচেয়ে চমৎকার অংশ সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে জহরলালের তুলনা, যার মধ্যে জহরলালের উদার দৃষ্টিভঙ্গি, মতবিরোধের ক্ষেত্রে স্বমত ক্ষুণ্ণ করে অপরের কাছে নতিস্বীকারের মহিমা বিশেষ প্রশংসালাভ করেছিল। জহরলালের তুলনায় সুভাষচন্দ্রের মানস গঠন এমনই বজ্র-কঠিন যে, ইচ্ছামত তা নমনীয় হয় না। রচনাংশটি আমরা উদ্ধৃত করছি, পাঠক লক্ষ্য করবেন, তার বিপুল নিন্দার মধ্যে থেকে সুভাষচন্দ্রের চরিত্রশক্তি কী বিপুল গৌরব লাভ করেছে।

"Like the retiring President, Mr. Subhas Chandra Bose is a Socialist with this difference that he has been less emenable to Mahatma Gandhi's influence than Pandit Jawaharlal Nehru, both of whom were members of the Independence for India League and on one occasion offered to resign when they found their ideals in conflict with Congress policy. Then again, both looked with disfavour on the Gandhi-Irwin Pact of 1931, but while Pandit Jawaharlal Nehru was persuaded to sign it, Mr. Bose refused point blank. These are incidents of the past but they go to show that the President-designate is not open to conviction once he has made up his mind. In fairness to Pandit Jawaharlal Nehru it must be admitted that his weakness or strength (by whatever name it may be called) has been governed partly by a desire to subordinate his views to the views of the majority and partly because he has a wider outlook, and the capacity to rise superior to the exigencies of the moment. Mr. Bose's views have also mellowed with time but his mental make-

up is a confusion of socialism and fascism—a totalitarian socialism !"

সবশেষে পত্রিকাটির ভবিষ্যদ্বাণী, যা প্রায় দৈববাণী—

"The year will also very probably see a split between the Right and the Left Wing of the Congress."

যে 'পায়োনীয়ার' সুভাষচন্দ্র সভাপতি হওয়া মাত্র এই ধরণের মনোভাব দেখিয়েছিলেন, কয়েক মাসের মধ্যে সে মনোভাব তাঁর সভাপতি-ভাষণের উপর মন্তব্য করতে গিয়ে বদলে যাবে, এমন হওয়া সম্ভব নয়, বদলাতে পারত যদি 'পায়োনীয়ার' বা সুভাষচন্দ্র, কোনো একের আমূল পরিবর্তন ঘটত। সুতরাং সুভাষচন্দ্রের ভাষণ, যা অপর অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান কাগজগুলির কাছে অংশত প্রশংসাযোগ্য ও ক্ষেত্র-বিশেষে চিন্তাসমৃদ্ধ মনে হয়েছিল, তা এই কাগজটির জনৈক পত্রলেখকের মতে একেবারেই মৌলিকতাহীন। উক্ত পত্রলেখক (আতাহার হোসেন) সুভাষচন্দ্রের ভাষণের মধ্যে তাঁর দীর্ঘ ইউরোপবাসের কোনো প্রভাবই দেখতে পান নি, সেখানে শুধু আছে রাশিয়া, আয়ারল্যাণ্ড ও তুরস্কের প্রভাব (ঐ দেশগুলি অবশ্যই ইউরোপের বহির্বর্তী !!)।

সুভাষচন্দ্রের ভাষণের উপরে 'পায়োনীয়ার' দুটি সম্পাদকীয় লিখেছিল—২০শে ফেব্রুয়ারীতে *The New Broom* এবং ২২শে ফেব্রুয়ারীতে *The future of Congress.* রচনা দুটির মধ্যে ছিল মন্ত্রিত্ব সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের বিরূপ মনোভাবের কঠোর নিন্দা, আর নিতান্ত বিস্মিত ঘৃণা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অন্তিম দশা সম্বন্ধে তাঁর উল্লসিত ভবিষ্যদ্বাণীর জন্য। অশুভ অসহ্য লোকটি সম্বন্ধে সম্পাদকীয়টি শুরু হয়েছিল এই বলে—

"Mr. Subhas Bose has assumed the reins of the Congress Presidentship under auspices which must seem ominous to most persons within the Congress and to every-one outside it. His Presidential address ...does not show any promise of states-manship."

'স্টেটসম্যানশিপ' বস্তুটা সুভাষচন্দ্রের নেই, কিন্তু অবশ্যই আছে জহরলালের, ব্যবহারিক বিবেচনাবুদ্ধি যাঁর আদর্শের কর্ণধার।

"Mr. Bose begins with a survey of international politics... but unlike Pandit Nehru he does not hesitate to pervert history to suit his conclusions. Empires have crumbled away before. Will the greatest of them share their fate? This question has been often asked and variously answered. Mr. Bose's conclusion, the British Empire can survive only as a federation of free nations, is by no means a new [illegible]. But his assertion that this will be possible only if Britain becomes a socialist state is a tribute to his faith in that political doctrine rather than to his political intelligence."

সামরিক দিক থেকে ইংরেজদের সর্বনাশ-সম্ভাবনার দিকে সুভাষচন্দ্র দৃষ্টি আকর্ষণ করে গান্ধী-প্রেম-নীতি থেকে কতখানি সরে গিয়েছিলেন, সাম্রাজ্যস্বার্থের সংরক্ষক পত্রিকাটি তা দেখিয়ে দিতে ভোলে নি।

"Mr. Bose's enunciation of the future of Congress policy is not consistent with Mahatma Gandhi's desire for permanent friendly relations with Britain. There is open exultation at the fact that modern armament has destroyed the supremacy of the British navy and brought London within striking distance of hostile aircraft."

এসব ক্ষেত্রেও নয়, 'পায়োনীয়ার' অস্থির হয়ে ছটফট করেছিল সুভাষচন্দ্রের অন্য বক্তব্যে। সোস্যালিস্টদের কংগ্রেসের মধ্যে সঙ্ঘবদ্ধ হতে আহ্বান জানিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র, ট্রেড ইউনিয়ন ও কিষাণসভার প্রতিও তাঁর আশীর্বাদ। এদের কংগ্রেসে নেওয়া ভাল। 'কেমন ভাল? রাশিয়ায় যেমন ভালটি হয়েছিল, যখন বিপ্লবের সময়ে শ্রমিক ও সৈন্যরা একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কী ভয়াবহ! 'পায়োনীয়ার' জানত এবং ভারতবর্ষের রাজনীতি-সচেতন মুষ্টিমেয় মানুষমাত্রে জানত, ব্যাপক জনপ্রিয়তা এবং আপোষ-বিরোধী মন নিয়ে সুভাষচন্দ্র যদি সমাজ-তন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়েন—ভারতবর্ষ সমাজতান্ত্রিক সত্যই হয়ে যাবে। সেই সম্ভাবনার শিহরণ 'পায়োনীয়ারের' লেখায়—

"Mr. Subhas Bose has given his blessings to the Congress Left Wing with Socialism as its *raison de' etre*. He is also of opinion that the Trade Union Congress and Kisan Sabhas "which have been causing worry and embarrassment to many of us" will continue to exist whether the Congress High Command likes it or not. He suggests that they should not "appear as a challange to the Congress", but should deal primarily with the economic grievances of the workers and peasants. He quotes the Russian example, where the peasants and workers dominated the Revolution, and the British, where the Trade Union Congress exerts a moderating influence on the Labour Party, and appears to favour the former. These are two obvious fallacies in his reasoning. In the

first place, Kisan Sabhas, labour organisations and the Congress Socialist Party are not mutually exclusive bodies. If the last named is given freedom to propagate socialism it is inevitable that its members will work through the Sabhas and Unions, and so long the main body of the Congress is not in a favour of a Socialist programme, their propaganda must be hostile. This is, in fact, what has been happening. As it stands today, it is Congress Governments who are attempting to redress immediate grievances while peasant and labour leaders are preaching abolition of landlords and capitalists and overthrow the present social order."

কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতাদের উদ্দেশ্যে এই পত্রিকার চরম সতর্কবাণী :

"Of those in power within the Congress do not now realise that they and the Socialists are at the parting of the ways, the day is not far off when the latter will have taken entire possession of the Party organisation."

অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকাগুলির বক্তব্যকে গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করেছি, কারণ এইসব বিরোধী রচনা সমকালে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী মহলে সমাদৃত না হলেও এদের ভিতর থেকে শাসকসমাজের মানসিক প্রতিক্রিয়ার চেহারা বুঝে নেওয়া যায়, এবং সেইজন্য ঐতিহাসিকভাবে এগুলি মূল্যবান।

প্রসঙ্গ শেষে কিন্তু একটি শ্রেষ্ঠ ভারতীয় পত্রিকার বক্তব্য উত্থাপন করছি। বুদ্ধিজীবীমহলে তখনো রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের মডার্ন রিভিউয়ের (প্রবাসীরও) যথেষ্ট সমাদর। হরিপুরা-ভাষণ সম্বন্ধে এই পত্রিকার কিছু মন্তব্য আগে উল্লেখ করেছি। সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে যে আশঙ্কা অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকাগুলি প্রকাশ করেছিল, তা অবশ্য মডার্ন রিভিউয়ের থাকার কথা নয়, কিন্তু যেহেতু ভারতীয় রাজনৈতিক মহলে ধারণাগত অস্পষ্টতা দূর করতে এই পত্রিকাটি সদাই সচেষ্ট, তাই সুভাষচন্দ্রের প্রস্তাবিত সমাজতন্ত্র কোন্ রূপ নিয়ে ভারতীয় রাজনীতিতে পতিত হবে, তা না খুলে ধরে পারে নি। স্বাধীনতার পরে সমাজতন্ত্রের প্রবর্তন হবে, সুভাষচন্দ্র এইটুকু বলেছিলেন, কিভাবে তা প্রবর্তিত হবে, প্রবর্তনের জন্য কি কি করা দরকার হতে পারে, তিনি সব জানতেন, কিন্তু সেইকালে তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার প্রয়োজন মনে করেন নি, কেন না তা করতে গেলে অকালে চোখের রোগ ও মনের রোগ ঘটবে। মডার্ন রিভিউ কিন্তু সুভাষচন্দ্রের অকথিত বক্তব্যকে স্পষ্ট প্রশ্নের আকারে তুলে ধরেছিল—

"Mr. Bose says that when national reconstruction takes place, it is the "Have nots" who will benefit at the expense of the "Haves". The "Haves"—the landlords, the capitalists, etc.—are the economic and occupational minority. There is to be no attempt at any agreed solution with this minority, for the Socialists among Congressmen appear to believe that human nature in India is different from that in the West and therefore no war between fascism and socialism need be apprehended in India. Or perhaps Indian socialists anticipate such a war—some among them may even be eager for the fray and may be willing to participate such a class-war. But what then would be the place of non-violence in the scheme of "national reconstruction" "on socialistic lines" "after the capture of political power" by the Congress ? Those whose homage to non-violence is not lip-homage should be able to answer.' (M. Review, March, 1938).

বিচক্ষণতা ও ইতিহাস-সচেতনতার জন্য সুপরিচিত মডার্ন রিভিউ সুভাষচন্দ্রের হরিপুরা-ভাষণের মৌলিকতার বিষয়ে যে সংযত প্রশংসা করেছিল, কংগ্রেস সভাপতিদের অতীত ভাষণগুলির সঙ্গে তুলনায় সুভাষচন্দ্রের অগ্রগামী চিন্তাগুলির উল্লেখ করেছিল, সেই বিষয়গুলি সুভাষচন্দ্রের প্রগতিশীলতা ও আধুনিকতার অভ্রান্ত প্রমাণ—

"So far we are aware no previous speaker has attained the policy or policies to be adopted after severance of the British connection, considered who will rule after freedom has been won, sketched out a plan of socialistic reconstruction, described the function of the Working Committee as the shadow Cabinet of independent India, stressed the great importance of educating and training a Volunteer Corps, and emphasised the urgency of developing internation cultural and commercial contacts."[18]

সত্যই যদি সুভাষচন্দ্র উপরের বিষয়গুলির প্রয়োজনীয়তা কংগ্রেস সভাপতিগণের মধ্যে প্রথম উল্লেখ করে থাকেন, তাহলে মনস্বিতাতেও যে তিনি সভাপতিগণের মধ্যে প্রথম সারির তাতে সন্দেহ থাকে না।

[ক্রমশ]

হরপ্রসাদ মিত্র

বই-বাছাই বাংলা বইয়ের মেলা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

আমার এই চতুর্থ চিন্তাটিই—অর্থাৎ আলোচনার এই গৃহীত রীতি বা ভঙ্গির উপযোগিতা সম্বন্ধে বিচার-বিতর্ক বেশ অনেকক্ষণ চলেছিল। সে আমাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। কাজে-কাজেই সে-সবের প্রত্যেকটি সূত্র এখানে বিশদভাবে উল্লেখ করা বাহুল্য মনে হবে। এখানে 'বই-বাছাই'-এর এই 'পূর্বকথা' জানাতে গিয়ে সেই তর্ক-বিতর্কের কেবল প্রধান কয়েকটি প্রসঙ্গই বলে বলে নেওয়া যাক্।

আনন্দ বলেছিল—শুধু প্রমথনাথ বিশী এবং অন্নদাশঙ্কর রায়ই নন,—আরো কেউ কেউ এ-রীতি মেনেছেন। সে-সব লেখকের এবং তাঁদের বইয়ের বা প্রবন্ধ-নিবন্ধের নাম তোমার এই বাছাইয়ের কাজে যথাসময়ে দেখা দেবে, জানি। কিন্তু এ-কাজে নামবার আগেই একবার ভেবে নেওয়া ভাল যে,—ঠিক এই নাম বা এই পরিকল্পনা ব্যবহার না করলেও ইতিপূর্বে যাঁরা এইরকম আস্বাদনের কিছু-না-কিছু দায়িত্ব নিয়েছিলেন, নিজের নিজের আদর্শ সম্বন্ধে তাঁরা কী কী বলে গেছেন।

এই প্রস্তাবটি শুনেই আমার মনে একযোগে অনেকগুলি নাম দেখা দেয়। সব সময়ে ঠিক বাংলা বইয়ের প্রসঙ্গে না হলেও সাধারণভাবে আমাদের সাহিত্য সম্বন্ধে এঁরা এক-একজন এক-একরকম ব্যাপার দেখে গেছেন—যেমন, পূর্ণচন্দ্র বসু তাঁর একটি বাংলা প্রবন্ধে দেখিয়েছিলেন যে, 'বিলাতী-সাহিত্যে' অভিশাপ নেই, কিন্তু 'আর্য' সাহিত্যে' তা বিদ্যমান। একজন বলেছিলেন 'অভিমান' ব্যাপারটিও সেই-রকম। ওটি বাংলায় আছে, ইংরেজিতে নেই। উপন্যাসের কথা-প্রসঙ্গে দেবেন্দ্রবিজয় বসু ১৩০১ সালের 'নব্যভারত' পত্রিকায় লেখেন যে, বিলাতী উপন্যাসের সঙ্গে বাংলা উপন্যাসের পার্থক্যের একটি বড়ো কারণ হোলো 'হিন্দুর ধর্মভাব'। তাঁর সেই প্রবন্ধে 'হিন্দু' শব্দটির অসংখ্য পুনরাবৃত্তি দেখে একালের ধর্মনিরপেক্ষ পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রের বাঙালী নিশ্চয় ঈষৎ কৌতুকবোধ করবেন,—তবে পাঠকদের মধ্যে যাঁরা একটু সহজেই উত্তেজিত হন, তাঁরা সে-প্রবন্ধে মধুসূদন সম্বন্ধে তাঁর একটি মন্তব্য পড়লে যে বেশ একটু আহত হবেন, সে-আশঙ্কাও ভিত্তিহীন নয়। আস্বাদন যে দেশ-কাল নিরপেক্ষ ব্যাপার নয়, সেই দিকটির উদাহরণ হিসেবেই সে-কথা এখানে উল্লেখ করা হোলো,—হয়তো না উল্লেখ করলেই ভাল হোতো,—যাই হোক্, তিনি যা বলে-ছিলেন তা এই—

> 'যে কবি-শিল্পী সাধু ও পূজনীয়, তিনি তাঁহার কবিত্ব-শক্তির সদ্ব্যবহার করেন—তাহার দ্বারা উচ্চ ideal বা আদর্শ সৃষ্টি করিয়া আমাদের নানারূপ বৃত্তির স্ফূর্তি ও উন্নতির চেষ্টা করেন। কিন্তু যে-কবি-শিল্পী অসাধু, তিনি তাঁহার শক্তির অপব্যবহার করেন—তাহার দ্বারা আমাদের মোহিত করিয়া পদস্খলিত করাইতে চেষ্টা করেন।'

এ-পর্যন্ত কথাটি মন্দ নয়। কিন্তু সাধু-অসাধু লেখক-বাছাইয়ের ফল কী দাঁড়ালো, দেবেন্দ্রবিজয়ের এই প্রবন্ধের পরবর্তী একটি বাক্য তুলে দেখালেই তা বোঝা যাবে। তিনি লিখে গেছেন—

> 'আমাদের মাইকেল এত বড় কবি হইলেও কালে এই কারণেই, তাঁহার সিংহাসন অনেক নিম্নে স্থাপিত হইবে।'

দেবেন্দ্রবিজয়ের এই প্রবন্ধ মাত্র পঁচাত্তর বছর আগের ঘটনা। মানুষের বিচারবুদ্ধি যে দেশকাল-নিরপেক্ষ ব্যাপার নয়,—মধুসূদন রাবণকে 'গ্র্যান্ড ফেলো' মনে করতেন বলে তিনি তাঁর মৃত্যুর অনেকদিন পরেও যে তাঁর স্বদেশবাসী পাঠকের এইরকম বাছাইয়ে কতকটা বাতিল হয়ে গিয়েছিলেন,—একথা তো তারই নজীর।

এঁরা কেউই তথাকথিত রম্যভঙ্গিতে বলেন নি, পুরো-পুরি সমালোচকের ভঙ্গিতেই কাজে নেমেছিলেন। অতএব একথা ঠিক নয় যে, সমারোহময়ী ভঙ্গিতে লিখলেই তা সমালোচনা হবে—এবং সমারোহ ছাড়া সমালোচনা হয় না। আসল কথা, চাই শান্ত মন এবং আন্তরিক উদ্যম। নিজের নিজের দেশ-কাল-অভিরুচির সীমা তো থাকবেই। মধুসূদন সম্বন্ধে সেকালের,—এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে একালেরও বাঙালী পাঠক-মনের বাধা বোধগম্য বটে, কিন্তু পাঠক তাঁর যে অভিমত জানাবেন, সে-অভিমত সংকীর্ণ কোনো কালের প্রতিধ্বনিমাত্র হয়ে পড়লেই এ কাজে সত্যিকার অস্বস্তি-বোধ শুরু হয়।

আনন্দ বলেছিল—সে যাই হোক্, দেবেন্দ্রবিজয়ের আদর্শ এ থেকে কতকটা বোঝা গেল। পাঠক-সমাজের, তথা সমালোচকদের এই আদর্শ-বৈচিত্র্যের দিকটি দেখে নেওয়া দরকার আর দু'একজনের কথা মনে পড়ে?

—মনে পড়ে ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্যের কথা। বিহারী-লালের 'বঙ্গসুন্দরী'র কথাপ্রসঙ্গে তিনিও মনে মনে

যাছাইয়ের কাজে যে নিযুক্ত ছিলেন, সে-কথা তাঁর এই প্রবন্ধটিতেই ব্যক্ত হয়। 'এডুকেশন গেজেটে' তিনি লেখেন—

> দশ-এগারো বৎসর হইল মেঘনাদবধ ও তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্যের রূপে ভারতী দেবী বঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সেই যুগে জনগণের নিকট বিশিষ্ট পূজ্য হইয়াছে বলিয়া মহারব উঠিয়াছিল, কিন্তু মধ্যে মধ্যে সেই মূর্তির যে প্রকার বিকৃত অনুকরণ দেখিতেছিলাম, তাহাতে বঙ্গসমাজে ভারতী দেবীর আন্তরিক পূজা লাভ বিষয়ে আমাদিগের বিলক্ষণ সন্দেহ ছিল। এই হেতু আমরা নব নব গ্রন্থ প্রচার বিষয়ে সচকিতনেত্র ছিলাম......

আনন্দ বললে—নব নব গ্রন্থবিষয়ে সচকিতনেত্র থাকাটা কিন্তু তোমার এই আলোচনার প্রধান কাজ নয়। সেজন্যে তো দেশের অসংখ্য সাময়িক পত্রিকার আলোচকরা চেষ্টা করছেন। 'গ্রন্থমেলা', 'গ্রন্থবার্তা', 'গ্রন্থ-পরিচয়', 'সাহিত্য-জগৎ' —এসব শিরোনাম কে না জানেন? যাই হোক্, ক্ষেত্রনাথেরও মনের আবহাওয়াটা বোঝা গেল,—কিন্তু তিনি কোন্ আদর্শের পক্ষপাতী ছিলেন?

আমি ক্ষেত্রনাথের প্রবন্ধ থেকে পড়ে শোনালুম—

> 'কোন নূতন বা পুরাতন সাহিত্যগ্রন্থের গুণাগুণ বিবেচনা করিতে হইলে কোন কোন লোকে আপাতত তাহার ভাষার রচনার পরীক্ষা করেন। পূর্বে এই প্রথাটি অতি বলবৎ ছিল; এক্ষণে লজ্জা বা অন্য কোন কারণবশতই হউক এই প্রথাটি ক্রমশ পরিত্যক্ত হইতেছে। এক্ষণে অধিকাংশ লোকে বিচার্য গ্রন্থের ভাবকলাপের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন। বিচার-পদ্ধতির এই পরিবর্তনটি শুভকর ও উন্নতিশীল বটে; কিন্তু এতদ্ব্যতীত আরও কিছু পরিবর্তন আবশ্যক।'

আনন্দ বলেছিল—থাক্, থাক্—আর পড়তে হবে না।

আমি জিগেস করলুম— বিরক্ত হলে নাকি?

সে বললে—আমার বিরক্তির কথা আমি ভাবি না, কিন্তু তোমার পাঠক-পাঠিকা এই ধরনের বচন শুনতে চাইবেন বলে মনে হয় না। এসব কথা বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের ক্রমগতির প্রকৃতি দেখিয়ে দেবার খুবই মামুলি চেষ্টামাত্র। আমাদের পাঠককৃত্য বলতে যা বোঝায়, তাতে কোন্ অবস্থায় 'ভাষার রচনার পরীক্ষা'ই ছিল প্রধান লক্ষ্য, কোন্ অবস্থায় 'ভাবকলাপের' দিকে নজর গেছে—এসব কোনো ভবিষ্যৎ আদর্শের ইঙ্গিত নয়। ভাষা আর ভাব কখনো আলাদা করে ভাবা যায়?

আমি বললুম—তা ভাবা উচিত নয়, বটে—কিন্তু মামুলি চেষ্টা বলে এই উদাহরণটি উপেক্ষা করা ঠিক হচ্ছে না। ক্ষেত্রনাথ কিঞ্চিৎ সমারোহের সঙ্গে বলেছেন বলেই তাঁর আয়োজনটি মনে ধরছে না বোধ হয়,—কিন্তু তিনিও একটি আদর্শের ইশারা রেখে গেছেন।

এই বলে ক্ষেত্রনাথের আর একটি বাক্য পড়ে শোনালুম—

> যেমন পরিধেয় অলংকারের শিল্পকবিতা বিষয়ে বিচার করিতে গিয়া আমাদিগের তদুপকরণ সমুদয়ের পরস্পর ও সর্বসাকল্য সম্বন্ধে যথাযোগ্যতার বিচার করা উচিত; তেমনি গ্রন্থবিশেষের গুণাগুণ বিচার করিতে হইলে কেবল তদন্তর্গত ভাবের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া গ্রন্থের সমুদয় অবয়ব পর্যন্ত দৃষ্টি চালনা করা কর্তব্য।

আনন্দ বললে—হাঁ, বোধগম্য হোলো। কিন্তু 'শিল্প-কবিতা' একটি উৎপীড়ক শব্দ। ওরকম শব্দের ত্রিসীমানায় যাওয়া উচিত নয় কখনো।

—কিন্তু শব্দ সম্বন্ধে বেশি খুঁৎখুঁতে ভাব,—বাক্যের গঠন সম্বন্ধে কেবলমাত্র আমাদের আপনকালের ছাঁচেই আস্থা —এরকম ঘটলে তো পুরোনো পর্বে হাঁটাই যাবে না।

—হাঁটা উচিত, হাঁটবে বৈ কি,—কিন্তু 'শিল্পকবিতা', 'চিরযৌবনী', 'প্রতিষ্ঠ', 'ভাবোন্মার'—এইসব শব্দ শুনলেই মনে হয় না-জানি-কী গম্ভীর ব্যাপার। দ্যাখো—'শিল্প-কবিতা' কথাটা পুরোপুরি নিরর্থক। সেকালের পাঠক হয় উদাসীন ছিলেন, নয় তো সহিষ্ণু। তাঁরা এসব প্রয়োগে আপত্তি করতেন না। একালের মেজাজ অন্য রকম। অক্ষয়-চন্দ্র সরকার লিখেছিলেন—ঈশ্বর গুপ্তের ভাষা চিরদিনই চিরযৌবনী'! ওর চেয়েও অদ্ভুত কথা দ্বিতীয় আর-কিছু শুনি নি যে তা নয়, কিন্তু ওটা বাজে কথা। মনে রেখো, পাঠকরা বেশি কথা যদিও বা সহ্য করেন, বাজে কথা মোটেই নয়।

—কিন্তু এসব প্রয়োগ যে-কালে চলতো, সেই বিশেষ সময়ের ভাষা মেনে নেওয়া ছাড়া উপায়ান্তর কী?

—সে আমি বুঝি। তোমার সঙ্গে এ-বিষয়ে আমার কোনো মতভেদ নেই। কিন্তু এই ধরনের উদ্ধৃতি ব্যবহার করে এগুলে তোমার লক্ষ্যে পৌঁছোনো দুঃসাধ্য হবে। দেবেন্দ্রবিজয়, ক্ষেত্রনাথ, অক্ষয়চন্দ্র—এঁরা সমালোচক ছিলেন বটে, কিন্তু একালের সমালোচকের পক্ষে এঁদের চেয়ে অনেক বেশি ভাষা-সচেতন হওয়া দরকার।

আনন্দ বললে কাজটা শক্ত বলেই 'শিল্পকবিতা' শব্দটা ধরে তোমাকে আমি সাধারণভাবে আবার সতর্ক করে দিলুম। যাই হোক্, অনেকক্ষণ সেকালের সমালোচকদের কথা হোলো —এইবার অপেক্ষাকৃত আধুনিক একজনের কথা বলি। নলিনীকান্ত গুপ্তের 'রূপ ও রস' বইখানি ১৩৩৫ সালে বেরিয়েছিল। সে-বইয়ের একটি প্রবন্ধের নাম ছিল 'সমালোচনার সার্থকতা'। নলিনীকান্ত তাঁর সেই প্রবন্ধে লেখেন—

> সমালোচনার যে আসল সার্থকতা তাহা স্রষ্টার সম্পর্কে নয়, তাহা হইতেছে সাধারণের সম্পর্কে আর ছোট ছোট কারিগরদিগের সম্পর্কে। সুন্দর জিনিসকে চেনা, উপভোগ করা সকলে সহজেই পারে না।

আনন্দ আবার ভেতরে ভেতরে উদ্বিগ্ন হয়ে বললে—তুমি-ই কি তা পারবে?

আমি বললুম—আমার খুবই সন্দেহ আছে,—সেই জন্যেই তো এসব মনে পড়ছে। নলিনীবাবু লিখেছেন—

সাধারণের রুচি যাহাতে মার্জিত হইয়া উঠে, তাহাদের মধ্যে যথার্থ রসজ্ঞতা যাহাতে জন্মিতে পারে, সেই কাজই সমালোচনার।"

—সেই উদ্দেশ্যটা একটু আড়ভাবে থাকাই ভাল নয় কি? ওটা নলিনীবাবুর মতন সোজাসুজি বলতে দ্বিধা হয়। নলিনীকান্তকে যা মানায়, তা কি সকলের পক্ষে শোভন? জনসাধারণকে মার্জিত করতে পারেন যাঁরা, তাঁরা সে-কাজ করুন, কিন্তু তোমার-আমার পক্ষে তা কীরকম যেন অতিসংকল্প বলে শোনায়।

বললুম—অতিসংকল্প শব্দটি বেশ বানিয়েছ। দ্যাখো, এ কাজে সকলকেই শব্দ বানাতে হয়—নলিনীকান্ত লিখেছেন—'ভাবৈকতানতা'। ওটাও সর্বসাধারণের পরিচিত শব্দ নয়।

—মানে কি?

—তাঁর কথা যতদূর মনে আছে বলছি,—তিনি লিখেছিলেন—বাংলার কাব্যে মস্তিষ্কের অন্বীক্ষা ও অন্বয় কিছুই নাই। বাংলার কাব্যে sheer lyricism—ভাবৈকতানতা।

আনন্দ বললে—'অতিসংকল্পে'ও আমার আপত্তি নেই, নলিনীকান্তের 'ভাবৈকতানতা'তেও নয়। পাঠকরা এসব শব্দ কখনোই আপত্তি করেন না। কিন্তু কী লেখক, কী সমালোচক—শব্দ-প্রয়োগে দুপক্ষই মাঝে মাঝে কিছু বেশি উৎসাহ দেখিয়ে থাকেন। সেটা ভাল নয়। তোমার চতুর্থ চিন্তার সঙ্গে এ-দিকটার যোগ আশা করি নিজেই বুঝতে পারছো?

—হাঁ পারছি,—তাহলে আমাদের তৃতীয়-চতুর্থ বিষয়ে সিদ্ধান্তটা এই দাঁড়ালো যে, রীতিমতো সমালোচনার আয়োজনে গুরুগম্ভীর ভঙ্গিতে না এগিয়েও,—আমাদের গৃহীত সময়ের মধ্যে দেশে কতো সব ভাবযুদ্ধ বা বহির্ঘটনা ঘটে গেছে, সেগুলির বিশদ তালিকা রচনায় একান্তমনোযোগী না হয়েও,—বাছাইয়ের কাজ চলতে পারে,—তবে রাশি রাশি উদ্ধৃতি যাতে না এসে যায়, সেদিকে খেয়াল থাকা চাই,—এবং প্রাণহীন উক্তি বা স্বাদহীন শব্দ একে চলবে না।

—ঠিক।

অতঃপর আনন্দ বলেছিল চতুর্থ বিষয়টা আরো একটু ভাবতে হবে। আধুনিক বাঙালী মনের উপাদান সম্বন্ধে আগেই আমাদের কিছু কথা হয়েছে। আমাদের ভাবজীবনের দ্বন্দ্ববিগ্রহ—এবং তার পেছনে আমাদের সমাজের অর্থনৈতিক ঘাত-প্রতিঘাত—এসবও ভাবা দরকার। এখন মনে পড়ছে সুনীতিবাবুর সেই 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য' সম্বন্ধে একালের অন্যান্য চিন্তা।

—কী রকম?

—দ্যাখো, বই-বাছাইয়ের কাজে এই সূত্রেই এক-একটি রচনার বিচিত্র সম্ভাবনার কথা মনে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ যখন 'শেষের কবিতা'য় অমিট রায়কে সেই অবস্থায় এনে পৌঁছিয়ে দিলেন যেখানে সে কবিতা লেখবার জন্যে মরীয়া হয়ে উঠেছে, —লাবণ্যকে বলেছে—'হে মোর বন্যা, তুমি অনন্যা—আপন স্বরূপে আপনি ধন্যা',—তখনকার কথা মনে পড়ে?

—হাঁ—অমিট বলেছিল—'এর আগে অনেক মেয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল, সমাজের কাটা খাল বেয়ে বাঁধাঘাটে রুচির ঢাকা লণ্ঠন জ্বালিয়ে।'

—এবং লাবণ্যর সঙ্গে দেখা হওয়াটা অন্যরকম,—সে যেন মরণের ধাক্কা লাগা দুটি নক্ষত্রের সংঘর্ষ। অমিট সেই উপলব্ধির কথা জানাতে গিয়ে বলে—

> মানুষের ইতিহাসটাই এইরকম। তাকে দেখে মনে হয় ধারাবাহিক; কিন্তু আসলে সে আকস্মিকের মালা গাঁথা। সৃষ্টির গতি চলে সেই আকস্মিকের ধাক্কায় ধাক্কায় দমকে দমকে, যুগের পর যুগ এগিয়ে যায় ঝাঁপতালের লয়ে।

এই সব পরিস্থিতিতে আনন্দ নিজেকে যেন সামলাতে পারে না। কোন্ কথার জন্যে সে এই প্রসঙ্গ এনেছিল, তা যেন মুহূর্তের জন্যে ভুলে গিয়ে 'শেষের কবিতা'র কবিতা আবৃত্তি করলে কয়েক ছত্র।

বর্তমান আলোচনার পক্ষে অবান্তর বলেই আমি সে লাইনগুলি পুরোপুরি এখানে লিখছি না।

'তোমার প্রবাহে মনেরে জাগায়ে নিজেরে চিনি'—বলতে বলতে সে যখন চুপ করলো, তখন আমি বললুম—কিন্তু যা বলছিলে সেটা বলো।

সে বললে—অমিট রায়ের ঐ মানব-ইতিহাস সম্পর্কিত উক্তিটি শুনে তোমার আমার মতন গোপাল হালদার মশাইও মুগ্ধ হয়েছিলেন, কিন্তু এক-একটি উক্তি কী রকম বিচিত্র সূত্রে বিভিন্ন মনে বিভিন্নভাবে জড়িয়ে যায়, তাঁর 'সংস্কৃতির রূপান্তর' বইখানি পড়তে গিয়ে সে-কথাই আমার মনে এসেছিল। ঐতিহাসিক জড়বাদ এবং 'ডায়ালেকটিক্স'-এর কথাসূত্রে অমিট রায়ের ঐ উক্তি দেখিয়ে গোপালবাবু লেখেন—

> ইতিহাসের পাতায় পাতায় এইরূপ উৎক্রান্তির সাক্ষাৎ মিলে। মানুষের ইতিহাস মূলত শুরু হয় তাহার জীবিকাপ্রয়াস হইতে; কিন্তু একটু পরেই তাহার ইতিহাস হইয়া উঠে তাহার আত্মবিরোধের ইতিহাস। শ্রেণীবিভক্ত সমাজের সেই ইতিহাস মূলত প্রচ্ছন্ন বা প্রকাশ্য শ্রেণীবিরোধের কাহিনী, দ্বন্দ্বমূলক প্রগতির কাহিনী।

আনন্দ বললে—সেই বইয়েতেই গোপালবাবু সুনীতিকুমারের 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য' সম্বন্ধে লেখেন—'ইহাতে মানস-সম্পদের উল্লেখ আছে, পণ্যেরও উল্লেখ আছে; উল্লেখ নাই জীবিকার মূল উপকরণের, উৎপাদন প্রথার, সমাজ-সংস্থানের।'

আমি জিগেস করলুম—আমরা তো বই-বাছাইয়ের কথা ভাবছি,—সে-চিন্তায় এ-চিন্তা কতোটা স্বীকার্য?

সে বললে—দ্যাখো, একালে এ-চিন্তা শুধু বিশেষ বিশেষ পাঠকের মনে জাগছে, নাকি সকলের মনেই জাগলে ভাল হয়, সেটা পাঠকরাই বিচার করবেন। এই 'পূর্বকথায়' সে-দিকটাও ওঠা উচিত, সেই কারণেই বলছি।

হাসতে হাসতে আনন্দ বললে—গোপালবাবুর বই

ঢেউ ও ঢল

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

আলস্যের ফিতে দিয়ে বাঁধা
অনেক অনিচ্ছা আর শৈথিল্যের ধুলোজমা ফাইলে
পড়লো এসে অকস্মাতের আঘাত।
হবে-হচ্ছে হবে-হচ্ছে
এই গয়ংগচ্ছতার উপরে
পড়লো এসে প্রলয়ের ঘাড়ধাক্কা—
কোথায় ফিতে, কোথায় ফাইল, কোথায় ফতোয়া!

কালও সুস্থ ভোর হবে
মানুষের এই নির্মল নিশ্চিন্ততার উ
পড়লো এসে অকাট্য কুঠার।
কুড়ুলে মেঘে রাতভোর বৃষ্টি হবে
আর চোখভোর ঘুম—
এই অর্জিত অভ্যাসের উপর
পড়লো এসে অঘটনের অট্টহাস।
গৈরিকাভ পাহাড়ি জল দেখতে-দেখতে
শাদা হয়ে গেল,
সর্বনাশের অপক্ষপাত শাদা
সমীকরণের শাদা—
উদ্ভিদের শেষ ঔদ্ধত্যটুকুও রইল না কোথাও।
কয়েদিরা জেলখানা থেকে ছাড়া পেয়ে
বেরিয়ে এসে দেখলো,
এ আবার আরেক জেলখানা—
জলের জেলখানা—
জলে-জলে জনে-জনে কোথাও কোনো ব্যবধান নেই,
বেনারসি আর ধুলধুলে ন্যাকড়া ভেসেছে পাশাপাশি
ক্ষুধার পাশে ক্ষুধা, শীতের পাশে শীত, মৃত্যুর পাশে মৃত্যু।
মুছে গিয়েছে দেশ-বিদেশের সীমানা,
মানচিত্রের কপট রেখায়
জরিপ-করা জমির চৌহদ্দি।

কিন্তু, ঢেউ, এই পর্যন্ত, আর নয়,
আর তুমি পারবে না এগোতে।
বাইরের সেতুই তুমি উড়িয়ে দিতে পারো,
কিন্তু কী করে ভাঙবে অন্তরের সেতু,
যে-সেতু মানবিকতার কংক্রিট দিয়ে গাঁথা!
কী করে ভাঙবে তুমি মানুষের ভালোবাসা,
এ যে তোমার প্রাকৃতিক জড়শক্তির চেয়েও
বিপুল-দুর্বার, অন্ধের চেয়েও অন্ধতর?
আমরা যে সব এক ভূগোলের মধ্যে
একই মাধ্যাকর্ষণের শরিফ
একই অন্তরীক্ষের সাক্ষী
একই গ্রহের বাসিন্দে।
আমরা যে একে-অন্যকে হাতে ধরে বুকে করে
বাঁচিয়ে তুলতে প্রতিশ্রুত।
তুমি ভাঙতে পারবে না আমাদের এই নিঃসমুদ্রের সেতু,
আবহমান রক্তের প্রতি অতলান্ত টান,
নিত্যনতুন দৃঢ়তর করে গড়ে তোলার প্রতিজ্ঞা।

ঢেউ, ফিরে যাও, ঢল, ফিরে যাও
দূরে দাঁড়িয়ে দেখ আমাদের
প্রাণের ঢেউ, মমতার ঢল ॥

বেরিয়েছিল ১৩৪৮ সালের আশ্বিনে,—দ্বিতীয় সংস্করণ বেরোয় ১৩৫১ সালের মাঘ মাসে। অর্থাৎ, রবীন্দ্র-মহানির্বাণের অল্প-পরবর্তী চিন্তা এসব। 'বাঙলার সংস্কৃতি' নামে একটি প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন—যা আমাদের নিজেদের কালের স্বাভাবিক অভ্যাস নয়—যেমন, রেডিও-তে ভাটিয়ালী গান শোনানো, আমাদের একালের মেয়েদের কলমধরা আঙুলে কলকাতার সিমেন্ট-বাঁধানো সভাক্ষেত্রে আলপনা আঁকা ইত্যাদি—প্রাণান্তকর পরিশ্রমে এইরকম সব ব্যাপারের চর্চার নামই 'কৃষ্টি'।—এ তাঁর সরোষ ব্যঙ্গবাণ। তাঁর ঐ বইয়ের ১৩১ পৃষ্ঠা দেখো।—কিন্তু আধুনিক কালের কথা ভাবতে গেলে এসব মন্তব্য সত্যিই তো পুরোপুরি ঝেড়ে ফেলা যায় না।

আমি বললুম—তা তো নয়ই। কিন্তু উনিশ শতকের প্রথম দিকটার পক্ষে এসব চিন্তা বোধ হয় কতকটা অবান্তর। তা ছাড়া ভাটিয়ালী তো একালেও পূর্ববঙ্গের নদীতে নদীতে ঢেউ তোলে। আমাদের শুভানুষ্ঠানে একালেও তো আল্পনা আমাদের মেয়েদের প্রিয় চর্চা। গোপালবাবু ওসবের নিন্দা করেন নি—শুধু যথাস্থানে যথাচরণের প্রয়োজনীয়তাই তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন।

আনন্দ বললে—সে-কথা ঠিকই। আমি ব্যঙ্গ-পরিহাসের কথা বলি নি—শুধু প্রয়োজনের দিকটাই দেখছি—সেই সূত্রেই গোপালবাবুর আর একটি মন্তব্য ছিল—

> যে সামন্ততন্ত্র ও পল্লীসমাজে এই সব জীবন-উপাদান ও এই জীবনযাত্রা সহজ ও স্বাভাবিক ছিল, সেই সামন্ততন্ত্র ভাঙিয়া গিয়াছে, সেই পল্লীসমাজ ম্রিয়মাণ—কৃষি-সংস্কৃতির সেই স্তর আজ শিল্পপ্রধান সাম্রাজ্যের আঘাতে পরিবর্তিত হইতেছে।

আমি বললুম—ভাই, এসবই ভাববার কথা। কিন্তু ভূমিকা বেড়ে যাচ্ছে,—আমি মোটামুটি মনস্থির করে ফেলেছি। বেশি শক্ত কথা ভাবতে ভয় হয়,—কেবলি মনে হয় প্যারীচাঁদ মিত্রের 'অভেদী' হয়ে পড়বে না তো এ লেখা?—সে উপন্যাসের অন্বেষণচন্দ্র হতে চাই না তুমি-আমি,—আমাদের মধ্যে একজনও না। আমরা অন্বেষণচন্দ্রের মতন গ্রামে-গ্রামে, সভায়-সভায়, তত্ত্বে-তত্ত্বে ঘুরতে চাই না—আমরা শুধু বাংলা বই পড়বার সুখের দিকটাই তো ভাবতে বসেছি এবং সেইসূত্রে কিঞ্চিৎ বাছাইয়ের এই উদ্যম—

[ক্রমশ]

আশা করি এ বক্তব্যে কোন দ্বিমত হবার কারণ নেই যে, পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের কৃষির উন্নতি সম্পূর্ণভাবেই ভূমিসংস্কারের ওপর নির্ভরশীল এবং যেহেতু আজও পর্যন্ত ভারতের সামগ্রিক অর্থনীতি কৃষির ওপর নির্ভরশীল সেই হেতু ভূমিসংস্কারের গুরুত্ব আপাত-দৃষ্টিতে যা মনে হয়, তার চেয়েও অনেক বেশি। ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার বহু পূর্ব থেকেই ভূমিসংস্কারের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, কিন্তু স্বাধীন ভারতে কংগ্রেসী আমলে সেই প্রস্তাব কোনদিনই কার্যকর করার চেষ্টা হয় নি, কেন না ভূমিকে কেন্দ্র করে যে কায়েমী-স্বার্থ, গত বিশ বছর ধরে সেই কায়েমী-স্বার্থই আবার কংগ্রেসের ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছে।

ভূমিসংস্কার বলতে কি বোঝায় এবং তার প্রয়োজনীয়তা কেন, সেই বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু বলা দরকার। আমাদের দেশের প্রচলিত রীতি অনুযায়ী যারা স্বহস্তে চাষ করে, তারা ভূমির মালিক নয়। একটি পরগাছা শ্রেণীই দেশের অধিকাংশ ভূমির দখলদার, যারা যেভাবেই হোক বহু জমির মালিক হয়েছে এবং বহুক্ষেত্রেই এই মালিকানা আবার আইন-সঙ্গত নয়। জমি চাষ করা হয় ভাগ-চাষী এবং ক্ষেতমজুরদের দ্বারা এবং তার সমগ্র মুনাফাটাই জোতদার মহাশয়ের পকেটে যায়। তারাই হচ্ছে ভিলেজ অ্যারিস্টোক্রাসী, ক্ষেত্রবিশেষে সম্রাটবিশেষ এবং কার্যত গত বিশ বছর ধরে গ্রাম ভারত এদের দ্বারাই শাসিত হয়ে এসেছে।

জমিদারীপ্রথা কাগজে-কলমে উচ্ছেদ করা হলেও হাজার হাজার বিঘা জমির মালিকরা বহাল তবিয়তেই টিকে রইল, যদিও তাদের এই অমিতপরিমাণ ভূ-সম্পত্তির উৎস কি সেটা অব্যক্তই রয়ে গেছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এই জমি-গুলির উৎস দখলদারী। রবীন্দ্রনাথের "দুই বিঘা জমির" কাহিনী অনেকেরই মনে আছে। যাই হোক, কংগ্রেসী আমলেই বিভিন্ন মহল থেকে এই সব কারণেই ভূমিব্যবস্থার আমূল পরি-বর্তনের দাবি উত্থিত হয় এবং শেষ পর্যন্ত একটা লোকদেখানো ভূমিসংস্কার আইনও পাশ হয়, যাতে ব্যক্তিগত মালিকানাধীনে ভূমির একটা সর্বোচ্চ পরিমাণও বেঁধে দেওয়া হয়। কিন্তু আগেই বলা হয়েছে, ভূমিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা কায়েমীস্বার্থই ছিল কংগ্রেসের ভিত্তিস্বরূপ, কাজেই উক্ত ভূমিসংস্কার আইনের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে অনেক ফাঁক রাখা হয়েছিল, যাতে কায়েমীস্বার্থে কোন আঘাত না লাগে। জমির সীমা বেঁধে দেওয়া হল, কিন্তু আইন করে ভূমির হস্তান্তরকরণ বন্ধ করা হল না। রাতারাতি সকল বাড়তি জমিকে বেনামী করে দেবার সুযোগ করে দেওয়া হল।

যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর, সেই পুরাতন কংগ্রেসী ভূমিসংস্কার আইনটিকেই যতদূর সম্ভব কার্যকর করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই হাজার হাজার বিঘা বেনামী বা বে-আইনী-ভাবে দখল করা জমিকে উদ্ধার করা হয়েছে এবং তা ভূমিহীনদের মধ্যে বিলিয়ে দেওয়া হচ্ছে। অবশ্য এই বিলি-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত শরিকী বিরোধ যে ঘটছে না, তা নয়। কিন্তু

সবিনয় নিবেদন

সাপ্তাহিক বসুমতীর ৭৪ বর্ষ ১ম সংখ্যায় 'মহানায়ক লেনিন' নাটকের অন্তর্গত "শ্রমিকদের গান"-টির অনুবাদক হচ্ছেন শ্রীজ্যোতির্ময় নন্দী। ভুলবশত তাঁকে ঐ গানের রচয়িতা বলা হয়েছে। এই ত্রুটির জন্য আমরা দুঃখিত।

—সম্পাদিকা

সবচেয়ে বেশি সঙ্ঘর্ষ হচ্ছে জোতদারদের সঙ্গে। এমন জোতদারের সন্ধান আমরা জানি যারা অতীতে বার-বার বন্দুকবাজি করেছে, অনেক দরিদ্র গ্রামবাসীর প্রাণহানি ঘটিয়েছে এবং সেই জোতদারই আবার আজকে বন্দুক নিয়ে আসরে অবতীর্ণ হয়েছে। তবে ভরসা এই যে, এবারে রাজশক্তি জোত-দারদের পিছনে নেই, ভূমিহীন নিরন্ন মানুষগুলির পিছনেই আছে। কিন্তু এই ভরসাতেই কাল কাটালে চলবে না। অনাবশ্যক রক্তপাত, দাঙ্গা-হাঙ্গামা এড়ানো দরকার এবং সেইজন্য প্রয়োজন এই বিষয়ে একটি সুষ্ঠু নীতি প্রণয়ন এবং সেই উদ্দেশ্যে সরকারিভাবে কাজ চালানো। জমি দখল, বে-আইনী জমি উদ্ধার, সমস্ত কাজগুলি একটি সুনির্দিষ্ট নীতির ভিত্তিতে সরকারিভাবেই করা দরকার। স্থানীয় নেতাদেরও এই মর্মে নির্দেশ দেওয়া উচিত যে, জমি দখলের ক্ষেত্রে ভাবাবেগমূলক ক্রিয়াকলাপের প্রশ্রয় না দিয়ে তাঁরা যেন যুক্তিশীল পদ্ধতিতে অগ্রসর হন।

নীতিহীনতার শিকার

নীতিহীনতা বলতে আমরা কোন অনৈতিকতা বা দুর্নীতির কথা বলছি না এবং যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীদের সততা প্রশ্নাতীত। আমাদের যা বক্তব্য, তা হচ্ছে এই যে, বিভিন্ন বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ না করার দরুণ যুক্তফ্রন্ট সরকার নিজের ইমেজ স্বেচ্ছায় নষ্ট করতে চলে-ছেন। বিশেষ করে এটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, সব কিছুতেই যেন সিরিয়াসনেসের অভাব। কোনগতিকে কাজ চালিয়ে যাওয়া ভিন্ন মন্ত্রীদের অধিকাংশেরই যেন আর কিছু করার নেই এবং বেশির ভাগই আমলাতন্ত্রের ওপর অত্যধিক নির্ভর-শীল হয়ে পড়েছেন।

খাদ্যনীতির কথা দিয়েই শুরু করা যাক। এই বিষয়টিকে যুক্তফ্রন্ট সরকার কখনোই গুরুত্বের সঙ্গে দেখেন নি। আজও পর্যন্ত একটি সুনির্দিষ্ট খাদ্য-নীতি অনুসরণ করা হয় নি। চালের দাম মাঝখানে হু-হু করে বেড়ে উঠে-ছিল এবং এখনো অনেক জায়গাতেই চাল নিয়ে মজুতদারেরা রীতিমত কার-সাজি করছে। ডাল, তেল, মশলার দাম দিনের পর দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, সরকারের তরফ থেকে পাইকারী ব্যবসায়ীদের উপদেশ দেওয়া ভিন্ন আর কিছুই করা হয় নি। এ বিষয়ে একজনকেও নিবর্তনমূলক আটক আইনে গ্রেপ্তার করা হয় নি। কঠোর সাজার ভয় না থাকলে অসাধু ব্যবসায়ীরা ঠান্ডা হবে না, কিন্তু এক্ষেত্রে সরকারের পক্ষেই যেন দৃঢ়তার সবচেয়ে অভাব।

শিল্প-বাণিজ্য ও শ্রমনীতির ক্ষেত্রেও জোড়াতালি দেওয়া নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে। এখনো পর্যন্ত এই সকল বিষয়ে সরকারী নীতি কি তা স্পষ্ট করে বলা হয় নি। ঘেরাও প্রসঙ্গ নিয়ে বৈঠকের পর বৈঠক বসেছে, কিন্তু কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ঐ জাতীয় আন্দোলন

নাম্বার টেন সিগারেটের পরম তৃপ্তি-দায়কতার মূলে
মাত্র একটি সমীচীন কারণ :

নিবিড় স্বাদে ও গন্ধে পরিপূর্ণ নাম্বার টেন
ভারতের সমশ্রেণীয় সিগারেটের মধ্যে
সবচেয়ে বেশী মিঠে আমেজ জোগায়—মধুর আবেশ জাগায়!

তাই তো হওয়ার কথা—

নাম্বার টেন-এ আছে দেশের উৎকৃষ্ট ভার্জিনিয়া তামাক
—যা সংগ্রহ, পরিপক্ক এবং ব্লেণ্ড করার দায়িত্ব নিয়েছেন অভিজ্ঞ তামাক বিশেষজ্ঞরা।

মিঠে আমেজের বিলাসে...

নাম্বার টেনের

পরিচয়

শ্রমিকেরা করতে পারে, সেই বিষয় কিছু বলা হয় নি। পূর্বের তুলনায় ঘেরাও অনেক কম হলেও এটিকে মূলধন করে যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক কুৎসা গাওয়া হচ্ছে। শিল্পপতিরা এই বিষয়টিকে লক্ষ করে যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে আসরে অবতীর্ণ হয়েছে, অথচ এক্ষেত্রেও প্রয়োজনীয় কঠোরতা সরকারের কাছ থেকে আশা করা যাচ্ছে। বিভিন্ন কারখানায় ইউনিয়নগুলির মধ্যে যে শারিকী সংঘর্ষ হচ্ছে সে বিষয়েও শ্রমদপ্তর উদাসীন বললেই চলে।

শিক্ষার ক্ষেত্রেও ঠিক একই অবস্থা। শিক্ষায়তনে দশ ক্লাস, কি এগারো ক্লাস, কি বারো ক্লাস থাকবে, এই নিয়ে অনাবশ্যক মাথা ঘামানো হচ্ছে, কিন্তু এগুলি কোনই প্রগতিশীল শিক্ষানীতির সূচনা করে না। প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষার সমন্বয় ঘটানো এবং মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে উচ্চশিক্ষার সমন্বয় ঘটানোই শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। ফালতু বোঝা ছাত্রের ঘাড় থেকে নামানো দরকার এবং সেই শূন্যস্থানে যুগোপযোগী প্রয়োজনীয় জ্ঞানের স্থান করে দেওয়াই প্রগতিশীল শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য। সিলেবাসসমূহের আধুনিকীকরণ এবং শিক্ষারাজ্য থেকে কালোবাজারী দূর করা সরকারী শিক্ষানীতির প্রাথমিক কর্তব্য হওয়া উচিত। কিন্তু সেরকম কোন কিছুর লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

গতবারে যুক্তফ্রন্টের আমলে সর্বক্ষেত্রেই যে সরকারী উদ্যম দেখা গিয়েছিল, এবারে তা বিশেষভাবেই অনুপস্থিত। অথচ এবারে যুক্তফ্রন্টের অবস্থা অনেক ভাল, গতবারের মত অস্তিত্বরক্ষার কোন সংগ্রামই নেই। অথচ সরকার প্রায় সকল ক্ষেত্রেই কোনরকমে কাজ চালিয়ে যাবার নীতি অনুসরণ করেছেন। এই শ্লথতার কারণ কি সেটা অবশ্য বলা আমাদের পক্ষে কঠিন, কিন্তু যুক্তফ্রন্টকে তার ইমেজ অক্ষুণ্ণ রাখতে গেলে আরও বেশি গতিশীল হওয়া প্রয়োজন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে দরকার সুস্পষ্ট পলিসির।

ভুয়া প্রতিষ্ঠান

পশ্চিমবঙ্গের কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প কর্পোরেশনে আশীটি ভুয়া প্রতিষ্ঠান ধরা পড়েছে, যে প্রতিষ্ঠানগুলির নামে বিগত কয়েক বৎসরে লক্ষ লক্ষ টাকার লাইসেন্স ও পারমিট দেওয়া হয়েছে। এই আশীটি ভুয়া প্রতিষ্ঠানের প্রায় আটাশ লক্ষ টাকার দ্রব্য বর্তমানে কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প কর্পোরেশনে আটকা পড়েছে। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প দপ্তরের মন্ত্রী অধ্যাপক শম্ভু ঘোষ নিজের দপ্তরের এই পুকুর চুরির সংবাদ জানিয়ে বলেন যে, বিগত কয়েক বৎসরে এই ভুয়া প্রতিষ্ঠানগুলি লক্ষ লক্ষ টাকা চুরি ও কালোবাজারীর সুযোগ পেয়েছে। যে সব প্রতিষ্ঠানের নামে পারমিট দেওয়া হয়েছে সেই প্রতিষ্ঠানগুলির ঠিকানা থাকলেও কোন অস্তিত্ব নেই।

শ্রীশম্ভু ঘোষ জানিয়েছেন যে, এই আশীটি প্রতিষ্ঠান তো বটেই, সেই সঙ্গে এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে পারমিট দেবার ব্যাপারে কারা জড়িত, তাদের সম্বন্ধে তদন্ত করবেন। কিন্তু আমাদের বক্তব্য শুধু তদন্ত করে কোন লাভ নেই, যদি না সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের রীতিমত শাস্তি দেওয়া হয়। ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প দপ্তর হাতে পেয়েই শ্রীশম্ভু ঘোষ সমবায়গুলি সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর দুর্নীতির কাহিনী প্রকাশ করেছিলেন। সেই বিরাট কেলেঙ্কারীর সঙ্গে অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিও জড়িত ছিল, তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তা আমরা এখনো জানি না।

সরকার ও প্রশাসনযন্ত্র

প্রশাসনযন্ত্র যুক্তফ্রন্টের আয়ত্তে নয়। সম্প্রতি সি পি এম নেতা শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত এই মর্মে একটি অভিমত জ্ঞাপন করেছেন। নানাদিক দিয়ে এই কথাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, শুধু একজন রাজনৈতিক দলের নেতার কথা বলেই নয়। শ্রীদাশগুপ্তের মতে ভূমিসংস্কার, খাদ্য ও শ্রমিকদের সম্পর্কে আইন করে বা অন্যভাবে কোন পরিবর্তন আনতে গেলে সরকারী ব্যবস্থাই বাধার সৃষ্টি করবে। প্রশাসন ব্যবস্থা সরকারের সঙ্গে যে সহযোগিতা করছে না—এর প্রমাণ হিসাবে মন্ত্রীদের নির্দেশ কার্যকরী করতে অহেতুক বিলম্ব করা হয়। একটি বিশেষ ফাইলের উল্লেখ করে তিনি বলেন যে, সেটি উপমন্ত্রীর ঘর থেকে চীফ সেক্রেটারীর ঘরে পড়ে আছে। এই সকল দৃষ্টান্তের পর যখন সাংবাদিকেরা প্রমোদবাবুকে জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে উক্ত কর্মচারীকে বদলি করা হচ্ছে না কেন, তখন তিনি পাল্টা প্রশ্ন করলেন, কোথায় দেবো? বস্তুত এই সমস্যার সমাধান বর্তমান সাংবিধানিক কাঠামোয় হওয়া দুরূহ, অথচ অসহযোগী আমলাদের হাতে পড়ে অনেক সৎ উদ্দেশ্য পণ্ড হয়ে যায়। যাই হোক, এই সমস্যাটা যে যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন শরিক দল উপলব্ধি করতে পারছেন, সেটাই সুলক্ষণ। তবে এটাও ঠিক যে, মন্ত্রীরা যদি তৎপর ও ব্যক্তিত্ববান হন, তাহলে আমলাতন্ত্রকে ঠিকমত তাঁবে রাখতে পারেন।

শিক্ষায়তন-প্রশাসন

শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্যপ্রিয় রায়কে আমরা কাজের লোক বলেই জানি, বিশেষ করে এ, বি, টি, এ-র সংগঠক হিসাবে তাঁর কৃতিত্ব সর্বজনবিদিত এবং শিক্ষকদের শোচনীয় আর্থিক অবস্থার কিছুটা উন্নতির মূলে তাঁর যথেষ্ট অবদান আছে। কিন্তু একটি ইংরাজী দৈনিকে সম্প্রতি এমন একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, যা তাঁর ইমেজ নষ্ট করার পক্ষে পর্যাপ্ত, যদি তা সত্য হয়। সংবাদে প্রকাশ যে, তিনি নাকি কয়েকটি বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটি ইত্যাদিতে এমন কিছু লোক ঢুকিয়েছেন, যাঁরা শিক্ষা জগতের সঙ্গে একান্তই সম্পর্কহীন। কেউ নাকি পাটের দালাল, কেউ এল আই সি-র ক্লার্ক এবং এই জাতীয় কোন কোন ব্যক্তিকে নাকি কোন বিদ্যালয়ের এ্যাডমিনিস্ট্রেটরও বানিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এঁদের একমাত্র কোয়ালিফিকেশন এই যে, এঁরা একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের সদস্য। ঘটনাগুলি যদি সত্য হয়, তাহলে তা গভীর পরিতাপের বিষয় হবে। কংগ্রেসী আমলেও এই নীতি ছিল, বর্ধমান জেলার একটি বিখ্যাত কলেজের খবর আমরা জানি, যেখানে কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী ভিন্ন অন্য লোককে অধ্যাপকের পদে নিয়োগ করা হয় না। কিন্তু এক অন্যায় দিয়ে আর এক অন্যায়ের প্রতিকার যে করা যায় না, শিক্ষামন্ত্রীর এটা অবশ্যই বোঝা উচিত।

(২৮।৬।৬৯)

কিস্তিতে ট্রানজিস্টর
"শ্যাম ডিলাক্স"
১০, মাসিক কিস্তিতে ৩ ব্যান্ড অল "ওয়ার্ল্ড" পোর্টেবল ট্রানজিস্টর লাভ করুন। প্রতি গ্রাম ও শহরে প্রেরণের যোগ্য। আবেদন করুন:
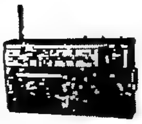
Music & Sound (B.W.C.—10)
Post Box 1576, Delhi—6.

ভারতদর্শন

জাপ-ভারত সহযোগিতা

এশিয়া ভূখণ্ডে উদয়-সূর্যকে অভ্যর্থনা জানাবার প্রাথমিক সুযোগ জাপানই ভোগ করে। তবে, এ সুযোগ শুধু ভৌগোলিক নয়। জাপ দ্বীপ-মালিকা শুধু যে পূর্বভাগে সুনীল জলরাশির ওপর মাথা তুলে জেগে উঠেছিল তাই নয়, পাশ্চাত্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে অথচ নিজের কৃষ্টি ও বৈশিষ্ট্যকে সর্বতোভাবে রক্ষা করে জাপানই এক উন্নত শক্তিশালী ও সমৃদ্ধিশালী জাতি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন নানান প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা সত্ত্বেও। এই দ্বীপমালার স্বজাতিপ্রেমী কর্মঠ ভাই-বোনেরা পাশ্চাত্যের উন্নত জাতিগুলির সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে এগিয়ে গেছে বিজ্ঞানে, শিল্পে, ব্যবসায়ে, কৃষিকাজে—এমন কি সামরিক ক্ষমতায় পর্যন্ত। আর সেজন্যই হয়ত পাশ্চাত্য-বাসীর অ্যাটম বোমা হিংস্র আক্রোশে এই অনমনীয় চিরগতিশীল জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছিল নাগাসাকি-হিরোসিমার বুকে। ছারখার করে দিয়েছিল একটি উন্নয়নশীল এশীয় জাতির স্বপ্নকে। কিন্তু পারে নি সেই অপরাজেয় জাতির উন্নত মস্তককে এতোটুকু অবনমিত করতে। বিস্ময়ের ঘোর, আঘাতের প্রচণ্ডতা থিতিয়ে আসতে-না-আসতেই জাপান আবার তার অপরাজেয় বিক্রম, একাগ্রতা এবং ঐক্যবদ্ধ জাতীয় চেতনাকে পাথেয় করে পাশ্চাত্য চক্রান্তকে পর্যুদস্ত করে নিজেকে পুনর্গঠিত করে তুলেছে। জাপানের সামাজিক, মানসিক এবং নৈতিক জীবনকেও পর্যুদস্ত করার জন্য জঘন্য সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনা সফল হয় নি। জাপানকে দুর্বল করা যায় নি আঘাত ও অন্তর্ঘাত হেনে।

সেই বিস্ময় আর বিপুল বিশ্বাসের দ্বীপপুঞ্জ সমস্ত চক্রান্ত ব্যর্থ করে উদয়ভানুর দেশ থেকে সমস্ত চাপিয়ে-দেওয়া আঁধারকে অবিলম্বেই দূরীভূত করতে পেরেছে। জাপান সেদিক থেকে সমগ্র এশিয়াবাসীর গর্বের ও শ্লাঘার বিষয়। এশিয়াবাসী হিসেবে এই জাপানের দিকে তাকিয়ে তাই এই প্রচণ্ড শক্তি ও দেশগড়ার এমন ঐকান্তিকতা যদি আরও পাঁচটি এশীয় জাতির মধ্যে একই সঙ্গে বর্তমান থাকত, তবে সুদূর পশ্চিম থেকে পূর্বভাগে মাতব্বরি করতে আসার আহ্লাদে ছেদ পড়ত পশ্চিমীদের। আজ চীন ও রাশিয়া এশিয়ার মহান্ ভরসাস্থল হতে পারত, কিন্তু ঐ দুটি দেশই এশিয়ায় মাতব্বরির চাবিকাঠিটি নিয়ে পারস্পরিক শক্তিদ্বন্দ্বে মেতেছে। জাপান মূল এশীয় ভূখণ্ড থেকে লোনা সাগরে জলের ফেনিল মত্ততার ব্যবধানে বিচ্ছিন্ন। সে যেন তাই নিজেকে নিয়ে আপনাকে রচনা করার তাগিদে সরে থেকেছে। নিজের মধ্যে গুটিয়ে থেকেছে। লেনদেনটা পাশ্চাত্যের সঙ্গেই করেছে ঘনিষ্ঠ। অর্থাৎ এশিয়াবাসীর উন্নয়ন নিয়ে প্রত্যক্ষত মাথা ঘামায় নি বিশেষ। চীনের সঙ্গে জাপানের বিরোধ নয়া দুরন্ত যৌবনে উদ্দীপ্ত চীনের অভ্যুত্থানের পরও মেটে নি, বরং বেড়েছে। এই বৈরিতা আজ শুধু রেষারেষির পর্যায়ে সীমাবদ্ধ নেই, বৈষয়িক জাপানের কাছে মার্ক্সিস্ট চীন অসহ্য। তাই ভারতের চীনকে স্বীকার কর আন্তর্জাতিক সংস্থায়, এই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে জাপান তার বৈষয়িক দৃষ্টিকে মেলাতে অক্ষম। কিন্তু এই অক্ষমতায় যে মহান্ লাল চীনের কিছুমাত্র যায়-আসে না, স্বীকার কর চাই না কর, লাল চীন যে আছে এবং থাকবে, এই অনস্বীকার্য সত্যটা তো মিথ্যে হয়ে যাবে না।

তবু ভালো, ভারতের সামরিক-চুক্তি বিরোধিতার সঙ্গে জাপানও এক-মত। আর তাই রাশিয়ার এশীয় নিরাপত্তা রক্ষার প্রস্তাবটি ভারত-জাপান কেউই যে সহজ মনে মেনে নিতে পারে নি, জাপানে ইন্দিরা-সাতো আলোচনায় ঐ বিষয়ের উল্লেখ সত্ত্বেও বিশিষ্ট নীরবতাই তা প্রমাণ করে। অর্থাৎ দুই দেশই ব্রেজনেভ-প্রস্তাবকে আড়াল দিয়ে এড়িয়ে গেছে।

বরিষণমন্দ্রিত আগমনে

ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে এসে জাপ প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুত সাতো বলেছেন: আপনি বহু আকাঙ্ক্ষিত বরষাকে সঙ্গে নিয়ে এলেন।

কথাটাকে আলঙ্কারিক অর্থে গ্রহণ করলে বলতে পারি, এক রকম তাই-ই বইকি। শ্রীমতী গান্ধী ভারতের শুভেচ্ছাই শুধু বর্ষণ করেন নি, জাপানের সঙ্গে যে বাণিজ্যিক লেনদেনের দুয়ার এতকাল আঁটোসাঁটো ছিল, তাই-ই পুনশ্চ অর্গলমুক্ত করে শ্রীমতী গান্ধী দুই দেশের মধ্যে একটি বিনিময়ের ধারা-বর্ষণের ভূমিকা রচনা করে এলেন। ভারত থেকে ভগবান বুদ্ধের প্রেমের বাণী একদিন বরষিত হয়েছিল জাপানে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী গেলেন বরষার ধারার মতো আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করতে।

কিছুটা কাজও হয়েছে। উন্নত দেশ জাপান উন্নয়নশীল ভারতের সঙ্গে বৈষয়িক সম্পর্কবৃদ্ধির উপায় উদ্ভাবনে রাজী।

শ্রীযুত সাতো বিশাখাপত্তনম পোতাশ্রয় নির্মাণে সক্রিয় সহযোগিতার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। কেন না শ্রীসাতোর উদ্দেশ্য, ভারতের পোতাশ্রয়গুলির উন্নতি হলে জাপান ভারতের কাছ থেকে অপেক্ষাকৃত সস্তা দরে আকরিক লোহা আমদানী করার সুযোগ পাবে।

ইতিপূর্বে ভারত সাহায্যের বাহু কেবলমাত্র বাছাই-করা কয়েকটি পাশ্চাত্য মহাজনের দিকেই প্রসারিত করে রেখেছিল। এখন সে যে নতুনতর বাণিজ্যিক সম্পর্ক সম্প্রসারণে উৎসাহবোধ করছে, এটা শুভলক্ষণ, আর তাই ভারতের এই নবচেতনাকে নিশ্চয় অনেকেই স্বাগত জানাবেন। যতদূর সংবাদ, জাপান ভারতীয় প্রস্তাব উৎসাহের সঙ্গেই বিবেচনা করবেন। শ্রীমতী গান্ধীর সফরের ফলে প্রথম কিস্তিতে দুশো চৌত্রিশ লক্ষ ডলার সাহায্য আসছে। বিশাখাপত্তনমের উন্নতি ছাড়াও ক্যাম্বে উপসাগরে যে অন্তঃসলিলা পেট্রলের সন্ধান পাওয়া গেছে, তা উত্তোলনের জন্যও এক কোটি ডলার সাহায্য মঞ্জুর করেছেন জাপ সরকার। ইতিপূর্বে জাপান প্রদত্ত ভারতকে সাহায্য দানের পরিমাণ ছিল পঞ্চাশ কোটি ডলার। ঋণদান জাপান বন্ধ করে দেয় ভারতের ঋণ পরিশোধ ক্ষমতায় হঠাৎ বিপর্যয় দেখা দেওয়ায়। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত সংঘর্ষ ও তৎপরবর্তী খরাজনিত প্রতিকূলে অবস্থায় ভারত ঋণ পরিশোধ ব্যবস্থার সামান্য রদবদল চেয়েছিল। ফলত জাপ ঋণদান বন্ধ হয়ে যায়। আবার সেই বন্ধ দুয়ার খুলছে।

কিন্তু কেবলমাত্র মহাজন দেদের কৃপালাভ করে সুদের কড়ি গুণে দেওয়ার মধ্যেই দেশের উন্নতির সম্ভাবনা প্রতীক্ষারত রয়েছে ;—বাইশ বছরের কর্মে বিমুখ কর্মক্ষম তরুণ ভারতকে এই সর্বনাশা নিশ্চিন্তির হাত থেকে মুক্তি পেতে হবে এবং যথাশীঘ্র ভারতকে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার জন্য

যথাসাধ্য শ্রম স্বীকার করতে হবে সাধারণ মানুষকে। ভারতের শোষণকারী দেশীয় পুঁজিপতিদের ক্ষুধা-তৃষ্ণা কমিয়ে দেশোন্নয়নের জন্য চেষ্টিত-হতে হবে; না হলে ঋণের বোঝায় আমরা আকণ্ঠ ডুবব, দুনিয়া-ব্যাপী মহাজনের মনোরঞ্জন করতে গিয়ে মেরুদণ্ড বেঁকে যাবে আমাদের।

দেশ গড়ার কাজে মানুষকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করার জন্য যে নেতৃত্বের দরকার, দুঃখের বিষয়, সে নেতৃত্ব স্বাধীনতা-পরবর্তী কাল থেকে ভারতবর্ষে বেপাত্তা। সাধারণকে রাজনীতির দাবার ছকে নেতারা নিরীহ পদাতিক শহীদের মতোই ব্যবহার করে আসছেন। দেশ গড়ার কাজে তাদের নিযুক্ত করার প্রেরণা দান করতে পারেন এমন নেতৃত্ব না থাকার কারণ হয়ত এই, আমরা দেশ গোছানোর চেয়ে নিজের নিজের গোছাতেই ব্যস্ত। তাই একটি মহা সম্পদশালিনী সুবিস্তৃত ভূখণ্ডে জন্মলাভের সৌভাগ্য লাভ করেও কোটি কোটি ভারতবাসী পরমুখাপেক্ষী।

দেশ গড়ার জন্য আজ তাই দেশে দেশে ভিক্ষাবৃত্তি আমাদের একমাত্র সম্বল। আর সেই ভিক্ষার্জিত সম্পদের মমতাহীন ব্যবহার করে ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পান করার বদভ্যাস আমাদের মজ্জাগত হয়ে পড়ছে। জাতি হিসেবে আমরা অপরিশ্রমী, বিলাসী ও কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে পড়ছি। আমাদের নেতৃত্ব ক্রমেই 'লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন' মনোভাব নিয়ে মসনদে গ্যাঁট হয়ে বসে থাকাই শ্রেয় জ্ঞান করছেন। ফলত ভবিষ্যতের জন্য আমরা রেখে যাচ্ছি দুনিয়াব্যাপী মহাজন। আর সেই ঋণভার পরিশোধের দায়িত্ব সমগ্র জাতির কাঁধে চাপলেও, ঋণ করে ঘি পানের মহা সুখটি ভোগ করছেন একদল সুবিধাভোগী মুষ্টিমেয় ভারতীয় পরিবারে। এই অবস্থা ও মনোভাবের পরিবর্তন না হলে, ভারতের কাঁধে শুধু ঋণের বোঝাই চাপবে—ঋণমুক্ত স্বাধীনতার আস্বাদ গ্রহণ আর ঘটে উঠবে না অদূরভবিষ্যতে। ঋণ করতে করতে ঋণ পাওয়াটাই আজ আমাদের একটা দাবি হয়ে দাঁড়িয়েছে দুনিয়ার দরবারে। না পেলেই গোঁসা হয়। উপদেশ দিই উন্নত দেশগুলিকে। অথচ ঋণদাতা দেশগুলি যদি সব্যঙ্গে প্রশ্ন করে: বাপু হে, ঋণ কর, আর দেশের সম্পত্তি ধ্বংস কর তোমরা, তোমাদের হাতে নষ্ট হওয়ার জন্য আমরা আমাদের কষ্টার্জিত সম্পদ কতদিন তুলে দেব, তার একটা সীমারেখা টেনে দিতে পার কি তোমরা?

আমাদের মূক ও বিষণ্ণ হয়ে চুপ করেই থাকতে হবে। এই দুর্বল-রুগ্ন অবস্থা থেকে আমাদের আরোগ্যলাভই তাই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। তিক্ত হলেও সেটাই সবচেয়ে কঠিন বাস্তব-সত্য। আমাদের ঋণ সংগ্রাহক নেতৃত্বকেও এই সত্যটিই উপলব্ধি করতে হবে। জাতীয় মর্যাদা প্রতিষ্ঠার কথা ভাবতে হবে সর্বাগ্রে।

ব্রহ্মানন্দ রেড্ডির বিলম্বিত সিদ্ধান্ত

সপ্তাহ ঘুরল না। বিহারে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা ভোটে পরিত্যক্ত হয়েছে মাত্র, শোনা গেল, অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রী বহু রক্তপাত ঘটিয়ে অতঃপর মন্ত্রিসভা ছেড়ে বানপ্রস্থে যাওয়ার অভীপ্সা প্রকাশ করেছেন। অবশ্য যাওয়ার আগে মনের ঝাল মিটিয়ে যাচ্ছেন, তেলেঙ্গানা আন্দোলনের নেতৃবৃন্দকে দিল্লীর কর্তাদের অনিচ্ছাসত্ত্বেও (সংবাদে এমনই ইঙ্গিত পাওয়া গেছে) হাজতে চালান করে ব্রহ্মানন্দজী সমস্যাকীর্ণ রাজ্যের মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে এখন মানে মানে সরে দাঁড়াতে চাইছেন। যে কাজ বছরের গোড়ায় করলে অন্ধ্রের প্রজ্বলিত বহ্নিতে হয়ত জলসিঞ্চনের সুযোগ ঘটত, সে কাজ তিনি অবশেষে অনন্যোপায় হয়েই করে ফেললেন। অবশ্য এখনও যে তাঁর মসনদী টান পুরোপুরি পরিত্যক্ত হয়েছে এমন ভরসা করা যায় না। কারণ তিনি তাঁর পদত্যাগপত্রটি বহু বিবেচনার পর কংগ্রেস পরিষদীয় বোর্ডের কাছে পেশ করেছেন। যার অর্থ, ব্রহ্মানন্দ পদত্যাগ করলেও সেই পদত্যাগপত্র নিয়ে নানান টালবাহানার সম্ভাবনা রয়ে গেল এবং ততদিন ব্রহ্মানন্দও রয়ে গেলেন। রয়ে গেলেন, কেন না বিকল্প ব্যবস্থা গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত তো উনিই কার্জ চালিয়ে যাবেন। কিন্তু কতদিন চালাবেন, তারও কোন স্থিরতা নেই। কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ড ব্রহ্মানন্দের পদত্যাগপত্রের ওপরে আদৌ কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারবেন কিনা? সুতরাং টালবাহানা যদ্দিন চলবে ব্রহ্মানন্দের টলমলে গদিও তদ্দিন যথাবিহিত বজায় থাকবে। ওদিকে ব্রহ্মানন্দ সরে দাঁড়িয়েছেন জেনে রাজ্য কংগ্রেসের ব্রহ্মানন্দ-বিরোধীরা যদি কিছুটা নম্র হন; তেলেঙ্গানা আন্দোলনের আগুনে যদি কিছু ছাই চাপা পড়ে। কিন্তু শুধু কি তাই? পদত্যাগ না করেও তাঁর তো দ্বিতীয় উপায় ছিল না। যতদিন ছিল, কামড়ে বসেছিলেন। কিন্তু অতঃপর আর উপায় ছিল না।

রেড্ডি-মন্ত্রিসভার শিল্পমন্ত্রী শ্রী বি ভি গুরুমূর্তি ব্রহ্মানন্দের কাছে আগেই পদত্যাগপত্র পেশ করেছিলেন। তিনি তেলেঙ্গানা থেকে নির্বাচিত মন্ত্রীদের মধ্যে দ্বিতীয়জন যিনি গদি ছাড়লেন। আর গুরুমূর্তির সঙ্গে সঙ্গেই নাকি বাকি ক'জন তেলেঙ্গানা প্রতিনিধি মন্ত্রিত্বের মায়া ত্যাগ করতে সঙ্কল্পবদ্ধ হচ্ছিলেন। সুতরাং ব্রহ্মানন্দের গদি আপনিই টলছিল। তবু তেলেঙ্গানা নেতৃবৃন্দের ওপর কড়া ব্যবস্থা নিয়ে বিক্ষোভকে উস্কে দিতে দিল্লী মানা করলেও ব্রহ্মানন্দ সে নিষেধ মানলেন না। যেতেই যখন হবে, বদলা নিয়ে নাও। দিল্লী থেকে ফিরেই গ্রেপ্তারের ঢালাও হুকুম তিনি জারি করে বসলেন।

কিন্তু সন্দেহ অন্যত্র। ব্রহ্মানন্দ এখনও সুনিপুণভাবেই রাজ্য রাজনীতিতে খেলতে চান, খেলাতে চান। না হলে পদত্যাগের আগে নিজলিঙ্গাপ্পা ও মোরারজী দেশাইয়ের সঙ্গে টেলিফোনে বাতচিত করার বিশেষ প্রয়োজন দেখা দিল কেন?

শিল্পমন্ত্রী শ্রীগুরুমূর্তি তেলেঙ্গানার দাবিদারদের আন্দোলনের ফলেই মন্ত্রিত্ব ত্যাগে বাধ্য হলেন। আন্দোলনকারীরা তাঁর পদত্যাগের দাবিতে গৃহদ্বারে 'ধর্ণা' দিয়ে বসেছিলেন। তবু তিনি বলেছেন, তাঁর পদত্যাগপত্র স্বেচ্ছাপ্রদত্ত। ব্রহ্মানন্দও গদি ছাড়লেন চাপে পড়ে, বলছেন, দেশের দশের স্বার্থে সরে দাঁড়ালেন।

তেলেঙ্গানার বিক্ষোভ চলছে, চলবে। কেন না ওঁরা বলছেন, ব্রহ্মানন্দের পদত্যাগ অত্যাচারীর পশ্চাদপসরণ মাত্র, কিন্তু তেলেঙ্গানার দাবি না মানা পর্যন্ত আন্দোলন চলবেই। চলবে শান্তিপূর্ণভাবে। কিন্তু এই শান্তিপূর্ণ শব্দটির বর্তমানে কোনও ওজন নেই তেলেঙ্গানার উত্তপ্ত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে।

আন্দোলনকারীরা রাষ্ট্রপতির শাসন প্রতিষ্ঠা ও নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবি করেছেন। বলছেন, টালবাহানা না করে ব্রহ্মানন্দের পদত্যাগ গ্রহণ করা হোক।

কেন্দ্র অবস্থার চাপে পড়ে হয়ত ঐ পদত্যাগপত্র শেষ পর্যন্ত গ্রহণও করবেন। কিন্তু এই অনিবার্য সিদ্ধান্তে উপনীত হতে যে সময়, সম্পত্তি ও প্রাণের মূল্য গুণে দিতে হ'ল সেই ভুলের কোনই প্রতিকার করতে পারবেন না। রক্ত না দেখে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া কংগ্রেসী শাসনের ইতিহাসে বিরলতম ঘটনা। এখানেও তার ব্যত্যয় ঘটে নি। অবস্থা যখন আয়ত্তের বাইরে তখনই অনন্যোপায় ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে এবং এ বিষয়ে (রেড্ডি-সমর্থকরা যতই বাকচাতুর্য তৈরি করুন না কেন) কোনও সন্দেহের অবকাশ নেই।

কিন্তু ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি সরে দাঁড়ালেই সমস্যার সমাধান হয়ে গেল, তা তো না। সমাধানের জন্য পরিস্থিতি তৈরি হল

যায়। এই অবস্থা কোন্ ভবিষ্যৎ রচনা করবে, এই মুহূর্তেই তা সঠিক বলা যায় না।

তবে এটা ঠিক, ব্রহ্মানন্দ সরে দাঁড়ালে দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা বসানোর, মুরোদ নেই কারো। কেউ আসবেন না পরিত্যক্ত উত্তপ্ত আসন গ্রহণ করতে। রাষ্ট্রপতির শাসন সেক্ষেত্রে অনিবার্য। অবশ্য রাষ্ট্রপতির শাসনকালেও তিনমাস আইনসভা বাতিল না করে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার যে প্রস্তাব শ্রীযুত কৃপালনী রেখেছেন, সে প্রস্তাবও একেবারে সারবত্তাহীন নয়। কিন্তু অবস্থা জড়িয়ে এনে ব্রহ্মানন্দকে ভোট অব কনফিডেন্সের মাধ্যমে পুনশ্চ বহাল করার প্রস্তাবটি শুনতে সুখকর। বাস্তবে ভোট অব কনফিডেন্সেও কি ব্রহ্মানন্দ তরে যেতে পারবেন।

স্বতন্ত্র তেলেঙ্গানার দাবিও পরিত্যক্ত হয় নি। পাঞ্জাব ভাগ করে যদি হরিয়ানা হতে পারে, তবে তেলেঙ্গানাই বা নয় কেন, এ প্রশ্নও সমান চালু আছে। পরিস্থিতি ঘোরালো ও জটিল। ভবিষ্যদ্বাণী তাই অসম্ভব। —২৮।৬।৬৮

এই তো সময়
ইউবিআইতে সঞ্চয় করার

* সেভিংস অ্যাকাউন্টে বছরে শতকরা ৩½ টাকা সুদ।
* মাত্র ৫৲ টাকা জমা দিয়ে হিসেব খুলতে পারেন।
* চেকবই ব্যবহার করা যায়।
* টাকা সহজেই তোলা যায়।
* মেয়াদী আমানতে মেয়াদ অনুসারে সর্বাধিক শতকরা ৬½ টাকা পর্যন্ত সুদ।
* পৌনঃপুনিক আমানতের (রেকারিং ডিপোজিট) শর্তাদি সুবিধাজনক।

আসুন…আমাদের এখানেই সঞ্চয় করুন

UNITED BANK OF INDIA LTD

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ
রেজিঃ ও হেড অফিস ঃ
৪, নরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত সরণি
(পূর্বতন ঃ ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট)
কলিকাতা-১

naa/UBI-7/68 BEN

পশ্চিমবঙ্গে ১১০টিরও অধিক শাখা অফিস আছে

আন্তর্জাতিক

দক্ষিণ রোডেশিয়া ঃ

বৃটিশ সরকার দক্ষিণ রোডেশিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে।

বৃটিশ সরকারের পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ দপ্তরের মন্ত্রী মাইকেল স্টুয়ার্ট গত ২৪শে জুন পার্লামেন্টে এই কথা ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, দক্ষিণ রোডেশিয়ার রাজধানী সলিসবেরী থেকে বৃটিশ মিশন তুলে নেওয়া হবে। বিপরীত দিকে লণ্ডনের রোডেশিয়া হাউসও বন্ধ করে দেওয়া হবে। তিন সপ্তাহের মধ্যে এই ব্যবস্থা কার্যকরী করা হবে। মাইকেল স্টুয়ার্ট আরও বলেছেন, দক্ষিণ রোডেশিয়ার গভর্নর-জেনারেল স্যার হামফ্রে গিবস পদত্যাগ করতে চেয়েছেন, এবং বৃটিশ মন্ত্রিসভার পরামর্শমত রাণী এলিজাবেথ গিবসের পদত্যাগপত্র গ্রহণে সম্মতি জানিয়েছেন।

আয়ান স্মিথের নেতৃত্বে রোডেশিয়া সরকার সাড়ে তিন বৎসর পূর্বে 'একতরফা স্বাধীনতা' (য়ুনিল্যাটেরাল ডিক্লারেশন অব ইন্ডিপেন্ডেন্স) ঘোষণা করার পর কার্যত রোডেশিয়া সরকারের ওপর বৃটেনের কোন কর্তৃত্ব ছিল না। তবু রাণীর প্রতিনিধি রূপে হামফ্রে গিবস গভর্নর-জেনারেলের কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আর, আনুষ্ঠানিকভাবে রাণীর আনুগত্যও মেনে চলছিল দক্ষিণ রোডেশিয়া।

এই অবস্থার পরিবর্তন হতে চলেছে। ২০শে জুন আয়ান স্মিথ গণভোট গ্রহণ করেছেন। এই গণভোটে সিদ্ধান্ত হয়েছে, রোডেশিয়া প্রজাতন্ত্র হবে। তাই বৃটেন সম্পর্ক ছিন্ন করল।

রোডেশিয়ার আসল সমস্যা প্রজাতন্ত্র কি রাজতন্ত্র নয়। এখানকার সমস্যা বর্ণ-বৈষম্যের সমস্যা। রোডেশিয়ার চল্লিশ লক্ষ কৃষ্ণকায় অধিবাসীর ওপর এদেশের সোয়া দু' লক্ষ শ্বেতকায় তাদের শাসনকর্তৃত্ব বজায় রাখতে চায়। শাসনক্ষমতা থেকে কৃষ্ণকায়দের তফাৎ রেখে, প্রতি বিষয়ে তাদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা করে চরম বর্ণ-বৈষম্যের নীতি অনুসরণ করাই রোডেশিয়া সরকারের উদ্দেশ্য।

এই উদ্দেশ্য নিয়েই আয়ান স্মিথ ও তাঁর দলবল একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। দক্ষিণ রোডেশিয়া তখন বৃটিশ সাম্রাজ্যের অংশ। বৃটেন কর্তৃত্ব অগ্রাহ্য করে এই কাজ করায় বৃটেন স্মিথ সরকারের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করুক, এই দাবি সর্বত্র উঠেছিল। কিন্তু বৃটেন বিশেষ কিছু করে নি। শ্বেতকায়দের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা বৃটিশ সরকারের পক্ষে শক্ত।

পরে অবশ্য নানাভাবে মীমাংসার চেষ্টা হয়েছে। ধীরে ধীরে কৃষ্ণকায়দের শাসনে গ্রহণ করার প্রস্তাব করা হয়েছে। কিন্তু আয়ান স্মিথরা কোন প্রস্তাবে কর্ণপাত করেন নি। রোডেশিয়ায় স্মিথ সরকারের বিরুদ্ধে আফ্রিকীয়রা গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেছে। স্মিথ সরকার তাতে বিচলিত হয় নি। বিশ্বজনমত নিন্দা করেছে বর্ণ-বৈষম্যের। স্মিথ সরকারের নিদ্রার কোন ব্যাঘাত ঘটে নি তাতে।

এখন তারা গণভোটে প্রস্তাব করেছে ঃ (১) রোডেশিয়াকে 'প্রজাতন্ত্র' রূপে ঘোষণা করা হোক; এবং (২) স্মিথের রোডেশিয়ান ফ্রন্ট সরকার কর্তৃক নতুন সংবিধান চালু করা হোক।

দুটি প্রস্তাবই গণভোটে বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হয়েছে। অবশ্য যাঁরা ভোট দিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে তেরো ভাগের মাত্র এক ভাগ ছিলেন কৃষ্ণকায়। 'এক মানুষ, এক ভোট' নীতি এখানে অনুসৃত নয়।

নতুন সংবিধান অনুসারে কৃষ্ণকায়দের জন্য কেবল পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থাই থাকবে না, প্রতি ব্যাপারে থাকবে 'পৃথকীকরণের' (সেগ্রেগেশন) ব্যবস্থা। তাছাড়া প্রদত্ত আয়করের পরিমাণের ভিত্তিতে ভোটদানের অধিকার দেওয়া হবে। ফলে অতি সামান্য কৃষ্ণকায় ভোটের অধিকার পাবে। অর্থাৎ, শ্বেতাঙ্গদের তুলনায় আফ্রিকীয়দের সংখ্যা বিশ গুণ বেশি হলেও চিরকালের জন্য শ্বেতাঙ্গ প্রভুত্ব অব্যাহত থাকবে। আয়ান স্মিথ গণভোটের সপক্ষে বক্তৃতা করতে গিয়েও এই কথাই বলেছেন। তিনি বলেছেন, "সভ্য লোকেদের হাতে যাতে চিরকালের জন্য ক্ষমতা থাকে", তার জন্য এই সংবিধান।

শ্বেতাঙ্গদের মধ্যেও অনেকে এই সংবিধান ও প্রজাতন্ত্র ঘোষণার সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছেন। এঁদের মধ্যে রোডেশিয়ার প্রবীণ নেতা রয় ওয়েলেনস্কি ও সেন্টার পার্টির নেতা প্যাট ব্যাসফোর্ড অন্যতম। তবু গণভোটে স্মিথের জয় হয়েছে।

গণভোটের ফল বের হবার পর আফ্রো-এশীয় গোষ্ঠীর সদস্যরা বিষয়টি রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদে তুলেছিলেন। কেবল রোডেশিয়া নয়, দক্ষিণ আফ্রিকা ও পর্তুগীজ অধিকৃত অ্যাঙ্গোলা, মোজাম্বিক প্রভৃতির বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের দাবি তাঁরা জানিয়েছিলেন। কিন্তু সদস্যদের মধ্যে মতভেদের দরুণ নিরাপত্তা পরিষদে কোন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় নি।

এখন প্রশ্ন হল ঃ বৃটেন কি কেবল কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেই বসে থাকবে, না আরও কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করবে? সাড়ে তিন বৎসরের অভিজ্ঞতা বলে, বৃটেন এবারও অপমান হজম করবে। দৃঢ়তার সঙ্গে অর্থনৈতিক অবরোধ, কিংবা বলপ্রয়োগ, কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করবে না।

সোভিয়েট য়ুনিয়নের সরকারী মুখপত্র 'প্রাভদা' আরও এক ধাপ এগিয়ে বলেছে। বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রজাতন্ত্রী রোডেশিয়াকে স্বীকৃতিদানের জন্য চেষ্টা করছে।

বৃটেন।

শেষ পর্যন্ত সরকারের সঙ্গে শ্রমিক নেতাদের একটা আপোষ হয়েছে।

আকস্মিক ধর্মঘটের বিরুদ্ধে সরকারী ব্যবস্থা গ্রহণের প্রস্তাব নিয়ে হ্যারল্ড উইলসনের শ্রমিক দলের সরকারের সঙ্গে প্রভাবশালী বৃটিশ ট্রেডস য়ুনিয়ন কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রায় ছ' মাস ধরে জোর বিবাদ চলছিল।

ইদানীং হঠাৎ ধর্মঘটের সংখ্যা খুব বেড়ে গিয়েছিল এবং তার ফলে শিল্পের প্রচুর ক্ষতি হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সরকারের পক্ষ থেকে পার্লামেন্টে এর বিরুদ্ধে বিল আনা হয়েছিল। এই বিলে বলা হয়েছিল ঃ (১) কোন শ্রমিক-মালিক বিরোধ উপস্থিত হলে ২৮ দিনের মধ্যে কোন পক্ষ কিছু করবে না; (২) বিরোধ-নিষ্পত্তির জন্য সরকারী ব্যবস্থা থাকবে; এবং, (৩) আকস্মিকভাবে ধর্মঘট শুরু করা হলে শাস্তিস্বরূপ শ্রমিকদের জরিমানা করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন এই বিলকে প্রায় মর্যাদার বিষয়ে পরিণত করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ "সরকারকে যদি ক্ষমতায় থাকতে হয়, তবে এই বিল পাশ করতেই হবে।"

কিন্তু উইলসন বোধ হয় একটু বেশি বলে ফেলেছিলেন। ট্রেডস য়ুনিয়ন কংগ্রেস, শ্রমিক দলের মূল শক্তি, তার প্রধান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবলম্বন। স্বাভাবিকভাবেই টি-ইউ-সি এই বিলকে পছন্দ করে নি। পার্লামেন্টেও শ্রমিক

দলের অনেক সদস্য একে সমর্থন করে নি। তাঁরা এই ব্যাপারে হ্যারল্ড উইলসন ও বারবারা ক্যাসলের ওপর চাপ দিতে থাকেন।

অবশেষে উইলসন বিলটি প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। টি-ইউ-সি'ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যাতে আকস্মিক ধর্মঘট না হয়, তার জন্য শ্রমিক নেতারা বিশেষভাবে চেষ্টা করবেন। টি-ইউ-সি'র বর্তমান সাধারণ সম্পাদক ভিক্টর ফেদার মীমাংসার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

কার জয় হল? উইলসন বলছেন, সরকারের জয় হয়েছে। সরকার কঠোর মনোভাব গ্রহণ করায়, শ্রমিক নেতারা আকস্মিক ধর্মঘট নিয়ন্ত্রণের সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। বিপরীত দিকে আবার টি-ইউ-সি বলছে, জয় তাদের হয়েছে। সরকার পশ্চাদপসরণ করেছেন। বিল প্রত্যাহার করতে হয়েছে।

জয়-পরাজয় যারই হোক, মালিকপক্ষ খুব চটেছে। আর চটেছে বিরোধীপক্ষ রক্ষণশীল দল।

মালিকপক্ষ, অর্থাৎ 'বৃটিশ কনফেডারেশন অব ইন্ডাস্ট্রিজ' একে 'অন্যায় চুক্তি' বলে অভিহিত করেছে। কনফেডারেশনের ডিরেক্টর-জেনারেল জন ডেভিস এই মীমাংসার কঠোর সমালোচনা করেছেন।

বিরোধী রক্ষণশীল দলনেতা এডওয়ার্ড হিথ একে সরকারপক্ষের বড় পরাজয় বলে অভিহিত করেছেন। রক্ষণশীল পত্রিকাগুলি সরাসরি প্রশ্ন করেছে: বৃটেনে সরকার চালাচ্ছে কে? প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভা, পার্লামেন্ট? না, ব্লুমসবেরীর 'কংগ্রেস হাউসে' যে ট্রেড য়ুনিয়ন নেতারা বসে আছেন, তাঁরা?

সরকার ও ট্রেড য়ুনিয়ন নেতাদের মধ্যে আপোষের ফলে ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিক দলের জয়ের সম্ভাবনা বেড়ে গেল, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সুদান:

কয়েক সপ্তাহ আগে সুদানে যে 'বিপ্লব' হয়ে গেল, তার পর এখন অবস্থা অনেকখানি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে।

সামরিক অভ্যুত্থানের নায়ক জেনারেল জাফর নুমেরি নতুন সর্বোচ্চ বিপ্লবী পরিষদের চেয়ারম্যান হয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন বাবিকর আওদাল্লা। নতুন সরকার সুস্পষ্টভাবেই বামপন্থীঘেঁষা। ইতিমধ্যেই এই সরকার জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতি দিয়েছে। মস্কোয় সুদানের নতুন রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হয়েছেন সুদান কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বিশিষ্ট সদস্য আহমেদ সুলেমান।

আগের আমলের রাষ্ট্রপতি, মন্ত্রী, সরকারী কর্মচারী, সৈন্য, পুলিশ, রাজনৈতিক নেতা প্রভৃতির বিরুদ্ধে দুর্নীতির নানা অভিযোগ এনেছেন নতুন সরকার। দুর্নীতি দূরীকরণে নুমেরি সরকার বদ্ধপরিকর। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ইসমাইল আজহারির বিরুদ্ধে অভিযোগ: তিনি সরকারী ক্ষমতার অপব্যবহার করে দশ লক্ষ স্টার্লিং পাউন্ডের ব্যক্তিগত সম্পত্তি করেছেন। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী সারিদ আল হিন্দির বিরুদ্ধেও গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। সাদিক আল মাহদি সহ প্রায় সকল রাজনৈতিক নেতাই বর্তমানে খার্তুমে নীল নদের তীরে এক বিরাট জেলে আটক রয়েছেন।

নুমেরি আরও স্থির করেছেন, দক্ষিণাঞ্চলের তিনটি প্রদেশের সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে ফেলবেন। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা উত্তরাঞ্চলের লোকেদের মত আরব বংশোদ্ভূত নয়। তাই ওদের পৃথক সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক অস্তিত্ব মেনে নিয়ে এদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার দেওয়া হবে। দক্ষিণাঞ্চলের জন্য একজন পৃথক মন্ত্রীও থাকবেন। দক্ষিণের সঙ্গে মিটমাট করে ফেলতে পারলে সরকারের অনেক অর্থ বাঁচবে। এই অর্থ জনকল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করা যাবে।

(২৯-৬-৬৯)

অহিংসা পরম ধর্ম—

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

আচ্ছা আইন করে কি মানুষের দেহে রোগ হওয়া বন্ধ করা যায়। অর্থাৎ আইনসভায় আইন পাশ করে দেওয়া হল যে, আর কারো কলেরা হবে না, টাইফয়েড হবে না, পেট খারাপ হবে না, চোখ উঠবে না, কান পাকবে না, তাহলে কেমন হতো? কথাটা মনে পড়লো রাজ্যের যুক্তফ্রন্টের শরিকদলের ঘেরাও নিয়ে তর্ক-বিতর্কে। মানুষের দেহ আর সমাজদেহে কি কোন তফাৎ আছে? বয়সের ধর্মে মানুষের দৈহিক গড়নের পরিবর্তন হয়, মানসিকতার পরিবর্তন হয় আবার ঋতুর পরিবর্তনে রোগেরও দেহে প্রবেশ ঘটে। কিন্তু মানুষের দেহ কি কোন আইন দিয়ে রোগমুক্ত রাখা যায়? যেমন ১৪৪ ধারা জারি করে বেআইনী জমায়েত বন্ধ করা হয়। কার্ফু অর্ডার জারি করে একেবারে ঘর থেকে রাস্তায় বেরুনো বন্ধ হয়—রোগের ক্ষেত্রে কি এইরকম কিছু আইন জারি সম্ভব? কোন পাগলও বলবে না আইন করে রোগমুক্ত করা সম্ভব। কিন্তু তাই বলে কি রোগ মুক্ত করা বা রোগ নির্মূল করা যায় না। নিশ্চয়ই যায়। একদা বাংলাদেশে কালাজ্বর হয়ে হাজার হাজার মানুষ মারা যেত, কিন্তু ডাঃ ইউ এন ব্রহ্মচারী কালাজ্বরের ঔষধ আবিষ্কার করে কালাজ্বরকে নির্মূল করেছেন। ম্যালেরিয়া রোগও একদা বাংলাদেশের শত শত গ্রামকে উজাড় করে শ্মশান করে দিয়েছে, সেই ম্যালেরিয়া রোগও আজ আর সমস্যা নয়। কিন্তু কালাজ্বর ও ম্যালেরিয়া রোগ বন্ধ করবার জন্য কেউ কখনও আইন প্রণয়নের কথা ভেবেছে কি? কেউ কোন নিষেধাজ্ঞা জারির কথা ভেবেছে কি? কিংবা কোন গ্রামে বা জেলায় ম্যালেরিয়া বা কালাজ্বর হচ্ছে বলে কখনও গভর্নর রুল কায়েমের কথা ভেবেছে কি? নিশ্চয়ই ভাবে নি—কিন্তু বোধ হয় দিন-কাল-যুগের পরিবর্তনে এই সব চিন্তাও মাথায় আসছে। জন্ম নিয়ন্ত্রণ হবে আর ঘেরাও নিয়ন্ত্রণ হবে না—এই কি একটা কথা। অতএব ঘেরাও আইন করে বন্ধ কর।

কিন্তু ঘেরাও কি কিছু নতুন ঘটনা, কোন অভিনব ঘটনা, আর ঘেরাও কি সত্যি কোন মাথা খারাপ হবার মত ঘটনা? সেই সঙ্গে আর একটা প্রশ্ন মনে আসে—ঘেরাও কি শুধু শ্রমিকরা করে? ঘেরাওকে কি মালিকরা অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করে না? আর একটা প্রশ্ন—যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলেই ঘেরাও নিয়ে এত সোরগোল ওঠে কেন? এই প্রশ্নসমূহের জবাবের মধ্যেই ঘেরাও সমস্যা এবং তার সমাধান ধরা পড়বে। প্রথম কথা হল—ঘেরাও চিরকালই হত, শ্রমিকরা বহু সময় যে জায়গায় দাঁড়িয়ে দাবি আদায়ের প্রয়োজনে ঘেরাও করত। বহু সময় মালিকরা সেই ঘেরাও-এর কাছে নতিস্বীকার করে শ্রমিকদের দাবি মেনে নিতো, অন্যথায় টেলিফোন তুলে পুলিশ ডেকে পাঠাত, পুলিশ এসে দরকার মত লাঠি-গুলী চালিয়ে শ্রমিকদের ঘেরাও ভাঙত, মালিক বা তার প্রতিনিধিকে উদ্ধার করে শ্রমিকদের ঠাণ্ডা করে দিত। কাক পক্ষীও টের পেত না—কে কোথায় মালিককে ঘেরাও করেছিল আর কোথায় লাঠি-গুলী চালিয়ে পুলিশ মালিককে শ্রমিকের হাত থেকে ঘেরাও মুক্ত করেছে। কিন্তু ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন হল, শ্রমিক-মালিকের বিরোধ মীমাংসায় গঠিত হল লেবার ট্রাইবুনাল। বিরোধ দেখা দিলে লেবার ট্রাইবুনালে যাও। কিন্তু কিছুদিন পরে দেখা গেল—লেবার ট্রাইবুনালেও কাজ হচ্ছে না, শ্রমিকরা তাদের দাবি আদায়ের জন্য লেবার ট্রাইবুনালে যায় বটে, কিন্তু সেই ট্রাইবুনাল-এর রায় বেরুতে বেরুতে শ্রমিকদের আয়ু শেষ হয়ে যায়। আবার ট্রাইবুনালের রায় মালিকের বিপক্ষে গেলে মালিক দিব্যি সুন্দর ট্রাইব্যুনালের রায়কে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখায়। শ্রমিকরা ধীরে ধীরে লেবার ট্রাইব্যুনালের মোহমুক্ত হতে লাগল। অর্থাৎ ঘেরাও অস্ত্র একইভাবে প্রয়োগ হতে লাগল। কিন্তু অবস্থার আরো কিছু পরিবর্তন ঘটল।

রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার পর সরকার ঘোষণা করলো শ্রমিক-মালিকের লড়াইয়ে সরকার পুলিশ পাঠাবে না, অর্থাৎ ঘেরাও ভাঙতে পুলিশ যেয়ে শ্রমিকের মাথায় ডাণ্ডা মারবে না। মালিকরা সরকারী এই নীতির প্রতি চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কোর্ট থেকে রায় বের করল যে, ঘেরাও বেআইনী কাজ, ঘেরাও মুক্ত হবার আবেদন জানালে সরকার তথা পুলিশ মালিককে শ্রমিকদের ঘেরাও থেকে মুক্ত করতে বাধ্য থাকবেন। কিন্তু এত কিছু করেও দেখা গেল—সমস্যা যেখানে ছিল, সেইখানেই আছে—ঘেরাও চলছে।

এই অবস্থার মধ্যেই যুক্তফ্রন্ট শরিক দলগুলির মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে বা কেউ কেউ তুলেছেন—না ঘেরাও একেবারে আইন করে বন্ধ করতে হব। এই কথা বলতে যেয়ে একটা গুরুতর কথা বলা হয়েছে, যে কথার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের ভাগ্য জড়িত। সেই কথা হল ঘেরাও-এর কারণে রাজ্যের সব শিল্প-কারখানা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, সব বিনিয়োগকারী অর্থ অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে, নতুন শিল্প-কারখানা হচ্ছে না বা কোন মালিক নতুন করে অর্থ বিনিয়োগ করে শিল্প-কারখানা স্থাপন করছেন না। এই ভয়ঙ্কর সমস্যাটিকে ঘেরাও-এর সঙ্গে জড়িত করে তোলা হয়েছে, তাই প্রশ্ন ওঠে—আচ্ছা ঘেরাও-এর কারণেই কি রাজ্যে শিল্প-কারখানা স্থাপন হচ্ছে না, অর্থ বিনিয়োগ বন্ধ হচ্ছে, বিনিয়োগের অর্থ অন্য রাজ্যে চলে যাচ্ছে? এই সব প্রশ্নগুলির জবাব অনেক বড় কথায় ও বড় বড় হিসাবের মাধ্যমে দেওয়া যায়। এই হিসাব রাজ্যের বণিক সংস্থাগুলি তথা চেম্বার অফ কমার্সসমূহ একভাবে দেবেন আবার রাজ্যের শ্রমদপ্তর বা মন্ত্রিসভা অন্যভাবে দেবেন। আমি বণিক সংস্থার কথা বা বণিক সংস্থার বক্তব্যের বিরোধীদের কথা কোনটাই তুলতে চাই না। আমার মনে আসে একটা সাদা প্রশ্ন। শিল্পক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ সারা ভারতে প্রথম ছিল. কিন্তু ১৯৫৫ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে যেতে শুরু করল। প্রথমে মহারাষ্ট্রের কাছে পরাজিত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ দ্বিতীয় হল—তারপর এখন সম্ভবত তৃতীয় বা

চতুর্থ স্থানে নেমে এসেছে। ১৯৫৫ সালে তো যুক্তফ্রন্ট সরকার ছিল না আর আজকের এই ঘেরাও ছিল না, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের এই শিল্পক্ষেত্রে অধঃপতন তো কম করে ১৫ বৎসর আগে থাকতে শুরু হয়েছে—তখন শিল্প দরদী, শ্রমিক দরদী ও রাজ্যের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উৎকণ্ঠিত এ-সব মহাপ্রাণরা কোথায় ছিলেন? শিল্পক্ষেত্রে না হয় ঘেরাও-এর কারণে সব গেল, না হয় আজ যুক্তফ্রন্ট সরকার এসে সবকিছু গ্রাস করে নিচ্ছে, কিন্তু যদি প্রশ্ন করি শিক্ষাক্ষেত্রে কি হচ্ছে? শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলা দেশে একদা ভারতে প্রথম ছিল। শুধু প্রথম থাকা নয় —বাঙালী জাতি শিক্ষাভিমানী, সংস্কৃতির পূজারী ইত্যাদি কত বিশেষণ ও মর্যাদা পেত। আজ স্বাধীনতার ২২ বৎসর পর সেই পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষাক্ষেত্রে নিচুতে নামতে নামতে এখন সম্ভবত অষ্টম স্থানে এসে দাঁড়িয়েছে। একবার চিন্তা করুন —ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বাংলা দেশ আজ শিক্ষাক্ষেত্রে অষ্টম স্থানে। তাহলে বোঝা দরকার মূল সমস্যাটা কোথায়, যে সমস্যা শিল্পক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গকে টেনে নামায়, শিক্ষাক্ষেত্রে টেনে নামায়। শুধু শিক্ষা আর শিল্প নয় প্রায় সব ক্ষেত্রেই যেখানে বাংলা দেশ ও বাঙালীর প্রথমস্থান এবং প্রাধান্য ছিল, সেখান থেকেই বাঙালী হটে এসেছে, সরে এসেছে। তবে শিল্পক্ষেত্রে ঘেরাও নামক একটি শব্দ বা অজুহাত পাওয়া গেছে, কিন্তু অন্যক্ষেত্রে সেই রকম কোন শব্দ বা অজুহাত পাওয়া যায় নি এই হল কথা।

যাই হোক ঘেরাও নিয়ে কথা চলছে, তবে তাই বলি। মূলধন আর কারখানা পশ্চিম বাংলা থেকে চলে যাচ্ছে বলে আজ অনেকে বাংলা দেশের দরদে চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছেন। আমার প্রশ্ন—এরা হঠাৎ এত দরদী হয়ে উঠলেন কেন? এত দরদ নিয়ে এত দিন কোথায় ঘুমোচ্ছিলেন? জীবনবীমা, স্টেট ব্যাঙ্ক, রেল প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে যুক্ত-সংস্থাগুলিই হোক, তৈল শোধনাগার থেকে শুরু করে একটা স্কুটার কারখানাই হোক—সব কিছু থেকে বাংলা দেশকে বঞ্চিত করা কি আজ থেকে শুরু হয়েছে? বোদয়ায় তেল পাওয়া গেল, যখন কাজ চলবে সব ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেল, কিন্তু আজ সব ভেস্তে যাচ্ছে কেন? হলদিয়ায় শোধনাগার তৈরি হতে কত টালবাহানা, কিন্তু গুজরাটে রাতারাতি শোধনাগার হয়ে যায়—শুধু হয়ে যাওয়া নয়, কারখানা তৈরি শেষ হবার আগেই কারখানার জন্য কত অগ্রিম অর্ডার পড়ে গেছে। ঘটনাটা হল এই—পশ্চিমবাংলায় কারখানা তৈরি হতে দেওয়া হয় না আর অন্যত্র কারখানা শুধু তৈরি, যে তৈরির আগে সেখানে অগ্রিম অর্ডার দেওয়া হয়। শুধু এই নয় বহুক্ষেত্রে চেষ্টা করা হয় পশ্চিমবঙ্গের তৈরি কারখানা যাতে বন্ধ হয় বা উঠে যায়। পশ্চিমবাংলায় কাঁকিনাড়ায় ইনচেক্ নামে যে টায়ার প্রস্তুত কারখানাটি আধা দেশীয় প্রতিষ্ঠান আছে, তা সম্পূর্ণভাবে বাঙালী শিল্পপতিদের নিয়ন্ত্রণে। এইবার এই কারখানার অর্ডার অর্ধেক করে ডানলপ ও ফায়ার স্টোনের অর্ডার বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কেন? কারণ হল এই যে, ইনচেক্ শুধু বাংলাদেশে অবস্থিত কারখানা—ডানলপের অন্য প্রদেশে শাখা আছে। এই পরিস্থিতি সৃষ্টির মূলে কি আছে? ইনচেককে বলা হচ্ছে যে, তোমরা বাংলাদেশ থেকে কারখানা গুটিয়ে অন্য প্রদেশে চলে এস, অর্ডার পাবে। শুধু ইনচেক্ কেন, সেক্‌স বি ফারমার কারখানা অচল হয়ে পড়ে আছে—রাজ্য সরকার আকাশ-পাতাল করছেন কারখানাটি চালু রাখতে, দশ হাজার পরিবারকে রক্ষা করতে। এই কারখানাটি বাঁচিয়ে রাখতে হলে দরকার কেন্দ্রীয় রেল মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা। কারণ রেলই এই কারখানায় উৎপন্ন দ্রব্যের প্রধান গ্রাহক। পশ্চিমবঙ্গ - সরকার প্রস্তাব দিল—তারা টাকা দিচ্ছে, কেন্দ্র কিছু দিক, কারখানা চালু থাক। আর কেন্দ্রের খুববেশি টাকাও দিতে হবে না। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বেশ উৎসাহী ছিলেন, রেলের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীপরিমল ঘোষও বেশ এগিয়েছিলেন, কিন্তু শ্রীরামসুভগ সিং বললেন— না না, কেন্দ্র কোন শেয়ার নেবে না, ওই কারখানা গোল্লায় যাক—শ্রীজ্যোতি বসু যে প্রস্তাবের প্রবক্তা, সেই প্রস্তাবে সায় দেবেন তিনি, ওয়াক থুঃ। অথচ প্রকৃত ঘটনা হল স্যাক্‌সবি কারখানা বন্ধ হলে এই রেলমন্ত্রী শ্রীরামসুভগ সিং বৎসরে ৮ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা দিয়ে স্যাক্‌সবি কারখানায় যে দ্রব্য তৈরি হয়, সেই দ্রব্য বিদেশ থেকে কিনবেন। ওভি আচ্ছা হ্যায়, কিন্তু শ্রীরামসুভগ সিংহ ২৫ কোটি টাকা সাহায্য করে বাংলাদেশের দশ হাজার পরিবার সেই সঙ্গে এই কারখানায় দ্রব্য সরবরাহ করে বেঁচে থাকে আরো দশ হাজার পরিবারকে রক্ষা করবেন না। কিন্তু যখন স্যাকসবিকে টাকা দেবার কথা চলছে ও শ্রীরামসুভগ সিংহ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাচ্ছেন, তখনই কেন্দ্রীয় সরকার টাকা দিয়ে ৮টি কাপড় কল চালু করেছেন। তবে কথা হল, সেই কাপড় কলগুলি সবই ভিন্ন প্রদেশে, বাংলাদেশে নয়। স্যাক্‌সবির মত স্ট্যান্ডার্ড ওয়াগন কারখানার এই একই অবস্থা। অর্থাৎ মূল কথা হল, এইভাবে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে সুরু করে বহু শিল্পপতি নীতি হিসাবে গ্রহণ করেছেন বাংলাদেশকে ভাতে মারার, কারণ হাতে মারবার ক্ষমতা আজ তাদের নেই। তাই হাতে না মারতে পেরে ভাতে মারবার কারণেই সৃষ্টি হচ্ছে সব সমস্যা। ঘেরাও, ঘেরাও বলে, শিল্প-কারখানা উঠে যাচ্ছে বলে যারা চিৎকার করছেন, তাঁরা এই কথা জানেন না এমন নয় যে, গত কয়েক বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে দু'শোর বেশি নতুন শিল্প-কারখানা হয়েছে এবং শিল্পপতিকুলের চূড়ামণি বিড়লা ব্রাদার্স হিন্দ্ মোটরে ভারতের বৃহত্তম মোটর শিল্পের কারখানা স্থাপন করেছেন, আর শিল্পপতি জগতের কুলগুরু খোদ গ্রেট ব্রিটেনের শিল্পপতিরা ভারতের শিল্পমন্ত্রী শ্রীফকরুদ্দিন আলিকে বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে ঘেরাও নিয়ে তাদের মাথা ব্যথা নেই, সেখানে শিল্প স্থাপনে কোন বাধা নেই বা উৎসাহের অভাব নেই। কাজেই পরিবেশের দিক দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ খারাপ এই তথ্য ধোপে টেকে না। মূল কথা হল—এই ভাতে মারবার, হাতে না মেরে পশ্চিমবঙ্গকে ভাতে মারতে হবে; ঘেরাও হল সেই স্কেপ গোট।

কিন্তু এই কথার অর্থ এই নয় যে, ঘেরাও ভাল বা ঘেরাও-এর নামে যা হচ্ছে সেটা ভাল। কিন্তু কেন ঘেরাও হয়, তার কারণ অনুসন্ধান করলে এই তথ্যই ধরা পড়বে; সেটা হল—ঘেরাও যত হয় শ্রমিকদের কারণে, তার চেয়ে বেশি হয় ঘেরাওকে স্কেপ গোট হিসাবে ব্যবহারের তাগিদে। বারান্তরে সেই কথা বলব।

পুরশ্চরণ রহস্যোল্লাস ঃ
(দুর্লভ তান্ত্রিক গ্রন্থ। মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ।) মূল্য—৩'০০ টাকা।

পঞ্চতীর্থ মাহাত্ম্য ঃ
শ্রীকাশীমাহাত্ম্যম্, শ্রীগয়ামাহাত্ম্যম্, শ্রীবৈদ্যনাথ মাহাত্ম্যম্, শ্রীপ্রয়াগ মাহাত্ম্যম্, শ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম্যম। মূল সংস্কৃত ও পণ্ডিতপ্রবর শ্রীকালীপ্রসন্নকৃত বঙ্গানুবাদ। মূল্য—৩'০০ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

রামরাজত্বের প্রধান আকর্ষণ হনুমান। এই সম্পর্কে আমাদের দার্শনিক, অধ্যাপক, পণ্ডিতেরা যত গবেষণাই করুন, অন্য কোনরূপ সিদ্ধান্ত তাঁহাদের পক্ষে প্রমাণ করা সম্ভব নহে। কেন না, ইহা একটি স্বতঃসিদ্ধ প্রমাণ, যাহাকে ইংরাজীতে বলা হয় axiom. আবার, কেহ যদি মনে করেন, এই হনুমান সংখ্যায় একক, যিনি লেজের আগুনে গোটা স্বর্ণলঙ্কা পোড়াইয়া অক্ষয়কীর্তি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা হইলেও ভুল হইবে। সেই রাম, সেই লঙ্কা, এমন কি সেই পবননন্দন (যদিও ইনি অমর) এখন ইতিহাসের পৃষ্ঠায়। আমি যে রামরাজত্বের কথা বলিতেছি, সেখানে শত-সহস্র হনুমান। এই রাজত্বে রামের বদল হয়; যেমন, কংগ্রেসী রাম, কমিউনিস্ট রাম, অথবা যুক্তফ্রন্টের রাম; কিন্তু হনুমানেরা আদিম, শাশ্বত এবং অপরিবর্তনীয়।

এইসব হনুমানের যে প্রত্যেকেরই একটি করিয়া লেজ আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। সমস্ত লেজ একত্র করিতে পারিলে একটি কেন, সহস্র স্বর্ণলঙ্কা ভস্মীভূত করা যায়। কিন্তু রামরাজত্বের হনুমানেরা সম্প্রতি বড়ই সুসভ্য। তাঁহারা সকলেই মানবপ্রেমিক। এতদিন তাঁহাদের মুখে অহিংসা ও গান্ধীপ্রেমের কত-না কীর্তন শুনিয়াছি; সকলেরই কণ্ঠস্বর বড় মিস্ট। সম্প্রতি তাঁহারা দলে দলে কমিউনিস্ট অথবা ঐ ধরণের কোন না কোন মানবধর্মী শিবিরে গিয়া সেবাধর্মের দীক্ষা গ্রহণ করিতেছেন। আগেই বলিয়াছি, রামরাজত্বে রামচন্দ্র মাঝে-মধ্যেই তাঁহার পোষাক বদলান। হনুমানেরা সকলেই রামভক্ত। "Ramchandra is dead, long live Ramchandra."—এই ধ্বনি দিতে দিতে তাঁহারাও নূতন রামরাজত্বে কিছু কিছু নূতন বুলি মুখস্থ করিয়া লন। যেমন গতকল্যের গান্ধীবাদ অদ্য শ্রেণীহীন সমাজের অমূল্য ভাষণে হনুদের সভা, ময়দান ইত্যাদিতে মাঝে-মধ্যেই মধুবর্ষণ করে। কিন্তু প্রবাদে আছে,

স্বভাব যায় না ম'লে,
কয়লা যায় না ধুলে......'

রামভক্তদের অপরের উপর মস্তানী, গুন্ডামী ইত্যাদি মহৎ গুণাবলীর কোনরূপ পরিবর্তন কখনই হয় না। সুতরাং তাঁহারা যখন রাস্তায় মিছিল করিয়া শ্রেণীহীন সমাজের শ্লোগান দিতে থাকেন; শুনিয়া সকলেরই প্রাণ জুড়ায়; আবার, কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই মিছিলের মাতব্বরেরা যখন ছোরা-ছুরি ইত্যাদির নানাবিধ কসরৎ দেখান এবং সম্ভব হইলে অপরের গৃহে আগুন দেন, তখনও তাঁহাদের গভীর মানবপ্রেম উপলব্ধি করিয়া (শ্রেণীহীন সমাজের প্রতিষ্ঠার জন্য ইহা ছাড়া অন্য পথ নাই) আমরা মুগ্ধ হই। ইতিপূর্বে গান্ধী, নেহরু, বিনোবা, রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রমুখ দেবতাদের নামে রামরাজত্বের সর্বত্র অহোরাত্র কীর্তন শুনা যাইত। কতদিন গৃহে উলঙ্গ অবস্থায় এবং এককণা তণ্ডুলের অভাবে ছটফট করিতে করিতে, এই সকল নামকীর্তন শুনিয়া বিবস্ত্রেরা লজ্জা এবং ক্ষুধার্তেরা জঠরের যন্ত্রণা ভুলিয়াছেন। আসলে নামকীর্তনের চাইতে বড় মৃতসঞ্জীবনী সুধা ত্রিভুবনে নাই। সম্প্রতি রামরাজত্বের মস্তানেরা যখন আমাদের পাশের বাড়িতে আগুন দিতে দিতে 'আন্তর্জাতিক সঙ্গীত' অথবা কোন-না-কোন জাগ্রত দেবতার (স্বদেশে না থাকিলে বিদেশ হইতে ধার লওয়া যাইতে পারে) 'জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করেন; আমাদের তখন প্রকৃতই স্বর্গসুখ অনুভব হয়।

পণ্ডিতেরা তর্ক করুন; আমরা হনুমান ছাড়া রামরাজত্বে কিছু দেখি না, জানি না। এই হনুবাহিনীর মধ্যে অবশ্যই বড় কুলীন, ছোট কুলীন ইত্যাদির পার্থক্য আছে। যদি ইনি কোন সরকারী কর্মচারী হন; রাজধানীতে যে লাল রঙের প্রাসাদটি আছে, ঐ প্রাসাদে অথবা উহার সহিত তুলনীয় কোন অট্টালিকায় বেতনভুক করণিক হিসাবে কিছুক্ষণ দিবানিদ্রার অধিকার অর্জন করেন; বুঝিতে হইবে ইহার এক বিঘৎ পরিমাণ লাঙ্গুল গজাইয়াছে। ইনি দপ্তরে হাজিরা দেন মাসকাবারী বেতন লইবার জন্য। ইঁহার Right আছে, কিন্তু কোন duty নাই। যদি কোথাও বামহস্তের কারবার থাকে, অবশ্যই তখন 'অফিসে' হাজিরার সময় বৃদ্ধি হয়; দশটার আগে দপ্তরে আসেন, পাঁচটা বাজিয়া গেলেও সহজে আরাম-কেদারা হইতে গাত্রোত্থান করেন না। কিন্তু যাঁহার অনুরূপ কোন মহৎ কার্য নাই, তিনি যখন ইচ্ছা আসেন, যখন ইচ্ছা যান—কেন না, ইহাতেই রামরাজত্বের সত্যিকারের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব। একমাত্র ত্রেতাযুগের 'উত্তমকুমার' কেহ আসিয়া যদি ইঁহাদের

'টেবিলের' উল্টোদিকে বসেন; ইঁহারা তাঁহার হুকুমে পঁচিশবার 'উঠ-বোস' এবং অর্ধ-শতবার 'ডন' দিতে একপায়ে খাড়া। নতুবা, ইহাদের দিবানিদ্রায় ব্যাঘাত জন্মাইতে পারেন, এমন রাম বা বাল্মীকি পৃথিবীতে এ পর্যন্ত জন্মগ্রহণ করেন নাই। কোনদিন জন্মগ্রহণ করিবেন, রাম-রাজত্বে এহেন দুর্দিনের কল্পনাও কেহ করেন না।

'এক নম্বর' হনুমানদের কথা সংক্ষেপে বলা হইল। ইহাদের ঊর্ধ্বে যাঁহারা রাম-রাজত্বের শান্তিরক্ষী; অর্থাৎ 'পুলিশ'। ইঁহাদের কর্তব্যকর্মে বড়ই অনুরাগ এবং গৃহস্থ ছাড়া অপর সকলের শান্তিরক্ষার জন্য এই শান্তিবাহিনী অহোরাত্র সজাগ থাকেন। চোর, ডাকাত, গুন্ডা, কালো-বাজারের মস্তান, মিলমালিক, জোতদার ইত্যাদির সুখ ও শান্তিরক্ষার জন্য ইঁহারা এক মুহূর্ত চক্ষুর পাতা পড়িতে দেন না। অবশ্য যাহারা সমাজবিরোধী—অর্থাৎ ছাত্র বা শিশু, দরিদ্র গৃহস্থ অথবা শোষিত সর্বহারা ভূমিহীন কৃষক—সেইসব নিকৃষ্ট দ্বিপদদের সহিত ইঁহাদের ব্যবহার অন্য রকম। গৃহস্থের ঘরে আগুন দেওয়া (যদি বামহস্তের ব্যবস্থা না থাকে), ছাত্রের রক্তে অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় করা, শিশুদের মনে বিভীষিকা ও ত্রাসের সৃষ্টি করা ইঁহাদের আবশ্যিক ধর্ম। লেজ মাপিয়া দেখিয়াছি; অধিকাংশেরই তিন হাত; কিন্তু যাঁহারা পালের গোদা, তাঁহাদের

নিকৃষ্ট জীব; লেজ নাই

লেজ চার হাত, সাড়ে চার হাত পর্যন্ত হয়।

তিন নম্বর হনুমান এবং ইহারাই রামরাজত্বের সর্বাধিক কুলীন, সমাজের রকবাজ এবং মস্তান ভলান্টিয়ারগণ। রাম-রাজত্বের রাম একজন; কিন্তু যাঁহারা রাজ্যের কর্ণধার, তাঁহাদের জন্য বত্রিশটি সিংহাসন। যে 'পার্টি'র যত বেশি সিংহাসন, তাহার মস্তান ভলান্টিয়ারদের তেজ তত বেশি। লাঙ্গুলের দৈর্ঘ্যও সেই পরিমাণ বৃহৎ। ইতিপূর্বে কংগ্রেসী রামের আমলে এক-একজন হনুমানের লেজের বহর ছিল বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি'-র মতন। এখন কিছু ইতর-বিশেষ যদি হইয়াও থাকে, খালি চক্ষে তাহা দেখা যায় না।

রামরাজত্বে 'মানুষ' নামধেয় দ্বিপদ-বিশিষ্ট জন্তুরা বড়ই ঘৃণ্য। এই কুৎসিত অবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইবার জন্য তাহারা সকলেই কেহ প্রকাশ্যে, কেহ বা গোপনে লেজ গজাইবার সাধনায় আত্মনিয়োগ করিয়া থাকেন। —কেহ কেহ আত্মরক্ষার জন্যও হনুমানদের গা ঘেঁসিয়া থাকেন, আদর করিয়া তাঁহাদের গা চাটিয়া দেন। যাঁহারা অধিকতর চতুর, কোন-না-কোন পলিটিক্যাল পার্টির 'মেম্বর' হইতেছেন। ফলে বড় বড় 'পলিটিক্যাল পার্টি'গুলি-র মেম্বরশিপ হু-হু করিয়া বাড়িতেছে। রাজ্যের রাজধানী এবং বড় বড় শহর-গুলিতে পার্টি-মেম্বরদের বিশেষ করিয়া মস্তান মেম্বরদের লাফ-ঝাঁপ-হুঙ্কার ও বোমা-যুদ্ধে কাহারও সাধ্য নাই নিশা-কালে এক মুহূর্ত চক্ষু বুজিয়া থাকেন। এই যুদ্ধ বিশেষ করিয়া এই জন্যই মনো-রম যে, কোন শ্রেষ্ঠী, মহাজন বা বেনামী জমির মালিকদের বিরুদ্ধে তাহা পরি-চালিত হয় না; পরিচালিত হয় অপর পার্টির ছাত্র বা শ্রমিকদের বিরুদ্ধে অথবা নিরীহ পথচারীদের লইয়া কিছুক্ষণ মজা করিবার জন্য।

অহো! ইহার পরিণাম কত শুভ, একবার ভাবিয়া দেখুন। রাজ্যের অর্ধেক লোক বোমার আওয়াজে নিদ্রা যান না; সুতরাং সদা-জাগ্রত। বাকি অর্ধেক, গ্রামাঞ্চলের দেহাতী মানুষ-ও, জঠরের যন্ত্রণায় ঘুমান না; সুতরাং সদা-জাগ্রত।

অতএব, রামরাজত্বের ভবিষ্যৎ উন্নতি কে রুধিবে? আজ না হউক, অদূর-ভবিষ্যতে দ্বিপদ বলিয়া কেহ এই রাজত্বে

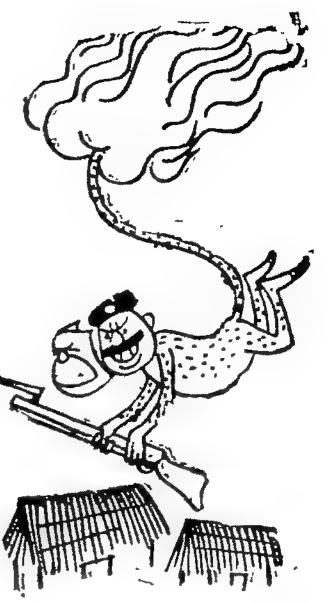

আইনশৃঙ্খলা রক্ষক

থাকিবে না; ঐ স্বপ্ন কতই না সুমধুর! গান্ধী, কার্ল মার্কস, বার্ট্রান্ড রাসেল—একজনও কি স্বপ্নে ঐ সুদিন কল্পনা করিতে পারিয়াছেন?

রামরাজত্বের মহিমা কীর্তন করিতে পারেন, এমন একজনও মানুষও এ পর্যন্ত পৃথিবীতে জন্মান নাই। যাঁহার বক্ষে রামসীতার ছবিটি চিরকালের জন্য মুদ্রিত, একমাত্র সেই পবননন্দনের পক্ষেই এই মহিমা কীর্তন করা সম্ভব। তাঁহার অবর্তমানে বিক্রমাদিত্যের সভার একজন অখ্যাত বয়স্যকে, যাহার এখন পর্যন্ত এক ইঞ্চি লেজ গজায় নাই, লেখনী ধারণ করিতে হইল। ইহা হইতে আক্ষেপের আর কি থাকিতে পারে?

বসুমতীর
যাবতীয়
গ্রন্থ ও
গ্রন্থাবলীর
প্রাপ্তিস্থান
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ
কলিকাতা—১২
এবং
সান্যাল এণ্ড কোং
১/১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

ইত্তেফাক সম্পাদক তফাজ্জল হোসেন

শ্রীউৎফুল্ল রায়

পূর্ববাংলার সাংবাদিকতা ও রাজনীতির আকাশ থেকে একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র খসে পড়লো। জনাব তফাজ্জল হোসেন—মাণিক মিঞা মারা গেলেন। রাওয়ালপিণ্ডিতে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। তাঁর মৃত্যু আমরা যাঁরা তাঁকে জানতাম তাঁদের জন্য এক শোকাবহ ঘটনা, কিন্তু পূর্ববাংলার জন্য এ মৃত্যু এক মারাত্মক ক্ষতি। পূর্ববাংলার জাগরণ উন্মুখ মানবতার জন্য এ মৃত্যু সেদিনের দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের কিংবা দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহনের মৃত্যুর মত, এমন কি তার চাইতেও বড় ক্ষতি। মাণিক মিঞা ছিলেন আজকের দিনের পূর্ববাংলার অন্যতম মাথার মণি। পূর্ববাংলায় যে গণতন্ত্রী চিন্তাধারার জোয়ার এসেছে, যার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে মেলা দুষ্কর—সেই স্রোতধারাকে তার উৎস থেকে ভগীরথের মত শঙ্খ বাজিয়ে পথ দেখিয়ে যাঁরা এগিয়ে নিয়ে এসেছেন মাণিক মিঞা তাঁদের মধ্যমণি।

মাণিক মিঞার জীবনপ্রদীপে তেল ও সলিতার অভাব ছিল না। বয়স যা হয়েছিল তাও মৃত্যুর হাতছানি দিয়ে ডাকবার মত কিছু নয়। তবুও তিনি চলে গেলেন। এ মৃত্যুর জন্য দায়ী কে?

আয়ুবশাহীর আমলে পূর্ববাংলার মসনদের অধিকারী আবদুল মোনেম খাঁর কোপদৃষ্টি পড়েছিল তাঁর ওপর। তিনি তাঁকে পিষে মারবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েই তাঁকে জেলে পুরলেন। তাঁর প্রাণাপেক্ষাও প্রিয় "ইত্তেফাক" কাগজ বন্ধ করে দেওয়া হলো। ছাপাখানায় তালা পড়লো। বন্ধ হলো তাঁর ইংরেজী সাপ্তাহিক "ঢাকা টাইমস"। "ইত্তেফাক" প্রেসের সামনের দরজায় তালা ঝুললো। পুলিশী তালা। পেছনের দরজা দিয়ে কে বা কারা মূল্যবান যন্ত্রপাতি, টাইপ প্রভৃতি সরিয়ে নিল। হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্ট "ইত্তেফাকের" প্রতি সরকারী জুলুমকে আইনের দৃষ্টিতে অসিদ্ধ বলে ঘোষণা করলেন। রাতারাতি নতুন অর্ডিন্যান্স জারী করিয়ে আবার তালা লাগান হলো ইত্তেফাক অফিসে—ছাপাখানায়। এ সবকিছুর প্রতিক্রিয়া পড়লো তাঁর মনের ওপর। তার ওপর জেল-জীবনের কঠোরতা তাঁর দেহমন সয়ে উঠতে পারল না। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁকে চিকিৎসার জন্য মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠাবার অনুরোধ জানালেন নেতৃস্থানীয়েরা। অনুরূপ দাবি উঠলো বিভিন্ন মহল থেকে। কিন্তু তাঁকে মেডিকেল কলেজে পাঠান হলো না। পাঠানো হলো পুলিশ হাসপাতালে। এমনি ধারা অত্যাচারে তাঁর দেহমন যখন ক্রমে নিস্তেজ হয়ে পড়তে লাগলো, চিকিৎসকেরাও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন। তাঁরাই সরকারকে তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থার কথা জানিয়ে সতর্ক করলেন। তাঁকে মুক্তি দেওয়া হলো।

জেল থেকে বেরিয়েও নিরুদ্বিগ্ন চিকিৎসা কিংবা পূর্ণ বিশ্রামের অবকাশ তাঁর ঘটে নি। "ইত্তেফাক" এবং তার ভবিষ্যৎ ভেবে তিনি পীড়িত হতেন। ইত্তেফাককে কেন্দ্র করে যে একদল নিষ্ঠাবান আদর্শবাদী সাংবাদিক গড়ে উঠেছিল তাঁদের দীর্ঘ বেকার জীবন ও তাঁদের অর্থনৈতিক সঙ্কটজনক অবস্থাও ছিল অত্যন্ত বেদনাদায়ক। তদুপরি সরকার তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন মামলা দায়ের করেছিলেন তাঁকে শায়েস্তা করবার জন্যে। ওগুলোও বিভিন্ন আদালতে ঝুলছিল। তাই তাঁর পক্ষে নিরুদ্বিগ্ন স্বাস্থ্যোদ্ধার করার সুযোগ অথবা অবকাশ ঘটে নি। এরই মধ্যে এসে গেল এক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জোয়ার। ছাত্র, যুবসমাজ আর মেহনতী মানুষ পরস্পর পরস্পরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গণতন্ত্রী বিশ্বকে দেখিয়ে দিল পূর্ববাংলার মানুষ তার ইচ্ছাশক্তিতে কি করতে পারে! এতবড় আন্দোলন স্বাধীনতাপূর্বে ভারতে হয় নি। পৃথিবীর কোন দেশ কি কখনও এমন আন্দোলন দেখেছে? প্রত্যেক দেশের প্রতিটি আন্দোলনে নেতাদের অনুসরণ করেছে দেশের ছাত্র, যুবসমাজ আর মেহনতী মানুষ। পূর্ববাংলার আন্দোলন নেতাদের মুখ চেয়ে থাকে নি। এ আন্দোলনে নেতারা প্রাণপণে ছুটতে চেয়েছেন—ছাত্র-যুবসমাজ আর মেহনতী মানুষের সম্মিলিত সুশৃঙ্খল, আবার বলি, সুশৃঙ্খল এবং দুঃসাহসী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্রোতধারার পেছনে পেছনে। কেউ বা এই স্রোতে অবগাহন করে পুণ্য অর্জন করতে চেয়েছেন; কেউ বা স্রোতের প্রখরতা দেখে ভীত হয়েছেন। রাজনীতির সেণ্টিমেণ্টাল রাজসামিও পেয়ে বসেছে কোন কোন নেতাকে। আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য সকলকে বিস্মিত করেছে, স্তম্ভিত করেছে। ভেবে অবাক হয়েছি—এত বড় আন্দোলন গড়ে উঠলো কিন্তু কই এতে ত' প্রয়োজন হয় নি বিত্তবানের অর্থানুকূল্যের। প্রয়োজন হয় নি শেঠ যমুনালাল বাজাজের; প্রয়োজন হয় নি বিড়লার?. আদমজী-ইস্পাহানীর অর্থের বিনিময়েও আন্দোলনের পবিত্রতা নষ্ট করা হয় নি। সেইজন্যই এ আন্দোলন হতে পেরেছিল এমন দুর্বার। অবাক বিস্ময়ে যখন বিশ্বের গণতন্ত্রী মানুষ প্রত্যক্ষ করছিল পূর্ববাংলার যৌবনশক্তিকে—তফাজ্জল হোসেন তখন আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়ছিলেন। আনন্দ অনুভব করছিলেন এই ভেবে যে, তাঁরই হাতে গড়া "ইত্তেফাক" বাঙালীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে একক যে আন্দোলনের বীজ বপন করেছিলো তা ব্যর্থ হয় নি। পূর্ববাংলার ছাত্রশক্তি, যুবশক্তি, জনশক্তি তাদের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে শত শহীদের রক্তের বিনিময়ে সরকারের কবল থেকে মুক্ত করেছে "ইত্তেফাক" কাগজকে। মুক্ত করেছে পূর্ববাংলার বীর সন্তান শেখ মুজিবর রহমানকে। মুজিবর রহমানের মুক্তি দিয়েছে মিথ্যা কলঙ্ক থেকে। মুক্ত করেছে মণি সিং, নগেন সরকার, জিতেন ঘোষ প্রমুখ বীর স্বাধীনতা সংগ্রামী বঙ্গ সন্তানদের।

নেতারা স্রোতের সঙ্গে চলতে পারলেন না। কেউ চাইলেন ঝড়ের বেগে এগিয়ে গিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে

হাততালি কুড়োতে—কেউ বা পড়লেন পিছিয়ে। আবার সামরিক শাসনের জগদ্দল পাথর চাপলো পাকিস্তানের বুকের ওপর। প্রবল আঘাত পেলো পাকিস্তানবাসী। প্রবল আঘাত লাগলো তফাজ্জল হোসেনের বুকে। পূর্ব-বাংলার ছাত্র-যুব ও জনশক্তির সম্মিলিত আন্দোলনের গতি হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। বন্ধ হয়ে গেল তফাজ্জল হোসেনের হৃদযন্ত্রের ক্রিয়াও। তফাজ্জল হোসেন আর নেই, কিন্তু বাঙালীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার দাবির যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা তিনি করে গেছেন তাই একদিন গণতন্ত্রী পূর্ববাংলাকে তার অভীষ্টে পৌঁছে দেবে।

এই ত' গেল তফাজ্জল হোসেন সাহেবের কথা। তাঁর কাছে আমি ব্যক্তিগতভাবে কৃতজ্ঞ। সে কথা বলেই আমার বক্তব্য শেষ করব। ১৯৫৮ সালের কথা। তাঁর "ইত্তেফাকে"র "রঙ্গমঞ্চে" বিপ্লব আন্দোলনের অন্যতম নায়ক শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত ও শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী সম্পর্কে একটি অশিষ্ট উক্তি প্রকাশিত হয়। এর কারণ অবশ্য মন্ত্রিত্ব দখল ও রক্ষার লড়াইয়ে এঁরা আওয়ামী লীগকে অন্ধ সমর্থন না দেবার ফলে উদ্ভূত রাগের অভিব্যক্তি বলেই আমি মনে করি। আমি তখন "সাপ্তাহিক সংবাদপত্র" নামে একটি ছোট সাপ্তাহিক কাগজ চালাই। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিপীড়িত মানুষের হয়ে কোন কাগজ কোন কথা বলে না, সংখ্যালঘুদের দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কিত কোন খবর কোন কাগজে ছাপা হয় না। সংখ্যালঘুদের ওপর অনুষ্ঠিত অত্যাচার-অবিচারের কথা প্রকাশের পরিবর্তে সংখ্যালঘুদের জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করবার প্রচেষ্টার প্রতিবাদ হিসাবে "সাপ্তাহিক সংবাদপত্রে"র জন্ম। আমি আমার কাগজে ইত্তেফাকের উক্তির তীব্র প্রতিবাদ করি। ভূপেন্দ্রকুমারের বিপ্লবী কর্মতৎপরতা ও কর্মকুশলতার কথা বলতে গিয়ে আমি এককালে অবিভক্ত বাংলার স্বরাষ্ট্র ও মুখ্যমন্ত্রী পরবর্তীকালে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল ও প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিম উদ্দিনের উক্তিঃ 'He (Bhupendra Kumar) knows how to plan, prepare, organise and execute" উদ্ধৃত করে বিপ্লবী ভূপেন্দ্রকুমার ও বিপ্লবী প্রভাসচন্দ্রের দীর্ঘ কর্মময় জীবন, ত্যাগ, তিতিক্ষা ও দেশসেবার গৌরবময় কাহিনী বর্ণনা করে, বিপ্লবীদের সম্পর্কে "ইত্তেফাক" এবং "ইত্তেফাক" সম্পাদকের অজ্ঞতার জন্য ধিক্কার দিই। বলা বাহুল্য আমার লেখায় নুন-ঝালের অভাব ছিল না। আমার লেখাটি পড়ে প্রভাসবাবুর অনুজ জিতেশ লাহিড়ী বহরমপুর থেকে আমাকে একটি দীর্ঘ পত্র লিখেছিলেন। সে যাই হোক, আমার লেখাটি তফাজ্জল হোসেন সাহেবের দৃষ্টি এড়ায় নি। আমারই এক মুসলমান সাংবাদিক বন্ধু আমার লেখাটির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। আমি ধরে নিয়েছিলাম তাঁর সঙ্গে আমার মুখ দেখাদেখি এইখানেই শেষ। আমার এ ধারণার কারণ আমি মনে করি লেখকেরা অভিমানী; তাঁরা নিন্দা কিংবা বিরূপ সমালোচনাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন না।

১৯৫৮ সালের অক্টোবর। মার্শাল ল' জারী হলো। আমার কাগজ বন্ধ হয়ে গেল বরং বলা চলে বন্ধ করে দেওয়া হলো। কিছুদিন বাদেই পূর্ব-বাংলার অর্ধনগ্ন ফকির পূর্ববাংলার গান্ধী আদর্শের জীবন্ত প্রতীক শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত লোকান্তরিত হলেন। বহু চেষ্টার পর তাঁর মৃত্যুসংবাদ দু-একটি কাগজে ছাপা হলো তাও দু-তিন লাইনে।

শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রকুমার দত্ত তখন ঢাকায়। তিনি একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ রচনা করে সুরেশবাবুর প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। পূর্ব-পাকিস্তানের কোন বিশিষ্ট পত্রিকায় সংখ্যালঘুদের, বিশেষ করে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত নেতাদের সম্পর্কে নিন্দাবাদ ছাড়া আর কিছু ছাপাবার রেওয়াজ তখন ছিল না। তাই লেখাটির ছাপার অক্ষরে আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনা সম্পর্কে আমরা প্রায় হতাশ হয়েছিলাম। কথায় কথায় একদিন আমার সেই সাংবাদিক বন্ধুটিকে লেখাটির কথা বললাম। তিনি পড়ে লেখাটি ছাপাবার জন্য উৎসাহিত হলেন। বললেন—"চলুন না মাণিক মিঞা সাহেবের কাছে যাই।" বললাম—"যাব কোন সাহসে! তিনি কি আমার দেওয়া গালাগালি এত তাড়াতাড়ি হজম করে ফেলতে পেরেছেন।" বন্ধুটি একটু ভেবে বললেন—"আচ্ছা ঠিক আছে; আমিই তাঁর সঙ্গে কথা বলব।" দিন দুই-তিন পরে মাণিক মিঞা সাহেবের নির্দেশে বন্ধুটি আমাকে তাঁর কাছে নিয়ে গেলেন। সুন্দর পরিবেশে হাসি-ঠাট্টার মধ্যে অনেক আলাপ হলো। সংখ্যালঘুদের প্রতি উপেক্ষা এবং তাদের প্রতি অত্যাচার-অবিচারের কথা, তেমনি তাদের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা আমিই তুললাম। বললেন—"সরকার যদি দৃষ্টিহীন না হতো তবে পাকিস্তানের স্বার্থেই এক কোটি সংখ্যালঘুর পূর্ণ মানবিক অধিকার ও মর্যাদায় বসবাসের ব্যবস্থার দায়িত্ব গ্রহণ তারাই করত। আজ হোক, কাল হোক সরকারকে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতেই হবে। এই এক কোটি সংখ্যালঘু যদি পূর্ববাংলায় মানবিক অধিকার লাভ করে বসবাস করতে না পারে, তবে ভারতের সাড়ে পাঁচ কোটি সংখ্যালঘু মুসলমানও সেখানে থাকতে পারবে না। আর সেই সাড়ে পাঁচ কোটি মুসলমানকে যদি পাকিস্তানকে গ্রহণ করতে হয় তবে পাকিস্তানের অর্থনীতি ভেঙে পড়বে। তাই সংখ্যাগুরুর স্বার্থেই পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের অবস্থার উন্নতি করতে হবে। তাদেরকে মানবিক অধিকার দিতে হবে।"

আমার লেখাটির কথাও উঠেছিলো। অত্যন্ত সহজভাবেই বললেন—"আপনি ঠিকই বলেছিলেন। বিপ্লবীদের সম্পর্কে আমরা কিই-বা জানি?" আরও বললেন—"সাংবাদিকতা করতে গিয়ে পলিসির খাতিরে অনেক কিছুই করতে হয়। ক'জন সখারাম গণেশ দেউস্কর হ'তে পারেন।"

সুরেশ দাশগুপ্ত মশাইয়ের ওপর ভূপেন্দ্রকুমার দত্তের লেখাটি ছাপা হয়েছিল ইত্তেফাকে। কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত নেতা সম্পর্কে এই প্রথম লেখা যা পূর্ব পাকিস্তানের একটি প্রথম শ্রেণীর দৈনিকে, বিশিষ্ট স্থানে ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হলো। এ মহত্ত্বের জন্য আমি তফাজ্জল হোসেন সাহেবের কাছে ব্যক্তিগতভাবে ঋণী ও কৃতজ্ঞ।

সম্প্রতি আমি চলে এসেছি। তবুও তফাজ্জল হোসেন সাহেবের মৃত্যুকে অত্যন্ত সহজভাবে গ্রহণ করতে পারছি না। বলতে পারছি না—"এই ত' নিয়ম; এ অমোঘ।" বরং তাঁর মৃত্যুতে আত্মীয় বিয়োগের বেদনাই অনুভব করছি।

তফাজ্জল হোসেনের মৃত্যুতে পূর্ববাংলা হারালো তার একজন কৃতী সাংবাদিককে; হারালো রাজনীতির পথপ্রদর্শক কৃতী সন্তানকে। পূর্ব-বাংলার আদর্শবাদী তরুণ সাংবাদিক-গোষ্ঠী হারালো তাদের সাংবাদিকতার অন্যতম গুরুকে; গণতন্ত্রকামী মানুষ হারালো গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎকে—যিনি প্রদীপ হাতে আলো জ্বালাতে এসেছিলেন।

রাণীধূপ
কাকাত্র প্রডাক্টস

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

"কুটিল চক্রান্তের নগ্নরূপ"

এ যেন এক বিস্ময়কর ঘটনা। বৃটিশ সরকার একদিকে গোপন-চুক্তিবদ্ধ আমাদের ফাঁসি দেবে না—ট্রাইব্যুনালের বিচারে সত্যিই আমাদের ফাঁসি হোলও না; আবার এ যেন এক রহস্য—তাদেরই গোষ্ঠীর একজন ইংরেজ জজ ট্রাইব্যুনালে আমাদের মৃত্যুদণ্ড না দেওয়াতে তাঁরা যেন আশ্চর্য ও হতবাক হয়েছেন এবং সমস্ত দলিলপত্র মারফত এক অভিনয়-জাল বিস্তার করে Legislative member-দের ও জনসাধারণকে বোঝাতে প্রয়াস পাচ্ছেন যে, তাঁরা দুর্বল নন—শত্রুর সঙ্গে কোনো আপোষ তাঁরা করেন নি; শত্রুকে ফাঁসি দিতে না পারলে তাঁদের শান্তি নেই।

সাম্রাজ্যবাদী সরকারের এই জঘন্য কূটনীতি সম্বন্ধে সাধারণের ধারণা থাকা সম্ভব নয়। দেশবরেণ্য রাষ্ট্রনায়ক সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বৃটিশ সরকারের রাজনীতি ও কূটনীতির মুখোস উন্মোচন করে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কঠোর সমালোচনায় বাংলার আকাশ-বাতাস ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন—"India can show unbroken promises with broken records". (ভারতবাসী দেখাতে পারে ইংরেজ শাসকেরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করবেন না বলে বহুবার প্রতিশ্রুত হয়েছেন, কিন্তু প্রতিবারই জঘন্যভাবে অঙ্গীকার ভঙ্গের বহু নজির তাঁরা রেখে গেছেন)। সাম্রাজ্যবাদীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আরও বিশেষভাবে বুঝতে হলে অতীতের সাম্রাজ্যবাদী কূট চক্রান্ত আজ ভুললে চলবে না। আজ মনে করুন সুচতুর কূট-নীতিজ্ঞ রবার্ট ক্লাইভের রণ-নীতি ও রণ-কৌশলের কথা। ধূর্ত ক্লাইভের ইঙ্গিতে মীরজাফরের বিশ্বাসঘাতক রণভেরী বেজে উঠলো—'নবাবের আদেশ—ক্ষান্ত হবে রণ।' বীর মোহনলালের মুহুর্মুহু কামান গর্জন মুহূর্তে স্তব্ধ হোল—অশ্বারোহী সৈন্য অশ্বের গতি হ্রাস করলো—পদাতিক সৈন্য সঙ্গীন হাতে নিশ্চল রইলো। পলাশী-প্রাঙ্গণের শোচনীয় পরাজয়ের ইতিহাস এইভাবেই রচিত হোল। বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার এই দুঃসহনীয় পতনের জ্বালা বুকে নিয়ে সেই দিন থেকেই বাঙালী, সুদূর ভবিষ্যতে হলেও, সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসের স্বপ্ন দেখেছে। সেই দিনই বাঙালী ইংরেজের রাজনীতি, কূটনীতি ও সমর-নীতির ভয়াবহ রূপ উপলব্ধি করেছিল। ইংরেজ শাসনের ইতিহাস এই মূল নীতি-রীতি ও গতি ধরেই দু'শ বছর চলেছে। আমাদের মন থেকে ইংরেজ শাসনের এই মূল background ইংরেজ-প্রীতির প্রচারে কোনো সময়ে যদি হারিয়ে ফেলি, তবে তাদের "সুমহান্" চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমরা কোনোমতেই বুঝতে পারবো না। এইটি হোল আমার প্রথম কথা।

যদি দু'শ বছরের বৃটিশ শাসনের ইতিহাস আরও বিশদভাবে পর্যালোচনা করি, তবে দেখতে পাবো 'নীলকর বিদ্রোহ' তারা কঠোর হস্তে দমন করেছে; 'তিতুমীরের কৃষক অভ্যুত্থান' ও কৃষকদের সেই প্রখ্যাত 'বাঁশের কেল্লা' অতি নিষ্ঠুরভাবে ধ্বংস করেছে; 'সিপাহী বিদ্রোহ' দমনে ভারতীয় বিদ্রোহী সৈন্যদের রক্তে ভারত-ভূমি প্লাবিত করেছে; 'জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডে' ও ভারতীয় নৌ-বাহিনীর নাবিকদের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা এবং বেকসুরভাবে হত্যা ও দমন-নীতি চালাতে একটুও পিছ-পা হয় নি। তাছাড়া এই সুদীর্ঘ বৃটিশ শাসনের ইতিহাসে দেখি—কখনও তারা গর্জন করেছে, কখনও তোষামোদ করেছে, কখনও এক দলের সঙ্গে সমঝোতা করে অন্য দলকে উপেক্ষা করেছে, সময় ও সুযোগ বুঝে বিভিন্ন স্তরের লোকদের নিয়ে 'গোল-টেবিল' বৈঠক ডেকেছে, আবার নিজেদের স্বার্থে তাদের সকলকে উপেক্ষা করে বিশেষ কাউকে নিয়ে 'গোল-টেবিল' বৈঠক নির্ধারিত করেছে। ভারতবাসীকে দিয়েই ভারতবর্ষ শাসন করেছে—ভারত-বাসীকে তাদের সাম্প্রদায়িকতার দৌর্বল্যের সুযোগে বিভক্ত করে একের বিরুদ্ধে অপরকে নিয়োগ করেছে।

তবে সব সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পক্ষেই এটা একটা মূল সত্য যে, প্রবলতর শক্তির কাছে সাময়িকভাবে, কৌশলের খাতিরে হলেও, তাদের মাথা নোয়াতেই হবে—তারাও 'শক্তের ভক্ত নরমের যম।'

আমাদের মামলা যখন চলছে তখনও আমাদের সশস্ত্র যুব-বাহিনী সূর্য সেনের প্রত্যক্ষ সুদৃঢ় সাংগঠনিক নেতৃত্বে পরিচালিত হচ্ছিল। এই কারণে তখন চট্টগ্রাম জেলার কর্তৃপক্ষ, পুলিশ ও মিলিটারী সকলেই অতি গোবেচারা সজ্জন ও নিতান্ত

ভালোমানুষ সেজেছিলো। জনসাধারণের প্রতি এবং বিপ্লবী বলে যাদের মনে করতো তাদের ও তাদের পরিবারের প্রতি কর্তৃপক্ষের সদ্‌ব্যবহারের তুলনা ছিল না। আবার সেইরূপ চট্টগ্রাম জেলের মধ্যে ও ট্রাইব্যুনাল বিচারালয়ে আমাদের 'অপ্রতিহত প্রতাপ' ছিল বলে পুলিশ ও মিলিটারী সর্বদাই ভীত, শঙ্কিত ও ত্রস্ত থাকতো। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে অম্বিকাদা যখন বন্দী হলেন, চাঁদপুরে তারিণী মুখার্জীর হত্যাপরাধে রামকৃষ্ণ ও কালীপদ চক্রবর্তী পুলিশের হাতে ধরা পড়লো, D.S.P. আসানুল্লাকে গুলী করায় অপরাধে হরিপদ ভট্টাচার্যকে গ্রেপ্তার করা হোল, ধলঘাটের যুদ্ধে নির্মলদা ও অপূর্ব সেন প্রাণ হারালো—এই সব ঘটনার পর থেকে বিপ্লবী-বাহিনীর শক্তি যেভাবে ক্ষুন্ন হচ্ছিল, ঠিক সেই পরিমাণেই জনসাধারণের প্রতি পুলিশ ও মিলিটারী-বাহিনীর অসৌজন্য প্রকাশ, দুর্ব্যবহার এবং অত্যাচার ও নিপীড়ন ক্রমেই বেড়ে চলেছিল। আমরা অত্যন্ত তিক্ত অভিজ্ঞতার সঙ্গে চট্টগ্রাম কর্তৃপক্ষের এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছি। কিন্তু বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, আমাদের বিরুদ্ধে জেলে ও বিচারকক্ষে পুলিশ এবং মিলিটারীর ব্যাপক ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও যখন তারা বুঝতে পারলো আমাদের সাংগঠনিক শক্তি দুর্বার গতিতে বেড়েই চলেছে এবং শত চেষ্টাতেও তারা তা' খর্ব করতে পারছে না, তখনই তারা "শক্তের ভক্ত" হওয়ার পথ অবলম্বন করলো।

আমার আগের লেখা থেকে স্মরণ করাচ্ছি—অজস্র পুলিশ ও মিলিটারীর সজাগ সতর্ক দৃষ্টির অন্তরালে আদালত-গৃহ ল্যান্ড-মাইন দিয়ে ধ্বংস করবার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ প্রায় তিন-চার মাস আগে থেকেই এও জানতে পেরেছিল যে, আমরা জেলের অভ্যন্তরে অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক দ্রব্য এনে গুদামজাত করছি। এই খবর জেনে, জেলের সমস্ত আনাচে-কানাচে তিনমাস ধরে তন্ন তন্ন করে ব্যাপক তল্লাসী চালিয়েও তারা তাদের প্রচেষ্টায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

আদালত-গৃহ সংশ্লিষ্ট মাটির নিচে বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় ল্যান্ড-মাইন বিস্ফোরণের ব্যবস্থা দেখে চট্টগ্রামের কর্তৃপক্ষ প্রতি মুহূর্তে মৃত্যু-বিভীষিকা দেখেছে, কিন্তু খবর পাওয়া সত্ত্বেও জেলে সেইরূপ মারাত্মক বিস্ফোরক দ্রব্য বা অস্ত্রশস্ত্র—কিছুই খুঁজে পায় নি। আমাদের সহকর্মীদের পক্ষে শহর ও শহরের উপকণ্ঠে ল্যান্ড-মাইন প্রস্তুত এবং সেইগুলি ধ্বংসাত্মক কার্যে ব্যবহার করা অত্যন্ত সুকঠিন ছিল। রাতে দিনে চারিদিকে পুলিশ ও মিলিটারীর কড়া পাহারা। তাদের নাকের ডগা দিয়ে তাদের শ্যেন-দৃষ্টির আড়ালে এই মারাত্মক কাজ চালিয়ে যাওয়া সত্যিই অভাবনীয় ও অতি বিস্ময়কর। তবু বিপ্লবী গেরিলা-যোদ্ধাদের পক্ষে বহুদিন ধরে এই কর্মতৎপরতা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু "আকস্মিকভাবে" এই সব ল্যান্ড-মাইন প্রস্তুত করার সময় একদিন দিনের বেলা শহরের উপকণ্ঠে পুলিশ আমাদের সাথীদের গ্রেপ্তার করে।

এই ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ আমি ইতিপূর্বে 'অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়'-এ সাপ্তাহিক বসুমতীর পাতায় লিখে গেছি। এখানে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু ট্রাইব্যুনাল ও ট্রাইব্যুনালের বিচার পদ্ধতি প্রসঙ্গে যে প্রশ্ন নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করেছি তার কঠোর সত্যতা ও নগ্নরূপ সর্বসমক্ষে তুলে ধরতে যেটুকু বলা একান্ত প্রয়োজন সেটুকুই এখানে বলছি। আমাদের বিপ্লবী সাথীদের ল্যান্ড-মাইন প্রভৃতি সমেত গ্রেপ্তার করা হয় এবং সরকার যথারীতি ডঙ্কা বাজিয়ে তাদের বিচারের জন্য স্পেশ্যাল গেজেটে ট্রাইব্যুনালের নাম ঘোষণা করলেন। ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট মিঃ এ এন সেন—ডিস্ট্রিক্ট জজ এবং 'পক্ষপাতশূন্য' ইংরেজ সরকারের নির্বাচিত দুজন কমিশনার—একজন খানবাহাদুর-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও অপরজন রায়বাহাদুর-রিটায়ার্ড জজ। B.C.L.A Act অনুযায়ী ট্রাইব্যুনাল গঠন-পদ্ধতিতে কোনো খুঁৎ নেই এবং এর বিচার পদ্ধতি ও বিচার ক্ষমতায়ও সামান্যতম তারতম্য নেই—সব ট্রাইব্যুনালগুলিই একই আইন-সূত্রে গাঁথা।

আমাদের ছ'জন বন্ধু অভিযুক্ত হয়েছে। অভিযুক্তদের মধ্যে পুলিশ কর্তৃক সাব্যস্ত প্রধান দোষী—অর্ধেন্দু গুহ। অর্ধেন্দু গুহ ও অন্যান্যরা আজও বেঁচে আছে। জেলখানা সংলগ্ন ক্ষুদ্র একটি টিলার ওপর রেজিস্ট্রেশান অফিস। এই অফিসেরই একটি কক্ষে ট্রাইব্যুনাল বিচারের ব্যবস্থা হয়েছে।

আজ প্রথম বিচার সুরু হবে। সরকার পক্ষের ও অভিযুক্ত বিপ্লবী বন্ধুদের পক্ষের উকিল-ব্যারিস্টারেরা আদালতে সমবেত। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও অগণিত দর্শকবৃন্দে আদালত কক্ষটি পরিপূর্ণ। কাঠগড়ায় উন্নতশির ছ'জন অভিযুক্ত বিপ্লবী। ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট ও বিচারকেরা সারিবদ্ধ হয়ে এজলাসে এসে স্ব স্ব চেয়ারে উপবিষ্ট হলেন।

তারপর ট্রাইব্যুনাল প্রেসিডেন্ট প্রত্যেক অভিযুক্ত "আসামীকে" তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি পড়ে শোনালেন এবং জানতে চাইলেন তারা "দোষী কি নির্দোষ"। প্রত্যেকের উত্তর হোল—"দোষী"।

মুহূর্তে বিচার শেষ হোল—ট্রাইব্যুনালের বিচার এক অপূর্ব নজির রেখে গেল। সরকার পক্ষের উকিল case open করলেন না—একজন সাক্ষীকেও ডাকলেন না—অভিযুক্ত পক্ষে কোনো সরকারী সাক্ষীকে জেরা করার বিন্দুমাত্র আগ্রহও দেখা গেল না—ট্রাইব্যুনাল প্রেসিডেন্টকে হাজার হাজার শব্দ জুড়ে দণ্ডাদেশ লেখবার কোনো পরিশ্রমও করতে হোল না। তৎক্ষণাৎ এক সীট কাগজে সবার দণ্ডাদেশ লেখা হয়ে গেল। Explosive Act-এ, বিশেষ করে এই ল্যান্ড-মাইনে যে ব্যাপক ধ্বংসাত্মক ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনা হয়েছিল, আইনত তার ন্যূনতম সাজা—যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। কিন্তু "অতিমাত্রায় সুবিচারক ও সহৃদয়" ট্রাইব্যুনাল প্রেসিডেন্ট মিঃ এ এন সেন 'প্রধান দোষী' অর্ধেন্দু গুহকে সর্বোচ্চ সাজা দিলেন—পাঁচ বছর সশ্রম কারাদণ্ড এবং অন্যান্য অভিযুক্তদের কাউকে দু' বছর বা এক বছর অথবা ছ' মাসের সশ্রম কারাদণ্ড। প্রেসিডেন্ট জাজমেন্টের নিচে নিজে সই করলেন এবং অপর দুজন "অতি সজ্জন" কমিশনার চোখ বন্ধ করে সেই জাজমেন্টে নিজেদের সই দিয়ে কৃতার্থ বোধ করলেন।

অপূর্ব! আশ্চর্য! অদ্ভুত? এই বিস্ময়কর ঘটনা সেদিন চট্টগ্রামবাসীকে হতবাক ও হতবুদ্ধি করেছিল। বিজ্ঞ উকিল-ব্যারিস্টার ও আইনজ্ঞেরা বুঝতে পারেন নি কি করে এই অসম্ভব ঘটনা সংঘটিত হোল। অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মা-বাপ, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব সকলেই অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন কমপক্ষে অন্তত পাঁচ-ছ' মাস ধরে কি করে তাঁরা ট্রাইব্যুনালের এই মামলা চালাবেন—তাঁদের সেই আর্থিক সঙ্গতি কোথায়? সবার

মাসিক ১০, টাকার কিস্তিতে লাভ করুন
অল ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড ট্রানজিস্টর (জাপান মেক) জনপ্রিয় মূল্য ৩০০,। দেশব্যাপী খ্যাতি আছে। ডবল স্পীকার ৩ ব্যান্ড, ৮ ট্রানজিস্টর। নাইট-ল্যাম্প ফিট করা। কেবল ইংরেজী বা হিন্দিতে যোগাযোগ করুন।
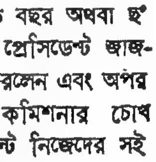
Allied Trading Agencies
(B.C.) P.B. 2123, Delhi-7.

সব অবন্ধ-চিন্তা চুকিয়ে দিয়ে এক ঘণ্টায় এমন একটি মামলা, সরকার যার নাম দিয়েছিলেন "Dynamite Conspiracy Case", এক নিমেষেই ফুৎকারে শেষ হয়ে গেল।

এই নাটকের গূঢ় রহস্য কোথায়? আগে যে এত সরকারী দলিলপত্র উদ্ধৃত করলাম তার মধ্যে এই মামলার কোনো উল্লেখ নেই কেন? তাছাড়া দিল্লীর মহাফেজখানায়ও রহস্যময় এই 'ডিনামাইট মামলা' সংক্রান্ত কোনো দলিলপত্র সংরক্ষিত হয় নি এবং খুঁজেও পাওয়া যায় নি।

বসুমতীর পাতায় আমার লেখা "অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়"-এ পেয়েছেন যে, আমাদের সঙ্গে আপোষ করে আমাদের শর্ত মেনে নিয়ে সরকার বলেছিলেন আমরা সাক্ষীদের জেরা করে মামলার কার্যকাল যেন বিলম্বিত না করি। আমরাও তার উত্তরে বলেছিলাম—"আমরা প্রমাণ চাই যে ট্রাইব্যুনালের বিচারকেরা আপনাদের কথা শিরোধার্য করে সেই অনুযায়ী দণ্ডাদেশ দেবেন।" সেই পরিপ্রেক্ষিতেই 'Dynamite Conspiracy Case' সরকার আপোষ-মীমাংসার মাধ্যমেই শেষ করেছিলেন। সরকারী অফিসারেরা এবং আমি, গণেশ ঘোষ ও লোকনাথ বল মিলে একত্রে পরামর্শ করেই সাব্যস্ত করি 'ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলায়' অভিযুক্ত বন্দীদের কার কত সাজা হবে। তারপর গণেশ, লোকনাথ ও আমি জেলখানার এক প্রকোষ্ঠে ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত আমাদের ছজন বন্ধুর সঙ্গে মিলিত হয়ে এই মীমাংসার কথা তাদের আদ্যোপান্ত জানালাম। আমাদের সিদ্ধান্ত বিনা দ্বিধায় তারা অনুমোদন করলো। এর পরেই চট্টগ্রামবাসী এবং বাংলা তথা ভারতের জনসাধারণ জানলো "Chittagong Dynamite Conspiracy Case"-এ ট্রাইব্যুনালের অক্ষমকীর্তির কথা।

Judiciary (বিচার বিভাগ) ও Executive (শাসন বিভাগ) সম্বন্ধে এই সব সরকারী দলিলপত্রে অনেক কচকচানি আছে। পৃথিবীর সমস্ত সরকারই বড় গলায় প্রচার করতে চেষ্টা করেন judiciary executive-এর আওতায় নেই—তারা স্বাধীন। মাঝে মাঝে judiciary চোখ ধাঁধানো executive-এর বিরুদ্ধে হয়ত কঠোর সমালোচনা করেন বা কোনো রায় দেন। সেইটুকুর সুযোগ নিয়েই executive যদিও প্রচার করেন judiciary স্বাধীন, তবু বাস্তবে দেখতে পাচ্ছি অন্তত এই ট্রাইব্যুনাল স্বাধীন ছিল না। এইটেই হচ্ছে আমার দ্বিতীয় প্রমাণ যে, "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলায়" ট্রাইব্যুনালেও সরকারী ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যের বাইরে কিছু করতে পারে নি। যদিও যেসব দলিলপত্র উদ্ধৃত করেছি তাতে দেখা যাচ্ছে executive—অর্থাৎ যাঁরা পেছনে বসে আগাগোড়া কলকাঠি নেড়েছেন, তাঁরা নিজেদের দুর্বলতা ঢাকতে judiciary—অর্থাৎ আমাদের মামলায় ট্রাইব্যুনালের বিচারকদের "শিখণ্ডী" খাড়া করে নিজেরা নিষ্কৃতি পেতে সচেষ্ট হয়েছেন। তাঁদের এই দুর্বলতা কাদের কাছে ধরা পড়েছে? কাদের কাছে প্রমাণ করা দরকার হয়ে পড়েছে বৃটিশ সরকার দুর্বল নয়—তাঁরা শত্রুর সঙ্গে কখনও সমঝোতা করেন নি—শত্রুকে ফাঁসি দেবেন না বলে অঙ্গীকারবদ্ধ হন নি? এখানে আমি তাঁদেরই দলিলের কটি লাইন আবার উদ্ধৃত করছি যা থেকে বোঝা যাবে কোথায় তাঁদের দুর্বলতা এবং কী তাঁরা ঢাকতে চাইছেন:

"....Their decision not to hang anyone in this case in which 7 murders were committed, coupled with sentences passed recently in other terrorist cases, has made people vehement in declaring that in Bengal of today there is no justice, only a mass of bad law. The mass in the street blames the Government and *refuses to recognise the differences between the judiciary and executive.* The executive has been badly hampered by the judiciary in its dealing with terrorism for a number of years; if the deterioration in the judiciary continues the executive shall be emasculated. I understand that there is a steady trickle of applications for proportionate pensions from the executive officers in the province" (Emphasis mine).

উপরোক্ত উদ্ধৃতিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি দেশের জনসাধারণ, এমন কি রাস্তার লোকেরাও বিক্ষোভ প্রকাশ করে বলাবলি করছে যে judiciary ও executive-এর মধ্যে কোনোই তফাৎ নেই ("The mass in the street blames the Government and refuses to recognise any differences between the judiciary and executive)—জাজ্বল্যমান সত্যকে জনসাধারণ কি করে অস্বীকার করবে? শ্রী পি, সি, সরকারের ম্যাজিকের মত "চট্টগ্রাম ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলা" এক নিমেষেই শেষ হয়ে গেল এবং কোন ভৌতিক যাদুমন্ত্রেই যেন "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলাতে"-ও একজনেরও মৃত্যুদণ্ড হোল না।

সরকারী দলিলে চেষ্টা করা হয়েছে "ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলা"-টিকে উহ্য রাখতে এবং আমাদের মামলার ট্রাইব্যুনাল প্রেসিডেণ্টকে ভীরু আখ্যা দিয়ে শাসন বিভাগ নিষ্কৃতিলাভ করতে চেয়েছেন। তাই আইনসম্মত উপায়ে কিভাবে আমাদের ফাঁসি দেওয়া যায় সেইজন্যই দপ্তরে দপ্তরে এত বিভিন্ন পত্রালাপ। তখনকার দুঁদে পাবলিক প্রসিকিউটার মিঃ এ, এন, ব্যানার্জী গভর্নমেণ্টের পক্ষাবলম্বন করে চট্টগ্রামে গিয়েছেন। তাঁর অকাট্য সওয়াল জবাব ট্রাইব্যুনাল উপেক্ষা করায় তাঁর মনে যথেষ্ট সন্দেহ হয়েছে। তিনি "ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলা"-র Magic Trial-এর পরিণাম সম্বন্ধে বিশেষভাবে অবহিত ছিলেন। বহু প্রখ্যাত উকিল-ব্যারিস্টারদের মনেও যথেষ্ট প্রশ্ন জেগেছিল। উচ্চমহলে মুখে মুখে এইরূপ 'ভৌতিক কাণ্ড' সম্বন্ধে রূপকথার মত অনেক গবেষণাই হয়েছিল। Legislative Assembly ও Legislative Counc'l Member-দের মনেও যথেষ্ট সংশয় দেখা দিয়েছিল। বিলেতে পার্লামেণ্টেও Secretary of State-কে এই সম্বন্ধে বহু জিজ্ঞাসার মোকাবিলা করতে হয়েছে।

এই দলিলে সুস্পষ্টরূপে দেখা যাচ্ছে উচ্চপদস্থ প্রভুদের প্রকৃত প্রতিক্রিয়া ঢেকে রেখে সাফাই গাওয়া হয়েছে "man in the street"-এর নামে—জনসাধারণের দোহাই দিয়ে। বাস্তবেও কী তাই? সারা ভারতবর্ষে তখন বৃটিশের বিরুদ্ধে আইন-অমান্য আন্দোলন চলছে—সশস্ত্র বিপ্লবী-সংগ্রাম মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। যাঁরা সক্রিয়ভাবে বৃটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সম্মুখে আসেন নি তাঁরাও অন্তরে অন্তরে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংসই কামনা করেছেন। আমাদের ফাঁসি না হওয়াতে জনসাধারণ খুবই উৎফুল্ল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বুঝতে হবে এই গোপন দলিলে সরকারের সীমিত উদ্দেশ্য কী? সরকার-ভক্ত খানবাহাদুর, রায়বাহাদুর ও উচ্চস্তরের সরকারী পদলেহনকারী গুটিকতক কর্মচারী এবং Legislative Assembly-র সদস্যদের কৈফিয়ৎ দিয়ে কোনো প্রকারে বোঝাতে চাওয়া—আমরা (executive) ট্রাইব্যুনাল জজদের প্রভাবান্বিত করতে মোটেই চেষ্টা করি নি—তাঁরা নিজেরাই তাঁদের দুর্বলচিত্তের পরিচয় দিয়েছেন। এতক্ষণ judiciary

গরম আরো কি তবে বাড়বে ?

সত্যেন্দ্রনাথ বড়াল

চারিদিকে ধিকি ধিকি আগুন তো জ্বলছে,
পূর্বে কি পশ্চিমে দাউ দাউ জ্বলে কোথা উঠবেই—
তাইত শুধায় লোকে—
গরম আরো কি তবে বাড়বে ?

ধরণীর পথে পথে ধূলিতে—
দিক্ না ছড়িয়ে যত অগ্নি,
ওদের কি এসে যায় ওসবে ?
মাটিতে চরণ ওরা ফেলে না—
ব্যোমপথে উড়ে যাবে
চন্দ্রে বা মঙ্গল গ্রহেতে।

রোদে পুড়ে বোকা মানুষের দল,
জানালা দুয়ার-ভেজা ঘরে
দুপুরের দম-চাপা গরমে
ধুঁকে ধুঁকে আধমরা হোক সব।

জ্ঞানী আর বিজ্ঞানী আছি যত—
হাইড্রো নাইট্রো আর অ্যাটমের,
গোটা কয় বোমা আরো ফাটিয়ে
মিটারের শেষ দাগ ছাড়িয়ে
ধরণীর উত্তাপ উঠাব।

ব্যোমপথে যাব আর শুনব,
পৃথিবীর মানুষেরা বলছে,—
গরম বেড়েছে আরো বাড়বে ॥

ও executive-এর ব্যাপার নিয়ে যা লিখলাম এবং যেভাবে "ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলা" ও "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা"-র ভৌতিক পরিসমাপ্তি ঘটেছে, সেই বাস্তব ঘটনাই হোল আমার বক্তব্যের তৃতীয় প্রমাণ যে, সরকার আমাদের সঙ্গে আমাদের কাউকে ফাঁসি না দেবার গোপন-চুক্তিতে আবদ্ধ ছিলেন।

আমি তদানীন্তন বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধিদের আহবান জানাচ্ছি যদি ক্ষমতা থাকে, তবে তাঁরা যেসব বাস্তব ঘটনাবলীর উল্লেখ আমি করেছি তার প্রতিবাদ করুন। আমি জানি প্রতিবাদের ক্ষমতা সেই প্রবঞ্চকদের নেই। তখন এইসব নথিপত্র অবতারণার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজ-ভক্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিদের শান্ত রাখা ও বুঝ দেওয়া যে, executive judiciary-র সঙ্গে আঁতাত করেন নি—judiciary-র জজেরাই দুর্বল প্রকৃতির।

আমার চতুর্থ প্রমাণ সামান্য কয়েকটি কথায় লিখছি। ট্রাইব্যুনালের প্রেসিডেন্ট মিঃ জে, ইউনী খাঁটি ইংরেজ সন্তান। "ডিনামাইট ষড়যন্ত্র মামলা"-র ট্রাইব্যুনাল প্রেসিডেন্ট মিঃ এ, এন, সেন ভীরু কাপুরুষ হলেও হতে পারেন। কিন্তু আমাদের কি বিশ্বাস করতে হবে "চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলা"-র ট্রাইব্যুনাল প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ইংরেজ সরকার খুঁজে খুঁজে একজন দুর্বলচেতা ইংরেজকেই মনোনীত করেছিলেন? দুটি বছর দিনের পর দিন আমাদের আত্মীয়-স্বজন, উকিল-ব্যারিস্টার ও আদালতভর্তি দর্শকবৃন্দ দেখেছেন ট্রাইব্যুনাল প্রেসিডেন্ট মিঃ জে, ইউনী কি প্রকৃতির লোক ছিলেন। আমরা বহু বড় বড় পুলিশ-অফিসার, মিলিটারী-অফিসার—ক্যাপ্টেন, মেজরদেরও দেখেছি আবার ইউনী সাহেবকেও দেখেছি। তাঁকে দেখে মনে হোত তিনি যেন একাধারে পুলিশের বড়কর্তা ও মিলিটারীর সেনা-ধ্যক্ষ। ইউনী সাহেবের চারিত্রিক গঠন এমনই ছিল যে, দেখে আমাদের মনে হোত তাঁকে যদি বলা হয় কাউকে ধরে আনতে তবে তিনি নির্ঘাত বেঁধেই আনবেন। দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইউনী সাহেব—তিনি হাতে গলা কাটবেন ও যত লোককে পারেন ফাঁসি দেবেন, কখনই পিছু হটবেন না—এই ছিল তাঁর সম্বন্ধে আমাদের প্রত্যেকের বদ্ধমূল ধারণা।

এহেন বৃটিশ-সিংহ মিঃ জে, ইউনী সাহেবের এ কী হোল? কোন্ অদৃশ্য যাদুমন্ত্র তাঁকে বশ করলো? বৃটিশ-সিংহের সেই প্রতাপ কোথায় বিলীন হোল? হঠাৎ যীশুখৃস্টের বেশে তিনি আবির্ভূত হলেন—আমাদের কারও ফাঁসি হোল না।

সরকারী দলিলপত্রে অভিযোগ পাওয়া যায়—দুর্বল ভীরু ইংরেজ সন্তান মিঃ জে, ইউনী আমাদের ফাঁসি না দিয়ে শাসন বিভাগকে (executive) একেবারে ক্লীবত্বে পরিণত করে দিল। তাহলে সেই একই মিঃ জে, ইউনীকে বাংলা সরকার 'Judicial Secretary'-র পদে বহাল করেছিলেন কেন? এই গুরুত্বপূর্ণ আসনে দুর্বলচেতা ইউনী সাহেবকে বসানো হোল কেন? একটু বিশ্লেষণী মন হলেই এ-কথার সহজ উত্তর—মিঃ জে, ইউনী কখনই দুর্বল ছিলেন না। তিনি শাসন বিভাগের একজন অনুগত ও বিশ্বস্ত বন্ধু। এই বিশেষ গুণের অধিকারী না হলে Judicial Secretary হওয়া যায় না। এই হোল আমার চতুর্থ প্রমাণ।

[ক্রমশ]

যুক্তফ্রন্ট সরকার সমীপেষু

উপ-মুখ্যমন্ত্রীকে আর একটা কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবন লোকসভা সদস্য শ্রীজ্যোতির্ময় বসুকে একটা চিঠিতে ২০।১১।৬৭ তারিখে জানিয়েছেন আই-এ-এস্ পদে প্রমোশন সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের ওপর নির্ভর করে। এখন রাজ্য সরকার সিলেক্ট লিস্ট তৈরি করার দায় নিশ্চয়ই কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর চাপিয়ে নিজেরা দায়মুক্ত হতে পারেন না।

শুধু আই-এ-এস্ ক্যাডারে উন্নীত করেই কি অনুগ্রহ বিতরণের পালা শেষ হয়? উপ-মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই জানেন যে, বিশেষ অনুগ্রহ দানের জন্য বিশেষ বেতনের ব্যবস্থাও আছে। দু-একটি উদাহরণ দিয়ে উপ-মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই। খাদ্য দপ্তরের ফিনান্সিয়াল উপদেষ্টা শ্রী কে এন্ চ্যাটার্জী ছিলেন ৫।৬ বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন জুনিয়ার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। এফ্-সি-আই গঠিত হওয়ার পর ফিন্যান্সিয়াল এ্যাড্-ভাইসারের কাজের চাপ অনেক কমে গেছে। তিনি শীঘ্রই অবসর গ্রহণ করবেন। এখন আই-এ-এস পদে উন্নীত হওয়ায় তিনি খুব বেশি সুযোগ পাচ্ছেন না বলে তাঁর জন্য ১৮ শত টাকা বেতনক্রমের একটি নতুন বেতনহার সৃষ্টি করা হয়েছে। পর্যটন বিভাগের ডিরেক্টর শ্রী বি এন ভট্টাচার্যের জন্যও অনুরূপ ১৩০০্—১৬০০্ টাকা বেতনহার সৃষ্টি করা হয়েছে। তাঁর চেয়ে সিনিয়র অন্তত ৭৫ জন অফিসার এখন পর্যন্ত ৩২৫্—১০০০্ টাকা বেতনহার অতিক্রম করতে পারেন নি। আর একটু খোঁজ নিলেই জানতে পারবেন যে, শ্রীচ্যাটার্জী আর শ্রীভট্টাচার্য দুজনেই জুনিয়র সিভিল সার্ভিসে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্যর্থ হয়েছেন।

আই-পি-এস, আই-এ-এস, এইচ-জে-এস প্রভৃতি ক্যাডারে সিলেকশন গ্রেড সিনিয়র অফিসারদের দেয়া হয়ে থাকে। স্টেট সিভিল সার্ভিসেও ১৯৬১ সাল পর্যন্ত এই নিয়মই চালু ছিল। কিন্তু তদানীন্তন হোম্ সেক্রেটারী বর্তমান চীফ সেক্রেটারী শ্রী এম্ এম্ বসু ফাইলটি চেপে রেখেছিলেন। ১৯৬৮ সালে যখন কোন মন্ত্রিমণ্ডলীর কাছে কৈফিয়ৎ দেওয়ার প্রশ্ন ছিল না। সেই সময়ে রাজ্যপালের আমলে শ্রীবসু মহাশয় নিজের পছন্দমত অফিসারদের এই সুযোগ দিয়ে অনুগ্রহ বিতরণ করতে থাকেন। বেশ কয়েকজন জুনিয়র অফি-সারকে এই সুযোগ দেওয়া হোল—তার মধ্যে কোন কোন ভাগ্যবানের কপালে ১৯৬২ সাল থেকে বকেয়া বেতনের সুযোগ পর্যন্ত দেওয়া হোল। নিরপেক্ষ তদন্তের ব্যবস্থা হোলে এসব রহস্য উদ্ঘাটিত হবে। শ্রীবসুর জনৈক সহপাঠী এই ধরণের বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন বলে আমাদের কাছে খবর আছে।

সিনিয়র অফিসারদের সুপারসীড করার বিরুদ্ধে চীফ্ সেক্রেটারীর কাছে কোন আবেদনপত্র পাঠালে তা বাজে কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষেপ করা হয়ে থাকে। চীফ্ সেক্রেটারী এ ধরণের অভিযোগপত্রের কোন জবাব পর্যন্ত দেন না। এ ধরণের কোন আবেদন মন্ত্রী, রাজ্যপাল বা রাষ্ট্রপতির কাছে করা হোলে সম্ভবত পাঠানো হয় না। সংশ্লিষ্ট সেক্রেটারীকে এই সব আবেদনপত্র যথাযোগ্য স্থানে পাঠানো বাধ্যতামূলক করার ক্ষমতা নিশ্চয়ই রাজ্য সরকারের আছে।

মাথাভারী প্রশাসন ব্যবস্থার অভি-যোগ দীর্ঘদিনের। উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু যতদিন বিরোধী নেতার আসনে ছিলেন তার প্রত্যেক বৎসরে বাজেট বক্তৃতায় মাথাভারী প্রশাসন ব্যবস্থার অভিযোগে মুখর হয়ে উঠতেন। শ্রীজ্যোতি বসুকে তাঁর বিধানসভার বক্তৃতাগুলোর পাতা উল্টোতে অনুরোধ করছি।

শ্রীবসু জানেন ওপরের কর্তাদের জন্য কত রকম বিশেষ ব্যবস্থা চালু আছে। রোল্যান্ড প্রশাসনিক তদন্ত কমিটির রিপোর্টে কমিশনারের পদ তুলে দেওয়ার সুপারিশ করা হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতালাভের পর কমিশনারের পদ বেড়ে গেছে। এখন ৩ জন বিভাগীয় কমিশনার ছাড়াও আরও কম করে ১৬ জন কমিশনার আছেন। কয়েকটি বিভাগে কমিশনারের নিচেই আবার আছেন সেক্রেটারী। বন, অর্থ, পশু-পালন, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কথা উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

ঠিক অনুরূপভাবেই পুলিশ বিভাগে আর-ও অনেক উচ্চপদ সৃষ্টি করা হয়েছে। একজন অফিসারকে বিশেষ সুযোগ দেওয়ার জন্য অতিরিক্ত আই-জি'র পদ সৃষ্টি করা হয়েছে।

পরস্পর পিঠ চুলকানির আর একটি অদ্ভুত নিয়ম চালু আছে। এই নিয়মানুসারে কোন একজন আই-এ-এস্ অফিসার উচ্চতর বেতনের কোন পদ পেলে তিনি যে সব আই-এ-এস্ অফিসারদের সুপারসীড করবেন, তাঁরা প্রত্যেকে নিজ নিজ পদে থেকেই উচ্চ উচ্চ বেতনহার পাবেন। ধরুন উত্তর-বাংলায় একজন আই-এ-এস্‌কে কমি-শনার করে পাঠানো হোল। সিনিয়র আই-এ-এস'রা ইচ্ছে করেই সেখানে না গিয়ে তাঁদের জুনিয়র একজন অফিসারকে সুযোগ দিলেন। যেহেতু তিনি জুনিয়র সেজন্য তাঁর সমান অভিজ্ঞতার বা সিনিয়র সকলেই তাঁর সমান বেতন পেতে থাকবেন। অথচ তাঁদের কারো কোন নতুন দায়-দায়িত্ব নিতে হোল না। ফলে গৌরী সেনের টাকা খরচ হতে লাগলো। আই-এ-এস্ এবং এইচ্-জে-এস্ স্তরের অফিসাররা এই সব সুযোগ-সুবিধা পেয়ে থাকেন।

জয়েন্ট সেক্রেটারী, সেক্রেটারী, স্পেশাল সেক্রেটারী পদের কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই। এখন কয়েকজন জেলাশাসক আর ডিরেক্টররা জয়েন্ট সেক্রেটারীর বেতন-হার পাচ্ছেন, কিন্তু জয়েন্ট সেক্রেটারীর দায় তাঁদের বহন করতে হয় না।

বড়কর্তারা আরো কত রকমের সুযোগ পান জানেন কি? কিছু কিছু সরকারী অফিসার সরকার নিয়ন্ত্রিত শিল্পসংস্থায় ডেপুটেশনে যান, তাঁরা ডেপুটেশনভাতা তো পান-ই অধিকন্তু পান বোনাস। অথচ তাঁদের কোন ঝুঁকি নেই। এই ধরণের কোন সংস্থা লিকুইডেশনে গেলে ডেপুটেশন অফি-সাররা আবার নিজ পদে ফিরে আসেন আর সাধারণ কর্মচারীদের চাকরি যায়। তাহলে এঁরা এই বোনাস পান কোন ন্যায়বিচারে?

১৯২৮ সালের কলকাতা বাড়িভাড়া-ভাতা অনুসারে আই-এ-এস্, আই-পি-এস্ এবং এইচ্-জে-এস্ অফিসারদের বাড়িভাড়াভাতা দেওয়া হয়। অল ইণ্ডিয়া সার্ভিস অফিসারদের এই সুযোগ রাজ্য সরকারের অধীনস্থ বিচারপতিদেরও দেওয়া হয়ে থাকে। ১৯৬৮ সালের নভেম্বর মাসে অর্থাৎ মধ্যবর্তী নির্বা-চনের প্রাক্কালে রাজ্যপালের সরকার দেখলেন যে, এই সব অফিসাররা বড় কষ্টে দিন কাটাচ্ছেন। তখনি ২৭৫০্ টাকা পর্যন্ত যাঁরা মাসিক বেতন পান তাঁদের বাড়িভাড়ার ভাতা ৩২৫্ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫২০্ টাকা করা হোল। এই স্তরের অফিসাররা নিজেদের বাড়িতে থাকলেও এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন না। অথচ অন্যান্য অফিসাররা

"এই দুর্দিনে বাঁধা আয়ে সংসার চালানো যে কি! ডাইনে আনতে বাঁয়ে কুলোয় না। অনেক কাটছাঁট করতে হয়। আর এর পুরো ঝক্কিটাই মেয়েরা নিয়ে নেন নিজেদের ওপর—হয় নিজের বরাদ্দ কমিয়ে অথবা একেবারে ছেঁটে ফেলে। কিন্তু শরীর মাটি ক'রে এই ব্যয় সংকোচ পরিণামে ভালো হয় না। সেইজন্য বাড়ীর আর সকলের সঙ্গে আমিও বোর্নভিটা খেয়ে নিই। একচুমুকে ক্লান্তি দূর হয়, বেশ ঝরঝরে লাগে। শরীর সুস্থ-সবল রাখতে যে পুষ্টি, শক্তি ও সামর্থ্যের প্রয়োজন, বোর্নভিটায় তা পুরোমাত্রায় রয়েছে।"

বোর্নভিটা পুষ্টিকর, শক্তিদায়ক। সুষম পরিমাণে কোকো, দুধ, চিনি ও মল্ট মিশিয়ে এটি তৈরি করেছেন ক্যাডবেরি—প্রাণোচ্ছল পানীয় প্রস্তুতে বিশেষজ্ঞ ব'লে যাঁদের খ্যাতি একশ' বছরেরও বেশি। এর কোকো-সমৃদ্ধ স্বাদ ছেলেমেয়েদের ভারী পছন্দ।

ক্যাডবেরির বোর্নভিটা খাবেন—
শক্তি, উদ্যম—এবং স্বাদের জন্যে

ভাড়াবাড়িতে থাকলে ৮০ টাকা এবং নিজেদের বাড়িতে থাকলে ৫০ টাকার বেশি বাড়িভাড়াভাতা পাওয়ার অধিকারী নন।

রাজ্যপালের আমলে পুলিশের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার এবং ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্টের জন্য ১ শত টাকা বিশেষ বাড়িভাড়াভাতার ব্যবস্থা হয়েছে—অনেকে আবার বিজলী খরচের টাকাও পেয়ে থাকেন। অথচ নিচের অফিসার আর সাধারণ কর্মচারীদের বেলায় ভাতা বৃদ্ধির প্রশ্নই নাকি অবান্তর।

কি করা সম্ভব

আমলাতন্ত্রের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটাতে হোলে, যোগ্য অফিসারদের মনোবল ফিরিয়ে আনতে হোলে, সাধারণ কর্মচারীদের বিক্ষোভ দূর করতে হোলে নিচের ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা যেতে পারে।

প্রথমত ভিজিল্যান্স কমিশনার যে সব অফিসারদের বিরুদ্ধে সুপারিশ করেছেন তাঁদের প্রত্যেকের দোষ অনুযায়ী শাস্তি দিতে হবে।

দ্বিতীয়ত নানারকমে বড়কর্তাদের খুশি করে যাঁরা উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন, যাঁরা প্রমোশনের ক্ষেত্রে দুর্নীতির আশ্রয় অবলম্বন করেছেন তাঁদের প্রত্যেককে নিচের পদে নামিয়ে এনে তাঁদের শূন্য পদে সিনিয়র যোগ্য অফিসারদের প্রমোশন দিতে হবে। এ ধরণের যে সমস্ত অফিসারদের আই-এ-এস ক্যাডারে উন্নীত করা হয়েছে তাঁদের পদাবনতি আইনবিরোধী বলে তাঁদের প্রত্যেককে জেলা প্রশাসনে বদলি করতে হবে। এই স্তরে সর্বশ্রী এস্ টি ব্যানার্জী, পি কে বোস, সি সি বোস এবং কে এম মুখার্জী প্রমুখের নাম করা যেতে পারে।

১৯৫০ সালে কোচবিহার গুলী-চালনার ঘটনাকে আবার পর্যালোচনা করা দরকার। এই গুলীচালনার ব্যাপারে এস্ এন্ গুহরায়ের রিপোর্ট প্রকাশ করে সমস্ত দোষী অফিসারদের শাস্তি দিতে হবে।

১৯৬৬ সালের খাদ্য আন্দোলন সম্পর্কে শরৎ প্রসাদ কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করে দোষী অফিসারদের শাস্তিবিধান করতে হবে।

রাষ্ট্রীয় পরিবহন এবং ট্রামকর্মীদের সংগে পুলিশের সংঘর্ষ সম্পর্কে রায়-চৌধুরী তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশ করে দোষী পুলিশ অফিসারদের শাস্তিবিধান করা প্রয়োজন।

এ ছাড়া উত্তরপাড়া কলেজের ছাত্র নির্যাতনযজ্ঞ, ময়দানে বিশ্বনাথ মুখার্জী প্রমুখদের ওপর বর্বর আক্রমণের ঘটনায় তদন্তের বিবরণ অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিশেষ বেতন দানের ব্যবস্থা যদি আদৌ রাখা হয় তাহলে তা ব্যক্তিগত হিসাবে প্রয়োগ না করে সিনিয়রদের দেওয়া বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে। বরং এই ব্যবস্থা উঠিয়ে দিয়ে সিনিয়রদের জন্য একটা বিশেষ বেতনহারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

স্টেট সিভিল সার্ভিস থেকে আই-এ-এস্ ক্যাডারে সিলেক্ট লিস্টের বর্তমান তালিকা বাতিল করতে হবে। নতুন তালিকা প্রণয়নের সময় পুরোপুরি সিনিয়রিটির মর্যাদা দিতে হবে। ব্যক্তিগত অনুগ্রহ বিতরণের ব্যবস্থা পুরোপুরি দূর করতে হবে। তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ করার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

মাথাভারী প্রশাসন ব্যবস্থাকে বদল করার জন্য কমিশনারের পদ তুলে দিয়ে যেখানে যেখানে সম্ভব বর্তমান পদাধিকারীদের অবসর দিয়ে তাঁদের কার্যভার সেক্রেটারী আর জয়েন্ট সেক্রেটারীদের ওপর দিয়ে বর্তমান ব্যবস্থার পরিবর্তন করা সম্ভব।

পুলিশ বিভাগেও অধিকাংশ ডি-আই-জি এবং জয়েন্ট কমিশনারের পদ তুলে নিয়ে যেতে হবে।

বাড়িভাড়াভাতার বিশেষ ব্যবস্থা তুলে দিয়ে চাই সকলের জন্য সমান ব্যবস্থা। এ রাজ্যে অল-ইণ্ডিয়া সার্ভিসের তথাকথিত দক্ষ ব্যক্তিদের আমদানী কমানো বা বন্ধ করা প্রয়োজন। তাদের অনেক কম কাজের জন্য বেশি টাকা দিতে হচ্ছে। এদের এনে যখন জেলাশাসক অথবা ডেপুটি সেক্রেটারী পদে নিয়োগ করা হয় তখন তাদের কোন অভিজ্ঞতাই থাকে না। স্টেট সিভিল সার্ভিস এবং সেক্রেটারিয়েট সার্ভিসের লোকদের এই সব পদে নিয়োগ করলে খরচ-ও কম হবে এবং সম্ভবত কাজ-ও বেশি হবে।

বিশেষ বেতন দানের বিশেষ পদ্ধতি বন্ধ করা প্রয়োজন। অর্থ দপ্তরের এস্ গোস্বামী এবং এস কে দাশগুপ্ত, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন দপ্তরের বি বসাক, বাণিজ্য ও শিল্প দপ্তরের এস কে মুখার্জি, মুখ্যমন্ত্রীর সেক্রেটারিয়েটের শ্রী এস এম বোস এবং সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তরের শ্রী এস এম ঘোষ অনেক সিনিয়র অফিসারদের ডিঙিয়ে বিশেষ বেতন পাচ্ছেন।

উপ-মুখ্যমন্ত্রী যদি মূল ঘাঁটিতে আঘাত না করেন তাহলে কোনদিনই অভীপ্সিত পথে বিন্দুমাত্র অগ্রসর হতে পারবেন না।

—শ্রীসর্বদর্শী

● ● সদ্য প্রকাশিত হইল ● ●

সাধকচূড়ামণি শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সঙ্কলিত

বৃহৎ তন্ত্রসারঃ

(১ম পর্ব)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩২৬

বহুকাল পরে পুনর্মুদ্রণ। বিশদ অনুবাদ।
অনুষ্ঠান পদ্ধতি ও অসংখ্য যন্ত্রচিত্র সহ।

মূল্য মাত্র পনেরো টাকা

(দ্বিতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ)

বসুমতী (প্রা) লিঃ ॥ কলিকাতা-১২

আজকের বিজ্ঞান

ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

চাঁদে নামার জল্পনা

সব ঠিকঠাক, সব। স্টেজ, ড্রেস-রিহার্সেল, অ্যাক্টার—সব ঠিক একেবারে। এখন শুধু আসল 'অ্যাক্টিং' বা অভিনয়-টুকু শুরু হবার প্রতীক্ষা। চাঁদের মাটিতে নামার প্রতীক্ষা শুধু এখন।

স্থির হয়েছে, চাঁদে নামবেন নেইল আর্মস্ট্রং ও এডউইন অলড্রিন। আগামী ২০শে জুলাই নামবেন ওঁরা।

১৬ই জুলাই সকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডার কেপ কেনেডী থেকে আর্মস্ট্রং, মাইকেল কলিনস ও অলড্রিন-এর চাঁদের দেশে যাত্রা করার কথা। আর চাঁদের মাটিতে প্রথম পা ফেলার কথা আর্মস্ট্রং-এর।

অলড্রিন আর্মস্ট্রং-এর ৩০ মিনিট পর চাঁদে নামবেন। চাঁদ-অভিযান সম্পর্কিত এই সর্বশেষ সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ-অভিযান বিভাগের 'প্রোগ্রাম-ডিরেক্টার' মিঃ স্যামুয়েল সি ফিলিপস জানিয়েছেন, আমাদের এই সিদ্ধান্তের মূলে আছে চাঁদ-অভিযাত্রী অ্যাপোলো-১১-র প্রস্তুতি এবং অ্যাপোলো-১০ থেকে লাভ-করা কিছু শিক্ষা।

ওদিকে মহড়া চলে পুরোদমে। ওয়াশিংটন থেকে চাঁদে যাবার সবুজ-সংকেত দেওয়া হয় যখন, কেপ কেনেডীতে তখন চলে রিহার্সেল। চাঁদ-অভিযাত্রী তিন নভশ্চর আর্মস্ট্রং, কলিনস ও অলড্রিন ছুটে-চলা মহাকাশযানের 'কু-কেবিন'-এর অনুরূপ পরিবেশে নিজেদের মানিয়ে নেবার চেষ্টা করেন।

পরিবেশটা সৃষ্টি করা হয় কৃত্রিম উপায়ে, যন্ত্রের সাহায্যে।

কিন্তু শুধুমাত্র পরিবেশ সম্বন্ধে ওয়াকবহাল হলেই চলবে না; আরও কিছু চাই। মিঃ ফিলিপস-এর ভাষায়, চাই আরও কঠোর প্রস্তুতি। যাত্রার আগের দিন অবধি নভশ্চরদের অনুশীলনের কাজটা নিয়মিত চলা চাই। এই অনুশীলনের মধ্যে পড়বে রকেট-চালনা, মূল রকেট থেকে চান্দ্রযানে যাতায়াতের শিক্ষা এবং চান্দ্রযানে করে চাঁদের মাটিতে নেমে আসার মহড়া। এ ছাড়া টেলিভিশন-ব্যবস্থা এবং ক্যামেরা সম্বন্ধেও অনেক কিছু জানতে হবে অভিযাত্রীদের।

চাঁদের মাটিতে যাঁরা নামবেন, অতিরিক্ত কিছু শিক্ষাক্রম অনেক আগে থেকেই তাঁদের জন্যে বরাদ্দ হয়ে আছে। এখন ওঁরা নিয়মিতভাবে লাভ করে চলেছেন সেই আজব শিক্ষা।

স্থির হয়েছে, আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন মোট ২২ ঘণ্টা কাটাবেন চাঁদের মাটিতে। তবে এই ২২ ঘণ্টার মধ্যে ১৯ ঘণ্টাই কাটবে চান্দ্রযানে বসে; অর্থাৎ, সেই বিশেষ যানটিতে বসে, যা' নাকি ওঁদের অ্যাপোলো-১১ মহাকাশযান থেকে চাঁদের দেশে নিয়ে যাবে।

এদিকে আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন যখন চাঁদের দেশে থাকবেন, তৃতীয় নভশ্চর কলিনস তখন থাকবেন মূল মহাকাশযানে। ওই যানটিতে থেকে কক্ষপথ ধরে চাঁদকে প্রদক্ষিণ করতে থাকবেন তিনি।

চাঁদে নেমে আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন মাটি সংগ্রহ করবেন মোট ৫০ পাউণ্ড (২৩ কিলোগ্রাম)। এই মাটি পরীক্ষার জন্যে পৃথিবীতে নিয়ে আসা হবে।

কিন্তু মাটি আনবেন যাঁরা, চাঁদের দেশে অভাবনীয় কোনো দুর্যোগ ঘিরে ধরবে না তো তাঁদের?

মার্কিন স্পেস এজেন্সি জানাচ্ছেন,—না, ধরবে না। কারণ, নভশ্চরদের সঙ্গে পৃথিবীর যোগাযোগ-ব্যবস্থা যাতে নিখুঁত থাকে, সে চেষ্টা প্রতিনিয়ত চলছে। এবং এই যোগাযোগের কথা স্মরণে রেখেই স্থির হয়েছে, ২০শে জুলাই গ্রীনউইচ সময় রাত ৮টা ২১ মিনিটে চাঁদে না নেমে নামা হবে আরও দু' ঘণ্টা পরে; অর্থাৎ, রাত প্রায় ১০টা ২১ মিনিটে। এই ব্যবস্থার ফলে চাঁদ-অভিযাত্রী আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন-এর সঙ্গে ক্যালিফোর্নিয়া-র যোগাযোগ

অ্যাপোলো—১১-তে করে চাঁদে নামবার মহড়া দিচ্ছেন আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন

কেন্দ্রের বেতার-সংযোগ স্থাপিত হবে আরও তাড়াতাড়ি।

এ ছাড়া চাঁদ-প্রদক্ষিণের জন্যে অতিরিক্ত আরও ২ ঘণ্টা সময় বরাদ্দ করেছেন 'স্পেস এজেন্সি'।

এজেন্সির কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, এই অতিরিক্ত সময়ের সুযোগে আরও

চাঁদ-অভিযান সম্পর্কে সর্বশেষ
তথ্যসমন্বিত গ্রন্থ
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের
চাঁদে যাবেন যাঁরা
প্রকাশিত হল

একবার চাঁদ-প্রদক্ষিণের সময় পাবে অ্যাপোলো-১১; এবং এই সুযোগে চাঁদ-প্রত্যাগত আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন জীবাণু-নাশক ওষুধ দিয়ে নিজেদের আরও ভালো করে পরিশুদ্ধ করে নিতে পারবেন।

যদিও এ ব্যাপারে প্রায় সকলেই এক-মত যে চাঁদে জীবনের চিহ্নমাত্র নেই, তবু সাবধান হতে দোষ কি।

চাঁদের একটি গহ্বর। অ্যাপোলো—১০-এর চান্দ্রযান থেকে তোলা ছবি

চাঁদের পৃষ্ঠদেশ। ছবিটি অ্যাপোলো ১০-এর চান্দ্রযান থেকে তোলা হয়

এদিকে এত কিছু সাবধানী উদ্যোগ-আয়োজন সত্ত্বেও চাঁদ থেকে ফিরে-আসার সময়ের কিন্তু কোনো পরিবর্তন হবে না। অর্থাৎ, ২৪শে জুলাই গ্রীনউইচ সময় বিকেল ঠিক ৪টে ৫৩ মিনিটেই প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে ফিরে আসবেন নভশ্চররা।

অবশ্য প্রোগ্রাম ডিরেক্টার মিঃ ফিলিপস বলেছেন, প্রয়োজন হলে অভিযানের দিন-ক্ষণ পরিবর্তিত হতে পারে। প্রস্তুতির সময় কোথাও কোনো রকম ত্রুটি দেখা দিলে ১৬ই জুলাই তারিখে অভিযান বাতিল করারও সম্ভাবনা আছে। আর সম্ভাবনা আছে বিপদ ঘটলে মাঝপথে চাঁদ-অভিযান বন্ধ করে অভিযাত্রীদের পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনবার।

আমরা আশা করি, এইভাবে নিশ্চয় ফিরে আসতে হবে না অভিযাত্রীদের এবং নিশ্চয় ওঁরা প্রতিবেশী উপগ্রহ জল-বাতাসহীন, রিক্ত, নিঃস্ব 'উদাসী' চাঁদের 'মহামূল্যবান' মাটি নিয়েই বিজয়ী বীরের মতো ঘরে ফিরবেন।

মাথার ওপর নগ্ন আকাশ। পিঠের নিচে স্যাঁৎসেতে ঘাস। চাঁদের মরা-আলো আকাশটাকে বে-আবরু করে দিয়েছে। যতদূর চোখ যায় কোথাও কোন আবরণের বালাই নেই। কনকের কথা মনে পড়ে।

ঘাসগুলো কেমন ভিজে ভিজে। পিঠটা মাঝে মাঝে যেন তলিয়ে যায় মাটির নিচে। কবরের ঠান্ডা হাত কে যেন পিঠে বুলিয়ে দেয়; নিজের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জাগে মনে। ছোটবেলায় বাড়ি থেকে পালিয়ে একটা রাত কাটিয়েছিল কবরে নিচে। অন্ধকারের কালো পর্দা ঝুলছিল চোখের সামনে। কতকগুলো জ্বলজ্বলে চোখ-ছুটে ফিরছিল। পচা-মাংসের লোভে উন্মত্ত শিবাকুল ঘুরছিল চারধারে।

কে তার নাম সংগ্রাম রেখেছিল, সে জানে না। সে অনেকবার ভেবেছে, এরকম নাম রাখার তাৎপর্য কি। নামের মানে নিয়ে মাথা কেউ একটা ঘামায় না। নাম রাখা হয় ডাকার জন্যে। কিংবা বলা যায়, পাঁচ-জনের থেকে পৃথক করবার জন্যে নামের দরকার হয়। যাই হোক না কেন, তার নাম সংগ্রাম না হয়ে অন্য কিছু হতে পারত। পৃথিবীতে সব কিছুর অভাব আছে, নেই নামের।

এ-চিন্তা মাঝে মাঝে তাকে বিব্রত করে। নিজের নামকে কেন্দ্র করে কেন এ ধরণের চিন্তা মাথার মধ্যে কিলবিলিয়ে ওঠে, সে বুঝতে পারে না। এক-একবার মনে হয়, নামটা খুব তাৎপর্যপূর্ণ—গম্ভীর ব্যঞ্জনাদ্যোতক। মাঝে মাঝে ভাবে নামটা তার গোটা জীবনকে ব্যঙ্গ করছে—জর্জরিত করছে কশাঘাতে।

ময়দান ফাঁকা হয়ে আসছে। ঝাঁকড়া-মাথা গাছগুলোর নিচে গোলাকার আঁধারের ছায়া পড়েছে। দূরে ট্রাম ছুটে চলেছে। আলো-জ্বলা ট্রামগুলোকে অদ্ভুত দেখায়। দিনের বেলার ছ্যাকড়া গাড়ি ট্রাম রাতে হয়েছে মোহিনী। সারা শরীরে আলোর বন্যা—বিগতযৌবনার মেছেতা-পড়া মুখে লাস্যময়ীর দীপ্ত হাসি।

গাছের অন্ধকার বৃত্তে এতক্ষণ কূজন চলছিল। উচ্চকিত প্রেতিনীর হাসি বিলসিত হচ্ছিল। সে দু'-একবার দেখার চেষ্টা করেছিল—চোখে পড়েছিল জোড়া-জোড়া ছায়ামূর্তি। টুকরো টুকরো কথা এসেছিল তার কানে।

—আর কতদিন এভাবে অপেক্ষা করব? ট্যানটালাসের মত তৃষ্ণায় আমার ছাতি ফেটে যাচ্ছে। আর তুমি না করো না, রিতা।

—তুমি অবুঝ হয়ো না লক্ষ্মীটি, এতে আমাদের ভালবাসার অপমৃত্যু ঘটবে।

ট্যানটালাস! কি মানে রে বাবা। এরা লেখাপড়া জানা লোক। তার মনে হয়েছিল, একটা কুকুর মাংসের দোকানের সামনে কাটা-খাসির দিকে চেয়ে আছে। ছট্‌ফট্ করছে, ল্যাজ নাড়ছে, কুঁই কুঁই করে শব্দ করছে; জিব দিয়ে লালা ঝরছে। ঘোলাটে চোখ দিয়ে নি-ছাল খাসিটাকে চাটছে।

মেয়েটার উদ্দেশ্যে সে মনে মনে একটা বিশ্রী গালাগালি দিয়েছিল। ভালবাসা শব্দ শুনতে ভাল। ভালবাসার তবকে দেহের চাহিদা ঢাকা থাকলেও রসিক লোক পানও চিবোয়, তবকও চিবোয়। সোজা কথা বলতে এরা ভয় পায়। ডাল-ভাতের মত জীবনে দেহের যে একটা চাহিদা আছে, উচ্চারণ করতে লজ্জা পায়। প্রেম টোপ—আসল লক্ষ্য দেহ।

অতনু বলেছিল—তুই সিনিক হয়ে যাচ্ছিস্।

লেখাপড়া জানা অতনু, বাপের ছেলেও

কারবার। আরো যেন সব কি কি আছে। অনেক টাকা। সাদা-কালো দুই-ই। অতনু শিল্পচর্চা করে। মেয়েদের ছবি আঁকতে সে নাকি ওস্তাদ। কলকাতার শিল্পিমহলে তার বেজায় নামডাক।

সে জিজ্ঞেস করেছিল—সিনিক মানে কিরে?

অতনু তার দিকে তাকিয়েছিল। তার সবুজাভ তারার মধ্যে সংগ্রাম তার ক্যাবলা-ক্যাবলা ছায়া দেখতে পেয়েছিল। অতনু বলেছিল—ছিদ্রান্বেষী কিংবা যার মধ্যে শিল্প ও ভোগ-বিলাসের প্রতি স্পৃহা নেই।

—ভোগ করতে গেলে টাকা চাই।

—রোজগার কর।

—কি করে?

—সংগ্রাম কর। তাছাড়া তোর নামই তো সংগ্রাম।

প্রশংসা না বিদ্রূপ—সংগ্রাম বুঝতে পারে নি। অতনুকে সংগ্রাম করতে হয় না। সে উপভোগ করে। শিল্পের প্রতি তার অদম্য স্পৃহা। সে বিশ্বাস করে, অতনুর উপদেশ সময়োচিত এবং প্রণিধানযোগ্য।

এবং সে চেষ্টা করেছিল রোজগারের। কিছুদিনের মধ্যে একটা জিনিস তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল, অতনুর উপদেশ এবং বাস্তব জগৎ সম্পূর্ণ আলাদা। লেখাপড়া তার বেশি নয়। কোন রকমে ইস্কুলের গেট পেরিয়েছিল। এ-বিদ্যে নিয়ে চাকরি পাবার প্রত্যাশা করা ভুল।

বাড়ি একটা আছে। বাবা অনেকদিন গতায়ু হয়েছে। বাবার কথা তার মনে পড়ে না। একটা আবছা-আবছা ছায়া-ছায়া মূর্তি। কিছু কিছু উঠে-যওয়া জলছবির মত। সত্যি কথা বলতে, বাবার স্মৃতির প্রতি তার যে অচলা শ্রদ্ধা-ভক্তি আছে, একথা সে হলফ্ করে বলতে পারে না। বরং বাবার প্রতি একটা প্রচ্ছন্ন ঘৃণা আছে। এ-ভাব সে কোনদিন কারো কাছে প্রকাশ করে না। কিন্তু বাবার প্রতি ঘৃণা মাঝে মাঝে এত তীব্র আকার ধারণ করে যে, সে গালাগাল করতে দ্বিধাবোধ করে না। মনের ব্যথার ধার কিছু মরে যায়। এ পৃথিবীতে অবাঞ্ছিত হয়ে থাকা যেন বাবার অপরাধ। অতনু তার মরা-বাবার গলায় সব সময় তাজা ফুলের মালা পরিয়ে রাখে। ওর বাবা ওর শিল্পচর্চার অবাধ সুযোগ রেখে গেছে। বাবার প্রতি অতনু গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। কিন্তু সংগ্রাম তার বাবাকে ক্ষমা করতে পারে না। এ পৃথিবীতে নিয়ে এসে এরকমভাবে নিঃস্ব করে রেখে যাওয়াকে তার হৃদয়হীনতা বলে মনে হয়।

বাবা মারা যাওয়ায় সংগ্রাম দুঃখ করে নি। অবশ্য দুঃখবোধ তখনও তার দেখা দেয় নি। পরে বড় হয়ে মায়ের বৈধব্য তার ভাল লেগেছে। এবং আশ্চর্যবোধ করেছে, মা-কে সে ভালবাসে। কারণ বাবা-বিহীন মা এ পৃথিবীতে আর কোন আগন্তুককে নিয়ে আসতে পারবে না।

মা বাড়ি বাড়ি ঝি-গিরি করত। সে আর তার বোন মধুমতী বাবুদের বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়াত। আবার নামের মানে তার মাথার মধ্যে ভিড় করে আসে। তার বোন মধুমতী। নামটা যে, কি বলে, বেশ লাগসই হয়েছিল একথা সংগ্রাম স্বীকার করে। প্যাকাটির মত ডিগ্‌ডিগে মেয়েটা হিল্‌হিলিয়ে উঠেছিল বর্ষার জল-পাওয়া কলমির-মত।

ছোটবেলায় সংগ্রামের বার বার মনে হত, সে আর মধুমতী দুটো কুকুরের ছানা। দিনরাত ডাস্টবিনের ধারে পড়ে থাকত। খাবার দেখলে ল্যাজ নেড়ে নেড়ে ছুটে যেত। বাবুরা হাসত আর কি বলাবলি করত।

একদিন সে ইস্কুলে গেল। পরিচয় হলো অতনুর সঙ্গে। ছোটবেলায় অতনু বেজায় বোকা ছিল। অকারণে হেসে উঠত। সকলে ওকে সমীহ করে চলত, মায় টিচাররা পর্যন্ত। ওর বাবার যত টাকা, তার বেশি প্রতাপ। তার এক কলমের খোঁচায় অনেক কিছু ঘটতে পারত। সকলে বলত, ওর বাবা এম-পি।

সংগ্রাম জিজ্ঞেস করেছিল—এম-পি কি রে?

অতনু বলেছিল—মেম্বার অব পার্লা-মেন্ট।

—সে আবার কি?

—সে তুই বুঝবি না, বিরাট ব্যাপার।

অতনু তাকে একদিন ওদের বাড়ি নিয়ে গেছল। বিরাট বাড়ি। ক'টা কুকুর এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তাকে দেখে তেড়ে এসেছিল। অতনু একটা হাঁক ছাড়ল। সব চুপ। কুকুরগুলো ওর পায়ের কাছে শুয়ে মাটিতে মাথা ঘষটাতে লাগল। মোজাইক-করা সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বার বার তার পা পিছলে যাচ্ছিল। চক-মিলান ঘর। কেউ কোথাও নেই। এত বড় বাড়িতে অতনু নাকি একলা থাকে।

একটা ঘরের আলমারিতে তাকে তাকে সাজান সুন্দর সুন্দর বোতল। অতনু বলেছিল—ওগুলো মদের বোতল। বাবা মা ভীষণ মদ খায়। তখন বাবা নাচে, গান গায়।

খিল খিল করে অতনু হেসেছিল। সংগ্রাম অবাক। তারপর অতনু গম্ভীর হয়ে গেছল। বলেছিল—মদ না খেলে বাবা মাঝে মাঝে ভারি রেগে যায়। তখন ভীষণ মারধোর করে।

—তোকে মারে?

—আমি তো কোন্ ছার। মা-কে না তলপেটে এমন লাথি মেরেছিল, মা অক্কা পেয়ে গেল।

—বলিস কি।

—হ্যাঁ।

অতনুর বাবার ফটোর দিকে সংগ্রাম তাকিয়েছিল। সুন্দর, শান্ত, সৌম্য মুখের ভাব। ঠোঁটের কোণে একটু হাসি। উজ্জ্বল চোখে গভীর ভাব-দ্যোতনা। কাগজে-ছাপা নেতাদের মুখের মত অনাবিল পবিত্র শিশুর মুখ।

এখন অতনু এসব কথা আর বলে না। বাবার মৃত্যুবার্ষিকী পালন করে সাড়ম্বরে। তার বাবার দেশপ্রীতি ও স্ত্রীর প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা কাগজে ছাপা হয় সালঙ্কারে। তার পত্নী-প্রেমের পরাকাষ্ঠা মুগ্ধ করে দেশবাসীকে। অতনুর বাবা এখন দেশনায়ক।

ইস্কুল তার ভাল লাগত। শিক্ষকরা তাকে ভালবাসত। মা বলত—ভাল করে লেখাপড়া কর। বড় চাকরি পাবি, আমাদের আর কোন দুঃখ থাকবে না।

মা-র কথা সে বিশ্বাস করত। মধুমতী বলত—জানিস দাদা, তোর টুকটুকে সুন্দরী বৌ হবে।

টুকটুকে সুন্দরী বৌ হলে কি হবে, সে সম্বন্ধে তার কোন ধারণা ছিল না। তবে মধুমতী বেশ ডাগর হয়ে উঠেছিল। লহস্তা হিঞ্চের ডগার মত হিলহিলিয়ে উঠেছিল।

ঐ বয়সেই মধুমতী বেশ আসর জমিয়ে ফেলেছিল, বলা যায়। সংগ্রাম ওর দিকে তাকিয়ে ভাবত, মেয়েটার সারা শরীরে একটা সাগরের ঢেউ উথাল-পাথাল করত। এবং সত্যি কথা বলতে কি, মধুমতীর দিকে তাকিয়ে থাকতে তারও ভাল লাগত।

কনক বলে—যে দেহটার জন্যে শকুনের মত তোমরা তাকিয়ে থাক কি পাও তাতে?

কনককে সে বোঝাতে পারে নি, কি পাওয়া যায় দেহের মধ্যে। সংগ্রাম ভেবেছে এবং এখনও ভাবে। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তে সে আসতে পারে নি। তবু

একথা অস্বীকার করতে পারে না। ফনকের দেহটা তার ভাল লাগে।

ইস্কুল থেকে সে পাশ করে বেরিয়েছিল। সেদিন তার ভীষণ আনন্দ হয়েছিল। মা চোখের জল ফেলেছিল বাবার জন্যে। সব আনন্দ নিমেষে উবে গেছল স্পিরিটের মত। বাবার অস্তিত্ব, এমন কি তার চিন্তা সে সহ্য করতে পারত না। একটা ক্রোধ ভয়ঙ্কর মূর্তি নিয়ে তার চোখের সামনে হাজির হত।

অতনু বলেছিল—আর পড়বি নাকি?

—না।

—কেন?

—টাকা কোথা?

পা দুটো একটু ফাঁক করে আকাশের দিকে মুখ তুলে অতনু ধোঁয়া ছেড়েছিল। সিগারেট ফোঁকায় সে বেশ রপ্ত হয়ে উঠেছিল। বলেছিল—ঠিক। মানি মানি মানি বেটার দ্যান হানি সুইটার দ্যান এনি গার্ল।

সংগ্রাম পাল্টা প্রশ্ন করেছিল—তুই কি করবি?

—শিল্পচর্চা।

—মানে?

—আর্ট কলেজে ভর্তি হব।

এ-পার্কের ঘাসের ওপর শুয়ে, আকাশের বে-সরম বুকে মুখ দিয়ে এবং পিঠের নিচে কবরের শীতলতা অনুভব করে, সংগ্রাম ভাবে—চাকরি তার হয় নি। বুক-পকেট হাতড়ে পোড়া সিগারেটটা বার করল। নাকের কাছে একবার ধরল। বিশ্রী একটা গন্ধ। সোনালী ভার্জিনিয়ার মিঠে স্বাদ এতে নেই। দেশলাই বার করে সিগারেট ধরায়। ক'টা টানের পরেই আগুনের তাপ লাগে আঙুলে। দূরে ছুঁড়ে দেয়। ঘাসের ওপর পড়ে বাতাসে জ্বলন্ত টুকরোটা ধোঁয়া ছড়ায়।

—এত বড় মাঠ, নিরিবিলি জায়গা একটুও পাওয়া যায় না।—মেয়েলি বিক্ষোভ।

—চলো, একটু এগিয়ে দেখা যাক।—পুরুষালি সান্ত্বনা।

দুটো ছায়ার কায়া তাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে যায়। দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর হয় ওদের ছায়া। শয়তানের হাতের মত ইচ্ছাকৃতভাবে বেড়ে চলে।

এগিয়ে সবাই যেতে চায়। কিন্তু ইচ্ছা করলেই এগিয়ে যাওয়া যায় না। সংগ্রাম ভাবে, সে তো এগিয়ে যেতে চেয়েছিল, পারে নি। মায়ের চোখের আলো নিভে এসেছিল—তার লেখাপড়া জানা ছেলে চাকরি পায় নি। ঝি-গিরি করতে করতে হয়তো কোন স্বপ্ন দেখেছিল, কে জানে। সংগ্রামের মন তখনো পলিমাটির মত নরম ছিল। মায়ের দীর্ঘশ্বাস ও ব্যথা-বেদনা তার মনের ওপর দিয়ে ঝড়ো বাতাসের মত বয়ে-যেত। মনের এখানে-সেখানে দেখা দিত দু'-একটা ক্ষত। আর আজ, এই এখন, সে ভেবে অবাক হয়ে যায়, সে চোখের জল ফেলত।

তারপর সে নোনতা-জলের ধারা কবে শুকিয়ে গেছে। কত প্রসন্ন প্রভাতের আশার আলো ও বিষণ্ণ বিকেলের নিরাশার কালিমা তার জীবনের ওপর আলো-ছায়ার জাফরি-নক্সা এঁকে দিয়ে গেছে। বেদনার্ত একটা পাখি লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে—আবার ছুটেছে সূর্যের দিকে আলোর আশায়। তারপর এক সময় ডানা ভেঙে ঘাড় গুঁজে ছিট্‌কে পড়েছে জঞ্জালের স্তূপের পাশে।

অতনু বলেছিল—একটা কাজ করবি?

—কি কাজ?

—মিটিং-এ যাবি?

—পেটে ভাত জোটে না, মিটিং-এ যেয়ে কি করব?

—টাকা পাবি।

—কি রকম?

অতনু খোলসা করে বুঝিয়ে দিয়েছিল। দিল্লী থেকে বড় নেতা আসছে। ময়দানে বিরাট মিটিং হবে। অনেক লোক চাই। মিছিল করে যেতে হবে। দুটো টাকা আর একটা কোয়ার্টার রুটি পাবি।

মিছিলের সাথী সংগ্রাম। মাথার ওপর সূর্যের অকৃপণ কিরণধারা। পায়ের তলায় গলন্ত পিচের অগ্নিজ্বালা। পতাকা ওড়ে আকাশে। মিছিল চলে। সংগ্রাম আশেপাশে তাকায়। এরা কি সকলে তার মত ক্ষুধার্ত? বুভুক্ষু? বেকার? সব মুখ যেন এক। ব্যতিক্রম নেই। মিছিল চলে। বিকার-বিহীন মুখে উচ্চকিত শ্লোগান। পায়ের চলায় অসম্ভব

হয়। সংগ্রাম চোখের সামনে দেখে দুটো টাকা ও একটা রুটি।

এ মিটিং-এ সে কনককে দেখেছিল। কৃষ্ণনগরের মেয়ে। সরম-সংকোচের বালাই নেই। কাপড়ের আঁচলে মুখ মুছে বলেছিল—মন্দ কি, খানিকটা হাঁটলে যদি দুটো টাকা ও একটা রুটি পাওয়া যায়। আমি এরকম অনেক মিছিলে এসেছি।

জনতা দেখে নেতা তৃপ্ত। আনন্দিত। ভারি সুন্দর চেহারা। ঠিক অতনুর বাবার মত। এরকম ম্যামথ গ্যাদারিং তার কল্পনাতীত। এত লোক যে তার দলের সমর্থক এতে সে একেবারে বিগলিত, আত্মহারা।

সংগ্রামের মনে হয়েছিল, একবার সে হেসে ওঠে আকাশ ফাটিয়ে। পারে নি।

মরা মায়ের দিকে তাকিয়ে সংগ্রাম স্বস্তির শ্বাস ফেলেছিল। মধুমতী কেঁদেছিল গলা ফাটিয়ে। সংগ্রামের চোখে একটুও জল দেখা যায় নি। একটা গভীর শান্তি সে অনুভব করেছিল। মনে পড়েছিল বাবাকে। খিস্তি আউড়েছিল। পাড়াপড়শীরা তাকে বলেছিল অমানুষ।

বাড়ির সঙ্গে তার সম্পর্ক বরাবর কম। চাকরি পাবার আশা আগে করত, আজকাল করে না। মধুমতী বেশ আসর জমিয়ে ফেলেছিল।

ক'টা লোক বাড়ির আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ায়। সংগ্রামের ভাবতে ভাল লাগে, বাড়িতে বেশ একটা স্বচ্ছলতার ভাব এসেছে। মায়ের আমলের দারিদ্র্য আর নেই। মধুমতীর সাজে-সজ্জায় এত চেকনাই, বিশ্বাস করা যায় না, ও এসব পায় কোথা থেকে।

সে বোকা নয়। কিসে কি হয়, বোঝার মত বুদ্ধি তার আছে। কোন কথা বলে না। আর বলবেই বা কেন? বলার অধিকার তার নেই। কারণ যা পকেটে থাকলে অধিকার থাকে তা তার নেই।

অতনু বলেছিল—নরেনদার জন্যে একটু খেটে দে, ভাই।

—কি ব্যাপারে?

—মিউনিসিপ্যালিটির ইলেকসনে নরেনদা দাঁড়াচ্ছেন। তোরা পাঁচজনে একটু খেটে দিলে উনি নিশ্চয় জিতে যাবেন। তাছাড়া তোদের পাঁচজনের উপকার করবার জন্যে তিনি ইলেক্‌সনে নেমেছেন।

—পাঁচজনের উপকার?

—হ্যাঁ। তোদের বস্তির উন্নয়ন তাঁর স্কীমে রয়েছে। সেজন্যে তোদের সাহায্য তিনি চান।

—আমাকে একটা চাকরি করে দিতে বল।

—বলব, নিশ্চয় বলব।

ক'টা দিন রাত-দিন কাজ করেছে সংগ্রাম। দেয়ালে-দেয়ালে পোস্টার মারা; ভোটারদের বাড়ি বাড়ি ঘোরা; মিটিং-এর বন্দোবস্ত করা। ভারি ভাল লোক নরেনদা। তার মুখে সব সময় হাসি লেগে থাকে। অমায়িক। বাড়িতে গেলে খাতির আপ্যায়নের বান ডেকে যায়। সংগ্রাম অবাক হয়ে যায়।

কনকের সঙ্গে দেখা হল ধর্মতলায়। সন্ধ্যে হয়ে গেছে। সাজ-সজ্জা চটকদার।

সংগ্রাম বলল—চিনতে পার?

—হ্যাঁ। তুমি তো মিছিলের লোক?

—তুমিও তো মিছিলের মেয়ে। কি করছ এখন?

—কাজ।

—তোমার ভাগ্য ভাল।

—তুমি কি কর?

—ইলেকসনের কাজ করছি।

—ক' পয়সা পাও?

—পেটটা চলে। একটা চাকরি দেবে বলেছে।

কনক হেসেছিল। বলেছিল—তুমি ভারি বোকা।

—কেন?

—চাকরি তুমি পাবে না।

—না, না, নরেনদা ভাল লোক।

কনকের কথাই ঠিক। সংগ্রামের চাকরি হয় নি। নির্বাচন শেষে সে গেছল নরেনের বাড়ি। সে খাতির-যত্ন আর নেই। ভানুমতীর খেলের মত দু'দিনেই বিরাট পরিবর্তন এসে গেছে। এমন কি গেটের দারোয়ানটা পর্যন্ত বাড়িতে ঢুকতে দেয় না।

সে বলেছিল—নরেনদা, আপনি জিতেছেন, এবার আমার চাকরি করে দেবেন ত'?

—চাকরি?

—হ্যাঁ।

—চাকরি কি গাছের ফল যে পেড়ে দোব?

—ইলেকসনের আগে আপনি বলেছিলেন কিন্তু।

—ওরকম অনেক কথা বলা হয়। খেটেছ, টাকা পেয়েছ, এখন যাও।

সংগ্রাম আর কিছু বলতে পারে নি। ক'টা দিনের লালিত আশা কেঁদে ক'কিয়ে উঠেছিল। এত বড় বঞ্চনা তার চিন্তার বাইরে ছিল। নরেনকে সে বিশ্বাস করেছিল, কিন্তু সেটা এত ভঙ্গুর ভাবতে পারে নি।

কনক শুনেছিল, কিছু বলে নি। সংগ্রাম ভাবছিল, কনক নিশ্চয় কিছু বলবে, কিন্তু সে চুপ করে থাকায়, সে যেন ব্যথা পায়। তার স্থির বিশ্বাস ছিল, কনক নিশ্চয় আগুনের মত জ্বলে উঠবে। ওর চোখের আগুন সে আগে দেখেছিল।

সে বলেছিল—তুমি কি কাজ ক' কনক?

—শুনবে?

—বল।

—নিজেকে বিক্রি করি।

সংগ্রাম এ উত্তর আশা করে নি। মাথাটা আপনা থেকে কেমন যেন মাটির দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। একটা সুতীব্র বেদনা ও দুঃসহ লজ্জা গ্রাস করেছিল তার সমস্ত সত্তাকে। বুকের যন্ত্রণা একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদের মত বাইরে ছুটে বেরিয়ে এসেছিল—কি বলছ।

—হ্যাঁ, যা সত্যি, তোমাকে বললাম।

—এ যে অন্যায়।

—কিসে অন্যায়?

—এ যে পাপ।

—কিসের পাপ? এ পৃথিবীতে বাঁচতে চাই, কিন্তু কারো দয়ার দান মাথায় নিয়ে নয়। মরবার জন্যে কি পৃথিবীতে এসেছি?

—তবু......

—কিসের তবু? পাপ-পুণ্য, ন্যায়-অন্যায় কথার কথা। এতে অন্যায় কোথা? পাপ কোথা? আমি কাকেও ঠকাই না—টাকার বিনিময়ে ব্যবসা করি। আমি বাঁচতে চাই।

কনকের মুখের দিকে সে তাকিয়েছিল। দাবানলের তীব্র অগ্নিজ্বালা ছিল তার চোখে। সমস্ত বনাঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল আগুনের শিখা। জ্বলন্ত শিখা শত শত জিব মেলে যেন জ্বালিয়ে দিতে চাইছিল সারা আকাশকে।

সংগ্রামের মাথার ওপর নগ্ন আকাশ। পিঠের নিচে কবরের শীতলতা। এ পৃথিবীতে সবাই বাঁচতে চায়—কনক, মধুমতী, মিছিলের লাখো লোক। দুটো টাকা আর রুটির স্বপ্ন তাদের চোখে। তার মনে হয়, কবরের মধ্যে থেকে একবার চীৎকার করে ওঠে—আমিও বাঁচতে চাই।

তার চোখের সামনে একটা সিঁড়ির ছবি জাগে। ধাপে ধাপে সিঁড়িটা উঠে গেছে অনেক উঁচুতে। ধাপগুলো সব মরা-মানুষ দিয়ে তৈরি। চোখ তাদের খোলা। সে, কনক, মধুমতী আরো কত লোক সিঁড়ির ধাপ হয়ে গেছে। মাথায় ওপর বসে আছে, নরেন, অতনু, অতনুর বাবা, দিল্লীর সে নেতা। তার মনে হয়, সিঁড়ির লোকগুলো কি কোনদিন গা-ঝাড়া দিয়ে উঠবে না? দিল্লীশ্বর হুমায়ুনের নিষ্প্রাণ দেহটা লুটিয়ে পড়বে সিঁড়ির পায়ের নিচে।

সে উঠে পড়ে। বাঁ দিকের গেটটা দিয়ে হাঁটতে শুরু করে।

তিমির প্রান্ত ডুয়ার্স

অনির্বাণ

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

॥ তেইশ ॥

আঁকাবাঁকা পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে সকাল-সন্ধ্যা ওপর-নিচ করছি। করতেই হয়। যখন-তখন। সময়ের বাঁধাবাঁধি নেই। সবটাই যেখানে পাহাড়ি এলাকা, সেখানে ওপর-নিচ করা ছাড়া আর উপায়ই বা কী। হঠাৎ একদিন রুটিনে ছেদ পড়ল। কিরণের কোয়ার্টারে।

আমার মামাত বোন কিরণ এখানকার গার্লস স্কুলের অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার। মিসট্রেস শব্দটা পছন্দ নয় তার। টিচার শব্দটাই ভালো। টিচিং-টাই যেখানে প্রফেশন, সেখানে আবার স্ত্রী-পুরুষ ওসব ওজর-আপত্তি কেন? টিচার মানে টিচার। যে শেখায়, স্ত্রী হোক, পুরুষ হোক, সেই টিচার। কি বল দাদা? শুনতে সেটাই ভালো শোনায় না?

আমাকে সে প্রশ্নটা করেছিল একদিন।

সেই থেকে ভয়ে-ভয়ে টিচার শব্দটা উচ্চারণ করি। সে এখানকার গার্লস স্কুলের টিচার। আজ তিন-চার বছর চাকরি করছে এখানে। পিসিমাকে নিয়ে থাকে। বিয়ে-থা হয় নি। হবেও কি না সন্দেহ। তিনকুলে তার এমন কেউ আছে কি না যে এ কাজটার দায়িত্ব নিতে পারে। তার নিজেরও কোন মাথাব্যথা নেই এ-ব্যাপারে। বলে, বেশ আছি দাদা। সাধ করে কে বলো নিজের স্বাধীনতা খোয়াতে চায়।

না, এ-বস্তুটি না-খোয়ানোই ভালো। স্বাধীনতার এক অদ্ভুত আস্বাদ আছে। তুমি মুক্ত। তোমার ওপর কারো কর্তৃত্ব নেই। দায়-দায়িত্ব নেই। কারো কাছে বাধ্য-বাধকতা নেই। এমন আর আনন্দের কিছু আছে নাকি পৃথিবীতে। তবু তো ভবিষ্যৎ আছে। বার্ধক্য আছে। যখন নিজের দায়-দায়িত্ব নিতে মানুষ ভয়ঙ্করভাবে অক্ষম হয়। তখন স্ত্রী-পুত্র-পরিবার-পরিজনদের ওপর নির্ভর করা চলতে পারে। না-করে চলে না বলেই নির্ভরতার প্রশ্ন। যৌবনের উদ্দাম পৌরুষ তখন কোথায়? হাত-পায়ের শক্তি দ্রুত কমে আসছে। নড়ে মাছিটি তাড়াবার পর্যন্ত ক্ষমতা নেই।

আসলে ভেবে দেখতে গেলে এজন্যেই পরিবার-সমাজ ইত্যাদির রচনা। পরিবারের গণ্ডিতে সমাজের চৌহদ্দীতে মানুষ আদৌ ঢুকত কি না সন্দেহ, যদি তার স্বার্থ না থাকত। মুক্ত জীবনের স্বাধীনতার আনন্দ তাকে আহ্লাদে আটখানা করে রাখত। আদি মানুষ তো স্বাধীনই ছিল। তার কোন ভয়-ভাবনা চিন্তা-চেতনা ছিল না। কিন্তু সেই পর্বতচারী অরণ্যবিহারী মানুষকেও শেষ পর্যন্ত ঘর বাঁধতে হল।

কিরণের সঙ্গে আমার ও বিষয় নিয়ে আলাপ হয় নি। আলাপ না-হওয়াই সঙ্গত। আমার চাইতে বয়সে অনেকটাই ছোট সে। তার বাবা, অর্থাৎ আমার মায়ের জেঠতুত ভাই হারাণমামাকে আমার ছোটবেলায় দেখেছি। হারাণমামার বিয়েতেও গিয়েছি। তখন আমি অবশ্য ছোট। আট-ন বছরের ছেলে। ছোট শহরের স্টেশনে রেলগাড়িতে উঠে মায়ের সঙ্গে গিয়েছিলাম। ভালো মনেও নেই তত। আবছা-আবছা মনে হয়।

তারপর দীর্ঘদিন হারাণমামার সঙ্গে দেখা হয় নি। কলকাতায় একবার দেখা হয়েছিল। সে-ও বছর চারেক আগে। তারপর তিনি মারা যান। মেয়ে কিরণ যে এখানে চাকরি করছে, তা-ও জানতাম না। কিছুদিন আগে হঠাৎ এক মামাতো ভাইয়ের চিঠিতে জানতে পেরে স্কুলে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করেছিলাম। পরিচয় পেতে কিরণ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল, কত শুনেছি তোমার কথা। এসো না একদিন আমার বাড়িতে। বাড়ি না অবশ্য কোয়ার্টার।

আমি জানি।

কি করে জানো? কিরণ অবাক হয়েছিল।

সব না জেনেই কি এসেছি?

তাহলে সোজা কোয়ার্টারে গেলেই পারতে।

পারতাম। কিন্তু খালি-বাড়িতে গিয়ে পিসিমাকে বিপদে ফেলতে হত না? তাই আর যাই নি।

তুমি ত দেখছি এখুনি আসছ। কথার মাঝখানেই হঠাৎ কিরণকে এক-মুহূর্তের জন্য ভাবতে দেখেছিলাম। হয়ত আমার রিক্সাটার দিকে তার চোখ পড়ে থাকতে পারে। তাতে চাপান একটা মাঝারি-সাইজের হ্যান্ডব্যাগ।

কিরণ বলেছিল, দাঁড়াও, এক মিনিট। আমি একটু হেড মাস্টারমশাইকে বলে আসছি।

না, না—বলে আসতে হবে কেন? আমি এক্ষুণি বাসায় যাচ্ছি না। বলে তাকে নিরস্ত করতে চেয়েছিলাম।

সে শোনে নি। আমার কথায় জন্য এক মিনিটও দাঁড়ায় নি। প্রায় ব্যস্ত পায়ে ছুটে হেড মাস্টারের ঘরে গিয়ে ঢুকেছিল। তারপর একটু পরেই ফিরে আসতে আসতে আমাকে বলেছিল, চলো।

আমার ভালো লাগছিল। এই আন্তরিকতাটুকুই জীবনের উত্তাপ। আর কিছুই থাকে না। থাকবার নয়। সংসারে অনেক কিছু আছে। অর্থ-বিত্ত-ঐশ্বর্য কতকিছুর সাধনা করে মানুষ। বাড়ি করে, গাড়ি করে। কারো বা আকাঙ্ক্ষা যশ-অর্জন। কিন্তু সব কিছুই বিনষ্ট হয়, যদি তার মধ্যে একটুখানি প্রাণের স্পর্শ সং আন্তরিকতা না-থাকে। আন্তরিকতা জীবনের পরম স্বাদ, বস্তুকেও রমণীয় করে তোলে। অথচ এ-জিনিষের জন্যে পয়সা দিতে হয় না। স্বর্গের দুর্লভ বস্তু আন্তরিকতা। এইটে ক্রমশ লোক-দেখানো ব্যাপারে পরিণত হচ্ছে। সমাজ আগেই ভেঙেছে। পরিবারকে বর্তমান অর্থনীতির যুগে কম মূল্য দিতে হচ্ছে না। হৃদয়নীতি বিদলিত বিপর্যস্ত এই যুগে। অর্থনীতির প্রকোপে। অর্থ-নীতি এক সর্দার পোড়ো। ভীষণ

আক্রোশে সবকিছুকে তাড়া করছে। কে জানে হৃদয়নীতি তারই শোধ নিচ্ছে কি না অন্য পথে। এত বেশি হৃদ্‌রোগের আক্রমণ কি তারই জন্য? এক্সপেক্টেশন এত বেশি ডেজার্ট হচ্ছে বলেই কি এত হার্ট-অ্যাটাক্ বেশি হচ্ছে? হৃদয়ের মত এমন বিশ্বস্ত কিছু নেই, কিন্তু তা ভাঙলে একেবারেই সব ভাঙে। তখন আর কোন জোড়াতালিতেই কাজে লাগে না। কিন্তু; এ সব কথা থাক। এ-সব বাহ্য।

রিক্সাতে আর উঠতে হয় নি। স্কুলের সঙ্গেই কোয়ার্টার। আমার হ্যান্ডব্যাগটার দিকে তাকিয়ে কিরণ বলে উঠেছিল, আর সব মালপত্র কোথায়?

আমিও অবাক!

মালপত্র?

তোমার বিছানা-পত্র, স্যুটকেস। কেন, কিছুই আনো নি?

তখন বলতে পারি নি। শুধু মাথা নেড়েছিলাম। পরে বুঝিয়ে বলেছিলাম তাকে, মালপত্র আবার আসবে কোত্থেকে? আমার এইরকমই কাজ। সারাটা ডুয়ার্স চষে বেড়াচ্ছি। আজ এখানে কাল ওখানে। কোথাও কি থাকি? এই আছি এই নেই। মালপত্র নিয়ে চষে বেড়াতে গেলে আর রক্ষে ছিল না। অপ্রসন্ন হয়েছিল কিরণের মুখ। হয়তো সে ভেবেছিল আমি কি এমনি ছন্নছাড়া হয়ে গেলাম। চাকরি-বাকরি আমি কিছু করি না। সে হয়তো জানে। ঘর-সংসারও কিছু করি নি। আমার কোন দায়-দায়িত্ব নেই। তাকে পরে বুঝিয়ে বলেছিলাম বিকেলের দিকে।

শুনে সে বলেছিল, তোমাদের কথা বাবার কাছে এত শুনেছি যে, এসব ভেবে মন খারাপ হয়ে যায়। তুমি তো অনেক ক'টা পাশ দিয়েছিলে? তবু কিছু কাজকর্ম না করে এভাবে জীবনটাকে বইয়ে দিলে কেন?

সে এক প্রশ্ন বটে। বলেছিলাম, ছোটখাটো কাজকর্মে থাকি। তাতেই চলে যায়। যাচ্ছে তো আপাতত।

মানুষ তো আপাততকে নিয়ে বাঁচে না। ভবিষ্যতের একটা প্রশ্ন আছে। তার মানে চাকরি? সেটাও ভেবে দেখেছি। এখন তো করছি না। করব যদি কখনো দরকার লাগে। ডুয়ার্সে স্কুলের তো অভাব নেই।

তা ঠিক। বলতে গিয়ে কিরণ একটু থেমেছিল। এই ছেলেমানুষ মেয়েটির মুখের দিকে তাকিয়ে আমার হঠাৎ মনে হচ্ছিল, বয়সের তুলনায় একটু বেশি করে তাকে জীবনটাকে জানতে হয়েছে। শুধু না-জেনে উপায় নেই বলেই। পৃথিবীতে এ-বয়সী অনেক মেয়েরাই আজো সুখ-আহ্লাদ আনন্দ-উল্লাস করে বেড়াচ্ছে। ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে। উজ্জ্বল সপ্রতিভ চোখ। ছেলেদের সঙ্গে নেমে পড়েছে প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। তাদের দেখে ভালো লাগে। আনন্দ হয়। এই তো জীবন। সে-জীবনকে ভালো করে দেখে নিতে দাও। জীবনকে উপভোগ করতে দাও। পরম-রমণীয়তায়। তার অভাবে জীবন শুষ্ক বিশীর্ণ হয়ে পড়ে। স্রোত থেমে যায়। নেমে যায়। চারপাশের চাপ মাটির তলাকার পীড়নে ফোয়ারা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে ওপরে। আনন্দের আতিশয্যের আবেগে বুকের তলার আনন্দ ও হাসির ফোয়ারার মত বেরিয়ে আসে। হারাণমামা থাকলে কিরণও হয়তো সে-জীবন জানতে পেত।

আমি বলেছিলাম, শোনো কিরণ। ডুয়ার্সে অনেক বছর আছি। ভালোই আছি। এখানেই বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেব বলে ভেবেছি।

কিরণ বলেছিল, কিন্তু মাস্টারীর কথা বলছ! এখানেও যে সে-ব্যবস্থা ক্রমেই শূন্যের কোঠায় আসতে চলল। কিছুদিন আগে পর্যন্ত স্কুলগুলিতে মাস্টারের অভাব ছিল। এখন সেখানেও নো ভেকেন্সি।

তুমি এখানে এলে কি করে?

কিরণকে প্রশ্ন করেছিলাম। তার কোয়ার্টারের খোলা জানালা পথে বিকেলের ম্লান আলো এসে পড়েছিল ঘরে। বিছানায়। বেডকভারে। পিছন-দিকে একটা বেতঝোপ। একটা পাখি ডাকছিল।

কিরণ বলল, কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে দরখাস্ত করে দিয়েছিলাম। চাকরি হবে কি না-হবে। তখন কি আর জানি। গার্লস স্কুল মানে গার্ল স্কুল। সেখানে নিশ্চয়ই মেয়েরা পড়ে। আর মেয়েরা যেখানে পড়ে সেখানে মেয়েদের মা-বাবা-রাও আছেন নিশ্চয়। অ্যাপয়েন্টমেন্ট পেয়ে এসে দেখি এই কান্ড। একেবারে অপরিচিত এক এলাকা। তখন এই কোয়ার্টারগুলিও ছিল না বললেই চলে। গার্লস স্কুলের কাছেই সেক্রেটারীর বাড়িতে থাকতাম। তাঁর স্ত্রী-পুত্র আছেন। এক মেয়ের বিয়ে হল সেদিন।

কোয়ার্টারগুলি তো বছরখানেক হয়েছে মাত্র।

কিরণকে আমি বললাম, যাক গে, ভালোই হল। দেখা হল তোমার সঙ্গে। পিসিমা কিন্তু বেশ শক্তই আছেন। আমি ভাবি নি।

কিরণের আগ্রহাতিশয্যে দু'-তিন দিন থেকেই যেতে হল। সে বলে, দেখছ তো আমাকে। রোজ দশটার মধ্যে খেয়েদেয়ে স্কুলে চলে যাই। ফিরি বিকেলে। ক'টা দিন থেকে যাও, দাদা। কী ভালোই যে লাগছে।

স্কুলে তোমার কত ছাত্রী?

ছাত্রীর সংখ্যা দেড়-দু'শর বেশি নয়। বেশির ভাগই চারপাশের বাগান আর বস্তিগুলির মেয়ে। শুনে তুমি অবাক হয়ে যাবে দাদা, এখানকার মেয়েদের মনে লেখা-পড়া শেখার কী আগ্রহ। কল্পনা করা যায় না।

বারে, যুগটা যে এগোচ্ছে, সে কথা ভুললে চলবে কেন?

বলেই আমার চট করে মনে পড়ল হপ্‌কিন্স সাহেবের কথা।

ডুয়ার্সের ভুটানীদের কথা জানতে নয়, গিয়েছিলাম মূল ভুটানের অধিবাসীদের সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিতে। ভুটান তো ডুয়ার্সেরই সঙ্গে। ভারতবর্ষের সঙ্গে একালের ভুটানের যোগ আন্তরিক। অতীতে ইংরাজ আমলে উনিশ শতকের প্রথমার্ধের আগে পর্যন্ত যাই হোক, যত যুদ্ধবিগ্রহই ঘটুক, এখনকার ভুটানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক আন্তরিক। প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এমন আন্তরিক ও অকৃত্রিম সম্পর্ক দেখা যায় না। ডুয়ার্সে এলে দেখা যাবে অনেক ভুটানীদের। তারা অবশ্য ডুয়ার্সেরই ভুটানী। এখানকার স্বীকৃত জাতি। বাজারে-বন্দরে লোকালয়ে অনেক এলাকায় তাদের দেখতে পাওয়া যায়। ভুটানী বস্তীও আছে। তাদের কথা বলব পরে। ইংরাজ আমলের পরবর্তী-কালেই ভুটান রাজ্যের সঙ্গে এই সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার সূচনা হয়েছিল। ইতিহাসে সবই ঘটে। ইতিহাস-বিধাতা নিজের প্রয়োজন সিদ্ধ করেন বিচিত্র পথে। ভাঙা-গড়ার আবর্তন নর্তনেই তার লীলা। এই হিসেবে দেখতে গেলে মানুষ তাঁরই আজ্ঞাবহ মাত্র।

মূল ভুটান সম্পর্কে জানতে গিয়েছিলাম সাহেবের কাছে। ইংরাজ ম্যানেজার বার্ন সাহেবের কাছেই খোঁজ পেয়েছিলাম হপকিন্স সাহেবের। ভুটান সম্পর্কে বিস্তর তাঁর পড়াশুনো।

এক সকালের রোদ্রে গিয়েছিলাম তাঁর কাছে। রৌদ্রালোকিত গেস্ট হাউসের লনের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছেছিলাম তাঁর কাছে। সুন্দর বাগান। গেটের ধারে কোন্ সুদূরে উর্দিপরা দারোয়ান থাকত কি না জানি না। একালে চোখে পড়ে নি। কেউ প্রশ্ন করে নি আমাকে। পরিচয়পত্র চায় নি। সাহেব-বাগানের গেস্ট হাউস প্রীতি-প্রসন্ন, দৃষ্টিতে অভিনন্দিত করেছিল আমাকে। ভিতরে ঢুকতে

শেলাক ব্যতীত

ঐ সুন্দর
কেশ বিন্যাস
অতি দীর্ঘকাল
সুন্দর থাকবে
না - - -

চুল আটকাবার প্রসাধন সামগ্রীতে, এরোসলযুক্ত ও এরোসলহীন কেশ সিঞ্চনে উভয়তই শেলাকই প্রাথমিক আঠা।
শেলাকসমূহ ফ্লেক্সোগ্রাফিক কালি, পেষাই কল, পিল, কনফেকশনারী, জলীয় বাষ্প সেট করা কালি, প্রসাধন, বৈদ্যুতিক ইনসুলেটর, কোল্ড টপ এনামেল ইত্যাদিতে বিভিন্ন প্রান্তিক ব্যবহার সামগ্রী পছন্দমত প্রস্তুত হয় পৃথিবীর বৃহত্তম শেলাক প্রস্তুতকারক এঞ্জেলো ব্রাদার্স কর্তৃক। উহারা নিখুঁতভাবে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী প্রস্তুত হয়। সমুদয় এঞ্জেলো গ্রেডই আই-এস-আই স্ট্যান্ডার্ড ও এতদ্ব্যতীত কঠোরতর এঞ্জেলো স্পেসিফিকেশন মত। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, এঞ্জেলো ব্রাদার্স গুণের সমতা রক্ষা করেন।

Angelo Shellacs

এঞ্জেলো ব্রাদার্স লিমিটেড, কাশীপুর, কলিকাতা-২

ঢুকতে দেখছিলাম নানারঙা মৌসুমি ফুল বাগান আলো করে আছে। সাদা লালে মেশানো কুরোনেশন ফ্লাওয়ারই বেশি। মাঝে মাঝে নানা মরসুমী ফুলের বাহারী বাগ। ডালিয়া আছে, জিনিয়া। সুইট সুলতানা, পপি, প্যানসি। সারিবদ্ধ চলেছে কসমস। অসংখ্য মৌমাছি গুনগুন করছিল।

গেস্ট হাউসের প্রকাণ্ড বাংলোর রেলিং বেয়ে ওঠা লতান বোগেনভিলাই। একই গাছে সাদা ও গোলাপী-রঙের থোকা-থোকা বোগেনভিলাই। বাতাসে দুলছে সারি-সারি হলুদ পর্দা। একটা মূল্যবান মেহগনীকাঠের ডেক-চেয়ারে বসে সিগারেট খেতে খেতে হপকিন্স সাহেব দূরের দিকে তাকাচ্ছিলেন। সীমান্তে নীলচে রঙের পাহাড়ের একটা ভিউ।

সো গ্ল্যাড টু সী ইউ। সাহেব আমাকে বলেছিলেন, বার্ন আমাকে বলেছে তুমি ভুটান সম্পর্কে জানতে চাও।

আমি শুনেছি আপনি ভীষণ ভালোবাসেন ডুয়ার্সকে। তার আগে বলুন ডুয়ার্সের কোন্ রূপ আপনাকে সবচাইতে বেশি আকৃষ্ট করেছে!

এক মুহূর্তের জন্য বিচলিত দেখেছিলাম সাহেবকে। তারপর তিনি বললেন, একদিন খেয়ালের ঝোঁকে ডুয়ার্সে জুটেছিলাম। তখন সে একটু একটু গড়ে উঠছে। নতুন একটা জায়গা—যেখানকার প্রাকৃতিক সবটুকুই অতীব মনোরম—সেখানটাকে মানুষ বসতির উপযুক্ত করে তুলতে কী আনন্দ। তারপর একদিন ইতিহাস-বিধাতার ইঙ্গিতে সরে পড়তে হল এখান থেকে। খুব খুশি মন নিয়ে যে যাই নি সে ত বুঝতেই পার। But I really love it. It's a beautiful sight.

একটু থেমে বললেন, এবারে এসে দেখছি, একেবারে নতুন জায়গা হয়ে গেছে ডুয়ার্স। এ আমি কল্পনাই করতে পারি নি। বিচিত্র জীবনের স্পন্দনে বেজে উঠেছে এখানকার সবকিছু।

মাসিক ৫. টাকা কিস্তিতে

স্ট্যাণ্ডার্ড ডবল স্পীকার ৩ ব্যাণ্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টার। যে কোন স্থানে পাঠান যায়।

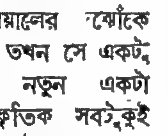

Tokyo Agencies, (W.B.C.)
Post Bag No. 11, New Delhi-1.

আসলে মানুষই ত সব। মানুষ যেখানে নেই, সেখানে সব থেকেও কিছু নেই। এবার আমি খুশি মন নিয়ে ফিরতে পারব। দেশে ফিরে স্বপ্ন দেখব আমার যৌবনের স্বপ্নভূমি ডুয়ার্স নতুনকালের আঙিনায় তীর্থ হয়ে উঠেছে। তার সূচনা হয়ে গেছে আর কোন ভয়-ভাবনা নেই। আমারও বয়স হয়েছে, কবরে যাবার সময় হয়ে এল। তারপর একদিন ঘুমিয়ে পড়ব।

বলতে বলতে আশ্চর্য নীল চোখ-দুটিতে অদ্ভুত এক প্রশান্তি নেমে এসেছিল সাহেবের। অনেক কথা বলেছিলেন সেদিন। ডুয়ার্সের আগেকার কথা। মূল ভুটানের কথাই আমি জানতে এসেছিলাম। সেখানকার প্রাকৃতিক বিশেষত্ব। মানুষ। সমাজব্যবস্থা, শাসন। তার রুচি-প্রকৃতি।

কিরণকে বললাম হপকিন্স সাহেবের কথা।

সন্ধ্যাবেলা টেবিল-লাইটের স্তিমিত আলোয় কিরণের কোয়ার্টারের বাইরের ঘরের বিছানায় বসে ভাই-বোনে গল্প করছিলাম। পিসিমার আহ্নিক হয়ে গেছে। তিনি বসেছেন একটা জলচৌকির ওপরে। একটু শীত-শীত করছে। সরস্বতী পুজোর দিনকয়েক বাকি। মনে পড়ছে ছোটবেলার সরস্বতী পুজোর দিনগুলির কথা। তখনও বেশ শীত থাকত। ডুয়ার্সে বেশ জোরালো শীত। রাত যত বাড়ে, শীত ততই বাড়ে। ঘণ্টায় ঘণ্টায়।

জানালা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

কিরণ বলে, ভুটান নাকি খুবই কাছে। আমাদের স্কুলেও কটি ভুটিয়া মেয়ে পড়াশুনো করছে।

আমি বললাম, এমনি করেই এগোয় ইতিহাস। কাল যেখানে ছিল অন্ধকার আজ সেখানেই পড়েছে নতুনকালের আলো। পূর্ব বাংলায় ছিলাম আমরা। সমাজ ছিল, সভ্যতা ছিল। দোল-দুর্গোৎসব। যুগান্তরের ঘূর্ণিঝড়ে সব ভেঙেচুরে গেল। উত্তরবাংলার এ-সব অঞ্চল ছিল অন্ধকার অরণ্যের রাজ্য। এসে পড়ল মানুষ। একেবারে গোটা এলাকাটা ধরেই নাড়া দিয়েছে। বন-জংলার অবসান হয়ে নতুন আবাদ ঘটছে। ভুটিয়ারাই বা অন্ধকারে থাকবে কেন? শুনবে ভুটানের গল্প?

কিরণ বলে, শুনব। তার দু'চোখ-জোড়া কৌতূহল। ঘরের মধ্যে টেবিল-লাইটের আলো পড়েছে। দেয়ালে একটা নটরাজের মূর্তি। এতটা এলার্ম-পিস ঘড়ি টিক্‌টিক্ করছে। দূরে কোথায় একদল শেয়াল ডেকে উঠল। পিসিমার কাঁপা-কাঁপা চোখের পাতায় কত জন্মের স্মৃতি নিথর হয়ে আছে। অনেক কথা জানেন উনি। কতকালের কথা। সে-সব কথারা কমতে কমতে একেবারেই ফুরোবে। পুরনো দিনের সে-সব মানুষেরা। যাদের সঙ্গে দেখা হলে মস্ত একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলেন, ওঃ কী দিনই যে ছিল!

তাঁদের দুঃখ বুঝি। বর্তমানকালের মহাভারত লেখা হতে পারে তাঁদের নিয়ে। তাঁদের দুঃখ কে বোঝে। কটি মহৎ সাহিত্য রচিত হয়েছে আজ পর্যন্ত তাঁদের নিয়ে? দুখখানা, আড়াইখানা। বুকের মধ্যে অতীত দিনের স্বপ্ন থরে-থরে। ধলেশ্বরীর তীর। ব্রহ্মপুত্রের চর। তাঁদের জীবনকালেই অতীতের সব গেল। ঘরদরজা, গোলাবাড়ি আট-চালা চণ্ডীমণ্ডপ বাগান-খামার। সিঁদুর-ছোপ নৌকোর গলুই। নক্সাকরা কপাটের খিলেন। অতীত গেল কিন্তু গেল না। জীবন থেকে গেল বটে, গেল না মন থেকে। নতুনকালের আঙিনায় ঘর বাঁধা হল, কিন্তু নতুনের মাটিতে মূল বসল না। এঁরাই ট্র্যাজেডির মহানায়ক। বিশ-বাইশ বছরে স্বাধীনতার উত্তরকালে যারা জন্মাল, শুধু বর্তমানেই তাদের কারবার। তাই তাদের মাথাব্যথা নেই।

পিসিমার দিকে তাকিয়ে সেই কথা মনে হয়। তাকিয়ে আছেন তিনি আমার দিকে। কিন্তু ঠিক জানি তিনি আমাকে দেখছেন না। হয়ত আমার মধ্যে দেখছেন আমার ছোটবেলার বাবাকে। আমার ঠাকুর্দাকে। জ্যেঠামশাইকে। চোখে তাঁর পলক পড়ে না। ঠিক জানি ঘরের ভিতরে গেলে দেখব তাঁর ছোট্ট কোঠা-টুকু, যেখানে তাঁর ঠাকুরের ঘট। সিঁদুরলেপা নারায়ণের ফটো। তাঁর লক্ষ্মীর আসন। ছোট ছোট থালা। একটুখানি চিনি। একটি বাতাসা। তাতে হয়ত পিঁপড়ে লেগেছে। জল-চৌকিটি পর্যন্ত দেশ থেকে আনা।

রেলের চাকুরে ছিলেন পিসেমশাই। তাঁকে মনে মনে ভাবি। একবার দুবার দেখেছি ছোটবেলায়। একবার দেখেছিলাম হীরুদার বিয়ের সময়। মস্ত বড় সামিয়ানা টাঙান হয়েছে। লোকজন। ভিড়। গিজগিজ করছে। কলাগাছ দিয়ে সাজানো হয়েছে বাড়ি। মস্ত বড় উঠানে রঙীন কাগজের মালা। পিসেমশাই বসে আছেন। খালি গায় পৈতেটা ঝুলছে। তামাক মানে গড়গড়িয়ার লম্বা নলে টান পড়েছে।

মনে পড়ছে সেই পিসেমশাইকে। রেলে কাজ করতেন। কত জায়গায় যে কাজ করেছেন। রংপুরে, সান্তাহারে। শুনেছি সেই ঘোর ইংরাজি আমলে লাল-মণিরহাটে ছিলেন সুপারভাইসিং স্টেশন-

মাস্টার। যে-কালে ইংরাজ ছাড়া ও-পথে যেতেই পারত না।

কিরণের মা বলেন; দিনে দিনে যে আরো কত দেখতে হবে বাবা, তার ঠিক নেই। ভুটানের আবার গল্প! ওদের গায়ের গন্ধে ভূত পালায়। তোমার পিসেমশাই তো কাজ করতেন এদিকে। কিছুদিন ছিলেন জয়ন্তী নাকি স্টেশানে।

জয়ন্তী? হ্যাঁ, আছে বটে। আমি ঘাড় নাড়ি।

শুনেছি ভুটান খুব দূরে না সেখান থেকে।

তা ঠিক।। একালে জয়ন্তী বলছি, কথাটা কিন্তু আসলে জৈন্তী। জৈন্তীও ভুটানের মধ্যেই ছিল। খাস ভুটানেরই এলাকা ছিল। ইংরাজকে দিয়ে দিল তারপর।

পিসিমা শোনেন কি শোনেন না। গালে হাত দিয়ে আছেন। হয়ত মন চলে গেছে সেই সব অতীতদিনে। যখন পিসিমা বুড়ি হন নি। পিসেমশাই জীবিত ছিলেন। সুখের সংসার ছিল তাঁদের।

কিরণ কিন্তু শুনছে মন দিয়ে। বলে, কেন জৈন্তী দিয়ে দিল কেন?

সে-সব পুরনোকালের কথা। আমি হেসে আবার বলি, ইংরাজদের অধিকারের মধ্যে ছিল ভুটানের দেওস্থান বলে একটা এলাকা। দেওস্থান কাকে বলে জানো তো?

কিরণের মুখে লজ্জার লাল পড়ে। সে তো আর ছেলেমানুষ নয়। বি-এ পাশ দিয়ে মাস্টারী করছে। কত ইতিহাস ভূগোল পড়েছে। ছেলেমানুষ তো নয় আর। বলে, দেওস্থান মানে বুঝি। দেবতার এলাকা আর কি!

এলাকাটা ইংরাজের কাছে ফিরিয়ে নিতে চাইল ওরা। ইংরাজের সঙ্গে তখন সন্ধি হয়ে গেছে। তারাও ফিরিয়ে দিল। বিনিময়ে চাইল এ জায়গাটা। জৈন্তীতে স্টেশান হল ইংরাজদের। পিসেমশাই ছিলেন সেখানে? পিসিমা বলেন, জৈন্তীতে উনি একাই ছিলেন। আমাদের আনতে চান নি। আমার তখন বয়সই বা কত। বলতেন, মানুষ বাসের নাকি উপযুক্ত না মোটেই। কিছুতেই আমাকে নিলেন না। প্রায় বছর দেড়েক ছিলেন। পরে গেলেন আসামের মধ্যে মাছভাত বলে একটা স্টেশানে।

কিরণ বলে, দেখেছ তুমি ভুটান? কই, আরম্ভ কর গল্প।

গল্প আরম্ভ করতে সময় নেয়। কিরণকে বলি, একেবারে আজব দেশ ভুটান।

পিসিমা শুনলেন কি না কথা মুশকিল। বলছেন, কী কপাল করেই যে এসেছিলাম। দেশ-গাঁ সব ভাঙল। এখন কে কাকে দেখে। মেয়েটারও একটা গতি করতে পারলাম না।

মা-র ওই এক কথা। কিরণ হাসল।

পিসিকে সান্ত্বনা দিতে বলি, এ-সব ভাবছ কেন পিসিমা? এ-কালের মেয়েরা নিজেই নিজেদের গতি করতে পারে।

কিরণ বলে, ছাড়ো দাদা এ-সব কথা। মা-র সুরু হলে আর থামতে চায় না। শোনাও তোমার ভুটানের গল্প।

চাদরটা আরেকটু টেনে কোমর পর্যন্ত তুলে নিই। তারপর ভুটানের কথা বলতে সুরু করি।

[ক্রমশ]

[পূর্বানুবৃত্তি]

একটু একটু করে রাত গড়িয়ে দুপুর হয়ে গেল।

হিম পড়তে শুরু করেছে। বটতলার অন্ধকার ছায়ায় ভাণ্ডড়দাস আর যমুনা আপাদমস্তক কাপড় টেনে গুটি-সুটি মেরে শুয়ে পড়েছে। সাড়াশব্দ নেই—হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে।

পাকুড়তলার শ্মশানে শেয়াল ডেকে গেল। জেলা বোর্ডের রাস্তার পাশে কোন গাছে হঠাৎ দুটো প্যাঁচা কর্কশকণ্ঠে গভীর রাতের সাড়াহীন শব্দহীন অন্ধকারকে চমকে দিয়ে আবার নীরব হয়ে গেল। চাঁদ নেই—আকাশ-ছাওয়া অগণিত নক্ষত্রের শুধু একটা পাতলা আলোয় দিগন্তব্যাপী সবুজ আবাদ যেন ঝিম মেরে আছে। পূবে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে—যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধু বুক সমান ধানগাছ আর ধানগাছ। কিষাণবসতির দিকে লাল আলোর ফুটকিগুলোর আর চিহ্নমাত্র নেই—সব কখন নিভে গেছে। চরের জলা-জংলা অঞ্চল—এমনিতেই লোকালয় নগণ্য। তার ওপরে রাতের এই সময়। জনমানবহীন জেলা বোর্ডের সড়ক। কিষাণবসতি মুখো আঁকা-বাঁকা বাঁধ, রাস্তাটা ভালো করে দেখাও যায় না। সবটা যেন আদিম—আরণ্যক—ভুতুড়ে। মনে হবে—মানুষের পদপাত এখানে কোনোদিন ঘটে নি।

এরই মধ্যে দুটি মানুষ চলেছে নিঃশব্দে। জেলা বোর্ডের সড়ক ছেড়ে চরের গাঁউলি ভেড়ি বাঁধ ধরে এগিয়ে চলেছে চরের কিষাণবসতির দিকে। খানিকটা ঠাউরে ঠাউরে—অনভ্যস্ত পদক্ষেপে। এসে দাঁড়াল মহেশ মণ্ডলের আঙিনায়।

গলা নামিয়ে একজন ডাকল, "মহেশ।"

মহেশ জেগেই ছিল—সাড়া দিল, "কে!"

"আমি আর ডাক্তার।"—

মহেশ মণ্ডল কোমর ধরে ঘষটে ঘষটে বাইরে বেরিয়ে এল।

সানো চৌধুরী তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল, "সাবাস আমার বাড়ুয়া!"

জগৎ ডাক্তার তার স্বভাবসিদ্ধ মেজাজে খ্যার-খ্যার করে উঠল, চাপা গলায়, "রাখো তোমার বাড়ুয়া সানো কর্তা। রাখো তোমার সাবাস। দিনকাল নাকি খারাপ। তা এত রাতে চরে এসে ঢুকলাম দুটো লোক ভূতের মত—একটা কুকুরও ডাকল না! যেন শ্মশান। সব মরে গেছে।"

নিশ্চিন্ত—নিরুপদ্রব—ঘুমন্ত চর। অসতর্ক।

ডাক্তার গর্-গর্ করতে করতে বলল, "এদের গলায় দড়ি দিয়ে ধরে নিয়ে যাবে না তো ধরবে কাকে! এদের কুকুরগুলো পেটে মুখ গুঁজে শুয়ে থাকে ছাইগাদায়। এদের গরুর শিং আছে—কিন্তু গুঁতোয় না। এদের হাত আছে—কখনো ওঠে না।"

সানো চৌধুরী বলল, "বাড়ুয়া মহেশ মণ্ডলের হাতের দোষ দিও না ডাক্তার। তার চরের নেশার আড্ডা সে খতম করে দিয়েছে।"

"ওই আনন্দে থাক সানো কর্তা।" তেমনি গর্-গর্ করতে করতে জগৎ ডাক্তার বলল, "আর বাজারের আবগারী দোকানের গায়ে সাইনবোর্ড একটা ঝুলিয়ে দিয়ে এসো—জগৎ ডাক্তারের ডিসপেনসারি দিবারাত্র খোলা থাকে। বিনি পয়সায় ওষুধ পাওয়া যায়, চিকিৎসা পাওয়া যায়, সেবা পাওয়া যায়।"

সানো চৌধুরী জানে ডাক্তারের মেজাজ খারাপের কারণ। প্রায় ডজনখানেক কচি-কাঁচা তরুণ ভলান্টিয়ার গুরুতর আহত হয়ে প্রায় হাসপাতাল করে তুলেছিল তার ডাক্তারখানাকে। এতক্ষণ নিজের হাতে তাদের চিকিৎসা করেছে—সেবা করেছে—ওষুধ দিয়েছে আর খোঁচা-খাওয়া বাঘের মত গর্-গর্ করেছে নিজের মনে। সানো চৌধুরীর সঙ্গে একটা কথাও বলে নি এতক্ষণ।

সানো চৌধুরী শান্ত গলায় বলল, "হবে ডাক্তার—হবে। ও নেশার ভাঁড়ার ঘরও ছাই হয়ে যাবে। বাড়ুয়া মহেশ মণ্ডল পথ দেখিয়ে দিয়েছে। মেজাজ খারাপ ক'রো না চট করে। তোমার ওই এক দোষ!"

আর যায় কোথায়। আগুনে যেন ঘি পড়লো এবং মুখে যা আসে তাই বলে ডাক্তার সানো চৌধুরীকে গাল পাড়তে লাগল। চাষা-চোষা থেকে অকর্মণ্য নপুংসক পর্যন্ত এবং নাম-পরিচয়হীন মার-খাওয়া বেচারী ভলান্টিয়াররাও বাদ গেল না।

"যতো খাসি করা ষাঁড় এসেছে সব মহকুমা থেকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মার খাবে আর হাত-পা ভেঙে মাথা ফাটিয়ে এসে ভিড় করবে আমার ডাক্তারখানায়!" হুঙ্কার দিয়ে উঠল জগৎ ডাক্তার, "কাল থেকে—এই তোমাকে বলে দিলাম, কাল থেকে ওদের একটা যদি ফের জখম হয়ে ঢোকবার চেষ্টা করে আমার ডিসপেনসারিতে—তাহলে আমিই ওদের লাঠিপেটা করব। থানার আর দরকার হবে না।"

তর্জন-গর্জনে ঘুম ভেঙে উঠে এল জগন্নাথ বলরাম।

সানো চৌধুরী তেমনি ঠাণ্ডা গলায় বললে, "শুধু একদিনের সময় দিলে ডাক্তার? আমার বাড়ুয়া মহেশ মণ্ডলের কোমরটা অন্তত সেরে উঠুক।"

কথার ইঙ্গিতে দপ্ করে জ্বলে উঠল মহেশের চোখ। আস্তে আস্তে বলল, "ওর জন্যে আমার কোমর সারবার দরকার নাই সানো কর্তা।"

"চুলোয় যাক সব—মরুক।" ডাক্তার নিজের মনে গজ্ গজ্ করতে করতে তার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে বললে, "আমি ডাক্তার—ডাক্তারী আমার পেশা।" মহেশকে বললে, "চলো—দেখি কি হলো।"

"আজ্ঞে বাড়ি মারলে।" মহেশ কোমর দেখিয়ে বললে, "সোজা এই কোমরে রুল দিয়ে—"

কথা শেষ হলো না—ডাক্তার ফের গর্জে উঠল, "বেশ করেছে। নাকে সরষে তেল দিয়ে চরসুদ্ধ সবাই ঘুমো! ধরে নিয়ে গেছল—ছাড়ল কেন? কোমর ভেঙে একেবারে শুইয়ে দিলে না কেন! বুকে হেঁটে কেমন কিল্‌বিল্ করতে কেঁচোর মত—কেন্নোর মত। চলো—উপড়ু হয়ে শুয়ে পড়ো দাওয়ায়।"

ডাক্তারকে এরা সবাই চেনে। আর কথা না বাড়িয়ে মহেশ দাওয়ায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। অনেকক্ষণ ধরে টিপে-টুপে পরীক্ষা সেরে ডাক্তার গম্ভীর গলায় বললে, "চুপ-চাপ শুয়ে থাকবে ক'দিন।" তারপর সানো চৌধুরীর দিকে ফিরে বললে, "ভেতরে হাড়ে চিড ধরে থাকলে এখানে বোঝার উপায় নেই। ও যমের অরুচি সব—ধুঁকে ধুঁকে আপনি সেরে যাবে। ওপর ওপর মালিস চলবে।"

মহেশ উঠে বসল।

ডাক্তার বলল, "চলো—আর কাকে দেখতে হবে।"

মহেশ বলল, "মুকুন্দকে। তার অবস্থা খুব খরাপ ডাক্তারবাবু। হাতটা বোধ করি ভেঙেই দিয়েছে।"

ডাক্তার আর সানো চৌধুরী চলে গেল মুকুন্দর ঘরের দিকে। মহেশ সঙ্গে যাচ্ছিল—ডাক্তার ধমকে উঠল, "শুয়ে থাকতে বললাম না!"

মহেশ দাওয়ায় ফিরে গিয়ে বসল। উস্‌খুস্ করতে লাগল।

ছেলেরা বললে, "শুয়ে পড় বাবা।"

মহেশ খেঁকরে উঠল, "তোরা যা না—শুবি।" বিড়বিড় করে বললে, "মোর ঘুম নাই।"

ঘুম নেই। জেগে বসে রইল। ডাক্তার আর সানো চৌধুরী মুকুন্দকে দেখে চলে গেল চর থেকে। কোমরে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে প্রাঙ্গণে বেরিয়ে এল মহেশ। খানিকটা এসে পেছন ফিরে দেখলে—না, ছেলেরা কেউ নেই। গুটি গুটি হেঁটে ডেকে তুললে গিয়ে সুবলকে, গুপীকে, হাবুকে। জোড় বাঁধে বেরিয়ে এসে বসে বসে সলা-পরামর্শ করলে অনেকক্ষণ ধরে। তারপর ফিরে গিয়ে শুয়ে পড়ল চুপচাপ।

কথার যেন পাখা আছে। সকালে ছড়িয়ে পড়ল কথাটা—পুবে পশ্চিমে উত্তরে দক্ষিণে। বাজারের আবগারী দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

আবার ছুটে এল ভলু মাঝি যমুনার কাছে—গাছতলার আস্তানায়। হাত ধরে বললে, "একবার নামগুলো থানায় বলবি চল যমুনা—তোর কোনো ভয় নাই।"

"ই মা গ'। আমি কি দেখেছি।"

"নাই বা দেখলি—বলে দিবি।" ভলু মাঝি চোখ টিপে বললে, "আর একবার মুকুন্দ পাইকের নামটা......এই সুযোগ!"

"মোকে খুন হতে বলছ!" যমুনা বললে, "তোমার বুদ্ধিতে গাছতলায় এসে দাঁড়িয়েছি। আরো চাও?"

ভলু হতাশ হয়ে চেয়ে রইল। শেষ চেষ্টা করলে, "বাবাজী কোথায়?"

"সে ভোর রাতে উঠে তীর্থে চলে গেছে।"

লোকটা ক্ষোভে হতাশায় বিকট মুখ করে চলে গেল।

ওদিকে তখন থানায় ভিড় করে এসেছে যতো নেশাড়ির পাল। আতঙ্কে অস্থির।

বড় দারোগা হুঙ্কার দিলে, "কি চাই?"

"শুধু আশ্রয় চাই হুজুর—প্রাণে বাঁচতে চাই। এবার মোদের ঘরে আগুন লাগাবে।"

"কে? কে আগুন লাগাতে চায়?"

"আমরা কি নাম জানি হুজুর। রাতের বেলা কখন কে লাগিয়ে দেবে—তার ঠিক কি! হেই...... হেই...... এক-দম পুড়ে মরে যাব! মোদের নিয়ে সব ছোট দারোগা কলা বাজারে গেছল।"

একে মাথা খারাপ হয়েছিল বড় দারোগার—তার ওপরে এই নেশাড়ি হত-ভাগাগুলোর উৎপাত। বড় দারোগা সেপাইদের হুকুম দিলে "মেরে ভাগাও শালাদের—একদম থানা কম্পাউণ্ডকা বাহার।"......

॥ নয় ॥

আগুন একবার দেখা দিয়েই যেন নেচে উঠল।

পুড়ল আরও দু'-একটা আবগারী দোকান। এবং দেখতে দেখতে বিলেতী কাপড়ের বহ্ন্যুৎসব ছড়িয়ে পড়ল হাটে-বাজারে—গ্রামে-গ্রামান্তরে। ছোট ছোট দলে ভলান্টিয়ারেরা সারাদিন বাড়ি বাড়ি ঘুরে বিলেতী কাপড় সংগ্রহ করে—আর বিকেলে হাট-বাজারের ভিড় দেখে দলে দলে এসে জমায়েত হয়। বক্তৃতা দেয় কলেজ ছেড়ে-আসা ছেলেরা। দেশী তাঁত আর তাঁতীর কাহিনী, ইংরেজ বেনের নির্মম অত্যাচারের কথা বলতে বলতে ক্রোধে ফেটে পড়ে ওদের তরুণ গলা। হাটের ভিড় ভেঙে পড়ে ওদের ঘিরে—গরম হয়ে

নেতাজীর সহকর্মী শিশির দাশের—

'মহানায়ক নেতাজী সুভাষচন্দ্র'

'গ্রন্থখানি নেতাজী সম্পর্কে ইদানীংকালে রচিত পুস্তকগুলির মধ্যে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজীর অনবদ্য ভূমিকা ও তাঁর রাষ্ট্রদর্শন, চিন্তাধারা, এবং তেজোদ্দীপ্ত জীবন-ইতিহাস অত্যন্ত বিশদভাবে ও প্রেরণাসঞ্চারী ভাষায় লিপিবদ্ধ। গ্রন্থখানি প্রতিগৃহে ও গ্রন্থাগারে সংগৃহীত হবার যোগ্য।

প্রথম খণ্ড—মূল্য : ১২·৫০ পয়সা

—প্রাপ্তিস্থান—

(১) এস, আর, দাশ
৩৫নং আশুতোষ মুখার্জি রোড, কলি-২৫

(২) শ্রীসুবোধ ঘোষ (গোবর্ধন প্রেস)
২০৯বি, বিধান সরণি, কলি-৬

বিশিষ্ট পুস্তকালয়সমূহেও পাওয়া যায়।

ওঠে গ্রামের মানুষের রক্ত। সভা শেষ হয় স্তূপীকৃত কাপড় আগুন লাগিয়ে। পুঞ্জিত একটা উত্তেজনার মধ্যে লক্‌লক্ করে ওঠে অগ্নিশিখা।

সে শিখার তাপে বোধ করি অতি সহজে তপ্ত হয়ে ওঠে গ্রাম্য আবেগ। কাঁধের গামছা পরনে জড়িয়ে কাপড় ছুঁড়ে দিয়ে যায় আগুনে।

"হেই লাও শালার বিলাতী বাঁদরের কাপড়। পোড়াও।"

দেখে দেখে ক্ষেপে গেল একদিন তাঁতী-সাহির তাঁতীরা। পুরুষানুক্রমের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ আর হতাশা ফেটে পড়ল অগ্নি-কাণ্ডের আকারে। আগুন লাগিয়ে দিলে এক বিলেতী কাপড়ের দোকানে।

দিনের পর দিন—কত বছরের পর বছর তার নিজের তাঁতের কাটা-সুতোর কাপড়ের মোট মাথায় করে বয়ে এনে মুখ শুকনো করে বসে থেকেছে হাট-বাজারের এক পাশে। বিক্রি নেই। সস্তায় বাজার ছেয়ে দিয়েছে ল্যাঙ্কাশায়ার ম্যাঞ্চে-স্টারের মিল। কাটুনীর চরকা বন্ধ হয়েছে, তাঁতী তাঁত বন্ধ করেছে। কাপাস তুলোর ক্ষেতে চাষী বুনতে শুরু করেছে বিলেতী মিলের জন্য পাট। রেশমের দাদন দিতে সাহেব কুঠিয়ালের মহাজন আর গ্রামে ঢোকে না।

কিন্তু একদিন ঢুকত।......

অমুক—সুতাহাটা, নামেই তার পরিচয়। আরও ছিল সদরের তৈরি থান, রাধানগরের তসর গরদ, ক্ষীরপাই চন্দ্র-কোণার ধুতি, শাড়ি। এসবের ওপরে এক-দিন একচেটিয়া অধিকার বিস্তার করে-ছিল কোম্পানীর কুঠিয়াল, রেসিডেন্ট এজেন্ট। শুধু দেশের বাজার নয়—তার মাটির কাপাসের সুতোয় তৈরি পালের কাপড় হাওয়া লাগিয়ে দেশ-দেশান্তরে একদিন পাড়ি জমিয়েছে বিদেশীর বাণিজ্য-তরণী। তারপর দাদন গেছে, মহাজন গেছে, কুঠিয়াল গেছে। এখানে-ওখানে ছড়ানো কুঠিয়ালের কুঠির চারদিকে ঘন থেকে ঘনতর হয়েছে আগাছা জঙ্গল। কোথায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কোম্পানীর নিযুক্ত বিশেষজ্ঞ গ্রিমণ্ড সাহেবের কুঠি। পেটের জ্বালায় ধীরে ধীরে তাঁতী হয়েছে চাষী।

তারই মধ্যে তাঁতীসাহির ক'ঘর তাঁতী বেঁচে ছিল ধুঁকে ধুঁকে। এবারের আঘাতে তাও বুঝি যায়।

কাঁধে গামছা, এককাপড়ে হারান মণ্ডল জিজ্ঞেস করে করে চরে এসে হাজির—সেই দশ ক্রোশ পশ্চিম থেকে একেবারে পুবে। বেলা তখন যায় যায়।

লোকটা পরিশ্রান্ত। মুখ-চোখ বসে গেছে। গালভর্তি খোঁচা খোঁচা কাঁচা-পাকা দাড়ি। গাঁয়ের মানুষ,—বোঝার উপায় নেই—বয়স পঞ্চাশ কি পঞ্চান্ন। এসে ধপ্ করে বসে পড়ল সাগর খুড়ির দাওয়ায়।

সাগর খুড়ি তখন উঠোন ঝাঁট দিচ্ছিল। আচমকা একটা লোককে অমন সটান দাওয়ায় চেপে বসতে দেখে তার পিত্তি জ্বলে গেল। দিন-কাল খারাপ। কে না কে!

কিন্তু লোকটা বিরস মুখে হাসবার চেষ্টা করে বললে, "দিদি, চিনতে পার?"

তা সাগর খুড়ির বয়স প্রায় ষাট। দৃষ্টি ঘোলাটে। সাগর খুড়ি চেয়ে চেয়ে লোকটাকে চেনবার চেষ্টা করতে লাগল।

লোকটি বললে, "আমি হারান—হারান মণ্ডল, তোমার ভাই।"

সে প্রায় তিরিশ বছর আগের কথা। দপ্ করে জ্বলে উঠল স্মৃতি—এবং সে স্মৃতি সুখের স্মৃতি নয়। ঝাঁটার ওপরে সাগর খুড়ির মুঠো বরং আরও শক্ত হয়ে চেপে বসল।

সাগর খুড়ি গোমড়া মুখ করে বললে, "তুই হারান! তা এতদিন বাদে কি মনে করে?"

হারান বলল, "বড় বিপদে পড়ে এসেছি দিদি। মোদের তাঁতীসাহির মণ্ডল পাড়া পুলিশ জ্বালিয়ে শেষ করে দিল। তারপর ধর-পাকড়। কে কোন্‌দিকে ছিটকে গেল তার ঠিক নাই।"

তাঁত জ্বলেছে, চরকা পুড়েছে, সেই সঙ্গে মণ্ডলপাড়ার গোটা ভাগা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। খ্যাপা পুলিশ বদ্‌লা নিয়েছে।

হারান বললে, "শোন নি কিছু?"

"তা শুনে কি করব বলো।" সাগর খুড়ি কট্‌কট করে কথা শুনিয়ে দিলে, "ও সব কি মোদের চলে কম?"

"তবু তোমাদের মাথার উপরে ছাউনি আছে—মোদের নাই।" হারান বললে, "বউ-বেটাকে শ্বশুর ঘরে রেখে বেরিয়ে পড়েছি দিদি কপাল নিয়ে। একদিন ছিলাম সেখানে—পুলিশে তাড়া করল—তাছাড়া অতগুলোন বোঝা নিয়ে ওদের ঘাড়ে থাকি বা কি করে বলো। ওদেরও তো সেই তাঁত চালিয়ে খাওয়া।"

"তাই মোর ঘাড়ে চাপতে এসেছ?" সেই কবেকার তেতো কথা সাগর খুড়ি যেন উগরে দিলে। হাতে ঝাঁটা ওঠা-নামা করতে লাগল সমানে—এই বুঝি সপাসপ্ পড়তে সুরু করে হারানের পিঠে। নেচে কুঁদে সাগর খুড়ি বলতে লাগল, "মনে নাই—তোর মায়ের কথার জ্বালায় একটা লোক মোকে অনাথা করে গলায় দড়ি দিয়ে মরেছিল! মনে নাই—সেই এক কাপড়ে বেরিয়ে এসেছিলম কচি ছেলেটার হাত ধরে। ভগবান আছে হারান—ভগবান আছে।"

"কিন্তু আমি তো তোকে তাড়াই নি দিদি—বরং—"

কিন্তু কার কথা কে শোনে। সাগর খুড়ির আজ দিন এসেছে, হাবু বড় হয়েছে—চরে চাষ-বাস করছে। বহু দিনের সেই জ্বালা—অতৃপ্ত আশা আজ একেবারে সুদে আসলে মিটিয়ে নিলে সাগর খুড়ি। বললে, "সেই তোর মায়ের কথা জীবনে আমি ভুলব!"

হারানের মা—সাগর খুড়ির সৎমা। তার পুরনো পাঁচালি পেড়ে সাগর খুড়ি পাড়া জাগিয়ে দিলে। যেমন গলা—তেমনি ঝাঁটার আস্ফালন। পাড়াপড়শী ছুটে এসে থ' মেরে দাঁড়িয়ে রইল। এগোতে কারুর সাহস হলো না। সাগর খুড়িকে সবাই চেনে।

কোথা থেকে খবর পেয়ে হাবু ছুটতে ছুটতে এসে হাজির। বললে, "কে!—কে এসেছে মা?"

"এই যে তোমার গুণের মামু।" স্রেফ ঝাঁটা দিয়ে দেখিয়ে সাগর খুড়ি বলল, "যেমন এক কাপড়ে একদিন তোর হাত ধরে বেরিয়ে এসেছিলম—তেমনি আজ ওকে বের করব। তবে মোর জ্বালা মিটবে।"

"মামু! মোর মামু!"...

"হ্যাঁ—সেই আবাগীর বেটির ব্যাটা।" সাগর খুড়ি ফোঁস করে উঠে বললে। "সৎ মামু। ঝাঁটা মারো।"—

"মা!" হাবু চিৎকার করে ধমকে উঠল। তারপর ছুটে গেল দাওয়ায় বসা হারানের দিকে। কাঁদছে—লোকটা ঘাড় হেঁট করে কাঁদছে নিঃশব্দে।

"এর কথা তো তুই কোনোদিন বলিস নি মা!"

সাগর খুড়ি দাবড়ে উঠল "বলবে আবার কি? শুধু ভগবান জানে-

১৯৫৯ তে আপনার ভাগ্য

যে-কোন একটি ফুলের নাম লিখিয়া আপনার ঠিকানাসহ একটি পোস্টকার্ড আমাদের কাছে পাঠান। আগামী বারমাসে আপনার ভাগ্যের বিস্তারিত বিবরণ আমরা আপনাকে পাঠাইব. ইহাতে পাইবেন ব্যবসায়ে লাভ লোকসান. চাকুরিতে উন্নতি, বদলী. জন্ম বিবাহ ও সুখ-সমৃদ্ধির বিবরণ : আর থাকিবে দুষ্ট-গ্রহের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষার নির্দেশ। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন!

PT. DEV DUTT SHASTRI-
RAJ JYOTISHI (B. M. W)
P. B. 86, JULLUNDUR CITY

সাধনা
বিউটি স্নো-এর
কোমল স্পর্শে
সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়
সাধনা বিউটি স্নো
—একটি অতি আধুনিক অঙ্গরাগ
ত্বক মালিন্যমুক্ত ও লাবণ্যযুক্ত
করে। মুখশ্রীতে লালিত্যের ও
তারুণ্যের আভা ফুটে ওঠে।
SADHANA
Beauty Snow
সাধনা ঔষধালয় কলিকাতা-৫
SBS-2/69

জীবনে কি জ্বালা মোর দাগা আছে। শুধু ওর মায়ের জন্য"—

সে দাগার কথা শুধু সেই জানে—মুখ ফুটে সব কথা বলা যায় না।

হাবু হারানের হাত ধরে বললে, "কেঁদো নি মামু—আমি মায়ের হয়ে ঘাট মানছি।"

ছোটবেলা থেকে হাবু তার আত্মীয়-স্বজন কখনো দেখে নি। অথচ এ-জঙ্গল জলপাই মহালের চর হলেও অনেকেরই অনেকরকম আত্মীয়-কুটুম আসা-যাওয়া করে। কুটুম্বিতা করে। সে শুধু মায়ের মুখে কখনো-সখনো শুনেছে তার গলায় দড়ি দেওয়া বাপের কথা—আর কারুর কথা নয়। তাই হঠাৎ আজ একজন আত্মীয়ের আবির্ভাবে তার আনন্দ ও আগ্রহ কম ছিল না।

কিন্তু মা তার উগ্র মূর্তি। মুখ বেঁকিয়ে বললে, "মামু বলে আর উথলে উঠতে হবে নি।"......

"মা!" হাবু রাগে ফেটে পড়ল, "তুই থামবি কি-না!"

হারান নীরবে এতক্ষণ অপমান সহ্য করছিল—শেষ পর্যন্ত হাউমাউ করে বললে, "চিরকাল কিছু থাকতে আসি নি দিদি। দু-একটা রাত হয়ত মাথা গুঁজে থাকতম। কাজ-কাম পেতম—ভালো। না হলে পুলিশের গোলমালটা চুকলে চলে যেতম।"

হাবু চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলে, "পুলিশের গোলমাল?"

সাগর খুড়ি খ্যার খ্যার করে বললে, "আরে সেই যে তাঁতীসাহির বাজারে বিলাতী কাপড়ের দোকানে আগুন দিল—তার মধ্যে আবার ছিল যে।"......

"তুমিও ছিলে মামু!" বড় বড় চোখ করে হাবু গভীর আবেগ ও উত্তেজনায় হারানের একটা হাত চেপে ধরল।

"ছিলম বাবা—মণ্ডলপাড়ার মোরা সবাই ছিলম।" হারান একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, "তাই পাল্টা পুলিশে মোদের সব জ্বালিয়ে শেষ করে দিলে বাপ্—একদম পথের ভিখারী হয়ে গেলম।"

"তোর মায়ের জন্য মোকেও একদিন পথের ভিখারী হতে হয়েছিল হারান।" সাগর খুড়ি কাটা কাটা জবাব দিলে, "ভগবান আজ তার বিচার করল। তোকে পথে বার করল।"

হাবু বলল, "সে কবেকার কথা—চুকে-বুকে গেছে মা। যতদিন খুশি—মামু মোদের এখানে থাকবে।"

সাগর খুড়ি তর্জন করে উঠল, "খবর্দার হাবু—মোর উপরে কথা!"

"তো থাক তুই তোর ঘর মাথায় করে—আমি চললাম মামুকে সঙ্গে করে। থাকবার জায়গা মোদের ঢের পাওয়া যাবে।" বলে হাবু হারানের হাত ধরে টেনে তুলে বললে, "চল মামু।—"—

পেছন থেকে সাগর খুড়ি হেঁকে উঠল, "খবর্দার হেবো। যেখানকার লোক—সেখানে চলে যেতে দে।"

হাবু ফিরেও তাকাল না। হারানকে সঙ্গে করে গোঁ ভরে চলে গেল—ভেড়ি বাঁধ ধরে সোজা জেলা বোর্ডের সড়কের দিকে।

পেছনে সাগর খুড়ি একাই দাপাতে লাগল এবং মুখে যা আসে তাই বলে তার অদৃশ্য অনুপস্থিত শত্রুকে গাল পাড়তে লাগল।

পড়শীদের মধ্যে কে একজন বলে ফেললে, "ভর সন্ধ্যা বেলা লোকটা চলে গেল গো!"

আর যায় কোথা—সাগর খুড়ি চেঁচিয়ে পাড়া মাৎ করে দিলে, "কি জানিস তোরা লা—এই সেদিনের মেয়্যা!"

দুঃখের কথায় সাগর খুড়ির চোখে জল নেই—আছে আগুন। ছিল বাপের আহ্লাদী মেয়ে—রাগটা চিরকাল বেশি। মুখটাও বেপরোয়া। লোকে বলে—ওই মুখের দোষে তার স্বামী তাঁতীসাহির অমন একটা কারিগর গলায় দড়ি দিয়েছে। অভাব-অনটন ছিল ঠিক—কিন্তু সে তাঁতী-সাহির মণ্ডল পাড়ায় ছিল না কার।

স্বামী গলায় দড়ি দিল—এক ছেলে হাবুকে নিয়ে বিধবা সাগর খুড়ির মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে গেল। সৎ মা কবে কি না কি বলে ফেললে—বাস্, ভোর রাতে এক কাপড়ে হাবুকে নিয়ে বাপের আশ্রয় ছাড়ল। তারপর ভিক্ষে করতে করতে সেই পশ্চিমে মিঠাপানীর দেশ থেকে একেবারে পুবে লোনা মাটির বাদা অঞ্চলে।

ভিক্ষে করছিল জেলা বোর্ডের সড়কে—চোখে পড়ে গিয়েছিল বাড়ুয্যা হরি মণ্ডলের। আর হাঁটতে পারে না ছেলেটা—শুয়ে পড়েছে গাছতলায়। যেন মানুষের চামড়ার থলেয় পোরা কতগুলো হাড়-গোড়।

"মোর বেটাটাকে বাঁচাও বাবু। একটা মুঠা খেতে দাও।"

"দিব—তোকেও দিব, ওকেও দিব।" হরি মণ্ডল বলেছিল, "কিন্তু একটা কড়ারে। মোর ঘরে কেউ নাই—ঘর দেখতে হবে।" তারপর চোখ পিট্ পিট্ করে চেয়েছিল জবাবের জন্য।

"কি—পারবি?"

সেদিন হাবুর সেই ফ্যাকাসে মুখ, হাড় জিরজিরে কঙ্কালসার দেহ, ডাগর ডাগর নিষ্প্রভ দুটো চোখ—অনেক্ষণ ধরে দেখে দেখে সাগর খুড়ি মাথা নেড়ে সায় দিয়েছিল।

কে জানে—লোকটা কেমন, কি আছে কপালে!...

[ক্রমশ]

বেকার সমস্যার সমাধান?

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে!!

বাঙলা দেশে বেকার সংখ্যা নাকি আনুমানিক এক কোটি। এই ভয়াবহ বেকার সমস্যার সমাধানে ক্ষুদ্র মূলধনের ব্যবসা হিসাবে মুর্গী উৎপাদন বা পোলট্রি ফার্মিং অধুনা অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায় রূপান্তরিত হয়েছে—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে। বেকার ব্যক্তিদের পোলট্রি ফার্মিং ব্যবসা পরিচালনার বিশদ নির্দেশলাভের সুবিধার জন্য বসুমতী থেকে আত্মপ্রকাশ করলো।

রয়েজ পেডিগ্রী পোলট্রি ফার্মের অধিকর্তা

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ রায়

জি, পি (আমেরিকা), এফ, এস, পি, আই, পি, এইচ (লন্ডন)

লিখিত সচিত্র

আধুনিক পোলট্রি ফার্মিং

মূল্য মাত্র চার টাকা। ডাকমাশুল এক টাকা।

অবিলম্বে অর্ডার পেশ করুন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ ॥ কলিকাতা-১২

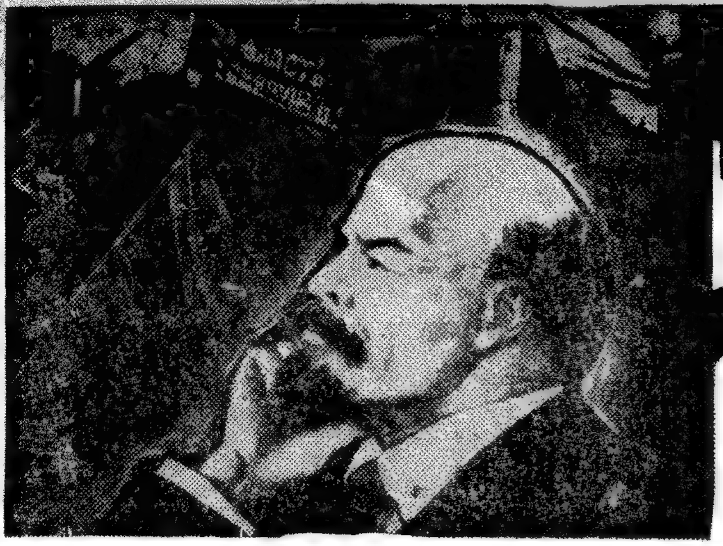

মহানায়ক লেনিন

অশোক সেন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ পাঁচ ॥

[কার্টেন উঠবে অন্ধকারের ভেতর। স্টেজের মাঝামাঝি জায়গায় একটি পার্টিশন দিয়ে দুটি চেম্বার আলাদা করা হয়েছে। স্টেজের বাঁ দিকের চেম্বারটিতে গোর্কী এবং তাঁর স্ত্রী ম্যারিয়া ফিয়োডো-রোভনা বসে রয়েছেন—গোর্কী একটা চিঠি পড়ছেন নিবিষ্টমনে। ডান দিকের চেম্বারে লেনিন এবং ক্রুপস্কায়া—লেনিনকেও একটা চিঠি পড়তে দেখা যাবে। একটা স্পটলাইট প্রথম এসে পড়বে গোর্কীর চেম্বারে—তারপর সেটা আস্তে আস্তে সরে আসবে লেনিনের চেম্বারে এবং আবার ফিরে গিয়ে গোর্কীর চেম্বারে স্থির হয়ে থাকবে। এই চেম্বারে এবার অভিনয় শুরু হবে—অন্য চেম্বারটি থাকবে অন্ধকারে ঢাকা।]

ম্যারিয়া ফিয়োডোরোভনা — এ্যালেক্সি ম্যাক্সিমোভিচ, এই নিয়ে তিনবার তুমি ভ্ল্যাডিমার ইলিচের চিঠিটা পড়লে। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে চিঠিটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ! কি লিখেছেন ভ্ল্যাডিমার ইলিচ?

গোর্কী—(মৃদু হেসে চিঠিটা খামসহ স্ত্রীর দিকে এগিয়ে দেবেন) পড়ে দেখ!

ম্যারিয়া—(চিঠিটা ভাঁজ করে খামে ভরে রেখে) তুমিই বল না কি আছে চিঠিটায়?

গোর্কী—আমি ভ্ল্যাডিমারকে কাপ্রিতে আমাদের আতিথ্য গ্রহণ করবার আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। তিনি লিখে-ছেন এখন তিনি প্রলিটারী কাগজটি রিভাইভ করবার কাজে এত ব্যস্ত যে এখানে আসবার সময় হবে না।

ম্যারিয়া—দেশের খবর কিছু লিখেছেন?

গোর্কী—লিখেছেন সম্প্রতি কয়েকজন নির্বাসিত বলশেভিক জেনিভাতে গিয়ে ওঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। তাঁরা ওঁকে জানিয়েছেন যে, জারিস্ট সরকারের অত্যাচার চরমে উঠেছে। হাজার হাজার বিপ্লবীদের জেলে বা নির্বাসনে পাঠানো হচ্ছে। কয়েক শত লোককে নির্মমভাবে ফাঁসির দড়িতে ঝোলানো হচ্ছে। শ্রমিক সঙ্ঘগুলোকে পুলিশ ভেঙে তছনছ করে দিচ্ছে। পার্টির অবস্থা খুবই খারাপ—প্রতি-দিন সভ্যসংখ্যা কমে যাচ্ছে।

ম্যারিয়া—বিপ্লবের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভ্ল্যাডিমার কি ভাবছেন!

গোর্কী—বিপ্লবের অসাফল্যে তিনি মোটেই আশাহত হন নি। লিখেছেন যে, এ অসাফল্য একটা সাময়িক ব্যাপার এবং শেষ পর্যন্ত স্বৈরাচারী সরকারের পতন অবশ্যম্ভাবী। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা তাদের এই প্রথম সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ব্যর্থতায় নিরুৎসাহ বা নিরুদ্যম হবে না—কারণ এই তো তাদের সংগ্রামের শুরু, ভবিষ্যতে প্রলেতারিয়াতের জয় অবশ্যম্ভাবী।

ম্যারিয়া—কিভাবে এখন তিনি বিপ্লবের কাজ চালাতে চান?

গোর্কী—প্রলিটারী পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার করে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করাই তাঁর উদ্দেশ্য। আমাকেও অনুরোধ করে-ছেন এই পত্রিকায় নিয়মিতভাবে লেখা দিতে। লুনাচারস্কি এবং অন্যান্য নাম করা পার্টির লেখকদেরও প্রলিটারীতে লেখবার ব্যবস্থা করবার জন্য ভ্ল্যাডিমার ইলিচ আমাকে বলেছেন।

ম্যারিয়া—তুমিও কি ভ্ল্যাডিমার ইলিচের মত মনে কর আবার সশস্ত্র গণ-অভ্যুত্থান করা সম্ভব হবে?

গোর্কী—নিশ্চয় হবে। জারিস্ট সরকার শত চেষ্টা করেও প্রগতিপন্থী বল-শেভিক পার্টিকে কখনই ধ্বংস করতে পারবে না। লেনিনের মত আমিও অন্তর থেকে বিশ্বাস করি আজকের রাশিয়ার জনসাধারণ আর ১৯০৫ সালের আগেকার রাশিয়ান জন-সাধারণের ভেতর চারিত্রিক সাদৃশ্য বিশেষ নেই। প্রলেতারিয়াত তাদের যুদ্ধ করতে শিখিয়েছে—প্রলেতা-রিয়াতই অদূর ভবিষ্যতে তাদের বিজয়ীর সম্মানে ভূষিত করবে। আমাদের আরও চেষ্টা করতে হবে কৃষক এবং প্রলেতারিয়াতদের এক সঙ্গে কাজে লাগাতে। জার সরকার কুলাক্‌দের সৃষ্টি করে এক নূতন ধনী কৃষকশ্রেণীর জন্ম দিতে চায়—যাতে কৃষকদের ভেতরও একটা প্রতি-ক্রিয়াশীল ক্যাপিটেলিস্ট গোষ্ঠী তৈরি করা যায়। কিন্তু তাদের এসব প্রচেষ্টাকে যে করেই হোক আমাদের ব্যর্থ করে দিতে হবে।

[স্পটলাইট এবার ঘুরে লেনিনের চেম্বারে এসে পড়বে। অন্য চেম্বারটি অন্ধকারে মিশে যাবে। লেনিন হাতের চিঠিটা খামে ভরে রাখবেন।]

লেনিন—গোর্কী আমাকে অনুরোধ করে-ছেন খোলাখুলিভাবে বোগডানভ, বাজারভ এবং লুনাচারস্কির সঙ্গে আমার মতবিরোধের কথাটা প্রকাশ না করতে। কিন্তু ওদের লেখায় আমি স্পষ্টভাবে রিভিসনিজমের প্রভাব দেখতে পাচ্ছি। যে বইটা ওঁরা এক সঙ্গে প্রকাশ করেছেন—"স্টাডিজ ইন্ দি ফিলসফি অফ মার্কসিজম" নামে —তার মত উদ্ভট, ক্ষতিকর, অর্থহীন বই এর আগে আমার চোখে পড়ে নি।

ক্রুপস্কায়া—কিন্তু গোর্কী যখন তাঁর ওখানে যাবার জন্য বার বার অনুরোধ

ম্যাক্সিম গোর্কী

করছেন, একবার কাপ্রি ঘুরে আসতে আপত্তি কি?

…নিন—তা বটে! গোর্কীর অনুরোধ এড়ানো কঠিন। সত্যিই এত শক্তিশালী জনদরদী লেখক বিশ্ব-সাহিত্যের ইতিহাসেও খুব বেশি দেখা যায় না। রাশিয়ান গণ-আন্দোলনের ইতিহাসে ম্যাক্সিম গোর্কীর অবদান চিরকাল সোনার অক্ষরে লেখা থাকবে। সব সময় আমাদের হয়তো মতৈক্য হয় নি। কিন্তু গোর্কীর চরিত্রের সব থেকে বড় গুণ—একবার যদি তাঁকে কনভিন্স করতে পারা যায় যে, তাঁর মতটা ভুল, তাহলে নিজেকে সংশোধন করে নিতে তিনি কখনও দ্বিধা করেন না। আমাদের শ্রমিক-আন্দোলন গড়ে তোলবার জন্য গোর্কীর জোরালো কলম এবং ক্রমান্বয় অর্থসাহায্য বলশেভিক পার্টি কখনও বিস্মৃত হবে না।

ক্রুপস্কায়া—আমার মনে হয় তুমি একবার কাপ্রিতে গিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করে এস।

লেনিন—বেশ লিখে দাও কাজের চাপটা একটু কমলেই যাব। তবে এ কথাও আমি বলছি উনি যে চেষ্টা করছেন বোগডানভ, লুনাচারস্কি এবং বাজারভের সঙ্গে আমার মতানৈক্যের দিকটা আলোচনার সাহায্যে উনি মিটিয়ে দেবেন এটাও ওঁর অবাস্তব কল্পনা।

I cannot and will not have anything to do with people who have set out to preach a union of scientific socialism and religion.

আমি স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি অদূর ভবিষ্যতে আবার গণ-বিপ্লব শুরু হবে। সুতরাং দ্বিধাহীন এবং বিজ্ঞানসম্মতভাবে শ্রমিকশ্রেণীর সামনে আমাদের সব সময় তুলে ধরতে হবে মার্ক্স প্রবর্তিত বিপ্লবপ্রসূত সমাজের বিবর্তিত রূপের আসল চেহারাটা। ডিক্টেটরশিপ অফ দি প্রলেতারিয়েতের প্রতিষ্ঠা করবার জন্য বলশেভিকরা কোন রকমের কম্প্রমাইজই সহ্য করবে না।

[স্টেজের সামনের দিকে এসে হাজির হবেন রাশিয়া থেকে আগত কয়েজন নির্বাসিত বলশেভিক—যথা পিটর বেজমেনেভ, পারচিখিন, আব্রাম মেডভেডেভ, বুবনভ, ইয়াকোভ বারডিন, মিখায়েল স্কোরোবটোভ প্রভৃতি। লেনিন এবং ক্রুপস্কায়া এগিয়ে এসে তাঁদের অভ্যর্থনা করবেন। উইংসের দিক থেকে কয়েকটি চেয়ার নিয়ে আসবেন লেনিন এবং ক্রুপস্কায়া—এঁদের দু'একজন এ কাজে তাঁদের সাহায্য করবেন।]

লেনিন—বসুন সবাই। আজ আপনাদের সঙ্গে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করবো। আপনারা সম্প্রতি দেশ থেকে এসেছেন—রাশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতির কথাও আপনাদের কাছে শুনবো।

বেজমেনেভ—কমরেড লেনিন! মস্কো এবং সেইন্ট পিটার্সবার্গে যেভাবে শ্রমিক-দের ওপর অত্যাচার চলেছে সে কথা সেদিন আপনাকে বলেছি।

বুবনভ—শ্রমিকদের খোলাখুলিভাবে কোন সঙ্ঘ বা সমিতিতে কাজ করা এখন প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ক্রুপস্কায়া—কেন?

বুবনভ—কারণ কোন সঙ্ঘ বা সমিতির কথা জানতে পারলেই সরকারের তরফ থেকে এসে গ্রেফতার করে নিয়ে যাচ্ছে সব সভ্যদের।

বেজমেনেভ—তারপরেই একটা বিচারের প্রহসন করে কারোর প্রাণদণ্ড দেওয়া হচ্ছে, কারোকে নির্বাসনে পাঠানো হচ্ছে আর কেউ কেউ জেলে গিয়ে অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করছে।

পারচিখিন—এ সবের ফলে পার্টি আণ্ডার-গ্রাউণ্ডে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

বারডিন—আরও একটা বিশ্রী ব্যাপার ঘটছে। সরকারের প্ররোচনায় মাঝে মাঝে শ্রমিক সংগঠনগুলোতে এজেন্ট-প্রভোকেটিওর্স ঢুকে পড়েছে। তারাই সরকারকে সংগঠনগুলোর গোপনীয় খবর যোগাচ্ছে এবং নানাভাবে শ্রমিক-দের সর্বনাশ করছে—ফলে শ্রমিকেরাও পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে উঠেছে।

লেনিন—মেনশেভিকরাও তো আমাদের কাজে প্রচণ্ডভাবে বাধা দিচ্ছে?

স্কোরোবটোভ—শ্রমিক বিপ্লব ব্যর্থ হবার পর থেকেই ওরা দূরে সরে দাঁড়িয়েছে। আসলে বিপ্লবীদের ওপর

সরকারের অত্যাচারের বহর দেখে ওরা খুবেই ভয় পেয়ে গেছে। আমাদের বৈপ্লবিক প্রগ্রাম এবং শ্লোগানগুলো ওরা খোলাখুলিভাবেই পরিত্যাগ করেছে। আমাদের সমস্ত বে-আইনী সংগঠনগুলো ওরা ভেঙে দিতে চায়...

লেনিন—এই জন্যই ওদের নাম দিয়েছি লিকুইডেটরস্—ওরা স্থির সিদ্ধান্তে এসেছে যে রাশিয়াতে আর দ্বিতীয়-বার শ্রমিক-বিপ্লব হতে পারবে না। আমার কাছে খুব বিশ্বস্তসূত্রে এ খবরও এসেছে যে ওরা রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীকে বুর্জোয়াজির সঙ্গে একটা রফায় আসবার জন্য প্ররোচনা দিচ্ছে। ওদের এই প্রতিক্রিয়াশীল নীতি আমাদের শ্রমিকেরা মেনে নিলে ওরা সহজেই সরকারের অনুমোদন সহ ওয়ার্কার্স পার্টি তৈরি করতে পারবে।

দুখেনভ—কি... এ ওদের দুরাশা! রাশিয়ার মে... ষক, মজদুর, শ্রমিকের ... থায় কান দিচ্ছে না।

লেনিন—সে ...রও আমার কাছে এসেছে। গত আন্দোলন থেকে আমাদের প্রলেতারিয়াত পার্টি বুঝতে শিখেছে যে, সত্যিকার বিপ্লববাদীদের সংগঠন স্বৈরাচারী সরকারের অনুমোদন লাভ করতে পারে না। সুতরাং মেনশে-ভিকরা পার্টির সংগ্রামের সহায়ক বা সহযোগী নয়।

বারডিন—কমরেড লেনিন! রাশিয়ান প্রলেতারিয়াত আজ বেশ ভালভাবেই জানে মেনশেভিকরা মনে-প্রাণে আমা-দের শত্রু। তবে আর এক মুস্কিল হয়েছে কিছু উগ্রপন্থী বলশেভিকদের নিয়ে......

লেনিন—সে খবরও আমার কানে এসেছে। ওদের আপনি উগ্রপন্থী বলছেন—আমি ওদের নাম দিয়েছি মাথামোটা বলশেভিকের দল। মেনশেভিকদের ঠিক উল্টো পথে চলেছে এই সব মাথা-মোটা বলশেভিক সভ্য। এরা চায় বিপ্লববাদের জিগীর তুলে আইনানু-মোদিত সংগঠনগুলো থেকে বল-শেভিকদের সরিয়ে আনতে। এরা বলছে ডুমাতে সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক যে সব সভ্য আছে তাদের ফিরিয়ে আনতে।

পারচিখিন—শুধু তাই নয় কমরেড লেনিন, আইনানুমোদিত সমস্ত কৃষ্টি এবং শিক্ষা সংসদ, ক্লাব, স্কুল, ট্রেড ইউনিয়ন, শ্রমিকদের জীবনবীমা সমিতিগুলোকেও এরা বর্জন করতে চায়।

লেনিন—অথচ এ কথাটা ওরা বুঝতে পারছে না যে, ওদের মতে কাজ করলে বলশেভিক পার্টি জনগণের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলবে। গণ-বিপ্লবের নেতৃত্ব করবার অধিকার আর তাদের ওপর থাকবে না।

মেডভেডেভ—তবে এদের সংখ্যা অতি মুষ্টিমেয়—পার্টিতে এদের কোন প্রভাবই নেই।

লেনিন—কমরেডস! আমরা চাই ডিক্টেটর-শিপ্ অফ দি প্রলেতারিয়াতের প্রতিষ্ঠা। তার জন্য আরও প্রচণ্ড আকারের কৃষক - শ্রমিক - মজদুর-মেহনতী-মানুষের বিপ্লবের প্রস্তুতির জন্য আমাদের উঠে পড়ে লাগতে হবে—

Bolsheviks must skilfully combine illegal and legal work for the achievement of their objective.

মেনশেভিক লিকুইডেটরস্ এবং বলশেভিক অটজোভিস্টসরা সত্যিকার বিপ্লববাদী নয়—

The party of the Proletariat will have to rid itself of such opportunists.

অন্য সবাই—লিকুইডেটরস্ নিপাত যাক্—বুলি-সর্বস্ব অটজোভিস্টরা ধ্বংস হোক।

[দপ্ করে আলো নিভে যাবে। অন্ধকারের ভেতরই চেয়ারগুলো সরিয়ে নেওয়া হবে। আলো জ্বললে দেখা যাবে কথক স্টেজের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন:]

কথক—১৯০৮ সালের শেষ দিকে প্রলেটারীর প্রকাশ ব্যবস্থা হল প্যারিসে, লেনিন এবং ক্রুপস্কায়াও চলে গেলেন সেখানে—বেশির ভাগ বিপ্লবী রাশিয়ান এই সময় প্যারিসেই নির্বাসিতের জীবন যাপন করছিলেন। লেনিন এখানে বলশেভিক গ্রুপের কাজে সক্রিয় অংশ নিতেন, রাশিয়ার রাজনীতিক পরিস্থিতি, প্যারিস কমিউন প্রভৃতি বিষয়ে প্রায়ই নানা জায়গায় বক্তৃতা দিতেন. এই সময় তিনি ফরাসী শ্রমিকদের জীবন ভাল-ভাবে অধ্যয়ন করলেন। শ্রমিকদের সভাতে যোগ দিতেন, তাদের পাড়ায় গিয়ে দেখতেন বিদ্রোহাত্মক নাটকের অভিনয়। লেনিন আসার অল্প পরে প্যারিসে 'অল রাশ্যা পার্টি কনফা-রেন্স' হল—এতে বলশেভিকদেরই ছিল প্রাধান্য। লিকুইডেশনিজম এবং অটজোভিসিমের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম চালাতে হবে, এই স্থির সিদ্ধান্তে এল কনফারেন্সের সমস্ত সভ্যরা। ১৯০৫—০৭ সালের শ্রমিক বিপ্লবের পর এই কনফারেন্স একটা বিরাট প্রেরণা দিল রাশিয়ার শ্রমিক-মজদুর-কৃষক আন্দোলনকে। বলশেভিকদের শক্তিশালী বিপ্লবী দল সংগঠনে ক্রমাগত বাধা আসছিল ট্রটস্কির তরফ থেকে। ভণ্ড-শিরোমণি ট্রটস্কি মুখে বলছিলেন তিনি শান্তির প্রয়াসী—অথচ ভেতরে ভেতরে উস্কানি দিচ্ছিলেন লিকুইডেটরসদের।

রেড স্কোয়ারে লেনিন

দু'জন সহকর্মীর সঙ্গে লেনিন (ফটো : ১৯১৯)

আর লেনিনের বিরুদ্ধে দল তৈরি করে তাঁর কাজ পণ্ড করে দেবার ফন্দি আঁটছিলেন। লেনিন এবার সবার কাছে ট্রট্স্কির ভণ্ড, স্বার্থান্বেষী, নোংরা স্বরূপটা প্রকাশ করে দিলেন। পার্টির সবাই ট্রট্স্কির নাম দিল—"জুডাস্ ট্রট্স্কি"।

[ব্ল্যাক আউট। আলো জ্বললে পেছনের পর্দা উঠবে, দেখা যাবে লেনিন যেন বিদেশ যাত্রার জন্য প্রস্তুত। দরজার কাছে একটা সুটকেস রাখা আছে—যাবার আগে ক্রুপস্কায়ার সঙ্গে লেনিনের কথা-বার্তা হবে এইভাবে :]

ক্রুপস্কায়া—স্টকহমে ক'দিন থাকবে?

লেনিন—সবই নির্ভর করছে মা'র আসার ওপর। সোশ্যাল ডেমোক্রেট পার্টির কয়েকটি মিটিং-এ আমাকে ভাষণ দিতে হবে বটে—কিন্তু ওখানে যাবার প্রধান উদ্দেশ্য মা'র সঙ্গে দেখা করা—কতদিন যে আমাদের দেখা হয় নি......

ক্রুপস্কায়া—তোমাদের শেষ দেখা হয়েছিল বোধহয় সেই তিন বছর আগে সেইন্ট পিটার্সবার্গে?

লেনিন—হ্যাঁ, বিপ্লবের সময়টায় যখন দেশে ছিলাম, তখন কয়েকবারই মা'র সঙ্গে গিয়ে দেখা করে এসেছি। প্রায় পঁচাত্তর বছর বয়স হতে চললো মা'র—তবু এখন পর্যন্ত বিশ্রাম কাকে বলে জানেন না। রাশিয়াতে আমাদের কাগজের প্রচারের জন্য উনি কি কম খাটেন।

ক্রুপস্কায়া—মা'র সঙ্গে তোমার বোন মারিয়া ইলিনিচনাও তো আসছে?

লেনিন—তাই তো কথা আছে। [পকেট থেকে ঘড়ি বের করে দেখে] সময় হয়ে গেছে—চললাম। দিন দশেকের পর ফিরতে পারবো বোধহয়।

[সুটকেস হাতে নিয়ে লেনিন বেরিয়ে যাবেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্ল্যাক আউট। আলো জ্বললে দেখা যাবে কথক এসে দাঁড়িয়েছেন :]

কথক—লেনিন এসে হাজির হলেন স্টকহমে। অধীর প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করতে লাগলেন মায়ের আসার জন্য। কেন জানি তাঁর বারবার মনে হচ্ছিল—এই হবে তাঁদের শেষ সাক্ষাৎ। মায়ের সঙ্গে এলেন ছোট বোন মারিয়া ইলিনিচনা, দীর্ঘদিন বাদে মায়ের সঙ্গে মিলন। ভ্ল্যাডিমার আপ্রাণ চেষ্টা করেন কিভাবে এই ক'দিন মাকে সুখে রাখবেন—খুবই আনন্দে কাটে কয়েকদিন, সকালবেলাটায় বেশির ভাগ থাকেন লাইব্রেরীতে কিন্তু বিকেলটা মুক্ত রাখেন মায়ের সেবার জন্য। অনেক সময় শহর এবং শহরতলীর রাস্তায় মায়ের সঙ্গে পায়ে হেঁটে বেড়ান ভ্ল্যাডিমার ইলিচ। একদিন কাজ থেকে ফিরে এসে দেখেন বোন মারিয়া বসে একটা বই পড়ছে :

[কথক সরে যাবেন। পেছনের পর্দা উঠলে দেখা যাবে ইলিনিচনা চেয়ারে বসে বই পড়ছেন—লেনিন দরজা ঠেলে ঢুকবেন :]

লেনিন—মা কোথায় মারিয়া?

ইলিনিচনা—(বইটা বন্ধ করে) তোমার জন্য একটা নরম ধূসর রঙের ক্লোক কিনবেন বলে বেরিয়েছেন।

লেনিন—আমার তো কোট আছে।

ইলিনিচনা—কালকের বলশেভিক গ্রুপে তুমি যে বক্তৃতা দিয়েছিলে তা শুনে মা'র খুব আনন্দ হয়েছিল। আমাকে রাতে বলছিলেন তোমাকে একটা ক্লোক কিনে উপহার দেবেন।

লেনিন—(বেশ খুশি মনে) কালকেই বোধহয় প্রথম মা আমার বক্তৃতা শুনলেন?

ইলিনিচনা—হ্যাঁ, এই প্রথম তোমার বক্তৃতা শুনলেন—আর শুনে যা খুশি—আমাকে রাত্রে বলছিলেন : "জানিস মারিয়া। ভ্ল্যাডিমারের বক্তৃতা শুনে আমার আজ বারবার আদালতে বিচারের সময় তোর বড়দার বক্তৃতার কথা মনে হচ্ছিল। মারিয়া আমি মাঝে মাঝে ভাবি আমার মত ভাগ্যবতী জননী ক'জন হতে পারে। আলেকজান্দার ভ্ল্যাডিমারের মত পুত্রভাগ্য ক'জন মায়ের হয়।

লেনিন—(হেসে উঠে) আর মারিয়ার মত মেয়েই বা ক'জন দেখা যায়!

মারিয়া—(জোরে হেসে উঠে) ওকথা কিন্তু মা বলেন নি!

লেনিন—মুখে বলেন নি, কিন্তু মনে ছিল।

[মারিয়া আলেকজান্দ্রোভনা ঘরে ঢুকবেন—হাতে একটা বড় প্যাকেট। প্যাকেটটা টেবিলে রাখলেন। লেনিন এগিয়ে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরবেন—মা তাঁর মাথায় চুম্বন করবেন।]

মা—বলতো এই প্যাকেটটায় কি?

লেনিন—দাঁড়াও, মনে মনে মার্কসিয়েন এ্যানালিসিস করে বলছি—(চোখ বুজে কি চিন্তা করবেন—তারপর চোখ খুলে:) ঐ প্যাকেটটায় রয়েছে আমার জন্য তোমার আনা...একটা উপহার...গ্রে রঙের একটা ক্লোক।

মা—সম্পূর্ণ সঠিক এ্যানালিসিস! তবে মার্কসিয়েন নয়, ইলিনিচ্নাইয়েন এ্যানালিসিস!

[তিনজনেই হো হো করে হেসে উঠবেন। ব্ল্যাক আউট। আলো জ্বললে দেখা যাবে পেছনের পর্দা নেমে গেছে। কথক স্টেজের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন :]

কথক : শেষ পর্যন্ত বিদায়ের দিন এসে গেল। জাহাজঘাট অবধি মায়ের সঙ্গে গেলেন ভ্ল্যাডিমার, জাহাজে উঠলেন না—কারণ রাশিয়ান জাহাজে উঠলে তাঁকে গ্রেফ্তার করবার সম্ভাবনা ছিল—জাহাজ ছেড়ে দিল। যতক্ষণ দেখা যায় দাঁড়িয়ে রইলেন ভ্ল্যাডিমার, সারা মনটা যেন বেদনাপীড়িত হয়ে উঠল, বারবার মনে হতে লাগল এই মায়ের সঙ্গে শেষ দেখা। সত্যি সত্যিই মা ছেলেতে এই শেষ সাক্ষাৎ। সাত বছর বাদে লেনিন যখন রাশিয়ায় ফিরলেন মা তখন জীবিত ছিলেন না, কারণ মারিয়া আলেকজান্দ্রোভনা মারা যান ১৯১৬ সালে।

[ব্ল্যাক আউট]

যবনিকা ক্রমশ]

পাঠক মন

'সাগিনা মাহাতো' প্রসঙ্গে

সাপ্তাহিক বসুমতী ৫১শ সংখ্যায় রঙ্গজগৎ বিভাগে শ্রীসুজন কর্তৃক শ্রীতপন সিংহ পরিচালিত "সাগিনা মাহাতো" সম্পর্কে লিখিত বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করি। আমি "সাগিনা মাহাতো" ছবির সঙ্গে জড়িত। উক্ত ছবিতে কোন রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে বা শ্রমিক আন্দোলনকে হেয় করে কিছু বলা হয় নি। বরং একটি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী মনের বিশ্লেষণ করা হয়েছে। তবে এই বিশ্লেষণ লাউড স্পীকারের চোঙার মাধ্যমে করা হয় নি, বিন্যাসের মধ্য দিয়ে অন্তর্নিহিত শাশ্বত সমাজতন্ত্রের কথাই বলা হয়েছে।

ছবিতে একটি রাজনৈতিক দলের কর্ণধার যিনি (শ্রীঅজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অভিনীত) তিনি সর্বজনপূজিত হবেন।

অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে শ্রীসুজন শুধুমাত্র গুজব এবং শোনা কথার ওপর নির্ভর করে কালি-কলমের সাহায্যে সাপ্তাহিক বসুমতীর অগণিত পাঠকের সামনে যা তুলে ধরেছেন, তাতে তিনি লেখক হিসেবে দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দেন নি।

—শ্রীবলাই সেন
৫।৩২, নেতাজীনগর
কলকাতা—৪০

লেখকের বক্তব্য

শ্রীবলাই সেন অযথা উত্তেজিত হয়ে চিঠিতে অপ্রাসঙ্গিক কথা লিখেছেন (লাউড স্পীকারের চোঙার মাধ্যমে করা হয় নি...) এবং সুজন-এর দায়িত্বজ্ঞানের প্রশ্ন তুলেছেন। পাঠকসমাজের প্রতি দায়িত্বজ্ঞান আছে বলেই সুজন প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে ছাত্র-বিক্ষোভ সমর্থন করে লিখেছেন। শ্রীবলাই সেনের যেমন শ্রীতপন সিংহের পক্ষে প্রতিবাদ করার স্বাধীনতা আছে, সুজনেরও নিজের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা থাকতে পারে। শ্রীসেনের বক্তব্য অনুসারে "রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে বা শ্রমিক আন্দোলনকে হেয় করে" (ছবি সম্পর্কে) এমন মন্তব্য সুজন করতে চায় নি। সুজন মন্তব্য করেছে শ্রীগৌর ঘোষের লেখা উপন্যাস 'সাগিনা মাহাতো' সম্পর্কে। উপন্যাসটিকে সুজন বলাই সেনের মত "সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী মনের বিশ্লেষণ" মনে করে না। বরং প্রগতি-বিরোধী মনে করে। কিন্তু ছবি সব সময় বইয়ের হুবহু অনুকরণ হয় না। পরিচালকরা নিজেদের চিন্তাধারা ও জ্ঞানবুদ্ধি খাটিয়ে নিজেদের মত বিশ্লেষণ করে চিত্ররূপ দিয়ে থাকেন। তাই সুজন লিখেছে "দেশের প্রগতিশীল অংশ আশা করবে 'সাগিনা মাহাতো' যদি শেষ পর্যন্ত চিত্ররূপ লাভ করে থাকে, তবে শ্রমিক আন্দোলন-বিরোধী অংশগুলি তা থেকে যেন বাদ দেওয়া হয়।" শ্রীবলাই সেনের বক্তব্য অনুযায়ী উপন্যাসটি যদি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী মনের পরিচায়ক হত, তা হলে পশ্চিমবঙ্গের সর্বাধিক শক্তিশালী ছাত্র সংগঠনের সদস্যরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ জানালেন কেন? এই বিক্ষোভের পরিপ্রেক্ষিতে সুজন শুধু আশা করেছে ছবিটি যেন উপন্যাসের নিছক কপি না হয়। সম্ভবত একটা শব্দ ছাপার ভুলের জন্য বলাই সেন বিভ্রান্ত হয়েছেন। 'সাগিনা মাহাতো' সম্পর্কিত প্যারায় অষ্টম লাইনে সমালোচকরা মনে করেন 'সাগিনা মাহাতো' বইয়ে কথার স্থানে ছাপা হয়েছে ছবিতে...। এই ছাপার ভুলের জন্যই সম্ভবত পত্রলেখক বিভ্রান্ত হয়েছেন। তবে লেখাটা মনোযোগ দিয়ে পড়লে বক্তব্য বুঝতে অসুবিধা হয় না।

—সুজন

'সপ্তাহের বোকা' প্রসঙ্গে

সাপ্তাহিক বসুমতীর ৭৩ বর্ষ, ৫২ সংখ্যায় শ্রীহিমাংশু চট্টোপাধ্যায়ের একটি প্রতিবাদ-পত্র প্রকাশিত হয়েছে। পত্রে চাটুজ্জেমশাই কৃত্তিবাস ওঝার যে ফিচারটির জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, সেটি সাপ্তাহিক বসুমতীর নিয়মিত পাঠক হিসেবে আমি পড়েছি।

সাংবাদিক কৃত্তিবাস ওঝার লেখার হুল বেশি করে ওদেরই ঘা দেয় যারা প্রগতি-বিরোধী। কৃত্তিবাস ওঝার মূল বক্তব্যকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে গিয়ে এবং শুধুমাত্র রাগের বশে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীচট্টোপাধ্যায় সামগ্রিকভাবে নিজের আয়নায় হারিয়ে ফেলেছেন আর হয়ত সেইজন্যেই 'দর্পণ'-এ প্রকাশিত তার প্রতিবাদপত্রে তাঁর মধ্যবিত্তসুলভ শ্রেণীচিন্তার প্রতিফলন ঘটেছে ছত্রে ছত্রে।

একজন মার্কসবাদী হিসেবে চাটুজ্জেমশাই নিজেকে জাহির করেছেন অথচ মার্কসীয় দর্শনের আলোকে স্বকীয় শ্রেণীচরিত্রকে স্বীকার করে নিতে ওঁর ভালো লাগে নি। কৃত্তিবাস ওঝার "......এই দুই (স্কুল মাস্টার ও সরকারী কর্মচারী) সম্প্রদায় সম্পর্কে এককথায় বলা যায় তাঁরা হলেন—রাজ্যের সবচেয়ে খিচনেওয়ালা পার্টি......তাঁদের দাবি আছে, নেই শুধু দায়িত্ব......।"—এই মন্তব্য প্রকৃতপক্ষে শ্রেণী-চিন্তার ভিত্তি থেকে উঠে আসা একটি সত্য, যাকে দ্বান্দ্বিক-বস্তুবাদের ছাত্ররা 'পেটি-বুর্জোয়া টেন্‌ডেন্সী' বলে স্বীকার করেন।

এই টেন্‌ডেন্সীর সবচেয়ে বড় কথা হল সুবিধাবাদী ঝোঁক। আমাদের দেশের মধ্যবিত্ত বা অল্পবিত্তশ্রেণী এই ঝোঁক থেকে মুক্ত, এমন মনে করার মত অ-মার্ক্সীয় সিদ্ধান্ত নেবার আগে চাটুজ্জেমশাই বোধহয় ভুলেই গেছিলেন যে, একজন মার্ক্সবাদী (একজন শিক্ষক হিসেবেও অবশ্যই) বলেই নিজেকে দাবি করেছেন তিনি।

কৃত্তিবাসের লেখার সাথে পুরোটা পরিচিত হতে পারেন নি বলেই তাঁর (ওঝার) মন্তব্যগুলোকে আক্ষরিক অর্থে, স্থূলভাবে নিয়ে চাটুজ্জেমশাই এলোপাথাড়ি হাত-পা ছুঁড়ে রোষ প্রকাশ করেছেন। যে উদ্ধৃতিগুলোর ওপর চটে চাটুজ্জেমশাই তাঁর প্রতিবাদ ধ্বনিত করেছেন, সেগুলোকে পূর্ণার্থক ধরে নিয়েই তিনি এগিয়েছেন। পুরোটা প্রবন্ধ এবং তার মৌল বক্তব্যকে পাশ কাটিয়ে চাটুজ্জেমশাই 'রাগী লোকের' পরিচয় দিয়েছেন, 'সমালোচকের' নয়।

সমালোচনার নামে সবচেয়ে বড় জবমাত্য করা হয় তখনই, যখন পূর্বাপর প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে কোনো লেখার মাঝখান থেকে আল-টপ্‌কা দু'-একটা লাইন তুলে নিন্দে করা হয়। দেখতে পাচ্ছি, প্রগতির নামে কিংবা বস্তুবাদীর নামে এই অসাধু সমালোচনা খুব বেড়েছে।

সমালোচনা করবার নামে চাটুজ্জেমশাই অবশ্য একটা জিনিষ প্রচার করতে পেরেছেন যে, তিনি যুক্তফ্রন্টের (মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বিশেষ করে) একজন সুহৃদ। একই সঙ্গে অবশ্য, কৃত্তিবাস ওঝাকে তিনি বেশ একচোট বকুনি দিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, আলোচ্য ফিচারটিতে কৃত্তিবাস নাকি সি-পি-আই (এম)-কে হেয় প্রতিপন্ন করতেই চান নি, যুক্তফ্রন্টের সুহৃদ সেজে যুক্তফ্রন্টের 'টোটাল ইমেজ'কেও কৌশলে বিনষ্ট করতে চেয়েছেন। চাটুজ্জেমশাইয়ের মন্তব্যের প্রতি দুক্‌-পাতনা করেও বলা যায়, পেটি-বুর্জোয়া শ্রেণী-স্বার্থের পংকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত ব্যক্তির পক্ষেই এইরকমের এলোপাথাড়ি সিদ্ধান্ত করে নেওয়া সম্ভব। তাঁর সমালোচনা করার ঢং দেখে আর যাই মনে হোক, এটা মনে করার কোনো কারণ নেই যে, তিনি যুক্তফ্রন্টের সুহৃদ। তাঁর চিঠি তাঁকে পেটি-বুর্জোয়া সুবিধা-

বাদী সম্প্রদায়ের (শ্রেণীর) প্রতিনিধি হিসেবেই প্রমাণিত করেছে। 'মার্ক্সবাদী' হওয়া এখনও দূরঅস্ত।

অবশেষে সাংবাদিক কৃত্তিবাস ওঝাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি তাঁর শ্রেণী-সচেতন দৃপ্তভঙ্গি ও বক্তব্য উপস্থাপনের যোগ্য দূরদর্শী, রাজনীতি-সচেতন ও প্রগতিশীল মানসের জন্য। নিজে একজন শিক্ষক হিসেবেই, সীমিত বুদ্ধি নিয়ে হলেও, যতটুকু বুঝতে পেরেছি—বিনা দ্বিধায়, শ্রেণী-স্বার্থের ঊর্ধ্বে থেকে আমার বক্তব্য রাখলাম।

—রাজেন উপাধ্যায়
পোঃ বহরমপুর (মুর্শিদাবাদ)

আপনার বহুল প্রচারিত "সাপ্তাহিক বসুমতী'র ৫২শ সংখ্যার পাঠকমহলে 'সপ্তাহের বোঝা'র একটা প্রতিবাদপত্র পড়লাম. আশ্চর্য হলাম—একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক (যিনি নামের পাশে বিদ্যার ডিগ্রীগুলো পর্যন্ত লিখতে ভোলেন নি) 'সপ্তাহের বোঝা'র লেখক কৃত্তিবাস ওঝা সম্বন্ধে কি করে একটা অবান্তর প্রতিবাদ করে বসলেন! 'সাপ্তাহিক বসুমতী'র ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার পেছনে কৃত্তিবাস ওঝা যে একটা বিরাট ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন—একথা নিশ্চয় অতিবড় শত্রুও বিশ্বাস করবেন। জানি না, মাননীয় প্রধান শিক্ষক মহাশয় সেই লেখকের লেখা 'সপ্তাহের বোঝা' ফিচারের কোথায় মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে হেয় হতে দেখলেন! আর এও জানি না, কৃত্তিবাস ওঝা কোথায় বা যুক্তফ্রন্ট বা মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে হেয় করলেন! মাননীয় প্রধান শিক্ষক মহাশয় বোধহয় 'সপ্তাহের বোঝা' (৫১শ সংখ্যার) ফিচারটা ভালভাবে না পড়েই এই রকম অন্তঃসারশূন্য মন্তব্য করে বসেছেন। "পূর্বেই বলেছি সি পি এম দলের উল্লেখ করে বলছি বলে সি পি এম-ই শুধু এই বক্তব্যের লক্ষ্য নয়, একইভাবে এই বক্তব্য সি পি আই, ফরোয়ার্ড ব্লক, আর এস পি, এস ইউ সি, বাংলা কংগ্রেস—সকলের সম্পর্কেই প্রযোজ্য"—মাননীয় প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের এই কটা লাইন বোধহয় দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। আর একথাও জোর করে বলা যায় যে, কৃত্তিবাস ওঝা দিনের পর দিন একজন উপযুক্ত সাংবাদিক হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করছেন।

—দিলীপ দত্ত
উল্টোডাঙা
কলিকাতা-৪

সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতি প্রসঙ্গে

সাপ্তাহিক বসুমতীর বঙ্গদর্শনে ও আরো দু'-একটি নিয়মিত বিভাগে সরকারী কর্মচারীদের দুর্নীতির বিবরণ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারী কর্মীদের দুর্নীতির কাহিনী প্রকাশ করে যুগপৎ জনসাধারণকে সতর্ক করা ও তাদের বিরুদ্ধে জনমত গঠন করা সৎ সাংবাদিকের কর্তব্য—এ বিষয়ে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না। কিন্তু যেভাবে দিনের পর দিন ক্রমশ প্রকাশ্য উপন্যাসের মতো চিত্তাকর্ষকভাবে এ কাহিনী প্রচারিত হচ্ছে তাতে একথা মনে করবার কারণ ঘটেছে যে, বাংলাদেশে সৎ নিয়মনিষ্ঠ ও কর্তব্যপরায়ণ কর্মচারীর সংখ্যা আজ অতি নগণ্য। প্রকারান্তরে সমগ্র কর্মচারী-সমাজকেই দুর্নীতির অপরাধে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে জনসমক্ষে হেয় প্রতিপন্ন করা হচ্ছে তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের কোন সুযোগ না দিয়েই। একটি সংখ্যায় বঙ্গদর্শন লেখক তো সরকারী কর্মীদের অফিসে হাজির হয়ে ফাইল না ধরে জলপান করা ও সহকর্মীর কুশল জিজ্ঞেস করার মধ্যেও দুর্নীতির গন্ধ পেয়েছেন। অন্য সংখ্যায় জনৈক পত্রলেখক সরকারী কর্মীদের গালভর্তি পানের পুরাতন রসিকতা টেনে এনে প্রচুর আনন্দ উপভোগ করেছেন। যদিও পত্রলেখকের মনে ছাড়া বাংলাদেশের কী শহরে কী গ্রামে গালভর্তি পানের রেওয়াজ আজ অতি বিরল। আজকাল পান খাওয়া অপেক্ষা পান করাটাই অধিকতর জনপ্রিয়। কিন্তু সে কথা যাক। সরকারী কর্মীরাও দেহধারী প্রাণী ও সামাজিক জীব। দেহ ধারণ করার জন্য জলপান করা এবং সামাজিক শিষ্টাচারের বাধ্যবাধকতা তাদেরও মেনে চলতে হয়। বস্তুত কোন সরকারও আশা করেন না যে, তাঁদের কর্মচারীরা দৈহিক প্রয়োজন-শূন্য সামাজিক শিষ্টাচার বোধহীন যন্ত্রে পরিণত হোক।

সরকারী কর্মীদের বিষয় কিছু বলার আগে আমাদের ভেবে দেখা উচিত, এরা কারা? এবং কোথা থেকে এরা আসে। একথা নিশ্চিত যে, ভারত সরকারের কোন লাইসেন্স বলে এদের চীন আমেরিকা বা রাশিয়া থেকে আমদানী করা হয় না। এরা আমাদের দেশেরই সন্তান। আমাদের সমাজেরই মানুষ। আপনার আমার ঘরের ছেলে। যদি আমাদের সমাজ ও সংসার কলুষমুক্ত থেকে থাকে, যদি আমাদের ছেলেদের চাকরি গ্রহণের পূর্বে সাধুতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার সুনাম থেকে থাকে, তবে চাকরি গ্রহণের পরেই এদের নামে দুর্নীতির অভিযোগ আসে কেন? নাকি চাকরি গ্রহণের পর এদের আচরণে আমাদের সমাজেরই রূপ প্রতিফলিত হয় অথবা শাসনযন্ত্রের কোন ত্রুটি এদের দুর্নীতি-পরায়ণ করে তোলে—এ কথা আমাদের সমাজসেবী ও রাষ্ট্রনায়কদের ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে সমাধান খুঁজে বের করতে হবে।

বস্তুত এ কথা কেউ অস্বীকার করবেন না যে, আমাদের সমাজে আজ এমন কোন একটি শ্রেণী নেই যাকে সকলেই এক নিশ্বাসে সৎ নিয়মনিষ্ঠ ও কর্তব্যপরায়ণ বলে সাধুবাদ জানাবে। বিস্তারিতভাবে বলতে চাই না, কেন না তাতে মৌচাকে ঢিল পড়ার সামিল হবে—তবে ব্যবসায়ী, কর্মচারী, শিক্ষক, ডাক্তার, সংবাদসেবী, কৃষক, রাজনীতিবিদ, সমাজসেবী কার না বিরুদ্ধেই দুর্নীতির অভিযোগ সংবাদপত্রের পাতায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে—আজও হচ্ছে এবং আমাদের প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতায় ধরা পড়ছে। যারা জনসাধারণকে দুর্নীতিমুক্ত পরিচ্ছন্ন প্রশাসন উপহার দেবেন বলে সরকার গঠন করেন, দেখা যায় সরষের মধ্যে ভূতের মতো তাঁদের বিরুদ্ধেই দুর্নীতির ট্রাইব্যুনাল গঠন করার প্রয়োজন হয়ে পড়ে। তার প্রমাণ আমরা বিহার, উড়িষ্যা এবং ইদানীং কেরালাতেও পাচ্ছি। অথচ যুধিষ্ঠিরের প্রতি বকরূপী ধর্মের দ্বিতীয় প্রশ্নের মতো—কী আশ্চর্য এরা একে অন্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করে চলেছেন। কারণ নিজেদের কুৎসিত মুখ আয়নায় দেখতে ভাল লাগে না। তার চেয়ে অন্যের মুখের কালো দাগের দিকে অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা অধিকতর সুবিধাজনক এবং বোধহয় নিজের দিকে অপরের দৃষ্টি ফেলতে না দেবার আধুনিক টেক্‌নিক।

আমি কোন শ্রেণীবিশেষের হয়ে ওকালতি করছি না। কেন না সমাজের কেবল এই সরকারী কর্মীশ্রেণীই অধঃপাতে যায় নি—সারা সমাজদেহেই আজ পচন ধরেছে এবং পচন থেকে সমাজকে বাঁচাতে হলে তার সর্বাঙ্গীণ ব্যাপক চিকিৎসা প্রয়োজন। কোন একটি বিশেষ অঙ্গের দিকে অধিকতর মনোযোগী হলে সামগ্রিক নিরাময়ের আশা কম, কারণ পচনশীল অন্য অঙ্গ তাকে সুস্থ থাকতে দেবে না।

সরকারী কর্মীরাও মানুষ। তাদেরও আশা-আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে। সর্বোপরি তারা আমাদের পকেট থেকে পয়সা ছিনিয়ে নেয় না। আমরাই আমাদের কোন অনুচিত কার্য সিদ্ধির জন্য তাদের পকেট ভারী করি। কাজেই এককভাবে তাদের দোষ না দিয়ে আমাদেরও আত্মানুসন্ধানের প্রয়োজন আছে।

—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সিংহরায়
আরামবাগ, হুগলী

রঙ্গজগৎ

তারকার বিড়ম্বনা

'ফিল্ম ফ্যান' বলে পরিচিত সমাজের এক শ্রেণীর মানুষ সম্পর্কে নানা গল্প শোনা যায়। চিত্রতারকা দেখলে ওরা যেন ক্ষেপে ওঠে। বয়সের বা নারী-পুরুষের ভেদাভেদ থাকে না। এ নিয়ে অনেক হাসি-তামাসা হয়ে গেছে, কিন্তু এই তারকা পাগলদের পাগলামী বন্ধ করা যায় নি। পুলিশের লাঠি, টিয়ারগ্যাসের মধ্যেও ক্ষণিকের জন্য চিত্রতারকা দেখার রোগে ওরা দিশাহারা। এদের পাগলামীতে চিত্রতারকাদের বিড়ম্বনাও কম নয়। সম্প্রতি এমন একটা ঘটনা ঘটেছে, যা বিস্ময়ের কেবল নয়, লজ্জারও। অভিনেতা জহর গাঙ্গুলীর মৃত্যুতে এক শোকসভার আয়োজন করা হয়েছিল। আয়োজন খুবই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু সভার পূর্বে এত লোকসমাগম হয়েছিল যে, উদ্যোক্তারা হতভম্ব। তাঁদের বিস্ময়ের আরো সীমা থাকল না, যখন এক চিত্রতারকার উপস্থিতিতে হাততালিতে সভাস্থল চঞ্চল হয়ে উঠল এবং শোকের পরিবর্তে আনন্দের পরিবেশ সৃষ্টি হল। এমন কি চিত্রতারকাকে গান গাইবার কথা বলতেও ওদের বাধলো না। হাততালি আর চিৎকারে শোকসভার গাম্ভীর্য আর থাকল না।

চিত্রতারকা দেখার এই রোগের গভীরে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে তারকার প্রতি ভালবাসা বা শ্রদ্ধা এখানে নেই, আছে এক ধরণের হীনতামূলক চিন্তাপ্রসূত ঔৎসুক্য। জহর গাঙ্গুলীকে দেখবার জন্যও এক সময় অনেকে কাছে গেছেন; কিন্তু মৃত্যুর পর শোকসভায় জহর গাঙ্গুলী অপেক্ষা প্রধান আকর্ষণের বিষয় হয়ে উঠেছিল জীবন্ত তারকা। চিত্রতারকারা তাঁদের আশেপাশে লোকের ভিড় না দেখলে নাকি খুশি হন না। লোকের ভিড় নাকি তাঁদের বাজার দরের প্রমাণ। নানা রকম পত্র-পত্রিকার সাহায্যে একটা ঔৎসুক্য জাগিয়ে রাখা হয় তারকাদের সম্পর্কে—ফিল্ম ব্যবসার এ এক রীতি। কিন্তু ওই পাগলদের মনের পরিচয় পাওয়া গেছে উক্ত শোকসভায়। সেখানে বিষাদকে আনন্দে পরিণত করে সকলকে লজ্জা দিয়েছে।

—সুজন

হীরেন নাগ পরিচালিত 'চেনা অচেনা' ছবিতে সুমিত্রা সান্যাল

চিত্রালোচনা

টু স্যার, উইথ লাভ

মিনার্ভা সিনেমায় সিডনী পয়েটার অভিনীত 'টু স্যার, উইথ লাভ' মুক্তিলাভ করেছে। এই ব্রিটিশ ছবিতে অবাধ্য ও বখাটে ছেলেমেয়েদের একজন দৃঢ়চেতা শিক্ষক কিভাবে পরিবর্তন করলেন সে ঘটনা দেখান হয়েছে। লণ্ডনের ইস্ট য়েণ্ড অঞ্চলে এক সেকেণ্ডারী স্কুলের একটা ক্লাশের ছেলেমেয়েদের সামলানো কোন শিক্ষকের পক্ষে সম্ভব ছিল না। নিগ্রো কার্লো অন্য একটা চাকরিতে যাবার মধ্যবর্তীকালে শিক্ষকের খালি চাকরীটি গ্রহণ করল। পালের গোদা কয়েকটি ছেলের দাপটে ক্লাশটাতে যা কাণ্ড চলছিল তা দেখে স্কুল মনে করল

যায় না। কিন্তু কার্লো ধৈর্য, সাহস, বুদ্ধি, জ্ঞান ও সহানুভূতি দিয়ে তাদের মন জয় করল। এই পরিবর্তন ঘটাবার পথে কার্লোকে কালো বলে ঘৃণা এবং নানাভাবে অপমান বরণ করতে হয়েছে, এমন কি ব্যায়ামের ক্লাশে মুষ্টিযুদ্ধে নিজের শক্তির পরিচয়ও দিতে হয়েছে। আজকালকার ছেলেমেয়েদের মনে অনেক প্রশ্ন। যৌন সমস্যা থেকে বিবাহ, ফ্যাসানের সঙ্গে ঐতিহ্য ও শালীনতার সম্পর্ক ইত্যাদি অনেক প্রশ্নের জবাব দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে চিন্তার ইচ্ছা জাগাতে হয়েছে ; এবং তাদের চিন্তার ক্ষমতা থেকে কার্লো পেয়েছে শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। ছবিটির মনোরঞ্জনী ক্ষমতা যেমন রয়েছে, সেই সঙ্গে রয়েছে নাটকীয়তা। কাজেই ছবিটি গানে, নাচে, কাহিনীর আকর্ষণীয়তায় উপভোগ্য। ছবিটি শিক্ষক ও অভিভাবকদের এবং ছাত্র-ছাত্রীদের ভাল লাগবে। সিডনী পয়েটারের চমৎকার অভিনয়ে ছবিটি দর্শক-মনে সাড়া জাগায়।

দি গুরু

ইসমাইল মার্চেণ্ট ও জেমস আইভরির বহু বিজ্ঞাপিত ছবি 'দি গুরু' মুক্তিলাভ করেছে। এই রঙিন ছবিটির ফটোগ্রাফি, সঙ্গীত ও অভিনয় সার্থকতা উল্লেখযোগ্য। কিন্তু কাহিনী বা নাটকীয় দ্বন্দ্বে ছবিটি সার্থকতার দাবি করতে পারে না।

ছবির মূলচরিত্র 'গুরু' একজন সঙ্গীত শিক্ষক। তাঁর কাছে এক বিদেশী পপ সিঙ্গার এসেছে সেতার শিখতে। গুরুর নির্দেশ ভারতীয় সঙ্গীত শিখতে হলে গুরুর কাছে আত্মসমর্পণ করা কর্তব্য। কিন্তু বিদেশী শিক্ষার্থীর চোখে সেতার শেখাবার গুণ ছাড়া গুরুর আর এমন কিছু নেই, যাকে শ্রদ্ধা করা যায়। গুরু মসজিদে নামাজ পড়েন, শুক্রবারে পান করেন, কিন্তু দুই শহরে দুই স্ত্রীর সঙ্গে ঘর করেন। তৃতীয় স্ত্রী গ্রহণেও খুব অনিচ্ছুক নন, একবার জানিয়ে দিলেন, তিনি চারটি পর্যন্ত বিয়ে করতে পারেন, তবে দুটো মাত্র করেছেন। গুরু অনুদার, স্বার্থপর এবং ভোগবিলাস ছাড়া তাঁর জীবনের অন্য কোন চিন্তা নেই। অথচ আসল সঙ্গীতগুরু অর্থাৎ গুরুর গুরু—তিনি কিন্তু দারিদ্র্যের মধ্যেই রয়েছেন। কিছুটা গল্প গড়ে উঠল—যখন রাত্রিবেলা এক বিদেশী শিক্ষার্থিনী উপস্থিত হল। গুরুর কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে প্রস্তুত। তারপরে একসময় বিদেশী শিক্ষার্থীদের মোহভঙ্গ হল, তারা হাত ধরাধরি করে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হয়ে দেশের দিকে পাড়ি দিল।

ছবিটি শ্লেষাত্মক। ভারতীয় সঙ্গীতের প্রতি বিদেশীদের আকর্ষণ রয়েছে, অথচ এদেশের কিশোর ও তরুণদের মধ্যে রয়েছে পপসঙ্গীতের প্রতি আগ্রহ। তাই তুলনামূলকভাবে দেখিয়েছেন ফ্যাসান প্যারেডে ছেলেবুড়ো সকলে ভিড় করে ; পপসঙ্গীত শিল্পীর গাড়ির পেছনে পেছনে যুবকরা ছুটে চলে। পরিচালক কোন চরিত্রের গভীরে পৌঁছতে না পেরে শ্লেষটাকে রসোত্তীর্ণ করে তুলতে পারেন নি ; ভারতীয় সঙ্গীতজ্ঞদের রক্ষণশীলতা ও সংকীর্ণতাকে তুলে ধরে বিদেশীদের মোহ ভাঙবার চেষ্টা করেছেন মাত্র।

অভিনয়ে মাধুর জাফরী, অপর্ণা সেন, উৎপল দত্ত প্রমুখ ভারতের এবং রিটা তুশিংহাম প্রমুখ বিদেশী শিল্পীরা অভিনয় করেছেন।

ম্যুলক টা সিনে ইনস্টিটিউট আয়োজিত ফরাসী চলচ্চিত্র উৎসবের একটি ছবি 'তেরেসে দেস কুয়েরক্স' ছবির একটি দৃশ্য। ছবির পরিচালক জি· ফ্রানজু।

নাটকের কথা

কাঞ্চনরঙ্গ

স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া স্টাফ এ্যাসোঃ, বালিগঞ্জ শাখার অষ্টম বার্ষিক মিলনোৎসব উপলক্ষে ১৬ই জুন সন্ধ্যায় স্টার রঙ্গমঞ্চে শ্রীশম্ভু মিত্র ও অমিত্র মৈত্র বিরচিত 'কাঞ্চনরঙ্গ' নাটকটি সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়ে দর্শকমণ্ডলীর বিশেষ প্রশংসা লাভ করে।

বিভিন্ন চরিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয়

করেছেনঃ দিলীপ ভট্টাচার্য (পাঁচু), মমতা চট্টোপাধ্যায় (তরলা), তপন চট্টোপাধ্যায় (সমর) ও নিরঞ্জন মুখার্জী (বরকর্তা)। নাটক নির্দেশনায় ছিলেন শ্রীশম্ভু বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্যবস্থাপনায় ছিলেন শ্রীঅমিত বক্সী।

লবণাক্ত

বৈঠকখানা রোড অঞ্চলের 'নবারুণ' সংস্থা গত ১৫ই জুন 'লবণাক্ত' নাটক মঞ্চস্থ করেছে নেতাজী সুভাষ ইনস্টিটিউটে। অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেছেন: মার্শব ঘোষ, কল্যাণ সেন, দেবকুমার পাইন, অণিমা চক্রবর্তী, সন্ধ্যা চক্রবর্তী প্রমুখ। নাটকের প্রারম্ভে কবি শ্রীদুর্গাদাস সরকার বর্তমান নাটকের ধারা সম্পর্কে আলোচনা করেন।

নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি

নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি ও নয়াদিল্লীস্থিত পশ্চিম জার্মানীর সহযোগিতায় আগামী ৭ই ও ৮ই জুলাই প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে যথাক্রমে 'বিশে জুলাই' (টোয়েন্টিয়েথ জুলাই) এবং 'দি ব্রীজ' ছবি দুটি প্রদর্শনের আয়োজন করেছে।

ব্যালে নৃত্যশিল্পী ইয়েলেনা রায়াবিনকিনা দশ বছর নৃত্য শিক্ষার পর স্নাতক হয়ে প্রথম মঞ্চাবতরণ করেন 'ওদেত্তে এ্যাণ্ড ওদিল' নৃত্যনাট্যে। বর্তমানে তিনি সোভিয়েতের খ্যাত শিল্পী।

"পুশকিনের সংগে একা"

কবি পুশকিনের ১৭০তম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষে সদ্য তৈরি রঙিন সোভিয়েত চলচ্চিত্রের নাম হল—"পুশকিনের সংগে একা।"

মস্কোয় আলেকজান্দার পুশকিন মিউজিয়ামে এই চলচ্চিত্রটি প্রথম প্রদর্শিত হয়। পুশকিন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ বহু খ্যাতনামা ব্যক্তি এবং পুশকিনের কবিতার গুণগ্রাহীর দল এই চলচ্চিত্রের প্রথম রাত্রির প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন।

১৮২৪—১৮২৬ সালে স্বাধীনতার ওপর কবিতা রচনার জন্য যে সমস্ত স্থানে পুশকিনকে নির্বাসিত জীবনযাপন করতে হয়েছিল এই ফিল্মে সেই সমস্ত জায়গা দেখান হয়েছে।

প্রাচীন রুশ শহর পেসকোভ থেকে কিছুদূরে মিখাইলোভস্কোয়ে গ্রাম, যেখানে বসে কবি তার বিখ্যাত উপন্যাস "ইউজিন ওনেগিনের" কয়েকটি অধ্যায়, ঐতিহাসিক ট্রাজেডি "বরিস গোদুনোভ" এবং অসংখ্য কবিতা লেখেন সেই গ্রামটিও ছবিতে দেখান হয়েছে।

যে সমস্ত বিদেশী পর্যটক সোভিয়েত ইউনিয়নে আসবেন তাঁরা যাতে কাব্যময় রাশিয়া, মিখাইলোভস্কোয়ে গ্রামে কবির আবাস, ত্রিগোর্সকোয়ে এস্টেট—যেখানে কবি অনেক সময়ে বন্ধুদের সংগে মিলিত হতেন এবং এছাড়া প্রাচীন রুশীয় স্মৃতিস্তম্ভ, স্থাপত্য ও লোক-শিল্পের সংগে পরিচয় লাভ করতে পারেন তার দিকে লক্ষ্য রেখে এই চলচ্চিত্রের অনেক দৃশ্য রচিত হয়েছে। প্রাচীন স্ভিয়াতোগোর্সক মঠে যেখানে ১৮৩৭ সালে জারের রাজসভার প্ররোচনায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে পুশকিন মৃত্যুবরণ করেন এ ছবিতে সে জায়গাটি দেখান হয়েছে।

ছবিটি শীঘ্রই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে মুক্তিলাভ করবে।

বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসব

২৫শে জুন থেকে বার্লিন চলচ্চিত্র উৎসব শুরু হয়েছে। চলবে ৬ই জুন পর্যন্ত। নানা দেশের লোক এসে সমবেত হয়েছেন। হোটেলে আর জায়গা নেই বললেই চলে। চিত্রতারকা, পরিচালক, প্রযোজক, চিত্র-পরিবেশক থেকে ফিল্ম ফ্যান পর্যন্ত নানা ধরণের লোক। পথেঘাটে ফিল্ম ভি. আই. পি'র সাক্ষাৎ

মিলছে। এবারের উৎসবে কয়েকটি ছবি সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। এই ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে ঃ

পশ্চিম জার্মানীর ঃ 'আই এ্যাম এ্যান এলিফ্যান্ট ম্যাডাম'। ছবিটি করেছেন তরুণ পরিচালক পেটার জাদেক। এই ছবিতে যৌন প্ররোচনাকে এক সামাজিক সমস্যা হিসাবে তুলে ধরা হয়েছে। এক ছাত্রী কলেজের সহকর্মীদের, এমন কি অধ্যাপকদের পর্যন্ত প্ররোচিত করতো পোষাক পরায় ধরন ও অঙ্গভঙ্গিতে। কিন্তু কেন?

জাঁ লুক গদার্দের ফরাসী ছবি 'লে গাই সাবিওর এ বর্তমান সমাজের কয়েকটি সমস্যার কথা বলা হয়েছে।

স্পেনের ছবি 'লা মাদ্রিগুয়েরা' পারিবারিক সমস্যাকে কেন্দ্র করে তৈরি হয়েছে। পরিচালক কার্লোস সাওরা ১৯৬৬ সালে পুরস্কার পেয়েছিলেন। সত্যজিৎ রায় উপস্থিত হয়েছেন 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' নিয়ে।

'উদীচী'-র পরিবেশনায় 'আষাঢ় সন্ধ্যা'

গত ২২শে জুন রবিবার সন্ধ্যা ৭টায় ৬৪, মসজিদ বাড়ি স্ট্রীটে উদীচী শিল্পিগোষ্ঠী বিশেষ কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীত সহযোগে 'আষাঢ় সন্ধ্যা' গীতিবিচিত্রাটি পরিবেশন করলেন। সংগীতাংশে ছিলেন সুশীল মল্লিক, তপন সিংহ, পার্থসারথি জমাদার, তপন ভট্টাচার্য, সুনন্দা রায়, স্মৃতি সেন, অরুণা চৌধুরী ও প্রভাতী বন্দ্যোপাধ্যায়। আবৃত্তি করেন অতীন চট্টোপাধ্যায় এবং অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শৈলেশ ভড়।

সুরধুনীর সমাবর্তন

গত ১৭ই জুন মহাজাতি সদনে সুরধুনী সঙ্গীত শিক্ষায়তনে তৃতীয় বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব সম্পন্ন হয়েছে। সংগীত ও নৃত্য বিভাগের কৃতী ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞানপত্র দেওয়া হয়। শেষে চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্য মঞ্চস্থ করা হয়।

নজরুল জয়ন্তী

গত ১৫ই জুন খিদিরপুর কালচারাল সেমিনারের উদ্যোগে নজরুল জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীসীতেশ দাশগুপ্ত নজরুল সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা করেন। সভাপতিত্ব করেন শ্রীসুনীলকান্তি মুখোপাধ্যায়। আবৃত্তি, গান ও 'কালোমাটির কান্না' নাটক অভিনয়ে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

ইতিহাসের পাতা থেকে

সোভিয়েত পুনর্দর্শন

॥ সতের ॥

সেকালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সবাক ছবি আলেকজান্দার ডভজেঙ্কোর 'আইভান' এবং সেগেই ইয়ুৎকেভিচ ও ফ্রেডরিক এর্মলারের 'কাউণ্টার প্ল্যান'। এ'রা দুজনাই ছিল দশকের শেষ ও ত্রিশ দশকের দেশে যে ঐতিহাসিক পরিবর্তন ঘটেছে সে দিকে আগ্রহী ছিলেন। এ সময়টা ছিল অভিকায়ায়নের দ্রুত সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের এবং দেশকে পিছিয়ে পড়া পশ্চাদ্‌গামিতা থেকে উদ্ধার করার যুগ। শত শত কারখানা, বিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরি হচ্ছিল এবং খনিমুখ খোলা হচ্ছিল। শ্রমিকদের পাশে এসে দাঁড়াল আরো সহস্র সহস্র মানুষ নতুন কারখানার ও পুরাতন কারখানাগুলিকে নতুন করে গঠন করার কাজে। এই নতুন শ্রমিকরা কাজ আরম্ভ করার ব্যাপারে অসাধারণ দক্ষতার পরিচয় দিল, কাজ করার ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাল, তারা অনুভব করল যে, তারাই কারখানার আসল মালিক ও পরিচালক। তারাই দেশ পরিচালনা করছে। শ্রমিক ও জনসাধারণের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চেতনার এইরূপ ব্যাপক বিকাশ তখনকার দিনের উপন্যাস, নাটক ও চলচ্চিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। চলচ্চিত্রের দিক থেকে এই পরিস্থিতি ও বক্তব্যের সবচেয়ে সার্থক প্রতিফলন হয়েছে 'আইভান' ও 'কাউণ্টার প্ল্যান' ছবিতে, যদিও ছবি দুটি সম্পূর্ণভাবে বিপরীত কাহিনীর। 'আইভান'-এর বিষয়বস্তু নীপার নদীতে বিরাট হাইড্রো ইলেকট্রিক স্টেশন ও বাঁধ নির্মাণের গাথা। সেকালের অন্যতম বিরাট গঠনমূলক কাজের প্রামাণিক মূল্য সম্পন্ন এই ছবি সব দিক থেকেই মহান চিত্রের পর্যায়ভুক্ত। ছবির প্রত্যেকটি চরিত্র নির্মাণক্ষেত্রের কর্মরত দলের প্রয়োজনীয় অংশ। প্রত্যেককে দেখান হয়েছে কাজের মধ্য দিয়ে। অপর দিকে 'কাউণ্টার প্ল্যান' ছবিতে দেখান হয়েছে শ্রমিকদের চেতনা বৃদ্ধির ফলে তাদের চারিত্রিক বিকাশ এবং তার জন্য কাজের উন্নতি কিভাবে ঘটেছে। এই ছবির সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ রাশিয়ার বিখ্যাত অভিনেতা ভ্লাডিমির গার্ডিনের অভিনয়।

আজকের দিনে কেউ যদি এই ছবি দুটি দেখেন তবে 'কাউণ্টার প্ল্যান'-কে তাঁর মনে হবে পুরাতন রীতির; বিশেষ শিল্প-শোভনতার দিক থেকে। 'আইভান' আজও আকর্ষণীয় তার গভীরতা ঘটনার সঠিক বর্ণনা ও দৃষ্টিভঙ্গি সূক্ষ্মতার জন্য। ছবিটির শিল্প শোভনতা চমৎকার। কিন্তু সে সময় লোকে প্রথম ছবিটি বেশি পছন্দ করেছে। পরিস্থিতি ও পরিবেশ তার কারণ। সে সময় 'কাউণ্টার প্ল্যান' এমন এক বিষয়ে বক্তব্য উপস্থিত করেছে যা সে যুগসন্ধিক্ষণে প্রত্যেকের মনে ছিল এবং নতুন সবাকচিত্র সেই মানসিকতাকে প্রকাশ করতে পেরেছিল।

১৯৩৩-৩৪ সালে তিনটি উপন্যাসের চমৎকার চিত্ররূপ নির্মিত হয়। এই তিনটি সল্টিকভ-শ্চেড্রিনের উপন্যাস অবলম্বনে 'গলভলেভ'; গ্রিগোরী রোশাল ও ভেরা স্ট্রয়েভার 'নেতোচ্‌কা নেজভানোভা' এবং 'হোয়াইট নাইট'; ছবি দুটি ডস্টয়েভস্কির গল্প অবলম্বনে তৈরি হয়েছে। ভ্লাডিমির পেট্রভের 'স্টর্ম' ছবিটি তৈরি হয়েছে অস্ট্রোভস্কির নাটক অবলম্বনে। মূল বই-এর ক্ল্যাসিক্যাল সাহিত্য ভিত্তি এবং অনন্যসাধারণ অভিনয় গুণে এই ছবিগুলি দেশে এবং বিদেশে জনপ্রিয় হয়েছিল। চলচ্চিত্রে পূর্বসূরীদের অভিজ্ঞতা এবং পুরাতন শিল্পরীতিকে কাজে লাগাবার ব্যাপারে এ সময়ের একটা বিশেষ ভূমিকা আছে। সিনেমার ক্ষেত্রে পুরাতন শিল্পরীতিকে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় এ সময়ের ছবিতে তাঁরা তা দেখিয়েছেন।

প্রথম যুগের সবাকচিত্রের সাফল্যের প্রসংগে বোরিস বার্নেটের 'আউট স্কার্ট' (১৯৩৩) ছবির উল্লেখ করতেই হবে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে এক শ্রমিক অঞ্চলের পরিবেশ ও চরিত্রগুলিকে তিনি চমৎকারভাবে উপস্থিত করেছেন। এই ছবিটি সে সময়ে যোগ্যভাবে সমাদৃত হয় নি—কিন্তু পরবর্তীকালে অনেক ছবির প্রেরণা হয়েছে এবং চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকে ইতালীর অনেক বাস্তবধর্মী ছবি এই ছবির শিল্প-শোভনতার অনুকরণ করেছে।

প্রথম যুগের সবাকচিত্র বাস্তবধর্মী ছবির ঐতিহ্যকে সমৃদ্ধ করেছে এবং সাহিত্য ও নাটকের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছে। এই যুগের ছবি সোভিয়েত ছবির বিরাট অগ্রগতির পথ করে দিয়েছে, যার জন্য 'চাপায়েভ'-এর মত ছবি সম্ভব হয়েছে। সে কথা আমরা পরে বলব।

—ক· স· গু·

খবর বলছি

"বেতার জগং" (১৬—৩০ জুন ১৯৬৯) পত্রিকাটিতে একটি চিঠিপত্র বিভাগ খোলা হয়েছে। এর আগে বেতার জগতে চিঠিপত্র প্রকাশের বালাই ছিল না। ঐ পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় জনৈক পত্র-লেখকের বকলমে চিঠিপত্র বিভাগটিতে খ্যাতিমান লেখদের অশ্রদ্ধেয় ভাষায় গালাগালি দেবার জন্য যে রকম দায়িত্ব-জ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়।

আকাশবাণীতে (কলকাতা) কী প্রচারিত হোল বা হোল না তার সঠিক সন্ধান না নিয়ে—'বেতার জগং' পত্রিকার দায়িত্বশীল পদে অধিষ্ঠিত একজন সম্পাদক কি করে জনৈক অজ্ঞাতকুলশীল ব্যক্তির নামাঙ্কিত পত্রের যা ইচ্ছে তাই ছাপতে পারেন, তা আমাদের চিন্তার অতীত।

প্রথমত, আকাশবাণীতে (কলকাতা) আলোচনার যে টেপরেকর্ড সযত্নে রক্ষা করা হয় তার যাথার্থ্য যাচাই করে কি বেতার জগং সম্পাদক মহাশয় তিন স্তম্ভের চেয়ে বেশি পরিমাপের চিঠিটি ছেপেছেন?

আমরা বেতার জগতে পত্রলেখকের কাছ থেকেই 'বেতার জগং' মারফত এই প্রথম জানলাম যে, গত ২১শে মে সাহিত্য বাসরের অধিবেশনে—'মহৎ সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্যে সারবস্তুর সন্ধান'—এই ছিল আলোচনার বিষয়বস্তু।"

আসল শ্রোতারা জানেন, আলোচনার বিষয়বস্তু মহৎ সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা সাহিত্যে সারবস্তুর সন্ধান—ছিল না।

সেদিন আলোচ্য বিষয়বস্তু ছিল :
॥ 'বাংলা সাহিত্য কি অসার হয়ে যাচ্ছে ॥

যে পত্রলেখক অজ্ঞাতে প্রথমেই বিভ্রান্তি ঘটিয়েছেন, তাঁর বক্তব্যকেই যথার্থ ধরে নিয়ে, টেপরেকর্ড-ধৃত আলোচনায় কি ছিল তা মিলিয়ে দেখলেন না—এ হেন সম্পাদককে সম্পাদনার অভূতপূর্ব কাজের জন্য প্রশংসা করতে হয় বৈ কি! কারণ সাহিত্যিকদের মিথ্যা গালাগালি দেওয়ানোর জন্য এভাবে সরকারী অর্থ অপব্যয় অন্য কেউ করতে দেয় না বলে আমাদের জানা নেই। মিথ্যা গালাগালি দেওয়ানোর জন্য প্রায় এক পৃষ্ঠা যিনি বরাদ্দ করলেন, তিনি টেপ রেকর্ড এনে 'টকে' কি আছে একবার পরীক্ষা করে দেখলেন না। দেখলেন না—তাতে আলোচনার বিষয়বস্তু কি ছিল এবং আমন্ত্রিত সাহিত্যিকরাই বা সাহিত্য-বাসরে কি আলোচনা করেছিলেন?

দ্বিতীয়ত, পত্রলেখক তাঁর চিঠিতে একটি উদ্ধৃতি দিয়েছেন এবং তা নাকি শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের! উদ্ধৃতিটি এই—

"এই আবর্জনা ও ছাই ঘেঁটে আমি তিনখানা সারবান মহৎ সাহিত্যের সন্ধান পেয়েছি।"

আমরা প্রশ্ন করি, তিনি যা বলেছেন এই কি তার হুবহু উদ্ধৃতি? প্রেমেন্দ্র মিত্র তিনখানা, দুখানা বা চার-খানা—যাই বলুন কেন, তাতে আমাদের কিছু বলার নেই, আলো-চনার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নিঃসন্দেহে তাঁর মতামত উদ্ধৃত করতে পারেন। কিন্তু আবর্জনা বা ছাই এ সব আসে কোথা থেকে? আমাদের শ্রুতিকেও কি আমরা অবিশ্বাস করবো। অথবা, পত্রলেখক সাহিত্যবাসরের আলোচনায় অংশ গ্রহণ-কারীদের হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য অসত্য যা লিখবেন, তাই বেতার জগং-সম্পাদক ছেপে বাহাদুরি নেবেন? এ ব্যাপারে আকাশবাণীর ডিরেক্টর জেনারেলকে ভেবে দেখতে ও যথাকর্তব্য করতে অনুরোধ করি। আকাশবাণীর ডিরেক্টর জেনারেলের নিয়ন্ত্রণেই আকাশবাণীর (কলকাতা) কার্যক্রম পরিচালিত ও বেতার জগং পত্রিকাটি প্রকাশিত হয় বলেই আমাদের ধারণা। অথচ আকাশবাণীর (কলকাতা) বিরুদ্ধে অসত্য প্রচারের সাহায্যার্থে লেগেছেন বেতার জগং পত্রিকা সম্পাদক একথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। ডিরেক্টর জেনারেল মহোদয়ের কাছে অনু-রোধ, বেতার জগং-সম্পাদক মহাশয় টেপ-রেকর্ড-ধৃত আলোচনায় কি আছে-না-আছে, তা পরখ না করে গালাগালি দেওয়ানোর উদ্দেশ্যে এই প্রথম চিঠি ছেপে যে অহিত কাজ করেছেন, তার সত্যাসত্য যাচাই করার জন্য তিনি স্বয়ং টেপরেকর্ড-ধৃত আলোচনাটি শুনুন অথবা বিশেষজ্ঞ কমিটিকে দিয়ে শুনিয়ে তাঁদের রায় গ্রহণ করে অবিলম্বে যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করুন।

তৃতীয়ত, বেতার জগং পত্রিকাটিকে গালাগালি দেবার হাতিয়ার করে তোলা হোল কেন এটাও আমাদের প্রশ্ন? কারণ সরকারী ব্যয়ে যে পত্রিকা প্রকাশিত হয় তার সমান অংশীদার হচ্ছেন জনসাধারণ। সেইজন্য সরকারী মুখপত্রে এমন বিষয় প্রকাশিত হবে—যা সবাইকে আনন্দ দান করতে না পারুক, অন্তত একজনকেও গালাগালি দিতে পারবে না। বেতার জগতের সম্পাদক মহাশয়, তা তো অগ্রাহ্য করেছেনই, উপরন্তু 'এখনই' উপন্যাসের সম্পূর্ণ বক্তব্যকে পরিহার করে সেই গ্রন্থের ভগ্নাংশ-বিশেষ কয়েকটা পঙক্তিকে হাজির করেছেন যে পত্রলেখক সে সব তিনি মুখরোচক অশ্লীল ভেবেই বেতার জগতের পাতায় এঁটে দিয়েছেন।

রমাপদ চৌধুরীর 'এখনই' উপন্যাসটির নাম করেছেন শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। ঐ উপন্যাসটি আলোচনার যোগ্য কি অযোগ্য, সে সম্বন্ধে কোনো কথা না বলেও একথা অবশ্যই বলা যায় যে—পত্র-লেখক যে সব উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তাতেই প্রমাণ হয় না সম্পূর্ণ বইটি পাঠের অযোগ্য এবং এও প্রমাণ হয় না এটি একটি আলো-চনার যোগ্য বই। পত্রলেখক নিজেই জানেন না যোগ্যতা বা অযোগ্যতা বিচারের যথার্থ ও ন্যায্য মাপকাঠি কি। তবে আমরা কিন্তু একটা ব্যাপার এই পত্র লেখার মধ্যে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, পত্র-লেখক একটি উপন্যাস থেকে বেছে বেছে কতকগুলি আপাতদৃষ্টিতে অশ্লীল উদ্ধৃতি 'বেতার জগতে'র পৃষ্ঠায় ছুঁড়ে দিয়েছেন এবং বেতার জগংও তাঁর কুরুচির শিকার হয়েছেন। কী করে এই ধরণের বাছাইকরা পঙক্তিগুলি বেতার জগতে ছাপা হলো তার কৈফিয়ৎ এই পত্রিকার যে কোন পাঠক নিশ্চয় দাবি করতে পারে। 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' একজন পত্র লেখকের কুৎসা ও গালাগালিকে কী কারণে বেতার জগং' প্রশ্রয় দিলেন সে সম্পর্কেও নানা প্রশ্ন থেকে যায়। এই পত্রটি প্রকাশের জন্য যাঁরা দায়ী, তাঁদের বিরুদ্ধে দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আকাশবাণীর ডিরেক্টর জেনারেলের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

—অভ্রবাহন

বাড়াবাড়ি

কলকাতার ফুটবলকে কেন্দ্র করে এখন চলেছে এক অদ্ভুত অস্বস্তিকর পরিবেশ। গত দু' বছর ময়দানী ফুটবলের ইতিহাসে সৃষ্টি হয়েছে এক অদ্ভুত নজির—ফুটবলের আসরে আইন-আদালত থেকে আরম্ভ করে বাকী ছিল না কোন কিছুই আর নেমে আসতে। ফলে দেখতে দেখতে ফুটবল খেলা উঠলো শিকেয়। এবারও ফুটবল-রসিক এবং ক্লাব সমর্থকদের মনে ছিলো সেই আশংকা—শেষ পর্যন্ত কলকাতার ফুটবল মরশুম ভালোয়-ভালোয় শেষ হবে তো? অবশ্য এ চিন্তা তাঁদের মনে আসা খুবই স্বাভাবিক। বিশেষ করে ক্লাব-মেম্বারদের—সব থেকে বেশি মুশকিল হয়েছে তো তাঁদেরই। খেলা হোক চাই নাই হোক ক্লাবের মেম্বারশীপ কার্ড তাঁদের রিনিউ করতেই হবে। তা নাহলে আর তাঁরা পারবেন না ক্লাবের মেম্বার থাকতে। এ যুগে মোহনবাগান কিম্বা ইস্টবেঙ্গলের মতো ক্লাবগুলোর নতুন করে মেম্বার হওয়া যে সাংঘাতিক ব্যাপার তা বোধহয় ক্রীড়ার সিকমাত্রেই জানেন। তাই ময়দানী ফুটবলের ভাগ্যে যাই ঘটুক না কেন, কিম্বা ফুটবল খেলা হোক বা না হোক, ক্লাব সমর্থকরা ঠিকই জানেন যে, কার্ড রিনিউ করার মতো টাকা সংগ্রহ করে আগে ক্লাবের চাঁদাটা তাঁদের দিতেই হবে। কিন্তু বছরের পর বছর যদি এইভাবে খেলা না হয় কিম্বা খেলা অর্ধেক হয়ে বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে সাধারণ ক্রীড়ারসিকদের অবস্থা কি হয় একবার ভেবে দেখুন। ফালতু গোটা বাটেক টাকা নষ্ট করার ক্ষমতা এ যুগে আর কতো জনেরই বা আছে? অথচ এই অতি সাধারণ বিষয়টা কিছুতেই ক্লাব কর্তৃপক্ষের মাথায় ঢোকে না।

এবারও ময়দানী ফুটবলের আসরে শুরু হয়েছে মৃদু গোলমাল। গোলমালের উৎস ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। বেশি পিছিয়ে যাবার দরকার নেই, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলার বিষয়টা নিয়েই আলোচনা করা যাক। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলাটা হলো বছরের সব থেকে বেশি আকর্ষণীয় খেলা। সারা বছর ক্রীড়ারসিকরা হাঁ করে বসে থাকেন ঐ খেলাটার জন্যে। আর সাধারণত চ্যারিটি হিসেবেই অনুষ্ঠিত হয় ঐ খেলাটা। এতে সুবিধে হয় সকলেরই। ক্লাব, আই· এফ· এ থেকে আরম্ভ করে সাধারণ ফুটবল-রসিকদেরও—কারণ অনেকেই ঐ খেলাটা দেখার জন্যে আগেভাগে চেনা-জানাদের বলে রেখে একখানা টিকিট সংগ্রহ করেন। যাক ও কথা—এবার অনেক আগে থেকেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাব গোঁ ধরলেন যে, তাঁরা চ্যারিটি খেলবেন না। কারণ ফিরতি লীগ না থাকায় খেলার সংখ্যা কমে গেছে। অতো টাকা দিয়ে মেম্বার হয়ে আবার কেন পকেটের পয়সা দিয়ে মেম্বাররা খেলা দেখবেন? কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাস্য, মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের খেলার ব্যাপারেও কি এই গোঁ বজায় রাখা উচিত? বিশেষ করে খেলার ব্যবস্থা যখন ছিল ইস্টবেঙ্গল মাঠে। সাধারণ ম্যাচ হলে ঐ মাঠে খেলা দেখার সুযোগ পাবেন ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের মেম্বাররা ছাড়াও এরিয়ান্স ও স্পোর্টিং ইউনিয়নের মেম্বাররাও। ফলে সাধারণ ক্রীড়ারসিকরা মাঠে প্রবেশাধিকার ধরতে গেলে পাবেনই না। ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলা দেখার শখ সকলেরই। যাঁরা লাইন দিয়ে খেলা দেখেন অর্থাৎ যাঁরা ক্লাব সদস্য নন, তাঁদের এইভাবে বঞ্চিত করা কি ঠিক? থাক ও কথা, অবস্থা এখন এমনই সংগীন যে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের খেলাটা আর হবে না। কারণ হিসেবে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব জানিয়েছেন যে, খেলা স্থগিতের জন্যে তাঁরা যে চিঠিটি পেয়েছেন সেটি হলো মোহনবাগান ক্লাবকে লেখা আই· এফ·এ-র কার্বনকপি—এ ছাড়াও অবশ্য আই· এফ· এ-র জনৈক যুগ্ম সম্পাদক ব্যক্তিগতভাবে জে· সি· গুহকে একটা চিঠি দিয়েছিলেন। কিন্তু ঐ সব চিঠিকে পাত্তা না দিয়ে তাঁরা সেদিন মাঠে দল নামিয়েছিলেন এবং পরে বলেছেন যে, মোহনবাগানের সংগে খেলার আর কোন প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু আমরা অর্থাৎ সাধারণ ক্রীড়ারসিকরা আমাদের পরম আকাঙ্ক্ষিত মোহনবাগান বনাম ইস্টবেঙ্গল দলের খেলাটা বানচাল হয়ে যাবার জন্যে কাকে দায়ী করবো? —শান্তিপ্রিয়

ফুটবল ফুটবল

ময়দানী ফুটবলের আসর অনেক-দূর এগিয়ে গেলেও. মাঠের পরিবেশ কিছুতেই যেন আর সেই পুরনো রূপ ফিরে পাচ্ছে না। সহজে বোধহয় আর পাবেও না। কারণ ময়দানে শুধু মাত্র আর আইন-আদালতই অনুপ্রবেশ করে নি। সেই সংগে তাল দিয়ে মাঠে এসে হাজির হয়েছে পলিটিক্সও। মাঠের হাল এখন শোচনীয়।

আই· এফ· এ'র দুর্বল পরিচালনা এবং কয়েকটি ক্লাবের অসহযোগিতাই ময়দানী ফুটবলকে আজ বিপর্যয়ের পথে ঠেলে দিচ্ছে। অথচ এতে যে কারো কোন লাভ হচ্ছে তাও নয়, বরঞ্চ বাংলার বাই-রের ফুটবল-রসিকদের চোখে আমরা দিন দিন ছোট হয়ে যাচ্ছি। বাংলাদেশের বাইরে বেশ কয়েকটি স্থানে আমি নিজের কানে শুনেছি কলকাতা তথা বাংলাদেশের ফুটবলের বদনাম।

অথচ আজো ভারতীয় ফুটবল বলতে বাংলাকেই বোঝায়। ক্রিকেটে যেমন বম্বে তেমনি ফুটবলে বাংলা আজো অপ্রতিদ্বন্দ্বী—আজো শ্রেষ্ঠ। কিন্তু বাংলাদেশের ফুটবল খেলার সাম্প্রতিক হাল-চাল দেখে মনে আজ সংশয়ের কালো মেঘ জমে উঠেছে—আমাদের এই শ্রেষ্ঠত্ব আর কতোদিন থাকবে কে জানে!

কারণ ফুটবল খেলাকে নিয়ে ঘোঁট পাকাতে আজ সকলেই ব্যস্ত। শুধু তাই নয়—ময়দানী ফুটবলের সেই

২রা জুলাই—
ইস্টবেঙ্গল : পোর্ট কমিঃ
৩রা জুলাই—
মোহনবাগান : বাটা
৪ঠা জুলাই—
ইস্টবেঙ্গল : খিদিরপুর
মহামেডান : জর্জ টেলিগ্রাফ
৫ই জুলাই—
মোহনবাগান : রাজস্থান

ঐতিহ্যও আজ আর নেই। আজ শুধু অস্বস্তি, অশান্তি আর অভাবনীয় পরি-স্থিতিই বিরাজ করছে কলকাতা ময়দানে। খেলা ছেড়ে দিয়ে ফুটবল খেলা নিয়ে পলিটিক্সই হচ্ছে বেশি।

মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল আর মহা-মেডান স্পোর্টিং—এই তিন প্রধানের কেউই এ বছর বিশেষ সুবিধে করতে পারে নি—ভালো খেলতে পারে নি কোন দলই। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের কথা না হয় ছেড়েই দিলাম—কিন্তু মহা-মেডান স্পোর্টিং-এর এবারকার অবস্থার কথা চিন্তা করলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়।

মহামেডান স্পোর্টিং দলটা খুব একটা খারাপ নয়—খেলোয়াড় তালিকার ওপর চোখ বুলোলে মনে হয় বুঝি বেশ শক্তিশালীই দলটা। কারণ দলে নামকরা খেলোয়াড়ের সংখ্যাও কম নয়। তবু একটার পর একটা খেলায় মহা-মেডান স্পোর্টিং হারলো। হারতে হারতে মহামেডানের হাল এমনই যে, তাদের অবস্থা আজ আর কিছুতেই ময়দানের দুর্বল দলগুলোর চেয়ে যে ভালো. এ কথা বলা যায় না।

কিন্তু কেন এমন হয়? কেন, কেন? এই কেনর উত্তরটা দেবে কে?

যাই হোক, কলকাতা ময়দানে খেলার ধারা দেখে এবার যেন মনে হয় যে, শক্তিশালী দলগুলোর চেয়ে অপেক্ষা-কৃত দুর্বল দল পোর্ট কমিশনার, উয়াড়ী, কালীঘাট, হাওড়া ইউনিয়ন প্রভৃতি ছোট ছোট ক্লাবগুলো অনেক ভালো খেলেছে।

আর এ-কথা যে কতো সত্যি তার প্রমাণ পাওয়া যাবে এবারের সুপার লীগের খেলায় যে পাঁচটি দল স্থান লাভ করছে তাদের নামের দিকে তাকালেই!

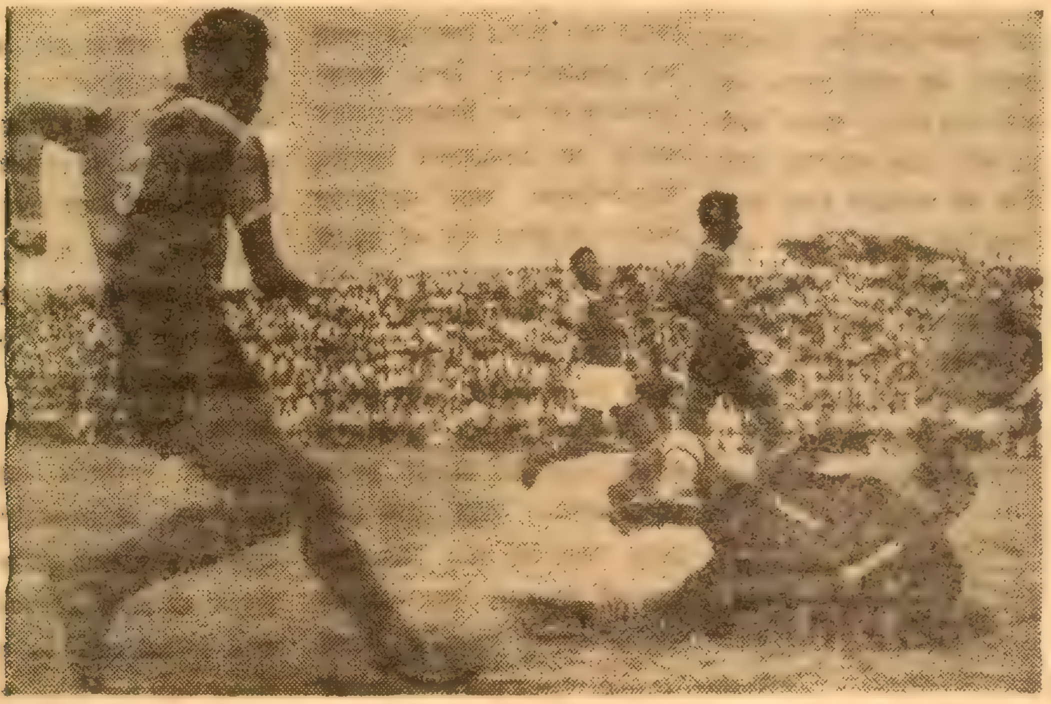

হাওড়া ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলের প্রথম গোলের দৃশ্য। সুভাষ ভৌমিকের তীব্র শট গোলরক্ষককে পরাজিত করে গোলে ঢুকছে।

পরিচীয়তে

কালীঘাটের অভিজ্ঞ অধিনায়ক

মানস ব্যানার্জী

সুযোগ পেয়েও বড় দলে খেললেন না

কালীঘাট ক্লাবের ফুটবল ক্যাপ্টেন মানস ব্যানার্জী কলকাতা ময়দানের একটি অতি পুরনো নাম।

অনেক দিন ধরে খেলছে মানস। দেখতে দেখতে কেটে গেলো তার খেলোয়াড় জীবনের বেশ কয়েকটা বছর। ইস্টার্ন রেলকে যদি বড় দল বলতে হয় তাহলে মাঝে ঐ ইস্টার্ন রেল ছাড়া চিরকাল মানস খেলে গেলো ছোট দলে। প্রথমে বাটা, মাঝে ইস্টার্ন রেল আর সব শেষে এখন সে খেলছে কালীঘাটের পক্ষে।

তাই মানস ব্যানার্জীও চিরকাল মাঝারিয়ানার মধ্যে থেকে গেলো। বড় খেলোয়াড় হবার মতো সুযোগ এবং সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তার আর সেই তথাকথিত বড় খেলোয়াড় হওয়া হলো না। তবে কিছু কিছু খেলায় তার বুদ্ধিদীপ্ত নিপুণতা দেখে মনে হয়েছে যে, কলকাতা ময়দানের তথাকথিত নামকরা কিছুসংখ্যক বড় খেলোয়াড়ের চেয়ে কালীঘাটের মানস ব্যানার্জী কোন অংশে কম যায় না।

তবু মানস ব্যানার্জীকে কেউ বড় প্লেয়ার বলে না, তাতে অবশ্য কারো কিছু আসে-যায় না। মানসও তোয়াক্কা করে না তার। তবে এ-কথা ঠিক যে, মানসের মধ্যে ফুটবল প্রতিভার যে সামান্য অংশটুকুও ছিলো তারও স্ফুরণ হলো না। আজ যদি মানস মোহনবাগান কিম্বা ইস্টবেঙ্গলে খেলতো, তাহলে ভারতীয় দলের পক্ষে খেলার সুযোগও তার সামনে হয়তো এসে যেতো।

কারণ ফুটবল সেন্স বলতে যা বোঝায় তা মানসের মধ্যে আছে একটু বেশি পরিমাণেই। মানস যেমন নিজে খেলতে পারে তেমনি খেলাতেও পারে অন্য খেলোয়াড়দের। কিন্তু মানসের নিজের দল মানসকে ঠিকমতো খেলাতে পারলো না কোনদিনও। কিছুদিন আগে ইস্টবেঙ্গল বনাম কালীঘাটের খেলা দেখতে দেখতে শুধু এই কথাটাই মনে হয়েছে, মনে হয়েছিলো ওরা যদি মানসকে আর একটু খেলাতো, আর একটু বেশি করে বল দিতো তাহলে হয়তো খেলার ধারাটাই যেতো বদলে।

কিন্তু তা হলো না। হয়তো হবেও না কোনদিন। ঠিক এইভাবে খেলতে খেলতে একদিন মানস খেলা ছেড়ে দেবে। অবশ্য তার জন্যে এতোটুকুও দুঃখ নেই তার মনে। বরঞ্চ আছে এক অনাবিল আনন্দ, অভাবনীয় সুখের অনুভূতি। খেলার মাঠে মানস ব্যানার্জী নিশ্চয়ই সাফল্য লাভ করেছে কিন্তু তার-চেয়ে অনেক বড় সাফল্য তার পারিবারিক জীবনে।

স্কুল ফাইন্যাল পাশ করতে না করতে সংসারের যে জোয়াল সে কাঁধে তুলে নিয়েছিলো, মাঝ সমুদ্রে হাল-ভাঙা নাবিকের মতো সে যেভাবে তাদের সংসারকে আজকের অবস্থায় এনে ফেলেছে তার তুলনা মেলা ভার—আর সেই সাফল্যই মানসের জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া।

টাকীর ভবনাথ স্কুলের সেই দুরন্ত ছেলেটাকে আজ আর তাই চেনা যায় না, চেনা যায় না সেই ছেলেটাকে যে স্কুল ফাইন্যাল পাশ করতে না করতে সংসারের চাপে গিয়ে ঢুকেছিলো বাটার কারখানায়। তারপর সেকেণ্ড ডিভি-সান থেকে বাটা উঠলো প্রথম বিভাগে। সেই সংগে দাম বাড়তে লাগলো মানসের। চলে এলো সে ইস্টার্ন রেলে। ইস্টার্ন রেলে এক বছর খেলতে না খেলতে চাকরি পেলো স্টেট ব্যাংকে। তারপর কালীঘাটে গেলো মানস। আজো সে কালীঘাটের আক্রমণভাগের প্রধান স্তম্ভ। প্রত্যেক বছরই তার কাছে আসে বড় ক্লাবে যাবার আহবান, তাকে দেখানো হয় অনেক প্রলোভন। কিন্তু মানস কালীঘাট ছাড়ে নি—কালীঘাটও বোধহয় মানস ব্যানার্জীকে কোনদিনও ছাড়বে না।

পরিচীয়তে

সমাচারদর্পণ

এবারের উইম্বেলেডন টেনিস প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়ে গেছে। পরাজিতের তালিকায় ইতিমধ্যেই স্থান পেয়েছেন ভারতের দুই খেলোয়াড় জয়দীপ ও প্রেমজিৎ। তবে লেভারের বিরুদ্ধে প্রেমজিতের আকর্ষণীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতা সকলকে অবাক করে দিয়েছে। উইম্বেলেডনের এক নম্বর খেলোয়াড়

॥ প্রেমজিৎলাল ॥

প্রথম দিকে লেভারের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে (৬-৩ ও ৬-৪) দুটি সেটে জিতেছিলেন। কিন্তু তারপর আর সুবিধে করতে পারেন নি। শেষ তিনটি সেটে সরাসরি পরাজিত (৬-৩, ৬-০ ও ৬-০) হলেন।

লেভারের বিরুদ্ধে পর পর দু সেটে জেতা আর যাই হোক খুব একটা সহজ বিষয় নয়। ভারতের আর কৃষ্ণান ব্যক্তিগত ব্যাপারে উইম্বেলেডন টেনিস প্রতিযোগিতায় যোগ দেন নি।

* * *

প্রথম টেস্টে শোচনীয়ভাবে হেরে যাবার পর ওয়েস্ট ইন্ডিজ যেন কিছুটা সামলে নিয়েছে। ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটসম্যানরা মোটামুটি ভালোভাবে ব্যাটিং করেছেন। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়। এই টেস্টে জিততে পারলে ওয়েস্ট ইন্ডিজ আপ্রাণ চেষ্টা করবে শেষ টেস্টে জিততে। কারণ তিন-টেস্ট মরশুমের প্রথম টেস্টে ইংলন্ড জিতেছে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত এই মরশুমের 'রাবার' কারা পায়।

* * *

খেলার বই

মাঠ থেকে বলছি : অজয় বসু

[রূপরেখা, ১২৪/১এ, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলকাতা—৪, দাম চার টাকা পঞ্চাশ পয়সা]

মাঠের মানুষ অজয় বসুর 'মাঠ থেকে বলছি' বইটি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত খেলার বই-এর তালিকায় একটি অনন্য সংযোজন। ঠিক এই ধরণের বই বাংলা ভাষায় বিশেষ একটা লেখা হয় নি, অথচ 'মাঠ থেকে বলছি'র মতো বই-এর প্রয়োজন বোধহয় আজ আমাদের সব থেকে বেশি। কারণ বইটি ময়দানী ফুটবলের পরিচালনা থেকে আরম্ভ করে খেলোয়াড়দের খেলা, কোচদের কোচিং প্রভৃতি সব বিষয়েরই খুঁত ও ত্রুটিগুলো আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। কলকাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রীড়া-সাংবাদিক অজয় বসুর সাংবাদিক জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফসল বোধহয় এই 'মাঠ থেকে বলছি' বইটি।

অজয় বসুর পরিচয় আজ বোধহয় আর নতুন করে দেবার কোন প্রয়োজন নেই। কারণ আগেই বলেছি, মাঠের মানুষ অজয় বসু। এক সময়ে তিনি ছিলেন ফুটবল খেলোয়াড় আর মাত্র ক'বছর আগেও তাঁকে দেখা গেছে নিয়মিত ক্রিকেট খেলতে। তাই শ্রীবসুর খেলোয়াড় ও সাংবাদিক জীবন মিলে-মিশে এক হয়ে রূপ দিয়েছে এই 'মাঠ থেকে বলছি' বইটি। আর সেই জন্যেই বইটি বাংলাদেশের ক্রীড়াজগতে অমূল্য।

আমাদের মনে হয় যে, এই বইটি সকলেরই—দর্শক, ক্লাব সমর্থক, খেলোয়াড়, কর্মকর্তা, রেফারী প্রমুখের পড়া উচিত। কারণ বইটির মধ্যে এমন কতকগুলো বিষয় আছে, এমন কিছু বক্তব্য আছে যার সংগে অনেকেই মিল খুঁজে পাবেন—হয়তো বা অনেকে নিজেদের ব্যক্তিগত দোষত্রুটিটাও দেখতে পাবেন। একটি বই-এর পক্ষে এবং সেই বই-এর লেখকের কাছে এ বড় কম কথা নয়। তাই শুধু এইটুকুই বলতে পারি যে, শ্রদ্ধেয় ক্রীড়া-সাংবাদিক শ্রীঅজয় বসুর সফল কীর্তিই নয় বইটি—এই বইটি আমাদের কাছের মানুষ অজয়দাকে নতুনভাবে চিনিয়ে দিয়েছে আমাদের। এক কথায় বলা যায় মাঠের মানুষ অজয় বসুর 'মাঠ থেকে বলছি' বইটি সত্যিই অপূর্ব, সত্যিই অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ক্রীড়া-জিজ্ঞাসায় অধীর বাংলাদেশের পাঠকদের অনেক দিনের একটা চাহিদা এতোদিনে মিটলো।

লেখকের লেখার সংগে তাল দিয়ে বইটির সব কিছুই যেন সুন্দর। ছাপা, বাঁধাই আর ছবিগুলোও মনোরম। আমরা এই বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

—শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

এবারে পুরো ইডেন গার্ডেনের ওপর নজর পড়েছে রাজ্য সরকারের ক্রীড়া-দপ্তরের। শোনা যাচ্ছে সমস্ত ইডেন উদ্যান ঘিরেই নাকি কম্পোজিট স্টেডিয়াম তৈরি হবে। অর্থাৎ ঐতিহাসিক ইডেন উদ্যানের ঐতিহ্য আর থাকবে না। জানি না প্যাগোডার ভাগ্যে কি আছে, জলভরা ছোট্ট খাল ছায়া-শীতল ভাগ্যে কি আছে। কম্পোজিট স্টেডিয়ামের খবরে আমরা উল্লসিত—সে বিষয়ে এতটুকুও সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের আবেদন ঐতিহাসিক এই উদ্যানের ঐতিহ্য বজায় রেখে কম্পোজিট স্টেডিয়ামটা অন্য কোথাও তৈরি করা হোক না কেন.....!

[১২৮ পৃষ্ঠার পর]

কমল পোদ্দার (শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড, দমদম ক্যান্ট)

প্রশ্ন : ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক শ্রী জে সি গুহর ঠিকানা জানতে চাই।

উত্তর : শ্রী জে সি গুহ C/o. ইস্টবেঙ্গল ক্লাব টেন্ট, কলকাতা—২১।

হেমেন দাস (বিদ্যানিকেতন হাই স্কুল, পান্ডু, গোহাটি)

প্রশ্ন : ইস্টবেঙ্গল দলের অধিনায়ককে নির্দেশ করে সকলের নামগুলি জানাবেন।

উত্তর : কি জানতে চাইছেন ঠিক বুঝতে পারলাম না তো!

প্রশ্ন উত্তর

[illegible] মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া বাজার, উত্তরপাড়া)

প্রশ্ন : জয়দীপ কিরূপ শ্রেণীর খেলোয়াড়?

উত্তর : যেরূপ আপনি মনে করেন!

শক্তিপদ ভট্টাচার্য (গোপীকৃষ্ণ গোস্বামী রোড, ভাটপাড়া)

প্রশ্ন : ফাউল হলে চার্জ করা যায় কি?

উত্তর : রেফারী ফাউলের নির্দেশ দেবার পর কোন খেলোয়াড়কে চার্জ করা সংগত নয়।

শশাঙ্ক ঘোষাল (লালবাড়ি এয়ার ফিল্ড, আসাম)

উত্তর : আপনার চিঠিটি অমল দত্তকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে বেশ কয়েক দিন আগেই।

অরুণ গুহকর্মকার (তেজগঞ্জ, বর্ধমান)

প্রশ্ন : বর্তমানে ভারতীয় টেস্ট ক্রিকেটে সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় কে?

উত্তর : রমেশ স্যাকসেনা।

মহঃ নাসিরুদ্দিন (দেবীদাসপুর, কাকুড়িয়া, মুর্শিদাবাদ)

প্রশ্ন : বর্তমান ফুটবল মরশুমে ইস্ট-বেঙ্গল, মোহনবাগান এবং মহামেডান স্পোর্টিং-এর অধিনায়ক কে? মহামেডানের রামানা ও পাপ্পানাকে দেখা যাচ্ছে না কেন?

উত্তর : শান্ত মিত্র, সি প্রসাদ ও বিদ্যুৎ মজুমদার। ওঁরা দুজন তো এখন খেলছেন।

সমীরকুমার সেনমজুমদার (বাবুপাড়া কুলটি)

উত্তর : জার্নাল সিং আর কলকাতায় অর্থাৎ মোহনবাগান দলের পক্ষে খেলবেন না। উনি এখন পাতিয়ালার স্পোর্টস ইনস্টিটিউটে খুব বড় পোস্টে আছেন। আপনি পাতিয়ালা স্পোর্টস ইনস্টিটিউট, পোঃ পাতিয়ালা এই ঠিকানায় চিঠি লিখতে পারেন। গল্প হলেও সত্যি আপনার ভালো লাগে জেনে আমরা উৎসাহিত হয়েছি।

নীরদবরণ রায় (দেগঙ্গা, ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন : লীগ ফুটবলে পয়েন্ট কিভাবে গোণা হয়? ইনিংসে ও রানে পরাজয় কি নিয়মে হয়?

উত্তর : লীগের খেলায় জিতলে দু' পয়েন্ট আর ড্র করলে দু'টি দল এক পয়েন্ট করে পায়।

কোন দলের এক ইনিংসের রান সংখ্যার চেয়ে অন্য দলটি দু' ইনিংসের রান সংখ্যার যোগফল যদি কম হয়, তাহলে ঐ দলটি ইনিংসে জয়লাভ করে। টেস্ট খেলার দু'টি দল দু' ইনিংস করে ব্যাটিং করার পর যে দল যতো বেশি রানে এগিয়ে থাকে, সেই দল ততো রানে জেতে।

প্রবীর নন্দী (কল্যাণগড়)

প্রশ্ন : ইডেনে কম্পোজিট স্টেডিয়াম প্রসংগে বাংলার সেরা ক্রীড়াবিদরা কি বলেন এই প্রসংগে যে লেখাগুলো প্রকাশ করা হলো তাতে মনে হয় যে, ইডেনে ফুটবল খেলা বন্ধ হবেই।

উত্তর : দেখা যাক কি হয়—কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে কি হবে তা কে জানে।

প্রদীপ ব্যানার্জী (কল্যাণগড়)

প্রশ্ন : বিশ্বের সেরা ফুটবল খেলোয়াড় পেলে কোন্ দলের বিরুদ্ধে এবং কতো সালে সর্বোচ্চ গোল করেছিলেন—তাঁর মোট গোলসংখ্যা কতো?

উত্তর : কিছুদিন আগে 'পেলে এবার হাজার গোল করবেন' এই শিরোনামায় একটা লেখা প্রকাশ করা হয়েছিলো। তাতেই আপনার প্রশ্নের উত্তর আছে দেখেছেন নিশ্চয়ই।

দেবাশীষ সেনগুপ্ত (নিউ ব্যারাকপুর, ২৪ পরগনা)

উত্তর : আপনার চিঠির জন্য ধন্যবাদ। গত সংখ্যায় নিশ্চয়ই দেখেছেন সারদেশাই-এর ২০০ রান করার বিষয়টি।

অমলকুমার চ্যাটার্জী (বি· কে পাল এ্যাভিন্যু, কলকাতা—৫)

প্রশ্ন : ভারতীয় ক্রিকেট দলের নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় দুরানী এবং হনুমন্ত সিং অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড দলের বিরুদ্ধে কি খেলার সুযোগ পাবেন?

উত্তর : হনুমন্ত সিং পাবেন বোধহয়।

[শেষাংশ ১২৭ পৃষ্ঠায়]

গল্প হলেও সত্যি

১৯১১ সালে আই· এফ· এ শীল্ডের সেমিফাইন্যাল খেলা।

মোহনবাগান খেলছে মিডলসেক্স দলের সংগে।

গোরা দলের বিরুদ্ধে অমিত-বিক্রমে খেলে ন্যাংগা-পা বাবুর দল মোহনবাগান পারলো না একটাও গোল করতে। অথচ গোল করার মতো সহজ সুযোগ তারা পেয়েছিল অনেকগুলো। কিন্তু মিডলসেক্স দলের গোলরক্ষক পিগটই ভেস্তে দিলেন মোহনবাগানের সব আক্রমণ।

পরের দিনের খেলাও জমে উঠলো খুব। কে জিতবে? মোহনবাগান না মিডলসেক্স। দু' দলের মধ্যে চলেছে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এরা বল নিয়ে এগিয়ে আসে তো ওরা বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে ফিরিয়ে দেয় সেই বল। হঠাৎ এক সময় মোহনবাগানের সেন্টার ফরোয়ার্ড অভিলাষ ঘোষ বল নিয়ে চলে এলেন মিডলসেক্সের গোলের কাছে। বলটা ধরার জন্যে পিগটও এগিয়ে এসেছেন। দুজনের মধ্যে সংঘর্ষ অনিবার্য। কিন্তু ঠিক আগের মুহূর্তে অভিলাষ ঘোষ বলটা ঠেলে দিলেন গোলে। তারপর দুজনের মধ্যে যখন সেই প্রচণ্ড সংঘর্ষ হলো তখন বলটা ঢুকে গেছে গোলের মধ্যে। ফলে এক গোলে এগিয়ে গেল মোহনবাগান।

কিন্তু সাংঘাতিক এই সংঘর্ষের ফলে পিগট সাহেবের একটা চোখ ঠেলে বেরিয়ে এলো। সাহেব কিন্তু পিছু হটার পাত্র নন। চোখে ব্যান্ডেজ বেঁধে আবার খেলতে নামলেন। কিন্তু মোহনবাগানের সেই তীব্র আক্রমণধারা এক চোখে আর কতক্ষণ সামলাবেন তিনি। ফলে আরো দু'টো গোল হয়ে গেলো।

মিডলসেক্সকে তিন গোলে হারিয়ে প্রথম ভারতীয় দল হিসেবে মোহনবাগান ক্লাব উঠলো আই· এফ· এ শীল্ডের ফাইন্যালে।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাপ্তাহিক বসুমতী

ঘটনাবৈচিত্র্যে সরগরম বিগত সপ্তাহের কলকাতা

৪ বর্ষ ঃ ৩য় সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৫শে আষাঢ়, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [74 year, No. 3, 10th July

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		১৩১
আজকের প্রসঙ্গ		১৩২
সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	শঙ্করীপ্রসাদ বসু	১৩৩
একটি, দুটি, তিনটি নরক যদিও জন্মে (কবিতা)	বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৩৫
বই-বাহাই—বাংলা বইয়ের মেলা	হরপ্রসাদ মিত্র	১৩৬
আর এক দিগন্তে (কবিতা)	সরিৎ শর্মা	১৩৯
বঙ্গদর্শন		১৪০
ভারতদর্শন		১৪৪
আন্তর্জাতিক		১৪৭
সপ্তাহের বোকা	কৃত্তিবাস ওঝা	১৪৯
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	অনন্ত সিংহ	১৫২

যে কোন
গয়না
আর
আসল
গ্রহরত্ন
কেনার
দক্ষিণ কোলকাতায়
নামকরা প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সন অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ডসন্স অব লেট
এম. বি. সরকার

এ.সরকার এণ্ড সন্স
[illegible] রাসবিহারী এভিনিউ কলিকাতা-[illegible]

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
শহর কলকাতা	— শহরদর্শী	১৫৬
কথায় কথায়	— নিবারণ মননশী	১৫৭
উইলিয়াম হার্শেল (প্রবন্ধ)	— গোলোকেন্দু ঘোষ	১৫৮
জীবনের টার্মিনাস কতদূর আর (কবিতা)	— মনোরঞ্জন হাজরা	১৬২
বীজাণু (গল্প)	— পীযূষ সরকার	১৬৩
বিপ্লব প্রচেষ্টার একটি বিস্মৃত অধ্যায়	— তপতীনাথ মুখোপাধ্যায়	১৬৮
তিমির প্রান্ত ভূমায়	— অগ্নিবর্ণ	১৭০
সাগর সঙ্গমে (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— স্বর্ণালি জানা	১৭৫
পাঠকমন		১৭৮
মহানায়ক লেনিন (নাটক)	— অশোক সেন	১৭৯
রঙ্গজগৎ		১৮৩
খেলাধূলা	— শান্তিপ্রিয়	১৮৮

—সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে !!—

বহুকাল পরে পুনর্মুদ্রণ

"নবীনবাবু বর্ণনা এবং গীতিতে একপ্রকার সিদ্ধহস্ত। এই সকল বিষয়ে তাঁহার লিপিপ্রণালীর সঙ্গে বায়রনের লিপিপ্রণালীর বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়।......বায়রনের ন্যায় নবীনবাবু বর্ণনায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী।...... নবীনবাবুর যখন স্বদেশবাৎসল্য স্রোতঃ উচ্ছলিত হয়, তখন তিনিও রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেন না।"—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মহাকবি

নবীনচন্দ্র সেনের গ্রন্থাবলী

রৈবতক কাব্য ॥ কুরুক্ষেত্র প্রভাস

গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫০৮। মূল্য মাত্র সাত টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

সাপ্তাহিক বসুমতী

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

৭৪ বর্ষ : ৩য় সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ২৫শে আষাঢ়, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 10th July, 1969

CALCUTTA ... CENTRAL LIBRARY ... & UNI

অনুত্তীর্ণ ও তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রী

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বের হয়েছে, কিন্তু সমষ্টিগতভাবে তা সুফল বহন করে আনে নি। এবার ঐ পরীক্ষার পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১০৮৭৪৩। তার মধ্যে অনুত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৪৯২৮২। এরপর স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যার সঙ্গে যোগ করলে অবস্থা কী দাঁড়াবে—তা সহজেই অনুমেয়। তবে ছাত্র-ছাত্রীরা জীবনের ভাগ্য পরীক্ষার প্রথম পদক্ষেপেই যে গুরুতরভাবে মার খাচ্ছেন, আশা করি, একথা যে কোন সুস্থবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি স্বীকার করবেন। অনুত্তীর্ণ হওয়ায় শুধু ছাত্র-ছাত্রীরাই প্রচন্ড রকম আঘাত খাচ্ছেন না, সেই সঙ্গে বর্তমান অর্থনৈতিক অবস্থায় নাকাল অভিভাবকরাও অকূলে দিশা হারাচ্ছেন। আর অকৃতকার্যতার দ্বারা আর্থিক অপচয় জাতীয় অপচয়-এরই নামান্তর। প্রসঙ্গত আমরা উল্লেখ করতে পারি, সরকার যদি অবৈতনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা (পশ্চিমবঙ্গে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করার ইচ্ছা যুক্তফ্রন্ট প্রকাশ করেছেন) গ্রহণ করেন, তাহলে এভাবে অসাফল্যের হার কি খুশি মনে গ্রহণ করবেন। এর উত্তরে নিশ্চয়ই 'না' বলাই উচিত। আর 'না'-ই যদি হয়, তাহলে রাজ্য সরকার এখনই এমন পরিকল্পনা গ্রহণ করুন যাতে আগামী বছর থেকে অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীরা সমাজের কলঙ্ক হিসেবে পরিগণিত না হয়। বলা বাহুল্য, কেউ অকৃতকার্য না হোক এটাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু 'পাশ' শব্দটা থাকলে 'ফেল' শব্দটা যখন থাকবেই, সেই অজুহাতে নির্মমভাবে ফেল করিয়ে দেওয়াই বা কী রকমের কাজ! এবার উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীদের উত্তর-পত্র নিয়মানুযায়ী দ্বিতীয়বার পরীক্ষা করে পর্যন্ত দেখা হয় নি। এই ধরনের ঘটনা শুধু গর্হিত নয়, ছাত্রবধযজ্ঞে ঘৃতাহুতি দান করারই রহস্যময় এক অক্ষয় কীর্তি মধ্যশিক্ষা পর্ষদের।

আরো একটি বিষয় গভীরভাবে অনুধাবনযোগ্য। বিষয়টি হচ্ছে তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সম্পর্কে। বলা বাহুল্য, যাঁরা তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন তাঁরা অঘোষিত 'ফেল'-এরই আর এক রূপ। এবার তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের তথাকথিত উত্তীর্ণের তালিকা থেকে বাদ দিলে ১০৮৭৪৩ জন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে মোট উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২৩৬১৯ (=৩৩৭২+২০২৪৭) তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা শুধু অভিভাবকদেরই মাথা ব্যথা নন, এরা কোনো চাকরিতে দরখাস্ত করার অধিকার থেকেও বঞ্চিত হয়। অবশ্য চতুর্থ শ্রেণীর চাকরির জন্য যেখানে এম-এ ডিগ্রীধারী ও ইঞ্জিনীয়াররা পর্যন্ত দরখাস্ত করে থাকেন, সেখানে তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা প্রায় আবর্জনারই তুল্য। কিন্তু উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য কলেজে ভর্তির প্রবেশপত্র পাবার অধিকার থেকেও এরা নির্মমভাবে বঞ্চিত। যা হোক, রাজ্য সরকার এবার আধা-সরকারী কলেজগুলিতে 'সিট' সংখ্যা বাড়াবার এবং নতুন বিভাগ খোলার মনস্থ করেছেন। আমরা স্বীকার করি, রাজ্য সরকারের এই ধরনের প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য। তবু প্রশ্ন থেকে যায়, সম্ভাব্য ঐ ব্যবস্থা সত্ত্বেও অবস্থার পরিবর্তন হবে কতটুকু? দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা ঠাঁই পাবার পর তবে তো তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের কথা বিবেচনা করা হবে। তাই আমাদের অনুরোধ, তৃতীয় বিভাগ উঠিয়ে দেওয়া হোক এবং অনুত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীদের সংখ্যা কিভাবে কমিয়ে দেওয়া যায় সে-ব্যাপারে কালবিলম্ব না করে চিন্তা করা হোক।

অনুত্তীর্ণদের সংখ্যা কমানোর অর্থ এই নয় যে, সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্রদের বিদ্যালয় থেকে বাতিল করা। শিক্ষা দান ব্যবস্থায় এমন একটা মান ও পরীক্ষা-পদ্ধতি গ্রহণ করা বাঞ্ছনীয়, যাতে তথাকথিত সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যাভ্যাসকে বিভীষিকা বলে গ্রহণ করবে না। আর যে-সব ছাত্র-ছাত্রী তীক্ষ্ম মেধাসম্পন্ন তারা কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হোক। আশা করি, তাতে কেউ আপত্তি করবেন না। সোজা কথা, গুটি কয় ছাত্র-ছাত্রীর চরম কৃতিত্বের কথা দৈনিক কাগজে পড়ে আমরা যেন না ভাবি তাতেই দেশোদ্ধার হয়ে গেল। অনুত্তীর্ণ ও তৃতীয় বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীরাও দেশেরই ছেলে—একথা আমরা যেন না ভুলি।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

হিজ রয়্যাল হাইনেস প্রিন্স চার্লস ফিলিপ আর্থার জর্জ, কে জি, প্রিন্স অফ ওয়েলস এ্যান্ড আর্ল চেস্টার, ডিউক অফ কর্নোয়াল ইন দি পীয়ারেজ অফ ইংল্যান্ড, ডিউক অফ রটসে, আর্ল অফ ক্যারিক এ্যান্ড লর্ড অফ রেনফ্রু ইন দি পীয়ারেজ অফ স্কটল্যান্ড......কিছু বোঝা গেল কি গেল না তাতে কিছু যায় আসে না, মবলগ কথা হল, বৃটিশ রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথের ২০ বছরের পুত্র শ্রীমান চার্লস এখন থেকে এই উপাধিতে পরিচিত হবেন। অর্থাৎ ১লা জুলাই যুবরাজ চার্লস-এর অভিষেক হতে তিনি প্রিন্স অফ ওয়েলস খেতাবের অধিকারী হলেন।

ওয়েলস প্রদেশের কারনার্ভন প্রাসাদে রাণী এলিজাবেথ পুত্র চার্লসের মাথায় সোনার মুকুট পরিয়ে দিলেন। সারা দেশ সেদিন উৎসবের সাজে সজ্জিত। পাঁচঘণ্টা ধরে টেলিভিসনে সমগ্র অনুষ্ঠানটির ছবি তোলা হল। হৈ-চৈ রৈ-রৈ ব্যাপার। এমন ঘটনা তো ফি-বছর ঘটছে না। প্রায় ৫৮ বছর আগে ১৯১১ সালে শেষ অভিষেক উৎসব হয়েছিল, অষ্টম এডোয়ার্ড সেদিন প্রিন্স অফ ওয়েলস খেতাব পেয়েছিলেন। আর ১৯৫৮ সালে রাণী এলিজাবেথের অভিষেকের পর আর এ-মোচ্ছব হল কৈ। মোচ্ছব নয় তো কি। অনুষ্ঠানের জন্যে নিদেনপক্ষে ৫০ লাখ টাকা তো খরচ হয়েছে।

যিনি ইংলণ্ডের রাজা হবেন, তাঁকে প্রিন্স অফ ওয়েলস খেতাবে ভূষিত করা হল কেন? হল ঠেলায় পড়ে। কূট-নৈতিক চাল আর কি। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম এডোয়ার্ড গায়ের জোরে ওয়েলস এবং স্কটল্যান্ড জয় করেছিলেন। তারপর বহু যুগ কেটে গিয়েছে, কিন্তু ওয়েলসবাসীরা কখনই মন থেকে মুছতে পারে নি সে-পরাজয়ের ব্যথা। তারা বার বার বিদ্রোহ করেছে, আবার হারও স্বীকার করতে হয়েছে সামরিক দিক থেকে দুর্বল, আর্থিক দিক থেকে দরিদ্র ওয়েলসকে। ইংরেজরা ওয়েলসবাসীদের পদানত করলেও কখনই তাদের শ্রদ্ধা বা ভালবাসা অর্জন করতে পারে নি। সে জন্যে তাদের মন খুশি করার জন্যে ইংলণ্ডরাজ ঘোষণা করে-ছিলেন যে, রাজার প্রথম পুত্র বা যুব-রাজকে—যিনি ভবিষ্যতে ইংলণ্ডেশ্বর হবেন—তাঁকে ওয়েলস-এর যুবরাজ হিসেবে অভিষেক করা হবে। সেই থেকে প্রিন্স অফ ওয়েলস

চার্লস

অভিষেক উৎসবের রেওয়াজ চলে আসছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও জাতীয়তাবাদী ওয়েলসবাসীরা এই অভিষেক উৎসবকে বা প্রিন্স অফ ওয়েলসকে নিজেদের ব্যাপার বলে কখনো খোলা মনে মেনে নিতে পেরেছে কি-না সন্দেহ।

তা যদি না-ও নিতে পারে তার জন্য কিন্তু ২২তম প্রিন্স অফ ওয়েলস চার্লসকে দোষারোপ করা যাবে না। এমন কি রাণীর ট্রেনে বোমা বিস্ফোরণের পিছনে যদি কোন ইঙ্গিত থাকে তো তা চার্লসকে লক্ষ্য করে ততটা নয়, যতটা অনুষ্ঠানের ভাঁড়ামিকে বিদ্রূপ করে। এ প্রহসনের জন্যে (চার্লস নিজেই অভিষেক অনুষ্ঠানকে একটা মজার খেলা' বলে বর্ণনা করেছেন।) চার্লসকে তো দায়ী করা চলবে না, বেচারা নিমিত্তমাত্র। বরং চার্লস ওয়েলসবাসীদেরই একজন হিসেবে নিজেকে তৈরি করার জন্যে কম কষ্ট স্বীকার করেন নি। অল্প সময়ের মধ্যে তিনি ওয়েলস ভাষা রপ্ত করে নিয়েছেন, ওয়েলসদের সঙ্গে পারতপক্ষে ইংরেজী বলেন না। সাধারণ ওয়েলসবাসীদের সঙ্গে আপনভাবে মেলামেশা করে ওয়েলস প্রদেশের প্রতিনিধি হতে চেষ্টা করছেন চার্লস।

রাজপুত্র এবং ইংলণ্ডের সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হয়েও চার্লস গোড়া থেকেই সাধারণের জীবন যাপন করে আসছেন। সাধারণ ঘরের ছেলেমেয়ের মত রাজকুমার চার্লসও স্কুল-কলেজে পড়ছেন, পরীক্ষা দিয়েছেন, হোস্টেলে থেকেছেন কেরাণী-মজুরের ছেলের পাশাপাশি। এবং বংশমর্যাদা, ধমনীতে প্রবাহিত নীল রক্তধারার কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে হোস্টেলে নিজের হাতে রান্না করে বন্ধুবান্ধবদের খাইয়েছেন, বাসন মেজেছেন কলতলার বসে। কী না করেছেন চার্লস? ট্রাউজার গুটিয়ে জলে নেমে রাস্তার জঞ্জাল পরিষ্কার করে জনসেবার কাজ করেছেন। নতুনতম মডেলের মোটর ছেড়ে সাইকেল চালিয়ে স্কুল-কলেজে গিয়েছেন। চার্লসকে দাম্ভিক বলা যাবে না, এবং বিশুদ্ধ খুব। আবার সাথে হৈ-চৈ করে কলেজের অনুষ্ঠানে অভিনয় করেছেন, চেলো বাজিয়েছেন। শিখেছেন নৌকো এবং বিমান চালনাও।

নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সিংহাসনে বসে গণতান্ত্রিক ব্রিটেনের পরিস্থিতির সঙ্গে চার্লস নিজেকে যে সহজেই খাপ খাইয়ে নিতে পারবেন, সে-বিষয়ে কি কোনো সন্দেহ আছে?

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ন্যাশনাল প্ল্যানিং

॥ এক ॥

হরিপুরার প্রকাশ্য অধিবেশনে ভাষণ পাঠ করার আগে সুভাষচন্দ্র তার কপি গান্ধীজীকে পড়তে দিয়েছিলেন—তা পড়ে গান্ধীজীর মনোভাব কি হয়েছিল তা আমাদের জানা নেই। সংযত ভাষার আবরণে মুড়ে সুভাষচন্দ্র কোন্ বে-গান্ধী বস্তু উপহার দিচ্ছেন, তা গান্ধীজী না-বুঝেছিলেন তা নয়,—বুঝেই কি তিনি সতর্ক হয়েছিলেন, কিংবা বুঝেও হেসেছিলেন, তাঁর সেই বিখ্যাত বিজয়ী হাসি, যার নির্দন্ত শৈশবস্বরাজ্যের সামনে দন্তহীন হয়ে পড়ে যে-কোনো বিরোধিতা, যা বলতে চেয়েছিল, অশান্ত সুভাষের প্রকাশ-ভঙ্গির ঐ সাবধানতার মধ্যেই আছে তার ভাব-পরিবর্তনের ইঙ্গিত, পুরনো কথাগুলি বলছে সে নিতান্তই পুরনো অভ্যাসে, তাতে গর্জন আছে কিন্তু জলহীন মেঘ গর্জন ছাড়া তা আর কিছু নয়।

জানি না গান্ধীজী কোন্ দৃষ্টিতে সুভাষ-চন্দ্রের ভাষণকে দেখেছিলেন। উপরে যে-রকম বললাম, সেইভাবে যদি না দেখে থাকেন তাহলে অবশ্যই সতর্ক হয়েছিলেন শুরু থেকেই। সতর্ক হয়েছিলেন বলেই মনে হয়, কারণ, সুভাষচন্দ্রের ভাষণে গান্ধীজীর দীর্ঘ-পোষিত নানা ধারণার শত্রুতা ছিল পদে পদে।

হরিপুরা ভাষণে সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষের ক্রম-স্ফীত জনসংখ্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে জন্মনিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছিলেন। আধুনিক ভারতীয় ইতি-হাসের সঙ্গে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রে জানেন, গান্ধীজী কৃত্রিম উপায়ে জন্মনিয়ন্ত্রণের কতখানি বিরোধী ছিলেন; এক্ষেত্রে তিনি সাধারণ মানুষের কাছে অতিমানুষের আত্মসংযম দাবি করেছিলেন। গান্ধীজীর এই উচ্চ নৈতিকতা কিভাবে গান্ধী-পন্থী ভারতীয় রাষ্ট্রকর্তাদের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে রেখে নিম্নশ্রেণীর দারিদ্র্যের মধ্যে ভারতবর্ষকে বেঁধে রেখেছে স্বাধীনতার পরবর্তীকালেও, সে কথা কিছুদিন আগে গান্ধীভক্ত এক বিশিষ্ট সমাজনেত্রীর স্বীকারোক্তিতে পেয়েছি। সুভাষচন্দ্র রাষ্ট্রভাষার জন্য রোমক লিপি চেয়েছিলেন। জহরলালও তাই চাইতেন। এ-ব্যাপারে গান্ধীজীর ধমক খেয়ে জহরলাল গাটিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু সুভাষচন্দ্র সে পাত্র ছিলেন না। সুতরাং গান্ধীজীকে ১৯৩৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রোমান লিপির বিরুদ্ধে পুরাতন আপত্তি পুনশ্চ উত্থাপন করতে দেখা গেল। সুভাষচন্দ্র বৈদেশিক প্রচারের উপর বিশেষ জোর দিয়েছিলেন। আমরা আগেই দেখেছি, গান্ধীজীর ইচ্ছাতেই ইংলণ্ডে কংগ্রেসের মুখপত্র *India* পত্রিকা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। গান্ধীজীর একটি প্রিয় ধারণা, স্বাধীনতালাভের পরে কংগ্রেসকে ভেঙে দেওয়া উচিত, সুভাষচন্দ্র এই ধারণার হাস্যকরতায় যথেষ্ট হাসতে পারেন নি, দেশের রাজনৈতিক মনের এমনই অপরূপ চেহারা, বরং গম্ভীরভাবে তার বিরুদ্ধে তাঁকে প্রতিবাদ করতে হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র তাঁর ভাষণে বড় বেশি লেনিন, রাশিয়া, সমাজ-তন্ত্রের উল্লেখ করেছিলেন, স্বাধীন ভারতে হ্যাভস-দের ধরনে হ্যাভ-নটসদের উন্নতি ঘটাতে হবে এমন ভয়াবহ কথাও বলেছিলেন— এই বক্তব্য গান্ধীজীর ধনিক-অছিবাদের কত-খানি বিরোধী তা না বললেও চলবে। গান্ধীজী এইকালে কংগ্রেসের মিশ্র চরিত্রে বড়ই পীড়াবোধ করছিলেন, অনন্য-ব্রতী অহিংসকদের নিয়ে কংগ্রেস পরিচালনার কথা ভাব-ছিলেন ও বলছিলেন, সেখানে সুভাষচন্দ্র কিষাণ মজদুরদের কংগ্রেসে গ্রহণ করে তার সংগ্রামী শক্তি বৃদ্ধির পক্ষে যুক্তি উত্থাপন করেছিলেন। ইংলণ্ডের সামরিক সর্বনাশের সম্ভা-বনায় যে পুলক সুভাষচন্দ্র তাঁর ভাষণে অনিবার্য সুখে প্রকাশ করে ফেলেছিলেন, গান্ধীজীর 'শত্রুকে ভালবাসো' নীতির নিশ্চয় তা বিরোধী, এবং উক্ত শত্রুর জেলে আবদ্ধ রাজনৈতিক বন্দীদের অনশনের প্রতি সুভাষচন্দ্র যে সহানু-ভূতির মনোভাব দেখিয়েছিলেন, তাও গান্ধীজীর মনঃপূত হবার কথা নয়। দাবি আদায়ের জন্য রাজবন্দীদের অনশন-পন্থা গ্রহণের বিশেষ নিন্দা গান্ধীজী এইকালে (পূর্বেও) করেছেন; সুভাষচন্দ্র অপরপক্ষে গান্ধীশিক্ষাকে কেবল গান্ধীতেই সীমাবদ্ধ দেখতে চান নি, অনশনকে তিনি নিরুপায়ের অহিংস অস্ত্র রূপেই দেখেছিলেন এবং 'তরুণ বালক কী যন্ত্রণায়' জেলের গরাদে 'নিস্ফল মাথা কুটে' মরে, সেই যন্ত্রণাকে নিজের বুকে তুলে না নিয়ে পারেন নি, ঢাকা জেলে অনশনে মৃত্যুবরণকারী হরেন মুনশীর প্রতি শ্রদ্ধা-জ্ঞাপনের মধ্যে তা ফুটে উঠেছিল।

সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, গান্ধীজীর ছত্রচ্ছায়ায় বসে সুভাষচন্দ্র বিশ্রাম করছিলেন গান্ধীবাদের সঙ্গে পরবর্তী লড়াইয়ের জন্য। প্রায় কুড়ি বছর আগে রাজনীতিতে অংশ

গ্রহণের সময় থেকেই তিনি গান্ধী-নেতৃত্বের বিরোধী, সেই বিরোধিতা এতদিন কিয়দংশে নীতিমুখী হলেও (যেমন হিংসা অহিংসা, বা পূর্ণ স্বাধীনতা ও ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের প্রশ্ন) বহুলাংশে ব্যক্তিমুখী ছিল, এখন ব্যক্তির সঙ্গে নীতির বিরোধিতা সমগুরুত্ব লাভ করল, যেহেতু তিনি বুঝেছিলেন, গান্ধীনেতৃত্বের সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীনীতির মধ্যযুগীয় গতিহীনতা এবং সন্তোষলুব্ধতা স্বতঃই-শান্ত ভারতীয় মনের গভীরে প্রবাহ বিস্তার করেছে। বৃহৎ আকারে যন্ত্রশিল্পায়নের প্রস্তাব ও তার পক্ষে প্রচার গান্ধী-নীতির বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্রের ব্যাপক বিদ্রোহ ছাড়া-আর কিছু নয়।

হরিপুরা ভাষণেই শিল্পায়ণের পক্ষে সুভাষচন্দ্র যুক্তি তুলেছিলেন। তাকে কথায় পর্যবসিত না রেখে কার্যকর করে তোলার জন্য তিনি বাস্তব ব্যবস্থা রূপে নিখিল ভারত প্ল্যানিংকমিটি গঠন করলেন। হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতিরূপে এই কাজই সুভাষচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ কীর্তিরূপে গণ্য হবার যোগ্য। পাঠকদের নিশ্চয় মনে আছে, সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতা-পূর্ব ও স্বাধীনতা-উত্তর, এই দুই ভারতের সমস্যার রূপ ও সমাধানের উপায় দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যুদ্ধপ্রস্তুতির সাক্ষাৎ সূত্ররূপে তিনি ফেডারেশন পরিকল্পনাকে নিয়েছিলেন, স্বাধীনতা-উত্তর কালে পুনর্গঠনের প্রস্তুতিরূপে প্ল্যানিং কমিটি। এই দুই ক্ষেত্রেই দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ কঠিন আকার ধারণ করবে, যা ভারতীয় রাজনীতি থেকে তৎকালে সুভাষচন্দ্রকে বিতাড়িত করার প্রয়াসে পর্যবসিত হবে। সে ইতিহাস আমরা লক্ষ্য করব।

প্ল্যানিং কমিটির ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা নিয়ে আমাদের আলোচনা দীর্ঘ হবে। তার প্রথম কারণ, সত্যই এটি সুভাষচন্দ্রের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি এবং এর মধ্য থেকে আমরা সেই দেশনেতাকে লাভ করি যিনি কেবল সংগ্রামের রুদ্রশক্তি নন, সংগঠনের শিবশক্তিও। দ্বিতীয়ত, এই আলোচনার মধ্য দিয়ে দেখাবার চেষ্টা করব, সুভাষচন্দ্রের দান সম্বন্ধে স্বাধীনতা-উত্তরকালে ক্ষমতাপ্রাপ্ত দেশনেতাদের রাজনৈতিক নীরবতা কী লজ্জাজনক। এক্ষেত্রে মুখ্য নেতৃত্ব স্বভাবতই নিয়েছিলেন পণ্ডিত জহরলাল নেহরু, যিনি সুভাষ-গঠিত প্ল্যানিং কমিশনে সভাপতিত্বের পদ নিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্রেরই অনুরোধে। পণ্ডিত নেহরু তাঁর 'ভারত আবিষ্কার' গ্রন্থে ন্যাশনাল প্ল্যানিং সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনার মধ্যে সুভাষচন্দ্রের নামোল্লেখ করতেও ভুলে গেছেন, বোধহয় এই কারণে যে, তিনি সব সময়েই ব্যক্তির থেকে নীতিকে বড় করে দেখেন (স্মরণীয় ব্যতিক্রম তাঁর মধ্যেই বাস করছিল), কিংবা নির্ভর করেছিলেন স্ব-প্রবর্তিত 'সত্যমেব জয়তে' নীতির উপরে, কিংবা হয়ত ভেবেছিলেন দার্শনিক ঔদাস্যের সঙ্গে, বাড়ি তৈরি হয়ে গেলে ভিত্তি চোখের আড়ালে চলে যায়, এই নিয়ম।

শিল্পায়ন-নির্ভর পরিকল্পনার ব্যাপারটিকে সুভাষচন্দ্র শুধু বৈষয়িক সমৃদ্ধির দিক দিয়েই বিবেচনা করেন নি, এর সঙ্গে ভারতীয় জনমানসের বিজ্ঞানচেতনার সম্পর্ক সম্বন্ধেও তিনি সচেতন ছিলেন। ভারতীয় সমস্যাগুলিকে ভাবাবেগ দিয়ে নয়, বৈজ্ঞানিকভাবে বিচার করতে হবে, এই ছিল তাঁর এইকালীন মনোভাব। এই মনোভাবের প্রসার হোক দেশে, স্বতঃই তা চাইতেন। গান্ধীবাদের প্রভাব দূর করার জন্য যুক্তিনির্ভর বৈজ্ঞানিক মনোভাব জাগানো ছাড়া গত্যন্তর নেই এও তিনি বুঝেছিলেন। কিন্তু কেবল তিনিই বোঝেন নি, আরও অনেকেই বুঝেছিলেন এদেশে। এঁদের মধ্যে এখন আমি দুজনকে বেছে নেব, যাঁরা ন্যাশনাল প্ল্যানিং-এর সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন, যাঁদের একজন গান্ধীচরিত্রের অনুরাগী হয়েও গান্ধীবাদের বড় অংশের বিরোধী, অন্যজন কোনোদিক দিয়েই গান্ধীভক্ত নন। তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ ও মেঘনাদ সাহা। এঁদের ধারণার কথা একটু বিস্তারিত আলোচনা করব, ন্যাশনাল প্ল্যানিংয়ের ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রের বড় সমর্থক এঁরা ছিলেন বলেই নয়, ভারতীয় প্রতিভার দুই দিকের প্রতিনিধিত্ব এঁরা করেছেন—একজন দেশের সবচেয়ে বড় কবি, অন্যজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক। ভারতবর্ষেও যে শ্রেষ্ঠ মনীষা গান্ধীবাদের সমর্থক ছিল না, এই দুইজনের মনোভাব থেকে তা দেখা যাবে।

॥ দুই ॥

"বৈজ্ঞানিক পরিমণ্ডল" : রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি'

'রাশিয়ার চিঠি'র রবীন্দ্রনাথের পরিচয় নিলেই বুঝতে পারব, কোন্ রবীন্দ্রনাথ ভারতের জন্য 'জাতীয় পরিকল্পনা'র উৎসাহী সমর্থক হয়েছিলেন। যন্ত্রশিল্পায়ন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রথমাবধি বক্তব্য সংকলনের প্রয়োজন এখানে নেই। তিনি পূর্বে যদি কোথাও শিল্পায়নের পক্ষ সমর্থন করেও থাকেন, তবু সাধারণের কাছে, বুদ্ধিজীবীদের কাছেও, তিনি যন্ত্রশিল্পবিরোধী শান্তিবাদী কবিরূপেই বেশি পরিচিত ছিলেন, যাঁর বাণী, 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর।' এমন কি ন্যাশনাল প্ল্যানিংয়ের বড় সমর্থক হওয়া সত্ত্বেও আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার প্রতি তাঁর সমর্থন রক্তভাবে প্রবেশ করেছিল কি না সে বিষয়ে সন্দেহ স্বয়ং সুভাষচন্দ্রেরই ছিল না হলে তিনি ১৯৪৫ সালে টোকিও বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দেবার সময়ে শিল্পায়নের ব্যাপারে মনোভাবের দিক দিয়ে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীকে এক পর্যায়ে ফেলতেন না।

রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া ভ্রমণ এবং রাশিয়ার চিঠি তাঁর ব্যক্তিজীবন ও জাতীয় জীবনের পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ। আমরা আগেই দেখে এসেছি, গান্ধীজীর সঙ্গে মতসংঘর্ষের জন্য ১৯২০ সালের কিছু পূর্ব থেকে তিনি কি দারুণ নিঃসঙ্গতা বোধ করেছেন। গান্ধী-নীতিকে তিনি গ্রহণ করতে অসমর্থ, অথচ তার অর্থ ভারতবর্ষের ব্যাপক মনোজীবনের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ। এই মানসিক শূন্যতা থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য বারবার বিদেশে ভ্রমণ করেছেন গান্ধীনীতির বিকল্প সন্ধানের জন্য প্রলুব্ধ হয়ে

একটি, দুটি, তিনটি নরক যদিও জ্বলে

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বন্ধু বলেন : 'দোহাই, বীরেনবাবু।
সেই কবিতা লিখুন,
যাতে মানুষ গভীরতম অন্ধকারে তবু মানুষ...
সবার আগে, সবার ওপর মানুষ।

'বীরেনবাবু! আপনি যখন বাংলাদেশের পুলিশ দেখে
চমকে ওঠেন, চারদিকেই নরক দেখেন,
তখন আপনি শিশুর মতই সরল। কিন্তু
কবির বয়েস ক্রমেই বাড়ে—
যাদের মুখে তাকাতে ঘৃণা, একটিবার তাদের বুকের
ভিতর তাকান!

'দেখতে পাবেন একটি, দুটি, তিনটি নরক যদিও
চোখের সামনে জ্বলে;
তবু মানুষ সবার ওপর মানুষ। বাংলাদেশের পুলিশ
সবাই পরের ঘরে আগুন দেয় না...বরং আলো
যখন মুখের ওপর, তারাও মানুষ,
সবার ওপর মানুষ!'

মুসোলিনির কর্মনীতির প্রতি মুগ্ধতা। তিনি বোধ করেছিলেন, সেই শোচনীয় বুদ্ধিভ্রান্তি থেকে রোমা রোলাঁ কিভাবে তাঁকে উদ্ধার করেন তাও দেখেছি। মুসোলিনীর কর্মপদ্ধতির প্রতি সমাদরমূলক মনোভাবমাত্রই ভ্রান্তিজনক এমন ধারণা আমার নয়; কিন্তু নানা রাজনৈতিক কর্মধারার মধ্যে নিজ ধারণায় অবিচল থেকে প্রয়োজনীয় অংশটুকু উদ্ধার করবার মত রাজনৈতিক বুদ্ধিশৃঙ্খলা অবশ্যই এই ভাবতন্ময় কবির ছিল না। রবীন্দ্রনাথের সর্বশেষ মানসিক আশ্রয়ভূমি-সন্ধান রাশিয়ায়, যেখানে সশস্ত্র বিপ্লবের অন্তে বৈজ্ঞানিক রীতিতে আত্মগঠনের পর্ব চলেছিল। 'সশস্ত্র' ব্যাপারটিতে যদি রবীন্দ্রনাথের অ. . ত্ত থাকেও, সংগঠনে তাঁর উৎসাহের অবধি নেই, বিশেষত তা যদি যুক্তি ও বুদ্ধিকে অগ্রাহ্য না করে। রবীন্দ্রনাথ হয়ত আরও ভেবেছিলেন, যে নতুনের সন্ধান পুরাতনী ভারতবর্ষ থেকে আধুনিক ইটালিতে তাঁকে টেনে নিয়ে গিয়ে প্রগতিপন্থীদের কাছে সমালোচ্য করে তুলেছে, তা যদি তাঁকে রাশিয়ার অভিমুখীন করে অবশ্যই বিতর্ক কম উঠবে। সমালোচনা উঠতে পারে যে-মহল থেকে সেই ইম্পিরিয়ালিস্টদের সম্বন্ধে স্পর্শকাতরতা ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথ অনেকখানি কাটিয়ে উঠেছিলেন।

জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া ভ্রমণ এবং বিপ্লবোত্তর রাশিয়া সম্বন্ধে সমাদরমূলক রচনাদি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। রাশিয়ার বিপ্লব অবিলম্বে ভারতবর্ষে যথেষ্ট সাড়া জাগাতে না পারলেও, ১৯২০ সালের অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার পরে ক্রমেই ভারতীয় রাজনৈতিক মহলে মনোযোগযোগ্য ব্যাপার হয়ে উঠতে থাকে। রাশিয়া থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত ভারতীয় কমিউনিস্টরা রাশিয়ার নীতি ও কর্মপন্থা সম্বন্ধে ভারতবর্ষে প্রচার চালাতে আরম্ভ করেছিল। সাম্রাজ্যবাদী ধনতন্ত্রী ইংরেজ ও ফরাসী, রাশিয়ার বিপ্লবকে সর্বনাশা জ্ঞান করে যখন তাকে সর্বদিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখবার চেষ্টা করল, তখন রাশিয়া সম্বন্ধে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিসমূহের ঐ আতঙ্কপূর্ণ শত্রুতা ভারতীয় মনের কাছে রাশিয়াকে প্রিয়তর করেছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু পূর্ণ প্রীতির ব্যাপারে দু-একটি বাধাও ছিল। গান্ধী-প্রভাবে অহিংসার মাহাত্ম্যে আস্থাশীল জন-মন রাশিয়ার সশস্ত্র বিপ্লব সম্বন্ধে কিছুটা দ্বিধান্বিত ছিল এবং প্রায় সম্পূর্ণভাবে সন্দিগ্ধ ছিল ধর্মব্যাপারে রাশিয়ার কালাপাহাড়ী নীতিতে। ঠিক এমনই মানসিক পরিস্থিতিতে রবীন্দ্রনাথের রাশিয়া-প্রশস্তি ভারতীয় মনকে, বিশেষত বাঙালী মনকে, রাশিয়ার অনুকূল করতে বিশেষ সাহায্য করেছিল। গান্ধীজীর মহান বন্দনাকার, পরম শান্তিবাদী এই কবি যদি রাশিয়ার রক্তাক্ত বিপ্লবের অঙ্কে নবজাত মহাসৃষ্টিকে দেখে থাকেন, তাহলে তার প্রতি মনোযোগ না দিয়ে উপায় থাকে না—সে মনোযোগ রাশিয়া পেয়েছিল এবং, রাশিয়ার পাওয়ার অর্থ, যে-পদ্ধতিতে রাশিয়ার সংগঠন-পর্ব চলেছে, সেই পদ্ধতিও তা পেয়েছিল। তাই দেখতে পাই, রাশিয়ার প্রতি যাঁরা ভারতীয় মনকে আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেন, তাঁরা কতভাবে যে রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠিকে ব্যবহার করেছেন, তার ইয়ত্তা নেই।

উল্টোদিকে এখানে আমরা জানাতে পারি, রাশিয়া-দর্শনের অভিজ্ঞতার পরে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক পন্থায় যাঁরা ভারত-গঠন করতে চাইছিলেন তাঁদের প্রতি মানসিক আনুকূল্য বিশেষভাবে বোধ করেছিলেন। যান্ত্রিকতার প্রতি রবীন্দ্রনাথের অ-প্রেম হয়ত শিথিল হয় নি, কিন্তু যন্ত্রের শুভকর ক্রিয়াত্মিক শক্তিও তিনি নিশ্চয় অনুভব করেছিলেন। তারই ফলে কয়েক বৎসর পরে সুভাষচন্দ্রের ন্যাশনাল প্ল্যানিং ও বৃহৎ শিল্পায়ন-প্রস্তাবের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জানানো তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার অভিজ্ঞতাকথাকে একটু বিস্তারিতভাবে উপস্থিত করছি। কবি তখন সমকালীন ভারতীয় মানবতাবাদী বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন। তাঁর মধ্যে অধিকন্তু যুগসন্ধির রূপও দেখা যাচ্ছিল। সুতরাং রাশিয়া-বিষয়ক তাঁর বক্তব্যের মধ্যে মনের পরিবর্তনচিহ্ন স্পষ্ট; অতীত বোধ থেকে আধুনিক ধারণায় যে-ভারতবর্ষ উত্তীর্ণ হচ্ছে, তারই পরিচয়বাহী ঐ প্রবন্ধগুলি। ঐতিহ্যকে রবীন্দ্রনাথ অস্বীকার করেন না, আবার মানবকল্যাণকে যখন ঐতিহ্য আঘাত করে তার বিরুদ্ধে প্রতিঘাতে তাঁর সঙ্কোচ নেই। সুভাষচন্দ্রও ঐতিহ্যবাদী, কিন্তু তিনিই আবার ভারতবর্ষকে সবলে আধুনিকতার দিকে আকর্ষণ করেছিলেন। [ক্রমশ]

হরপ্রসাদ মিত্র

বই-বাছাই

বাংলা বইয়ের মেলা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর

আনন্দ বুঝেছিল সবই। প্যারীচাঁদের 'উপন্যাস' থেকে—সেদিন আমাদের কথার মধ্যে—'অন্বেষণ-চন্দ্র' নামটি বেশ একটু খোঁচা দেবার জন্যেই যে তোলা হয়েছিল, সে-অভিপ্রায়ও তার কাছে গোপন থাকে নি। 'বই-বাছাই'য়ের কাজে নেমে, ভূমিকা বেশি বাড়িয়ে তুলতে আমার যে আর বিন্দুমাত্র ইচ্ছা ছিল না, সেকথাও সে বুঝেছিল। তবু, এই আলোচনার মধ্যে—সেকালের সামন্ত-তন্ত্র ও পল্লীসমাজ ভেঙে, একালের এই যে নতুন শিল্প-প্রধান সমাজের ভাব-ভাবনার ধাক্কার কথা উঠলো, সেটা অগ্রাহ্য করবার—বা এড়িয়ে যাবার চেষ্টাতে তার বিশেষ আপত্তি ছিল। সে হঠাৎ ব'লে বসলো—যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের একটি কবিতা শোনা ভাল—এইরকম কবিতা পড়া থাকলে দেশ-কালের আবহাওয়াটা ঠিক ঠিক বুঝে দেখবার উৎসাহ সজাগ থাকতে পারে।

এই বলে সে কয়েক ছত্র কবিতা শুনিয়ে দিল—

এখন বুঝেছি ভাই,—
পেট ছাড়া আর পূজা করিবার
দুনিয়ায় কিছু নাই।
আপাদ-মস্ত সাড়ে ত্রিহস্ত
তারি মাঝে রাজে পেট,
তারি নির্দেশে দেশে ও বিদেশে
বার বার মাথা হেঁট।

আনন্দর সঙ্গে আমার এই বই-বাছাই সম্পর্কিত আলোচনা প্রথম যখন শুরু হয়, এ তার অনেক পরবর্তী আর এক বৈঠকের আর এক কিস্তির আলাপ। এ থেকে বোঝা যাবে যে এ-কাজে নামবার আগে মনের মধ্যে ভূমিকা চলেছে অনেকটা সময় জুড়ে। বার বার এগিয়ে বার বার পিছিয়ে গেছে মন। একে একে একাজের চিন্তাসূত্রগুলি দেখা দিয়েছে। সে-সব মোটেই অল্প সময়ের ব্যাপার নয়' তারই চারটি সূত্র ইতিমধ্যে এই 'পূর্বকথা'য় বলে নেওয়া গেছে। অতঃপর আনন্দ যেদিন আমাকে যতীন্দ্রনাথের 'পেট ও মাটি' নামে ১৩৬০ সালের ঐ কবিতাটি শোনায়, সেদিন সত্যিই আমার আর ধৈর্য ছিল না। আমি আজ সে-কথা লিখতেও লজ্জা বোধ করছি, কিন্তু ব্যক্তিগত ধারণার জন্যে পাঠক-সমাজের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে,—সত্য গোপন না করবার জন্যেই,—বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, আমি তাকে বলেছিলুম—পেটের উৎপাত আর সহ্য হয় না, আনন্দ।

এক মুহূর্তের জন্যে বড়ো বড়ো সহাস্য দুই চোখ দিয়ে আমার ধৈর্যহারা অবস্থাটা দেখে নিয়ে, আনন্দ এক দমেই আবৃত্তি করে গিয়েছিল—

আঁধার অতীতে ঋক্-বেদীয়ার
তারি ধান্দায় হোলো ঘরছাড়া,
হয়ে মরু পার গিরি কান্তার
ভাঙে 'খাইবার' গেট্।
বুদ্ধ শুদ্ধ—পেয়ে বোধিমূলে
পরমান্নের প্লেট।

আমি বলেছিলুম—থাক্, থাক্—

আনন্দ বলেছিল—

যত সিঁদুর তা গণেশের পেটে
তিন যুগই লেপা হয়,
অলিতে গলিতে ঘটিছে কলিতে
তারি পুনরভিনয়।
যা কিছু রকমফের,—
সে শুধু বিধাতা উলটিয়া পাতা
টানিছে নূতন জের।

আমি আবার বলেছিলুম—এই কবিতা আমি পড়েছি। এ-লেখার সঙ্গে আমাদের উপস্থিত আলোচনার যোগ কতোটুকু?

গভীর প্রত্যয়ের সুরে সে বলেছিল—এটি তোমার ভূমিকার পঞ্চম সূত্র।

—অর্থাৎ?

—অর্থাৎ, আধুনিক দৃগ্ভঙ্গির স্বরূপ অনুসন্ধানেরই অন্তর্ভুক্ত এটি।

—তার মানে?

—তার মানে মানুষের সামাজিক-অর্থনৈতিক অধিকার সম্বন্ধে একালের পুনর্জিজ্ঞাসা। আমাদের গত পৌনে দু'শ বছরের বাংলা গল্প, উপন্যাস, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে এ সন্ধানের লক্ষণ বার-বার ব্যক্ত হয়েছে।—যতীন্দ্রনাথের এই কবিতাটা সেই কারণেই কাজে লাগবে আমাদের,—শোনো আরো—

পেটের খোরাক ঠিক পেতে হলে
চিরকাল চাষা চাই,
পেটের সুবাদে মানুষে মানুষে
ভাই চাষতুতো ভাই।
তাই চারিদিকে চাষ ও চাষার
ঘন ঘন জয়রব,
তাই সংগ্রাম, তাই প্রস্তুতি
তাই যত বিপ্লব।

আড়চোখে আমার অসহায় বিরক্তি দেখে নিয়ে,—অতঃপর আবৃত্তি বন্ধ করে,—সে বললে—

'গোপাল হালদার মশাই 'বাঙলা সাহিত্য ও মানব-স্বীকৃতি' নামে যে বইখানি লিখেছেন, সেটি দেখেছ বোধ হয়?'

১৩৬৩ সালের আষাঢ় মাসে হালদার মশায়ের ঐ বই প্রথম বেরোয়। আধুনিক বাঙালী মনের প্রকৃতি অনুসন্ধানের চেষ্টায় তিনি অনেকদিন থেকেই তাঁর নিজের পথে নিযুক্ত আছেন বলে জানি। এই বইখানির 'নিবেদন'-অংশের প্রথম অনুচ্ছেদেই তিনি জানান—'একটা বিশেষ প্রশ্নকে কেন্দ্র করে এই প্রবন্ধগুলি সাময়িকপত্রে নানা সময়ে লিখিত হয়েছিল। সেই প্রশ্নটা এই—আধুনিক সাহিত্যের মূল প্রকৃতি কী, আর বাঙলা সাহিত্যে কীভাবে তা প্রকাশ লাভ করেছে।'

তাঁর 'সংস্কৃতির রূপান্তর'-এর কথা আগেই বলা হয়েছে। 'বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা' (শ্রাবণ, ১৩৬১) নামে তাঁর আর একখানি বইও সুপরিচিত। আমাদের আধুনিক সাহিত্যের তো বটেই,—আরো ব্যাপকভাবে বলা যায় যে, পুরো বাংলা-সাহিত্যের পক্ষেই মানবস্বীকৃতির দিকটি তিনি প্রধানত দেখতে চেয়েছেন। ডক্টর সুশীলকুমার দে ঐ 'বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা'র ভূমিকায় লিখেছিলেন—

> প্রথমেই লক্ষ্য করবার বিষয়, তিনি তাঁর বইয়ের নামকরণ করেছেন বাংলা সাহিত্যের 'রূপ-রেখা'—'ইতিহাস', 'ইতিবৃত্ত' বা 'ইতিকথা' নয়। এই রূপ-রেখা তিনি এঁকেছেন বাংলার সাংস্কৃতিক ইতিহাসের পটভূমিতে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের যতগুলি বিবরণ আমার জানা আছে তার কোনটি এরূপ সমগ্র দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লেখা হয়েছে বলে মনে হয় না।

কেন যে আগে এরকম চেষ্টা ঘটে নি, তার ব্যাখ্যা ছিল অধ্যাপক সুশীলকুমার দের সেই ছোটো ভূমিকাটিতে। দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের মধ্যেই দেশের সাহিত্যধারা আশ্রিত,—অতএব যেসব উপাদানের সামগ্রিক গোচরতার ফলে, সাংস্কৃতিক ইতিহাস উপলব্ধি করা সম্ভব হতে পারে সেইসব উপাদান না পাওয়া পর্যন্ত এ-চেষ্টা সার্থক হওয়া সম্ভব নয়। অবশ্য, একথাও স্মরণীয় যে আধুনিককাল, অর্থাৎ—এই গত পৌনে দু'শ' বছর সম্বন্ধে উপাদান-গোচরতার অভাব মেনে নেওয়া যায় না। কিন্তু সুশীলকুমার বিশেষভাবে প্রাচীন ও মধ্যযুগ সম্বন্ধেই সে-কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—'সাহিত্য কেবল ব্যক্তি-মানসের নয়, সমষ্টিগত জীবনেরও প্রতিফলন।' গোপালবাবুর সঙ্গে সুশীলবাবুর এ-দিকে মতানৈক্য ঘটেনি। তবে, সুশীলবাবু একথাও জানিয়েছিলেন যে—

> 'সাহিত্যের ইতিহাস কেবল কবি, কাব্য ও কাহিনীর বিবরণে অথবা স্থান, কাল ও পাত্রের নীরস তর্কে সার্থকতা লাভ করে না। এখানে প্রধান জিজ্ঞাসা হচ্ছে—সৃষ্টির প্রেরণা ও সেই অন্তর্গত প্রেরণার ঐতিহ্য, যার সমাধান কেবল বাহ্য তথ্যের বিচারে সম্পন্ন হয় না। এই প্রেরণার স্বরূপ বোঝার জন্য রাষ্ট্রিক ও সামাজিক পরিবেশের ধারণাও আবশ্যক, কারণ তার মধ্যেই এই প্রেরণা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে।

আনন্দকে সেদিন এসব কথা শুনিয়েছিলুম। বলেছিলুম—আমরা তো মধ্যযুগে যাচ্ছি না—অতএব উপাদান-সন্ধানের দুশ্চিন্তা এক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে অনেক কম।

সে বলেছিল—দুশ্চিন্তা কম বটে, কিন্তু উপাদান কম নয়। সেগুলো দেখতে হবে।

আমি বলেছিলুম—সে তো বটেই, কিন্তু এসব চিন্তা তো সংক্ষেপে বলে নেওয়া যায়। কথা বাড়িয়ে কি হবে?

বাড়ানো বাতুলতা, কিন্তু যতোটুকু দরকার, সেটুকু তো বলতেই হবে। দ্যাখো—এডুকেশন গেজেটে ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য যখন সাহিত্যের বিচার-পদ্ধতির পরিবর্তন দাবি করে প্রবন্ধ লিখেছিলেন,—যে প্রবন্ধ থেকে তাঁর কোনো কোনো উক্তি আমরা আগেই স্মরণ করেছি,—সেদিনের সেই দাবির সঙ্গে আজকের নতুন দাবির মিল এবং গরমিল কোথায়, সেটা দেখা দরকার। আজকের দাবি—যেমন গোপাল হালদার মশায়ের প্রবন্ধগুলিতে দেখা যাচ্ছে,—স্বরূপত তাতে কি কোনো পরিবর্তন চোখে পড়ে না? বই বাছাই করবার আগে এ-দিকটাও কি লক্ষণীয় বিশেষ দিক নয়?

—একা হালদার মশাই-ই যে এ দাবি উত্থাপন করেছেন,—আর কেউ এ বিষয়ে কিছু বলেন নি, তা নয়। আইডিয়া কোনো ব্যক্তিবিশেষের জিনিস নয়,—তবে, গোপালবাবুর কথা থেকেই আধুনিক কালের বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে এই বিচার-পদ্ধতি সম্পর্কিত নতুন চিন্তাগুলি দেখা যেতে পারে।

আনন্দ বললে—স্বর্গত ব্রজেন শীলের কথা মনে করিয়ে দিলে তুমি,—তিনি বলতেন, কোনো আইডিয়াই কোনো বিশেষ ব্যক্তির সম্পত্তি নয়,—আইডিয়া মাত্রেই ইউনিভার্সাল,—বিশ্বজনীন। —হয়তো সে-কথাই ঠিক। তবু ব্যক্তি পুরুষের অহঙ্কার মার্জনা কোরো,—ওটা আমার দুর্বলতা,—ও-দুর্বলতা তোমারও আছে,—ব্যক্তিনিরপেক্ষভাবে চোখ-কান মুখ-মাথা ইত্যাদির মহাপরিমেল আমার বোধে আসে না,—আমি এই কারণেই এইসব চিন্তায় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকেই লক্ষণীয় বলে মনে করি,—যেমন নীরেন্দ্রনাথ রায়,—যেমন গোপাল হালদার। যাই হোক হালদার মশাই যে সূত্রগুলি দিয়েছেন, কথা না বাড়িয়ে সেগুলি কি সংক্ষেপে বলা যায়?

আমি বললুম—তাঁর প্রথম কথা—সাহিত্যের বাজারদর সর্বদাই ওঠা-নামা করে বটে, তবে মনে রাখা দরকার যে, দর জিনিসটা নিতান্তই খামখেয়াল নয়। দ্বিতীয় কথা—আমাদের দেশে প্রায় ১৯৩৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত, অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সূচনা পর্যন্ত যে বিচার একচ্ছত্র ছিল সে হল 'রসের বিচার' অথবা 'আর্টের হিসাব'। তৃতীয় কথা—অতঃপর অনেকেই 'ঐতিহাসিক বিচারের' পক্ষপাতী হয়েছেন কিন্তু 'ঐতিহাসিক' বলতে অনেকেই বোঝেন

'কালানুক্রমিক',—অনেকেই বলেন 'বাস্তব'। কিন্তু গোপালবাবু বলেন—'ঐতিহাসিক বিচার শুধু জড়বস্তুর কালানুক্রমিক হিসাব নয়।'

—তবে কী?

—গোপালবাবুর কথায়—'দেশ-কালের যৌগিক ছাপ' খুঁজে দেখতে হবে—পারিপার্শ্বিকের ছাপ চোখে পড়া চাই।

আনন্দ বললে—সেই জন্যেই তো যতীন্দ্রনাথের কবিতা শোনালুম তোমাকে। দ্যাখো ভাই, রামমোহন যখন বেদান্ত গ্রন্থ লিখেছিলেন তখন তাঁর মনে একথা জাগতেই পারে নি যে—'আঁধার অতীতে ঋক্-বেদীয়ারা' পেটের ধান্দায় ঘর-ছাড়া হয়েছিলেন। কিন্তু যতীন্দ্রনাথের মনে সেরকম একটা বিদ্রূপ-ভাবনা দেখা দিয়ে গেছে তো।

আমি বললুম—এটা কোনো ধর্তব্য যুক্তি নয়—কারণ, রামমোহন যে উদ্দেশ্যে বেদের প্রসঙ্গে মন দিয়েছিলেন, সেই উদ্দেশ্য-চেতনা বা তার উপায়-সাধনা—যতীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে দুয়ের কোনোটাই ঘটে নি। ওটা নিতান্তই একটা আপতিক সাদৃশ্য।

সে বললে—অর্থাৎ ইতিমধ্যে দেশ-কাল, উদ্দেশ্য-আচরণ সবই বদলে গেছে।

আমি বললুম—তবু কতকগুলি ব্যাপার আছে, যেখানে পরিবর্তনের চেয়ে স্থিতি বা অপরিবর্তনই গ্রাহ্য।

—যেমন ?

—যেমন ঐ যে যতীন্দ্রনাথ ঐই আধুনিক—রবীন্দ্রোত্তর বাংলাদেশে—কৃষিনির্ভর জনগণের অনস্বীকার্য সংযোগের দিকটি লক্ষ্য করে 'চাষতুতো ভাই' কথাটা ব্যবহার করেছিলেন,—এই সত্যস্বীকৃতির ব্যঙ্গচাতুর্যটা আধুনিক বটে, কিন্তু এর মূলে যে মানবস্বীকৃতি,—সে তো মধুসূদনের মতন সাহিত্যিকের সাহেবী-স্বভাবের সঙ্গেও মিশে ছিল। অতি প্রাচীন রীতির চাষ-আবাদে আর নানা কালের ধর্ম-সংস্কারগত ধারণায় আশ্রিত অতি সাধারণ হিন্দু-মুসলমান বাঙালী কি তাঁর নজর এড়িয়ে গেছে ? দেশের দুঃখ তিনি কি কিছু কম দেখেছিলেন?

সে বললে—মেঘনাদবধ কাব্যে,—চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে,—কৃষ্ণকুমারী বা পদ্মাবতী নাটকে,—বীরাঙ্গনায় বা ব্রজাঙ্গনায় তিনি কি পেটের ধান্দার কথা বলে গেছেন?

আমি এ-কথার কোনো জবাব না-দিয়ে তাকে একটু পড়ে শোনালুম—বললুম—শোনো ভাই গ্রামের পুষ্করিণীর ধারে একটি বাদামগাছের নিচে দাঁড়িয়ে কথা হচ্ছে :

হানিফ গাজী—(দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া) এবার যে পিরির দরগায় কত ছিন্নি দিছি তা আর বলবো কি। তা ভাই কিছুতেই কিছু হয়ে উঠলো না। দশ ছালা ধানও বাড়ি আনতি পারলাম না—খোদাতালার মর্জ্জি।

গদাধর—বিষ্টি না হলি কি কখনও ধান হয় রে? তা দেখ এখন কর্ত্তাবাবু কি করেন।

হানিফ—আর কি করবেন? উনি কি আর খাজনা ছাড়বেন ?

গদাধর—হ্যারে, তুই কি করবি?

হানিফ—আর মোর মাথা করবো। এখনে মলিই বাঁচি। এবার যদি নাঙ্গলখান আর গরু দুটো যায় তা হলি তো আমিও গেলাম। হা আল্লা! বাপ-দাদার ভিটেটাও কি আখেরে ছাড়তি হোলো।

বললুম—আনন্দ, মধুসূদনের 'বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ'-র এসব প্রশ্নোত্তর তোমার অজানা নয়। হানিফের রাগের কথাগুলো ভোলবার নয়। ভক্তপ্রসাদের ভণ্ডামি, ঐশ্বর্য আর কামুকতা মধুসূদন কি কম লক্ষ্য করেছিলেন? জাতিভেদের আচারগত বাছ-বিচার—পল্লীবাংলায় যা অনেকদিন চলে এসেছে,—নতুন কালের কলকাতায় যা অতঃপর আর ঠিক একইভাবে টিকে থাকা সম্ভব ছিল না,—মধুসূদন কি সে-সব না দেখে গেছেন? —সে-সব তিনি কি না লিখেছেন? মনে আছে তো, ভক্তপ্রসাদ নিজে ছিল একটি বুড়ো শালিক,—কিন্তু নিজের ছেলে অম্বিকাপ্রসাদ কলকাতায় পড়তে গিয়ে কীরকম বিপজ্জ-অনাচারে ভেসে যাবার সম্ভাবনার মুখোমুখি গিয়ে পড়েছিল, সে-সব তার মনে বিঁধেছে অহরহ। আনন্দবাবুকে সে বলেছিল—ভাল, আমি শুনেছি যে কলকাতায় নাকি সব একাকার হয়ে যাচ্ছে? কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, সোনার বেনে, কপালী, তাঁতী, জোলা, তেলী, কলু, সকলই না কি একত্রে উঠে বসে, আর খাওয়া-দাওয়াও করে ? বাপু, এ সকল কি সত্য?'

আনন্দ বললে—এসব নজীর থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে, সময় অত্যন্ত দ্রুতগামী,—এবং মানুষের মনের মধ্য দিয়ে সারা পৃথিবী জুড়ে, সে-স্রোত বয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে সাহিত্য-সমালোচকরা ঐই সময়প্রবাহের অভিব্যক্তি ঠিক ঠিক দেখে যাচ্ছেন কি না, পাঠক সে-কথা অবশ্যই ভাবতে চাইবেন।

আমি বললুম—তা মানছি, কিন্তু মানব-স্বীকৃতি মানে শুধু জীবের জীবিকার অবস্থা নিরীক্ষা,—অর্থাৎ তার পেটের ধান্দা মাত্র,—একথা মানতে ইচ্ছে করে না।

সে বললে,—তা আমিও বলি নি,—বলতে চাই না। কিন্তু পেটের কথাটা উহ্য রেখে যাওয়াও ঠিক হবে না।

পেটের বিষয়ে সংকোচ আমাদের সাহিত্যে বোধ হয় কোনোদিনই ছিল না। আহারের প্রসঙ্গ চৈতন্যচরিতামৃতেও ছিল, চণ্ডীমঙ্গলেও ছিল। অনাহারের যন্ত্রণা জীবনসত্তার বহির্ভূত নয়। জীবিকার কথাই বা লেখকদের রচনায় অনুক্ত থাকবে কেন? অতএব পেটের কথা উহ্য রাখবার কথা ওঠা উচিত নয়।

কিন্তু একটা আপেক্ষিকতার চিন্তাও অবান্তর নয়। সুরুচি-ই এ বিষয়ে বিশেষ মাত্রা রক্ষা করবার পরামর্শ দেয়। সেই মাত্রার আলোচনাসূত্রেই সেদিন দীনবন্ধুর নীলদর্পণের প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কের কথা উঠেছিল—

গোলোক বসু সাধুচরণকে নীলকরদের অত্যাচারের কথা বলছিলেন। সেই সময়ে নবীনমাধব এলেন নীলকর

আর এক দিগন্তে

শরিৎ শর্মা

স্মৃতি-বিস্মৃতির দুয়োর গোড়ায়
বোধির একচিলতে আলো এসে পড়েছে...

আবারো সেই সব দিন ফিরে আসছে,
ফিরে আসছে না, শুরু হচ্ছে, ঠিক
যেখানে শেষ হয়েছে বলে মনে করেছিলাম...

বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বন্দ্বে
আশা-নৈরাশ্যের সংশয়ের
পরিধি থেকে আত্মার কেন্দ্রে...

সার্থক ব্যর্থতা এসে মাথা খুঁড়ছে নতুন আকাশের নিচে,
মুখে দাঁড়িয়েছে অজস্র কণ্ঠ,
চোখগুলো নিষ্কম্প নক্ষত্রের দেশ-কাল-আলোর নিরিখ!

এখন সমস্ত বেদনাকে উৎসারিত করে দিতে হবে—
সমস্ত যন্ত্রণাকে...
মিছিলের পায়ে-পায়ে পুরনো ক্ষতের ওপর নতুন ক্ষত—
দিনগুলি রাতগুলি পায়ে-পায়ে হাঁটছে কতদিন...
নতুন কথা-উপকথার ছন্দে
শব্দে-প্রতিশব্দে উৎকর্ণ-উদ্গ্রীব ইতিহাস...

কালান্তরের দিন ছুঁয়ে
আবারো আমরা আর এক দিগন্তে।

সাহেবের সঙ্গে দেখা করে। গোলোক জিগেস করেন—'কি বাবা, কি করো এলে?'

নবীন বলেন—'আজ্ঞে, জননীর পরিতাপ বিবেচনা করে কি কালসর্প ক্রোড়স্থ শিশুকে দংশন করিতে সংকুচিত হয়? আমি অনেক প্রতিবাদ করিলাম, তা তিনি কিছুই বুঝিলেন না। সাহেবের সেই কথা, তিনি বলেন ৫০ টাকা লইয়া ৬০ বিঘা নীলের লেখাপড়া করিয়া দাও, পরে একেবারে দুই সনের হিসাব চুকাইয়া দেওয়া যাইবে?'২

এসবই বাস্তব, বৈষয়িক কথা। পেটের দুঃখ এতে উহ্য থাকেনি। কিন্তু চমৎকার কবি-কল্পনার কাজ আছে এই কঠিন কঠোর জীবন-পরিবেশের মধ্যেই। সেই কাজের আর একটু উদাহরণ দেখা যাক্—

সাধুচরণ গোলোক বসুকে বলেছে যে, দক্ষিণপাড়ার মোড়লদের বাড়িতে তিন বছর আগে কী শ্রী-ই না ছিল, ঐশ্বর্যের কী সব লক্ষণ ছিল—"কি উঠানই ছিল, যেন ঘোড়দৌড়ের মাঠ, আহা! যখন আসধানের পালা সাজাতো বোধ হতো যেন চন্দন-বিলে পদ্মফুল ফুটে রয়েছে। গোয়ালখান ছিল যেন একটা পাহাড়।"

এই কালসাপ, ঘোড়দৌড়ের মাঠ,—এই চন্দনবিলের পদ্মফুল,—পাহাড়ের মতো বিশাল গোয়াল—এই সব রূপক-উপমাই পুরুষের উক্তি। চতুর্থ গর্ভাঙ্কে পৌঁছে গোলোক বসুর দরদালানে চুলের দড়ি বিনতে বিনতে সৈরিন্ধ্রীকে বলতে শোনা যায়—'আহা চুল তো নয়, শ্যামাঠাকুরুণের কেশ, মুখখানি যেন পদ্মফুল।

বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ আন্দোলন তখন জমে উঠেছিল। নীলকরদের অত্যাচারে দেশের রায়ৎ জমিদার তখন অস্থির। শুধু নীল নয়,—শ্রম নয়,—সাহেবদের চাহিদার আর শেষ ছিল না। সাধুচরণের স্ত্রী রেবতী এসে সৈরিন্ধ্রীকে জানায়—'মুই তো বড় আপদে পড়েছি, পদী ময়রাণী কাল মোদের বাড়ি এয়েলো'। পদী কেন যে এয়েলো, এর আগেই দ্বিতীয় গর্ভাঙ্কে তার ইঙ্গিত ছিল—নীলের পেয়াদা এসে রাইচরণকে বেঁধে নিয়ে গেছে, আর ক্ষেত্রমণির দিকে তাকিয়ে আমিন মনে মনে বলেছে—'এ ছুঁড়ি তো মন্দ নয়—ছোট সাহেব এমন মাল পেলে তো লুপে নেবে।'

এসব খুবই তিক্ত প্রসঙ্গ বটে। দীনবন্ধু জীবনসত্যই তুলে ধরেছিলেন তাঁর রচনায়, কিন্তু এই আবিল আবহাওয়ার মধ্যেও কবিত্বের কাজ বন্ধ হয়নি। দ্বিতীয় অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে দেখা যায়—বেগুনবেড়ের কুঠীর গুদামঘর। সেখানে এক রাইয়ত অন্য রাইয়তদের বলে—'আন্দারবাদে মুই অ্যাকবার গিয়েলাম—ঐ যে ভাবনাপুরীর কুটি, যে কুটির সাহেবডারে সকলি ভাল বলে—ঐ সুমুন্দি মোরে অ্যাকবার ফৌজদুরিতি ঠেলেলো। মুই সেরেব কেচ্রির ভেতর অনেক তামসা দেখেলাম। ওয়াঃ! ন্যাজের কাছে বসে মাচেরটক্ সাহেব যেই হ্যাল মেরেছে, দুই সুমুন্দি মোক্তার ওমনি র, র, করো অ্যাসেছে, হেড়া হেড়ি যে কত্তি নেগলো, মুই ভাবলাম ময়নার মাটে সাদখাঁদের ধলা দামড়া আর জমান্দারদের বুদো এঁড়ের নড়ুই বেদ্লো।'

এ সংলাপ অকৃত্রিম সহজ ভাষাতেই বাহিত। দু-একটি শব্দে হয়তো একালের সাধারণ পাঠকের পক্ষে অর্থবোধে বাধা ঘটতে পারে—যেমন 'মাচেরটক' (ম্যাজিস্ট্রেট) কিংবা 'হ্যাল মেরেছে' (হ্যালো বলেছে) কিংবা 'সাদখাঁদের' (সাধুখাঁদের)।

কিন্তু তাতে কিছু আসে যায় না। দীনবন্ধুর মনে এবং তাঁর কলমে মানব-স্বীকৃতির জোর যে ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। দেশ-কালের যৌগিক ছাপ তাঁর এ লেখাতে নিঃসন্দেহে বর্তেছিল,—মধুসূদনের প্রহসনগুলিতেও তা বেশ স্পষ্টভাবেই ছিল। কিন্তু 'ব্রজাঙ্গনায়' কি সেভাবে দেখা যায়?

[ক্রমশ]

---

২ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ দীনবন্ধু গ্রন্থাবলী ১, পৃঃ ৮

বর্ষ দর্শন

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই কলকাতায় এসে বিভিন্ন সভা-সমিতিতে যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে কিছুটা উস্কানি দিয়ে গেলেন, বলে গেলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের ঘটনাবলীর ওপর সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন এবং সময় এলে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তিনি বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের শ্রম-পরিস্থিতি মোটেই ভাল নয়। বেশ কিছু শিল্পসংস্থার উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেছে। এ রাজ্যে এমন অনেক কিছু ঘটছে যার ওপর কোন মন্তব্য করলেই সেটা একটা রাজনৈতিক প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াবে। কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যে বিমাতৃসুলভ আচরণ করেছেন বলে অভিযোগ করা হয় তার উত্তরে মোরারজী বলেন যে, এই অভিযোগ একেবারে ভিত্তিহীন। তিনি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকার এরকম একটা নজির দেখান, আমি চ্যালেঞ্জ করছি এই ব্যাপারে।"

কিন্তু এইরকম গরম গরম কথাতেই উপ-প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের যথার্থতা যদি প্রমাণ করা যেত, তাহলে পশ্চিমবঙ্গে বোধহয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের আগমনের কোন প্রয়োজনই ঘটত না। কেন্দ্রীয় তহবিল বণ্টন, কাঁচামাল বরাদ্দ, লাইসেন্স পারমিট প্রদান, উদ্বাস্তু পুনর্বসতি এগুলির কোন্ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার পক্ষপাতহীন আচরণ করেছেন? পশ্চিমবঙ্গের কয়লা ও ইস্পাত সারা ভারতে সমান দরে বিক্রয় করা বাধ্যতামূলক এবং এর ফলে পশ্চিমবঙ্গকে রীতিমত লোকসান স্বীকার করতে হয় একথা কি মোরারজী অস্বীকার করতে পারেন? অথচ অন্যান্য রাজ্য তাদের উৎপাদিত পণ্য নিজস্ব দরে পশ্চিমবঙ্গকে বিক্রয় করে, এক্ষেত্রে সর্বভারতীয় সমমূল্যনীতি প্রয়োগ করা হয় না। কলকাতা শহর থেকে কেন্দ্রীয় সরকার যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় করেন, তা ভারতের যে কোন শহরের তুলনায় অনেক বেশি, অথচ কলকাতা উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কি করেছেন? কয়লাখনির বকেয়া রয়ালটি, যার পরিমাণ ৬১ কোটি টাকা, তা থেকে পশ্চিমবঙ্গকে কি স্বেচ্ছাকৃতভাবে বঞ্চিত করা হচ্ছে না? চক্রবেড় রেল স্থাপনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার যে ভানুমতীর খেল্ দেখাচ্ছেন তাতে কি মোরারজী সাহেবের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় নেই? স্যাক্সবি ফার্মার কারখানার ব্যাপারে কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কি প্রেমময় ব্যবহারের নিদর্শন রাখলেন? পশ্চিমবঙ্গের পাট, চা, ইঞ্জিনীয়ারিং দ্রব্যাদি রপ্তানী করে ভারত সরকার সর্বাধিক পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ তার কতটুকু সুবিধা পায়?

তালিকা দীর্ঘ করার প্রয়োজন নেই, শুধু মোরারজীর এটুকু জেনে রাখা ভাল যে, এই রকম গরম গরম কথায় পশ্চিমবঙ্গবাসীকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করা যাবে না। একথা ঠিক যে, সীমাবদ্ধ সাংবিধানিক ক্ষমতার মধ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকার পশ্চিমবঙ্গের দীর্ঘকালীন এবং ক্রমবর্ধমান সমস্যাগুলির ঠিকমত মোকাবিলা করতে পারছেন না। তাঁরা সঙ্গতভাবেই কেন্দ্রকে দোষ দিচ্ছেন, কেন না, পশ্চিমবঙ্গের প্রতি কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ এবং অসহযোগিতার মনোভাব এত বেশি প্রকট যে, তা নতুন করে প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

পশ্চিমবাংলার বাজেট

বিগত ১০ই মার্চ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ১৯৬৯-৭০ সালের যে বাজেট পেশ করা হয়েছিল, সেটা তৈরি করেছিলেন পূর্ববর্তী রাজ্যপালের সরকার। সে বাজেটে স্বভাবতই যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার নীতি-পদ্ধতির প্রতিফলন থাকা সম্ভব ছিল না। এখন সেই বাজেটের পরিবর্তন করে মুখ্য ও অর্থমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় নতুন করে বিধানসভায় বাজেট পেশ করেছেন। চলতি বছরের বাজেটে রাজস্বখাতে অনুমিত আয় হবে মোট ২৩০ কোটি ৫২ লক্ষ টাকা এবং অনুমিত ব্যয় হবে ২৮২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। সুতরাং রাজস্বখাতে মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ৫১ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা।

অনুমিত আয় কম হবার কারণ ভূমি-রাজস্ব থেকে ছোট জমির মালিকদের রেহাই দেওয়া হয়েছে, তাছাড়া দুর্গাপুর প্রোজেক্ট লোকসানে চলার জন্য সেখান থেকে সুদের খাতে কিছু পাওয়া যাবে না। রাজস্বখাতে খরচ বৃদ্ধির কারণগুলির মধ্যে রয়েছে সরকারী কর্মচারীদের দুর্মূল্যভাতা বৃদ্ধি; পরিকল্পনার ব্যয় বৃদ্ধি; উত্তরবঙ্গের বন্যাবিধ্বস্তদের সাহায্যদানের বর্ধিত ব্যয় এবং কেন্দ্রীয় বকেয়া সুদ বাবদ ব্যয় বৃদ্ধি।

রাজস্বখাতের বাইরে অন্যান্য উৎস থেকে সরকারের অনুমিত আয় হবে ৪৪৬ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় হবে ৪৬০ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ এক্ষেত্রে ঘাটতির পরিমাণ ১৩ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা। রাজস্বখাতের ৫১ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ঘাটতির সঙ্গে এই ঘাটতি যোগ করলে মোট ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় ৬৫ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা। চলতি বছরের শুরুতে উদ্বৃত্ত ছিল ১১ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা এবং এই টাকাটা বাদ দিলে নীট ঘাটতি দাঁড়াবে ৫৩ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা।

এই ঘাটতি সত্ত্বেও রাজ্য সরকার কোনরূপ কর ধার্যের ব্যবস্থা আপাতত করেন নি, তবে অজয়বাবু তাঁর বাজেট বক্তৃতায় বলেছেন যে, কেন্দ্রীয় ঋণ পরিশোধের ব্যাপারে অধিকতর সময় নেবার ব্যবস্থা করে এই ঘাটতি অনেকটা কমিয়ে আনার আশা সরকার করছেন। বস্তুত এই কেন্দ্রীয় ঋণ এবং ঋণের বোঝা রাজ্য সরকারগুলির পক্ষে যে অসঙ্গত ও মারাত্মক বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং রাজ্যের অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে তা শ্রীমুখোপাধ্যায় তাঁর বাজেট বক্তৃতার মধ্যে সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের আচরণ এক্ষেত্রে সুদখোর মহাজনের মত। সংবিধান অনুযায়ী রাজ্যগুলির সব উন্নয়ন ইত্যাদির দায়িত্ব রাজ্য সরকারগুলির ওপর, কিন্তু আয়ের উৎসগুলি নিয়ন্ত্রণ করছেন কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের আয়ের সিংহভাগটা নিচ্ছেন, আবার সেই টাকারই একটা অংশ রাজ্যকে ঋণ হিসাবে দিচ্ছেন এবং সেই ঋণের ওপর চড়া হারে সুদ আদায় করছেন। এই অযৌক্তিক নীতি সামগ্রিকভাবে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক উন্নতির পথে সব চেয়ে বেশি বিঘ্নের সৃষ্টি করেছে।

শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর বাজেট বক্তৃতার উপসংহারে বলেছেন, রাজ্য সরকারগুলিকে যদি জনকল্যাণের দায়িত্ব পালন করতে হয় তবে রাজ্যগুলির জন্য অতিরিক্ত সম্পদের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রয়োজন হলে সংবিধান সংশোধন করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার এ রাজ্যের সম্পদের একটা বড় অংশ নিয়ে যাবেন অথচ রাজ্যের প্রয়োজন মেটাবার সময় হাত গুটিয়ে ফেলবেন এ অবস্থা চিরদিন চলতে পারে না। শিল্পোদ্যোগের জন্য ব্যাঙ্ক যেভাবে টাকা ধার দেয় কেন্দ্রীয় সরকার সেভাবে রাজ্যগুলিকে টাকা ধার দেবেন কেন? যে ক্ষেত্রে অর্থসম্পদের জন্য রাজ্যগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর একান্তই নির্ভরশীল এবং কেন্দ্রের অর্থ-সম্পদের প্রকৃত উৎস যেখানে রাজ্যগুলিই, সেখানে এই ব্যবস্থা চূড়ান্ত অযৌক্তিকতা ছাড়া আর কি? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচিত এই বিষয়ে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা, কেন না অভিজ্ঞতায় দেখেছি যে, কেন্দ্রের কাছে ভাল কথায় কোন কাজ হয় না।

ট্রেড ইউনিয়নে রেষারেষি

প্রত্যেক শিল্পসংস্থায় সব কর্মীর পক্ষ থেকে সমস্ত বিষয়ে আলাপ-

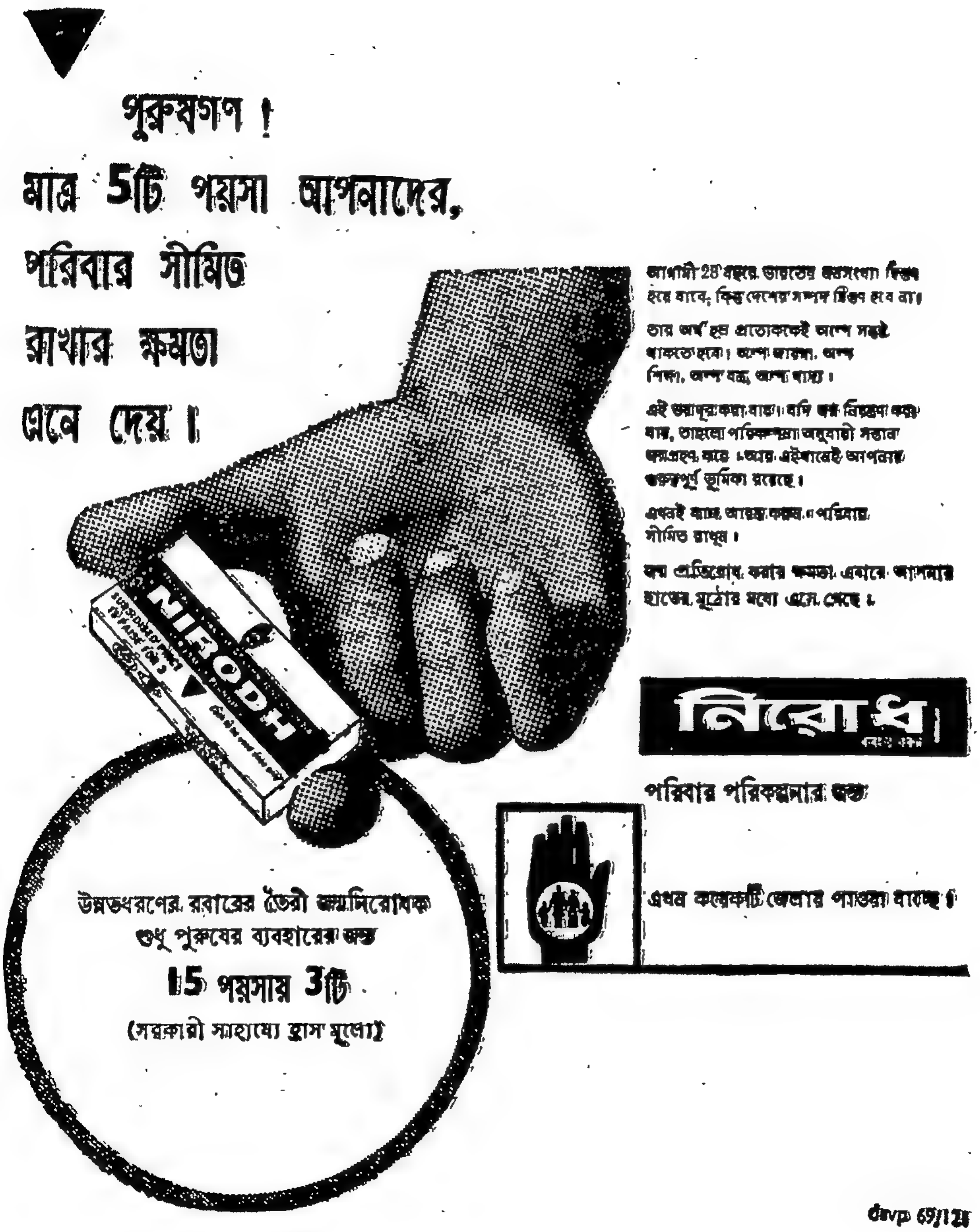

আলোচনার অধিকার একটিমাত্র কর্মচারী ইউনিয়নকেই অর্পণ করার জন্য পশ্চিমবাংলার শ্রমমন্ত্রী একটি প্রস্তাব এনেছেন। প্রস্তাবের মূল বক্তব্য হচ্ছে : কারখানার কর্মীদের মধ্যে গোপন ব্যালটের দ্বারা ভোট নিয়ে বিভিন্ন ইউনিয়নের শক্তি নির্ণয় করতে হবে। যে ইউনিয়ন সবচেয়ে বেশি ভোট পাবে, তাকেই সব বিষয়ে আলোচনার অধিকারী বলে অনুমোদন দেওয়া হবে। এই রকম একটি প্রস্তাব পাশ হলে শ্রমরাজ্যের অশান্তি অনেকটাই বিদূরিত হবে। দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী ইউনিয়নের রেষারেষির ফল যে কতদূর মারাত্মক হতে পারে, কৃষ্ণা গ্লাস কারখানার ঘটনাই তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ। এ-কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, শ্রমিক ও কর্মচারীদের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের জন্য এ দেশের অধিকাংশ সংস্থায় ইউনিয়নগুলির মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা আছে। যে সব সংস্থায় একাধিক ইউনিয়ন নেই, সেখানেও নতুন নতুন সংগঠন গড়ে তোলার জন্য চেষ্টার অন্ত নেই। এর অনিবার্য পরিণতিই হচ্ছে পারস্পরিক সংঘর্ষ, যার মারাত্মক বিস্তার সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে দেখা গেছে। অথচ কিছুটা যুক্তিশীলতার দ্বারা পরিচালিত হলে এই সমস্যার সমাধান মোটেই দুরূহ নয়। প্রতি বছর বা প্রতি দু'বছর অন্তর গোপন ব্যালটের দ্বারা প্রতিনিধি নির্বাচন এবং যে দল নির্বাচিত হবে, ওই নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সেই কারখানার কর্মীদের শ্রমনীতি তারাই নির্ধারণ করবে, এবং বিষয়টির গণতান্ত্রিক নিষ্পত্তিও ঘটবে। এবং এই জাতীয় নির্বাচনের দ্বারা কোন্ দল তাদের প্রকৃত বন্ধু, সেটা শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে চিনে নেওয়া সম্ভবপর হবে।

কলেজে দুর্নীতি

আমাদের হাতে হুগলী জেলার তিনটি কলেজসংক্রান্ত তথ্য আছে এবং আমাদের আলোচ্য বিষয়টি এই তিনটি কলেজের আভ্যন্তরীণ বিষয়ের দ্বারা সমর্থিত হলেও, অনুমান করতে বাধা নেই যে, বোধ হয় বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সকল কলেজেই চলছে। বিষয়টি হল বিভিন্ন ধরণের প্রাকটিকাল পরীক্ষাকে উপলক্ষ করে অধ্যাপকেরা অর্থ উপার্জনের একটি চমৎকার কৌশল বার করেছেন। কৌশলটি হল, পরীক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বিশেষ বিশেষ বেয়ারার হাতে না দিলে তাকে প্রাকটিকাল পরীক্ষায় পাশ করানো হবে না। হুগলীর এই তিনটি কলেজে এই প্রদেয় উৎকোচের পরিমাণ মাথাপিছু পনের থেকে তিরিশ টাকার মধ্যে। বেয়ারাদের মারফৎ এই টাকাটা সংগ্রহ করা হয় এবং সংশ্লিষ্ট অধ্যাপকেরা তার ভাগ পান। শুধুমাত্র ওই টাকা দিতে অস্বীকার করার অপরাধে কয়েকজন মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীকেও প্রাকটিকাল পরীক্ষায় ফেল করানো হয়েছে। অথচ তাদের অ্যাকাডেমিক কেরিয়ার অত্যন্ত উৎকৃষ্ট। মনে আছে, আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন কোন কোন ফাঁকিবাজ ছাত্র রসায়ন বিভাগের বেয়ারাকে দু'-একটা টাকা দিয়ে তাদের কাছ থেকে মিশ্রণের কনস্টিট্যুয়েন্টগুলো জেনে নিত। সেটা ঘটত অধ্যাপকদের অজ্ঞাতেই এবং তার পরিসর ছিল একান্ত সীমাবদ্ধ। কিন্তু কালক্রমে সেই দুর্নীতির প্রসার ঘটেছে, অধ্যাপকবর্গও মধুর স্বাদ পেয়েছেন এবং বিষয়টি এখন বাধ্যতামূলক হয়ে গেছে। এই কলেজ অধ্যাপকেরা অধঃপতিত হয়েছেন, সজ্ঞানে দুর্নীতি করছেন, ছাত্রদের হুমকি দেখিয়ে তাদের কাছে পয়সা আদায় করছেন, এই অভিযোগগুলির জবাবে অধ্যাপকসমাজ কি বলবেন?

বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষকগণের প্রাইভেট টিউশন

বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীর পরীক্ষা ব্যাপারে দুর্নীতির কথা নানাভাবে ইদানীং আলোচিত হচ্ছে। এইসব দুর্নীতির মূল একটি কারণ আলোচিত হয় নি। তা হল, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকগণ কর্তৃক প্রাইভেট টিউশন করা। খুব কম সংখ্যক শিক্ষকই এ কাজ করে থাকেন, তা সত্য, কিন্তু কিছুসংখ্যক শিক্ষকের কাজের জন্য বাকি শিক্ষকদের অযথা সন্দেহের অধীন হতে হচ্ছে। অবশ্য এ-বিষয়টি প্রমাণ করা কঠিন, কারণ যাঁরা টাকা নেন তাঁরা প্রমাণ রেখে টাকা নেবেন না। কিন্তু যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষকমহলে একটু খোঁজ নেওয়া যায়, তাহলেই দেখা যাবে, ব্যাপারটি সকলেরই জানা এবং ছাত্ররা অধিকাংশই খুবই অভিযোগের সঙ্গে ব্যাপারটির উল্লেখ করে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনি অবশ্য নতুন কিছু নয়, অতীতে "কর্তাদের" আমলে কর্তাদের পুত্রদের জন্য বহু বিখ্যাত পুণ্যশ্লোক শিক্ষক নিযুক্ত হতেন, এমন শোনা গেছে।

প্রাইমারী থেকে পোস্ট গ্রাজুয়েট পর্যন্ত সর্বশ্রেণীতেই প্রাইভেট টিউশন বিষময় ফল আনছে। তবে এ সকলের মধ্যে পোস্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশনিকেই আমরা অক্ষমণীয় অপরাধ মনে করি বিশেষ কারণে। আন্ডার গ্রাজুয়েট ক্লাসের অধ্যাপকদের সাধারণত প্রশ্ন করতে দেওয়া হয় না, কারণ তাঁরা যথেষ্ট বিশ্বাসযোগ্য নন, তাঁরা হয়ত নিজ কলেজের ছাত্রদের বা প্রাইভেট টিউটর ছাত্রদের কাছে প্রশ্ন ফাঁস করতে পারেন। নিজ কলেজের ছাত্রদের খাতাও তাঁরা দেখেন না। পোস্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষকেরা এ সবের অতীত ধরে নেওয়া হয়। তাঁরা কোনমতে দুর্বলতার অধীন নন এবং তাঁরা টিউশনি করেন না—অন্তত যাতে না করেন তার জন্য তাঁদের বেশি মাইনে দেওয়া হয়। পোস্ট গ্রাজুয়েট শিক্ষকেরা তাই যে ক্লাসে পড়ান, সেই ক্লাসেরই প্রশ্ন করেন, এবং খাতা দেখেন। বাকি প্রশ্ন অধিকাংশক্ষেত্রে তাঁদের সহকর্মীরা করেন। মডারেটররূপে কেউ কেউ আবার সকল প্রশ্ন জানার অধিকারী। এক্ষেত্রে যদি এই সব শিক্ষক টিউশনি করেন, এবং যদি তাঁরা তাঁদের ব্যক্তিগত ছাত্রদের ভালো করার ইচ্ছা করেন, তাহলে সরাসরি প্রশ্ন বলে, প্রচুর নম্বর বাড়িয়ে দিতে পারেন। সহকর্মীদের প্রভাবিত করে বাকি পেপারের নম্বরও বাড়িয়ে দেওয়া আশ্চর্য নয়। এখানে উল্লেখযোগ্য—এতাবৎকাল ক ল কা তা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ, এম-এসসি খাতায় কোনো স্ক্রুটিনি হত না, (ডঃ সত্যেন সেন এবছর তার ব্যত্যয় করেছেন)। কিন্তু এখনো এই শ্রেণীতে কোনো হেড এগজামিনার নেই।

বিশ্বাস করে এতখানি দায়িত্ব যাঁদের ওপর দেওয়া হয়েছে—তাঁরা যদি প্রাইভেট টিউশনি করেন, তাঁদের সঙ্গে ভেজালদার, ঘুষখোর প্রভৃতি সাধারণ অপরাধীদের কি পার্থক্য? বিশ্ববিদালয়ের শিক্ষক বিশেষ সম্মানীয় চরিত্র বলে এখনো সমাজে গৃহীত। শিক্ষকগণের সর্বোচ্চ স্তরে তাঁরা স্থাপিত। তাঁরাও যদি অর্থের দাস হন, তাহলে দেশের ভবিষ্যৎ নেই।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে

পশ্চিমবঙ্গ হাসপাতাল কর্মচারী সমিতির সাধারণ সম্পাদক রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের অধীনে কর্মরত নার্সিং স্টাফদের (পদোন্নতির জন্য) বিভাগীয় পরীক্ষার ব্যাপারে অভিযোগ করে আমাদের নিকট এক পত্র দিয়েছেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য পত্রটি সংক্ষেপাকারে প্রকাশ করা হলো :

"১৯৬৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের এক বিজ্ঞপ্তিতে নার্সিং স্টাফদের জানানো হয় যে, পাঁচ বৎসর যাবৎ যাঁরা উক্ত পদে কাজ করেছেন, তাঁরা (পদোন্নতির জন্য) বিভাগীয় পরীক্ষা দিতে পারবেন। গত ১৯৬৮ সালে জুন মাসে পরীক্ষাও হয়। কিন্তু বেশ কিছু নার্সিং স্টাফকে নাকি এখনও পরীক্ষায় ডাকা হয় নি। এমন কি যাঁরা নাকি সাত-আট বৎসর যাবৎ কাজ করছেন, তাঁদেরও অনেককে নাকি পরীক্ষায় ডাকা হয় নি, অথচ তাঁদের থেকে অনেক জুনিয়রকে এই পরীক্ষায় ডাকা হয়েছে। অভিযোগে আরও প্রকাশ যে, এইসব প্রার্থীদের বাদ দিয়েই নাকি শীঘ্র ফলাফল ঘোষণা করা হচ্ছে। এ ছাড়া যাঁদের এই পরীক্ষায় ডাক হয়েছে, তাঁরাও নাকি লিখিত ছাড়া শুধু মৌখিক পরীক্ষার ফলাফলের ওপর যথেষ্ট সন্দেহ প্রকাশ করছেন। আবার স্বাস্থ্য বিভাগ এ বছর আর এক বিজ্ঞপ্তিতে নার্সিং স্টাফদের জানিয়েছেন যে, তিনবার পরীক্ষায় ফেল করলে আর পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে না।

যে কোনো
উপলক্ষে
অনবদ্য উপহার

ইউবিআই গিফ্‌ট চেক

শুভ পরিণয়, জন্মদিন, নববর্ষ, শারদীয়া পূজা, দেওয়ালি, বড়দিন, ঈদ কি অন্য যে কোনো উপলক্ষে প্রিয়জনকে উপহার দিতে পারেন ইউবিআই গিফ্‌ট চেক। দেখতে ভারি সুন্দর—চেক ও চেকের ফোল্ডার দুটিই নজর কেড়ে নেবে।

ব্যাঙ্কে আপনার অ্যাকাউন্ট না থাকলেও চেকে আপনি সই করতে পারবেন।

এবার থেকে উপহার দিন ইউবিআই গিফ্‌ট চেক।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া লিঃ
রেজিঃ ও হেড অফিস : ৪, নরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত সরণি
(পূর্বতন : ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট) কলিকাতা-১

Asa/UBU9-69 Ben

পশ্চিমবঙ্গে ১১০টিরও অধিক শাখা অফিস আছে

ভারত দর্শন

ভারতের আইন-শৃঙ্খলা

সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় চোখ রাখলে এমন একটা ধারণাই হয় যে, আইন-শৃঙ্খলা নামক ব্যাপারটি যেন ভারতের পূর্বপ্রান্তে একমাত্র ডানা-কাটা বাঙলা-দেশেই অবর্তমান।

ভারত ভূখণ্ডে পশ্চিমবঙ্গ (আগে অখণ্ড বাঙলা) চিরকালই এক আজব জায়গা। ভারতে যা কিছু নতুনত্ব (বোম্বাই-কোমরভাঙা-নাচ ছাড়া), এই বাঙলাদেশই তার জন্মভূমি। আজও বাঙলাকে কেটে-ছিঁড়ে এই 'এতটুকুন' করে ফেলা সত্ত্বেও বাঙলার জল-হাওয়ায় সেই নতুন বরণের নেশায় কিন্তু কিছুমাত্র ছেদ পড়ে নি। ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে সেজন্যই কি পশ্চিমবঙ্গে যা ঘটে, সমগ্র ভারত বাধ্য হয়েই তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দান করে? কারণ হয়ত এই যে, আজ যা বাঙলায়, কাল তা ভারতে অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। ভয়ের কারণ কিন্তু বস্তুতপক্ষে আইন-শৃঙ্খলা-জনিত প্রশ্ন; অর্থাৎ আইন-শৃঙ্খলার অবনতিও যে পশ্চিমবঙ্গেরই একচেটিয়া কারবার; একমাত্র পশ্চিমবঙ্গই যে দুঃস্বপ্নের জন্মভূমি, এমন কথা যাঁরা ভাবেন ও অপরকে একই চিন্তায় ভাবিত করতে চান, তাঁরা ভারতের অপরাপর স্থানে নজর রাখতে আলস্য বোধ করেন সম্ভবত। দৈনিক পত্রেও সেই আলস্যের ছায়াপাত খুব স্পষ্টতই লক্ষণীয়।

দেখছি, পশ্চিম বাঙলার একটা কারখানায় শ্রমিকরা গণ ডেপুটেশনে গেলে দৈনিক পত্রের প্রথম পাতার ব্যানার জুড়ে যেমন সোরগোল ওঠে। যে শিরোনাম, যে স্থান সেই সংবাদের গুরুত্ব জাহির করার জন্য বদান্যতার সঙ্গে বিলি-বন্দোবস্ত হয়ে যায়, খোদ দিল্লীতে শ্রমিক অসন্তোষের ফলে ফাইলপত্র, আসবাবপত্রাদি, এমন কি গৃহাদি ভস্মীভূত হলেও তেমন ভাবে সে-সংবাদকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না।

দিল্লীতে আইন-শৃঙ্খলা

আমি দিল্লীর হিন্দুস্থান হাউসিং ফ্যাক্টরির কথা বলছি। দিল্লীর হিন্দুস্থান হাউসিং ফ্যাক্টরিতে যা ঘটে গেল, তা অভূতপূর্ব। কাশীপুর গান এন্ড শেল ফ্যাক্টরিতেও এমন কাণ্ড হয় নি। কিন্তু তার জন্য সংবাদপত্রে ফলাও প্রচার দূরে থাক, বিস্তৃত সংবাদ পরিবেশনও হয় নি। কেমন একটা আলস্য সংবাদটির গুরুত্বে হেলাফেলা করেছে।

সংবাদের গুরুত্ব সম্পর্কে এই আলস্য ও উত্তেজনা ভারতের 'আইন-শৃঙ্খলা'র প্রশ্নটির গুরুত্ব হ্রাস করে ঐ গুরুতর প্রশ্নটিকেও রাজনীতির প্যাঁচে পিষ্ট করতে চাইছে—এই অবস্থাটি যেমন অসুস্থ, বিকারগ্রস্ত তেমনিই ভয়াবহ। সংবাদ পাঠককে যদি রাজনীতি ব্যবসায়ীরা মূর্খ ভেবে সংবাদ পরিবেশনায় এইভাবে অশ্বডিম্ব প্রসবের আয়োজন করতে থাকেন, তবে সংবাদের প্রতিই মানুষ কোন একদিন বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়বে। তখন কি রাজনীতি ব্যবসায়ীদের সেই মূর্খ রাখালের অবস্থাই হবে না, যে রোজদিন 'বাঘ এসেছে' বলে চীৎকার করে লোক ঠকাতো এবং সত্যিই যেদিন পালে বাঘ পড়ল তখন কেউ তার পাশে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এল না।

পশ্চিমবঙ্গের হয়ে ওকালতি করার জন্য এ বক্তব্য নয়. সংবাদ নিয়ে যে মূর্খ রাখালের খেলা চলছে, তার প্রতি সতর্ক হওয়ার জন্যই এতো কথা।

এইবার আসা যাক হিন্দুস্থান হাউসিং ফ্যাক্টরির প্রশ্নে। দেখা যাক সেখানে যে সংবাদ তৈরি হয়েছে তার গুরুত্ব কতখানি।

ফ্যাক্টরির শ্রমিক-কর্মচারীরা কর্তৃপক্ষের মজুরী-কর্তন নীতির বিরুদ্ধে পয়লা জুলাই বিক্ষুব্ধ হয়ে জনৈক ফোরম্যানকে মারধোর করবেন বলে শাসিয়ে দেন। সংবাদে প্রকাশ, পরদিনই অর্থাৎ দোসরা জুলাই তাঁরা একটি গেট মিটিং-এর আয়োজন করেন। উদ্দেশ্য, শ্রমিকরা কাজে ঢিলা দিয়েছেন, এই অজুহাতে কর্তৃপক্ষ যে মাহিনা কর্তন করেছেন, তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের প্রকাশ।

বলা বাহুল্য, কর্তৃপক্ষ পুলিশ তলব করেন। অর্থাৎ সংঘর্ষকে আহবান করা হয়। পুলিশ আসে, কিন্তু অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যায়। ক্ষিপ্ত শ্রমিকের দল জোটবদ্ধভাবে তাঁদের বিক্ষোভকে ইষ্টক বর্ষণের মাধ্যমে রূপদান করেন। দেখতে দেখতে কারখানা সংলগ্ন দ্বিতল অট্টালিকায় আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। হু হু করে পুড়ে ছাই হয়ে যায় যাবতীয় বিষয়াদি সহ দ্বিতল ভবনটি। দুটি মোটরগাড়ি, একটি স্কুটার ও তিনটি সাইকেলও বহ্ন্যুৎসবের ধ্বংসলীলার শিকার হয়েছে। কয়েক মাস ধরে শ্রমিকমনে যে পুঞ্জীভূত বিক্ষোভ দানা বাঁধছিল আইন-শৃঙ্খলার প্রয়োগনৈপুণ্য দেখাতে গিয়ে কর্তৃপক্ষ তারই চরমতম বিস্ফোরণের আয়োজন করলেন। পুলিশ তার কর্তব্য ভালই পালন করেছে বলে ধারণা হওয়ায় কর্তব্যরত পুলিশ অফিসারটিকে হাজার টাকা পুরস্কার দানের ঘোষণাও ঐ সংক্ষিপ্ত সংবাদের কলেবর বৃদ্ধি করেছে সংবাদের উপসংহারস্বরূপ।

'রাহুগ্রস্ত' পশ্চিমবঙ্গে নয়, এই ঘটনা খোদ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হল। যেমন. সাধু-বিক্ষোভ দিল্লীর বুকে বিভীষিকার রাজ্য সৃষ্টি করেছিল কিছুকাল আগে।

প্রশ্ন হল, এমন করে আগুন নিয়ে খেলা হল কেন? যাঁরা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ধারক-বাহক, তাঁরা এতোবড় একটা ঘটনায় কী বাক্‌রুদ্ধ হয়ে গেলেন? আইন-শৃঙ্খলা কি কেবলমাত্র একটা 'তোতা বুলি', বিশেষ ক্ষেত্রে পান থেকে চুন খসলেই তার অবনতি দেখা দেয়? আর অন্যত্র ওসবের বালাই না থাকলেও চুপ করে থাকতে হয়?

স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে, আইন ও শৃঙ্খলা নিয়ে কর্তাদের আদৌ কোন মাথা ব্যথা নেই। মাথা ঘামছে রাজনীতির ময়লা জমে। লক্ষণ অসুস্থ, আর সাধারণ মানুষ প্রকৃত আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্নে সত্যিই বিভীষিকাগ্রস্ত।

তেলেঙ্গানায় আইন-শৃঙ্খলা

আইন-শৃঙ্খলা বলতে তেলেঙ্গানায় প্রায় কিছুই ছিল না। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ রেড্ডী নাচার হয়ে যখন পদত্যাগ করলেন তখন আইনের রক্তচক্ষু প্রদর্শিত হতে থাকলেও শৃঙ্খলা রক্ষা একেবারেই অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু তার জন্য কিছুমাত্র বিচলিত বোধ করেন নি। যতদূর এবং যতদিন সম্ভব গদি আঁকড়ে ছিলেন। চুলোয় যাক

আইন-শৃঙ্খলা, এই মনোভাব নিয়েই। আজও তাঁর পদত্যাগপত্র কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ড গ্রহণ করে উঠতে পারেন নি। পারবেন না তা আগেই জানা ছিল এবং আমরাও সেকথাই বলেছিলাম। এখন সরেজমিন তদন্তে হায়দ্রাবাদ যাচ্ছেন নিজলিঙ্গাপ্পা আর কামরাজ। কিন্তু এতদিন জল ঘোলা করার পর এখন সাফ জানা যাচ্ছে, তেলেঙ্গানার স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবি কিছুতেই মানা যাবে না। অর্থাৎ রেড্ডীরই জয় এক হিসেবে সূচিত হল। কিন্তু যদি এমনই ধনুকভাঙা পণ তখন দৃঢ়হাতে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা কি প্রথম থেকেই কর্তব্য ছিল না! ব্রহ্মানন্দকে নিয়ে রাজ্য কংগ্রেসের বিক্ষোভে কার পাল্লা কতখানি ঝোঁকে এই ধোঁকা পরিষ্কার করে জেনে নেওয়ার জন্য রাজ্যবাসীর ওপর অত অশান্তি এতোকাল চাপিয়ে রাখা হল কেন? ব্রহ্মানন্দ ঢের আগেই সরে দাঁড়াতে পারতেন। আজ যদি স্বতন্ত্র তেলেঙ্গানা সৃষ্ট না হলেও শৃঙ্খলা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়, তবে বুঝতে হবে এতোদিনের আইন-শৃঙ্খলা সেখানে কেবলমাত্র একটি ব্যক্তির মর্যাদার খেলায় দিনের পর দিন অবনমিত করা হয়েছে। লক্ষ লক্ষ টাকার জাতীয় সম্পত্তি বিনষ্ট হয়েছে, আর কয়েকটি অমূল্য প্রাণ সে খেলায় বলিপ্রদত্ত হয়েছে।

ভারতে আইন-শৃঙ্খলা এমনই এক

আজব বস্তু। একটিমাত্র লোকের জিদ বজায় রাখার জন্য যাকে অনায়াসেই শিকেয় দেওয়া যায়, আবার বুভুক্ষু মানুষ তার রুটি চাইলে সেই আইন-শৃঙ্খলা গোল্লায় গেল বলে চীৎকার করতে বাধে না। সুতরাং এই আজব চীজ কোথায়ও আছে কি নেই এ প্রশ্নের মীমাংসা আঞ্চলিক পরিস্থিতির ওপর নির্ভরশীল নয়। রাজনীতির ঘোরপ্যাঁচে আইন-শৃঙ্খলার অস্তিত্ব সম্পর্কেই আমরা সচেতন হই মাত্র।

রাজস্থানে আইন-শৃঙ্খলা

২৭শে জুন রাজস্থানের হিন্দউন শহরে আঞ্চলিক দাবির প্রতি প্রশাসনিক অবহেলার দরুণ বিক্ষোভ অগ্নিমূর্তি ধারণ করে। ২৬শে জুন টেলিফোন-যোগে বিক্ষুব্ধ নাগরিকবৃন্দের তরফ থেকে সতর্কীকরণ করা হয়। ছাত্রদের দাবি শহরের একমাত্র মাধ্যমিক স্কুলটিকে উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের মর্যাদা দিতে হবে। শহরবাসীর দাবি, শহরের হেল্থ সেন্টারে একের স্থলে আরও অন্তত দুজন চিকিৎসক নিয়োগ করতে হবে এবং শহরবাসীর জন্য জল সরবরাহ পরিকল্পনাটির আশু রূপায়ণ ত্বরান্বিত করতে হবে।

দাবিগুলি একান্ত সাধারণ। একটি শহরের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটানোর দাবি বই আর কিছু নয়। কিন্তু সেই সামান্য চাহিদাও পূর্ণ করতে প্রশাসন অক্ষমতা প্রদর্শন করে আসছে। স্বভাবতই বিক্ষোভ স্বতঃস্ফূর্তভাবে শহরকে গ্রাস করে ফেলে। সংবাদে প্রকাশ, কয়েকদিন ধরে সারা শহরে শুধু অগ্ন্যুৎসব, কাঁদানে গ্যাস, পুলিশের লাঠি ও গুলী এবং বিক্ষোভ চলছিল। দুজনের প্রাণ হরণও করেছে কর্তব্যব্রত পুলিশ (দিল্লীর মতো পুলিশের জন্য এখানেও পুরস্কার ঘোষণা হয়েছে বলে অবশ্য সংবাদ নেই)। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ, নামে ১৪৪ ধারা জারি করা হলেও কার্যত কারফিউ-ই যেন বলবৎ হয়েছিল। শহরের সমস্ত দোকানপাট বাজারহাট বন্ধ। এমন কি, পান-সিগারেটও ছিল দুর্লভ বস্তু। সমস্ত শহর শত্রুবাহিনীর দ্বারা অধিকৃত মৃত নগরীর মতোই খাঁ-খাঁ করছিল। কেবল বন্দুকধারী পুলিশের বুটের ও ভ্যানের আওয়াজই ছিল একমাত্র শ্রোতব্য। মানুষের কলতান স্তব্ধ হয়ে গেছল।

আর ধ্বংসলীলা? শহরের স্থানে স্থানে টেলিফোনের ছিন্ন তার পোস্ট অফিসের পোড়া কাগজপত্র, সরকারী দপ্তরের অর্ধদগ্ধ ফাইল স্তূপীকৃত হচ্ছিল। টেলিফোন ভবনটিই দগ্ধায়িত করা হয়েছে। হিন্দউন শহর রাজ্যের অপরাপর স্থান থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

অথচ এই এতো কাণ্ড ঘটে গেলেও আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্নে আদিল্লী কোথাও কেউ উদ্বিগ্নবোধ করেন নি। সংবাদ সংবাদপত্রের ভেতরের পাতায় এক জাবড়া বিজ্ঞাপনের আড়ালে আত্মগোপনের চেষ্টা করেছে।

কিন্তু শহরবাসীর দাবি কি এমনই অপূরণীয় আকাশ ছোঁয়া আকাঙ্ক্ষা ছিল। একটিই মাত্র স্কুল। তাও স্থানীয় নাগরিকদের উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত। তাঁরাই চাঁদা তুলে তার মনোনয়নের যথোচিত ব্যবস্থা করেছিলেন। কেবলমাত্র অনুমোদন।

হায়, এই সামান্য দাবির কণ্ঠরোধ করার জন্য আইন-শৃঙ্খলার কী বাহাদুর ব্যবহার। কিন্তু রাজস্থানে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে কোন মোড়ল বা নেতা হাহাকার করেন নি। আমরা তাই অত কাণ্ডের খবর অনেকেই রাখি না।

বিহারে রাষ্ট্রপতি শাসন

বস্তুতই রাগ করেছেন ১১৫ দিনের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হরিহর সিং, গোঁসা হয়েছে রাজ্য কংগ্রেসী নেতৃত্বের। কারণ? কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বিহারে পুনরায় কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠনের যৌক্তিকতা স্বীকার করেন নি। হরিহরের হাতে আবার মুখ্যমন্ত্রীর ঘরের চাবিটি দিতে এলেও সে চাবি গ্রহণ করায় বাদ সেধেছেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

হরিহরের রাগ যে কেমন জ্বালাময় তা প্রশ্নোত্তরকালে হরিহর সিং-এর ভাষাতেই প্রকাশ পেয়েছিল।

প্রশ্ন ছিল: মন্ত্রিত্ব করতে গিয়ে আবার যদি দল ভাঙে, মন্ত্রিসভা ভাঙে, কী করবেন?

হরিহর ক্ষুব্ধ হয়ে জবাব দিয়েছেন: দল ভাঙবে কি-না এ গ্যারান্টি কি কেন্দ্রই দিতে পারেন।

বস্তুত, প্রথমবার মন্ত্রিসভা গঠনের কালেও যেমন এখন গঠন করতে চাওয়ার কালেও তেমনি হরিহর সিং কিসের গ্যারান্টিতে মন্ত্রিসভা গঠন করতে যাচ্ছেন জানেন না। জানতেন না, নয় দিনের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভোলা পাশোয়ান শাস্ত্রীও। শাস্ত্রীকে জনসঙ্ঘের পছন্দ হয় নি। সমর্থন প্রত্যাখ্যান করতেই শাস্ত্রী-মন্ত্রিসভা পড়ে গেছে। হরিহরও না হয় আর একবার পড়তেন। আর মাঝে পড়ে শোষিত দল, ঝাড়খণ্ড, হুল ঝাড়খণ্ড দলগুলির মতো দ্রুত 'মেঝে-বদল' এক্সপার্টবৃন্দ এ পাল্লায় ও পাল্লায় চড়ে নিজেদের পাল্লা ভারী করে তোলার সুযোগ পেতেন।

কেন্দ্রের সুবুদ্ধি বলতে হবে, হরিহর সিং-কে একই খেলার পুনরাবৃত্তির সুযোগ তাঁরা দেন নি, বলেছেন এমনটা হতে থাকলে কংগ্রেসের ইমেজ রাজ্যে মলিনতর হয়ে পড়বে। কিন্তু হরিহর এবং রাজ্য কংগ্রেস নেতৃত্ব এই বাস্তব অবস্থা স্বীকার পেতে নারাজ। তাঁরা সেই শোষিত দলের চার, ঝাড়খণ্ডের নয়, হুল ঝাড়খণ্ডের পাঁচজনকে দলে নিয়ে স্বতন্ত্র, বি কে ডি, নির্দলদের হাত ধরে টলমলে গদিতে আরোহণের জন্য খুবই উদ্ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। অথচ শোষিত আর ঝাড়খণ্ডদের সম্পর্কে হরিহরের তিক্ত অভিজ্ঞতা কিছু কম নয়। এঁদের জন্যই তাঁর প্রথম মন্ত্রিসভার পতন ঘটেছিল। এক-একবার মন্ত্রিসভা পতনে এঁরা আরও কিছুটা গুছিয়ে নেওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন, আর সেজন্যই রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তনের তীব্র সমালোচনায় এঁরা এখন সোচ্চার। কিন্তু কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব চান সাময়িকভাবে রাষ্ট্রপতি শাসন চাপিয়ে সুবিধাভোগী ভগ্নাংশ দলগুলির কাছে স্থায়িভাবে কংগ্রেসকে সমর্থন করার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিতে।

কিন্তু বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভোলা পাশোয়ান শাস্ত্রী যথার্থই উপলব্ধি করেছেন যে, এই মুহূর্তে রাষ্ট্রপতির শাসনই একমাত্র সুস্থ সমাধান। কেন না রাজ্যের গণতান্ত্রিক আবহাওয়া পর্যুদস্ত। এখন মধ্যবর্তী সময়ে সম-মনোভাবাপন্ন দলগুলির একত্র হয়ে স্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ এলো। এই সুযোগ যথাযথ গ্রহণ করতে দলগুলি অক্ষম হলে, দীর্ঘকাল রাষ্ট্রপতির শাসনই বিহারের ঘাড়ে চেপে বসবে।

বিহার রাজ্যে এমন একটি অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন ছিল। ১৯৬৭-র পর মহামায়ার যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভাই অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকাল স্থায়ী। এর মেয়াদ ছিল মাত্র নয় মাস পঁচিশ দিন। দল ভাঙানিয়ারা রাজ্যবাসীকে পথে বসিয়ে রাজনৈতিক ব্যবসায়ে নেমেছিলেন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের মতো কঠোর ভাবায় ভোটবাক্সে তাঁদের সমুচিত জবাব বিহার দিতে পারেন নি। ফলত রাষ্ট্রপতির শাসনও দুবার পাশোয়ান মন্ত্রিসভা ও একবার হরিহর সিংয়ের স্বল্পকালস্থায়ী মন্ত্রিসভার লম্ফ-ঝম্ফ রাজ্যের সমস্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে কলুষিত করেছে। আর সেইভাবে কলুষিত করার সুযোগ করে দিয়েছেন বিহারের জনসাধারণ। অতঃপর ভোটদানের গুরুত্ব যদি তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন, তবেই বিহারে একদিন সুস্থ কোন গণতান্ত্রিক মন্ত্রিসভা পত্তন হতে পারে, নচেৎ রাজ্যবাসী রাজনীতি ব্যবসায়ীদের দাবার ছকে অসহায় দুর্বল 'বড়ে'র মতোই নির্জিত হবেন।

(৫।৭।৬৯)

আন্তর্জাতিক

ইজরায়েল ।

রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ইজরায়েলের আচরণের কঠোর নিন্দা করেছে।

জর্ডান অভিযোগ করেছিল, ইজরায়েল জেরুজালেম শহরটিকে পুরোপুরি গ্রাস করার কাজ সুরু করেছে। ইজরায়েল সৃষ্টির পর থেকে জেরুজালেম শহর দুই ভাগে বিভক্ত রয়েছে—এক অংশের ওপর ইজরায়েলের দখল থাকলেও, অপর অংশটি আরবদের। কিন্তু ১৯৬৭ সালের জুন যুদ্ধে ইজরায়েলী সৈন্যরা জোর করে আরব-জেরুজালেম দখল করে নেয় এবং দুই অংশের সীমানাস্বরূপ দেয়ালটি ভেঙে ফেলে। বারে বারে দাবি জানানো সত্ত্বেও ইজরায়েলী সৈন্য এই এলাকার ওপর দখলদারী ছাড়ে নি। বরং নানাভাবে ইজরায়েলী সার্বভৌমত্ব বিস্তারের চেষ্টা হয়েছে।

এখন ইজরায়েল স্থির করেছে, ইজরায়েল সরকারের সকল মন্ত্রিদপ্তর বর্তমান রাজধানী তেল আভিভ থেকে সরিয়ে জেরুজালেম শহরে নিয়ে আসা হবে। তা ছাড়া, জাতীয় পুলিশ-বাহিনীর সদর দপ্তর ইতিমধ্যেই এখানে স্থাপন করা হয়েছে, একেবারে বলতে গেলে আরব এলাকার মধ্যে। নিশ্চিতভাবে ইজরায়েল সরকার জেরুজালেমের স্বীকৃত আন্তর্জাতিক মর্যাদা অস্বীকার করে এই ঐতিহাসিক শহরটির ওপর নিজেদের পূর্ণ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপন করতে চায়। আরবদের কোন অধিকারই তারা মানতে চায় না।

নিরাপত্তা পরিষদের কোন সদস্যই ইজরায়েলের এত বড় অন্যায়কে সমর্থন করতে পারেন নি। চতুঃশক্তির সবাই এই কাজের নিন্দা করেছেন।

নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন প্রতিনিধি চার্লস ইয়স্ট বলেন: ইজরায়েলের পক্ষে পূর্বেকার আইন-কানুন, প্রশাসন পরিবর্তন করা চলবে না। ব্রিটেনের লর্ড ক্যারাডন বলেছেন: ইজরায়েল যদি এই কাজ করে, তবে শান্তির সকল সম্ভাবনা নষ্ট হবে এবং নতুন করে গোলযোগ সুরু হবে। ফ্রান্সের আরমাঁদ বেরারড্ বলেছেন: কোনরকম পরিবর্তন করা হলে, তা সম্পূর্ণ বে-আইনী হবে। সোভিয়েট য়ুনিয়নের অ্যালেক্সি ভাকারফ বলেছেন: বিশ্বের সকলের উচিত, ইজরায়েলকে অস্ত্র-সরবরাহ বন্ধ করা।

আরব-ইজরায়েল বিরোধ মীমাংসার জন্য নিউইয়র্কে বৃহৎ চতুঃশক্তির মধ্যে যে আলাপ-আলোচনা সুরু হয়েছিল, বর্তমানে তা বন্ধ রয়েছে। স্থির হয়েছে, এই বিষয়ে একবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট য়ুনিয়নের নেতাদের মধ্যে উচ্চপর্যায়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হবে। তারপর আবার চতুঃশক্তি আলোচনা সুরু হবে। সম্ভবত আগামী মাসে এই আলোচনা হবে।

তবে জেরুজালেমের প্রশ্নে চতুঃশক্তি নিরাপত্তা পরিষদে একযোগে ইজরায়েলের নিন্দা করায় দেখা যাচ্ছে, এই ব্যাপারে এদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কিছুটা সমতা এসেছে।

ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গোল্ডা মেয়ার এতে খুবই ক্ষুব্ধ। তাঁর বক্তব্য, সবাই মিলে ইজরায়েলের বিরোধিতা করছে। তাই এদের কারও মধ্যস্থতা মানতে ইজরায়েল প্রস্তুত নয়।

২রা জুলাই আলজিরিয়া, নেপাল, পাকিস্তান, সেনেগাল ও জাম্বিয়া একযোগে নিরাপত্তা পরিষদে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে। প্রস্তাবটির মূল বক্তব্য: (১) জেরুজালেম গ্রাস করার/অপচেষ্টার জন্য ইজরায়েলকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করতে হবে; (২) যতক্ষণ পর্যন্ত ইজরায়েল আরব-জেরুজালেম ফিরিয়ে না দিচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিশ্বের কোন রাষ্ট্র ইজরায়েলকে কোন প্রকার সামরিক অস্ত্র সরবরাহ করবে না; এবং (৩) আরব-জেরুজালেম ফিরিয়ে দেবার জন্য ইজরায়েলকে এক মাস সময় দেওয়া হবে—তার মধ্যে যদি ইজরায়েল এই কাজ না করে তবে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পশ্চিমী গোষ্ঠী ইজরায়েলকে নিন্দা করতে রাজী হলেও এতটা কড়া প্রস্তাব তাদের মনঃপূত হয় নি। তাই প্রস্তাব-উত্থাপকদের ওপর চাপ পড়তে লাগল। শেষ পর্যন্ত সংশোধিত আকারে ৩রা জুলাই নিরাপত্তা পরিষদের সম্মুখে আবার প্রস্তাবটি এল। কিন্তু প্রস্তাবের সুর নরম হওয়ায় আলজিরিয়া ও নেপাল সরে দাঁড়িয়েছে। এবার উত্থাপক পাকিস্তান, সেনেগাল ও জাম্বিয়া।

প্রস্তাবে জেরুজালেম গ্রাসের চেষ্টার জন্য ইজরায়েলকে কড়া ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে এবং জেরুজালেমের পূর্বাবস্থা ক্ষুণ্ণ করে এ পর্যন্ত যা যা করা হয়েছে, তা বাতিল করার জন্য ইজরায়েলকে বলা হয়েছে। তা ছাড়া এই প্রস্তাবে আরও বলা হয়েছে, ইজরায়েলের প্রকৃত উদ্দেশ্য কি তা জানাতে হবে। এ ব্যাপারে যদি কোন সদুত্তর বা আদৌ কোন উত্তর অবিলম্বে না পাওয়া যায়, তবে নিরাপত্তা পরিষদ আবার বসবে এবং ইতিকর্তব্য স্থির করবে।

প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। প্রস্তাবের নিন্দা-অংশটির ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্যান্যের সঙ্গে ভোট দেয়। কিন্তু, অপর ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভোটদানে বিরত থাকে। আফ্রো-এশীয় গোষ্ঠী ও সোভিয়েট য়ুনিয়নের কাছে প্রস্তাবের বয়ান পুরোপুরি ভাল না লাগলেও তারা সবাই একে সমর্থন করেছে। ইজরায়েলের বিরুদ্ধে সবাই মিলে একটা বক্তব্য রাখা গেল ত'!

তবে ইজরায়েল থোড়াই পরোয়া করে নিরাপত্তা পরিষদের এই প্রস্তাবের। এ পর্যন্ত কোন ধমক, কোন নিন্দা-প্রস্তাবেই সে আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ থেকে বিরত হয় নি। এবারও হবে না।

ইজরায়েলের সহকারী প্রধানমন্ত্রী ইগাল আলোন নিরাপত্তা পরিষদের আলোচনারই বিরোধিতা করেছেন। জেরুজালেমের ব্যাপার একান্তভাবে ইজরায়েলের নিজস্ব ঘরোয়া ব্যাপার। এ ব্যাপারে নিরাপত্তা পরিষদের খবরদারির অর্থ তাদের 'আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ' করা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র:

রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিকসন বিশ্ব সফরে বের হবেন।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় যে পাঁচটি দেশে নিকসন যাবেন, সেগুলি হল: ফিলিপাইনস, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যাণ্ড, ভারত ও পাকিস্তান। তাছাড়া তিনি যাবেন রুমানিয়া।

নিকসনের প্রস্তাবিত এই সফর নিয়ে বিভিন্ন মহলে আলোচনা সুরু হয়েছে। যে-কোন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান অন্য দেশে সফরে যেতে পারেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিও পারেন। গিয়েও থাকেন। এর মধ্যে বিশেষ গুরুত্ব কি আছে?

নিকসনের এশীয় সফর প্রসঙ্গে মনে করা হচ্ছে, এই অঞ্চলের রাজনীতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে এখনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে চায়, প্রস্তাবিত সফর সে-কথাই প্রমাণ করছে। মার্কিন যুক্ত-

রাষ্ট্র বর্তমানে এই অঞ্চলের অন্যতম প্রধান শক্তি, এই অবস্থা সে অব্যাহত রাখতে চায়। ভিয়েতনাম থেকে যদি তাকে চলেও যেতে হয়, তবু সামগ্রিকভাবে

নিকসন

এশিয়া থেকে তাকে বিদায় নিতে হবে না। চীনের প্রভাববৃদ্ধি রোধের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই এলাকায় কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে চায়।

কিন্তু হঠাৎ রুমানিয়া যাবার ইচ্ছা হল কেন নিকসনের? সরকারিভাবে দুই দেশ থেকেই এই সফরের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। পূর্ব য়ুরোপের অন্যতম কমিউনিস্ট রাষ্ট্র রুমানিয়া সোভিয়েট নেতৃত্ব মানতে প্রস্তুত নয়। চীন-সোভিয়েট দ্বন্দ্বে সে নিরপেক্ষ। কমিউনিস্ট রাষ্ট্র-জগতে রুমানিয়া অনেকখানি স্বাধীন।

তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রুমানিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে চায়। রুমানিয়ার মারফৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব য়ুরোপে প্রবেশ করতে চায়। নানাভাবে সাহায্য করে যদি রুমানিয়ার শক্তিবৃদ্ধি করতে পারে, তবে পূর্ব য়ুরোপের অন্যান্য কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের মধ্যেও স্বাধীনভাবে চলার ইচ্ছা জাগবে। রুমানিয়ার সঙ্গে ওঠা-বসার ফলে সোভিয়েট য়ুনিয়নের ওপরেও চাপ পড়বে। সোভিয়েট য়ুনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় পৌঁছবার জন্য উদ্যোগী হবে।

অনেকে আবার এমন কথাও ভাবছেন, চীনের সঙ্গে একটা আলোচনা-সুরু করার সূত্র বের করার জন্যই নিকসন রুমানিয়া যাচ্ছেন। রুমানিয়ার সঙ্গে চীনের মোটা-মুটি ভাল সম্পর্ক আছে।

যাই হোক, রুমানিয়ার রাষ্ট্রপতি ও কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক নিকোলাই সোসেসকু রিচার্ড নিকসনের সঙ্গে আলোচনার জন্য অপেক্ষা করছেন। হয়তো তার আগেই সোভিয়েট নেতৃবৃন্দ লিওনিদ ব্রেজনেভ ও অ্যালেক্সি কোসিগিন রুমানিয়া যাবেন সোসেসকুর সঙ্গে কথা-বার্তা বলার জন্য। নিকসনের সফর সম্পর্কে তাঁরাও চিন্তিত।

পশ্চিম জার্মানী:

ডঃ গুস্তাভ হাইনেমান পশ্চিম জার্মানীর তৃতীয় রাষ্ট্রপতিরূপে কার্যভার গ্রহণ করেছেন ১লা জুলাই তারিখে। গত ৫ই মার্চ তারিখে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

গুস্তাভ হাইনেমান পশ্চিম জার্মানীর প্রথম সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রপতি। এর আগে রাষ্ট্রপতি ছিলেন হাইনরিখ লুবকে। তিনি প্রধানমন্ত্রী জর্জ কিসিঞ্জারের দল ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক য়ুনিয়নের নেতা ছিলেন। কিন্তু এবারের রাষ্ট্রপতি গুস্তাভ হাইনেমান সোস্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির নেতা। এই দলের প্রধান নেতা হলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলি ব্রান্ড্ট। কিসিঞ্জারের প্রার্থীকে নির্বাচনে হারিয়ে হাইনেমান রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন।

হাইনেমান ১৯৬৬ থেকে পশ্চিম জার্মানীর আইনমন্ত্রী ছিলেন।

১লা জুলাই পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষে উদ্বোধনী ভাষণ দিতে গিয়ে হাইনেমান বলেছেন, শান্তি, নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র-নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রয়াস চালিয়ে যেতে হবে।

পশ্চিম জার্মানীকে পরমাণু অস্ত্রে সজ্জিত করার যে চেষ্টা চলছে, নতুন রাষ্ট্রপতি গুস্তাভ হাইনেমান তার ঘোরতর বিরোধী। তিনি স্পষ্ট বলেছেন, পরমাণু অস্ত্র সংক্রান্ত কোন বিলে স্বাক্ষরদান করার চেয়ে তিনি পদত্যাগকেই শ্রেয় বলে মনে করেন।

কেনিয়া:

আফ্রিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নেতা টম এমবয়া আততায়ীর গুলীতে মারা গেছেন।

কেনিয়ার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা মন্ত্রী ৩৮ বৎসর বয়সের যুবক টম এমবয়া ৫ই জুলাই নাইরোবির গভর্নমেন্ট রোডে এক ওষুধের দোকান থেকে বের হবার সময় অজ্ঞাত আততায়ীর দ্বারা গুলীবিদ্ধ হন। হাসপাতালে পৌঁছতে পৌঁছতেই তিনি মারা যান। এমবয়ার মৃত্যুতে কেনিয়ার সর্বত্র গভীর শোকের ছায়া নেমেছে। অন্যান্য দেশেও লক্ষ লক্ষ মানুষ শোকে অভিভূত।

জনপ্রিয় নেতা এমবয়াকে অনেকেই জোমো কেনিয়াট্টার উত্তরাধিকারী বলে মনে করতেন। ১৯৬০ সালে যখন কেনিয়া আফ্রিকান ন্যাশনাল য়ুনিয়ন বা 'কানু' দলের জন্ম হয়, তখন থেকে টম এমবয়া এই দলের সাধারণ সম্পাদক। স্বাধীনতা আন্দোলনে তিনি অংশ গ্রহণ করেছেন। কেনিয়াট্টার অত্যন্ত বিশ্বস্ত সহকর্মী তিনি।

১৯৫৭ সালে এমবয়া প্রথম আইন পরিষদের সদস্য হন। স্বাধীনতার সময় ১৯৬৩ সালে যখন কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়, তখন তিনি শ্রমমন্ত্রী হন। পরে ১৯৬৪ সালে কেনিয়া প্রজাতন্ত্র হলে তিনি হন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা দপ্তরের মন্ত্রী। প্রগতিশীল ও আধুনিক চিন্তাধারায় বিশ্বাসী, সৎ ও দক্ষ কর্মী টম এমবয়ার অভাব সহজে পূরণ হবে না।

এই হত্যাকাণ্ডের পেছনে কি কারণ আছে, তা এখনও জানা যায় নি। নেহাৎ কোন ব্যক্তিগত আক্রোশ, না গভীর কোন রাজনৈতিক কারণ রয়েছে এই ব্যাপারের পেছনে, তা খুঁজে বের করার জন্য অভিজ্ঞ য়ুরোপীয় গোয়েন্দাদের নিয়োগ করা হয়েছে। (৬-৭-৬৯)

সদ্য প্রকাশিত হইল!

বহুকাল পরে পুনর্মুদ্রণ

সায়ন মাধবাচার্য্য বা বিদ্যারণ্য মুনি বিরচিত

বেদান্ত-গ্রন্থ

বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহঃ

বেদান্ত শাস্ত্রের একখানি অতীব দুরূহ ও উপাদেয় গ্রন্থ

অনুবাদক

পণ্ডিতপ্রবর প্রমথনাথ তর্কভূষণ

মূল্য চার টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা ১২

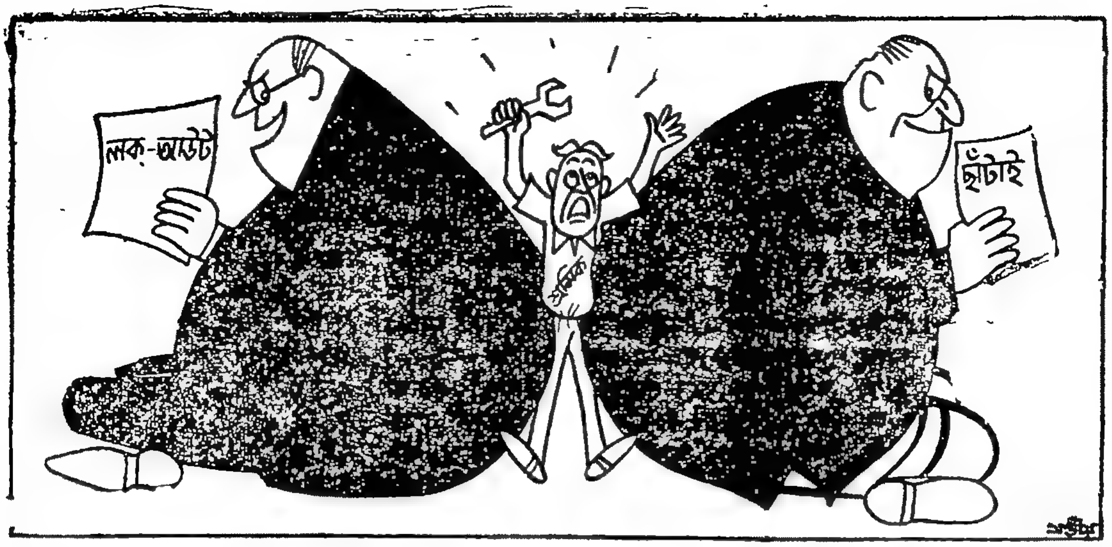

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

অবশেষে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও যুক্তফ্রন্ট ঘেরাও মুক্ত হতে চলেছেন। ঘেরাও সম্পর্কে রাজ্যের যুক্তফ্রণ্ট সরকারের কি নীতি হবে সেই সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার নিজেরাই অস্থির চিন্তা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের অক্ষমতায় ঘেরাও হয়ে পড়ছিলেন। যা-হোক গত যুক্তফ্রন্টের সভায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় একটা সূত্র দিয়েছেন এবং সেই সূত্র মোটামুটি সকলে মেনে নিয়েছেন বলা যায়। সেই নীতি হল, ঘেরাও নিষিদ্ধ করাও নয় আবার ঘেরাওকে উৎসাহ দেওয়াও নয়—তবে ঘেরাও যাতে না হয়, তার জন্য তিন পক্ষের সালিশী ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এই কথা সত্য, ঘেরাও প্রশ্নটা নিয়ে যুক্তফ্রন্ট খুবই বিব্রত অবস্থায় পড়েছিল—কারণ রাজ্যের যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির চিন্তা-দর্শনে যে ফারাক আছে, ঘেরাও সম্পর্কে নীতি গ্রহণে সেই ফারাক ধরা পড়ছিল নগ্নভাবে। যুক্তফ্রন্টের মার্ক্সবাদী চিন্তা, গান্ধীবাদী চিন্তা, সুভাষবাদী চিন্তা, শিবদাস ঘোষপন্থী চিন্তা এবং আরো অনেক চিন্তার প্রকাশ ঘটছিল। প্রকৃতপক্ষে ঘেরাও নিয়ে একটা আইনের কচকচি সৃষ্টি হচ্ছিল, সেটা ক্রমেই বাস্তব অবস্থা থেকে অনেক দূরে চলে যাচ্ছিল। ঘেরাও সম্পর্কে গত সংখ্যার 'সপ্তাহের বোঝায়' আলোচনা করেছিলাম। খুবই গর্ব ও আনন্দের কথা এই যে, গত সপ্তাহে ঘেরাও সম্পর্কে প্রাথমিক যে নীতির আভাস দেওয়া হয়েছিল, যুক্তফ্রন্টে গৃহীত নীতির সঙ্গে তার মিল প্রায় হুবহু। এই কথার উল্লেখ এই কারণে করা হল যে, কৃত্তিবাস ওঝা কোন নীতিপন্থী রাজনৈতিক পণ্ডিত নন, শ্রমিক সমস্যা বা মালিকদের সমস্যা সম্পর্কে তার কোন জ্ঞান নেই, কিন্তু একজন সাধারণ জ্ঞানের মানুষ হিসাবে সমস্যাকে যেভাবে দেখেছি ও যেভাবে তার সমাধানের সূত্র খুঁজেছি—সেটাই প্রায় একই আকারে যুক্তফ্রন্টের নীতিতে দেখা গেছে। আমার কাছে ঘেরাও হল একটা সামাজিক ব্যাধি, কাজেই তার নিরাময়ও হবে সমাজ সংস্কারের মধ্যে। ঘেরাও মানে জবরদস্তি, ঘেরাও মানে কারো ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণ, ঘেরাও মানে অন্যায়ভাবে কাউকে পীড়ন—কাজেই এই কাজগুলি কখনও সমর্থনযোগ্য হতে পারে না, এই কথা গান্ধীবাদীদের কাছেও সত্য, মার্ক্সবাদীদের কাছেও সত্য বা অন্য কোন উগ্রপন্থীদের কাছেও সত্য। আবার একইভাবে সত্য শক্তিশালী দুর্বলের ওপর অত্যাচার করবে না, কারো ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করবে না, শ্রমের উপযুক্ত মূল্য না দিয়ে শোষণ করবে না। এই নীতিগুলি কারো পক্ষেই অগ্রাহ্যের নয়, অস্বীকারেরও নয়। কাজেই এই নীতির আলোকেই ঘেরাও-এর বিচার হওয়া উচিত। কোন সমস্যাকে চাপা দিয়ে রেখে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করার মত বোকামী নেই। ঘেরাও সম্পর্কেও এই এককথা বলা যায়। ধামা-চাপা দেওয়া নয়—সমস্যার জট গোড়া থেকে উৎপাটন করা দরকার। মালিকরাও যেন বুঝতে পারেন তাঁদের করণীয় কি। আর শ্রমিকরা যেন বুঝতে পারে তাদের করণীয় কি। তা যদি না হয়, তবে আজ হয়ত সাময়িকভাবে ঘেরাও-এর সংখ্যা হ্রাস পাবে, কিন্তু কাল নতুন ইস্যু নিয়ে আবার প্রকটভাবে তা দেখা দেবে। যেমন এখনই বলা যায় আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই শ্রমিকদের বোনাস পাবার সময় আসছে—এই বোনাস সম্পর্কে যদি শ্রমিক-মালিক-সরকার এখন থেকে কোন সুস্থ নীতিতে না অগ্রসর হন, তবে আগামী দিনে দেখা যাবে ঘেরাও বেড়েছে, ক্লোজার বেড়েছে, লক আউট বেড়েছে। তখন আবার নতুন করে পণ্ডিতরা সমস্যার সমাধানে বসবেন, আবার দিকে দিকে হৈ-চৈ পড়বে। যা হোক, যে মূল সমস্যার কথা বলছিলাম, সেই সমস্যাগুলি কিন্তু কোন দর্শন ভিত্তিতে নয় বা কোন গবেষণালব্ধ নয়—এটা হল সাধারণ মানুষের চোখে সাধারণ জ্ঞানের সমস্যা। এই রাজ্যে শিল্পমালিকদের প্রধান সমস্যা কি? সেই সমস্যা হল শিল্প চালু রাখার ক্ষেত্রে উপযুক্ত অর্ডারের অভাব ও কারখানা চালু রাখার উপযুক্ত মালের অভাব। কাজেই যে মালিক শ্রমিকদের উপযুক্ত পাওনা দিয়ে বা শিল্পক্ষেত্রে শান্তি বজায় রেখে কারখানা চালু রাখতে চান, তাঁকে মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে হয় কাঁচা মালের কথা বা ভারত সরকারের কাছে পাওয়া মালের কথা। কাজেই এই সমস্যাটা সবার ক্ষেত্রেই মোটামুটি সমান। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পপতিরা কেমন যেন একটা অচ্ছুৎ ব্যবহার পান কেন্দ্রীয়

শিল্প-বাণিজ্য ও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের কাছ থেকে। অন্যান্য রাজ্যের শিল্পপতিরা কোন একটা লাইসেন্স পেতে বা কোন একটা ভারত সরকারের সরবরাহ-যোগ্য মাল পেতে যে সহযোগিতা পান, পশ্চিমবঙ্গের শিল্পপতিরা সেই সহযোগিতা পান না। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটাকেই ভিন্ন নজরে দেখার কারণে রাজ্যের শিল্পপতিরাও কেন্দ্রের কাছে সতীনের ছেলে হয়ে পড়ছেন। পরোক্ষে কেন্দ্রের কয়েকজন মন্ত্রী ক্রমাগত পশ্চিমবঙ্গের শিল্পপতিদের নিরুৎসাহ করেন আর উৎসাহ দেন পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে অন্য রাজ্যে শিল্প-কারখানা স্থাপনে। এটা একটা গুরুতর সমস্যা। একজন শিল্পপতিকে যদি সর্বদা মন্ত্র দেওয়া হয় যে, তোমার শিল্প-কারখানা বাংলা দেশ থেকে সরিয়ে অন্যত্র আনলেই ভাল ব্যবহার পাবে, তবে সেই শিল্পপতি কেন পশ্চিমবঙ্গের মাটি কামড়ে থাকবে? পশ্চিমবঙ্গের অনেকগুলি একচেটিয়া শিল্প অন্য রাজ্যে তাদের শাখা স্থাপন করে কেন্দ্রের কাছে ভাল ব্যবহার পেয়ে ক্রমেই উৎসাহ পাচ্ছেন এখানকার কারখানা গুটিয়ে সেই ভিন্ন রাজ্যে চলে যাবার। এটা যে একটা কঠিন রোগ, সেটা মনে রাখা দরকার। সেই দিক দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের দুর্ভাগ্য হল এই যে, পশ্চিমবঙ্গ থেকে যাঁরা কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আছেন, তাঁরা বাংলা দেশের এই সামগ্রিক স্বার্থের কথা বেশি ভাবেন না। প্রকৃতপক্ষে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, শ্রী কে সি নিয়োগীর পর—যাঁরাই পশ্চিমবঙ্গ থেকে গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রিদপ্তর পেয়েছেন, তাঁরা সর্বদা মন্ত্রিত্ব রক্ষার জন্য হয় কিল খেয়ে কিল হজম করেছেন, অথবা শিমুল ফুল বনে গেছেন। যে ফুলের শোভা আছে—কিন্তু না আছে গন্ধ, না লাগে পুজোয়। অতি সাম্প্রতিক কালের ঘটনা স্যাক্সবি ফারমার নিয়ে আমাদের শ্রীপরিমল ঘোষ রেলমন্ত্রী শ্রীরামসুভগ সিংহের কাছে যেভাবে বেইজ্জৎ হলেন বা বাংলা দেশের স্বার্থ রক্ষা করতে যেভাবে মুখরা মেয়েমানুষের মুখঝামটা খেলেন, আর সব কিছু মুখ বুঝে সহ্য করলেন, তারপর আর কি বলা যায়! প্রকৃতপক্ষে গত বিশ-বাইশ বৎসরে দুইজন মন্ত্রী ছাড়া বাংলা দেশের স্বার্থ বিপন্ন দেখে কোন বাঙালী কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কখনও টুঁ-শব্দটি করেন নি। একজন ডাঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—যিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেছিলেন। অপরজন শ্রীঅশোক সেন—তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করেন নি, আসামে বাঙালী নির্যাতনের ঘটনায় ও উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ব্যাপারে কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ ব্যবহারের বিরুদ্ধে বাংলা দেশের মনের কথা সাহসভরে বলেছিলেন ও প্রতিবাদধ্বনি তুলেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের শিল্পে কেন্দ্রের বিমাতৃসুলভ আচরণ হোক অথবা অন্য কোন ঘটনায় হোক আমাদের বাঙালী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা সব অপমান, অন্যায় ব্যবহার, বৈষম্যমূলক আচরণ নীরবে সহ্য করে নিজেদের পদ ও গদি রক্ষা করে দিন কাটান। বাংলা দেশ সম্পর্কে আজ সারা ভারতে অপপ্রচারে কান পাতা যায় না, সে ঘেরাও নিয়েই হোক, রবীন্দ্র সরোবর নিয়েই হোক অথবা অন্য যে কোন ইস্যুতেই হোক। কেউ সম্প্রতি কোন দিন কি শুনেছেন যে, বাংলা দেশের বাঙালী মন্ত্রী—একজন বাঙালী হিসাবে তার প্রতিবাদ করেছেন অথবা অপপ্রচারের বিরুদ্ধে কিছু বলছেন। শুনলে হয়ত অনেকে অবাক হবেন যে, বাংলা দেশের বাইরে সকলে জানে কলকাতায় সন্ধ্যার পর রাস্তায় কোন মহিলা বেরুতে পারে না, কোন স্বামী তার স্ত্রীকে নিয়ে বেরুতে পারে না, কারণ বেরুলেই টেনে নিয়ে যাবে। এটা গল্প কথা নয়—দিল্লী থেকে কেউ কলকাতা আসবার আগে আমাদের অনেক মন্ত্রী ও লোকসভা সদস্যকেই স্ত্রীকে নিয়ে যাওয়া ভাল কি মন্দ সেই সম্পর্কে পরামর্শ করে থাকেন ও উপদেশ নিয়ে থাকেন। কথাটা এই কারণেই বললাম যে, কলকাতায় স্ত্রীকে নিয়ে রাস্তায় বের হওয়া মানে স্ত্রীকে হারানো—এই যেমন প্রচার, একই প্রচারের শিকার শিল্পক্ষেত্রে, অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গে শিল্প মানেই ঘেরাও, শিল্প মানেই অরাজকতা।

যাক আবার গোড়ায় ফিরে আসি।

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পপতিদের ওপরের সমস্যা ছাড়া আরো কিছু মানসিক সমস্যাও আছে, যার সৃষ্টি হয়েছে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ভীতিতে। খোঁজ নিলে দেখা যাবে, কলকাতার কোন শিল্পপতি কোন দিনই দুটো-তিনটের বেশি আর অফিসে বসেন না, সকাল সকাল এসে সকাল সকাল কাজ সেরে ফিরে যান, তার কারণ হল—কে জানে যদি কোনদিন কোন কারণে ঘেরাও হয়ে পড়ি। আর ঘেরাও হলে পুলিশ পাব না। আগে এই ভয় কখনও ছিল না, কারণ পুলিশ চলত মালিকের হুকুমে। মালিকরা আগে চলতেন যে কোন ট্রাফিক আইন অগ্রাহ্য করে, আজ আর সেভাবে চলতে পারছেন না। যেমন রাস্তায় মোটর চালাতে গিয়ে একটা মানুষ চাপা পড়লে সেটা খুন হয় না, হয় দুর্ঘটনা—মালিকরাও শ্রমিকদের ওপর তাদের যে কোন অন্যায় অত্যাচারকে এই দুর্ঘটনার বেশি মূল্য দিতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু আজ এই মূল দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের সময় এসেছে। একটা কথা ভুললে তো কারো ভাল হবে না যে, আমরা বাইশ বছর স্বাধীন হয়েছি, মানুষের স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন নাগরিকত্বের মনোভাব বেড়েছে। কিন্তু আমরা অনেকেই এখনো মনটাকে বন্ধক রেখে দিয়েছি সেই ১৯৩৭-৩৮ বা '৪৪-'৪৫ সালের চৌহদ্দিতে। বেলঘরিয়ায় একটা কারখানায় একদা একজন লেবার অফিসার একজন শ্রমিক নেতাকে বন্দুক নিয়ে তাড়া করলো, শ্রমিক নেতা প্রাণরক্ষায় পুকুরে ঝাঁপ দিল, সেই পুকুরে গুলী করে সেই শ্রমিক নেতাকে হত্যা করা হল—আর তারপর সেই বন্দুকধারী দিব্যি সুন্দর সুখী জীবন ভোগ করতে লাগলো। কিন্তু আজ? আজ যদি এই জাতীয় ঘটনা ঘটে, তবে তার পরিণতি কি হবে? অথচ সেই পরিণতিকে যদি কেউ বলেন—এটা বড় অন্যায়, সরকার কেন শ্রমিকদের পক্ষ নিচ্ছে, তাহলে সেটা কি ঠিক বলা হবে? শিল্প কারখানায় বে-সরকারী দূরে থাক, কাশীপুর কারখানায় খোদ কেন্দ্রীয় রিজার্ভ ফোর্স গুলী করেও রেহাই পেল না। শুধু রেহাই না পাওয়া নয়, পশ্চিমবঙ্গ থেকেই রিজার্ভ ফোর্স সরিয়ে নেবার দাবি উঠেছে। আবার কেউ বা বলতে পারেন এটা বুঝি শুধু পশ্চিমবঙ্গের পক্ষেই সত্য। তা নয়, পাঞ্জাব সরকারও আওয়াজ তুলেছে—কেন্দ্রীয় রিজার্ভ ফোর্স দূর হটো। পরিস্থিতি হল এই। শ্রমিকদের ক্ষেত্রে অবস্থা হল তাদের প্রত্যাশা বেড়েছে, তাদের অধিকার বোধ বেড়েছে, তারা তাদের পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিতে শিখেছে, সংঘশক্তি বেড়েছে। এটার কোনটাই কিন্তু কোন স্বাধীন

দেশের পক্ষে অপমান নয়। কিন্তু অনেকের কাছেই এটাই দুঃসহ হয়ে পড়ছে—দুর্ভাগ্য সেইখানে।

পশ্চিমবঙ্গে কমপক্ষে দশটা কারখানা আছে—যার মালিকরা শ্রমিকদের পাওনা পয়সা না দিয়ে, এমন কি তাদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকাটা পর্যন্ত না দিয়ে কারখানা বন্ধ করে বসে আছে। এমন অনেকগুলি কারখানা আছে—যেখানকার শ্রমিকরা ৮।১০ মাস মাইনে পান না, কিন্তু মালিক কারখানায় তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। এই ক্ষেত্রে শ্রমিকরা কি করবে? আমরা যারা চাই আইনমাফিক সবকিছু চলুক বা রাজ্যে আইনের শাসন চলায় যেন কোন বিঘ্ন না ঘটে, তারা একবার যদি ভাবি—দশ মাস মাইনে না পেলে একজন ব্যক্তি বা তার পরিবারের অবস্থাটা কি হয়? তবু আমরা যারা কোন অবস্থায় অশান্তি হতে দেব না বলে হাঁকডাক করি, একটু বলতে পারি এই শ্রমিকরা কি করবে? আমরা শান্তিকামী শান্তির পূজারীরা বলব—কেন কোর্টে যাক, মামলা করুক। খুব ভাল কথা। দেশে কোর্ট আছে, কাছারী আছে, ট্রাইব্যুনাল আছে—শ্রমিকদের ন্যায় বিচার পেতে বাধা কোথায়? সত্যি বাধা নেই। কিন্তু মুশকিলটা হল—রায় যখন বেরুবে, তখন রায় শোনার জন্য কেউ আর বেঁচে থাকবে না। কারণ এইসব ক্ষেত্রে মামলা করতে হবে ব্যক্তিগতভাবে, আর এক-একটা মামলা মিটতে সময় লাগবে পাঁচ-সাত বছর। গোরক্ষপুরের একজন অন্ধ শ্রমিক, বালিয়ার একজন মহিলা শ্রমিক মামলা করবে শিল্পপতির বিরুদ্ধে কোর্টে, শুধু নিম্ন আদালত নয়—মালিক যেতে পারেন সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত। ব্যস কোন অশান্তি নেই। দিন আনা দিন খাওয়া মজুর সুপ্রীম কোর্ট পর্যন্ত মালিকের সঙ্গে লড়াই করে পাওনা আদায় করবে—আমরা এই দৃশ্য দেখবো, তাই কোন অশান্তি দেখতে চাই না।

আরো একটা কথা বলা যেতে পারে। যেমন রাজ্যের চেম্বারগুলি যারা মালিকদের সংস্থা, তারা কি এই ব্যাপারে কোন ভূমিকা নিতে পারেন না। তিনটি চেম্বার থেকে সম্প্রতি ঘেরাও সম্পর্কে যুক্ত বিবৃতি দেওয়া হয়েছে—তাঁদের বিবৃতিতে অনেক ভাল ভাল কথা বলা হয়েছে, কিন্তু তাঁরা শুধু বলেন নি যে-সব মালিক বা যারা শ্রমিকদের পাওনা না দিয়ে কারখানা বন্ধ করেছে অথবা শ্রমিকদের প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকা পর্যন্ত দিচ্ছে না, তাদের সম্পর্কে কি ব্যবস্থা করছেন?

কাজেই আজ প্রশ্ন হল শুধু শ্রমিকদের নয়, মালিকদের কিছু করণীয় আছে, করণীয় আছে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের। স্বাধীন দেশের মালিকদেরও একটা কোড মেনে চলতে হবে আর শ্রমিকদের স্বাধীনতা যেমন শুধু ঘেরাও করায় সীমাবদ্ধ থাকবে না—উৎপাদন বৃদ্ধি, শিল্পে শান্তি বজায় রাখার ক্ষেত্রে প্রয়োজন হবে, তেমনি মালিকদের মনে রাখতে হবে যে, বিশ্বের দুই ভাগের বেশি স্থানে শ্রমিকদের রাজত্ব কায়েম হয়েছে এবং সব দেশের শ্রমিকরাই সেই দৃষ্টান্তে উৎসাহী হয়ে নিজেদের প্রত্যাশা গড়ে তুলছে। তাই মালিকদের স্বাধীনতা বলতে শুধু শোষণ, ছাঁটাই, বঞ্চনার স্বাধীনতা নয়—সেই স্বাধীনতার অর্থ শ্রমিককে ন্যায্য পাওনা দিয়ে নিজের পাওনা বুঝে নেওয়া। এই পথের যদি ব্যতিক্রম হয়, তবেই হবে সংঘর্ষ—সেই সংঘর্ষ কত ভয়ঙ্কর হতে পারে তার নিদর্শন দেখা গেছে দিল্লীতে। পশ্চিমবঙ্গে ঘেরাও দেখে যাঁরা চিন্তিত, তাঁরা দিল্লীতে পোড়াও দেখে কি বলবেন জানি না, কারণ দিল্লীর কিছু কর্মচারী কয়েক শত ব্যক্তিকে পুড়িয়ে মারতে চেষ্টা করেছিল। পোড়াও-এর চেয়ে ঘেরাও ভাল—তার চেয়ে ভাল শ্রমিক-মালিকের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা ও সমঝোতার মধ্যে উৎপাদন বৃদ্ধি ও শিল্পে শান্তিরক্ষা। সেই পথে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করাই প্রয়োজন, আর তার জন্য প্রয়োজন মানসিকতার পরিবর্তন। শ্রমিকদের মানসিকতা, মালিকদের মানসিকতার একযোগে পরিবর্তন হওয়া দরকার। একজন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে আর একজন এগিয়ে যাবে—এই নীতি চলতে পারে না। সরকারের নীতি হবে সেই দুইজনকে এক সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাবার। তবেই বন্ধ হবে ঘেরাও, তবেই বন্ধ হবে পোড়াও।

চ্যালেঞ্জ, পাল্টা চ্যালেঞ্জ—

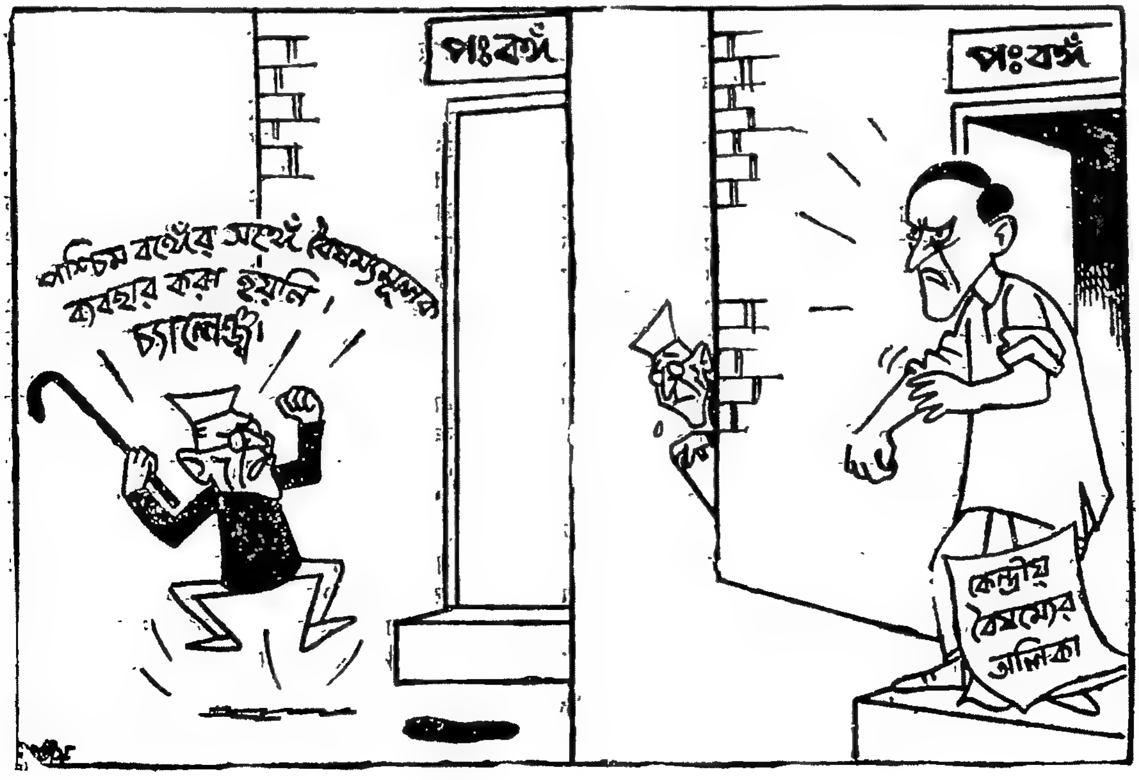

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

মৃত্যুদণ্ড—দ্বীপান্তর হাইকোর্টে আপীল

"অঙ্গীকার ভঙ্গের অপবাদ ইংরেজকে কখনই দেওয়া যায় না"—সরকারী দলিলপত্র সমালোচনা করে আমার লেখায় এ পর্যন্ত যা যা দেখিয়েছি তা পড়ে নিশ্চয়ই সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ বা ইংরেজভক্ত কেউ কেউ আমাকে প্রশ্ন করবেন—"সত্যিই তো, তাঁরা অঙ্গীকার ভঙ্গ করলেন কোথায়? আপনিই তো লিখছেন বৃটিশ মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখতে ঐসব দলিলপত্র আমদানী করে উচ্চমহলের ভারতীয় কর্মচারীদের ও Legislative Assembly প্রভৃতির সদস্যদের কাছে শত্রুর সঙ্গে আপোষ-মীমাংসার ব্যাপারটা ঢাকবার জন্যই নানাভাবে তাঁদের এই প্রচেষ্টা। পর্দার অন্তরালে সরকার যদি তাঁদের নিজ সম্মান বজায় রাখতে ঐরূপ দলিলপত্রের সমাবেশে একটা অভিনয় করেও থাকেন, তবে তা তাঁদের নিজেদের ব্যাপার—তা থেকে তো প্রমাণ হয় না যে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে আমাদের ফাঁসিকাঠে ঝোলাবার জন্য এ তাঁদের গোপন ষড়যন্ত্র।

রাজনীতি ও কূটনীতিকে অত সহজ সরলভাবে দেখতে আমরা অভ্যস্ত নই। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী কুটিলচক্রকে আমরা অন্তত ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের গোষ্ঠী বলে মেনে নেবো না। যদি মনে করি কেবলমাত্র নিজেদের ঘর সামলাবার উদ্দেশ্যেই ঐসব দলিলপত্রের আদান-প্রদান রয়েছে. অঙ্গীকার ভঙ্গের কোনো ইচ্ছে বা জিঘাংসা তাঁদের মধ্যে ছিল না, তবে অন্তর্নিহিত মূল বাস্তব সত্য উদ্ঘাটিত হবে না। ডিরেক্টার অব ইনটেলিজেন্স ব্যুরো—এইচ, উইলিয়ামসনের গভীর অন্তর্ব্যথা কোথায়? ব্যথিত মনের জিঘাংসাবৃত্তি চরিতার্থ করবার জন্য ঐ দলিলে তিনি লিখছেন—

"The remedy in future (there is no remedy applicable to the 12 murdered and unavenged police men and soldiers) is to appoint judges —men who will not flinch from their duty . . ."

প্রতিশোধপরায়ণ মনোবৃত্তির জঘন্যতম রূপটি এই সমস্ত দলিলের মধ্যে এক ফাঁকে প্রকাশ পেয়েছে। সরকারপক্ষীয় বারোজন নিহত ব্যক্তির জন্য সাহেবের মনে বড় ব্যথা! এই একটি লাইন লেখার আগে সাহেবের তো কই মনে পড়ে নি বৃটিশ অত্যাচারে হত ভারতবাসীর সংখ্যা? তাঁর তো মনে পড়ে নি পলাশী-প্রাঙ্গণে তাঁদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা; মনে পড়ে নি সিপাহী বিদ্রোহ দমনে বীভৎস হত্যাকাণ্ড ও জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস নরমেধযজ্ঞ—নিরীহ জনসাধারণের রক্তে রঞ্জিত ভারতভূমির কথা!

সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ প্রতিভূদের কাছে আমরা আশা করি না যে, তাঁরা নিজেদের "কুকীর্তির অমরগাথা" নিজমুখে স্বীকার করবেন। আমার বক্তব্য বৃটিশ কূটনীতিজ্ঞদের এইসব দলিলে আমরা সুস্পষ্টভাবেই দেখতে পাচ্ছি যে, তাঁরা প্রথমত ট্রাইব্যুনাল বিচারে আমাদের ফাঁসি দেবেন না বলে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন; দ্বিতীয়ত দেখতে পাচ্ছি, ফাঁসি না দেওয়াতে উচ্চবিভাগীয় সরকারী কর্মচারী-মহলের সন্দেহ ভঞ্জন করা তাঁদের পক্ষে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে এবং সেই হেতু পর্দার আড়ালে ঘর সামলাতে ঐসব দলিলপত্র ব্যবহার করা হয়েছে; তৃতীয়ত, বারোজন সরকারী পুলিশ ও মিলিটারী কর্মচারী হত্যা অপরাধের হাত থেকে আসামীদের মুক্তি তাঁদের পক্ষে অসহনীয় হয়েছিল। এই কারণেই এ সমস্ত দলিলপত্র দেখে তাঁরা যে কেবলমাত্র ঘর সামলাবার উদ্দেশ্যেই দলিলগুলো ব্যবহার করেছেন এ কথা ভাবলে ভাল হবে।

"সাপও মরুক লাঠিও না ভাঙুক"—এই কূটনীতি প্রয়োগের পূর্ণ প্রচেষ্টা তাঁদের মধ্যে যে ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে এইসব উদ্ঘাটিত দলিলপত্রের মাধ্যমে। ট্রাইব্যুনাল আমাদের ফাঁসি দিল না। ব্যস্! সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ সরকারের অঙ্গীকার রক্ষা হয়ে গেল! এখন যদি হাইকোর্ট নিজস্ব এক্তিয়ারে Revisional Power ব্যবহার করে সাজা বাড়িয়ে দেয় তবে তাঁরা কি করবেন? আর যদি ভারত সরকার "বাংলা সরকারের চুক্তি" অস্বীকার করেন বা Secretary of State for India যদি আমাদের কাছে বাংলা সরকারের "গোপন অঙ্গীকার" মানতে রাজী না হয়ে বাংলা সরকারকে সাজা বৃদ্ধির জন্য হাইকোর্টে আপীল করতে জোর করেন, তবে, এমতাবস্থায় তাঁরা (বাংলা সরকার) কী করবেন! —তাঁরা তো আর অঙ্গীকার ভঙ্গ করছেন না! এই জন্যই দলিলে হাইকোর্টে "own motion-এ Revisional Power" ও সরকারপক্ষ থেকে সাজা বৃদ্ধির আপীলের আইন সংক্রান্ত ব্যাপার

ব্রিটানিয়া গ্ল্যাক্সো বিস্কুট

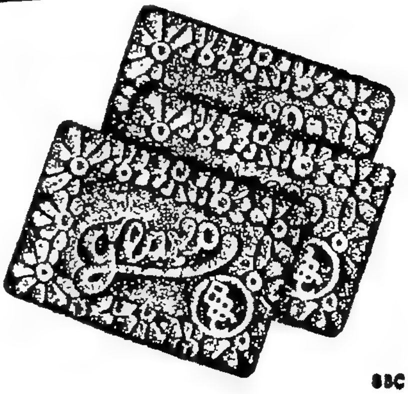

প্রচুর দুধ আর অঢেল পুষ্টিতে ভরা ব্রিটানিয়া গ্ল্যাক্সো বিস্কুট। বাড়ন্ত শিশুদের তো তাই-ই চাই। আপনার বাচ্চার খাবার পুষ্টিকর ক'রে তুলুন—ব্রিটানিয়া গ্ল্যাক্সো বিস্কুট দিন।

ব্রিটানিয়া মানেই সেরা বিস্কুট

BBC 8491

নিয়ে অনেক গবেষণা দেখা যায়। এই সম্বন্ধীয় আইন সংক্রান্ত আলোচনায় গুরুত্বের কোনো অভাব ছিল না। অ্যাড্‌ভোকেট-জেনারেলের শেষ সিদ্ধান্তে তাঁরা যদি জানতে না পারতেন যে, B-C-L-A-Act অনুযায়ী হাইকোর্ট সাজা-বৃদ্ধির সরকারী আপীল গ্রাহ্য করতে পারে না এবং হাইকোর্টের Revisional Power-ও নেই, তাহলে তাঁরা আমাদের ফাঁসি দেওয়ার জন্য হাইকোর্টের সাহায্য নিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করতেন না।

তাঁরা যখন সুস্পষ্টভাবে বুঝলেন যে, আমাদের ফাঁসি দিয়ে এই পরিস্থিতির প্রতিকারের আর কোনো উপায় সরকার-পক্ষের নেই, তখনও কি তাঁরা তাঁদের জিঘাংসাবৃত্তি মেটাবার পথ পরিহার করেছিলেন? যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। সোজা রাস্তায় যদি পারা না যায়, তবে কোনো বক্রপথেও কি এই সমস্যার সমাধান নেই? তাঁদের সমস্যা—বারোজন সরকারী পুলিশ ও মিলিটারী কর্মচারীর প্রাণনাশ সত্ত্বেও এই সব হত্যাকারীদের কারও কি ফাঁসি হবে না? বৃটিশ মর্যাদা তাহলে কী চিরকালের মত ধুলায় লুটাবে! না, তা' কোনমতেই ঘটতে দেওয়া যায় না—সরকারী কর্মচারীদের মনোবল অটুট রাখতেই হবে—দোষীদের শাস্তি দিতে হবে—অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের আসামী-দের প্রাণদণ্ড চাইই?

আইনের পথ এ ব্যাপারে একেবারেই রুদ্ধ? পিছনের দরজা দিয়েও কি কোন-মতে হাইকোর্টে মামলা ওঠানো যায় না? দলিলের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ছোট্ট দুটি উদ্ধৃতি এখানে দিচ্ছি। এই দুটি উদ্ধৃতি থেকে আমাদের মামলা অন্য কোনো উপায়ে হাইকোর্টে যাতে ওঠানো যায়, সেই সরকারী চক্রান্তের স্বরূপ স্পষ্টই বোঝা যাবে। প্রথম উদ্ধৃতিতে পাচ্ছি—"....We may let the Bengal Government make the next move."—এই লাইনটি অত্যন্ত ছোট। আগেই তাঁরা বলেছেন বারোটি হত্যার কোনোই প্রতিকার তাঁরা আর দেখতে পাচ্ছেন না! তবু প্রতিকার খুঁজে বার করবার ভার অর্পণ করা হচ্ছে বাংলা সর-কারের ওপর। যদি মনে হয় কেবল আইনের মাধ্যমে বা B-C-L-A-Act-এর সংশোধনী আইন দ্বারা বাংলা সর-কারের হাতে প্রতিকারের ভার ন্যস্ত করা হয়েছে, তবে এর মাত্র আংশিক অর্থই বোঝা যাবে। এই তাৎপর্যপূর্ণ ছোট্ট একটা লাইনের ইঙ্গিত অত্যন্ত গুরুত্ব-পূর্ণ—বাংলা সরকারকে অবাধ অধিকার দেওয়া হচ্ছে যে কোনো প্রকারে প্রতি-কারের ব্যবস্থা করতে। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে দেখছি—"....No right of appeal or application for revision has been given to the Government by any law, in the case of trial under B-C-L-A-Act, section 3 of the B-C-L (supplimentary) Act 1925, gives the right of appeal to a convicted person only."

এই উপরোক্ত অনুচ্ছেদে বাংলা সর-কার একটা ছোট্ট ছিদ্র খুঁজে পাচ্ছেন, যে ছিদ্রপথে প্রবেশ করতে পারলে ভারত সরকার ও বাংলা সরকারের অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। এই নথিপত্রে দেখা যাচ্ছে ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে আপীলের অধিকার একমাত্র "দণ্ডিত আসামী" পক্ষেরই আছে। বাংলা সরকারের হাতে এখন বৈতরণী পার করাবার ভার ন্যস্ত। সরকারের পক্ষে সোজা পথ রুদ্ধ; কাজেই বক্রপথে যদি কোনমতে বাংলা সরকার ফাঁদ পাততে পারেন, অর্থাৎ—আমাদের মামলার কোন একজন দণ্ডিত আসামীকে দিয়ে হাই-কোর্টে আপীলের দরখাস্ত করাতে পারেন, তবে তো অতি সহজেই সরকারের পক্ষে বাজীমাৎ করা সম্ভব।

সরকার যখন এই দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করবার জন্য আমাদের কাউকে দিয়ে হাইকোর্টে আপীলের দরখাস্ত করাবার সুনিপুণ জাল বিস্তার কর-ছিলেন, তখন আমাদের নিজেদের সম্পূর্ণ অজান্তে কোনো এক অদৃশ্য হস্তের অশুভ ইঙ্গিতে আমরা যেন শত্রুর কাছে প্রায় আত্মসমর্পণ করতে যাচ্ছিলাম।

আগেই লিখেছি, আমাদের সাজা হবার পরে রণধীর, সুবোধ চৌধুরী, আমার দাদা ও আমাকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে রাখা হয়। সেই সময় রণধীরের বাবা-মা, দাদা-বৌদি প্রভৃতি সকলেই কল-কাতায় আসেন। তাঁদের প্রবল ইচ্ছে ট্রাই-ব্যুনাল রায়ের বিরুদ্ধে তাঁরা রণধীরের জন্য হাইকোর্টে আপীলের দরখাস্ত করেন। কলকাতায় থাকাকালীন "জেল-সাক্ষাতের" অনুমতি নিয়ে যতবার সম্ভব তাঁরা রণধীরের সঙ্গে জেলে দেখা করতেন। আমাদের দণ্ডাদেশের পর প্রায় একই সময়ে, আমার বারাও মামলার রায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডহ্রাস ও মুক্তির জন্য হাইকোর্টে আপীল করা যায় কিনা তা' নিয়ে আইনজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করতে কলকাতায় আসেন। সেই সময়কার প্রখ্যাত ব্যারিস্টার শ্রদ্ধেয় বি, সি, চ্যাটার্জী, শ্রদ্ধেয় শরৎবাবু ও অন্যান্য বিশিষ্ট আইনজ্ঞেরা গভীরভাবে বিস্তারিত আলোচনা করে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়ে-ছিলেন—ট্রাইব্যুনাল রায়ের বিরুদ্ধে আমরা কোনমতেই যেন হাইকোর্টে আপীল না করি। তাঁদের সুস্পষ্ট অভি-মত ছিল যে, যদি আমরা হাইকোর্টে আপীল করি, তবে সরকার সেই আপীল করি তবে সরকার সেই দণ্ডাদেশ বাড়াবার চেষ্টা করবেন। এই আইনজ্ঞেরা বাংলা দেশের বৈপ্লবিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে তাঁদের শঙ্কিত অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে, দূরদৃষ্টি রেখে আমরা কোনমতেই যেন হাইকোর্টে আপীল না করি। তাঁদের মতে গুলীবিদ্ধ হিংস্র বাঘের মত হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করতে Bengal Amend-ment Act-এর নতুন ধারা বা একেবারে নতুন Ordinance-এর সাহায্যে সরকার যে কোনো আইন রচনা করে ফাঁসি দেওয়ার অধিকার হাইকোর্টের হাতে তুলে দিতে পারে। কাজেই যে পথে এত সংশয়, সেই পথ তাঁদের মতে সর্বতোভাবে পরিহার করাই উচিত; অতএব আমরা যেন কোনো প্রকারেই হাইকোর্টে আপীল না করি।

অপরদিকে রণধীরের বাবা ব্যারিস্টার বি, সি, চ্যাটার্জীর প্রায় সমপর্যায়ের আর একজন প্রখ্যাত ব্যারিস্টারকে (এঁর নাম আমার এখন মনে নেই) নিয়ে রণধীরের জন্য আপীলের দরখাস্ত করার ব্যবস্থা করছিলেন। এই প্রখ্যাত ব্যারিস্টার ও তাঁর সঙ্গে আরও অনেক বিশিষ্ট আইনজ্ঞরা মিলিত হয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে মত প্রকাশ করলেন যে, হাইকোর্টে আপীল করা অন্যায় হবে না। রণধীরের অভিভাবকদের হয়ত বিশ্বাস ছিল ট্রাইব্যুনাল রায়ের বিরুদ্ধে সাজা বৃদ্ধির অধিকার হাইকোর্টেরও নেই। কাজেই প্রখ্যাত ব্যারিস্টারদের কাছে রণধীরের মুক্তির আশ্বাস পেয়ে এবং এতে অপর কারও ফাঁসি হওয়ার আশঙ্কা নেই জেনে, রণধীরের বাবা রণধীরের মুক্তির আবেদন জানিয়ে হাইকোর্টে দরখাস্ত করাই সাব্যস্ত করলেন।

বেশ মজার কথা! কে তখন জানতো পর্দার অন্তরালে সরকারের এই গভীর দুরভিসন্ধির কথা! কারও জানার কোনো সুযোগ ছিল না যে, সরকার তাঁর প্রতি-শ্রুতি ভঙ্গের জন্য উঠেপড়ে লেগেছেন। কেউ জানতে পারে নি সরকার যে কোনো উপায়ে বারোজন পুলিশ হত্যার প্রতি-শোধ নিতে বদ্ধপরিকর। এই তথ্য তখন আমাদের কাছেও প্রকাশ পায় নি যে, বারোজন পুলিশ হত্যার কোনো প্রতিকার ভাবত সরকারের হাতে নেই বলেই তাঁরা বাংলা সরকারকে প্রতিকারের পথ খুঁজে বার করবার অবাধ অধিকার দিচ্ছেন।

এই সম্পূর্ণ অজানা বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কোন এক রবিবারের সকালে Legal interview দিতে জেল অফিসে আমার ডাক পড়লো। এই Legal interview সম্বন্ধে আমি

আগে কিছুই জানতাম না। তাই ভাবলাম আমার বাবা নিজে উকিল বলেই Legal interview-র জন্য দরখাস্ত করেছেন। কিন্তু জেল অফিসে গিয়ে দেখলাম শ্রদ্ধেয় এ্যাড্‌ভোকেট্ শৈলেশ বিশী আমার সঙ্গে আইন সংক্রান্ত আলোচনা করতে বসে আছেন। তিনি আমাদের মামলার Argument-এর সময় দেশবরেণ্য ব্যারিস্টার বি, এন, শাসমলের জুনিয়ার হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। জেলে তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলাম। আমাদের মধ্যে কুশল বিনিময়ের পর মূল প্রসঙ্গে আসা গেল। তিনিই মূল বিষয়-বস্তুর অবতারণা করে জানালেন ব্যারিস্টারদের মধ্যে দুই দলে দুই মত হয়েছে। এক পক্ষ হাইকোর্টে আপীলের স্বপক্ষে এবং অপর পক্ষ আপীলের বিরুদ্ধে মত পোষণ করছেন।

এইটুকু জানিয়ে তিনি বললেন, তাঁদের মতে, অর্থাৎ বি, এন, শাসমল ও তাঁর মতে, আমার ব্যক্তিগত সাজার বিরুদ্ধে আপীলের যৌক্তিকতা আছে বলেই তাঁরা মনে করেন। তিনি জানালেন —"Test case হিসেবে আপনার case-টা আমরা হাইকোর্টে তুলতে চাই। আপনার বিরুদ্ধে যা' evidence আছে সেটি হচ্ছে আপনার লেখা একটা চিঠি মিঃ লোম্যানকে। আমাদের বিশ্বাস আপীলে আমরা আপনাকে খালাস করে আনতে পারবো.........।" আমি তাঁর কথা শুনে একগাল হেসে বললাম—"যদিও আপনাদের সদিচ্ছাকে আমি প্রশংসা করি ও শ্রদ্ধা জানাচ্ছি, তবে ব্যক্তিগতভাবে আপীলের কোনো ইচ্ছে বা মোহ আমার নেই। তাছাড়া অনিশ্চয়তার মধ্যে এই নিয়ে একটা test-case করে হাইকোর্টে নজির রাখবার বাসনা আমার বিন্দুমাত্রও নেই.........।"

শ্রদ্ধেয় এ্যাড্‌ভোকেট শৈলেশ বিশীর সঙ্গে আমার আইন-সংক্রান্ত আলোচনা এইভাবেই শেষ হোল। আমাকে ভুল বোঝার কোনো অবকাশ আমি তাঁকে দিই'নি এবং আমার বিশ্বাস তিনিও আমাকে ভুল বোঝেন নি। আজ এই সমস্ত উদ্‌ঘাটিত দলিলপত্র দেখে তিনি হয়ত ভয়ে শঙ্কিত হয়ে উঠবেন এই ভেবে যে, তাঁর অজান্তে তিনি কী এক মারাত্মক দায়িত্বের বোঝা নিজ স্কন্ধে তুলে নিতে যাচ্ছিলেন? তাঁর সেই নিদারুণ ভুলের অপূরণীয় ক্ষতি-পূরণের কোনো পথই আর থাকতো না।

আমাদের ব্যাপারে আইনজ্ঞদের দু'টি দলের বিরুদ্ধ মতের সুযোগ নিয়ে বাংলা সরকার প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে তাঁদের বিশ্বস্ত অনুচর মারফৎ আমাদের কাউকে দিয়ে হাইকোর্টে আপীলের দরখাস্ত করাবার জন্য প্রভাব বিস্তার করেছিলেন কী? বাংলা সরকার এই ব্যাপারে একেবারে নিশ্চেষ্ট ছিলেন বলে কখনই মনে হয় না।

মা-বাবা পুত্রের প্রতি স্নেহান্ধ। রণধীর বিত্তশালী ধনী পরিবারের ছেলে। রণধীরের বয়স মাত্র ষোল বছর। পঁচিশ বছরের জন্য যাবজ্জীবন কারা-বাসের দণ্ড হয়েছে তার। এই সুদীর্ঘ দিন ধরে জেলের কঠোর নিষ্পেষণে রণ-ধীরের স্বাস্থ্য কী ঠিক থাকবে? চার-পাশে দেওয়াল ঘেরা জেলে পঁচিশ বছর আত্মীয়-স্বজন, ভাই-বোন, মা-বাবা সকলকে ছেড়ে তাঁদের স্নেহের রণধীর বাঁচবে কি করে? জেলের খাওয়া-দাওয়া ও কঠোর পরিশ্রম তার সহ্য হবে কেন? জেলের ভয়াবহ কঠোরতর চিত্র প্রতি মুহূর্তেই রণধীরের মা-বাবাকে চিন্তিত, উদ্বিগ্ন ও বিচলিত করেছে। কেবল তাঁরাই জানেন কতখানি অসহ্য অন্তর বেদনা নিয়ে তাঁদের দিন কেটেছে। যদিও রণধীর এবং তারই বয়সের আরও দু'জন —সুবোধ রায় ও ফকির সেনকে ট্রাইব্যু-নালের জজ্‌সাহেব পাঁচ বছর দণ্ডকাল উত্তীর্ণ হবার পর মুক্তি দিতে সরকারের কাছে clemency দিয়ে recommend করেছেন, তবু মা-বাবার অশান্ত আকুল হৃদয় অনিশ্চয়তার দিকে তাকিয়ে থাকতে পারে কী? কে জানে সেই clemency সরকার অনুমোদন করবেন কি না—পাঁচ বছর পরে তাদের আদৌ মুক্তি দেবেন কী? কাজেই এই clemency-র কথা মা-বাবার কাছে ভরসা পাবার মত কিছু নয়। তাঁদের কাছে সবচেয়ে বড়—রণধীর —তাঁদের ছোট্ট রণধীর তাঁদের কাছে নেই! বহু বছর—সুদীর্ঘ পঁচিশ বছর তাকে তাঁদের চোখের আড়ালেই কাটাতে হবে। এই সম্পর্কে দিনের ব্যবধানে কত ঘটনাই ঘটে যেতে পারে। সকলে সুস্থ শরীরে বেঁচে নাও থাকতে পারেন—ছেলের সঙ্গে হয়ত আর দেখাই হবে না। এই সমস্ত ভাবনা-চিন্তায় অধীর হয়ে উকিল-ব্যারিস্টারের পরামর্শে তাঁরা মনস্থির করে ফেললেন, কালবিলম্ব না করে যত তাড়া-তাড়ি সম্ভব রণধীরের জন্য হাইকোর্টে আপীলের দরখাস্ত করবেন। তাঁদের এই সিদ্ধান্তের কথা শরৎবাবু, বি সি চ্যাটার্জী প্রমুখ ব্যারিস্টারেরা অবগত হলেন এবং তাঁরা প্রমাদ গুণলেন এই অবস্থায় কি করা যায়—এই আপীলের ব্যবস্থা কিভাবে রোধ করা সম্ভব! একজনের জন্যও যদি হাইকোর্টে আপীল করা হয়, তবে সাজা বৃদ্ধির প্রার্থনা করতে সরকারও পরাঙ্মুখ হবেন না। আমাদের পক্ষের উকিল-ব্যারিস্টারেরা পরামর্শ করে স্থির করলেন যে, আমার বাবা আমার সঙ্গে Legal interview নিয়ে এই জটিল পরিস্থিতি সম্বন্ধে আমাকে ওয়াকিবহাল করবেন। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জেল-অফিসে বাবা আমার সঙ্গে দেখা করে সমস্ত ব্যাপারটা আদ্যোপান্ত আমাকে জানালেন। আমাদের আপীল সংক্রান্ত ব্যাপারে আইনজ্ঞদের দুই দলের মতদ্বৈধতার কথা যা' আমি আগে বর্ণনা করেছি, সেই সম্বন্ধে বাবা আমার কাছে সাবশেষ ব্যক্ত করলেন। তারপর তিনি জানালেন, হাইকোর্টে আপীলের প্রার্থনা রণধীরের পক্ষে বা যে কোনো দণ্ডিত আসামীর পক্ষে তখনই করা সম্ভব যদি সেই দণ্ডিত ব্যক্তি ওকালতনামা সাহ করে কোনো এক উকিলকে হাইকোর্টে আপীলের প্রার্থনা করার ক্ষমতা দেয়। বাবা আরও বুঝিয়ে বললেন—"দেখ্, নন্দলালের (আমার দাদা) মাত্র দু' বছর সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে। দেখতে দেখতে এই সময় কেটে যাবে। তারপর রণধীর, সুবোধ রায় ও ফকির সেনের জন্য পাঁচ বছর দণ্ডকাল অতিবাহিত হওয়ার পর জজ্‌সাহেব তাদের clemency দিতে recommend করেছেন। এই অবস্থায় হাইকোর্টে যদি রণধীরের পক্ষে আপীল করাও হয়, তবু সেই শুনানী সুরু হতেই প্রায় দু' বছর কেটে যাবে। কারণ, হাই-কোর্টে আপীলের শুনানী ওঠার আগে তোদের দু'টি বছরের মামলায় যত সাক্ষ্য-প্রমাণ ট্রাইব্যুনাল-জজ্ লিপিবদ্ধ করেছেন সরকারকে সরকারী প্রেসে সে সমস্তই ছাপাতে হবে। এইগুলি বহু সময়-সাপেক্ষ এবং এতে সরকারী খরচের মাত্রাও কিছু কম নয়। তারপর শুনানী—এবং শুনানীর পরে রায়দানে আরও প্রায় পাঁচ-ছ' মাস লাগবে। ইতিমধ্যে রণধীরদের দণ্ডকালও জেলের আইন অনুযায়ী কয়েক মাস হ্রাস পাবে। এইভাবে হিসাব করলে clemency-র দণ্ডকাল শেষ হতে প্রায় বছর দুয়েকের বেশি বাকি থাকে না। এই সব দিক চিন্তা করে রণধীর আপীল করবে কিনা সেই সিদ্ধান্ত তোরাই নিবি। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে যেভাবে দেশ জুড়ে সংগ্রাম চলেছে—'গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট' কার্যকরী হয় নি, তাতে সরকার আর কি জরুরী আইন পাশ করবে? সমস্ত প্রখ্যাত আইনজ্ঞেরা যখন এইরূপ একটা অনিশ্চয়তার কথা ভেবে কোনমতেই ট্রাইব্যুনাল রায়ের বিরুদ্ধে আমাদের পক্ষে আপীল করে সরকারপক্ষকে কোনোরূপ সুযোগ দিতে ঘোরতর আপত্তি জানাচ্ছেন, তখন আমারও মনে হয় ঐরূপ বিপদের ঝুঁকি তোদের না নেওয়াই উচিত।" বাবা এইটুকু বলে সব বিবেচনার ভার আমাদের ওপর ন্যস্ত করে বিদায় নিলেন।

[ক্রমশ]

শহর কলকাতা

জনগণের রথ

জগন্নাথের রথের রশি আছে। বছরের একটা দিন সারা বছরের অচল রথ টানার হিড়িক পড়ে। কলকাতার জম-জমাট রাস্তায় জগন্নাথের রথও সেদিন নড়ে। দেখবেন, ভক্তরা রশি কেমন টানেন।

আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, তাঁরা ভক্ত নন। বরং বলা যায়, তিক্ত-বিরক্ত। এ'রা রথ টানেন বাধ্য হয়েই। আর তা জগন্নাথের রথ নয়; জনগণের রথ, নামান্তরে স্টেট ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশনের বাস।

অবশ্য রথ টানেন, বলাটা ঠিক নয়, রথ ঠেলেন। কিন্তু আমাদের প্রস্তাবঃ ব্রেক ডাউন যে-হারে শুরু হয়েছে, তাতে সরকারী বাসনামক রথের রশি থাকাই উচিত ছিল এবং যাত্রিসাধারণ সেই রশি সারা বছর টানবেন এই রকম আইন করাও দরকার। রশি টানার পারিশ্রমিক বাবদ আপিসের কর্মীরা 'লেট' হতে পারবেন, শিক্ষকরা বিলম্বে ক্লাসে যাবেন, ছাত্ররা ক্লাসে উপস্থিত না হয়েও উপস্থিত বলে চিহ্নিত হবেন এবং রোগীরা হাসপাতালের আউটডোরে লাইন দেবার আগে কলকাতার কলের জল মারফৎ ওষুধ পাবেন।

আমার মনে হয়, এমন ঘটলে তথাকথিত যাত্রীদের ক্ষোভের কারণ থাকবে না। স্টেটবাস কর্মচারীরা সরকারের কাছে ভরতুকি বাবদ নিয়মিত মাইনে পেলে খুশি থাকবেন। অন্য লাভের কথা, পেট্রোলের জন্য খরচের ঝামেলা থাকবে না। অতএব প্রত্যহ হাজার হাজার গ্যালন পেট্রোল 'বায়বীয়' হবে না। আর সবচেয়ে বড়ো কথা, জনগণের রথের রশি সারা বছর টানা হলে কোনোদিনই স্টেট বাসের ব্রেক ডাউনের ভয় থাকবে না। কলকাতার মানুষ নিশ্চয়ই আমার মতোই হাঁফ ছেড়ে বাঁচবেন।

জবা রঙের জবাব

মহাত্মা গান্ধীর শতবর্ষ পূর্তির আর বিলম্ব নেই। কিন্তু তার আগেই মহাত্মা স্মরণে নানাদিকে নানা আয়োজন।

পার্ক স্ট্রীট ও চৌরঙ্গীর কাছে দু' দণ্ড দাঁড়ালে দেখা যাবে মহাত্মা গান্ধীর মূর্তি। ভাগ্যিস মূর্তির প্রাণ নেই। অবশ্য আমরা মূর্তির প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করি। মূর্তির পূজা করে ধন্য হই।

এদেশে মহাপুরুষরা দেবতার পর্যায়ে পড়েন। নিয়মিত পূজা পান। অধম ভক্তদের তাঁরা বোধ হয়, দেবতার মতোই ক্ষমা করেন। পার্ক স্ট্রীটের কিছু হোটেলে বা 'বারে' গেলেই তার প্রমাণ মেলে। একজন একবার ক্ষোভ করে বলেছিলেন, মূর্তি-টুর্তির বোধ হয় সত্যিকারের চোখ নেই।

চোখ আছেই বা ক'জার। দু' চোখ থাকলেই দৃষ্টিশক্তি থাকবে—এমন কথা কে বলেছে?

পার্ক স্ট্রীট ও চৌরঙ্গীর যোগাযোগস্থল থেকে ধর্মতলার দিকে এগিয়ে এলেই, দৃষ্টি যদি থাকে, চক্ষু চড়কগাছ হবেই। নারীত্বের সম্মান রক্ষা নিয়ে হৈ-চৈ-এর শেষ নেই। ডান ফুটপাত ধরে হেঁটে আসতে আসতে তাকালেই দেখতে পাবেন শো-কেসে একটি নারীমূর্তি, হাতে তার পানপাত্র।

ঐ পাত্র নিশ্চয়ই জলের কিংবা দুধের নয়। আপনাদের মুখের ওপর জবা রঙের জবাব।

আকাশবাণীর 'আষাঢ় এলো'

কলকাতায় গরমে প্রাণ যখন ছটফট করে তখন যদি মনের বৃষ্টির ছিটেফোঁটায় ঠাণ্ডা হওয়া যেত, তাহলে সেই পথই সবাই গ্রহণ করতো।

একটা রেওয়াজ আছে আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে বর্ষা নামুক বা না নামুক তাকে স্বাগত আহ্বান জানানোর। তবে জ্যৈষ্ঠে কলকাতার ফুটপাত ফাটা রোদ্দুরে কেউ 'আষাঢ় এলো' বলে থৈ-থৈ করে নাচে—এমন ঘটনা শুনি নি।

এখন বঙ্গাব্দ কেন্দ্রীয় আপিস থেকে বিদায় নিয়েছে; তার স্থান নিয়েছে শকাব্দ।

১৮৯১ শকাব্দের ২৬শে জ্যৈষ্ঠ আকাশবাণী কলকাতায় রাত সাড়ে দশটায় অনুষ্ঠিত হোলো সঙ্গীতালেখ্য "আষাঢ় এলো।"

তানসেন মল্লার রাগসঙ্গীতে গান ধরে বৃষ্টি নামাতেন, এমন প্রবাদ আছে। আকাশবাণী কলকাতার 'আষাঢ় এলো এলোমেলো হাওয়ায় সেদিন জ্যৈষ্ঠের রাত্রির অন্ধকারে বৃথাই শুধু মাথা খুঁড়লো, মাথা নোয়ালো না।

ক্রেতারা সাবধান

কাঠ চুরি নয়, কাঠি চুরি। দেশলাই-এর কাঠি।

সেদিন এক বন্ধু, মনোহরপুকুর রোডের এক পান-বিড়িওয়ালার দোকান থেকে দেশলাই কেনার অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনালেন।

দেশলাইটা কিনেই তিনি সেদিন পকেটে ফেলে দেন নি। একটা কাঠি ধরাতে গিয়েই দেখেন বাক্সটার অর্ধেক কাঠি উধাও। সেটা ফেরৎ দিয়ে আরেকটা খুলেই দেখেন প্রায় একই অবস্থা।

আমাদের আর এক বন্ধু ঘটনাটা শুনে বললেন, আমি একটা দোকানে প্রত্যেকটা বাক্স থেকে দু'-তিনটে করে খালি বাক্সে ভর্তে দেখেছি।

অতএব সাধু দেশলাই ক্রেতারা সাবধান।

শিশু-সংবাদ

সংবাদপত্রের হেডিংঃ

কলকাতার হাসপাতাল থেকে শিশু নিখোঁজ।

আর একটি সংবাদঃ

শিশু চুরির কাজে নিযুক্ত চার বছরের শিশু।

—শহরদর্শী

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়—কি বাইরের চেহারায় কি জৌলুসে, ঠাটে ঠমকে একেবারে তিলোত্তমা। স্বর্গত বিধানচন্দ্র রায় যে গুটিকয়েক তিলোত্তমা সৃষ্টি করে গিয়েছিলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তার অন্যতম।

তিলোত্তমা ছাড়া কিছু বলা যায় না একে। একদিকে কলকাতার দক্ষিণ শহরতলীর প্রায় ভেঙেপড়া রিফিউজি কলোনীগুলি। সেখানে জলে কাদায় গ্রীষ্মে বর্ষায়, এ'দো পুকুর, কচুরিপানা, মশা আর সাপের ভয়াবহ পরিবেশে ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের জীবনসংগ্রাম আর তার পাশেই বিরাট অঞ্চল জুড়ে মার্কিন অর্থে ও সতর্ক স্নেহদৃষ্টিতে গড়ে-ওঠা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের অত্যাধুনিক স্ট্রিমলাইনড, অভ্রংলিহ অট্টালিকা। এমন পরিবেশে শিক্ষা লাভ করতে না পারলে দেশের ছেলেমেয়েরা দেশকে, জাতিকে, দেশবাসীকে, জানতে বুঝতে শিখবে কেমন করে? এই তো ভারতের আদর্শ শিক্ষানিকেতন!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলে একজন এই ভারতেই জন্মেছিলেন। হাজার কয়েক গান লিখে গিয়েছিলেন তিনি বুড়ো বয়স পর্যন্ত বসে বসে। তাঁরই একটা গানের কলির কথা হচ্ছেঃ

"ভাল মানুষ নইরে মোরা ভাল মানুষ নই
গুণের মধ্যে ওই আমাদের গুণের মধ্যে ওই
দেশে দেশে নিন্দে রটে, পদে পদে বিপদ ঘটে
পুঁথির কথা কইনে মোরা
উল্টো কথা কই।"

উল্টোপাল্টা কথা বলে আত্মসন্তুষ্ট তেল-চুকচুকে বিবেকগুলিকে বিব্রত করা সেই বৃদ্ধ কবির বদ্‌অভ্যাসের মধ্যে অন্যতম ছিল। যে দেশে প্রতি চারজনের মধ্যে তিনজন নিরক্ষর, শিক্ষার প্রশ্নটা সে দেশের জীবনে ফ্যাসান অথবা বিলাস নয়, বাঁচা মরার প্রশ্ন। তাই শিক্ষার প্রথম প্রয়োজন বিপুল অর্থব্যয়ে সুদৃশ্য সুন্দর অট্টালিকা নয়—ছাত্র, সৎ শিক্ষক এবং উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক। এই তিন উপাদানকে একত্রে জোগাড় করতে পারলে গাছতলায় বসেও পাঠদান ও পাঠ গ্রহণ করা যায়।

কিন্তু কে কান দেয় রবীন্দ্রনাথের কথায়। সরে যাওয়ার পর বছর বছর পঁচিশে বৈশাখে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে চাদর গলায় দিয়ে কিছু কিছু পুরুষ-পণ্ডিত মেয়েলি গলায় যে আজও রবীন্দ্র প্রশস্তি পাঠ করেন এবং কিছু কপালে চন্দনের টিপ পরা খোঁপায় রজনীগন্ধা জড়ানো মেয়ে যে দুগ্ধপোষ্যের মত আধো আধো উচ্চারণে এখনও, এখনও রবীন্দ্রনাথের গান করে এইটেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক আটাশ বছর আগে মৃত সেই ব্যক্তিটির চতুর্দশ পূর্বপুরুষের পরম ভাগ্য। বাংলা দেশের মতিগতি দেখে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে এটাই যেন তার শেষ কথা। পোড়া কপাল বাংলা দেশের না রবীন্দ্র-

বলবে নয়, ইতিহাস ইতিমধ্যেই বলতে শুরু করে দিয়েছে। জাতীয় আন্দোলনের যজ্ঞাগ্নি থেকে একদা যাদবপুরে জাতীয় বিদ্যানিকেতনের জন্ম হয়েছিল। কিন্তু যেদিন থেকে বিজাতীয় অর্থের দাক্ষিণ্যে নির্ভর করে সেইখানে এই তিলোত্তমাটি এসে হাজির হন সেইদিনই স্থির হয়ে গিয়েছিল এর ভবিষ্যৎ এর চরিত্র। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাটা প্রায় গৌণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং মুখ্য হয়ে উঠেছে এর ঠাট ও ঠমক। সত্যিকার শিক্ষাব্রতী ও বিবেকবান অধ্যাপক-অধ্যাপিকা যে এখানে নেই তা নয়। কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় সামান্যই। অধিকাংশ অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা এ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেই খোঁজেন সেই গবাক্ষটি যেটি গলে উচ্চশিক্ষার নাম করে আটলান্টিকের ওপারে স্বর্গরাজ্য আমেরিকায় যাওয়া যায়। গবাক্ষের সন্ধান পেতেও দেরি হয় না। একটু গদগদ হয়ে উঁকিঝুঁকি দিলেই সাগর পাড়ি দেওয়া যায়। বিদেশ ফেরৎ পণ্ডিত অধ্যাপক গুটি কয় থাকলেও এ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের এমন একটা শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছে যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়টা হয় নাট্যশালা না হয় সম্ভবত রথের মেলা বলে মনে করেন। তাঁদের চালে-চলনে, আচারে-ব্যবহারে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে, এমন কি পাঠদানেও এক মুহূর্তের জন্য একথা মনে হয় না যে, এটা বিশ্ববিদ্যালয় এবং তাঁদের হাতেই ভবিষ্যৎ জাতি গড়ে তোলার ভার।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এই অত্যাধুনিক আদর্শহীনতা কোন্ পর্যায়ে গিয়েছে এবার সে-সম্পর্কে একটা খবর দিই। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন আগে একটি ফেল করা ছাত্রী এসে ভর্তি হয়। ছাত্রীটি যে কোন্ ম্যাজিকের বলে এমন একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারল সেটাই হল প্রথম বিস্ময়। কারণ এই ছাত্রীটিই অপর একটি ইনজিনিয়ারিং কলেজ থেকে প্রায় অধিকাংশ বিষয়ে ফেল

তবু যাই হোক, রূপ গুণ কিংবা অর্থ এর যে কোনটার অথবা কয়েকটির জোরেই মেয়েটি ভর্তি হয়ে গেল যাদবপুরে।

এরপর শুরু হল আসল ভানুমতির খেল্। পরীক্ষার ফল বেরোয় আর দেখা যায় মেয়েটি প্রতিবারই প্রথম স্থান অধিকার করেছে। এ প্রায় কালিদাসের গল্পের মত। মূর্খ কালিদাস তবু বাগদেবীর বরে পণ্ডিত হয়েছিলেন রাতারাতি, কিন্তু যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এই মেয়ে-কালিদাসটি কার বরে এমন পাণ্ডিত্য অর্জন করে রাতারাতি সবাইকে ডিঙিয়ে ফার্স্ট হচ্ছিল?

শেষ পর্যন্ত সেই বিভাগের অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরাই বেড়ালটিকে কান ধরে থলের মধ্য থেকে বের করে দিল। স্বয়ং 'হেড অব দ্য ডিপার্টমেন্ট' এই ভেল্কির রাজা। পরীক্ষার আগে সেই স্নেহধন্য ছাত্রীটিকে তিনিই সমস্ত প্রশ্নপত্র যোগান দিতেন। কেলেঙ্কারি প্রকাশ হয়ে পড়ার পর ভাকে ঢাক ঢাক করে চাপা দেওয়ার জন্য সেই অধ্যাপককে দিয়ে শেষ পর্যন্ত পদত্যাগপত্র লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে। এরবার সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মুখ ধুয়ে, গোঁফ মুছে একেবারে ভাল মানুষ সেজে বসে আছেন। যেন কিছুই হয় নি অথবা ও কিছু নয়।

খুঁজলে এই তিলোত্তমার সর্বদেহে এমন আরও নোংরা ঘায়ের দাগ পাওয়া যাবে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের কলঙ্কের উপাখ্যান আরও আছে। শিক্ষাদপ্তর যদি একটু তৎপর হন তাহলে জানতে পারবেন, এত অঢেল অর্থ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কোথা থেকে আসে? কে দেয়, কি উদ্দেশ্যে দেয় এবং এর আসল পরিচালক কারা? এ-সবের একটা অনুসন্ধান হওয়ার সময় হয়েছে। অনুসন্ধানে খোঁজ পাওয়া যাবে যে, নামে বিশ্ববিদ্যালয় হলেও এটা আসলে শিক্ষানিকেতন নয়। তারপরই আসবে একে ঢেলে সাজাবার স্বাভাবিক

উইলিয়াম হার্শেল

গোলোকেন্দু ঘোষ

দক্ষিণমেরুর ঊর্ধ্বে যে অজ্ঞাত তারা
মহাজনশূন্যতার রাত্রি তার করিতেছে
সারা,
সে আমার অর্ধরাত্রে অনিমেষ চোখে
অনিদ্রা করেছে স্পর্শ অপূর্ব
আলোকে।
সমুদ্রের মহাপ্লাবী প্রচণ্ড নির্ঝর
মনের গহনে মোর পাঠায়েছে স্বর।

অসীম নীলিমায় যে জ্যোতিষ্ক আলো দেয়, তা কবিকে বিনিদ্র রেখেছে; প্রকৃতি যে মনের গহনে আন্দোলন তোলে তাতে কবি পেয়েছেন সঙ্গীতের স্বাদ। উইলিয়াম হার্শেল সর্বকালের এমন একটি বরেণ্য নাম, যিনি এসেছেন সঙ্গীতের জগৎ থেকে প্রকৃতির পরিমণ্ডলে, জ্যোতির্বিদ্যায়। সঙ্গীত জগতের চিহ্নিত সীমানা পেরিয়ে তিনি পেয়েছিলেন অসীম নীলিমায় পরিব্যাপ্ত সঙ্গীতের স্বাদ। বিজ্ঞানী হার্শেল যেন আর এক কবি, যিনি আমাদের কবির মত শুনেছিলেন সঙ্গীত ও প্রকৃতির ঐকতান।

জার্মানির হ্যানোভার শহরে উইলিয়াম হার্শেলের জন্ম ১৭৩৮ সনের ১৫ই নভেম্বর। মা অ্যানা। পিতা আইজ্যাক হ্যানোভার পদাতিকবাহিনীর 'ব্যাণ্ড'-এর অন্তর্ভুক্ত অন্যতম বাদ্যকর। আর্থিক সঙ্গতি বেশি নয়, তবু সন্তানদের শিক্ষাবিষয়ে যথেষ্ট লক্ষ্য আইজ্যাকের। আইজ্যাক ইহুদী, খৃস্টান; নিজেরও বিভিন্ন বিষয়ে আগ্রহ। সন্তানদের মধ্যে সে আগ্রহ সঞ্চারিত করে দিতে পেরেছিলেন। এরই ফলশ্রুতি—উইলিয়ামের জ্যোতির্বিদ্যায় সাধনা কি না কে জানে। জ্যেষ্ঠপুত্র জ্যাকব, কন্যা ক্যারিলন এবং তৃতীয় সন্তান উইলিয়াম—এদের শিক্ষার ভার আইজ্যাক নিজের হাতে তুলে নিয়েছিলেন। তবে মূলত সে শিক্ষা ছিল সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রের, যাতে জীবিকার জন্যে সন্তানদের উপযুক্ত শিক্ষার অভাব না হয়। হ্যানোভার সামরিক বাহিনীর ইস্কুলে উইলিয়ামের পড়াশোনা। লেখাপড়ায় সাধারণ ছেলেদের চেয়ে তিনি ছিলেন বেশি মেধাবী, বিশেষ করে গণিতে।

উইলিয়ামের স্বভাবে ছিল সঙ্গীতে অনুরাগ। ইস্কুলের পাঠ শেষ করলেন, তখন তাঁর বয়স পনর। হ্যানোভার-বাহিনীর 'ব্যাণ্ড'-এ কাজ নিলেন বেহালাবাদকের; বড় ভাই জ্যাকব কাজ নিলেন বাহিনীর গির্জায় অর্গান বাজানর। আইজ্যাক-পরিবারের অবস্থা এখন অনেক স্বচ্ছল। ছেলেদের ফরাসী ভাষা শেখানর জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করলেন। আইজ্যাকের মত এই শিক্ষক ভদ্রলোকও যেন সাধারণের অতিরিক্ত। নানা বিষয়ে তাঁর জ্ঞান ও আগ্রহ; উইলিয়ামকেও তিনি যেন ভালবেসেছিলেন। পরবর্তী জীবনে উইলিয়াম এই ভদ্রলোকের নিকট কৃতজ্ঞতা সশ্রদ্ধায় স্মরণ করেছেন। কত বিষয়ে আলোচনা, বিশেষ করে সর্ববিষয়-সার দর্শনের আলোচনায় সারা বাড়ি যেন মুখর হয়ে থাকত। সন্তানদের আনুষ্ঠানিক-বিদ্যায়তনের বিদ্যার অভাব ছিল বটে, কিন্তু বিশ্ববিদ্যায়তনের প্রবেশদ্বার উন্মুক্ত করে দিতে সচেষ্ট ছিলেন আইজ্যাক।

জীবন যদি সাধারণ ছন্দে এগিয়ে যেত, কি হত কে জানে। কিন্তু দেশে নেমে এল রাজনৈতিক বিপর্যয়। তার ঢেউ আলোড়ন তুলল এই পরিবারের জীবনে।

ইউরোপে সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতকে জ্ঞানের প্রভাব পরিস্ফুট। নবজাগরণ (রেনেসাঁস) আন্দোলনের ফলে চিন্তারাজ্যের পরিধি অনেক বিস্তৃত। নব নব আবিষ্কারের ফলে ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির জন্যে মানুষের কর্মজগৎ প্রসারমাণ। ষষ্ঠদশ শতকে মুদ্রণযন্ত্র ও মুদ্রণযোগ্য কাগজের আবিষ্কার হয়েছে, ফলে সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষ তখন শিক্ষার আস্বাদন পাচ্ছে। সমুদ্রগামী জাহাজ উন্নত হয়েছে, জাহাজে কম্পাশ ব্যবহারের দরুণ মানুষ এখ পৃথিবীর প্রায়-সর্বত্রগামী। সামরিক প্রয়োজনে বারুদ ব্যবহারের ফলে শাসন-শক্তি অনেক সংহত। জ্ঞান-বিজ্ঞান রাজ্যেও প্রোজ্জ্বলক বর্তিকার সমাবেশ হচ্ছে। লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি ও ইউরোপের বিভিন্ন আকাদমী যেমন, ফ্লোরেন্টাইন সোসাইটি ও ফ্রান্সের ফরাসী আকাদমী গবেষণামূলক কাজে উৎসাহ দিচ্ছে। ভাঙাগড়ার মধ্যে দিয়ে একটা নতুন কল্প রূপায়িত হচ্ছে ইউরোপের মানসমণ্ডলে। ধর্মজগতে আলোড়ন এবং রাজনৈতিক মণ্ডলেও কর্মচাঞ্চল্য দ্রুতবেগ। ফ্রান্সে লুই চতুর্দশের দীর্ঘ বাহাত্তর বৎসর (১৬৪৩—১৭১৫) রাজত্বকাল ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যবহ। সংস্কৃতি ও শিষ্টাচারের শীর্ষে ফরাসী উন্নীত। পরবর্তী দুশ বছর ধরে বিশ্ববাসী তাতে প্রভাবান্বিত হয়েছে। লুই চতুর্দশ ধীরে ধীরে ফরাসীকে সংহত করেছেন এবং সামরিক শক্তির যথেষ্ট বল বৃদ্ধি করেছেন। লুই চতুর্দশ এবং লুই পঞ্চদশ জার্মানিকে খণ্ডবিচ্ছিন্ন করে পদাবনত করে রেখেছিলেন। ফ্রেডারিক দি গ্রেট প্রাসিয়ার সিংহাসনে আরোহণ করে সামরিকবাহিনীকে শক্তিশালী করলেন। সাইলেসিয়া ও অস্ট্রিয়া দখল করলেন।

১৭৫৫ সনে ফ্রেডারিক দি গ্রেট ইংলণ্ডের পক্ষ নিয়ে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। উইলিয়াম হার্শেল এবং তাঁর পিতা ও বড় ভাই এখন জার্মানবাহিনীতে নিযুক্ত। জার্মানির হ্যানোভার পদাতিকবাহিনীকে ইংলণ্ডে পাঠান হল। সেই সূত্রে ওঁরা তিনজন ইংলণ্ডে পদার্পণ করলেন এই প্রথম। যোদ্ধা সৈনিক না হয়েও একটি আক্রমণে ওঁরা যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। বুঝলেন, যুদ্ধ ওঁদের ধাতে নেই। যাই হোক, কয়েক মাসের মধ্যেই পদাতিকবাহিনী হ্যানোভারে ফিরে এল; সেই সঙ্গে ওঁরাও ফিরে এলেন। কিন্তু ফিরে এসেও রেহাই নেই। ফ্রান্সের সঙ্গে প্রাসিয়ার লড়াই। ফরাসীরা হ্যানোভার শহর দখল করতে পারে এমন আশঙ্কা দেখা দিল। সমস্ত সক্ষম ব্যক্তিকে হ্যানোভার সামরিকবাহিনীতে সৈনিকরূপে যোগ দিতে বাধ্য করা হল। উইলিয়াম ও জ্যাকব সামরিকবাহিনীতে যোগ দিলেন বটে, কিন্তু প্রথম সুযোগেই উইলিয়াম পালিয়ে এলেন ইংলণ্ডে, জ্যাকবও অনুসরণ করলেন ছোট ভাইকে।

দুই ভাই ১৭৫৭ সনের নভেম্বরে এসে পড়লেন এক বিদেশী রাষ্ট্রে ইংলণ্ডে, সঙ্গীতবিদ্যার সাহায্যে জীবিকার অন্বেষণে। ইংরেজি ভাষায় উইলিয়ামের জ্ঞান কয়েকটি শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ, তবু উইলিয়াম মনস্থির করে ফেললেন—ইংলণ্ডকেই তাঁর কর্মক্ষেত্র করে নেবেন। ইংলণ্ডকে ভালবেসে ফেললেন বোধ হয়, তাই তাঁর জার্মান নাম ফ্রেডারিক উইলহেলম বদলে

মুক্তোঝরা দাঁত! এ মুক্তো চিরকাল মুক্তোর মতো রাখবে এই টুথপেস্টটি

(বিনাকা ফ্লোরাইড সব বয়সের টুথপেস্ট)

এ গুলিই ওর প্রথম দাঁত। আর একটি নতুন সারি আসবে কিন্তু তার পর দাঁত গেলে তা আর ও ফিরে পাবে না। এখন থেকেই ওকে সু-শিক্ষা দিন। উদাহরণ হয়ে উঠুন ওর কাছে। বিনাকা ফ্লোরাইডকে করে তুলুন ওর, আপনার, সবাইর টুথপেস্ট।

আধুনিক গবেষণা প্রমাণ করেছে যে সব থেকে ফলপ্রসূ ফ্লোরাইড মিশ্রণ সোডিয়াম্-মোনো-ফ্লোরো-ফসফেট (এস্-এম্-এফ-পি) যেটা পাবেন বিনাকা ফ্লোরাইডের মধ্যে-দাঁতের এনামেলের সাথে যোগ দিয়ে তাকে সুদৃঢ় করে ও ক্ষয়শক্তির বিরুদ্ধে তাকে ত্রিবিধ প্রতিরোধ শক্তি দেয়। বর্ণে হিম-নীল, স্বাদে মিন্ট-স্বাদ! বিনাকা ফ্লোরাইড্ শুধুমাত্র একটা টুথপেস্ট নয়, এ ভার নেয় দাঁতের পূর্ণ পরিচর্যার।

CIBA
Cosmetics.

দাঁতের ক্ষয়ের শুরু তখনই যখন এসিডগুলি দাঁতের এনামেলকে ধ্বংস করে ও দাঁতের জীবিত অংশকে বীজাণুর কাছে উন্মুক্ত করে বেদনাদায়ক ক্ষয়-গহ্বর গড়ে তোলে।

বিনাকা ফ্লোরাইডের এস-এম-এফ-পি দাঁতের এনামেলের সঙ্গী হয়ে তাকে এসিডের আক্রমণ প্রতিরোধে শক্তি দেয়।

বিনাকা ফ্লোরাইডের এস-এম-এফ-পি দাঁতের এনামেল-ধ্বংসকারী এসিডের পতন-রোধ করে।

বিনাকা ফ্লোরাইডের এস-এম-এফ-পি দাঁতের এনামেলকে তার প্রাথমিক ক্ষয়ের গ্রাস থেকে সেরে উঠতে সাহায্য করে।

দন্তক্ষয় ও বেদনাদায়ক ক্ষয়-গহ্বরের অবসানে ত্রিবিধ প্রতিরোধক Binaca Fluoride toothpaste

CIBA/CF-25 BEN

জেডায়ক উইলিয়াম জয়ে নিতে বেশি দেরি হল না।

উইলিয়াম এখন উনিশ বছরের তরুণ, জ্যাকবের বয়স তেইশ। লণ্ডনে থাকেন দুজনেই। জ্যাকব সংগীতের শিক্ষক এবং উইলিয়াম স্বরলিপি নকল করার কাজ করেন। কাজে-দক্ষতার জন্যে খ্যাতি বাড়তে লাগল। জ্যাকবের কিন্তু দেশে ফেরার টান। দু' বছর বাদে ১৭৬০ সনে হ্যানোভারে সরকারী অর্কেস্ট্রায় চাকরি নিয়ে ফিরে গেলেন জ্যাকব। উইলিয়াম ইংলণ্ডেই রয়ে গেলেন। তাঁর খ্যাতির ফলে লর্ড ডার্লিংটন তাঁকে ডারহামবাহিনীর ব্যাণ্ড-শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করলেন, তাই উইলিয়ামকে স্যাণ্ডারল্যাণ্ডে চলে আসতে হল। সংগীত-রচয়িতা, পরিচালক ও শিক্ষকরূপে তাঁর খ্যাতির পরিধি বাড়তে লাগল। ব্যক্তিগতভাবে অনেককে সংগীত শিক্ষা দিতে লাগলেন। এই সময়ে বাড়িতে একটি চিঠিতে জানান যে, ছ' মাসে তিনি সাতটি সিম্ফনি রচনা করেছেন।

পরের বছর, ১৭৬১ সনে উইলিয়াম ডারহামবাহিনীর চাকরি থেকে পদত্যাগ করে এডিনবরায় কনসার্ট ম্যানেজারের চাকরির আশায় চলে এলেন। কিন্তু চাকরিটা তাঁর হল না। সাধারণ সংগীত-শিক্ষকরূপে দিন গুজরান করতে লাগলেন, পরের বছর লিড্স-এ কনসার্ট ম্যানেজারের চাকরি পাওয়াতে সুরাহা হল, হ্যানোভারে টাকা পাঠাতে হয়। '৬৬ সনে বাথ-এর গির্জায় অর্গানবাদকের চাকরি পাওয়াতে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য পেলেন। হ্যানোভার থেকে আব এক ছোট ভাই আলেকজাণ্ডার ও বোন ক্যারলিনকে নিয়ে এলেন। ক্যারলিন ও উইলিয়াম এই ভাই-বোন-জুটি মেরি ও চার্লস ল্যাম্ ভাই-বোন-জুটির মতই এক মহীয়ান স্নেহসিক্ত দৃষ্টান্ত। ক্যারলিনও নিজস্ব মেধায় পরবর্তীকালে প্রথম সারির একজন জ্যোতির্বিদ হয়েছিলেন, কিন্তু নিশ্চয়ই সেটা তাঁর ব্রত ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন তাঁর ভাইকে সর্বক্ষমতায় সাহায্য করে তাঁর বিকাশে সহায়তা করতে। বাথ-এ ওঁদের দিন বেশ সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে কেটে যেতে লাগল। ওঁরা যেন সংগীত জগতের অধিবাসী, সংগীত পরিমণ্ডলে ওঁদের জীবনযাপন। উইলিয়ামের সমস্ত সময়টাই যেন সংগীতের সেবায় নিয়োজিত। একশ' জন বাদ্যকরবিশিষ্ট অর্কেস্ট্রার পরিচালক, থিয়েটারের প্রধান বেহালাবাদক, সংগীত-শিক্ষক, সংগীত-রচয়িতা উইলিয়াম ডুবে থাকেন সংগীত-সাগরে দিনের মধ্যে চোদ্দ ঘণ্টা—তার পরেও বিশ্রাম নেই—আধখানা রাত পর্যন্ত ডুবে থাকেন আর এক সাগরে—সে সাগর গণিতের, আলোকতত্ত্বের, জ্যোতির্বিদ্যার। সে সাগরেও পেয়েছিলেন সংগীতের আস্বাদন।

এমনি ছন্দে তাঁর দিন কাটে। বয়স তখন তাঁর ছত্রিশ। একটি ছোটখাট সখের দুই-ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত টেলিস্কোপ কিনলেন। ক্লান্ত দিবাবসানে শুরু করলেন আকাশ পর্যবেক্ষণ। সখের টেলিস্কোপ, ভাল কাজ দেয় না, পর পর কিনলেন আরও দুটো টেলিস্কোপ। টেলিস্কোপের তখন খুব দাম, বিশেষ চল ছিল না এবং ভাল কাজও দিত না। তাই তাঁর মন ওঠে না। ঠিক করলেন, নিজেই তৈরি করে নেবেন মনের মত করে একটি।

নিউটন যে ধরণের টেলিস্কোপ তৈরি করেছেন, সেই ধরণের, আয়নার ছয় ফুট ব্যাসযুক্ত একটি রিফ্লেক্টিং টেলিস্কোপ তৈরি করবেন। এর জন্যে দরকার একটি নিখুঁত অত্যন্ত চকচকে আয়না। সে আয়না কাচের নয়, আয়না 'স্পেকুলাম'-এর অর্থাৎ দু'ভাগ তামা, এক-ভাগ টিনের সঙ্কর-ধাতুর। এই ধাতু ঢালাই করে নিতে হবে, আয়নাও পালিশ করে নিতে হবে। বোন ক্যারলিন আছেন সহায়তায়। সংসারের সব দায়ভার কাজকর্ম ইতিমধ্যে কাঁধে তুলে নিয়েছেন। ধাতু ঢালাই করা হল রান্নাঘরে, একবারেই কি সফল হওয়া যায়? কতবারই না চেষ্টা করতে হল, কতবার ছাঁচ ফেটে গিয়ে গলিত ধাতু চতুর্দিকে গড়িয়ে গিয়ে বিপদ ঘটাত। ক্যারলিন হোতা। তারপর আয়না পালিশ করা, সেও কি কম ধৈর্যের কথা! এদিকে আবার অর্কেস্ট্রার স্বরলিপি নকল করতে হয়। সর্বকাজে ভগিনী ক্যারলিন। উইলিয়ামের বাড়িটা হয়ে উঠল সংগীত-কেন্দ্র ও গবেষণা-কেন্দ্রের এক অপূর্ব সমন্বয়। উভয়ের প্রত্যেকটি মুহূর্ত—এই সব কাজে নিয়োজিত হতে লাগল। রান্না-বান্না, খাওয়া-দাওয়া, কিছুক্ষণের জন্যে ঘুম—এগুলি যেন নিরুপায় বালাই।

১৭৭৮ সাল। হার্শেল এখন হাতে পেয়েছেন নিজেদের তৈরি কবে নেওয়া ছ' ফুট ব্যাসের (আয়নার) টেলিস্কোপ। তখনকার মান অনুযায়ী এটা বড়ই। কিন্তু একটা টেলিস্কোপ তৈরি করেই থামলেন না। আরও তৈরি করেন, নিজের কাজেও লাগান, বিক্রিও করেন।

এক জীবনীকার হার্শেলকে তুলনা করেছেন 'টাইটান'-এর সঙ্গে। গ্রীক মহাকাব্যে টাইটানরা অসীম শক্তিশালী দৈত্যবিশেষ। হার্শেল জ্যোতির্বিজ্ঞানে সত্যই সাহস, শক্তি ও দূরদৃষ্টির চূড়ান্ত কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

টেলিস্কোপ হাতে পেয়েই তিনি সঙ্কল্প করলেন, মাথার ওপরের সারা আকাশের পুরো গম্বুজটা টেলিস্কোপ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করবেন। পর্যবেক্ষণ হবে ছক-কাটা পরিকল্পনা অনুযায়ী যাতে আকাশের কোন একটি বিন্দুও পর্যবেক্ষণে বাদ না পড়ে। দিগন্ত থেকে দিগন্ত বিস্তৃত পর্যবেক্ষণ। এ যেন বিচুলির গোলাঘরে ছুঁচ খোঁজা।

দিনমান অতিবাহিত হয় সংগীতের সেবায়—এটা হল জীবিকা। আর জীবন-সাধন শুরু হয় রাত্রির তমিস্রায়। 'নিদ নাহি আঁখিপাতে'। পর্যবেক্ষণ চলে রাতের পর রাত। ভগিনী ক্যারলিন সঙ্গে থাকেন, আকাশের মানচিত্র তৈরি করতে সাহায্য করেন।

টেলিস্কোপ নিয়ে তাকালেন চাঁদের ত্বকে প্রথম। গ্যালিলিও যেমন নিজে টেলিস্কোপ তৈরি করে চাঁদের দিকে তাকিয়েছিলেন প্রথম। চাঁদের আকর্ষণ প্রতিহত করতে পারে ক'জন? তিনি চাঁদের ত্বকের দেড় শ'র বেশি জ্বালামুখের মাপজোখ করেন তিনটি বিভিন্ন পদ্ধতিতে।

বিভিন্ন নক্ষত্রের দিকে টেলিস্কোপ দিয়ে তাকাতে তাকাতে তিনি দেখলেন এমন কিছু নক্ষত্র আছে যা একটিমাত্র নক্ষত্র নয়, দুটি স্বতন্ত্র নক্ষত্র খুব নিকটে থেকে পরস্পরকে ঘোরে, যেন বলনাচের একজোড়া নাচিয়ে। এদের নাম দিলেন 'বাইনারি'। উন্নত টেলিস্কোপ তৈরি করে তিনি প্রায় ৮০০ বাইনারি নক্ষত্র দেখতে পেলেন এবং আরও লক্ষ্য করলেন যে মোটামুটি সূর্যের কাছাকাছি তিনটি নক্ষত্রের একটি বাইনারি। ২ থেকে ৭০০ বছর পর্যন্ত পরস্পরকে ঘোরার সময়। নিউটনের বিবৃত মাধ্যাকর্ষণ-সূত্র অনুযায়ী এদের গতিবিধি। পরবর্তীকালে বাইনারি সম্পর্কে হার্শেলের সব সূত্রগুলি সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং বর্তমানে জ্যোতির্বিদরা প্রায় তিরিশ হাজার বাইনারির খবর রাখেন।

১৭৭৯ সনের ডিসেম্বরের শীতের এক রাতে এক অচেনা ভদ্রলোক পথ চলতি হঠাৎ এসে উপস্থিত। ও'দের টেলিস্কোপ দেখে ভারি উৎসাহিত তিনি। হার্শেলের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল। ইনি বিলাতের রয়েল সোসাইটির একজন সদস্য ডক্টর উইলিয়াম ওয়াটসন। হার্শেলকে জ্যোতির্বিদমহলে পরিচয় করিয়ে দিলেন। পরবর্তীকালে বহু ব্যাপারে সহায়তা করেছিলেন তিনি।

১৭৮১ সন, ১৩ই মার্চের রাত্র। টেলিস্কোপে উজ্জ্বল কি যেন একটা

বিন্দু দেখলেন যার কথা কোন জ্যোতির্বিদ আগে বলেন নি। নক্ষত্র এটা নয়, তবে কি কমেট? পরের চার রাত্রি ধরে পর্যবেক্ষণ করে বুঝলেন, না এটা কমেট নয়। কমেটকে টেলিস্কোপে দেখায় আবছা।

ডক্টর ওয়াটসনকে টেলিস্কোপে দেখা বিন্দুটির কথা জানালেন। তিনি গ্রীনউইচ রয়েল অবজারভেটরি ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অবজারভেটরিকে পর্যবেক্ষণের অনুরোধ জানালেন। ইউরোপের বিভিন্ন অবজারভেটরিকেও অনুরোধ জানান হল। জ্যোতির্বিদ হ্যালি এর আগে প্রমাণ করেছেন যে, কমেট নির্দিষ্ট কক্ষরেখা ধরে পরিক্রমণ করে। এটির পরিক্রমণ সে-রকম নয়। অবশেষে সেণ্ট পিটার্সবার্গের জ্যোতির্বিদ এণ্ডার্স ল্যাক্সেল এবং বিখ্যাত ফরাসী গণিতবিদ কেরি ল্যাপলাস ঘোষণা করলেন—হার্শেল যে বিন্দুটি লক্ষ্য করেছেন, সেটি কোন নক্ষত্র নয়, কমেট নয়; একটি গ্রহ সেটি। এতদিন মানুষের চোখের আড়ালে ছিল, দূরত্বের জন্যে খালি চোখে দেখা যায় না বলে।

এই গ্রহটি আবিষ্কারের জন্যে হার্শেলকে রয়াল সোসাইটি সদস্য করে নিল এবং শ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'কোপলে পদক'-এ ভূষিত করল (১৭৮১)। ইংলণ্ডের রাজা তৃতীয় জর্জ-এর নাম অনুযায়ী হার্শেল গ্রহটির নাম দিতে চেয়েছিলেন 'জর্জিয়ান সাইডাস'; কিন্তু জার্মান জ্যোতির্বিদ জোহান বোড আপত্তি তুলে বললেন—কোন গ্রহই এযাবৎ মানুষের নামে নামাঙ্কিত হয় নি। অবশেষে গ্রীক-মহাকাব্যের দেবরাজ জিউস-এর পিতামহ 'ইউরেনাস'-এর নামে পরিচিত হল হার্শেল আবিষ্কৃত এই গ্রহটি। শনির পরবর্তী গ্রহ ইউরেনাস, সূর্য থেকে দূরত্ব ১৭৮ কোটি ৪০ লক্ষ মাইল।

এই সময়ে টেলিস্কোপের নির্মাণ নিয়ে এক বিতর্কে জড়িয়ে পড়েন। তাঁর তৈরি টেলিস্কোপে যে সূক্ষ্মতম ও অতিবিস্তৃ পর্যবেক্ষণ তিনি দাবি করছিলেন তা অন্য জ্যোতির্বিদরা মানতে চাইছিলেন না। রয়াল সোসাইটিতে তিনি একটি প্রবন্ধ পাঠান। রয়াল সোসাইটির পর্যবেক্ষকরা হার্শেলের তৈরি টেলিস্কোপের সঙ্গে অন্য টেলিস্কোপের তুলনা করে বুঝলেন, টেলিস্কোপ তৈরির বিজ্ঞানে তিনি অনেক এগিয়ে গেছেন। বর্তমান শতকে হার্শেলের তৈরি টেলিস্কোপ পরীক্ষা করে দেখা গেছে, তিনি যা দাবি করতেন, তার চেয়েও তাঁর যন্ত্রগুলির গুণ ছিল অনেক বেশি। পরে তিনি ৪০ ফিট দীর্ঘ টিউববিশিষ্ট একটি টেলিস্কোপ তৈরি করেন যার আয়নাটারই ওজন হল এক টন। তখনকার মান অনুযায়ী এই কাজটা ছিল বিস্ময়কর কারিগরির দৃষ্টান্ত।

বিজ্ঞানীমহলের পরামর্শ অনুযায়ী তৃতীয় জর্জ তাঁকে রাজকীয় জ্যোতির্বিদরূপে নিযুক্ত করলেন। বছরে ভাতা দু'শ' পাউণ্ড। ভাতার পরিমাণ দেখে ক্যারলিন দুঃখ করে বলেছিলেন—এত সস্তা দামে এ পর্যন্ত কোন রাজা এত বেশি সম্মান খরিদ করতে পারেন নি। সঙ্গীত জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন; এই টাকায় দিন চলে না। ছোট বড় টেলিস্কোপ তৈরি করে দেশ-বিদেশে বিক্রি করে অর্থের সংকুলান করতে লাগলেন। এর মধ্যে তিন হাজার পাউণ্ডে বিক্রি করা ম্যাড্রিড অবজারভেটরির ২৫ ফিট দীর্ঘ টেলিস্কোপটি বিখ্যাত। পাঁচ বছর পরে ক্যারলিনকেও ভাতা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এখন ওঁরা থাকেন স্লাউতে। এইখানেই ওঁদের সারা জীবন অতিবাহিত হয়।

হার্শেল ও ক্যারলিনের প্রতিটি রাত যেন সাধনার উৎসব। হার্শেল একটি রাতও বিরাম দিতে চান না। ক্যারলিনও তাই। ক্যারলিন ইতিমধ্যে আটটি কমেট আবিষ্কার করে পৃথিবীর প্রথম নারী জ্যোতির্বিদরূপে বরেণ্য হয়েছেন। রয়াল সোসাইটির অধিবেশন বসত রাতে, হার্শেল পর্যবেক্ষণ নষ্ট করে যেতে চাইতেন না। যেতেন শুধু পূর্ণিমার রাতে, যে রাতে জ্যোৎস্নার জন্যে পর্যবেক্ষণ ভাল হত না।

১৭৮৩ সনে হার্শেল একটি যুগান্তকারী কথা বললেন।

আকাশের দিকে যদি সারারাত চেয়ে থাকা যায়, তাহলে সাদা চোখে মনে হবে যে, সূর্য যেমন পূর্বে উদিত হয়ে সারা আকাশটা অতিক্রম করে পশ্চিমে অস্ত যায়, তেমনি নক্ষত্রগুলিও সারা আকাশটা অতিক্রম করে; নক্ষত্রগুলির পারস্পরিক দূরত্বের কোন হেরফের হয় না। বিখ্যাত ইংরেজ জ্যোতির্বিদ এডমাণ্ড হ্যালি প্রথম বললেন যে, নক্ষত্রগুলির প্রত্যেকটির নিজস্ব গতিবেগ আছে এবং তাদের পারস্পরিক দূরত্বের হেরফের হয়।

আকাশে যে ছায়াপথ আমরা দেখি তার একটি নক্ষত্র সূর্য। সাধারণভাবে আমরা বলি যে, সূর্য একজায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে (আবর্তন আছে, পরিক্রমণ নেই), সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহ-উপগ্রহগুলি ঘুরে চলেছে—এই নিয়ে সৌরজগৎ। হার্শেল যে যুগান্তকারী কথা বললেন তা এই যে—ছায়াপথে সৌরজগৎ সহ সূর্যের গতি আছে এবং হারকিউলিস নক্ষত্রপুঞ্জের দিকে এর গতিমুখ। তিনি গতিবেগ কত বলতে পারেন নি, কিন্তু পরবর্তীকালে আমরা জেনেছি গতিবেগ সেকেণ্ডে ১২ মাইল। নক্ষত্র, নীহারিকা, ছায়াপথ প্রভৃতি সম্পর্কিত আধুনিক গবেষণা যুগসূচনা করেন হার্শেল।

হার্শেল ছায়াপথের গঠন সম্পর্কেও অনেক আলোকপাত করেছেন। তিনি বিষয়টির যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে তাঁর ১৮ ইঞ্চি ব্যাসযুক্ত (আয়নার) টেলিস্কোপে যত নক্ষত্র দেখা যায় তার তালিকা প্রণয়ন করেন। তিনি প্রথম লক্ষ্য করলেন, ছায়াপথে এমন কিছু অংশ আছে, যেখানটা অপেক্ষাকৃত কাল। ছায়াপথের ঘনত্বও তিনি হিসাব করেন এবং ছায়াপথের অবয়ব ও রূপরেখা সম্পর্কেও তিনি একটা ধারণা দেন তা মোটামুটি বর্তমান ধারণার কাছাকাছি।

একদিকে বিরামহীন গবেষণা, আর একদিকে অর্থের অনটন। টেলিস্কোপ তৈরি করে বিক্রি করা—গবেষণার মূল্যবান সময় নষ্ট। অবশেষে ৪৬ বৎসর বয়সে (১৭৮৮) হার্শেল বিয়ে করলেন এক ধনী তরুণী বিধবাকে, তাঁর নাম মেরি পিট। ভারি ভাল ভদ্রমহিলা। ক্যারলিনের অকৃত্রিম স্নেহ তিনি পেয়েছিলেন। সংসারে মেরির মাত্র দুটো দাবি ছিল—এক, স্বামী বিরামহীন কাজ করে যেতে পারবেন না। দুই, মাঝে মাঝে স্বামীকে ছুটি নিয়ে বেড়াতে যেতে হবে। হার্শেল সুখী হয়েছিলেন। তাঁদের একটিই ছেলে হয়েছিল, নাম জন। তিনিও কালে প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ হয়েছিলেন। হার্শেলের আর্থিক অনটন দূর হয়েছিল। বিয়ের পর আর তাঁকে টেলিস্কোপ বিক্রি করতে হয় নি।

বিয়ের আগেই তিনি ৪০ ফিট লম্বা একটি অতিকায় টেলিস্কোপ তৈরি করতে শুরু করে দেন, বিয়ের পরের বছর এটার নির্মাণ শেষ হয়। ভাল কাজ পাবার আশায় এটি তৈরি করেন বটে কিন্তু তেমন সফল হন নি। এইটাই তাঁর তৈরি করা শেষ টেলিস্কোপ। অবশ্য এই টেলিস্কোপ দিয়েই তিনি শনির দুটি উপগ্রহ আবিষ্কার করেন। তখন পর্যন্ত শনির পাঁচটি উপগ্রহ জানা ছিল। বর্তমানে আমরা জানি শনির দশটি উপগ্রহ। দশম গ্রহটি আবিষ্কৃত হয়েছে ১৯৬৬ সনের শেষের দিকে। শনির বলয়টি কত পুরু তাও তিনি মাপেন। তিনি বলেছিলেন ২৫০ মাইল; বর্তমান জ্যোতির্বিদদের মতে ১০ থেকে ৫০ মাইলের মত পুরু শনির বলয়। ১৭৮৭ সনে ইউরেনাস-এর দুটি উপগ্রহ হার্শেল আবিষ্কার করেন। বর্তমানে আমরা জানি ইউরেনাসের পাঁচটি উপগ্রহ।

তিনি যে ৪০ ফিট লম্বা অতিকায় একটি টেলিস্কোপ তৈরির কাজ হাতে নেন তার একটা বিশেষ কারণ ছিল। সাধারণ টেলিস্কোপ দিয়ে নীহারিকার (নেবুলা) দিকে তাকালে মনে হবে যেন উজ্জ্বল গ্যাসের মেঘ। (খালি চোখে সারা পৃথিবী থেকে মাত্র ৩।৪টি নীহারিকা দেখা যায়।) এডম্যাণ্ড হ্যালি-র আগে টেলিস্কোপ দিয়ে নীহারিকা পর্যবেক্ষণ করতে করতে হার্শেলের মনে হল যে,

যদি আরো বিবর্ধক শক্তিযুক্ত টেলিস্কোপ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করা যায়, তাহলে মনে হবে যে, স্বতন্ত্র নক্ষত্রের সমষ্টি হল নীহারিকা। অতিকায় টেলিস্কোপটি তৈরি হলে তিনি দেখলেন যে, এমন কিছু নীহারিকা আছে যেগুলি স্বতন্ত্র নক্ষত্রের সমষ্টি নয়, বাস্তবিকই গ্যাসীয় মেঘ। সৃষ্টিতত্ত্বের অনেক রহস্য উন্মাটিত হয়েছে নীহারিকা পর্যবেক্ষণের ফলে, কিন্তু তার সূত্রপাত ও সঠিক পথনির্দেশ দিয়েছিলেন জ্যোতির্বিদ হার্শেল।

হার্শেলকে বলা হয়েছে নক্ষত্র-পর্যবেক্ষণের পথিকৃৎ। সারা আকাশের প্রতিটি অংশ তিনি অন্তত চারবার টেলিস্কোপ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। এত যে বিশাল তথ্যাবলী সংগৃহীত হয়, তা নিজের কাজেও যেমন লাগিয়েছেন, পরবর্তীকালে অন্যের কাজেও তেমন সহায়তা করেছে। তাঁর চেষ্টা ছিল নক্ষত্রের দূরত্ব মাপা। একাজে সম্পূর্ণ সফল তিনি হতে পারেন নি বটে, তবে সঠিক পদ্ধতির সূত্রপাত করে যান। বিভিন্ন নক্ষত্রের তুলনামূলক ঔজ্জ্বল্য নির্ণয়ের সূত্র তিনি দেন এবং নক্ষত্রের ঔজ্জ্বল্যের সাহায্যে দূরত্ব মাপার সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণা করেন। নক্ষত্ররাজি যে কি বিশাল দূরে দূরে বিরাজমান তার আভাসও তিনি দেন—আধুনিক চেতনার সঙ্গে যার যথেষ্ট সঙ্গতি আছে। হার্শেলের পরে জ্যোতির্বিদ্যার সর্বশাখায়, কি তত্ত্বে, কি পর্যবেক্ষণে, কি যন্ত্র-পদ্ধতিতে বিপুল উন্নতি হয়েছে। কিন্তু হার্শেল একক প্রচেষ্টায় নক্ষত্র-পর্যবেক্ষণের প্রায় শূন্য থেকে শুরু করে কতদূর যে সাফল্য অর্জন করেছিলেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। সত্যিই তিনি ছিলেন জ্যোতির্বিদদের মধ্যে 'টাইটান'।

কাজের বিরাম নেই। কিন্তু বয়স বাড়ছেই। ৭০ বছর যখন বয়স (১৮০৮) তাঁর দারুণ অসুখ করল। এর পর থেকে কাজের মাত্রা কিছু কমিয়ে দিলেন। এখন তিনি জ্যোতির্বিদদের মধ্যমণি, সারা ইউরোপের শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি। ১৮১৬ সনে তাঁকে নাইট উপাধিতে ভূষিত করা হয়। ১৮২০ সনে অ্যাস্ট্রনমিক্যাল সোসাইটি গঠনের সময়ে তাঁকে সভাপতির পদে বৃত করা হয়। ১৮২১ সনে ভগিনী ক্যারলিনকে পাশে নিয়ে শেষবারের মত টেলিস্কোপে পর্যবেক্ষণ করেন। তারপর পরিণত ৮৪ বৎসর বয়সে ১৮২২ সনের ২৫ আগস্ট ইহধাম পরিত্যাগ করেন। একটি সঙ্গীতময় জীবনের অবসান ঘটল।

এক মনীষী বলেছিলেন, "হার্শেল একজন মহান সরল মানুষ। তাঁর সারল্য, সদয় আচরণ, তাঁর সরস বাক্যালাপ, নিজের গবেষণা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করার আগ্রহ এত হৃদয়গ্রাহী যে তা ভাষায় বলা যায় না।"

ভগিনী ক্যারলিনের বিষাদ যে কত গভীর তা অনুভব করা যায়। জ্যেষ্ঠ ভাই, বন্ধু, সহকারী, পথপ্রদর্শক, পথসাথী আজ আর সঙ্গে নেই। ক্যারলিনের বিলেতে আর মন টিকল না। তিনি হ্যানোভারে ফিরে এলেন। এখানে এসে ১৮২৫ সনে হার্শেলের পর্যবেক্ষণ করা নীহারিকাগুলির বিরাট এক তালিকা প্রকাশ করলেন। ২৫ হাজার নীহারিকার পরিচয় এতে ছিল। এর জন্যে অ্যাস্ট্রনমিক্যাল সোসাইটি ক্যারলিনকে স্বর্ণপদকে ভূষিত করল। ১৮৪৬ সনে তিনি সোসাইটির সদস্যা হন। ৯৭ বৎসর বয়সে ১৮৪৮ সনের জানুয়ারি মাসে ভগিনী ক্যারলিনের জীবনাবসান ঘটল। ছন্দোময় আর একটি সঙ্গীত সমাপ্ত হল।

জীবনের টার্মিনাস কতদূর আর

মনোরঞ্জন [illegible]

রেলের দু'পাটি লাইন উধাও সুদূরে
ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটে ট্রেন—
জংশট্ যাত্রীর চোখে:
খালবিল নদীনালা তেপান্তর মাঠ
ফসলের ক্ষেত কিংবা গ্রাম জনপদ
নীলডুরে পরা কোন কৃষ্ণা কিশোরী
বঙ্কিম গ্রীবায় তার কৌতূহলী ভয়
গরু নিয়ে চলে যায় হল কাঁধে চাষী
হাটুরিয়া সারি সারি মাথায় পসরা
নবোঢ়া পাল্কীতে চলে বিস্ময় আকুল
দিগন্ত অনন্ত আকাশ শূন্যের বাহুতে
এ বিচিত্র রূপে রূপে একই মালা গাঁথা
শুরু হলে শেষ হয় শেষ হলে শুরু।

তবুও এ ট্রেনের আছায় নিশ্চিত বিরতি
রোড সাইড স্টেশন কতগুলিয়ে ছাড়িয়ে যায়
ছাড়িয়ে যায় অনেক জংশন
অন্তহীন ছোটা আর অন্তহীন থামা।
হয়তো বিকল কোনো ব্লক সিগন্যাল
অথবা সম্মুখে কোন বিপদ সংকেত
নিরুপায় ট্রেনকে তখন থামতেই হয়।
তবুও ছোটার পালা, ভবিতব্য এই:
টার্মিনাস—কে জানে সে কতদূর আর।

এ ট্রেনে আমিও যাত্রী—
কামরায় বসে দেখি অনেক অতীত।
অনেক স্টেশনে ওঠা অনেক যাত্রী
নেমে গেছে অনেক স্টেশনে—
আবার উঠেছে কত,
নেমে গেছে লক্ষ্য খুঁজে পেয়ে
নামা ওঠা নিরন্তর এইভাবে চলে—
আমি শুধু ছুটে চলি ধাবমান ট্রেনে
টার্মিনাস, জীবনের স্বপ্নমাখা টার্মিনাস
কতদূর আর।

অবাক দৃষ্টিতে সিঁড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকে সমীর। কেমন তরতর করে ওপরে উঠে গেছে সিঁড়িটা। সমস্ত চিন্তা কেন্দ্রীভূত করে দেখছে সিঁড়িটা। জীবনের রহস্য যেন লুকিয়ে আছে এই সিঁড়িটাতেই। ঠুকঠাক লাফিয়ে লাফিয়ে যেমন একদম ওপরে উঠে যাওয়া যায়, ঠিক তেমনি একটু বেকায়দায় পা ফেললে বা ওপর থেকে হঠাৎ ধাক্কা খেলে হুড়-মুড় করে গড়িয়ে গড়িয়ে একদম নিচে পড়ে যেতে হয়। নিচে—আরও নিচে—ধাপে ধাপে—আরও—তারপর অতলে। আর বুঝি ওপরে ওঠার শক্তি থাকে না।

গরাদের ফাঁক দিয়ে কেমন মোহময় দেখাচ্ছে সিঁড়িটাকে। সিঁড়িটার দিকে তাকালেই কেমন- আনমনা হয়ে যায় সমীর। সেও তো পারে তরতর করে সিঁড়িটা দিয়ে একদম ওপরে উঠে যেতে। আর দশটা লোকের সাথে তার তফাৎ কোথায়? কিন্তু তবু কেন সে পারে না? অলস মুহূর্তের অগোছাল কল্পনায় কতদিন লাফিয়ে লাফিয়ে উঠতে চেয়েছে সিঁড়িটা দিয়ে, উঠেও গেছে কিছুদূর, কিন্তু মাঝামাঝি গিয়েই যেন প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়েছে নিচে। অব্যক্ত যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠেছে দেহ, অবশ হয়েছে হৃদয়। তারপর যন্ত্রণায় ছটফট করেছে শুধু, কিন্তু উঠতে পারে নি।

কল্পনায় সিঁড়িটার কাছাকাছি নিজেকে দাঁড় করালেই বাবার কথা মনে পড়ে সমীরের। তিনি বলতেন, 'সব সময় সততা রক্ষা করে চলবি। অসৎ পথ এড়িয়ে যাবি। বুক উঁচিয়ে সৎ পথে চলবি। এই-ই জীবনের পথ।' সিঁড়িটার কাছাকাছি দাঁড়ালেই বাবার দীপ্ত মুখ-খানা ভেসে ওঠে তার মনে, আর মাথা উঁচিয়েই ওপরে উঠতে চেষ্টা করে সে। রোগযন্ত্রণায় জর্জরিত হয়ে প্রায় বিনে চিকিৎসায় মরেছেন তিনি, তবু মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও কাছে ডেকে বলে-ছিলেন, 'কখনো অন্যায় পথে পা বাড়িও না। গুরুজন ও বয়োজ্যেষ্ঠদের শ্রদ্ধা করো। সততাই জীবনের একমাত্র আনন্দ।' কথাগুলো আজও পেরেকের মত আটকে আছে সমীরের মনে। আর এই কথার আলোতেই বুক উঁচিয়ে উঠে যায় কয়েকটা সিঁড়ি। ব্যস্, তারপরই আসে সেই প্রচণ্ড ধাক্কা—মুখ থুবড়ে পড়ে যায় সমীর। দু' ফোঁটা উষ্ণ অশ্রু গড়িয়ে পড়ে। আর ঠিক তখনই সৌম্যদর্শন অধ্যক্ষ মশায়ের মুখখানা ভেসে ওঠে তার মানসপটে।

তাঁর কথাও ভুলতে পারে না সমীর। কলেজের অধ্যক্ষ, পিতৃতুল্য গুরুজন।

তন্ময় চেতনার ওপর দিয়ে রেল-গাড়ির মত গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যাচ্ছে একের পর এক প্রশ্ন। উত্তর মিলছে না কারো। হিসাব মেলাতে গিয়ে কোন-মতেই মিলছে না হিসাবটা, শুধু অব-রুদ্ধ তারুণ্যের অশ্রুত ক্রন্দন গুমরে গুমরে আছড়ে পড়ছে হৃদয়ের দেয়ালে। কাকেই বা দোষ দেবে সে। দোষ কার? বাবার? অধ্যক্ষের? না পল্টুর? না নিজেরই? কে বলবে।

পল্টুরই বা দোষ কি? ও ত' কোন অপরাধ করে নি। ও বাঁচতে চেয়েছে। বাঁচাতে চেয়েছে।

শুরুটা পরিষ্কার মনে পড়ে সমীরের। বাবার মৃত্যুর মাস কয়েক পরেই হবে। মায়ের যাকিছু অলংকার ছিল তাও শেষ হয়েছে তখন। কলেজের পড়াটা তখনও ও ছাড়ে নি। সহায়-সম্বলহীনা বৃদ্ধা মায়ের পক্ষে অন্ন চালানো সম্ভব হচ্ছিল না। এক-দিকে বাড়ির মালিকের তাগাদা, অন্যদিকে ক্ষুধার জ্বালা আর লেখাপড়া শিখে

বড় হবার আকাঙ্ক্ষার অপরাধ—এই তিনে মিলে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল তাকে। পড়াশুনো বন্ধ করে কাজ জোটাতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারে নি। কি করেই বা পারবে? এতটুকু ছেলেকে কেই বা কাজ দিতে যাবে। বয়সই আর কত হবে। বড়জোর সতের। কলেজের প্রথম বর্ষের ছাত্র। দারিদ্র্যের অসহ্য উত্তাপ আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবকে তখন দূরে সরিয়ে দিয়েছে। দু দিন আহার জোটে নি, এর-ওর কাছে ধার চেয়েও যখন উপবাসী মায়ের মুখে একমুঠো খাবার তুলে দিতে পারে নি, ঠিক তখনই পল্টুর সাথে দেখা। বয়সে কিছু বড় হলেও সমীরের বাল্যবন্ধু। পল্টু পড়াশোনা ছেড়ে তখন ব্যবসায় নেমেছে।

সবকিছু দেখে পল্টু বলেছিল, এভাবে ঘোরাফেরা করে কিছু হবে না। আমি তোকে কাজ দিতে পারি। করবি? সংগে পড়াশোনাও চালাতে পারবি।

আশার সামান্য আলোকে চোখ দুটো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল সমীরের। বলেছিল, করব মানে? পেলে বর্তে যাই। করতে আমাকে হবেই। যে করে হোক লেখাপড়া শিখে আমাকে দাঁড়াতেই হবে।

—ঠিক আছে, তাহলে আগামীকাল আমার ওখানে চলে আয়। সব তোকে বুঝিয়ে দোব।

আনন্দের আতিশয্যে পল্টুর হাতখানা চেপে ধরেছিল সমীর, তুই আমায় বাঁচালি ভাই। সবদিকে অন্ধকার দেখছিলাম। কাজ যখন পেয়েছি পড়াশোনাটাও চালিয়ে যায়। তা কাজটা কি?

—আরে কাজটা এমন কিছু কঠিন নয়। ভাল কাজ। কোন ঝামেলা নেই। সপ্তাহে শুধু একদিন এখান থেকে বাইরে যেতে হবে। ব্যস।

—তা নায় যাব। কিন্তু কি করতে হবে আমাকে?

—শুনবি?

—হ্যাঁ, বল না। মাকে গিয়েও তো বলতে হবে। বুঝলি মা'র খুব আনন্দ হবে।

—তাহলে কাছে আয়।

ফিসফিস করে কানের কাছে কথাগুলো বলেছিল পল্টু। কিন্তু শুনে চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছিল সমীরের। পরক্ষণেই আশঙ্কা ও হতাশায় একদম মিইয়ে গিয়েছিল। বলেছিল, না খেয়ে পচে মরব, তবু এ কাজ করবো না। তুই এ-কথাটা কি করে বলতে পারলি?

—কেন, না বলার কি হল? করবি না কেন?

—এ অন্যায়। এ অসৎ পথ। ভুবন মুখুজ্জের ছেলে এসব কাজ করতে যাবে না।

—আরে এতে অন্যায়টা কোথায়?

—নিশ্চয়ই অন্যায়। রীতিমত চুরি। বে-আইনী।

—অত সব বুঝি না। তোর ভালর জন্যই বলছিলাম। তুই ছেলেবেলার বন্ধু, অসুবিধেয় পড়েছিস তাই।

তারপরও অনেক বোঝাল পল্টু। কিছুতেই রাজী হয় নি সমীর। শেষকালে রেগেমেগে উত্তর দিয়েছিল, অসুবিধেয় পড়েছি বলে কি চুরি করতে হবে? আদর্শ বলে কি কিছু নেই?

মুখটা শক্ত হয়ে উঠেছিল পল্টুর। দৃঢ়তা সহকারেই বলেছিল, বড় কথাই যখন বললি তাহলে শোন্। আদর্শ আদর্শ করে চেঁচাচ্ছিস। কে মেনে চলছে আদর্শ? তোমার গুরুজনরা মেনে চলেছে? শ্রদ্ধেয় নেতারা, যাঁরা উপদেশামৃত বর্ষণ করে বেড়ান তাঁরাও কি মেনে চলছেন? দুনিয়ার কোন খবরই তুই রাখিস না। আচ্ছা তোর কথাই ধর না। ঐ যে সেদিন তোর পিতৃতুল্য প্রিন্সিপাল তোকে বঞ্চিত করে সুদর্শনকে ফ্রি স্টুডেন্টশিপ দিলেন এবং তোকে উপহাস করে তাড়িয়ে দিলেন, সেটা কোন আদর্শের জোরে বলতে পারিস?

বাধা দিয়েছিল সমীর, ছিঃ ছিঃ গুরুজনদের সম্পর্কে এমন উক্তি তুই করবি না।

—আলবৎ করব। কেন করবো না। আমি জানি তোর ফ্রি স্টুডেন্টশিপ পাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তুই পেলি না, পেল সুদর্শন বাগচী, যার বাবা নিজের গাড়ি চড়ে ঘুরে বেড়ায়। তুই পেলি না কোন্ যুক্তিতে? কলেজ গরীবদের জন্য নয় এমন নির্মম উপহাসই বা তিনি করলেন কোন মানবতায়? ও, তাঁরা গুরুজন, নিজেরা হাজারো অন্যায় করবেন, আর আমাদের সকলকে রামকৃষ্ণ সাজার উপদেশ দেবেন। তাঁরা যদি বিনা কারণে এমন নির্মম অন্যায় করতে পারেন, তবে প্রাণে বেঁচে থাকার জন্য কেন আমরা একাজ করতে পারবো না?

এবার অসহায় বোধ করল সমীর। চট করে কোন যুক্তি খুঁজে পেল না সে। বাধা দিয়ে বলল, ওসব কথা থাক। আমি মাথা উঁচিয়ে বাঁচতে চাই......

—বেশ তাই কর। তবে জেনে রাখ এ সব সেন্টিমেন্ট আমারও একদিন ছিল, কিন্তু আজ......

—থাক। আমি চলি।

চলে এসেছিল সমীর। কিন্তু তোলপাড় চলেছিল মনের ভিতর। মাছির মত ঘুরেফিরে বারবার পল্টুর শেষ কথাগুলো মনের ওপর ছায়া ফেলেছিল—জাগিয়ে তুলছিল কতকগুলো তীক্ষ্ণমুখ প্রশ্ন। বিষাক্ত সাপের মত ফণা তুলে চোখের ওপর ভাসছিল প্রশ্নগুলো—আর তার বিষবাষ্পে কাঁপিয়ে তুলছিল সমীরের বিশ্বাসের ভিত। এতদিনকার বিশ্বাস, মূল্যবোধ আর জীবনের ছকটা যেন কেমন কেঁপে কেঁপে উঠছে। প্রিন্সিপালকে পিতার মতই শ্রদ্ধা করে সে। তিনি কোন অন্যায় করতে পারেন এ কথাটা ভাবতেও ভাল লাগে না সমীরের। এতদিন যে প্রশ্নগুলো নিজের মনের মধ্যেই আনাগোনা করে ক্লান্ত হয়ে পড়ত, হঠাৎ পল্টুর মুখে সেগুলো শুনে কেমন যেন এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে।

শিক্ষক হবেন পিতার মত, সমস্ত ছাত্ররা স্নেহ, ভালবাসা ও ন্যায়বিচার পাবে তাঁর কাছে—এই ত' এতদিন শিখিয়েছেন বাবা। কিন্তু বাবার কথাটা কি তাহলে মিথ্যে? তা না হলে সুদর্শন বিরাট ধনীর ছেলে হয়েও ফ্রি স্টুডেন্টশিপ পেল, কিন্তু যার দুবেলা অন্ন জোটে না অথচ পড়াশোনায় আগ্রহ আছে সে পেল না। তারই তো পাওয়া উচিত ছিল। প্রিন্সিপালের সাথে দেখা করেছিল সে। গম্ভীরস্বরে 'আর কিছু হবে না' বলে তাড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন। অভিভাবক নেই, আয়ের কোন পথ নেই, ফ্রি না পেলে তার পড়াশোনা হবে না, এ কথার উত্তরেই ধমকে উঠে প্রিন্সিপাল বলেছিলেন, 'কলেজ গরীবের জন্য নয়।' প্রতিবাদ করতে পারতো সমীর, চিৎকার করে এক গণ্ডগোল বাধিয়ে ফেলতে পারতো। কিন্তু সেই মুহূর্তেই বাবার মুখখানা মনে পড়ে গিয়েছিল, সংগে সংগে তাঁর কথাটাও—'গুরুজনের মুখে মুখে কথা বলা অন্যায়।' তাই আর পারে নি। বুকভরা অভিমানের দুঃসহ যন্ত্রণা নিয়েই ফিরে এসেছিল সে। সুদর্শন নিশ্চয়ই বাড়ি থেকে মাইনের টাকাটা আনবে এবং তা দিয়ে সিগারেট ফুঁকে ঘুরে বেড়াবে—কিন্তু সেই ক'টা পয়সার অভাবে সমীরের পড়াশোনাই হয়ত বন্ধ হয়ে যাবে ইত্যাদি অনেক কথা তার বলার ছিল। কিন্তু বলতে পারে নি।

বাসায় ফিরেই নতুন আর এক ঝামেলার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তাকে। বাড়িওয়ালার তাগাদা। প্রথমে তাগাদা, তারপর গালাগালি। মাথাটা টনটন করে উঠেছিল। বাড়িওয়ালারই বা দোষ কি? তিন মাস এক পয়সা ভাড়া দিতে না পারলে কেই বা থাকতে দেবে। শেষকালে অনেক অনুনয়-বিনয় করে এবং কয়েকদিনের মধ্যেই ভাড়াটা

মিটিয়ে দেবে বলে ঠাণ্ডা করেছিল বাড়িওয়ালাকে।

কিন্তু......। কিন্তু নিজে ঠাণ্ডা হতে পারল না। কি করে দেবে ভাড়ার টাকা? আর না দিতে পারলে আবার গালাগালি শুরু করবে, হয়ত বাড়ি থেকে বেরই করে দেবে। তাছাড়া অন্নের সংস্থানই বা হবে কি করে?

গনগনে সব চিন্তার বোঝা নিয়েই কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল সে। সমাধানের রাস্তা খুঁজে বেড়ালো কল্পনায়, কিন্তু সব রাস্তাই মরুপথে হারিয়ে যাওয়া স্রোতস্বতীর মতই হারিয়ে গেল। কোন রাস্তা খুঁজে পেল না সে।

তারপর একসময় মা'র কাছে পল্টুর কথাটা পাড়লো। কিন্তু সায় মিলল না। তাঁরও সেই অভিযোগ 'রাস্তাটা অন্যায়।'

'অন্যায়' কথাটা শুনেই মাথাটা কেমন যেন বিগড়ে গেল সমীরের। উষ্ণ কণ্ঠেই বলে উঠলো, অন্যায়, অন্যায় বলছ কিন্তু ন্যায়টাই বা কে করছে? এই যে আমাকে ফ্রি স্টুডেন্টশিপ না দিয়ে সুদর্শনকে দেওয়া হলো এটা কি ন্যায়। আমার অবস্থা বিন্দুমাত্র না বুঝে পিতৃতুল্য প্রিন্সিপাল আমার দারিদ্র্যকে নিয়ে উপহাস করলেন, এটাও কি ন্যায়?

রপ্তানীর বাজারে যাঁরা বেশ জাঁকিয়ে বসেছেন কিম্বা উৎপাদনের ক্ষেত্রে সবে উঠতে শুরু করেছেন, তাঁরা যদি বিদেশের বাজারে নিজেদের মাল পাঠাতে চান তবে আমাদের "ক্ষুদ্র প্যাকেট সেবা"র সদুপযোগ করতে পারেন। এর সাহায্যে আপনি আপনার মালের নমুনা কিংবা সামান্য পরিমাণে আপনার পণ্য বিদেশের বাজারে পাঠাতে পারেন। আপনার ইচ্ছে অনুযায়ী রেজিস্টার্ড বা সাধারণভাবে এয়ারমেলে বা সাধারণ ডাকে (সারফেস পোস্ট) পাঠাতে পারেন।

তলার বিবরণ মতো "ছোট প্যাকেট" টি হওয়া উচিত:—

রপ্তানীকারকদের

ক্ষুদ্র প্যাকেট সেবার মাধ্যমে

বিদেশের বাজারে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়

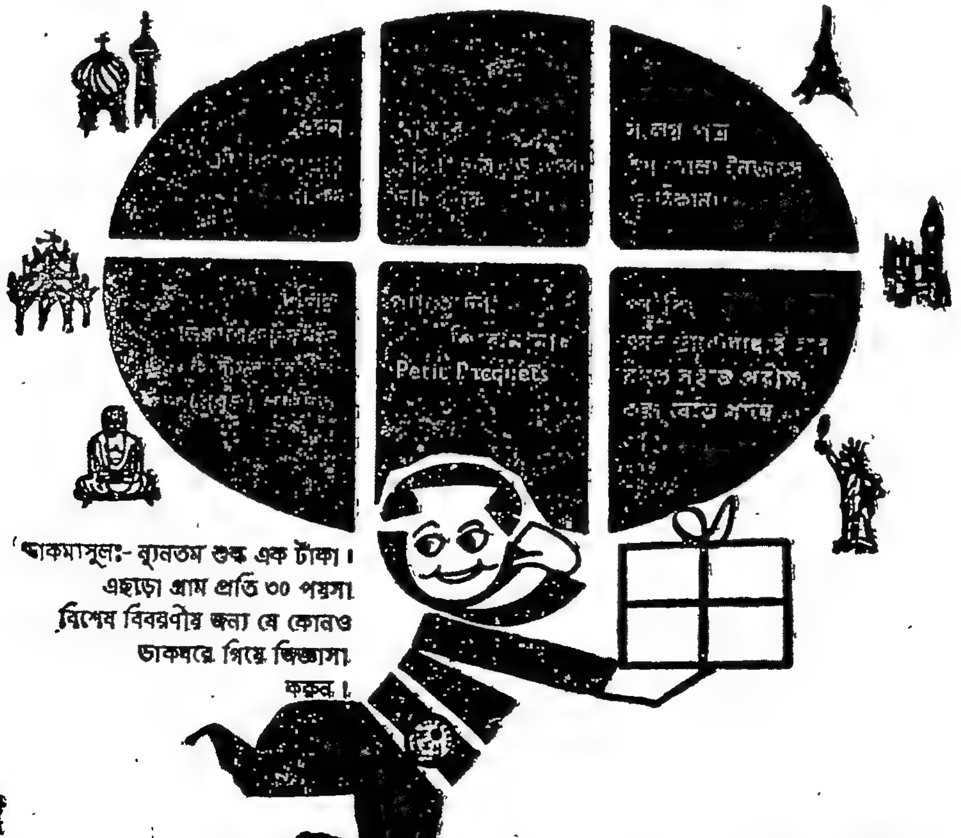

ডাকমাসুল:- ন্যূনতম শুল্ক এক টাকা।
এছাড়া গ্রাম প্রতি ৩০ পয়সা।
বিশেষ বিবরণীর জন্য যে কোনও ডাকঘরে গিয়ে জিজ্ঞাসা করুন।

ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ

—বড়দের দোষ-ত্রুটি দেখতে নেই বাবা।

—সব তাতেই তোমাদের এক কথা। বলে আর কথা বাড়াতে ইচ্ছে করে না সমীরের।

চুপচাপ শুয়ে থাকে সে। কিন্তু ঘুম আসে নি। ঘুমুতে পারে নি। অভাব, বাড়িওয়ালা, কলেজে পড়া, পল্টু সব প্রশ্নগুলো কিলবিল করে ছোটাছুটি করতে থাকল মনের ভিতর। প্রিন্সিপালের আচরণকে কোনমতেই ন্যায়সঙ্গত বলে ভাবতে পারল না সে—অথচ প্রাপ্য ন্যায়-বিচার আদায় করার ক্ষমতাও তার নেই। এই অক্ষমতাটাই অভিমানের পাহাড়টাকে স্ফীততর করে তুলল, নিভৃত রজনীর ঘন তমিস্রার অন্তরালে জন্ম নিল এক সুতীব্র আত্মঘাতী প্রতিশোধস্পৃহা। রাতের দুঃস্বপ্নের মতই প্রিন্সিপালের কথাটা সমীরের বিশ্বাসের মর্মমূলে আঘাত হানতে থাকল, ক্ষয়রোগের বীজাণুর মত আচ্ছন্ন করে ফেলল সতেজ আদর্শপুষ্ট তরুণ হৃদয়টাকে। প্রিন্সিপাল হয়ে যদি বিনা কারণে এমন নিষ্ঠুর অন্যায় করতে পারেন, অবিচার করতে পারেন, তবে আমি বাঁচার জন্য কেন পারবো না। ঠিকই বলেছে পল্টু।

কথাটা ভাবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরটা অস্বাভাবিক দৃঢ়তায় সচকিত হয়ে ওঠে সমীরের, যেন নতুন এক চেতনার জন্ম হল তার মধ্যে। একটা ভ্যাপসা দুর্ভেদ্য বলয় এতক্ষণ ঘিরে রেখেছিল তাকে। এবার যেন তার থেকে মুক্তি পেল সে। দৈনন্দিন অভাব, দারিদ্র্যের বিষাক্ত জ্বালা, বাড়ি-ওয়ালার অত্যাচার যা পারে নি তাই পারলো প্রিন্সিপাল মশায়ের এক অসতর্ক উক্তি। নৈতিকতার সমস্ত বাঁধন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দিল, কিশোর মনের সতেজ আদর্শবাদের মূল উচ্ছেদ করে পঙ্কিলতার বিষাক্ত ফেনায় ভরিয়ে তুলল ভুবন মুখুজ্জের ছেলের বুকটাকে।

তার পরদিনই পল্টুর সাথে কাজে নেমে পড়েছিল সে। ভরদুপুরে গণি সাহেবের ডেরা থেকে মালগুলো পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পল্টুর কাছে পৌঁছে দিতে পারলেই কাজ শেষ। সপ্তাহে মাত্র একদিন। প্রথম দু'-একদিন অসুবিধে হলেও পরে ভুবন মুখুজ্জের ছেলে আর পল্টুর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য ছিল না।

ভালই চলছিল। কিন্তু বামাল ধরা পড়ে গেল একদিন। চালান দিলে পুলিশ। জেল হলো এক মাসের। লজ্জায় মাথাটা নিচু হয়ে গিয়েছিল সমীরের।

জেল থেকে ছাড়া পেয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিল আর অন্যায় পথে যাবে না। বাবার ছবিটার নিচে দাঁড়িয়ে শপথ নিয়েছিল আর ও-পথে যাবে না। কষ্ট করে লেখা-পড়া শিখে মানুষের মত মানুষ হবে।

কিন্তু......। আবার ঘটল অঘটন। কলেজে গিয়েছিল সমীর। কিন্তু সুদর্শন তাকে দেখতে পেয়েই টিটকারি দিয়ে উঠেছিল। 'শ্বশুর বাড়ি' কেমন লাগল ইত্যাদি ইত্যাদি সব অশোভন কথা দিয়ে আপ্যায়ন করল তাকে। প্রতিবাদ করতে গিয়ে কথা কাটাকাটি হল তার সাথে। ব্যস্—তারপরই দল পাকাল সুদর্শন। সোজা প্রিন্সিপালের কাছে গিয়ে জানাল একটা চরিত্রহীন স্মাগলারের সাথে ক্লাস করতে তারা রাজী নয়। কলেজের মরালিটি নষ্ট করে দেবে ছেলেটা। সব কথা শুনে প্রিন্সিপাল সমীরকে ডাকিয়ে কলেজ ছেড়ে যাবার হুকুম দিলেন। তার কলেজে পড়া চলবে না। এই বয়সেই কু-ব্যবসায় হাত পাকিয়েছে বলে ছিঃ ছিঃ করলেন। একথাটাও বললেন, তুমি আমাদের ছাত্র ছিলে একথাটা ভাবতেও মাথাটা নিচু হয়ে যায়। ছিঃ ছিঃ।

অনেক অনুনয় করেছিল সমীর। আর এ-কাজ করবে না, বাধ্য হয়েই এ-কাজ করতে হয়েছিল তাকে, এসব কথাও বলল। কিন্তু কোন কথাতেই কাজ হল না। প্রিন্সিপালের এক উত্তর, পক্ষপাতিত্ব করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তোমার জন্য আলাদা কিছু করা আমার পক্ষে অন্যায়। তোমার একার জন্য আমি সমস্ত কলেজের মরালিটি নষ্ট হতে দিতে পারি না। কাল থেকে আর কলেজে আসবে না।

অপমানের দুঃসহ উত্তাপ বুকে নিয়েই বেরিয়ে এসেছিল সমীর। প্রিন্সিপাল ভেবেও দেখলেন না, কেন সে এমন করতে গেল। সুদর্শন, যে টেরিকট টেরিলিন পরে ফ্রি স্টুডেন্টশিপ নিয়ে মাইনের টাকাটা দিয়ে সিগারেট ফুঁকে বেড়ায় তার মরালিটি নষ্ট হয়ে যাবে আমার জন্য?—কথাটা ভাবার সংগে সংগে ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছে হয়েছিল তার। সমস্ত পৃথিবীটাকে বীভৎস নিষ্ঠুর মনে হয়েছিল। ঘৃণা ও অভিমানের পুঞ্জীভূত চাপে জমাট বেঁধে গিয়েছিল বুকটা।

নিজের পৃথিবীটা ক্রমশ ছোট হয়ে এল। পাড়ায়; চেনা-জানা, আত্মীয়-বন্ধু সকলের চোখে এক অবজ্ঞামিশ্রিত ঘৃণার ভাব। সকলের তাচ্ছিল্য সহ্য করার জন্যই যেন জন্ম হয়েছে সমীরের। দিনের পর দিন সকলের ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য আবার এক দুর্দমনীয় প্রতিশোধস্পৃহার জন্ম দিল, সকলকে অস্বীকার করে নিজের পথে এগিয়ে যাবার সর্বনাশা শক্তি জুগিয়ে দিল। সে চায় না, চায় না কারো স্নেহ, কারো ভালবাসা, কারো কৃপা বা কারো প্রশংসা—যে যাই বলুক, নিজের পথ নিজেকেই বেছে নিতে হবে। কেউ বোঝে না কারো দরদ, প্রয়োজনে কেউ হাত বাড়িয়ে দেবে না, শুধু সুযোগ পেলেই বিচারকের আসনে বসে একতরফা বিচার করে যাবে। পল্টু, হ্যাঁ, পল্টুরাই প্রয়োজনে পাশে এসে দাঁড়ায়। হ্যাঁ, পল্টুই তার একমাত্র বন্ধু। সে-ই বোঝে তাকে, সে-ই জানে তার ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়কে। পৃথিবীর নির্মল আলোকেই সে বুকে টেনে নিতে চেয়েছিল, কিন্তু পারলো না।

আবার অন্ধকারের শিকার হল সে। আবার ভিড়ে পড়ল পল্টুর দলে। এবার আরও বেপরোয়া। সে জেলখাটা স্মাগলার। এ ছাড়া তার আর পরিচিতি নেই। তার সাথে কথা বললে সুদর্শনের মত ছেলেদের মরালিটি নষ্ট হয়, প্রিন্সিপালের লজ্জা হয়। তার আত্মসম্মান নেই, তার কোন মর্যাদাবোধ থাকতে নেই। বন্ধু-বান্ধবের তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য তাকে আর পীড়া দিতে পারবে না, সবকিছু পিছনে ফেলে দুর্নিবার গতিতে এগিয়ে চলল সে।

কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। হঠাৎ শেয়ার নিয়ে গণ্ডগোল হল পল্টুর সাথে। শেষকালে মারামারি।

হাসপাতালে পড়ে আছে পল্টু। আর তার স্থান হয়েছে পাঁচিল-ঘেরা এই গারদে। স্মাগলার সমীর মুখুজ্জের নামের সাথে যোগ হল আর ক'টা বিশেষণ—বদমায়েস, গুণ্ডা, সমাজবিরোধী।

ঢং ঢং করে পাঁচটা আওয়াজ হল জেলখানার পেটাঘড়িতে। রাত্রির অবসান ঘোষিত হল। তন্ময়তা কেটে গেল সমীরের। ঘড়ির শব্দটা তাকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনল। নিজের দিকে তাকিয়ে দেখল সে। ডোরাকাটা কয়েদীর পোষাকটা বেশ ভালই মানিয়েছে।

পুব আকাশটা লাল হয়ে উঠেছে। রক্তিম সূর্যের লালচে আলো তমসাচ্ছন্ন রজনীর কালো ঘোমটা একটু একটু টেনে তুলছে। ক্লান্ত দেহের ওপর সস্নেহ মাতৃ-হস্তের মত আলতোভাবে হাত বুলিয়ে যাচ্ছে একটা প্রভাতী সমীরণ।

গরাদের ফাঁক দিয়ে সূর্যের দিকে মুখ তুলে দাঁড়াল সমীর। একাগ্র দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। রাত্রির কালিমা পুড়ে সোনালী আলো নিয়ে হাজির হয়েছে সূর্যটা। একথালা রক্তের মত দেখাচ্ছে ওকে। দেখছে সমীর। চেয়ে চেয়ে দেখছে সূর্যের ঠিক মাঝখানটায় হঠাৎ বাবার মুখখানা দেখতে পেল সে। সেই দৃষ্টি, সেই মৃদু হাসি। পরিস্কার দেখতে পাচ্ছে সমীর। বাবার দৃষ্টি থেকেই যেন সোনালী আলোটা বেরিয়ে এসে ছড়িয়ে পড়েছে পৃথিবীর বুকে। জেলখানার মনের ওপরও লুটিয়ে পড়েছে একমুঠো আলো। বাবা, বাবা, বলে চীৎকার করতে ইচ্ছে হল সমীরের। একে একে সব কথা-গুলো মনে পড়ল। বাবার মুখের দিকে

আবার ডাকাল সমীর। আবার মুখে ম্লান হাসি, যেন অস্ফুটস্বরে তিনি বলছেন 'পথ ভুলে গেলি কেন?' ডুকরে কাঁদতে ইচ্ছে হল সমীরের। পারলো না। আলোটা আরও গভীরভাবে ছড়িয়ে পড়ল ঘরের চারদিকে, তবু গরাদের ভিতর ঢুকল না। সমীরের দেহ-মন সমস্ত সত্তা একসংগে আকুলি-বিকুলি শুরু করল এই প্রভাতী রোদ্দুরের জন্য। পিতার সংস্পর্শ যেন ছড়িয়ে রয়েছে এই রোদ্দুরে। চাইল, গরাদের দরজাটা ভেঙে দৌড়ে গিয়ে সমস্ত দেহে একটু পবিত্র আলো, একটু পিতৃ-পরশ বুলিয়ে নিতে। ওতেই যেন দূর হবে ওর সমস্ত ক্লান্তি। সমস্ত তন্ত্রী-গুলো তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠলো এই একটু উত্তাপ, একটু আলোর জন্য। ব্যাকুলতায় প্রায় চেতনা হারিয়ে ফেলল সমীর। গবাক্ষের শিক ধরে প্রচণ্ড ধাক্কা দিয়ে ভেঙে দিতে চেষ্টা করলো। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান-গর্বিত সভ্যতর সর্বাধুনিক গরাদের ইস্পাতের দরজা কোনমতেই সমীরকে একটু জায়গা করে দিল না। আটকে দিল সমীরকে, স্তব্ধ করে দিতে চাইল সমীরের প্রতিমুহূর্তের আকাঙ্ক্ষাকে। বাধা পেয়ে পুঞ্জীভূত আক্ষেপে চীৎকার করে উঠলো সমীর, আলো, একটু আলো......

দেয়াল-ঘেরা বন্ধ গরাদের খাঁজে খাঁজে সেই চীৎকার প্রতিধ্বনিত হয়ে গুমরে গুমরে ফিরল শুধু।

কৃষকের জীবন নির্ভর করে চাষ-বাসের উপর। খেতখামারের উন্নতির জন্য এবং গোলাভরা ফসলের জন্য তার চাই অর্থ। কিন্তু সেই অর্থ আসবে কোথা থেকে?... ভাবনা নেই। কৃষি উৎপাদন ও খেতখামারের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের 'ফার্ম ফিনান্সিং স্কীম' প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকদের সরাসরি আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়।

উচ্চ স্তরের বীজ, সার, কীটপতঙ্গনাশক ওষুধপত্র প্রভৃতি কেনার জন্য কৃষকদের স্বল্প-মেয়াদী ঋণ দেওয়া হয় যা ফসল কাটবার পর শোধ দেওয়া যায়।

খেতখামারের উন্নতির জন্য, জলকূপ বৈদ্যুতিকীকরণ করে জলসেচের সুবিধা বাড়িয়ে তুলতে এবং পাম্পের সরঞ্জাম, ট্রাক্টর ও কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহারোপযোগী অন্যান্য সাজ-সরঞ্জাম কেনার জন্য পাঁচ বছরে কিস্তিতে কিস্তিতে শোধনীয় মধ্য-মেয়াদী ঋণেরও ব্যবস্থা আছে।

এই প্রকল্প অনুযায়ী কৃষি ও খেতখামারের সবরকম সমস্যার বিষয়ে কৃষকদের বিনামূল্যে পরামর্শও দেওয়া হয়।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

১৮৯৫ সাল থেকে
জাতির সেবায় নিয়োজিত

চেয়ারম্যান : এস. সি. ত্রিখা

কৃষকের প্রয়োজনে
পি এন বি-ই প্রকৃত বন্ধু

বিপ্লব প্রচেষ্টার একটি বিস্মৃত অধ্যায়

তপতীনাথ মুখোপাধ্যায়

অবনী মুখার্জী

[জন্ম—৩রা জুন, ১৮৯১। স্থান—জব্বলপুর, মধ্যপ্রদেশ। দেশ—বাবুলিয়া, সাতক্ষীরা, খুলনা। পিতা রাও সাহেব ত্রৈলোক্যনাথ মুখার্জী। মাতা হরিমতী দেবী। মৃত্যু—২৮শে অক্টোবর, ১৯৩৭ সালে সোভিয়েত রাশিয়াতে।]

যে সমস্ত ভারতীয় বিপ্লবীরা দেশ-বিদেশে ভারতের স্বাধীনতার জন্য সহ্যাতীত দুঃখবরণ, দুর্জয়-চেতনা ও নির্ভীক প্রত্যয়ের সঙ্গে সংগ্রাম করেছিলেন, অবনী মুখার্জী তাঁদেরই অন্যতম। কৈশোরে ও ছাত্রাবস্থায় এসেছিলেন সখারাম গণেশ দেউস্কর, বিপিনচন্দ্র পাল, মৌলভী লিয়াকত হোসেন, প্রভাসচন্দ্র দেব (মাণিকবাবু), ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রমুখ দেশবরেণ্য নেতাদের সংস্পর্শে. আর সকলের ওপরে ছিল তাঁর গর্ভধারিণীর উৎসাহ বা প্রেরণা। গেলেন আমেদাবাদ থেকে বয়ন-শিল্পের বিজ্ঞানসম্মত কৌশল করায়ত্ত করতে জাপানের ওসাকায় ও পরে জার্মানী। জার্মানীতে তথাকার রয়েল হাউসের চেম্বারলেন কাউন্ট ভন উইডির সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তার ক'রে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহের চেষ্টা করেন। প্রাসিয়ার বিখ্যাত সোসিয়েলিস্ট নেতা ডঃ অসকর খনের নিকট সমাজতন্ত্রবাদ শিক্ষা করেন। ফিরলেন দেশে ১৯১২ সালে। পরিচয় হল বৃন্দাবনে প্রেম মহাবিদ্যালয়ে সুরেন কর, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, কনখলে রাসবিহারী বসু, কলকাতার অতীন্দ্রনাথ মুখার্জী প্রমুখের সঙ্গে। বিপ্লব সাধনার পরিণতি তখন হাতছানি দিয়েছে। যতীন্দ্রনাথ মুখার্জীর পরামর্শে ১৯১৫ সালে ভারত ছেড়ে চললেন জাপানে রাসবিহারী বসুর সঙ্গে মিলিত হতে। এলেন আরও অনেক বিপ্লবীর সংস্পর্শে, তাঁর পূর্ব-পরিচিত বিনয়কুমার সরকার, শিবপ্রসাদ গুপ্ত, ভাই ভগবান সিং, সান ইয়াং সেন, লালা লাজপৎ রায়, ধন সিং, অবিনাশচন্দ্র রায় প্রমুখ নেতাদের সঙ্গে হল মতের আদান-প্রদান। সান ইয়াং সেনের দক্ষিণহস্ত বিপ্লবী ওয়েসির সঙ্গে রাসবিহারী বসুর আলাপ করিয়ে দেন। চীনের জার্মান রাজদূত পিকিং-এ তাঁদের আমন্ত্রণ করলেন। কিন্তু পিকিং নিরাপদ নয় বলে আয়োজন করলেন সাংহাইয়ের এক সম্মেলন ১৯১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। জাভায় ভারত থেকে প্রেরিত জনৈক বিপ্লবীর সঙ্গে ব্যাংককের বিপ্লবীদের সমর্থিত এক উকিলের টাকা-পয়সার ব্যাপারে বিরোধ ও মনোমালিন্য হওয়ায় উক্ত উকিল সিঙ্গাপুর গভর্নমেন্টের কাছে বিপ্লব ও বিপ্লবীদের সমস্ত গোপন খবর প্রকাশ করে দেন। তিনি এই অঞ্চলের সমস্ত প্ল্যান জানতেন। গভর্নমেন্ট চারিদিকে জাল বিস্তার করল। সম্মেলনের শেষে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পথে অতর্কিতে পুলিশ ধরে ফেলল তাঁকে। পকেটে ছিল একটি নোটবুক, অবসর পেলেন না সেটিকে সরাবার, পুলিশ পেয়ে গেল অনেকের গোপন পরিচয়। ১৯১৭ সালের মার্চ মাসে কোর্ট মারশেলের দিন ধার্য হয়। কিন্তু তখন ভাগ্য সুপ্রসন্ন। কয়েকজন জার্মান যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে সমুদ্রে স্নান করতে গিয়ে সবার অলক্ষে সাঁতার দিয়ে পালালেন। সুদূরে পথের যাত্রী। অজানা তার পরিণাম। তবুও জুটে গেল এক জেলে-ডিঙি বিধাতার করুণায়। চলে গেলেন সুমাত্রায় কপর্দকহীন অবস্থায়। দেশের স্বাধীনতার জন্য উৎসর্গীকৃত প্রাণ, কোনদিন কোন বিপদকেই ভয় পায় না। তাঁরাই এ মুক্তিযজ্ঞের সাত্বিক পুরোহিত।

পুলিশের সতর্কদৃষ্টি এড়িয়ে কুলির কাজ নিলেন এক রবার কোম্পানীতে। উদ্দেশ্য পাথেয় সঞ্চয়। মন তখন চলে গেছে সুদূরে সাগর পারে, মিলিত হতে ইংরাজ-শত্রু জার্মানদের সঙ্গে যাতে ভারতের স্বাধীনতার পথ সুগম হয়। পাথের সঞ্চয় হতেই এক ওলন্দাজ ভদ্রলোকের চাকর সেজে "আর সাহির" নামে পরিচয় দিয়ে পাড়ি দিলেন। পৌঁছলেন হল্যান্ডে। তারপর জার্মানী। জার্মানীতে সৌভাগ্যক্রমে দেখা হয়ে গেল ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অধ্যাপক ক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের সঙ্গে। পূর্ব-পরিচয় এতদিনে কাজে লাগল, ঝাঁপিয়ে পড়লেন কর্ম-সমুদ্রের মাঝখানে। কিছুদিন বাদে গেলেন পুনরায় মস্কো ভারতীয় ডেলিগেটরূপে ১৯২০ সালের জুলাই মাসে, দ্বিতীয় কম্যুনিস্ট ইণ্টারন্যাশনাল কংগ্রেসে। "মস্কো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিপ্লবযজ্ঞের হোমকুণ্ড। দেখলেন ধনশক্তিকে—দুর্জয় পাশ্চাত্য সভ্যতার ওপর সেখানে নির্ধনের শক্তিসাধনার আসন পাতা হয়েছে, দেখলেন সমাজতান্ত্রিক মহাবিপ্লব পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে মানবসমাজের উত্তরণের নব অধ্যায়।" বৈপ্লবিক চিন্তাধারায় ঘটল রূপান্তর। ভাবলেন যে সাম্যবাদমূলক বিজ্ঞানচর্চা না করলে দেশের স্বাধীনতা অসম্ভব। পরে মস্কোস্থিত ইনস্টিটিউট অফ রেড প্রফেসারস্এ চলল গবেষণা চার বৎসর। পেলেন ডক্টরেট উপাধি। ১৯২০ সালেরই সেপ্টেম্বর মাসে ভারতীয় ডেলিগেটরূপে গেলেন বাকু কংগ্রেসে। তারপর তাসখন্ড। নানান আপত্তি ও বাধা সত্ত্বেও তাঁর প্রবল চেষ্টায় ১৯২০ সালের অক্টোবর মাসে তাসখন্ডে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। সেই পার্টির ওয়ার্কিং কমিটির সভ্য ও সভ্যাদের মধ্যে ছিলেন অবনী মুখার্জী, রোজা ফিটিংগফ, মহম্মদ সাফিক, মাউসুক আলি সাহ প্রমুখ। ইতিমধ্যে বৃটিশ গভর্নমেন্ট অবনী মুখার্জীর কথা জানতে পেরে সোভিয়েত সরকারকে তাঁকে ভারতে কোর্ট মারশেলের জন্য ফেরত পাঠাতে অনুরোধ করেন। সোভিয়েত সরকার সে অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। শ্রীমতী রোজা ফিটিংগফকে অবনী মুখার্জী পত্নীরূপে গ্রহণ করেন। ১৯২১ সালে ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টি মস্কোয় কম্যুনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের অনুমোদন লাভ করে। এর কিছুদিন পরে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে পুস্তক লেখা প্রসঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হয়। ১৯২২ সালের গোড়ার দিকে নলিনী গুপ্ত ভারত থেকে প্রত্যাবর্তনের পর বার্লিনে আরও অন্য এক কারণে রায়ের সঙ্গে উক্ত বিরোধ প্রবল হয়। সুরেন কর ও অবনী মুখার্জী রায়ের সংস্রব ত্যাগ করেন। নলিনী গুপ্ত প্রথমে রায়ের বিরুদ্ধে যান, কিন্তু পরে রায়ের সঙ্গে শ্রীগুপ্তর পুনরায় সৌহার্দ্য হয়। দুজনের এই বিরোধের ঢেউ এমন কি ভারতবর্ষেও এসে পৌঁছয়। অবনীনাথের চেষ্টায় ১৯২২ সালে রাশিয়ার দুর্ভিক্ষের সময় বার্লিনে দি ইণ্ডিয়ান কমিটি ফর রাশিয়ান ফেমিন রিলিফ গঠিত হয়। অবনীনাথ তার জয়েন্ট সেক্রেটারী ছিলেন। ঐ সালেই বার্লিনে মহম্মদ বরকতুল্লা, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখকে নিয়ে ইণ্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পার্টি তাঁর চেষ্টায় গঠিত হয়। ১৯২২ সালে পার্টির নির্দেশে অবনীনাথ গোপনে এলেন ভারতে। মহামতি লেনিন অবনীনাথের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় ও তাঁর লিখিত প্রবন্ধাদি পড়ে তাঁর সম্বন্ধে খুব উচ্চ

ধারণা পোষণ করতেন। জিনোভিয়েভের কর্মসূচী নিয়ে ভারতে যাতে কম্যুনিস্ট পার্টির কাজ সুষ্ঠুভাবে চলে সে প্রচেষ্টা অবনী মুখার্জী করেন। শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্যানি। ভাগ্যের বিড়ম্বনায় তাঁর বিপক্ষ ও সেই বিপক্ষের ভারতে প্রেরিত এজেন্টের প্ররোচনায় তাঁ । কয়েকজন সহকর্মী তাঁর বিরোধিতা করেন। তিনি রাশিয়ায় জিনোভিয়েভকে এইসব বিরোধিতার রিপোর্ট পাঠালেন। প্রচার পুলিশ তা পেয়ে গেল। তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহাফেজখানায় রক্ষিত রেকর্ড থেকে জানেন তাঁর বিপক্ষের লোকেরা তাঁকে গুপ্তচর আখ্যা দেয়—এই আখ্যা পুলিশ মোটেই বিশ্বাস করেন নি। অবশ্য কমরেড ঘাটেও কায়রো থেকে জনাব সৌকাত উসমানী কোনও একজনকে লিখিত পত্রে তার প্রতিবাদ করেন এবং বলেন যাঁরা এইসব কুৎসা রটনা করেন তাঁরা অপরের কর্মদক্ষতা ও গৌরবকে সহ্য করতে পারেন না বলে এরকম করেন। কলকাতায় তাঁর বিপক্ষের এক ভূতপূর্ব সহকর্মী ছোটনাগপুরের জনৈক বিপ্লবীর পরামর্শে ঐ বিপ্লবী দলের কয়েকজন তাঁকে একটি ঘরে আটকে রাখেন। স্মরণীয় বিপ্লবী সন্তোষ মিত্র মশায় তাঁকে সেখান থেকে উদ্ধার করেন। রাজকুমার বসু, জনাব আবদুর রেজ্জাক খাঁ, সুরেন্দ্রনাথ হালদার প্রমুখ বহু দেশপ্রেমিক তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। বিপ্লবীর মধ্যমণি সুভাষচন্দ্র ও উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে ঢাকায় অনুশীলনের আশ্রয়ে পাঠান। তথায় জাত বিপ্লবীরা নরেন্দ্রমোহন সেন, প্রতুলচন্দ্র গাঙ্গুলী, বীরেন্দ্র গাঙ্গুলী, মনোরঞ্জন বানার্জী প্রমুখ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। তৎকালীন বিখ্যাত ছাত্রনেতা ঢাকাতে অবনীনাথের তত্ত্বাবধানের ভার যাঁর ওপর ছিল সেই বরণীয় নেতাকে অবনীনাথ সম্বন্ধে তাঁহার উচ্চধারণা জানান। তিনি ভারতের চাষী-ভাইদের সম্বন্ধে লেখা "গরীবের কথা"র পাণ্ডুলিপি পড়ে মুগ্ধ হন। রাখালচন্দ্র ঘোষ মহাশয় "বিপ্লবী অবনী মুখার্জী" নামে তাঁর জীবনী প্রকাশ করেন। ভারতে থাকাকালীন মাদ্রাজে তাঁর বিশেষ সহকর্মী সিঙ্গারো ভেলচেট্টি, ভেলায়ুধাম পিল্লাই প্রমুখকে নিয়ে হিন্দুস্থান লেবার ও পেজেন্টস পার্টি গঠন করেন। বিদেশে যাবার পাথেয় সুভাষচন্দ্র বসু পাঠালেন অনুশীলনের আশুতোষ কালী মহাশয়ের হাতে। জাহাজে বিখ্যাত শিল্পী শ্রীঅতুল বোস তাঁর সহযাত্রী ছিলেন। জীবনে সঙ্কল্প ছিল অটুট। চললেন কলম্বো হয়ে ফ্রান্সে আবার মস্কো। ১৯২৫ সালে তিনি সমরখন্ড সোভিয়েতের সভ্য মনোনীত হলেন। আর ভারত সম্বন্ধে কয়েকখানি বই লেখেন। তার আগে তাঁর লেখা বই ইন্ডিয়া ইন ট্রানজিসান যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল। লিখলেন এগরেরিয়ান ইন্ডিয়া, ইংলন্ড ও ভারতবর্ষ, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ, ভারতের কৃষি আন্দোলন প্রভৃতি বইগুলি সোভিয়েত সরকারের পেল পূর্ণ সমর্থন। তাঁর হস্তলিখিত আত্মজীবনী লেখা প্রসঙ্গে একথা জানা যায়, এই আত্মজীবনী তাঁর হস্তলেখা নয় বললে সোভিয়েত সরকার লেনিনগ্রাড হতে রাশিয়ার হস্তলিপি বিশারদ দ্বারা তদন্ত করান এবং তাঁরা শ্রীরায়কেই দোষী সাব্যস্ত করেন। পরে নানা কারণে মানবেন্দ্রনাথ রায় পার্টি থেকে বিতাড়িত হন। ১৯২৯ সালে তিনি প্রাচ্য বৈজ্ঞানিক গবেষণা সমিতির সভ্য ও কম্যুনিস্ট একাডেমির বিজ্ঞান সভ্য নিযুক্ত হন। প্রাচ্য বিদ্যা পরিষদের অধ্যাপকের কাজ করার সময় বিজ্ঞান মন্দিরের প্রাচ্য শাখার শিক্ষাসচিব নিযুক্ত হন। এত সম্মান, এত সমর্থন সত্ত্বেও তিনি ভারতে স্ত্রীপুত্র নিয়ে দেশে ফিরে আসার জন্য আবেদন করলেন ভারত সচিবের কাছে। কিন্তু ভারত সচিব সে আবেদন অগ্রাহ্য করলেন। জানালেন তাঁর মত দুরন্ত বিপ্লবীকে "এমনেশটি" দেওয়া হবে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে তিনি, বীরেন চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য অনেকে স্টালিনের বিরাগভাজন হওয়ায় অন্যান্য সকলের মত তাঁকেও নিগৃহীত হতে হয় বলে শোনা যায়। শ্রীমতী মুখার্জী আজও ভারতে আসার জন্য উন্মুখ। পুত্র গোরা ১৮।১৯ বৎসর বয়সে মারা যায়। কন্যা শ্রীমতী মায়া এখন লেনিনগ্রাডে যক্ষ্মারোগ বিশেষজ্ঞ কৃতবিদ্য চিকিৎসক। পিতার আদর্শ আজও তাঁর কাছে অনবদ্য। স্বাধীনতা সংগ্রামের একজন নির্ভীক যোদ্ধা অবনী মুখার্জীর কর্মময় জীবনের এই সংক্ষিপ্ত কাহিনী।

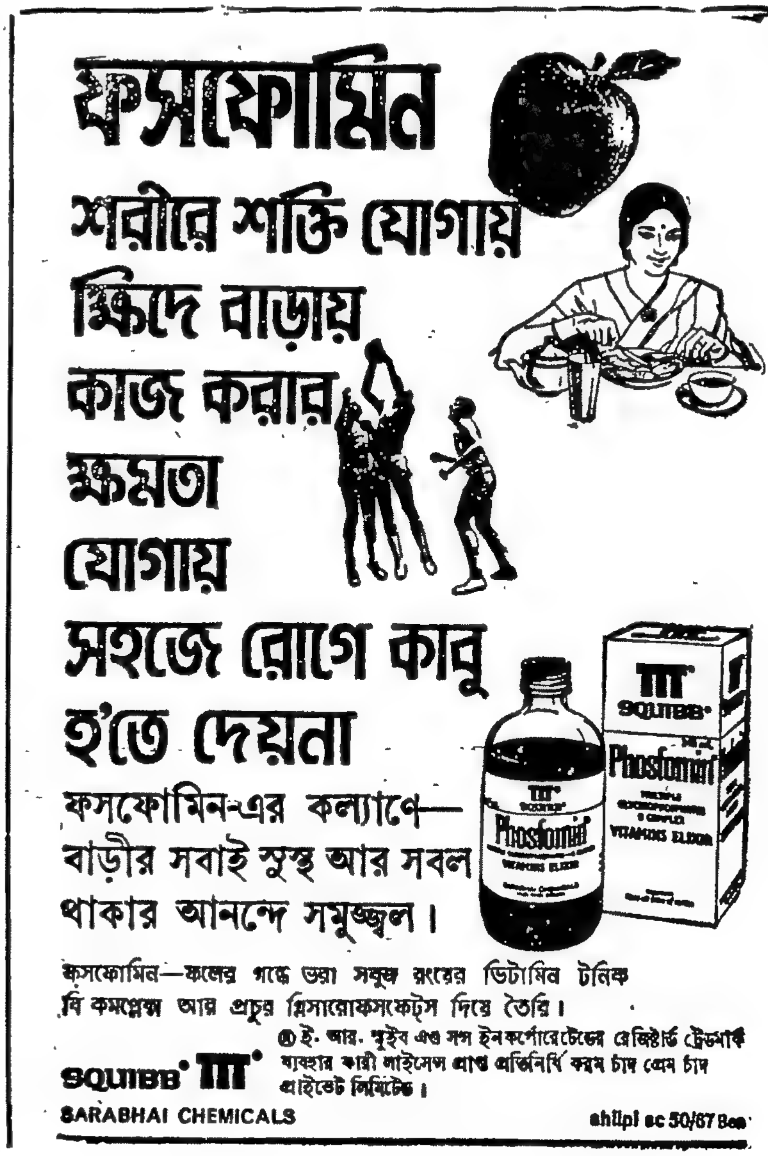

তিমির প্রান্ত ডুয়ার্স

অগ্নিবর্ণ

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ চব্বিশ ॥

সদো ভুটিয়ার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয়েছিল কোথায় ঠিক মনে নেই। কিন্তু তার উজ্জ্বল উপস্থিতিটি আমার মনে গেঁথে আছে।

কিরণকে ভুটানের গল্প করতে গিয়ে তার কথা আগে মনে এসে গেল। গুছিয়ে তুলেছিলাম কথাগুলো কিরণকে বলবো বলে। ভুটানের কথা। হঠাৎ মনে এসে গেল। সাজানো চিন্তা ছত্রখান হয়ে গেল।

কিরণ বলল, কি থামলে কেন?

বুঝতে পারছি সে অধীর হয়েছে। আমার আগ্রহ তার কৌতূহলকে খুঁচিয়ে তুলেছে। সে ইতিহাসের কথা শুনতে চায়। ভুটানের কথা। যে ভুটানকে সকাল হলেই সে স্বপ্নে দেখতে পায়। তার কোয়ার্টারের বারান্দায় দাঁড়িয়ে। নীল আবছা ছবির মত ভুটান পাহাড়ের দৃশ্য জেগে থাকে উত্তরের আকাশে। প্রায় সারাদিন। যতক্ষণ উজ্জ্বল রৌদ্র থাকে। আকাশ জেগে থাকে। নীল ফ্রেমে বাঁধানো একটি স্বপ্নের মত। মাঝে মাঝে অবশ্য ছেদ পড়ে। যখন আকাশ মেঘে মেঘে ছেয়ে যায়। তখন অস্পষ্ট দেখায় ভুটান পাহাড়। আবার মেঘ সরে গেলেই উজ্জ্বল দিন আসে। নীল বুনো হাতীর পিঠের মত স্বচ্ছন্দ পাহাড়ের সারি। ওই ভুটান। ভুটান। পাহাড়ের দেশ। ছেলেবেলায় ভূগোলে পড়েছে ভুটান রাজ্যের কথা। কিন্তু সে পরীক্ষার প্রয়োজনে, ভূগোলের ক্লাশের প্রয়োজনে সদাজাগ্রত শিক্ষকের রক্তচক্ষু মনে রেখে পড়া মুখস্থ করার তাগিদে। বড় হয়ে ডুয়ার্সে এসে প্রথম তার বাস্তব অস্তিত্ব।

কিরণকে বললাম, তার আগে যদি কিছু মনে না কর, সদো ভুটিয়ার কথা কিছু বলে নিই।

সদো ভুটিয়া? কে সদো ভুটিয়া? কিরণের চোখ তেমনি জ্বলজ্বল করে বিস্ময়ে। আগ্রহে ও কৌতূহলে দ্যুতিময়।

সদো ভুটিয়ার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কোথায় আজ আর ঠিক মনে নেই। তবে এইটুকু মনে আছে ডুয়ার্সেরই কোন স্টেশনে দেখা হয়েছিল। স্টেশনটার নাম ভুলে গেছি। অনেকদিন আগেকার কথা। তখন প্রথম এসেছি এখানে। প্রায় অজ্ঞাত অপরিচিত এক দেশকে দেখা থেকেই ভালোবেসে ফেলেছি। মানুষজনের সঙ্গে বেশি পরিচয় নেই। একটা ক্যাম্বিসের ব্যাগ কাঁধে ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ছি যখন-তখন। যেখানে-সেখানে। গাড়ি থামিয়ে উঠে পড়ছি। আবার খেয়ালখুশিতে নেমে পড়ছি যত্রতত্র। সেই সময় ডুয়ার্সেরই এক স্টেশনে দেখা হয়েছিল তার সঙ্গে। মনে আছে সেটি দুপুরবেলা। আকাশে প্রখর রৌদ্র। চারদিক ঝাঁ ঝাঁ করছে। গোটা প্ল্যাটফর্মটা জনহীন পড়ে পড়ে ধুঁকছে। সময়টা গাড়ির নয়। কোন ট্রেন কাছাকাছি নেই। এ-অঞ্চলের স্টেশনগুলিতে খুব গাড়ির ভিড় নেই। হয়তো সকালে দুপুরে দুটি গাড়ি যাওয়া-আসা করে। স্টেশনমাস্টারেরও তাই পোয়াবারো। নির্দিষ্ট সময়মত খেয়েদেয়ে নিয়ে কোয়ার্টারের বিছানায় পড়ে পড়ে ঘুমোতে বাধা নেই।

আমি রৌদ্রের ঝাঁঝালো উত্তাপ থেকে মাথা এবং গা বাঁচাতে চট করে সদ্য-আবিষ্কৃত স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ঢুকে পড়েছিলাম। উদ্দেশ্য স্টেশনঘরের বেওয়ারিশ চালের তলায় আশ্রয় নেওয়া। সামনেই একটা কৃষ্ণচূড়া না গোলমোহর রৌদ্রে জ্বলছে। তার রক্তলাল পুষ্পসম্ভারে চোখ রাখা যায় না। পাতা নেই বললেই চলে। পাতার চাইতে ফুল অনেক বেশি।

সেদিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে তাকাতেই চোখে পড়েছিল বজ্‌রি-ঢালা স্টেশন-প্ল্যাটফর্মের গা-ছুঁয়ে চলে যাওয়া রেললাইনের সরু দুসারি ইস্পাত ঝকঝকিয়ে জ্বলছে মধ্যাহ্নের রৌদ্রে।

আমি দ্রুত ছুটে টিনের চালের তলায় আশ্রয় নিয়েছিলাম। পছন্দমত একটা জায়গা খুঁজে ক্যাম্বিসের ব্যাগটিকে মাটিতে রেখে তার পাশেই বসে পড়েছিলাম পা দুটি যত্নে গুটিয়ে। তারপর পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখ মুছেছিলাম। ঠিক সেই সময় সেই ভর দুপুরে অবিকল আমারই মত বিশ্রামরত সদো ভুটিয়ার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। সে একটা বিড়ি ধরাচ্ছিল। বিড়ি ধরিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে সে বারবার আমার দিকে তাকাচ্ছিল।

হিন্দুস্থানী ভাষায় জিগ্যেস করেছিলাম, তুমি কোথায় যাবে, ভাই?

সদো ভুটিয়া হিন্দীতেই জবাব দিয়েছিল। একটা কোথাও যাবার কথা বলেছিল সে। আমাকেও ফিরিয়ে জিগ্যেস করেছিল, আপ্?

আমি হেসে ফেলেছিলাম। না-হেসে উপায় ছিল না বলে। কোথায় আমি যাব তার কিছু ঠিক-ঠিকানা আছে কি? নিজেই জানি না। তাই বলেছিলাম, আমি মুশাফির ভাই। হামকো কোই ডেরা-উরা নেহি।

হিন্দুস্থানী ভাষাতে বলছিলাম বটে। কিন্তু সে যে ঠিক কোন্ ভাষায় কথা বলে তা বুঝে উঠতে পারছিলাম না। তার পোশাক-আশাক আমার চোখে দুর্বোধ্য ঠেকছিল। মনে করেছিলাম সে হয়তো কোন নেপালী হবে। ডুয়ার্সে এসে থেকতে দেখেছি এন্তার নেপালীকে। যেখানে-সেখানে তাদের অবাধ গতায়াত। আর নেপালীরা যে হিন্দী বলতে জানে, তা জেনেছিলাম শিলিগুড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই। সেই সরল বিশ্বাসের বশবর্তী হয়েই হিন্দীতে বলেছিলাম। তখনো তার আসল পরিচয় আমার জানা হয় নি।

সরল হিন্দীতেই ফিরিয়ে তাকে প্রশ্নটা করেছিলাম তক্ষুণি। লক্ষ্য করেছিলাম যে আমি নিজেকে মুশাফির ঘোষণা করতে তার চোখ দুটিতে কিছু বিস্ময় ফুটে বেরুচ্ছিল। চোখের ভাষা জীবজগতের আদিভাষা। যে কোন ভাষা জানে না, সে-ও অন্যের চোখের দিকে তাকিয়ে তার মনের কিছু-না-কিছু আন্দাজ করতে পারে।

আমি আলাপ জমাবার জন্যেই তাকে

বলেছিলাম, তোমার ডেরা কোথায় ভাই ?

বিড়িতে একটা জোর টান পড়েছিল। তারপর এক-আধ মুহূর্ত নাক দিয়ে মুখ দিয়ে ধূম্রত্যাগপর্ব চলল। আমি তার জবাবের জন্য তাকাচ্ছি।

লোকটা বলল, সে ভুটানী। পরে কাছেই কোন একটা ভুটিয়াবস্তীর নাম করেছিল। নামটা আমি মনে রাখতে পারি নি। ভুটিয়াবস্তী বলতে সুদূর অতীতে একটাই ছিল। প্রায় পঁচাত্তর বছর আগেকার একটি ইংরাজি সরকারী দলিলে দেখেছি খবরটা। তখন আমি নতুন। দলিল-দস্তাবেজ কিছু দেখা হয় নি। আর পঁচাত্তর বছর আগে যাই থাক, এখন এদিকে-ওদিকে ভুটিয়া-বস্তী যে কিছু কিছু আছে তা শুনেছি লোকজনের মুখে।

কিরণ বলল, মূল ভুটিয়াবস্তী কোথায় ছিল বললে না ত' ?

বললাম, স্যান্ডার্স রিপোর্টে পাবে। Survey করেছিল সাহেবরা। ১৮৯৫ খৃস্টাব্দের সেই রিপোর্টে দেখেছি ডুয়ার্সের বকসা ডিভিশনে পাহাড়ের ওপর চুনাভাটি বলে এক জায়গায় তখন প্রায় ১০০০ ভুটিয়া থাকত। পরে তারা ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে থাকবে।

সে যাই হোক। পরিচয় পেতে দেরি হল না। নির্জন দুপুরের নির্জনতর প্ল্যাটফর্মের এই পড়শী ভুটিয়াটির সঙ্গে আলাপ জমিয়ে বসতে দেরি হয় নি আমার। চিরকালই গল্প জমাতে ওস্তাদ। আর তাছাড়া, একটি ভুটানীর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে তার কাছ থেকে কিছু জানবার সুযোগ আর যে-ই ছাড়ে ছাড়ুক, আমি কিছুতেই ছাড়তে রাজী ছিলাম না। আলাপ হল। তার নাম জানলাম। সে নাম বলল, সদো ভুটিয়া। বাড়ির কথাও বলেছিল। দেশ যেখানেই হোক না কেন, সেখানে সে যায় নি কোনদিন। ডুয়ার্সেই আছে। এইখানেই কোথায় একটি ডেরা আছে তার। পাহাড়ের প্রায় গা ঘেঁষেই। সেখানে থাকে তার বৌ, তার দুটি ছেলে ও একটি মেয়ে। ভুটিয়া ভাষায় অবশ্য বলে নি। হিন্দীতেই বলেছিল। দীর্ঘকাল আছে এখানে। সেই সূত্রে শিখে ফেলেছে হিন্দী। শিখতে হয়েছে।

আমি বললাম, তুমি কর কি ?

সদো ভুটিয়া বলল, সে কাজ করে নানা রকমারী। যখন যা সুবিধে। তবে তাদের মুখ্য কাজই কমলালেবুর। শীতে যখন পাহাড়ের কমলালেবুর বাগানগুলি পাকা কমলালেবুর ভারে নুয়ে পড়ে, তখনই সুরু হয় তার আসল কাজ।

অবাক হয়ে তার কথা শুনছিলাম। কমলার ব্যবসা করে সদো ভুটিয়া ? শুনে আমি বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলাম। আজীবন শহুরে মানুষ। পূর্ববাংলায় থাকতেও শীতকালে দেখেছি কমলায় কমলায় ছেয়ে গেছে বাজার। আর সে কমলার প্রাচুর্য যেমন, দামেও তেমনি সস্তা। কলকাতার শীতের বাজারগুলির কথা মনে হয়। দু'হাতে বিক্রি করে কুলাতে পারছে না দোকানী। পাহাড় থেকে আসে কমলা, আশৈশব শুনেছি। আর উত্তরবাংলা শুনলেই কার না মনে আসে দার্জিলিং। সিকিমের ভুটানের কমলালেবুর কথা মনে এসে গেল এখুনি। কলকাতায় অবশ্য নাগপুর থেকেও আসে বিস্তর কমলা। কলকাতা যে বড় বড় মস্ত মানুষদের জায়গা। সৌখিন বাবুদের জন্য গরমের দিনে আছে অবশ্য অনেক উপকরণ। তার মধ্যে কমলালেবুর স্থান কম নয়। সিকিমী কমলার রসে গ্রীষ্মকণ্ঠ বাবুরা মাঝে মাঝে গলা ভিজিয়ে নিচ্ছেন, কল্পনায় দেখতে পাই। আর তার সঙ্গে মনে পড়ে সদো ভুটিয়ার গল্প। সদো ভুটিয়াকে ভুলতে পারি না। কী হয়েছে আমার। কমলা-লেবু দেখলেই, হাটে বা বাজারে, সৌখিন বাবুদের ঘরে বা সাহেবদের মূল্যবান ফ্রীজে, আমার মনে এসে যায় দরিদ্র হতভাগ্য সেই সরল ভুটিয়াটির কথা। এত বছর চলে গেল, কিন্তু আজও ভুলতে পারলাম না।

সদোকে নিছক কৌতূহলবশেই শুধিয়েছিলাম তার জীবিকার কথা। বাইরে যখন কঠোরতম গ্রীষ্মের তীক্ষ্ম ভর্ৎসনা, ডুয়ার্সের আকাশে তাপ বাড়ছে, রাস্তার পিচ গলছে, প্ল্যাট-ফর্মের উল্টোদিকের কৃষ্ণচূড়া বা গোল-মোহরের লাল রক্ত গরমে টগবগ করে ফুটছে, রেললাইনের দুসারি সরু ইস্পাতী চোখে খিকিয়ে উঠছে শাণিত রোদ্দুরের চকচকে ফলা, তখন নেহাৎ কৌতূহলবশতই অপরিচিত পড়শীকে তার জীবন ও জীবিকার ব্যাপারে প্রশ্ন করেছিলাম। এ-প্রশ্ন কলকাতার নাগ-রিক সমাজে নিশ্চয় জানি অভদ্র ও ইতরতার সামিল। পরের ব্যাপারে এমন অভব্য কৌতূহল কেন? প্রাইভেসি ক্ষুণ্ণ হয় না ?

হ্যাঁ, হয়। নিশ্চয় হয়। কিন্তু সদো ভুটিয়া তেমন কোন কদর্থ করে নি। তাকে অধুশিও মনে হয় নি। সরল মনেই সে আমার প্রশ্নের জবাব দিয়ে-ছিল। বিড়িও একটা এগিয়ে দিয়েছিল আমার দিকে। আমি খাই না বলে ফিরিয়ে দিতেও পারতাম। কিন্তু তা করি নি আমি। সহজভাবেই নেশা-খোরের মত গ্রহণ করে অনভ্যস্ত হাতে বিড়িও ধরেছিলাম, অল্প-অল্প টানও দিয়েছিলাম। সে খুশি হল কি না জানি না। কিন্তু তার মুখে তেমন কোন বিশেষ প্রকাশ দেখি নি। মাথার খুব ছোট ছোট করে ছাঁটা চুলের ওপরে বাঁ-হাতের তেলোটা ঘষতে ঘষতে বলে-ছিল তার অভিজ্ঞতার কথা। সে অভিজ্ঞতা মর্মান্তিক। না, ব্যবসা করে না সদো। কমলালেবুর ব্যবসা নয়। শুনতে শুনতে আমি থেমে যাচ্ছিলাম। কথা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল আমার।

ভুটানে কমলা-বাগান অনেক আছে বটে, কিন্তু সে বাগানে ভুটিয়াদের কোন আধিপত্য নেই। বাগানের মালিক তারা নয়। আসলে প্রায় সব বাগানেরই মালিক নেপালীরা। নেপালীরাই সে-অঞ্চলে ধনী এবং ভাগ্যবান। তাদের অবস্থাই সব চাইতে স্বচ্ছল। বিশেষত ইস্টার্ন ভুটানে নেপালীদেরই বসবাস বেশি। ক্ষেত-খামার, জমি, গাইগরু এ-সব নিয়ে তাদের দিন ভালোই কাটে।

এই সব লোকদের আগাম দাদনের টাকা জোগায় ব্যবসায়ীরা। মাড়োয়ারী-রাই তাদের মধ্যে বেশি। বক্তারমল-নাগরমলদের দল। রাজস্থান-বিকানীরের অধিবাসী। সারা দেশ জুড়েই এদের ব্যবসা। সেই ব্যবসার চাবিকাঠিটি কিন্তু সংগুপ্ত। রাতারাতি ব্যবসায় লাখো লাখো টাকা উপার্জনের মন্ত্রটি জানে তারা।

ইংরাজ আমলেই কোন্ এক সুদূরকালে তারা দেশ থেকে বেরিয়ে এখানে ঢুকে পড়েছিল। সেই থেকে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ব্যবসা করেই চলেছে। আগাম দাদনের টাকা জোগায় তারা। তার বিনিময়ে নির্দিষ্ট সময়মত পাহাড়ের ওপর থেকে আসে আলু, আদা, কমলালেবু, পিপুল এই সব কত কী। আর আসে মাখন। মাখনের একচেটিয়া কারবার এদের সঙ্গে। নেপালীদের শুধু কমলালেবুর বাগানই নয়, ও-সব অঞ্চলে গরু-বাছুরের সংখ্যাও তাদের কম নয়। এগুলি থেকেই মাখনের সৃষ্টি।

হ্যাঁ, বলছিলাম সদো ভুটিয়ার গল্প।

দারিদ্র্য তাদের নিত্য সহচর। নিজের বলতে প্রায় কিছু নেই। শীতের দিন কটিতেই তার কাজ। দু' পয়সা ঘরে আসে তখন। সে-ও কঠোর পরি-শ্রমের বিনিময়ে। ওপরের কমলা-বাগানগুলিতে কাজ করতে যায়। অনেক ওপরে সেই বাগান। সান্তালাবাড়ি থেকে যেতে হয় বক্সা। বক্সা ফোর্ট হয়ে আরো ওপরে। তারপর কাঁধে কমলা-লেবুর বস্তা চাপিয়ে দিনের পর দিন পায়ে হেঁটে নিচের দিকে নেমে আসা।

পাহাড়ি পথ। প্রতি পদে পদে বিপদের ভয়। অনিশ্চয়তার ঝুঁকি। ওপর থেকে নিচে নেমেছে রাস্তা। পাহাড়ের ভিতর দিয়ে। চড়াই-উৎরাই ভেঙে ভেঙে। মুখ নীল হয়ে যায় মস্ত বোঝার ভারে। যন্ত্রণায় শিরদাঁড়া টনটন করছে। রক্ত জমে যাচ্ছে কপালের দুই পাশে। বোঝায় পিঠ নুয়ে যাচ্ছে। আঙুলগুলি ছিঁড়ে যাচ্ছে যন্ত্রণায়।

আর সে-ও কি একদিনের পথ! দিনের পর দিন। দিনের পর দিন। খাওয়া নেই, নাওয়া নেই, বিশ্রাম নেই। জংগল, গাছপালা। বিপদ-আপদের ভয়। পায়ের তলায় পাথর। যে-কোন সময় পা পিছলে যেতে পারে। তাহলে আর রক্ষে নেই। নিশ্চিত মৃত্যু। তারপর একদিন ধুঁকতে ধুঁকতে ক্লান্ত দেহটা নিয়ে নিচে নেমে আসা। বিনিময়ে ক'টা টাকা। সেই টাকা আর রক্তের দামে কেনা। কিন্তু সেই ত' শেষ নয়। আবার যাত্রা সুরু ওপরে। আবার তেমনি বোঝা বয়ে ফেরা। অপর ভুটানের দিকে দু'-তিন দিনের রাস্তা। এইভাবে সারাটা কমলালেবুর ঋতু কঠোর রক্ত জলকরা পরিশ্রম।

সমতলের মানুষ ভাবতে পারে না সে-কথা। কমলালেবুর কোয়ায় তৃষ্ণা মেটাই আমরা। উত্তপ্ত ওষ্ঠকে শীতল করি। গ্রীষ্মকণ্ঠ ভিজিয়ে ভিজিয়ে তৃপ্তিকে আস্বাদন করি। প্রিয়জনের হাতে মোড়কে-বাঁধা কমলালেবু তুলে দিই আমরা। সাজানো বাগানে বসে খোসা ছাড়াতে-ছাড়াতে হাসি-গান-আনন্দে ভাসি। রোগশয্যায় ফল দিতে যাই প্রিয়জনকে। বছরের পর বছর টুরিস্টরা সখ করে এসে কমলা-বাগানের ছবি তুলে নেয়। সদো ভুটিয়াদের কথা আমরা ভাবি না। জানিও না। স্টেশন-ঘরের দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে থাকতে থাকতে আমার বুকের ভিতরটা ব্যথায় টনটন করে উঠেছিল। সদো ভুটিয়া বলছিল তার নিজের কথা। সরলমনে সে বলেছিল। আর আমি ভাবছিলাম, আমাদের নিজেদেরও আছে কত সমস্যা। কত অভাব, কত বিপর্যয় প্রতিদিনের জীবনে। আমরা নিজেদের নিয়েই এত ব্যস্ত-সমস্ত। নিকট-পৃথিবীতে এই কাছাকাছি মানুষদের জীবনেই তার চাইতে কঠোর দুঃখ থাকতে পারে। তারা কথা বলতে শেখে নি। নিজেদের অভাব কিভাবে প্রকাশ করতে হয় তা জানে নি। তারা শুধু নীরবে সয়ে যেতে শিখেছে। বিশ শতকের বর্তমান দশকে পৃথিবী-জোড়া সভ্যতা কত পথ হাঁটল। না, ভুল বললাম। এই জেট বিমানের যুগে পৃথিবী আর হাঁটছে না। একেবারেই দূরপাল্লার প্রতিযোগিতায় দৌড় লাগাচ্ছে। চোখের পলক ফেলতে-না-ফেলতেই। বিজ্ঞানের যুগ এটি। বাস্তবিকই এই যুগ আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপের মত অসম্ভবকে সম্ভব করছে। চণ্ডীদাস বলেছিলেন, সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। তামাম দুনিয়ার মানুষকে কাছাকাছি এনেছে বিজ্ঞান। রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা কত কি। কত অল্প সময়ে এক দেশ থেকে আরেক দেশে উড়ে যাচ্ছি আমরা। অবশ্য আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান নিয়মসূত্রাবলী আছে। পাস-পোর্ট আছে। সে-সব মানতেই হয়। কিন্তু এই জেট বিমানের যুগেই, যখন সুদূর হয়েছে অনেকখানি নিকট, তখনও কিন্তু পর নেই পরই থেকেছে, আপন হয় নি। তার কারণ মন দিয়ে দেখে একাল, হৃদয় দিয়ে দেখে না। মস্তিষ্ক ও মননচর্চা বেড়েছে, হৃদয়-চর্চা প্রায় শূন্য। প্রাধান্য। রাষ্ট্রনীতি আমাদের চাবিকাঠি, তাতে রত্নভাণ্ডারের দুয়ার খোলে, কিন্তু হৃদয়নীতি ছাড়া মানবলোকের অন্তঃপুরে প্রবেশের পথ নেই। তাই ঘরের কাছেই আমাদের প্রতিবেশী-নিকটজনেরা অবজ্ঞাত পড়ে আছে। অজ্ঞতায়, রোগে-শোকে, অনাদরের অন্ধকারে। অশিক্ষায়-কুশিক্ষায়। মরুভূমি গ্রাস করছে। বিষাদ ছেয়ে ফেলছে চতুর্দিক। সেদিকে তাকিয়েও দেখে না কেউ। নিকট-পৃথিবীটার প্রতি কর্তব্যজ্ঞানের ঔদাসীন্য যত বাড়ছে, ততই ঘটা করে আমরা চাঁদে রকেট পাঠাচ্ছি। মহাকাশ পরিক্রমায় নেমে পড়ছি। সহানুভূতিহীন এক অদ্ভুত যুগ এই পৃথিবীতে এল। অথচ ঘটা করে ইণ্টার-ন্যাশনাল রিলেশনস পড়াবার আয়োজনের কমতি নেই।

অবশ্য ভুটানের কথা আলাদা। ভুটানের জন্য অনেককিছু করছে ভারত-বর্ষ। ভুটানে যে নতুনকালের পত্তন হল, যুগের হাওয়া এল, তাকে স্বাগত জানাতে তাদের সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে ভারতবর্ষ। কাঁধে কাঁধ। একটা ঘনান্ধকার যুগ হয়েছে অপসৃত। গুহা-গহবরের আদিম দিনগুলি আর নেই। নতুনকালের ভুটানকে গড়ছে যারা, ভারতবর্ষ তাদের সঙ্গে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে।

কী ছিল ভুটানে?

অতীতের দিকে তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে। ভুটানের প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক চিত্রগুলি মনে আসে। অতীতকালের ভুটান। হপকিন্স্ সাহেবের কাছে শুনেছি কিছু কিছু। সে-ইতিহাস শুনেছি সুধীরদার মুখে। সুধীরদার কথা কিছু বলব। বই-পড়া চোখ দিয়ে নয়, নিজের চোখ দিয়ে সবকিছু পরখ করে দেখা সুধীরদার কাজ। এক আশ্চর্য মানুষ। মনের ধর্মে সুধীরদা এক আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব। তিনি চলতে চলতে দেখেন। দেশ দেখা চোখ আমরা একালে হারিয়েছি। ঠিক জানি আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্যের কথা উঠবেই। আর্থিক অসামর্থ্য আছে বটে, কিন্তু আমাদের মনের দুর্ভিক্ষও কম নয়। মানুষকে দেখতে হয় তার কাছাকাছি যেয়ে, তার সঙ্গে মিশে। তাকে সঙ্গ দিয়ে। তার অভাবে সে-পরিচয় হয় ভাসা-ভাসা। আমাদের মহাকবিকেও তাই বলতে শুনি,

সব চেয়ে দুর্গম যে মানুষ
আপন অন্তরালে
তার কোন সীমা নাই
বাহিরের দেশেকালে,...

একালের বড়লোকের ছেলেরা সখ-আয়েস করতে ভ্রমণে বেরোন। তার জন্যে চাই টাইম-টেবল, স্কীম, চার্ট ইত্যাদি। নিশ্চয়তা, নিরাপত্তা ত' বটেই, সেই সঙ্গে চাই আরাম-বিলাসিতা। সরকারী বাংলো, ঠাকুর-চাকর, টেলিগ্রাম-টেলিফোন। হোল্ড অল, থার্মোফ্লাস্ক থেকে মায় জলের কুঁজো পর্যন্ত। এস্পিরিন, ডেটলের শিশি।

এ-সবের ধার ধারেন না সুধীরদা। সংসারে তাঁর মন টানতে পারল না। ঘর বাঁধলেন না। যখন-তখন বেরিয়ে পড়ছেন। কলকাতায় নিজের একটি ডেরা আছে। ছবি আঁকা ছাড়াও টুকি-টাকি ব্যবসা করেন। হাতে দু'-চার পয়সা জমলেই নীলচে রঙের ক্যাম্বিসের ব্যাগটি বগলে করে বেরিয়ে পড়ছেন। আর একটা ক্যামেরা। এমন পথ-চলা মানুষ কমই দেখেছি।

সেই সুধীরদার কাছেও শুনেছি ভুটানের গল্প। রাঙামাটি চা-বাগানের একটি দুর্লভ মধ্যাহ্নে সুধীরদার সঙ্গে মিলতে পেরেছিলাম। সে বেশ অনেক-দিন হয়ে গেল। এক বন্ধুর সঙ্গে বাসে করে ফিরছিলাম। শিলিগুড়ি থেকে। পথে বাসের চাকা ফাঁসল। নামতে হল সেখানেই। সেণ্ট্রাল এক্সাইজের এক ভদ্রলোক ছিলেন সঙ্গে। পদবীতে ইন্সপেক্টর। তাঁর সঙ্গে আলাপ হতে তিনি ডেকে নিয়ে গিয়ে-ছিলেন তাঁর ডেরায়। ডেরা তো নয় কোয়ার্টার। মুগ্ধ হলাম তাঁর আন্তরিকতায়। তার চাইতেও বড় লাভ হল সেখানে। সুধীরদার সঙ্গে প্রথম আলাপ সেখানেই।

ইন্সপেক্টরই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। যথারীতি তাঁর গুণের পরিচয় পেতে বিলম্ব হয় নি। শান্ত সাধারণ মানুষ একটি। কোনরকম

সাধনা
বিউটি স্নো-এর
কোমল স্পর্শে
সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়
সাধনা বিউটি স্নো
•একটি অতি আধুনিক অঙ্গরাগ
ত্বক মালিন্যমুক্ত ও লাবণ্যযুক্ত করে। মুখশ্রীতে লালিত্যের ও তারুণ্যের আভা ফুটে ওঠে।
SADHANA
Beauty
সাধনা ঔষধালয় কলিকাতা-৫

বাহ্যিক চাঞ্চল্য নেই। রেলিঙ-ঘেরা বারান্দার ডেকচেয়ারে মুখোমুখি বসে সুধীরদার সঙ্গে কথা বলেছিলাম। সারাটা দুপুর।

সারাটা ভারতবর্ষই ঘুরবেন মনস্থ করেছেন সুধীরদা। পূর্ব দিক থেকে সুরু করবেন বলে যাত্রা সুরু।

বলেছিলাম, ডুয়ার্স দেখতে এলেন?

দেখতে নেই?

না, সে কথা নয়। আপনি কোন-দিক থেকে সুরু করবেন তাই জানতে চাইছিলাম।

এদিকটায় ক'দিন থেকে যাব আসামে। আসাম থেকে যাবার ইচ্ছে নেফা পর্যন্ত। সংক্ষেপে নেফা। নর্থ-ইস্ট ফ্রন্টিয়ার এজেন্সী।

আমি বলেছিলাম, সে এক ভয়ংকর জায়গা শুনেছি।

সুধীরদা চুপ করে ছিলেন। আমার কথার উত্তর দেন নি। হয়ত তিনি অন্য কথা ভাবছিলেন। পরে বললেন, বিপদ-আপদ তো সব জায়গাতেই আছে। আগেও ছিল। বিপদের ভয়ে চুপ করে বসে থাকলে তো দেশ দেখাই হয় না।

তারপর ঢের দিন সুধীরদার সঙ্গে দেখা হল। জানা হল। কাছাকাছি মিলবার মিশবার ব্যবস্থা হল। রওনা হবার আগে পর্যন্ত বেশ কিছুদিন ছিলেন ডুয়ার্সে। যে ক'দিন ছিলেন মালবাজারে আমার ছোট্ট আস্তানাটিতে যখন-তখন এসেছেন উনি। তখন কিছু-দিন ওখানেই থাকতে হয়েছিল আমাকে।

সেই সুধীরদার কাছে শুনেছি ডুয়ার্সের গল্প। মাস দু'-তিনেক দেখা হয় নি। হঠাৎ একদিন এসে উপস্থিত। উস্কো-খুস্কো চুল। দাড়ি-গোঁফ হয়ে গেছে। পোষাক-পরিচ্ছদময়লা। কাঁধে-ঝোলানো ক্যাম্বিসের সেই নীলচে রঙের ব্যাগটা তেমনি আছে। অনেকটা রোগা হয়ে গেছেন সুধীরদা। কিন্তু মুখে হাসিটা দেখেই তাঁকে চিনতে পারলাম। তখুনি ছুটে গিয়ে তাঁর হাত ধরে বিছা-নার ওপরে বসিয়েছিলাম।

ভুটানের অতীত ইতিহাস অনেক শুনেছি হপকিন্স সাহেবের কাছে। তাঁর গ্রন্থলব্ধ জ্ঞান। ইতিহাস, লোক-পরিচয়, ভূগোলবিবরণ। সেই সঙ্গে ডুয়ার্সের ভুটানীদেরও কথা। সুধীরদা-ও বলেছিলেন খাস চোখে-দেখা ভুটানের কথা।

কি করে গিয়েছিলেন তা আর শুধাই নি। মাসখানেক ওদিকে কোথায় কাটিয়ে এলেন জানতে চেয়েছিলাম। অনেক কথা বলেছিলেন সেদিন।

টালা ভুটানে গিয়েছেন সুধীরদা। ভুটানের একটি গ্রামের নাম টালা ভুটান। ডুয়ার্সের সান্তালাবাড়ি থেকে আট-ন' মাইলের উঁচু-নিচু পাহাড়ি পথ ভেঙে পৌঁছেছেন সীমানা পর্যন্ত। ভারতবর্ষ ও ভুটানের বর্ডারলাইন পেরিয়ে আরও বারো মাইল ভিতরে যেতে পারলে তবে মিলবে টালা ভুটান। ভুটানের ভিতরে যাবার স্বীকৃত রাস্তাটিই ছিল ওইদিকে। বলা চলে অরিজিন্যাল রোড। ভুটানের রাজা-মহারাজরা যেতেন ওই পথে। অন্তত উনিশ শ' বাষট্টি সাল পর্যন্ত ত' ছিলই। ওই রাস্তা চলে গেছে ভুটানের পারো পর্যন্ত। পাহাড়ি রাস্তা। ভারতবর্ষের সীমানা পর্যন্ত রাস্তা ওই একরকমের। মোটামুটি ভালো রাস্তাই। ইংরাজরা তৈরি করেছিল অনেক বছর আগে। খাদ্যের প্রয়োজনে, রসদের জন্য সৈন্যদের। বক্সা ফোর্ট তৈরি করেছিল ওপরে। একশ' বছর পেরিয়ে যাচ্ছে আজ।

ভুটানের ভিতরে গিয়েছিলেন সুধীরদা। পায়ে হেঁটে। ঘোড়া নিতে পারতেন। ভুটানী ঘোড়া। নেন নি। ভুটানের রাস্তা মানে পাহাড়কাটা পথ। ইন্ডিয়ান বর্ডার পেরিয়ে। পাঁচ-ছ'জন পর্যন্ত পাশাপাশি যাওয়া যায়। বক্সা থেকে টালা ভুটান পর্যন্ত আঠারো মাইল রাস্তা যেতে অনেক সময় লেগেছিল। ওপরের দিকে ওঠবার রাস্তা। সঙ্গীহীন নির্জন। মাইলের পর মাইল লোকালয়-হীন নির্জন। শুধু বন-জঙ্গলের শ্রেণী দাঁড়িয়ে রয়েছে নিঃশব্দে। যুগ-যুগান্তকাল। আঠারো মাইল পথ হেঁটে ভুটানের ওই গ্রামে পৌঁছতে মাত্র দুটি গ্রামের দেখা পেয়েছিলেন সুধীরদা। একেকটি গ্রামে আবার চার-পাঁচটি মাত্র পরিবারের বাস। শুকর পোষে ভুটানীরা। অত্যন্ত দরিদ্র। সাধারণ মানুষদের বেশির ভাগই করে কুলির কাজ। পৃথিবীর মধ্যে এমন দরিদ্র কমই আছে। কিছু কিছু আছে রাজমিস্ত্রী ও কাঠমিস্ত্রী। সান্তালা-বাড়ি থেকে মাল টানাটানি করা চাট্টি-খানি কথা নয়। দুর্গম ওই পথে প্রতি পদে মুখ বুকের রক্ত ঝরিয়ে দিতে চায়।

ফুন্টশোলিঙের রাস্তা তখনও খোলে নি। যখন সুধীরদা যান। ফুন্ট-শোলিঙের রাস্তা খোলা হল তার পর। মানুষের হাঁটাপথ হয়ত বা ছিল। হাসি-মারা হয়ে রাস্তা খুলল সম্ভবত উনিশ শ' চৌষট্টি সালে। মোটর যাবার রাস্তা হল সেই।

আজ কত মানুষ চলে যাচ্ছে ফুন্ট-শোলিঙ। খাস ভুটানের বুকের মধ্যে। বাস চলে যাচ্ছে ভুটানের মধ্যিখানে। জয়গাঁ বাগানের পাশ দিয়ে। ইন্ডিয়ান চেক পোস্ট পেরিয়ে। কিন্তু থাক সে-কথা। ফুন্টশোলিঙ তো আমাদেরই হয়ে গেছে একালে। প্রায় আমাদের শহর। ডুয়ার্সের সঙ্গে তার নাড়ীর যোগ একেবারে। কিন্তু সে-কথা পরে বলা যাবে।

ভীষণ ঠান্ডা ভুটানে। নাইট্-হল্টের জন্য রাস্তার ধারে আছে গুহা। আছে ছোট ছোট ঝর্ণা। সেই গুহার মধ্যেও রান্নাবান্না করা চলে। পা ছড়িয়ে শোয়াও চলে। ছ'-সাতজন। দশ-বারোজন শোবার মত গুহাও আছে। রংপো নামের ছোট্ট উপত্যকাটি আছে ওই দিকে। ভুটানের পথে। সেখানেও আছে একটি ঝর্ণা। খাবার জলের ব্যবস্থা ওই ঝর্ণায়।

সুধীরদা বলেছিলেন, স্বর্গ যদি কোথাও থাকে তো—ওইখানে দাঁড়িয়ে তাকাও দু'চোখ মেলে—এক অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তোমাকে মুগ্ধ করে দেবে। মনে হবে স্বর্গের শোভা যদি কোথাও থাকে তো ওইখানে।

সুধীরদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, কত হাজার ফুট হবে?

সে-কথার জবাব না-দিয়ে সুধীরদা নিজের কথা বলেছিলেন অন্যমনে, রংপো ভ্যালিতে দাঁড়িয়ে তাকাও চারদিকে। চারদিককার Peakগুলির সবই সাত-আট হাজার ফুট উচ্চতা। ভুটানের ভিতরে দেড়শ' মাইল গেলে দেখতে পাওয়া যাবে সতেরো-আঠারো হাজার ফুট উঁচু চুড়াগুলো।

আরেক মজার কথা বলেছিলেন সুধীরদা। বলেছিলেন, ভুটানীদের জীবনে বাঁশের ভূমিকা খুবই গুরুত্ব-পূর্ণ।

আমি ঢোক গিলেছিলাম, বাঁশ?

হেসে ঘাড় নেড়ে সুধীরদা বলে-ছিলেন, Yes please. বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? নানা রকমারী কাজে বাঁশ-ই তাদের জীবনে প্রধান অবলম্বন বলা চলে। বাঁশের বেড়া, বাঁশের খুঁটি, ঘরের বা চালের বাঁশের কাঠামো বা বাঁশপাতার ছাউনির কথা ছেড়েই দিলাম। বাঁশের মাচাই তাদের শোবার প্রধান আশ্রয়। জন্মের সূচনা থেকে বাঁশ, মৃত্যুর পর পর্যন্ত। জন্মের সময় ওরা একরকম ফরসেপ্ ব্যবহার করে—তা তৈরি হয় বাঁশ দিয়ে। বাঁশের কাঠি দিয়ে বাচ্চা বার করে যেমন, তেমনি মৃত্যুর পর শবদেহ পুড়িয়ে একটা আস্ত বাঁশ দাঁড় করিয়ে দেয় সেখানে। মন্ত্র-তন্ত্র ছাপান কাপড়ের টুকরো একটা লাগিয়ে দেয় তার ওপরে।

সুধীরদার সঙ্গের লোকটি বসে বসে চা খাচ্ছিল আমার ঘরে। জাতিতে নেপালী।

সে বলল, ওই কাপড়টাকে বলে দুদরু।

শব্দটা মনে মনে উচ্চারণ করতে চেষ্টা করি। [ক্রমশ]

[পূর্বানুবৃত্ত]

ছেলের সেই ড্যাবড্যাবে দুটো চোখ আর পাণ্ডুর ফ্যাকাসে মুখটার দিকে চেয়ে ভয়ে ভাবনায় হরি মণ্ডলের ঘরে এসে ঢুকেছিল সাগর খুড়ী। তখন বয়স বা আর কত হবে—বছর চব্বিশ-পঁচিশ। দেখতে দেখতে মাসখানেকের মধ্যে দু'মুঠো পেট ভরে খেয়ে ছেলেটার শুকনো চামড়ার তলায় মাংস গজিয়েছে, চেকন-চাকন হয়েছে—প্রাণ ফিরে পেয়েছে। কিন্তু নিজেকে সে শেষ পর্যন্ত হরি মণ্ডলের হাত থেকে বাঁচাতে পারে নি। সে বহুকাল আগের কথা। সে কথা কেউ জানে না। পুরাতন খেজুর কাঁটার মতো শরীরের গভীরে শিরার রক্তপ্রবাহে তা যেন কোথায় লুকিয়ে আছে—একটা অনিচ্ছুক, পর্যুদস্ত নারী-মন সে সাময়িক পাশব-পরাজয়কে কোনো দিন স্বীকার করে নি। কদিন শুধু খোঁচা-খাওয়া বাঘিনীর মতো ছটফট করেছে—নিজের ঠোঁট নিজে কামড়ে কামড়ে চাপা অপমানে রক্তাক্ত করে তুলেছে। সেকালের মানুষজনও এ চরে বড় একটা আর কেউ নেই। যারা আছে তারা শুধু জানে—একদিন ভয়ানক ঝগড়া করে সাগর খুড়ী ছেলের হাত ধরে আবার গিয়ে দাঁড়িয়েছিল জেলা বোর্ডের সড়কে।

সেই এক বুড়ো বট সাক্ষী। পাগলীর মতো ঠাস ঠাস করে নিজের মুখ নিজে চড়াতে চড়াতে বলেছিল: "কি করলি—তুই কি করলি রাক্ষসী! এই মুখ তোর—এই মুখ তোর, তাকে খেলি—এবার তুই মর... মর।"

সেদিন পেছনে পেছনে এসেছিল শুধু কলিমন্দী। হাত দুটো ধরে ফেলে বলেছিল, "ক্ষেপে গেলি হাবুর মা—অ হাবুর মা..."

"খবর্দার...খবর্দার হারামজাদা।" রুখে উঠেছিল হাবুর মা, "তোর আমি দাড়ি উপড়ে ফেলাব। হাত ধরিস তুই!"

হয়তো সেই ঝোঁকে আবার ভেসে যেত কোথায়। কলিমন্দীর সাহায্যে আশ্রয় পেয়েছিল সানো চৌধুরীর বাপের কাছে।

সেই পথে পথে ঘোরার দাগ, ক্ষুধার দাগ, কলঙ্কের দাগে দাগা জীবন—এক সে নিজে ছাড়া আর কেউ জানে না। তারপর দিন কেটে গেছে এ চরের রুক্ষ জীবনধারার ওঠা-পড়ায়, কখনো খরায়—কখনো হাজায়, অনুর্বর ডাহা নোনা মাটির সঙ্গে লড়াই করে করে। হাবু ক্রমে বড় হয়েছে, চাষ-বাস করতে শিখেছে, ঘরে বৌ এসেছে। নতুন কলরবের মধ্যে কবে যেন চাপা পড়ে গেছে সাগর খুড়ীর জীবনের কথা। এ চরের রুক্ষ জীবন-সংগ্রামের মধ্যে আজকের কথা আগামী কালের অনিশ্চয়তায় বাসি হয়ে যায়। সাগর খুড়ীরও গেল। ফেলে-আসা কোন গ্রামের কোন জীবনের কথা—বাপের ঘর, স্বামী, সংসার—সব কোথায় যেন তলিয়ে গেল।

আজ হঠাৎ হারু মণ্ডলের আবির্ভাবে পুরনো সেই দাগা—ক্ষোভে ক্রোধে নতুন ব্যথায় যেন ফেটে পড়ল। বহুদিনের ভুলে-যাওয়া একটা প্রতিশোধের কথা আজ আবার গা-ঝাড়া দিয়ে যেন উঠে দাঁড়াল।

যতো যাই হোক, ঘরে অতিথি। হাবুর বৌ ভয়ে ভয়ে এসে শুধোলে, রান্নাবান্নার কথা। সাগর খুড়ী তাকে তেড়ে গেল ঝাঁটা নিয়ে। এবং আবার এক দফা অনুপস্থিত হারু, হারুর মা ও তার চোদ্দ পুরুষের উদ্দেশে চোখা চোখা গালাগাল দিতে দিতে বাপের কথায় এসে হঠাৎ একেবারে চুপ করে গেল। গুম মেরে বসে রইল দাওয়ায়। সাগর খুড়ীকে চরের কেউ কখনো কাঁদতে দেখে নি—দেখেছে দাপিয়ে শুধু ঝগড়া করতে। আজও কেউ দেখতে পেল না।—অন্ধকার দাওয়ায় বসে বসে হঠাৎ হাজার কথা মনে পড়ে বুড়িয়ে আসা চোখ দুটো কখন যেন ধীরে ধীরে ছল-ছলিয়ে উঠল।

ভেজা চোখের সামনে, স্বপ্নের ঘোরের মত উঁকি মারে আর এক দেশ—আর এক জীবন। নির্ভেজাল এই ধানী আবাদের মাঝখানে—জলপাই জঙ্গল মহালের রুক্ষ জংলা জীবনধারার মাঝখানে কবেকার হারিয়ে-যাওয়া, ভুলে-যাওয়া টুকরো টুকরো কথা আর ঘটনা যেন পরস্পরের হাত ধরাধরি করে সামনে এসে দাঁড়ায়। তারা যেন হারানের মতই বলে: দিদি চিনতে পারো!'

তাঁতীসাহি মণ্ডলপাড়া—তাঁতীর গ্রাম। তার নামাল জমিতে ঝিলমিল করছে সবুজ ধানের গাছ—আর ডাঙা জমিতে তুলো। বেশির ভাগই উঁচু ডাঙা জমি—গ্রামের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত তুলোর আবাদ। সবুজ পাতার ঝাঁকের ওপরে এমন দিনে বীজ ফেটে তুলো বেরিয়ে পড়েছে—যেদিকে তাকাও যেন থোকা থোকা শাদা ফুল তোমার দিকে তাকিয়ে হাসছে—ঠোঁটের

ফাঁকে তার মুক্তোর ঝিলিক। কোথাও রাশি করা তুলোর তুষারশুভ্র পাহাড়—কোথাও মিলে দেওয়া হয়েছে রোদে। চিকন মিহি রোঁয়া রোদ লেগে খুদে খুদে পাখীর মত যেন পালক ঝাড়া দিয়ে ফুলে ফেঁপে উঠছে।

ঘর ঘর চরকা—ঘর ঘর তাঁত—কারুর বা দুটো-তিনটে পর্যন্ত। সকালের ঠাণ্ডা হাওয়া কেঁপে কেঁপে উঠছে চরকার ঘর্ঘর আর তাঁতের শব্দে। বাতাসে ভুর ভুর করছে খই মাড়ের টক-টক গন্ধ। প্রতিটি কুঁড়ের সামনে শাড়ি-ধুতির টানা। কোথাও সুতো রং করছে মেয়েরা। রোদে মিলে দিয়েছে নানা রঙের সুতার গাছা—যেন নানা রঙের মালা। সকালের সূর্য মাথায় ওঠে—শুকনো তুলোর বিচি বাছাইয়ের জন্যে 'খাই' নিয়ে বসে মেয়েরা। তার বিচিত্র পাড়া জাগানো শব্দে মুখরিত হয়ে ওঠে সারা গ্রামের দুপুর। তিরিশ বছর আগের জন্য সে এক গ্রামের ছবি—সাগর খুড়ীর বাপের দেশ।

বাপ খগেন মণ্ডলের দু-দুখানা তাঁত, একটা চালায় নিজে—আর একটা চালায় মাইনে করে রাখা এক কারিগর ছোকরা, নাম পুলিন মণ্ডল। পাড়ের নক্সায় মণ্ডল-পাড়ায় যার জুড়ি নেই। ছোকরার না আছে মা-বাপ—না আছে চালচুলো। কোথা থেকে ঘুরতে ঘুরতে এসে কাজে ঢুকে গেছে খগেন মণ্ডলের কাছে। রোগা রোগা চেহারা—কটা কটা চোখ, রং যেন ফেটে পড়ছে। নামটুকু আর মুখের ভাষাটুকু ছাড়া হঠাৎ দেখলে ভুল হবে—এ বুঝি কোন বিদেশী।

সেই লোকের সঙ্গে খগেন মণ্ডল একদিন নিজের একমাত্র মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করে বসল।

পাড়াপড়শী তাজ্জব হয়ে শুধোলে, "তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল না-কি খগেন!"

"কেন?"

"শুনেছি ঘর-দোর নেই—কোথাকার কে!"

"সে ঘর-দোর আমি করে দেবো।"

"বাপ মা?"

"কেউ নাই।"

"কোথাকার লোক?"

"ক্ষীরপাই। ভালো জায়গা। ভালো ঘরের ছেলে।"

তবু তারা খুঁৎ খুঁৎ করে বলেছে "তবু এ ভালো হলো নি খগেন।"

খগেন মণ্ডল আর রাগ চেপে রাখতে পারে নি—বলে ফেলেছিল, "তোমরা ওই নন্দ মণ্ডলের হয়ে ভাংচি দিতে এসেছ।"

"তার মানে?"

"মানে আমি বুঝি নি ভেবেছ।" খগেন মণ্ডল বলেছিল, "নন্দ মণ্ডলের এক খানা তাঁত বসে আছে—হেঁ হেঁ, সে বেশ কিছুদিন থেকে পুলিনকে আমার কাছ থেকে ভাঙাবার চেষ্টায় আছে। বুঝলে—সব খবর আমি রাখি।"

কথাটা মিথ্যে নয়। অমন নক্সার হাত—অমন নতুন নতুন নক্সার মাথা, কারবারী, হিসেবে তাঁতীপাড়ায় পুলিনকে সকলেই চায়। তা বলে জামাই করে বসবে একেবারে—এটা কারুর মাথায় আসে নি।

খগেন মণ্ডল বলেছিল, "ওকে ঘর-জামাই করে রাখব। মেয়ে মোর একটাই—কাছে কাছে সে-ও মোর থাকবে। আর চালচুলো? নাই বা থাকল। ওর যা আছে—তাতেই ওর বাজাব মাৎ। তার সঙ্গে জুড়ে দেব মোর মেয়ের হাতযশ—অমন মিহিন সুতো আর কাটে কে!" বলে মা-ঠাকুমার কালের ছড়া কেটেছিল খগেন "ঠাকুমা বলত—

চরকা আমার ভাতার পুত চরকা
আমার নাতি।
চরকার দৌলতে আমার দোরে বাঁধা
হাতী॥"

একদিন বিয়ে চুকে গেল। মেয়ের ঘর-দোর করে দিলে খগেন।—যে তাঁত পুলিন চালাত সে তাঁতও তাকে বিয়ের যৌতুক দিয়ে দিলে। এক সঙ্গে মিলে-মিশে চললো শ্বশুর জামাইয়ের কারবার। কিন্তু যে হিসেবটা খগেনের আয়ত্তে নেই—গোলমাল থেকে গেল সেইখানে। সে হিসেব ম্যাঞ্চেস্টার—ল্যাঙ্কাশায়ারের, সে হিসেব ইংরেজ বানিয়ার।

বাজার ছেয়ে গেল বিলাতী কাপড়ে—দামও টেনে নামিয়ে দিলে তাঁতের কাপড়ের অর্ধেক। ব্যাকুল তাঁতীপাড়া শুধু মাথায় মোট নিয়ে মুখ শুকনো করে ছুটতে লাগল এ-হাট ও-হাট।

এরই মধ্যে সুখে দুঃখে কেটে গেছে দিন। হাবু কোলে এসেছে, খগেন মণ্ডল আবার বিযে করেছে। নতুন বৌ এসে হাল ধরেছে তার সংসারের। এবং সেই থেকে একটা নতুন বিরোধ বেধে উঠেছে দিনে দিনে। এতদিন অভাব অনটনে শ্বশুর জামাইযের সংসাব আলাদা হয়েও ছিল এক। একলা মানুষ খগেন—বুক দিয়ে খাড়া রেখেছে মেয়ের সংসার। আজ চাল, কাল টাকা—একবার মেয়ে মুখ খুললেই বেবিয়ে এসেছে বাপের কাছ থেকে। কিন্ত দ্বিতীয় পক্ষ শশিমুখী এসে সে সোজা সহজ পথ বন্ধ হযে গেল। শুরু হলো বাপ-মেয়ের লুকোচুরির বাঁকা পথ।

● ● সদ্য প্রকাশিত হইল ● ●

সাধকচূড়ামণি শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ সঙ্কলিত

(১ম পর্ব)
পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০৬

বৃহৎ তন্ত্রসারঃ

বহুকাল পরে পুনর্মুদ্রণ। বিশদ অনুবাদ।
অনুষ্ঠান পদ্ধতি ও অসংখ্য যন্ত্রচিত্র সহ।

মূল্য মাত্র পনেরো টাকা

(দ্বিতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ)

বসুমতী (প্রা) লিঃ ॥ কলিকাতা-১২

কিন্তু একদিন ধরা পড়ে গেল।

পাঁচ-পাঁচ সের আঁচলে বাঁধা চাল—সাগর একেবারে সামনে পড়ে গেল শশিমুখীর। মেয়ে কাঠ, তার বাপ কাঠ।—পুকুরে জল আনতে গিয়েছিল—সেই ফাঁকে এই কান্ড।

শশিমুখী জ্বলে উঠে বললে, "আঁচলে কি বেঁধে দিলে ?"

খগেন চুপ।

"বলি বাঁধলে কি !" শশিমুখী চিৎকার করে উঠল।

খগেন বললে, "চিল্লাস কেন বৌ ? ও কোথা থেকে চাল চেয়ে এনেছে। তা যাওয়ার পথে একটু এই বাপকে দেখে গেল।"

"ও চাল তুমি বেঁধে দাও নি ?"

"আমি কোথা থেকে দেব বৌ। আমি কি করে দেব! বলে আমাদের অভাবটা কি কম !"—

আরো সব কত কি যেন বলেছিল খগেন—হঠাৎ শশিমুখীর চোখ দপ করে জ্বলে উঠেছিল। ফস করে বলে উঠেছিল, "ও যদি তুমি দিয়ে থাকো—তা হলে ও তোমার রক্ত—রক্ত—রক্ত। যে খাবে—সে তোমার রক্ত খাবে।"

মেয়ের আঁচলে বাঁধা চাল ঝর ঝর করে পড়ে গেল। হাবুকে কোলে তুলে নিয়ে কেঁদে ছুটে পালাল সাগর।

খগেন হাউমাউ করে উঠল, "এ তুই কি বললি বৌ! মেয়েটা যে সারা দিন কিছু খায় নি। পুলিন সেই সকাল থেকে কোথায় গেছে টাকার ধান্ধায়।"

কিন্তু শশিমুখীকে থামায় কে। এ তার হকের ধন—তার হিসেবের কড়ি, তার সংসারের অধিকার!

খগেন বলেছিল, "দিনকাল খারাপ বৌ। অত বড় একটা অস্তাদ কারিগর—সে আজ পেটের খোরাক জোগাড় করতে পারছে না।"

"গলায় দড়ি তার।" শশী চিৎকার করে বলেছিল, "অস্তাদ কারিগর তো পেটের ভাত জোগাড় করতে পারে না !"

"তার কাজের দাম যে কেউ দেয় না বৌ। বস্তাবন্দী হয়ে থাকে মোট। আমি তো জানি"—

"তুমি ছাই জান। তুমি মোকে পথে বসাবে।—তুমি হারানকে পথে বসাবে।... তুমি সব্বস্ব ওই কাঙালের গভ্ভে দিয়ে ফকীর হবে।"

রাগে শশিমুখী সমানে দাপাতে লাগল এবং মুখে যা এল তাই বলে পাড়া মাতিয়ে তুললে।

গালাগাল নয় তো গালানো লোহা। মেয়ের কানে বাপের মিনমিনে গলা হয়তো সবটা পৌঁছল না—কিন্তু সৎমায়ের প্রতিটি কথা যেন দাগ দিয়ে দিয়ে গায়ে কেটে বসতে লাগল। একেবারে পাশাপাশি ঘর। গালাগালের একটা শব্দও ফসকালো না।

সন্ধ্যেবেলা পুলিন ফিরে এল শূন্য হাতে।

শশিমুখীর গলা তখন থেমেছে বটে। এবার নতুন করে শুরু হলো সাগরের পালা। ক্ষিধের জ্বালায়, রাগের বিষে কি ছোবল সে দিয়েছিল—সব কথা মনে নেই। লোকটা একটা উত্তরও দেয় নি, চুপ করে মুখ নিচু করে বসেছিল দাওয়ার এক কোণে। এইটুকু মনে আছে।

"ওই নক্সার বাহার গলায় জড়িয়ে এবার মরো।" এই বলে দড়াম করে দরজা এঁটে, পেট ভরে জল খেয়ে ঘুমন্ত ছেলের পাশে গিয়ে শুয়ে পড়েছিল।

কি অলক্ষুণে কথা মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল তার—লোকটা সেই পথেই চলে গেল। ভোরে উঠে তাঁতঘরের দিকে চেয়ে ভয়ে চিৎকার করে উঠেছিল সাগর খুড়ী।

গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলছে পুলিন—মন্ডলপাড়ার ওস্তাদ কারিগর।

কুঁড়ের সামনের প্রাঙ্গণটুকু ছাড়িয়ে শুরু হয়েছে ধানের ক্ষেত, দিকচিহ্নহীন অন্ধকার আবাদ।—ওপরে সাড়াশব্দহীন মহাশূন্যের অন্ধকার। সবটা মিলে বড় নির্জন, বড় পরিত্যক্ত মনে হয়। সেই নিঃসাড় অন্ধকারের দিকে চেয়ে চেয়ে সাগর খুড়ী একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। ওই ধানী আবাদের গভীর অন্ধকারে কোথায় হারিয়ে গেছে কবেকার সেই কথা। বাপ মরেছে, সৎমাও হয়তো আর বেঁচে নেই। আর নেই সেই একটা লোক। আছে শুধু তার হাবু। আজ এতদিন পরে সবটা কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

রাত হয়েছে।

হাবুও আসে নি, হারানও না। সাগর খুড়ী দাওয়া ছেড়ে পথে বের হলো। কি যেন বিড় বিড় করতে করতে ভেড়ি বাঁধ ধরে এগিয়ে চললো সেই জেলা বোর্ডের সড়কের দিকে।

ডাক্তারখানার সামনে এসে দাঁড়াল। যা অনুমান করেছিল—তাই। ওখানে হাবুও আছে, হারানও আছে—এমন কি খোদ ছোট মণ্ডল পর্যন্ত। চেয়ারে বসে আছে ডাক্তার আর সানো চৌধুরী। হারান কি যেন একটা হিসেব বোঝাচ্ছিল—সহসা সাগর খুড়ীকে দেখে চুপ করে গেল।

সাগর খুড়ী ডাকল, "হাবু!"

হাবু সাড়া দিল না। ফিরেও তাকাল না।

সাগর খুড়ী আবার ডাকল, "হারান!"

হারান থতোমতো খেয়ে ভয়ে ভয়ে তাকাল সাগর খুড়ীর দিকে।

সাগর খুড়ী আস্তে আস্তে বলল, "আমি ভাবলুম—তোকে সংগে করে আবার কোথায় না কোথায় গেল। রাতও হয়েছে। তাই খুঁজতে এলম।"

কেউ কোনো কথা বললে না—না হারান, না হাবু।

সাগর খুড়ী আবার আস্তে আস্তে বললে, "তো চল—রাত হলো তো।"

এবার হাবু খ্যাঁক খ্যাঁক করে উঠল, "তাড়িয়ে তো দিলি—আবার ডাকতে এলি কেন! থাক তুই তোর ঘর আর জমিন মাথায় করে। আমি মামুর সংগে তাঁতকল করবো। তার হিসেব করছিলম। বাপ মোর তাঁতী ছিল—অস্তাদ কারিগর। একদিনও বলেছিস?"

"কি বলব!" টেনে টেনে আস্তে আস্তে বললে সাগর খুড়ী। তার পর ঠোঁট দুটো শুধু নড়তে লাগল। বুড়ো চোখ দুটো সজল হয়ে গেল। আবার সেই একদিনের মতো হঠাৎ নিজের মুখে, গালে চড় মারতে লাগল সশব্দে—আর হাউমাউ করে কেঁদে উঠল, "মোর এই মুখ—এই মুখ, এতে আজও পোকা পড়ল নি।..."

সাক্ষী সেই অদরের বুড়ো বট। সড়কের ধারে ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে।

[ক্রমশ]

মাসিক ১০, টাকার কিস্তিতে লাভ করুন
অল ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড ট্রানজিস্টর (জাপান মেক) জনপ্রিয় মূল্য ৩০০,। দেশব্যাপী খ্যাতি আছে। ডবল স্পীকার ৩ ব্যান্ড, ৮ ট্রানজিস্টর। নাইট-ল্যাম্প ফিট করা। কেবল ইংরেজী বা হিন্দিতে যোগাযোগ করুন।
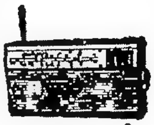
Allied Trading Agencies
(B.C.) P.B. 2123, Delhi-7.

পাঠক মন

ভারতের জাতীয় সংগীত প্রসঙ্গে

গত ৫২শ সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে "ভেদবুদ্ধি" প্রকাশের জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানাই। এবং এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথাও উল্লেখ করতে চাই।

'জনগণমন' ভারতের জাতীয় সংগীত-রূপে আজ থেকে প্রচলিত নয়। গত ১৯৫০ সালের ২৪শে জানুয়ারী থেকে এই সংগীতটি জাতীয় সংগীত হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। এ কথা ভাবতে খুবই আশ্চর্য লাগছে যে, আজ উনিশ বছর পরে পাতিল সাহেব কি করে বলতে পারলেন যে, 'সিন্ধু' শব্দটি সংগীতটিতে থাকায় জাতীয় সংগীতের মান ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। এই শব্দটি নিয়ে তো ভারতের কোন জাতির মধ্যে দীর্ঘ উনিশ বছরে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায় নি। তবে আজ কেন তাঁর এই অস্থিরতা।

অন্যছাড়া যখন জাতীয় সংগীত হিসাবে "জনগণমন"কে গ্রহণ করা হয়, তখন তো দেশ স্বাধীন হয়েছে। "সিন্ধু" দেশটিও পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কই তখন তো কোন নেতা বা জাতির মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায় নি। তখন সেটা তো সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরেই জাতীয় সংগীতের সম্মান পেয়েছিল। অথচ আজ পাতিল সাহেব উঠে পড়ে লেগেছেন ঐ "সিন্ধু" শব্দটিকে খণ্ডন করতে। আশ্চর্য ব্যাপার!

আরও আশ্চর্য হয়ে যেতে হয় তাঁর এই কথা শুনে যে, ভারতের প্রতিটি রাজ্যের নাম জাতীয় সংগীতটিতে থাকতে হবে। এই রকম উদ্ভট কল্পনা সত্যিই বিচিত্র। কোন রাষ্ট্রের জাতীয় সংগীতে তাদের প্রতিটি রাজ্যের নাম আছে কি না জানি না। তাছাড়া প্রতিটি রাজ্যের নাম জাতীয় সংগীতে ঢোকানোয় অনেক অসুবিধা দেখা যায়। ভারতের বেলায় এটা খুবই প্রকট। যেমন, আজ মাদ্রাজ প্রদেশের নাম বদল হয়ে 'তামিলনাড়ু' হল। সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সংগীতে মাদ্রাজের নাম কেটে 'তামিলনাড়ু' করতে হয়। এইভাবে একের পর এক, যেমন তেলেঙ্গানা, হরিয়ানা প্রতিটি রাজ্যের নামই তাদের পুরনো নাম কেটে ঢোকাতে হয়। আবার এ নামও যে স্থায়ী হবে, তাও নয়। সুতরাং তাঁর এই দাবিটি কি মেনে নেওয়া চলে? কখনোই চলতে পারে না। অথচ মেনে না নিলেও সেই সমস্ত রাজ্যের অধিবাসীদের মধ্যে বিক্ষোভ দেখা যাবে।

—কনক বাগচী
বল্লাবপুর, মহারাষ্ট্র

'খবর বলছি' প্রসঙ্গে

আপনার বহুল প্রচারিত পত্রিকায় 'খবর বলছি'তে বেতার জগতের একটি অশালীন পত্রকে কেন্দ্র করে যে মন্তব্য করা হয়েছে, তা শুধু সময়োচিতই নয়, অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত বলেই আমাদের ধারণা। 'বেতার জগতে'র সম্পাদকের কাছে এ-ব্যাপারে প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু তার কোন নিদর্শন 'বেতার জগতে'র চলতি সংখ্যায় নেই। আমাদের বক্তব্যটি আপনার পত্রিকায় প্রকাশিত হলে, বলা বাহুল্য, খুশি হব।

এই নির্মল ঘোষ মহোদয় কে? কী তাঁর পরিচয়? তাঁর খবরাখবর বোধকরি বেতার জগতের সম্পাদক ভিন্ন আর কেউই রাখেন না। কোনো পত্রিকায় মতামত প্রকাশের সঙ্গে শালীনতা, স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি, রসজ্ঞান, বিচক্ষণতা এবং অভিজ্ঞতারও প্রয়োজন। চিঠিটি যিনি লিখেছেন এবং যিনি ছাপিয়েছেন, উভয়েরই উপরি উক্ত বোধশক্তি আদৌ আছে বলে সন্দেহ হয়। এ ব্যাপারে আমাদের ধারণা নিম্নরূপ :—

॥ এক ॥ পত্রলেখক সমালোচ্য অনুষ্ঠানটি শোনেন নি। কারণ, (ক) অনুষ্ঠানের শীর্ষনাম ভুল। অতএব আলোচনার ধারায় বিচার-বিশ্লেষণ ও কটূক্তি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। (খ) উক্তি বলে যেগুলি উদ্ধৃত, সেগুলি শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র, কিংবা শ্রীরামপদ চৌধুরী বলেন নি—অতএব তা কল্পিত। (গ) শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবীর কাঁদো কাঁদো কণ্ঠস্বর শোনা —পত্রলেখকের কানের দোষ নয়—তাও বানানো। এই প্রসঙ্গে বলা দরকার শ্রীঘোষ উপন্যাস তিনটির সঠিক নামকরণ করেছেন—যা আলোচনার মধ্যে একবার মাত্র উল্লেখ করেছিলেন শ্রীমিত্র। অন্য সব কিছু যিনি ভুল করেছেন—আশ্চর্যের বিষয়—এই নাম তিনটিতে তিনি বিস্ময়করভাবে সত্যভাষণ করেছেন। এটাও সন্দেহজনক।

॥ দুই ॥ পত্রলেখকের মূল উদ্দেশ্য শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রকে গালাগাল দেওয়া ও লোকচক্ষে হেয় করা। কারণ—(ক) পাঠক হিসেবে নিন্দার্হ (?) তিনি হন নি—অথচ হয়েছেন বলে এবং এই আলোচনায় তাঁকে উপলক্ষ করাটা অপ্রয়োজনীয়, উদ্দেশ্যমূলক এবং অযৌক্তিক। (খ) সজনীকান্ত দাসের মন্তব্যের সঙ্গে সমালোচ্য প্রোগ্রামের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই—অতএব এটাও বিদ্বেষ ছড়াবার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত। (গ) শ্রীমিত্রের সাহিত্য বিচারবোধ সম্বন্ধে লেখকের তীব্র কটূক্তি অপমানকর এবং সমস্ত-রকম ভদ্র আচরণের সমস্ত সীমাকে তা লঙ্ঘন করেছে। এটাও অযথার্থ এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। বাংলার সাহিত্যসমাজ শ্রীমিত্রের রসবোধ ও বিচারক্ষমতার নিদর্শন অনেকদিন ধরেই জানেন।—এ ছাড়াও এমন অনেক মন্তব্য আছে যা অভব্য, অসম্মানকর।

॥ তিন ॥ আকাশবাণীর প্রোগ্রাম রচয়িতাদের সমালোচনা করা গৌণ নয়। কারণ (ক) উদ্দেশ্য যেখানে শ্রীমিত্রের প্রতি বিদ্বেষ ছড়ানো—সেখানে একটা স্থান রাখা দরকার। প্রোগ্রাম রচয়িতাদের সমালোচনা করা স্থান করা কৌশল ছাড়া আর কিছুই নয়। (খ) উপযুক্ত আলোচক নিয়োগ করার অর্থ যাঁরা আলোচনা করেছিলেন সেদিন, তাঁরা এ ব্যাপারে অযোগ্য এটাকে প্রমাণ করার চেষ্টা সুতরাং উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট।

দুই আর দুইয়ে চারের মতন এখানেও কোনো একটা যোগাযোগ আছে বলে সন্দেহ হয়। স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোনো কারণেই কি কেবলমাত্র 'এখনই' গ্রন্থের কটা বাছা বাছা সংলাপ উদ্ধৃত হয়েছে এবং অন্য গ্রন্থ দুটির হয় নি।

চলতি সংখ্যায় শ্রীনির্মলকুমার ঘোষের একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করে সম্পাদক শ্রীঘোষের বুদ্ধির ও বিদ্যার দৌড়কে প্রকাশ করে ফেলেছেন। এজন্য সম্পাদককে ধন্যবাদ। তবে স্বভাব মুখোপাধ্যায় ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ঘন ঘন প্রোগ্রাম পাবার আগে পত্রলেখক যদি গুণে রাখতেন শ্রীসুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কতরকমের কটা প্রোগ্রাম রেডিওতে গত দু'বছরে করেছেন, তাহলে ভালো করতেন। এই সংখ্যাতেই তো শ্রীনারায়ণ চৌধুরী কর্তৃক একাধিক গ্রন্থের সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছে—তাই বলে কি প্রমাণিত হবে শ্রীচৌধুরীর প্রতি অহেতুক প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে!

সাপ্তাহিক বসুমতী আকাশবাণীর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে শ্রীঘোষের পত্রটির প্রকাশের জন্য তদন্ত করতে বলেছেন। আমরা চাই তদন্ত হোক, দোষীর শাস্তি হোক—নয় তিনি নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করুন। এবং এই ধরনের অপপ্রচার ও বিদ্বেষ ছড়ানো বন্ধ হোক।

—রজত রায়চৌধুরী ও রাধারমণ দে
১এ, সর্দার শঙ্কর রোড
কলকাতা—২৬

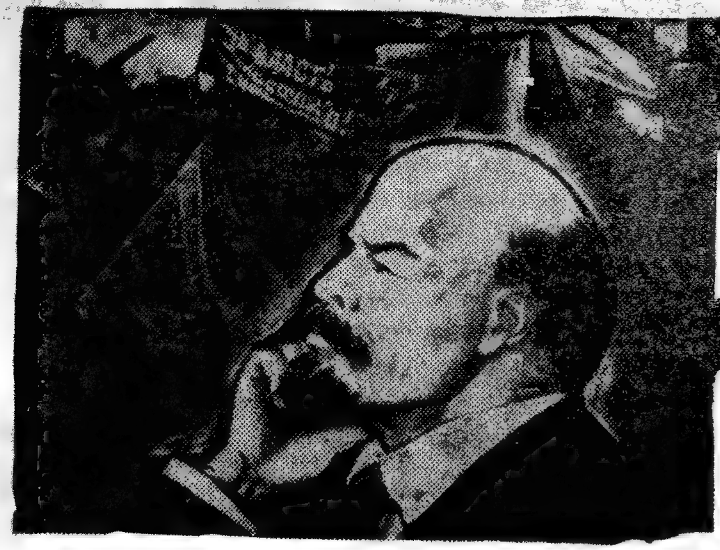

মহানায়ক লেনিন

অশোক সেন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ ছয় ॥

[পর্দা উঠলে দেখা যাবে কথক এসে দাঁড়িয়েছেন ঃ]

কথক ঃ ১৯১০ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিকে, লেনিন ফিরে এলেন প্যারিসে। জারিস্ট রিঅ্যাকসনের অন্ধকারের দিনগুলোতে শ্রমিক-শ্রেণী এবং পার্টিকে সুদক্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে পরিচালিত করেছিলেন ভ্ল্যাডিমার ইলিচ, তাদের অগ্রগতি যাতে সঠিক পথ ধরে অগ্রসর হয় সেদিকে ছিল তাঁর কড়া নজর। লেনিনের নির্দেশনায় বলশেভিক পার্টি ক্রমাগত শক্তি অর্জন করে চলেছিল। শ্রমিক-শ্রেণী আরও দৃঢ় ঐক্যের বন্ধনে তৈরি হচ্ছিল, স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে নতুন করে আঘাত হানবার জন্য—বেশ বোঝা যাচ্ছিল নতুন বিপ্লবের মাহেন্দ্রক্ষণ স মা গ ত প্রা য়—বোঝা যাচ্ছিল এ বিপদে শ্রমিকদের জয় অবশ্যম্ভাবী।

"আবার বিপ্লব শুরু হবে—বিরাটাকারে এবং ব্যাপকভাবে ঃ" লেনিনের এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হতে চলেছিল। ১৯১০ সালেই রাশিয়াতে শ্রমিক-আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত হল। সেইন্ট পিটার্সবার্গ, মস্কো এবং অন্যান্য বড় শহরগুলোর সব ফ্যাক্টরী এবং মিলগুলোতে ধর্মঘট, প্রতিবাদ-আন্দোলন, সভা-সমিতি এবং রাজনীতিক কার্যকলাপ আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল—

[আলো নিভে যাবে। এখানে সিনেম্যাটোগ্রাফীর সাহায্যে ধর্মঘটের দৃশ্যগুলো দেখানো হবে। তারপর আবার আলো জ্বললে কথক এসে বলবেন ঃ]

কথক ঃ কৃষক সম্প্রদায়, স্থলবাহিনী এবং নৌবাহিনীর সৈনিকদের ভেতরেও গণ-আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবার ইচ্ছা প্রকাশ পেতে লাগল। এই জনগণের বিপ্লবী সংগ্রামে বলশেভিক পার্টিই সংগ্রাম পরিচালনার প্রধান দায়িত্ব নিজেদের ওপর নিয়েছিল। লেনিন এবং বলশেভিক পার্টি স্থির সিদ্ধান্তে এলেন যে, অনতিবিলম্বে এবার একটি পার্টি কনফারেন্সের আয়োজন করা দরকার। এই কনফারেন্স হল ১৯১২-র প্রথম দিকে প্রাহাতে। এখানকার অধিবেশনে রাশিয়ার তখনকার পরিস্থিতি এবং পার্টির কর্মপন্থা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করলেন লেনিন।

[ব্ল্যাক আউট। লেনিন এসে দাঁড়াবেন—তাঁর মুখের ওপর স্পট্‌লাইট ফোকাস করা হবে। লেনিন যেন প্রাহা কনফারেন্সের অধিবেশনে বক্তৃতারত ঃ]

লেনিন ঃ এখন থেকে প্রলেতেরিয়াতকে আরও শিক্ষিত, সংগঠিত এবং সঙ্ঘবদ্ধ করতে হবে। পার্টির বে-আইনী সংগঠনগুলোকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে—আর এগুলোকে আগের থেকে অনেক ব্যাপকভাবে আইনানুমোদিত সঙ্ঘগুলোর সাহায্যে আগামী সংগ্রামের জন্য কাজ করতে হবে। প্রলেতারিয়াতের সংগ্রাম বলতে বোঝাবে—একই সঙ্গে রাজনীতিক এবং অর্থনীতিক সংগ্রাম। বন্ধুগণ! এই প্রাহা কনফারেন্স আগামী বিপ্লবের প্রস্তুতির জন্য নতুন প্রাণশক্তির সঞ্চার করলো বলশেভিক পার্টিতে। এখন থেকে আর একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল—ভবিষ্যতে সুযোগবাদীদের বলশেভিক পার্টি থেকে বিতাড়িত করা হবে।

[ব্ল্যাক আউট—আলো জ্বললে কথক এসে বলতে থাকবেন ঃ]

কথক ঃ ১৯১২ সালের বসন্তকালে সেইন্ট পিটার্সবার্গের শ্রমিকদের প্রচেষ্টায় এবং লেনিনের সাহায্যে বলশেভিক দৈনিক পত্রিকা প্রাভদা প্রকাশনের ব্যবস্থা হল। প্রথম সংখ্যা বাজারে এল ২২শে এপ্রিল—ঠিক যে সময় জারিস্টবাহিনী লেনা গোল্ডফিল্ডের শ্রমিকদের ওপর গুলী চালিয়েছিল এবং সারা রাশিয়াতে জনসাধারণ এই নির্মম অত্যাচার এবং হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের অগ্নুদ্গার শুরু করেছিল।

[ব্ল্যাক আউট। সিনেম্যাটোগ্রাফীর সাহায্যে খনির শ্রমিকদের প্রতি জারিস্টবাহিনীর গুলীচালনার দৃশ্য দেখানো হবে। আলো জ্বললে দেখা যাবে আবার কথক এসে দাঁড়িয়েছেন ঃ]

কথক ঃ মাতৃভূমির কাছাকাছি থাকবার জন্য লেনিন এই সময় চলে এলেন ক্র্যাকোতে। তাঁর নির্দেশনায় এবং বলশেভিকদের উদ্যমে রাশিয়ার সর্বত্র আবার ধর্মঘট শুরু হয়ে গিয়েছিল শ্রমিক, মজদুর এবং মেহনতী মানুষদের ভেতর। ১৯১৩ সালের বসন্তকালে কুপস্কায়ার স্বাস্থ্যহানি ঘটল—তিনি এবং লেনিন ক্র্যাকো থেকে চলে এলেন পোরোনিন গ্রামে। সেখান থেকে গেলেন বার্ন, তারপর আবার

ফিরে এলেন পোরোনিনে। এদিকে রাশিয়াতে বিপ্লবাত্মক সংগ্রাম বিস্তারলাভ করেছিল, ১৯১৪ সালের ধর্মঘটগুলোতে পাঁচ লক্ষ শ্রমিক যোগ দিয়েছিল—বেশ বোঝা যাচ্ছিল আবার শ্রমিক বিপ্লব শুরু হবে অনতিবিলম্বে।

যবনিকা

॥ সাত ॥

[অন্ধকারের ভেতর পর্দা উঠবে। মাইকে কণ্ঠস্বর শোনা যাবে:]

মাইকভয়েস : ১৯১৪ সালের গ্রীষ্মকালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধলো. যুদ্ধ বাধলো, সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের ভেতর—একদিকে জার্মানী, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী, টার্কী ও বুলগেরিয়া, অন্যদিকে বৃটেন, ফ্রান্স এবং রাশিয়া, পরে তাদের সঙ্গে যোগ দিল আমেরিকা, জাপান, ইটালী এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের দল। প্রথম থেকেই লেনিন ছিলেন যুদ্ধবিরোধী, কারণ এ যুদ্ধ ছিল জনগণের পক্ষে সর্বনাশা অভিশাপের মত, পৃথিবীর কৃষক, মজদুর, মেহনতী মানুষদের পক্ষে শমনস্বরূপ। এই সময় একদিন অস্ট্রিয়ান পুলিশ ভুল ধারণাবশত এসে গ্রেফতার করলো লেনিনকে। তারা ভেবেছিল লেনিন জারিস্ট সরকারের গুপ্তচর—এবার সে দৃশ্য দেখানো হবে:

[স্টেজ আলোকিত হয়ে উঠবে। ঘরে একটি ক্যালেন্ডার—তার তারিখ ২৫শে জুলাই। দেখা যাবে লেনিন এবং ক্রুপস্কায়া বসে কাজ করছেন। লেনিন একটি পাণ্ডুলিপিতে লিখতে থাকবেন এবং মাঝে মাঝে ক্রুপস্কায়ার উদ্দেশ্যে বলবেন:]

লেনিন : আমি তো কতদিন আগে থেকেই বলে আসছি যে ক্যাপিটেলিস্টরা যুদ্ধ বাধাবার জন্য তৈরি হচ্ছে—আর এই ধনতন্ত্রবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়াই করবার জন্য শ্রমিক, কৃষক, মজদুরদের তৈরি থাকতে হবে।

ক্রুপস্কায়া : অনেকেই তখন তোমার কথা বিশ্বাস করেন নি। এমন কি তোমার সত্যিকার বন্ধুস্থানীয় কেউ কেউ এসে আমাকে বলে গেছেন এই যুদ্ধের ব্যাপারটা তোমার কাছে একটা অবসেসনের মত হয়ে দাঁড়িয়েছে।

লেনিন : তাদের কথা শুনে তোমার কি মনে হয়েছে?

ক্রুপস্কায়া : আমি কখনই তাদের সঙ্গে একমত হই নি। কারণ এ কথা তো আমার অজানা নয় যে, ধীরভাবে বিশ্লেষণ না করে তুমি কোন মতামত প্রকাশ কর না।

[দরজা ধাক্কার আওয়াজ—ক্রুপস্কায়া দরজা খুলে দেবেন। সঙ্গে সঙ্গে ঘরে এসে ঢুকবে একজন পুলিশ অফিসার এবং দুজন সাধারণ পুলিশম্যান।]

পুলিশ অফিসার : ভ্লাডিমার ইলিচ! আমাদের সরকারের কাছে খবর এসেছে যে, আপনি অস্ট্রিয়ান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জারের গুপ্তচর হিসাবে এখানে কাজ করতে এসেছেন।

[লেনিন হো হো করে হেসে উঠবেন:]

ক্রুপস্কায়া : কোথাও একটা বিরাট ভুল হয়েছে অফিসার! রাশিয়ার জার ভ্ল্যাডিমার ইলিচকে তাঁর একজন প্রধান শত্রু হিসাবেই গণ্য করেন। ভ্ল্যাডিমার জারের গুপ্তচর! এর থেকে উদ্ভট আর কিছু হতে পারে না...

পুলিশ অফিসার : কিন্তু আমাকে আমার কর্তব্য করতে হবে মাদাম। আমাদের ওপর আদেশ হয়েছে আপনাদের বাড়ি সার্চ করবার।

লেনিন : বেশ তো সার্চ করুন।

[পুলিশ অফিসার এবং তাঁর সহচরেরা সার্চ করতে শুরু করবে। ঘরের সমস্ত কিছু তারা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে দেখবে। শেষে টেবিলের ড্রয়ার থেকে একটি পাণ্ডুলিপি নিয়ে একজন পুলিশম্যান অফিসারের হাতে সেটি দেবে। পাণ্ডুলিপিটি দেখতে দেখতেই অফিসারের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।]

পুলিশ অফিসার : ভ্ল্যাডিমার ইলিচ। আমাদের যা দরকার তা পেয়ে গেছি।

লেনিন—অর্থাৎ?

পুলিশ অফিসার : এর ভেতরই আপনার

সব সিক্রেট কোড লেখা রয়েছে।

লেনিন : (প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠবেন।) এতে রয়েছে কৃষি সমস্যা সম্বন্ধে আমার তৈরি করা সমস্ত স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেবলস।

পুলিশ অফিসার : আপনার যা বক্তব্য তা বিচারের সময় আদালতের কাছে পেশ করবেন।

লেনিন : আপনারা কি আমাকে গ্রেফতার করবেন?

পুলিশ অফিসার : না, কাল অর্থাৎ ২৬শে জুলাই নোয়ি টার্গ-এ মিলিটারী অথরিটিজের সামনে আপনাকে হাজির হতে হবে। পাণ্ডুলিপিটি আমরা সংগে নিয়ে যাচ্ছি। কালকে হাজির না থাকলে কিন্তু আপনার সমূহ বিপদ হবে—আচ্ছা গুডবাই…

[ওরা চলে যাবে। লেনিন এবং কুপস্কায়া হতভম্বের মত কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকবেন। তারপর—]

লেনিন : এ আবার কি ক্যাসাদ বাধলো। কালকে কোর্টে ওরা নিশ্চয় আমাকে গ্রেফতার করবে। কিন্তু এখন আমার জেলে বসে থাকলে তো চলবে না কুপস্কায়া—হাতে অনেক কাজ—

কুপস্কায়া : বিচারে তোমার কি শাস্তি হতে পারে?

লেনিন : অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর—ওরা যদি প্রমাণ করতে পারে আমি স্পাই, তাহলে প্রাণদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে।

কুপস্কায়া : সে কি!

লেনিন : যদি প্রমাণ করতে পারে! কিন্তু অতোটা মিথ্যাকে সত্যি হিসাবে দাঁড় করানো যায় না। যাই হোক এ ব্যাপার নিয়ে এখুনি আমাকে পোলিশ সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক নেতা Ganiceki এবং Bagocki-র সংগে দেখা করতে হবে। আর আমি কয়েকটা চিঠি লিখে দিচ্ছি—চিঠিগুলো নিয়ে তোমাকে গিয়েও কয়েকজনের সংগে এ ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে।

[লেনিন চিঠি লিখতে বসলেন—ব্ল্যাক আউট। মাইকে কণ্ঠস্বর ভেসে উঠবে।]

মাইকভয়েস : নোয়ি টার্গ-এ লেনিনকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়েছিল পরের দিন। পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন, তিনি সেইণ্ট পিটার্সবার্গের প্রাভদা পত্রিকার প্রতিনিধি এবং মেম্বার। এরপর পোলাণ্ড এবং অস্ট্রিয়ার বিখ্যাত জননেতারা সবাই মিলে—লেনিনের হয়ে আন্দোলন শুরু করলেন। দু' সপ্তাহ জেলে থাকবার পর মিলিটারী কর্তৃপক্ষ লেনিনকে মুক্তি দিল। অস্ট্রিয়া থেকে অ্যাডিসন চলে গেলেন সুইটজারল্যাণ্ডে। এর পর তাঁকে আমরা দেখতে পাচ্ছি বার্ণে স্থানীয় বলশেভিক দলের সভ্যদের কাছে বক্তৃতা দিচ্ছেন :

[আলো জ্বললে দেখা যাবে বহু শ্রমিক লেনিনের বক্তৃতা শুনছেন—লেনিন একটি টেবিলের ওপর দাঁড়িয়ে বলতে থাকবেন—তাঁর চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকবে শ্রমিকের দল।]

লেনিন : কমরেডস। আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক কংগ্রেসগুলোতে এতকাল নানা দেশের সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা বলে এসেছেন যে, পৃথিবীর সর্বত্র ধনতন্ত্রবাদীরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এবং মেহনতী মানুষদের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে যুদ্ধ বাধলে সেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়াই করা এবং শ্রমিকদের একত্রিত করে প্রচণ্ড আক্রমণের দ্বারা ধনতন্ত্রবাদের অবসান ঘটানো। কিন্তু আজ যখন বিশ্বব্যাপী যুদ্ধের লেলিহান শিখা জ্বলে উঠেছে, আমরা অবাক হয়ে দেখছি, বিভিন্ন দেশের শ্রমিক নেতারা প্রলেতারিয়াতের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে নিজ নিজ দেশের বুর্জোয়াজির দলে গিয়ে যোগ দিয়েছেন। ফ্রান্স, বৃটেন এবং বেলজিয়ামের সোশ্যালিস্টরা তাঁদের স্ব স্ব সরকারের সংগে হাত মিলিয়েছেন। জার্মানীতে সোশ্যালিস্টরা যুদ্ধঋণের স্বপক্ষে ভোট দিয়েছেন। অর্থাৎ এঁরা সবাই এই ইম্পিরিয়ালিস্ট ওয়ারকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করছেন…

১ম শ্রমিক : এখানে একটা প্রশ্ন আছে কমরেড লেনিন। বিদেশী শত্রু যদি আমার স্বদেশকে আক্রমণ করে, তখন কি নিষ্ক্রিয়ভাবে বসে থাকাটা দেশভক্তির পরিচায়ক?

লেনিন : কমরেড! আমি বলবো সমস্ত ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখুন। স্বাভাবিক দেশভক্তি আর উৎকট দেশভক্তির ভেতর একটা তফাৎ আছে। জার্মানী বা অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর সংগে বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়ার যুদ্ধ বেধেছে—একটু বিশ্লেষণ করে দেখলেই আমরা বুঝতে পারবো যুদ্ধরত ওসব দেশের মেহনতী মানুষদের নিজেদের ভেতর কোন বিবাদ, মনান্তর বা বিরোধ নেই। তাদের যুদ্ধে লাগিয়ে দিয়েছে তাদের দেশের ধনতন্ত্রবাদীরা—নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য। আর যুদ্ধের মাশুল যোগাচ্ছে এই শোষিতের দল—প্রাণ দিয়ে, অর্থ দিয়ে এবং —সাধন করে।

২য় শ্রমিক : কিন্তু এ যুদ্ধকে শ্রমিকেরা ঠেকাবে কি করে?

লেনিন : আমি তো আগেই বলেছি ভাই, যুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেই এই অন্যায় যুদ্ধকে বন্ধ করতে হবে।

৩য় শ্রমিক : কমরেড লেনিন, বিদেশীরা যখন আমার দেশকে আক্রমণ করেছে, সে সময় আমরা যদি দেশীয় সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করি, তবে বিদেশী শত্রু যে অতি সহজেই আমার দেশকে পদানত করে ফেলবে।

লেনিন : কিন্তু ভাই প্রত্যেক দেশের শ্রমিকরাই যদি একযোগে এই ধনতন্ত্রবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে মাথা উঁচু করে রুখে দাঁড়ায়; ক্যাপিটালিস্টের দল তখন যে আপনা থেকেই বাধ্য হবে যুদ্ধ থামাতে—

৪র্থ শ্রমিক : এই যুদ্ধ বাধিয়ে ক্যাপিটালিস্টদের লাভ কি?

লেনিন : যুদ্ধ বাধলে নানা মারাত্মক অস্ত্র উৎপাদন করে তারা প্রচুর মুনাফা অর্জন করবে। তাছাড়া ইওরোপের সব দেশেই আজ শ্রমিক আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে। সেই আন্দোলনকে পরোক্ষভাবে চেপে দেবার জন্যই জমিদারশ্রেণী এবং বুর্জোয়াজি এই বিশ্বযুদ্ধের অবতারণা করেছে—

৫ম শ্রমিক : আমাদের তাহলে কর্তব্য কি?

লেনিন : প্রত্যেক যুদ্ধরত দেশের শ্রমিক-শ্রেণীর কর্তব্য হচ্ছে—to turn the imperialist war into a civil war, a war of the working class and

১৯৬৯ তে আপনার ভাগ্য

যে-কোন একটি ফুলের নাম লিখিয়া আপনার ঠিকানাসহ একটি পোস্টকার্ড আমাদের কাছে পাঠান। আগামী বৎসরে

আপনার ভাগ্যের বিস্তারিত বিবরণ আমরা আপনাকে পাঠাইব, ইহাতে পাইবেন ব্যবসায়ে লাভ লোকসান, চাকুরিতে উন্নতি, বদলী, জমি, বিবাহ ও সুখ-সম্পত্তির বিবরণ; আর থাকিবে দুষ্ট-গ্রহের প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষায় নির্দেশ। একবার পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারিবেন।

PT. DEV DUTT SHASTRI
RAJ JYOTISHI (B. M. W)
P. B. 86, JULLUNDUR CITY

রেড স্কোয়ারে সেনাবাহিনীর উদ্দেশ্য ভাষণদানরত লেনিন (ফটো : ১৯১৯)

the labouring masses against the bourgeoisie of their countries.

[দপ করে আলো নিভে যাবে। আলো জ্বললে দেখা যাবে কথক এসে দাঁড়িয়েছেন :]

কথক : বিশ্বযুদ্ধ লাগবার পর থেকেই বোঝা যাচ্ছিল জারিস্ট রাশিয়া সব দিক থেকেই অন্তঃসারশূন্য। যুদ্ধ করবার মত যোগ্যতা বা প্রস্তুতি, অস্ত্র-শস্ত্র, গোলাবারুদ কোনকিছুই ছিল না, যার সাহায্যে রাশিয়া জার্মানীকে এঁটে উঠবে। ক্রমাগত তারা জার্মানদের কাছে মার খাচ্ছিল, জার এবং তাঁর মন্ত্রীরা যুদ্ধ চালাবার পক্ষে ছিলেন সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত—সৈন্যাধ্যক্ষেরা এবং ডুমার সভ্যেরা এবার খোলাখুলিভাবে ঘোষণা করলেন যে, জার সরকার যুদ্ধ বাধিয়ে হাজার হাজার রাশিয়ানকে মৃত্যুর পথে ঠেলে দিয়েছেন। এদিকে আবার দেশের সর্বত্র দেখা দিল দুর্ভিক্ষ। ১৯১৭ সালের ৯ই জানুয়ারী রাশিয়ার সর্বত্র যুদ্ধ-বিরোধী আন্দোলন শুরু হোল। দিনের পর দিন শ্রমিক-বিপ্লব আত্ম-প্রকাশ করতে লাগল পেট্রোগ্র্যাড, মস্কো, বাকু এবং নিজনি নোভগোরোড প্রভৃতি শহরে। ১৯১৭-র ফেব্রুয়ারীতে বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে লক্ষের ওপর শ্রমিক (মেয়ে-পুরুষ), পেট্রোগ্র্যাডে রাজনীতিক-ধর্মঘট আন্দোলনে যোগ দিল। রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করে চলতে চলতে তারা শ্লোগান দিচ্ছিল—"স্বৈরাচারী সরকার নিপাত যাক, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বন্ধ হোক, আমরা চাই খাবার রুটি, পরবার পোষাক।" জারিস্ট মিলিটারী অফিসাররা সৈন্য নিয়ে এই সব শ্রমিক বিদ্রোহ দমন করতে এগিয়ে এল—কিন্তু সৈন্যদলের সহানুভূতিও তখন বিদ্রোহী শ্রমিক-কৃষকদের দিকে—শ্রমিক মিছিল সৈন্য দিয়ে বন্ধ করতে গিয়ে মিলিটারী অফিসারদের প্রচেষ্টা কিভাবে ব্যর্থ হচ্ছিল পরের দৃশ্যটি থেকে তা বোঝা যাবে।

[কথক সরে যাবেন। একদল শ্রমিক, কৃষক, মেহনতী পুরুষ এবং নারী স্টেজের বাঁ দিক থেকে আসবে। ডান দিক থেকে মিলিটারী অফিসার তাঁর সৈন্যদল নিয়ে এগিয়ে আসবে—সৈনিকদের হাতের বন্দুক জনতার প্রতি উদ্যত। দুই দলই স্টেজের মাঝে এসে দাঁড়িয়ে যাবে। অফিসার অর্ডার করবে—"ফায়ার!" সৈন্যরা সে আদেশ অমান্য করে বন্দুক ফিরিয়ে অফিসারের দিকে উঁচিয়ে ধরবে। মিছিল থেকে সবাই চীৎকার করে উঠবে—"সাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক! স্বৈরাচারী শাসন খতম হোক! কৃষক-শ্রমিক-আন্দোলন জিন্দাবাদ!"]

[দপ করে আলো নিভে যাবে। আলো জ্বললে কথক এসে মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়ে বলতে থাকবেন :]

কথক : কৃষক এবং শ্রমিকদের বিপ্লবী আন্দোলনে সৈন্যরা যোগ দেওয়াতে জার বাধ্য হলেন সিংহাসন ত্যাগ করতে। এবার ডুমা প্রতিষ্ঠা করলেন প্রভিশ্যনাল গভর্নমেন্ট। সাংগঠনিক দিক থেকে এটি ছিল বুর্জোয়া ধরণের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ওপর নির্ভরশীল। তারপর এই সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা শুরু করল মেনশেভিকরা। তাদের নেতা আলেকজান্ডার কেরেনস্কি এসে এই সরকারের প্রধান পরিচালক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হলেন। রাশিয়ার এই সাময়িক সরকারে ছিল দুটি দল—এক দিকে বুর্জোয়াজি, অন্যদিকে শ্রমিক-কৃষকদের প্রতিনিধি হিসাবে সোভিয়েতগুলো। মেনশেভিক এবং সোশ্যালিস্ট রেভোলুশনারীরা চাইছিল সোভিয়েতদের দাবিয়ে রাখতে। এদিকে লেনিন এবং অন্যান্য প্রবাসী বলশেভিকরা দেশে ফিরে আসবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন। কেরেনস্কি এবং তাঁর সরকার কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করছিলেন তাঁদের প্রত্যাবর্তনে বাধা দিতে। ১৯১৭ সালের ৩রা এপ্রিল রাত্রে, প্রায় দশ বছর নির্বাসিতের জীবনযাপনের পর, লেনিন পেট্রোগ্র্যাডে এসে পৌঁছলেন। বলশেভিকদের একটি সভায় তিনি বললেন :

[এক বিরাট সভার দৃশ্য। লেনিন একটি মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতারত।]

লেনিন : কমরেডস! কেরেনস্কি সরকার চায় বুর্জোয়াজির কায়েমী স্বার্থের প্রতিষ্ঠা করতে। চায় বলশেভিকদের ধ্বংস করতে। শ্রমিকদের তারা বোঝাতে চাইছে যে, রাজতন্ত্রের অবসান হওয়াতে, বর্তমান যুদ্ধকে আর সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বলা চলে না—এটাকে এখন তারা ন্যায়যুদ্ধ বলে অভিহিত করছে। আমি আপনাদের বলেছি যে, কেরেনস্কি সরকার চায় এই যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে নিজেদের পাশবিক শক্তি বাড়িয়ে তুলতে এবং শ্রমিক-কৃষক-মজদুরদের সমস্ত বৈপ্লবিক আন্দোলনকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করতে। বন্ধুগণ! আমাদের এখন সবার আগে নতুন আন্দোলন শুরু করতে হবে এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্য। বলশেভিকদের হাতে ক্ষমতা না আসা পর্যন্ত দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না একথা আপনারা সবাই জানেন। দেশের কৃষক, মজদুর, মেহনতী মানুষদের কাছে আমার আবেদন—সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে নতুন সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হোন!

[দপ করে আলো নিভে যাবে—অন্ধকারের ভেতর থেকে জনতার চিৎকার-ধ্বনি উঠবে—"কেরেনস্কি সরকার নিপাত যাক! বলশেভিক পার্টি জিন্দাবাদ!"]

যবনিকা

[ক্রমশ]

রঙ্গজগৎ

চলচ্চিত্র উপদেষ্টা কমিটি

পশ্চিমবঙ্গের সরকার সম্প্রতি এক চলচ্চিত্র উপদেষ্টা কমিটি গঠন করেছেন। এই উদ্যোগ অভিনন্দনীয়। বহু বছর থেকে একটি উপদেষ্টা কমিটির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা যাচ্ছিল। কংগ্রেস সরকারের আমলের এক তদন্ত কমিশনেও একটি উপদেষ্টা কমিটির কথা স্বীকার করেছিল। চলচ্চিত্র-শিল্পের বিভিন্ন বিভাগে নানারকম সমস্যা রয়েছে। সিনেমার কর্মচারীদের সঙ্গে মালিকদের বিরোধ একরকম লেগেই রয়েছে। পরিবেশক অফিসগুলিতে কর্মচারীদের অসন্তোষ রয়েছে। স্টুডিওতে বিভিন্ন বিভাগের কলাকুশলীদের কাজের নিশ্চয়তা, সম্মানজনক পারিশ্রমিক ইত্যাদির প্রশ্ন আছে। শিল্পীদের সমস্যাও কম নয়। কয়েকজন শিল্পী 'তারকা' হয়ে লাখের ঘরে উঠলেও, নিরানব্বই জন শিল্পী একটি ছবিতে কাজ পাবার জন্য প্রযোজক ও পরিচালকদের বাড়িতে হাঁটাহাঁটি করে হয়রান হন। আরো বড় হয়ে উঠেছে প্রযোজক-পরিবেশকদের সঙ্গে সিনেমা মালিকদের বিরোধ। এবং সিনেমা মালিকদের সর্বনাশা কর্তৃত্ব। এ সব সমস্যার বিভিন্ন দিক থেকে বাংলা চলচ্চিত্র-শিল্পের এক মুমূর্ষু অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। যার জন্যে বছরে কয়েকটি ছবি তৈরি হলেও বোম্বাইয়ের অনুকরণে হাল্কা মনোরঞ্জনী ছবি ছাড়া সত্যিকার ভাল ছবি; সমসাময়িক অবস্থার বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণমূলক ছবি করার সম্ভাবনা ক্রমে কমে যাচ্ছে।

এই পরিস্থিতিতে দেশের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সমভাবে যদি চলচ্চিত্র-শিল্পকে ভালভাবে সংগঠিত করার এবং যারা জাতীয় স্বার্থ ও চলচ্চিত্রের শিল্পমূল্যকে অস্বীকার করে এমন ব্যবসায়ী-চক্রের হাত থেকে চলচ্চিত্রকে উদ্ধার না করেন, তবে বাংলা চলচ্চিত্রের ভবিষ্যৎ কোথায়। বর্তমানে কলকাতায় ও জেলা শহরগুলিতে যে সকল সিনেমা আছে তার অধিকাংশ হিন্দী ছবির দখলে। প্রতি সপ্তাহে হিন্দী ছবি মুক্তিলাভ করে অথচ বাংলাদেশে বাংলা ছবির মুক্তির পথ নেই। বাংলা ছবিকে মুক্তির ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেবার কথা অনেকদিন থেকে করা হচ্ছে। কিন্তু নানা জটিলতায় এ দাবি কার্যকরী হচ্ছে না। বাংলা ছবির রিলিজ চেন বেড়ে গেলে স্টুডিওগুলিতে কাজ বৃদ্ধি এবং অনেকের রুজির পথ সুগম হয়। অপসংস্কৃতিমূলক ছবির জবরদখল থেকেও বাংলার সমাজ বাঁচে। কিন্তু কাজগুলি — কঠিন। কারণ ছবির ব্যবসা হলেও এমন এক চক্র এতে জড়িত আছে, যেখানে হাত দিলে প্রতিক্রিয়ার শিবিরের গায়ে হাত লাগে।

উপদেষ্টা কমিটি যদি ঠিকভাবে কাজ করতে পারে, তবে হয়ত জটিল পরিস্থিতি কিছুটা সহজ হতে সাহায্য করবে। কিন্তু এই কমিটি যোগ্য প্রতিনিধিত্বমূলক হয়েছে কি না সে বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কয়েকটি সংস্থা থেকে দু'জন করে প্রতিনিধি এবং কয়েকজন সরকার মনোনীত ব্যক্তি এতে রয়েছেন। সংস্থাগুলির মধ্যে দু'-একটির নাম এই প্রথম আমরা জানলাম। এসব সংস্থার কোন কাজ বা নামের সঙ্গে আমরা পরিচিত নই। এমন এক সংস্থার দু'জন প্রতিনিধিও রয়েছেন যাঁদের কাজের সঙ্গে চলচ্চিত্রের সম্পর্ক আছে এমন কথা বলা যায় না। সঙ্গীত-শিল্পী হলেই যে চলচ্চিত্রের সঙ্গে যুক্ত হবেন এমন কথা কি করে ধরে নেওয়া যায়। কোন একটা সংস্থা সকল চলচ্চিত্র সাংবাদিকদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে এমন কথাও বলা যায় না: কারণ ভারতীয় বার্তাজীবী সমিতির সদস্য রয়েছেন অনেক চলচ্চিত্র সমালোচক। ফিল্ম সোসাইটি ফেডারেশনের অন্তত একজন প্রতিনিধির স্থান কমিটিতে হওয়া উচিত ছিল। এসব ব্যাপারে তথ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব অপেক্ষা যাঁরা পরামর্শদান করেছেন তাঁদের দায়িত্ব বেশি। তাঁরা নিজেদের সীমিত জ্ঞান দিয়ে যথার্থ সাহায্য করতে পারেন নি এবং কমিটি হয়ে পড়েছে কাজ চালাবার পক্ষে খুবই বড়। এই উদ্যোগ প্রশংসনীয়। —সুজন।

অহীন্দ্র চৌধুরী
স্টার থিয়েটারের শিল্পী ও কর্মীরা অভিনন্দন জানিয়েছেন

নাটকের কথা

শর্মিলা শতরজনী স্মারক উৎসব

স্টার থিয়েটারে 'শর্মিলা' নাটকের শততম রজনী স্মারক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ২৮শে জুন। এই অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য শ্রীমতী রমা চৌধুরী এবং প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেছিলেন সাহিত্যিক শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল। এই অনুষ্ঠানের প্রধান উল্লেখযোগ্য বিষয় নটসূর্য শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর ডি· লিট (রবীন্দ্র-ভারতী) প্রাপ্তি উপলক্ষে সম্বর্ধনা দান। স্টার থিয়েটারের পক্ষ থেকে শ্রীচৌধুরীকে সম্বর্ধনা এবং উপহার দান করা হয়। সম্বর্ধনার উত্তরে শ্রীচৌধুরী নটের জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে নবাগত শিল্পীদের অভিনন্দন জানান।

সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানান্তে স্টার

থিয়েটারের নাটক 'শর্মিলা'র অভিনয় হয়। এক উচ্চবিত্তসম্পন্ন পরিবারের পতনের কাহিনী 'শর্মিলা'। পরিবারের কর্তা চোরাপথে অনেক কালোটাকার অধিকারী হয়ে কিভাবে টাকা ব্যয় করবে যেন খুঁজে ওঠে না। এই টাকা তিন ছেলে খুশিমত ওড়ায়। তিন ছেলের তিন বউ, বাঙালী, মাদ্রাজী ও ইংরেজ। বাড়ির সকলের মধ্যে ব্যতিক্রম মাদ্রাজী পুত্রবধূ আর মেয়ে শর্মিলা। ওরা কর্তব্যজ্ঞানে ও ব্যবহারে বিশৃংখল পরিবারে স্বতন্ত্র। একদা কর্তার কালোবাজারী ধরা পড়ে গেল এবং তাঁর মৃত্যুর পর পরিবারে ভাঙন দেখা দিল। সে ভাঙা পরিবারে ভায়েদের মিলনের পথ করে দিল শর্মিলা, তার সহযোগী মাদ্রাজী পুত্রবধূ।

অন্যচ্ছায়া

২৩শে জুন সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টায় তরুণ তীর্থের সভ্যগণ কিরণ মৈত্রের আজকের নাটক "অন্যছায়া" প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে মঞ্চস্থ করলেন। দলগত অভিনয়ে সভ্যরা নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন। অভিনয় করেছেন,—গৌতম দাস—গুপী, নিমে—সুপ্রভাত বসু, সনৎ নাগচৌধুরী—পল্টু ও কল্যাণ ঘোষ—পণ্টু। অন্যান্য চরিত্রে সুবীর সিনহা, দেবদাস দে, হরিনাথ শীল, পবিত্র মজুমদার, অসিত নাগচৌধুরী, তপন নাগ, অসিত চক্রবর্তী, গৌতম লাহা, অরবিন্দ ভট্টাচার্য, মনোজ সরকার, গদাধর মুখার্জী, রঞ্জিৎ নাগ, দমন রায়চৌধুরী ও দীপক বসু তাঁদের চরিত্রগুলি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলেন। পরিচালক জয়ন্ত ভাদুড়ী।

সংঘাত

ইতিহাসের ধারাপথে পশ্চিমবাংলার শ্রমিকশ্রেণী আজ বিশ্বব্যাপী যে ধনতান্ত্রিক সংকট, তার মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন। শ্রমিকশ্রেণীর ওপর নির্বিচারে দমন-পীড়ন চলছে—ছাঁটাই, লক-আউট, লে-অফ, ক্লোজার ইত্যাদির মাধ্যমে।

এই পটভূমিকায় প্রত্যয়নিষ্ঠ শ্রমিক-জীবনের ওপর রচিত নাটক 'সংঘাত' (রচনা শ্রীচিররঞ্জন দাস) ৯ই জুলাই সন্ধ্যা সাতটায় মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ সীমান্তিক শাখা কর্তৃক অভিনীত হবে।

শিশু স্বর্গ

শিশু স্বর্গের নিয়মিত অনুষ্ঠান বসবে মহাজাতি সদনে রবিবার (১৩ই জুলাই) সকাল ৯টায়। এদিন শিশু শিল্পীরা ছাড়া গল্প শোনাবেন শ্রীবীরেন চট্টোপাধ্যায় ও অভিযান বন্দ্যোপাধ্যায়। রিজেন্ট এস্টেট এ্যাসোসিয়েশন নৃত্য পরিবেশন করবেন শ্রীমতী গায়ত্রী চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় "আমরা যৌবনেরই দূত"।

সমর চৌধুরী পরিচালিত 'মৌসুমী মন' ছবিতে জহর রায় ও দীপ শ্রীমানী

স্টুডিও খবর

"আরোগ্য নিকেতন"-এর মুক্তি আনন্দ

রবীন্দ্র পুরস্কারপ্রাপ্ত "আরোগ্য নিকেতন"-এর রচয়িতা জ্ঞানপীঠ পুরস্কারপ্রাপ্ত কথাশিল্পী তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়। বছরের শ্রেষ্ঠ বাংলা ছবিরূপে রাষ্ট্রপ্রতি পুরস্কার বিজয়ী "আরোগ্য নিকেতন" ছবিটি "রাজা রামমোহন" প্রভৃতি চিত্রনির্মাতা 'অরোরা'-র শ্রদ্ধাঞ্জলি। ছবিটি পরিচালনা করেছেন স্বয়ং এ ছবির চিত্রনাট্যকার 'ভগিনী নিবেদিতা', 'রাজা রামমোহন'-খ্যাত বিজয় বসু। রবীন চ্যাটার্জী সুরারোপিত এ ছবির নেপথ্য সংগীতে কণ্ঠ দিয়েছেন হেমন্ত মুখার্জী, মানবেন্দ্র মুখার্জী, সন্ধ্যা মুখার্জী ও আরতি মুখার্জী। ছবিটির চিত্রগ্রহণ, শিল্প নির্দেশনা ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে কৃষ্ণ চক্রবর্তী, সত্যেন রায়চৌধুরী এবং বিশ্বনাথ মিত্র।

ছবির বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করেছেন বিকাশ রায়, ছায়া দেবী, রুমা গুহঠাকুরতা, ছন্দা দেবী, দিলীপ রায়, শুভেন্দু চ্যাটার্জী, রবি ঘোষ, বঙ্কিম ঘোষ, রমা দাস, কালী সরকার, ইন্দিরা দে, জহর গাঙ্গুলী এবং সন্ধ্যা রায়।

অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন ছবিটির পরিবেশক।

"প্রতিদান"

নবগঠিত এম· বি· প্রোডাকসন্স্-এর প্রথম চিত্রার্ঘ্য "প্রতিদান" মুক্তির দিন গুণছে। যাঁরা নিজেদেরকে নিঃস্ব করে যুগে যুগে, কালে কালে নিজেদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার করে জাতির ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার মহান ব্রত উদ্যাপন করেন, আমাদের দেশের সেই সবচেয়ে অবহেলিত শিক্ষকসমাজের এক শরিককে কেন্দ্র করে এই ছবির কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করেছেন অজিত গাঙ্গুলী। ছবিটির পরিচালনাও তাঁরই। সুখশ্রাব্য এবং সুগীত এ ছবির গানগুলির সুররচয়িতা শৈলেন মুখার্জী।

সংবেদনশীল এ ছবির চরিত্রগুলি যাঁদের অভিনয়ে পর্দায় মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁরা হলেন—কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, অনিল চট্টোপাধ্যায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজল গুপ্ত, জহর গাঙ্গুলী, মলিনা দেবী, জহর রায়, প্রীতি মজুমদার, অনুভা গুপ্তা, কালী চক্রবর্তী, রুমা গুহঠাকুরতা, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, শীতল বন্দোপাধ্যায়, সুশীল দাস, সুখেন দাস, সমরকুমার, মাঃ অরিন্দম এবং নবাগতা সুচেতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

কৃষ্ণলীলা

শ্রীকৃষ্ণের জন্ম থেকে কংস বধ পর্যন্ত প্রতিটি ভারতবাসীর বিদিত কাহিনী,

"তীরভূমি" ছবির একটি বিশেষ মুহূর্তে মাধবী মুখার্জী, রুমা গুহঠাকুরতা ও অনিল চ্যাটার্জী

জাঁকজমকপূর্ণ গীত-বহুল "কৃষ্ণলীলা" চিত্রে গৃহীত হয়েছে। বলাকা পিকচার্স ছবিটির প্রযোজক ও পরিবেশক। বহু অর্থ ব্যয়ে তোলা এ ছবি ভক্তি আর প্রেম-রসে ভরা। ছবিটিতে বহু ট্রিক শট রয়েছে। মৃণাল ঘোষ, শ্রীধর ভট্টাচার্য ও সরল গুহ যথাক্রমে সংলাপ রচনা, পরিচালনা ও গীত রচনা করেছেন। সুর দিয়েছেন—বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য ও অনিলকুমার দে। প্রতিমা ব্যানার্জী, ইলা বসু, শিপ্রা বসু, মানবেন্দ্র মুখার্জী, আরতি মুখার্জী, অঞ্জলি ব্যানার্জী ও সুদাম ব্যানার্জী গান গেয়েছেন। ছবিটি আগামী মাসেই শহর ও শহরতলীতে একাধিক চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে।

"নলদময়ন্তী"

মহাভারতের প্রেমোপাখ্যান "নলদময়ন্তী" অবলম্বনে রচিত দীর্ঘ প্রতীক্ষিত পৌরাণিক ছবি "নলদময়ন্তী" বর্তমানে আসন্ন মুক্তিপথে। জয়দেব চক্রবর্তী ও সমীরণ মজুমদার প্রযোজিত জে, এম, প্রোডাকসন্স-এর উক্ত ছবিটি পরিচালনা করেছেন গোপালকৃষ্ণ রায়। ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন মণি বর্মা। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত এবং কালীপদ সেন সুরারোপিত এ ছবির সংগীতাংশ সমৃদ্ধ হয়েছে মান্না দে, সতীনাথ মুখার্জী, আরতি মুখার্জী, নির্মলা মিশ্র, গীতা দাস এবং গঙ্গা দে-র কণ্ঠমাধুর্যে। চিত্রগ্রহণ, শিল্প নির্দেশনা এবং সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে বিব্যেন্দু ঘোষ, সুনীল সরকার এবং বিশ্বনাথ নায়ক। কেনেটকুমার ছবিটির নৃত্য-পরিকল্পক।

"নলদময়ন্তী"-র ভূমিকাগুলি চিত্রিত করেছেন অসীমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, রবীন ব্যানার্জী, কালীপদ চক্রবর্তী, দীপিকা দাস, গঙ্গাপদ বসু, গীতা দে, লীলাবতী দেবী (করালী) গোপী চক্রবর্তী, মণি শ্রীমানী, জয়নারায়ণ মুখার্জী, পদ্মা দেবী ধীরাজ দাস, ইন্দিরা দে, জ্যোৎস্না ব্যানার্জী, লীলা চক্রবর্তী, সুস্মিতা দে, সীমা ভৌমিক, রত্না ঘোষাল, তপন চ্যাটার্জী, সুমন মুখার্জী, জীবনকুমার, মলিন মুখার্জী, অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য, বিনয় মিত্র, জয়ন্তী, ঋষি ব্যানার্জী, শৈলেন গাঙ্গুলী, রেণুকা রায় এবং সুনীলেশ ভট্টাচার্য।

পারফেক্ট ফিল্ম্ ছবিটির পরিবেশক।

"সাবিত্রীসত্যবান"

যমরাজের কাছ থেকে স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনতে পেরেছিল সতী সাবিত্রী। ভারতীয় নারীর অন্তর সাবিত্রীর নামে শ্রদ্ধা জানায়। শ্রীসুজাতা মুভিজ নিবেদিত "সাবিত্রীসত্যবান" বাংলা ছবিখানি বালাজী ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটর্সের পরিবেশনায় আগামী মাসে শহর ও শহরতলীর একাধিক চিত্রগৃহে মুক্তিলাভ করবে বলে জানা গেল। দ্বিজু ভাওয়াল ছবির ভাষান্তর নির্দেশনার কাজ করেছেন। সংলাপ রচনা করেছেন : অরুণ রায়। প্রযোজনা ও সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন : রমেশ নাইডু। গীত রচনায় আছেন শ্যামল গুপ্ত ও শ্যামল ঘোষ। কণ্ঠসঙ্গীতে আছেন—ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, দ্বিজেন মুখার্জী, প্রদীপ দাশগুপ্ত, গীতা দাস ও নির্মলা মিশ্র। চরিত্রলিপিতে আছেন : বরলক্ষ্মী, নাগেশ্বর রাও, এস বি রঙ্গরাও, রেলাঙ্গী প্রমুখ।

সংবাদিকী

ত্রিসপ্তকের প্রতিষ্ঠাদিবস

সম্প্রতি ঝামাপুকুর রাজবাড়ি মঞ্চে 'ত্রিসপ্তকে'র প্রতিষ্ঠাদিবস পালন করা হয়। ওই উপলক্ষে আয়োজিত এক সংগীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিদ্যুৎ বসু, প্রিয়াঙ্ক মৈত্র, বন্দনা সিংহ ও অতিথি শিল্পী স্বপন গুপ্ত, গোতম মিত্র ও ইকোডিলা অর্কেস্ট্রার শিল্পিবৃন্দ। শিক্ষার্থীদের সমবেত কণ্ঠসংগীত ও গীটারের অনুষ্ঠান দুটি সাধনার পরিচয় বহন করে। একক কণ্ঠসংগীত ও গীটারে বিশেষ কৃতিত্ব দেখান সর্বশ্রী জয়ন্ত মিত্র, অমল বসু, স্বপ্না দে, শিবানী দাস ও রুমা দত্ত। স্প্যানিশ গীটারে পারদর্শিতা দেখান প্রত্যুষকিরণ মিত্র ও ভাস্কর মিত্র। গীটার ও কণ্ঠসংগীত এই উভয় বিষয়ে কৃতিত্ব দেখান শিক্ষায়তনের ছাত্র শ্রীপ্রতাপ মিত্র। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন প্রতিষ্ঠানের সর্বাধ্যক্ষা শ্রীমতী পার্বতী মিত্র।

মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব

মস্কোয় ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব আরম্ভ হচ্ছে ৭ই জুলাই থেকে। এ পর্যন্ত ৪০টি দেশ এই বিশাল উৎসবে যোগদানের জন্য আবেদন পেশ করেছে।

মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবের ডাইরেক্টর জেনালের ভি· বাসকাকোভ বলেন যে, এই উৎসবের প্রতিযোগিতায় বৃটেন, অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, বুলগেরিয়া, ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, জার্মান গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, হাংগেরি, ভারত, ইতালি, কাম্বোডিয়া, কিউবা, মংগোলিয়া,

তরুণতীর্থ' প্রযোজিত 'অন্যছায়া' নাটকের একটি দৃশ্যে সুপ্রভাত বসু (নিম্নে) ও রঞ্জিৎ নাগ (রতন)

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, পোলান্ড, রুমানিয়া, সিরিয়া, সোভিয়েট ইউনিয়ন, আমেরিকা, ফ্রান্স, ফিনল্যান্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া এবং ইওরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার অন্যান্য অসংখ্য দেশ থেকে যে সব চলচ্চিত্র যোগ দিচ্ছে সেগুলি দেখান হবে ক্রেমলিনের কংগ্রেস প্রাসাদে, সিনেমা ক্লাবে এবং ইয়ং পাইওনিয়র প্রাসাদে।

এই উৎসবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল লেনিন সম্পর্কে তোলা "অক্টোবর", "লেনিন ইন অক্টোবর", "মাদার্স হার্ট" "লেনিন ইন পোল্যান্ড" প্রভৃতি চলচ্চিত্রও রুশ ও বিদেশী দর্শকেরা দেখতে পাবেন।

উৎসবের সংবাদ বিভাগ প্রস্তুতির বিবরণ দিয়ে ইতিমধ্যেই একটি নিয়মিত বুলেটিন প্রকাশ করছেন। উৎসব চলাকালে "চলচ্চিত্র উৎসবের স্পুৎনিক" এই নামে তিনটি বিভিন্ন ভাষায় একটি দৈনিক পত্রিকাও প্রকাশিত হবে।

উৎসব চলাকালে অবসর সময়ে উৎসবে অংশগ্রহণকারিগণ মস্কোর বৃহত্তম ফিল্ম স্টুডিওগুলি পরিদর্শন করবেন এবং বিদেশী অতিথিদের লেনিনগ্রাদ, কিয়েভ, তিবিলিস, মিনস্ক, স্ভারদ্লোভস্ক, নোভোসিবিরস্ক, রোস্তভ অন দন, দোনেৎস্ক প্রভৃতি স্থান পরিদর্শনে নিয়ে যাওয়া হবে।

ষষ্ঠ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব বিশ্বের চলচ্চিত্র নির্মাতাদের মধ্যে মৈত্রী ও সহযোগিতার অধিকতর বিকাশ সাধন করবে।

ফরাসী চলচ্চিত্র উৎসব

ক্যালকাটা সিনে ইনস্টিটিউট এবং ফরাসী দূতাবাসের কালচারাল সার্ভিসের যুক্ত উদ্যোগে গত ৩রা জুলাই সন্ধ্যায় এক ফরাসী চলচ্চিত্র উৎসব উদ্বোধন করেছেন যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী। ফরাসী দূতাবাসের কনসাল জেনারেল মিঃ হেনরি বেকেট উপস্থিত দর্শকদের স্বাগত জানান। প্রথম দিনের উৎসবে জি. ফ্রানজু পরিচালিত 'থেরেসে ডেসকুয়েরক্স' ছবিটি দেখান হয়েছে। এই উৎসব ১০ই জুলাই পর্যন্ত একাডেমি ফাইন আর্টস হলে চলবে।

সঙ্গীত কথা

'সুরবাহার'-এর উদ্যোগে রবীন্দ্র ও নজরুল উৎসব

দক্ষিণ শহরতলীর সঙ্গীত-কলা কেন্দ্র 'সুরবাহার'। রবীন্দ্র ও নজরুল জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে সম্প্রতি কসবায় এক সঙ্গীত বাসরের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষার্থীরা সঙ্গীতে কবিপ্রণাম জানান। কণ্ঠসঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেন— কৃষ্ণা সমাদ্দার, বিমলকুমার মিত্র, কৃষ্ণগোপাল ঘোষ, সুগতা মৈত্র, জয়শ্রী ঘোষ, ঊর্মিলা দত্ত, প্রতিমা সরকার, আরতি রায়, ডলি ভট্টাচার্য, স্বপ্না চক্রবর্তী, শ্রীলা রায়, সন্ধ্যা সাহা, কল্পনা রায়চৌধুরী, শাশ্বতী সাহা, সুপর্ণা দত্ত, ললিতা চট্টোপাধ্যায়, অতসী ভট্টাচার্য, বাসনা ঘোষ, অলকানন্দা মৌলিক, ব্রততীছায় চৌধুরী ও তৃপ্তি মজুমদার এবং শ্যামশ্রী বিশ্বাস। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গ নজরুল একাডেমী আয়োজিত সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারিণী সংস্থার দুজন শিক্ষার্থী বাণী সমাদ্দার ও নন্দা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে নজরুলগীতি সুরবাহারের উন্নত মানের শিক্ষাপদ্ধতির পরিচয় দেয়।

এ ছাড়া যন্ত্রসঙ্গীতের আসরে গীটারে রবীন্দ্রগীতি বাজিয়ে শোনান শেখর সাহা, স্বপন দত্ত, সুশীল রায়, নীলা দাশগুপ্তা, অনিতা সেন, নমিতা সেন, ডলি চক্রবর্তী ও জ্যোৎস্না কর্মকার।

ইতিহাসের পাতা থেকে

গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে ছবি

॥ আঠার ॥

১৯৩৪ সালের ৭ই নভেম্বর বিপ্লব বার্ষিকী উপলক্ষে জনপ্রিয় যোদ্ধার নামানুসারে 'চাপায়েভ' মুক্তি-লাভ করে। পরিচালক জর্জি এবং সের্গেই ভাসিলিয়েভ তখন অখ্যাত, কিন্তু এই ছবির জন্য তাঁরা রাতারাতি খ্যাতি লাভ করেন। ইতিপূর্বে সোভিয়েট ইউনিয়নে আর কোন ছবি এত জনপ্রিয় হয় নি। এই ছবিতে বিস্ময়কর কোন নতুনত্ব যে ছিল তা নয়, কেবলমাত্র এই কথা উল্লেখযোগ্য যে, পরিচালকদের আগের দুটি ছবি জন-সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে নি। এই ছবির মাধ্যমে পরিচালকরা জনসাধারণের কাছে ভাসিলিয়েভ ব্রাদার্স নামে পরিচিত হয়ে পড়েন। তাঁরা গৃহযুদ্ধে সোভিয়েটের পক্ষে অংশ গ্রহণ করেছিলেন এবং নিজেদের অভিজ্ঞতা ছবিতে বর্ণনা করেছেন। আর একটি কথা, ছবিটি ডিমিট্রি ফুরমানভের লেখা জীবনীমূলক উপ-ন্যাসকে অবলম্বন করে নির্মিত, লেখক চাপায়েভের সঙ্গে হোয়াইট গার্ডদের বিরুদ্ধে লড়েছিলেন।

ভাসিলিয়েভ ব্রাদার্স এক নতুন রীতিতে গৃহযুদ্ধের গল্প বললেন, সেকালের পরিবেশ উপস্থিত করলেন এবং বিভিন্ন ধরণের চরিত্রের মাধ্যমে গৃহযুদ্ধের কারণ ও অর্থ জানালেন।

চাপায়েভের ভূমিকায় বরিস ধাবোচ্‌কিনের চরিত্ররূপায়ণ একেবারে প্রত্যক্ষ এবং নানাদিক থেকে অর্থপূর্ণ। একমাত্র জনবিক্ষোভের মধ্যেই ব্যক্তিত্ব এমনভাবে বিকশিত হতে পারে এবং এ ধরণের চরিত্র রূপায়ণে অভিনেতার বিশ্বময় জনপ্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ে।

যদিও ছবির বিষয়বস্তু ছিল পনের বছরের পুরনো, কিন্তু নানাদিক থেকে তাকে সমসাময়িক বলা যায়। সোভিয়েট রাশিয়া তখন জারতন্ত্রের অর্থ-নৈতিক পশ্চাদ্‌গামিতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছিল এবং এই সংগ্রাম-ক্ষেত্র ছিল গঠনমূলক কাজের ক্ষেত্রে, কল-কারখানা ও যৌথ খামারে। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে এল সমাজে নতুন নায়ক, মানুষের চরিত্রকে বদলে দিল। দর্শকরা পর্দায় দেখল তাদের জীবনের অভিজ্ঞতা, তাদের শত্রু ও মিত্রদের। বীরত্বপূর্ণ অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সাদৃশ্যকে দেখল।

ত্রিশ দশকেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিপদসঙ্কেত দেখা যাচ্ছিল। সুতরাং এটা স্বাভাবিক যে, সিনেমা সেই অতীতের দিকে মুখ ফেরাবে যখন নবজাত সোভিয়েট রিপাবলিক প্রতি-বিপ্লবী ও চোদ্দটি বিদেশী শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছিল।

ভাসিলিয়েভ ব্রাদার্স তাদের পর-বর্তী ছবি করল গৃহযুদ্ধের সময়, দূর পূর্বাঞ্চলে জাপানীদের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে। এই ছবির নাম "ভলোচায়ে-ভস্ক ডেজ" (১৯৩৭)। ভলোচায়েভস্ক একটা শহরের নাম, যে শহরে ভয়ঙ্কর রকমের যুদ্ধ হয়েছিল। এই ছবিতে একটা প্রতীক দৃশ্য রয়েছে ঃ একটা বরফের গোলক পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ছে, ক্রমে ক্রমে বড় হচ্ছে এবং সামনে যা পাচ্ছে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে। ছবির ঘটনা এভাবে বিকশিত হয়েছে। ছোট এক গেরিলা দল জাপানী সৈন্যবাহিনীকে উত্যক্ত করছিল, ক্রমে তা একটা বাহিনীতে পরিণত হল, শেষ পর্যন্ত হস্তক্ষেপ-কারী জাপানীদের সোভিয়েট দেশ থেকে হটিয়ে দিল।

ইয়েফিম ঝিগন-এর "উই আর ফ্রম ক্রনসটাং" তৃতীয় দশকের মাঝা-মাঝি সময়ের আর একটি জনপ্রিয় ছবি। সেভোলড ভিসনেভস্কির লেখা চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিটি তৈরি। ছবির কাহিনী—১৯১৯ সালের শরৎ-কালে হোয়াইট গার্ডদের বিরুদ্ধে পেট্রোগ্রাডের বিপ্লবী সংগ্রামের কথা। এ ছবিতেও 'ব্যাটলশিপ পটেমকিন'-এর মত কেন্দ্রবিন্দু ছিল সৈনিক ও নাবিকদের মিলিত চরিত্র। কিন্তু আইজেনস্টাইনের ছবি থেকে তফাৎ হল—এখানে বিস্তা-রিতভাবে চরিত্র এবং ব্যক্তিকে দেখান হয়েছে—নাবিক আর্তিয়ম বালাসেভ (গ্রিগরি বুশুয়েভ), কমিশার (ভাসিল জাইচিকভ) এবং জান স্ত্রাউডিন, রাইফেল রেজিমেন্টের কম্যান্ডার (ওলেগ ঝাকভ) প্রমুখ। ছবি শেষ হয়েছে আর্তিয়ম বালাসেভের ক্লোজ আপে, সে আবেগ-পূর্ণ কণ্ঠে বলছে ঃ আর কেউ পেট্রো-গ্রাডে ঢুকতে চাও কি? এই কথাটা এমনভাবে ধ্বনিত হল যাতে অতীতকে মনে করিয়ে দিল এবং ভবিষ্যতের জন্য হুঁসিয়ারী জানাল।

চাপায়েভের পরে গৃহযুদ্ধ সম্পর্কে সর্বাধিক তাৎপর্যপূর্ণ এবং অর্থপূর্ণ ছবি 'শ্চোর' (১৯৩৯)। ছবিটির নির্মাতা আলেকজান্দার ডবঝেঙ্কো।

বাণী সমাদ্দার
নজরুল একাডেমির সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় রাগপ্রধানে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন।

উক্রাইনে সোভিয়েট শাসন প্রতিষ্ঠার ব্যাপক পটভূমি, ১৯১৮ সালে জর্মান জবরদখলী ফৌজের বিরুদ্ধে এবং প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

ছবির বিষয়বস্তু সমগ্র উক্রাইনে শ্চোর বাহিনীর অভিযান। খণ্ড খণ্ড দ্রুত পরিবর্তিত চিত্রে সংগ্রামের বিচিত্র দৃশ্যগুলি দেখান হয়েছে। যেমন, পুত্র রেড আর্মিতে যোগ দিয়েছে বলে তার অপরাধে পিতা নির্যাতন সহ্য করছে; বিয়ের আসর থেকে কনে পালিয়ে গেল ভালবাসাহীন বিয়ে থেকে নিস্তার পাবার জন্য, বিয়ে করল এক বিপ্লবী সৈনিককে; শ্চোর-এর সহযোদ্ধা বোজেনকো কিয়েভের বুর্জোয়াদের মেসিনগানের কাজ দেখাচ্ছে এবং নম্রভাবে তাদের অর্থ সাহায্যের কথা বলছে বিপ্লবী বাহিনী রক্ষার জন্য; শ্চোর স্বপ্ন দেখছে—আগামীদিনের যুদ্ধে যখন সমগ্র বিশ্ব শোষণমুক্ত হবে— জগৎ হবে সত্যিকার শান্তির নীড়, পুষ্প উদ্যানের মত সুন্দর। যুদ্ধদৃশ্যের মত এই দৃশ্যগুলিতে চমৎকার মানুষ, অগ্নিময় রোমান্টিক শ্চোর, গভীরভাবে নিষ্ঠাসম্পন্ন বোজেনকো, প্রাক্তন ছুতার-মিস্ত্রী যে পরবর্তীকালে বিখ্যাত তারাশ্চাস্ক বাহিনীর কম্যান্ডার হয়েছিল এবং কল্পনাপ্রবণ সৈনিক পেট্রোচিঝকে দেখান হয়েছে। এরা ব্যক্তি হিসাবে স্বতন্ত্র—কিন্তু সকলে এসেছে সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে। 'শ্চোর' ছবিতে সোভিয়েট স্বদেশভূমির মুক্তি-সংগ্রামকে এক বীরত্বপূর্ণ রণকৌশল হিসাবে দেখান হয়েছে সমগ্র মানব-সমাজের সুখময় ভবিষ্যতের জন্য।

—ক-স-প

শনির দশা

ময়দানী ফুটবলের বরাতে এখন বোধহয় শনির দশা। তবে এই শনির দশা চলেছে গত ক' বছর ধরেই। গত ক' বছর ধরে ফুটবল খেলাকে কেন্দ্র করে কলকাতা ময়দানে যে সব ঘটনা ঘটছে তার তুলনা মেলা ভার। ময়দানী ফুটবলের সেই অতি পুরোন জটটা যেন কিছুতেই খুলছে না। তাই একটার পর একটা গোলমাল লেগেই আছে। আর সেই গোলমালগুলো একের পর এক মিলে-মিশে এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করেছে যার থেকে নিস্তার পাওয়ার জন্যে 'ত্রাহি মধুসূদন' ডাক ছাড়তে হচ্ছে আই· এফ· এ কর্তৃপক্ষকে। তবে আমাদের মনে হয় যে, এই সমস্ত গোলমালের পেছনে আই· এফ· এ'র কর্তৃপক্ষের দুর্বল পরিচালনা—এক কথায় বলা যেতে পারে যে, তাঁদের দুর্বলতারই সুযোগ নিচ্ছে কতকগুলো ক্লাব। আই· এফ· এ'র উচিত আরো বেশি কঠোর হওয়া, আরো বেশি সংযত হওয়া। সেই সংগে ছোট-বড় সব ক্লাবের ওপর নিরপেক্ষ মনোভাবের পরিচয় তাঁদের কাছ থেকে সকলেই আশা করেন। কিন্তু কোনদিনও কি আই· এফ· এ'র কাছ থেকে প্রত্যাশিত নিরপেক্ষতার এবং কঠোরতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তরে সকলেই বোধহয় একগলায় বলবেন, না পাওয়া যায় নি—গেলে আর যাই হোক বাংলাদেশের ফুটবল খেলা নিয়ে এই ধরণের ছেলেমানুষী করা চলতো না, অন্যান্য প্রদেশের ফুটবল-রসিকদের চোখে বাংলাদেশের সুনাম এইভাবে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হতো না কিছুতেই। ভারতের শ্রেষ্ঠ বাংলার ফুটবল খেলা নিয়ে আজ সকলে হাসাহাসি করে—এর থেকে লজ্জা, এর থেকে দুঃখ আর পরিতাপের বিষয় আমাদের আর কি হতে পারে?

কিন্তু এই লোক হাসানি বন্ধ করার ভার যাঁদের ওপর তাঁরা আছেন পরম নিশ্চিন্তে। বড় ক্লাবগুলোর মুখের ওপর সাহস করে কিছু বলার ক্ষমতা নেই তাঁদের। আর তারই সুযোগ পুরোপুরি নিয়ে বড় ক্লাবগুলো পায়ের ওপর পা তুলে যা খুশি তাই করে যাচ্ছেন। কারণ তাঁরা বেশ ভালোভাবেই জানেন যে, তাঁদের মুখের ওপর কিছু বলার বা কিছু করার সাহস আই· এফ· এ'র নেই। তাই ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানের সংগে চ্যারিটি ম্যাচ খেলবে না বলে গোঁ ধরে, তারপর খেলা না হওয়ার কথা জানা সত্ত্বেও মাঠে টিম নামায়। একটার পর একটা খেলায় গোলমাল করার পর ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে খেলার সময় লতিফকে মাঠ থেকে রেফারী বেরিয়ে যাবার নির্দেশ দিলে, রেফারীর নির্দেশে লতিফ কর্ণপাত করলেন না—ফলে রেফারী খেলা বন্ধ করে দেন। আর তারপরই মহামেডান স্পোর্টিং এই বলে শাসায় যে, কলকাতার রেফারীদের পরিচালনায় তারা খেলবে না। কোন্ সাহসে এবং কোন্ যুক্তিতে মহামেডান স্পোর্টিং এই ধরণের কথা বলতে সাহস করে জানি না। এবং তার জন্যে কলকাতার রেফারীস অ্যাসোসিয়েশন এবং আই· এফ· এ কর্তৃপক্ষ কোনরকম ব্যবস্থা অবলম্বন করতে যাচ্ছেন কি না জানি নে। শুধু তাই নয়—মহামেডান স্পোর্টিং-এর এই অন্যায় আবদারকে আবার অভিনন্দন জানিয়েছে রাজস্থান। সত্যি কি বিচিত্র এই পরিস্থিতি। এঁরা কি সকলে মিলে কলকাতার ফুটবল লীগ কিছুতেই শেষ করতে দেবেন না? কিন্তু কেন—কিসের জন্যে এইভাবে বছরের পর বছর কলকাতার ফুটবল খেলার গোড়া কেটে আগায় জল দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে? এর কি কোন প্রতিকার নেই? নাকি সত্যি সত্যি কলকাতার ফুটবলের বরাতে এখন চলেছে শনির দশা! কিন্তু আর কতোকাল. আর কতো বছর চলবে এই অবস্থা?

—শান্তিপ্রিয়।

ক্রিকেটের খবর

ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ হেরে গিয়েছিল বিশ্রীভাবে। দ্বিতীয় টেস্টে তারা যেন নিজেদের কিছুটা খুঁজে পেয়েছে। দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে তাদের খেলায় পাওয়া গিয়েছিল প্রাণের সাড়া। জেতার জন্যে তারা আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এক আকর্ষণীয় পরিবেশের মধ্যে শেষ হয়ে গেলো দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ। সত্যি কথা বলতে কি—সময় থাকলে দ্বিতীয় টেস্টে যে কোন দলই জিততে পারতো।

কারণ খেলা যখন শেষ হয়ে গেলো তখন জেতার জন্যে ইংলণ্ডের প্রয়োজন ছিল মাত্র ৩৭ রান। তবে হাতে তাদের ছিল মাত্র ৩টি উইকেট। ইলিংওয়ার্থ আর নট তখন ব্যাট করছিলেন। তাই শেষ পর্যন্ত যে কি হতো তা বলা যায় না। সময় থাকলে ইংলণ্ড হয়তো প্রয়োজনীয় ৩৭ রান তুলে ফেলতে পারতো, আবার ওয়েস্ট ইণ্ডিজ হয়তো ৩৭ রানের মধ্যেই ইংলণ্ডের বাকী ৩টি উইকেট ফেলে দিতে পারতো।

যাই হোক দ্বিতীয় টেস্ট ড্র হওয়ায় ইংলণ্ড প্রথম টেস্টে জেতার সূত্রে এখনো এগিয়ে আছে। রাবারের ভাগ্য তাই এখন নির্ভর করছে তৃতীয় ও শেষ টেস্ট ম্যাচের ওপর।

যাই হোক টসে জিতে দ্বিতীয় টেস্টে প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। ইনিংসের গোড়াপত্তন ভালো হওয়ায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অন্য ব্যাটসম্যানরাও মোটামুটিভাবে ভালোই খেললেন। তবে আসল খেলার মতো খেলেছেন ডেভিস। তাঁর জীবনের দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে তিনি করেছেন সেঞ্চুরীলাভের কৃতিত্ব।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ প্রথম ইনিংসে করে ৩৮০ রান। এর মধ্যে ডেভিস একাই করলেন ১০৩ রান। ফ্রেডারিক ৬৩ আর কামাচো করলেন ৬৭ রান। ইংলণ্ডের স্নো ১১২ রান দিয়ে ৬টা আর ব্রাউন ৯৯ রানের বিনিময়ে লাভ করলেন ৩টে উইকেট।

প্রথমটায় বিপর্যয়ের মুখোমুখি হলেও ইংলণ্ডও ছেড়ে কথা কইলো না। ইংলণ্ডের তরুণ ব্যাটসম্যান হ্যাম্পশায়ার তাঁর জীবনের প্রথম টেস্টেই করলেন শত রান। আর ইংলণ্ডের অধিনায়ক ইলিংওয়ার্থও জীবনে প্রথম সেঞ্চুরী করার কৃতিত্ব অর্জন করলেন এই টেস্টে।

তবু ওয়েস্ট ইণ্ডিজের রান সংখ্যা ছাড়িয়ে যেতে পারলো না ইংলণ্ড। ৩৪৪ রানের মাথায় শেষ হয়ে গেলো তাদের প্রথম ইনিংস। ইলিংওয়ার্থ করলেন ১১৩, হ্যাম্পশায়ার ১০৩ আর নট করলেন ৫৩ রান।

দ্বিতীয় ইনিংসে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ফ্রেডারিক ৬০, কামাচো ৪৫, লয়েড ৭০ আর সোবার্স ৫০ রান করায় ৯ উইকেটে ২৯৫ রান উঠলো এবং ইংলণ্ডকে জেতার সুযোগ দেবার জন্যে সোবার্স তখন ইনিংস সমাপ্তি ঘোষণা করলেন।

ইংলণ্ডকে জিততে হলে তখন ৫ ঘণ্টায় অর্থাৎ ৩০০ মিনিটে করতে হবে ৩৩২ রান। সোবার্সের সেই চ্যালেঞ্জ ইলিংওয়ার্থ গ্রহণ করলেন। ফলে দ্বিতীয় টেস্টের খেলা জমে উঠলো খুব। দু দলই জয়লাভের জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলো। রান উঠতে লাগলো তাড়াতাড়ি, উইকেটও পড়তে লাগলো।

বয়কট সেঞ্চুরী করে করলেন ১০৬ রান, পারফিট ৩৯, ডলিভেরা ১৮, ফিল শার্প ৮৬ রান করলেন। ৫ রান করে হ্যাম্পশায়ার রান আউট হলেন। নট আউট হয়ে গেলেন ১১ রান করে। ইলিংওয়ার্থ ৯ আর নাইট ১ রান করে নট আউট থাকলেন।

খেলার সময়ও শেষ হয়ে গেলো। ইংলণ্ড তখন করেছে ৭ উইকেটে ২৯৫ রান। জয়লাভের জন্যে তখনো তাদের দরকার ছিল ৩৭ রানের... হাতে ছিল

॥ বয়কট ॥
দ্বিতীয় টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে খুব তাড়াতাড়ি সেঞ্চুরী করে শেষ দিনের খেলা আকর্ষণীয় করে তুলেছিলেন।

৩টি উইকেট। ওয়েস্ট ইণ্ডিজও চেষ্টা করেছিল বাকী তিনটে উইকেট তাড়াতাড়ি ফেলে দিতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হলো না। দ্বিতীয় টেস্ট শেষ হয়ে গেলো অমীমাংসিতভাবে।

ইংলণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচে সেঞ্চুরী করার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তরুণ খেলোয়াড় ডেভিস। খেলাটি ছিল ডেভিসের জীবনের দ্বিতীয় ম্যাচ। ছবিতে সুন্দর ভঙ্গিতে ডেভিসকে একটা দর্শনীয় মার মারতে দেখা যাচ্ছে।

মরশুমী আবিষ্কার

নীলিমেশ রায়চৌধুরী

কলকাতায় ফুটবল গড়িয়ে চলেছে ঢিমেতালে। কোন দলের খেলায় মধ্যে এখনও কোন বাঁধন লক্ষ্য করলাম না। দিনের পর দিন মাঠে বল নিয়ে কত কসরৎই না করেছে বাংলা দলগুলি—আজ সেই বাংলার ফুটবলের হাল দেখলে দুঃখ হয় বৈকি! অনিশ্চয়তার কালো মেঘ বাংলার ফুটবল আঙিনাকে ঢেকে রেখেছে। গত দু' বছর ধরে লীগ-শীল্ড নিয়ে টানা-পোড়েন চলছে। বাংলাদেশের অতি কর্ম-তৎপর (!) কর্মকর্তাদের মহান(?) দয়ায় লক্ষ্যে পৌঁছতে পারছে না বাংলার ফুটবল। এককালের ভারতীয় ফুটবল মক্কা আজ এক শ্মশানে পরিণত হতে চলেছে। হবে না কেন? ঘরের ছেলেদের দিকে চোখ না দিয়ে—বাইরের চাকচিক্যের দিকে নজর রাখতে গিয়েই বাংলার ফুট-বলের আজ গেলো-গেলো রব উঠেছে। লক্ষ টাকার দলগুলি নিজেদের ঐতিহ্য ধরে রাখতে হাজার হাজার টাকা খরচ করে ভিন্ রাজ্যের দামী ছেলেদের ধরে এনে ছেড়ে দিয়েছেন বাংলার মাঠে—লীগ-শীল্ড জয়ের ঐকান্তিক লালসায়। তাই গেঁয়ো যোগীর ভাগ্যে ভিক্ষে জুটছে না। ঘরের ছেলেরা টাচ্ লাইনের বাইরে বসে তাই অসীম ধৈর্যের পরীক্ষা দিয়ে চলেছে।

হল—অবশেষে হল—আন্তঃরাজ্য ছাড়-

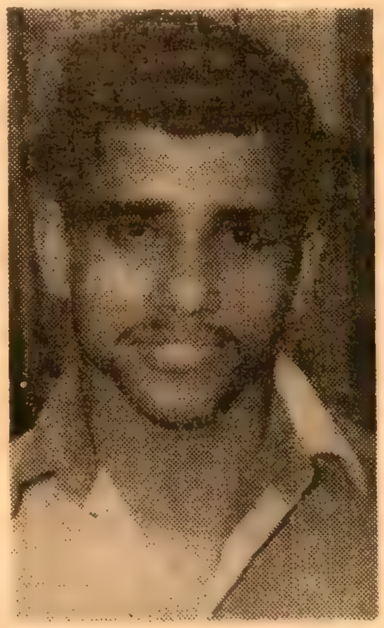

॥ সুধীর কর্মকার ॥

পত্রের নতুন আইনে বেকায়দায় পড়লেন লক্ষ টাকার দলগুলি। অবশেষে নিতান্ত বাধ্য হয়েই চোখ ফেরাতে হল ঘরের দিকে। বলি লোভ যাবে কোথায়? ঘরের দিকে চোখ এল ঠিকই কিন্তু তা যে ক'জনকে নিয়ে বাংলা ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখতো তাদের দিকেই—ফুটতে যাওয়া ফুলটিকে পুরোপুরি ফোটার আগ-মুহূর্তে ছিঁড়ে নেওয়ার মত।

বাংলার চার উদীয়মান—সুভাষ-সুকল্যাণ-দেবী আর সুধীর। খেলোয়াড় ঘাটতির যুগে গত মরশুম থেকেই মোটা-মুটি সাফল্যের নজির দেখিয়ে ক্রীড়ানু-রাগীদের আলোচনার বস্তু হয়ে উঠেছেন। প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টায় তাই এবার ও'রা পা বাড়িয়েছেন দুই বড়ো দলে। দেবী-

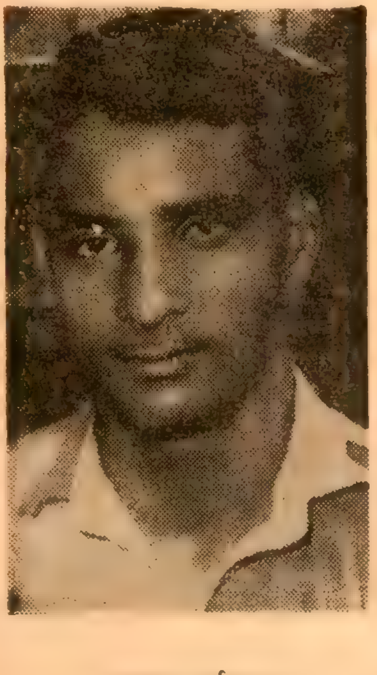

॥ সুভাষ ভৌমিক ॥

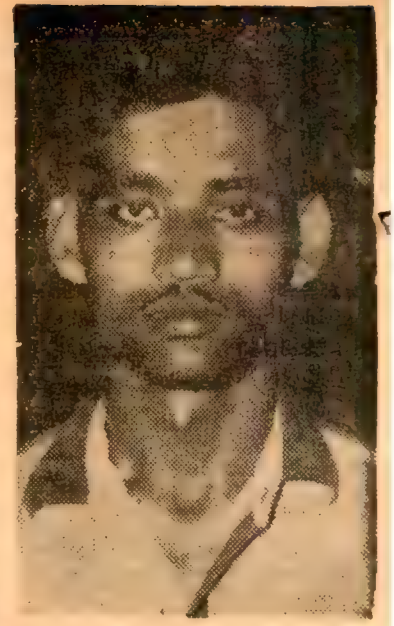

॥ দেবী দত্ত ॥

সুকল্যাণ মোহনবাগানে আর সুধীর-সুভাষ ইস্টবেঙ্গলে।

এ মরশুমে দু'দলের আশা-ভরসা ছিল এই চারজনই। ও'দের ঘিরে আমা-দেরও প্রত্যাশা ছিল অনেক। সেই প্রত্যাশা পূরণে ও'রা কতটা কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছিলেন তা বিশ্লেষণ করে দেখা যাক।

এই মুহূর্তে ভারতে উপযুক্ত ফরোয়ার্ড নেই—একথা অনস্বীকার্য। চুনী-বলরামের পর আদর্শ ফরোয়ার্ড বলতে যা বোঝায় তার দেখা ভারতে মেলে নি। মাঝখানে যেসব খেলোয়াড়েরা জোড়া-তালি দিতে ভারতীয় ফুটবলের হাল ধরে-ছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউ-ই তেমন আহা-মরি নয় তাই তাঁদের খেলোয়াড়ী আয়ুও ছিল স্বল্প। সেক্ষেত্রে যুব-ভারত, যুব-বাংলা এবং বাংলা দলে এই তরুণদের দেখে কিছুটা যে আশার আলো দেখি নি তা নয়। ফরোয়ার্ডের মূলধন যে সট্ নিঃসন্দেহে সুকল্যাণ-সুভাষ যে-কোন মুহূর্তে সেই চটকদার সট্ মারতে পারেন। সুকল্যাণের দু' পায়ের দুরন্ত সট্ই ও'র বাড়তি সম্পদ। উত্তরবঙ্গে সদ্য-বন্যাকবলিত এলাকা জলপাইগুড়ির ছেলে সুকল্যাণ কলকাতা দর্শকদের প্রথম নজর কেড়েছেন এই সটের দৌলতেই। ভারতীয় ফুটবলে ফরোয়ার্ডের অভাব যে কতটা তার জ্বলন্ত-জ্বলে দৃষ্টান্ত হল এই সুকল্যাণ। জলপাইগুড়ি থেকে আসার প্রায় সাথে সাথেই মারডেকা ফুটবলে ভারতীয় নির্বাচনী ক্যাম্পে ডাক পেলেন। মূল দলে সুযোগ হল না অভিজ্ঞতার অভাবে। সেই সুকল্যাণের সাথে আজকের সুকল্যাণের তফাৎ আছে। অভিজ্ঞতার

পরিণত হওয়া উচিত ছিল কিন্তু কার্যত তা হয় নি। সুকল্যাণ সার্থক 'স্কোরার' সন্দেহ নেই, কিন্তু 'স্ট্রাইকার' নন। সট্ মারার মত জায়গায় বল জোগালে গোলে মারতে পারেন ঠিক, কিন্তু গোল করার মত বল তৈরি করে নিতে পারেন না। প্রশিক্ষণের যুগে বিজ্ঞানভিত্তিক ফুটবলে শুধু 'স্কোরার' হলেই ফরোয়ার্ডের দায়িত্ব শেষ হয়ে গেল, এটা ভেবে থাকলে সুকল্যাণ ভুল করবেন। বেশ কিছুদিন আগে প্রখ্যাত খেলোয়াড় উমাপতিকুমার যে কথাটি বলেছিলেন—"হেডের বিকল্প নেই" সেই হেড নিতেও সুকল্যাণের দেখেছি কেমন অনীহা। ফরোয়ার্ডের [illegible] 'হেড' হল একটা বিশেষ অস্ত্র—এটা জানা নেই যে সার্থক ফরোয়ার্ড হবে কি করে? শুনেছি অমল দত্ত নামী কোচ। তাঁর হাতে এসে সুকল্যাণ পরিণত হবেন সেই আশাই ছিল। কিন্তু এবারের সুকল্যাণকে দেখে মন ভরে নি—সেকথা অসংকোচে বলতে পারি।

সুভাষও ঠিক তাই। আমাদের আশার প্রতি তো প্রথমপর্বে সুভাষ কণামাত্র সুবিচার করেন নি। উত্তরপর্বে নিজেকে মোটামুটি তৈরি করে খানিকটা নড়ে-চড়ে খেলার প্রয়াস পেয়েছেন। গত মরশুমে সুভাষকে 'স্ট্রাইকার' হিসেবেই জানতাম কিন্তু এবার অযথা সুভাষকে পায়ে বল রাখতে দেখে আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। সময় থাকতে বল যদি সতীর্থকে ঠেলে দেওয়া না যায় তবে সে আক্রমণের মূল্য থাকে না। একা খেলার দিন অতিক্রান্ত। নিখাঁজ আক্রমণ গড়ার মূলেই হল পারস্পরিক বোঝাপড়া। আক্রমণ গড়তে হলে উপযুক্ত বুদ্ধি ধরে রাখার দিন আজ। সুভাষ পরিশ্রমী সন্দেহ নেই, কিন্তু সেই পরিশ্রমের পেছনে আরও পরিণত বুদ্ধির দরকার। অযথা ছোটাছুটি করে নিজেকে দর্শনধারী হিসেবে দাঁড় করানো যায়, কিন্তু তাতে ভাল খেলোয়াড় হওয়া যায় না।

দেবী দত্ত এঁদের থেকে খানিকটা ব্যতিক্রম। মাথা খাটিয়ে খেলার প্রচেষ্টা আছে। সতীর্থকে বল জোগানোর পদ্ধতি জানা—নিজে গোল করার ক্ষমতাও রাখেন। তবে সঠিক সট নেওয়ায় দেবী খুব একটা দক্ষ নন। উঠে-নেমে খেলার চেষ্টা দেবী করেন—তবে তার জন্য যে-পরিমাণ দম দরকার তা দেবী ধরে রাখতে পারেন না। অবশ্য এর জন্য দেবী ততটা দায়ী নন। কারণ বেশি বয়সে ফুটবল খেলা ধরায় দমের ঘাটতি ওঁর—এই ঘাটতি পুষিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব অমল দত্তের।

এ মরশুমের সেরা আবিষ্কার নিঃসন্দেহে ইস্টবেঙ্গলের রাইট হাফ্ সুধীর কর্মকার। বয়সে তরুণ—উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রতিশ্রুতি এই সুধীর। সুকল্যাণ-সুভাষ বড়ো দলে এসে যে স্নায়ুচাপে ভুগছেন—পরিচ্ছন্নভাবে খেলার পথে সংকোচ হচ্ছে, সুধীরের কিন্তু তা নেই। একেবারে স্বাভাবিক খেলা। রিষড়ার ছেলে, খর্বাকৃতি সুধীর ইস্টবেঙ্গলের শক্ত ভিতের সেরা ইঁট। রিসিভিং, ট্যাকলিং দুই-ই দর্শনীয়। অহেতুক দাপা-দাপি ঝাঁপাঝাঁপি নেই—নেই আস্ফালন। মাথা ঠাণ্ডা রেখে অভিজ্ঞ খেলোয়াড়ের মত রক্ষণভাগের সাথে আক্রমণভাগকে সাহায্য করতে সুধীর যোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন। তিন ব্যাকের পার্শ্ব হাফের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থেকে সুধীর ষষ্ঠ ফরোয়ার্ডের ভূমিকা নিতে কসুর করেন না।

তবে হ্যাঁ—দোষ সুধীরের আছে। তা হল—গতি-মন্থরতা। মন্থর হলে উপরে উঠে নিচে নেমে আসার পথে যে সময়টা বেশি নিয়ে নেবেন তার ফলে মাঝমাঠে ফাঁকের সৃষ্টি হবে। সেই ফাঁকেই চলবে বিপক্ষ খেলোয়াড়দের অবাধ আনাগোনা—দলের বিপদের পক্ষে সেটাই যথেষ্ট। আজকাল সুধীরের বাঁ দিকে সরে খেলার ঝোঁক বেশি—এতে নিজ দলের আক্রমণভাগের খেলোয়াড়দের সময় সময় বিপদে পড়তে হয়—এই একদিকে চেপে খেলার ঝোঁকটা সুধীরকে শোধরাতে হবে।

নেই, সেই প্রশ্ন যখন অনেক কপাল চাপড়াই, ঠিক সেই মুহূর্তে সুধীর-সুকল্যাণ-সুভাষ ও দেবীর মত ছেলেরাই আমাদের ভরসা। এঁদের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়ে খাঁটি খেলোয়াড় হিসেবে তৈরি করাটা জাতীয় কর্তব্য। ভিন্ রাজ্যের ছেলে এনে হয়তো 'ট্রফি' জয় করা যায় কিন্তু জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা যায় না—সে খেলায় মন ভরে না। তাই বলছি লক্ষ টাকার দলগুলি ঘরের ছেলেদের তৈরি করার দিকে নজর দিন—তাতে যদি ট্রফি না জোটে ক্ষতি নেই, তবুও তাঁরা গঠনমূলক কাজে হাত বাড়িয়ে বাংলার ক্রীড়ানুরাগীদের কাছে পূজনীয় হয়ে থাকতে পারবেন—প্রত্যাশা, সেই শুভদিন সমাগত হোক!

আর সুধীর-সুকল্যাণ-সুভাষ ও দেবীর মত খেলোয়াড়দের কাছে অনুরোধ—আমরা বড়ো অল্পে সন্তুষ্ট হয়ে আকাশ-ছোঁয়া বীরপুজো করে থাকি। তাতেই তোমরা ভেবো না তোমাদের ইয়া-নামডাক-ওয়ালা খেলোয়াড় ভেবে কলার উঁচিয়ে চললেই বড়ো খেলোয়াড় হওয়া যায় না—এই সহজ সত্য কথাটা মনে রেখো।

বাংলার তরুণদের জয় হোক!!

গল্প হলেও সত্যি

ক্রিকেটে 'অ্যাসেস' শব্দটির উৎপত্তি কিভাবে হয়? 'অ্যাসেস' বলতে ছাই বোঝায়, কিন্তু অ্যাসেস কি সত্যিই খানিকটা ছাই?

ইংল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে টেস্ট ক্রিকেট খেলায় বিজয়ী দল 'অ্যাসেস' জিতেছে বলা হয়, এই অ্যাসেস বস্তুটির পেছনে একটি মজার ঘটনা জড়িয়ে আছে। কত দুঃখ ও কত ব্যথা এর পেছনে জড়িত আছে, তা অনুমান করা কষ্টসাধ্য ব্যাপার নয়। ১৯৫৮-৫৯ সালে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড ভারতীয় ক্রিকেট টিমের বিরুদ্ধে যেরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন, ১৮৮২ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ইংলন্ডের ব্যাটস্‌ম্যানদের শোচনীয় ব্যর্থতার পর ইংলন্ডের বিখ্যাত পত্রিকা স্পোর্টিং টাইমস সেইরূপ বিলাপ করেই লিখেছিল যে, ১৮৮২ সালের ২৯শে আগস্ট ওভাল মাঠে ইংলিশ ক্রিকেটের মৃত্যু হয়েছে, সৎকারের পর ছাই অস্ট্রেলিয়া নিয়ে যাওয়া হবে। এর পর থেকেই 'অ্যাসেস' কথাটা চলে আসছে। সেই অ্যাসেস দখলে রাখার সম্মান নিয়ে ইংলন্ড ও অস্ট্রেলিয়া টেস্ট ক্রিকেটের আসরে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয় আজো।

—[illegible] গুহ
সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি

[১১২ পৃষ্ঠার পর]

উত্তর: আমি তো ঠিক বুঝতে পারছি না কেন পরিমল দে আপনার চিঠির উত্তর দিলেন না। উত্তর দেওয়া নিশ্চয়ই উচিত ছিলো।

প্রশান্ত বসু (কল্যাণী ভবন, ইয়ং রোড, আসানসোল)

প্রশ্ন: পর পর দুটি টেস্ট ম্যাচের উভয় ইনিংসে কেউ সেঞ্চুরী করেছেন কি?

উত্তর: না। আপনার অন্য প্রশ্ন দুটির উত্তরও দেখেছেন নিশ্চয়ই।

প্রণব ও পল্লব চক্রবর্তী (বেগুনবাড়ি, জলপাইগুড়ি)

প্রশ্ন: ভারতীয় ফুটবল খেলোয়াড়দের মধ্যে কে কে মারডেকায় হ্যাটট্রিক করেছেন? কোন্ কোন্ সালে?

উত্তর: আমি ঠিক জানি না। কেউ জানলে যদি জানান তাহলে জানিয়ে দেবো।

প্রশ্ন উত্তর

উত্তম সরকার (খুপগুড়ি জলপাই-গুড়ি)

প্রশ্ন : এশিয়ান ফুটবল দলের গোলরক্ষক কে এবং তিনি কতো সাল থেকে খেলছেন?

উত্তর : এশিয়ান ফুটবল দল বলে কোন দল নেই। তবে এশিয়ান অল স্টার বলে একটা দল গঠন করা হয় বটে। বছরের সেরা গোলরক্ষক সে দলে স্থান পান।

তপনকুমার ঘোষ (বাড়াই, হুগলী)

প্রশ্ন : আই· এফ· এ শীল্ডের খেলা কোন্ সালে চালু হয়েছে? সেই সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত কোন কোন দল বিজয়ী হয়েছে?

উত্তর : ১৮৯৩ সাল থেকে আই· এফ· এ শীল্ডের খেলা চালু হয়। সেবার রয়াল আইরিশ রাইফেলস দল ডাব্লিউ· ডি· আর· এ দলকে হারিয়ে সর্বপ্রথম আই· এফ· এ শীল্ড জয়ের কৃতিত্ব অর্জন করে।

অতো জায়গা কোথায় পাবো?

অর্দ্ধেন্দু ব্যানার্জী, বাসুদেব ও নারায়ণ মুখার্জী (কলাবাড়ি চা-বাগান,) জলপাইগুড়ি)

প্রশ্ন : বর্তমানে কলকাতার সর্বাপেক্ষা ভালো ফুটবল দল কোনটি?

উত্তর : আপনাদের সমর্থিত দলটিই...।

কবি দত্ত (নামবাড়ি রেলওয়ে কলোনী, গৌহাটি)

উত্তর : প্রেসের ওপর আপনি 'গল্প হলেও সত্যি' বিভাগের জন্যে যে লেখাটা পাঠিয়েছেন, ঐ ধরণের একটা লেখা আগে একবার প্রকাশ করা হয়েছে। আপনি বরং আর একটা লেখা পাঠান।

ভবেন্দ্রনাথ দত্ত (মাইথন, এরিয়া—৫)

উত্তর : হাতে বল লাগলে সব সময়ই অফ সাইড হয় না, ইচ্ছাকৃত-অনিচ্ছাকৃতর প্রশ্ন আছে। আর আপনি যে বিষয়ে লিখেছেন ওটি পুরোপুরি নির্ভর করে রেফারীর ওপর। রেফারী ইচ্ছে করলে ও-ক্ষেত্রে পেনাল্টির নির্দেশ দিতে পারেন।

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত (এরিয়া—৫ মাইথন)

উত্তর : মাত্র কয়েক সংখ্যা আগে পতৌদির ব্যাটিং এ্যাভারেজ ছাপা হয়েছে। একটু দেখে নেবেন।

অরিন্দম দাশগুপ্ত (ডাঙ্গালপাড়া, সিউড়ী)

প্রশ্ন : একজন খেলোয়াড় পেনাল্টি কিক করলো। গোলরক্ষক বল আটকালে বলটা ফিরে এলো সেই খেলোয়াড়ের কাছে। এবং তিনি পুনরায় শট করে গোলরক্ষককে পরাজিত করলেন। গোল হবে কি?

উত্তর : না, গোল হবে না। বরং যে খেলোয়াড় পেনাল্টি কিক করার পর পুনরায় বলটা নিজেই মেরেছেন রেফারী তাঁর বিরুদ্ধে ইন ডাইরেক্ট ফ্রি কিকের নির্দেশ দেবেন।

চন্দ্রশেখর ভড় [শংকর] (লোয়ার চিৎপুর রোড, কলকাতা—৭)

প্রশ্ন : এতো শক্তি নিয়েও ইস্টবেঙ্গল বি· এন· আর-এর সংগে ড্র করলো কেন? এতে ইস্টবেঙ্গলের লজ্জা হওয়া উচিত। আপনি কি বলেন?

উত্তর : কিছু না.....।

স্বপন চন্দ্র (জেমো, মুর্শিদাবাদ)

উত্তর : আমার মনে হয় বলাই দে আর থঙ্গরাজই এ মরশুমে কলকাতা ময়দানের শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক।

শুকদেব মুখোপাধ্যায় (মিরহাট, বৈদ্যপুর, বর্ধমান)

উত্তর : আপনি পত্রিকা সিন্ডিকেট, লিন্ডসে স্ট্রীট, কলকাতা, এই ঠিকানায় চিঠি লিখে 'ক্রিকেট' পত্রিকা আর 'ইন্ডিয়ান ক্রিকেট' বইটা সংগ্রহ করে নিতে পারেন।

গোপাল, প্রকাশ ও দীপালি (পঞ্চাননতলা)

উত্তর : মোহনবাগান কতোবার আই· এফ· এ শীল্ড, ডুরাণ্ড ও রোভার্স কাপ পেয়েছে তা তো আগেই জানানো হয়েছে। দেখেছেন নিশ্চয়ই?

অজয় বর্মণ (বংকফোরাম, পানবাজার, গৌহাটি)

প্রশ্ন : এবার ভারতীয় ফুটবল দল কি মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় খেলতে যাবে? গেলে তো এখন থেকেই অনুশীলন আরম্ভ করা উচিত? এই বিষয়ে আপনার ব্যক্তিগত মতামত জানতে চাই।

উত্তর : যাবে বলেই তো শুনেছি। অনুশীলন আরম্ভ হবার কথাও কদিন আগে শুনেছিলাম। তবে কবে হবে তা বোধ হয় কেউই বলতে পারবেন না। এ বিষয়ে আপনাদের মতামতই আমার ব্যক্তিগত মতামত।

আমাকে ব্যক্তিগতভাবে লেখা আপনার কোন চিঠি তো আমি পাই নি।

অমল চ্যাটার্জী (বি কে পাল এ্যাভেনিউ, কলকাতা-৫)

প্রশ্ন : আচ্ছা বলতে পারেন কলকাতা ফুটবলে এই যে বিশৃংখলা চলছে এর জন্যে দায়ী কি শুধুমাত্র দর্শকগণই? উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কি কোন দোষ-ত্রুটি নেই? দর্শক সাধারণ অপেক্ষা তাঁরাই এই বিশৃংখলার জন্যে অধিকাংশে দায়ী নয় কি?

উত্তর : নিশ্চয়ই! দর্শকদের আর শুধু একটা দোষ কোথায়?

নীলকমল সরকার (মুনসেফডাঙ্গা, পুরুলিয়া)

প্রশ্ন : জয়সীমা টেস্ট খেলায় কতোগুলি সেঞ্চুরী করেছেন। প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগে সব চেয়ে বেশি গোল করেছেন কে?

উত্তর : টেস্ট খেলায় জয়সীমা এখনো পর্যন্ত ৩টি সেঞ্চুরী করেছেন। নায়ার প্রথম ডিভিসন ফুটবল লীগে সব চেয়ে বেশি গোল করেছেন।

মিতান মুখোপাধ্যায় (আর বি ঘোষ রোড, ঘোসবাগান, বর্ধমান)

প্রশ্ন : টেস্ট খেলায় এক ইনিংসে সর্বোচ্চ রান করেছেন কোন্ খেলোয়াড়? তিনি কোন্ দেশের খেলোয়াড় এবং কতো সালে কোন্ দলের বিরুদ্ধে ঐ রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন?

উত্তর : সোবার্স—পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ১৯৫৭-৫৮ সালে ঐ রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন। সেবার তিনি অপরাজিত থেকে করেছিলেন ৩৬৫ রান।

সুশান্ত গুহ, অমিতাভ ও অরুণাভ ব্যানার্জী (এল রোড, জামসেদপুর)

প্রশ্ন : পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক কে? তিনি কোন্ দেশের খেলোয়াড়?

উত্তর : এখনো রাশিয়ার ইয়াসিনকেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক বলা হয়।

ইংলণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলা শেষ হয়ে যাবার পর সোবার্সের ব্যাটিং এ্যাভারেজ জানানো হবে।

সুভাষরঞ্জন দত্ত (ট্রাংগুলার কলোনী, পাণ্ডু, আসাম)

[শেষাংশ ১১১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কালকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতী

বাঙ্গালোরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থী মনোনয়ন প্রশ্নে তীব্র মতান্তর

৭৪ বর্ষ ঃ ৪র্থ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১লা শ্রাবণ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ | OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA | 74 year, No. 4, 17th July, 1

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		১৯৫
আজকের মানুষ		১৯৬
সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন		
ভারতবর্ষ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	শংকরীপ্রসাদ বসু	১৯৭
বই-বাছাই—বাংলা বইয়ের মেলা	হরপ্রসাদ মিত্র	২০১
দীঘা সৈকতে (কবিতা)	কৃত্তি সোম	২০৪
রহস্য (কবিতা)	সুচেতা ভট্টাচার্য	২০৪
বঙ্গদর্শন		২০৫
ভারতদর্শন		২০৯
আন্তর্জাতিক		২১১
সপ্তাহের বোঝা	কৃত্তিবাস ওঝা	২১৩
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	অনন্ত সিংহ	২১৫
যুক্তফ্রন্ট সরকার সমীপেষু	শ্রীসর্বদর্শী	২২০
সাগর সংগমে (ধারাবাহিক উপন্যাস)	সুশীল জানা	২২১
গ্রন্থমেলা		২২৪
চাঁদে যাওয়ার ঝুঁকি	ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	২২৫
ব্লাড ব্যাঙ্কে (কবিতা)	মনোরমা সিংহরায়	২২৬
বিশ্ব কমিউনিস্ট সম্মেলন	তুষার চট্টোপাধ্যায়	২২৭
তিমির প্রান্ত ভুয়ার্স	অগ্নিবর্ণ	২৩০

যে কোন
গয়না
আর
আ স ল
গ্র হ র ত্ন
কেনার
দক্ষিণ কোলকাতায়
নামকরা প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সন অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ডসন্স অব লেট
এস. বি. সরকার

এ. সরকার
এণ্ড সন্স
৩৭।১এ রাসবিহারী এভিনিউ

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
গ্রামবাংলার কথা	— অসীম মুখোপাধ্যায়	২৩৩
মুলন পাণ্ডুলিপি (গল্প)	— বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়	২৩৬
চিতায় দিও মঠ	— বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৪১
পাঠকমন		২৪২
মহানায়ক লেনিন (নাটক)	— অশোক সেন	২৪৩
রূপজগৎ		২৪৭
খেলাধূলা	— শান্তিপ্রিয়	২৫২

পুরুষগণ !

মাত্র 5টি পয়সা আপনাদের, পরিবার সীমিত রাখার ক্ষমতা এনে দেয় ।

আগামী 28 বছরে ভারতের জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে যাবে, কিন্তু দেশের সম্পদ দ্বিগুণ হবে না।

তার অর্থ হল প্রত্যেককেই অল্পে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। অল্প বাসস্থান, অল্প শিক্ষা, অল্প বস্ত্র, অল্প খাদ্য।

এই ভয় দূর করা যায়। যদি জন্ম নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তাহলে পরিকল্পনা অনুযায়ী সন্তান জন্মগ্রহণ করে। আর এইখানেই আপনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

এখনই কার্য আরম্ভ করুন। পরিবার সীমিত রাখুন।

জন্ম প্রতিরোধ করার ক্ষমতা এখনে আপনার হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গেছে।

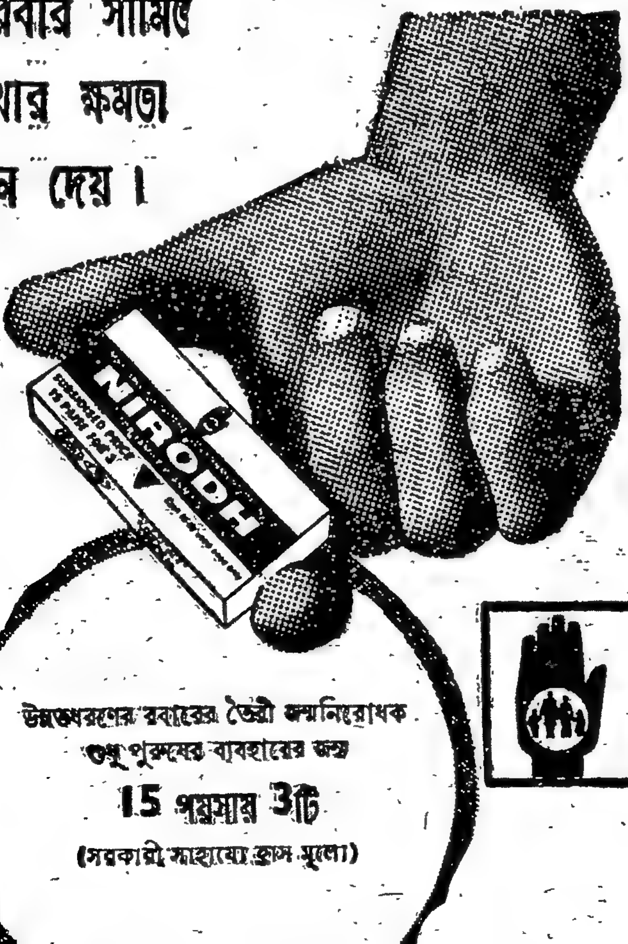

নিরোধ

পরিবার পরিকল্পনার জন্য

এখন প্রত্যেকটি জেলায় পাওয়া যাচ্ছে।

davp 69/126

৭৪ বর্ষ ঃ ৪র্থ সংখ্যা—মূল্য ঃ ৩০ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ১লা শ্রাবণ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 17th July, 1969

প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব ও প্রতিক্রিয়া

এবার বাঙ্গালোরে এ-আই-সি-সি'র অধিবেশন নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বৃহৎ ব্যাঙ্কগুলিকে রাষ্ট্রায়ত্ত, সরকারী সিকিউরিটিতে ব্যাঙ্কের লগ্নীর বিধিবদ্ধ সীমা বৃদ্ধি এবং একচেটিয়া ব্যবসা সংস্থাসমূহের ক্ষমতা খর্ব ও শ্রমিকদের শিল্পে মুনাফার অংশীদার করার বিষয় বিবেচনা করতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে অনুরোধ জানিয়েছেন। উপরন্তু তিনি অবিলম্বে কাঁচামাল আমদানী রাষ্ট্রায়ত্ত করা ও নিয়ন্ত্রিতভাবে কারবারের অশুভ নীতি খর্ব করারও প্রস্তাব করেছেন।

এবার অধিবেশনে অর্থনৈতিক নীতি সম্পর্কিত সুব্রহ্মনিয়ম ও সাদিক আলির খসড়া প্রস্তাব ছিল-সম্ভাব্য প্রধান বিবেচ্য বিষয়। কিন্তু সেই খসড়া প্রস্তাব অগ্রিম পাঠ করে প্রধানমন্ত্রী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, ঐ প্রস্তাব পেশ ও গৃহীত হলেও দেশের অর্থনৈতিক নীতি পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। তাই তিনি স্বয়ং যে প্রস্তাব পেশ করেছেন তা গভীর ভাবনা-চিন্তাপ্রসূত—একথা বলাই বাহুল্য। তাঁর প্রস্তাবে সায় দিয়েছেন শ্রীচ্যবন, শ্রীকামরাজ, শ্রীফকরুদ্দীন প্রমুখ প্রথম সারির নেতৃবৃন্দ এবং কংগ্রেস দলের মধ্যে প্রগতিবাদী বলে পরিচিত তরুণ তুর্কীরা প্রধানমন্ত্রীর বাস্তবোচিত প্রস্তাবে অবশ্যই তুষ্ট হবেন। তাছাড়া আগামী পঞ্চম সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের অবস্থা কী হতে পারে—তা বিবেচনা করে জনগণের সামনে কিছু প্রতিশ্রুতি, আশ্বাসবাণী ও আশা তুলে ধরতে না পারলে দলের অবস্থা যে অন্ধকারাচ্ছন্ন হবে, তা উচ্চকণ্ঠে না বললেও চলে।

আমরা আগেই বলেছি, এবার বাঙ্গালোরে এ-আই-সি-সি'র অধিবেশন গুরুত্বপূর্ণ একমাত্র প্রধানমন্ত্রীর সাহসিকতাপূর্ণ প্রস্তাবের জন্যই। অবশ্য ঐ ধরণের প্রস্তাব ঐতিহাসিক বিচারে নতুন বা অভিনব নয়। কারণ শ্রীনেহরুর জীবদ্দশায় ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের প্রস্তাব উঠেছিল—কিন্তু দক্ষিণপন্থী নেতাদের ঘোরতর বিরোধিতার জন্য তা গৃহীত হয় নি। কিন্তু যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল এবং যা আশাব্যঞ্জক বলে মনে হয়েছিল তা হচ্ছে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র-সম্মত পথে দেশকে চালনা করার প্রস্তাব। দুঃখের ব্যাপার, ভারতের বুকে গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয় নি এবং সমাজতন্ত্র রূপায়ণে বাধাগুলিও অপসারণ করার জন্য দেশের বৃহত্তম দল কংগ্রেস কোনো-রকম কার্যক্রম গ্রহণ করে নি।

ইতিমধ্যে হাওয়া বদলেছে। কংগ্রেসের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখাই এখন প্রধান সমস্যা। তাই একথা সুবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা স্বীকার করবেন যে, কংগ্রেসের বর্তমান অবস্থার পরিবর্তনের জন্য শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রস্তাবগুলি কার্যকর হওয়া উচিত। কিন্তু দেশটা জনসাধারণের হাতে চলে যাক—এ হেন ইচ্ছা বোধ হয় দক্ষিণপন্থী নেতাদের নয়। তাই বড় বড় ব্যাঙ্ক-গুলির রাষ্ট্রীয়করণ সংক্রান্ত প্রধান-মন্ত্রীর মূল্যবান মূল প্রস্তাবটির বিরোধিতা করেছেন উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীদেশাই। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে, এই তো মোটে মাস ছয় হোলো ব্যাঙ্কের ওপর সামাজিক নিয়ন্ত্রণ চালু হয়েছে—এখন তার ফলাফলটা না দেখে ব্যাঙ্কের রাষ্ট্রীয়করণ কোনো মতেই উচিত নয়। শ্রীপাতিল তো স্পষ্টই বলেছেন, বরং দল ভেঙে যাক, তবু ব্যাঙ্কের রাষ্ট্রীয়-করণ সহ্য করা হবে না। কংগ্রেসের 'তরুণ তুর্কী' গোষ্ঠীরা বহুকাল ধরে বলে আসছেন—ব্যাঙ্কগুলিকে সরকারী আওতায় আনা সম্ভব হলে কালো-বাজারীর পথ রুদ্ধ হবে এবং দেশকে সমাজতন্ত্রের দিকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। শেষ পর্যন্ত শ্রীচ্যবন কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর ঘষামাজা প্রস্তাব শ্রীদেশাই ও শ্রীপাতিলের মনঃপূত হলেও আসল কাজ শিকেয় তোলা থাকবে। এইভাবে প্রধান-মন্ত্রীর প্রস্তাব এদিক-ওদিক করার পর হয়তো শ্যাম এবং কুল দুই-ই রক্ষা করা হলো, কিন্তু তদ্দ্বারা কি জন-সাধারণ উপকৃত হবেন? কারণ দল হিসেবে কংগ্রেস দীর্ঘকাল জনসাধারণের কাছ থেকে সরে গেছে এবং সেখানে ধীরে ধীরে যাঁরা প্রবেশ করেছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই বহুজন সুখায়, বহু-জন হিতায় চ নয়। সুতরাং দলের হাত পরিষ্কার করে সর্বাগ্রে জনমনে আস্থা অর্জন করা দরকার। প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব কাট-ছাঁট করে গৃহীত হলেও তাতে সোনার ফসল ফলবে না—যদি না সোনার ফসলের বিপজ্জনক ব্যাপারীরা বিদায় গ্রহণ করে।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

কেউ বলছে ঘটনা, কারো মতে প্রেফ দুর্ঘটনা। ঘটনা হল কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব পোলারাইজেশন——পরিষ্কার দু'-ভাগে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে। দুর্ঘটনা হচ্ছে ভারতবর্ষে দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠা হতে চলেছে। বিষয়টা হল, ভারতের প্রেসিডেন্ট পদের জন্যে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ড শ্রীনীলম সঞ্জীব রেড্ডিকে মনোনয়ন দিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর প্রার্থী শ্রীজগজীবন রাম হেরে গিয়েছেন। ভোটের ফলাফল ছিল শ্রীরেড্ডির পক্ষে চার, শ্রীরামের পক্ষে দুই। সিন্ডিকেট গ্রুপের কাছে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার পরাজয়ের এ ঘটনাটা ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে হয়তো এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।

গণতান্ত্রিক দলের নেতা নির্বাচন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হবে—এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ভারতের মাটিতে যে গণতান্ত্রিক জাতীয় কংগ্রেস দলটি পুষ্ট, তার ক্ষেত্রে এ-ধরণের নির্বাচনের বিশেষ রেওয়াজ নেই। নির্বাচন অর্থে আমরা নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা বলছি অবশ্য। এখানে প্রচলিত রীতি দাঁড়িয়েছে, নেতা বা প্রার্থী মনোনয়নে নেতৃবৃন্দের কনসেন্সাস বা পূর্ণ মতৈক্য। কী রাষ্ট্রপতি মনোনয়নে, কী প্রধানমন্ত্রী বা কংগ্রেস দলের সভাপতি মনোনয়নে এই কনসেন্সাসই দেখে আসছি।

কিন্তু মতানৈক্য কি একেবারেই দেখা দেয় নি? তাও দিয়েছে। ১৯৫৭ সালে স্বয়ং নেহরুর প্রার্থী ডঃ রাধাকৃষ্ণন হেরেছিলেন মেজরিটি গ্রুপের প্রার্থী ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের কাছে। একই পদের জন্যে যখন দলের দু'জন প্রার্থী হয়েছেন তখন বাকি সকলকে দেখা গিয়েছে আদা-জল খেয়ে তাঁকে নিরস্ত করতে লেগে যেতে। শেষ পর্যন্ত 'কম্প্রমাইজ ক্যান্ডিডেট' বা আপোষ প্রার্থী হিসেবে লড়াইয়ের ময়দানে তৃতীয় ব্যক্তির আবির্ভাবও কি দেখি নি আমরা?

ডঃ জাকির হোসেনের মৃত্যুতে উপরাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরিই অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির পদ পেলেন। শ্রীমতী গান্ধী চেয়েছিলেন, শ্রীগিরিকেই রাষ্ট্রপতির পদে মনোনয়ন দেওয়া হোক। কিন্তু কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের নেতারা আপত্তি তুললেন; শ্রীগিরি বড়জোর একজন শ্রমিক-নেতা মাত্র, বৃহত্তর রাজনীতির সঙ্গে যেহেতু তিনি জড়িত ছিলেন না এবং যেহেতু তিনি বার্ধক্যে উপনীত সেইহেতু রাষ্ট্রপতির দায়িত্বভার তাঁকে দেওয়া যায় না। প্রধানমন্ত্রী তখন ঝুঁকেছিলেন কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীজগজীবন রামের

সঞ্জীব রেড্ডি

দিকে: তিনি হয়তো ভেবেছিলেন অনুন্নত তপশীল জাতির প্রতিনিধি হিসেবে শ্রীরাম অধিকাংশ নেতার সমর্থন লাভ করবেন। কিন্তু বাঙ্গালোরের কংগ্রেস অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর সে-হিসেব বানচাল হতে দেখা গেল। রাজনীতিতে যার অ-আ-ক-খ জ্ঞানও আছে সে-ও জানে যে এ পরাজয় জগজীবন রামের নয়, এ পরাজয় প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল দুহিতা শ্রীমতী গান্ধীর।

কংগ্রেস দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল বলছিলাম। কিন্তু দ্বিধাবিভক্তই বা বলি কেন, ত্রিধা-বিভক্ত বলাই ঠিক নয় কি? কারণ উপরাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরি ঘোষণা করেছেন যে, প্রেসিডেন্ট পদের জন্যে তিনিও অন্যতম প্রার্থী। কার প্রার্থী, কংগ্রেসের কোন্ গ্রুপের? শ্রীগিরি নিজেই সে প্রশ্নের জবাব দিয়ে বলেছেন, তিনি কোনো দলের প্রার্থী নন, নির্দলীয় প্রার্থী। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পাও কালবিলম্ব না করে ঘোষণা করেছেন যে, শ্রীগিরি কংগ্রেস প্রার্থী নন; কংগ্রেস দল তাঁর প্রার্থীপদ সমর্থন করে না।

তা না করুক, কিন্তু কংগ্রেস দলের ভেতরে ও বাইরে কি গিরির সমর্থকের অভাব হবে? বিরোধী দলগুলির একটা বড় অংশ যে সিন্ডিকেট প্রার্থীকে হারাবার তাগিদে গিরিকেই সমর্থন করবেন, সে বিষয়ে কি কোনো সন্দেহ আছে? আর শ্রীমতী গান্ধীও কি গোপনে শ্রীগিরিকে সমর্থন করে পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে চাইবেন না?

রাজনীতিতে শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি একজন প্রবীণ ব্যক্তি, যদিও কংগ্রেস দলের মধ্যে তিনি কখনই প্রথম সারিতে উন্নীত হতে পারেন নি। তিনি দীর্ঘ দশ বছর (১৯৩৬—৪৬) অন্ধ্রপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী ছিলেন। মাদ্রাজ বিধানসভার প্রথম সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৯৪৬ সালে। পরের বছরে গণপরিষদের সদস্য। মাদ্রাজ সরকারের অন্যতম মন্ত্রী ছিলেন ১৯৪৯—৫৬ সাল পর্যন্ত; পরে রাজ্যসভায় নির্বাচিত হন। অন্ধ্রপ্রদেশ গঠিত হলে শ্রীসঞ্জীব রেড্ডিই তার প্রথম মুখ্যমন্ত্রীর পদ লাভ করেন। চার বছর ১৯৫৬—৬০ এ পদে থাকার পর জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদে বৃত হন ১৯৬০ সনে। দু' বছরের জন্যে আবার অন্ধ্রের মুখ্যমন্ত্রীর পদ অলংকৃত করার পর কেন্দ্রীয় সরকারের ইস্পাত ও খনিদপ্তরের মন্ত্রী হন শ্রীরেড্ডি এবং পরে লাভ করেন পরিবহন ও অসামরিক বিমান পরিবহন দপ্তর। চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত হবার পর তাঁর লোকসভার স্পীকারের পদটি জুটে গিয়েছিল। এবার রাষ্ট্রের কর্ণধারের পদটি কি তাঁরই জন্যে অপেক্ষা করছে?

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং—(২)

প্ল্যানিং কমিটি গঠিত হওয়ার আট বছর আগে, ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, ইংরেজ-শুভার্থীদের সস্পৃহ উদ্বেগ এড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ মস্কোয় পৌঁছেছিলেন। শুভার্থীরা তাঁর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন (ঠিক কথা, ৭০ বছরের বৃদ্ধের স্বাস্থ্য তখন ভাল যাচ্ছিল না), রাশিয়ায় থাকা-খাওয়ার কষ্টের কথা তুলেছিলেন (একটুও মিথ্যে নয়, ইংলন্ডের তুলনায় নির্ধন পরিবেশে সেখানে রবীন্দ্রনাথকে থাকতে হয়েছিল), তাঁদের আরও নানা আধ্যাত্মিক আধি-ভৌতিক দুশ্চিন্তা, তবু রবীন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন (ভাগ্য নাইটহুড ত্যাগের পরেও পাসপোর্ট মিলেছিল), কারণ তিনি অনুভব করেছিলেন—রাশিয়ার যবনিকা-অন্তরালে এক বিরাট প্রস্তুতি চলেছে এই বিশ্বের নাট্যশালায় কোনো একটি স্মরণীয় অবতরণের জন্য, সে নাটকের নাম,—যবনিকা-ভিতরে উঁকি দিয়ে রবীন্দ্রনাথ অতঃপর বললেন,—"এই বিশ্বের নূতন তীর্থ।"

বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার আত্মনির্মাণসাধনা রবীন্দ্রনাথকে অভিভূত করে ফেলেছিল। তিনি নমস্কার করেছিলেন। তাঁর অনেক স্বপ্নকে সিদ্ধ দেখেছিলেন সুদূর এক দেশে। মানবসাধনায় মহাকবি বার বার তাই একই কথা বলে-ছিলেন—

"আপাতত রাশিয়ায় এসেছি—না এলে এ জন্মের তীর্থদর্শন অত্যন্ত অসমাপ্ত থাকত।"

রাশিয়া তীর্থ? যে-রাশিয়া ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতার বিরোধী!! রাশিয়া সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ অমন একটা অধ্যাত্ম-ঘেঁষা শব্দ ব্যবহার করলেন কেন? উত্তর রবীন্দ্রনাথই দিয়েছেন—

"আমি নিজের চোখে না দেখলে কোনোমতেই বিশ্বাস করতুম না যে, অশিক্ষা ও অবমাননার নিম্নতল থেকে আজ কেবলমাত্র দশ বৎসরের মধ্যে লক্ষ লক্ষ মানুষকে এরা শুধু ক, খ, গ, ঘ শেখায় নি, মনুষ্যত্বে সম্মানিত করেছে। শুধু নিজের জাতকে নয়, অন্য জাতের জন্যেও এদের সমান চেষ্টা। অথচ সাম্প্রদায়িক ধর্মের মানুষেরা এদের অধার্মিক বলে নিন্দা করে। ধর্ম কি কেবল পুঁথির মন্ত্রে, দেবতা কি কেবল মন্দিরের প্রাঙ্গণে। মানুষকে যারা কেবলই ফাঁকি দেয়, দেবতা কি তাদের কোনোখানে আছে।"

'অধার্মিক' রাশিয়ার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আরও বহু তীর্থধর্ম দেখেছিলেন। দেখেছিলেন 'অখণ্ড সাধনাকে',—তীর্থের যা মূল আশ্রয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মহৎ আবেগকে প্রকাশ করবার সময়ে উপনিষদের বাণীর উপর প্রায়ই নির্ভর করেন, এখানেও ব্যত্যয় ঘটে নি—

"অন্যান্য যেসব দেশে ঘুরেছি তারা সমগ্রভাবে মনকে নাড়া দেয় না......কিন্তু এখানে সমস্ত দেশটা এক অভি-প্রায় মনে নিয়ে সমস্ত কর্মবিভাগকে এক স্নায়ুজালে জড়িত করে এক বিরাট দেহ, এক বৃহৎ ব্যক্তিস্বরূপ ধারণ করেছে, সর্বকিছু মিলে গেছে একটি অখণ্ড সাধনার মধ্যে।...

"উপনিষদের একটা কথা এখানে এসে খুব স্পষ্ট করে বুঝেছি—'মা গৃধঃ', লোভ কোরো না। কেন লোভ করবে না। যে-হেতু সমস্ত কিছু এক সত্যের দ্বারা পরিব্যাপ্ত; ব্যক্তিগত লোভতেই সেই একের উপলব্ধির মধ্যে বাধা আনে। 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'—সেই একের থেকে যা আসছে তাকেই ভোগ করো। এরা আর্থিক দিক থেকে সেই কথাটা বলছে। সমস্ত মানবসাধারণের মধ্যে এরা একটি অদ্বিতীয় মানবসত্যকেই বড়ো বলে মানে—সেই একের যোগে উৎপন্ন যা কিছু, এরা বলে, তাকেই সকলে মিলে ভোগ করো—'মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনং'—কারও ধনে লোভ কোরো না। কিন্তু ধনের ব্যক্তিগত বিভাগ থাকলেই ধনের লোভ আপনিই হয়। সেইটিকে ঘুচিয়ে দিয়ে এরা বলতে চায় 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'।"

রবীন্দ্রনাথ তাঁর নবতীর্থ রাশিয়ায় দেখেছিলেন অনেক পুরাতনের বর্জন, নতুনের পরীক্ষা এবং অভাবনীয়ের অবলম্বন। "কী অসম্ভব সাহস", কবি বললেন, "হাজার বছরের বিরুদ্ধে দশ-পনেরো বছর জিতবে বলে পণ করেছে।" তিনি দেখলেন, অন্য দেশের সঙ্গে এদের মূলে প্রভেদ, "আগাগোড়া সকল মানুষকেই এরা সমান করে জাগিয়ে তুলছে।" সুতরাং রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন সত্তর, বয়সের ও স্বাস্থ্যের অবস্থার জন্য দীর্ঘ ও কষ্টসাধ্য ভ্রমণ যখন 'দুঃসাহসিকতা', তখনো তিনি সে দায় মাথা পেতে নিয়ে-ছেন, কারণ "পৃথিবীতে যেখানে সবচেয়ে বড়ো ঐতিহাসিক যজ্ঞের অনুষ্ঠান সেখানে নিমন্ত্রণ পেয়েও না-আসা অমার্জনীয় হত।"

রবীন্দ্রনাথ বললেন—"আমার পৃথিবীর মেয়াদ সংকীর্ণ

হয়ে এসেছে; অতএব আমাকে সভ্য হবার বেশি চেষ্টা করতে হবে, ইতর হবার নয়।"

আরো স্পষ্ট বক্তব্যে আসা যাক। রাশিয়ার বিপ্লবের কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন? প্রথমেই স্বীকার করতে হবে, রবীন্দ্রনাথ ঐ বিপ্লবের মূল তাৎপর্য, মার্কসীয় দর্শনের একটা প্রধান বক্তব্যকে মেনে নিয়েছিলেন: সর্বদেশের সর্বহারারা স্বভাবে ও সমস্যায় এক। তাই "রাশিয়ার বিপ্লবের বাণী বিশ্ববাণী।" "স্বাজাতিক স্বার্থের উপরে সমস্ত মানুষের স্বার্থের চিন্তা", "স্বজাতির সমস্যা সমস্ত মানুষের সমস্যা"—এই বোধের দ্বারা রাশিয়ার বিপ্লব বিশ্ববিপ্লবের সূচনা-স্বরূপ।

সর্বহারাদের মর্মসত্যকে রবীন্দ্রনাথ এইভাবে উপস্থিত করেন

"দুঃখী আজ সমস্ত মানুষের রঙ্গভূমিতে নিজেকে বিরাট করে দেখতে পাচ্ছে, এইটে মস্ত কথা। আগেকার দিনে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করে দেখেছে বলেই কোনোমতে নিজের শক্তিরূপ দেখতে পায় নি—অদৃষ্টের উপর ভর করে সব সহ্য করেছে। আজ অত্যন্ত নিরুপায়ও অন্তত সেই স্বর্গরাজ্য কল্পনা করতে পারছে যে-রাজ্যে পীড়িতের পীড়া যায়, অপমানিতের অপমান ঘোচে। এই কারণেই সমস্ত পৃথিবীতেই আজ দুঃখজীবীরা নড়ে উঠেছে।"

দুঃখীর বিশ্ববিপ্লবের অংশবিশেষকে নিজ দেশে সফল করে তুলতে রাশিয়াকে ভাঙা এবং গড়া দুই কাজই করতে হয়েছে। তার মধ্যে ধর্মভাঙা একটি বড় ভাঙা। ভারতের অধ্যাত্মকবি ঐ তথাকথিত ধর্মনাশে নিতান্ত আনন্দিত। কঠিনতম ভাষায় অন্ধধর্মের নিন্দা করে রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ার আচরণের সমর্থন করেছেন। মূঢ় ধর্মের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিযোগের কারণ, প্রথমত, এই ধর্ম চিত্তের স্বাধীনতাকে নষ্ট করে, দ্বিতীয়ত, ধর্ম রাজার সহায় যে-রাজা প্রজাকে দাস করে রাখতে চায়। ঐ ধর্ম রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, "বিষকন্যার মতো; আলিঙ্গন করে সে মুগ্ধ করে, মুগ্ধ করে সে মারে। শক্তিশেলের চেয়ে ভক্তিশেল গভীরতর মর্মে গিয়ে প্রবেশ করে, কেন না তার মার আরামের মার।"

সুতরাং রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, আমি সোভিয়েটের ধর্মবিরোধিতার "নিন্দা করতে পারব না; ধর্মমোহের চেয়ে নাস্তিকতা অনেক ভালো।"

রাশিয়ার আরও কয়েকটি সাফল্যের কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—সাম্প্রদায়িকতা দূরীকরণ, বিভিন্ন জাতির সমন্বয়-বিধান ইত্যাদি। কিন্তু মূল সাফল্য, রবীন্দ্রনাথের মতে, সর্বশ্রেণীর মানুষের মধ্যে সাম্যসৃষ্টি ও সর্বশ্রেণীর মানুষের নৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়ন। ইতিহাসের এই গৌরবময় সিদ্ধি সম্ভবপর হয়েছে কয়েকটি সাফল্যের ফলে। সেগুলি—(১) শিক্ষাবিস্তার, (২) কৃষি-সংস্কার ও (৩) ব্যাপক শিল্পায়ন।

রাশিয়ার বিপ্লব যেহেতু সর্বহারাদের বিপ্লব সেকারণে সেখানে সাধারণ মানুষের উন্নতি শুধু নয়, সাধারণ মানুষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে, তাই স্বাভাবিক। সাধারণ মানুষেরা, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, সভ্যতার পিলসুজ—"মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে—উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।" রবীন্দ্রনাথ যখন রাশিয়ায় গিয়েছিলেন তখন রাশিয়ায় সাম্যসাধনার বিপুল আবেগের যুগ। একদিকে তাদের পেটের ভাত বিক্রি করে অস্ত্র কিনে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা রাখতে হচ্ছে বিদেশের মহাজনী রাষ্ট্রশক্তি ও স্বদেশের কায়েমী স্বার্থের অবশিষ্ট শক্তির বিরুদ্ধে, অন্যদিকে যে-অন্ন বাঁচছে তাকেই সমভাগে বণ্টন করে দিতে হচ্ছে সকল দেশবাসীর মধ্যে। তার ফলে রাশিয়ায় "সর্বব্যাপী নির্ধনতা।" এই নির্ধনতা কিন্তু আপন রিক্ততায় লজ্জিত নয়। "এখানে ভেদ নেই বলেই ধনের চেহারা গেছে ঘুচে; দৈন্যেরও কুশ্রীতা নেই, আছে অকিঞ্চনতা। দেশজোড়া এই অধন আর কোথাও দেখিনি বলেই প্রথমেই এটা আমাদের খুব চোখে পড়ে। অন্য দেশে যাদের আমরা জনসাধারণ বলি এখানে তারাই একমাত্র।"

এই সাম্য সম্ভবপর নয় যদি না দেশের মানুষ মানসিক-ভাবে সমভূমিতে বাস করবার অধিকারী হয়। রাশিয়ার সিদ্ধান্ত—শিক্ষাই মানসিক সমভূমি দান করতে সমর্থ। আর, রাশিয়ার সর্বব্যাপী নির্ধনতা কিভাবে সর্বব্যাপী ধনশালিতায় রূপান্তরিত হতে পারে? রাশিয়া সে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে কৃষি ও শিল্পের ব্যাপারে সমাজতান্ত্রিক-অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে গ্রহণ করে।

রবীন্দ্রনাথ বললেন, আমার রাশিয়া ভ্রমণের মূল উদ্দেশ্য শিক্ষাবিধি দেখে আসা। যখন তিনি শুনেছিলেন যে, "রাশিয়াতে জনসাধারণের শিক্ষা প্রায় শূন্য থেকে প্রভূত পরিমাণে বেড়ে গেছে", তখন একটি পরম প্রতিজ্ঞায় অধীর হয়েছিলেন মহাকবি—"ভাঙা শরীর যদি আরও ভাঙে তো ভাঙুক, ওখানে যেতেই হবে।" 'ওখানে' গিয়ে তিনি উদ্ভাসিত হয়ে উঠলেন শ্রদ্ধায়—আট বছরের শিক্ষার জোরে এমন করে মানুষের মনের চেহারা বদলে দেওয়া যায়—মনের মরা গাঙে শিক্ষার প্লাবন বইয়ে জীবনের বেগ এমন করে আনা যায়—এমন পূর্ণমাত্রায়।

রবীন্দ্রনাথ দেখলেন, রাশিয়ার শিক্ষাচেষ্টা ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ। তারা একদিকে মধ্য এশিয়ার অর্ধসভ্যদের পর্যন্ত শিক্ষিত করছে, অন্যদিকে তাদের শিক্ষাপদ্ধতি মানুষকে সক্রিয় করছে কর্মোদ্যমে, মানুষের সত্তাকে জাগাচ্ছে ভাব-প্রেরণায়। জীবনমুখী শিক্ষার রূপ কি হওয়া উচিত তার চেহারা রাশিয়ায় দেখলেন। কেবল বৃত্তিমুখী যন্ত্রশিক্ষা নয়—অভিনয়, সঙ্গীত, চিত্রকলা—সর্ববিধ উপায়ে চিত্ত-সম্পূর্ণতার প্রয়াস সেখানে সক্রিয়।

শিক্ষা ছাড়া আরও দুটি জিনিসের সাধনা দেখেছিলেন রাশিয়ায়—কৃষি ও যন্ত্র। কৃষির সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের আযৌবন আগ্রহ। জাতীয় আন্দোলনে যোগ দিয়ে তাঁর ধারণা হয়েছিল, "আমাদের স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্র হচ্ছে কৃষি-পল্লীতে", এবং সেই স্বায়ত্তশাসন লাভের জন্য তিনি নিজে সাধনা করেছেন, অন্যদের আহ্বান করেছেন যোগ দিতে। রবীন্দ্রনাথের দুটি মূল্যবান ধারণার কথা পাচ্ছি—প্রথম, জমির স্বত্ব ন্যায়ত জমিদারের নয়, দ্বিতীয়, সমবায়নীতি অনুসারে একত্র চাষ করতে না পারলে কৃষির উন্নতি নেই।

রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ায় গিয়ে দেখলেন, কৃষির সম্বন্ধে সর্বব্যাপক উৎসাহ, বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রসার, আধুনিক যান্ত্রিক পদ্ধতিতে চাষ এবং যৌথ খামারের ব্যবস্থা। নিজের কল্পনাকে বাস্তবের মধ্যে চরিতার্থ দেখে উদ্দীপ্ত কবি তার পাশে তুলে ধরলেন আমাদের কৃষির চেহারাকে পৌরাণিক কাহিনীর পটভূমিকায়। উপমায় নবপুরাণ-সৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথের দক্ষতা অসামান্য।

"আমাদের দেশে কোনো এক সময়ে গোবর্ধনধারী কৃষ্ণ বোধহয় ছিলেন কৃষির দেবতা, গোয়ালার ঘরে তাঁর বিহার। তাঁর দাদা বলরাম, হলধর। ঐ লাঙল—অস্ত্রটা হল মানুষের যন্ত্রবলের প্রতীক। কৃষিকে বলদান করেছে যন্ত্র। আজকের দিনে আমাদের কৃষিক্ষেত্রের কোনো কিনারায় বলরামের দেখা নেই—তিনি লজ্জিত—যে-দেশে তাঁর অস্ত্রে তেজ আছে সেই সাগরপারে তিনি চলে গেছেন। রাশিয়ায় কৃষি বলরামকে ডাক দিয়েছে; দেখতে দেখতে সেখানকার কেদারখণ্ডগুলো অখণ্ড হয়ে উঠল, তাঁর নূতন হলের স্পর্শে অহল্যাভূমিতে প্রাণসঞ্চার হয়েছে।

একটা কথা আমাদের মনে রাখা উচিত, রামেরই হল-যন্ত্রধারী রূপ হচ্ছে বলরাম।

"১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে এখানে যে বিপ্লব হয়ে গেল তার আগে এদেশে শতকরা নিরানব্বই জন চাষী আধুনিক হলাস্ত্র চক্ষেও দেখেনি। তারা সেদিন আমাদেরই চাষীদের মতো সম্পূর্ণ দুর্বলরাম ছিল নিরস্ত্র, নিঃসহায়, নির্বাক। আজ দেখতে দেখতে এদের খেতে হাজার হাজার হলযন্ত্র নেমেছে। আগে এরা ছিল যাকে আমাদের ভাষায় বলে কৃষ্ণের জীব, আজ এরা হয়েছে বলরামের দল।"

উপমার আক্ষরিক সত্যতা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন তুলে তার সৌন্দর্যকে ক্ষুণ্ণ করতে ইচ্ছে নেই; কৃষিকার্যে যন্ত্র-ব্যবহার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব লক্ষ্য করাই প্রয়োজন। রবীন্দ্রনাথ স্পষ্টত কৃষিকার্যে বৈজ্ঞানিক যন্ত্র-প্রয়োগের পক্ষপাতী। যন্ত্র সম্বন্ধে কবির এই পক্ষপাত যদি কৃষি পায়, তাহলে অপর উৎপাদনব্যবস্থা নিশ্চয় বঞ্চিত হবে না, বঞ্চিত হয় নিও, রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য উক্তি থেকে তা বোঝা যায়। কবি রাশিয়ার সর্বত্র যন্ত্রশিক্ষার প্রচুর ব্যবস্থা ও সে বিষয়ে আগ্রহ লক্ষ্য করেছেন। এই যন্ত্র যখন ব্যক্তির স্বার্থসিদ্ধির জন্য প্রযুক্ত তখন তার উদর থেকে ওঠে গরল, যখন সমষ্টির কল্যাণে নিযুক্ত, তখন আসে অমৃত।

"একটা কথা মনে রেখো, এরা নানা জাতির লোক, কল-কারখানার রহস্য আয়ত্ত করবার জন্য এত অগাধ উৎসাহ ও সুযোগ পেয়েছে, তার একমাত্র কারণ যন্ত্রকে ব্যক্তিগত স্বতন্ত্র স্বার্থসাধনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় না। ......আমরা আমাদের লোভের জন্য যন্ত্রকে দোষ দিই, মাতলামির জন্য শাস্তি দিই তালগাছকে।"

কথাগুলো বিস্ময়কর। যন্ত্রের দোষ নেই যত দোষ যন্ত্রীর—রবীন্দ্রনাথও এই ধরাবাঁধা যুক্তির আশ্রয় নিলেন। যন্ত্রের যখন মন নেই তখন দোষও নেই, এই বুঝতে বেশি বুদ্ধির দরকার হয় না এবং সর্বজনের স্বার্থে নিয়োগ করলে যন্ত্রের দোষ হ্রাস পেতে পারে, কিন্তু যন্ত্রের যান্ত্রিকতার

মস্কোয় রবীন্দ্রনাথ

কথা ভুলে গেলেন রবীন্দ্রনাথ এবং ভুলবার সময়ে তিনি কি নিজের কণ্টকগুলি সুগভীর স্মরণকে বিসর্জন দিলেন না? যাই হোক, এক্ষেত্রে আমরা রবীন্দ্রনাথের মোট বক্তব্যের পক্ষপাতী; যন্ত্রের নানা ত্রুটি স্বীকার করেও, যন্ত্রযোগে মানুষ যান্ত্রিক হয়ে পড়ে এই নিন্দা মেনে নিয়েও আমরা বলি, তবু যন্ত্র দরকার আমাদের শোচনীয় দারিদ্র্যকে দূর করার জন্য, যন্ত্রশক্তির সহায়তা ছাড়া আমাদের এগোবার উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, যেখানে কৃষির সুযোগ নেই, অন্য উপায়ে গ্রাসাচ্ছাদনের ভালো ব্যবস্থা করা সম্ভব নয় সেখানে—

"দেশকে বাঁচাবার উপায় কারখানার কাজ খোলা, যাকে বলে *industrialisation.*"

বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের চোখের সামনে বারবার একটি দেশের ছবি ভেসে উঠেছে—বিপরীত ছবিরূপে—সেদেশ তাঁর স্বদেশ, ভারতবর্ষ। ভারত-বর্ষের ভয়াবহ দারিদ্র্য, শোচনীয় অশিক্ষা নিষ্ঠুর পীড়ন, অপরিসীম শোষণের দিকে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ অধৈর্য হয়ে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে ধিক্কার উচ্চারণ করেছেন। দেড়শো বছরের শাসনে ইংরেজ ভারতের শতকরা পাঁচজনের বেশি মানুষকে শিক্ষিত করতে পারে নি, যে-শিক্ষা আবার তার শোষণ-সহায়ক কেরানী তৈরির শিক্ষা। ভারতের অন্নে ইংরেজ পরিপুষ্ট হয়েছে; পরিপুষ্ট ইংরেজ অন্নহীনের কোলাহলকে থামাবার জন্য দিয়েছে ল' এণ্ড অর্ডারের কঠিন ব্যবস্থা। ইংরেজ শাসনের শূন্যতার বিদ্রূপের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গেলেই ইংরেজ তার 'ডিফিকালটিজের' কথা তোলে, আর ভারতের লজ্জা খুঁজতে তৎপর থাকে কলঙ্ক-শিকারী পাদরীর দল। রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত অন্যান্য

সাম্রাজ্যবাদীর তুলনায় ইংরেজের অপেক্ষাকৃত ঔদার্যকে স্বীকার করলেও (এ বিষয়ে মতভেদের অবকাশ আছে) বলতে বাধ্য হয়েছেন, আমার ধৈর্য গেছে, এবং সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয়, তিনি ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের ঘৃণার জোরের কথা তুলেছেন।—"বৃটিশ সাম্রাজ্য আজ আমাদের ঘৃণার দ্বারা বিকৃত। এই ঘৃণার আমাদের জোর দেবে, এই ঘৃণার জোরেই আমরা জিতব।"

র-বী-ন্দ্র-না-থ বলছেন—ঘৃণার শক্তির কথা!! এর বিপরীত বহু কথা পাব রবীন্দ্রনাথের রচনায়, তথাপি কোনো এক সময়ের এই রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় বিপ্লবীদের কার্যকলাপের পক্ষে শ্রেষ্ঠ নৈতিক সমর্থন।

রাশিয়া সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভাবাবেগ এই পর্যন্ত। রাশিয়ায় বিপ্লবের পূর্ণতার রূপ যেমন তিনি দেখেছিলেন, তেমনি তার ক্ষুদ্রতার দিকও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। রবীন্দ্রনাথ যদিও বলেছেন, রাশিয়ার কলঙ্ক চাঁদের কলঙ্ক, এবং তিনি আলোকের দিকই দেখতে চেয়েছেন, কারণ সেখানে 'আশ্চর্য দীপ্তি', তবু তিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে যে-সমস্ত প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন এবং যে-সমস্ত সমালোচনাকে স্বীকার করেছেন, পরিমাণে ও গুরুত্বে তা মোটেই অল্প নয়। এ বিষয়ে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ও লক্ষণীয় কথা হল, তিনি রাশিয়ার বিপ্লবকে সামঞ্জস্যের সৃষ্টি বলেন নি, বলেছেন—ইতিহাসের অস্বাভাবিক অবস্থার প্রতিবাদ। বর্তমান রুগ্ন যুগে বলশেভিক নীতি তাঁর কাছে স্বাভাবিক স্বাস্থ্য নয়, চিকিৎসা। মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বার্থের সংঘাতের ইতিহাস সংক্ষেপে উপস্থিত করার পরে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"বর্তমান সভ্যতার এই অমানবিক অবস্থায় বলশেভিক নীতির অভ্যুদয়; বায়ুমণ্ডলের এক অংশে তনুত্ব ঘটলে ঝড় যেমন বিদ্যুদ্দন্ত পেষণ করে মারমূর্তি ধরে ছুটে আসে, এও সেইরকম কাণ্ড। মানবসমাজে সামঞ্জস্য ভেঙে গেছে বলেই এই একটা অপ্রাকৃতিক বিপ্লবের প্রাদুর্ভাব। সমষ্টির প্রতি ব্যষ্টির উপেক্ষা ক্রমশই বেড়ে উঠছিল বলেই সমষ্টির দোহাই দিয়ে আজ ব্যষ্টিকে বলি দেবার আত্মঘাতী প্রস্তাব উঠেছে। তীরে অগ্নিগিরি উৎপাত বাধিয়েছে বলে সমুদ্রকেই একমাত্র বন্ধু বলে এই ঘোষণা। ...ব্যষ্টিবর্জিত সমষ্টির অবাস্তবতা কখনই মানুষ চিরদিন সইবে না। সমাজ থেকে লোভের দুর্গগুলোকে জয় করে আয়ত্ত করতে হবে, কিন্তু ব্যক্তিকে বৈতরণী পার করে দিয়ে সমাজরক্ষা করবে কে। অসম্ভব নয় যে, বর্তমান রুগ্ন যুগে বলশেভিক নীতিই চিকিৎসা, কিন্তু চিকিৎসা তো নিত্যকালের হতে পারে না, বস্তুত ডাক্তারের শাসন যেদিন ঘুচবে, সেইদিনই রোগীর শুভদিন।"

ব্যষ্টির ও সমষ্টির সীমারক্ষায় রাশিয়ার পরিমাণবোধ সম্বন্ধে প্রশ্ন রবীন্দ্রনাথ অন্যত্রও তুলেছেন। এ-ব্যাপারে রাশিয়ার আচরণ, রবীন্দ্রনাথের মতে "ফ্যাসিস্টদেরই মতো"। রাশিয়ায় জবরদস্তি যথেষ্ট, সেখানে একনায়কের কঠিন শাসন, ব্যক্তিস্বাধীনতার পথ রুদ্ধ, এবং শাসন নিতান্ত নিষ্ঠুর,—এসব কথাও রবীন্দ্রনাথ বহুভাবে বলেছেন। সোভিয়েট অর্থনীতি সম্বন্ধেও তাঁর সংশয় ছিল। এমন কি সে সংশয় অবিশ্বাসে পৌঁচেছিল। ব্যক্তিগত সম্পদের সম্পূর্ণ বিলোপকে রবীন্দ্রনাথ পছন্দ করতে পারেন নি, কারণ "সাধারণ মানুষের পক্ষে আপন সম্পত্তি তার আপন ব্যক্তিস্বরূপের ভাষা"। রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে বজায় রেখে তার "ভোগের একান্ত স্বাতন্ত্র্যকে সীমাবদ্ধ" করে দেবার পক্ষপাতী। এ ব্যাপারে জবরদস্তি করার জন্য রাশিয়ার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যঙ্গ না করে পারেননি—

"শোনা যায় যথেষ্ট জবরদস্তি আছে; বিনা বিচারে দ্রুত পদ্ধতিতে শাস্তি, সেও চলে; আর সব বিষয়ে স্বাধীনতা আছে; কিন্তু কর্তৃপক্ষের বিধানের বিরুদ্ধে নেই।"

"সোভিয়েট রাশিয়ায় মার্কসীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে সর্বসাধারণের বিচারবুদ্ধিকে এক ছাঁচে ঢালবার একটা প্রয়াস সুপ্রত্যক্ষ। সেই জেদের মুখে এ সম্বন্ধে স্বাধীন আলোচনার পথ জোর করে অবরুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে, এ অপবাদকে আমি সত্য বলে বিশ্বাস করি।

"ধনতন্ত্রের বেলায় যে জননায়কেরা শাস্ত্রবাক্য মানে না, তারাই দেখি অর্থতন্ত্রের দিকে শাস্ত্র মেনে অচল হয়ে বসে আছে।"

রাশিয়ার একনায়কতার বিরুদ্ধে নানা তীব্র বাক্য উচ্চারণ করবার পরে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"জনগণের ভাগ্য যদি তাদের সম্মিলিত ইচ্ছার দ্বারাই সৃস্ট বা পালিত না হয়, তবে সেটা হয় খাঁচা, দানাপানি সেখানে ভালো মিলতেও পারে, কিন্তু তাকে নীড় বলা চলে না, সেখানে থাকতে থাকতে হাত-পা আড়ষ্ট হয়ে যায়। এই নায়কতা শাস্ত্রের মধ্যেই থাক, গুরুর মধ্যেই থাক, আর রাষ্ট্রনেতার মধ্যেই থাক, মনুষ্যত্বহানির পক্ষে এমন উপদ্রব কিছুই নেই।"

রাশিয়ায় শিক্ষাপ্রসারের বিপুল প্রশংসা কবি করেছিলেন, সেই শিক্ষা ছাঁচে গড়া বলে কলের মানুষ তৈরি করবে, এমন আশঙ্কাও তাঁর হয়েছিল।

সুতরাং নিন্দা যথেষ্ট। রবীন্দ্রনাথকে শেষ পর্যন্ত তীর্থনিন্দা করতে হয়ই—সেই তাঁর ভবিতব্য!!

রাশিয়া সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের সারসংকলন আমরা করলাম। কিন্তু পরে সুভাষচন্দ্র বা মেঘনাদ সাহার রাশিয়া-বিষয়ক বক্তব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের তুলনা আমরা করব।

[ক্রমশ]

হরপ্রসাদ মিত্র

বই-বাছাই

বাংলা বইয়ের মেলা

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ' যে ধরনের বই, 'ব্রজাঙ্গনা' সে ধরনের নয়। মধুসূদন যে উনিশ শতকের সক্রিয়তম বাঙালী লেখকদের অন্যতম ছিলেন, সে তাঁর বিভিন্ন রচনার বিষয়-প্রকৃতি এবং রূপবৈচিত্র্য থেকেই নিঃসন্দেহে অনুভব করা যায়। মানব-স্বীকৃতি বলতে বিশেষ একটি সংকীর্ণ লক্ষ্যের কথা বোঝায় না। মানব-স্বীকৃতি প্রসঙ্গে গোপালবাবুর ঐ 'দেশ-কালের যৌগিক ছাপ' উক্তিটি সেই কারণেই বেশ সুপ্রয়োগ বলে মনে হয়।

আনন্দ বললে—এদেশে মোগল শাসনের শেষ অবস্থায় যখন ইংরেজ এসে দেখা দেয়,—পলাশীর কয়েক-বছর আগে এবং পরে দেশ যখন নানা যন্ত্রণায় কাতর,—তখনকার মানব-স্বীকৃতির পরিচয় আছে রামপ্রসাদের গানে। তিনি শ্যামা-মাকে ডেকে বলেছিলেন—মা, তুমি কাউকে দিলে হাতি-ঘোড়া, জুড়ি-গাড়ি,—কাউকে দিয়েছ ক্ষেত-খামার, চাষ-আবাদের কাজ। কেউ কেউ বাস করে বড়ো বড়ো প্রাসাদে। এরাই কি তোমার পরম প্রিয়? এরাই কি তোমার আপনজন? এক-দল পাল্কিতে চড়ে আসা-যাওয়া করে,—আর আমার কাজ তো পাল্কি-বেহারা হয়ে বোঝা বয়ে বেড়ানো।

এসব তো বৈষয়িক দুঃখের কথা, পার্থিব যন্ত্রণা বোধের পরিচয় অথচ, রামপ্রসাদ ধর্মভাবের কবি বলেই পরিচিত। তাঁর নিজের নামে লেখা একখানি 'বিদ্যাসুন্দর' কাব্য ছিল —সেও সত্য,—তবে একথাও সত্য যে, ভক্তের গভীর আর্তি বেজেছে তাঁর গানের ছত্রে ছত্রে। 'কলুর চোখ-ঢাকা বলদ',—'মানব-জমিন রইলো পতিত' ইত্যাদি উক্তির সঙ্গে তাঁর প্রিয় আরো সব রূপক বা রূপ-সংকেতের কথা মনে পড়ে,—একালের ভাষায় যাকে বলা হয় 'চিত্রকল্প' বা 'ইমেজরি'—তাঁর সেই চিত্রকল্প-প্রকৃতি দেখলেই দেশ-কালের যৌগিক ছাপটা বোঝা যায়। যেমন, দশ ইন্দ্রিয়কে তিনি বলেছিলেন 'আঠিয়াল',—আদালতের ভাষা দেখা দিয়েছিল তাঁর রচনায়—'শমন', 'ডিক্রি-জারি' ইত্যাদি শব্দই এর উদাহরণ। 'তছরূপ', 'বাজেয়াপ্ত' প্রভৃতি শব্দ তাঁর গানে গানে ছড়িয়ে আছে। একটি গানে লেখা হয়—

> খড়্গহস্তে রুধির-ধারা, এ মা মুণ্ডমালা গলে,
> একবার হে'ট নয়নে চেয়ে দেখ মা, পতি পদতলে গো মা।

আর একটি গানে দেখা যায়—

> নিম খাওয়ালি মা চিনি বলে কেবল কথার করি ছল।
> মিঠার আগে তেতো মুখে সারা দিনটা গেল।

সংসার বড়োই বিরস, বিস্বাদ মনে হয়েছিল সেকালের এই ভাবুকের বোধে। রামপ্রসাদের এইসব উক্তিই তার সাক্ষী।

আনন্দ বললে—অনাথকৃষ্ণ দেবের 'বঙ্গের কবিতা' (প্রথম ভাগ) বেরিয়েছিল ১৩১৭ সালের অগ্রহায়ণে। শোভাবাজার-রাজবাড়ির এই ভদ্রলোক ১৩১৬ সালের অগ্রহায়ণে সাহিত্য-সভার এক অধিবেশনে 'বঙ্গের কবিতা' নামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। পরের বছর সেই প্রবন্ধই বোধ হয় পরিমার্জিত এবং পরিবর্ধিত হয়ে বই হয়ে বেরোয়। নানা কারণে বইখানি ভাল লাগবার কথা। কিন্তু রামপ্রসাদ এবং ভারতচন্দ্রের কথা-প্রসঙ্গে তিনি এক জায়গায় যা লিখে গেছেন, সেটা এই সূত্রে একটু দেখে নেওয়া দরকার। শোনো সে-মন্তব্য—

> 'অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের অভ্যুদয়। ১৭৫২ খৃস্টাব্দে বিদ্যাসুন্দর রচনা শেষ হয়, ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে পলাশীর অভিনয়; বঙ্গের ভাগ্যচক্র ঘুরিয়া গেল। বঙ্গদেশ ইংরাজের হইল। আমাদের পুরাতন জীর্ণ শৃঙ্খল ঘুচিয়া নূতন সুদৃঢ় শৃঙ্খল লাভ হইল। এই দাসত্ব-শৃঙ্খল পরিবর্তনে বঙ্গবাসীর প্রাণে আঁচড়টি লাগে নাই। বাঙ্গালী তখন গীত গান তোটক-ছন্দ লইয়া উন্মত্ত।'

আমি বললুম—স্বর্গত দেব মশায়ের বইখানি আমারও ভাল লাগে, কিন্তু আঠারোর শতকের ঐ সন্ধিকাল 'বঙ্গবাসীর প্রাণে আঁচড়টি লাগে নাই'—এ উক্তিটি ঠিক নয়। আমাদের সে-পর্বের সাহিত্য এর বিপরীত পক্ষের সাক্ষী।

আনন্দ বললে,—অনাথকৃষ্ণ এক্ষেত্রে 'মানব-স্বীকৃতির' গভীর ইঙ্গিত হয় ধরতে পারেন নি, নয় তো এদিকে তাঁর নজরই ছিল না। বঙ্গবাসীর প্রাণে আঁচড় লাগে নি বলার যুক্তি হিসেবে তিনি যা লিখে গেছেন তাও পড়ছি—

> ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ তরঙ্গিণীর তরঙ্গে চালিতা তরণীর ন্যায় এই গীত গানের ভাব তখন দুলিতেছিল; একবার উপরে উঠে, সে সময়ে ধ্বনিত হইতেছিল-

> বাসনায় দাও আগুন জেলে
> ক্ষার হবে তায় পরিপাটি
> কর মনকে ধোলাই আপদ বালাই
> মনের ময়লা ফেল কাটি।

> আবার তখনই নামিয়া আসে,—কানে বাজিতেছিল—
> যদি না রহিতে তুমি পার বঁধু
> পর ফুলে ফুলে কর পান মধু॥

আনন্দ এই পর্যন্ত পড়ে একটু থেমে নিয়ে বললে—তখনকার এই সমস্ত গান কবিতা ইত্যাদিকে অনাথকৃষ্ণ একটিমাত্র 'লেবেল' দিয়ে চিহ্নিত করেছেন—তাঁর চোখে এ সবই ছিল তখনকার বাঙালীর 'গীত গান তোটক-ছন্দ'-ঘটিত উন্মাদনা। কিন্তু আরো খুঁটিয়ে দেখলে আমাদের ঐ আমলের গানে গানে একই রকম ভাব-প্রমত্ততার পরিবর্তে গভীর মানব-স্বীকৃতির সত্যই চোখে পড়বে। কোনো কোনো ঐতিহাসিক তা দেখিয়ে গেছেন।

কাজে নামবার আগে মনকে সাধ্যানুসারে প্রস্তুত করে নেওয়া দরকার বলেই ভূমিকায় এই মানব-স্বীকৃতি-সম্পর্কিত পঞ্চম সূত্র সম্বন্ধে আনন্দ সেদিন এতোসব আলোচনা তুলেছিল। এ আলোচনা আরো চলতে পারতো—যদি না অনাথকৃষ্ণের আর একটি মন্তব্যে আমাদের দৃষ্টি গিয়ে পড়তো। ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের কাল সম্বন্ধে কথাসূত্রেই অনাথকৃষ্ণ এ-কথা বলে গেছেন—

> গুণী, গুণগ্রাহী সমালোচকগণ বলেন, ভারতচন্দ্রের পর পঞ্চাশ বৎসর বঙ্গভাষাতে উন্নতি-অবনতি প্রায় কিছুই হয় নাই।

আমি বললুম—সে কি? তখন তো আমাদের ভাষার ব্যাকরণ-সন্ধান চলেছে, গদ্য দেখা দিয়েছে, সাহেব সিবিলিয়ানরা এবং অন্যান্য বিদেশী অনুরাগীরা বাংলা, সংস্কৃত এবং অন্যান্য ভারতীয় ভাষার চর্চা শুরু করেছেন, আরো কতোরকম...

আমার কথা থামিয়ে দিয়ে আনন্দ বললে—অনাথকৃষ্ণ জানিয়েছেন—

> 'আমরা এই পঞ্চাশ বৎসর এবং ইহার পরের পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত বঙ্গ-সাহিত্যের প্রাচীন ভাগ ধরিয়াছি; কেন না এই পর্যন্ত "খাঁটি" বাঙ্গালা ভাব। ইহার পর হইতে ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব এবং সেই প্রভাবে নবশক্তি সঞ্চারের লক্ষণ দৃষ্ট হয়।'

—অতএব লক্ষ্য করো,—খাঁটি বাংলা ভাব, আর মিশ্র ভাব—এই দুই ভাবই তোমাকে ভেবে দেখতে হবে। —১৮০০ থেকে যখন তোমার এই আলোচনার কাল-বিস্তার ধরেছো, প্রায় সে পর্যন্ত—অনাথকৃষ্ণের হিসেবে,—ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পরে—অর্থাৎ ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দের পরের পঞ্চাশ বছর যেখানে শেষ হয়, সেই ১৮১০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত গেছে 'খাঁটি' বাংলা-ভাবের বিস্তার। তারপর দেখা দেয় ইংরেজী সাহিত্যের প্রভাব ইত্যাদি ব্যাপার। এই হিসেব তোমার অনুমোদনযোগ্য কি না সেটা চিন্তনীয়।

আমি বললুম—এটাকে কি এ আলোচনার ষষ্ঠ সূত্র বলতে চাও?

সে বললে—না, না ওটাকে আলাদা সূত্র হিসেবে ধরবো না; ওটা একটা আনুষঙ্গিক কথা। কারণ, প্রথমে 'খাঁটি', আর পরে—'প্রভাবিত' বা 'মিশ্র' বা অন্য কোনো নামে চিহ্নিত ক'রে,—ঠিক ১৮১০ পর্যন্ত একটা পর্ব,—এবং তারপরে আর-এক পর্বের বিস্তার ধরে লাভ নেই। ও-বিভাগ ঠিক বিজ্ঞান-সম্মত নয়। এ-প্রসঙ্গ এখানে কথায়-কথায় উঠলো ব'লেই একটু ভেবে নেওয়া গেল;—ওটা এখন থাক্।

বরং পঞ্চম সূত্রটিই আরো ভাবা দরকার। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে,—ব্যাপকভাবে, বাংলার শিক্ষিত মনের জীবনবোধের ক্ষেত্রে এই মানব-স্বীকৃতির দিকটি আমরা এখনো সমুচিত তলিয়ে দেখেছি ব'লে মনে হয় না। বই-বাছাইয়ের নিরিখ-বিচারের পক্ষে এ ভাবনা মোটেই অবান্তর নয়।

আমি বললুম—এ-কথা ঠিক বোঝা গেল না। কোনো বই ভাল লাগছে কি লাগছে না—এজন্যে পাঠকের মনই তো যথেষ্ট। তুমি কি বলতে চাও যে, কোনো বইয়ের মধ্যে (এবং ধরেই নিচ্ছি যে সাহিত্যের বইয়ের কথাই এ-ক্ষেত্রে বিশেষভাবে স্মরণীয়) বৃহৎ বাঙালী-সাধারণের জীবনসত্য প্রতিফলিত হয়েছে, কি হয় নি,—ভালো-লাগা বা না-লাগার সেটাই বিশেষ নিরিখ?

আনন্দ বললে—এতদ্বিষয়ে এদেশের দুরবস্থার কথা বঙ্কিম তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধে দেখিয়ে গেছেন। আমি একটু নমুনা শোনাতে পারি। ১২৮৫ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যার 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিম লিখেছিলেন—

> লোকসংখ্যা গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, বাঙ্গালা দেশে না কি ছয় কোটি ষাটি লক্ষ মনুষ্য আছে। ছয় কোটি ষাটি লক্ষ মনুষ্যের দ্বারা সিদ্ধ না হইতে পারে, বুঝি পৃথিবীতে এমন কোন কার্যই নাই।

আমি শঙ্কিত হয়ে বললুম,—আনন্দ, বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকশিক্ষা' প্রবন্ধটি আমরা সকলেই পড়েছি। ওটি বড়ো ভাল প্রবন্ধ,—কিন্তু আর উদ্ধৃতি শোনাবার দরকার নেই। আমাদের আসল কাজের পূর্বকথা প্রায় শেষ হয়ে এলো।

সে বললে—না, আমি পুরো প্রবন্ধটা এখনি পড়ছি না,—কিন্তু ও-প্রবন্ধের একটি বিশেষ উক্তিই আমাদের এই উপস্থিত প্রস্তুতির পক্ষে সাহায্য করবে—শোনো সেটা—

> সুশিক্ষিত যাহা বুঝেন, অশিক্ষিতকে ডাকিয়া কিছু কিছু বুঝাইলেই লোক শিক্ষিত হয়। এই কথা বাঙ্গালার সর্বত্র প্রচারিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু সুশিক্ষিত, অশিক্ষিতের সঙ্গে না মিশিলে তাহা ঘটিবে না। সুশিক্ষিতে অশিক্ষিতে সমবেদনা চাই।

আমার প্রতিবাদ এবার বেশ কঠিন হয়ে উঠলো। বললুম—আনন্দ, ও-কথা এখানে চলবে না। সাহিত্যে মানব-স্বীকৃতি যে খুবই বিস্তীর্ণ বিষয়, তা বুঝতে পারি, কিন্তু

লোকশিক্ষা যাতে নেই, সে-বই কিছুতেই ভাল বলা চলবে না,—এ মত আমি মানতে নারাজ। বই-বাছাইয়ের এটি কোনো আবশ্যিক শর্ত হতে পারে না।

সে বললে—আমি কি এতোই কাণ্ডজ্ঞানহীন যে এরকম একটা শর্ত দাবি করবো? 'শেষের কবিতা' বা 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কি লোকশিক্ষার বই? এ দুটি বইয়ের কি কম প্রশংসা হয়েছে?

—দ্যাখো আনন্দ, তুমি হঠাৎ এমন সব উদাহরণ দিতে থাকো, যে সে-সব শুনলে কিছু জবাব দিতেই হয়,—জবাব না দিয়ে পারা যায় না,—কিন্তু 'স্বপ্নপ্রয়াণ' সম্বন্ধে আমার মত মিলবে না তোমার সঙ্গে,—তবু ও-কথা এখন থাক্। আমি আর কথা বাড়াবো না, শুধু 'মানব-স্বীকৃতি'-কথাটার সীমা মানতে অনুরোধ করছি তোমায়। লোকশিক্ষার মহতী প্রেরণা ব্যতিরেকে ভাল বই লেখা যায় না, পুনরায় একথার প্রবল প্রতিবাদ জানাচ্ছি আমি।

আনন্দ চুপ করে গিয়েছিল। কিন্তু আমিই থামতে পারি নি।

বলেছিলুম—দ্যাখো, আনন্দ, মানুষের স্থূল প্রয়োজনগুলো মানুষ স্বভাবতই বুঝে থাকে,—দরকার মতো তাকে বুঝিয়েও দেওয়া যায়। কিন্তু অন্ন-বস্ত্রের বা বাসস্থানের অভাবই একমাত্র অভাব নয়। তার আরো সব ক্ষুধা-তৃষ্ণা আছে।—যা জাগিয়ে তুলতে অনেক সময় লাগে,—অনেক পরিস্রুত না হলে ময়লা জল কি স্বচ্ছ হয়ে ওঠে?

সে এ প্রশ্নের জবাব দিল বঙ্কিমের সেই প্রবন্ধ থেকেই—

> মরুক রামা লাঙ্গল চষে, আমার ফাউলকারি সুসিদ্ধ হইলেই হইল। রামা কিসে দিনযাপন করে, কি ভাবে, তার কি অসুখ, কি সুখ, তাহা নব্যের ফটিকচাঁদ তিলার্ধ মনে স্থান দেন না।

আমি বললুম—আমাদের এই প্রস্তাবিত কাজের পক্ষে এ-প্রসঙ্গটি যতোটা দেখা দরকার তা তো দেখা গেল। কিন্তু এর চেয়ে বেশি টানাটানি করলে দু'জনেরই মন তেতো হয়ে যাবে। অতএব তোমার দেওয়া পঞ্চম সূত্রের আর কোনো উপশাখা ধরবার দরকার নেই। তবে আসল প্রসঙ্গের একটু বাইরে দাঁড়িয়ে,—উনিশ শতকের বাঙালী মনের পর্ব-পরিবর্তনগুলি একটু ভেবে নেওয়া যেতে পারে।

—কী রকম?

—অনাথকৃষ্ণ দেব ১৭৬০ থেকে ১৮১০ পর্যন্ত যে খাঁটি বাংলা-ভাবের কথা বলে গেছেন, সেটা বোধ হয় এক-ভাবে মেনে নেওয়া যায়। সেই সুদূর ১৮১০ খ্রীস্টাব্দে শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্যের ক্ষেত্রে রামমোহন তখনো অব্যক্ত,—অর্থাৎ ১৮১০ পর্যন্ত তো বটেই,—তার বছর-তিনেক পরেও তিনি ছিলেন অনুপস্থিত। ১৮১৩-১৫ খ্রীস্টাব্দেই কলকাতায় তাঁর কাজ শুরু হয়। নতুন কালের চেতনা এবং সনাতন ভারতের যোগ—সে কালের বাংলাদেশে তাঁরই মধ্যে প্রথম উজ্জ্বল অভিব্যক্তির সুযোগ পায়। তিনি ছিলেন আমাদের নবজাগৃতির প্রথম তুঙ্গবিন্দু।

আনন্দ বললে—বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন—'রামমোহন রায় হইতে কালেজের ছেলের দল পর্যন্ত সাড়ে তিন পুরুষ ব্রাহ্মধর্ম ঘুষিতেছেন। কিন্তু লোকে শিখে না।'

আমি বললুম—বঙ্কিম তাঁর 'লোকশিক্ষা' প্রবন্ধে যখন এ-কথা লিখেছেন,—তখন শতাব্দীর প্রথম দিকের—অর্থাৎ ১৮১৩-১৪ থেকে প্রায় ১৮৬০ পর্যন্ত যে মেজাজ ছিল, সেটা বদলাতে আরম্ভ করেছে। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, রামমোহনের আমলের যথার্থ মেজাজটা মানব-স্বীকৃতির পরিপন্থী মেজাজ ছিল। ব্রাহ্ম-আন্দোলন যেমন সত্য, তার বিরোধী আন্দোলনও তেমনি ঐতিহাসিক সত্য। আমার মতে, দুই-ই ছিল মানব-স্বীকৃতির উদাহরণ।

খাওয়া-পরার কষ্টটাই সত্যিকার কষ্ট,—আর যা যা কষ্ট, সবই কোনো-না-কোনোরকম ভাববিলাস,—আমার মনে হয়েছিল যে, আনন্দ এইরকম একটা ধারণায় বাঁধা পড়েছে। তাই তাকে বলেছিলুম—মানুষের দুঃখ কি শুধু অর্থাভাবে, বস্ত্রাভাবে, অন্নাভাবেই আশ্রিত? অন্ন-বস্ত্রের অভাববোধই বেশি ব্যাপক বটে। অর্থ-ঘটিত বিপত্তিই সব চেয়ে পরিচিত। কিন্তু 'নীলদর্পণে'র রায়তদের জীবনে যেমন ঘটেছিল, সেই-রকম কষ্টই একমাত্র স্বীকার্য কষ্ট,—পৃথিবীতে আর কোনো রকম কষ্ট গ্রাহ্য নয়,—অথবা মানুষের আধ্যাত্মিক বেদনা,—তার ধর্মজিজ্ঞাসার যন্ত্রণা,—তার সৌন্দর্যের সন্ধান ইত্যাদি বিষয় নিতান্তই তার বিলাস,—এ রকম ধারণা মোটেই সমর্থন-যোগ্য নয়। ইতিহাসে বড়ো বড়ো ব্যক্তিত্বের এই ধরনের যন্ত্রণা সুকীর্তিত। রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যপিপাসা, বিবেকানন্দের বা সুভাষচন্দ্রের দেশপ্রেম, রামকৃষ্ণের ঈশ্বর-ব্যাকুলতা ইত্যাদি তো স্বতঃসিদ্ধ উচ্চপ্রসঙ্গ। আমরা মনে করি অসাধারণ লোকেদের পক্ষে এসব মানিয়ে যায়। আমরা ভাবি যে, লোকসাধারণের প্রসঙ্গে 'মানব-স্বীকৃতি' কথাটার তাৎপর্য শুধু শারীরিক-বৈষয়িক যন্ত্রণারই স্বীকৃতি। কিন্তু খুবই সাধারণ মানুষের মনেও যে ঐ রকম বিভিন্ন পিপাসা দেখা দিতে পারে—এবং উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে—রবীন্দ্রনাথের জন্মকালের কাছা-কাছি দু'-এক বছরের মধ্যে এই কলকাতাতেই একজন সাধারণ মানুষের জীবনে যে এরকম ব্যাপার ঘটেছিল, তারই এক খবর ছাপা হয় ১৭৮৫ শকের (১৮৬৩ খৃঃ) তত্ত্বোধিনী পত্রিকায়। 'সম্পাদক-সমীপেষু'—নিবেদনে পত্র-লেখক বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী যা লেখেন তার মর্মার্থ এই যে, কৃষ্ণনগর নিবাসী মধুসূদন লাহিড়ী নামে এক ব্যক্তি ব্রাহ্মমতে তাঁর পিতার আদ্যশ্রাদ্ধ পালন করবেন বলে মনস্থ করেন। তিনি কলকাতায় এসে বিজয়কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করেন। বিজয়কৃষ্ণ নিজে তাঁর ধর্মভাব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে ঐ বছর ২৮এ

দীঘা সৈকতে

কুন্তী ঘোষ

শঙ্কিত তটের গায়ে ঝরে পড়ে তামাটে বিকেল।
ঝাউবনে হাতছানি, হিসহিসে সাপিনীর ফণা
দুরন্ত উদ্দাম বুকে অনুক্ষণ ঘোরে গাঙচিল
পদচিহ্ন স্পষ্টতর ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত বালিতে
জলখেলা, ফিসফাস, ভঙ্গিমা, চারণা...... ॥

কলকাতা কত দূরে ? —অনেক অনেক।
ক্ষণিকই এখানে বড়, সাম্প্রতিকী ভুলে-থাকা জমাট সময়
শিকেয় রয়েছে তোলা আন্দোলন, অর্থাভাব, কলহ, সংশয়;
ঝড় আসে—হোটেলের ঘরে ঘরে, উঁচু উঁচু বালির পাহাড়ে
সিঁদুরে কাঁকড়া ছোটে অবিরাম বিপুলো বাহারে
মালান নেশায় মাতে অনাক্রান্ত অলৌকিক মন।
বিবর্ণ দেহশ্রী ঘিরে এ কেমন ফেনিল কৌতুক !

রহস্য

সুচেতা ভট্টাচার্য

বুকের গভীরে বসে কী অনন্ত ধ্যানের পাথেয়
ভাঙা-গড়া পৃথিবীর প্রচণ্ড অমোঘ আকর্ষণ
বুকের গভীরে বসে রহস্যের নির্বাক স্পন্দন
বুকের গভীরে বসে ক্রমশ অতল প্রদক্ষিণ।

কেন যে কান্নায় এত সুখ আছে কেন যে ধূসর
মুখের কোমল ছবি অশ্রুধারে দুর্বোধ্য প্রাচীন
অসম্পূর্ণতার ব্যথা তোমার প্রতিমা হয়ে ওঠে
প্রতিশোধ রক্তে ফোটে আগুনের দূর অভিষেক।

বুকের গভীরে বসে রক্তের সঞ্চার দৃঢ়তর
অঙ্কুরিত মহাবীজ অনুক্ষণ হৃদয়স্পন্দন।

অগ্রহায়ণ তাঁর পিতার শ্রাদ্ধের দিন স্থির করেন। নির্ধারিত দিনের আগের রাত্রে হঠাৎ কয়েকজন এসে দেখা দেন এবং মিথ্যা প্রয়োজনের অজুহাতে তাঁরা বিজয়কৃষ্ণের আশ্রয় থেকে মধুসূদনকে অন্যত্র ডেকে নিয়ে যান। মধুসূদন তাঁদের হাতে নানাভাবে উৎপীড়িত হন। পরদিন—"তিনি ক্ষত-বিক্ষত শরীরে ক্লেশে ও অনাহারে শীর্ণ" হয়ে ব্রাহ্ম বন্ধুদের কাছে ফিরে আসেন।৩

মধুসূদন লাহিড়ী নামে উনিশ শতকের সেই সাধারণ বাঙালী ভদ্রলোকটির এই ধর্মভাবের জোরও দেশ-কালের যৌগিক সত্য বলে মানতে হবে।

এই কাহিনী শুনে আনন্দ বললে—বিনয় ঘোষ মশায়ের 'সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র' বইখানির সবকটি খণ্ডই পড়ে নেওয়া দরকার। উনিশ শতকের বাঙালীর মানসিক আবহাওয়া ও-থেকে অনেকটা অনুভব করা যায়। আমি সেই বই থেকেই আর একটি কাহিনী বলছি শোনো। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সঙ্গে রামমোহনের প্রথম আলাপের বিবরণ ছিল ১৮৩৭ শকাব্দের (১৯১৫ খৃঃ) অগ্রহায়ণ সংখ্যার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়। বিনয়বাবু বিদ্যাবাগীশ সম্বন্ধে ঐ পত্রিকার ২১ সংখ্যায় প্রকাশিত (১৭৬৭ শক, ১ বৈশাখ) আরো এক বৃত্তান্ত তুলে দিয়েছেন। যাই হোক,—সে-কালের বাঙালীর জীবন-সত্যের নমুনা হিসেবে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের ফুল-তোলার গল্প মনে পড়ে।

এই বলে সে সংক্ষেপে ঘটনাটি শুনিয়ে দিলে—

প্রতিদিন সকালে দ্বারকানাথ ঠাকুরের বাগান থেকে পুজোর ফুল তুলতে আসতেন বিদ্যাবাগীশ। তখন তাঁর বয়স প্রায় পঁচিশ বছর,—অধ্যয়ন শেষ করে কলকাতায় বাস করছিলেন তিনি। দ্বারকানাথ তাঁকে রামমোহনের বাগানে যেতে বলেন। সে-পর্বে রামমোহন সম্বন্ধে বিদ্যাবাগীশের মনে খুবই রাগ ছিল। তিনি রামমোহনের নাম শুনেই রেগে উঠে অনেক কটু কথা বলেন। দ্বারকানাথ তবু অনুরোধ করায় ফুলের সাজি হাতে নিয়ে তিনি সেই বাগানে উপস্থিত হন। বাগানের যে-অংশে ফুল তোলা নিষিদ্ধ ছিল, সেই অংশে তাঁকে ফুল তুলতে দেখে, প্রহরী নিষেধ করে। বিদ্যাবাগীশ তাতে আবার রাগ করেন,—রামমোহনের বিরুদ্ধে আবার কটু কথা বলেন। এদিকে, রামমোহন সবই দেখেছিলেন,—সব কথাই তাঁর কানে পৌঁছেছিল। তিনি বিদ্যাবাগীশের কাছে গিয়ে তাঁর রাগের কারণ জিগেস করেন। অতঃপর ধর্ম সম্বন্ধে অনেকক্ষণ দুজনের মধ্যে তর্ক চলতে থাকে। শেষে—ফুলের সাজি ফেলে দিয়ে, বিদ্যাবাগীশ গুরু-সম্বোধনে রামমোহনের পায়ে লুটিয়ে পড়েন। দুজনে একসঙ্গে আহারে বসেন অতঃপর।

আনন্দ বললে—বেশ গল্পটি, কি বলো?

আমি বললুম—আর গল্প নয়, এইবার বাছাই শুরু করা যেতে পারে—তার আগে বাকি আছে কেবল কয়েকটি বিভাগের চিন্তা, বিষয়ের শ্রেণীবিন্যাস। কবিতা, প্রবন্ধ, রেখাচিত্র; গল্প, নাটক,—আমাদের এ আলোচনায় সব কি একযোগে দেখা দেবে, না কি আলাদা আলাদা? কীভাবে সাজালে পাঠকদের পড়তে অসুবিধা হবে না?

[ক্রমশ]

৩। সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র (২য় খণ্ড), পৃঃ ৫৩৪-৩৬—বিনয় ঘোষ সম্পা—

বঙ্গ দর্শন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সামগ্রিকভাবে শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে যে একটা ব্যাপক দুর্নীতি ও অনাচারের রাজত্ব চলছে, সেকথা পৃথক করে প্রমাণ করার বোধ হয় কোন প্রয়োজন নেই। এমন একটা সময় ছিল যখন বলা হত যে, সরকারের দুটো বিভাগই মাত্র কলুষমুক্ত—ডাক ও তার বিভাগ এবং শিক্ষা বিভাগ। কিন্তু আজ একথা কেউ বলবেন না। শিক্ষক-অধ্যাপকেরা আজ প্রশ্নের ঊর্ধ্বে নন। তাঁদের নানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা থাকলেও, একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, তাঁদের অনেকেই চরিত্রভ্রষ্ট ও আদর্শভ্রষ্ট হয়েছেন, শিক্ষার ক্ষেত্রকে সজ্ঞানে কালোবাজার করে তুলেছেন এবং নিজেরা দু'হাতে মুনাফা লুঠছেন। অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে এখনও কিছু কিছু শিক্ষক-অধ্যাপক আছেন, যাঁদের সততা ও কর্মনিষ্ঠা প্রশ্নাতীত, সকল বিভাগেই সেরকম মানুষ আছেন, কিন্তু অধঃপতনের সংক্রমণটা অধিকাংশের ক্ষেত্রেই ব্যাপকভাবে হয়েছে।

গত সপ্তাহের বঙ্গদর্শনে আমরা দু'টি বিষয়ের উল্লেখ করেছিলাম, যা থেকে এটা বোঝা যায় যে, শিক্ষাক্ষেত্রে অনাচার ও কালোবাজারী আজ কোন্ পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়েছে। প্রথম বিষয়টি ছিল বিভিন্ন কলেজে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার নাম করে কিভাবে বেয়ারাদের মারফৎ ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে টাকা আদায় করা হয় এবং কিভাবে অধ্যাপকেরা সেই টাকার ভাগ পান। দ্বিতীয় বিষয়টি ছিল, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষকদের প্রাইভেট টিউশন, কিভাবে কিছু কিছু বাস্তুঘুঘু বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষাটিকে নিয়ন্ত্রণ করে, কিভাবে নিজস্ব ক্যান্ডিডেটদের প্রথম শ্রেণী বিতরণ করা হয়, সে কাহিনী গত সংখ্যাতেই বলা হয়েছে। এই সেদিন রাজনীতি-বিজ্ঞানের স্নাতকোত্তর পরীক্ষার ফলাফলকে কেন্দ্র করে তুমুল কাণ্ড ঘটে গেল। টাকা খরচ করতে পারলে অনধিকারীও অক্লেশে পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করতে পারে, দু'-তিনজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপককে প্রাইভেট টিউটর হিসাবে রাখতে পারলেই হল। মাসে হাজার দেড় হাজার টাকা ইনভেস্ট করনেওয়ালা কালো টাকার মালিকের অভাব তো আজ নেই। এম, ডি, পরীক্ষার ক্ষেত্রে কি কাণ্ড যে ঘটে, তা এত বেশি বলা হয়েছে এই বঙ্গদর্শনের পাতায় যে, নতুন করে তা আর বলার প্রয়োজন নেই।

এই বাস্তুঘুঘুদের জাল সর্বত্র ছড়ানো এবং দেশে যতগুলি শিক্ষামূলক সংগঠন আছে, সর্বত্রই এই চেনা লোকগুলি বিরাজমান এবং বিভিন্ন এ-জাতীয় প্রতিষ্ঠানে অনুপ্রবেশের জন্য যে কোন পন্থা অবলম্বনে এরা পিছ-পা নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেট ও অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের নির্বাচনে যে ব্যাপক জালিয়াতি ও অনাচার ঘটেছিল, সে কাহিনী আজ আর কারো কাছেই অজানা নয়। সেই প্রসঙ্গে আমরা গত ১৯৬৮ সালের ২৭শে জুন তারিখের বঙ্গদর্শনে লিখেছিলামঃ "'আন্তর্জাতিক খ্যাতি-সম্পন্ন' সংস্কৃত কলেজে অনুষ্ঠিত একটি ঘটনা বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজের মুখে চুন-কালি লেপে দিয়েছে। আমরা জানতাম সাধারণ নির্বাচনের সময় চ্যাংড়া প্রকৃতির কিছু মানুষ বিভিন্ন দলের পাল্লায় পড়ে জাল ভোট দেয়। কিন্তু সেনেট ও অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের নির্বাচনে অধ্যাপক-ভোটাররাও যে জালিয়াতি করেন বা করতে পারেন, সেটা আমাদের ধারণার বাইরে ছিল। মৃত এবং ভারতে অনুপস্থিত অধ্যাপকেরাও এই কেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন।...... আর এটা ঘটল সংস্কৃত কলেজেই, যে কলেজ আবার নাকি ভারত-সংস্কৃতির পীঠস্থান। দেশে যুবকদের চরিত্র গঠনের দায়িত্ব যাদের ওপর ন্যস্ত, সেই উচ্চশিক্ষিত অধ্যাপকমহল দেশের সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বে অংশ গ্রহণের জন্য জালিয়াতির আশ্রয় নিতে যখন কুণ্ঠাবোধ করেন না, তখন বুঝতে হবে যে, শিক্ষিত সমাজে নীতিবোধ বলে আর কোন বস্তু অবশিষ্ট নেই, সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপকদের জাল ভোটে মত্ত হতে দেখে, এই ধারণাই দৃঢ় হয়।"

আমাদের এই মন্তব্য প্রসঙ্গে ১৯৬৮ সালের ৪ঠা জুলাই তারিখের সাপ্তাহিক বসুমতীতে জনৈক পত্রলেখক লিখেছিলেনঃ "আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজ যে কতদূর অধঃপতিত হয়েছে এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্ষমতা-লাভের জন্য শিক্ষিত মানুষেরা যে কতদূর নিচে নামতে পারেন, চুরি-জোচ্চুরি-জালিয়াতিরূপ মহাবিদ্যায় তাঁরা যে বাঘা বাঘা ক্রিমিনালদেরও টেক্কা দিতে পারেন, ক্ষমতালাভের কূটকৌশলের জন্য তাঁরা যে রাজনৈতিক নেতাদেরও গুরুপদে আসীন হতে পারেন এবং চ্যাংড়াসুলভ আচরণে তাঁরা যে রকবাজ ছোকরাদের লজ্জা দিতে পারেন, এ তথ্য বোধ হয় সাধারণ মানুষের জানা ছিল না...... আপনারা এ-ও সঠিক লিখেছেন যে, শিক্ষাজগতে এই অনাচার দীর্ঘকাল ধরেই প্রচলিত, তবে এক্ষেত্রে বিষয়টি বেয়াড়াভাবে ধরা পড়ে গিয়েছে। আমি যতদূর জানি, অন্যান্য শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানসমূহ এই শ্রেণীর জালিয়াতদের করায়ত্ত। উদাহরণস্বরূপ এশিয়াটিক সোসাইটির নাম করা যায়। সেখানকারও কর্মকর্তা নির্বাচনে এই রকম জালিয়াতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল, সেখানেও অনুপস্থিত সদস্যের নামে ভোট পড়েছে এবং সবচেয়ে যেটা মজার বিষয় সেটা হচ্ছে যে, সেখানকার নির্বাচিত কর্মকর্তাদের তালিকার দিকে তাকালে বোঝা যাবে আজ সংস্কৃত কলেজের এই কুকর্মের যাঁরা নায়ক তাঁরাই সেখানে জাঁকিয়ে বসে আছেন।"

এশিয়াটিক সোসাইটি সম্পর্কে পত্রলেখকের অভিমত অবশ্যই তাঁর নিজস্ব। এই ঐতিহ্যসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানটি সম্পর্কে বিরূপ আলোচনা করতে স্বভাবতই আমাদের একটু কুণ্ঠা আছে। কিন্তু ঐতিহ্য এক জিনিস এবং ঐতিহ্য ভাঙিয়ে খাওয়া আর এক জিনিস। তাই যখন দেখি যে, যে পুস্তকের উৎপাদন-ব্যয় তিন হাজার টাকার বেশি হতে পারে না এবং তার জন্য বারো হাজারেরও বেশি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে, তখন ঐতিহ্যের বদলে ঐতিহ্য ভাঙিয়ে খাওয়ার কথাটাই বিশেষ করে মনে হয়। এই বিষয়ে অনেক সদস্যই

আমাদের কাছে অভিযোগ করেছেন। শোনা যায়, এই প্রতিষ্ঠানের জনৈক কর্মকর্তা আজ বৎসরাধিককাল কার্যত বেকার আছেন।

আবার পুরাতন প্রসঙ্গে ফিরে আসা যাক। সংস্কৃত কলেজের ঐ কেচ্ছা প্রকাশিত হবার পর তদানীন্তন রাজ্যপালের নির্দেশে ছয়জন সেনেট সদস্যের নির্বাচন বাতিল হয়। ঐ কলঙ্কজনক কাহিনীর জনৈক নায়ক সম্বন্ধে তদানীন্তন শিক্ষা-সচিব যে কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্ট দিয়েছিলেন, তা আজ আর কারও অজানা নেই। তার পুনরাবৃত্তি করাও নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, এঁরা আজও বীরদর্পে বিচরণ করছেন এবং এঁদের বিরুদ্ধে এখনও পর্যন্ত কোন কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নি। তার কারণ হচ্ছে প্রথমত এঁরা সমাজের মান্যগণ্য ব্যক্তি। উচ্চপদস্থ সরকারী আমলাদের সঙ্গে এঁদের একত্রে ওঠা-বসা, হলায়-গলায় সম্পর্ক এবং দ্বিতীয়ত রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গেও এঁদের দহরম-মহরম আছে। আমরা সাধারণ মানুষ বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি যে, কিভাবে এঁদের মধ্যে কেউ কেউ মফস্বলে শাস্তিমূলক বদলির আদেশকে অগ্রাহ্য করে বৎসরাধিককাল ধরে কলকাতায় বসে নেপথ্যে কলকাঠি নাড়ছেন, এমন কি অনেকে রাতারাতি ভোল বদলে রীতিমত বৈপ্লবিক বামপন্থী হয়ে গেছেন। আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, যুক্তফ্রন্টকেও এঁরা কব্জার মধ্যে এনে ফেলেছেন, যুক্তফ্রন্টের সঙ্গে খুবই ঘনিষ্ঠ একজন ব্যারিস্টার জনৈক মন্ত্রীকে উক্ত ব্যক্তির পুনর্বাসনের জন্য ডি-ও লেটার দিচ্ছেন এবং আরও উন্নততর পদে বসিয়ে দেবার জন্য সুপারিশ করা হচ্ছে।

আমরা এই বিষয়ে দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, এই ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারের তরফ থেকে যে তৎপরতা আশা করা গিয়েছিল, তা কার্যত পাওয়া যাচ্ছে না। এ-বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও নিজ দায়িত্ব এড়াতে পারেন না, কারণ সেনেট ও অ্যাকাডেমিক কাউন্সিলের নির্বাচনের সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রত্যক্ষভাবেই সংশ্লিষ্ট এবং যে কলেজে উক্ত কুকর্ম অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেই কলেজও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকার মধ্যে পড়ে। হাওড়া জেলার একটি কলেজের অধ্যক্ষ সম্পর্কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটি বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে, কিন্তু এক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় আগাগোড়াই নির্লিপ্ত কেন?

বোদাই উচ্চ বিদ্যালয়

আমরা এই বঙ্গদর্শনে পূর্বে একবার লিখেছিলাম, এক অন্যায় দিয়ে আর এক অন্যায়ের প্রতিকার হয় না। কংগ্রেসী আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে দলীয় রাজনীতির স্বার্থে অনেক অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে ঐ রাজ্যে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়েছিল। কিছুদিন আগে একটি ইংরেজী দৈনিকে কয়েকটি বিদ্যালয়ের নাম দেওয়া হয়েছিল, যেগুলির শীর্ষে কিছু অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে চাপিয়ে দেবার অভিযোগ করা হয়েছিল, যে ব্যক্তিদের একটি বিশেষ পার্টির সদস্যপদ থাকা ভিন্ন আর কোন গুণ ছিল না। আমরা লিখেছিলাম যে, এই ঘটনা যদি সত্য হয়, তাহলে তা নিতান্তই পরিতাপের বিষয় হবে। সম্প্রতি বারাসত মহকুমার অন্তর্গত বোদাই উচ্চ বিদ্যালয়ে এমন একটি ঘটনা ঘটেছে, যা শিক্ষাক্ষেত্রে নোংরা পার্টিবাজির একটা উৎকট নিদর্শন। ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষক মহাশয় শ্রীঅনন্ত গিরিকে বলপূর্বক পদত্যাগ করানো হয়েছে। তাঁকে শুধু ঘেরাও-ই করা হয় নি, তাঁর ওপর শারীরিক হামলাও চালানো হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেছিলেন যে, এইভাবে বলপূর্বক পদত্যাগপত্র আদায় করলে তা গ্রাহ্য হবে না। বর্তমান ঘটনাটি সম্পর্কে তিনি কি বলবেন?

স্বাস্থ্যমন্ত্রী অনুসন্ধান করে দেখবেন কি?

স্বাস্থ্যদপ্তর সম্পর্কে অনেক অভিযোগ, জনৈক পদস্থ আমলার কুকীর্তি, বিভিন্ন জেলায় নিম্নের বহু কর্মচারীর অনাচারের বহু ইতিহাস আমরা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অবগতির জন্য ইতিপূর্বে বার বার বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করেছি। আমরা দুঃখের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, বারবার তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও তিনি কার্যকর কোন ব্যবস্থাই অবলম্বন করেন নি; উল্টে আমাদের এই সব লেখার পিছনে কোন স্বার্থের তাগিদ আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছেন। সে যাই হোক আমাদের কর্তব্য আমাদের অবশ্যই করে যেতে হবে এবং এবারেও আমরা স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে পূর্বের মতোই অনুরোধ করব যাতে বিষয়টির দিকে তিনি নজর দেন।

আমাদের বর্তমান কাহিনীর নায়ক একজন করণিক, যিনি দীর্ঘকাল ধরে স্বাস্থ্য অধিকারের প্রশাসন (অ্যাডমিনিস্ট্রেশন) শাখায় কাজ করছেন। শুনেছি, তাঁর কাজ হল প্রধানত নন-গেজেটেড মেডিক্যাল অফিসারদের নিয়োগ-বদলি-প্রমোশন সংক্রান্ত ফাইলগুলি দেখাশোনা করা। তাঁর স্ত্রী লাইফ ইন্সিওরেন্স কর্পোরেশনের একজন এজেন্ট, বলাই বাহুল্য স্বামীভদ্রলোকই স্ত্রীর হয়ে এই এজেন্সি চালান। নিয়োগ-বদলি প্রমোশন ইত্যাদির ব্যাপারে যাঁরা তাঁর কাছে আসেন, তাঁকে তিনি তাঁর স্ত্রীর কাছে মোটা অঙ্কের ইন্সিওরেন্স করতে বাধ্য করান, না করলে হয়রানি সুনিশ্চিত। এ ছাড়া নিয়োগ-বদলি-প্রমোশনের ব্যাপারে তাঁকে মোটা টাকা খাওয়াতে হয়, যার পরিমাণ দুশো থেকে পাঁচশো টাকার মধ্যে। এই সেদিনও তিনি লোয়ার ডিভিশন ক্লার্ক ছিলেন, ইতিমধ্যেই তিনি নাকি মধ্যমগ্রামে ভালো বাড়ি

আরও একজন নায়কের কথাও আমরা এখানে উল্লেখ করছি, ইনিও অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ব্রাঞ্চে করণিকের কাজ করছেন। একবার তাঁকে রাইটার্স বিল্ডিংসের বাইরে বদলি করা হয়েছিল, কিন্তু কতিপয় অফিসারের আগ্রহাতিশয্যে তাঁকে আবার স্বস্থানে ফিরিয়ে আনা হয়। ইনি প্রকাশ্যেই হেলথ অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়োগ ও বদলি এবং স্যানিটারী ইন্সপেক্টর ট্রেনিং-এর ব্যবস্থা করে দেবার জন্য মোটা টাকা নেন, তা ছাড়া ইনি কারো পরোয়া করেন না, তাঁর ব্যবহার ও চালচলন অত্যন্ত জঘন্য ও সন্দেহজনক। তাঁর পিছনে দুজন পদস্থ আমলা থাকাতে তাঁর বিরুদ্ধে বড় কেউ যেতে পারেন না। সম্প্রতি, অর্থাৎ গত ২রা জুলাই ল্যাবোরেটরি অ্যাসিস্ট্যান্ট, হেল্‌থ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রভৃতি পদের জন শিয়ালদায় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের হলে যে লিখিত পরীক্ষা হয়েছিল, সেখান থেকে এই ভদ্রলোককে পুলিশের সাহায্যে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। পরীক্ষার্থীরা প্রকাশ্যে সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও অবৈধ কার্যকলাপের অভিযোগ এনেছিলেন। এখানে তাঁর বিরুদ্ধে কোন কোন পরীক্ষার্থীর কাছ থেকে টাকা নেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। এই ব্যাপারে পরীক্ষার্থীরা এত উত্তেজিত হয়েছিলেন যে, পুলিশ প্রোটেকশন না দিলে আমাদের আলোচ্য ব্যক্তিটিকে সুস্থ অবস্থায় বাড়ি ফিরতে হত না।

এই দুটি সুনির্দিষ্ট অভিযোগ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে আমরা নিবেদন করলাম। আশা করি এক্ষেত্রে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে তাঁর বিশ্বস্ত সহকর্মীটি বাদ সাধবেন না।

কলকাতায় কবি জসিমউদ্দীন

কবি জসিমউদ্দীন কিছুদিনের জন্য কলকাতায় এসেছেন। পূর্ববাংলার

সাধনা
বিউটি স্নো-এর
কোমল স্পর্শে
সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়
সাধনা বিউটি স্নো
একটি অতি আধুনিক অঙ্গরাগ
ত্বক মালিন্যমুক্ত ও লাবণ্যযুক্ত করে। মুখশ্রীতে লালিত্যের ও তারুণ্যের আভা ফুটে ওঠে।
সাধনা ঔষধালয়, কলিকাতা-৫
SADHANA
Beauty

এই বর্ষীয়ান কবিকে কাছে পেয়ে এখানকার শিল্পী-সাহিত্যিকদের ভেতরেই শুধু নয়, সাধারণ মানুষদের মনেও এক অভূতপূর্ব প্রাণের সাড়া পড়েছিল। এর প্রমাণ পেয়েছি সম্প্রতি কবি সম্বর্ধনার দিনটিতে, যেদিন রবীন্দ্রসদনে আর তিলধারণের ঠাঁই ছিল না। সভায় অন্নদাশঙ্কর রায়, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কবিরা ছাড়াও নানা গুণিজনের সমাবেশ হয়েছিল। অন্নদাশঙ্কর রায় এবং বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় তাঁদের সংক্ষিপ্ত ভাষণে কবি জসিমউদ্দীন-কে স্বাগতম জানিয়ে আরো বলেন, তাঁরা শুধু এই বর্ষীয়ান কবিকেই হৃদয়ের সমস্ত প্রীতি ও শ্রদ্ধা উজাড় করে দিচ্ছেন না, কবির মাধ্যমে সমস্ত পূর্ববাংলার শিল্পী, সাহিত্যিক এবং সাধারণ মানুষকেও পশ্চিমবাংলার গভীর ভালবাসা নিবেদন করছেন। অন্যান্য বক্তাদের কণ্ঠেও এই একটিই প্রসন্ন আত্মীয়তার অনুভব যেন সমস্ত সভাটিকেই পবিত্র করে তুলেছিল। কবি জসিমউদ্দীন ভাষণ দিতে উঠেই রুদ্ধকণ্ঠে জানালেন যে, এতবড় সম্বর্ধনার যোগ্য তিনি নন, এই সম্পর্কে তিনি সজাগ; তিনি বুঝতে পারছেন, পশ্চিমবাংলার মানুষ আজ তাঁর মাধ্যমে সমস্ত পূর্ববাংলাকেই হৃদয়ের গভীর ভালবাসা নিবেদন করছেন। এ ভালবাসার বাণী তিনি ঠিকই স্বদেশে বহন করে নিয়ে যাবেন। দেশ ভাগ হয়ে গেলেও ভাষাকে ভেঙে টুকরো করা যায় না (যে কথা বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় আগে বলেছিলেন)। পূর্ববাংলার সাম্প্রতিক সাহিত্য সম্পর্কেও তিনি সংক্ষেপে একটি সুন্দর ভাষণ দিলেন। কিন্তু তিনি আমাদের একটি পিপাসা তাঁর ভাষণে সম্পূর্ণই অতৃপ্ত রাখলেন। পূর্ববাংলার কবিদের সম্পর্কে, সেখানকার সমকালীন কবিতা আন্দোলন সম্পর্কে কবি তাঁর ভাষণে একটি শব্দও উচ্চারণ করেন নি; যদিও প্রবীণ কবিয়ালদের প্রশংসায় সংগতভাবেই তিনি বারবার উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন।

কবির ভাষণে এই একটি অসম্পূর্ণতা ছাড়া এবং সভার মঞ্চে অত্যধিক ভিড়ের অশোভনতাকে বাদ দিলে এইদিনের অনুষ্ঠান আমাদের কাছে অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং দীর্ঘকাল মনে রাখবার মত বলে মনে হয়েছে।

মুহম্মদ আবদুল হাই

দুই বাংলার আধুনিককালের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে মুহম্মদ আবদুল হাই একটি অবিস্মরণীয় নাম। তাঁর আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ তাই বিনা মেঘে বজ্রাপাততুল্য। গত ৩রা জুন মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে ঢাকার খিলগাঁও অঞ্চলে ট্রেন কাটা পড়ে ঘটনাস্থলেই তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। সুগভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী বাংলা ভাষাতাত্ত্বিকের অকাল-তিরোধানে বঙ্গভারতীর অপরিমেয় ও অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হল। এমন উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা নয়।

গৌরবোজ্জ্বল এমন জীবন বিরল। তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন অসাধারণ মেধাবী ছাত্র ছিলেন মুহম্মদ আবদুল হাই। জন্মস্থান মুর্শিদাবাদের মরিচা নামে অখ্যাত এক গ্রামে। শিক্ষালাভ করেন রাজশাহী ও ঢাকায়। আপন প্রতিভার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছেন প্রতিটি পরীক্ষায়। তিনিই প্রথম মুসলমান ছাত্র যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় বি-এ অনার্স ও এম-এ-তে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন।

ভাষাতত্ত্বের ওপর জন্মালো তাঁর অদ্ভুত আসক্তি। বলতে গেলে সমস্ত জীবন ভাষাতত্ত্ব নিয়েই কাটিয়েছেন। উচ্চতর গবেষণা করেন লণ্ডন ভাষাতত্ত্ব বিভাগে অধ্যাপক ফার্থ-এর সহকারী হিসাবে। তাঁর মৌলিক ও মূল্যবান গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল। 'Nasals and Nasalization in Bengali.'

বাংলা ভাষাকে প্রাণ থেকে ভালবেসেছিলেন বলে অধ্যাপনার সুমহান ব্রতে আত্মনিয়োগ করেন। চট্টগ্রাম, রাজশাহী ছাড়াও কয়েক বছর কৃষ্ণনগর কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন ১৯৪৯ খৃস্টাব্দে। মৃত্যুকালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন।

অধ্যাপক হাই সৃজনশীল-শক্তির অধিকারসম্পন্ন এক বিশিষ্ট প্রতিভা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তাঁর মূল্যবান গবেষণা উভয়বঙ্গেরই সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি লাভ করেছে। তাঁর সম্পাদিত 'সাহিত্যপত্র' পত্রিকায় বাংলা সাহিত্য, ইতিহাস, বিজ্ঞান ইত্যাদি সম্পর্কে নিজের এবং উভয়বঙ্গের কবি, সাহিত্যিক, সমালোচকদের বহু তথ্যপূর্ণ মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। এরকম একটি পত্রিকা বাংলা ভাষায় বিরল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগকে তিনি প্রাণোচ্ছল করে তুলেছিলেন। তাঁর পরিচালনাধীনে নতুন নতুন গবেষণাকর্মে তাঁর ছাত্র ও অনুচরবর্গ আত্মনিয়োগ করেছিলেন। তাঁরই একাগ্র উৎসাহে ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ প্রতিপালিত হত—এতে জনসাধারণ ভাষা ও সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ বিষয়ে অবহিত হতেন। পূর্ববঙ্গে বাংলা অভিধান রচনায় অংশ গ্রহণ করেছেন। অক্লান্ত পরিশ্রমে ইউনেসকোর বদান্যতায় প্রধানত লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য, লোকশিল্প ইত্যাদি নিয়ে 'Traditional Culture in East Bengal'. নামে এক সঙ্কলন গ্রন্থ প্রকাশ করেন। পূর্ববঙ্গের ভাষা ও সাহিত্য আন্দোলনে তাঁর অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

অধ্যাপক হাই-এর উল্লেখ্য রচনাবলীঃ 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি', 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', 'ভাষা ও সাহিত্য', 'ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিতত্ত্ব', 'মধ্যযুগের বাংলা গীতি কবিতা' ইত্যাদি।

মুহম্মদ আবদুল হাই ও আবদুল শরীফ সম্পাদিত 'মধ্যযুগের বাংলা গীতি-কবিতা' (১৯৬১) গ্রন্থে বহু জানা-না-জানা মুসলমান গীতিকার ও ফকিরের উল্লেখ করেছেন, যাঁরা লিখেছেন চৈতন্য-বিষয়ক ও শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক পদ, বৈষ্ণব ও শাক্তপদাবলী ও বাউলগীতি। অসাধারণ শ্রমের নিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় গ্রন্থটিতে। সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় অধ্যাপক হাই বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন মুসলিম কবি সাহিত্যিকদের কথা। হয়তো অনেক সময় তিনি একদেশদর্শী না হয়ে পারেন নি। এর জন্যে তাঁকে সমালোচনাও সহ্য করতে হয়েছে। 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত' (আধুনিক যুগ) (১৯৬১) রচনা করেছেন মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান। এই পুস্তকটির আলোচনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী সাহিত্যের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসায়েন বলেন, 'বিভাগোত্তর সাহিত্যের আলোচনায় মুহম্মদ আবদুল হাই ও আলী আহসান ঐতিহাসিকোচিত সংযমের ততটা পরিচয় দেন নি, যতটা দিয়েছেন স্বদেশপ্রীতি জনিত ভাবপ্রবণতার। ঐ সমালোচনা মনে রেখেও এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে, অনেক মুসলিম লেখক এতাবৎ ইতিহাসের সুবিচার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। এদিক থেকে অধ্যাপক হাই-এর গবেষণা ভারসাম্য বজায় রাখায় সাহায্য করবে।

রবীন্দ্রনাথকে গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে বহুবার বহুরকমে তিনি স্মরণ করেছেন। বাংলাভাষার ইতিবৃত্ত গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের অপরূপ মূল্যবান সাহিত্য পাঠক মাত্রেরই শ্রদ্ধার উদ্রেক করে।

বাংলাভাষা ও বাঙালীকে তিনি ভালবেসেছিলেন। বাংলাভাষা ও বাঙালীর মনের মণিকোঠায় তাঁর আসন পাতা থাকবে। আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ ও বন্ধুবান্ধবদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

ভারত দর্শন

পক্ষে-বিপক্ষে

বাঙ্গালোরে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন আছে সর্বশ্রী কামরাজ, চ্যবন, জগজীবন রাম, স্বর্ণ সিং ও ফকরুদ্দিন আলি আমেদ প্রমুখের।

আর মোরারজী দেশাইয়ের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ প্রথার প্রধান সমর্থক সর্বশ্রী পাতিল, নিজলিঙ্গাপ্পা, রামসুভগ সিং। পাতিলের আর এক জবরদস্ত সমর্থক গুপ্ত-কান্ড খ্যাত শ্রীযুত সি বি গুপ্ত মহাশয়। এঁরা দল-ভাঙতে রাজী, গররাজী ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ প্রস্তাব গ্রহণে। মোরারজী সাহেব যত-না মুখ খুলেছেন, থমথমে গাম্ভীর্য প্রকাশ করেছেন তার চেয়ে ঢের বেশি।

'নোট'টা কি?

প্রধানমন্ত্রীর নোটটি সংবাদপত্রে এই-ভাবে সংক্ষেপিত আকারে পাওয়া যাচ্ছে।

১॥ কোম্পানীর অনুৎপাদক ব্যয় ও প্রত্যক্ষ খরচাদির সীমা নির্ধারণ। ২॥ উপযুক্ত ব্যক্তির কর্মোদ্যোগ যাতে বাড়ে রাষ্ট্রীয়করণের আওতাভুক্ত আর্থিক সংস্থাগুলির ঋণদান ব্যবস্থাকে তদনুপাতে পরিবর্তিত করার প্রয়োজন। ৩॥ অনধিক উন্নত অঞ্চলে শিল্পোদ্যোগে আর্থিক সাহায্যদান। ৪॥ একচেটিয়া কমিশনের শীর্ষে ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির নিয়োগ। ৫॥ সরকারী উদ্যোগে তরুণ-তরদের নিয়োগ ও অধিকতর প্রশাসনিক ক্ষমতা দানের ব্যবস্থা। ৬॥ সরকারী উদ্যোগে বিশেষ শ্রেণীর কর্মচারী সংস্থা গড়ার চেষ্টা। ৭॥ নতুন প্রতিভার নিয়োগ পথে বাধা অপসারণ। ৮॥ স্থানীয় শিল্প-কুশলী পাওয়া গেলে সেক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহায্য প্রবেশে নিষেধারোপ। ৯॥ অধিকাংশ ভোগ্যপণ্য শিল্পকে ক্ষুদ্র শিল্পের আওতাধীন করা এবং সেখানে বৃহৎ ব্যবসায়ের খবরদারি নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। ১০॥ কৃত্রিম ঘাটতি সৃষ্টিকারী ব্যবসায়ীদের জন্য কঠোর শাস্তির বন্দোবস্ত করতে হবে। ১১॥ গ্রামাঞ্চলে কৃষি-সমবায় গঠন। ১২॥ খামার সমবায় এবং কৃষকগণ যাতে কৃষিভিত্তিক ও অপরাপর শিল্পের দায়িত্ব গ্রহণে সক্ষম হন, সেজন্য উপযুক্ত পরিবেশ গঠন করতে হবে। ১৩॥ ক্ষুদ্র সেচ-প্রকল্পাদির উন্নয়নের দিকে বিশেষ নজর রাখতে হবে।

উপরোক্ত তের দফার ক্রমান্বয় প্রযুক্তিকরণের সম্ভাব্য উপায়গুলি বার করা ছাড়াও প্রধানমন্ত্রী যে কয়েকটি বিতর্কিত প্রস্তাব অধিবেশনের মাত্র চব্বিশ ঘণ্টা আগে পাঠিয়ে কংগ্রেসের দক্ষিণী চক্রকে কর্তব্যবিমূঢ় করেছিলেন, সেগুলি হ'ল: ১। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ। সরকারী ঋণপত্রে ব্যাঙ্কের আইনসম্মত লগ্নীর সীমা বৃদ্ধি।

বাঙ্গালোর অধিবেশনে
প্রধানমন্ত্রীর নোট

এ সম্পর্কে—

কামরাজ: আমি খুশি।

পাতিল: আমাদের আপোষ করতে হল। দল ভাঙুক। চাই না।

নিজলিঙ্গাপ্পা: প্রধানমন্ত্রীর নোটটি ওয়ার্কিং কমিটিতে বিবেচনার বাধ্য-বাধকতা নেই। কারণ ঐ নোট না এ-আই-সি-সি, না ওয়ার্কিং কমিটি কাউকে সম্বোধন করেই লিখিত হয় নি।

অভিনন্দন: তরুণ তুর্ক কংগ্রেস গোষ্ঠী এবং সারা ভারত ব্যাঙ্ক কর্মচারী ফেডারেশনের সভাপতি প্রধানমন্ত্রীর নোটটিকে স্বাগত জানিয়ে এ-আই-সি-সি'র সমর্থনের জন্য আবেদন ও প্রচার শুরু করেন।

প্রধানমন্ত্রী: নোটটি গ্রহণ করা অপেক্ষা দলকেই ভেঙে দেওয়া শ্রেয়—পাতিল সাহেবের এহেন ভীতি প্রদর্শনের পাল্টা জবাবে শ্রীমতী গান্ধী বলেন: **আমি চাই ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ প্রস্তাব কার্যকরী করা হোক।**

২। একচেটিয়া পুঁজির ক্ষমতা খর্ব করা ও শ্রমিকদের মুনাফার ভাগ দেওয়ার জন্য শিল্প লাইসেন্স নীতির ব্যাপক পরিবর্তনের প্রস্তাব।

৩। শিল্পের কাঁচা মাল জাতীয়করণ।

কংগ্রেস অধিবেশনের চেহারা

এই প্রথম কংগ্রেস অধিবেশনের চেহারা এক অভিনব রূপ পরিগ্রহ করেছিল। দোর্দণ্ডপ্রতাপ সিণ্ডিকেট প্রধানমন্ত্রীর নোটের উত্তাপে শুকিয়ে গেছে। যে পাতিল সর্বদাই লাঠি ঘোরাতে অভ্যস্ত তিনিও কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলেন। শেষে ভাঙি তো—মচকাই না-ভাবে বললেন, পাছে দল ভাঙে তাই, আপোষে আসতে হ'ল। আপোষ মানে প্রধানমন্ত্রীর নোটটিকে গুরুত্ব দিতেই হয়েছে মোরারজী পাতিলেব বিমর্ষ বিরোধিতা সত্ত্বেও। তবে শ্রীমতী গান্ধীর নোটেও আপোষের অবস্থার ভূমিকা আগে থেকেই রক্ষা করা হয়েছিল। তিনি সব ক্ষেত্রেই বলেছেন যদি এটা হয় তো ভালোই, যদি না হয় তবে তার জন্য আবও একটু নরম পথ-সন্ধান কবতে হবে। ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ হলে প্রধানমন্ত্রী খুশি, আবার এখনই তা সম্ভব না হলে অন্তত লগ্নীর ব্যাপাবে সরকারী সংস্থাব জন্য সম্পদ জমাভাণ্ডারে রাখা দরকার।

শেষে বিতণ্ডার ইতি করতে চ্যবন সাহেবকেই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন মহলের সঙ্গে আপোষ আলোচনান্তে ইনি আর একটি প্রস্তাব দাঁড করিয়েছেন যা হাই কমাণ্ডে অনুমোদিত হয়েছে আর স্বয়ং দেশাই প্রস্তাবক হয়েছেন। প্রস্তাবের এক জায়গায় প্রধানমন্ত্রীর নোটে উল্লিখিত বিভিন্ন বিষয়গুলির দ্রুত রূপায়ণের জন্য, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলিকে ব্যবস্থা অবলম্বনে আগ্রহী হতে অনুরোধ করা হয়েছে। কী ব্যবস্থা তাঁরা গ্রহণ করবেন সে সম্পর্কে এ-আই-সি-সি'কে অবহিত রাখার নির্দেশও দেওয়া আছে। কিন্তু শ্রীদেশাই-এর

অনুরোধে কোন নির্দিষ্ট সীমারেখা বেঁধে দেওয়া হয় নি। অর্থাৎ ইচ্ছে করলেই প্রস্তাবগুলিকে বিশ বাঁও জলে ডোবাতে কোন সরকারেরই অসুবিধে হবে না। এ আই সি সি-র কথামৃত যেমন এতোকাল বহুক্ষেত্রেই কাগজ-কালি-বন্দী হয়ে আছে তেমনিই থাকবে। কোনও সোনার কাঠির স্পর্শে সেই বন্দিনী কন্যার কোনদিন ঘুম ভাঙবে কিনা তারও স্থিরতা রইল না।

মোরারজীর জয়

দেশাই সাহেব সুতরাং প্রধানমন্ত্রার ওপরও এক হাত নিলেন। অবশ্য এ সবই ওঁরা এখন মিলেমিশে তৈরি করে নিলেন। কারণ ইচ্ছে থাকলে সবগুলিই ত্বরান্বিত করার নির্দেশ রাখা যেত। ছিলও। প্রস্তাবে ছিল, এ আই সি সি-র পরবর্তী অধিবেশনেই জানাতে হবে কাজ কোথায় কেমন এগোলো। কিন্তু সেই সংকল্পে বাধা হয়ে দাঁড়ালেন কায়েমী স্বার্থের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ রক্ষক শ্রীযুত মোরারজী দেশাই, উপ-প্রধান তথা অর্থমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর নোটও অবশ্য ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণে নাছোড়বন্দা ছিল না। এটা না হলে ওটার ধোঁকা বর্তমানই ছিল। তিনি চেয়েছিলেন, রাষ্ট্রীয়করণে অসুবিধা হলে দেশাই সাহেবের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ যেন কঠোরভাবেই প্রয়োগ করা হয়। দেশাই বলেন, শ্রীমতী গান্ধীর অধিকাংশ প্রস্তাব নিয়ে ইতিমধ্যেই কাজ হয়েছে।

সুতরাং বলতে গেলে বিমর্ষ মোরারজীরই জিত হয়েছে যদিও প্রচার এই যে, ইন্দিরা গান্ধী বাজিমাৎ করলেন।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থী মনোনয়ন

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে শ্রীমতী গান্ধীর ৪—২ ভোটে পরাজয় হয়েছে। বৈষয়িক নীতি নিয়ামক কার্যসূচী অকস্মাৎ সিন্ডিকেটের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার জন্য শ্রীমতী গান্ধীকে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী মনোনয়নের আসরে সমুচিত জবাব দেওয়ার প্রেরণাটা খুব প্রচণ্ডভাবেই অনেককে নাড়া দিয়েছিল বলে কারোও কারোও ধারণা।

চ্যবন কামরাজকেও এক্ষেত্রে দলে পান নি প্রধানমন্ত্রী।

সি পি বি ৪—২ ভোটে শ্রীমতী গান্ধীর সমর্থিত প্রার্থী শ্রীজগজীবন রামকে খারিজ করে সঞ্জীব রেড্ডীকে রাষ্ট্রপতিরূপে বরণে ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

সঞ্জীব রেড্ডির সমর্থনে ভোট দান করেন সর্বশ্রী কামরাজ, চ্যবন এবং পাতিল-মোরারজী। শ্রীআমেদ ও শ্রীমতী গান্ধীর ভোট পড়ে জগজীবন রামের পক্ষে।

রাষ্ট্রপতি পদে মনোনয়ন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর নোটের ওপর তৈরি করা জোড়াতালি আবার ফেঁসে গেল। প্রধানমন্ত্রী স্পষ্টতই অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ। সুতরাং তিনি কীভাবে পরিস্থিতির মোকাবিলা করবেন সিন্ডিকেটকে তা ভাবিত করে তুলেছে। প্রধানমন্ত্রী কি প্রশ্নটা অতঃপর পরিষদীয় দলের সামনে রাখবেন? না-কি তিনি জনসাধারণের দরবারেই হাজির করবেন তাঁর বক্তব্য। সাধারণের সামনে অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে শ্রীমতী গান্ধীর ইমেজই অপেক্ষাকৃত ভালো। তাছাড়া কয়েকটি বিরোধী দলেরও মূক সমর্থন তাঁর প্রতি বর্তমান। সুতরাং সিন্ডিকেট প্রধানমন্ত্রীর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত সন্দেহ নেই।

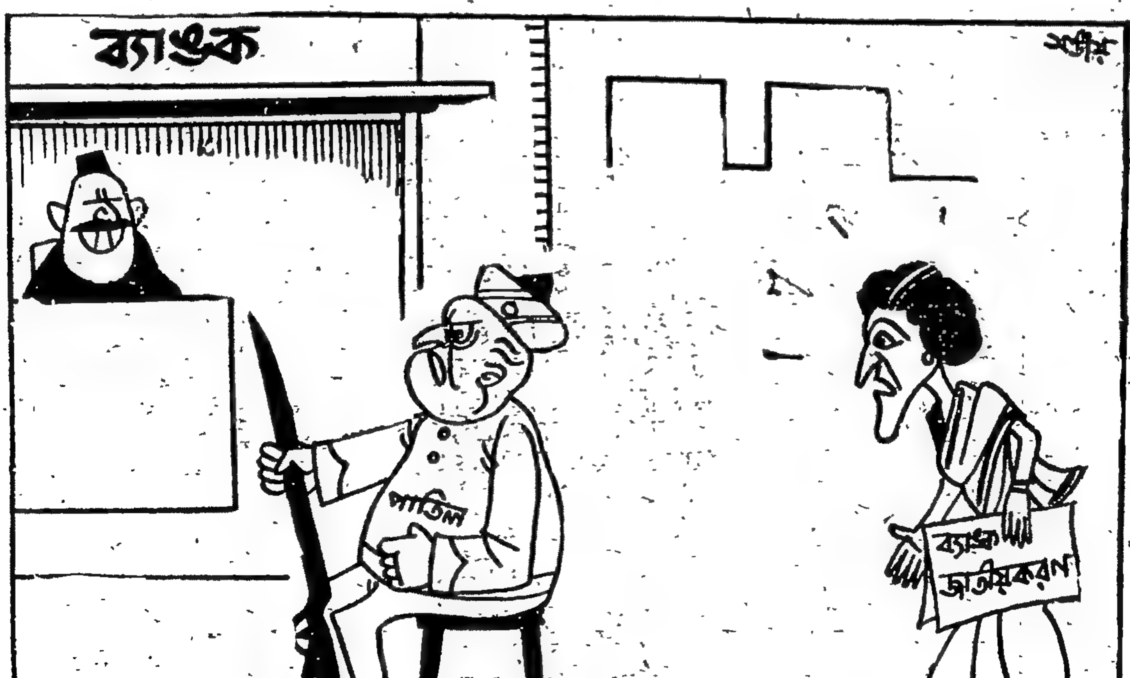

আন্তর্জাতিক

টম এমবয়ার হত্যার পরে নাইরোবির ক্যাথি ড্রেলে বিশেষ উপাসনার সময় সমবেত দশ হাজার লিও উপজাতি কিকুয়ুদের ওপর হামলা করে। পুলিশ কে কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে বিক্ষোভ দমন করতে হয়।

সোভিয়েট য়ুনিয়ন :

চীন আবার সোভিয়েট সীমান্ত লংঘন করেছে।

৯ই জুলাই মস্কো থেকে প্রচার করা হয়েছে যে, ৮ই জুলাই সকালে সাইবেরিয়ার আমুর নদীর গোলডিনস্কি দ্বীপে চীনা সৈন্য প্রবেশ করে আক্রমণ চালিয়েছে। এই আক্রমণের ফলে একজন সোভিয়েট নাগরিক নিহত হয়েছে, ৩ জন আহত হয়েছে, এবং দুটি লঞ্চ নষ্ট হয়েছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, কয়েকজন সোভিয়েট নাবিক খাবারভস্ক থেকে ১১৪ কিলোমিটার উজানে গোলডিন্স্কি দ্বীপে আলোকস্তম্ভের মেরামতির কাজ করছিল, তখন অতর্কিতভাবে সশস্ত্র চীনা সৈন্য সোভিয়েট এলাকার মধ্যে ঢুকে পড়ে বেপরোয়া গুলী চালায়।

সোভিয়েট য়ুনিয়নের পক্ষ থেকে চীনের কাছে এই আক্রমণের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এক কড়া নোট পাঠানো হয়েছে। সোভিয়েটের পক্ষ থেকে এই আক্রমণকে নিছক 'দস্যুতা' বলে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং সোভিয়েট য়ুনিয়নের বিরুদ্ধে চীনের এই 'সর্বনাশা উস্কানি' সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে। এই ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের শাস্তি দাবি করা হয়েছে সোভিয়েট নোটে।

১০ই জুলাই সোভিয়েট য়ুনিয়নের কেন্দ্রীয় আইনসভা সুপ্রীম সোভিয়েটে ভাষণ দিতে গিয়ে সোভিয়েট য়ুনিয়নের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্দ্রে গ্রোমিকো চীনের প্রতি কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলেছেন, চীন কর্তৃক সোভিয়েট য়ুনিয়নের আন্তর্জাতিক সীমানা লঙ্ঘন করার অপচেষ্টা তাঁরা কিছুতেই সহ্য করবেন না। সোভিয়েট নাগরিকদের নিরাপত্তার ওপর এটি একটি জঘন্য আঘাত. এই মন্তব্য করেছেন গ্রোমিকো। গ্রোমিকো আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ওপর সুপ্রীম

লিন পিয়াও

সোভিয়েটে তাঁর দুই ঘণ্টা ব্যাপী ভাষণে এই কথা বলেন।

অপরদিকে আবার ঠিক বিপরীত কথা বলা হচ্ছে চীনের পক্ষ থেকে। ৯ই জুলাই তারিখেই 'পিকিং রেডিও' থেকে বলা হয়েছে, সোভিয়েট য়ুনিয়নের সশস্ত্র বাহিনী, নৌ-বাহিনী বিমানবাহিনী একযোগে চীনের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে।

ঘটনার চীনা ভাষ্য হল নিম্নরূপ :

৮ই জুলাই তারিখে সকাল ৮-৩০টা নাগাদ চীনের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে হেলুংকিয়াং প্রদেশে চীনের আঞ্চলিক সাগরে সোভিয়েট সৈন্যরা জোর করে প্রবেশ করে, এবং আমুর নদীর ওপর একটি চীনা দ্বীপে গুলীবর্ষণ করে। নৌকো করে সোভিয়েট সৈন্যরা আক্রমণ করতে চায়। সোভিয়েট সৈন্যদের আক্রমণে কয়েকজন চীনা অধিবাসী হতাহত হয়েছে। অবশ্য পরে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে চীনেরাও গুলী চালায়।

চীনের পক্ষ থেকে পিকিং-এর সোভিয়েট দূতাবাসে এক কড়া নোট পাঠানো হয়েছে। চীন এই আক্রমণকে সোভিয়েট য়ুনিয়নের নগ্ন 'সামরিক উস্কানি' বলে বর্ণনা করেছে।

চীনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও মাও সে-তুং-এর উত্তরাধিকারী লিন পিয়াও সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক

লিওনিদ ব্রেজনেভের কঠোর সমালোচনা করে বক্তৃতা করেছেন। আলবানিয়ার জাতীয় দিবস উপলক্ষে বক্তৃতা করতে গিয়ে লিন পিয়াও বলেছেন, মস্কোয় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত বিশ্ব কমিউনিস্ট সম্মেলনে ব্রেজনেভ চীন ও আলবানিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণের চক্রান্ত করেছেন। লিন পিয়াও-এর মতে, এই সম্মেলনের পরই সোভিয়েট কর্তৃক চীনের ওপর নতুন আক্রমণ বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

উসুরির ঘটনার সামান্য দিন পরে আমুরের এই ঘটনা প্রমাণ করছে, চীন ও সোভিয়েট য়ুনিয়নের মধ্যে সামরিক উত্তেজনা এখনও পূর্ণমাত্রায় বজায় রয়েছে। আরও খবর বেরিয়েছে, সোভিয়েট য়ুনিয়ন সাইবেরিয়া সীমান্ত বরাবর সৈন্যসংখ্যা বৃদ্ধি করেছে।

আরও চিন্তার কথা, আমুর নদীতে সোভিয়েট য়ুনিয়ন ও চীনের পক্ষ থেকে যুক্তভাবে নৌ-পরিবহন ব্যবস্থা পরিচালনার বিষয়ে উভয় দেশের প্রতিনিধিরা খাবারভস্কে যে আলোচনা সুরু করেছিলেন, সেই আলোচনা ভেঙে গিয়েছে।

এখন এখানে বিরোধ থাকবে, এবং নিত্য নতুন সংঘর্ষ দেখা দেবে।

কেনিয়া :

টম এম্‌বয়ার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে।

কেনিয়ার বিশিষ্ট নেতা এবং উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক পরিকল্পনামন্ত্রী টম এম্‌বয়ার হত্যার সংবাদে সর্বত্র যেমন শোকের ছায়া নেমেছে, তেমনি এই হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে নানাস্থানে উপজাতীয় সংঘর্ষ সুরু হয়েছে। দেশব্যাপী ব্যাপক গৃহযুদ্ধের আশংকাও উড়িয়ে দেয়া যায় না।

টম এম্‌বয়া কেনিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম লিও উপজাতির সঙ্গে যুক্ত। সংখ্যাগরিষ্ঠ কিকুয়ু উপজাতির অধিকাংশ টম এম্‌বয়ার বিরোধী।

কেনিয়ার একচ্ছত্র নেতা রাষ্ট্রপতি জেমো কেনিয়াট্টার বয়স হয়েছে। বর্তমানে তাঁর বয়স ৭৩। তার ওপর তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থ। স্বভাবতই প্রশ্ন উঠেছে, কেনিয়াট্টার পর কে?

অনেকেরই ধারণা, টম এম্‌বয়া কেনিয়াট্টার স্থলাভিষিক্ত হবেন। এম্‌বয়ার জনপ্রিয়তা, তাঁর সংগঠন-ক্ষমতা এবং সর্বোপরি তাঁর তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি—এ সবের সঙ্গে কোন কিকুয়ু নেতার পেরে ওঠা শক্ত। সরকারী দল কেনিয়া আফ্রিকান ন্যাশনাল য়ুনিয়ন বা 'কানু'র সাধারণ সম্পাদকও এম্‌বয়া। সংগঠিত শ্রমিক আন্দোলনও মোটামুটি এম্‌বয়ার পক্ষে। তাছাড়া তিনি স্বয়ং জেমো কেনিয়াট্টার আস্থাভাজন। কেনিয়াট্টা নিজে কিকুয়ু উপজাতির হওয়া সত্ত্বেও এম্‌বয়ার প্রতি তাঁর অগাধ বিশ্বাস। এম্‌বয়ার মৃত্যুর পর সজল চোখে এই বৃদ্ধ নেতা বলেছেন, 'টম এম্‌বয়ার মৃত্যুতে কেনিয়া, আফ্রিকা তথা বিশ্বের ক্ষতি হল।'

তাই কিকুয়ু নেতাদের ভয়, নির্বাচনে টম এম্‌বয়া জয়লাভ করবেন, এবং পরবর্তী রাষ্ট্রপতি তিনিই হবেন। এম্‌বয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী বর্তমান উপরাষ্ট্রপতি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ড্যানিয়েল আরা মই এবং তাঁর সমর্থকরা কিছুতেই এ জিনিষ হতে দিতে পারেন না।

শোনা যাচ্ছে, প্রায় এক বছর ধরে এম্‌বয়াকে হত্যার চক্রান্ত চলছিল। এম্‌বয়া নিজেও এ কথা জানতেন।

হত্যাকারীকে এখনও ধরা যায় নি। তবে এম্‌বয়ার সমর্থক ও লিও উপজাতির লোকেদের ধারণা, কিকুয়ু উপজাতির কয়েকজন নেতার চক্রান্তের ফলেই এম্‌বয়া নিহত হয়েছেন।

শোকবিহ্বল লিওদের ক্ষোভ কিকুয়ু-বিরোধী ক্রোধের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পাচ্ছে। হত্যার তিন দিন পরে ক্যাথিড্রেলে বিশেষ উপাসনার সময় সমবেত দশ হাজার লিও উপজাতি কিকুয়ুদের ওপর হামলা করে। বিক্ষোভকারীরা জোমো কেনিয়াট্টাকেও ছেড়ে কথা বলে নি। শেষ পর্যন্ত কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে বিক্ষোভ দমন করতে হয়।

কিকুয়ু ও কালেন্‌জি উপজাতি একজোট হয়েছে। ড্যানিয়েল আরা মই ছাড়া প্রতিরক্ষামন্ত্রী এন্‌জোরোজ মুংগাই ও অ্যাটর্নি-জেনারেল চার্লস এনজোনজো এই লুওবিরোধী জোটের নেতা।

কিন্তু কিকুয়ু-কালেন্‌জি উপজাতি-গোষ্ঠীর হাতে যদি লুওরা নিগৃহীত হতে থাকে, তাঁদের ন্যায্য দাবি থেকে তারা বঞ্চিত হয়, তাহলে শেষ পর্যন্ত পৃথক রাষ্ট্রের দাবি উঠবে। আগেও এই দাবি উঠেছিল। ভবিষ্যতে আরও জোরের সঙ্গে এই দাবি উঠতে পারে।

যুগোশ্লাভিয়া :

৫১টি জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের প্রায় ১৫০ জন প্রতিনিধি ৪ দিন ধরে বেলগ্রেডে এক পরামর্শসভায় মিলিত হয়েছিলেন। ১২ই জুলাই এই বৈঠক শেষ হয়েছে।

আলোচনা শেষে সবাই একমত হয়ে ঘোষণা করেছেন, জোটনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলির আর একটি শীর্ষ সম্মেলন আহ্বান করা হবে। সম্মেলনের তারিখ ও স্থান ঘোষণা না করা হলেও শীঘ্রই এই সম্মেলন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। নেপাল প্রস্তাব করেছে, নয়াদিল্লীতে এই জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন হোক। এই প্রস্তাবের উত্তরে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতা শ্রী টি এন কাউল বলেছেন, নির্দিষ্টভাবে এই প্রস্তাব এলে ভারত নিশ্চয়ই তা গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করবে। মনে হচ্ছে, আগামী বছরের গোড়ার দিকে নয়াদিল্লীতে এই সম্মেলন হবে।

এর আগে জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলন বসেছিল ১৯৬১ সালে বেলগ্রেডে, এবং ১৯৬৪ সালে কায়রোতে। বর্তমানে অবস্থার অনেক পরিবর্তন হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট য়ুনিয়নের মধ্যে যে বিরোধ, যার জন্য বিশ্বে অশান্তি ও উত্তেজনা বৃদ্ধি পেয়েছে, তার মাঝে একটি তৃতীয় শক্তিরূপে উভয় জোট থেকে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রগুলি মিলিত হয়েছে। প্রথমে এই জোটের নেতা ছিলেন জওহরলাল নেহরু, জোসেফ ব্রজ টিটো ও আবদুল গামেল নাসের। নেহরু মারা গেছেন। কিন্তু টিটো ও নাসের আছেন।

কিন্তু ইতিমধ্যে জোটনিরপেক্ষতার ধারণার পরিবর্তন হয়েছে, বাস্তব অবস্থারও পরিবর্তন হয়েছে। নাসের জোটনিরপেক্ষ হওয়া সত্ত্বেও ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সম্পূর্ণভাবে সোভিয়েট সমর্থনের ওপর দাঁড়িয়েছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট য়ুনিয়নের মধ্যে কিছুটা বোঝাপড়ার মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে। মার্কিন শিবির ও সোভিয়েট শিবির, দুই শিবিরেই ভাঙন ধরেছে। চীন একটি পৃথক শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়েছে। তাই অনেকের মনেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, এই অবস্থায় বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জোটনিরপেক্ষ গোষ্ঠীর কি কোন বিশেষ ভূমিকা আছে?

বেলগ্রেড আলোচনার পর সবাই স্বীকার করেছেন, এখনও জোটনিরপেক্ষতার প্রয়োজন আছে।

চেকোশ্লোভাকিয়ায় সোভিয়েট সামরিক হস্তক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে জোটনিরপেক্ষ বৈঠকে।

এবারের বৈঠকে আরও নতুন রাষ্ট্রকে জোটনিরপেক্ষ শীর্ষ সম্মেলনে আমন্ত্রণ করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। আলোচনার পর স্থির হয়েছে, যে-সব রাষ্ট্র কোন সামরিক জোটের সঙ্গে যুক্ত নয় তাদের ডাকা হবে। আফ্রিকার নতুন স্বাধীন অনেক দেশ এই শ্রেণীতে পড়ে। কিন্তু জর্ডানের প্রস্তাবমত পাকিস্তানকে ডাকা হবে না, কারণ পাকিস্তান মার্কিন সামরিক জোট 'সেন্টো'র সঙ্গে যুক্ত।

(১৩-৭-৬৯)

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

অল্প কদিন আগে যুক্তফ্রন্টের শরিকী হানাহানি সুরুর সময়ই বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলার ভাগ্যহীন নায়ক নবকুমারের দুর্ভাগ্যের কথা বলেছিলাম। তখন এই কথাই বলেছিলাম—আমাদের রাজ্যের যুক্তফ্রন্ট সরকারের নবকুমাররা সমুদ্রকূলে বালিয়াড়ী ও জঙ্গলে পথ হারিয়েছে। কিন্তু নবকুমারের ভাগ্যে পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ বলে আশ্রম-কন্যা কপালকুণ্ডলার মত কেউ এসে পথ দেখিয়ে দিতে পারছে না। সেইদিন ছিল শুধু নবকুমারের যাত্রা সুরুর কাল, তাই সব দৃশ্য তখনও পরিষ্কার হয় নি, সব দুর্ভাগ্য ধরাও পড়ে নি। কিন্তু আজ যুক্তফ্রন্ট সরকারের সোয়াশত দিন অতিক্রান্ত হবার পর স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে —আমাদের নবকুমার না পারলো সন্ন্যাসী কাপালিক হয়ে আশ্রমে বাস করতে, না পারলো কপালকুণ্ডলাকে ঘরে এনে শান্তিতে ঘর বাঁধতে। পথহারা নবকুমার না ঘরকা না ঘাটকা হয়ে পথের সন্ধানেই দিন কাটালো। রাজ্যের যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার পর প্রথম সমস্যা সৃষ্টি হল ঘেরাও নিয়ে। ঘেরাও-এর সমস্যা শীর্ষে উঠতেই সুরু হল শরিকে শরিকে হানাহানি, আর শরিকী হানাহানি শীর্ষে উঠতেই সেই হানাহানির সঙ্গে যুক্ত হল জমি ও ভেড়ী দখল। জমি ও ভেড়ী দখল শুধু জমি দখল আর ভেড়ী দখলে সীমাবদ্ধ রইল না, সেটাও রূপ নিল শরিকী সংঘর্ষে। প্রকৃত অবস্থা দাঁড়ালো এই যে, শরিকী সংঘর্ষ ও হানাহানি এমন পর্যায়ে পৌঁছালো—যে পর্যায় থেকে সেই সংঘর্ষ নানা শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়লো রাজ্যময় এবং এক ভয়াবহ অন্ধকার সৃষ্টি করলো—যে অন্ধকারে নবকুমার যা একটু পথের সন্ধান পেয়েছিল, সেই পথও হারিয়ে ফেলল।

সুখের কথা ঘেরাও-এর হুজ্জা একটু কমেছে, যে কারণেই হোক ঘেরাও নিয়ে আর রাজ্য সরকারকে খুব বেশি মাথা ঘামাতে হচ্ছে না। কিন্তু শহরের শিল্প এলাকায় ঘেরাও-এর ঢেউ শেষ না হতেই সুরু হয়ে গেছে জমি দখলের হুজ্জা। জমি দখলের ব্যাপারটা খুবেই গোলমেলে। জমি হল এমন একটা বস্তু, যার সামান্য সীমানা এদিক-ওদিক হলে রক্তারক্তি কাণ্ড হয়ে যায়। আমাদের জমির সীমানা বা আলকে বুকের পাঁজরের মত রক্ষা করে ভূস্বামী ও জমির মালিকরা। কিন্তু আজ জমির আল তো আল, হাজার হাজার বিঘার জমি লোপাট করে দিচ্ছে এবং তাই নিয়ে চলছে খুনোখুনি। এখন প্রশ্ন হলঃ এই জমির গোলমালটা কি, খুনোখুনিই বা কেন আর তা নিরসনের পথই বা কি? এই সবগুলি প্রশ্ন বিবেচনা করা দরকার। ঘেরাও নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় একটা সূত্র দিয়েছেন। তবু যা হোক একটা পথ পাওয়া গেছে কিন্তু জমি নিয়ে দেখা যাচ্ছে যুক্তফ্রন্ট শরিক দলগুলি রয়েছে একটি লম্ব রেখার দুই প্রান্তে—যে দুই প্রান্তের চিন্তা-ভাবনার সঙ্গে কারো মিল নেই।

রাজ্য মন্ত্রিসভার দুই প্রধান শরিক দলের দুই মন্ত্রী প্রকৃতপক্ষে এই ব্যাপারে প্রকাশ্য বিতর্কে নেমেছেন। তাঁরা দু'জন হলেন শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার ও শ্রীসুশীল ধাড়া। এই দু'জন মন্ত্রীই কৃষি, কৃষক, জমি সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু বলবার মত এক্তিয়ার রাখেন। শ্রীকোঙার দীর্ঘ দিনের কৃষক আন্দোলনের পরীক্ষিত নেতা—বহু আন্দোলন পরিচালনায় তিনি অভিজ্ঞতা পুষ্ট। শ্রীধাড়াও কিন্তু এই ব্যাপারে একেবারে পিছিয়ে পড়া ব্যক্তি নন। কৃষি সংক্রান্ত ব্যাপারে তাত্ত্বিক পণ্ডিত, কিন্তু ধাড়া কৃষকদের সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতার অধিকারী। রাজ্যের মন্ত্রীদের মধ্যে লাঙল চালাতে পারেন বা আজও মাঠে নেমে লাঙলের মুঠি ধরে গরুর লেজে মোচড় দিয়ে হ্যাট হ্যাট করতে পারেন একমাত্র শ্রীসুশীল ধাড়া। শ্রীধাড়া বৎসরে একদিন তমলুকের মাঠে নামেন হলকর্ষণ উৎসবে। সঙ্গে নামে আরো কয়েকশ' লাঙল—সেই দিন কিন্তু চেনা যায় না শ্রীধাড়াকে সেই লাঙলের মিছিল থেকে আলাদাভাবে।

এ হেন শ্রীকোঙার আর শ্রীধাড়া নেমেছেন নীতির যুদ্ধে। যুক্তফ্রন্টের একটি সভায় ইতিমধ্যে দুই মন্ত্রী মুখোমুখি বসে এক প্রস্ত বিতর্ক শেষ করেছেন, আবার বসবেন ১৬ই জুলাই। অর্থাৎ ঘেরাও-এর পর জমি নিয়ে যুক্তফ্রন্ট একটা নীতি গ্রহণে ক্রমে এগিয়ে চলেছেন।

কিন্তু প্রশ্ন হলঃ রাজ্যের বর্তমান এই জমি সংক্রান্ত বিরোধের উৎসটা কি বা জমি সংক্রান্ত সমস্যাটা কি, তা একটু বোঝা দরকার। কারণ চারদিকে হৈ-চৈ-এর মধ্যে প্রকৃত সমস্যাটা কিন্তু বহু সময় খেই হারিয়ে ফেলছে। শুধু তাই নয় অনেকের কাছেই প্রকৃত সমস্যাটা অজানা রয়ে গেছে। কাজেই এই জমি সংক্রান্ত সমস্যাটার ইতিহাস সামান্য বিবৃত করা দরকার, তা হলে সমস্যার গুরুত্ব বোঝা সহজ হবে। ১৯৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী প্রথা বিলোপ করে ভূমি সংস্কার আইন তৈরি হয়। এই আইনে জমিদারী অবলুপ্ত করে জমির সর্বোচ্চ সিলিং বেঁধে দেওয়া হয় ও উদ্বৃত্ত জমি জমিহীনদের মধ্যে বণ্টনের সিদ্ধান্ত হয়।

জমিদারী দখল আইন পাশ হবার সময় হিসাব হয় যে, রাজ্য সরকারের হাতে আট লক্ষ একর জমি আসবে অর্থাৎ খাস হবে। আইন পাশ হল। কিন্ত গত ১৫

বৎসর খাস জমি আর খাস হল না, কি সরকারের হাতে, কি কৃষকের হাতে এল না। জমিদার ও জমির মালিকরা দিব্যি সুন্দর জমিদারী আইন পাশ হওয়ায় সরকারের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা খেসারৎ পেয়ে গেল, অথচ সরকার জমি পেল না। তার কারণ অন্য কিছু নয়, রাতারাতি এই সব জমির মালিকরা জমি হস্তান্তর করে এমনভাবে আইনকে ফাঁকি দিল যে, সরকারের আর কিছু করণীয় থাকলো না। জমিদারী দখল আইনের কিন্তু একটি ধাঁধা ছিল যে, বেআইনী হস্তান্তর কোন হস্তান্তরই নয়। কিন্তু এই আট লক্ষ একর জমি গেল কোথায়? এর মধ্যে এক লক্ষ একর জমিতে কোর্টের ইঞ্জাংশন রয়েছে, কাজেই সে-সম্পর্কে কিছু বলার নেই। কিন্তু বাকি সাত লক্ষ? কোথায় গেল? এই জমি বঙ্গোপসাগরে ডুবে যায় নি, কিন্তু সিলিং-এর উর্ধ্বের জমি জমির মালিকরা রাতারাতি কেউ দেবোত্তর করে দিল, কেউ ঠিকা প্রজার নামে লিখে দিল, কেউ চাষের জমিকে হোগলা বন দেখাল, কেউ রাতারাতি মেছো ঘেরী তৈরি করে ফেলল। আর বিভিন্ন নামের হস্তান্তর সে এক হাস্যকর ব্যাপার—যার নামে খুশি দলিল করে জমি রাখা হল।

বলে লাভ নেই। বাংলায় এমন বহু গ্রামে বহু জমিদার পরিবার ছিলেন, যে গ্রামের মানুষ কখনও নব বিবাহিত স্ত্রীকে নিয়ে নিজের ঘরে উঠতে পারতো না। বিবাহিত স্ত্রীকে প্রথমে রেখে আসতে হতো বাবুদের সেবার জন্য। কিন্তু ইতিহাস থেমে থাকে নি। আমাদের দেশে জমিদারদের অত্যাচারের যেমন ইতিহাস আছে, কৃষকদের সংগ্রাম ও বিদ্রোহেরও ইতিহাস তেমন কম গৌরবদীপ্ত নয়। সেই নীলকর আমল থেকে তেভাগা আন্দোলন, কাকদ্বীপ, বড়া কমলাপুর, হাজং বিদ্রোহ পর্যন্ত এক একটা অধ্যায় রচিত হয়েছে। তারপর সুরু হল নব অধ্যায়। সেই অধ্যায়েতে যেমন রয়েছে আচার্য বিনোবা ভাবের ভূদান, তেমনি শ্রীকানু সান্যালের নকশালবাড়ী আন্দোলন। এ-সবই কিন্তু কৃষি ও কৃষক সমস্যা নিয়ে। ইতিহাস আরো এগিয়ে গেল। রাজ্যে সৃষ্টি হল যুক্তফ্রন্ট সরকার, যে সরকারের পরিচালনায় এলেন শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার আর শ্রীসুশীল ধাড়া প্রমুখরা। রাজ্যে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়ে কি হল জানেন, ঐ যে আট লক্ষ একর জমি না-পাত্তা হয়েছিল, তার মধ্যে ২ লক্ষ ৩২ হাজার একর জমি উদ্ধার করে কৃষকদের মধ্যে বিলি করে দিল। আর এইবার ক্ষমতায় এসে যুক্তফ্রন্ট আবার নতুন করে ২ লক্ষ ৭০৮ একর জমি উদ্ধার করলো, যে জমি শীঘ্রই কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হবে। কিন্তু সরকারও সর্বশক্তিমান নন, সরকারকেও আইনের পথে চলতে হয়, বিধিনিষেধের গন্ডী সরকারেরও আছে। তাই সরকার চাইলেই রাজ্যের চাষযোগ্য জমি, বেআইনীভাবে হস্তান্তরিত জমি, বেনামী জমি, চোরাই জমি উদ্ধার করতে পারে না, এবং পারলও না। এই তো সরকার চাইলো রাজ্যের একজন দেশীয় রাজার কয়েক হাজার একর জমি নিয়ে নিতে, যে রাজা দিব্যি সুন্দর সরকারী মাসোহারা পান, মাসোহারার টাকায় হামেশা লন্ডন-নিউ ইয়র্ক করেন। বিলাস ও স্বাচ্ছন্দ্যের এবং ভোগেরও কোন প্রকার ঘাটতি নেই। তাঁর জমিতে হাত দিতে যেতেই আগুনে হাত দেবার মত সরকারের হাতে ছেঁকা লাগলো, সরকার হাত তুলে নিলেন। সমস্যা হল এইখানে সুরু যেখানে সরকার হাত দিতে পারেন না, আইন যেখানে বাঁধা ও বাধা—সেখানে কি হবে? সরকারের অসমাপ্ত কাজই গ্রহণ করলো সরকারের কিছু দল—তারা ঝাঁপিয়ে পড়লো বেআইনী আর খাস জমি দখলে। সংঘর্ষ সুরু হল এইখান থেকে। শ্রীসুশীল ধাড়া বললেন—জমি দখলের নামে যা হচ্ছে, সে হল জঙ্গলের আইন ও কোন প্রতিষ্ঠিত সরকারের আমলে এই কাজ চলতে পারে না। শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার বললেন—যা হচ্ছে ভালই হচ্ছে, একটু বাড়াবাড়ি কোথাও হয়ে থাকলে ঠিক হয়ে যাবে। শুধু এইখানে নয়, জমি দখল করতে যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলি সুরু করলেন খন্ডযুদ্ধ। নকশালপন্থীদের মুখপত্র 'দেশব্রতী' তার ৩রা জুলাই-এর সংখ্যায় লিখলোঃ "শ্মশানঘাটের চৌদ্দটা রোঁয়া ওঠা ঘেয়ো কুকুরের পচামড়া নিয়ে উন্মত্ত কামড়া-কামড়ি।"। দেশব্রতীর ভাষা অশ্লীল-অশালীন। বাস্তব অবস্থা কিন্তু মোটেই মনোহর বা হৃদয়গ্রাহী নয়। অবস্থাটাকে যদি নিজেদের মধ্যে কদর্য কামড়া-কামড়ি কেউ বলেন, তবে তাঁকে খুব দোষ দেওয়া যায় না। যদি প্রশ্ন করা যায়ঃ সরকার যাদের হাতে, আইন যাদের হাতে, তাদেরই দল কেন নিজেরা হানাহানি করে, কেন একে অন্যের বুকে বসে দুঃশাসনের রক্ত পান করে—এর জবাব পাওয়া সহজ নয়। কিন্তু কর্তা ছাড়া কর্ম হয় না—কাজেই সমগ্র ঘটনার কর্তা নিশ্চয়ই আছে। দরকার হল সেই কর্তাকে খুঁজে বের করা, তাকে আইনের পথে চালানো। অবশ্য আশার কথা, সেই চেষ্টা সুরু হয়েছে।

রাজ্যের পাঁচ প্রধান অর্থাৎ শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত, শ্রীবিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্রীসুকুমার রায়, শ্রীঅশোক ঘোষ, শ্রীমাখন পাল ইতিমধ্যে নিজেদের মধ্যে কয়েক প্রস্থ আলাপ-আলোচনা করে শরিকী সংঘর্ষ রোধের চেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন। একটা খসড়া দলিলও রচিত হয়েছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হলঃ ঘটনা যেন এমন না হয়—"চাচী যতদিনে লায়েক হবে চাচা ততদিনে গোরে যাবে।" যুক্তফ্রন্ট শরিক দলগুলি নিকা করুন। তবে একটু বয়েস থাকতে করুন, যাতে চাচীর বয়ঃপ্রাপ্তির আগেই চাচাকে গোরে চলে যেতে না হয়।

[১২ই জুলাই, '৬৯]

সদ্য প্রকাশিত হইল !
বাঙলা সাহিত্যের অদ্বিতীয় হাস্যরসিক
শিবরাম চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী
গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত
(১) মনের মত বৌ
(২) মস্কো বনাম পন্ডিচেরী
(৩) প্রেমের পথ ঘোরালো
(৪) প্রেমের বিচিত্র গতি
(৫) রক্তের টান
(৬) যখন তারা কথা বলবে
পৃষ্ঠা ২৪০
মূল্য মাত্র চার টাকা
বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা-১২

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

"বালক রণধীরের কুঠারাঘাতে সরকারী চক্রান্ত ধূলিসাৎ"

যতদূর মনে পড়ে জেল-অফিসে বাবার সঙ্গে আমার legal interview বিকেলের দিকেই হয়েছিল। জেলের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার জেল-অফিসেই হোত। যাঁরা যে ইয়ার্ডে আবদ্ধ থাকতেন সেই ইয়ার্ড থেকে সার্জেন্ট বা হাবিলদার সাক্ষাৎ প্রার্থী রাজনৈতিক বন্দী বা বন্দী-দের নির্ধারিত সময়ে জেল অফিসে নিয়ে যেত এবং সাক্ষাৎকার শেষ হলেই আবার ইয়ার্ডে ফিরিয়ে আনতো।

রীতি অনুযায়ী বাবার সঙ্গে এই সাক্ষাৎকার সমাপ্ত হবার পর আমি ইউরোপীয়ান সার্জেন্টের সঙ্গে আমার "বাসস্থান", অর্থাৎ, বম্-ইয়ার্ডে ফিরে এলাম। তখন বিকেল—সূর্য অস্ত যেতে কিছু বাকি। এই সময়টুকুতে আমরা আমাদের শরীরচর্চার ব্যবস্থা করে নিয়ে-ছিলাম। এই বম্-ইয়ার্ডের অভ্যন্তরে প্রাচীরে ঘেরা ছোট মাঠের মত একটুখানি জায়গা আছে। আমরা এখানে আসবার অনেক আগে থেকেই "স্বদেশীবাবুদের" শরীরচর্চার জন্য একজোড়া "প্যারালাল বার" এখানে স্থায়িভাবে বসানো ছিল। বিকেলে আমার সাথীরা সকলেই ব্যায়ামের উপযুক্ত জাঙিয়া ও হাতকাটা গেঞ্জি পরে মাঠে শরীরচর্চায় ব্যস্ত।

এই সময় আমার সঙ্গে বাবার যা গুরুত্বপূর্ণ আলাপ হয়েছে তা সাথীদের সঙ্গে আলোচনা করার চাইতেও ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা বেশি অনুভব করলাম। আমি ছুটে দোতলায় আমার নিজের সেলে গিয়ে ব্যায়ামের পোষাকে সজ্জিত হয়ে কালবিলম্ব না করে বন্ধুদের সঙ্গে যোগ দিলাম।

রণধীর প্যারালাল বারে balancing প্র্যাকটিস করছে—তার অদ্ভুত balancing-এর ক্ষমতা ছিল। তার বিভিন্ন ধরণের balancing সবাই অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতো। আমরাই কেবল নয়, পাশের দু-তিনটি ওয়ার্ড থেকে সত্যাগ্রহে দণ্ডিত প্রখ্যাত নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরাও আমাদের ব্যায়ামের সময় উৎসাহভরে কৌতূহলের সঙ্গে আমাদের শরীরচর্চা, মুষ্টিযুদ্ধ ও জাপানী কুস্তি (যুযুৎসু) প্রভৃতি দেখতেন।

সুবোধ চৌধুরী, রণধীর ও আমি তখনও সশস্ত্র যুব-বিদ্রোহের সদ্য প্রভাব কাটিয়ে মানসিক ও দৈহিক নিষ্ক্রিয়তায় এসে পৌঁছই নি। কবে কখন আমাদের ফাঁসি হবে—কি আদৌ হবে না—সেদিকে আমাদের বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ ছিল না—পরম উৎসাহভরে আমরা নিয়মিত ব্যায়াম ও নানাবিধ শারীরিক ক্রিয়া-কৌশলের চর্চা করে যেতাম। তারপর চট্টগ্রাম জেলের এই পরিবেশ থেকে যখন ফাঁসির পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ডাদেশ নিয়ে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে এসে "বাসা" বাঁধলাম, তখনও প্রতি মুহূর্তেই মনে হয়েছে শরীর আমাদের সবল ও সুস্থ রাখতেই হবে, এই সুদীর্ঘকাল দণ্ড-ভোগের নিষ্পেষণ থেকে বাঁচতে হলে চাই ডন-কুস্তির তাণ্ডব উদ্দীপনা। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়তো স্বামীজীর সেই অগ্নিক্ষরা বাণী—"দেশ আজ ঘোর তমসাচ্ছন্ন—চাই রজগুণের তাণ্ডব উদ্দীপনা; তাই তোদের বলি মাছ-মাংস তোরা খুব খাবি।" সত্যি বলতে কি, Marxism Leninism-এর বৈজ্ঞানিক বৈপ্লবিক সূত্র সম্বন্ধে তখনও আমাদের কোনো বিশেষ ধারণা ও জ্ঞান ছিল না। এই জেলে এসে প্রথমেই দেখলাম অন্যান্য দণ্ডিত রাজনৈতিক সাথীরা তাদের রিভল-ভারের গুলীর প্রতিধ্বনি বাতাসে মিলিয়ে যাবার আগেই—এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই, নিজেদের বৈপ্লবিক জীবনের সশস্ত্র কর্ম-ধারার কথা ভুলে গিয়ে একটি দুটি কমিউনিস্ট শাস্ত্রের বই পড়ে নিজেদের 'কমিউনিস্ট' বলে অভিহিত করছেন। ও'দের নিদর্শন দেখেই বোধ হয় 'বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ' সম্বন্ধে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম। এই কারণেই চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারীদের মনে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল। অন্যান্য সাথী-দের ঐ অবস্থা দেখে তাদের বৈপ্লবিক চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে কার কত-খানি বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তা সঠিক নির্ণয় করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার নিজের কথাটুকুই আমি বলতে পারি। তাঁদের সম্বন্ধে আমার মনের প্রতিক্রিয়া এইভাবে দেখা দিয়েছিল —তাঁরা নিজেদের 'কমিউনিস্ট' বলে যতটা জাহির করছিলেন আমার মনে হয়েছিল তার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে কমিউনিজমের আড়ালে নিজেদের বৈপ্লবিক বৈশিষ্ট্য ও ঐতিহ্য চিরকালের জন্য বিসর্জন দিয়ে গঙ্গাস্নান করে মুক্তি পাওয়া। ছোট্ট একটি প্রশ্ন—আজ তাঁরা কোথায়? বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদ দুর্বলের জন্য নয় —সবল, বলিষ্ঠ ও নিঃস্বার্থ মানুষের জন্য।

জেলের এই পরিবেশে জাগ্রত বৈপ্লবিক শক্তির বিরুদ্ধে একটি দারুণ আঘাত পেয়ে প্রতিঘাত হানবার জন্য আমার মন ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠলো। জেলে দেখলাম লেখা-পড়ার ধুম পড়ে গেছে এবং তাদের মুখে অপরিপক্ক Marxism-এর বুলি শুনতে লাগলাম। দুর্বল ও "সদ্য জ্ঞানীর" বুলিতে বাস্তবে বোধগম্য কিছু থাকে না বলেই সেই সব বুলির অর্থ তখন আমি কিছুই বুঝি নি। এই অবস্থার প্রতি-ক্রিয়ার স্রোতের গতি ঘুরিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে ভাবলাম যে, ব্যায়াম ও শারীরিক ক্রিয়াকৌশলের চর্চা আমাদের ক্রমেই বাড়িয়ে যেতে হবে—কমালে চলবে না।

উপরোক্ত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেই যুগে রণধীরের মধ্যে যে সব বৈপ্লবিক বিশেষ গুণ আমার চোখে ধরা পড়েছিল ও আমাদের ফাঁসি দেওয়ার জন্য সরকারী চক্রান্তের বিরুদ্ধে রণধীরের যে অপরি-হার্য ভূমিকা ছিল এবারে আমি তার বর্ণনায় আসছি। রণধীরের সাহস ও মানসিক দৃঢ়তা সম্বন্ধে আগেই বলেছি। বাড়ি থেকে গোপনে বন্দুক নিয়ে ১৮ই এপ্রিল সে বৃটিশ অস্ত্রাগার দখলে অংশ গ্রহণ করেছে, ২২শে এপ্রিল জালালাবাদ পাহাড়ে শহীদদের পাশে দাঁড়িয়ে অকুতো-ভয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে মরণ-সংগ্রামে সমানে রাইফেল চালিয়েছে। দু'টি বছর জেল-হাজতে ট্রাইব্যুনালে অভিযুক্ত বন্দী হিসেবে দিন কাটিয়েছে; কিন্তু এই দীর্ঘ-কালের মধ্যে জেল ও পুলিশ-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে রণধীরের কোনোরূপ আপোষ-মীমাংসার ভাব কখনও দেখা যায় নি। সদা-সর্বদা তার মুখে হাসি লেগেই আছে। কারা-প্রাচীরের অন্তরালে কর্তৃপক্ষের রক্ত-চক্ষু ও কড়া শাসন এক মুহূর্তের জন্যও তার বিপ্লবী মনোভাবের বিন্দুমাত্রও পরি-বর্তন ঘটাতে পারে নি। রণধীরকে চঞ্চল বলা যায় না। তার বালকসুলভ চপলতার মধ্যেও ছিল ধৈর্য, বিবেচনা ও চরম লক্ষ্যে পৌঁছবার অকৃত্রিম অধ্যবসায়। Morning shows the day?—(দিনের পূর্বাভাষ প্রত্যূষেই সূচীত হয়)। রণধীরকে দেখেছি সবার মত সেও একজন কেবল ব্যায়ামচর্চা করে গেছে তা' নয়—ছোট ছোট ক্রীড়া-কৌশল ও প্যারালাল বারে ভারসাম্য তার কতকগুলো শারীরিক ক্ষমতা আয়ত্ত আনবার জন্য সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা দিনের পর দিন লাগাতার, সাফল্যলাভের আগে পর্যন্ত অধ্যবসায়ের সঙ্গে অনু-শীলন করে গেছে। একনাগাড়ে বারো থেকে বিশ রাউন্ড পর্যন্ত মুষ্টিযুদ্ধ করে গেছে রণধীর। পুলিশ ও জেল সুপারি-ন্টেণ্ডেন্ট মিঃ ডারিউ ডি হিক্স এবং আরও দু'জন অতিবিজ্ঞ পুলিশ-সুপারিণ্টেন্ডেন্ট মিঃ বি জে সুটার ও মিঃ লুইস প্রমুখ রাজপুরুষেরা জেলের মধ্যে রণধীরের শারীরিক ক্রিয়া-কৌশলের পারদর্শিতা দেখে বিস্ময় প্রকাশ করতেন। এঁরা জেলের ভেতর আমাদের তত্ত্বাবধানে নিযুক্ত ছিলেন এবং যখন-তখন জেলে surprise visit দিতেন। চট্টগ্রাম জেলে আমাদের ব্যায়ামের সময়েও এইসব "সাহেব-প্রভুরা" মাঝে মাঝে এসে পড়তেন। রণধীর দেখতে ছোটখাটো, একমাথা কোঁকড়া চুল, উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, জোড়া ভুরু ও দু'টি উজ্জ্বল চোখ। রণধীরের তীক্ষ্ণদৃষ্টি-সম্পন্ন চোখ দু'টি দেখে মনে হোত বালক-সুলভ চপলতার মধ্যেও বেশ বিচক্ষণতা আছে। জামা গায়ে রণধীর যেন একটি শান্ত-সুবোধ সাধারণ বালকমাত্র। কিন্তু জামা খুললেই তার শরীরের সুস্থ বলিষ্ঠ মাংসপেশীগুলি মুহূর্তে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতো। রণধীরকে যতই সবল ও বলিষ্ঠ দেখাক না কেন, তবু দীর্ঘকায় ইংরেজ রাজপুরুষ বি জে সুটার ও কমাণ্ডেন্ট লুইস-সাহেবের তুলনায় সে অতি ক্ষুদ্রকায় একটি বালকমাত্র। এই দু'জন গর্বিত ইংরেজ সাহেব এই ক্ষুদ্রকায় বালকটির শক্তির পরিচয় পেয়েছেন। রণধীরের শক্তি পরখ করতে এঁরা দু'জনেই তার সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে পরাজিত হয়েছিলেন। ছোট্ট একটি বালকের হাতে পরাজয়ের গ্লানিতে তাঁদের লাল মুখ আরও লাল হয়েছে। তবু তাঁরা sports men— হাসি মুখেই বিদায় নিয়েছেন। এই রণধীর বাড়ির সকল মায়া পরিত্যাগ করে যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ডাদেশ বহন করে আমার সঙ্গে আলি-পুর সেন্ট্রাল জেলে আছে। এই রণধীরই বম্-ইয়ার্ডের মাঠে বিকেলে যখন নিষ্ঠার সঙ্গে ব্যায়ামচর্চা করছিল, তখনই আমি বাবার কাছ থেকে হাইকোর্টে আপীল সম্বন্ধে সেই গুরুতর মতভেদের কথা শুনে এলাম। বাবার কাছে সব শুনে বম্-ইয়ার্ডে ফিরে এসেও আমার মনে এই মতভেদ সংক্রান্ত সমস্যাটা খুব বড় হয়ে দেখা দেয় নি। হাইকোর্টে আপীল করলে আমাদের কারও ফাঁসি হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে যদি রণধীর জানতে পারে, তবে সে কখনই ওকালতনামা স্বাক্ষর করবে না—রণধীর সম্বন্ধে এই অভিমতই আমি পোষণ করতাম। তাই এইটি আমার কাছে তখন খুব সামান্য ব্যাপার বলেই মনে হয়েছে। কাজেই ব্যায়ামচর্চা বন্ধ করে আপীল সম্বন্ধে অলস আলোচনায় প্রবৃত্ত না হয়ে আগে ব্যায়ামের মাঠে যোগ দেওয়াই শ্রেয় মনে করেছিলাম।

সূর্য অস্ত গেল। জেলের আইন অনুযায়ী আমাদের নিজ নিজ সেলে গিয়ে আটক বন্দী হতে হবে। প্রহরী ও সার্জেন্টের ইঙ্গিতে আমাদের ব্যায়ামচর্চা বন্ধ হল। হাত-মুখ ধুয়ে নিজ নিজ খাবারের থালা-বাটি নিয়ে সেলে আবদ্ধ হলাম। রণধীরকে জানালাম যবার সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বাইরের অবস্থা সম্বন্ধে যা' জেনেছি, আগামীকাল সকালে তাকে সব বলবো।

সকালে জেলের ঘণ্টা বাজলো। বিশেষ সময়ে বিশেষ ঘণ্টার নির্দেশ অনুযায়ী আমাদের সেলের দরজা যথারীতি খুলে দিল। আমরাও হাত-মুখ ধুয়ে প্রাতঃকৃত্য শেষ করে চা খেতে প্রস্তুত হলাম। রণধীরের সঙ্গে নানা কথা হল। তার মধ্যে আপীল সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ কথাটাও তাকে জানালাম। হেসে বললাম —"আমাদের ফাঁসি না দেওয়ার মহা-মূল্যবান চাবি-কাঠিটি কিন্তু বর্তমানে তোমার হাতে। ট্রাইব্যুনাল-জজ্ যা' পারেন নি তুমি ইচ্ছে করলেই এখন তা' পার—ওকালতনামায় একটা সই করলেই গুলী-বিদ্ধ ব্যাঘ্রের মত ক্ষিপ্ত ইংরেজ সরকারকে আর পায় কে? তক্ষুণি তাঁরা আমাদের চরম দণ্ড দিতে হাইকোর্টে সর্ব-প্রকারে চেষ্টা করবেন।..।" রণধীর আমার কথা শুনে হেসে ফেললো। তারপর দুষ্টুমী করে বললো—"তবে ফাঁসির রায় আমিই দেবো"—এই কথা ক'টি বলে সে এমন ভাব দেখালো যেন এই বিষয়টি নিয়ে আমাদের ভাববার বা মাথা ঘামাবার কিছুই নেই। তার মা-বাবা যে সেই দিনই তার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন জেল-কর্তৃপক্ষ এই খবরটি তাকে আগেই জানিয়েছেন। বিকেল প্রায় চারটায় সাক্ষাৎকারের জন্য যথারীতি রণধীরের ডাক পড়লো। রণধীর যাবার আগে আমাকে জানিয়ে গেল সে ঠিক আছে, ভাববার কোনো কারণ নেই।

প্রথম প্রথম জেলের নিয়ম অনুযায়ী জেল-অফিসের একটা বড় ঘরেই চার-পাঁচটি পরিবারের ছোট ছোট দল একত্রে তাঁদের নিজেদের দণ্ডিত আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। সাক্ষাৎ করবার এই বড় ঘরের এক কোণে রণধীর বসে তার বাবা, মা, দাদা ও বৌদির সঙ্গে কথাবার্তা বলছিল। মা-বাবা ছেলের জেল-জীবনের সুখ-দুঃখের কথা জানতে চাইলেন। দাদা-বৌদি তার শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য উৎকণ্ঠা প্রকাশ করলেন। চট্টগ্রাম-জেল থেকে রণধীর এত দূরে কলকাতায় আছে বলে প্রতি সপ্তাহে তাঁরা দেখা করবার সুযোগ পাবেন না এবং দণ্ড হয়ে যাবার পর তিন মাসের আগে হয়ত আর দেখাও হবে না—এই সব বলে তাঁরা নানা আক্ষেপ করছিলেন। রণধীর হাসি মুখে প্রাণপণে তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা করছিল যে, বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে জেলে সে খুব ভালো আছে — খাওয়া-দাওয়া জামা-কাপড়, ইত্যাদি কোনো কিছুর কোনো কষ্টই নেই এবং লেখাপড়া ও ব্যায়ামচর্চারও প্রচুর সুবিধা আছে। সে আরও জানালো—

মাড়ীর যত্ন, নাকি রক্তারক্তি কান্ড?

ঠিকমত যত্ন নেবে

বিনাকা

টুথব্রাশ

একমাত্র বিনাকা টুথব্রাশেরই ছুঁচিগুলো সুগোল, আর বিশেষ যত্ন নিয়ে তৈরি করেছে সিবা—ফলে, আপনার মাড়ী কেটে রক্তারক্তি কাণ্ড হবে না। তাছাড়া, নানান ধরণের বিনাকা টুথব্রাশ পাবেন—বয়স অনুযায়ী, পছন্দ অনুসারে, যার যেমন দরকার, পরিবারের প্রত্যেকের উপযোগী বিনাকা টুথব্রাশ আছে।

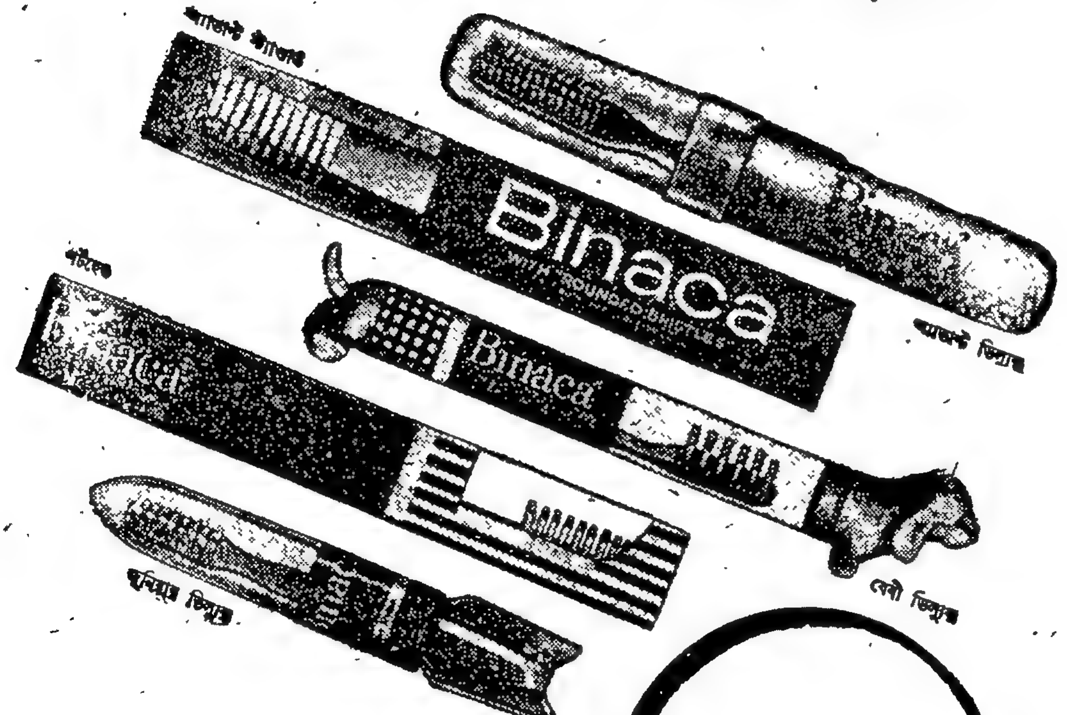

বিনাকা টুথব্রাশের
ছুঁচিগুলো সুগোল—
মাড়ী কেটে যায় না

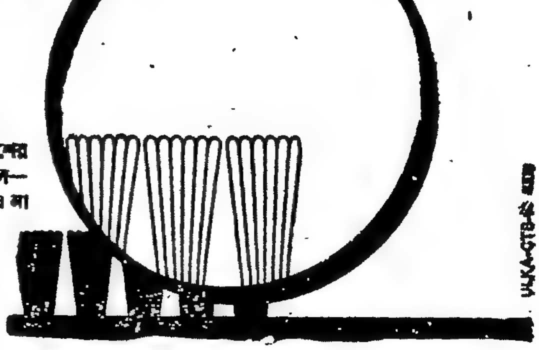

CIBA Cosmetics

ট্রাইব্যুনালের জজ্ clemency-র জন্য recommend করেছেন; পাঁচ বছর দণ্ডভোগের পরেই তাদের তিনজনের মুক্তি অনুমোদন করেছেন। Jail remision পেয়ে চার বছরের মধ্যেই হয়ত সে বাড়ি ফিরে যেতে পারবে। এই বলে মা-বাবাকে সান্ত্বনা দিয়ে রণধীর বললো—"তোমরা যদি এত ব্যস্ত হও, এত অস্থির হয়ে এমন ভেঙে পড়, তবে আমি জেলে বসে তোমাদের কথা ভেবে ভেবে শান্তি পাবো না। আর যদি একবারও আমি জানতে পারি, জেলের সমস্ত কাঠোরতা বাধা-বিপত্তি হাসি মুখে উপেক্ষা করার জন্য তোমরা আমাকে আশীর্বাদ করছ, তবে এ-ক'টা দিন আমি অতি সহজেই আনন্দের সঙ্গে কাটিয়ে দিতে পারবো...।" রণধীরের কথা শুনে বাবার দীর্ঘশ্বাস পড়লো, মায়ের চোখ ছলছল করতে লাগল। দাদা ও বৌদি মা-বাবার ব্যথা ও ভাইয়ের মনোভাব জেনে খুব অস্বস্তিবোধ করছিলেন। কা'কে কিভাবে সান্ত্বনা দেবেন, কি বোঝাবেন—কিছুই তাঁরা ভেবে পাচ্ছিলেন না। রণধীর এই অস্বস্তিকর অবস্থার জন্য প্রস্তুত ছিল না বলেই খুব বিব্রতবোধ করছিল। এ-সমস্তই আমার রণধীরের নিজ মুখের শোনা কথা। রণধীর সেই গুরুগম্ভীর পরিস্থিতিকে সহজ ও হাল্কা করতে বিভিন্ন পারিবারিক বিষয় নিয়ে আলাপের গতি ফেরাতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তার বাবা-মা অন্য কোন প্রসঙ্গেই মন দিতে পারছিলেন না। রণধীরের বাবা একটু সামলে নিয়ে ধীরকণ্ঠে রণধীরের কাছে তাঁদের আসল উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে বললেন—"...আমরা ব্যারিস্টার বি সি চ্যাটার্জীর সমসাময়িক প্রখ্যাত ব্যারিস্টার ও অন্যান্য আইনজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করেছি হাইকোর্টে তোমার জন্য আপীলের দরখাস্ত করবো। তাঁদের সুনিশ্চিত অভিমত : হাইকোর্ট যদি ট্রাইব্যুনাল রায়ের বিরুদ্ধে তোমার আপীলের শুনানী হয়, তবে সেই সুযোগে সরকার ট্রাইব্যুনাল রায়ের বিরুদ্ধে কারও দণ্ডাদেশ বৃদ্ধি করার আইনগত কোনো সুযোগ পাবে না...।"

রণধীরকে তার বাবা অনেক করে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, রণধীরের পক্ষে যদি হাইকোর্টে আপীল করা হয় তাতে কারও কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই। তিনি পরে রণধীরকে জানালেন আগামীকাল তার সঙ্গে আবার দেখা করবার 'বিশেষ অনুমতি' তাঁরা পেয়েছেন এবং আগামীকাল আসবার সময় তিনি সঙ্গে করে ওকালতনামাটি নিয়ে আসবেন। রণধীর যেন তা'তে সই করে। ওকালতনামায় রণধীরের স্বাক্ষর ছাড়া কোনো উকিল তার পক্ষে হাইকোর্টে আপীলের দরখাস্ত পেশ করতে পারবে না—তাই রণধীরের স্বাক্ষরের একান্ত প্রয়োজন। রণধীর বাবার সব কথা শুনেও বিনীতভাবে তাঁকে বুঝিয়ে বললো এ-ক'টা দিনের জন্য শুধু শুধু তাঁরা কেন ব্যস্ত হচ্ছেন, অযথা হাজার হাজার টাকা খরচেরই বা কী প্রয়োজন!—আপীলের ঝামেলায় তাঁরা যেন একেবারেই না যান। নিজের মুক্তির জন্য আপীলের চিন্তাই সে করতে পারছিল না। রণধীর যতই বোঝাতে চেষ্টা করুক না কেন, পুত্রস্নেহান্ধ পিতা-মাতার মন কোনো যুক্তিই মানছিল না। সাক্ষাৎকারের সময় অতিবাহিত হয়ে গেল। রণধীরের বাবা পরের দিন আবার দেখা করতে আসবেন জানিয়ে গেলেন রণধীরকে।

পুলিশের অনুমতি ছাড়া জেলে আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে দেখা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। পুলিশের "বিশেষ অনুমতি" নিয়ে রণধীরের বাবা পরের দিন আবার রণধীরের সঙ্গে দেখা করতে সপরিবারে আলিপুর নিউ সেন্ট্রাল জেলে উপস্থিত হলেন। পাঠকবর্গের নিশ্চয়ই মনে আছে পূর্বের লেখা সরকারী দলিলের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এই পঙ্‌ক্তিটির কথা—"..We may let the Bengal Government make the next move."—

কাজেই পরের দিনই আবার দেখা করবার 'বিশেষ অনুমতি' পেতে তাঁদের কোনো কষ্টই হয় নি। রণধীরের স্বাক্ষরটি কোনোমতে আদায় করবার উদ্দেশ্যে তাঁরা অনুমতি না চাইলেও হয়ত স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই কর্তৃপক্ষ তাঁদের সেইরূপ অনুমতি দিতে পারলে ওকালতনামাটাও নিজ অর্থে ক্রয় করে দিতেন।

সাক্ষাৎকারের জন্য জেল-অফিসে পরের দিন বিকেলে রণধীরের আবার ডাক পড়লো। কোনো ভাবনা-চিন্তা বা বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রমও রণধীরের মধ্যে দেখা গেল না। সে হাসতে হাসতে বলে গেল—"আবার এক জীবন্ত নাটকের সম্মুখীন হতে যাচ্ছি...।" জেল-অফিসের দেখা করবার ঘরে রণধীরের বাবা-মা, দাদা-বৌদি বসে আছেন: মা সস্নেহে রণধীরকে ডেকে কাছে বসালেন। সব কথার মাঝে তাঁদের সর্ব-প্রধান কথা ও কাজ রণধীরের জন্য হাইকোর্টে আপীল করতে হবে এবং সেই জন্য তাঁরা ওকালতনামা সঙ্গে করেই এনেছেন। রণধীরের বাবা খুব দৃঢ়তার সঙ্গেই তাঁর মনোভাব প্রকাশ করলেন—"রণধীর, ওকালতনামাটা সই করে দাও!" রণধীর তার বাবার এই নির্দেশের বিরুদ্ধে মৌখিক প্রতিবাদ না জানালেও তার হাবভাবে সে যে ঐ অসম্ভব প্রস্তাবে কোনমতেই সম্মত নয়—এটা তার বাবা সহজেই বুঝতে পারলেন। পিতা যে দৃঢ়তা নিয়ে ওকালতনামা সই করাতে এগিয়েছিলেন পুত্রের ভাব-ভঙ্গীতে তিনি খুব দমে গেলেন। তাঁর অন্তরের ব্যথা, হৃদয়ের আবেগ তিনি আর চেপে রাখতে পারছিলেন না। কাতর হয়ে আকুল অন্তরে রণধীরকে তিনি অনেক কথাই বলতে চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু সবটাই আধা আধা—একটা থেকে একটা বিচ্ছিন্ন—সামঞ্জস্যহীন। মোট কথা যা' বোঝা যাচ্ছিল, রণধীর যেন অবাধ্য না হয়ে তাঁর কথা মেনে নেয়। রণধীরের মা খুব ব্যাকুল হয়ে পড়লেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন—"বাবা, সই করে দে না? আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে তোর কি একটুও দয়া-মায়া হয় না? এত করে বলছি আমরা, কারও কোনো অনিষ্ট হবে না, তবে কেন তুই সই করবি না?"—স্নেহাতুরা মাকে রণধীর আর কি বলবে? তবু শ্রদ্ধার সঙ্গে বিনীতভাবে সে বললো—"অবুঝ হোয়ো না মা! এত অবুঝ হলে কি চলে? আমি আমাদের সবার মঙ্গলের জন্যই ওকালতনামাটা সই করতে চাই না। এর মূল্য আজ হয়ত তোমরা কেউ বুঝবে না। কিন্তু ভবিষ্যতে কোনোদিন আমার ওকালতনামায় সই দিতে অস্বীকার করার মূল্য যাচাই হতেও বা পারে।"

(আমি যেভাবে আমার ভাষায় রণধীরের কথোপকথন বলে গেলাম এবং এই বিষয়ে আরও যে-যে বর্ণনা দিয়ে যাবো, তা'তে স্বভাবতই মনে হবে ঔপন্যাসিকদের মত সামান্য ঘটনাকে রং চং লাগিয়ে পাঠকবর্গের কাছে পরিবেশন করছি। সত্যি বলতে কি আমি যেভাবে লিখছি অত বছর আগে সেইদিনের এই একটি ঘটনা ও তা' নিয়ে যে নাটকের ভূমিকায় রণধীরকে অংশ নিতে হয়েছিল তার হুবহু চিত্রের প্রতিটি অবিকল পঙ্‌ক্তি লেখা কী সম্ভব? নিশ্চয়ই তা' সম্ভবপর নয়। কিন্তু যে জলন্ত মৌখিক বর্ণনা আমি সেদিন রণধীরের মুখে শুনেছিলাম তা' আমার অন্তরের মণিকোঠায় আজও সযত্নে সঞ্চিত আছে। অত বছর আগে সেদিন যা' ঘটেছিল এবং রণধীরের মুখে শুনে যে চিত্রটি আমার মনে দাগ কেটেছিল সেটা শত চেষ্টা সত্ত্বেও আজ আর আমি হুবহু প্রকাশ করতে পারবো না। তাই উপন্যাস লিখছি বলে পাঠকবর্গ আমাকে ভুল বুঝবেন না—উপন্যাস লেখার বিন্দুমাত্র বাসনাও আমার নেই। কোনো বলিষ্ঠ সাহিত্যিকের লেখনীর স্পর্শ পেলে সেই যুগের সেই সব বৈচিত্র্যময় সত্য ঘটনার সত্য বর্ণনা উপন্যাসকেও হার মানিয়ে আরও হৃদয়গ্রাহী ও মর্মস্পর্শী হয়ে উঠতো)।

ওকালতনামায় স্বাক্ষরের ব্যাপারে দ্বিতীয় দিনের সাক্ষাৎকারও ফলপ্রসূ হল না। বিফলমনোরথ হয়ে মা-বাবা

ফিরে গেলেন। বিদায়কালে হৃদয়াবেগে তারা একেবারে ভেঙে পড়লেন—সবার চোখেই জলের ধারা? অশ্রুপ্লাবিত নয়নে রণধীরকে আশীর্বাদ করে মা বিদায় নিলেন।

ভারাক্রান্ত হৃদয়ে রণধীর বস্-ইয়ার্ডে ফিরে এলো। একলাফে ছুটে গিয়ে সে ব্যায়ামের পোষাক পরে ব্যায়ামচর্চায় এসে যোগ দিল। করুণ নাটকের সাময়িক প্রভাবে যদিও রণধীর সাময়িকভাবে বিচলিত হয়েছিল, তবু ব্যায়াম-শিবিরের পরিবেশ তাকে মুহূর্তেই সহজ ও স্বাভাবিক করে তুললো।

আশ্চর্য? তৃতীয় দিন বিকেলেও আবার জেল-অফিসে রণধীরের ডাক পড়লো! কেন? সার্জেন্টের কাছে জানা গেল রণধীরের বাবা আবার "বিশেষ অনুমতি" নিয়ে সপরিবারে রণধীরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

আমাদের মামলা পুনর্বিচারের জন্য হাইকোর্টে যাতে আপীলের ব্যবস্থা করা যায়—বাংলা সরকারের ওপর তার ভার ন্যস্ত আছে। ছত্রিশ বছর আগে জনান্তিকে যে চক্রান্ত ঘটেছিল তা' এই দলিলপত্রগুলো সংগৃহীত হওয়ার পূর্বে জানবার কোনো উপায় ছিল না। তাই রণধীরের বাবাকে বারে বারে "বিশেষ অনুমতি" দেওয়ার কারণ—পুলিশের অত অনুগ্রহের কারণ তখন জানতে পারি নি। ধন্য বৃটিশ সরকারের কূটনীতি! ধন্য বৃটিশ সরকারের অনুচর পুলিশ কর্তৃপক্ষ!

তৃতীয় দিন জেল-অফিসে এই করুণ পারিবারিক নাটকের শেষ অঙ্কে যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে নিদারুণ কঠোর দ্বন্দ্বের সমাধান রণধীরকে করতে হয়েছিল তাতে রণধীরের বিপ্লবী-মনের গভীরতার সঠিক পরিচয় মেলে।

তৃতীয় দিন রণধীরের বাবা-মা বদ্ধপরিকর হয়ে এসেছিলেন ওকালতনামায় রণধীরের স্বাক্ষরটি নিয়ে তবেই তাঁরা ফিরবেন। রণধীরের বাবা, মা, দাদা ও বৌদি চোখের জলে বহু কথা বললেন—বহু যুক্তি দেখালেন, কিন্তু তাঁদের অনুনয়-বিনয়-কাতরতা সবই ব্যর্থ হল। রণধীর তার সংকল্পে অচল-অটল—তাঁদের এত অনুরোধ-উপরোধ কিছুই তাকে বিচলিত করতে পারলো না। তাঁদের মনে অপরিসীম ব্যথা ও কষ্ট দিতে সে বাধ্য হল। মা আর পারলেন না—রণধীরকে আরও কাছে টেনে নিয়ে ওকালতনামাটা সামনে রেখে তার হাতে কলম গুঁজে দিলেন এবং একটা স্বাক্ষর করতে চোখের জলে মিনতি জানালেন। অক্ষম অপারগ রণধীর—কি করে সে স্বাক্ষর করবে? মায়ের অবুঝ মন মানতে চায় না—তিনতিনবার রণধীরের হাতে তিনি কলম তুলে দিলেন, কিন্তু প্রতিবারেই অতি সম্ভ্রমের সঙ্গে রণধীর কলম রেখে দিল। মাকে সে বললো—"মা, তুমি আমায় ক্ষমা কর—আমি পারবো না।"

মা কান্নায় ভেঙে পড়লেন। অশ্রুসিক্ত নয়নে ভগ্নকণ্ঠে বললেন—"বাবা, আশীর্বাদ করছি তোর মঙ্গল হোক।" তাঁরা বিদায় নিলেন। বড়ই করুণ মর্মান্তিক সেই বিদায়ের পালা! কারুরই যেন পা আর চলে না! বৌদি নিম্ন সুরে রণধীরকে বললেন—"তোদের কি দয়া-মায়া কিছুই নেই...।"

জেল-অফিস থেকে বস্-ইয়ার্ডে ফেরবার সময় বৌদির সেই কটি কথা—'তোদের কি দয়া-মায়া কিছুই নেই' রণধীরের বার বার মনে পড়ছিল। রণধীর নিভৃত মনে এই কথার উত্তর পেয়েছে—"মহেন্দ্র ভবানন্দকে প্রশ্ন করিলেন, 'তবে কি আপনাদের কোনো মায়া নেই'? ভবানন্দ মহেন্দ্রকে উত্তর দিলেন—'যে বলে তার মায়া নেই হয় সে মিথ্যা কথা বলে নইলে তার মায়া কোনদিনই ছিল না। আমাদের মায়া আছে—আমরা মায়া কাটাই'।"

মনে হবে এ অতি সামান্য কথা—একে এত বড় করে দেখার কী আছে? সেদিনের বিপ্লবী যুগের বালক রণধীরকে কোনো স্বার্থ ও ভীরুতা স্পর্শ করতে না পারার মধ্যে আশ্চর্য হবার কী আছে? মানব-চরিত্র ও বৈচিত্র্যময় বিপ্লবীদের বৈপ্লবিক চরিত্র দেখেছি বলেই বালক রণধীরের এই দৃঢ় বৈশিষ্ট্যময় বিপ্লবী চরিত্রকে অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে আমি পরিবেশন করলাম।

আমরা সকলে ডাণ্ডা-বেড়ি পরে "মহারাজ" স্টীমারে দ্বীপান্তরের সাজা ভোগ করতে আন্দামান যাত্রা করলাম। বাংলাদেশ ছেড়ে বহু দূরে বহু বছরের জন্য কালাপানি অভিমুখে চলেছি। ধীরে ধীরে বাংলার উপকূল ছাড়িয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়লাম—ক্রমেই বাংলাদেশ আমাদের চোখের সামনে থেকে মিলিয়ে গেল। সবার মনে হয়ত সুজলা সুফলা বাংলাদেশের জন্য আকুল ক্রন্দনে ফেটে পড়ছিল, তবু আমাদের সবার এক সঙ্গে আন্দামান যাত্রা দুঃখের দিনেও সান্ত্বনা যুগিয়েছিল। যেহেতু আন্দামানে থাকলেও সকলে এক সঙ্গেই থাকবো। সবাই আমরা হৈ-হৈ রৈ-রৈ করে চলেছি। নিজেদের মধ্যে গল্প-গুজব হাসি-ঠাট্টা লেগেই আছে; কেউ অভিনয় করছে, কেউ বা গান ধরেছে, গানের সঙ্গে হয়ত বা কেউ তার ডাণ্ডা-বেড়ি ঠুকে তাল দিচ্ছে—আমরা যেন সবাই মিলে কোনো এক অভিযানে চলেছি—মনে কোনো খেদ নেই, দুঃখ নেই, ভাবনা নেই; সব ভাবনা-চিন্তা যেন তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছি। এই অবস্থাতেও—"কে ও? কেন একা এককোণে বিমর্ষ বদনে বসে আছে? তাকেও তো রণধীরের মত clemency দেওয়া হয়েছে। তবে কেন সে এত বিষণ্ণ...।" তাকে দেখে আমার মনে প্রশ্ন জাগলো। সস্নেহে তাকে কাছে ডাকলাম। জিজ্ঞাসা করলাম,

—"তুমি এত বিষণ্ণ কেন? তোমার কি ভালো লাগছে না এই যে, আমরা সবাই এক সঙ্গে আন্দামান যাচ্ছি—আন্দামান-জেলকে গুলজার করে তুলবো?"

—"না। বাংলা-জেল ছেড়ে যেতে আমার একটুও ভালো লাগছে না।"

—"সাথীদের সঙ্গে একত্রে যদি নরকে গিয়ে থাকার সুযোগ পাই তাহলেও কিন্তু আমার খুব ভালো লাগবে...। মনে হচ্ছে তুমি কোনো কিছু ভাবছ এবং তার সমাধান চাইছ। আগামীকাল সকালে এই নিয়ে তোমার সঙ্গে আমি আলোচনা করবো।"

আলোচনা হল। নিজের দোষ-ত্রুটি ঢেকে না রেখে সরল মনে অপকটে সে আমাকে সব বললো। আমাদের দণ্ডাদেশের পর বিচ্ছিন্ন হয়ে বাংলার অন্য জেলে থাকাকালীন অবস্থায় "পুলিশ অফিসার"কে পত্রযোগে ডেকে পাঠিয়ে প্রস্তাব করেছিল সে অম্বিকাদার বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী হবে। পুলিশ অফিসার তার কাছ থেকে এইরূপ সহযোগিতার প্রস্তাব পেয়েও তা' প্রত্যাখ্যান করতে বাধ্য হয়েছিলেন এবং জানিয়েছিলেন যে, আমাদের ট্রাইবুনালের বিচার যেভাবে পরিসমাপ্ত হয়েছে তারপর অম্বিকাদার বিরুদ্ধে আদালতের কাছে রাজসাক্ষীর মূল্য আর বিবেচিত হবে না। এই স্বীকারোক্তির পরে আমার কাছে সে তার প্রবঞ্চনামূলক মনের কথাও জানালো।—বাহ্যিক মনের অজুহাত তাকে পরিচালিত করেছিল সে Secretary of State for India—মিঃ স্যামুয়েল হোড়কে নিহত করবার উদ্দেশ্য নিয়ে অম্বিকাদার বিরুদ্ধে রাজসাক্ষী হবে ও সরকারের সাহায্যে বিলেত যাওয়ার সুযোগ গ্রহণ করবে।

তার মুখে এই কথা শুনে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। কিন্তু সাহসের সঙ্গে অকপটে নিজের দুর্বলতা ও আত্মপ্রবঞ্চনাকে নগ্নরূপে বিশ্লেষণ করে বিনা দ্বিধায় সে আমার কাছে সমস্ত স্বীকার করেছে দেখে তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা অনেকখানি বেড়ে গেল।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বৈপ্লবিক কষ্টিপাথরে বিচার করে দেখলেই বালক রণধীরের প্রকৃত মূল্যায়ন করা যাবে। রণধীরের প্রাচুর্যের অভাব ছিল না—সাংসারিক বহুবিধ আকর্ষণের উপকরণও বিদ্যমান ছিল। বৈপ্লবিক দৃঢ়তা ও চরম স্বার্থত্যাগের প্রবল ইচ্ছাই প্রকৃত বিপ্লবীকে দুর্বলতা জয়ে সাহায্য করে ও চরম আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত করে। [ক্রমশ]

যুক্তফ্রণ্ট সরকার মন্ত্রীদেষু

যুক্তফ্রন্ট সরকার আমলাতন্ত্র সম্পর্কে এখনি সতর্ক হোন। এখনও সময় আছে।

মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জীর টেলিফোনে আড়ি পাতার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। আরও অনেক মন্ত্রীরই একই রকমের অভিজ্ঞতা আছে। কিন্তু অত্যন্ত সুচতুরভাবে এই আড়ি পাতার দায় যুক্তফ্রন্টের বিশেষ একটি শরিকের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে। বিশ্বাস করুন আর না করুন, আমলাতন্ত্রের ওপরতলা থেকে এই প্রচার চালানো হচ্ছে। কিন্তু উক্ত শরিকের মন্ত্রীদের টেলিফোনে তাহলে আড়ি পাতে কে? মুখ্যমন্ত্রী আর উপ-মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ, ভাল করে খোঁজখবর নিন। প্রাথমিক অনুসন্ধানে এমন কিছু সাধারণ কর্মীদের ওপর সন্দেহ পড়বে যাঁরা কংগ্রেস আমলে বামপন্থীদের সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। তাছাড়া রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের আন্দোলনে তাঁরা বিরোধিতা করতেন। কিন্তু এখানেই থামলে চলবে না—এঁদের পেছনে যাঁরা কাজ করছেন সতর্ক হলে তাঁদের চিনে নিতে দেরি হবে না।

আবার বলছি, প্রত্যেকটি দপ্তরের মন্ত্রীরা সতর্ক হোন। আপনাদের অত্যন্ত বিশ্বস্ত সেজে আমলাতন্ত্রের যে-সব খুঁটিরা সামনাসামনি প্রশস্তি গেয়ে থাকেন—এমন কি কোন কোন সময় আপনার অসতর্ক মুহূর্তে অন্য শরিক দলের মন্ত্রীর বিরুদ্ধেও মন্তব্য করে আপনাদের দলের সমর্থক হয়ে পড়েছেন বলে ভাব দেখান, তাঁদেরও চেনবার চেষ্টা করুন।

অনেক মন্ত্রীরই বোধ হয় নজরে পড়েছে যে, বড় বড় অফিসাররা সহযোগিতা করছেন না। অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে মন্ত্রীর কাছে যে-সব সুপারিশ করার দায়িত্ব তাঁদের আছে, সে-দায়িত্ব তাঁরা পালন করছেন না। মন্ত্রীর ওপরে পুরোপুরি নির্ভর করার ভাণ করে নিজেরা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে বিরত থাকছেন। অথচ প্রশাসনের কর্তা হিসাবে ঐ সব ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়ার দায়িত্ব তাঁদের।

উদাহরণ হিসেবে একটি নমুনার কথা উল্লেখ করছি। কোন একটি বিভাগে বেশ কয়েকজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর পদ খালি পড়ে আছে। এই পদগুলি অত্যন্ত জরুরী, আর এই নিয়োগের ভার বিভাগীয় প্রধানদের ওপরই ন্যস্ত। তাঁরা কিন্তু এই নিয়োগের ব্যাপারেও নিজেদের বিবেচনানুসারে স্থানীয়ভাবে নিয়োগ না করে মন্ত্রীর নির্দেশের অপেক্ষায় বসে আছেন। মন্ত্রীমহাশয় যদি ভেবে থাকেন, এই সব অফিসাররা রাতারাতি আপনার অনুগামী হয়ে পড়েছেন, তাহলে মারাত্মক ভুল করবেন।

আসল কারণটা জানিয়ে রাখছি। ঐসব পদে নিয়োগের জন্য ঐসব স্থানে কর্মরত চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীরা তাঁদের আত্মীয়-স্বজনকে নিতে হবে বলে দাবি করেছেন। এ নিয়ে চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীদের সঙ্গে সংঘর্ষ বা মনোমালিন্য অনিবার্য। সব দায় মন্ত্রীর ঘাড়ে চাপাবার জন্য বিভাগীয় কর্তারা কোন মন্তব্য পর্যন্ত না করে মন্ত্রীর নির্দেশের অপেক্ষায় আছেন। অথচ এই সব পদে নিয়োগ নিয়ে আগে কত খেলাই না জমতো!

আরও নমুনা আছে—সেটা অবশ্য অন্য চক্রান্তের নমুনা। একটি বিশেষ বিভাগের কয়েকজন কর্তাব্যক্তি, যাঁরা রাইটার্স বিল্ডিংসে উক্ত বিভাগীয় মন্ত্রীর অত্যন্ত অনুগত বলে সর্বদা জাহির করেন, তাঁদের মধ্যে বেশ কয়েকজন মফস্বলে গেলেই সব অফিসারদের উক্ত মন্ত্রীর দল সম্পর্কে সতর্ক থাকতে বলেন। শুধু তাই নয়, আমার কাছে এমন সব সাক্ষ্য-প্রমাণ আছে, যা থেকে আমি সমস্ত দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি যে, রাইটার্স বিল্ডিংস থেকে আগত ঐ সব অফিসাররা স্থানীয় অফিসারদের নির্দেশ দিয়ে যান যে, তাঁরা যেন কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলার চেষ্টা করেন। তাঁদের বিভাগীয় মন্ত্রীর দলের বিরুদ্ধে তাঁরা যেন ফ্রন্টের অন্য শরিক দলের সহযোগিতা গ্রহণ করেন। প্রয়োজন হলে সেই শরিক দলকে বিশেষ সুযোগ দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একটি দপ্তরের মন্ত্রীর অফিসাররাই নয়, কয়েকটি দলের মন্ত্রীর অফিসাররাই এই একই পথ গ্রহণ করেছেন।

কোন এক দপ্তরের মন্ত্রী যদি বিশেষ কোন কর্মচারীকে বদলি করার নির্দেশ দেন, হয় তা বানচাল করার চেষ্টা চলে, না হলে সেই নির্দেশ কার্যকরী করার পর মন্ত্রীর বিরুদ্ধে গোপন প্রচারে ব্রতী হন সেই বিশেষ অফিসার।

মন্ত্রীর দু-একদিনের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে মন্ত্রীর মনোভাবের বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত দ্রুত কার্যকরী করার অনেক ঘটনা আমাদের অজ্ঞাত নয়।

আরও একটি গুরুতর অভিযোগ আমার আছে। এই বিশেষ অফিসারদের কয়েকজনের সঙ্গে আজও চৌরঙ্গী ভবনের প্রাক্তন খ্যাতিসম্পন্ন ব্যক্তিদের যোগাযোগ বজায় রয়েছে।

আমলাতন্ত্র সম্পর্কে সতর্ক হওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য আর একটি কথাও বলা প্রয়োজন। আমার বক্তব্যের অর্থ এই নয় যে, অফিসারদের সকলেই যুক্তফ্রন্ট-বিরোধী। অনেক তরুণ সৎ অফিসার আছেন, যাঁদের দু-একটি কাজ দেখে বিরূপ ধারণা হলেও তাঁদের সম্পর্কেও খোঁজ-খবর নেওয়া প্রয়োজন।

দীর্ঘদিন ধরে কংগ্রেসী মন্ত্রীদের অধীনে কট্টর আমলাদের নির্দেশে কাজ করে অনেকেরই এমন অবস্থা ঘটেছে যে, যুক্তফ্রন্টের চিন্তাধারার সঙ্গে সঙ্গতি রাখা অসম্ভব হয়ে পড়ছে। ওঁরা সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে জনকল্যাণমূলক কাজ করতে চান। কিন্তু ফ্রন্টের মানসিকতা আত্মস্থ করতে পারছেন না বলে মাঝে মাঝেই অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে। জনকল্যাণে কাজ করতে গেলেও আসলে তা মেহনতী মানুষের পক্ষে যাচ্ছে না।

এই শ্রেণীর অফিসাররা নিজেদের বদলাতে চেষ্টা করছেন। তাঁদের সম্পর্কে সহানুভূতিশীল হতে হবে। সাবধানবাণী দিয়ে শুরু করলেও যুক্তফ্রন্ট সরকারকে জানিয়ে রাখতে চাই, সাধারণ আর মাঝারি কর্মীরা তো বটেই—অনেক তরুণ অফিসারও যুক্তফ্রন্টের নীতি কার্যকরী করতে চান। শত্রুর যেমন অভাব নেই, তেমনি আবার আপনাদের মিত্রের সংখ্যাও যথেষ্ট। শত্রুর তুলনায় মিত্রই বেশি।

ফ্রন্ট সরকারকে তাই আর একবার অনুরোধ করছি, শত্রু-মিত্র চেনার চেষ্টা করুন।

—শ্রীলব দর্শী

[পূর্বানুবৃত্ত]

চটাস্ চটাস্ করে নিজের মুখে চড়িয়ে তারপর কান্না। সাগর খুড়ী আঁচলে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। জীবনে বোধ করি এই তার দ্বিতীয় কান্না। এ চরে কাঁদবার অবকাশ আর তার ছিল কোথায়।

হাবু আজ জোয়ান ছোকরা। এতদিন পরে তার ওস্তাদ কারিগর বাপের কথা শুনে আনন্দে বিষাদে মন তার চঞ্চল। সামনে বসে আছে এক মামা—হোক সৎ-মামা, মা তার যাই বলুক—তাঁতীসাহির এই আর এক কারিগর মামাকে মাথায় তুলে আজ তার নাচতে ইচ্ছে করছে। তার একমাত্র স্বজনের সংগে প্রথম পরিচয়!

তেমনি মায়ের বিরুদ্ধে তার কঠিন অভিযোগ, "এতদিন তুই এসব কথা কিছুই বলিস নি!"

সাগর খুড়ী শুধু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললে, "সে কথা বলার মোর মুখ ছিল নি রে হাবু। সে তুই বুঝবি নি।"...

ছোট মণ্ডল ওদের রাগ-গোসা ঝগড়া-ঝাঁটি মিটমাট করে দিয়ে বললে, "থাক—এখন তোমার কাঁদন থামাও সাগর খুড়ী, তোমার ভাইকে নিয়ে ঘরে চলো। চলো হাবু। গুপী চলো। রাত হয়ে গেছে মেলা।"

ওরা দল বেঁধে চরের দিকে চলে গেল।

ডাক্তারখানার বারান্দায় তখনো বসে রইল দুজন—ডাক্তার আর সানো চৌধুরী। কারুর মুখে কোনো কথা নেই। সামনের ঘন অন্ধকারের দিকে চেয়ে কি ভাবছিল ওরা কে জানে। হয়তো বা কিছুক্ষণ আগে হারান মণ্ডলের মুখে শোনা কোন্ অচেনা গ্রাম—সেই তাঁতীসাহির ওস্তাদ কারিগরদের ফৌত হয়ে যাওয়ার কাহিনী।

অনেকক্ষণ পর সানো চৌধুরীই আগে কথা বলল। মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলে, "ডাক্তারখানার পেছনে তোমার খানিকটা জমি আছে না ডাক্তার?"

ডাক্তার বললে, "তা আছে।"—

"দেবে আমাকে?"

"কি করবে?"

একটু চুপ করে থেকে সানো চৌধুরী বললে, "একটা তাঁত বসাতাম।"

হঠাৎ ডাক্তার হো হো করে হেসে উঠল। হাসি থামলে বলল, "তাঁত বসিয়ে কি করবে?—দেশ স্বাধীন করে দেবে? ল্যাঙ্কাশায়ারের মিল বন্ধ করে দেবে?" বলে আবার অট্টহাসি।

সানো চৌধুরী ধীর শান্ত অবিচলিত গলায় বললে, "না—অত বড় আত্মকল্পনার কথা ভাবছি না ডাক্তার। ভাবছিলাম—একটা সর্বস্বান্ত লোককে কাজ দেবো।"

"কি জানি—আমি ভাবলাম", ডাক্তার হাসতে হাসতে বললে, "তুমি একটা মস্ত কিছু করে-টরে ফেলবে।"

"না—মস্ত আর কি।" সানো চৌধুরী তেমনি আস্তে আস্তে বললে, "এদিকে তাঁতী নেই। যদি কেউ কাজ শিখতে চায়—শিখবে।"

"সুতো?"

"চরকা বসাতে হবে।" সানো চৌধুরী বললে, "শুনলে তো ওদের সাগর খুড়ীর কথা—একদিন কি মিহি সুতো কাটতো। আরও পাঁচজনকে সে শিখিয়ে নেবে।"

"তোমাদের চরে জমি চষে চষে ওর হাত দিয়ে এখন খড় বেরুবে।" ডাক্তার বিদ্রূপ করে বললে, "তারপর তুলো। সে পাবে কোথায়?"

"সে ব্যবস্থা করা যাবে।"

"পাগল! পাগল!" ডাক্তার হাসতে লাগল।

সানো চৌধুরী স্বপ্নের ঘোর থেকে যেন রুদ্ধকণ্ঠে বললে, "হেসে উড়িয়ে দিয়ো না ডাক্তার—তাঁতীসাহী একদিন ছিল।"

ডাক্তার বললে, "আরে ছিল বলেই তো তাকে শুধু ভাতে নয়; হাতে মেরে টেনে উপড়ে ফেললে। না থাকলে আর অত বড় কাণ্ডটা হতো কি করে।"

"তার মোকাবিলা আমার চরের চাষীরা করবে এবার।"—সানো চৌধুরী তেমনি ধীর অবিচলিত গলায় বললে, "তারা তাদের নুন পেয়েছে, তাঁতও পাবে—সুতোও পাবে, কাপড়ও পাবে।"

"আস্তে—আস্তে হে সানো চৌধুরী, জঙ্গল জালপাই মহালের দুআনী জমিদার—বন গাঁয়ের শেয়াল রাজা; আস্তে কথা বলো।" ডাক্তার তার স্বভাবসিদ্ধ বাঁকা ভঙ্গীতে বললে, "ম্যাঞ্চেস্টার ল্যাঙ্কাশায়ারের মেশিনগুলোও হেসে উঠবে!...বুঝলে—সে হাসি আমি সাত সমুদ্র তের নদীর পার থেকেও শুনতে পাচ্ছি! হুঁ"...

"পারব বৈকি! তুমি আমার চেয়ে ঢের বিচক্ষণ—কত বুদ্ধিমান ডাক্তার।" সানো চৌধুরী অভিমানভরে বললে, "আমার দৌড় ওই তোমার সঙ্গে ইস্কুল পর্যন্ত আর পরে বাপের বিষয় নিয়ে সদর আদালতের হাকিমের দরবার পর্যন্ত। তা-ও ধানী জমির মামলায়। মুখ্যু মানুষ ভাই—ম্যাঞ্চেস্টারের মেশিন বুঝি না, তবে আমার চরের মাটির রোঁয়া বুঝি, তার মানুষগুলোর ধক্ বুঝি—তার তাঁত বুঝি, তার তাঁতী বুঝি। শুধু হারান নয় ডাক্তার—হারানের চৌদ্দপুরুষের জন্যে আজ আমার কান্না পাচ্ছে। বুক চাপড়ে—ডাক পেড়ে আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছে। হ্যাঁ, আমি গাঁইয়া, জংলী, মুখ্যু—আমি তোমার মেশিন বুঝি না।"...

বলতে বলতে উত্তেজিত সানো চৌধুরী এক দণ্ড আর দাঁড়াল না, পেছনে একবার ফিরেও তাকাল না—দাওয়া থেকে নেমে সামনের ঘন অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেল।

জগৎ ডাক্তার প্রশান্ত চোখে—হাসি হাসি মুখে তার বহুকালের অভিন্নহৃদয় বন্ধুটির অতর্কিত প্রস্থানের দিকে চেয়ে রইল। বিড়বিড় করে নিজের মনে আবার বললে, "পাগল—স্বপ্ন-পাগল!"......

কথাটা ঠিকই—সানো চৌধুরী স্বপ্ন-পাগল হয়ে উঠেছে। এক-একটা আন্দোলনের ঢেউ এসে আছড়ে পড়েছে নিঃসাড় এই ধানী আবাদের দেশে আর অসাড় মন জেগে উঠেছে নানা প্রত্যাশায়। যে কথা, যে কাহিনী পূর্বপুরুষের দলিল দস্তাবেজ রোয়দাদে আর গালগল্পে শুধু উপকথার মত হয়ে ছিল—তারা যেন একে একে প্রাণের স্পর্শে সঞ্জীবিত হয়ে উঠেছে। শুধু সঞ্জীবিত নয়—নতুন সম্ভাবনায় সানো চৌধুরীর স্বপ্নালু চোখের সামনে তারা নবোদিত উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের মত। এই ভাবালুতা তার পুঁথিপড়া নয়, বৃহৎ বিশ্বের জটিল সভ্যতার কুটিল গতির তার কিছুই জানা নেই, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির যুগে কোন্‌টা সম্ভব, কোন্‌টা অসম্ভব—ও নিয়ে মন তার মাথা ঘামায় না। সে শুধু স্বপ্ন দেখে—একটা সাহসী সুস্থ স্বাধীন দেশ, তার হারানো সব শ্রী ও সম্পদ নিয়ে দিগন্ত থেকে দিগন্তে ঝলমল করছে। এ স্বপ্ন সানো চৌধুরীকে পেয়ে বসেছে। সম্মুখ এক সামন্তযুগের স্বপ্ন—সে যেন তার ধানাখন্দে মাঠে বনেবাদাড় ছড়ানো।

জগৎ ডাক্তার সেই স্বপ্ন-পাগল লোকটাকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ যাই করুক—পরের দিন সকালে দেখা গেল, ডাক্তারখানার পেছনের লম্বা ফালি জায়গাটুকু আমিন ডেকে নক্সার দাগ চৌহদ্দি মিলিয়ে চেন টেনে মাপজোখ হচ্ছে। সরেজমিনে স্বয়ং ডাক্তার হাজির। হারান মণ্ডল ফাঁকা মাঠে চোখ পিট্ পিট্ করে বোধ করি হবু তাঁতশালের স্বপ্ন দেখছে। হাবু গেছে সানো চৌধুরীকে ডাকতে।

সানো চৌধুরী এসে পৌঁছতেই মৌজা নক্সাটা তার হাতে তুলে দিয়ে ডাক্তার বললে, "মিলিয়ে নাও ২৭৭৮ নম্বর দাগ। ওসব তাঁতিয়া ব্যাপারের আমি আর কিছু জানি নে। আমি ডাক্তার—চিকিৎসা আমার ব্যবসা। ওদিকে রোগীরা আমার মরলো।" বলে গট্ গট্ করে ডিসপেন্সারিতে ঢুকলো।

সানো চৌধুরী পেছনে মুচকে হাসল।

সেদিন অপরাহ্ণের দিকে ভলান্টিয়ারদের ছোটখাট একটা মিছিল ধ্বনি দিতে দিতে চরের ভেতরে গিয়ে ঢুকলো। ডাক্তারখানায় তখন রোগী আসতে শুরু করেছে। এক ফাঁকে ডাক্তার উঁকি মেরে দেখলে—মিছিল এগিয়ে যাচ্ছে চরের কিষাণ বসতির দিকে। পেছনে দুজন ভলান্টিয়ারের পিঠে বাঁধা ছোট ছোট বোঁচকা।

ডাক্তার বিড়বিড় করে বলল, "বলদগুলো ওদিকে আবার মরতে যাচ্ছে কোথায়!"

রোগীদের মধ্যে থেকে কে একজন বললে, "ওরা বিলাতী কাপড় চেয়ে বেড়াচ্ছে। মোদের পাড়াতেও কাল মেগে যেচে ঢের কাপড় পেয়ে গেছে।"

গর্ গর্ করে উঠে ডাক্তার মন্তব্য করলে, "চাষারা সব বড়লোক হয়ে গেছে!"

"বড়লোক নয় ডাক্তারবাবু।" আর এক রোগী মন্তব্য করলে, "কে আর কাপড়ের আন্ডিলের উপর শুয়ে আছে বলো!" লোকটা বললে, "ওরা যেয়ে এমন করে বলে—হেই সেদিন মোর ব্যাটার বৌ দুখানা তার বিয়ের শাড়ি দিয়ে দিলে।"

আর একজন এককোণ থেকে হেঁকে উঠল, "কেন, মোর বৌ আগে দিল না!"

কে আগে দিয়েছে এবং কে পরে দিয়েছে এবং কে সকলের আগে বের করে রেখেছিল—দিতে একটু দেরি হয়েছে, এই নিয়ে হঠাৎ ভয়ানক একটা কোলাহল শুরু হয়ে গেল। শুনে শুনে গুরুগম্ভীর শুধু একটা হুম্ শব্দ করে ডাক্তার চুপ করে গেল এবং সবার অলক্ষ্যে ভেতরে ভেতরে ফুঁসতে লাগল। রোগী দেখার সঙ্গে সঙ্গে একটা চোখ আর একটা কান তার সজাগ হয়ে রইল চরে ঢোকা ফিরতি মিছিলটার জন্য।

রোগী দেখা সারতে সারতে বেলা পড়ে এল। দু'-চারটে বাইরের ডাক অপেক্ষা করছে, লোক বসে আছে। ডাক্তার চেয়ার ছেড়ে উঠল। বহু পুরনো তেলচটা শোলার টুপিটা মাথায় দিলে। এ তার ঢের বাঁটি শিশিরের আচ্ছাদন। পুরনো ঝরঝরে সাইকেলটা টেনে যাত্রা করলে—দূরের ডাকের সঙ্গী। ডাক্তারখানার দাওয়া থেকে নামতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। চরের সেই মিছিল ফিরছে—নিঃশব্দে।

ডাক্তারখানার পেছনে উঁকি মেরে দেখলে ডাক্তার—হাবু, হারান আর কয়েকটা লোক কাজ করছে। সানো চৌধুরীকে আশপাশে কোথাও দেখা গেল না। বজ্রবিদ্যুতে ভরা একটা থমথমে মেঘের মত মুখ করে ডাক্তার মিছিলটার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল।

ডাকের লোক ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে মৃদু তাগাদা দিয়ে বললে, "তাহলে চলুন ডাক্তারবাবু। বেলা গেল।"

ডাক্তার হুঙ্কার দিয়ে উঠল, "থামো!"......

গ্রামের চাষাভুষো মানুষ—ধমক খেয়ে ক্যাল ক্যাল করে চেয়ে রইল।

ওদেকে তখন ভাঙা নিঃশব্দ মিছিলের মানুষগুলো চরের ভেড়ি বাঁধ ছেড়ে একে একে জেলা বোর্ডের সড়কে উঠে এক জায়গায় জমা হচ্ছে। দল বাঁধল। পেছনে জুটেছে চরের কৌতূহলী মানুষ—কাচ্চাবাচ্চা। সামনের সারির গলায় গানের তরঙ্গ উঠল:

> মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
> মাথায় তুলে নে রে ভাই।
> দীন-দুখিনী মা যে তোদের
> তার বেশী আর সাধ্য নাই......

সাইকেল ধরে খাড়া দাঁড়িয়ে রইল ডাক্তার। আসছে—মিছিলটা এগিয়ে আসছে গান গাইতে গাইতে—

> সেই মোটা সুতার সঙ্গে মায়ের
> অপার স্নেহ দেখতে পাই;
> আমরা এমনি পাষাণ, তাই জেনে ওই
> পরের দোরে ভিক্ষে চাই।

মিছিলটা এবার সামনাসামনি। ডাক্তার কটমট করে চেয়ে দেখলে—না, একটাও চেনা মুখ নেই। তা জগৎ ডাক্তার চেনা-অচেনার ধার আবার কবে ধারে। হুংকার দিয়ে উঠল, "এ্যা-ই......শোনো!"

সেই শব্দে গান থেমে গেল। ছেলে-ছোকরার দল—এই বছর পনেরো থেকে বিশ, তার মধ্যে সব। একজন আছে—একটু ভারিক্কি, তা-ও ওই পঁচিশের মধ্যে। ডাক্তারের হুংকারে সবাই থমকে দাঁড়িয়ে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল—দাওয়ায় দাঁড়ানো অদ্ভুত দর্শন লোকটিকে। ঠোঁটের ওপরে এক বোঁজলা কাঁচাপাকা গোঁফ, রং কালো—মাথায় পুরাতন তেলচিটে একটা হ্যাট। সার্টের ওপরে কোঁচা গুঁজে ধুতি পরা, পায়ে বুট জুতো। গলায় জড়ানো স্টেথো।

কর্কশ গলায় ডাক্তার জিজ্ঞেস করলে,

"গরীব চাষীর ঘর থেকে কতকগুলো কাপড় হাতালে ?"

দুই তরুণ ভলান্টিয়ারের পিঠের বোঁচকা—তা ফুলে-ফেঁপে মন্দ হয় নি। এক ভলান্টিয়ার ডাক্তারের কথার খোঁচা বুঝতে না পেরে হাসিখুশি মুখে বোঁচকা দুটো দেখিয়ে বললে, "তা মন্দ নয়—প্রায় সব ঘর থেকেই এক-আধখানা দিয়েছে। বেশির ভাগই পুরনো, ছেঁড়া—তা হোক।

"বলতে লজ্জা করছে না!" ডাক্তার হুংকার ছাড়লে।

"কেন!" বেচারী ছেলেমানুষ, থতমত খেয়ে জিজ্ঞেস করলে, "কেন! লজ্জা করবে কেন!"

"সে বোধও নেই।" ডাক্তার খেঁকিয়ে উঠে বললে, "ওই গরীবদের পরণের ছেঁড়া কাপড় ধরে টান দিতে তোমাদের হাত কাঁপল না। পরণের কাপড় ছাড়া ক'খানা কাপড় থাকে ওদের ঘরে ?"

"বিলেতী কাপড়। ওরা স্বেচ্ছায় দিলে।"

ডাক্তার বললে, "স্বেচ্ছায় দেয় নি—তোমাদের ঐ ভাব-বিলাসী বক্তৃতার ফাঁদে ফেলে গরীব মুখ্যু চাষাগুলোকে তোমরা ঠকাচ্ছ।"

"ভাব-বিলাসী বক্তৃতা! ......আমরা ঠকাচ্ছি ?"

"হ্যাঁ—ঠকাচ্ছ।" ডাক্তার জোর দিয়ে বললে, "অনেক কাপড় তোমরা নিয়েছ। ক'খানা কাপড় দিয়েছ? কি তারা পরবে ?"

"কাটা সুতোর কাপড় পরবে—চরকা কাটবে, তাঁত চালাবে।"

"সে কোথায় ?

ছেলেটা একটু থতমত খেয়ে গেল। তারপর বললে, "তার কেন্দ্র আমাদের মহকুমায় আছে, কলকাতায় আছে।"

"আর এখানে ?"

"ছেলেটি চুপ।"

"এখানে তোমরা কাপড় লুঠ করতে এসেছ!"

পাশ থেকে একটি ছেলে বলে উঠল, "আমরা চরকা দিতে পারি, তুলো দিতে পারি।"

"সে কোথায়?"

"কেউ চায় নি।"

এবার এগিয়ে এল সেই ভারিক্কি গোছের তরুণটি। নিজের সহকর্মীটিকে মৃদু তিরস্কার করে বললে, "বাজে কথা কাটাকাটি ক'রে কি হবে বলাই—কাকে বলছ? দেখছ না—সর্বাঙ্গে ওঁর গোলামীর বেশ।"

আর যায় কোথায়—জগৎ ডাক্তার রাগে থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল।

"কি বললে!"

"ঠিক বলেছি।" তরুণটি ধীর অবিচলিত গলায় বললে, "আপনি রাগ করবেন না—ওকে আমরা গোলামীর বেশই বলি।"

"গোলামীর বেশ!"

"হ্যাঁ। অনেকেই পরে। আপনিও পরেছেন। আপনার মত কথা অনেকেই বলে—আপনিও বলছেন। আপনাকে জোড়-হাত করে অনুরোধ করতে পারি—ও আর পরবেন না। আর আমাদের কিছুই বলার নেই।"

"ঠিক আছে—তোমাদের অনুরোধ আমি রাখব। এই নাও—এই নাও—"

ক্রুদ্ধ জগৎ ডাক্তার একে একে তার বেশবাস খুলে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতে লাগল। প্রথমে মাথার সেই শোলার টুপি, তারপর গায়ের সার্ট, মায় পরণের কাপড়, গায়ের গেঞ্জি। মাত্র আন্ডারউয়ার সম্বল। চেয়ার টেনে গ্যাঁট হয়ে বসে বললে, "কোথায় নিয়ে এসো তোমার মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়। এই আমি বসে রইলাম।"

লোক জুটে গেছে অনেক। ডিসপেন্সারির পেছন থেকে কাজ ছেড়ে ছুটে এসেছে হাবুর দলবল। ভলান্টিয়াররা ভ্যাবাচ্যাকা। ওদের মধ্যে বয়সে বড় সেই তরুণটিই কথা বললে। বললে, "রাগ করে ছুঁড়ে দেওয়া ও জিনিস আমরা ছোঁব না।"

"বটে!" ডাক্তার আবার হুংকার দিয়ে উঠল, "হাবু—ওদের বোঁচকায় বেঁধে দে।"

হাবু বিনা বাক্যব্যয়ে ডাক্তারের জামা-কাপড় মায় হ্যাটটি পর্যন্ত একজনের পিঠে বাঁধা বোঁচকায় গুঁজে দিতে দিতে চাপা গলায় বললে, "নিয়ে চলে যান। আপনাদের বিমলবাবুকে ও'র নাম বলবেন—জগৎ ডাক্তার। তিনি এখানে আছেন না ?"

"কে বিমল? বিমল মুখোপাধ্যায়?"

"হ্যাঁ—তিনি নুনের সময় এখানে কাজ করে গেছেন।"

আবার ডাক্তারের গুরুগম্ভীর গলা ফেটে পড়ল, "হাবু—ওদের জিজ্ঞেস কর তো—খোদ চৌধুরীপাড়ায় গিয়েছিল নাকি? — খোদ দশ আনি বাড়ি থেকে ক' বোঁচকা কাপড় আদায় করতে পারল ?"

হাবু চাপা গলায় জিজ্ঞেস করল, "গেছলেন ?"

ওরা পাল্টা জিজ্ঞেস করলে বোকার মত, "সেটা কোন্ দিকে? তারা কারা ?"

"চরের জমিদার।"

"এই পথে যাব।"

ডাক্তার জিজ্ঞেস করলে, "কি বলে ?"

হাবু বললে, "যায় নি।"

"তা যাবে কেন!" তিক্তকণ্ঠে ডাক্তার বলে উঠল, "ওরা যাবে গরীব মুখ্যু চাষাগুলোকে ভাঁওতা দিতে।"

হাবু চোখ টিপে চাপা গলায় বললে, "চলে যান—এই পথে।" হাতের ইসারা করে পথ দেখিয়ে দিলে।

মিছিল চলল পশ্চিমমুখো—জেলা বোর্ডের সড়ক ছেড়ে ভেড়ি বাঁধ ধরে চৌধুরীপাড়া। ওদের পেছনে তখন কৌতূহলী গ্রামের মানুষের রীতিমত ভিড় জমে গেছে। তারাও এগিয়ে গেল মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে।

ডাক্তার তেমনি একভাবে বসে রইল চেয়ারে—সেই আদুড় গা, পরণে মাত্র আন্ডারউয়ার—পায়ে বুটজুতো। দু'-চারজন রোগী এল—সেই অবস্থাতেই ঘরের ভেতরে উঠে গিয়ে তাদের দেখলে। ভাগ্যে স্টেথিসকোপটাও ছুঁড়ে ফেলে দেয় নি।

সন্ধ্যের পরে এল সানো চৌধুরী—সঙ্গে হাবু আর হারান মণ্ডল।

দরজার সামনে সানো চৌধুরী থমকে দাঁড়াল—ডাক্তারকে ওই অবস্থায় দেখে অবাক হয়ে বলে উঠল, "এ কী—ডাক্তার!"

ডাক্তার বললে, "কি!"

"এ কী বেশ!"

"ওই বলদগুলো বললে—আমার নাকি গোলামের বেশ। দিয়েছি সব খুলে।" ডাক্তার বললে, "এখন ওই ওদের 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ের' জন্যে বসে আছি।"

সানো চৌধুরী মোটামুটি একটা আন্দাজ করে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল।

পেছন থেকে হাবু গলা নামিয়ে ঘটনাটা বললে, "ভলান্টিয়াররা এসেছিল—ডাক্তারবাবু রাগ করে সব খুলে দিয়েছেন।"

"ওঃ হো।" —সানো চৌধুরী সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ে বলে উঠল, "তুমি পাগল—আস্ত একটি খ্যাপা।"

ডাক্তার বললে, "পাগল আমি না তুমি—তোমরা, ওই বলদগুলো?" বলে গম্ভীর-কণ্ঠে সামনের রোগীটির উপর অকারণে ধমকে উঠল, "দেখি—নাড়ী দেখি।"

একমনে ডাক্তার নাড়ী টিপে দেখতে লাগল।

সানো চৌধুরী আর কথা না বাড়িয়ে চুপ করে বসে রইল।

[ক্রমশ]

কিস্তিতে ট্রানজিস্টার
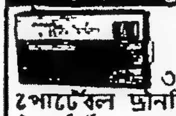
BAZA
৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড
৫ পোর্টেবল ট্রানজিস্টর মাসিক ৫ টাকা কিস্তিতে। প্রত্যেক গ্রাম ও শহরে পাঠান যাইতে পারে।
HIND AGENCIES (P7) KOLHAPUR ROAD, DELHI-7

নবজাতক (৫ম ও ৬ষ্ঠ রবীন্দ্র সংখ্যা পঞ্চম বর্ষ, ১৩৭৬) সম্পাদিকা মৈত্রেয়ী দেবী। ১৩/১ পাম এভেনিউ, কলকাতা—১৯।

ইতঃপূর্বেও আমরা এই পত্রিকাটির বিশেষ সংখ্যাগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছি। বর্তমান রবীন্দ্রসংখ্যাটি দেশ-বিদেশের মনীষীর মূল্যবান তথ্যপূর্ণ রচনা সম্ভারে সমৃদ্ধ। স্বর্গীয়া প্রতিমা ঠাকুর-এর 'গুরুদেব' শীর্ষক প্রবন্ধে তাঁর ঋষিতুল্য চরিত্রের বিশ্বজনীন রূপটি উদ্ঘাটিত ক'রে অকুণ্ঠ সম্মান ও ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করেছেন। বিষ্ণু দে তাঁর অলোকসামান্য 'চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধটিতে অতি সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন যে, 'এই ভারতীয় ভূমিতে রবীন্দ্রনাথই প্রথম আধুনিক শিল্পীর মানস আনলেন।' 'রবীন্দ্রনাথের ছবি কবিতার সম্পূরক—তাঁর ছবি ও কবিতা একে অন্যের রূপান্তর মাত্র নয়। বিদেশীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ কেমনভাবে প্রতিভাত—তার কয়েকটি মনোজ্ঞ আলোচনা—সুসান কার্পালেস লিখিত 'ফরাসীদের চোখে রবীন্দ্রনাথ'; লুডমিল স্তোয়িনভ (ম্যাগাজিন ইস্তোক (ইস্ট) ১৯২৬) রচিত 'জীবনগুরু' ও জে বেনী (প্যারিস, এপ্রিল ১৯৬১) রচিত 'রবীন্দ্রনাথ' এই তিনটি প্রবন্ধে তার কিছু পরিচয় পাই। মৈত্রেয়ী দেবীর সুদীর্ঘ প্রবন্ধ 'বিদেশে রবীন্দ্রসাহিত্য চর্চা' তথ্যনিষ্ঠ ও বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ। 'পূর্বপাকিস্তানে রবীন্দ্রচর্চা' এই শিরোনামায় আনিসুজ্জামান-এর 'রবীন্দ্রনাথের সমাজচিন্তা : একটি দিক' এই প্রবন্ধটি একটি আলোকিত রচনা যেখানে তিনি সাম্প্রদায়িকতা বিরোধী রবীন্দ্রনাথের অপরূপ চিত্র অঙ্কন করে বলছেন, 'রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি, যন্ত্রশক্তির বিকাশ, জীবন ধারণের আবশ্যকীয় উপকরণের শুভকর বণ্টন আর সর্বোপরি সবল মানবতার প্রতিষ্ঠা কামনার মধ্যে আশি বছরের বিচিত্র সৃষ্টিশীল জীবনের যবনিকা পাত হল।

চিকিৎসক-সমাজ (বর্ষ—১ সংখ্যা—২ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৬) সম্পাদক ডাঃ অমল ঘোষহাজরা ১৫১, ডায়মন্ড হারবার রোড, কলকাতা—৩৪। দাম—প্রতি সংখ্যা ২০ পয়সা।

'চিকিৎসক-সমাজ' একটি অভিনব পত্রিকা। এ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি ও কবিরাজী তিন রকম চিকিৎসা পদ্ধতির বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা তো রয়েছে, এ ছাড়া এতে স্থান পেয়েছে, এ্যালোপ্যাথ, আয়ুর্বেদীয় ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক পঞ্জী, চিকিৎসক ও চিকিৎসা সংক্রান্ত বিভিন্ন সংবাদ, সাংস্কৃতিক সংবাদ, চিকিৎসকদের লেখা গল্প, কবিতা ইত্যাদি। চিকিৎসার মূল উদ্দেশ্য মানুষের স্বাস্থ্যরক্ষা ও রোগ নিরাময়। এইরকম একটি অভিনব পরিকল্পনায় প্রকাশিত পত্রিকার মাধ্যমে বিভিন্ন মতাবলম্বী চিকিৎসকদের মত বিনিময়, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ইত্যাদি সমগ্র মানবসমাজের কল্যাণেই নিয়োজিত হবে বলে মনে করি। বৈজ্ঞানিক বৈপরীত্য তো বিভিন্ন মতের থাকবেই। তা সত্ত্বেও বৈচিত্র্যের মধ্যে এই সমন্বয়ের জন্য সাধুবাদ জানাচ্ছি। কতকগুলি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা থেকে পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। লেখকগোষ্ঠীতে আছেন : রবীন্দ্র কবিরাজ, ডাঃ সরোজ মুখার্জী, কবিরাজ বগলাকুমার মজুমদার, ডাঃ সাধন ঘোষ, ডাঃ রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, ডাঃ সুবোধ দত্ত, কবিরাজ শিবকালী ভট্টাচার্য, ডাঃ ত্রিগুণানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, কবিরাজ নরেন্দ্রচন্দ্র আচার্য প্রমুখ।

স্বাস্থ্য দীপিকা (বর্ষ ৬, সংখ্যা ১০, অক্টোবর '৬৮) পরিবার পরিকল্পনা বিশেষ সংখ্যা। পরিচালনা সম্পাদক : শ্রীনিতাইপদ মুখোপাধ্যায়। দাম—ষাট পয়সা।

দীর্ঘ ৬ বছর ধরে এই পত্রিকাটি স্বাস্থ্য সংক্রান্ত মূল্যবান বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধাদি পরিবেশন করে একদিকে যেমন সুস্বাস্থ্যরক্ষার বিধিনিয়ম প্রচার করছে, অন্যদিকে তেমনই বাংলাভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার পথ প্রশস্ত করে দিচ্ছে। বস্তুত এই রকম পত্রিকার মূল্য অপরিসীম। স্বাস্থ্য দীপিকার আলোচ্য পরিবার পরিকল্পনা বিশেষ সংখ্যাটি সাধারণের নানা জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। যাঁদের মূল্যবান প্রবন্ধে পত্রিকাটি সুসজ্জিত, তাঁরা হচ্ছেন : ডাঃ সুনীলকুমার হাজরা, শ্রী এস আর দাস, লেঃ জেঃ ডাঃ একে দেব, ডাঃ মিস চন্দ্রশেখর, লেঃ কঃ বি এল রায়না, ডঃ ফুলরেণু গুহ, মিঃ গোবিন্দনারায়ণ, শ্রীঅশোক মিত্র, ডাঃ রমেশ আচার্য, ডাঃ গোলক দে, ডাঃ কমলকুমার ব্যানার্জী, শ্রীআরতি দত্ত, শ্রীগীতা মুখোপাধ্যায় ও শ্রীরত্না বন্দ্যোপাধ্যায়।

চতুষ্কোণ : মাসিক সাহিত্যপত্র—অষ্টম বর্ষ—একাদশ সংখ্যা : ফাল্গুন ১৩৭৫ : সম্পাদক : শ্রীশিবপ্রসাদ চক্রবর্তী : ১২৩, আচার্য জগদীশ বসু রোড, কলকাতা—১৪। দাম ১·০০ টাকা।

এই সংখ্যায় প্রকাশিত 'রবীন্দ্র মানসে গঙ্গা' ও 'রুশ লোকসাহিত্য' দুটি তথ্যবহুল প্রবন্ধ। শ্রীসুনাথ মজুমদারের 'একটি কবিতা : দুটি অনুবাদ' শীর্ষক প্রবন্ধটিতে লেখক হুইটম্যানের To a Common Prostitute কবিতাটির অনুবাদ সম্পর্কে যে প্রবন্ধটি লিখেছেন তা সত্যিই হাস্যকর। কাব্য অনুবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তিই সত্য। কবিতার অনুবাদ যথার্থই সৃষ্টিধর্মী কাজ এবং তার সঙ্গে স্কুলের তর্জমা অনুশীলনের কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। এই সংখ্যার কবিতাগুলির মধ্যে পূর্ণেন্দুবিকাশ ভট্টাচার্যের 'এখন এখানে' এবং অন্য দু-একটি কবিতাও ভালই লাগল।

দেহাত (প্রথম বর্ষ ১ম ও ২য় সংকলন)। সম্পাদক বরুণ রায়। পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ। মূল্য—পঁচিশ পয়সা।

আলোচ্য পত্রিকাটি পাক্ষিক সাহিত্য সংবাদ সংকলন। মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে প্রকাশিত। মফস্বলের পত্রিকা হলেও প্রকাশকদের সংবাদ ও সাহিত্যের প্রতি নিষ্ঠা লক্ষ্য করা যায় 'দেহাত' হল দেহাতী মানুষের কাগজ। এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় ত্রিদিব চৌধুরী ও মাখন পালের প্রবন্ধ দুইটি তথ্য ও তত্ত্বমূলক। দ্বিতীয় সংখ্যায় পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বৈদ্যনাথ চক্রবর্তীর রচনা দুইটিও সুখপাঠ্য। এই ছাড়া রয়েছে সংখ্যা দুইটিতে কবিতা ও স্থানীয় সংবাদ। বাংলার সংগ্রামী মানুষের কাছে এই পত্রিকাটি সমাদর লাভ করবে।

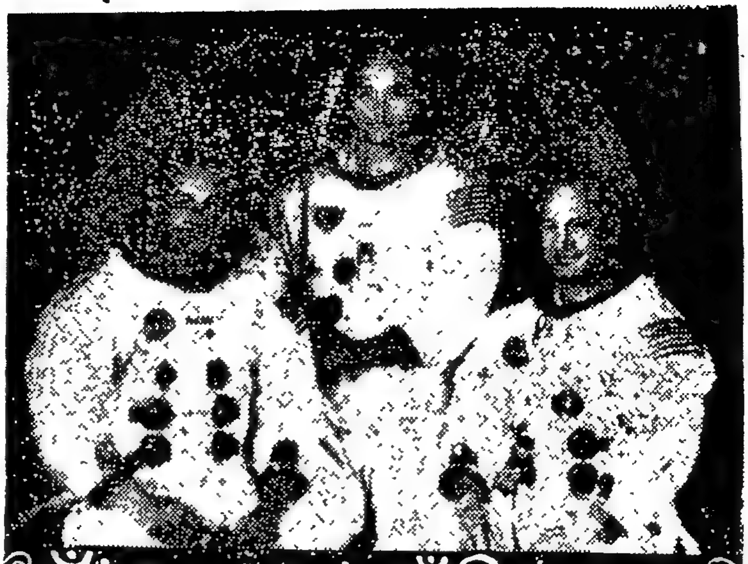

চাঁদে যাওয়ার ঝুঁকি / বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

দুঃসাহসের নেশা আদ্যিকাল থেকেই মাতাল করেছে মানুষকে এবং সেই মাতলামোর ঘোর আজও লেগে আছে তার চোখেমুখে।

চাঁদ-অভিযানের মধ্য দিয়ে দুঃসাহসের নেশায়-পাওয়া মাতাল মানব-মনের নতুন দিগন্ত আবিষ্কার করছি আমরা। আমরা খুঁজে পাবার চেষ্টা করছি সেই মানুষকে, সহস্র বিঘ্নের উদ্যত ফণার সামনে দাঁড়িয়েও যে ব'ল, 'আমি অপরাজিত'।

মানুষের এই বলাটা চাঁদ-অভিযানের বেলায় আরও মর্মান্তিক হয়ে উঠছে। কেন না, কারিগরী বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি সত্ত্বেও মানুষ আজ এমন কথা বলতে পারছে না যে, নিশ্চিন্তে চাঁদের দেশে পাড়ি দেবো আমি। বরং আজ উল্টো কথাই বলছে সে। বলছে, 'চাঁদে পাড়ির পথে বাধা অনেক, বিঘ্ন অজস্র। যাত্রালগ্নে রকেট-প্রজ্বলনের মুহূর্তটি থেকে সুরু করে সাগর-বুকে নেমে আসা অবধি অনেক-অজস্র বাধা-বিঘ্ন'।

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ থেকে ছুটি নেবার মুহূর্ত এবং চাঁদে নামাব ও ফিরে আসাব মুহূর্তও বিঘ্ন-কন্টকিত। কেন না, রহস্যময় অজানার পথ ধ'রে সম্পূর্ণ এক নতুন দেশে অভিযান এবার।

বিশেষজ্ঞরা অবিশ্যি বলছেন, হলই বা দেশটা নতুন আর পথটা রহস্যময় ও অজানা। তাই বলে অভিযাত্রীরা সত্যি-সত্যিই তো আর বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছেন না ওখানে। পৃথিবীর সঙ্গে ও'দের যোগাযোগ বরাবরই অটুট থাকছে। এমন কি পৃথিবী থেকে ৪ লক্ষ কিলোমিটার দূরে চাঁদের মাটিতে দাঁড়িয়েও ঘরের লোকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারছেন ও'রা।

ঘরের লোকরা অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করছে তখন। বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীরা তখন বসে আছেন 'কন্ট্রোল রুম'-এর সামনে। মহাকাশচারীদের এতটুকু অসুবিধে হলেই পৃথিবী থেকে নির্দেশ দেবেন ও'রা: মহাকাশযানে এতটুকু গন্ডগোল দেখা দিলেই সাধ্য মতো পরামর্শ পাঠিয়ে ও'রা সাহায্য করবেন।

শুনতে পাই, সাহায্য নাকি অভিযাত্রীদের স্ত্রীরাও করতে পারবেন দরকার হলে। মহাকাশচারী স্বামীদের ও'রা উৎসাহ দিতে পারবেন।

উৎসাহ-দেবার এই শেষোক্ত ব্যবস্থাটা নতুন ধরণের বটে। কেন না, অতীতে পৃথিবীর বুকে যখন দুঃসাহসিক সব অভিযান হয়েছে, তখন এ-ধরণের ব্যবস্থার কথা মানুষ স্বপ্নেও ভাবতে পারে নি।

এছাড়া, আজই কি ভাবতে পারছে মানুষ? আজই কি সে বিশ্বাস করতে পারছে যে, টেলিভিশন এবং বেতারের দৌলতে চাঁদ-অভিযাত্রী মহাকাশচারীদের প্রায় সমস্ত কার্যকলাপ ঘরে বসেই প্রত্যক্ষ করা সম্ভব?

অথচ সম্ভব তো হচ্ছে এখন। ঘরে বসেই অভিযাত্রীদের সমস্ত কথাবার্তাও এখন শোনা যাচ্ছে। আর চাঁদ-অভিযানের উদ্যোক্তারাও শুনিয়ে দিচ্ছেন সঙ্গে সঙ্গে, এ একেবারে নতুন জিনিস। একেবারে অভিনব। এর আগে আর কোনো অভিযানে এত লোক সাক্ষী হন নি।

কিন্তু তবু বলবো, সাক্ষী-সাবুদের ব্যাপারটা পরে আসছে। খোদ অভিযান সফল হলেই সাক্ষীর প্রশ্ন উঠছে।

এদিকে অভিযানের সাফল্য নিয়ে আশা-নিরাশায় দুলছেন বিজ্ঞানীরা। 'ন্যাসা'র (ইউনাইটেড স্টেটস ন্যাশনাল অ্যারোনটিক্স অ্যান্ড স্পেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশান) প্রশাসক ডঃ পেইন বলছেন,

> "আমাদের আগেকার কয়েকটি সাফল্যের দিকে তাকিয়ে অনেকেই খুব আশাবাদী হয়ে পড়েছেন এখন। অনেকেই ভাবছেন, অ্যাপোলো-১১-র সাফল্য একেবারে অবধারিত।...কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, এ হল দারুণ বিপজ্জনক এক অভিযান। ...মানুষ এমন এক জায়গায় এখন যাচ্ছে, যেখানে আগে কেউ কোনোদিন যায় নি।...অতএব প্রথমবার চাঁদে নামতে গিয়ে ব্যর্থ হওয়া আমাদের পক্ষে খুবই স্বাভাবিক।"

ব্যর্থতার ভাবনা 'ন্যাসা'র অন্যান্য কর্মকর্তাদের মনেও উঁকিঝুঁকি মারছে। অনেককেই বলতে শোনা যাচ্ছে, চাঁদ-অভিযানে কোথাও যদি এতটুকু গলদ ঘটে তো অভিযাত্রীরা চাঁদে নামবেন না আর; অভিযান অসম্পূর্ণ রেখেই ঘরে ফিরে আসবেন। অবিশ্যি বিকল্প কোনো ব্যবস্থাও হতে পারে। হতে পারে এমন অ মহাশূন্যে গিয়ে বিপদে পড়লেন অভিযাত্রীরা; চাঁদ অবধি পৌঁছুতে পারলেন না। সেক্ষেত্রে পৃথিবীর দিকে তাড়াতাড়ি ফিরে আসবেন ও'রা। ১০ দিন ধরে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে করতে ও'রা মূল্যবান কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন।

কিন্তু পৃথিবী-প্রদক্ষিণের পথও যদি রুদ্ধ হয়? যদি ঘরে ফেরার কোনো পথই খোলা না থাকে?

'ন্যাসা'র বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অ্যাপোলো-১২ ও ১৩ প্রস্তুত থাকবে সেক্ষেত্রে। নতুন মহাকাশচারীদের নিয়ে সেক্ষেত্রে নতুন করে অভিযান হবে আবার।

শুনতে পাই, নতুন—অভিযানের ব্যবস্থা আগে থাকতেই করে রাখা হচ্ছে। রকেট গড়া হচ্ছে দ্রুত এবং সেই সঙ্গে মহাকাশচারীদেরও তালিম দেওয়া হচ্ছে। আগে থাকতেই ব্যবস্থাটা করে রাখা হচ্ছে এমন, যা'তে করে প্রতি দু' মাস অন্তর একটি করে অ্যাপোলো-মহাকাশযান চাঁদের দিকে যেতে পারে।

কিন্তু অ্যাপোলো-১১? যেতে পারবে কি সে? চাঁদের দেশে সে কি পৌঁছুতে পারবে?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পৌঁছুবার পথে বিপদ হতে পারে যে কোনো মুহূর্তে। কারণ, অ্যাপোলো-১১-র অভিযাত্রীদের আগেকার সব ক'টি মানুষ-বাহী মহাকাশযানকে সবরকম বিপদ-আপদের ঝুঁকি মাথায় নিয়ে যেতে হচ্ছে এবং এছাড়া নিতে হচ্ছে অতিরিক্ত কিছু ঝুঁকি।

এই অতিরিক্ত ঝুঁকিটা কী, তা' আগেকার দু'টি স্মরণীয় মহাকাশ-অভিযানের সঙ্গে মিলিয়ে আলোচনা করা যাক।

কিছুদিন আগে, ১৯৬৮ সালের ডিসেম্বরে অ্যাপোলো-৮-এ চেপে তিনজন

ব্লাড ব্যাঙ্কে

মনোরমা সিংহরায়

শুধুই কাজের কথা মধ্যাহ্নের অতিতপ্ত আলোকে
হিসেবের খাতা খুলে দিনগুলি হেঁটে হেঁটে যায়।
জানালার পাশে সেই টগরের গাছ ফুলে ফুলে
কতো যে ফুলন্ত হলো ভুলেও পড়ে না চোখে আর॥

সময় তো পলাতক, একে একে সকলেই পালায়
কবিতা কোথায় বলো? এখানে শুধুই কাজ করা
রুগী আর রোগ দেখা, ব্লাড ব্যাঙ্ক, রক্ত চাই ত্বরা
রক্ত না মিললে পরে রুগীকে বাঁচানো হয় ভার॥

বিদায়ের দৃশ্য দেখি স্তব্ধ শোক আর কান্না শুনি।
অন্ধকার নেমে আসে চারিধারে সকলের মনে॥
হঠাৎ কখন যেন রক্ত পেয়ে কী উল্লাস ধ্বনি
জননীর মুখে হাসি রক্তদান সার্থক হয়েছে।
সব দৃশ্য মুছে যায় নবজাত শিশু এক হাসে
ব্লাড ব্যাঙ্ক—দুই পাশে টগরের গাছ ভরা ফুলে॥

মহাকাশচারী চাঁদের আকাশে অভিযান করেন এবং ১০ বার ও'রা প্রদক্ষিণ করেন চাঁদকে। ১৯৬৯ সালের মে মাসে অ্যাপোলো-১০-এর কীর্তিকলাপ ৮-কে অনেক দূরে ছাড়িয়ে গেল। ঐ সময়েই অ্যাপোলো থেকে নেমে চান্দ্রযানে করে চাঁদের মাত্র ৯ মাইলের মধ্যে এগিয়ে গেল মানুষ।

এখন অ্যাপোলো-১১-যাত্রী মানুষদের এ দুটি অভিযানের সব রকম ঝুঁকিই নিতে হবে; এবং এই সঙ্গে নিতে হবে নতুন কিছু ঝুঁকি। কেন না, অ্যাপোলো-১১-র দুজন যাত্রী নেইল এ আর্মস্টং এবং এডউইন ই অলড্রিন চাঁদের মাটিতে নেমে আসবেন।

বিশেষজ্ঞদের ধারণা,—মহাকাশচারীদের এইভাবে চাঁদের মাটিতে নেমে আসার ঝুঁকির সঙ্গে পূর্ববর্তী মহাকাশ-অভিযানগুলোর কোনোরকম তুলনাই চলে না। কারণ, এ ক্ষেত্রে মূল মহাকাশযান ছেড়ে চান্দ্রযানে করে সম্পূর্ণ এক নতুন জগতে নেমে আসবে মানুষ।

এ ক্ষেত্রে নেমে আসবার সময় তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে, যা'তে মোটামুটি সমতল অঞ্চলের ওপর অবতরণ করে চান্দ্রযান; এবং অবতরণের সময় যা'তে তার গুরুতর রকমের কোনো ক্ষতি না হয়। কেন না, এই চান্দ্রযানে করেই আর্মস্ট্রং ও অলড্রিনকে মূল মহাকাশযানে ফিরে যেতে হবে আবার।

মূল মহাকাশযানটি চালাবেন মাইকেল কলিন্স। সহযাত্রীদের প্রত্যাগমনের আশায় চাঁদের আকাশে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করবেন তিনি। কিন্তু মনে রাখতে হবে, চাঁদের দেশে পৌঁছে সহযাত্রীদের কোনো বিপদ হলে তাঁর কিছুই করার থাকবে না। চাঁদের মাটিতে নেমে কিছুতেই তিনি উদ্ধার করতে পারবেন না আর্মস্ট্রং ও অলড্রিনকে। কেন না, মূল মহাকাশ-যানটির এমন ক্ষমতা নেই যা'র সাহায্যে সে চাঁদের মাটিতে অবতরণ করতে পারে।

অতএব, আগাগোড়া খুবই সাবধান থাকতে হবে আর্মস্ট্রং ও অলড্রিনকে। চান্দ্রযান যা'তে এতটুকু বিগড়ে না যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কেন না, পৃথিবীতে ফিরে আসার একমাত্র সম্বল এই যানটি একবার বিগড়োলেই সর্বনাশ অবধারিত; হাজার আর্তনাদের বিনিময়েও জল-বাতাসহীন নির্মম-নিষ্ঠুর চাঁদের দেশ থেকে এতটুকু সাহায্য মিলবে না। পৃথিবী থেকে নতুন আর একটি অ্যাপোলো নিয়ে গিয়েও উদ্ধার করার সময় থাকবে না আর।

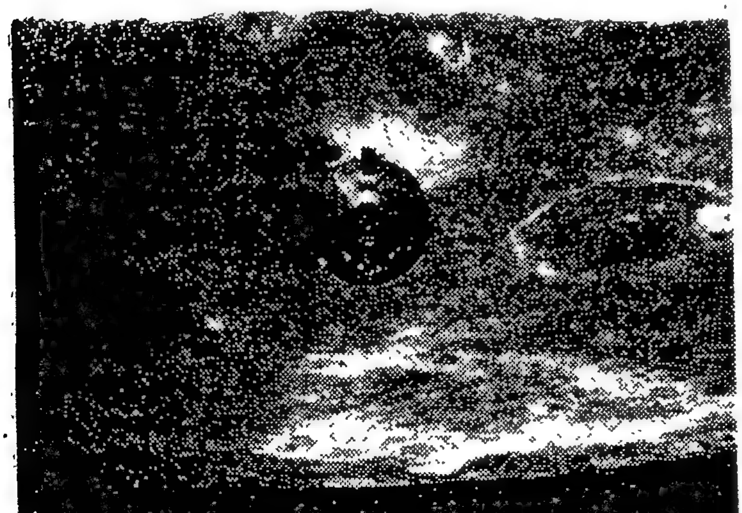

চাঁদ-প্রদক্ষিণরত অ্যাপোলো-১০। ছবিটি চান্দ্রযান থেকে নেওয়া

চাঁদ-অভিযানের এই বিপদ-আপদের কথা স্মরণে রেখেই স্থির হয়েছে, চাঁদে পৌঁছে আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন চান্দ্রযানের যন্ত্রপাতিগুলো পরীক্ষা করে নেবেন সকলের আগে। যন্ত্রপাতির কোথাও এতটুকু গলদ দেখা দিলে আগে তাঁরা সেটি মেরামত করে নেবেন। আর যদি দেখা যায়, গলদ ক্রমেই বড় রকমের হয়ে উঠছে, তবে মেরামতের চেষ্টা না করেই চাঁদের কক্ষপথে মূল যানটিতে ফিরে আসবেন তাঁরা।

অবিশ্যি নির্দিষ্ট সময়ে ফেরার প্রশ্ন না উঠলেও সম্ভাবনা থাকবে প্রতি মুহূর্তে। চাঁদে আর্মস্ট্রং ও অলড্রিনের যে ২২ ঘণ্টা সময় কাটবে, বিপদ-আপদের আশঙ্কায় অনেকের কাছেই তা মনে হবে ২২ বছরের চেয়েও দীর্ঘতর।

কিন্তু বিপদ-আপদ কি শুধু বাইরেই? ভেতরে নেই? চাঁদে গিয়ে অভিযাত্রীদের দেহে এবং মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে না?

মহাকাশচারীদের চিকিৎসক ডাঃ চার্লস এ বেরী বলছেন, "হলেও তা মারাত্মক কিছু হবে না। কারণ, চাঁদে যাবার জন্যে এমন সব মহাকাশচারীকেই আমরা নির্বাচন করেছি, যাঁদের মানসিক শক্তি অসাধারণ এবং যাঁরা মানসিক কোনো আঘাতকে স্বাভাবিক শক্তির বলেই প্রতিহত করবার ক্ষমতা রাখেন।"

—এই ক্ষমতা অটুট থাকে যেন!—আমরা প্রার্থনা করি।

আমরা কামনা করি, পাঁচের মতো জমাট কালো মহাকাশের বুকে মানুষের বিপজ্জনক এই খেলা জয়যুক্ত হোক।

বিশ্ব কমিউনিস্ট সম্মেলন

তুষার চট্টোপাধ্যায়

[মতামত লেখকের]

জুন মাসে যে বিশ্ব-কমিউনিস্ট সম্মেলন হয়ে গেল, তার দিকে সমগ্র পৃথিবীর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। স্বভাবতই কমিউনিস্ট-আন্দোলনের বন্ধু এবং শত্রু—দুইয়ের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন। বন্ধুদের দৃষ্টি ছিল এই সম্মেলনের সাফল্য কতটা হয় তার দিকে। আর শত্রুরা আশা করছিল, যে-মতভেদের পরিপ্রেক্ষিতে এই সম্মেলন হচ্ছে, তাতে এই সম্মেলন একটা লোক-দেখানো চেষ্টা মাত্র, কমিউনিস্ট-আন্দোলনে ঐক্য আর কিছুতেই আসবে না। এবং সেটা কমিউনিজমের শত্রুদের পক্ষে মঙ্গলেরই কথা।

১৯৬০-এর পর থেকে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি যেভাবে সর্ব-সম্মত আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট-আন্দোলনের মূল ধারা থেকে ক্রমশ সরে গিয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক ধারা সৃষ্টি করল এবং যার ফলে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট-আন্দোলন স্পষ্টভাবেই এমন বিভক্ত হয়ে পড়ল যে, দেশে দেশে সে-বিভাগ ছড়িয়ে পড়ল, তাতে কমিউনিজমের শত্রু সাম্রাজ্যবাদ উল্লসিত হয়েছিল। আরো উল্লসিত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদ, যখন এই বিভাগ শুধু মতপার্থক্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকল না, সোভিয়েটকে চীন খোলাখুলিভাবেই সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী আখ্যা দিয়ে আক্রমণ করল এবং সোভিয়েটের কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তার সংঘাতকে 'বিরোধিতামূলক' (antagonistic), অর্থাৎ শত্রুর সঙ্গে সংঘাতের সমার্থক বলে জাহির করল। লক্ষ্য করার বিষয়, সাম্রাজ্যবাদ তার দিক থেকে এই আরো অনুকূল অবস্থাকে কাজে লাগাতে একটুও দেরি করল না। ভিয়েতনামের ওপর মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণ-বৃদ্ধি ঘটল এই পরিপ্রেক্ষিতেই। অবশ্য এটাও ঠিক যে, চীনের এই উগ্র সোভিয়েট-বিরোধিতা অনেক চীন-সমর্থক কঃ পার্টির কাছেও এমন কমিউনিস্ট-নীতি-বিরোধী মনে হল যে, তাদের অনেকেই তার পর থেকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট-আন্দোলনকে রক্ষা করায় আগ্রহী হয়ে উঠল। কিন্তু তার পর আবার চেকোশ্লোভাকিয়া মত-বিরোধ হল। এবং এ-মতবিরোধ প্রধানত চীন-বিরোধী এবং সোভিয়েট-সমর্থকদের মধ্যে হওয়ায় আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংহতির মূল জায়গাতেই আঘাত এল। সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী আবার নতুন করে খুশি হয়ে ভাবল যে, এবার আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট-আন্দোলন আর কিছুতেই জোড়া লাগতে পারবে না।

অন্যদিকে, চীন-সোভিয়েট মত-বিরোধের শুরু থেকেই অধিকাংশ কমিউনিস্ট ও কমিউনিস্ট-আন্দোলনের মিত্রদের মনে প্রশ্ন ছিল, একটা আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মধ্য দিয়ে আবার কমিউনিস্ট সংহতি ফিরিয়ে আনা যায় কি না। গোঁড়া চীন-সমর্থকদের কথা বাদ দিই। কেন না, তাঁরা বিচ্ছেদটাই বাড়াতে চেয়েছিলেন। কিন্তু অধিকাংশের আগ্রহ ছিল মত-বিরোধের বিষয়টার সম্বন্ধে একটা যৌথ সিদ্ধান্ত, যাতে পথ-নির্দেশটা স্পষ্ট হয়। কিন্তু তার মধ্যেও দ্বিমত ও ইতস্তত ভাব ছিল এইজন্য যে, আন্তর্জাতিক সম্মেলন করলেই চীনের ও চীন-সমর্থকদের সঙ্গে বিচ্ছেদ পাকাপাকি হয়ে যাবে এবং তাতে কমিউনিস্ট-আন্দোলনের ঐক্যের সমস্যা আরো জটিল ও সমাধানের অযোগ্য হয়ে দাঁড়াবে। কিন্তু যখন থেকে চীন সোভিয়েটকে সাম্রাজ্যবাদের দোসর বলতে আরম্ভ করল, তখন থেকে এই ইতস্তত মনোভাব কমতে লাগল এবং তার বদলে ক্রমশ এই মনোভাবই স্পষ্ট হতে লাগল যে, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সম্মেলনের আর দেরি করা উচিত নয়। কেন না, চীনের নীতি এখন আর শুধু আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংহতি বিভক্ত করার নীতিই নয়, তা নষ্ট করারই নীতি, যার বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট-সংহতি স্পষ্ট রূপ নেওয়া উচিত। স্পষ্টভাবে এই মনোভাব প্রকাশিত না হলেও, এই অনুভূতি যে ক্রমশ কমিউনিস্ট-আন্দোলনের প্রধান অনুভূতি উঠেছিল, তা অস্বীকার করার উপায় নেই। এই পটভূমিতে না দেখলে আজকের বিশ্ব-কমিউনিস্ট সম্মেলনের মূল চরিত্র ও দিক-নির্দেশটা বোঝা যাবে না। এ-পটভূমি বাদ দিলে মনে হবে, বুঝি এটা একটা যুক্তফ্রন্টের মতো শুধু সাধারণ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মোর্চা তৈরিরই চেষ্টা। এই মূল দিকটার প্রতি নজর থাকলে এটাও বোঝা যাবে যে, চেকোশ্লোভাকিয়া নিয়ে প্রচণ্ড মত-বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে অনুষ্ঠিত হলেও এবং বাহ্যত চেকোশ্লোভাকিয়া সমস্যাটাই সম্মেলনের সামনে সবচেয়ে বড় সমস্যা মনে হলেও, সম্মেলনের মূল ভিত্তিটা তার চেয়ে অনেক গভীর।

বুর্জোয়া-জগতের প্রচার ছিল যে, এ-সম্মেলন হয়ত শেষ পর্যন্ত হবেই না। কেন না, একে চীনের প্রচণ্ড বিরুদ্ধতা, তার ওপর চেকোশ্লোভাকিয়া নিয়ে মত-বিরোধ। আর যদিই বা সম্মেলন হয়, বেশ কিছু দেশের কমিউনিস্ট পার্টি এতে অংশ গ্রহণ করবে না। কমিউনিস্টদের মধ্যেও সন্দেহ ছিল যে, একমাত্র চীন-বিরোধী গোষ্ঠীই এতে যোগ দেবে এবং তাদের মধ্যেও চেকোশ্লোভাকিয়া নিয়ে এমন মত-পার্থক্য দেখা দেবে যে, সম্মেলন থেকে উল্লেখ-যোগ্য কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ত সম্ভব হবে না। অন্ততপক্ষে, এ-সম্মেলন একটা চেষ্টা মাত্র, সাফল্যের খুব একটা আশা এর মধ্যে নেই—এইরকম দৃষ্টিতেই সকলে চেয়েছিল সম্মেলনের দিকে। কিন্তু তা হল না। ৭৫টি কমিউনিস্ট পার্টি এতে খোলাখুলিভাবেই যোগ দিয়েছে, আর আরো কয়েকটি পার্টি যোগ দিয়েছে অপ্রকাশ্যভাবে, তাই তাদের নাম করা হয় নি। মোট প্রায় ৮২।৮৩টি পার্টির অংশ গ্রহণ হয়েছে এতে। উত্তর ভিয়েতনাম প্রভৃতি কয়েকটি দেশ, যাদের চীন নিজের দিকে রাখতে চায়, তারা এই সম্মেলনে যোগ না দিলেও, শুভেচ্ছা জানিয়েছে সম্মেলনের প্রতি। রুমানিয়া চীন ও সোভিয়েটের মধ্যে সমদূরত্ব রাখতে চেষ্টা করে। সেই রুমানিয়াও সম্মেলনে অংশ নিয়েছে। কিউবার অবস্থানও অনেকটা তাই, সেও দর্শক হিসাবে সম্মেলনে এসেছে। সুতরাং মোট হিসাবে দেখলে, এই সম্মেলন চীন-সমর্থক অবস্থানের ভিত্তি প্রায় নষ্ট করে দিয়েছে। একমাত্র আলবেনিয়া ছাড়া চীনের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সম-অবস্থানে দাঁড়াবার আর কেউ অত্র নেই। এ-অবস্থাটা আজকের পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্য ও সংহতির দিক থেকে নিশ্চয়ই একটা সাফল্যের কথা।

সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী ৭৫টি পার্টির মধ্যে একমাত্র ডোমিনিকান কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়া আর কেউ সম্মেলনের মূল দলিলকে প্রত্যাখ্যান করে নি। স্বাক্ষর করেছে অধিকাংশই। বৃটেন, নরওয়ে এবং রিইউনিয়ন পার্টি

তাঁদের কেন্দ্রীয় কমিটির সঙ্গে পরামর্শ করে তারা পরে স্বাক্ষর দেবে বলেছে এবং ইটালি, অস্ট্রেলিয়া ও স্যানম্যারিনো জানিয়েছে যে, তারা স্বাক্ষর করলেও, তার সঙ্গে কিছু কিছু বিষয়ে দ্বিমত জানিয়ে রাখবে। কিউবার পার্টি দর্শক হিসাবে উপস্থিত ছিল বলে তার স্বাক্ষরের প্রশ্ন ওঠে নি, কিন্তু কিউবা সোৎসাহে মূল দলিলের প্রতি সমর্থন জানিয়েছে। রুমানিয়ার পার্টি সম্মেলনে চীনের সমালোচনা হওয়ায় আপত্তি জানিয়েছিল। কিন্তু তারা সম্মেলন ছেড়ে চলে যাবে বলে যে রটনা হয়েছিল, তা মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। তারা কয়েকটি বিষয়ে দ্বিমত প্রকাশ করলেও সম্মেলনের মূল কাজের গুরুত্ব প্রকাশ্যভাবেই স্বীকার করেছে। এই সমস্ত বিষয় মিলিয়ে বিচার করলে এটাই প্রমাণিত হয় যে, কমিউনিস্ট-আন্দোলনের ঐক্যের প্রশ্নে আজ বিশ্বের সমস্ত কমিউনিস্ট পার্টিই কত সজাগ, সচেতন ও দায়িত্বশীল। এক কথায় বলতে গেলে, ১৯৬০-এর পর থেকে ধীরে ধীরে বিশ্ব-কমিউনিস্ট-আন্দোলনে বিভেদের যে চরিত্রটা প্রধান হয়ে উঠেছিল মাও-সে-তুঙের বিকৃত রাজনীতির ফলে, সে-চরিত্র বদলে গিয়ে ঐক্যের চরিত্রই আবার স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

এটা ঠিক, এই সম্মেলনে মত-বিরোধ ব্যক্ত হয়েছে যথেষ্ট এবং মূল ঘোষণায় মত-বিরোধের বিষয়গুলি যথাসম্ভব বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু মত-বিরোধ ব্যক্ত হওয়াটাই কমিউনিস্ট-আন্দোলনের ঐক্যের অভাব নয়। যে বিশ্ব-পরিস্থিতির মধ্যে সমাজতন্ত্রের অগ্রগতি হচ্ছে, তাতে সমস্যামুক্ত একটা সরল রেখায় অগ্রগতি হতে পারে না। পরিস্থিতির জটিলতা থেকে সমস্যার উদ্ভব হবেই, সে-সমস্যার বিচার-বিবেচনা নিয়ে মতভেদও হতে পারে। কিন্তু সে-মতভেদ বুর্জোয়া শ্রেণী ও শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যকার মতভেদ নয়, শ্রমিকশ্রেণীরই আভ্যন্তরীণ মতভেদ, যা দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার অ-বিরোধিতামূলক (non-antagonistic) দ্বন্দ্বেরই প্রকাশ এবং যা যৌথ আলোচনার মধ্য দিয়ে ক্রমশ সমাধান হবে। যদি এই মতভেদ শ্রেণী-মতভেদ হত, তাহলে কমিউনিস্ট-আন্দোলনের ঐক্যের জন্য সকলে সমবেত হত না বা সমবেত হলেও সম্মেলন ভেঙে যেত। সমাজতন্ত্রের শত্রুরা তাই আশা করেছিল। কিন্তু কমিউনিস্ট-নীতি এমন একটা মূল ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, যেখান থেকে শ্রমিকশ্রেণীর ঐক্যের পথে ছাড়া অন্য কোনো পথে যাওয়া যায় না। কমিউনিস্ট-নীতির এটাই তো ঐতিহাসিক সমস্যা।

অন্যদিকে, মত-বিরোধের সুনির্দিষ্ট বিষয়গুলি বাদ দিলেও, মূল দলিলের বক্তব্যে কমিউনিস্ট-আন্দোলনের পথ সম্বন্ধে কি কোনো অস্পষ্টতা রাখা হয়েছে? মোটেই না। কমিউনিস্ট-আন্দোলনের মূল দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে সর্বহারা-আন্তর্জাতিকতা। মূল দলিলে সেই কথাই ঘোষণা করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে, "অর্থনৈতিক বিকাশের স্তর, সামাজিক কাঠামো, জাতীয় চরিত্র ইত্যাদির তারতম্যের জন্য মতভেদ হতে পারে, কিন্তু এই সমস্ত মতভেদই সর্বহারা-আন্তর্জাতিকতার ভিত্তিতে ভ্রাতৃসুলভ আলোচনার ও সহযোগিতার দ্বারা দূর হবেই।" চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রশ্নকে উপলক্ষ করে বুর্জোয়া জগৎ এবং তার প্রচারে বিভ্রান্ত একদল বুদ্ধিজীবী বুর্জোয়া-গণতন্ত্রের নিয়মকেই সমাজতান্ত্রিক-গণতন্ত্রের মধ্যেও চালু করতে চেয়েছিল। তারা 'সমাজতন্ত্র রক্ষা করার চেয়ে 'হস্তক্ষেপ চলবে না' নীতিকেই বড় করে দেখতে চেষ্টা করেছিল। সেই বিভ্রান্তি দূর করতে এই সম্মেলনের দলিল ঘোষণা করেছে যে, "সমাজতন্ত্র রক্ষা করা কমিউনিস্টদের আন্তর্জাতিক কর্তব্য।" কারণ, "সমাজতন্ত্রের শত্রুরা সোশ্যালিস্ট-সমাজের ভিত্তি নষ্ট করে সোশ্যালিস্ট রূপান্তর ব্যর্থ করার জন্য ও তাদের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা বন্ধ করে নি।" এই কথাগুলিই স্পষ্ট করে দেয় যে, চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রশ্নে মতভেদ থাকলেও সমাজতন্ত্রের শত্রুদের চক্রান্ত সম্বন্ধে মতভেদ নেই।

সম্মেলনের ইতিবাচক কর্তব্য নির্ধারণ আরো স্পষ্ট। বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের চক্রান্তের প্রতিরোধে বিশ্বের সমস্ত কমিউনিস্ট ও অন্যান্য প্রগতিশীল শক্তির ঐক্যের আহ্বান জানান হয়েছে মূল দলিলে। ভিয়েতনামী জনগণের মৌলিক জাতীয় অধিকারসমূহের স্বীকৃতির ভিত্তিতে ভিয়েতনাম-সমস্যার সমাধানের দাবি ও দক্ষিণ ভিয়েতনাম জাতীয় মুক্তিফ্রন্টের দশ দফা কর্মসূচীর প্রতি সমর্থন জানান হয়েছে সম্মেলন থেকে। মধ্যপ্রাচ্য সমস্যা সম্পর্কে স্পষ্ট ঘোষণা করা হয়েছে যে, সাম্রাজ্যবাদ-পৃষ্ঠপোষিত ইসরাইলী ক্রিয়াকলাপই এর জন্য দায়ী। বিশ্ব-পরিস্থিতির আজকের প্রধান প্রশ্নগুলির ওপর স্পষ্ট ঘোষণা এই সম্মেলন থেকে হওয়া মানেই হচ্ছে বিশ্ব-কমিউনিস্ট-আন্দোলনের ঐক্যের ভিত্তি রচনা করা। চীন ঠিক এটারই বিরুদ্ধে। সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যথাক্রমে চীনের আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু চীনের আপত্তি, একমাত্র তার অনুসরণকারী ছাড়া আর সকলকেই কমিউনিস্ট-আন্দোলনের প্রতিবন্ধক মনে করে প্রত্যাখ্যান করা এবং তাই তার সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়োজিত হয়েছে কমিউনিস্ট-আন্দোলনকে বিভক্ত করে নিজ গোষ্ঠীর একটি সংহতি করায়। সুতরাং, অ-লিখিত ও অ-ঘোষিত হলেও এই বিশ্ব-কমিউনিস্ট সম্মেলন হচ্ছে চীনের রাজনীতির স্পষ্ট প্রত্যাখ্যানের প্রতীক।

প্রশ্ন উঠতে পারে, আগের দিনের মতো সর্ববিষয়ে একমত কমিউনিস্ট সংহতি আজ হচ্ছে না কেন? এর কারণ, সমাজতন্ত্রের যুগ যত এগিয়ে যাচ্ছে, তত একদিকে সমাজতন্ত্রের আদর্শের সুনির্দিষ্ট প্রয়োগের প্রশ্ন এসে পড়ছে, অন্যদিকে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের নতুন নতুন পদ্ধতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব বাড়ছে। স্বভাবতই এই পরিস্থিতিতে প্রধান দায়িত্ব এসে পড়ে দেশগুলির কঃ পার্টির ওপর। সেই জন্যই যুগ-পরিবর্তনের ধারার সঙ্গেই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সংহতির সাংগঠনিক চরিত্রও বদলে গেছে। কমিন্টার্নের সময় প্রত্যেক দেশের কমিউনিস্ট পার্টি ছিল কমিন্টার্নের অংশ, অর্থাৎ তার সঙ্গে 'অ্যাফিলিয়েটেড'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে সমাজতন্ত্র গড়ে তোলার কাজ আরো সুনির্দিষ্ট রূপ নেওয়ায় এবং সেই পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট-সংহতির প্রয়োজনে কমিন্টার্নের বদলে 'কমিনফর্ম' রূপ একটা মতামত-কেন্দ্র তৈরি হল কমিউনিস্ট-আন্দোলনকে পরিচালিত করার জন্য। তার পরে একদিকে সমাজতন্ত্রের শক্তির আরো বৃদ্ধি ও অপরদিকে সমস্যার বিভিন্নতা ও সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের নানা পদ্ধতি দুইয়ে মিলিয়ে প্রয়োজন হল প্রত্যেক দেশের কমিউনিস্ট-আন্দোলনের ওপর আরো বেশি দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়া।

তাই ১৯৬০-এর দলিলে প্রত্যেক দেশের পার্টির সম-মর্যাদা, ও সম-অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। কমিউনিস্ট-আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি ও পরিপক্কতারই পরিচয় এটা। এখন আর কোনো সাংগঠনিক সংহতি বা সংহতির কোনো নির্দিষ্ট কেন্দ্র দরকার নেই, দরকার মাঝে মাঝে সমস্ত কমিউনিস্ট পার্টির একত্র হয়ে আলোচনা করা ও সেই আলোচনা-প্রসূত সিদ্ধান্ত হিসাবে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট-আন্দোলনের পথ-নির্দেশ দেওয়া। এই অগ্রসর পরিস্থিতিতেই এবারের সম্মেলনকে দেখতে হবে। যতদিন কমিউনিস্ট-আন্দোলনকে নিজেকে রক্ষার দিকে নজর দিতে হত, ততদিন অনেক কিছু বাঁধাবাঁধি রাখার

প্রয়োজন হ'ত। কিন্তু এখন কমিউনিস্ট-আন্দোলন নিজেকে রক্ষার স্তর অতিক্রম করে সাম্রাজ্যবাদকে পরাস্ত করার অভিযানে দুর্বার গতিতে অগ্রসর। এ-অবস্থায় আভ্যন্তরীণ মতভেদ স্থায়ী প্রতিবন্ধক হতে পারে না, মতভেদ প্রকাশে ঐক্য নষ্ট হয়ে যেতে পারে না. বরং দায়িত্ববোধকে আরো স্পষ্ট ও পরিষ্কার করে তোলে। এই সম্মেলন থেকে তারই পরিচয় পাওয়া গেল নাকি ? সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে আজকের যুগের তিন শক্তি—বিশ্ব-সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণী ও জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম, এই তিন শক্তি পরস্পরের আরো কাছাকাছি এসেছে—এই উপলব্ধিই আজকের বিশ্ব-কমিউনিস্ট-আন্দোলনের ঐক্যের সবচেয়ে বড় প্রেরণা। স্বভাবতই এই সম্মেলনের প্রভাব প্রত্যেক দেশের কমিউনিস্ট-আন্দোলনের ওপর এসে পড়বে এবং তার ঐক্য ও শক্তিবৃদ্ধিতে প্রেরণা জোগাবে।

এই প্রসঙ্গে ভারতের কমিউনিস্ট-আন্দোলনের মধ্যেকার বিচ্ছেদের কথাটাও এসে পড়ে। প্রশ্ন উঠছে যে, এই বিশ্ব-সম্মেলনের পর ভারতের কমিউনিস্ট-আন্দোলনে, কমিউনিস্ট পার্টিতে ঐক্য ফিরে আসবে কি ? ঐক্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টার অত্যন্ত অনুকূল পরিবেশ এই বিশ্ব-কমিউনিস্ট-সম্মেলন যে তৈরি করে দিয়েছে, একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। একমাত্র যারা অন্ধ ও তাঁবেদারী মনোভাব নিয়ে মাও সে-তুং গোষ্ঠীকে সমর্থন করে, তারা ছাড়া অন্য সকলেই এই বিশ্ব-কমিউনিস্ট-সম্মেলনকে সমর্থনের মনোভাব নিয়েই দেখেছে। আমাদের দেশের মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে এ-সম্মেলনকে সেই দৃষ্টিতে দেখাই স্বাভাবিক। বিশেষত যখন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ধীরে ধীরে মাও সে-তুংয়ের চিন্তাধারার প্রভাব থেকে সরে এসেছে এবং সোভিয়েট-বিরোধিতাও বন্ধ করেছে, তখন এই সম্মেলনের ভিত্তির ওপর দাঁড়ানো নীতিগতভাবেই তাদের উচিত। এই সম্মেলনের সময়েই মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা বি, টি, রণদিভে ও সুরজিৎ রুমানিয়ায় গিয়েছিলেন। এ-থেকে বোঝা যায় যে, রুমানিয়ার পার্টির মাধ্যমে এই সম্মেলনের সঙ্গে একটা পরোক্ষ যোগসূত্র তৈরি করার চেষ্টা তাদের ছিল। এ-ছাড়া অন্য পথ তাদের নেই। কেন না, যতই তারা নিজেদের সোভিয়েট ও চীন দুইয়ের প্রভাব থেকে মুক্ত বলে জাহির করুন না কেন, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট-আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্কহীন হয়ে শুধু জাতীয় ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে থাকাটা কমিউনিস্ট পার্টি হিসাবে যে সঙ্গতিহীন হয়ে পড়ে, এটা তাঁরা বুঝেছেন। বিশেষ করে এই বিশ্ব-কমিউনিস্ট-সম্মেলনের পরপ্রেক্ষিতে এই অবস্থাটা অত্যন্ত প্রকট হয়ে ওঠে। কাজেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতির জন্য আজ মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি যে অত্যন্ত ব্যগ্র তা স্পষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু প্রশ্ন এই, আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট-সংহতির অংশ হওয়া শুধু তো পার্টির ইচ্ছার ওপরই নির্ভর করে না, যেমনটা হয়ে থাকে যুক্তফ্রন্টে। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট-সংহতির ভিত্তি হচ্ছে বিভিন্ন দেশ হিসাবে কমিউনিস্ট-শক্তির সম্মিলিত হওয়া। পার্থক্য থাকতে পারে একটা দেশের সঙ্গে আরেকটা দেশের, কিন্তু একটা দেশের ভিত্তিতে কমিউনিস্ট-আন্দোলনকে একটা আন্দোলন হিসাবেই দেখতে হবে। সুতরাং এখানে কমিউনিস্ট-আন্দোলনের মধ্যে ঐক্য আনাব ভিত্তি ছাড়া মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির আন্তর্জাতিক সংহতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন হওয়া কঠিন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ভারতের কমিউনিস্ট-আন্দোলনের মূল অংশ হিসাবেই আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট-আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল এবং এখনও আছে। কিন্তু মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির উদ্ভবটাই হচ্ছে ভারতের কমিউনিস্ট-আন্দোলনের মূল অংশের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। এই বিচ্ছিন্নতা কাটানোর মধ্য দিয়েই তার সম্পর্ক স্থাপন হতে পারে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট-আন্দোলনের সঙ্গে। এইখানেই এসে পড়ছে দুই পার্টির মধ্যে ঐক্যের প্রশ্ন। বিশ্ব-কমিউনিস্ট-সম্মেলন এই প্রশ্নকে আজ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে সামনে এনে দিয়েছে।

বলা বাহুল্য, বাস্তবে এই মুহূর্তে দুই কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক ঐক্যের কথা ভাবা যায় না। কেন না, মত-পার্থক্য রয়েছে প্রচুর এবং মত-পার্থক্য যত আছে, তার চেয়ে বেশি আছে পার্টিগতভাবে পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব। সুতরাং, পার্টিগত ঐক্যের আগে দুই পার্টির মিলিত প্রচেষ্টার একটা প্রক্রিয়া দরকার এ-দেশের কমিউনিস্ট-আন্দোলনকে সংহত ও শক্তিশালী করার জন্য। সেই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই দুই পার্টির ঐক্যের ভিত্তি তৈরি হতে পারে। সেই দিকে যদি সকল কমিউনিস্টের দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়, তাহলেই এই বিশ্ব-কমিউনিস্ট-সম্মেলনের সাফল্য ভারতেও অনুভূত হবে।

শেষ করার আগে এ-কথা বলা দরকার যে, কমিউনিস্ট-ঐক্যের প্রশ্নটি শুধু কমিউনিস্টদেরই চিন্তার বিষয় নয়। গণতান্ত্রিক জনতার দিক থেকেও, প্রগতিশীল আন্দোলনের দিক থেকেও চিন্তার বিষয়। কেন না, কমিউনিস্ট-আন্দোলন গণতান্ত্রিক শক্তির অগ্রগামী ও চালিকা-শক্তি হিসাবেই কাজ করছে। কমিউনিস্ট-আন্দোলনের শক্তি গণতান্ত্রিক শিবিরকেই গড়ে তুলতে ও প্রসারিত করতে সাহায্য করছে। কমিউনিস্টদের ঐতিহাসিক দৃষ্টির জন্য এটা হয়। সেই জন্যই, কমিউনিস্ট-আদর্শের সঙ্গে সর্বাংশে একমত না হয়েও বা অনেক মতভেদ রেখেও, গণতান্ত্রিক জনসাধারণ ও গণতান্ত্রিক পার্টিসমূহ চেয়ে থাকে কমিউনিস্টদের দিকে অগ্রগামী ভূমিকার জন্য। আজকে দেশের মধ্যে যে শক্তি-সংঘাত, শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক শক্তির মিলিত অভিযান, তাতে কমিউনিস্ট-শক্তিই যে প্রধান উদ্যোগ, দায়িত্ব ও চালিকা-শক্তি হিসাবে কাজ করছে, এ-কথা কোনো অ-কমিউনিস্টও অস্বীকার করে না এবং সেই জন্যই কমিউনিস্ট-অ-কমিউনিস্ট মিলিত গণতান্ত্রিক মোর্চা গড়ে উঠছে ও ক্রমশ শক্তিমান হচ্ছে। কমিউনিস্টদের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক রাখা উচিত নয়, কমিউনিস্ট-বিরোধিতার পথেই চলা উচিত —এই মনোভাব যাদের, তারা শুধু কমিউনিস্টদেরই পরিহার করে না, গণতান্ত্রিক শিবিরই পরিত্যাগ করে এবং স্থান নেয় প্রতিক্রিয়ার শিবিরে। সুতরাং গণতান্ত্রিক জনসাধারণের দিক থেকেই কমিউনিস্ট-শক্তির মূল্য, কমিউনিস্ট-আন্দোলনের মূল্য আজ ঐতিহাসিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কমিউনিস্ট-ঐক্য এই জন্যই সাধারণ মানুষেরই চাহিদা আজ। এখানে কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধা-বিভক্ত হওয়ায় তাই সাধারণ মানুষও বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। কিন্তু বিক্ষোভের মধ্যেও সাধারণ মানুষই কি অনবরত কমিউনিস্ট-ঐক্যের কথা বলে আসে নি? পার্টি দুটো হয়ে গেলেও সাধারণ মানুষ সর্বদাই দুই পার্টির মিলিত শক্তিকেই কমিউনিস্ট-শক্তি বলে বিবেচনা করে এসেছে। দুই পার্টি মিলিত হয়ে কোনো কাজ করলেই উদ্বুদ্ধ হয়েছে, মিলিতভাবে ফ্রন্ট তৈরি হলেই তাতে অনুপ্রেরণা পেয়েছে এবং জনশক্তির বিপুল উদ্বোধন তাতেই হয়েছে। এই যে বাস্তব, এটাই প্রমাণ করে যে কমিউনিস্ট-ঐক্যের পথে ছাড়া আজকের ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন হতে পারে না।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

দশ ঃ

নতুনকালের বুকে দাঁড়িয়ে পুরনোকে অবিশ্বাস করতে ইচ্ছে করে।

সত্যিই কি ছিল পুরনো? ছিল কোনদিন? ছিল আমাদের জীবনে?

আমরা মনের ভিতরে প্রশ্ন করতে থাকি। এই তো আমরা। আমাদের দেখতে পাচ্ছি। বর্তমান চলে যাচ্ছে আমাদের চোখের সম্মুখ দিয়ে হেসে-খেলে। নেচে গান গেয়ে। পুরনো যে সত্যিই ছিল তার প্রমাণ কোথায়?

প্রমাণ আমরাই। জলজ্যান্ত মানুষগুলি। খাচ্ছি-দাচ্ছি। গল্পগুজব করছি। হাসি-ঠাট্টা। রঙ্গমস্করা। ক্ষেতের কাজ করছি। দোকান আগলাচ্ছি। ঘর-গেরস্থালী করছি। সবই যেন সিনেমার ফিতের মত। পুরনোকে চিনবো কি করে?

চেনা কঠিন। পুরনো নতুনরূপেই আসে। পুরনোরূপে আসে না। তাই চিনতে কষ্ট হয় তাকে। কিন্তু পুরনোকে বাদ দিয়ে নতুন নেই। পিছনের ঢেউগুলি যদি না-থাকবে তো অগ্রবর্তী ঢেউগুলি আসবে কি করে?

এক ফকিরের সঙ্গে দেখা ডুয়ার্সে। বছর দশেক আগে। জায়গাটার নাম মনে আছে। ডুয়ার্সের পরিচিত জায়গা। বরোদীঘির কাছাকাছি। অবশ্য বরোদীঘি বলে লোকে। কিন্তু জায়গাটার আসল নাম বারোদীঘি। বারোদীঘি কেন? না, বারোটা দীঘি ছিল ওখানে এককালে। প্রায় বুজে গেছে একালে। চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যাবে কি না সন্দেহ। এখানকার জোতদারদের অধিকাংশই ছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকেরা।

চেল নদী বয়ে গেছে কাছ দিয়ে। তখন সন্ধ্যা হয়-হয়। বুনো হাতী আর বুনো শুকরের আস্তানা। কিন্তু ফকিরের ভয়-ডর নেই। যা সে-কথা।

ফকির বলেছিল, বাবা খুদা নিশ্চয় আছেন।

কি করে জানলে?

খুদা না-থাকলে এই দুনিয়া পয়দা হল কি করে? এই চান্দ-সুরুজ এল কোথেকে? বলে মুচকি-মুচকি হাসছিল। শীতকাল। শীতের ছোট বেলা। হাওয়ায় শীতের আমেজ।

ফকিরের কথা শুনে ফিরে আসতে আসতে ভাবছিলাম। এ তাঁর জ্ঞান-বিশ্বাসের কথা। তাঁর উপলব্ধির কথা। তাই তাঁর সঙ্গে তর্ক করি নি। তবে এ-কথা ঠিক, খুদা আছেন কি নেই জানি না, তবে সব জিনিষেরই একটা সূত্র আছে। ইংরাজিতে যাকে বলে সোর্স। অরিজিন যাকে বলে। পাহাড় আছে। তাতে বরফ জমে। তাতেই বরফ-গলা জলে নদীর সৃষ্টি হয়। সেই জল নামে লোকালয়ের বসতবাড়ির পাশ দিয়ে। পিছন আছে বলেই সম্মুখ আছে।

কিন্তু অনেক সময় পিছনটা মনে থাকতে চায় না।

ইতিহাস সেই অতীতকে মনে করিয়ে দেয়। ইতিহাস কি? গুণিজন বলেছেন, ইতি হ আস—এই তিনে মিলে তার সৃষ্টি। তার মানে হচ্ছে কি? না, এইরূপ হয়ে আসছে। ইতিহাস মানে তাই। মানবজাতির জীবনে যা হয়ে আসছে। সে ত' অনেক-দিনের কথা। অনেককালের। আসলে যেদিন থেকে সুরু—অর্থাৎ মানুষের সৃষ্টি, সেদিন থেকেই ইতিহাস।

কিন্তু অতবড় একটা বিশাল জিনিষকে মানুষ ধরবে কি করে? দেখতে হলে তাকে চোখের সামনে ধরা চাই যে। একটা নির্দিষ্ট দূরত্বে স্থাপন করতে হয়। তাই নিরবধিকাল ভাঙতে হয়েছে টুকরো-টুকরো করে। বাঁধতে হয়েছে একেকটা বিশেষ কালের সীমানায়। কখনো চিহ্নিত হয়েছে শক্তিমান সম্রাটের নামে। কখনো মানব-প্রেমিক মানুষের আবির্ভাবের নিরিখে। তা ছাড়াও। পুরনো প্রস্তরযুগ এইটুকু। মধ্য প্রস্তরযুগ এইখানে। এখান থেকে সুরু।

তাহলে বলা চলতে পারে ইতিহাস এক মস্ত লম্বা প্রবহমাণ নদী। বেগবান নদী। তার স্রোত কখনো প্রবল। কখনো ঝিমিয়ে-আসা। কখনো বা অনতিপ্রসার। আবার কখনো-বা তটপ্রান্ত দেখা যায় না। আমরা বিশেষ বিশেষ কালের মানুষ সেই নদীর বাঁক আশ্রয় করে আছি। বাঁকে দাঁড়িয়ে ফুল-ফসল ফলাচ্ছি। তাকিয়ে দেখছি নদী। পিছনের বাঁকও দেখা যায়। চেষ্টা করলে সামনের বাঁকটুকুও।

ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে অতীত দেখি আমরা। সাধারণ মানুষরা না হোক, তাঁদের জন্য ঐতিহাসিকরা আছেন। আমাদের নিজেদের অতীত। ভুটান-প্রসঙ্গেও সেই কথা মনে আসে বারবার।

টুর্সা চা-বাগানের ধারে নেমে পড়েছিলাম।

স্টেট বাসের ড্রাইভারকে বলাই ছিল আমার। নর্থবেঙ্গল স্টেট ট্রান্স-পোর্টের গাড়ি। বাইরে জয়গাঁ লেখা রয়েছে। অর্থাৎ কি না এ-গাড়ি যাচ্ছে জয়গাঁ। আসছে কুচবিহার থেকে। বেলা আটটায় চেপেছি আলিপুরদুয়ার থেকে। না, জয়গাঁ যাচ্ছি না। যাচ্ছি আমি অবশ্য ফুন্টশোলিং। কিন্তু ফুন্টশোলিং যেতে-যেতে টুর্সা চা-বাগানের ধারে নামবার প্রয়োজন ছিল। তাই আগে ড্রাইভার লিম্বুকে বলা ছিল আমার। যদিও কণ্ডাক্টরকে বলাই রীতি। কণ্ডাক্টর-কেই বলে সবাই। আমিও বলতাম। কিন্তু ড্রাইভার লিম্বুর সঙ্গে আমার বেশ জানাশোনা হয়ে গেছে কিছুদিন।

লিম্বু বলেছিল, কোথায় যাবেন দাদা?

ঠাকুর কর্তাল সিং-এর সঙ্গে একবার দেখা করে যাব।

সে কে?

এ-অঞ্চলের একজন বিখ্যাত কন্ট্রাক্টর ঠাকুর কর্তাল সিংকে কি

তাহলে চেনে না লিম্বু? চেনাই উচিত। লোকটা টাকার কুমীর। ভুটানে আছে কন্ট্রাক্টরীর ব্যবসা। চালাও ব্যাপার। আছে জয়গাঁতেও। তার আরেক ভাই নাকি আছে ওখানে। সে দেখাশোনা করে ওদিকটা। তাছাড়া ঠাকুর কর্তাল সিং-এর আরো বিস্তর কন্ট্রাক্ট আছে।

লিম্বু বলল, কর্তাল সিংকে দিয়ে কি হবে? দেখছেন তো কী রোদ? এ রোদ্দুরে কে যায়, দাদা? জানি তো আপনার মাথা খারাপ। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে বেড়ানো। চলুন, চলুন।

আমার হাতটা ধরে ফেলল।

না, না আমাকে যেতেই হবে।

দাদা, আপনি এভাবে ঘুরতে ঘুরতেই মারা পড়বেন।

মরণ তো একদিন আছেই।

তাই বলে এগিয়ে কে মরণের মুখে ঝাঁপ দিতে চায়? লিম্বু বলল, আমাকে দেখছেন দাদা? এই শক্ত দুটি হাতে স্টিয়ারিং ধরে রাখি। কখন বেঘোরে যায় প্রাণ। এ আমার চাকরি। প্রায় মরণের মুখে ঝাঁপ দিয়েই আছি। কী করব, চাকরির জন্য করতেই হয়। কিন্তু আপনি দাদা—

লিম্বু অবশ্য মিথ্যে কথা বলে না। সে ঠিক কথাই বলে। কিন্তু আমিই বা তাকে কি করে বোঝাই যে, সংসারে আরো একরকম মানুষ আছে, প্রয়োজন-ছাড়াই যারা অস্থানে-কুস্থানে যায়, ঘরের মায়ায় বাঁধা পড়ে না, আরাম নিশ্চিত আশ্রয় খোঁজে না। বিনা কারণেই তারা ঝুঁকি নিয়ে বসে। তাদের জন্ম-লগ্নেই এমন এক হতচ্ছাড়া গ্রহের হাতছানি যে তাদের ঘরছাড়া দিকহারা অলক্ষ্মীর বরপুত্র করে তোলা। অনিশ্চিতের আহ্বানে মরণপণ তাদের ঝোঁক। লাভ-লোকসানের বাটখারাটা থাকে তাদের আয়ত্তের বাইরে। নৌকো তাদের নোঙর জানে না। নিরুদ্দেশের পালে তাদের হাওয়া লেগেই আছে। ঘরের বন্ধন সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য তাদের জীবনের ইতিহাসে নিতান্তই বেমানান।

লিম্বুকে সে-কথা না-বলাই ভালো।

আমাকে লিম্বু বলছিল, কোথাকার কে কর্তাল সিং তার ঠিকানা নেই। আপনি চললেন তার কাছে। ব্যাটা এক টাকাওয়ালা পেটমোটা কন্ট্রাক্টর।

লিম্বুকে বোঝান কঠিন। বুঝতে পারছিলাম শুধু পাঞ্জাবী কর্তাল সিং বলে কথা নয়। আসলে কন্ট্রাক্টরদের ওপরেই সে হাড়ে-হাড়ে চটা। রেগে কন্ট্রাক্টরদের ওপরে হয়ত আরো কুড়ি-কুড়ি গাল পাড়ত। কন্ট্রাক্টরদের ওপর তার রাগ আছে, অসন্তোষ আছে। তবে আমার সামনে ভদ্রতা করে শুধু পেটমোটা বিশেষণটা প্রয়োগ করল।

লিম্বুকে বোঝান হল না। সে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিল। পথে সাত মিনিটের বিরতি। যাত্রীরাও রেস্টুরেন্টে যথারীতি। আমি তাকে বোঝাতে পারতাম, এ-যুগ কন্ট্রাক্টরদেরই যুগ। কন্ট্রাক্ট মানে চুক্তি। কিন্তু কে না জানে প্রতিটি কন্ট্রাক্টই যদি সুন্দরভাবে সাধিত হত তাহলে পাল্টে যেত পৃথিবীর চেহারা। সত্য সুন্দর সরল নিরাবরণ হত সভ্যতা। কিন্তু তা হল কই? কন্ট্রাক্ট মানে আর চুক্তি নয়, বর্তমানযুগে বলা চলে চুক্তিভঙ্গ। কিন্তু রাষ্ট্রবিদ কূট-নীতিবিদদের প্রসঙ্গে যা গুণ হতে পারত, সাধারণের বেলায় তা চরম অখ্যাতির। তাছাড়া, কন্ট্রাক্টররা যে নতুন যুগেরই মানুষ। গড়ার ব্যাপারে তাঁদের ভূমিকা কম নয়।

চলুন, চলুন দাদা, ফুন্টশোলিং ঘুরে আসবেন।

যাচ্ছি ভাই। তবে পরের গাড়িতে। আমার একটু দরকার আছে এখানে। আধ ঘণ্টা বাদেই আসছি।

অপ্রসন্ন মুখ। চোয়াল ভারী। লিম্বু গাড়িতে উঠে স্টিয়ারিং ধরে বসল।

বলা বাহুল্য টুর্সা বাগান আমি চিনতাম না। টুর্সার দিকেই আসি নি কখনো। এই প্রথম। লিম্বু আমাকে নামিয়ে দিল।

তারপর গাড়ি বেরিয়ে গেল। আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি।

নর্থবেঙ্গল স্টেট ট্রান্সপোর্ট চলেছে জয়গাঁ। না, জয়গাঁ নয়। জয়গাঁ পেরিয়ে চলেছে খাস ভুটানে। ফুন্টশোলিং।

টুর্সা টী এস্টেটের সুন্দর বাগান।

উল্লেখযোগ্য কিছু দেখলেই ডায়েরী বের করে দাঁড়িয়ে পড়া আমার অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে। ডায়েরীতে টোকা আছে সকল কথাই। যেখানে যা পেয়েছি। পরীক্ষার্থী ছাত্রও বুঝি এত মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করে না। আসলে ডুয়ার্স পাগল করেছে আমাকে। মোহ-মুগ্ধ করেছে।

দূরে ভুটান পাহাড়ের পটে-আঁকা ছবি। কাছে-কাছে স্নিগ্ধ সবুজ বনাঞ্চল।

গাঢ় সবুজ। চা-বাগিচার স্বচ্ছন্দ বিস্তার। দাঁড়িয়ে আছে শেড্ ট্রিগুলি। ছায়া দিচ্ছে বাগানকে। ডায়েরী খুলে দেখলাম, টুর্সা টী এস্টেট অতীতে ছিল কীলবার্ন কোম্পানীর। সাহেব বাগান। বর্তমানে নিরিম্ টী কোম্পানী। এটিও সাহেবদের। যদিও কি না বেশিরভাগ শেয়ারই ধনী গোয়েঙ্কাদের এক্তিয়ারে।

কর্তাল সিং-এর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। কিন্তু খুবই ব্যস্ত। এখানে দু-একদিনের কাজ সেরে একটু বিশেষ প্রয়োজনে তাঁকে যেতে হচ্ছে ফুন্ট-শোলিং। গাড়ির দরজা খুলে অকৃত্রিম আহ্বান জানালেন, আসুন।

বললাম, কোথায়?

জয়গাঁর একটু কাজ আছে। সেটুকু সেরেই যাচ্ছি ফুন্টশোলিং। বললেন কর্তাল সিং, আসুন না। যেতে-যেতে আলাপও করা যাবে।

ফুন্টশোলিং-এর জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছি। খাস ভুটান দেখব। নতুন-কালের ভুটান। নতুন যুগ। অতীতকে, তার জগদ্দল পাথরটাকে বুকের ওপর থেকে সরিয়ে দিতে কী আন্তরিক চেষ্টাই না চলেছে ওখানে। না দেখলে পরে বিশ্বাস করা যাবে না সে-কথা।

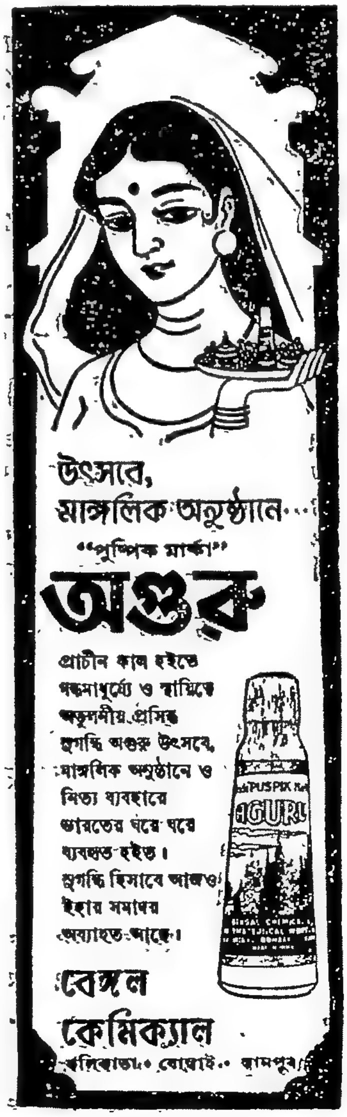

ভুটান তো আমাদের কাছে অজ্ঞাত অপরিচিত এক জগৎ।

গাড়িতে উঠে বসা গেল। পথে জয়গাঁ বাজার। জয়গাঁই এদিকে ডুয়ার্সের শেষ সীমানা। ভারতবর্ষের সীমান্ত এলাকা এইখানে। দূরে দেখা যাচ্ছে ভুটান পাহাড়। প্রায় জয়গাঁর বুক ছুঁয়েই উঠেছে ভুটান পাহাড়। পথে ভারতীয় এলাকার ধারে একটি ভারতীয় মিলিটারী ক্যাম্প। প্রায় ছবির মত সুন্দর। ঝকঝকে।

জয়গাঁয় গাড়ি থামল কয়েক মিনিট। এখানকার পোস্টমাস্টার মশায়ের সাথে আলাপ হল। বাঙালী। প্রায় চারপুরুষ আছেন এখানে।

শুনে চমকে উঠেছি। বললাম, বলেন কী। চারপুরুষ?

হাসলেন গোলগাল মোটাসোটা সুন্দর পুরুষমানুষটি। মাথা নাড়লেন ঈষৎ।

বললেন, আজ্ঞে।

চারপুরুষ এরকম জায়গায়?

চারপুরুষ আগে আমার দাদা-মশায়রা এসেছিলেন এখানে। বর্ধমানে ছিল আমাদের পৈতৃক বাড়ি। তারপর থেকে এখানেই রয়ে গেছি।

এই দালান-বাড়ি?

সবিনয়ে জানালেন, আমারই। এখানে প্রায় তিনশ' একর জমি আছে আমাদের। বাগান করবেন বলে কিনেছিলেন।

এখানে অসুবিধে হয় না?

কী আর অসুবিধে? হাসলেন তিনি।

কাছেই তো ভুটান।

ভুটানের ফুন্ট্‌শোলিং এই ত' মাইল দুয়েকের ব্যাপার। নতুন শহর গড়ে উঠেছে ওখানে। ওখান থেকেই আসে খাবার জল। বছরে পাঁচ শ' টাকা দিতে হয় এ-জন্যে।

যেতে যেতে ভুটানের গল্প শুনি কর্তাল সিং-এর কাছে।

কর্তাল সিং বললেন, এই যে এ-সব জায়গা দেখছেন এই সেদিনও এ-সব জায়গা ছিল হিংস্র জীব-জন্তুদের এলাকা। আমারই লোক রাস্তা করেছে এখানে। দিনের পর দিন খেটে এই রাস্তা তৈরি হয়েছে। এখন তো পশ্চিম এসে পড়েছে এখানে।

আমার মনে পড়ল হপকিন্স সাহেবের কথা। অতীতের ভুটানীদের কথা। সরল অনাড়ম্বর দুঃসাহসী একটি জাতি। ইংরাজের সঙ্গে সম্পর্ক-বন্ধন স্থাপিত হবার পর এ-সব বন-বাদাড়ে জলাজঙ্গলায় অক্লেশে চলে আসত ভুটানীরা। বছরের একটা নির্দিষ্ট সময় কুচবিহার থেকে বৃটিশ-সরকারের প্রতিনিধিরা আসতেন ভুটান সরকারের বাৎসরিক বৃত্তির টাকা নিয়ে। সঙ্গে পাইক-পল্টন থাকত দু'-চারজন। নির্দিষ্ট তারিখ মত আসতেন ভুটানের প্রতিনিধিরাও। জল-জঙ্গল দিয়ে চলে আসতে হত সেকালে। তাদের রওয়ানা হতে হত আগেই। হাঁটা পথ। কখনও বা ঘোড়া, খচ্চরের পিঠে। না-ছিল কোন বাংলো। যেখানে-সেখানে, যেমন-তেমন ভাবে হয়ত বা গাছতলায় বিশ্রাম করে থাকত। সন্ধিসর্ত অনুযায়ী বাৎসরিক পঞ্চাশ হাজার টাকা বৃত্তি দিতে হত ভুটানকে। ইংরাজ সরকারের পক্ষে এই বৃত্তির টাকা দিতেন তখনকার জলপাইগুড়ির ডেপুটি কমিশনার। প্রতি বছরের দশই জানুয়ারী তারিখ নির্ধারিত ছিল এ-জন্যে। স্থান ডুয়ার্স।

কর্তাল সিং-এর জীপ ছুটেছে জয়গাঁ পেরিয়ে ভুটানের দিকে। সামনে ভুটান। পিচ-মসৃণ রাস্তার দুধারে মিলিয়ে যাচ্ছে ভারতবর্ষের এলাকা। স্বাধীন হিন্দুস্থান। আর ওই ভুটান। পাহাড় এখন স্পষ্ট।

কর্তাল সিং-এর হাতে হাতঘড়ি। মাথায় সাদা পাগড়ি। সাদা গোঁফ। পরনে হাফ প্যান্ট। পান খাওয়া অভ্যেস আছে বোঝা যায়। লাল ঠোঁট, চাপা। তাঁর হাতে স্টীয়ারিং। স্পীডোমিটারের কাঁটায় গতির অভ্রান্ত নির্দেশ। তিনি বলছিলেন, জয়গাঁয় বাজার ছিল আগে। ফুন্টশোলিং জমে উঠতে সবাই সেখানে চলে গিয়েছে।

সিনেমা-ছবির মত দৃশ্য পাল্টাচ্ছে চোখের সামনে। চমকে তাকাবার আগে-আগেই গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়েছে। সামনেই নোটিশ বোর্ড। Jaigaon Frontier Check Post, Jalpaiguri. বাঁদিকে লেখা। ডানদিকে স্পষ্ট লেখা রয়েছে Foreigners Stop.

আমরা আগন্তুক। চেকপোস্টের প্রহরী এগিয়ে এসে গাড়ির ভিতরে উঁকি দিয়ে দেখল। গতানুগতিক রীতি। ফিরে গিয়ে দাঁড়াল তারপর। রাস্তার ওপরে আড়াআড়িভাবে নামানো বাঁশটা উঠল তারপর।

গাড়ি আবার ছুটতে সুরু করছে।

[ক্রমশ]

বেকার সমস্যার সমাধান ?

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে !!

বাঙলা দেশে বেকার সংখ্যা নাকি আনুমানিক এক কোটি। এই ভয়াবহ বেকার সমস্যার সমাধানে ক্ষুদ্র মূলধনের ব্যবসা হিসাবে মুর্গী উৎপাদন বা পোলট্রি ফার্মিং অধুনা অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায় রূপান্তরিত হয়েছে—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে। বেকার ব্যক্তিদের পোলট্রি ফার্মিং ব্যবসা পরিচালনার বিশদ নির্দেশলাভের সুবিধার জন্য বসুমতী থেকে আত্মপ্রকাশ করলো।

রয়েজ পেডিগ্রী পোলট্রি ফার্মের অধিকর্তা

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ রায়

জি, পি (আমেরিকা), এফ, এস, পি, আই, পি, এইচ (লন্ডন)

লিখিত সচিত্র

আধুনিক পোলট্রি ফার্মিং

মূল্য মাত্র চার টাকা। ডাকমাশুল এক টাকা।

অবিলম্বে অর্ডার পেশ করুন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ ॥ কলিকাতা-১২

গ্রামবাংলার কথা

অসীম মুখোপাধ্যায়

অবিনাশের শাঁখা

আলাপ হয়েছিল গাড়িতে আর সেই আলাপের সূত্র ধরে আজ সটান বাড়ি চলে এসেছি। ভাবতেই পারে নি অবিনাশ আমি আসব; তাই খিড়কির দোর খুলে আমায় দেখা মাত্রই দু'হাতে জাপটে ধরল। "দাদা আপনি :"

বললুম—"হ্যাঁ আমিই, আর কেউ যে নয় তা তো দিব্যি বুঝতে পারছ। কি ভেবেছিলে তুমি? সবাই ভুলে যায়, তাই না?"

—"না ঠিক তা নয়। তবে ভেবেছিলুম, ভবঘুরে মানুষটার কি আর আমায় মনে আছে?"

হেসে ফেলি ওর কথা শুনে—বলি, "সেইজন্যেই তো আরও বেশি করে মনে রাখি তোমাদের অবিনাশ। যখন পথে পা দিই তখন মন বলে—তোমার ঘর আছে ওখানে; ঘর আছে সেখানে আর ঘর যখন আছে তখন আপনমানুষও আছে, চল তাদের কাছে।"

অবিনাশের চোখের তারায় খুশির আলো নাচে।

—"তা এলেন যখন এতদিন পরে তখন দু'-চারদিন থাকতেই হবে দাদা। কি, রাজী।"

ঘাড় নাড়ি আমি—"রাজী।"

—"বেশ, তা হলে চলুন ভেতরে।"

পুকুরঘাটে ফলসা গাছের ছায়া। নিথর জলে রূপকথার রাজ্য, মায়াপুরীর চুপ-কথা। মায়াপুরীর মানুষজনের ঘুম ভেঙে যায় পাছে তাই সাবধানে পা ফেলি। থমকে আছে বৈশাখের নীল আকাশ। জলের বুকে মেঘের প্রাসাদ আঁকা। মাছেরাও ঘাই দিচ্ছে না ভুলে, ছবিটা যদি ছেঁড়ে, স্বপ্নটা যদি মোছে!

—"এখানে বসব না অবিনাশ, আমাদের কোনও কথাই এত সুন্দর হবে না। চল ঐ আমগাছের নিচে বসি।"

—"তাই চন্দন"—আমার হাত ধরল অবিনাশ।

—"আজ কিন্তু আমি বলব না, বলবে তুমি, আমি কেবল শুনব।"

—"কি শুনবেন?" অবিনাশের চোখে কুণ্ঠা, লজ্জা, খুশি মিলেমিশে ধরা দেয়।

—"তোমার অভিজ্ঞতার কথা। গঞ্জে, গাঁয়ে, মেলায় মেলায় ও শাঁখা বেচে বেড়াও। আমায় আজ মেলার গল্প শোনাও। মানুষের গল্প বল।"

অবিনাশ আনমনা। বুঝি স্মৃতির অলি-গলিতে খবর আনতে গেছে।

—"দশ বছর বয়েস থেকেই শাঁখার ব্যবসা করছি। তখন বাবা বেঁচেছিলেন। কাকাও ছিলেন তাঁর সাথে। ছোটখাটো একটা কারখানাই ছিল আমাদের। মনে আছে সাতটা লোক খাটত। একজনকে তো ভুলতে পারি না কিছুতেই। "সুধীর" ছিল তার নাম, বেজায় মোটা, বসে বসে নক্সা তুলত শাঁখার গায়ে। ওর কোলে-পিঠেই বড় হয়েছি আমি। কত জায়গায় নিয়ে যেত আমাকে, উৎসবে, পুজোয়, পার্বণে! বাবাও যেতেন সঙ্গে। শাঁখা নিতেন, সিঁদুর নিতেন, গাঁথের গুড়ো নিতেন। আমাদের শাঁখার নাম-ডাক ছিল গোটা জেলা জুড়ে। হাওড়ার বৌ-ঝিরা শাঁখারী বলতে বাবাকেই বুঝত। সেদিনের সব কথা মনে নেই দাদা। যা মনে আছে তা ইদানীংকালের। আপনি কোন কালের কথা শুনবেন?"

—"হালের কথাই বল।"

—"তাই ভাল। আমারও স্পষ্ট মনে আছে। বছর পাঁচেক আগে একবার মাকড়দায় গিয়েছিলুম। মার্টিনের ছোট রেলে আমতার পথে মাকড়দা স্টেশন পাবেন। বাসেও যেতে পারেন। বেশ জম-জমাট গ্রাম। বার মাসে তের পার্বণ লেগেই আছে যেন। আষাঢ়ে রথ, পৌষে পৌষপার্বণ, মকরের স্নান, ফাল্গুনে পঞ্চম দোল, ঢাকের কাঠি থামে না কখনও। ড্যাডাং ড্যাডাং বাজছেই। আমি গিয়েছিলুম পঞ্চম দোলের মেলায়। মেলাও দেখব, শাঁখাও বিক্রি হবে।"

—"একাই গিয়েছিলে?" আমি প্রশ্ন করি।

—"হ্যাঁ, বাবার আমলের কিছুই আর নেই। কাকা সব হজম করে দিয়েছেন। আমার শাঁখা আমিই কাটি, নক্সা তুলি নিজেই। বিক্রিও করি আমি। একটা ঠিকে লোক আছে, টুকিটাকি কাজগুলো তাকে দিয়ে করাই।"

—"তারপর?"

—"বহুদিনের পুরনো মেলা, দাদা। ১২৫২ সাল থেকে শুরু হয়েছে। দিন পনেরোর আগে শেষ হয় না। কেবল হাওড়া কেন, হুগলী, মেদিনীপুর এমন কি বাঁকুড়ার লোকও আসে এই মেলায়। ব্যবসা করতে আসে, মজা করতে আসে, আসে নানান ধান্দায়। এখন যদিও নাম হয়েছে মাকড়দা, এককালে বোধহয় তা ছিল না। গাঁয়ের চৌধুরী-দের আদিপুরুষ রামেশ্বর চৌধুরীর নামেই নাকি ছিল গাঁয়ের নাম। মেলায় এক ইস্কুলমাস্টার শাঁখা কিনতে এসেছিলেন। ভারি আলাপী মানুষ। বসে বসে গল্প করলেন কত! এসব খবর তো তাঁরই দেওয়া। তিনি বললেন গাঁয়ের নাম ছিল "রামেশ্বর বাটী"। চণ্ডীঠাকরুণ নাকি আরও সাবেক কালের। রামেশ্বর চৌধুরী এসে তাঁকে দেখতে পান। ভালভাবে পুজো-পাটের বন্দোবস্ত করেন। এখন যে চাটুজ্জে সেবাইতরা আছে তাদের আদিপুরুষ রাজেন্দ্রনাথকে রামেশ্বরই কাজে লাগিয়েছিলেন। পরে, চৌধুরীদেব জমিদারী মহিয়াড়ীর কুণ্ডুরা কিনে নিল। ওদেরই একজন, রামকান্ত কুণ্ডু চণ্ডীর মন্দির বানিয়ে দেন। প্রায় দেড়শ' বছর হতে চলল মন্দিরের বয়েস।"

—"ঠাকরুণের চেহারাটি কেমন অবিনাশ?"

—"মূর্তি নেই কোনও। কেবল তেল-সিঁদুর মাখানো শিলা আছে একটা। এই শিলাটাই দেবী "মাকড়চণ্ডী"। তবে

জঙ্গল-পীরের থান

শুনেছি, আগে নাকি দেবীর মূর্তি ছিল এবং এতই বড় ছিল যে, ফুল-বেলপাতা চড়াতে পুরুতঠাকুরকে মই লাগাতে হত।"

—"বল কি?"

—"আরও মজা আছে, শুনুন। একবার এক পুরুত তো ঠাকরুণকে ধমকেই দিল—আর কাউকে নিয়ে এত ঝামেলা নেই, কেবল তোমার যত বাড়াবাড়ি। তোমাকে পুজো করতে গেলেই মই লাগাতে হয়। চারবেলা কেউ মই চড়তে পারে? কে বলেছিল এত ঢ্যাঙা হতে? ব্যস! আর যায় কোথা! দেবীরও হল অভিমান। রাতে স্বপ্নে দেখা দিলেন—যাঃ! মই চড়া কেন, পুজোই করতে হবে না তোকে আর। আমি পাতালে যাচ্ছি। ঘুম ভেঙে পুরুত ছুটল মন্দিরে—মা আমায় এবারটি মাপ করে দে, পাতালে যাস নি, সৃষ্টি তা হলে রসাতলে যাবে যে! অনেক কান্নাকাটির পর দেবীর মান ভাঙল। তারপর থেকেই এই শিলা-রূপ।"

—"বেশ গল্প তো! তা রামেশ্বর বাটী মাকড়দা হোল কি করে অবিনাশ?"

—"গাঁয়ের দু-এক বাড়ির দলিল-পত্তরে মাপুরদা নামও পাওয়া গেছে। পণ্ডিতরা বললেন মাতৃপুর অর্থাৎ চণ্ডী-মাতার পুর; তার থেকেই সংক্ষেপে মা-পুর।—আর দা হল দহের ছোট চেহারা। সরস্বতী নদীর দহ ছিল কাছেপিঠে। আবার একথাও শুনেছি, মন্দিরের কাছে নদীর দহে থাকত চণ্ডী ঠাকরুণের বাহন বিরাট এক মকর। তাই জন্যে দহের নাম হল মাকড়দহ, পরে গাঁয়ের নামও হল মাকড়দহ চলতি ভাষায় মাকড়দা।

"উৎসবটা বেশ মজার। দেখতে কি যে ভাল লাগে! চোখ বুজলেই এখনও সব স্পষ্ট হয়ে সামনে ভেসে ওঠে।

চাঁচরের রাত। পঞ্চম দোলের আগের দিন। হাজার, হাজার লোক এসেছে। মেলাও বসে গেছে। হাঁকডাকে গম গম করছে জায়গাটা। বাজী পোড়ানো হবে কত টাকার! তুবড়ি, হাউই, রকেট, তারা আরও কত কি! সামনের পেতলের কলসী তিনটেতে ঠুংঠাং পয়সা পড়ছে। যতক্ষণ ওগুলো না ভরবে, বাজী পুড়বে না ততক্ষণ। রাত একটা নাগাদ বাজীতে আগুন লাগল! সে কি চিৎকার শিস দেওয়া আর বাঁশী বাজানো! কালো আকাশে মুঠো মুঠো আগুনের আবির ছড়িয়ে পড়ছে। বুড়ো, বাচ্চা, মেয়ে, পুরুষ সবাই হাত তুলে দেখাচ্ছে—"ঐ, ঐ যাচ্ছে তারাটা। কি সুন্দর ভাসছে! ঐ ঝরাচ্ছে রকেট, লাল, নীল, হলদে, সবুজ কত রঙের বাহার।" তুবড়ি জ্বলছে, পাতাল থেকে সোনা তুলে এনে ঢেলে দিচ্ছে পৃথিবীতে। সে উল্লাস, সে আনন্দের রূপটা বুঝতে পারে কেবল তারাই যারা চোখে দেখেছে! পরদিন ভোর থেকে দেবদোল পুজো আর অন্নসত্র। আবিরে আবিরে প্রাঙ্গণটা লাল। কে বলবে দাদা, হাসির আড়ালে আছে চোখের জল, খেতে না পাওয়ার দুঃখ, পরতে না পারার লজ্জা! পনেরো দিন বাদেই তো আবার অভাব-দস্যুটা দাঁত বার করে তাড়া করবে। বলবে "আমি যাই নি আবার এলুম, এবার তোদের খেলুম।" কালো মাটিতে আবার ঘাম ঝরবে, ঘাম তো নয় ভাই, সাদা রক্ত! তবুও মন্দিরের দোরে দাঁড়িয়ে, মেলার ভিড়ে দাঁড়িয়ে লাল আবিরের গন্ধে ভুলে যেতেই হবে দুঃখকে। সাতদিন ছিলুম। মাত্র কুড়ি টাকার শাঁখা বিক্রি হল। কিন্তু বুকে হাত দিয়ে দেখি—ভরে গেছে, শাঁখার চেয়ে দামী, টাকার চেয়ে দামী, বিচিত্র অভিজ্ঞতায়।"

—"বেশ লাগল শুনতে।...আর একটা বল।"

হাসল অবিনাশ—"কোঁচড়ের মুড়ি নারকেল যে মিইয়ে গেল দাদা—খাবেন কখন আর?"

—"সে দোষ তো তোমার ভাই।"

—"আমার?"

—"তাই তো, এমন গল্পই বলছ যে, খাবার কথা মনে থাকে না। এস আগে খেয়ে নি।"

খাওয়া শেষ করে আবার গল্প বলে অবিনাশ।

—"উলুবেড়ের কাছেই বাণীবন। বেশ

বাণীবন-এর মেলার পথে

বড় গাঁ, বড় রেলে যেতে পারেন, সেটাই সবচেয়ে ভাল। তবে, আমি গিয়েছিলুম রাজাপুরের খাল ধরে। পৌষ মাসের দিন। সামনেই জঙ্গল-বিলাস পীরের উৎসব। পাঁচদিন ধরে মেলা চলবে। লোকজনও আসবে প্রচুর। ভাবলুম, যাই, কিছু শাঁখা যদি বিকোয়, মন্দ কি? বৈশাখের আকাশ দেখেছি, দেখেছি ভাদ্রের। এবার খালের পথে যেতে যেতে যে আকাশটা দেখলুম সেটা পৌষের। কেবল নীল, নীল, আর নীল! মেঘ নেই কোথাও। ঠাকুমা বলত, "আকাশ-সাওর", মনে হল ঠিক যেন তাই! সাগরের বুকে পাখী, আকাশের বুকে চিল। বুকফাটা কান্নার দুপুরের নিঝুম পরিবেশটা কেমন বিষন্ন করে দিচ্ছে! খালের জলে বৈঠা ফেলার খলবল শব্দ। বকের পাখায় সোনারোদ। দেখতে দেখতে এসে পড়লুম।

"জঙ্গল-পীরের গল্পগুলো ভারি চমৎকার। অলৌকিক ক্ষমতা ছিল পীর-সাহেবের। যা খুশি তাই করতে পারতেন নাকি তিনি। দু-একটা শুনেছি—এক ফকিরের কাছে। এবার আমার কাছে আপনি শুনুন।

"জঙ্গল-পীরের দেশ ছিল আরবে। এ-দেশে তিনি আসেন ইসলাম প্রচার করতে। যখন খুশি, যেমন খুশি, তেমন পোষাকে, তেমন বেশে ঘুরে বেড়াতেন তিনি। একবার রাখাল সেজে ভেড়া চরাচ্ছেন। রাজাপুরের কাছে নদীর ধারে বিরাট মাঠ। হঠাৎ খেয়াল হল নদী পার হবেন। মাঠ পার হয়ে ঘাটে এসে মাঝিকে বললেন—"আমায় পার করে দে।"

"মাঝি বেজায় লোভী। ভেড়া দেখে জিভে জল এসে গেছে তার। নরম মাংস খায় নি কতদিন! বলল—"পার করে দেব কিন্তু ভেড়া দিতে হবে একটা।"

"তাই দেব।" ফকির ঘাড় নাড়লেন। মাঝি তাঁকে চিনতে পারে নি। খেয়া পার হয়ে মাঝিকে একটা ভেড়া দিলেন তিনি। মাঝি বেজায় খুশি। কতদিন পরে মজার খানা খাবে! হঠাৎ ভেড়াটা বাঘ হয়ে গেল এবং মাঝির ঘাড়ে চড়ে বসল। ভেড়া খেতে গিয়ে বাঘের খাদ্য হোল লোভী মাঝি।

"আর একবার—বর্ধমানের রাজার এক কর্মচারী জঙ্গল-পীরের আস্তানাকে হিন্দুর মন্দির বলে দাবি করল। মৌলভী আর রাজার পাইক-বরকন্দাজের মধ্যে শুরু হোল কথা কাটাকাটি। ব্যাপার দেখে ফকির সাহেব নিজেই একদল গরু আর বাঘ নিয়ে সোজা রাজার দরবারে হাজির হলেন। তাঁর ক্ষমতা দেখে রাজার টনক নড়ল। কর্মচারীদের হুকুম দিলেন ফকির সাহেবকে আরও কিছু জমিজমা দান করতে। কিন্তু কর্মচারীদের হাত অত সহজে গলে না। দাদা, যাই বলুন না কেন, আমলা-ফয়লারা সব যুগেই সমান।"

আমি শুনে হাসি। বলি—"কি হোল তারপর?"

—"ব্যাপার দেখে ফকির গেলেন চটে। মনে মনে বললেন রোস, জব্দ করছি তোমাদের। তিনি চলে যেতেই গাঁয়ে গাঁয়ে বাঘ এসে হানা দিতে লাগল। আজ একে মারে, কাল ওকে খায়। মানুষজন ভয়ে পথে বার হয় না আর। কাজকর্ম সব বন্ধ। রাজার আমলারা তখন বাধ্য হয়ে জমিজমা যা দেবার ফকিরকে দিয়ে দিল। আবার সব ঠিক-ঠাক, যেমন-কে তেমন।

—"পৌষ-সংক্রান্তির প্রায় পনেরো দিন আগে থেকে উৎসবের তোড়জোড় শুরু হয়ে যায়। ভোর থেকে কোরাণ পাঠ আর শাস্ত্রের আলোচনা চলতে থাকে। সংক্রান্তির রাতে কাওয়ালী গানের আসর বসে। আতসবাজীও পোড়ে বেশ। পরদিন পয়লা মাঘ। দূর-দূরান্তের গাঁ থেকে হাজার হাজার লোক আসে ফকির সাহেবের দরগায়। প্রার্থনা করে, মানত করে, সিন্নী দেয়। কত রকমের রোগী যে আসে তার ঠিক নেই, কারো যক্ষ্মা, কারো হাঁপানী, কারো কুষ্ঠ, কারো গোপন রোগ। তারা সব দুধ দিচ্ছে, সিন্নী দিচ্ছে, মাটির ঘোড়া দিচ্ছে। "দোয়া মাঙছে" ফকির সাহেবের কাছে। বাঁজা মেয়েরা পীর পুকুরের জলে দাঁড়িয়ে ফুল ভাসিয়ে অপেক্ষা করছে, কখন সেই ফুলটি আবার তার হাতেই উঠে আসবে। এ না হলে বোঝা গেল যে, ফকির তার আর্জি শোনেন নি। মা হবার কি নেশা দাদা! এ-নেশায় বুকের কলজে ফেটে যাবে, ছেলে বড় হয়ে যা দেবে মাকে তবুও মা হবার ইচ্ছের কনকনে ঠাণ্ডা জলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মুখ বুজে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েরা! দুঃখ পেতেও এত সাধ হয়? নাকি মা না হলে সম্পূর্ণ হয় না মেয়েরা?

"একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। পীর পুকুরের কাছেই শাঁখা নিয়ে বসে আছি। মাঝে-মধ্যে বৌ-ঝিরা শাঁখা নিয়ে যাচ্ছে। তবে বিক্রি তেমন হচ্ছে না আমার। একা মানুষ। শাঁখা কাটা থেকে শুরু করে সবই তো করতে হয় নিজেকে, তাই কোয়ালিটি তেমন নয়। আর সবার মন্দ বিকোচ্ছে না। একবার একটি মেয়ে এলো। বছর ২৩।২৪ বয়েস। রোগা ছিম-ছাম চেহারা, তবে অদ্ভুত কালো দুটি চোখ। তাকালে মুখ ফেরাতে মন চায় না। পরনে একটা তালি দেওয়া শাড়ি। ছেঁড়া কিন্তু নোংরা নয়। কাচা কাপড়। সিঁথিতে মেটে সিঁদুর। এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। চায়ও না কিছু,—যায়ও না। তাই দেখে বললুম—কি গো নেবে না শাঁখা?"

মুখটি নামিয়ে বলল,—"আজ্ঞে, নেবার তো সাধ ছিলো কিন্তুক পয়সায় কুলবে না যে?"

—"মানত করবে কি করে তবে?"

একেবারে ঝরঝরিয়ে কেঁদে দিল বৌ-টি। বলল—

"আছে তো একটিমাত্র আধলা। কি হবে এতে?"

—"কোথায় থাক?"

—"দূরে নয়, পাশের গাঁয়েই।"

—"সাথে স্বামী কই?"

"আর মুখ তোলে না সে। সাধ্য-সাধনা করে জানলুম স্বামী তাকে ত্যাগ করে অন্য একটা মেয়েছেলে নিয়ে চেঙ্গাইলে ঘর ভাড়া করেছে। বেশ্যা বলা যেতে পারে। স্বামীর কঠিন অসুখ। লোকের মধ্যে বেরুতে পারে না। পাড়া-পড়শীর কাছে খবর পেয়ে বৌ এসেছে ফকিরের কাছে মানত করতে।

"বললুম, জলে নামবে স্বামীর জন্যে, কিন্তু সবাই তো নামছে ছেলের জন্যে? এবার মুখ তুলল মেয়েটা। বলল—

—"বাবুগো, মোর সোয়ামী কি মোর ছাওয়াল নয়, বল?" *

* আলোকচিত্র : লেখক কর্তৃক গৃহীত

মাসিক ১০, টাকার কিস্তিতে লাভ করুন
অল ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড ট্রানজিস্টর (জাপান মেক) জনপ্রিয় মূল্য ৩০০, দেশব্যাপী খ্যাতি আছে। ডবল

স্পীকার ৩ ব্যাণ্ড, ৮ ট্রানজিস্টর। নাইট-ল্যাম্প ফিট করা। কেবল ইংরেজী বা হিন্দিতে যোগাযোগ করুন।
Allied Trading Agencies
(B.C.) P.B. 2123, Delhi-7.

মানস পাণ্ডুলিপি

বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়

আমরা চারজন, সমীর, পুলক, শীতল আর আমি, একসঙ্গে লিখতে সুরু করেছিলাম। নতুন রীতির গল্প লিখতাম। গল্প থেকে কাহিনী বর্জন করে আগাগোড়া এক বা একাধিক ভাবনাকে একটু একটু করে পাঠকমনে সঞ্চার করে দেবার রীতি-প্রচার করবার জন্য একটা লিট্‌ল্ ম্যাগাজিনও বার করেছিলাম আমরা। আমরা নিজেরাই একে বলতাম নব্যগল্পকারদের আন্দোলন। পকেটের পয়সা খরচ করে কাগজ চালিয়েছিলাম কয়েক মাস। তারপর উৎসাহে একটু ভাটা পড়তেই সে কাগজ উঠে গেল। আমরাও যে যার এদিক-সেদিক ছিটকে গেলাম। সমীর স্কুল-মাস্টারী পেয়ে গেল বরানগরে, আমি একটা খবরের কাগজের অফিসে ঢুকে পড়ে চুটিয়ে সংবাদ সাহিত্য লিখতে লাগলাম, পুলক দেখলাম ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখছে। এক শীতলই শেষ পর্যন্ত নতুন রীতি আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিয়ে লেগে রইল। একদিন অমনি একটা গল্পের পাণ্ডুলিপি নিয়ে আমাদের খবরের কাগজের অফিসে এসেছিল। অনেকদিন পরে দেখা। একটু খুশিই হলাম। খবরের কাগজের অফিসের লোক,—সুতরাং নতুন লিখিয়েদের পিঠ-চাপড়াবার অধিকার আছেই। তাই বললাম, 'লিখছিস তো?' উত্তরে এমন সব খামচা খামচা কথা বলেছিল তাতেই সন্দেহ হয়েছিল শীতল বড় বেশি ভাবে। ভাবতে ভাবতে ও নিজেই কেমন জটিল হয়ে গেছে। আমাদের কাগজের রবিবারের সাহিত্যপত্রের জন্য গল্পটা রেখে গিয়েছিল শীতল, বলেছিল, 'তুইও পড়িস।' পড়েছিলাম, পড়েই বুঝেছিলাম এ গল্প ছাপা হবে না, আমাদের কাগজে তো না-ই, বাংলাদেশের কোন কাগজেই না। পাঠক চায় ঠাসবুনোট গল্প, শীতলের গল্পে মোটে গল্পই নেই। সাহিত্য সম্পাদকের দপ্তর থেকে গল্পটা যথারীতি ফেরত গিয়েছিল। তখন আর একবার, সে-ই শেষবার, অফিসে আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আমি টা সিগ্রেট খাইয়েছিলাম৷ ও চুপ করে একটা চেয়ারে আমার মুখোমুখি বসেছিল অনেকক্ষণ। আমি বলেছিলাম, 'তোর অমন জোরালো কলম, লেখ না পাঠক যেমন চায়।' শীতল কী যেন ভাবছিল, আমার কথা কানে যেতেই টান হয়ে বসেছিল, বলেছিল,—'সমকালের লোভ দেখাচ্ছিস। ভবিষ্যৎ বন্ধক দিতে হবে তো?' শীতলের সঙ্গে আর আমার দেখা হয় নি।

সমীর মাস্টারীর ফাঁকে ফাঁকে, মাঝে মাঝে টিউশনি কামাই করে, গল্প লিখত। সে সব গল্প ছাপাও হত, চোখে পড়লেই পড়তাম, লক্ষ্য করতাম ও দিব্যি নতুন রীতির খোলস ছেড়ে ফেলেছে। নায়ক-নায়িকা নিয়ে নিটোল গল্প লিখছে, নাটুকে সংলাপে পাঠকদের

ঝিমিয়ে পড়তে দিচ্ছে না। প্রায়ই আসত আমাদের কাগজের অফিসে, বলত, 'সব গল্পেই এমন ফ্যাকড়া রেখে দিই যে, যখন ইচ্ছে টেনেটুনে ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে বিয়ের উপহারের উপন্যাস করে দিতে পারব। উৎসাহী প্রকাশক থাকলে বলিস।'

পুলকও আসত। বলত,—'নব্যরীতির আন্দোলন করতে গিয়ে কয়েকটা বছর মাঠে মারা গেল।' এরই মধ্যে খানসাতেক ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছে, ছাপাও হয়েছে। পুজোর সময় তিনটে উপন্যাস লিখবেই। পত্রিকার উপন্যাস মাস দুয়েকের মধ্যেই বই-আকারে বেরুবে। একদিন বলেছিলাম, 'এত ইতিহাস পড়িস কখন?' ও হেসে বলেছিল, 'কয়েকটা নাম ইতিহাস থেকে নিই, ব্যস। গল্প বানাই। ইতিহাস পড়ে কে যাচাই করে দেখতে যাচ্ছে রে!' তিরিশ পেরোতে-না-পেরোতেই পুলক বেশ নাম করেছিল।

আমাদের খবরের কাগজের সাপ্তাহিক সাহিত্য পত্রিকাতে আমি প্রায়ই গল্প লিখতাম, মনোবিকলন আর যৌনবিকৃতির গল্প। সে সব গল্প বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। তাতেই সম্পাদক-মশাই ফরমাস করলেন, 'এবার একটা গোটা উপন্যাস লেখ পুজো সংখ্যায়। একটু জীবন-দর্শনের মশলা দিয়ে কাঁচা মাল মেখে নিও। জিনিষটা যেন খাস্তা আর মুখরোচক হয়।' তাই করলাম। সে বছর ঐ লেখাটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, পাঠক-পাঠিকারা চিঠি লিখে খুব বাদানুবাদ করেছিল। শীতলও একটা চিঠি লিখেছিল আমার নামে। চিঠির সব কথা মনে নেই, তবে এটুকু মনে আছে ও আমার লেখা পড়ে খুশি হয় নি। 'অতি মাত্রায় সমকালীন হওয়ার নির্লজ্জ প্রয়াস', 'ভণ্ড জীবন-দর্শনের আতর ছিটনো দুর্গন্ধ মানসিকতা,' এমনি সব কড়া কড়া কথায় চিঠিটা ভর্তি ছিল। আমি কৌতুকবোধ করেছিলাম প্রসন্ন আত্মতৃপ্তিতে। ভেবেছিলাম সফল সতীর্থের প্রতি অক্ষম সতীর্থ এমনি করেই হাত-পা ছোঁড়ে। কিছুদিনের মধ্যেই বইটার সিনেমাস্বত্ব বিক্রি হয়ে গেল পাঁচ হাজার টাকায়। ছবির চিত্রনাট্য আলোচনার সূত্রে পরিচালকের বাড়িতে যাই, নায়ক-নায়িকারা আসে, গল্প শোনে, এক-আধ পাত্র পান করি। মুখে সাফল্যের জেল্লা ফুটতে দেরি হয় না। সমীর পুলক সবাই কেমন সম্ভ্রমের চোখে দেখত আমাকে। শীতলের খবর আর রাখি না। ওকে প্রায় ভুলেই গেলাম।

বছর ঘুরে যায়। ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখে পুলক বেশ গুছিয়ে নিয়েছে। বিয়ে-থা করে মুটিয়েছে। বাড়ি করেছে হুগলীতে। এখন কোথায় সিমেণ্ট, কোথায় রড, কোথায় সুরকি, কোথায় চুন, এই ধান্দায় ঘুরছে। একদিন ট্রামে দেখা কলেজ স্ট্রীটে। ট্রামের মধ্যেই খবরাখবর দেওয়া-নেওয়া হল। আমার গল্প সিনেমা হচ্ছে, দেখেছে খবরের কাগজে। বলল, 'প্রিমিয়ারে ডাকবি ত?'

আমি বললাম, 'তোর গৃহপ্রবেশে ফাঁকি দিস না যেন।' ট্রাম থেকে নামবার সময় পুলক বলল, 'সমীরের একটা গল্প সংকলন বেরিয়েছে, জানিস?' বললাম, 'তাই নাকি?' ও বলল, 'সমালোচনার জন্যে তোকে ধরবে।' বললাম, 'কেমন হয়েছে বইটা?' 'পড়ে দেখি নি। খুব ব্যস্ত রয়েছি।' বলেই পুলক নেমে গেল। আশ্চর্য, শীতলের কথা সেদিন কেউ আমরা উচ্চারণও করলাম না।

রিভিউ-এর জন্যে দু' কপি বই নিয়ে সত্যি সত্যি সমীর একদিন কাগজের অফিসে এল। আমার হাতে একটা বই দিয়ে সামনের চেয়ারে চুপ করে বসে রইল। আগের মত আর সহজ হতে পারছে না। আমার বই ছবি হচ্ছে, নামডাক খুব। সুতরাং ও-ও যেন আমার কাছে অনুগ্রহ প্রার্থী। কার্টিজ পেপারের পুস্তানিটা উলটেই দেখলাম বইটা আমাকেই উৎসর্গ করেছে। বুঝলাম স্তাবকতা। ভাল লাগল। বললাম, 'এ আবার কী পাগলামি!' সমীর শুধু হাসল। ওঠবার সময় বলল, 'পারলে তুই রিভিউ করিস। প্রথম বই, বুঝতেই পারছিস।' মুরুব্বিয়ানার সুরে বললাম, 'উপন্যাস লেখার কদ্দুর?' ও বলল, 'লিখছি।'

সমীর উপন্যাসও লিখেছিল একটা সিনেমা পত্রিকায়। আমি পাব্লিশার জুটিয়ে দিয়েছিলাম, অনেক ফ্যাকড়া রাখা ছিল, সুতরাং বড় গল্পকে ঢাউস উপন্যাস করে দিতে ওর দেরি হয় নি। দাম হয়েছিল দশ টাকা। অল্প সময়ের মধ্যেই দুটো এডিশন কেটেছিল। ওতে দু' পয়সা পেয়েওছিল। এখন আর ছোট গল্প লেখে না সমীর। বলে, 'সবাই টানা গল্প পড়তে চায়। উপন্যাসই লক্ষ্মী।'

সমীরের লক্ষ্মীলাভ হয়েছে।

আমরা তিনজন, আমি, সমীর ও পুলক, যে যার জনপ্রিয় রচনার ওপর দাগ বুলোই, মোটা রয়্যালটি পাই, বৌ ছেলেপুলে নিয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর-সংসার করি। তিনজনেরই গায়ে উত্তরতিরিশেও স্বাস্থ্যের চিকন আভা মুখে সাফল্যের দ্যুতি। আমরা এক-জায়গায় হলে প্রথম যৌবনের নতুন রীতির পাগলামি নিয়ে হাসাহাসি করি, আশ্চর্য, তখনও শীতলের কথা ওঠে না। এখন মনে হয় ইচ্ছে করেই ওর কথা আমরা তুলতাম না। ও কোথায় আছে, কী করছে, কেমন আছে, কিছুই আমরা, এই দশকের তিন সফল লেখক, খবর রাখতাম না।

প্রায় দশ বছর পরে, যখন মাথার চুল আমাদের তিনজনেরই পাতলা হয়ে গেছে, লিখতে আর তেমন উৎসাহ পাই না, লিখতে হয়, লিখে পয়সা পাওয়া যায় বলেই লিখি, নিজের লেখা বই পড়তে ইচ্ছে করে না, পড়লেও কেমন অন্তঃসারশূন্য মনে হয়, তখন হঠাৎ একদিন শীতলের খবর পাওয়া গেল। পুলক খবর আনল, শীতল হাসপাতালে, মরো-মরো। তিনজনে মিলে দিনক্ষণ স্থির করলাম, শত হলেও পুরনো বন্ধু, একসঙ্গে লিখতে সুরু করেছিলাম, সবাইকার চেয়ে ও-ই ভাল লিখত, শুধু জেদ আর একগুঁয়েমির জন্যে কিছু করতে পারল না, একবার দেখতে যাওয়া উচিত। ঐতিহাসিক-উপন্যাসের বাজার পড়ে গেছে। পুলকের আর তেমন পড়তা নেই। সমীর সিনেমার ছকে সিনেমা পত্রিকায় গল্প-উপন্যাস লিখে একটাও ছবিতে লাগাতে পারে নি, এক আমারই তিন-তিনটে গল্প ছবি হয়েছে, আরও দুটোর সিনেমাস্বত্ব বিক্রি হয়েছে। তাই বোধহয় আমার উৎসাহই বেশি, বললাম, 'তাহলে ঐ কথাই রইল। তোরা আমার অফিসে আয় পরশুদিন, এখান থেকে যাওয়া যাবে।'

ওয়ার্ডের দরজার পাশের বোর্ডে খোপে খোপে বেড নম্বর ও পেশেণ্টের নাম, তাই দেখেই ঠিক জায়গায় পৌঁছুতে পেরেছিলাম, নইলে, শীতলকে আমরা চিনতে পারতাম না। অমন শক্তপোক্ত চেহারার মানুষ, এ কী হাল হয়েছে! শীতলের শিয়রের কাছে নতমুখে দাঁড়িয়েছিল একটি বেদনাবিধুর বিষণ্ন স্ত্রীলোক, পরে জেনেছিলাম শীতলের স্ত্রী কমলা। আগে আমরা ওকে দেখি নি। ও-ও আমাদের দেখে নি, নিজ-

রাণীধূপ
কাকার প্রডাক্টস

মুখে তাই পরিচয় দিতে হল। শুনে কেমন ব্যস্ত হয়ে পড়ল। আমি বললাম, 'থাক্ থাক্' আমরা কিছু ফল আর সন্দেশ নিয়ে গিয়েছিলাম, কমলার হাতে দিতে কেমন সঙ্কোচ হল, আলতো করে ঠোঙা ধরে রেখে দিলাম শিয়রের কাছে মাথা টেবিলটার ওপর। অক্সিজেন দেওয়া হচ্ছিল শীতলকে। ঠায় দাঁড়িয়েছিলাম আমরা, যতক্ষণ না দুটো বাজে। দুটোয় ভিজিটিং আওয়ার্স শেষ, কমলার সঙ্গে আমরাও বাইরে এলাম। পুলক বলল, 'রাত্রে কে থাকে, নার্স?' কমলা অনেকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপর বলল, 'আমি থাকতে চেয়েছিলাম, থাকতে দিল না, নিয়ম নেই।' বুঝলাম, নার্স রাখার সঙ্গতি নেই। বললাম, 'আপনি থাকবেন কেন? নার্সের ব্যবস্থা করছি।'

যথাসাধ্য করেছিলাম আমরা, কিন্তু শীতল বাঁচে নি। যেদিন আমরা দেখতে গেলাম তার দুদিন পরে ও মারা গেল। ওর মৃতদেহের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে বলতে পারতাম 'সাহিত্যে নিষ্ঠা সততা এসব দেখিয়ে কী লাভ হল তোর' যদি না ওর শেষ কথাগুলো আমরা শুনতে পেতাম। হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের বিশেষ অনুমতি নিয়ে হাসপাতালের মধ্যে ওয়ার্ডের বাইরে দরজার কাছে রাত্রিযাপনের অনুমতি পেয়েছিলাম আমরা। নার্স রেখেছিলাম, সেই এসে কখন কেমন থাকে মাঝে মাঝে বলে যেত। গভীর রাত্রে এক-আধবার পা টিপে টিপে আমরাও যেতাম বেডের কাছে।

মারা যাবার কয়েক ঘণ্টা আগে শেষ রাত্তিরে কিছুক্ষণের জন্য শীতলের জ্ঞান হয়েছিল, আমরা ওর মুখের কাছে ঝুঁকে পড়েছিলাম, ও বিড়বিড় করছিল, আমরা বুঝতে চেষ্টা করছিলাম ও কি বলে।

শীতলের কথা অস্ফুট, প্রায় অনুচ্চারিত কথা, আমরা বুঝব কি করে। ওকে ত' আমরা বুঝি নি। ওকে আমরা ভুলে গিয়েছিলাম, খারিজ করে দিয়েছিলাম বন্ধুত্বের পংক্তি থেকে। শীতল হারিয়ে গিয়েছিল, বড় ছোট কোন পত্র-পত্রিকায় ওর লেখা দেখি নি। আমার উপন্যাসের বিরূপ সমালোচনা করে সেই যে একটা চিঠি লিখেছিল তারপর আর কোন চিঠি লেখে নি। ওর হাতের লেখাটা কেমন তা-ও ভুলে গিয়েছিলাম।

হাসপাতাল থেকে আমাদের তিনজনকে কমলা নিয়ে গিয়েছিল ওদের বাড়িতে। যাবার ইচ্ছে কারোর-ই ছিল না, অথচ না গিয়েও পারলাম না। বাড়ি বলতে খোলার ঘর। তিনজন অভ্যাগতকে ভদ্রভাবে বসতে দেবার মত জায়গা নেই। ঘর জুড়ে একখানা তক্তপোষ, তার নিচে পুরনো ট্রাঙ্ক, হাঁড়ি, বালতি, আনাজের ঝুড়ি। এক পাশে একটা সস্তা বেঞ্চির ওপর দামী দামী সব বই,—ইতিহাস, সমাজ বিজ্ঞান, প্রত্নতত্ত্ব, আরও কত কী। কমলা বলল, 'হাসপাতালে যাবার আগে প্রায় মাসতিনেক তো বাড়িতেই ভুগেছেন, তখন ঐগুলোই পড়তেন।' আমরা তক্তপোষের ওপর বসেছিলাম, কমলা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছিল।

আমি বললাম, 'লিখত-টিখত কিছু?'

কমলা বলল, 'অনেক লেখা ছিল ঐ বাক্সটার মধ্যে,—একদিন বার করে সব ছিঁড়ে ফেললেন।'

আমরা তিনজনে প্রায় একসঙ্গে বললাম, 'সে কী!'

আমাদের পেয়ে বুঝি মনে একটু বল পেয়েছিল কমলা। এমন সহজভাবে কথা বলেছে যেন কতকালের চেনা, কত অন্তরঙ্গ। একটু একটু করে, যখন যেমন মনে পড়েছে, আগেরটা পরে, পরেরটা আগে, শীতলের নানা খেয়ালখুশির কথা বলেছিল কমলা। তাতেই এত বছর পরে আমরা তিন বন্ধু নতুন করে আবিষ্কার করেছিলাম শীতলকে, একসঙ্গে যাত্রা সুরু করে যে-শীতল, আমরা ভাবতাম, পিছিয়ে পড়েছে। মরবার আগের মুহূর্তে শেষ কথাটি বলে যে-শীতল আমাদের সবটুকু সাফল্যের অভিমান কেড়ে নিয়ে একেবারে রিক্ত করে দিয়ে গেছে।

পুরনো পাণ্ডুলিপিগুলো বার করে একদিন পড়তে বসল শীতল, তারপর সবগুলো একসঙ্গে কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলল। কমলা বাধা দিয়েছিল, বলেছিল, 'ওকি, অমন লেখাগুলো সব ছিঁড়ে ফেললে?' শীতল বলেছিল, 'লেখা না ছাই, শুধু হিজিবিজি।' কমলার পড়া ছিল ওগুলো, বলেছিল, 'কেন, বেশ ত' লাগে পড়তে।' শীতল বলেছিল, 'ঐ পর্যন্ত। ইনিয়ে-বিনিয়ে অনেকবার বলা কথাগুলো বলা। ভাষায় এত নুন যে কাগজে নোনা লেগে যাচ্ছে।' সেই যে ভাষা নিয়ে পড়ল বছরের পর বছর ঐ নিয়েই লেগে রইল। বলত, 'ভাবে আধুনিক হলেই হবে? ভাষায় হতে হবে না?' সমকালীন বাংলাভাষার যথার্থ রূপ কি হবে, তাই নিয়ে গবেষণার অন্ত ছিল না ওর। কমলা বলেছিল, সে সময় শীতল টি· এস· এলিয়েটের কথা বলত, শব্দের উপযুক্ত ব্যবহার শিখতে তাঁর নাকি বিশ বছর সময় লেগেছিল। শীতল রুটিন করে রোজ দু'ঘণ্টা লিখত, একই বিষয় দিনের পর দিন নানারকম করে প্রকাশ করবার চেষ্টা করত। ভাষা অনুশীলনের ওর সেই খাতাটা কমলা আমাদের দেখিয়েছিল। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কত বিচিত্র মন্তব্য তাতে। এক জায়গায় লিখেছে,—'রামেন্দ্রসুন্দরের গদ্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। ভাষা ব্যবহারে অর্থাৎ শব্দ প্রয়োগে কী যত্ন, কত সতর্কতা! একালের বাংলা বড় ছন্নছাড়া।' কোথাও লিখেছে, 'ঝি-চাকরদের মুখের ভাষার প্রচণ্ড শক্তি।' দিনের পর দিন অনুশীলন করে, খাতার সর্বশেষ লেখা দেখে বুঝলাম, শীতল অনবদ্য ভাষা রচনার অধিকারী হয়েছিল। খাতাটা দেখতে দেখতে সমীর বলল, 'পুরো গল্প-টল্প কিছু লেখে নি?' কমলা চুপ করে রইল। কিছুক্ষণ পরে বলল, 'আমি কম তাগাদা করেছি! বলতেন, 'লিখব, এখন তৈরি হচ্ছি। যখন লিখব, একেবারে বঙ্কিমচন্দ্রের মত, রবীন্দ্রনাথের মত।' কমলা আই· এ· পর্যন্ত পড়েছিল, একটা প্রাইমারী স্কুলে মাস্টারী করে, সাহিত্যবোধও আছে, সুতরাং শীতলের কথা বুঝতে পারত, এবং বুঝতে পারত বলেই মনে রেখেছে সব। বলল, 'যেই বঙ্কিম, রবিঠাকুর মাথায় এল অমনি অনেকবার পড়া বইগুলো পড়তে সুরু করলেন। তখন ঐতিহাসিক উপন্যাসের চল হয়েছে, উনি বলতেন, কেউ বঙ্কিমের ধারে-কাছেও ঘেঁসতে পারছে না। আমি ঠাট্টা করে বলেছিলাম, তুমিই লিখে দেখাও না। বললেন, তাই লিখব।'

বসুমতীর

যুগতায়

গ্রন্থ ও

গ্রন্থাবলীর

প্রাপ্তিস্থান

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ

কলিকাতা—১২

এবং

সান্যাল এণ্ড কোং

১/১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট

কলিকাতা—১২

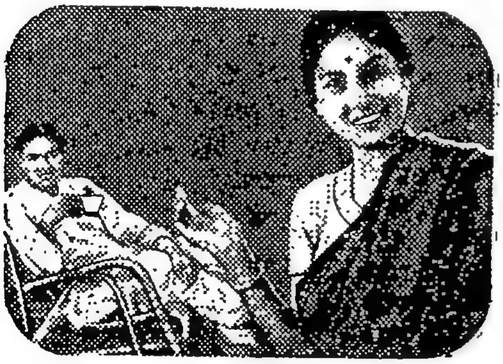

Bensons 142 R-Ben

"সত্যি ভাই, সারাদিন কি কঠিন পরিশ্রমই-না করতে হয় ওঁকে। তারপর ট্রাম-বাসের দারুন ভিড়, তার ধকলতো আছেই। অথচ ওঁকে এবং পরিবারের আর সবাইকে সুস্থ কর্মক্ষম রাখার পুরো দায়িত্ব আমার ওপর। ভাগ্যিস বোর্নভিটা ছিল; তাই কাজটা অনেক সহজ হয়ে গেছে। এক কাপ বোর্নভিটায় সব ক্লান্তি দূর হয়, নিমেষে ওরা চাঙ্গা হয়ে ওঠে, প্রাণের দীপ্তি ঝলমল করে ওদের চোখে-মুখে। বোর্নভিটার চমৎকার স্বাদ আমাদের সকলের খুব ভালো লাগে, বাচ্চাদেরতো কথাই নেই! শরীর সুস্থ-সবল রাখতে যে-পুষ্টি, শক্তি ও সামর্থ্যের প্রয়োজন বোর্নভিটায় তা পুরোমাত্রায় রয়েছে।"

বোর্নভিটা পুষ্টিকর; শক্তিদায়ক। সুষম পরিমাণে কোকো, দুধ, চিনি ও মল্ট মিশিয়ে এটি তৈরি করেছেন ক্যাডবেরি—প্রাণোচ্ছল পানীয় প্রস্তুতে বিশেষজ্ঞ বলে যাঁদের খ্যাতি একশ' বছরেরও বেশি। এর কোকো-সমৃদ্ধ স্বাদ ছেলেমেয়েদের ভারী পছন্দ!

ক্যাডবেরির বোর্নভিটা খাবেন—
শক্তি, উদ্যম—এবং স্বাদের জন্যে

কথাটা শুনে পুলক বোধহয় একটু রুষ্ট হয়েছিল, বলল, 'লিখেছে নাকি কিছু?'

'ঐতিহাসিক উপন্যাসের পরিকল্পনা মাথায় ঢুকেই সর্বনাশ হল।' বলতে বলতে কেঁদে ফেলেছিল কমলা।

সামান্য কী একটা চাকরি করত শীতল। কমলা মাস্টারী করত, দুজনের রোজগারে কোনরকমে চলে যেত। উপন্যাস লিখতে শীতল এমন ক্ষেপে উঠল যে, মাসের মধ্যে দশ দিনই কাজে কামাই করত, তাতেই চাকরিটা খোয়াল। বাড়িতে বসে, লাইব্রেরীতে গিয়ে ইতিহাসের বই পড়ত। পুরো মোগলযুগ নিয়ে একটা বড় উপন্যাস লিখবে। প্রথমটায় বঙ্কিম ছিলেন আদর্শ, হঠাৎ একদিন বলে বসল, 'না, বঙ্কিম অসম্পূর্ণ। সে যুগের সাধারণ মানুষ, যাকে বলে জনশক্তি, তারা কোথায়? রাজা-বাদশার থেকে তারাই ত' সংখ্যায় বেশি, তারাই হবে মূল পাত্র-পাত্রী।' সুতরাং সমাজতত্ত্ব নিয়ে পড়ল। মোগলযুগের কৃষিব্যবস্থা, কামার, কুমোর, তাঁতীদের সামাজিক অবস্থা, এসব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে লাগল। প,তার পর পাতা নোট করেছিল।

মানুষের মুখের ভাষা তো রেকর্ড করা নেই, অশিক্ষিত গ্রাম্য মানুষেরা উপন্যাসে কিরকম কথা বলবে, এই হল আর এক চিন্তা। শীতল বলত, 'ওদের মুখের ভাষার ইডিয়ম খুব বেশি বদলায় নি। কাছাকাছি থেকে ওদের দেখব, কেমন করে ঝগড়া করে, কেমন করে স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসা জানায়, জমিদার বা রাজপুরুষ দেখলে কেমন আনত হয়ে দীনতা প্রকাশ করে।' তখন ওর চাকরি নেই, একা কমলা যা পায়। তাই থেকে কিছু নিয়ে বেরিয়ে পড়ত বর্ধমানের দিকে, কখনও বা মুর্শিদাবাদের দিকে, সোজা চলে যেত অজগাঁয়ে, অতিথি হত হিন্দু-মুসলমান যে কোন লোকের বাড়িতে। তখন থেকেই শরীর ভাঙছিল।

অনেকদিন পর কাগজ-কলম নিয়ে বসল। খানিকটা লিখলও।। কমলা নিশ্চিন্ত হল। কিন্তু লেখা বেশিদূর এগোল না। আবার অস্থিরতা দেখা দিল শীতলের মধ্যে। প্রাসাদের পুষ্পোদ্যানের বর্ণনা করবে, কী-কী ফুল ছিল সেকালে? কৃষ্ণকলি এনেছিল পর্তুগীজরা, সে ফুল ত' ফোটানো যায় না মোগল বাগিচায়। কী ফুল এনেছিল মোগলেরা, কোন্ দেশ থেকে? সে যুগে, সে ফুলের নাম কী ছিল? নানা প্রশ্ন মাথার মধ্যে ঘুরপাক খায়, লেখা এগোয় না। পাণ্ডুলিপি কেটেকুটে দেয় শীতল। বলে, 'আরও জানতে হবে।'

মোগলযুগের পুরো ইতিহাস তন্ন তন্ন করে পড়ে ফেলেছে। কত সঙ্গীতশিল্পীর নাম পেয়েছে, মিঞা তানসেন, আমীর খসরু, নায়ক চাটু, সুরদাস। এঁরা অনিবার্যভাবেই আসবেন উপন্যাসে। এঁদের সঙ্গীতসাধনার বর্ণনা করতে সেকালের সঙ্গীতের ইতিহাস জানতেই হবে, জানতে হবে মিঞা-কি-মল্লারের ঠাট, বিন্যাস, সুরদাসী মল্লারের সঙ্গে এর তফাৎ কোথায়। গানের সঙ্গে কী-কী যন্ত্র বাজত সেকালে? তানপুরা, তবলা, সারেঙ্গী? কাষ্ঠতরঙ্গ, দিলরুবা, বাঁশ? এসব জানতে কত গানের বই পড়েছে শীতল, কত সঙ্গীতবিশেষজ্ঞের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে। সামান্য দু'-চার আনা পয়সা সম্বল করে সারা কলকাতা ঘুরত টো-টো করে, বাড়িতে এসে পড়ত, নোট লিখত। তাতেই রোগটা বাধাল। বাড়িতে চিকিৎসা করিয়েছে কমলা, ডাক্তার, লেখাপড়া করতে নিষেধ করেছিলেন, শীতল শুনত না, কমলা স্কুলে বেরিয়ে গেলেই পড়ত। কমলা বলল, 'একএকদিন বিছানায় শুয়ে শুয়ে মুখে মুখে তার পরিকল্পিত উপন্যাসের গল্প শোনাতেন, বলতেন, জানো উপযুক্ত ভাষাও আমি তৈরি করে নেব। ইতিহাসের গল্প নয়, নবাব-বাদশার হারেমের কেচ্ছা নয়, দীর্ঘ কয়েক শ' বছর ধরে সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রাম ও সিদ্ধি, ব্যর্থতা ও হতাশার কাহিনী লিখব।'

সে কাহিনী শীতল লিখে যেতে পারে নি। রোগশয্যায় সেই কাহিনীই বোধহয় বিড়বিড় করত, যা মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েও আমরা বুঝতে পারি নি।

কমলার মুখে শীতলের কথা শুনে আমাদের এক-একরকম প্রতিক্রিয়া হয়েছিল। পুলক পরে বলেছিল, 'ওর সবতাতেই বাড়াবাড়ি। একটা উপন্যাস লিখতে দশ-পনের বছর কাটলেই হয়েছে আর কী!' সমীর বলেছিল, 'কপালগুণে বৌটা ভাল পেয়েছে, স্বামী লিখে একটা পয়সাও কামাই করতে পারে নি বলে একটুও ক্ষোভ নেই।'

আমি চুপ করেছিলাম। ভাবছিলাম, শীতল চিরকালই একরকম রয়ে গেল, সেই যখন লিট্ল্ ম্যাগাজিন বার করেছিলাম তখন থেকে আজ পর্যন্ত। নিষ্ঠা ও সততা বিরল হয়ে এসেছে বলেই বোধহয় ওকে হঠাৎ কেমন শ্রদ্ধা করতে ইচ্ছে হল। পরক্ষণেই মনে হল, এ-সবের কোন দাম নেই। কী পেল শীতল? মনে মনে একটা নিখুঁত কালজয়ী উপন্যাসের পাণ্ডুলিপিই তৈরি করল। যে জানে না তার কাছেও যেমন, যে জানে, তার কাছেও তেমনি এর কানাকড়িও দাম নেই।' আমাদের ও চরিত্রহীন লেখক বলবে, তবু সেই চরিত্রহীনদের টাকাতেই ওর শেষ কয়েকটা মুহূর্তের মৃত্যুযন্ত্রণা অন্তত একটু লাঘব হয়েছে।

ওর মুখের ওপর আমরা ঝুঁকে পড়েছিলাম, ও চোখ মেলেছিল, আমাদের দিকে শূন্যদৃষ্টিতে চেয়েছিল কিছুক্ষণ, আমাদের নিশ্চয়ই চিনতে পারে নি, তবু আমরা একসঙ্গে ডেকেছিলাম, 'শীতল!' ওর মুখে যন্ত্রণার কোন লক্ষণ ছিল না, বুঝতেও পারি নি একটু পরেই ও মারা যাবে। সারা ওয়ার্ডে কোন শব্দ নেই, ঘেরাটোপ পরান মৃদু আলো বেডের শিয়রে। সেই আলোতেই দেখলাম ওর রোগপাণ্ডুর মুখে কী প্রসন্নতা! বিড়বিড় করছে, 'বঙ্কিম......রবীন্দ্রনাথ......।'

তখনই শেষ কথাটি বলল, 'আমি লিখতে পারলাম না, কিন্তু ওঁদের মতই তৈরি হয়েছিলাম।'

মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এই বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ে ওর মুখ উজ্জ্বল দেখেছিলাম। আমরা এই দশকের তিনজন সফল সাহিত্যিক অনেকক্ষণ কথা বলতে পারি নি। চিরকাল যেমন করেছে তেমনি শেষবারও যেন শীতল আমাদের ভর্ৎসনা করে গেল। পার্থিব সাফল্যে না হোক, অপার্থিব আত্মতৃপ্তিতে ও আমাদের অনেকখানি ছাড়িয়ে গেল।

কিস্তিতে ট্রানজিস্টর

ন্যাশন্যাল ডিলাক্স

১০, মাসিক কিস্তিতে ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টর লাভ করুন। প্রতি গ্রাম ও শহরে প্রেরণের যোগ্য। আবেদন করুন:

Music & Sound (B.W.C.—10)
Post Box 1576, Delhi—6.

চিতায় দিও মঠ

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সাত বছর হয়ে গেল, শিশিরকুমারের চিতায় আর মঠ উঠলো না। পরিকল্পনাটা তাঁর মৃত্যুর পরেই নেওয়া হয়েছিল, কিন্তু মানতেই হবে, তিনি বাংলাদেশের কোনো হবু মন্ত্রী বা চোখঝলসানো আধুনিক চলচ্চিত্রের নায়ক ছিলেন না। সুতরাং শিশিরকুমার ভাদুড়ীর চিতায় মঠ ওঠা চাট্টিখানি কথা নয়। বাংলাদেশ অতি সহজেই গগনেন্দ্রনাথ, শিশিরকুমার, উদয়শঙ্কর, দিলীপকুমার, প্রমথেশ বড়ুয়াদের ভুলে যায়। এঁদের কেউ কেউ এখনো বেঁচে আছেন, কিন্তু আজ মঞ্চের সামনে দেবোপম মহিমায় ভাস্বর নন। এঁদের তুলনায় উত্তমকুমার চুনী গোস্বামী অথবা মান্না দে এখন অনেক বেশি উজ্জ্বল। শিশিরকুমারের বরং ভাগ্য ভাল; মৃত্যুর পর তাঁর চিতায় একটি মঠ তুলবার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছিল। 'ও ভাই বঙ্গবাসী! আমি ম'লে তোমরা আমার চিতায় দিও মঠ!' —অনেক দুঃখ থেকেই ভাওয়ালের কবি গোবিন্দচন্দ্র দাস এই ব্যঙ্গোক্তি করেছিলেন। কিন্তু তিনি জানতেন না, ঐ ব্যঙ্গোক্তি তাঁকেই একদিন ফিরে আঘাত করবে। তাঁর চিতায় কোনো মঠ ওঠে নি; তেমন প্রস্তাবও কেউ নিয়েছিলেন বলে জানি না।

আমাদের শ্রেষ্ঠ শিল্পী, অভিনেতা, গায়ক, কবিরা তাঁদের সমস্ত জীবন ব্যয় করেছেন বাংলাদেশের শিল্প ও সংস্কৃতির প্রদীপটিকে অনির্বাণ রাখতে। এবং এখানেই শেষ নয়। প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের মধ্যে যে রাখিবন্ধন মহৎ শিল্পীমাত্রেরই অন্বিষ্ট, তার-উৎসবের দিনটিকেও এঁরাই একদিন আমাদের চোখের সামনে মূর্ত করে তুলেছিলেন। বাঙালীর রেনেসাঁস-এর প্রথম দুই শিল্পী বোধহয় রাজা রামমোহন রায় এবং ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত: যদিও একজনের প্রাণ ছিল সমাজে, অপরের কবিতায়। এরপর একে একে মুখের পর মুখের মিছিল; বিদ্যাসাগর, মাইকেল, ভূদেব, দীনবন্ধু, বঙ্কিমচন্দ্র, গিরিশচন্দ্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, ডি, এল, রায়। সব নাম দিতে গেলে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা শুধু মনীষীদের নামই লিখে যেতে হবে। গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, শিশিরকুমার, উদয়শঙ্কর এঁদেরই উত্তরসূরী; তাঁদের প্রতিভায় শুধু বাংলাদেশ বা ভারতবর্ষ নয়, কখনো বা সমস্ত পৃথিবী দীপ্ত হয়েছে।

ভাবতে অবাক লাগে, এইসব অমর মানুষকে আমরা কত সহজে এবং কত তাড়াতাড়ি ভুলে যাই। এক উত্তমকুমারকে দেখবার জন্য কলকাতার রাস্তায় লক্ষ লোক বিনা নোটিশে একত্র হয়; অথচ প্রমথেশ বড়ুয়ার নামও অনেকের জানা নেই। উদয়শঙ্কর বা দিলীপকুমার আমাদের সামনে দিয়ে হেঁটে গেলেও অনেকের চোখে পড়বে না; অথচ আধুনিক সঙ্গীতের একজন যেমন-তেমন গাইয়েকে নিয়ে আমাদের কত আপ্যায়ন, আদর, বাহবা! ছবি যে একটি আর্ট, বাংলাদেশের মানুষ কোনদিনই সে-কথা মনে রাখে নি। সুতরাং গগনেন্দ্রনাথকে ভুলে থাকা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু যাঁরা আর্ট ক্রিটিক, তাঁরাই কি তাঁকে মনে রেখেছেন? সিনেমা ক্রিটিকরা সত্যজিৎ রায়ের নাম উচ্চারণেই উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন; এবং এতে আমাদের বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। সত্যজিৎ রায় আমাদের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের মধ্যে একজন; কিন্তু প্রমথেশ বড়ুয়াকে তিনিও খুব বেশিদূর ছাড়িয়ে যান নি। অথচ সত্যজিৎ রায়কে যখন দেবতাজ্ঞানে পূজা করা হয়, তখন একটি দুটি পূজার ফুল বা বিল্বপত্রও কি এই পূর্বসূরী মানুষটির নামে কখনো নিবেদিত হয়?

এই অবহেলা, যদি তার কারণ অজ্ঞতাও হয়ে থাকে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের অথবা এই রাজ্যের বুদ্ধিজীবী-সমাজের বিবেক এবং বিচারবুদ্ধিকেই আঘাত করে। বাংলাদেশ থেকে 'ফাইন আর্ট'-এর চর্চা এখনও উঠে যায় নি। অথচ নির্মম সত্য এই, বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পীরাও ক্রমেই আমাদের বিস্মৃতির অন্ধকারে কোণঠাসা হতে চলেছেন। এমন কি রাজনীতিই যাঁর ধ্যান এবং জ্ঞান ছিল, সেই সর্বত্যাগী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকেও আজ তাঁর শতবর্ষে আমরা ক'জন মনে রেখেছি? অথচ আমাদের বুকের একেবারে ভিতরে তাঁর জন্য জায়গা থাকা উচিত ছিল। বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দের মত তিনিও সব দিয়ে মনুষ্যত্বের বাতি জ্বালিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন।

এইসব মানুষ আজ আর আমাদের বুকের মধ্যে নেই। আমাদের ইচ্ছে হলে তাঁদের চিতায় একটি করে মঠ তুলি, আর যাঁর অনেক ভাগ্য তাঁর একটি মূর্তি গড়িয়ে কলকাতার মাঠে বা পার্কে কিছুদিন হৈ-চৈ করি। গিরিশচন্দ্রের এমন একটি মূর্তি তাঁর নামের পার্কে আমরা গড়িয়ে দিয়েছি। শিশিরকুমার সম্পর্কে এখনো ভাবছি।

অবহেলার একটা সীমা আছে। আমাদের ভিতরেও আজ ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, দিলীপকুমার রায়, উদয়শঙ্করের মত মানুষেরা বেঁচে আছেন। এখনো এঁরা নিজেদের আশ্চর্য ক্ষমতার সবটাই হারিয়ে ফেলেন নি। অথবা, যদি আরো বেশিদিন এঁরা বেঁচে থাকেন, দৃষ্টি ক্রমেই আরো ক্ষীণ হতে থাকবে, কণ্ঠস্বর একটু করে কাঁপতে থাকবে, হাতের মুদ্রাও আর শিল্পীর বশে থাকবে না।

ভারতবর্ষের জনসাধারণ, আমাদের রাষ্ট্রের কর্ণধারেরা, এই দেশের বুদ্ধিজীবী-সমাজ তখন কি এঁদের বিস্মৃতির কুয়াসায় ছুঁড়ে ফেলে দেবেন? তাঁদের কি এখনই উচিত ছিল না গুণীর উপযুক্ত সম্মান দিয়ে এঁদের প্রতি অন্তরের শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করা?

যদি এইসব মানুষের শেষ-জীবন বিস্মৃতির অবহেলায় কুয়াসায় ক্রমেই অন্ধকার হতে থাকে; তাহলে বুঝতে হবে, বাংলাদেশ থেকে সত্যিকারের 'ফাইন আর্ট'-এর প্রয়োজন এবার ফুরিয়ে এসেছে। বিসর্জনের ঢাকীদের জন্যই শুধু অপেক্ষা। আর, ঢাকীদের অভাবে, আমরা যখন টুইস্ট নাচ নাচতে শিখেছি, কোনো মন্ত্রী বা সিনেমা অ্যাক্টরকে সামনে রেখে এই মহৎ কাজ শুরু করে দিতে পারি।

এতে করে আমরা আর যত অপরাধই করি না কেন, বাঙালীর আসল ট্র্যাডিশন ঠিকই থাকবে। এমন একটি আত্মবিস্মৃত জাতি আর ভূ-ভারতে নেই; সেটাই কি আমাদের কম বাহবা!

পাঠক মন

'সপ্তাহের বোঝা' প্রসঙ্গে

'পাঠকমন' বিভাগে শ্রীহিতাংশু চট্টোপাধ্যায়ের একটা প্রতিবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছে। আমার সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝে উঠতে পারছি না যে, কি কারণে, বুঝি বা তথ্যের কোন ইঙ্গিত না দিয়ে তিনি প্রতিবাদ করেছেন।

তাঁর উষ্মার কারণটা যেটুকু বোঝা যায় তা হচ্ছে ৭৩ বর্ষ ৫১ সংখ্যার 'সপ্তাহের বোঝা'য় লেখা হয়েছে যে, "রাজ্যে মন্ত্রিসভায় তিন ভাগের এক ভাগ সি-পি-এম-এ'র নিয়ন্ত্রণে আছে। এর পর যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, রাজ্যে বর্তমান পরিস্থিতি যা সৃষ্টি হয়েছে তা সি-পি-এম দলের সতর্কতার অভাবেই, সেটা বলা কি ভুল বা অন্যায় হবে?"

কিন্তু ভদ্রলোক উপরি-উক্ত লাইনটি পড়ে এতই ধৈর্যচ্যুত হয়েছিলেন যে, সমস্ত লেখাটি পড়ে উঠতে পারেন নি। পড়লেই দেখতে পেতেন যে, শ্রীওঝা শুধু একমাত্র সি-পি-এম-এরই সমালোচনা করেন নি। যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলিরও সমালোচনা করেছেন। তিনি লিখেছেন সি-পি-এমই এই বক্তব্যের লক্ষ্য নয়। সি-পি-আই, ফরওয়ার্ড ব্লক, আর-এস-পি, এস-ইউ-সি ও বাংলা কংগ্রেস সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। প্রতিবাদকারী তাঁর অভিযোগে বলেছেন, "কৃত্তিবাস ওঝা সুকৌশলে যুক্তফ্রন্ট বিশেষ করে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা করেছেন। এই আবিষ্কার করে তিনি হয়তো নিজে নিজেকেই খুব প্রশংসা করেছেন। কিন্তু সাপ্তাহিক বসুমতীর নিয়মিত পাঠকেরা তাঁর এই চিন্তাহীন অভিযোগপত্রের প্রশংসা করতে পারবেন না। সাপ্তাহিক বসুমতী যুক্তফ্রন্টের অন্ধ সমর্থক না হলেও প্রকৃত দরদী বলে সকলে জানে। অতীত ও বর্তমানের বহু তথ্যনিষ্ঠ সমালোচনাই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তবে শ্রীচট্টোপাধ্যায় এক জায়গায় যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তার সঙ্গে পুরোপুরি একমত না হলেও আমি ক্ষুব্ধ। যেখানে কৃত্তিবাস ওঝা বলেছেন "খিচুনেওয়ালা পার্টি"; কথাটা সত্য হলেও; সমগ্র শিক্ষক সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে মন্তব্যটি অত্যন্ত বাড়াবাড়ি হয়েছে। আশা করি কৃত্তিবাস ওঝা এই মন্তব্যটি প্রত্যাহার করে নিয়ে। সৎ এবং শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের ও পাঠকদের মনোবেদনা দূর করবেন।

পরিশেষে অনুরোধ করি—হিতাংশুবাবু। দয়া করে কানে না পড়ে নিজের চোখে সমস্তটা পড়ুন। দলীয় অন্ধত্ব ত্যাগ করে বিচার করুন, দেখবেন আপনার বক্তব্যটি কত অসার। আশা করি প্রতিবাদ প্রত্যাহার করবেন।

—সতীশচন্দ্র সাহা
পোঃ বাউড়িয়া (হাওড়া)

"গ্রামবাংলার কথা প্রসঙ্গে"

আমি আপনাদের সাপ্তাহিক বসুমতী নিয়মিত পাঠ করিয়া থাকি। শ্রীঅসীম মুখোপাধ্যায়ের "গ্রামবাংলার কথা"-র রচনাবলীর পূর্বাপর সকল রচনাই অভিনিবেশসহকারে পাঠ করিয়া আসিতেছি। পূর্বে তিনি পুরাতন মন্দির, দেউল সম্পর্কেই নানা তথ্যপূর্ণ রচনা লিখিতেন এবং ইদানীং সাক্ষাৎ কথাগুচ্ছের ভিতর দিয়া গল্পচ্ছলে গ্রামজীবনের নানা সমস্যার চিত্র পাঠকবর্গের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতেছেন। এগুলি যেমন উপভোগ্য, তেমনই রসোত্তীর্ণ, আর লেখকের এই প্রচেষ্টা সত্যই প্রশংসনীয়। এই সকল কারণে লেখককে আমার অভিনন্দন জানাই। ইহা যদিও রম্যরচনা নয়, তথাপি রম্যরচনার কিছুটা স্পর্শ থাকায় লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে, বাড়ির ছেলেমেয়েদের কাছেও ইহা বেশ উপভোগ্য হইয়া উঠিয়াছে।

মন্দির, দেউল সম্পর্কে রচনাগুলির মধ্যে পূর্বেও লক্ষ্য করিয়াছি আর এখন সাম্প্রতিক নবপর্যায়ের রচনাগুলির (যেমন ২২শে জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার "ফুলদোলের মেলা" এবং এই সংখ্যায় "কত ফুলুরা") মধ্যেও লক্ষ্য করিয়াছি যে যুদ্ধোত্তর ২০।২২ বৎসর পরেও গ্রামবাংলার বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নাই। উপযুক্ত শিক্ষার অভাব এখনও বর্তমান, ইহা ছাড়া বিশেষ কয়েকটি শ্রেণীর মধ্যে (সংখ্যায় হয়ত ইহারাই অধিক হইবে) দারিদ্র্য কী ভীষণভাবে প্রকট, অর্থাভাবের জন্য অন্ন-বস্ত্র ও বাসগৃহের সমস্যায় ইহারা জর্জরিত,—পূর্বে যেমন ছিল এখনও তেমনই রহিয়াছে। মহানগরী কলিকাতাকে বাদ দিয়া যেমন বাংলাকে ভাবা যায় না, তেমনই বাংলার গ্রামাঞ্চলকে বাদ দিয়া কলিকাতাকে ভাবিতে গেলে ইহার বাঙালীত্বই আর থাকে না—অস্তিত্ব যেন বিপন্ন হইয়া পড়ে। কলিকাতা যদি বাংলার মস্তিষ্ক হয়, তাহা হইলে গ্রামগুলিকে একই দেহের অন্যান্য অংশ বলা চলে। দেহের এই অংশগুলি অসুস্থ হইয়া পড়িলে মস্তিষ্কও ক্রমে ক্রমে অসুস্থ হইতে বাধ্য। লেখকের নবপর্যায়ের রচনাগুলির মধ্যে গ্রামজীবন ও চরিত্র বেশ সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে, বিশেষ করিয়া দরিদ্রের মূক মর্মবেদনা—তাহারা যে শহুরে মানুষের মত চীৎকার করিয়া গুছাইয়া বলিতে পারে না, প্রতিবাদ বা জানেও না।

আর একটি বিষয় লক্ষ্য করিলাম যে, লেখক কেবল হাওড়া ও ২৪ পরগনা জেলা দুইটির গ্রামগুলি সম্পর্কেই পাঠকবর্গকে অবহিত করিতেছেন, কিন্তু তিনি কি উত্তরবঙ্গ সহ বাংলার অন্যান্য গ্রামগুলি সম্পর্কেও আমাদিগকে সমান অবহিত করিতে পারেন না? এই উদ্দেশ্যে লেখককে যদি বাংলার অন্যান্য জেলাতেও পাঠান তাহা হইলে গোটা বাংলার বর্তমান অবস্থা পাঠকবর্গ জানিতে পাবেন।

পরিশেষে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আমার বক্তব্যের উপসংহার করিতেছি। বিষয়টি এই। আপনাদের কাগজের দোষেই হউক কিম্বা ব্লকের দোষেই হউক পত্রিকার ছবিগুলি খুবই অস্পষ্ট। আপনাদের তরফ হইতে এই ত্রুটি সংশোধন করিতে পারিলে ভাল হয়।

—শ্রীতেজেন্দ্রনাথ রায়
২০এ, হরিশ মুখার্জী রোড,
কলকাতা-২৫

সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশিত 'গ্রামবাংলার কথা' ফিচারটা পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছি। সত্যি বলতে কি প্রথম দুটি কাহিনী বিশ্বাস করাই কঠিন। কি বিচিত্র এই দেশ। স্বাধীনতার ২২ বছর পরেও যদি এমন ব্যাপার ঘটতে পারে, তবে আর দেশের সমাজবাদ-সাম্যবাদ ইত্যাদির বাকি রইল কি? সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয় আজ যুক্তফ্রন্টের শাসনব্যবস্থা চলছে, অথচ চিরদারিদ্র্যের পেষণে মৃতপ্রায় গ্রামের এইসব অসহায় মানুষগুলোর দিকে তাকাবার কেউ নেই? আজ বাংলার ঘরে-ঘরে, গ্রামে-গ্রামে 'মোতিবালা' এবং এই রুগ্ন স্বামীর অসহায়া স্ত্রী' যে কি দুর্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করছে, সেদিকে কে নজর দেবে? আমরা সাধারণ শহুরবাসীরা কাগজ-টাগজে পড়ে বড় জোর কিছুটা মৌখিক হা-হুতাশ অথবা সমবেদনা জানাতে পারি; কিন্তু তার দ্বারা ওই সব অভাগ্য মানুষগুলোর কোনো লাভ হবে কি? বড় বেদনা বোধ করলাম শ্রীঅসীম মুখোপাধ্যায়ের (লেখক) উক্তিতে—'আমার মা কাঁদছে।' অনেক বড় বড় পরিকল্পনা, অনেক স্কীম, পাঁচসালা-দশসালা পার হয়ে যাবে, গঙ্গার ওপর কোটি কোটি টাকা খরচ করে দ্বিতীয় সেতু, চাই কি তৃতীয় সেতুও তৈরি হয়ে যাবে, কিন্তু এই সব দুর্ভাগা মানুষগুলো যে তিমিরে সেই তিমিরেই রয়ে যাবে।

পরিশেষে লেখককে ধন্যবাদ যে, তিনি সত্য কথা বা ঘটনা প্রকাশ করে গ্রামবাংলার মানুষদের প্রকৃত অবস্থা দেশের সামনে ফুটিয়ে তুলছেন।

—অনিল চক্রবর্তী,
বেলপার
আসানসোল

মহানায়ক লেনিন

অশোক সেন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ আট ॥

[পেট্রোগ্রাডে ভগ্নী আনা এবং তাঁর স্বামী মার্ক টিমোকেয়েভিচ ইয়েলিজারভ থাকতেন ৪৮/৯ শিরোকায়া স্ট্রীটের ২৪নং ফ্ল্যাটে পেট্রোগ্র্যাডস্কায়া স্টোরোনাতে। লেনিন এবং ক্রুপস্কায়া এখানে এসে উঠলেন এবং জুলাই মাস অবধি এখানে ছিলেন। একদিন বিকেলে মিটিং রুমে বসে সবার আলোচনা হচ্ছিল। কমরেড সাউমিয়ান এবং কমরেড ইয়েনুকিড্জেও উপস্থিত ছিলেন। পর্দা উঠলে এই আলোচনারত দলটিকে আমরা দেখতে পাব।]

ইয়েনুকিড্জে—জনগণের মন কি চায় জানেন কমরেড লেনিন? তারা চায় দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক, কৃষকেরা জমির মালিকানা পাক, আর ক্ষুধিত লোকেরা যেন ক্ষিদের সময় তাদের খাবার রুটি পায়।

লেনিন—আমাদের সোভিয়েটগুলো শক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠলেই এসব সমস্যার সমাধান হবে—নচেৎ নয়।

টিমোকেয়েভিচ—বর্তমান ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে বলশেভিক পার্টি কোন্ পথে এগিয়ে যাবে সেটাই আগে ঠিক করা দরকার। ভ্যাডিমার ইলিচ এই বিষয়েই পার্টিকে নির্দেশ দেবেন বলে ঠিক করেছেন।

লেনিন—কমরেডস সাউমিয়ান এবং ইয়েনুকিড্জে! টিমোকেয়েভিচ যা বললেন—অর্থাৎ পার্টি এখন কিভাবে কাজ করবে সেই বিষয় নিয়েই আমি ক'দিন ধরে চিন্তা করছি।

ইয়েনুকিড্জে—কোন সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছেন কি?

লেনিন—নানাভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে আমি যখন এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, বর্তমানের বুর্জোয়া ডেমোক্রেটিক বিপ্লবকে আমাদের রূপান্তরিত করতে হবে সোস্যালিস্ট রেভোল্যুশানে। তারই ফলে রাষ্ট্রের সমস্ত শক্তি চলে আসবে শ্রমিকশ্রেণী এবং গরীব কৃষকদের হাতে। আচ্ছা কমরেড সাউমিয়ান! আপনার কি মনে হয় কেরেনস্কির সরকার মেহনতী মানুষদের স্বার্থের দিকে নজর রেখে তাদের শাসনকাজ চালাচ্ছে?

সাউমিয়ান—এখন পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে, প্রভিশ্যানাল গভর্নমেন্ট জমিদার এবং ধনতন্ত্রবাদীদের কায়েমী স্বার্থ বজায় রাখবার জন্যই তৎপর হয়ে উঠেছে।

আনা—এদের মতিগতি দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এরা যুদ্ধ বন্ধ করবার জন্য মোটেই উৎসুক নয়।

লেনিন—অথচ এ যুদ্ধ মুক্তির যুদ্ধ নয়। ধনতন্ত্রবাদীদের উগ্র লোভের চরিতার্থতার জন্যই যুদ্ধ শুরু করা হয়েছিল। এবং এখনও সেই কারণেই যুদ্ধটা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আর ধনিকদের এই পাশবিক স্বার্থপরতার বলি হচ্ছে যুদ্ধরত দেশের দরিদ্র জনসাধারণ। এ যুদ্ধ আমাদের যে করেই হোক বন্ধ করতে হবে। এখন থেকে বলশেভিকদের মটো হবে—**No support for the Provisional Government** এবং **All power to the Soviets!**

ইয়েনুকিড্জে—অর্থাৎ সামরিক সরকারের পতন ঘটাবার চেষ্টা করতে হবে?

লেনিন—না, এখনও সে সময় আসে নি। এখন পর্যন্ত সোভিয়েটগুলো সামরিক সরকারকে সমর্থন করছে—আর জনগণের পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে সোভিয়েটগুলোর ওপর—জনমতের বিরুদ্ধে আমরা কিছুতেই যেতে পারি না।

আনা—সোভিয়েটগুলোতে এখন মেনশেভিকদের প্রাধান্য......

লেনিন—সোভিয়েটগুলোতে আগে বলশেভিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করতে হবে—এর জন্য আমাদের ক্রমাগত কাজ করে যাওয়া দরকার। এরপর এমন সময় আসবে যখন বলশেভিকদের দ্বারা গঠিত সোভিয়েটগুলোর সমর্থন হারিয়ে সামরিক সরকার বাধ্য হবে কৃষক এবং শ্রমিকদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে। কৃষক-শ্রমিকদের ভেতর সহযোগিতার জন্যই আমাদের বিরাটভাবে প্রচারের কাজ শুরু করা দরকার।

টিমোকেয়েভিচ—আচ্ছা, ইকনমিক ফিল্ডে এ পার্টির কাজ কি হবে?

লেনিন—জমিদারী বাজেয়াপ্ত করতে হবে। সমস্ত জমির জাতীয়করণ করা এবং জমি সংক্রান্ত ব্যক্তিগত মালিকানার অবলোপ করে তা কৃষকদের সোভিয়েট এবং এগ্রিকালচারেল লেবারার্স-এর ডেপুটিদের কাছে হস্তান্তরকরণ করা দরকার। কলকারখানাতেও শ্রমিকদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। তাছাড়া দেশের সমস্ত ব্যাঙ্কগুলোকে একসঙ্গে করে একটি জাতীয় ব্যাঙ্ক গড়ে তুলতে হবে—এটি থাকবে সোভিয়েট শ্রমিক এবং সোলজারদের অধীনে।

সিউমিয়ান—আচ্ছা, কিভাবে আপনি কাজে এগোতে চান?

লেনিন—প্রথমে আমাদের পার্টির একটি কংগ্রেস আহ্বান করা দরকার। আমি ঠিক করেছি আমাদের পার্টির নতুন নামকরণ হবে 'দি কমিউনিস্ট পার্টি'।

তারপর এর প্রোগ্রামও এবার পাল্টাতে হবে।

ইয়েন্‌াকড্‌জে—কেন?

লেনিন—কারণ আমাদের আগের কর্মসূচী প্রায় সম্পন্ন করে ফেলা হয়েছে। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল জারিস্ট সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করা—সে কাজ সারা হয়েছে। এখন পার্টির প্রধান কাজ হবে তৃতীয় কমিউনিস্ট ইণ্টারন্যাশনালের অধিবেশনের ব্যবস্থা করা। তাছাড়া এখন থেকেই জনগণকে রাজনীতি বিষয়ে সচেতন করে তোলবার কাজে উঠে-পড়ে লাগতে হবে পার্টির সভ্যদের। আমাদের পার্টির কার্যধারা এবং উদ্দেশ্য ভালভাবে বুঝিয়ে দিতে হবে শ্রমিক, কৃষক এবং সৈন্যবাহিনীকে।

[ব্ল্যাক আউট। আলো জ্বললে দেখা যাবে কথক এসে দাঁড়িয়েছেন:]

কথক—লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি, শ্রমিক, সৈন্যদল এবং কৃষকদের কাছে তাদের কার্যধারা বিশদভাবে প্রচার করতে শুরু করলেন। জনগণের রাজনীতিক শিক্ষা এবং শৃঙ্খলাপূর্ণ সংগঠনের দিকেও তাঁরা বিশেষভাবে মনোযোগ দিলেন। লেনিনকে কেন্দ্র করেই বলশেভিকরা ব্যাপকভাবে তাদের বৈপ্লবিক কার্যধারা চালিয়ে চলেছিল। পুটিলভ, ওবুখবের শ্রমিকদের সভাতে, স্কবোকনি এবং পেট্রোগ্র্যাডের সমস্ত মিল এবং ফ্যাক্টরীগুলোর মজদুরদের মিটিং-এ সৈন্য এবং নাবিকদের সম্মেলনে লেনিন প্রায়-প্রায়ই বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। এবার দু'জন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ শুনুন। প্রথমে বলবেন পুটিলভ কারখানার শ্রমিক ভি, ভি, ভ্যাসিলিয়েভ:

[কথক স্টেজের ডানদিকের কোণায় এসে দাঁড়াবেন। ডানদিকের উইংস থেকে স্টেজের মাঝে এসে ভ্যাসিলিয়েভ দর্শকদের অভিবাদন করবেন:]

ভ্যাসিলিয়েভ—আমি পুটিলভ কারখানার শ্রমিক ভ্যাসিলিয়েভ। এই সেদিনের কথা! বলতে গেলে সেদিনকার ঘটনাবলী এখনও আমার চোখের ওপর ভাসছে! সোস্যালিস্ট রেভোল্যুশনারী নেতা চারনভ এসেছিল আমাদের শ্রমিকদের তার বাক্যজালে সম্মোহিত করে তাদের প্রতিক্রিয়াশীল কর্মধারার প্রতি আকর্ষণ করতে। হতভাগা বুঝতে পারে নি রাশিয়ার শ্রমিকেরা আজ জেগে উঠেছে—ভাঁওতা দিয়ে তাদের আর ভুলিয়ে রাখা যাবে না। মজদুরেরা চারনভের কথায় ক্ষেপে উঠে তাকে তাড়া করলো। শেষে বক্তৃতামঞ্চ থেকে লাফিয়ে পড়ে কোনরকমে তো চারনভ প্রাণ নিয়ে পালালো। এমন সময় খবর এল যে, লেনিন এসে হাজির হয়েছেন আমাদের কারখানায়।

[কথক এগিয়ে এসে]

কথক—লেনিন আসাতে কিরকম প্রতিক্রিয়া দেখা দিল?

ভ্যাসিলিয়েভ—দেখতে দেখতে কারখানার রোলিং-শপের বাইরের বিরাট চতুষ্কোণ জায়গাটি লোকে ভরে গেল।

কথক—কত লোক সমবেত হয়েছিল সেখানে?

ভ্যাসিলিয়েভ—সে আপনি ধারণা করতে পারবেন না। পঁচিশ হাজার লোক এসে জড় হয়েছিল লেনিনের বক্তৃতা শুনতে—দোকানঘরগুলোর ছাদগুলোতে পর্যন্ত লোকে গিস্‌গিস্ করছিল।

কথক—লেনিন কি বক্তৃতা করলেন?

ভ্যাসিলিয়েভ—বক্তৃতা দিয়েছিলেন বৈ কি। তবে তাঁর কথার মাঝে মাঝে শ্রমিকেরা তাঁকে নানারকম প্রশ্ন করেছিলেন। ভ্ল্যাডিমার ইলিচ সহজ ভাষায় আমাদের সব সমস্যার সমাধান করে দিলেন।

কথক—মোটামুটি তিনি কি বলেছিলেন?

ভ্যাসিলিয়েভ—তিনি বললেন: "কেরেনস্কি সরকার এখনও যুদ্ধ চালিয়ে চলেছে। এদিকে জ্বালানি ইন্ধনের অভাবে ফ্যাক্টরীগুলো সব বন্ধ। চারদিকে খাদ্যাভাব।" নানাভাবে বিশ্লেষণ করে লেনিন বুঝিয়ে দিলেন যুদ্ধ বন্ধ না হলে আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা ক্রমশই খারাপের দিকে যাবে। তিনি স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে দিলেন যে, একমাত্র সোভিয়েটগুলোই তাদের ক্ষমতা দিয়ে এই সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের পৈশাচিক হত্যাকাণ্ড বন্ধ করে দিতে পারে—তারাই দেশে শান্তি ফিরিয়ে আনবার ক্ষমতা রাখে, লোকের খাবার রুটির ব্যবস্থা করতে পারে, দেশের বেকারত্বের অবসান ঘটাবার ক্ষমতা একমাত্র তাদেরই আছে।

কথক—কিভাবে সবাই তাঁর বক্তৃতা গ্রহণ করেছিল?

ভ্যাসিলিয়েভ—জনতা মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁর ভাষণ শুনছিল। তাঁর মুখনিঃসৃত প্রতিটি শব্দ আমরা অন্তর থেকে গ্রহণ করেছিলাম—কারণ আমরা বেশ বুঝতে পারছিলাম, তিনি যা বলছেন তার ভেতর এতটুকু মিথ্যে নেই।

[দপ্ করে আলো নিভে যাবে—

ছদ্মবেশী লেনিন

ভ্যাসিলিয়েভ চলে যাবেন। আলো জ্বললে দেখা যাবে কথক এবং আরেকজন লোক স্টেজের মাঝে এসে দাঁড়িয়েছেন।]

কথক—এঁর নাম ভি, পি, ইয়েমেলিয়ানভ। ইনি সেমিয়ান্নিকভ ফ্যাক্টরীর একজন শ্রমিক। ওঁদের ফ্যাক্টরীতে লেনিন যখন বক্তৃতা দেন উনি তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। লেনিনের বক্তৃতা সম্বন্ধে ওঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে উনি আপনাদের কিছু বলবেন ঃ

[কথক উইংসের দিকে সরে যাবেন—ইয়েমেলিয়ানভ এগিয়ে এসে দাঁড়াবেন।]

ইয়েমেলিয়ানভ—আমাদের ফ্যাক্টরীতে আরও কয়েকবার লেনিনের বক্তৃতা শোনবার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাঁর কথা শুনে শ্রমিকেরা একতাবদ্ধ হতে শিখতো। প্রত্যেক শ্রমিককে তিনি বুঝিয়ে দিতেন কি তার কর্তব্য এবং সে কর্তব্যসাধনের জন্য তার কি করা উচিত। তাঁর কথাগুলো তিন হাজার সংগ্রামী শ্রমিকের হাতিয়ারের কাজ করেছিল। তাঁর ভাবধারা মজদুর, কৃষক, শ্রমিক, সৈনিক এবং

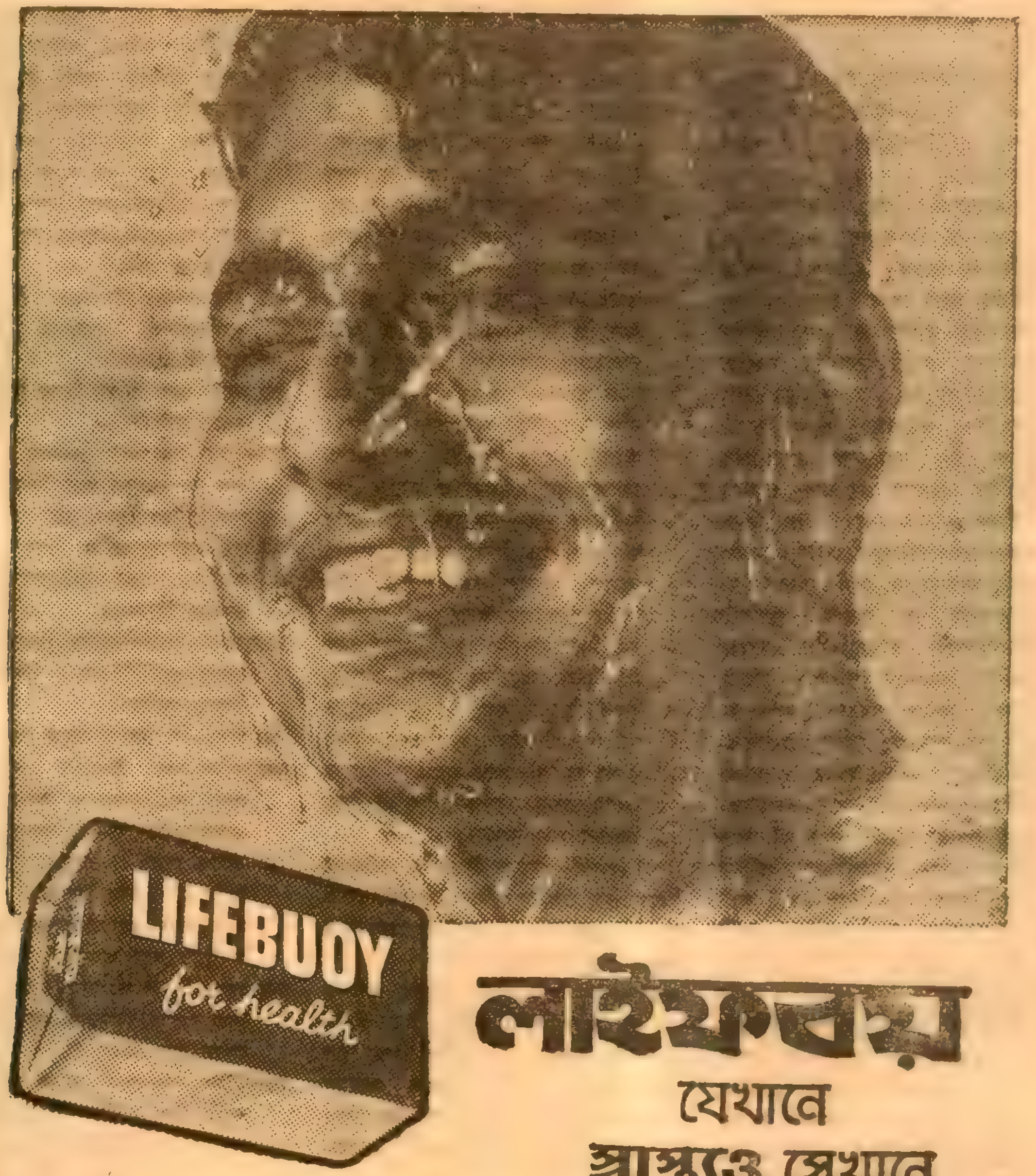

লাইফবয়
যেখানে
স্বাস্থ্যও সেখানে

লাইফবয় মেখে স্নান করলেই তাজা ঝরঝরে হবেন। এই
চমৎকার সুস্থ পরিচ্ছন্ন ভাব থেকেই বুঝবেন ভাল সাবানের
সবকিছু গুণ তো আছেই লাইফবয়ে, তারচেয়ে বেশীও কী যেন আছে!

লাইফবয় ধুলোময়লার রোগবীজাণু ধুয়ে দেয়

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

নাবিকদের অন্তরের অন্তস্তলে সাড়া জাগিয়ে তুলতো। লেনিনের কাছ থেকে প্রেরণা পেয়েই আমরা বিপ্লবী-সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে পেরেছিলাম।

[ব্ল্যাক আউট। মাইক ভয়েস শোনা যাবে অন্ধকারের ভেতর ঃ]

মাইক ভয়েস—প্রথম সমগ্র রাশিয়ার কংগ্রেস অভ্ পেজেন্টদের ডেপুটিজে এবার ভাষণ দিতে দেখা যাবে লেনিনকে। স্টেজটা যেন ডায়াস—লেনিন সেখানে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেবেন। আর অডিটোরিয়ামটা যেন সভাগৃহ।

[লেনিন অন্ধকারের ভেতরই স্টেজের ওপর এসে দাঁড়াবেন—তাঁর মুখের ওপর এসে স্পট লাইট পড়বে। লেনিন ভাষণ শুরু করবেন ঃ]

লেনিন—কমরেডস! বহু আলোচনার পর আমরা এই সিদ্ধান্তে এসেছি যে, অবিলম্বে সমস্ত জমিদারী সম্পত্তি স্টেটের তরফ থেকে বাজেয়াপ্ত করা দরকার। কৃষিশ্রমিক এবং গরীব চাষীদের একটি স্বাধীন সংগঠন গড়ে তোলবারও আবশ্যকতা দেখা দিয়েছে। আপনারা শুনে সুখী হবেন যে, আমাদের বলশেভিক পার্টির নেতারা সুবিধে পেলেই সৈনিক এবং শ্রমিকদের মাঝে গিয়ে বক্তৃতা এবং আলোচনা করে বোঝাতে চেষ্টা করছেন যে, সোভিয়েটগুলোকে শক্তিশালী করে তুলতে পারলেই বুর্জোয়াজী পরিচালিত দেশের সঙ্গীন অবস্থার অবসান ঘটানো যাবে। আরও আনন্দের কথা যে, এই সব বক্তৃতায় খুবই কার্যকরী প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দলে দলে মেহনতী মানুষ, কৃষক এবং শ্রমিকেরা ক্রমাগত এসে বলশেভিক পার্টির সভ্য হিসাবে নাম লেখাচ্ছেন। ফ্রণ্ট থেকে একদল সৈনিক আমাকে একটি অত্যন্ত আশাপ্রদ চিঠি লিখেছেন। এবার সেটি আপনাদের পড়ে শোনাবো। [পকেট থেকে চিঠি বের করে পড়বেন] ওঁরা লিখেছেন ঃ "কমরেড ও বন্ধু লেনিন! আপনাকে আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, আমরা এখানকার সৈনিকের দল একমন একপ্রাণ হয়ে আপনার নেতৃত্বে এবং আদেশে যে-কোন জায়গায় গিয়ে সশস্ত্র-সংগ্রাম করতে প্রস্তুত। আমরা জানি কৃষক, শ্রমিক এবং বঞ্চিত মানুষের মুক্তির জন্যই আপনার এবং বলশেভিকদের এই বিপ্লবী সংগ্রাম। আপনার চরম নির্দেশের জন্য আমরা সাগ্রহে অপেক্ষা করছি।" [চিঠিটা খামে ভরে পকেটে রাখবেন।] বন্ধুগণ! জারিস্ট সরকারের পতন ঘটিয়ে শ্রমিকেরা যা কিছু লাভ করেছিল, তার সবটাই হাতিয়ে নিচ্ছে বুর্জোয়াজীর মুখপাত্র কেরেনস্কির এই সামরিক সরকার। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরতি ঘটানো দূরে থাকুক, এরা পূর্ণোদ্যমে সেই যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে অসংখ্য রাশিয়ান সৈনিক বিনা কারণে ফ্রণ্টে গিয়ে প্রাণ হারাচ্ছে।

[স্পট লাইট সরে যাবে। আবার সারা স্টেজ অন্ধকার হয়ে যাবে—এই অন্ধকারের ভেতর থেকে মাইক ভয়েস শোনা যাবে।]

মাইক ভয়েস ঃ কেরেনস্কি সরকার দরিদ্র মেহনতী মানুষদেরই বাধ্য করছিল সৈনিকবৃত্তি নিতে। রক্ত দিয়ে প্রাণ দিয়ে এইসব দরিদ্র বঞ্চিতের দল, পুঁজিবাদী এবং বুর্জোয়াজীর পাশবিক সাম্রাজ্যবাদী এই নারকীয় যুদ্ধে অকারণে নিজেদের জীবন আহুতি দিচ্ছিল। ক্রমে ক্রমে জনসাধারণের মনে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল অসন্তোষের অগ্নিশিখা কেরেনস্কির সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে। জুলাই মাসের তিন তারিখে পেট্রোগ্র্যাডের রাস্তায় রাস্তায় শ্রমিক এবং সৈনিকের দল জমায়েত হয়ে দাবি জানালো—"সামরিক সরকারকে সমস্ত ক্ষমতা হস্তান্তরিত করতে হবে সোভিয়েটগুলোর হাতে। এই আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ এবং সুগঠিত। সামরিক সরকার সোস্যালিস্ট বিপ্লবী এবং মেনশেভিকদের সমর্থনপুষ্ট হয়ে আন্দোলনকারীদের ওপর সশস্ত্র হামলা চালালো—আবার পেট্রোগ্র্যাডের রাস্তার ওপর দিয়ে রক্তধারা বয়ে চললো।

[এখানে সিনেমাটোগ্রাফীর সাহায্যে কিছু এই জাতীয় ছবি দেখানো যেতে পারে। এরপর আলো জ্বললে দেখা যাবে কথক এসে দাঁড়িয়েছেন ঃ]

কথক—বলশেভিক পার্টি এবং শ্রমিক সংগঠনগুলোকে ভেঙে দিতে উঠে-পড়ে লাগলো কেরেনস্কি এবং তার সরকার। পার্টির অনেক সভ্যকে গ্রেপ্তার করে জেলে পাঠানো হল। ৫ঠা জুলাই রাতে মিলিটারী ক্যাডেটস গিয়ে হামলা করলো প্রাভদার অফিসগুলোতে। এই হামলার ঠিক আধঘণ্টা আগে লেনিন সেখানে এসেছিলেন—কোনরকমে সেখান থেকে আত্মগোপন করে তিনি পালিয়ে গেলেন। এবার সামরিক বুর্জোয়াজী সরকার সমস্ত ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়ে নিল। এইভাবেই ঘটল রাশিয়াতে দ্বৈতশাসনের অবসান। এই সময় একদিন কেরেনস্কি তার গুপ্ত মন্ত্রণাসভায় কয়েকজন সোস্যালিস্ট রেভোল্যুশনারী এবং মেনশেভিকদের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে বলছিল ঃ

[ব্ল্যাক আউট। আলো জ্বললে দেখা যাবে পেছনের পর্দা উঠে গেছে—কেরেনস্কি এবং তার বিশ্বস্ত মন্ত্রিসভার কয়েকজন সভ্য গুপ্ত আলোচনা করছে ঃ]

কেরেনস্কি—বন্ধুগণ! আমাদের এই সরকারকে বাঁচিয়ে রেখেছেন ধনতন্ত্রবাদীরা। তাঁদের স্বার্থ আমাদের বজায় রাখতেই হবে। তা না হলে আমাদেরও পতন অবশ্যম্ভাবী। পুঁজিবাদীদের মুনাফার অঙ্ক স্ফীত করতে হলে এই যুদ্ধ যে-করেই হোক চালিয়ে যেতে হবে।

১ম সভ্য—আমাদের একমাত্র বাধা এই বলশেভিকগুলো—

২য় সভ্য—ওরা শ্রমিকদের, সৈনিকদের, নাগরিকদের আমাদের বিরুদ্ধে তাতিয়ে তুলছে—

৩য় সভ্য—ওরা জিগির দিচ্ছে "যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে।"

কেরেনস্কি—বন্ধুগণ! একবার যদি যুদ্ধ বন্ধ হয় তাহলে বলশেভিকরা সমস্ত শাসনক্ষমতা আয়ত্ত করে নেবে।

২য় সভ্য—বুর্জোয়াজীর এবং ধনতন্ত্রবাদীদের ধ্বংস করাই বলশেভিকদের একমাত্র উদ্দেশ্য।

কেরেনস্কি—বলশেভিকদের বিষদাঁত ভেঙে দেবার একটিই মাত্র উপায় আমি দেখতে পাচ্ছি।

৩য় সভ্য—কি উপায় বলুন তো?

কেরেনস্কি—সে উপায়টা হচ্ছে—ছলে হোক, বলে হোক বা কৌশলে হোক, ওদের নেতা লেনিনকে আমাদের হত্যা করতে হবে। আপনারা দেখবেন লেনিনকে মেরে ফেলতে পারলেই বলশেভিক আন্দোলন আপনা থেকেই স্তিমিত হয়ে আসবে।

২য় সভ্য—ঠিকই বলেছেন। তখন ওদের দমন করতে আমাদের এতটুকুও বেগ পেতে হবে না।

কেরেনস্কি—বন্ধুগণ! অনেক ভেবেচিন্তে আমি ঠিক করেছি যে, ঘোষণা করে দেব—একটা বিরাট অঙ্কের পুরস্কার দেওয়া হবে যদি কেউ আমাদের লেনিনকে গ্রেপ্তার করতে ঠিকমত সাহায্য করে। এ বিষয়ে আপনাদের অভিমত কি?

সমবেত সভ্যেরা—আমরা এ-বিষয়ে আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত।

[ব্ল্যাক আউট।]

[ক্রমশ]

রঙ্গজগৎ

মস্কো উৎসবে ভারতীয় ছবি

প্রথম শ্রেণীর আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবসমূহের মধ্যে অন্যতম মস্কো চলচ্চিত্র উৎসব। মর্যাদার দিক থেকে মস্কো উৎসবের বিশেষ স্থান রয়েছে। মার্কিন মুলুকে যেমন অস্কার, সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ায় তেমনি মস্কো। দুই বিপরীত জগতের এই দুই উৎসবের আকর্ষণ বিশ্বব্যাপী। ভেনিস, কানস, কার্লোভিভ্যারী প্রথম শ্রেণীর উৎসব হলেও তার মর্যাদা যদিও যথেষ্ট, তথাপি অস্কার আর মস্কোর দিকে মানুষের নজর বেশি। মার্কিন মুলুকে অস্কার আনবার জন্য সাধারণত সমাজতান্ত্রিক দেশ যোগদান করে না, কানস্-এ স্বল্প-সংখ্যক সমাজতান্ত্রিক দেশ যোগ দেয়। মস্কো উৎসবে সমাজতান্ত্রিক ও ধনতান্ত্রিক দেশ যোগদান করে। সুতরাং ধনতান্ত্রিক দেশ আর সমাজতান্ত্রিক দেশে চলচ্চিত্র-শিল্পের বিকাশ কিভাবে ঘটছে, দুই জগতের শিল্প-চিন্তার কোন তারতম্য আছে কি-না এবং দুই সমাজব্যবস্থার প্রতিফলনে শিল্পরীতির কিভাবে পরিবর্তন ঘটছে ইত্যাদি দেখার জন্য মস্কো উৎসবের প্রতি আকর্ষণ অনেক বেশি। মস্কো উৎসবে আমেরিকা থেকে জাপান পর্যন্ত উপস্থিত হয়। অবশ্য গত কয়েক বছর চীন মস্কো উৎসব বর্জন করেছে; কোন উৎসবেই চীন যোগ দেয় না। ফলে চীনের চলচ্চিত্র-শিল্প একরূপ অজ্ঞাতই থেকে যাচ্ছে। কোনরূপ বিকাশ হচ্ছে কি না অথবা কি তার মান জানবার উপায় নেই।

ভারত প্রথম থেকেই মস্কো উৎসবে যোগ দিচ্ছে এবং ভারতীয়দের একজনকে মস্কো উৎসবে জুরী করা হয়। ভারতের চলচ্চিত্র-শিল্পের প্রতি এই সম্মান ধনতান্ত্রিক দেশগুলির তুলনায় মস্কো আগে দিয়েছে। ভারত থেকেও প্রথম প্রথম ভাল ভাল ছবি মস্কো উৎসবে পাঠান হয়েছে। স্বভাবতই সকলে আশা করে মস্কো বা কার্লোভিভ্যারী উৎসবে এমন ছবি পাঠানো হবে—যে সব ছবি শিল্প কর্মের দিক থেকে কেবল উন্নত, অর্থাৎ আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন নয়, সেই সঙ্গে ভারতের মানুষের সত্যিকার জীবন ও ভারতীয় বৈশিষ্ট্য তাতে প্রতিফলিত হয়েছে। অর্থাৎ খাঁটি ভারতীয় ছবি মস্কো বা আন্তর্জাতিক উৎসবসমূহে পাঠানো হবে মনে করাই ত' স্বাভাবিক। এবার মস্কো উৎসবে সরকারিভাবে প্রতিযোগিতার জন্য পাঠানো হয়েছে অরুন্ধতী দেবী পরিচালিত 'মেঘ ও রৌদ্র'। ছবিটি দেখার সুযোগ আমাদের ঘটে নি। কাজেই শুভেচ্ছা পোষণ করা ছাড়া কোন মন্তব্য করা চলে না। কিন্তু এই সঙ্গে আরো যে কয়টি ছবি প্রদর্শনের জন্যে পাঠানো হয়েছে সে নামগুলি দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি। যেমন, জোহার ইন গোয়া, জুয়েল থীফ, গাইড, প্রিন্স। এগুলি নাকি মস্কো উৎসবে দেখিয়ে ভারতীয় ছবির সঙ্গে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞদের পরিচয় ঘটান হবে। এই ছবিগুলি কলকাতায় মুক্তিলাভ করেছিল। শিক্ষিত ও রুচি-সম্পন্ন মানুষের প্রশংসালাভ করতে পারে নি যে ছবি সেই ছবি দেখান হচ্ছে আন্তর্জাতিক উৎসবে। জোহার ইন গোয়া আর জুয়েল থীফ-এ ভারতীয় জীবনের কি প্রতিফলন হয়েছে! নাকি আন্তর্জাতিক দর্শকদের দেখান হবে ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতারা হলিউডের ছবি নকল করতে কত পারদর্শী তার নমুনা। শুধু নাম আর কিছু স্থানের কথা ছাড়া চলনে-বলনে-পোষাকে হলি-উড ছবির অনুকরণ ছাড়া বোম্বাইয়ের ক'টা ছবিতে দেশের মাটি ও মানুষের পরিচয় থাকে? এই ছবিগুলি বরং আমেরিকার উৎসবে পাঠিয়ে আমেরিকান-দের বোঝানো যেতো ভারতীয়রা হলিউড কালচারের কত ভক্ত। তাতে হয়ত মার্কিন সাহায্য প্রাপ্তিতে কিছু সুবিধা হলেও হতে পারত; অন্তত কিছু ভিক্ষাও পাওয়া যেতে পারত। তাই দিল্লীর কর্তারা একটু ভুল করেছেন ছবিগুলিকে মার্কিন দেশের পরিবর্তে মস্কো পাঠিয়ে।

এই উৎসবে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছেন বৈজয়ন্তীমালা, আই. এস. জোহার প্রমুখ। দেব আনন্দ নাকি জুরীদের মধ্যে থাকবার কথা। জোহার এবং দেব আনন্দ সম্পর্কে চলচ্চিত্র জগতে মার্কিন-ঘেঁষা বলে একটা কথা প্রচলিত আছে। তাই এই দু'জনকে মস্কোতে দেখে অনেকে বিস্মিত হলেও মনে রাখতে হবে কালের ধর্ম এই। আর সোভিয়েট কর্তাদের রকম-সকম দেখে সব যেন গুলিয়ে যাচ্ছে। —সুজন।

'চেনা-অচেনা' ছবিতে সুস্মিতা সান্যাল

নাটকের কথা

অক্টোবর বিপ্লব ও লেনিন

বিশ্বব্যাপী মহান লেনিনের জন্ম শতবর্ষ উৎসব উদ্‌যাপনের উদ্যোগ আয়োজন চলেছে। এই উৎসবে পশ্চিমবঙ্গ যথাযোগ্য স্থান গ্রহণের জন্য উদ্যোগী হয়েছে। নাট্যসংস্থাসমূহের উদ্যোগ সর্বাগ্রে লক্ষণীয় হয়েছে। ইণ্ডিয়ান থিয়েটার এসোসিয়েশন গত ৫ই জুলাই সন্ধ্যায় ত্যাগরাজ হলে 'অক্টোবর বিপ্লব ও লেনিন' নাটক অভিনয় করেন। নাটকটি লিখেছেন নিবেদিতা দাস। পরিচালনা করেছেন বীরেশ মুখার্জী।

অভিনয়ের প্রারম্ভে আনুষ্ঠানিকভাবে ইণ্ডিয়ান থিয়েটার এসোসিয়েশনের উৎসব উদ্বোধন করেন মেয়র শ্রীপ্রশান্ত সুর এবং সভাপতিত্ব করেন মন্ত্রী শ্রী গোলাম ইয়াজদানি। তাঁদের অতিদীর্ঘ বক্তৃতার ফলে নাটক আরম্ভ হতে সাড়ে সাতটা বেজে যায় এবং নাটক দর্শনাকাঙ্ক্ষীরা বিরক্ত হয়ে ওঠেন। অনুষ্ঠানে সোভিয়েট ভাইস কনসাল শ্রী এন, এস, পারাস্তায়েভ ও শ্রীগুরগানভ স্বল্প ভাষণে উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানান।

'অক্টোবর বিপ্লব ও লেনিন' নাটক বিপ্লবের মুহূর্তে লেনিনের দিনগুলিকে নিয়ে রচিত। লেনিনের জীবনীমূলক নাটক নয়। এখানে কয়েকটি দিনে লেনিনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, নেতৃত্বদানের ক্ষমতা এবং সংশোধনবাদ এবং প্রতিক্রিয়াশক্তির বিরুদ্ধে অনমনীয় মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। রাশিয়ার শাসকশ্রেণী এবং সুবিধাবাদী রাজনীতিকরা লেনিনকে কি চোখে দেখত তাও এই নাটক দেখে বোঝা যায়। এখানে লেনিনকে দেখা গেছে আত্মগোপন করে থাকার সময় তাঁর আশ্রয়দাতা বলশেভিক পার্টির এক নেতৃস্থানীয় ভ্যাসিলির অভিজ্ঞতা দিয়ে। নাটকে অক্টোবর বিপ্লবের ঝটিকাময় দিনগুলিকে তেমন অনুভব করা না গেলেও লেনিনের জীবনাংশকে বেশ অনুভব করা যায়। এদিক থেকে নাটকটি সার্থক। আরো সার্থক মনে হয়েছে লেনিনের ভূমিকাভিনয়ের মোটামুটি সাফল্যের জন্য।

তবে এই নাটকের ত্রুটির দিকও রয়েছে। প্রথমত এতে শাসকশ্রেণীকে যত দুর্বল ও অসহায় মনে হয়েছে রাশিয়ার শাসকশ্রেণী তত দুর্বল ছিল না; দর্শকদের হাসির রস জোগাবার মত ক্লাউন ত' নয়ই। লেনিনকে এক চরম হিংস্রশক্তির মোকাবিলা করতে হয়েছিল। যদিও বিপ্লবের অন্যতম প্রধান সংগঠক ছিলেন স্তালিন, কিন্তু নাটকে একবারও সে নাম উল্লেখ পর্যন্ত হয় নি। নাটকে স্পাই প্রসঙ্গ তুলনামূলকভাবে বেশি স্থান লাভ করেছে, তাতে লেনিনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশে কোন সাহায্য করেছেন বলে মনে হয় না।

যাঁরা অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁরা সকলেই মোটামুটি পরিচালকের নির্দেশকে যথারূপে পালন করেছেন। সঙ্গীতাংশে আরো অনুশীলন এবং সুরের শুদ্ধতার প্রতি লক্ষ্য রাখা দরকার।

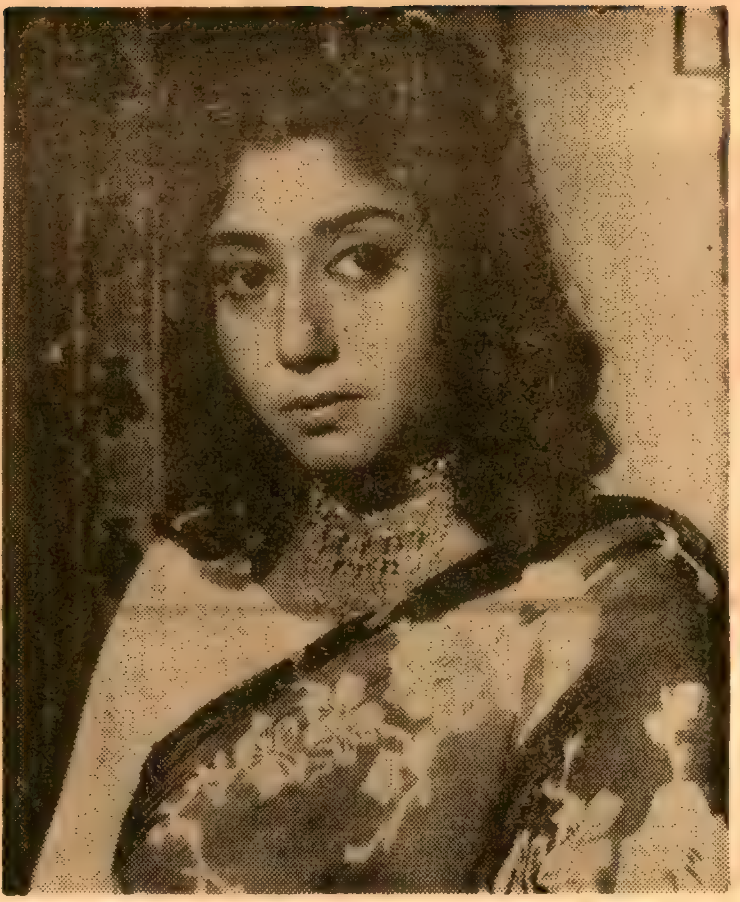

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

স্টুডিও খবর

রূপসী

'অদ্বিতীয়া' ছবির প্রযোজক অরুণ রায়চৌধুরী তাঁর নিজস্ব প্রযোজক প্রতিষ্ঠান এ· আর· সি'র পতাকাতলে দ্বিতীয় ছবি "রূপসী"র চিত্রগ্রহণ কাজ শীগ্‌গির সুরু করবেন। ছবির কাহিনীকার, চিত্রনাট্য রচয়িতা ও পরিচালক অজিত গাঙ্গুলীকে নিয়ে গিয়ে গত সপ্তাহে বহির্দৃশ্যের স্থান নির্বাচন করে এসেছেন। ছবিখানির প্রায় অংশ বহির্দৃশ্যে তোলা হবে। মাটি আর তার মানুষের সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না ও গানে ভরা এই কাহিনী চিত্রজগতে একটি নতুন সুরের মূর্ছনা এনে দেবে। এর সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব নিয়েছেন—অনিল বাগচি। প্রধান চরিত্রে এখন পর্যন্ত যাঁদের নাম পাওয়া গেছে—তাঁদের মধ্যে আছেন—সন্ধ্যা রায়, কালী ব্যানার্জী ও শমিত ভঞ্জ। এম-এ ফিল্মস ছবিটির পরিবেশন স্বত্ব গ্রহণ করেছেন।

মুক্তিস্নান

কার্তিক বর্মণ প্রযোজিত রাধারাণী পিকচার্সের চতুর্থ নিবেদন শক্তিপদ রাজগুরুর কাহিনী অবলম্বনে গৃহীত "মুক্তিস্নান"-এর চিত্রগ্রহণ কাজ শেষ হয়ে গেছে। দু'-একদিনের প্যাচ্ মাত্র বাকী। অজিত গাঙ্গুলী ছবির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করেছেন। রাজেন সরকার এর সুর দিয়েছেন। বিভিন্ন চরিত্রে আছেন—সাবিত্রী চ্যাটার্জী, অনিল চ্যাটার্জী, পাহাড়ী সান্যাল, কমল মিত্র, গঙ্গাপদ, হরিধন, জহর রায়, অজয় গাঙ্গুলী, শ্যামল ঘোষাল, কালী ব্যানার্জী, গীতা দে, ছায়া দেবী, শোভা সেন, মাঃ মলয়, কামু, সমর,

বেকার যুবকের মূকাভিনয়ে দেবু চক্রবর্তী।

মিণ্টু ও ললিতা চ্যাটার্জী। গীত রচনা পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। নর্মদা চিত্র ছবিটির পরিবেশক।

কলঙ্কিত নায়ক

বেবী জুন প্রোডাক্সনের প্রথম ছবি 'কলঙ্কিত নায়ক'-এর চিত্রগ্রহণ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ডাঃ বিশ্বনাথ রায়ের উপন্যাস অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করছেন সলিল দত্ত। সুরকার রবীন চ্যাটার্জীর সুরে ছবিটিতে নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন মান্না দে, সন্ধ্যা মুখার্জী, নির্মলা মিশ্র ও বাসবী নন্দী। অমিয় মুখার্জী ছবিটির সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন।

চরিত্রচিত্রণে আ ছে ন—উত্তমকুমার, অপর্ণা সেন, বিকাশ রায়, ছায়া দেবী, অনুপকুমার, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, তরুণকুমার, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, জ্যোৎস্না ব্যানার্জী, সুব্রত সেন ও সাবিত্রী চ্যাটার্জী।

এস, বি, ফিল্মস ছবিটির পরিবেশক।

মহাকবি কৃত্তিবাস

নবগঠিত 'রামায়ণ চিত্রম্'-এর প্রথম চিত্রার্ঘ্য বাংলার আদি কবি রামায়ণ-রচয়িতা কৃত্তিবাসের পুণ্যময় জীবনী অবলম্বনে রচিত "মহাকবি কৃত্তিবাস" "লবকুশ"-খ্যাত পরিচালক অশোক চট্টোপাধ্যায় ছবিটি পরিচালনা করছেন। ছবিটির চিত্রগ্রহণ সম্প্রতি সুরু হয়েছে। শ্রীমতী বিজন ঘোষদস্তিদারের সুরে মান্না দে, হেমন্ত মুখার্জী, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্যামল মিত্র, প্রসূন ব্যানার্জী, আরতি মুখার্জী, পিণ্টু ভট্টাচার্য ও অনুপ ঘোষালের কণ্ঠে কয়েকটি গান রেকর্ড করা হয়েছে। প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী গোপীকিষণের কিছু নৃত্যাংশও ইতিমধ্যে গৃহীত হয়েছে।

তরুণ অপেরার আগামী পালা

'হিটলার' পালার পর তরুণ অপেরা এবার যে তিনটি পালা পরিবেশনে উদ্যোগী হচ্ছেন, সেগুলি হলো 'রাজা রামমোহন', 'লেনিন' ও 'নেপোলিয়ান'। প্রথম পালা লিখেছেন সৌরেন চট্টোপাধ্যায় এবং শেষের দুটির রচয়িতা শম্ভু বাগ।

সংবাদিকী

আন্তর্জাতিক ব্যালে উৎসব

মস্কোয় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ব্যালে নৃত্য উৎসবে সোভিয়েট ইউনিয়নের মালিকা সাপিরোভা এবং মিখেইল বারিসনিভক একক নৃত্যের জন্য স্বর্ণপদক লাভ করেছেন। দ্বিতীয় পুরস্কার রৌপ্যপদক লাভ করেছেন কিউবার ব্যালেরিনা লোইপা অরোজা। কিউবার নৃত্যশিল্পী মার্তা গার্সিয়া একজন কৃতী ও সম্মানিত শিল্পী হিসাবে সার্টিফিকেট লাভ করেছেন।

দ্বৈত নৃত্যের ক্ষেত্রে স্বর্ণপদক পেয়েছেন ফ্রান্সের ফ্রান্সেসকা জাম্বো এবং প্যাট্রিস বার্ট। তাঁরা ফ্রান্স গ্রান্ড অপেরার শিল্পী। সোভিয়েটের নিনা সরোকিনা এবং ইয়ুরি ভ্যাডিমিরভও যুক্তভাবে স্বর্ণপদক পেয়েছেন। এই ক্ষেত্রে কেউ রৌপ্যপদকের অধিকারী হতে পারে নি। তৃতীয় পুরস্কার পেয়েছে জাপান ও সোভিয়েট মিলিতভাবে।

বাউরিয়া স্টুডেন্টস য়ুনিয়ন ক্লাবের বিচিত্রানুষ্ঠান

গত ২৯শে জুন একটি মনোজ্ঞ বিচিত্রানুষ্ঠানের মাধ্যমে বাউরিয়া স্টুডেন্টস য়ুনিয়ন ক্লাব তাঁদের সপ্তম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করেন। প্রখ্যাত শিল্পিবৃন্দের সঙ্গীতানুষ্ঠান ছাড়াও কয়েকজন তরুণ শিল্পীর দ্বারা প্রমোদ পরিবেশনা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। তরুণ মূকাভিনেতা দেবু চক্রবর্তীর তিনটি ফিচার, শংকর বিশ্বাস ও দেবল রায়ের কৌতুকাভিনয় দর্শকদের প্রশংসার্জনে সমর্থ হয়।

ইতিহাসের পাতা থেকে

চলচ্চিত্রে লেনিন

॥ উনিশ ॥

নিউজ রীলের লোকেরা প্রথম লেনিনকে চলচ্চিত্রে দেখিয়েছেন। ১৯১৮ সালের মে-দিবস থেকে কমপক্ষে কুড়ি বার তাঁরা বিভিন্ন সময়ের লেনিনের ছবি তুলেছেন। লেনিন কাজ করছেন, বিপ্লববার্ষিকীতে লেনিন, শ্রমিক সভায়, লাল ফৌজের প্যারেডে, কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রতিনিধি সভায়

পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ কর্মচারীদের 'কালো মাটির কান্না' নাটকের একটি দৃশ্য।

'দি ম্যান উইথ দি গান' ছবিতে লেনিনের চরিত্রে ম্যাক্সিম স্ট্রথ

বক্তৃতা দিচ্ছেন। তাঁর কমরেড মার্ক ইয়েলিঝারভ এবং ইয়াকভ সার্ডলভের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় বক্তৃতা দিচ্ছেন ইত্যাদি।

এই প্রামাণিক ছবিগুলির অধিকাংশ গ্রহণ করা হয়েছে গৃহ-যুদ্ধের অর্থনৈতিক সংকটের সময়। ফিল্মগুলি ছিল খুবই নিকৃষ্ট এবং ছাটাছিটা টুকরো। রাশিয়ায় ফিল্ম তৈরি হত না এবং ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের পূর্বে বাইরের কাঁচা ফিল্ম আমদানী পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিল। টেকনিক্যাল দিক থেকে অসুবিধা এবং বাধা সত্ত্বেও তাঁরা মানুষ হিসাবে লেনিনের বৈশিষ্ট্য, তাঁর সারল্য, জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা, তাঁর বাগ্মিতার অসাধারণ ভঙ্গী এবং ক্ষণে ক্ষণে অভিব্যক্তির পরিবর্তন তাঁরা ছবিতে দেখাতে পেরেছেন। আজ পর্যন্ত কোন শিল্পী এবং অভিনেতার পক্ষে লেনিন চরিত্রের সব কয়টি দিক প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি।

লেনিনের মৃত্যুর পর পরিচালক ডিগা ভার্টব এই প্রামাণিক ছবিগুলোকে নিয়ে একটা ছবি করেন 'দি থ্রি অব লেনিনস্ পিকচারস' (১৯২৪)। ছবিটির গঠন ছিল সাঙ্গীতিক; তিন তরঙ্গের সিম্ফনী প্রকাশ ঃ প্রথম, সোভিয়েট রাষ্ট্রের স্রষ্টা ও প্রধান হিসাবে লেনিন; দ্বিতীয়, লেনিনের মৃত্যুতে সমগ্র দেশ ও প্রত্যেকটি শোকাভিভূত মানুষের শোকসঙ্গীত; তৃতীয়, সোভিয়েট জনগণ লেনিনের নির্দেশ ও শিক্ষাকে কাজে রূপদান করছে। সোভিয়েট চলচ্চিত্র-শিল্পের ইতিহাসে এই ছবিটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং নব আঙ্গিক আবিষ্কারে উল্লেখ্য হয়ে আছে।

কিছু পরিমাণে একই আদর্শ অনুসরণ করেছে 'অক্টোবর' (টেন ডেজ দ্যাট স্যুক দি ওয়ার্ল্ড ১৯২৭)। কিন্তু এই ছবি সম্পূর্ণ নতুন মাল-মসলা দিয়ে তৈরি, কেবলমাত্র নিউজ রীলের মন্টাজ নয়। পরিচালক সের্গেই আইজেনস্টাইন এবং গ্রিগরি আলেকজান্দ্রভ অপেশাদার এবং এক নতুন লোককে প্রধান ভূমিকার জন্য গ্রহণ করলেন। ইনি উরালের একজন শ্রমিক, নাম—নিকানদ্রোভ; তিনি দেখতে অনেকটা লেনিনের মত ছিলেন। এই ছবিতে পেট্রোগ্রাডে ফিনল্যান্ড স্টেশনের সামনে আর্মার্ড গাড়িতে বক্তৃতার দৃশ্য, দ্বিতীয় সারা রাশিয়া সোভিয়েট সমূহের কংগ্রেসে মঞ্চ থেকে বক্তৃতা চমৎকারভাবে লঙ সটে তোলা হয়েছে এবং সার্থকভাবে অভিনীত হয়েছে। কিন্তু একই ছবিতে ক্লোজ সটগুলিতে লেনিনের বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা ও অভিব্যক্তি এবং প্রজ্ঞাকে অভিনেতা যে প্রকাশ করতে পারেন নি তা ধরা পড়ে গেছে।

১৯৩৪ সালে ডিগা ভার্টব আবার লেনিন সম্পর্কিত খণ্ড খণ্ড প্রামাণিক চিত্রগুলিকে ব্যবহার করে তার সঙ্গে নতুন বিষয় যোগ করে, সোভিয়েট পূর্বাঞ্চলে নারীর মুক্তিকে নিয়ে একটা আধা-প্রামাণিক ছবি করলেন। ছবির নাম —"থ্রি সঙস্ এবাউট লেনিন।" এই ছবিতে তিনি চমৎকারভাবে পুরনো নিউজ রীল থেকে নির্বাক সটকে যুক্ত করলেন গ্রামোফোন রেকর্ডে লেনিনের বক্তৃতার সঙ্গে।

'লেনিন ইন অক্টোবর' ছবিটি তৈরি হয়েছে ১৯৩৭ সালে, অক্টোবর বিপ্লবের বিংশ বার্ষিকী উপলক্ষে। এই ছবির পরিচালক মিখেইল রম, এবং চিত্রনাট্য লিখেছেন আলেক্সেই কেপলার। চিত্রনাট্যের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য—বিপ্লবী ইতিহাসের নিউজ রীলের নাটকীয় রূপদান। সোভিয়েটের অন্যতম বিশিষ্ট অভিনেতা বোরিস শচুকিন প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেন। অভিনয়ের আগে তিনি লেনিন সম্পর্কিত নিউজ রীল ও ফটোসমূহ দেখেন; লেনিনের বক্তৃতার রেকর্ড শোনেন, তার চেয়েও বেশি লেনিনের জীবনের ঘটনাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করেন। এসব দেখা-শোনা ও পড়বার পর ক্রমে ক্রমে তিনি অনুভব করলেন যে, লেনিন চরিত্রের অন্তর-সত্যের কাছাকাছি তিনি আসছেন।

পরবর্তী ছবি 'লেনিন ইন ১৯১৮'-তে শচুকিন লেনিনের চরিত্রে আরো উচ্চাঙ্গের অভিনয়শক্তির পরিচয় দিলেন। এই ছবির সর্বাধিক জটিল দৃশ্য লেনিনের ওপর আক্রমণ এবং তার পরবর্তী অসুস্থতা। প্রায় পুরো একটা রীলে আমরা দেখি লেনিন বিছানায় শুয়ে আছেন। কিন্তু শচুকিন এই দৃশ্যে শরীর নাড়াচাড়ার সুযোগ না থাকলেও দারুণ এক ফলপ্রসূ প্রভাব দেখালেন।

১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবের নেতা হিসাবে আরো দুটি ছবি ১৯৩৮ সালে মুক্তিলাভ করে। এই দুটি ছবি ঃ 'দি গ্রেট ডন' (চিত্রনাট্য—গ্রিগরি সাগারেলি, পরিচালক—মিখেইল চিয়ারেলি), এবং 'দি ম্যান উইথ দি গান' (চিত্রনাট্য—নিকোলাই পগোদিন, পরিচালক—সের্গেই ইয়ুৎকেভিচ)।

'দি ম্যান উইথ দি গান' ছবিটি দারুণ সফল হয়েছিল। এই ছবিতে এক সৈনিকের কথা বলা হয়েছে— যে, ঘটনাক্রমে বিপ্লবের জন্য এক সচেতন যোদ্ধায় পরিণত হয়েছিল। লেনিনের চরিত্রে বিস্ময়কর ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন ম্যাক্সিম স্ট্রথ। তিনি লেনিন চরিত্র রূপায়ণে এক নতুন ধারা সৃষ্টি করলেন, আদর্শগত চিন্তাকে কেন্দ্র করে শিল্পগত ধারণার যোগাযোগ ঘটালেন। এই ছবিতে অভিনয় করে স্ট্রথের দীর্ঘদিনের কাজের শুরু হল। তারপর থেকে বিপ্লবের ইতিহাসের অনেক ছবিতে তিনি লেনিনের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন, যেমন— 'দি ভায়বর্গ ডিস্ট্রিক্ট' (পরিচালক—গ্রিগরি কোজিনৎসেব এবং লিওনিড ট্রবার্গ, ১৯৩৯) এবং 'ইয়াকভ সে ভ র্ড ল ভ' (পরিচালক—ইয়ুৎকেভিচ, ১৯৪০)। স্ট্রথ এবং ইয়ুৎকেভিচের সর্বাধিক সাফল্যপূর্ণ ছবি 'স্টোরিজ এবাউট লেনিন' (১৯৫৮) এবং 'লেনিন ইন পোল্যান্ড' (১৯৬৫), এই ছবি দুটি সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করব।

—ক· স· গ·

খবর বলছি

নীরব আকাশবাণী

জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকারের অধীনে কার্যরত রয়েছে 'আকাশবাণী'। অথচ আকাশবাণীকে কেন যে আজো জনগণ নিজেদের বলে ভাবতে পারেন না, তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না।

এটাও নাকি সত্য, সরকারী নিয়ন্ত্রণে থাকায় আকাশবাণী কর্তৃপক্ষকে সাবধানে কথা বলতে হয়, অনেক রকম হিসেব-নিকেশ করে খরচ করতে হয়। সাবধানে কথা বলা ও হিসেব করে খরচ করার মধ্যে স্বভাবতই স্বাধীনতা কিছুটা খর্ব হয় তাঁদের, যাঁরা কড়া হিসেবী। সেখানে সৃষ্টি হয় বজ্র আঁটুনির, একটু এদিক-ওদিক হলে পাছে জবাবদিহি করতে হয়। সে অবস্থায় সরকারকে খুশি রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ। অপরপক্ষে যে জনগণ সরকারকে গদিতে বসিয়েছেন, তাঁরা কোনো আমল পায় না বললেই চলে। মামুলি ও গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে তাঁরা সরব হলে আকাশবাণী নীরব থাকে। অবশ্য যে আকাশবাণী সর্বদাই বাণী বিতরণে ব্যস্ত, তার পক্ষে নীরবতা পালন পরমাশ্চর্য গুণ হিসেবে স্বীকৃতি না পেয়ে নিন্দুকের মুখে দোষ হয়ে দাঁড়ায়। তাঁরাই আবার প্রমাণ হাজির করেন, যেখানে বজ্র আঁটুনি, সেখানে কী রহস্যময় ফস্‌কা গেরো আকাশবাণী কলকাতায়। এর প্রতিপদে আকাশবাণী নীরব।

সবিনয় নিবেদন

আকাশবাণীর (কলকাতা) 'সবিনয় নিবেদন' শোনার জন্য অত্যুৎসাহী কিছু শ্রোতা যেমন আছেন, তাঁদের মধ্যে অভ্রবাহনও একজন। সবিনয় নিবেদনে শ্রোতাদের চিঠির উত্তর দেওয়া হয়। শ্রোতাদের সংখ্যার সীমা নির্দেশ করা কঠিন। আবার সব শ্রোতাই একমত পোষণ করেন না। তাঁদের ভিন্ন রুচির স্বাদ মেটানো সহজসাধ্য ব্যাপারও নয়—একথা আমরা স্বীকার করি। তবু প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্য একটি বিভাগ থাকায়, সেই বিভাগটিতে বাস্তবোচিত উত্তর দানের ব্যবস্থা থাকা দরকার। সত্য কথা বলতে কি, অনেক সময় কোনো একটি বিশেষ প্রশ্নের উত্তর যখন দু'-এক কথায় দেওয়া সম্ভব ছিল বলে মনে হয়েছে, তখন শোনা গেছে, উত্তরদাতা প্রশ্নের উত্তর এমনভাবে দিয়েছেন—আসলে যা কোনোরকম উত্তর নয়, বস্তুত তা কথার প্যাঁচমাত্র। আমাদের মনে হয়, মোটামুটিভাবে এমন উত্তর দেওয়া উচিত যাতে কখনো প্রশ্নকর্তার মনে না হয় যে, উত্তরদাতা প্রশ্নটি এড়িয়ে গেছেন এবং উত্তর এমন হওয়াই কাম্য যাতে সাকুল্যে সমস্ত শ্রোতাই সম্পূর্ণ খুশি না হন, অন্তত অসন্তুষ্ট হবেন না ও একই প্রশ্ন দ্বিতীয়বার করার প্রলোভন ত্যাগ করবেন। আমরা মনে করি, সবিনয় নিবেদন বিভাগটি গুরুত্বপূর্ণ। এই বিভাগটির মাধ্যমে শ্রোতাদের সঙ্গে আকাশবাণীর (কলকাতা) সম্পর্কটিকে নিকটতর করা সম্ভব। আর আপাতত এই ধারণা বদ্ধমূল যে, আকাশবাণী জনগণের নয়; সবিনয় বিভাগের মাধ্যমে এবং শ্রোতাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করে সেই ধারণার অবসান ঘটানো যেতে পারে। শ্রোতাদের অভিযোগ কখনো অসত্য, কখনো বা তা ভুল ধারণাবশত—এই রকম যদি মনে হয় আকাশবাণীর মতে—তাহলে শ্রোতাদের চিঠির উত্তরদানের ব্যাপারে নীরবতা পালন অনুচিত। কারণ কয়েকটি ক্ষেত্রে আমরা তাদের অভিযোগের নকল পেয়ে দেখেছি যে, আকাশবাণী সে অভিযোগের উত্তরদানের ব্যাপারে বৃথাই মৌনাবলম্বন করেছেন। ফলে সেই অভিযোগ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ পেলে নিশ্চয়ই আকাশবাণীর গৌরব বাড়বে না। আশা করি, বিষয়টি আকাশবাণী (কলকাতা) কর্তৃপক্ষ একটু বিচার-বিবেচনা করে ভেবে দেখবেন।

সঙ্গীতজগতে কি দুর্ভিক্ষ?

শ্রোতাদের অভিযোগ সব সময় অবহেলার যোগ্য নয়। সরকারের রীতিনীতি বজায় রাখতে যখন আকাশবাণীর কর্তৃপক্ষ মুখ খুলতে পারেন না, তখন ফস্‌কা গেরো দিয়ে বের হয়ে যায় জলের স্রোতের মতো জনগণের অর্থ। আকাশবাণীতে প্রচারের দরুণ অর্থ ব্যয় হবেই, কিন্তু ব্যয়টা যদি অকারণে বেহিসেবী হয়, তাহলে দুঃখ করা ছাড়া উপায় থাকে না। শুধু আমরা দুঃখ প্রকাশ করলেই সমস্যার সমাধান হয় না। শ্রোতারা এগিয়ে আসেন প্রতিবাদপত্র হাতে নিয়ে। আর মুস্কিল হয় তখনই।

ব্যাপারটা খোলসা করেই বলা যাক। ইদানীং আকাশবাণীতে (কলকাতা) নিয়মিত শ্রোতাদের রু , নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছে। একই রেকর্ড ও একই টেপ বারবার বাজিয়ে শোনালে নিশ্চয়ই আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন না। অনেক সময় মনে হয়, মামুলি বিষয়ের বড় বেশি ঘনঘটা। একই গান একই দিনে একাধিকবার শোনানোর কী মানে হয়!—যদিও তা ভিন্ন শিল্পীর কণ্ঠে প্রচার করা হয়, তবুও তা পুনরাবৃত্তির দরুণ শ্রুতিসুখকর হয় না। তাছাড়া খ্যাতিমান শিল্পীর নাম শুনেই বলে দেওয়া যায়—তাঁর বহুবার গাওয়া কোন্ গানটা শুনতে পাওয়া যাবে। বাংলাদেশে কি সঙ্গীতজগতে দুর্ভিক্ষ সুরু হয়েছে। এছাড়া অন্য অভিযোগ এই যে, বহু প্রচারিত ও বহু পরিচিত রবীন্দ্রসঙ্গীত নবাগত কোনো কোনো শিল্পীর কণ্ঠে শুনে মনে হয়, আকাশবাণীতে (কলকাতা) অডিশনের বজ্র আঁটুনি থাকলেও ফস্‌কা গেরো দিয়ে অযোগ্য ব্যক্তিরও ঠাঁই পেতে বাধা থাকে না। অথচ কোনো যোগ্য শিল্পী হয়তো অপরিচয়ের অভাবে কোনো পাত্তাই পেলেন না।

আমরা চাই নবাগত শিল্পীরা প্রবেশাধিকার পাক যোগ্যতার মাপকাঠিতে। আর ঐসব শিল্পীকে দিয়ে বহু প্রচারিত গান গাওয়ানো আকাশবাণীর পক্ষে নিরর্থক। এখন বর্ষাকাল। রবীন্দ্রনাথ প্রচুর বর্ষা-সঙ্গীত লিখেছেন। কিন্তু আকাশবাণীতে এখন বর্ষা সম্পর্কিত রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ বোধ হয় সারা জীবনের সাধনায় পাঁচ-ছয়টি বর্ষা-সঙ্গীত গেয়ে গেছেন। তাই খ্যাতিমান শিল্পীদের পুরনো রেকর্ড বাজিয়ে বা তাঁদের দ্বারা যে গান গাইয়ে শোনানো হয়—সেই গান নবাগত শিল্পীরাও যেমন-তেমন গেয়ে যোগ্যতার সার্টিফিকেট পেয়ে যান। এই ব্যাপারে যেমন শিল্পীদের সচেতন হওয়া দরকার তেমনি সমগ্র বাংলা সঙ্গীত তথা রবীন্দ্র-অতুল-নজরুল সঙ্গীতের যাবতীয় সম্পদ একালের বিচিত্র সঙ্গীত-রসপিপাসুদের সমক্ষে উপস্থাপিত করা আকাশবাণীর (কলকাতা) মৌল কর্তব্য ও দায়িত্ব বলে আমরা বিবেচনা করি। আকাশবাণীর সঙ্গীত প্রচারে একঘেয়েমি দূর হোক—এই বিনীত নিবেদন জানিয়ে আকাশবাণীকে আরো রসসন্ধানী হতে অনুরোধ করি। বলা বাহুল্য, তখন ব্যয় আর বাহুল্য বলে বিবেচিত হবে না—যা পুনরাবৃত্তি ও একঘেয়েমির দরুণ হচ্ছিল।

—অভ্রবাহন

খেলাধুলা

আমরা কি করছি

রড লেভার আবার চ্যাম্পিয়ান হলেন। উইম্বেলেডন টেনিস প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করে এ বছরও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ টেনিস খেলোয়াড়ের স্বীকৃতি অর্জন করেছেন তিনি। লেভারের কাছে এ সম্মান কিছু আর নতুন নয়। এর আগেও বেশ কয়েকবার লেভার লাভ করেছেন উইম্বেলেডন-চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভের সম্মান। তবে এবারের উইম্বেলেডন টেনিস প্রতিযোগিতায় সেই পুরোন বিষয়টা আর একবার নতুনভাবে প্রমাণিত হয়ে গেলো। পুরুষদের টেনিস খেলায় অস্ট্রেলিয়া আজো অপ্রতিদ্বন্দ্বী। অস্ট্রেলিয়ার খেলোয়াড়দের সংগে ঠিক যেন পাল্লা দিয়ে চলতে পারছেন না অন্য দেশের খেলোয়াড়রা। এবারও তাই উইম্বেলেডন টেনিস প্রতিযোগিতার পুরুষদের ফাইন্যালে উঠেছিলেন অস্ট্রেলিয়ারই দু'জন খেলোয়াড়। শেষ পর্যন্ত নিউকাম্বেকে হারিয়ে দিয়ে এবারের এক নম্বর বাছাই খেলোয়াড় লেভার লাভ করলেন শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান। অথচ ভাবতে অবাক লাগে যে, মাত্র কয়েকদিন আগে উইম্বেলেডন টেনিস প্রতিযোগিতার প্রথম দিককার খেলায় ভারতের প্রেমজিৎলাল সুন্দরভাবে খেলে লেভারকে রীতিমত বে-কায়দায় ফেলেছিলেন। শুধু তাই নয়, পর পর দু'টো সেটে জিতেও ছিলেন প্রেমজিৎ। তারপর লেভার ধরলেন তাঁর নিজ-মূর্তি আর পর পর তিনটে সেটে একেবারে সরাসরি হারিয়ে দিলেন প্রেমজিৎকে। এর থেকে যদিও কিছুই প্রমাণ হয় না, তবু লেভারের বিরুদ্ধে প্রেমজিতের ঐ সাফল্য নিঃসন্দেহে ভাববার বিষয়। মনে হয় যে, ভারতীয় খেলোয়াড়রা যদি একটু চেষ্টা করেন আর সেই চেষ্টা যদি আন্তরিক হয় তাহলে তাঁরাও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের সংগে সমানে সমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালাতে পারেন। এ শুধু টেনিসেই নয়; ফুটবল, ক্রিকেট কিম্বা হকির মাঠেও ঐ রকমভাবে একই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখা গেছে। অবশ্য তাতে লাভ হচ্ছে না কিছুই। কারণ আরো প্রচেষ্টা যে আরো সাফল্য বয়ে আনতে পারে সে কথাটা আমরা যেন ভুলে যাই বার বার, কিম্বা বুঝেও বুঝতে চেষ্টা করি না। পাছে আরো বেশি পরিশ্রম করতে হয়! অথচ ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে এমন সব গুণ আছে যে সত্যিকারের চেষ্টার মতো চেষ্টা করলে তাঁরাও বিশ্বের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়দের সংগে পাল্লা দিয়ে চলতে পারেন। কিন্তু সব কিছু জানা সত্ত্বেও তাঁরা ও-পথে পা বাড়াবেন না। কোন বিষয়ে সত্যিকারের উন্নতি করা বোধহয় আমাদের স্বভাবও নয়। অথচ অন্য সকলে কি সাংঘাতিক চেষ্টাই না করে। বেশিদূরে যাবার দরকার নেই। এবারের উইম্বেলেডন টেনিস প্রতিযোগিতায় মেয়েদের সিংগলস বিভাগের চ্যাম্পিয়ান বৃটেনের অ্যান জোন্সের কথাই ধরা যাক। চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভের জন্যে জোন্স কি সাংঘাতিক চেষ্টাই না চালিয়েছিলেন। কুড়ি বছর বয়েস থেকে শুরু হয়েছিল তাঁর প্রচেষ্টা এবং গত দশ বছর সাতবার সেমিফাইন্যালে আর একবার ফাইন্যালে উঠেও হেরে যাবার পর আজ তিরিশ বছর বয়েসে জোন্স লাভ করলেন তাঁর ঈপ্সিত সম্মান। শুধু তাই নয় ১৯৬১ সালের পর জোন্স বৃটেনের মেয়ে হিসেবে তাকে এনে দিয়েছেন মেয়েদের সিংগলস খেলায় চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভের সম্মান। জোন্সের কৃতিত্ব আরো বেশি, কারণ তিনি হারিয়েছেন বিলি জেন কিং-এর মতো নাম করা খেলোয়াড়কে। সে যাই হোক—অস্ট্রেলিয়া কিম্বা বৃটেনের কথা না হয় থাক, কিন্তু আমরা কি করছি, কতোদূর এগিয়েছি আমরা, এইটাই জানা দরকার সবার কিন্তু। কিন্তু জানাবে কে? যাঁরা খেলছেন আর যাঁরা খেলাচ্ছেন তাঁরাও বিশেষ কিছু বলবেন বলে মনে হয় না। টেনিস খেলার উন্নতির জন্যে আমরা আদৌ কিছু করছি কিনা সেটাই জানার দরকার সবার আগে। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়! —শান্তিপ্রিয়

ফুটবল ফুটবল

ময়দানী ফুটবলের হাল-চাল মোটেই ভালো নয়। গত সপ্তাহে আমরা লিখেছিলাম যে, কলকাতার ফুটবলের ভাগ্যে এখন শনির দশা। হয়তো সত্যিই তাই। তা না হলে কি আর এই সব কাণ্ড-কারখানা ঘটে। কি বিশ্রী সব ব্যাপার, কি বিশ্রী সব হুমকি।

কিন্তু এইভাবে যদি চলতে থাকে তাহলে কলকাতার ফুটবল যে দিনে দিনে কোথায় গিয়ে পৌঁছবে সে কথা চিন্তা করতেও ইচ্ছে করে না। অথচ এ দায় সামলানোর দায়িত্ব যাঁদের তাঁরা আছেন পরম নিশ্চিন্তে। তাঁরা ফিরেও তাকাচ্ছেন না কোন দিকে। দিব্যি নিজেদের গোঁ বজায় রেখে বহাল তবিয়তে আছেন। কিন্তু একটা কথা তাঁরা কিছুতেই খেয়াল করছেন না যে, এ সব ব্যাপার-স্যাপার যদি বছরের পর বছর চলতে থাকে, তাহলে আর যেই করুন ক্লাবের সদস্যরা সহ্য করবেন না। তাঁদের সহ্যেরও একটা সীমা আছে। একগাদা টাকা খরচ করে তাঁরা কার্ড রিনিউ করান খেলা দেখবার জন্যে। ক্লাব পলিটিক্সের নোংরামি কতোদিন আর তাঁদের সহ্য হবে?

কলকাতার ময়দানী ফুটবলের ভাঙা হাল ধরার জন্যে এখন শক্ত হতে হবে সকলকে। শুধুমাত্র আই এফ এ কর্তৃপক্ষ কঠোর হলেই চলবে না—তাঁদের সেই কঠোরতার সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্যে এগিয়ে আসতে হবে কলকাতার ছোট-বড় ক্লাবগুলোকে। দর্শক এবং ক্লাব সমর্থকরা পিছিয়ে থাকলে চলবে না। তাঁদেরও পালন করতে হবে দর্শক হিসেবে দায়িত্বটুকু।

বর্তমানে কলকাতা ময়দানের যা হাল তাতে সমবেত প্রচেষ্টা ছাড়া কিছুতেই কিছু করা সম্ভব হবে না। ভারতীয় ফুটবলের পথিকৃৎ এবং পীঠস্থান বাংলাদেশের ফুটবল খেলাকে তার সেই গৌরবজনক স্থানে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে আমরা সকলকে অনুরোধ জানাই। আমরা জানি যে, আজ সকলে মিলে এগিয়ে এসে কলকাতা-ফুটবলের ভাঙা হাল না ধরলে আজকের এই শোচনীয় পরিস্থিতি থেকে কিছুতেই কলকাতার ফুটবলকে, বাংলাদেশের খেলার রাজা ফুটবলকে উদ্ধার করা যাবে না।

যাই হোক এবারের ফুটবল লীগ শেষ হয়ে এলো। এবার বসবে সুপার লীগের আসর। সুপার লীগে প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলোর মধ্যে বর্তমানে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল আর পোর্ট কমিশনার্স তো আছে, ইস্টার্ন রেলের সুপার লীগে খেলার সম্ভাবনা খুব বেশি, বাকী দলটির জন্যে বাটা আর বি এন আর প্রতিদ্বন্দ্বী। উয়াড়ীর সুপার লীগে খেলায় সুযোগ এখন একটু কম। তবে শেষ পর্যন্ত যে কি হবে—কে জানে। তবে এ লেখা যখন আপনাদের হাতে পৌঁছবে ততোদিনে হয়তো সুপার লীগে খেলার প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যাবে।

তবে এ কথা বোধহয় এখন আর না বললেও চলে যে, সুপার লীগ খেলার চ্যাম্পিয়ানশীপের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গলই। আর সুপার লীগের খেলাও এবার খুব একটা জমবে বলে মনে হয় না। কারণ তিন প্রধানের অন্যতম মহামেডান স্পোর্টিং এবার নেই সুপার লীগে, নেই এরিয়ান্সও।

আর যতোই ভালো খেলুক না কেন পোর্ট কমিশনার্স, বাটা কিম্বা ইস্টার্ন-রেল চূড়ান্ত খেলায় কোন মতেই খুব একটা সুবিধে করতে পারবে না মোহনবাগান কিম্বা ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে। তাই সুপার লীগের খেলা দেখতে গিয়ে দর্শকরা এবার আর প্রত্যাশিত উত্তেজনায় অধীর হয়ে উঠবেন না।

মোহনবাগান বনাম রাজস্থান দলের খেলার একটি অসাধারণ মুহূর্ত। সুকল্যাণ ঘোষদস্তিদার হেড দিয়ে গোল করতে গিয়েছিলেন কিন্তু ঠিক সময় মত রাজস্থানের গোলরক্ষক টি বসু লাফিয়ে উঠে বলটি বিপদ সীমানা থেকে মুক্ত করেন।

কুমারটুলি আসছে বছর প্রথম বিভাগে খেলবে

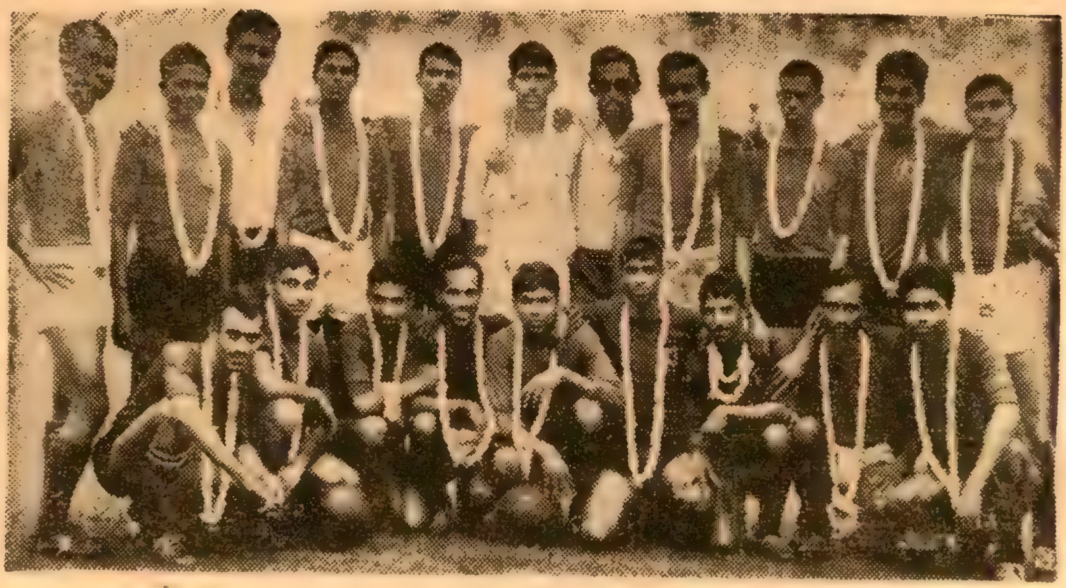

বাঁদিক থেকে দাঁড়িয়ে আছেন, সুদীপ পাল, অজিত নস্কর, বনমালী রায়, সুভাষ বসু, সুনীল বসু, চিত্ত ভৌমিক, অলোক ব্যানার্জী, রবীন মিত্র, এস সর্দার, শ্যাম নস্কর ও এন দত্ত। বাঁদিক থেকে বসে আছেন, দীপক গুপ্ত, আনবিক ব্যানার্জী, গঙ্গা দাস, দুলাল পাল, শ্যামসুন্দর দাস, গ্যাব্রি গোমেজ, বিশ্বনাথ ঘোষ, এইচ ঘোষ ও শক্তি রায়।

কলকাতা ময়দানের সব থেকে পুরোন দলগুলোর একটি, এতো কালের উপেক্ষায় নিশ্চুপ দল কুমারটুলি এ বছর দ্বিতীয় বিভাগে সব থেকে বেশি পয়েন্ট পাওয়া দুটি দলের একটি হয়ে এবার প্রথম বিভাগে উঠেছে। সামনের মরশুম থেকে তারা খেলবে প্রথম বিভাগে। কুমারটুলির প্রথম বিভাগে ওঠার মতো আনন্দের বিষয় আমাদের কাছে আর কি হতে পারে!

কারণ কুমারটুলি আজকের দল নয়। সেই বহুকাল আগে কলকাতার ফুটবল যখন সবে হাঁটি-হাঁটি পা-পা করছিল তখনই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কুমারটুলি ক্লাব। এ আজকের কথা নয়, অনেক বছর আগের কাহিনী। ১৮৮৫ সালে শোভাবাজার রাজবাড়ির কুমার জিতেন্দ্রকৃষ্ণ দেব প্রথম ভারতীয় আর সাহেবদের ভাষায় নেটিভ দল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করলেন শোভাবাজার ক্লাব। অবশ্য তার কয়েক বছর আগে ১৮৭৭ সালে নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাব নামে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কিন্তু শোভাবাজার ক্লাবের জন্ম হওয়ায় তিনি মেতে উঠলেন এই নতুন ক্লাবটাকে নিয়েই।

তাই ভারতীয়দের মধ্যে শোভাবাজার ক্লাবই সাংঘাতিক রকম প্রভাব বিস্তার করতে লাগলো। শোভাবাজারের দেখাদেখি অনেক ক্লাব জন্ম নিল। আর শোভাবাজারের ও-পাশের পাড়াতে প্রতিষ্ঠিত হলো আর একটা ক্লাব—নাম কুমারটুলি। দেখতে দেখতে আরো দুটো ক্লাবের জন্ম হলো—টাউন আর ন্যাশানাল ক্লাব। ফুটবল খেলাই ছিল এই চারটি বাঙালী দলের আসল লক্ষ্য। ফলে এই চারটি বাঙালী দল কলকাতার বাঙালী সমাজে সাড়া জাগিয়ে পুরোদমে খেলতে শুরু করলো ফুটবল।

১৮৮৯ সালে শুরু হলো ট্রেডস কাপের খেলা। বাঙালী দলগুলোর মধ্যে একমাত্র শোভাবাজারই পেলো ট্রেডস কাপে খেলার সুযোগ। তারপর ১৮৯৩ সালে আই এফ এ শীল্ড আর ১৮৯৮ সালে লীগ খেলার ব্যবস্থা হলো। কিন্তু বাঙালী দলগুলো রয়ে গেলো উপেক্ষিতই। কিন্তু ১৯১১ সালে মোহনবাগান আই এফ এ শীল্ড পাওয়ায় সব কিছু যেন বদলে গেলো। ১৯১৪ সালে লীগের দ্বিতীয় বিভাগে স্থান পেল মোহনবাগান আর এরিয়ান্স। ১৯১৫ সালে মোহনবাগান আর ১৯১৬ সালে এরিয়ান্স উঠলো প্রথম বিভাগে। মোহনবাগানের জায়গায় দ্বিতীয় বিভাগে খেলার সুযোগ পেলো শোভাবাজার আর ১৯১৭ সালে টাউন, গ্রীয়ার, মুসলিম দল ওরিয়েন্টালোর সংগে কুমারটুলিকেও দেওয়া হলো দ্বিতীয় বিভাগে খেলার সুযোগ।

দ্বিতীয় বিভাগে খেলতে এসে কুমারটুলিই দিলো সব থেকে বেশি যোগ্যতার পরিচয়। ১৯১৭ আর ১৯১৮ সালে পর পর দু'বছর কুমারটুলি লীগ তালিকায় লাভ করলো দ্বিতীয় স্থানটি। সে-দু'বার চ্যাম্পিয়ান হলো লিংকনস বি দল। কিন্তু পরের বছর কুমারটুলি প্রথম বিভাগে ওঠার যোগ্যতা প্রমাণ করে হলো দ্বিতীয় বিভাগ চ্যাম্পিয়ান। কিন্তু সাহেবরা কিছুতেই দু'টোর বেশি ভারতীয় দলকে প্রথম বিভাগে খেলতে দেবে না। তাই কুমারটুলির প্রথম বিভাগে খেলা হলো না।

১৯২০ সালে কুমারটুলি আবার সাংঘাতিক খেলা খেললো। তারা সেবার তাজহাট, এরিয়ান্স আর মোহনবাগানকে হারিয়ে উঠেছিল আই এফ এ শীল্ড ফাইন্যালে। কিন্তু ফাইন্যালে তারা হেরে গেলো ব্ল্যাকওয়াচের কাছে। তবে সেবার কুমারটুলির হেরে যাবার পেছনে একটা ইতিহাস আছে। বংশী গোঁসাই ছিলেন খুব নামকরা গোলরক্ষক। আই এফ এ শীল্ডের ফাইন্যালে তিনি আবদার ধরলেন যে তাঁর জায়গায় তাঁর বন্ধু কুমারটুলির দু'নং গোলরক্ষক সাহাজাদাকে খেলাতে হবে। ক্লাব রাজী হলো না তাঁর কথায়। তাই খেলার দিন তিনি ডুব মারলেন। কুমারটুলিও রাগ করে সাহাজাদাকে খেলালো না—তারক দে-কে খেলালো। সকলের ধারণা

[শেষাংশ ২৫৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

গল্প হলেও সত্যি

১৯৪৯-৫০ সালের কথা। কমনওয়েলথ ক্রিকেট টিম এসেছে ভারত সফরে। কানপুরের গ্রীনপার্কে শুরু হয়েছে বেসরকারী টেস্ট ম্যাচ। স্টেডিয়াম লোকেলোকারণ্য। যথারীতি খেলা শুরু হলো। হঠাৎ দারুণ গোলমাল দেখা গেল দর্শকের গ্যালারীতে। কোন কারণে দারুণ মারামারি শুরু হয়ে গেছে পুলিশ আর দর্শকদের মধ্যে। সে এক বিশ্রী ব্যাপার। উত্তরপ্রদেশের তখনকার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সেদিন মাঠে উপস্থিত ছিলেন। তিনি অসীম সাহসে এগিয়ে গিয়ে পুলিশ আর দর্শকদের নিরস্ত করলেন। দর্শকেরা দাবি জানাল, পরদিন থেকে মাঠে উপস্থিত থাকতে পারবে না তথাকথিত লালপাগড়ীর দল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেনে নিলেন তাদের দাবি। পরদিন মাঠে প্রবেশ করে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হয়ে উঠল দর্শকবৃন্দ। কথার খেলাপ করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। মাঠে বহাল-তবিয়তে বর্তমান পুলিশবাহিনী। সমস্বরে কৈফিয়ৎ চাইল তারা। অমায়িক হেসে উত্তর দিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, 'কথার খেলাপ আমি করি নি মোটেই। চেয়ে দেখুন, মাঠে একটিও লালপাগড়ী নেই, সব খাকি টুপি।' পুলিশ সেদিন লালপাগড়ীর বদলে খাকি টুপী পরে মাঠে উপস্থিত হয়েছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল দর্শকবৃন্দ। তারপর আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে চীৎকার করে উঠল, "লালবাহাদুর শাস্ত্রীকি জয়!"

—হিমাদ্রীকান্ত ব্যানার্জী,
কাঁঠালগুড়ি চা-বাগান,
জলপাইগুড়ি।

সমাচারদর্পণ

দেশে

ভবানীপুর ক্লাব এ বছর তৃতীয় বিভাগে চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করায় সামনের বছর থেকে তারা দ্বিতীয় বিভাগে খেলবে। ভবানীপুরের দ্বিতীয় বিভাগে ওঠাকে আমরা স্বাগত জানাই। ভবানীপুরে কলকাতা ময়দানের একটি ঐতিহ্যশালী পুরোন দল। পুরোন দলগুলো লাইম লাইটে আসায় ফুটবল রসিকরা নিঃসন্দেহে আনন্দিত। কুমারটুলিও আসছে বছর প্রথম বিভাগে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে। চতুর্থ বিভাগের চ্যাম্পিয়ান দল চৈতালী সংঘ সামনের বছর থেকে তৃতীয় বিভাগে খেলবে। আমরা কুমারটুলি, ভবানীপুর ও চৈতালী সংঘের খেলোয়াড়দের সাফল্যের জন্যে তাদের অভিনন্দন জানাই।

॥ বুচার ॥

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের প্রথম ইনিংসে শুধু ভালো ব্যাটিংই করেন নি। এই খেলায় তিনি পূর্ণ করেছেন তিন হাজার রানও।

বিদেশে

সুইজারল্যাণ্ডের মেয়ে এণ্টেনের পেথালন প্রতিযোগিতায় ৫০৪৬ পয়েন্ট সংগ্রহ করে নতুন বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেছেন। তিনি পশ্চিম জার্মানীর হেহডে বোজেনথালের ৫০২৩ পয়েণ্টের রেকর্ড ভেঙেছেন।

* * *

ফরাসী মেয়েরা ৪×৪০০ মিটার রিলে রেসে নতুন বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেছেন। তাঁরা ৩ মিঃ ৩৪·২ সেকেণ্ডে অতিক্রম করেছেন ঐ দূরত্ব। মিচেল মোম্বেট, ইজেইন জ্যাক, নিকলি ডুক্লো ও কোলেটি বেসন এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

* * *

কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় দলে এবার দু'জন ভারতীয় খেলোয়াড় স্থান লাভ করেছেন। উত্তর প্রদেশের এ এন ভাটিয়া ও পাঞ্জাবের জাহানার খান লর্ডস মাঠে অনুষ্ঠিত অক্সফোর্ড দলের বিরুদ্ধে খেলার জন্যে মনোনীত হয়েছেন।

॥ এডরিচ ॥

এডরিচের ব্যাটিং ইংলণ্ডকে প্রথম ইনিংসে অগ্রগামী করেছে।

প্রশ্ন উত্তর

অজয় বর্মণ ও বাপ্পা (রেলওয়ে কলোনী, গৌহাটি)

প্রশ্ন : ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মধ্যে সব চেয়ে কম বয়সের খেলোয়াড় এখন কে?

উত্তর : এখন রমেশ সাক্সেনাই। সুনীল ভট্টাচার্য এখন কলকাতাতেই আছেন।

বুদ্ধ গুপ্ত (শিলিগুড়ি, দার্জিলিং)

উত্তর : ঐভাবে গোলরক্ষককে বাধা দিলে গোলরক্ষকের তখন বলটা ছুড়ে দেওয়াই উচিত। তবে ওর বেশি বাড়াবাড়ি করলে রেফারী ঐ খেলোয়াড়টিকে, যিনি গোলরক্ষককে ন্যায়সংগতভাবে বাধা দিচ্ছিলেন না, তাঁর বিরুদ্ধে ফ্রি কিকের নির্দেশ দেবেন।

বিনয়ভূষণ সরকার (কল্যাণী, নদীয়া)

উত্তর : টেস্ট ক্রিকেটে সোবার্সই ব্যক্তিগতভাবে সর্বোচ্চ রান করেছেন। অন্য একটি প্রশ্ন-উত্তরে আপনার জবাব পাবেন।

খাম, ইনল্যাণ্ড কিম্বা পোস্ট কার্ড সংগে থাকলে তবেই ব্যক্তিগতভাবে উত্তর দেওয়া সম্ভব হয়। কারণটা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন।

পরিতোষ নাগ (বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি)

উত্তর : দর্শকদের বেশে এ বছর অনেক সময় সমাজবিরোধীরাও খেলার মাঠে গোলমাল করছেন। তার কারণ হলো গোলমালের ছুতোয় যদি কিছু লুঠ-পাট করা যায়। এর জন্যে পুলিশ কয়েকজনকে গ্রেফতারও করেছে।

খেলার মাঠে আজকের এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতির জন্যে কোনমতেই কেবলমাত্র দর্শকদের দায়ী করা যায় না।

সোমনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (হালিসহর, গোলাবাড়ি, ২৪ পরগনা)

উত্তর : আপনি সাদা কাগজে লিখে লেখা পাঠাবেন। 'গল্প হলেও সত্যি' বিভাগের জন্যে হলেও পোস্ট কার্ডের লেখায় আমাদের খুব অসুবিধে হয়।

শঙ্কর রায়মৌলিক (মছলন্দপুর, যোষপুর, ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন : কোন কোন খেলোয়াড় দল বদল করেন, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবার নিজ দলে ফিরে যান। এটা কি সমর্থকদের সাময়িক আনন্দ ও পরে নিরাশ করার জন্যে, না অন্য কিছু?

উত্তর : অন্য কিছুই......সেটা যে কি তা বোধহয় আপনারা ভালোভাবেই জানেন।

উৎপল ধর (শ্যামনগর, রাণাঘাট) ও বাবুল (নেহালপুর, ২৪ পরগনা)।

উত্তর : আপনাদের চিঠির জন্যে ধন্যবাদ। মহামেডান স্পোর্টিং-এর অধিনায়ক বিদ্যুৎ মজুমদার নন লতিফই।

সুভাষ সাধু (খাউতড়া, বীরভূম)।

প্রশ্ন : মোহনবাগানের গোলরক্ষক গোবিন্দ গুহঠাকুরতাকে মাঠে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না কেন?

উত্তর : তা তো বলতে পারবো না।

নিশীথ চ্যাটার্জী ও শুভেন্দু বসু (আড়িয়াদহ, কলকাতা-৫৭)।

প্রশ্ন : ফুটবল হকি ও ক্রিকেট সর্বভারতীয় শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতাগুলির নাম জানতে চাই।

উত্তর : ফুটবল—আই, এফ, এ শীল্ড, হকি—বাইটন কাপ ও ক্রিকেটে—রণজী ট্রফি।

দেবাশীষ দাস ও প্রবাল মুখোপাধ্যায় (বানিবন, উলুবেড়িয়া)।

উত্তর : কোন ফুটবল খেলোয়াড় কোন সময়েই নিজের দলের কিম্বা বিপক্ষ দলের কোন খেলোয়াড়ের কাঁধের ওপর ভর দিয়ে হেড দিতে পারেন না। যদি কোন খেলোয়াড় অন্য কারো কাঁধের ওপর ভর দিয়ে হেড দেন, তাহলে রেফারী তাঁর বিরুদ্ধে ফ্রি কিকের নির্দেশ দেবেন। সুতরাং আপনাদের প্রশ্নের ক্ষেত্রেও গোলের বিষয় ওঠেই না।

অসীম বিশ্বাস (সন্তোষপুর এ্যাভিনিউ, যাদবপুর)।

উত্তর : খেলোয়াড়দের ছবি সংগ্রহ করার বিষয়ে আমরা তো কোন সাহায্য করতে পারবো না। আপনি বরঞ্চ খেলাধুলোর সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করুন। ওঁরা হয়তো ছবির বিষয়ে আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন।

চন্দ্রশেখর ভক্ত (অরবিন্দ সরণী, কলকাতা-৫)।

উত্তর : আপনাদের পত্রিকায় নিশ্চয়ই লেখা দেবো। যাই হোক, আপনি অগাস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে দুপুর দুটোর পর বসুমতী পত্রিকায় এসে আমার সংগে দেখা করলে খুব খুশি হবো।

পরিতোষকুমার নাগ (বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি)।

উত্তর : ইস্টবেঙ্গল-মহামেডান স্পোর্টিং-এর খেলার দিন রেফারী যে পন্থা অবলম্বন করেছিলেন সব ক্ষেত্রে রেফারীরা সাধারণত তাই করে থাকেন।

সুভাষরঞ্জন দত্ত, স্বপন মজুমদার, কাজল দাশগুপ্ত ও মন্টু (ব্রাংগুলোর কলোনী, গৌহাটী-১২)।

উত্তর : আপনারা ফুটবল খেলার ওপর যে প্রশ্ন করেছেন সেটি ঠিক বুঝতে পারলাম না। তবে খেলা যদি কোন কারণে শেষ হবার কিছু আগেই বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে খেলা বন্ধ হয়ে যাবার সময় পর্যন্ত যে ফলাফল ছিল খেলার সেই ফলাফলই সাধারণত বজায় থাকে। তবে তা নির্ভর করে লীগ কমিটির সিদ্ধান্ত ও প্রতিযোগিতার নিয়ম-কানুনের ওপর।

বড় মুশকিলে ফেললেন আপনারা, কোন্ খেলোয়াড়ের নাম বলবো যিনি আপনাদের চিঠির উত্তর নিশ্চয়ই দেবেন—কয়েকজনকে তাঁদের ক্লাবের ঠিকানায় চিঠি লিখে দেখুন না—উত্তর পান কি-না।

[২৫৪ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

যে ব্ল্যাকওয়াচের বিরুদ্ধে বংশী গোঁসাই খেললে তারা কিছুতেই দুটো গোল খেতো না।

যাক সে কথা। সে যুগে কুমারটুলির খেলোয়াড়দের মধ্যে আজো পুরোন লোকরা মনে করেন ব্যাক তুলসী দত্ত, হাফ ব্যাক দ্বিজেন ঘোষ, লেফট আউট মশা বোস আর ফজলুল রহমানের কথা।

পুরোন কথা থাক। কুমারটুলি এ বছর প্রথম বিভাগে উঠলো। কলকাতার পুরোন দিনের ঐতিহ্যপূর্ণ ক্লাবগুলোর মধ্যে একটি হলো কুমারটুলি। আমরা আশা করবো প্রথম বিভাগে নবাগত কুমারটুলি সামনের বছর থেকে তাদের সেই পুরোন ঐতিহ্য নিয়ে আবার ভারতীয় ফুটবলের পুরোধায় এসে দাঁড়াতে সক্ষম হবে।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতী

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে মোরারজী দেশাইয়ের বিদায় ঃ দেশের চোদ্দটি বড় ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ

ইন্দিরাজীর অনমনীয় দৃঢ়তা

৭৪ বর্ষ ঃ ৫ম সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৮ই শ্রাবণ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [74 year, No. 5, 24th July,

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		২৫৯
আজকের মানুষ		২৬০
সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন		
ভারতবর্ষ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— শঙ্করীপ্রসাদ বসু	২৬১
বঙ্গদর্শন		২৬৭
ভারতদর্শন		২৭০
আন্তর্জাতিক		২৭২
যুক্তফ্রন্ট সরকার সমীপেষু	— শ্রীসর্বদর্শী	২৭৫
ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (প্রবন্ধ)	— ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য	২৭৭
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	— অনন্ত সিংহ	২৮২
মানুষের ঘর (কবিতা)	— বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৮৪
চাই পরিচ্ছন্ন প্রশাসনযন্ত্র (প্রবন্ধ)	— মনোরঞ্জন হাজরা	২৮৫

যে কোন
গয়না
আর
আসল
গ্রহরত্ন
কেনার
দক্ষিণ কোলকাতায়
নামকরা প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সন অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ডসন্স অব ছোট
এম. বি. সরকার

এ. সরকার এণ্ড সন্স
রাসবিহারী এভিনিউ

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
তিমিরপ্রান্ত তুরঙ্গ	অগ্নিবর্ণ	২৮৭
নর-নক্ষত্র সংবাদ (গল্প)	গোপাল সামন্ত	২৯১
শিল্প-বাণিজ্য-অর্থনীতি	শ্রীসওদাগর	২৯৬
চিত্রলেখা	* * *	২৯৮
সাগর সঙ্গমে (ধারাবাহিক উপন্যাস)	সুশীল জানা	৩০০
মহানায়ক লেনিন (নাটক)	অশোক সেন	৩০৫
লোকসংগীতের একাল না আকাল?	মুরশিদ	৩০৯
গ্রন্থমেলা		৩১১
রূপজগৎ		৩১২
খেলাধূলা	শান্তিপ্রিয়	৩১৬

॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥

বহুকাল পরে আবার পাওয়া যাচ্ছে।

ম হা ক বি

গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচনাবলী

প্রথম খণ্ড : প্রফুল্ল, ম্যাকবেথ, ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে চারটি প্রবন্ধ, তিনখানি গীতিনাট্য ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১২। মূল্য দশ টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড : সিরাজউদ্দৌলা ; ব্যায়সা কা ত্যায়সা ; জনা ; দোললীলা ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫৮। মূল্য দশ টাকা।

তৃতীয় খণ্ড : পাণ্ডবগৌরব, বলিদান, আবুহোসেন ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫২। মূল্য দশ টাকা॥

চতুর্থ খণ্ড : চৈতন্যলীলা, ভ্রান্তি, মলিনাবিকাশ, হীরার ফুল, বিবিধ রচনা ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০২। মূল্য দশ টাকা॥

পরমহংসদেব শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত-শিরোমণি অতি প্রিয় নোটো গিরিশকে বলেছিলেন, —"অভিনয়ের প্রয়োজন আছে বৈ-কি—ওতে লোকশিক্ষা হবে। আর তোমার লেখা—ও যে ভারি ভাল হয়েছে।"

প্রতিটি খণ্ড বোর্ডে বাঁধাই। মূল্যবান কাগজে ছাপা।

রচনাবলী সম্পাদনা : শ্রীরমেন চৌধুরী

অবিলম্বে অর্ডার পেশ করুন।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

সাপ্তাহিক বসুমতী

CALCUT
CENTRAL LIBRARY
UNIVERS

৭৪ বর্ষ : ৫ম সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ৮ই শ্রাবণ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 24th July, 1969

প্রধানমন্ত্রীর ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত

গত ১৯শে জুলাই তারিখটি ইতিহাসে স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে। ঐ দিন শ্রীমোরারজী দেশাই-এর পদত্যাগপত্র প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে রাষ্ট্রপতি গ্রহণ করেছেন। প্রথম এই ঘটনাটি প্রচার হবার পর দ্বিতীয় যে ঘটনাটি প্রচারিত হয়েছে তা ইতিহাসে যুগান্তকারী ঘটনা হিসেবে উল্লিখিত হবে। ঐ ঘটনাটি হচ্ছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের পর অর্ডিন্যান্স জারী করে ভারতের বৃহৎ চোদ্দটি ব্যাঙ্ককে জাতীয়করণ করা এবং আর আমানত না বাড়াবার জন্য বিদেশী ব্যাঙ্কগুলিকে নির্দেশ দেওয়া।

প্রথম ঘটনায় অর্থাৎ শ্রীদেশাই-এর পদত্যাগের ব্যাপারে দলীয় রাজনীতি বেশ দানা বেঁধে উঠেছিল। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় এই বক্তব্য ছিল যে, বাঙ্গালোরে এ আই সি সি-র অধিবেশনে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর হাতেকলমে তা কার্যকর করে তুলতে হলে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থদপ্তর প্রধানমন্ত্রীর নিজের হাতে থাকা অবশ্য কর্তব্য। কারণ অর্থনৈতিক সামঞ্জস্য বিধানের জন্যই ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করা এবং ঐ দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর পালনীয় কর্তব্য বলেই অর্থদপ্তর তাঁরই হাতে ন্যস্ত থাকা উচিত। বলা বাহুল্য শ্রীদেশাই অর্থদপ্তর ছেড়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিত্বে থাকা সম্মানজনক কাজ বিবেচনা করেন নি তাই পদত্যাগপত্র পাঠিয়েছিলেন এবং তিনি যাতে ঐ দপ্তরে থাকতে পারেন সেজন্য প্রধানমন্ত্রীর কাছে বাঘা বাঘা নেতৃবৃন্দ দরবার করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত শ্রীদেশাই অনমনীয় থাকায় এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী অর্থদপ্তর শ্রীদেশাইকে ফিরিয়ে দিতে রাজী না হওয়ায় সমাধান স্বরূপ শ্রীদেশাই-এর পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে। অবশ্য ঘটনার শেষ হয়তো এখানেই নয়। শ্রীদেশাইকে অর্থদপ্তরে পুনরায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টায় মিটিং ও গোপন সলাপরামর্শ কিছুই বাদ যাচ্ছে না। কংগ্রেস সভাপতির নয়াদিল্লীস্থ বাসভবনে প্রবীণ কংগ্রেস নেতাদের সংগে সাক্ষাৎকারের পর শ্রী এস কে পাতিল এই বলে হুমকি দিয়েছেন যে, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী উপ-প্রধানমন্ত্রী তথা অর্থমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাইকে পদচ্যুত করে যে "প্রতিহিংসা-পরায়ণ" মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন, তার যথাযথ মোকাবিলা করা হবে।

আমাদের মনে হয়, শ্রীমতী গান্ধী গভীরভাবে ভেবে-চিন্তেই বিপজ্জনক পথে পা বাড়িয়ে ইতিকর্তব্য করেছেন। তবে রাষ্ট্রপতির নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপার থেকে সুরু করে এখনো পর্যন্ত যে সব ঘটনা ঘটছে তদ্দ্বারা এটাই প্রমাণ হচ্ছে, কংগ্রেস দলের মধ্যে যে বিরাট ফাটল ধরেছে, তার জের এখানেই শেষ হবে না। কিন্তু এটাও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য, দীর্ঘ বাইশ বছরের কংগ্রেসী শাসনে অনেকভাবে সমাজবাদের কথা বলা হলেও, শ্রীমতী গান্ধী তার প্রথম ধাপে পা দিতে গিয়েই যেন সাপের ফণায় পা দিয়েছেন! তবু তাঁর দৃঢ়তা ও মনোবল প্রশংসনীয়। সেই কারণে তিনি জনগণ ও বিরোধী-দলের নেতাদের কাছে অভিনন্দনও লাভ করছেন। অবশ্য স্বতন্ত্র, জনসঙ্ঘ বা বি কে ডি-র মতো দলগুলি শ্রীমতী গান্ধীর বিরোধিতা করবেন—এ তো নতুন কিছু নয়। আবার ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের দাবিও আজকের নয়। এই দাবি শুধু বিরোধীপক্ষরাই করেন নি, তার বহু আগে এই দাবি জানানো হয়েছিল কংগ্রেস অধিবেশনে। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করার সংগে সংগে স্বতন্ত্র, জনসঙ্ঘ প্রভৃতি দলগুলি এমন হৈ চৈ সুরু করেছে, দেশটা যেন জাহান্নামে গেল, দেশের শিল্প গেল! গেল!

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ দেশের সার্বিক কল্যাণের জন্য একটা প্রাথমিক ব্যবস্থা মাত্র। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ না হওয়ার ফলে কালোবাজারী, ফাটকাবাজী, কালো টাকা আজ ঊর্ধ্বমুখী। ব্যাঙ্কে জমানো টাকায় জনসাধারণের কল্যাণ করা যায় নি; কারণ শিল্পপতিরাই এতোদিন নিজেদের স্বার্থে তা কাজে লাগিয়েছেন অথচ অর্থের অভাবে চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কাগজ-পত্রে উই ধরতে সুরু করেছে।

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের বিরুদ্ধে হৈ চৈ করার কারণ কি আমরা বুঝি না। শ্রীমতী গান্ধী তাঁর বেতার বক্তৃতায় বলেছেন, যে সব দেশ সমাজবাদী নয় সে সব দেশেও ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করা হয়েছে। শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে আমরা একমত। আর আমরা মনে করি, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ হলেই দেশটা রাতারাতি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয় না। বর্তমান যে চোদ্দটি বৃহৎ ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রায়ত্ত করা হোল সেগুলি ভারতের কোটি কোটি কৃষাণ, শ্রমিকদের অর্থের প্রয়োজন কিছুটা মেটাতে পারবে। কিন্তু তাতেই তাদের দুঃখ ঘুচবে না, দুর্ভাগ্যের অবসান হবে না—সে বিষয়ে সমাজতন্ত্র আতঙ্কগ্রস্ত ব্যক্তিরা নিঃসন্দেহ হতে পারেন। তবে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ব্যাপারটি এবার অনেকের চোখ খুলে দেবে এই কারণে যে, এ ঘটনাটিকে অবলম্বন করে যাঁরা মড়াকান্না সুরু করেছেন তাঁরা অকংগ্রেসী মন্ত্রিসভাগুলিকে কোন দৃষ্টিতে দেখেন তা বোঝা যাবে। যেখানে প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্য কাজে বাধা সৃষ্টির জন্যে "ভাগ্যবিধাতা"দের অভাব হয় না, সেখানে অকংগ্রেসী মন্ত্রীদের যে-কোনো কাজের বিরুদ্ধে যে চরম সঙ্কট সৃষ্টি করা হবে, এ তো স্বাভাবিক। তবে শ্রীমতী গান্ধী আজ দেশের গরীব মানুষগুলির কল্যাণের জন্য যেভাবে নিজেদের মধ্যে চরম প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই করছেন তজ্জন্য তিনি সর্বসাধারণের সমর্থন পাবেন এবং ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

...গত সপ্তাহে যা ঘটে গেল তাকে ঘটনা না বলে খন্ড খন্ড রোমাঞ্চকর ইতিহাস বলাই ঠিক। বিরোধী বা বিরুদ্ধ মতাবলম্বীরা তো বটেই, স্বপক্ষের সহযোগীরাও কেউ ভাবতে পারেন নি যে, শ্রীমতী ইন্দিরা এতখানি দৃঢ়তা, এতখানি মনোবলের অধিকারিণী। দুটো কাজের মধ্য দিয়েই ইন্দিরা গান্ধী প্রমাণ করেছেন তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি এবং কূটনৈতিক বিচারবুদ্ধি কত নিখুঁত ও প্রখর। বাঙ্গালোরে কংগ্রেস অধিবেশনে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের প্রস্তাব করে সম্মেলনে অনুপস্থিত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা একটা 'নোট' পাঠিয়েছিলেন। উপ-প্রধানমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী মোরারজী দেশাই, কংগ্রেস নেতা পাতিল তাতে এমন ভাব করলেন যেন কেউ মৌচাকে ঢিল মেরেছে। বিরুদ্ধবাদীরা ব্যাঙ্কের রাষ্ট্রীয়করণ চান না, শ্রীদেশাইয়ের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ফর্মুলা পেয়েই ডগমগ। একচেটিয়া পুঁজিপতিদের কাছে যাদের টিকি বাঁধা তারা করবে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ! শেষ পর্যন্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীচ্যবনের একটা আপোষ-প্রস্তাব গৃহীত হল।

কিন্তু শ্রীমতী ইন্দিরার এতটা 'বাড়াবাড়ি' কংগ্রেসের সিন্ডিকেট গ্রুপ বরদাস্ত করতে প্রস্তুত নয়। অলক্ষ্যে শুরু হল এক ঘৃণ্য ষড়যন্ত্র—প্রধানমন্ত্রীর গদি থেকে ইন্দিরা-অপসারণের গভীর চক্রান্ত। কারণ সিন্ডিকেট মনে করে যে, জওহরলাল-তনয়াকে তাঁরাই দয়া করে প্রধানমন্ত্রীর পদ দিয়েছিলেন, কাজেই ইচ্ছে করলে তাঁরাই আবার তাঁকে গদিচ্যুত করতে পারেন। ভারতের জনতা কেউ নয়, কংগ্রেসের অন্য সদস্যরাও হুকুমের দাসমাত্র। সে-ষড়যন্ত্রের প্রথম প্রচন্ড বিস্ফোরণ ঘটলো কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ডের সভায়, যখন দেখা গেল প্রেসিডেন্ট পদে প্রধানমন্ত্রীর মনোনীত প্রার্থী শ্রীজগজীবনরামকে সিন্ডিকেট প্রার্থী শ্রীসঞ্জীব রেড্ডির কাছে পরাজয় বরণ করতে। অভূতপূর্ব না হলেও ঘটনাটা ছিল অভাবনীয়। শ্রীমতী গান্ধী প্রেস কনফারেন্সে এ-ধরনের নির্বাচনে তাঁর ক্ষোভ গোপন রাখেন নি। কারণ ৫০ কোটি মানুষের মাথার মুকুট যিনি হবেন তাঁর এ-পদ্ধতিতে নির্বাচন আর যাই হোক, শোভন নয়।

আত্মসম্মানবোধ যাঁর আছে তাঁর পক্ষে এ-আঘাত হজম করা সম্ভব নয়, ইন্দিরার পক্ষেও হয় নি, বিশেষত তাঁর যখন বুঝতে বাকি রইলো না যে, তাঁর অর্থনৈতিক নোট-এরই প্রতিক্রিয়া সঞ্জীব রেড্ডির জয়লাভ। শ্রীমতী ইন্দিরা শক্ত হয়েছেন, অর্থদপ্তরের দায়িত্ব থেকে মোরারজী দেশাইকে অব্যাহতি দিয়ে দপ্তরটি স্বহস্তে গ্রহণ করেছেন। সিন্ডিকেট গ্রুপও প্রধানমন্ত্রীর এ-দৃঢ়তার জন্যে তৈরি ছিল না। সর্বশ্রী নিজলিঙ্গাপ্পা, কামরাজ, পাতিল, চ্যবন যখন মোরারজীকে তাঁর দপ্তর ফিরিয়ে দিতে ইন্দিরাজীকে রাজী করাতে পারলেন না, তখন বুঝলেন ইন্দিরা অবলা নারীমাত্র নন, ইন্দিরা সিন্ডিকেটের ওপর নির্ভরশীল হয়ে প্রধানমন্ত্রিত্ব করছেন না।

মোরারজী দেশাই পদত্যাগ করলেন, ইন্দিরাজীও যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন।

ইন্দিরা গান্ধী

তারপরেই সেই ঐতিহাসিক, বৈপ্লবিক ঘোষণা : দেশের ১৪টি বড় বড় ভারতীয় ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত হলো। ১৯৫৪ সালের আবাদী অধিবেশনে কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে রাষ্ট্র গঠনের কথা বলেছিল। ভুবনেশ্বর অধিবেশনেও কংগ্রেস ১০-দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচী নিয়েছিল। কিন্তু দেশকে সমাজতন্ত্রের পথে নিয়ে যেতে কংগ্রেস এ-পর্যন্ত কী করেছে? প্রভাবশালী নেতা জওহরলাল পুঁজিপতিদের স্বার্থে আঘাত করতে সাহসী হন নি, লালবাহাদুরও না। বাহাদুর বলতে হবে ইন্দিরা গান্ধীকে।

১৯১৭ সালের ১৯শে নভেম্বর ইন্দিরার জন্ম। বড়লোকের ঘরে জন্ম, তাই বড়লোকী চালে তাঁর শিক্ষারম্ভও ঘটে সুইজারল্যান্ডে। সেখান থেকে এলেন কবিগুরুর শান্তিনিকেতনে। তারপরে গেলেন অক্সফোর্ডের সোমারভিল কলেজে। পিতা জওহরলাল যখন ইয়োরোপ, আমেরিকা, সোভিয়েট য়ুনিয়ন, এশিয়ার অন্যান্য দেশে গিয়েছেন কন্যা ইন্দিরা গিয়েছেন সঙ্গে, দেশভ্রমণ হল, সেক্রেটারী হিসেবে বাবাকে সাহায্য করাও হল। হরিজন নারীদের নিয়েই ইন্দিরা প্রথম কংগ্রেস বা জাতীয় আন্দোলনে নামেন। তারপর যুব-আন্দোলন। কংগ্রেসের মহিলা শাখাকে উদ্দীপ্ত করে তুললেন ইন্দিরা। ২১ বছর বয়সে কংগ্রেসের সদস্য পদ লাভ করেন। কারাবাস ঘটেছে ১৩ মাসের জন্যে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য নির্বাচিত হতে সময় লাগল না বিশেষ। কেন্দ্রীয় নির্বাচনী কমিটির এবং যুব-উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্যপদও পেলেন। উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্যপদও পেলেন। ১৯৫৯ সালে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন।

নেহরুর মৃত্যুতে লালবাহাদুর মন্ত্রিসভায় যখন ইন্দিরাকে তথ্য ও বেতার-দপ্তর দেওয়া হল তখন অনেকে তাঁকে পরলোকগত নেতার প্রতি সম্মানসূচক রূপে মনে করেছিল। এমন কি ইন্দিরা যেদিন প্রধানমন্ত্রীর পদ পেলেন তখনও বহু নেতা নিজেদের এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন যে, নেহরু-কন্যা বলেই তাঁকে ওই গুরুত্বপূর্ণ পদ দেওয়া হল, আসলে প্রধানমন্ত্রিত্বের যোগ্যতা তাঁর নেই। একজন বিরোধী নেতা তো বলেই ফেলেছিলেন যে, ইন্দিরাকে প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসিয়ে দেশবাসীর এ-লাভ হল যে, তারা রোজ সকালে খবরের কাগজে একটা সুন্দর মুখ দেখতে পাবে।

ইন্দিরা অবশ্যই প্রিয়দর্শিনী। সাজগোজও করেন, তবে তা অত্যন্ত সাদাসিধে। গরমকালে খাদি, শীতে তাঁতের সিল্কশাড়ি। কোনো গয়নার বালাই নেই ইন্দিরার হাতে-গলায়, কেবল বাঁ হাতে একটা গোল্ড ঘড়ি। তাঁর বব চুলের বাহার খোলার জন্যে পাঁচজন পরিচারিকার প্রয়োজন হয় না, একবার চিরুনি চালালেই তাঁর চুল অমন সুন্দর রূপ ধরে।

ইন্দিরা যা এতদিন করেন নি আজ করতে গেলেন কেন? করলেন নিজেকে এবং কংগ্রেসকে বাঁচাবার তাগিদে। ইন্দিরা গান্ধী বুঝতে পেরেছেন যে, সমাজতন্ত্রের পথে না গেলে আগামী নির্বাচনে কংগ্রেসের পক্ষে ক্ষমতা রাখা অসম্ভব। তারই জন্যে তিনি ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্তকরণের পদক্ষেপ নিলেন। এতদিন পুরুষসিংহরা যা পারেন নি একজন নারী তা পারলেন কী করে? সরোজিনী নাইডু ঠিকই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন : ইন্দিরার জন্মে ভারতের নতুন আত্মা জন্মলাভ করলো।

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং—(৩)

বৈজ্ঞানিক পরিমন্ডল : মেঘনাদ সাহার 'নব নীতি'

বাঙালী বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ডঃ মেঘনাদ সাহা অত্যন্ত ক্রিয়াশীল ও গতিশীল চরিত্রের মানুষ ছিলেন। তিনি জেনেছিলেন যে, ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য বিজ্ঞান অবশ্য-অবলম্বনীয় বস্তু, এবং বিজ্ঞানকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে উপযুক্ত মানস-সংগঠন প্রয়োজন, ইউরোপীয় জীবন-বোধকে ভারতবর্ষে প্রবর্তিত করলে সেই অভিপ্রেত মানস-ভূমি প্রস্তুত করা যাবে যেহেতু ঐ জীবনবোধ সহজেই বিজ্ঞানানুকূল—সেই চেষ্টা তাই তিনি ধর্মযোদ্ধার উন্মাদনা নিয়ে করে গেছেন। এ ব্যাপারে নিতান্ত উগ্র ও ব্যগ্র এই মানুষটি তাঁর কাছে বাতিল জীবনাদর্শ অর্থাৎ স্থিতিশীল ভারতীয় ধর্মাদর্শকে আক্রমণ করেছিলেন প্রচন্ড বেগে। ভারতীয় সমাজব্যবস্থা সাম্যভিত্তিক নয়, অসাম্যের শিকার স্বয়ং এই বৈজ্ঞানিক—এই সমাজব্যবস্থা তাঁর আঘাতলক্ষ্য হবে, বুঝতে অসুবিধা হয় না। কিন্তু এতেই তিনি নিবৃত্ত হন নি। ভারতীয় সমাজব্যবস্থার সঙ্গে ভারতীয় অধ্যাত্ম-সত্যকেও খোঁচা দিতে শুরু করেছিলেন। ফলে যথেষ্ট বিক্ষোভ জেগেছিল, যার বিষয়ে স্বভাবাসন্ধ ঝাঁঝালো ভাষায় ডঃ সাহা বলেছেন—"মৌমাছির চাকে ঢিল মারিলে যেরূপ হয় সেইরূপ—।"

মেঘনাদ সাহা সুভাষচন্দ্রের ন্যাশন্যাল প্ল্যানিংয়ের জোরালো সমর্থক। এমন কি বলা যায়, প্ল্যানিংয়ের পট-ভূমিকা প্রস্তুতিতেও তাঁর প্রয়াসের গুরুত্ব যথেষ্ট। সুভাষ-চন্দ্র যেহেতু ন্যাশন্যাল প্ল্যানিংয়ের প্রবর্তক সেই কারণে কংগ্রেস সভাপতিপদে তাঁর পুনর্নির্বাচনের পক্ষে রবীন্দ্র-নাথের সমর্থন আদায়ের জন্য শান্তিনিকেতন গিয়েছিলেন। সেখানে ১৪ নভেম্বর, ১৯৩৮ তারিখে ছাত্রসভায় এক দারুণ বক্তৃতা করেন, তাতে শান্তিনিকেতনে কতখানি অশান্তির লক্ষণ দেখা দিয়েছিল জানি না, বাইরে কিন্তু অশান্তির সীমা ছিল না, বিশেষত সুদূরে পন্ডিচেরীর শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে, যেখানে কর্মবিমুখ যোগসাধনা চলেছে, একথা বলার জন্য দশ বছর আগে সুভাষচন্দ্র প্রচন্ড নিন্দার সম্মুখীন হয়েছিলেন। শান্তিনিকেতনের সভায় মেঘনাদ সাহা যা বলেছিলেন, তা "ডঃ সাহার নতুন জীবনদর্শন" নামে সংবাদপত্রে বেরিয়েছিল। ঐ বক্তৃতায় সভাপতিত্ব করেছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।[১]

---

১ ডঃ সাহার পরিচয় দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন, "ইনি এমন একজন ব্যক্তি যাঁর পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন; এঁর খ্যাতি আমাদের মাতৃভূমির সীমাকে অতিক্রম করে গেছে, গর্বিত ইউরোপ পর্যন্ত এঁকে এক প্রধান বৈজ্ঞানিক বলে স্বীকার করেছে।" (অমৃতবাজার, ১৬ নভেম্বর, ১৯৩৮)।

'গর্বিত ইউরোপ' কিভাবে ডঃ সাহার বৈজ্ঞানিক প্রতিভাকে স্বীকার করেছিল, রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তার প্রত্যক্ষদর্শী। *Professor Meghnad Saha* গ্রন্থে পাই :

"...Here (in Berlin) he met and made personal acquaintance of scientists who now loom large in science : Planck, Einstein, Nernst, Von Lane, Rubens, Pringsheim, Grotrain, Westphal, Kohlschutter, Eggert and many others. He sent his paper "On a Physical Theory of Steller Spectra" to Prof. Arnold Sommerfield who was holding the Chair of Theoretical Physics at Munich. Prof. Sommerfield at once realised the fundamental nature of Saha's contributions and invited him to Munich to deliver a lecture on the subject. His visit to Munich coincided with that of the Poet Tagore who was receiving a great ovation there. Prof. Sommerfield visited the Poet and spoke to him highly of Saha's work. When Saha visited the Poet next day at his hotel to pay his respects to him, the Poet who had not known him before, received him very affectionately, enquired about his work and invited him to visit Santiniketan on his return to India."

শান্তিনিকেতন সভায় ডঃ সাহা পৃথিবীর ধর্মসমূহের পর্যালোচনা করে দেখান সকল ধর্মের দর্শনই কল্পনামূলক; সেইজন্য বৈজ্ঞানিক তাদের সত্যতা স্বীকার করে না। তিনি বলেন, জাতীয় 'আদর্শ' অনুযায়ী প্রাচীন ধর্ম ও দর্শনগুলিতে সৃষ্টিকর্তার কল্পনা করা হয়েছে। ইহুদী, চীনা ও ভারতীয় সৃষ্টিকর্তার চরিত্র বিচার করে তিনের মধ্যে চীনা সৃষ্টিকর্তাকেই ডঃ সাহা সবচেয়ে পছন্দ করেছিলেন এবং একেবারেই পছন্দ করেন নি ভারতীয় সৃষ্টিকর্তাকে। প্রাচীন চীনে সৃষ্টিকর্তা কারিগর, ভারতবর্ষে তিনি দার্শনিক। এর ফলে চীনের সমাজে কারিগর ও স্থপতির উচ্চস্থান এবং ভারতবর্ষের লোক অলস দার্শনিকতায় মগ্ন।২

হিন্দু ধর্ম ও দর্শনের বিষয়ে নানা বৈজ্ঞানিক আপত্তি উত্থাপনের পরে ডঃ সাহা স্বভাবতই আধুনিক ভারতীয় জীবনে উক্ত ধর্ম-দর্শনের মন্দ প্রভাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। এক্ষেত্রে গান্ধীনীতি তাঁর সদ্য আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছিল। আদিপর্বে মানুষ অতিশয় দুর্বল ও অসহায়, সেখান থেকে সে বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে বিরূপ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রাম করে। প্রকৃতির উপরে আধিপত্যের জন্যই সে অপর প্রাণী থেকে উন্নত। সেই আধিপত্যের চেষ্টা যদি কোনো মনুষ্যসমাজ ত্যাগ করে, সে অপর মনুষ্যসমাজের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পরাভূত হবেই। পুরনো ভারতীয় দর্শন এবং তারই অনুগত এখনকার গান্ধীদর্শনের অনুসৃতির ফলে ভারতবাসী তার দুর্গতির অবস্থাকে কাটিয়ে উঠতে পারছে না। "জীবনসমস্যার সমাধানের জন্য অনেকে বলেন যে, শহর থেকে গ্রামে ফিরে যাও, কুটীর শিল্পের উন্নতি কর, চরকা ঘোরাও।" সমস্যার সমাধান ঐ নীতির মধ্যে নেই তা তিনি বৈজ্ঞানিক হিসেবে গাণিতিক হিসাব করে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। ইউরোপের মানুষ ভারতীয় মানুষের চেয়ে ২০ গুণ বেশি কাজ করে, কারণ তারা প্রকৃতির শক্তিকে ব্যবহার করতে সমর্থ। গ্রামজীবনের মহিমা যাঁরা প্রচার করেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে বেপরোয়া ভঙ্গিতে ডঃ সাহা বলেছিলেন—"I have no glamour for villages and do not think they are ideal places for living." তাছাড়া, এদেশে ভূমির উপরে জনসংখ্যার যে-চাপ রয়েছে, তা অযথা বেড়ে যাবে যদি আরও লোক গ্রামে গিয়ে ভিড় করে। ভারতবর্ষ চিরদিন কৃষিজীবীর দেশ থেকে যাবে, ডঃ সাহার মতে, এর থেকে প্রতিক্রিয়াশীল ধারণা আর কিছু হতে পারে না। ওর দ্বারা সাধারণ মানুষের শোষণের পথ অব্যাহত থাকবে।—"Ruralisation will only lead to continuous exploitation of the poor by a few capitalists." সমস্যার সমাধানের উপায় শিল্পায়ন, যার দ্বারা বেকার সমস্যা দূর হবে এবং বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার অস্ত্রও তৈরি করা যাবে। শিল্প মানে অবশ্য কুটীর শিল্প নয়, বৃহৎ শিল্প; এবং, ডঃ সাহা জানিয়েছেন, মূল শিল্প অবশ্যই রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে থাকবে।—

"As Sun Yat Sen preached for China, I maintain that State-controlled capital with large measures of a social programme gives us a satisfactory way of solving the problems of regeneration of our industries to level of Europe and America."

ডঃ সাহার এই প্রখর ভাষণটি অবিলম্বে দেশে কতখানি বিজ্ঞানমনস্কতা সৃষ্টি করেছিল জানি না, কিন্তু আধ্যাত্মিক বিতৃষ্ণা যে বিশেষ উদ্রিক্ত করেছিল তা দেখতে পাই। পণ্ডিচেরী আশ্রম থেকে শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় হিন্দুধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে ডঃ সাহার বক্তব্যের প্রতিবাদ করে যা লিখেছিলেন, তা এই বৈজ্ঞানিকের সুবিধাই ঘটিয়েছিল, তিনি আরও কঠোরভাবে হিন্দুর শাস্ত্রীয় ধারণাদিকে আঘাত করার সুযোগ পেয়েছিলেন; সেই সঙ্গে প্রাচীন ভারতবর্ষে বৈজ্ঞানিক সভ্যতার বিশেষ উৎকর্ষ সম্বন্ধে যে-সকল পরিস্ফীত ধারণা আছে, তাদেরও বিধ্বস্ত করতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নি।৩

ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে ডঃ সাহার এই সকল আক্রমণের

---

২ "The Chinese Creator was a mechanic who shaped the world by his hammer and axe, and forge. So the Chinese became great mechanics, engineers and the artisan had a place in society which is much superior than in other nations.

"The Hindu Creator, on the other hand is a philosopher, who evolves everything, the phenomenal world, the living beings, the scriptures out of his meditations. So in the Hindu society great social prestige is attached to the mystic and professors of idle speculative philosophy. The mechanic and the engineer belong to a lower stratum and there is a complete divorce between the brain and the hand." (A. B. P. Nov. 16, 1938).

৩ ডঃ সাহার শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত বক্তৃতার বাংলা রূপ মাসিক ভারতবর্ষে প্রকাশিত হয় ১৩৪৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে। শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় তার আগের মাসেই প্রতিবাদ করেছিলেন সম্ভবত সংবাদপত্রের রিপোর্টের উপর নির্ভর করে। ডঃ সাহা অতঃপর কয়েক সংখ্যায় অনিলবরণ রায়ের প্রতিবাদের উত্তর দেন। উত্তরগুলি এক কথায়, বিধ্বংসী। অনিলবরণের ঐকান্তিকতা এবং হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে প্রীতি যথেষ্ট ছিল, কিন্তু ডঃ

পিছনে 'নব নীতি' প্রচারের উত্তেজনা ছিলই,—সে কথা 'মেঘনাদ রচনা সংকলনে'র সম্পাদক অধ্যাপক শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় স্বীকারও করেছেন।॥ ঐসব রচনা থেকে ডঃ সাহাকে যতখানি নিরেট জড়বাদী মনে হয় তিনি সত্যই তা ছিলেন না,৪ কিন্তু কুসংস্কারের, আড়ম্বরের সামনে তিনি ধৈর্যরক্ষা করতে পারতেন না, এবং মনে করেছিলেন, দায়িত্বশীল সামাজিক মানুষ হিসাবে প্রগতির পক্ষে ক্ষতিকর জিনিসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো তাঁর কর্তব্য। শোচনীয় দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেতে হলে, ভারতের পক্ষে বৃহৎ আকারে শিল্পায়নকে অবলম্বন করা ছাড়া উপায় নেই। এ সম্বন্ধে ডঃ সাহার মনে কোনই দ্বিধা ছিল না এবং এর বিরোধী ধারণাকে সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না। গান্ধীজীর গ্রামীণ শিল্পনীতি তাঁর নিতান্ত অপছন্দের বস্তু, একটু আগেই আমরা দেখেছি, আর—অপছন্দের বস্তু সম্বন্ধে শত্রুতাজ্ঞান করতে তিনি কখনই বিলম্ব করেন নি। আলোচ্য বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে ডঃ সাহা অনিলবরণের সঙ্গে গান্ধী-পন্থীদেরও আক্রমণলক্ষ্য করেছিলেন—

"বিজ্ঞানের নামে সমালোচকের দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে, মানুষ প্রকৃতিকে জয় করিয়াছে সত্য, কিন্তু সে তাহার অন্তর্নিহিত পাশবিক ভাবকে জয় করিতে পারে নাই।......

সাহার সম্মুখীন হবার মত পাণ্ডিত্য ছিল না। তাঁর রচনায় ছিল যুক্তির চেয়ে আবেগের প্রাধান্য, এবং ডঃ সাহার বিষয়ে অধিকন্তু কিছু কটূক্তি; ডঃ সাহা সেই দুর্বলতার সুযোগ নিয়েছিলেন পুরোমাত্রায়—সানন্দে ধ্বংসকার্য চালিয়ে গিয়েছিলেন। অনিলবরণের লেখায় এমন মনোভাব প্রকাশ পেয়েছিল, যা থেকে মনে হয়, ডঃ সাহা হিন্দু শাস্ত্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় রাখেন না। বিনয়কে ডঃ সাহা মহৎ গুণ বলে মনে করতেন না, সুতরাং সোজা জানালেন—"বিগত কুড়ি বৎসরে বেদ, উপনিষদ, পুরাণ ইত্যাদি সমস্ত হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থ এবং হিন্দু জ্যোতিষ ও অপরাপর বিজ্ঞানসম্বন্ধীয় প্রাচীন গ্রন্থাদি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া আমি কোথাও আবিষ্কার করিতে সক্ষম হই নাই যে, এই সমস্ত প্রাচীন গ্রন্থে বর্তমান বিজ্ঞানের মূল তত্ত্ব নিহিত আছে।" অপরপক্ষে অনিলবরণের বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্বন্ধে তিনি বলতে দ্বিধা করেন নি—"লেখক হয়ত পণ্ডিচেরী শ্রীঅরবিন্দ আশ্রমে আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধনে এতটা ব্যস্ত আছেন যে, গত পনের বৎসরের জ্ঞানবিজ্ঞানের রাজ্যে নূতন আবিষ্কারের কথা তাঁহার কর্ণে পৌঁছায় নাই এবং ধ্যানে বসিয়াও হয়ত অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা এই সমস্ত জ্ঞানলাভ করিতে পারেন নাই।" দেহপ্রাণের উপরে মনের উৎকর্ষ দেখাতে গিয়ে অনিলবরণ বক্রোক্তি করে বলেছিলেন, "মেঘনাদ বা রবীন্দ্রনাথ কেহই কারিগর নহেন; তাই বলিয়া একজন নিপুণ তাঁতী বা মুচীর স্থান তাঁহাদের ঊর্ধ্বে হইবে?" মেঘনাদ উত্তর দিয়েছিলেন—"একজন মূর্খ পুরোহিত যে সংস্কৃত মন্ত্রের অর্থ না জানিয়াই শ্রাদ্ধ বা বিবাহের মন্ত্র পড়ায়, তাহার সামাজিক সম্মান তাঁতী বা মুচীর অধিক হইবে কেন? তাঁতী বা মুচী পরিশ্রম দিয়া সমাজের একটা বিশেষ কাজ করে, কিন্তু মূর্খ পুরোহিতকে প্রতারক ব্যতীত আর কী বলা যাইতে পারে? কসাইর ছেলের যদি প্রতিভা থাকিত, তাহা হইলে ইউরোপে সে শেক্সপীয়ার হইতে পারিত, কিন্তু এদেশে প্রাচীন প্রথা অনুসারে সে রবীন্দ্রনাথ বা কালিদাস হইতে পারিত না, হইবার চেষ্টা করিলে ভগবানের অবতার রামচন্দ্র স্বয়ং আসিয়া তাহার মাথা কাটিয়া বর্ণাশ্রমধর্ম রক্ষা করিতেন।" ডঃ সাহা নিজ বিশ্বাসের উপরে কোনই আবরণ দিতেন না, সুতরাং তাঁর লিখতে বাধে নি—"কোন মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেবতাকে ডাকিলে সিদ্ধিলাভ হয়—আমার এ বিশ্বাস কদাপি ছিল না, এখনও নাই। আমার মতে উহা একটি মধ্যযুগীয় কুসংস্কার মাত্র।" ডঃ সাহার রচনায় উৎপীড়িত হয়ে কেউ কেউ তাঁকে নরকস্থ দেখতে চেয়েছিলেন। তাতে খুশি হয়ে ডঃ সাহা বলেছিলেন, আমার বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই, কারণ নরকে বৈজ্ঞানিক আরামাদির ব্যবস্থা প্রচুর।

ডঃ সাহার বক্তব্যের সত্যতা বা শিষ্টতার পরিমাণ নির্ণয় আমার সাধ্যেও নেই, সামর্থ্যেও নেই। এগুলির উল্লেখের উদ্দেশ্য, ডঃ সাহা যে বৈজ্ঞানিক মনোভাব এদেশে জাগাতে চাইছিলেন, তার জন্য অনেক পুরনো ধারণাকে নির্মমভাবে উৎসাদিত করতে চেয়েছেন, ও একাজে তাঁর সাহসের অভাব হয় নি। ডঃ সাহা ভাববিপ্লবী হওয়ার শক্তি ধরতেন সন্দেহ নেই।

অনিলবরণ রায়ের সঙ্গে ডঃ সাহার বাদপ্রতিবাদমূলক রচনাগুলি অধ্যাপক শ্রীশান্তিময় চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মেঘনাদ রচনা সংকলনে'র মধ্যে পাওয়া যাবে।

৪ ১৯৩১ সালে *Golden Book of Tagore*-এর জন্য ডঃ সাহা *Poetry and Science* নামে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তার মধ্যে তিনি ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে অতি প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত কবিদের ভূমিকার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন। কবিদের বস্তুজ্ঞানের প্রশংসা তিনি করতে না পারলেও ভাষার দ্বারা জনগণকে উদ্দীপিত করার ক্ষমতা তিনি স্বীকার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রভূত প্রশংসা করেও আক্ষেপ করতে ছাড়েন নি, তিনি গ্যেটের মত বিজ্ঞানের প্রতি মনোযোগী মন।

এই রচনায় সাহা প্রচলিত ধর্মকে নস্যাৎ করেও এক নূতন বৈজ্ঞানিক প্রাণধর্মের কথা বলেছেন—

"বিজ্ঞান, জগতের যে নূতন রূপ উন্মোচিত করিয়াছে সে সম্বন্ধে কবিরা অনেকেই অজ্ঞ।...আধুনিক বিজ্ঞানের ধ্বংসাত্মক দিকটিই কেবল তাঁহারা দেখিতে পান।...আইনস্টাইন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের যে অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের আভাস দিয়াছেন, যেখানে স্থান ও কাল একাত্ম, তাহা সম্বন্ধে ইঁহাদের কোনই ধারণা নাই। ইঁহারা জানেন না, বিজ্ঞানীরা

অনেক গান্ধীপন্থী বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উপস্থিত করিয়া চরকা, গোরুর গাড়ি, ও বৈদিক তাঁতের আধ্যাত্মিক শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করেন।" ('মেঘনাদ রচনা সংকলন', পৃঃ—১৫৫)

"প্রাকৃতিক শক্তিকে কার্যে বিনিয়োগ করার ফলে প্রতি ইংলন্ডবাসী কম-বেশি দশটি ক্রীতদাসের পরিশ্রমলব্ধ সম্পদের অধিকারী হইয়াছে।...একণে বক্তব্য, যদি এদেশের সুমহান অধ্যাত্মতত্ত্বের সাধকগণ এবং তথা গান্ধীপন্থিগণ এই সামান্য তত্ত্বটি উপলব্ধি করিয়া কর্মক্ষেত্রে অগ্রসর হন, তবে আমাদের দেশে চরকা, গোরুর গাড়ি, বৈদিক তাঁত ও প্রাচীন শাস্ত্রের মারাত্মক আধ্যাত্মিকতার বস্তু হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া ভবিষ্যতে মহীয়সী সভ্যতার পথে দ্রুত অগ্রসর হইতে পারে।" (ঐ—পৃঃ—১৫৮-৫৯)

উদ্ধৃত অংশগুলিতে নিছক খোঁচা দেওয়ার মনোবৃত্তি দেখা গিয়েছে পটভূমিকা অনুযায়ী। কিন্তু এর কয়েক-মাস আগে মডার্ন রিভিউ পত্রিকার অগাস্ট সংখ্যায় (যেটিকে 'শিল্পসংখ্যা' বলা যায়) *Philosophy of Industrialisation* নামে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে বক্তব্যের বিষয় গুরুত্ব অনেক বেশি পরিমাণে ছিল। প্রবন্ধটিতে গান্ধীজীর কুটীর শিল্পনীতিকে এমন যুক্তি ও তথ্যের সাহায্যে আক্রমণ করা হয়েছিল যে, সারা ভারতবর্ষে বুদ্ধিজীবীমহলে সাড়া পড়ে যায়, গান্ধীপন্থীরা নাড়া খেয়ে প্রতিবাদ করতে এগিয়ে আসেন,—তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন গান্ধীবাদী শিক্ষাবিদ্ ডাঃ কুমারাপ্পা। উক্ত প্রবন্ধে ডঃ সাহার বক্তব্য থেকে দেখতে পাই, শিল্পায়ন ব্যাপারটিকে তিনি কখনই নিছক কতকগুলি যন্ত্রপাতিযুক্ত কাণ্ডকারখানা বলে মনে করেন নি, এর সঙ্গে জীবনবোধের সুনিশ্চিত যোগ।

"All human actions springs from conviction, and if we continue to look back

ধর্মের গোঁড়া অনুশাসন মুক্ত হইয়া প্রকৃতির অন্তরের সত্তার উপাসনায় রত। প্রাণহীন সাংকেতিক মূর্তি অপেক্ষা প্রাণের পূজায় ইঁহারা বিশ্বাসী।" ('মেঘনাদ রচনা সংকলন')

এই যাঁর বক্তব্য, তিনি কখনো প্রচলিত অর্থে জড়বাদী বা সুখবাদী হতে পারেন না। বিজ্ঞান ও ধর্মের সম্পর্ক সম্বন্ধেও তিনি একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত *The Cultural Heritage of India* গ্রন্থে। প্রবন্ধটি লেখেন ১৯৩৭ সালে, যার অনেক আগেই তাঁর মত সংগঠিত হয়ে গেছে এবং যার এক-দেড় বছরের মধ্যে অনিলবরণের সঙ্গে ধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ করবেন। 'বিজ্ঞান ও ধর্ম' রচনায় বিজ্ঞানের মহিমা যথেষ্ট জানিয়েও তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছিল—স্পেংলারের মতানুযায়ী বলতে হয়েছিল,—"প্রকৃতিকে বশ করিতে শিখিলে কি হইবে নিজের প্রকৃতি এখনো তাহার আয়ত্তাধীন নহে। পশ্চিমের শক্তিগুলি এমনই স্বার্থান্ধ ও জাতীয়তাবাদী হইয়া উঠিয়াছে যে, হয়ত ধর্মকে বাদ দিবার মত কোনো গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের পূর্বেই তাহারা নিজেদের মধ্যে হানাহানি করিয়া মরিবে, এবং তাহাদের এতদিনকার সভ্যতা ও সংস্কৃতিও বিলুপ্ত হইবে।" এই সমস্যার সামনে দাঁড়িয়ে মেঘনাদ সাহা তাঁর পরিচিত বিশ্বাস অনুযায়ী চলেছেন, নূতন ধর্মপ্রবর্তকের দ্বারা সকল সমস্যার সমাধান হবে এমন বিশ্বাস তাঁর নেই। অথচ বিস্ময়ের কথা, ঐ প্রবন্ধে এক বৈজ্ঞানিক ধর্মের সম্ভাবনার কথা উড়িয়ে দিতে পারেন নি —"প্রচলিত ধর্মগুলি বিজ্ঞানসম্মতভাবে অনুধাবন করিলে এবং সেই সঙ্গে মানবমন ও জীবনের আদ্যোপান্ত বিশ্লেষণ করিলে হয়ত আবার ধর্মকে তাহার পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করা যাইতে পারে।" ডঃ সাহা তাঁর আকাঙ্ক্ষিত ধর্মের প্রকৃতি বুঝিয়েছেন স্পিনোজার উক্তি উদ্ধৃত করে। স্পিনোজার মতে, শীত গ্রীষ্ম ঝড় বৃষ্টি প্রভৃতি যেমন আবহাওয়ার ধর্ম, তেমনি প্রেম দয়া মায়া কাম ক্রোধাদি মানবপ্রকৃতির ধর্ম। আবহাওয়ার কার্যকলাপ যেমন বৈজ্ঞানিকভাবে নির্ণয় করার চেষ্টা করা হয়, মানববৃত্তিগুলি সম্বন্ধে প্রীতি বা বিদ্বেষের অনধীন হয়ে যদি সেগুলির কার্যকারণ সন্ধান করা যায় তাহলে বিশুদ্ধ আনন্দ পাওয়া যেতে পারে। ডঃ সাহার মতে—"এই উপায়ে এক বিবর্তনশীল ধর্মভাবের উদ্ভব হইবে। ইহার জ্ঞান ও প্রয়োগবিধি প্রচার করা বিজ্ঞানশিক্ষার মতই সহজসাধ্য।...বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে অধীত হইলে ধর্ম ক্রমে জ্ঞানের এমন ক্ষেত্র উন্মুক্ত করিবে, যাহা চিকিৎসাশাস্ত্র অপেক্ষাও অধিক কার্যকরী—কেন না ধর্ম মানুষের সত্তাকে শিখাইবে সমাজ ও প্রকৃতির সহিত একাত্মবোধ।"

ধর্ম সম্বন্ধে ডঃ সাহার এহেন মনোভাব শ্রীরামকৃষ্ণ শতবার্ষিকী গ্রন্থের পাল্লায় পড়েই, এমন মনে করার কারণ নেই। স্থান ও কাল যেখানে একাত্ম, যার সঙ্গে অভেদবোধে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যের আভাস পাওয়া সম্ভব—কবির সেই আদর্শকর্মের কথা 'বিজ্ঞান ও কাব্য' প্রবন্ধে যাহা আগেই বলেছেন। অনিলবরণের সঙ্গে তর্কযুদ্ধের সময়েও তিনি বলছিলেন, "তাঁহার বিশ্বাস যে, প্রাচীন ধর্মগ্রন্থসমূহে যে সকল জাগতিক তথ্য ঐতিহাসিক জ্ঞান ও মানবচরিত্রের অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহাদের উপর বর্তমান যুগের 'আধ্যাত্মিকতা' প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। কিরূপে "বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তির" ভিত্তিতে নবযুগের উপযোগী "আধ্যাত্মিকতা"র প্রতিষ্ঠা হইতে পারে, প্রবন্ধান্তরে তাহার সবিশেষ আলোচনা করা যাইবে।" এই বৈজ্ঞানিক আধ্যাত্মিকতার কথা কোনো প্রবন্ধে ডঃ সাহা লিখেছেন বলে জানি না কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর মনে তাগিদ ছিল দেখতে পাই। সাহার প্রতিভাবান সহপাঠী সুরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যিনি পরে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী নির্বেদানন্দ হয়েছিলেন, তাঁর সঙ্গে ধর্ম বিষয়ে গভীর জিজ্ঞাসা নিয়ে তিনি আলোচনা করতেন, একথা জানি। এবং একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, সাহার বৈজ্ঞানিক ধর্ম স্বামী বিবেকানন্দের অদ্বৈত বেদান্ত ধর্মের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

সাধনা
বিউটি স্নো-এর
কোমল স্পর্শে
সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়
সাধনা বিউটি স্নো
একটি অতি আধুনিক অঙ্গরাগ
ত্বক মালিন্যমুক্ত ও লাবণ্যযুক্ত করে। মুখশ্রীতে লালিত্যের ও তারুণ্যের আভা ফুটে ওঠে।
SADHANA
Beauty
সাধনা ঔষধালয় কলিকাতা-৫

with wistful eyes to the supposed charms of older methods of living, we can never decide upon the line of action which alone can lead to the fulfilment of our national desire."

প্রবন্ধের গোড়ার দিকে লেখক শিল্পায়ন প্রসঙ্গে গান্ধীজী ও চার্লি চ্যাপলিনের একটি সাক্ষাৎকারের উল্লেখ করেছিলেন। দরিদ্র দেশে খাদির দ্বারা কিভাবে জনগণের কিছু আর্থিক সাশ্রয় হয়, গান্ধীজী তা চার্লিকে বোঝাতে চেয়েছিলেন। বড় কারখানা অপরপক্ষে গ্রামীণ শিল্পীদের কর্মনাশ করে। তাতে চার্লি বলেন, "আমি বুঝতে পারছি তোমাদের দেশের শাসকসম্প্রদায় জনগণের সুখ-দুঃখ নিয়ে বিশেষ ভাবিত নয়। জনগণ দারিদ্র্যে ডুবে আছে। কল-কারখানার বৃদ্ধির ফলে তারা বেকার, দারিদ্র্যের মূল কারণ তাই। কিন্তু ধরো, যদি এমন হয় যে, সরকার আধুনিক পদ্ধতিতে শিল্পব্যবস্থা তৈরী করবে, সে দেখবে যে, প্রতিটি ব্যক্তির কর্মসংস্থান হয়, তারা উপযুক্তভাবে অন্নবস্ত্র ও আশ্রয়ের সুযোগ লাভ করে, সেই সঙ্গে আধুনিক জীবনের সুযোগ-সুবিধাও পায়, তখনো কি তুমি যন্ত্রের বিরোধিতা করবে? তখনো কি আদিম উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার পক্ষে প্রচার চালাবে?"

ডঃ সাহা বলতে চেয়েছেন, চার্লির প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর গান্ধীজী দিতে পারেন নি; এবং, অনেক কংগ্রেসীর কাছে ঐ প্রশ্ন করেও ডঃ সাহা সদুত্তর পান নি। কংগ্রেসী-দের কথা শুনে মনে হয়, জাতীয় পুনর্গঠন সম্বন্ধে তাঁদের স্পষ্ট কোনো ধারণাই নেই। তাঁরা অনেক বকেন, কিন্তু জানেন না কি বকছেন। নচেৎ এক নিশ্বাসে গ্রামে চরকা প্রবর্তনের সঙ্গে gird electrification-এর কথা বলতেন না। গ্রামোদ্যোগ, জমিদারী উচ্ছেদ, মহাজনী বন্ধ, বা কুটীর শিল্পের উন্নতিতে যে দেশের দারিদ্র্য দূর হবে না, তা যুক্তিতথ্যসহ বোঝাবার পরে ডঃ সাহা ব্যাখ্যা করে বলেছেন শিল্পায়ন বলতে ঠিক কি বোঝায়—

"The technique nsed by most advanced countries of the world at present time is so complex that it is very wrong to classify it as the continuation of the primitive Iron Age Culture. It constitutes entirely a new phase in culture, distinguished not only by a new system of industrial production, but also by a new philosophy of human life. This new age has been variously called the new-technique age in contradistinction by the pales-technique age which has passed off and the change is sometimes termed as the Third Revolution (Gordon Childe) of which the Industrial Revolution of the last century was only a precursor. But it is better to call the present one as the age of science, because human activity in the present age springs from the conviction, that by the application of science we can attain to a much better standard of living and in general to a much better world... To have a comprehensive idea of the New Age, we should look at the kind of life persued in a country like U.S.A., England or Germany."

মেঘনাদ সাহা যে জীবনদর্শনকে নস্যাৎ করতে চেয়ে-ছিলেন তার পক্ষ সমর্থনে এগিয়ে এলেন 'অল ইণ্ডিয়া ভিলেজ ইনডাসট্রিজ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ডঃ জে সি কুমারাপ্পা। তিনি নিজ আদর্শের পক্ষে ধ্রুববাক্যগুলি ব্যবহার করলেন: "মানুষ শুধু অন্নজীবিত নয়", "সারা পৃথিবী জয় করেও যদি মানুষ নিজ আত্মাকে হারিয়ে ফেলে, সে সত্যই কী লাভ করল!" ইত্যাদি। "মানুষ এখন যন্ত্রের দাস",—ডঃ কুমারাপ্পা জানালেন,—"যে-যন্ত্র মানুষের কাছে নৈপুণ্য দাবি করে না, দাবি করে শুধু তৎপরতা।" চার্লি চ্যাপলিনকে গান্ধীজী কোনো সদুত্তর দিতে পারেন নি, এক কথায় আপত্তি জানিয়ে তিনি বললেন, কংগ্রেসীরা বৈদ্যুতিকীকরণ ব্যাপারটা বোঝে না তাও একেবারে সত্য ন। "ওয়ার্ধা স্কীম অব এডুকেশন", "অল ইণ্ডিয়া স্পিনারস অ্যাসোসিয়েশন", "অল ইণ্ডিয়া ভিলেজ ইনডাস-ট্রিজ অ্যাসোসিয়েশন" প্রভৃতির দ্বারা কংগ্রেস কিভাবে গ্রামোদ্যোগের চেষ্টা চালাচ্ছে, সেকথা বলার পরে সবশেষে জানালেন, বৃহৎ শিল্পায়ন উৎপাদন-শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে হিংসা ও সাম্রাজ্যবাদের দিকে মানুষকে ঠেলে দেয়—সে পথ কখনই বাঞ্ছনীয় নয়।

"Finally, I would like to remind Dr. Saha that we must learn by the experience of other countries. Every country that has taken to centralisation of production has ultimately drifted towards Imperialism and armaments. I am sure that Dr. Saha does not mean that we in India should also develop a war mentality. As a scientist, I am sure, he deplores the prostitution of science to serve violent means of large-scale destruction. If India can give a lead in this direction by having nothing to do with the means and methods of economic production based on violence, she will be surving humanity to gain real and lasting peace based on love and truth." (A.B.P. Aug. 18, 1938).

[ক্রমশ]

বঙ্গ দর্শন

পাকা ব্যবস্থা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমি-রাজস্বদপ্তর সম্প্রতি বেনামী জমি, সরকারী খাস জমি এবং বেআইনী ভেড়ি উদ্ধারের জন্য কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ নীতি নির্ধারণ করেছেন। এই নীতি কার্যকরী হলে একদিকে কৃষক জমি পাবে, আর অন্যদিকে শরিকী সংঘর্ষ দূর করে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের জন্য কৃষকদের প্রস্তুতি গড়ে তোলা সম্ভব হবে বলে ফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ আশা করেন। যুক্তফ্রন্ট কমিটির পক্ষ থেকে প্রচারিত এক বিবৃতিতে কৃষকদের জমি উদ্ধারের কাজকে উৎসাহ দেবার সঙ্গে সঙ্গে যে সব ক্ষেত্রে ভুল ত্রুটি হয়েছে সেগুলি সংশোধন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিটি সুস্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন যে, পঁচাত্তর বিঘার কম জমির আইনত অধিকারীর কাছ থেকে জমি দখল করা চলবে না, এই ধরণের দখল হলে তা ফিরিয়ে দিতে হবে। সরকারের হাতে ন্যস্ত এবং সরকারের অধিকারে যে জমি আছে তা বন্টনের জন্য প্রত্যেক থানা স্তরে জে-এল-আর-ও এবং ওই এলাকায় কর্মরত সমস্ত কৃষক সংগঠন নিয়ে ভূমিবন্টন উপদেষ্টা কমিটি গঠিত হবে। বন্টনক্ষেত্রে প্রথম অগ্রাধিকার দেওয়া হবে ওই এলাকার ভূমিহীন কৃষককে, তারপর পাবে দুই একরের কম জমির মালিক, তারপর পাবে পার্শ্ববর্তী এলাকার উক্ত পর্যায়ের কৃষক। কাউকেই দুই একরের বেশি জমি দেওয়া হবে না। গ্রামাঞ্চলে উক্ত কমিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে পরামর্শ করে জমি বিলি করবেন। জে-এল-আর-ও র সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হবার পূর্বে কৃষক সংগঠন ক্ষেতমজুর সংগঠনের প্রতিনিধিরা একটি সর্বসম্মত তালিকা প্রণয়নের জন্য চেষ্টা করবেন। জে-এল-আর-ওর সঙ্গে বিরোধ দেখা দিলে তা মন্ত্রীর কাছে পেশ করতে হবে। মন্ত্রীর সিদ্ধান্ত হবে চূড়ান্ত। যদি কোন কৃষক বঞ্চিত হয় তাহলে সে সরাসরি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করতে পারবে। এই নীতির ফলে শরিকী সংঘর্ষও দূর হবে। সাধারণভাবে একটি এলাকায় কর্মরত সমস্ত শরিক দল যুক্তভাবে পরিকল্পনা করে জমি উদ্ধারের কাজে আন্দোলন করবে। কোন একক সংগঠন উদ্যোগ নিলেও, উদ্ধার করা জমি এবং রায়তী স্বত্বের জমিতে ভেড়ি করা হয়েছে এমন ভেড়ির জমি বন্টনের সময় এলাকায় কর্মরত সমস্ত সংগঠনের সঙ্গে পরামর্শ করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উদ্ধার করা জমি ও ভেড়ি বিতরণের সময় সরকারের অধিকৃত জমি বিতরণের নীতি অনুসরণ করা হবে। প্রথমে যে কৃষকের রায়তী স্বত্বের জমিতে ভেড়ি করা হয়েছে সেখানে সেই কৃষক পাবে অগ্রাধিকার। অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকারী জমির পদ্ধতিই প্রযোজ্য হবে। উদ্ধারের ক্ষেত্রে বা বন্টনের ক্ষেত্রে শরিক দলগুলির মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে নিজেরা মেটাবার চেষ্টা করবে এবং যদি সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় তাহলে বিষয়টি উর্ধ্বতন যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দের কাছে পেশ করতে হবে। কোন ক্ষেত্রেই আইনত অধিকারভুক্ত পঁচাত্তর বিঘার কম জমির মালিকের গায়ে হাত দেওয়া হবে না।

নিঃসন্দেহে এই পাকা ব্যবস্থার জন্য যুক্তফ্রন্ট অভিনন্দন দাবি করতে পারেন। এ বিষয়ে দ্বিমত হবার কোন অবকাশই নেই যে, জোতদারেরা নানাভাবে লক্ষ লক্ষ একর জমি বেআইনীভাবে দখল করে আছে। শক্তিশালী কৃষক আন্দোলন ব্যতীত ওই জমি উদ্ধার করা সম্ভব নয়। বিগত কয়েক মাস কৃষক আন্দোলনের ফলে এই ধরণের কিছু বেআইনী জমি উদ্ধার করা হয়েছে, কিন্তু এই আন্দোলনকে আরও সংঘবদ্ধ ও সংহত করতে হবে। যুক্তফ্রন্ট স্বীকার করেন যে, এই আন্দোলনের পথে দু-চারিটি ক্ষেত্রে অন্যায়ভাবে জমি দখল করা হয়েছে এবং সেই ঘটনাগুলিকে পরীক্ষা করা দরকার। কেন না আগামী দিনে এমন আন্দোলন গড়ে উঠবে যাতে জোতদারেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। তারা যাতে কোন সুযোগ নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি না করতে পারে সেই জন্য সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে আন্দোলন ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। যুক্তফ্রন্টের তরফ থেকে খোলাখুলি ঘোষণা করা হয়েছে যে, সমস্ত শরিক দলকে লক্ষ্য রাখতে হবে জোতদার ও কায়েমী স্বার্থের লোকেরা যেন কোনক্রমেই তাদের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণের সুযোগ না পায়। বলাই বাহুল্য, এইরকম একটি সুষ্ঠু নীতি প্রণয়নের প্রয়োজন দীর্ঘকাল আগেই হয়েছিল এবং আরও কিছুকাল পূর্বে এই নীতি ঘোষিত হলে জমি দখলের বিষয়কে উপলক্ষ করে যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে যারা কুৎসা রটাচ্ছে তাদের মুখ সহজেই বন্ধ করা যেত।

উত্তরবঙ্গে বন্যার সংকেত

গত কয়েকদিন ধরে অনবরত বৃষ্টির দরুণ দার্জিলিং-এর পাহাড়ী নদনদীগুলির প্রবল জলোচ্ছ্বাসে এ অঞ্চলের বিশাল বিশাল বসত ও শস্যভূমি ভাঙনের সম্মুখীন হয়েছে এবং এই প্লাবনের তোড়ে নদীগুলির গতিপথের পরিবর্তন শুরু হয়েছে। শিলিগুড়ির মহকুমা শাসক ইতিমধ্যেই এই ব্যাপারটি রাজ্য সরকারকে জানিয়ে নদীর স্রোতোধারা পরিবর্তন রোধের ব্যবস্থা অবিলম্বে অবলম্বনের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বালাসন নদীর ভাঙনের ফলে শিলিগুড়ি ও বাগডোগরার মধ্যবর্তী বহু বর্গমাইল জায়গা জুড়ে কয়েকটি মৌজার অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়েছে। এই এলাকায় প্রায় পাঁচশো পরিবারের বাস। পূর্ব-পশ্চিমে প্রবাহিত মেচি নদীটির স্রোতোধারা দক্ষিণমুখী হয়ে বিশাল ধানী জমি এলাকা ও জনবসতিকে বিপন্ন করে তুলেছে। বাগডোগরার দক্ষিণাঞ্চল এবং ৩১ নং জাতীয় সড়কটিও মহানন্দা নদীর প্লাবনের সম্মুখীন হয়েছে। উত্তরবঙ্গের চেল নদীতে জলস্ফীতির ফলে ও নদীর গতিধারার পরিবর্তনের ফলে হলদিবাড়ী শহর, রেলপথ ও জাতীয় সড়ক বিপন্ন হয়ে পড়েছে। শহর ও রাস্তাঘাট রক্ষার জন্য রাজ্য সরকার জরুরী ব্যবস্থা হিসাবে সেখানে প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম কিছু কিছু পাঠিয়ে দিয়েছেন। রাজ্য সরকার জরুরী পর্যায়ে শহর ও রাস্তাঘাট রক্ষার জন্য কাজকর্ম শুরু করার জন্য অর্থ মঞ্জুর করেছেন। প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতের

ফলে দিনহাটা শহর ও পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলির কতকগুলি বাড়ি জলমগ্ন হয়েছে। দিনহাটা শহরের নিচু অঞ্চলগুলি এখনো জলের তলায় রয়েছে। দিনহাটা মহকুমার ধারলা ও সিংঘী নদীতে জলস্ফীতি ঘটেছে। প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে তিস্তা নদীর জল আবার মণ্ডলঘাট অঞ্চল প্লাবিত করেছে। বোয়ালমারী এবং নন্দনপুর গ্রাম ডুবে গেছে। মণ্ডলঘাট রাইস মিল পর্যন্ত তিস্তার জল এসে পৌঁচেছে। ঘরঘরিয়া ব্রীজ এবং মণ্ডলঘাট স্টেশনের মধ্যবর্তী সড়কে দুই ফুট জল জমেছে। বন্যাকবলিত মণ্ডলঘাটের উক্ত এলাকার উদ্ধারকার্য চালাবার জন্য সরকারী লোক পাঠানো হয়েছে। হলদিবাড়ীর নারায়ণপুর গ্রামও তিস্তার জলে প্লাবিত হয়েছে। তিস্তার জল ঢুকে পড়ায় করলা নদীর জল বেড়েছে। জলপাইগুড়ি শহরের করলা নদীর জলও দুকূল ছাপিয়ে নিম্নাঞ্চলগুলি ডুবিয়ে দিয়েছে। সমাজপাড়া, হাসপাতালপাড়া এবং সেনপাড়ার কিছু অংশে হাঁটু জল দাঁড়িয়েছে। সামগ্রিক পরিস্থিতি অবশ্য এখনও আয়ত্তের বাইরে নয় এবং যুক্তফ্রন্ট সরকার গোড়া থেকেই উত্তরবঙ্গের বন্যাপরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন, এটাই ভরসার কথা। ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ডরায়। গত বছরের শোচনীয় অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি আর যাতে না ঘটে সেটাই এখন দেখতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ যোগ্য যে, গত বছর উত্তরবঙ্গের বন্যাপরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু সাহায্য করার কথা ছিল। কেন্দ্রীয় সরকার স্টাডি টীমও পাঠিয়েছিলেন এবং তাঁরা প্রয়োজনের তুলনায় কম হলেও এই বিষয়ে কয়েক কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সাহায্যের জন্য সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু সেই বাবদে কেন্দ্রীয় সরকার কিছু দিয়েছিলেন বলে মনে হয় না। পরবর্তীকালের রাজনৈতিক ডামাডোলের মধ্যে বোধ হয় বিষয়টি হারিয়ে গেছে। বিষয়টি সম্পর্কে পুনরায় চিন্তা করার জন্য আমরা সেচমন্ত্রীকে অনুরোধ করব।

শহরাঞ্চলের সম্পত্তি

গ্রামাঞ্চলে সর্বোচ্চ পরিমাণ জমির সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে এবং যারা বেনামীতে জমি লুকিয়ে রেখেছে তাদের কাছ থেকে জমি উদ্ধারের অভিযান চলছে এটা অবশ্যই আনন্দের কথা। তবে সেই উদ্ধারের পদ্ধতি নিয়ে বহুক্ষেত্রেই বিতর্কের অবকাশ ঘটেছিল, কিন্তু এ দিকে যুক্তফ্রন্ট সতর্ক হবার ফলে এখন আর সে-সম্ভাবনাটা নেই। কিন্তু প্রসঙ্গত এ কথাটাও মনে রাখা দরকার যে, রাজ্যের সকল নাগরিকই আইনের চোখে সমান, গ্রামাঞ্চলে সম্পত্তির সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে, অথচ শহরাঞ্চলে সম্পত্তির ক্ষেত্রে কোন সীমারেখা নেই। এখানে যত খুশি জমি কেনা যায়, যতগুলি খুশি বাড়ি বাড়ানো যায়, যততলা খুশি বাড়ি হাঁকানো যায়। আর্থিক মূল্যের বিচারে কলকাতা শহরের এককাঠা জমির দাম গ্রামের কয়েক বিঘার চেয়েও বেশি। তদুপরি গগনচুম্বী বিলডিং তুলে কালো টাকাকে সহজেই সাদা করা যায়; বিলডিং-এর নির্মাণব্যয় কম করে দেখালেই চলে। গ্রাম ও শহরের এই পার্থক্য বজায় রাখার নিশ্চয়ই কোন প্রয়োজন নেই, নীতির বিচারেও এই পার্থক্য বজায় রাখা চলে না। কাজেই শহরাঞ্চলের সম্পত্তির সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেবার প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। এ-ছাড়া পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এখন যেমন অর্থাভাব তাতে এই গগনচুম্বী বিলডিংগুলির, যেগুলিকে অফিসের প্রয়োজনে ও নানাভাবে ভাড়া দিয়ে মাসে লাখ লাখ টাকা তোলা হয়, সেগুলির ওপর স্পেসাল রেন্ট বসানো দরকার। আশা করি যুক্তফ্রন্ট সরকার এ বিষয়ে অবহিত হবেন।

ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে ধর্মঘট কেন ?

ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের ডাক্তার-নার্স-কর্মচারীদের একাংশের ধর্মঘটের ওপর রাজ্যের সকল সুস্থ এবং সুস্থ-হতে-চাওয়া মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ। গত ১০ই জুলাই সকাল থেকে ডাক্তার-কর্মচারী-নার্স-ছাত্র ইউনিয়নের কো-অর্ডিনেশন কমিটির ডাকে এই ধর্মঘট শুরু হয়েছে। কো-অর্ডিনেশন কমিটির পক্ষ থেকে শ্রীগৌরমোহন ঘোড়ুই এবং ডাঃ সুশান্ত বসু আমাদের বলেছেন যে, ১৯৬৭ সালে প্রিন্সিপাল/সুপারিনটেন্ডেন্ট হিসাবে স্থায়িভাবে ডাঃ দেবব্রত রায়মহাশয়কে সরকার এই হাসপাতালে নিয়োগ করেন। ডাঃ রায়মহাশয়ের যে উপযুক্ত কোয়ালিফিকেশনই ছিল তাই নয়, তাঁর বিচক্ষণতা এবং পক্ষপাতশূন্য পরিচালন-ব্যবস্থা হাসপাতালের সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল। গত মার্চ মাসে অসুস্থতার জন্য তিনি ছুটি নিলে ডাঃ লাহিড়ী (একজন অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর) অস্থায়িভাবে অধ্যক্ষের কার্যভার গ্রহণ করেন। তারপর ডাঃ রায়মহাশয়ের ছুটির মেয়াদ শেষে ৩০শে জুন যখন তাঁর পূর্ব পদে যোগদানের কথা, তখন তাঁকে হেলথ ডাইরেক্টরেটে বদলি করে ডাঃ লাহিড়ীর মত একজন জুনিয়ার প্রফেসরকে—যিনি তাঁর তিন মাস কার্যকালে হাসপাতালের সর্বস্তরের কর্মী, ডাক্তার, নার্স, ছাত্রদের অপ্রীতিভাজন হয়েছেন—তাঁকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে নিয়োগপত্র দেবার কি যুক্তি থাকতে পারে? কো-অর্ডিনেশন কমিটি মনে করেন যে, এই নিয়োগ সরকারের ২৫শে জুনের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেছে। যেখানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি এবং নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারে কো-অর্ডিনেশন কমিটির সঙ্গে আলোচনা করে সব নির্ধারণ করা হবে। উপরন্তু গত ১৯শে এপ্রিল কো-অর্ডিনেশন কমিটির যে প্রস্তাব সরকার গ্রহণ করেছিলেন, তাতে বলা হয়েছিল:

"The State Government is requested to appoint Principal Superintendent and Director Professors from the Senior non-practising West Bengal Medical Service Cadre."—

এই নিয়োগে সেই প্রস্তাবকেও অগ্রাহ্য করা হয়েছে। তাঁরা আরো বল্লেন—ডাঃ লাহিড়ীকে যেভাবে ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিক্যাল সার্ভিসের ১২২ জন সিনিয়ার অধ্যাপককে ডিঙিয়ে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়েছে তা সম্পূর্ণ বে-আইনী এবং রীতিবিরুদ্ধ। এবং এই নিয়োগপত্র বাতিল করার ব্যাপারটা এখন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর 'মর্যাদার প্রশ্ন' হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু প্রশ্ন উঠবে—তাহলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী এই অর্ডার দিলেন কেন?

এর উত্তরে কো-অর্ডিনেশন কমিটির বক্তব্য হলো, স্বাস্থ্যমন্ত্রী মুষ্টিমেয় কয়েকজন 'স্বার্থপর' ব্যক্তির উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ইচ্ছার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। গত এপ্রিল মাসে হাসপাতালের Teaching and Medical Staff Association থেকে স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে যে স্মারকপত্রটি দেওয়া হয়েছিল, সেখানে আমরা দেখছি, "just after 'Take over' in 1967 a small group of senior & junior Medical Staff having had their personal ambitions fulfilled in the name of the then U. F. Government created such a vitiating atmosphere in the institution, that gradually the majority staff of all categories and students became aware of their motives.."

উক্ত স্মারকপত্রের চতুর্থ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে—

"whenever any suggestions were put forward or protests were made against their activities by other staff members, that small coterie used to brand them as Reactioneries.

in the eyes of the Government to get their sympathy and most unfortunately the Government only believed them who so far had looked into their own interest ignoring that of others and the institution.

এ ছাড়াও ছাত্র, নার্স, হাউস সার্জন, চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের মধ্যেও ডাঃ লাহিড়ী সম্পর্কে অনেক অভিযোগ শুনেছি। শিক্ষারত নার্সরা তো ২৮শে, জুনে বিভিন্ন অব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একদিনের অনশন-ধর্মঘটও করেছিলেন। কিন্তু এহবাহ্য। অন্যচিত্রও আছে। ডাঃ বিনয় ভট্টাচার্য এবং তাঁর অনুগামীরা, যাঁরা এই ধর্মঘট সমর্থন করেন না—যাঁদের 'বিরুদ্ধে' ধর্মঘটীরা শ্লোগান দিয়েছেন ও দিচ্ছেন—যাঁদের উপরোক্ত স্মারকপত্রে 'small coterie' বলে নির্দেশ করা হয়েছে, তাঁদের বক্তব্য ভিন্ন। তাঁদের মতে ডাঃ লাহিড়ীর উপযুক্ত কোয়ালিফিকেশন নেই বলে যে কো-অর্ডিনেশন কমিটি দাবি করেছে, তা ভুল। ছাত্র হিসাবে ডাঃ লাহিড়ী খুবই ভাল। Physiology-তে তিনি শুধু class assistant ছিলেন তাই নয়, তিনি অনার্স এবং স্বর্ণপদক পেয়েছিলেন। তাঁর শিক্ষক হিসেবে অভিজ্ঞতা একুশ বছরের, যেখানে ডাঃ রায়মহাশয়ের মাত্র সাড়ে ছক বছরের। ডাঃ রায়মহাশয়ও এমনি একদিন Associate Professor থেকে বাঁকুড়ায় Principal-Superintendent হয়েছিলেন। ডাঃ রায় ১৯৬৭ সালের জুন মাসে এই কলেজে আসার পর প্রায়ই শারীরিক অসুস্থতাবশত ছুটি নিতেন—he had an attack of coronery desease. গত ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি যখন ছুটিতে যান তখন ডেপুটি সুপারিনটেন্ডেন্টও ছুটিতে চলে যান। কার্যত এত বড় হাসপাতালটি তখন কর্ণধারহীন হয়ে পড়ে। যে Resident Physician-এর ওপর কর্মভার থাকে, তিনি বস্তুত Resident ছিলেন না; থাকেন হাওড়ায় আবার প্রাকটিশও করেন। এই পরিস্থিতিতে গত এপ্রিল মাসে সরকার ডাঃ লাহিড়ীকে প্রিন্সিপাল/সুপারিনটেন্ডেন্ট হিসেবে কাজ করবার জন্য নির্দেশ দেন। ১৭ই এপ্রিল কোন চার্জ না নিয়েও ডাঃ লাহিড়ী নির্দেশ অনুযায়ী কাজ শুরু করেন। ডাঃ রায়মহাশয় তখন ছুটিতে। তারপর তিন মাস কেটে গেছে। অথচ কোন অভিযোগই কখনো শোনা যায় নি। আজ তবে কেন এই অভিযোগ? ডাঃ বিনয় ভট্টাচার্য বললেন—এই আন্দোলন আসলে ডাঃ রায়মহাশয়কে পুনর্নিয়োগের জন্যও নয়। এ আন্দোলন আসলে 'বিনয়-চক্রে'র বিরুদ্ধে। কারণ 'বিনয়-চক্র' তাঁদেরই 'সাধের স্বপ্ন' ভেঙে এই হাসপাতালকে জাতীয়করণ করবার জন্য অগ্রণ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

****

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে

স্বাস্থ্য অধিকারের প্রশাসন শাখায় (এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ব্রাঞ্চ) কর্মরত দুই করনিকের দুর্নীতি ও অবৈধ কার্যকলাপ সম্পর্কে গত সপ্তাহের বঙ্গদর্শনে যে মন্তব্য করা হয়েছিল, তা স্বাস্থ্য-দপ্তরের সংশ্লিষ্ট মহলে দারুণ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের একজন এতই উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন যে, তিনি ও তাঁর পেটোয়া কয়েকজন স্যানিটারী ইন্সপেক্টর, হেলথ এ্যাসিস্ট্যান্ট সরকারী চাকরির নিয়ম-শৃঙ্খলা অমান্য করে সংবাদপত্র অফিসে গোপনীয় ফাইলপত্র দেখিয়ে গেছেন এবং বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত অভিযোগের বিরুদ্ধে কোনো প্রামাণ্য বিবরণ দিতে ব্যর্থ হয়ে স্বাস্থ্য অধিকারে তাঁদের কয়েকজন সহকর্মীর বিরুদ্ধে যথারীতি বিষোদ্‌গার করে গেছেন। কতকগুলি অপ্রাসঙ্গিক ফাইল নিয়ে তাঁদের আবোল-তাবোল কথাবার্তা ও কিস্তুত আচরণ আমাদের অভিযোগের সত্যতা ও যথার্থতা যে সুপ্রমাণিত করেছে—এ কথা বলাই বাহুল্য।

তাঁদের বক্তব্যের মূল কথা হলো—সংবাদপত্রে প্রকাশিত অভিযোগের ভিত্তিতে আমাদের সহকর্মীদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হলে, আমরা তার প্রতিশোধ নেবই। এই প্রসঙ্গে কয়েকজনের নাম তাঁরা বারবার উল্লেখ করেছেন, যাঁরা নাকি তাঁদের অপদস্থ ও অন্যত্র বদলি করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন এবং সাপ্তাহিক বসুমতীর আশ্রয় নিয়েছেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁদের মহরম-মহরম আছে এবং তাঁকে বলে উপরোক্ত কয়েকজনকে (প্রয়োজন হলে এঁদের নাম প্রকাশ করা হবে) তাঁরা অবিলম্বে বদলি করিয়ে দেবেন—একথাও তাঁরা বারবার আমাদের শুনিয়ে গেছেন। জানি না, স্বাস্থ্যমন্ত্রী কি করবেন?'

তবে, স্বাস্থ্য অধিকারের প্রশাসন শাখার কয়েকজন মার্কামারা দুর্নীতি-বাজ করনিক (যাঁদের কথা আমরা গত সংখ্যায় লিখেছি।) নিশ্চয়ই তাঁকে প্রভাবান্বিত করতে পারবে না—এ বিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত।

****

রাতারাতি একটা বিরাট anti-U. F. Front 'যুক্তফ্রন্ট জিন্দাবাদ' ধ্বনি দিয়ে pro-United Front হয়ে গেল। ডাঃ পি, এম, লাহিড়ী যেহেতু অনেক দুর্নীতি দূর করবার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ করেছিলেন, সেহেতু তিনি হয়ে গেলেন অযোগ্য এবং দুর্নীতিপরায়ণ।

ডাঃ পি, সি, ঘোষ বললেন—গত ১০ই মার্চের হাঙ্গামার পরিপ্রেক্ষিতে যে এনকোয়ারি কমিটি হয়েছিলো—সেই কমিটির নিকট কো-অর্ডিনেশন কমিটি যে সুপারিশ করেছিল, তাতে বলা হয়েছিল কোনো Local Principal নয়—একজন full time B.M.S. non-practising Principal নিয়োগ করা হোক (সেই সুপারিশের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি); আবার কো-অর্ডিনেশন কমিটির একটি সিদ্ধান্তে বলা হয়েছিল যে, যদি ভিতর থেকেই যোগ্য প্রার্থী পাওয়া যায়, তাহলে বাইরে থেকে যেন কাউকে নিয়োগ করা না হয়। বর্তমান ঘটনা বস্তুত সকল সিদ্ধান্তেরই পরিপন্থী। ডাঃ ডি, এন, ব্যানার্জী সম্পর্কে মাঝে মাঝে শোনা যায় বটে, কিন্তু তাঁর সম্পর্কে আমরা বলতে চাই—তিনি আসলে আর, জি, কর মেডিক্যাল কলেজের স্টাফ, আমাদের কলেজের একজন পার্ট-টাইম লেকচারার।

ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে এই হলো ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সাম্প্রতিক চিত্র। একদিকে ধর্মঘট এবং ধর্মঘট নয়-এর যুক্তি-অযুক্তির লড়াই, আর একদিকে কো-অর্ডিনেশন কমিটি এবং স্বাস্থ্য দপ্তর তথা স্বাস্থ্য-মন্ত্রীর টাগ অব ওয়ার। স্বভাবতই এই অস্বস্তিকর এবং অনির্দিষ্ট (uncertain) অবস্থার মধ্যে সামগ্রিক চিত্র স্বচ্ছ হতে পারে না। এর মধ্যে আবার ছাত্র-ফেডারেশনের ধর্মঘট-বিরোধী বিবৃতি এবং কো-অর্ডিনেশন কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীহরপ্রসাদ চ্যাটার্জীর ধর্মঘট তুলে নেবার আবেদন পরিবেশটাকে আরো দুর্বোধ্য করে তুলেছে। সর্বশেষ পরিস্থিতি হলো—ডাঃ পি, এম, লাহিড়ী যথারীতি তাঁর নতুন পদের দায়িত্ব বুঝে নিয়েছেন, কিন্তু হাসপাতালে প্রবেশ করতে পারছেন না। ডাঃ রায়মহাশয় যথারীতি তাঁর নতুন কর্মস্থল রাইটার্স বিল্ডিংসে কাজে যাচ্ছেন। হাসপাতালের আউটডোর বন্ধ। নতুন রোগী ভর্তি হচ্ছে না (এমার্জেন্সী ছাড়া)।

সরকারের প্রেস্টিজের প্রশ্ন আছে কি নেই, সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্য না করে আমরা শুধু একটি কথা বলতে চাই, তা হলো—এই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ অনির্দিষ্টকালের জন্য চলতে পারে না। তাতে কি হাসপাতাল কর্মচারী, কি যুক্তফ্রন্ট সরকার কারোই স্বাস্থ্যরক্ষা হয় না। অবিলম্বে হাসপাতালে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরকে তৎপর হতে হবে, প্রয়োজনে কঠোর হলেও হতে হবে। বিলম্ব বা কালহরণ করে সরকার যেন prisoner of indecision হয়ে না পড়েন।

ভারত দর্শন

সাসপেন্স'।

ইংরেজিতে যাকে বলে 'সাসপেন্স' সেই 'কী হবে কী হবে' ভাব এখনও ভারতের রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশ সমাচ্ছন্ন করে আছে। ঠিক এই মুহূর্তে, অর্থাৎ ১৮ই জুলাই সন্ধ্যায় যখন আমি লিখছি তখনও কোনও নতুন খবর নেই। অর্থাৎ মোরারজী দেশাই-এর ধনুকভাঙা পণ। হরধনুর ঊর্ধ্ব কর্পটি যথাপূর্বং দক্ষিণ-হস্তে আচ্ছা করে পাকড়ে আছেন—পদত্যাগ প্রত্যাহার করিব না। প্রধান-মন্ত্রীর তরফে 'নাই করিলে' আমিও অর্থ মন্ত্রণালয় ফিরিয়ে দেব না—ভাব। আর সে-কারণে চতুর্দিকে জোর তৎপরতা। কেউ ছুটছেন শ্রীমতী গান্ধীর কাছে, কেউ চলেছেন সহানুভূতি ও শলা-পরামর্শের জন্য মোরারজী মশায়ের দুয়ারে। আবার কেউ দেখা করছেন চ্যবন সাহেবের সঙ্গে। চ্যবন সাহেব কি না অর্থনৈতিক প্রস্তাবের ঝামেলার সময় প্রধান-উপ-প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে হাই-ফেনের কাজ করেছিলেন আপোষী প্রস্তাব খাড়া করার জন্য, তাই। কিন্তু পাতিল? সে বড় শক্ত ঠাঁই। উনি স্রেফ বলে দিয়েছেন, আপোষের ব্যাপারে ওনার তেমন শানায় না। কামরাজ আর নিজলিঙ্গাপ্পা সময় বুঝে দুজনেই দুম-দাম অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ওঁরা একটু সময় চাইছেন। যেন আঘাতের জন্য প্রস্তুত থাকলেও প্রধানমন্ত্রীর কাছ থেকে যে প্রত্যাঘাত আসতে পারে এ সম্পর্কে হাই কমান্ডের অনেকেই মনে মনে প্রস্তুত ছিলেন না। কথাটা উঠছে এই কারণে যে, ইতিমধ্যেই ভারতের কিছু কিছু সংবাদপত্রে একটি সংবাদ জোর গুরুত্ব পেয়ে গেছে, তা হল, প্রধানমন্ত্রিত্ব থেকে শ্রীমতী গান্ধীকে অপসারিত করার তলে তলে নাকি একটা প্রচেষ্টা চলছিল এবং সেটা টের পেয়ে প্রধানমন্ত্রীও কিছু একটা করবার জন্য অনেকদিন থেকেই কোমরে আঁচল জড়াচ্ছিলেন। এতোদিনে সেই টাগ অব ওয়ারই নাকি প্রদর্শনী 'গেম'-এর আকারে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে। এসব অবশ্য সরকারী সমর্থিত সংবাদ নয় এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠলে গরম 'স্টান্ট নিউজ' বা চমকপ্রদ সংবাদ ক্রেতা-আকর্ষণে মনোযোগ দেয়। কিন্তু একটা বিষয় তো আর অস্পষ্ট নেই যে, কংগ্রেসের মধ্যে এখন একটা পথ বাছাবাছির ধুম পড়ে গেছে। অর্থাৎ খোদ কেন্দ্রীয় পার্টিই এখন পথে-বিপথে দিশেহারা।

এমন একটা অবস্থা যে অবশ্যম্ভাবী তা অবশ্য অনেকেই বলছিলেন, কিন্তু পাল্টা শিবির সংস্থাপনার কাজ যে এতো দ্রুত ঘটবে নিশ্চয়ই এতোটা কেউ ভাবতে পারেন নি। প্রসঙ্গত অবশ্য উল্লেখ করতেই হয় যে, কেউ রাজনৈতিক চিন্তায় সময় গণনা করতে না পারলেও গণৎকারের ছকে তা ধরা পড়েছিল। জনৈকা বিদে-শিনী গণৎকার মাত্র সপ্তাখানেক আগে বলেছিলেন জুলাই-এর মধ্যেই ভারতের রাজনীতিতে পটপরিবর্তন শুরু হবে। যা হয়েছে, যদিও তাকে পটপরিবর্তন আখ্যা দেওয়া এখনও অসম্ভব। কিন্তু

সবিনয় নিবেদন

অনিবার্য কারণবশত এ সপ্তাহে ডঃ হর-প্রসাদ মিত্রের 'বই-বাছাই, বাংলা বইয়ের মেলা' এবং কৃত্তিবাস ওঝার 'সপ্তাহের বোকা' প্রকাশিত না হওয়ায় আমরা দুঃখিত। আগামী সপ্তাহ থেকে যথানিয়মিত প্রকাশিত হবে।

—সম্পাদিকা, সাপ্তাহিক বসুমতী

একটা ক্ষীণ সূচনা যে দেখা না যাচ্ছে এমন কথা বললে সত্যের অপলাপ হবে। স্বয়ং কংগ্রেস সভাপতি বলছেন ঃ পরি-স্থিতি জটিল। সঙ্কটমুক্তির জন্য তাঁর প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হচ্ছে না।

যাক সে সব কথা, কিন্তু যাকে বলে 'পলিটিক্যাল পোলারাইজেশন', ভারতের রাজনীতিতে কি তারও কোনও লক্ষণ পরিস্ফুট? মনে হচ্ছে একেবারে চাঁছা-ছোলা অবস্থার সৃষ্টি না হলেও ভারতীয় রাজনীতি স্পষ্টভাবে চরমপন্থা ও নরম-পন্থার দুই মেরুতে সঙ্ঘবদ্ধ হতে চলেছে। চরমপন্থীরা সঞ্জীব রেড্ডির রাষ্ট্রপতিত্বে ক্ষমতা বজায় রাখার যে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন, নরমপন্থীরা তারই বিরোধিতা করেছেন শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে। অতঃপর ভারতের অন্যান্য দলগুলি দুই বিপরীত বিন্দুর দিকে গা-গড়িয়ে চলার জন্য তৈরি হচ্ছেন। কেউ প্রকাশ্যে 'সাইড' নিচ্ছেন বা আপনা-পন ঈপ্সিত কোটিকে মদত দিতে এগিয়ে যাচ্ছেন; কেউ বা গা-ঢাকা দিয়ে বিপক্ষীয়ের হাত ভাঙার সুযোগ খুঁজছেন।

পাল্লা কোন পক্ষে?

প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের কালে পাল্লা মোরারজী দেশাই-এর পক্ষে পূর্ণ ঝুঁকিত না দেখানোর জন্যই তাঁকে গান্ধী-ক্যাবিনেটে ডেপুটির চেয়ারে গিয়ে বসতে হয়েছিল। তখন তাঁর স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দাবি ছিল, কিন্তু চ্যবন দপ্তরটি ছাড়তে রাজী ছিলেন না। আর সেজন্যই চ্যবন সাহেব তাঁর দলবল সহ সেদিন এমন কি দেশাইকে ক্যাবিনেটের বাইরে রাখার জন্যও চেষ্টা পেয়েছিলেন। পরে আপোষ হয়ে গেল। মোরারজী তাঁর তীক্ষ্ণ নজর তারপর অর্থদপ্তর থেকে আর সরান নি। কেন না, 'হোম' না হলে 'ফিনান্স' দুই চাবিকাঠির একটি তাঁর চাই-ই। অর্থদপ্তর হাতে থাকার প্রগতি-শীল অর্থনীতির সব কটি প্রস্তাব বিলম্বিত করার ক্ষমতাও তিনিই ভোগ করে আসছিলেন। অবস্থা শেষে এমন এক পর্যায়ে এলো, যখন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি কামরাজকেও, কংগ্রেসের শেষ-তম ঐতিহাসিক অধিবেশন বাঙ্গালোরে প্রধানমন্ত্রীর নোট গ্রহণের পর, তাঁর ঘনিষ্ঠমহলে নাকি বলতে শোনা গেছল যে, অতঃপর অর্থদপ্তর থেকে মোরার-জীকে গান্ধী অপসারিত না করলে এ-আই-সি-সি প্রস্তাবকে বাস্তবায়িত করার পথে মোরারজী বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াবেন, কেন না তিনি প্রধানমন্ত্রীর নোটের বিরোধী। বলা বাহুল্য এই বিরোধ তাৎক্ষণিকভাবেই শুরু হয়ে গেল এবং প্রধানমন্ত্রীকেও অর্থদপ্তর কেড়ে নিতে হল উপ-প্রধানের হাত থেকে। এখন মোরারজীর অভিমান, অর্থদপ্তর কেড়ে নিয়ে তাঁর বিশেষ অবমাননা করা হয়েছে। সুতরাং দপ্তর ফেরত না পেলে তিনিও ফিরতে অক্ষম। প্রধানমন্ত্রী

বলছেন ঢের দপ্তর আছে, উনি নিন না। কিন্তু তাও কি হয়। শেষে নিজলিঙ্গাপ্পা একটা বিকল্প পথও ভাবলেন। যদি মোরারজী স্বরাষ্ট্র নিয়ে সন্তুষ্ট হন। কিন্তু চ্যবন সাহেব তাতে আগের মতই গররাজী। সিণ্ডিকেট কোন সাহায্যেই আসতে পারছেন না দেশাই-এর সম্মান রক্ষার্থে। দুর্বলতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দেশাই ফাঁপরে পড়ে গেছেন। এমন একটা অবস্থা উনি গণনা করেন নি। ভাবতে পারেন নি যে, প্রধানমন্ত্রীকে ঘাঁটাতে একে একে সকলেই পিছপাও হয়ে পড়বেন। রাষ্ট্রপতি মনোনয়নে প্রধানমন্ত্রীর ওপর জয়টাই বড় কথা নয়; শক্ত ঘাঁটি তাঁরও আছে।

কিন্তু ক্রমশ সেটা সকলেই উপলব্ধি করছেন। রাজনৈতিক চমৎকারিতা যাকে প্রাঞ্জল বাংলায় 'ভর্ড়াকি' বলা যেতে পারে, এক্ষেত্রে তা আর চলছে না।

কংগ্রেসের শক্ত মানুষদের পশ্চাদপসরণ লক্ষ্য করলে এই চিত্র আরও স্পষ্ট হয়ে যায়। যেমন, প্রগতির পথে চির-বৈরী পাতিল সাহেব এক পা পিছিয়ে গিয়ে বলছেন, প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা আনয়নে তিনি কোন পক্ষ হতে রাজী নন। এটা যে নিতান্তই শোভনতা-সঞ্জাত মন্তব্য, পাতিল সাহেবের অনমনীয়তার ইতিহাসে নজর রেখে সেই সাধুবাদ নিশ্চয় কেউ উচ্চারণ করবেন না। নিজলিঙ্গাপ্পা কম কসরৎ করলেন না। সদলে মিটিং ছাড়াও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন। কিন্তু অবস্থা ন যযৌ ন তস্থৌ। উপায়ান্তর না দেখে চ্যবন সাহেবের ঘাঁটি মহারাষ্ট্র থেকে কিছু সংসদ সদস্য এই বলে প্রস্তাব রেখেছেন যে, সঙ্কটমুক্তির জন্য তাঁদের নেতা মোরারজী-তুষ্টিকরণের জন্য স্বরাষ্ট্রদপ্তর ছেড়ে দিতে রাজী। মোরারজীপন্থী সি বি গুপ্ত নাচার হয়ে বলেছেন, ঘটনাবলীতে তাঁর দুঃখের শেষ নেই; কিন্তু উত্তরপ্রদেশের সংসদ সদস্যদের পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হচ্ছে তাঁকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভোটাভুটির সময়। অর্থাৎ তা না দিয়ে তাঁরও উপায় নেই। পশ্চিমবঙ্গে অতুল্য ঘোষের গান্ধীবিরোধিতায় অনেকেই যে কণ্ঠস্বর মেলাতে গররাজী, পরিষদীয় নেতা শ্রীরায়ের সঞ্জীব রেড্ডীর বিরোধিতা করে পত্র প্রেরণে তার আভাস পাওয়া যায়। তিনি জানিয়েছেন, রাষ্ট্রপতি মনোনয়নে কংগ্রেস মত পরিবর্তন না করলে গিরিকে সমর্থন ব্যতীত উপায় থাকবে না। সিণ্ডিকেট সমর্থক বহু কংগ্রেস এম-পি একে একে বলতে শুরু করেছেন, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব সম্পর্কে তাঁরা কোনও প্রশ্ন উত্থাপনে রাজী নন।

মোরারজী দেশাইয়ের সঙ্গে আলোচনারত এস কে পাতিল ও অতুল্য ঘোষ

এমতাবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মোরারজী দেশাইয়ের সাক্ষাৎকার কাজেকাজেই ফলবতী হয় নি। অনেকে অনেকভাবে চাপ সৃষ্টি করেও মোরারজী দেশাইয়ের পাল্লা টেনে নামিয়ে ধরতে পারছেন না। তিনি যেন ক্রমেই শূন্যমার্গে উত্থিত হচ্ছেন।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সঙ্কট

এই সঙ্কট মুহূর্তে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যাপারটিও একটা গভীর 'সাসপেন্সে'র মধ্যে রুদ্ধশ্বাস হয়ে আছে। নিজলিঙ্গাপ্পা আশাবাদী। তিনি বলছেন, শ্রীমতী গান্ধী তো সিণ্ডিকেট মনোনীত সঞ্জীব রেড্ডীকেই সমর্থন জানিয়েছেন কিন্তু পাতিল সাহেবের মনে সন্দেহের নিরসন হয় নি। উনি বলেছেন এ ব্যাপার সুবিধের নয়। "একখানা কাগজে পড়লাম, তিনি শ্রীরেড্ডীর নাম প্রস্তাব করবেন।"

বস্তুত এতোদূর এগোনোর পর শ্রীমতী গান্ধী হাওয়া অনুকূলে দেখেও কি সঞ্জীব রেড্ডীকেই মেনে নেবেন, যাঁর মনোনয়নের বিরুদ্ধে নিজে তিনি ভোট দিয়েছিলেন প্রকাশ্যে! তাছাড়া এ কদিনের রাজনৈতিক বাদানুবাদে সঞ্জীব রেড্ডী সম্পর্কে সাধারণের ধারণা এই জন্মে গেছে যে, তিনি চরম দক্ষিণপন্থী-হাত শক্ত করার জন্যই রাষ্ট্রপতি ভবন দখল করতে যাচ্ছেন। বিরোধীরা তাঁর বিরুদ্ধে সোচ্চারে কোমর বাঁধছেন। এমন পরিস্থিতিতে শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষে সাদরে সঞ্জীব রেড্ডীকে বরণ করে নেওয়া তাঁর 'ইমেজ'কেই নষ্ট করবে না কি? শ্রীমতী গান্ধীকে এ প্রশ্নটিও নিশ্চয় ভেবে দেখতে হবে।

প্রধানমন্ত্রীকে অপসারণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা

চরম দক্ষিণীরা কংগ্রেসের দক্ষিণ ডানা শক্ত করার জন্য বি-কে-ডি-কে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে একটি অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনের চেষ্টা যে করবেন এতে বিচিত্র কিছু নেই, সাসপেন্স-ও নেই। অমন একটি অনাস্থা প্রস্তাবের নোটিশ বি-কে-ডি দিয়েছেন। —তোবা, তোবা।

'সাসপেন্স' হল, এই প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় সরকারের গণেশ বস্তুতই ওল্টাবে কি না। একটি সূত্রের সংবাদে প্রকাশ, 'সিণ্ডিকেট' নিজেরা নাকি এমন একটি অবস্থার কথাও ভেবে দেখেছিলেন। সেক্ষেত্রে অনাস্থা অবশ্য আনা হত গান্ধী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে। কিন্তু গণনায় দেখা গেছে, প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে প্রায় কুড়িটি ভোট বেশি থাকবে (চ্যবন সাহেবকে বাদ দিয়েও)। কেউ কেউ মনে করছেন, প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের সময় ১৯৬৬ সালে মোরারজী দেশাই যতগুলি ভোট টেনেছিলেন, এবার প্রধানমন্ত্রীর বিপক্ষে ততগুলিও জোগাড় করা সম্ভব হবে না। এই যদি অবস্থা হয়, তবে অনাস্থা এনে সরকার উল্টিয়ে কোন সুরাহা হবে কি? তা ছাড়া দক্ষিণী চক্রান্তে বামেরা যে পা ফস্কাবেন না তাতো জানা কথাই।

সুতরাং সমগ্র ব্যাপারটি বর্তমান সপ্তাহে রুদ্ধশ্বাস 'সাসপেন্স' হয়েই রইল। পরবর্তী পর্যায়ের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া আমরা অনন্যোপায়।

(১১।৭।৬৯)

সোস্যালিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় পিয়েত্রো নেন্নি ও ফ্রানসিসকো ডা মারটিনো

হন্ডুরাস :

হন্ডুরাস সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, এল সালভেডরের সৈন্যরা হন্ডুরাস আক্রমণ করেছে।

মধ্য আমেরিকার দেশ হন্ডুরাস। আর এল সালভেডর তার পার্শ্ববর্তী দেশ। মধ্য আমেরিকার ক্ষুদ্রতম ও বিশ্বের অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দেশ এল সালভেডর। দুই দেশের মধ্যে সীমানা নিয়ে বিরোধ চলছে কিছুদিন যাবৎ।

ওয়াশিংটনে নিযুক্ত হন্ডুরাস রাষ্ট্রদূত মিডেন্স সোটো এক বিবৃতিতে বলেছেন, ১৪ই জুলাই রাত্রে এল সালভেডরের সৈন্যরা অতর্কিতভাবে হন্ডুরাস আক্রমণ করে। এল সালভেডরের ন' হাজার সৈন্য হন্ডুরাসের ভেতরে প্রবেশ করে আক্রমণ চালায়। বিমান থেকে হন্ডুরাসের ন'টি শহরের ওপর বোমাবর্ষণ করা হয়। রাজধানী তেগুসিগালপা, আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর টনকনটিন প্রভৃতির ওপরও বোমাবর্ষণ হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধখ্যাত মুস্তাং বোমারু বিমানবাহিনী এই অভিযানে অংশ গ্রহণ করেছে। তাছাড়া সামরিক ট্যাঙ্কও ব্যবহার করা হয়েছে স্থলপথে আক্রমণে।

স্বাভাবিকভাবেই এই আক্রমণে হন্ডুরাস খুব ক্ষুব্ধ। হন্ডুরাস সরকার এই আক্রমণকে জাপান কর্তৃক ১৯৪১ সালে পার্ল হারবার আক্রমণের সঙ্গে তুলনা করেছে। তারা এই আক্রমণকে 'পূর্বপরিকল্পিত' ও 'চরম বিশ্বাসঘাতকতার নিদর্শন' বলে বর্ণনা করেছে। হন্ডুরাসের রাষ্ট্রপতি ওসভালডো লোপেজ এই নগ্ন আক্রমণের মোকাবিলা করার জন্য দেশবাসীর প্রতি আহবান জানিয়েছেন।

আরও উল্লেখযোগ্য, যখন এই আক্রমণ অনুষ্ঠিত হয়, তখন ওয়াশিংটনে আমেরিকান রাষ্ট্র সমিতির (Organisation of American States! বা সংক্ষেপে ও-এ-এস) অধিবেশন চলছিল। উত্তর, দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার ২২টি রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত এই সংস্থার সঙ্গে হন্ডুরাস ও এল সালভেডর, দুই দেশই যুক্ত। ও-এ-এসের ওয়াশিংটন বৈঠকে দুই দেশের সীমানা বিরোধ নিয়েও আলোচনা চলছিল। এমন সময় এই আক্রমণের সংবাদে ও-এ-এসের সদস্যরা, বিশেষ করে প্রধান কর্তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একটু বিচলিত হয়ে পড়েছে। ও-এ-এসের সেক্রেটারি-জেনারেল গালো প্লাজা ইতিমধ্যে দুই দেশের কাছেই শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন করেছেন।

এল সালভেডর আক্রমণের সংবাদ অস্বীকার করে নি। এল সালভেডর সরকারের বক্তব্য, পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে তারা এই কাজ করতে বাধ্য হয়েছে। এল সালভেডর থেকে যেসব কৃষকরা হন্ডুরাসে প্রবেশ করেছে, হন্ডুরাস সরকার তাদের হত্যা করেছে। এল সালভেডরের অভিযোগ, এইভাবে হাজার হাজার কৃষককে হত্যা করা হয়েছে।

ইতালী :

মারিয়ানো রুমরের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করেছে। এই নিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইতালীতে ২৯টি মন্ত্রিসভার পতন হল।

৫ই জুলাই মন্ত্রিসভার এক জরুরী বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রী রুমর রাষ্ট্রপতি গিসেপ্পে সারাগাতের কাছে তাঁর মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ইতালীতে অর্থনৈতিক সংকট চরম আকার ধারণ করেছে, কারখানায় কারখানায় ধর্মঘট লেগেই আছে, শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র-বিক্ষোভ এখানকার নিত্যদিনের ঘটনা। তবু এসব কোন কিছুকে উপলক্ষ করে এবার মন্ত্রিসভার পতন হয় নি। পতন হয়েছে কোয়ালিশন সরকারের দ্বিতীয় বৃহত্তম দল সোস্যালিস্ট পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্য।

অন্যান্য দেশের মত ইতালীর সোস্যালিস্ট পার্টিরও একই সমস্যা। সোস্যালিস্টরা কোন স্পষ্ট নীতি গ্রহণ করতে পারে না—বামপন্থা আর দক্ষিণপন্থার মধ্যপথে দোদুল্যমান অবস্থায় থাকতে হয়। একটু বেশি বামপন্থী হলে দলের নরমপন্থীরা মধ্যপন্থী ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টির দিকে ঝোঁকে। আর একটু নরম মনোভাব গ্রহণ করলে বামপন্থীরা কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে চলে যায়। এই অবস্থায় দু'দিক সামলে চলা খুব শক্ত। এই কারণেই বারে বারে ইতালীর সোস্যালিস্ট পার্টিতে ভাঙন ধরেছে। আবার কখনও কখনও ভাঙা দল জোড়াও লেগেছে। যেসব সোস্যাল ডেমোক্রাট দল ত্যাগ করে গিয়েছিলেন, তিন বছর আগে তাঁরা আবার ফিরে এসেছিলেন সোস্যালিস্ট পার্টিতে। এবার তাঁরাই আবার সংকট সৃষ্টি করলেন।

রুমর মন্ত্রিসভার সহকারী প্রধানমন্ত্রী ও সোস্যালিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক ফ্রানসিসকো ডা মারটিনোর নেতৃত্বে ইদানীং সোস্যালিস্ট পার্টি একটু বেশি বামপন্থার দিকে ঝুঁকেছিল। কমিউনিস্ট জগতের বাইরে বৃহত্তম কমিউনিস্ট দল ইতালীর কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সহযোগিতার পথ গ্রহণের জন্য ডা মারটিনো চেষ্টা করছিলেন। ডা মারটিনো ও তাঁর সহযোগীদের প্রভাবে ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টির প্রভাবাধীন রুমর সরকারও বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রগতিশীল নীতি গ্রহণ করেছিলেন। তানাসি, ফেরি ও প্রেতির নেতৃত্বাধীন নরমপন্থী সোস্যালিস্টদের এ জিনিস পছন্দ নয়। তাই তাঁরা বিদ্রোহ করলেন।

নরমপন্থী সোস্যালিস্টরা, অর্থাৎ পূর্বতন সোস্যাল ডেমোক্রাটরা রুমর মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও বাজেট মন্ত্রী প্রেতির নেতৃত্বে মন্টেসিটোরিও-তে মিলিত হয়ে য়ুনিটারিয়ান সোস্যালিস্ট পার্টি নামে ভিন্ন একটি দল গঠন করলেন। প্রেতি ও অন্যান্য মন্ত্রীরা প্রধানমন্ত্রী রুমরের কাছে তাঁদের পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিলেন। তাছাড়াও তাঁরা ঘোষণা করলেন, সোস্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে একত্র তাঁরা কোন মন্ত্রিসভায় যোগ দেবেন না।

প্রবীণ সোস্যালিস্ট নেতা, পার্টির সভাপতি ও ইতালীর পররাষ্ট্রমন্ত্রী পিয়েত্রো নেন্নি দু' পক্ষের মধ্যে আপোষের চেষ্টা করলেন। কিন্তু দলের বামপন্থীরা তাঁর

নাম্বার টেন সিগারেটের পরম তৃপ্তি-দায়কতার মূলে
মাত্র একটি সমীচীন কারণ ঃ

নিবিড় স্বাদে ও গন্ধে পরিপূর্ণ নাম্বার টেন
ভারতের সমশ্রেণীয় সিগারেটের মধ্যে
সবচেয়ে বেশী মিঠে আমেজ জোগায়—মধুর আবেশ জাগায়।

তাই তো হওয়ার কথা—

নাম্বার টেন-এ আছে দেশের উৎকৃষ্ট ভার্জিনিয়া তামাক
—যা সংগ্রহ, পরিপক্ক এবং ব্লেণ্ড করার দায়িত্ব নিয়েছেন অভিজ্ঞ তামাক বিশেষজ্ঞরা।

মিঠে আমেজের বিশেষত্ব...

নাম্বার টেনের
পরিচয়

আপোষ-প্রস্তাব গ্রহণ করেন নি। সোস্যালিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় তিনি প্রস্তাব রেখেছিলেন, দলের সাধারণ সম্মেলন আহ্বান করা হোক, এবং অন্তবর্তীকালে নেন্নি দলের দপ্তরের দায়িত্ব নেবেন ও সোস্যাল ডেমোক্রাটদের অনুমোদন নিয়ে দলের নতুন রাজনৈতিক বক্তব্য প্রস্তুত করবেন। নেন্নির এই আপোষ প্রস্তাব কেন্দ্রীয় কমিটিতে ৫২—৬৯ ভোটে পরাজিত হয়।

পিয়েত্রো নেন্নির কাছে এই পরাজয় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত। ইতালীর সোস্যালিস্ট পার্টিকে সাধারণত নেন্নির পার্টি বলা হয় এবং সোস্যালিস্টরা নেন্নিপন্থী বলে পরিচিত। সেই দলে তাঁর পরাজয়। ৭৮ বৎসর বয়স্ক পিয়েত্রো নেন্নির পক্ষে এত বড় অপমান হজম করা সহজ নয়। ভোটের ফল ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন, তিনি আর এক মুহূর্ত দলের সভাপতি থাকবেন না। এই কথা বলে তিনি সভাকক্ষ ত্যাগ করে চলে যান। ডা মারটিনোও অন্যান্য নেতাদের আবেদনে কোন কর্ণপাত করেন নি।

অপমানের আরও কিছুটা বাকি ছিল। ডা মারটিনোর উত্থাপিত রাজনৈতিক প্রস্তাব নেন্নির সমর্থকদের বিরোধিতার মধ্যে ৫৮—১৬ ভোটে গৃহীত হয়েছে।

নেন্নি পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদেও ইস্তফা দিয়েছেন। সম্ভবত তিনি রাজনীতি থেকেও অবসর গ্রহণ করবেন।

এখন সমস্যা হচ্ছে, নতুন সরকার কাদের নিয়ে গঠিত হবে। রাষ্ট্রপতি সারাগাত প্রধানমন্ত্রী রুমরকে আপাতত কাজ চালিয়ে যেতে বলেছেন এবং নতুন আর একটি মধ্যপন্থী-বামপন্থী কোয়ালিশন সরকার গঠনের ব্যাপারে উদ্যোগী হতে অনুরোধ করেছেন। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনপুষ্ট এরূপ একটি সরকার বর্তমান পরিস্থিতিতে গঠন করা যাবে কি-না, এখনও তা বোঝা যাচ্ছে না।

ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টি সাময়িকভাবে সংখ্যালঘু সরকারের দায়িত্ব গ্রহণ করতেও রাজী নয়। দলের সাধারণ সম্পাদক ফ্লামিনিয়ো পিকলি এই কথা জানিয়েছেন।

সব দেখে মনে হয়, নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা করা ছাড়া আর কোন পথ নেই।

ইতিমধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক লুইগি লোঙ্গো সকল বামপন্থী দলের নিকট একযোগে কাজ করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

চীন ঃ

বিশ্বাস করুন আর নাই করুন, চীনে এই জিনিস ঘটেছে!

ইয়ে চিন-জুং নামে একজন নাবিক মাথায় আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। মস্তিষ্কের ভেতর গর্ত হয়ে মস্তিষ্কের গলিত পদার্থ চুইয়ে চুইয়ে পড়ছিল এবং ইয়ে চিন-জুং নিশ্চিত মৃত্যুর পথে এগিয়ে চলছিলেন। হাসপাতালে তাঁকে বাঁচাবার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হয়। চারদিন পরেও তাঁর জ্ঞান ফেরে নি।

যখন সবাই চিন-জুং-এর জীবনের সব আশা ছেড়ে দিয়েছেন, তখন হাসপাতালের এক নার্স মাও সে-তুং-এর একটি ছবি অজ্ঞান নাবিকের মুখের কাছে তুলে ধরেন। সঙ্গে সঙ্গে যাদুমন্ত্রের মত কাজ হয়। নিশ্চিত মৃত্যুপথ যাত্রী অজ্ঞান নাবিকের জ্ঞান ফিরে আসে। তিনি চোখ খুলে ফেলেন; ভাবে বিহ্বল তাঁর চোখে জল। তিনি উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বলে ওঠেন ঃ চেয়ারম্যান মাও দীর্ঘজীবী হোন।

নাবিকটি বেঁচে গেছেন। সংবাদটি খাস 'নিউ চায়না নিউজ এজেন্সী' প্রচার করেছে। নিশ্চয়ই এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ। মার্কসবাদ বিকৃত হতে হতে কতটা নিকৃষ্ট গুরুবাদে পরিণত হয়েছে, তার দৃষ্টান্তরূপে এর চেয়ে ভাল ঘটনা বোধ হয় আর হতে পারে না।

(২১।৭।৬৯)

অবিশ্বাস্য অবিস্মরণীয়

একুশে জুলাই মানব ইতিহাসে, সৃষ্টির ইতিহাসে নতুন অধ্যায় রচিত হল। এতদিন যা ছিল কল্পনার বস্তু, স্বপ্নের বিষয় এদিন পৃথিবীর মানুষ তা বাস্তবে রূপায়িত করেছে। মাটির পৃথিবী ছেড়ে মহাকাশচারীরা উড়ে গেছে চন্দ্রলোকে। এক-এক করে দুজন নভশ্চর চাঁদের নরম মাটিতে আলতো করে পা রাখলেন। একজন শিশুর মত সকৌতুকে কুড়িয়ে নিল মুঠো মুঠো চাঁদের মাটি। আরেকজন অবিরাম তুলে গেছে চন্দ্রলোকের আলোকচিত্র।

আমাদের ঘড়িতে যখন সকাল আটটা বেজে ছাব্বিশ মিনিট হয়ে কুড়ি সেকেন্ড তখনই মানবেতিহাসের সেই নাটকীয়, রোমাঞ্চকর ঘটনাটি ঘটলো। চন্দ্রযান ঈগলের খোলস ছেড়ে চন্দ্র অভিযানের নেতা নীল আর্মস্ট্রং চাঁদের মাটিতে পা রাখলেন। তাঁকে অনুসরণ করলেন অলড্রিন।

অদ্ভুত, অভাবনীয় এক অনুভূতি। পৃথিবীর অভিধানে তাকে বর্ণনা করার কোন ভাষা, কোন বিশেষণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। চাঁদের বুকে থেকেও পৃথিবীর মানুষেরা পৃথিবীর ভাষাতেই বার্তা পাঠিয়েছেন ঃ চমৎকার! বালুকাময় নুড়িতে ভরা চাঁদের মাটি। একই ভাষায় প্রেসিডেন্ট নিকসনের সঙ্গে টেলিফোনে আর্মস্ট্রং, অলড্রিন দুজনেই কথা বললেন।

চাঁদ দেশটি কেমন? প্রথম অভিযাত্রী আর্মস্ট্রংয়ের ভাষায় পাউডারের মত গুঁড়ো গুঁড়ো ধুলো দিয়ে চাঁদের দেশটি তৈরি। আর্মস্ট্রং সন্তর্পণে হেঁটে চলেছেন, বড় বড় পা ফেলার উপায় নেই, ছোট এক ইঞ্চি করে এগিয়েছেন, জরীপ করেছেন চাঁদের জমি। আলতো করে চাঁদের মাটি নিয়েছেন তুলে, কালো কয়লার গুঁড়োর মত মাটি।

ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে তাল মিলিয়ে সব কিছু এগিয়ে গেছে। চান্দ্রযানটিকে নামানো হয়েছে কাল্পনিক "শান্তি সমুদ্রে" যেখানে বড় গহবর নেই অথচ মাটিটা অপেক্ষাকৃত মসৃণ ও সমতল। আর সময়টা বেছে নেওয়া হয়েছে যখন চাঁদ সূর্যের কোণাকুণি রয়েছে, যখন সূর্যের ঘন কালো ছায়াটা পড়েছে চাঁদের ওপরে। এর ফলে অভিযাত্রীরা চাঁদের পাহাড়-পর্বত, গুহা-গহবরগুলো স্পষ্ট দেখা যায় এবং এভাবে বিপদ থেকে তাঁরা আত্মরক্ষা করতে পারেন।

মানুষের এ-সাফল্য অবিশ্বাস্য। মানুষ এ-সাফল্যের মাধ্যমে সভ্যতার নতুন স্তরে উন্নীত হল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মহাকাশ অভিযানের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে সোভিয়েট রাশিয়াকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল। নীল আর্মস্ট্রং, এডুইন অলড্রিন এবং মাইকেল কলিন্সের নাম ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে। সাবাস আর্মস্ট্রং! সাবাস অলড্রিন। মানুষের জয়যাত্রা, বিজ্ঞানের জয়যাত্রার ধারাকে এক লাফে হাজার যোজন এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তোমাদের জানাই আন্তরিক অভিনন্দন।

যুক্তফ্রণ্ট সরকার সমীপেষু

মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু অতি বিচক্ষণ অফিসারের রং বদল হতে সুরু করে। প্রথম থেকেই আমি অভিযোগ করেছি এই রং বদল একটা চাল মাত্র। প্রকাশ্যে রং বদল করে ঐ সব অতি-বিচক্ষণ অফিসাররা ফ্রন্টের অতি-উৎসাহী ভক্ত বলে নিজেদের পরিচয় জাহির করেন আর গোপনে যোগাযোগ রাখেন যুক্তফ্রন্ট বিরোধী চক্র ও চক্রান্তের সঙ্গে।

দু'-একটি উদাহরণ উপস্থাপিত করছি ফ্রন্ট সরকারের কাছে। রাজ্য সরকারের প্রচার দপ্তরের জনৈক অফিসার আগাগোড়া অতুল্যবাবুর ঘনিষ্ঠতম অনুচররূপে পরিচিত ছিলেন। নির্বাচনের ফল প্রকাশের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, কংগ্রেসের জয়লাভ অনিবার্য। আসলে তিনি মনে-প্রাণে কামনা করতেন রাষ্ট্রপতির শাসনের মত রাজনৈতিক অবস্থা সৃষ্টি হোক।

একটির পর একটি কেন্দ্রে কংগ্রেসের পতনের সংবাদ আসতে লাগলো আর উক্ত অফিসারের গলার স্বর বদলাতে লাগলো। মাত্র ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে দেখা গেল ঐ অফিসার একেবারে যুক্তফ্রন্টের সমর্থক। ভোটের ফল ঘোষণার সময় আগে ফ্রন্ট প্রার্থীর নাম ঘোষণা করতে আরম্ভ করলেন। ফ্রন্টের বিভিন্ন দলের নেতাদের কাছে টেলিফোনে ভোটের ফলাফল জানাতে সুরু করলেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাঁর রং বদল হয়ে গেল। এখন তিনি ফ্রন্টের অত্যন্ত বিশ্বস্ত লোক বলে নিজেকে জাহির করেন। অথচ একটু খোঁজ নিলেই উক্ত ভদ্রমহোদয়ের আসল রংটি জানতে পারবেন। কিছু বদলায় নি। নিজের অন্তরঙ্গদের কাছে ফ্রন্টের প্রভাবশালী নেতাদের সম্বন্ধে তিনি কি মন্তব্য করেন, জানতে পারলেই বুঝবেন যে, তিনি কত ফ্রন্ট দরদী।

ফ্রন্ট সরকারের দরদী সেজে সরকারকে ভুল সংবাদ দিয়ে ফ্রন্টকে বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করছেন কয়েকজন ঊর্ধতন অফিসার। জনকয়েক পদস্থ পুলিশ অফিসার আপাতত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর অত্যন্ত বিশ্বস্ত হওয়ার ভান করছেন।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই আনন্দবাজার পত্রিকা অফিসের সামনে ছাত্রদের বিক্ষোভ প্রকাশের ঘটনার কথা। সেদিন সদ্য ফ্রন্ট সরকার ভক্ত সেজেছেন এমন একজন অফিসার ঐ ঘটনার যে বিবরণ উপ-মুখ্যমন্ত্রীকে দেন, তার ওপর বিশ্বাস করলে উপ-মুখ্যমন্ত্রী নিজেই কি বেকায়দায় পড়তেন না। যখন মন্ত্রিসভার অপর একজন প্রভাবশালী সদস্য আনন্দবাজারের ঘটনার বিবরণ উপ-মুখ্যমন্ত্রীকে দেন, তখন তাঁর-ই সামনে উক্ত অফিসার "সব ঝুটা হ্যায়" বলার মত ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেন। কিছুই হয় নি বলে উক্ত অফিসার আপাতদৃষ্টিতে সি-পি-এম প্রভাবান্বিত ছাত্র সংস্থার কিছু সংখ্যক কর্মীর দোষ স্খালনের চেষ্টা করে উপ-মুখ্যমন্ত্রীর বিশ্বাস অর্জন করতে চেয়েছিলেন। আসলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অপদস্থ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য—এই অভিযোগ করলে কি অন্যায় হবে?

বিধানসভায় উপ-মুখ্যমন্ত্রী ঐ দিনের ঘটনার যে বিবরণ পেশ করেন, তা থেকেই বোঝা যায় যে, উক্ত অফিসার উপ-মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ভুল তথ্য সরবরাহ করেছিলেন। এই সব দায়িত্বশীল অফিসারের বিবরণের ওপর উপ-মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বাস স্থাপন করে কোন কর্মপন্থা কি গ্রহণ করতে পারেন? বিভিন্ন এলাকায় যে সব শরিকী সংঘর্ষ ঘটছে, তার সত্য বিবরণ কি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে এসে পৌঁছয়? শরিকী দ্বন্দ্বকে উস্কিয়ে তোলার জন্য পদস্থ পুলিশ অফিসারদের সক্রিয় ভূমিকার অভিযোগ তো বিভিন্ন শরিক দলের কাছ থেকেই এসেছে?

উপ-মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ তিনি যেন উক্ত বিশেষ পুলিশ অফিসার, যিনি তাঁর কাছে আনন্দবাজার পত্রিকার ঘটনার প্রাথমিক বিবরণ দিয়েছিলেন, তাঁর অতীত ও বর্তমান কার্যকলাপ সম্পর্কে আরো কিছু সংবাদ সংগ্রহ করার অনুরোধ করি।

ফ্রন্টের নীতির বিরোধী দুইখানি নামকরা সংবাদপত্রে উক্ত অফিসার কি এখনও বেনামে রাজনৈতিক প্রবন্ধ নিয়মিত লিখে থাকেন? আর এজন্য তিনি বেশ মোটা টাকা মজুরি পান। এই লেখাগুলিতে কি প্রধানত যুক্তফ্রন্ট সরকারের নীতিগত সমালোচনা করা হয়ে থাকে? এই অভিযোগ সত্য হলে উক্ত অফিসার অনেকগুলি গুরুতর অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত হবেন। প্রথমত সরকারী কর্মচারী হিসাবে সরকারের অনুমতি না নিয়ে তিনি অন্য কাজ করে অর্থ উপার্জন করতে পারেন না। দ্বিতীয়ত সরকারের সমালোচনা করে প্রবন্ধ লিখে তিনি সরকারের বিরোধিতা করছেন—এ অধিকার তাঁর নেই।

আলোচ্য অফিসারের অতীত দিনের কার্যকলাপের সঙ্গে আমরা পরিচিত। কংগ্রেস আমলেই তিনি শুধু কংগ্রেসের মন্ত্রীদের সন্তুষ্ট রাখতেই চেষ্টা করতেন না, চৌরঙ্গী ভবনের সঙ্গে তাঁর ছিল ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। যোগাযোগ যে আজো ছিন্ন হয় নি, তার যথেষ্ট প্রমাণ আমাদের কাছে আছে। উপ-মুখ্যমন্ত্রী কি তাঁর ওপর আস্থা স্থাপনের পূর্বে আর একবার ভাল করে তদন্ত করে দেখবেন?

কিস্তিতে ট্রানজিস্টার
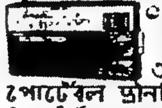
BAZA
৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড
পোর্টেবল ট্রানজিস্টর মাসিক ৫ টাকা কিস্তিতে। প্রত্যেক গ্রাম ও শহরে পাওয়া যাইতে পারে।
HIND AGENCIES (P7) KOLHAPUR ROAD, DELHI-7

আর-ও একজন পদস্থ পুলিশ অফিসারের কথা তো সকলেই জানেন। কংগ্রেস আমলে তিনি কংগ্রেসের মন্ত্রী আর নেতাদের ছিলেন অতি বশংবদ। কংগ্রেস নেতাদের সন্তুষ্ট করার জন্য নিজে বয়ে ভেট নিয়ে যেতেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের ছিলেন তিনি অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন। কিন্তু তখনি তিনি নিজের স্বার্থে দু-মুখো নীতি গ্রহণ করে চলতেন। একটি ঘটনার কথা আমাদের মনে পড়ে। দুর্গাপুর প্রজেক্টের বহু কেলেঙ্কারীর কাহিনী তিনি তথ্যাদি সহ জনৈক বিরোধী নেতার হাতে তুলে দেন বিধানসভায় উপস্থিত করাবা জন্য। আর সেদিন-ই তিনি তদানীন্তন শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রীর কক্ষে গিয়ে জানিয়ে এলেন, "স্যার আপনার দপ্তরের বিরুদ্ধে ওরা যাচ্ছেতাই লাগাচ্ছে। ওদের পুলিশ দিয়ে দুর্গাপুরে একেবারে ঠান্ডা করে দিচ্ছি।" ঠিক ঐ সময় শ্রীতরুণকান্তি ঘোষের কক্ষে একজন বিরোধী দলের বিশিষ্ট লোকসভা সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সম্ভবত উক্ত পুলিশ অফিসার তাঁকে চিনতেন না। উক্ত অফিসারের চরিত্র বোঝার জন্য এই উদাহরণটি দিলাম।

উক্ত পুলিশ অফিসারের হঠাৎ ভোল বদলো গেলো ফ্রন্টের আমলে। ফ্রন্টের মন্ত্রীদের বাড়িতে যাতায়াত সুরু করে দিয়েছেন তিনি। সেই পুরনো কায়দায় আত্মীয়তা পাতাতে চেষ্টা করছেন। তারপর যেভাবে দিনের পর দিন মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করে কংগ্রেসকে জনসাধারণের কাছে অপ্রিয় করে তুলতে সাহায্য করেছেন, ঠিক সেই পথ গ্রহণ করতে সুরু করেছেন ফ্রন্ট সরকার সম্পর্কে। ইনি-ও শরিকী সংঘর্ষে পক্ষপাতমূলক আচরণ করছেন। আপাত উদ্দেশ্য কোন বিশেষ এক শরিককে সন্তুষ্ট করা আর আসল উদ্দেশ্য হলো ফ্রন্টের বিভিন্ন দলকে অপ্রিয় করে তোলা।

এ ধরণের অজস্র উদাহরণ দেওয়া যায়। উপ-মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অনুরোধ শরিকী সংঘর্ষ সম্পর্কে পুলিশ রিপোর্ট যাচাই করে নিন।

কৃষিমন্ত্রী ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্যের দপ্তরের অত্যন্ত পদস্থ কয়েকজন অফিসার কৃষিমন্ত্রীর সামনে তাঁর প্রশংসায় মুখর। কৃষিমন্ত্রী কি দয়া করে খোঁজ নেবেন কৃষ্ণনগরের যে অফিসারকে তিনি সরেজমিনে তদন্ত করে সাসপেন্ড করে এসেছিলেন, সেই অফিসার একতরফা মামলা করে সরকারী আদেশ কিভাবে নাকচ করলো। কার গাফিলতিতে রাজ্য সরকার কোর্টে হাজির হয়ে উপযুক্ত বক্তব্য রাখার সুযোগ পেলেন না? ডঃ ভট্টাচার্য অনেকগুলো মারাত্মকরকমের পুরাতন গাফিলতির মূলো খুঁজে বের করার জন্য তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি কি জানেন তাঁর আশেপাশে সর্বক্ষণ যে অফিসাররা ঘোরাঘুরি করেন, তাঁরাই সেই সব তদন্তের মূল উদ্দেশ্য বানচাল করার চেষ্টা করছে?

স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্য এতদিনে নিশ্চয়ই টের পেয়েছেন বিভিন্ন হাসপাতালে অসন্তোষ সৃষ্টি করার রাজনৈতিক চক্রান্তের সঙ্গে কয়েকজন পদস্থ অফিসার কিভাবে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে রয়েছেন। যাঁরা প্রকাশ্য বিরোধিতা করছেন, তাঁদের চেনা সহজ। কিন্তু দরদী, অনুগত ও বিশ্বস্ত সেজে পেছনে ছুরিকাঘাত করছেন যাঁরা, তাঁদের চেনা সহজ নয়। মনে রাখবেন আমলাতন্ত্রের ঐ সব মুকুটমণিরা নীতিগতভাবে ফ্রন্ট সরকারের বিরোধী। তাদের অনেকেই আজো গোপনে চৌরঙ্গী ভবনের নায়কদের সেলাম দেয়।

—শ্রীসর্বদর্শী

সদ্য প্রকাশিত

কালিকট থেকে পলাশী

শ্রীসতীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় রচিত পাশ্চাত্য জাতিগুলির প্রাচ্যে অভিযান কাহিনী। এই বই-এ আলোচিত হয়েছে, ইংরেজ-পর্তুগীজ আসার বহু আগে থেকে এদেশের সঙ্গে ইউরোপের কিভাবে যোগাযোগ ও ব্যবসা-বাণিজ্য হত, এবং কালিকটে পর্তুগীজ বাণিজ্যতরী নোঙর ফেলার দিন (১৪৯৮, ২০ মে) থেকে পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭, ২৩ জুন) সময় পর্যন্ত—এই আড়াই শ বছরে পাশ্চত্যের সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ, ইংরেজ কর্তৃক ভারতের বাণিজ্য অধিকার এদেশের রাষ্ট্রিক, আর্থিক, সামাজিক ও ধর্ম বিষয়ে কতখানি পরিবর্তন ঘটেছিল তার বিবরণ। বিশেষ করে বলা হয়েছে বাঙলা দেশের কথা, কেমন করে এই ঐশ্বর্যময় দেশটি হঠাৎ কোন জাদুমন্ত্রের ফলে একটা ভিক্ষুকের আখড়ায় পরিণত হল, কেমন করে মুর্শিদাবাদের রত্নরাজি সেকালের নিরাভরণা লন্ডনের দেহে ঝলমল করে উঠল। শ্রীঅর্ধেন্দু দত্তের আঁকা দশটি বিরল মূল্যবান মানচিত্র। একটি অবশ্যপাঠ্য ইতিবৃত্ত। [৬·৫০]

বঙ্কিম রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড

বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা যাবতীয় ইংরেজি রচনা এই খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত। [১৫·০০]

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড :: কলিকাতা-৯

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

আশুতোষ ভট্টাচার্য

বাংলা শিক্ষা জগতে প্রাচীন ধারার যে সকল অধ্যাপক অধ্যয়ন এবং গবেষণা-কর্মকে জীবনের একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান বলে গ্রহণ করেছিলেন, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন তাঁদেরই একজন। তিনি সর্বদাই রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকতেন, সেইজন্য জীবনে দর্শনীয় এমন কিছু করে উঠতে পারেন নি সত্যি, এমন কি, এ বিষয়ে তাঁর স্বাভাবিকভাবেই যা প্রাপ্য ছিল, তাও তিনি লাভ করতে পারেন নি, তবু যাঁরা তাঁর সাহচর্যে আসবার সুযোগ লাভ করেছিলেন, কিংবা যাঁরা তাঁর ছাত্র হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, তাঁরা তাঁর উদার চরিত্রের অফুরন্ত মাধুর্য এবং মহত্ত্বে মুগ্ধ হয়েছেন।

ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেব তাঁর জীবনের সর্ববিধ কৃতিত্বের জন্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের নিকট গভীর ঋণ স্বীকার করতেন। তাঁর ছাত্রজীবন থেকেই স্যার আশুতোষ তাঁকে চিনতেন। এই বিষয়ে ডঃ শহীদুল্লাহ সাহেবের কাছে যা শুনেছি, তাই এখানে বলছি। তিনি বলতেন, স্যার আশুতোষই তাঁর জীবনের ধারা স্থির করে দিয়েছিলেন। শহীদুল্লাহ সাহেব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি-এ পাশ করবার পর ১৯১০ সনে সংস্কৃতে এম-এ পড়বার জন্য যথারীতি ভর্তি হন। বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কৃত বিভাগের একজন গোঁড়া পণ্ডিত তাঁকে বেদ পড়াতে অসম্মত হন। এমন কি তাঁকে ক্লাশ থেকে বিতাড়িত করে দেন। শহীদুল্লাহ সাহেব স্যার আশুতোষের শরণাপন্ন হন। স্যার আশুতোষ সংস্কৃত বিভাগের পণ্ডিতদিগের কাজে হস্তক্ষেপ করতে চান না, কারণ, তাঁদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করতে গেলে, তাঁরা বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারেন। সেই জন্য তিনি শহীদুল্লাহ সাহেবকে সংস্কৃতের পরিবর্তে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব নিয়ে এম-এ পড়বার পরামর্শ দিলেন। তিনি স্যার আশুতোষের পরামর্শ শিরোধার্য করে নিয়ে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব নিয়ে এম-এ পড়তে লাগলেন এবং এই বিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনিই প্রথম স্নাতকোত্তর উপাধি লাভ করলেন। সুতরাং ভাষাতত্ত্ব আলোচনার পথে স্যার আশুতোষই তাঁকে নিয়োজিত করেছিলেন এবং এই পথে সাধনা করেই তিনি জীবনে যশস্বী হয়েছেন।

শহীদুল্লাহ সাহেব বলতেন, কেবলমাত্র শিক্ষা বিষয়ের পথনির্দেশের জন্যই নয়, জীবিকা অর্জনের পথসন্ধান লাভ করবার জন্যও তিনি স্যার আশুতোষের নিকট ঋণী ছিলেন। এম-এ এবং আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর শহীদুল্লাহ সাহেব বসিরহাট মহকুমা আদালতে ওকালতি ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ইতিমধ্যে তাঁর ভাষাতত্ত্ব বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ এবং অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। স্যার আশুতোষ সেই সময় একবার বসিরহাট কোর্ট পরিদর্শন করবার জন্য যান এবং শহীদুল্লাহ সাহেবকে সেখানে ওকালতি ব্যবসায় নিযুক্ত দেখতে পান। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধগুলো তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল, শহীদুল্লাহ সাহেব ওকালতি ব্যবসায় নিযুক্ত থেকেও ভাষাতত্ত্বের বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা করে চলেছেন দেখে স্যার আশুতোষ তাঁকে ২০০্ টাকা বেতনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নব প্রতিষ্ঠিত বাংলা বিভাগে রামতনু লাহিড়ী গবেষণা সহায়ক নিযুক্ত করবার প্রস্তাব করলেন, শহীদুল্লাহ সাহেব আনন্দের সঙ্গে স্যার আশুতোষের সেই প্রস্তাব গ্রহণ করে আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে যোগদান করলেন, জীবিকা অর্জনের দিক থেকেও তাঁর জীবনে স্যার আশুতোষ মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। তখন থেকেই শহীদুল্লাহ সাহেবের অধ্যাপনার এবং গবেষক জীবনের সূচনা হলো।

শহীদুল্লাহ সাহেব সর্বদাই কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্যার আশুতোষের প্রতি তাঁর এই সুগভীর ঋণের কথা স্বীকার করতেন, মুহূর্তের জন্যও তা বিস্মৃত হতেন না। ১৯২১ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলো। সেখানে সংস্কৃত ও বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তিনি মুহম্মদ শহীদুল্লাহ সাহেবকে তাঁর বিভাগে তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব এবং প্রাচীন বাংলা পড়ানোর জন্য লেকচারার নিযুক্ত করে নিলেন।

১৯২৮ সনে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত এবং বাংলায় অনার্স নিয়ে একক ছাত্ররূপে ভর্তি হই এবং চার বছর তাঁর কাছে পড়ে ১৯৩২ সনে প্রথম শ্রেণীতে এম-এ পাশ করি। তখনকার কঠিন বেকার সমস্যার দিনে আমি যখন কর্মান্তরে নিযুক্ত হয়েছিলাম, তখন শহীদুল্লাহ সাহেব আমাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচাররূপে নিযুক্ত করে আমার জীবনের মোড়ও ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন। সে জন্য মধ্যে মধ্যে তিনি রসিকতা করে বলতেন, এক আশুতোষের কাছে আমার যে ঋণ জমা হয়ে আছে, তা আর এক আশুতোষকে যতটা পারি শোধ করে যাই। [সে কথাই আজ এই সুযোগে কিছু বলতে চাই।]

আমি ১৯২৮ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন ভর্তি হই, তখন শহীদুল্লাহ সাহেব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দু-বছরের ছুটি নিয়ে প্যারিসে গেছেন; তাঁর বদলে স্বর্গত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের ভাষাতত্ত্ব পড়াচ্ছেন। আমি ভর্তি হবার তিন মাসের মধ্যেই শহীদুল্লাহ সাহেব প্যারিস থেকে ডক্টরেট (ডি লিট) নিয়ে ফিরে এসে তাঁর কাজে যোগ দিলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ত্রিশের কোঠায় পা দিয়েছে, উজ্জ্বল স্বাস্থ্যবান দেহ। প্রথম বার্ষিক ষান্মাসিক শ্রেণীতে ভাষাতত্ত্ব ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ক্লাশে আমি তখন তাঁর একমাত্র ছাত্র। আমরা দুজন ছাত্র ভর্তি হয়েছিলাম, একজন সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে ধরা পড়ে পুলিশ কর্তৃক অন্তরীণ হলো, আর কোনদিন ফিরে এলো না। ডক্টর শহীদুল্লাহ সাহেবের তখন আমার সম্পর্কেও আশঙ্কা হতে লাগলো যে, আমিও হয়ত কোন সন্ত্রাসবাদী দলের সঙ্গে যুক্ত আছি এবং একদিন তিনি ক্লাশে এসে দেখলেন যে, আমিও উপস্থিত নেই। সেই জন্য প্রথম থেকেই তিনি আমাকে সর্বদা চোখে চোখে রাখতে লাগলেন। ক্লাশ শেষ হলে বাড়িতে নিয়ে

যেতেন, সেখানেও আমাকে পড়াতেন এবং তাঁর কোন রচনা মৌখিক আমাকে বলে যেতেন, আমি লিখে যেতুম। এইভাবে তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হতে লাগল।

শহীদুল্লাহ সাহেব তাঁর পড়াশোনার মধ্যেও সকল ছাত্রেরই ঘনিষ্ঠ সংস্রবে থাকতে ভালবাসতেন; সেজন্য তিনি সলিমুল্লাহ মুসলিম হল অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্রাবাসে 'হাউস টিউটর' বা তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয়েছেন। সেখানেই তিনি তাঁর বিরাট ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারটি স্থাপন করেছিলেন, তাতে পৃথিবীর নানা ভাষার নানা বিষয়ক বই সাজিয়ে রাখতেন। কিন্তু বই কেবল মাত্র তাঁর সাজানোই থাকতো না, সর্বদা কোন-না-কোন বিষয় নিয়ে তিনি পড়াশুনা করতেন। এমন কি, একটি বই যদি এদিক-সেদিক হতো তবে তৎক্ষণাৎ তাঁর সন্ধান নিতেন। একবার 'হারানো মাণিক' নামে একটি বাংলা প্রবাদ সংগ্রহের ছোট্ট বই কি কারণে তিনি খুঁজে পান নি। নিজে খুঁজলেন, আমাদের দিয়ে তন্ন তন্ন করে খোঁজালেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁর সন্ধান পেলেন না; বইখানি দুর্লভ ছিল; বাজারেও কিনতে পাওয়া গেল না, তার জন্য বছরে একবার দু'বার করে আমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করতে শুনেছি।

ছাত্রজীবনে আমি শহীদুল্লাহ সাহেবের অসংখ্য প্রবন্ধ লিখে দিয়েছি, অর্থাৎ তিনি মৌখিক বলে যেতেন, আমি লিখে যেতুম, তারপর তিনি তা সংশোধন করে ছাপাতেন। তাঁর অনেক বেশ বড় বড় স্কুলপাঠ্য বইও এইভাবে লেখা হয়েছে। এইভাবে আমার নিজের গবেষণামূলক প্রবন্ধ এবং বই লেখার অভ্যাস হয়েছিল।

আমাদের ছাত্রজীবনেই শহীদুল্লাহ সাহেব হাফেজের পারসী গজলগুলো বাংলা অনুবাদ করতে আরম্ভ করেন। সেই সময় তাঁর বিশ্বাস হলো তিনি খুব ভাল সঙ্গীতও রচনা করেন এবং খাঁটি পারসী গজল তাঁর নিজস্ব সুরে বাংলায় প্রচলিত করতে পারবেন। প্রধানত ভারতবর্ষ পত্রিকায় তাঁর অনূদিত গজলগুলো এক-একটি করে প্রকাশিত হতো। তাঁর একটি গজলে এই একটি পদ ছিল—

'না জানি কলম চোখে ঝরিছে কতই পানি।'

সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'শনিবারের চিঠি'তে এই পদটি সম্পর্কে মন্তব্য করা হলো—'কবিতা লিখিতে বসিয়া শহীদুল্লাহ সাহেবের কলমের চোখে কত পানি ঝরে, তাহা না দেখিলেও অনুমান করিতে পারি।' এই মন্তব্যটি আমিই প্রথম এনে তাঁকে দেখালাম; তিনি পড়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে হেসে উঠলেন। দ্বিগুণ উৎসাহে তাঁর গজল রচনা চলতে লাগল। প্রত্যেকটি গজল রচনা করবার পরই প্রথমই আমাকে পড়ে শোনাতেন এবং আমার মন্তব্য শুনতে চাইতেন। তার কারণ, আমি তখন কবিতা রচনা করতাম এবং আমার কবিত্ব সম্পর্কে তাঁর গভীর শ্রদ্ধা জন্মেছিল। আমি তাঁর প্রত্যেক গজলকেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতাম। তাঁর রচনায় গজলগুলোর এক-একটি পদ অপূর্ব রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠত; কয়েকটি পদ আজ পর্যন্তও স্মরণ করতে পারি।

আমরা এম-এ-তে শহীদুল্লাহ সাহেবের ক্লাসে তিনজন ছাত্র ছিলাম। তখন তিনি বৌদ্ধ গান বা চর্যাপদ পড়াতেন। তাঁর ছাত্র-বাৎসল্যের গুণে তিনজনেরই তাঁকে অত্যন্ত আপনার বলে মনে হতো। আমাদের একজন সতীর্থের বাড়িতে একটু সঙ্গীতচর্চা হতো। সন্ধ্যের পর আমিও সেখানে গিয়ে কোন-কোনদিন বসতাম। একদিন শহীদুল্লাহ সাহেব সেখানে এসে হাজির হলেন। তিনি বললেন, তাঁর রচিত গজলগুলোর সুর দিতে হবে। সেদিন থেকে শহীদুল্লাহ সাহেবের গজল গানগুলোতে সুর বসানোর কাজ চলতে লাগলো। শহীদুল্লাহ সাহেব তা শুনে খুব খুশি হয়েছিলেন, কিন্তু তা আর কারো কোন কাজে এসেছিল বলে মনে হচ্ছে না।

তারপর শহীদুল্লাহ সাহেব একদিন সেখানে গিয়েই বললেন, চর্যাগানগুলোতে সুর দিতে হবে। সে চেষ্টাও অনেক হলো। শহীদুল্লাহ সাহেব গভীর মনোযোগের সঙ্গে তা শুনতেন, কিন্তু তারও শেষ পর্যন্ত কোন স্থায়ী প্রভাব দেখা গেল না। চর্যাগানগুলোকে সুরের ভেতর দিয়ে প্রকাশ করার সঙ্কল্প তাঁর ছিল, কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে তা আর সম্ভব হয়ে ওঠে নি। বাইরে থেকে ডিগ্রি নিয়ে এসে এতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি করা সত্ত্বেও শহীদুল্লাহ সাহেবের কর্মজীবনে তখন পর্যন্ত কোন উন্নতি হয় নি। তার দুটি কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতির সঙ্গে তাঁর কোন যোগ ছিল না, তারপর তিনি সংস্কৃত ভাষার প্রতি অনুরাগী ছিলেন বলে সবাই তাঁকে হিন্দুভাবাপন্ন বলে মনে করত। সেইজন্য মুসলমান সমাজেও তাঁকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখা হতো। অথচ যাঁরা তাঁকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন, তাঁরা জানতেন, তাঁর মত নিষ্ঠাবান মুসলমানও খুব কমই ছিল। এই সকল নানা কারণে শহীদুল্লাহ সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারারের পদ থেকে তখন পর্যন্তও উন্নতি লাভ করতে পারেন নি, তাঁর মাইনেও তখন পর্যন্ত ছিল মাত্র চার শত টাকা। তা নিয়ে মধ্যে মধ্যে তিনি দুঃখ করতেন, কারণ, ইতিমধ্যে তাঁর বহু সন্তান জন্মেছিল, তাঁর পরিবার বৃহৎ আকার লাভ করেছিল। ব্যয় সঙ্কুলান অনেক সময় কঠিন হয়ে উঠত বলে তিনি বিদ্যালয় ও মাদ্রাসার জন্য পাঠ্যপুস্তক লিখতেন, এইসব বই লেখার ব্যাপারে আমি তাঁকে সাহায্য করতাম, অবশ্য তার বিনিময়ে তিনি আমাকে প্রচুর অর্থ দিতেন, আমার কাছে কোন রকম সুযোগ নিতেন না। সেই সময় তাঁর চরিত্রের একটি গুণের যে পরিচয় পেয়েছিলাম, তা এখানে উল্লেখ না করে পারব না।

সে সময়ে শহীদুল্লাহ সাহেবের ছোট একটি মোটর গাড়ি ছিল, তিনি অনেক সময় তাতে করে আমাকে তুলে নিয়ে রমনা থেকে শহরের ভিতরে একটা প্রেসে যেতেন, সেখানে বসে বসে তিনি এবং আমি দুজনে প্রুফ সংশোধন করতাম। একদিন এই-ভাবে গাড়ি করে দুজনে যাবার সময় একটি দশ বছরের মেয়ে দৈবাৎ গাড়িতে চাপা পড়ল। মেয়েটি অজ্ঞান হয়ে গেল, কিন্তু বাইরে থেকে কোন আঘাতের চিহ্ন দেখা গেল না। তাড়াতাড়ি গাড়ি থেকে নেমে তিনি মেয়েটির আত্মীয়-স্বজনের সন্ধান করতে লাগলেন, দেখা গেল এক পর্দা-নসীন দরিদ্র মুসলিম মহিলা বালিকাটির জননী, সে বাইরে আমাদের সামনে আসবে না, অথচ বাড়ির ভিতর থেকে তার কান্না শুনতে পাওয়া গেল। শহীদুল্লাহ সাহেব অধীর হয়ে উঠলেন, তার বাড়ির ঠিকানাটি লিখে নিয়ে আহত মেয়েটিকে গাড়িতে তুলে নিয়ে হাসপাতালে এলেন। ডাক্তারের কাছে এসে ডাক্তারের দুই হাত জড়িয়ে ধরিয়ে বললেন, ডাক্তারবাবু, এ আমার মেয়ে, যেভাবেই হোক, একে বাঁচিয়ে তুলতে হবে, যত টাকা লাগে দেব, বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এল। আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

ডাক্তার কিছুক্ষণ পরীক্ষা করে একটি শয্যায় নিয়ে তাকে শুইয়ে দিলেন, তখনও জ্ঞান ফিরে আসে নি। ডাক্তার বললেন, জ্ঞান না ফেরা পর্যন্ত কিছু বলা যাবে না।

শহীদুল্লাহ সাহেব রোগিণীর শিয়রে বসে তার গায়ে হাত বুলাতে লাগলেন, চোখ থেকে তখনও জল শুকোয় নি। কণ্ঠ বন্ধ হয়ে এসেছে বলে ডাক্তারকেও আর কিছু বলতে পারলেন না। কিছুক্ষণ অমনি চুপ করে বসে রইলেন। রোগিণীও চোখ বুজে নিশ্চল হয়ে শুয়ে রইল।

কিছুক্ষণ পর ডাক্তার বললেন, আপনি এখন বাড়ি যান, কতক্ষণ বসে থাকবেন, আমরা এখানে ওর যা করবার তা করব।

কিন্তু তিনি বললেন, ওর জ্ঞান না

যেন্না পর্যন্ত আমি বাড়ি যাব না। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি গাড়িটা নিয়ে আমার বাড়িতে সফিকে (সফিউল্লাহ তাঁর বড় ছেলের নাম) গিয়ে খবর দাও। তুমি গিয়ে খাওয়া-দাওয়া কর, তোমার আর এখানে ফিরবার দরকার নেই, আমি আছি।

ডাক্তার অনেক বোঝালেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই শুনলেন না, রোগিণীর শিয়রে বসে রইলেন। আমি অগত্যা গাড়ি নিয়ে ফিরে এসে তাঁর বাড়িতে সফিউল্লাহকে খবর দিলাম। সেদিন সন্ধ্যায় রোগিণীর জ্ঞান ফিরে আসবার পর তিনি বাড়ি ফিরে এলেন। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, রোগিণীর বিশেষ কিছুই হয় নি, তবু বেশ কয়েকদিন তাকে হাসপাতালে থাকতে হয়েছিল। সেই সময় প্রতিদিন শহীদুল্লাহ সাহেব হাসপাতালে যেতেন, রোগিণীর সংবাদ নিয়ে তার জন্য খাবার জিনিস কিনে দিতেন।

আমাকে সেই সময় বললেন, দেখ, এইজন্য গাড়ি চড়তে ইচ্ছা করে না, যখনই মেয়েটার মুখটা আমার মনে হয়, তখনই মনে করি জীবনে আর গাড়ি চড়ব না। তারপর সত্য-সত্যই তিনি গাড়ি ছেড়ে দিয়েছিলেন, অনেক দিন তাঁকে গাড়ি চড়তে দেখি নি। হাসপাতাল থেকে ফিরে আসার পরও তিনি মেয়েটির সর্বদা সংবাদ নিতেন, শেষ পর্যন্ত তিনিই মেয়েটিকে বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন, বিয়ের যাবতীয় ব্যয় তিনিই নিজে বহন করেছিলেন।

শহীদুল্লাহ সাহেবের সহকর্মী ডক্টর সুশীলকুমার দে অত্যন্ত রসিক লোক ছিলেন, তিনি সমস্ত ঘটনাটি শুনবার পর শহীদুল্লাহ সাহেবকে রসিকতা করে বললেন, 'রথে তু বামনং দৃষ্টা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে' কেন সে অধিকার থেকে তুমি তাকে বঞ্চিত করলে? শুনে শহীদুল্লাহ সাহেব উচ্ছ্বসিত হাসি রোধ করতে পারলেন না, ততদিনে মেয়েটি সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে এসেছে।

শহীদুল্লাহ সাহেবকে পণ্ডিত বলেই বাইরের লোকে জানে, এই দিকটার পরিচয় কেউ জানে না, সেজন্যই কাহিনীটি একটু বিস্তৃত করে এখানে উল্লেখ করলাম।

আমি এম-এ পাশ করবার অল্প দিনের মধ্যে বাংলা বিভাগের অন্যতম লেকচারার স্বর্গত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অবসর গ্রহণ করলেন, শহীদুল্লাহ সাহেবের একান্ত অনুরোধে বিভাগীয় প্রধান ডক্টর সুশীলকুমার দে সেই পদে অস্থায়িভাবে আমাকে নিয়োগ করলেন। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুকাল গবেষণা করবার পর সেখান থেকে চলে গিয়ে অন্যত্র এক সামান্য কাজে নিযুক্ত হয়েছিলাম। একদিন শহীদুল্লাহ সাহেবের এক চিঠি পেয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে জানতে পেলাম, আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার নিযুক্ত হয়েছি। নির্দিষ্ট সময়ে আমি কাজে যোগদান করলাম। শহীদুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে সম্পর্কের যে সূত্র সাময়িকভাবে ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, তা পুনরায় স্থাপিত হলো। তখন পর্যন্ত ডঃ সুশীলকুমার দে সংস্কৃত ও বাংলার বিভাগীয় প্রধান ছিলেন, কিন্তু সেই বছরই (১৯৩৭) এই দুই বিভাগ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং শহীদুল্লাহ সাহেব বাংলা বিভাগের প্রধান হয়ে সর্বপ্রথম লেকচারার থেকে রীডার নিযুক্ত হন। তখন থেকে বাংলার গবেষণা বিষয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করবার তাঁর সুযোগ হয়। আমি তখন থেকেই শহীদুল্লাহ সাহেবের অধীনে বাংলা বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হই।

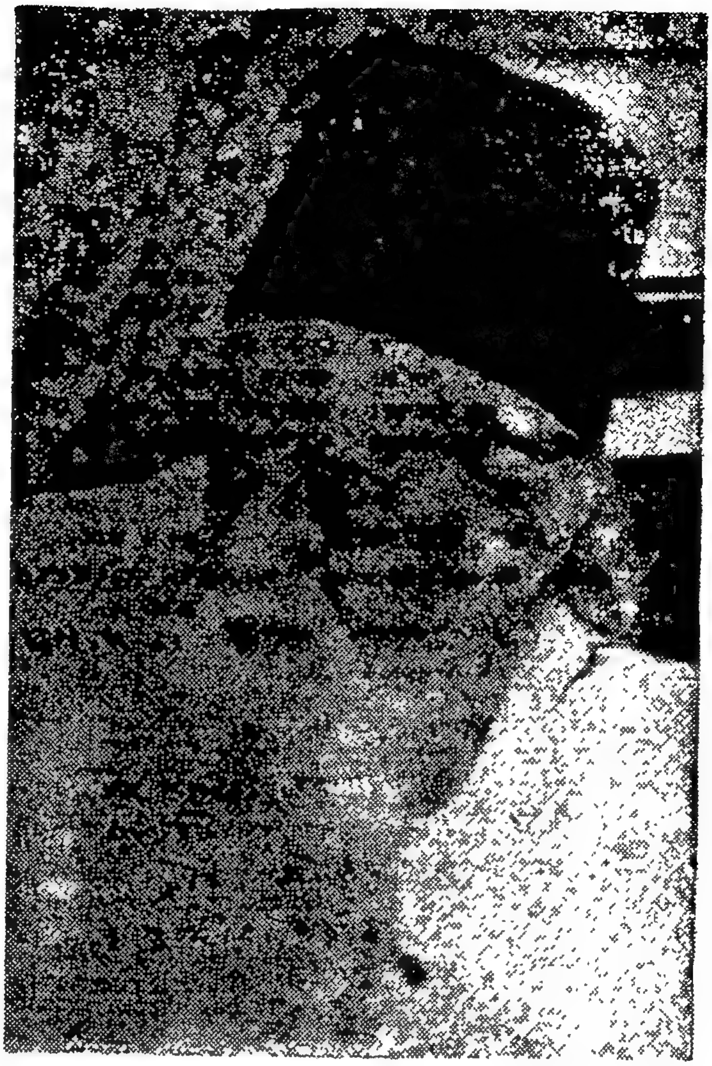

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

শহীদুল্লাহ সাহেব বিভাগীয় প্রধান নিযুক্ত হবার পর থেকেই পূর্ববাংলার লোক-সাহিত্য সংগ্রহ এবং তা নিয়ে গবেষণা করবার কাজে তিনি প্রবল উৎসাহ প্রকাশ করতে লাগলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লোক-সাহিত্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ সমিতি নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করলেন, তিনি সেই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি এবং আমি তার সম্পাদক নিযুক্ত হলাম। কিন্তু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এই জন্য অর্থমঞ্জুর করতে রাজী হলো না। শহীদুল্লাহ সাহেব তখন সরকারী সাহায্য লাভ করবার উপায় সন্ধান করতে লাগলেন। একবার সে সময়কার অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী পরলোকগত মৌলভী ফজলুল হক যখন ঢাকায় এলেন, তখন আমাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। সে সাক্ষাৎকারের কথা আমার এখনও মনে আছে এবং তা এখানে উল্লেখ করবার যোগ্য।

তখন বর্ষাকাল, ঢাকার সদরঘাটে বুড়ীগঙ্গা নদীতে বড় বড় পানসি নৌকোয় তখন কয়েকজন মন্ত্রী এসেছিলেন। একদিন সকালবেলা শহীদুল্লাহ সাহেবকে অগ্রবর্তী করে আমি তাঁর পিছু পিছু সদরঘাটে এসে পৌঁছুলাম। কড়া পুলিশ পাহারার ভেতর দিয়েও নির্বিকারচিত্তে শহীদুল্লাহ সাহেব এগিয়ে চলেছেন, কেউ তাঁর পথ রোধ করছে না, কোন কোন রক্ষী আমার মুখের দিকে একবার করে তাকিয়ে দেখছে মাত্র। কোন্ পানসিতে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন, প্রথমত তার সন্ধান করে শহীদুল্লাহ সাহেব পানসির সিঁড়ি বেয়ে একটা পানসিতে উঠে গেলেন, আমিও নিঃসঙ্কোচে তাঁর পিছনে যেতে লাগলাম। সেই পানসির প্রথম কক্ষটিতে ফজলুল হক সাহেব প্রাতরাশে নিযুক্ত ছিলেন, শহীদুল্লাহ সাহেব কোন রকম ইতস্তত না করেই তার ভেতরে ঢুকে পড়লেন, আমিও তাঁর পিছন পিছন ঢুকলাম। শহীদুল্লাহ সাহেবকে দেখবা মাত্রই ফজলুল হক সাহেব তাঁর দিকে দু' হাত বাড়িয়ে দিয়ে উচ্ছ্বসিত আবেগে বলে উঠলেন, আইয়ে আইয়ে ডক্টর সাহেব, বৈঠিয়ে বৈঠিয়ে। টেবিলের ওপর তাঁর প্রাতরাশ বিস্তৃত রয়েছে। তার বহর দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আরও দু-একজন মন্ত্রী, তাদের মধ্যে একজন অর্থমন্ত্রী নলিনীরঞ্জন সরকারও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তাঁরা প্রাতরাশ সেখানে গ্রহণ করেন নি। শহীদুল্লাহ সাহেব একটা চেয়ার টেনে বসে পড়েই আমার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ফজলুল হক-সাহেবকে বললেন, এই আমার ছাত্র, এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে লেকচারার। খুব ভাল ছাত্র। ফজলুল হক সাহেব আমার দিকে তাকিয়েও বললেন, বৈঠিয়ে। আমিও শহীদুল্লাহ সাহেবের পাশে একটা চেয়ারে বসে পড়লাম।

ফজলুল হক সাহেব খেতে খেতে বললেন, বলিয়ে ডক্টর সাহেব, খবর বলিয়ে।

আমি ভাবলাম, ফজলুল হক সাহেব ত' বাঙালী, তিনি এমন আধা হিন্দী ও আধা উর্দুতে কথা বলছেন কেন? বিশেষত শহীদুল্লাহ সাহেবের সঙ্গে? এই অবস্থায় বাংলা লোক-সাহিত্যের আবেদন নিয়ে তাঁর কাছে আসা পণ্ডশ্রম নয় ত'?

শহীদুল্লাহ সাহেব ধীরে ধীরে তাঁর পরিকল্পনার কথা খুলে বললেন, উপসংহারে বললেন, এজন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। আপনি ছাড়া এ ব্যবস্থা এ দেশে আর কে করতে পারে?

ফজলুল হক সাহেব এবার বাংলায় বললেন, ডক্টর সাহেব, আপনি বড় বেশি বাংলা বাংলা করছেন। বাংলা নিয়ে বাঙালীর ছেলেগুলো ঘরকুনো হয়ে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছেন না, ইংরেজি না শিখলে বাইরের সঙ্গে যোগ স্থাপন হবে না, আর বাইরের সঙ্গে যোগ স্থাপন করতে না পারলে এ জাত বাঁচবে না। অবশ্য ফজলুল হক সাহেব তাঁর নিজস্ব বরিশালী ভাষায় এই কথাগুলো বলেছিলেন, আমি এখানে তারই সাধুভাষায় অনুবাদ করে দিলাম।

শহীদুল্লাহ সাহেব বাংলা ভাষার উন্নতির আবশ্যকতা নিয়ে ধীরে ধীরে অনেক কথা বলতে লাগলেন, ফজলুল হক সাহেবের মনোযোগ সেদিকে কতখানি ছিল জানি না, কারণ, প্রাতরাশ তাঁর তখনও চলছিল এবং সেদিকে তাঁর মনোযোগের কোন অভাব দেখতে পাই নি।

ভোজন শেষ করে ফজলুল হক সাহেব একনিশ্বাসে বলে উঠলেন, যাক, আমি অত-শত বুঝি না, তবে টাকাকড়ির জন্য যা দরকার তার জন্য অর্থমন্ত্রী এখানে উপস্থিত রয়েছেন, তাঁকেই বলুন, বলে নলিনীরঞ্জন সরকারকে দেখিয়ে দিলেন। অর্থমন্ত্রী বিশেষ কোন কথা শুনতে চাইলেন না, কেবলমাত্র লিখিতভাবে শহীদুল্লাহ সাহেবের পরিকল্পনা তাঁর কাছে পেশ করতে বললেন। অর্থ সাহায্যের জন্য একটি লিখিত পরিকল্পনা আমি সঙ্গে করেই নিয়ে গিয়েছিলাম। শহীদুল্লাহ সাহেবের ইঙ্গিতে তা আমি তৎক্ষণাৎ তা অর্থমন্ত্রীর হাতে দিলাম। অর্থমন্ত্রী একবার তার ওপর চোখ

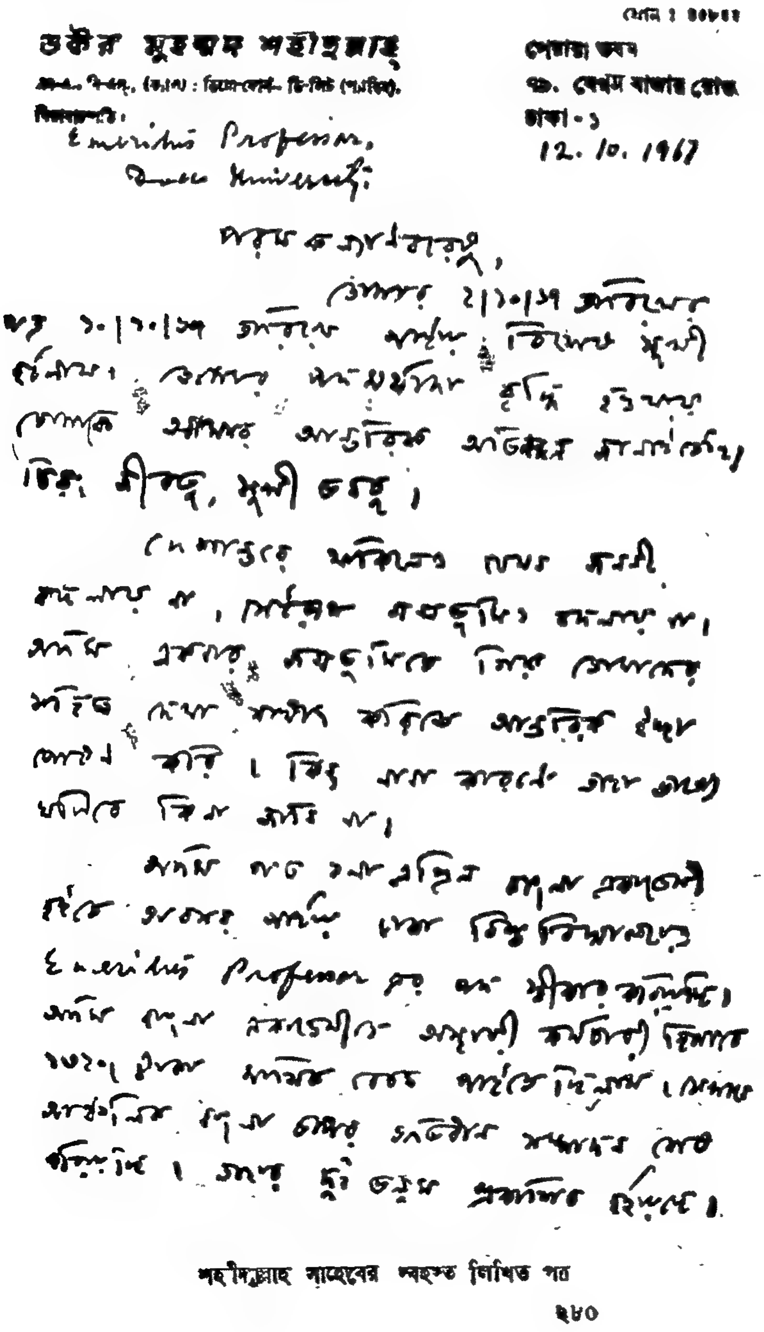
ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

পেয়ারা ভবন

ঢাকা-১

Emiritus Professor,
Dacca University

12. 10. 1967

শহীদুল্লাহ সাহেবের স্বহস্ত লিখিত পত্র

মুলিয়ে দেখলেন, বললেন, কলকাতায় গিয়ে চিঠি লিখে জানাবেন।

শহীদুল্লাহ সাহেব বললেন, আমরা আজ শূন্য হাতে ফিরতে চাই না, অন্তত মুখেরও আশ্বাস একটা নিয়ে যেতে চাই।

ফজলুল হক সাহেব বললেন, মন্ত্রীদের মুখের আশ্বাসের কি দাম, তা কি জানেন না ডক্টর সাহেব? বিশেষত অর্থ-মন্ত্রী। তার চাইতে শূন্য হাতে ফিরে যাওয়াই ভাল। শুনে সকলেই উচ্চ হাস্য করে উঠলেন, শহীদুল্লাহ সাহেব হাসতে হাসতে মুখের দাড়িতে মৃদু হাত বুলোতে লাগলেন।

শহীদুল্লাহ সাহেবের প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গেই নানাভাবে আমি জড়িত হয়ে পড়েছিলাম। তাঁর পারিবারিক জীবনের উৎসব পার্বণে, সামাজিক জীবনের নানা অনুষ্ঠানে যুক্ত থেকে তাঁর ভেতরকার মানুষটির আমি সন্ধান পেয়েছিলাম। নিজের ধর্মের প্রতি যেমন নিষ্ঠাবান ছিলেন, তেমনই অন্য ধর্মের প্রতিও তিনি শ্রদ্ধাবান ছিলেন। তিনি বলতেন, মাতৃকুলে আমরা সবাই হিন্দু; আরব পারস্য দেশ থেকে সপরিবারে কেউ এসে এখানে বাস করে নি, সেজন্য আমাদের অন্তরের দিক থেকে এক অখণ্ড ঐক্য আছে।

১৯৪৭ সনে যখন পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা ঘোষিত হলো, তখন আমি ঢাকা ছেড়ে চলে এলাম, তার আগেই তিনিও ঢাকা থেকে অবসর নিয়ে বগুড়া কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হয়েছিলেন। পাকিস্তান হবার পর তিনি আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন করে নিযুক্ত হলেন। সেখান থেকে আবার অবসর নিয়ে ঢাকা বেঙ্গলী আকাদেমিতে গ্রামীণ শব্দের অভিধান রচনায় আত্ম-নিয়োগ করলেন। জীবনের শেষ প্রায় দুবছর তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে শয্যাগত হয়েছিলেন। তার মাত্র এক মাস পূর্বে তিনি স্বহস্তে আমাকে যে তাঁর শেষ চিঠিখানি লিখেছিলেন, তা এখানে উদ্ধৃত করে তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন আজ শেষ করব। ৮৩ বৎসর বয়সে স্বহস্তে লিখিত তাঁর পত্রখানির ভেতর দিয়ে দেখা যাবে, জীবনে তিনি যে আদর্শ গ্রহণ করেছিলেন, তার মধ্যে তখনও কোন শৈথিল্য দেখা দেয় নি।

* * *

পেয়ারা ভবন
৭৯, বেগমবাজার রোড,
ঢাকা-১
১২-১০-১৯৬৭

পরম কল্যাণবরেষু,

তোমার ২।১০।৬৭ তারিখের পত্র ১০।১০।৬৭ তারিখে পাইয়া বিশেষ সুখী হইলাম। তোমার পদমর্যাদা বৃদ্ধি হওয়ায় তোমাকে আমার আন্তরিক অভি-নন্দন জানাইতেছি। চিরং জীবতু, সুখী ভবতু।

দেশান্তরে থাকিলেও যেমন জননী বদলায় না, সেইরূপ জন্মভূমিও বদলায় না। আমি একবার জন্মভূমিতে গিয়া তোমাদের সহিত দেখাসাক্ষাৎ করিতে আন্তরিক ইচ্ছা পোষণ করি। কিন্তু নানা কারণে তাহা ভাগ্যে ঘটিবে কি না জানি না।

আমি গত ১লা এপ্রিল বাংলা একাডেমী হইতে অবসর পাইয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Emeritus Professor-এর পদ স্বীকার করিয়াছি। আমি বাংলা একাডেমীতে অস্থায়ী কর্মচারী হিসাবে ১৩২০৲ টাকা মাসিক বেতন পাইতেছিলাম। সেখানে আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধান সম্পাদন শেষ করিয়াছি। তাহার দুই ভলুম প্রকাশিত হইয়াছে। তৃতীয় ভলুম যন্ত্রস্থ। আমার দ্বিতীয় কার্য ইস্‌লামী বিশ্বকোষও শেষ হইয়াছে। কিন্তু এখনও তাহার ছাপা আরম্ভ হয় নাই। সুনীতিবাবু আঞ্চলিক বাংলা ভাষার অভিধানের অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ।

বিশ্ববিদ্যালয় আমাকে ৫০০৲ টাকা সৌজন্যমূলক ভাতা দিবেন। কোন কাজের নির্দেশ কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজিরা দিবার কোনও আদেশ নাই। ইহা যাবজ্জীবনের জন্য। পূর্ব পাকিস্তানে আমারই জন্য সর্বপ্রথম এই পদ সৃষ্টি করা হইল। তজ্জন্য আমি ভাইস চ্যান্সেলারের নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞ।

আমি এক্ষণে আমার রচিত বাংলা সাহিত্যের কথা ২য় খণ্ডের পুনর্মুদ্রণের জন্য ব্যাপৃত আছি। ছাপা শেষ হইলে তোমাকে পাঠাইতে চেষ্টা করিব। উহাতে তোমার গবেষণার অনেক স্বীকৃতি আছে।

ডঃ সুশীলকুমার দে, ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ সুকুমার রায় (সেন?) প্রভৃত বন্ধু-বর্গের সহিত সাক্ষাতের বাসনা পোষণ করি। জানি না এ জীবনে এই বাসনা পূর্ণ হইবে কি না। সুনীতিবাবু Indian (National ?) Professor এর পদ পাইয়াছেন, শুনিয়াছি। উহার মাসিক ভাতা কত জানি না।

আমি ভাল আছি। আমার ৮৩ বৎসর বয়স চলিতেছে। তোমার দীর্ঘায়ু ও উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি। ইতি

চিরশুভাকাঙ্ক্ষী
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ

এই চিঠিতে তিনি যে তাঁর জীবনের কয়েকটি আকাঙ্ক্ষার কথা উল্লেখ করেছেন, তা পূর্ণ করবার তিনি আর সুযোগ পেলেন না।

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

সীমিত গণ্ডীতে মাস্টারদার "রণনীতি" ও "রণকৌশল"

আমাদের চরমদণ্ড দেওয়ার জন্য লোকচক্ষুর অন্তরালে বৃটিশ সরকার যে ঘোরতর চক্রান্তজাল বিস্তৃত করেছিলেন—প্রায় চল্লিশ বৎসর আগে সরকারী মহাফেজখানায় সংরক্ষিত দলিলপত্র থেকেই আজ তা প্রমাণে প্রয়াসী হয়েছি। নয়তো এতবড় একটি ঐতিহাসিক তথ্য জনসাধারণের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই থেকে যেতো। ঘটনাচক্রে তখনকার দিনের এই সমস্ত সরকারী গোপন দলিলপত্র হস্তগত হওয়াতে মনে হলো—ঐতিহাসিক দায়িত্ব পূর্ণ করতে হলে এই সকল দলিল অপ্রকাশিত রাখার কোন অধিকার আমার নেই—তাই এই সংক্রান্ত দলিলগুলির হুবহু নকল প্রকাশ করলাম। আর এই সমস্ত দলিল প্রকাশে আমার পূর্ণ বক্তব্যের সত্যতা সম্বন্ধে কারো মনে যেন কোনপ্রকার সংশয়ের অবকাশ না থাকে, তার জন্য যথাসম্ভব পর্যালোচনামূলক উত্তর দিলাম। নয়তো বিশেষ ধরণের সমালোচকেরা নানাভাবে নানা অর্থ করার সুযোগ নিতেন বলেই মনে হয়। নিজেকে এই সমালোচনামূলক অবস্থায় পড়তে হয়েছে বলেই পাঠকবর্গের ধৈর্যচ্যুতির সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আমাকে এই সরকারী চক্রান্তের মুলোদ্ঘাটন করতে হয়েছে।

আলিপুরের নতুন সেন্ট্রাল জেলে আমাদের দিন কাটছে। গান্ধী-আরউইন প্যাক্ট অনুযায়ী আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত। ১৯৩১ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য গান্ধীজী ইংলণ্ডে গেলেন। অহেতুক কালহরণ করে ও কেবলমাত্র ব্যর্থতা নিয়ে তিন মাস পরে ভগ্নহৃদয়ে তিনি ভারতে ফিরে এলেন—গান্ধী-আরউইন অধ্যায়টির পরিসমাপ্তি ঘটলো। এ সময়ে বৃটিশ সরকারের যুদ্ধনীতির একান্ত প্রয়োজন—তাই ভারতের মসনদে লর্ড আরউইনের পরিবর্তে বড়লাট উইলিংডন ও বাংলার ছোটলাটের মসনদে আপোষ-মীমাংসাকারী স্যার স্ট্যানলী জ্যাকসনের পরিবর্তে কুখ্যাত জন এণ্ডারসনের আবির্ভাব ঘটলো। দমননীতির তাণ্ডব অবাধে ও অবিচ্ছিন্নভাবে চালাবার জন্য বৃটিশ সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। লর্ড উইলিংডনের কূটনীতির প্রভাবে ও প্রচেষ্টায় অকংগ্রেসী ও সরকারভক্ত অল্পসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক ডাকা হলো। সরকারের এই কূটনীতি ও কৌশলের বিরুদ্ধে ১৯৩২-এর জানুয়ারীতে গান্ধীজী আইন অমান্য আন্দোলনে আবার ভারতবাসীকে ডাক দিলেন—সরকারও এই পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিলেন। ব্যাপক ধরপাকড় আরম্ভ হলো—নেতৃস্থানীয়েরা প্রায় সকলেই বন্দী হলেন—১৯৩২-এর ৪ঠা জানুয়ারী গান্ধীজীও কারারুদ্ধ হলেন। দিকে দিকে আইন অমান্য আন্দোলনের অভিযান ও বৃটিশ সরকারের নিদারুণ দমননীতির বীভৎস তাণ্ডব ভারতের আকাশ-বাতাসকে আচ্ছন্ন করে তুললো।

শান্তিপ্রিয় জনগণের আইন অমান্য আন্দোলনের বিরুদ্ধে বৃটিশ সরকারের এই অবাধ পৈশাচিক হিংস্র আক্রমণ বাংলা ও তথা ভারতের বিপ্লবীরা মুখ বুজে সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন না। বাংলাদেশে 'সন্ত্রাসবাদ' দমন করার জন্য বাংলা সরকার ORDINANCE (জরুরী বিধি)-এর পর Ordinance এবং একটার পর একটা নিরাপত্তা আইন জারী করে চললেন। এইরূপ Ordinance ও নিরাপত্তা আইনের ইতিহাস বহু লেখার মধ্যেই পাওয়া যাবে। এখানে সামান্য একটু উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

'B.C.L.A. Act of 1925 which was put into force only for five years expired on 21-3-30. Only a minor portion of it was retained. This deprived the police of their powers of arrest and detention and Government had to restore these powers to them by special ordinance immediately after the armoury raid. In July 1930 the life of the Bengal Criminal Law Amendment Act of 1925 was extended by another five years. But on 16-10-30 members of the Bengal Legislative Council agreed to make the Law a permanent one and B. C. L. A. Act of 1930 became a Law.

('A brief history of terrorism'—a true

extract from the police document. Preserved in Bengal Police Abstract of Intelligence 1926 Vol. XXXIX).

(এখানে স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে, বাংলা সরকার ও পুলিশ বিপ্লবীদের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছিলেন না বলে—বিপ্লবীদের যখন-তখন বিনা ওয়ারেণ্টে গ্রেপ্তার ও বিনা বিচারে আটক রাখার জন্য ১৯২৫ সালের B.C.L.A. Act-কে নতুন ছাঁচে ঢালাই করে পুলিশকে আরও অনেক ক্ষমতা দেওয়া হলো।)

সেই একই ডকুমেণ্টে পাওয়া যাচ্ছেঃ "The Chittagong Armoury Raid was followed by the undermentioned series of outrages which reveal how far the terrorist conspiracy had extended."

("পুলিশ কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছেন—চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের পর যেরূপ ধারাবাহিকভাবে 'সন্ত্রাসবাদীদের' আক্রমণ চলেছিল তাতে বোঝা যায় হিংসাত্মক কার্যকলাপ কত ব্যাপক ও তীব্র হয়ে উঠেছিল।)

তারপর সেই একই ডকুমেণ্টে ঘটনার পর ঘটনার বর্ণনা—২৫-৮-৩০ ডালহৌসী স্কোয়ারে Sir Charles Tegart-কে হত্যাব চেষ্টায় দীনেশ মজুমদার ধৃত, হাতবোমার স্বয়ংক্রিয়াতে অনুজা সেনের মৃত্যু, ২৬-৮-৩০শে জোড়াবাগান পুলিশ থানাতে বোমা নিক্ষিপ্ত, তার একদিন পরেই ইডেন গার্ডেন পুলিশ আউটপোস্টে পুলিশেরা বোমার আঘাতে আহত, এই ঘটনার দু'দিন পরেই ঢাকাতে বিপ্লবী বিনয় বোসের গুলীতে পুলিশ সাহেব মিঃ হাড্‌সন গুরুতর আহত, ও পুলিশ ইন্সপেক্টার জেনারেল মিঃ লোম্যান নিহত। দীনেশ বিনয় ও বাদলের অবিস্মরণীয় রাইটার্স বিল্ডিংস অভিযানেরও বিশেষ উল্লেখ আছে। বাংলার মেয়ে শান্তি-সুনীতির গুলীতে কুমিল্লার জেলাশাসক মিঃ স্টিভেন্সের মৃত্যু—জেলাশাসক মিঃ পেডী, মিঃ ডগলাস ও মিঃ বার্জ প্রমুখ সাহেবদের ও নিজের রক্ত দিয়ে ভারতবাসীর "রক্তঋণ" পরিশোধের ঘটনাবলীর উল্লেখ আছে।

এইরূপ আরো অসংখ্য শৌর্যবীর্য দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের ঘটনাবলীর ও স্বাধীনতার বীর সৈনিক বিপ্লবীদের মহান চরিত্র অঙ্কনের দায়িত্ব কিন্তু আমার নয়। কারণ প্রতি মুহূর্তেই আমার আশঙ্কা—সেইরূপ অনধিকার চর্চায়—প্রত্যক্ষ ও অতি নিকট পরোক্ষ জ্ঞানের অভাববশত আমার লেখায় বাস্তবতার গণ্ডী অতিক্রম করে তাঁদের ছোট করে দেখানোর সম্ভাবনা থাকতে পারে।

আমাদের ট্রাইব্যুনালের বিচার সমাপ্ত হওয়ার পর চট্টল সূর্য মহানায়ক সূর্য সেন পুলিশ ও মিলিটারীর নিশ্ছিদ্র বেড়াজাল সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে, ইতিহাসের পর ইতিহাস সৃষ্টি করে চলেছেন। তাঁর চারপাশে তাঁর লেফটেনেণ্টস—লোকনাথ বল, অম্বিকা চক্রবর্তী, গণেশ ঘোষ, অনন্ত সিং, নির্মল সেন প্রমুখ কেউই উপস্থিত নেই—ইণ্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মি পরিচালনার গুরু দায়িত্বভার তাঁরই বলিষ্ঠ স্কন্ধে ন্যস্ত। এই সময়ে তারকেশ্বর দস্তিদারই তাঁর দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন।

সেই যুগে সেই অবস্থায় বিভিন্ন স্তরের সীমাবদ্ধ গণ্ডীতে সশস্ত্র সংগ্রামের কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য মাস্টারদাকে "রণনীতি" ও সশস্ত্র আক্রমণ-কৌশল পরিবর্তন ও প্রয়োগ করতে হয়েছিল।

(১) ১৯৩০-এর ১৮ই এপ্রিলের আগে আমাদের যুব-বিদ্রোহের প্রস্তুতি-পর্ব চলাকালে মাস্টারদা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ প্রতিভূদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার প্রতি অবিচলিত নিষ্ঠা ও দৃষ্টিই তাঁর এই মনোভাবের একমাত্র কারণ। এই সময়ে কংগ্রেসের মধ্যে প্রচণ্ড দলাদলি এবং অনুশীলন ও যুগান্তরের মধ্যে তীব্র মনকষাকষি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ছোটখাটো মারামারি লেগেই ছিল। এইরূপ রাজনৈতিক বিবাদের প্রভাবে আমাদের তরুণ সাথী সুখেন্দু দত্ত গোপন ছুরিকাঘাতে প্রাণ হারায়। এইরূপ তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও নিষ্ঠুর হত্যায় দলের বিপ্লবী সাথীদের ধৈর্যের সীমা প্রায় অতিক্রম করে গেল—কিন্তু মাস্টারদা শেষ পর্যন্ত নিজেকে স্থির ও অবিচল রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। আশু ভবিষ্যতে ঝটিকাবেগে চট্টগ্রাম শহর দখল করে নিয়ে সাময়িক বৈপ্লবিক সরকার ঘোষণা করার পরিকল্পনা দ্রুত সমাপ্তির পথে চলেছে—কোনরূপ হঠকারিতার জন্য তার ওপর কোন বাধা বা বিপর্যয়ের সৃষ্টি হোক মাস্টারদা তা কোনমতেই ঘটতে দিতে রাজী ছিলেন না। তাই তাঁর কঠোর নির্দেশ ছিল—যখন আমরা একটা দৃঢ় সংকল্প নিয়ে মূল বস্তুকে লক্ষ্য করে প্রস্তুতির দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে চলেছি, তখন কোনমতে কোন কারণেই আমাদের বিপ্লবী যুবক সৈনিকেরা সাময়িক উত্তেজনায় বিভ্রান্ত ও বিপথে চালিত হয়ে সংগঠনের মূলে যেন আঘাত না করে সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে।

এই যুক্তিপূর্ণ অভ্রান্ত নির্দেশে আমাদের সবাইকে সাময়িক উত্তেজনা দমন করতে হয়েছিল। কোন স্তরের বা কোন যুগের বিপ্লবীদের পক্ষেই—কৃতকার্যতার দিকেই একমাত্র লক্ষ্য রাখার—বিপ্লবী নেতৃত্বের এই নির্ভুল শিক্ষাকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

(২) দ্বিতীয় স্তরে যুগপৎ আক্রমণে চট্টগ্রাম শহর অধিকৃত হলো। এর চারদিন পরে মাস্টারদার নেতৃত্বে জালালাবাদের ঐতিহাসিক সংঘর্ষে বিপ্লবী বাংলার মরণজয়ী সৈনিকেরা বিশিষ্ট বৃটিশ সামরিক অফিসার কর্নেল ডালাস স্মিথ পরিচালিত বিরাট মিলিটারী সৈন্যদলকে পশ্চাদপসরণে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগে বাধ্য করে।

(৩) এই বিজয়ের পর ইংরেজ শাসকশ্রেণী অনাগত বিপ্লবের পূর্বাভাষে মরিয়া হয়ে প্রবল সামরিক শক্তি নিয়ে চট্টগ্রাম শহর ও গ্রামাঞ্চল ছেয়ে ফেললেন। মাস্টারদাও তখন নতুন বৈপ্লবিক রণ-কৌশল অনুসরণ করলেন। এই পর্যায়ে শত্রু অনেক বেশি শক্তিশালী—আমাদের যুব-বিদ্রোহের প্রথম আক্রমণ সাময়িকভাবে স্তিমিত হয়ে পড়েছে—আমরা ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। শত্রুর আক্রমণ চেষ্টা ব্যর্থ করবার জন্য যেখানে সম্ভব আমরা আত্মরক্ষার্থে খণ্ডযুদ্ধ করে যাবো এই নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হলাম। এই রণ-কৌশলের বাস্তব ইতিহাস রচিত হয়েছে—ফেণী স্টেশনের খণ্ডযুদ্ধ, ফিরিঙ্গীবাজারে শহীদ অমরেন্দ্র নন্দীর আত্মদানে। কালারপোলে মরণপাগল চারজন শহীদের অবিস্মরণীয় রক্তাক্ত সংগ্রামে, চন্দননগরে নিশীথ রাতে স্যার চার্লস টেগার্টের অতর্কিত আক্রমণের বিরুদ্ধে বিপ্লবীদের রিভলবার যুদ্ধে আর ধলঘাট রণপ্রাঙ্গণে শহীদ নির্মলদা ও অপূর্ব সেনের অব্যর্থ নিশানায় ক্যাপ্টেন কেমারনের শোণিত-প্রবাহে।

(৪) ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে আক্রমণ প্রতি-আক্রমণের ক্ষমতা কমে আসার ওপরে বর্ণিত খণ্ডযুদ্ধের বাস্তব অবস্থার পরিবর্তন এল। মহানায়ক সূর্য সেন রক্তঝরা সংগ্রামের গতি অব্যাহত রাখবার উদ্দেশ্যে ধীর শান্তভাবে সুচিন্তিত রণ-কৌশল গ্রহণ করলেন। চট্টগ্রাম যুব-বাহিনীর প্রতি নির্দেশ দিলেন—'শত্রু প্রবল—যুব-বিদ্রোহের পর আমরা ছোট ছোট দলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে খণ্ডযুদ্ধে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়েছি—প্রবল শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাবার সেই শক্তিও আজ আমাদের বহুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে—তাই আবার বড় পরিকল্পনা নিয়ে সঙ্ঘবদ্ধভাবে শত্রুকে প্রচণ্ড আঘাত হানবার দায়িত্ব আমাদের সংগঠনের ওপর এসে পড়েছে। তার জন্য প্রস্তুতির সময় চাই—এই সময় আমাদের নিতেই হবে। একবার যখন আমরা আক্রমণ সুরু করে দিয়েছি

মানুষের ঘর

—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—

নদীর ওপারে মানুষের জন্য একটি ঘর আছে। প্রচণ্ড প্লাবন এলে কখনো সে ঘর খড়কুটোর মত ভেসে যায়, মনে হয় মানুষ ব'লে কখনো কেউ ঐ শূন্য প্রান্তরে ছিল না। কিন্তু বন্যার শেষে হাঁটু-অব্দি কাদা সরিয়ে আবার মানুষ ঘর বাঁধে। সেই ঘর আমাদের ডাকে।

কবি জসীমউদ্দীন! আপনি এসেছেন অন্ধকার নদী পার হ'য়ে, যেখানে আমাদের ঘর। এই ঘরের নিচেও একদিন হাঁটু-অব্দি কাদা ছিল, কিন্তু এখন সে নির্মল, আপনার জন্য বুকের ভিতরটা পর্যন্ত খুলে দিয়েছে। আপনি কি সেই ডাক, যা হৃৎপিণ্ডের ভিতর থেকে উঠে আসে, দীর্ঘদিন কান পেতে শোনেন নি?

কবি জসীমউদ্দীন! আপনি অন্ধকার ঝড়ের নদী পার হ'য়ে এসেছেন, সে-কি শুধুই দুদিনের জন্য এক ঠাণ্ডা, মৃত, মানুষের বিদেশ দেখবার পাশপোর্ট আর ভিসা পকেটে রাখবার অহঙ্কারে! আমরা জানি, আপনি সেজন্য এত কষ্ট স্বীকার ক'রে অন্ধকার নদীতে সাঁতার কাটেন নি। আপনি এসেছিলেন মিলতে, আর হয়তো আরেকটু বেশি বাতাস বুকে নিয়ে, মেলাতে।

নদীর ওপারে আপনি যখন ফিরে যাবেন, তাদের বলবেন, আমরা প্রস্তুত।

আমাদের এই সীমিত অবস্থায়ও তার গতি অব্যাহত রাখার জন্য মাঝে মাঝে সরকারী কর্মচারী ও ইংরেজ রাজপুরুষদের ওপরে সময়োপযোগী ছোটখাটো ব্যক্তিগত আক্রমণ চালাতেই হবে। বড় বড় সামরিক অভিযানের মাঝখানে যেমন স্কাউটিং অভিযান করতে হয়, ঠিক তেমনই বৈপ্লবিক মনোবল অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য আমাদেরও স্কাউটিং অপারেশন চালাতে হবে।

চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের সর্বাধিনায়ক মহাবিপ্লবী সূর্য সেনের নেতৃত্বে এই রণকৌশলের পরিণাম—চাঁদপুরে রামকৃষ্ণ ও কালী চক্রবর্তীর পিস্তলের গুলীতে শত্রুর শোণিতপ্রবাহ, বালক হরিপদ ভট্টাচার্যের অব্যর্থ নিশানায় খানবাহাদুর আসানুল্লার জীবনাবসান। তারকেশ্বরের রিভলবারের মুখে শশাঙ্ক ভট্টাচার্যের চিরজীবনের জন্য পঙ্গুত্ব বরণ।

(৫) মাস্টারদার পরিকল্পনা অনুযায়ী জেল ভাণ্ডার ও বিস্ফোরক দ্রব্যের বিশেষ ধরণের ব্যবহারে প্রচণ্ড তাণ্ডব সৃষ্টি করে চট্টগ্রামে ইংরেজ শাসনকে আবার সংগঠিতভাবে দারুণ আঘাতে নিশ্চল করে দেবার ব্যাপক প্রস্তুতি আরম্ভ হলো।

(৬) বিস্ফোরক দ্রব্যের প্রয়োগে মাস্টারদা নতুন ধরণের যে "রণনীতি" ও কৌশল গ্রহণ করেছিলেন তা' ফলপ্রসূ হলো না। আমাদের যাবজ্জীবন কারাবাসের দণ্ড হয়ে গেল, অম্বিকাদা পুলিশের হাতে বন্দী হয়ে বিচারের অপেক্ষায় জেল হাজতে দিন কাটাচ্ছেন, ধলঘাট রণপ্রাঙ্গণে নির্মলদা শহীদের গৌরবময় মৃত্যু বরণ করেছেন—একের পর এক অন্যান্য নেতারা প্রায় সকলেই বন্দী—নির্মলদাই তখন মাস্টারদার পাশে একমাত্র পুরাতন সাথী—তিনিও চলে গেলেন—মাস্টারদা সম্পূর্ণ একা—তবু তরুণ ভাইদের দিকে তাকিয়ে ভবিষ্যতের বিপ্লবী সৌধ নির্মাণে দ্বিধাহীন চিত্তে দৃঢ় পদে এগিয়ে চলেছেন। তাঁর চোখের সামনে রয়েছে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী অত্যাচারের বীভৎস চেহারা—জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নায়ক জেনারেল ও'ডায়ার—বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর আরও অসংখ্য চরম অত্যাচারের কাহিনী। Indian Republican army, Chittagon Branch সেইজন্যই তাঁদের ইস্তাহারে ছাপিয়েছিলেন—

"It remembers today with sorrowful indignation the inhuman massacre of the Indian people perpetrated by the British Government on the Indian soil, the blowing up of her women-folk in the mouth of the guns, the indiscriminate hangings and cold blooded murders of her manhood, the crushing of her infants under the cruel British boots...."

এই বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারার মধ্যে কোন প্রকার আপোষ-মীমাংসার স্থান ছিল না, তাই যুব-বিদ্রোহের কর্মসূচীতে সেই রাত্রে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ অনুচরদের বুকের রক্তে প্রতিশোধ নেওয়ারও প্রোগ্রাম ছিল। গুড-ফ্রাইডে উপলক্ষে ছুটির জন্য সেই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হয় নি। যুব-বিদ্রোহের বৈপ্লবিক কর্মসূচীর এই একটি প্রধান অংশ কার্যে পরিণত হবে না, মাস্টারদা কখনও তা ঘটতে দেবেন না। তাই পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করার পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করলেন। ইংরেজ অত্যাচারের রূপ তখন অবর্ণনীয়। উত্তরোত্তর পুলিশ ও মিলিটারীর তাণ্ডবলীলা বেড়েই চলেছে। শহরের প্রতিটি অলি-গলি, স্কুল-কলেজ প্রাঙ্গণে সর্বত্রই তাদের সদা জাগ্রত তীক্ষ্ণদৃষ্টি প্রসারিত। মিলিটারী ও পুলিশের এই পর্বতপ্রমাণ বাধা সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টির অগোচরে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এই মহান্ নেতার নেতৃত্বে ক্লাব হাউস আক্রমণের পরিকল্পনা সফলতার মুখে এগিয়ে চললো।

এই পরিকল্পনা যতক্ষণ কার্যে পরিণত না হচ্ছে—বিপ্লবী শক্তির নিষ্ক্রিয়তায় বিপ্লবীদের মনোবল নষ্ট হবার আশঙ্কায় মাস্টারদা ইংরেজরাজপুরুষদের প্রাণ হরণের ভার দিয়ে তরুণ বিপ্লবীদের কাউকে কাউকে ঢাকায় ও কুমিল্লায় প্রেরণ করলেন। ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট ডুর্নোকে আক্রমণের কাহিনী আমার লেখায় আগে বর্ণিত হয়েছে। কুমিল্লার অতিরিক্ত পুলিশ সাহেবকে হত্যা করার ভার নিলেন এক তরুণ বিপ্লবী। মাস্টারদার কাছে মরণপণ শপথ নিয়ে এই নির্ভীক তরুণ কুমিল্লা অভিমুখে যাত্রা করলেন। কে এই তরুণ?

[ক্রমশ]

পশ্চিমবাংলায় যুক্তফ্রন্ট সরকার হয়েছে দু-দুবার॥ তার আগে ছিল বিশ বছর একটানা কংগ্রেস সরকার। তার আগে ইংরেজ সরকার। কিন্তু কেউ কি ভাবতে পারেন সেই ইংরেজ সরকারের আমল থেকে একই লোক বর্তমান যুক্তফ্রন্ট সরকার অবধি একই জায়গায় বসে রাইটার্স বিল্ডিংস আলো করছেন? শুধু আলো করার কথাই না বলি কেন, সেখানে বসে তিনি পশ্চিমবাংলার সমগ্র প্রশাসনিক যন্ত্রটাকে ব্যক্তিগত ও আমলাতান্ত্রিক স্বার্থ ছাড়া কোন রকমেই অন্য স্বার্থে ব্যবহৃত হতে দিচ্ছেন না। ভদ্রলোক সরকারী চাকুরীতে ঢুকেছিলেন ১৯৩৯ সালের ২৬শে এপ্রিল॥ অন্তত ১৯৬৭ সালের ১লা জুলাই সর্বশেষ যে সিভিল লিস্ট বেরিয়েছে তাতে এই তারিখ দেওয়া আছে। ভদ্রলোক প্রথমে ৫৫৲ টাকা মাইনের ঢোকেন—এখন দুশো টাকা স্পেশাল পে নিয়ে পান বারশো টাকা॥ কিন্তু ভদ্রলোক স্বীয় বুদ্ধিমত্তার বলে বা ফলে আরও কি কি ভাগ্য-পরিবর্তনের কাজ করেছেন, সেটা বলা যাবে পরে॥ কিন্তু তার আগে অন্য কথাগুলি আমাকে বলে নিতে হবে।

যে পদে ভদ্রলোক আসীন আছেন সে পদটির নাম হচ্ছে, কোনও এক ডেপুটি সেক্রেটারীর পদ এবং বিভাগটা হল হোম, জেনারেল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন॥ পাঁচিশটা বছর ধরে ভদ্রলোক এখানে আছেন॥ এটা কংগ্রেস সরকারের নজরে পড়ে নি, দু-দুবার যুক্তফ্রন্ট সরকারেরও নজরে পড়ে নি। অবশ্য বলা বাহুল্য যে, কংগ্রেস সরকারের নজরে পড়লে যে কি হত তা আমাদের অজানা নয়॥ কিন্তু যুক্তফ্রন্টের নজরে পড়ে নি দেখে আমরা বিস্মিত হচ্ছি॥ তবে একথাও ঠিক, নজরে পড়ার কিছুটা অসুবিধাও আছে। কেন না ভদ্রলোক এমন একটি চক্রব্যূহ রচনা করে রেখেছেন রাইটার্স তথা সমস্ত পশ্চিমবাংলার প্রশাসনিক যন্ত্রের মধ্যে যাতে তাঁর দিকে নির্দিষ্ট করে অঙ্গুলিসংকেত করার লোকের অভাব হবে। যে সব সৎ এবং দক্ষ অফিসার আছেন তাঁদের কাকে কোথায় চেপে রেখে দলের লোক অথবা অপদার্থ লোককে কোথায় কাকে রাখতে হবে, তা সঠিকভাবে নির্দেশ করতে ভদ্রলোক সিদ্ধহস্ত। পাছে কেউ কোনদিন কোন প্রশ্ন তুলে বসে ভদ্রলোকের হাতে তা চাপা দেওয়ার যন্ত্রটিও আছে। কাউকে কোন নালিশ জানাতে হলে এই ভদ্রলোকের রচিত চক্রব্যূহের মধ্যে দিয়েই আসতে হবে। কিন্তু সে পথ দিয়ে আসা যে কত কঠিন তা ভুক্তভোগী মাত্রেই বুঝতে পারবেন। তাছাড়া সরাসরি মন্ত্রী মহাশয়দের যদি কোন অফিসার কোন নালিশ জানান এঁর সম্পর্কে, তাহলে যাঁরা তার তদন্ত করবেন তাঁরা এঁর সমর্থকই হবেন অর্থাৎ তাঁরা সকলেই এই একই চক্রের লোক এবং তাঁরা 'স্যার' 'স্যারের' ঠেলায় অভিযোগকারীর মত খারাপ লোক আর হয় না এবং যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তাঁর মত 'এফিসিয়েন্ট' এবং 'অনেস্ট' অফিসারও আর হয় না. এই কথাটাই বেরিয়ে আসবে অনেক কাঠখড় পোড়ানোর মধ্যে দিয়ে।

বিভাগীয় মন্ত্রী মহাশয়কে তাই আমি বলব, সিভিল লিস্ট সম্পর্কে একটু তদন্ত করতে॥ কেন নিয়মিত সিভিল লিস্ট প্রকাশ করা হয় না? নিয়মিত এটি প্রকাশিত হলে এবং বিশেষ করে তাতে ডিপার্টমেন্টের উল্লেখ থাকলে কোন অফিসার কোথায় পোস্টেড হয়েছেন তা একনজরে চোখে পড়বে। তাছাড়া এক-জায়গায় কে কতদিন আছে তাও ধরা পড়বে। কিন্তু দুঃখের বিষয় সিভিল লিস্ট প্রকাশের জন্য নিয়মিত এবং বিশেষভাবে অর্থব্যয় করার পরেও কেন সেটা হয় না, কিম্বা তার মূলে কোন ব্যক্তিবিশেষের হীন ষড়যন্ত্র আছে, সেটা দেখার কোন ব্যবস্থাই আজ পর্যন্ত হয় নি। সেজন্য যেটা চলে আসছে—সেটা হচ্ছে এক-একটি পদে মৌরসীপাট্টা করে থাকার ব্যবস্থা এবং তার ফলে কায়েমী স্বার্থের জন্ম। আর তার ফলে সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের মধ্যে সৎ ও দক্ষ অফিসারদের মধ্যে আশাভংগজনিত বেদনাময় পরিস্থিতির বিস্তৃতি। তাছাড়া সর্বোপরি যে অবস্থাটা হয় সরকারকে একদিকে ঘরের মধ্যে কাল-কেউটেকে নিয়ে ও অন্যদিকে সেই বিপদে আগুয়ান হয়ে আসার লোকের অভাবে, দৈনন্দিন ভয়ে ভয়ে শাসনযাত্রা নির্বাহ করতে হয়। এ পরিস্থিতি থেকে বাঁচবার চেষ্টা করা একান্তই প্রয়োজন।

যে ভদ্রলোকের কথা বলছি তাঁর চক্রটির একটু পরিচয় এখানে দিচ্ছি। এই ভদ্রলোকের দুজন সহকারী আছেন—একজনের পদের নাম কোনও এক ডেপুটি সেক্রেটারী হোম জি-এ। ভদ্রলোক সরকারী চাকুরীতে ঢুকেছেন ১৯৪১ সালের ৩০শে জুন তারিখে এবং বিশ বছর এই একই বিভাগে পূর্বোক্ত ভদ্রলোকের সঙ্গে যুক্ত আছেন। কংগ্রেস আমলে প্রভুদের অতিরিক্ত সেবা করেছিলেন বলে ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী পরাজিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পিছনকার তারিখ দিয়ে কে যে এঁকে প্রমোশন দিয়ে গেলেন বোঝাই গেল না। অপর ভদ্রলোকের সম্পর্কেও প্রায় এই একই ব্যাপার। তাঁর পদের নাম হল স্পেশাল সেক্রেটারী। সরকারী চাকুরীতে যোগ দেন ইনি ১৯৫৬ সালের ২রা এপ্রিল। প্রথমে ইনি রানাঘাটে সাব-ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। পরবর্তীকালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীর

অনুরোধে মাত্র সাত বছরের সার্ভিসে এঁকে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদে উন্নীত করা হয়। শুধু তাই নয়, মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় নির্বাচনে পরাস্ত হবার পর পিছনকার তারিখ দিয়ে এঁকেও যে কে স্পেশাল সেক্রেটারীর পদে উন্নীত করে গেলেন এবং মাইনেটাকেও করে দিলেন আই-এ-এস ক্যাডারের, তা পরম বিস্ময়ের বস্তুই হয়ে রইল। স্বভাবতই এখানে যে সিনিয়র অফিসারদের বলি পড়তে হল সে কথা বোধ করি না বললেও চলবে। অথচ সবকিছুই এইভাবে চলে এসেছে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে এই—সবকিছু এইভাবে চলে এসেছে বলেই কি, আজও এসব চলবে?

এরপর চক্রের দুজন সুবিখ্যাত কেরানীর কথায় আমাকে আসতে হবে। পশ্চিমবাংলায় এমন কোন জেলা বা মহকুমা নেই যেখানের যে কোন অফিসার এই দুই ভদ্রলোকের কথা না জানেন। নিয়োগ ও বদলীর ব্যাপারে সাধারণ প্রশাসন বিভাগের প্রথমোক্ত নেতৃস্থানীয় ডেপুটি সেক্রেটারী যা করেন তা দ্বিতীয়োক্ত দুজন অফিসারসহ এই দুজন কেরানীর সঙ্গে পরামর্শ করেই করেন। এই বিভাগটির নাম হচ্ছে—"হোম জেনারেল এ্যাডমিনিস্ট্রেশন, কনফিডেন্সিয়াল ট্রান্সফার এ্যান্ড পোস্টিং অফ দি অফিসারস।" এঁদের একজনের বাড়ি মালদহে—আরেকজনের বাড়ি নদীয়া জেলার নাকাশীপাড়া থানায়। শেষোক্ত ব্যক্তি বর্তমানে থাকেন কলকাতায় বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটে। দীর্ঘকাল অর্থাৎ বছরের পর বছর এই দুটি কেরানী জগাই-মাধাইয়ের মত এই একই জায়গায় বিরাজ করছেন এবং প্রথমোক্ত ডেপুটি সেক্রেটারী হোম জি-এর দোসর হিসাবে দিনের পর দিন কায়েমী চক্রকে পুষ্ট থেকে পুষ্টতর করে তুলছেন। এবং এঁরা কিভাবে দিনযাপন করেন তার একটি উদাহরণ মন্ত্রী মহাশয়কে শুধু দিতে চাই, তিনি এটা তদন্ত করে দেখবেন। যে কেরানীটির বাড়ি নদীয়া জেলার নাকাশীপাড়া থানায়, যিনি বর্তমানে থাকেন কলকাতায় বারাণসী ঘোষ স্ট্রীটে সেই কেরানীটি, জানি না তিনি কত মাইনে পান (খাসি অনুমান করে নিতে হবে সরকারী আপিসে তিনি একজন আপার ডিভিশন ক্লার্ক মাত্র) এবং এই বাজারে সংসার চালিয়ে তাঁর হাতেই বা কত থাকে—তবু তিনি তাঁর বোনের বিয়েতে পনেরোটি হাজার টাকা খরচ করেছেন। বাংলাদেশের অনেক ভাই-ই বোনের জন্য অনেক কিছু ত্যাগ করেন এ আমরা জানি, কিন্তু একজন কেরানী বোনকে যতই স্নেহ করুন না কেন, পনেরো হাজার টাকা খরচ করেন কি করে এটা কল্পনা করতে গেলে বিস্ময়ের অন্ত থাকে না।

এই চক্রের আরও একটি লোক আছেন। তাঁর কথা না বললে সমস্ত কথাটাই অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। তিনি হচ্ছেন এই বিভাগেরই হেড এ্যাসিস্ট্যান্ট। ভদ্রলোকের বাড়ি খন্যানে ইটাচুণা কলেজের পাশে। এবারে নির্বাচনের প্রাক্কালে শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনী এখানে এলে কংগ্রেস প্রার্থীর পক্ষে ভদ্রলোক লোক জড়ো করার খুবই চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু শ্রীমতী কৃপালনীর সভায় শতখানেকের বেশি লোক না হওয়ায় তিনি রীতিমত মুস্কিলে পড়ে যান এবং হাওয়া কোনদিকে বুঝে কিছুটা নীরব হয়ে যান।

সাধারণ প্রশাসন বিভাগে যত নিয়োগ ও বদলীর কারসাজি হয় তার প্রধান বাহন এই ভদ্রলোকটি। এখানে একটি উদাহরণ দিলে বোধ করি অপ্রাসঙ্গিক হবে না। হুগলী জেলার কোন এস-ডি-ও, যিনি প্রফুল্ল-ধরমবীর ফ্রন্ট বা পি-ডি-এফ-এর আমলে উত্তরপাড়া কলেজ থেকে আরম্ভ করে সর্বত্র রক্তের বন্যা বহানোর অংশীদার ছিলেন, তাঁকে দ্বিতীয়বার যুক্তফ্রন্ট সরকার হলে এ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারী টু দি পাসপোর্ট (হোম) ডিপার্টমেন্টে বদলী করা হয়েছিল, কিন্তু এই কেরানীটির কর্ম-কৃতিত্বে বিভাগীয় চক্রের হস্তক্ষেপে তাঁর বদলীর আদেশ রহস্যময় কারণে স্থগিত, নাকচ বা চাপা দিয়ে দেওয়া হয়। মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় এ বিষয়ে তদন্ত করে দেখলে অনেক রহস্যই ফাঁস হয়ে পড়বে বলে আশা করি।

এখন পরিশেষে যে কথাটা বলতে চাইব সেটা স্বরাষ্ট্র বিভাগের আওতায় তো পড়বেই—তাছাড়াও ভূমিরাজস্ব বিভাগকেও এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে হবে। স্বরাষ্ট্রের এই সাধারণ প্রশাসন বিভাগে এই চক্র যে শুধু স্বরাষ্ট্র বিভাগকেই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়েছে তাই-নয়, ভূমিরাজস্ব বিভাগকেও অনুরূপভাবে কদলী প্রদর্শন করেছে। ইটাচুণা কলেজের পাশে বসবাসকারী এই হেড এ্যাসিস্ট্যান্ট ভদ্রলোকের শ্বশুরের কাছে অথবা সম্বন্ধী বা বড়কুটুমের কাছে যদি যাওয়া যায় তবে, স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সাধারণ প্রশাসন বিভাগে চক্র ও চক্রীদের মূল কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত, তা সুস্পষ্টরূপে চোখের সামনে ফুটে উঠবে। ঐ ভদ্রলোকদের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত জমির দলিলগুলি দেখতে হবে প্রথমে, তারপর দেখতে হবে সম্প্রতিকার দলিল করা জমিগুলির হিসাব। তাহলেই ব্যাপারটা জলবৎতরলং হয়ে যাবে। এই রকম জমির পার্থক্যটা যে কি তা আমাকে বলে দিতে হবে না—যিনি দেখবেন তাঁরই নজরে পড়বে। এই সঙ্গে ভূসম্পত্তি সম্পর্কে মুসলিম আইনটাও অবিশ্যি জেনে যেতে হবে। আরও দেখতে হবে ঐ জমিগুলি হেড এ্যাসিস্ট্যান্টের শ্বশুর এবং শ্যালকের সত্যই ক্রয় করার ক্ষমতা আছে কিনা। তা দেখলে দেখা যাবে এই জমিগুলি স্বরাষ্ট্র দপ্তরের সাধারণ প্রশাসন বিভাগের কোন ডেপুটি সেক্রেটারীর বেনামী জমি। কুড়ি-পঁচিশ বছর ধরে যে চক্রব্যূহ রচনা করে এসেছেন ভদ্রলোকেরা, সে চক্রব্যূহের অবদান এমনিতরই হয়। আমি আশা করব, যুক্তফ্রন্ট সরকার একটি পরিচ্ছন্ন প্রশাসন বিভাগ গড়ে তোলার জন্য এই রকম কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূদের বিতাড়িত করতে প্রয়োজনমত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। বারান্তরে আরও কিছু বলার ইচ্ছা রইল।

শ্রীরামচরিত-মানস

ভক্তকবি তুলসীদাস

অধ্যাপক শিবপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক বঙ্গানুবাদ

শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনা-গানে ভারতবর্ষের বহু গুণী ও জ্ঞানীজন লেখনী ধারণ করিয়া আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। সেই সকল অমর লেখনীর প্রতিভা-নির্ঝরে ভারতবর্ষের মহাকাব্য পৃথিবীর সাহিত্যে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। ভক্তকবি গোস্বামী তুলসীদাস তন্মধ্যে অন্যতম—যিনি সহজ সরল ভাষায় পতিতপাবন সীতা-রামের চরিত্র বর্ণনা করিয়াছেন সুমধুর সংগীতের মাধ্যমে। তুলসীদাসের জীবনসর্বস্ব মহামানব শ্রীরামচন্দ্রের সেই বন্দনা-গানের সুললিত বাংলা অনুবাদ এই প্রথম—বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের অপূর্ব কীর্তির নূতন এক পরিচয় এই শ্রীরামচরিত-মানস। বহু রঙীন চিত্রে সুশোভিত।

মূল্য—১ম খণ্ড তিন টাকা, ২য় খণ্ড তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেডঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ ছাব্বিশ ॥

ডুয়ার্সের ভুটানীদের কথা বলতে চাই। সেই প্রয়োজনের টানে এসে যাচ্ছে মূল ভুটানের কথা।

এক আশ্চর্য দেশ ভুটান। বিশ্বের বিস্ময়। অনেক ছোট ছোট দেশ আছে পৃথিবীতে। ক্ষুদ্রতম রাজ্য। কিন্তু বহির্জগতের অগম্য নয় তারা। ভুটান পরিচিত দুনিয়ার এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। তার প্রাকৃতিক গঠন তাকে করেছে দুর্ভেদ্য। প্রায় অগম্য দেশ।

তদানীন্তন বৃটিশ সরকারের পক্ষে প্রথম ভুটান যান ক্যাপ্টেন টার্নার, ১৭৮৩ খৃস্টাব্দে। ভারতবর্ষে তখন মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংসস্তূপের শ্মশানে নতুন করে ইংরাজের সাম্রাজ্য-স্বপ্নের সূচনা হচ্ছে। সেই সময়টায় ইংরাজের আধিপত্য বিস্তারের কাজ চলেছে দ্রুতগতিতে। ১৭৫৭-তে পলাশী-যুদ্ধের পর বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় ইংরাজের শক্তিমদমত্ততা যতই থাকুক, আসলে কিন্তু তখন উত্তর-বাংলার এই নির্জনতম প্রান্তে অধুনা-কালের ডুয়ার্স বলে কথিত অঞ্চলটিতে ভুটানের সঙ্গে ইংরাজের যুদ্ধের ঘোর আমল সেটা। ক্যাপ্টেন টার্নার ১৭৮৩-তে ভুটানে গিয়েছিলেন দৌত্যকর্মে। স্বাভাবিকভাবেই তা সফল হয় নি। ফলে ভুটানের ইতিহাস, ভূগোল, লোক-বিবরণ, প্রাকৃতিক অবস্থা, অবস্থান, আয়তন ও নদ-নদী, কৃষি-শিল্প এসব কোন কিছু সম্পর্কেই তিনি দেখবার অবসর ও সুযোগ পান নি। সংগ্রহের অনুকূল পরিবেশই তার কালে ছিল না বলা চলে।

ভুটানের বিবরণ প্রথম যেখানে পাই, তা হচ্ছে ক্যাপ্টেন পেম্বারটন সাহেবের ভুটান সম্পর্কিত বিবরণী Report on Bhutan. পেম্বারটন সাহেব ভুটান গিয়েছিলেন ১৮৩৯ খৃস্টাব্দের আগে আগে। তাঁর গমনের পশ্চাদপট সম্পর্কে সরকারী দলিলের বক্তব্য পরিষ্কার—"The Bhutias had usurped several tracts of lowland lying at the foot of the mountains, called the Duars or Passes, and for these they agreed to pay a small tribute. They failed to do so, however, and availed themselves of the Command of the Passes to Commit depredations within British territory. Captain Pemberton was accordingly deputed to Bhutan to adjust the points of difference.

ভুটান সম্পর্কিত পরবর্তী উল্লেখযোগ্য আলোচনা অ্যাশলে এডেন সাহেবের Report on the State of Bhutan (Cal, 1865), ১৮৬৩ খৃস্টাব্দে অ্যাশলে এডেন ভুটান যান। উদ্দেশ্য একই। ইংরাজদের সঙ্গে ভুটানের সম্পর্কের উন্নতিসাধন। Summary of Affairs in the Foreign department of the Government of India, 1864 to 1869 শীর্ষক সরকারী বিবরণীতে এর উল্লেখ আছে। দৌত্য সফল হয় নি। ১৮৬৪ খৃস্টাব্দের এপ্রিলের মধ্যেই ফিরে আসতে হল এডেন সাহেবকে। স্যান্ডার্স রিপোর্ট বলছে— "He had been subjected to gross insults, and obliged by force to sign to papers, agreeing to make over the Assam and Bengal Duars to Bhutan, and to surrender all runaway slaves and political offenders.'

ইংরাজ সরকারের সেই চরম অব-মাননার কথা ছাড়াও আরো অনেক খবর ভুটান থেকে সংগ্রহ করে এনেছিলেন এডেন সাহেব। ভুটানের রাজনৈতিক অবস্থার অনেক কথা আছে ওতে। ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল ওটি। ভুটানে তখন দেবরাজা ও ধর্মরাজাদের কর্তৃত্ব প্রকৃতপক্ষে শূন্যের কোঠায়। যদিও তাঁরাই নিয়ম-তান্ত্রিক ক্ষমতার অধিকারী। পরিবর্তে কিন্তু আধিপত্য বিস্তৃত হয়েছিল টংসা পেনলো (Tongsa Penlo) নামে এক ব্যক্তির পুরনো কথা শুনতে শুনতে হপ্-কিন্স সাহেবকে টংসা পেনলোর পরিচয় জানতে চেয়ে প্রশ্ন করেছিলাম। হপকিন্স সাহেব বলেছিলেন,

It appears from the report submitted by Ashley Eden that the Deb and Dharam Rajas were mere puppets in the hands of Tongsa Penlo. It was Tongsa Penlo and his faction who had treated the envoy with indignity.

ভুটান সম্পর্কে Ashley Eden-এর Report on the State of Bhutan (Cal. 1865) একটি খুবই প্রামাণিক গ্রন্থ। এই দুটি রিপোর্ট ছাড়াও আরো দুটি গ্রন্থের কথা বলেছিলেন হপকিন্স। Earl of Ronaldsay লিখিত Lands of Thunderbolt এক অসাধারণ গ্রন্থ। এ-ছাড়াও Charles Bell-লিখিত Tibet, Past and present গ্রন্থটিতেও এ সম্পর্কে কিছু কিছু জানা যায়। J. C. White লিখিত Sikkim and Bhutan-ও এমনি একটি প্রামাণিক গ্রন্থ। এগুলিতে দেখা যায়, ভুটানের সঠিক অবস্থান হিমা-লয়ের পূর্বপ্রান্তে। তিব্বত ও ভারত-বর্ষের মাঝামাঝি। ভুটানের পশ্চিম দিকে সিকিমরাজ্য ও ভারতবর্ষের দার্জিলিং জেলা। পূর্বদিকে আবর ও মিশমি উপ-জাতীয়দের বাস। তিব্বতীদের ভাষায় এদের বলা হয় খা লো (Kha Lo) ও তিং লো (Ting Lo)। স্যান্ডার্সের রিপোর্ট খুললেও দেখা যাবে—

The Bhutias or Bhots belonged to the Country known as Bhutan. It is situated between the 28' and 26'45" parallels of north latitude and 89'30' and 92' of east longitude. It is about 220 miles in length and 75 miles

in breadth, with an area of about 15,000 square miles.

পর্বত ও পাহাড়ের দেশ এই ভুটান। দক্ষিণ থেকে উত্তরের দিকে যতদূর যাওয়া যায় পাহাড়ের পর পাহাড়, পাহাড় পেরিয়ে সুউন্নত পর্বতশ্রেণী সারিবন্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। মাঝে মাঝে তার উপত্যকাগুলি। মূল দেশটি তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত। দক্ষিণের সীমানায় দাঁড়ানো ডুয়ার্স থেকে উত্তরের দিকে এর অভ্যন্তরে যেতে থাকলে প্রথম অঞ্চলটির সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। বঙ্গোপসাগর থেকে ধেয়ে-আসা মৌসুমী-বায়ুপ্রবাহ এই অঞ্চলের পাহাড়ে প্রতিহত হয়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত ঘটায়। সাধারণত প্রায় ২০০ থেকে ৩০০ ইঞ্চি বারিপাত ঘটে এখানে। এই অঞ্চল নানা জাতীয় বৃক্ষের বনভূমি। নিম্নাঞ্চলে মাঝে মাঝে দেখা যায় পাইন, ফার, লার্চ প্রভৃতি গাছ। ওক, বীচ, মেপোল- গাছগুলি। বাঁশবন চোখে পড়ে প্রচুর। প্রচুর পরিমাণে ফার্ন জাতীয় বনজংলা এক অসাধারণ সৌন্দর্যের সৃষ্টি করে। পাহাড়ের প্রান্তগুলিতে দেখা যায় ওক জাতীয় গাছ। সেই সঙ্গে রডোডেনড্রন গাছগুলির সৌন্দর্যও পথিকের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রায় আট হাজার ফুট পর্যন্ত এই চেহারা। তারপর ধীরে ধীরে যতই ওপরের দিকে উঠে যাওয়া যাবে, চোখে পড়বে পাইন-ফার গাছের কৃষ্ণবনাঞ্চলশ্রেণী।

ভুটানের দ্বিতীয় অঞ্চলটি দেশের মধ্যবর্তী অঞ্চল। এখানে নানা উপত্যকা আছে। সাধারণত সমুদ্রপৃষ্ঠের ৩,৫০০ থেকে প্রায় ১০,০০০ ফুট উচ্চতা এই অঞ্চলের। এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণও তেমন বেশি নয়। গড় বারিপাত ৪০ থেকে ৬০ ইঞ্চি পর্যন্ত। জনবসতিপূর্ণ উপত্যকাগুলি এখানেই দেখতে পাওয়া যায়। ভুটানের গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল পারো (Paro), হা (Ha) প্রভৃতি এখানে। বেশ বিস্তৃত। কর্ষণ হচ্ছে দেখা যায়। উঁচু উঁচু পর্বতপৃষ্ঠসমূহ একে দিয়েছে এক বিশিষ্ট স্বকীয়তা। সেই সঙ্গে করেছে দুর্ভেদ্য ও জটিল। কিছুদিন আগে পর্যন্তও ছিল মানুষ বসবাস ও যাতায়াতের পক্ষে কষ্টকর। পারো পর্যন্ত সুন্দর রাস্তা হয়ে গেছে আজ।

তৃতীয় অঞ্চল আরো ওপরে। আরো উঁচু উঁচু পর্বতমালা। প্রায় অজের বলা চলে। বরফের শুভ্রতা এই অঞ্চলের অনেকাংশকেই দিয়েছে এক লক্ষণীয় মহিমা। বরফের শুভ্রচূড়াগুলি বারো মাস কঠিন বরফপুঞ্জ বুকে করে পড়ে আছে। প্রায় চব্বিশ হাজার ফুট পর্যন্ত উঁচু চূড়া এই অঞ্চলের বিশেষত্ব।

সামগ্রিকভাবে ভুটান এক ভয়ংকর দুর্গম এলাকা আগেই বলেছি। বিদেশী আগন্তুকদের প্রতি পার্বত্য রাজ্য ভুটান ভয়ঙ্কর নির্মম ও উদাসীন। পাহাড়-পর্বত, জঙ্গল, বুনো পরিবেশ এর প্রধান বাধা। আর রয়েছে সর্বক্ষণের জন্য এক ভয়ংকর জলীয় আবহাওয়া। এই সব কথা ছেড়ে দিলেও ভয়ংকর জোঁকের কথা বলতেই হয়। পথের ওপরে ঘনবদ্ধ গাছ ও জংলা ঘাসে-পাতায় শাখা-প্রসারিত পত্রব্যূহের অন্তরালে প্রতিমুহূর্তে রক্তপানের জন্য উল্লসিত প্রতীক্ষা করছে ওরা। মানুষের রক্তপান করবার জন্য তাদের ভয়ঙ্কর লালসা কল্পনাও করা যায় না। যে-কেউ যে-কোন প্রাণী এই পথে যাবে তার হিংস্র আলিঙ্গন থেকে রক্ষা পাবার উপায় নেই। এ ছাড়াও রয়েছে অগণিত নামগোত্রহীন ভয়ংকর কীটের দল। এগুলি প্রতিমুহূর্তে মনে করিয়ে দেয় যে-অঞ্চলে আমরা যাচ্ছি, সেখানটা আগন্তুকদের প্রতি কী নির্মম উদাসীন। কী ভয়ংকর আতিথেয়তাশূন্য দেশ। হিংস্র জীবজন্তুও কম নয়। নিম্নাঞ্চলের প্রাণীসমূহের বর্ণনায় Sikkim and Bhutan গ্রন্থের লেখক J. C. White বলেছেন, "They are the haunt of almost every kind of wild animals—Elephant, Rhino, tiger, leopard, bison, sambur, cheetah, hog-deer, barking deer etc."

বরফাচ্ছন্ন পাহাড় অঞ্চলে ভালুকও দেখতে পাওয়া যায়। আর আছে ঘোড়া। ভুটানী ঘোড়া।

ভুটানের এইসব অঞ্চলে রয়েছে অসংখ্য গিরিপথ। বিশেষত তিব্বতের দিকে প্রসারিত গিরিপথগুলির কাছাকাছি দেখতে পওয়া যায় অনেকগুলি পাহাড়ী দুর্গ। মাঝে মাঝে আছে দুর্গগুলি। তাতে থাকেন শাসনকর্তারা। বৌদ্ধমঠ কিংবা দুর্গগুলি পাথর কেটে কেটে এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে তুষার-ঝড় থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভব। অসংখ্য পার্বত্য দুর্গগুলি থেকে অনুদার ভুটান আগন্তুক-দের প্রতি রাখে কঠোর সতর্ক দৃষ্টি।

প্রধান অধিবাসীরা ভুটানী। তিব্বতী উপভাষা থেকেই এদের ভাষার সৃষ্টি। যে বৌদ্ধধর্মের স্রোত একদা তিব্বতের বুকের ওপর দিয়ে বিপুল আবেগে প্রবাহিত হয়েছিল, ভুটানীরাও সেই ধর্মেরই উপাসক। সিকিম এবং তিব্বতের ভুটানীদের সঙ্গে মূল ভুটানের অধিবাসী-দের জীবনযাত্রায় কিছু কিছু পার্থক্যও দেখতে পাওয়া যায়। ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল। মঙ্গোলিয়ান ধাঁচের মুখ। ভুটানের সর্বাপেক্ষা ঘনবসতিপূর্ণ অঞ্চল হচ্ছে পুনাকা, টংসা, পারো, হা প্রভৃতি অঞ্চল। নানা অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃত ক্ষমতাসম্পন্ন লামা সম্প্রদায় সম্পর্কে ভীতিমিশ্রিত সংস্কার আচ্ছ ভুটানীদের মনে। সাধারণ মানুষদের জীবনের ওপর লামাদের অগাধ আধিপত্য। ভূত-প্রেত দত্যি-দানো, অপদেবতা ইত্যাদি নিয়ে নিত্য কারবার লামাদের।

আগেই বলেছি, অতীতের দিকে তাকালে ভুটানের শাসকপদে দেবরাজা ও ধর্মরাজাদের খুবই আধিপত্য দেখা যায়। ভুটান সরকারের শীর্ষে ছিলেন এই দুজন। ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রধান শাসক ছিলেন ধর্ম-রাজা। দেবরাজা ছিলেন পার্থিব বিষয়-সংক্রান্ত রাজা। এইসব রাজাদের সময়োচিত পরামর্শ ও মন্ত্রণাদানের জন্য ছিল একটি মন্ত্রিসভা। ধর্মরাজার অধীনস্থ প্রধানমন্ত্রীকে বলা হত লাম খেম (Lam Khem)। তিনি ধর্মগুরু হিসাবে সমস্ত লামাদের প্রধান বলে গণ্য হতেন। তৎপরবর্তী প্রধানকে বলা হত ডোগি-লোবেন '(Dogi-Loben)। অন্যেরা যথাক্রমে Chinie-Loben, Yang-Loben ও Tashang-Aumje এঁরা সকলেই ধর্মরাজা কর্তৃক নিযুক্ত হতেন লামাদের মধ্যে থেকে। লোবেনদের পরেই কুডুংদের স্থান। তিনজন কুডুং পদাধিকারী থাকতেন। পারো কুডুং (Paro Kudung), চোচেন কুডুং (Chochen Kudung) এবং সা কুডুং (Sha Kudung); এঁদের কার্যকাল এক বছর করে। তরুণ লামাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা ছিল এঁদের প্রধান কাজ। রাজারা দুজন, লামা খেম, লামারা এবং অন্যান্য সরকারী কর্মচারীরা গ্রীষ্মকালে থাকতেন টাসি-চুজং (Tashi Chujong) এলাকায়। এই টাসি-চুজং ছিল থিম্বু জাংপেন নামক শাসনকর্তার বাসস্থান। শীতে এঁরা বাস করতেন পুনাকা অঞ্চলে। এবং ওখানকার জাংপেন নামক শাসকেরা তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণপোষণ করতেন।

কর্তৃত্ব-ব্যাপারে ধর্মরাজারাই ছিলেন প্রায় সবচাইতে ক্ষমতাসম্পন্ন। দেবরাজাদের ক্ষমতা এঁর তুলনায় ছিল সংকীর্ণ ও সংকুচিত। এ-অবস্থার অবশ্য অনেক পরি-বর্তন ঘটেছে একালে। উত্তরাধিকারসূত্রে দেবরাজাই এখন প্রকৃত শাসনকর্তা। পর-রাষ্ট্রব্যাপারে ভারতবর্ষের সঙ্গেই এঁদের প্রধান সম্পর্ক। কিন্তু বিগত শতাব্দী-কাল পর্যন্ত কোন সুপরিণত শাসনব্যবস্থা ভুটানে ছিলই না বলা চলে। শাসনকর্তা-দের মধ্যে যিনি যখন প্রাধান্য বিস্তার করতেন, তিনিই তখন সর্বাপেক্ষা প্রবল প্রতাপান্বিত শাসক। দুর্বল শাসকেরা নতমস্তকে তাঁর আধিপত্য স্বীকার করত। এবং তাঁকেই রাজা বলে মান্য করত।

১৯০৭ খৃস্টাব্দে যিনি ভুটানের সকল শাসকদের পরাজিত করে সর্বপ্রথম মহারাজরূপে প্রতিষ্ঠিত করলেন, তিনি হিজ হাইনেস আগেন ওয়াংচুক। এঁর মৃত্যু ১৯২৬ খৃস্টাব্দে। তিব্বতের ব্যাপারে বৃটিশ শক্তিকে সময়োচিত সাহায্য ও সহায়তাদানের পুরস্কার হিসেবে তাঁকে নাইট কমান্ডারের গৌরবজনক পদে সম্মানিত করা হয়েছিল। ভুটানের বর্তমান মহারাজা হিজ হাইনেস জিগমি দর্জি ওয়াংচুক।

ইতিহাসের পুরনো পাতা ওল্টাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি ১৮৬৫ খৃস্টাব্দের একটি সময়োচিত সন্ধিস্থাপনার মাধ্যমে ভুটানের সাথে ইংরাজের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের অবসান ঘটে। এই সময় থেকেই মিত্রতা সম্পর্ক দানা বেঁধে উঠতে থাকে। ১৯১০ খৃস্টাব্দে এই সন্ধিরই পরিণতিরূপে উভয়ে অনেকটা কাছে আসে। বহির্বিষয়ক ব্যাপারে ভুটান ইংরাজের সঙ্গে একমত হয়ে চলতে থাকে। এরই ফলে স্থির হয়, ভুটানের অন্তর্বর্তী শাসন ব্যাপারে ইংরাজ সরকার ভুটানরাজকে এক লক্ষ টাকা বার্ষিক নির্দেশ-উপদেশ দেবার চেষ্টা করবেন না। সন্ধি-সূত্র অনুযায়ী এই সময় ইংরাজ সরকার ভুটানকে এক লক্ষ টাকা বার্ষিক বৃত্তি দিতে স্বীকৃত হন। ভুটানের ব্যাপারে এতে করে চীনাদের সকল দাবি স্পষ্টাক্ষরে অস্বীকৃত হয় এবং চীনাদের সম্ভাব্য যে-কোনরকম আক্রমণ সম্পর্কে সতর্কতার ভূমিকা গ্রহণ করা হয়। চীন সরকারকে পিকিং-এ বৃটিশ সরকার জানিয়ে দেন, ভুটান কোন কালেই চীন-এলাকা ছিল না এবং সর্বপ্রকার বহিঃরাষ্ট্রবিষয়ক ব্যাপারে ভুটান বৃটিশ সরকারের সম্পর্কযুক্ত। ভুটানের ওপর কোন বে-আইনী অধিকারের দাবির বিরুদ্ধে কঠোরতর ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানিয়ে দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। ১৯৪৯ খৃস্টাব্দে মিত্ররাজ্য হিসেবে ভুটানকে সাহায্যদানের মাত্রা বার্ষিক পাঁচ লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়। ১৯৫১-তে ভুটানের প্রতি সম্পর্কের গভীরতা-সূত্রে ডুয়ার্সের দেওয়ানগিরি অঞ্চল ভুটানকে অর্পণ করা হয়।

অতীত অতীতই থাক।

ইতিহাসের পুরনো পাতা উড়ে গেছে আজ। নতুন কালের ঝড়ে। নতুন দেশ ভুটান আজ। তার মুখে ঝলমল করছে নতুন কালের রোদ্দুর। তার বুকে লেগেছে প্রবল প্রাণের টান। তার বুকভরা আশা। মানবেতিহাসের যে চাকাটা সারা পৃথিবী জুড়ে ঘুরিয়ে দিচ্ছে প্রগতিকামী সুস্থ মানুষের দল, তাঁদেরই দেখতে পাবেন একালের ভুটানে এলে। এক অভূতপূর্ব জাগরণ। ডুয়ার্স থেকে কয়েক পা এগোলেই সেই ভুটান।

ইন্দ্রজালের যাদুমন্ত্রে বদলে গেছে চেহারা।

ফুন্টশোলিং-এর জেনারেল পোস্ট আপিসে আলাপ হয়েছিল সেখানকার পোস্টাল সুপারিন্টেনডেন্টের সঙ্গে। এক আশ্চর্য মানুষ। সতেজ উজ্জ্বল একটি বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব। ঝকঝকে অফিস। দেয়ালের ক্যালেন্ডারটি থেকে শুরু করে টেবিলের ওপর পর্যন্ত রুচির এক আশ্চর্য সংযম। ঝকঝকে কাউন্টারে কাউন্টারে ভুটানের যুবকেরা কাজ করছেন। পরিচ্ছন্ন ফিট্-ফাট্ চেহারা। ছিমছাম। ডাকঘরের দেয়ালে ভুটানের শিল্পীদের নিজস্ব ঢং-এর আলপনা। টেরিলিন টেরিকট-এর প্রাধান্য এখানকার পোষাকেও। যুবকদের হাতে হাত-ঘড়ি। পায়ে পয়েন্টেড সু। পরনে ফাউন্টেনপেনের নিব উঁকি মারছে। ঘুরছে সিলিং ফ্যান। টেলিফোন ক্রীং ক্রীং করছে। Office of the Forest Range Officer-এর একটি নোটিশের অর্ধেকটা চোখে পড়ল। ওপরের দিকটুকু কাগজের তলায় চাপা পড়েছে। ফুন্টশোলিং-ভুটানের অন্তর্ভুক্ত টর্সা-সংকোশ-রেঞ্জ-এর ফরেস্ট অফিসার সর্বজন-জ্ঞাতার্থে একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিলেন। হয়ত বেশ কিছুদিন আগে। যতটুকু দেখছি লোভনীয়—"...modern amenities of life like electricity, cushioned beds and palatable dishes of Food to suit everybody's taste."

একবার কল্পনা করুন, ডুয়ার্স থেকে কয়েক পা বাড়িয়ে মাত্র টর্সা-সংকোশ ফরেস্ট রেঞ্জের একটি বাংলোর উজ্জ্বল আলোকিত কক্ষে রয়েছে সেই আন্তরিক অকৃত্রিম আহ্বান। সমতলে যখন প্রবলতম গ্রীষ্মের উৎপীড়নে খাবি খাচ্ছেন আপনার ঘরটুকুর মধ্যে, হাত-পাখা বা বৈদ্যুতিক পাখা এবং খসখস প্রভৃতি সবকিছু উপেক্ষা করে সেই গ্রীষ্ম যখন আপনার বিশ্রামের মুহূর্তগুলিকে ক্লিষ্ট ও দুঃসহ করে তুলছে, তখন এখানে ভুটানের শ্যামাঞ্চল বনবনানীরা ওড়াচ্ছে ভালোবাসায় ভরা সবুজ আঁচল। রাতে তোফা খানার পরে মশারি টাঙিয়ে শুয়ে পড়েছেন বাংলোর কুশন-শয্যায়। অল্প দূরেই ভুটান-পাহাড়ের মাথায় সোনার থালার মত রূপকথা যুগের একটি চাঁদ, স্বপ্নাবিষ্ট চারদিক।

ভারত সরকারের সঙ্গে ভুটানের অন্তরঙ্গতার আরেকটি নিদর্শন চোখে পড়ল, নোটিশ বোর্ডেই রয়েছে ছাপানো একটি বিজ্ঞপ্তি ও সেই সঙ্গে ছবি। At the invitation of the Indian Posts and Telegraph dept. a delegation of four officials of the Bhutan Post and Telegraph

সদ্য প্রকাশিত হইল!

বাঙলা সাহিত্যের অদ্বিতীয় হাস্যরসিক

শিবরাম চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত

(১) মনের মত বৌ
(২) মস্কো বনাম পন্ডিচেরী
(৩) প্রেমের পথ ঘোরালো
(৪) প্রেমের বিচিত্র গতি
(৫) রক্তের টান
(৬) যখন তারা কথা বলবে

পৃষ্ঠা ২৪০

মূল্য মাত্র চার টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-১২

শঙ্করাচার্যের গ্রন্থমালা ঃ

পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত। সুবিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিবৃতি সম্বলিত।

প্রথম খণ্ড—৫'০০ টাকা।

তৃতীয় খণ্ড—৪'০০ টাকা।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ ঃ

(সমগ্র সপ্তকাণ্ড। কবির জীবনী-সম্বলিত) আদি কবির মহাকাব্যের বাঙালীর সংস্করণ। সোনার বাংলার ভক্তি-অর্ঘ্য। পদানুযায়ে। রাজসংস্করণ। সচিত্র। রেক্সিন ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—৮'০০ টাকা।

উপনিষদ গ্রন্থাবলী ঃ

১ম খণ্ড : শ্রীতত্রেয়, কৈবল্য, কাঠকো নৃসিংহতাপনী।

২য় খণ্ড : শ্বেতাশ্বতর, পরমহংস, সন্ন্যাস, নীলরুদ্রচূলিক, আরুণেয়, কণ্ঠশ্রুতি, জাবাল, পিণ্ড, আত্ম, ষট্‌চক্র, ভৃগু, শিক্ষা, ব্রহ্মবিদ, নারদ, পরিব্রাজক, পৈঙ্গল, তুরীয়াতীত, বাসুদেব, শাণ্ডিল্য, নারায়ণ (ক), নারায়ণ (খ)।

৩য় খণ্ড : ঈশ, কেন, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, পাশুপত-ব্রহ্ম, প্রাণাগ্নিহোত্র, ভারন, গরুড়, শ্রীরামপূর্বতাপনীয়, শ্রীরামোত্তরতাপনীয়, পঞ্চব্রহ্ম, কালাগ্নিরুদ্র, যাজ্ঞবল্ক্য, রামরহস্য, গোপালপূর্বতাপনীয়, গোপালোত্তরতাপনী, কোষীতক্য, অমৃতবিন্দু, কালিকা সর্বসার ও অমৃতনাদ। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য : প্রতি খণ্ড—৪'০০ টাকা।

পুরশ্চরণ রসোল্লাস ঃ

(দুর্লভ তান্ত্রিক গ্রন্থ। মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ।) মূল্য—৩'০০ টাকা।

পঞ্চতীর্থ মাহাত্ম্য ঃ

শ্রীকাশীমাহাত্ম্যম্ শ্রীগয়ামাহাত্ম্যম্, শ্রীবৈদ্যনাথ মাহাত্ম্যম্, শ্রীপ্রয়াগ মাহাত্ম্যম্, শ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম্যম্। মূল সংস্কৃত ও পণ্ডিতপ্রবর শ্রীকালীপ্রসন্নকৃত বঙ্গানুবাদ। মূল্য—৩'০০ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

led by Shri Lam Penjor, Supdt. of Post Offices, Bhutan, participated in the all India Post and Telegraph Sports and Cultural meeting held at Hyderabad. The Bhutan P. & T. delegation led the march-past when the meeting was inaugurated by Major General Moitra of South Command.

নতুন যুগের আরেক প্রধান লক্ষণ হোটেলগুলি। বলা চলে হোটেলই বুঝি বর্তমান যুগের সভ্যতার এক প্রতীক। আমাদের ছেলেবেলার মা-মাসী খুড়ী-জ্যাঠিদের হাতের রান্না খেতে খেতে বর্তমান যুগে কখন যে পৌঁছে গেলাম আমরা। স্বপ্ন দেখি সেই অতীত। দাদামশায় খেতে বসেছেন। দ্বিপ্রাহরিক ভোজন। অস্ত কাঁঠালকাঠের পিঁড়িতে বসেছেন আসনপিঁড়ি হয়ে। খালি গায় নাদুসনুদুস ভুঁড়িতে ঝুলছে পৈতৃক পৈতেটি। মস্ত থালার চারদিকে বাটি সাজিয়ে দিচ্ছেন দিদিমা। সব চাল গব্যঘৃত। চর্ব্যচোষ্য-লেহ্য-পেয়র ঢালাও ব্যবস্থা। গ্রীষ্মের দিনে বৈকালিক জলাহার। দুধ সন্দেশ-কলা-আম সহযোগে চিঁড়ে ভোজন। এমনি কত ছবি। মা খেতে দিচ্ছেন বাবাকে, আমাদের। প্রকৃতই স্নেহপালিত ছিলাম এই আশ্রয়ে। বর্তমান যুগ কেড়ে নিচ্ছে সেই ব্যবস্থা। সর্বত্রই নানা আর্থিক অনিশ্চয়তা, মূল্যবোধে ভাঙন ও অস্থির চিত্তবিক্ষেপ। গৃহিণীরা জঠরানল-নিবৃত্তির সাধনাতেই হৃদয়লোকে প্রবেশের পথ খুঁজে পেতেন সেকালে। ঘরের নিশ্চিন্ত আঙিনা। পারিবারিক স্নেহকোণটুকু। দয়া-দাক্ষিণ্য স্নেহ-মমতা। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথকে পর্যন্ত বলতে শুনেছি একটি কবিতায়—

> পাকপ্রণালীর মতে করো তুমি রন্ধন
> জেনো ইহা প্রণয়ের সবসেরা বন্ধন,
> চামড়ার মত যেন না-দেখায় লুচিটা
> স্বরচিত বলে দাবী নাহি করে মুচিটা
> পাতে যেন পাতে বসে নাহি করে ক্রন্দন॥

বর্তমান যুগ যে বন্ধনমুক্তির যুগ॥ তাই হাতা-খুন্তি-বেড়ির বন্ধন থেকে মুক্তি পাচ্ছেন নারীরা। ইতিহাসের নির্মম বিধানে। ঘর থেকে হোটেলের যুগে পৌঁছে যাচ্ছি আমরা। গোয়ালন্দ হোটেলের "পাকা পায়খানা, খাবেন ভালো" নয়, শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত এক রাজকীয় হোটেলের যুগ এটি। অশোক হোটেল, ওবেরয় গ্র্যাণ্ড, হিন্দুস্থান ইন্টারন্যাশনাল এক কথায় এই হোটেলগুলির প্রত্যেকটির অন্যতম হোটেল বলে কোনটি সুপরিচিত কিনা। রাজা, রাজপুরুষ থেকে সাধারণ মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ পর্যন্ত হোটেলের ভক্ত। সর্বক্ষণের জন্য উদারহস্ত প্রশস্ত করছে হোটেল।

ভুটানে এলেও দেখতে পাবেন হোটেল। বিস্তর সাহেবি-কেতার হোটেল। বড় বড় ইংরাজি অক্ষরের সাইনবোর্ড। ফুন্টশোলিং-এ আছে, আছে পারো-তে থিম্পুতেও। পারো ফুন্টশোলিং থেকে ১৬৬ কিলোমিটার দূরত্বে। থিম্পু নতুন রাজধানী ১৭৯ কিলোমিটার। মিঃ হৃষ্ণিকেশের কাছে শুনেছিলাম অতীত ইতিহাস। আর সুধীরদার কাছে শুনেছিলাম নতুন যুগের ভুটানের কথা। সুধীরদা বলেছিলেন, নিয়ে যাব একবার তোমাকে। দেখে আসবে Finance Minister, Home, Trade ও Commerce Minister-দের বড় বড় অফিস, Development wing-ই বা কত। থিম্পুতে দেখবে Financial Ministry-র office মহারাজারই এক বাড়িতে। Finance-ই সবচাইতে Powerful. এর প্রধান প্রধান কর্তাব্যক্তিরা একালে প্রায় সবাই শিক্ষিত ভুটানীরা। Finance-এ Indian-রাও অনেক আছেন। Development-এর কাজ না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবে না। Road, Buildings, Quarters-এ রাতদিন কাজ হচ্ছে। প্রায় সারা ভারতবর্ষের মানুষই আছেন ওখানে। মাদ্রাজী, বাঙালী, পাঞ্জাবী, বিহারী অনেক। সুধীরদাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, থিম্পু সমতল থেকে কত হাজার ফুট হবে?

ন'-দশ হাজার ফুট তো হবেই। বলে সুধীরদা বলেছিলেন, ফুন্টশোলিং থেকে ওপরের দিকে উঠে যাচ্ছে রাস্তা। ওই পথে ডানদিকে যাচ্ছে থিম্পু, পারো বাঁ-দিকে। নিতান্ত সাধারণ শহর পারো। মহারাজের বাড়ি আছে ওখানে। ফুন্টশোলিং-এ আছে Tap-এর জল। বর্ণার জল রিজার্ভ করে রাখা হয়। পারোতে কিন্তু নদীর জল। Water Supply System আছে থিম্পুতে।

[ক্রমশ]

ঘুমোচ্ছিলাম। কতো রাত্তির তা জানি না।

খুট খুট খুট—জানলায় শব্দ। কে যেন জানালায় টোকা দিচ্ছে—কে যেন ডাকছে।

—কে? —একটা সাড়া দিলাম।

—আমি।

—আমি কে? কে তুমি? —আর কোন আওয়াজ নেই। তখন আবার একটু ঘুমের মধ্যে চলে গেছি, বোধহয় পাশ-বালিশটা-কেও উল্টে নিয়ে এসেছি, আবার সেই এক খুট খুট খুট। একটু জোরেই এবার।

—কে? কে হে? কাকে চাই?

—তোমাকেই।

—এখন ঘুমের সময়—এই কাঁচা ঘুমে কেন জ্বালাও বাপু! নামটাই বলো না।

—বললাম তো, আমি। আগে জানালাটাই খোল না।

কী আর করি—হাতটা বাড়িয়ে জানালার নিচের ছিট্‌কিনী খুলে নিলাম, কড়াটা ধরে সামান্য একটু টান দিলাম—সার্সিটা খুলে গেল। তার পাট দুটো ভাঁজ করে নিয়ে দেয়ালের কোণলায় ঘুরিয়ে দিলাম, বললাম—বলো এবার তুমি কে? কী চাই এত রাত্তিরে?

—আরে খড়খড়িটা তো খুলবে? কতো দূর থেকে কতো কষ্ট করে তোমার কাছে এলাম, আর একটা জানালা খুলতেই দেখি তোমার যতো ক্লান্তি।

উপায় নেই! ঘুমের তো ততক্ষণে বারো-টাই বেজেছে—ঘড়িতে ক'টা বাজে তা অবশ্য জানি না। জানালার খড়খড়ির একটা পাটের পাখিগুলো খোলা ছিল—রোজই থাকে, ওখান দিয়েই সকালবেলার প্রথম আলো ঘরে ঢুকে আসে—বোঝা যায়, খবরের কাগজ আসবার সময় হয়েছে, চা আসবে এবার। তার মধ্যে দিয়ে, কালো চক্‌চকে এনামেল রংয়ের গরাদের ফাঁক দিয়ে কার্নিশের কিছুটা অংশ আর সামনের রাস্তার খানিকটা দেখা যায়—তার ভেতর দিয়ে বাইরের দিকে তাকালাম। আরে! কার্নিশের ওপরে আমার ঠিক সামনেই কে-যেন দাঁড়িয়ে আছে—হাতে টর্চ না লণ্ঠন কিসের জানি একটা আলো। বললাম—দাঁড়াও খুলছি, কিসের এত তাড়া তোমার বাপু!

মশারি সরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। আবার একপ্রস্থ ছিট্‌কিনী খোলা। আস্তে ঠেলা দিয়ে জানালাটা খুলে দিলাম।

—কী, এবারে চিনেছো তো?

—চিনছি যেন—কিন্তু, নামটা কি জানি—নামটা তো—

—আরে, নামে কী চিনবে আমাকে? নাম তো আমার রাখাই হয় নি এখনো। আর ক'টা নামই বা তুমি মনে রাখতে পারো?

—আরে, আরে! তুমি নাকি! তুমি

এতো সেই তারাটাই, না? আজ সন্ধ্যায় তোমাকেই না দেখছিলাম?

—হ্যাঁ, ধরেছ ঠিকই দেখছি।

—তা এখানে কী মনে করে? ব্যাপারটা কী?

—ব্যাপার কিছু গুরুতর নয়, এই তোমাদের শহরে আজ একটু বেড়াতেই এলাম—তোমাদের দেশ দেখতেই এলাম আর-কি। রাস্তা-ঘাট তো কিছু চিনি না, তাই ভাবলাম, তোমাকেই সঙ্গে নিয়ে যাই। চলো, একটু বেড়িয়ে আসি আমরা! —কিন্তু, তোমার মুখটা অতো গম্ভীর লাগছে কেন? তুমি কি রাগ করেছ নাকি —

—নাঃ রাগটাগ কিছু নয়, আর রেগেই বা কী লাভ বলো, তুমি যা একটি ন-ছোড় বাবাজী! সেই সন্ধ্যের যখনই তোমাকে প্রথম দেখি, তখনই বুঝেছি, কপালে আজ কিছু একটা আছেই। তা এখন তো দেখছি, খুব বড় একটা কিছু কাণ্ড নয়—শুধু ঘুমেরই বারোটা বাজল, এই যা। কাল সকাল-সকাল ঘুমিয়ে উঠে বাজারে যাওয়া, অফিস আছে না!

—আরে ও-সব অফিস-টফিসের ভাবনা এখন ছাড়ো তো, চলো একটু বেড়াই ঘুরে।

—দ্যাখো বাপু, তোমার সঙ্গে বেরোতে বলছ, তা না হয় যাচ্ছি, কিন্তু অফিস তুলে তুমি আমাকে কথা বলো না, অফিস ছাড়লে আমি খাব কি, এ্যাঁ?

—বেশ, যাবেই যদি তো এত দেরি করছ কেন? তুমি নিজেই তো কথা বাড়াচ্ছ, কতো দূর থেকে আমি তোমাদের দেশ দেখতে শহর বেড়াতে এলাম, আর এই কার্নিশের ওপরেই আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে কি রাতটা কাবার করে দেবে?

কথা বাড়িয়ে সত্যিই আমার কোন লাভ নেই, তাই ওর সঙ্গে বাইরে বেরিয়ে এলাম। ঘুমটা কখন চলে গিয়েছে। কোনো ঢুলুনি নেই, ক্লান্তি নেই—শরীফ্ মেজাজ। মনে হলো—এ তো বেশ ভালই। রোজই রাত্তিরে ঘরের মধ্যে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিই—রাত্তিরকে রোজ তো আসতেই দেখি, তার পরে আর কিছু খবর রাখি না; কিন্তু রাস্তায়-রাস্তায় মাঠে-পার্কে মানুষের ঘরে ঘরে কেমন যে তার চলা-ফেরা, তারপর কখন আবার তার চলে যাওয়া—এসব তো কখনও দেখি না। তাই আজ এই নিঝুম রাতে তারার সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়ে বেশ রাতকে দেখা যাবে। সুন্দর একটা প্রত্যাশার মুখোমুখিই আমি। খুশি মনেই তারার সঙ্গে শহর দেখতে চললাম।

আমার হাঁটতে ভাল লাগে, ওর উড়তে ভাল লাগে, ইচ্ছে হলে আমি হাঁটতেও পারি, আবার ইচ্ছে করলে ওর হাতটা ধরে ভেসে-ভেসে আমি উড়েও যেতে পারি—এ বেশ সুন্দর একটা চলা। চমৎকার লাগছিল আমার।

আমাদের বাড়ির সামনেই পীচের রাস্তা, দু' পাশে ফুটপাথের পাথুরে বেড়া—ফুটপাথ, তবু হাঁটা যায় না—আমাদের পাড়াটাই এমনি। বেশি পীচ খরচের ভয়েই হয়তো ওরা রাস্তার দু'দিকে একটা করে জায়গা ছেড়ে দিয়ে গেছে—হাঁটার কাজ তাতে মোটেও চলে না, কিন্তু ময়লা ফেলা, ল্যাম্পপোস্টের দাঁড়ানো—এসব বেশ চলে যায়।

রাস্তায় নেমে প্রথম ল্যাম্পপোস্টের কাছে এসেই ও থমকে দাঁড়াল, বলল—বাঃ! তোমরাও তো দেখি বেশ আলো জ্বালিয়েছ!

মাসিক ১০, টাকার কিস্তিতে লাভ করুন অল ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড ট্রানজিস্টর (জাপান মেক) জনপ্রিয় মূল্য ৩০০,। দেশব্যাপী খ্যাতি আছে। ডবল স্পীকার ৩ ব্যান্ড, ৮ ট্রানজিস্টর। নাইট-ল্যাম্প ফিট করা। কেবল ইংরেজী বা হিন্দিতে যোগাযোগ করুন।

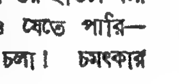

Allied Trading Agencies
(B.C.) P.B. 2123, Delhi-7.

—হ্যাঁ, আমরাই কি পারি না নাকি? তুমি কি ভেবেছ আলো জ্বালানোর এখ্‌তিয়ার শুধু তোমাদেরই?

—না, তা কি আমি বলছি নাকি? নিজের থেকেই তো আমি বললাম, আর দেখতেই তো পাচ্ছি, তোমরাও বেশ সার দিয়ে আলো জ্বালিয়েছ। আবার আমাদের দেশে তো গাড়িও পাঠাচ্ছ মাঝে মাঝে। পারো, পারো হে! তোমরা সত্যি অনেক কিছু পারো।

শুনে আমার বুক ভরে উঠল—খুব ভাল লাগল আমার—দলের প্রশংসা আর জাতের সম্মান কারই বা ভাল না লাগে। মনের মধ্যে খুশি নিয়ে আমি ওর সঙ্গে বড়ো রাস্তার দিকে চললাম। সামনেই ফুটপাথের গা-ঘেঁষে রাস্তার ওপরেই একটা বালির গাদা, তার ওপর একটা কুকুর লেজ গোল করে বেশ আরামে ঘুম দিচ্ছিল, সেখানেই ও আবার দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল—এসব কী এখানে? কারা এসব রেখেছে জানো?

—কি জানি কারা রেখেছে, কেউ বোধ হয় বাড়ি করবে, বাড়ি করতেও বালি লাগে কিনা। নদীর ধার থেকে তাই আমরা এই সব বালি তুলে নিয়ে আসি।

—বাঃ, বেশ তো তোমরা, অনেক কিছু জানো দেখছি।

—হ্যাঁ, তা একটু জানি বটে—বিনয়ের হাসি হেসে আমি বললাম, তোমার তো সবকিছুই বেশ ভালো লাগছে, না?

—তা তো তুমি বলতেই পারছ! সত্যি, খুব ভাল লাগছে আমার।

আমরা রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে কখনও বা হাওয়ায় ভাসতে-ভাসতে অনেক দূরে চলে এলাম। কী আশ্চর্য আর চমৎকার যে লাগছিল আমার! রাতের চারপাশ ঘিরে অল্প কুয়াশা, তার মধ্যে রাস্তার আলোগুলো সব ধোঁয়া-ধোঁয়া, টিম্‌টিম্ জ্বলছে, পথ ঝিম্‌ঝিম্—শূন্য। দু' ধারের বাড়ি-ঘর দোকান-পাট একঠাঁয় একা দাঁড়ানো চিঠির বাক্স আর সারি সারি জোড়া-জোড়া ট্রামের লাইন সবকিছুই একটা নিঝুম ঘুমের মধ্যে ঢুল্ ঢুল্ ঢুলছে—কুয়াশার পর্দার আড়ালে তাদের কিছু দেখা যায়, কিছু আবার যায়ও না। তারার জন্যেই আজ এসব দেখতে পেলাম, মনে ভাবছিলাম—এ রাতটা একটুও নিষ্ফলা নয়! এর জন্যে ওকে আমি ধন্যবাদই দিতে যাব, এমন সময় ও হঠাৎ বলে উঠল—আচ্ছা, ওইসব কারা ওখানে এসে সার বেঁধে শুয়ে আছে? ওখানে ওরা শুতে এল কেন বলো তো?

দেখলাম, রাস্তার ফুটপাথে আর কয়েকটা বড় বাড়ির গাড়ি-বারান্দার তলায় বেশ ভিড় করে যে কিছু লোক শুয়ে ছিল, সেদিকেই ওর চোখ পড়ে গেছে। এ বিষয়ে কী যে বলব তা আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না, তাই প্রশ্নটা ভালও লাগছিল না আমার। তবু বললাম—ওদের সব ঘর-বাড়ি নেই কিনা, তাই ওরা রাত্তিরে ওখানেই শোয়, ঘুমোয় কিন্তু বেশ ভালোই, জানো! মানে, আমাদের চেয়েও আরও অনেক গভীর ঘুম হয় ওদের—যেখানেই শুক না কেন!

—তুমি কিন্তু অন্য কথা বলছ, এই তো তোমরা কতো বড়ো বড়ো বাড়ি করেছ দেখছি, মাঠে-ময়দানে কতো সারি-সারি আলো জেলেছ, আমাদের দেশে মাঝে মাঝে গাড়িও পাঠাচ্ছ আজকাল—এতসব করতে পারলে, আর এইটুকু তোমরা পারলে না?

বুঝছি, তোমার এগুলো ভাল লাগছে না, চলো আরও একটু এগিয়ে যাই, কতো কিছু দেখবার আছে—কতো যে বিষয় আছে! আমাদের দেশে সবই কি এক রকম নাকি?

এরপর একটুখানিই মোটে এগিয়েছি, আবার হঠাৎ থেমে যেতে হলো। একটা বড়ো রাস্তার একদিকে খুব বড়ো বড়ো বাড়ি, অন্যদিকে একটা প্রকাণ্ড মাঠ, তার ধারে রাস্তার কোল-ঘেঁষে একটা চারিদিক-খোলা গুমটির মত ঘর—সেখানেই ওর চোখ পড়ে গেছে। ও প্রশ্ন করল—ওখানে ওরা কারা বলো, কী করছে ওরা, জানো?

দেখলাম গুমটিটার মধ্যে মেঝের উপরে অনেক মানুষের একসঙ্গে ঠাসাঠাসি নিদ্রা। ওরই একটা পাশ দিয়ে পাশাপাশি শুয়ে এক যুবতী নারী—আবার একটি শিশু তারই বুকের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে ঘুমিয়ে, তার পাশে একজন পুরুষ—তার একটা হাত ওই শিশুর দেহের ওপর দিয়ে সেই নারীর শরীরের ওপর পড়ে, আর ওরা তিনজনই একটা ঘুমের মধ্যে ডুবে। তারার চোখ সেদিকেই।

বললাম—ওরা সব ঘুমোচ্ছে, জানো! আর এই যে এদিকের তিনজন ওদের একজন হলো—ভালবাসা, একটি হচ্ছে স্নেহ, আর একজন প্রেম। কেন, এসবও কি তোমার খারাপ লাগছে নাকি?

—না না, খারাপ কী লাগবে! খুবই তো ভাল লাগছে আমার! সত্যি, বেশ চমৎকার দেশ তো তোমাদের! মাঝে মাঝেই আমি কিন্তু তোমাদের দেশ দেখতে আসব, আর তোমার ঘুমটি মাটি করে দিয়ে যাব। জানো, তোমাদের দেশের মতো এসব সুন্দর ব্যাপার আমাদের পোড়া দেশে কিন্তু মোটেও নেই।

আমার দস্তুরমতো ভাল লাগল শুনে, বললাম—আরে, এ আর তুমি কি দেখছ! এসব যদি ছাদের তলায়—আশ্রয়ের আওতায় ভালো করে না দ্যাখো! বুঝবে কী-সব নিয়ে আমরা আছি, আর কিসের জোরেই বা

শেলাক ব্যতীত

ঐ সুন্দর কেশ বিন্যাস অতি দীর্ঘকাল সুন্দর থাকবে না - - -

চক্ষু আর্টকাবার প্রসাধন সামগ্রীতে, এরোসলযুক্ত ও এরোসলহীন কেশ সিঞ্চনে উভয়তই শেলাকই প্রাথমিক আঠা।
শেলাকসমূহ ফ্লেক্সোগ্রাফিক কালি, পেষাই কল, পিল, কনফেকশনারী, জলীয় বাষ্প সেট করা কালি, প্রসাধন, বৈদ্যুতিক ইন-স্যুলেটর, কোল্ড টপ এনামেল ইত্যাদিতে বিভিন্ন প্রান্তিক ব্যবহার সামগ্রী. পছন্দমত প্রস্তুত হয় পৃথিবীর বৃহত্তম শেলাক প্রস্তুতকারক, এঞ্জেলো ব্রাদার্স কর্তৃক। উহারা নিখুঁতভাবে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী প্রস্তুত হয়। সমুদয় এঞ্জেলো গ্রেডই আই-এস-আই স্ট্যাণ্ডার্ড ও এতদ্ব্যতীত কঠোরতর এঞ্জেলো স্পেসিফিকেশন মত। সবচেয়ে বড় কথা এই যে, এঞ্জেলো ব্রাদার্স গুণের সমতা রক্ষা করেন।

Angelo Shellacs

এঞ্জেলো ব্রাদার্স লিমিটেড, কাশীপুর, কলিকাতা-২

ASP/AB-2/60

আমাদের এই ছোট্ট দেশ থেকে তোমাদের দেশে ওই অত দূরেও আমরা গাড়ি ছুটিয়ে দিচ্ছি। গর্বে আমার বুক ভরে উঠেছিল, তাই কথায় গাড়িই ওর দিকে ছুটিয়ে দিলাম, আর খুশির পাখায় ভেসে ভেসে হাওয়ায় তুফান তুলে, তারাকে অনেক পিছনে ফেলে আমি চলে যাচ্ছিলাম—ও আমার সঙ্গে পারবে কেন।

—ওহে শোনো, শুনছো, একটু আস্তে চলো—দ্যাখো, শহর থেকে কতো দূরে আমরা চলে এসেছি।

তাকিয়ে দেখি, সত্যিই তো! শহরটাকে পিছনে ফেলে কতোই দূরে আমরা চলে এসেছি যে! এখন একটা বড়ো নদীর ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছি আমরা। যাক্, আবার না-হয় ফিরে গেলেই চলবে। এখন নিচের ওই নদীটা—ওটার' ওপর সারি-সারি ছোট ছোট ডিঙি-নৌকা ভাসছিল, তাদের ছইয়ের বাইরে পাটাতনের ওপর ছোট ছোট লণ্ঠন বসানো রয়েছে—ওসব নিশ্চয় জেলে নৌকা। ঘের দিয়ে বেড় দিয়ে ওরা বেড়জাল টানছে। তারাও ওদিকেই তাকিয়ে ছিল—বলল, ওরা সব কারা বলো তো, ওখানে ওরা কী করছে সবাই?

—ওরা হলো জেলে। নৌকা থেকে জাল ছড়িয়ে মাছ ধরছে নদীতে। মাছ নিয়ে ওরা সবাই বাড়ি যাবে, ওদের বউরা রেঁধে দেবে, তারপর সবাই মিলে বেশ পেট ভরে খাবে ওরা, জানো।

—বাঃ, বেশ তো। তোমাদের তো চমৎকার সব ব্যাপার দেখছি। সত্যি, বেশ আছো তোমরা।

—হ্যাঁ, দ্যাখোই না, নিজের চোখেই তুমি সব দেখে যাও। তোমাদের দেশে গিয়ে সবকিছুই বলবে কিন্তু। তবু, কি-আর দেখলে তুমি আজ? মোটে একটা রাতের মধ্যে কতোটাই বা দেখা যায়। অন্য একদিন এসো তুমি, আরো কতো কিছু কাণ্ড তোমাকে আমি দেখিয়ে দেব।

—বেশ, আবার আসব আমি—মাঝে মাঝেই আসব। সব কিছুই খুব ভাল লাগছে আমার—মনে হচ্ছে, এবার থেকে তোমাদের দেশেই আমি থেকে যাই, এই আজকের মতই রোজ আস্তে আস্তে ঘুরে ঘুরে সবকিছু দেখা যাবে—এইসব মজার মধ্যে। সত্যি, খুবই সুখ তোমাদের। আর আমাদের দেশ—তার কথা আর তুলো না। সব ন্যাড়া, সব ফাঁকা। তবু তারই মধ্যে প্রাণপণে শুধু ওড়ো আর ওড়ো—সময়ের নিয়মে বাঁধা, পথের সীমানায় বাঁধা, তবু শুধু বেড় দিয়ে ঘুরে যাও আর ঘুরে যাও। তোমাদের দেশ দেখে যাবার পর ওসব কোনদিন আমার আর ভালো লাগবে না, জানো!

এইসব শুনে খুব খুশির সঙ্গে আমি যখন আমার বাড়ির দিকে ফিরতে যাব, তখনই আমাদের দুজনের চোখই আবার নদীর দিকে পড়ে গেছে। তারা বলে উঠল—ওরা সব কারা ওখানে এসে গেছে দ্যাখো, ওদের সঙ্গে ওটা আবার কী?

দেখলাম জেলেরা নৌকাগুলোকে এত-ক্ষণে পাড়ের কাছে এনে বেঁধে রেখেছে, একটা লরিও এসেছে ওখানে অনেক বরফ নিয়ে, আর নৌকা থেকে মাছগুলো তুলে এনে ঝোড়ায় ভরে ভরে বরফ চাপা দিয়ে লরিটার ওপর তোলা হচ্ছে, জেলেরা সবাই মিলে জলের ধারে উবু হয়ে বসে কী জানি সব কথা বলছে, আর শীতের মধ্যে কাঁপছে। ওদের পরণে তখনও শুধু সেই জলে-ভেজা গামছা। তারপর মাছগুলো সবই যখন লরির মধ্যে উঠে গেল, ওরা একটা কল্কেয় আগুন ধরিয়ে মুখে মুখে ফিরিয়ে ফিরিয়ে ধোঁয়া টানতে লাগল। আর ব্যাপারীরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করছে, সামনে বিয়ের মরশুমে অনেক লাভ হবে। কয়েকদিন কেবল মাছগুলো ঠাণ্ডা ঘরে রেখে দিতে হবে।

—ব্যাপার কী হে? ওরা সবাই কি বলছে? মাছগুলোও তো সবই দেখলাম লরির ওপর চলে গেল, তুমি যে বললে, ওইসব মাছ রেঁধে ওদের বউরা ওদের খুব করে খাওয়াবে?

—আমিও তো তাই ভাবছি, দেখছি সব মাছই তো ব্যাপারীদের দিয়ে ওরা ঠাণ্ডায় বসে কাঁপছে, তবে এ তো আর আমাদের ব্যাপার নয়! আমাদের কিছু হাতও নেই এতে, চলো এবারে বরং শহরেই ফেরা যাক।

মুখটা ভারি করে ও চলতে লাগল, ওর মুখের আলোটাই যেন অনেক কমে গেছে, বেশি আর কথাও বলছে না, আমারও বেশি কথা বলবার ইচ্ছে নেই।

শহরের মধ্যে ফিরে এলাম আমরা দুজনেই। আবার সেই মাঠের পাশে গুমটির মতো ঘরটা চোখে পড়ল। ওখানে এখন এ কী ব্যাপার—আরে! পাশেই যে রাস্তাটা তার গায়ে একটা চওড়া ফুটপাথ—তার ওপর একটা মজাদার-মশলাদার পানের দোকান। সেটার ভেতর থেকে এক-জন লোক বেরিয়ে আসছিল—বেশ গোল-গাল পুষ্টির দেহ, ইয়া গোঁফ, সঙ্গে কয়েকবস্তা চাল। সে এগিয়ে এসে ওই ঘরটার দিকে চলে এল, সেই যেখানটার একটি নারী, একটি শিশু ও একজন পুরুষের এক ত্রয়ীকে দেখা আমাদের খুব ভাল লেগেছিল, সেখানে এসে লোকটা ফিসফিস করে কি বলল পুরুষ ও নারীর সঙ্গে। তারপর মাঠটার বিশাল অন্ধ-কারের মধ্যে চলে গেল। তারা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—এবারে! এটা কী হলো বলো? প্রেম-ভালবাসা-স্নেহ কী সব জানি বলছিলে তখন? তোমাদের শহরে কি সেসব—

—চলো, চলো এখান থেকে। আমি ওর কথার মধ্যেই বলে উঠলাম—এসব দেখাতে

সদ্য প্রকাশিত হইল!

বহুকাল পরে পুনর্মুদ্রণ

সায়ন মাধবাচার্য্য বা বিদ্যারণ্য মুনি বিরচিত

বেদান্ত-গ্রন্থ

বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহঃ

বেদান্ত শাস্ত্রের একখানি অতীব দুরূহ ও উপাদেয় গ্রন্থ

অনুবাদক

পণ্ডিতপ্রবর প্রমথনাথ তর্কভূষণ

মূল্য চার টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা ১২

তো তোমাকে আমি আনি নি; চলো এবার বাড়ির দিকে যাই।

ওর মুখ এখন বেশ অন্ধকার। আর কোন কথা ওর মুখে নেই। দুজনেই আমরা বাড়ির দিকে চলেছি। পথের মধ্যে একটা লোক লাঠি ঠক্‌ঠক্‌ করতে করতে চলছিল, আর মাঝে মাঝে গলা তুলে খুব গান করছিল—ওকে দেখে আবার মুখে আবার একটু আলো। বলল—ওই লোকটা এখানে কী করছে জানো? মনে হচ্ছে, যেন ভালই একটা কিছু করছে ও।

—হ্যাঁ, ও লোকটা পাহারা-অলা। মনে হচ্ছে, এখন ওর মনটা বেশ ভাল, একা একা রাস্তায় চলতে চলতে ওর ভগবানের কথা মনে পড়ে গেছে; তাই তাঁর নাম করেই গান গাইছে ও।

তখনই রাস্তা দিয়ে খুব উঁচু করে মাল-বোঝাই একটা লরি পথ দিয়ে আসছিল; ওকে দেখেই সেটা থেমে পড়ল আর তার থেকে একজন লোক ওর হাতে কি যেন একটা গুঁজে দিয়ে আবার চলতে লাগল। পাহারা-অলা সেটাকে পকেটের মধ্যে রেখে দিল। ও দেখে বলল—এই এটা এখন কী হলো বলতো? পকেটে ওটা কী রাখল? আমার যেন ব্যাপারটা কেমন ভাল ঠেকছে না।

—আমারও না, তবে মনে হচ্ছে এটা বোধহয় একটা ওভারলোডিং কেস্‌। চলো, এখন এখান থেকে যাই, বাড়ি ফেরবারও সময় হয়ে গেছে, তুমি বরং অন্য একদিন এসো, সেদিন তোমাকে অনেক কিছু ভালো জিনিস দেখাবো। দ্যাখো, সবই তো আর একরকম হয় না। কোথাও হয় না, জানো।

ও আর কিছুই বলল না। মুখ অন্ধকার করে আমার সঙ্গে চলেছে, চলতে চলতে আমরা আবার সেই বালির ঢিবিটার কাছে এসে গেছি, সেই কুকুরটা তখনও সেই বালির ওপর আরামের মধ্যে ঘুমিয়ে। পাশেই একটা বাড়ির বারান্দা থেকে একজন লোক তখন রাস্তার মধ্যে এসেছে—বোধহয়, কিছু কৃত্য করতেই। দেখলাম সে কুকুরটাকে ওখানে দেখতে পেল; আর তখনই রাস্তায় ঝুঁকে পড়ে খুব ব্যস্ত-ভাবেই কি-যেন খুঁজতে লাগল; তারপর হাতে কি-একটা তুলে নিয়ে ওটার দিকে সজোরে ছুঁড়ে দিল। আর তখনই ওটার সে কি চীৎকার! এতক্ষণে ও আবার মুখ খুলল—

—চীৎকারটা শুনলে তো?

ও কোনো বড়ো প্রশ্ন করে নি, তাই পশুক্লেশ-নিবারণীর ব্যবস্থাটা ওকে জানাবার আমি কোন সুযোগই পেলাম না। মনের মধ্যেও কোন জোর নেই আমার। তাই শুধু বললাম—যাক্‌, যেতে দাও ভাই। সবই কি তোমার-আমার পছন্দসই হয়? সবাই কি আমাদের কথা শুনে চলবে নাকি কোনদিন?

ওর মুখে আর যেন একটুও আলো নেই, ওকে আর প্রায় দেখতেও পাচ্ছি না, অন্ধকারের মধ্যে থেকে ওর শব্দ এল—আমার তো যাবার সময় হলো, এবারে এখন আমি আসি আজ, কি বলো! তোমাকে আনালা পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়াও বোধহয় আর হলো না।

—ঠিক আছে, বাড়ি তো প্রায় পৌঁছেই গেছি; আমি একাই ফিরব না-হয়, কিন্তু তুমি আবার কবে আসছ বলো। আর এক দিন ঠিক আসবে কিন্তু, কেমন!

—না, আমার আর আসা হয়ে উঠবে না। আমাদের দেশ ন্যাড়া এবং ফাঁকা, তবু সেখানেই বরং জোর-জোর ঘূর্ণিতে চরকীপাক খাব আমি, রোজ রোজ একই জায়গায় বাঁধা, একই নিয়মের মধ্যে, তবু তোমাদের দেশে আর কোনদিন নয়।

ওকে আমি কি-ই বা আর বলতে পারি, আর শুনবেই বা কেন ও—যেখানে যার পছন্দ। তাই শুধু বললাম—বেশ, তাই না-হয় হবে, কিন্তু যাবার আগে এসো একবার হাতটা মিলিয়ে যাও। দাও, তোমার হাতটা বাড়িয়ে দাও তো!

—থাক, তাও বরং থাক, শেষে আবার হয়তো হাত ধুতে হবে, কি জানি তোমার হাতেও যে ময়লা নেই তারই বা ঠিক কী।

বেকার সমস্যার সমাধান ?

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে !!

বাঙলা দেশে বেকার সংখ্যা নাকি আনুমানিক এক কোটি। এই ভয়াবহ বেকার সমস্যার সমাধানে ক্ষুদ্র মূলধনের ব্যবসা হিসাবে মুর্গী উৎপাদন বা পোলট্রি ফার্মিং অধুনা অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায় রূপান্তরিত হয়েছে—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে। বেকার ব্যক্তিদের পোলট্রি ফার্মিং ব্যবসা পরিচালনার বিশদ নির্দেশলাভের সুবিধার জন্য বসুমতী থেকে আত্মপ্রকাশ করলো।

রয়েজ পেডিগ্রী পোলট্রি ফার্মের অধিকর্তা
শ্রীসমরেন্দ্রনাথ রায়
জি, পি (আমেরিকা), এফ, এস, পি, আই, পি, এইচ (লণ্ডন)
লিখিত সচিত্র

আধুনিক পোলট্রি ফার্মিং

মূল্য মাত্র চার টাকা। ডাকমাশুল এক টাকা।
অবিলম্বে অর্ডার পেশ করুন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ ॥ কলিকাতা-১২

শিল্প • বাণিজ্য • অর্থনীতি

তামা-দস্তা-সীসা-টিনের সমস্যা

লৌহেতর ধাতু (ননফেরাস মেটাল) ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের অপরিহার্য কাঁচা মাল। তামা, দস্তা, সীসা, টিন এবং নিকেল জাতীয় লৌহেতর ধাতুর পর্যাপ্ত সরবরাহ ছাড়া সূক্ষ্ম এবং জটিল ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য উৎপাদন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের ক্রমবর্ধমান ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প যে হঠাৎ ঘায়েল হয়ে পড়েছে, তার প্রধান কারণ লৌহেতর ধাতুর নিদারুণ সঙ্কট।

সম্প্রতি লৌহেতর ধাতু উৎপাদন সংঘের (ইণ্ডিয়ান ননফেরাস মেটাল ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন) সভাপতি মিঃ জি-বিনানী সংঘের বার্ষিক সভায় বলেছেন যে, সম্প্রতি লৌহেতর ধাতুর অভাবে দেশে এলয় (মিশ্র ধাতু) এবং 'সেমি' উৎপাদন দস্তুরমত কঠিন হয়ে পড়েছে। যদি অবিলম্বে এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা না হয়, তাহলে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির উপর তার তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রতিফলিত হবে এবং বেকার সমস্যা জটিলতর হয়ে উঠবে। বিনানী বলেছেন যে, একমাত্র এলুমিনিয়াম ছাড়া আর প্রায় সমস্ত লৌহেতর ধাতুর জন্যই আমরা সুদীর্ঘকাল পরনির্ভরশীল হয়ে আছি। দেশের অভ্যন্তরে লৌহেতর ধাতুর অনুসন্ধান ত্বরান্বিত না হলে আমরা আরও বহুকাল পরনির্ভরশীল হয়ে থাকতে বাধ্য।

কয়েক সপ্তাহ আগে ইস্পাত ও ভারী ইঞ্জিনিয়ারিং মন্ত্রী শ্রীপুনাচা কলকাতায় এসেছিলেন। তখন ইণ্ডিয়ান ইঞ্জিনিয়ারিং এসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট শ্রী এ কে বসাক তাঁকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন যে, দেশে খনিজ সম্পদ আহরণের জন্য যথেষ্ট তৎপরতা সৃষ্টি না হলে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের অগ্রগতির পথ ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে পড়বে।

সম্প্রতি জিঙ্ক অক্সাইড উৎপাদন সংঘের সভাপতি শ্রী এ আর বাজারিয়া বলেছেন যে, জিঙ্কের (দস্তা) অপ্রতুলতায় তাঁদের কারবারের অবস্থা বেশ সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠেছে। চতুর্থ পরিকল্পনায় জিঙ্ক অক্সাইডের চাহিদা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। কিন্তু গভর্নমেণ্ট যদি চালু শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোয় প্রচুর পরিমাণ দস্তা সরবরাহ করতে না পারেন, তাহলে কারখানাগুলো চালু রাখাই মুস্কিল হয়ে পড়বে। ভারত প্রচুর জিঙ্ক অক্সাইড বিদেশে রপ্তানী করে থাকে এবং তাতে আমাদের যথেষ্ট বৈদেশিক মুদ্রা আমদানী হয়। সুতরাং কাঁচা মালের অভাবে এই শিল্প সঙ্কুচিত হলে আমরা দস্তুরমত লোকসানে পড়ে যাব।

সত্যি কথা বলতে কি, ভারতে চাহিদার তুলনায় লৌহেতর ধাতুর উৎপাদন একেবারেই অপ্রতুল। ১৯৬৭-৬৮ সালেই ভারত ৮৭ কোটি টাকার লৌহেতর ধাতু আমদানী করে দেশের সর্বনিম্ন চাহিদা পূরণ করেছে। এলুমিনিয়াম উৎপাদনে ভারত স্বনির্ভর হতে চলেছে ঠিকই, তবে তামা, দস্তা, সীসা এবং এণ্টিমনির জন্য আমরা প্রায় পুরোপুরিই আমদানীর উপর নির্ভরশীল। দেশের অভ্যন্তরে লৌহেতর ধাতু অনুসন্ধানের কাজ এত মন্থর গতিতে অগ্রসর হচ্ছে যে, এভাবে এগোলে আগামী ৫।৬ বছরের মধ্যে আমাদের লৌহেতর ধাতু আমদানীর পরিমাণ ৪।৫ শত কোটি টাকায় পৌঁছে যেতে পারে বলে অনেকে আশঙ্কা করছেন।

লৌহেতর ধাতুর মধ্যে এলুমিনিয়াম উৎপাদনের ক্ষেত্রে ভারত কিছুটা সাফল্য অর্জন করেছে ঠিকই, কিন্তু এখনও স্বনির্ভর হতে পারে নি। ১৯৬৭-৬৮ সালেও ভারত বিদেশ থেকে ৩৮ হাজার টন এলুমিনিয়াম আমদানী করেছে। এ দেশের মাটিতে এত বক্সাইট জমা আছে যে, আগামী শতাধিক বছর ধরে বার্ষিক ৫ লক্ষ টন করে এলুমিনিয়াম উৎপন্ন হলেও সেই বক্সাইট শেষ করা যাবে না। তামা, দস্তা এবং সীসার ক্রমবর্ধমান চাহিদা এলুমিনিয়ামের দ্বারা কিছুটা পূরণ হতে পারে। আজকাল বহু বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম তামার পরিবর্তে এলুমিনিয়াম দিয়েই তৈরি হচ্ছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এলুমিনিয়াম উৎপাদন বৃদ্ধির দিকে সরকার এবং শিল্পপতিরা বেশি করে নজর দিচ্ছেন না কেন, তা আমাদের বোধগম্য নয়। ১৯৭২-৭৩ সালে আমাদের এলুমিনিয়াম উৎপাদনের লক্ষ্য ধরা হয়েছে সাড়ে ৪ লক্ষ টন। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তৎপর হলে সেই লক্ষ্য পূরণ করা কঠিন হবে বলে মনে হয় না।

আগামী চার বছরে তামার চাহিদা ১ লক্ষ ২৪ হাজার টনে পৌঁছবে বলে অনুমান করা হচ্ছে। কিন্তু তামা উৎপাদনে আমরা এত পেছিয়ে আছি যে, এই ধাতুর প্রায় চোদ্দ আনাই বিদেশ থেকে আমদানী করতে হয়। বর্তমানে দেশে মাত্র ৭।৮ হাজার টন তামা উৎপন্ন হয় এবং সেটা উৎপাদন করেন ঘাটশীলার ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন। এঁরা ১৯৭০ সালের মধ্যে উৎপাদন সাড়ে ১৬ হাজার টনে তুলতে পারবেন বলে আশা করছেন। ভারত সরকার তামার উৎপাদন বাড়াবার জন্য ৮।১০ বছর আগে সরকারী তত্ত্বাবধানে হিন্দুস্থান কপার লিমিটেড নামে একটি কোম্পানী গঠন করেন। রাজস্থানের ক্ষেত্রীতে অবস্থিত এই প্রকল্পের ব্যয় ধার্য হয় ৮০ কোটি টাকা। ক্ষেত্রীর তাম্র খনির মালিক আগে ছিলেন বিড়লারা। গভর্নমেণ্ট তাঁদের ক্ষতিপূরণ দিয়ে এই খনির মালিকানা গ্রহণ করেন। কিন্তু কার্যকালে দেখা যায় ক্ষেত্রীর তামা অত্যন্ত নিম্নস্তরের। তাছাড়া আমলাতান্ত্রিক অবহেলা এবং অকর্মণ্যতার ফলে গত কয়েক বছরে এই প্রকল্পে যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় হয়েছে, সেই তুলনায় কাজের কাজ বিশেষ কিছু হয় নি। সম্প্রতি এঁরা বিহারের রাখায় অবস্থিত তাম্র খনি চালু করবার জন্য ৬ কোটি টাকার একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী স্থির হয়েছে যে, রাখায় দৈনিক ৫০০ টন করে আকরিক তাম্র খনি থেকে আহরণ করা হবে। যে-কোন তামা গালাই কারখানার পক্ষে দৈনিক ৫০০ টন আকরিক তাম্র নিতান্তই অপ্রতুল। তাই স্থির হয়েছে যে, এই ৫০০ টন আকরিক তাম্র গালাইয়ের জন্য ঘাটশীলায় ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশনের কারখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হবে এবং তাঁরা এর থেকে বিশুদ্ধ তামা উৎপাদন করবেন। এতে হাজার টন তামা উৎপন্ন হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে রাখার আকরিক তাম্র থেকে বার্ষিক ২০ হাজার টন তামা উৎপাদনের একটি কার্যক্রমে হাত দেওয়া হবে।

ক্ষেত্রীতে আকরিক তাম্র আহরণ থেকে বিশুদ্ধ তামা উৎপাদনের সব রকম ব্যবস্থাই চালু করা হচ্ছে। ১৯৭২ সালে এই বহুমুখী প্রকল্পের কাজ চালু হবে বলে আশা করা যায়। বর্তমানে ক্ষেত্রীর খনির উপরের স্তর থেকে দৈনিক ২ হাজার টন করে আকরিক তাম্র আহরণ করা হচ্ছে। কারখানা চালু হয়ে গেলে সেখানে বার্ষিক ৩১ হাজার টন তামা উৎপন্ন হবে বলে আশা করা যায়।

ক্ষেত্রী এবং রাখা ছাড়া আর তাম্র খনির সন্ধান পাওয়া গেছে অন্ধ্র প্রদেশের অগ্নিকুণ্ডলায়। একটি মার্কিন কোম্পানীর সহযোগিতায় এই খনিতে কাজ সুরু করার ব্যবস্থা হয়েছিল, কিন্তু

মার্কিন কোম্পানী পরে সরে দাঁড়ায়। হিন্দুস্থান কপার সেখানে তামা উৎপাদনের জন্য ৫ কোটি টাকার একটা পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। প্রথম পর্যায়ে সেখানে শুধু সীসা আহরণ করা হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে গভীর খননের দ্বারা আকরিক তাম্র আহরণ করা হবে।

যা দেখা যাচ্ছে, তাতে ক্ষেত্রী এবং ইণ্ডিয়ান কপার কর্পোরেশন মিলে চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে ৪৭ হাজার টন তামা উৎপাদন করতে পারে। কাজেই তামার জন্য আমরা যে কি সাংঘাতিকভাবে পরনির্ভরশীল হয়ে থাকব তা সহজেই অনুমেয়। ভারত সরকারের ভূতত্ত্ব বিভাগ আরও যে সব জায়গায় তাম্র খনি সন্ধানের সুপারিশ করেছেন, তার মধ্যে আছে বিহারের রোয়াম সিদ্ধেশ্বর (বিহার) আকওয়ালি এবং বাসোনি (রাজস্থান) এবং নালাকোণ্ডা ও ইরুরাম (অন্ধ্রপ্রদেশ)।

ভারতে দস্তা আর সীসার খনি খুবই কম। কাজেই নতুন খনি আবিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত আমদানীর দ্বারা চাহিদা পূরণ করা ছাড়া আমাদের গত্যন্তর নেই।

লোহেতর ধাতুর ঘরোয়া সরবরাহ যখন এই রকম সঙ্কটজনক, তখন আমদানীকৃত ধাতুর সুষম বণ্টন অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু ভারত সরকার সেখানে নানা রকম প্যাঁচ কষে বাংলার ধাতুভিত্তিক শিল্পগুলোকে বেশ কাবু করে ফেলেছেন। লোহেতর ধাতু বরাদ্দ করার ভার কেন্দ্রীয় সরকারের। তাঁরা প্রতি কল-কারখানার চাহিদার ভিত্তিতে এই পণ্য বরাদ্দ না করে নিজেদের খেয়ালখুশি মত বরাদ্দ করে থাকেন। সকল রাজ্যের মধ্যে সমতা বিধানের মতলববাজী ধুয়ো তুলে, তাঁরা নাকি প্রত্যেক রাজ্যের লোকসংখ্যার ভিত্তিতে লোহেতর ধাতুর বরাদ্দ স্থির করে দেন। সকলেই জানেন, ভারতবর্ষের এক-একটি রাজ্যে এক-এক প্রকার শিল্পের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশ ধাতুভিত্তিক শিল্পে অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে অনেক বেশি এগিয়ে আছে। সুতরাং এই রাজ্যে লোহেতর ধাতুর চাহিদা যে অন্যান্য রাজ্যের চেয়ে বহুগুণ বেশি হবে, সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু চাহিদার ভিত্তিতে কাঁচা মাল সরবরাহ না করে লোকসংখ্যার ভিত্তিতে সরবরাহ করা হলে বাংলাদেশ কিছুতেই তার ন্যায্য পাওনা পেতে পারে না এবং পাচ্ছেও না। কিন্তু যে সব রাজ্যে ধাতুভিত্তিক শিল্পের অস্তিত্ব নেই তারা যথেষ্ট পরিমাণ লোহেতর ধাতুর বরাদ্দ পেয়ে যাচ্ছে। সেই সব রাজ্যের প্রাপকরা প্রায় সকলেই কলকাতায় অফিস খুলে বসেছে এবং বরাদ্দের মাল পাওয়া মাত্র সেটা চোরা বাজারে বিক্রি করছে। কলকাতার চোরাবাজারে ছেড়ে দিচ্ছে। কলকাতার কল-কারখানাগুলো স্রেফ নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখবার জন্য চোরাবাজার থেকে চড়া দামে সেই মাল কিনতে বাধ্য হচ্ছে এবং তাদের উৎপন্ন মালের মূল্য কাঠামো এত স্ফীত হয়ে উঠছে যে, প্রতিযোগিতায় তারা হটে আসতে বাধ্য হচ্ছে। বিশেষ করে রাজ্যের ক্ষুদ্র শিল্পগুলো লোহেতর ধাতুর অভাবে একেবারে লাটে ওঠবার অবস্থায় পৌঁছে যাচ্ছে। লোহেতর ধাতুর উপযুক্ত বরাদ্দ না পেলে বাংলাদেশের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পের ভবিষ্যৎ যে খুব অন্ধকারাচ্ছন্ন, সে কথা বলাই বাহুল্য। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার যদি অবিলম্বে এ ব্যাপারে এই রাজ্যের ন্যায্য পাওনা আদায় না করতে পারেন, তাহলে নিদারুণ বেকার সমস্যার হাত থেকে অব্যাহতি লাভ করা তাঁদের পক্ষে দস্তুরমত কঠিন হয়ে পড়বে।

—শ্রীসওদাগর

বর্তমান বঙ্গসাহিত্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় লেখিকা

আশাপূর্ণা দেবীর

গ্রন্থাবলী

আবার একখণ্ড প্রকাশিত হয়েছে!

তিনখানি সম্পূর্ণ উপন্যাস। সাতটি বড় গল্প

১। বলয়গ্রাস ২। প্রেম ও প্রয়োজন

৩। দুর্নিবার ৪। এক গুচ্ছ গল্প

মূল্য মাত্র সাড়ে ছয় টাকা

আগেই বেরিয়েছে আর এক খণ্ড

গ্র ন্থা ব লী

১। জহুরী ২। অনির্বাণ

৩। সোনালী দিনের মন

৪। এক গুচ্ছ গল্প

মূল্য মাত্র পাঁচ টাকা

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ
কলিকাতা-১২

সম্পাদনা : দেবব্রত মুখোপাধ্যায়

"জাতের নামে বজ্জাতি"

সম্প্রতি কলকাতার আকাদেমী অফ্ ফাইন আর্টস-এর প্রদর্শনকক্ষে কেন্দ্রীয় ললিতকলা আকাদেমী, পশ্চিমবঙ্গ সঙ্গীত, নাটক ও ললিতকলা আকাদেমী এবং আকাদেমী অফ্ ফাইন আর্টস-এর যুগ্ম প্রচেষ্টায় "জাতীয়" কলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হলো। তৈলচিত্র, ভাস্কর্য, ও রেখচিত্র-এর নামে কয়েকটি বিজাতীয় আমদানী করা মাল এদিক-ওদিক সাজিয়ে রেখে এই "জাতীয়" কলা প্রদর্শনীর আয়োজন।

কথায় আছে ভাগের মা গঙ্গা পায় না, জাতীয়-বিজাতীয় এই তিন সংগঠনের আয়োজিত এ প্রদর্শনীটিতেও সেই অবস্থা ঘটেছে। কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান মাল পাচার করেই খালাস। পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গীত নাটক আকাদেমী ঘরে ছবি পৌঁছে দিয়েই নিশ্চিন্ত। আর আকাদেমী অফ্ ফাইন আর্টস কোনক্রমে মাল কটিকে এদিক-ওদিক ছড়িয়ে দিয়ে হাত গুটিয়ে বসেছিলেন। এই "জাতীয়" নাম চিহ্নিত প্রদর্শনীটি দেখে এ কথাই মনে হয় যে, আয়োজকদের প্রদর্শনবস্তু নির্বাচনের কোন দায়-দায়িত্ব ছিল না। জাতীয়তার কথা তো স্বতন্ত্র? কলকাতার প্রতিষ্ঠান দুটিও এ প্রদর্শনীর প্রচার, আমন্ত্রণ-নিমন্ত্রণ এমন কি প্রয়োজনানুগ সংখ্যায় চিত্রতালিকা মুদ্রণের আবশ্যকতা বোধ করেন নি? সম্ভবত কেন্দ্র বিতরিত অর্থটির প্রতিই তাদের প্রখর নজর ছিল।

তাই জাতীয় এ প্রদর্শনীর সংবাদ লোকমুখে শুনে রবাহূত হয়ে প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিলাম নিছক "জাতীয" কলা বিকাশের মান নির্ণয়ের আকাঙ্ক্ষায়। প্রথম পদক্ষেপেই একেবারে মোহমুক্ত অবস্থা—পরমজ্ঞানের তথা আদিমজ্ঞানের অসীম সমুদ্রের অথৈ জলে হাবুডুবু, তা না হলে এমন হয়—মোটা মোটা দামী দামী বড় বড় কাপড়ের টুকরোয় তেলরঙ, রাসায়নিক রঙ, জানলা-দরজার রঙ ফেরাবার জন্য ব্যবহৃত রঙের ছোপছাপ প্লাস্টার, পশু-লোহ, ইস্পাত, লোহা, টিনের টুকরো-টাকরা, কিম্ভূত খোদকারী রেখাচিত্রের থেকে অপরূপ ছাপছোপ তোলা কাগজের টুকুরো-টাকরা, চতুর্দিকে টাঙিয়ে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখায় এক আজবখানা হয়ে উঠেছিল এই বিচিত্র "জাতীয়" কলাজগৎটি।

"জাতীয়" এ কলা প্রদর্শনীটি যে জাতীয় প্রতিনিধিত্ব করছে তাদের তো দেখছি তুরীয় অবস্থা। ঘুমন্ত শিব, দেবীমা, বাইকুম্ভার ছেলে, নারী ও দেশ, যাত্রী. বড়ে গোলাম আলী খাঁ, জানলা, স্মৃতিস্তম্ভ, সূর্যগ্রহণ, শেষকথা এমন বহু বিভিন্ন শিরোনামায় বিভিন্ন বিষয়-বস্তু ভুয়োদর্শী কলাকারদের কদলী-চর্চার আকারে-প্রকারে, করণ-প্রকরণে মিলে মিশে একাকার, টীকা ভেদ ঘটলেও প্রকার ভেদ ঘটে নি। কলা-ক্ষেত্রের দিগদর্শনে এমন একদর্শিতা জঙ্গী নিয়মানুবর্তিতাতেই লভ্য। আমাদের এই ছত্রিশ জাতের দেশে ভাষা, ধর্ম, সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতায় বিপর্যস্ত ভারতে হঠাৎ এই কলাজগতে এমন জঙ্গী নিয়মানুবর্তিতা জাত একত্রীকরণের প্রসার ও প্রচার দেখে এমন অসম্ভব সম্ভবকারী সেই নেপথ্যচারী জং বাহাদুরটির সার্থক উপস্থিতি অনুভব করলাম। তুমিই ধন্য ধন্য হে, বিট-মড-হিপি থেকে এক্সট্রো, ইনট্রো, অপ-পপ, এ্যাংরি-হ্যাংরি, এক্সিস্টেন সিয়ালী এমন কত রূপে তুমি দেশে দেশে নন্দিত রন্দিত। বহুরূপী সম্মুখে তোমার......?

এই সব বিজাতীয় "মাল" প্রস্তুতের কারিগরদের মধ্যে দু-চারটি বাংলাঘেঁষা নামের সন্ধান পাওয়া যায় তালিকা খুঁজলে। তবে তার বেশি খুঁজতে গেলে আবার এই অলাতচক্রের চক্রব্যূহে অকারণ চক্র খেতে হবে। তবু একটা বিরাট নামের প্রেরণায় আকৃষ্ট হয়ে—"বড়ে গোলাম আলী খাঁ"-কে খুঁজতে লাগলাম, এঘর-সেঘর তিন ঘরেরই আনাচ-কানাচ, (আমার এই অতিপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পীর সঙ্গে কয়েকবার চাক্ষুষ পরিচয় ঘটেছিল স্বভাবতই সহজেই খুঁজে পাবার কামনায়) বহু ঘোরাঘুরির পর বুঝলাম—সহজ করে যায়-না চেনা সহজে। আমায় ঘোরাফেরা করতে দেখে সংগঠকদের একজন এগিয়ে এসে চিনিয়ে দিলেন আমার অতি-পরিচিত সেই মহাশিল্পীকে। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা। খাঁসাহেবের ঘরোয়ানার রাগ ছিল মালকোষ, খাঁসাহেবের ঘনিষ্ঠ সঙ্গীত-রসিকদের কাছেই এমন কথা শুনেছি। খাঁসাহেবের ছবি দেখেই বুঝলাম এ ছবির কারিগর যে সংবাদ রাখেন, তবে ছবিটির শিরোনামায় একটি ছোট্ট ভুল থাকায় দর্শকদের কিছুটা অসুবিধা হয়েছে। খাঁসাহেবের নামের পরে বন্ধনীর মধ্যে (ক্রমশ) থাকলেই একেবারে ত্রুটিহীন হতো। দর্শনীয় এ ছবিটি নিশ্চয়ই প্রথম পর্যায়, সেটি ছবি দেখেই নির্ভুলভাবে বুঝলাম। স্বরমন্ডলের আভাষটুকুই কিছুটা ব্যাহত করেছে এমন "পয়মাল" সৃষ্টিকে। কারণ এটি একটি নিছক মাল। ভবিষ্যতে হয়তো কোনদিন আমরা সেই কোষ-মুক্ত পরবর্তী ছবিটি দেখতে পাবো এই ভরসায় আছি।

এমন একটি ছবির ব্যাখ্যাতেই এ-প্রদর্শনীর কলা আলোচনা ধারণা করা সম্ভব হবে। কারণ জঙ্গী নিয়মানুবর্তিতায় এ "জাতীয়" প্রদর্শনীটির প্রতিটি প্রয়াস একীকৃত, তাই এখন প্রদর্শনবস্তুর আলোচনা ছেড়ে প্রসঙ্গান্তরেই যাই।

সংগঠকদের সঙ্গে আলোচনায় জানলাম কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানটি এবং পশ্চিমবঙ্গ আকাদেমী এ প্রদর্শনীর জন্য সমান অংশে অর্থের দায়িত্ব নিয়েছেন। আকাদেমী অফ্ ফাইন আর্টস সুলভ মূল্যে এ প্রদর্শনীর জন্য ঘর ভাড়া দিলেও, মোট অর্থ ব্যয়ের প্রায় অর্ধেকটাই তাঁরা ঘর ভাড়া বাবদ পাচ্ছেন। স্বভাবতই পশ্চিমবঙ্গ আকাদেমী কড়াকড়ি হিসাবের মধ্যে থাকবার চেষ্টা করছেন, না হলে লাভের গুড় প্রায় সবই পিঁপড়ে খেয়ে যায়। দরিদ্র ভারতের দরিদ্রতম প্রদেশ বাংলা ২১ বছরের স্বাধীনতার আস্বাদন ভারতের এক বিশেষ শ্রেণী ও শাসকগোষ্ঠী ছাড়া আর কোন ভারতবাসীর ভাগ্যে জোটে নি, বহু সংগ্রাম ও রক্তপাতের পর আজ বাংলা আংশিকভাবে সেই রাহুমুক্ত। তবু আমলাতন্ত্রের কণ্টকজাল কাটিয়ে যুক্তফ্রন্ট আজও জনগণের কাম্য ক্ষমতায় যথাযথ প্রতিষ্ঠিত নয়। আমলাতন্ত্র আজও তার কর্ম তথা ভাগ্য নিয়ন্ত, না হলে কেন্দ্রের এই বিলাসবহুল বিজাতীয় "জাতীয়" কলা-কলা খেলায় অকারণ অর্থ অপচয়ের সঙ্গী হলেন কেন বাংলা সরকার? শিক্ষামন্ত্রী কি জানেন না যে, আজও দেশের শতকরা ৬০ ভাগ নিরক্ষর? দেশবাসীর কথা ছেড়ে দিয়ে শুধু প্রাথমিক শিক্ষকদের কথা ভাবলেও এমন অর্থ অপচয়ের কথা কল্পনা করতেও তাঁর বুক কাঁপতো। দেশের জনগণ, চিত্রকর, কলারসিক ও করদাতাদের পক্ষ থেকে এ প্রশ্ন আজ উঠেছে যে—বিজাতীয় এমন "জাতীয়" কলা ক্রীড়ায় একটি জনপ্রিয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের অংশ গ্রহণ করা উচিত কি না? এবং যদি এমন অংশ গ্রহণ করতে হয়, তাহলে এমন সরকারের পক্ষ থেকে সর্বাগ্রে বিষয় বিশেষে বিশেষজ্ঞদের অনুমোদন সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা আছে কি না? শিক্ষামন্ত্রকের আগামী কর্মসূচীর দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য জনপ্রিয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রককে অনুরোধ করছে তার নির্বাচকমণ্ডলী—জনগণ।

নবাঙ্কুর

বিয়ের বাজারে গানজানা মেয়ের কদর আছে বলেই পাড়ায় পাড়ায় গানের মাস্টারদের রোজগার ছিল ভাল। যুগভেদে রুচিভেদ ঘটায়, বিশেষ করে প্রতিযোগিতা তীব্র হতেই গানের সঙ্গে নৃত্য-পটীয়সী বলে পরিচয় দেবার রেওয়াজ চালু হলো দেশে। স্বভাবতই পাড়ায় পাড়ায় প্রচলন হলো নাচ-গানের ইস্কুলের।

কলাবন্ত কলাকারদের কথা ছেড়ে দিয়ে ছাপোষা গানের মাস্টারদের রোজগার এ ব্যবস্থায় অনেক উন্নত হলো। শিক্ষকদের মধ্যেও প্রতিযোগিতা এলো, দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো রেডিও আর্টিস্ট, গ্রামোফোন আর্টিস্ট, চুক্তিতে কেউ তিন মাসে গীটার শেখায়, কেউ বা দু' সপ্তাহে—এমন কত। ব্যবসার সাফল্য দেখে বাজারে নামলেন বড় বড় ইস্কুলের কর্তৃপক্ষ। ছুটির দিনে সকাল-সন্ধ্যে ইস্কুলবাড়ির দু'-একখানা ঘরে এমন ক্লাস খুলে উপরি দু'পয়সা রোজগার শুরু করলেন পাড়ায় পাড়ায় হাই ইস্কুলের কর্তৃপক্ষবৃন্দ।

ঋতুভেদে রুচিভেদ ঘটেছে আবার এখন। তাই পাড়ায় পাড়ায় চিত্রকলা বিদ্যালয় খোলার রেওয়াজ শুরু হয়েছে বেশ কিছুদিন হলো। চন্দননগরের শিশু বিদ্যালয়টি ছাড়া দক্ষিণ কলকাতার এমন সৌখিন চিত্রকলা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান ছিল দু'-একটি। তারপর কলকাতার কলাকারবারী আকাদেমী অফ্ ফাইন আর্টস স্কেচ ক্লাবের নাম করে এক চিত্রশিক্ষায়তন খুলে বসলেন তাঁদের ঘরে। মাসে চারদিন ক্লাসের জন্য প্রতি ছাত্রের মাইনে ১০ টাকা আর মাসে চারটি ক্লাস নেবার জন্য মাস্টারটির মাইনে মাত্র ২০ টাকা হিসাবে। নিখরচায় এমন সংবাদে উন্মত্ত হয়ে অনেক বেকার শিল্পী এ নতুন পথে বাঁচবার প্রয়াসী হলেন—পাড়ায় পাড়ায় ইস্কুল খুলে। হা হতোস্মি—সময় বুঝি এখনও পরিপক্ক নয়, তাই এমন বেশির ভাগ বিদ্যালয়ই লাটে উঠেছে। শুধু আকাদেমীর মত বেনিয়া কর্ণধারদের পরিচালনাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি ছাড়া।

উত্তর কলকাতার উত্তরে সেই সাউথ সিঁথি রোডে, সেই ১৬৭/২৮/১ সাউথ সিঁথি রোড, কলকাতা—৫০-এ স্টুডিও "আলো" বলে এক ছোট্ট কলাবিদ্যালয় চালু হয়েছে অল্প কিছুদিন। এ বিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষক শ্রীসুবীর বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতার সরকারী কলাবিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠানটি তাঁদের প্রথম কলা প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন তাঁদের স্টুডিও আলোয় ঘরে।

এমন প্রতিকূল পরিবেশে কলাবিদ্যালয়ের প্রচেষ্টা সাফল্য সম্বন্ধে সন্দিহান মন নিয়ে সেদিন প্রদর্শনী দেখতে গিয়েছিলাম। ছোট্ট ছোট্ট ছেলেমেয়েদের মোট ৩৬টি (জলরঙ) ছবি, একটি ছোট্ট ঘরে সাজিয়ে এ-প্রদর্শনীর আয়োজন। এ প্রচেষ্টার অনেকগুলি অনুকরণ, অনুসরণ এবং স্বল্প ক'টি মৌলিক চিত্র ছিল। তার মধ্যে কেকা রায়চৌধুরীর "তপর্ষি" ছবিটি অনুস্থাপন ও বর্ণবিন্যাসে সুন্দর হয়ে উঠেছে। ছবিটি যদি মৌলিক না-ও হয় তবুও বিষয়বস্তু নির্বাচনের সময় কেকা নিশ্চয়ই তাঁর শিল্পমনের পরিচয় দিয়েছে। কেকার আর একটি ছবি "রেলগাড়ি" শিশুসুলভ সহজীকরণের ফলে এক দুরূহ অনুস্থাপন সমস্যার বিচিত্র সমাধান দেখতে পাওয়া যায়। তাই এই রেলগাড়ি ছবিটিতে আমরা দেখি রেলগাড়ি, পাহাড়, ঈগল, আকাশ পটভূমিতে একের পর এক সন্নিবিষ্ট।

রাহুল মুখার্জীর "নিসর্গ" চিত্রটির বিষয়বস্তুটিতে ছিল পুঞ্জীভূত মেঘের কোলে বিদ্যুতের ঝকমকি। রাহুলের আর একটি ছবি সাদাকালোয় আঁকা "প্রাগৈতিহাসিক" আদিমযুগের ডাইনোসোর, এ্যারানেসেরাস এমন কত হারিয়ে-যাওয়া প্রাণী। জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাতা থেকে প্রতিরূপগুলি সংগৃহীত হলেও চিত্রবিন্যাসে বা রেখায় জোরে ছবিটি মনোরম।

এ ছাড়া ছিল আরো চারজন ক্ষুদে শিল্পী শর্মিষ্ঠা শেঠ, বীথি ঘোষ, কৃষ্ণা দত্ত, শুভ্রা রায় প্রভৃতি। এদের ছবিগুলির মধ্যেও যথেষ্ট প্রাণশক্তি ও মৌলিকতার সন্ধান পাওয়া যায়। স্বল্প ক'দিন আগে সংগঠিত এমন একটি ছোট্ট বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র এ প্রাথমিক প্রচেষ্টা বৃহৎ এক সম্ভাবনার সন্ধান দেয়। এজন্য সংগঠক ও শিক্ষক অবশ্যই কৃতিত্বের দাবি রাখেন।

—শিলাদিত্য

বসুমতীর যাবতীয় গ্রন্থ ও গ্রন্থাবলীর
প্রাপ্তিস্থান
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ
কলিকাতা—১২
এবং
সান্যাল এণ্ড কোং
১/১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

[পূর্বানুবৃত্তি]

॥ দশ ॥

সকৌতূহলে মিছিলের পেছনে পেছনে যারা গিয়েছিল খবরটা দিলে তারাই।

"আরি বাপ্‌রে বাপ্‌রে বাপ্‌রে—লগদীগুলোর কি দাপট্ রে বাপ—একেবারে মেরে গলাধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিলে।"

সন্ধ্যের পরে ডাক্তারখানায় সবাই ভিড় করেছে। সকলের মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা। তাড়া খেয়ে সবাই ছুটে পালিয়ে এসেছে বলেই নয়—মিছিলটাও আজ সারা চর ঘুরে ঘুরে সকলের মন যেন গরম করে দিয়ে গেছে। নানা গ্রাম ঘুরেছে এ মিছিল—এতদিন আসে নি শুধু এই চরে। আজ চরে ঢুকে—তার আশ-পাশের গ্রামে ঘুরে ঘুরে এ অঞ্চলের লোকগুলোকে যেন তার উষ্ণ প্রবাহের সামিল করে নিলে। সবাই আশা করেছিল—এ মিছিলের পরিসমাপ্তি হবে চরের আশ-পাশে কোথাও। সেই বিলেতী কাপড়ের বহ্ন্যুৎসব। দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠবে। কথাটা হাটে-বাজারে ছড়িয়ে পড়বে। সবাই জানবে—চরের চাষাভুষোরাও পিছিয়ে নেই। কিন্তু তেমন কিছু হলো না। হয়ে গেল অন্যরকম।

হারু জিজ্ঞেস করল, "চৌধুরী পাড়ায় কেউ কাপড় দিল না?"

"দিবেনি কেন গো!" একজন বললে, "হেই তো সানাকত্তার ঝি দু'খানা শাড়ি দিল, মেজকত্তার বৌ একখানা দিল—আরও সব কে কে দিল। কিন্তু যেই দশ-আনি চৌধুরীর দেউড়িতে ঢুকে বাবুরা বন্দেমাতরং বন্দেমাতরং বলে চেঁচিয়ে উঠল অমনি বৈঠকখানা থেকে হাঁকড়ে উঠল ম্যানেজারবাবু।"

"তারপর?"

"তারপর আর কি—শুনলে তো লগদী-শালাদের কাণ্ড! হেই একেবারে খেদিয়ে চৌধুরী পাড়ার বার করে দিলে। একটা লগ্‌দী বোঁচকা কেড়ে দু'-চারখানা ভালো ভালো কাপড়-জামা পর্যন্ত বার করে নিল। সে একেবারে লুঠ।"

ওরা ডাক্তারখানার দাওয়ায় বসে কথা বলছিল। ওদের কথা শুনে ভেতরে সানো চৌধুরী আর জগৎ ডাক্তার নীরবে মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করলে।

ছোট মণ্ডল রাগ করে বললে, "চর থেকে মোরা কাপড় দিলম আর ওরা কেড়ে নিল।"

গুপী বলে উঠল, "এর কিন্তু শোধ লিব ছোট মণ্ডল—এই আমি বলে রাখলম!"

ছোট্ট একটু 'হুম' শব্দ করে ছোট মণ্ডল চুপ করে গেল।

হারান মণ্ডল এ অঞ্চলের হাল-চাল মানুষ-জন এখনো ভালো করে জানে না। না জানলেও ব্যাপার শুনে চটে যায়। সাগ্রহে জিজ্ঞেস করল, "ওই কি চৌধুরী বলছ—ওদের বিলাতী কাপড়ের দোকান আছে নাকি?"

তার চোখের সামনে এখনো নাচে সেই লকলকে লাল লাল শিখা—সাপের ফণার মত। তাল তাল ধোঁয়া আর পোড়া সুতোর গন্ধ। বহুদিন চুপ করে সয়ে সয়ে তারা একটা বাদ্‌লা নিয়েছিল। সর্বস্বান্ত হয়েছে তাতে—কিন্তু তার আর বদ্‌লা নেওয়া হয় নি। অবরুদ্ধ সে ক্ষোভ ওর বুকের মধ্যে এখনো যেন দাউ দাউ করে জ্বলছে। সে আর একটা আগুন। সে কেউ জানে না—ভেতর থেকে লোকটাকে পুড়িয়ে খাক্ করে দিচ্ছে।

......আগুন নেচে উঠেছে—ভিতরে... বাইরে।...

ডাক্তারখানার ভেতরে—ডাক্তারের টেবিলে শুধু একটা লণ্ঠন জ্বলছে। কয়েকটি রোগী বসে আছে—ডাক্তার দেখছে একে একে। বাইরের দাওয়া অন্ধকার। হঠাৎ সেই অন্ধকারে কয়েকটা টর্চের তীব্র ঝিলিক এসে পড়ল দূর থেকে। কারা যেন ছুটে আসছে জেলা বোর্ডের সড়ক দিয়ে।

"পুলিশ!"

দু'-একজন দাওয়া থেকে নেমে পালাবার মতলবে ছিল—ছোট মণ্ডল চাপা গলায় বলে উঠল, "খবর্দার! ঘরে ঢুকে যা—ঘরে।"

দাওয়ার লোকগুলো ডাক্তারখানার ভেতরে ঢুকে কান খাড়া করে অপেক্ষা করতে লাগল। ভারী জুতোর শব্দ এগিয়ে আসছে—ঘরের ভেতরেও ঝিলিক মেরে যাচ্ছে তীব্র টর্চের আলো। পায়ের দাপাদাপির শব্দ ডাক্তারখানার সামনে এসে

থামল। আবার এগিয়ে গেল। অস্পষ্ট মৃদু কথার শব্দ মিলিয়ে গেল। টর্চের আলো বৃথাই ঘুরতে লাগল এদিক-ওদিক।

খানিকক্ষণ ব্যর্থ সন্ধানের পর একজন সাব-ইন্সপেক্টার আর জনাকয়েক সেপাই এসে দাঁড়াল আবার ডাক্তারখানার সামনে।

কে বলল, "এই দিকে সব ছুটে এসেছে।"

"তারপর? হাওয়ায় মিলিয়ে গেল!"

সাব-ইন্সপেক্টার ঠেলে দরোজার সামনে এসে দাঁড়াল। ভেতরে ঘরভর্তি লোক। চুপচাপ। উবু হয়ে হাঁটুতে মুখ গুঁজে, কেউ থুৎনিতে হাত দিয়ে বসে আছে। সাব-ইন্সপেক্টার তার সন্দিগ্ধ দৃষ্টি চারিয়ে চারিয়ে দেখলে। কেউ তার সঙ্গে কথা বললে না—ঘুরেও একবার দেখলে না। ডাক্তার রোগী দেখছে গম্ভীর মুখে। আদুড় গা। পাথর মুখ। চওড়া কাঁধটা ধীরে শুধু অল্প ওঠা-নামা করছে নিরুদ্বিগ্ন প্রশান্ত নিশ্বাস-প্রশ্বাসে।

এমন একটা পরিবেশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সাব-ইন্সপেক্টারও যেন প্রথমটায় থতমত খেয়ে গেল। তবু মরিয়া হয়ে জিজ্ঞেস করলে, "এদিকে কেউ এসেছে? কোনো ভলান্টিয়ার বা আর কেউ?"

কেউ উত্তর দিল না।

সাব-ইন্সপেক্টার ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠল। এমন নীরব উপেক্ষায় মুখ-চোখ তার লাল হয়ে উঠল। তবু কর্তব্য বড় নির্মম। বললে, "একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই ডাক্তারবাবু!"

জগৎ ডাক্তার তার নীরব সমুদ্রের জলরাশি থেকে যেন একটু মাথা তুলে তাকাল। মুখে কথা নেই—কাঁচা-পাকা এক বোঁজলা গোঁফ ঢাকা ঠোঁট, একটু নড়ল কি না বোঝাও গেল না।

"এরা কারা?" ঘরভরা লোকের দিকে ইঙ্গিত করলে সাব-ইন্সপেক্টার।

জগৎ ডাক্তার গম্ভীর গলায় শুধু বলল, "রোগী।"

"সবাই? ঠিক বলছেন?"

সাব-ইন্সপেক্টার সন্দিগ্ধকণ্ঠে বললে, "এই কিছুক্ষণ আগে চরের চাষাভুষো কারা সব গিয়ে চড়াও হয়েছিল জমিদার বাড়িতে। থানায় রিপোর্ট করেছেন ওঁরা।"

জগৎ ডাক্তার তীব্র কটাক্ষে একবার মাত্র চেয়ে আবার রোগী দেখায় মন দিলে—আর কোনো কথার উত্তর দেওয়ারও প্রয়োজন বোধ করলে না।

সাব-ইন্সপেক্টার যেমন হুট্ করে এসেছিল—তেমনি হুট্ করে চলে গেল। ওদের ভারী জুতোর শব্দ আস্তে আস্তে দূরে মিলিয়ে গেল।

সানো চৌধুরী ক্ষুব্ধ গলায় আস্তে আস্তে বলল, "দেউড়ির নগ্‌দী লাগিয়ে হলো না—বড় শরিক পুলিশে পর্যন্ত খবর দিল!"

ডাক্তার কোনো কথা বললে না—তেমনি থম্‌থমে মুখে রোগীর বুকে স্টেথো লাগিয়ে নিবিষ্ট হয়ে শুধু হৃৎস্পন্দন শুনতে লাগল। এ চরের চাষীর বুক। সেখানে কি রক্ত উদ্দাম বেগে বইতে শুরু করেছে! হৃৎস্পন্দন দ্রুত? ডাক্তার খেঁকিয়ে উঠল, "জোরে নিশ্বাস নিতে পারো না! দম নেই? উদো চাষা কোথাকার!"...

অদ্ভুত—সে শব্দ বিস্ময়কর। জীবন্ত মানুষের বেঁচে থাকার শব্দ—নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের এক শব্দ দুদ্দাড় করছে সকলের অলক্ষে। উষ্ণ রক্তের সমুদ্রে স্নান করে বিকশিত হয়ে উঠছে লক্ষ কোটি জীবকোষ। তার বিরাম নেই—বিশ্রাম নেই। সে শব্দে কান পেতে ডাক্তার বলে দিতে পারে—মানুষটা মরা, না মরছে, না জীবনের উদ্দাম প্রবাহে টগ্‌বগ করে ফুটছে। কখনো কখনো সেই উদ্দাম শব্দ শুনেছে ডাক্তার—জীবন-আকাশে যেন পক্ষীরাজের ডানা ঝট্‌পটানি। ...সে অপূর্ব...ছোঁয়াচে...চঞ্চল হয়ে উঠেছে তার নিজের বুকের রক্ত। মনে পড়ে যায় একটা তরুণ তাজা মুখ—উজ্জ্বল দুটো চোখের ওপরে দুটো পাতা স্বপ্ন দেখে দেখে যেন ভারী হয়ে গেছে, এমনি চুপচাপ—মুখ ফুটে সে কিছুই বলে না। কিন্তু তার শান্তশিষ্ট নিরীহ শরীরটার গভীরে—সেই ছোট্ট হরতনের মতো একটা টুকরোর মধ্যে কী গভীর—কি গম্ভীর জীবন-ছন্দের দ্রুত লয়। নাম তার নিবারণ। নিবারণ মিশ্র।

সে শব্দ কই!...

সে শব্দ নেই। এ যেন ঢিপ্ ঢিপ্ করে মাথা কুট্‌ছে জীবনের পায়ের কাছে। কবে ফেলে আসা সেই হাসপাতালে হাউস-সার্জেন জীবনের স্মৃতি—লম্বা হলের মধ্যে মরা মরা পাণ্ডুর আলো...ফ্যাকাসে মুখগুলো...ইথারের গন্ধ। ...মনে পড়ে ক্ষণে ক্ষণে।

ডাক্তার স্টেথো তুলে নিলে।

ঘর নিঃশব্দ। অন্ধকার মেশা লণ্ঠনের সেই ম্লান আলোকে সকলের মুখ চেনা যায় না। ওদের কালো চামড়ার ওপরে আলোর চেয়ে যেন অন্ধকার পিছলে পড়ছে বেশি। ডাক্তারের এই মুহূর্তে ইচ্ছে করে—স্টেথো লাগিয়ে ওদের বুকের গভীরে জীবন-ছন্দের সেই দ্রুত গম্ভীর অশান্ত অশ্রান্ত শব্দটা শুনে তার জাত বিচার করে।

গুপী চাপা গলায় বলে উঠলো, "ছোট মণ্ডল, নবান্নকে আর কতদিন?"

হাবু বোধ হয় মনে মনে গুণছিল—বলে উঠল, "দিন দশেক হবে।"

মুকুন্দের হাত এখনো ভালো করে সারে নি—এখনো সেটা সে বুকের কাছে তুলে ধরে থাকে আর মাঝে মাঝে দেখে। এ যেন তার অভ্যেস হয়ে গেছে। সেই হাতটার দিকে চেয়ে সে বললে, "বড় শরিক দশ আনিরা আবার চরে পুলিশ লেলিয়ে দিলে!"

গুপী ফোঁস করে উঠে বললে, "দিক। যাদব সাঁটের খোপার পাট কাল যেয়ে একবার ঘুরে দেখে আসতে হবে।"

ছোট মণ্ডল চোখ টিপে বললে, "আস্তে আস্তে। ...ছটফট করিস নি।"

হারান মণ্ডল ওদের কথার ধারা কিছুই বুঝল না—এর-ওর মুখের দিকে চেয়ে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করতে লাগল।

রোগী দেখতে দেখতে ডাক্তার শুধু একপলক স্থিরদৃষ্টিতে চেয়ে ওদের মুখগুলো চেনবার চেষ্টা করলে। তারপর আবার নতুন রোগী দেখায় মন দিলে।

তাঁতঘরের জমি তৈরি হয়েছে—এবার কাঠকুটো দড়াদড়ির হিসেব। সে হিসেব নিয়ে মেতে উঠল হাবু, হারান আর সানো চৌধুরী। এ ব্যাপারে ছোট মণ্ডল বা গুপীর মত যারা উৎসাহী তারা ছাড়া আর সবাই একে একে চলে গেল। সন্ধ্যে গড়িয়ে রাত বাড়ছে। ডাক্তার রোগী দেখা শেষ করে ডাক্তারখানার দাওয়ায় চেয়ার টেনে বসলে। নতুন তাঁতঘরের পরিকল্পনার সঙ্গে তার যে বিন্দুবিসর্গ সম্পর্ক নেই—এই কথাটাই যেন নীরবে তার উদ্যোক্তাদের, বিশেষ করে সানো চৌধুরীকে বুঝিয়ে দিলে।

সানো চৌধুরী একবার চোখ তুলে দেখলে। তারপর হিসেব যেমন চলছিল—চলতে লাগল।

একটু রাত করে অন্ধকারের আড়ালে তিনজন ভলান্টিয়ার এসে উঠল ডাক্তারখানার দাওয়ায়।

অন্ধকারে চেনা যায় না। ডাক্তার জিজ্ঞেস করলে, "কে!"

"আমি বিমল।"

"বিমল!"

ডাক্তার উঠে দাঁড়াল। বললে, "ভেতরে এসো।"

সকলে ঘরে ঢুকলো।

"তারপর...কি খবর তোমার বিমল!" ডাক্তার চেয়ার টেনে বসল।

বিমল চেয়ে চেয়ে দেখছিল ডাক্তারকে—

সেই আদুড় গা, আন্ডারওয়্যার মাত্র সম্বল। দোহারা আধবুড়ো চেহারার খ্যাপাটে মানুষটা।

ডাক্তার বললে, "দেখছ! তোমার বন্ধুদের কীর্তি।" একটু থেমে ডাক্তার আবার বললে, "বসে আছি—তাদের সেই 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ের' জন্যে।"

বিমল কাগজে জড়ানো একটা মোটা-সোটা মোড়ক ডাক্তারের পায়ের কাছে রেখে দিয়ে প্রণাম করলে। দেখাদেখি পেছনের দুটি বন্ধুও। তাদের একজনকে ডাক্তার চিনতে পারল—সেই ভারিক্কী ধরণের অপেক্ষাকৃত বয়স্ক যুবকটি।

ডাক্তার বলে উঠল, "আরে এই সেই... এই সেই!

বিমল সস্মিত মুখে বললে, "ওর নাম পবিত্র। পবিত্র রায়। আর এ কমল—কমল দাস। আমার বন্ধুদের ক্ষমা করুন।"

"যতক্ষণ না আমার গোলামী বেশ বদলে দিচ্ছে ততক্ষণ ক্ষমা পাচ্ছে কোথায়।" বলতে বলতে ডাক্তার কাগজের মোড়কটা হাতে তুলে নিয়ে বললে, "এটায় আছে কি?"

বিমল অপেক্ষা করতে লাগল। ঘরের আর সবাই চেয়ে আছে মোড়কটার দিকে। সকৌতূহলে।

ডাক্তার টেবিলের ওপরে মোড়কটা খুলে ফেললে। একখানা খদ্দরের ধুতি আর পাঞ্জাবী। পুরনো শার্টের মাপে এক টুকরো শাদা থান। সবার ওপরে ডাক্তারের মনিব্যাগ—পুরনো শার্টের সঙ্গে সঙ্গে যেটা চলে গিয়েছিল রাগের মাথায়।

ব্যাগটা বিমলের দিকে ঠেলে দিয়ে ডাক্তার বললে, "এটা পবিত্রকে দাও বিমল—ওটা তোমাদের 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ের' প্রণামী।" বলে গোঁফের ফাঁকে একটু হাসল।

বিমল সবিনয়ে বললে, "কিন্তু এটা যে আমাদের প্রণামী।"

"তোমাদের কাটুনীরা, তোমাদের তাঁতীরা বুঝি খুব বড় লোক! বিলেতী কাপড় পুড়িয়ে সেই ফাঁকে বেশ দু' পয়সা করে নিচ্ছে!"

"না, তারা খুবই গরীব। চালচুলো কারুর নেই।"

"তবে!"

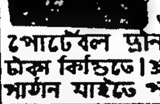

ডাক্তারকে ভালো করেই চেনে বিমল, আর কথা বাড়ালে না—মাথা নিচু করলে।

সানো চৌধুরী এতক্ষণ চুপ করে ছিল—বলে উঠল, "এবার কাপড়-জামা পরো ডাক্তার—তোমার দিকে অনেকক্ষণ থেকে তাকানো যাচ্ছে না।"

"ঠিক বলেছ।" ডাক্তার বললে, "তখন তোমাদের দক্ষিণ চরের ক'টা মেয়ে রুগী এসেছিল—চোখ তুলে তাকাতে পারে নি।" বলে ডাক্তার হো হো করে হাসতে লাগল। একাই। তারপর বললে, "পাঞ্জাবী আমি পরি না। না হয় পরলাম। কিন্তু গায়ে হবে তো বিমল? কি পবিত্র?"

পবিত্র মৃদুকণ্ঠে বললে, "পরুন। না হলে বদলে আনবো।"

"বটে! তাহলে স্টকও আছে?" বলে ডাক্তার উঠে পড়ল। কাপড়-জামা পরলে। এবং সানো চৌধুরীর সামনে দাঁড়িয়ে বললে, "কি রকম দেখছ?"

"চমৎকার।" সানো চৌধুরী বললে, "একেবারে নতুন মানুষ। ডাক্তারগিন্নি চিনে এখন ঘরে ঢুকতে দিলে হয়।"

ডাক্তার মাথায় হাত দিয়ে বললে, "কিন্তু আমার ঝড়-জল-রোদের সঙ্গী?" পবিত্রের দিকে ফিরে বললে, "কি পবিত্র, মায়ের দেওয়া তালপাতার টুপির মত কিছু বানিয়েছ নাকি!" না সেখানে চাষীদের টোকা বা পাথিয়া চালাব?"

সানো চৌধুরী গম্ভীর হয়ে বললে, "চেষ্টা করে দেখতে পারো। তোমার আগের দো-আঁসলা কিম্ভূত বেশের চেয়ে সেটা খুব খারাপ হবে বলে মনে হয় না।"

বোধ করি সেই রকম অভিনব একটা বেশ কল্পনা করে ঘরসুদ্ধ সবাই হেসে উঠল।

বিমল বললে, "না. আপনার পুরনো সঙ্গীকে ত্যাগ করে কাজ নেই—শুনেছি ওটা না দেখতে পেলে আপনার রোগীদের ধড়ে প্রাণ আসে না। আপনার ওই হ্যাটের মাহাত্ম্য আছে। ভয়ে আর শ্রদ্ধায় রোগীদের রোগ অর্ধেক সেরে যায়। সেটা আমরা এনেছি।" পেছন ফিরে বললে, "কমল, ডাক্তারবাবুর হ্যাটটা দাও।"

কাগজে মোড়া হ্যাটটা কমল এগিয়ে এসে টেবিলের ওপর রেখে দিলে।

ডাক্তার মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে বললে, "একটা মস্ত খবর তোমাকে দেওয়ার আছে বিমল। সানো চৌধুরী তাঁত বসাচ্ছে, ছুতোরকে এক কুড়ি চরকার বরাত দিয়েছে। একদিকে তোমাদের চাপ আর একদিকে সানো চৌধুরী—এবার ম্যাঞ্চেস্টার ল্যাঙ্কাশায়ারের মিলগুলো রসাতলে গেল।"

সানো চৌধুরীর দিকে প্রদীপ্ত চোখে চেয়ে বিমল বলে উঠল, "সত্যি! সত্যি চৌধুরী মশাই!"

"সামান্য উদ্যোগ বিমল!" সানো চৌধুরী বললে, "একটা বেকার উদ্বাস্তু ঘর-পোড়া তাঁতী—পাকা কারিগর, তাকে কাজ দিতে চাই। তাতে যদি ডক্তারের ওই মিলগুলো সত্যি সত্যি উঠে যায় তো কত বড় একটা কাণ্ড হয় বলো দেখি!" কৃত্রিম বিস্ময়ে আবার বললে, "সেই তাঁত বসাবার জায়গা দিচ্ছে কে—না স্বয়ং ডাক্তার। চার-দিকে একেবারে ধন্য ধন্য পড়ে যাবে।" একটু থেমে আবার বললে, "আমার অঙ্গ থেকে বিলেতী চিহ্ন এখনো ঝেড়ে ফেলতে পারি নি বিমল—কিন্তু উনিই সকলের আগে সেই ম্যাঞ্চেস্টার ল্যাঙ্কাশায়ারের গঙ্গাযাত্রা করে দিয়ে প্রায় কৌপিন মাত্র সম্বল করে এতক্ষণ বসেছিলেন।"

এই দুই পুরাতন বন্ধুর বহুদিনের বহু কথা কাটাকাটি—বহু সূক্ষ্ম বিরোধের সাক্ষী বিমল—হেসে ফেললে সানো চৌধুরীর কথায়। জিজ্ঞেস করলে, "পাকা কারিগরটি কে? আপনাদের এদিকে তাঁতী নেই বলেই তো জানতাম।"

"ছিল না—এখন একজন এসেছে।" সানো চৌধুরী হারান মণ্ডলকে দেখিয়ে বললে, "তাঁতীসাহির নাম এই বিলেতী কাপড় পোড়ানোর মরশুমে নিশ্চয়ই শুনেছ?"

"শুনেছি। যেখানে দোকানসুদ্ধ পুড়িয়ে দিলে।"

"ও সেই তাদেরই একজন—তাঁতীসাহি মণ্ডলপাড়ার তাঁতী।"

একটা চাপা উত্তেজনায় তিনটি তরুণ মুখ চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল আদুড় গা, কাঁচা-পাকা চুল, চোয়াড়ে চেহারার মানুষটিকে।

সানো চৌধুরী বলল, "পুলিশ ওদের ঘরদোর তাঁত—সব জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে শেষ করে দিয়েছে। ওর একটা কাজের ব্যবস্থা করে দিতে চাই।"

"ওয়ারেন্ট না থাকলে আমি আবার এখানে ফিরে আসতাম চৌধুরী মশায়।" সোৎসাহে বিমল বললে, "পবিত্র এখানে থাকছে—আপনার যদি কিছু দরকার হয় এ ব্যাপারে—জানাবেন, আমরা প্রাণপণে সাহায্য করবো।"

"আপাতত চাই আমার তুলো।" সানো চৌধুরী বললে, "এ ডাহা নোনা মাটির দেশ—এখানে তুলো হয় না।"

"সে আপনি যত চান পাবেন।" বিমল বললে, "আমরা জোগাবো।"

"আর কিছুর দরকার নেই বিমল—বাকি সব আমরা তৈরি করে নেবো।"

ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে বিমল বললে, "আজ তবে যাই ডাক্তারবাবু।"

ডাক্তার অন্যমনে কি যেন ভাবছিল। বিমলের কথায় কয়েক মুহূর্তের জন্য তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। কি একটা

টাকা বাক্সবন্দী রেখে কি লাভ

পি এন বি-তে সঞ্চয় করুন

বাড়ীতে টাকা রাখা মোটেই নিরাপদ নয়। এই অলস টাকা দেশের কোন কাজেও লাগে না, বাড়েও না। আমাদের ব্যাঙ্কে আপনার সঞ্চিত অর্থ দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতিকল্পে উৎপাদনশীল শিল্প, কৃষি এবং রপ্তানীর ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করা হয়। শুধু তাই নয়, এর থেকে আপনি সুদও পাবেন। তাই দলে দলে লোক আজকাল পি. এন বি-তে টাকা জমা রাখছেন। পি এন বি এমন একটি ব্যাঙ্ক—যা সেবায় দক্ষ, ব্যবহারে অমায়িক।

পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

১৮৯৫ সাল থেকে জাতির সেবায় নিয়োজিত
চেয়ারম্যান : এস.সি. ত্রিখা

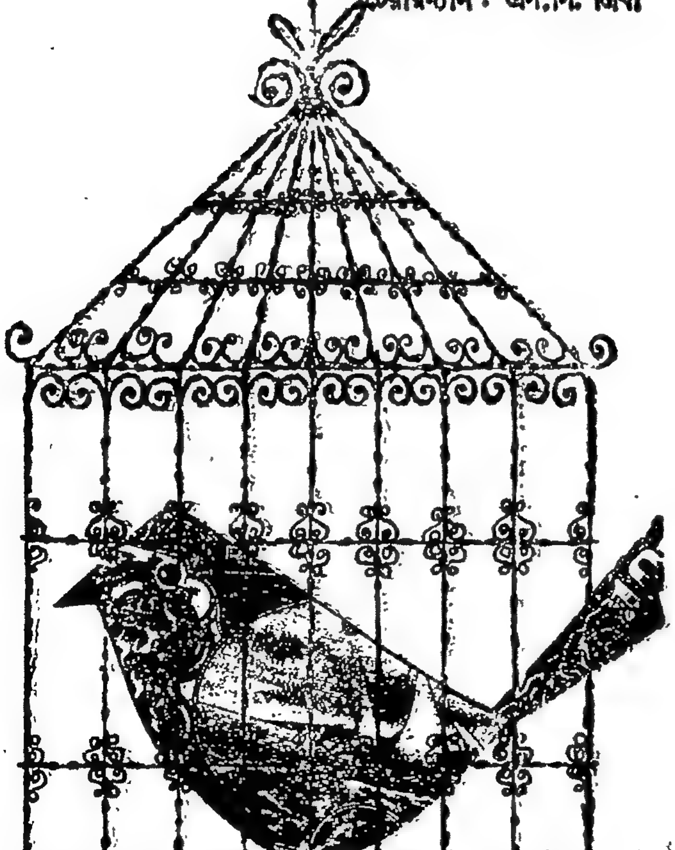

PR/PNB/6978

কথা যেন বলি বলি করেও মুখে আটকে যাচ্ছে। তারপর আস্তে আস্তে বলে ফেললে, "তুমি এদিকে অনেকদিন আসো নি বিমল।"

"ওয়ারেন্ট।"

"বুঝি বিমল—আসা তোমার উচিত নয়।" ডাক্তার তেমনি আস্তে আস্তে বললে, "যখন একবার এসেই পড়েছ—তোমার ডাক্তার কাকীমার সঙ্গে যাবে একবার দেখা করে? তিনি প্রায়ই তোমার কথা জিজ্ঞেস করেন—উত্তর দিতে পারিনে। তিনি ভাবেন তোমারও বোধ করি সারা জীবনের দ্বীপান্তর হয়ে গেছে। আমি কথাটা চেপে যাচ্ছি।"

সেই নিবারণের মতো। যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর। ডাক্তার অন্যমনে বিমলের মুখের দিকে চেয়ে রইল। বোধ করি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলো কোথায় লুকনো আছে নিবারণের মুখের আদল। স্ত্রীর শঙ্কিত আগ্রহ, নীরব অশ্রুপাত—এক লহমায় মনে ভেসে ওঠে।

বিমল লজ্জিতকণ্ঠে বললে, "কাকীমা আমায় মনে রেখেছেন? সত্যি, অন্তত লুকিয়ে-চুরিয়ে একবারও আমার দেখা করা উচিত ছিল।"

"বুঝলে না—মা, বোকা মা—বুনো মা! ও তোমাদের গায়ের গন্ধ শুঁকে মন ভরাতে চায়। আমি দেখেছি গাইগরু-গুলোকে, একেবারে রাস্তার কোণায় বাচ্চা আগলানো কুকুরগুলোকে—মাঝে মাঝে বাচ্চাদের গা শুঁকছে আর আরামে চোখ বুজোচ্ছে।" ডাক্তার হাসি হাসি মুখে বললে, "অথচ তোমার ডাক্তার কাকীমা জানেন না—জানতেও চান না, নিবারণদের সঙ্গে তোমাদের কতটা তফাৎ—সে তোমাদের লড়াইয়েই বলো আর আদর্শেই বলো। তোমাদের দ্বীপান্তর হবে কেন? ফাঁসি হবে কেন! কিন্তু বুঝবে কে? একেবারে চাষার গাইগরু—গা শুঁকবে বলে তার বক্না খুঁজছে।" বলে ডাক্তার হো হো করে হাসতে লাগল।

আদর্শের কথায় বিমলের মুখটা কঠিন হয়ে গেল—যেন ঈষৎ রং বদলে গেল মুখের চামড়ার।

সেটুকু সানো চৌধুরীর চোখ এড়াল না। ডাক্তারকে উদ্দেশ করে বললে, "তুমি একটি মস্ত বিম্বান জন্তু! —বলি এই মাইল চারেক দূরে—যেখানে আমাদের হুগলী নদী সাগরে গিয়ে মিশেছে—সেখানে কখনো গিয়েছ?"

ডাক্তার কট্ কট্ করে বললে, "যতো দূর মনে আছে—তোমাকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম এবং জায়গাটার অতীত ইতিহাস আমিই তোমাকে শুনিয়েছিলাম।"

"ঠিক। মনে আছে।" সানো চৌধুরী স্বীকার করে বললে, "বিদ্যেটা তোমার—কিন্তু জ্ঞান হয়েছিল আমার। আমি দেখেছিলাম—তোমার আওড়ানো সেই মরা ইতিহাসের পাশ দিয়ে অনেক নদী-নালা এসে সেই থৈ-থৈ করা এক সাগরে এসে মিশেছে। সাগর জননী কারুকেই ফিরিয়ে দেন নি।"

তিনটি তরুণ মুখ উজ্জ্বল চোখে সানো চৌধুরীর দিকে চেয়ে রইল।

সানো চৌধুরী বললো, "চলো বিমল—রাত হলো।"

"তোমরা তবে ফিরে যাও।" বিমল তার আর দুই বন্ধুকে বিদায় দিলে।

সানো চৌধুরী বলে উঠল, "উঁহু; তোমার ডাক্তার কাকীমাকে আমি ভালো করে জানি বিমল, তোমাদের সব ক'টি গেলে তিনি আরও খুশি হবেন। বহুদিন পরে একটি রাত্রি তিনি আনন্দে ঘুমোবেন। চলো ডাক্তার।"

[ক্রমশ]

মোনালিসার হাসি ?

যুগনায়ক লেনিন

অশোক সেন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

[আলো জ্বললে দেখা যাবে কথক এসে মঞ্চের সামনে দাঁড়িয়েছেন ঃ]

কথক ঃ লেনিনের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বের করা হল। কমিউনিস্ট পার্টি এবং বিপ্লবী শ্রমিকেরা তাদের নেতার নিরাপত্তার জন্য সব রকমের ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। সেন্ট্রাল কমিটির নির্দেশে লেনিন এখন থেকে আত্মগোপন করে রইলেন—প্রায় সাড়ে তিন মাসের ওপর তিনি আন্ডারগ্রাউন্ডে থেকে কাজ চালিয়ে গেলেন। অনেক সময় তিনি পেট্রোগ্র্যাডের শ্রমিকদের বাড়িতে আশ্রয় নিতেন।

[দ্রষ্টব্য ঃ ওপরের ব্যাপারটা মাইকের সাহায্যে স্টেজে দেখানো যেতে পারে।]

এরপর লেনিন ছিলেন লেক রাজলিভের তীরে একটি সাধারণ কুঁড়েঘরে—জায়গাটা ছিল পেট্রোগ্র্যাডের কাছে, লেনিন তখন ছদ্মবেশী ফিনিশ হে-মেকার। তাঁর কুঁড়েঘরটি তৈরি করা হয়েছিল খড় এবং গাছের ডালপালা দিয়ে। তাঁর বৃত্তি অনুযায়ী তাঁকে দেওয়া হয়েছিল একটি কাস্তে, জমি মসৃণ করবার মই, কুড়াল এবং একটি পাত্র। কুঁড়েঘরের সামনে গাছপালায় ঢাকা জায়গার ভেতর খানিকটা পরিষ্কার করে দু'টি গাছের কান্ডকে কেটেকুটে পাশাপাশি বসিয়ে রাখা হয়েছিল—এর একটিকে লেনিন চেয়ার হিসাবে ব্যবহার করতেন, অন্যটি টেবিলের কাজ করতো। লেনিন ঠাট্টা করে বলতেন এ জায়গাটা হচ্ছে আমার সবুজ পাঠ-কামরা। এখানে বসেই লেনিন রচনা করতেন তাঁর সে সময়কার প্রবন্ধগুলো, চিঠিপত্র এবং "দি স্টেট এন্ড দি রেভোল্যুশন" বইটির পাণ্ডুলিপি। এইভাবেই তিনি আগামী সংগ্রামের প্রস্তুতি-পর্ব চালিয়েছিলেন। পেট্রোগ্র্যাড এবং রাশিয়ার অন্য সব জায়গার সমস্ত খবর তিনি পেতেন সেন্ট্রাল কমিটির সভ্যদের কাছ থেকে, ওয়ার-ফ্রন্টের খবরও তাঁরাই পৌঁছিয়ে দিতেন। এমনি একদিনে সেন্ট্রাল কমিটির কয়েকজন সভ্য এসেছিলেন এই সবুজ পাঠ-কামরায় লেনিনের সঙ্গে আলোচনা করতে ঃ

[দ্রষ্টব্য ঃ ওপরের দৃশ্যটিও মঞ্চাভিনয়ের সময় মূকাভিনয়ের সাহায্যে স্টেজে দেখানো যেতে পারে। ব্ল্যাক আউট—আলো জ্বললে পেছনের পর্দা উঠে যাবে—দেখা যাবে লেনিন তাঁর গ্রীন-স্টাডিতে সেন্ট্রাল কমিটির সভ্য জি. কে. আরজোনিকিডজে, ভি আই. জোফ্, এ. ভি. শর্টম্যান এবং ই· রাজার সঙ্গে আলোচনারত।]

লেনিন—যদিও আমাদের পার্টিকে এখন আণ্ডারগ্রাউণ্ডে থেকেই কাজ করতে হচ্ছে, আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, শ্রমিকশ্রেণীর বিজয় অভিযানের দিন ক্রমশ এগিয়ে আসছে।

আরজোনিকিডজে—ভ্লাডিমার ইলিচ! সেদিন একজন কমরেড আমাকে বলছিল যে, সে মনে করে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা এবার বলশেভিকদের হাতে এসে পড়বে—আর কমরেড লেনিনই তখন হবেন রাষ্ট্রের প্রধান।

লেনিন—(গম্ভীরভাবে) সে ঠিক কথাই বলেছে। মেনশেভিকরা সোভিয়েটগুলোতে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। ক্ষমতা আয়ত্তে নেবার সুযোগ পেয়েও কিন্তু তারা সে সুযোগ হারালো। এখন সমস্ত ক্ষমতা চলে গিয়েছে কেরেনস্কির বুর্জোয়া সরকারের হাতে—এ শক্তিকে ছিনিয়ে নেবার একমাত্র উপায় হল সশস্ত্র বিপ্লব।

শর্টম্যান—কতদিন লাগতে পারে এই আর্মড্ আপরাইজিং-এর জন্য?

লেনিন—বেশি দেরি হবে না। সেপ্টেম্বর অক্টোবরের ভেতরই গণ-বিপ্লব শুরু হবে বলে আমার বিশ্বাস। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতার হাতবদল হওয়াটা এখন অসম্ভব। সুতরাং ডিক্টেটরশিপ অফ্ দি প্রলেতারিয়েতের প্রতিষ্ঠা করবার জন্য আর্মড রেভোল্যুশন করা ছাড়া অন্য পথ নেই—বলশেভিক পার্টির ষষ্ঠ কংগ্রেসে আমি আমাদের কর্মপন্থা, সমস্ত সভ্যদের সঙ্গে বিশদভাবে আলোচনা করবো।

জোফ্—প্রলেতারিয়েতের হাতে ক্ষমতা আসবার পর রাষ্ট্রের আকৃতি এবং ধরণটা কি রকমের হবে কমরেড লেনিন?

লেনিন—এ বিষয়ে আমি বিস্তারিতভাবে লিখছি আমার এই নতুন বইটিতে (বইয়ের পাণ্ডুলিপিটা তুলে ওদের দেখাবেন)।

রাজা—এ বইটার নাম কি দিয়েছেন?

লেনিন—দি স্টেট এ্যান্ড রেভোল্যুশন।

রাজা—আচ্ছা, সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য আমাদের সাংগঠনিক কাজও তো অনেক করতে হবে?

লেনিন—নিশ্চয়! গ্রামে, শহরে, বস্তীতে, বস্তীতে ঘুরে কল-কারখানা, সৈন্যাবাস, ডক্ সব জায়গায় গিয়ে আমাদের বিপ্লবী মজদুর এবং মেহনতী মানুষদের মধ্যে গিয়ে

অস্ত্র বিতরণ করতে হবে—যারা অস্ত্রের ব্যবহার করতে জানে না, তাদের সে শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে। আমাদের নিজস্ব সৈন্য-বাহিনী "রেড্ গার্ডস্" তৈরি করতে হবে। একটা কথা মনে রাখবেন কমরেডস্—মার্কসিজমের মূল কথাটা হোল, 'ডিক্টেটরশিপ অভ্ দি প্রলেতারিয়েতের' প্রতিষ্ঠা করা—এর ফলেই সমাজ থেকে শোষকশ্রেণীকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলা যাবে।

[ব্ল্যাক আউট। পর্দা নেমে আসবে। আলো জ্বললে দেখা যাবে কথক এসে দাঁড়িয়েছেন :]

কথক : এদিকে লেনিনকে গ্রেপ্তার করবার জন্য কেরেনস্কি সরকার তোড়-জোড় চালিয়েছিল। সেন্ট্রাল কমিটির নির্দেশে লেনিন এঞ্জিনের ফায়ারম্যানের ছদ্মবেশে ফিন্ল্যাণ্ডে চলে গেলেন। প্রথমে লেনিন ছিলেন হেলসিংফোর্সের বাইরে এক গ্রামে একজন ফিনিশ শ্রমিকের বাড়িতে—তারপর চলে এলেন শহরে। এদিকে রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ অবস্থা ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছিল—অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা বাড়ছিল, জ্বালানি ইন্ধনের অভাবে রেলের পরিবহন ব্যবস্থা অচল হয়েছিল, খাদ্যবস্তু এবং কাঁচামাল আসছিল না শহরে, মুনাফাখোরেরা বিরাট দাপটে সমাজের বুকে আধিপত্য বিস্তার করেছিল। বুর্জোয়াজি যেন আগে থেকেই পরিকল্পনা করে দেশের অর্থনৈতিক সংকটকে বাড়িয়ে তুলছিল—তাদের আসল উদ্দেশ্য ছিল দেশে দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করে গণ-বিপ্লবকে গলা টিপে মারবে, ক্যাপিটালিস্টরা তাদের কল-কারখানা বন্ধ করে দিচ্ছিল—যাতে শ্রমিকেরা বেকার হয়ে অনশনে মারা যায়। এই সময় লেনিনের বিশ্বস্ত সহকর্মী মিখায়েল ক্যালিনিন এবং ক্রুপস্কায়া হেলসিংফোর্সে লেনিনের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। একটি ঘরে বসে তাঁরা এইভাবে কথাবার্তা বলছিলেন :

[আলো নিভে যাবে। পেছনের পর্দা উঠবে এবং আলো জ্বলবে। দৃশ্য : উপরোক্ত ঘরটি]

লেনিন : (সামনের টেবিলের ওপর রাখা পাণ্ডুলিপিটা দেখিয়ে) হ্যাঁ, এই আমার "আসন্ন বিপর্যয় এবং তার বিরুদ্ধে সংগ্রামপ্রণালী" বইয়ের পাণ্ডুলিপি। ধনতন্ত্রবাদীর দল এবং জমিদারেরা কিভাবে রাশিয়াকে সর্বনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছে তার বিশদ আলোচনা করেছি বইটাতে।

ক্রুপস্কায়া : ওরা আপ্রাণ চেষ্টা করছে বর্তমান অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে সোভিয়েটগুলোকে ওরা নিশ্চিহ্ন করবে—

ক্যালিনিন : তার ফলে ওরা যা চায় তাই হবে—অর্থাৎ রাষ্ট্রের সমস্ত শক্তি এসে যাবে বুর্জোয়াজির হাতে।

লেনিন : একমাত্র সোশ্যালিজম প্রতিষ্ঠার দ্বারাই আমাদের দেশকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে। এর-জন্য প্রথম থেকেই দেশের সমস্ত জমির জাতীয়করণ করতে হবে, ব্যাঙ্কগুলোকে ন্যাশনালাইজ করে নিয়ে একটি মাত্র রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক চালাবার ব্যবস্থা করা দরকার। দেশের সব কিছুর উৎপাদন এবং বণ্টনের ব্যাপারে কর্তৃত্ব থাকবে শ্রমিকদের। এই সব ব্যবস্থা করতে পারলেই দেশের অর্থনীতিকে নতুন-ভাবে গড়ে তোলা যাবে। আর সবার আগে দরকার—এই সাম্রাজ্য-বাদী যুদ্ধ থেকে আমাদের সরে আসা।

ক্যালিনিন : জেনারেল কর্নিলভের প্রতি-ক্রিয়াশীল বিপ্লব দমনে আপনি আগে থেকেই সেন্ট্রাল কমিটিকে যে সব নির্দেশ দিয়েছিলেন তার ফলেই অত সহজে কর্নিলভকে শায়েস্তা করা গেছে।

ক্রুপস্কায়া : জেনারেলের উদ্দেশ্য ছিল আমাদের গণ-বিপ্লবকে ধ্বংস করে জঙ্গী স্বৈরতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু বলশেভিকরা অতি সহজেই এই বিদ্রোহকে দমন করলো।

লেনিন : সেটা সম্ভব হয়েছিল জন-সাধারণ নির্ভীকভাবে আমাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল বলে।

ক্যালিনিন : কমরেড লেনিন, আগেই কমিটি আপনাকে জানিয়েছে যে, মস্কো এবং পেট্রোগ্র্যাডের সমস্ত

বিশ্রামরত লেনিন ও ক্রুপস্কায়া—টেবিলের ওপর টেলিস্কোপের অংশ বিশেষ দেখা যাচ্ছে।

সোভিয়েটগুলো বলশেভিক কণ্ট্রোলে এসে গেছে। এর পরের খবর শুনে আরও খুশি হবেন। রাশিয়ার সমস্ত বড় শিল্পকেন্দ্রের সোভিয়েট-গুলোতেও এখন বলশেভিকদেরই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

লেনিন : ক্যালিনিন, ক্রুপস্কায়া! তোমরা ফিরে গিয়েই সেণ্ট্রাল কমিটিকে জানাবে যে এখন থেকে আবার ক্রমাগত আমাদের শ্লোগান দিতে হবে—"All power to the Soviets!" দেশের কৃষক, শ্রমিকদের আমরা সম্পূর্ণভাবে সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য তৈরি করে তুলেছি। আমাদের কাছ থেকে ইঙ্গিত পাওয়ামাত্রই তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করবে কেরেনস্কি সরকারের বিরুদ্ধে। দেশের নানা জায়গা থেকে সৈনিক এবং নাবিকরাও আমাদের জানিয়েছে যে, গণ-অভ্যুত্থান শুরু হলেই তারা আমাদের পেছনে এসে দাঁড়াবে। আর কোনমতেই দেরি করা চলবে না—এতদিন এই কারণেই অপেক্ষা করতে হচ্ছিল যে সোভিয়েটগুলোতে ছিল মেনশেভিকদের প্রাধান্য। কেরেনস্কি সরকারের পতন ঘটলে ওদের হাতেই চলে আসতো সব ক্ষমতা। আর ওরা তো আসলে বুর্জোয়াজিরই প্রতিনিধির দল—সুতরাং গণ-অভ্যুত্থানের ফলেও জনগণের আসলে কোনই লাভ হোতো না।

ক্রুপস্কায়া : এখন সে বাধাও দূর হয়েছে—

লেনিন : হ্যাঁ, সোভিয়েটগুলো এখন বলশেভিকদেরই আয়ত্তে—কেরেনস্কি সরকারের অপসারণ ঘটাতে পারলেই এখন আমরা ডিক্টেটরশিপ অভ্ দি প্রলেতারিয়েতের প্রতিষ্ঠা করতে পারবো। আমারও আর এভাবে ফিন্ল্যাণ্ডে পড়ে থাকলে চলবে না।

ক্যালিনিন : হ্যাঁ, কমরেড। আপনাকে হয় পেট্রোগ্র্যাডে, কিম্বা ওখানকার কাছাকাছি কোন জায়গায় থেকে পার্টির সমস্ত পরিচালনভার নিতে হবে।

লেনিন : তোমরা ফিরে গিয়ে সেণ্ট্রাল কমিটির সঙ্গে সমস্ত কথা আলোচনা করে আমাকে তাদের মতামত জানাবে। আমিও ব্যস্ত থাকবো আমাদের আসন্ন সশস্ত্র সংগ্রামের একটা মোটামুটি প্ল্যান তৈরি করবার কাজে। এটা আমি দু'দিনেই করে ফেলতে পারবো—আসছে সপ্তাহের ভেতরই তার একটা খসড়া আমি সেণ্ট্রাল কমিটিকে পাঠিয়ে দেব।

মহানায়ক লেনিন

[আলো নিভে যাবে। পর্দা নামবে —আলো জ্বললে দেখা যাবে কথক মঞ্চের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন :]

কথক : বলশেভিক পার্টি সশস্ত্র বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হতে লাগল, সেণ্ট্রাল কমিটিকে বিপ্লব বিষয়ক যে সব নির্দেশ লেনিন চিঠিতে লিখে পাঠাতেন, কমিটি সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো প্রচার করবার ব্যবস্থা করতো সমস্ত বলশেভিক সংগঠনগুলোর ভেতর। রেড আর্মির সৈন্যবাহিনীগুলোতে সৈন্যসংখ্যা বাড়ানো হল। অনেকগুলো নতুন ইউনিটেরও সৃষ্টি হল, পূর্ণোদ্যমে মিলিটারী ট্রেনিং দেওয়া হতে লাগল এই সব সৈন্যদের। বল্টিক নৌবাহিনীর নাবিকদের বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত করতে লাগল বাহিনীর ভেতরকার বলশেভিকরা। তাদের প্রতি অনুগত ফ্রণ্টিয়ার সংগঠনের সৈনিকরাও, বিপ্লবের সময় শ্রমিকদের সাহায্য করবার জন্য আর্মি ইউনিটে গড়ে তুলতে লাগল। ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি লেনিন হেলসিংফোর্স থেকে ভাইবর্গে চলে এলেন—কারণ এ জায়গাটা ছিল পেট্রোগ্র্যাডের অনেক কাছে। বলশেভিক সংবাদপত্র Rabochy Put-এ তাঁর প্রবন্ধগুলো প্রকাশিত হতে লাগল। এ সব প্রবন্ধে তিনি বারবার বলতে লাগলেন—"রাষ্ট্র-ক্ষমতা দখলের জন্য সব রকমভাবে প্রস্তুত হতে হবে বলশেভিকদের—কারণ সশস্ত্র বিপ্লবের মাহেন্দ্রক্ষণ আগত, এবং অযথা বিলম্বে শ্রমিকদের সমুজ্জল ভবিষ্যৎ চিরতরে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। বিপ্লব পরিচালনার নেতৃত্ব করবেন বলে লেনিন ভাইবর্গ ছেড়ে ১লা সেপ্টেম্বর পেট্রোগ্র্যাড চলে এলেন। সেণ্ট্রাল

কমিটিকে লেনিন আবার জনালেন অবিলম্বে আঘাত হানতে হবে—কারণ অন্যথায় সব কিছু পণ্ড হয়ে যেতে পারে। সশস্ত্র বিপ্লবের সাফল্য সম্পর্কে, লেনিনের মনে কিন্তু এতটুকু দ্বিধা কেউ কখনও দেখে নি। ১০ই অক্টোবর সেণ্ট্রাল কমিটির মিটিং-এ সশস্ত্র বিপ্লবের প্রশ্ন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হল। লেনিন তাঁর রিপোর্টে প্রমাণ করে দিলেন যে, প্রলেতারিয়েত এবং গরীব কৃষকদের জোর করে ক্ষমতা অধিকারের শুভক্ষণ সমাগত। এই মিটিং বসে ছিল কমরেড জি, সুখানোভার ফ্ল্যাটে সভাপতিত্ব করেছিলেন লেনিন নিজে।

[কথক সরে যাবেন। পেছনের পর্দা উঠলে দেখা যাবে সুখানোভার ফ্ল্যাটে সেণ্ট্রাল কমিটির সভ্যরা অপেক্ষা করছেন লেনিনের আসবার জন্য। ধীরে ধীরে লেনিন এসে ঢুকবেন—সমবেত সভ্যরা একসঙ্গে উঠে দাঁড়াবেন এবং উচ্চকণ্ঠে তাঁদের নেতাকে স্বাগত অভিনন্দন জানাবেন। লেনিনের চেহারার পরিবর্তন দেখে সভ্যেরা সবাই বিস্মিত—কেরেনস্কি সরকারের টিকটিকিদের দৃষ্টি এড়িয়ে চলবার জন্য লেনিন তাঁর গোঁফ-দাড়ি কামিয়ে ফেলেছেন—মাথায় পরিধান করেছেন ধূসর রঙের পরচুলা। কমিটির সভ্য এ. বুবনভ অন্যান্য সভ্যদের সম্বোধন করে বললেন :]

বুবনভ : কমরেড! বিগত জুলাই মাসের পর আমাদের অনেকের সঙ্গেই কমরেড লেনিনের আর দেখা হয় নি। কারণ তখন থেকেই আত্মগোপন করে ছদ্মবেশে তাঁকে লুকিয়ে লুকিয়ে বেড়াতে হচ্ছে। দেশের জনগণ অর্থাৎ কৃষক, শ্রমিক, মজদুরদের দল, রাশিয়ার সৈন্যবাহিনী, নৌবাহিনী—সবারই আজ পূর্ণ সমর্থন আমাদের বলশেভিক পার্টির ওপর। অপদার্থ কেরেনস্কি সরকারের ধারণা বলশেভিক নেতা কমরেড লেনিনকে যদি তারা গ্রেফ্তার বা হত্যা করতে পারে তাহলেই বলশেভিক পার্টির মেরুদণ্ড ভেঙে যাবে এবং তখন সামরিক সরকারকে বাধা দেবার মত দল আর দেশে থাকবে না। আপনারা জানেন কমরেড লেনিন আজকের সভার সভাপতি। দেশের বর্তমান পরিস্থিতি সম্বন্ধে তিনি আপনাদের কাছে প্রথমে ভাষণ দেবেন—তারপর আপনাদের সামনে আমাদের কর্মপন্থা তুলে ধরবেন। সেই ভাষণ নিয়ে পরে সভ্যেরা আলোচনা করবেন। আমি সভার তরফ থেকে কমরেড লেনিনকে সভাপতি পদে বরণ করছি এবং তাঁর ভাষণ শুরু করতে অনুরোধ করছি।

[লেনিন এবার সভাপতির আসন গ্রহণ করবেন—সভ্যরা উচ্চকণ্ঠে আবার তাঁকে অভিনন্দন জানাবে। তারপর লেনিন উঠে ভাষণ দিতে শুরু করবেন :]

লেনিন : কমরেডস্! আমি মনে করি এই সেপ্টেম্বর মাসের শুরু থেকেই সশস্ত্র বিপ্লবের প্রশ্নটাকে আমরা যেন এড়িয়ে চলছি। কিন্তু সোভিয়েটগুলোকে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা নিজেদের হাতে ছিনিয়ে নিতে হবে বলে যে শ্লোগান আমরা দিচ্ছি তার পরিপ্রেক্ষিতে এ ধরণের মনোভাবকে কোনদিক থেকেই আর সমর্থন করা যায় না। এই সমস্যার সঙ্গে জড়িত প্রায়োগিক বা টেকনিক্যাল দিকটা নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করবার সময় এসেছে। এমনিতেই অনেকটা সময় আমরা নষ্ট করেছি—আর দেরি করা চলে না। আমি আপনাদের বলছি, যে-সমস্যা আমি তুলছি সেটা খুবই জরুরী। এখন সমস্ত আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি এমন একটা অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে যে, আমাদের বলশেভিক পার্টি থেকে ইনিসিয়েটিভ না নিলে আর চলবে না। What is being done to surrender territory as far as Narva, and to surrender Petrograd makes it still more imperative for us to take decisive action. দেশের বর্তমান রাজনীতিক পরিস্থিতি দেখেও স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে আমাদের সেই decisive action এবার নিতেই হবে। ৩রা, ৪ঠা বা ৫ই জুলাই যদি আমরা এই ডিসাইসিভ্ এ্যাকসন নিতে যেতাম তাহলে আমাদের প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হোত—কারণ সে সময় সোভিয়েটগুলোতে আমাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল না। কিন্তু তারপর থেকে আমরা অনেকটাই এগিয়ে এসেছি—এখন সোভিয়েটগুলোতে বলশেভিকদেরই সংখ্যাগরিষ্ঠতা। কেউ, কেউ বলছেন জনগণের ভেতর আগের মত উৎসাহ বা উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে না। আমি প্রশ্ন করি—কি করে তা থাকবে? আমাদের বক্তৃতা আর সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তগুলোর কথা শুনতে শুনতে মেহনতী মানুষেরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। এবার দৃঢ় সঙ্কল্পের সঙ্গে আমাদের কাজে লাগতে হবে—কাজে নামবার সত্যিকার উদ্যোগ করলেই তারা আমাদের পাশে এসে দাঁড়াবে। কমরেডস্! সশস্ত্র সংগ্রামের শুভমুহূর্ত আমাদের সামনে এসে গেছে। আর কালবিলম্ব না করে আমাদের শক্তির লড়াইয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে।

[ব্ল্যাক আউট—পেছনের পর্দা নেমে যাবে।]

[ক্রমশ]

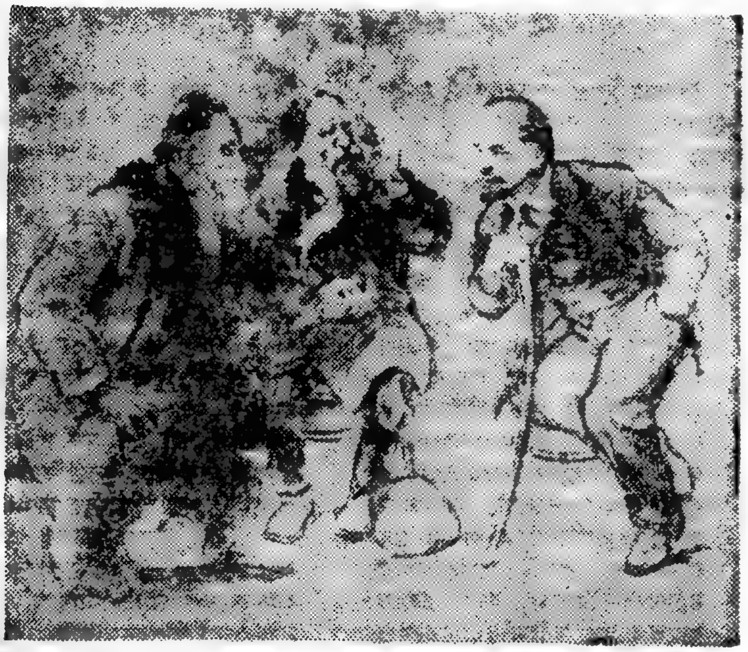

বলশেভিক কর্মীদের সঙ্গে আলোচনারত লেনিন

লোকসঙ্গীতের একাল না আকাল?

মুরশিদ

অনেকদিনের নীরবতা ভাঙবো একটা সুখবর দিয়ে। ওপার পদ্মা—এপার গঙ্গা, মধ্যিখানে বিরহিণী নক্সীকাঁথার মাঠ পেরিয়ে কলকাতার হুলুস্থুলের হাটে সুজনবাদিয়ার ঘাটের মাঝি নাও ভিড়িয়েছেন এক যুগ পর। কিন্তু মাত্র দু'সপ্তাহের মেহমান। খবর ছড়ানো মাত্র ভাবের বেপারী সব, ভেঙে পড়লো সেই ঘাটে। সবাই তাঁর কুটুম। কুটুম্বিতার বহর দেখে মুরশিদ তো বেওকুফ. কেউ বা সহ-পাঠী, কেউ বা গানের দোহার, কারও বা কবিকাকা, কারও বা কবিদা, কারও বা আবার কবিদাদু কেউবা তাঁর পাতানো মেয়ে, কাউকে আবার ডাকছেন বৌমা বলে, কেউ বা করছে কোলাকুলি, কেউ নিচ্ছে মাথায় তাঁর পায়ের ধূলি। তাজ্জব মিলাত্!

মুরশিদের সাথে নামে মানুষে দেখাদেখি এই প্রথম। মুরশিদ যে কথা কইতে চায় মরমে, মরমে। একটু নিরিবিলি না হলে তো চলে না। হুলুস্থুলের হাটে তো মুরশিদের লাউ বাজে না। কিছু মোকা মিলে গেল। তিনি নিজেই কলকাতার এই মুরশিদের সঙ্গে বিশেষ মোলাকাতের ইচ্ছা জানালেন।

মুরশিদে, মুরশিদে কোলাকুলি

'জ্যৈষ্ঠ মাসের মিষ্ট ফল,
আষাঢ় মাসের নয়াজল রে।'

বিরহের বারমাস্যা পার হয়ে এই আষাঢ়ের এক মেঘলা সকালে পদ্মা-পারের মুরশিদের সাথে গঙ্গাপারের মুরশিদের মোলাকাত হলো। মারিফতী দর্শনের এক বয়ান দিয়ে আমাকে সম্ভাষণ জানালেন : 'মারিফতে ভেদ সিনায় সিনায়।' অন্তর দিয়ে জান অন্তরকে। মুহূর্তে অপরিচয়ের পর্দা ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। কী সহজ মানুষ কবি জসিমউদ্দীন। আগের দিন কলকাতার কোনো দৈনিকে এক সাংবাদিকের সাক্ষাৎকারে পড়েছিলাম—তাঁর নামে এখন ঢাকার এক রাস্তার নাম—বাড়ি, গাড়ি, টেলিফোন সবই আছে—আর কি চাই? আমি একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। ভবের সওদা করে যাঁর ভাবের বেপার শেষ হয় তবে আবার কিসের লোককবি। তিনি হেসে আমাকে বললেন, 'চল না ঢাকায় আমার ঘরের বৈঠকখানায়। দেখবে সেখানে আউল-বাউল নিয়েই আমার আসর। এদের সাথেই আমার দোস্তি। এদের সাথেই গানে গানে আমি দেওয়ানা হৈয়া কান্দি হাসি।'

আমি বললাম, গোড়া থেকেই সুরু করুন। আমার লোকগীতির গবেষণার সাথীরা কাগজ-কলম নিয়ে আর টেপ-রেকর্ডারের মাউথপিস হাতে নিয়ে উন্মুখ। আমি বললাম মহানগরীর কেরানীকুল ফুলবাগিচার শোভা বর্ণনায় যখন বাংলা কাব্য মত্ত, তখন সেখান থেকে আপনি আমাদের চোখ ফেরালেন এক ডালিম গাছের তলে—'ঐখানে তোর দাদীর কবর, ডালিম গাছের তলে।' শুকনো দেশে যখন মেঘের আরাধনায় রুদ্ধ দরবারে মল্লারের কঠিন কালো-য়াতী চলছিল, তখন হঠাৎ আপনার কণ্ঠে আমরা শুনলাম,

... ...

"কালো মেঘা নামো,
ফুলতোলা মেঘ নামো
ধুলট মেঘা, তুলট মেঘা,
তোমরা সবাই নামো।
কালো মেঘা নামো,
নামো চোখের কাজল দিয়া
তোমার ভালে টিপ আঁকিব
মোদের হলে বিয়া—
আড়িয়া মেঘা, হাঁড়িয়া মেঘা,
কাঁড়িয়া মেঘার নাতি
নাকের নোলক বেচিয়া দিব
তোমার মাথার ছাতি।
কৌটাভরা সিন্দুর দিব
সিন্দুরিয়া মেঘার গায়
আজকে যেন দেয়ার ডাকে
মাঠ ডুবিয়া যায়।"

... ...

আজ আবার আমরা আবাহন করছি তুলট মেঘা—সিন্দুরিয়া মেঘাদের। পশ্চিমবঙ্গের কাব্যগানের গাঙের পানি শুকিয়ে এসেছে। কতোরকমের কাঁটা ফুলের দাবি নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। আবার লাগে দেয়া-ডাকা মাঠ-ডুবানো বান। এজন্যই তো আপনার প্রতি কলকাতার এই স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন। শুধু কি সেজন্য? অপসংস্কৃতির নাগপাশে আবদ্ধ পশ্চিমবঙ্গ, ২১শে ফেব্রুয়ারীর ভাষা-আন্দোলনের শহীদদের রক্তে রচিত পূর্ব পাকিস্তানের ভাষা-সাহিত্যের নতুন জীবনবেদ পাঠ করছেন। শুধু কি তাই, এই সেদিন আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় শত শত আত্ম-বলিদানে পূর্ব পাকিস্তানের গ্রাম্যজীবনে যে কৃষিবিদ্রোহের মহাকাব্য রচিত হল—পশ্চিমবঙ্গে মন ভরে, কান পেতে তা-ও শুনেছে। আপনার অভ্যর্থনার পশ্চাৎপট রচনা করেছে—এ সবই। আপনি হয়ত জানেন, বঙ্গভঙ্গের পর, আমাদের রেডিওতে আপনার গান গাওয়া হলে রচয়িতা হিসাবে আপনার নাম ঘোষণা বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল—কারণ আপনি পাকিস্তান ন্যাশনাল।...কিন্তু ভাষা সংস্কৃতির বাঁধন কি এভাবে ছেঁড়া যায়? নতুন করে আবার যখন আমরা সেতু বাঁধতে সুরু করেছি—তখন ছাতিপাটানো সুরে আমাদের সবাইকে আবার গলা মিলাতে হবে। তা ছাড়া আমাদের লোক-সংগীতের চর্চার আর কি মূল্য আছে। তাই বলছিলাম প্রথম থেকেই যদি আবার সুরু করেছি—আপনিও প্রথমদিনকার কিছু কথা আমাদেরকে প্রথমে শোনান।

সেদিনের কলকাতা

"এর আগে কয়েকবার এলেও ১৯২৭ ইংরেজী থেকে অনেকটা স্থায়ি-ভাবে এলাম কলকাতায়। কলকাতার শিক্ষা, সভ্যতা, চালচলনের মধ্যে নিজেকে খাপ খাওয়াতে চাইলেও মনে মনে আমি রয়ে গেলাম সেই ফরিদপুরের গোবিন্দপুরের গ্রাম্য ছেলেটি। শহরের সঙ্গীতের জলসা শুনতে যেতাম—ভালো লাগতো, বিশেষ করে রবীন্দ্র-সঙ্গীত খুবই ভালো লাগতো, কিন্তু তথাপি গ্রামে শোনা গানগুলিতে যে কী যাদু ছিল—আমাকে পাগল করে দিত। কিন্তু শহরের শিক্ষিতের দরবারে তার অবহেলা দেখে আমার মনে খুব দুঃখ

হতো। কিন্তু এ সময় হলো অসহযোগের Back to Village—আন্দোলন: 'গ্রামে চলো'র আন্দোলন। আমাকে সে নতুন উন্মাদনা দিল। তখন এ কাজে সবচেয়ে বেশি উৎসাহ ও প্রেরণা পেয়েছি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দীনেশচন্দ্র সেনের কাছে। কিছু উৎসাহী যুবক ও যুবতীকে নিয়ে গ্রাম্যসঙ্গীত প্রচারের কাজে লেগে গেলাম। কিন্তু তখন কলকাতাতে এ কাজটা সহজ ছিল না। কিন্তু আমি জানতাম বাংলাদেশ কলকাতার দিকেই তাকিয়ে থাকে—কলকাতাকে দেশের লোক অনুসরণ ও অনুকরণ করে—কাজেই কলকাতার অনাবাদী মাটিতে ফসল ফলাতে হবে—সংকল্প নিলাম। কলকাতার কলেজে কলেজে বক্তৃতার আয়োজন করতাম—গান সহযোগে। শুধু কলকাতা নয়—একাজে তখন বাংলার অনেক জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি। এই অভিযান চলাকালীন বীরভূমে সিউড়িতে গুরুসদয় দত্তের সাথে দেখা হলো। গুরুসদয় দত্তের উদ্যোগে গঠিত হ'ল Rural Heritage Revival Society—গুরুসদয় দত্ত হলেন সভাপতি আর আমি হলাম সেক্রেটারী। সে সময়কার শিক্ষিতসমাজে লোকসঙ্গীতের কদর কি ছিল তা বুঝতে পারবে একটি দৃষ্টান্ত দিলে। সে সময় আমাদের সোসাইটির সভাপতি হিসাবে গুরুসদয় দত্ত পত্রিকায় এক বিজ্ঞাপন দেন—'যিনি আমাদের কাছে এসে লোকসঙ্গীত শিক্ষা করবেন—তাঁকে মাসে মাসে পনের টাকা করে মাসিক বৃত্তি দেওয়া হবে।' আমিই প্রধান শিক্ষক। ছাত্র জুটলো মাত্র একটি। নাম তার বিনয়কৃষ্ণ ঘোষ। গানের হাতেখড়ি হয়েছিল ভীমনাগের বড় সন্দেশ দিয়ে, অন্তত মিষ্টির প্রলোভনেও ছাত্রটি যাতে নিয়মিত আসে।"

মুরশিদ কবি জসিমউদ্‌দীনের কাছে তাঁর প্রথম ছাত্র বিনয়বাবু কলকাতাতেই আছেন জেনে তাঁকে খুঁজে বার করেন। তাঁর কাছ থেকে মুরশিদ জানতে পারেন যে, প্রথম যে দু'টি গান তিনি কবির কাছে শিখেছিলেন সে দু'টি হ'ল:

ঘাটে লাগাও রে নাও—
আমি চিন্যা লই বেপারীরে।
যাইলাম তরী ঘাটারে ঘাটে
না পাইলাম রে কূল—
এই ঘাটে ভাসিয়া গেছে,
আমার, সুবর্ণের ফুল॥
—ইত্যাদি

অন্য গানটি হ'ল:

আগে জানিনা রে দয়াল
এমন হবে রে,
আগে না জেনে পাছে না শুনে
প্রেম যেজন করে—
যেমন আগুন তুষের ধুমে
সদা জ্বইলে জ্বলে ওঠে রে॥
—ইত্যাদি

লোককবি তাঁর সেদিনকার কলকাতার পাথুরে পথে গ্রামের শ্যামল মাটি ছড়াবার কাহিনী বলে চললেন। আরো উৎসাহী যুবক-যুবতী যাঁরা সেদিন জুটেছিলেন তাঁদের মধ্যে বিশেষ করে বিমলকৃষ্ণ দত্ত (জলী দত্ত) এবং নমিতা দত্তের নাম করলেন। শ্রীদত্ত কবির অনেক গান রেকর্ড করেছিলেন। এর মধ্যে কবির নিজের রচনা ছিল কয়েকটি। তার মধ্যে 'পাখি কইও বন্ধুয়ার লাগ পাইলে'—'আমার হাড় কালা করলাম রে' ও বাদিয়া সম্মুখে নাচে তোর'—প্রভৃতি গান সে সময় অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

সেদিন জসিমদা'র দলে যাঁরা ছিলেন তাঁরা সবাই নাচ, গান, ছবি আঁকা কিছু না কিছু জানতেন। অনেকটা এ্যামেচারী ব্যাপার তাতে থাকলেও—তাঁরা নিজেদের চারণ বলেই ভাবতেন—তাই সঙ্কোচ, লজ্জা ভয় কিংবা প্রতিকূল সমালোচনা তাঁদের দমাতে পারে নি। এইরকম একটি দল নিয়েই তাঁরা শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে শোনাতে। রবীন্দ্রনাথ সপ্রশংস দৃষ্টিতেই সব দেখেছিলেন এবং পরে আলোচনাও করেছিলেন। কিন্তু সেখানে অনেক ছাত্রেরই তা ভাল লাগে নি। কবি জসিমউদ্‌দীন আমাদের হেসে হেসে বলেছিলেন—কোনো কোনো ছাত্র নাকি তাঁদের শুনিয়ে বলেছিল—"এদের ঘুঁটের মালা দিতে হয়।"

লোককবি বললেন, ইতিমধ্যে আব্বাসউদ্‌দীন কলকাতায় এসে গেছেন। তাঁকে নিয়ে প্রথমে প্রথমে তিনি কলেজে কলেজে এবং অনেক বিশিষ্ট লোকের বাড়িতে গানের ও আলোচনার বৈঠক সংগঠিত করেন। কিন্তু পরে গ্রামোফোনে লোকসঙ্গীতের সাফল্যে ও আব্বাসউদ্‌দীনের ব্যক্তিগত সাফল্যে গ্রামোফোনের দিকেই বিশেষ নজর পড়লো সকলের।

"জাপানী খদ্দর"

গ্রামোফোনের কথা আসতেই আমি তার ব্যবসায়িক সাফল্য এবং জনপ্রিয়তার খাতিরে রচনার মধ্যে 'গ্রাম্যতা'কে পরিমার্জিত করার উল্লেখ করলাম। সাপ্তাহিক বসুমতীতে মুরশিদের শেষ লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিলাম। এখানে আমাদের আলোচনা লোকসঙ্গীতের কয়েকটি গভীর সমস্যার বাঁকে মোড় ফিরলো।

সেদিন ছিল শিক্ষিত ভদ্রশ্রেণীকে দিয়ে গ্রহণ করানোর সমস্যা। কাজেই খাঁটি গ্রাম্যভাষার যে সব গান ওদের কাছে দুর্বোধ্য ছিল তাতে কিছু ভাষার অদলবদল করতে হয়েছে। দ্বিতীয়ত গ্রামোফোন কোম্পানীর কর্তারাও "লোকে নেবে না" বলে ভাষাকে মার্জিত না করে রেকর্ড করতে চাইতেন না কিছুতেই। তৃতীয়ত সংগ্রহ বললে যে টাকা পাওয়া যেত, নিজের রচনা বললে দক্ষিণা তার চেয়ে অনেক বেশি মিলতো। এই প্রলোভনও পিছনে কাজ করছিল। আরেকটা সমস্যা ছিল, দেহতত্ত্বের জবকৎ, মালাকুত কিংবা 'আটকুঠুরী নয় দরজা' প্রভৃতি সেদিনের, এমন কি আজকেরও শিক্ষিতশ্রেণীর কাছে দুর্বোধ্য। সেদিক দিয়েও দেহতত্ত্বের গানকে অনেক সময় প্রেমের গানে রূপান্তরিত করতে হয়েছিল। সেদিনের সে সব সমস্যা উল্লেখ করতেই কবি জসিমউদ্‌দীন একটি উপমা দিয়ে বললেন: গানের মুখটি মৌলিক গ্রাম্য-গীতির কথা রেখে বাকী অংশের কথা অনেক সময় আমরা কিছু অদল-বদল করেছি, যেমন, অত্যন্ত জনপ্রিয় গান—ওরে ও রঙিলা নায়ের মাঝি। মূল গানটির কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

ওরে ও রঙিলা নায়ের মাঝি,
এই ঘাটে লাগাইয়া নাও, নিগূঢ় কথা
কইয়া যাও শুনি
কাওয়াতো কাণ্ডারী নৌকার—
শকুন ভাণ্ডারী
বনের শৃগাল বলে আমি
এই নৌকার বেপারী॥
—ইত্যাদি

মূল গানের মুখটি আমি ঠিকই রাখলাম। কিন্তু অন্তরা বদলিয়ে রচনা করলাম:

তোমারনি পরাণ রে বন্ধু
হরিয়াছে কেউ
কলসী ভাসাইয়া জলে
গণে গাঙের ঢেউ॥
—ইত্যাদি

আমি বললাম, এ রচনা ঠিক আছে—আপনার অধিকারও অস্বীকার করবো না। কিন্তু যখন লিখলেন, "কইব কথা শিশিরের সনে" তখন কিন্তু মৌলিক থাকলো না হ'লো রাবীন্দ্রিক। তিনি স্বীকার করলেন এবং বললেন: "দেখ তখন মোটা খদ্দর কেউ পরবে না বলে—আমরা কিছু 'জাপানী খদ্দরও' দিয়েছিলাম।" আমি বললাম সে কথা বুঝি, কিন্তু আজ বাংলায় চলেছে প্লাস্টিকের খদ্দর। সে সমস্যা নিয়েই আপনার সঙ্গে আসল আলাপ। কিন্তু আজ তো আলোচ্য বিষয় অসমাপ্ত রইলো। আমার গরীবের মোকামে আপনার দাওয়াত রইলো, সেদিন আলাপ করবো সব।

গ্রন্থ পরিচয়

অন্তর্লীন গৌরী রাগমালা : শ্রীদিলীপকুমার রায় : অধ্যয়ন, ২০৩, গোবিন্দ সেন লেন, কলিকাতা-১২। মূল্য : দশ টাকা।

দিলীপকুমারের সাহিত্য-কীর্তির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমরা দেখি যে বাংলা ভাষায় সামান্য যে-কজন লেখক সার্থক ইণ্টেলেকচুয়াল উপন্যাস লিখেছেন তিনি তার মধ্যে অন্যতম। তাঁর ছ'টি মননপ্রধান রোমান্সের মধ্যে শেষটি হল 'তরঙ্গ রোধিবে কে'। এই বইটির থেকেই তাঁর লেখার মধ্যে নানাবিধ আধ্যাত্মিক ভাবনার সন্ধান আমরা পাই।

অবশ্য এ-ব্যাপারটি আকস্মিক নয়। দিলীপকুমারের ইণ্টেলেকচুয়াল উপন্যাসগুলিতেও বুদ্ধির প্রাধান্যই সবচেয়ে বড় কথা নয়। দিলীপকুমার একজন complete Artist, তাই বুদ্ধিকেই শ্রেষ্ঠ দিশারী বলে মেনে নিতে তিনি পারেন নি। মানুষের জীবনে ভাব ও আবেগের গুরুত্বকে তিনি কোনদিনই অস্বীকার করেন নি। প্রকৃত গুণগ্রাহী বলেই তিনি একদিকে যেমন রাসেলের দ্বারা আকৃষ্ট হয়েছেন অপরদিকে ভক্তিমার্গের মূল সুরটুকু বিভিন্ন সাধকদের থেকে উপলব্ধি করতে তাঁর অসুবিধা হয় নি।

বর্তমান গ্রন্থটিতে নয়টি গল্প ও একটি নাটিকা রয়েছে। গল্পগুলি পড়ে মনে হয় না এগুলি সম্পূর্ণভাবে বানানো কথা। বহু তথাকথিত ঈশ্বরে অবিশ্বাসী মানুষের চরিত্র চিত্রণে যে দক্ষতা ফুটে উঠেছে তা সত্যিই অসামান্য। প্রসঙ্গক্রমে শেক্সপিয়রের Measure for Measure-এর একটি অংশের যে অনুবাদ তিনি করেছেন তা হল :

"সামান্য ক্ষণায়ু শক্তিমদান্ধ দাম্ভিক নর, হায়,/না জানি, স্ফটিকশুভ্র জন্মসত্য দেবত্ব আপন/ক্রোধে অন্ধ বানরের মত করে কুশ্রী হানাহানি/দেখি' যাহা স্বর্গে দুঃখে দেবগণও করেন ক্রন্দন।"

কিন্তু এর চেয়েও বড় কথা ভক্তিমার্গকে অনুসরণ করবার জন্য যে আকূতি তাঁর রচিত বিভিন্ন চরিত্রের মধ্যে দিয়ে উদ্ঘাটিত হয়েছে, তা কখনো ভোলা যায় না। দ্বিজেন্দ্রলাল বলেছিলেন :

পরের দুঃখে কাঁদিতে শেখা—
তাহাই শুধু চরম নয় :
মহৎ দেখে কাঁদিতে জানা—
তবেই কাঁদা ধন্য হয়।

দিলীপকুমারের এই গ্রন্থটিতে গৌরী রাগের এমনই এক মূর্ছনা সর্বত্র ধ্বনিত হয়ে উঠেছে।

পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের লোকসাহিত্য (উৎস ও অভিপ্রায়) : শ্রীসুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায়। সাহিত্য প্রকাশ, কলকাতা-৯। মূল্য : দশ টাকা।

সাম্প্রতিককালে লোকসাহিত্যের প্রতি সুধীজনের আগ্রহ যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনি তার চর্চাও বহুল পরিমাণে বেড়ে গেছে। গ্রন্থকার শ্রীসুভাষ বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসাহিত্যের ছাত্র এবং গবেষক। যে বিষয়বস্তুর ওপর তিনি আলোচনা করতে চেয়েছেন তা নিঃসন্দেহে প্রশংসা পাবার যোগ্য।

গ্রন্থনামের মধ্যে যে ব্যাপকতা আছে, গ্রন্থান্তর্গত বিষয়বস্তুর মধ্যে তার অভাব বড় ব্যাপক। লেখক কার্যত তিনটি জেলার কয়েকটি গ্রামের উপর বিশেষ দৃষ্টি নিবদ্ধ করে (পৃঃ ৩১) সমগ্র পশ্চিম সীমান্ত বঙ্গের লোকসাহিত্যের আলোচনায় ব্রতী হয়েছেন। দ্বিতীয় প্রবাদ, পুরোকথা, ইতিকথা ইত্যাদি বিষয় সম্পূর্ণরূপে বাদ দিয়েছেন। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মূল্যবান ভূমিকাটি স্মরণ করিয়ে দেয় স্থানসীমা ও বিষয়বস্তুর দিক থেকে গ্রন্থনাম সার্থকতা লাভ করে নি।

প্রাচীন ধারানুসরণ করেই লেখক আলোচনায় নিমগ্ন হয়েছেন। গবেষণার ক্ষেত্রে যে "সমাজতত্ত্ব ও বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার ও বিশ্লেষণ" (পৃঃ ২৫) করবার প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন তা কিন্তু বহুলাংশেই প্রয়োগ করতে পারেন নি। যেমন কিংবদন্তীমূলক বিজয়সিংহের কাহিনী কিংবা প্রয়োজনহীন রাঢ় অধ্যায়ের সংযুক্তি অথবা ভাদু-উৎসব ও গো-উৎসবকে ব্রতকথা বলার প্রচেষ্টায় যুক্তির প্রয়োগ নেই। তাছাড়া ধর্ম ও লোক-উৎসবের অসম্পূর্ণ আলোচনা কিংবা বহিরাগত ইতুব্রতকে আলোচ্য অঞ্চলের ব্রতরূপে নির্দেশ করবার বাসনাও যুক্তির পথে আসে নি। সর্বোপরি গ্রন্থান্তর্গত স্থানসীমার ও লোকসাহিত্যের নিজস্ব চরিত্র বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ উদ্ঘাটনে লেখক কোন নতুন দিক দেখাতেও সক্ষম হন নি।

ছাত্রের এ সমস্ত ভুলত্রুটি ডঃ ভট্টাচার্য তাঁর সুদীর্ঘ মূল্যবান ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। মনে হয় লেখকের আরও অনেক সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ছিল।

গবেষণামূলক গ্রন্থে ডায়েরীপ্রধান রচনাভঙ্গী অপ্রয়োজনীয় হলেও এ গ্রন্থে তা পাঠকের কাছে প্রীতিপ্রদ। বেশ কিছু নতুন উপকরণ ভবিষ্যৎ গবেষকদের কাজে লাগবে। বেশি করে কাজে লাগবে ডঃ ভট্টাচার্যের মূল্যবান ভূমিকাটি। গ্রন্থের প্রচ্ছদ ও বাঁধাই সুন্দর।

প্রথমা (শ্রীপঞ্চমী, ১৩৭৫), তপতী ঘোষ। ৩০, রাজকুমার মুখার্জী রোড, কলকাতা-৩৫। দাম : এক টাকা।

লেখিকার প্রথম কাব্যগ্রন্থ। মোট ২৮টি কবিতা আছে। প্রাচীন রীতির কবিতা।

বঙ্গবাসী মর্নিং কলেজ পত্রিকা (চতুর্থ সংখ্যা, ১৯৬৮)।

বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দী এই তিন বিভাগে ভাগ করা কবিতা, গল্প ও মূল্যবান প্রবন্ধে সমৃদ্ধ সুন্দর ও সুরুচিপূর্ণ বঙ্গবাসী মর্নিং কলেজ পত্রিকাটি ভাল লাগল। বাংলা বিভাগে সুমেরুশেখর চাকীর কবিতা (গোর্কী : তোমাকে), শ্যামল গুহের কবিতা (সাম্রাজ্য, শান্তি, মানবতা), এ ই আই মারুফুল হক-এর প্রবন্ধ (কবি নজরুল), প্রদীপ চৌধুরীর গল্প (দৃষ্টি), গৌরমোহন মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ (লেখকের সাফল্য), মিলন দত্তের গল্প (উত্তাপ) প্রভৃতি উল্লেখের দাবি রাখে। ইংরাজী বিভাগে অধ্যক্ষ পি কে বোস-এর (Wordsworth as a Poet of Nature), অধ্যক্ষ এ কে রায়চৌধুরীর (Tagore's Search for Truth), অধ্যাপক জে কে দাস-এর (Twentieth Century English Poetry) প্রভৃতি অত্যন্ত মূল্যবান রচনা। অধ্যাপক এস কে চ্যাটার্জীর একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধও মুদ্রিত হয়েছে (The object of Mathematical Research). সুপ্রকাশ ঘোষের কবিতাটি (The Unattainable) ভাল লেগেছে। হিন্দী বিভাগে লিখেছেন অধ্যক্ষ অনিলকুমার রায়চৌধুরী, অধ্যাপক রামধ্যান সিংহ, ডঃ কৃষ্ণবিহারী মিশ্র, অশোককুমার গুপ্ত প্রভৃতি।

রঙ্গজগৎ

ভিয়েৎনামের সংস্কৃতিবাহিনী

দক্ষিণ ভিয়েতনামে একটি নতুন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র জন্মগ্রহণ করেছে। বিশ্বের বহু দেশ এই সরকারকে সমর্থন জানিয়েছেন, এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে সাম্রাজ্যবাদী শোষণ অবসানের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন।

এই নতুন রাষ্ট্রের জন্মের জন্য দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্তিযোদ্ধারা অভিনন্দন লাভ করেছেন। কিন্তু তাঁদের পাশে যে বিরাট সাংস্কৃতিক বাহিনী কাজ করেছে, তাঁদের কথাও স্মরণ করা উচিত। এই সাংস্কৃতিক কর্মীরা যেভাবে কাজ করেছেন এবং যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, ইতিহাসে তা উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকবে। কিছুকাল আগে কলকাতায় আমরা দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্ত অঞ্চলের কয়েকটি ছবি দেখেছিলাম। প্রবল বোমাবর্ষণ, হত্যা ও গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে দেবার মধ্যেও কিভাবে তাঁরা ছবিগুলি করেছেন দেখে আমরা বিস্মিত হয়েছি। মুক্তিসেনারা যেমন সাম্রাজ্যবাদী সৈন্যদের বিরুদ্ধে বন্দুক নিয়ে মোকাবিলা করেছেন; সাংস্কৃতিক কর্মীরা তেমনি ক্যামেরা নিয়ে সেই ছবিগুলি তুলে রেখেছেন জীবন বিপন্ন করে। তারপরে জঙ্গলের মধ্যে ঘাঁটিতে গিয়ে ছবির রাসায়নিক কাজ থেকে সম্পাদনা পর্যন্ত সব কাজ সম্পাদন করে রীলের পর রীল সাজিয়েছেন। এভাবে মুক্তিসংগ্রামের সংবাদ ছবির মাধ্যমে তাঁরা নিজেদের জনগণের মধ্যে এবং বিদেশে পৌঁছে দিয়েছেন। এই ছবিগুলি দেখে বিশ্বের মানুষ বুঝেছে কি নিষ্ঠুর শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করতে হচ্ছে দক্ষিণ ভিয়েতনামের মানুষের; এবং মুক্তিযোদ্ধাদের শক্তির উৎস কোথায়। শুনলে আশ্চর্য হতে হয়—দক্ষিণ ভিয়েতনামের মুক্ত অঞ্চলে দুটি ফিল্ম স্টুডিও কাজ করছে। একটিতে নির্মিত হয় ডকুমেণ্টারী ছবি, অন্যটিতে কাহিনীচিত্র। বছরে এদের নির্মিত ছবির সংখ্যাও কম নয়।

মুক্তিফৌজের সঙ্গে সঙ্গে সাংস্কৃতিক বাহিনী মুক্ত অঞ্চলে নিরক্ষরতা দূর করা, লোকসঙ্গীত সংগ্রহ করা এবং জনগণকে নতুন সংস্কৃতি সৃষ্টির জন্য উৎসাহ দেওয়ার যে ভূমিকা পালন করেছে তাও বিস্ময়কর। যে গ্রামে দিনের বেলা মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিমান থেকে বোমা বর্ষিত হল, রাত্রে সে গ্রামে

কল্যাণী রায় সম্প্রতি দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার কয়েকটি দেশে সেতার বাজিয়ে বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেছেন।

সংস্কৃতিবাহিনী গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করে, গ্রামবাসীদের গান শুনিয়ে, সুযোগ বুঝে নাটক অভিনয় করে নতুন জীবনের পথে উদ্দীপিত করেছে। গ্রামবাসীদের জীবনের ঘটনা নিয়ে নতুন করে নাটক রচনা করেছে, সেই নাটক অভিনয় করে দেখিয়েছে। গ্রামে গ্রামে চিত্র প্রদর্শনী করে এক প্রান্তের সঙ্গে আরেক প্রান্তকে পরিচিত করেছে। সংস্কৃতিবাহিনীর লোকেরা সৈন্যদের মত পিঠে বেঁধে জিনিসপত্র নিয়ে গ্রামের পর গ্রাম সফর করেছে। তাঁদের অভিনয় দেখবার জন্য এবং গান শোনবার জন্য গ্রামবাসীরা জমায়েত হয়েছেন। দেখা গেছে এরূপ জমায়েতের ওপর যখন বোমাবর্ষণ হয়েছে তখন সংস্কৃতিবাহিনী সমবেত মানুষদের পরিখায় নিয়ে গিয়ে আশ্রয় দিয়েছেন, এবং প্রয়োজনবোধে নিজেরা বন্দুক নিয়ে লড়াই করেছেন। লোকসঙ্গীতের সুর সংগ্রহ করে সেই সুর প্রয়োগ করে নতুন করে গান বেঁধেছেন আজকের জীবনের অভিজ্ঞতায়। এই গানগুলিই আজকাল জনগণের মুখে মুখে শোনা যাচ্ছে। জনগণের সাংস্কৃতিক পিপাসা এতে এত বেড়ে যায় যে, মুক্ত অঞ্চলে সাহিত্য পাঠকের সংখ্যা সাইগনের চেয়ে অনেক বেশি। একটা দৃষ্টান্ত থেকে তা বোঝা যাবে। লেখক আন দুক-এর বাস্তবধর্মী উপন্যাস 'হন দাত'-এর প্রথম সংস্করণ ছাপা হয়েছিল দশ হাজার কপি, এবং তা অল্প সময়ের মধ্যে বিক্রি হয়ে গিয়েছিল। এত রক্তক্ষয়ের মধ্যে জাতীয় সাহিত্যিক ও বীরদের জন্মোৎসব পালন ইত্যাদি কাজগুলি সংস্কৃতি-কর্মীরা নিপুণভাবে করে গেছে। মুক্ত অঞ্চলে সংবাদপত্র প্রকাশ হয়েছে এবং তা গ্রামে গ্রামে সংস্কৃতি-কর্মীরা পৌঁছে দিয়েছে।

সাইগনে যখন সংস্কৃতির নামে হতাশা, নৈরাজ্য, অসুস্থ মানসিকতা, বিকৃত যৌনাচার ও খুন-খারাবির ছবি গল্প ও গানের স্রোত চলছিল। সাম্রাজ্যবাদী বাহিনীর তৃপ্তির জন্য অপসংস্কৃতির সরবরাহ চলছিল, তখন মুক্ত অঞ্চলে সাংস্কৃতিক বাহিনী সৃষ্টি করে চলেছে এক বিপ্লবী মানবিকতার সাহিত্য, চলচ্চিত্র ও সঙ্গীত, যা মানুষকে আশাবাদে উজ্জীবিত করে, সংগ্রামের প্রেরণা দেয়। তাই আজকের বিজয়ী দক্ষিণ ভিয়েতনামে নতুন রাষ্ট্রের জন্ম সংবাদে এই সংস্কৃতিবাহিনীর মহৎ অবদানের কথা স্মরণ করি। এই সংস্কৃতি বীরত্বপূর্ণ মানবিকতার সংস্কৃতি। —সুজন।

চিত্রসমালোচনা

চেনা অচেনা

[পরিচালনা : হীরেন নাগ]

সাহিত্যিক আশাপূর্ণা দেবীর 'সুয়োরাণীর সাধ' গল্প অবলম্বনে চিত্র-রথ-এর 'চেনা অচেনা' ছবিটি মুক্তিলাভ করেছে। কাহিনীর নায়িকা এক ধনীর নাতনী। বিরাট বাড়িতে, প্রচুর ধন-দৌলতের মধ্যে দাদু থাকেন একমাত্র নাতনী তামসীকে নিয়ে। সংসারে যার কোন অভাব নেই, প্রয়োজনের বেশি পরি-চারকের সাহায্য পায় যে তার কিনা সাধ হল গরীব হবার। এদিকে দাদুর পছন্দ-মত বড়লোকের ছেলে তাকে বিয়ে করার জন্য ঘুর ঘুর করছে পেছনে। কিন্তু বড়লোকে অরুচি ধরে গেছে মানসের সঙ্গে দেখা হবার পর। মানস অত্যন্ত গরীব পরিবারের ছেলে। একটা সওদাগরী অফিসের কেরানিমাত্র। একদিন এক অনুষ্ঠান শেষে মানসের সঙ্গে তামসীর দেখা। একদিনের দেখাতেই মানসকে মনে ধরে গেল। তারপর থেকে মানসের মনে সে স্থান করে নিয়েছে এবং তার মনে রঙ ধরিয়ে দিয়েছে নিজেকে গরীব সাজিয়ে। পরিচয় দিয়েছে সে এক বড়-লোকের বাড়িতে চাকরি করে। মানস যখন তামসীকে নিয়ে কল্পনার সৌধ রচনা করছে এমন সময় জানতে পারল তামসী তাকে মিথ্যা পরিচয় দিয়েছে। সে দূরে সরে যেতে চাইল, কিন্তু তামসী চাইল ওকে বুঝতে কেন সে মিথ্যা পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু কিছুতেই যখন কিছু হল না তখন সে দাদুকে মত জানাল বড়-লোকের ছেলেটিকে বিয়ে করতে। বিয়ের আসরে যখন বর আসছে, সে সেজেছে নববধূর সাজে, এমন সময় হঠাৎ তামসী উধাও হয়ে গেল। সে ছুটে চলে গেল মানসের কাছে। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখল মানসরা বাড়ি ছেড়ে চলে গেছে। তামসী তখন মানসকে খুঁজে বার করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, এমন সময় মানস এবং তার কিছুক্ষণ পরেই দাদু উপস্থিত। শেষ পর্যন্ত তামসী-মানসের মিলনে দাদু আশীর্বাদ করে কাহিনী শেষ করলেন।

ছবির দর্শকরা হয় গরীব মানুষ। কাজেই গরীবদের একটু ওপরে তুলতে পারলে, বিশেষ ধনী আর গরীবে মিলন ঘটাতে পারলে ছবির ব্যবসাটা লাভের হয় এমন ধারণা থেকে এ ধরণের ফর্মুলা ছবির সৃষ্টি। কাজেই বাস্তব এবং যৌক্তিকতার কথা কাহিনীকাররা গ্রাহ্যই করেন না। গরীব আর ধনীর ছেলে-মেয়েতে প্রেম হতে পারে, কিন্তু সে প্রেমের নিশ্চয়ই একটা আদর্শগত ভিত্তি থাকবে। তা যদি না থাকে তবে বাস্তব-তার ছোঁয়ায় মনে রেখাপাত করতে পারে না। বরঞ্চ কিছুটা দর্শকদের ধনী-দারিদ্রের সম্পর্ক সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি করে জীবনসংগ্রামকে বিভ্রান্ত করে। সুতরাং এ ধরণের কাহিনীচিত্র মানুষের অন্তরকে জ্ঞানের আলোয় আনন্দময় করে না, ভুল ধারণার সৃষ্টি করে।

ছবিটিকে বাস্তবধর্মী দাবি করা হলেও শেষ দৃশ্যটি (মানসের বাড়িতে

নিউ এম্পায়ারে 'সুইট নভেম্বর' ছবিতে স্যান্ডি ডেনিস।

দীপেন গুপ্ত পরিচালিত 'বনজ্যোৎস্না' ছবিতে মীনাক্ষী দত্ত

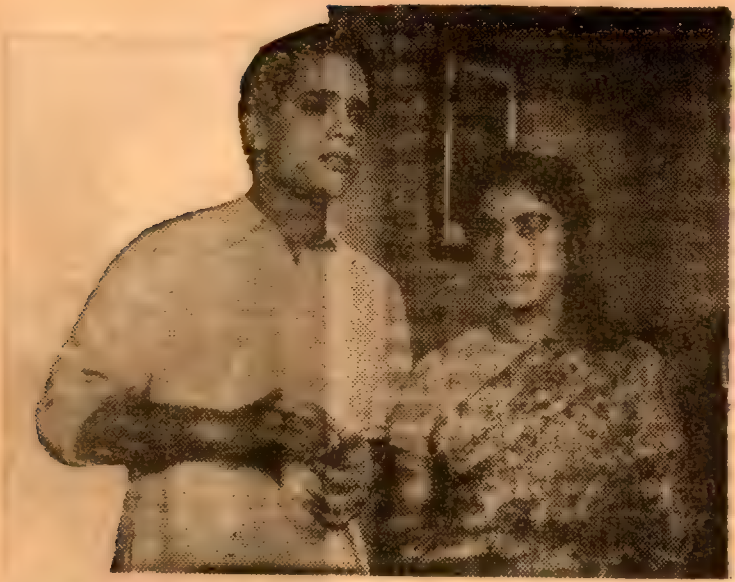

'আমার স্বপ্ন' ছবিতে মৃণাল মুখার্জী ও রীণা ঘোষ। পরিচালনায় সুধীর মুখার্জী

মানসীর উপস্থিতি হওয়া ও মানসের উপস্থিতি) নেহাৎ জোর করে ঘটানো। তবে নদীর ধারে দু-জনের বেড়াবার দৃশ্যগুলি সত্যিই উপভোগ্য।

অভিনয়ে সুমিতা সান্যাল প্রশংসনীয় অভিনয় করেছেন। কয়েকটি মুহূর্তে তাঁকে খুবই ভাল লেগেছে। সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় মানসরূপে যথাযথ অভিনয় করেছেন। দাদু হয়েছেন বিকাশ রায়। অন্যান্য ভূমিকায় আছেন: জহর রায়, ছায়া দেবী, বিদ্যা রাও, বঙ্কিম ঘোষ, অজয় গাঙ্গুলী প্রমুখ।

নাটকের কথা

চরিত্রহীন

সম্প্রতি স্টার থিয়েটারে শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' কাহিনীর নাট্যরূপ পরিবেশন করেছে "সেন-র‍্যালে অ্যান্ড অ্যাসোসিয়েটস রিক্রিয়েশন ক্লাব"-এর সদস্যবৃন্দ। এই অভিনয়ে দলগত অভিনয়-নৈপুণ্য বিশেষ প্রশংসার দাবি রাখে। নির্দেশনায় ছিলেন গোবিন্দ গাঙ্গুলী, কাহিনী সম্পাদনার কৃতিত্বও তাঁরই; পান্নালাল মৈত্র ও রথীন দাশগুপ্ত যথাক্রমে 'বেহারী' ও 'উপেন' চরিত্র দুটিতে অভিনয় করেন। অন্যান্য ভূমিকায় অভিনয় করেছেন: মধু ঘোষাল, সুকুমার ঘোষ, দিব্যেন্দু দাশগুপ্ত, তাপস লাহিড়ী ও অমিতাভ ঘোষ, দিলীপ সেনগুপ্ত, প্রণয় সোম, বরেণ্য মুখোপাধ্যায়, সুশান্ত নাথ, মুকুল রায়, চিত্ত ভট্টাচার্য, অতুল মান্না, শ্যামদাস সাহা, বিমল রায়চৌধুরী, মিতা চ্যাটার্জী, তপন মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা পাল, শম্ভু ঘোষাল, গীতা প্রধান, প্রবীর ভট্টাচার্য, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

পশ্চিম ভারতে যোগেশ দত্তের মূকাভিনয়

সম্প্রতি মূকাভিনেতা যোগেশ দত্ত বোম্বাই, আহমেদাবাদ, বরোদা, পুণা ও আরো কয়েকস্থানে তাঁর মূকাভিনয় প্রদর্শন করে প্রভূত প্রশংসা লাভ করেছেন। তাঁর সফর শুরু হয় বোম্বাই-এর শ্রেষ্ঠ মঞ্চ বিড়লা মাতুশ্রী হলে। এই হলে তিনি দু'দিন অভিনয় প্রদর্শন করেন। প্রথম দিনের অনুষ্ঠান শেষে ফরাসী রাষ্ট্রদূত মিঃ এস, কোঁবিলি বলেন, ভারতবর্ষে মূকাভিনয়ের শুরু যদিও অল্প দিন, কিন্তু এই অল্পদিনের মধ্যে ভারতীয় মূকাভিনয় বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় পিছিয়ে নেই। আজ যোগেশ দত্তের অভিনয় দেখে তার পরিচয় পেলাম। বোম্বাই-এর পত্রপত্রিকায় শ্রীদত্তের প্রশংসা করে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। বোম্বাই-এর পরে আহমেদাবাদে মূকাভিনয় প্রদর্শন করে সেখানেও দারুণ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেন।

স্টুডিও খবর

মহরৎ : এপার-ওপার

কুশল প্রোডাকসন্সের প্রথম ছবি 'এপার ওপার'-এর মহরৎ অনুষ্ঠিত হয়েছে গত ১৫ই জুলাই ইন্দ্রপুরী স্টুডিওতে। সমরেশ বসু রচিত কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করবেন আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালনা করবেন সুধীন দাশগুপ্ত। প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করেন: সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা সেন, সমিত ভঞ্জ ও অরূপ বসু।

সেতার শিল্পী কল্যাণী রায় দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশে দেশে সম্বর্ধনা লাভ

পশ্চিমবাংলার সেতার শিল্পী শ্রীমতী কল্যাণী রায় সম্প্রতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ সফর করে দেশে ফিরেছেন। এক সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলের তিনি ছিলেন অন্যতমা প্রধান সদস্যা; অধ্যক্ষ মধ্যমণি। হংকং, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, শ্যাম, সিঙ্গাপুর, প্রভৃতি দেশে এই সাংস্কৃতিক দল যে সুখ্যাতি ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছে তার তুলনা হয় না। বিশেষ করে কল্যাণী রায়ের সেতার শুনে দক্ষিণ ভারতীয় শ্রোতারা এত মুগ্ধ হয়েছে যে, খবরের কাগজগুলিতে তাঁকে নিয়ে অজস্র প্রশস্তি রচিত হয়েছে। পত্রিকাগুলিতে শিরোনামা ছিল: 'মেলোডি কুইন অব ইন্ডিয়া'; "ওয়ার্ল্ড ফেমাস সিতার প্লেয়ার এট সিঙ্গাপুর"। প্রায় সব দেশেই কল্যাণী রায়ের সেতার বাজনা টেলিভিশন হয়েছে। অনুষ্ঠানের দু-একদিন আগে সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। যেখানে ভারতীয় আছেন সেখানে ভারতীয়দের জন্য তাঁরা স্বতন্ত্র প্রোগ্রাম করেছেন। শ্রীমতী রায় বললেন, তাঁর সেতার শুনে এত বিমুগ্ধ হবার মত শ্রোতা তিনি দেশে পান নি; সেতার শুনে চোখে জল দেখে তিনি নিজেও বিস্মিত হয়েছেন। অনেকে তাঁকে জানিয়ে গেছেন এই সঙ্গীতের সঙ্গে কোথায় যেন তাঁদের প্রাণের যোগ রয়েছে। বহু শ্রোতা নিজের নাম গোপন রেখে তাঁকে উপহার পাঠিয়েছেন। ইন্দোনেশিয়ার এক ভারতীয় তাঁদের দলের প্রত্যেককে দশ হাজার রুপাইয়ার একটা করে খাম দিয়ে প্রীতি জানালেন।

হংকং-এ ইন্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স শ্রীমতী রায়ের জন্য দু-দিন প্রোগ্রাম করেছিলেন। হংকং 'ঈগল নেস্ট'-এ বাজানোর পর পৃথিবীর নানা দেশ থেকে তাঁর উদ্দেশ্যে আমন্ত্রণ আসতে থাকে। হংকং-এ শ্রীমতী রায় এত জনপ্রিয় হয়েছিলেন যে, লিফটে, হোটেলে,

দোকানে যেখানেই গেছেন নানা দেশের লোক তাঁদের ঘিরে ধরে অভিনন্দন জানিয়েছে।

হংকং থেকে ৪ঠা জুন তাঁরা ম্যানিলা গিয়েছিলেন। সেখানে শ্রীমতী রায় যেমন ভারতীয় সঙ্গীত বাজালেন, তেমনি প্রেসের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠানে ফিলিপাইনের একটা বিখ্যাত গান সেতারে বাজিয়ে তাঁদের বিস্মিত করে দিলেন। ফিলিপাইনের আর্টস কাউন্সিল উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বাজাবার জন্য শ্রীমতী রায়কে বিশেষ অনুরোধ করা হয়। তারপরে সংগীতরসিকদের বিশেষ অনুরোধে তিনি আবার আর্ট গ্যালারীতে বাজান। বাজনার শেষে শ্রোতারা বলতে থাকেন 'সী সিঙস্ উইথ সেতার'। ম্যানিলার পত্রিকায়ও লেখা হয়েছে 'শ্রোতারা অনুভব করবেন যেন তিনি গান করছেন।' ম্যানিলাতে গান্ধী মেমোরিয়াল সোসাইটি এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। সেখানে ন্যাশনাল থিয়েটারেও তাঁদের অনুষ্ঠান হয়।

শ্রীমতী রায়ের দল ব্যাংককে পোঁছে-ছিলেন ১০ই জুন। সেখানেও তাঁদের প্রোগ্রাম অসাধারণ জনপ্রিয় হয়। ফেরার পথে আবার বাজাবার জন্য আমন্ত্রণ পান, কিন্তু প্রোগ্রাম করা সত্ত্বেও অনিবার্য কারণে সে আমন্ত্রণ রক্ষা করতে পারেন নি।

১৪ই জুন সিঙ্গাপুর হয়ে তাঁরা জাকার্তায় যান। শ্রীমতী রায়ের কাছে জানা গেল এখানে খুব একটা মজার ব্যাপার ঘটে। সেখানকার একটি কাগজে তাঁর ছবি ছাপিয়ে লেখা হয়েছিল তিনি নাকি সেতার বাজিয়ে নাচেন, তিনি একজন নর্তকী। আসলে সেতার জিনিষটা কি তা ইন্দোনেশিয়ানরা জানত না। ওরা সেতার বাজনা শোনে নি। তাই ঔৎসুক্য হয়েছিল খুবই বেশি। জাকার্তায় আর্টস কাউন্সিলের মুরুব্বিয়ানায় হলে অনুষ্ঠান হয়েছিল। বাজনা শুনে পত্রিকাগুলিতে দারুণ প্রশংসা। শ্রীমতী রায়ের মতে অন্যান্য দেশের তুলনায় ইন্দোনেশিয়া গরীব দেশ। অনুষ্ঠানে গভর্নর উপস্থিত ছিলেন এবং জেনারেল নাসুসান উপহার পাঠিয়েছিলেন। এখানে সরকারী অনুষ্ঠান ছাড়া ভারতীয়রা আর একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন। শ্রীমতী রায় বললেন: এখানে প্রবাসী ভারতীয়রা প্রায় সর্বক্ষণ ওঁদের অনেকের সংগে ছিলেন এবং আসার সময় ওঁদের অনেকের চোখে জল দেখে তাঁরাও ব্যথা অনুভব করেছেন।

সিঙ্গাপুরে ৩০শে জুন পোঁছেন সরকারী অতিথি হিসাবে। ওখানে ন্যাশনাল থিয়েটার ট্রাস্টের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠান হয়। এখানে শ্রোতাদের অনুরোধে একই অনুষ্ঠানে নাচের পরে তাঁকে আবার বাজাতে হয়।

সিঙ্গাপুর থেকে তাঁদের মালয়েশিয়াতে প্রোগ্রাম বাতিল হয়ে গিয়েছিল।

দ… -পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের মানুষের কাছে ভারতের বন্ধুত্ব ও শুভেচ্ছার বাণী পোঁছিয়ে এবং ভারতীয় সঙ্গীতের প্রতি তাঁদের অনুরাগ সৃষ্টি করে শ্রীমতী রায় সদলে ২রা জুলাই কলকাতা পোঁচেছেন. বিদেশে তিনি যে অভিনন্দন ও জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন তার জন্য তিনি জাতির কাছেও অভিনন্দনযোগ্য।

যোগেশ দত্ত বোম্বাইতে মূকাভিনয় করে আরো জনপ্রিয় হয়েছেন

সংবাদকণী

ঝংকার-এর রবীন্দ্র জন্মোৎসব

গত ১৩ই জুলাই অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস হলে ঝংকার মিউজিক সার্কল কর্তৃক রবীন্দ্র জন্মোৎসব পালিত হয়।

উদ্‌বোধন সঙ্গীতের পরে কবি শ্রীদুর্গাদাস সরকার রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ অভিভাষণ দান করেন। রবীন্দ্রকাব্যের নব মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তার বিষয় তিনি তাঁর মত বিবৃত করেন। তাঁর পরে শ্রীবিভূতিভূষণ সরকার রবীন্দ্রকাব্যে জীবনদর্শনের ওপর একটি মনোরম ব্যাখ্যা করেন।

অবশেষে শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদারের পরিচালনায় 'সুরঙ্গমা' রবীন্দ্রসংগীতের ও নৃত্যের অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। অনুষ্ঠানটি উচ্চমানের হয়েছিল।

জুলিয়াস ফুচিক

ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামের অন্যতম নায়ক জুলিয়াস ফুচিকের জীবন পটভূমিকায় ভারতীয় গণনাট্য সংঘের সীমান্তিক শাখার উদ্যোগে চিররঞ্জন দাস রচিত ও পরিচালিত 'জুলিয়াস ফুচিক' অভিনয় হচ্ছে মুক্তাঙ্গন রঙ্গমঞ্চে আগামী ২৫শে জুলাই, সন্ধ্যা ৭টায়। মঞ্চ পরিকল্পনায় খালেদ চৌধুরী।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম ইংলণ্ডের দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচের একটি মুহূর্ত। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্যামাচো একটা বল ঘুরিয়ে মারছে, ইংলণ্ডের অধিনায়ক ইলিংওয়ার্থকে নিচু হয়ে সেই বলের আঘাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে দেখা যাচ্ছে।

খেলাধুলা

কম্পোজিট ষ্টেডিয়াম

ক্রিকেটের নন্দনকানন ইডেন গার্ডেনে কম্পোজিট স্টেডিয়াম নিয়ে ইতিমধ্যে অনেক জল ঘোলা হয়েছে। অনেক বাদ-প্রতিবাদের পর অবস্থাটা এখন অনেকটা সেই যুদ্ধ-শেষের রণক্ষেত্রের মতো। কেমন যেন একটা চুপ-চাপ ভাব। থমথমে পরিবেশ। প্রতিবাদের ঝড় ওঠার পেছনে ছিল একটাই কারণ—সেটি আর কিছুই নয়, ঐতিহাসিক ইডেন উদ্যানের ঐতিহ্যের প্রশ্ন। ইডেন উদ্যান শুধুমাত্র অত্যন্ত পুরোন ক্রিকেট খেলার মাঠই নয়—ইডেন হলো বাংলা তথা ভারতের গৌরবের বস্তু—বিশ্বের দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ ক্রিকেট মাঠ। বহু ঐতিহ্যের ধারক ও বহু স্মৃতির বাহক ইডেনকে তাই রূপান্তরিত করার প্রশ্নে অনেকেরই আপত্তি। সত্যি কথা বলতে কি ক্রিকেটউৎসাহীরা পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের ক্রীড়ামন্ত্রীর এই প্রস্তাবকে তাই মেনে নিতে পারেন নি। প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিলেন তাঁরা। বাংলাদেশের সেরা ক্রীড়াবিদদের অনেকেই এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। সাপ্তাহিক বসুমতীতে আমরা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেছি তাঁদের সেই মন্তব্যগুলোও। এঁরা প্রায় সকলেই ইডেনে কম্পোজিট স্টেডিয়াম তৈরি করার বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন। তাঁদের মতে ইডেনে ফুটবল আর ক্রিকেট খেলা এক সংগে একেবারেই অচল। কারণ ইডেন তৈরি হয়েছে শুধুমাত্র ক্রিকেট খেলার জন্য। ফুটবলের অনুপ্রবেশ সেখানে শুধুমাত্র যে অবাঞ্ছিত তাই নয় এক রকম অসম্ভবও। যাই হোক চারদিকে প্রতিবাদের ঝড় ওঠায় ক্রীড়াদপ্তর শেষ পর্যন্ত তাঁদের সেই সাংঘাতিক উত্তেজনাপূর্ণ প্রচেষ্টায় কিছুটা গা-আল্গা দিলেন। আর তার কিছুদিন পরেই আবার শোনা গেলো নতুন ঘোষণা। তবে সাম্প্রতিক ঘোষণাটি বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। কারণ এবার জানা গেলো যে, কম্পোজিট স্টেডিয়ামটা শুধুমাত্র ইডেন উদ্যানেই গড়ে উঠছে না—অর্থাৎ ক্রিকেট মাঠ তো কোন ছার, ইডেনের পুরো চত্বরটা নিয়ে গড়ে উঠবে কম্পোজিট স্টেডিয়াম। সে এক বিরাট ব্যাপার, এলাহি কান্ড! ভাবুন দেখি একবার সেই অবস্থাটার কথা—সেই কম্পোজিট স্টেডিয়ামের এক জায়গায় হবে ক্রিকেট খেলা, আর এক জায়গায় বসবে ফুটবলের আসর, একপাশে চলবে সাঁতারকাটা আর সুইমিং পুল থেকে লাফ-টাফ আর ওপাশে হয়তো বসবে টেনিস খেলা কিম্বা হকি খেলার আসর। অর্থাৎ শুধু মাত্র নামে নয়, সত্যি সত্যিই আসল কম্পোজিট স্টেডিয়ামই তৈরি হবে ইডেন উদ্যানে। এর চেয়ে সুখের কথা আর কি হতে পারে। সত্যি এমন সিদ্ধান্ত আর তার ঘোষণার তুলনা মেলা ভার। এই ধরণের কম্পোজিট স্টেডিয়াম তৈরি করা শেষ পর্যন্ত হবে কি হবে না সে প্রশ্ন তুলছি না—বরঞ্চ ধন্যবাদ দিচ্ছি রাজ্য সরকারের ক্রীড়াদপ্তরকে। কারণ কলকাতার স্টেডিয়াম নিয়ে অনেক স্বপ্নই আমরা দেখেছি। কিন্তু এমন মধুর, এমন মনোরম স্বপ্ন দেখার সৌভাগ্য যে আমাদের এর আগে ঘটে নি। তাই ধন্যবাদ না জানিয়ে যে আজ আর কোন উপায়ই নেই।...। —শান্তিপ্রিয়॥

ফুটবল-ফুটবল

কলকাতায় প্রথম বিভাগীয় ফুটবল এখনো চলেছে পরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিয়ে। শেষ পর্যন্ত যে কি হবে তা বোধহয় কেউ বলতে পারবেন না অর্থাৎ বলতে পারবেন না, লীগ ফুটবল শেষ হবে কি হবে না। হবার সম্ভাবনা যেমন আছে, তেমনি আছে শেষ না হবারও আশংকা।

আর এ সবের পেছনে আছে নানা রকমের অহেতুক অন্যায় আব্দার। সেই সংগে কতকগুলো বড় বড় দল দেখাচ্ছে অনিয়মানুবর্তিতার পরম পরাকাষ্ঠা। এদের মধ্যে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবই দিয়েছে সব থেকে বেশি অনিয়মানুবর্তিতার পরিচয়।

মহামেডান বনাম ইস্টবেঙ্গল দলের খেলায় লতিফকে রেফারী মাঠ থেকে বেরিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন। তার প্রতিবাদে মহামেডান সেদিনের বাকী সময়ের খেলায় আর অংশ গ্রহণ করে নি। আর তার পরই তারা নাটকীয়ভাবে ঘোষণা করেছে যে, কলকাতার রেফারী-দের পরিচালনায় তারা আর খেলবে না।

আমরা ভেবে পাই না যে, মহামেডান স্পোর্টিং দলের এই ঘোষণার পেছনে কি যুক্তি ছিলো। যাই হোক না কেন, কলকাতা ময়দানের কয়েকটি দলের হাব-ভাব দেখে আজ শুধু একটা কথাই বলতে ইচ্ছে করছে, এতো বাড়াবাড়ি ভালো নয়।

এই প্রসংগে আমাদের মনে একটা প্রশ্নই জাগছে। মহামেডান স্পোর্টিং দলের যদি সুপার লীগে খেলার সম্ভাবনা থাকতো তাহলে তারা কি আর এইরকম আচরণ করতে পারতো? মনে তো হয় না তা। সুপার লীগে খেলার সুযোগ পাবার যখন কোন সম্ভাবনাই ছিল না— আর মহামেডানের মতো দলের সুপার লীগে খেলতে না পারা নিয়ে যখন আলোচনারও শেষ ছিল না, তখনই একটি ছুতোকে কাজে লাগিয়ে মহা-মেডান সরে দাঁড়ালো লীগ ফুটবল থেকে। এই সরে দাঁড়াবার জন্যে তারা যে হুমকী দিলো তা শুধুমাত্র অপমান-করই নয় অশোভনও বটে। তাদের ঐ ঘোষণার মধ্যে দিয়ে মহামেডান স্পোর্টিং বিশ্রীভাবে অপমান করেছে কলকাতার রেফারীদের। অথচ সি· আর· এ এখনো চুপ। এই বিষয়ে প্রতিবাদ জানিয়ে তাঁরা কিছুই বলেন নি।

কিন্তু এই ধরণের আচরণের একটা প্রতিকার হওয়া দরকার। আমরা চাই আই· এফ· এ কর্তৃপক্ষ মহামেডান স্পোর্টিং দলের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। তাঁরা যদি তা না করেন তাহলে কলকাতা ময়দান থেকে 'ডিসি-প্লিন' বলে জিনিষটি চিরকালের মতো উঠে যাবে এবং আই· এফ· এ কর্তৃপক্ষ কলকাতা ময়দানের বড় দলগুলোর কাছে খেলার পুতুল হয়ে দাঁড়াবেন।

তাই আই· এফ· এ কর্তৃপক্ষকে আজ কঠোর হতেই হবে। তাঁদের কঠোরতার ওপরই নির্ভর করছে কলকাতা ময়দানের ফুটবল খেলার ভাগ্য।

বাংলাদেশের ফুটবল খেলাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে, বাংলাদেশের ফুট-বল খেলার মান উন্নত করতে হলে, ভারতীয় ফুটবলাঙ্গনে বাংলার হারানো স্থান ফিরে পেতে হলে এখনই এগিয়ে আসতে হবে সকলকে। আই· এফ· এ কর্তৃপক্ষ, ক্লাব কর্তৃপক্ষ, খেলোয়াড় এমন কি দর্শকদেরও চেষ্টা করতে হবে।

একটা কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, আজকের এই অনিশ্চিত অবস্থা থেকে বাংলাদেশের ফুটবল খেলাকে এখনই উদ্ধার করা দরকার—তা নাহলে ভারতীয় ফুটবলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী বাংলা দিনে দিনে এমন জায়গায় গিয়ে পৌঁছুবে যেখান থেকে সহজে উদ্ধার পাবার আর কোন সম্ভাবনাই থাকবে না।

তাই আমরা সকলের কাছে আবেদন জানাই যে, বাংলাদেশের ফুটবল খেলার ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে সকলকে এক-সংগে চেষ্টা করতে হবে যাতে আজকের এই অস্থির অবস্থা থেকে বাংলার ফুট-বল রেহাই পায়। সবার প্রিয়, বাংলা-দেশের খেলার রাজা, পাগলকরা খেলা ফুটবল আবার তার হারানো সম্মান ফিরে পাক, আবার ভারতীয় ক্রীড়াংগনে বাংলাদেশের ফুটবল সবার ওপরে স্থান পাক—আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের সংগে গলা মিলিয়ে আমরা শুধু বলতে চাই যে, আসুন আপনারা—আমরা সকলে মিলে চেষ্টা করি যাতে এই শোচনীয় পরিস্থিতি থেকে, যাতে এই সঙ্গীন অবস্থার মধ্যে বাংলাদেশের ফুটবল খেলা বেরিয়ে আসতে পারে। আবার বাংলা-দেশের ফুটবল খেলা নিয়ে আনন্দ-হাসি-গানে মেতে উঠুক সকলে—বাংলাদেশের অংগনে-প্রাঙ্গণে শুধুই সোচ্চারিত হোক একটি ধ্বনি—ফুটবল-ফুটবল...।

মুষ্টিযোদ্ধা সন্তোষ দে'র শিক্ষাধীনে টেরিটোরিয়াল আর্মি ইন্সটিটিউটে বেঙ্গলী বক্সিং এসোসিয়েশনের তত্ত্বাবধানে মুষ্টিযুদ্ধ শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্রে হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগনা ও কলকাতার যোগদানকারী শিক্ষার্থীদের দেখা যাচ্ছে।

ক্রিকেটের খবর

আকর্ষণীয় পরিবেশের মধ্যে শেষ হলো ইংলন্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের শেষ টেস্ট ম্যাচটি। শেষ টেস্টে জয়লাভের সম্মান অর্জন করেছে ইংলন্ড। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বনাম ইংলন্ডের প্রথম টেস্টে জিতেছিল ইংলন্ড। দ্বিতীয় টেস্ট ম্যাচ শেষ হলো অমীমাংসিতভাবে, আর তৃতীয় ও শেষ ম্যাচে জিতলো ইংলন্ড।

॥ ক্যামাচো ॥
ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ওপনিং ব্যাটসম্যান ক্যামাচো দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং-এ অসামান্য নৈপুণ্য প্রদর্শন করেছিলেন।

তৃতীয় টেস্ট ম্যাচে প্রথমে ব্যাটিং করার সুযোগ পেয়েছিল ইংলন্ড। কিন্তু সে সুযোগ তারা খুব একটা কাজে লাগাতে পারে নি। সোবার্স, হোল্ডার

॥ বুচার ॥
বুচার অল্পর জন্যে দ্বিতীয় ইনিংসে শতরান করতে পারেন নি।

আর শেফার্ডের বোলিং লীডস মাঠে বিপর্যয় ডেকে আনলো ইংলন্ডের পক্ষে। তাই মাত্র ২২৩ রানে শেষ হয়ে গেলো ইংলন্ডের প্রথম ইনিংস। এডরিচ আর ডলিভিয়েরা ছাড়া আর কেউ ব্যাটিং-এ একদম সুবিধেই করতে পারলেন না। এডরিচ করলেন ৭১ আর ডলিভিয়েরা করলেন ৪৮ রান। হোল্ডার ৪৮ রানে ৪টি, শেফার্ড ৪৩ রানে ৩টি ও সোবার্স ৬৮ রানে ২টি উইকেট পান।

প্রথম ইনিংসে ওয়েস্ট ইণ্ডিজও কিন্তু একদম সুবিধা করতে পারলো না। মাত্র ১৬১ রানে শেষ হয়ে গেলো তাদের ইনিংস। এর মধ্যে বুচারের ৩৫ রানই ছিলো সব থেকে বেশি। বোলিং-এ নাইট ৪টি উইকেট দখল করলেন ৬৩ রানের বিনিময়ে।

দ্বিতীয় ইনিংসে ইংলন্ড করলো ২৪০ রান। ডলিভিয়েরার ৩৯ রানই ছিল সব থেকে বেশি। তারপরে বেশি রান করলেন বোলার ব্রাউন। তাঁর রান সংখ্যা হলো ৩৪।

৩০৩ রান করলে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জিতে যাবে এমন অবস্থায় খেলতে নেমে তারা করলো মাত্র ২৭২ রান। বুচার দুর্ভাগ্যের জন্যে শতরান করতে পারলেন না। তিনি আউট হয়ে গেলেন ৯১ রানের মাথায়। ক্যামাচোর ৭১ রানও ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে জেতার পথে অনেকটা এগিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অন্য সব ব্যাটসম্যানরা একেবারেই সুবিধে করতে পারলেন না। ফলে শেষ টেস্ট ম্যাচে জয়লাভের সম্মান অর্জন করলো ইংলন্ডই। ইংলন্ডের হাতেই তাই থেকে গেল বহু আকাঙ্ক্ষিত রাবার। রাবার যেমন থাকল, সেই সঙ্গে উইসডেন ট্রফিটিও ইংলন্ডের হাতেই থেকে গেল।

গল্প হলেও সত্যি

আজ থেকে ২৯ বছর আগে অর্থাৎ ইংরাজী ১৯৪০ সালে একজন অস্ট্রেলিয়ান মহিলা মাত্র ১৮ বছর বয়সে সাতদিন একটানা সাইকেল চালিয়ে, ১৫৪৬·৬ মাইল পথ অতিক্রম করে মহিলাদের মধ্যে সাইকেল চালনায় নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছিলেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি তার এক বছর আগেও সাইকেল চালাতে জানতেন না। মেলবোর্নের জনৈকা মহিলা সাইক্লিস্ট মিসেস ভালদা উথাঙ্কের উপদেশে তিনি সাইকেল চালনা শিক্ষায় মন দেন। আর মাত্র এক বছরের প্রচেষ্টায় তিনি ঐ রেকর্ড স্থাপন করতে সমর্থ হন। তিনিই দেখিয়ে দিলেন একাগ্রতা থাকলে অতি অল্প সময়েও বিস্ময়করভাবে এগিয়ে যাওয়া যায়, রেকর্ডও করা যায়। নতুবা যিনি এক বছর আগেও সাইকেল চালাতে জানতেন না, তিনিই পরে রেকর্ড করলেন। তাঁর নাম মিস্ প্যাট হকিন্স।

—প্রশান্ত বসু,
'কল্যাণী ভবন' (রামডাঙা ইয়ং রোড, আসানসোল।

[৩১৯ পৃষ্ঠার পর]

এ লাফ সত্যিই অবিশ্বাস্য লাফ। বিশ্বমানে পৌঁছবার পর যেখানে দূরত্ব বা উচ্চতার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভগ্নাংশের উন্নতির অনলস সাধনার প্রয়োজন সেখানে প্রায় দু' ফুটের ব্যবধান সত্যিই অলৌকিক কৃতিত্বের জ্বলন্ত স্বাক্ষর। সুতরাং বব বীমন সৃষ্ট এই কৃতিত্বকে দাবিয়ে নতুন কৃতিত্ব প্রদর্শন হয়ত বা নিকট ভবিষ্যতে আর সম্ভব হবে না।

অবিস্মরণীয় মুহূর্ত

অজয় মুখোপাধ্যায়

সবাই রুদ্ধশ্বাস রুদ্ধ-আশ—সবারই মনের মধ্যে একটা কি হয় কি হয় ভাব। বর্ণাঢ্য স্টেডিয়ামে এক মনোরম চাঞ্চল্যকর অপরাহ্ন। অগণিত দর্শক সমাগমে এক বিরাট প্রতিযোগিতার আসর—ইতিহাসে যার এক গালভরা নাম অ-লি-ম্পি-ক। পৃথিবীর সর্বদেশের মিলনের পীঠস্থান এই অলিম্পিক।

সবাই আসছেন একে একে—যোগ্যতানুযায়ী প্রতিযোগিতা করছেন—যোগ,তার পরিমাপ জানছেন—তার পর ফিরে যাচ্ছেন নিজের নিজের উদ্দিষ্ট জায়গায়। প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্রমশই বাড়ছে—বাড়ছে উত্তেজনা—চরমে উঠছে উদ্দীপনা।

হ্যাঁ—আমি গত মেক্সিকো অলিম্পিকের দীর্ঘলাফ অনুষ্ঠানের কথাই বলছি—অর্থাৎ ওটাই আমার বক্তব্যের প্রতিপাদ্য বিষয়।

রাজনীতির ক্ষেত্রে রাশিয়া যেমন আমেরিকার চরম এবং পরমতম প্রতিদ্বন্দ্বী—তেমনই ক্রীড়াভূমিতেও তাদের সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যতিক্রম নেই—বরং বেশিই।

লাফ সুরু হলো। রাশিয়ার প্রতিযোগীর প্রথম লাফই সবাইকে তাক লাগিয়ে দিল—কিন্তু সেই অবাক করাকে আরও বেশি হতবাক করলো আমেরিকার প্রতিযোগী র‍্যালফ বোস্টন্। অন্য দেশ কম বেশি দূরত্বে অবস্থান করলো—এইভাবেই শেষ হলো দীর্ঘলাফের প্রথম পর্ব।

২য় পর্বে কিন্তু মোড় ঘুরে গেল। আমেরিকা রাশিয়া পূর্ব জার্মানী সমান সমান—কিন্তু অলক্ষ্যে আমেরিকার এক অখ্যাতনামা প্রতিযোগীও কিন্তু চূড়ান্ত লাফে লাফানোর আসন পাকা করে নিলো। কিন্তু তাকে নিয়ে খুব বেশি কল্পনার জাল কেউ বোনে নি—অন্তরীক্ষে কেউ তার জন্য আশীর্বাণী বর্ষণ করে নি।

আস্তে আস্তে এগিয়ে এল সেই শেষ পর্বের চরম মুহূর্ত—যে মুহূর্তেই রচিত হলো দীর্ঘলাফের নতুন ইতিহাস। পুরনো রেকর্ড ভেঙে চুরমার করে তৈরি হলো নতুন এক বিশ্ব রেকর্ড।

৬০ হাজার দর্শক সমাকীর্ণ স্টেডিয়ামে এক চাঞ্চল্যের জোয়ার—এক উত্তেজনাকর অনুভূতির সাড়া পড়ে গেলো। সবাই চায় তার দেশ জিতুক—সবাইয়ের ইচ্ছা তার মনোমত প্রতিযোগীই হোক ঐ আসরের সর্বশ্রেষ্ঠ নায়ক—প্রত্যেকেরই মনের ইচ্ছা ঐ প্রতিযোগিতার বরমাল্য পড়ুক তারই ঈপ্সিত ব্যক্তির গলায়।

বিচারকের গুরুগম্ভীর স্বর শোনা গেল—"Competitors get ready for the last and final Jump." প্রতিযোগীদের মধ্যে আলোড়নের সাড়া পড়ে গেল। প্রত্যেকেই চায় আজকের এই প্রতিযোগিতায় সেই তবে সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। তাই রণ-বেশকে তাঁরা দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর করতে লাগলেন।

বিচারক একে একে নাম ডাকছেন। প্রতিযোগীরা তাদের নিজ নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে প্রস্তুত হচ্ছেন—দেহে তাঁদের অটুট বল—মনে তাঁদের জয়লাভের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা—চোখে তাঁদের যশগৌরব লাভের দৃঢ় ব্যঞ্জনা। সময়ের গতিতে প্রতিযোগিতা একে সুরু ও সারা হচ্ছে। প্রতিযোগীদের মনও তাঁদের দূরত্বানুযায়ী আশা-নিরাশার দোলায় দোদুল্যমান।

আমেরিকার প্রতিযোগী র‍্যালফ বোস্টন দেবতার নাম নিয়ে মরণপণে ছুটলেন, লাফও দিলেন প্রচণ্ড—আর উল্লাসে ফেটে পড়লেন—কারণ তাঁর লাফই তখন পর্যন্ত সব থেকে বেশি। মনে তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে, পূর্ব বিশ্ব রেকর্ড তাঁর কব্জার মধ্যে।

এগিয়ে এলেন পূর্ব জার্মানীর দীর্ঘদেহী প্রতিযোগী কে বিয়ার—দৃঢ় পদক্ষেপ—হাত মুষ্টিবদ্ধ—চোখের দৃষ্টি সামনে নিবদ্ধ। সর্বশক্তি একত্রিত করে দিলেন তিনি প্রচণ্ড লাফ—অসম্ভব সে লাফ—বোস্টম তার তলায় তলিয়ে গেলেন। বিশ্ব রেকর্ড ভঙ্গের স্বপ্ন ভঙ্গ হলো তাঁর। সবারই মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মালো যে, বিয়ারই হবেন আজকের অনুষ্ঠানের সর্বশ্রেষ্ঠ নায়ক।

তারপর এলো সেই চরম আর পরম মুহূর্ত—এলো সেই মধুর লগন—যে লগনটিই ইতিহাস তৈরির জন্য সৃষ্টি হয়েছিলো—যে ক্ষণটি ছিল অভাবনীয় বিশ্ব রেকর্ড তৈরির জন্য নির্দিষ্ট। ঐ প্রতিযোগিতার শেষ প্রতিযোগী হলেন আমেরিকার বব-বীমন। লম্বা দোহারা চেহারা—মিশ কালো গায়ের রং—সদা হাস্যময়। ডাক পড়লো তাঁর অনুষ্ঠানের শেষ লাফটি লাফানোর জন্যে। এগিয়ে গেলেন তিনি তাঁর যথানির্দিষ্ট দৌড়ের জায়গায়। গলার মাদুলিটা মুখে পুরে—একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন কিছুক্ষণ সামনের jump pit-এর দিকে। তারপর দৌড় সুরু করলেন। প্রতি পদক্ষেপে গতিবেগ দ্রুত থেকে দ্রুততর দ্রুততম হচ্ছে—তারপর অন্তিম মুহূর্তে take off Board-এর ওপর থেকে লাফ......।

জনতার প্রচণ্ড চীৎকার আর করতালির পর যখন প্রতিযোগী সম্বিৎ ফিরে পেলেন—তখন নিজেই তিনি বুঝতে পারেন নি যে তিনি কি করেছেন।

দূরত্ব পরিমাপের সময় বিচারকেরা বিস্মিত হলেন—অবাক হলেন—আবিষ্ট হলেন—একি—এও কি সম্ভব—এটা যে অবিশ্বাস্য—তাঁরা মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা

বব-বীমন

করলেন যে বব-বীমনের এই সাফল্য অ্যাথলেটিকস্ বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি।

যখন মাইকে ঘোষণা করা হলো যে, আমেরিকার প্রতিযোগী বব-বীমন দীর্ঘলাফ প্রতিযোগিতায় এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করে প্রথম হলেন। আমেরিকার জাতীয় সংগীত ধ্বনিত হলো—পরিয়ে দেওয়া হলো প্রতিযোগীর গলায় বিজয়ীর বরমাল্য। আনন্দের বান ডাকলো হাজার হাজার দর্শক সমাকীর্ণ stadium-এ। সহ প্রতিযোগীরা তাঁকে কাঁধে তুলে নিয়ে সারা stadium পরিক্রমা করলেন।

[শেষাংশ ৩১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

প্রশ্ন উত্তর

সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পেটিয়ের কলেজ, বাঁকুড়া)।

প্রশ্ন: চুনী গোস্বামী কি ক্রীড়াজগৎ থেকে বিদায় নিলেন?

উত্তর: কই আর? চুনী গোস্বামীর ক্রিকেট খেলার কথা ভুলে গেলেন।

মানবকুমার ঘোষ ও রমা ঘোষ (ফোরম্যান কলোনী, কাঁচরাপাড়া)

উত্তর: 'গল্প হলেও সত্যি' বিভাগটা আপনাদের ভালো লাগে জেনে উৎসাহিত হয়েছি। আপনারাও সাদা কাগজে লিখে লেখা পাঠাতে পারেন।

বর্তমানে প্রসন্নকেই ভারতের শ্রেষ্ঠ স্পিন বোলার বলা যেতে পারে। ভারতে এখন ভাল পেস বোলার ধরতে গেলে নেই-ই।

প্রদীপ পোদ্দার (সোদি খান দেয়াড়, মুর্শিদাবাদ)

প্রশ্ন: ক্রিকেট ব্যাটের দৈর্ঘ্য কতো? দুই উইকেটের মধ্যে দূরত্ব কতো? উইকেট কত চওড়া, মাটির ওপর থেকে উইকেট কতো উঁচু?

উত্তর: ক্রিকেট ব্যাট চওড়ায় 4¼ ইঞ্চি ও লম্বায় ৩৮ ইঞ্চির বেশি হবে না। দুই উইকেটের মধ্যে দূরত্ব ২২ গজের। উইকেট ৯ ইঞ্চি চওড়া হবে এবং মাটির ওপরে ২৮ ইঞ্চি উঁচু হয়ে থাকবে।

তড়িৎকুমার চৌধুরী (অফিস টাংলা স্বামীজী ক্লাব, দরং, আসাম)

প্রশ্ন: আন্দামান বিজয়ী পিনাকী চট্টোপাধ্যায় ও ডিউক মোটর সাইকেল যোগে বিশ্ব ভ্রমণের যে পরিকল্পনা করেছেন তার কতোদূর কি হলো?

উত্তর: এ বিষয়ে আমরা তো কিছুই জানি না।

বিনয়ভূষণ দত্ত (আগরতলা)

প্রশ্ন: মোহনবাগানের প্রাক্তন ফুটবল খেলোয়াড় জার্নাল সিং এবং হকি খেলোয়াড় জার্নাল সিং কি একই ব্যক্তি?

উত্তর: না।

বীরেন পাল (বংশীহারী)

উত্তর: আমার লেখা আপনার ভালো লেগেছে জেনে উৎসাহিত হয়েছি। সাপ্তাহিক বসুমতীতে বিজ্ঞান বিষয়ক প্রবন্ধ তো প্রায়ই প্রকাশ করা হয়। দেখেছেন নিশ্চয়ই।

সুভাষচন্দ্র শীল (বলরাম মল্লিক রোড, হুগলী)

উত্তর: ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান দল এতোগুলো করে ম্যাচ খেলেছে—এর পরেও কি এই দুটি দলের খেলোয়াড়দের নাম প্রকাশ করার কোন প্রয়োজন আছে?

অমিতাভ মুখোপাধ্যায় (রহড়া রামকৃষ্ণ মিশন বালকাশ্রম)

প্রশ্ন: দেশে এবং বিদেশে ভারত কতোগুলো টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করেছে? ভারতের টেস্ট খেলার পূর্ণ হিসেব জানতে চাই।

উত্তর: দেশে এবং বিদেশে ভারতের টেস্ট খেলা—

	খেলা	জয়	পরাঃ	ড্র
দেশে	৬১	১০	১৫	৩৬
বিদেশে	৪৭	৩	৩০	১৪
	১০৮	১৩	৪৫	৫০

পূর্ণ ফলাফল

কোন দল	খেলা	জয়	পরাঃ	ড্র
ইংলন্ড	৩৭	৩	১৮	১৬
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	২৩	০	১২	১১
অস্ট্রেলিয়া	২০	২	১৩	৫
পাকিস্তান	১৫	২	১	১২
নিউজিল্যাণ্ড	১৩	৬	১	৬
মোট	১০৮	১৩	৪৫	৫০

অমিতাভ সেনগুপ্ত (রেলওয়ে কলোনী, গৌহাটি, আসাম)

প্রশ্ন: এবার নাকি সন্তোষ ট্রফির খেলা গৌহাটিতে হচ্ছে—সত্যি নাকি?

উত্তর: সত্যি!

পরিতোষ নাগ (বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি)

প্রশ্ন: মাঠের মধ্যে একেবারে না ঢুকে কোন খেলোয়াড়ের পক্ষে কি গোল করা সম্ভব?

উত্তর: কোনমতেই না।

রেফারী বল ড্রপ দেবার সময়ই শুধু নয়, মাঠের মধ্যে কোন সময়ই মারামারি করা রেফারী সহ্য করেন না। দোষী খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, এমন কি দোষী খেলোয়াড়দের মাঠ থেকেও বার করে দিতে পারেন রেফারী।

অজয় বর্মণ (বুক ফোরাম, পান বাজার, গৌহাটি—১)

উত্তর: আপনি জবাব চান—কিন্তু প্রশ্ন কই? আপনার আগের চিঠিটা আমি বোধহয় পাই নি।

আব্দুল মালেক (সিউড়ী বীরভূম)

উত্তর: সোবার্সের ব্যাটিং এ্যাভারেজ আগেই জানানো হয়েছে। এবারকার টেস্ট মরশুম শেষ হলে আবার জানানো হবে।

সুশান্ত মঠ (শান্তিপুর)

উত্তর: 'গল্প হলেও সত্যি' বিভাগের জন্যে আপনি আর একটা লেখা পাঠান।

উত্তম সরকার (ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি)

প্রশ্ন: ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কয়জন খেলোয়াড় এবার মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ভারতীয় দলের পক্ষে স্থান লাভ করবেন?

উত্তর: দল নির্বাচন পর্বের যে এখনো অনেক দেরি।

অসীমকুমার দাশগুপ্ত ও আশীষকুমার দাশগুপ্ত (হাতীগড় চা-বাগান দরং, আসাম)

প্রশ্ন: অশোক চ্যাটার্জী মোহনবাগান ছেড়ে গেলেন কেন? ভারতের শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক কে?

উত্তর: ব্যক্তিগত কারণে।
এখনো থঙ্গরাজ।

হীরেন্দ্রমোহন ভদ্র (সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি)

প্রশ্ন: এ বছর শ্রেষ্ঠ গোলদাতা (লীগ ফুটবলে) কিভাবে ঠিক হবে?

উত্তর: যেভাবে হয় অনেকটা সে ভাবেই হবে।

নরেন্দ্রনাথ দত্ত (মণ্টু) (সুন্দরনগর জামসেদপুর)

উত্তর: এই মুহূর্তে শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রশিক্ষকের নাম জানানো সম্ভব নয়, বোধহয় সংগতও নয়, একটু চিন্তা করলেই কারণটা জানতে পারবেন।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট্স্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতী

চাঁদ জয় করে মার্কিন নভশ্চরত্রয়ের পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন

বর্ষ ঃ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৫ই শ্রাবণ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [74 year, No. 6, 31st July,

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৩২৩
আজকের মানুষ		৩২৪
সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন		
ভারতবর্ষ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— শঙ্করীপ্রসাদ বসু	৩২৫
বই-বাছাই—বাংলা বইয়ের মেলা	— হরপ্রসাদ মিত্র	৩২৯
কয়েকটি মানুষ (কবিতা)	— মনীষীমোহন রায়	৩৩১
রঙ্গদর্শন		৩৩২
ভারতদর্শন		৩৩৬
আন্তর্জাতিক		৩৩৯
সপ্তাহের বোঝা	— কৃত্তিবাস ওঝা	৩৪১
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	— অনন্ত সিংহ	৩৪৩
শহর কলকাতা	— শহরদর্শী	৩৪৬
যুক্তফ্রন্ট সরকার সমীপেষু	— শ্রীসর্বদর্শী	৩৪৭

যে কোন
গয়না
আর
আসল
গ্রহরত্ন
কেনার
দক্ষিণ কোলকাতায়
নামকরা প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সন অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ডসন্স অব ছোট
এস. বি. সরকার

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
গ্রন্থমেলা		৩৪৮
চাঁদে নামলাম	— ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	৩৪৯
চাঁদ! হুঁসিয়ার!... (কবিতা)	— রাণী দেবী	৩৫৪
দুই বাংলা : একজন কবি	— বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	৩৫৫
মাধ্যমিক শিক্ষা	— প্রিয়দর্শন সেনশর্মা	৩৫৭
গ্রহণ (গল্প)	— রজত রায়চৌধুরী	৩৬০
তিমিরপ্রান্ত ভূস্বর্গ	— অগ্নিবর্ণ	৩৬৩
গ্রামবাংলার কথা	— অসীম মুখোপাধ্যায়	৩৬৬
মহানায়ক লেনিন (নাটক)	— অশোক সেন	৩৬৯
লোকসঙ্গীতের একাল না আকাল?	— মুর্শিদ	৩৭৩
রঙ্গজগৎ		৩৭৬
খেলাধূলা	— শান্তিপ্রিয়	৩৮০

সদ্য বেরিয়েছে ॥ বহুকাল পরে পুনর্মুদ্রণ ॥ নামমাত্র মূল্য

দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগ ঃঃ নীলদর্পণ। জামাই বারিক। বিয়ে পাগলা বুড়ো। নবীন তপস্বিনী। কমলে কামিনী। ২য় ভাগ ঃ সধবার একাদশী। যমালয়ে জীবন্ত মানুষ। পোড়া মহেশ্বর। কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ। লীলাবতী। সুরধুনী কাব্য। দ্বাদশ কবিতা। পদ্য সংগ্রহ। তৎসহ লেখকের জীবনী ও ভূমিকা।

(দুই ভাগে সম্পূর্ণ)

মূল্য প্রতি ভাগ চার টাকা।

বিদ্যারণ্য মুনি রচিত
বিবরণ প্রমেয়-সংগ্রহ
মূল্য চার টাকা

স্তবকবচমালা
মূল্য আট টাকা

যোগশাস্ত্র
মূল্য পাঁচ টাকা

শিবায়ন
মূল্য তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা-১২

সাপ্তাহিক বসুমতী

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন

৭৪ বর্ষ : ৬ষ্ঠ সংখ্যা—মূল্য : ৩০ পয়সা | বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা | PRICE : 30 Paise

বৃহস্পতিবার, ১৫ই শ্রাবণ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ | Thursday, 31st July, 1969

চাঁদে মানুষের প্রথম পদক্ষেপ

এবার শুধু মহাকাশের সীমা লঙ্ঘনই নয়, মানুষ অসম্ভবকে সম্ভব করে চাঁদের মাটি স্পর্শ করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বীর ত্রয়ী এবার চন্দ্রাভিযানে গেছেন: চাঁদের ওপর পদচারণা করেছেন নীল আর্মস্ট্রং ও এডউইন অলড্রিন। আর অন্যজন চাঁদের বুকে না নামলেও ঐ অভিযানের সাফল্যের পথ সহজ করেছেন। সুতরাং কৃতিত্বধন্য তিনজনই। সেই সঙ্গে স্মরণীয় মহাকাশচারী গ্যাগারিন, যিনি মহাকাশ বিজয়ের স্বপ্নকে সর্বপ্রথম বাস্তবে রূপায়িত করে তুলেছেন। অবশ্য ঐ সব মহাকাশচারীদের গৌরবদীপ্ত বিজয়ের মূলে যে সব বৈজ্ঞানিকদের দীর্ঘযুগের ধ্যান-ধারণা ও সাধনা কাজ করেছে, তাঁদের অবদান কোনদিনই ভোলবার নয়। আর ঐ সব বৈজ্ঞানিকগণ কোন বিশেষ দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। প্রথম একজন বৈজ্ঞানিক মহাকাশ-চিন্তায় যে সূত্র নির্ধারণ করেছেন, অন্য দশকের ও অন্য শতকের বৈজ্ঞানিকগণ সেই সূত্রের ওপর নির্ভর করে মহাকাশ সম্পর্কে নতুন আলোকপাত করেছেন। সুতরাং এই সিদ্ধান্ত সঠিক, বিশ্বের বিভিন্ন বৈজ্ঞানিকগণের চিন্তানুসৃত পথে দিগ্বিজয়ী মার্কিন মহাকাশচারীরা চাঁদে নেমে সমগ্র মানবসমাজের জয়ই সূচিত করেছেন। এবং ঐ জয়ের দ্বারা বিজ্ঞানের মহা অগ্রগতির কথাই প্রমাণিত হয়েছে।

বিজ্ঞানের ঐ অগ্রগতির সঙ্গে সম্পর্কিত সত্যানুসন্ধান। সোভিয়েট রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঐ সত্যানুসন্ধানর অগ্রগামী পথিক। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশচারিগণই চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রথম পদক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে একটি নতুন যুগের সূচনা করেছেন। সেই যুগ চান্দ্রযুগ। এখন ঐ মহাকাশচারিগণ পৃথিবীর পৃষ্ঠে ফিরে এসেছেন। চন্দ্রপৃষ্ঠের রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য যে মাটি ও পাথর আনা হয়েছে, তা গবেষণার দ্বারা আগামী দিনে অনেক নতুন তথ্য দান করবে, পৃথিবী ও চন্দ্রের পারস্পরিক যে সম্পর্ক বাস্তব তথ্যসহ অজ্ঞাত ছিল, সেই অজ্ঞাত পরিচয়েরও একটা হদিস মিলবে। সুতরাং চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করার মধ্যে শুধু দিগ্বিজয়ের নেশাই নেই, এই পৃথিবীকে গভীরভাবে জানার উদগ্র আকাঙ্ক্ষাও নিহিত রয়েছে। প্রসঙ্গত তাই মনে হয়, চন্দ্রপৃষ্ঠে নতুন উপনিবেশ স্থাপনের উদ্দেশ্য কারও নয়। আজ মানুষ চন্দ্রপৃষ্ঠে অবতরণ করেছে, আগামী দিনে সে অন্যান্য গ্রহে পাড়ি দিয়ে বিজ্ঞানের জয়যাত্রাকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করেই যাবে।

এই ধরনের মহাকাশ অভিযান যেমন একদা অকল্পনীয় ব্যাপার ছিল, তেমনি এই মহাকাশ অভিযানকে সার্থক করার জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় হচ্ছে। এখন পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মহাকাশ অভিযানে যে অর্থ ব্যয় করেছেন, তার পরিমাণ নাকি আটাশ হাজার কোটি ডলার। এই পরিমাণ ব্যয়ের কথা দরিদ্র দেশগুলি কল্পনাই করতে পারে না। তা ছাড়া ঐ সব দরিদ্র দেশ যদি ঐ অর্থের সামান্য অংশও লাভ করত, তাহলে তারা দারিদ্র্যমুক্ত হতে পারত। প্রসঙ্গত বলা প্রয়োজন, দরিদ্র দেশগুলিকে দারিদ্র্যমুক্ত করা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলির নৈতিক কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে এবং সেদিকে তাঁরা দৃষ্টি দেবেন। কিন্তু একথাও স্বীকার্য যে, মহাকাশ অভিযানের দ্বারা বিজ্ঞানের যে অগ্রগতি তাঁরা ঘটিয়েছেন, তদ্দ্বারা মানুষের কল্যাণ সাধনই তাঁরা করবেন। মহাকাশ অভিযানজনিত মোটা অঙ্কের অর্থ ব্যয়ে আপাতত যাঁরা প্রশ্ন তুলছেন, আমরা তাঁদের প্রশ্ন করি, পরস্পর বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি যদি যুদ্ধের জন্য অস্ত্র নির্মাণের প্রতিযোগিতার পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক সত্য-সন্ধানে এগিয়ে যায়, তবে কি তাঁরা অভিনন্দিত হবেন না? আমরা মনে করি, নিশ্চয়ই হবেন এবং সত্য-সন্ধানের পথেই একদিন বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। পৃথিবীর সমস্ত মানুষ সেদিন সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে এই পৃথিবীর জল-হাওয়ায় পরমানন্দে বাস করতে পারবে। চান্দ্রযুগই আনবে মানবসমাজের পারস্পরিক প্রীতির সেই নতুন যুগ।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

রাজনীতিক ও বাঘ—এ দুটি প্রাণীর মধ্যে মিল কোথায়? সকল রাজনীতিকের তেজ, শৌর্য-বীর্য বা মনোবল বাঘের মত নয়। ক্ষমতার উচ্চ আসনে বসেও কোনো কোনো রাজনীতিকের গায়ে বাঘের নকল চামড়াটুকুই কেবল আছে, আসলে তাঁরা ভীরু, মেরুদন্ডহীন। কিন্তু শার্দুল যেমন একবার রক্তের স্বাদ পেলে আর তা ভুলতে পারে না, আবার ঘুরে-ফিরে সেই রক্তের সন্ধানে ছুটে বেড়ায়, তেমনি রাজনীতিকও একবার ক্ষমতা ভোগ করার সুযোগ পেলে বার বার তা পেতে চান। যে রাজনীতিক ক্ষমতার আসনে রয়েছেন তিনি দেহে প্রাণ থাকতে তা ছাড়তে রাজী হন না, আর যিনি আসনচ্যুত হয়েছেন, তিনি তা পুনর্দখলের জন্যে প্রাণ বাজি রাখতেও দ্বিধা করেন না। আদর্শ, নীতি ইত্যাদি নীতিকথা সেই ব্যাঘ্রসম রাজনীতিকদের কাছে সস্তা ভাবালুতার মত পরিত্যাজ্য। আর সেই বাঘকে যদি খোঁচাবার মত প্রাণীর অভাব না হয়, তবে তো আর কথাই নেই। রাষ্ট্রপতিপদে শ্রী সি ডি দেশমুখকে তৃতীয় প্রার্থী হতে দেখে আমার মনে এই তুলনাটার খাঁটিত্ব সম্পর্কে সন্দেহের বাষ্পমাত্র রইল না।

কংগ্রেস প্রার্থী দিয়েছেন লোকসভার প্রাক্তন স্পীকার শ্রীসঞ্জীব রেড্ডিকে। প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি ও কার্যকরী রাষ্ট্রপতি শ্রী ভি ভি গিরির প্রতি সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে দেশের প্রধান কংগ্রেস-বিরোধী দলগুলো। জনসঙ্ঘ, স্বতন্ত্র, বি-কে-ডি ইত্যাদি দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল দল সারা দেশে প্রার্থী হাতড়ে বেড়িয়েছেন। সর্বোদয় নেতা শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ, আচার্য কৃপালনী, এমন কি মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকরুণানিধিকে পর্যন্ত তাঁরা বিস্তর সাধাসাধি করেছেন তৃতীয় প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে। কিন্তু সম্ভবত জনুরুদ্ধ নেতারা এই দক্ষিণপন্থী জোটের সীমিত শক্তি সম্পর্কে মোহমুক্ত বলে এই হাস্যকর প্রস্তাবে সায় দিতে পারেন নি। কিন্তু হাতি-ঘোড়া তল গেলেও মশা স্বভাবদোষে মাপতে চাইবেই জল আছে কতটা। দেখা গেল শ্রীদেশমুখকে এগিয়ে আসতে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও মর্যাদার উচ্চতম আসন দখল করা যায় কি-না তিনি একবার লড়ে দেখতে চান।

শ্রীচিন্তামন দ্বারকানাথ দেশমুখকে ভারতের রাজনীতি-জগতে একটা অস্তগামী উপগ্রহ বললেও বোধ হয় বাহুল্য হয়ে যায়। কিন্তু ওই যে বলেছি, ক্ষুধায় ক্লান্ত-অবসন্ন হয়ে যে শার্দুল নিদ্রায় অচেতন, তাকে খোঁচালে সে-ও যেমন বন-হরিণীর পিছনে ধাবমান হতে প্রলুব্ধ হয়, তেমনি আমাদের দেশমুখ সাহেবও জনসঙ্ঘ-স্বতন্ত্র-বি-কে-ডিওয়ালাদের খোঁচা খেয়ে আরামশয্যা ছেড়ে সিধে হয়ে বসেছেন। ক্ষমতার সাধ তিনি পেয়েছেন, খাদ্য যখন প্রস্তুত, তার খোশবু যখন তাঁর নাসারন্ধ্রে এসে সুড়সুড়ি দিয়েছে,

দেশমুখ

তখন রসনা তৃপ্ত করার এ সুবর্ণ সুযোগ ছাড়বেন—এমন মূর্খ তিনি নন।

মূর্খ তিনি কস্মিনকালেও ছিলেন না, মূর্খামি করলে তাঁর সিভিলিয়ান হওয়াই শক্ত হত তো মন্ত্রীগিরি দূরস্থান। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া শেষ করে চিন্তামন যান বিলেতে। আর সেদিন বিলেত যাওয়ার অর্থই তো হয় পুরোপুরি স্বাধীন কর্মজীবনে-প্রবেশের জন্যে নিজেকে তৈরি করা, নয়তো নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিদেশী শাসকদের কাছে সমর্পণ করা। স্বাধীন ব্যারিস্টারী পেশা চিন্তামন দেশমুখের মনঃপূত হয় নি, তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি নেবার পর আই-সি-এস দিলেন এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন।

সরকারী আমলা হিসেবে সি, ডি দেশমুখের খ্যাতি এখানে যে, তিনি অত্যন্ত শক্ত, ভাবাবেগহীন মনের অধিকারী, মনটা যেন তাঁর কঠিন ইস্পাতে তৈরি। তাই চাকুরীক্ষেত্রে ক্রমোন্নতি তাঁর কখনো বাধাপ্রাপ্ত হয় নি। ১৯১৯ সালে বৃটিশ শাসন দপ্তরে প্রবেশ করে তিনি বিভিন্ন দায়িত্বভার পালন করেছেন। তদানীন্তন মধ্যপ্রদেশ ও বেরার সরকারের তিনি ফিনান্সিয়াল সেক্রেটারীগিরি করেছেন ছ' বছর। তারপরে ১৯৩৯ সালে প্রদেশ সরকারের পদ থেকে প্রমোশন পেয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ে যোগ দিলেন। এখানে তিনি কালক্রমে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডেপুটি গভর্নরের পদ লাভ করেন। এখান থেকে পরবর্তী ধাপের দূরত্ব তাঁর কাছে সামান্যই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আমলে ছাপা কারেন্সী নোটগুলি শ্রী সি, ডি, দেশমুখের হস্তাক্ষরেই ধন্য হত, তিনিই তো তখন রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্নর।

স্বাধীন ভারতেও এই সিভিলিয়ান পুরুতের কোনো অমর্যাদা তো ঘটেই নি, বরঞ্চ তিনি বার বার পুরস্কৃত হয়েছেন। ব্যাঙ্ক ব্যবসা, অর্থনীতিটা নাকি তিনি বেশ ভালই বোঝেন, তাই উচ্চ থেকে উচ্চতর পদও জুটেছে তাঁর। ব্রেটনউড্স, বিশ্বব্যাঙ্ক, আন্তর্জাতিক অর্থ ভান্ডার ইত্যাদির সম্মেলনে ভারতকে প্রতিনিধিত্ব করার দুর্লভ অধিকার একদিন তাঁরই একচেটে ছিল। প্রধানমন্ত্রী নেহরু এই কৃতী পুরুষের দাম বুঝেছিলেন, তাই প্ল্যানিং কমিশনের সদস্যপদ দিতে তিনি বিলম্ব ঘটান নি। সম্মুখম চেট্টি বিদায় নিলে প্রধানমন্ত্রী নেহরু প্রায় সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ক্যাবিনেটে শূন্য অর্থমন্ত্রীর পদটি অর্থনীতির পন্ডিত লোক শ্রীচিন্তামন দেশমুখকে উপহার দেন।

দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই গুরুত্বপূর্ণ পদটি তিনি বেশিদিন দখলে রাখতে পারেন নি। সৌরাষ্ট্র রাজ্য গঠনের প্রশ্ন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ ঘটলে তিনি পদত্যাগ করেন। হয়তো জীবনবীমা ব্যবসার রাষ্ট্রীয়করণেও তাঁর আপত্তি ছিল বলে তিনি নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। কিন্তু এই প্রতিভার তো আর অপচয় হতে দেওয়া যায় না। তাই দেশমুখকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরের পদ দিয়ে তাঁর মূল্যবান উপদেশ থেকে যাতে দেশবাসী বঞ্চিত না হয়, তার ব্যবস্থা করা হল।

শ্রীদেশমুখের দ্বিতীয় পক্ষের (প্রথম পক্ষের ইংরেজঘরণী তাঁকে ত্যাগ করে গিয়েছেন।) শ্রীমতী দুর্গাবাঈ ওকালতি ছেড়ে সমাজসেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন। শ্রীদেশমুখ কখনো রাজনীতি করেন নি, দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাঁর স্বেচ্ছাসেবকের ভূমিকাও ছিল না। ৭৩ বছরের বৃদ্ধ দেশমুখ তবুও এই সান্ত্বনা লাভ করতে পারবেন যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তাঁর স্থান মাত্র দুজনের পরেই হয়েছে।

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং—(৪)

মেঘনাদ সাহা গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে একটি-দুটি বিচ্ছিন্ন রচনায় বা বক্তৃতায় মাত্র আপত্তি জানান নি, তাঁর ছিল ধারাবাহিক সর্বাত্মক আক্রমণ। ভারতীয় ইতিহাসে গান্ধীজীর আবির্ভাবের সময় থেকেই তিনি গান্ধীবাদের বিরোধী, এবং সেই মানসিক বিরোধিতাকে নিজের মনের খাঁচায় আবদ্ধ রাখতে পারেন নি, যেহেতু বৈজ্ঞানিককে তিনি সামাজিক মানুষ হিসাবেও গণ্য করতেন। আবার গান্ধীবাদকে ক্ষতিকর মনে করলে নিছক বাচনিক সমালোচনাতে থেমে থাকাকেও তিনি দায়িত্বহীনতা মনে করেছিলেন, তাই বিকল্প জীবনদর্শন ও তাকে কার্যকর করার পথও দেখিয়েছিলেন। "এলাহাবাদে থাকার সময়েই সাহার সংগঠনী শক্তি বিকাশ লাভ করে। 'ন্যাশন্যাল একাডেমী অব সায়েন্স', 'ন্যাশন্যাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স' প্রভৃতি বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠান স্থাপনে তিনি অগ্রণী হন। ১৯৩৩ সালে কলকাতায় 'ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশন', ও 'সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার' পত্রিকার প্রতিষ্ঠা সাহার জীবনের অন্যতম কীর্তি। তিনি আজীবন এই পত্রিকাটির সম্পাদনা করে গেছেন।"১

'সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ সালের জুন মাসে। একেবারে প্রথম সংখ্যাতেই সম্পাদকীয় নিবন্ধে ডঃ সাহা ভারতবর্ষে চিরাচরিত প্রাচীনের জয়-গানের সমালোচনা করে গান্ধী-অর্থনীতির অসারত্ব দেখিয়ে দিয়েছিলেন—

"With respect to our country, we would hold with Mahatma Gandhi that the spinning wheel and the bullock cart should be protected so long as the State cannot provide for the victims of unemployment; on the otherhand, there should unremitting effort to adopt the modern technic to all the needs of industrial and economic life, and old and antiquated methods should be discarded without a sigh or tear when the proper insurance against unemployment has been made."

সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার পত্রিকা প্রকাশের উদ্দেশ্য "জাতীয় পুনর্গঠনে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জনসাধারণের আগ্রহ উদ্দীপিত করা।' সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশনের তৃতীয় সাধারণ সভায় (১৯৩৮) সম্পাদকীয় বিবরণী উপস্থিত করতে গিয়ে ঐ কথা সম্পাদক ডঃ শিশিরকুমার মিত্র বলেছিলেন। তিনি আরও জানিয়েছিলেন, নদী সমস্যা, সুলভ বিদ্যুৎ-শক্তি, বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংস্থা, শিল্প সংগঠন, কৃষিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সম্বন্ধে প্রচুর তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ এই পত্রিকাতে বেরিয়ে গেছে। 'সায়েন্স অ্যাণ্ড ইনডাস্ট্রি' পর্যায়ে তাঁরা প্রচুর প্রবন্ধ ছেপেছেন, তাও জানিয়েছিলেন।

এই সমস্ত কিছুর পিছনে মূল প্রেরণাশক্তি ডঃ মেঘনাদ সাহারই। বিজ্ঞানকে উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্যবহারের ব্যাপারে ডঃ সাহার বিশেষ মনোযোগ ছিল। সেই উদ্দেশ্যে ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৮-এর মধ্যে শিল্পায়ন সম্বন্ধে অনেকগুলি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখেছিলেন, এবং অন্যদের দিয়ে লিখিয়েছিলেন।২ এখানে স্মরণ করিয়ে দেওয়া যায়, অধ্যাপক শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়ের মতে, "আজকের দামোদর বাঁধ পরিকল্পনার জন্মদাতা মেঘনাদ সাহা।..... এই পরি-

---

১ মেঘনাদ রচনা সংকলনের ভূমিকা : ডঃ শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় লিখিত।

২ মেঘনাদ সাহা সায়েন্স অ্যাণ্ড কালচার পত্রিকায় ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে যন্ত্রশিল্পায়ন এবং জাতীয় পরিকল্পনার সমর্থনে অনেকগুলি সম্পাদকীয় প্রবন্ধ ও সাধারণ প্রবন্ধ লিখেছেন। অগস্ট, ১৯৩৫-এ—A Common Script for India; ডিসেম্বর, ১৯৩৬-এ—Irrigation Research in India; মার্চ, ১৯৩৭-এ—Industries and Scientific Research; মে, ১৯৩৭-এ—Problems of Industrial Development in India; অগস্ট, ১৯৩৭-এ—On the National Supply of Electricity; অক্টোবর, ১৯৩৭-এ—Indian National Reconstruction ond Soviet Example; ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৮-এ Need for Power Research and Investigation Board in India; মে, ১৯৩৮-এ—The Intelligent Man's Guide to the Production and Economics of Electrical Power; মে, ১৯৩৮-এ—Symposium on India's Power Supply; জুলাই, ১৯৩৮-এ—The Next Twenty-five Years of Science in

কল্পনার প্রথম খসড়া তিনি উপস্থিত করেন ১৯৩৪ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে মূল সভাপতির অভিভাষণে।"

জার্মানী, ইংলন্ড, আমেরিকা প্রভৃতি বিজ্ঞানে ও শিল্পে উন্নত দেশগুলি থেকে ডঃ সাহা লিখেছিলেন বিজ্ঞানকে শিল্পে ব্যবহার করে কিভাবে জনজীবনের মান উন্নয়ন করা যায়, কিন্তু সেই সঙ্গে একটি সমস্যা থেকে গিয়েছিলই—ঐ সব দেশে বৈজ্ঞানিক পন্থায় শিল্পসাধনার ইতিহাস দীর্ঘ দিনের,—সেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি স্বদেশের ক্ষেত্রে ঘটাতে গেলে অনুরূপ দীর্ঘ সময় বা দীর্ঘতর সময় লাগবে, কারণ ভারতবর্ষ অধিকন্তু পরাধীন। ডঃ সাহার চিন্তা-ভাবনা ভারতবর্ষকে কেন্দ্র করেই, যে-দেশের বিপুল আকার, বিপুল জনসংখ্যা এবং বিপুল দারিদ্র্য। ডঃ সাহা স্বভাবে গতিশীল, সমস্যা তাঁর কাছে চ্যালেঞ্জের মত, যতক্ষণ না তার সমাধান খুঁজে পাচ্ছেন অস্থিরতার শেষ থাকে না,—সমাধান এনে দিল একটি দেশ, ভারতবর্ষের মত অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে যাত্রারম্ভ করে কুড়ি বছরের মধ্যে অভূতপূর্ব বৈষয়িক উন্নতি যে-দেশ দেখাতে পেরেছে—তার নাম রাশিয়া। ভারতবর্ষের জন্য রাশিয়ার পদ্ধতি—সিদ্ধান্ত করতে ডঃ সাহার দেরি হয় নি।

বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার সবকিছু ডঃ সাহা গ্রহণ করেছিলেন এমন কিন্তু মনে হয় না। ১৯৩৮ সালের নভেম্বর মাসে শান্তিনিকেতনে ছাত্রসভায় বক্তৃতা করার সময়ে বিজ্ঞানমুখী জীবনবোধ গ্রহণ করার আহ্বান যখন জানিয়েছিলেন, তখনো তিনি বলেছেন,—তাই বলে রাশিয়ার আদর্শই ভারতের আদর্শ নয়।

"But I want that our philosophy should not be of the Russian brand. *If any philosophy is to bear fruit it should not only be based on mere materialism. There is something missing in the life of Russia and that is freedom of ideas and action.* If we have to review our springs of civilization we should have a certain background of moral and social benevolence, without these there can be no stability." (বক্রলিপি লেখক নির্দেশে)

জানি না, রবীন্দ্রনাথ সামনে উপস্থিত ছিলেন বলেই ডঃ সাহা এই কথাগুলি বলেছিলেন কি না! কিন্তু যতদূর শুনেছি, ডঃ সাহা মতের ক্ষেত্রে কাউকে, তিনি যত বড়ই হোন না কেন, পরোয়া করতেন না। ডঃ সাহার কথায় ও কাজে কোনো পার্থক্য থাকত না, এ-কথা বিশেষ জোরের সঙ্গে তাঁর গুণমুগ্ধ ছাত্র, বর্তমানে অধ্যাপক শ্রীশান্তিময় চট্টোপাধ্যায় আমাকে জানিয়েছেন।৩ আমাদের তাই মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ কাছে আছেন, এই সুবিবেচনার প্রণোদিত হয়েই ডঃ সাহা রাশিয়ার জীবনদর্শনের অসম্পূর্ণতার কথা বলেন নি—রবীন্দ্র-সান্নিধ্য তাঁর মধ্যে অপর জীবনের জন্য যে একটা নিগূঢ় আকাঙ্ক্ষা সর্বদা বর্তমান ছিল, তাকেই উদ্দীপ্ত করেছিল। প্রচণ্ড বৈজ্ঞানিকতার মধ্যেও সাহিত্য ও রসশিল্পের প্রতি আকর্ষণ ডঃ সাহা এড়াতে পারেন নি, এবং জীবনের পূর্ণতা যে বস্তুবাদী দর্শনের মধ্যে নেই, তা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন। ইতিপূর্বে একটি ফুটনোটে আমরা বিজ্ঞান ও ধর্মের সম্পর্ক সম্বন্ধে ডঃ সাহার মনোভাবের কথা জানিয়েছি। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে 'গোল্ডেন বুক টেগোরে' প্রদত্ত তাঁর রচনার বক্তব্যও দেখেছি। দেখেছি যে, এই বৈজ্ঞানিক পুরাতন গোঁড়া ধর্মগুলির বন্ধনমুক্ত হতে চান, কিন্তু আইনস্টাইন-দর্শিত 'বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্নিহিত সৌন্দর্য... যেখানে স্থান ও কাল একাত্ম'—তার মহিমাকে অস্বীকার করেন না। রবীন্দ্রনাথের দেহত্যাগের পরে ডঃ সাহা তাঁর উপরে যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার মধ্যে হৃদয়ের ভক্তি ও শ্রদ্ধা উজাড় করে দিয়েছিলেন, যে-রবীন্দ্রনাথ কিন্তু বহুলাংশে অধ্যাত্মবাদী কবি। ঐ রচনার সর্বশেষ অনুচ্ছেদে ডঃ সাহা যা লিখেছিলেন তা রীতিমত বিস্ময়কর মনে

India ; সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮-এ—Congress President on National Reconstruction ; সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮-এ—Technical Assistance to Indian Industry by the Govt. of India ; অক্টোবর, ১৯৩৮-এ—On a National Scheme of Education ; জানুয়ারী, ১৯৩৯-এ—Industrial India.

এই সব বিষয়ে অন্যান্য বিশেষজ্ঞের লেখা প্রচুর প্রবন্ধ বেরিয়েছে উক্ত পত্রিকায়। শিল্পায়নে বিজ্ঞানের প্রযুক্তির বিষয়ে Science and Industry নামে একটি গোটা বিভাগই নির্দিষ্ট ছিল, যার মধ্যে বহু মূল্যবান লেখা ও অভিমত বেরিয়েছিল।

প্রধানত ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত সময়ে প্রকাশিত লেখাগুলির উল্লেখের কারণ, ১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র প্ল্যানিং কমিটি গঠন করেন—সেই অবধি পরিকল্পনার পক্ষে ডঃ সাহার প্রচারের রূপ দেখাতে চাইছি।

৩ ডঃ সাহার পুত্র অধ্যাপক ডঃ অজিতকুমার সাহার কাছ থেকে একটি কৌতুকজনক কাহিনী এই প্রসঙ্গে শুনেছি। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্রকে ডঃ সাহা পিতৃতুল্য জ্ঞান করতেন। তাহলেও, গান্ধী-নীতির প্রতি বৈজ্ঞানিক প্রফুল্লচন্দ্রের আনুগত্য তাঁর একেবারেই পছন্দ ছিল না। একবার আচার্য রায় এলাহাবাদে ডঃ সাহার বাড়িতে উঠেছেন, সেখান থেকে কয়েকটি সভায় গিয়ে খদ্দর, চরকা প্রভৃতির গুণগান করেছেন। কলকাতা ফেরার দিনও ঐরকম একটি সভায় গেছেন। তারপরে ডঃ সাহার বাড়িতে এসে তিনি তাঁকে বলেছেন, "মেঘনাদ, একটা মোটর ডেকে দাও, স্টেশনে যাব।" মেঘনাদ তাতে বললেন, "উঁহু, তা পারব না।" "সে কি, ফিরতে হবে যে, গাড়ি তো চাই"। ডঃ সাহা বলেছিলেন, "হাঁ, গাড়ি ডাকব, তবে মোটর নয়, গরুর গাড়ি, যার মহিমা এই ক'দিন আপনি শুনিয়েছেন।"

হবে, অনিলবরণ রায়ের প্রতিবাদের উত্তরে তাঁর রচনাগুলিকে মনে রাখলে। দেখা যাবে, ভারতবর্ষের অতীত গৌরবকে ডঃ সাহা অগ্রাহ্য করেন নি, এবং ভারতবর্ষ ভবিষ্যতে পৃথিবীর সকল দেশের সকল সভ্যতার অপেক্ষা মহান্ সভ্যতা সৃষ্টি করবে,—গভীরভাবে এই আশা পোষণ করেছেন—

"It is said that Homer made ancient Greece. We hope Rabindranath with go down to posterity as the maker of future India—an India greater than herself with all her variegated past, and greater than any other home of civilization—past or present." (*Rabindranath Tagore*; Science and Culture, Sep. 1941.)

শান্তিনিকেতনের বক্তৃতায় রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের কথা বলতে গিয়ে সাহা চীনের ডঃ সানিয়াত সেনের পরিকল্পনার উল্লেখ করেছিলেন, রাশিয়ার নয়।৪ তাহলেও একথা মনে করার কারণ নেই, রাশিয়ার পরিকল্পনা সম্বন্ধে তিনি এইকালে উদাসীন। তা একেবারেই ঠিক নয়। এর দু' বৎসর আগে, 'সায়েন্স অ্যান্ড কালচার' পত্রিকার অক্টোবর, ১৯৩৭, সংখ্যার *Indian National Reconstrution and the Soviet Example* নামক প্রবন্ধের মধ্যে ভারতবর্ষের জন্য সোভিয়েট পরিকল্পনাই অবলম্বনীয়, এ কথা জোরের সঙ্গে বলেছিলেন। জাতীয় পরিকল্পনা সম্বন্ধে 'সায়েন্স অ্যান্ড কালচার' পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাদির বক্তব্যকে অনেকেই আকাশকুসুম মনে করছিলেন; উত্তরে ঐ রচনায় ডঃ সাহা পরিকল্পনার দ্বারা অল্প সময়ের মধ্যে কিভাবে জাতীয় উন্নতি ঘটান যায়, তার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিলেন—সে উন্নতি ঘটিয়েছিল সোভিয়েট রাশিয়া। বিপ্লব-পূর্ব রাশিয়া এবং তৎকালীন ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা একই রকমের, একথা প্রবন্ধ-সূচনায় তিনি জানিয়েছিলেন; তাঁর মতে, রাশিয়ার পক্ষে যা সাধ্য ভারতের পক্ষে তা অসাধ্য নাও হতে পারে, যদি ভারত রাশিয়ার দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষা নেয়। রাশিয়া বৈজ্ঞানিকদের উন্নয়নকাজে লাগিয়েছিল, ভারতকেও তাই করতে হবে। "কিছু বড়-লোকের পকেট মেরে গরীব চাষাদের মধ্যে সে টাকা ছড়িয়ে দিয় সমস্যা সমাধানের" যে-চেষ্টা প্রাদেশিক কংগ্রেসী সরকারগুলি করছে, সেই বৃথা চেষ্টা ত্যাগ করে জাতীয় পরিকল্পনার সাহায্যে জাতীয় সম্পদবৃদ্ধিতে ভারত যদি না প্রয়াসী হয় তাহলে উন্নতির সম্ভাবনা সুদূর পরাহত—ডঃ সাহা বলতে চেয়েছিলেন।

বিপ্লবপূর্ব রাশিয়া ও ১৯৩৭ সালের ভারতবর্ষের সম-অবস্থার বিষয়ে ডঃ সাহা লিখেছিলেন—

"যুদ্ধের (প্রথম বিশ্বযুদ্ধ) ঠিক আগে রাশিয়ার অবস্থা নানা দিক দিয়ে ভারতেরই অনুরূপ ছিল। বিদ্যুৎশক্তি, জলপ্রবাহ, খনিজ এবং কৃষির বিপুল সম্পদ এই দেশের ছিল কিন্তু সেগুলির কোনই উন্নতি ঘটানো হয়নি। কৃষকেরা ছিল দেশের জনসংখ্যার ৯৪ ভাগ,—নিতান্ত অনুন্নত অবস্থায় থাকার জন্য দুর্ভিক্ষে ও মহামারীতে তারা লাখে লাখে মরত। দেশের শিল্প প্রধানতঃ বিদেশী পুঁজিবাদী ও কারিগরদের হাতে। এই ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্য জাতীয় পুনর্গঠনের কোনো পরিকল্পনাকেই সফল করা যেত না, সে চেষ্টাকে বানচাল করে দিত কায়েমী স্বার্থ। বিপ্লবের পরে ক্ষমতায় এসে বলশেভিকরা যদি শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতাটুকু বজায় রাখতেই সচেষ্ট থাকত, পোলাণ্ড-সরকার যেমন করেছিল, তাহলে এতদিনে তাদের কবরবাস ঘটে যেত। তার পরিবর্তে, ক্ষমতা পাবার পরেই তারা কৃষি, শিল্প, পরিবহন, জলসম্পদ প্রভৃতি সর্ববিষয়ে জাতীয় সম্পদ উন্নয়নের পরিকল্পনা করেছিল।...তারা বুঝেছিল, এর জন্য অনেক বছরের ধৈর্য ও শ্রমসাধ্য প্রয়াসের প্রয়োজন হবে, এবং দেশ যদি নিজ সন্তানকে শিক্ষা দিয়ে তৈরি করে নিতে পারে ও দেশের সমস্ত সম্পদ ও শক্তি যদি এই কাজে লাগানো যায় তবেই পরিকল্পনার সাফল্য ঘটবে। পরিকল্পনার কী অপূর্ব পরিণতি ঘটেছে, তার চেহারা তো এখন বিশ্বের সামনে উন্মুক্ত।"

উক্ত প্রবন্ধে ডঃ সাহা কৃষিতে, খনিজ শিল্পে, নদী-ব্যবস্থায় কত উন্নতি রাশিয়া ঘটিয়েছে দৃষ্টান্তসহ তার উল্লেখ করেছিলেন, কিন্তু বিশেষ জোর দিয়ে বুঝিয়েছিলেন বিদ্যুৎশক্তিতে রাশিয়ার আশ্চর্যজনক উন্নতির কথা। বিদ্যুৎশক্তিকে ডঃ সাহা উন্নতির চাবিকাঠি মনে করতেন, এই প্রবন্ধে ও অন্য বহু প্রবন্ধে তা আমরা দেখতে পাই। যুদ্ধপূর্বে রাশিয়ার বিদ্যুৎ-উৎপাদনের পরিমাণ ছিল জার্মানীর এক চতুর্থাংশ, এমন কি ১৯২২ খৃষ্টাব্দেও তা ক্ষুদ্র সুইজারল্যাণ্ডের চেয়েও অল্প, অথচ বিদ্যুৎ-উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় খনিজ সম্পদ ও জলশক্তির সম্ভার রাশিয়ার ছিল প্রায় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের মতই। বিদ্যুৎ-উপাদান শিল্পের মূলধনের মাত্র ৩০% তখন রাশিয়ার হাতে, বাকি সবই জার্মান, ইংরেজ, সুইডিশ প্রভৃতির করায়ত্ত। এই অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে রাশিয়া বিদ্যুৎশক্তিতে অগ্রণী দেশগুলির সমকক্ষতা পেয়েছিল লেনিনের দূরদৃষ্টির ফলে, যিনি কমিউনিজমকে সফল করার ক্ষেত্রে চেতনার বৈদ্যুতিকীকরণের চেয়ে বাস্তব বৈদ্যুতিকীকরণকে কম মূল্য দেন নি।৫

[ক্রমশ]

৪ 'সায়েন্স অ্যান্ড কালচারের নভেম্বর, ১৯৪২ সংখ্যায় প্রকাশিত *The Renaissance of China* রচনাতে সান ইয়াত সেনের চীনের নীতির প্রতি ডাঃ সাহার পূর্ণ সমর্থন দেখা যায়।

৫ ডঃ সাহা বৈদ্যুতিকরণ সম্বন্ধে লেনিনের উক্তি যথেষ্ট উদ্ধৃত করেছেন। ১৯২০ সালে লেনিন বলেছিলেন—

"A report on the electrification of Russia has been included in the agenda of the Congress of Soviets, so that the single economic plan for the restoration of national economy that we have been discussing may be outlined from the technical standpoint. Unless Russia is placed on a different technical level, higher than before, *restoration of the national economy and Communism are out of the question. Communism is the Soviet power plus the electrification of the whole country, for without electrification progress in industry is impossible."*

(সায়েন্স অ্যান্ড কালচার, অক্টোবর, ১৯৩৭ সংখ্যায় *Indian National Reconstruction and the Soviet Example* প্রবন্ধে উদ্ধৃত)

হরপ্রসাদ মিত্র

বই-বাছাই বাংলা বইয়ের মেলা

[পূর্বানুবৃত্তি]

আনন্দ বলেছিল—রূপ গঠনের শ্রেণী-বৈচিত্র্যের দিক থেকে গদ্য, পদ্য, নাটক-নাটিকা ইত্যাদি-ই বলো, —আর, বিষয়-বৈচিত্র্যের দিকে নজর রেখে জীবনী, ব্যাকরণ, অভিধান, পত্রাবলী,—কিংবা ইতিহাস, ভূগোল, ধর্মশাস্ত্র প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের বইয়ের কথাই বলো,—এ-আলোচনায় কেবলমাত্র বিষয় বা রূপগত প্রকৃতি অনুসারে বইগুলি সাজাবার চেষ্টা মোটেই মনোমত হবে না। ধরো, কবিতা একটি বিষয়;—সময়ানুক্রম ধরে সে-ধারায়—ধরো, পর-পর ঈশ্বর গুপ্ত, রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, দেবেন সেন ইত্যাদি দেখা দিলেন,—তাঁদের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলির আলোচনা করা গেল,—এবং তাঁদের অন্যান্য বইগুলিরও সংক্ষিপ্ত পরিচয় বা উল্লেখমাত্র দেওয়া গেল। কিন্তু যতো সংক্ষেপেই এসব বলা যাক, ১৮০০ থেকে ১৯৫০ পর্যন্ত—শ-দেড়েক বছরের বাংলা কবিতার ধারা-বিবরণী কি হাজার পৃষ্ঠার কমে,—অথবা ন্যূনপক্ষে পাঁচশ' পৃষ্ঠার কমে শেষ করা যাবে?

আনন্দ আরো বলেছিল—সেই পাঁচশ' বা হাজার পৃষ্ঠা ব্যাপী কাব্যালোচনার পরেও পাঠকদের কি আর ধৈর্য থাকবে অন্য বিষয়ের অন্য আলোচনা শোনবার?

আমি বলেছিলুম—আমরা তো বাংলা সাহিত্যের বিস্তৃত গ্রন্থ-পরিচিতি লিখতে বসি নি। অতো সব বলবার দরকার কী?

—তাহলে কতোটুকু দরকার, সেটা বুঝিয়ে দাও।

—কতোটুকু দরকার, সে তো আগেই বুঝে নিয়েছি। এতক্ষণ তো সেই সব কথাই হোলো।

—কী রকম?

—গোপালবাবুর 'বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা'র ভূমিকা থেকে অধ্যাপক সুশীলকুমার দের সেই কথাগুলি আর একবার মনে করো—

এই বলে আমি আবার ডক্টর দের সেই উক্তি পড়ে শুনিয়েছিলুম—

> 'সাহিত্যের ইতিহাস কেবল কবি, কাব্য ও কাহিনীর বিবরণে অথবা স্থান, কাল ও পাত্রের নীরস তর্কে সার্থকতা লাভ করে না। এখানে প্রধান জিজ্ঞাস্য হচ্ছে—সৃষ্টির প্রেরণা ও সেই অন্তর্গত প্রেরণার ঐতিহ্য, যার সমাধান কেবল বাহ্য তথ্যের বিচারে সম্পন্ন হয় না। এই প্রেরণার স্বরূপ বোঝার জন্য রাষ্ট্রিক ও সামাজিক পরিবেশের ধারণাও আবশ্যক, কারণ তার মধ্যেই এই প্রেরণা বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে।'

আনন্দ বললে—এই কথাটা তাহলে তোমার এ আলোচনার স্থির প্রেরণা বলে ধরতে দাও। তাই ঠিক তো?

—দিলুম। তাই-ই ঠিক।

—তাহলে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের—তথা, নানা ধরনের বাংলা রচনাবলীর অন্তর্নিহিত প্রেরণার বস্তু-বৈচিত্র্যের দিকে চোখ রেখে এগুতে হলে, এই 'আধুনিকতা'র আদি, মধ্য, অন্ত—বা সাম্প্রতিক পর্বগুলির প্রকৃতি দেখতে দেখতে বিশেষ বিশেষ লেখক, বিষয়, বই, ঘটনা ইত্যাদির বৈশিষ্ট্য বা মূল পরিচিতি দিয়ে যাওয়াই ভাল।

আমি বললুম—হাঁ,—এবং এই সূত্র ধরে, উনিশ শতকের সূচনা পর্বে আমাদের সাহিত্যে যে আধুনিকতা দেখা দিয়েছিল,—ডক্টর সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' বইখানির দ্বিতীয় খণ্ডে (পঞ্চম সংস্করণ, ১৩৭০) তার কয়েকটি চিন্তাসূত্র আমি যা যা লক্ষ্য করেছি,—তা একটু পড়ে শোনাই?

সুকুমারবাবু লিখেছেন, 'ইংরেজি সাহিত্যের স্বাদ পাইয়া শিক্ষিত বাঙ্গালী নিজের সাহিত্যের প্রতি সচেতন হয় এবং সে সাহিত্যের অপূর্ণতার সম্বন্ধেও তাহার বোধ জন্মায়। ইহার প্রথম ফল ফলিল ঊনবিংশ শতাব্দের প্রথম ভাগে গদ্য-পাঠ্যপুস্তক রচনায় এবং সমসাময়িক পত্রিকার প্রচলনে।'

আনন্দ বললে—রোসো, রোসো—ধীরে বন্ধু, ধীরে—! ওসব অনেক পরের কথা। ১৮০০ থেকে ধরা যাক, ১৮২৫ পর্যন্ত,—শ্রীরামপুর মিশন এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত, মুন্সী ইত্যাদি লেখকরা বাংলায় যে গদ্যচর্চা করে গেছেন, তার পেছনে, 'ইংরেজি সাহিত্যের স্বাদ'-পাওয়া আত্মপ্রকাশের তাড়না ছিল কি? সে সব কি সত্যিই সাহিত্যরসিক মনের কাজ?

—আমি বললুম—সর্বত্র তা না ঘটে থাকলেও কথাটা কিন্তু মন্দ নয়। 'সমসাময়িক পত্রিকা'গুলিতে তো সে-কাজ কিছু কিছু ছিল?

সে বললে—ছিল কি ছিল না, সেটা বিচার-সাপেক্ষ বিষয়। হঠাৎ এক নিশ্বাসে এসব কথা বলা চলে না।

—তাহলে সে-পর্বের প্রকৃতি তুমি কিভাবে দেখতে চাও?

—আমি দেখছি খৃস্টধর্ম প্রচারের প্রবল এক ইউরোপীয় ঢেউ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক এবং রাষ্ট্রগত দুর্যোগের ছিদ্রপথে ঐ সময়ে আমাদের অভিভূত করেছিল। বাংলায় পাঠ্যপুস্তক রচনা তারই একটা আনুষঙ্গিক ফল।

আনন্দ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আরো বললে—অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন তাঁর 'ওয়েস্টার্ন ইনফ্লুয়েন্স ইন বেঙ্গলি লিটারেচার' (১৯৩২) বইখানির প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পৃষ্ঠাতেই ১৯৩১ খৃস্টাব্দের আদম-সুমারির বিবরণী থেকে দেখিয়েছিলেন যে, এদেশে পাঁচ-বছরের বেশি বয়সের পুরুষদের মধ্যে শতকরা মাত্র আঠারজন মাতৃভাষায় নিজের নিজের নাম লিখতে-পড়তে পারতেন। ১৯২১ খৃস্টাব্দে এই যদি আমাদের শিক্ষার অবস্থা ঘটে থাকে, তাহলে ১৮২১ খৃস্টাব্দে কী যে ছিল, সে তো ভাবতেও ভয় হয়। দেশে 'আধুনিকতা' সম্বন্ধে জনশিক্ষা ছিল না।

আমি বললুম—তাতে কী এসে যায়? 'শিক্ষিত বাঙালী' বলতে সুকুমারবাবু যাঁদের কথা ধরেছেন, তাঁরা দেশের লোকসংখ্যার শতকরা একভাগ হলেও তাঁর বক্তব্য তো মিথ্যে হয়ে যায় না।

সে বললে—স্বাধীনভাবে অবস্থাটা ভেবে দেখা দরকার। সুকুমারবাবুর ভাবনা সুকুমারবাবু জানিয়েছেন। তোমার ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে—এবং পাঠককে সোজাসুজি স্পষ্টভাবে সে-সব জানাতে হবে।—পড়ো তাঁর কথা—

আমি পরের অংশ আবার পড়তে আরম্ভ করলুম—

'ইংরেজী শিক্ষার মার্জনা ও তল্লব্ধ নব-মূল্য-বোধের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যে আধুনিকতার পথ প্রস্তুত হইতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দের মধ্যভাগের শ্রেষ্ঠ লেখক রঙ্গলাল-মধুসূদন-বঙ্কিমের রচনাকে সম্ভাবিত করিয়াছিল ইংরেজী শিক্ষা। ইংরেজী-সাহিত্যের রসপদৃষ্টি লাভ করিয়া শিক্ষিত বাঙ্গালীর কল্পনায় যে আত্মসম্মানের বিস্ফার ও দেশপ্রীতির রঙ দিয়াছিল তাহাই আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের মনোবীজ।'

সে বললে—এসব কথা অবশ্যই স্বীকার্য,—কিন্তু এই সব বাক্যের মাঝে মাঝে অনেক ফাঁক থেকে গেছে। অধ্যাপক সেন পুরো ঊনিশ শতক এক নজরে দেখে নিয়েছেন তাঁর বইয়ের ঐ কয়েক পৃষ্ঠায়,—কিন্তু তোমাকে দেখতে হবে আরো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে।

—কীরকম?

—রঙ্গলাল-মধুসূদন-বঙ্কিম ঊনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ লেখকদের মধ্যে গণ্য বটেন,—কিন্তু ১৮০০ থেকে ১৮৫০-এর মধ্যে এ'দের কোন্ শ্রেষ্ঠ রচনা বেরিয়েছিল বলো? শতাব্দীর প্রথম পঁচিশ-তিরিশ বছরে 'আধুনিক' ইংরেজী-সাহিত্যের 'রসপদৃষ্টি' কি আমাদের লেখকদের মনে মনে বর্তেছিল?

আমার জবাবের জন্যে অপেক্ষা না করেই সে আরো বললে—গত শতকের জাতীয় অভিজ্ঞতার সূত্রগুলি দেখাতে গিয়ে অধ্যাপক সেন দেখিয়েছেন—প্রথমত ইংরেজি শিক্ষার ফলে যে পরিবর্তন দেখা দেয়, তাতে জাতির আত্মরক্ষার চেষ্টা জেগে ওঠে,—অতঃপর সংস্কারের প্রয়াস দেখা দেয়। দ্বিতীয়ত জাগে ব্যক্তি-চেতনা—মধুসূদনের কাব্যে যে-লক্ষণটির বিশেষ অভিব্যক্তি ঘটেছে।

আমি বললুম—তিনি 'ব্যক্তিচেতনা' এবং 'আত্মচেতনা' দুটি শব্দ আলাদা আলাদা অর্থে প্রয়োগ করেছেন,—যেমন ব্যক্তিচেতনার কথা-সূত্রে তিনি লিখেছেন—

'মধুসূদনের কাব্যের প্রধান ব্যক্তিগুলি ছাঁচে গড়া পুতুল নয়। তাই মেঘনাদবধে রামের তুলনায় রাবণ মহৎ এবং দশরথের মাপে কেকয়ী বড় দেখায়।'

আবার 'আত্মচেতনা'র উল্লেখও সুকুমারবাবুর এই লেখাতে বিদ্যমান,—যেমন—

'চতুর্দশপদী কবিতাবলীর কোন কোনটিতে আবার ব্যক্তিচেতনার সঙ্গে আত্মচেতনারও উদ্ভাস পড়িয়াছে।'

আনন্দ বললে—এ দুটি শব্দের বাঞ্ছিত ইঙ্গিত বুঝে দেখতে হবে। কিন্তু ঊনিশ শতকের প্রথম পঁচিশ বছরের বাংলা বইয়ের রাজ্যে এসব কথার উপযোগিতা একটুও ছিল কি না, সেটা ভেবে দেখা উচিত।

আমি বললুম—সুকুমারবাবু অতঃপর তৃতীয় লক্ষণ হিসেবে 'আত্মকেন্দ্রিকতা' শব্দটি ব্যবহার করে, তার নমুনা হিসেবে বিহারীলাল চক্রবর্তীর রচনা স্মরণ করেছেন।

—সে তো আরো পরের কথা।

—তা হোক, ঊনিশ শতকের সাহিত্যিক মেজাজের মধ্যে তাও গণ্য।—এবং তাঁর দেওয়া চতুর্থ লক্ষণ—'আত্মপ্রসার'।

আনন্দ বললে—সাবধান। সুকুমারবাবু ও-কথাটা ব্যবহার করেই লিখেছেন—

'আত্মপ্রসার—বর্তমান আলোচনার বাহিরে পড়ে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনায় কবির ভাবনা আত্মকেন্দ্রিকতা ছাপাইয়া রূপরসের বিশ্বে সম্প্রসারিত হইয়া দ্যুলোক-ভূলোককে একাকার করিয়াছে, প্রকৃতির সঙ্গে মানব-মনের সুর একতারে গাঁথিয়া দিয়াছে।'

এই সব লক্ষণ-নামগুলি আনন্দ যে পছন্দ করছে না, সে আমি অনুভব করেছিলুম। কোথায় তার মন খুঁৎখুঁৎ করছিল, সেটাও সম্পূর্ণ আমার অগোচর ছিল না। আমি জানতুম ঊনিশ শতকের প্রথম পঁচিশ-তিরিশ বছরের খৃস্টীয় ভাবের ঢেউটা সে একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করাতে চায়। তাই তাকে জিগেস করলুম—আচ্ছা, প্রথম ঢেউটা যদি খৃস্টীয় ভাবের ঢেউ হয়, তাহলে তার অব্যবহিত ফল কী হোলো?

—অব্যবহিত ফল দুটি—একদিকে ভেসে যাওয়া; অন্য-দিকে জোরে আঁকড়ে ধরা,—প্রবল রক্ষণশীলতা এবং প্রবল বিচ্যুতি।

—রক্ষণশীলতা মানে পুরোনো আদর্শ আর সংস্কার অন্ধভাবে ধরে থাকা?

—হাঁ।

—তাহলে তখনকার ব্রাহ্ম-আন্দোলন-কে কি বলা যাবে

—সে খুবই প্রগতির কেতন, কিন্তু আমাদের এই বই বাছাইয়ের কাজে দেশ-কালের যৌগিক ছাপের দিকে নজর

কয়েকটি মানুষ

মনীষীমোহন রায়

কয়েকটি মানুষের বুকে, করতলে
লালকমলের নীলকমলের চোখ—
চন্দন চন্দন গন্ধ কদাচিৎ জাগে তাই শহুরে বাতাসে
তাই জাগে হাটুজলে লালকমলের নীলকমলের হাসি।

চারিদিক প্রতিকূল—বিরুদ্ধ বেসুরে
কুটিল হাতের ছোপ—কালো শুধু কালো......
পথে-ঘাটে টলে পড়া ঢলে পড়া রীতি
ভয়াবহ পরিচর্যা—সীমাছাড়া অসাম্য অপার
দুটি রুজি নিয়ে শুধু আনাচে-কানাচে চলে, জুয়া
জীবন-যৌবন নিয়ে খেলা—পরিচিত কার্নিশে, শিকড়ে...

পুরনো ট্রামের ট্রলি পূর্বাপর একসুরে চলে;
কারাগার অসীম শূন্যতা এক স্নায়ুর ভিতরে করে খেলা
ফেলে ছায়া নিশাতুর—অসীম কুয়াশা।

কয়েকটি মানুষের চোখ
তথাপি তখনো অপলক—
করতলে চন্দন চন্দন গন্ধ—পদ্মের কোরক।
মানুষের নাম গেয়ে আঁকে তারা ছিন্নপটে
মানুষের মুখ......
টানা টানা চোখ নাক—অপার অলক মেঘ
অমল জোয়ার......
তাদের তুলির গতি—চিরদিন, আকাশ অবধি।

রেখে এগুতে হলে আগে খ্রীস্টীয় ধাক্কা,—তারপর রাষ্ট্র-চিন্তা আর রক্ষণশীলতা দুই-ই পাশাপাশি থর্তব্য।

—তারপর?

—তারপর নব্য-হিন্দু ভাব, কিন্তু সে আরো পরের কথা। সে-কথা একটু পরে উঠলেও ক্ষতি নেই। কি বলো?

আমি ভাবছিলুম উইলিয়ম কেরির প্রসঙ্গ,—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের জীবনকথা। হঠাৎ আনন্দ বললে—দ্যাখো, ইতিহাসের গভীর ঢেউ অনেক সময়ে লোকচক্ষুতে ধরতে দেরি হয়। বড়ো বড়ো যুদ্ধ-বিগ্রহ বা রাজা-রাজড়ার অদল-বদল ঘটতেও পারে, নাও ঘটতে পারে। তবু সমাজ বদলে যাচ্ছে,—নানা ভাবের তরঙ্গ কাজ করছে,—ভেতরে ভেতরে কী অদ্ভুত সব শক্তির খেলা চলেছে এই আমাদের মনুষ্য-সমাজে, সে তো বোধেই ধরা দেয়!

এ প্রায় স্বগতোক্তি। আমি শুনলুম শুধু। জবাব নিষ্প্রয়োজন।

সে বললে—একটি একালের চেনা কবিতা মনে পড়ছে, শোনো-

এই বলে সে আবৃত্তি শুরু করলো—

অবাক পৃথিবী! অবাক করলে তুমি!
জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি
অবাক পৃথিবী! আমরা যে পরাধীন
অবাক, কী দ্রুত জমে ক্রোধ দিন দিন;
অবাক পৃথিবী! অবাক করলে আরো—
দেখি এই দেশে অন্ন নেইকো কারো...

আবৃত্তি থামিয়ে আনন্দ বললে—১৯৪০-এর বঙ্গদেশ এই ছাপ রেখে গেছে আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যে। এ অবশ্য খুবই নিরাভরণ সাহিত্য,—কিংবা বলতে পারো, এখানে সরল কারুকার্যের খেলা। এতে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কোনো শিল্পবৈভব আছে বলে আমারও মনে হয় না,—কিন্তু ছাপটা যে খাঁটি তাতে সন্দেহ নেই। ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দের কথা তো মাত্র সেদিনের কথা।

এর বছর-ছয়েক পরের কথা শোনো—

বিদ্রোহ আজ বিদ্রোহ চারিদিকে
আমি যাই তারি দিন-পঞ্জিকা লিখে
এতো বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ,
দিকে দিকে ওঠে অবাধ্যতার-ঢেউ।

আনন্দ বললে—সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'ছাড়পত্র' (২য় সংস্করণ, ১৩৫৫) থেকে 'অনুভব' নামে যুগল কবিতার দুটি অংশ শোনালুম তোমাকে। এর প্রথমটির শিরোনাম ১৯৪০, দ্বিতীয়টির ১৯৪৬। এই বইয়েই তার 'বোধন' কবিতা ছাপা হয়েছিল। সে-সব লাইন মনে পড়ে—

শোন্ রে মালিক, শোন্ রে মজুতদার
তোদের প্রাসাদে জমা হোলো কতো মৃত মানুষের হাড়
হিসাব কি দিবি তার?

আমি বললুম—আনন্দ, অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছে...... আমরা উইলিয়ম কেরির কথাটা আগে ভেবে নিতে পারি—কি বলো?

সে বললে—মোটেই না। অপ্রাসঙ্গিক নয়। বলছি শোনো—দেশ-কালের যৌগিক যে বেগ থেকে বড়ো সৃষ্টি দেখা দেয়, তার চেহারা এইরকমই। প্রথম দিকে দু'একটি স্পর্শকাতর তীক্ষ্ণ সজাগ মনে মনে এই বোধ দেখা দিয়ে যায়—পরে নানা মনে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। প্রথম-দিকে শিল্পের তুলনায় যন্ত্রণাটাই বড়ো হয়ে চীৎকার করে,—পরে শিল্পের যথাযথ শাসন দেখা দেয়। সব যুগের পক্ষেই কথাটা সত্য বলে মনে হয়। কেরি-মৃত্যুঞ্জয়-রামমোহনের আমলেও এইরকমই ঘটেছিল।

[ক্রমশ]

বঙ্গদর্শন

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ সম্প্রতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে, পরীক্ষার ব্যাপারে দুর্নীতি দূর করার জন্য তাঁরা বৃহত্তর আন্দোলনে অবতীর্ণ হবেন, কেন না পরীক্ষা পাশের ক্ষেত্রে ব্যাপক স্বজনপোষণ চলছে, বিশেষ বিশেষ পরীক্ষককে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করলে বিনা পরিশ্রমেই ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া যায়, বহু প্রশ্নকর্তাই নাকি মোটা অর্থের বিনিময়ে অর্থদাতার নিকট পরীক্ষার আগেই প্রশ্ন ফাঁস করে দেন, অনেক ক্ষেত্রে নানান কৌশলে পরীক্ষার্থীর নম্বর বৃদ্ধি করে তাকে উচ্চতর ক্লাস পাইয়ে দেওয়া হয়। তাই দেখা যায়, পরীক্ষার আগে ও পরে বিরাট সংখ্যক পরীক্ষার্থী পড়াশোনার বদলে পরীক্ষা তরিয়ে দেবার মালিকদের ঘরে ঘরে যাতায়াত করছে এবং কিছু কিছু পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় বসার আগেই পরীক্ষা পাশের গ্যারান্টি লাভ করে পরম নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাচ্ছে। অনেক সময় দেখা যায়, খুব ভাল ছাত্রও পরীক্ষায় বাজে নম্বর পেয়েছে এবং অনেক অযোগ্য ছাত্রও, যে কোন কারণেই হোক, প্রথম শ্রেণী করায়ত্ত করতে সক্ষম হয়েছে। এ বছরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান পরীক্ষার ফলাফলে দুর্নীতি, অনাচার ও স্বজনপোষণের চিত্র এত বেশি প্রকট ও নগ্ন যে, তা বৃহত্তর ছাত্রসমাজের পক্ষে মেনে নেওয়া কোনভাবেই সম্ভবপর নয়। স্বাভাবিকভাবেই ছাত্ররা এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন এবং এই বিষয়টি নিয়ে তদন্ত কমিশন বসানোর দাবি করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আংশিকভাবে সেই দাবি মানতে বাধ্য হয়েছেন এবং এ থেকেই প্রমাণিত হয় যে, পরীক্ষায় ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ ভিত্তিহীন নয়।

শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির এইরকম ব্যাপক স্রোত বইতে থাকলে সামাজিক সুস্থতা বজায়-রাখা যে অসম্ভব হয়ে ওঠে সেকথা বলাই বাহুল্য। শিক্ষায়তনেই ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র গড়ে ওঠে, কিন্তু পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-অধ্যাপকেরাই যদি নৈতিক অধঃপতনের গভীর পাঁকে হাবুডুবু খেতে থাকেন, তাহলে ছাত্ররা যে কি ধরণের শিক্ষালাভ করছেন তা সহজেই অনুমান করা যায়। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, মাত্র কয়েক মাস আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের নির্বাচনে জাল ভোট প্রদানের অভিযোগে সংস্কৃত কলেজের কয়েকজন অধ্যাপক অভিযুক্ত হয়েছিলেন। এঁদের বিরুদ্ধে সরকারের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা অবলম্বনের আদেশ থাকলেও এঁরা স্বচ্ছন্দে কলকাতা শহরে আজও বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। উচ্চপদস্থ কয়েকজন সরকারী কর্মচারী এঁদের একান্ত ঘনিষ্ঠ, বন্ধু বন্ধুকে না দেখলে কে দেখবে? কিভাবে এঁরা সর্বত্র নিজেদের প্রভাবজাল বিছিয়ে রেখেছেন, তার একটা নিদর্শন এখানে দেওয়া চলতে পারে। কলকাতা শহরে অনেক বিশিষ্ট শিক্ষা-সংস্কৃতি গবেষণামূলক প্রতিষ্ঠান আছে এবং সেগুলিতেও এইসব চক্র নানাভাবে নিজেদের কর্তৃত্ব স্থাপন করে বসে আছে। এই সব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অনেক বড় বড় ক্ষমতাশালী সরকারী কর্মচারীও সংশ্লিষ্ট আছেন। এরকম একটি প্রতিষ্ঠানের বর্তমান কর্মকর্তাদের তালিকার দিকে তাকালেই দেখা যাবে যে, তাঁরা অধিকাংশই সংস্কৃত কলেজের সঙ্গে কোন-না-কোন প্রকারে সংশ্লিষ্ট, প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃত কলেজের যে চক্রটি আজ জাল ভোটের জন্য চিহ্নিত হয়েছে, ঐ একই চক্র এই প্রতিষ্ঠানের ওপরেও কর্তৃত্ব করছে। কিছু কিছু কর্তৃত্বপদে অত্যন্ত ক্ষমতার অধিকারী পদস্থ সরকারী আমলারাও আছেন, এঁদের মধ্যে এমন একজনের উল্লেখ করা যেতে পারে, যিনি রাজ্যপালের আমলে কার্যত পশ্চিমবঙ্গের হর্তা-কর্তা-বিধাতা ছিলেন। কাজেই আমাদের আলোচ্য চক্রগুলির সঙ্গে এই রকম স্থলেই উচ্চ পর্যায়ের সরকারী আমলাদের হৃদয়ের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কাজেই এক্ষেত্রে একে যে অপরকে দেখবে, তাতে আর সন্দেহ কি? কেন না সমগ্র ব্যাপারটাই হচ্ছে সুপার সিটিজেনদের।

এভাবে শুধু যে দুর্নীতিপরায়ণ লোকেরাই বহাল তবিয়তে রাজত্ব করছে তাই নয়, যাঁরা কোন সাতে-পাঁচে থাকেন না, নিষ্ঠাসহকারে নিজের কর্তব্যকর্ম

গত সপ্তাহের আগের সপ্তাহের বঙ্গদর্শনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের নির্বাচনে দুর্নীতি প্রসঙ্গে আলোচনা করতে যেয়ে আমরা জাল ভোটের নায়কদের প্রসঙ্গে যা লিখেছিলাম, বিভিন্ন শিক্ষানুরাগী মহল থেকে সেইজন্য আমাদের অভিনন্দন জানিয়ে অসংখ্য পত্র এসেছে, এবং সেগুলির কয়েকটির মধ্যে উক্ত চক্রটি সম্পর্কে আরও বহু অভিযোগ এসেছে। এই পত্রগুলি যথাসময়ে প্রকাশ করা হবে। উক্ত চক্রটি কিভাবে যুক্তফ্রন্ট সরকারের ওপরেও প্রভাব বিস্তার করেছিল তার নেপথ্য কাহিনী জনৈক পত্রলেখক পরিবেশন করেছেন, যা পাঠ করলে স্তম্ভিত হয়ে ভাবতে হয় যে, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি বজায় রাখার লোভে এই শ্রেণীর মানুষেরা (এই শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে কলকাতা ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের দু-তিনজন অধ্যাপকও আছেন।) কি না করতে পারে! এ ছাড়া উক্ত ব্যাপারে আমরা ইতিমধ্যে আরও বহু তথ্য সংগ্রহ করেছি, যা যথাকালে প্রকাশ করা হবে। এঁদের নাম প্রকাশ করা হয় নি কেন এজন্য অনেক পত্রলেখক অনুযোগ করেছেন। তাঁর অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, নাম প্রকাশ করতে কোন বাধা নেই. তবে শিক্ষা বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তিই এঁদের চেনেন বলেই বাহুল্যবোধে তা করা হয় নি। আমাদের লক্ষ্য কিন্তু যথাস্থানেই ভেদ করেছে।

করে যান, তাঁদেরই হয় সর্বনাশ। প্রেসিডেন্সি কলেজের একজন অধ্যাপক সেদিন দুঃখ করছিলেন। পঁচিশ বছর বয়স থেকে তিনি সরকারী কলেজে অধ্যাপনা করছেন এবং নিয়মানুযায়ী এক কলেজ থেকে অন্য কলেজে বদলি হতে হতে শেষ জীবনে প্রেসিডেন্সি কলেজে পোস্টেড রয়েছেন, অবসর গ্রহণের আর বেশি বাকি নেই। সংস্কৃত কলেজের কেলেঙ্কারির ব্যাপারে একজনকে দূর জায়গায় বদলি করার আদেশ হয়েছিল, কিন্তু তিনি সেই আদেশকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করে কলকাতায় বসে আছেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের বৃদ্ধ অধ্যাপকটি সেদিন দুঃখ করছিলেন, অমুক তো চালাক ছেলে, খুঁটিরও জোর আছে, সে কিছুতেই অন্যত্র যাবে না, এখানেই ব্যবস্থা করে নেবে। এদিকে খবর পেয়েছি যে, অমুকের পাপের প্রায়শ্চিত্তটা আমাকেই করতে হবে, আমাকেই সেই দূর জায়গায় যেতে হবে, এমন নাকি অর্ডার হয়েছে।

অধ্যাপকেরাই যদি সমাজবিরোধী ব্যক্তিদের মত জাল ভোট থেকে শুরু করে উৎকোচ গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে নিজেদের প্রভাব-প্রতিপত্তি, বিষয়-সম্পদ বাড়াবার চেষ্টা করেন, তাহলে তরলমতি ছাত্রদেরও মনে হতে পারে যে, অসাধুতাই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা। পূর্ববর্তী কোন একটি সংখ্যার বঙ্গদর্শনে লেখা হয়েছিল যে, বিভিন্ন কলেজে প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষার নাম করে ছাত্র-পিছু পনের থেকে তিরিশ টাকা পর্যন্ত আদায় করা হয় এবং সেই টাকাটা সংশ্লিষ্ট অধ্যাপকদের ভোগে লাগে। কলকাতা থেকে মাত্র পঁচিশ মাইল দূরে জনৈক পুণ্যশ্লোক লেখকের নামাঙ্কিত "এশিয়ার বৃহত্তম কলেজে" (ছাত্রসংখ্যার হিসাবে) দিনের পর দিন যে বিশ্রী কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে, যেখানে অধ্যাপকদের দুর্নীতির জন্য ছাত্ররা সমবেতভাবে আন্দোলনে নেমেছেন, তার জন্য ছাত্র-ছাত্রীদের দোষ দেবার স্পর্ধা কারও আছে কি? আজকাল শোনা যায় যে, ছাত্রসমাজ উচ্ছৃঙ্খল ও সমাজবিরোধী হয়ে উঠছে। একশ্রেণীর অধঃপতিত শিক্ষকরাই কি এর জন্য দায়ী নন? শিক্ষকদের সততা সম্বন্ধে ছাত্রদের মনে যদি সন্দেহ থাকে, তাহলে শিক্ষকরা ছাত্রদের শ্রদ্ধাভাজন হবেন কিভাবে, আর শিক্ষায়তনে শান্তি ও শৃঙ্খলাই বা বজায় থাকবে কিভাবে?

একথা সত্য যে, শিক্ষায়তনে সৎ ও আদর্শবাদী শিক্ষকের অভাব নেই, বরং তাঁদের সংখ্যাই বেশি, কিন্তু ধান্দাবাজের দল তাঁদের এমনভাবে দাবিয়ে রেখেছে যে, তাঁরা আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ পাচ্ছেন না। অবিলম্বে এই অবস্থার প্রতিকার হওয়া দরকার। শিক্ষাক্ষেত্র থেকে শিক্ষা-ব্যবসায়ীদের বিতাড়িত করতে না পারলে সমস্যার সমাধান নেই। বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষাক্ষেত্রে এই সমস্ত অনাচারের বিরুদ্ধে শিক্ষক-সমাজেরই বিদ্রোহ ঘোষণা করা উচিত ছিল, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের তিন-চতুর্থাংশেরই লক্ষ্য ও আদর্শ ইউনিভার্সিটি পলিটিক্স, যা ক্ষমতা, প্রতিপত্তি ও অর্থোপার্জনের সোজা রাস্তা, কলেজ অধ্যাপকদের তিন-চতুর্থাংশের লক্ষ্য ইউ-জি-সি'র স্কেল ও অর্থার্জনের বিভিন্ন দিক, স্কুল শিক্ষকদের তিন-চতুর্থাংশের লক্ষ্য বকেয়া টাকা প্রাপ্তি ও পরিস্ফীত প্রাইভেট টিউশন। শিক্ষক-সমাজ দায়িত্ব পালনে অগ্রণী হতে পারেন নি বলেই ছাত্ররা আজ দুর্নীতি-বিরোধী অভিযানে নামতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁদের এই সৎ প্রচেষ্টায় শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকল নাগরিকেরই সমর্থন থাকা উচিত। এদেশে বিনা আন্দোলনে কোন কাজই হয় না, কাজেই ছাত্ররা যদি ঐক্যবদ্ধভাবে কায়েমী স্বার্থের মোকাবিলা করেন তার পরিণাম সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে

তবে কি আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য হব যে, সত্যই স্বাস্থ্যমন্ত্রী তাঁর দপ্তরের "সুহৃদ-চক্রের" শিকার হয়েছেন, এবং যুক্তফ্রন্ট সরকার (যেহেতু স্বাস্থ্যমন্ত্রী সেই সরকারেরই একজন) দুর্নীতির সঙ্গে সহাবস্থানের নীতি অবলম্বন করেছেন?

মাত্র কয়েকদিন আগে আমরা স্বাস্থ্য অধিকারের প্রশাসন শাখার দুজন করণিক সম্পর্কে যে কথা লিখেছিলাম তার পরিপ্রেক্ষিতে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন হওয়া দূরে থাক, উল্টে তাদের আড়াল করার ন্যক্কারজনক প্রচেষ্টা চলছে স্বাস্থ্য অধিকারের দুজন পদস্থ আমলার (এঁরা দুজনেই সুহৃদ-চক্রের সক্রিয় অংশীদার) দ্বারা এবং এ বিষয়ে ওই দুর্নীতিবাজদের খুঁটি হয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রীরই জনৈক বিশ্বস্ত কর্মচারী, খোদ তাঁর ঘরের লোক, —এ যদি চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যায়, তাহলেও কি স্বাস্থ্যমন্ত্রী স্বীকার করবেন না যে তিনি সজ্ঞানে দুর্নীতির প্রশ্রয় দিয়ে চলেছেন?

ওই দুজন প্রশাসন শাখার কর্মচারীই শুধু নয়, আরও অনেকের ক্ষেত্রেই যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী উক্ত সুহৃদ-চক্রের নায়কের পরামর্শে জেনেশুনেই দুর্নীতির পৃষ্ঠপোষকতা করছেন, তার যদি দু'-একটা নিদর্শন দেওয়া যায় তাহলেও কি স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলবেন—সব ঝ্যুটা হ্যায়? স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় কি অবগত আছেন যে, যুক্তফ্রন্টের একটি বিশেষ ঘোষিত নীতিই হচ্ছে যে, একজন কর্মচারীর পুনর্নিয়োগ যদি অপর কোন কর্মচারীর উন্নতির অন্তরায় হয়, তবে তাকে আর পুনর্নিয়োগ করা চলবে না? যদি স্বাস্থ্যমন্ত্রী এই নিয়মটি অবগত হয়ে থাকেন, তাঁকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারি কি তাঁর দপ্তরের জনৈক সেনগুপ্ত মহাশয়ের ৩১-১২-৬৯ পর্যন্ত চাকুরীতে পুনর্নিয়োগ ঘটল কেন? উক্ত কর্মচারীটিকে পুনর্নিযুক্ত করার আগে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কি এই তথ্য অবগত ছিলেন যে, বিভাগীয় অফিসাররা, এমন কি সেক্রেটারী পর্যন্ত উক্ত সেনগুপ্ত মহাশয়ের পুনর্নিয়োগের আবেদন সোজাসুজি নাকচ করে দিয়েছিলেন? স্বাস্থ্যমন্ত্রী কি অস্বীকার করতে পারেন যে, "সুহৃদ-চক্রের" নায়কটির চাপেই তিনি ওই কর্মচারীটির পুনর্নিয়োগের আদেশ দিয়েছেন? (ঠিক এমনিভাবেই একজন অফিসার শ্রীমজুমদারকে পুনর্নিয়োগ করা হয়েছে। কল্যাণী জওহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল হাসপাতালের একজন ডাক্তারের বদলির আদেশ স্থগিত রাখা হয়েছে।)

কাজেই যদি আমরা সিদ্ধান্ত করি যে একটি দুর্নীতিপরায়ণ ক্ষমতালোভী চক্রের সরিৎ-ধারায় স্বাস্থ্যদপ্তর আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়েছে, এবং এর ফলে স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিজেও ডুবতে চলেছেন—শুধু তাই নয়—যুক্তফ্রন্টের ইমেজকেও নষ্ট করতে চলেছেন, তাহলে আমাদের সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত হবে কি? তিনি কি অস্বীকার করতে পারেন যে, স্বাস্থ্যদপ্তরকে তিনি মালিন্য-মুক্ত করবেন এই প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে

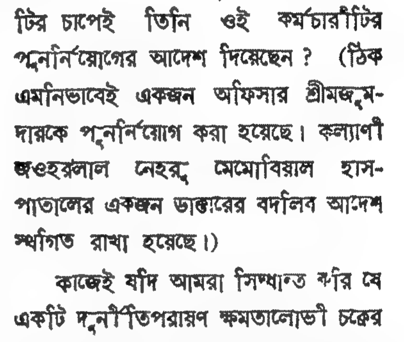

তাকে আমরা একের পর এক দুর্নীতির সংবাদ দিয়েছি, কিন্তু সেগুলির প্রতিকার করা দূরে থাকুক, উল্টে দুর্নীতিবাজদের কথাতেই ওঠাবসা করছেন?

ন্যাশনাল মেডিকাল কলেজ-হাসপাতালের ধর্মঘট প্রসঙ্গে

গত সংখ্যার 'বঙ্গদর্শন' লেখার সময়ে ধর্মঘটাক্রান্ত ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের এমার্জেন্সীটা অন্তত খোলা ছিল। আশা প্রকাশ করেছিলাম যে, পারস্পরিক বোঝাপড়ার মাধ্যমে ন্যাশনালের অচল অবস্থার সত্বর অবসান ঘটবে। কিন্তু ন্যাশনালের ধর্মঘটজনিত পরিস্থিতির সর্বশেষ অবস্থা হলো হাসপাতালের এমার্জেন্সীটাও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এক সরকারী নির্দেশে হাসপাতালের এমার্জেন্সীতেও রোগী ভর্তি বন্ধ করে দেওয়া হয়। ২৫শে জুলাই ন্যাশনালের ধর্মঘটের সমর্থনে বিভিন্ন হাসপাতালে এক দিনের প্রতীক ধর্মঘট পালন করা হয় এবং ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ সহ বিভিন্ন হাসপাতালের কর্মী ইউনিয়ন বিধানসভা অভিযান করেন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বিধানসভায় না থাকায় এবং পরিষদীয়মন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্তী ধর্মঘটী জনতার প্রতিনিধিদের সঙ্গে কোন আলোচনা করতে রাজী না হওয়ায় কেবল মুখ্যমন্ত্রী একটি স্মারকলিপি গ্রহণ করেন। বিধানসভার উত্তর-দ্বারে টাউন হলের সামনে অপেক্ষমাণ কয়েক সহস্র ডাক্তার-নার্স-কর্মচারীদের সামনে কোনো মন্ত্রী কিংবা বিধানসভার কোনো সদস্যকে দেখা যায় নি। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়—ন্যাশনালের ধর্মঘট চলছে, চলবে। স্বাস্থ্যমন্ত্রী ও কো-অর্ডিনেশন কমিটির 'টাগ অব ওয়ার' চলছে—চলবে। কিন্তু কতদিন?

চিরকালই আমরা দেখে আসছি, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় আর প্রাণ যায় উলুখাগড়াদের। ন্যাশনালের ধর্মঘট আজ হোক, কাল হোক মিটে যাবেই। কিন্তু প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয় সেটা কি কোনো দৈব-নির্দেশিত পথে মিটবে? তা যদি না হয় তাহলে আজ যে হাজার হাজার সুস্থ-হতে-চাওয়া দরিদ্র সাধারণ মানুষের রোগপাণ্ডুর মুখের সামনে হাসপাতালের দ্বার রুদ্ধ হয়ে রয়েছে, যাঁরা ভেতরে রয়েছেন একটা অনিশ্চয়তার দিকে তাকিয়ে তীব্র উৎকণ্ঠা নিয়ে বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে, তাঁরা যদি কখনো প্রশ্ন তুলে বসেন—'এ সব কাদের স্বার্থে'। তখন সন্তোষজনক কি জবাব তাঁদের দেওয়া হবে? অথচ আপোষ-মীমাংসা, সকলেই জানে আজ হোক, কাল হোক হবেই। ন্যাশনালের ধর্মঘটের ব্যাপারে স্বাস্থ্যদপ্তরের অন্তত দুজন পদস্থ আমলা নেপথ্যে কলকাঠি নাড়ছেন, এ সংবাদও আমরা পেয়েছি, কিন্তু এই মুহূর্তে আমরা এই নিয়ে ঘাটাঘাটি করতে চাই না। প্রয়োজন হলে যথাসময়ে আমরা সে চাঞ্চল্যকর কাহিনী ফাঁস করে দেব।

একটু সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে বোঝা যাবে যে এই ধর্মঘট-জনিত পরিস্থিতি এত দীর্ঘমেয়াদী এবং চরম পর্যায়ে পৌঁছবার তেমন কোনো অনিবার্য কারণ ছিল না। কো-অর্ডিনেশন কমিটি একটি বাক্যে এই ধর্মঘটের কারণ তুলে ধরেছেন। তা হলোঃ

"Pent up discontent since 1967, indifferent attitude of the Health Minister, non implimentation of signed agreement regarding various demands in 1968 and April, 1969 and lastly the deliberate irregular officiating appointment of a person like Dr. P. M. Lahiri as Principal—Superintendent and the unexpectedly bad behaviour of our Health Minister with the representatives of the Co-ordination Committee acted as a last straw which compelled us to take this unfortunate decision of calling this strike."

কর্মীদের দাবি-দাওয়া তা যত তুচ্ছই হোক না কেন, তার মুখোমুখি হবার জন্য যে বলিষ্ঠতা সরকারের থাকা প্রয়োজন—গোড়া থেকেই সেটা থাকলে এই ধর্মঘট হয়তো এড়ানো যেত। 'উদ্দেশ্য-প্রণোদিত', 'প্রতিক্রিয়াশীল', 'ফ্রন্ট-বিরোধী' ইত্যাদি বলে কর্মীদের ক্ষিপ্ত করে তুলে কি লাভ হয়েছে? সরকার যদি মনে করেন, যে হাসপাতালের শতকরা ৯০ জন কর্মী ধর্মঘটের সামিল হয়েছেন, তাঁরা সকলেই ফ্রন্ট-বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল, তবে সেই মনে করাটা বোধহয় ঠিক হবে না।

ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের তথাকথিত ফ্রন্টপন্থী ধর্মঘট-বিরোধী গোষ্ঠীর মধ্যেও ত' নেতৃস্থানীয় এমন ব্যক্তি আছেন, যিনি দু'বার সাধারণ নির্বাচনে ফ্রন্ট-বিরোধী কংগ্রেসের টিকিটে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন? শিক্ষারত নার্সরা—যাঁদের বেশির ভাগই অল্পবয়স্কা তরুণী, যাঁরা বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে গত মাসে একদিনের অনশন ধর্মঘটও করেছিলেন, তাঁদের কি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বলে উপেক্ষা করলেই কর্তব্য করা হবে? নার্সদের ট্রেনিং-এর অব্যবস্থা, খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধা, অন্যান্য হাসপাতালের তুলনায় স্টাইপেন্ডের পরিমাণের স্বল্পতা, পরীক্ষার ব্যাপারে সিস্টার নার্স এবং মেট্রনদের ব্যবহার সম্পর্কে যে সব অভিযোগ হয়েছে, সেগুলি কি অবশ্য তদন্ত এবং প্রতিকারযোগ্য নয়? আর বাংলাদেশের হাসপাতালে এগুলি কি কোন নতুন কথা? আসল কথা হলো কর্মী ইউনিয়নের দাবি-দাওয়াকে রাজনৈতিক ব্রান্ড দিয়ে এড়িয়ে যাওয়া সহজ হতে পারে। কিন্তু সেটা সুস্থ পদ্ধতি নয়।

সঙ্গে সঙ্গে কো-অর্ডিনেশন কমিটির এই দীর্ঘসূত্রী জেদ-এরও প্রশংসা করা যায় না এইজন্য যে, এর জন্য চূড়ান্ত দুর্গতি ওই সাধারণ মানুষগুলিকেই পোহাতে হচ্ছে, যারা কেবল সুস্থ হতে চায়। বাংলাদেশের হাসপাতালের চিকিৎসকদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মনোভাব অজানা থাকবার কথা নয়। দিনের পর দিন তাঁদের অনাত্মীয়সুলভ, সহানুভূতিহীন ব্যবহারের (ব্যতিক্রম স্বীকার করে বলছি) বিনিময়ে তাঁরা যে অনাস্থা এবং অবিশ্বাস অর্জন করেছেন, তাতে তাঁরা অনির্দিষ্টকাল জনগণের সমর্থন পাবার যদি আশা করেন, তবে একটু বেশি আশা করা হবে। বিশেষ করে এই ধর্মঘটের পরিপ্রেক্ষিতে যখন স্বাস্থ্যমন্ত্রী 'present ad-hoc arrangement'-কে বজায় রেখে যোগ্যতর প্রিন্সিপাল/সুপারিন্টে-

কিস্তিতে ট্রানজিস্টার

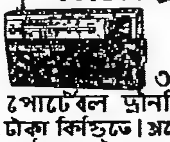

HAVA
৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড
পোর্টেবল ট্রানজিস্টর মাসিক ৫ টাকা কিস্তিতে। প্রত্যেক গ্রাম ও শহরে পাঠান যাইতে পারে।
HAVA SALES (34) SHAKTI NAGAR, DELHI-7

…ডেন্ট নিয়োগ করা এবং সমগ্র ব্যাপারটির তদন্তের জন্য একটি শক্তিশালী কমিটি গঠন করবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, যখন মুখ্যমন্ত্রী 'দেখি কি করা যায়' বলে সমস্যা মেটানোর প্রচেষ্টা করবার আশ্বাস দিয়েছেন, তখন অনির্দিষ্টকালের জন্য এই অচলাবস্থা বজায় রাখার অনিবার্য কারণ নেই। এই প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে ধর্মঘটের নৈতিক জয়লাভ এবং সরকারের মর্যাদা রক্ষিত হয়েছে। তাছাড়া কর্মীদের বৃহত্তর ধর্মঘটের রাস্তা কেউ চিরতরে রুদ্ধ করে দেয় নি।

কিন্তু প্রতিশ্রুত তদন্ত কমিটি সম্পর্কে আমরা একটা কথা স্পষ্ট করে বলতে চাই। বলতে চাই এইজন্য যে, ইতিপূর্বে গঠিত এ ধরণের তদন্ত কমিটি সম্পর্কে আমাদের কিছু অভিজ্ঞতা আছে। এই ধরনের কমিটিগুলির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই হয়—'বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া।' শুরু হবার বেলায় বেশ সাড়ম্বরে শুরু হয়, কিন্তু কোন্ অজ্ঞাত কারণে এমন কচ্ছপের গতিতে কাজ চলতে থাকে যে, মানুষের মনে অধৈর্য এবং হতাশার রাশি স্তূপীকৃত না করে ফলাফল প্রকাশিত হয় না। সেই দীর্ঘসূত্রতার মধ্যে যাদের যা গুছিয়ে নেবার দরকার, তারা তা গুছিয়ে নেয়। কাজেই আমরা আশা করব—উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন এমন একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হবে, যাকে তদন্তের ফলাফল যেন দু' সপ্তাহের মধ্যে প্রকাশ করতে নির্দেশ দেওয়া হবে।

সবিনয় নিবেদন

অনিবার্য কারণবশতঃ এ সংখ্যায় সুশীল জানার ধারাবাহিক উপন্যাস 'সাগর সঙ্গমে' প্রকাশ করা গেল না—এর জন্যে আমরা দুঃখিত।

—সম্পাদক

ঐতিহাসিক অবলুপ্তি এবং অতঃপর

দণ্ডাদেশ আগেই হয়ে গিয়েছিল, এতদিনে আনুষ্ঠানিকভাবে বিধান পরিষদের মৃত্যু ঘটল। গত বৃহস্পতিবার ২৫শে জুলাই তারিখেই বিধান পরিষদের শেষ অধিবেশন সমাপ্ত হয়ে গেল। বাস্তবিকই বিধান পরিষদ বজায় রাখার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না এবং বিধান পরিষদের অবলুপ্তি ঘটানো যুক্তফ্রন্টের বত্রিশ দফা কর্মসূচীর একটি ছিল। সেই হিসাবে যুক্তফ্রন্ট অভিনন্দনও দাবি করতে পারেন। তবে যা ছিল, তা চলে গেলে একটা দুঃখবোধ অবশ্যই থাকবে, যদিও কিছুকাল পরে এর স্মৃতির কোন অবশেষ থাকবে না।

এখন প্রশ্ন, ছজন মন্ত্রীর বরাতে কি আছে? সংশ্লিষ্ট দলগুলি ভাবছেন যে, তাঁদের কয়েকজন বিধান সভার সদস্যকে বসিয়ে দিয়ে সেই শূন্য আসনগুলিতে বর্তমান কয়েকজন মন্ত্রীকে পুনর্নির্বাচিত করে আনবেন। আমাদের বিবেচনায় এতে ঝামেলা অনেক, ঝুঁকিও কিছু আছে, নির্বাচন ব্যাপারটাই ব্যয়সাধ্য, সময়ও কম নষ্ট হবে না, কাজকর্ম ফেলে মন্ত্রীদের নির্বাচনী সফরের জন্য অনেক জরুরী কাজও আটকে থাকবে। তার চেয়ে বরং এই ছয়জন মন্ত্রীকে বসিয়ে দিয়ে বিধানসভার স্থায়ী সদস্যদের মধ্য থেকেই মন্ত্রী নিয়োগ করা হোক। একথা বলার কোন সার্থকতাই নেই যে, অমুক ব্যক্তি অপরিহার্য। একের কাজ অনায়াসেই অপরকে দিয়ে চলে।

(২৬-৭-৬৯)

চন্দ্র বিজয় (?)---

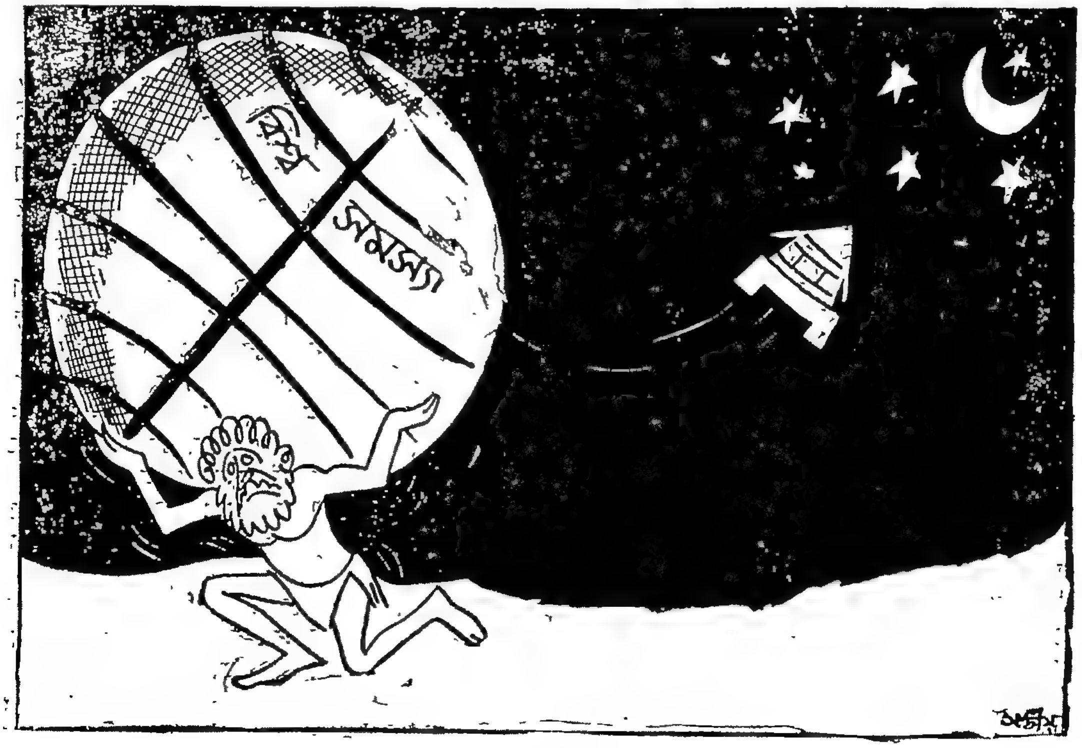

ভারত দর্শন

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রাক্ মুহূর্তে

আগামী ১৬ই আগস্ট ভারতের চতুর্থ রাষ্ট্রপতির নির্বাচনও ভারতের চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের মতই এক নতুন ইতিহাস রচনা করতে যাচ্ছে।

ভি, ভি গিরি

কারণ এই প্রথম রাষ্ট্রপতি নির্বাচন একটি দোলাচল অবস্থার মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। যে ক্ষেত্রে হলফ করে আগেভাগে বলা অসম্ভব কে হবেন বিজয়ী, রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ মর্যাদার আসনে অলঙ্কৃত হওয়ার সৌভাগ্য বস্তুত কার ললাটলিপি। ইতি-পূর্বে এমন সঙ্কট এতো গভীরভাবে দেখা দেয় নি। স্বর্গত রাষ্ট্রপতি জাকির হোসেনকেও রীতিমত শক্ত নির্বাচনী যুদ্ধে জয়ী হয়ে আসতে হয়েছিল। বিরোধীরা সুব্বা রাওকে খাড়া করে শক্তি পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু খুব একটা আশাবাদী কেউ ছিলেন এমন কথা বলা যায় না। অন্তত আজকের অবস্থার তুলনায় সেদিনকার অবস্থা কংগ্রেসপ্রার্থীর অনুকূলে ছিল অনেক বেশি। কংগ্রেসের ঘরে আশঙ্কা আজ-কের মতো অতি প্রকট ছিল না সেদিন। কিন্তু আজ গোল বেঁধেছে ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর কংগ্রেসী সমর্থকদের নিয়ে।

কংগ্রেসের বাইশ বছরের স্বর্ণ-প্রাসাদে আজ ফাট ধরেছে, আর সেই রন্ধ্রপথে প্রবেশ করছে চাঁদের আলো। এখন বলা মুস্কিল, কংগ্রেসের সব কটি ভোটই কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীযুত রেড্ডিরই পক্ষে প্রদত্ত হবে কি না। শ্রীমতী গান্ধীর মৌখিক সমর্থনের ওপর 'রাজনৈতিক বিশ্বাস' প্রকৃতপক্ষে খুব বেশি নির্ভর করতে পারে কি? কংগ্রেস-নেতৃত্বে যে স্পষ্ট সঙ্ঘর্ষশীল দুটি শিবিরের সৃষ্টি হয়ে গেছে, তারপরও সঞ্জীব রেড্ডির পক্ষে সমস্ত কংগ্রেসী ভোট টানা কষ্টকর বৈকি। তৎসত্ত্বেও শ্রীমতী গান্ধী যদি সমর্থকবৃন্দ সহ তাঁর মৌখিক সমর্থনকে বাস্তবে অনুবাদ করেন, তাহলে ভারতে আজকের অবশ্যম্ভাবী রাজনীতির গতি এক দুর্বল মুহূর্তে উল্টো ঘটনাবর্তে পড়ে দিশাহারা হয়ে যাবে। কংগ্রেসের প্রগতিপন্থীরা স্বখাত সলিলে নিমজ্জিত হবেন এবং প্রগতি-পন্থী নেতৃত্বের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ-ও সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠবে। রেড্ডি-সমর্থক-দের অন্যতম এস কে পাতিল ইতিমধ্যেই জেহাদ ঘোষণা করেছেন। ব্যাঙ্ক জাতীয়-করণের পরই তাঁর নানাবর্ণের বিভীষিকাদর্শন শুরু হয়ে গেছে।

সি, ডি, দেশমুখ

কোনো রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেই গণতন্ত্রের 'বারটা বাজতো' বলে এতোকাল শুনে আস-ছিলাম। সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, এ পাপে স্বয়ং কংগ্রেসী প্রধানমন্ত্রীও পাতিলীয় অভিধানে পাপিষ্ঠা সাব্যস্ত হয়েছেন। পাতিল উপলব্ধি করেছেন এবং রোটারিয়ানদের এই বক্তব্য উপলব্ধি

সঞ্জীব রেড্ডি

করাতে প্রয়াস পেয়েছেন যে : ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ফলে "ডেমোক্রেসীর ভিত্তিমূল প্রচণ্ড নাড়া খেয়েছে" এবং ইতিপূর্বে কখনই নাকি "ডেমোক্রেসীর এমন ভয়ঙ্কর বিপদ সমুপস্থিত হয় নি।"

কার স্বার্থে গণতন্ত্র!

আসলে গণতন্ত্রের এই সমুদয় দিক-পাল রক্ষকদের বক্তব্য বেশ কিছুকাল ধরেই গোলমেলে হয়ে উঠছিল। গণতন্ত্র বলতে ওঁরা যা বোঝেন, অভিধানে তার অর্থ খুঁজতে শুধুই অনর্থ বাধবে। কেন না, ডিমোক্রেসীকে কেউ ডিমনস'-ক্র্যাসী বলে সহজভাবে মেনে নিতে পারবেন না। অন্যে পরে আর কথা কি, পাতিল সাহাবদের সম মনোভাবা-পন্ন পার্টি জনসঙ্ঘের এম-পি স্বামী ব্রহ্মানন্দ পর্যন্ত ডিমোক্রেসী বলতে ডিমনস'-ক্র্যাসী বুঝতে অস্বীকার করে বলেছেন, দেশের স্বার্থেই তিনি ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের সমর্থক। গরীব দেশের মঙ্গলই হবে তাতে। এবং স্বতন্ত্র

জনসঙ্ঘ সি ডি দেশমুখকে সমর্থন করে দ্বিতীয় প্রেফারেন্স ভোটটি সঞ্জীব রেড্ডিকে প্রদানের নির্দেশ দলীয় সদস্যদের ওপর চাপিয়ে দিলেও স্বামী ব্রহ্মানন্দ ঘোষণা করেছেন তিনি শ্রী ভি ভি গিরিকেই রাষ্ট্রপতি পদে সমর্থন জানাবেন, তাতে তাঁর বিরুদ্ধে জনসঙ্ঘ কোনও ব্যবস্থাবলম্বন করলেও তিনি সিদ্ধান্ত পাল্টাবেন না। দলের চেয়ে দেশ বড়। দেশের স্বার্থই আগে। স্বামী ব্রহ্মানন্দ আজ তা বুঝতে পারছেন। ক্রমে আরও অনেকেই বুঝবেন। বুঝবেন, দল ফুটে যেতে পারে, কিন্তু দেশবাসী অমৃতের সন্তান। বুঝবেন, স্বার্থান্বেষণে দল ভ্রান্ত নেতৃত্বের হাতে মার খেতে পারে, কিন্তু দেশের স্বার্থের পরিপন্থী কাজ করলে সে মার নিজের ওপরই একদিন না একদিন প্রচন্ডভাবে নেমে আসবে। দেশের স্বার্থ সংরক্ষিত না হলে নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থ কখনই স্বাভাবিকভাবে শ্বাস গ্রহণ করতে পারবে না কোনদিন।

যাক, এতো কথার অবতারণা এই কারণে যে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবার ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের প্রেক্ষাপটে সংস্থাপিত হয়েছে। অর্থাৎ ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের দ্বারা ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোতে যেটুকু উনিশ-বিশ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে তাই নিয়েই বেধেছে দু' তরফে লড়াই, আর সেই লড়াইয়ের একটা প্রত্যক্ষ পরীক্ষা হয়ে যাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ময়দানে।

দুই অভিকর্ষের মাঝপথে

ভি ভি গিরি প্রগতিপন্থীদের ক্যান্ডিডেট হয়ে গেছেন। ডি-এম-কে, মুসলিম লীগও পালে হাওয়ার গতি নজর করে শ্রীগিরিকেই সমর্থন জানিয়েদিয়েছেন। বেচারা পি-এস-পি, প্রজা-মন্ডলের নামাবলীটি গায়ে জড়িয়ে, কংগ্রেস-বিরোধিতার 'বম্ শংকর' শ্লোগানবিষ কণ্ঠে ধারণ করে বম্ ভোলানাথ সেজে অনেককাল নির্বিঘ্নে কাটিয়ে আসছিলেন। এবার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মুখোশহীন সম্মুখ সমরে বিভীষিকা দর্শনে পি-এস-পি'র ভোলানাথ গঞ্জিকার কলিকাটি নামিয়ে রেখে শশব্যস্তে বিরোধীদের নিয়ে রাষ্ট্রপতিপদে তৃতীয় প্রার্থীর সন্ধানে ডি-এম-কে'র আহবানে একবার ডম্বরুধ্বনি করে উঠেছিলেন। কিন্তু কোনও নন্দী-ভৃঙ্গী পাশে গিয়ে দাঁড়াল না। চড়কতলায় শিবের গাজন জমল না। পি-এস-পি এবার কী করবে? কার হাতে গঞ্জিকা সাজিয়ে নিয়ে শ্মশান জাগিয়ে বসবে! তার আর উপায় নেই, সময়ও নেই। তাদের একমাত্র প্রতিজ্ঞা 'কংগ্রেসের সঙ্গে একাসনে না বসিয়া বিরোধী সাজিব'—এই মুহূর্তে ভঙ্গ হওয়ার মুখে। কেন না ওঁরা কি পারবেন গিরিকে সমর্থন জানাতে? না পারলে, রেড্ডি তো কংগ্রেসপ্রার্থী। তাঁকে সমর্থন করা অসম্ভব। আবার সি ডি দেশমুখকে মঞ্চে তুলেছেন স্বতন্ত্র জনসঙ্ঘ। কিন্তু পি-এস-পি একে প্রজা মন্ডলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তায় আবার সোস্যালিস্ট! এ হেন অবস্থায় দেশমুখকে সমর্থন জানানো তো সম্ভব নয়। কিন্তু তারও থেকে কণ্টকর যে কোন প্রগতিশীল পদক্ষেপের সঙ্গে পা মিলিয়ে দেওয়া। গিরিকে সমর্থন করলেই নাকি দেশটা প্রগতির প্যারাম্বুলেটরে চেপে বসবে। মহা সর্বনাশ। পি-এস-পি'কে ইতিকর্তব্য স্থির করার জন্য সুতরাং জুলাই-এর শেষ দিনটি পর্যন্ত আকাশ-পাতাল ভেবে ঠিক করে নিতে হবে।

কার কত ভোট

পার্লামেন্টের দুই কক্ষ এবং রাজ্য বিধানসভার সব ভোট মিলিয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মোট ভোটসংখ্যা হল ৮·৬ লক্ষ। এর মধ্যে কংগ্রেসের ৪,৫০,০০০; স্বতন্ত্রের ৫৮,০০০; জনসঙ্ঘের ৪৯,০০০; সি-পি-আই-এর ৩৫,০০০; সি-পি-এম-এর ৩৪,০০০; এস-এস-পি'র ৩৪,০০০; ডি-এম-কে'র ৩৬,০০০; পি-এস-পি ও বি-কে-ডি'র প্রত্যেকে ২১,০০০; মুসলিম লীগ ৫,০০০ এবং নির্দল ৪৭,০০০।

এ ছাড়া অন্যান্য রাজ্যস্তরের দলগুলির মোট ভোট সংখ্যা ৬৬,০০০। সর্বমোট ৮,৬০,০০০।

প্রধান তিনজন

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ১৯৬৭ সালে ১৭ জন প্রার্থী ছিলেন। এবার ২৪ জনের মনোনয়নপত্র দাখিল করা হয়েছে। স্ক্রুটিনি হচ্ছে আজ, ২৪শে জুলাই। ২৯ তারিখের মধ্যে প্রত্যাহার করা চলবে।

প্রার্থী যত জনই হোন, নির্বাচনে প্রধান তিনজন হলেন, শ্রী ভি ভি গিরি (নির্দল), শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি (কংগ্রেস) এবং শ্রী সি ডি দেশমুখ (স্বতন্ত্র-জনসঙ্ঘ-বি-কে-ডি সমর্থিত)। আর এই তিন প্রধানের মধ্যে মুখ্য লড়াই হবে শ্রী ভি ভি গিরির সঙ্গে শ্রীনীলম সঞ্জীব রেড্ডির এবং ফলাফল এ পর্যন্ত অনিশ্চিত।

ব্যাঙ্কের মালিকানা বদল

গত ১৯শে জুলাই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সর্বসম্মত সুপারিশ অনুযায়ী অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ডঃ ভি ভি গিরি এক অর্ডিন্যান্স জারী করে বড় বড় ১৪টি ভারতীয় ব্যাঙ্ককে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করেছেন। যেসব ব্যাঙ্কের আমানতের পরিমাণ ৫০ কোটি টাকার ওপর, একমাত্র তারাই এই অর্ডিন্যান্সের আওতায় পড়েছে। তার চেয়ে কম আমানতকারী ব্যাঙ্কগুলো রাষ্ট্রায়ত্ত হয় নি। বিদেশী ব্যাঙ্কগুলোও অর্ডিন্যান্সের আওতা থেকে বাদ পড়েছে।

২১শে জুলাই স্বতন্ত্র দলের মিনু মাসানী এবং জনসঙ্ঘের বলরাজ ম্যাধোক সুপ্রীম কোর্টে এই অর্ডিন্যান্স জারীর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে এক মামলা দায়ের করায় সুপ্রীম কোর্ট মামলার রায় সাপেক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর তিনটি নিষেধাজ্ঞা জারী করেন, (১) রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোকে এমন কোন নির্দেশ দেওয়া চলবে না, যা ১৯৬৮ সালের ব্যাঙ্কিং কোম্পানী আইনের বিরোধী, (২) কোন নতুন উপদেষ্টা বোর্ড নিয়োগ করা চলবে না এবং (৩) রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোর পুরনো চেয়ারম্যানদের অপসারণ করা চলবে না। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেন যে, সুপ্রীম কোর্টের এই আদেশের ফলে ব্যাঙ্কের মালিকানা পরিবর্তনে কোন বাধা সৃষ্টি হয় নি। অর্থাৎ ব্যাঙ্কগুলো বর্তমানে রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানেই পরিচালিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ বিলও বিবেচনার জন্য পার্লামেন্টে এসেছে এবং সেটা খুব তাড়াতাড়ি পাশ হয়ে যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে। কারণ জনসঙ্ঘ, স্বতন্ত্র এবং বি-কে-ডি দল ছাড়া পার্লামেন্টের আর সব দলই ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পক্ষে।

যে ১৪টি ব্যাঙ্ক জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে, তাদের মোট মূলধন সাড়ে ২৮ কোটি টাকা, কিন্তু তাদের হাতে ১৯৬৮ সালের শেষে আমানতের পরিমাণ ছিল ২৭৪১ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা। গত সাত মাসে আমানতের পরিমাণ অনেক বেড়ে গেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই, কারণ গত দু'-তিন বছর যাবৎ ব্যাঙ্কের আমানত অত্যন্ত দ্রুত হারে বেড়ে চলেছে এবং বহু ব্যাঙ্কের হাতে এত টাকা উদ্বৃত্ত হয়েছে যে, টাকা খাটাবার প্রশ্ন নিয়ে দস্তুরমত দুশ্চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলেন। কারণ আমানতের টাকা দাদন দেবার সুযোগ না পেলে ব্যাঙ্কের মুনাফার হার কমে যেতে বাধ্য।

অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী স্থির হয়েছে যে, ব্যাঙ্কের প্রাক্তন মালিকরা মালিকানা ত্যাগের জন্য যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ পাবেন। ব্যাঙ্কের সম্পত্তির ভিত্তিতে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে এবং তাতে ৭০ কোটি টাকা ব্যয় হতে পারে বলে অনুমান করা হচ্ছে। ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত সমস্ত বিরোধের নিষ্পত্তির ভার দেওয়া হয়েছে একটি ট্রাইবুনালের ওপর। রাষ্ট্রায়ত্ত

ব্যাঙ্কগুলোর মূলধন, আমানত এবং দাদনের একটি তালিকা নিচে প্রকাশ করা হচ্ছে:

১৯৬৮ সালের শেষে সদ্য রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির অবস্থা

(কোটি টাকার হিসাবে

ক্রমিক সংখ্যা	নাম	আদায়ীকৃত মূলধন	আমানত	দাদন
১	সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক	৪-৭৫	৪৩৩-২৭	২৭৬-২৭
২	ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া	৪-০৫	৩৯৪-৯৭	২৫৩-৩৫
৩	পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক	২-০০	৩৫৫-৯৬	২০৯-৪০
৪	ব্যাঙ্ক অব বরোদা	২-৫০	৩১৩-৮০	১৯৬-১৪
৫	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক	২-৮০	২৪০-৫৮	১৪৪-০০
৬	কানাড়া ব্যাঙ্ক	১-৫০	১৪৬-৪৪	৯৬-৭২
৭	ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক	২-৬৯	১৪৩-৮৯	৯৯-৬১
৮	দেনা ব্যাঙ্ক	১-২৫	১২১-৮৮	৭৪-০৮
৯	ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক	১-২৫	১১৫-২২	৬৮-৬৩
১০	এলাহাবাদ ব্যাঙ্ক	১-০৫	১১২-৭২	৬৯-৯৩
১১	সিণ্ডিকেট ব্যাঙ্ক	১-২৯	১১২-১৯	৭০-৬১
১২	ইণ্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাঙ্ক	১-০০	৯৩-২২	৫৮-৩২
১৩	ইণ্ডিয়ান ব্যাঙ্ক	০-৮৯	৮৪-৫৯	৫৭-১৬
১৪	ব্যাঙ্ক অব মহারাষ্ট্র	১-৪৮	৭৩-০২	৪৯-৭৪
	১৪টি ব্যাঙ্কে মোট—	২৮-৫০	২৭৪১-৭৬	১৭৪৩-৬৬
	স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া (৩-১-৬৯)	৫-৩৩	১০৭৮-২৫	৭৫৭-৩৭

ভারতবর্ষে আধুনিক ব্যাঙ্ক-শিল্প প্রকৃতপক্ষে বৃটিশশাসনের অবদান। তার আগে এদেশে শেঠ এবং মহাজনরাই ব্যাঙ্কারের কাজ করতেন। গোড়ায় ব্যাঙ্ক-শিল্প পুরোপুরিই ছিল ইংরাজ বণিকদের হাতে। কালক্রমে ভারতীয় বণিকরাও এই কারবারে ঢুকে পড়েন এবং স্বদেশী আন্দোলন ভারতীয় ব্যাঙ্কগুলোর মদৎ যোগায়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ব্যাঙ্ক-শিল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটে, কিন্তু ব্যাঙ্কিং আইনের শিথিলতার ফলে যুদ্ধের শেষে বহু ব্যাঙ্কের অকালমৃত্যু ঘটে। তাতে আমানতকারীদের কয়েকশত কোটি টাকার সর্বনাশ হয়। যে কটি ব্যাঙ্ক তার মধ্যেও নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল, পরবর্তীকালে তাদের সমৃদ্ধি ঘটতে থাকে এবং ইতিমধ্যে ব্যাঙ্কিং আইনের কড়াকড়ির ফলে ব্যাঙ্ক ব্যবসাও স্থিতিশীল হয়ে ওঠে।

১৯৬৮ সালের শেষে ভারতে কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কগুলোর আমানতের পরিমাণ ছিল ৪২২৩ কোটি টাকা। সম্প্রতি এ-আই-সি-সি অধিবেশনে এস, কে, পাতিল বলেছেন যে, বর্তমানে আমানতের পরিমাণ ৪৬০০ কোটি টাকা। তাতে বোঝা যাচ্ছে, এই সাত মাসে আমানতের পরিমাণ ৪০০ কোটি টাকা বেড়ে গেছে।

বর্তমানে সারা ভারতে ব্যাঙ্ক এবং তাদের শাখা অফিসের সংখ্যা প্রায় সাত হাজার। কিন্তু এই শাখা অফিসগুলো বেশির ভাগই বড় বড় শহর এবং তার আশপাশে অবস্থিত। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এক সাম্প্রতিক হিসাবে প্রকাশ পেয়েছিল যে, বহু ছোট ছোট শহরে এখনও কোন ব্যাঙ্কের অস্তিত্ব নেই। আর গ্রামাঞ্চলে ব্যাঙ্কের সংখ্যা একেবারেই নগণ্য। অর্থাৎ ব্যাঙ্কিং ব্যবসা মোটামুটি শহরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ।

স্টেট ব্যাঙ্কের সঙ্গে সম্প্রতি রাষ্ট্রায়ত্ত ১৪টি ব্যাঙ্কের আমানত মিলিত হলে ভারত সরকার মোট ৪ হাজার কোটি টাকার ওপর কর্তৃত্বলাভের সুযোগ পাবেন।

সারা ভারতে ব্যাঙ্কে নিযুক্ত কর্মচারীদের সংখ্যা পৌনে দু' লক্ষের ওপর। তাঁদের বেতনের হার সমপর্যায়ের অন্যান্য চাকরির তুলনায় অনেক ভাল।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্যাঙ্কের মুখ্য ভূমিকার কথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। সাধারণ মানুষের সঞ্চয়ের বড় অংশ ব্যাঙ্কে গিয়েই জমা পড়ে। সেই অর্থ দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নয়নে লগ্নী হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ব্যাঙ্কের মালিকরা সেই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালনে শোচনীয় অক্ষমতার পরিচয় দিচ্ছিলেন। অধিকাংশক্ষেত্রে বড় বড় ব্যাঙ্কের মালিক ছিলেন বড় বড় শিল্প ও বাণিজ্যপতিরা। তাঁরা ব্যাঙ্কের টাকার মোটা অংশ দিয়ে নিজেদের কারবার রাতারাতি ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে নিচ্ছিলেন। অথচ কৃষি এবং ক্ষুদ্র শিল্পগুলোকে মোটেই সাহায্য করছিলেন না। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পীড়াপীড়ি সত্ত্বেও গ্রামাঞ্চলে এবং ক্ষুদ্র শিল্পের ক্ষেত্রে দাদন দিতে ব্যাঙ্কগুলোর হাত উঠছিল না। মতলববাজ ব্যবসায়ীরা কিভাবে ব্যাঙ্কের টাকা স্রেফ ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য ব্যবহার করছিলেন, তার মস্ত উদাহরণ ইণ্ডিয়ান আয়রনের শেয়ার কর্নার করার ঘটনা। ইণ্ডিয়ান আয়রন ভারতের একটি সুপরিচালিত বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান। বর্তমান পরিচালকদের হাত থেকে এই সরকার ছিনিয়ে নেবার জন্য জনৈক ব্যবসায়ী বহু কোটি টাকা ব্যয় করে প্রয়োজনাতিরিক্ত মূল্য দিয়ে এর শতকরা ৪০ ভাগ শেয়ার হস্তগত করেছেন। শেয়ার বন্ধক রেখে ব্যাঙ্ক থেকেই এই কোটি কোটি টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে। ইণ্ডিয়ান আয়রন ঐ মতলববাজ ব্যবসায়ীর হস্তগত হলে শেয়ার হোল্ডারদের কোন লাভ নেই এবং সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কগুলোরও কোন লাভ নেই। লাভ একমাত্র সেই মতলববাজ ব্যবসায়ীর। ব্যাঙ্কগুলো কোন ফলপ্রসূ কাজে ঐ কোটি কোটি টাকা দাদন না দিয়ে ব্যবসায়ীর অসৎ মতলব হাসিলে সহায়তা করছে। এরকম দৃষ্টান্ত আরও অনেক উল্লেখ করা যায়।

সত্যিকথা বলতে কি, জনগণের কষ্টার্জিত সঞ্চয়ের টাকা নিয়ে মুষ্টিমেয় ব্যাঙ্কের মালিক যেভাবে প্রায় রাতারাতি ফুলে ফেঁপে ঢোল হয়ে উঠেছেন, তাতে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত না হলে অদূর ভবিষ্যতেই দেশের অর্থনীতি পুরোপুরি একচেটিয়া কারবারীদের হাতে চলে যেতো।

যে সব ব্যাঙ্কের মালিকানায় বৃহৎ কারবারীদের প্রাধান্য ছিল না (যেমন পশ্চিমবঙ্গের ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া এবং দক্ষিণ ভারতের সিণ্ডিকেট ব্যাঙ্ক), তারা এই ব্যাঙ্ক জাতীয়করণকে স্বাগত জানিয়েছেন।

ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান শ্রীবটুক দত্ত বলেছেন, "ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ অপ্রত্যাশিত নয়। এতে গভর্নমেণ্টের সামাজিক লক্ষ্য পূরণের উপযোগী নীতি নির্ধারণ সহজ হয়ে উঠবে।"

সিণ্ডিকেট ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান টি-এ-পাই জাতীয়করণকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, প্রাইভেট ব্যাঙ্কে সচলতার অভাব ছিল। তাই অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে টাকা লগ্নী না করে তারা শুধু আশু মুনাফার দিকে তাকিয়ে টাকা লগ্নী করত। গ্রামাঞ্চলের লোকেরা প্রাইভেট ব্যাঙ্কের কাছে কোন সাহায্য পায় নি। চতুর্থ পরিকল্পনায় কৃষির যে লক্ষ্য ধার্য হয়েছে, তাতে আগামী ৪ বছরে গ্রামাঞ্চলে ১৫০০ কোটি টাকা দাদন দেবার প্রয়োজন হবে। প্রাইভেট ব্যাঙ্ক সেই দায়িত্ব পালন করতে পারত না। প্রাইভেট ব্যাঙ্কের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে আমানত বৃদ্ধি করা।

আর সেই আমানত বৃদ্ধির একমাত্র উদ্দেশ্য যে অন্যান্য শিল্প-বাণিজ্যের দিকে চোখ বুজে নিজেদের শিল্প-বাণিজ্যের দ্রুত সম্প্রসারণ সে কথা বুঝতে কারও কষ্ট হবার কথা নয়।

তাই ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাতে দেশবাসীর কোন দ্বিধা নেই।

—শ্রী[illegible]

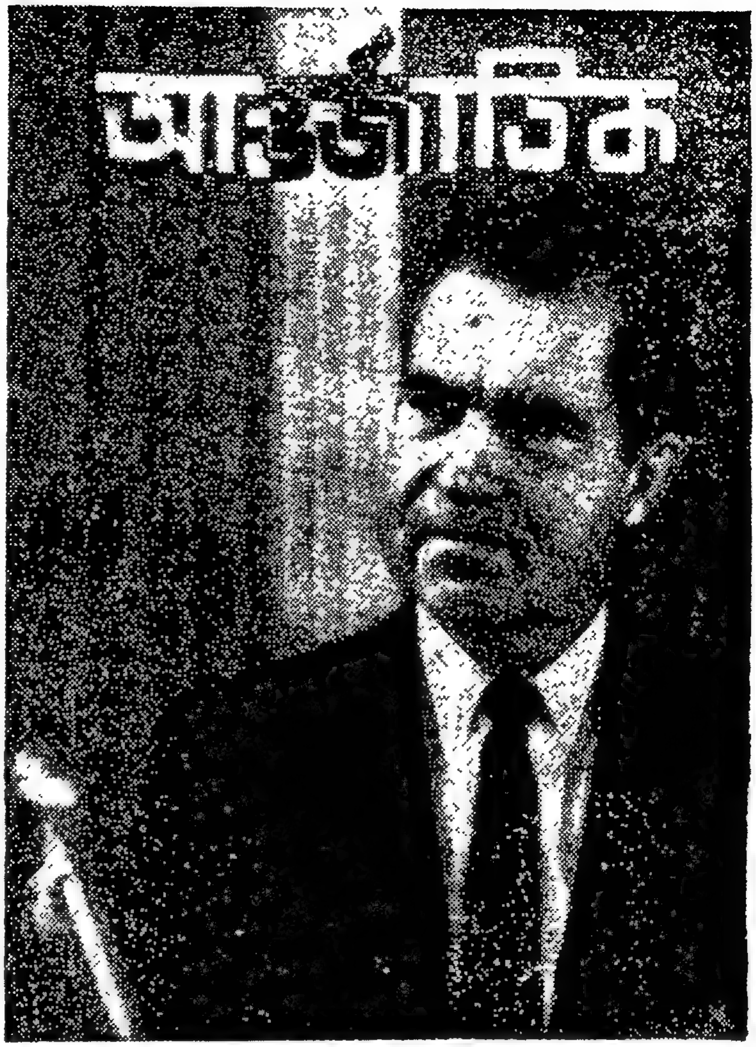

এশিয়া সফরে নিকসন

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রঃ

রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিকসন এশিয়া সফরে বের হয়েছেন। ন' দিনে তিনি সাতটি এশীয় দেশ সফর করবেন। এই দেশগুলির মধ্যে রয়েছে ফিলিপাইনস, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, ভারত ও পাকিস্তান। সম্ভবত তিনি এর মধ্যে দক্ষিণ ভিয়েতনামেও যাবেন।

রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচিত হবার পর এশিয়ার দেশগুলিতে ব্যাপকভাবে এইরূপ সফর নিকসনের এই প্রথম। ভিয়েতনামের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিছু সৈন্য সরিয়ে নিয়েছে। আরও সৈন্য হয়তো সরাবে। তাই অনেকের ধারণা, ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসানের সম্ভাবনা নিয়ে নিকসন এশীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। মার্কিন সম্মান বজায় রেখে কিভাবে ভিয়েতনাম সমস্যার সমাধান করা যায় সে সম্পর্কে তিনি পরামর্শ চাইবেন। বিপরীত দিকে থাইল্যান্ডের মত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর একান্তভাবে নির্ভরশীল দেশের মনে ভয় ঢুকেছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এশিয়া থেকে চলে গেলে তারা 'কমিউনিস্ট চীনের' আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারবে না। নিকসন এদের বোঝাবেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এশিয়া রক্ষার দায়িত্ব ছেড়ে চলে যাচ্ছে না। আগের মতই তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করবেন। সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির নেতা লিওনিদ ব্রেজনেভ সম্প্রতি এশিয়ার দেশগুলিকে নিজেদের নিরাপত্তার ব্যাপারে এগিয়ে আসার আহবান জানিয়েছেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে নিকসনের এই সফর গুরুত্বপূর্ণ। তাছাড়া, চীন সম্পর্কে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এতদিনের নীতির কিছুটা পরিবর্তন হতে পারে—চীনের সঙ্গে কিছু পরিমাণ সম্পর্ক স্থাপন করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাজী হতে পারে বলে যে-সব খবর প্রকাশিত হচ্ছে, সে বিষয়েও হয়তো কথা হবে। বিভিন্ন দেশের জন্য মার্কিন অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্যের প্রশ্নও নিশ্চয়ই আলোচিত হবে।

মারকোস

২৬শে জুলাই রিচার্ড নিকসন তাঁর সফরের প্রথম দিনে ফিলিপাইনসের রাজধানী ম্যানিলা এসে পৌঁছান। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব উইলিয়াম রজার্স। ফিলিপাইনসের রাষ্ট্রপতি ফারডানডো মারকোস, পররাষ্ট্রমন্ত্রী কার্লো রোমুলো ও অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে তাঁরা আলোচনা করেছেন। পরদিন রিচার্ড নিকসন সদলবলে ইন্দোনেশিয়া রওনা হয়ে গেছেন।

ফিলিপাইনস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একান্ত বশংবদ রাষ্ট্রগুলির অন্যতম। কিন্তু সেখানেও মার্কিনবিরোধী মনোভাব ক্রমে তীব্র হচ্ছে। এই বছর ফিলিপাইনসে নির্বাচন হবে। তাই অনেকে ভেবেছিলেন, জনসাধারণের চাপে ফারডানডো মারকোস ফিলিপাইনসের বুক থেকে মার্কিন যুদ্ধঘাঁটিগুলি তুলে নেবার জন্য, বা অন্ততপক্ষে নিয়ন্ত্রণহ্রাসের জন্য নিকসনের কাছে অনুরোধ জানাবে। কিন্তু দেখা গেল তা হয় নি। আলোচনা শেষে জানানো হয়েছে, নিকসন ও মারকোস দুজনেই ফিলিপাইনসে মার্কিন যুদ্ধঘাঁটি রাখার যৌক্তিকতা সম্পর্কে একমত হয়েছেন।

মারকোস একমত হলে কি হবে, ফিলিপাইনসের অনেকেই এ বিষয়ে রাজী হতে পারে নি। তার প্রমাণ, নিকসনের সফরকালে ম্যানিলায় প্রচন্ড বিক্ষোভ। বিক্ষোভকারীদের প্রধান দাবি ছিল : যুদ্ধঘাঁটি তুলে নিতে হবে, এবং ভিয়েতনাম রণাঙ্গনে ফিলিপাইনসের যে দু'হাজার সৈন্য রয়েছে, তাদের স্বদেশে ফিরিয়ে আনতে হবে। বিক্ষোভকারীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র।

ম্যানিলায় নাকি নিকসনকে হত্যা করার জন্য কমিউনিস্টদের পক্ষ থেকে এক বড় চক্রান্ত হয়েছিল। পুলিশের সঙ্গে

সংঘর্ষে একজন চক্রান্তকারী নিহতও হয়েছে। নিহত ব্যক্তির নাম আলবার্টো কটার্ক।

দক্ষিণ কোরিয়া ঃ

সিওলের পথে আবার ছাত্ররা নেমেছে। ছাত্রদের প্রচণ্ড বিক্ষোভ দমনের জন্য সরকারকে লাঠি, গুলী, টিয়ারগ্যাস প্রয়োগ করতে হয়েছে। তাতেও ছাত্রবিক্ষোভ দমন করা সম্ভব না হওয়ায়, সরকার সিওল ও অন্যান্য শহরের স্কুল-কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার রাষ্ট্রপতি চুং হি পার্ক তৃতীয়বারের জন্য রাষ্ট্রপতি হতে চান। দেশের বর্তমান সংবিধান অনুযায়ী কারও পক্ষে পর পর দুবারের বেশি রাষ্ট্রপতি হওয়া সম্ভব নয়। পার্ক ও তাঁর অনুগামীরা তাই সংবিধান সংশোধন করতে চান।

ছাত্ররা এর ঘোরতর বিরোধী। পার্ক যত ভাল শাসকই হোন না কেন, সংবিধান সংশোধন করে আরও বেশি দিন রাষ্ট্রপতিপদে তাঁকে থাকতে দেওয়া হবে না। কোন এক ব্যক্তির একাধিপত্যের তাঁরা বিরোধী।

৫১ বৎসর বয়স্ক প্রাক্তন সেনাধ্যক্ষ চুং হি পার্ক ইতিমধ্যেই তৃতীয়বার রাষ্ট্রপতি হবার জন্য তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তাঁর দল ডেমোক্রাটিক রিপাবলিকান পার্টি এই প্রস্তাবে রাজীও হয়েছে। এখন আনুষ্ঠানিকভাবে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলীতে দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে প্রস্তাব গ্রহণ এবং গণভোটে তা অনুমোদনের অপেক্ষা।

চুং হি পার্ক

কিন্তু বাদ সেধেছে ছাত্ররা।। আর সিওলের ছাত্রদের ভয় করে না কে? দক্ষিণ কোরিয়ার জবরদস্ত রাষ্ট্রপতি, অত্যাচারী শাসক সিংম্যান রীকে বারো বৎসর শাসনের পর গদী ছাড়তে হয়েছিল এই ছাত্রদের আন্দোলনের ফলে। ১৯৬০ সালে দেশব্যাপী ব্যাপক ছাত্র আন্দোলন থেকে গণ-অসন্তোষের সৃষ্টি হয়, তার ফলেই সিংম্যান রীর পতন ঘটে।

আজও আবার ছাত্ররা সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছে, পার্ককেও রীর পথে যেতে হবে।

স্পেন ঃ

একনায়ক জেনারেল ফ্রানসিসকো ফ্র্যাঙ্কো একটানা তেত্রিশ বছর স্পেনে কর্তৃত্ব করছেন। তাঁর বয়স বর্তমানে ৭৬। ফ্র্যাঙ্কো অনেক দিন আগেই ঘোষণা করেছেন, তাঁর পর আবার স্পেনে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হবে।

ফ্র্যাঙ্কোর ঘোষণার পর থেকেই জল্পনা-কল্পনা সুরু হয়েছে। ফ্র্যাঙ্কোর পর স্পেনের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত রাজসিংহাসনে কে বসবেন? ফ্র্যাঙ্কোর 'মনোনয়ন' কে পাবেন? এ ব্যাপারে প্রধানত দুজনের কথাই শোনা যাচ্ছিল। পুরোনো রাজার ছেলে ডন জুয়ান। বর্তমানে তিনি পর্তুগালে রয়েছেন। আর ডন জুয়ানের ছেলে জুয়ান কার্লো। কার্লো স্পেনেই থাকেন।

ডন জুয়ানের ওপর ফ্র্যাঙ্কো খুব প্রসন্ন নন। কারণ, ডন জুয়ান বিভিন্ন সময় ফ্র্যাঙ্কো শাসনের সমালোচনা করেছেন। তাছাড়া তিনি একজন নরমপন্থী উদারনীতিক বলে পরিচিত। এমন মানুষকে একনায়কের পছন্দ হবার কথা নয়। বিপরীত দিকে জুয়ান কার্লো ফ্র্যাঙ্কোর আস্থাভাজন। জুয়ান কার্লো ম্যাড্রিদে ফ্র্যাঙ্কোর প্রাসাদের কাছাকাছি থাকেন, মাঝে মাঝেই তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। স্পেনের সেনাবাহিনীতে রয়েছেন তিনি। অনেকেরই মত, ফ্র্যাঙ্কো বেশ কিছু দিন ধরে জুয়ান কার্লোকে তাঁর মনের মত করে গড়ে তুলছেন।

গত সপ্তাহে ফ্র্যাঙ্কো স্পেনের আইনসভা কর্টেসের অধিবেশন ডেকে সেখানে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেছেন, তাঁর পর স্পেনের শাসনকর্তা হবেন ৩১ বৎসর বয়স্ক জুয়ান কার্লো।

এই সংবাদে ডন জুয়ান খুবই চটেছেন। তাঁর বড় আশা ছিল, তিনি সিংহাসন পাবেন। তাঁকে বাদ দিয়ে তাঁর ছেলেকে গদীতে বসানো কেন? জুয়ান কার্লো যখন তাঁর পিতাকে টেলিফোন করেন, তখন ক্রুদ্ধ পিতা টেলিফোন ধরতে পর্যন্ত অস্বীকার করেন।

স্পেনের রাজতন্ত্রীরাও খুশি নন। তাঁদের বক্তব্য, রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠাই যখন হল, তখন উত্তরাধিকারের লাইন বরাবর অগ্রসর হতে হবে। একনায়ক নিজে রাজার মনোনয়ন দেবেন, এ কেমন কথা?

তবে, মনোনয়ন হলেই যে রাজা সিংহাসনে বসবেন, এমন কথা নেই। ফ্র্যাঙ্কোর মৃত্যু বা অবসর গ্রহণের পূর্বে জুয়ান কার্লো সিংহাসনে বসতে পারবেন না। আর ফ্র্যাঙ্কো যে এখনই অবসর নেবেন, এমন কোন সম্ভাবনা নেই।

হণ্ডুরাস ঃ

মধ্য আমেরিকার দুই ক্ষুদ্র দেশ হণ্ডুরাস ও এল সালভেডরের মধ্যে যে সংঘর্ষ সুরু হয়েছিল, আমেরিকান রাষ্ট্রসমিতি বা ও-এ-এসের (অরগানিজেশন অব আমেরিকান স্টেটস্) উদ্যোগে সেখানে যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হলেও, যুদ্ধ এখনও থামে নি।

এল সালভেডরের রাষ্ট্রপতি ফাইডেল সানচেজ হেরনানডেজ ঘোষণা করেছেন, তাঁরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবেন।

এই সংবাদে ও-এ-এস খুবই অস্বস্তিতে পড়েছে। ও-এ-এসের পক্ষ থেকে একটি তদারকি দল ইতিমধ্যেই হণ্ডুরাস পৌঁচেছে। তা ছাড়া, ওয়াশিংটনে ও-এ-এসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রগুলির পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক বসেছে এই বিষয়ে আলোচনার জন্য।

এল সালভেডরের বক্তব্য, হণ্ডুরাসে অবস্থানরত সালভেডরবাসীদের পূর্ণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা না হওয়া পর্যন্ত তারা যুদ্ধ থামাবে না, হণ্ডুরাসের ভেতর থেকে তাদের সৈন্যও ফিরিয়ে আনবে না।

এল সালভেডর ছোট দেশ, অথচ তার লোকসংখ্যা বেশি। এখানকার লোকসংখ্যা ৩৩ লক্ষ। আর তার পাঁচগুণে বেশি জমি থাকা সত্ত্বেও হণ্ডুরাসের লোকসংখ্যা মাত্র ২৬ লক্ষ। তাই এল সালভেডর থেকে গত দুই দশকে প্রায় পৌনে তিন লক্ষ লোক হণ্ডুরাস গিয়েছে।

এখন হণ্ডুরাসের লোকেরা সালভেডরীয়দের পিটিয়ে তাদের দেশ থেকে তাড়াচ্ছে। তাদের ঘর-বাড়ি জ্বালিয়ে দিচ্ছে। এমন কি মেয়েদের ওপরও অত্যাচার করা হচ্ছে। আতঙ্কে সালভেডরীয়রা হণ্ডুরাস থেকে দলে দলে পালিয়ে আসছে। এতেই এল সালভেডরের আপত্তি। তারা এর প্রতিকার চায়।

(২৭-৭-৬৯)

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

তোর শিল তোর নোড়া তাই দিয়ে ভাঙি তোর দাঁতের গোড়া—এই কথাটার যে কত সার্থক প্রয়োগ হতে পারে, তার এক বিরল নজির স্থাপন করলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী শ্রীমোরারজী দেশাইকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে বিতাড়ন ও ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী একজন নারী এবং নারীর মন যে কি ভয়ঙ্কর বস্তু—সেটা একইভাবে অনুভবের সুযোগ এনে দিয়েছে শ্রীসদোবা পাতিলের মত দক্ষিণপন্থী ব্যক্তিকে, শ্রীজ্যোতি বসুর মত কট্টর বামপন্থীকে। শ্রীপাতিল শ্রীমতী গান্ধী সম্পর্কে বলেছেন, 'প্রতিহিংসাপরায়ণা' আর শ্রীজ্যোতি বসু বলেছেন—নারীর মন কি বোঝা যায়। গত সপ্তাহে চন্দ্র বিজয় করে মার্কিন মহাকাশচারীরা নতুন মহাকাব্য রচনা করেছেন, সারা বিশ্বকে পরম রোমাঞ্চকর অনুভূতিতে অবগাহনের সুযোগ এনে দিয়েছেন আর আমরা ভারতবাসী এই একই সময়ে অন্য এক রোমাঞ্চকর অধ্যায় অনুভবের সুযোগ পেয়েছি—সেই অধ্যায় হল শ্রীমতী গান্ধীর ভারত বিজয়। চন্দ্র বিজয়ীদের সাফল্য তুলনাহীন, কিন্তু নিজ ক্ষেত্রে শ্রীমতী গান্ধীর সাফল্যও নগণ্য নয় বরং বলা যায় পরম বিস্ময়কর—ভারতের রাজনীতিতে অভূতপূর্ব। শ্রীমতী গান্ধীর সাফল্য গৌরবদীপ্ত হয়েছে আরো এই কারণে যে, তিনি ঐ যার শিল যার নোড়া, তাই দিয়েই তার দাঁত ভেঙে দিয়েছেন।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যে সংঘাতের মধ্য দিয়ে নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি করলেন ও পরম শক্তিশালী শ্রীমোরারজী দেশাইকে ধরাশায়ী করলেন, সেই সংঘাত কোন নতুন নয়, অভিনবও নয়, তবে এই সংঘাতে যেটা অনেকের অনুমানের বাইরে ছিল সেটা হল অনেকে ভাবতে পারেন নি এই সংঘাত এইভাবে ভারত রাষ্ট্রের কাঠামো কাঁপিয়ে দেবে, ভূমিকম্প সৃষ্টি করবে। প্রশ্ন উঠতে পারে—আচ্ছা একজন মন্ত্রীর দপ্তর কেড়ে নিলে কিংবা কোন দপ্তর বদল হলে এতবড় কম্পন দেখা দেবে কেন? তার জবাব হল প্রকাশ্যে যা ঘটেছে, সেটা কোন ঘটনাই নয়। এই ঘটনার পেছনে যে ঘটনা আছে অথবা ভবিষ্যতে যা ঘটবে, সেইটাই হল আসল ঘটনা—সেই ঘটনা হল তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিকারী, তাই এই ভূ-কম্পন, তাই এই হাড়-কাঁপানো প্রতিক্রিয়া। কাজেই বোঝা দরকার মূলে ঘটনার পেছনের ঘটনাগুলি কি আর ভবিষ্যতের ঘটনাগুলিই বা কি? সেই কথাই স্বল্প জ্ঞানে নিবেদন করব। কিন্তু একটা প্রশ্ন উঠতে পারে—দিল্লীর এত বড় রাজনীতি নিয়ে হঠাৎ সপ্তাহের বোঝাকে ভারাক্রান্ত করা কেন? এই কথার অনেক জবাব আছে—আমি মাত্র দুটি কথা বলে বক্তব্য সুরু করতে চাই। প্রথম কথা হল—শ্রীমোরারজী দেশাইকে নিয়ে এতবড় ঝড়, সেই শ্রীদেশাই মাত্র কিছুদিন আগে কলকাতা এসে প্রকাশ্যে একটি কথা বলেছিলেন। সেই কথা হল—পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রতি নজর রাখা হচ্ছে এবং ঠিক সময়মত উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর চুপি চুপি (যদিও এই চুপি চুপি বলা কথাটাও কোন কোন পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে ও প্রতিবাদ না হওয়ায় সত্য বলেই অনেকে মেনে নিয়েছেন) শ্রীদেশাই বলেছিলেন—নভেম্বর মাস পর্যন্ত অপেক্ষা কর। উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর একটি খবর হল—মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকরুণানিধি দিল্লীতে একটা সম্মেলন ডেকেছিলেন ২১শে জুলাই। ১৯শে জুলাই রাত্রে শ্রীঅজয় মুখার্জী বললেন—না দিল্লীর এই সম্মেলনে তাঁরা কেউ যাবেন না, সময় নেই। কিন্তু পরেই জানা গেল, ২১শে সকালেই তিনি আর শ্রীজ্যোতি বসু দিল্লী যাচ্ছেন। কেন? কয়েক ঘন্টায় মতটা পাল্টে গেল কেন? কারণ মাঝে একটা টেলিফোন আসে শ্রীজ্যোতি বসুর কাছ থেকে। শ্রীবসু শ্রীমুখোপাধ্যায়কে বলেন—চলুন দিল্লী যাই, আমাদের একটু যাওয়া দরকার। শ্রীঅজয় মুখার্জী বলেন, শুধু শুধু এই সময়... শ্রীবসু বললেন—না, না শুধু শ্রীকরুণানিধির জন্য নয়, চলুন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে দেখা করবো। অজয়বাবু বলেন—এই ঝঞ্ঝাটের সময় আমাদের সঙ্গে দেখা হবে কি করে? শ্রীজ্যোতি বসু বলেছিলেন—দেখাই যাক না কেন? পরের কথা হল প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল অজয়বাবু, জ্যোতিবাবুর আর এই বৈঠকে যে কথা হয়েছিল তার প্রধান কথাই ছিল এই যে, দেশাই যখন গেছেন, তখন চতুর্থ পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনা একবার ঢেলে সাজুন। শুধু আলাপই নয়, শ্রীমতী গান্ধীর ব্যবহারে রাজ্যের দুই নেতা শুধু মুগ্ধই হন নি, শ্রীজ্যোতি বসু নারীর মন নিয়ে গবেষণায় উৎসাহ পেয়েছেন, অজয়বাবু টেলিভিশনে মহাকাশচারীদের চন্দ্রে অবতরণ দেখে খুশি হয়েছেন এবং শ্রীমতী গান্ধী যে খাবার দিয়েছিলেন সেটাও খেয়ে খুবই পরিতোষলাভ করেছিলেন।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বর্তমান কাজ অর্থাৎ শ্রীদেশাই বিতাড়ন তথা সিন্ডিকেটকে ঠান্ডা করা ও ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ ঘটনাটি ঘটেছে একটি দীর্ঘকালের ও দীর্ঘস্থায়ী পরিকল্পনার অঙ্গ হিসাবে। শ্রীমতী গান্ধী বনাম সিন্ডিকেটের লড়াই-এর ক্ষেত্র প্রস্তুত

হচ্ছিল অনেক দিন ধরে—আর দুই পক্ষই অপেক্ষা করছিলেন উপযুক্ত সুযোগের। সিন্ডিকেট চাইছিল—একটু সুযোগ পেলেই মহিলা প্রধানমন্ত্রীকে সরিয়ে দেবে এবং তার জায়গায় তাদের যোগ্য প্রতিনিধিকে বসাবে। আর এই কথা জেনে প্রধানমন্ত্রী অপেক্ষা করছিলেন সুযোগ পেলেই তিনি সিন্ডিকেটকে কাৎ করে কাদায় ফেলবেন—তাঁদের নির্মূল করে একাধিপত্য কায়েম যদি সম্ভব নাও হয়, তবু তিনিই যে প্রধানা সেটা প্রমাণ করে দেবেন। এই সুযোগই এল বাঙ্গালোর কংগ্রেস অধিবেশনে। বাঙ্গালোর অধিবেশনে সিন্ডিকেট ঠিক করল তারা সঞ্জীব রেড্ডিকে রাষ্ট্রপতিপদে প্রার্থী করে শ্রীমতী ইন্দিরাকে বুঝিয়ে দেবে তারা কি চায় ও কি করতে বলছে। আর শ্রীমতী ইন্দিরা—যিনি শুধু একটা ইস্যু খুঁজছিলেন, সেই ইস্যু তিনি পেয়ে গেলেন। অর্থাৎ যে ইস্যুতে সংঘাত হলে কেউ বলবে না যে, তিনিই ঝঞ্ঝাট পাকিয়েছেন, দায়িত্বটা অপর পক্ষেরই ঘাড়ে পড়বে। সিন্ডিকেট চেয়েছিলো—শ্রীরেড্ডিকে রাষ্ট্রপতি করার পর শ্রীমতী ইন্দিরা অপসারণের কাজটা রাষ্ট্রপতি বনাম প্রধানমন্ত্রীর মতবিরোধে হবে—সিন্ডিকেট নিজেদের হাত ময়লা করবে না, অর্থাৎ সম্পূর্ণ সাংবিধানিক সংকটে প্রধানমন্ত্রী সরে যাবেন।

শ্রীমতী ইন্দিরা সেই সত্যটা ধরে ফেললেন এবং বুঝলেন রাষ্ট্রপতি হল তুরুপের তাস, সেখানা হাতছাড়া হ'লে বোর্ড জয় করা খুবই কঠিন হবে। তাই যা করবার এক্ষুণি করতে হবে। রাষ্ট্রপতি পদ নিয়ে বিরোধ হবে, কিন্তু সেই বিরোধকে ইস্যু করে সিন্ডিকেটকে ঠাণ্ডা করা যাবে না—তাই তার জন্য নতুন অস্ত্র চাই, সেই অস্ত্র হল একটি সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপ—ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ। এই অর্থনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণে যারা বিরোধিতা করবে, তারা প্রতিক্রিয়াশীলরূপে চিহ্নিত হবে—আর এই মৌলিক প্রশ্নে যদি বিরোধ কেন্দ্রীভূত হয়—তিনি একদিকে সব বামপন্থী দলের সমর্থন পাবেন, লোকসভার কংগ্রেস দলের বহু সদস্যের সমর্থন পাবেন এমন কি এই ইস্যু নিয়ে যদি তিনি কেন্দ্রে জাতীয় সরকার গড়ার ডাক দেন, তবে তাতেও বাধা হবে না। কারণ লোকসভায় যদি শ্রীমতী গান্ধী পঞ্চাশজন সদস্য নিয়ে কংগ্রেস বিরোধীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরকার গঠন করেন, তবে সেটা আটকাবার ক্ষমতা সিন্ডিকেটের নেই। সিন্ডিকেট বিপদে পড়ল এইখানে—কারণ শ্রীমতী গান্ধী ইচ্ছে করলে লোকসভা ভেঙে দিতে পারেন এবং শ্রীগিরির রাষ্ট্রপতি থাকাকালে সেটা করা খুবই সহজ আর আজ যদি শ্রীমতী ইন্দিরা সরকার ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচনের ডাক দেন, তবে কংগ্রেসের অবস্থা কি হবে সেটা তাদের অনুমানের বাইরে নয়। তাই হজম করতে হল শ্রীমতী গান্ধীর অর্থনৈতিক নোট। সিন্ডিকেট ভেবেছিল যাহোক এখন দু'পা এগিয়ে একপা পিছিয়ে আসা যাক। রাষ্ট্রপতিপদে শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি নির্বাচিত হলেন, দু'পা এগোনো গেল—অর্থনৈতিক প্রস্তাব গ্রহণ করে না হয় এক পা পেছনো গেল। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী দেখলেন সাপের গর্তে যখন হাত দিয়েছেন, তখন পিছিয়ে আসা সম্ভব নয়—আর পিছিয়ে আসা মানে সাপকে ছোবল মারতে নিশ্চিত সুযোগ করে দেওয়া। তাই দিল্লী এসে সুরু করলেন সাপের বিষদাঁত ভাঙা। শ্রীমতী ইন্দিরা এমন দুঃসাহসিকভাবে বিষদাঁত ভাঙতে সুরু করবেন, সেটা কেউ কল্পনা করতে পারেন নি। সিন্ডিকেটের একটু ভয় ছিল শ্রীচ্যবনকে নিয়ে, কারণ শ্রীমতী গান্ধী যেটুকু উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন, সেটা নাম উল্লেখ না করে শ্রীচ্যবন প্রসঙ্গে। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী সেই পথে গেলেন না। তিনি বাঙ্গালোরে যে অর্থনৈতিক নোটকে রূপায়ণের দায়িত্ব কংগ্রেসের কাছ থেকে পেয়েছেন, সেই নোড়া দিয়েই সিন্ডিকেটের দাঁতে আঘাত করলেন। শ্রীমতী গান্ধী যদি শ্রীচ্যবন সম্পর্কে কোন পথ নিতেন, তবে সকলে বলত—দেখ শ্রীমতী গান্ধী কেমন প্রতিহিংসাপরায়ণা, শ্রীচ্যবন তাঁকে সমর্থন করেন নি, তাই শ্রীচ্যবনকে কোতল করলেন। তাই তিনি বেছে নিলেন শ্রীদেশাইকে। শ্রীমতী গান্ধী জানেন—আসল পালের গোদা হলেন শ্রীদেশাই আর শ্রীদেশাইকে বধ করলে দুটো ফল হবে। এক হল ঝিকে শাসন করে বৌকে শিক্ষা দেওয়া হবে, দুই হল—তাঁর জনপ্রিয়তা (সেটা মূল্যবান বা সস্তা যাই হোক না কেন) বৃদ্ধি পাবে। শ্রীদেশাইকে অর্থমন্ত্রী থেকে বিতাড়ন করে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ ঘোষণা করে এটাই প্রমাণ করে দিলেন যে, এতদিন যেন শ্রীদেশাইয়ের কারণে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের কাজ সম্ভব হচ্ছিল না—অর্থমন্ত্রী দেশাইকে বিতাড়নে এটা সম্ভব হল। এর ফল হল এই, শ্রীদেশাইয়ের হয়ে যাঁরা দাঁড়াবেন তাঁদেরই চিহ্নিত হতে হবে সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণের বিরোধী হিসাবে। সেই ঝুঁকি নেওয়া সম্ভব নয়, আবার সিন্ডিকেট যদি এই ইস্যু নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকেই বরখাস্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তবে তার প্রতিক্রিয়া হবে হাওয়ার গতির বিরুদ্ধে যাওয়া। তাই যাঁরা এতদিনে রাজন্যবর্গের ভাতা বিলোপ করতে সাহস পান নি বা করেন নি, তাঁরাই ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের মত বিষবড়ি হজম করতে বাধ্য হলেন। শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে এই মুহূর্তে সিন্ডিকেটের দ্বন্দ্বে নামার প্রধান ভয় হল যতদিন রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর হাতে আছেন, ততদিন প্রধানমন্ত্রী দরকার হলে লোকসভা ভেঙে দিতে পারেন। আবার লোকসভায় আসনগত যে ব্যবধান আছে, তাতে সামান্য কয়েকজন সদস্য নিয়ে অন্যের সমর্থনে কংগ্রেস বিরোধী সরকারও গঠন করতে পারেন—সেই বিপদ সিন্ডিকেট ডেকে আনতে সাহস পেলেন না। আর শ্রীমোরারজী একদা শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে দ্বন্দ্বে নেমে নিজেকে হ্যামলেট বলেছিলেন—আজ বিতাড়িত হয়ে নিজেকে একজন কেরানির বেশি ভাবতে পারছেন না। ১৯৬৬ সালে প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রীর মৃত্যুর পর শ্রীদেশাই প্রথম ইন্দিরার সঙ্গে দ্বন্দ্বে নামেন—আর জয়ী হবই এই কথা বলে লড়াইতে নেমে শ্রীমতী গান্ধীর কাছে বিয়োগান্তভাবে পরাজিত হন। তারপর ১৯৬৭ সালে মার্চ মাসে আবার নামেন শ্রীমতী ইন্দিরার সঙ্গে লড়াইয়ে—তখনই তিনি বলেছিলেন—আমি হ্যামলেট। কিন্তু ১৯৬৭ সালের ১১ই মার্চ তিনি ঘোষণা করলেন—না আমি রণে ভঙ্গ দিলাম—আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবো না। আর এবার ১৯৬৯ সালের ১৬ই জুলাই শ্রীমতী ইন্দিরা তাঁকে বরখাস্ত করলেন অর্থমন্ত্রিত্ব থেকে এবং এবার শ্রীদেশাই বললেন—শ্রীমতী গান্ধী তাঁকে একজন কেরানির মত বরখাস্ত করলেন। সেই দিনের হ্যামলেট আজ নিজেকে কেরানির বেশি ভাবতে পারছেন না। প্রথম পর্যায়ের নাটক এই পর্যন্ত এগিয়েছে। সুরু হয়েছে দ্বিতীয় পর্যায়। নাটকের প্রথম অঙ্কে দর্শকরা যতটা উপভোগ্য দৃশ্য দেখেছেন, পরবর্তী অঙ্কে একই উপভোগ্য দৃশ্য দেখবেন। সার্থক নাটক সব সময় সফল পরিণতি লাভ করে, এই ক্ষেত্রেও সেই আশা করলে নিরাশ হবার কারণ নেই। এই নাটকের কিন্তু আরো একটা দিক আছে। সেই দিক হল: কংগ্রেসের যেমন ভাঙাগড়া চলছে, প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করে একইভাবেই বামপন্থীদের মহলেও চলছে নানা দৃশ্যের অভিনয়। সেই অভিনয়ও কিন্তু কংগ্রেসের নায়কদের অপেক্ষা কম উপভোগ্য নয়—সেই দৃশ্যগুলি দেখা যাক।

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

কে এই যুবক ?

দুর্বার দুর্জয় মৃত্যুভয়হীন অনমনীয় তরুণ—দৃপ্ত উদ্ভাসিত চক্ষুতে অচঞ্চল স্বচ্ছ দৃষ্টি, উন্নত শির, দৃঢ় পদক্ষেপে পথ চলেছেন। মনে অটুট সঙ্কল্প—বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে আঘাত হানতে হবে—সমস্ত বাধাকে পর্যুদস্ত করে এগিয়ে যেতে হবে।

চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর নাম করা মেধাবী ছাত্র। স্বাধীনতা-সংগ্রামের আহবানে চরম আত্মত্যাগের সঙ্কল্প নিয়ে ঘর ছেড়ে কুমিল্লা শহরে আজ তার পদার্পণ।

ইতিপূর্বে কুমিল্লার জেলাশাসক মিঃ স্টিভেন্স কুমারী শান্তি-সুনীতির গুলীতে প্রাণত্যাগ করেছেন। একটার-পর-একটা আঘাতে বৃটিশ সরকার ক্রমশই হিংস্র থেকে হিংস্রতর হয়ে উঠেছেন—শুরু হয়েছে নিরপরাধ দেশবাসীর ওপর অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতন।

বিপ্লবী তরুণবৃন্দ প্রতিকারকল্পে তাঁদের সীমিত শক্তি নিয়েই দুর্বার বেগে এগিয়ে এলেন—রক্তের অক্ষরে শপথ নিলেন—বৃটিশ শাসনযন্ত্রের শ্বেতাঙ্গ অফিসারদের ওপর প্রচণ্ড আঘাত হানতে হবে—কোন ক্ষেত্রেই কার্যোদ্ধার না করে আমরা ফিরে আসবো না।

কুমিল্লার অতিরিক্ত পুলিশ সাহেবকে যুবকের রক্তে এই অত্যাচারের জবাব দিতে হবে—বিপ্লবীদের আদালতে তাঁর প্রাণ-দণ্ডের আদেশ হয়েছে। এ আদেশের নড়-চড় নিশ্চয়ই হবে না!

এই পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজ-প্রীতিসম্পন্ন মন নিয়ে কেউ হয়ত প্রশ্ন করতে পারেন—সরকারের সঙ্গে আপনাদের শর্ত বিনিময় হয়েছিল—সরকার আপনাদের চরমদণ্ড দেবেন না—আপনারাও প্রতিশ্রুত ছিলেন রাজনৈতিক হত্যা ও বিভিন্ন ধরণের আক্রমণ পরিহার করবেন। তবে এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে মিঃ এলিসনের প্রাণ-দণ্ডাজ্ঞা ঘোষণা করতে মাস্টারদা কেন একটুও কুণ্ঠাবোধ করলেন না?

মাস্টারদার সুস্থির ও বিশেষ বিবেচিত মত নিয়েই আমরা সরকারকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে, বন্দী থাকাকালীন কেবল-মাত্র আমরাই আক্রমণাত্মক কার্যসূচী স্থগিত রাখবো।

আমাদের প্রাণদণ্ডের বিনিময়ে বাংলা তথা ভারতের বিপ্লবীরা সকলেই অস্ত্র-সংবরণ করবে এইরূপ অবাস্তব প্রতিশ্রুতি দিতে মাস্টারদা আমাদের কখনই বলতে পারেন না—আমরাও ঐরূপ অসম্ভব ও মিথ্যা অঙ্গীকারে কোনমতেই আবদ্ধ হতে পারি না!

ভারতের বিপ্লবীরা সকলে একই কেন্দ্রীয় পার্টির অন্তর্গত ছিলেন না। কাজেই সবার পক্ষে ঐরূপ প্রতিশ্রুতির কথা উঠতেই পারে না—বিপ্লবীরা তা কেনই বা মানবেন আর আমরাও বা তা চাইব কেন? তাই মিঃ এলিসনকে মৃত্যু-দণ্ড দেবার মধ্যে মাস্টারদার কুণ্ঠাবোধের কোন কারণ ছিল না। জেলের ভেতরে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকলেও জেলের বাইরে বিপ্লবীদের আক্রমণাত্মক কর্মসূচীর অগ্রগতিকে আমরা জেল থেকেও আন্তরিক সমর্থন জানিয়েছি।

আমাদের বিপ্লবী সাথীরা কেউ কেউ ঢাকা, কুমিল্লা ও নোয়াখালিতে 'নিরাপদ আশ্রয়' ও কর্মস্থল বেছে নিলেন। আমাদের—গণেশ, লোকনাথ, মাখন, আনন্দ ও আমাকে কলকাতায় নিয়ে আসা হল। সমস্ত দুর্যোগ, বিপদ ও প্রতি মুহূর্তেই ধরা পড়বার আশঙ্কাকে তুচ্ছ করে মাস্টার-দা ও নির্মলদা চট্টগ্রামেই নিজেদের কর্ম-ক্ষেত্রে স্থির রইলেন। কালের পরিবর্তনে ও যুগের গতিতে মাস্টারদার বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গি সমৃদ্ধিশালী হয়েছে। যাঁরা স্বাধীনতা-সংগ্রামে আমাদের পথপ্রদর্শক, যাঁদের আদর্শ নিয়ে মাস্টারদা ও আমরা আগামীদিনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করেছিলাম তাঁদের প্রতি কোনপ্রকার কটাক্ষ না করে বা কোনরূপ অশ্রদ্ধার মনোভাব না রেখে অতীত যুগের কথা আমাদের ভাবতে হবে। গৌরবোজ্জ্বল চিত্র-শোভিত অতীত জীবন-কাহিনীর মূল্যায়ন করতে যেমন আমরা কোনরূপ দ্বিধা বা সঙ্কোচ-বোধ করবো না, ঠিক তেমনিই আবার জীবনের বৈপ্লবিক দুর্বলতা বা বিচ্যুতির পাতাগুলি অন্ধকারে সযত্নে ঢেকে রেখে ভবিষ্যতের সার্বিক মূল শিক্ষা হতে বঞ্চিত হওয়ার বা বঞ্চিত করবার চেষ্টাও না করাই ঐতিহাসিক দায়িত্ব।

জালালাবাদ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরে এসে আমরা কেউ কেউ ব্যস্ত হয়ে পড়েছি স্কুল-কলেজের পড়াশুনা নিয়ে—কেউ বা সংসার নিয়ে, কেউ বা নিজ নিরাপত্তার জন্য ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালিয়েছি বর্মা

দেশের সুদূর প্রান্তরে—লোকালয় বিহীন গ্রামাঞ্চলে—পুলিশের নাগালের সম্পূর্ণ বাইরে।

বিপ্লবী যুবক-সাথীদের বৈপ্লবিক চরিত্রের দ্রুত পরিবর্তন মাস্টারদার মনকে যেমন আলোড়িত করে তুলেছিল ঠিক তেমনি অতীত ইতিহাসের দৃষ্টান্তও তাঁর মনে প্রশ্ন তুলল—বছরের-পর-বছর দেশ-দেশান্তরে গিয়ে গা ঢাকা দিয়ে থাকা বিপ্লবী নায়কদের কি একান্তই প্রয়োজন ছিল? ভারতের সেই যুগের 'বিপ্লব' বাস্তবে পরিচালনার জন্য মাতৃভূমি ছেড়ে কারো রুশ দেশে, কারো জাপানে, কারো বা মার্কিন দেশে চলে যাওয়া তাঁদের পক্ষে কি অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল? মহানায়ক সূর্য সেন নতুন ও পুরনো বৈপ্লবিক চরিত্রের অভিজ্ঞতার সমন্বয়ে সেই যুগের আপোষহীন রক্তাক্ত সংগ্রামের নির্ভীক সেনাপতি। তিনি জানতেন তাঁর 'আদেশ', 'সমর্থন' ও 'পরিচালনায়' রাজনৈতিক হত্যা ও আক্রমণাত্মক প্রতিটি কার্যকলাপের জন্য সরকারের নিকট তাঁর অপরাধের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলেছে—এবং সেই জন্য ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ক্রমবর্ধমান হারে তাঁর মস্তকের মূল্য ধার্য করছেন। তবু সূর্য সেন সৈন্য-বেষ্টিত চট্টগ্রামে থাকাই শ্রেয় মনে করেছেন। মৃত্যুভয় তাঁকে ভীত করতে পারে নি। চট্টগ্রাম জেলায় নিজের বৈপ্লবিক হেড-কোয়ার্টার পরিত্যাগ করে অন্যত্র যাওয়ার যৌক্তিকতা তিনি খুঁজে পান নি। তিনি বুঝেছিলেন বিদেশে গিয়ে বা ভারতের দূর প্রদেশে আত্মগোপন করে—ভারতীয় গণতন্ত্রবাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার নেতৃত্বের দায়িত্বভার বহন করা চলবে না। সত্যিকারের বৈপ্লবিক দায়িত্ববহনকারী সুযোগ্য অধিনায়কের স্থান সৈনিকদের সঙ্গেই হওয়া উচিত। দূর দেশে থেকে বা হেড-কোয়ার্টার ছেড়ে গিয়ে সৈন্যদের পরিচালনা করার অবাস্তব পরিকল্পনা অতি মন্দ আদর্শ—এই আদর্শে সৈনিক-দের মনোবল নষ্ট করার দায়িত্ব বহুলাংশে নেতার ওপরেই অর্শায়। এই অভিজ্ঞানের মধ্যেই সূর্য সেনের নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য।

জালালাবাদ যুদ্ধের রক্ত-বিভীষিকায় সূর্য সেন বোমা, রিভলভার ত্যাগ করলেন না, হেড-কোয়ার্টার ছাড়লেন না—ছাড়লেন না তাঁরই তৈরি বৈপ্লবিক বাহিনীর সঙ্গ—পরিবর্তে দিয়ে গেলেন একটার-পর-একটা আক্রমণের নির্দেশ!

এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্লেষণী দৃষ্টি নিয়ে নিজের মনে ভাবতে হবে আমরা কে কোথায়! "আমি সেই জেলার সংগঠনের দায়িত্ব নিয়েছিলাম"—কেবল এইটুকু বলে আমাদের নিস্তার পাওয়া চলবে না। আরো বলতে হবে—"আমি সেই দায়িত্ব বহন করে সেই সেই স্থানে সেই জেলায় বা নগরে কতখানি কি করেছি।" কোথায় নিজের দুর্বলতা তা জনসমাজে বা তরুণ-দের কাছে ধরে দিলে তাতে আমরা কেউ ছোট হবে না। তরুণেরা যদি কেবলমাত্র নেতৃবৃন্দের সাহস বিক্রম ও স্বার্থত্যাগের জয়গানই শুনে থাকে তবে শ্রদ্ধান্বিত অন্তরে আদর্শ বিপ্লবীদের প্রণাম জানাবে সত্য বটে—কিন্তু বৈপ্লবিক দুর্বলতার দিকটা উপেক্ষিত হলে বাস্তব শিক্ষার মূলে নিষ্ঠুর কুঠারাঘাত করা হবে।

মাস্টারদা সম্বন্ধে আজ যা লিখলাম তা না লিখলে তাঁর মহানায়কের ভূমিকার মূল বৈশিষ্ট্য আমাদের অজানা থাকতো।

সীমিত গণ্ডিতে সেই যুগের সাম্রাজ্য-বাদী ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে রক্তঝরা স্বাধীনতা-সংগ্রামের যে দায়িত্ব মাস্টারদা নিয়েছিলেন তা তিনি নির্ভীক অন্তরে নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে গেছেন।

যুবক গ্রুপ সংগঠকেরা যদি মনে করেন—অ্যাক্‌শনে নিজে অংশ গ্রহণ না করে তাঁরাও মাস্টারদার মত ছোটদের নির্দেশ দিয়েছেন—তবে তাঁদের পক্ষে সেটা

★ ★ সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে!

স্বনামধন্য সাহিত্যিক
ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যারিস্টার

মারদরঞ্জন দাশগুপ্তের
গ্রন্থাবলী

গ্রন্থাবলীতে
আছে দুইখানি
সুবৃহৎ ও
সুপদী
উপন্যাস

সুশান্ত-সা
ও
নীল শাড়ী

পৃষ্ঠা সংখ্যা
সর্বসমেত
৩৩৪

বাঙলা সাহিত্যে
অভিনব সংযোজন

মূল্য মাত্র দশ টাকা

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ
কলিকাতা—১২

অনধিকার চর্চা করা হবে। কারণ নাগারখানা যুদ্ধে, ১৮ই এপ্রিল পুলিশ লাইন দখলে, ২২শে এপ্রিল জালালাবাদ রণাঙ্গনে, তারপর ধলঘাট, গৈরলা প্রভৃতি একটার-পর-একটা সংঘর্ষে মাস্টারদা প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করেছেন। সৈন্যবেষ্টনীতে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য অন্যত্র পাড়ি না দিয়ে একটার-পর-একটা অ্যাক্‌শনের নির্দেশ দেওয়া—আর অল্পবয়স্ক যুবক-নেতার নিজে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ না করে অন্যদের নির্দেশ দিয়ে অ্যাক্‌শনে পাঠানোর মধ্যে আকাশ-পাতাল তফাৎ। তাছাড়া সুদীর্ঘকাল ধরে অন্য জেলায় বসে থেকে আমরা কে ক'টি অ্যাক্‌শন করেছি?

তাই যারা প্রত্যক্ষ অ্যাক্‌শনে অংশ গ্রহণ করেছে আমার চোখে বিপ্লবী প্রাধান্য তাদেরই। সেই কারণে আমার মন আচ্ছন্ন করে আছেন—"তরুণ বিপ্লবী" মাস্টারদার নির্দেশ পালনে যিনি চলেছেন কুমিল্লার পথে—মিঃ এলিসন তোমার নিস্তার নেই।

আদালতবাড়ির কম্পাউণ্ডে জেলা পুলিশদপ্তরের অফিসে মিঃ এলিসন নিয়মিত সাইকেলে চেপে আসা-যাওয়া করতেন। এডিশন্যাল জেলা পুলিশ সাহেবের সত্যই কি মোটরগাড়ি ছিল না, না কি 'উৎকোচ বা ঘুষ ইত্যাদি আমি বরদাস্ত করি না'—এই প্রচারের প্রয়োজনে তিনি সাইকেল ব্যবহার করতেন তা আমি বলতে পারি না। বাস্তবে তিনি সাইকেলে চেপেই কোর্টে আসতেন ও বাড়ি ফিরতেন। তাঁর পিছনে আর একটি সাইকেলে তাঁর আর্দালী থাকতো। সাহেবের পরনে খাকি ইউনিফর্ম—কটিবন্ধ চামড়ার ব্যাগে রিভলভার। বাছাই করা সেপাই-আর্দালী হিসাবে সাহেবের দেহরক্ষী নিযুক্ত। আর্দালীর সঙ্গেও গুলীভরা রিভলভার। হঠাৎ আক্রান্ত হলে সাহেবকে রক্ষা করতে হবে। বাংলার দিকে দিকে ইংরেজ প্রতিভূরা বিপ্লবীদের অতর্কিত গুলীর মুখে প্রাণ হারাচ্ছেন—তাই প্রতি মুহূর্তেই তাঁদের জীবনের আশঙ্কা বর্তমান। সাইকেলে চেপে সাহস ও বিক্রমের বাহ্যিক চাল বজায় রাখবার চেষ্টা সাহেব যতই করে থাকুন না কেন—কাছারী ও পুলিশ জেলাদপ্তরের চারপাশ ঘিরে সাবধানতার জন্য সাদা পোশাকে পুলিশ মোতায়েন থাকতো।

অ্যাক্‌শনের সাফল্যের জন্য—কোন্ পথে সাহেব অফিসে আসেন ও বাড়ি ফেরেন, পথ-ঘাটের নির্জনতা দিনের কোন্ সময়ে কিরূপ থাকে—সাদা পোশাকে আরো কোন দেহরক্ষী সাহেবের সঙ্গে থাকে কি-না ইত্যাদি ইত্যাদি নির্ভুল সংবাদ সংগ্রহে যুবক নিজেই মনোনিবেশ করলেন। কুমিল্লা ছোট্ট শহর। কোর্ট কম্পাউণ্ডে বা পথে-ঘাটে তেমন জনসমাগম সচরাচর থাকতো না। কাজেই যুবককে কখনও কোর্টের সামান্য কর্মচারীর, কখনও নিরীহ পথিকের, কখনও বা দীন-দুঃখী ভিখারীর ছদ্মবেশে পুলিশ সাহেবের গমনাগমনের পথটির ও তাঁর দপ্তরের বিভিন্ন অবস্থানের সমস্ত খবর সংগ্রহ করতে হলো। বলিষ্ঠ দীর্ঘকায় সাহেব—সঙ্গে কার্তুজভর্তি রিভলভার। সঙ্গী বলিষ্ঠ দেহরক্ষী আর্দালীটিও আগ্নেয়াস্ত্রে সুসজ্জিত। যুবক সম্পূর্ণ একলা—তাঁর কাছে একটি মাত্র আর্মি-রিভলভার—তাকে একাই অস্ত্রচালনায় পারদর্শী দু'জন পুলিশকে একসঙ্গে আক্রমণ করতে হবে। কে বলতে পারে আক্রমণ করবার সুযোগ তিনি পাবেন কি না! পুলিশ ধুরন্ধরেরা সন্দেহবশে আগেই যদি তাঁকে আক্রমণ করে বসে! তাছাড়া কোন কারণে যুবক যদি প্রথমে লক্ষ্যভ্রষ্ট হন—তবে তাঁর বক্ষ লক্ষ্য করে দুটি পিস্তলই একসঙ্গে গর্জে উঠবে—মাস্টারদার নির্দেশ পালন করা হবে না। যদি রিভলভারের গুলীতে পুলিশ সাহেবের হৃদয় বিদীর্ণ করা সম্ভব হয়ও বা, আর্দালীর অব্যর্থ নিশানায় তাঁর দেহ সঙ্গে সঙ্গেই ঝাঁঝরা হয়ে যাবে। নানা বেশে নানা ছলে মৃত্যু তাঁকে বারে বারে বিভীষিকা দেখাচ্ছে। কিন্তু যুবকের চক্ষে ভাসছে কানাইলাল, ক্ষুদিরাম, প্রমোদ, গোপীনাথ, বিনয়, বাদল প্রমুখের আত্মবলির উজ্জ্বল ছবি—কর্ণে বাজছে রক্তঝরা স্বাধীনতা-সংগ্রামের রণভেরীর আহ্বান—হৃদয়ে স্পন্দন জাগাচ্ছে মাস্টারদার নির্দেশ—শত্রুর নিষ্ঠুরতার কাছে হার মানলে চলবে না—হতে হবে তারই মত নিষ্ঠুর ও নির্মম!

যুবক মিঃ এলিসনের চিরবিদায়ের দিন ধার্য করলেন ১৯৩২-এর ২১শে জুন। আজ তার একজন নিরীহ পথচারীর বেশ। পরনে সামান্য ছেঁড়া মলিন ধুতি অঙ্গে মানানসই মলিন সার্ট। আজ আর সেই গর্বিত দৃপ্ত পদক্ষেপ নেই—নির্ভীক জ্বলন্ত চক্ষু ঢাকা পড়েছে সরল শান্ত দৃষ্টির আড়ালে। পায়ে খাকি রং-এর কেট্‌স—ডান হাতে একটি পুরনো ছাতা। যেখানে গোলাগুলীর খেলা চলবে—সেখানে ছাতার কি প্রয়োজন? আগেকার দিনের রাজা-রাজড়াদের যুদ্ধে ঢালের ব্যবহার ছিল। গুলীর বিরুদ্ধে ছাতার ব্যবহার ভাবাও অবাস্তব। তবে ছাতার আড়ালে গা-ঢাকা দেওয়ার উদ্দেশ্যেই কি যুবক ছাতাটি সঙ্গে নিয়েছিল?

অনিবার্য মৃত্যুমুখে যার পদক্ষেপ—গা-ঢাকা দেওয়ার কথা তার মনেও আসে নি। সে আমাকে হাসতে হাসতে বলেছিল—"পুলিশদের রিভলভার রয়েছে চামড়ার হোলস্টারে—আর আমার রিভলভারটি আশ্রয় নিয়েছিল ওই পুরনো ছাতাটির কাপড়ের অন্তরালে—আমাকে বেশ মানিয়েছিল কিন্তু। ছাতার কাপড়ের আড়ালে রিভলভারটি ছাতার বাঁটের সঙ্গে ডানহাতের মুঠিতে ধরে রেখেছিলাম—বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না।

"সাহেব তাঁর বাড়ি ও অফিসের প্রায় মাঝামাঝি এসে পড়েছেন। আমি পথের ধারে—সাহেবকে দেখে যেন ভয় পেয়ে পথের পাশে একটু সরে দাঁড়ালাম। গর্বিত ইংরেজ ভারতীয় নেটিভকে স্বাভাবিকভাবেই তাচ্ছিল্য করে এগিয়ে গেলেন। ভারতীয় নেটিভটির হাত হতে ছাতাটি খসে মাটিতে পড়ে গেল আর সঙ্গে সঙ্গে দৃঢ়মুষ্ঠিতে ধরা ·৪৫০ ব্যাসের আর্মি-রিভলভারটি বেরিয়ে এলো। সাহেব কিছু বুঝতে পারার আগেই লক্ষ্যভেদ হয়ে গেল—উপর্যুপরি গুড়ুম-গুড়ুম দুটি শব্দ হলো। গুলী লাগার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে সাদা ফ্যাকাশে মুখে সাইকেল নিয়ে সাহেব মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

জালালাবাদে কর্নেল ডালাস স্মিথের সৈন্যের গুলীতে শহীদ ত্রিপুরা সেনও মুহূর্তে সাদা ও ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিলেন, মাস্টারদার মুখে শুনেছি—হৃৎপিণ্ডে গুলী লাগলে মুখে নাকি ঐরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। মনে হলো আমার গুলীও সাহেবের হৃৎপিণ্ড ভেদ করেছে। ......আশ্চর্য সাহেবের বিশ্বস্ত দেহরক্ষী কই? বিকেল পাঁচটায়—দিনের আলোতে আমার রিভলভার অগ্নুদ্গার করেছে। সাহেব ও তাঁর দেহরক্ষীর খুব নিকটে দশ গজের মধ্যেই আমি ছিলাম—সমস্তটা স্পষ্টই আমার চোখে ধরা পড়েছে। অতর্কিত আক্রমণে ইংরেজ প্রভু ধরাশায়ী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বেতনভোগী দেহরক্ষী ঊর্ধ্বশ্বাসে তার প্রথম কর্তব্য—"যঃ পলায়তি স জীবতি" অতি নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করেছে। তারপর আস্তে আস্তে যখন সে বুঝতে পারল রিভলভারের গুলী তাকে আর অনুসরণ করছে না—তখন নির্ভীক সেপাই তার রিভলভার বাগিয়ে ধরে দু'বার গুলী ছোড়ে। ততক্ষণে দেহরক্ষীর দৃষ্টির সম্পূর্ণ অগোচরে আমি, বহুদূরে। চাকরি বজায় রাখার তাগিদে দেহরক্ষীর এই কর্তব্য পালনের প্রয়াসকে আমরা নিশ্চয়ই ক্ষমার চোখে দেখতে পারি!" যুবক-বন্ধু আমাকে এই বর্ণনা দিয়ে হেসে ফেললেন। কে এই যুবক?

[ক্রমশ]

শহর কলকাতা

নীলের দর্পণ

প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় (কে ন কা তা বিশ্ববিদ্যালয়)-এর ফলাফল বের হয়েছে। বিফল ছাত্ররা মনমরা হয়ে পড়েছেন। কেউ কেউ এই ভেবে সান্ত্বনা পাচ্ছেন যে, পরীক্ষার ব্যাপারটা ভাগ্যের খেলা মাত্র। ফেল যাঁরা করেন, অন্যের চোখে তাঁরা না-পড়ুয়া দলের অবশ্যম্ভাবী ফেল মার্কা ছাত্র।

আমাদের মনে হয়, ছাত্রদের ঘাড়ে দোষ চাপানোটা আমাদের গতানুগতিক অভ্যাসেরই দোষ। না-পড়ুয়া ছাত্র যে নেই, তা বলছি না, তবে ফেল করার উদ্দেশ্যে কিছু ছাত্র পরীক্ষা দিলেও, হাজার হাজার ছাত্র কখনো ফেল করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে পরীক্ষা দেয় না।

তবে একথা ঠিক, এখন পরীক্ষায় পাশ করা বা না-করা যেন ভাগ্যের খেলা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ পরীক্ষা করার জন্যে যাঁরা নিযুক্ত হন, তাঁরা যথোপযুক্ত কি না সে প্রশ্নটাও বিবেচ্য।

এবার প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্রে ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় করতে বলা হয়েছিল। হাজার হাজার ছাত্র কী উত্তর লিখেছেন তা পরীক্ষকরাই জানেন। কিন্তু প্রধান পরীক্ষক স্বয়ং প্রশ্নোত্তর তৈরি করে খাতা দেখার জন্যে যেভাবে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তা দেখলে তাজ্জব বনে যেতে হয়।

প্রধান পরীক্ষক মহাশয় 'নীলদর্পণ' সমাসবদ্ধ পদটির ব্যাসবাক্য তৈরি করে লিখেছেন—'নীলের দর্পণ'। এবং ছাত্ররা নীলচাষবিষয়ক দর্পণ লিখলে নিশ্চয়ই রেহাই পান নি।

'ব্যাকরণে সুপণ্ডিত প্রধান পরীক্ষকের এই কীর্তি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অক্ষয় হয়ে থাকুক। সেই সঙ্গে, বলা যায়, কলকাতার যে কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা উক্ত প্রধান পরীক্ষক মশায়ের কাছে অধ্যাপনা লাভ করেন, তাঁদের শিক্ষারও হন্দমুদ্দ হচ্ছে।

পণ্ডিতেরা তবু ফেলের দায়টা অসহায় ও নিরুপায় ছাত্রদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েই নিজের দায়িত্ব সম্পন্ন করেন। এহেন অবস্থায় চুপচাপ থাকাটাই কি অভিভাবকদের পক্ষেও সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমানের কাজ?

ম্যানহোল গোডাউন : পূর্ত বিভাগ

বর্তমান যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে একটা অভাব দূর হতে চলেছে। কৃতিত্বটা অবশ্য সরকারের পূর্ত দপ্তরের। কলকাতা থেকে দক্ষিণ অঞ্চলে বেড়াতে গিয়ে দেখি মানচিত্রে অঙ্কিত পথ-ঘাটের নিশানা, সুন্দরভাবে খোদাই করা দূরত্বজ্ঞাপক নতুন প্রস্তরগুলি। এতোদিন এসব ছিল না—যদিও থাকা খুবই দরকার ছিল। কলকাতার স্থানে স্থানে পূর্ত বিভাগের কোনো কিছু নেই বলে এতোদিন আমাদের যে ধারণা ছিল, সে ধারণাও দূর হচ্ছে। রাজপথের ধারে যে সব জায়গায় এযাবৎকাল পূর্ত বিভাগের মালপত্র 'বে-ওয়ারিশ' হিসেবে পড়ে থাকতে দেখা গেছিল, এখন সেখানে পূর্ত বিভাগের নোটিশ বোর্ড দিন-রাত্রির জাগ্রত প্রহরী।

প্রহরীরও প্রহরী আছে, বোধ হয়। দু'-একটি নোটিশ বোর্ডে ইতিমধ্যে ইস্তাহার লটকানো হয়েছে। অবশিষ্টাংশগুলির অবস্থা কি হয়, আমরা তা দেখার অপেক্ষায় আছি।

অমল মানুষ

ওপার-এপার। দুই পারের মধ্যিখানে যতোই চর থাকুক, ডক্টর শহীদুল্লাহ্-এর মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সংগে সংগে এপারে শোকের ছায়া পড়ল।

সেদিন শহর কলকাতায় শহীদুল্লাহ্ স্মরণে শোকসভা অনুষ্ঠিত হল। শোকসন্তপ্ত বাগ্মীরা তাঁর কৃতিত্ব ও পাণ্ডিত্য সম্পর্কে অনেক কথাই বললেন।

ঐ সভায় শোকাকুল শ্রোতা হিসেবে শহীদুল্লাহ্-এর পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতা আমার কাছে কোনোরকম নতুন মনে হয় নি। শুধু একটি ঘটনা বারবার আমার মনকে আলোড়িত করছিল।

ঘটনাটি ঘটেছিল বোদা হাইস্কুলে। ১৯৪৭-এর ১৫ই অগাস্ট বোদা ছিল ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যেই। র‍্যাডক্লিফ এওয়ার্ডে ১৮ই অগাস্ট বোদা পড়ল পূর্ব পাকিস্তানে। স্কুলটি ছিল খুব নাম করা। প্রখ্যাত সাংবাদিক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার ঐ স্কুলে পড়ার সময়ই বহিষ্কৃত হয়েছিলেন।

হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ছাত্ররা সম্প্রীতির সঙ্গে পড়াশুনো করতো। হিন্দু ছাত্রদের সরস্বতী পুজো অনুষ্ঠিত হত বিদ্যালয়ে। সেখানে আসতেন মুসলমান ছাত্ররা। মিলেমিশে উভয় সম্প্রদায়ের ছাত্ররা উৎসবে আনন্দ উপভোগ করত। মুসলমান ছাত্রদের মিলাত্‌শরীফ-এও হিন্দু ছাত্ররা সমানভাবে আনন্দ উপভোগ করত।

তখন ১৯৪৬ সাল। সবাই জানেন, একশ্রেণীর হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদবুদ্ধি তখন কীরকম প্রবল হয়ে উঠেছিল। এতোদিনের হিন্দু-মুসলমানের মিলন-মৈত্রীর বিদ্যালয় বোদা—সেখানেও সাম্প্রদায়িক উৎপাত সুরু হল। সেবার বিদ্যালয়ে আর সরস্বতী পুজো হল না।

তারপর এল মিলাত্‌শরীফের সময়। ঐ উৎসবে ডক্টর শহীদুল্লাহ্ আসছেন শুনে চারদিকে হৈ-চৈ পড়ে গেল। মুসলমান ছাত্রদের তো আনন্দ ধরে না। কিন্তু এ কি ব্যাপার? শহীদুল্লাহ্ একজন খাঁটি মুসলমান, অথচ তাঁর মুখে এ কি কথা। তিনি গভীর বেদনার সঙ্গে জানালেন যে, হিন্দু ছাত্রদের সরস্বতী পুজো করতে না দিয়ে তাঁরা শুধু অন্যায় করেন নি, মিলাত্‌-বিরুদ্ধ কাজ করেছেন। তিনি বললেন, কোরানে কোথাও অন্য ধর্মাবলম্বীদের বিরুদ্ধাচরণ করার নির্দেশ নেই।

শহীদুল্লাহ্-এর মুখে এই ধরণের কথা শুনে কিছু মুসলমান খুশি হলেও বাকিরা তো খাপ্পা। শহীদুল্লাহ্ তবু তাঁর বক্তব্যে অনড় এবং অটল। একই কথা বারবার বললেন, হৃদয় দিয়ে তাদের বোঝালেন।

বোদা হাইস্কুলে সম্প্রীতির যে ফাটল সুরু হয়েছিল, আবার তাতে জোড়া লাগালেন ডক্টর শহীদুল্লাহ্। যে সব মুসলমান ছাত্র এবং কর্তৃপক্ষস্থানীয় ব্যক্তি খাপ্পা হয়েছিলেন, তাঁরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে তাঁর কাছে দলে দলে এসে ক্ষমা চাইলেন। একটি মহৎ ব্যক্তির স্পর্শে সেদিন বোদা হাইস্কুল হিন্দু-মুসলমানের মিলন তীর্থরূপে পরিগণিত হল।

শোকসভায় এই স্মৃতির মধ্যে সেদিন নতুন করে ডক্টর শহীদুল্লাহ্-কে জানলাম। তিনি শুধু একজন শ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ পণ্ডিতব্যক্তিই ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন অমল মানুষ।

—শহরদর্শী

যুক্তফ্রণ্ট সরকার সমীপেষু

গত সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় শিক্ষামন্ত্রী এ বৎসরের ব্যয়-বরাদ্দের দাবি উত্থাপন করেন। দাবিটি ভোটাধিক্যে গৃহীতও হয়েছে। বিধানসভায় কংগ্রেস সদস্যরা শিক্ষামন্ত্রীর তীব্র সমালোচনা করেছেন।

কংগ্রেস সদস্যদের ক্রুদ্ধ হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। কারণ, যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসেই কংগ্রেসের ওপর মোক্ষম আঘাত হেনেছেন। গ্রামাঞ্চলে যে শক্তিকে অবলম্বন করে কংগ্রেসের সংগঠনের প্রসার ঘটেছিল, সেই জেলা স্কুল বোর্ডকে বাতিল করায় কংগ্রেসের ক্ষোভ হওয়া স্বাভাবিক। বিদ্যালয় পরিচালকমণ্ডলীকেও কুক্ষিগত করে রাখার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আইন করা হচ্ছে।

প্রাথমিক শিক্ষা পরিচালনা ব্যবস্থাকে কুক্ষিগত করে রেখে গত বিশ বৎসরে কংগ্রেস দুর্নীতির এক অকল্পনীয় ইতিহাস সৃষ্টি করে রেখেছে। প্রসাদ বিতরণের এতবড় হাতিয়ার আজ হাতছাড়া হয়ে গেল বলেই কংগ্রেস সদস্যদের ক্ষোভ।

এই দুর্নীতির জাল ছিঁড়ে ফেলার পথে রাজ্য সরকারের প্রাথমিক পদক্ষেপকে যে কোন শিক্ষানুরাগী অভিনন্দন জানাবে। সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষামন্ত্রী তাঁর বাজেট ভাষণে যুক্তফ্রন্টের গৃহীত নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ঘোষণা করেছেন, ১৯৭০ সালের জানুয়ারী মাস থেকে রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষা সরকার হাতে তুলে নেবেন। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সমস্ত বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ দেওয়ার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রীর এই সব ঘোষণা নিশ্চয়ই অভিনন্দনযোগ্য—কংগ্রেস সদস্যরা যতই ক্ষোভ করুন না কেন!

এ তো গেল ভবিষ্যতের কথা। কিন্তু রাজ্য সরকার এখন পর্যন্ত এমন কিছু করতে পেরেছেন কি, যাতে শিক্ষক ও অভিভাবকরা আশ্বস্ত হতে পারে।

শিক্ষা-ব্যবস্থার পরিবর্তনের আগে শিক্ষকরা অন্তত নিয়মিত বেতন পাওয়ার আশা করেন। কিন্তু গত বিশ বৎসর ধরে বেতন প্রাপ্তির ব্যাপারে যে অনিশ্চয়তা চলে আসছে, আজও তার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটে নি। প্রাথমিক শিক্ষকরা চাপরাশীর চেয়েও কম বেতন পান। তাও নিয়মিত জোটে না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের রেশনের থলি হাতে করে ডাকঘরে রোজ ধর্ণা দেওয়ার দৃশ্য আজও অনিয়মিত হল না। পুজোর ছুটির আগে অগ্রিম বেতন দেওয়ার কথা। খুব কম শিক্ষকই এই টাকাটা অতীতে পুজোর আগে পেয়েছেন। এবারও যে ব্যতিক্রম ঘটবে, তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে না।

কংগ্রেসীদের কল্যাণে যে সব ভুয়া বিদ্যালয় তালিকাভুক্ত আছে, তার ভুয়া শিক্ষকের হাতে সময়মত টাকা না গেলে কিছু যায়-আসে না। অতীতের মত আজ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা অনেকের কাছেই বাড়তি উপায়ের পথ নয়। মাসিক বেতনের ওপর অনেকেরই সংসার চলে। সবিনয়ে শিক্ষামন্ত্রীর কাছে কি জানতে পারি, হতভাগ্য এই সব শিক্ষকরা যাতে মাস গেলে একটা নির্দিষ্ট দিনে বেতন পেতে পারেন, তার জন্য তিনি কি কিছু করেছেন?

মাধ্যমিক, উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা বিদ্যালয় পরিচালকমণ্ডলীর কাছ থেকে মাসে কত বেতন পান, তা এককালের শিক্ষক এবং শিক্ষা আন্দোলনের নেতা সত্যপ্রিয়বাবুর অজানা নয়। রাজ্য সরকারের কাছ থেকে বিদ্যালয়ের প্রাপ্য অনুদান এবং শিক্ষকদের প্রাপ্য মহার্ঘভাতা কতদিন পরে শিক্ষকদের হাতে পৌঁছয় তার খবরও নিশ্চয় শিক্ষামন্ত্রী রাখেন। কলেজের অধ্যাপক, যাঁর মাসিক সবশুদ্ধ প্রাপ্য ছ'শো টাকা, তাঁকে যে মাসে মাত্র শ'দুয়েক টাকা হাতে নিয়ে ঘরে ফিরতে হয়, শিক্ষামন্ত্রী কি সে খবর রাখেন না।

নিশ্চয়ই রাখেন। তবু আজও অবস্থার কেন পরিবর্তন ঘটছে না, শিক্ষামন্ত্রী কি তাঁর বড় বড় পরিকল্পনা রচনার ফাঁকে ফাঁকে সেদিকে দৃষ্টি দেওয়ার সময় পান।

তারপর প্রশাসনিক দুর্নীতির কথা বলতে হলে তো মহাভারত রচনা করতে হয়। আগে পুলিশ বিভাগের সর্বাপেক্ষা অখ্যাতি ছিল দুর্নীতির। তার পর স্বাস্থ্যদপ্তরের। এখন শিক্ষাদপ্তর প্রথম স্থান অধিকার করেছে বলে শোনা যায়।

শিক্ষাদপ্তরের অনেক কেলেঙ্কারীর কথা বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। অনেকগুলি মামলা তদারকি কমিশনের কাছেও গেছে। শিক্ষামন্ত্রী রাজনৈতিক স্তরে দুর্নীতির দরজা বন্ধ করার জন্য যতটুকু সক্রিয় হয়েছেন, রাইটার্স বিল্ডিংসে তাঁর বসবার ঘরের পিছন দিকের বাড়ির ঘরে ঘরে যে দুর্নীতির জাল আজ ছড়িয়ে রয়েছে, তা ছিন্ন করার দিকে তিনি কি তার সিকিভাগ সক্রিয় হয়েছেন।

শিক্ষক-শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী আর অভিভাবকদের তো অন্য অভিজ্ঞতা। যুক্তফ্রন্ট সরকার এখানে আপোষের পথ গ্রহণ করে চলেছেন বলে অভিযোগ করলে তা কি অসত্য বলে প্রমাণিত হবে?

সর্বশ্রেণীর শিক্ষকদের মধ্যে চূড়ান্ত অসন্তোষ। নিখিল বঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি আর এ-বি-টি-এ যুক্তফ্রন্ট সরকারের সমর্থনে যত মিছিলই সংগঠিত করুন না কেন, একটু খোঁজ নিলেই দেখা যাবে সেই সব মিছিলেও আজ ভিন্ন সুর উঠতে সুরু করেছে।

শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক দলবাজির অভিযোগ কোন কোন মহল থেকে করা হচ্ছে। এই অভিযোগের মধ্যেও আবার দলবাজি থাকতে পারে, কিন্তু একথা তো সত্য যে, শিক্ষাদপ্তর সম্পর্কে যুক্তফ্রন্টের দলগুলির সমালোচনা দিনের পর দিন তীব্রতর হয়ে উঠছে। অন্তত বিভিন্ন স্তরে শিক্ষা বিস্তার ও শিক্ষা পরিচালনায় ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে না। এখন পর্যন্ত সরকারের হাতে আনা কমিটিগুলোতে সর্বদলীয় প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা হচ্ছে না কেন?

পরিশেষে আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। শিক্ষকগণ শ্রদ্ধেয়। কিন্তু তাঁরা আমাদের এই সমাজের ঊর্ধ্বে নন। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে দুর্নীতি ছড়িয়ে রয়েছে, শিক্ষকরা তো তা থেকে মুক্ত নন। কাজেই বিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁদের সমস্ত অধিকার স্বীকার করে নিয়েও শিক্ষা সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সৎ ব্যক্তিদের স্থান অস্বীকার করার যে চেষ্টা চলছে, তা কি ভবিষ্যতে অকল্যাণই টেনে আনবে না? শিক্ষামন্ত্রী তথা যুক্তফ্রন্ট সরকার কি নতুন ব্যবস্থা প্রচলনের আগে এই বক্তব্যগুলো বিবেচনা করে দেখবেন?

—শ্রীসর্বদর্শী

কিস্তিতে ট্রানজিস্টার
BAZA
৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড
পোর্টেবল ট্রানজিস্টর মাসিক ৫ টাকা কিস্তিতে। প্রত্যেক গ্রাম ও শহরে পাওয়া যাইতে পারে।
HIND AGENCIES (57) KOLHAPUR ROAD, DELHI-7

দি মহাভারত: ব্যাসদেবের মূল সংস্কৃত রচনার অনুবাদ : অধ্যাপক পি লাল : ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬ এবং ৭ খণ্ড : রাইটার্স ওয়ার্কশপ, ১৬২/৯২, লেক গার্ডেন্স, কলিকাতা-৪৫ : ১২ খণ্ডের মূল্য : ৫০ টাকা।

মহাভারতের ইংরাজি অনুবাদ বহুবার প্রকাশিত হয়েছে। অধ্যাপক পি লাল সেই দীর্ঘ তালিকায় আরেকটি নতুন সংস্করণ সংযোজন করছেন। করছেন কথাটি ব্যবহার করা হল এই কারণে যে, এ অবধি যে ক'টি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে তা ভারতবর্ষের এক অনুপম মহাকাব্যের অংশবিশেষ মাত্র। অধ্যাপক লাল স্থির করেছেন যে, আগামী দশ বছর ধরে প্রতি মাসে একটি করে খণ্ড প্রকাশ করবেন। এ কাজ অব্যাহত থাকলে গোটা মহাভারতখানি হবে দশ বছর পরে।

সব ভাষারই কতকগুলি স্বকীয় ধ্বনি উচ্চারণা আছে। তার থেকেই তার স্বরূপ চেনা যায়। সংস্কৃত ভাষার সংহতিগুণে এবং সংস্কৃত শ্লোকের ধ্বনিমাধুর্যে কবির যে বক্তব্য পাঠকের চিত্তে সহজে মুদ্রিত হয়ে যায় ইংরাজিতে অনুবাদ করতে গেলে তা নিতান্ত নির্জীব হয়ে পড়ে। কারণ দুটি ভাষার ইডিয়াম একেবারে আলাদা। তাই মহাভারতের যে কোন ইংরাজি অনুবাদ পড়েই মনে হয় এ দেশের অতুলনীয় এই প্রাচীন সাহিত্যের মূল সুরটি যেন কিছুটা ক্ষুন্ন হয়েছে। অধ্যাপক লাল নিজেও সে বিষয়ে সচেতন। কিন্তু এই দুরূহ কাজটি হাতে নিয়ে তিনি যা লিখেছেন তা সত্যিই প্রশংসনীয়। সার্থক ইংরাজি রচনার বেশ কিছু নিদর্শন তাঁর এই গ্রন্থে দেখতে পেলাম। উদাহরণ হিসাবে একটি তুলে দিচ্ছি :

There is a wheel;/It has seven hundred and twenty spokes,/which are days and nights./Its hub is one year/ Its circumference is unending./The wheel is full of delusion/The wheel does not decay.

প্রথম তিনটি খণ্ড সাধারণভাবে টাইপের সাহায্যে মুদ্রণ করা হয়েছে। চতুর্থ খণ্ড থেকে বাকিগুলি লেখকের পাণ্ডুলিপি থেকে প্লেট তৈরি করে ছেপে দেওয়া হয়েছে। টাইপোগ্রাফির বিচারে এমন না হলেই ভাল হত। কারণ লেখকের সুন্দর হস্তাক্ষরের চেয়েও সমস্ত জিনিসটি টাইপে ছাপা হলে পাঠকের অনেক বেশি সুবিধা হত।

প্রথম খণ্ডটি—The Anukramanika in the Adi Parva; দ্বিতীয়টি—The Parva-Sangraha in the Adi Parva; তৃতীয়টি—The Pausya in the Adi Parva; চতুর্থটি—The Pauloma in the Adi Parva; পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম খণ্ডে রয়েছে—The Astika in the Adi Parva. ইংরাজি ভাষার পাঠকেরা এই গ্রন্থটি পাঠ করে বিশেষ তৃপ্তি বোধ করবেন বলেই আমরা মনে করি।

অধ্যাপক পি লালের অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থ : Sanskrit Love Lyrics—Rs. 6; The Avyakta Upanishad—Rs. 10; The Gita Govinda of Joyadeva—Rs. 12 : দি রাইটার্স ওয়ার্কশপ, ১৬২/৯২, লেক গার্ডেন্স, কলিকাতা-৪৫।

সংস্কৃত প্রেমের কবিতা ইংরাজি অনুবাদ করতে গেলে কাব্যধ্বনিময় গদ্য ছাড়া তার গাম্ভীর্য ও রস রক্ষা করা সহজ নয়। তবে ছোট ছোট কবিতা অনুবাদের মাধ্যমে মূল কবিতার ভাবটি মোটামুটি বজায় রাখতে পারে। অধ্যাপক লালের গীত গোবিন্দের অনুবাদের তুলনায় সংস্কৃত প্রেমের কবিতাগুলি সেই কারণেই আরো উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। The Avyakta Upanishad; বিষ্ণুর নৃসিংহ অবতারের উদ্দেশ্যে নিবেদিত অব্যক্ত উপনিষদের এটিই প্রথম ইংরাজি সংস্করণ। এটিতে অধ্যাপক লালের ইংরাজি ভাষায় মুন্সীয়ানা আপনিই চোখে পড়ে।

মহানগরীর রাণী : উপন্যাস : সুকুমার রায় : চক্রবর্তী এন্ড কোং : ১২নং শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ মূল্য—দশ টাকা।

কলকাতার বিশেষ অঞ্চলের চেনা-জানা বাস্তব চরিত্র নিয়ে মহানগরীর রাণী একটি সার্থক উপন্যাস। কিছু কিছু সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসে দেখা যায়, সাধারণত নারীচরিত্র মহানগরীর জীবনসংগ্রামের বিপাকে ব্যক্তিসত্তাকে বিসর্জন করে। কিন্তু বাস্তব জীবনে বহুক্ষেত্রেই স্পষ্ট দেখা যায় যে, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে পড়েও মেয়েরা কলকাতায় সংসারকে দাঁড় করিয়ে রাখে অথবা বিনাশের পথে প্রবল প্রতিরোধ জানায়। এই উপন্যাসের রাণী চরিত্রটি ব্যক্তিত্ব বিনাশের সীমানায় এসে শেষ পর্যন্ত আদালতের সামনে দাঁড়াল। কিন্তু নিজেকে বিসর্জন দিল কি? সংক্ষেপে; রাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে এল শিক্ষকতার পথে। ছেলেবেলায় অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল তরুণ নিঃস্বার্থ প্রাইভেট টিউটার মণিময়। মণিময়ের সংগে একটা মানসিক যোগ রইল কিন্তু প্রত্যক্ষে তা দানা বাঁধলো না। পাড়ার এডভোকেট সহদেব ছাত্রজীবন থেকেই নানা কৌশলে রাণীকে অধিকার করতে চেয়েছে। তখন; কয়েকটি বছরে শিক্ষা সম্বন্ধে নানান প্ল্যান চালু হচ্ছে কিন্তু শিক্ষক জীবনের মান ও মর্যাদা বাড়ছে না। রাণী শিক্ষিকার জীবন ও বিদ্যালয়ের পরিবেশ নিয়ে বিশেষ ভাবছে, অন্যান্যের সংগে রাজপথে এসে বসেছে। বিদ্যালয়ের ওপরওয়ালার প্রতিকূল ব্যবহার, অভাব-অভিযোগ, মধ্যবিত্ত সংসারের নানা সমস্যা, মণিময়ের প্রতি প্রচ্ছন্ন প্রেম ও মণিময়ের মানসিক বিক্ষেপ, ইস্কুলের চাকরি ত্যাগ, এড্‌ভোকেট সহদেবের অবাঞ্ছিত কামনার টান ও কৌশল ইত্যাদি বহু বিচিত্র জটিলতার মুখে দাঁড়াল রাণী। কয়েকটি নারীচরিত্রও পাশাপাশি কন্ট্রাস্ট হিসেবে এসে দাঁড়াল। যদিও ঘটনা-সংঘাতে রাণীকে বিমূঢ় ও বিপর্যস্ত হতে হল কিন্তু আত্ম-বিলোপের সীমানায় সহদেবের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও; রাণী ব্যক্তিত্ব নিয়ে এসে দাঁড়ালো মণিময়ের কাছে। অবশ্য এজন্যে মূল্য দিতে হল অনেক এবং রাণী সমস্যামুক্ত হল না। এখানে চরিত্র ও পরিবেশ সৃষ্টিতে যে অভিনব বাস্তব সমীক্ষণ আছে তাতে উপন্যাসটিকে বিগত দশকের মূল্যবান চিত্র এবং শিক্ষিকা-জীবনের প্রতিরূপ বলা যায়। বিচিত্র চরিত্র, মন-সমীক্ষণ ও ঘটনাবৈচিত্র্য পাঠককে টেনে নিয়ে যায়।

চাঁদে নামলাম

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

"ধীরে ধীরে নামছি আমরা। ধীরে, খুব ধীরে নামছি। আমাদের ঈগলের পাখা দুটি চমৎকার। নিচে—১১০ কিলোমিটার নিচে ওই চাঁদ। বন্ধুর সে, পাথর-সমাকীর্ণ। তারই বিষুবরেখা বরাবর আমাদের ঈগল চলেছে। চাঁদকে প্রদক্ষিণ করছে সে। আমাদের থেকে খানিকটা দূরে চাঁদের এ্যাপনাইন পর্বত; 'অভ্রসাগর'-কে সাক্ষী করে সে দাঁড়িয়ে। একটির-পর-একটি দৃশ্য আসছে আমাদের সামনে। আসছে, সরে যাচ্ছে। ওই যে! 'শান্তসাগর'-ও এসে গেল দেখতে দেখতে।"

এ কথাগুলো অ্যাপোলো-১১-র অধিনায়ক আর্মস্ট্রং-এর। মূল মহাকাশযান কলাম্বিয়া থেকে বেরিয়ে চান্দ্রযান ঈগলে করে চাঁদে নামবার সময় পৃথিবীর উদ্দেশে এ কথাগুলো বলেছিলেন তিনি।

কিন্তু একটু আগেই কোথায় ছিল পৃথিবী! যখন চাঁদের ওপিঠে ছিলেন ও'রা, যখন ঈগলকে কলাম্বিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করেছিলেন, তখন পৃথিবীর সঙ্গে ও'দের এমন কি বেতার সংযোগও তো ছিল না।

হ্যাঁ, বেতার সংযোগ ছিল না তখন। সংযোগ হল এখুনি—এইমাত্র।

এইমাত্র পৃথিবীর নির্দেশ ভেসে এলো ও'দের কাছে,—"নিস্তরঙ্গ সাগরের তটভূমির দিকে ঈগলের মুখটি ঘুরিয়ে নাও। মনে রেখো, চাঁদের বিষুবরেখা বরাবর একটি অপ্রশস্ত সমতল স্থানে নামাতে হবে তাকে।"

"নামছি। নামছি আমরা",—আর্মস্ট্রং আবার বললেন।

ওদিকে মূল মহাকাশযানের চালক কলিন্স-ও চাঁদের এপিঠে এসে গেছেন এতক্ষণে। বলছেন, "ঈগল নামছে, হেলিকপ্টার যেমন করে মাটিতে নামে, পাখি যেমন করে সামান্য একটু কাত হয়ে মাটির দিকে ঝুঁকে পড়ে, ঠিক তেমনই নামছে, ...নামছে। এই তো আমি দেখতে পাচ্ছি। স্পষ্ট দেখছি আমি, বিদঘুটে কিম্ভূতকিমাকার চার ঠ্যাংওয়ালা ঈগল পাখিটা ওদের দু'জনকে নিয়ে সুন্দরভাবে নামছে।"

সুন্দর! সুন্দর! ......নভশ্চরদের চোখে চাঁদকে আর চাঁদের আকাশকে বড় সুন্দর মনে হচ্ছে এখন। বিরাট সূর্য এখন চাঁদের কোণাকুণি একেবারে। সূর্যের ঘনকৃষ্ণ ছায়া পড়ছে চাঁদের দেশে। সূর্যের এই ছায়ায় চাঁদ-অভিযাত্রীরা স্পষ্ট দেখছেন সবকিছু। চাঁদের পাহাড়-পর্বত দেখছেন। আর দেখছেন ভয়াবহ সব গহ্বরকে।

এই 'দেখা'-টা বড় জরুরী। দেখতে না পেলে চাঁদের দেশে ও'রা নামবেন কী করে! সম্ভাব্য বিপদ-আপদ থেকে কী করে আত্মরক্ষা করবেন।

আত্মরক্ষার সুবিধের জন্যেই, নিশ্চিন্ত-নির্বিঘ্ন অবতরণের জন্যেই নভোমণ্ডলে সূর্যের এই রকম অবস্থিতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চাঁদে-নামার সময় নির্দিষ্ট হয়েছে।

কিন্তু নামতে কি পারবেন ও'রা? —পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষের একই জিজ্ঞাসা।

একটু আগেই ও'রা পূব দিক থেকে এসে মলট্‌কে নামক বিরাট এক গহ্বরকে বামে রেখে এগিয়ে এলেন। গহ্বরটি ছিল শান্তসাগর থেকে ৩০ মাইল মাত্র দূরে।

এ ছাড়া শান্তসাগরের কাছেই আরও দুটি গহ্বর ছিল। উত্তর-পূর্ব দিকে ছিল সেবাইন ই আর সেবাইন ডি।

ওদেরও দেখতে দেখতে পেরিয়ে এলেন মহাকাশচারীরা। প্রায় ৩০০ ফুট উঁচু এক দীর্ঘ ও সরু পাহাড়ের চূড়ার ওপর দিয়ে ও'রা যেতে লাগলেন। এতক্ষণে শান্তসাগরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবতরণের জন্যে নির্দিষ্ট জায়গাটির খুব কাছাকাছি এসে গেছেন ও'রা। কিন্তু অবতরণ কি ওখানে করা যাবে? ওখানটা বড় বেশি অসমতল আর পাথর-আকীর্ণ যে!

আর্মস্ট্রং ভাবনায় পড়েন। চাঁদের মানচিত্র খুলে ধরেন সঙ্গে সঙ্গে। মোট ৯৭ খানা মানচিত্র সঙ্গে এনেছেন ও'রা। আমেরিকার জিওলজিক্যাল সার্ভে এগুলো ও'দের তৈরি করে দিয়েছেন।

এইসব মানচিত্রে নিখুঁতভাবে ধরা পড়েছে চাঁদের পিঠ। প্রতি ১ ইঞ্চি স্থান এখানে চাঁদের ৪০০ ফুট এলাকাকে বোঝাচ্ছে। এ ছাড়া যেসব পাথরের ব্যাস ২ বা ৩ ফুট সেগুলোও পরিষ্কারভাবে

ধরা পড়ছে এখানে। আর এদের মধ্যে ৫টিতে বিশেষভাবে ধরা পড়ছে চাঁদে অবতরণের উপযুক্ত জায়গাগুলো।

ওই জায়গাগুলোকে আবার দেখে নেন আর্মস্ট্রং। আবার মানচিত্র খোলেন।

না, নির্দিষ্ট জায়গা থেকে আরও খানিকটা দূরে নামতে হবে ওঁদের।

কিন্তু কোথায় ও'রা নামবেন? নামবার সময় যে ওদিকে এসে গেল।

আর্মস্ট্রং নিজে চান্দ্রযান ঈগলকে চালাতে থাকেন এবার; আর অলড্রিন বসেন মানচিত্র নিয়ে। মানচিত্রের পেছনেটাকেও মাঝে মাঝে দেখতে থাকেন তিনি। পেছনে লেখা ভূতাত্ত্বিক সংজ্ঞাগুলো বারবার পড়েন।

ওদিকে ঈগল এতক্ষণে অবতরণের জন্যে নির্দিষ্ট জায়গা থেকে ৪/৫ কিলোমিটার দূরে এসে গেছে। চাঁদের মাটি থেকে মাত্র ৪০ ফুট ওপরে এসে গেছে সে।

চাঁদে তখন ধুলো উড়ছিল খুব। ঈগলের আবির্ভাব-হেতুই উড়ছিল।

কিন্তু ঈগল হঠাৎ থমকে দাঁড়ায় যেন। অচেনা দেশে নামবার আগে একবার যেন সে পেছন ফিরে সবকিছু দেখে নেয়।

দু' মিনিট সব চুপচাপ। কোনো সংবাদ নেই পৃথিবীতে। আর্মস্ট্রং আর অলড্রিন ঈগলের ইঞ্জিন-পরীক্ষায় ব্যস্ত। যদি কোনো গোলমাল হয় তো এখনও ও'রা মূল মহাকাশযানে ফিরতে পারবেন।

কিন্তু না, কোনো গোলমাল হল না। পরীক্ষা করে জানা গেল, সব ঠিক আছে।

—ঠিক......ঠিক এগোচ্ছি আমরা, আর্মস্ট্রং জানালেন,—আমরা নামছি।

নামবার মুখে অলড্রিন ঈগলের গবাক্ষপথ দিয়ে তাকালেন একবার। বললেন, চারদিকে রঙ-বেরঙ-এর সব পাথর। কীভাবে তুমি তাকাচ্ছ, তার ওপর তাদের রঙ নির্ভর করছে। তবে পৃথিবীতে আমরা যেসব রঙ দেখে থাকি, তাদের সঙ্গে এসবের কোনো মিল নেই।

কিন্তু মিল-অমিল বেশিক্ষণ যেন চোখে পড়ে না। দেখতে দেখতে ধুলোর মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে যায় চারিদিক। আর আর্মস্ট্রং-এর মনে আসে অদ্ভুত সব কথা। মানব-ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা রোমাঞ্চকর ঘটনার নায়কদের কথা মনে আসে তাঁর।

ওদিকে ঈগল চাঁদের মাটিতে নামল এইমাত্র। মৃদু ধাক্কা থেকেই আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন-এর ঠাওর হল, ও'রা নেমেছেন।

হ্যাঁ, নেমেছেন ও'রা। ঠিক এই মুহূর্তে অভূতপূর্ব এক ইতিহাস ও'রা সৃষ্টি করেছেন।

আর্মস্ট্রং চান্দ্রযানের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকালেন এইবার। বললেন, —অদ্ভুত! অবাস্তব এক দৃশ্য আমার সামনে। পৃথিবীর ভাষা দিয়ে বর্ণনা চলে না এর। এ-দেশ গহ্বর আর পাথরে আকীর্ণ। দেখতে এ যেন মরুভূমির মতো।

অলড্রিন বললেন, যত রকমের পাথর থাকতে পারে, সব দেখছি। একদিক থেকে পাথরগুলোর যে রঙ দেখা যাচ্ছে, অন্যদিক থেকে দেখলে তা সম্পূর্ণ আলাদা।

আর্মস্ট্রংও জানালেন,—হ্যাঁ, আলাদা। এখানকার পরিবেশ পৃথিবীর থেকে একেবারেই আলাদা। এখানে চারিদিকে কেবলই খাদ আর শিলাখণ্ড। তাই নামবার উপযুক্ত স্থান বেছে নিতে একটু সময় লাগল। ......বোধ করি প্রায় একটি বেলা সময় লাগল। মাফ করবেন।

আর মাফ! পৃথিবীতে তখন হৈ-চৈ। হিউসটন থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, চাঁদে নামল মানুষ।

আর আমাদের দেশের মানুষরা জানল, ভারতীয় সময় ২১শে জুলাই-এর রাত্রি ঠিক ১টা ৪৭ মিনিটে চাঁদের 'শান্ত-সাগরে' নিখুঁতভাবে নামল অভিযাত্রীরা।

আর্মস্ট্রং জানালেন, নামতে ঝাঁকুনি লাগে নি মোটেই। চাঁদের অভিকর্ষের সঙ্গে তাল রাখতে মোটেই কষ্ট হয় নি।

হিউসটন থেকে জানানো হল,—এখানে এবং পৃথিবীর সর্বত্র এখন হাসি আর আনন্দ। ওদিকে মূল মহাকাশযানে করে চাঁদ-প্রদক্ষিণরত কলিন্স কথা বললেন এতক্ষণে,—ওপরে আর একজনের মুখেও হাসি। তাকে যেন বাদ দিও না।

আর্মস্ট্রং বললেন,—না, দেবো না বাদ। কিন্তু ভাই, একটা কথা। তুমি যেন ওপরের ওই ঘুরে-চলা ঘাঁটিটি ঠিক রেখো।

—রাখবো! রাখবো! —আশ্বস্ত করেন কলিন্স। আর ওদিকে আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন লেগে যান ঈগলের যন্ত্রপাতি পরীক্ষা করতে।

পরীক্ষার কাজটা ধীরে-সুস্থে চলে। কারণ, একটু ভুলচুক হলে রক্ষে নেই আর। ঈগল চাঁদের মাটি ছেড়ে আর উঠবে না। এবং অভিযাত্রীদেরও ভীষণ-সুন্দর চাঁদের দেশে নিশ্চিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা ছাড়া আর কোনো পথ খোলা থাকবে না। কলিন্স শত চেষ্টা করেও অ্যাপোলো-১১কে নিয়ে নামতে পারবেন না চাঁদের মাটিতে। আর পৃথিবীর মাটি থেকেও সাহায্য পাঠাবার কোনো পথ খোলা থাকবে না।

অতএব, ...ধীরে-সুস্থেই চলে কাজ। আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন চান্দ্রযানের অনেকগুলো খুঁটিনাটি জিনিস পরীক্ষা করেন।

পরীক্ষার পর বিশ্রাম নেবার পালা, ঘুমোবার পালা। কারণ, চাঁদে পায়চারি করার সময় দারুণ পরিশ্রম হবে অভিযাত্রীদের। মাটি সংগ্রহ, লেসার-স্থাপন ইত্যাদি কাজগুলো করবার সময়েও পরিশ্রম

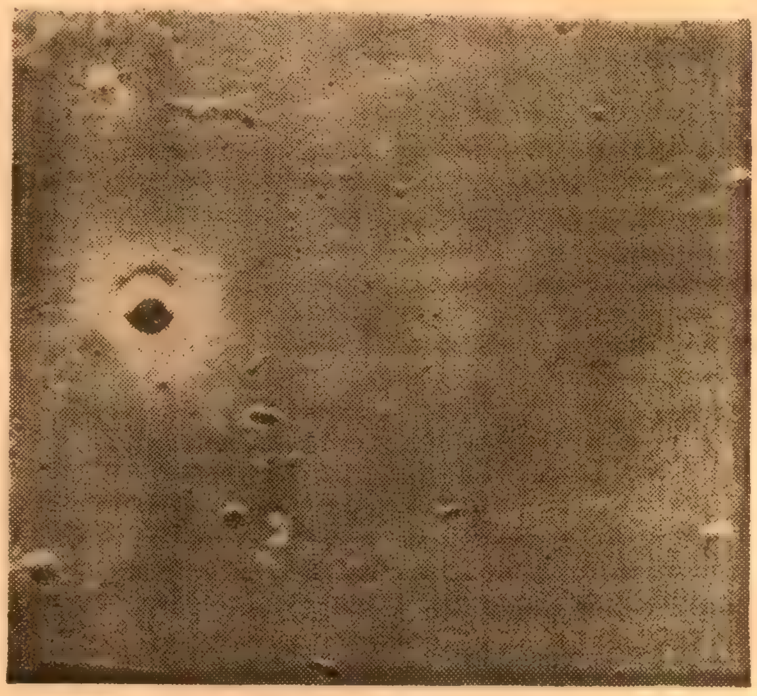

আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন-এর অবতরণস্থল চাঁদের শান্ত-সাগর এলাকা। ছবির ডানপাশের প্রায় মাঝামাঝি জায়গাটিতে ওঁরা অবতরণ করেন। বাঁ-পাশে মাঝখানে বিরাট গহ্বর 'মজট্কে'কে দেখা যাচ্ছে। আর গহ্বরটির খুব কাছেই দেখা যাচ্ছে সরু, দীর্ঘ একটা উচ্চভূমি।

দুরূহতর রকমের হবে। তাই উপযুক্ত পরিমাণ বিশ্রাম নিয়ে শরীরটাকে আগে থাকতেই তাজা রাখা দরকার।

বিশ্রাম নিলেন অভিযাত্রীরা। কিন্তু ঘুম আসতে একটু দেরি হল।

কী করে আসবে ঘুম। একে নতুন জগৎ, নতুন পরিবেশ; তার ওপর গত কয়েকদিন ধরে ঘটছে চমকপ্রদ সব ঘটনা। অদ্ভুত এক মহানাটক অভিনীত হচ্ছে যেন।

ওই নাটকেরই ছিটেফোঁটা একটু একটু করে ভেসে ওঠে অভিযাত্রীদের সামনে। যেন ও'রা দেখতে পান......

অ্যাপোলো-১১। কেপ কেনেডি। ঝকঝকে সাদা রকেট স্যাটার্ন-৫। হাজারখানেক লোক রকেটটাকে ঘিরে কাজ করছে।

১৫ই জুলাই, যাত্রার আগের দিনও কাজের বিরতি নেই। রকেট উড্ডয়নে পর্যায়-গণনার কাজ গতকাল রাত থেকে চূড়ান্ত স্তরে প্রবেশ করেছে এবং নির্দিষ্ট সময়ের ৯ ঘণ্টা আগে আগেই তা চলছে।

কিন্তু আজ মহাকাশচারীদের সবরকম কাজ থেকে বিরতি। আজ বিশ্রামের দিন ও'দের।

বিশ্রাম নেই ১৬ই জুলাই। আজ চাঁদের পথে যাত্রা-সুরু।

ওদিকে যথাসময়েই সুরু হয় যাত্রা। স্যাটার্ন-৫ রকেট সাদা ও কমলা রঙ-এর রাশি রাশি ধোঁয়া ছড়িয়ে আকাশে ওঠে। আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই 'ন্যাসা'-র কর্মকর্তাদের একজন বলে ওঠেন, সব ঠিক আছে।

আর্মস্ট্রং-ও জানান,—হাঁ, ঠিক আছে। ঠিক পথেই চলছি।

কিন্তু চলাটা বড় বেশি দ্রুত যেন। দেখতে দেখতে কোথা থেকে কোথায় চলে এলেন ও'রা। ফ্লোরিডা থেকে নিক্ষিপ্ত হবার মাত্র ১২ মিনিটের মধ্যে আফ্রিকার পূর্বাকাশে কক্ষপথে প্রবেশ করলেন। এই সময়ের মধ্যে অ্যাপোলো-১১ প্রথম পর্যায়ের রকেটটি ফেলে দেয় এবং প্রজ্বলিত করে দ্বিতীয় পর্যায়ের রকেট।

এই দ্বিতীয়ের দৌলতেই পৃথিবীর কক্ষপথে ২ ঘণ্টা ৩২ মিনিট অবস্থান করে সে। এবং তারপর তৃতীয় রকেটটি প্রজ্বলিত করে পৃথিবীর কক্ষ থেকে সে চাঁদের দিকে ছুটে চলে।

এবার দুরন্ত বেগে চলে অ্যাপোলো-১১। যাত্রার মাত্র ২০ ঘণ্টার মধ্যেই সে গিয়ে পৌঁছয় পৃথিবী থেকে ৮৮,২৯৯ মাইল দূরে। তার গতিবেগ তখন দাঁড়ায় সেকেণ্ডে ৫,৮৭৫ ফুট। এছাড়া, অন্য সব কিছুও চলে প্রায় পূর্ব-পরিকল্পনা-মাফিক।

শুধুমাত্র একটি ব্যাপারে অসুবিধে দেখা দেয় সামান্য। মহাকাশযানের অভ্যন্তরে হাইড্রোজেন-অক্সিজেনের ভারসাম্য রক্ষা করার অনুকূল কৃত্রিম আবহাওয়া-সৃষ্টির কাজ কিছুটা ব্যাহত হয়। কিন্তু হোক সে ব্যাহত। এ নিয়ে মহাকাশচারীরা ভাবছেন না খুব একটা। এটুকু যান্ত্রিক গোলযোগ সারিয়ে নেওয়া ওঁদের কাছে মোটেই কঠিন কাজ নয়।

কঠিন কাজ সত্যি বলতে কী অ্যাপোলো-১১কে ঠিকভাবে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া। ঠিকভাবে চাঁদের উপকূলে তাকে পৌঁছে দেওয়া।

হয়তো পৌঁছুবে সে ঠিক। আজ ১৮ই জুলাই। যাত্রার পর থেকে ২ দিনও পেরোয় নি এখনও। এরই মধ্যে দুই-তৃতীয়াংশ পথ সে অতিক্রম করেছে এবং মহাকাশচারীরাও ওঁদের কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছেন ঠিক পরিকল্পনা-মাফিক। ঘুমোচ্ছেন ওঁরা, খাওয়া-দাওয়া করছেন এবং পৃথিবীতে পাঠাচ্ছেন রঙীন টেলিভিশন-চিত্র। ১৮ই জুলাই অরিখে ওঁরা যখন ঘুমিয়েছেন, মহাকাশযানটি তখন বৃত্তাকার-পথে চাঁদের কক্ষপথের দিকে এগিয়ে গেছে।

ঘুম থেকে উঠেই পৃথিবীর কণ্ট্রোল-রুম থেকে ভেসে-আসা একজন কর্মকর্তার কণ্ঠস্বর স্পষ্ট শুনেছেন ওঁরা। শুনেছেন, তিনি বলছেন,—অ্যাপোলো-১১কে শনিবার, ১৯শে জুলাই ৬৯ মাইল উঁচুতে চাঁদের কক্ষপথে স্থাপন করতে আর কোনো সংশোধনের দরকার হবে না।

—কিন্তু তবু যন্ত্রপাতিগুলো একবার দেখে নেওয়া দরকার,—মহাকাশচারীরা বলাবলি করেন, মূল যান এবং চান্দ্রযান উভয়েরই পরীক্ষা করা দরকার আলাদাভাবে।

পরীক্ষা হল ঠিক। যান দুটির হল। আর হল তাপশূন্যতার, অক্সিজেনের এবং যোগাযোগ-ব্যবস্থার। এছাড়া স্থির-চিত্র, চলচ্চিত্র এবং টেলিভিশন-চিত্রের ক্যামেরাও পরীক্ষা করা হল বার বার।

অবশেষে ১৯শে জুলাই অ্যাপোলো-১১ চাঁদের চারিদিকে ঘোরা সুরু করল। চাঁদের আড়াল-করা দিকে থাকবার সময় চালু করা হল তার মূল ইঞ্জিনটি। মিল আর্মস্ট্রং ও এডুইন অলড্রিন-এর চান্দ্রযানে করে নামবার যাতে সুবিধে হয়, সেজন্য অ্যাপোলো-১১ চাঁদের দিকে কিছুটা নেমে গিয়ে ঘুরতে লাগল।

ঘোরবার সময় ৮ ঘণ্টা করে ঘুমিয়ে নিলেন মহাকাশচারীরা। ঘুম থেকে ওঠার আড়াই ঘণ্টা পরে প্রথমে অলড্রিন একটি টানেলের মধ্য দিয়ে হামাগুড়ি দিয়ে চান্দ্রযানে চলে গেলেন। ২৪ মিনিট পরে ঠিক এই একই পথ ধরে চান্দ্রযানে গেলেন অধিনায়ক আর্মস্ট্রং। এর মধ্যে মূলযানের এবং তার সঙ্গে লাগান চান্দ্রযানের ১১ বার চন্দ্র-পরিক্রমা শেষ হয়েছে।

এদিকে পরিক্রমা অবিরাম এখনও চলে। আর চলে পরীক্ষা। আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন চান্দ্রযান ঈগলের যন্ত্রপাতিগুলো পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করেন।

এই পরীক্ষার সঙ্গে অভিযাত্রীদের জয়-পরাজয় আর জীবন-মরণের প্রশ্ন জড়িত। কারণ, এই চান্দ্রযান একটু পরেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে মূল যানটি থেকে; এবং এ একবার খারাপ হলে আর ফেরা যাবে না পৃথিবীতে।

কিন্তু পৃথিবীতেও কি ব্যস্ততা কম। কত শত বিজ্ঞানী, ইঞ্জিনীয়ার আর চিকিৎসক উৎকণ্ঠিত হয়ে বসে আছেন।

এ জন্য চীফ মেডিক্যাল অফিসার ডাঃ চার্লস বেরীও আছেন বসে। তাঁর সহকর্মীরা মহাকাশচারীদের হৃদ্‌স্পন্দন, রক্তচাপ এবং স্থিরতা মাপছেন। কার্ডিওগ্রাফ নিচ্ছেন।

—ঠিক আছে সব, রায় দিলেন চিকিৎসকরা। বললেন, এগিয়ে চলো এবার।

—এগোচ্ছি, বললেন মহাকাশচারীদের একজন; এবং সঙ্গে সঙ্গেই ১২টি স্প্রিংকলিন খুলে দেওয়া মাত্র চান্দ্রযান মূল যান থেকে আলাদা হয়ে গেল।

ওদিকে আগেই চাঁদের কক্ষপথে ১২ বার পরিক্রমা শেষ হলে আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন সুইচ টিপেছিলেন একটা; এবং তাতেই মূল যানের সঙ্গে যুক্ত চান্দ্রযানের পাগুলো প্রসারিত হয়েছিল।

চান্দ্রযানের চারটি পা ৮ ফুট করে লম্বা। প্রতিটি পায়ের নিচে ৩৭ ইঞ্চি ব্যাসের প্যাড। প্যাডের নিচে আবার ৫ ফুট করে লম্বা শলাকা। এই শলাকারা মাটিতে প্রবেশ করার সময় অভিযাত্রীরা চাঁদে-নামার মুহূর্তটি উপলব্ধি করতে পারবেন।

নামবার সময় চান্দ্রযান ঈগলের গতি কমে যাবে খুব। সেকেণ্ডে হবে মাত্র ১০ ফুট। আর চাঁদের মাটি ছোঁবার সময় তা আরও কমে গিয়ে সেকেণ্ডে মাত্র ৩ ফুটে দাঁড়াবে।

কিন্তু সত্যি কি তাই দাঁড়িয়েছিল? চাঁদের দেশে পৌঁছে যদুবার উদ্যোগ

রাণী ধূপ
কাকার প্রডাক্টস

আয়োজনে ব্যস্ত মহাকাশচারীরা অলক ক্ষণেও তা' আর মনে আনতে পারেন না।

বরং ওঁদের মনে আসে অন্য সব কথা। কন্ট্রোল-রুমের সাবধান-বাণীটা মনে আসে বার বার।

—চাঁদের মাধ্যাকর্ষণ কিন্তু পৃথিবীর ৬ ভাগের ১ ভাগ। মনে রেখো। ওখানে পা ফেলতে হবে হিসেব করে, মনে রেখো। লাফ-ঝাঁপ দেবে না ওখানে, মনে রেখো। তোমাদের নাড়ীর স্পন্দন প্রতি মুহূর্তে আমরা দেখবো, মনে রেখো। চাঁদের দেশে কোনোরকম তাড়াহুড়ো চলবে না কিন্তু, মনে রেখো।

ওদিকে চীফ মেডিক্যাল অফিসার ডঃ বরী প্রয়োজনের তুলনায় কথা একটু বেশি বলেন। মানুষের চাঁদে পদার্পণের খানিকক্ষণ আগে সমবেত সাংবাদিকদেরও তিনি কতকগুলো কথা মনে রাখিয়ে তবে ছাড়লেন।

—বুঝলেন কি না,—তিনি বললেন, চাঁদের দেশে কাজের তুলনায় ক্লান্তি খুব বেশি হবে। এমন কি চাঁদের পোশাকটিও ক্লান্তিকর মনে হতে পারে। অভিযাত্রী-দের হৃদ্‌স্পন্দন, রক্তের চাপ ইত্যাদি বেড়ে যেতে পারে। অতএব, বিপদ-সংকেত দেওয়া মাত্র চলে আসতে বলা হয়েছে ওদের।

কিন্তু সংকেতের প্রশ্নটা কেন উঠল, তা' বুঝলেন কি?—উঠল মহাকাশচারী-দেরই মঙ্গলের জন্যে।

অর্থাৎ কি না, চাঁদের দেশে নেমে যত হাত-পা নাড়বেন ওঁরা, ততবারই ও'দের শক্তি প্রয়োগ করতে হবে পোশাকের ভেতর-কার চাপের বিরুদ্ধে। ওঁরা ওখানে হাঁটু গেড়ে বসতে পারবেন না কিন্তু, হাত তুলে নিজেদের মাথাও ধরতে পারবেন না। এমন কি কপাল অবধি হাত তুলতে গেলেও ওঁদের দেহের প্রায় সবটুকু শক্তি খরচ হয়ে যাবে। তাই চাঁদে পায়চারি সুরু করার আগে চান্দ্রযানে বসে ৮—১০ ঘন্টা করে ওঁদের ঘুমিয়ে নিতে বলেছি।...কিন্তু আমস্ট্রং নাছোড়বন্দা। একটু আগেই ও কী বললো জানেন?...বললো যে,—নতুন দেশে এতক্ষণ ঘুমুবো কী করে? তার চেয়ে খানিকক্ষণ আগেই যদি...। আমি বাধা দিলুম। বললুম যে,—নেমে পড়ার মতলব তো?...না বাপু, সেটি চলবে না। বড় জোর একটু-আধটু আগে নামতে পারো। কিন্তু খানিকক্ষণ আগে নয়।...কেন নয়? না তোমার কাছে মাপা অক্সিজেন থাকবে যে! চাঁদের মাটিতে বেশি আগে নেমে বেশিক্ষণ পায়চারি করলে পরিশ্রমের মাত্রাধিক্যহেতু সে অক্সিজেন খরচ হয়ে যাবে যে!...কেন ভুলে যাচ্ছে যে, চাঁদে পায়চারি করার কাজটা ঠিক সুইমিং-পুলের জলের তলা দিয়ে হেঁটে বেড়ানোর মতো কঠিন।

—কঠিন। সত্যি কঠিন!—আর্মস্ট্রং ও অলড্রিনও স্বীকার করেন; এবং শেষ পর্যন্ত কয়েক ঘণ্টা করে ঘুমিয়ে নেন ওঁরা।

ঘুম থেকে ওঠবার খানিক পরেই ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে সেই চরম মুহূর্ত। মহাকাশচারীরা চান্দ্রযান ঈগলের দরজার সামনে এসে দাঁড়ান। দরজা খোলার ঠিক আগে শেষবারের মতো সব কিছু পরীক্ষা করে নেন আর্মস্ট্রং। তারপর মই বেয়ে অতি সন্তর্পণে নামতে সুরু করেন। একটি টেলিভিশন ক্যামেরা ছবি তুলতে থাকে তাঁর। এবং তাঁকে নামতে দেখা যায় হামাগুড়ি দেবার মতো করে।

—আমি ঠিক ঠিক নামছি তো?—একবার অলড্রিনকে জিজ্ঞাসা করেন তিনি।

অলড্রিন চান্দ্রযানের ভেতর থেকে জবাব দেন,—আপনি খুব সুন্দরভাবে নামছেন।

ঠিক। ঠিক। সুন্দরভাবেই নামছেন আর্মস্ট্রং। কিন্তু সে সৌন্দর্য পৃথিবীর টেলিভিশন-দর্শকের চোখে পুরোপুরি ধরা পড়ে না। ওঁরা দেখেন, আর্মস্ট্রং-এর পা দু'টো যেন ভেসে বেড়াচ্ছে। যেন তিনি মইটিকে হাতড়ে বেড়াচ্ছেন।

—কিন্তু হাতড়ানোর পর্বটা বেশিক্ষণ চলে না বুঝি! ইতিহাস বুঝি যে কোনো মুহূর্তে রচিত হয়!—রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা করতে করতে ওঁরা ভাবেন। ওদিকে আর্মস্ট্রং চান্দ্রযানের মইয়ের একেবারে শেষ ধাপে পা রাখার আগে কিছুক্ষণের জন্যে থমকে দাঁড়ান। চাঁদের অভিকর্ষটা বুঝে নেবার চেষ্টা করেন। এবং তারপরেই ঈগলের একেবারে শেষপ্রান্তে চলে আসেন। পিরিচের মতো তার যে চারটি পদাবরণ তৈরি করা হয়েছিল, তারই একটির ওপর নামেন। এবং তাপরেই......

ঠিক তারপরেই নতুন ইতিহাস। আর্মস্ট্রংকে বলতে শোনা যায়,—সুন্দর, সুন্দর! সত্যি সুন্দর! তাই না?

হাউস্টন-এর কর্মকর্তাদের মুখ দিয়ে কথা বেরোয় না। সত্যিই তো! এর জবাবে কী-ই বা বলবেন ওঁরা। ওদিকে চাঁদ থেকে কথা বলছেন আর্মস্ট্রং,—সব ঠিক আছে, হাউস্টন, আমি নেমে পড়েছি।

হ্যাঁ, সত্যি নেমেছেন তিনি। ক্যামেরায় স্পষ্ট ধরা পড়ে, চাঁদের মাটিতে তাঁর বাঁ পা বসে যাচ্ছে। চাঁদে যখন তিনি নামলেন, এতকালের চেনা পৃথিবীটা তখন ঠিক তাঁর মাথার ওপরে। আর ওই পৃথিবীরই একটি দেশ ভারতবর্ষের ঘড়িতে তখন ২১শে জুলাইয়ের সকাল ৮টা বেজে ২৬ মিনিট ২০ সেকেন্ড।

পৃথিবীমুখী চাঁদ—অভিযাত্রীরা দূর থেকে চাঁদকে এই রকম দেখেন।

ওদিকে চাঁদের মাটিতে প্রথম পদক্ষেপের সংগে সংগেই আর্মস্ট্রং ঘোষণা করলেন,—চাঁদের বুকে একটি পদক্ষেপ, মানবজাতির অগ্রগতির পথে এক বিরাট পদক্ষেপ।

—কিন্তু পদক্ষেপের জায়গাটা কেমন?—কণ্ট্রোল-রুম থেকে জিজ্ঞাসা ভেসে আসে।

আর্মস্ট্রং জানান,—সূক্ষ্ম বালুকণায় ভরা। এখানে হাঁটতে কোনো অসুবিধে নেই। আমরা এখানকার সমতলভূমিতে আছি। এখানে নিরন্ধ্র অন্ধকার এখন। তাই কোথায় যে পা ফেলছি, তা' ঠিক জানি না। তবে ঈগলের দিকে তাকিয়ে সব কিছুই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আমি।

—পরিষ্কার! পরিষ্কার! খানিক বাদেই আর্মস্ট্রংকে বলতে শোনা যায়,—চাঁদের মাটি ও পাথর এখন পরিষ্কার চোখে পড়ছে। সূর্যের আলোয় এখন ঝলমল করছে সেগুলো।

ওদিকে ঝলমল করে ওঠে আর্মস্ট্রং-এর সাদা পোশাকও। তাঁকে দেখা যায়, ক্যাঙারুর মতো ধীরপদে চলাফেরা করতে। আর দেখা যায়, চাঁদের বুক থেকে সামান্য ধুলো তুলে তাঁর পোশাকের পকেটে রাখতে।

অবশ্য ধুলো তোলবার আগে মাঝে মাঝেই তিনি চান্দ্রযান ঈগলের দিকে আসছিলেন। নানারকমের কাজ সেরে নিচ্ছিলেন।

এই সময়ে একবার তাঁকে বলতে শোনা যায়,—প্রথমটায় চাঁদের ধূসর মাটিতে আমার পা ১ কি ২ ইঞ্চি পরিমাণ বসে যাবার উপক্রম হয়েছিল। তবে এখন আর কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। এখন বুঝতে পারছি, চাঁদের দেশটা আসলে পশ্চিম আমেরিকার ধূসর মরুভূমির মতো দেখতে।

—মরুভূমিটা বিরাট মনে হচ্ছে কি খুব?—কণ্ট্রোল-রুম থেকে প্রশ্ন করা হয় একবার। আর্মস্ট্রং জানান,—না, খুব একটা বিরাট মনে হচ্ছে না। আমাদের অবতরণক্ষেত্রটাকে মনে হচ্ছে বড়সড় গোছের একটা ফুটবল মাঠের মতো। তবে খুব সুন্দর মাঠ। এর একটা নিজস্ব সৌন্দর্য আছে।

কিন্তু চাঁদের সৌন্দর্যের ধরণ-ধারণ যে পৃথিবীর থেকে একেবারে আলাদা, তা' বোঝা গেল আর্মস্ট্রং-এর পরবর্তী কথাগুলো থেকে।

—ভারি মজার ব্যাপার!—হঠাৎ বললেন তিনি,—মনে হল, চাঁদের মাটি খুব নরম। কিন্তু আমি যখন নমুনা নেবো বলে তা' খুঁড়ছি, তখন মনে হল, ওই একই মাটি যেন বেশ শক্ত; আর যেন বেশ আঠালো।...কিন্তু চাঁদের একেবারে ওপরটায় মাটি তো নেই ঠিক। আছে অতি সূক্ষ্ম সব বালুকণা, পাউডারের মতো সূক্ষ্ম ধুলো। সেই ধুলোকে জুতোর ডগা দিয়ে সহজেই খুঁড়তে পারছি আমি। ...তবে চাঁদের মাটির দিকে ঝুঁকে পাথর কুড়োতে আমার কিন্তু বেশ কষ্ট হচ্ছে।

ওদিকে আর্মস্ট্রং-এর কণ্টের সংগী অলড্রিনও এগিয়ে আসেন দেখতে দেখতে। ঈগলের মই বেয়ে তিনি চাঁদের দেশে নামতে সুরু করেন।

আর্মস্ট্রং তখন তাঁর ক্যামেরা নিয়ে তৈরি। অলড্রিন-এর ছবি তুলতে তুলতেই তাঁকে তখন তিনি নানারকম নির্দেশ দিচ্ছিলেন।

অলড্রিন তন্ময় হয়ে শুনছিলেন সে নির্দেশ; এবং শুনতে শুনতেই এক শুভ মুহূর্তে, আর্মস্ট্রং-এর নেমে আসার ঠিক ২০ মিনিট পরে চাঁদের মাটিতে পা দিয়েছিলেন তিনি।

চাঁদে পা দিয়ে প্রথমেই তিনি বলেছিলেন,—এমন দৃশ্য আমি জীবনে দেখি নি। আমি সত্যি অভিভূত।...আর বলেছিলেন,—বালুকাময় চাঁদের পিঠের পাথরগুলো স্যাঁৎসেঁতে, দেখতে ভিজে ভিজে।

এবার ওই স্যাঁৎসেঁতে, ভিজে ভিজে পাথরের ওপর দিয়েই হাঁটতে লাগলেন দুই চন্দ্র-পথিক। ওঁরা একে অপরকে নিজ নিজ অনুভূতির কথা জানালেন। গল্পগুজব করলেন। চাঁদের ধূসর মাটিতে ওঁদের বুটের ছাপ দেখতে পেলেন। এবং এসব কিছুর চেয়েও বড় কথা, ওঁরা সংগ্রহ করলেন চাঁদের কিছু ধুলো আর পাথর। চাঁদের দেশে স্থাপন করলেন কম্পননির্ধারক যন্ত্র। একবার আর্মস্ট্রং যখন কথা বলছিলেন, তখন তাঁর জুতো তারে আটকে যায়। সহযাত্রী অলড্রিন তৎক্ষণাৎ তাঁকে জুতোটা ছাড়িয়ে নিতে বলেন।

জুতো ছাড়াতে কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগল। আর্মস্ট্রং বললেন,—আমার জুতোর রঙ্ বোঝা যাচ্ছে না। ধূসর বালুতে সব একেবারে ঢেকে গেছে।

অলড্রিন ১ ঘণ্টা ৫৪ মিনিট চাঁদভ্রমণের পর ঈগলে ফিরে আসেন। আর আর্মস্ট্রং ফেরেন আরও খানিকক্ষণ পরে, নির্দিষ্ট সময়ের চেয়েও ১৫ মিনিট বাদে। অর্থাৎ, মোট ২ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট চাঁদের মাটিতে পদচারণা করেন তিনি।

পদচারণা সেরে ঈগলে ফেরার সময় বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল তাঁকে। এছাড়া, ফেরার আগে চাঁদের মাটিতে তিনি যখন একটি ফলক স্থাপন করেন, তখনও তাঁকে বেশ পরিশ্রান্ত মনে হচ্ছিল।

ওই ফলকটিতে লেখা ছিলঃ—

জুলাই ১৯৬৯ সালে পৃথিবীর মানুষ এখানে প্রথম পদার্পণ করে। আমরা সমগ্র মানবজাতির শান্তির উদ্দেশ্যে এখানে এসেছিলাম।

ওদিকে চান্দ্রযানে ফিরে আসার পর বিশ্রাম নিলেন দুই চন্দ্র পথিক। খাওয়া-দাওয়া সেরে খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিলেন।

দেখতে দেখতে যাবার সময় হয়ে এলো। যাবার ঠিক আগের মুহূর্তে অলড্রিন-এর কণ্ঠস্বর শোনাল খুব শান্ত।

তিনি গুণে চললেন,—নয়, আট, সাত, ছয়......এগোও......চমৎকার!...সব কিছুই ভালো মনে হচ্ছে।

—ভালোই বটে,—পৃথিবীর কন্ট্রোল-রুম থেকেও ঠিক এই একই কথা উচ্চারিত হল; এবং প্রায় সংগে সংগেই ২১শে জুলাই ভারতীয় সময় রাত ১১টা ২৪ মিনিটে দুই মহাকাশচারী চান্দ্রযানের ইঞ্জিন চালু করলেন।

চান্দ্রযান ঈগল এবার চাঁদের মাটি ছেড়ে উঠল। ৬৯ মাইল দূরে দিয়ে চাঁদকে প্রদক্ষিণরত মূল মহাকাশযানের দিকে যাত্রা করল।

ওই মহাকাশযানে রয়েছেন মাইকেল কলিন্স। ঈগলের যাত্রা-মুহূর্তে চাঁদের শান্তসাগর থেকে ৬৯ মাইল ওপর দিয়ে উড়ে চলেছেন তিনি।

তিনি শান্তসাগর এলাকাকে পেরিয়ে যাবার ঠিক ৬৯ সেকেণ্ড পরে ঈগল চাঁদের বুক ছেড়ে উঠতে সুরু করে। ঈগলের নিচের অংশ পড়ে থাকে চাঁদের দেশে।

এছাড়া, আরও অনেক কিছুই পড়ে থাকে। চাঁদে-নামার পোশাক, ক্যামেরা, বিভিন্ন যন্ত্রপাতি এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের জিনিসপত্র সমেত প্রায় ১০ লক্ষ ডলার দামের দ্রব্য চাঁদের মাটিতে ফেলে আসা হয়।

ওদিকে ঈগল উঠছে আকাশে। ধীরে ধীরে উঠছে। চাঁদ থেকে সে যখন মাত্র ৫০ ফুট ওপরে তখন আর্মস্ট্রং চেঁচিয়ে ওঠেন,—ঈশ্বর! কী সুন্দর!

খাড়া ওঠবার সময় আর্মস্ট্রং-এর নাড়ীর স্পন্দন ৯৪-এ দাঁড়িয়ে পড়ল। আর অলড্রিন-এর উঠল ১২০ অবধি। অবশ্য কয়েক মিনিট পর তাঁর নাড়ীর স্পন্দন ৮৫তে নেমে এলো।

আর্মস্ট্রং বললেন, বেশ আরামেই চলেছি।...এবং তারপর তাঁকে বলতে শোনা গেল, সোজা আমেরিকার দিকে চলেছি।

মিথ্যে নয় কথাটা। সোজাই চলেছেন ওঁরা। ঈগল নির্ভুলভাবে যাত্রা সুরু করেছে। এবং যাত্রার মাত্র ৭ মিনিট পরেই ভারতীয় সময় রাত ১১টা ৩১ মিনিটে সে চন্দ্র-প্রদক্ষিণকক্ষে স্থাপিত হয়েছে।

চাঁদ ! হুঁসিয়ার !...

রাণী দেবী

প্রিয়ার মুখ নয়, ঝলসানো রুটি নয়, এমন কি চাষীর হাতের মাটি আর কাদা মাখা বাঁকাচোরা কাস্তেটিও নয়

এ কোন্ চাঁদ, হাততালির জন্য দিব্যি মুখখানা রঙচঙ্ ক'রে এসেছে। অথচ রঙের ছিটেফোঁটাও নেই তার মধ্যে; সবটাই বাজার থেকে ধার ক'রে আনা, অর্থাৎ কিনা সবটাই ভেজাল

আর লোকঠকানো রসিকতা; যদিও রাত ফুরুলে রোজই অমাবস্যা। অথচ কয়েক হাজার বছর ধ'রে কেমন সার্কাসের ক্লাউনের মতো একটার পর একটা খেলা দেখিয়ে কবিদের দিয়ে কবিতা লিখিয়েছে; পুরুতদের দিয়ে ডিটেকটিভ নভেলের চেয়েও আশ্চর্য সব কথকতা পাঠ করিয়েছে; মেয়েদের চোখে যখন তখন বিরহের মেঘ, মেঘ থেকে বৃষ্টি নামিয়েছে; আর প্রস্তর যুগ থেকেই বীট, হাংরী, হিপিদের দিয়ে যা-সব কীর্তি করিয়েছে তা লিখতে গেলে মহাভারত

আর শুধু কি তাই? কোনো গুণ নেই, তার কপালে আগুন কত্তো? এখনো নদীতে জোয়ার-ভাঁটা আনে কে? ঐ যে, রকে ব'সে আছে, সেই মস্তান চাঁদ! কে সাঁওতাল-ওঁরাওদের, এশিয়ার হাজার হাজার বোকা ছেলেমেয়েদের, হাততালি দিয়ে নাচায় (আর অমনি চারদিক থেকে ঢাক বাজে, মাদল কাঁসর ঘণ্টা আর কত সব বাদ্য বাজে)?— সে-ও একটিই বাহাদুর চাঁদ। অথচ তার নিজের কোন্ বিদ্যেটা আছে? গাইতে জানে না, নাচতে জানে না

তাই, এবার সুযোগ এসেছে, তার সব্বল জারিজুরি ভেঙে দেবার। বিশেষ ক'রে কবিদের সঙ্গে ইয়ার্কি—কী বোকাটাই বানিয়েছে আমাদের! এবার তবে প্রতিশোধ নেবার পালা। হুঁসিয়ার, চাঁদ! হুঁসিয়ার!...

চাঁদ থেকে ঈগল তখন ১৬ কিলোমিটারেরও কিছু বেশি দূরে। এইভাবে চাঁদের চারদিকে পাক খেতে খেতে মূল মহাকাশযান কলাম্বিয়াকে অনুসরণ করল সে। ধীরে ধীরে ওপরে উঠল। এবং অবশেষে মাইকেল কলিন্স পরিচালিত কলাম্বিয়ার সঙ্গে সে যখন মিলিত হল ভারতের ঘড়িতে তখন ২২শে জুলাইয়ের রাত্রি ৩টে বেজে ৭ মিনিট।

ঈগলকে পরিত্যাগ করা হল শেষ অবধি। চাঁদেই সে আবার ফিরে গেল। ওদিকে মূল মহাকাশযানটি আবার শুরু করল চাঁদ-প্রদক্ষিণ; এবং ভারতীয় সময় ২২শে জুলাই সকাল ১০টা ২৭ মিনিটে সে আবার পৃথিবীমুখী হল। ঐ সময় রকেট-ইঞ্জিনটি কাজ করছিল পুরোদমে এবং চাঁদের অভিকর্ষ থেকে বেরিয়ে আসবার সময় তার গতিবেগ দাঁড়িয়েছিল ঘণ্টায় ৫,৭০০ মাইল।

এইবার নিশ্চিন্ত। তিনজন নভশ্চরই নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে নেন এবার। এবং ২২শে জুলাই ভারতীয় সময় সন্ধ্যে সাড়ে সাতটা নাগাদ চাঁদ থেকে ওঁদের দূরত্ব দাঁড়ায় ২৩ হাজার ৩০০ মাইল।

ওদিকে ওঁদের থেকে ২ লক্ষ মাইলেরও বেশি দূরে পৃথিবীতে জল্পনা-কল্পনা চলে তখন। চাঁদ-অভিযান থেকে কী লাভ হল, তা' নিয়ে চলে গবেষণা।

বিজ্ঞানীরা বলেন, চাঁদের যে ৫০ পাউন্ড মাটি নিয়ে অভিযাত্রীরা ঘরে ফিরে আসছেন, তা' চাঁদ ও পৃথিবীর জন্মরহস্য অনেকখানি উদ্ঘাটন করবে।

এছাড়া চাঁদের গহ্বরগুলোর রহস্যও এ থেকে উদ্ঘাটিত হতে পারে।

চাঁদের গহ্বর বা ক্রেটার সম্পর্কে নানারকম মতবাদ আছে। কেউ বলেন, উল্কার আঘাত থেকে সৃষ্টি হয়েছে ওগুলো। আবার কারও মতে, চাঁদের আভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়ার ফলেই ওদের সৃষ্টি।

এই সব সৃষ্টি-রহস্য ছাড়া আরও অনেক কিছু জানা যাবে চাঁদ-অভিযান থেকে। চাঁদের কম্পন জানা যাবে; আর জানা যাবে সঠিক দূরত্ব। অভিযাত্রীরা চাঁদে কম্পন-পরিমাপক যন্ত্র প্রোথিত করে এসেছেন। এছাড়া পৃথিবী থেকে চাঁদের সঠিক দূরত্ব-পরিমাপের ব্যবস্থাও করে এসেছেন ওঁরা।

এদিকে পৃথিবীতে যখন চলে এই গবেষণা, অভিযাত্রীরা তখন আরও খানিকটা এগিয়ে আসেন। ২২শে জুলাই ভারতীয় সময় রাত ১১টা ২৩ মিনিটে পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যবর্তী সম-অভিকর্ষ এলাকা অতিক্রম করেন ওঁরা। আর ২৩শে জুলাই ভারতীয় সময় বিকেল ৪টা ১৭ মিনিটে ওঁরা এসে পৌঁছন পৃথিবী থেকে প্রায় ১ লক্ষ ১৪ হাজার মাইল দূরে। অ্যাপোলো-১১-র গতিবেগ তখন ঘণ্টায় ৩,৩৫৪ মাইল।

নিখুঁতভাবে এগিয়ে আসে অ্যাপোলো। এত নিখুঁত যে, ২৩শে জুলাই রাতে ভারতীয় সময় ১১টা ২ মিনিটে তার গতিপথ সংশোধনের যে কর্মসূচী ছিল, তা' বাতিল করে দেওয়া হয়।

মাইকেল কলিন্স জানান, ঠিকই এগোচ্ছি আমরা। পৃথিবীর অভিকর্ষের দৌলতে আমাদের গতিবেগ ক্রমেই তীব্র হচ্ছে।

হ্যাঁ, তীব্র বেগেই ২৪শে জুলাই ভারতীয় সময় রাত ১০টা ৫ মিনিটে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে অ্যাপোলো-১১। প্রশান্ত মহাসাগরে অবতরণস্থলের দিকে সে এগিয়ে আসে।

আবহাওয়া খারাপ ছিল তখন। তাই পূর্বনির্দিষ্ট অবতরণস্থল থেকে প্রায় ২১৫ মাইল দূরে অ্যাপোলোর অবতরণের ব্যবস্থা হয়। এবং ঠিক ব্যবস্থামাফিকই হাওয়াই থেকে প্রায় ৯০০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে ভারতীয় সময় রাত ১০টা ১৯ মিনিটে প্রশান্ত মহাসাগরে অবতরণ করে সে। অবতরণের সময় মাথা নিচের দিকে ছিল তার; এবং বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ৮ দিনের এই ১৯৫ ঘণ্টা ১৮ মিনিট ২১ সেকেণ্ডব্যাপী অভিযানে এইটেই একমাত্র ত্রুটি।

ত্রুটি-সংশোধনে সময় লাগে না অবিশ্যি। মহাকাশযানটি উল্টে পড়ায় বহির্বিশ্বের সঙ্গে তার যোগাযোগ-স্থাপনে কয়েক মিনিট মাত্র দেরি হয়।

এখন তিনজন চাঁদ-অভিযাত্রী অন্তত ১৮ দিন ধরে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকবেন। চিকিৎসকরা ওঁদের পরীক্ষা করে দেখবেন, চাঁদ থেকে ও'রা কোনো রোগ-বীজাণু বহন করে এনেছেন কিনা।

এদিকে সবাই বলছেন, চাঁদে জীবাণু নেই হয়তো।...কিন্তু তবু সাবধান হতে দোষ কি! আমরাও ঠিক এই একই কথা বলি,—সাবধান হতে দোষ কি।...এবং সাবধান হলে বুদ্ধিমান, দুঃসাহসী ও দুরভিসারী মানুষ যে অসাধ্যসাধন করতে পারে, চাঁদ-অভিযানের সাফল্য থেকেই তো তা' প্রমাণিত হল।

দুই বাংলা : একজন কবি

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

কবি জসিমউদ্দীন কলকাতায় এসেছিলেন। এমন এক সময়ে যখন উভয় বাংলার কবি-সাহিত্যিকেরা পরস্পারের মুখ দেখেন না। এর কারণ অবশ্য এই নয় যে, তাঁদের মধ্যে ঝগড়া আছে। কারণ অন্যখানে, পাশপোর্ট আর ভিসার অভাব। কবি জসিমদ্দীন এদিক থেকে সৌভাগ্যবান এবং ভাগ্যের এই প্রসন্নতা তাঁর পশ্চিমবাংলা সফরকে এমন এক মহিমা দিয়েছে যা তাঁর জীবনে এবং উভয় বাংলার সাংস্কৃতিক বিনিময়ের ইতিহাসে বিরল ঘটনা।

কলকাতা এই বর্ষীয়ান কবি-কে অভূতপূর্ব সম্মান জানিয়েছে, যে-সম্মান আমাদের স্মরণকালের মধ্যে বাংলাদেশের কোন কবি বা শিল্পীকে পেতে দেখি নি। পশ্চিমবাংলার রাজধানী হয়তো তাঁকে প্রতীকের আশ্চর্য আলোয় আবিষ্কার করতে চেয়েছে। কার প্রতিক ?—পূর্ববাংলার জাগ্রত, সংগ্রামী জীবন-বেদের। একদা ভাষার জন্য এবং সম্প্রতি ফ্যাসিস্ট আয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে সেখানকার যুবশক্তি যে প্রতিরোধ-সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন, এবং আজো চালিয়ে যাচ্ছেন, স্বভাবতই কলকাতার কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরা সেই সংগ্রামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। এই সংগ্রামে কবি জসিমউদ্দীনের কোনো অংশ ছিল কি ছিল না তা নিয়ে তাঁদের উদ্বায়ু হওয়ার সময় এখনো আসে নি। অনেক দিন পর তাঁরা সুযোগ পেয়েছেন পূর্ববাংলার একজন প্রবীণ কবির কাছে নিজেদের বুকের আবরণ উন্মোচন করার; প্রতিবেশী পূর্ববাংলার গর্বে নিজেদের বুকের মধ্যে কী হয় কবিকে সেই দৃশ্য দেখানোর জন্যই ভিতরকার অন্য সমস্ত বাধাকে দুহাতে সরিয়ে দেওয়ার।

এই বাঁধভাঙা ভালবাসার সমারোহ, যা পূবের সঙ্গে পশ্চিমকে, পদ্মার এক পারের সঙ্গে অন্য পার-কে কবিতায়, গানে, মানুষের মুখের মেলায়, বুকের উত্তাপে মেলাতে চায়, রাঙিয়ে দিতে চায়, আমরা কয়েকদিন ধরে কলকাতা শহরে প্রত্যক্ষ করেছি। প্রত্যক্ষদর্শীদের মধ্যে পশ্চিমবাংলার মানুষ ছাড়াও একজন ছিলেন, তিনি কবি স্বয়ং। মাঝেমধ্যেই ঘরোয়া কথাবার্তায়, সভার ভাষণে তিনি এমন একটা অনুভূতির সীমান্ত পর্যন্ত স্পর্শ করছিলেন যা উভয় বাংলার মধ্যে আত্মিক বা বাহ্যিক কোন বিচ্ছেদকেই মেনে চলে না। কিন্তু অনেক ঝড়ে ও আগুনে পোড়-খাওয়া বর্ষীয়ান কবি যেহেতু এই সময়কার পূর্ববাংলার কোন দর্পণ নন, মাঝেমধ্যে ঘরোয়া কথাবার্তার সময়েও তিনি ভাষার ব্যবহারে সংযত ও সতর্ক থাকবার চেষ্টা করেছেন। রাজনীতির আলোচনায় তিনি যেমন পূর্ববাংলার ছাত্রসমাজের প্রতি তাঁর বিস্ময় ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন, তেমনি বর্তমান শাসনকর্তাকেও নানাভাবে আমাদের সামনে উজ্জ্বল রাখার সাবধানী চেষ্টা করেছেন। পূর্ববাংলার কবিয়ালদের প্রতি তাঁর প্রশংসা যেমন অজস্র ও অকুণ্ঠ, তেমনি সেখানকার কবিসমাজের প্রতি তাঁর নিম্নকণ্ঠ ভর্ৎসনা ও অবহেলা। এই ভর্ৎসনা আমাদের কাছে মাঝেমধ্যেই বেমানান এবং নিষ্প্রাণ কবিকণ্ঠের উচ্চারণ বলে মনে হয়েছে ; কেন না আমরা কলকাতায় বসেও এই সত্য জানি যে, পূর্ববাংলার কবিসমাজ এখন আর ঘুমিয়ে নেই। পশ্চিমবাংলার সংস্কৃতি ও সাহিত্য সম্পর্কে কবি জসিমউদ্দীনের মনে কোন জিজ্ঞাসা আছে, কয়েকদিন তাঁর সান্নিধ্যে থেকেও এমন কথা একবারও মনে হয় নি। অবশ্য কবি সকল সময়েই ব্যস্ত ছিলেন; মনোজ বসুর বৈঠকখানায় তাঁর সঙ্গে পাঁচ মিনিট একটানা কথা বলারও সুযোগ ছিল না; কেন না সমস্ত কলকাতা শহরটাই যেন তখন ঐ বৈঠকখানার কড়া নাড়ছে। তবু, রবীন্দ্রসদনের সম্বর্ধনা সভায়, সাপ্তাহিক বসুমতীর ঘরোয়া বৈঠকে আমরা তাঁর ভাষণে অথবা কথকতায় পশ্চিমবাংলার শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতিতে কোথাও খুঁজে পাই নি।

এর কারণ, কবি তাঁর মনের ভেতর কোথাও হয়তো দরজা বন্ধ রাখতে চেয়েছিলেন। অথবা পূর্ব বা পশ্চিমবাংলায় অন্তত কবিতার ক্ষেত্রে কোথাও কোন পরিবর্তন ঘটছে কি-না সে সম্পর্কে আজ আর তাঁর মনে কোন আগ্রহ নেই। পশ্চিমবাংলার সাহিত্য সম্পর্কে প্রকাশ্য সভায় তিনি একটি মাত্র বক্তব্য রেখেছিলেন। তা হলো, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মুসলমান সমাজকে নিয়ে উপন্যাস লেখেন নি। এই নঙর্থক বাক্যটির ব্যবহার ছাড়া এখানকার সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর যেন আর কিছু বলার নেই, চিন্তা করারও নেই।

অথবা এইসব আলোচনায় মনের

চাঁদের কপোলে চুমো

[illegible] দে

ওরা তখনও নিজেদের পানে তাকায় নি ঃ

ধরিত্রীর মাটি স্পর্শ করলো
'টাইম'।
আকাশের চোখে চোখ মিলালো
'স্পেস'।
চাঁদের কপোলে চুমো খেলো
'স্পীড'।

আকাশের কোটি কোটি তারা
যুগ যুগ ধরে আমাদের চোখ দু'টি খুঁজছিলো ঃ

দু'টি চোখ, পৃথিবী নয়, দু'টি আকাশ
দু'টি চোখ ঃ একটি আকাশ ঃ একটি মন

আমরা যখন স্পীড ঃ জন্ম
যখন স্পেস ঃ মৃত্যু
যখন টাইম ঃ জীবন।

ওরা যখন নিজেদের পানে তাকালো
বিদ্যুত হলো ওদের বিন্দুশ আত্মায়
চিরন্তন সত্তায় টাইম-স্পেস-স্পীড।

দুয়ার আরো খুলে দিতে হয়, তাই কবি সকল সম্বর্ধনার মধ্যে থেকেও কিছুটা সতর্ক অবরোধ মেনে চলেছেন। অথচ আমরা তো মনের দুয়ার খুলে দিতেই চাই। কবি যখন সম্বর্ধনার উত্তরে বলেন ঃ "আজ আমার প্রতি আপনারা যে শ্রদ্ধা ভালবাসা নিবেদন করেছেন, সেই শ্রদ্ধা ভালবাসা আমার দেশের মানুষের উদ্দেশ্যে নিবেদিত, যারা বহু রক্ত বহু দুঃখভোগের মধ্যে সেই শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন"—তখন মনে হয়, তিনি ভেতরের দুয়ার খুলে দিচ্ছেন। কিন্তু এর পরেই যখন তিনি রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের বিরুদ্ধেও মুসলমান সমাজের হয়ে অভিযোগ উত্থাপন করেন (যদিও অত্যন্ত মৃদুভাবে) তখন মনে হয় তিনি সতর্ক হয়েছেন, তাঁর ভাষণের হয়তো টেপ-রেকর্ড হবে।

আমরা তাই পূর্ববাংলার এই বরেণ্য কবির মধ্যে একজন সংগ্রামী কবির শপথ ও উচ্চারণ নয়, কিন্তু ভালবাসার বদলে কিছুটা ভালবাসার উত্তাপ পেয়েই আমাদের পিপাসা মিটিয়েছি। পাশপোর্ট ও ভিসা পকেটে করে যে মানুষ পূব থেকে কয়েকদিনের জন্য পশ্চিমে এসেছিলেন, একটি কারণে তাঁর সান্নিধ্য আমার কাছে গভীর আনন্দের। সংগ্রাম থেকে শান্ত এবং রাজনীতির আগুন থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন, মানুষ জসিমউদ্দীন কিন্তু ছোট-বড়, উচ্চ-নিচের কোনরকম ব্যবধানই স্বীকার করেন না। তাঁর পাশে দুদণ্ড বসলে কখনো মনে হয় নি, কবিকে আমরা বিরক্ত করছি, অথবা তিনি আমাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চান যে দর্শনদাতা ও দর্শনার্থীরা দুই জাতের মানুষ।

তিনি পূর্ববাংলার মুকুর নন, একজন সংগ্রামী কবিও নন, কিন্তু তাকে আমাদের ভাল লেগেছে। যে রাজার সম্বর্ধনা তিনি কলকাতায় পেয়েছেন, তার পরেও আমাদের সামনে সকল সময় তিনি একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন। অপরিসীম ধৈর্য এবং প্রশান্তিতে।

---

*কবির মনের ভিতর কোথাও যেন একটি শিশুর সরলতা আছে। কলকাতা শহরে সময় পেলেই তিনি থিয়েটার দেখেছেন; পশ্চিমবাংলার এই একটি সংস্কৃতির প্রতিই যেন তাঁর সমস্ত আকর্ষণ। পূর্ববাংলার সাহিত্য সম্পর্কে কবির আলোচনায় আরো প্রকাশ পেয়েছে, সময় পেলেই তিনি উপন্যাস পড়েন এবং সম্ভবত কবিতা পড়েন না। পূবের দেশে 'রহমান যাত্রা' নামে যে পালাগান নানাস্থানে অনুষ্ঠিত হয়, তার সঙ্গে কবির কোথাও যেন একটি আত্মিক যোগাযোগ আছে। সেখানকার কবিগান তিনি এখনো মুগ্ধ হন। প্রতিবেশী বাংলায় রবীন্দ্রসঙ্গীত এখন আকাশে-বাতাসে। এই প্রসঙ্গে তিনি খুলনার বিজয় সরকারের নাম উল্লেখ করলেন, যিনি রবীন্দ্রনাথের গানে নিজের সুর আরোপ করে রবীন্দ্রসংগীতকে সর্বত্র জনপ্রিয় করে তুলেছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ওপর এভাবে সুর আরোপ করা উচিত কি অনুচিত এ সম্পর্কে কিন্তু কবি জসিমউদ্দীনের মনে কোন প্রশ্ন নেই। যেমন, কলকাতায় কেউ তাঁর 'নক্সীকাঁথার মাঠ'-এর নাট্যরূপ দিচ্ছেন শুনেই তিনি শিশুর মত খুশি। রবুবান যাত্রা সম্পর্কে তাঁকে কিছু লিখতে বলায়, আমাকে অনুরোধ করলেন, 'একটি টেপ-রেকর্ডার নিয়ে আসুন, মুখে বলবো।' তাঁর এই অনুরোধ পালন করার ক্ষমতা যদি আমার থাকতো, তিনি একদিন সারা সকাল এ নিয়ে বুকের দুয়ার খুলে দিতেন। একটি অখ্যাত 'লিটল ম্যাগাজিন' থেকে একদিন আমার সামনেই কবির 'ইন্টারভিউ' নেওয়া হয়। এক ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে তিনি সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন; অথচ ঐ সময় অন্যত্র তাঁর জরুরী সাক্ষাৎকার ছিল এবং বজেই দূত অপেক্ষা করছিল তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

কবির সঙ্গে কয়েকদিনের সাক্ষাৎকারে তাঁর আরেকটি স্বভাবও আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছিল, তা হলো সাধারণ মানুষের অতি তুচ্ছ আব্দারকেও তিনি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে জরুরী ব্যস্ততার সমান মর্যাদা দিতেন। এমনি এক অখ্যাত ব্যক্তি তাঁর দুই কন্যার অটোগ্রাফের খাতা নিয়ে এসেছেন; কবিকে কিছু লিখে দিতে হবে। ঐ সময় অজস্র টেলিফোন আসছে এবং মাননীয় অতিথিরাও আসছেন কবির সঙ্গে কিছুক্ষণ হৃদয়ের বিনিময়ের জন্য। আশ্চর্য ধৈর্যের সঙ্গে, সমস্ত কথাবার্তার মধ্যেও, কবি অটোগ্রাফের খাতায় কবিতা লিখে দিলেন, একটুও বিরক্ত না হয়ে।

রবীন্দ্রসদনের সভায় এবং বসুমতীর ঘরোয়া বৈঠকে অনেক গুণী ব্যক্তি কবিকে তাঁদের প্রীতি-ভালবাসা-শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। উভয় সভাতেই বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়-কে কবির পাশে দেখেছি। এ ছাড়া অন্নদাশঙ্কর রায়, বিষ্ণু দে, হরপ্রসাদ মিত্র, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মত কবিরা তাঁকে সম্বর্ধনা জানিয়েছেন। কিন্তু সবচেয়ে মুগ্ধ হয়েছি যখন মনোজ বসুর বৈঠকখানায় অনন্ত সিং এবং জসিমউদ্দীন পরস্পরকে একেবারে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে আলিঙ্গনে আবদ্ধ হয়েছিলেন। আর ভাল লেগেছিল যখন মুজাফ্ফর আহমদ-কে তিনি পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম করেছিলেন।

সেই গ্রামীণ মানুষ, যিনি বিনয়ী এবং সরল। একদিন যিনি 'নক্সীকাঁথার মাঠ' আর 'সোজনবাদিয়ার ঘাট' রচনা করেছিলেন এবং আজো সেখানেই রয়ে গেছেন।

শ্রীপ্রিয়দর্শন সেনশর্মা

মাধ্যমিক শিক্ষা

দেশ স্বাধীন হবার পর থেকেই হৈ-চৈ চলছে দেশের শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন করতে হবে—কারণ বৃটিশ আমলে এই শিক্ষাপদ্ধতি চালু করা হয়েছিল কেবলমাত্র কেরানী তৈরির উদ্দেশ্যে। ঐ পদ্ধতিতে হরিণ খাঁচায় পুরে শিশুদের হৃদয়বৃত্তি বা মেধার স্বাভাবিক ক্রমবিকাশ হতে দেওয়া হয় না। শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই তর্কের অতীত। কিন্তু পরিবর্তন মানে হঠকারিতা নিশ্চয়ই নয়। শিক্ষাপদ্ধতির কোন পরিবর্তন করতে হলে তা করতে হয় শিক্ষার সকল স্তরে অর্থাৎ প্রাথমিক স্তর থেকে স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত; কেন না প্রতিটি স্তরই অন্যান্য স্তরের সংগে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত। যে ছাত্র আজ প্রাথমিক স্তরে শিক্ষালাভ করছে, কয়েক বছর পর সেই ছাত্রই স্নাতকোত্তর স্তরে শিক্ষা নেবে। তাই যদি প্রাথমিক স্তর থেকে স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত একটা সুসামঞ্জস্য না থাকে, তাহলে ঐ ছাত্রটি কোন একটি স্তরে এসে সামঞ্জস্যহীনতার ফাঁদে পড়বে—তখন তার উদ্ধারের পথ খুঁজে পাওয়া দুরূহ হয়ে উঠবে। মজা এই যে, শিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন করতে গিয়ে যাঁরা ভুল করবেন, সেই ভুলের শিকার কিন্তু তাঁরা হবেন না, হবে তাঁদের পরবর্তী বংশধররা।

শিক্ষাপদ্ধতির যে কোন পরিবর্তনের ফলই সুদূরপ্রসারী এবং একটি ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাপদ্ধতির পরিণাম কেবলমাত্র ভয়াবহই নয়, বিষময়ও বটে। আরো একটি কথা এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, কোন শিক্ষাপদ্ধতি সার্থক হয়েছে কি ব্যর্থ হয়েছে এই মূল্যায়ন সম্ভব হয় ঐ পদ্ধতিটাকে অন্তত পনেরো থেকে কুড়ি বছর ত্রুটিহীনভাবে পরিচালনার পর। কারণ, প্রাথমিক স্তর থেকে স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত অতিক্রম করতেই একটি ছাত্রের পনেরো-ষোল বছর সময় লাগে; এবং একটি পদ্ধতিতে শিক্ষিত চার-পাঁচটি ব্যাচ না বেরিয়ে আসা পর্যন্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিশ্লেষণ সম্ভব কি? শিক্ষার ক্ষেত্র ছাড়া আর কোন ক্ষেত্রে কিন্তু একটি পরিবর্তন ঘটিয়ে তার মূল্যায়ন করতে এত দীর্ঘকাল অপেক্ষা করতে হয় না।

এগুলো কিছু নতুন কথা নয়, বা এমন নয় যে, যাঁরা শিক্ষা সম্বন্ধে চিন্তা করেন তাঁরা জানেন না। কিন্তু তবু বলতে হল এই কারণে যে, কিছুদিন ধরেই দেখা যাচ্ছে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারে বা রাজ্য সরকারে শিক্ষামন্ত্রী পদে কোন ব্যক্তি অধিষ্ঠিত হওয়ার সংগে সংগেই একটা নতুন শিক্ষাপদ্ধতি চালু করার জন্য তিনি ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এতে তাঁদের পরিবর্তনপ্রবণতার পরিচয় পাওয়া গেলেও দায়িত্বশীলতার প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভয়টা এখানেই।

অধুনা শিক্ষাব্রতীদের আরও শংকিত করে তুলেছে পশ্চিমবংগের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্যপ্রিয় রায়ের বারো ক্লাসের মাধ্যমিক শিক্ষার পরিকল্পনা। অবশ্য তাঁর এই পরিকল্পনাটি এখন পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে তাঁরই, কেন না যুক্তফ্রন্ট এখনও এই পরিকল্পনা অনুমোদন করেন নি; বরং যুক্তফ্রন্টের কোন কোন শরিকদল এই পরিকল্পনার তীব্র নিন্দাও করেছেন।

শ্রীরায় নিজেও তাঁর পরিকল্পনাটি সবিস্তারে ব্যাখ্যা করেন নি। তাঁর মূল বক্তব্যগুলি হচ্ছে—(১) শিক্ষার লক্ষ্য হবে সমাজতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা; (২) শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকে 'সরকারী' ও 'বেসরকারী' এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করার প্রথা রদ করা হবে; শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা উদার গণতান্ত্রিক পন্থায় করা হবে—যে পন্থায় থাকবে না আমলাতান্ত্রিক কার্যধারা অথবা বর্তমান বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মত ব্যক্তি-প্রাধান্য; (৩) মাধ্যমিক শিক্ষার মান দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বাড়ানো হবে, অর্থাৎ দ্বাদশ শ্রেণীর স্তর অতিক্রম করেই একটি ছাত্র কলেজীয় শিক্ষার প্রথম পর্বে প্রবেশের যোগ্য হবে; (৪) বিদ্যালয়গুলিকে দু'টি ভাগে ভাগ করা হবে—এক শ্রেণীর স্কুলে দশম শ্রেণী পর্যন্ত থাকবে, আর অন্য শ্রেণীর স্কুলগুলিতে কেবলমাত্র একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী থাকবে; এই দ্বিতীয় শ্রেণীর স্কুলগুলি 'কেন্দ্রীয় উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়' বলে বিবেচিত হবে। শ্রীরায়ের লক্ষ্য আগামী ১৫।১৬ বছরের মধ্যে সারা পশ্চিমবাংলায় ৫০০টি এই রকম কেন্দ্রীয় উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় তৈরি করা।

শিক্ষামন্ত্রীর এই পরিকল্পনায় সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে, তিনি শিক্ষা সমস্যাটিকে সামগ্রিকভাবে না দেখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছেন কেবলমাত্র মাধ্যমিক পর্যায়ে—অর্থাৎ শিক্ষামহীরুহের গোড়া এবং আগা যেমন আছে তেমনই থাকবে, শুধু মধ্যেকার কাণ্ডটি বড় হবে। জানি না, শিক্ষামন্ত্রীর আজীবন মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষকতা করার জন্য তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী এইরূপ সীমিত হয়েছে কি না।

যাই হোক, শিক্ষামন্ত্রীর প্রথম ও দ্বিতীয় বক্তব্য প্রশংসা পাবার যোগ্য। শিক্ষামন্ত্রী কিন্তু জানান নি যে কোন্ পন্থায় তিনি তাঁর দ্বিতীয় লক্ষ্য বাস্তবে রূপায়িত করবেন। এর থেকে যদি কেউ অনুমান করেন যে, শিক্ষামন্ত্রীর এই পরিকল্পনা বাস্তবভিত্তিক চিন্তার ওপর গড়ে ওঠে নি, তাহলে কি তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে? শ্রীরায় শিক্ষামন্ত্রী হবার পর সরকারী প্রচেষ্টায় কয়েকটি গভর্নমেন্ট স্পনসর্ড কলেজ বা স্কুলের পরিচালক সমিতির যেভাবে রূপান্তর করা হয়েছে, তাতেও কিন্তু শিক্ষামন্ত্রীর দ্বিতীয় লক্ষ্য—উদার গণতান্ত্রিক পরিচালনায় পৌঁছনোর পন্থার ইংগিত পাওয়া যায় না।

আমাদের সবচেয়ে বেশি আতংকিত করে তুলেছে তাঁর পরিকল্পনার তৃতীয় এবং চতুর্থ অংশ, যেখানে তিনি বলছেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষার কালক্রম বাড়ানো হবে এবং ১৫।১৬ বছরে মাত্র ৫০০টি কেন্দ্রীয় উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় তৈরি করা হবে।

প্রথমেই সকলের মনে যে প্রশ্ন আসে, সেটা হচ্ছে যে, বৃটিশ আমলের দশ ক্লাশব্যাপী মাধ্যমিক শিক্ষার পরিবর্তে এগারো ক্লাশের উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার প্রচলন করাতেই নিম্নবিত্ত এবং মধ্যবিত্ত নাগরিকদের পক্ষে সন্তানসন্ততিকে অন্তত ম্যাট্রিক (বর্তমানের হায়ার সেকেন্ডারি) পর্যন্ত পড়ানোই আর্থিক কারণে কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে। তারপর যদি আরও এক বছর সময় বেশি পড়াতে হয় তা হলে ক'জনের পক্ষে সময় এবং অর্থের প্রতিবন্ধক দূর করে সন্তানকে শেষ পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষায় শিক্ষিত করা সম্ভব হবে? একথা নিশ্চয়ই কারুরই অবিদিত নয় যে, জনগণের বৃহত্তম অংশই চান যে, যত অল্প সময়ে এবং কম খরচে সন্তানকে চাকরির জন্য যোগ্য করে তুলতে—আর তার কারণটাও আর্থিক সমস্যা। হয়ত অনেকে বলবেন, শিক্ষামন্ত্রী ত' বলেছেন যে, অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক হবে। উত্তরে বলব, আগে নশ' মণ তেল পুড়ুক তবে ত' রাধা নাচবে। অর্থাৎ আগে ঐ 'অবৈতনিক' শিক্ষাটি চালু হোক তখন না হয় দ্বাদশ শ্রেণীর কথা ভাবব। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক করতে হলে শিক্ষামন্ত্রকের যে আর্থিক সংগতির প্রয়োজন, সেটা কি তার আছে? তাই ভয় হয় বাস্তবক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত শিক্ষামন্ত্রীর প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে পরোক্ষে শিক্ষা-সংকোচন হবে কি না? শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তনের ফলে যদি আমাদের মত শিক্ষায় অনগ্রসর দেশেও শিক্ষা-সংকোচন ঘটে তবে সেটা কি প্রগতিশীলতার পরিচয় বহন করবে?

এ ত' হল অধিকাংশ জনগণের, অর্থাৎ যাঁরা পশ্চিমবংগের মাধ্যমিক শিক্ষার বাস্তব অবস্থার সঠিক খবর রাখেন না, তাঁদের ভীতি। বাস্তব অবস্থার পর্যালোচনা কিন্তু আরও ভয়াবহ ছবি তুলে ধরে।

১৯৫৬ খৃস্টাব্দে পশ্চিমবংগের শিক্ষাজগতে একটি বিরাট পরিবর্তন আরম্ভ হয়। এখানে মনে রাখতে হবে যে, ঐ পরিবর্তনসূচী বাস্তবে রূপায়িত করার পেছনে রয়েছে সারা ভারতব্যাপী শিক্ষাবিদদের সাত-আট বছরের বহু কমিটি-কমিশন, অনেক মিটিং-কনফারেন্স-সিম্পোশিয়াম—এবং মোটামুটিভাবে প্রগতিশীল শিক্ষাবিদদের সুপারিশ।

এই সুপারিশ অনুযায়ী মাধ্যমিক শিক্ষার স্তর একাদশ বর্ষব্যাপী করা হল. একাদশ বর্ষব্যাপী বিদ্যালয়গুলির নাম হল উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং এই বিদ্যালয়গুলিতে একাধিক ধারার শিক্ষার ব্যবস্থা করা হল। উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষার স্তর পেরিয়েই ছাত্ররা সরাসরি স্নাতক শ্রেণীতে পড়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হতে লাগল। বৃটিশ আমলের 'ইন্টারমিডিয়েট' স্তর উঠিয়ে দেওয়া হল; এবং স্নাতক শ্রেণীর পাঠকাল দুই বছর থেকে বাড়িয়ে তিন বছর করা হল।

১৯৫৬ খৃস্টাব্দ থেকেই পশ্চিমবংগে একাদশ শ্রেণীব্যাপী বহুমুখী উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন শুরু হয় এবং নীতিগতভাবে স্থির হয় যে, ১৯৬৬ খৃস্টাব্দের মধ্যে সব কটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়গুলিকেই ঐ শ্রেণীতে উন্নীত করা হবে। ঐ উদ্দেশ্যেই সেই বছর থেকে নতুন কোন দশম শ্রেণীব্যাপী উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়কে সরকারী অনুমোদন বা স্বীকৃতি দান বন্ধ করে দেওয়া হল (অবশ্য শ্রীসত্যপ্রিয় রায় শিক্ষামন্ত্রী হবার পর থেকে পুনরায় অনুমোদন-স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে)। তখনই স্থির হয়েছিল যে, যতদিন পর্যন্ত না সব উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়গুলির রূপান্তর সম্ভব হচ্ছে ততদিন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির পাশাপাশি ঐ বিদ্যালয়গুলিও থাকবে; এবং ঐ বিদ্যালয়গুলির ছাত্ররা 'স্কুল ফাইন্যাল' পরীক্ষা দিয়ে মাধ্যমিক স্তর অতিক্রম করবে। কিন্তু স্নাতক শ্রেণীতে ভর্তি হবার আগে তাদের এক বছর 'প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয়' শ্রেণীতে পড়তে হবে। প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় শ্রেণীর অধ্যয়ন এবং পরীক্ষার দায়িত্ব অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয়েরই থেকে গেল। সে বছরই আরও স্থির হল যে, কোন একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়কে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করতে যা খরচা পড়বে তার ১২½% বিদ্যালয়টিকে দিতে হবে, আর বাকী সব টাকাই দেবেন রাজ্য সরকার। আর যে স্কুলগুলি ১৯৬৬ খৃস্টাব্দের মধ্যে ঐ খরচাটুকু দিতে পারবে না তাদের জুনিয়ার হাই (অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) স্কুলের শ্রেণীতে নেমে যেতে হবে। উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে দুই বা ততোধিক ধারার শিক্ষা বা 'স্ট্রীম' থাকতে পারে। আজ পর্যন্ত পশ্চিমবংগে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষায় সাতটি ধারা চালু হয়েছে, যথাঃ (১) মানবিকবিদ্যা (হিউম্যানিটিজ), (২) বিজ্ঞান, (৩) বাণিজ্য (কমার্স), (৪) কারিগরি (টেকনিক্যাল), (৫) কৃষি, (৬) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান (হোম সায়েন্স) এবং (৭) চারুকলা (ফাইন আর্টস)।

সরকার যদিও উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়গুলিকে উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নীত করার জন্য মুক্ত হস্তে অর্থ সাহায্য বা ক্যাপিটাল গ্র্যান্ট দিতে আরম্ভ করলেন ১৯৫৬ খৃস্টাব্দে, কিন্তু ১৯৬২ খৃস্টাব্দে ভারত-চীন যুদ্ধের ধাক্কা লাগার সংগে সংগেই হাত গুটিয়ে নিলেন—অর্থাৎ ১৯৬২-৬৩ খৃস্টাব্দের আর্থিক বছর শেষ হয়ে যাওয়ার পর আর কোন বিদ্যালয়কে সরকার ক্যাপিটাল গ্র্যান্ট দিচ্ছেন না। অবশ্য ইতিমধ্যেই ক্যাপিটাল গ্র্যান্ট বাবদ সরকারের খরচা হয়েছে প্রায় সাড়ে সাতাশ কোটি টাকা, (মানবিকবিদ্যা—৯,৫৪,৯৭,২০০ টাকা, বিজ্ঞান—১৪,৮৮,৬৭,১৬০ টাকা, বাণিজ্য—১,৫০,২১,২৫০ টাকা, কারিগরি—৮২,৩৫,০০০ টাকা, কৃষি—২৫,৯৮,৭৫০ টাকা, গার্হস্থ্য বিজ্ঞান—২৯,৯২,৫০০ টাকা, চারুকলা—৮,৪০,০০০ টাকা)। তখনও কিন্তু সরকার নীতিগতভাবে স্বীকার করলেন যে, মাধ্যমিক শিক্ষাকে উচ্চমাধ্যমিক স্তরেই তুলতে হবে এবং তার জন্য আগ্রহী উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়গুলিকে সরকার ক্যাপিটাল গ্র্যান্টও দেবেন। অথচ বাস্তবে দেখা যাচ্ছে সরকার আর ক্যাপিটাল গ্র্যান্ট দিচ্ছেন না এবং ১৯৬৬ খৃস্টাব্দে যে সীমারেখা টেনেছিলেন তাকেও অনির্দিষ্টকালের জন্য সম্প্রসারিত করলেন। সহজেই অনুমান করা যায় সরকারের এই নীতির মূল কারণ আর্থিক অনটন। ইতিমধ্যে কিছু কিছু উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় নিজেদের আর্থিক ক্ষমতাতেই উচ্চমাধ্যমিক স্তরে উন্নীত হচ্ছে—তাদের কিন্তু সরকার প্রতিটি 'স্ট্রীম' বা 'শিক্ষাধারা' পরিচালনার জন্য প্রতি বছর কিছু আর্থিক সাহায্য করছেন। চালু নিয়মানুযায়ী এই সাহায্যদানের দায়িত্ব কিন্তু সরকার এড়িয়ে যেতে পারবেন না।

এবার দেখা যাক ১৯৫৬ খৃস্টাব্দ থেকে ১৯৬৯ খৃস্টাব্দের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত ক'টি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় হয়েছে। এখানে অবশ্য বিদ্যালয়ের সংখ্যা গণনা করলেই সঠিক ছবিটি পাওয়া যাবে না, কেন না কোন বিদ্যালয়ে হয়ত আছে দু'টি শিক্ষাধারা, কোনটিতে বা তিনটি, কোথাও হয়ত পাঁচটি। তাই আমরা শিক্ষাধারা অনুযায়ী বিদ্যালয়ের সংখ্যা নেব, অর্থাৎ আমরা দেখব কোন একটি শিক্ষাধারা ক'টি স্কুলে পড়ানো হয়।

উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়গুলিকেও সরকারকে আর্থিক সাহায্য দিতে হয়। ১৯৬৮-১৯৬৯ আর্থিক সালে কেবলমাত্র এই দুই শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলির পিছনে সরকারের খরচ হয়েছে দেড় কোটি টাকার ওপর। এ ছাড়াও প্রতি বছর সরকারকে খরচা করতে হয় জুনিয়ার হাইস্কুল বাবদ প্রায় এক কোটি টাকা, প্রাইমারি স্কুল বাবদ প্রায় এগারো কোটি টাকা

এবং বুনিয়াদি স্কুলগুলো বাবদ প্রায় সোয়া কোটি টাকা। তাছাড়া রয়েছে সরকারী ও বে-সরকারী কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, শিক্ষা ডাইরেক্টরেট, মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ এবং শিক্ষাদপ্তরের জন্য ব্যয়ের দায়িত্ব।

এদিকে যুক্তফ্রণ্ট সরকারের অর্থমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় কিন্তু চলতি বছরে শিক্ষার জন্য বরাদ্দ করেছেন মাত্র ঊনিশ কোটি টাকা। এই অবস্থায় সমস্ত রুটিন খরচা মিটিয়ে শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে পরীক্ষামূলক বাস্তব গবেষণা করার মত শিক্ষামন্ত্রীর হাতে ক'টি টাকা থাকবে?

এ ত' গেল আর্থিক ব্যয়-বরাদ্দ ও দায়িত্বের কথা।

সমস্যাটির আরও অনেক দিক আছে যা খুঁটিয়ে বিবেচনা করা দরকার।

বহুমুখী উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে চারুকলা ও গার্হস্থ্য বিজ্ঞানের শাখা দুটি ছাড়া অন্যান্য শাখাগুলোর শিক্ষণ-ব্যবস্থা প্রথমদিকে কি ভয়ংকরই না ছিল! তার মূলে কারণ ছিল উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। বিশেষত মফস্বল স্কুলগুলিতে প্রায়ই দেখা যেত যে, লোকের অভাবে একজন শিক্ষকই পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ও জীববিদ্যা পড়াচ্ছেন। কোথাও বা পড়াচ্ছেন পার্ট-টাইম অধ্যাপক, আর কোথাও বা একজন ডাক্তার।

কারিগরি, বাণিজ্য এবং কৃষি শাখাগুলিতে অতি-সাম্প্রতিককালে কিছু শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে। তা না হলে এতদিন হয় কোন অবসরপ্রাপ্ত বৃদ্ধকে (যিনি জীবনে ইতিপূর্বে কখনও শিক্ষকতা করেন নি) দিয়ে, না হয় কোন পার্টটাইম সরকারী কর্মচারীকে দিয়ে কোনরকমে দায়সারা গোছের কাজ সারা হত! এখন অবশ্য অন্য সকল দিকে চাকরি পাবার সুযোগ সংকুচিত হওয়াতে কিছু কিছু উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে।

এসব কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, যদিও আপাতদৃষ্টিতে একাদশ শ্রেণীর উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলি চালু হয়েছে প্রায় তের বছর হল, তবু কিন্তু বস্তুতাবিকপক্ষে এই শিক্ষাব্যবস্থা ত্রুটিহীনভাবে পরিচালিত হয়ে পরীক্ষিত হয় নি। তাই বলছিলাম যে, একাদশ শ্রেণীর ব্যবস্থাকেই যখন তের বছরেও ত্রুটিহীন করা সম্ভব হল না, তখন মাধ্যমিক শিক্ষার মান আরও এক শ্রেণী বাড়িয়ে সমস্যাকে আরো জটিল করার সার্থকতা কি?

সমস্যা জটিল হবার আরও কারণ আছে।

১৯৬৬ খৃষ্টাব্দ থেকেই উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের অনুমোদন দেওয়া বন্ধ হয়েছে, তবু আজও কিন্তু পশ্চিমবংগে উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১,৬০৩। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, এই ১,৬০৩টি বিদ্যালয়কে উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণীতে উন্নীত করা সম্ভব হয় নি টাকার অভাবে। আজ যদি হঠাৎ দ্বাদশ শ্রেণীর কেন্দ্রীয় উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় চালু করা হয় তবে অবস্থাটা কি দাঁড়াবে? শ্রীরায়ের ঘোষিত পরিকল্পনাতেই ১৫।১৬ বছর লাগবে মাত্র ৫০০টি ঐরূপ বিদ্যালয় তৈরি করতে। তার অর্থ হচ্ছে যে, আগামী ১৫।১৬ বছর মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে তিন শ্রেণীর বিদ্যালয় চালু থাকবে—উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়, (দশম শ্রেণী পর্যন্ত), উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় (একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত) এবং কেন্দ্রীয় উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় (দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত)। এইভাবে সমস্ত মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থাই কি জটিল হয়ে যাবে না? তাতে করে কার লাভ হবে?

যদি প্রস্তাবিত পরিকল্পনা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের উচ্চসংখ্যা মাত্র ৫০০ই থাকে, তাহলে বর্তমানের অনেক উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়কেই উচ্চ-ইংরাজি বিদ্যালয়ের স্তরে নেমে আসতে হবে। তখন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর বিভিন্ন শিক্ষাধারার বিশেষ প্রয়োজনেই নিযুক্ত শিক্ষকদের কোথায় চাকরি দেওয়া হবে? তাঁদের বেতনের হারই বা হবে কি?

এসব দেখে কি মনে হয় না যে, দ্বাদশ শ্রেণীর মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থার পরিকল্পনাটি কেবলমাত্র অবাস্তবই নয়, অপ্রয়োজনীয়ও বটে।

তার চাইতে শিক্ষামন্ত্রী যদি বর্তমানের চালু শিক্ষাব্যবস্থার পরিচালনাকে ত্রুটিমুক্ত করতে পারেন তাহলেই বোধহয় যথেষ্ট হবে। অবশ্য সবচেয়ে আগে তাঁর যা করা উচিত তা হচ্ছে বিভিন্ন বিদ্যায়তনের শিক্ষকদের বেতন ও মাগ্‌গিভাতা যাতে ঠিক সময়ে পৌঁছে দেওয়া যায় তার ব্যবস্থা করা। প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকরা (যাঁদের বেতন ১২৫, টাকা থেকে ১৫০, টাকার মধ্যে) যাতে পরবর্তী মাসের ২৬।২৭ তারিখে মাইনে পান। তারও সঠিক ভরসা নেই। মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয়ের এবং বে-সরকারী কলেজের শিক্ষকরা সরকারের দেয় বেতন ও মাগ্‌গিভাতা যে কবে পাবেন তা বোধহয় কেউই বলতে পারেন না। কখনও তাঁরা পান তিন মাস পরে, কখনও বা ছয় মাস পরে। অনেক শিক্ষককেই বলতে শুনেছি, আমরা ত' সরকারের থেকে বেতনের অংশ বা মাগ্‌গিভাতা পাই নে, পাই বখ্‌শিস্! বিদ্যালয়গুলোও যথাসময়ে তাদের প্রাপ্য ম্যাচিংগ্রাণ্ট পায় না—তার ফলে অনেক সময়ই প্র্যাকটিক্যাল ক্লাশ (যে ক্লাশে পয়সা খরচ করে জিনিষপত্র কিনতে হয়) চালানো অসম্ভব হয়ে ওঠে। শিক্ষামন্ত্রী তাঁর সীমিত ক্ষমতার মধ্যেও এগুলোর সুরাহা করতে পারেন, তাঁর মন্ত্রক ও শিক্ষা অধিকর্তার প্রশাসন এবং স্কুল-কলেজগুলির পরিচালনা ত্রুটিমুক্ত করতে পারলে।

শিক্ষাধারা বা স্ট্রীম	ক'টি বিদ্যালয়ে পড়ানো হয়	প্রতি বিদ্যালয় বাবদ সরকারের বার্ষিক আর্থিক সাহায্যের পরিমাণ	মোট সরকারী দায়িত্ব
(১) মানবিকবিদ্যা	১১৪১	১,০০০=০০ টাকা	১১,৪১,০০০=০০ টাকা
(২) বিজ্ঞান	১৬২২	২,০০০=০০ টাকা	৩২,৪৪,০০০=০০ টাকা
(৩) বাণিজ্য	৫১৫	৮০০=০০ টাকা	৪,১২,০০০=০০ টাকা
(৪) কারিগরি	৫৪	৩,০০০=০০ টাকা	১,৬২,০০০=০০ টাকা
(৫) কৃষি	৬৬	৩,০০০=০০ টাকা	১,৯৮,০০০=০০ টাকা
(৬) গার্হস্থ্য বিজ্ঞান	১১৪	১,০০০=০০ টাকা	১,১৪,০০০=০০ টাকা
(৭) চারুকলা	৩২	৮০০=০০ টাকা	২৫,৬০০=০০ টাকা

চকচকে কালো রঙের মধ্যে ঝকঝকে সাদা একঝাঁক দাঁতের সারি চোখে পড়বার মতন। এমন প্রসন্ন আপ্যায়ন করবার জন্য এখানে একজন অপেক্ষা করছেন তা আমাদের অনেকেরই জানা ছিল না।

চেহারাটা দীর্ঘ। বেশ মজবুত। মাথার চুলগুলো ছোট এবং কালো কুচকুচে। দরজার বাইরেই দাঁড়িয়েছিলেন।

আমাদের দেখেই এগিয়ে এলেন। এবং সেই নির্মল হাসির আপ্যায়ন ভঙ্গিটুকু মুখে আটকে রেখেই বললেন, ওপরেই বসবেন তো—

—ওপরে—আমরা সবাই ঘাড় উঁচু করলাম।

—হ্যাঁ। ওখানে অনেক হাওয়া আর—

—আর কি? আমরা সবাই তাঁর মুখের দিকে তাকালাম।

—আর অনেক নিরিবিলি—

দোতলায় খানতিনেক ঘর। তার

চারপাশে চওড়া বারান্দা। আমরা সবাই পশ্চিমের বারান্দায় ভিড় জমালাম।

নিচে রাস্তা। সেই রাস্তা পেরিয়ে একটা বাগানবাড়ি। তারপর অবাধ বিস্তার নীলাকাশ। আর নিচে নদী।

সেই নদীর ওপর দিয়ে একটা ঠাণ্ডা বাতাস এসে মুহূর্তে আমাদের হৃদয়কে ভরিয়ে তুলল।

মিস সেন বারান্দার একটা রেলিং-এ হেলান দিয়ে বললে, নড়তে ইচ্ছে করছে না।

সুজয় তাড়াতাড়ি ক্যামেরাটা খুলে ফেলল। মল্লিনাথও। কিন্তু মিস সেনের দুর্লভ ভঙ্গির ছবিটি আর নেওয়া হল না কারুরই।

মূর্তিমান উপদ্রুতের মতন বারান্দায় আবির্ভূত হল মিসেস ভট্টাচার্য। বললে, হাওয়া খাওয়া পরে, আপাতত চা রেডি।

চায়ের আসরে আবার তাঁকে দেখলাম। বড় ঘরটায় সতরঞ্চি আর মাদুর বিছোচ্ছেন তিনি। মুখে সেই আপ্যায়িত হাসির রেশ।

—আসুন স্যার বসে পড়ুন, চা জুড়িয়ে যাবে—বলে বড় একটা কেতলী থেকে ভাঁড়ে চা ঢালতে লাগলেন তিনি।

চা-ডিম সিদ্ধ, বিস্কুট, কলা—আমাদের যেন আজ রা ক্ষু সে ক্ষিদে। দেবতোষ পেটরোগা। বললে, খাব এসব?

—খাবেন না মানে? এ আর কতটুকু

—ভদ্রলোক অ বা ক হলেন।

মিসেস ভট্টাচার্য বললে, শিবপদবাবু, এবার আপনি নিন তো আপনার খাবারটা—

—আবার আমি কেন? সঙ্কুচিত হয়ে উঠলেন তিনি।

—তা কখনও হয়—মিসেস ভট্টাচার্য প্লাস্টিকের ডিশটা এগিয়ে দিল—অনেক আছে আমাদের—তাছাড়া তিনজন তো এখনও এল না। সুজয় দেবতোষের কলা দুটো কেড়ে নিল। বললে, খাসনে, পেট ব্যথা করবে তোর—তারপর মুখটা ঘুরিয়ে বললে, দীপুদি, তুমি কি মাদুর-টাদুরও বয়ে এনেছ নাকি?

—পাগল! —ওসব ম্যানেজ করতে হয়—

—এখানেও ম্যানেজ—

—তুমিও তো দেখছি এইমাত্র দুটো কলা ম্যানেজ করলে—

আমরা সবাই খুব হাসলাম। এবং একটু পরেই পশ্চিমের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। মিসেস ভট্টাচার্য শিবপদর সহায়তায় রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে রইল।

মল্লিনাথ বললে, সুজয় বলতো ঐ যে জাহাজটা আসছে ওটার ফ্ল্যাগ কোন্ দেশের—

—রাখো তোমার ফ্ল্যাগের জিওগ্রাফি—

মিস সেন—আজ তো গান গাইবার দিন। অনুমতি দেন তো একটা কথা বলি—সুজয় যেন রোমান্টিক হতে চাইল।

—আমি গান জানি না—কণিকা মুখ ফেরাল।

—আহা, আমি তো জানি—আমি শুধু আপনার অনুমতি চাইছি—

সুজয় দাঁত বার করে হাসল।

—আপনি গাইবেন, তার জন্যে আমার অনুমতির দরকার। —বেশ বিরক্ত এবং বিস্মিত কণিকা।

—কারণ আছে—মাথা দোলাল সুজয়। গুনগুন করল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বললে, এরা আমার গান দু'-চারবার শুনেছে। কিন্তু আপনি তো শোনেন নি—অথচ শুনতে শুনতে যদি এমন ভাবাবেগ আসে যে আপনি ধরুন—সত্যি না-ও হতে পারে—ঝাঁপিয়ে পড়লেন নিচে—আর তৎক্ষণাৎ এখানকার বোরিং বাসগুলো যদি এসে পড়ে—

—রাবিশ—মুখ ফিরিয়ে নিল কণিকা।

আর তখন, ঠিক তখনই শোনা গেল একটা গুরু গুরু গর্জন। ক্রমেই সে গর্জন তীব্র থেকে তীব্রতর হল। তারপর এই ঘরবাড়ি বারান্দা কাঁপিয়ে দিয়ে ঝড়ের বেগে চলে গেল একটা যাত্রীবাস। সুজয় দুষ্টু হেসে বললে, ভাগ্যিস একটু আগে গানটা ধরি নি—

—এখন ধরুন—কণিকা বললে হেসে।

গানের পর গান চলছিল। সুজয়ের সঙ্গে আমরাও গলা মিশিয়েছি। এমন সময় শিবপদ এলেন। বললেন, চলুন, বাগানবাড়িটায় গিয়ে বসবেন—সব ব্যবস্থা করে এসেছি।

আমরা, কলকাতার কয়েকজন অধ্যাপক, প্রজাপতির মতন হাল্কা পায়ে যেন উড়ে চলে এলাম এপারের বাগানে।

চমৎকার বাগানটি। পাথরকুচির সরু রাস্তা দু' পায়ে মাড়াতে মাড়াতে ছটফটে পায়ে একেবারে নদীর ধারে এসে বসলাম।

উঁচু পাড়। বাঁধানো। যেন নদীর কিছুটা কেড়ে নিয়ে এ বাগানটা তৈরি। বাঁধানো তটের মাঝখানে সিঁড়ি নেমে গেছে একটা।

আমরা ঘাসের ওপর শুয়ে পড়লাম। বাতাস লুটোপুটি খেতে লাগল আমাদের ঘিরে।

শিবপদ বললে, আর এক রাউণ্ড চা হবে নাকি স্যার।

—নিশ্চয় নিশ্চয়—

—একেবারে মনের কথা ধরে ফেলেছেন—আমরা হৈ-হৈ করে উঠলাম। শিবপদ চায়ের ব্যবস্থা করতে গেলেন। আমরা বাগানটায় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

একটি ফুলগাছের ডাল ধরে কণিকা বললে, এটা কি ফুলগাছ? আমরা আনাড়ী ক'জন যত ফুলের নাম জানি মনে মনে আওড়াতে লাগলাম। কিন্তু কোন নামটাই পছন্দসই হল না।

মুস্কিল আসান করলেন শিবপদ। সেই মসৃণ কালো রঙের পশ্চাদপটে শুভ্র সারিবদ্ধ দাঁতের পঙক্তিগুলো আবার আভাসিত হল। বললেন, এই গাছ আরও একটা আছে—এ-পাশে।

আমাদের সবার চোখ সেদিকে গিয়ে পড়ল। শিবপদ বললেন, এ-ফুলগুলোর নাম কুরুবক।

কুরুবক! এই সেই কালিদাসের কাব্যের 'কুরুবকের পরত চূড়া কালো কেশের মাঝে।' —কুন্দ নেই, শিরীষ?

—আছে বৈকি। শিবপদ আমাদের কাণ্ডারী। কিন্তু লীলাকমল এখন নেই, লোধ্রফুলের সংবাদ রাখেন না তিনি।

না রাখুন ক্ষতি নেই। আমরা পুকুর পাড়ের বাঁধানো চত্বরে এসে বসলাম।

মিসেস দীপা ভট্টাচার্যের সাবজেক্ট দর্শন। সে এসে বসল। বলল, খুব চা চলছে দেখছি—আমার বেলায় ফাঁকি—

—দীপুদি, তোমার কি স্পেশাল ছিল উদর-দর্শন,—সুজয় গম্ভীর হতে চেষ্টা করল।

—না হলে আজ তোমাদের খাওয়ার দফা ভণ্ডুল হয়ে যেত—দীপা হাসল।

—তা কেন হবে, মল্লিনাথ এধার-ওধার কাকে যেন খুঁজল। বলল, শিবপদবাবু গেলেন কোথায়?

—ওনাকে আমি একবার দোকানে পাঠিয়েছি, দীপা বলল, ভারি মাই ডিয়ার লোক, অথচ দেখ এই সবে বিজন এল—

বিজন এসেছে? কই? আমরা সবাই চারদিকে তাকালাম।

—বিজনও গেছে শিবপদর সঙ্গে।

—বিজনকে একটা কমপ্লিমেণ্ট দেওয়া দরকার। সত্যি চমৎকার জায়গা বেছেছে।

—তার চেয়েও চমৎকার রিসেপসনিস্ট—আমি বললাম।

দীপা উঠল। মাংস বোধহয় হয়ে এল। এবার ফ্রায়েড রাইস হবে। রুমালে মুখ-চোখ মুছে দীপা বলল, বিজনটাকে কিছু খেতে দিতে পারলাম না, বড্ড খারাপ লাগছে।

—কেন? কিছু নেই—কণিকা প্রশ্ন করল।

—ছিল তো—ঠোঁট ওলটালো দীপা, ওই ভজু না গজু ছোকরাটা কেমন ছোঁক-ছোঁক করছিল—সেই বোধহয় ফাঁক করেছে।

—তাহলে শীগ্‌গির তুমি ওঠ দীপুদি, ওদিকে মাংসও হয়তো ফাঁক হয়ে যাবে, সুজয়ের কথায় আমরা প্রচুর হাসলাম।

শুধু দীপা নয়, কণিকাও উঠল। সুজয় আমাদের দিকে চেয়ে বলল, বিজনকে পাঠিয়ে দিও। পঞ্চপাণ্ডবের অরণ্যবাস না হলে মিথ্যে হয়ে যাবে।

হাসতে হাসতে ওরা চলে গেল।

আমরা গলা ছেড়ে গান ধরলাম। গান যখন মধ্যপথে তখন এল ওরা। বিজন আর শিবপদ।

সুজয় গানের সুরে বিজনের প্রশস্তি করল।

খাওয়ার ডাক যখন এল, তখন প্রায় তিনটে। আমরা বাতাসে এতক্ষণ জলের গন্ধ মেখে হৃদয়টা ভরিয়ে তুলেছিলাম। আমাদের মাথায় চন্দ্রাতপ বিছিয়ে দিয়েছিল বকুল-শিমুল-পেয়ারার ডালপালা। তাদের কাছে থেকে বিদায় নিলাম।

দোতলার উত্তরের বারান্দায় টানা আয়োজন। আশ্চর্য, ইতিমধ্যে সরোজ এসে গেছে। কাপড় গুটিয়ে শিবপদর সঙ্গে পরিবেশন করতে নেমে পড়েছে।

শিবপদর এখন অন্য চেহারা। নীল রঙের লুঙ্গির ওপর স্যাণ্ডো গেঞ্জি। ভদ্রলোক সত্যিই খুব মিশুকে।

দীপু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পর্যবেক্ষণ করছিল। বলল, শিবপদবাবু আপনিও বসুন—

—এই তো বসছি—না বসলে কি আর আপনি ছাড়বেন—শিবপদ বসল।

হঠাৎ দুটি ছোট ছেলের হাত ধরে ওদিককার বারান্দা থেকে এদিকে এল দীপু। বললে, দেবতোষবাবু, একটু সরে বসুন—এরাও বসবে।

আমরা জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকালাম। শিবপদ মাংসের হাড় চুষতে চুষতে বললেন, অল্প খাবে, বেশি খাবে না—বারোটায় ভাত খেয়েছে।

বোঝা গেল সব। হৈ-হুল্লোড় করে আমরা খেলাম। তারপর নিচে নেমে বাগানবাড়িতে এসে সবাই রান্নার তারিফ করছি—হঠাৎ খেয়াল হল বিজন নেই।

—হোপলেস। গেল কোথায় বিজনটা, সুজয় বলল।

—তোমাদের তো পেট ঠাসা, দীপুদি খাবে না—সরোজ বলল, বিজন ওদের খাওয়াচ্ছে।

—ওরা আবার কারা? কণিকা উঠে দাঁড়াল।

—বোধহয় শিবপদবাবুর তিন মেয়ে—

—অ, আমরা ঘাসের ওপর শুয়ে সিগারেটের ধোঁয়া বাতাসে ওড়াতে লাগলাম।

কিছুক্ষণ বিরতির পর সুজয় বলল, বেশ কাটল দিনটা। একঘেয়ে জীবনে ফাইন ডাইভারসন।

—হ্যাঁ, ছেলেমেয়েরা অধ্যাপকদের কাণ্ডারখানা দেখলে রীতিমত ঘাবড়ে যেত মল্লিনাথ বললে।

—থামো—সুজয় ধমক দিল। এখানে আমি তুমি দীপুদি সবাই এক-একটি মানুষ—কেউ অধ্যাপক নই।

—রাইট, আমি বললাম, ওইটে ভোলবার জন্যই তো এখানে আসা।

দেবতোষ কাত হয়ে নদীর দিকে নিঃশব্দে চেয়েছিল। বলছে, একটা অয়েল ট্যাঙ্কার আসছে। বলতো দেবতোষ, ওটা যাচ্ছে কোথায়?

—যাচ্ছে বজবজ, আবার কোথায়,

সরোজ বলল, শিবপদ বলছিল এখানে কোথায় একটা পুরনো কেল্লা আছে।

—কেল্লা মানে ফোর্ট—মল্লিনাথ বিস্মিত হল।

—হ্যাঁ, ফোর্ট মানে কেল্লা—সরোজ হাসল।

এমন সময় ওরা এল। দীপুদি আর কণিকা। কিন্তু কণিকার হাতের ঠোঙায় কি?

সুজয় উঠে বসল। বলল, এখানে একা একা কিছু করা বা খাওয়া নিষিদ্ধ। যীশুর কথা মনে নেই, গোপনতাই পাপ।

—তোমরা কে কি গোপন করছ, গীগ্‌গির বলে ফেল—হাসতে হাসতে দীপা বসল। বলল, বাপস্, পা দুটো টনটন করছে।

সুজয় ফিরে বসল। বলল, আই সী। আচ্ছা দীপুদি, তুমি জানো আমি ওই হাইপাশ ধোঁয়া গিলি না, চিবিয়ে খেতে ভীষণ ভালবাসি, তা তুমি পান চিবুচ্ছ, আমার জন্য আনো নি।

—এনেছি বাবা এনেছি—কণিকা দাও তো সবাইকে একটা করে পান।

হাতের ঠোঙা খুলল কণিকা। সুজয়ের হাতে প্রথম পানটা দিয়ে সহাস্যে বললে, খাও, পাপমোচন হল।

আমরা প্রচুর হাসলাম।

বেশ বাতাস বইছে। এপাশের ঝাউ-ইউক্যালিপটাস—শিরীষ-বকুলের পাতায় শন্‌শন্ শব্দ হচ্ছে। নদীতে খেয়াপারের আয়োজন চলছে। ওপারের আকাশে দুটো চিম্‌নী। ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে হেলে-পড়া সূর্যের লাল আভার ঝিলিক।

—কই, আপনারা উঠুন—শিবপদর গলার আওয়াজে আমরা ফিরে তাকালাম। খাকি ফুল প্যান্ট। হাফ হাতা সাদা সার্ট। বুকের দুপাশে বোতাম-লাগা পকেট। কোমরে চওড়া বেল্ট।

—এখান থেকে কেল্লা কতদূর। প্রশ্ন করলাম।

—আচ্ছা শিবপদবাবু, নৌকায় ওপার যাওয়া যায় না—দেবতোষ বলল।

—এক কাজ করুন, শিবপদ কি যেন ভাবল। তারপর বলল, নৌকায় কিছুটা ঘুরে কেল্লার পাশ দিয়ে বাস স্ট্যাণ্ডে ফিরে আসি—যাবেন?

আমরা সোল্লাসে লাফিয়ে উঠলাম। সুজয়, বিজন আর শিবপদ নৌকার সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল।

বোধ করি, দশ মিনিটও না। সুজয় প্রায় লাফাতে লাফাতে ফিরে এল। বলল, নৌকা রেডি। সব চলে এসো।

আমরা ছোট ছোট সিঁড়ির ধাপ পেরিয়ে শুকনো মাটিতে নেমে এলাম। কিন্তু শুকনো মাটি শেষ হতেই থমকে দাঁড়াতে হল। শিবপদ চটিজুতো হাতে তুলে নিলেন। হাঁটু অবধি গুটিয়ে নিলেন প্যান্ট। তারপর নৌকোর দিকে এগিয়ে চললেন; শুধু বললেন, সাবধানে আসবেন, কাদা বেশ।

আমরা শিবপদর পদাঙ্ক অনুসরণ করলাম। কিন্তু বেঁকে দাঁড়াল কণিকা। বলল, আমি যাব না। এই কাদা ভেঙে নৌকা চড়ার সখ আমার নেই।

—সখ না থাকুক, লোকে অনুরোধে ঢেঁকিও তো গেলে—আমরা বোঝাতে লাগলাম।

অতি কষ্টে কাদা পার হয়ে জলে নামলাম। নৌকোর ওপর প্রসন্ন হস্ত প্রসারণ করে আপ্যায়ন করবার জন্য প্রস্তুত শিবপদ। সেই সাদা দাঁতের সাজানো পদ্ধতি। আর মিষ্টি হাসি।

নৌকোর কিনারে বসে পা ঝুলিয়ে নদীর জলে পায়ের কাদা ধুয়ে নিলাম।

মুশকিল হল কণিকার। জলে দাঁড়িয়ে সে বলল, সবাই অন্যদিকে তাকান, এদিকে তাকালে আমি উঠব না।

অগত্যা। কণিকা উঠতে গিয়ে বিফল হল। শেষ পর্যন্ত হাত বাড়ালাম। আর তখনই কাঁধের ওপর এসে পড়ল একটা তোয়ালে। তোয়ালেটা ছুঁড়ে দিলেন শিবপদ। বললেন, পা-টা মুছে ফেলুন।

দীপা আর কণিকা পা মুছে মাঝখানে এসে বসল। হাল ধরলেন শিবপদ। টলমল করতে করতে নৌকা চলল।

মাঝে মাঝে নৌকা কাত হচ্ছিল। দীপা আর কণিকাই শুধু নয়, দেবতোষ আর মল্লিনাথও আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল।

সুজয় বলল, কে কে সাঁতার জানো না—বল—

কেউ কোন কথা বলল না। বিজন বলল, শিবপদবাবু এত টলছ কেন নৌকা?

—ঢেউ কাটছি আড়াআড়ি—এখন একটু দুলবে—ভয় পাবেন না।

—ভয়ে হোক আর আনন্দেই হোক, দীপা গান ধরল। আমরা দিলাম ধুয়া।

মাথার ওপর অন্ধকার চুপি চুপি ঘন হচ্ছে। দূরের ছবি ঝাপসা। আমরা প্রায় মাঝ নদীতে।

শিবপদ বললেন, ওই দূরে রূপ-নারায়ণ। যাবেন।

—না, না, অতদূরে না—দু-তিনজন একসংগে বলে উঠল।

—আমার না, কণিকা বলল, নৌকোয় চড়া এই প্রথম।

—আমারও, দেবতোষ বলল।

এমন সময় মাঝিকে সরিয়ে দাঁড়ে বসল সুজয়।

—ওকি, ওকি! —প্রায় আর্তনাদ করে উঠল কণিকা, দীপাদি এবার নির্ঘাৎ নৌকা ডুববে।

—সুজয়, কালকে কনডোলেন্স মিটিং কায়েম করেছে—নৌকা ওল্টালে দু-চারজন নিশ্চয় তলিয়ে যাবে—বিজনের গলার স্বরটা কেমন যেন করুণ শোনাল।

আবার গান ধরলে দীপা। সেই সঙ্গে আমরাও।

তীরে নয়, জেটিতে এসে থামল নৌকা। একে একে আমরা উঠে এলাম।

তখন সন্ধ্যা নামছে। নদীর জলের রঙ কালো। কেবল বাতাস অফুরন্ত। প্রাণ মাতানো।

সুজয় বললে, কারুর কাছে চারটে টাকা হবে?

টাকা নিয়ে সুজয় দিল শিবপদর হাতে। শিবপদ মাঝির দিকে এগিয়ে গেল।

আমরা জেটির ওপর ঘন হয়ে দাঁড়ালাম। এই নদী, এই বাতাস, এই আদিগন্ত খোলা প্রকৃতির রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে হবে—মনটা বিষণ্ণ হয়ে উঠল।

সুজয় বলল, আবার আসব এখানে। জায়গাটা বড় ভাল। তার চেয়েও ভাল শিবপদর মতন মনের মানুষ।

—সত্যি। কতটুকুই বা আলাপ—অথচ একেবারে আপনজনের মতন ব্যবহার—কণিকা সুজয়কে সমর্থন করল।

দেবতোষ বলল, তার চেয়েও বড় কথা, আমাদের খুশি করতে ভদ্রলোকের আপ্রাণ প্রচেষ্টা—

—ঠিক বলেছো, মল্লিনাথ বললে, যেন রেডি হয়েই রয়েছেন, হুকুম পাওয়া মাত্র কাজ হাসিল।

একটু পিছিয়ে একেবারে জলের ধারে কথা বলছিল বিজন আর দীপা। আস্তে আস্তে এগিয়ে এল ওরা। বলল, চল।

ওরা যেন একটু গম্ভীর। ওদের দুজনেরই মুখে যেন বেদনার ছায়া।

বিজন বলল, দেখলেন তো দীপুদি সব—

—দেখলাম বেশ শুনলামও। দীপার কণ্ঠস্বর বেশ ভারী।

সুজয় বলল, দীপুদি, আমরা আবার আসবার প্ল্যান করছি। এবার আর ভয় কিসের! আমাদের শিবপদবাবু তো আছেনই।

দীপু একবার আমার দিকে তাকাল। বললে, তখন বড় অন্যায় করেছিলাম ভজুকে সন্দেহ করে।

বিজন বলল, নাউ আই অ্যাম কন্‌-ফিডান্ট, ভজু ইজ ইনোসেন্ট।

বিজন চুপ করল। একটা বাতাসের দমকা ছুটে এসে আমাদের নাড়িয়ে দিয়ে গেল। তখনও জলের ধারে দাঁড়িয়ে মাঝির সঙ্গে চেঁচামেচি করছেন শিবপদ।

আমরা একবার দূরে শিবপদ আর মাঝির দিকে এবং আর একবার দীপা আর বিজনের দিকে তাকালাম।

এবার আমরা সবাই বুঝতে পারলাম।

আমাদের মুখেও কি দীপা-বিজনের মতন ম্লান সন্ধ্যার ছায়া নেমে এল?

তিমির প্রান্ত ডুয়ার্স

অগ্নিবর্ণ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ আঠাশ ॥

ভুটানের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি বলেছিলেন, ভুটান-ব্যাপারে আপনার আগ্রহ দেখছি খুব।

আমি বলেছিলাম, প্রতিবেশী রাজ্য হিসেবে এটুকু থাকাই তো উচিত।

তা বটে। ভদ্রলোক খুশি হয়ে বলেছিলেন, আপনার ডাকটিকিট-ব্যাপারে কোন উৎসাহ আছে কি?

আমি বলেছিলাম, ডাকটিকিট জমানোর হবির কথা বলছেন? এককালে খুব বেশি ছিল। তবে সে ছোটবেলার নেশা কবে কেটে গিয়েছে।

ভদ্রলোক বলেছিলেন, ভুটানের ডাকটিকিটের কিন্তু খুব চাহিদা এ-ব্যাপারে। তারপর তিনি সংক্ষেপে খানিকটা তথ্য নিবেদন করেছিলেন। বলেছিলেন, নানা দেশ থেকে ভুটানের ডাকটিকিটের চাহিদা আসে। Stamp-Collector-দের কাছে এগুলি খুবই প্রিয়। ভুটানে বেশ কিছুকাল আগে ডাকবিভাগীয় উপদেষ্টা হয়ে ভারত সরকারের ডেপুটেশানে আসেন জনৈক মিঃ রামমূর্তি। এ-ব্যাপারে তাঁর মত দক্ষ কর্মচারী খুব কমই দেখা যায়। বর্তমানে উপদেষ্টাপদ উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। Supdtt. পদ অলঙ্কৃত করছেন Lam Penjor নামে ভুটানেরই একটি অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। Asstt. Supdtt. of Mail পদে আছেন ভারতীয় জনৈক মিঃ শাস্ত্রী। এঁদের আন্তরিক আগ্রহে গড়ে উঠেছে ভুটানের Philatelic Bureau. নানা সিরিজের ডাকটিকিট আছে এঁদের। সিরিজগুলির নাম লক্ষ্য করবার মত। কলম্বো, প্লেন সিরিজ, ফ্রীডম ফ্রম হাঙ্গার সিরিজ, ডান্সার সিরিজ, টোকিও ওলিম্পিক সিরিজ, কেনেডী মেমোরিয়াল সিরিজ, চার্চিল ওভারপ্রিন্টস্ সিরিজ, ওয়ার্ল্ড ফেয়ার সিরিজ, এনিমেল সিরিজ, ওল্ড ফ্লাওয়ার্স সিরিজ, বয় স্কাউটস্ সিরিজ, ব্যাট্‌ল্ অব বৃটেন সিরিজ, স্পেস ডায়মেনশন সিরিজ, মাইথোলজি সিরিজ, বাটারফ্লাই সিরিজ, ফেমাস্ পেণ্টিংস্ সিরিজ, মেক্সিকো ওলিম্পিক সিরিজ, হিউমেন রাইট্‌স—এমনি অসংখ্য সিরিজ। 3-Dimensional Insects Series নামে এক বিশেষ সিরিজের ডাকটিকিট ডাকঘরগুলি থেকে মুক্তি পেয়েছে ১৯৬৯-এর এপ্রিল মাসে। এই সেদিন। The issue consists of eight completely different designs. The stamps are close-up photographs of the actual insects in their natural habitat bonded with a chemical plastic overlay with hundreds of microscopic prisms formed into their surface, which give the stamps sensational depth. এই সিরিজের সমস্ত ডাকটিকিটই জাপানের টোকিও থেকে ছাপানো। শুনতে শুনতে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলাম। কালক্ষেপ না করে দ্রুত হাতে টুকে এনেছিলাম যতটুকু সম্ভব।

আরেকটি সিরিজের নাম Design of eight Auspicious signs সবগুলিই ভুটানী শিল্পীদের আঁকা। ছাপানো হয়েছে স্পেন থেকে। Aquarinm Fishes 3-Dimensional Postage Stamp-গুলির মুক্তি ঘটেছে ১৯৬৯-এর ফেব্রুয়ারী মাসে। ছ' রকমের ডাকটিকিট। The 3-Dimensional technique gives the stamps sensational depth and shows the facinating nnderwater fishes in their natural setting. এমনি আরেকটি আশ্চর্য সিরিজ Bhutan Birds Commemorative Series. এগুলির ডিজাইন করেছেন Dr. Salim Ali of Bombay Natural History Society, India. টিকিটগুলি ছাপানো হয়েছে ইন্দোনেশিয়া থেকে। এগুলি সম্পর্কে ভুটান সরকার বলেছেন, The rich flora of Bhutan provides the sanctuary for a variety of fascinating birds. Famous among these are (i) The Crimson Winged Laughing Thrush, (ii) Ward's Trogon, (iii) Grey Peacock-Pheasant, (iv) Rufons Necked Hornbill and (v) Myzornis. সব টিকিটই বিদেশে ছাপা। সেট হিসেবেও কিনতে পাওয়া যায়। ভদ্রলোক বলেছিলেন, Orders for such stamps should be accompanied by remittances by Money Order in the case of the customers from India.

এমনি আরো অনেক কথা। বলে দিয়েছিলেন, তবে হ্যাঁ আপনাকে বলি, যদি দরকার হয় চিঠি লিখবেন আমাকে। অথবা ভারতীয় পোস্টাল অর্ডার পাঠাবেন দলসিংপাড়া পোস্ট অফিসের নামে।

ফিরে আসতে আসতে ভাবছিলাম। দলসিংপাড়া পৌঁছে গেছি ইতিমধ্যে। মস্ত বড়ো বটগাছটা দেখে মনে পড়ল। সুন্দর ঝকঝকে ভুটানের ডিলাক্স বাস চড়ে চলেছি। ব্যবস্থা আরামদায়ক। ভিড় নেই। ঠাসাঠাসি নেই। যতদূর মনে পড়ে সিকিমের বাস আরও সুন্দর এবং আরামদায়ক। ডিলাক্স গাড়িগুলোর কাচের জানালায় সৌখিন পর্দাও টাঙান আছে। ইচ্ছেমতন টেনে দেওয়া যায়। মোটামুটি আরামদায়ক ভ্রমণ-ব্যবস্থা আসাম পরিবহনেও দেখেছি। যতগুলি সিট ততজন যাত্রী দূরপাল্লার ভ্রমণে।

বাংলা দেশেই বাসযাত্রীদের অবস্থা সবচাইতে শোচনীয়।

দলসিংপাড়া। জানালার বাইরে তাকিয়ে দেখছি বড় বড় চোখে।

ফুন্টশোলিং থেকে এসে পড়লাম কয়েক মিনিটে। ফুন্টশোলিং-এর কাছাকাছিই প্রায় ডুয়ার্সের একটি বিখ্যাত বন্দর এই দলসিংপাড়া। এখানে পোস্ট অফিস আছে। দলসিংপাড়া হয়ে ভারত থেকে ডাক আসে ভুটানে। ফুন্টশোলিঙে। বেলা দশটায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের এক বিখ্যাত লেন-দেন কেন্দ্র। বটগাছগুলি দাঁড়িয়ে আছে। বট না পাকুড়? সহযাত্রী একজন অন্যকে জিজ্ঞাসা করছেন। শুনে কৌতূহলী দৃষ্টি ফেরাই আমিও। মস্ত একটা বট। না না, এ পাকুড় হতেই পারে না। সহযাত্রী একজন প্রশ্নকর্তার জবাবে মাথা নেড়ে বলে উঠলেন।

তাঁর যুক্তি, দেখছেন না মশাই বটের লাল ফলগুলি?

তাকাচ্ছি আমিও। মস্ত বটগাছটা দেখেছি। তাতে অজস্র লাল ফল ধরে আছে। ঝুরিগুলি নেমেছে অসংখ্য। সহযাত্রীদের গলা ভিতরে।

বট আর পাকুড়ে তফাৎ কি?

আছে আছে মশাই।

কি করে ধরেন?

তার জবাব না-দিয়ে উল্টে প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক, জানেন মশাই, বটের পূজো লাগে, পাকুড়ে পূজো হয় না?

পূর্ববর্তী প্রশ্নকর্তা ভদ্রলোকটির গলা আর শোনা যায় না। হয়ত বা বিস্ময়ের বিহ্বলতায়। গাড়ির ভিতরে চোখ ফেরাতে ভুলে গেছি। বটগাছের তলায় তলায় অনেকগুলি পানের দোকান। অধিকাংশই হিন্দুস্থানী। পানের দোকানে বেশ ভিড়। দড়ি থেকে সিগারেট ধরাচ্ছে একজন। মাল বোঝাই একটি মিলিটারী ট্রাক আগাগোড়া বোল্ডারে ঠাসা। বড় বড় পাথরের চাঁই-ও আছে। কাছেই হাসিমারা। মিলিটারীর একটি বিখ্যাত কেন্দ্র। নতুন পাকা বাড়ি উঠছে একটা। এ যেন ইতিহাসের রূপক। নতুনকালের মাটিতে নতুন যুগের ভিত্ খুঁড়ছে একদল কুলি-মজুরের দল।

তাকিয়েই চমকে উঠেছি। অধিকাংশই ভুটানী মজুর। মেয়েরাও আছে। আছে বিহারী এবং মদেশিয়ারাও। হিন্দুস্থানী একজন রাজমিস্ত্রি। তার পাশে দাঁড়ান অন্য রাজমিস্ত্রিটিকে দেখে বোঝা গেল সে-ও ভুটানী। সহযোগিতার এক অভূতপূর্ব নিদর্শন।

এই এক বিস্ময়। ডুয়ার্সের যে-দিকেই তাকাচ্ছি, দেখছি সর্বজাতির মিলনে এক আশ্চর্য মানবতীর্থ গড়ে তোলবার কাজ হচ্ছে এখানে। কেউ গড়ছে না। নিজে থেকেই গড়ে উঠছে। ইতিহাস-বিধাতার অব্যর্থ অঙ্গুলি নির্দেশে। গাড়ি ছাড়বার আগে ছুটতে ছুটতে এল একজন ভুটিয়া। ছোট ছোট করে ছাঁটা চুল। মোঙ্গলিয়ান মুখ-চোখ-নাক। তার পিছন পিছন একটি বিহারী মেয়ে।

এক বোরা মিরচা উঠা দেও, হো কমলি।

ভুটিয়াটি চিৎকার করে বলল কমলিকে। আশ্চর্য হিন্দুস্থানী শিখে গেছে সে। কমলি মানে সেই বিহারী মেয়েটি পাশের একটা ছোট্ট খুপরির ঘর থেকে কালবিলম্ব না করে পিঠে করে নিয়ে এল একটি মিরচা-বোঝাই বস্তা।

ধাক্কা খেয়ে মন ফিরে যাচ্ছে সেই অতীতে। সুদূরলোক পর্যন্ত আলোড়িত হয়ে উঠল। একদিন অন্ধকার বনাঞ্চলের মধ্যে আত্মগোপন করেছিল এই এলাকা। বন আজও আছে। সেদিন আরো গভীর ছিল তাতে সন্দেহের কণামাত্র নেই। হিংস্র জীবজন্তুর বাসভূমি ছিল এই অঞ্চল। ভুটানীরাও কম হিংস্র ছিল না। তারপর ধীরে ধীরে এসে পড়ল এক-আধটি মানুষ। রাত্রিদিন অন্ধকারের মধ্যে একটেরে খুপরিতে আত্মগোপন করে থাকা। আর, বছরের আট-ন' মাস সে কী বৃষ্টি! বৃষ্টি, বৃষ্টি! বৃষ্টির অঢেল বন্যায় চোখে কিছু দেখা যায় না। হিংস্র বড় বড় মশা।

সেই গল্প শুনেছিলাম মৃগাঙ্কমোহনের কাছে। প্রায় ষাট-সত্তর বছর আগে দলসিংপাড়ায় ব্যবসা করতে এসেছিলেন মৃগাঙ্কবাবু। বিক্রমপুরের এক গণ্ডগ্রামে ছিল বাড়ি। কাউকে কিছু না বলে দুঃসাহসের নেশায় প্রায় মাতাল হয়ে ছুটে এসেছিলেন এখানে। অনেকদিন পর্যন্ত কেউ তাঁর কোনও খবর রাখে নি। বিনোদপুরের রাধাবিনোদবাবুরা তাঁকে মৃত বলেই ঠাউরে নিয়েছিলেন। বৎসরান্তে একটি চিঠিও তাঁর কাছে এখানে কেউ পৌঁছে দিয়ে যায় নি। ঠিকানা জানলে তো আসবে এই চিঠি।

এখানে এই ভয়ংকর নির্জনতম অঞ্চলে ধীরে ধীরে তিনি ব্যবসা ফেঁদেছেন। বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন মৃগাঙ্কবাবু। নানা ব্যবসার চালাও কারবার। আজ তাঁর নাম ডুয়ার্সে কে না জানে। লক্ষপতি বড়লোক বলে খ্যাতিও আছে। কিন্তু সেদিনকার কী যে প্রাণপাত পরিশ্রমে এই খ্যাতি তা জানেন শুধু মৃগাঙ্কবাবু। আজ তাঁর বয়স হয়ে গেছে। বার্ধক্য তাঁকে প্রায় দ্বিতীয় শৈশবে পৌঁছে দিয়েছে। চোখে ভালো দেখেন না। তাঁর বড় বড় ছেলেরা সব ব্যবসার নানাদিক রক্ষণাবেক্ষণ করছে। এই সেদিন পর্যন্ত বড় নাতনী তাঁকে খবরের কাগজ পড়ে শোনাত। এখন পর পর সব ক'টি নাতনীরই বিয়ে হয়ে গেছে। তারা সৃষ্টির নিয়মে নিজের-নিজের ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর করছে। খবরের কাগজ মাঝে মাঝে শোনায় ছোট ছেলের বৌ। ভারি বুদ্ধিমতী বৌ হয়েছে।

শুনতে শুনতে নিজের অলক্ষে নিশ্বাস ফেলেন মৃগাঙ্কবাবু। দেশ-কাল কেমন দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে সব। আরো যাবে। এমনি করেই যায়। তিনি যখন এসেছিলেন এখানে, কল্পনা করতে পারেন আজ কী চেহারা ছিল তখন দলসিংপাড়ার? সেইখানেই আজো আছে সব ব্যবসা-বাণিজ্য। অন্যদিকেও ছড়িয়েছে। শরীরেই নেই বল-বীর্য। যদি থাকত ছুটে গিয়ে দেখে আসতেন সেই দলসিংপাড়া।

কথায় কথায় আমার কাছে এইসব বলেছিলেন মৃগাঙ্কবাবু। প্রাতঃস্মরণীয় মৃগাঙ্কবাবুকে মনে পড়ে গেল। দলসিংপাড়া দিয়ে যেতে যেতে। কর্মবীর মানুষ ছিলেন তিনি। ঊনিশ শতকের শেষ দিকে জন্মেছিলেন। বাংলাদেশের এক অভূতপূর্ব নবজাগরণের যুগ সেটি। চরিত্র-ধর্মেও তাঁদের লেগেছিল সেই মাহাত্ম্যের ছিটে-ফোঁটা। শক্ত মানুষ ছিলেন তাঁরা। শক্তিধর মানুষ ছিলেন। জীবন তাঁদের কাছে বলবানের তপস্যার মত ছিল। সেই ছিটে-ফোঁটাও যদি আমাদের থাকত। একটা শতাব্দী পার হতে-না-হতেই আমরা একেবারে অন্তঃসারশূন্য দেউলে হয়ে গেছি। আসলে বর্তমান যুগ যে প্লাস্টিকের সে-কথা ভুললে চলবে কেন?

এ-যুগে লোহা কোথায়? লোহা আছে বটে, কিন্তু প্লাস্টিকেরই জয়-জয়কার চারদিকে।

দলসিংপাড়া মিলিয়ে গেল চোখের সামনে থেকে। চলন্ত বাস থেকে বাইরের চলমান দৃশ্য দেখছি। মৃগাঙ্কবাবুর বড় ছেলে বলেছিলেন আমাকে, দলসিংপাড়ার দাম আরো বেড়ে গেছে একালে হাসিমারায় মিলিটারী ঘাঁটি হয়ে। ভুটানের দিকে আমাদের ব্যবসা-কেন্দ্রগুলির মধ্যে দলসিংপাড়ার খ্যাতি বেশ। হাসিমারা রেলওয়ে স্টেশন আছে ওদিকে।

ব্যবসা খুবই বেড়েছে সন্দেহ নেই। মিলিটারী ঘাঁটিগুলির কল্যাণে ডুয়ার্সের আভ্যন্তরীণ উন্নতিও কম হয় নি। সারা ভারতবর্ষ থেকে এসে পড়েছে মানুষেরা। চলতি পথে দেখি জোয়ানদের। সারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের যুবক ছেলেরা। এম· ই· এস, এয়ারফোর্স সার্ভিসের

ছেলেরাও। শক্ত, সবল। সুন্দর সবল চেহারা।

অনেকদিন আগে দেখেছিলাম এক মধুপুরে। জলপাইগুড়ি থেকে বাসে করে ফিরছি। রওনা হতে বেলা হয়েছিল। সাড়ে ন'টা-দশটায় গাড়ি। বীরপাড়া হয়ে যখন চলল, তখনই সূর্য মধ্য গগনে। মাদারিহাটের আগে গাড়িতে উঠল এক দল জোয়ান। বেশ হাসি-খুশি। নানা ভাষায় কথা বলছিল নিজেদের মধ্যে। তাদের মধ্যে দু'টি বাঙালী ছেলেও ছিল। কথায় কথায় তারা হাসছিল। ঠাট্টা করছিল নিজেদের মধ্যে।

পাশে বসা এ-অঞ্চলের বিখ্যাত কণ্ট্রাক্টর যদুবাবুকে শুধিয়েছিলাম, এরা সব যাচ্ছে কোথায়? কোথায় আবার? যদুবাবু পান চিবুচ্ছিলেন। বললেন, কাছাকাছি হাসিমারাতে যাচ্ছে ছবি দেখতে। ছুটি নিয়ে বেরিয়েছে। ম্যাটিনি দেখে আবার ফিরবে সন্ধ্যেবেলা।

বলে মন্তব্য করেছিলেন, বেশ আছে মশাই, নির্ঝঞ্ঝাট। সংসার নিয়ে ডুবে মরছি, মশাই। ওরা আবার হৈ-হল্লা করে নেমে গেল হাসিমারায়। বাস থেকেই দেখছি, একটা বোর্ডে লেখা রয়েছে—Now showing, তার তলায় সিনেমার একটি পোস্টার। Around the world.

ফুণ্টশোলিঙেও দেখে এলাম সিনেমা হল। হলের নাম Mig, সুন্দর যুগোপযোগী নাম। বাইরে টিকিটের জন্য ভিড় করেছে অসংখ্য দর্শনোৎসুক মানুষজন। তার সামনে বাসে উঠে পাকা রাস্তা দিয়ে গড়গড়িয়ে চলে আসছি দলসিংপাড়া হয়ে।

মনে মনে ভাবি, কোথায় গেল সেই সব অন্ধকার ভয়ংকর দিনগুলি? পাথরের আড়ালে লুকোনো সশস্ত্র ভুটানী যোদ্ধারা তীর ছুঁড়ছে। ঝাঁকে ঝাঁকে তীরে অস্থির করে তুলছে ইংরাজ সৈন্যদের। জলে-জঙ্গলে ভয়ংকর কঠিন-পণ সংগ্রাম। রৌদ্রে-বৃষ্টিতে। তার সময়-অসময় নেই। ওপর থেকে ধাক্কা দিয়ে গড়িয়ে দিচ্ছে বড় বড় পাথরের চাঁই। তাতে মিশিয়ে দিচ্ছে ভয়ংকর বিষ। আতঙ্ক, উদ্বেগ। অস্থির প্রাণ। ইংরেজ সৈন্য খুঁজছে ভুটানীদের হন্যে হয়ে। জলে-জঙ্গলে আঁতিপাঁতি করে। বড় বড় জেনারেলেরা হিমসিম—খাচ্ছে।

তারপর একদিন থামল যুদ্ধ। অপরিচয়ের গণ্ডী কাটল। সম্পর্কের সূত্র হল স্থাপিত। একশ বছর পেরিয়ে গেল এমনি করে। তত্দিন বংশের পর বংশ ধরে বেঁচে এ-মাটিকে আপন করে নিয়েছে ডুয়ার্সের অন্যান্য জাতির মত ভুটানীরাও। ডুয়ার্সের মানুষ হয়ে গেছে তারা। স্বীকৃত একটি জাতি। রক্তের বন্যতা হয়েছে শান্ত। দুর্ধর্ষ যোদ্ধারা হয়ে গেছে সুসংসারী শান্ত মানুষ। ডুয়ার্সে এলে দেখতে পাবে অনেক ছোট ছোট ডেরাডুর সামনে ভুট্টা ক্ষেত দুলছে বাতাসে। পিছনের বাজার ঝোপে মোচা ঝুলছে। ছোট-খাটো একটা দোকান চালাচ্ছে ভুটিয়া পিতা। গায়ে একটা গেঞ্জী। ক্রেতাকে মুড়ি দিচ্ছে কৌটো দিয়ে মেপে মেপে। ছোট একটা বাচ্চা বসে আছে কোলের কাছে। বাজারে মস্ত বোকু গায়ে চড়িয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেনা-কাটা করছে এটা-ওটা। আস্ত আস্ত সুপারী দু'ফালা করে মুখে পুরে দিচ্ছে পানের সঙ্গে। কৌটো থেকে চুন নিচ্ছে আঙুলে। চিবুচ্ছে পরমানন্দে।

[ক্রমশ]

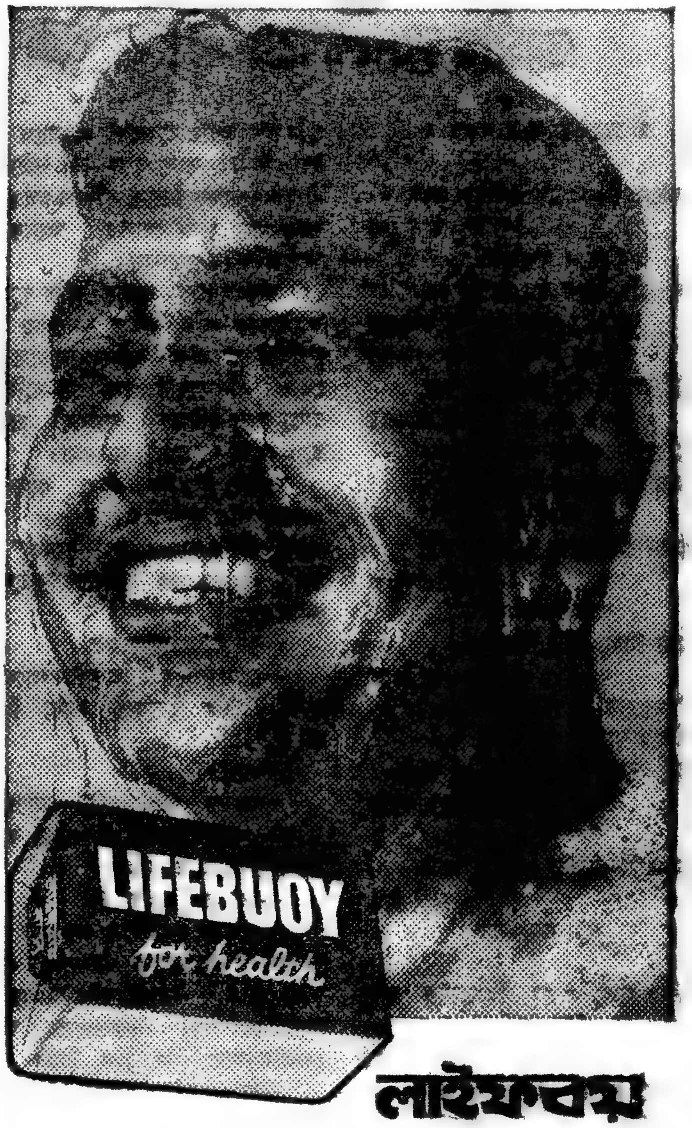

লাইফবয়

যেখানে স্বাস্থ্যও সেখানে

লাইফবয় মেখে স্নান করলেই তাজা ঝরঝরে হবেন।
এই চমৎকার সুস্থ পরিচ্ছন্ন ভাব থেকেই বুঝবেন তাও।
সাবানের সবকিছু গুণ তো আছেই লাইফবয়ে,
তারচেয়ে বেশীও কী যেন আছে।

লাইফবয় ধুলোময়লার রোগবীজাণু ধুয়ে দেয়

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

লিনটাস-L. 31-20 80

গ্রামবাংলার কথা

অসীম মুখোপাধ্যায়

॥ কোথায় পাব তারে ॥

"ভগমান মিনসাটার কলিজা নাই,
নাই গো
শুন সব্বজন।
পাপ করি কেউ হয় যুদিষ্টির,
পুণ্য করি দুজ্জোধন
শুন সব্বজন॥
মোর জরু গেছে, জিরেত গেছে,
গেছে বাপের জমিন।
যার তরে মোর চোখে পানি,
সাজায় তারে মোমিন॥
শুন সব্বজন।
ভগমান মিনসাটার কলিজা নাই,
নাই গো.—
শুন সব্বজন॥
ক্ষ্যাপা সাধু গীত ধরিছে,
বলিছে গলা চিরে
দুই হাতের নখের ঘায়ে
ফেলিবে আকাশ ছিঁড়ে
তখন, আকাশ থিকে পড়িবে খসে
শালার ভগমান
শুন সব্বজন।
ভগমান মিনসাটার কলিজা নাই,
নাই গো
শুন সব্বজন।"

—তা সাধু এ যে বিদ্রোহের কথা গো?

—একতারা থামিয়ে সাধু হাসে। বলে—বিদ্রোহ না করিলে কি চলে গো ভাইজীবন? বিদ্রোহ করিই তো আদায় করতি হবে, তা সে ভগমানের কাছ থিকিই হোক আর বড়সায়েবের কাছ থিকিই হোক।

—তুমি সর্বঘটের কাঠালীকলা সাধু। গেল বছর তারকেশ্বরের মেলায় দেখা হোল। এবার এলুম আমতার রসপুরে, বিন্ধ্যবাসিনীর মেলায়। এখানেও তুমি!

ক্ষ্যাপা সাধুর দাড়ির আড়ালে অনাবিল হাসি। বলে—"আমিও তো তাই বলি, কাঠালীকলা কে, আমি না তুমি?" এবার দুজনেই একসাথে হাসি। হাসি থামলে সাধু বলে—চল ভাইজীবন, ঐ অশথগাছের নিচেয় বসিগে চল। এক বছর বাদে দেখা হোল। অনেক খবর দিবার আছে তোমায়।

অশথগাছের ছায়ায় বসি দুজনে। ফাল্গুনের কচি পাতায় বসন্তের গান। কোথায় যেন একটা পাপিয়া ডাকছে থেকে থেকে। শিমুলের পাপড়িতে সুঁড়িপথটা ঢাকা পড়ে গেছে। গরবিনী প্রকৃতির রূপে দেখে দুজনেই আনমনা।

সাধুই প্রথম কথা বলে—কেন এখানে সরি এলাম জান?

—চোখে আমার প্রশ্ন—"কেন"?

—এখানে যে আমার কুটুমবাড়ি আছে।

—কুটুম? তোমার?

—কেন সাধুর বুঝি কুটুম থাকে না? নাকি আমি বরাবরই সাধু ছিলাম, ভাবছ?

—তবে?

—আমার শ্বশুরবাড়ি আছে এ-গাঁয়ে। এ-গাঁয়ের জীবন রায়ের কন্যারে বিয়া করিছেলাম আমি।

—বৌ কই তোমার?

—আমার বৌ? আঙুল দিয়ে আকাশ দেখায় সাধু। ঐখানে। ঐখানে আছে সে। ঐখানে বসি আমার মনে ছায়া ফেলিছে। একতারাতে আঙুল বোলায় সাধু—টিঙ, টিঙ, টিঙ।

—শ্বশুরবাড়ির খবর রাখো না তুমি?

—একদম না। বরং তারাই রাখে খবর। একতারাটা দেখিয়ে বলে—এ যন্তরটা বড় শ্যালা কিনে দেছে আজ বছর আষ্টেক হোল। আমি যাই না শ্বশুরবাড়ি। মোরে দেখে কাঁদে সবাই। বুড়ো কাঁদে, বুড়ি কাঁদে, শালী, শ্যালারা কাঁদে। আবদার করে—মোদের মাঝে ফিরে এস রাখাল।

—তাই আর যাই না। তবে ভাইজীবন, ফি বছর ফাগুন মাসে আমি হেতা আসবই। আমারে আসতেই হবে।

—কেন?

—সাধু হাসে, বলে—এ মাসটা যে তার যাবার মাস ভাই। আবার আঙুল দিয়ে আকাশ দেখায় সে।

—একটা কথা বলি?

—একটা কেন গো, হাজারটা বল। সাধু আমার কাঁধে হাত রাখে।

—বৌকে যদি ভুলতে নাই পারলে তবে এ-পথ ধরলে কেন?

আবার সেই প্রশান্ত হাসি। সাদা-কালো দাড়ির আড়ালে ঝকঝকে দাঁতগুলো দেখা যায়।

—বৌকে ভোলা যায়, কিন্তু ভালবাসারে ভোলা যায় না গো ভাই। সে যে আকাশের থিকে বড়,—আরও ছড়ানো আরও গভীর। সে ভালোবাসা যদি বৌ হোয়ে দেখা দেয় তো কি করিব আমি বল? আর একটা কথা ভায়া। সাধু পুরোপুরি হতি পারি নি যেমন, অসাধুও হই নি। মোর কোনও চেলা নাই, মন্তরও দেই নি কাউরে, গুরুও নাই কেউ। মোর গুরু বল, চেলা বল, আমিই সব।

—তুমি প্রতি বছর আস? ফাল্গুনে মাসে? বিন্ধ্যবাসিনীর মেলায়?

—আসি। সে কথাই তো বলছেলুম তোমায়।

—বছর কুড়ি আগের কথা হবে। অঘ্রানের শেষাশেষি সেটা। শুভদিন দেখি দেবীর প্রতিমা বানানোর কাজে হাত দেওয়া হোল। ধুমধাম করি পুজো-আচ্চা দিয়ে মন্তর পড়ি মাটি কাটা শুরু হোয়ে গেল। ছেলে, বুড়ো সবার মনেই ফুর্তি। সন্ধ্যে হোতেই গাঁয়ের ঢাকী ঢুলীর দল ঢ্যাঁড়া পিটায়ে দেল। পাড়ায়, পাড়ায় ঘরে ঘরে বারতা পেঁছে গেল,—মা বিন্ধ্যবাসিনী আসিছেন। তখনও তো তেমন আকাল হয় নি ভাই। জিনিষপত্তরের দাম তখনও তেমন আকাশছোঁয়া হয় নি। সবে আমন উঠিছে ঘরে, লোকের মনে তাই কিছু সাহস আছে আর যা হোক ভাতটা তো জুটিবেই!

আমি তখন এ-গাঁয়েই ছিলুম। মোর শ্বশুরবাড়িতে। মোর বৌ-এর

রূপপুরের পথে মান-দেবতা

সান্নিপাতিক জবর হোয়েছেল। বেশ বাড়াবাড়ি। মন মেজাজ খারাপ। ঢাকের বাদ্যি শুনে আরও খারাপ হোয়ে গেল। শয্যার পাশে বসি বসি জবরে রোগা মানুষটারে দেখি। মোরে দেখে কেবল সেই এক কথাই বলে—নবমীর মুণ্ডুনাচ দেখাতি নেবানা মোরে,—বলনাগো নেবা-না মোরে?

—নবমীর মুণ্ডুনাচ কি সাধু? প্রশ্ন করি আমি।

—বলছি। আজ তো সবে ষষ্ঠী। আসল পূজা হবে শুক্লা সপ্তমী থিকে। দেবীমূর্তি দেখিছ?

বলি—হ্যাঁ! কি চমৎকার! চক-চকে সোনার মত রঙ, আট হাত, তিন চোখ, জোড়াসিংহের পিঠে আসন, তার ওপর মহারাণীর সাজে দেবী বসে আছেন!

বর্ণনা শুনে সাধু উৎসাহ বোধ করে। বলে পুতুলগুলো দেখ নি?

—দেখেছি বৈকি। দেবীর দুপাশে ছোট ছোট মাটির পুতুল, একটার ওপর আর একটা কেমন সুন্দর বসানো আছে, দেখতে বেশ লাগে।

সাধু বলে—নবমীর দিনই সবচেয়ে বেশি ঘটা। মুণ্ডুনাচের উৎসবটা ঐদিনই হয়। দেখিবে, কত লোক আসিবে নৃত্য দেখিতে। নবমীর দিন পাঁঠা আর মহিষ বলি পড়িবে। মহিষের মুণ্ডু নিয়ে উন্মত্ত নাচ নাচিবে ভক্ত্যার দল। বামুন বল, কায়েত বল, মাহিষ্য বল আর বাগদী বল :—মুণ্ডুর তরে সব কাড়াকাড়ি শুরু করি দিবে। সে এক দৃশ্য গো ভাইজীবন! গুরু-লঘু মান্যি নাই, জাতিবিচারের প্রেয়জন নাই, সব বয়সের সব্বজন হুড়োহুড়ি লাগায়ে দেছে। বাড়ির ছাদে মানুষ, গাছের ডালে মানুষ, মানুষের কাঁধের উপরে মানুষ, যেদিকেই তাকানো যায়, শুধু মানুষের মাথা।

ভারতের
আদিতম
রসায়ন

চ্যবনপ্রাশ

আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত

চ্যবনপ্রাশ নুতন ও পুরাতন সর্দ্দি কাশি, স্বরভঙ্গ ও শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় বিশেষ উপকারী।

টনিক হিসাবে নিয়মিত ব্যবহারে দেহের দৌর্ব্বল্য ও রুগ্নতা দূর করে ও শরীরের পুষ্টি সাধন করিয়া স্বাস্থ্যশ্রীর পুনরুদ্ধার করে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা বোম্বাই কানপুর

আর কত দূরে মেলা?

—গড় দেখতি হাজির হোয়েছে সবাই। একঘণ্টারও বেশি সময় মুণ্ডুর নাচ চলিবে। তোমারে এবার দেখাব সে জিনিষ।

সাধুর কণ্ঠে আন্তরিকতা ঝরে। আমি বলি—বেশ তো, দেখিও।

উঠতে যাব। এমন সময় জন-চারেক লোক এসে দাঁড়াল। সাধু যেন কেমন চঞ্চল হোয়ে উঠল—ওদের দেখে। কারা এরা, কি চায়?

একটু পরেই বোঝা গেল এরা কে, কেনই বা এসেছে। ওদের একজন ডাকল:

—রাখাল?

সাধু বলল—বলি ফেলেন।

—ক'দিন হোল এসিছ, একবার বাড়ি যেতি নেই?

—সি কতা তো কত্‌বার কত্‌দিন বলেদেছি বড়দা আমি যাব না, যেতি মন চায় না মোর! তবু কেন ডাকেন বলেন?

বড়দার মুখটা ম্লান হোয়ে যায়, তবু হাসতে চেষ্টা করেন।—রাখাল, বাড়িতে আসতি চাও না কিন্তুক ফি বছর ফাগুন মাসে গাঁয়ে আস কেন?

সাধু এমন কথার জন্য প্রস্তুত ছিল না। মুখ কাঁচুমাচু করে অন্যদিকে তাকায়।

বড়দা আবার বলেন—রাখাল আমি সব বুঝি। যার জন্যি তুমি আজ ফকির, যার জন্যি প্রত্যেক ফাগুনে তোমার হেতা আসা, তার ঘরে যদি একবার একদণ্ডের তরেও যাও তো তার আত্মা খুশি হবে।

এবার সাধুর মুখ খোলে—বড়দা গোটা দেশজুড়ে, হাজার মানষের মুখের উপরে ছায়া ফেলি সে আমারে ডাকে। ঘরে তারে পাব কোথায় বলেন?

বড়দা তবু বলেন—সব মানি রাখাল, জানি সব। তবু কেন তুমি ফাগুন মাসে আস তার উত্তর দাও। আসল কতাডা সবাই বোঝে ভায়া, তুমি পুরো সাধু নও।

সাধুর চোখে জল এসেছে ইতিমধ্যে। আড়াল করতে যায় কিন্তু পারে না। বলে—বড়দা সেজন্যি মোর দুঃখু নাই তেমন। সাধু হোতি গিয়ে খানিকটা মানুষ হোয়ে গেছি এটাই পরম লাভ মোর।

এবার বড়দার সঙ্গীরা সব কথা বলল। বুঝলুম এরাও রাখাল সাধুর শালা। ভগ্নীপতিকে এত ভালবাসে কেউ! ওরা বলল,—তত্ত্বকতায় কাজ নাই অত। তোমারে বাসায় যেতি হবেই। মায়ের অসুখ,—দেখতি যাবা চল। আর যদি সোঝা কতায় কাজ না হয় তো—কথা শেষ না করেই ইসারা করে তারা—ধরে নিয়ে যাবে।

একতারা আর ছেঁড়া ঝোলাটা মাটি থেকে তুলে নেয় রাখাল, তারপর ভাঙা গলায় বলে,—চলো। যাবার আগে আমায় বলে—নবমীর দিন থাকিবে। দুজনে মুণ্ডুনাচ দেখিব।

সাধু যায় আর ফিরে ফিরে তাকায়, হাত নেড়ে নেড়ে ইসারা করে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবি,—রাখাল সাধু ভালবাসার সাধনা করছে, আর তার সাধুত্ব যে খাঁটি তাতে কোনও সন্দেহই নেই। মুগ-কল্যাণের অবিনাশ রায়কে মনে পড়ছে,—শাঁখারী অবিনাশ। সে বলেছিল, "মা না হোতে পারলে বুঝি মেয়েদের পূর্ণতা আসে না। সে থাকলে শুধোতুম, ভাল বাসতে না জানলে কি মেয়ে, কি পুরুষ, কেউই পূর্ণ হয় কি না?*

---

*আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত

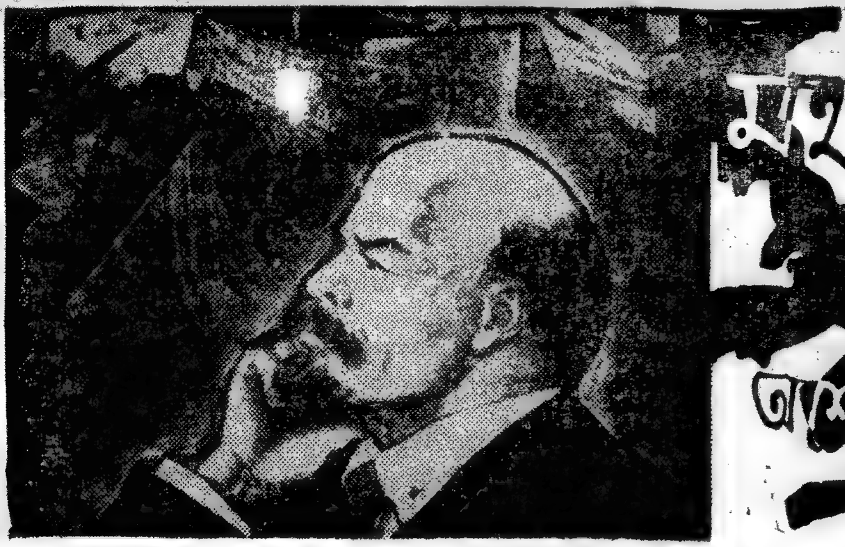

মহানায়ক লেনিন

অশোক সেন

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

[আলো জ্বললে দেখা যাবে কথক এসে দাঁড়িয়েছেন ঃ]

কথক—সুখানোভার বাড়িতে সেন্ট্রাল কমিটির সভায় লেনিনের সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হল। প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন মাত্র দু'জন সভ্য—কামেনেভ এবং জিনোভিব। ১৬ই অক্টোবর লেনিন সেন্ট্রাল কমিটি এবং শ্রমিক সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিদের যুগ্ম অধিবেশনে আবার ভাষণ দিলেন—এখানেও তিনি অবিলম্বে সশস্ত্র গণবিপ্লব শুরু করবার স্বপক্ষে সুতীক্ষ্ম যুক্তির অবতারণা করলেন। সভায় আবার বিপুল ভোটে লেনিনের প্রস্তাব গ্রহণ করা হল। সভার শেষে সশস্ত্র বিপ্লব পরিচালনার জন্য রেভোল্যুশ্যনারী মিলিটারী সেন্টারের প্রতিষ্ঠা করা হল—এর সভ্য নির্বাচিত হলেন এ এস বুবনভ্, এফ ই জারঝিনস্কি, ওয়াই এম ভার্ডলভ, জে ভি স্টালিন এবং এম এস উরিটস্কি। লেনিন এবং সেন্ট্রাল কমিটির নেতৃত্বে অত্যন্ত সুসম্বদ্ধভাবে সারা দেশে সশস্ত্র বিপ্লবের আয়োজন আরম্ভ হয়ে গেল। নিয়মিতভাবে বলশেভিক বিপ্লবীদের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে সেন্ট্রাল কমিটির নির্দেশ আসতে লাগল, কিভাবে বিদ্রোহাত্মক সংগ্রাম চালাতে হবে কেরেনস্কি সরকারের বিরুদ্ধে। সেন্ট্রাল কমিটির সভ্যরাও নানা জায়গার বিপ্লবী ঘাঁটিগুলোতে গিয়ে সশস্ত্র বিপ্লবের সংগঠনের সাহায্য করতে লাগলেন। দুর্দমনীয় তেজস্বিতা এবং অসীম আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে লেনিন মেহনতী মজদুর, শ্রমিক, কৃষকদের চরম আঘাত হানবার জন্য প্রস্তুত করে রাখলেন। রাশিয়ার বঞ্চিত, শোষিত, ক্ষুধিত, পীড়িত, সর্বহারা জনগণ যেন একটা বিরাট বারুদের স্তূপে পরিণত হয়েছিল। মহানায়ক লেনিনের মুখনিঃসৃত চরম আদেশের জন্যই তারা ছিল অপেক্ষমাণ—যে আদেশ একটা স্ফুলিঙ্গের মত এসে পড়ে সেই বিরাট বারুদস্তূপে ঘটাবে এক প্রচন্ড বিস্ফোরণ, আর যার ফলে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হবে ধনতন্ত্রবাদী শোষকশ্রেণীর শয়তানগুলো—যারা এতকাল ধরে শ্রমিকশ্রেণীর রক্তশোষণ করে ক্রমান্বয়ে স্ফীত করে তুলেছে নিজেদের মুনাফার অঙ্ক।

[ব্ল্যাক আউট। আলো জ্বললে দেখা যাবে পেট্রোগ্র্যাডে মার্গারিট ফোফানোভার বাড়িতে রেভোল্যুশ্যনারী মিলিটারী কমিটির কয়েকজন সভ্য এসে হাজির হয়েছেন। লেনিনের সঙ্গে সবাই আলোচনারত। আর আছেন ই রাজা ও এম ফোফানোভা।]

লেনিন—হ্যাঁ, স্মলনিই হবে আমাদের বিপ্লব পরিচালনার প্রধান কর্মকেন্দ্র।

বুবনভ—কামেনেভ এবং জিনোভিব নোভায়া ঝিন্-এ বিবৃতি দেবার পর থেকেই কেরেনস্কির সরকার আমাদের সশস্ত্র বিপ্লবকে দমন করবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

লেনিন—আমার কাছে খবর এসেছে যে কেরেনস্কি সরকার ঠিক করেছে, পঁচিশে অক্টোবর, অর্থাৎ 'সেকেন্ড কংগ্রেস অভ সোভিয়েটসের' শুভ উদ্বোধনের দিনে ওরা আমাদের ওপর চরম আঘাত হানবে।

জারঝিনস্কি—আমরা কিভাবে প্রস্তুত হব?

লেনিন—আমাদের সশস্ত্র বিপ্লব শুরু হবে একদিন আগে, অর্থাৎ ২৪শে অক্টোবর।

[ব্ল্যাক আউট। মাইকের থেকে কণ্ঠস্বর বলবে ঃ "২৪শে অক্টোবরের ঘটনাগুলো পর্দায় প্রতিফলিত দেখতে পাবেন।"

এরপর সিনেম্যাটোগ্রাফীর সাহায্যে ১৯১৭ সালের ২৪শে অক্টোবর ঘটনাগুলো পর পর দেখানো হবে ঃ]

২৪শে অক্টোবর ১৯১৭ সালের ঘটনা ঃ (সিনারিও টেকনিকে লেখা)

প্রথম ঘটনা ঃ রাত্রি শেষে। রাত্রির অন্ধকার মাত্র শেষ হয়ে আসছে। বলশেভিকদের দৈনিক কাগজ Rabochy Put-এর ছাপাখানা এবং অফিসের ওপর এসে হামলা করতে শুরু করলো সামরিক সরকারের ক্যাডেট দল। এরা টাইপগুলো নিয়ে ভাঙতে থাকবে এবং যে কাগজগুলো ছাপা হয়ে গেছিল সেগুলো বাজেয়াপ্ত করে নেবে। এরা নিম্নোক্তভাবে কথা বলতে থাকবে ঃ

একজন ক্যাডেট—বলশেভিক ব্যাটাদের এবার এমন শিক্ষা দিতে হবে যাতে আর কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারে।

অপর ক্যাডেট—এ কাগজ আর কখনও ছেপে বের হবে না।

তৃতীয় ক্যাডেট—এ ছাপাখানা এখন থেকে কেরেনস্কি সরকারের।

এবার সকালের আলো ফুটে উঠবে। কিছুক্ষণের মধ্যেই কয়েক রাউন্ড মেসিন-গান এবং বন্দুকের গুলীর আওয়াজ শোনা যাবে। মার্চ করতে করতে এগিয়ে আসবে রেড্ গার্ডস এবং বলশেভিক সৈন্যবাহিনী। আর তাদের পেছনে আসবে অসংখ্য সশস্ত্র মজদুর, শ্রমিক এবং কৃষকের দল। খন্ডযুদ্ধ হবে দুই দলে —কেরেনস্কি বাহিনীর কিছু মরবে এবং বাকী আত্মসমর্পণ করবে।

বলশেভিকরা গান ধরবে—

এক মন এক প্রাণ
হবে দূর অপমান
আমরা হলাম ভাই ভাই
ঝঞ্ঝায় সংগ্রামে
জানি রক্তের দামে
মোরা এক হয়েছি সবাই
আজি মোরা তৈরি
কে যে দেশবৈরী
কে যে নিপীড়ক আছে জানা...

ফেড্ আউট

দ্বিতীয় ঘটনা : ঘন্টা দুয়েক বাদে—দু' হাজার প্রতিক্রিয়াশীল সৈন্যবাহিনী উইন্টার প্যালেস রক্ষা করবার জন্য এসে হাজির হবে—তারা জিগির দিতে থাকবে : "কেরেনস্কি সরকার জিন্দাবাদ। লেনিন আর তার বলশেভিক পার্টি নিপাত যাক্।"

একটি বড় হল ঘরে কেরেনস্কি এবং তার অফিসাররা বসে আছে দেখা যাবে। তাদের পরামর্শ দিতে এসেছে আমেরিকান ও বৃটিশ এ্যামব্যাসেডররা এবং অন্যান্য বৈদেশিক শক্তির দল।

বৃটিশ রাজপ্রতিনিধি বুকানান—মিস্টার কেরেনস্কি, আপনার ভয়ের কোন কারণ নেই। কঠিন হস্তে বলশেভিকদের বিদ্রোহ দমন করুন—বৃটিশ গভর্নমেন্ট আপনাকে সব রকম সাহায্য দিতে প্রস্তুত।

কেরেনস্কি—আমার অসংখ্য সৈনাবাহিনী —বলশেভিকদের বিষদাঁত যদি ভেঙে দিতে না পারি তো আমার নাম কেরেনস্কি নয়।

আমেরিকান রাষ্ট্রদূত ফ্র্যান্সিস—আপনি মনে কোন ভয় রাখবেন না মিস্টার কেরেনস্কি। বৃটিশ সরকারের মত আমেরিকান সরকারও আপনাকে সবরকমে সাহায্য দেবে। বলশেভিক কুকুরগুলোকে শায়েস্তা করবার একমাত্র উপায় হচ্ছে বন্দুক এবং মেসিন-গান। কমিউনিস্টগুলো একবার যদি এদেশে শাসন ক্ষমতা অধিকার করে বসে, তাহলে ক্রমে ক্রমে সমস্ত পৃথিবীতে ওরা নিজেদের শয়তানীতে ভরা মন্ত্রগুলো ছড়িয়ে দেবে।

অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিরা—বৃটিশ এবং মার্কিন সরকারের মত আমরাও আপনাকে সবরকমে সাহায্য করবো মিস্টার কেরেনস্কি।

কেরেনস্কি—আপনাদের এই সাহায্যের প্রস্তাবের জন্য আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। যদিও আমার মনে হয় আমার নিজের সৈন্যবাহিনীই পারবে।

ফেড্ আউট

তৃতীয় ঘটনা : দুপুরবেলা—পেট্রোগ্র্যাডের শহরের শেষে একটি বড় ফ্যাক্টরী —শ্রমিকেরা নানা স্থানে জড় হয়ে জটলা করছে— কেউ কাজ করছে না—সবার হাতেই নানা রকমের হাতিয়ার—বন্দুক, লোহার রড, রাইফেল ইত্যাদি। ফ্যাক্টরীর মেসিনগুলো সব বন্ধ। শহর থেকে ফ্যাক্টরী আসবার রাস্তায় সব দোকানগুলো বন্ধ। রাস্তায় লোকজন নেই। একটি ল্যাম্পপোস্ট থেকে একটি কুশপুত্তলিকা ঝুলছে—তার বুকে একটি প্ল্যাকার্ড সেঁটে দেওয়া হয়েছে, তাতে লেখা "বৃটিশ ও মার্কিনের পোষা কুত্তা দেশবৈরী কেরেনস্কি।"

ফেড্ আউট

চতুর্থ ঘটনা : দুপুরবেলা—ওপরের ফ্যাক্টরীর থেকে কিছু দূরে অবস্থিত একটি শ্রমিকের বাড়ির রান্নাঘর—ঐ ঘরের জানালা দিয়ে ল্যাম্পপোস্টটা দেখা যায়। এক বৃদ্ধা স্টোভের ধারে চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর দৃষ্টি সুদূরপ্রসারী—মুখভাবে চিন্তা এবং ভয়। জানালার সামনে দাঁড়িয়ে একজন যুবতী একটি পুরুষের কোট পরিষ্কার করছে—তার দৃষ্টি খোলা জানালা দিয়ে গিয়ে পড়েছে ল্যাম্পপোস্টে ঝুলতে থাকা কেরেনস্কির কুশপুত্তলিকার ওপর।

মাঝে মাঝে দূর থেকে বন্দুকের আওয়াজ এবং মেসিনগান-ফায়ারের শব্দ ভেসে আসছে। যুবতীর হাত থেকে ব্রাশটা পড়ে যাবে—সে জানালার ধারে গিয়ে আরও ভালভাবে, কোন্ দিক থেকে গোলমালের শব্দ আসছে তা শুনতে চেষ্টা করবে। বৃদ্ধা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবেন।

"ওরা এখনও যুদ্ধ করছে", ক্লান্তভাবে

'অক্টোবর বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!' (ভি. ভি. কুজনেৎসবের আঁকা ছবি)

বলবেন বৃদ্ধা। "কখন গোলমাল থামবে?"

ইতিমধ্যে যুবতী নিচু হয়ে রাশটা তুলে নিয়েছিল—সেটা দিয়ে কুশপুত্তলিকার দিকে ইংগিত করে বলবে—"থামবে? যখন ঐ হতভাগা দেশবৈরীকে ফাঁসীকাঠে ঝোলাবে।"

ফেড্ আউট

পঞ্চম ঘটনা ঃ দুপুরবেলা— শহরের একটি বড় রাস্তায়—রাস্তার শেষে একটা বড় বাড়ি—বাড়িটা ছিল সরকারের অফিস—বলশেভিক এবং মেহনতী মানুষেরা আজ খণ্ডযুদ্ধে অধিকার করে নিয়েছে। রাস্তাটায় লোকজন নেই—রাস্তার ধারের দোকানপাট সব বন্ধ—কয়েকটা দোকান-ঘরের জানালাগুলো ভেঙে গেছে—রাস্তার মাঝে ট্রাম লাইনে একটি ট্রামগাড়ি উল্টে পড়ে আছে। কিছু দূরে একটা সরকারী সৈন্যের মৃতদেহ পড়ে আছে—তার বুকের ওপর কার্ট্রিজ-বেল্ট ঝোলানো—তার রাইফেলটা সামনে পড়ে আছে—সে উপুড় হয়ে পড়েছে—হাত দুটো সামনে ছড়ানো। একটা বাড়ির কোণ থেকে একজন শ্রমিক বন্দুক হাতে মৃতদেহটার দিকে এগিয়ে আসবে—কিছু দূর থেকে মেশিনগানের গুলীর ঝাঁক তার দিকে আসবে—সে মৃত-দেহটার পাশে শুয়ে পড়বে। কিছুক্ষণ বাদে অল্প উঠে মৃত সৈনিকের কার্ট্রিজ-ভরা বেল্টটা খুলে নেবে—বুকে ঠেলে এগিয়ে রাইফেলটাও নেবে—তারপর হামা-গুড়ি দিয়ে যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে পালিয়ে যাবে।

ফেড্ আউট

ষষ্ঠ ঘটনা—একটা বড় বাড়ির সামনে বিরাট প্রাঙ্গণ। কয়েকজন সশস্ত্র বিপ্লবী শ্রমিক এবং মহিলা সেখানে ভিড় করে আছে। পূর্বোক্ত শ্রমিক সেখানে ছুটে এসে ওদের কার্ট্রিজ-বেল্ট এবং রাইফেলটা দেবে।

১ম শ্রমিক—তোমার ভাগ্য ভাল যে ফিরে আসতে পেরেছ।

২য় শ্রমিক—ওদিকে যে এখনও কিছু সরকারী সৈন্য লুকিয়ে আছে আমরা ভাবতে পারি নি।

১ম মহিলা—মেশিনগানের আওয়াজ শুনে আমরা ভাবলাম তোমাকে ওরা মেরে ফেললো।

পূর্বোক্ত শ্রমিক—গুলীর আওয়াজ হতেই আমি শবটার পাশে শুয়ে পড়লাম। ওরা বোধ হয় ভাবলো ওদের গুলী খেয়ে আমি মরে গেছি। কিছুক্ষণ বাদে আমি জিনিসগুলো নিয়ে পালিয়ে এলাম।

৩য় শ্রমিক—যাক অনেকগুলো কার্ট্রিজ আর একটা রাইফেল লাভ হল।

স্মলনিতে লেনিন—১৯১৭ সাল

ফেড্ আউট

সপ্তম ঘটনা ঃ ভোরবেলায়—কেরেনস্কি সরকারের ক্রমাগত মন্ত্রণা সভা বসছিল উইন্টার প্যালেসে। প্রথমত দেখা যাবে একটি এ্যান্টিচেম্বার—বেশ বড় ঘরটি। ভেলভেটে মোড়া একটি সোফা—দুটি বিরাট জানালার মাঝের জায়গাটায় একটা বড় টেবিল—জনকয়েক মন্ত্রী বসে আছেন চেয়ারে—কেউ কেউ বসেছেন ভেলভেটে মোড়া সোফায়—একটি চেয়ারে বসে কেরেনস্কি কাগজপত্র দেখছেন। একজন সেক্রেটারী এসে কয়েকটি চিঠি কেরেনস্কির হাতে দেবে। চিঠিগুলো খুলে কেরেনস্কি পড়বেন—মন্ত্রীর দল জিজ্ঞাসুভাবে তাঁর দিকে চাইবে।

কেরেনস্কি—নর্দার্ন এবং ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টের কমান্ডারদের লিখে পাঠিয়েছিলাম ওখানকার বিশ্বাসী সৈন্যদের অবিলম্বে আমাদের জন্য পাঠিয়ে দিতে। দু' জায়গা থেকেই জবাব এসেছে এখন আর তা সম্ভব নয়—কারণ বেশির ভাগ সৈন্য বলশেভিকের দলে।

ফেড্ আউট

অষ্টম ঘটনা ঃ বিকেল পাঁচটা—দেখা যাবে দলে দলে বিপ্লবী সৈন্য এবং ক শ্রমিকের দল অধিকার করে নিচ্ছে পে অফিস, টেলিগ্রাফ অফিস এবং অন্য সরকারী অফিসগুলো। সরকারপ মিলিটারী ক্যাডেটস্ এবং কসাক বলশেভিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চা না।

রাত্রি নটায় বলশেভিকরা সেন্ টেলিগ্রাফ অফিস এবং পেট্রোগ্রাড টে গ্রাফ এজেন্সী অধিকার করে নেবে।

ওপরের দৃশ্যগুলো মূক ছায়াচি দেখানো হবে।

ফেড্ আউট

নবম ঘটনা ঃ রাত্রি দশটা এগারোটার ভেতর দেখা যাবে আই রাখিয়ার সঙ্গে লেনিন চলেছেন বি সঙ্কুল পেট্রোগ্র্যাডের পথ দিয়ে স্মল দিকে—তাঁর পরনে একটি পুরনো ওভ কোট, মাথায় ক্যাপ এবং গলায় জড় একটি বড় রুমালের গলাবন্ধনী।

ফেড্ আউট

দশম ঘটনা ঃ রাত্রি—২৪শে রা রেড গার্ডস নিকোলায়েভস্কি, বলটিক

ওয়ারশ রেল স্টেশন, পাওয়ার স্টেশন, স্টেট ব্যাংক এবং অন্যান্য প্রধান কেন্দ্রগুলো অধিকার করবে। এই সব ঘটনার আলেখ্য এখানে দেখানোর পর—ফেড আউট।

[মাইকে কণ্ঠস্বর শোনা যাবেঃ]

মাইকভয়েস ঃ ২৫শে অক্টোবর সকালের ভেতর পেট্রোগ্র্যাডের প্রায় সমস্তটাই বলশেভিকরা নিজেদের আয়ত্তে এনে ফেলেছিল। কেরেনস্কি সরকার শুধু উইন্টার প্যালেস এবং তার কাছাকাছি অল্প জায়গা, আর জেনারেল হেড কোয়ার্টার্স দখল করে ছিল। ২৫শে অক্টোবর সকাল দশটায় "পেট্রোগ্র্যাড সোভিয়েট অফ ওয়ার্কার্স এণ্ড সোলজার্স ডেপুটিজ" লেনিনের লেখা ম্যানিফেস্টো —"টু দি সিটিজেন্স অভ রাশ্যা"— প্রকাশ করলেন। এই রচনায় মহানায়ক লেনিন বললেন ঃ "যে ব্রতের সাধনার জন্য জনগণ সংগ্রাম শুরু করেছিলেন—অর্থাৎ দেশে শান্তি-স্থাপন, উৎপাদনের ব্যাপারে শ্রমিকদের কর্তৃত্ব স্থাপন, জমিদারী প্রথার বিলোপ এবং বলশেভিক অধিকৃত সোভিয়েট ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা—সেই ব্রত উদ্‌যাপনে আমরা সাফল্য অর্জন করেছি। শ্রমিক, কৃষক এবং সৈন্যবাহিনীর এই বিপ্লব পৃথিবীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।"

২৫শে অক্টোবর বিকেলে একটি শ্রমিক এবং সৈনিকদের প্রতিনিধিদের সভায় লেনিন ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন—

[স্টেজ অন্ধকার থাকবে—লেনিন এসে দাঁড়াবেন তাঁর মুখের ওপর স্পটলাইটের আলো পড়বে।]

লেনিন ঃ কমরেডস ! মেহনতী শ্রমিক এবং কৃষকদের সশস্ত্র বিপ্লবের কথা বলশেভিকরা এতকাল আপনাদের শুনিয়ে এসেছেন। সে বিপ্লব আজ সাফল্য অর্জন করেছে—আপনাদের আর একটি সুখবর দিচ্ছি ঃ আজ সকালে কেরেনস্কি উইন্টার প্যালেস থেকে পালিয়ে গেছেন নর্দার্ন ফ্রন্টের দিকে। কেরেনস্কি সরকারের শেষ ঘাঁটি উইন্টার প্যালেসও আজকের ভেতরই আমরা অধিকার করে নেব—একথা আমি বিনা দ্বিধায় বলতে পারি।

[ব্ল্যাক আউট—অন্ধকারের ভেতর বিরাট হাততালির শব্দ হবে কিছুক্ষণ—সেটা থামলে মাইকভয়েস শোনা যাবেঃ]

মাইকভয়েস ঃ ২৫শে অক্টোবর বিকেল ছ'টায় বলশেভিকরা উইন্টার প্যালেস চারদিক থেকে অবরোধ করে ফেললো। রাত্রি ন'টা প'য়তাল্লিশ মিনিটে ক্রুজার অরোরা থেকে ব্ল্যাঙ্ক সট্ ফায়ার করে আক্রমণ করবার সঙ্কেতধ্বনি করা হল। সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র বিপ্লবী সৈনিকেরা, নাবিকের দল এবং বিদ্রোহী শ্রমিক ও কৃষকেরা উইন্টার প্যালেসের ওপর হামলা শুরু করে দিল। কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধের পর ভেতরের সাময়িক সরকারের রক্ষীরা বুঝতে পারলো এই গণবিপ্লবের প্রতিরোধ করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। তখন তারা বলশেভিকদের কাছে আত্মসমর্পণ করলো। এইভাবেই ১৯১৭ সালের ২৫শে অক্টোবর রাশিয়ার বিপ্লবী শ্রমিক এবং কৃষকের দল মহানায়ক লেনিনের নেতৃত্বে সশস্ত্র বিপ্লব'ক জয়যুক্ত করে রাশিয়ায় ডিক্টেটরশিপ অফ দি প্রলেতারিয়েতের প্রতিষ্ঠা করেছিল।

নেভা নদীতে ব্যাটলশিপ অরোরা—সান নে লেখক (ফটো ঃ উরা ব্রেজমেনেভ)

[মাইকভয়েস থামবার সঙ্গে সঙ্গে স্টেজে আলো জ্বলে উঠবে। দেখা যাবে সমস্ত নটনটী স্টেজের ওপর এসে দাঁড়িয়েছেন। সমবেতভাবে সবাই গান ধরবেন ঃ]

কোরাস—

ভেদি অনশন মৃত্যু তুষার তুফান
প্রতি নগর হতে গ্রামাঞ্চল
কমরেড লেনিনের আহ্বান
চলে মুক্তিসেনা দল॥

অতিক্রান্ত ঐ প্রান্তর গিরিদুর্গ
পূর্ব সীমান্তে ধায় পল্টন
প্রাইমোরিয়ার শেষ দুর্গে
আশ্রয় নিয়েছে দুষমন॥

যুদ্ধলাঞ্ছিত বিবর্ণ লাল পতাকা
মহাগৌরবে ঊর্ধ্বে উড্ডীন
সদ্যসিক্ত রক্তের রঙে
হলো সহস্রগুণ রঙীন॥

চিরস্মরণীয় ইতিহাসে সেই মহাদিন
নিখিল চিত্তে সে কাহিনী প্রচার
মহাগৌরবে লাল পল্টন
শেষদুর্গ করে অধিকার॥

নিশ্চিহ্ন হলো শত্রুসৈন্য
জাহান্নামে দস্যু বিলীন
প্রশান্ত সাগরতীরে
শ্রমিক পতাকা উড্ডীন॥

[অনুবাদক ঃ শ্রীহেমাঙ্গ বিশ্বাস

[এই গানটি শেষ হলেই নটনটীরা রাশিয়ান আন্তর্জাতিক গানটি গাইবেন ঃ]

কোরাস—

জাগো জাগো জাগো সর্বহারা
অনশন বন্দী ক্রীতদাস
শ্রমিক দিয়াছে আজ সাড়া
উঠিয়াছে মুক্তির আশ্বাস।

সনাতন জীর্ণ কু-আচার
চূর্ণ করি জাগো জনগণ
ঘুচাও এ দৈন্য হাহাকার
জীবন মরণ করি পণ।

শেষযুদ্ধ সুরু আজ কমরেড
এস মোরা মিলি এক সাথ
ইনটারন্যাশনাল
মিলাবে মানব জাতি।

[অনুবাদ ঃ শ্রীমোহিত ব্যানার্জি

যবনিকা

'মহানায়ক লেনিন' নাটকের এইখানেই সমাপ্তি।

লোকসঙ্গীতের একাল না আকাল?

মুরশিদ

আমার বাড়ি বন্ধুর বাড়ি
মধ্যে সুরনদী—

মুরশিদের মোকামে তশ্‌রীফ্‌ নিয়ে এলেন কবি জসিমউদ্দীন। সঙ্গে এলেন তাঁর প্রথমদিনকার গানের সাথী বিনয়বাবু, বিমলবাবু আর নমিতা দেবী। সেই মিলাত্‌-এ এলেন কয়েকজন গুণী রসিক, লোকসঙ্গীতের অনুরাগী। আরো এলেন একজন খ্যাতনামা দোতারা-বাদক এবং কয়েকজন বিশিষ্ট লোক-গীতি গায়ক ও গায়িকা। গানের আলাপ হলো গানে গানে। মাঝে মাঝে বয়ান ও চা-পান, আবার গান। চললো সন্ধ্যা থেকে রাত বারটা অবধি। মুরশিদের সাথী দুজন গবেষক হাতে টেপরেকর্ডার ও কাগজ-কলম নিয়ে উৎকর্ণ।

গানে টানে কথা, কথার টানে গান। ছন্দের মাকুতে কথার টানায়, সুরের পোড়েনে তাঁতী কবি শাড়ীর নক্সা তোলেন। কিন্তু মানসপটে অনেক-দিনের ছিটেফোঁটা রঙে তা আঁকা হয়ে থাকে আগে থেকেই। পল্লী-কবির সেই মনের পটের মূলে রঙটি হলো সুর। সুরের গুনগুনানিতেই কথায় পাখা মেলে। নানা অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গান গেয়ে চলেছিলাম আমরা। কাজেই কবি জসিমউদ্দীনও গান ধরলেন। পূর্ববঙ্গের রাখালীয়া গানের বিলম্বিত সুরের সূক্ষ্ম খোঁচগুলি এমন চমৎকার তাঁর গলায় উঠছিল যে, সরল সবুজ গ্রাম্যতার স্পর্শ আমরা সবাই তাতে পাচ্ছিলাম। অথচ গায়ক বলে কিন্তু তাঁর নাম নেই। এ গানই হয়ত রেকর্ড বা রেডিওতে অচল। অন্য যে কোনো শহুরে পল্লীগায়ককে দিয়ে গাওয়াতে গেলে তাঁর গলায় এই গান জল ছাড়া মাছের মত ছটফটিয়ে মরবে।

দোতারার টুংটাং-এর মধ্যেই সমস্যা-মূলক আলোচনায় এসে গেলাম। আগের দিনের সমস্যা—যা লোককবি তাঁর "স্মৃতির পটে" ধরে রেখেছেন। আজকের লোকসঙ্গীতের সমস্যার তীব্রতা বুঝতে গেলে সেদিনের সমস্যার সমীক্ষার প্রয়োজন। "স্মৃতির পটে" জসিমউদ্দীন লিখছেন—

"ইহার কিছুদিন আগে বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ নামক একটি যুবক এই গানটি (গহীন গাঙের নাইয়া) শিখিয়া গ্রামোফোন কোম্পানীতে রেকর্ড করাইতে যায়। তাহার গলাটি বেশ সুরেলা। গ্রামো-ফোন কোম্পানীর মিঃ ভট্টাচার্য এবং কাজী নজরুল ইসলাম গানটি শুনিয়া অভিমত প্রকাশ করেন যে, "পূর্ববঙ্গের ভাষায় এই গানটি রচিত বলিয়া ইহা দেশের সকল স্থানে বোধগম্য হইবে না। এই গানের কমার্শিয়াল মূল্য নাই।"

"ইতিমধ্যে কবি নজরুল ইসলাম 'ও আমার গহীন জলের নদী' এবং 'আমার সাম্পান যাত্রি না লয়' প্রভৃতি কয়েকটি গ্রাম্য-আধুনিক মিশ্র সুরের গান রেকর্ড করাইয়া ফেলিলেন।'... পূর্বেই বলিয়াছি আব্বাসকে গান শেখানো (পূর্ববঙ্গের) সে এক অসামান্য ধৈর্যের ব্যাপার। তখন তার মনে তেমন সূক্ষ্ম সৌন্দর্যানুভূতি জাগে নাই। আমি কোনো গ্রাম্য গানে হারমোনিয়ম বাজান পছন্দ করি না। আব্বাস তাহা মানিত না, আমার রচিত 'আগে জানলে তোর ভাঙা নৌকায় চড়তাম না' গানটিতে আব্বাস এক জায়গায় গান থামাইয়া খানিকক্ষণ হারমোনিয়াম বাজাইয়া লইয়াছে। ইহাতে গ্রাম্য গানের আব-হাওয়া যে কত ক্ষুণ্ণ হইয়াছে তাহা আব্বাসকে বুঝাইতে পারিতাম না। আব্বাস তখন খ্যাতির এমন উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছে যে, সে যেভাবে যাহা গায় তাহাতেই লোকে ধন্য ধন্য করে। পূর্ববাংলার গ্রাম্য গানের যে ঢংটি আছে —তাহা আব্বাসকে কিছুতেই শিখাইতে পারি নাই। কিন্তু আব্বাসের সুরেলা কণ্ঠে গ্রাম্য গান প্রচারের এ বড় সুযোগ হইল। তাই তাহার গানের খুঁটিনাটি দুটি অবহেলা করিতাম।"......

মুরশিদের সঙ্গে আলোচনায় কবি বলেছিলেন: 'লোকসঙ্গীতকে জনপ্রিয় করাটাই ছিল সেদিনকার আসল সমস্যা। এবং তার প্রধান মাধ্যম ছিল গ্রামোফোন কোম্পানী। কাজেই কিছু আপোষরফা করতে আমরা বাধ্য হয়েছিলাম। অবশ্য সেটা কথার দিক থেকে, সুরের দিক থেকে নয়। সেদিন গ্রামোফোনের কর্তারা কেবল 'গ্রাম্য কথাতেই' আপত্তি করতেন—সুরে নয়।'

এখানে আমি বললাম আজকের দিনের সঙ্গে সেদিনের এটা প্রধান পার্থক্য। সেদিন ভাওয়াইয়া ও ভাটি-য়ালীর কেবল কথা পরিমার্জিত করা হতো।

জনসমক্ষে আব্বাস উদ্‌দীন যে প্রথম 'পল্লীগীতি' গেয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিলেন সেটি 'নদীর নাম সই কচুয়া' এই গ্রাম্য গানটির নজরুল কর্তৃক পরিমার্জিত রূপ—'নদীর নাম সই অঞ্জনা'। শচীনদেবও যে প্রথম ভাটিয়ালী গান করেন সেটি ছিল পরিমার্জিত ভদ্র-ভাটিয়ালী—। রচনার দিক দিয়ে এগুলিকে পল্লীগীতি বলা চলে না কিছুতেই। গায়কী এবং মিউজিক ইত্যাদির দিক দিয়েও তার গ্রাম্য চেহারাটাকে পালিশ করে দেওয়া হতো। এখানে জসিমউদ্দীন বললেন, 'সুরের দিক দিয়েও আমরা কিছুটা পরিবর্তন আনবার চেষ্টা করেছি। তখন একই অঞ্চলের প্রচলিত দুই তিন ধরণের সুরের আশ্রয় নিয়েই তা করা হয়েছে কিন্তু কখনো সেই অঞ্চলের লোক-সঙ্গীতের সীমানার বাইরে যাই নি। যেমন: 'আগে জানলে তোর ভাঙা নৌকায় চড়তাম না'—সেই ভাটিয়ালী গানটিতে সারির কায়দায় সঞ্চারী জুড়ে দিয়েছিলাম:

ছল, ছল কল কল
করে জল টলমল
নাহি বল তবু চল
ওরে মাঝি তুই কেন হলি আজ
বিমনা।'
—ইত্যাদি

আমি বললাম আঞ্চলিক সুরের মূল কাঠামোর মধ্যে থেকে ভঙ্গির অদল-বদল লোকসঙ্গীতের ধারাতেই আমরা পাই, লোককবি হিসাবে আপনারও সে অধিকার আছে। এবং গানটিতে আপনার এক্সপেরিমেণ্ট ভালোই হয়েছে, কারণ ভাটিয়ালীর মূল কাঠামোর মধ্যে

মাসিক ১০, টাকার কিস্তিতে লাভ করুন অল ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড ট্রানজিস্টর (জাপান মেক) জনপ্রিয় মূল্য ৩০০,। দেশব্যাপী খ্যাতি আছে। অল স্পীকার ৩ ব্যান্ড, ৮ ট্রানজিস্টর। নাইট-ল্যাম্প ফিট করা। কেবল ইংরেজী বা হিন্দিতে যোগাযোগ করুন।
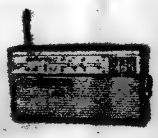
Allied Trading Agencies
(B.C.) P.B. 2129, Delhi-7.

থেকেই সেটা করেছেন। কিন্তু ব্যবসায়িক কারণে বৈচিত্র্য আনবার জন্য এক্সপেরিমেন্ট করাতে বিপদ আছে।

সেই সূত্রেই আবার বললাম—কিন্তু খাঁটি জিনিষকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আপনারা লড়াই করেছিলেন। আব্বাস উদ্‌দীন তাঁর আত্মজীবনীতে লিখছেন: "মাতৃভাষাকে (কুচবিহারী ভাষা) অবিকৃত রেখে গান দিতে পারলাম না। মনে জেগে আছে ক্ষোভ। এই গান বাজারে বের হবার তিন-চার মাস পরে ম্যানেজার-বাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বললেন, "আচ্ছা এবার ঐ ধরণের ভাওয়াইয়া গানই দিন।" আমি বললাম, "দিতে পারি এক শর্তে। আমার দেশের ভাষা-কেই রাখতে হবে অবিকৃতভাবে।"...... তারপর গাইলাম, "ও কি গাড়ীয়ান ভাই কত রব আমি পন্থের দিকে চায়ারে।"

শুধু গ্রাম্যভাষা নয়—গ্রাম্য বাদ্য-যন্ত্রের স্থলে কখনো কখনো অন্য বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করতে হয়েছিল বলে পল্লীপ্রাণ আব্বাস উদ্‌দীন শেষ জীবনে গভীর অনুভূতি দিয়ে লিখে গেছেন যে, ভাটিয়ালী, ভাওয়াইয়া গানে তিনি কানাই শীলের দোতারা ও রাজাবাবুর বাঁশীই বেশি ব্যবহার করেছেন কিন্তু তাঁদের অবর্তমানে তাঁকে দু'-চারখানা পল্লীগীতির রেকর্ড ম্যান্ডোলিন বাদ্য সহযোগে করতে হয়েছিল। সে বিষয়ে আব্বাস আক্ষেপ করে লিখছেন: "গ্রাম্য সুরকে যেমন আমি চির-অবিকৃত রেখেছি, উচিত ছিল সেই সুর যে যন্ত্র-সহযোগে আবহমানকাল ধরে গীত হয়ে আসছে, সেই যন্ত্র ব্যবহার করা।... আজ মনে হচ্ছে সত্যি সত্যি সেভাবে আদৌ এক্সপেরিমেন্ট করা উচিত ছিল না আমার। সারা দুনিয়া আজ তৎপর হয়ে উঠেছে, পল্লীগীতি ও সুর, তার আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতিকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য।...দু'হাজার বছর পরেও যেন আগামী দিনের মানুষ আমাদের অতীত ও বর্তমানের পল্লীসুর ও তাদের আদিমপুরুষের ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রকে সম্ভ্রমের চোখে দেখে।"

আমি বললাম, আপনারা সাময়িক-ভাবে পিছু হটেছিলেন এগিয়ে যাবেন বলে। কবি সেই প্রসঙ্গে বললেন, "এটা শুধু কি আপোষ? গ্রাম্য পরি-বেশ থেকে শহরের পরিবেশে উপস্থিত করতে সেটা কি অপরিহার্য ছিল না? উদয়শঙ্কর প্রথম যে লোকনৃত্য মঞ্চে উপস্থিত করলেন, তা কি গ্রাম্য লোক-নৃত্যের কিছুটা পরিবর্তিত রূপ ছিল না?" আমি সে কথা মেনে নিয়ে বললাম—গ্রামের আটপৌরে জিনিষের মঞ্চ উপস্থাপনার বিশেষ করে মাইকের মাধ্যমে কিছুটা পোষাকী হতে বাধ্য। কিন্তু সে এক কথা আর শহুরে ব্যবসায়ী তাগিদে মঞ্চে উপস্থাপনায়—জামদানী ছাড়িয়ে জর্জেট পরানো আরেক কথা।

কিছুটা পোষাকী উপস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বললেন: যে সব খাঁটি লোক-শিল্পী আমাকে গ্রামে মাতিয়েছিল, কাঁদিয়েছিল, যেমন মমতাজ আলী বা হরিপদ শীল, তাদের শহরে এনে যখন রেকর্ড করালাম তখন সে রেকর্ড—মোটেই বিক্রি হলো না। কবি জসিম-উদ্দীন একথা বলার সঙ্গে তাঁর আত্ম-জীবনীমূলক "স্মৃতির পটে"র কয়েকটি কথা আমার মানসপটে ভেসে উঠলো। বাংলাদেশের একজন শ্রেষ্ঠ দোতারাবাদক ও গায়ক কানাই-এর দলকে নিজের খরচে ফরিদপুর থেকে কলকাতায় রেকর্ড করাবার জন্য নিয়ে আসেন। গ্রামোফোন কোম্পানীর জনৈক ভারপ্রাপ্ত অফিসার তাঁদের গান শুনে মন্তব্য করেন "ইহাদের কাহারও গলার স্বর কলকাতার গায়কদের মত ঘসা-মাজা নয়। ইহারা উচ্চ পর্দায় গান গাহে বলিয়া ইহাদের কণ্ঠস্বরের অনেক জায়গা চিরিয়া গিয়াছে। ইহাদের গান রেকর্ড করিলে সেই ক্ষতচিহ্নগুলি আরও প্রকট হইয়া উঠিবে। রেকর্ড বাজারে বিক্রি হইবে না। ইহাদের গানের ভাবালুতা দেখিয়া আপনি মুগ্ধ হইয়াছেন। রেকর্ডের গানে ঘসা-মাজা কণ্ঠস্বর চাই। ভাবালুতার দাম এখানে অতি অল্পই।"

এই প্রসঙ্গে আমি বললাম, রেকর্ড বা মাইকে গাইতে গেলে গ্রাম্য স্বতঃস্ফূর্ত গলার Pitch-এর তন্ময় খোলাভাবকে অনেক সময় সংযত করতে হয়। কিন্তু অনন্তবালা বৈষ্ণবী, ললিতা দেবী বা নিরঞ্জন সূত্রধরদের মতো পূর্ববঙ্গের গ্রাম্য গায়কদের রেকর্ড তো ভালো বিক্রি হয়েছিল বলেই জানি। কিংবা ভাওয়াইয়া অঞ্চলের নায়েব আলী, কেশব বর্মণ, ধীরেন চন্দ, সুরেন্দ্রনাথ রায়, বসুনিয়ার এঁদের গানও তো খারাপ বিক্রি হয় নি। তবে হ্যাঁ আব্বাস উদ্‌দীনের শচীন দেবের পরিবেশনায় শিক্ষিত "রেওয়াজী গলা"র সচেতন ভঙ্গিমা ছিল, যেজন্য হয়ত তা ভদ্রশ্রেণীর মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছিল। কিন্তু তাঁরা তো কোথায়ও মূল সুরের বিকৃতি করেন নি। এবং গ্রাম্য গায়কীও ধরে রাখতে পেরেছিলেন।

এখানে কবি আরেকটা প্রশ্ন তুললেন। গ্রাম্য কাব্যে নতুন ভাব ও প্রকাশভঙ্গী আসছে। কোনো কোনো গ্রাম্য রচয়িতার মধ্যে রবীন্দ্র-সাহিত্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। যেমন বর্তমান পূর্ব পাকিস্তানের যশোহরের বিজয় কবিয়াল। তিনি রবীন্দ্র-

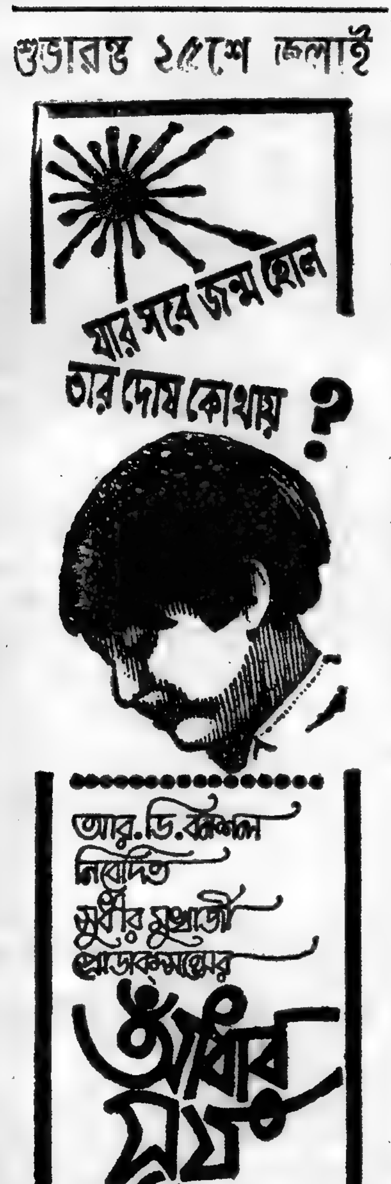

সাহিত্য দ্বারা প্রভাবান্বিত। তিনি গ্রাম্য শ্রোতার সামনে গাইছিলেন যার ভাবটা হলো—'কূল তুমি কূলের বাঁধন খুলে দাও। আমি অকূলের যাত্রী, তাই আমি তোমার কূলে বারে বারে আঘাত করি।' প্রকাশভঙ্গী রাবীন্দ্রিক, অথচ গ্রামের মানুষেরা তা খুব নিচ্ছে। পাকিস্তানের আব্দুল মজিদ যখন রচনা করেন ঃ

আমার শ্যামলা কাঁচ প্রিয়া
আর্শিতে তারে রাখলে পরে
আর্শি যায় ফাটিয়া
কেমনে রাখবে আব্দুল মজিদ
বুকেতে ধরিয়া।...

এটাও নতুন প্রকাশভঙ্গী। আমি বললাম, এ বিষয়ে আমিও একমত। এ বিষয়ে আমার কোনো গোঁড়ামী নেই। বরং আমি মনে করি এ বিষয়ে গোঁড়ামী লোকসঙ্গীতকে চলমান জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে সংগ্রহশালার মৃত বস্তুতে রূপান্তরিত করে। ভাবের ও প্রকাশভঙ্গীর গতিশীলতা কিন্তু সুরের ও গায়কীর রক্ষণশীলতা—লোকসঙ্গীতের রূপান্তরের এই হলো রূপরেখা—এটাই আমার বক্তব্য। কিন্তু নতুন রচনার অধিকার সবাইকার নেই। পল্লীজীবনের ও পল্লীসাহিত্যের মধ্যে ডুব না দিলে এ অধিকার কেউ অর্জন করতে পারে না। এ বিষয়ে অধিকারভেদ আমি মানি। আপনি এ অধিকার অর্জন করেছেন। তাই আপনি যখন দেহতত্ত্বের গানের মুখটা নিয়ে পরে তাতে পল্লীপ্রেম ও প্রকৃতির কথা বসিয়েছেন, তখন কথাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এতো মুখে মুখে বসে গেছে যে, মনে হয় না কারও জুড়ে দেওয়া।

কবি বললেন, অনেক সময় পল্লীগীতির মধ্যে অশ্লীলতাও থাকতো, সেগুলিও নতুন শব্দ দিয়ে ভরাট করে দিতে হতো। আবার কোনো কোনো সময় ভাঙা ভাঙা দু'-তিন কলি পাওয়া যেতো—পুরা গান খুঁজে পাওয়া যেতো না। অথচ সেই ভাঙা কলিগুলি এমন কাব্যমাখা থাকতো যে, ওদের পূরণ করে দেবার লোভও সামলানো যেতো না।...

আমি বললাম, এতে কি অনেক সময় মূল পল্লীগীতি রচয়িতার প্রতি অবিচার করা হয় নি? কবি তা স্বীকার করে নিজেই একটা দৃষ্টান্ত দিলেন। একবার মেগাফোন "পাখী কইও বন্ধুয়ার লাগ পাইলে" গানখানা জসিমউদ্দীনের রচনা বলে রেকর্ড করেন, কিন্তু ফরিদপুর থেকে আইজদ্দী চিঠিতে তাঁর কাছে প্রতিবাদ করে জানান যে, এটা তাঁর গান। কবি দুঃখ প্রকাশ করে তাঁকে চিঠি দেন এবং এ গানের জন্য তাঁর প্রাপ্য সমস্ত রয়্যালটি আইজদ্দীকে পাঠিয়ে দেন।

গ্রাম্য প্রেমগীতির কাব্যমাখা ট্র্যাডিশনাল গান যেখানে এখনো অফুরন্ত সেখানে ভণিতাহীন সেই সহজাত গানগুলিকে উপস্থিত না করে সেই ভাবেরই ঘরে চুরি করে নতুন গান রচনার রেওয়াজও তখন এসেছিল—কারণ সংগৃহীত সহজাত গানে কোন পয়সাও ছিল না—নাম যশও পাওয়া যেত না। যেমন আব্বাস উদ্দীনের ভাই আব্দুল আলিম এমন বহু গান রচনা করেছিলেন যা পল্লীর সহজাত গানেরই হেরফের মাত্র। তাছাড়া সমাজবিকাশের যে স্তরে উত্তরবঙ্গের গান আমাদের কাছে এসেছে সেই ভাওয়াইয়া গানে কোনো ভণিতা থাকে না এবং কে তার রচয়িতা জনসাধারণের মধ্যে এ নিয়ে কোনো কৌতূহলও থাকে না। সার্থক কবি জসিমউদ্দীন কোনো কোনো সময় এমন গান রচনা করেছেন—যা পল্লীগানেরই সামান্য হেরফের মাত্র। বাউল-শ্রেষ্ঠ লালন ফকিরের "কথা কয়রে দেখা দেয় না" গানটির মুখ নিয়ে তিনি তখন যে গানটি রচনা করেছিলেন তা সম্পূর্ণ অসার্থক এবং লালনের প্যারডির মত মনে হয়।

সেই পরিপ্রেক্ষিতেই—কবিকে আমি নতুন রচনার অধিকারী ভেদের কথা বারে বারে বলছিলাম।

লোকগীতিকে জনপ্রিয় করার প্রথম লিককার আন্দোলনের এই সংক্ষিপ্ত নক্সাটি আমাদের মনে রাখা দরকার আজকের সমস্যার চরিত্রটা বুঝতে হলে।

আজকের সমস্যাটা কবির কাছেও তুলে ধরাটাই ছিল আমার আলোচনার মূল লক্ষ্য। তিনি বলেছিলেন, তখন ভদ্রলোকে মোটা খদ্দর পরতে রাজী হতো না বলে অনেক সময় আমাদেরকে জাপানী খদ্দর দিতে হয়েছিল। কিন্তু আমার বক্তব্য হলো, পরে খাঁটি খদ্দর দিতে তাঁরা সমর্থ হয়েছিলেন এবং 'ভদ্রলোকে'ও তা পরতে রাজী হয়েছিল। 'গ্রাম্য-আধুনিক' আধুনিকতার পরিধান পরিত্যাগ করে সর্বত্র প্রবেশ করতে পেরেছিল। কিন্তু আজ ঠিক তার উল্টো। জাপানী খদ্দরেও পোষায় না। জনপ্রিয়তার চূড়ায় উঠতে গেলে প্লাস্টিকের খদ্দর পরতে হয়। সেটাই আপনাকে এখন বলতে যাচ্ছি।

রংঢং

মহিলা শিল্পীমহলের মহৎ উদ্যোগ

মহিলা শিল্পীমহল দুস্থা শিল্পীদের জন্য এক আবাস নির্মাণ করেছেন। এই কাজের জন্য তাঁরা কেবল নাটক ও চলচ্চিত্র জগতের নয়, সকল দেশবাসীর প্রশংসা লাভ করবেন। গত সাত বছর যাবৎ মহিলা শিল্পীমহল দুস্থা শিল্পীদের জন্য একটি আবাস নির্মাণের চেষ্টা করেছেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা নাটক অভিনয় করে অর্থ সংগ্রহ করেছেন এবং নিজেরাও সাধ্যমত চাঁদা দিয়েছেন। এই প্রশংসনীয় কাজের মাধ্যমে মহিলা শিল্পীমহল দেশবাসীর কাছে পরিচিত হয়ে ওঠে এবং সকলে শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে এই সংগঠনের কাজ লক্ষ্য করে। একমাত্র নিজেদের শক্তির ওপর নির্ভর করে যে আবাস তাঁরা তৈরি করেছেন সারা ভারতে তার তুলনা নেই। এই কাজের মধ্য দিয়ে মহিলা শিল্পীমহল যে সংগঠনশক্তির পরিচয় দিলেন তা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অন্যান্য সংগঠনগুলির অনুকরণযোগ্য।

মহিলা শিল্পীমহল গড়চা লেনে এই আবাস নির্মাণ করেছেন। তিনতলা এই বাড়িতে পাঁচটি ঘরে দুস্থা শিল্পীদের থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। গত ২১শে জুলাই আনুষ্ঠানিকভাবে এই আবাসের দ্বারোদ্ঘাটন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে মহিলা শিল্পীমহলের সভানেত্রী শ্রীমতী কানন দেবী এবং সম্পাদিকা শ্রীমতী সাধনা রায়চৌধুরী সমাগত অতিথিদের কাছে তাঁদের প্রচেষ্টা এবং উদ্দেশ্যের কথা জানান।

দুস্থা শিল্পীদের একটি আবাস এবং শেষ জীবনে তাঁদের তত্ত্বাবধান করার মত ব্যবস্থার প্রয়োজনের কথা অনেকদিন থেকে অনুভব করা হচ্ছিল। যাঁরা একসময় নাট্যমঞ্চ আলো করে থাকেন, ছবিতে যাঁদের অভিনয় দেখে দর্শকরা হাততালি দেন, তাঁদেরই অনেকে শেষ জীবনে কপর্দকহীন ও অসহায় হয়ে পড়েন। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 'দেহ পট সঙ্গে নট' কথাটা বলা হয়। কেবল আমাদের দেশে নয় প্রত্যেক ধনতান্ত্রিক দেশেই অভিনেতা-অভিনেত্রীদের এই ত' জীবন। খবরের কাগজে মাঝে মাঝে এরকম দুস্থ শিল্পীদের কথা প্রকাশ করে রিপোর্টাররা আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। পাঠকরা দু'-চার মিনিট স্মৃতি রোমন্থন করেন, তার পরে আবার বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে যান। কয়েক বছর আগে একটি খবর বেরিয়েছিল কোন সময়ের মঞ্চ-নায়িকা, যাঁর অভিনয় দেখার জন্য দর্শকরা অগ্রিম টিকেট করতেন, তিনি আজ গঙ্গার নিকটবর্তী কোন বস্তিতে কয়লার উনুনে হাওয়া করছেন ছেঁড়া কাপড় পরে। অনেক খ্যাতনামা অভিনেত্রী আজ এভাবে বিস্মৃতির অন্ধকারে থেকে দুঃসহ দারিদ্র্যে জীবন কাটাচ্ছেন। খোঁজ করলে সে তালিকা খুব ছোট হবে না। কিন্তু এই অবস্থায়ও তাঁরা মুখ বুজে পরিচিত জনের বাইরে জীবন কাটাচ্ছেন, আত্মসম্মানবোধে সাহায্যপ্রার্থী হন নি। মহিলা শিল্পীমহল এরকম দুস্থা শিল্পীদের শেষ জীবনের আশ্রয় দেবার জন্য হাত বাড়িয়েছেন। সমস্যা খুব বড় এবং একটি সংগঠনের পক্ষে এতবড় কাজ করা সম্ভবও নয়। তাকে সম্ভব করে তোলার জন্য দেশবাসীর যেমন সমর্থন দরকার, তেমন সরকারের সহযোগিতা প্রয়োজন। মহিলা শিল্পীমহল দেশবাসী এবং সরকারের সহযোগিতা যে পাবেন সে-বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। কারণ যাঁরা নিজেদের ওপর বিশ্বাস রাখে, তাদের ওপর বিশ্বাস রাখে সকলে। এই মহৎ কাজের জন্য মহিলা শিল্পীমহলের প্রত্যেক সদস্যকে আমরা অভিনন্দন জানাই। —সুজন।

চিত্র আলোচনা

সোয়ান লেক

রাশিয়ান ব্যালে 'সোয়ান লেক'-এর খ্যাতি বিশ্বব্যাপী। বলশই থিয়েটারে এই ব্যালে প্রথম মঞ্চস্থ হয়েছিল ১৮৭৭ সালে। তারপর থেকে জারের আমলের রাশিয়ায় এবং সোভিয়েট আমলে এই ব্যালে দেশ বিদেশের মানুষের কাছে আকর্ষণের বিষয় হয়ে আছে। যাঁরা সোভিয়েট ইউনিয়নে যান তাঁদের কাছে আকর্ষণের বিষয়সমূহের অন্যতম বলশই থিয়েটারে 'সোয়ান লেক' দেখা। 'সোয়ান লেক'-এর ইতিপূর্বে একটি চিত্ররূপ হয়েছে। তাতে প্রধান ভূমিকা ওদেতে—ওদিলিয়ার ভূমিকায় নেচেছেন বিশ্ববিখ্যাত ব্যালেরিনা মায়া পিসেৎস্কায়া। বর্তমান ছবিটি নির্মিত হয়েছে লেনিনগ্রাডের কিরভ থিয়েটার অব অপেরা এণ্ড ব্যালের শিল্পীদের নিয়ে।

বৈজয়ন্তীমালা

'সোয়ান লেক' একটি উপকথার নৃত্যকাব্য। প্রেমের অমর কাহিনী। সত্যিকার প্রেম সকল অশুভশক্তিকে অতিক্রম করে বিজয়ী হতে পারে—এই প্রত্যায়সৃষ্টিকারী এক অপরূপ নৃত্য। রাজপুত্র সিগফ্রিড যৌবনে উপস্থিত হয়েছে। এই উপলক্ষে উৎসবে অনেক সুন্দরী তার সঙ্গে নাচবার জন্য, তাকে হৃদয় দেবার জন্য ব্যাকুল। কিন্তু রাজপুত্রের মনে ধরে না কাকেও। রাজমাতা আসেন—ছেলের বিয়ের জন্য আগ্রহ নিয়ে—কিন্তু রাজপুত্র মনস্থির করে উঠতে পারে না। সন্ধ্যা নামে—এক দল মরালী উড়ে যায় বনের দিকে। রাজপুত্র যায় শিকারে। শিকারে গিয়ে সে জানতে পারে এই মরালীর দল অভিশপ্ত রাজকন্যারা। তাদের নেত্রী ওদেতে। এক শয়তান যাদুকর তাদের মরালী করে রেখেছে। শাপমুক্ত করতে পারে একমাত্র সত্যিকার ভালবাসা, নিষ্ঠাপূর্ণ প্রেম। রাজপুত্র সিগফ্রিড ওদেতেকে ভালবাসে। যাদুকর নানাভাবে প্রতিবন্ধক সৃষ্টি করল কিন্তু রাজপুত্রকে টলাতে পারল না। অবশেষে নিজের মেয়ে ওদিলাকে ওদেতের মত সাজিয়ে রাজপুত্রকে বিচ্যুত করতে চাইল কিন্তু সিগফ্রিডের মনে ওদেতের ছবি ভেসে উঠতেই সে নিজের ভুল বুঝতে পারল। রাজপুত্র ওদেতের কাছে গিয়ে নিজের ভুল স্বীকার করল। শয়তান যাদুকর শেষ চেষ্টা করল বাধা দেবার, কিন্তু প্রেমের পবিত্রতার কাছে সকল অশুভশক্তি পরাজিত হল। একনিষ্ঠ

প্রেমে মরালীরা আবার মানবী রূপ পেল। প্রেম হল বিজয়ী।

আলোচ্য ছবি 'সোয়ান লেক' চলচ্চিত্রের রূপ রীতি এবং চিত্রগ্রহণের বাহাদুরী ও সম্পাদনার দিক থেকে আগের ছবি অপেক্ষা উন্নত। কিন্তু ট্রাডিশন্যাল নাচের দিক থেকে কিছুটা ব্যতিক্রম এতে রয়েছে। 'সোয়ান লেক' ব্যালেতে যে গাম্ভীর্য ও ক্ল্যাসিক্যাল নাচের গভীরতা রয়েছে এখানে তা কিছুটা চটুল হয়েছে। নাচের কয়েকটি কম্পোজিসন খুবই উল্লেখযোগ্য হলেও—মাঝে মাঝে চটুলতার জন্য কিছুটা ছন্দঃপতনের মত মনে হয়। সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও ছন্দঃপতন কিছুটা সোচ্চার মনে হয়। এই ছবিতে ওদেতে—ওদিলার ভূমিকায় নেচেছেন ইয়েলানা ইয়েভেয়েভা। যাঁরা উলানভার এবং মায়া পিসেৎস্কায়ার সোয়ান দেখেছেন তাঁদের মন ভরবে কিনা সন্দেহ। তথাপি প্রেমের গর্বের বাণী বাহক এই ব্যালে নৃত্য নৃত্যরসিক বিশেষ করে যুবক-যুবতীদের অবশ্য দর্শনীয়। ছবিটি মুক্তি লাভ করবে এলিট সিনেমায়—'অলিভার'-এর পরে।

স্টুডিও খবর

"ত্রিনয়নী মা"

গত রথযাত্রার পুণ্যতিথিতে হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায় প্রযোজিত রূপঋষি চিত্রমের ভক্তিমূলক বাংলা ছবি "ত্রিনয়নী মা"-র শুভ মহরৎ চিত্রজগতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে সুসম্পন্ন হয়েছে টেকনিসিয়ান্স স্টুডিওতে। বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র রচিত কাহিনী ও চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিটি পরিচালনা করছেন—পূর্ণেন্দু রায়চৌধুরী। চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন যথাক্রমে—রামানন্দ সেনগুপ্ত ও অমিয় মুখার্জী।

ছবিটির নিয়মিত চিত্রগ্রহণও ঐ সঙ্গে সুরু হয়েছে। প্রথম দিনের স্যুটিং-এর শিল্পী ছিলেন—আনন্দ মুখার্জী ও সীমা জানা।

অবলোকনী

মস্কো চলচ্চিত্র উৎসব

মেঘ ও রৌদ্র পুরস্কৃত

মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব শেষ হয়েছে। এই উৎসবে বিচারকমণ্ডলীর রায়ে শ্রেষ্ঠ ছবির সম্মান লাভ করেছে কিউবার 'লুসিয়া', ইতালীর 'মেরাকিপে' এবং সোভিয়েট ইউনিয়নের 'আনটিল মনডে'। এই তিনটি কাহিনী-চিত্র স্বর্ণপদক লাভ করেছে।

সত্তরটি দেশ এই উৎসবে যোগ দিয়েছিল।

ভারত থেকে অংশগ্রহণ করেছিল অরুন্ধতী দেবী পরিচালিত 'মেঘ ও রৌদ্র'। আর তথ্যচিত্র 'আই টু—মেক এনিমেটেড কার্টুন'। এছাড়া প্রতিযোগিতার বাইরে আরো কয়েকটি ছবি দেখান হয়েছে। কিন্তু উৎসবে ভারতীয় ছবি বিশেষ কোন রেখাপাত করতে পারে নি। তবে নারীর অধিকারের জন্য নিবেদিত বলে সোভিয়েটের কমিটি অব উম্যান 'মেঘ ও রৌদ্র'-কে একটি পুরস্কার দিয়েছে। বিশেষ করে ভারতের মত দেশে মহিলা পরিচালিকার ছবি এবং তাঁর উপস্থিতি বিবেচনা করে।

মস্কো চলচ্চিত্র উৎসব উপলক্ষে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল উৎসব কমিটি কর্তৃক। এই পত্রিকার নাম 'ফেস্টিভ্যাল স্পুটনিক'। তার প্রথম সংখ্যায় ছিল বলরাজ সাহনীর ছবি। চতুর্থ দিনে বেরিয়েছিল রাজকাপুরের ছবি ; সঙ্গে ব্যালেরিনা রায়া কিনকিনা। এই ব্যালেরিনা 'মেরা নাম জোকার' ছবিতে অভিনয় করেছে।

মস্কো উৎসবে প্রতিযোগিতা করেছে : করিডর (সুইডেন), এ ট্রিপ টু স্কাই (আর্জেন্টিনা), এ উম্যান ফর এ সীজন (রুমানিয়া), আনটিল মনডে (সোভিয়েট), মর্নিং (মঙ্গোলিয়া), কাবাসকাবো (নাইজেরিয়া), হোয়েন দি বেলস স্টার্ট টু টল (যুগোশ্লাভিয়া), এ রিভার ক্লোজ (পাকিস্তান), দি লানফিয়ের কলোনী (চেকোশ্লোভাকিয়া), এ বিট টু ফিয়ার (সংযুক্ত আরব), সামুরাইজ (জাপান)।

উৎসবে অনেক অতিথির মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সোফিয়া লোরেন, মার্চেলো মাস্ত্রয়ানি, মারিনা ভ্লাডি, থেরেসে দিওপ, এরউইন গেসচোনেক, মিউলি ইসনিমুরা, আইরিন পেট্রেসকু, লুইস নোসেন। ভারত থেকে উপস্থিত ছিলেন সরোজা দেবী, বৈজয়ন্তীমালা, অরুন্ধতী দেবী, আই এস জোহার। পাকিস্তান থেকে উপস্থিত ছিলেন শামিম আরা।

বিচারকমণ্ডলীতে ছিলেন ভারতের দেব আনন্দ। তাঁকে অভিনেতা, প্রযোজক, চিত্রনাট্যকার, পরিচালকরূপে ছয় হাজার দর্শকের সঙ্গে পরিচয় করে

মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে অভিনেত্রী-পরিচালিকা শ্রীমতী অরুন্ধতী দেবী

'সোয়ানলেক' নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্য

দেওয়া হয়। অতিথিদের মস্কোর নানা দর্শনীয় স্থানের সংগে লেনিনের জীবনী-চিত্র দেখান হয়েছে।

পূর্ব জার্মানীতে সত্যজিৎ রায়

সম্প্রতি সত্যজিৎ রায় পূর্ব জার্মানীর বার্লিন, লীপজিগ এবং এরফুর্ট গিয়েছিলেন তাঁর ছবি 'হীরো' (গুপী গাইন বাঘা বাইন) প্রদর্শন উপলক্ষে। ছবিটি পশ্চিম জার্মানীর বার্লিন আন্তর্জাতিক উৎসবে প্রতিযোগিতা করেছে। শ্রীরায় বলেছেন—পূর্ব জার্মানীর সাংস্কৃতিক জীবন দেখার আগ্রহ তাঁর অনেক দিনের। তিনি বিভিন্ন স্থানে ছবি দেখাবার সময় দর্শকদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। লীপজিগে ফিল্ম ক্লাবের সভায় উপস্থিত হয়ে নানা প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন পূর্ব জার্মানীর দর্শকরা ভারতীয় ছবির সংগে পরিচিত না হলেও ভারত সম্পর্কে ওঁরা এত খবর রাখেন যে প্রশ্ন শুনে অবাক হতে হয়। চিত্রশিল্প সম্পর্কেও তাঁদের অনেক জ্ঞান।

শ্রীরায় 'বার্লিনার এসেম্বল' থিয়েটারে বার্টোল্ট ব্রেশটের 'আর্তুরো ইউ' অভিনয় দেখেছেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেছেন, 'এই প্রথম আমি বিশ্ববিখ্যাত ব্রেখট থিয়েটার দেখলাম। আমার ধারণার বেশি আনন্দ আমি পেয়েছি।'

পশ্চিম বার্লিনের গভর্নিং মেয়র ক্লাউজ শুৎজ-এর সঙ্গে বৃটিশ অভিনেত্রী জুডি গ্রীসন। মিস গ্রীসন বার্লিন আন্তর্জাতিক উৎসবে পুরস্কার লাভ করেছেন।

রূপোলী পর্দায় পিপ্পি ল্যাংস্ট্রাম্ফ

পশ্চিম জার্মানীতে শিশুসাহিত্যের দশখানা বইয়ের মধ্যে পিপ্পি ল্যাংসম্ট্রাম্ফ পয়লা নম্বরের। চ্যাপ্টা নাক, বেঢপ বিনুনী, আর গায়ে ছিটছিট দাগের ছোট্ট মেয়েটির এই গল্পের বইখানা এই বছর চারমাসের মধ্যে বিক্রি হয়েছে এক লাখ। বইটা লিখেছেন সুইডেনের বাষট্টি বছরের লেখিকা অ্যাস্ট্রিড লিন্ডগ্রেন। পিপ্পি হচ্ছে এক জাহাজী কাপ্তেনের মেয়ে, সোনাভরা এক অদ্ভুত বাড়িতে সে একা থাকে, যাদুর বড়ি বিলোয় আর আশ্চর্য সব গল্প বলে। তার প্রাণের বন্ধু হচ্ছে টমি আর আরেকজন হচ্ছে পিপ্পির সোনা মেরে দেবার চেষ্টায় রত এক দুর্ভাগ্য জোচ্চোর। শীগ্গিরই বইটির ছবি হবে। পরিচালক ওলে হেলবোম ইনগের নিলসন নামে ঠিক পিপ্পির মত একজনকে খুঁজে বের করেছেন।

সের্গেই আইজেনস্টাইন

ইতিহাসের পাতা থেকে

ঐতিহাসিক ছবি

॥ বিশ ॥

তিরিশ দশকের শেষার্ধে কয়েকটি অনন্যসাধারণ ঐতিহাসিক ছবি সোভিয়েট ইউনিয়নে নির্মিত হয়েছিল। অতীতের দিকে কৌতূহল প্রকাশের অর্থ এই নয় যে, বর্তমান দিনের সমস্যাকে উপেক্ষা করছে। ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অতীতকে ঠিকভাবে দেখতে পারলে বর্তমানকে বুঝতে সাহায্য করে এবং ভবিষ্যৎকে দেখা যায়। ফরাসী বিপ্লবে প্রেরণা জুগিয়েছে প্রাচীন রোম; প্রজাতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা এবং কাজের দৃষ্টান্ত পেয়েছে এখান থেকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সোভিয়েট জনগণ অনুপ্রেরণা লাভ করেছে তাঁদের পূর্বসূরীদের কথা চিন্তা করে, যাঁরা বিদেশী আক্রমণ থেকে দেশরক্ষার জন্য অসীম সাহসিকতা দেখিয়েছেন এবং অসাধারণ আত্মত্যাগ করেছেন।

এই দিক চিন্তা করেই সোভিয়েট চলচ্চিত্র নির্মাতারা দূর অতীতের দিকে ক্যামেরাকে ঘুরিয়ে ধরলেন 'পিটার-এক' (পরিচালক ভ্লাডিমির পেট্রভ) 'আলেকজান্দার নেভস্কি' (সের্গেই আইজেনস্টাইন), 'সুভোরভ' (সেভেলোড পুডোভকিন) এবং 'বোগদান ক্মেলনিৎস্কি' (ইগোর সেভচেঙ্কো) ছবিতে।

'পিটার-এক' (দুই খণ্ড ১৯৩৭-৮) আলেক্সি টলস্টয়-এর উপন্যাস অবলম্বনে স্ক্রিপ্ট সিনেমাটোগ্রাফিক কম্পোজিশন, পরিচালক মূল ভাবকে রক্ষা করে সিনেমার উপযোগী করে দৃশ্যগুলিকে তৈরি করে নিয়েছেন। আলেক্সি টলস্টয় নিজে প্রযোজনায় অংশ গ্রহণ করেছেন। এই ছবিতে রাশিয়ার ইতিহাসে বীরত্বপূর্ণ এক অধ্যায় বিবৃত হয়েছে; যখন রুশভূমি যুগ যুগের পশ্চাদগামিতাকে দূর করে অসাধারণ উদ্যম নিয়ে বিশ্ব রাজনীতিতে এক রাজনৈতিক শক্তিরূপে নিজেকে গড়ে তোলে। এখানে পিটারকে রাশিয়ার ইতিহাসে এক অসাধারণ ব্যক্তি হিসাবে, একজন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সংস্কারক হিসাবে উপস্থিত করেছেন, যিনি সাহসের সাথে পুরনো দিনের রীতিনীতি ও সংস্কারকে ভেঙে ফেলতে চেয়েছিলেন। তাঁর সাথে বিবাদ বেধেছিল তাদের—যারা রক্ষণশীলতাকে ধরে রাখতে চেয়েছিল, এবং সেই বিদেশী শত্রুর দল—যারা রাশিয়ার দুর্বলতার সুযোগ নিতে চেয়েছিল।

এই ছবিতে চিন্তার খোরাক যথেষ্ট ছিল। যদিও ছবিটি অতীত এবং বর্তমানের মধ্যে সেতুবন্ধন, কিন্তু ছবিটি ইতিহাসের আধুনিক রূপান্তর করে নি। ঐতিহাসিক মূল্য সম্পন্ন চরিত্রগুলিতে মূল লেখকের ধ্যান-ধারণা পরিস্ফুট হয়েছে। প্রথমত পিটার চরিত্রে—যে চরিত্র দক্ষতার সঙ্গে অভিনয় করেছিলেন নিকোলাই সিমোনভ, দ্বিতীয় পিটারের পুত্র আলেক্সি, যে পিটারের সংস্কার বিরোধীদের নিজের পাশে সমবেত করেছিল; এই চরিত্রে অভিনয় করেন নিকোলাই চেরকাশভ। পিটার এবং আলেক্সির মধ্যে নাটকীয় সংঘাত ছবির একমাত্র বিষয় নয়, এতে কেবলমাত্র ইতিহাসের কাল এবং ঘটনার প্রতিফলন হয়েছে চমৎকারভাবে। ছবিতে জারের মিলিটারি লিডার থেকে কৃষক বিদ্রোহের সময় পর্যন্ত সাধারণ মানুষের ভাগ্যকে দেখান হয়েছে। ছবিতে যুদ্ধদৃশ্যগুলি দেখান হয়েছে বিরাটভাবে। অন্যান্য সব ব্যাপারে ইতিহাস ও সময়ের সঙ্গে নিখুঁত যোগাযোগ রক্ষা করা হয়েছে। একটা কালকে প্রতিফলিত করার দিক থেকে ছবিটি শিক্ষণীয়।

সের্গেই আইজেনস্টাইন ইতিহাসের আরো পেছনে চলে গেলেন। তাঁর আলেকজান্দার নেভস্কি (১৯৩৮) নির্মিত হয় লেখক পিয়তর পাভলেঙ্কো এবং সুরস্রষ্টা সের্গেই প্রোকোফিয়েভ-এর সহযোগে। এই ছবির বিষয়বস্তু সাতটি শতাব্দী পেছনের। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে টিউটনিক নাইটরা, যারা বল্টিক সাগরের পাড়ে ঘাঁটি করেছিল তারা রাশিয়ার দুটি সমৃদ্ধিশালী অঞ্চল পিয়েসকভ এবং নভোগোরদ জয় করতে চেষ্টা করে। বিশ্বাসঘাতকদের সহায়তায় তারা পিয়েসকভ জয় করে। কিন্তু নভোগোরদ-এর নাগরিকরা সুদক্ষ সেনাপতি আলেকজান্দার নেভস্কির কাছে আবেদন করে। এই সুকৌশলী বীর টিউটনিক নাইটদের চাদস্কয়ার তুষার হ্রদে পরাজিত করে, পিয়েসকভকে মুক্ত করে এবং তাদের দ্বারা অধিকৃত রাশিয়ার আঞ্চলিক ভূমি পুনরুদ্ধার করে।

এই ছবিতে চরিত্রগুলি আশ্চর্যজনক: আলেকজান্দার (নিকোলাই চেরকাসভ) এবং তার সহযোদ্ধা লোকগাথার নায়ক ভাসিলি বুসলাই (নিকোলাই ওখলোপকভ) এবং প্রবীণ যোদ্ধা (ডিমিট্রি ওরলভ)। কিন্তু পরিচালকের স্বভাব অনুযায়ী তিনি সর্বদা জনগণের ওপর বেশি জোর দিয়েছেন—, পিয়েসকভ এবং নভোগোরদের তাঁর বিখ্যাত এপিক দৃশ্য—বিশেষ করে তুষারের ওপর নাইটদের পরাজয়ের দৃশ্যে জনগণের সাহস ও ইচ্ছাশক্তিকে এত বড় করে দেখিয়েছেন, কারণ তারা এক সন্ত্রাস, হিংসা ও ধ্বংসের শক্তির বিরুদ্ধে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অভ্যুত্থান করেছে এবং জয়লাভ করেছে। বিশ্ব চলচ্চিত্রে আর কোন যুদ্ধদৃশ্য প্রেরণা ও নৈপুণ্যের দিক থেকে এই দৃশ্যের সমকক্ষ নয়।

এখানে গভীরভাবে ভাব প্রকাশক কয়েকটি দৃশ্য আছে; যেমন—পিয়েসকভে ধৃত নারীদের প্রতি টিউটনদের বর্বর ব্যবহার, বৃদ্ধ এবং শিশুদের প্রতি নিষ্ঠুরতা। এই ছবি মুক্তিলাভের কিছুকাল পরে নাৎসি অধিকৃত সোভিয়েট অঞ্চলে নারী, শিশু বৃদ্ধদের প্রতি ব্যবহার টিউটনদের বর্বরতার কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল।

—ক·স·গ

কিস্তিতে ট্রানজিস্টর

ন্যাশন্যাল ডিল্যুক্স"

১০৲ মাসিক কিস্তিতে ৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টর লাভ করুন। প্রতি গ্রাম ও শহরে প্রেরণের যোগ্য। আবেদন করুন:

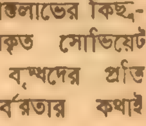

Music & Sound (B.W.C.—10)
Post Box 1576, Delhi—6.

কোথায় আছি

কলকাতা ময়দানের হাল দিনে দিনে এমন জায়গায় গিয়ে পেঁাচচ্ছে যে, মুশকিল আসানের পথ খুঁজে পাওয়া এখন রীতিমত কণ্টকর। সমস্যার যেন আর শেষ নেই। একটার পর একটা লেগেই আছে। কথায় বলে, হাতী কাদায় পড়লে ব্যাং-এও লাথি মারে—ময়দানী ফুটবলের অবস্থা এখন অনেকটা সেই রকমই। শুধু এ-কথা বললে বোধহয় সবটা বলা হবে না। বরঞ্চ বলতে হবে, বর্তমানে কলকাতার ময়দানী ফুটবলের হাল কাদায় পড়া হাতীর চেয়েও শোচনীয়। পরিস্থিতি দিনের পর দিন এমনই খারাপ হয়ে গেছে, অবস্থা এতোই নিচে নেমে গেছে যে, সেখান থেকে ফিরে আসার কিম্বা অন্ধকার থেকে আলোর পথ খুঁজে পাওয়া বোধহয় আজ শুধু মাত্র মুশকিলই নয়, একরকম অসম্ভবও। কলকাতার ফুটবল যে দিনের পর দিন কোথায় এগিয়ে চলেছে, কিম্বা আর কতোদিন ধরে আর কতো নোংরামির মধ্যে দিয়ে যে ময়দানী ফুটবলকে এগিয়ে যেতে হবে—তা বোধহয় আজ আর কেউই বলতে পারবেন না—আই, এফ, এ-ও না, কলকাতা ময়দানের ছোট কিম্বা বড় ক্লাবগুলোর কর্তৃপক্ষরাও না। কিন্তু কোথায় চলেছি আমরা? কোন্ পথে আজ চলেছে কলকাতা তথা বাংলাদেশের ফুটবল খেলা। ভারতীয় ফুটবলের পথিকৃৎ বাংলাদেশের ফুটবল খেলা আজ এমন একটা অবস্থায় এসে পেঁাচেছে—যখন শুধু আমাদের ভাগ্যে জুটছে উপহাস, জুটছে কটু মন্তব্য। ভিন্ন প্রদেশে গিয়ে ভিন্ন প্রদেশীয়দের কাছ থেকে এইসব মন্তব্য শোনার অভিজ্ঞতা যে কতো দুঃখের, কতো লজ্জার তা বোধহয় ও'রা বুঝতে চান না, কিম্বা বুঝেও না বোঝার ভান করে থাকেন। তাই ও'দের কাছে, ময়দানের বড় বাবুদের কাছে আমাদের শুধু একটিমাত্র জিজ্ঞাস্য, এইভাবে ঘরে এবং বাইরে বাংলাদেশের এবং বাংলাদেশের খেলার রাজা ফুটবলের মুখ হাসাবার অধিকার ও'দের কে দিয়েছে? বর্তমানে রাজ্য সরকারের ক্রীড়া-দপ্তর বলে একটি আলাদা দপ্তর হয়েছে এবং তার ভারপ্রাপ্ত ক্রীড়ামন্ত্রীও আছেন। কিন্তু আমরা ভেবে পাই না কি করে ও'দের চোখের সামনে দিয়ে এইসব ঘটনা ঘটছে? রাজ্য সরকারের ক্রীড়াদপ্তরের কাছে আমাদের বিনীত নিবেদন, এইবার আপনারা এগিয়ে আসুন—আপনারা অনেক দেখেছেন, অনেক শুনেছেন, এমন কি সহ্যও করেছেন অনেক কিছু, কিন্তু আর নয়—এবার আপনারা এগিয়ে এসে ময়দানী ফুটবলের হাল ধরুন। কলকাতা তথা বাংলাদেশের ফুটবলকে বাঁচান আপনারা। ভারতীয় ফুটবল জগতে বাংলার শ্রেষ্ঠত্ব আবার প্রতিষ্ঠা করুন আপনারাই। —[illegible]।

ক্রিকেটের খবর

সম্প্রতি সমাপ্ত ইংলণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট মরশুমের দিকে ফিরে তাকালে কিম্বা বিগত তিনটি টেস্ট ম্যাচের পর্যালোচনা করতে বসলে ব্যাটিং, বোলিং এমন কি ফিল্ডিং-এর ক্ষেত্রেও ইংলণ্ডের প্রাধান্য বড় বেশি করে পরিলক্ষিত হয়। কাউড্রে, ব্যারিংটন, মিলবার্ন এবং শেষ দুটি টেস্টে গ্রেভনীর মতো খেলোয়াড় দলে না থাকা সত্ত্বেও ইংলণ্ডের খেলোয়াড়রা প্রশংসিতভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালাতে সমর্থ হয়েছিলেন আর তারই ফল হিসেবে ২—০ টেস্টে ওয়েস্ট ইণ্ডিজকে হারিয়ে ইংলণ্ড এই মরশুমেও নিজেদের দখলে 'রাবার' রাখতে সমর্থ হয়েছে।

আর ওয়েস্ট ইণ্ডিজও, প্রথম টেস্ট ম্যাচ ছাড়া বাকী দুটি টেস্টে যেভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে সমর্থ হয়েছে তার জন্যে প্রশংসা তাদেরও প্রাপ্য। কারণ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পরম নির্ভরশীল এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলোয়াড়দের সমস্ত উৎসাহের প্রধান জন সোবার্স একেবারেই খেলতে পারেন নি। এক কথায় বলা চলে যে,

॥ গিব্স ॥

অভিজ্ঞ স্পিন বোলার হিসেবে গিবস আজো বিশ্বের সেরা। কিন্তু এই মরশুমে তাঁর খেলার ধারা দেখে যেন মনে হয় খেলা ছাড়ার সময় বুঝি তাঁরও হয়ে এলো।

ব্যাটিং-এ সোবার্স এবার একেবারে 'আউট অফ ফর্ম', তবে বোলিং-এ কিছুটা তোলক তিনি এবারও দেখিয়েছেন বটে। ব্যাটিং এ্যাভারেজে সোবার্সের স্থান এবার ষষ্ঠ, আর বোলিং-এ তৃতীয়।

ইলিংওয়ার্থের মধ্যে ইংলণ্ড খুঁজে পেয়েছে তাদের নতুন অধিনায়ককে। তবে কাউড্রে আগামী কয়েক মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবেন। আর সামনের বছরে ইংলণ্ডের অস্ট্রেলিয়া সফরে মনে হয় কাউড্রের ওপরই পড়বে দল পরিচালনার ভার, কারণ অস্ট্রেলিয়া সফরে কাউড্রে ইতিমধ্যে চারবার ছিলেন ইংলণ্ডের সহ-অধিনায়ক।

॥ সোবার্স ॥

প্রত্যেক ব্যাটসম্যানের জীবনেই খারাপ সময় আসে। তখন হাজার চেষ্টা করেও তাঁরা ঠিকমত খেলতে পারেন না। তবে কি সোবার্সকেও সেই খারাপ সময়েরই মুখোমুখি হতে হলো?

উইকেট কীপার ব্যাটসম্যান এ্যালান নটই হলেন এই মরশুমে ইংলণ্ডের সব থেকে বড় আবিষ্কার। আরো একটা বিষয়ে ইংলণ্ডের ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ নিশ্চিন্ত হয়েছেন যে, ব্রাউন এবং স্নো ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ফাস্ট বোলার হিসেবে তাঁদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পেরেছেন।

ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে বয়কট, ইলিংওয়ার্থ, এডরিচ, হ্যাম্পশায়ার প্রভৃতি ব্যাটসম্যানরা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তবে ইংলণ্ড দলের পক্ষে বেরী নাইট-কে খেলানো রীতিমত বিস্ময়কর। কারণ নাইট স্বনামে কয়েকটি সংবাদপত্রে কতকগুলি প্রবন্ধ লিখেছিলেন—যার জন্যে গত মরশুমে ইংলণ্ড দলের সাউথ আফ্রিকার

॥ কাউড্রে ॥

পায়ের প্লাস্টার খুলে ফেলা হয়েছে। আশা করা যায় সামনের মরশুমে আবার পুরোদমে খেলতে পারবেন কলিন কাউড্রে।

বাতিল সফরে তিনি বাদ পড়েছিলেন দল থেকে। তাই চৌকস খেলোয়াড় নাইটকে দলে নেওয়ায় ক্রিকেটরসিকরা যথেষ্ট খুশি হয়েছেন।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলে এবার কানহাই, নার্স প্রভৃতির মতো ব্যাটসম্যানরা নেই। তাই ব্যাটিং-এর শক্তি পুরোপুরিভাবে নির্ভর করছিলো অধিনায়ক সোবার্সের ওপর। কিন্তু সোবার্স এবার কিছুই করতে পারলেন না। তিনটে টেস্ট সব মিলিয়ে করলেন মাত্র ১৫০ রান। তবে বোলিং-এ সোবার্স ভেল্কি দেখিয়েছেন। হাতে ব্যথার জন্যে স্পিন বোলিং-এ চ্যায়নাম্যান কিম্বা গুগলী বল ছাড়তে না পারলেও পেস বোলিং-এ যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়ে সোবার্স লাভ করেছেন বোলিং এ্যাভারেজে তৃতীয় স্থান।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পুরনো খেলোয়াড়দের মধ্যে বুচার খুব একটা সুবিধে করতে না পারলেও মোটামুটিভাবে খেলেছেন। কিন্তু উইকেট কীপার ব্যাটসম্যান হেনড্রিকস একেবারেই ডুবিয়েছেন দলকে। লয়েডও এই মরশুমে তাঁর সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারেন নি। তবু যেটুকু তিনি খেলেছিলেন, তারই চকিত চমকে ইংলণ্ডের দর্শকদের মন ভরে উঠেছিল।

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বোলিং সাইডও দিনে দিনে বেশ দুর্বল হয়ে পড়ছে। ইংলণ্ডের মাঠগুলোতে গিবস তাঁর সুনাম অনুযায়ী খেলতে পারেন নি। আর তিনটে

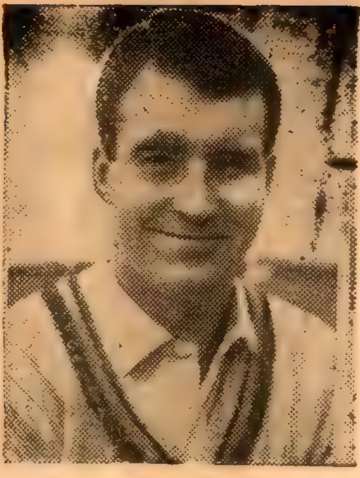

॥ বেরী নাইট ॥
সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লেখার জন্যে আগের মরশুমে বাদ পড়েছিলেন ইংলণ্ড দল থেকে। এবার আবার তাঁর ডাক পড়েছে।

টেস্টে গিবস পেয়েছেন মাত্র ৬টি উইকেট। সিলিংফোর্ড তাঁর জীবনের প্রথম টেস্ট ম্যাচগুলোতে মোটামুটি খেলেছেন। তবে ডেভিসের মধ্যে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ খুব শীগ্গিরই খুঁজে পাবে একজন নিপুণ চৌকস খেলোয়াড়ক।

যাই হোক প্রথমে অস্ট্রেলিয়া তারপর ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে এই পরাজয়ে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ বিশ্ব-ক্রিকেটের আসরে অনেকখানি পিছিয়ে পড়লো।

ইংলণ্ড এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজের এই মরশুমের তিনটি টেস্টের ব্যাটিং এবং বোলিং এ্যাভারেজ নিচে দেওয়া হলো। ব্যাটিং-এ ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ক্যামাচো আর ইংলণ্ডের বয়কট শীর্ষস্থান লাভ করেছেন আর বোলিং-এ সবার ওপরে আছেন যথাক্রমে শেফার্ড ও আণ্ডারউড।

॥ বয়কট ॥
শুধু ইংলণ্ড নয়, দু'দলের ব্যাটসম্যানদের মধ্যে ব্যাটিং এ্যাভারেজে বয়কট আছেন সবার ওপরে।

ব্যাটিং এ্যাভারেজঃ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

	টেস্ট	ইনিংস	নঃ আঃ	রান	সর্বোচ্চ	গড়
ক্যামাচো	২	৪	০	১৮৭	৭১	৪৬'৭৫
বুচার	৩	৬	০	২৩৮	৯১	৩৯'৬৬
ডেভিস	৩	৬	০	২০৮	১০৩	৩৪'৬৬
ফ্রেডারিক্স	৩	৬	০	২০৪	৬৪	৩৪'০০
লয়েড	৩	৬	০	১৮৩	৭০	৩০'৫০
সোবার্স		৩	৬	১	১৫০	৫০'৩৩
হোল্ডার	৩	৫	০	৮০	৩৫	১৩'৩৩
শেফার্ড	৩	"	০	৬৫	৩২	১৩'০০

বোলিং এ্যাভারেজঃ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

	ওভার	মেডেন	রান	উইঃ	গড়
শেফার্ড	১৩৭'৫	৪৪	২৬৬	১২	২২'১৬
সিলিংফোর্ড	৫৯'৪	১২	১৬০	৬	২৬'৬৬
সোবার্স	১৪৫'০	৪৭	৩১৮	১১	২৮'৯০
ডেভিস	৩০'০	৮	৩২	১	৩২'০০
হোল্ডার	১৪৮'৫	৫২	৩৩৫	৯	৩৭'২২
গিবস	১৬৮'৪	৫৭	৩১৭	৬	৫২'৮৩

ব্যাটিং এ্যাভারেজঃ ইংলণ্ড

বয়কট	৩	৬	১	২৭৯	১২৮	৫৪'''০০
ইলিংওয়ার্থ	৩	৫	১	১৬৩	১১৩	৪০৭৫
এডরিচ	৩	৬	১	১৬৯	৭৯	৩৩'৮০
হ্যাম্পশায়ার	২	৪	০	১৩৫	১০৭	৩৩'৭৫
ডলিভিয়েরা	৩	৫	০	১৬২	৫৭	৩২'৪০
নট	৩	৫	০	১৩৯	৫৩	২৭'৮০
শার্প	৩	৫	০	১২০	৮৬	২৪'০০

বোলিং এ্যাভারেজঃ ইংলণ্ড

আণ্ডারউড	৫৩'০	২৯	১০১	৬	১৬'৮৩
ব্রাউন	১১০'৩	২৫	২৮৮	১৪	২০'৫৭
নাইট	১২০'১	২৯	২৭৯	১১	২৫'৩৬
স্নো	১৩৯'৩	২৬	৪০৬	১৫	২৭'০৬
ডলিভিয়েরা	৭৫'০	২৫	১৬৯	৪	৪২'২৫
ইলিংওয়ার্থ	৯৩'০	৩২	২১৮	৫	৪৩'৬০

সমাচারদর্পণ

ভারতঃ আঞ্চলিক ডেভিস কাপ টেনিস প্রতিযোগিতার সেমিফাইন্যালে ভারত খেলবে, রাশিয়া বনাম রুমানিয়া দলের মধ্যের খেলায়, বিজয়ী দেশের সংগে। এই খেলাটা অনুষ্ঠিত হবে আগস্ট মাসের গোড়ার দিকেই।

* * *

রাশিয়ার ভারোত্তোলক গোলুভোচি লাইট হেভি ওয়েটে নতুন বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেছেন। ২৪ বছরের গোলুভোচি ৪৯০ কে· এম অর্থাৎ ১,০৮০ পাউণ্ড তোলেন। তিনি পূর্ববর্তী রেকর্ড থেকে ২·৫ কে· এম অর্থাৎ ৫½ পাউণ্ড বেশি তুলেছেন। গোলুভোচি ভাঙলেন রাশিয়ার আর এক ভারোত্তোলক বরিস সেলিস্টীকর রেকর্ড।

ওয়াশিংটন ইভিনিং স্টারের আন্তর্জাতিক টেনিস প্রতিযোগিতার পুরুষদের সিংগলসে ব্রেজিলের টমাস কক ৭—৫, ১—৭, ৪—৬, ২—৬ ও ৬—৪ সেটে আমেরিকার আর্থার এ্যাসকে হারিয়ে দিয়ে চ্যাম্পিয়ানশীপের সম্মান লাভ করেছেন এবং সেই সংগে পুরস্কার হিসেবে লাভ করেছেন ৫,০০০ ডলার।

* * *

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে দল পরিচালনায় কৃতিত্বের পরিচয় দেওয়ায় নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধেও ইংলণ্ড দল পরিচালনার ভার পড়েছে ইলিংওয়ার্থের ওপর। নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তিনটে টেস্টেই তিনি থাকবেন ইংলণ্ডের অধিনায়ক। কলিন কাউড্রে অসুস্থ হওয়ায় ইলিংওয়ার্থকেই ইংলণ্ড দলের অধিনায়ক হিসেবে নির্বাচন করা হয়।

ইউসোবিও সেদিন কেঁদেছিলেন

কেঁদে ফেলেছিলেন ইউসোবিও। বিশ্ব কাপের খেলায় ইংলণ্ডের কাছে হেরে গিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদেছিলেন তিনি। হেরে গিয়ে কাঁদেন অনেকেই—কাঁদেন খেলোয়াড়রা, কাঁদেন সমর্থকরা, অনেক সময় কেঁদে ফেলেন কর্মকর্তারাও। কিন্তু ইউসোবিওর সেদিনের কান্নার ধরণটাই ছিল আলাদা। একটি অতি স্বাভাবিক এবং অতি প্রিয় প্রত্যাশার মৃত্যুই এক মাঠ লোকের সামনে ইউসোবিওকে কাঁদিয়েছিল।

অথচ কেউ কোনদিন কল্পনাও করতে পারে নি যে, বিশ্ব কাপের খেলায় হেরে গিয়ে ইউসোবিও ঐভাবে কাঁদবেন। অথচ ছোটবেলায় ইউসোবিও কোনদিন কাঁদতেন না—পারতেনও না। অভাব আর অনটনের মধ্যে মানুষ ইউসোবিও। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে হারিয়েছিলেন বাবাকে। ফলে মা শ্রীমতী ডি· সিলভারকে তাঁর দুই ছেলে আর দুই মেয়েকে মানুষ করার জন্যে প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হতো। আর মায়ের সংগে কাজে হাত মিলোতে হতো ইউসোবিওকেও।

পেটের জ্বালা মেটাতে যাদের প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে হয় তাদের আবার খেলাধুলার শখ কিসের? তবু ইউসোবিও থাকতে পারতেন না। ছুটে ছুটে যেতেন খেলার মাঠে। একটু খেলার সুযোগ পেলে ভাবতেন যেন হাতে স্বর্গ পেয়ে গেছেন।

বয়স বাড়ার সংগে ফুটবল খেলোয়াড় হিসেবে বেশ নামও করে ফেললেন ইউসোবিও। ছোটবেলায় খেলতেন লাউরেঙ্কো মার্কুইস ক্লাবে। কিন্তু ১৯৬১ সালে লিসবনের স্পোর্‌টিং লিসবোয়া বেনিফিকা ক্লাব পাঁচ হাজার ছ'শ' পাউণ্ডের কিছু বেশি দিয়ে লাউরেঙ্কো ক্লাবের কাছ থেকে ইউসোবিওকে নিজেদের দলে নিয়ে এলো।

বেনিফিকা ক্লাবের সদস্য সংখ্যা হলো ৭০ হাজার। এই সত্তর হাজার সমর্থকের মধ্যমণি হলেন ইউসোবিও। তারা কিছুতেই ছাড়বে না ইউসোবিওকে। তাই তারা সেবার পরম উপেক্ষায় প্রত্যাখ্যান করেছিল আমেরিকার ভাস্কো-ডা-গামা ক্লাবের প্রস্তাব। এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার পাউণ্ডের বিনিময়ে ভাস্কো চেয়েছিল ইউসোবিওকে। কিন্তু বেনিফিকা ক্লাব রাজী হয় নি সে প্রস্তাবে। কারণ তারা জানতো যে, ইউসোবিওকে ছেড়ে দিলে সমস্ত পর্তুগাল ক্ষেপে যাবে। তাই যতো টাকা লাগে লাগুক ইউসোবিওকে বেনিফিকা ক্লাব নিজেদের দলে রাখবেই।

১৯৬২ সাল থেকে বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে শুরু করেন ইউসোবিও। ১৯৬১ সাল থেকে ১৯৬৬ সালের বিশ্ব ফুটবল প্রতিযোগিতা পর্যন্ত ইউসোবিও ২১ বার জাতীয় দলের পক্ষে খেলেছেন। এর মধ্যে সর্বোচ্চ গোলদাতার পুরস্কার হিসেবে ইউসোবিও দু'বার লাভ করেছেন 'সিলভার বল'।

ইউসোবিও হলেন পর্তুগাল ফুটবলের সেরা ফসল আর ইউরোপের দ্বিতীয় পেলে। বিশ্ব ফুটবলে শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়ে ব্রাজিলের পেলের পরেই ইউসোবিওর স্থান। ইউসোবিওর আরো একটা নাম আছে। শুধু খেলার সময়ই নয়, যে-কোন বিষয়ে ভাবনায় পড়লে ইউসোবিওর কপাল কুঁচকে যায়। হয়তো বা সেই জন্যেই অনেকে তাঁকে ইউরোপের ব্ল্যাক পান্থার বলেন।

ইউসোবিওর বয়েস কিন্তু বেশি নয়। জন্ম ১৯৪৩ সালের ৫ই জানুয়ারী। বিয়ে করেছেন ফ্লোরাকে ১৯৬৫ সালে। পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি লম্বা মাঝারি চেহারার খেলোয়াড় ইউসোবিও আজ ফুটবল জগতের হিরো। ছোটবেলায় অর্থের অভাবে একদিন যাঁকে প্রাণান্ত পরিশ্রম করতে হতো, কিন্তু হাজার অসুবিধার মধ্যেও কোনদিন নিজের সংকল্প থেকে বিচ্যুত হন নি—আজ অর্থের প্রাচুর্যের মধ্যে বাস করেও সেই ইউসোবিও নিজেকে হারান নি। সেই একই রকম আছেন তিনি। শুধুমাত্র মাঠের মধ্যেই নয়, খেলার মাঠের বাইরেও তাঁর মতো শান্ত মানুষ আজো খুঁজে পাওয়া ভার।

প্রশ্ন উত্তর

শচীনাথ মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া)

প্রশ্ন : অলিম্পিক ফুটবলে যোগদানকারী ভারতীয় দলের অধিনায়কদের নাম, প্রতিযোগিতার স্থান এবং সাল জানতে চাই। বিশেষ দরকার, জানাবেন নিশ্চয়ই।

উত্তর : সাল — স্থান — অধিনায়ক

১৯৪৮ — লণ্ডন — টি· আও

১৯৫২ — হেলসিংকি — শৈলেন মান্না

১৯৫৬ — মেলবোর্ন — সমর ব্যানার্জী

১৯৬০ — রোম — প্রদীপ ব্যানার্জী

১৯৬৪ — টোকিও — চুনী গোস্বামী

(প্রাথমিক পর্যায়ের খেলায় ভারত ইরানের কাছে পরাজিত হওয়ায় অলিম্পিকের মূল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করতে পারে নি।)

১৯৬৮ — মেক্সিকো — ভারত যোগ দেয় নি।

জগন্নাথ মজুমদার (বেলডাঙা, মুর্শিদাবাদ)

উত্তর : তোমায় ব্যক্তিগতভাবে চিঠি দিয়েছি, পেয়েছো নিশ্চয়ই।

সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ (রাসবিহারী এ্যাভিনিউ, কলকাতা)

প্রশ্ন : লেকার তাঁর সেই সাংঘাতিক বোলিং কতো সালে কার বিরুদ্ধে করেছিলেন? সেই খেলায় লেকারের বোলিং এ্যাভারেজ জানতে চাই।

উত্তর : ১৯৫৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাঞ্চেস্টার টেস্টে লেকার সাংঘাতিক বোলিং করেছিলেন। সেই খেলায় লেকার (১০ + ৯) = ১৯টি উইকেট দখল করেছিলেন।

সেই খেলায় লেকারের বোলিং-এর হিসেব হলো—

	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
১ম ইনিংস	৫১·২	২৩	৫৩	১০
২য় ইনিংস	১৬·৪	৪	৩৭	৯

নবনীতা গুহ (কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা—৪)

প্রশ্ন : টেস্ট খেলায় এবং প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় সবচেয়ে কম বয়সে অংশ গ্রহণ করেছেন কোন্ কোন্ খেলোয়াড়? কতো বছর বয়সে এবং কোন্ সালে কোন্ কোন্ দলের খেলায় খেলেছেন তাঁরা। ভারতের পক্ষে সবচেয়ে কম বয়সে টেস্ট খেলেছেন কে?

প্রথম শ্রেণীর খেলায়

উত্তর : ১২ বছর ৭৬ দিনে : সমর বসু ১৯৫৯-৬০ সালে খেলেছেন বিহার বনাম আসামের খেলায়।

১২ বছর ২০২ দিনে : এম পি বড়ুয়া ১৯৫৪-৫৫ সালে খেলেছেন আসাম বনাম বিহারের খেলায়।

সবিনয় নিবেদন

আপনারা যাঁরা 'গল্প হলেও সত্যি' বিভাগের জন্যে লেখা পাঠান তাঁদের কাছে আমাদের সবিনয় নিবেদন এই যে, আপনারা পোস্ট কার্ডে লিখে লেখা পাঠাবেন না। সাদা কাগজের এক পিঠে পরিষ্কার-ভাবে লিখে পাঠালে আমাদের খুব সুবিধে হয়। আশা করি আমাদের এই অসুবিধাটুকু আপনারা বুঝবেন।

—ক্রীড়া সম্পাদক

টেস্ট খেলায়

১৫ বছর ১২৪ দিনে : মুস্তাক মহম্মদ ১৯৫৮-৫৯ সালে পাকিস্তান বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের লাহোর টেস্টে খেলেছেন।

ভারতের পক্ষে

১৭ বছর ২৬৫ দিনে : বিজয় মেহেরা ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়েসে টেস্ট খেলেন। তিনি খেলেছিলেন নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে বোম্বাই টেস্টে ১৯৫৫-৫৬ সালে।

রামপ্রসাদ ঘোষ (বারাসাত, ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন : জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার (সন্তোষ ট্রফি) গত আট বছরের ফলাফল যদি জানান তাহলে খুব ভালো হয়। আমাদের কয়েক বন্ধুর মধ্যে বাজী ধরা হয়েছে। আপনার উত্তরের ওপর তার মীমাংসা হবে।

উত্তর : তথাস্তু।

সাল — বিজয়ী — স্থান

১৯৬১—রেলওয়ে—বম্বে

১৯৬২—বাংলা—ব্যাঙ্গালোর

১৯৬৩—বম্বে—মাদ্রাজ

১৯৬৪—রেলওয়ে—গোহাটি

১৯৬৫—অন্ধ্র—কুইলন

১৯৬৬—রেলওয়ে—হায়দ্রাবাদ

১৯৬৭—মহীশূর—কটক

১৯৬৮—মহীশূর—ব্যাংগালোর

গল্প হলেও সত্যি

ইংলণ্ডের টেস্ট ক্রিকেটের সিরিল ওয়াশব্রুক অবসর নিয়েছিলেন ১৯৫১ সালে।

১৯৫৬ সালে অস্ট্রেলিয়ার ইংলণ্ড সফরের সময় ওয়াশব্রুক ইংলণ্ড দলের নির্বাচকমণ্ডলীর অন্যতম।

লর্ডস টেস্টে ইংলণ্ডের শোচনীয় পরাজয়ের পর নির্বাচকমণ্ডলীর সভা বসেছে। 'অ্যাসেজ' দখলে রাখাই তখন প্রধান সমস্যা।

হঠাৎ নির্বাচকমণ্ডলীর সভাপতি ওয়াশব্রুককে কিছুক্ষণের জন্য সভা ছেড়ে যেতে অনুরোধ করলেন।

ফিরে এসে ওয়াশব্রুক শুনলেন, পরবর্তী টেস্ট দলে তিনি মনোনীত হয়েছেন।

৪২ বছর বয়স্ক ওয়াশব্রুক বিস্ময়ে হতবাক্।

পরের টেস্ট লীডসে।

লিণ্ডওয়াল ও আর্চারের দুর্ধর্ষ বোলিং-এ বিধ্বস্ত ইংলণ্ডের রান-সংখ্যা যখন তিন উইকেটে ১৭, তখন ব্যাট করতে নামলেন প্রবীণ ওয়াশ-ব্রুক।

পিটার মে ও ওয়াশব্রুকের দীর্ঘ জুটি খেলার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে ইংলণ্ডকে জয়ের পথে ফিরিয়ে আনল।

ওয়াশব্রুক করেছিলেন ৯৮ রান।

—জয়ন্ত হালদার
নরেন্দ্রনগর,
কলকাতা-৫৬

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতী

বিধানসভায় মারমুখী একদল পুলিশের তাণ্ডবনৃত্য

পরিস্থিতির মোকাবিলায় যুক্তফ্রন্ট সরকারের কঠোরতম ব্যবস্থা অবলম্বন : অপরাধীদের বরখাস্ত ও গ্রেপ্তার

৭৪ বর্ষ : ৭ম সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২২শে শ্রাবণ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [74 year, No. 7, 7th Aug

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৩৮৭
আজকের মানুষ		৩৮৮
সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	শঙ্করীপ্রসাদ বসু	৩৮৯
জসিমউদ্দীন : একটি সাক্ষাৎকার (কবিতা)	অপরাজিতা গোপ্পী	৩৯২
ই-বাহাই—বাংলা বইয়ের মেলা	হরপ্রসাদ মিত্র	৩৯৩
বঙ্গদর্শন		৩৯৬
ভারতদর্শন		৩৯৯
আন্তর্জাতিক		৪০২
সপ্তাহের বোঝা	কৃত্তিবাস ওঝা	৪০৪
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	অনন্ত সিংহ	৪০৬
গ্রন্থমেলা		৪১০
মঙ্গল-সংবাদ	ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	৪১১

যে কোন
গয়না
আর
আ স ল
গ্র হ র ত্ন
কেনার
দক্ষিণ কোলকাতায়
নামকরা প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সন অ্যান্ড গ্র্যাণ্ডসন্স অব স্বর্গত
এম. বি. সরকার

এ. সরকার এণ্ড সন্স

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
যুক্তফ্রন্ট সরকার সমীপেষু	— শ্রীসর্বদর্শী	৪১৪
ভূমি বণ্টন সমস্যা ও আইরিশ দৃষ্টান্ত (প্রবন্ধ)	— নরেন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্তী	৪১৬
তিমিরপ্রান্ত ভুবনে	— অগ্নিবর্ণ	৪১৯
সাগর সঙ্গমে (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— সুশীল জানা	৪২২
গ্রামবাংলার কথা	— অসীম মুখোপাধ্যায়	৪২৫
পাহারা (গল্প)	— নির্মলেন্দু গৌতম	৪২৮
লোকসংগীতের একাল না আকাল?	— মুরশিদ	৪৩২
খবর বলছি	— অভ্রবাহন	৪৩৪
রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে	— শিশালি	৪৩৬
রঙ্গজগৎ		৪৪০
খেলাধূলা	— শান্তিপ্রিয়	৪৪৪

॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥

বহুকাল পরে আবার পাওয়া যাচ্ছে।

ম হা ক বি

গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচনাবলী

প্রথম খণ্ড : প্রফুল্ল, ম্যাকবেথ, ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে চারটি প্রবন্ধ, তিনখানি গীতিনাট্য ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১২। মূল্য দশ টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড : সিরাজউদ্দৌলা ; ম্যায়সা কা ত্যায়সা ; জনা ; দোললীলা ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫৮। মূল্য দশ টাকা।

তৃতীয় খণ্ড : পাণ্ডবগৌরব, বলিদান, আবুহোসেন ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫২। মূল্য দশ টাকা।

চতুর্থ খণ্ড : চৈতন্যলীলা, ভ্রান্তি, মল্লিকাবিকাশ, হীরার ফুল, বিবিধ রচনা ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০২। মূল্য দশ টাকা।

পরমহংসদেব শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত-শিরোমণি অতি প্রিয় নোটো গিরিশকে বলেছিলেন, —"অভিনয়ের প্রয়োজন আছে বৈ-কি—ওতে লোকশিক্ষা হবে। আর তোমার লেখা—ও যে ভারি ভাল হয়েছে।"

প্রতিটি রঙ্গ বোর্ডে বাঁধাই। মূল্যবান কাগজে ছাপা।

রচনাবলী সম্পাদনা : শ্রীরমেন চৌধুরী

অবিলম্বে অর্ডার পেশ করুন।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২.

৭৪ বর্ষ ঃ ৭ম সংখ্যা—মূল্য ঃ ৩০ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ২২শে শ্রাবণ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 7th August, 1969

একদলে পুলিশের বীভৎস আচরণ

গত বৃহস্পতিবার শোক-মিছিল করার নামে বিধানসভায় ঢুকে একদল পুলিশ যে ধরণের তান্ডবনৃত্য করেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে তার নজির নেই। এটাই আশা করা যায় যে, পুলিশবাহিনী হবে সর্বদাই শৃঙ্খলাপরায়ণ; কারণ শৃঙ্খলা ও শান্তি রক্ষার ভার তাদের হাতেই প্রত্যক্ষভাবে ন্যস্ত থাকে। কিন্তু মৃতদেহ সঙ্গে নিয়ে সেদিন একদল পুলিশ এন্ডারসন হাউসে পুলিশ সুপারের আপিস তছনছ করেছে এবং তারপর বিধানসভার ভেতরে মাননীয় সদস্য ও মন্ত্রীদের আক্রমণ করেছে, উপরন্তু বহু মূল্যবান জিনিস ধ্বংস করে দিয়েছে। এই ধরণের আচরণের দ্বারা তারা—যে-মৃতদেহটিকে মিছিল করে নিয়ে যাচ্ছিল তার প্রতি অমন অমর্যাদা নিজেরাই প্রদর্শন করবে তা ছিল সম্পূর্ণ কল্পনাতীত।

অবশ্য ঐ পুলিশ দলের পাঁচজন ক্রোধোন্মত্ত ও মারমুখী হয়ে যখন উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর কক্ষে প্রবেশ করেছিল, তখন তাদের উপলব্ধি হয়েছিল এ ধরণের উন্মত্ততার জবাব দেবার মতো মনের বল যুক্তফ্রন্ট সরকারের মন্ত্রীদের মধ্যেই আছে। শ্রীজ্যোতি বসুর সম্মুখীন হবার পর তারা শুধু চুপষেই যায় নি, তাদের কাপুরুষোচিত কাজের জন্য বিধানসভার মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়ের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতেও বাধ্য হয়েছে।

এই যে অভাবনীয় ঘটনা ঘটলো, এর পেছনে চক্রান্ত ছিল বলে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার দৃঢ় ধারণা। কিন্তু সর্বাপেক্ষা যে-বিষয়টি আমাদের বিস্মিত করেছে, তা হচ্ছে এই, একদল পুলিশ চক্রান্ত করছে—এ খবর গোয়েন্দা বিভাগ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলো না! দ্বিতীয়ত এন্ডারসন হাউসে গিয়ে একদল পুলিশ এস-পি'র আপিস তছনচ করলো, তবু কলকাতার পুলিশবাহিনী তাতে বাধা দিল না এবং সেই সুযোগে (যা পূর্বপরিকল্পিত ব্যাপার ছাড়া অন্য কিছু অনুমান করা যায় না) তারা বিধানসভা আক্রমণ করলো। এবং পুলিশরা প্রকাশ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকারের ধ্বংস কামনা করলো এবং শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়, শ্রীজ্যোতি বসু ও শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুধু মুন্ডুপাতই করলো না, জ্যোতি বসুর মুন্ডুও দাবি করলো।

তথাকথিত শোক-মিছিলকারী ঐ সব পুলিশের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আই-জি এবং পুলিশ কমিশনার রিপোর্ট দিয়েছেন এবং দুজনের রিপোর্টে গরমিল থাকবে—একথা বলাই বাহুল্য। গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্টও হয়তো স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পেয়েছেন। কিন্তু ঘটনা ঘটে যাওয়ার আগে যারা আশ্চর্যরকম নীরবতা পালন করেছে, তাদের রিপোর্টের মূল্য কতটুকু তা মন্ত্রিসভাই বিচার করবেন। তা ছাড়া রাজ্যের গোয়েন্দা বিভাগের মতো একটি অর্থপুষ্ট দায়িত্বশীল বিভাগকে অকাজের জন্য রাখার কোনো প্রয়োজনীয়তা আছে কি না তাও অবিলম্বে ভেবেচিন্তে দেখতে হবে। বিশেষত যারা এখন রয়েছে, তারা কোনো কাজের কি না সেটাই আগে বিবেচ্য। অক্ষম এই বিভাগটির জন্য একদা অনেক নিরপরাধ ব্যক্তির সর্বনাশ ঘটেছে, এখন এই বিভাগটি যুক্তফ্রন্টের সর্বনাশ ঘটাতে চায়—এমন ধারণা আজ পশ্চিমবঙ্গের শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের।

পুলিশ দলের বীভৎস আচরণের বিরুদ্ধে সম্বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরা দৃঢ় প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কিন্তু মিছিলকারী পুলিশদের উত্তেজনায় কেউ কেউ ইন্ধন যুগিয়েছেন, এমন কথা শুনে তাজ্জব বনে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। কারণ গণতন্ত্র রক্ষার কথা মুখে উচ্চারণ করে, গণতন্ত্রের পবিত্র মন্দির বিধানসভার মধ্যে একদল পুলিশকে প্রবেশের প্রেরণা দিলে তাতে কিভাবে গণতন্ত্র রক্ষা পায় তা আমাদের কাছে শুধু দুর্বোধ্যই নয়, রহস্যময়ও। আশার কথা, পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভার বিরোধী দলের সদস্য—এক শ্রেণীর পুলিশের বিধানসভায় চড়াও হওয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন এবং পার্লামেন্টের সদস্যগণও বিচলিত।

যাহোক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিশৃঙ্খল পুলিশদের বিরুদ্ধে কড়া মনোভাব গ্রহণ করেছেন এবং ইতিমধ্যে রাজ্যপালের নির্দেশে কয়েকজনের চাকরি খতম হয়েছে এবং চক্রান্তের মূলসূত্র বের করে সরকার ইতিকর্তব্য করার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এ ছাড়া পুলিশবিভাগের যে সব অংশ বিশৃঙ্খল আচরণ করবে তাদের দমন করার জন্য মিলিটারীকে প্রস্তুত থাকতে বলেছেন। পুলিশবাহিনী সম্পর্কে সতর্কতার উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারের কড়া নির্দেশে শুধু অস্ত্রাগার তালাবন্ধ নয়—রাজ্যের সমস্ত পুলিশ লাইন ও পুলিশ ব্যারাকেও সতর্ক নজর রাখা হয়েছে ও নজর রাখার জন্য নির্দিষ্ট অফিসারদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

শান্তিরক্ষার ভার যাদের হাতে, চরম অশান্তির আশঙ্কায় যদি তাদের ওপর সর্বদা সতর্ক নজর রাখতে হয়, তাহলে সুষ্ঠুভাবে রাজ্যচালনা সম্ভব নয়। সুতরাং যুক্তফ্রন্ট সরকারের কর্তব্য, দুষ্কৃত ব্যক্তিদের পুলিশ বিভাগ থেকে অপসারণ করে যোগ্যদের স্থান করে দেওয়া। কিন্তু পুলিশদের কর্তব্য পালনে বাধ্য করার জন্য যে সব পুলিশ কর্তারা মোটা মাহিনায় বহাল তবিয়তে রয়েছেন, তাঁদের নিজেদের কর্তব্যও কি কিছু নেই?

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

চাঁদে মানুষের প্রথম পদচারণা নয়, প্রেসিডেন্ট নিক্সনের এশিয়া রুমানিয়া সফরও নয়, কিম্বা ভিয়েৎনামের যুদ্ধও নয়—আজকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র আলোচ্য প্রসঙ্গ হল টেড কেনেডি। আগামী ১৯৭২ সালের প্রেসিডেন্টপদে নির্বাচনে সেনেটর এডওয়ার্ড কেনেডি কি ডেমোক্রেটিক দলের মনোনয়ন আর পাবেন?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেনেডি পরিবারকে কেন্দ্র করে যে গ্রন্থাগাথা প্রচলিত হয়েছে, টেড কি তাকে ধুলোয় মিশিয়ে দিলেন। টেড কেনেডির রাজনৈতিক জীবনের কি অবসান ঘটলো?

বহু প্রশ্ন কেনেডিকে কেন্দ্র করে, বহু জিজ্ঞাসা সেদিনকার ঘটনাটিকে ঘিরে। আমেরিকার একটা বিরাট অংশ দেশের প্রেসিডেন্টের গদিতে এডওয়ার্ড কেনেডিকে দেখত চান বলেই এ জিজ্ঞাসা। এডওয়ার্ডের ভবিষ্যতের সঙ্গে প্রগতিশীল রাজনীতির ভবিষ্যৎ, কেনেডি পরিবারের সম্মান জড়িত বলেই এ-প্রশ্নবাণ। কী করেছেন কেনেডি যার জন্য তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ বিপন্ন হয়ে পড়লো আজ? এডওয়ার্ড কেনেডি একটা গুরুতর কর্তব্য পালনে ক্ষমাহীন অবহেলা করেছেন। আদালতে টেড তাঁর অপরাধ নতমস্তকে স্বীকারও করেছেন এবং শাস্তিও মেনে নিয়েছেন।

সেদিন ছিল ১৮ই জুলাই যেদিন টেড কেনেডির রাজনৈতিক জীবনে গভীর ফাঁড়াটি এলো। একটা ছোট্ট "পারিবারিক" পার্টি সেরে টেড কেনেডি রাত্রি প্রায় সোয়া এগারোটায় ফিরছিলেন ফেরী-নৌকো ধরার জন্যে—তাঁর সঙ্গে গাড়িতে ছিলেন ২৮ বছরের সুন্দরী যুবতী মেরী জো কোপেকনি। কিন্তু মাঝপথে একটা কাঠের সেতুর কাছে এসে গাড়িটা নিচে জলে পড়ে যায়। টেড অতিকষ্টে জল থেকে নিজেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হন বটে, কিন্তু মেরী জোকে তিনি পারে তুলতে পারেন নি। মেরীর সেখানেই মৃত্যু হয়।

রহস্যনাটক মেরীর মৃত্যুকে নিয়ে ততটা নয়, যতটা দুর্ঘটনার সংবাদটা পুলিশের কাছে পৌঁছে দিতে টেড দশ ঘণ্টা বিলম্ব ঘটিয়েছেন বলে। এতটা সময় তিনি নিলেন কেন? তিনি সে সময়ে কী ভাবছিলেন? টেড কি মত্ত অবস্থায় গাড়ি চালাচ্ছিলেন বলেই চেনা-রাস্তায় গাড়ি চালিয়েও দুর্ঘটনায় পড়লেন? মেরী জোর সঙ্গে কি তাঁর অবৈধ প্রণয় সম্পর্ক ছিল? আটদিন পরে জাতির উদ্দেশে প্রচারিত টেলিভিশন ভাষণে টেড কেনেডি তাঁর আচরণের জবাব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, নেশার ঘোরে তিনি গাড়ি চালান নি, মেরী জো ছিলেন তাঁর দাদা রবার্ট কেনেডির সেক্রেটারী, যাঁকে কেনেডি পরিবারেরই একজন বলে গণ্য করা

এডওয়ার্ড কেনেডি

হতো। মেরী জোর সঙ্গে তাঁর কোনো অবৈধ প্রণয় সম্পর্কও ছিল না। কিন্তু দুর্ঘটনার খবরটি দেরিতে পুলিশকে জানানোর অপরাধে টেড কেনেডির ছ'মাসের কারাবাসের আদেশ হয়, কিন্তু সে আদেশ আবার কার্যকর না করার নির্দেশ থাকায় টেডকে জেল খাটতে হয় নি তবে এক বছর পুলিশের নজরবন্দী হয়ে থাকতে হবে।

বলা বাহুল্য, এডওয়ার্ড কেনেডির কথায় সব প্রশ্নের জবাব মেলে নি, তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন যে, তাঁর কাজ সমর্থনযোগ্য নয়। এখানেই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে আগামী প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টি এই "কলঙ্কের নায়ককে" মনোনয়ন দেবে কি না।

জোসেফ কেনেডির কনিষ্ঠ সন্তান এডওয়ার্ড কেনেডি। পরিবারটি যেন ভাগ্যবিড়ম্বিত। বড় ভাই বিমান-দুর্ঘটনায় মারা যান। একটা বোনও। মেজ ভাই জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট জন কেনেডি গুলীবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারান। পরের ভাই রবার্ট কেনেডিও গুলীতে প্রাণ দেন, প্রেসিডেন্ট হবার স্বপ্নে যখন তিনি প্রচার অভিযান চালাচ্ছিলেন তখন। এডওয়ার্ড কেনেডি একবার বিমান-দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছেন।

ছোটবেলা থেকেই অবশ্য টেড দুরন্ত প্রকৃতির, কিন্তু বুদ্ধিমান বরাবরই। বাড়ি থেকে পালিয়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দিলেন। ফিরে এসে আবার ভালোমানুষ হলেন, হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে ভার্জিনিয়া ল' কলেজে পড়লেন, নিজেকে তৈরি করলেন ভবিষ্যতের আইন প্রণেতা হিসেবে। মাত্র তিরিশ বছর (যার নিচে প্রার্থী হওয়া যায় না।) বয়সে এডওয়ার্ড সেনেটের সদস্য হলেন ম্যাসাচুসেট্‌স থেকে ১৯৬২ সালে। এবং উদ্বাস্তু, অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ, নিগ্রোদের ভোটাধিকার, ইমিগ্রেশন ইত্যাদি ক্ষেত্রে কাজ করে শীঘ্রই যথেষ্ট সুনাম অর্জন করলেন। সাম্প্রতিককালে ভিয়েৎনাম, এ-বি-এম ইত্যাদি প্রশ্ন মৌলিক ভাষণ দিয়ে এবং প্রচার অভিযান চালিয়ে টেড তরুণদের মন জয় করেন। এমনিতে সুদর্শন টেড কেনেডির ঝোঁক দ্রুতজব গাড়ি, ভাল মদ, সুন্দরী নারীর প্রতি। টেড-এর স্ত্রী জোন, ছেলেমেয়ে তিনটি।

এডওয়ার্ড কেনেডির ভবিষ্যৎ কেউ জানে না। তিনি কি ১৯৭২-র নির্বাচনে না দাঁড়িয়ে '৭৬-এ দাঁড়াবেন? ইতিমধ্যে ভোটাররা কি সব ভুলে যাবেন? রিচার্ড নিক্সনকে কি তিনি দুটো মেয়াদ দেবেন? কিছুই স্থির করে বলা যায় না। তবে একটা কথা মনে রাখতে হবে যে, সংবিধানের দিক থেকে কোর্টের শাস্তি পেয়েও নির্বাচনে দাঁড়াতে কোন বাধা নেই। তাছাড়া, এ-কথাও ভুলে যাওয়া ঠিক নয় যে, জোসেফ কেনেডি বলতেন, তাঁর ছেলেদের মধ্যে টেডই সবচেয়ে বুদ্ধিমান এবং তার রাজনৈতিক বিচারবুদ্ধিই সবচেয়ে প্রখর।

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং—(৫)

১৯৩৭ সালের এই প্রবন্ধের পাঁচ বছর পরে 'সায়েন্স অ্যান্ড কালচারের' ১৯৪২ সালের অক্টোবর সংখ্যায় *Twenty-five years of the Soviet Union* নামক প্রবন্ধে ডঃ সাহা সোভিয়েট রাশিয়ার পরিকল্পিত উন্নতির বিষয়ে আরও উচ্ছ্বসিত। উচ্ছ্বাসের সদ্য কারণ তাঁর ভাষাতেই দেখা যাক:

"The titanic struggle which the Soviet Union has been putting up against the most powerful military machine of all times has been a surprise to most Governments and peoples of the world including even Germany. The history of a State which began to industrialise itself barely two decades ago and which has proved a near match for Germany, which is one of the leading industrial and militarised countries with hundreds of years of technical and scientific efficiency, is a matter well worthy of study by every country, which wishes to get on in the present-day world. Twenty-five years ago the proletariat came to power in Russia, emancipated all the colonies of Czarist Russia, consolidated their revolution against heavy odds, both external and internal, and set to the task of industrialisation and modernisation on a scale unheardof in all history."

বহু শত বৎসরব্যাপী অতিশ্রেষ্ঠ যন্ত্রসভ্যতার শক্তিতে বলীয়ান জার্মানীর সঙ্গে পঁচিশ বছরের শিল্প-জাগ্রত রাশিয়া যুদ্ধ করল সমানে সমানে—এই অলৌকিক অথচ লৌকিক ব্যাপারটি বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহাকে অভিভূত না করে পারে নি। পাঁচ বছর আগেও রাশিয়ার উন্নতিতে তিনি বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন; রাশিয়ার অল্প সময়ের উন্নতির পিছনে 'সঠিক সিদ্ধান্ত' এবং 'বৈপ্লবিক প্রেরণা' দুই-ই আছে তা বলেছিলেন, কিন্তু উভয়বস্তু কতখানি শক্তি দান করতে পারে তার সম্পূর্ণ পরীক্ষা তখনো হয় নি, যখন হল এবং সে পরীক্ষায় অসাধারণ সাফল্যের সঙ্গে রাশিয়াকে উত্তীর্ণ হতে দেখলেন, তখন বৈজ্ঞানিকের মন সেদিকে আরও ঝুঁকেছিল তাতে সন্দেহ নেই। বিশেষ উৎসাহের সঙ্গে ২৫ বৎসরে রাশিয়ার উন্নতির কারণ বিশ্লেষণে তিনি বসেছিলেন, বলেছিলেন,—এই বিপ্লব সর্বাত্মক, মানবজীবনের সকল অংশকে এই বিপ্লব পরিবর্তিত করেছে। বিপ্লবপ্রয়াসকে তিনি চারভাগে ভাগ করেন:

(১) যন্ত্র-বিপ্লব (A Technological Revolution);—কালপুরাতন কৃষি-নির্ভর উৎপাদন ও ছোটখাট যন্ত্রশিল্প ব্যবহার থেকে বিজ্ঞান-নির্ভর বৃহৎ যন্ত্রের শিল্পব্যবস্থায় উত্তরণ;

(২) রাজনৈতিক বিপ্লব (A Political Revolution);— জারতন্ত্র থেকে সর্বহারার একনায়কত্বে উত্তরণ;

(৩) সামাজিক-অর্থনৈতিক বিপ্লব (A Socio-Economic Revolution); ধনতন্ত্র এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তির সমাজ থেকে সমষ্টির মালিকানা ও ব্যক্তিসম্পত্তির বিলোপে উত্তরণ;

(৪) ধর্ম-বিপ্লব (A Religious Revolution); প্রতিষ্ঠিত পুরাতন ধর্মশাসন থেকে ডারুইন যেভাবে জীবজীবনের রূপ দেখেছেন, তার উপরে নির্ভরশীল নতুন সমাজব্যবস্থায় উত্তরণ।

এই চার বিপ্লবের প্রকৃতি সম্বন্ধে ডঃ সাহা যথেষ্ট আলোচনা ঐ প্রবন্ধে করেছেন। এদের মধ্যে যন্ত্র-বিপ্লবকে তিনি সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন, কারণ তার মধ্যে আছে মানুষের বাঁচার উপায়। বাকি বিপ্লবগুলি ঐ বিপ্লবেরই সন্তানস্বরূপ।৬ এই যন্ত্র-বিপ্লবে রাশিয়ার সাফল্য সম্বন্ধে ডঃ সাহার উচ্ছ্বাসের সীমা ছিল না। জার আমলের অনগ্রসরতা থেকে কিভাবে 'ক্রেমলিনের সাধিক' লেনিনের প্রগতিশীল চেষ্টায় রাশিয়া এগিয়ে এসেছে, শুধু ধনতন্ত্রী শোষণের চাপ থেকে মুক্ত হয়ে নয়, জিও টলস্টয়ের আধা-

৬ ডঃ সাহার প্রবন্ধের উপর চমৎকার বিতর্ক হয়। Technological Revolution-কে তিনি অগ্রাধিকার দেওয়ায় 'এন, মুখার্জি' এবং 'কে চ্যাটার্জি' প্রতিবাদপত্র পাঠান। রুশ-জার্মান যুদ্ধের পিছনে শ্লাভ ও টিউটন জাতির বৈরিতাও আছে, ডঃ সাহার এই উক্তির প্রতিবাদও পত্রলেখকেরা করেন। তাঁদের মতে, রাজনৈতিক বিপ্লব না

থিয়েটোরী' জীবনদর্শনের মূল মাদকতাকেও ছেড়ে ফেলে,—সে বিষয়ে বলতে গিয়ে এই প্রবন্ধের বিস্তৃত বর্ণনাকেও ডঃ সাহা যথেষ্ট মনে করেন নি, ৬ মাস পরে শুধু ঐ যন্ত্র-বিপ্লব নিয়েই আরও একটি বৃহৎ প্রবন্ধ লিখেছিলেন—***Technological Revolution in Industry—How the Russians Did It*** (সায়েন্স অ্যান্ড কালচার, এপ্রিল, ১৯৪৩),—তার মধ্যে বহু ভাগে ভাগ করে যন্ত্র-বিপ্লবের ক্ষেত্রে রাশিয়ার সাফল্য তুলে ধরেন।

এক্ষেত্রে ডঃ সাহার সিদ্ধান্ত—

"We must therefore conclude that as far as the Technological Revolution is concerned, the success of Russia has been completed and unqualified, and if Russia were allowed to develop her resources undisturbed, she would have attained a prosperity and a strength unequalled in the history of the world."

এই যন্ত্র-বিপ্লব স্বতই ঘটে নি, ঘটিয়েছিলেন একদল মানুষ একটি বিশেষ জীবননীতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে, সেকথা ডঃ সাহার কাছে অগোচর থাকার কথা নয়। ১৯৩৭ সালের প্রবন্ধেও রাশিয়ার নতুন জীবননীতির কথা বলেছিলেন পোল্যান্ডের সঙ্গে তুলনা করে। পোল্যান্ড ও রাশিয়া একই সময়ে একই অবস্থা থেকে যাত্রা শুরু করেছিল, কিন্তু রাশিয়ার তুলনায় পোল্যান্ডের অগ্রগতি অল্পই, কারণ "রাশিয়া একটি নূতন জীবনদর্শনে উদ্বুদ্ধ, তারা প্রকৃতিকে জয় করতে বদ্ধপরিকর, এবং নিজেদের আদর্শকে বাস্তবে রূপায়িত করার কার্যকর পন্থা তারা উদ্ভাবন করতে পেরেছে।"

রাশিয়ার রাজনৈতিক বিপ্লব সম্বন্ধে সমালোচকদের সংশয়ে তাই ডঃ সাহা সায় দিতে পারেন নি; এটি ক্রেমলিনে জার-এর জায়গায় লেনিন-স্ট্যালিনের বসে-পড়া নয়; কমিউনিস্ট নেতারা তাঁর চোখে একেবারে প্লেটোর দার্শনিক-শাসকের চেহারায় অবতীর্ণ; তিনি সানন্দে সিডনি ও বিয়েট্রিস ওয়েবের রচনা উদ্ধৃত করেছেন এঁদের প্রশস্তিতে—**"A set of rulers carefully chosen for their character and powers of leadership, having almost ascetic habits, and with a psychological make-up against the chance of having their judgement vitiated by private or privileged class interests."**

রাজনৈতিক বিপ্লবের অঙ্গাঙ্গি রাশিয়ার সামাজিক-অর্থনৈতিক বিপ্লব। ফরাসী বিপ্লব ব্যর্থ হয়েছিল, যেহেতু তা রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদ করেও রাজতন্ত্রের মূলকে উচ্ছেদ করতে পারে নি। রাশিয়ার বিপ্লব কিন্তু মূলগত। এই বিপ্লবের উদ্দেশ্য যে জারবদল নয়, তা প্রমাণিত হয়েছে বিপ্লবোত্তরকালে পূর্বতন সামাজিক-অর্থনৈতিক পটভূমিকা বদলে ফেলার চেষ্টার মধ্যে। ডঃ সাহা এই সব কথাই বলেছেন, তবু একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, যন্ত্র-বিপ্লবের ক্ষেত্রে রাশিয়ার সাফল্যের প্রশংসায় তিনি যত মুক্তকণ্ঠ, ততখানি ভাবাবেগ সামাজিক-অর্থনৈতিক বিপ্লবের ব্যাপারে প্রকাশ করেন নি। লাভের মনোবৃত্তি না রেখে রাষ্ট্র-পরিচালিত শিল্পব্যবস্থা ও তার অবিলম্ব-সাফল্য ধনতান্ত্রিক জগতে সম্ভব নয়, একথা তিনি অবশ্য স্বীকার করেছেন,৭ তাহলেও একই সঙ্গে সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা নষ্ট করায় বোধ হয় তাঁর সম্পূর্ণ সমর্থন ছিল

হলে অন্য বিপ্লব সম্ভব নয়, সুতরাং অগ্রাধিকার রাজনৈতিক বিপ্লবেরই। ডঃ সাহা বলেন, তা তিনি জানেন, সেই সঙ্গে এও জানেন, রাজনৈতিক স্বাধীনতা সত্ত্বেও যন্ত্র-বিপ্লবের প্রয়োজন সম্বন্ধে ধারণা না থাকায় অনেক দেশের দুর্গতি ঘোচে নি। তিনি বলতে চেয়েছিলেন, যন্ত্র-বিপ্লব ভিন্ন রাজনৈতিক বিপ্লব ব্যর্থ: **"The full benefits of the other three revolutions—political, socio-economic and religious—cannot be reaped in the lives of the people without the technological revolution."**

পত্রলেখকেরা রুশ-জার্মানীর যুদ্ধের পিছনে কেবল আদর্শবাদের সংঘাতই দেখেছিলেন: নাজী ও কমিউনিস্ট মত সম্পূর্ণ ভিন্ন; উভয়ের একত্র অবস্থান সম্ভব নয়; নাজীরা ক্ষমতা-লালসায় লড়ছে, সোভিয়েট শক্তি লড়ছে যাতে পৃথিবীতে মানবতার আদর্শ বাঁচে; নাজীমত জঘন্য ধরণের সাম্রাজ্যবাদে বিশ্বাসী, আর কমিউনিজমের মূল উদ্দেশ্য সাম্রাজ্যবাদের ধ্বংস, কারণ তা শোষণে বিশ্বাস করে। ডঃ সাহা জানিয়েছিলেন, রাশিয়ার এইসব উচ্চ আদর্শের কথা তাঁর জানা আছে। সেই সঙ্গে কিছু বাড়তি কথাও বলেছিলেন: "হিটলার খোলাখুলি টিউটনিক জাতির পৃথিবী-শাসনের পক্ষে প্রচারকর্তা, অপরদিকে স্ট্যালিন সোভিয়েটভূমি রক্ষার জন্য তাঁর দেশাত্মবোধের (সমাজতন্ত্রের নয়) আহ্বান জানিয়েছেন। কিছুদিন আগে মস্কোতে সত্যই নিখিল শ্লাভ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়েছিল—আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সারা ইউরোপে শ্লাভ জাতির প্রতিরোধ জাগ্রত করার উদ্দেশ্যে।" এর পরে ডঃ সাহা কঠোরভাবে ভারতীয় কমিউনিস্টদের জাতীয়তাবিরোধী নীতির সমালোচনা করেছিলেন—অগাস্ট আন্দোলনের সময়ে কমিউনিস্টদের আচরণ তাঁর চোখের সামনেই ছিল।—**"Such a position may not be understood by some so-called Communists in India, who are so internationally minded that they consider a fight for national freedom to constitute narrow nationalism, but Stalin is completely justified in reinforcing the nationalist spirit and the feeling of the race-pride of his people in order to defend the liberty of the Soviet fatherland."** (Science and Culture ; Feb. 1943).

৭ **"Such a rapid glance may however bring out clearly the superiority of planned economic development to the capitalistic system prevailing elsewhere."**

(Technological Revolution in Industry, Etc.)

১৯৩৮ সালের জানুয়ারীতে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতের বিজ্ঞান কংগ্রেসের রৌপ্য-জয়ন্তী উৎসবে বিবর্তনবাদের জনক চার্লস ডারউইনের পৌত্র সি, জি ডারউইনের সঙ্গে অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা (বামে)।

না। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা থেকে রাতারাতি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উত্তীর্ণ হবার চেষ্টা করতে গিয়ে রাশিয়া যে কিছু ভুল করেছিল তা তিনি মৃদুভাবে জানিয়েছেন। উৎপাদনক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা তুলে দেওয়ায় উৎপাদন-ব্যবস্থা অচল হয়ে গিয়েছিল; মলোটোভের স্বীকারোক্তি মত অবস্থা দাঁড়িয়েছিল—"কারখানার বাইরে পরিপূর্ণ পরিকল্পনা, কারখানার ভিতরে পরিপূর্ণ বিশৃঙ্খলা"; এর ফলে লেনিনকে আপোষ করতে হয়েছিল; তাঁর 'নতুন অর্থ-নৈতিক নীতি'তে তিনি মূল শিল্প ও বাণিজ্য রাষ্ট্রের হাতে রেখে সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে উৎপাদনে ও সম্পদে ব্যক্তিগত অধিকার মেনে নিয়েছিলেন।৮ তা অবশ্য সাময়িকভাবে। পুরো কমিউনিজম ক্রমে আসবেই, জনসাধারণের মন তৈরি হয়ে গেলেই—এ বিশ্বাস তাঁরা ত্যাগ করেন নি।৯

ডঃ সাহার রচনা থেকে বোঝা যায়, তিনিও সামাজিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিপ্লবের ব্যাপারে কিছু ধীরে চলার পক্ষপাতী এবং কিছু আপোষের। এমন কি ধর্মবিপ্লবের ক্ষেত্রেও তাঁর তাই মত। ডঃ সাহাকে পূর্বে যেভাবে ধর্ম-বিদ্রোহীরূপে দেখেছি, তাতে এই ধীরতার মনোভাব কিছু বিস্ময়কর। রাশিয়ায় ধর্মবিপ্লব সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি অবশ্য পুরাতন অবৈজ্ঞানিক ধর্মের বিদায়ে আনন্দ প্রকাশ

---

৮ Fortunately Lenin sensed the dan ger in time and introduced the New Economic Policy, which allowed liberty of prod uction and of sale to peasants, small manufacturers, and retail businessmen keeping in the hands of the Government all foreign trade, heavy and medium industries, contr ol of transport, banking and all public utility service . . . The Bolsheviks, right at the begining of the Revolution, sought to go over to a communist system as nearly as possible, whose principle is "To every man according to his needs: from every man according to his capacity." This did not work because the necessary output of mate rial production had not been effected. The slogan "To every man according to his ability" has therefore been adopted in order to stimulate production during the present period, which according to them is essentially transitional."

৯ "They claim to be marching towar ds full-fledged communism when the psychology of the people is gradually changed by education and when material production has advanced sufficiently to satisfy all men's reasonable needs."

জসিমউদ্দীন

একটি সাক্ষাৎকার

অপরাজিতা গোপ্পী

কোনকালে কোনোখানে
নিষেধের প্রাচীর টেনে
কেউ পারে নি তোমাদের বেঁধে রাখতে

কবি জসিমউদ্দীন—
একালের মানুষ আমরা ঃ
প্রাণের প্রবল উচ্ছ্বাসে বলতে গিয়ে,
হঠাৎ গিয়েছি থেমে
পৃথিবীর এ-পারে।

দেখেছি রাজনীতির
পূতিগন্ধময় ব্যর্থতার অহঙ্কার।
একদিন ক্ষমতালিপ্সু রাজদণ্ড
রাজনীতির প্রাচীর তুলে
চেয়েছিল জীবন থেকে
জীবনকে ছিনিয়ে নিতে-

ভেবেছিল তারা—
নিষেধের প্রাচীর ডিঙিয়ে
কোনদিনও ঐ আকাশ
বর্ষণের প্রত্যাশায়
হিমালয়ের শ্বেত শুভ্র বুকে
আর আসবে না নেমে!

ওপারে—সোনালি ধানের শিষে
গঙ্গার বুক ছুঁয়ে—বাতাস
আর বুঝি কোনদিনও
তুলবে না প্রেমের হা হুতাশ।

এ-পারের মাছরাঙা পাখি
আর ও-পারের গাঙচিল
একসাথে ডুব দিয়ে
কোনদিনও ধরবে না মাছ—পদ্মা যমুনায়।

কিন্তু ওরা জানে না—
পদ্মার বুক ছুঁয়ে যে মন প্রহর গোণে

সে মন গঙ্গার এ-পারে
সবুজ ঘাসের বুকে—শিশিরের ঘ্রাণ লয়ে
প্রতিদিন আগামী দিনের
ইতিহাস খোঁজে।

কবি জসিমউদ্দীন—
সাম্রাজ্যলোভীর রক্তস্বাক্ষর বুকে লয়ে
অসহ্য যন্ত্রণায়—বিভক্ত বাংলার মানুষ আমরা
প্রশ্নের মত রয়েছি দাঁড়িয়ে
সেকাল আর এ-কালের মাঝে।

জানি না—
সীমাহীন আকাশের বুকে
রাত্রি অন্ধকারে সে মন কথা বলে
সে মন সাগরের লোনা জলে মুখ রেখে
ছিনিয়ে নেবে নাকি রক্ত
দূর নক্ষত্রের।

ওখানে কোন জাত নেই—
এপার ওপার হৃদয়ে হৃদয়ে,
মনের মিনার ঘিরে
সেখানে পারে নি
নিষেধের প্রাচীর—টেনে দিতে সীমানা
সেখানে জীবন ছাড়িয়ে জীবন
দিয়েছে বাড়িয়ে হাত হৃদয় গভীরে।

পুঞ্জীভূত ব্যথতা হতে
তোমার বাণী
উঠুক মূর্ত হয়ে
সর্বকালে সর্বদেশে,
তাই হে কবি—
খণ্ডিত বাংলার কলঙ্কিত রক্ত
বুকে লয়ে,
আগামী দিনের প্রত্যাশায়
দিয়েছি বাড়িয়ে হাত
তোমার হৃদয় গভীরে।

করেছেন, তবু বলেছেন, রাশিয়ায় যেভাবে ধর্মকে তাড়ানো হয়েছে তার জন্য চার্চের প্রগতিবিরোধী ভূমিকাই দায়ী।১০ বলশেভিকরা প্রথম দিকে ধর্মে হস্তক্ষেপ করে নি, কিন্তু পরে যখন দেখা গেল, পাদরীরা প্রতি-বিপ্লবে অংশ নিচ্ছে, তখনই তারা চার্চগুলিকে শিক্ষায়তনে পরিবর্তিত করে ফেলল। ঈশ্বরহীন সমাজ তারা তৈরি করল এবং পুরাতন ধর্মব্যবস্থার উদ্ভট হাস্যকর দিকগুলি খুলে ধরতে লাগল নানাভাবে। ধর্মীয় অনুষ্ঠান বাতিল করে নতুন ধরনের উৎসব-অনুষ্ঠানের প্রবর্তনও হল। ডঃ সাহা বলতে বাধ্য হয়েছেন, ঐ সব চেষ্টা স্থূল ধরণের ঃ

"They tried to organise, in a crude way, new festivals and new calendars. Thus the festival of St. John became the festival of the war on Superstition, that of St. Ilya the festival of Natural Science and the Electrification of Russia."

সাহার মতে, বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিস্তার ঘটিয়ে পুরাতন অবৈজ্ঞানিক ধর্মের স্বাভাবিক মৃত্যু আনাই বাঞ্ছনীয়। রাশিয়ার ধর্মবিপ্লবের এ দৃষ্টান্ত অন্য দেশ অনুসরণ করুক এও তিনি চান না ঃ

"Of the fourfold revolution, the religious one is the most difficult to judge, and the application lessons to other countries will be risky." [ক্রমশ]

---

১০ ইণ্ডিয়ান স্লোগানের শেষে সুভাষচন্দ্র এই কথাই বলেছেন।

হরপ্রসাদ মিত্র

বই-বাছাই

বাংলা বইয়ের মেলা

[পূর্বানুবৃত্তি]

১৯৪০-এর দশকের প্রাক্-স্বাধীনতা-পর্বের দিনগুলির সঙ্গে ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি বিশ-পঁচিশ বছরের কোনো তুলনাই সঙ্গত নয়,—এ-কথা আমি আনন্দকে ক্ষীণভাবে হলেও বেশ স্পষ্ট করেই জানিয়েছিলুম। সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিতার কয়েকটি উদাহরণ আমিও তাকে শুনিয়েছিলুম,—কারণ সুকান্তর কবিতা উল্লেখ করেই আনন্দ সেদিন তার বক্তব্য প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল। আমি বলেছিলুম উনিশ-শ' চল্লিশের কাছাকাছি সময়ে আমাদের জাতিমানসের যে অবস্থা গেছে, ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের পরবর্তী পঁচিশ বছরের সঙ্গে তার কোনো রকম সাদৃশ্যের ধারণা কষ্টকল্পনা মাত্র। সিঁড়ি, কলম, মোরগ, সিগারেট ইত্যাদি খুবই পরিচিত বিষয়গুলিতেও বিদ্রোহের রঙ ধরে গিয়েছিল ঐ ১৯৪০-এর দশকে,—সুকান্তর কবিতাই তার প্রমাণ। সুকান্ত তার 'ঠিকানা' জানাতে গিয়ে লিখেছিল—

ইন্দোনেশিয়া, যুগোশ্লাভিয়া
রুশ ও চীনের কাছে
আমার ঠিকানা বহুকাল ধরে
জেনো গচ্ছিত আছে

একটি বীর-বন্দনার কবিতার শেষ লাইনে সুকান্তের কথা ছিল—'বিপ্লব স্পন্দিত বুকে, মনে হয় আমিই লেনিন'।

আনন্দ বলেছিল—বুঝেছি, আর উদাহরণ বাড়াবার দরকার নেই। ১৮০০ সাল যে ১৯৪০ নয়, সে-বিষয়ে আমাদের মধ্যে কোনো মতানৈক্য ঘটতেই পারে না। আমি যা বলতে চাই, তা মাত্র এই যে, ১৮০০ খ্রীস্টাব্দ থেকে বাংলার সমাজ-জীবনে, জন-জীবনে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যে ব্যাপক পরিবর্তন দেখা দেয়, তা হয়তো ঠিক সেই সময়েই সকলের নজরে পড়ে নি, কিন্তু সেটা ঘটেছিল ঠিকই। এদেশে খ্রীস্টধর্মের সেই প্রচার-উদ্যম কি ভোলা যায়? আমাদের বাংলা গদ্য-সাহিত্যের উদ্ভব-পর্ব এই খ্রীস্টীয় আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। সেও একটা বৈপ্লবিক ব্যাপার।

এই বলে সে সজনীকান্ত দাসের 'বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস' [১৩৫৩] বইখানির 'ভূমিকা' থেকে অধ্যাপক সুশীলকুমার দের এই কথাগুলি পড়ে শুনিয়েছিল—

> উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নূতন শিক্ষা ও আদর্শের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে যে দেশব্যাপী জাগরণের সূত্রপাত হইয়াছিল, তাহাই বাংলা গদ্যের প্রথম যুগের সূত্রপাত করিয়াছিল। কিন্তু বেশি দিনের কথা না হইলেও এই সদ্যোবিগত শতাব্দীর ইতিবৃত্ত আমরা প্রায় ভুলিতে বসিয়াছি। প্রাচীনতর যুগ সম্বন্ধে আমরা অনেক সংবাদ রাখি, কিন্তু যে-যুগ আমাদের এত নিকটবর্তী এবং আমরা এখনও যে-যুগের ভাব-বিপ্লবের ফলভাগী, তাহার সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান যে খুব বেশি তাহা বলা যায় না।

আমি বললুম—সজনীবাবু যখন শ্রীরামপুর কলেজের লাইব্রেরিতে গিয়ে কাজ করছিলেন, সে-সময়ে আমি সেখানে অনেকদিন তাঁকে অধ্যয়নরত দেখেছি। আমি তাঁকে জিগেস করেছিলুম—'সজনীদা, কেরির অভিধান, ব্যাকরণ, কথোপ-কথনমালা ইত্যাদি বইয়ের মধ্য দিয়ে সে-পর্বের সমাজ-মনের চেহারাটা কি আপনি লক্ষ্য করছেন?'

তিনি বলেছিলেন—আমি ঠিক এই মুহূর্তে টমাসের প্রসঙ্গ দেখছি—হাঁ সমাজের চেহারা এসব রচনা থেকে অনেকটাই অনুভব করা যায়। কিন্তু আমি প্রধানত অন্য আলোচনার মালমশলা নিতেই এখানে এসেছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৩৫৩ সালের ১০ই আষাঢ় ডক্টর সুশীলকুমার দে সজনীকান্তের বইখানির যে ভূমিকা লিখে দেন, তাতে তিনি জানান—

> পথিকৃৎ না হইলেও সজনীকান্তের রচনা তাঁহার পূর্বগামীদের রচনার পূরণ ও সংশোধন হিসাবে বহু অজ্ঞাত ও মূল্যবান তথ্যের সন্ধান দিয়াছে। শ্রীরামপুর কলেজের ও অন্যান্য স্থলের বিক্ষিপ্ত দপ্তরে অনেক পুরাতন কাগজপত্র পরীক্ষা করিবার সৌভাগ্য তিনি পাইয়াছেন, যাহা তাঁহার পূর্বগামীদের নাগাল বা নজরের বাহিরে পড়িয়াছিল। নূতন তথ্যের উদাহরণ হিসাবে বলা যাইতে পারে, রামরাম বসু, গোলোকনাথ শর্মা ও উইলিয়ম কেরি সম্বন্ধে তিনি অনেক নূতন কথা বলিতে পারিয়াছেন, মিলার ও আপজনের পুস্তক তিনি প্রথম আবিষ্কার করিয়া আমাদের গোচরে আনিয়াছেন।

আনন্দ বলেছিল—বাংলা গদ্যচর্চার ইতিহাস দীনেশ-চন্দ্রের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের' নবম অধ্যায়ের 'পরিশিষ্ট'-অংশেও কিছু কিছু দেখেছ নিশ্চয়? দীনেশচন্দ্র 'শূন্য-পুরাণ'-কে যতো প্রাচীন মনে করেছেন, অন্যান্য সাহিত্য-ঐতিহাসিকেরা ঠিক ততো প্রাচীন মনে করেন নি। 'শূন্য-পুরাণে' গদ্যরীতি ছিল কি ছিল না, সে-কথা এখানে অবান্তর, কারণ তোমার পরিকল্পনা ১৮০৩ খ্রীস্টাব্দের বেশি আগে পিছিয়ে যেতে অনিচ্ছুক। অতএব দীনেশবাবুর বইয়ে চণ্ডীদাসের 'চৈতন্যরূপ-প্রাপ্তি', রূপ গোস্বামীর 'কারিকা', কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'রাগময়ীকণা'-র সূত্রব্যাখ্যান-অংশ—অথবা 'দেহকড়চা', 'ভাষা পরিচ্ছেদ', 'বৃন্দাবনলীলা'

—যা 'আশ্রয়নির্ভর', 'ত্রিগুণাত্মিকা' প্রভৃতি যেসব সহজিয়া বৈষ্ণব পুঁথিতে গদ্যের উদাহরণ আছে বলা হয়েছে সে-সব। তথ্যের আলোচনাও এখানে নিষ্প্রয়োজন। দীনেশচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে লেখা কয়েকখানি চিঠিপত্রের উল্লেখ করেছেন,—নন্দকুমারের চিঠির কথা লিখেছেন। এই চিঠিগুলিতে উর্দু এবং বাংলার মিশ্রণ কীরকম চলেছিল, তিনি তারও উদাহরণ দেখিয়েছেন, কিন্তু সে-সব কথাও এখানে আলোচনায় দরকার নেই। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'স্মৃতিকল্পদ্রুম' নামে একখানি স্মৃতি-গ্রন্থে গদ্যের নমুনা দেখেছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ১২৫২ সালের ১৭ই ফাল্গুন তারিখে লেখা রেকবদের এক প্রাচীন দলিলের গদ্যের আলোচনা করে গেছেন ১৩০৬ সালের সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায়। দীনেশবাবু এ সবই উল্লেখ করে গেছেন।৪ কিন্তু এসব এ-আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যাঁরা বাংলা গদ্যের আদিপর্ব—অর্থাৎ আঠারো-উনিশ শতকের সন্ধিপর্ব সম্বন্ধে উৎসুক, তাঁরা নিশ্চয় দীনেশবাবুর এই কথাগুলি লক্ষ্য করবেন—

এই বলে আনন্দ এই ক'টি কথা পড়ে শোনালো—

> এই উর্দু-মিশ্র ভাষাকে যথাসাধ্য সহজ করিয়া ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে এইচ পি ফর্স্টার সাহেব কতকগুলি আইনের তর্জমা করেন, তাহা এস্থলে আলোচ্য নহে। সেই তর্জমার ভাষা অপেক্ষাকৃত সহজ হইলেও অন্বয় ইংরেজীর অনুকরণে সম্পাদিত হইয়া দুরূহ হইয়াছে, তাহাতে কর্ম, কর্তা ও ক্রিয়ার যথেচ্ছাচার সন্নিবেশ হেতু ছত্রগুলির পরিষ্কাররূপ অর্থ পরিগ্রহ করা যায় না।

বললে—আরো শোনো, দীনেশবাবু লিখেছেন—

> যে ভাষায় টেকচাঁদ ঠাকুর 'আলালের ঘরের দুলাল' রচনা করিয়াছিলেন, তাহা তিনিই প্রবর্তিত করিয়াছিলেন বলিয়া খ্যাতি আছে, কিন্তু অষ্টাদশ খ্রীস্টাব্দের শেষ ভাগে 'কামিনীকুমার'-রচক কালীকৃষ্ণ দাস 'গদ্য-ছন্দের' যে নমুনা দিয়াছেন, তদৃষ্টে 'আলালী ভাষা' তাঁহার সময়েও প্রচলিত ছিল বলিয়া বোধ হয়।

আমি বললুম—আনন্দ, আমরা মূল প্রসঙ্গ থেকে দূরে সরে এসেছি। এসব মতামতের সমালোচনা কিছু কম হয় নি ইতিমধ্যে। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের আগে যা ঘটে গেছে—আমাদের গদ্য-চর্চার সে-সব তথ্য সুকুমারবাবুও দিয়েছেন। কিন্তু তিনি আগের ঘটনা দিয়ে আলোচ্য সময়কে আচ্ছন্ন করেন নি।

আমি আরো বললুম—দীনেশবাবুও তা করেন নি। ঐতিহাসিকেরা সাধ্যানুসারে মালমশলা সাজিয়ে গেছেন। কিন্তু সে-সব তথ্য এখানে নতুন করে পরিবেশন করবার দরকার কিসের?

আনন্দ বললে—কিঞ্চিৎ তথ্য উল্লেখ করলে পাঠকদের একথা বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, দেশী-বিদেশী অসংখ্য লেখকের মনে মনে বিশেষ এক লক্ষ্যচেতনা অনেকদিন ধরে জাগ ছিল। ভাবের অভিব্যক্তি সার্থক হতে সময় লাগে। ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে বাংলা গদ্যরীতির যে চর্চা দেখা গেছে, সেটাই এ-ইতিহাসের সূচনা নয়,—ইতিহাসেরও ইতিহাস ছিল।

—অর্থাৎ প্রাচীনকালে আয়ুর্বেদ-জ্যোতিষ-স্মৃতি-ন্যায়-কথকতা শিক্ষার্থীর ছোটো ছোটো কড়চাগুলিতে,—নাথ-যোগীদের প্রশ্নোত্তরমালায়,—ষোড়শ শতকের শেষ দিকের পোর্তুগীজ পাদরিদের কড়চায়,—অষ্টাদশ শতাব্দীর মনোএল-দা-আসসুম্পসাম-এর লেখা 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থ, ভেদ' (১৭৩৪; মুদ্রিত ১৭৪৩) বইখানিতে,—এবং এই ধরনের আরো নানা উদাহরণে গদ্যের যে-সব নমুনা পাওয়া যায়, সে-সব এক্ষেত্রে অবান্তর নয়,—তবে সে-ইতিহাস এ-আলোচনায় উহ্য থাক।

আনন্দ বললে—হাঁ অতিকিস্তার ত্যাগ করাই ভাল। বরং কেরি প্রভৃতির প্রসঙ্গেই এগিয়ে যাওয়া সমীচীন।

আমি বলেছিলুম—কেরির জীবনী নিয়েও এখানে বেশি কথা বাড়াবার দরকার নেই—যদিও তাঁর এই একটি কথা আমার বিশেষভাবে মনে পড়ছে। জেমস কালরসের (James Culross) 'উইলিয়ম কেরি' বইখানি বোধ হয় ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে লণ্ডন থেকে ছাপা হয়। ইউস্ট্যাস কেরিকে (Eustace Carey) উইলিয়ম কেরি একদা যা বলেছিলেন, সে-বইখানির এক জায়গায় সেই কথাগুলি তুলে দেওয়া হয়। বাংলা গদ্য-চর্চায় এবং—ভাষা ও সাহিত্যগত কেরির অন্যান্য চর্চার যা প্রধান কথা, সেটা বোধ হয় কেরির নিজের সেই উক্তি থেকেই ধরা যাবে। কেরি বলেন—আমার মৃত্যুর পরে কেউ যদি আমার জীবনী লেখবার কথা ভাবেন, তাহলে তাঁর সেই রচনা ভুল হোলো কি ঠিক হোলো সেটা মেপে দেখবার জন্যে তোমাকে একটা সূত্র দিয়ে যেতে পারি। তিনি যদি এইটুকু লেখেন যে, আমি নিরলস পরিশ্রমে অকুণ্ঠ ছিলুম,—কেবল হেঁটেছি আর হেঁটেছি—খেটেছি আর খেটেছি—তাহলে সেটাই হবে সত্যের স্বীকৃতি,—সেটাই হবে ন্যায়বিচার।

আনন্দ বললে—এ মন্তব্য যথার্থ শীলবানের বিনয় বচনও বটে, আবার উইলিয়ম কেরির কতকটা অভ্রান্ত আত্ম-সমালোচনাও বটে। কিন্তু তোমার এই বই-বাছাইয়ের ভূমিকা এইখানেই শেষ হোক। আমরা উনিশ শতকের প্রবেশদ্বারে এসে পৌঁচেছি।

আমি বললুম—শতকের রাজপথ দেখতে পাচ্ছি সামনে। পিছনে পড়ে রইলো অতীত। সেই অতীতকে আমাদের এই আধুনিককালের মূল ছুঁয়ে আছে,—আধুনিক ছাপা লেখার সূচনা ঘটেছিল সেই পর্বে! সেই তারিখটা স্মরণ করে নিতে বেশি সময় লাগবে না।

১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দই সেই স্মরণীয় সময়। হুগলিতে ছেনিকাটা বাংলা হরফে প্রথম ছাপা আরম্ভ হয়। এই বছরেই হুগলির ছাপাখানায় নাথানিয়েল ব্রাসি হালহেডের ইংরেজি বই এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গলী ল্যাঙ্গোয়েজ-এ কিছু কিছু ব্যাকরণ-সম্পর্কিত উদাহরণ হিসেবে কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীরামের মহাভারত আর ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর থেকে বাংলা হরফে কোনো কোনো অংশ ছাপা হয়। সাহেবরা এ কাজে আমাদের পথ দেখিয়ে গেছেন।

---

৪ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—পৃঃ ৫৭০-৭১ দ্রষ্টব্য।

বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির আধুনিক পর্ব এদিক দিয়ে সত্যিই পাশ্চাত্য সম্পর্ক কোনোমতেই অস্বীকার করতে পারে না।

আমি বললুম—তা যদি বলো, তাহলে সে-সম্পর্ক তো আরো আগেকার ব্যাপার। কাশিমবাজারের কুঠীর মার্শাল সাহেব তো সুদূর ১৬৭৭ খ্রীস্টাব্দে শ্রীমদ্ভাগবতের ইংরেজি অনুবাদ করেছিলেন। ১৮০০ সাল অতিক্রম করবার আগেই অষ্টাদশ শতকের সপ্তম দশক থেকে হালহেড, ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন, চার্লস উইলকিনস, জোনস, গিলক্রাইস্ট প্রভৃতির গবেষণা শুরু হয়েছে। ১৭৮০ খ্রীস্টাব্দে মালদহ থেকে গ্ল্যাডউইনের 'A Compendious Vocabulary, English and Persian, Compiled for the East India Company' ছাপা হয়। তাতে বাংলা শব্দে সংস্কৃতের প্রভাব সম্বন্ধে সচেতনতার লক্ষণ ছিল।

হঠাৎ আনন্দ বললে—তোমার পাঠকদের পক্ষে এসব তথ্য বিরক্তিজনক হয়ে পড়ছে। লেখবার সময়ে বাদ দিও এসব। তাঁদের শ্রম কমাবার জন্যে অসংখ্য বইয়ের স্তূপ থেকে বই বেছে দিতে চাও তো? তাহলে এইসব আনুষঙ্গিক খবর পড়িয়ে লাভ কি?

আমি বললুম—আর নয়,—প্রথম ছাপার হরফের প্রসঙ্গটা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাবে কি?

এ প্রশ্নের উত্তরে সজনীকান্ত দাসের বই থেকে ১২৮৪ সালের 'নববার্ষিকীর' এই মন্তব্যটি আনন্দ পড়ে শোনালো—

> উইলকিন্স সাহেব (যিনি পরে সার চার্লস উইলকিন্স নামে খ্যাত হন) নিজ হস্তে প্রথম বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষর প্রস্তুত করেন। তৎপর পঞ্চানন কর্মকার নামক এক ব্যক্তিকে ছেনী প্রস্তুত করিবার পন্থা শিখাইয়া দেন। ১৭৮৫ অব্দে সার ইলাইজা ইম্পের সংগৃহীত ইংরেজি ব্যবস্থা সকল জোনাথন ডনকেন সাহেব কর্তৃক বাংলা ভাষায় অনুবাদিত হইয়া কোম্পানির যন্ত্রে মুদ্রিত হয়। কিন্তু বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষর সৃষ্টির দিবস হইতে সাত বৎসর কাল পর্যন্ত বাঙ্গালা মুদ্রাক্ষরের কিঞ্চিৎমাত্র উন্নতি দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অতঃপর ফস্টর [ফরস্টর] সাহেব, কর্ণওয়ালিসের ১৭৯৩ অব্দের ব্যবস্থা যখন সরল ও চলিত ভাষায় অনুবাদ করিয়া মুদ্রাঙ্কনে প্রবৃত্ত হন, তখন যে অক্ষরের প্রয়োজন হয়, পঞ্চানন কর্মকার নূতন এক সেট তাঁবা নির্মাণ করিয়া তাহা প্রস্তুত করেন। সেই মুদ্রাক্ষর উৎকৃষ্ট বলিয়া তৎকালে বিশেষ আদৃত হইয়াছিল। কালীকুমার রায় নামক এক ব্যক্তি সুছাঁদ লিখিতেন, তাঁহারই লেখা দেখিয়া বর্তমানে মুদ্রাক্ষরের ছাঁদ হইয়াছে। বাংলা মুদ্রাক্ষরের যাহা কিছু উন্নতি তাহা শ্রীরামপুরে সংসিদ্ধ হইয়াছে।

এক নিশ্বাসে এই অংশ পড়ে শেষ করে আনন্দ বললে—সজনীবাবু এ খবরটি তাঁর বইয়ের পরিবর্তিত সংস্করণের (১৩৬৯) পাদটীকায় দিয়েছেন। তোমার বই-বাছাই সম্পর্কিত আলোচনাতেও এ খবর পৃষ্ঠার পদসংলগ্ন হওয়া উচিত—এ খবর গোপ খবর। মনে রেখো।

আমি বললুম—আর কি মনে রাখবো?

—মনে রেখো, স্মরণীয়, সার্থক রচনার গৌরবই তোমার প্রধান ধর্তব্য বিষয়। সন-তারিখের বেশি বিতর্ক, সামাজিক রাজনৈতিক প্রসঙ্গের বাহুল্য,—বিশেষ লেখকের জীবনকথার বিস্তার—ইত্যাদি ব্যাপার তোমাকে সাধ্যানুসারে এড়িয়ে চলতে হবে।

—কিন্তু উনিশ শতক তো সামাজিক-সাংস্কৃতিক নানা আন্দোলনের সময়। কিছু কিছু কথা তো অপরিহার্য।

আনন্দ বললে—অপরিহার্য কথা থেকেই পরিহার্য কথা এসে পড়ে। একখানি বইয়ের কথা মনে পড়ছে। সে কথা বললেই তুমি আমার কথা বুঝতে পারবে। 'মহামোগল কাব্যের' কথা শুনেছ?

—শুনেছি, কিন্তু পড়ি নি।

সে বললে—আমিও পড়ি নি। 'বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস'-এর লেখকই ছিলেন ঐ 'মহামোগল কাব্য'র লেখক। 'বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস' হয়তো দরকারী বই—সামাজিক তথ্যের অনুসন্ধানী যাঁরা, তাঁদের হয়তো ও-বই কাজে লাগে, কিন্তু আমি সে বইয়ের কয়েক পৃষ্ঠা পড়েই পরিত্যাগ করি। আমার রুচি অন্যরকম। দুর্গাচরণের জন্ম হয় ১২৫৪ সালে। ভদ্রলোক ছিলেন অনেক রকম অভিজ্ঞতার মানুষ, কিন্তু তাঁর লেখার ভার এবং একঘেয়েমি আমার একেবারেই সহ্য হয় নি।

আমি বললুম—আমি কোন্ রুচির জন্যে লিখবো?

দ্বিধাহীন মুক্তকণ্ঠে সে বললে—আমার মতন যাঁদের রুচি, তাঁদের জন্যে। জানো তো, আমার নাম 'আনন্দ'।

তারপর আবার পূর্বপ্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে সে বললে—সান্যাল মশাই ১৩১৩ সালের ১লা চৈত্র তারিখে লেখা তাঁর এই বইখানির 'বিজ্ঞাপন'-অংশে জানান যে, বাংলাদেশের ইতিহাস সংগ্রহের চেষ্টায় তিনি আঠার বছরের পরিশ্রমের পরে—"নানাবিধ বিবরণী সংগ্রহ করত এই গ্রন্থ প্রকাশ করিলাম। প্রচলিত ইংরেজী ও পারসী ইতিহাস, পুরাতন জমিদারদিগের সনদ, বংশানুক্রমিক কিংবদন্তী, শেখ শুভোদয়া নামক গ্রন্থ, রাঢ়ী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদের কুলশাস্ত্র, বল্লালচরিত, এবং ভট্টকবিতা, এই সমস্ত মিলাইয়া যথাসাধ্য সত্য নির্ণয়-পূর্বক এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিয়াছি।" এই 'বিজ্ঞাপন'-এর শেষ কয়েক ছত্রে তিনি আরো লিখেছেন—"মৎকৃত এই ইতিহাস সম্বন্ধে আমি এইমাত্র বলিতে পারি যে, ইহাতে সম্পূর্ণ অমূলক বৃত্তান্ত নাই; অধিকন্তু ইহাতে সাময়িক আচার ব্যবহার রীতিপদ্ধতি সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। সেইজন্য এই গ্রন্থের নাম "বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস" রাখিলাম।

১৩১৭ সালে 'লোকনাথ এন্ড কোম্পানী'—কলিকাতা—থেকে শ্রীদুর্গাচন্দ্র সান্যাল কর্তৃক সংগৃহীত ও শ্রীফকিরচন্দ্র দত্ত সম্পাদিত 'বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস' বইখানির 'সম্পূর্ণ পরিশোধিত ও পরিবর্ধিত' যে নতুন সংস্করণ ছাপা হয়, তাতে সম্পাদক ফকিরচন্দ্রের একটি নিবেদন এবং দুর্গাচন্দ্রের সংক্ষিপ্ত জীবনীও পাওয়া যায়।

কিন্তু থাক সে-সব কথা। আশা করি, এ-থেকে আমার অভিপ্রায় তুমি ধরতে পেরেছ? সান্যাল-মশায়ের এই অভ্যাসেরই নাম অতিবিস্তার,—একেই বলে বাহুল্য।

এই বলে আনন্দ চুপ করলো। [ক্রমশ]

বর্ষ দর্পণ

প্রতিদিনের সংবাদপত্র খুললেই প্রথম পৃষ্ঠাতেই কোন না কোন ধরনের সংঘর্ষের সংবাদ চোখে পড়ে। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির, বা গোষ্ঠীর সঙ্গে গোষ্ঠীর সংঘর্ষ বরাবরই আছে, তবে এ বিষয়ে পূর্বে ঘটনাগুলির বিবরণ ছাপা হত তৃতীয় কিম্বা সপ্তম পৃষ্ঠায়, কখনো বা মফস্বল বাংলার খবরাখবরের মধ্যে; কিন্তু বর্তমানে তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপারগুলিও প্রথম পৃষ্ঠায় বড় বড় হরফে ছাপানো হয়, উদ্দেশ্য যাতে এগুলি বিশেষ করে লোকের চোখে পড়ে। অনেক উচ্চাভিলাষী আছেন, যাঁরা আশা করেন এই ঘটনাগুলিকে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আইন ও শৃংখলার ব্যর্থতার নিদর্শন হিসাবে গ্রহণ করে কেন্দ্রীয় সরকার রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করবেন।

যুক্তফ্রন্টের হয়ে এখানে ওকালতি করা হচ্ছে না। যদিও সংঘর্ষের ঘটনাগুলির ঘটায় ঔচিত্য কতখানি তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যায়, কিন্তু তথ্যের সাহায্যে এ কথা মোটেই প্রমাণ করা যায় না যে, সংখ্যা এবং পরিমাণের দিক থেকে তা পূর্ববর্তী বছরগুলির রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। কিন্তু যেহেতু ঘটনামাত্রেই আপেক্ষিক, সেগুলি প্রথম পৃষ্ঠার খবর ছিল না, কেন না সেগুলিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা যায় নি, কিন্তু এখন যেহেতু রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের চেষ্টা হচ্ছে সেই কারণেই হয়ত সেগুলি উপস্থাপিত হচ্ছে নিত্য-নতুন কৌশলে এবং আঙ্গিকে।

গত বাইশ বছর জুড়ে সমগ্র ব্যাপারটাই ছিল একতরফা। সংবাদগুলি প্রকাশিত হয়েছে একান্তই দায়সারাভাবে। যারা হত হয়েছে, যেহেতু তারা সুবিধাভোগী শ্রেণীর লোক নয়, অতএব সেক্ষেত্রে হত্যা বা লুণ্ঠন বা অত্যাচার আইন-শৃংখলাঘটিত কোন সমস্যা নয়। কারখানার অভ্যন্তরে মালিকপক্ষের নির্দেশে ব্যাপক হত্যা ঘটেছে, কিন্তু তা আইন-শৃংখলার সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় নি। বলপ্রয়োগে বর্গাদার উচ্ছেদ করা হয়েছে, ভূমি-শ্রমিককে পিটিয়ে মারা হয়েছে, কথায় কথায় নিরস্ত্র মানুষের ওপর গুলী চলেছে, কিন্তু সেগুলিকে আইন-শৃংখলার সমস্যা বলে গণ্য করা হয় নি। যখন বলপূর্বক দরিদ্রের জমি দখল করা হয়েছে তখন আইন-শৃংখলার সমস্যা দেখা দেয় নি। যখন হাজার হাজার বিঘা জমিতে জল ঢুকিয়ে তাকে ভেড়িতে পরিণত করা হয়েছে, সুপরিকল্পিতভাবে চাষীদের সর্বনাশ করা হয়েছে, তখন আইন-শৃংখলার সমস্যার সৃষ্টি হয় নি। যখন দরিদ্র মানুষ নিজের বৈধ অধিকার বজায় রাখার জন্য সংগ্রাম করেছে, তখন তা হয়েছে আইন-শৃংখলার সমস্যা, তাদের ওপর নির্বিচারে গুলীবর্ষিত হয়েছে। কিন্তু আজ চাকা ঘুরে গেছে বলেই যে কোন ঘটনার ভাষ্য যে কোন ভাবেই করা হচ্ছে।

এর অর্থ নিশ্চয়ই এই নয় যে, কোথাও কিছু হচ্ছে না, সব ঝুটা হ্যায়। এরকম কথা কেউই বলে না। তবে এবারের সংঘর্ষের প্রকৃতি গুণগতভাবে গত বাইশ বছরের তুলনায় পৃথক। মূলত অধিকাংশক্ষেত্রেই লড়াইটা হচ্ছে ভূমি দখলের লড়াই এবং প্রতিরোধটা আসছে ধনী জোতদারদের তরফ থেকে। অধিকাংশক্ষেত্রে তারাই আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করছে, কেন না তারা এতদিনের বে-আইনী অধিকার ছেড়ে দিতে নারাজ। কংগ্রেসী আমলে মাথাপিছু জমির পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল, বলা হয়েছিল যে, এইভাবে যে জমি উদ্বৃত্ত হবে তা ভূমিহীনদের দেওয়া হবে। কিন্তু সেই আইনকে ফাঁকি দিয়ে লক্ষ লক্ষ একর জমিকে বেনামী করে লুকিয়ে ফেলা হয়েছিল। তৎকালীন কংগ্রেস সরকার হুমকি দিয়েছিলেন যে, এইভাবে লুকোনো জমিগুলিকে উদ্ধার করা হবে, কিন্তু সেই হুমকি কাজে পরিণত করা হয় নি। যুক্তফ্রন্ট সরকার তা কাজে পরিণত করছেন। কাজেই সর্বত্র বে-আইনী জমি দখলের প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে।

নীতিগতভাবে সকলেই স্বীকার করেন যে, বে-আইনীভাবে ধরে রাখা জমিগুলির পুনরুদ্ধার ও ভূমিহীনদের মধ্যে সেগুলি বণ্টন করা উচিত। কিন্তু কার্যত তা ঘটতে দেখলেই তাঁরা পাইকারীহারে আর্তনাদ শুরু করে দেন, গেল গেল সব গেল, খুন-জখম হচ্ছে, আইন-শৃংখলা গোল্লায় যাচ্ছে। কিন্তু অহিংস উপায়ে এই কাজটা কিভাবে হবে? এটা কি আশা করা যায় যে, বে-আইনী জমির মালিকরা অকস্মাৎ তাদের হৃদয় পরিবর্তন করে তাদের লুকোনো বেনামী জমিগুলি সরকারের হাতে সমর্পণ করে দেবে? পক্ষান্তরে এটাই আশা করা যায় যে, সর্বশক্তি দিয়ে তারা তা প্রতিরোধ করবে, কেন না তাদের সামর্থ্য এবং অর্থ কোনটারই অভাব নেই। ইতিমধ্যে তারা কোর্টে হাজার হাজার মামলা দায়ের করেছে এবং অন্তর্বর্তীকালীন ইনজাংশন আদায় করে নিয়ে বহু লক্ষ বিঘা জমির হস্তান্তরকরণ কিছুকালের জন্যও স্থগিত রাখতে সক্ষম হয়েছে।

এবং দ্বিতীয়ত তারা সশস্ত্র প্রতিরোধ করছে। বেশির ভাগ জোতদারেরই আগ্নেয়াস্ত্র আছে। এবং এখন বে-আইনী জমির অধিকার বজায় রাখতে সেগুলি ব্যবহার বেপরোয়াভাবে করা হচ্ছে। এ সাহস তাদের কোথা থেকে এসেছে যদি সে প্রশ্ন তোলা যায়, তার জবাবে একথা বলা যায় যে, বাইরে থেকে এই কাজটাকে যতটা ঝুঁকিপূর্ণ বলে মনে হয় কার্যক্ষেত্রে তা নয়। যদি আদালতে মামলা ওঠে তারা স্বচ্ছন্দেই এ কথা বলতে পারবে যে, আত্মরক্ষার প্রয়োজনেই তারা আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার করেছে। (এমন কি যখন পুলিশও গুলী চালায় তাও নাকি আত্মরক্ষার জন্য, যে কোন গুলীচালানোর ঘটনার পর সরকারী প্রেসনোটটি দ্রষ্টব্য), বিশেষ করে যখন নাকি "ক্রুদ্ধ জনতা" তাদের জীবন বিপন্ন করে তুলেছে। কাজেই যাঁরা সাম্প্রতিক ঘটনাবলীতে আইন-শৃংখলা গেল গেল বলে রব তুলছেন, তাঁদের অবগতির জন্য এটুকু বলার প্রয়োজন যে, তাঁরা যে অর্থে আইন-শৃংখলার পুনরুদ্ধার চান তা পেতে হলে যুক্তফ্রন্টকে সকল সংস্কারমূলক কাজকর্ম থেকে বিরত হতে হয়, জমির ক্ষেত্রে জোতদারকে, শিল্পের

ক্ষেত্রে মালককে অবশ্য স্বাধীনতা দিতে হয়, স্বীকার করতে হয় যে জোতদারের অধিকার আছে যে কোন পরিমাণ জমি রাখার, অধিকার আছে বর্গাদার উচ্ছেদ করার, অধিকার আছে ভূমি-শ্রমিকদের পেটানোর, কারখানার মালিকের অধিকার আছে শ্রম আইন না মানার, অধিকার আছে ট্রাইব্যুনালের রায়ের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখানোর, অধিকার আছে শ্রমিককে সর্বনিম্ন মজুরী থেকে বঞ্চিত করার, অধিকার আছে ব্যাপক ছাঁটাই, লক-আউট, লে-অফ-এর। তাঁরা যে অর্থে আইন-শৃংখলার পুনরুদ্ধার চান তা পেতে হলে সরকারকে পুলিশী সরকার হতে হয়, মালিক বা জোতদারের নির্দেশে পুলিশকে ভাড়াটে গুন্ডার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দিতে হয় এবং যদি রক্তগঙ্গা বয়, তাতে আইন-শৃংখলার হানি হবে না—সংবাদপত্রগুলি সরকারের তারিফ করবে, এমন কি মুখ্যমন্ত্রী বা উপ-মুখ্যমন্ত্রীকে "জবরদস্ত মানুষ" নামক অনারারী ডিগ্রীটিও দিয়ে দেবে।

পরিকল্পিত চক্রান্তের প্রকাশিত অংশ

জুলাই মাসের শেষ তারিখটিতে বিধানসভার অভ্যন্তরে একদল পুলিশ প্রবেশ করে যে কান্ডটি ঘটিয়েছে, সেটিকে কোন বিচ্ছিন্ন সাময়িক উন্মাদনার ব্যাপার মনে করলে একান্তই ভুল করা হবে। যুক্তফ্রন্ট সরকারের ওপর এক শ্রেণীর পুলিশকর্মচারীদের ক্রোধ অতি প্রকট, কেন না যুক্তফ্রন্ট সরকার পুলিশের চেয়ে জনগণের ওপর অধিকতর নির্ভর করতে চান। যুক্তফ্রন্ট সরকারের এই নীতির জন্য দীর্ঘকাল ধরেই বিভিন্ন মহল থেকে ধুয়া তোলা হয়েছে যে, যুক্তফ্রন্ট সরকার নাকি পুলিশের মনোবল নষ্ট করে দিয়েছে। বলা বাহুল্য, এই জাতীয় কথাবার্তার সঙ্গে সত্যের সম্পর্ক বড় সামান্য। এতকাল পুলিশকে পীড়নের যন্ত্র হিসাবে শাসক ও সুবিধাভোগী শ্রেণীর "সবচেয়ে সংগঠিত গুন্ডাবাহিনী" হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। যুক্তফ্রন্ট সরকার এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন চান। পুলিশও জনসাধারণের অংশ এবং সেই হিসাবে জনসাধারণের বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থের সঙ্গে পুলিশী ব্যবস্থাকে সমন্বিত করাই যুক্তফ্রন্ট সরকারের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, সামগ্রিকভাবে না হলেও, যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে পুলিশকে রাজনৈতিক প্রয়োজনে বা সুবিধাভোগী শ্রেণীর স্বার্থে ব্যবহার করা হয় নি, তাকে তার আসল কর্তব্যগুলির প্রতি, অর্থাৎ সমাজবিরোধী কার্যকলাপ দমনের প্রতিই নিবদ্ধ করা হয়েছে এবং একথাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপ দমনের ক্ষেত্রে পুলিশের তৎপরতা গত বাইশ বছরের অনুপাতে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এমন অভিযোগ অবশ্য পাওয়া যায় যে, কোন কোন স্থানের পুলিশ তাদের কর্তব্যের জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর রাজনৈতিক দলের নির্দেশের ওপর নির্ভরশীল থাকে। কথাটা মিথ্যা নয়, অবশ্য এই জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের বহুদিনের গড়ে-ওঠা মনোবৃত্তিটাই বহুলাংশে দায়ী। সকল ধরণের কর্মচারীর মধ্যে এমন এক শ্রেণীর মেরুদন্ডহীন মানুষ আছে, যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতদের অধিকতর মন যুগিয়ে চলার পথ অবলম্বন করে, নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে এবং এই পথ অবলম্বনে তার ব্যক্তিগত লাভও যে হয় না তা নয়। আমরা এমন একজন অতি বিশিষ্ট পুলিশ অফিসারের কথা জানি, যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অত্যন্ত কৃতী ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও এবং প্রভূত ব্যক্তিগত গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও এই জাতীয় মনোবৃত্তির দ্বারা চলেন, কংগ্রেসী আমলে ইনি কংগ্রেসী নেতাদের সেবাদাস ছিলেন, ফ্রন্ট আমলে রাতারাতি আনুগত্যের পরিবর্তন করে নিয়েছেন।

যাই হোক, যুক্তফ্রন্ট সরকার কায়েম হবার পর থেকেই পুলিশমহলে এক মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হতে শুরু করে। দীর্ঘকাল ধরে সুবিধাভোগীদের স্বার্থে কাজ করতে বাধ্য হবার ফলে পুলিশবাহিনীর একাংশের মধ্যেও চূড়ান্ত ধরণের ব্যভিচারী মনোবৃত্তি গড়ে উঠেছে। প্রচুর ক্ষমতা, চালাও উৎকোচ ইত্যাদির প্রভাব এদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে অনুপ্রবিষ্ট হবার ফলে আজকের যুগের নতুন আদর্শের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলা এদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। এক শ্রেণীর অফিসারের কাছে যুক্তফ্রন্ট সত্যই অসহ্য হয়ে উঠেছে এবং তারা দৃশ্যতই শুধু যে ফ্রন্টবিরোধী নানা কাজ করছে তাই-ই নয়, অধিকন্তু গোপনে ফ্রন্টবিরোধী নানা চক্রান্তের সামিল হচ্ছে এবং বিভিন্ন তরফ থেকে সেজন্য মদত পাচ্ছে।

কয়েকখানি বিখ্যাত বাংলা অনুবাদ

এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ		
উদার পন্থী বিবেক	—চেস্টাব বোলজ	৫·০০
রূপান্তরের দুর্গম পথে	—এরিক হফার	১·০০
সাংবাদিকতার গোড়ার কথা	—বন্ড	৪·০০
কমিউনিজম ও বিপ্লব	—ব্ল্যাক ও থর্ণটন	৪·০০
যুবসমাজ ও কমিউনিজম	—রিচার্ড কর্ণেল	২·০০
রূপা এন্ড কোং		
প্রেম এক মন্ত্র	—হেনরী জেম্স	৪·৫০
স্বাদশ সূর্য	—সল কে প্যাডোভার	৪·৫০
প্রেসিডেন্ট নিক্সন	—মেজো এন্ড হেস	৩·৫০
সাহিত্যায়ন		
ইতিহাসের স্বর্ণ স্বাক্ষর	—ডি সি পিটি	৪·০০
শান্তিবোদ্ধা মার্টিন লুথার কিং	—এড ক্লেটন	২·২৫
ব্যাধির উৎস সন্ধানে	—বার্টন বোস	৪·০০
বাক্-সাহিত্য		
অর্থনীতি ও মানব কল্যাণ	—জে এম ক্লার্ক	৪·০০
প্রশ্নোত্তরে আমেরিকা	—বিয়ার	৩·০০
এশিয়ার ধূমায়িত অগ্নিকোণ	—ব্রায়ান ক্রোজিয়ার	৩·০০
এশিয়া পাবলিশিং কোং		
বিশ্ববিধানের সন্ধানে	—রিচার্ড এন গার্ডনার	৩·০০
হোমশিখা প্রকাশনী	স্লোসিংগার ও ব্রাস্টেন	১·৫০
অতীতের সন্ধানে বিজ্ঞান	—	
সাম্যবাদ : বিষয়বস্তু ও কার্যপদ্ধতি	—গোথ্লে	২·০০
নক্ষত্রলোকের পথে	—আইলিন ও সুখলার	১·০০
মাটি থেকে মহাকাশ	—ক্লাইড অর	১·০০
শ্রীভূমি পাবলিশিং কোং		
কেনেডি-মানস	—ওয়েসলি পেডারসেন	৩·০০
ভারতের কৃষি ব্যবস্থার পরিচয় (তিন খন্ড)	—ডাঃ জোনাহ্ ও অন্যান্য	৩·০০

এ ছাড়া নানা বিষয়ে আরো অনেক বই : পুস্তক বিক্রেতাদের উচ্চ কমিশন
তালিকা চেয়ে পাঠান : আজই অর্ডার দিন

এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ : ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলি-১২

বেশ কিছুকাল ধরেই লক্ষ্য করা যাচ্ছে এই শ্রেণীটি নানাপ্রকার উস্কানিমূলক কাজকর্মে লিপ্ত আছে এবং ইতিপূর্বেও তারা এমন কয়েকটি কাজ করেছে যা যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহেরই দ্যোতক।

কিন্তু ৩১শে জুলাই তারিখে এরা যে কার্যটি করেছে ইতিহাসে বোধ হয় তার তুলনা নেই। কোন একটি সংঘর্ষে জনৈক পুলিশকর্মচারী নিহত হয়েছিলেন। নিহত হবার ব্যাপারটা নিঃসন্দেহে দুঃখের, যদিও পুলিশের চাকরিতে জীবনের ঝুঁকি সর্বদাই থাকে এবং এক্ষেত্রে দুর্ভাগ্যক্রমে তাই ঘটেছে, কিন্তু নিহত পুলিশটির প্রতি যথাকর্তব্য সম্মানদানে যুক্তফ্রন্ট সরকার বিমুখ ছিলেন না। তথাপি বিস্ময়ের সঙ্গে দেখা গেল এই যে, শোকমিছিলটি শোকমিছিল থাকার পরিবর্তে অকস্মাৎ একটি জঙ্গীবাহিনীতে রূপান্তরিত হল, যুক্তফ্রন্ট সরকার ও জ্যোতি বসুর মুন্ডপাত করতে করতে তারা আইনসভার অভ্যন্তরে প্রবেশ করল, বিধানসভার অভ্যন্তরে তারা ক্ষিপ্তের ন্যায় আচরণ করল, সকল জিনিসপত্র নষ্ট করে দিল, কয়েকজন সদস্য আক্রান্ত হলেন, সব মিলিয়ে একটা নারকীয় দৃশ্যের অভিনয় সেখানে হয়ে গেল। অত্যন্ত ক্রোধের সঙ্গে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মন্তব্য করেছেন, বিক্ষোভ জানাবার এই কি পদ্ধতি? এ কি মৃতের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের নমুনা? না আসলে এটা একটা সুপরিকল্পিত চক্রান্তের প্রকাশ মৃতব্যক্তি যেখানে উপলক্ষ মাত্র।

শেষের অনুমানটাই যথার্থ। কেন না, কি অবস্থায় উক্ত পুলিশটির মৃত্যু হয়েছিল এবং এই বিষয়ে প্রকৃত দোষীদের শাস্তিদানের জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকার পূর্ব থেকেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। এ ছাড়া সরকারিভাবেও শোক প্রকাশের ব্যবস্থা হয়েছিল, স্থির হয়েছিল যে, মিছিলের সংগে দুজন মন্ত্রীও যাবেন, এবং সরকারী মর্যাদায় তার শেষকৃত্য করা হবে। কিন্তু অকস্মাৎ কোন্ যাদুমন্ত্রবলে ওই মিছিল যুক্তফ্রন্ট-বিরোধী একটি বিদ্রোহীবাহিনীতে পরিণত হল? আসলে নেপথ্য হস্তের কাজ এই ঘটনার পেছনে চলছিল, ফ্রন্ট-বিরোধী একটি গোটা বাহিনীই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল এবং উক্ত মৃত্যুটিই তাদের সেই আকাঙ্ক্ষিত সুযোগটি এনে দিয়েছিল।

এই বিদ্রোহীদের সম্পর্কে কি করণীয় সেটা যুক্তফ্রন্টসরকারই স্থির করবেন। তবে যাঁরা নানাভাবে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে অপদস্থ করতে চান, বা বেকায়দায় ফেলতে চান,—এইরকম অনাভপ্রেত ঘটনার সৃষ্টি করে, তাদের কয়েকটি বিষয় স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন। বিদ্রোহী পুলিশেরা বিধানসভার প্রাঙ্গণ তখনই ত্যাগ করে যখন খবর পাওয়া যায় যে, এই ঘটনার প্রতিবাদে যুক্তফ্রন্টের সমর্থনে হাজার পঞ্চাশেক লোকের একটি মিছিল দ্রুত বিধানসভা ভবনের দিকে আসছে। ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও যুক্তফ্রন্টের পিছনের এই ব্যাপক গণসমর্থন যতদিন আছে, ততদিন কোনপ্রকার চক্রান্ত করে কিছু হবে না।

সুখের বিষয়, বর্তমান বিষয়টি সম্পর্কে যুক্তফ্রন্ট কঠোরতম মনোভাব অবলম্বন করেছেন। শুধু সংশিলষ্ট ব্যক্তিগণকেই সাজা দিলে চলবে না—এর মূল খুঁজে বার করা দরকার। যে কথা বলে আমরা শুরু করেছিলাম, বিষয়টিকে কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে দেখলে নিতান্তই ভুল করা হবে। এর পিছনে নিঃসন্দেহে পদস্থ অফিসারদের হাত আছে। বেলা সাড়ে বারোটায় প্রথম ঘটনা ঘটল অ্যান্ডারসন হাউসে, কিন্তু গোয়েন্দা দপ্তর কোন খবর পেল না কেন? উন্মত্তের মত মারমুখী মিছিল শুরু হলে বেতার ভ্যান তাদের সঙ্গী হল না কেন? জনৈক পদস্থ পুলিশ অফিসার চব্বিশ পরগনা জেলার এস· পি অফিসে হাজির থেকে সেখানকার সমস্ত ঘটনা দেখেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও সতর্কতামূলক কোন ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নি কেন? এমন কি উন্মত্ত পুলিশদল বিধানসভা ভবনে প্রবেশ করার পরেও লালবাজার হেড কোয়ার্টার্সে কোন খবর পৌঁছয় নি।

ইতিমধ্যে দুজন সাব ইন্সপেক্টর সহ ছাব্বিশজন পুলিশ বরখাস্ত হয়েছে, চব্বিশ পরগনার এস· পি'কে বদলী করা হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ওপর মহলেও বিরাট পরিবর্তন আসন্ন। সৈন্যবাহিনীকেও প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিষয়টির শেষ পরিণতি কি ঘটে তা দেখার জন্য এখন আগ্রহ সকলেরই। একদিক থেকে অবশ্য ব্যাপারটা ঘটে ভালই হয়েছে, যুক্তফ্রন্ট সরকারের কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে মোহমুক্তি ঘটাতে সাহায্য করেছে। এই ঘটনাটিকে শুধু পুলিশবাহিনীর বিদ্রোহ হিসাবে দেখলেই চলবে না। এই ঘটনার পিছনে মদত যুগিয়েছে শুধু উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারীরাই নয়, সামগ্রিকভাবে আমলাতন্ত্র। যুক্তফ্রন্টের প্রতি যারা শুধু মৌখিক আনুগত্য প্রদর্শন করে অথচ গোপনে ফ্রন্ট-বিরোধী চক্রান্তের সামিল হয়, তাদের নির্মূল করার প্রয়োজনীয়তা এখন থেকে আরও বিশদভাবে অনুভূত হবে। —২রা আগস্ট, '৬৯

আবার প্রকাশিত হল

পাপুর বই

বইটি আমরা প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠক-মহলে অভূতপূর্ব আদৃত হয় এবং কিছু দিনের মধ্যেই সংস্করণটি নিঃশেষিত হয়ে যায়। সাড়ে-আট বছরের ছেলে পাপু কিভাবে এত অল্প বয়সে, কি ছবি আঁকায়, কি সাহিত্যের নানা বিভাগে—কবিতা, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধে এত প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গেল তা দেখে বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। আমরা তাই আবার বইটা পুনর্মুদ্রণ করে পাঠকদের হাতে তুলে দিলাম। সাম্প্রতিককালের একটি ইতিহাস এই বই।

ভাল কাগজ। লাইনো হরফে সুমুদ্রণ:
আর্ট কাগজে রঙিন ছবি।
মজবুত বোর্ড বাঁধাই।
শোভন পরিসাজ

দাম ঃ পাঁচ টাকা মাত্র

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাঃ লিঃ
৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড ঃঃ কলিঃ-৯

ভারত দর্শন

ইয়া ইয়া প্রস্তাব

ভ্যালা যন্ত্রণা হয়েছে এই পাকিস্তানকে নিয়ে। থেকে থেকে পাক-ভারতের সীমান্ত অতিক্রম করে ইয়া ইয়া প্রস্তাব চালাচালি হচ্ছে। বৃটিশ বদ্‌জাতির বিস্ফোটক অখণ্ড ভারতের ঐ বিখণ্ডিত অংশটি ভারত নামক ভূখণ্ডের হিংসায় জর্জরিত। উভয় ভূখণ্ডে শান্তি আসুক, এটা নিত্য পরিবর্তমান পাক-সরকারের আদৌ অভিপ্রেত নয়। কেন না স্বাধীনতার পর থেকে পাক ভূখণ্ডে রাজনৈতিক শান্তি বলতে কখনই স্থায়িভাবে কিছু প্রতিষ্ঠা পায় নি। গদীর জন্য খুনখারাবি আর ষড়যন্ত্র পাকিস্তানের জনসাধারণকে উপহার দিয়েছে কয়েকটি উচ্চাভিলাষী শাসক যাঁরা কেবলমাত্র অশান্তি এবং ভারতের সঙ্গে শরিকী হিংসার বনিয়াদের ওপর যতদিন সম্ভব গদী আঁকড়ে বসে থাকতে চেয়েছেন। সাধারণের মনে উত্তেজনার রেশ বজায় রেখে তাঁদের নিজস্ব সমস্যা থেকে চোখ ফিরিয়ে সর্বদা সেই দৃষ্টিকে সীমান্ত সঙ্ঘর্ষে আবদ্ধ রেখে নিজেকে টিকিয়ে রাখার বারম্বার ব্যর্থ-প্রয়াস চালিয়ে আসছেন। শাসকের পর শাসক ঘন ঘন পাল্টেছে, পাল্টায় নি শুধু ভারত-বিদ্বেষী রাজনীতির সস্তা খেলা। এই খেলার শেষতম খেলোয়াড় সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খানও নতুন কিছু করার ক্ষমতা নিয়ে পাক-শাসকের সিংহ আসনে আরোহণ করেন নি। আয়ুবকে সরিয়ে পরিত্যক্ত গদী একই গতানুগতিক নিয়মে ভোগদখল করতে এসেছেন মাত্র, যার মারাত্মক ফলশ্রুতি নতুন পাক-শাসকও পাকিস্তানের এতাবৎকালের ইতিহাসকেই পুনরাবৃত্তির স্রোতে বহমান রাখছেন। তাঁর সামনেও নতুন কোন ভবিষ্যৎ সৃষ্টি হয় নি। পাক-জনগণও নতুন আশা ও উদ্দীপনার কারণ খুঁজে পান নি। স্বৈরাচারী আয়ুব গেছেন, অনির্বাচিত ক্ষমতাধীশ গদী দখল করেছেন। জননেতা নন, তাই জনগণের উপকারার্থে নয়া নীতি উদ্ভাবন করে গণমঙ্গলের মাথা ব্যথাও তাঁর নেই। পাকিস্তানের রাজনীতি যে ভারত বিদ্বেষকে একমাত্র ক্যাপিটাল করে চলে আসছে ইয়াহিয়াও তারই স্রোতে কাজে কাজেই গা ভাসিয়েছেন। তাই ইন্দিরা গান্ধীর পারস্পরিক সৌহার্দ্যের প্রস্তাবের জবাবে ইয়াহিয়ার কাছ থেকেও এসে পৌঁছেছে সেই পুরনো ছকে-বাঁধা উত্তর। অর্থাৎ পহেলা কাশ্মীর আর ফরাক্কার ব্যাপারে পাক-বায়না মেটাও, পরে অন্য কথা। যেন ভারত দ্বিখণ্ড করার কালে এমন একটা লিখিত শর্ত হয়েছিল যে, ভারতকে পাকিস্তানের দাবিমাত্র যখন যেমন বায়না মিটিয়ে দিয়ে যেতে হবে। ভারতই অবশ্য পাকে-চক্রে পাকিস্তানকে এমনই একটা বিশ্বাস লালন করার সুযোগ দিয়ে এসেছে। তার অত্যাচার সহ্য করে এসেছে। তার সৃষ্ট হিন্দু বিতাড়ন সমস্যার ভারে অনেকগুলি বছর ভারতকে নাজেহাল হয়ে উন্নয়ন কার্যাদিতে কাটছাঁট করতে হয়েছে। পাকিস্তানের স্থায়ী শত্রুতার জন্য সীমান্ত রক্ষা ব্যয় এবং কাশ্মীরে অর্থ বিনিয়োগ গরিব দেশের মস্ত হস্তী পোষণের সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। আয়ুবের যুদ্ধ করার শখ মেটাতে দেশের বীর ছেলেদের মৃত্যুর মুখে এগিয়ে দিতে হয়েছে এবং তাসখন্দে শান্তির আশায় দৌড়-ঝাঁপ করতে গিয়ে ভারতের অন্যতম প্রিয় ও শক্ত নেতা লালবাহাদুর শাস্ত্রীকে দেহ রাখতে হয়েছে। এতো কাণ্ডের পরেও দুদেশে যে ইয়া ইয়া প্রস্তাবের চালাচালি হচ্ছে, ভারতের ক্ষেত্রে তাই কি যথেষ্ট সহনশীলতার পরিচায়ক নয়?

কিন্তু ভারতের এই ভালোমানুষের ভূমিকাটি দেশে-বিদেশে দুর্বলতা বলেই পরিগণিত। লালবাহাদুর এই পাক-তোষণী মনোভাবের চিরাচরিত ভাঁড়ামি থেকে ভারতকে ক্ষণিকের জন্য মুক্তি দিয়ে আয়ুবী অহঙ্কারের মাথা মুড়িয়ে দিয়েছিলেন। বেকায়দা দেখে বিশ্বের সদাহিতৈষী মুখগুলি হাঁ-হাঁ করে উঠেছিল। আরে সর্বনাশ, ভারত যে পাল্টা রুখে দাঁড়ায়! দে, দে আগুনে জল ছিটে দে। আমেরিকার গোঁসা তো ছিলই। রাশিয়াও তাসখন্দের আয়োজন করল। লালবাহাদুর দুনিয়াব্যাপী দুর্জনের খেলা দেখে দেহ রাখলেন। তাসখন্দ একটা পাকিস্তানের অনুকূলে লিখিত চুক্তি মাত্র হল যাকে রূপায়িত করার জন্য ভারতের ভালোমানুষী ফের বন্ধুবেশী কূটকৌশলীদের পাতা ফাঁদে যথারীতি পা ফেলতে লাগল। এ ছাড়া নান্যোপায়। চীন যে লাল চীন, সে পাক-মিতা হল। তাতে মার্কিনীদের কিন্তু পাক-বিরাগ জন্মাল না এতটুকু। আশ্চর্য ঘটনা। সেই লাল চীনও মার্কিন রক্ষকের তাঁবেদার পাকিস্তান সরকারকে সমানে মদত দিয়ে চলল। বুদ্ধিতে এসব ঘটনার ব্যাখ্যা দুর্লভ। সম্প্রতি আবার রাশিয়াও পাক-দরদী। পাকিস্তানের কয়েকটি স্বেচ্ছাচারী শাসককে মদত দেওয়ার জন্য বিশ্বশক্তি এ ব্যাপারে যাঁহা বাহান্ন তাঁহা তিপ্পান্ন। লাল আর লাল-বিরোধীতে কোন বিবাদ নেই। ভারতকে বন্ধুত্বপাশে আবদ্ধ করেছি, এইসব ফলাও বক্তার সঙ্গে কাজে কথায় বিশ্ববন্ধুদের উল্টো-পাল্টা কার্যাদি দেখে ভারতের পক্ষে ভালোমানুষীই যেন একমাত্র অবশ্য গ্রহণযোগ্য পথ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর আলালের ঘরের দুলালের মতো পাকিস্তানের স্বৈরাচারী শাসকরা তার ফলভাগী হচ্ছেন। দুটি দেশের সাধারণ মানুষের ওপর এইভাবে বিশ্ববন্ধুরা অনন্ত বোঝা চাপিয়ে অহেতুক বৈরিতা বজায় রাখার সুপরিকল্পিত প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন, এই কথাটা সোচ্চারে বললে যদি কোন বিশ্ববন্ধুর আবার গোঁসা হয়, তবে নাচার। আমরা হাড়ে-হাড়ে টের পাচ্ছি, বন্ধুরা পাক-ভারত ঠাণ্ডা লড়াইয়া জিইয়ে রাখতেই উৎসুক।

পাকিস্তানে তাই অস্ত্র যোগাবার জন্য এঁরা আজ উন্মুখ। এঁদের কার্যকলাপ দুই দেশের সাধারণ মানুষ লক্ষ্য করে যেদিন বুঝতে শিখবে যে, এই রাজনৈতিক চালবাজির শিকার না হয়ে তাদের স্বার্থ তাদেরই দেখতে হবে, সেদিন গোটা পৃথিবীর ওপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্ববন্ধুদের প্রতিযোগিতায় তারা আর কোন পার্টি বা পক্ষ হতে চাইবে না। ভারত-পাকিস্তানের মাটিতে সেদিন বিশ্ববন্ধুদের খেলও খতম হবে। ইয়া ইয়া প্রস্তাবের গঙ্গাযাত্রা করিয়ে দুই দেশের সাধারণ মানুষ তাদের শাসকবর্গের চাতুরীর ওপরও আঘাত হানবে। কিন্তু সেই

সাধনা
বিউটি স্নো-এর
কোমল স্পর্শে
সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়
সাধনা বিউটি স্নো
•একটি অতি আধুনিক অঙ্গরাগ
ত্বক মালিন্যমুক্ত ও লাবণ্যযুক্ত করে। মুখশ্রীতে লালিত্যের ও তারুণ্যের আভা ফুটে ওঠে।
SADHANA
Beauty Snow
সাধনা ঔষধালয় কলিকাতা-৫

চৈতন্য হতে আরও কতকাল, কত যুগ আমাদের অতিক্রম করতে হবে।

একটা সহজ ব্যাপার সাধারণ মানুষকে বুঝতে হবে যে, কাশ্মীর একটা ছুতো মাত্র। কাশ্মীর না হলে ছুতোটা অন্য কিছু নিয়েই হত। কেন না দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না। স্বেচ্ছাচারী শাসকও ছলের দ্বারাই নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে। কাশ্মীর ছল এই কারণে যে, সেখানে যে গণভোটের ভুয়ো দাবি তোলা হচ্ছে সেটা ভিত্তিহীন। ভিত্তিহীন, কারণ কাশ্মীরে কয়েকটি সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেছে, এর পর গণভোটের প্রশ্ন অবান্তর। কাশ্মীর নিয়ে চাতুরী ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে বলে, দ্বিতীয় তুরুপ তাস হিসেবে এবার ফরাক্কাকে নিয়ে জল ঘোলানো শুরু হয়ে গেছে।

আসল উদ্দেশ্য এবং মুখোশের আড়ালে আসল মুখ এবার পরিষ্কার উঁকি দিচ্ছে। এমত অবস্থায় দুই দেশের চিন্তাশীল সাধারণ মানুষই একমাত্র স্ব স্ব দেশে চাপ সৃষ্টি করে টাঙানো সমস্যার সমাধান করতে পারেন। অন্যথা লোকসান তাঁদেরই।

প্রেসিডেন্ট নিক্সনের ভারত সফর

প্রেসিডেন্ট নিক্সন শ্রীমতী নিক্সনকে নিয়ে তাঁর ঝটিকা সফরে বার হয়েছেন। মধ্যে তিনি ভারত সন্দর্শনও করে গেলেন। যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতিরূপে এই প্রথম হলেও শ্রীযুত নিক্সনের ভারত সফর এই নিয়ে হল তৃতীয়বার।

প্রেসিডেন্ট নিক্সনের এবারকার সফর কয়েকটি ক্ষেত্রে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। এশিয়া মহাদেশের কয়েকটি রাষ্ট্রকেই তিনি তাঁর সফর কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এবং এবারই তিনি এলেন মহাপরাক্রমশালী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বময় কর্তারূপে। রাশিয়ার সঙ্গে কোনরকম সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত না হওয়ার নীতি এবং এশিয়ায় সরাসরি ও প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ বজায় রাখার ব্যাপারে অনীহা, মার্কিনী নীতিতে যে একটি পরিবর্তনের সূচনা করছে তাও সবিশেষ লক্ষণীয়। এছাড়া নিক্সন আবার বলেছেন যে, শুধু রাশিয়ার ব্যাপারেই নয়, মার্কিন সরকার চীনের ব্যাপারেও এবার যে নীতি গ্রহণ করতে যাচ্ছেন, তা হল, দুই বৃহৎ শক্তি র‍্যাশো-আমেরিকার সম্পর্কের উন্নতিতে চীন যাতে নিজেকে পরিত্যক্ত এবং বিচ্ছিন্ন মনে না করে সেদিকেও সমান লক্ষ্য রাখা। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার পুরোপুরি ভোগ করুক, তবে আমেরিকার ওপর নির্ভরশীল ও ভিয়েৎনাম যুদ্ধে মার্কিনীদের সহযোগী দেশ ফরমোজা, দঃ কোরিয়া, ফিলিপিনস, থাইল্যান্ডের মতো রাষ্ট্রগুলির পেছনে মার্কিনী আশ্বাস এই থাকবে যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এশিয়া থেকে একেবারে সরে যাচ্ছে না। অর্থাৎ চীন মহাদেশ থেকে এই সব রাষ্ট্রের কোন আশঙ্কা দেখা দিলে যুক্তরাষ্ট্র তাঁদের পেছনে সর্বদাই রক্ষকের ভূমিকা গ্রহণ করবে। একদিকে এই প্রত্যক্ষ পার্শ্বচরের ভূমিকা, অন্যদিকে বর্মা, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়ার মতো দেশগুলিকে অর্থনৈতিক ও সামরিক জোটে আবদ্ধ রাখার দ্বৈতনীতি নিক্সনেব।

ভারত ও পাকিস্তান সম্পর্কে রাশিয়া-আমেরিকা যেমন শান্তির কথা বলে আসে, এবারও সেই প্রতিশ্রুতির কোন ব্যত্যয় ঘটে নি। রাশিয়া চীন পাকিস্তানকে অস্ত্র যোগাচ্ছে, আমেরিকাও যোগাবে। তবে যেহেতু পৃথিবীর নেতৃত্ব করার দায়িত্ব ওনারা ভাগবাঁটোয়ারা করে নিতে আগ্রহশীল, এজন্য শান্তি যাতে বজায় থাকে সেদিকেও অবশ্যই নজর থাকবে বলে ভারতকে এবারেও আশ্বস্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ এই দুই দেশে ঠাণ্ডা যুদ্ধটা বজায় থাক। উভয় দেশই পারস্পারক কোলাহলে বিব্রত ও বিপর্যস্ত থাক এটা যেন তিন প্রধানেরই উদ্দেশ্য। এর অন্যতর যে কারণটি বড় বলে মনে হয়, তা হল ভারতের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে কেউ-ই ছোট করে দেখতে পারেন না। নেহরু আমলে বাহুবলে না হোক, ভারত আন্তর্জাতিকক্ষেত্রে মনোবলের যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল তা খুব হেলাফেলার বিষয় নয়। শান্তি সহাবস্থান এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় ভারতের ভূমিকা যথেষ্ট আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। আন্তর্জাতিক জনমত গঠনে এর সুদূরপ্রসারী ফলাফল আজও লক্ষণীয়। এসব কারণে ভারতকে বেশি বাড়তে দেওয়ার মতো নির্বুদ্ধিতা কেউই করবেন না, না রাশিয়া, না আমেরিকা, না চায়না। কারণ সাধারণত জীবনের সর্বক্ষেত্রেই মাতব্বররা পদানতদের বাড়তে দেন না। বাড়াবাড়ি দেখলে একে অপরের বিরুদ্ধে লাগিয়ে নিজেব মোড়লী বজায় রাখেন। —২রা আগস্ট, '৬৯

অবাঞ্ছিত সন্তান জন্মের ঝুঁকি না নিয়ে...বিবাহিত জীবনের সর্বসুখ উপভোগ করুন।

আজকাল, সব পুরুষই, জন্ম নিয়ন্ত্রণের একটা নিরাপদ ও সন্তোষজনক উপায় "নিরোধ" কিনে নিতে পারেন।

পুরুষদের জন্য উচ্চগুণ সম্পন্ন রাবারের তৈরী জন্ম নিরোধক

নিরোধ

পরিবার পরিকল্পনার জন্যে

15 পয়সায় 3টি

সরকারী সাহায্যে হ্রাসমূল্যে

davp 69/157

আরব সোশ্যালিস্ট ইউনিয়নের প্রতিনিধি সম্মেলনে ইজরায়েলী যুদ্ধবাজদের উচিত শিক্ষা দেওয়ার জন্য আরবদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন।

নিক্সনের এশিয়া সফর

মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সন এশিয়ার ছ'টি দেশ সফর করে ২রা আগস্ট রুমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্ট গিয়ে পৌঁছেছেন।

ম্যানিলা, জাকার্তা, ব্যাংকক ও সায়গন হয়ে নিক্সন দিল্লী এসেছিলেন ৩১শে জুলাই। নিক্সনের সরকারী সফর তালিকায় দক্ষিণ ভিয়েতনাম যাবার কথা ছিল না। তবে তিনি যে সেখানে যেতে পারেন এরকম সংবাদ ছিল। গত সংখ্যায় এই স্তম্ভে সে-কথা বলা হয়েছে। মার্কিন গোয়েন্দা বিভাগের আপত্তি অগ্রাহ্য করেই নিক্সন দক্ষিণ ভিয়েতনাম গিয়েছিলেন। আরও উল্লেখযোগ্য, দক্ষিণ ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপতি থিউ-এর সঙ্গে নিক্সন দেখা করেন নি। এই ঘটনা উল্লেখ করে অনেকে এই কথা বলার চেষ্টা করছেন যে, থিউ-এর 'পুতুল সরকারের' প্রতি নিক্সনের খুব একটা সমর্থন নেই।

ভারতে অবস্থানকালে নিক্সন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। অফিসার পর্যায়েও উভয় দেশের মধ্যে কথাবার্তা হয়েছে। ভারত-পাকিস্তান সম্পর্ক ও কাশ্মীর প্রসঙ্গ নিয়ে ইন্দিরা-নিক্সন আলোচনা হয়েছে। এবার অবশ্য নিক্সন উভয় দেশের বিরোধে কোনরূপ মধ্যস্থতার প্রস্তাব করেন নি, তবে পাকিস্তানের সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে ফেলার জন্য নিক্সন যে বিশেষভাবে পরামর্শ দিয়েছেন, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ভিয়েতনাম যুদ্ধের অবসান, এশিয়ার নিরাপত্তা এবং মার্কিন অর্থনৈতিক সাহায্য নিয়েও দুজনের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। পাকিস্তানকে মার্কিন সামরিক সাহায্যদানের বিরুদ্ধে ইন্দিরা নিক্সনের কাছে বলেছেন। চীনের দিক থেকে ভারতের বিপদ সম্পর্কেও উভয়ের মধ্যে কথা হয়েছে।

দিল্লী থেকে নিক্সন ১লা আগস্ট পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য লাহোর যান। পাকিস্তান মার্কিন সামরিক জোট 'সেন্টো' ও 'সিয়েটো'র সদস্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাকিস্তান প্রচুর পরিমাণে সামরিক সাহায্য, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি পায়। অথচ, চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের অত্যন্ত ভাল সম্পর্ক। এদিকে আবার সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গেও নতুন করে বন্ধুত্ব পাতানোর চেষ্টা করছে পাকিস্তান। এই অবস্থায় নিক্সন একটু ভাল করে নতুন পাকিস্তানী নেতাদের মন বুঝে নেবার চেষ্টা করেছেন। নিক্সন আশ্বস্ত হয়ে গেছেন, পাকিস্তান যাই করুক না কেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি তার আনুগত্য ঠিক আছে। সেখানে কোন গোলমাল নেই।

নিক্সন নাকি এবার এশীয় বন্ধুদের তাঁর নতুন 'এশিয়া নীতি' বা 'প্রশান্ত মহাসাগরীয় নীতি' (এশিয়া ডকট্রিন বা 'প্যাসিফিক ডকট্রিন') বোঝাতে এসেছিলেন। এই নীতির মূল কথা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর এশিয়ার দায়িত্ব বহন করতে পারবে না। সম্ভাব্য চীন বা কমিউনিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে এশিয়ার দেশগুলিকে নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে হবে। থাইল্যান্ডে বক্তৃতা প্রসঙ্গে নিক্সন বলেছেন, "অন্যের ওপর বেশি নির্ভরতার ফলে শেষ পর্যন্ত নিজের আত্মমর্যাদা নষ্ট হয়।" অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে তিনি এই কথা বলে থাইল্যান্ডকে আশ্বস্ত করেছেন, "যদি কেউ ভেতর বা বাইরে থেকে থাইল্যান্ডের বিপদ ঘটাবার চেষ্টা করে তাহলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দৃঢ়তার সঙ্গে থাইল্যান্ডের পাশে দাঁড়াবে।"

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন যেভাবে এশিয়ার রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছে, দেশে দেশে সৈন্য রাখতে হচ্ছে, সেভাবে সে অতটা দায়িত্ব নিয়ে থাকতে চায় না, তবে কেউ বিপদে পড়লে তার পাশে এসে দাঁড়াবে।

ভিয়েতনাম যুদ্ধ থেকেই প্রধানত এই সব প্রশ্ন এসেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখান থেকে কিছু সৈন্য সরিয়ে নিয়েছে। কিন্তু সব সৈন্য এখনই প্রত্যাহার করবে না। দক্ষিণ ভিয়েতনামের যথেষ্ট সংখ্যক নিজস্ব সৈন্য প্রস্তুত হলে তবে সে এখান থেকে যাবে।

ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেতে রাজী। তবে কমিউনিস্ট গুন্ডাদের হাতে এভাবে ছেড়ে দিয়ে তো যেতে পারে না। এখানে গণতন্ত্র রক্ষার ব্যবস্থা করে তবে যাবে। তার আগে নয়।

মার্কিন যুদ্ধঘাঁটি সম্পর্কেও একই কথা। যুদ্ধঘাঁটি অপসারণের জন্য ম্যানিলায় প্রচন্ড বিক্ষোভ প্রদর্শনের পরেও নিক্সন বলেছেন, ফিলিপাইনসে মার্কিন যুদ্ধঘাঁটিগুলি থাকবে। ফিলিপাইনসের রাষ্ট্রপতি ফারডিনানডো মারকোসও তাতে সম্মতি জানিয়েছেন।

জাকার্তা গিয়ে নিক্সন বলেছেন, তিনি জোটনিরপেক্ষতার বিরোধী নন। জেনারেল সুহার্তোর নেতৃত্বে ইন্দোনেশিয়া যে জোট-নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করছে, তা চলতে থাকুক, তবে সুহার্তো যেভাবে কমিউনিস্টদের শায়েস্তা করেছেন, তাতে নিক্সন খুব খুশি। তাই তিনি ইন্দোনেশিয়াকে সবরকম সাহায্য করতে চান। ইতিমধ্যেই প্রচুর মার্কিন অর্থসাহায্য পেয়েছে ইন্দোনেশিয়া। মার্কিন পুঁজিও ঢালা হয়েছে। এদিকে সাহায্য আরও বাড়বে।

নিক্সনের নতুন এশীয় নীতির মধ্যে নতুনত্বটা কোথায়? আগের মতই মার্কিন যুদ্ধঘাঁটি থাকবে, মার্কিন সৈন্য থাকবে, মার্কিন অর্থসাহায্য পাওয়া যাবে। কমিউনিস্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও আছে। তফাৎ কেবল এইখানে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর দায়িত্ব বাড়াতে চায় না, কিছুটা অব্যাহতি চায়। যদি নীতির কোন পরিবর্তন হয়ে থাকে, তবে তা নেহাৎই পরিমাণগত গুণগত কিছু নয়।

অনেকের ধারণা, নিক্সন এশিয়ার দায়িত্বটা কিছুটা ছাড়তে চান, কারণ ইউরোপে তিনি এখন বেশি জোর দিতে চাইছেন। তাঁর সাম্প্রতিক বন ও লন্ডন সফর তারই ইঙ্গিত।

ইজরায়েলী যুদ্ধঘাঁটির ওপর আরবদের ব্যাপক আক্রমণ

২৭শে জুলাই সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। ষোলো বছর আগে এই দিন নাসেরের নেতৃত্বে মিশরে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটেছিল। বিপ্লবের সপ্তদশ বার্ষিকীতে এবার মিশরীয় সৈনারা সর্বশক্তি নিয়ে ইজরায়েলী যুদ্ধঘাঁটির ওপর আক্রমণ পরিচালনা করেছে।

মিশরীয় বিমান থেকে সিনাই মরু অঞ্চলে ইজরায়েলী ঘাঁটি লক্ষ্য করে ব্যাপকভাবে গুলীবর্ষণ করা হয়। এই বিমান আক্রমণের ফলে বহুসংখ্যক ইজরায়েলী সৈন্য নিহত হয়েছে, এবং প্রচুর পরিমাণ সমরোপকরণ নষ্ট হয়েছে। ১৯৬৭ সালের জুন মাসের ঐতিহাসিক ছ'দিনের যুদ্ধের পর মিশরীয়রা আর কখনও এত বড় আক্রমণ করে নি। ইজরায়েলী বিমান থেকে পালটা আক্রমণ করা হয়েছে। উভয়পক্ষেরই ক্ষতি হলেও, ইজরায়েলের ক্ষতির পরিমাণই বেশি। ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী মশে ডায়ানের পক্ষে সে-কথা অস্বীকার করা সম্ভব হয় নি।

দুইপক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বরাবর রয়েছে। ছোটোখাটো সংঘর্ষও প্রায়ই হচ্ছে। কিন্তু এবারের আক্রমণের তীব্রতা অনেক বেশি। সুয়েজ খালের দুই তীরে চলছে লড়াই।

এবার লক্ষণীয়, আরবরা নতুন উদ্যমে আক্রমণ করেছে। ইজরায়েলীরা অপরাজেয় বলে যে ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল, তা এবারের আক্রমণে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে। সাতষট্টির পরাজয়ের গ্লানি কাটিয়ে উঠে নিজ শক্তিতে দৃঢ় হয়ে আরবরা এখন আক্রমণের জন্য প্রস্তুত।

আরবরা সত্যি ইজরায়েলের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। তাদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে, শান্তিপূর্ণ পথে কোন মীমাংসা হবে না। ইজরায়েল সহজে অধিকৃত আরব এলাকা ছাড়বে না। সুতরাং, যুদ্ধ ছাড়া কোন পথ নেই।

এই কথাই বলেছেন নাসের বিপ্লব বার্ষিকী অনুষ্ঠানে 'আরব সোস্যালিস্ট ইউনিয়নের' প্রতিনিধি-সম্মেলনে। ইজরায়েলী যুদ্ধবাজদের উচিত শিক্ষা দেবার জন্য তিনি আরবদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানিয়েছেন। এই সঙ্গে তিনি সোভিয়েট ইউনিয়নের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। সামরিক শক্তিতে বলীয়ান হবার ব্যাপারে তাঁরা সর্বপ্রকার সোভিয়েট সাহায্য পেয়েছেন। এবারের আক্রমণেও মিশরীয়রা সোভিয়েট মিগ বিমান ব্যবহার করেছে। তাছাড়া সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক লিওনিদ ব্রেজনেভ নাসেরকে পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, আরবদের পছন্দ নয় এমন কোন প্রস্তাব সোভিয়েট ইউনিয়ন স্বীকার করবে না।

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেনারেল মহম্মদ ফৌজিও বলেছেন, যুদ্ধ অনিবার্য। আরবরা ধৈর্যের শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছে।

পশ্চিম এশিয়ায় উত্তেজনাবৃদ্ধির ফল সুদূরপ্রসারী হতে বাধ্য।

ব্রিটেনকে কি কমন মার্কেটে নেওয়া হবে?

এতদিন ফ্রান্সের তীব্র বিরোধিতার জন্য ব্রিটেনকে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠী (ইউরোপীয়ান ইকনমিক কমিউনিটি, বা ই-ই-সি) বা কমন মার্কেটে ঢুকতে দেওয়া হয় নি। প্রবেশের জন্য ব্রিটেনের আগ্রহ অত্যন্ত বেশি। অন্যান্য সদস্য-রাষ্ট্রেরও মোটামুটি মত আছে। কিন্তু ফ্রান্সের ঘোরতর আপত্তি। আপত্তির কারণ কিছুটা অর্থনৈতিক, কিছুটা রাজনৈতিক। ফ্রান্স ব্রিটেনকে ইউরোপীয় দেশ বলেই মানতে রাজী নয়।

ফ্রান্সের রাজনীতি থেকে দ্য গলের বিদায় এবং জর্জ পম্পিদুর নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠনের পর অনেকের মনে হয়েছে, এবার ফ্রান্সের মতপরিবর্তন হবে, এবং কমন মার্কেটে ব্রিটেনের যোগদান সহজ হবে।

গত সপ্তাহে ব্রাসেলসে কমন মার্কেটভুক্ত ছ'টি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠক বসেছিল। বৈঠকের সভাপতি নেদারল্যান্ডসের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ লুন্স নিজে প্রস্তাব উত্থাপন করেছেন, ব্রিটেনের কমন মার্কেট সদস্যপদের জন্য।

ফ্রান্সের নতুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মরিস সুম্যান সরাসরি এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন নি। তিনি নতুন সদস্য গ্রহণ ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনার জন্য এই বৎসরের শেষে কমন মার্কেট রাষ্ট্রপ্রধানদের একটি শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তাব করেছেন। প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছে। হেগে এই সম্মেলন হবে বলে ঠিক হয়েছে। সুম্যান এই সঙ্গে বলেছেন, ইউরোপীয় ঐক্যের ধারণার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এবং বর্তমান সদস্যদের স্বার্থ ক্ষুন্ন না করে কিভাবে কমন মার্কেটের নতুন সদস্য গ্রহণ করা যায় সে-বিষয়ে সদস্যদের মধ্যে ঐক্যমত আনতে হবে।

সুম্যানের নরম সুর, শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তাব এবং ব্রিটেনের সমর্থক নেদারল্যান্ডসের রাজধানীতে সম্মেলন অনুষ্ঠানের সম্মতি, এই সব দেখে অনেকে বলছেন, ফ্রান্স তাহলে এবার রাজী হবে ব্রিটেনের প্রবেশাধিকারে। ব্রাসেলসে উপস্থিত বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধিরাও এই রিপোর্টই পাঠিয়েছেন লন্ডনে। ফ্রান্সের মনোভাব অনুকূল।

কিন্তু আর এক দল পর্যবেক্ষকের মতে, এতটা আশাবাদী হবার কোন কারণ নেই। ফরাসী সরকার এখনও ব্রিটেনের প্রবেশের বিরোধী। নানা অজুহাত তুলে তারা শেষ পর্যন্ত ব্রিটেনের কমন মার্কেট প্রবেশে বাধা দেবে। ৩-৮-৬৯

বেকার সমস্যার সমাধান ?

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে !!

বাংলা দেশে বেকার সংখ্যা নাকি আনুমানিক এক কোটি। এই ভয়াবহ বেকার সমস্যার সমাধানে ক্ষুদ্র মূলধনের ব্যবসা হিসাবে মুর্গী উৎপাদন বা পোলট্রি ফার্মিং অধুনা অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায় রূপান্তরিত হয়েছে—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে। বেকার ব্যক্তিদের পোলট্রি ফার্মিং ব্যবসা পরিচালনার বিশদ নির্দেশলাভের সুবিধার জন্য বসুমতী থেকে আত্মপ্রকাশ করলো।

রয়েজ পেডিগ্রী পোলট্রি ফার্মের অধিকর্তা

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ রায়

জি, পি (আমেরিকা), এফ, এস, পি, আই, পি, এইচ (লন্ডন)

লিখিত সচিত্র

আধুনিক পোলট্রি ফার্মিং

মূল্য মাত্র চার টাকা। ডাকমাশুল এক টাকা।

অবিলম্বে অর্ডার পেশ করুন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ ॥ কলিকাতা-১২

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

অবশেষে সব ভয়ের শেষ হল। যে আশঙ্কা বহুদিন থেকেই মনকে পীড়া দিত, উদ্বেগ সৃষ্টি করতো, এইবার বস্তা থেকে বিড়াল বের হবার পর বুঝলাম—এতদিন বৃথাই বাঘের ভয় করেছি, ওরা সব বিড়াল। বিড়াল যেমন একটু উচ্ছিষ্ট ভুক্তাবশিষ্ট পেলে খুশি, তেমনি পাঁচ বৎসরের একটি মেয়ের মৃদু ধমকানিতে লেজ গুটিয়ে পলায়নে তৎপর। গত ৩১শে জুলাই পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় পুলিশ-বাহিনীর যে হামলা দেখেছি, তারপর ঐ বস্তামুক্ত বিড়ালদের সম্পর্কে এই কটি কথাই বলতে চাই। বৃহস্পতিবার বারবেলায় যে তিনজন সাংবাদিকের বিধানসভা ভবনে পুলিশের তাণ্ডবের সমস্ত দৃশ্য দেখবার দুর্লভ সৌভাগ্য হয়েছে, তাঁরা দেখেছেন—এই হামলাবাজরা কত বোকা, কত গোঁয়ার, আর দেখেছে এরা যেমন যে ডালে বসে সেই ডাল কাটে, তেমনি নিজেদের মুখে চুনকালি মাখিয়ে কিভাবে সং সাজতে পারে। কিন্তু সেইদিনের ঘটনা লঘু করে দেখবার নয়, ছোট করেও দেখবার নয়। তাই বর্তমান সপ্তাহের সবচেয়ে বড় খবর বিধানসভায় পুলিশী হামলা নিয়েই লিখতে বসলাম, নইলে কথা ছিল এই সপ্তাহেও দিল্লীর রাজনীতি নিয়ে প্রতিবেদন পেশ করব।

৩১শে জুলাই বিধানসভায় পুলিশী হামলা নিয়ে ইতিমধ্যে অনেক জল গড়িয়ে গেছে, আর 'সপ্তাহের বোঝা' যখন প্রকাশিত হবে, তখন আরো জল গড়িয়ে যাবে—কারণ শুক্রবার বেলা চারটে থেকে সরকারী কর্মসূচী মত হামলাকারী আর দুষ্কৃতকারীদের শাস্তিদান সুরু হয়ে গেছে। রাজ্য সরকার দীর্ঘ প্রতীক্ষিত পুলিশ-বাহিনীতে অপারেশন সুরু করেছেন—তাই সেই দিনের ঘটনার আমি কোন রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করছি না, আমি শুধু তুলে ধরতে চাই—কেন এমন ঘটনা ঘটল? কার লাভ হল এই ঘটনায় আর ভবিষ্যতে কি হবে?

রাজ্যের পুলিশবাহিনীর মধ্যে কিছু বিক্ষোভ ছিল এই কথা অস্বীকার করে লাভ নেই। সরকার পরিবর্তন হয়, কিন্তু পুলিশের লাঠির পরিবর্তন হয় না। তাই যে কোন সরকারের আমলেই পুলিশকে একটা তিক্ত ভূমিকার দায়িত্ব পালন করতে হয়। 'এই দায়িত্ব আরো কঠিন হয়ে উঠেছিল রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর। তার কারণ পুলিশ ছাড়া সরকার চলে না। কিন্তু বর্তমান সরকার যাঁরা পরিচালনা করেন, তাঁরা পুলিশকে (সঙ্গত কারণেই) সব সময় একটা সন্দেহের চোখে ও চক্রান্তরূপে দেখেন। সরকারের নীতি-নিয়ামকদের এই দৃষ্টিভঙ্গী সরকারী দল-সমূহের শাখা-প্রশাখায় সর্বত্র একই রকম। কিন্তু এই সঙ্গে আরো একটা কথা মনে রাখা দরকার। সেটা হল রাজ্যের যুক্তফ্রন্ট সরকার দুবার ক্ষমতায় এসে পুলিশ দপ্তরের প্রতি সীমাহীন দরদের পরিচয়ই দিয়ে এসেছেন বলা যায়। প্রকৃতপক্ষে জনগণের একটা বিরাট অংশ—যারা পুলিশ মাত্রকেই নিপীড়ন, দুর্নীতি ও অবিচারের প্রতীক বলে মনে করে, তাদের দমনে আগ্রহী ছিল। জনমনের একটা বিরাট অংশের চাহিদা ছিল যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় এসে পুলিশের বাস্তুঘুঘুর বাসা ভাঙুক—তাদের টিট্ করুক। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পুলিশের বহু প্রকার দুষ্কর্মের হিসাব জেনেও রাজ্য সরকার দরদী মন নিয়ে পুলিশ সম্পর্কে নীতি পরিচালনা করছিলেন। রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার পর রাইটার্স বিল্ডিংসে বিভিন্ন দপ্তরে দুর্নীতি দমন ও তদন্তে যে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে, পুলিশ দপ্তরে ততটা দেওয়া হয় নি—এমন কি অন্য দপ্তরে যত বদলী বা ওলটপালট হয়েছে, পুলিশ দপ্তরে তা হয় নি। এর পিছনে আরো একটি কারণ ছিল, সেটা হল—সরকারের সবচেয়ে জবরদস্ত সুশৃঙ্খল পুলিশ-বাহিনীর গায়ে হাত দিতে হলে একটা দীর্ঘ প্রস্তুতির প্রয়োজন। আর এই মারণাস্ত্রধারীদের সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণে অনেক আটঘাট বাঁধা দরকার। পুলিশ সরকারের এই মনোভাবের পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলো। আর সুযোগ গ্রহণ এমন একটা সময়ে করল, যখন পুলিশকে সরকার আরো বেশি মর্যাদা, আরও বেশি সম্মান ও আরও বেশি প্রশ্রয় দিতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। খুলে বললে এই দাঁড়ায় যে, যুক্তফ্রন্টের অনেক দল, এমন কি শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত থেকে সুরু করে ছোট-বড় অনেক নেতা অনেক পুলিশ অফিসারের নাম ধরে তাঁদের সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাচ্ছিলেন। অনেক দল থেকে একটা অভিযোগ ক্রমেই শক্ত ভিত্তি পাচ্ছিল যে, সি পি এম দল পুলিশকে ব্যবহার করছে অথবা সি পি এম দলের হয়ে পুলিশ কাজ করছে। অর্থাৎ পুলিশকে রাজ্যের সর্ববৃহৎ রাজনৈতিক দল ও খোদ পুলিশমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর দলের সঙ্গে লাইন আপ করে দেওয়া হচ্ছিল। এই সময়ে এস ইউ সি দলের সঙ্গে সংঘর্ষে একজন পুলিশ নিহত হওয়ায় ঘটনা এমন টার্ন নিল যে, এই মৃত পুলিশের দেহে মালা দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জী আর শ্রীজ্যোতি বসু নিজেকে প্রস্তুত করলেন। শুধু প্রস্তুত করা নয়, এই পুলিশ দল আক্রান্ত ও একজন পুলিশ নিহত হবার পর মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় বেশ কয়েকজন মন্ত্রীকে ডেকে বলেছিলেন—এই যদি চলতে থাকে, তবে তাঁর মুখ্যমন্ত্রী থাকার সার্থকতা কোথায়? অর্থাৎ একজন পুলিশের মৃত্যুতে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রীর শুধু মৃত পুলিশের দেহে মালা দেওয়া নয়, তাঁদের মন সম্পূর্ণ পুলিশের প্রতি সহানুভূতি-পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। অর্থাৎ রাজ্যের পুলিশের প্রকৃতপক্ষে একটা পরম সুদিন এসেছিল, যখন সরকারী দল ভাবছিল—না, না, পুলিশের প্রতি গুরুতর অবিচার ও অন্যায় করা হয়েছে। ঠিক এই সময় বিধানসভায় তাণ্ডব ঘটিয়ে পুলিশমন্ত্রীর প্রতি আক্রমণ চালিয়ে, সমস্ত হাওয়া ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু কেন? একজন পুলিশ মারা গেছে বলে? পুলিশ কি এই প্রথম মারা গেল? কর্তব্য পালন করতে গিয়ে কি শুধু পুলিশই মারা গেছে? ১৯৬৬ সালে কৃষ্ণনগরে একজন আই-বি অফিসার ও একজন পুলিশকে কি নৃশংসভাবে খুন হতে হয় নি! বাসন্তীতে পুলিশকে গুলী করে মেরেছে, আর কৃষ্ণনগরে—একজন পুলিশের দুই পা টেনে ফেঁড়ে ফেলা হয়েছিল, একজনকে পাগলা কুকুরের মত পিটিয়ে ইট মেরে মারা হয়েছিল। কই সেদিন তো এমন কাণ্ড হয় নি? একজন কর্তব্যরত পুলিশের মৃত্যু—গভীর দুঃখের, গভীর অনুতাপের কথা। কিন্ত মৃত্যু কি দুঃখের হবে শুধু একজন পুলিশ মরলে—অন্য মৃত্যু কি মৃত্যু নয়। ১৯৫০ সালে একদিনে দু-চারজন মহিলার মৃত্যু হয়েছিল বৌবাজার স্ট্রীটে। আজকের কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা ডাঃ রণেন সেনের স্ত্রী তার মধ্যে অন্যতমা ছিলেন। ১৯৫৯

সালে কলকাতার পথে একদিনে ৮০ জনের মৃত্যু হয়েছিল, তার পর ১৯৬৬ সালে আরও কত মৃত্যু হয়েছিল—এই মৃত্যুগুলি কি কিছু কম নৃশংস ছিল। ১৯৪৮ সালে রাজ্য বিধানসভার সামনে ডাঃ শিশির মণ্ডলের মৃত্যু থেকে সুরু করে আজ পর্যন্ত আন্দোলন আর রাজনৈতিক কারণে কত শত মানুষ মারা গেছে। কিন্তু তার মধ্যে এই শঙ্কর দত্ত শর্মার মৃত্যুকে এমন আলাদা করা হল কেন ? শুধু একজন পুলিশের মৃত্যু এত বড় অঘটনের কারণ কখনই হতে পারে না, তাহলে তো বললাম ১৯৬৬ সালে পুলিশ আরো নৃশংসভাবে মরেছিল। মনে আছে কৃষ্ণনগর মর্গে ঢুকে ডি-আই-জি দুর্গাপতি ভট্টাচার্য চোখ বন্ধ করে ফিরে এসেছিলেন, দেখতে পারেন নি সেই বীভৎস দৃশ্য আর বসুমতীর ফটোগ্রাফার শ্রীবিনয় মুখার্জী ছবি তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে প্রায় মাথা ঘুরে পড়ে গেছিলেন—কই সেই দিন তো দেখি নি এই বিদ্রোহ, এই বিক্ষোভ, এই শৃঙ্খলাভঙ্গ ? কই সেই দিন তো দেখি নি, নদীয়ার এস-পি'র ওপর কাউকে চড়াও হতে। দেখি নি কোন মন্ত্রীর মুণ্ডু চাইতে। দেখি নি মৃতদেহ বহনের নামে তাণ্ডব করতে, বিধানসভায় হামলা করতে? কিন্তু সেই দিন হয় নি, আজ হল কেন ? তার কারণ কি এই যে, পুলিশের কাছে বন্দুক আছে, পুলিশের পরনে খাকি পোষাক আছে? হামলা হল কি এই কারণে যে, তারা মনে করে তারা সব এক—আই-জি, পুলিশ কমিশনার, কনেস্টবল সবাই একই চিন্তার। তারা কি মনে করে—তাদের হাতে মানুষের নিরাপত্তা, তাদের হাতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব; অতএব তারাই সব কিছুর শীর্ষে। তারাই সবার বড়, তারা মানুষকে গ্রেপ্তার করতে পারে, তারাই মানুষকে জেলে পুরতে পারে। তারাই মানুষকে লাঠিপেটা করতে পারে, মানুষকে গুলী করে মারতে পারে? আর তারই বলে বিধানসভা তছনছ করতে পারে, মন্ত্রীর ঘরে ঢুকে তাঁকে খুন করতে চেষ্টা করতে পারে। আমি বলবো—হ্যাঁ, এই চিন্তা আর বিশ্বাসেই সেই দিন কিছু পাগল পুলিশ কর্মচারী ছুটে এসেছিল বিধানসভায়—দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী হিসাবে ৩১শে জুলাই সর্বসময়ের জন্য সঙ্গে থেকে এই দৃশ্যই দেখেছি। কোন মৃত্যু অথবা শোকযাত্রা যদি কারণ হয়, তবে বলেছি বাসন্তীতে নৃশংসভাবে পুলিশের মৃত্যু অপেক্ষা অনেক অনেক করুণ নৃশংস মৃত্যু পশ্চিমবঙ্গে অতীতে হয়েছে। আর শোভাযাত্রা, এ তো ছিল কয়েক শত পুলিশের—লক্ষ জনতা বহু বহু বার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভবনে এসেছে—জনপ্লাবন সৃষ্টি করেছে। বিধানসভার দরজায় সেই দিন সেই সব জনসমুদ্র চাইলে বিধানসভার দরজা ভেঙে সমগ্র বিধানসভা ভবন আর শাসকগোষ্ঠীকে কয়েক শত গজ দূরে গঙ্গায় ফেলে দিতে পারতো, কিন্তু সেই চেষ্টা কোন দিন কোন মিছিলকারী জনতা করে নি। তাই যে কাজ কোন দিন কেউ করে নি, সেই কাজ করল রাজ্যের কয়েক শত পুলিশ—যাদের ওপর মানুষেরা সব নির্ভর করে, যাদের মানুষ সবচেয়ে বেশি ভয় করে, যাদের ওপর মানুষের সবচেয়ে বেশি নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব। কিন্তু এই হামলা কি শুধু শ্রীজ্যোতি বসুর ওপর ? এই হামলা কি শুধু বিধানসভার ওপর—এরা কি শুধু বিধানসভার কিছু চেয়ার-টেবিল ভেঙেছে? এরা কি শুধু স্পীকার শ্রীবিজয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে জীবনরক্ষার জন্য জানালা দিয়ে পালাতে বাধ্য করেছে—এরা ভেঙেছে সংবিধান, গণতন্ত্র—এরা জানালা দিয়ে পালাতে বাধ্য করেছে ন্যায় নীতি, আইনশৃঙ্খলাকে। এরা কিন্তু শুধু শ্রীজ্যোতি বসুর মুণ্ডু চেয়েছিল—এরা মুণ্ডু চেয়েছিল প্রশাসন ও সরকারের। তা প্রশ্ন—এরপর ঐ ওরা আর কি করবে? তাদের শক্তি, তাদের বীরত্ব, তাদের করণীয় সব তো শেষ হয়ে গেল আর তো কোন ভয়ের অবশিষ্ট রইল না। কিন্তু একপক্ষের যেখানে শেষ, আর পক্ষের সেখানে সুরু। রাতের পর দিন, অন্ধকারের পর আলো—এইবার সুরু হবে অপরপক্ষের কাজ। সেই দিন কয়েক শত মানুষ—যারা ভেবেছিল তারাই সব, ভেবেছিল তাদের 'পর কেউ নেই, তারা ভুলে গেছিল তাদের বাদ দিয়েও আছে জনতা বলে একটি শক্তি। তাদের শক্তি বুঝতে পারে নি—এই বার সেই শক্তির নতুন অভ্যুদয় ঘটবে। সেই দিনের ঘটনাকে যারা শেষ মনে করেছে, তারা দেখবে সেইদিন তারা কিছু শেষ করতে পারে নি—সুরু করে দিয়ে গেছে। কিন্তু এর মধ্যে একটা প্রশ্ন থেকে যায়—আচ্ছা এর জন্য দায়ী কে? অথবা দায়ী কারা ? এত বড় ঘটনা তো হঠাৎ ঘটল না। আর বিনা প্রস্তুতি ও পরিকল্পনায় ঘটল না—সেই কথার জবাব দেবার চেষ্টা করব।

বিধানসভা চলো—

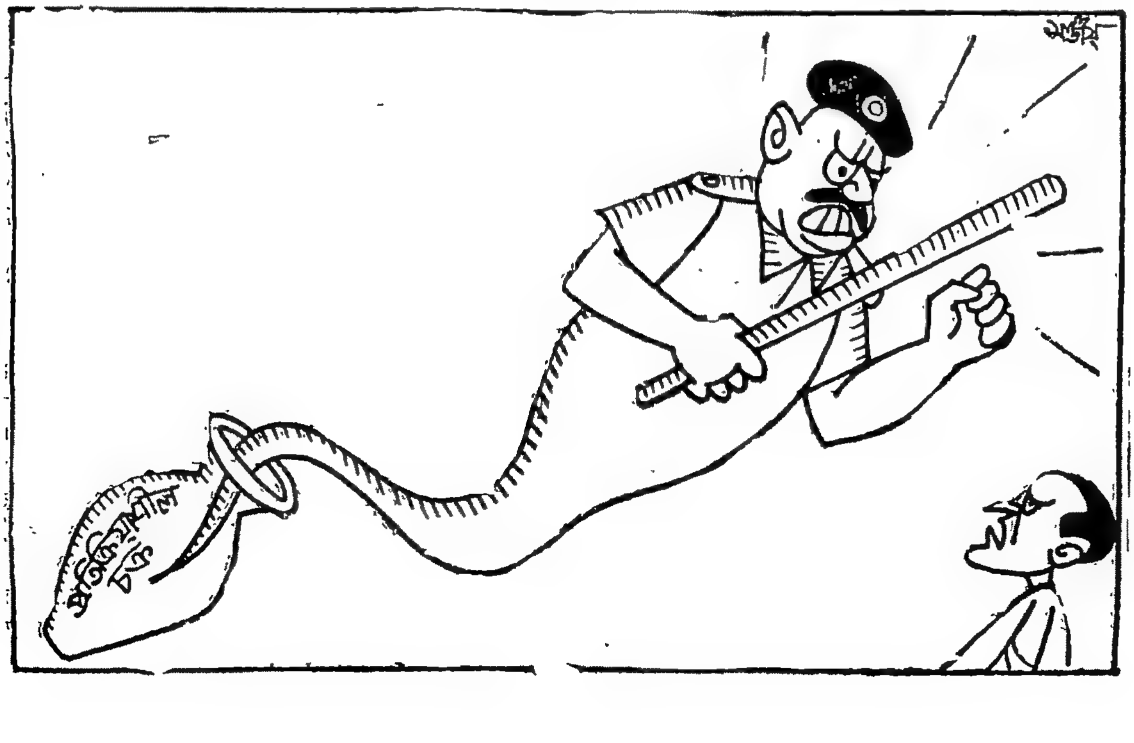

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

"সাহস, আরও সাহস—চাই অসীম দুঃসাহস!"

—(দাঁতো)

যার অব্যর্থ নিশানায় কুমিল্লার কুখ্যাত জেলা সুপারিনটেণ্ডেন্ট মিঃ এলিসনকে চরম শাস্তি মাথা পেতে নিতে হল—কে সেই দুঃসাহসী, নিঃশঙ্ক তরুণ?

সুদীর্ঘকালব্যাপী প্রবল শক্তিশালী বৃটিশ রাজত্বের অবসান ঘটেছে—গোপনতার অন্ধকারে আজও সেই যুবকের পরিচয় ঢেকে রাখার কি কোনো প্রয়োজন আছে? সেই দিন প্রবল পরাক্রান্ত বৃটিশ সিংহ এতবড় আঘাতটি যে নিঃশব্দে মেনে নেন নি সে-কথা দিনের আলোর মতই সুস্পষ্ট। এই যুবকের মাথার জন্য গেজেটে পুরস্কার ঘোষণা করে, শত শত নির্দোষ তরুণকে গ্রেপ্তার করে—নিরীহ দেশবাসীর ওপর অমানুষিক অত্যাচার ও নির্যাতন চালিয়ে এই "আততায়ীর" পরিচয় জানবার জন্য সরকার সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিল। জেলের মধ্যেও পুলিশের অনুচর রাজনৈতিক বন্দীদের সূত্রে মিঃ এলিসন হত্যার ও হত্যাকারীর রহস্য ভেদে পুলিশী বুদ্ধি চূড়ান্তভাবে প্রযুক্ত হল। কিন্তু সব সুচতুর ফাঁদই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল—হত্যাকারীর কোনো হদিসই পুলিশ পেল না।

অসমান যুদ্ধে মাস্টারদার নেতৃত্বে গোপন বিপ্লবী সংগঠনের লৌহদৃঢ় নিয়ম-শৃঙ্খলা ও বৈপ্লবিক শিক্ষা পুলিশ চক্রান্তকে বিপর্যস্ত করার জন্য যে দুর্ভেদ্য প্রাচীর সৃষ্টি করেছিল তার কাছে শাসককুলের প্রচণ্ড শক্তির সাময়িক পরাভবও সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে বিচলিত ও চিন্তিত করে তুললো। মাস্টারদার নির্দেশে ভারতীয় গণতন্ত্রবাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার এক তরুণ সৈনিকই যে এলিসন হত্যার নায়ক এ-তথ্যের কোন সন্ধানই পুলিশ পেল না।

খবরের কাগজ মারফৎ বিপ্লবী যুবকের গুলীতে মিঃ এলিসনের জীবনাবসানের ও মিঃ ডুর্নোর আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ আমরা বাংলার জেলে থাকার সময়েই পেয়েছিলাম। চট্টগ্রাম জেলের বাইরের এ দুটি ঘটনা মাস্টারদার নির্দেশেই যে সংঘটিত—এ তথ্য আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না।

আন্দামান জেলে আমাদের প্রায় আড়াই বছর কেটে যাওয়ার পর ভারতীয় গণতন্ত্রবাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার সৈনিক শান্তি চক্রবর্তী, শৈলেশ রায়, মণি দত্ত, দীনেশ দাশগুপ্ত, কালীকিঙ্কর দে প্রমুখ বিপ্লবীরা বিভিন্ন দণ্ডে দণ্ডিত হয়ে বাংলার জেল হতে আন্দামান জেলে স্থানান্তরিত হল। আন্দামান জেলে তাদের আসার পূর্বেই আমরা জেলের অভ্যন্তরে "টৌলিগ্রাম" মারফৎ পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের এবং মাস্টারদার বন্দী হওয়ার সংবাদ পেয়েছিলাম। আন্দামান সরকারের একটা বুলেটিনকেই বলা হোত 'টৌলিগ্রাম'—এইটি প্রতিদিন সন্ধ্যায় ইংরেজীতে ছাপা হয়ে বেরুতো। বুলেটিনের আকারটি ছিল খাতার পাতা থেকেও ছোট। কোনো সময় দু' পৃষ্ঠাতেই সংবাদ ছাপা থাকতো আবার বেশিদিনই খবরের অভাবে একদিকটাও পুরো ছাপা হোত না। কাজেই ঐ সংবাদগুলির কয়েকটি লাইনমাত্রই আমরা জানতে পেরেছিলাম।

আন্দামানে দলের উপরোক্ত বন্ধুদের পেয়ে আমাদের খুবই আনন্দ হল। বন্ধুদের থেকে দলের অন্যান্য সাথীদের বিভিন্ন বৈপ্লবিক কার্যকলাপ ও মাস্টারদার ফাঁসি হওয়া পর্যন্ত যেসব চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটেছিল তার পূর্ণ নির্ভুল ও বিশদ বিবরণ আমরা জানতে পারলাম। তারা বিভিন্ন আক্রমণাত্মক ঘটনায় প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করেছিল।

বন্ধুদের কাছেই জেনেছিলাম চট্টল-সূর্য মহানায়ক সূর্য সেন ট্রাইব্যুনালের বিচারে প্রাণদণ্ডের আদেশ পেয়ে চট্টগ্রাম জেলে যখন বন্দীজীবনযাপন করছিলেন, তখন তাঁকে জেল থেকে মুক্ত করবার উদ্দেশ্যে বিপ্লবী সৈনিকেরা জেল ভাঙার একটা পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই বিষয়ে পরে আমি বিশদভাবে লিখবো। বর্তমানে এই জেল ভঙার পরিকল্পনার ব্যাপারে দণ্ডিত শৈলেশ রায় সম্বন্ধে কিছু বলা প্রয়োজন মনে করছি। জেল ভাঙার পরিকল্পনাটি ছিল গানদার (শচীন সেন)। প্ল্যানটি কার্যকরী করতে হলে তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন। যারা প্ল্যানটিকে কার্যকরী করতে অংশ গ্রহণ করবে, কে কোন্ অস্ত্র নেবে, কোন্ রাস্তায় ক'টি মোটরগাড়ি ও নৌকো ব্যবহার করা হবে ঐ প্ল্যানে তার খসড়া করা ছিল। কিন্তু প্ল্যানটির সাফল্যের প্রাথমিক কাজ হিসেবে জেলের চতুর্দিকের পুলিশ ও মিলিটারীর অবস্থান এবং পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ঐসব বিশদ তথ্য সংগ্রহের একান্ত প্রয়োজন। সেই জন্য জেলের চতুর্দিকের গুরুত্বপূর্ণ

জুতো হবে
ছিমছাম ও
আরামভরা
এই যাঁরা চান
তাঁদের জন্য
Bata
ওয়াকমাস্টার
ডার্বি ৩৪.৯৫
ওয়াকমাস্টার
ক্যাজুয়াল ৩৪.৯৫

তথ্য সংগ্রহ করতে বাছাই করা একজন বিচক্ষণ বিপ্লবী সৈনিককে নিযুক্ত করা হল। এই বিচক্ষণ বিপ্লবী সৈনিকটিই চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর একজন বিশেষ মেধাবী ছাত্র—শৈলেশ রায়। সবল সুস্থ অর দেহ, উজ্জ্বল দীপ্ত দুটি চক্ষু—দৃঢ়তাব্যঞ্জক মুখাকৃতি।

চট্টগ্রাম জেল সীমানার প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ গজ দূরে লালদীঘির পাড়ে অবস্থিত চট্টগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটি পরিচালিত পাবলিক লাইব্রেরী। সাধারণের ব্যবহারের জন্য এই লাইব্রেরী সংলগ্ন লালদীঘির শানবাঁধানো বড় ঘাট। প্রাক্ সন্ধ্যার আকাশ—দিবসের রশ্মিরেখা তখনও সম্পূর্ণ মুছে যায় নি—দীঘির শান-বাঁধানো নির্জন ঘাটটিতে শৈলেশ রায় একা বসে আছে। জেলের ও জেল সংলগ্ন বিভিন্ন পথ-ঘাটের হাতে আঁকা নক্সাটি সযত্নে তার পকেটে রক্ষিত। বিভিন্ন সুযোগে জেলের চারপাশের পথ-ঘাট ঘুরে দেখবার উদ্দেশ্যে শৈলেশ রায় অপেক্ষা করছে। আশ্চর্য! এই জনশূন্য ঘাটে হঠাৎ একজন জেলের সেপাইয়ের আবির্ভাব! হঠাৎ সে শৈলেশ রায়কে বিপ্লবী যুবক বলে সন্দেহ করলো! জেলের সাধারণ সেপাইরা জেলের বাইরে পুলিশ-ওয়াচারের ডিউটি করে না। তবু এই বিশেষ সেপাইটি দীঘির ঘাটে শৈলেশ রায়কে বিপ্লবী সন্দেহে কালবিলম্ব না করে চ্যালেঞ্জ করলো—'কেন সে সেখানে বসে আছে?' জেলের সাধারণ সেপাই বিপ্লবী যুবককে চ্যালেঞ্জ করছে—তার মনে একটুও ভয় নেই পাছে বিপ্লবী যুবকের গুপ্তস্থান হতে রিভলভার বেরিয়ে আসে?

জেল সেপাইয়ের চ্যালেঞ্জের সঙ্গে সঙ্গে সাদা পোশাকে আরও দুয়েকজন জুটে গেল—শৈলেশ রায়কে গ্রেপ্তার করা হল। আই, বি. ইন্সপেক্টার শচীন ভৌমিকও হঠাৎ আবির্ভূত হলেন! অবস্থা বেগতিক দেখে কাগজে হাতে আঁকা নক্সাটি গলাধঃকরণের উদ্দেশ্যে শৈলেশ রায় তৎক্ষণাৎ মুখে পুরে দিয়েছে। মিঃ শচীন ভৌমিক শৈলেশ রায়ের কণ্ঠনালী চেপে ধরে নক্সাটি উদ্ধার করলেন। শৈলেশ রায় নক্সাটি নষ্ট করবার উদ্দেশ্যে দাঁতে চিবিয়েছিল বলে নক্সাটির অনেকটা অংশ দুর্বোধ্য হওয়া সত্ত্বেও সেইটিই যে জেল ও জেলের পারিপার্শ্বিক অবস্থানেরই চিত্র তা বেশ বোঝা যাচ্ছিল। অপূর্ব পুলিশের অভিনয়? প্রশ্ন—শৈলেশ রায় একা দীঘির ঘাটে বসে থাকবে এবং এই শৈলেশ রায়ের পকেটেই জেলের নক্সা থাকবে ও একজন জেল-সেপাই তখন সেখানে আসবে এবং সেই সেপাই-ই শৈলেশ রায়কে বিপ্লবী যুবক সন্দেহ হওয়াতে তাকে গ্রেপ্তার করে ফেলবে? আবার প্রশ্ন—এই সেপাইয়ের জীবনে ইতিপূর্বে বা পরে এইরূপ ঘটনার পুনরাবৃত্তি কি কখনও হয়েছে? আরও একটি প্রশ্ন—এই ঘাটে বা অন্যত্র এইরূপ অস্বাভাবিক ঘটনার আর কি কোনো নজির আছে?

কিভাবে, কেন বা কি সূত্রে শৈলেশ রায় যে নক্সা পকেটে নিয়ে তথ্য সংগ্রহে যাবে ও লালদীঘির ঘাটেই সময় অতিবাহিত করবে তা গোপন বিপ্লবী দলের কোন্ কোন্ সদস্য জানতো? বিপ্লবী দলের সংগঠকদের মনে কি প্রশ্ন জেগেছিল যে, সংগঠকদের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করাই এই পুলিশী নাটকের মূল উদ্দেশ্য? এইরূপ প্রশ্ন এড়িয়ে জটিল পুলিশী চক্রান্তের মূল সূত্র উদ্ঘাটনের ব্যাপারে সংগঠকেরা যদি উদাসীন থাকেন তবে সেই ঔদাসীন্যের "মহৎ" কারণটি কী?

জেল-সেপাইকে দিয়ে নাটক ফেঁদে শৈলেশ রায়কে গ্রেপ্তারের পিছনে যে ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের চক্রান্ত ছিল না এটা আমি কোনমতেই বিশ্বাস করি না। আমি বিশ্বাস করি না, সংগঠনের গোপনচক্রের কোনো বিভীষণ সদস্য পুলিশকে শৈলেশ রায়ের তথ্য আগে থেকে সরবরাহ করে নি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস দলীয় সভ্যের বিশ্বাসঘাতকতা ছাড়া শৈলেশ রায় ঐভাবে ঐ স্থানে জেল-সেপাই কর্তৃক গ্রেপ্তার হতেই পারে না। পুলিশ চরদের অস্তিত্ব গোপন রাখতে ও বিপ্লবী দলে সন্দেহাতীতভাবে তাদের মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্য এইরূপ নাটকের সৃষ্টি পুলিশ অহরহই করে থাকে। এই ব্যাপারটা যে কেবল আমিই জানি তা নয়, "অভিজ্ঞ" বিপ্লবী নেতা ও সংগঠকেরাও তা খুব ভালভাবেই জানেন। তবু আমার আশ্চর্য মনে হয় ও খুব অবাক লাগে যখন দেখি "বিজ্ঞ" ব্যক্তিরাও এইরূপ পুলিশী নাটককে প্রাধান্য দিয়ে মূল বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস ঢেকে রাখতে সচেষ্ট হন।

বেচারা শৈলেশ রায় শেষ পর্যন্ত, আন্দামানে আমার সান্নিধ্যে আসবার আগে, ধারণাই করতে পারে নি যে তার গ্রেপ্তারের পিছনে কোনো বিশ্বাসঘাতকের গুপ্ত চক্রান্ত আছে। সরল মনে সে বিশ্বাস করেছিল আকস্মিকভাবে জেল-সেপাই এসে সন্দেহবশেই তাকে গ্রেপ্তার করতে সাহায্য করেছে।

শৈলেশ রায়ের বিরুদ্ধে জেল ভেঙে মাস্টারদাকে মুক্ত করার ষড়যন্ত্র মামলা আনা হল। এই মামলায় সাত বছরের জন্য তার সাজা হল। দণ্ডপ্রাপ্ত যুবক হাসতে হাসতে কালাপানি এলো দণ্ড ভোগ করতে। আর অন্যান্যরা—যাদের নাম পূর্বে উল্লেখ করেছি, তাদের মধ্যে অনেকে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের নেতৃত্বে পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাব-হাউস আক্রমণে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিল। তারপর আরও জানলাম এদের মধ্যেই মিঃ ডুর্নের আক্রমণকারী ও মিঃ এলিসনের হত্যাকারী সেই দুজন তরুণ সৈনিকও বিদ্যমান। মিঃ এলিসনের হত্যাকারী কে সেই তরুণ সৈনিক? সেই তরুণই এই শৈলেশ রায়।

মিঃ এলিসন হত্যার সূত্র উদ্ঘাটনে সর্বশক্তি নিয়োগ করেও পুলিশ সেই "হত্যাকারী" যুবকের কোনো সন্ধান পায় নি। শৈলেশ রায় লালদীঘির ঘাটে ধরা পড়লো। জেল ভাঙার ষড়যন্ত্র মামলায় সাত বছরের জন্য আন্দামানে নির্বাসিত হল। কিন্তু এই শৈলেশ রায়ই যে মিঃ এলিসনের হত্যাকারী তা পুলিশের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতই রয়ে গেল।

একটু চিন্তা করে দেখলে খুবই আশ্চর্য মনে হবে যে, শৈলেশ রায় মিঃ এলিসনকে হত্যা করার পরেও তার অ্যাকশন পুলিশের সম্পূর্ণ অজ্ঞাত ছিল এবং তার বিরুদ্ধে মিঃ এলিসন হত্যাপরাধে কোনো মামলা রুজু করা সম্ভব হয় নি, তবে সেই শৈলেশ রায় জেল ভাঙার ষড়যন্ত্র কার্যে পরিণত করার পথে লালদীঘির ঘাটে "আকস্মিকভাবে" ধরা পড়ে কেমন করে! দলের বিভীষণের বিশ্বাসঘাতকতায় শৈলেশ রায় যদি জেলের আশেপাশে ধরা পড়ে যেতে পারে, তবে সেই বিভীষণের অনুকম্পায় শৈলেশ রায় পুলিশের কাছে মিঃ এলিসন হত্যার অপরাধে বন্দী হল না কেন?

মাস্টারদা তখনও জেলের বাইরে। তখনও তিনি নিজেই বিশেষ সংগঠকদের নিয়ে দলের কর্মসূচী নিরূপণ করছিলেন। মাস্টারদার নির্দেশে গোপন দলের সুকঠিন নিয়ম-শৃঙ্খলা ও মন্ত্রগুপ্তির কঠোর প্রয়োগ মিঃ এলিসন হত্যাকাণ্ডকে রহস্যের নিবিড় তিমিরে ঢেকে রাখতে সক্ষম হয়। মিঃ এলিসন হত্যার নায়ক নির্ভীক যুবক শৈলেশ রায়ের পাত্তা পাওয়া পুলিশের পক্ষে দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

এলিসন সাহেবের মৃত্যুদণ্ডের পরিকল্পনাটি ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। নোয়াখালি ও ত্রিপুরা জেলায় আমাদের সাথী বিনোদ দত্ত ছিল। সেই দুটি জেলায় তখন "প্রথম শ্রেণীর" মাত্র কয়েকজন বিপ্লবী যুবক ভবিষ্যৎ 'বৈপ্লবিক' কর্মসূচী কার্যে পরিণত করার জন্য আগ্রহে দিন গুণছে। বিপ্লবীদের প্রতি দরদী কয়েকটি পরিবার ও কয়েকজন বন্ধুও তখন ঐ দুটি জেলায় ছিলেন। তাঁরা বিপ্লবীদের

আশ্রয়দান ও নানাভাবে সাহায্য করেছেন। শৈলেশ রায় নোয়াখালিবাসী; কুমিল্লায়ও তার বিভিন্ন পরিচিত স্থান ও বন্ধু-বান্ধব ছিল। কাজেই কুমিল্লায় বিনোদ দত্ত ও শৈলেশ রায়ের ফেরারী জীবন-যাপনের সুযোগ-সুবিধে ছিল। সেইরূপ কোনো দরদী বন্ধুর বাড়িতেই শৈলেশ রায় আশ্রয় নিয়েছিল। ব্যক্তিগত সাহেব হত্যা প্ল্যানের এটাই হল প্রাথমিক ব্যবস্থা। এ ছাড়া এলিসন-হত্যা প্ল্যানের মধ্যে কোনো নতুনত্ব বা বৈশিষ্ট্য নেই। বাংলার ইতিহাসে আগাগোড়া ব্যক্তিগত সাহসের ওপর নির্ভর করেই ব্যক্তিগত হত্যার পরিকল্পনা রচিত হয়েছে। বিশ্বাসঘাতক নরেন গোঁসাইকে জেলের অভ্যন্তরে হত্যা করার মূলে ছিল কানাই-লালের মৃত্যুকে উপেক্ষা করার সাহস ও অমিতবিক্রম; দিনের আলোতে চৌরঙ্গীর ওপর টেগার্ট সাহেবের পরিবর্তে ভ্রমক্রমে মিঃ আর্নেস্ট ডে-র বুকের ওপর বসে গোপীনাথের দু' হাতে রিভলভার চালিয়ে হত্যা করার প্ল্যানের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল গোপীনাথের মৃত্যুপণ দুঃসাহসিকতা।

কার্ল মার্ক্স Armed Insurrection সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে লিখছেন—"...In one word, according to the words of Danton—the greatest master of revolutionary policy yet known—'Audacity, audacity and yet again audacity?'"

যে-কোনো বৈপ্লবিক পরিকল্পনা ও কৌশলের মূল বক্তব্য কার্ল মার্ক্স ফরাসী বিপ্লবী নেতা দাঁতোর উদাত্ত বাণী উদ্ধৃত করে বলেছেন—'চাই বিক্রম, আরও বিক্রম ও সিংহ বিক্রম।' পরিকল্পনার এই মূল বিষয়টি যেখানে উপেক্ষিত হয়েছে সেখানেই বিপ্লবীদের অবস্থা শোচনীয়। আজ মনে করতেও কষ্ট হয় যখন ভাবি চারজন যুবক মরণ-পণ করে ১৯৩২ সালে চৌরঙ্গীর কাছে "The Statesman" অফিসের দ্বারদেশে সম্পাদক মিঃ ওয়াট্‌সনকে লক্ষ্য করে গুলী ছুঁড়লো—তারপর লক্ষ্যভেদ করতে না পেরে যে মোটরে করে চারজন চৌরঙ্গীতে এসেছিল সেই মোটরে করেই প্রায় দশ মাইল পথ অতিক্রম করে তারা বেহালায় চলে যায় এবং সেখানে একটি স্তম্ভে মোটর গাড়িটিতে সামান্য ধাক্কা লাগে। এর পরমুহূর্তেই এই চারজন বিপ্লবী যুবক যারা জীবনকে তুচ্ছ করে রিভলভার হাতে বেরিয়েছিল তারা সত্যিই জীবনকে তুচ্ছ করেই প্রত্যেকে পটাসিয়াম সায়ানাইড গলাধঃকরণ করে চিরবিদায় নেয়।

যাদের কাছে মৃত্যু এত তুচ্ছ, যারা মৃত্যুকে এত সহজে উপেক্ষা করতে পারে, যাদের পেছনের আকর্ষণ বলে কিছুই নেই, তারা কেন এত সময় পেয়েও সুদূর রাস্তা অতিক্রম করার পর এইরূপ শোচনীয় মৃত্যুবরণ করে নিল?—এর উত্তর কে দেবে? এই আত্মত্যাগী যুবকদের এইরূপ শোচনীয় মৃত্যুর জন্য দায়ী কে? এইসব নির্ভীক যুবক যারা নিজের জীবনপাতে ভ্রূক্ষেপ করে না, তাদের যদি শিক্ষা ও মানসিক প্রস্তুতি সম্বন্ধে নেতারা সচেতন করেন তবে কি এইরূপ পরিণতির কোনো সম্ভাবনা থাকে? যে নেতা বা নেতৃস্থানীয়েরা সশস্ত্র সংঘর্ষের বাস্তব চিত্র অন্তরে কখনও দেখেন নি এবং নিজেরাও সেইরূপ মানসিক প্রস্তুতি থেকে বহু দূরে, তাঁরা কি কখনও নির্ভীক সৈন্য তৈরি করতে পারেন? নেতারাই যদি পুলিশের হাতে ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে দুর্বলতা দেখান তবে কি সেইরূপ নেতাদের পক্ষে বিপ্লবী যুবকদের দ্বারা পরিকল্পনাকে সার্থকভাবে বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব? আরও মনে পড়ে ১৯৩০ সালের ২৫শে জুলাই তারিখে ডালহৌসী স্কোয়ারে স্যার চার্লস টেগার্টকে হত্যার উদ্দেশ্যে তাজা বোমা নিক্ষেপ করতে গিয়ে নিজের হাতেই সেই বোমার আকস্মিক বিস্ফোরণে অনুজা সেনের নির্মম মৃত্যু! এই জাতীয় বোমার 'ফিউজ' সম্বন্ধে চন্দননগরের বাড়িতে শ্রীকালিপদ ঘোষ যখন বর্ণনা করছিলেন তখন আমি তাঁকে হুঁশিয়ার করেছিলাম যে, ওই বোমা "Suicidal" (আত্মঘাতী) হবে। দুটি কারণ আমার কাছে সুস্পষ্টভাবে দেখা দিয়েছিল—প্রথমত, তিন মিনিটের 'টাইম ফিউজ' বোমায় সংযোগ করা অত্যন্ত impractical idea. কোনোদিন যে নেতা স্বহস্তে বোমা নিক্ষেপ করেন নি বা যাঁর এ সম্বন্ধে কোনো বাস্তব ধারণাই নেই যে নিশানা লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়তে কতখানি সময় লাগে ও লক্ষ্যস্থলে তা পৌঁছতে আরও ক'টি সেকেণ্ডের প্রয়োজন, তাঁর পক্ষে অনুজার বোমায় মাত্র তিন সেকেণ্ডের 'টাইম ফিউজ' সংযোগ করে মারাত্মক ভুল করা অত্যন্ত স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত, নিজের হাতে তৈরি 'টাইম ফিউজ' টিসু কাগজ দিয়ে গান-কটনকে বিচ্ছিন্ন রেখে সময় বৃদ্ধি করার process ঠিক নয়। কারণ, হাতের মাপ 'ফিউজের' ভিতরে গান-কটনের ব্যবধান মাপ অনুযায়ী রাখা সম্ভব নয়—ফিউজের মধ্যে যদি তুলোর টুকরোগুলো একটু বেশি চাপাচাপি হয়ে বসে তবে যে ক'টি সেকেণ্ড পাওয়া যাবে বলে স্থির করা হবে তার অনেক আগেই বোমার বিস্ফোরণ ঘটার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। নেতার পক্ষে এই মূল শিক্ষা ও বাস্তব জ্ঞান না থাকাই অনুজার নিজ হাতে বোমা ফেটে মৃত্যুর কারণ।

এই সুদীর্ঘকাল পরে আজ আমাদের নিজেদের দুর্বলতা সম্বন্ধে এইসব আলোচনায় কাউকে ছোট করা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার মূল উদ্দেশ্য অতীত ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা। আমার এই উদ্দেশ্যকে যদি কোনো হীন ও নীচ স্বার্থ-প্রণোদিত নয় বলে মনে করতে পারেন তবেই উপরোক্ত বিষয়বস্তু সম্বন্ধে লেখা আমার অনধিকারচর্চা নয় বলে আমাকে ক্ষমা করতে পারবেন। ইতিহাসের এই পরিপ্রেক্ষিতে এলিসন হত্যার সার্থক প্ল্যানের কথা আমার মনে বিশেষ ছায়াপাত করে। এই ব্যক্তিগত হত্যার সার্থক পরিকল্পনার মূল বৈশিষ্ট্য কী ছিল? এলিসন সাহেব কখন কোথায় যান আসেন, কিভাবে তিনি তাঁর দেহরক্ষীদের সঙ্গে নিয়ে চলাফেরা করেন বা শৈলেশ রায়কে এলিসন সাহেবের হত্যার পূর্বে বা পরে কোথায় আশ্রয় নিতে হবে ইত্যাদির মধ্যে যদি একটা বিশদ পরিকল্পনা হয়েছিল বলে ভাবি তবে প্ল্যানের মুখ্য দিকটি অবহেলিত হবে। এলিসন হত্যার প্ল্যানের মধ্যে যদি দেখতে পেতাম শৈলেশ একা একটা রিভলভার নিয়ে শত্রুর দুটি রিভলভারের সম্মুখীন হয় নি, তাকে মোটরগাড়ি দিয়ে সাহায্য করা হয়েছিল কিম্বা তার সঙ্গেও দেহরক্ষী হিসেবে অন্য কোনো বিপ্লবী যুবক রিভলভার হাতে উপস্থিত ছিল তবে কোনো বিশেষ প্ল্যান ছিল বলে ভাবতে বিশেষ অসুবিধে হোত না। কিন্তু আমরা দেখতে পাই, শৈলেশ রায় একাই নির্ভীকচিত্তে একটি মাত্র রিভলভার নিয়ে এলিসন সাহেব ও তাঁর দেহরক্ষীর রিভলভারকে উপেক্ষা করে গুলী চালিয়ে এলিসনকে হত্যা করেছে।

আমার সুদৃঢ় অভিমত এলিসন সাহেব হত্যা পরিকল্পনার মুখ্য বস্তু ছিল শৈলেশের মৃত্যুপণ বৈপ্লবিক দৃঢ়তা। পরিকল্পনাটির মুখ্য বস্তু ছিল—'Be daring, be still more daring, be daring always!'—(Danton). এই পরিকল্পনার মুখ্য বস্তু ছিল—শৈলেশের ডানহাতে মুষ্টিবদ্ধ গুলীভর্তি রিভলভার ও হাসিমুখে দৃঢ়-পদক্ষেপে রক্তক্ষয়ী মৃত্যুপথে অভিযান।

[ক্রমশ]

হিমবন্তের দেবদেউল : (রথযাত্রা, ১৩৭৬) : লেঃ কর্নেল সত্যেন্দ্রপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ১০নং ভৈরব মুখার্জী লেন, কলকাতা-৪। দাম—ছ' টাকা।

হিমালয় চিরকালই তীর্থযাত্রীকে আকর্ষণ করেছে, করবে। লেঃ কর্নেল সত্যেন্দ্রপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তাঁর "হিমবন্তের দেবদেউল" গ্রন্থে হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলের বহু জানা-অজানা তীর্থের কথা বলেছেন। যান্ত্রিকসভ্যতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে তীর্থযাত্রাও অবশ্য সুলভ ও সহজ হয়ে আসছে। এখন বদ্রীনারায়ণ একেবারে বাসে চেপে যাওয়া যায়। লেখক তাঁর গ্রন্থে সহজ ভাষায় সুন্দরভাবে সপ্তবদরী ও পঞ্চকেদার ভ্রমণ বর্ণনা করেছেন। যাঁরা এই তীর্থযাত্রায় বেরুতে চান, বইখানি তাঁদের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান বলে বিবেচিত হবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। অজস্র তীর্থস্থানের বিবরণ, পথ, পরিচয়, মন্দির এবং স্থানমাহাত্ম্য বর্ণনা, পৌরাণিক বহু কাহিনী ইত্যাদি সমন্বয়ে উৎসুক ধর্মপ্রাণ যাত্রীদের ও ভ্রমণকারীদের সত্যিকার 'গাইড' হিসাবে 'হিমবন্তের দেবদেউল' একটি সার্থক গ্রন্থ। বিকৃত কোন রোম্যান্স বা অর্ধসত্য, অসত্য কোন বিবরণ দিযে পাঠকদের ভ্রান্ত করার কোন চেষ্টা গ্রন্থকার করেন নি বলে তিনি আমাদের একান্ত ধন্যবাদার্হ। লেখক একজন অবসরপ্রাপ্ত মিলিটারী ডাক্তার—লেখার প্রচেষ্টা সম্ভবত এই প্রথম। সাহিত্যগত মূল্য সম্বন্ধে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে। ভাষা বেশ সরল ও ঝরঝরে। পৌরাণিক কাহিনীগুলি বর্ণনায় মুন্সীয়ানার পরিচয় আছে। বাইশটি সুন্দর ছবি গ্রন্থটির শোভাবর্ধন করেছে। দুরঙা একটি মানচিত্রে পথপরিচয় সন্নিবিষ্ট রয়েছে। কতকগুলি উপেক্ষিত ও অবহেলিত তীর্থস্থান সম্বন্ধে সাধারণের নিকট আলোকপাত করেছেন সত্যেন্দ্রবাবু। আমরা আশা করি, তীর্থযাত্রী ও ভ্রমণপিপাসুদের "হিমবন্তের দেবদেউল" সমানভাবে তৃপ্তিদান করবে।

আকাশ প্রদীপ :- (দ্বিতীয় প্রকাশ ৭ই আষাঢ়, ১৩৭৪) : সুখরঞ্জন রায়। এম সি সরকার এ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম—তিন টাকা।

রবীন্দ্রযুগের স্বর্গত কবি সুখরঞ্জন রায় রচিত এই রূপক কাব্যনাট্যটির প্রথম প্রকাশকাল ২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩২১। প্রকাশক ছিলেন ঢাকার নলিনীকান্ত ভট্টশালী। করিপুত্র মিহিররঞ্জন রায় নবপর্যায়ে গ্রন্থটি পুনর্মুদ্রিত করেছেন।

সুখরঞ্জন ছিলেন রবীন্দ্র প্রভাবান্বিত কবি। 'শুক্লা', 'মায়াচিত্র' ও 'আকাশ প্রদীপ' নামে তাঁর জীবৎকালে তিনটি কাব্য বা নাট্যকাব্য প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে আকাশ প্রদীপে তাঁর বিশিষ্ট মেজাজের পরিচয় পরিস্ফুট। গ্রন্থটি কবির ২৩-২৪ বৎসর বয়সের রচনা।

কাব্যের রূপক বিশ্লেষণ করে যা পাই তা এই যে, পুরুষ নিত্যমুক্ত। হয় তো ক্ষণিক।

ভ্রান্তবশে সে প্রেম ও সৌন্দর্য শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে। কীভাবে সেই বন্ধনপাশ ছিন্ন করে অনন্ত অসীম মুক্তির রাজ্যে উধাও হয়—তারই তত্ত্ব ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনার মধ্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এই কাব্যে। স্বভাবতই দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' ও বিহারীলালের 'সারদামঙ্গল'-এর রোম্যান্টিক মিস্টিসিজমের কথা আমাদের মনে পড়ে। জীবনের যা উপলব্ধি, তার রসটুকু নিংড়ে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনা এনেছেন কবি তার মধ্যে। রবীন্দ্রপ্রভাব কাব্যের সর্বত্র। সুখরঞ্জনের শুচিশুভ্র কবিমানস উল্লেখের দাবি রাখে। ইতিহাসের ধারায় কাব্যগ্রন্থটির নব মূল্যায়ন নির্ণীত হচ্ছে। বিস্মৃত সুখরঞ্জনকে পাঠকসমাজে নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে তাঁর পুত্রকন্যাদির প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানাচ্ছি।

সংকলন—দ্বিতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা (বৈশাখ)—মূল্য—দুই টাকা। কার্যালয়—১৭এস, ইস্ট রোড, কলকাতা-৩২।

এটি শিল্প ও সংস্কৃতি সংখ্যা। একটি সুখপাঠ্য এবং তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেছেন শ্রীগুরুদাস ভট্টাচার্য, শ্রীরাধিকামোহন মৈত্রেয়, শ্রীশান্তিদেব ঘোষ প্রমুখ। শ্রীযুক্ত সত্যজিৎ রায়ের "ছোট্ট পথের দীর্ঘ কাহিনী" তাঁর প্রথম ছবি পথের পাঁচালীর স্যুটিং বিষয়ক অত্যন্ত মনোজ্ঞ একটি রচনা। সহজ সরল ভাষায় পথের পাঁচালী তোলার দিনগুলোর অভিজ্ঞতার কথা অতি সুন্দরভাবে ব্যক্ত করেছেন শ্রীযুক্ত রায় তাঁর এই লেখায়। কোথাও এতটুকু আত্মম্ভরিতা বা আত্মপ্রচারের প্রয়াস দেখা যায় না। শ্রীঅলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের প্রবন্ধের সূচনায় ই মার্টিন ব্রাউনের উক্তিটি সত্যিই সুনির্বাচিত। বর্তমান সমালোচকের ১৯৫৬ সালে মার্টিন ব্রাউনের সঙ্গে কয়েকবার ইংরাজী কাব্যনাট্যের (বিশেষভাবে টি এস এলিয়টের নাটকের) আলোচনা করবার সুযোগ হয়েছিল। ব্রাউন আলোচনা প্রসঙ্গে যে সব কথা বলেছিলেন, তা কিন্তু মোটেই দুর্বোধ্য ছিল না। কিন্তু দাশগুপ্ত মহাশয়ের লেখাটি বড় বেশি পাণ্ডিত্যপূর্ণ, খুব ঘোরানো এবং পেঁচানো—সাধারণ পাঠকের পক্ষে বোঝা প্রায় দুঃসাধ্য।

শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় এক জায়গায় লিখেছেন—"এই সময়ের মধ্যে প্রযোজনার সামগ্রিক বোধ ইত্যাদি, ইত্যাদি।" কথাগুলো ঠিক নয়—তথাকথিত আধুনিক নাট্যাচার্যের দল এই সব কৃতিত্ব নিজেদের বলে দাবি করেন—কিন্তু এসব বহু আগেই শিশিরযুগের অভিনয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। প্রমাণস্বরূপে শিশিরকুমার সম্বন্ধে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ এবং বিখ্যাত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাগুলোর উল্লেখ করা যায়।

শ্রীরুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত রচিত ব্রেশট বিষয়ক প্রবন্ধটি ইচ্ছাকৃত ভুল তথ্য সম্বলিত। বাংলাদেশে ব্রেশট চর্চা হালফিল থেকে শুরু হয় নি। শ্রীঅশোক সেন ১৯৫৭ সাল থেকে ব্রেশট বিষয়ে বহু পত্রপত্রিকায় লিখে আসছেন। সাপ্তাহিক বসুমতী ও দৈনিকে শ্রীসেন ব্রেশট বিষয়ে নিয়মিত লিখেছেন। তাঁর অনূদিত 'দি গুড পার্সন অভ সেজুয়ান' সাপ্তাহিক বসুমতী ও মাসিক বসুমতীতে প্রকাশিত হয়েছে এবং 'ককেশিয়ান চক সার্কল'-এর বাংলা অনুবাদ প্রবাসীতে বেরিয়েছে। ১৯৬৪ সালের ব্রেশট-ডায়ালগে আসেম্বল কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে শ্রীসেন বার্লিনে গিয়ে ব্রেশট সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতাও ওখানে দিয়ে এসেছিলেন। এসব কথাও এখানকার কাগজে বেরিয়েছে। শ্রীসেনের দ্বারা প্রযোজিত দি গুড পার্সন অভ সেজুয়ান নাটক দেখেই জার্মান সরকারের লোকেরা গত বছর তাঁকে বার্লিনে আমন্ত্রণ করেছিলেন। তাঁর লেখা ব্রেশটের নাটকগুলোর অনুবাদের উল্লেখ করবার মত সৌজন্য শ্রীরুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত দেখান নি'

চাঁদের পর মঙ্গল; এবং মঙ্গলগ্রহ-সংক্রান্ত সংবাদ, তাই মঙ্গলসংবাদ।

আবার, প্রতিবেশী-গ্রহ মঙ্গলকে নতুন করে জানার উদ্যোগ-আয়োজনের সংবাদ। মঙ্গল-সংবাদ সে কারণেও বটে।

এদিকে সংবাদ হামেশাই পাচ্ছি। এই সেদিনও পেলাম।

এই সেদিন জানলাম আমরা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুটি মহাকাশযান মঙ্গলগ্রহ-অভিমুখে ছুটে চলেছে। খুব শীগ্‌গিরই গ্রহটি থেকে মাত্র ২ হাজার মাইল দূরে পৌঁছুচ্ছে ওরা এবং আমাদের জানিয়ে দিচ্ছে, জীবনের অস্তিত্ব ওখানে আদৌ সম্ভব কি না।

জানিয়ে দেবার দায়িত্বটা আগে গিয়ে পড়ছে ম্যারিনার—৬-এর ওপর। কারণ, এই ৬-কেই আগে পাঠানো হয় মঙ্গলগ্রহের দিকে। গত ফেব্রুয়ারীর ২৪ তারিখে ফ্লোরিডার কেপ-কেনেডী থেকে তাকে মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত করা হয়।

আশা করা হচ্ছে, যথাসময়ে মঙ্গল-গ্রহের আকাশে পৌঁছুবে সে; এবং নতুন খবর কিছু পাঠাবে।

এ-ছাড়া দ্বিতীয় মহাকাশযান ম্যারিনার-৭-ও নিশ্চয় নিরাশ করবে না আমাদের। নিশ্চয় সে পূর্ব-ব্যবস্থা অনুযায়ী মঙ্গলগ্রহ থেকে ২ হাজার মাইল দূরে পৌঁছুবে।

এখন প্রশ্ন, পৌঁছে কী কী করবে ওরা?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, পৌঁছন-সংবাদ দেবে প্রথমে; এবং তারপর দেবে মঙ্গল-সংবাদ। মঙ্গলগ্রহের ওরা টেলিভিসন-ছবি নেবে, গ্রহটির বায়ুমণ্ডলের খবর নেবে; আর নেবে তাপাংকের খবর।

শুনেছি, এছাড়া আরও নাকি অনেক খবর নেবার কথা ওদের; এবং খবরগুলোকে নাকি বেতার-মারফৎ পৃথিবীতে 'রিলে' করার কথা।

আমরা বলি, ভালো কথা এসব। খেলার 'রিলে' এবং বিভিন্ন সব উৎসবের 'রিলে' শুনে শুনে অনেকেরই কান ঝালা-পালা হয়ে গেছে। এবার প্রতিবেশী গ্রহের 'রিলে' শুনে বৈচিত্র্যের আস্বাদ লাভ করুন ওঁরা।

ম্যারিনার-৬ এবং ৭ বৈচিত্র্যের রুদ্ধ-দুয়ার খুলল বলে। পৃথিবী থেকে ৬ কোটি মাইল দূরে থেকে ৩০৩ কিলোগ্রাম ওজনের এক-একটি মহাকাশযান শুরু করল বলে 'নতুন রিলে'।

ম্যারিনার-৬ মঙ্গলগ্রহের নিরক্ষীয় অঞ্চলের ওপর দিয়ে ছুটবে। আর ম্যারি-নার-৭ ছুটবে গ্রহটির দক্ষিণ-গোলার্ধ দিয়ে। শোনা যাচ্ছে, ৭ নাকি মঙ্গলের দক্ষিণ-মেরুর খবরও কিছু নেবে।

—তা' নিক, বলি আমরা,—ঘরে বসে দূরের খবর যত নিতে পারি, ততই ভালো।

কিন্তু তবু প্রশ্ন থেকে যায়, মোট

গ্রহান্তর-যাত্রী মহাকাশযান

খবর কতটুকু পাবো এ-থেকে? মঙ্গলের পৃষ্ঠদেশের মোট কতটা পরিমাণ জায়গাকে আমরা জানবো?

বিজ্ঞানীরা বলছেন, শতকরা ২০ ভাগ মাত্র। কিন্তু ওই ২০ ভাগই মঙ্গল সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানকে ২০ গুণ বাড়িয়ে দেবে।

এইখানে প্রশ্ন করেন কেউ কেউ। বলেন, জ্ঞান বাড়াবার এই রকম চেষ্টা এর আগে কি কখনও হয় নি? বিশেষজ্ঞরা জবাব দেন, হয়েছে। আগে আরও হয়েছে এই রকম। প্রথম হয়েছে ১৯৬২ সালের নভেম্বরে। রাশিয়া মারস্-১-কে ঐ সময়েই মঙ্গলগ্রহের দিকে পাঠায়। কিন্তু মারস্-১ গ্রহটির অনেক দূর দিয়ে চলে যায়। ১৯৬৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে উৎক্ষিপ্ত ম্যারিনার-৪ এই দূরত্বকে কমিয়ে আনে খানিকটা। ৬ হাজার মাইল দূরে থেকে সে মঙ্গলগ্রহের খবর নেয়।

এরপর থেকে মঙ্গলগ্রহের খবর নেবার চেষ্টা আরও অবিশ্যি নানাভাবে হয়েছে। কিন্তু কোনো চেষ্টাই মারস-১ বা ম্যারিনার-৪-এর মতো উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে নি।

এই শেষোক্ত দুটি মহাকাশযানের দৌলতে মঙ্গলগ্রহ সম্বন্ধে অনেক নতুন খবর জেনেছি আমরা; এবং সেই জানার সঙ্গে আগেকার সব 'জানা' মিলেমিশে গ্রহটি সম্বন্ধে আমাদের ধারণা যা' দাঁড়িয়েছে, নিচে তা নিয়ে সামান্য কিছু আলোচনা করা হল।

আলোচনার শুরুতেই মঙ্গলের জল-বায়ুর কথা ওঠে। প্রশ্ন ওঠে, জল আছে কি সেখানে? বায়ু আছে? থাকে যদি তো কেমনতরো ওরা? আমাদের পৃথিবীর ধরণের?

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা বলছেন,—হ্যাঁ, বায়ু আছে বটে মঙ্গলগ্রহে; তবে তার ধরণধারণ বোধ হয় পৃথিবীর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বোধ হয়, সেই বায়ুতে আছে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ক্ষুদ্রাতি-ক্ষুদ্র সব ক্রিস্ট্যাল, আর আছে বরফের ক্রিস্ট্যাল।

এই বায়ুস্তর সমানভাবে নেই সবায়। কোথাও ঘন সে, কোথাও আবার পাতলা।

এছাড়া মেঘও আছে মঙ্গলগ্রহে। দু'রকমের মেঘ আছে। তলার দিককার মেঘগুলো হলদে রঙের। বাতাসের দৌলতে মঙ্গলগ্রহের মাটি থেকে ধুলোবালি উঠে আসে আকাশে; তাই হলদে ওরা।

শোনা যায়, ওদের ওপর নাকি জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা হাড়ে হাড়ে চটা। কারণ, ওরাই অনেক সময় মঙ্গলগ্রহের মাটিকে আড়াল করে।

গ্রহটির অনেক উঁচুতে আছে যে মেঘগুলো, তারা বেগুনী-রঙের। মঙ্গলের ১১ থেকে ১৬ মাইল অবধি উঁচুতে আছে ওরা। ওদের নিয়ে সন্দেহ-শঙ্কা এখন আর বিশেষ কিছু নেই। কারণ, বিশেষজ্ঞদের প্রায় সকলেই এখন একমত যে, পৃথিবী থেকে প্রায় ৫০ মাইল উঁচুতে চোখে পড়ে যে রুপালী মেঘের দল, তাদের সঙ্গে ওই বেগুনীদের মিল আছে। মঙ্গলগ্রহের বেগুনীদের মতোই পৃথিবীর রুপালীরাও অতি সূক্ষ্ম সব বরফের টুকরো দিয়ে গড়া।

কিন্তু পৃথিবীর বায়ুচাপের সঙ্গে আদৌ মিল আছে কি মঙ্গলগ্রহের?

বিজ্ঞানীরা বলছেন,—না, মিল নেই। পৃথিবীতে বায়ুচাপ মঙ্গলের তুলনায় প্রায় ১২ গুণ বেশি। বিজ্ঞানীদের হিসেব দেখে অবাক হই আমরা। শুধোই, কী কী আছে তবে মঙ্গলগ্রহের বায়ুতে? কোন্ কোন্ রাসায়নিক উপাদান আছে?

বিজ্ঞানীরা জানান, আছে অনেক কিছুই। তবে সবচেয়ে বেশি আছে নাইট্রোজেন।

হ্যাঁ, সাম্প্রতিক গবেষণাও ঠিক তাই বলছে,—সবচেয়ে বেশি আছে নাইট্রোজেন। মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলের শতকরা ৯৮ ভাগই হল নাইট্রোজেন। বাকী দু' ভাগের মধ্যে আছে আর্গন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং অন্য সব পদার্থ।

—কিন্তু অক্সিজেন? মঙ্গলগ্রহে কি অক্সিজেন নেই তবে?—কৌতূহলীরা প্রশ্নবাণে মুখরিত করেন চারদিক।

বিশেষজ্ঞরা জবাব দেন,—নেই খুব সম্ভব। আর যদি থাকেও তো তার পরিমাণ পৃথিবীর অক্সিজেনের তুলনায় খুবই নগণ্য। এমন কি পৃথিবীর ১ হাজার ভাগের ১ ভাগও নয় তা'।

—জলীয় বাষ্পের ভাগটাও কি একই রকম?

বিশেষজ্ঞরা ভাবিয়ে তোলেন এইখানে। বলেন, আরও খারাপ রকম বরং। কেন না, মঙ্গলগ্রহের জলীয় বাষ্পের খবর নিতে গিয়ে আমাদের দেহেরও প্রায় সব জলীয় বাষ্প ঘাম হয়ে বেরিয়ে গেল যে।

বলেন কি পণ্ডিত ব্যক্তিরা!

কথা শুনে ঘেমে নেয়ে উঠি আমরা। এবং ঘামতে ঘামতেই মূর্তিমান অপাণ্ডিত্যের মতো রহস্যময় মঙ্গলগ্রহের রুদ্ধ-দরজায় আবার গিয়ে হত্যে দিই।

আবার খবর পাই কিছু। রুদ্ধ-দরজার ওপার থেকে ভেসে-আসা অসম্পূর্ণ ও অস্পষ্ট সব খবর।

শুনি, মঙ্গলগ্রহের জগৎটা বড় অদ্ভুত না কি। পৃথিবীর তুলনায় না কি বড় বেশি ঠাণ্ডা সে। তার গড় তাপমাত্রা না কি পৃথিবীর চেয়ে ৩০ থেকে ৪০ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড নিচে। এমন কি নিরক্ষীয় অঞ্চলেও না কি তাপমাত্রাকে সে শূন্যের কোঠার ১০ থেকে ২০ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড নিচে নামিয়ে দিয়ে বসে আছে। আর মেরু অঞ্চলে অনাদি-অনন্তকাল ধরে শীতের সাধনা করছে সে। শূন্যের চেয়ে আরও ৬০ ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড নিচে নেমে শীতের নিষ্ঠুর-নির্মম গার্জেনী সহ্য করছে। অবশ্য এই গার্জেনীর মানে এই নয় যে, শীত তার দোসর তুষারকে পর্বত হবার সুযোগ দিয়েছে ওখানে, অথবা দিয়েছে বিশাল-বিপুল তুষার-সমুদ্র হবার সুযোগ।

বলতে কি, মঙ্গলের শীত বড় বেশি উদাসী। নিজের ঐশ্বর্যকে নিলাম করিয়ে দিয়েই আনন্দ তার।

আর এই রকম বিদঘুটে আনন্দের ভাগীদার যদি সে না হবে তো তার মেরুদেশের তুষার-মুকুটগুলো অত বেশি পাতলা হতে যাবে কেন! কেন ওরা এক ইঞ্চিরও ভগ্নাংশের ভগ্নাংশ হবে!

হ্যাঁ, অস্বীকার করবো না, মঙ্গলগ্রহের তুষার-মুকুটগুলো কয়েক ইঞ্চি করে পুরু। কিন্তু সেই সামান্য পুরুরা তুষার-ভাণ্ডার হিসেবে মঙ্গলের গুরুত্ব বাড়ায় কি?

সুধীজনেরা বলেন,—না, বাড়ায় না। কারণ, এত কম তুষার আছে ওখানে, ওখানকার জমাট জলভাণ্ডার এত অল্প যে, পৃথিবীর সঙ্গে তার কোনোরকম তুলনাই চলে না। এছাড়া, ওখানকার বায়ুমণ্ডলেও তুষার-কণিকার পরিমাণ নগণ্য।

অর্থাৎ, এককথায় মঙ্গলগ্রহের বায়ুমণ্ডল শুকনো ভীষণ। ভীষণ নীরস। এত নীরস যে, পৃথিবীর ভয়াল-রুক্ষ মরুভূমিও তার তুলনায় রসের আকর।

কিন্তু জল নামক সত্যিকারের রস একেবারেই কি নেই মঙ্গলগ্রহে? ডোবা-নালা, খাল-বিল কিছু নেই? এমন কি সামান্য কিছু পরিমাণেও নেই সেই মূল্যবান তরল পদার্থটি, পৃথিবীবাসীদের কাছে যার অন্য নাম জীবন?

বিশেষজ্ঞরা মাথা নাড়েন আবার। বলেন,—না, নেই। উন্মুক্ত অবস্থায় ওই তরল পদার্থটি ওখানে একেবারেই নেই।

—কিন্তু তরল জল না থাক, জমাট জল তো আছে। তুষার-কণিকারা তো আছে সেখানে। সেই তুষার-কণিকা থেকে দু'-চার ফোঁটা জল দু'-চারটি শুভ মুহূর্তেও কি গড়িয়ে পড়ে না?—অজ্ঞজনেরা আশার প্রদীপটি জ্বালিয়ে তোলেন আবার।

বিজ্ঞজনেরা একটিমাত্র ফুঁ-তে সেই প্রদীপটি নিভিয়ে দেন। বলেন, কে গড়াবে? জল? বাতাস তুষারের গর্ভ থেকেই যাকে আকাশে ওড়াবার জন্যে তৈরি হয়ে আছে, গলে গলে মাটিতে গড়াতে তার বয়েই গেছে। আসলে তুষার-কণিকার দৃষ্টিটা ওখানে মাটির দিকে নয়, আকাশের দিকে। গলবার মুহূর্তেই বাষ্প হয়ে আকাশে ওড়ে সে; এবং তারপর মাটিতে আবার যখন নেমে আসে তখন আবার সে জমাট তুষার-কণিকা।

প্রশ্ন উঠবে; মঙ্গলগ্রহে যদি যেতে পারতাম আমরা এবং সব তুষার-কণিকাকে যদি গলাতে পারতাম তো কী পরিমাণ জল পাওয়া যেত?

মঙ্গল-গবেষকরা জবাব দেন,—জল পাওয়া যেত খুব সামান্যই। এবং এত সামান্য পাওয়া যেত যে, তার পরিমাণ হত আমাদের পৃথিবীর শুধুমাত্র প্রাণিদেহের ভিতরকার জলের ১০ লক্ষ বা ১০০ লক্ষ ভাগের এক ভাগ।

এইখানে সন্দেহ জাগে আমাদের। প্রশ্ন করতে মন চায়, তবে কি মঙ্গলগ্রহের তুষার-ভাণ্ডারও খুব সামান্য?

সুধীরা বলেন,—হ্যাঁ, সামান্য। খুব সামান্য। এত সামান্য যে, তাকে তুষার-ভাণ্ডার না বলে তুষার-কণিকা বলা উচিত। কণিকাগুলো আবার স্পর্শকাতর ভীষণ। তাপমাত্রা সামান্য একটু বাড়লেই ওরা মাটি থেকে ছুটি নিয়ে আকাশে আশ্রয় নেয়।

কিন্তু তবু সংশয় জাগে,—আশ্রয় কি শুধু আকাশেই নেয় ওরা? মঙ্গলগ্রহের মাটির তলায় নেয় না? ভূগর্ভে আছে এত জল? আর মঙ্গলগর্ভে নেই?

—না, নেই—বিজ্ঞানীরা অটুট আস্থার সঙ্গেই ঘোষণা করেছেন সম্প্রতি। বলেছেন, ভূমণ্ডলের সঙ্গে মঙ্গলমণ্ডলের তুলনা করার দুঃসাহস আর রাখি নে আমরা। রাখতাম, যদি প্রমাণিত হত, ভূপৃষ্ঠের মরুভূমির তলায় যে-পরিমাণ জল আছে, মঙ্গলপৃষ্ঠের তলাকার জলের পরিমাণ তার অন্তত লক্ষ ভাগেরও এক ভাগ মাত্র।

—জল থাকবে কী করে মঙ্গলগর্ভে!

—বিজ্ঞানীরা বলছেন, কী করে থাকবে? গর্ভের জল তো বাইরেরই জল। ওপরকারই জল। ওপরের জলই না ভূত্বক ভেদ করে ভূগর্ভে গিয়ে জড়ো হয়! মঙ্গলগ্রহের ওপরে নেই জলের ছিটেফোঁটা তো মঙ্গলগর্ভে জল আসবে কোত্থেকে।

এতক্ষণে সমস্ত ব্যাপারটা বোধগম্য

হয় আমাদের। আমরা বলি, তাও তো ঘটে। কোত্থেকে আসবে। এইখানে একদল নাছোড়বান্দা বেঁকে দাঁড়ায় আবার। বলে, আচ্ছা! তর্কের খাতিরে না হয় মেনেই নিলাম যে, মঙ্গলগ্রহে জল নেই। কিন্তু সত্যের খাতিরে মঙ্গলগ্রহের জলের উপাদানগুলোকে অস্বীকার করি কী করে?

বিজ্ঞানীরা বুঝিয়ে দেন,—বেশ। অস্বীকার করো না। সত্যের খাতিরে ধরে নিও বরং যে ওখানকার সব উপাদানকে কাজে লাগিয়ে তোমার এত সাধের জল তুমি পেলে। কিন্তু সে জলের পরিমাণ কতটুকু হবে জানো?

নাছোড়বান্দারা অনেক আশা নিয়ে কান পাতেন এইখানে। শুধোন, কতটুকু?

বিজ্ঞানীরা একটি উপমা দিয়ে বুঝিয়ে দেন,—শোন তবে, কতটুকু। তোমার পৃথিবীতে যে জল আছে তাকে সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে দিলে কয়েক কিলোমিটার উঁচু হবে। আর মঙ্গলগ্রহের জলকে যদি ঠিক একইভাবে ছড়িয়ে দাও তো তার উচ্চতা হবে ১ মিলিমিটারেরও ১০ ভাগের দু'-তিন ভাগ মাত্র।

—মাত্র!—মাথায় হাত দেন উৎসাহীরা। দারুণ আশাহত হন।

—তবে কি জীবন আছে মঙ্গলগ্রহে?—বলতে শোনা যায় ওদের।

বিজ্ঞানীরা বলেন,—আছে কি না, বলা খুব মুশকিল। তবে সম্ভবত নেই।

নেই,—জীবন নেই মঙ্গলগ্রহে;—অনেককেই আজকাল বলতে শোনা যাচ্ছে।

—জীবন কী করে থাকবে!—বলছেন ওঁরা,—এভারেস্ট যদি আর দু'-তিন গুণ উঁচু হত, জীবন কি তবে থাকত সেখানে? এমন কি এখনই কি জীবন আছে এভারেস্ট এলাকায়? জীবন তো তার পাদদেশে, তার গায়ে গায়ে খানিকটা উঁচুতে অবধি জীবন। কিন্তু বেশি উঁচুতে উঠলেই চেহারা অন্যরকম একেবারে। জনপ্রাণী, গাছপালা, লতাপাতা এমন কি দূর্বা পর্যন্ত নেই সেখানে।... এবার কল্পনা করা যাক, এভারেস্ট যেন আরও প্রায় আড়াই গুণ উঁচুতে উঠে গেল। যেন বায়ুমণ্ডলের সীমানা ছাড়িয়ে ট্রপোসফিয়ার ভেদ করে উঠে গেল সে।... উঠলে কী দাঁড়াবে? এভারেস্ট-এর গায়ে তুষারের চিহ্নমাত্রও থাকবে না। শুষ্ক, রুক্ষ পাহাড়ীয়া এক মরুভূমির চেহারা নেবে সে। সেই মরুভূমি দিনের বেলায় দারুণ গরম হয়ে উঠবে। আর রাত্তিরে হয়ে উঠবে ভীষণ ঠান্ডা। এছাড়া, মরুভূমির বাতাস ঠান্ডা থাকবে বরাবরই। এত ঠান্ডা যে তার মাটির তাপমাত্রার সঙ্গে এর কোনো তুলনাই চলবে না।...এখন কল্পনা করুন, প্রায় অক্সিজেনহীন সেই দেশে, রুক্ষ অনুর্বর ও ভয়ঙ্কর সেই এলাকায় জীবনের অস্তিত্ব সম্ভব কি না। সেখানে যদি সম্ভব না হয় তো মঙ্গলগ্রহেও হবে না। কারণ, মঙ্গলগ্রহের পৃষ্ঠদেশের পরিবেশটা সেখানকার পরিবেশের চেয়েও অনেক বেশি ভয়াবহ।

ভয়াবহ ও অদ্ভুত সেই দেশে জীবনের অস্তিত্ব নিয়ে অন্য এক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা শুরু করা যাক এবার। 'প্যানসপারমিয়া'র প্রসঙ্গে আসা যাক।

'প্যানসপারমিয়া' হল এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে জীবাণুর স্থানান্তর সম্পর্কিত মতবাদ।

এই মতবাদ এখন আর ধোপে টেকে না। কারণ, এরই মধ্যে এন খোলোড্নি যুক্তিতর্কের এভারেস্ট গড়ে তুলে প্রমাণ করেছেন যে, অন্য গ্রহ থেকে আগত জীবাণুদের পক্ষে পৃথিবীতে বংশবিস্তার করা কোনোমতেই সম্ভব নয়। এবং যে কারণে পৃথিবীতে সম্ভব নয়, ঠিক সে কারণেই সম্ভব নয় মঙ্গলগ্রহেও। অতএব, মঙ্গলগ্রহে যদি জীবন থাকে তো ওই গ্রহেই তাকে গড়ে উঠতে হবে। কিন্তু মঙ্গলের এখন যা অবস্থা, তাতে আদৌ কি ওখানে জীবন থাকা সম্ভব?

বিশেষজ্ঞদের মতে,—না, সম্ভব নয় আদৌ। মঙ্গলে জীবন খুঁজে পাবার আশা এখনও সুদূরপরাহত।

কিন্তু আশাবাদীরা শুনলে তো এসব যুক্তি। মঙ্গলগ্রহকে বিদঘুটে একটা পড়ো জায়গা হিসেবে মানলে তো ওরা। তাই নতুন তর্ক ওঠে। তুফান ওঠে নতুন যুক্তির। ওঁরা বলেন, আমাদের পৃথিবীর মতো জীবন হয়তো ওখানে নেই। কিন্তু অন্য রকমের জীবন তো থাকলেও থাকতে পারে!

—তা' পারে, বিজ্ঞানীরা বলেন,—কিন্তু পৃথিবীর মতো জীবন ওখানে নৈব নৈব চ।

আশাবাদীরা হেসে-দুলে ওঠেন আবার। বলেন, অতটা আত্মবিশ্বাস কি ঠিক?

—হ্যাঁ, ঠিক,—জানান বিজ্ঞানীরা এবং সঙ্গে সঙ্গেই নতুন আর একটা যুক্তিজাল খাড়া করেন। প্রোটিন-অণুর প্রসঙ্গ আনেন ওঁরা।

প্রধানত চার রকমের মৌলিক পদার্থ হাইড্রোজেন, কার্বন, নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন মিলে এই প্রোটিন-অণু গড়ে ওঠে। এবং এই অণুরাই আছে জীবনের মূলে। অবশ্য, সন্দেহ নেই, আরও কয়েক রকমের পদার্থ এই প্রোটিন-অণুতে থাকতে পারে; এবং সেই পদার্থগুলো হল ফসফরাস, গন্ধক ইত্যাদি।

উল্লিখিত পদার্থগুলো মিলেমিশে প্রোটিন-অণু গড়ে তুলবে তখনই, পরিবেশ যখন নাকি মিলনের অনুকূল হবে।

অনুকূল পরিবেশ বলতে আমাদের পৃথিবীর মতো জায়গাকে বোঝান হচ্ছে। অর্থাৎ, বোঝান হচ্ছে ঠিক সেই রকম জায়গাকে যেখানে নাকি ইচ্ছেমতো চলাফেরা করতে পারে ওরা, মেলামেশা করতে পারে, বিভিন্ন অনুপাতে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিভিন্ন রকমের প্রোটিন-অণু গড়ে তুলতে পারে।

কিন্তু ঠিক এইরকমের পরিবেশ কি মঙ্গলগ্রহের পুরোপুরি শুষ্ক মরুভূমিতে সৃষ্টি হওয়া সম্ভব?

জীব-বিজ্ঞানীরা বলেন,—না, সম্ভব নয়। কারণ, এজন্যে প্রয়োজন জলো জায়গা। সে জায়গায় বিভিন্ন অজৈব পদার্থ দ্রবীভূত অবস্থায় থাকবে।

কিন্তু এরকম কোনো জলো জায়গা তো মঙ্গলগ্রহে নেই। অতএব, সন্দেহ হয়, জীবন বলতে আমরা যা' বুঝি, ঠিক সেরকম কিছুও নেই সেখানে।

সদ্য প্রকাশিত হইল!
বহুকাল পরে পুনর্মুদ্রণ
সায়ন মাধবাচার্য্য বা বিদ্যারণ্য মুনি বিরচিত
বেদান্ত-গ্রন্থ
বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহঃ
বেদান্ত শাস্ত্রের একখানি অতীব দুরূহ ও উপাদেয় গ্রন্থ
অনুবাদক
পণ্ডিতপ্রবর প্রমথনাথ তর্কভূষণ
মূল্য চার টাকা
বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা ১২

যুক্তফ্রণ্ট সরকার সমীপেষু

আমরা যা আশঙ্কা করেছিলাম, তা-ই সত্যি হলো। তবে এত তাড়াতাড়ি আর এভাবে হবে তা আমাদের কল্পনার মধ্যেও ছিল না।

গত দু' মাস ধরে অজস্র তথ্য দিয়ে আমলাতন্ত্রের চাবিকাঠিদের সম্পর্কে যুক্তফ্রন্ট সরকার, বিশেষ করে স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রীকে আমরা সতর্ক থাকতে বলেছিলাম। তত্ত্বের ক্ষেত্রে যে কথা তাঁরা বিশ্বাস করেন, কার্যত সেই বিশ্বাসানুযায়ী চলার জন্য আমরা আবেদন করেছিলাম।

একত্রিশে জুলাই বৃহস্পতিবারের বারবেলায় পশ্চিম বাংলার বিধানসভা ভবনে যে কান্ড ঘটে গেল, তা থেকে আমলাতন্ত্র সম্পর্কে মার্কসবাদীদের তত্ত্ব অক্ষরে অক্ষরে প্রমাণিত হয়ে গেল।

সেদিন বিধানসভা ভবনে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু যে দৃঢ়তা, নির্ভীকতা এবং চরিত্রবল দেখিয়েছেন, তাতে বামপন্থীরা সকলেই গৌরব বোধ করবেন। বস্তুত স্বাধীনতা লাভের পরে পশ্চিম বাংলায় কোন রাজনৈতিক নেতাই এই দৃঢ়তা দেখাতে পারেন নি। সেদিন আরো যে বীভৎস কান্ড ঘটতে পারতো, শ্রীবসু তা থেকে পশ্চিম বাংলাকে বাঁচিয়েছেন।

যুক্তফ্রন্ট সরকার দ্রুত সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সুরু করেছেন। ফ্রন্টের অন্যতম বিশিষ্ট মন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙার সত্য-সত্যই বলেছেন, এই ঘটনা থেকে অনেক শিক্ষা নেওয়ার আছে। ঘটনা থেকে শিক্ষা লাভ করে তাঁরা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে আগ্রহী।

বিধানসভার বিতর্কে অংশ গ্রহণ করে সরকারপক্ষীয় সদস্যরা এদিনের ঘটনার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে সরকারের কাছে অনেকগুলো প্রশ্ন তুলে ধরেছেন। কেউ কেউ পুলিশ বিভাগের মূল ঘাঁটিগুলো যাঁরা আগলে আছেন, তাঁদের সম্পর্কে নানা প্রশ্ন তুলেছেন। রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকেও অধিকাংশ মন্ত্রীই নানা তথ্য দিয়ে পুলিশ বিভাগের গাফিলতির বিষয়ে অকাট্য প্রমাণ হাজির করেছেন। কাজেই নতুন করে সেইসব ত্রুটি এবং দুর্বলতার কথা উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই।

এখন প্রশ্ন হল কি ব্যবস্থা সরকার গ্রহণ করবেন?

পুলিশমহলে সরকারের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ থাকা স্বাভাবিক। ইংরেজ আমল থেকে সুরু করে এতদিন পর্যন্ত পুলিশের ছিল একই মনোভাব। অত্যন্ত কৃতিত্ব সহকারে কংগ্রেস সরকার গত বাইশ বছর ধরে ইংরেজের হাত থেকে পাওয়া আমলাতান্ত্রিক ভাবধারা বিশ্বস্ততার সাথে অনুসরণ করেছেন, প্রসার করেছেন। গত বাইশ বছর ধরে পুলিশ জমিদার, জোতদার, মহাজন, বৃহৎ পুঁজিপতির স্বার্থ রক্ষা করেছেন। অতন্দ্র প্রহরায় তাঁরা নিযুক্ত থেকেছেন কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন শক্তির সাহায্যের জন্য। সেই একই কাঠামোর মধ্যে বাইশ বছরের সেই ভাবধারার উত্তরাধিকারত্ব নিয়ে যাঁরা কাজ করছেন, রাতারাতি তাঁদের মনোভাবের তো পরিবর্তন করা সম্ভব নয়।

যুক্তফ্রন্ট সরকার এবার ক্ষমতায় আসার পর মূল জায়গায় আঘাত করলেন। ঘোষণা করে দিলেন শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী মধ্যবিত্ত মানুষের অধিকারের আন্দোলন রুখতে পুলিশ পারবে না। সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে চিৎকার সুরু হয়ে গেল। গেল গেল রব উঠলো। সাধারণ পুলিশের পক্ষে এতদিনের ভাবধারা থেকে সরে আসা কি এত সহজে সম্ভব।

জমিদার, মহাজন, পুঁজিপতির স্বার্থে কাজ করলে নগদ মুনাফা হাতে আসে। গত চার মাসে সে মুনাফা থেকে একেবারে বঞ্চিত না হলেও মুনাফার পরিমাণ কমে গেছে। অভ্যস্ত পথে চলতে না পারায় বিক্ষোভ তো থাকবেই।

কিন্তু সাধারণ পুলিশ এসেছে গরীব চাষী আর নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে। আর্থিক দিক থেকে এবং আত্মীয়তার দিক থেকেও গণ-আন্দোলনের শরিকদের এরা সমগোত্রীয়। গত বাইশ বছরের ভাবধারা থেকে পুষ্ট অহমিকাকে আঘাত করতে পারলে আর তাঁদের ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত দৃষ্টি যে পথে তার সঠিক নির্দেশ দিতে পারলে শেষ পর্যন্ত বর্তমান কাঠামোর বিরুদ্ধে তাঁদের বৃহৎ অংশ যেতে বাধ্য। তাই একটা বৃহৎ ষড়যন্ত্রের ক্রীড়নক হয়ে এই সাধারণ পুলিশের যে অংশ সেদিন বিধানসভা ভবনে অমানুষের মত আচরণ করলো, তাদের বিরুদ্ধে শাস্তি দেওয়ার সময় সরকারকে বারংবার চিন্তা করতে হবে।

শৃঙ্খলাভঙ্গের জন্য কঠোর শাস্তি তাদের অবশ্যই প্রাপ্য। শাস্তির পরিমাপে কঠোরতম হওয়াই উচিত। কিন্তু সেখানে বেছে নেওয়া প্রয়োজন, বৃহৎ ষড়যন্ত্রের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত খুঁটিগুলিকে নিশ্চয়ই ধরতে হবে। তবে যাঁরা না বুঝে নিছক একজন সহকর্মীর মৃত্যুতে সমবেদনা প্রকাশের তাগিদে এই ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়েছেন, তাঁরা নিশ্চয়ই অনুকম্পার পাত্র। কাজেই ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে শাস্তিদানের ব্যাপারে সরকারকে ধীর-স্থির হয়ে চলতে হবে।

কিন্তু আমলাতন্ত্রের আসল নায়ক যাঁরা, সরকারের পরিবর্তনের সঙ্গে বাইরে থেকে যাঁরা জ্যোতিবাবুর পরম ভক্ত বনে যাওয়ার ভান করে তাঁর পিঠে ছুরিকাঘাত করার চেষ্টা করছেন, যাঁদের চূড়ান্ত গাফিলতির ফলে সেদিনের এই অভাবনীয় ব্যাপার সংগঠিত হল, তাঁদের গায়ে কি হাত পড়বে? ধর-গুপ্ত-মজুমদার সাহেবদের কি কৈফিয়ৎ আছে! অঙ্কের হিসাবের মত সহজ তাঁদের চরিত্র। কংগ্রেস নায়কদের তাঁরা কুর্নিশ জানাতেন শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়। মূলগতভাবে যে শ্রেণীস্বার্থ রক্ষা করাই তাঁদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য, বর্তমান দিনের কংগ্রেস নেতৃত্বকে সেই স্বার্থের তাগিদেই সেলাম বাজিয়েছেন। শুধু তাই নয়, অনেক সময় তাঁদের নির্দেশও দিয়েছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে ঠোকাঠুকি লেগেছে বটে। কিন্তু সে ঠোকাঠুকি ব্যক্তিগত কারণে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শাসনের আসল ঘাঁটি আমলাতন্ত্রকে আরো সুদৃঢ় আর ব্যাপক করে তোলবার জন্য।

রাতারাতি এঁদের অনেকে বদলে যাওয়ার ভান করেছেন। মন্ত্রীদের প্রতি অতিরিক্ত আনুগত্য দেখিয়ে প্রগতিশীলতার আচরণে দেহ ঢাকবার চেষ্টা করছেন। তাঁদের সম্পর্কেই সতর্ক থাকার কথা আমরা বারংবার বলেছি।

এদিনের ঘটনায় তাঁদের চরিত্র আর একবার বোঝা গেল পরিষ্কারভাবে। সামান্য গাফিলতি বলে সেদিনের ত্রুটি-বিচ্যুতিকে ঢেকে রাখা যাবে না। সমস্ত ঘটনার সঙ্গে শ্রীমতী আভা মাইতি বা শ্রীনেপাল রায়ের যে যোগাযোগের কথা বাইরের দু-একটি ঘটনা থেকে পরিস্ফুট হয়েছে, তা থেকে অনেক বেশি যোগাযোগ আমলাতন্ত্রের ঐ বিশেষ ব্যক্তিদের আছে।

অথচ সরকার ভারতের বর্তমান সংবিধান অনুসারে আমলাতন্ত্রের ঐ নায়কদের গায়ে হাত দিতে পারছেন না, যতদিন না বর্তমান প্রচলিত আইনের মাধ্যমে তাঁদের দোষী সাব্যস্ত করতে

পারেন। সরকারের হাতে একমাত্র অস্ত্র বদলী করা। কিন্তু তাতে কি ষড়যন্ত্র বন্ধ হবে? তার এমন কিছু একটা করা দরকার, যাতে ফিরে আঘাত করার ক্ষমতা এঁদের না থাকে। বসিয়ে বেতন দেওয়া অনেক ভালো। তা না হলে নিছক জনকল্যাণমূলক কিছু কিছু কাজের দায়িত্ব দিয়ে সাধারণ কর্মচারী, বিশেষ করে সাধারণ পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে এঁদের সমস্ত যোগসূত্রকে ছিন্ন করে ফেলতে হবে। হাওড়া শহরের খাটা পায়খানা রক্ষণাবেক্ষণের কমিশনারের মত পদ সৃষ্টি করে এঁদের বহাল করুন।

শুধু পুলিশ বিভাগই নয়—অন্যান্য দপ্তরের প্রশাসনিক দায়িত্বে যাঁরা আছেন, তাঁদের কথাও ভাবতে হবে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু এবং সামগ্রিকভাবে যুক্তফ্রণ্ট সরকার এবার সতর্ক হতে চেষ্টা করছেন। আশা করবো তাঁরা সত্যসত্যই আসল জায়গায় হাত দেবেন।

—শ্রীসর্বদর্শী

গুণে মন ভোর?

যে সমস্ত খদ্দের গুণের কদর করেন

জানেন তাঁরা ঘি, মাখন, তেল, মধু,

মশলা ও অন্যান্য কৃষিজাত জিনিষপত্র

কেনাকাটা করবার সময়ে সব সময়ে

আগমার্ক লেবেল দেখেই কেনেন।

গত বছর প্রায় 150 কোটি টাকা

মূল্যের কৃষি ও পশুজাত জিনিষপত্রে

"আগমার্ক" ছাপ মারা হয়েছিল।

এই বছরে 82 কোটির চেয়েও

বেশী টাকা মূল্যের আগমার্ক

ছাপমারা জিনিষ বিদেশে রপ্তানি

করা হয়েছিল।

আগমার্ক ছাপ

দেখে জিনিষ কিনুন

ভালো যন্ত্রপাতিতে ভরা গবেষণাগারে

অনেক রকমের পরীক্ষার পর

সরকারের তরফ থেকে আগমার্ক

ছাপ দেওয়া হয়। আগমার্ক হলো

সরকারী গ্যারান্টির প্রতীক।

আগমার্ক মানেই হলো

বিশুদ্ধ উচ্চগুণসম্পন্ন

davp 69/127 Bengali

ভূমি-বণ্টন সমস্যা ও আইরিশ দৃষ্টান্ত

নরেন্দ্র নারায়ন চক্রবর্তী

বাংলা দেশের ভূমি-বণ্টন সমস্যার সমাধান-প্রশ্ন সহজ নয়, সুলভ তো নয়ই। স্মরণাতীতকাল থেকে বাংলার বুকে এই সমস্যা অনড় ও অচল হয়ে চেপে বসে আছে। এর ফলে অতীতে এক শ্রেণীর লোক শুধু লাভবানই হয় নি,—বর্তমান সমাজের বিশেষ সুবিধাভোগী অধিকাংশ জমির মালিক যারা, তাদের উদ্ভব হয়েছিল এরই কল্যাণে।

আজ জবরদখল শব্দটা নিয়ে যে-প্রকার গভীর ও গম্ভীর কলরোল উঠেছে, অতীতে এই শব্দটারই নাম ছিল বে-দখল, এবং এর সুশৃঙ্খল ও সুচারু কারবার চালাতেন তখনকার জমিদার ও তাঁদের অধীনস্থ জোতদাররা। গরীব যারা তারা সেদিন একতরফা পড়ে পড়ে মার খেত। এই বে-দখল কারবারের চূড়ান্ত পর্যায়ের কারুকর্মের নাম ছিল ভিটে-মাটি-উচ্ছেদ। বাংলা দেশের বিগত শত বৎসরের ইতিহাসে এই উচ্ছেদ-কর্মের সুদীর্ঘ তালিকার সংখ্যা অগুনতি।

পশ্চিম বাংলার ভূমিরাজস্বমন্ত্রী শ্রীহরেকৃষ্ণ কোঙারের সাম্প্রতিক বিবৃতি শুধু করুণ ও অসহায় নয়,—বর্তমান সমাজের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সমস্যাও। অতীতে কোর্ট ও কাছারির নিখুঁত ব্যবস্থাপনায় কোনদিনই নিস্ব তার বে-দখলি জমি ফিরে পায় নি। আজও পাবে না। সেদিনও আইন ও শৃঙ্খলার অজুহাত ছিল। আজও সেই অজুহাত শতমুখে এবং সবিস্তারে প্রতিবাদ জানায়। সেদিন অত্যাচারী জমিদার, জোতদার কিম্বা বিত্তশালী মহাজনের অত্যাচার কারো চোখে পড়ে নি। আজও তাদেরই এক শ্রেণীর সুবিধাবাদী প্রতিনিধি ভূমিহারা নিস্বের সামান্যতম প্রতিকার চেষ্টা দেখবামাত্র গেল রাজ্য গেল মান বলে তারস্বরে আর্তনাদ করে।

স্থানে স্থানে ভূমিহীনরা অথবা ভূমিহারারা একজোটে এতকালের সুবিধাভোগীদের সুদৃঢ় কব্জা থেকে কিছু কিছু জমি ছিনিয়ে নিয়েছে। প্রয়োজন এবং ন্যায়বিচারের তুলনায় এর সংখ্যা ও পরিমাণ একান্তই তুচ্ছ ও সামান্য। অনেকের এবং হয়তো বেশির ভাগ লোকেরই ধারণা যে, এই প্রতিকার-চেষ্টার সকল দায়িত্ব,—এবং কৃতিত্বও বটে,—কম্যুনিস্টদের। মূলত, সবটা না হলেও অংশত,—কথাটা সত্য। আমাদের দেশের যারা নির্ভেজাল জাতীয়তাবাদী, তাদের অকুণ্ঠ ধারণা এই যে, শ্রমিক কিম্বা কৃষকদের সমস্যা সম্পর্কে তাদের করণীয় কিছুই নেই এবং তাই সুদীর্ঘ কুড়ি বৎসর স্বাধীনতার মধু আকণ্ঠ পান করা ছাড়া এদের দিকে তাকাবার তাদের ফুরসৎ হয় নি। আরও একটা তথ্যও এর ভেতর আছে। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে একদা যে-জাতীয়তাবাদীরা বিদ্রোহ করেছিল, তাদের অধিকাংশই ছিল, হয় জমিদার, না হয় জোতদার শ্রেণীভুক্ত। এদের মধ্যে সামান্য কিছু লোকই শ্রেণীস্বার্থের উর্ধ্বে নিজেদের নিয়ে যেতে পেরেছিল। বাদবাকি সবাই শ্রেণীস্বার্থের শুধু পরিপোষকই ছিল না, পরন্তু শ্রেণীস্বার্থের গায়ে মৃদুতম আঁচ লাগলে দস্তুরমতো তারা ক্ষিপ্ত হতেও পারঙ্গম ছিল। এ কারণেও শ্রেণীস্বার্থেই তাদের এই সমস্যা সম্পর্কে সজাগ-উপেক্ষার ভান দেখাতে বাধ্য করেছে। ডালে বসে সে-ডাল কেউ কাটে না।

স্ট্রাইক, ধর্মঘট, হরতাল প্রভৃতি শব্দগুলির সঙ্গে কম্যুনিজম্ আজকের দিনে ওতপ্রোত মিশে গেছে। কিন্তু ঐ অঘটনগুলির অস্তিত্ব যে অতি পুরাতন এবং দূর ও মধ্যবর্তী অতীতেও যে ওগুলো অপ্রচলিত ছিল না, এ-তথ্য অনেকেরই জানা, কিন্তু তবুও ভুল হয়ে যায় কার্যকালে। এবং যত দোষ নন্দ ঘোষ প্রবাদ বচনটি অনুসরণ করে এ-সবের যাবতীয় দায়-দায়িত্ব অবলীলায় চাপিয়ে দেওয়া হয় কম্যুনিস্টদের স্কন্ধে। বস্তুত এটা যে একটা সামাজিক সমস্যা এবং মানুষ তার অপরিহার্য জৈবিক চাহিদায় এ-কাজের শরণাপন্ন হয়, গরজের তাগিদে অনেকেই এ কথাটা ভুলে যায়। বয়কট কথাটার জন্ম দিয়েছে আয়র্লণ্ডের জাতীয়তাবাদীরা। এ-দেশের প্রথম বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় বয়কট কথাটা অতিমাত্রায় চালু হয়ে গিয়েছিল। ধর্মঘট কথাটা একান্তই স্ব-এবং-সু-ব্যক্ত। ইওরোপ ও আমেরিকা এবং বিশ্বের আরও নানাস্থানে স্ট্রাইক, ধর্মঘট ও ব্যাপক শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন কম্যুনিজ্‌ম্-এর উৎপত্তির বহু পূর্ব থেকেই শুরু হয়েছে। ও-সব দেশে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন যে রূপে ও ভাবে এই সামাজিক সমস্যার সমাধান করেছিল এবং জন-জীবনের ভাগ্যে বহুলাংশে পরিবর্তন এনেছিল, তাও কম্যুনিজ্‌ম্-এর সাহায্যে বা আদর্শে ঘটে নি।

এই সম্পর্কে আয়র্লণ্ডের সিন্‌ফিন্ পার্টি যে নীতি ও রীতি অনুসরণ করে তাদের স্বাধীনতা অর্জনের পূর্বেই ভূমি বণ্টন সমস্যা বহুলাংশে সমাধান করতে সমর্থ হয়েছিল, তার বিবরণ খুবই চমকপ্রদ ও বস্তুতান্ত্রিক। কৌতূহলোদ্দীপকও কম নয়। একথা বলবার পূর্বে সবিনয়ে একটা কথা নিবেদন করতে চাই : সিন্‌ফিন্ সঙ্ঘের উদ্ভব হয়েছিল চলতি শতাব্দীর প্রথম দশকে। সেদিন এবং পরবর্তীকালে তাদের কারও কম্যুনিজ্‌ম্-এর সঙ্গে সম্পর্ক গাঢ় ছিল, এ প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

ইংরেজ যেখানেই উপনিবেশ স্থাপন করেছিল, সঙ্গে সঙ্গে অপরিহার্য জমিদারি প্রথাও সেখানে সে চালু করেছে। ভারতবর্ষে করেছিল এবং করেছিল আয়র্লণ্ডেও। খাস ইংলণ্ডের ইংরেজরা পূর্বকালে আয়র্লণ্ডের উত্তর অংশ তো বেদখলই করে নিয়েছিল। এই অংশের নামই আলস্টার। এবং আয়র্লণ্ড খণ্ডিত করে এই উত্তরাংশ নিয়ে আজকের এই গ্রেট বৃটেন বা যুক্তরাজ্য। দক্ষিণ অংশের বাসিন্দা মোটামুটি খাস আইরিশ। কিন্তু ইংরেজের শুভবুদ্ধির কারণে এখানেও দু-চারজন ইংরেজ জমিদার ছিল। তবে সংখ্যায় তারা ছিল নিতান্তই স্বল্প। ইংরেজের তাঁবেদারি করে বা বিভিন্ন উপায়ে বড় বড় আইরিশ জোতদার মনের সুখে অতি-দীর্ঘকাল হাজার হাজার একর জমি ভোগ করেছে, তাদের জমিতে সোনার ফসল উৎপন্ন করে ভূমিহীন কৃষক অনাহারে ছেলে-মেয়ে নিয়ে খাবি খেয়েছে। এবং অনন্যোপায় হয়ে বছরের পর বছর অসংখ্য আইরিশ কৃষক দেশান্তরে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে।

১৯১৯ সালের ২১শে জানুয়ারী সিন্‌ফিন্ পার্টি আয়র্লণ্ডের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। সেদিন প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের বিজয়ী ইংরেজ জয়োৎসবে মেতে উঠেছিল। এবং তার দম্ভেরও অবধি ছিল না। কিন্তু ক্ষুদ্র আয়র্লণ্ড তা দেখে ভয় পায় নি। সেদিন আয়র্লণ্ডের বহু নামকরা শীর্ষস্থানীয় নেতা ছিলেন ইংরেজের কারাগারে। ইংরেজের পত্র ও পত্রিকা হেসেছিল। কিন্তু সে-হাসি

ন্তম্ভ হতে খুব বেশি সময় লাগে নি। লেগেছিল মাত্র বছর তিনেক।

বিরাট নাগরিক সেবকবাহিনী (Irish Republican Army) গড়ে উঠেছিল স্বল্পতম সময়ে। সৈন্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল প্রায় দুই লক্ষ। রাজনৈতিক ও সামরিক কর্মের সীমা-পরিসীমা ছিল না সত্যিই, কিন্তু বিভিন্ন জাতীয় জীবনের সমস্যার প্রতি তিলার্ধও অবহেলা বা ঔদাসিন্য ছিল না। ইংরেজের আদালত ছিল, কিন্তু আইরিশ বেসরকারি পঞ্চায়েত গড়ে উঠেছিল দেশের সর্বত্র। এবং এই পঞ্চায়েতের সাহায্যেই আয়র্লণ্ডের ভূমি বণ্টন সমস্যার অনেকখানি সুরাহাও হয়েছিল।

জনৈক ফরাসী সাংবাদিক (সিলভাঁ ব্রায়ালাঁ) এ সময়ে আয়র্লণ্ডে ছিলেন। তাঁর লেখা থেকে উদ্ধৃতি দিলে বিষয়টির সত্যতাও যথার্থ পরিস্ফুট হবে: "ভূমি সমস্যাই আয়র্লণ্ডের বড় সমস্যা। কোনপ্রকার দুর্বলতা না দেখিয়ে এবং কেবলমাত্র ন্যায়বিচার দ্বারা এই সমস্যার সমাধান করতে হলে ইংরেজের আদালতের দিকে তাকিয়ে না থেকে পঞ্চায়েতি প্রথা শক্তিশালী করে তুলতে হবে, এ কথা নেতারা ভোলেন নি। এই জন্য পঞ্চায়েতি আদালতের গঠনশক্তি ও সুনামের দিকে গণতন্ত্রী সরকারকে বিশেষ মনোযোগ দিতে হল। রাজনৈতিক ও সামরিক তৎপরতার সঙ্গে সঙ্গে ভূমি সমস্যা খুব তাড়াতাড়ি ঐ[illegible] ধারণ করল এবং দেশের সর্বত্র রীতিমতো উত্তেজনার সৃষ্টি হল। খুনোখুনির অন্ত রইল না। স্থানে স্থানে খণ্ডযুদ্ধও ঘটল। আইরিশ কৃষকদের মনোভাব ছিল, যেমন করেই হোক জমিদার ও জোতদারদের বাড়তি জমি কেড়ে নিতে হবে। জমিদার ও জোতদার হাজার হাজার একর জমি নিয়ে পরম সুখে কাল কাটাবে, আর তাদেরই পাশে নিরন্ন কৃষকের একফালি জমিও থাকবে না, ওদের কাছে কাকুতি-মিনতি করেও মিলবে না এককণা মাটি,—এ-ব্যবস্থা চলবে না। চলতে দেওয়া হবে না। ওরা শত্রু। জাতি, ধর্ম ও দেশের পরম শত্রু। এদের প্রতি তাই কোন দয়া-মায়াও নেই। যেমন করে হোক এদের ধ্বংস করতেই হবে।

'গণতন্ত্রী সরকার পড়ে গেলেন দোটানায়। এদের প্রশ্রয় দিলে অরাজকতা অবশ্যম্ভাবী। আবার জোর-জুলুম করে এদের দমন করতে গেলে গণতন্ত্রী সরকারের প্রতি ওরা বিরূপ হয়ে উঠবে। জাতীয় সরকার ধীরে কিন্তু দৃঢ়তার সঙ্গে এগোতে লাগলেন।"

আয়র্লণ্ডে চার্চের প্রভাব ছিল অপরিসীম। আমাদের দেশের গুরু-পুরোহিতের মতোই এরা জনসাধারণের ওপর অপ্রতিহত প্রভাব অতি দীর্ঘদিন অক্ষুণ্ণ রেখেছিল। কিন্তু মস্ত পার্থক্য ছিল একটি বিষয়ে। মুক্তি-সংগ্রামে এদেশের গুরু-পুরোহিতের অবদান প্রায় শূন্যাঙ্কে। কিন্তু আইরিশ চার্চের প্রতিটি যাজক ছিল অন্ধ ইংরেজ বিদ্বেষী। এবং মুক্তি-সংগ্রামে তাদের সক্রিয় অংশ তাচ্ছিল্য করবার মতো নয়। এই আন্দোলনের হাত থেকে চার্চও অব্যাহতি পেল না। এই প্রসঙ্গে সাংবাদিক বলে চলেছেন: "একদিন ক্লন্‌ফার্ট্‌টের বিশপের নিকট তাঁর এক দল

কলগেট ব্যবহার করে মুখের দুর্গন্ধ দূর করুন ও সারাদিন দন্তক্ষয় রোধ করুন!

কারণ: একবার মাত্র কলগেট ডেণ্টাল ক্রীম দিয়ে দাঁত ব্রাশ করলেই দুর্গন্ধ ও ক্ষয়ের জন্য দায়ী বীজাণুর শতকরা ৮৫ ভাগ পর্যন্ত দূর হয়ে যাবে।

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে যে কলগেট প্রতি ১০ জনের মধ্যে ৭ জনের মুখের দুর্গন্ধ সঙ্গে সঙ্গেই দূর করে দেয় এবং কলগেট প্রক্রিয়ায় খাওয়ার ঠিক পরেই দাঁত ব্রাশ করলে বেশীর ভাগ লোকের দন্তক্ষয় রোধ করা যায়—আজ পর্যন্ত দন্ত-চিকিৎসার ইতিহাসে যেমনটি আর কখনো দেখা যায়নি! আর একমাত্র কলগেট'এর সেই প্রমাণ আছে।

কী সুন্দর এর পিপারমেণ্টের স্বাদ—তাই ছেলেমেয়েরা কলগেট ডেণ্টাল ক্রীম দিয়ে নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করতে ভালবাসে!

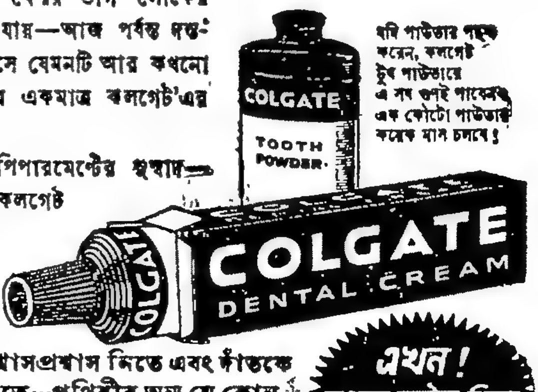

পরিচ্ছন্ন নির্মল শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে এবং দাঁতকে উজ্জ্বল সাদা করতে…পৃথিবীর অন্য যে কোন টুথপেস্টের চেয়ে কলগেট অনেক বেশী লোক কেনেন।

এখন! সুপার সাইজ কিনে …পয়সা বাঁচান!

ধশংবদ যজমান বিহিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন জানাল যে, তাঁর সম্পত্তির কিয়দংশ তারা কিনে নিতে চায়। বিশপ মশাই-এর নাড়ীজ্ঞান ছিল বিলক্ষণ, যজমানদের না ঘাঁটিয়ে প্রস্তাবে সম্মত হলেন।

"এই আন্দোলন সব চেয়ে ভীষণ আকার ধারণ করল দারিদ্র্য-পীড়িত পশ্চিমপ্রদেশে। অভাবের কশাঘাতে তাদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছিল। জমিদার ও কৃষক উভয় সম্প্রদায়ই প্রতিবেশীর জমির দিকে লোলুপদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকত। ফলে বিবাদ বিসংবাদও অনিবার্য হয়ে উঠল। জমির জন্য একে অন্যকে গুলী করে মারতেও পশ্চাদপদ হল না। জাতীয় সরকার (অর্থাৎ গণতন্ত্রী দল) প্রমাদ গণলেন। এবং একথা বুঝতে তাঁদের বিলম্ব হল না যে, এই বিরোধের সুমীমাংসা না হলে এমন এক সামাজিক বিপ্লবের সূত্রপাত হবে, যার ফলে জাতীয় আন্দোলন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যাবে। এরই ফলে তৎকালীন আয়র্লণ্ডের খ্যাতনামা নেতৃবৃন্দ সমবেত-ভাবে এক বিবৃতি প্রচার করলেন। ঐ বিবৃতিতে ছিল : 'যেদিন আমরা এই যুদ্ধে জয়লাভ করব, 'ডেইল' (জাতীয় পার্লামেণ্ট) নিশ্চয়ই সেদিন সুবিচার করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে; যাতে আর কাউকে দেশ ছেড়ে দুটি অন্নের জন্য বিদেশে যেতে না হয়। আপাতত যাদের মনে হবে যে, জোর করে বা জুলুম করে সম্পত্তি দখল করা হচ্ছে, তারা পশ্চিম ক্লেয়ারের আদালতে (অর্থাৎ ইংরেজের আদালতে) সুবিচারের জন্য নালিশ করুক।

"কিন্তু যে নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের দাবি করতে গিয়ে আজকের দিনে অযথা বিরোধ সৃষ্টি করতে চায়, গণতন্ত্রী সরকারের নাম নিয়ে যে নিজের দেশ-বাসীকে ভয় দেখিয়ে চিঠি দেবে, মনে থাকে যেন সে আজ জনসাধারণের প্রতিনিধিদের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণই করছে এবং জাতির মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের বিরুদ্ধে শত্রুতাও তার সুস্পষ্ট। (লক্ষ্য করবার বিষয়, গণতন্ত্রী দল উভয় পক্ষকেই সাবধান হতে বলেছেন।)

"এই সমস্যাসঙ্কুল পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে কিন্‌ফিন্‌ দলের নেতারা দ্বিধা করেন নি। দৃঢ়তার সংগে এবং জাতির প্রতি একান্ত মমতা নিয়ে তাঁরা এই দুঃসাধ্য কর্মে বিপুল সাফল্য অর্জন করেছেন। অবশ্য কেউ যেন এ-কথা না ভাবে যে, ইন্দ্রজালের প্রভাবে এ-বিরোধ রাতারাতি মিটে গেল; জমিদারেরা ঘুম থেকে উঠে দেখল তাদের গরু-বাছুর যেমন ছিল তেমনি আছে; আগের মতো লোপাট হয়ে যায় নি। জোর-জবরদস্তি একেবারেই যে ঘটত না, তা নয়; তবুও উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে বহু বিরোধের সুমীমাংসাও হয়েছে। ১৩ই মে তারিখের 'লণ্ডন মর্নিং পোস্ট' পড়লে বেশ বোঝা যায়, ক্যাবিক-অনু-শ্যাননের পঞ্চায়েত কেমন করে উভয়পক্ষের বক্তব্য শুনে শহর নিকটবর্তী চার খণ্ড বড় বড় জমির বিলিব্যবস্থা করে দিয়েছিল।"

ফরাসী সাংবাদিক এই সাফল্যের কারণ ও মনস্তত্ত্ব খুঁজতে অশেষ শ্রম স্বীকার করেছেন। এর জন্য বিপদ-সঙ্কুল ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে তাঁকে যেতে হয়েছে। বহু ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ও তথ্য নির্ধারণ করে অবশেষে তিনি লিখেছেন : "কোন্‌ বিশেষ কানুন ও পদ্ধতির ওপর নির্ভর করে বিচারকরা এই সব বিরোধ নিষ্পত্তি করতেন, আমি বহু চেষ্টা করেছি, কিন্তু খুঁজে পাই নি। আমার বোধ হয়, পঞ্চায়েত প্রচলিত আইন-কানুনের খুব বেশি ধার ধারতেন না; অপক্ষপাতিত্ব, সাধারণ বিচারবুদ্ধি এবং ব্যক্তিগত ন্যায় ও সততার ওপরেই তাঁরা বেশি নির্ভর করতেন। ...বিচারকগণ যথাসাধ্য সুবিচার করতে চেষ্টা করতেন। জনসাধারণেরও এ বিশ্বাস ছিল যে, তাদের মঙ্গলের জন্যই এই পঞ্চায়েতের সৃষ্টি হয়েছে।

"প্রতিটি মামলার নিষ্পত্তি হত তার দোষ-গুণ বিচার করে,—ব্যক্তিগত দখলি স্বত্ব বা দাবি অনুসারে নয়। যে-সব কাউণ্টির লোকসংখ্যা কম এবং জমির পরিমাণ খুব বেশি, সে-সব স্থানের জোতদারকে ১০০, ২০০ এমন কি ৩০০ একর জমিও ভোগ করতে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পশ্চিম প্রদেশে লোকসংখ্যার সংগে সংগে দারিদ্র্যও ছিল বহু ব্যাপক ও বিস্তৃত; তাই সেখানে ছোট একটুকরো জমিও সাত ভাগ করে দেওয়া হল। জমি ভাগ করবার সময় কার পরিবারে কত লোকসংখ্যা, কার কী পরিমাণ জমির দরকার, সবই বিবেচনা করা হত।...

"পঞ্চায়েত একজনের দখলি জমি অন্য আরেকজনকে দেওয়া সংগত মনে করলে, কোন সুদক্ষ জমি ব্যবসায়ীকে দিয়ে জমির যথার্থ মূল্য ঠিক করে নেওয়া হত এবং জমির পূর্ব মালিককে জমির দাম পরিশোধ করার পর জমি নতুন মালিক পেত।

"সব সময় কিন্তু সহজে এবং বিনা উত্তাপে এ-বিরোধ মিটত না। মাঝে মাঝে সরল গ্রামবাসীরা এমনভাবে জমি বেটে নেবার ব্যবস্থা করত যে, তা প্রায় রাহাজানির সমতুল। এ-সব দাবি মেটানো প্রায় অসাধ্য বলে মনে হত। একটা উদাহরণ দিই : মেয়ো কাউণ্টির কোন গ্রামের বাসিন্দাদের যুক্ত আবেদনের বিরুদ্ধে পঞ্চায়েত রায় দেয়। ফলে গ্রামবাসীরা ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং পঞ্চায়েতের মুখের ওপর তারা জানিয়ে যায় যে, ও-রায় তারা মানবে না। অবস্থা ক্রমেই সঙ্গীন হয়ে উঠল। একটা ভয়ানক দাঙ্গা-হাঙ্গামার আশঙ্কায় সবাই তটস্থ। নেতৃবৃন্দ বিচলিত হয়ে উঠলেন। নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষই কি তাহলে শেষ কথা? এক ভাই আর এক ভাই-এর বুকের রক্তপাত না করে ক্ষান্ত হবে না? কিন্তু;—এমনিভাবে চলে তাদেরই হাতে গড়া গণতন্ত্রী দল ও জাতীয় সরকার কি শত্রুর কাছে কলঙ্কিত ও হতমান হবে না? নাবালক শাসন-যন্ত্রকে এমনি করে উপেক্ষা করতে থাকলে পরিণতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে? শত্রু হাসবে না? দোলা লাগে অনেকের অন্তরে।

"শেষকালে এগিয়ে এল জাতীয় সরকার। ধীরে কিন্তু দৃঢ় ও নিশ্চিত পদক্ষেপে। একদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে সবাই যখন ক্লান্ত ও অবসাদগ্রস্ত, গণ-তন্ত্রী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গ্রামে ঢুকে পড়ল অলক্ষ্যে। আকস্মিক আক্রমণে বন্দী করে ফেলল বিদ্রোহী দলের দুজন নেতাকে। বিদ্রোহী নেতৃদ্বয় তিন মাসের জন্য গ্রাম থেকে নির্বাসিত হল। বিনা রক্তপাতে,— এবং খানিকটা হাসি-ঠাট্টার মধ্যেই সব কিছু মিটে গেল।"

আয়র্লণ্ড সেদিন কার্যত এবং আইনত ইংরেজের অধীনে। স্বাধীনতা তখনও আসে নি। একটা পরাধীন দেশ যে সাহস, প্রতিজ্ঞা ও সততা সম্বল করে একটা প্রায়-অসম্ভব ও জটিল সমস্যার সমাধান করতে পেরেছিল বহুলাংশে, আমাদের স্বাধীন দেশকে তা কতটা প্রেরণা দিতে পারবে, জানি নে। আদৌ কি পারবে? ভাববার কথা।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ আটাশ ॥

"কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও?

তারি রথ নিত্যই উধাও—"

চোখ বুজলে মনের ভিতরে কবি-কণ্ঠের আবৃত্তি চলেছে শুনতে পাই। নতুন কালের ঘণ্টা বাজছে মন্দিরে। মন্দির আর কোথায়? এই মানুজনের বসবাস এই সুন্দর পৃথিবী—এই তো মন্দির। ডুয়ার্সের পথে-পথে পুরনোকালের বুক মাড়িয়ে ছুটেছে নতুন কালের রথ। উদ্দাম উধাও। লোকালয়। মানুষজনের বসতি। ঘর-বাড়ি, বাজার-বন্দর। দ্রুত ধাবমান গাড়ি-ঘোড়া। ভাঙছে পুরনোকে। উচ্ছন্ন করছে জঙ্গল-জঞ্জাল। কাল যেখানে ছিল অরণ্য, সেখানে মাথা তুলে উঠছে মস্ত-মস্ত বাড়ি। সিনেমাহলের সামনে আলোয় আলোময় ব্যস্ত-চঞ্চল মানুষেরা।

যেন ভোজবাজি। যেন এক যাদুকরের হাতে পাঁচ আঙুলের খেলা।

ভুটিয়াদের কথা বলছিলাম। ভুটানের ভুটিয়া নয়, ডুয়ার্সের ভুটিয়া।

আজ অনেক ছড়িয়ে পড়েছে ওরা।

একশ' বছর আগে কিন্তু ভুটিয়া বলতে যা-কিছু ছিল সব ওই পাহাড়ের ওপর। বক্সা ফোর্টের কাছাকাছি। বক্সার কথা বলব আরেকদিন। আজ ভুটিয়াদের কথা বলছি। ভুটিয়াবস্তি ছিল ওই-খানে। ওই চুনাভাটিতে। বক্সা থেকে প্রায় মাইল দুই দূরবর্তী অঞ্চলে। ডুয়ার্সের ভুটিয়া বলতে ওরাই। ইংরাজ-আমলের সরকারী দলিলগুলিতে এখানে-ওখানে ওদের সম্পর্কে এটা-ওটা নানা কথার উল্লেখ দেখা যায়।

ভুটানীরা সব বেঁটে খাটো ধরণের মানুষ। লম্বা চেহারার লোক তাদের বেশি নেই বললেই চলে। দেখতে-শুনতে বেশ মোটাসোটা সুস্থ-সমর্থ চেহারা। মোঙ্গলিয়ান ধাঁচের মুখ। অনেকটাই চ্যাপ্টা ধরণের। খুদে-খুদে বাঁকা চোখ। চওড়া চোয়াল, মুখের হাঁ বড়। গায়ের রঙ অনেকটা ফিকে জলপাইরঙের। কালো চামড়ার ভুটিয়াও আছে ডুয়ার্সে।

ডুয়ার্সে ইংরাজ অধিকারের অনেক আগে থেকেই এই বক্সা অঞ্চলে ভুটিয়া সুবা ছিল একটি। তাদের প্রভাবও বেশ ছিল। কিন্তু চিরকাল সেখানে থাকে নি। তাদের অপরিণত ও নোংরা জীবনযাত্রার ফলে পাছে সেখানে কলেরা দেখা দেয়, এবং সৈন্যবাহিনীতেও তা ছড়িয়ে পড়ে, এই ভয়ে পরে তাদের বক্সার পশ্চিম দিকে মাইল দুয়েক দূরে চুনভাটিতে স্থানান্তরিত করা হয়। বাংলা সরকারের নির্দেশক্রমে এই কার্য সম্পন্ন করা হয়, এবং যতদূর জানা যায় ভুটিয়ারা এ-জন্যে ন্যায়সঙ্গত ক্ষতিপূরণও পেয়েছিল। কিন্তু সে একশ' বছর আগেকার কথা। পরে এই বক্সা অঞ্চল থেকেই ভুটিয়ারা ডুয়ার্সের নানা দিকে ছড়িয়ে পড়তে সুরু করে।

মোটামুটিভাবে অতীত জানা গেল এই পর্যন্ত। ডুয়ার্সের ভুটিয়াদের বর্তমান জীবনযাত্রার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা যাক এইবারে। ভুটিয়া-দের খাদ্যের মধ্যে প্রধান হচ্ছে ভাত। শুকরের মাংস, চমরীগরুর মাংস, খচ্চরের মাংস, হাঁসের মাংস, মুরগী, হরিণ প্রভৃতির মাংস তাদের খুবই প্রিয় খাদ্য। কাঁচা বা শুকনো মাছ, মাখন, চীজ বা পনির, যবজাত খাদ্য এবং সবরকমের তরকারিই তারা খেয়ে থাকে। ফলের মধ্যে কমলালেবু, আনা-রস, কাঁঠাল, কলা প্রভৃতির নাম করা যায়। দুধ কমই খায়, এমন কি অসুস্থ অবস্থাতেও দুধ বেশি খায় না। বরং তা থেকে মাখন, পনির প্রভৃতি তৈরি করার দিকেই আগ্রহ। মোষের পরিবর্তে গরুর দুধই বেশি ব্যবহার করা হয়। মাঝে মাঝে ছাগল চরায় বটে, কিন্তু ছাগলের দুধ কখনো খায় না। শুকনো মাছ, শুকনো শুকর বা গরুর মাংসের চাহিদাই বেশি। গরুর মাংস কেটে শুকিয়ে রাখে বেশির ভাগ ভুটিয়ারা। হাড়গুলো ভেঙে তা থেকে মজ্জা বের করে নেয়, নানাজাতীয় তরকারির সাথে ভোজনের রীতি আছে। মাঝে মাঝে শুকরের রক্ত পান করতেও দেখা যায়। মাংসের সাথে মিশিয়ে মাখিয়েও নেওয়া হয়। ভুটিয়া রীতি অনুসারে বছরের চতুর্থ মাসে ভুটিয়ারা, বিশেষত লামা শ্রেণীর ভুটিয়ারা কোনো পশুর বা জীবজন্তুর প্রাণ-হনন করা থেকে বিরত থাকে। তখন মাংস বা প্রাণীজাত কোনো খাদ্যও ভক্ষণ করে না, কারণ ওই মাসে বুদ্ধদেবের জন্মসূচনা হয়েছিল। অবশ্য এটা সকলের পক্ষে আচরণযোগ্য সাধারণ রীতি নয়। সাধারণত শিশুদের খাদ্য হিসেবে প্রাণীর জিভ বা মস্তিষ্ক খেতে দেওয়া হয় না। ভুটিয়াদের সমাজে সন্তানবতী রমণীদের খাদ্য হিসেবে কোনো প্রাণীর বা জীবজন্তুর হৃৎপিণ্ড খেতে দেওয়া হয় না। ডিম্বভক্ষণ শিশুদের পক্ষে নিষিদ্ধ। কারণ ভুটিয়ারা মনে করে ডিম খেলে শিশুরা সোজা হয়ে দাঁড়াতে বা স্থির সোজাসুজিভাবে হাঁটতে পারবে না। ছাগল-ভেড়ার মাংস খাদ্য হিসেবে খুবই কম ব্যবহৃত হয়। মূর্ছা, মৃগী বা সন্ন্যাস রোগাক্রান্তদের পরিবারে এদের মাংস একেবারেই নিষিদ্ধ। এই মাংস থেকেই ও-জাতীয় রোগের সৃষ্টি হয় বলে তাদের ধারণা। দরিদ্র পরিবারগুলিতে সাধারণ ভুটিয়ারা বুনো চুপড়ি আলু, তাদের ভাষায় বলে আপ্-সু এবং ফার্নজাতীয় গাছের শিকড় (ভুটানী ভাষায় প-কো) খাদ্যের প্রয়োজনে সংগ্রহ করে। পান-সুপারী খাওয়ার রীতি আছে বালক-বৃদ্ধ সকলেরই মধ্যে। চুন সংগ্রহের কৌটোকে বলে টিমি। দিশি মদের সঙ্গে মেশানো হয় শুকনো তামাক। এ বস্তুটিও পানের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়। সাধারণত তৈলজাতীয় উপাদান হিসাবে মাখন ব্যবহৃত হয় তাদের সংসারে। সর্ষের তেল ব্যবহার করে নিতান্ত গরিবেরা।

খাদ্য তৈরি করার তামার পাত্রকে তাদের ভাষায় বলা হয় সানুচুন. লোহার

পাত্রকে বলে সাঙ্গা, সাধারণত ব্যবহারের পর এগুলিকে পরিষ্কার করার রীতি নেই। হাতা-চামচে জাতীয় জিনিষগুলিকে তাদের ভাষায় বলে **জারু**। উনুন বা চুল্লীকে বলে **থুপ্**, প্রথমে পাথর দিয়ে বানিয়ে তাতে মাটি লাগানো হয়। সাঁড়াশীকে ওদের ভাষায় বলে **কাম্পু**। দিনের বেলায় বার বার চা খাবার রীতি আছে এদের। কাঠের একজাতীয় পাত্রে চা পরিবেশন করা হয়। এই পাত্রগুলিকে তাদের ভাষায় বলে **ফপ্**। অনুসন্ধানে দেখা গেছে **চাকা** নামে একটি মাটির পাত্রে ভুটিয়ারা চা-পাতা, ঠাণ্ডা জল ও খানিকটা সোডা মেশায় প্রথমে। তারপর তাকে আগুনের আঁচে ফোটানো হয়। খানিকটা মাখন এবং একটু লবণও তাতে দেওয়া হয়। প্রায় পনেরো মিনিট ধরে জ্বাল দেবার পর জিনিষটা বাদামী রঙে দাঁড়ায় এবং **চাসু** নামে একটি বাঁশের নলে সেই তরল বাদামী বর্ণের পদার্থটুকু ঢেলে নিয়ে মন্থন করা হয়। **চাসু** থেকে তারপর তা ঢালা হয় **চাম্বি** নামে একটি মাটির পাত্রে। পাত্রটির মুখে থাকে একটি ছাঁকনি, ভুটানী ভাষায় যাকে বলে **চাকচাক্**। এইভাবে তৈরি হয় চা। চা-পানের আরো একটি রীতি আছে এদের মধ্যে। চা-র সঙ্গে সব সময়ই থাকে কিছু না কিছু খাদ্য। তা সেদ্ধ ভাতও হতে পারে। গুলি পাকিয়ে সেগুলি দেওয়া হয় কোনো পাত্রে। ভাজা গম বা চালও ব্যবহার করা হয়। ভাজা গমকে তাদের ভাষায় বলে **না-ফি** অথবা **না-চম্**।

ভাত থেকে তৈরি করা হয় বিয়ার-জাতীয় মদ। যাকে বলে বিয়াচং, এবং নানাজাতীয় উৎসব ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানেই এদের ব্যবহার হয় বেশি। ছেলে-বুড়ো, যুবক-যুবতী এমন কি শিশুরাও মদ খেতে অভ্যস্ত। সরকারী তত্ত্বাবধানের মদ তো আছেই, ঘরেও মদ বানানো হয়। সারাদিনের কঠোর পরিশ্রমের পর এই মদ পান করে তারা সজীব ও সতেজ হয়ে ওঠে। সমস্তপ্রকার উৎসবে প্রধান পানীয় চা। সকালের চা-পান পর্বের পর দুপুরে ও রাতে দু'বার ভাত খায় ওরা। অল্প পরিমাণে ভাত খায়। ভাত খাওয়ার পাত্রকে বলে পাচন, ঝোল খাবার কাঠের পাত্র ফপ্। সাধারণত নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে একসঙ্গে এক-পাত্রে ভাত খাবার রীতি দেখা যায়। উৎসবের দিনে সাধারণত চার রকমের খাবার পরিবেশন করা হয়ে থাকে—(ক) চা, তার সঙ্গে থাকে ভাজা অথবা সেদ্ধ চাল কিংবা ভাজা গম, যাকে বলে নাফি। (খ) ভাত থেকে তৈরি করা বিয়ারজাতীয় মদের সঙ্গে কাঁচা শাক, শসা বা মূলোজাতীয় তরকারি। (গ) সেদ্ধ ভাতের সঙ্গে অল্প-সেদ্ধ মাংসের আয়োজন, (ঘ) পান ও সুপারী।

ভুটিয়া মেয়েদের পরনে থাকে লম্বা ক্লোকজাতীয় একরকমের পোষাক, ঢিলে হাতার আস্তিন থাকে তাতে। ভুটিয়া ভাষায় বলে **কিরা** বা খোকি। **কেরা** নামে একজাতীয় কটিবন্ধও ব্যবহার করে তারা। পুরুষদের পোষাককে বলে কো; এগুলি পশমি, সুতি কিম্বা এণ্ডি জাতীয় সিল্ক দিয়েও তৈরি হতে পারে। ঢিলেঢালা এই পোষাকগুলি নামে হাঁটু পর্যন্ত। কোমরে থাকে তাদেরও কেরা নামে কটিবন্ধ। কোট জাতীয় জামাগুলির সামনের দিকের প্রায় সবটাই পকেট হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এতে থাকে অনেক জিনিস। খাদ্যদ্রব্য, পান-সুপারী, এবং এমনিতর নানা বস্তু। সুপারী কাটবার ছুরিও থাকে তাতে। **ফটকেরা** নামে একরকম পাগড়ীও ব্যবহার করে এরা।

অলংকারের মধ্যে ভুটিয়া মেয়েরা ব্যবহার করে পলা বা প্রবালের কণ্ঠহার। অনেক সময় ঈষৎ নীলিমাযুক্ত একজাতীয় হরিদ্রাবর্ণ খনিজ পদার্থও এতে ব্যবহার করা হয়। এই কণ্ঠহারকে বলে জিসে। কখনো রুপোর সঙ্গে অন্য জাতীয় খনিজ পদার্থ মিশিয়ে তৈরি করা হয় কর্ণাভরণ, তাদের বলে সোকং। ব্রেসলেট জাতীয় অলংকারকে বলে ডোকচুং। পুরুষরা ব্যবহার করে সদা-সর্বদা পেটাং নামে তরবারি। তীক্ষ্ণধার ছুরিকে বলে চেপ্সি। তরবারি রাখা যাদের পক্ষে সম্ভব হয় না, তারা ছোরা রাখতে ভোলে না কখনো। সুপারী কাটার ছুরিকে বলে কাপ্তা।

এই প্রসঙ্গে ভুটিয়াদের বিবাহরীতির কথা মনে আসে। ডুয়ার্সের ভুটিয়াদের মধ্যে বিবাহের কোনো অনুষ্ঠান নেই। কোন পুরুষের যদি কাউকে ভালো লাগে বা পছন্দ হয়, তবে তার কাছে পাঠিয়ে দেয় তার বার্তাবাহককে। এই বার্তাবহকে তাদের ভাষায় বলে **পাহাম**। সে জেনে আসে ওই তরুণী তার সঙ্গে বসবাস করতে ইচ্ছুক কি না। সাধারণত সে আপত্তি করে না এবং পুরুষটির স্ত্রীরূপে তার সঙ্গে বসবাস করতে থাকে। যদি স্ত্রীলোকটি এজন্যে সেই পুরুষের কাছে ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা দাবি করে, তাহলে পুরুষ হাসিমুখে তা লিখে দিতে ইতস্তত করে না। সাধারণত লামারা এগুলি লেখেন এবং দু-একজন সাক্ষী থাকেন। স্বামী এবং স্ত্রী দুজনেই কঠোর পরিশ্রমে জীবিকানির্বাহ করেন। বহুবিবাহ প্রথা আছে ভুটিয়াদের মধ্যে। তারা ইচ্ছে করলে একাধিক স্ত্রী বিবাহ করতে পারে। প্রথম স্ত্রীকে এরূপ ক্ষেত্র সকলের ওপরের মর্যাদা দেওয়া হয়। পরবর্তী স্ত্রীদের সে কাজকর্মের আদেশ-নির্দেশ দেবার অধিকারী। সমস্ত স্ত্রীরাই এক সাথে মিলিত হয়ে বাস করে। এক নারী কর্তৃক একই সময়ে বহুপুরুষকে স্বামীত্বে গ্রহণের প্রথা তিব্বতে যেমন আছে, তেমনি ভুটানেও আছে। স্বামীর যদি অনেক ভাই থাকে, তাহলে সেই স্বামীর অনুপস্থিতে ভাইদেরও সে স্ত্রী বলে গণ্য হয়ে থাকে এবং তাদের সঙ্গে সহবাসে রত হয়। নারীর স্বাধীনতা এই সমাজে বিশেষভাবে স্বীকৃত। এবং সেই স্বাধীনতা কোনোক্রমেই ক্ষুণ্ণ করার কারণ দেখা যায় না। অন্যায়কারিণী অথবা ব্যভিচারিণী স্ত্রীকে তার মা-বাবার কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়। তবে সাধারণত অবিশ্বস্তা রমণী এই সমাজে কচিৎ দেখা যায়।

ধর্মের দিক থেকে ডুয়ার্সের ভুটিয়ারাও মূল ভুটানের অনুবর্তী। এরা বৌদ্ধ। ওম-মণিপদ্মে হোম এদের উচ্চারণ করতে শোনা যায়। তাদের একটি ছোট মন্দির আছে চুনাভাটিতে। লামারা সেখানে উপাসনা করে। ভুটিয়াদের মধ্যে সম্মাননা ও প্রণামের রীতিও আছে দেখতে পাওয়া যায়। পদমর্যাদা অনুসারে এর মধ্যে ভিন্নতা দেখা যায়। সাধারণ স্তরের সরকারী কর্মচারীদের এরা মাথা নত করে অভিবাদন জানায়। নিজের সমান ও সমবয়স্কদের এক বিশেষ ভঙ্গিতে অভিবাদন করে যেন করমর্দন করতে যাচ্ছে, কিন্তু করমর্দনের পরিবর্তে উক্ত ব্যক্তির সামনে দুটি হাত তোলে মাত্র এবং পরস্পরের স্বাস্থ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে। অনেকদিন পরে নিকট বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে দেখা হলে পরস্পরকে গভীরভাবে আলিঙ্গন করে এবং আতিথ্য ব্যাপারেও খুব উদারতা দেখায়। পুরুষ ও রমণীর মধ্যে দেখাশোনা হলে দেখাই পুরুষ মানুষকেই প্রথম প্রশ্ন করতে হয়। নারী তার উত্তর দেয়। পুরুষের ভূমিকা ন্যায়নিষ্ঠ অভিভাবক অথবা ভ্রাতার মত

সাপ্তাহিক বসুমতীর চাঁদার হার

সাপ্তাহিক বসুমতীর বাৎসরিক চাঁদা সডাক ১৮ টাকা, ষাণ্মাসিক ৯ টাকা ও ত্রৈমাসিক ৪·৫০ টাকা। প্রতি সংখ্যা ৩০ পঃ।

তিন মাসের কমে গ্রাহক করা হয় না। গ্রাহক হতে হলে আপিসে অগ্রিম টাকা জমা দিতে কিংবা মনি অর্ডারে টাকা পাঠাতে হবে।

—কর্মাধ্যক্ষ, বসুমতী

হয়ে থাকে। সাধারণত নারীর পোষাক-পরিচ্ছদ অথবা তার ব্যবহৃত কোনো জিনিসের খুব প্রশংসা করা হয়। অনেক সময় তার মুখ কিংবা হাতের সৌন্দর্যেরও প্রশংসা করা হয়। বয়স্কা রমণী তাঁর চাইতে বয়সে ছোটকে সাধারণত চা-পানে আহ্বান জানায় অথবা মধ্যাহ্নভোজনে। আলাপ-পরিচয়কালে পান-সুপারী বিনিময় হয়ে থাকে। পরিচয় থেকে বন্ধুত্বের সূত্রপাত হয়। বিদায়কালে আবার দেখা হবার বাসনা জানান হয়। নারীর জন্য পুরুষটি উপহারও নিয়ে আসে। দেখা যাচ্ছে সমস্ত সভ্যজগতের মতই নারী এদের সমাজেও ভালোবাসা, আদর ও শ্রদ্ধার পাত্রী।

ভুটিয়ারা ন্যায়কে বলে ছুপ, অন্যায়কে বলে মা-ছুপ, ধার্মিককে বলে ছ-লা-কাও, পাপীকে বলে ডিচেন। ভালোকে তাদের ভাষায় বলা হয় নি-থাং-পু, মন্দকে বলে মি-সব। লামারা সকলকে ভালো-মন্দ সম্পর্কে উপদেশ ও শিক্ষা দেন। কিন্তু শিশুরা পিতামাতার কাছ থেকে এরকম কোন শিক্ষা পায় না। ভুটিয়ারা সাহসী, সরল, সত্যবাদী, অনেক সময় দুঃসাহসী এবং স্পষ্টবক্তাও। বিপদে স্থির এই মানুষগুলি সৎ ও উদার। ভ্রমণকারীদের প্রতি সদাশয়। যারা ভ্রমণকারীদের প্রতি ভালো ব্যবহার করে না, তাদের এরা কচ্ছপ এবং শামুক জাতীয় প্রাণীদের সঙ্গে তুলনা করে থাকে এবং মনেপ্রাণে ঘৃণা করে। মেয়েদের বক্ষ অনাবৃত রাখা এদের কাছে রুচিবিকৃতি ওঅশোভন বলে গণ্য। অসংযত কথাবার্তা অনেক সময় নিজেদের মধ্যে হলে বটে, কিন্তু বাচ্চাদের সামনে কখনো তা করা হয় না।

ভুটিয়াদের প্রিয় খেলাগুলির মধ্যে ধনুচালনা বিদ্যা একটি। এই ধনুর্বাণ-চর্চাকে তাদের ভাষায় বলে ডাট্‌চা। ডুয়েকো বলে পাথর-ছোড়া খেলাকে। আমাদের লংজাম্পের মত তাদেরও আছে। তাদের ভাষায় এজাতীয় খেলাকে বলে শাং চং। আঙুলে গোণে ভুটিয়ারা। সব-চেয়ে ছোট আঙুল থেকে গুণতি শুরু করে। একজাতীয় জপমালা আছে, তাই দিয়েও গোণে কেউ কেউ। পাথরে টুকরো দিয়েও গোণে অনেকে। এক থেকে একশ' পর্যন্ত গুণতে পারে ওরা। একশ'র পরে আবার এক থেকে শুরু করতে হয়।

ডুয়ার্সের সাধারণ ভুটিয়াদের দেখা যায় ব্যবসা করে জীবিকানির্বাহ করতে। তাদের মূলধন তেমন বেশি নয়, অনেক টাকার জিনিসপত্রও সওদা করে না। বনে-জঙ্গলে ঘুরে ঘুরে নানা জিনিস সংগ্রহ করে। নানা রকমারী উদ্ভিদ, গাছের শেকড়, পাথর যেমন থাকে, পাখি বা জীবজন্তুর বাচ্চাও তেমনি বিক্রি করতে আসে। মুল ভুটানে চলে গিয়ে সেখান থেকে সমতলের ব্যবসায়ীদের জন্য আলু বা কমলালেবুর বোঝা নিয়ে নিচে নেমে আসে কঠোর পরিশ্রমে। মাঝে মাঝে ধনী নেপালীদের অধীনে কাজ করে। তাদের গরু ছাগল দেখে। মাখন নিয়ে নামে বাজারে। হ্যামিল্টনের বাজারে, গায়ের-কাটায়, নাগ্রাকাটায়, বানারহাটে, রাঙামাটির হাটে এই সব ভুটিয়াদের অনেক দেখেছি। দলসিংপাড়া বাজারে একবার এমনি একটি ভুটিয়ার সাথে আলাপ হয়েছিল। সে টিয়ে-ময়না ইত্যাদি পাখি ধরার ব্যবসা করে এবং ঘুরে ঘুরে বিক্রি করে। নানা রকমারী শাকশব্জী উৎপাদন ও বিক্রি করাও তাদের ব্যবসা।

সময়কে ভুটিয়া ভাষায় বলা হয় চুচু। দিনকে ছ'টি ভাগে ভাগ করা হয়। সূর্যোদয় থেকে ভোর ছটা পর্যন্ত সময়কে বলে টৌলে। সকাল ৬টার পর থেকে ১০টা পর্যন্ত সময়কে বলে নিনচু, দশটার পর থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত সময়কে বলা হয় নিনচে। বেলা বারোটার পর থেকে সন্ধ্যা ছটা সময়কে নিনচে এনো। সন্ধ্যা ছটা থেকে সাতটা পর্যন্ত নামসো, এবং তারপর থেকে সূর্যোদয়ের আগের মুহূর্ত-পর্যন্ত সময়কে বলে ফিরু।

সকালের চা খাওয়া হয় টৌলের মধ্যে, ব্রেকফাস্ট নিনচে-য়। এবং ডিনার-এর সময় নামসো। তারপর ভুটিয়ারা ঘুমাতে যায়। বছরকে ভাগ করা হয় বারোটি ভাগে। প্রতিমাসে ত্রিশ দিন। মাসগুলিকে যথা-ক্রমে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। আমাদের মতই তাদেরো সপ্তাহ সাতদিনে। রবিবারকে তাদের ভাষায় বলা হয় জার্নিহম, সোম-বার জা-দাও, মঙ্গলবার জা-মিকমা, বুধ-বার জাহলাকবা, বৃহস্পতিবার জা-পুর্বা, শুক্রবার জা-পানুং এবং শনিবারকে বলা হয় জা-পিম্পা।

একটি ভুটিয়া ছেলেকে দেখলাম দমন-পুর স্টেশনের ধারে।

বেলা যায় যায়। আসন্ন সূর্যাস্তের ছটা চারদিকে। সরকারী সংরক্ষিত বনা-ঞ্চল পিছনে। ছেলেটি পীচের রাস্তার ধারে একটি কাষ্ঠখণ্ডের ওপরে বসেছিল। শুকনো মুখ। তার চুল বড়ো হয়ে গেছে। ঘাড়ের ওপরে ও কপালে একরাশ চুল পড়ে আছে। খালি গা। কত গাড়ি যাচ্ছে। কত মানুষজন। তার ভ্রূক্ষেপ নেই কোনদিকে। অদূরে সেগুনবনের ধারে বয়ে চলেছে পদ্মাই।

ছেলেটিকে ফেরাতেই পারলাম না আমার দিকে। গাড়ির কাচের জানালা বন্ধ। খুলতে খুলতে ছেড়ে গেল গাড়ি।

পাশের ভদ্রলোক বললেন, কোন চেনা লোক বুঝি?

আজ্ঞে না। একটি ভুটিয়া ছেলে।

ভদ্রলোক অবাক। চেনেন নাকি?

ঘাড় নাড়লাম। না—চিনি না। বল-লাম তাঁকে। এই প্রচণ্ড শীতে দেখলেন মশাই কাণ্ড। খালি গায় বসে আছে।

ওদের অভ্যেস আছে, বলে ভদ্রলোক আর বিনা বাক্যব্যয়ে চুপ করলেন।

আমিও মনকে বোঝালাম। ঠিক তাই। কে না জানে অভ্যাসই দ্বিতীয় প্রকৃতি। হয়ত সহ্য হয়ে গেছে ওর। এই দুরন্ত শীত সভ্যবাবুদের যতটা কাহিল করে, ওদের ততটা করে না।

ভদ্রলোক বললেন, আবার যুগের ধর্ম বুঝে গিয়ে বড়লোক হয়ে গেছে এমন ভুটিয়াকেও দেখতে পাবেন ডুয়ার্সে। হ্যামিল্টন গিয়ে দেখে আসুন। হোটেল চালাচ্ছে মশাই। হোটেলের বাইরের চেহারা যাই হোক, ভিতরে আছে মদের ঢালাও কারবার। নেপালী মেয়েরাও আছে হোটেলে। মেয়ে না হলে হোটেল চালাবে কারা? রান্নাবান্না দেখাশোনা—মেয়েরা না হলে কে আগলাবে বলুন তো? তামাম দুনিয়ার এই হালের কায়দাটাও তাদের নখদর্পণে।

ভদ্রলোক হেসে উঠলেন হো-হো করে। বাস ভর্তি লোক তাকাচ্ছে আমাদের দিকে। ভাগ্যিস কেউই আমাদের কথা খেয়াল করে নি। মনে মনে ভাবি, সেকালের রাজাদের বিলাস ছিল সুরা ও নর্তকী। মাঝে মাঝে একঘেয়েমি ভাঙাতে দু-একটা রাজ্যজয়, নিদেনপক্ষে ছোটোখাটো যুদ্ধ। তারপর আবার বিশ্রম্ভাগার। সেকালের রাজারা নেই। তাদের স্থান অধিকার করেছেন শ্রেষ্ঠীরা। শ্রেষ্ঠ যে তাঁরাই এ-যুগে। ফাটকার বাজারে তুড়ি দিয়ে রাজ্যজয় কর-ছেন। কিন্তু বিলাস নেই তাঁদের স্বভাবে। সেকালের রাজাদের যুগ হয়েছে অন্ত-র্হিত। নিজে সুরা পান করেন না, একালে অন্যের বিলাসের জন্য সুরা দান করাই রীতি। আর নর্তকী? তাঁরা বিলকুল বেপাত্তা। নিজেরা না নেচে অন্যদের নাচানোই যে তাদের রীতি। সঙ্গে তানপুরা-সঙ্গত অর্থের ঝনৎকার।

অতএব চলে যদি চলুক। ঢালাও কারবার রাত্রিদিন। চোখ বুজে গাড়ির সীটে পিঠ দিলাম। [ক্রমশ]

কিস্তিতে ট্রানজিস্টার
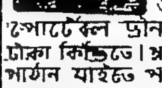
BAZA
৩ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড
পোর্টেবল ট্রানজিস্টর মাসিক ৫ টাকা কিস্তিতে। প্রত্যেক গ্রাম ও শহরে পাঠান যাইতে পারে।
HIND AGENCIES (57) KOLHAPUR ROAD, DELHI-7

[পূর্বানুবৃত্তি]

চরের মানুষ চরের দিকে চলে গেল। বিমল আর তার বন্ধুদের নিয়ে সানো চৌধুরী ও ডাক্তার এগোলো সড়ক রাস্তা ধরে।

কিছুটা যেতে-না-যেতে সানো চৌধুরী বলে উঠল, "ডাক্তার, সড়ক ছেড়ে আমাদের গাঁউলি রাস্তায় যাওয়া উচিত। বিমলের নামে ওয়ারেন্ট—তার ওপর আজ আবার একদফা ঘাঁটাঘাঁটি হয়ে গেছে।"

ডাক্তার অন্য মনে পথ হাঁটছিল। নানা কথায়—নানা কারণে মন বিক্ষিপ্ত। সানো চৌধুরীর কথায় সচকিত হয়ে বললে, "ঠিক বলেছ। আমার একেবারে মনেই ছিল না।"

সামনে বাঁয়ে গ্রামমুখো ভেড়ি বাঁধ—এঁকে বেঁকে চলে গেছে ধানী আবাদের মধ্যে দিয়ে। সড়ক ছেড়ে ওরা সেই রাস্তা ধরলে। কিন্তু ওরা সড়ক ছাড়লেও এক জোড়া চোখ ওদের সঙ্গ ছাড়ল না। সড়কের ধারে কোনো এক গাছতলার অন্ধকার থেকে তার তীক্ষ্ম দৃষ্টি ওদের পেছনে লেগে রইল মাছির মত। মাথায় তার বাবরী চুল, কান চেপে গালপাট্টা জুলপি। লম্বায় সাড়ে ছ' ফুট।

জগৎ ডাক্তার খুঁত্‌খুঁত্‌ করে বললে, "এখন মনে হচ্ছে—বিমলকে আজ না নিলেই ভাল হত।"

সানো চৌধুরী বললে, "কিন্তু ও তো নিজেই এসে পড়েছে এ এলাকায়। শুধু এখন তোমার বাড়ি হয়ে একটু ঘুরে যাওয়া—এই যা।"

বিমল বলল, "গোলমালের কোনো ব্যাপার আমি জানতুম না—পবিত্র ওসব আমাকে কিছুই বলে নি।"

সানো চৌধুরী বললে, "ব্যাপারটা যে পবিত্রও জানে না। আমাদের বড় শরিক থানায় রিপোর্ট করেছে। একজন এস· আই· সেপাই নিয়ে ডাক্তারখানায় ওদের খোঁজ করতে এসেছিল।"

দ্বিধায় সংকোচে ডাক্তারের গতি মন্থর হয়ে এসেছিল—প্রায় থেমে যাওয়ার মতো। বিমল বললে, "চলুন—আমি কাকীমার সঙ্গে একটু দেখা করেই চলে যাব। আর যদি থানার প্রভুরা এসেই পড়ে—তখন দেখা যাবে।"—

বিমল হাসল।

সে হাসিমুখের দিকে জগৎ ডাক্তার কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। বোধ করি খুঁজতে লাগল ওইরকম তরুণ আর একটা মুখের সাদৃশ্য—সেই নির্ভীক, নিরুদ্বিগ্ন প্রদীপ্ত মুখের রেখাগুলো। আছে। ওদের মত পথ আলাদা। তবু সাদৃশ্য আছে। হাসি মনের আয়না। সে আয়নায় ডাক্তারের প্রবীণ অভ্যস্ত চোখ মুখ দুটোকে যেন পাশাপাশি দেখতে পেল।...আদালতের রায় বেরুল—দু'জনের ফাঁসি, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বাকি ছ'জনের দ্বীপান্তর। রায় শুনে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়ানো সেই তরুণ মুখগুলোর এতটুকু ভাবান্তর লক্ষ্য করে নি জগৎ ডাক্তার। শেষ দেখা করতে গিয়েছিল জেলে।

খোকা মা জিজ্ঞেস করেছিল, "কখন নেবে?"

..."সে কী জানাবে!" নিবারণ হেসে বলেছিল, "তুমি যদি—তোমরা মায়েরা যদি ওদের সেই ভুতুড়ে কালো গাড়িটা থেকে আমাদের ছিনিয়ে নাও।"

..."ওরে—তাই যদি পারতাম!" খোকা মা কেঁদেছিল।

..."কেঁদো না মা। সেই সাগর পারের দ্বীপে গিয়ে আমার মন খারাপ করবে। কিচ্ছু ভয় করো না—আমার সব বন্ধুরা রইল সঙ্গে। সেখানে আরও কত বন্ধু আছে।"

বন্ধু...বন্ধু...বন্ধু! ফল পরিণত হলে সে আর গাছে কিছুতেই ঝুলে থাকে না। চলে তার নতুন মাটির সন্ধান—নিজের মতো করে ফুটে ওঠা। শুধু দেহবিচ্যুতি নয়—বোধ করি মনের ডাঁটাও ছিঁড়ে যায়। তারপর একটা গাছ যেমন করে আর একটা গাছের দিকে চেয়ে থাকে—বেড়ে ওঠে, এ যেন তেমনি।

......বাপের থমথমে মুখের দিকে তাকিয়ে প্রশান্ত গলায় বলেছিল, "ডাক্তার হওয়া হলো না—নিশ্চয় তুমি খুব রাগ করছ।" বাপের কাছে এই তার অনুশোচনা—না বিদ্রূপ!

"তোর কি তাই মনে হচ্ছে?"

"বিজ্ঞান পড়তে পাঠিয়েছিলে।"

"ঠিক। ভুল করি নি। তোর কেমিস্ট্রি লেবরেটরীটা অন্য কাজে লাগিয়েছিস।"

একদিন সে প্রাণের সন্ধান করত না! সেই ছোটবেলায়। ফড়িং আরশুলা

ঢেকাঢাক ব্যাঙ—বাপের ছুরি চিমটে চুরি করে চিরে চিরে দেখত—ওগুলো বাঁচে কোথায়? কে জানে—হয়ত নিবারণ একটু একটু করে বড় হয়ে বাপের অজ্ঞাতে কখন সে জিজ্ঞাসার একটা উত্তর পেয়ে গেছে।

স্কলারশিপ নিয়ে পাশ করেছিল নিবারণ। বিজ্ঞান পড়তে পাঠিয়েছিল জেলা কলেজে। প্রথম দিকে বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল ভরাট। ছুটিছাটা থাকলে সোজা হোস্টেল থেকে বাড়ি। তারপর ঠিক কবে থেকে শিথিল হয়ে গেছে বন্ধন—কবে থেকে নতুন মাটিতে পরিণত বীজ খুঁজেছে তার নতুন উত্তাপ, অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছে গভীর গোপনে—তার সব খবর সে রাখে নি। হঠাৎ একদিন সারা দেশ চমকে দিলে একটা খবর—কলেজের প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্যাডি প্রাণ দিয়েছে সন্ত্রাসবাদী এক তরুণের হাতে। জেলা শহর তোলপাড়। কলেজ হোস্টেল উথাল-পাথাল করে দিলে পুলিশ। নিবারণের খোঁজে ছুটে এসেছিল বাড়ি পর্যন্ত। পায় নি। কদিন বাদে খবর পেয়েছিল—গোটা দলটাই নাকি ধরা পড়ে গেছে।

.. না, তাতেও একটু বিষন্ন রেখা দেখে নি সে নিবারণের মুখে।

.. জেল সুপার ঘড়ি দেখে গম্ভীর গলায় বলেছিল, "সময় হয়ে গেছে।"

.. চলে আসার সময় নিবারণ হাসি-মুখে বলেছিল, "আমার জন্যে তুমি ভেবো না বাবা।"

সেই হাসি। প্রবল ধ্বনিতরঙ্গের বিক্ষেপও নেই—তার নিঃশব্দ প্রকাশে কোথাও বিষন্ন অনুতাপের চিহ্নও নেই। পুরাতন ছক বাঁধা জীবনের জন্য মমতা নেই—তার বিপর্যয়ের জন্য অনুশোচনা নেই। সব ভেঙেচুরে ঝড়ের মুখে দাঁড়িয়ে ওরা যেন হাসছে। সেই প্রশান্ত নিরুদ্বিগ্ন হাসি। একই রকম। কিছুক্ষণ আগে দেখেছে সে বিমলের মুখেও।

.. জেলা থেকে ফিরে এসে মাধবী চোখ ছলছল করে শুধু বলেছিল, "দাদার সঙ্গে আমারই শুধু দেখা হলো না।"

আজও সে-ই প্রথম বিমলকে দেখে সকলরবে বলে উঠল, "বিমল দা!" মাকে ডাক দিলে, "মা দ্যাখ—কে এসেছে!"

"কে রে!"

রান্নাঘর থেকে আনন্দময়ী বেরিয়ে এসে সামনে বিমলকে দেখে উচ্ছ্বসিত গলায় বলে উঠল, "বিমল! কতদিন তোমার দেখা নেই বিমল!"

ডাক্তারের চোখ এড়াল না—একটা বিষন্ন-করুণ মুখের ওপরে কেমন করে স্নিগ্ধ একটা আনন্দের উচ্ছাস উছলে পড়ে। মাধবীর মুখেও আনন্দের চাপা উত্তেজনা। দুর্দিনের ঝড়ে যে ছেলেটা এ বাড়ি থেকে অনেক দূরে ছিটকে গেছে—বিমলের মধ্যে দিয়ে তার উপস্থিতি বোধ করি ওরা অনুভব করে। ওয়ারেন্ট বেরুবার আগে পর্যন্ত বিমল থেকে গেছে এখানে। এ বাড়িতে সে-ও আর একজনের মতো দেশজোড়া আন্দোলনের উত্তেজনা বয়ে এনেছিল একদিন। অন্য পথে। অন্য মতে। এমন অনেক দিন গিয়েছে—কোথায় না কোথায় লাঠিডান্ডা খেয়ে রক্তে রঙিন হয়ে ফিরে এসেছে। পুলিশে ক্যাম্প টিকতে দেয় নি। ডেকে এনেছে মাথা-ফাটা হাত-পা-ভাঙা বন্ধুদেরও। দিনে দিনে একটু একটু করে এ বাড়ির শীতল শূন্যতা উষ্ণ হয়ে উঠেছে আন্দোলনের তড়িৎ স্পর্শে। শূন্যতা ভরে উঠেছে। আনন্দময়ীর ফ্যাকাশে নিষ্প্রাণ মুখে যেন প্রাণ ফিরে এসেছে উৎকণ্ঠায়, দুর্যোগের উত্তেজনায়। "দাদারা ঠিক করেছিল।"... উত্তেজনায় ফেটে পড়ত মাধবীর গলা। মনে হতো, ওই একফোঁটা মেয়ে যেন অনেক বড় হয়ে গেছে হঠাৎ।

তারপর একদিন সন্ধ্যের পরে বিমল আর প্রতিদিনের মত ফিরে এলো না। ওয়ারেন্ট বেরিয়েছে। তারপর এ বাড়ি আবার নিঃসাড় হয়ে গেছে। আবার সেই শীতল শূন্যতা শুধু বাড়ি নয়—গ্রাস করেছে আনন্দময়ীকে। আর মায়ের সেই বিষন্ন করুণ ছায়ায় মিইয়ে গেছে সতেরো বছরের মাধবী।

বিমলের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবে আজ এ বাড়ির সেই শূন্যতা আবার ভরে ওঠে। চোখ ভরে—বুক ভরে সেটুকু দেখে ডাক্তার তার নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

বিমল এগিয়ে গিয়ে আনন্দময়ীকে প্রণাম করলে—দেখাদেখি তার দুটি বন্ধুও।

"হয়েছে—হয়েছে।" আনন্দময়ী ওদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করল। নতুন দুটি মুখ দেখে জিজ্ঞেস করলে, "এদের তো চিনলাম না বিমল!"

"আমার বন্ধু।" বিমল চিনিয়ে দিলে, "এ পবিত্র, ও কমল।"

"আমি চিনেছি।" মাধবী বললে, "ওঁরাই তো বিকেলে এসেছিলেন সেই বিলেতী কাপড়ের মিছিল নিয়ে।"

আনন্দময়ী হাসল। অনেক দিন পরে। বললে, "বিমলের বন্ধু যখন—একটা অপ-কর্মের বোঝা নিয়ে তো আসবেই। চিনবি বৈ কি।"

পেছনের অন্ধকার থেকে আর একজন এসে আনন্দময়ীর সামনে মাথা নোয়ালে। বললে, "আমাকে চিনলে না বৌঠান!"

"ও মা! আপনি! ছি ছি ছি"—আনন্দময়ী সলজ্জে বললে, "আপনিও এসেছেন!"

কৃত্রিম ক্ষোভে সান্যো চৌধুরী বললে, "সকলের পেছনে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম—কেউ যদি চিনিয়ে দেয়। তা কেউ দিলে না। নিজেই ঠেলে এলাম।"

"নাটের গুরু।" আনন্দময়ী বললে, "হঠাৎ বিমল যখন এসে উদয় হলো—আমার তখনি বোঝা উচিত ছিল, সান্যো কর্তা কাছাকাছি কোথাও আছে।"

"তুমি আমার এমন অপবাদ দিচ্ছ বৌঠান!"

"না দেওয়ার পথ রেখেছেন!" আনন্দ-ময়ী বললে, "ছেলেটার মাথায়, কপালে, গায়ে যতগুলো দাগ—সায় ওয়ারেন্ট, সব আপনার অপকর্ম।"

সান্যো চৌধুরী বললে, "এ আপনার মিথ্যে অপবাদ।"

"মিথ্যে!" আনন্দময়ী রাগ করে বললে, "আপনার চরের চাষীদের সঙ্গে কে ওকে ক্ষেপিয়ে দিলে? হিজলীর সেই নুনের কারখানার আসল আসামীটি কে! তবু বলবেন, আপনি ওকে ক্ষেপান নি?"

সান্যো চৌধুরী মৃদু মৃদু হাসছিল। বললে, "ও যে ক্ষেপতে এসেছিল বৌঠান।"

"তা আজকের মতলবটা কি? বিমলের হঠাৎ আবির্ভাবে সন্দেহ হলো বোধহয় আনন্দময়ীর—তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল সান্যো চৌধুরীর দিকে।

সান্যো চৌধুরী বললে, "কিছু না। আজ এসেছি—বহুদিন পরে আপনার মুখে একটু হাসি দেখব বলে।"

"যান।"—

আনন্দময়ী রাগ করে মুখ ঘুরিয়ে নিলে। কিন্তু আজ কারুর চোখকেই ফাঁকি দিতে পারলে না—না ডাক্তার, না সান্যো চৌধুরী—না ওই সতেরো বছরের মেয়েটাকে পর্যন্ত। সেই নিঃসাড় নীরব মানুষটি মুখর হয়ে উঠেছে। দুঃখের সেই কঠিন রেখাগুলো কোথায় যেন ভোজবাজীর মতো মিলিয়ে গেছে।

আনন্দময়ী বিমলের দিকে চেয়ে বললে, "এসো বিমল তোমার বন্ধুদের নিয়ে, রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে বসে গল্প করবে।"

বিমল বললে, "আজ বোধ করি আমার বেশিক্ষণ থাকা ঠিক হবে না কাকীমা।"

"কেন!" পাংশুমুখে তাকাল আনন্দ-ময়ী।

"শুনলাম, থানার দরদী বন্ধুরা আমার

রাণীধূপ
কাকার প্রডাক্টস

এই দুই বন্ধুর খোঁজখবর করে গেছে ডাক্তারখানায়।" বিমল হেসে বললে, "আর আমার নেমন্তন্ন তো সেই কবে থেকে ঝুলে আছে জানেন।"

আনন্দময়ীর স্নেহস্নিগ্ধ হাসিখুশি মুখটার ওপর দিয়ে হঠাৎ যেন একটা কালো মেঘের ছায়া ভেসে যায়। হতাশ চোখে চেয়ে আনন্দময়ী অস্ফুট কণ্ঠে বললে, "এই বিপদের ঝড় মাথায় করে দিব্যি তোমরা হাসতে হাসতে এসে মায়েদের মন জুড়ে বসো—আবার হারিয়ে যাও। এ আমার কপালের দোষ বিমল।"

কেমন একটা গুরুভার আবহাওয়া হঠাৎ যেন থমথম করে। হৃদয়ের গভীর পর্যন্ত যেন অনাবৃত হয়ে নিবারণের সেই শূন্য জায়গাটা বিমলেরও চোখে পড়ে।

হাতজোড় করে বিমল বললে, "এ হতভাগাদের মা হওয়ার ওই তো যন্ত্রণা কাকীমা।"

"তোমাদের বলা সহজ বিমল।" আনন্দময়ীর চোখ ছলছল করে এল। বললে, "সে যন্ত্রণা তোমরা বুঝবে না।" একটু থেমে জিজ্ঞেস করলে, "তোমার মাকে ক'খানা চিঠি লিখেছ শুনি?"

"একখানাও না।" বিমল হেসে বললে, "আপনার কাছে লুকবো না। হরিপদ মাইতির গোয়ালটা যেমন অন্ধকার—তেমনি নোংরা। সেখানে ব্যাটার না আছে কাগজ, না আছে কলম।"

"ওমা! গোয়ালে আছ!" আনন্দময়ী ব্যাকুল হয়ে বললে, "খাওয়া-দাওয়া?"

"ওইখানে।" বিমলের সেই হাসি। বললে, "মুড়ি চিবোই আর মশা মারি। কোনোদিন যদি এক-আধ থাল জুটে যায়—ভাগ্য বলে মনে করি।"

সানো চৌধুরী মন্তব্য করলে, "আপাতত ওই তোমার হেড-কোয়ার্টার বুঝি?"

বিমল হাসতে হাসতে বললে, "না। বেঁচে থাক আপনাদের গো-বংশ। আরও ঢের গোয়ালা আছে।"

আনন্দময়ী বেদনার্ত চোখ মেলে চেয়ে রইল বিমলের হাসিমুখের দিকে। দেখ, পবিত্রও হাসছে, কমলও হাসছে। বিপর্যস্ত জীবনের মাঝখানে ওরা হাসছে। তাজা তরুণ মুখগুলো—কপালে, গালে, চিবুকে শৈশবের সেই স্নিগ্ধ মসৃণতা, কোথাও এতটুকু ভাঁজ পড়ে নি আজও—একটু যা আকারে বড় হয়েছে। বুকের একান্তে এনে ওইরকম মুখ সে কতদিন দেখেছে, একটু ধুলো-বালি পড়লে আলতো করে মুছে দিয়েছে—পাছে লাগে। দেখ, সেখানে কত দাগ!

......ষড়যন্ত্র কবুল করাবার জন্যে নিবারণের সর্বাঙ্গেও অনেক দাগ পড়েছিল। কতদিন চিঠি লেখে নি নিবারণ। সাগরের সেই উত্তাল কালোজলের মাঝখানে কোথায় সে দ্বীপ—কে জানে!......

বিমল বললে, "আজ তা হলে বিদায় দিন কাকীমা।"

"না খেয়ে যাবে কি!" আনন্দময়ী বললে, "এসো। মাধবী, ওদের খাওয়ার জায়গা করে দে।"

সানো চৌধুরী বললে, "ওটা চটপট সেরে দাও বৌঠান। ওরা বড্ড খারাপ দিনে এসে পড়েছে।" বলে সে ডাক্তারের ঘরে ঢুকলো।

সানো চৌধুরীর অনুমান মিথ্যে নয়। দিনটা ওদের পক্ষে খারাপই বটে। রান্নাঘরের দাওয়ায় আনন্দময়ী সামনে বসে ওদের খাওয়াচ্ছিল।

সামনে বড় উঠোনটা পার হয়ে বৈঠকখানা। সেখানে বসে কথা বলছিল জগৎ ডাক্তার আর সানো চৌধুরী।

বিমলদের খাওয়া বোধ করি আধা-আধিও হয় নি এমন সময় কতকগুলো ভারী বুটের শব্দে বৈঠকখানা সচকিত হয়ে উঠল।

"আমরা থানা থেকে আসছি।" কট্-কটে গলা চম্‌কে দিলে অন্ধকারকে।

"তা বুঝেছি।" ডাক্তার বললে, "কি চাই।"

"সার্চ ওয়ারেণ্ট আছে।"

সানো চৌধুরী একফাঁকে অন্দরে ঢুকতে যাচ্ছিল—ছোট দারোগা পেছন থেকে বলে উঠল, "বৃথা চেষ্টা চৌধুরী মশাই, বাড়ির চারদিকে সেপাই মোতায়েন আছে। আপনি যেমন চেয়ারে বসেছিলেন—বসুন। আমরা খুঁজে দেখছি।"

সানো চৌধুরী ক্ষোভে ক্রোধে ঠোঁট কামড়ে দাঁড়িয়ে রইল।

ডাক্তার কঠিনকণ্ঠে বলে উঠল, "কি চান আপনারা—কাকে চান?"

"কিছু ভলাণ্টিয়ার আপনার এখানে এসেছে।"

"যদি বলি তারা আমার রোগী।"

অধৈর্য ছোট দারোগা বিরসকণ্ঠে বললে, "দয়া করে অনুমতি দিন—খুঁজে দেখি। নইলে আমাদের কর্তব্য জবরদস্তি আমাদেরই করতে হবে।" বলতে বলতে সঙ্গের সেপাইদের চোখের ইঙ্গিত করে বৈঠকখানার দরজা পার হয়ে একেবারে ভেতরের উঠোনে।

"আরে—বিমলবাবু না?" রান্নাঘরের খোলা দাওয়ার দিকে চেয়ে ছোট দারোগা সবিস্ময়ে বলে উঠল, "আপনাকে পাবো—আশা করি নি।"

পবিত্র কমলের খাওয়া বন্ধ। আলো-অন্ধকারে দাঁড়ানো ছোট দারোগার দিকে চেয়ে ওদের মুখ কঠিন হয়ে উঠল। বিমল অবলীলায় একগাল লুচি-তরকারী গালে পুরে বাঁ হাত তুলে শুধু বললে, "দাঁড়ান।" তারপর মুখের বস্তুগুলো কোনো রকমে গলায় চালান করে ঢোক গিলে বললে, "ভালো-মন্দ খাওয়া বহুদিন জোটে নি মশাই—দাঁড়ান, খেয়ে নিই। দেখা যখন হয়েছে—আশা আজ আপনাদের মিটবে।"

"আমরা দুঃখিত বিমলবাবু।"

"তার মানে খেতে দেবেন না?"

"দয়া করে হাত ধুয়ে আসুন।"

"চলো হে—উঠে পড়ো।" বিমল আসন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে আধ-খাওয়া পাতের দিকে তাকিয়ে অত্যন্ত অনুশোচনাভরা-কণ্ঠে বললে, "ইস! ওরে মাধবী—পাতে সব ভালো ভালো জিনিসগুলো রয়ে গেল রে।"

সামনে অভিভূতের মতো দাঁড়িয়ে ছিল মাধবী—বিমলের তরল মন্তব্য কি জানি কত জোরে তাকে আঘাত করলে, চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ছুটে পালাল।

অর্ধভুক্ত পাতের সামনে মাথায় ঘোমটা তুলে কাঠের মতো বসে রইল আনন্দময়ী। না সাড়া, না শব্দ।

এক সময়ে গোলমাল চুকে গেল। ভলাণ্টিয়ারদের নিয়ে থানার লোক থানায় চলে গেল।

পেছনে এসে সানো চৌধুরী মৃদুকণ্ঠে ডাকলো, "বৌঠান!"

আনন্দময়ী যেন সম্বিৎ ফিরে পেল। চোখে আঁচল চাপা দিয়ে ডুকরে উঠল, "ওরা ওদের খেতেও দিলে না!"—

[ক্রমশ]

বসুমতীর
যাবতীয়
গ্রন্থ ও
গ্রন্থাবলীর
প্রাপ্তিস্থান
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ
কলিকাতা—১২
এবং
সান্যাল এণ্ড কোং
১/১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

গ্রামবাংলার কথা

অসীম মুখোপাধ্যায়

॥ ভি আই পি ॥

মেলাইচণ্ডীর মেলায় এসেছি। সাথে অনিল দেয়াশী আর তার ভাইপো দুধকুমার। ভয়ানক ভিড়। কে যেন বলল হাজার বিশেক লোক হয়েছে এবার। তা সে মিথ্যে বলে নি মনে হচ্ছে। অনিলকে চুপিচুপি বলি—"পকেট সামলাও।" সে শুনে হাসে, ইসারায় বলে—"সামলেই বা কি হবে, যা একটি চীজ সাথে আছে! যেটা দেখছে সেটাই তার চাই। পকেটমারের গুরুঠাকুর।"

গুরুঠাকুর কিন্তু আমাদের কথা শুনছেন না, বুঝছেনও না কিছু। তার নজর কেবল দোকানগুলোর দিকে। ভাবসাব দেখে দেয়াশীকে বলি—"ভায়া, ব্যাপার সুবিধের নয়, আমার টাঁক খসবে মনে হচ্ছে, চলুন ওদিকে যাই।"

খানিকটা এগিয়েছি, এমন সময়—

—"ইঃ, কি ন্যাস্টি, যত সব ডারটি ডগ্‌স, দিল আমার শাড়িটাকে নোংরা করে।"

ঘাড় ফিরিয়ে দেখি, অল্পবয়সী বেজায় মোটা এক মহিলা নাক সিঁটকে আছেন। পরনে মূল্যবান, চিত্রিত, নাইলন শাড়ি আর ফতুয়া মার্কা ব্লাউজ, তাও আবার নাই-এর ওপর থেকে। ফলে মেদবহুল পেটটি বেরিয়ে আছে। উগ্র প্রসাধনচর্চিত মুখে শ্রমজনিত স্বেদরেখা। পায়ে হিলতোলা জুতো। মফস্বলের মেলায় নিঃসন্দেহে এক অন্যতম আকর্ষণ। মনে মনে বলি—"কোথা হতে হল আগমন দেবী?" অনিলকে ডাকি—"ভায়া ব্যাপারটা কি? কে ইনি?" ফিসফিসিয়ে অনিল বলে—"বি-ডি-ও'র শালী।"

—"তাই নাকি?"

—"হ্যাঁ দাদা। স্বামী মস্ত সরকারী চাকুরে। রাজধানীতে কোন্ এক দপ্তরের ডেপুটি যেন। এখানে বেড়াতে এসেছেন।"

—"তা গর্জন করছেন কেন?" দেয়াশী ব্যাপারটা জানতে গেল। ফিরে এসে বলে—"অতি গুরুতর।"

—"কেন?" আমি ওর মুখের দিকে তাকাই।

কপট গাম্ভীর্যে দেয়াশী বলে—"একটি ছোট্ট ছেলে, বছর পাঁচেক বয়েস হবে বোধ হয়, সে মহিলার আঁচল ধরে টেনেছিল, বলেছিল, "হ্যাঁ গা, তুমি কে গা, তাতেই এত দাদা!"

শুনে আমিও মাথা নাড়ি—"বটেই তো, অপরাধ কি কম, চাষাভুষোর ছেলে, হাতের আঙুলে মাঠ-ঘাটের মণ মণ ময়লা! সে যদি অমন চমৎকার শাড়ির আঁচল চেপে ধরে তবে শাড়ির কি আর ইজ্জত থাকে নাকি?"

আমার মুখের চেহারা দেখে দেয়াশী হো হো করে হাসে।

জাঁকিয়ে মেলা বসেছে চারপাশে। কি আছে আর কি যে নেই বলা ভারি শক্ত। দুধকুমার গুণেছে, ময়রার দোকান বসেছে পঁচিশটা, খেলনার দোকান বাইশটা, মনিহারী দোকান পনেরটা, আর বাদবাকী? বাদবাকীতে কাজ কি তার? জিজ্ঞাসা করি

—"আর সব জিনিসের দোকান ক'টা?" ছোট্ট একটি উত্তরে সব বুঝিয়ে দিল শ্রীমান—"ওগুলো আমার ভালই লাগে না।" অতএব,—কষ্ট করে গুণবে কেন?

এক জায়গায় বেশ কয়েকটা নার্শারী বসে গেছে। হরেকরকম ফুলের গন্ধে দাঁড়িয়ে পড়তে ইচ্ছে করে। ফলের গাছ, শাকসব্জীর বীচির কেনাকাটাই বেশি চলছে। খদ্দেররা অধিকাংশই চাষী। হঠাৎ দুধকুমার বলে বসল—"কাঁঠালগাছ নেব।" "সে কি?" দেয়াশী আকাশ থেকে পড়ে যেন,—"বাড়িতে কত কাঁঠালের গাছ, আরও নিয়ে হবেটা কি?"

—"সেগুলো তো তোমাদের। কাঁঠাল হলেই তোমরা বড়রা নামিয়ে নেও। এটার কাঁঠাল আমি একা খাব। আজই নিয়ে গিয়ে মাটিতে পুঁতে জল ঢালব। পরশুই কাঁঠাল হয়ে যাবে।"

কি সুগভীর আত্মপ্রত্যয়! এহেন ব্যক্তিকে মর্যাদা না দিলে ভদ্রতার আদর্শ টেকে না। ছ' আনা পয়সা ব্যয় করে

মেলাইচণ্ডীর মেলায় জয়নগরের পুতুল

দেবী মেলাই চণ্ডীর মূর্তি

দোকানীকে দিলুম। দেয়াশী কিছু বলার আগেই ভারতের শ্রেষ্ঠতম কৃষি উৎপাদক ছোঁ-মেরে কাঁঠালগাছটি কোলে তুলে নিলেন।

আবার হাঁটছি আমরা। সামনে দুধ-কুমার। সযত্নে চারাগাছটি বুকে চেপে ধরে চলেছে. আর থেকে থেকে "হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার" করে চেঁচাচ্ছে। এ রাস্তাটার দু' পাশে অসংখ্য কুমোরের দোকান। মাটির হাঁড়ি, থালা, জল খাবার গেলাস, মালসা, ফুলের টব, পয়সা রাখার ঘট কত কি যে বিক্রি হচ্ছে! এক বুড়ো রাস্তা জুড়ে উবু হয়ে বসে আছে, তাকিয়ে দেখি, একটা হাঁড়ির গায়ে কান লাগিয়ে পয়সা দিয়ে ঠন্ ঠন্ আওয়াজ তুলছে। দোকানী বেচারী মহা বিব্রত, বাদবাকী খদ্দেররা হাঁকডাক করছে। বুড়োকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে আসতেই কাকে যেন ডাকল দেয়াশী—"ও অধরদা, শোন, শোন।"

অধরদা কাছে এসে দাঁড়াল। হাঁটুর ওপরে গুটিয়ে পরা ধুতি, কাঁধে বিরাট এক গামছা, মাথা থেকে ঘামের স্রোত ঝরছে। দুজনেই দুজনকে দেখে অবাক। "তুমি এখানে?" "তুই এখানে?" দেয়াশী বলে—"ইনি মুখার্জী, আমার বিশেষ বন্ধু।" হাত তুলে নমস্কার করি। অধরদা নিজেই পরিচয় দেয়—"আমার নাম অধর রক্ষিত। শক্তিগড়ে মিষ্টির দোকান করি।"

দেয়াশী বল্ল—"কিন্তু তুমি এখানে কেন অধরদা?"

অধরদা হাসে—"জানিস তো ঢেঁকী স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে? এখানে ল্যাংচার দোকান দিয়েছি রে একটা। সাথে পান্তুয়াও আছে। চল না, বসবি চল।" হাসব না কাঁদব? দুধকুমার অধরদার হাত ধরে টানতে শুরু করেছে। অধরদা হাসে।

—"কে রে এটা অনিল?"

—"বড়দার ছেলে।"

—"বলিস কি? আমায় তো দেখে নি কোনদিন? অথচ কেমন আলাপ করতে চাইছে।"

ওর কথা শুনে হেসে ফেলি। মনে মনে বলি—

—"চল না দোকানে, আলাপ গিয়ে বিলাপে দাঁড়াবে।" কিন্তু অধরদার দোকানে যাবার আগেই আবার বিপত্তি ঘটল। আবার বজ্রাঘাত।

—"উঃ মাগো! ফ্রম হেভেন টু হেল। কোথায় নিয়ে এসেছে আমায়। জামাইবাবু, —প্লিজ। এই সাফোকেটিং সিচুয়েশন থেকে বাইরে চলুন।"

সর্বনাশ! কি হল আবার! আমি, দেয়াশী আর অধর একে অন্যের মুখের দিকে তাকাই। সরে পড়ব কি-না ভাবছি। ঠিক এমন সময় গুণধর ভাইপোটি এক কাণ্ড করে বসল। "মেম, মেম" চেঁচিয়ে উঠল দুধকুমার। চোখে তার রাজ্যের বিস্ময়, হাঁ করে ডেপুটির বৌকে গিলছে। এই সেরেছে!

—"হাউ সিলি! পার্সনিফিকেশন অব ইডিয়সি! এইটুকু ছেলে ইনসাল্ট করছে? বাড়িতে ম্যানার্স জানে না কেউ?"

—"কি বলছে মেম রাঙাকাকু?" দুধ-কুমার আমার দিকে তাকায়। আমি বলি, —"উনি বলছেন যে, তোমার কাঁঠালগাছটা ওঁর চাই. চল পালাই এখান থেকে। কথা শুনেই দুধকুমার দে ছুট্। ওদিকে গর্জন শোনা যায়—"কি বলেছিলুম না, ছেলেটা ইনসাল্ট করছে আমায়, নইলে ভয়ে পালাবে কেন? সাথের লোকগুলোই বা কেমন? ওদের ব্রেন ওয়াশিং দরকার।"

আর রক্ষে নেই! ধরল বুঝি চেপে! দেয়াশীর কনুই-এর প্রচণ্ড গুঁতোয় ভিড়ের ভেতর ঢুকে গেলুম।

অধরদার দোকানে বসে আছি। দুধ-কুমার দুটি ল্যাংচা নিয়ে খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে পাছে তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যায়। হঠাৎ মন্দিরের দিক থেকে ভীষণ গোলমাল কানে এল। উঠে দাঁড়াই—

—"কি হোল অনিলবাবু?"

—"বলি পড়ছে মায়ের কাছে, এবার শুনছি, প্রায় পঞ্চাশটা পাঁঠা বলি দেওয়া হচ্ছে। আগে আরও হোত। বাবার কাছে শুনেছি আজ এই বোশেখী পূর্ণিমার দিনে সাড়ে তিনশ'র মত পাঁঠা পড়ত মায়ের কাছে।"

—"জয় চণ্ডী মায়ের জয়। মেলাই চণ্ডীর জয়"—মন্দিরের প্রাঙ্গণ থেকে ভক্তদের চিৎকার শোনা যাচ্ছে।

অধরদা বলে—"বর্ধমান থেকে আমার জানা-শোনা লোকই এসেছে প্রায় তিনশ'। অচেনাদের তো ছেড়েই দিলুম।"

"প্রাতবারই কি আসে?" আমি প্রশ্ন করি।

—"নিশ্চয়!" বর্ধমান কি বলছেন, নদীয়া, বীরভূমের লোকও পাবেন যথেষ্ট। মেলাইচণ্ডীর কথা পশ্চিমবাংলায় জানে না, এমন লোক নেই। যে-সে তীর্থ তো নয়, পীঠস্থান একেবারে! বিষ্ণুচক্রের আঘাতে সতীর বাঁ পায়ের মালাইচাকি পড়েছিল জয়ন্তীতে, নদের ওপারে। তাই দেবীকে মেলাইচণ্ডী বলে সবাই।

—"দেবীর গল্প একটা বলুন না আমায়।" আমি অনুরোধ করি। অধরদা বলে—"অনিল বলবে গল্প, এখানে তার বাড়ি-ঘর, এখানেই সে মানুষ। আমি আর কতটুকু জানি।"

অনিল বলে—সেকেলে গল্প বলব না, তা সবারই প্রায় জানা। একালের গল্প শুনুন। মাস চারেক আগে উদং থেকে এক ভদ্রলোক এলেন। পাঁচের কোঠায় বয়েস। দেখে বেশ অবস্থাপন্ন বলেই মনে হল, চেহারাটিও সৌম্য। আমরা ক'বন্ধু চত্বরে বসে আছি। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হয়েছে সবে। পুরুত চক্রবর্তী কাকু মন্দিরের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। ভদ্রলোক এলেন, আর এসেই কাকুর পা জড়িয়ে ধরে সে কি কান্না! আমরাও অবাক। এগিয়ে গেলুম কাছে। শুনলুম ভদ্রলোক সম্প্রতি কলকাতায় একটা বড় কাপড়ের দোকান দিয়েছেন। এক নিকট আত্মীয়ের ওপর ছিল দেখাশোনার ভার। এত নিকট সম্পর্ক যে, অবিশ্বাসের প্রশ্নই আসে না। কিন্তু সে আত্মীয়টি নাকি তার নিজের নামে দোকানের লেখাপড়া করে নিয়েছে। মামলা চলছিল। কাল রায় বেরোবে। যদি হারেন তো পথে বসবেন ভদ্রলোক। উদং-এর জমিজমা বেচে মামলা চালিয়েছেন। এদিকে ঘরে তাঁর ছেলের কঠিন অসুখ। ক্যান্সার। চিকিৎসার জন্যে প্রচুর খরচা হচ্ছে। হাসপাতাল থেকে ফেরৎ দিয়েছে রোগীকে। রোগ এখন প্রায় আয়ত্তের বাইরে। কি হবে যদি হারেন? আত্মীয়টি নাকি শাসিয়েছেন, জিতলে মানহানির মামলা আনবেন তাঁর নামে। আমরা দেখলুম পুরুতকাকু আর ভদ্রলোক মন্দিরে ঢুকে সটান শুয়ে পড়লেন মায়ের কাছে। খানিক পরে কাকু উঠে ধ্যানে বসলেন, ভদ্রলোক তখনও তেমনি পড়ে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। আমরাও বসে আছি। সন্ধ্যে হয় হয়। এমন সময় পুরুত-কাকু ডাকলেন ভদ্রলোককে,—মামাবাবু, উঠুন, মন বলছে আপনি জিতবেন—মা অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন না কোনদিন। নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি যান। ছেলেও ভাল হয়ে যাবে।

মামামশাই উঠে দাঁড়িয়ে বললেন,—কাল তিনি আসবেন। খবর দিয়ে যাবেন নিজেই।

পরদিন, বেলা তিনটে বাজে বোধ হয়। ভীষণ উৎকণ্ঠা নিয়ে আমরা চত্বরে দাঁড়িয়ে আছি। পুরুতকাকু মন্দিরে মায়ের কাছে বসেই আছেন ভোর থেকে। খবরটা শুনে আরও অনেকেই এসেছে। হঠাৎ দেখি মামাবাবু ছুটতে ছুটতে আসছেন। চোখে জল, কেমন যেন পাগলের মত চেহারা। কি হল? হেরে গেলেন না কি ভদ্রলোক?

"মা, মা" বলতে বলতে সোজা ভেতরে ঢুকে গেলেন মামাবাবু। হকচকিয়ে কাকু বললেন,—কি হয়েছে ফল?

—জিতেছি। শুধু এই একটি কথা বলেই ভদ্রলোক জ্ঞান হারালেন।

—চমৎকার! অধরদার মুখে ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিস্ময় সব একসাথে ধরা দিল। কপালে হাত ঠেকাল সে।

—ল্যাংচা কেমন হবে?

প্রশ্ন শুনে ঘাড় ফেরালুম। পুরোপুরি সাহেবি পোশাক পরা দু'জন ভদ্রলোক। একজনের মুখে পাইপ। ঘন ঘন ধোঁয়া ছাড়ছেন। চেহারাটায় একটা আকর্ষণীয় শান্তশ্রী আছে। হাসিমুখে বললেন—ল্যাংচা ভাল হবে কি?

অধরদা নড়েচড়ে বসে, বলে,—খুব হবে, আমি শক্তিগড়ের লোক। সেখানেও দোকান আছে আমার। এ'রা সবাই চেনেন আমাকে।

—তবে দিন দু' কিলো। কত দাম?

—সাড়ে সাত টাকা।

দুধকুমার ঈর্ষাকাতর চোখে ভদ্রলোকদের দেখে। আমি আর দেয়াশী মুখ ঘুরিয়ে হাসি। হঠাৎ কানে এল—

—সঞ্জয়? সেম টু ইউ অল! আমি তোমাদের খুঁজে মরছি আর তোমরা এই গারবেজের মধ্যে দাঁড়িয়ে? কি কিনছ ওসব?

সঞ্জয়বাবুকে ভীষণ বিব্রত দেখায়। বলেন,—কেন? শক্তিগড়ের ল্যাংচা! তুমি তো সুইটস খুব ভালবাস।

—অব কোর্স। ল্যাংচা আমি ভীষণ লাইক করি!

এমন সময় দুধকুমার বলে বসে—রাঙাকাকু, সেই মেমটা এসেছে।

—হায় মেলাইচণ্ডী, এ কি করলে মা? কোথায় পালাই এখন! কিন্তু পালাবার আগেই নজরে পড়ে গেলুম।

—হোয়াট ননসেন্স! সেই ব্রাট ছেলেটা না? দেখুন জামাইবাবু—তখন থেকে ছেলেটা আমায় দেখলেই 'মেম, মেম' করছে। সাথের লোকগুলো শিখিয়ে দিচ্ছে বোধহয়।

বি-ডি-ও মুখ ফিরিয়ে আছেন হাসছেন না কি? সঞ্জয়বাবুর দিকে তাকিয়ে দেখি তার ফর্সা মুখটা লাল হয়ে উঠেছে। কথা বলতে পারছেন না ভদ্রলোক। অধরদা-ই বাঁচিয়ে দিল ওঁকে। বলল—এই দিন মাগ্গা হয়ে গেছে। কোন মতে দামটা দিয়েই বেরিয়ে গেলেন ভদ্রলোক। ব্যাপার বুঝে বি-ডি-ও-ই নিলেন হাঁড়িটা। হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম সবাই।

লাঠিখেলা হচ্ছে। তেল চুক-চুকে লাঠিগুলো বন-বন করে লাফিয়ে উঠছে শূন্যে। পর-মুহূর্তেই আবার নিচে নেমে আসছে। বিদ্যুৎ যেন! এখন যারা লড়ছে তারা পাতিনান আর কানুপাটের দল। জোর জমেছে খেলা! খেলুড়েরা লাঠির সাথে নিজেরাও লাফিয়ে উঠছে। ছিপছিপে কালো চেহারাগুলো চাবুকের মত দুলছে। দর্শকরা হাঁটু চাপড়াচ্ছে আর বলছে,—"সাব্বাস, সাব্বাস লড়ি যাও, লড়ি যাও মহাভারত বানায়ে দাও একেবারে।" কে একজন একটানা সিটি দিয়েই চলেছে, মুখ থেকে লালা ঝরে বুক বেয়ে পড়ছে। কোন দৃক্পাত নেই। দুধকুমারও মেতে গেল। ধেই ধেই করে নাচছে। তাকে দেখে সবাই হৈ-হৈ করছে—

—এসি গেছে, এসি গেছে। উস্তাদ এসি গেছে। ভাইপোর কৃতিত্বে দেয়াশীর মুখে আকর্ণ বিস্তৃত হাসি। আমারও বেশ লাগছে। এমন সময় কারা যেন পাশে এসে দাঁড়াল। তাকিয়ে দেখি সেই তিন মূর্তি;—বি-ডি-ও, ডেপুটি আর ডেপুটি-পত্নী। কান পেতে রাখি, কি বলে এবার। ওদিকে বুকটাও দুরুদুরু করছে। শুনলুম, ফিসফিসিয়ে ডেপুটিগিন্নী বলছেন,—সঞ্জয়, লেট আস লিভ দা প্লেস। টেরিবল ব্যাপার চলছে। লোকগুলো সব "বাড-হাউণ্ডের" মত ক্ষেপে উঠেছে। অ্যাট এনি মোমেণ্ট মার্ডার হবে যাবে।

—আঃ, ভয় পাচ্ছ কেন তুহিনা? এটা সেরেফ খেলা ছাড়া কিছুই না আর।

—ইউ ওয়াণ্ট টু মেক দা ম্যাটার লাইট? আই সি। আমি একাই যাচ্ছি। যতসব গেঁয়ো ব্যাপার! এর নাম আবার কালচার!

ডেপুটিগিন্নী সবেগে গমন করলেন। পেছন পেছন গোবেচারা দুই ভদ্রলোক? *

---

* আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত

মাসিক ১০, টাকার কিস্তিতে লাভ করুন অল ওয়ার্ল্ড স্ট্যাণ্ডার্ড ট্রানজিস্টর (জাপান মেক) জনপ্রিয় মূল্য ৩০০, । দেশব্যাপী খ্যাতি আছে। ডবল স্পীকার ৩ ব্যাণ্ড, ৮ ট্রানজিস্টর। নাইট-ল্যাম্প ফিট করা। কেবল ইংরেজী বা হিন্দিতে যোগাযোগ করুন।

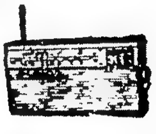

Allied Trading Agencies
(B.C.) P.B. 2123, Delhi-7.

পাহারা

নির্মলেন্দু গৌতম

এই দীর্ঘ মাঠের মধ্যে দৈত্যের মতো বিরাট একটা অন্ধকার নিশ্চিন্তে শুয়ে আছে। এক আকাশ নক্ষত্র যে ভীরু আলো ছড়াচ্ছে, সে আলো অন্ধকারের শরীরের ওপর নেমে শিশুর মতো খেলা করছে। অন্তত গগনের তাই মনে হলো। মাঠের এদিকে দাঁড়িয়ে।

গগনের সঙ্গে সুধাময় ফিরছিলো। সঙ্গে বললে ভুল হবে, সুধাময় গগনকে নিয়েই ফিরছিল। গগনের কোনো সঙ্গীর প্রয়োজন ছিলো না অবশ্য।

গগনকে দাঁড়াতে দেখে সুধাময়ও দাঁড়িয়ে পড়েছিলো।

গগন বললো, 'আপনি চলে যান সুধাময়বাবু, এখানে খানিকটা সময় থাকবো আমি।'

'চারদিকে খুব অন্ধকার কিন্তু।'

হাসলো গগন। সুধাময় ভাবছে গগন ভয় পাবে। অবশ্য ভাবনাটা মিথ্যে নয়। এমন অন্ধকার গগনের মতো লোকেরা দেখতে পায় না। আর সুধাময় সে কথাটা ভালো করেই জানে।

মাঠের দিকে তাকিয়ে গগন বললো, 'আমার জন্যে ভয় পাবার কিছু নেই। আমি খানিকটা সময় এখানে বসে চলে যাবো। পথ আমার চেনাই। আনন্দবাবুকে বলবেন, আমি খানিক পরে যাচ্ছি।'

সুধাময় কি যেন বলতে চাচ্ছে। গগন বুঝতে পারছে, সুধাময় যেতে চাচ্ছে না কিছুতেই। কারণ গগনের পাহারাটা সে শিথিল করতে পারবে না। সুতরাং তাকে রেখে যাবে না সুধাময়।

গগন বললো, 'তাহলে চলুন।'

সুধাময় কুণ্ঠিতভাবে বললো, 'আপনার যদি এখানে দাঁড়াতেই ইচ্ছে হয়, দাঁড়ান না। আমার কোনো কাজ নেই এখন।'

গগন একটুখানি হাসলো। হাজারটা কাজ থাকলেও গগনের সঙ্গে দাঁড়াবে সুধাময়।

কুণ্ঠিত গলায় ফের সুধাময় বললো কথাটা।

গগন বললো, 'না না, এই অন্ধকার মাঠের সামনে কেউ দাঁড়ায় নাকি! কোথায় সাপটাপ আছে। তাছাড়া গ্রামে থাকা তো আমাদের অভ্যেস নেই। কাজেই দুঃসাহস ভালো নয়।'

সুধাময় খানিকটা খুশি হয়েই হাসলো। চোখ ঝিলিক দিয়ে উঠলো সুধাময়ের। গগন অন্ধকারেও সেটুকু উপলব্ধি করতে পারলো। তারপর বললো, 'সত্যি কথাই।'

মাঠের পাশের রাস্তা দিয়ে দুজনে হাঁটতে থাকলো।

মাঠটা বেশ বড়োই। অনেকক্ষণ হেঁটে ফুরোতে হলো মাঠটা। মাঠের গা বেয়েই মেটে রাস্তা একটা। সেই পথে উঠে দুজনে একটু জোরেই হাঁটতে থাকলো।

মাঠের মধ্যে কিছু জোনাকী উড়ে বেড়াচ্ছিলো। এখন এই মেটে পথের ওপর তারা অজস্র ছড়িয়ে আছে। গগনের ফের মনে হলো, সুধাময়কে ফিরিয়ে দিয়ে অনেকক্ষণ এই পথ ধরে একা একা হেঁটে বেড়ালে সে খুব সুখ পাবে। কিন্তু তার উপায় নেই। কারণ সুধাময় তার প্রহরী। তার সঙ্গে সমস্ত সময় ছায়ার মতো ফিরবে। এই অন্ধকার গ্রামের মধ্যে গগনকে রেখে সে যেতে পারবে না। আলোয়, আশ্রয়ে পৌঁছে দেয়া যেন সুধাময়ের দায়িত্ব। সুধাময়কে একটা বিশেষ কিছুর সঙ্গে মনে মনে তুলনা করলো গগন।

আরো একটা কথা মনে হলো গগনের। সুধাময় যেন গগনকে কিছু রেখে যেতে দেবে না এখানে। গগনকে ঘিরে একটা শক্ত দেয়াল হয়ে আছে সে।

সুধাময়ের সঙ্গে গগনের আজ সকালবেলায় এখানে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই পরিচয় হয়েছে। আনন্দবাবুই পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন।

অত্যন্ত সপ্রতিভ এই সুধাময়। দীর্ঘ এবং হাল্কা গড়ন। দেখলে স্পষ্টই মনে হয় সুধাময়ের পায়ের তলার গ্রামের মাটিটুকুতে খাদ নেই।

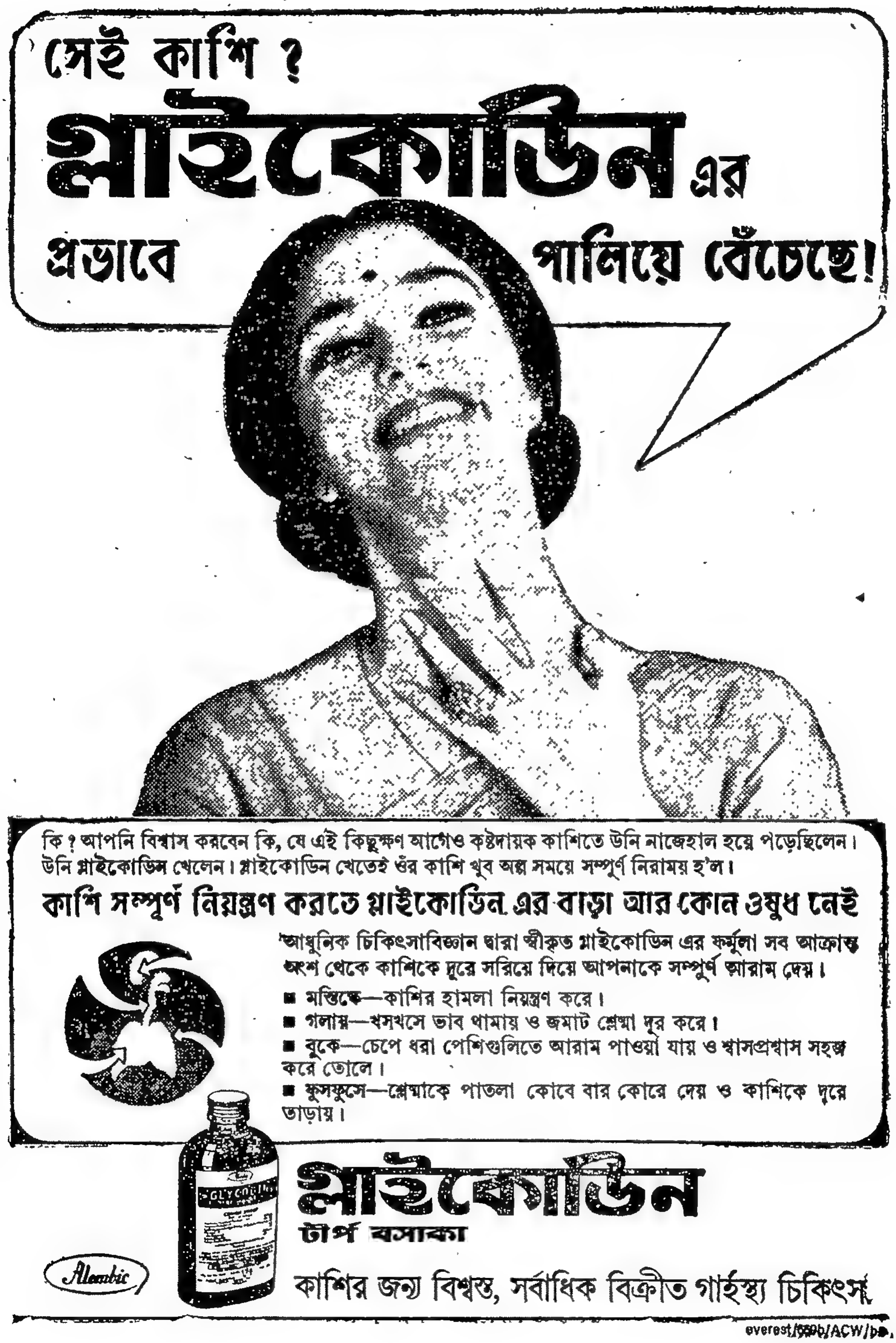
সেই কাশি ?
গ্লাইকোডিন এর
প্রভাবে পালিয়ে বেঁচেছে!
কি ? আপনি বিশ্বাস করবেন কি, যে এই কিছুক্ষণ আগেও কষ্টদায়ক কাশিতে উনি নাজেহাল হয়ে পড়েছিলেন। উনি গ্লাইকোডিন খেলেন। গ্লাইকোডিন খেতেই ওঁর কাশি খুব অল্প সময়ে সম্পূর্ণ নিরাময় হ'ল।
কাশি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করতে গ্লাইকোডিন এর বাড়া আর কোন ওষুধ নেই
'আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান দ্বারা স্বীকৃত গ্লাইকোডিন এর ফর্মুলা সব আক্রান্ত অংশ থেকে কাশিকে দূরে সরিয়ে দিয়ে আপনাকে সম্পূর্ণ আরাম দেয়।
■ মস্তিষ্কে—কাশির হামলা নিয়ন্ত্রণ করে।
■ গলায়—খসখসে ভাব থামায় ও জমাট শ্লেষ্মা দূর করে।
■ বুকে—চেপে ধরা পেশিগুলিতে আরাম পাওয়া যায় ও শ্বাসপ্রশ্বাস সহজ করে তোলে।
■ ফুসফুসে—শ্লেষ্মাকে পাতলা কোরে বার কোরে দেয় ও কাশিকে দূরে তাড়ায়।
গ্লাইকোডিন
টার্প বসাকা
Alembic
কাশির জন্য বিশ্বস্ত, সর্বাধিক বিক্রীত গার্হস্থ্য চিকিৎসা
everest/

আজকে এদিকে-সেদিকে বেড়াবার ফাঁকে ফাঁকে সুধাময়ের অনেক গল্প শুনেছে গগন। তাতে সুধাময় সম্পর্কে আরো একটা ধারণা স্পষ্ট হয়েছে গগনের। গ্রাম ছেড়ে সুধাময় যেতে চায় না। কারণ এই বন-জঙ্গল মাঠ, এখানে তার শৈশব, কৈশোর জমা হয়ে আছে। এই গ্রামেই সে তার জীবনের মুহূর্তগুলিকে গচ্ছিত রেখে যাচ্ছে।

একথা শুনে কিন্তু একটা আশ্চর্য অনুভূতি গগনের মধ্যে জেগে উঠেছে। গগন কোথায় যেন সুধাময়ের চাইতে ছোটো। অনেক ছোটো। গগন এমন একটা জায়গা খুঁজেপেতে পারে না, যেখানে দাঁড়ালে সে অনুভব করতে পারবে, এখানে তার ফুরিয়ে যাওয়া জীবনটুকু গচ্ছিত আছে আর গগন সেখানে গিয়ে মূল্যবান সম্পত্তির মতো তাকে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখতে পারে।

জোনাকীপোকা আর অন্ধকার ঠেলে গগন অন্যমনস্কভাবে হাঁটলো অনেকক্ষণ। সুধাময় ছায়ার মতো সঙ্গে হাঁটছে। এই অন্ধকারের মধ্যেও সুধাময় গগনের ছায়া। ভাবতে গগনের অবাক লাগলো।

সুধাময় তাকে কিছুই রাখতে দেবে না গ্রামের মাটিতে। সুধাময়কে তবু স্বার্থপর মনে হলো না গগনের। বরং নিজেকে লোভী এবং ঈর্ষাকাতর মনে হলো খানিকটা।

গগনকে আনন্দবাবুর বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে সুধাময় চলে গেলো।

আনন্দবাবু বললেন, 'খুব ঘুরে বেড়ালে নিশ্চয়ই। সুধাময় তো ঘুরতে খুব ভালোবাসে। ওর সঙ্গে বেরোলে আর পায়ে কিছু থাকে না।'

গগন বললো, 'ওর সঙ্গে ঘুরে খুব ভালো লাগলো আজকে।'

'ফের কালকে সকালেই আবার ওকে পাবে। বাইরের কেউ এলে ওকে তার সঙ্গে সব সময় দেখতে পাবে। এটা ওর একটা নেশা।' আনন্দবাবু বললেন।

কিস্তিতে ট্রানজিস্টার

মাসিক ১০, কিস্তিতে গ্যারান্টিযুক্ত বিশ্ব-বিখ্যাত ন্যাশানাল—৭০ ৩ ব্যান্ড, অল ওয়ার্ল্ড, পোর্টেবল ট্রানজিস্টার লউন। প্রতি গ্রামে এবং শহরে পাঠান যায়।

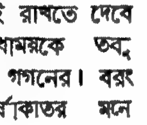

আবেদন করুন:
Music & Sound (—' —10)
P.B. 1576, Delhi—6.

'তাই নাকি!' সামান্য হাসলো গগন।

কিন্তু গগনের স্পষ্টই মনে হলো সুধাময়ের এটা নেশা নয়। খেয়ালের তাগিদে এখানে কাউকে কিছু জমিয়ে রাখতে দেবে না সুধাময়। পায়ের তলায় যাদের খাদশূন্য গ্রামের মাটি নেই তারা মাঠে-জঙ্গলে নদীর তীরে নিশ্চয়ই গভীর পায়ের চিহ্ন ফেলে চলে যেতে পারবে না। সুধাময়কে পাহারাদার বলা ভুল নয়। সমস্ত পায়ের চিহ্ন কুড়িয়ে কুড়িয়ে সে ফেরার সময় ফিরিয়ে দেয় সবাইকে।

গগন সুধাময় সম্পর্কে এই কথাগুলো ভেবে রোমাঞ্চিত হলো। নিজের লোভটাকে চিনে ফেললো। তবু কিন্তু লোভের কাছে হার স্বীকার করলো গগন। মন হলো এখানে কিছু জমিয়ে রেখে গেলে সুখকে সে হাতের মুঠোয় পুরে খেলা করতে পারবে।

গগনকে থেমে থাকতে দেখে আনন্দবাবু ফের বললেন, 'কী ভাবছো?'

'কিছু না।' গগন একটু যেন লজ্জা পেলো হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়ায়।

আনন্দবাবু বললেন, 'তোমার বই পড়া অভ্যেস বলে খানকয়েক বই আনিয়ে রেখেছি। তোমার ঘরের টেবিলেই সাজানো আছে সেগুলো।'

খুশি হয়ে উঠলো গগন। বললো, 'লাইব্রেরী থেকে আনিয়েছেন নাকি?'

'এখানে লাইব্রেরী আছে একটা। তবে সপ্তাহে দু'দিন বই দেওয়া হয় সেখানে। আগামী কাল বই দেবার তারিখ। কাজেই অশোকবাবুর বাড়ি থেকে আনিয়েছি বই। ওর এক মেয়ে কলকাতায় থেকে কলেজে পড়ে। তার খুব নেশা বই পড়বার আর কেনবার।' আনন্দবাবু বললেন।

নানা গল্পে রাত্রিটা এগিয়ে গেলো অনেকখানি। বইগুলো দেখবার জন্য আগ্রহ হচ্ছিলো গগনের। কিন্তু খাওয়া-দাওয়া সেরে ঘরে আসা পর্যন্ত গগনকে অপেক্ষা করতে হলো। কারণ আনন্দবাবু এই সময়টুকুর মধ্যে এতোটুকু সময় ছুটি দেন নি গগনকে।

ঘরের টেবিলের ওপর খানপাঁচেক বই।

গগন বইগুলো নেড়েচেড়ে দেখলো একবার। সুস্থ রুচি আছে মেয়েটির। গগনের মনে হলো।

একখানা বই খুলে মেয়েটির নামও জেনে ফেললো গগন। চন্দনা বোস। পরিপাটি করে নামটি লেখা। লেখার মধ্যে কোনো বাহুল্য নেই। গগনের হাতের লেখাটিও ভালো লাগল।

চন্দনা সম্পর্কে খানিকটা সময় পরিচ্ছন্ন চিন্তায় ফুরিয়ে ফেললো গগন। তারপর আলোটা আরো খানিক বাড়িয়ে বিছানায় শুয়ে একখানা বই মেলে ধরলো চোখের সামনে।

আজ সকালে গগন এসেছে এখানে। কোনো কাজ নয়, দু'টো দিন এখানে বেড়িয়ে যাওয়া। আনন্দবাবুর ইচ্ছে তাকে বেশি করে টেনে এনেছে এখানে। আনন্দবাবু গগনের সঙ্গেই কাজ করতেন এক সময়। সে বছর তিনেক আগের কথা। অফিসের মধ্যেই গগনের সঙ্গে একটা আশ্চর্য হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিলো আনন্দবাবুর।

আনন্দবাবু নিয়মিত গগনকে এখানে নিয়ে আসতে চাইতেন তখন। কিন্তু গগন আসতে পারে নি। দু'দিনের ছুটি হলেও গগন কোথাও যেতে পারতো না। বাবা তখন অসম্ভব অসুস্থ ছিলেন। বাবার পাশে তার দিনের বেশি সময়টুকু কেটে যেতো। তাছাড়া ওর মধ্যেই সময় করে গগনকে ডাক্তার, ওষুধ, পথ্য ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হতো। ব্যবস্থা করবার যে কেউ ছিলো না, তা নয়। ছোটো ভাই প্রবীর ছিলো। কিন্তু গগনের নিজের মনে হতো সে নিজের হাতে এ সব না করলে বোধহয় গোটা ব্যবস্থার মধ্যে একটা ফাঁক থেকে যাবে। গগন সেই ফাঁকটুকু থাকতে দিতে চাইতো না।

তাছাড়া গগন অনুভব করতে পারতো, বাবা নিজেও যেন সেটাই চাইতেন একান্তভাবে। শনিবার রবিবার কিংবা ছুটির দিন বাবার চোখে-মুখে একটা স্বস্তির চিহ্ন ফুটে উঠতো। কারণ বাবা জানতেন গগন অধিকাংশ সময় সেদিন তার পাশেই থাকবে। ডাক্তার ওষুধ এবং পথ্য আসবে সেদিন। একটা নিশ্চিন্ত নিশ্বাস সেদিন গলির মধ্যেকার ছোটো ঘরটাকে বিশাল এবং উন্মুক্ত করে ফেলতো।

সে জন্যেই আনন্দবাবুর সামনে খুব বিপন্ন বোধ করতো গগন।

তারপর আনন্দবাবু একদিন রিটায়ার করলেন। গগন সেদিন বলেছিলো, 'এবার একদিন যাবো। বাবা প্রায় ভালো হয়ে এসেছেন।'

আনন্দবাবু হেসে বলেছিলেন, 'তোমায় আর যেতে বলবো না।'

তবু তারপর আর সময় করে উঠতে পারে নি গগন। সময় করলেও যেহেতু তাড়া ছিলো না সেহেতু যাওয়াও হয় নি।

হঠাৎ আজ সকালে কি খেয়াল হতেই সঙ্গে সঙ্গে তৈরি হয়ে গগন বেরিয়ে পড়েছে। দু'দিন ছুটি আছে। এ দু'দিন আনন্দবাবুর বাসায় কাটিয়ে যাবে গগন।

বইখানার একলাইনও পড়া হলো

না। বইখানা বন্ধ করে গগন পাশ ফিরে শুলো। উজ্জ্বল আলোটা চার দেয়ালে বন্দী হয়ে আছে বলে আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আলোর ফিতেটাকে কমাতে গিয়েও কমালো না গগন। আলোর দিকে তাকিয়ে শুয়ে রইলো।

সকালে দেরি করে ঘুম থেকে উঠে গগন বাইরে এসে দাঁড়ালো। কিড্স ব্যাগটায় পেস্ট এবং ব্রাস থাকা সত্ত্বেও গগন দাঁত মাজবার জন্য একটা দাঁতন পেতে ইচ্ছে করলো। একটু এগিয়ে রাস্তার ওপিঠে দাঁতনের একসার গাছ। গেট পেরিয়ে বাইরে রাস্তায় এলো গগন।

রোদ্দুরে চারদিক ভরে গেছে। নারকোল সুপুরী গাছের ওপর ঝলকে উঠেছে রোদ্দুর। ছোট-বড়ো গাছ, বিশৃঙ্খল এবং নানারকমের বাড়ি, মেঠো পথ, ঝোপ-ঝাড় নির্জনতা গগনকে ভরে দিলো হঠাৎ। আস্তে আস্তে হাঁটতে থাকলো গগন।

সুধাময় আসছে। সুধাময়কে চিন্তিত দেখাচ্ছে।

কাছাকাছি এসে সুধাময় বললো, 'ঘুম থেকে উঠেই বেরিয়েছেন মনে হচ্ছে।'

'হুঁ।'

'কোথায় যাচ্ছেন?'

'দাঁতন ভাঙবো।'

হো হো করে হেসে উঠলো সুধাময়। বললো, 'দাঁতনে হঠাৎ একদিন দাঁত মেজে ভালো লাগবে না। ওটা একটা অভ্যেস।'

'গ্রামে এসে দাঁতনে দাঁত মেজে আরাম পাবো নিশ্চয়ই।' গগন হাসলো।

'গ্রামে এলেও দাঁত, মাড়ি, মুখ তো আপনার নিজের নিশ্চয়ই।'

গগন স্পষ্টই বুঝলো সুচতুর পাহারাওয়ালার মতো তাকে রুখে দিয়েছে সুধাময়। গগনের এখন ক্ষমতা নেই এগিয়ে গিয়ে দাঁতন ভেঙে আনে।

'কি, ঘরে আসবেন নাকি কিছুটা?' সুধাময় হেসে শুধালো।

গগন বললো, 'না। ফিরে যাবো বাসায়।'

দুজনে নিঃশব্দে ফিরতে থাকলো।

আনন্দবাবু বলেন, 'সুধাময়ের এটা একটা নেশা।' কিন্তু আবারও গগন অনুভব করলো সুধাময়ের নেশা নয় এটা। কাউকে খেয়ালের তাগিদে এখানে কিছু ফেলে রেখে যেতে দেবে না সুধাময়। সমস্ত পায়ের চিহ্ন কুড়িয়ে কুড়িয়ে সে ফেরার সময় ফিরিয়ে দেয় সবাইকে।

ফিরে অনেকটা সময় ধরে দাঁত মাজলো গগন। মুখ ধুয়ে কয়োতলা থেকে ফিরে এসে দেখলো সকালের জলখাবার তৈরি।

সুধাময় বাইরের ঘরে বসেছিলো। আনন্দবাবুর সঙ্গে গল্প করছিলো। গগন বাইরের ঘরে আসতেই সুধাময় বললো, 'কোথাও যাবেন নাকি?'

গগন বললো, 'না।'

'আমার কিন্তু কোনো কাজ নেই।' হাসলো সুধাময়।

গগন কিছু বললো না। আনন্দবাবু বললেন, 'ওর টেবিলে একগাদা বই রয়েছে। বাইরে কি আর যাবে ও।'

কিন্তু না যাবার কারণটা যে তা নয়, গগন তা বললো না।

কেবল লজ্জিত চোখে হাসলো।

'তাছাড়া কাল হেঁটে হেঁটে বোধহয় পায়ে আর কিছু নেই।' আনন্দবাবু ফের বললেন।

সুধাময় বললো, 'হাঁটার ব্যাপারে কলকাতার মানুষ সবচেয়ে পেছনে।'

কিছু একটা বলা দরকার বলেই গগন বললো, 'তা যা বলেছেন।'

খানিক পরে সুধাময় চলে গেলো। আনন্দবাবু আর গগন শুধু রইলো বাইরের ঘরে।

জানালার পাশে সজনের ডালে চড়ুইগুলো নেচে বেড়াচ্ছে। গগন দেখলো। কিন্তু সুধাময়ের শূন্য চেয়ারটার মধ্যে তারই অস্তিত্ব কল্পনা করে গগন নির্লিপ্ত চোখে দেখতে দেখতে একসময় উঠে নিজের ঘরে এসে বই নিয়ে বসলো। স্নানে যাওয়া পর্যন্ত আর উঠছে না সে।

সারাটা দিন বইয়ের মধ্যে আর আনন্দবাবুর সঙ্গে গল্পে কাটলো গগনের।

বিকেলের রঙ লাল হতেই সুধাময় এলো। সুধাময় যেন ছিলই। জানান দিলো এতোক্ষণে।

আনন্দবাবুর ইচ্ছায় এবার বেরুলো গগন।

আকাশ, মাঠ, বন, ক্ষেত ইত্যাদি কিছু দেখলো না গগন। মনের মধ্যে একটা ইচ্ছাকে শুধু শক্তিশালী করে তুলতে থাকলো। সুধাময়কে, পাহারাওয়ালাকে, সে নিশ্চয়ই ফাঁকি দেবে।

ফেরার পথে আনন্দবাবু বললেন, 'কেমন লাগলো গ্রামকে?'

'চমৎকার।'

'বলেছিলুম না চমৎকার লাগবে।' অত্যন্ত খুশি গলায় বললেন আনন্দবাবু।

সন্ধ্যের পর বাড়িতে ফিরে অনেক রাত পর্যন্ত আনন্দবাবুর সঙ্গে বসে রইলো গগন। তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে অনেক রাত্রে এসে ঘরে বসলো। উসকে দিলো আলোটা। দেয়ালে বন্দী আলোটা আরো অনেক উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

বই খুলে চন্দনা বোসের নাম দেখলো গগন। সুস্থ ভাবনায় খানিকটা সময় ফুরিয়ে ফেললো আজ রাত্রেও। বই পড়তে ভালো লাগলো না বলে রাত্রিকে গভীর হতে দিয়ে গগন ছাদের দিকে মুখ করে শুয়ে পড়লো।

হাতঘড়িটা হাতেই বাঁধা আছে গগনের। হাত তুলে একবার সময় দেখলো গগন।

আস্তে আস্তে সমস্ত বাড়িটা নির্জন হয়ে গেলো। আনন্দবাবুর নাক ডাকছে খুব জোরে। দূরে কোথায় যেন কুকুর ডাকছে।

তবু আরো দশ মিনিট সময় অতিক্রান্ত হতে দিলো গগন। তারপর উঠে গায়ে জামাটা চাপিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো বাইরে। আজ সমস্ত রাত সে সেই অন্ধকার পথ দিয়ে হাঁটবে। মাঠের মধ্যে শুয়ে থাকবে। মুঠো মুঠো জোনাকীপোকা ধরে উড়িয়ে দেবে।

রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো গগন।

একটা রাতে সে কোটি কোটি পায়ের চিহ্ন এঁকে যাবে সুধাময়ের পাশে পাশে। সুধাময় ঠকে যাবে।

কিন্তু ও কি, বাইরে কে? সুধাময়কেই তো মনে হচ্ছে।

'কে?' অস্পষ্ট গলায় বললো।

উত্তর নেই।

পর পর এবার তিনবার প্রশ্ন করলো গগন। সুধাময় নড়লো না, সরলো না, উত্তর দিলো না। গগন বুঝলো সুধাময়কে ফাঁকি দেয়া যাবে না। নির্ঘুম সুধাময় সতর্ক পাহারাওয়ালার মতো তাকে পাহারা দিয়ে চলেছে।

দ্রুত পিছিয়ে গগন দরজা বন্ধ করে দরজা থেকে খানিকটা সরে এলো। আর সঙ্গে সঙ্গে স্পষ্টই বুঝতে পারলো, ওখানে কেউ দাঁড়িয়ে নেই। সুধাময় তো নয়-ই। তার ভাবনাটাই ওখানে দাঁড়িয়ে।

ফের এগিয়ে দরজা খুলতে চাইলো গগন, পারলো না। কারণ গগন যেন অনুভব করলো সুধাময়কে ঠকিয়ে সুধাময়ের গ্রামের মাটিতে কিছু জমিয়ে রাখা যায় না।

কিস্তিতে ট্রানজিস্টর
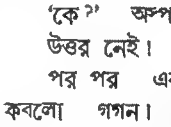
HAVA
৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড
পোর্টেবল ট্রানজিস্টর মাসিক ৫ টাকা কিস্তিতে। প্রত্যেক গ্রাম ও শহরে পাওয়া যাইতে পারে।
HAVA SALES (34) SHAKTI NAGAR, DELHI-7

লোকসংগীতের একাল না আকাল?

মুরশিদ

কবি জসিমউদ্দীনের সঙ্গে আলোচনা গড়িয়ে গড়িয়ে আধুনিক যুগে এসে পড়লো। প্রথম সাক্ষাতে তিনি বলেছিলেন, 'আর যাই বলুন এখন পল্লীগীতি সর্বজনপ্রিয়, তাকে জনপ্রিয় করার জন্য আমাদের মতো এখন আর কষ্ট করতে হয় না।' সেই কথারই জের টেনে আমি তাঁকে বললাম, এই জনপ্রিয়তাই এখন কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে আজ এই 'জনপ্রিয়তা'র বিরুদ্ধেই আমাদের লড়াই। এ লড়াই আপনাদের আমল থেকে বহুগুণ কঠিন। আপনার কাছে আমার এ বক্তব্যটাই বিশেষভাবে রাখতে চাই। এখানে 'জনপ্রিয়' শিল্পী, সাহিত্যিক লোকগীতিকার—এ'দের কারও প্রাণসত্তা নেই। এ'রা হ'লেন সবাই 'ট্রেডমার্ক'। প্রচারিত 'জনপ্রিয়' পণ্য। এ'রা 'বক্স-অফিসে' বাস করেন। এ'রা গান করেন না, গলা বেচে খান।

জনপ্রিয়তার দু'-একটি নমুনা আপনার সামনে হাজির করতে চাই। গত বছরের শারদ অর্ঘ্যের থালা থেকেই একটি আধুনিক পল্লীগীতির 'পুষ্প' আপনাকে উপহার দিতে চাই। একজন 'জনপ্রিয়' গীত রচয়িতার বাগান থেকেই এই ফুলটি এসেছে। রেকর্ড আরম্ভ হওয়ার আগে—রচনাটি একটু শুনুন।

"ঝুনুর ঝুনুর পায়
সুন্দরী যে যায়
ইতি উতি চায়, সুন্দরী যে যায়
ও শাড়ির ভাঁইজে ভাঁইজে
থাইকা থাইকা রে
যেন বিজুলি চমকায়।
কাঁচা অঙ্গে ঢেউ উঠেছে
রসে টলমল
আহা পদ্মমধু খেয়ে ভ্রমর
হয়েছে পাগল
ঈষৎ কটাক্ষে সে যে মন ভুলায়।"
......ইত্যাদি।

এই রচয়িতারই দ্বিতীয় গানটি হলো:

"ডাগল দীঘল চোখে কন্যা
যার পানে চায়
ভুজঙ্গী হইয়া কন্যা ছোবল মারে গায়।
বিষের জ্বালা বড়ই জ্বালা
ঔষধে নাহি তায়
এ জ্বালা যে সুখের জ্বালা
অঙ্গ শীতল হইয়া যায়।"
......ইত্যাদি।

এই রচনার কোনো বিশদ বিশ্লেষণ না করে শুধু বলব, বাক্যভঙ্গি শুনলেই মনে হয় শহরের কোনো Eve-teaser বা বিড়িফুঁক ক্ষুদে মস্তান পাড়ার কোনো 'ভুজঙ্গী' আধুনিকার দিকে শিস দিয়ে গান গাইছে। এ কোন্ গ্রাম্য মেয়ে?

এর পাশাপাশি মৈমনসিংহ গীতিকার দু'টি কলির উদ্ধৃতি দিতে চাই:

"সাপের মাথায় যেমন থাইক্যা
জ্বলে মণি
যে দেখে পাগল হয় বাদ্যার নন্দিনী।
হাটীয়া না যাইতে কইন্যার পায়ে
পড়ে চুল,
মুখেতে ফুট্টা উঠে কনকচাম্পার
ফুল।

বেদের মেয়ে সাধারণ গ্রাম্য মেয়ে নয়। তার মাথায় সাপের মণি জ্বলে। 'পাহাড়ীয়া তক্ষকের বিষ শিরে বান্ধা' ভাব। 'সুতের শেওলা হৈয়া' যে দুরন্ত মেয়েটি ঘাটে-ঘাটে ঘুরে বেড়ায়—তারও কটাক্ষ আছে, তবু সে কিন্তু এরকম 'ফ্লার্ট' করে না। তার প্রেমের গভীরতা পাঠককে স্পর্শ করে। এই বেদের মেয়েটিও গ্রাম্য মেয়ে। আমাদের চিনতে ভুল হয় না।

অবশ্য সুরের বিচার না করে শুধু রচনার আলোচনায় গানের সমীক্ষা কখনো সম্পূর্ণ হতে পারে না। সে আলোচনায় আমি এক্ষুণি আসছি। আমাদের আলোচ্য রচয়িতা সেই শারদ অর্ঘ্যের থালায় আরো নানা উপচার সাজিয়েছেন। পল্লীসাহিত্যে ছেলে-ভুলানো ছড়া, মেয়েলী ছড়া, ঐন্দ্রজালিক ছড়া ইত্যাদি অনেক রকমের ছড়া আছে। এই ছড়াগুলির ভাঙা বাক্য, ধ্বনি এবং দুর্বোধ্যতার মধ্যে এমন একটি সহজ চিত্র পাই—যা একান্তই পল্লীর। কিন্তু আজকের 'জনপ্রিয়' গীত রচয়িতা ছড়ার অবলম্বনে একটি আধুনিক Nonsense Rime লিখেছেন—গেয়েছেন একজন অতি 'জনপ্রিয়' চিত্রতারকা, নাম কিশোরকুমার। দীর্ঘ ছড়াটির কিছু উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

বম বম মকু
প্রাণ হাঁকু পাঁকু জান হাঁকু পাঁকু
রাম রাম কুক্ কুক্ লা বৌ টুকটুক
দুধ খায় চুক চুক
চামচিকে চিকে বাম চিকে চিকে
বম বম চিকে বম, বম চিকে বম বম

....

বম বম চিকে রম, বম চিকে বম বম
যদু মাস্টার শ্বশুর-বাড়ি,
রেলকম ঝমাঝম পা পিছলে
আলুর দম

....

জালাভরা চিটেগুড়
চৌরঙ্গী চিৎপুর
মধুপুর, বোলপুর
ভাগলপুর, ছাগলপুর
রাঁচী রাঁচী পাগলপুর॥
......ইত্যাদি।

এ দীর্ঘ ছড়াটি শুনলে কেবল একটি কথাই মনে থাকে 'রাঁচী রাঁচী পাগলপুর।'

এই জনপ্রিয় রচয়িতা পুজোর থালায় বহু রকমের নৈবেদ্য নিবেদন করেছেন। একটি অতি আধুনিক গানও রচনা করেছেন এবং তা গেয়েছেন বোম্বের একজন 'টপ' শিল্পী, আশা ভোঁসলে।

"এই এসো না—কাছে এসো না প্লীজ
—আসবে না? (সংলাপ)
এই এদিকে এসো এসো না
কথাটি শোন শোন না প্লীজ
(ও) কেন দূরে দূরে সরে থাকো?॥

....

কবি জসিমউদ্দীনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—'এমন সব্যসাচী রচয়িতা কি আপনাদের আমলে সম্ভব ছিল? রবীন্দ্র-নজরুল-অতুলপ্রসাদের দেশে তাদের উত্তরসাধক অজয় ভট্টাচার্য, প্রণব রায়, সুবোধ পুরকায়স্থ, শৈলেন রায়, হিমাংশু দত্ত সুরসাগর, সুধীরলাল প্রমুখ ছোট বড়ো রচয়িতা বা গীতিকারের পক্ষে কি এই কৃতিত্ব অর্জন করা সম্ভব ছিল?'

রেকর্ড প্লেয়ারটি প্রস্তুতই ছিল। প্রথম গানটি বাজিয়ে শোনালাম। বলুন, লেবেলে লোকসঙ্গীত লেখা না থাকলে কি একে বারোয়াজারী আধুনিক থেকে আলাদা করা যেতো? গানখানা গেয়েছেন এখনকার সবচেয়ে 'জনপ্রিয়' একজন লোকসঙ্গীত শিল্পী। শহরের 'ভুজঙ্গী ছোবলমারা' মেয়ের চলনকে অনুসরণ করে সুর সংযোজনা করতে হলে, সুরকেও কোমরভাঙা দুলকীছন্দে বাঁধতে হয়। সুরাশ্রয়ী সুরের 'পাত্র' চাই। শুধু রচয়িতা ও গায়ককে দোষ দিচ্ছি না—শ্রোতাদেরও এই চাহিদা।

আপনার 'স্মৃতিপটে' আছে আপনাদের আমলে গ্রামোফোন কর্তারা—খাঁটি লৌকিক সুরে আপত্তি করতেন না বটে

তবে আনকোরা পল্লীগলা নয়—একটু 'ঘষামাজা গলা' চাইতেন। কিন্তু এই ঘষামাজারও শ্রেষ্ঠ রূপ সেদিনকার জনপ্রিয় আব্বাস বা শচীন দেব, যাঁদের কণ্ঠে পল্লীর গায়কী ও ভঙ্গি ছিল অটুট। কিন্তু আজ সেই ঘষামাজার প্রক্রিয়ার মসৃণতার রিফাইনারিতে গ্রাম্যতার 'ক্রুড্ অয়েল' একেবারে পেট্রল হয়ে বেরুচ্ছে। গ্রামোফোন কোম্পানী কয়েকমাস আগে লোকসঙ্গীতের একটি 'লং প্লে' রেকর্ড বের করেছেন মূলত বিদেশী বাজারের ভরসায়। কারণ এদেশে ৩৬৲ টাকা দিয়ে রেকর্ড ক'জন কিনতে পারে? যাহোক বিদেশের বাজা'র আমাদের দেশের লোকসঙ্গীত যাবে, এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কি থাকতে পারে? কোম্পানী কাগজে বিজ্ঞাপন দিলে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে গ্রাম্য গায়করা অবশ্য 'অডিশন' দিতে আসতেন। এখনও গ্রামের শিল্পীরা সব মরে যায় নি। কিন্তু গ্রামোফোনের কর্তারা তো তা চান না। কোথাকার গান, কি গান, সেসব পরের কথা। কে গাইলো, তাদের বাজারদর আছে কি-না সেটাই বড় কথা। কাজেই প্রথমে, গায়ক তাঁরা ঠিক করে ফেললেন। সিনেমায় যেমন আজকাল 'স্ক্রিপ্ট' তৈরির আগে স্টার অভিনেতা ঠিক হয়ে যায়,—কিম্বা স্টার অভিনেতাকে সামনে রেখেই 'স্ক্রিপ্ট' তৈরি করা হয়—তেমনি। যাহোক 'ঘষামাজা' গলার রীতির কথা বলছিলাম। এই 'লং প্লে' তার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এতে দু'-তিনজন আছেন তাঁরা কোনদিন লোকসঙ্গীত করেন না। কিন্তু তবু এঁদের সুরেলা মসৃণতা এবং আধুনিক গানে 'জনপ্রিয়তা'র জন্যই এঁরা নির্বাচিত হয়েছেন। এবার শুনুন আপনার আমলের একজন গায়িকার গান। নাম ললিতা দেবী। এতক্ষণ কবি জসিমউদ্দীন একেবারে চুপ করে ছিলেন। ললিতা দেবীর নাম শুনেই তিনি সপ্রশংস উক্তি করে—এই গায়িকার সঙ্গে একসময়ে তার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের কথা বললেন। সংগৃহীত পুরনো রেকর্ডটি বাজালাম। গানটি হলো:

তুই ক্যানে ফাঁকি দিলি রে
কি অপরাধ পাইয়া
আমি কি দুষে হৈলাম রে দুষী
গেলি না বলিয়া-রে
চন্দ্রছাড়া নিশি যেমন শস্যছাড়া ভূমি
স্রোতছাড়া নদীর মতন তুমিছাড়া
আমি-রে
কি অপরাধ পাইয়া
......ইত্যাদি।

এই পুরনো গায়িকার পুরুষালী গলার রেকীতে এমন একটি মাটির গন্ধ ছিল যাতে ঘর ভরে উঠেছিল। অথচ গলাটি ত' 'ঘষামাজা' নয়। 'ঘষামাজা'র প্রক্রিয়ায় ফেললে এই মাটির গন্ধ থাকতো না।

এবার টেপ রেকর্ডারে এ যুগের একটি গলা শুনুন। জীবন্ত দুষ্প্রাপ্য গলা। গৌরীপুরের প্রতিমা বড়ুয়া। আসামের গোয়ালপাড়া জেলার গৌরীপুর অঞ্চল—ভাষায় ও সুরে উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সংস্কৃতির অন্তর্গত হলেও গৌরীপুরের একটি চমৎকার আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য আছে। বিষয়বস্তুতেও তার একটি স্বকীয়তা আছে। এই বৈশিষ্ট্যের শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি—প্রতিমা বড়ুয়া। গানটি প্রথমে শুনুন।

হস্তীর কন্যা হস্তীর কন্যা
বামুনের নারী
মাথায় নিয়া তাম্ কলসী
হস্তে সোনার ঝারী।
......ইত্যাদি।

হাতী কি করে বামুনের নারী হল—তার পিছনে আছে একটি স্থানীয় লোককাহিনী। ভুটান সীমান্তে গভীর জঙ্গলে পিতার সঙ্গে হাতী ধরার অভিযানে গিয়ে রাত্রির তাঁবুতে অরণ্যের সুরে তার গলা সাধা। বন্দী বন্য হাতীকে বশ করার সময় মাহুতে এ-গানটি গায়। গলায় কী মাদকতা। অথচ গলাটি 'ঘষামাজা' বলতে যা বোঝায় তা নয়। কোথায় যেন একটা বন্যতা আছে। বাংলাদেশে যদি সত্যি শ্রোতা থাকতো তবে তার গান ছড়িয়ে পড়তো চারদিকে। কিন্তু রেকর্ড কোম্পানী বা রেডিও এ-ধরণের শিল্পীকে জনপ্রিয় করার কথা ভাবতে পারেন না। গানের বিকৃতি কিন্তু রেডিওতে ইদানীং খুব চলছে। আপনাদের সময়ে কিন্তু এ-ধরণের শিল্পীকে জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করা অনেক সহজ ছিল। অবশ্য আজকের নাগরিক শ্রোতার সামনে উপস্থিত করাতেও আরেক বিপদ। 'জনপ্রিয়তা'র পিচ্ছিল পথে 'ঘষামাজার' প্রক্রিয়ায় গলার 'গ্রাম্যতা' বা 'বন্যতা' সব উবে যায়। আর উবে যাবার প্রক্রিয়ার সঙ্গে মিশে আছে কালোটাকা—যার পরিমাণ সে আমলে আপনারা কল্পনাও করতে পারতেন না। আজকের 'ঘষামাজায়' আব্বাসউদ্দীন বা শচীন দেববর্মণ আর তৈরি হয় না। এই বিষচক্রের গোলকধাঁধায় আমরা পড়েছি। সংক্ষেপে আপনাদের আমল আর এ আমলের ফারাকটা তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আপনাদের আমলে আপনারা (১) সাময়িকভাবে আপোষ করছিলেন।

এ আমলে—একেবারে 'সারেন্ডার'।

সে আমলে (২) আক্রমণটা শুধু গ্রাম্য ভষার বিরুদ্ধে এসেছিল। সুরটাকে অক্ষত রাখা হতো।

এ আমলে—সুরকে বিকলাঙ্গ করেই সুরু। তারপরে ভাষা ও বাক্যবিন্যাস। তার সঙ্গে গোদের ওপর বিষফোড়ার মত মিউজিক।

সে আমলে (৩) গ্রামের পথে কলকাতায় আসা যেতো। আপনারা অনেক লোককবি ও গীতিকারকে এ মহানগরে এনেছেন। এমন কি গ্রামোফোন কোম্পানী স্কাউট পাঠিয়ে লোকশিল্পীর সন্ধান করতেন।

এ আমলে—সে পথ বন্ধ। শুধু কলকাতার বিশেষ লেবেলে তৈরি পণ্য গ্রামে চালান যায়।

সে আমলে (৪) সুরের শুচিতা, যশ ও অর্থের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য ছিল।

এ আমলে—যশ বা জনপ্রিয়তার সাথে শুচিতা একঘরে বাস করতে পারে না। তা না হলে অর্থের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে।

সে আমলে (৫) সংগঠিত অপসংস্কৃতির এভাবে 'রাগী ছোকরা'র জীবনদর্শন নাগরিক শ্রোতাদের মধ্যে এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে নি—যে কারণে আপনারা কলেজে কলেজে পল্লীগীতির প্রচার করত পেরেছিলেন।

এ আমলে—পি এল ৪৮০-র রসদ খাওয়া ভারতীয় শ্রী৪২০-র চেলাদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে খাঁটি পল্লীগীতিকে প্রতিষ্ঠা করা আপনার আমলের চেয়ে হাজার গুণ কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আপনি ঢাকায় ফিরে যাবার আগে এ সমস্যাগুলি উপলব্ধি করে যান—আমার একান্ত ইচ্ছা, কারণ আজকাল মাঝে মাঝে ঢাকা রেডিওতেও কলকাতা উঁকিঝুঁকি মারছে। কবি জসিমউদ্দীন কিন্তু চুপ করে শুনছিলেন। কোন মন্তব্য করেন নি।

টেপরেকর্ডার বন্ধ হয়ে যাবার পর একান্তে আমাকে বললেন, "সব সময় কি উচিত কথা বলা যায়?"

খবর বলছি

আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে প্রতি রবিবার, সকালে সংগীত শিক্ষার আসর বসে। সংগীত শিক্ষার্থীদের কাছে এই আসর আকর্ষণীয়। কিন্তু এই আসরে রবীন্দ্রসংগীতই বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়ে আসছে। যিনি ঐ আসরে রবীন্দ্রসংগীতের শিক্ষা দিয়ে থাকেন তিনি যোগ্য ব্যক্তি। এবং রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষাদানের ব্যাপারে তাঁর যোগ্যতা বিশেষভাবে স্বীকৃত। সুতরাং ঐ আসরে শুধু রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার ব্যবস্থাই প্রচলিত থাক। তাছাড়া রবীন্দ্রসংগীতের প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্য, সেই সংগে রবীন্দ্রসংগত শিক্ষার্থীদের আগ্রহের কথা বিবেচনা করলে প্রতি রবিবারের সকালে সংগীত শিক্ষার আসরে রবীন্দ্র-সংগীত শিক্ষাদানের প্রাধান্য অস্বীকার করা যায় না।

এতদসত্ত্বেও আমাদের কাছে যে-অভিযোগ আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের শ্রোতাদের কাছ থেকে আসছে, তা হচ্ছে এই যে, আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে বারবার টেপ রেকর্ড বাজিয়ে সময় নষ্ট না করে ও অযথা তাতে ব্যয় বাড়ানো বন্ধ করে অন্য একটি আসরের মাধ্যমে সেই সময়ে ও অর্থে নজরুল সংগীত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হোক।

বলা বাহুল্য, শ্রোতাদের এই ধরণের আবেদনে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষের উচিত নজরুল সংগীত শিক্ষাদানের জন্য একটি নতুন আসর খোলার ব্যবস্থা করা।

নজরুল সংগীতের প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্য সম্বন্ধে এখন প্রায় সবাই একমত। একমাত্র কাজী নজরুল ইসলামই ঐক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের সংগে তুলনীয় হতে পারেন। একদা নজরুল সংগীত বাংলা দেশের আকাশ-বাতাস নিত্য মুখর করে তুলতো। গ্রামোফোন রেকর্ড, চলচ্চিত্র—সর্বত্রই নজরুল সংগীতের মূল্য স্বীকৃত হয়েছিল। তারপর কালাতিক্রমে কবির রোগদশা ও স্মৃতি বিলুপ্তির সংগে সংগে কোথা থেকে এলো মরা কোটাল। মাত্র কয়েকজন নজরুল সংগীতানুরাগী গায়ক-গায়িকা নজরুল সংগীতের মর্ম উপলব্ধি করে সেই গান প্রচার করতে সুযোগ না পেয়েও তাকে নিজেদের মধ্যে জিইয়ে রাখলেন। এমন কি, সেই সময়, আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের প্রচারিত গানের সংগে যাঁরা যোগাযোগ রেখেছিলেন, তাঁরা ভালোভাবেই জানেন যে, যে-নজরুল একদা আকাশবাণীর সংগে যুক্ত ছিলেন, তাঁর সংগীত সেখানেই কিভাবে অবহেলিত হোল।

অবশ্য, এরপর হঠাৎ হাওয়ার পরিবর্তন হোল। যে চাকাটা কাদায় আটকে গেছিল সেটা এক মুহূর্তে ঘুরতে ঘুরতে সামনের দিকে এগোতে সুরু করলো। নজরুলের স্বদেশ সংগীতগুলিকে আকাশবাণী থেকে প্রচারের ব্যবস্থা করা হোল। কর্তৃপক্ষ, এরপর, আরো কিছুটা এগোলেন। হয়তো না এগিয়ে উপায় ছিল না, কারণ অগ্রণী দল-একটি নজরুলোনুরাগী প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সাড়া পেয়ে জনসাধারণের মধ্যে যে বিপুল আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল, সেই আগ্রহ প্রশমিত করার একমাত্র উপায় বহু প্রচারিত কিছু নজরুল সংগীত পরিবেশন।

আমরা জোর দিয়ে বলতে চাই, আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ ঐভাবে 'ঘুড়ি ছুঁয়ে' খুব দায়িত্ব পালন করছেন ভাবলে তা ভুল হবে। নজরুল সংগীতগুলিই এখন শুধু হারিয়ে যাবার পথে নয়, তাঁর গানের স্বরলিপিগুলি পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে। এর ওপর বিপদ হচ্ছে এই যে, নজরুল সংগীত শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে ব্যবসায়ী মনোবৃত্তিসুলভ ব্যক্তিরা ভুল স্বরলিপি সহ নজরুল সংগীত শিখিয়ে নজরুল সংগীতের সর্বনাশ সাধন করছেন। এই অবস্থা থেকে উদ্ধারকল্পে আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন নজরুল সংগীত শিক্ষার আসর বসিয়ে—দশজন পত্রদাতার ঐ মূল্যবান অভিমতের

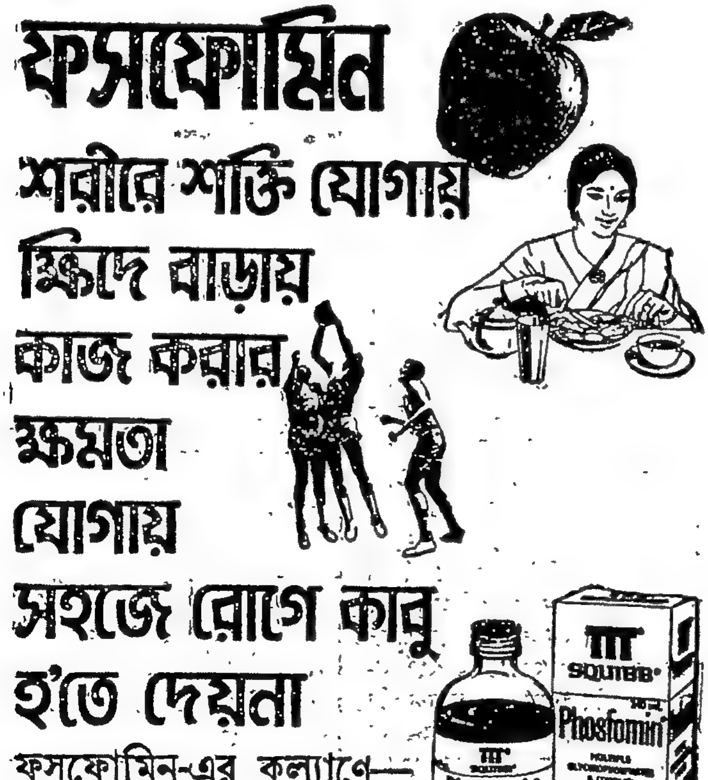

সঙ্গে আমরা একমত এবং ঐ ব্যাপারে আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ যথাকর্তব্য করবেন বলে আমরা মনে করি।

তবে এই প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা বলা উচিত। প্রথম কথা হচ্ছে, নজরুল সংগীত শিক্ষাদানের ব্যাপারে নজরুল সংগীতজ্ঞদের কাছ থেকেই সাহায্য গ্রহণ করা উচিত। কারণ 'বিশ্বভারতী'র মতো প্রতিষ্ঠান না থাকায়, নজরুল সংগীত গাওয়ার ক্ষেত্রে বিধিবিধান মানার কোনো পাকাপাকি ব্যবস্থা নেই। তবে নজরুল সংগীতে অভিজ্ঞ, পারদর্শী ও প্রতিভাধর ব্যক্তিদের মধ্যে অনিল বাগচী, জগৎ ঘটক, কমল দাশগুপ্ত (এখন পূর্ব পাকিস্তানে), আঙ্গুরবালা, ইন্দুবালা, নিতাই ঘটক প্রমুখের পরামর্শ গ্রহণ করলে নজরুল সংগীত শিক্ষাদানের জন্য আকাশবাণী (কলকাতা) কর্তৃপক্ষ নিঃসন্দেহে একটা বলিষ্ঠ পরিকল্পনা পেতে পারেন। এবং নজরুল সংগীত শিক্ষাদানকল্পে ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, সুপ্রভা সরকার প্রমুখ শিল্পীর সাহায্যও প্রভূত কাজে লাগতে পারে বলে আমাদের ধারণা। আশা করি, আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ যথোচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অহেতুক বিলম্ব করবেন না।

এবার আমরা একটি চিঠি পেশ করছি। চিঠিটি লিখেছেন গরিফা (২৪ পরগনা) থেকে নমিতা সেনগুপ্ত। ইতিপূর্বে আমরা অডিসনের রীতিনীতি নিয়ে দু-চার কথা বলেছি। আমরা বলতে বাধ্য হচ্ছি যে, অডিসনের যে নীতি বর্তমানে প্রচলিত আছে তা বদল হওয়া দরকার। আকাশবাণীর মতো সরকারী প্রতিষ্ঠানে নতুন শিল্পীদের যথাযোগ্য স্থান হওয়া উচিত। উপরন্তু ঐ সব শিল্পীদের সক্রিয় সাহায্যের জন্য আকাশবাণী কর্তৃপক্ষের একটা কিছু করা দরকার। শ্রীমতী নমিতা সেনগুপ্তের চিঠিতে এমন কথা বলা হয়েছে, যা হয়তো নতুন শিল্পীদের বিশেষ সাহায্য করবে। চিঠিটা এই—

"অন্যান্য পরীক্ষার মত 'রেডিও অডিসন' ও সংগীত শিক্ষার্থীদের কাছে একধারে যেমন লোভনীয় অন্যদিকে ভীতিপ্রদ বস্তু। এ-কথা অস্বীকার করা যায় না যে, "অডিসন বোর্ড" পরীক্ষার্থীকে জানান—'আপনি রেডিওতে গাইবার উপযুক্ত নন অথবা আপনার গান খুশি করতে পারে নি।' দীর্ঘদিন অপেক্ষা করার পর এই কথা শুনেও অকৃতকার্য ছাত্র-ছাত্রীদের অর্থব্যয় করে আবার 'অডিসন' দেবার জন্য প্রস্তুত হতে হয়—এই ক্ষীণ আশা নিয়ে যদি কোনদিন সুযোগ পাওয়া যায় জীবনে।

কিন্তু আমার বক্তব্য এই, প্রত্যেক পরীক্ষায় নম্বর থাকে প্রতিটি বিষয়কে কেন্দ্র করে। গান-বাজনার পরীক্ষাতেও ঐ একই নিয়ম অনুসরণ করা হয়। যথা—কণ্ঠস্বর, তাল, সুর, উচ্চারণভঙ্গি ইত্যাদি বিষয়ের ওপর নম্বর থাকে, সেটা প্রত্যেক পরীক্ষক মাত্রেই জানেন। কিন্তু অন্যান্য পরীক্ষার মত 'রেডিও বোর্ডে'র 'রেজাল্ট' যখন পরীক্ষার্থীকে জানান হয়, তখন শুধুমাত্র 'উপযুক্ত নন' প্রভৃতি বাঁধা কথাই লেখা হয়, কিন্তু কেন? পরীক্ষিত কোন্ বিষয়ে তার অযোগ্যতা প্রমাণ করেছেন সেটা তালে, না উচ্চারণে, না গায়কীতে? পরীক্ষার্থী নম্বর কিসে কম পেয়েছেন সেটা দয়া করে জানাতে বাধা কি? তাহলে দ্বিতীয়বার 'অডিসন' দেবার সময় সেই বিষয়গুলিতে ভালভাবে দক্ষতা নিয়ে উপস্থিত হতে পারা যায়। যেমন সমস্ত পরীক্ষায় হয়ে থাকে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় পরীক্ষার্থী তার অকৃতকার্যতার আসল কারণ জানতে পারে না। এটা বর্তমান যুগে একদিকে যেমন বিস্ময়কর জিনিষ, অন্যদিকে 'অডিসন বোর্ডে'র' ওপর এক বীতশ্রদ্ধার ভাব এনে দিচ্ছে নাকি? সেই কারণে কর্তৃপক্ষ যদি অনুগ্রহ করে পরীক্ষার্থীদের একই ভুলের পুনরাবৃত্তি থেকে রেহাই দিয়ে 'অডিসন' পরীক্ষার উপযুক্ত করতে সাহায্য করেন, তাহলে প্রত্যেক প্রার্থীই নিজের দোষ-ত্রুটি সংশোধন করবার সুযোগ পায়। নচেৎ একই ভুল নিয়ে অন্ধ বিশ্বাসে দৌড়বে তাতে 'অডিসন বোর্ডে'র' আয়বৃদ্ধি হবে সত্যি, কিন্তু প্রার্থীর উপকার কিছু হবে কি? সুতরাং কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি এদিকে একটু রাখার একান্ত অনুরোধ জানাচ্ছি।"

আমাদের ধারণা, আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রের কর্তৃপক্ষ চিঠিটির প্রতি গুরুত্ব আরোপ করবেন।

—অভ্রবাহন

বেঙ্গল কেমিক্যালের

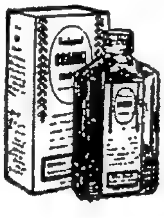

সুবাসিত ব্রাহ্মী

হেয়ার অয়েল

আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে

আয়ুর্বেদ-নির্দিষ্ট উপকরণে প্রস্তুত

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা • বোম্বাই • কানপুর • দিল্লী

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

শিলালি

[দেশী এবং বিদেশী নাটকের তত্ত্ব, তথ্য, ব্যাকরণ, অভিনয় প্রভৃতি বিভিন্ন দিক নিয়ে বহু আলোচনা করেছি উপরোক্ত শীর্ষকে। এবার কিছু আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইওরোপীয় নাটকের অনুবাদ এবং বঙ্গীকরণ (অর্থাৎ বিদেশী নাটককে সম্পূর্ণ বাংলা নাটক করে দেওয়া) করে পাঠকদের উপহার দেব—এর ভেতর থাকবে সাধারণ নাটক বা স্ট্রেইট প্লেজ, সাঙ্কেতিক নাটক, অস্তিত্ববাদী নাটক এবং কিছু অ্যাবসার্ড নাটক।

প্রথম যে নাটকটি আপনাদের কাছে উপস্থিত করছি এটি বিখ্যাত ইংরাজ নাট্যকার জে· বি· প্রিস্টলের 'দি লং মিররের' ভাবানুবাদ এবং বঙ্গীকরণ। এটি সাধারণ নাটক—এর নামকরণ করেছি "অনন্যা"। নাটকটির কাহিনীটি খুবই চমকপ্রদ—আশা করি পাঠকদের পড়তে ভালই লাগবে।]

= অনন্যা =

প্রথম অঙ্ক

[এ নাটকের সমস্ত ঘটনা কেন্দ্রীভূত হয়েছে শিলং পাহাড়ের একটি ছোট প্রাইভেট হোটেলের সিটিং রুমে। হোটেলটি অপেক্ষাকৃত সমতলভূমিতে অবস্থিত। সামনে খানিকটা দূরে উঁচু বিস্তৃত পাহাড়ের শ্রেণী। পাহাড়ে ঘন পাইনের বন। পাইনবনে যখন হাওয়া খেলতে থাকে তখন একটা বেদনাভরা সুর শুনতে পাওয়া যায় হোটেল থেকে। এ জায়গাটি অপেক্ষাকৃত নির্জন।

এক সময়ে এই হোটেলের মালিক ছিলেন কোনও সাহেব। স্বাধীনতার পর এক বাঙালী দম্পতি হোটেলটি কিনে নিয়েছেন। বর্তমান মালিক অনাদি দত্ত সরকারী চাকরি থেকে রিটায়ার করবার পর এই ব্যবসা শুরু করেছেন। সাহেবের আমলেরই পুরনো আসবাবপত্রে এখানকার সিটিং রুমটি সাজানো—পেছনে কয়েকটি ফ্রেঞ্চ উইন্ডো, তার পরেই বিস্তৃত লন—লনের পর রাস্তা। জানলার ওপারে কেউ এসে দাঁড়ালেই প্রেক্ষাগৃহ থেকে তাকে পরিষ্কার দেখা যাবে। ডাউনস্টেজে বাঁদিকে দেয়ালের গা ঘেঁসে ফায়ারপ্লেস। তার পরেই একটি দরজা—এর মাঝের জায়গায় একটি বড় সাইজের আয়না। কয়েকটি কাউচ, সোফা এবং ছোট ছোট টেবিল পাতা রয়েছে। বিকেলে অনেক সময়েই বোর্ডাররা এখানে বসেই চা খান। ডানদিকে কয়েকটি বুক কেস দেখা যাচ্ছে। নাটকের শুরু শীতকালের এক বিকেলে। শীতের সময় বলেই শিলং-এ এখন বাইরের লোক কম।

কার্টেন উঠলে দেখা যাবে মিস সুরমা মল্লিক একটি বই হাতে বসে আছেন। মিস মল্লিক রিটায়ার্ড হেড মিসট্রেস—বয়স ৫৭।৫৮। এবার মালিক অনাদি দত্ত ঘরে ঢুকবেন।]

অনাদি—মিস মল্লিক, আপনার চা কি আনতে বলব?

সুরমা—মিস সেন কোথায়?

অনাদি—উনি নিজের ঘরেই আছেন। আমাকে বললেন একটু বাদে এখানে এসে চা খাবেন।

সুরমা—তবে ওঁর জন্য অপেক্ষা করা যাক্—একসঙ্গেই চা খাওয়া যাবে।

অনাদি—সেই ভাল, অবশ্য আপনার যদি অন্য কাজ না থাকে...

সুরমা—এখানে আর অন্য কাজ কি থাকতে পারে বলুন। থাচ্ছি, বিশ্রাম করছি আর বসে বসে দিবাস্বপ্ন দেখে সময় কাটাচ্ছি।

অনাদি—(হেসে উঠে) আমিও একটু আগে বসে বসে ঝিমোচ্ছিলাম—এক অদ্ভুত স্বপ্নও দেখলাম খানিকক্ষণ।

সুরমা—কি রকম?

অনাদি—চাকরির জীবনে এক সময় লন্ডনের ইন্ডিয়া হাউসে কাজ করতাম। স্বপ্ন দেখছিলাম যেন সকালে ফিন্সবারী পার্কের বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটা কাফেতে চা স্যান্ডউইচ দিয়ে ব্রেকফাস্ট সারলাম। তারপর বাসে রওনা হলাম। ক্যামডেন টাউনের বাড়ি-ঘর চোখের ওপর ভাসতে লাগল—টটেনহ্যাম কোর্ট রোডে এসে পড়লাম—মেপল্ স্টোরস-এর সামনে এসে বাস দাঁড়ালো, সামনে ওডিয়ন সিনেমা হাউস। রাস্তায় লোকজন চলছে—হঠাৎ চলতে গিয়ে বাসটা যেন একটা ঝাঁকানি খেল—ঘুম ভেঙে গেল। কোথায় লন্ডন! দেখলাম শিলং-এর হোটেলে শুয়ে আছি নিজের ঘরে ইজিচেয়ারে।

সুরমা—আমি আবার এমন অনেক জায়গা সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখি যেখানে আগে কখনও যাই নি। খুব স্পষ্টভাবেই এসব জায়গার রাস্তাঘাট, ঘর-বাড়ি, লোকজনের যাতায়াত দেখতে পাই ঘুমন্ত অবস্থায়—কি করে যে এটা সম্ভব হয় বুঝি না।

অনাদি—আমার স্ত্রী কিন্তু স্বপ্ন দেখা বিষয়ে একেবারে এক্সপার্ট—এ নিয়ে আপনার সঙ্গে কোন কথা হয় নি মিস মল্লিক?

সুরমা—না, মিসেস দত্ত তো আমাকে কিছু বলেন নি?

অনাদি—জানেন, আমাদের সম্পর্কীয় কারোর কোন বিপদের সম্ভাবনা এলে উনি আগেই স্বপ্নে সে সম্বন্ধে ইঙ্গিত পান।

সুরমা—বলেন কি?

অনাদি—আপনি শুনলে আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে, যে কোনো বিপদ ঘটবার আগে মিসেস দত্ত এই একই স্বপ্ন সব সময়েই দেখেন—উনি যেন ঐ পাহাড়ের গভীর বনে পথ হারিয়ে ফেলেছেন। [এইবার ক্রমশ বিকেলের আলো কমে আসতে থাকবে।] যত এগিয়ে চলেছেন, বন আরও ঘন, আরও অন্ধকার হয়ে উঠছে—কখনও যে লোকালয়ে ফিরে আসতে পারবেন সে আশাও আর নেই—নিজেকে এত অসহায় মনে হয় যে দুঃখে চোখে জল এসে যায়। এই ধরণের স্বপ্ন দেখবার পরই...

সুরমা—কি ভয়ানক ব্যাপার। এর পরেই বুঝি বিপদ-আপদ ঘটে?

অনাদি—ঠিক তাই। মৃন্ময়ী যখনই বলেন—'শুনছ! কাল আবার স্বপ্নে বনের ভেতর পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। তার মানে বুঝছ? দু'-একদিনের মধ্যেই এখানে একটা বিপদ ঘটবে।' হয়ও তাই— প্রতিবারেই কোন না কোন বিপদ ঘটে।

সুরমা—কি সর্বনেশে কান্ড। আমি আসার পর এ ধরণের কোন স্বপ্ন মিসেস দত্ত দেখেন নি তো?

অনাদি—কাল রাত্রি অবধি দেখেন নি বটে...

সুরমা—যাক, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। অবশ্য আমি নিজে এসব ব্যাপারে ঠিক বিশ্বাস করি না—কিন্তু মনে হয় আপনি করেন?

অনাদি—আমিও বিশ্বাস করতে চাই নাই। কিন্তু যখন দেখি বার বার একই ব্যাপার ঘটছে—

সুরমা—আপনি বললেন কাল রাত্রি অবধি মিসেস দত্ত ঐ স্বপ্ন দেখেন নি...

অনাদি—কিন্তু আজ দুপুরে যখন ঘুমোচ্ছিলেন...

সুরমা—(অল্প হাসির সঙ্গে) তাহলে কি আমারই ওপর দিয়ে এবার বিপদ ঘটবে...

অনাদি—আপনার ওপর নয়। আপনার সম্বন্ধে মৃন্ময়ী সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত।

সুরমা—তবে?

অনাদি—মিস সুজাতা সেন এই অফ্ সিজনে এখানে কেন এসেছেন বলতে পারেন?

সুরমা—আমিও তো এসেছি।

অনাদি—আপনার কথা আলাদা। আপনি রিটায়ার্ড। এই ধরণের নির্জনতা আপনার ভাল লাগবে এ তো অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু ওঁর বয়সের মেয়েদের—তাছাড়া আমার স্ত্রী বলছিলেন মিস সেনের মুখে সব সময়েই কেমন একটা বিষাদের ছাপ দেখা যায়—যেন কখন কি বিপদ ঘটবে ভেবে উনি আগে থেকেই সন্ত্রস্ত। তারপর আজ দুপুরের ঐ স্বপ্ন দেখার ব্যাপারটা—মৃন্ময়ী ভয়ানক চিন্তিত হয়ে উঠেছে। ঐ মিস সেন আসছেন—এবার চা আনতে বলি। [টেলিফোন বক্সের নব্ ঘুরিয়ে প্যান্ট্রির সঙ্গে কানেক্ট করবেনঃ] হ্যালো...কে, ইব্রাহিম। হ্যাঁ, সিটিং রুমে মিস মল্লিক আর মিস সেনের চা পাঠিয়ে দাও। [অনাদিবাবু টেলিফোন রাখবেন ও ইতিমধ্যে সুজাতা সেন ঘরে ঢুকবেন।]

সুরমা—আপনার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম মিস সেন—একসঙ্গে চা খাব বলে। কিন্তু আপনাকে এত ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে কেন? আপনার চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে ভয়ের ভাব। আবার কি...

সুজাতা—হ্যাঁ, মিস মল্লিক। এই একটু আগে আবার তাকে দেখতে পেয়েছি।

অনাদি—সেই ছাই রং-এর গাউন পরা বুড়ি মেমসাহেব?

সুজাতা—হ্যাঁ।

সুরমা—কোথায় দেখলেন?

সুজাতা—চা খেতে আসব বলে পোষাক বদলাচ্ছিলাম। জানলা দিয়ে স্পষ্ট দেখতে পেলাম বাগানের ধারে ঐ মেমটি দাঁড়িয়ে আছে।

সুরমা—এ ব্যাপারটা কি অনাদিবাবু?

সুজাতা—এখানে এসে কয়েকবারই ছাই-রং-এর পোষাকপরা ঐ বুড়িকে দেখেছি—মুখে তার স্পষ্ট বিরক্তির ছাপ। অনাদিবাবুকেও তো একথা বলেছি—উনিও তো এর সম্বন্ধে জানেন।

জে. বি. প্রিস্টলে (স্কেচ : সঞ্জয়)

সুরমা—আপনি নিজেও বুড়ি মেমসাহেবকে দেখেছেন অনাদিবাবু?

অনাদি—না, আমি নিজে দেখি নি। মাস কয়েক আগে আমার ছোট বোন লক্ষ্ণৌ থেকে কয়েকদিনের জন্য এখানে এসেছিল। সে কয়েকবার দেখেছিল ঐ ছাই রং-এর পোষকপরা বুড়িকে হোটেলের এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতে।

[বেয়ারা চায়ের সরঞ্জাম এনে টেবিলে রাখবে—মিস মল্লিক চা ঢালতে থাকবেন।]

সুরমা—মিস সেন, কতোটা চিনি দেব?

সুজাতা—এক চামচ।

[চা ঢেলে চিনি, দুধ দিয়ে এক কাপ সুজাতার দিকে এগিয়ে দেবেন এবং নিজের কাপে চুমুক দেবেন। তারপর—]

সুরমা—এ তো বড় অদ্ভুত ব্যাপার!

সুজাতা—এই ধরণের নির্জন পরিবেশেই—অর্থাৎ যেসব জায়গায় মানুষের ওপর প্রকৃতির প্রাধান্য—অশরীরী আত্মাদের আবির্ভাব ঘটে।

অনাদি—ঠিকই বলেছেন—কোন জনবহুল বড় বড় শহরে কোন জায়গায় ভূত দেখা গেছে বলে তো শুনি নি।

সুরমা—আচ্ছা, ওই ছাই রং-এর পোষাকপরা মেমসাহেব ছাড়া অন্য কাউকে কি দেখা যায় নি?

সুজাতা—আমি আরও কয়েকজনকে দেখেছি—কিন্তু তাদের চেহারা খুব স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে নি।

সুরমা—কিন্তু এসব ভৌতিক ব্যাপারে আমার ঠিক বিশ্বাস আসে না।

সুজাতা—বিশ্বাস আমিও করি না।

সুরমা—(বিস্ময়ের সঙ্গে) কিন্তু আপনি তো এদের দেখতে পান—যেমন এই একটু আগেই দেখে এসেছেন ছাই রং-এর পোষাকপরা মেয়েটিকে।

সুজাতা—দেখেছি বটে। কিন্তু সে ঠিক তার প্রেতাত্মা নয়। আমার মনে হয় অশরীরী আত্মারা জীবিতকালে তাদের পারিপার্শ্বিকের ওপর ইম্প্রেশন বা ছাপ রেখে যান—যেমন বালির ওপর পায়ের ছাপ পড়ে বা কাঁচের গ্লাসের গায়ে আঙুলের ছাপ। অনুভূতির তীব্রতার ওপরই ইম্প্রেশনের গভীরত্ব নির্ভর করে।

সুরমা—You're a most unusual kind of girl, Miss Sen.

সুজাতা—না, তা ঠিক নয়।

অনাদি—আমি একটু ভেতর থেকে আসছি। [যেতে থাকবেন :]

সুরমা—মিস্টার দত্ত! [অনাদি ফিরে দাঁড়াবেন :] আর কারা জানি এখানে এসে উঠবেন বলছিলেন?

অনাদি—ফার্নভেল হোটেলের ম্যানেজার সকালে ফোন করেছিলেন যে সন্ধ্যায় কলকাতা থেকে দুজন বেড়াতে আসছেন। ওদের হোটেলে জায়গা না থাকাতে আমাকে অনুরোধ করেছেন এখানে ব্যবস্থা করতে। (একটু থেমে) আচ্ছা, আমি আসছি। [প্রস্থান]

সুরমা—মিস সেন, আপনি কি অসুস্থ-বোধ করছেন?

সুজাতা—(ভেতরকার চাঞ্চল্য চাপবার চেষ্টা করে) না, ও কিছু নয়।

সুরমা—আপনার চোখ-মুখের চেহারা দেখে মনে হচ্ছে আপনি ঠিক সুস্থ নন্।

সুজাতা—আপনাকে কালকেই তো বলেছিলাম এখানে আসবার আগে বড্ড টায়ার্ড ফিল্ করছিলাম।

সুরমা—চেঞ্জ অভ্ ক্লাইমেটে এ ভাবটা দুদিনেই কেটে যাবে। আমি কিন্তু আপনার ওই অশরীরী আত্মাদের পারিপার্শ্বিকের ওপর ইম্প্রেশন রেখে যাবার কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না।

সুজাতা—আমি বলতে চাইছিলাম—মানুষ যখন বেঁচে থাকে, তার সুখ-দুঃখের গভীর অনুভূতির সময় তার দেহ-মনের ছাপ পড়ে যায় তার পারিপার্শ্বিকের ওপর। তার মৃত্যুর পরেও কেউ কেউ ঐ সব ছাপের ইমেজেস্ দেখতে পেয়ে মনে করে ঐ লোক বুঝি অশরীরী ছায়ারূপে পুরনো জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সুরমা—এভাবে কথাটা কখনও ভেবে দেখি নি। (কেক্-এ কামড় দিয়ে) অনাদিবাবুর এই কেক্গুলোর জুড়ি মেলা ভার—কিরকম একটা গন্ধ...

সুজাতা—(হেসে উঠে) ডেট্ল দিয়ে গারগল্ করবার সময় যেমন গন্ধ লাগে অনেকটা সেইরকম।

সুরমা—অথচ বললে উত্তর দেন এখানকার সবচেয়ে ভাল দোকানের কেক্ আপনাদের জন্য আনিয়ে রাখি। আপনাকে আর এক কাপ চা দেব?

সুজাতা—না, ধন্যবাদ!

সুরমা—আচ্ছা, মিস সেন—আপনি তো ছবি আঁকা শিখতে বিলেত গেছিলেন। একদিনও তো আপনাকে এখানে আঁকতে বসতে দেখলাম না?

সুজাতা—বিলেত থেকে ফিরেই কোনও কারণে সোজা এখানে চলে এসেছি। এদেশের প্রখর আলোটা চোখ-সওয়া হয়ে নিতে অন্তত আরও কয়েক দিন লাগবে।

[অনাদির প্রবেশ]

অনাদি—আপনাদের আরও চা বা কেক্ দেবে কি?

সুরমা—না, ধন্যবাদ।

সুজাতা—আচ্ছা মিস্টার দত্ত, আপনাদের আর যে দুজন বোর্ডার আসবেন... (একটু ইতস্তত করে)...তাদের কোন পরিচয় পেয়েছেন কি?

অনাদি—না, ফার্নডেলের ম্যানেজার তাদের নাম বলেন নি। আচ্ছা আমি ভেতরে গিয়ে বয়কে পাঠিয়ে দিচ্ছি কাপ-ডিস্গুলো নিয়ে যেতে। [প্রস্থান।]

[কিছুক্ষণ সব চুপচাপ থাকবে। সুজাতা সেন যেন অন্যমনস্ক হয়ে কি চিন্তায় আত্মমগ্ন থাকবেন। সুরমা মল্লিক তার এই ভাবনাটা লক্ষ্য করবেন। তারপর—]

সুরমা—অনাদিবাবু এবং তাঁর স্ত্রী কিন্তু আপনার সম্বন্ধে বেশ কিউরিয়াস হয়ে উঠেছেন মিস সেন। একটু আগে আপনার সম্পর্কে খোঁজখবর নিচ্ছিলেন আমার কাছ থেকে—অবশ্য অত্যন্ত ভদ্রভাবে জিজ্ঞেস করছিলেন।

সুজাতা—(অন্যমনস্কভাবে) অনাদিবাবু লোকটি বড় ভাল।

সুরমা—আমি অবশ্য ওঁর কৌতূহল মেটাতে পারি নি। একথাও ওঁকে বলি নি যে, আপনাকে আরও ভালভাবে জানবার কৌতূহল আমারও কম নয়।

সুজাতা—(অল্প হাসির সঙ্গে) কোন একটা ব্যাপারে আমি অত্যন্ত worried মিস মল্লিক। আমার মধ্যে কোন রহস্যময়তাই নেই, একথা আপনি বিশ্বাস করতে পারেন।

সুরমা—গত তিনদিন ধরে আমরা এই হোটেলে বাস করছি। এবং এক্ষেত্রে সাধারণত যতটা পরিচয় হয়, তার থেকে অনেক বেশি ঘনিষ্ঠতা আমাদের মধ্যে হয়েছে সেকথা নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন?

সুজাতা—কেন জানি না, আপনাকে মনে হয় আমার বহুদিনের পরিচিত—আমার সত্যিকার হিতাকাঙ্ক্ষী।

সুরমা—তাই যদি মনে করেন, তবে বলুন কিজন্য আপনার এত দুশ্চিন্তা। সব সময়েই দেখছি আপনি অন্যমনস্ক—কি যেন বিপদের আশঙ্কায় সারাক্ষণ সন্ত্রস্ত—

সুজাতা—আমার সম্বন্ধে এ ধারণা আপনার হোল কি করে মিস মল্লিক?

সুরমা—বিলেত থেকে ফিরেই আপনার এভাবে এই নির্জন জায়গায় আউট অভ্ সিজনে চলে আসাটাই আমার অস্বাভাবিক লেগেছে। এখানে নিশ্চয় ছবি আঁকতে আসেন নি—কারণ যতোই আলোর এক্সকিউজ দেখান, আঁকবার আকাঙ্ক্ষা থাকলে এভাবে এ কদিন চুপ করে বসে থাকতেন না। বিশ্রাম করাও আপনার উদ্দেশ্য নয়—কারণ সব সময়েই দেখছি আপনার ভেতর একটা অস্থিরতা এবং চাঞ্চল্য—

সুজাতা—(কথা এড়িয়ে যাবার চেষ্টায়) আমার মনে হয় আগাথা ক্রিস্টির বই পড়ে আপনি সাধারণ ব্যাপারের ভেতরও রহস্য খুঁজতে চেষ্টা করেন।

সুরমা—দেখুন মিস সেন, আপনার থেকে বয়সে আমি অনেক বড়—সেই জন্যই জীবন সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাও আমার অনেক বেশি। আমার চোখকে আপনি ফাঁকি দিতে পারেন নি। আমার নিজের জীবনের ওপর দিয়ে অনেক ঝড়-ঝাপ্টা বয়ে গেছে। আমার মনে হয় আপনার জীবনের সমস্যার কথা খুলে বললে আমি আপনাকে সত্যিকার সাহায্য করতে পারবো—

সুজাতা—তাই যদি সম্ভব হোত।

সুরমা—বেশ তো বলেই দেখুন না।

সুজাতা—আমার জীবনের যা সমস্যা তাতে কারোর পক্ষেই কোন সাহায্য করা অসম্ভব। সেই জন্যই বোধহয় আমার জীবনটা এত জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ বিষয়ে কোন আলোচনা করতেও আমি যেন ভেতর থেকে বাধা পাই। আর সেই জন্যই... (কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ থাকবেন। তারপর—)

সুরমা—আমার কি মনে হচ্ছে জানেন?
সুজাতা—বলুন।
সুরমা—আপনি এখানে কারোকে মিট করবার জন্য এসেছেন—Yet you are afraid of that meeting.
সুজাতা—(বিস্মিতভাবে) আমি কি নিজের মনের অবস্থা এতোটা পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করে ফেলেছি!
সুরমা—আমার কথা সত্যি কি না বলুন।
সুজাতা—আপনি ঠিকই ধরেছেন।
সুরমা—আপনি এখানে কার প্রতীক্ষা করছেন মিস সেন?
সুজাতা—তিনি একজন সাহিত্যিক—এবং বিবাহিত।
সুরমা—(দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে) আমি সত্যই অত্যন্ত দুঃখিত সুজাতা দেবী। বুঝতে পেরেছি আপনি তাঁকে ভালবাসেন—অথচ আপনাদের মধ্যে কোন মিলনের সম্ভাবনা নেই। আপনার ভাল না লাগলে এ বিষয়ে আলোচনা করে আর আপনাকে বিরক্ত করবো না।

[ক্রমশ]

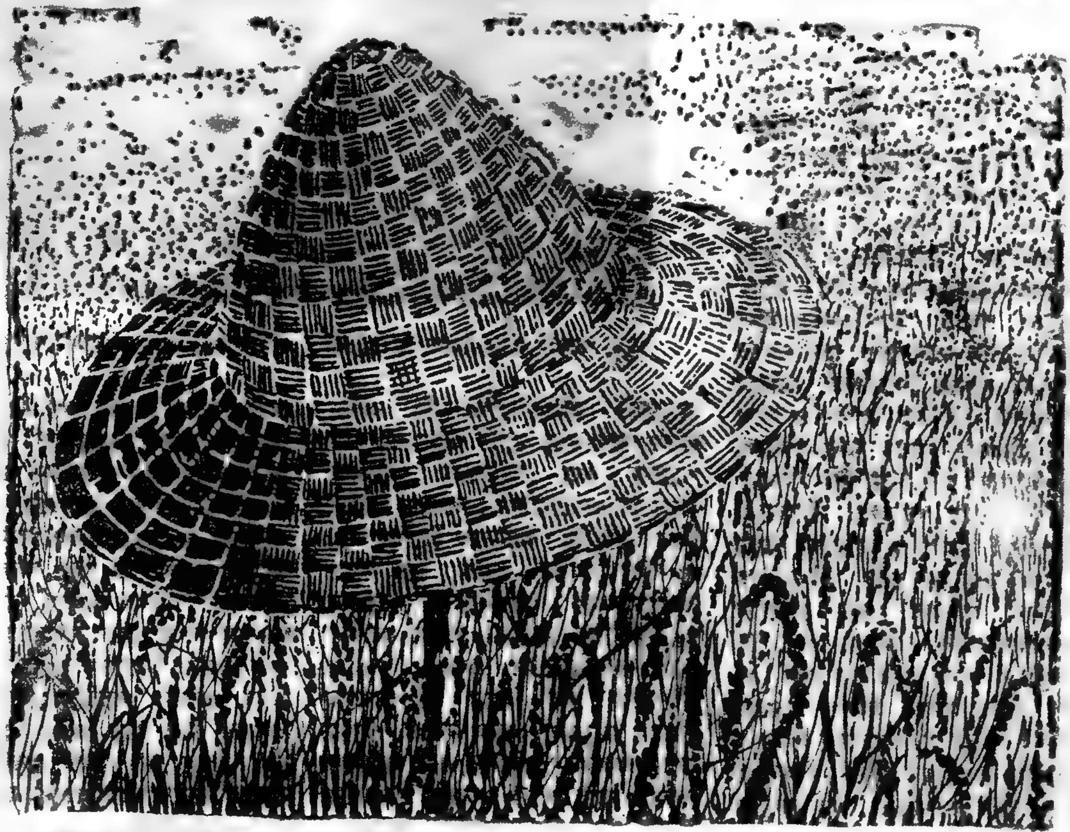

ইউবিআই ও কৃষক

কৃষি উন্নয়নে অর্থলগ্নির ব্যাপারে দরকার সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির। সে দৃষ্টিভঙ্গি ইউবিআই-র আছে।

• আর দরকার সমগ্র প্রয়োজন মেটানোর ব্যবস্থার (পাম্প, ট্রাক্টর, বীজ, সার, চাই কি পোকামাকড় মারার ওষুধ কেনা, ফসল তুলে গুদামজাত করা, বেচতে বাজারে পাঠানো—কতদিকে কত খরচ)। সে ব্যবস্থা ইউবিআই-র আছে।

• রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় কোন পরিকল্পনাতে ঋণদানের প্রস্তাবও বিবেচনা করা হয়।

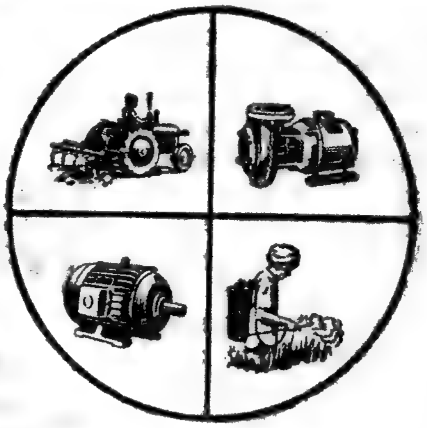

যোগাযোগ করুন:

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া

কৃষিঋণ বিভাগ

২৫-২৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১

পশ্চিমবঙ্গে ১১৫টিরও অধিক শাখা অফিস আছে

চিত্র-মুক্তির ব্যাপারে সমস্যা

সিনেমার মালিকরা চলচ্চিত্র জগতে শান্তি চান না। কখনো কর্মচারীদের ব্যাপারে, কখনো ছবির মুক্তির ব্যাপারে গন্ডগোল লেগেই আছে। চলচ্চিত্র-শিল্পে সিনেমার মালিকরা সর্বশক্তিমান, কারণ তাঁরা একাধারে প্রযোজক, পরিবেশক এবং প্রদর্শক। সুতরাং নেহাৎ বাধ্য না হলে নিয়ম-কানুন বা চুক্তি মেনে কাজ তাঁরা করতে চান না। এই ত' কিছুদিন আগে 'গুপী গাইন বাঘা বাইন' নিয়ে কি গন্ডগোল। শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিয়োজিত বারজন সদস্যবিশিষ্ট কমিটির সালিশীর ফলে ছবিটি মুক্তিলাভ করে। তখন মীমাংসা হয়েছিল 'গুপী গাইন'-এর পরে মিনার, বিজলী, ছবিঘরে 'আরোগ্য নিকেতন' মুক্তি পাবে। কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে উক্ত সিনেমার মালিক সেই মীমাংসাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে 'মেঘ ও রৌদ্র'কে মুক্তি দেবার চেষ্টা করছেন। এই মত পরিবর্তনের কারণ বোধ হয় 'মেঘ ও রৌদ্র' মস্কো ফেরৎ ছবি। সুতরাং টিকিটঘরে ভিড়টা সুবিধাজনকই হবে।

সরকার নিয়োজিত কমিটির আহবায়ক এস, এ, সাঈদ এম-এল-এ এক বিবৃতি প্রকাশ করে জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বিবৃতিতে তিনি চিত্রশিল্পের সংশ্লিষ্ট সকলকে এই ব্যাপারে তৎপর হয়ে অপ্রীতিকর অবস্থা থেকে শিল্পকে রক্ষা করার আবেদন জানিয়েছেন। ইতিপূর্বে চিত্র-মুক্তির ব্যাপারে একটা চুক্তি হয়েছিল যে, সেন্সর সার্টিফিকেটের তারিখ অনুযায়ী ছবি মুক্তি পাবে। সিনেমার মালিকরা এই চুক্তি ক্রমে ক্রমে অগ্রাহ্য করে সেই অরাজক অবস্থাকে জিইয়ে রাখতে চাইছেন। এরূপ অবস্থা চলতে থাকলে সিনেমা-মালিকরা ছাড়া অন্য প্রযোজকদের কোন ছবিই মুক্তিলাভের সম্ভাবনা থাকে না। ছোট প্রযোজকরা ছবি নির্মাণ করেও দেখাবার সুযোগ পাবেন না। এতে চলচ্চিত্র ব্যবসা ক্রমে কেবলমাত্র সিনেমা-মালিকদের কুক্ষিগত হয়ে থাকবে: চলচ্চিত্রের মান নিকৃষ্টতর হবে। সিনেমা-মালিকদের এই আধিপত্য কিছুতেই সহ্য করা চলে না।

গুরু বাগচী পরিচালিত 'তীরভূমি' ছবিতে রবি ঘোষ ও মাধবী মুখার্জী

সেন্সর সার্টিফিকেটের তারিখ অনুযায়ী ছবির মুক্তির চুক্তি বলবৎ রাখতে হবে এবং গুপী গাইন-এর পরে পূর্বের কথা অনুযায়ী 'আরোগ্য নিকেতন' দেখাতে হবে। সরকার নিয়োজিত কমিটির আহবায়ক হিসেবে এস, এ, সাঈদ বিবৃতি প্রচার করে জনসাধারণকে যে ওয়াকিবহাল করেছেন তা যথার্থ কাজ হয়েছে। আরো করণীয় আছে মনে করি যে, যেসকল সিনেমা মীমাংসার শর্ত মানে না—সেসকল সিনেমা প্রয়োজন হলে বয়কট করার জন্য আহবান জানান এবং লাইসেন্স বাতিল করে দেবার জন্যও সরকারের নিকট অনুরোধ জানান প্রয়োজন। সরকারী চলচ্চিত্র উপদেষ্টা কমিটিরও এ ব্যাপারে করণীয় আছে, এবং কঠোর মনোভাব নেবার সময় হয়েছে। নতুবা চলচ্চিত্র-শিল্পে এই সংকট লেগেই থাকবে। —সুজন।

চিত্র-আলোচনা

আঁধার সূর্য

পরিচালনা : সুধীর মুখোপাধ্যায়

ছবিটি যদিও নতুন, কিন্তু কাহিনীকে নতুন মনে করা যাবে না। হিন্দী এবং বাংলায় এ-রকমের কাহিনী অবলম্বনে কয়েকটি ছবি হয়েছে। তার মধ্যে 'আঁধার সূর্য' আর একটি সংযোজন।

গোপন বিবাহজাত সন্তানকে কেন্দ্র করে এই কাহিনী নাটকীয় রস সৃষ্টির চেষ্টা করেছে। মা-বাবা মনে করল তাদের মেয়ে বিবাহপূর্ব সন্তানের মা হতে চলেছে। সন্তান জন্ম দিয়ে তাদের কন্যা অণুর মৃত্যু হয়। রাতের অন্ধকারে মজুমদার সাহেব সন্তানটিকে নার্সের হাতে দিয়ে দেন, অনেক টাকা দিয়ে তাকে বিদায় করেন। সেই নার্স গোপনে পাওয়া ছেলে শঙ্করকে মানুষ করে তোলেন নিজেকে মা পরিচয় দি[illegible] ছেলে মেধাবী ছাত্ররূপে শিক্ষক [illegible] সমাজের প্রিয় হয়ে ওঠে। কিন্তু এক সময় পিতৃপরিচয় নিয়ে এক দ্বন্দ্বের মুহূর্তে জানতে পারে, এতদিন যাকে পিতা বলে জেনে এসেছে সে তার আসল পিতা নয়। তারপরে মজুমদার সাহেবের স্ত্রীর সেবার জন্য আবার সেই নার্সের যখন ডাক পড়ে তখন তার স্মৃতিতে সব কথা আবার উদয় হয়। এবং ঘটনাক্রমে প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, মেডিক্যাল কলেজের যিনি অধ্যক্ষ—তিনি শঙ্করের পিতা। পিতা সন্তানকে ফিরে পায়, সন্তান পায় পিতাকে। আর যিনি তাকে লালন-পালন করেছেন শঙ্কর তাকেই দেয় মায়ের স্বীকৃতি।

বিশ্বাস্য ঘটনা সৃষ্টির দিক থেকে ছবিতে কিছুটা দুর্বলতা রয়েছে। যেমন মজুমদার বাড়ির কন্যা সন্তানসম্ভবা হয়েও মায়ের কাছে তাদের বিয়ের কথা কেন গোপন করল এবং নিজেকে অবৈধ সন্তানের জননীরূপে পরিচয় দেবার লজ্জা বরণ করল তার কোন উত্তর ছবিতে নেই। নার্সের সঙ্গে তার স্বামীর সম্পর্ক এবং নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া সম্পর্কিত ঘটনাও বাস্তবতার দিক থেকে কষ্টকল্পিত মনে হয়। মনে হয় কাহিনীর

নাটকীয়তা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই দুটির ঘটনাগুলির উল্লেখ।

ছবিতে অভিনেতাদের মধ্যে নতুন ও পুরাতনের সমন্বয় ঘটেছে। নায়ক-নায়িকাকে (মৃণাল মুখার্জী ও রীণা ঘোষ) একরকম নতুনই বলা যায়। যে সুযোগ তাঁরা পেয়েছেন তাকে খুব ভালভাবে কাজে লাগিয়েছেন এমন বলা যায় না—অবশ্য পরিচালকের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁরা কাজ করেছেন। তাঁদের তুলনায় তরুণকুমার ও দীপক মুখার্জীর অভিনয় স্বচ্ছন্দ। অজিতেশকে তাঁর ভূমিকায় একেবারেই মানায় নি, তার ওপর সংলাপদোষে হাস্যকর মনে হয়েছে। নার্সের ভূমিকায় দীপ্তি রায় পরিচালকের নির্দেশ যথাযথভাবে রূপদান করেছেন। অন্যান্য চরিত্রে আছেনঃ কমল মিত্র, ছায়া দেবী, শৈলেন মুখার্জী, সুব্রত সেন প্রমুখ।

ছবির কাহিনীকার গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু, এবং সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায়। আলোকচিত্র পরিচালনা ও সম্পাদনা করেছেন যথাক্রমে অনিল গুপ্ত ও বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জী।

পারিবারিক চিত্র হিসাবে ছবিটি মেয়েমহলে সমাদৃত হতে পারে।

সলিল সেন পরিচালিত 'মন নিয়ে' ছবিতে সুপ্রীয়া দেবী

জাপানী চলচ্চিত্র উৎসব

১লা আগস্ট শুক্রবার লেনিন সরণিস্থিত অপেরা সিনেমায় জাপানী চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন হয়েছে। উদ্বোধন করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন শ্রীমধু বসু। এই উৎসব আয়োজিত হয়েছে জাপানী দূতাবাস, ইন্দো-জাপানীজ এসোসিয়েশন এবং সিনে সেণ্ট্রাল ক্যালকাটার উদ্যোগে। উদ্বোধনের দিন দেখান হয়েছে কেই কুমাই পরিচালিত 'কুরোবে না তাইয়ূ' (এ টানেল টু দি সান)।

উৎসব উদ্বোধনের পূর্বে গত ২৮শে জুলাই এক সাংবাদিক সম্মেলনে 'আকি বিওরি' বা 'লেট অটাম' ছবি দেখান হয়।

জাপানী ছবি 'লেট অটাম'-এর একটি দৃশ্যে মারিকো ওকাদা, সেতসুকো হারা ও ইয়কো সুকাদা।

এই ছবির পরিচালক ইয়াসুজিরো ওজু।

এক বিধবা এবং তাঁর কন্যাকে কেন্দ্র করে 'লেট অটাম'-এর কাহিনী। এই দু'জনকে নিয়ে নাটকীয় স্বপ্নের জাল বিস্তার করছে মৃত স্বামীর তিন বন্ধু; আর সেই জাল থেকে মুক্ত করছে কন্যার বান্ধবী। মাঝে মাঝে আরো চরিত্র উপস্থিত হয়ে কাহিনীকে ভরাট করেছে। বিধবার সুন্দরী কন্যা মা'র নিঃসঙ্গতার কথা চিন্তা করে বিয়েতে ইচ্ছুক নয়, এদিকে মা উপযুক্ত ছেলে খোঁজে মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য। স্বামীর তিন বন্ধু এ ব্যাপারে সাহায্য করাকে নিজেদের কর্তব্য মনে করে। কিন্তু মেয়ের মনোভাব বুঝতে পেরে তিন-জনের একজন কৌশলের পথ গ্রহণ করে। প্রফেসর বন্ধুর সামনে প্রস্তাব উত্থাপন করে বিধবাকে বিয়ে করার। ভদ্রলোক দীর্ঘদিন বিপত্নীক, সুতরাং প্রস্তাবে রাজী হন। মেয়েকে একথা ইঙ্গিতে জানিয়ে দিলে সে মায়ের ওপর অভিমান করে, মা যে এত শীঘ্র তার বাবাকে ভুলে গিয়ে বাবার বন্ধুকে বিয়ে করবে এমন কথা সে ভাবতেই পারে না। এ থেকে মা-মেয়েতে মনোমালিন্য। মেয়ের বান্ধবী এর মধ্যে এসে পড়ে আসল ব্যাপার বুঝতে পারে, অর্থাৎ এ বিয়ের কথা বিধবা কিছুই

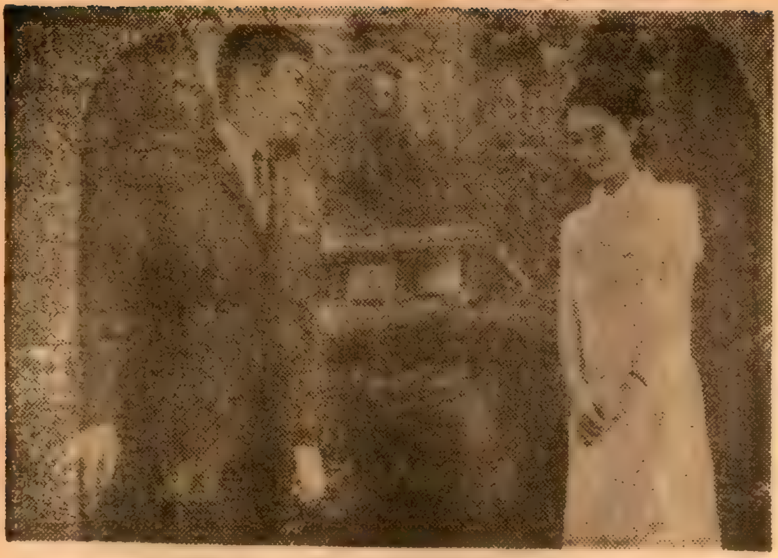

জাপানী ছবি 'এ টানেল টু দি সান' ছবির একটি দৃশ্য

জানে না। কিন্তু এতে লাভ হল—মেয়ে তার স্বামী খুঁজে নিল, অবশ্য এই ছেলেটি স্বামীর বন্ধুর প্রস্তাবিত এবং তারই অফিসের চাকুরে। শেষ পর্যন্ত সুন্দরভাবে বিয়ে সমাধা হল; বিধবা স্বামীর স্মৃতি নিয়ে নিঃসঙ্গই রইল।

ছোট ঘটনা, কিন্তু বিস্তার এত সুন্দর যে, প্রতিটি মুহূর্তে দর্শকরা একটা নতুন কিছু আশা করে অপেক্ষা করেন। মনে হবে সত্যিই বুঝি মা'র বিয়ের ব্যাপারেই তারা বেশি উৎসাহী, কখনো মনে হবে মা ও মেয়ে দুজনাকেই ওরা বিয়ে দেবার কথা ভাবছে। কিন্তু শেষে যখন বোঝা যাবে ওরা মেয়েকে তার চিন্তার আশ্রয় থেকে ছাড়িয়ে আনতে চায়, এভাবে তারা বন্ধুর কর্তব্য পালন করছে। তখন পরম কৌতুক বোধ হয়।

ছবিটি রঙিন। রঙের ব্যবহার খুবই পরিমিত এবং দৃশ্যগুলিতে জাপানী শিল্পরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। ছবিটি কমার্শিয়াল দৃষ্টিভঙ্গির হলেও পশ্চিমী জগতের ছবির তুলনায় কাহিনীর বিস্তারে সংযম এবং শিল্প-গুণে অনেক উন্নত এবং উপভোগ্য। ছবিতে সঙ্গীতের ব্যবহারও চমৎকার। অভিনয়ে সকল শিল্পীই ঘটনাগুলিকে বিশ্বাস্য করে তুলেছেন।

নাটকের কথা

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে নাট্যাভিনয়

এ বছর কাশ্মীরে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের শেষ দিনে টেগোর হাউসে ভারতের বহু সুধী দর্শকবৃন্দের উপস্থিতিতে "অভিনয় নয়" নামে একটি নাটক অভিনীত হয়েছে।

নাটকটি রচনা ও পরিচালনা করেন তরুণ নাট্যকার নীরেন সেন।

নাটকটির নায়কের ভূমিকায় রূপ-দান করেন অরুণরতন এবং নাট্যকার ও পরিচালকরূপে অবতীর্ণ হন নীরেন সেন। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য অংশে ছিলেন ফণীন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বাসুদেব লাহিড়ী ও স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়।

সু-অভিনয়ের জন্য অরুণরতন ও নীরেন সেনকে দু'টি রৌপ্যপদক দিয়ে সম্মেলন কর্তৃপক্ষ সম্মানিত করেছেন।

চয়নিকার বার্ষিক উৎসব

'চয়নিকা'র চতুর্থ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে ১১ই জুলাই হতে ১৩ই জুলাই পর্যন্ত তিনদিনব্যাপী কয়েকটি মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। উল্টাডাঙা মেন রোডের 'চয়নিকা'র শিশু উদ্যানে এক সুন্দর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল।

প্রথম দিনের শিশু উৎসবে রবীন্দ্র-নাথ ঠাকুরের 'মাস্টার মশাই' গল্পের নাট্যরূপ ও 'রবীন্দ্র চেতনায় প্রকৃতি' গীতিনাট্যটি পরিবেশিত হয়। 'মাস্টার মশাই' নাটকে কুমারী চিত্রা সর্বজ্ঞ, মিলন পাল, শংকর দে, প্রদীপ দাস, তারক বাগচী ও অলক পালের অভিনয়ে প্রাণের স্পর্শ পাওয়া যায়। 'রবীন্দ্র চেতনায় প্রকৃতি' গীতিনাট্যটি শিল্পীদের সপ্রাণ অভিনয়ে বেশ গতিসম্পন্ন ছিল। তাদের মধ্যে ভারতী রায়, শিপ্রা দে, যূথিকা রায়, পম্পা ঘোষ, আরতি ঘোষ ও বীণা বর্মণের নৃত্য খুব চিত্তাকর্ষক হয়েছিল।

দ্বিতীয় দিনের তরুণ-তরুণীদের অনুষ্ঠানে সুধাংশু ঘোষের 'আলোক ঝর্ণা' ও জোছন দস্তিদারের 'অন্তরীণ' নাটক দুটি অভিনীত হয়। 'আলোক ঝর্ণা'য় নিয়তি রায়, মংবী সাহা, ডলি দে, অসীমা ভৌমিক, মনোরমা সাহা নিজ নিজ ভূমিকায় উল্লেখযোগ্য অভিনয়-কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। নাটকটির সংগীতাংশে অংশ নেন শিবানী পাল ও পূরবী দে।

'অন্তরীণ' নাটকের বিভিন্ন ভূমি-কায় অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে কুমারী লক্ষ্মী হালদার, রজনীকান্ত রায়, মনোজ শেঠ, কমল হাজরা, ইন্দ্র পালচৌধুরী, দেবী রায়চৌধুরী ও মোহন দে'র অভিনয় ছিল বেশ গতিসম্পন্ন।

শেষ দিনের অনুষ্ঠান ছিল প্রবীণ-দের। এই উপলক্ষে প্রশান্ত চৌধুরীর 'ঘণ্টা ফটক' নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। জমিদারী আমলের বাঈমহল ও অন্দর-মহলের পটভূমিকায় নাটকটি লিখিত।

সংবাদ-কণা

সেগেই আইজেনস্টাইনের আঁকা ১০০টি ছবি

"ব্যাটলশিপ পটেমকিন", "আলেকজান্দার নেভস্কি", "ইভান দ্য টেরিবল" প্রমুখ জগদ্বিখ্যাত চল-চ্চিত্রের নির্মাতা সেগেই আইজেনস্টাইন যে একজন নিপুণ চিত্রশিল্পীও, একথা অনেকেই হয়তো জানেন না।

আইজেনস্টাইন তাঁর চলচ্চিত্রে যে সব চরিত্রকে রূপ দিয়েছেন সেই সৃষ্টির কাজে চলচ্চিত্র নির্মাতা আইজেনস্টাইন সর্বদাই সাহায্য পেয়েছেন চিত্রশিল্পী আইজেনস্টাইনের কাছ থেকে।

তাঁর নির্মিত চলচ্চিত্রের জন্য তৈরি অসংখ্য স্কেচ ও ড্রয়িং এবং তাঁর সম-সাময়িক ব্যক্তিদের অসংখ্য প্রতিকৃতি আইজেনস্টাইন এঁকেছেন। সব মিলিয়ে তাঁর ছবির সংখ্যা হবে হাজার কয়েক। এই সমস্ত ছবির মধ্যে অনেকগুলিই এ পর্যন্ত এ্যালবামে প্রকাশিত হয়েছে অথবা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রে ও বিদেশে বিভিন্ন প্রদর্শনীতে দেখান হয়েছে।

মস্কোয় অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সময়ে সোভি-য়েট যুক্তরাষ্ট্রের আর্টিস্ট ইউ-নিয়নের হলে সেগেই আই-জেনস্টাইনের ১০০টি অপ্রকাশিত ছবির একটি মনোজ্ঞ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। প্রদর্শনীতে দেখান ছবিগুলি ইতিপূর্বে কোন এ্যালবামে ছাপা হয় নি অথবা কোন প্রদর্শনীতে দেখান হয় নি।

ইতিহাসের পাতা থেকে

লেনিন চলচ্চিত্র উৎসব

গত ২৭শে জুলাই তারিখে কলকাতা অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস্ হলে কলকাতা যুব সংঘের উদ্যোগে চার-দিনব্যাপী লেনিন শতবার্ষিকী চলচ্চিত্র উৎসবের উদ্বোধন হয়।

উৎসবের উদ্বোধন করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় বলেন যে, আজ সমগ্র বিশ্ব জুড়ে লেনিন জন্মশতবার্ষিকী উৎসবের যে আয়োজন চলেছে তার কারণ লেনিন শুধু রুশিয়ার মানুষের নেতা ছিলেন না, পরন্তু তিনি ছিলেন সমগ্র বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের নেতা।

কলকাতায় সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের কনসাল জেনারেল মিঃ ভি· এ· ঝারকভ তাঁর ভাষণে সোভিয়েট ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েট সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা এবং অক্টোবর বিপ্লব ও বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলনের নেতারূপে ভি· আই· লেনিনের বিরাট ভূমিকার কথা উল্লেখ করে বলেন, "লেনিন সম্পর্কে বলা মানেই শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রাম সম্পর্কে বলা।"

২৭শে জুলাই থেকে ৩০শে জুলাই পর্যন্ত চারদিনব্যাপী এই উৎসবে, "স্টোরিজ এ্যাবাউট লেনিন", "সিক্সথ অব জুলাই", "অক্টোবর", "ব্যাটলশিপ পটেমকিন" ও অন্যান্য বিখ্যাত রুশ চলচ্চিত্র দেখান হয়।

নতুন জীবন—নতুন নায়ক

॥ একুশ ॥

সমসাময়িক সোভিয়েট জীবন সম্পর্কে বিশ দশকে যে ছবিগুলি হয়েছে তাতে দেখা গেছে কিভাবে নতুন জীবন, নতুন সম্পর্ক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে সেই অন্তর্বর্তীকালে অগ্রসর হচ্ছে। ত্রিশ দশকে সমসাময়িক জীবন-চিত্র স্বতন্ত্র রূপ লাভ করে ও ভিন্নতর দৃষ্টিতে চিত্র গ্রহণ করা হয়। তখন ছবিতে দেখান হয় এক নতুন ধরণের মানুষ; যারা বিপ্লবের দ্বারা শিক্ষা পেয়েছে, উন্নত তাদের নৈতিক মান এবং আদর্শের প্রতি আনুগত্য। কয়েক বছরের মধ্যে মানুষের পরিবর্তন হয়েছে, দেশের সঙ্গে সঙ্গে তাদের জীবন গড়ে উঠেছে। ওদের মধ্যে গড়ে ওঠে যৌথ জীবনের মনোভাব, কিন্তু ব্যক্তির সত্তাকে ক্ষুন্ন করে সকলকে যে একই পর্যায়ে এনে উপস্থিত করেছে তেমন নয়; পরন্তু ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করেছে, নাগরিক চেতনাকে উন্নত করেছে এবং সব কিছুর ওপর অর্থাৎ দেশে যা ঘটছে সে সম্পর্কে দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তুলেছে। এই যে চেতনা এবং লক্ষণ—যা দেশের বেশির ভাগ মানুষের মধ্যে দেখা যাচ্ছিল এ সব ছিল সমসাময়িক বিষয়ের ছবিতে শিল্পদৃষ্টিতে লক্ষ্য করার জিনিষ। আলেকজান্দার ঝার্কি এবং আভ্‌সিফ হেইফিটস্-এর ছবি 'এ মেম্বার অব দি গভর্নমেন্ট' (১৯৩৯) একটি বাস্তব জীবনচিত্র। কাতেরিনা ভিনোগ্রাডস্কায়ার চিত্রনাট্য অবলম্বনে ছবিটি নির্মিত। সোভিয়েট ইউনিয়নের কৃষক মহিলাদের এটি এক বাস্তব জীবনচিত্র, সোভিয়েট সমাজব্যবস্থা কেবল সম-অধিকার দেয় নি, রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থায় অংশ গ্রহণের পথও খুলে দিয়েছে। আলেকজান্দ্রা সকোলোভার চমকপ্রদ অগ্রগতির চরিত্রটিকে যথাযোগ্য বিশ্বস্ততা ও মনস্তাত্ত্বিক গভীরতায় রূপ দান করেছেন সেকালের মঞ্চ ও চলচ্চিত্রের বিখ্যাত অভিনেত্রী ভেরা মারেংস্কায়া। ছবির নায়িকাকে সংগ্রাম করতে হয়েছে নির্বোধ ও প্রভাবশালী স্থাবির মানুষদের বিরুদ্ধে, এবং তার নিজের বিরুদ্ধেও। তাকে নিজের সুখ ত্যাগ করতে হয়েছে, এবং যাকে সে ভালবাসে সেই স্বামীর সঙ্গেও তার বিচ্ছেদ বরণ করতে হয়েছে। বিপ্লবের প্রতি তার অবিচলিত বিশ্বাস এবং তার নৈতিক চেতনা তাকে শক্তি জুগিয়েছে। লেনিন বলেছিলেন—বিপ্লব প্রত্যেক রাঁধুনীকেও রাষ্ট্র পরিচালনার শিক্ষা দেবে। এই ছবিটি ঠিক তাই দেখিয়েছে কিভাবে তা ঘটে। দরিদ্র কৃষকরমণী হিসাবে তিক্ত অভিজ্ঞতা আলেকজান্দ্রা সকোলোভাকে তাড়িত করেছে সম্মানজনক অবস্থার জন্য এবং সকলের সুখের জন্য সংগ্রাম করতে। —ক·স·গ·

'জাহগীর' ছবিতে সন্ধ্যা মজুমদার (রায়)

চয়নিকার 'ঘণ্টফটক' নাটকে দর্পনারায়ণ (প্রসাদ কুণ্ডু) ও রত্নাবাই (জ্যোৎস্না নিয়োগী)।

ক্রিকেট পরিস্থিতি

ইংলণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের মরশুমে শেষ হয়েছে। এবার শুরু হবে ইংলণ্ড-নিউজিল্যাণ্ডের টেস্ট লড়াই। ইংলণ্ডে খেত সফর শেষ করে নিউজিল্যাণ্ড আসবে ভারত ভ্রমণে, আর নিউজিল্যাণ্ড ভারত ছেড়ে যেতে না যেতেই অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দলের ভারতে খেলতে আসার কথা। অর্থাৎ এক কথায় বলা যায় যে, এ বছর ভারতে ক্রিকেট মরশুমটা জমবে খুব। সে কথা এখন থাক। যথাসময়ে ঐ প্রসংগে আলোচনা করা যাবে। এখন বরঞ্চ ইংলণ্ড বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের টেস্ট লড়াই-এর পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্ব ক্রিকেটের সাম্প্রতিক অবস্থাটা পর্যালোচনা করে দেখা যাক। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল নিয়েই না হয় শুরু করা যাক আলোচনা—যদিও ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলার কথা একাধিকবার আলোচিত হয়েছে। তবু মাত্র কয়েক বছর আগের অঘোষিত বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান দলের আজকের এই শোচনীয় হালই আমাদের কাছে বোধহয় সব থেকে বেশি পীড়াদায়ক। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল যেন বড় তাড়াতাড়িই সাফল্যের উচ্চতম শিখর থেকে নেমে এসেছে একেবারে নিচে। কিন্তু কেন এমন হলো? এতো তাড়াতাড়ি তো ঠিক এমনটি হবার কথা নয়। তবু হয়েছে। ব্যর্থতার বোঝার ওপর তাই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দল আজ দাঁড়িয়ে আছে। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের পরে যদি আমরা আসি ইংলণ্ডের কথায় তাহলে দেখবো যে ইংলণ্ড ক্রিকেট দলের সেই ধার আজ আর যেন নেই। অস্ট্রেলিয়ার অবস্থাও অনেকটা সেই রকমই। তবে ইংলণ্ড আর অস্ট্রেলিয়া দলের একটি বিষয়ে যথেষ্ট সুবিধে আছে আর সেই সুবিধে যে দলগত স্বার্থের দিক দিয়ে কতো প্রয়োজনীয় তার প্রমাণ বার বার পাওয়া গেছে ইংলণ্ড এবং অস্ট্রেলিয়া দলের খেলোয়াড়দের খেলার মধ্যে। তাঁরা তাঁদের দেশকে, তাঁরা তাঁদের জাতীয় দলকে ভালোবাসেন প্রাণ দিয়েই। সেই ভালোবাসাই খেলার মাঠে তাঁদের অনেকটা এগিয়ে দেয়। ফলে তাঁদের খেলার ধারাই যায় পাল্টে। তাই অনেক সময় তাঁরা নির্ঘাৎ পরাজয়ের মুখ থেকেও ফিরে আসেন আবার ভাঙা দল নিয়ে। তাঁরা এমন খেলা খেলেন যে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয় সকলকে। ভারত এবং পাকিস্তান দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে আবার এই জিনিষটার অভাব বড় বেশি। তাই তাঁদের খেলার মধ্যে অনেক সময় আন্তরিকতার অভাব বড় বেশি প্রকট হয়ে ওঠে। ফলে অনেক সময় অবধারিত জয়লাভও তাঁদের মুঠোর মধ্যে এসে ফস্কে যায় আবার যে খেলায় হেরে যাবার কোন সম্ভাবনা নেই, সেই খেলাতেও পরাজয় বরণ করে নিতে হয়। অর্থাৎ ভারত এবং পাকিস্তান ক্রিকেট দলের বিশেষ কোন নির্ধারিত মান নেই। এই তালিকায় নিউজিল্যাণ্ডকে স্থান দিলে হয়তো কেউ কেউ আপত্তি করবেন। করতেই পারেন। কারণ ভারত ও পাকিস্তানের তুলনায় নিউজিল্যাণ্ড এখনো বেশ কিছুটা পিছিয়ে আছে। সে যাই হোক বিশ্ব ক্রিকেটের সাম্প্রতিক অবস্থার পর্যালোচনা করতে গেলে আজ বোধহয় স্বীকার করতেই হবে যে, ক্রিকেট খেলার মান এখন নিম্নমুখী। বিশেষ কোন দেশ নয়, প্রতিটি দেশেই ক্রিকেট খেলা আজ একটা হতাশাব্যঞ্জক অবস্থায় এসে উপস্থিত হয়েছে। ফলে পরিস্থিতিও বর্তমানে বেশ জটিল। অথচ দেশে দেশে ক্রিকেট খেলার উন্নতি করতে হলে এই জটিলতা দূর করে ফেলতেই হবে। কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব? সেই চিন্তাই আজ সকলকে করতে হবে, সেই চিন্তার প্রয়োজনই বোধহয় আজ সব থেকে বেশি। আর সব থেকে তাড়াতাড়ি সেই চিন্তাই কার্যে পরিণত করা দরকার। অন্য দেশগুলি ইতিমধ্যেই এ বিষয়ে তৎপর হয়ে উঠতে আরম্ভ করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। কিন্তু ভারত কি করছে? ভারতীয় ক্রিকেটের উন্নতির জন্যে ভারতেরও তো কিছু করা দরকার। —শান্তিপ্রিয়॥

ক্রিকেটের খবর

ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সংগে শৈাত সফরে এসে প্রথম টেস্টেই নিউজিল্যাণ্ড ইংলণ্ডের কাছে গো-হারা হেরে গেছে।

॥ এডরিচ ॥

নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্টে ইংলণ্ডের জেতার পেছনে আছে এডরিচের সেঞ্চুরী।

এই ফলাফল অপ্রত্যাশিত না হলেও প্রথম দিকে খেলার ধারা দেখে মনে হয় নি যে নিউজিল্যাণ্ড ঐরকমভাবে ২৩০ রানে পরাজিত হবে।

পরাজিত হলেও নিউজিল্যাণ্ডের ফাস্ট বোলাররা প্রথম দিকে ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানদের যথেষ্ট বিপদে ফেলেছিলেন। ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানরা কিছুতেই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারলেন না। তবে শেষ পর্যন্ত ইংলণ্ডের রানসংখ্যা ১৯০-এর বেশি কিছুতেই হলো না।

প্রথম ইনিংসে ১৯০ রান করা ইংলণ্ডের কাছে নিঃসন্দেহে লজ্জার বিষয়। কারণ ক্রিকেট বিশ্বে নিউজিল্যাণ্ডের স্থান এখনো দুর্বলতম দল হিসেবেই। তাই ওয়েস্ট ইণ্ডিজের কাছে সদ্য রাবার বিজয়ী ইংলণ্ডের আরো উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্য, ইংলণ্ডের ব্যাটসম্যানদের আরো উঁচুদরের খেলা প্রত্যাশা করেছিলেন ক্রিকেট রসিকরা।

কিন্তু তাঁদের সে আশা পূর্ণ হলো না। দুর্বলতম প্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে ইংলণ্ডের নামী ব্যাটসম্যানদের দুর্বলতা বড় বেশি প্রকট হয়ে উঠলো। শুধু তাই নয়, জন এডরিচ যদি ভালো খেলতে না পারতেন, তাহ'লে অবস্থা যে শেষ পর্যন্ত কি হতো তা বোধহয় কল্পনাও করা যায় না।

প্রথম ইনিংসে ইংলণ্ডের রানসংখ্যার মধ্যে এডরিচ ছাড়া ইলিংওয়ার্থের ৫৩ ও ডলিভিয়েরার ৩৭ রানই একমাত্র উল্লেখযোগ্য। নিউজিল্যাণ্ডের বোলারদের মধ্যে টেলর ৩টি, মজ ও হাওয়ার্থ ২টি করে উইকেট লাভ করেন।

নিউজিল্যাণ্ডও কিন্তু খুব একটা সুবিধে করতে পারলো না। মাত্র ১৬৯ রানে শেষ হয়ে গেলো নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস। অধিনায়ক ডাউলিং আর কংডন ছাড়া আর কেউ ধরতে গেলে খেলতেই পারেন নি। ওঁরা দু'জনেই ৪১ রান করে করেছিলেন। বোলিং-এ অধিনায়ক ইলিংওয়ার্থ ৩৭ রানে ৪টি

॥ নয়কট ॥

এডরিচের সংগে ইংলণ্ডের দ্বিতীয় ইনিংসে শুভ সূচনা করেছিলেন নয়কট।

ও আণ্ডারউড ৩৮ রানে ৪টি করে উইকেট দখল করেন।

ফলে খেলা তখন মোটামুটিভাবে এসে গেলো ইংলণ্ডের হাতের মধ্যে। অর্থাৎ দ্বিতীয় ইনিংসে একটু ভালো ব্যাটিং করতে পারলেই ইংলণ্ড পারবে নিউজিল্যাণ্ডকে হারিয়ে দিতে। শেষ

গল্প হলেও সত্যি

"মজার খেলা হল 'খেলার রাজা' এই ক্রিকেট। কত সব মজার মজার ঘটনার নজীর যে এই রাজার খেলায় রয়েছে তার বোধ হয় কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। কিন্তু তবু এমন কতকগুলো ঘটনা থাকে, যে ঘটনাগুলো পুরোন হয়ে গেলেও তার নিজস্ব স্বকীয়তায় চিরকালই ভাস্বর থেকে যায়।

"যে ঘটনার কথা বলতে চলেছি সে ঘটনার নায়ক হলেন বি এল গেরিশ। অ্যাজমিনিস্টার ও কিউকের্ন নামে দু'টি দলের মধ্যে খেলা চলছিল। গেরিশ খেলছিলেন এই অ্যাজমিনিস্টার দলে। খেলাটিতে অ্যাজমিনিস্টার দল ব্যাট করতে নেমে সর্বসাকুল্যে করল মাত্র ৫২ রান। আর মজাটা হলো দলের মোট এই ৫২ রানের মধ্যে গেরিশ ব্যক্তিগতভাবেই করেছিলেন ৫০ রান! কিন্তু আরও আশ্চর্যের বিষয়, দলের বাকি ঐ রান দু'টিও সংগৃহীত হয়েছিল 'অতিরিক্ত' হিসাবে অর্থাৎ দলের বাকি দশজনে একটি রানও সংগ্রহ করতে পারেন নি! আর তার ফলে খেলাটিতে গেরিশেরই হলো জয় জয়কার...।"

—শ্রীসোমনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
হালিসহর, গোলাবাড়ি,
২৪-পরগনা।

॥ চন্দ্রশেখর ॥

চোখের অসুখের জন্যে চন্দ্রশেখর আর খেলতে পারবেন কি না সন্দেহ।

পর্যন্ত হলোও তাই। বয়কট আর এডরিচ প্রথম থেকেই খুব সতর্কতার সংগে খেলতে লাগলেন রান তোলার দিকে মন দিয়ে। বয়কট করলেন ৪৭ রান, এডরিচ তো সেঞ্চুরীই করলেন আর নাইট-এর রানসংখ্যা গিয়ে দাঁড়ালো ৪৯-এ। ফলে ইংলন্ডের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হলো-৩৪০ রানের মাথায়।

নিউজিল্যান্ডকে প্রথম থেকেই ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখোমুখি হতে হলো। ইংলন্ডের তীব্র আক্রমণধারার সামনে নিউজিল্যান্ডের ব্যাটসম্যানরা মোটে দাঁড়াতেই পারলেন না। মাত্র ১৩১ রানে শেষ হয়ে গেলো নিউজিল্যান্ডের দ্বিতীয় ইনিংস। ফলে লর্ডস মাঠের প্রথম টেস্ট ম্যাচে ইংলন্ড ২৩০ রানে হারিয়ে দিলো নিউজিল্যান্ডকে।

ভারতে ক্রিকেট মরশুম জমে ওঠার সময় হয়ে গেছে। সেপ্টেম্বর মাসেই

॥ প্রসন্ন ॥

ইংলন্ডে প্রশিক্ষণের ব্যাপারে আটকে পড়ার সম্ভাবনা আছে প্রসন্নর।

আসবে নিউজিল্যান্ড আর তারপরই ভারত সফরে আসবে অস্ট্রেলিয়া। তাই ভারতীয় দল গঠন নিয়ে ভারতের ক্রিকেট কর্তাদের টনক ইতিমধ্যেই নড়েছে।

ভারতের কয়েকজন খেলোয়াড়কে নিয়ে একটু যেন চিন্তায় পড়েছেন ক্রিকেট কর্তারা। ভারতের উইকেট-কীপার ব্যাটসম্যান ইঞ্জিনিয়ার এখন ইংলন্ডে—খেলছেন ল্যাঙ্কাশায়ার লীগে। তবে মনে হয় সময় মতো তিনি দেশে ফিরে আসতে পারবেন। কারণ ইংলন্ডের কাউন্টি লীগের খেলাও শেষ হয়ে যাবে ঐ সময়ে।

॥ ইঞ্জিনিয়ার ॥

ভারতের উইকেটরক্ষক ব্যাটসম্যান ইঞ্জিনিয়ার মনে হয় ঠিক সময়েই দেশে ফিরে আসতে পারবেন।

তবে বেশ মুসকিল হবে রুসি সুর্তিকে নিয়ে। রুসি অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে গেছেন। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেট মরশুম আর ভারতের ক্রিকেট মরশুম মোটামুটিভাবে এক। তবু মনে হয় যে, ভারতের টেস্ট মরশুম শুরু হবার আগেই সুর্তি দেশে ফিরে আসতে পারবেন।

প্রসন্নকে নিয়েও গোলমালে পড়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ। প্রসন্নর নাকি কি একটা প্রশিক্ষণের ব্যাপারে ইংলন্ডে যাবার কথা আছে। অথচ

॥ সুব্রত গুহ ॥

বাংলাদেশ থেকে একমাত্র সুব্রতই বোধহয় স্থান পাবেন ভারতীয় দলে।

প্রসন্ন বোলিং-এ এখন ভারতীয় ক্রিকেটের একটি প্রধান সম্পদ। তাই মনে হয় যাই হোক না কেন, ঠিক সময়েই প্রসন্নকে দলে পাওয়া যাবে।

তবে মনে হয় নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের পক্ষে এবার কয়েকটি নতুন মুখ দেখা যাবে। কিন্তু সব থেকে দুঃখের বিষয় হলো যে, চন্দ্রশেখর খুব সম্ভব খেলতে পারবেন না। গত বছর-দেড়েক ধরে তিনি চোখের অসুখে ভুগছেন।

বাংলাদেশ থেকে সুব্রত গুহ ছাড়া আর কারো ভারতীয় দলে স্থান পাবার সম্ভাবনা খুব একটা আছে বলে মনে হয় না। দেখা যাক বাংলাদেশের আর

॥ সুর্তি ॥

ভারতীয় টেস্ট মরশুম শুরু হবার আগে অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরে আসতে পারবেন কি?—এই প্রশ্ন নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কর্তৃপক্ষ এখন চিন্তিত।

কোন খেলোয়াড়ের ভাগ্যে টেস্ট ক্যাপ জোটে কি না।

আর একটা বিষয়ে কারো কোন সন্দেহই নেই। সেটি হলো ভারতীয় দলের অধিনায়কের বিষয়। পতৌদিই হবেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক। তবে যতোদূর মনে হয়, বোরদেকে এবার থেকে আর ভারতীয় দলের পক্ষে খেলতে দেখা যাবে না।

পরিচীয়তে

সুকল্যাণ ঘোষদস্তিদারকে

আরো ভালো খেলতে হবে

ভিন্ন প্রদেশ থেকে খেলোয়াড় এনে ময়দানে খেলানোর প্রচেষ্টাকে আমরা কোনদিনই সমর্থন করি নি। কেন করি নি—এ প্রশ্ন তুললে শুধু বলবো যে, বাইরে থেকে যাঁদের অনেক টাকার বিনিময়ে আনা হয়, তাঁদের অনেকের চেয়ে অনেক ভালো খেলোয়াড় আছেন খোদ শহর কলকাতায়, কিম্বা বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে। অথচ তাঁরা উপেক্ষিত। তাঁদের দিকে চট করে যেন নজর পড়ে না কলকাতা ময়দানের নামী আর দামী দলগুলোর।

আর পড়ে না বলেই সুকল্যাণদের মতো সম্ভাবনাপূর্ণ খেলোয়াড়রা উপেক্ষিতের তালিকায় নাম লিখিয়ে চিরকাল থেকে যান মাঝারিয়ানার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে। অথচ বাংলা ও বাঙালী খেলোয়াড়রা আজো ভারতীয় ফুটবলে শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান দাবি করতে পারেন।

বাংলাদেশ যদি সেই শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান বজায় রাখতে চায় তাহলে সুকল্যাণদের মতো খেলোয়াড়দের খুঁজে বের করতে হবে। যারা জান লড়িয়ে খেলবে নিজের জন্যে, খেলবে নিজের দলের জন্যে আর খেলবে নিজের দেশের জন্যে। সুকল্যাণের মধ্যে এই গুণগুলো আছে।

তাই আজ আর বলতে বাধা নেই যে, মরশুমী আবিষ্কার সুকল্যাণ ঘোষদস্তিদার শুধুমাত্র মোহনবাগান ক্লাবের নয়, বাংলা দলের অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন।

জলপাইগুড়ির ছেলে তরুণ খেলোয়াড় সুকল্যাণ ঘোষদস্তিদারের মধ্যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভাবনা আজ যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। সুকল্যাণের পায়ের জোরালো শটই বোধহয় তার সব থেকে বড় সম্পদ। যে-কোন জায়গা থেকে যে-কোন ভাবেই হোক না কেন, তিনি পারেন খুব জোরে শট মারতে।

তাই মোহনবাগানের নতুন খেলোয়াড় সুকল্যাণ ঘোষদস্তিদার এ বছর প্রায় অধিকাংশ খেলাতেই একটা না একটা গোল করে চলেছেন। অবশ্য ক' বছর আগে কলকাতা ময়দানে খেলতে আসার সংগে সংগেই সুকল্যাণ ভালো স্কোরার হিসেবে নাম করে ফেলেছিলেন। তাই সুকল্যাণের আর একটা নাম হলো সন্ধানী খেলোয়াড়।

সুকল্যাণ কিন্তু খুব একটা বেশি দিন খেলছেন না কলকাতা ময়দানে। ধরতে গেলে এখনো দুটো বছরও হয় নি। ১৯৬৭ সালে সুকল্যাণ ঘোষদস্তিদার কলকাতায় এলেন। খেললেন খিদিরপুর দলে। সে বছর জুনিয়ার বেঙ্গল দলে খেলার সুযোগও পেলেন। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৬৮ সালে তাঁকে খেলতে দেখা গেল রাজস্থানের পক্ষে। সেবার অর্থাৎ গত বছর শুধুমাত্র জুনিয়ার বেঙ্গলেই নয়, জুনিয়ার ইণ্ডিয়া দলেও প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ এসে গেল তাঁর।

জুনিয়ার বেঙ্গল এবং ইণ্ডিয়া দলের খেলোয়াড় সুকল্যাণ ঘোষদস্তিদার এ বছর ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দল মোহনবাগানের আক্রমণভাগের অন্যতম সেরা প্রতিনিধি। সুকল্যাণের খেলায় এখনো যে-সব দুর্বলতা আছে, আশা করা যায়, খুব শীগ্‌গিরই তিনি সেগুলি কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

সুকল্যাণের খেলোয়াড় জীবন শুরু হয় ধরতে গেলে ১৯৬০ সাল থেকেই। ১৯৬৩ সালে তিনি পেলেন জলপাইগুড়ি জেলা দলের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ। ১৯৬৪ সালে স্থান পেলেন বাংলা স্কুল দলে। ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত জলপাইগুড়িতে খেলার পর সুকল্যাণ চলে এলেন কলকাতায়। ময়দানী ফুটবলের প্রথম বিভাগে আবির্ভাব ঘটলো তাঁর। খেললেন প্রথম বিভাগে, খেললেন জুনিয়ার বেঙ্গল দলে, খেললেন জুনিয়ার ইণ্ডিয়া দলে আর সব শেষে এলো সন্তোষ ট্রফিতে খেলার সুযোগ।

তাই বলতে বাধা নেই যে, সুকল্যাণ ঘোষদস্তিদার আজ নামী খেলোয়াড় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আমরা চাই, সুকল্যাণ আরো ভালো খেলুন, আরো নাম করুন—শুধু নিজের নয় বাংলার মুখও উজ্জ্বল করুন।

সমাচার দর্পণ

দিল্লীর উন্নয়ন পর্ষদ জানিয়েছেন যে, দিল্লীতে যমুনা নদীর ধারে নতুন অলিম্পিক গ্রাম তৈরি করা হবে। এর জন্যে খরচ হবে প্রায় এক কোটি টাকা। এই কাজ কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাদপ্তর এবং দিল্লী উন্নয়ন পর্ষদ একযোগে করবেন। এই গ্রামটি তৈরি করার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকার ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় করবেন। অলিম্পিক গ্রামে থাকবে একটা বড় বাড়ি (মালটিপারপাস), ৮,০০০ লোক বসে খেলা দেখার মতো একটা ঢাকা স্টেডিয়াম এবং ৫০,০০০ দর্শকের বসে খেলা দেখার মত একটি উন্মুক্ত স্টেডিয়াম। অলিম্পিক গ্রামটা গড়ে উঠবে ৬০০ একর জমির ওপর।

প্রশ্ন উত্তর

প্রদীপকুমার বিশ্বাস (গ্লেমা চা-বাগান, গ্লেমা, দার্জিলিং)

প্রশ্ন : এবার মেক্সিকোতে বিশ্ব ফুটবল কাপের খেলায় কতগুলো দেশ যোগদান করছে? এশিয়া থেকেই বা কতগুলো দেশ যাচ্ছে?

উত্তর : বিস্তারিতভাবে আমি এখনো কিছু জানতে পারি নি।

অভিজিৎ ব্যানার্জী (কোন্নগর, মনসাতলা)

প্রশ্ন : 'এস কর্মকার' এবারের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হবে।—আপনার কি মনে হয়?

উত্তর : কিছু না।

পেলে সম্বন্ধে লেখা হয়েছে। ইউসেবিও সম্বন্ধেও গত সংখ্যায় লেখা হয়েছে। আপনার অন্য প্রশ্নের উত্তর সেইখানে পেয়েছেন। ইয়াসিন রাশিয়ার খেলোয়াড়।

মৃদুল দে (নামবাড়ি কলোনী, গৌহাটি—১১)

প্রশ্ন : বিশ্ব ফুটবল কাপের খেলায় কোন দলের বিরুদ্ধে কে সব থেকে বেশি গোল করেছেন?

উত্তর : আমি ঠিক জানি না। কেউ জানলে জানালে জানিয়ে দেবো।

আপনার চিঠির উত্তর ব্যক্তিগতভাবে দেওয়া হয়েছে। পেয়েছেন নিশ্চয়ই।

হীরেন্দ্রমোহন ভদ্র (সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি)

উত্তর : 'গল্প হলেও সত্যি' বিভাগের জন্যে আপনি আর একটা লেখা পাঠান।

প্রদীপকুমার বিশ্বাস (গুলমা চা-বাগান, গুলমা, দার্জিলিং)

উত্তর : আপনার চিঠি থেকে কিছু অংশ তুলে দিলাম :

কয়েক সংখ্যা আগে পল্লব চক্রবর্তী মহাশয় প্রশ্ন করেছিলেন যে, ভারতীয় ফুটবল খেলোয়াড়দের মধ্যে কে মারডেকায় হ্যাটট্রিক করেছেন? আমি যতদূর জানি যে, ১৯৬৭ সালে মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ভারতীয় খেলোয়াড় এম· গ্রেসিয়াস থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করেছিলেন।

'গল্প হলেও সত্যি' বিভাগটা আপনার ভালো লাগে জেনে আমরা উৎসাহিত হয়েছি।

বিকাশ? (মুরারিপুকুর রোড, কলকাতা)

উত্তর : ভারতের শ্রেষ্ঠ দৌড়বীর বলতে এখনো মিলখা সিংকেই বোঝায়। ওর সংগে যোগাযোগ করার জন্যে C/o. পাতিয়ালা স্পোর্টস ইনস্টিটিউট, পোঃ পাতিয়ালা, পাঞ্জাব, এই ঠিকানায় চিঠি দিতে পারেন।

প্রশান্ত বসু (কল্যাণী ভবন, ইয়ং রোড, আসানসোল)

উত্তর : না, গোল হবে না।

পরিতোষ নাগ (বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি)

উত্তর : আধুনিক অলিম্পিকে এমিল জেটোপেকই হীরোর সম্মান লাভ করেছেন।

সমরকুমার কুণ্ডু (বি টি রোড, কলকাতা-২)

প্রশ্ন : লীগ ফুটবলে গত দশ বছরে মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল দলের খেলার ফলাফল জানতে চাই।

উত্তর :

১৯৫৮—মোহনবাগান	(১) :	ইস্টবেঙ্গল	(০)
মোহনবাগান	(২) :	ইস্টবেঙ্গল	(১)
১৯৫৯—মোহনবাগান	(২) :	ইস্টবেঙ্গল	(০)
ইস্টবেঙ্গল	(১) :	মোহনবাগান	(০)
১৯৬০—মোহনবাগান	(০) :	ইস্টবেঙ্গল	(০)
মোহনবাগান	(২) :	ইস্টবেঙ্গল	(০)
১৯৬১—ইস্টবেঙ্গল	(১) :	মোহনবাগান	(০)
ইস্টবেঙ্গল	(১) :	মোহনবাগান	(০)
১৯৬২—ইস্টবেঙ্গল	(১) :	মোহনবাগান	(০)
ইস্টবেঙ্গল	(০) :	মোহনবাগান	(০)
১৯৬৩—মোহনবাগান	(০) :	ইস্টবেঙ্গল	(০)
ইস্টবেঙ্গল	(২) :	মোহনবাগান	(০)
১৯৬৪—মোহনবাগান	(০) :	ইস্টবেঙ্গল	(০)
মোহনবাগান	(০) :	ইস্টবেঙ্গল	(১)
১৯৬৫—ইস্টবেঙ্গল	(০) :	মোহনবাগান	(১)
ইস্টবেঙ্গল	(০) :	মোহনবাগান	(০)
১৯৬৬—ইস্টবেঙ্গল	(১) :	মোহনবাগান	(১)
ইস্টবেঙ্গল	(১) :	মোহনবাগান	(০)
১৯৬৭—ইস্টবেঙ্গল	(২) :	মোহনবাগান	(১)
মোহনবাগান	(১) :	ইস্টবেঙ্গল	(০)
১৯৬৮—মোহনবাগান	(১) :	ইস্টবেঙ্গল	(০)

হেমেন্দ্র দাস (বিদ্যানিকেতন হাই স্কুল, পাণ্ডু, গৌহাটি)

উত্তর : আমার মনে হয় মুরগীর......। খেলাধুলার বিষয়ে প্রশ্ন করলে ভালো হয়।

নির্মলকুমার চ্যাটার্জী (বি· কে· পাল এ্যাভিনিউ, কলকাতা—৫)

প্রশ্ন : ভারতীয় ক্রিকেট দলে বাংলার কোন খেলোয়াড় প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পান না কেন?

উত্তর : অনেক সময় খেলার জগতের রাজনীতির জন্যে আবার অনেক সময় দক্ষতার অভাবের জন্যে।

ভুলটা পরের সংখ্যাতেই ঠিক করে দেওয়া হয়েছে দেখেছেন নিশ্চয়ই।

বীরেন্দ্রনাথ পাল ও বিমলকৃষ্ণ পাল (বংশহারী, পঃ দিনাজপুর)

প্রশ্ন : কতো সাল থেকে আই· এফ· এ শীল্ডের খেলা শুরু হয়েছে?

উত্তর : ১৮৯৩ সাল থেকে।

দীপককুমার চৌধুরী (হিলা চা-বাগান, নাগ্রাকাটা, জলপাইগুড়ি)

উত্তর : সাদা কাগজের একদিকে পরিষ্কারভাবে লিখে আপনি গল্প হলেও সত্যি বিভাগের জন্যে লেখা পাঠাতে পারেন।

অসীম বন্দ্যোপাধ্যায় (তিনখড়িয়া)

উত্তর : স্পোর্টস এণ্ড প্যাসটাইম আর বেরোয় না। বন্ধ হয়ে গেছে।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসতকুমার মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতী

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আর দু'দিন বাকি

কা'র গলায় বিজয়মালা ?
ইন্দিরাজী কি ভাবছেন ?

বর্ষ : ৮ম সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৯শে শ্রাবণ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [74 year, No. 8, 14th August, 19

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৪৫১
আজকের মানুষ		৪৫২
সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	শঙ্করীপ্রসাদ বসু	৪৫৩
বই-র হাই—বাংলা বইয়ের মেলা	হরপ্রসাদ মিত্র	৪৫৮
দাবানল (কবিতা)	অমিয়কুমার হাটি	৪৬১
মাঠে (কবিতা)	বীতশোক ভট্টাচার্য	৪৬১
বঙ্গদর্শন		৪৬২
ভারতদর্শন		৪৬৫
আন্তর্জাতিক		৪৬৭
সপ্তাহের বোকা	কৃত্তিবাস ওঝা	৪৭০
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	অনন্ত সিংহ	৪৭৩

যে কোন
গয়না
আর
আসল
গ্রহরত্ন
কেনার
দক্ষিণ কোলকাতায়
নামকরা প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সন অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ডসন্স অব লেট
এম. বি. সরকার

৭১।১এ রাসবিহারী এভিনিউ

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
কোন্ কংগ্রেস আগস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছিল?	— শ্রীসর্বদর্শী	৪৭৭
তেইশ বছরে পা দিয়ে	— নরেন ভট্টাচার্য	৪৭৯
আলোর অভ্যুদয় (গল্প)	— মনোরঞ্জন হাজরা	৪৮১
ভারতের স্বাধীনতা ও মাদাম কামা	— অমল সেন	৪৮৫
বেকারদের দিকে তাকান	— বেণু ঘোষ	৪৯২
সাগর সঙ্গমে (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— সুশীল জানা	৪৯৪
গ্রাম-বাংলায় অন্ধকার	— সাগর বিশ্বাস	৪৯৭
তিমিরপ্রান্ত তর্পণ	— অগ্নিবর্ণ	৫০০
[illegible] ওদেশে এবং এদেশে	— শিয়ালি	৫০৩
[illegible]		৫০৬
খেলাধুলো	— শান্তিপ্রিয়	৫১০

সদ্য বেরিয়েছে ॥ বহুকাল পরে পুনর্মুদ্রণ ॥ নামমাত্র মূল্য

দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগ ঃ নীলদর্পণ। জামাই বারিক। বিয়ে পাগলা বুড়ো। নবীন তপস্বিনী। কমলে কামিনী।
২য় ভাগ ঃ সধবার একাদশী। যমালয়ে জীবন্ত মানুষ। পোড়া মহেশ্বর। কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ। লীলাবতী। সুরধুনী কাব্য। দ্বাদশ কবিতা। পদ্য সংগ্রহ। তৎসহ লেখকের জীবনী ও ভূমিকা।
(দুই ভাগে সম্পূর্ণ)

মূল্য প্রতি ভাগ চার টাকা।

বিদ্যারণ্য মুনি রচিত
বিবরণ প্রমেয়-সংগ্রহ
মূল্য চার টাকা

স্তবকবচমালা
মূল্য আট টাকা

যোগশাস্ত্র
মূল্য পাঁচ টাকা

শিবায়ন
মূল্য তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা-১২

৪৪ বর্ষ ঃ ৮ম সংখ্যা—মূল্য ঃ ৩০ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ২৯শে শ্রাবণ, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 14th August, 1969

স্বাধীনতা দিবস

আর মাত্র একটি দিন। ঐ দিন আমাদের স্বাধীনতা দিবস। পুরো বাইশ বছর হোল আমরা ব্রিটিশ রাজশক্তির কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করেছি। ঐ স্বাধীনতা রাজনৈতিক স্বাধীনতা। ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্টের কথা আজ মনে পড়ে। সেদিন সমস্ত ভারতের জনমানসে ছিল অভূতপূর্ব উদ্দীপনা, অফুরন্ত আশা। স্বাধীনতা লাভের পর সাধারণ মানুষ আশা করেছিল তাদের নিপীড়িত জীবনে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য নেমে আসবে। আর তারা তাদের প্রাণের ভারতকে মনের মতো করে গড়ে তুলবে। কিন্তু সুদীর্ঘ বাইশ বছরে তাদের আর্থিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। এমন কি শিক্ষা প্রসারের দিক দিয়েও দেশ আজো অনগ্রসর। তবু যারা শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে, তাদের একাংশ আজ বেকারিত্বের অভিশাপ বহন করে দিনযাপন করছে। বলা বাহুল্য, এইভাবে দেশের বিরাট এক যুবশক্তি গভীর নৈরাশ্যে বঞ্চনার তমসার মধ্যে কালক্ষেপ করছে। জনশক্তি যে-কোন দেশের মৌলশক্তি। ঐ শক্তি দীর্ঘদিন ধরে উপেক্ষিত থেকেছে—যদিও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনতাই সব কিছু। অবশ্য জনসাধারণ আজ জেগে উঠেছে। এতোকাল ধরে মিষ্টি কথায় যেভাবে তাদের ভুলিয়ে রাখা হয়েছে, সেভাবে এখন ভুলে থাকতে তারা রাজী নয়। দেশের বেদনাদায়ক চিত্র তাদের কাছে আজ সুস্পষ্ট। অর্থনৈতিক বৈষম্যের মূলগত কারণগুলি তাদের কাছে এখন অজ্ঞাত নয়।

অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়া কোনো দেশের সাধারণ মানুষ, তারা যতোই নিরক্ষর বা অশিক্ষিত হোক না কেন, সান্ত্বনা লাভ করতে পারে না, শান্ত হবার অবসর পায় না। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের পর আমাদের দেশ সামগ্রিকভাবে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করবে—এটাই ছিল সাধারণ মানুষের আশা। দুর্ভাগ্যের বিষয়, জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে জওহরলাল নেহরুর প্রচেষ্টায় গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্ররূপে ভারতকে গড়ে তোলার সংকল্প গ্রহণ করা হলেও তা কোনোভাবেই কার্যকর করা হয় নি। ফলে জনসাধারণের চরিত্রেও যেন একটা নতুন রূপের প্রকাশ ঘটেছে। স্বাধীনতা লাভের পর বাইশ বছর জনসাধারণ যেন নিদ্রাচ্ছন্ন ছিল এবং তারপর হঠাৎ তার ঘুম ভেঙেছে। সিংহের গর্জনে তারা যেন ঘোষণা করছে তারা এতোদিন নিদ্রাচ্ছন্ন ছিল না, ভারতের ঐতিহ্য অনুযায়ী সাধনার দ্বারা নিজেদের জানার পর তারা তাদের রাজনৈতিক চেতনা নিয়ে গণতান্ত্রিক শক্তি প্রয়োগ করেছে। তাই ভারতের রাজ্যে রাজ্যে জনতার জাগরণের ইংগিত আজ অত্যন্ত লক্ষণীয়। একদা যারা বিরোধী দল ছিল, তাদের হাতে এখনও বহুক্ষেত্রে প্রশাসনের কর্তৃত্ব।

এতদ্‌সত্ত্বেও ধুরন্ধর রাজনীতিবিদদের মোহমুক্তি ঘটে নি। সেই কারণে একই দলের অন্তর্ভুক্ত এবং কেন্দ্রে ঐ দল সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও সেখানে পারস্পরিক লড়াই মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। প্রথমত, চোদ্দটি ব্যাঙ্কের রাষ্ট্রীয়করণের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে কম প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয় নি। ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ ফলপ্রসূ করার জন্য প্রধানমন্ত্রী অর্থদপ্তর স্বহস্তে গ্রহণ করলে উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই পদত্যাগ করেন। দ্বিতীয়ত রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনের ব্যাপারে এমন জলঘোলা হয়েছে যে, রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদের নির্বাচনে একই দলের নেতৃবৃন্দ একমত নয় বললেই চলে। ঐ সব ঘটনায় বিরোধী দল সুযোগ গ্রহণ করবে, একথা বলাই বাহুল্য। তবে কংগ্রেসের মধ্যে একটি বিরাট অংশ এখন অনুধাবন করছে যে, জনসাধারণের কল্যাণের জন্য যা করা উচিত ছিল, তা করাই হয় নি এবং প্রধানমন্ত্রী সমস্ত রকম বিরুদ্ধাচরণ অগ্রাহ্য করে তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। স্বাধীনতা লাভের বাইশ বছরে সাধারণ মানুষ অবহেলিত ও লাঞ্ছিত। শুধু সেখানেই শেষ নয়।

দীর্ঘদিনের অবিচারের ফলে দেশে যে সঙ্কট উপস্থিত হয়েছে, তা নিবারণ করতে না পারলে রাজনৈতিক হাওয়া কোন্ দিকে গতি পরিবর্তন করবে, বলা মুস্কিল। কারণ এতোদিন স্বাধীনতা ভোগ করার পর জনসাধারণের মধ্যে প্রকটভাবে অসন্তোষ দানা বেঁধে উঠেছে। তাদের ধারণা, ভারতের স্বাধীনতা লাভের জন্য দেশের মানুষ সংগ্রাম করলেও সেই স্বাধীনতার ফলভোগ সাধারণ মানুষ করতে পারে নি। তাই আজ চারিদিকে ক্ষুধা, অশিক্ষা, বেকারী ও চরম নৈরাশ্য। দেশ শাসনের ভার এতোদিন যাদের হাতে ছিল, তারা সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য সত্যিই কি প্রাণপাত করেছেন? বহু রাজ্যে এখন অকংগ্রেসী সরকারের ওপর শাসনভার ন্যস্ত করেছে জনসাধারণ—তারা দেখতে চায় বিনা বাধায় ঐ সব সরকার তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা মেটাতে পারে কি না? ঠিক সেই মুহূর্তে দিল্লীর দরবারে অনৈক্যের নানা ঘটনার সমাবেশ। আগামী দিনই বলবে, সাধারণ মানুষের কপালে কী আছে।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

কোনো কোনো কাজ আছে যা করতে গেলে বিদ্যের চেয়ে বুদ্ধির প্রয়োজন হয় বেশি, উৎসাহী দলীয় মনোভাবের চেয়ে নিস্পৃহ নিরপেক্ষতা। আইনসভার স্পীকারের পদটি তেমনি একটা দায়িত্বপূর্ণ দপ্তর, আর ধীলনও তেমনি একজন ব্যক্তি যাঁর কর্মক্ষমতা, নিরপেক্ষ মানসিকতা সকল সন্দেহ-সংশয়ের ঊর্ধ্বে।

গুরুদয়াল সিং ধীলন এবার কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে লোকসভার স্পীকার নির্বাচিত হলেন। নির্বাচন অনুষ্ঠান অবশ্য আদপে করতে হয় নি, কংগ্রেসের সিন্ডিকেট গ্রুপ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরার সঙ্গে এই প্রশ্নে শক্তি পরীক্ষায় নামেন নি। রাষ্ট্রপতি পদে শ্রীমতী গান্ধীর প্রার্থী শ্রীজগজীবন রামকে হারিয়ে দিয়ে শ্রীসঞ্জীব রেড্ডিকে মনোনয়ন দেবার বিষময় ফল (কন্সিকোয়েন্স) তাঁদের প্রাণান্তকর অবস্থা, তাই সে-জ্বালা আর তাঁরা বাড়াবেন কেন?

লোক বা প্রার্থী হিসেবে শ্রীধীলনের যোগ্যতা সম্পর্কে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। এ গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত ব্যক্তির যা চাই তা তো তাঁর রয়েছেই, কিছু উপরিও আছে। পাঞ্জাব গভর্নমেন্ট কলেজ থেকে ১৯৩৫ সালে তিনি গ্র্যাজুয়েট হন। দুবছর বাদে ধীলন আইন বিষয়েও স্নাতক হন। কাজেই প্রয়োজনীয় শিক্ষা তাঁর অর্জিত।

আর অভিজ্ঞতা? তাও কম নেই, বরং বেশিই আছে। বেশি এজন্যে যে, এতদিন লোকসভার স্পীকার পদটি যাঁরা অলংকৃত করে এসেছেন, তাঁদের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা দেখিয়ে ও মর্যাদা দিয়েও বলা যায় যে, মভলঙ্কর, অনন্ত শয়নম আয়েঙ্গার, সর্দার হুকুম সিং এবং সঞ্জীব রেড্ডির স্পীকারের দায়িত্ব পালনের মত বিচারবুদ্ধি থাকলেও অভিজ্ঞতা বিশেষ ছিল না, কিন্তু শ্রীধীলন ইতিপূর্বে দু-দুবার পাঞ্জাব বিধানসভার স্পীকার নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং, কৃতিত্বের সঙ্গে তার সে-দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

এ-ছাড়াও আছে।

তবল গ্র্যাজুয়েট হবার পর অমৃতসরের এই সুঠামদেহী, বুদ্ধিমান তরুণটি কিংস কমিশন পান। যে সামরিক বৃত্তি বহু পাঞ্জাবীর বংশগত ধারা, শ্রীধীলনও তার প্রতি আকৃষ্ট হলেন। কিন্তু তাঁর আকর্ষণ থাকলে কী হবে, তাঁর প্রতি

ধীলন

কর্তৃপক্ষের থাকলে তবেই না! মানে কমিশন পেয়ে, তিনি দেরাদুনে সামরিক বিদ্যের ট্রেনিং নিতে থাকলেন বটে, কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই কর্তৃপক্ষ যেন উপলব্ধি করলেন যে, তাঁদের হিসেবে ভুল হয়েছে। জাতীয়তাবাদী ভাবধারা পোষণ করার কারণে বৃটিশ কর্তৃপক্ষ ধীলনকে দেরাদুন-ছাড়া করলেন।

করলেন তো করলেন, ধীলনের যেন আর ভাত জুটবে না, দেশে করার মত যেন কাজের অভাব রয়েছে! অমৃতসরের জমিদার বংশের ছেলে ধীলন, ভাত-কাপড়ের তাঁর অভাব হতে যাবে কেন! পেটে বিদ্যে রয়েছে, আইনটাও পাশ করা আছে, বলতে-কইতেও পারেন, কাজেই ওকালতি করতে তাঁর বাধাই বা কোথায়? আর তাও যদি না হয়, তো নিজের জমিতে লাঙল ধরবেন! জমিদারের ছেলে বলে তো তাঁর কোনো অহমিকা নেই!

হাল অবশ্য আক্ষরিক অর্থে ধীলনকে ধরতে হয় নি, তবে রাজ্য রাজনীতির হলকর্ষণ তিনি অবশ্যই করেছেন। দেরাদুন থেকে ফিরে ধীলন প্রথমে আইনব্যবসায়ই শুরু করেছিলেন। কিন্তু নিজেকে পুরোপুরি নিয়োগ করলেন সমাজসেবার কাজে। কংগ্রেস ও আকালি দল সেদিন একযোগেই কাজ করতো, ধীলনও দুটো দলেরই সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু আকালি দলকে যখন সাম্প্রদায়িকতার সংকীর্ণতা গ্রাস করল, ধীলন তখন নিজেকে আকালি দলের ছায়া থেকে দূরে সরিয়ে নিলেন। তিনি কৃষক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

কংগ্রেসী হয়েও শ্রীধীলন উদারপন্থী। বোধ হয় দীর্ঘকাল সাংবাদিকতা করার কারণেই তিনি সংস্কারমুক্ত হতে পেরেছেন। পাঞ্জাবের একটি দৈনিক ও একটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন ধীলন দীর্ঘকাল ধরে। স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন থেকেই ধীলন জয়ী হয়ে আসছেন। প্রথমে পাঞ্জাব বিধানসভার ডেপুটি স্পীকার, পরে স্পীকারের পদ পেয়েছিলেন তিনি। কিছুদিনের জন্য এখানে মন্ত্রিত্বও করেছেন। ১৯৬৭ সালে লোকসভায় নির্বাচিত হয়ে শ্রীধীলন সরকারী উদ্যোগ কমিটির চেয়ারম্যান হন।

সঙ্গতভাবেই আশা করা যায়, লোকসভার বাদ-বিতণ্ডা উত্তপ্ত আবহাওয়া তিনি শান্তভাবেই নিয়ন্ত্রণ করবেন।

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ন্যাশন্যাল স্যোশালিজ্‌ম—(৬)

ডঃ সাহার প্রবন্ধগুলি থেকে মনে হয়, ব্যবহারিক বিজ্ঞানে রাশিয়ার কৃতিত্ব তাঁর মনোহরণ করলেও ভারতের জন্য রাশিয়ার অপেক্ষা চীনের সান ইয়াত সেনের বৈপ্লবিক নীতিকেই অধিক গ্রহণযোগ্য মনে করেছিলেন। *Twenty-five Years of Russian Revolution* (Oct, 1942) প্রবন্ধের শেষে রাশিয়া ও চীন উভয়ের আদর্শই ভারতের পক্ষে গ্রহণীয় বলেছিলেন।১১ (কেবল রাশিয়ার নয়), পরের মাসে লেখা *The Renaissance of China* প্রবন্ধ থেকে দেখা যায় রাশিয়ার কমিউনিজমের থেকে চীনের কুয়োমিনটাং আদর্শের (তার বিশুদ্ধ রূপে, যার প্রবর্তক সান ইয়াত সেন) দিকেই তাঁর টান বেশি। কুয়োমিনটাং-এর প্রতি পক্ষপাত দেখাবার সময়ে তিনি এই আদর্শের মধ্যে যে আংশিক কমিউনিজম-বিরোধিতা আছে, সে সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। তিনি লিখেছিলেন—

"Our political leaders would do well to make a serious study of Sun Yat Sen's scheme of Government adopted in principle by the kuomintang, and partly put into operation! As some of the methods advocated by him may turn out to be a radical cure for communism, mock parliamentarianism, bureaucraticism and other obsolet forms of Government introduced and maintained in this country."

আলোচ্য প্রবন্ধের সূচনাতেও জার্মানীর বিরুদ্ধে রাশিয়ার প্রতিরোধের অনুরূপ জাপানের বিরুদ্ধে চীনের প্রতিরোধ দেখে বিস্ময় প্রকাশ করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে ডঃ সাহা রাশিয়ার মত যন্ত্রশিল্পায়নে চীনের সাফল্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন নি; সুতরাং ভিন্ন কারণ সন্ধান করতে হয়েছিল। সান ইয়াত সেনের এবং পরবর্তীকালে জেনারেল চিয়াং কাইসেকের নেতৃত্বের মধ্যে তিনি তার ব্যাখ্যা খুঁজে পেয়েছিলেন। এবং, যেহেতু চীনের সঙ্গে ভারতের নানা দিক দিয়ে অবস্থার মিল রয়েছে, তিনি চেয়েছিলেন, ভারত চীনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করুক। ভারত ও চীন উভয় দেশেরই মহান্ অতীত, পৃথিবীর সভ্যতায় উভয়েরই বৃহৎ দান, শ্রেষ্ঠ শক্তির দিনেও

১১ "We have given a short and objective review of the Russian Revolution, because we believe that as regards political thought, this country appears to be in the same stage as was Russia in 1900, or China of 1911. The ruling class has shown itself to be determined opponents of 'Technological Revolution' to a greater degree than to political or economic reforms, probably because they fear that if the economic condition of the common man is substantially improved, power will slip from their hands. The 'Patriot groups' suffer from intellectual confusim—some are guided by the obsolete half-theatrics of a Tolstoyan ideal, others utter only some unmeaning slogans copied from other countries, but not applicable to the conditions of this country. Worst are the divisions, and parties formed on religious basis. There is a great dearth of Directive and Creative Political Thought, as post-war Russia had in Marxism or China has since 1923, in the famous 'Three principles of the People' (San Min Chou) enunciated by Sun Yat Sen, the father of the Chinese Revolution."

দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, বিশৃঙ্খল বুদ্ধির জন্য যে-সমালোচনা ডঃ সাহা দেশনেতাদের বিরুদ্ধে করেছেন, তা তাঁর বিরুদ্ধেও করা যায়। দীর্ঘদিন ধরে তিনি ভারতে যন্ত্র-বিপ্লবের কথা বলছেন—১৯৪২ সালেই মাত্র আবিষ্কার করলেন ইংরেজ শাসকেরা ভারতে তা ঘটাতে দেবে না। সুভাষচন্দ্র বার বার তাই স্বাধীনতার প্রশ্নকে অগ্রাধিকার দিতে বলেছেন—তাই সঙ্গে তাঁর বক্তব্য, দেশের মনোভূমি-প্রস্তুতির জন্য যন্ত্রশিল্পায়ন ও সমাজতন্ত্রের পক্ষে প্রচার যেন চালিয়ে যাওয়া হয়।

তারা ইউরোপীয়দের মত সাম্রাজ্যক্ষুধা দেখায় নি, বিদেশী আক্রমণকারীদের উভয়েই ধৈর্যের সঙ্গে নিজ জাতির মধ্যে গ্রহণ করতে চেষ্টা করেছিল, তারা বারে বারে আক্রান্ত হয়েছে বাহিঃশত্রুর দ্বারা, অন্তর্বিরোধ ও জনগণের উদ্যমহীনতার জন্য পরাভূত ও পরাধীন হয়েছে, উভয় দেশই গত দুই শত বৎসর ধরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির লুণ্ঠনের ক্ষেত্র হয়েছে, এবং উভয় দেশেই এখন নতুন জীবনের স্পন্দন দেখা যাচ্ছে। উভয় দেশের পার্থক্যের কথাও ডঃ সাহা বলেছেন। উভয়ত্রই একান্নবর্তী পরিবারপ্রথা, কিন্তু চীনে বহু শত বৎসর ধরে যে-ধরনের একান্নবর্তিতা বর্তমান, ভারতে তা অজ্ঞাত। চীনে প্রথম আনুগত্য পরিবারের প্রতি, তারপর গোষ্ঠীর প্রতি, তার পরে প্রদেশের প্রতি। এর জন্য চীনে ইউরোপ-সুলভ ব্যক্তিস্বাধীনতা এবং জাতীয়তাবোধ গড়েই উঠতে পারে নি। একটি ক্ষেত্রে কিন্তু ভারতের তুলনায় চীনের জয়। চীনে ধর্ম থাকলেও ভারতে যেমন নানা ধর্ম জনগণের মনের উপরে জেঁকে বসে অখণ্ড জাতীয়তা অসম্ভব করে তুলেছে, চীনে তা ঘটে নি এবং সেখানে বংশগত জাতি-প্রথাও নেই ভারতের মত, সেখানে বৃত্তি অনুযায়ী জাতি।১২

একালে চীনের জাতীয় সংগ্রামের ইতিহাস ডঃ সাহা সংক্ষেপে জানিয়েছেন। ডঃ সান ইয়াত সেন এবং তাঁর বিপ্লবী দল কুয়োমিনটাং-এর ক্রম-সাফল্যের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। চীনা বিপ্লবের পিতা সান ইয়াত সেন কিভাবে 'চিন্তায় দক্ষ কিন্তু কর্মে শিথিল' চীনাদের দেশকর্মে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন, সে ইতিহাস জানিয়েছেন অনুরাগের সঙ্গে। সান ইয়াত সেনের দলের মধ্যেও মত-পার্থক্য ছিল। "কেউ গ্রামে-ফেরো নীতি ও কুটীর শিল্পের পক্ষপাতী, কেউ বা সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য-অনুকরণের, কেউ

১২ "But in one respect China has been more fortunate. In India 'Religion' has proved to be a great disturber of human relations rendering national unity almost impossible of achievement. In China on the other hand, religion sits very lightely on the shoulders of its people. A Chinese common man would not think it incongruous to offer his homage simultaneously to Buddha, to Laotze, and to innumerable local spirits and dragons for personal and spiritual satisfaction, while majority of the learned sceptics who ruled the country regarded all religious as worthless. But in the organisation of society, religion is not allowed to take any liberty as in India. China has followed in this respect the wise precepts laid down by the great philosopher Confucius, a near contemporary of Buddha. This has prevented the growth of any such evil system as 'caste' with hereditary privileges and pretensious as in India; but society has been organised into classes based on profession. The highest class was composed of imperial officers, chosen by a competitive examination; they are essentially scholars and took precedence over every other class. The classes next in rank were farmers, artisans, merchants and soldiers."

উদ্ধৃতি দীর্ঘ হলেও শিক্ষণীয় বস্তু এর মধ্যে আছে। প্রাচীন চীনের সামাজিক ব্যবস্থার সমূহ প্রশংসা এবং ধর্মনির্ভর ভারতীয় সমাজব্যবস্থার সমূহ নিন্দা ডঃ সাহা করেছেন। এ ক্ষেত্রে মতভেদ স্বাভাবিক। কিন্তু বিস্ময়ের কথা, একালের শ্রেষ্ঠ হিন্দু ধর্মাচার্য স্বামী বিবেকানন্দের অনেক ধারণার সঙ্গে এই ধর্মদ্বেষী বৈজ্ঞানিকের ধারণার ঐক্য আছে। স্বামীজী ভারতীয় জাতি-প্রথার পরবর্তী মন্দ পরিণতির কঠোর সমালোচক ছিলেন আমরা জানি। সামাজিক প্রথার সঙ্গে তিনি ধর্মকে যুক্ত করতে চান নি; বলেছেন; সামাজিক বিধানের সঙ্গে ধর্মকে জুড়ে দেওয়া দুষ্ট পুরুষদের কারসাজি। সামাজিক জীবনে মানুষের সঙ্গে মানুষের অধিকার-পার্থক্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা বিবেকানন্দ করেছিলেন। নিপীড়িতের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে চীনের সামাজিক ব্যবস্থা তাঁর কাছে আদর্শ বলে মনে হয়েছিল। প্রথম পাশ্চাত্যদর্শনের পরে সেখানে সামাজিক সুবিচার চেষ্টা দেখে মুগ্ধ হয়ে ভেবেছিলেন, নিম্নশ্রেণীর উন্নতি আমেরিকা করবে। তাঁর সে বিশ্বাস দূর হয়ে যায় ক্রমে, কারণ দেখেন অপরিমেয় ধনলালসা ও দুর্বলকে পীড়নেচ্ছা পাশ্চাত্য সমাজের উচ্চবর্গকে গ্রাস করে ফেলেছে। তখন তিনি নিবেদিতাকে বলেছিলেন, বহু শত বৎসর পূর্বে চীন যে নৈতিক সভ্যতার ভিত্তিস্থাপন করেছে, পাশ্চাত্যের সামাজিক সমাধানের তুলনায় তিনি তার পক্ষপাতী। ("on a second visit, however, he felt tempted to change his mind, seeing the greed of wealth and the best of oppressim in the West, and comparing these with the calm dignity and ethical stability of the old Asiatic solutions formulated by China many centuries ago.")

রাশিয়া ও চীন থেকে পরবর্তী অভ্যুত্থান আসছে এ কথাও স্বামীজী বলেছিলেন। সেই প্রায় অলৌকিক ভবিষ্যদ্বাণী কিভাবে করতে পেরেছিলেন আমরা বলতে পারব না। তবে মনে হয়, কতকগুলি ঐতিহাসিক লক্ষণ থেকে স্বামীজী রুশ বিপ্লব অনুমান করেন। বিপ্লবাত্মক রচনাদির সঙ্গে তাঁর পরিচয়, রুশ বিপ্লবী প্রিন্স ক্রপটকিনের সঙ্গে

যদি আপনার কোন লাভজনক পরিকল্পনা,
প্রয়োজনীয় কারিগরী জ্ঞান এবং
আবশ্যকীয় দক্ষতা থাকে

আমরা আপনাকে অর্থসাহায্য
করব যাতে আপনি নিজের
ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের পত্তন করতে পারেন!

বিশদ বিবরণের জন্য কাছাকাছি ষ্টেট
ব্যাঙ্কের অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করুন

সকলের সেবায় ষ্টেট ব্যাঙ্ক

পক্ষপাতী কামউনিজমের, অন্যরা বিভিন্ন ধরণের গণতন্ত্রের।"

সান ইয়াত সেন তার জীবনের শেষ পর্যায়ে বহু পঠন ও মননের পরে (বৃটিশ মিউজিয়ম কার্ল মার্কসের মতই সান ইয়াত সেনের কাছেও নিজ বাসভূমি) যে 'তিন নীতি' উদ্ভাবন করেছিলেন, তা 'চীনা জাতীয়তাবাদীর বাইবেল স্বরূপ', ১৭ বছরের মধ্যে ঐ নীতি চীনের জাতীয় জীবনে সম্পূর্ণ পরিবর্তন করিয়ে 'এক জাতি এক দেশ' এই চেতনায় চীনকে উদ্বুদ্ধ করিয়েছিল, যার ফলে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে চীন পেয়েছিল তার 'ফুয়েরার মার্শাল চিয়াং কাইশেককে'।

সান ইয়াত সেনের তিন নীতির প্রথমটি 'জাতীয়তা-নীতি'। এই নীতির দ্বারা তিনি চীনে মনস্তাত্ত্বিক বিপ্লব আনতে চেয়েছিলেন। পরিবার, গোষ্ঠী এবং প্রদেশের প্রতি আনুগত্যের বদলে দেশের প্রতি আনুগত্য আনা এর উদ্দেশ্য। ধর্মের এবং তথাকথিত রোমান্টিক আন্ত-র্জাতিকতার ঊর্ধ্বে স্থাপিত হবে এই জাতীয়তা।

দ্বিতীয়ত, 'গণতন্ত্রের নীতি'। এর মধ্যে আছে জনগণ কিভাবে সরকার গঠন করবে তার প্রসঙ্গ। ইতি-মধ্যে সান ইয়াত সেন পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার মোহ কাটিয়ে উঠেছিলেন। পাশ্চাত্ত্যের কমিউনিজম, ফ্যাসিজম বা পার্লামেন্টারিয়ানিজম-এর তুলনায় প্রাচীন চৈনিক জীবন-নীতির ভিত্তিতে তিনি সরকার গঠনের পরিকল্পনা করে-ছিলেন।

তৃতীয় নীতি—'জনগণের জীবনোপায়ের নীতি'—কিভাবে তাদের ঐহিক সমৃদ্ধি ঘটবে তার ব্যবস্থা। এক্ষেত্রে গ্রামীণ পদ্ধতিকে তিনি একেবারে বাতিল করে পরিপূর্ণ যন্ত্র-বিপ্লবের কথা বলেছেন। শিল্প বাণিজ্য, যোগাযোগ প্রভৃতি সব কিছুই বিজ্ঞানের সাহায্যে চালিত হবে, চীন একটি বৃহৎ কারখানা ঘরে রূপান্তরিত হবে। পরবর্তীকালে কাইশেকের নেতৃত্বে চীন এই পথেই অগ্রসর হয়েছে।

In accordance with San Yat Sen's Will, the Kuonmintang started a full programme for complete and unqualified Technological Revolution—by starting a Sinica Academica, A National Resources Planning Commission, improving communications, harnessing and training rivers, by introducing a Pai Hua (people's language), in place of the difficult classical language, and by adopting an all-round programme of industrialisation based on the latest methods of science and technology and with no mental reservation."

ডঃ সাহা রাশিয়ার কমিউনিজমের তুলনায় চীনের এই ত্রি-নীতিরই বেশি পক্ষপাতী। সান ইয়াত সেন যে রাশিয়ার পদ্ধতির ত্রুটি বুঝতে পেরেছিলেন, সে-কথা উল্লেখ করেছেন বেশ তারিফ করেই—

'He (Sun Yat Sen) also rejected, with almost prophetic vision, certain methods in Russian Communism as practised between 1919-1922, but advocated for the retention in the Kuomintang of what he considered the essential points in Communism. The Russians themselves, as a result of their experience, have dropped these methods, thus justifying Dr. Sun's wisdom."

ডঃ সাহা রাষ্ট্রনীতির ব্যাপারে কমিউনিজম নয়, সান ইয়াত সেনের নীতির প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ করেছেন এইভাবে—

"Our political leaders would do well to make a serious study of Sun Yat Sen's scheme of Government adopted in principle by the Kuomintang, and partly put into operation: as some of the methods advocated by him may turn out to be a radical cure for Communism, mock parlia-

---

তাঁর সাক্ষাৎ (এ সাক্ষাৎ হয় ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে, কিন্তু তার পূর্বেই স্বামীজীর ধারণা গঠিত হয়ে গিয়েছিল), এবং সমসাময়িক নানা রাজনৈতিক ঘটনা থেকে তিনি পূর্বোক্ত অনুমান করতে পেরেছিলেন। চীনের অভ্যুত্থান বা বিপ্লবের কথা অনুমানের মূলেও স্বামীজীর অতি ব্যাপক ও গভীর ইতিহাসবোধ। স্বামীজী প্রাচীন চীন সম্বন্ধে বলেছেন, তা "সভ্যতার অর্থাৎ ভোগবিলাসের, সুখস্বচ্ছন্দতার" আদি গুরু। চীনের সভ্যতা ঐহিক। ধর্মকে কিছু পরিমাণে গ্রহণ করা সত্ত্বেও তার সভ্যতা 'আধ্যাত্মিক' নয়, 'নৈতিক'; সে 'কনফুছের চেলা'। নীতিবাদ যদি অধ্যাত্মবাদে উন্নীত না হয় তাহলে তা মানুষের লোকজীবনেই আবদ্ধ থাকে। ইহজীবনকেন্দ্রিক এই নীতিবাদকে পরিবর্তিত করে বস্তু-নীতিবাদে রূপান্তরিত করা সম্ভব, যা সান ইয়াত সেন, ও পরে মাও সে তুং করেছেন। চীনের বিপুল জনসংখ্যার বিষয়টিও স্বামীজীর দৃষ্টি এড়ায় নি। 'বর্তমান ভারতে' স্বামীজী লিখেছিলেন, "মহাবল চীন আমাদের সমক্ষেই দ্রুত পদসঞ্চারে শূদ্রত্বপ্রাপ্ত হইতেছে।"। এই 'শূদ্র' অর্থাৎ শ্রমজীবী চীনের মধ্যে যদি একতা প্রবেশ করে, তাহলে চীন কৃষিনির্ভর দেশ হলেও বিপ্লব সম্ভবপর। চীনের বিপুল জনসংখ্যা, অনলস কর্মক্ষমতা, অনাধ্যাত্মিক নীতি-নির্ভর সভ্যতার মধ্যে স্বামীজী বিপ্লব-সম্ভাবনা দেখেছিলেন, অধ্যাত্মবাদী ভারতের ক্ষেত্রে তাকে দূরবর্তী মনে হয়েছিল। তবে এখানে একথাও জানানো উচিত, চীনের উক্ত আনুমানিক অভ্যুত্থানকে স্বামীজী পৃথিবীর সভ্যতার পক্ষে সর্বমঙ্গলপ্রদ মনে করেন নি। অধ্যাত্মবাদী ভারতবর্ষ যদি আত্মশোধন করে সামাজিক সুবিচারসমন্বিত নতুন সভ্যতা সৃষ্টি করতে পারে, তার মধ্যেই আছে মানবজাতির সত্যকার পরিত্রাণ—এই ছিল তাঁর ধারণা, এবং ভারতবর্ষ তা করবেই—সে বিশ্বাসেও তিনি অবিচল ছিলেন।

mentarianism, bureaucraticism and other obsolet forms of Government introduced and maintained in this country."

এতৎসত্ত্বেও বলা যায়, বিশ্ব-ইতিহাসে রুশ বিপ্লবের বিরাট তাৎপর্য তাঁর মনকে অভিভূত করে রেখেছিল, এই বিপ্লবের ব্যাপকতা এবং সর্বাঙ্গীণতাকে তিনি অভিনন্দন না জানিয়ে পারেন নি—

"The Russian Revolution was rightly regarded as the most momentous experiment with human society, as no other previous movement could approach it in the extensiveness of its programme, in the radical nature of its doctrines and the stupendousness of the scale of operation." *(Twenty-five years of the Soviet Union).*

[ক্রমশ]

হিমালয়ান গোল্ডেন ডাস্ট গুঁড়ো চা যে খেয়েছে সেই মজেছে। যেমনি রংদার গাঢ় লিকার, তেমনি স্বাদে গন্ধে ভরপুর। চা হবে কাপের পর কাপ। খেয়ে তৃপ্তি, খাইয়ে তৃপ্তি।
অন্য সব গুঁড়ো চা-কে টেক্কা দেয় হিমালয়ান গোল্ডেন ডাস্ট।

LIPTON লিপটন বলতেই ভালো চা

LHGC-8 BEN

হরপ্রসাদ মিত্র

বই-বাছাই

বাংলা বইয়ের মেলা

[পূর্বানুবৃত্ত]

আনন্দ বললে—পাদ্রি, নীল-কুঠী আর কোম্পানি—এই তিন শক্তির যোগ ঘটেছিল আমাদের আধুনিক পর্বের সূচনায়।

আমি বললুম—তার মানে?

সে তখন ব্যাখ্যা শুরু করে—

দেশ-শাসনের প্রয়োজনবোধ আর পাদ্রিদের ধর্ম-প্রচারের তাগিদ,—এই দুটি পৃথক কারণ পরস্পর যোগ দিয়ে এক হয়ে গিয়েছিল সেই আঠার শ' খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে। প্রথমে ছাপাখানা হোলো,—গদ্যে আইনের বই লেখা হোলো,—কোম্পানি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা করলেন, —সেই কলেজের অধ্যয়ন-অধ্যাপনার প্রয়োজনে বাংলায় গদ্য-চর্চাও শুরু হোলো।

সুকুমারবাবু তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' বই-খানির প্রাসঙ্গিক অংশে সেই পর্বের কথাসূত্রে লিখেছেন যে, একদিকে যেমন ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রয়োজনে বাংলা বই লেখা হয়, অন্যদিকে—'ব্যাপ্টিস্ট মিশনারিরাও বাঙ্গালা গদ্যে ধর্মশাস্ত্র প্রচারে লাগিয়া গিয়াছিলেন।' কিন্তু—

'কোম্পানি ধর্মপ্রচারের জন্য পাদ্রিদের কোনো রকম উৎসাহ দিত না, বরং বিরুদ্ধতা করিত। ব্যাপ্টিস্ট মিশনারিরা কলিকাতায় ঘাঁটি গাড়িতে অনুমতি পায় নাই বলিয়াই দিনেমারদের অধিকার শ্রীরামপুরে মিশন প্রতিষ্ঠা করেন (১৮০০)। পাদ্রিদের প্রচেষ্টা এবং কোম্পানির প্রচেষ্টার মধ্যে সংঘর্ষ হইতে পারিত এবং তাহা হইলে বাঙ্গালা গদ্যের গতি বেশ কিছুকাল প্রতিহত থাকিত। সৌভাগ্যের বিষয় তাহা হয় নাই। মিশন ও কলেজ দুই নৌকাই পাদ্রি উইলিয়ম কেরি বাহিতে পারিলেন।'

উনিশ শতকের সূচনার আগে থেকেই বাংলার সারস্বত সাধনায় বিদেশী বিদ্যানুরাগীদের কাজ শুরু হয়েছিল। ১৭৮৩ খ্রীস্টাব্দে বিলেত থেকে এক জাহাজের ডাক্তার হয়ে প্রথম ব্যাপ্টিস্ট মিশনারি জন টমাস বাংলাদেশে এসে কাজ শুরু করেন। কেরি (১৭৬১—১৮৩৪) এসেছিলেন টমাসের পরে,—সেই আঠারোর শতকেরই শেষ দিকে,—১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে। এদিকে ১৮০০ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয় এবং পরের বছর ৪ঠা মে কলেজের নানা বিভাগে অধ্যাপনার ব্যবস্থা চালু হয়। সেই সময় বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ হন উইলিয়ম কেরি,—হিন্দুস্থানী-বিভাগের হন জন গিলক্রাইস্ট। মলেদহ, নব-দ্বীপ প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চল থেকে পণ্ডিতদের আনিয়ে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কাজে লাগিয়ে দেন কেরি। গ্রন্থ-রচনায় এইসব পণ্ডিতদের উৎসাহিত করবার জন্যে কলেজের কর্তৃপক্ষ ১৮০১ সালের ৭ই জুলাইয়ের এক প্রস্তাবে 'নগদ পুরস্কারের' ব্যবস্থা করেন। এঁদের বই তো বটেই,—এবং এঁরা ছাড়া কলেজের সঙ্গে যাঁরা সংশ্লিষ্ট ছিলেন না, সেরকম কারো কারো বইও সেকালে এই কলেজ-কর্তৃপক্ষের আনুকূল্যে ছাপা হয়েছে, বিক্রিও হয়েছে। সাহিত্যসাধক-চরিতমালায়—ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 'পণ্ডিত'-পুস্তিকায় শেষোক্ত এই লেখকদের মধ্যে বিশেষভাবে গোলোকনাথ শর্মার নাম করা হয়েছে এবং এইসব বইয়ের মধ্যে 'বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য' এই বইগুলিরও তালিকা দেওয়া হয়েছে—

১। রামরাম বসু	রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র	১৮০১
	লিপিমালা	১৮০২
২। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	দ্বাত্রিংশ সিংহাসন	১৮০২
	প্রবোধচন্দ্রিকা	১৮১৩
৩। গোলোকনাথ শর্মা	হিতোপদেশ	১৮০২
৪। তারিণীচরণ মিত্র	ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিস্ট	১৮০৩
৫। চণ্ডীচরণ মুন্শী	তোতা ইতিহাস	১৮০৫
৬। রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়	মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং	১৮০৫
৭। রামকিশোর তর্কচূড়ামণি	হিতোপদেশ	১৮০৮
৮। মোহনপ্রসাদ ঠাকুর	ইংরেজী-বাংলা শব্দকোষ	১৮১০
	ইংরেজী-ওড়িয়া অভিধান	১৮১১
৯। হরপ্রসাদ রায়	পুরুষপরীক্ষা	১৮১৫
১০। কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন	পদার্থকৌমুদী	১৮২১

গোলোকনাথের আসল নাম বোধ হয় গোলোকনাথ মুখোপাধ্যায় এবং দিনাজপুরের মহীপালদীঘির কাছাকাছি কোনো জায়গায় তাঁর নিবাস ছিল। ১৭৯৫ সালের প্রথম দিকেই তাঁর ভাই কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় কেরির পণ্ডিত হন। গোলোকনাথ এই ঘটনার আগে থেকেই মহীপাল-দীঘির নীলকুঠীতে টমাসের পণ্ডিত হয়েছেন। গোলোক-নাথের 'হিতোপদেশ' মূল রচনা নয়,—আসলে অনুবাদ। সুকুমারবাবু স্পষ্টভাবেই জানিয়েছেন যে, এ অনুবাদ অনেকেরই পছন্দ হয় নি। সে যাই হোক, সংস্কৃত থেকে এই অনুবাদের কাজ শুরু হয় সেই মহীপাল-দীঘির কুঠীতে। কেরি তারই কাছাকাছি সময়ে,—১৭৯৪-এর জুন মাসে মদনাবাটীর নীলকুঠীর অধ্যক্ষ হন। সুন্দর-বন-অঞ্চল থেকে জলপথে মুন্শী রামরাম বসুকে সঙ্গে নিয়ে তিনি মদনবাটীর নীলকুঠীর অধ্যক্ষের পদ নিতে যান।

গোলোকনাথ শর্মা কেরির অধীনে কাজ করে গেছেন,—তবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কর্মচারী হিসেবে নয়। কিন্তু তারিণীচরণ মিত্র ১৮০১ সালেই হিন্দুস্থানী-বিভাগে গিলক্রাইস্টের অধীনে দ্বিতীয় মুন্শীর কাজ পান,—পরে ১৮০৯ সালে তিনি ঐ বিভাগে প্রধান মুন্শী হন। ১৮৩০ পর্যন্ত সেই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন। সেই কাজের সঙ্গে সঙ্গেই—১৮১৭ সালের ৪ঠা জুলাই যখন কলকাতায় স্কুল-বুক-সোসাইটি স্থাপিত হয়, তখন তারিণীচরণ তার দেশীয় সম্পাদক হন। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং রাধাকান্ত দেবের নামও ঐ সমিতির পরিচালকসমিতির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

আমি বললুম—এভাবে তথ্য-বর্ণনা চললে মন ক্লান্ত হয়ে পড়ে।

পাঠক এবং শ্রোতাদের এই শ্রান্তির সম্ভাবনা সম্বন্ধে আনন্দ অবহিত ছিল। সে বললে—আমাদের আধুনিক পর্বের এই প্রবেশ-পথটা সংকীর্ণ। এখানে বই আছে, কিন্তু বাছাইয়ের সুযোগ কম। অতএব এটুকু মার্জনা করতে হবে। শোনো, একজন বিশেষ মুন্শীর কথা,—তারিণীচরণ ছিলেন গোলোকনাথের চেয়ে চিত্তাকর্ষক ব্যক্তি। তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মুন্শীও ছিলেন, আবার স্কুল-বুক-সোসাইটির নেটিভ-সম্পাদকও ছিলেন,—আবার কলিকাতা-ধর্মসভা যাঁরা গড়ে তুলেছিলেন, তাঁদের মধ্যেও তিনি ছিলেন একজন। ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক যখন সতীদাহ-রোধের আইন জারি করেন, তখন তার বিরুদ্ধে দেশ থেকে বিলেতে যে দরখাস্ত যায়, তার মূলে ছিল এই 'ধর্মসভা'। ১৮৩০ সালের ১৭ই জানুয়ারি সংস্কৃত কলেজে এক সভায় সম্মিলিত হন এই সমাজ-সেবকদল। 'ধর্মসভা' এঁদেরই সভা। তারিণীচরণ সেই দরখাস্তখানি বাংলায় এবং হিন্দিতে অনুবাদ করে দেন। সমাচার-দর্পণে প্রকাশিত ৩১, জুলাই, ১৮৩০ তারিখের এক খবর তুলে দিয়ে ব্রজেন্দ্রনাথ তারিণী-চরণের এই কীর্তির নজীর দেখিয়েছেন। রামকমল সেন, রাধাকান্ত দেব প্রভৃতি তাঁর গুণগ্রাহী ছিলেন। রাধাকান্ত তাকে 'দাদা' বলতেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চাকরি থেকে অবসর নেবার পরে, তাঁরই সুপারিশে তারিণীচরণের চাকরি হয় কাশীতে। সম্ভবতঃ ১৮৩৭ সালে কাশীতেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

জন গিলক্রাইস্ট তাঁর ইংরেজি-জ্ঞানের প্রশংসা করে গেছেন। ১৮০৩ সালে ইংরেজি থেকে ছ'টি দেশী ভাষায় ঈশপের গল্পের এবং অন্যান্য প্রাচীন কাহিনীর যে অনু-বাদ বেরোয় (দি ওরিয়েণ্টাল ফেবুলিস্ট), তারিণীচরণ তার বাংলা, ফার্সী আর হিন্দুস্থানী অংশের রচয়িতা। স্কুল-বুক সোসাইটির পক্ষ থেকে ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে রাধাকান্ত দেব আর রামকমল সেনের সঙ্গে ইংরেজি এবং আরবী থেকে একত্রিশটি কাহিনীর বঙ্গানুবাদ 'নীতিকথা'র রচয়িতা হিসেবেও তাঁর নাম ছিল।

আমি বললুম—আনন্দ, এসব বইয়ের সাহিত্যগুণ কিছুই নেই। এসব আমাদের সমালোচনায় বেশি জায়গা জুড়লে পরিণাম ভয়াবহ হবে।

সে বললে—শুধু রস-সাহিত্যের তালিকা দিতে হবে—এরকম কথা তো ছিল না। টমাস, রামরাম, তারিণীচরণ প্রভৃতি মানুষগুলিও কি কম বিবেচ্য?

—তা ছিল না বটে,—এবং তখনকার কয়েকটি সাহিত্য-সাধকের ব্যক্তিত্বও আবেদনের বিষয় বটে, কিন্তু গোলোক-নাথের 'হিতোপদেশ', তারিণীচরণের 'নীতিকথা', চণ্ডীচরণ 'মুন্শীর তোতা ইতিহাস', রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের 'মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং', হরপ্রসাদ রায়ের 'পুরুষ-পরীক্ষা' ইত্যাদি সেকালের রচনা থেকে পঙ্গু বাংলার উদাহরণ সাজিয়ে যাওয়া কি আনন্দসম্মত ব্যাপার?

—কিন্তু তারিণীচরণের মতন সজীবতা, সক্রিয়তা দেখলে আমরা কি সুখী হই না? রামরাম বসু বা কাশীনাথ তর্ক-পঞ্চাননের মতন মানুষ যে বাংলা গদ্যচর্চার সেই আদিযুগে বিদ্যমান ছিলেন,—দোষে-গুণে চিত্তাকর্ষক এইসব ব্যক্তিত্ব কি তুচ্ছ?

—না, তুচ্ছ নয়। কিন্তু আমাদের এ আলোচনার উদ্দেশ্য তো ব্যক্তিত্ব-বীক্ষা নয়,—এ লেখার নাম দেওয়া হয়েছে 'বই-বাছাই'। আমরা কি সেকালের বাংলা গদ্যের ছাত্রপাঠ্য এইসব বইয়ের তালিকা দিতে চাই শুধু? এটা তোমাকে মনে করিয়ে দেওয়া দরকার।

এই মন্তব্য শুনে আনন্দ হাসতে হাসতে বললে—

পুঁথি-কাটা যত পোকা
মানুষকে ভাবে বোকা
বই কেন সে যে চিবিয়ে খায় না
এই লাগে তার ধোঁকা।

আমি তার এই হাসিতে উপহসিত বোধ করে বললুম—একথা তোমার জন্যেই পাঠকরা তুলে রেখেছেন—কাকে যে তুমি 'পোকা' বলছো জানি না, মানুষের দৃষ্টিতে তাঁরাই এ দৃশ্য দেখছেন,—মানুষ শিল্প-সাহিত্য চায়,—যথার্থ আবেদন চায়,—চায় কল্পনার সুখ, আকাঙ্ক্ষার বেদনা।

—সমাজ-চিন্তা, ভাষা-বিজ্ঞান ধর্ম-আন্দোলন—এসব ব্যাপারে বুঝি বেদনার অভাব? —এ সবই বুঝি পোকার খেলা?

—নিশ্চয়ই নয়,—পোকার খেলা নয়,—কিন্তু এ-আলোচনায় তুমি যদি উইলিয়ম কেরির "এ গ্রামার অফ দি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গোয়েজ' নিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠো, তাহলে প্রমথনাথ বিশীর কেরী সাহেবের মুন্শীর কথা সম্বন্ধে সাহিত্য-রসিক যে বৃহৎ পাঠক-সম্প্রদায় অপেক্ষা করছেন, তাঁরা কি উশখুশ করবেন না? কেরির কথাসূত্রে বরং সে-বিষয়টা এখানে কিঞ্চিৎ বললে ভাল হয়।

আনন্দ বললে—প্রমথবাবুর ও-বই অন্য জিনিস—। অন্য পর্বের কথা। সে-কথা যথাসময়ে উঠবে। কিন্তু গল্প-উপন্যাসের লেখকরা আমাদের এ-অধ্যায়ে দেখা দেবেন কেন? তাঁদের প্রসঙ্গ যথাস্থানে উঠবে। তাছাড়া, আরো একটা কথা,—তুমি তো জানো, সাধারণ পাঠকের স্মৃতি দূরগামী নয়। আমরা আমাদের আপন কালেই সর্বাধিক বিদ্যমান। ঠিক এই মুহূর্তে আমরা আমাদের আধুনিক পর্বের দূর সূচনা-কালের কথায় আছি।

এইটুকু বলেই আনন্দ হঠাৎ যেন উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো। বললে, আমাদের এ আলোচনার 'পূর্বকথা' শেষ হোলো—পরের অধ্যায়ের নাম দেওয়া যেতে পারে—'প্রবেশ-পথ'।

বললে—দ্যাখো ভাই, এসব কাজে মন-কষাকষি ঘটানো ভাল নয়। যাঁরা আমাদের খুবই কাছের লোক তাঁদের সম্বন্ধে নিরপেক্ষ থাকা শক্ত কাজ। আরো এগিয়ে গেলে একথা বুঝতে পারবে। তুমি সমালোচক হিসেবে যতো তুচ্ছই হও, যখনি কোনো জীবিত লেখকের বই-বাছাই করছো,—জেনো তোমার চিন্তার ওপর অনেক নশ্বর কিন্তু জীবিত রক্তচক্ষুর নজর বিদ্যমান। কোনো প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ অধ্যাপকের লেখা গল্প-উপন্যাস, নাটক বা কবিতা তো দূরের কথা,—এমন কি তাঁর কোনো সমালোচনার কোনো জায়গায়—যথার্থ আন্তরিক প্রতিবাদ যদি তোমার মনে দেখা দেয়, তাহলেও তুমি তা বলতে ইতস্তত করবে। —মনে হবে, কে জানে লোকটি হয়তো অসাধারণ 'বৈষয়িক শক্তি'তে বলবান। হয়তো তিনি কোনোদিন মন্ত্রী হতেও চেয়েছিলেন,—হন নি হয়তো,—আর একটু কূটবুদ্ধি থাকলে কিংবা অদৃষ্ট তাঁর অনুকূল হলে হয়তো মন্ত্রী বা উপমন্ত্রী হতেও পারতেন,—হয়তো প্রভূত ব্যক্তিগত সম্পত্তির মালিক হয়েও দরকার-মতন সর্বহারার বন্ধু হন,—যাঁর নীতি হোলো—যখন যেমন সরকার, তখন তেমনি দরকার। তিনিই হয়তো তোমার চাকরির মালিক। তাঁকে তো সমীহ করে চলতেই হয়।

আমি বললুম—আনন্দ, এসব মহাজনদের তো আমরাই সমীহ করি। এঁদের সম্বন্ধে তোমার এতো উদ্বেগ কেন? তুমি তো তাঁর মুখ চেয়ে চাকরি করো নি, করবে না, করতে চাও না। তুমি তো নিরঙ্কুশ 'আনন্দ',—তুমি একজন স্বাধীন পাঠক-প্রতিনিধি। হে 'পার্থ', ক্লৈব্য পরিত্যাগ করো,—মহা-কালের দিকে তাকিয়ে না-হয় কাশীনাথ তর্কপঞ্চাননের কথাই বলো।

আনন্দ বললে—তার আগে 'ভারতকোষ' নামে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে যে গ্রন্থমালা বেরিয়েছে, সেসব খণ্ডের কথা মনে পড়ছে। তাতে 'কুস্তু'-নামে পালোয়ানের প্রসঙ্গ—এমন কি, তাঁর আয়ুষ্কাল পর্যন্ত (আমার কপিতে অবশ্য তারিখের হরফের ঠিক ঠিক ছাপা পড়ে নি) দেওয়া হয়েছে,—কালিম্পং শহরের ওপর প্রায় দেড় কলম তথ্য আছে,—'কুলু' 'কুষ্টিয়া' ইত্যাদি নানা জায়গার কথা আছে,—কিন্তু কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন অনুপস্থিত। বেচারা কাশীনাথ! হায় রে ভারতবর্ষ।

আমি বললুম—আনন্দ, আজ তোমার মন ভাল নেই—তোমার জন্যে আজ একটি উপহার মনে আসছে—এই মুহূর্তেই মনে এলো। ভরসা পাই তো বলি।

সে বললে—কী? শুনতে দাও।

বললুম—টেনেসি উইলিয়মসের চমৎকার একটি নাটকে কথাটা পেয়েছিলুম। নায়িকার সব সময়েই ভয় হয় যে, তাঁর হৃদ্‌রোগ হয়েছে। একদা বাল্যপ্রণয়ী, নায়কটি কাল-ক্রমে ডাক্তারের বৃত্তি নিয়েছেন,—কিন্তু ফূর্তিবাজ, দায়িত্ব-জ্ঞানহীন ডাক্তার তিনি। তাঁর প্রেম একনিষ্ঠ ছিল না, ছিল আত্মনিষ্ঠ। কাজে-কাজেই বাল্যপ্রণয়িনীও ছিলেন, অন্যান্য নায়িকার প্রতিও আকর্ষণে এবং ঘনিষ্ঠতায় তাঁর কোনো সংকোচ ছিল না। এদিকে বাল্যকালের সেই নায়িকাটি ছিলেন নীতিতে, কর্তব্যে বিশ্বাসী। ইন্দ্রিয়পরায়ণতার বিপক্ষে তিনি। এক রাত্রে সেই যাজক-কন্যা, হৃদ্‌রোগ-শঙ্কিতা নায়িকা এলেন নায়কের পিতার খোঁজে,—তিনিও ডাক্তার। বুঝতেই পারছো, আসলে তিনি পুত্রের খোঁজেই এসে-ছিলেন,—পিতা অজুহাত মাত্র। এদিকে পুত্র তখন অন্য এক যুবতীর সান্নিধ্যসুখী। হাতেনাতে ধরা পড়লেন। সে-রাত্রে।

কিঞ্চিৎ কলহ হোলো বটে, কিন্তু যাজক-কন্যা কলহা-ন্তরিতা হলেন না। পৃথক কক্ষে গভীর রাত্রে নায়কের বলিষ্ঠ দেহ, সুন্দর মুখশ্রী, প্রসন্ন ব্যক্তিত্ব এবং প্রবল যৌবনের বিভায় মনে মনে শরণার্থিনী এই নায়িকা বললেন—তিনি হৃদ্‌রোগের ওষুধ চান। পিতার ঘুম না ভাঙিয়ে পুত্রই না-হয় সে ওষুধ সরবরাহ করুন।

ডাক্তার মনে মনে হাসলেন,—রোগিনীর অন্তর্বাসের ছোট্টো ছোট্টো মুক্তোর বোতাম খুলে স্টেথেস্‌কোপ লাগা-লেন। পকেট থেকে চকচকে ঘড়ি বের করে রক্তসঞ্চালনের স্পন্দনগতি অনুভব করলেন। তারপর মেয়েটিকে দুটি ঘুমের বড়ি খাইয়ে দিলেন।

নায়িকা বললেন—আমার মনে হয় আমি মরে যাবো। এই গ্রীষ্মেই আমার দিনাবসান ঘটবে। আমার হৃদ্‌যন্ত্র বড়ো দুর্বল। দম বন্ধ হয়ে যায় ক্ষণে ক্ষণে।"

ডাক্তার বললেন—না, না—একটি একটি করে দিনের পরে রাত আসবে, যাবে—গ্রীষ্মের পরে শীত আসবে,—তোমার

দাবানল

অমিয়কুমার হাটি

পাহাড় চূড়ায় জাগে সমুন্নত পাইনের বন,
ভৈরব ঘাঁটিতে সন্ধ্যা এলো তার হিম পাখা মেলে।
গঙ্গোত্রী আগামী প্রাতে লক্ষ্যস্থল। গোমুখের পথে
নন্দনবনের স্বপ্ন ; ভাগীরথী শঙ্খ দেয় ডাক।

হঠাৎ পাইন বনে মরণের কোন্ আয়োজন ?
ধোঁয়ার কুণ্ডলী ওঠে। দাবানল। লকলকে শিখা জ্বেলে
এখনি বিস্তৃত হবে কালিন্দীর তুষার জগতে,
পাহাড় আকাশ বুঝি পুড়ে যাবে। যাত্রীরা নির্বাক।

যেখানে গঙ্গার উৎস, সেখানেই আগুন যখন
কে তাকে নেভাতে পারে ? হিমরাজ্য গুঁড়ো করে ফেলে
ক্রমশ এগিয়ে আসে। যেন কোন অনির্বাণ ব্রতে
তুষার চক্রান্ত ভাঙে। গুরু গুরু মেঘে বাজে ঢাক।

গঙ্গায় অনল স্রোত। রুদ্ররূপ। চলেছে যাত্রীরা।
আগুন দেখায় পথ জ্বেলে দিয়ে লক্ষ সূর্য হীরা॥

মাঠে

শীতাংশোক ভট্টাচার্য

তখন উঠোন ছেড়ে তারা সব নেবে এল মাঠে ;
অথচ উৎসব নেই ঃ লক্ষ্মীর পা কখন চৌকাঠে
আলিম্পনে মুছে গেছে, উনুনের ধোঁয়া থেকে ঝুল
জমেছে ; মাছির মতো ছেলেমেয়ে খালি চুলবুল
করেছে আঁচল ধরে, না হয় মেলাতে নয়, কিন্তু যাবে হাটে।

হাটের অভাব নেই ঃ কপাটের মতো করে হাজারদুয়ারি
ব্যবসায় খুলে যায়, থরে থরে গামছা ও শাড়ি
এখন এখনই জমে—সহজিয়া পাচার স্বভাবে,
বেড়ার ওদিকে চোখ ঃ বিক্রিবাটা, কত কাটা যাবে—
লাভ তাই তিমিঙ্গিল চাই তিমি পেটভরা তেলানো আহারই।

হাড় বার করা গোরু, গাড়ি, তার ছন্নছাড়া ছই—
তবু তো এখনো আছে ; না থাকলে পায়ে হলে হেঁটে
কাঁটা ও উপরে কাঁটা—তবু যেতো চাকলায়, বেঁটে
নিত ও ভাগের ভাগ ঃ কত ধানে কত চাল, পাকা ধানে মই!

হৃৎপিণ্ডের ছোট্টো ঐ রক্তমুষ্টি সময়ের কালো দরজার ওপর কেবলি আঘাত করবে, কেবলি, কেবলি......

হঠাৎ রোগিনীকে বললেন—তুমি কি জানো দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, উচ্চতা আর কাল—এই চতুঃসীমায় আবদ্ধ আমরা? জানো কি মহাশূন্যের বক্র-বিস্তার? জানো কি জ্যোতির্বিদরা যাকে বলেন ম্যাগেলানিক মেঘমালা, সেখান থেকে আমাদের এই দুনিয়ায় আলো এসে পৌঁছোয় লক্ষ আলোক-বর্ষে?

নায়িকা তখন ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন—কি বলছো তুমি?

তাঁর তখন ঘুম এসে গেছে।

ডাক্তার বললেন—যখনি মনে হবে হৃদ্‌রোগের কথা, তখন এসব ভেবো।

আনন্দর মুখে যে বিরক্তির মেঘ দেখেছিলুম, সে-মেঘ কেটে যেতে দেখে আমি টেনেসি উইলিয়মসকে মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানালুম।

বললুম—বৃহৎ এই বিশ্ব, মহাকাল নিরবধি—এবং আনন্দ, তুমি শাশ্বত। তুমি আপন সত্যে প্রতিষ্ঠিত থেকে সুপ্রতিষ্ঠিত নশ্বরদের উপেক্ষা কোরো। বৈষয়িক অধ্যাপক-সমালোচকদের গ্রাহ্য কোরো না। ওঁরা সব খ্যাতির কীট, বাদশার বান্দা। আনন্দ, ভাগ্যিস তুমি অধ্যাপক হও নি—ভাগ্যিস তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেউ নও।

সে বললে—না ভাই, আমি নিজেও তো নশ্বর। এই নশ্বরতাই তো পাঠকের সঙ্গে তাঁদের প্রতিনিধির যোগের একটা সূত্র। আমি মানী লোকদের উপেক্ষা করবো কেন? কিন্তু তুমিই বলো, আমাদের পণ্ডিতদের স্বভাব কি ভাল?

আমি বললুম—এ বড়ো শক্ত প্রশ্ন,—গল্পের সেই পরিচিত সওয়াল মনে পড়ছে—আদালতে উকিলবাবু জিগেস করলেন কি মশাই, আপনি আপনার স্ত্রীকে প্রহার করার অভ্যাসটা ছেড়েছেন—'হাঁ' কিংবা 'না' বলুন।' —এ-কথার জবাব নেই।

দুজনেই একসঙ্গে হেসে উঠলুম।

আনন্দ বললে—আজ আর অন্য কথা থাক্। কোথি-রামরাম-মৃত্যুঞ্জয়-তারিণীচরণের প্রসঙ্গ এসে গেছে। অতএব আমাদের 'পূর্বকথা' শেষ হয়েছে। অতঃপর উনিশ শতকে প্রবেশ সার্থক হোক্।

আমি বললুম—দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম কি দেবে?

সে বললে—'প্রবেশ-পথ'।

[প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত]

[ক্রমশ]

বঙ্গদর্শন

গত ৩১শে জুলাই বিধানসভায় পুলিশী উচ্ছৃঙ্খলতার পিছনে কি [illegible] পুলিশ এ্যাসোসিয়েশনের কয়েকজন কর্মকর্তার উস্কানি ছিল? বিভিন্ন মহলে এই প্রশ্নটিই এখন আলোচিত হচ্ছে। ওই দিনের ঘটনায় যে কয়েকশত পুলিশ কনস্টেবল জড়িত ছিল তাদের মধ্যে শতকরা নিরানব্বই ভাগ একটি এ্যাসোসিয়েশনের সভ্য। তাদের শ্লোগানগুলি ছিল অধিকাংশই রাজনৈতিক, যেমন যুক্তফ্রন্ট মুর্দাবাদ, যুক্তফ্রন্টের ধাপ্পাবাজি চলবে না, কংগ্রেসকে ফিরিয়ে আন, যুক্তফ্রন্টকে ভেঙে ফেল ইত্যাদি। শ্লোগানগুলি সকলেই এক সুরে বলেছেন, যা থেকে প্রমাণিত হয় এগুলি আগে থেকেই রিহার্সাল দেওয়া ছিল। রীতি অনুযায়ী কোন পুলিশের মৃতদেহ নিয়ে যখন কোন মিছিল বেরোয়, পুলিশ এ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তারা তাতে যোগ দিয়ে থাকেন, কিন্তু এবার তাঁরা নাকি উপস্থিত ছিলেন না। কয়েকজন বড় দরের পুলিশ অফিসারকে আশেপাশে ধুতি-পাঞ্জাবী পরে ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেছে, যাতে একনজরে তাঁদের কেউ আইডেণ্টিফাই করতে না পারে। প্রকাশ যে গত ৩০শে জুলাই রাজ্যের কয়েকটি জেলা পুলিশ লাইনে, বিশেষ করে চব্বিশ পরগনা, নদীয়া ও হাওড়াতে কয়েকটি গোপন সভা-সমিতি হয় এবং এ্যাসোসিয়েশনের কয়েকজন কর্মকর্তা নাকি মিছিলের পরামর্শ দেন। ওই দিন রাত্রে এক গোপন সভায় মিছিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল, সেই সিদ্ধান্তের কথা সংবাদপত্র অফিসে টেলিফোন করে জানানো হয়েছিল, কিন্তু স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রসচিব কাউকেই তা জানানো হয় নি। বিভিন্ন মহলে এ প্রশ্ন উঠেছে যে, এর আগেও পুলিশবাহিনীতে বহু লোক নিহত হয়েছেন, কংগ্রেসী আমলে অসংখ্য, এমন কি ১৯৬৭ সালের যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে ইনস্পেক্টর শ্রীসোনাম ওয়াংদি জনতার হাতে তীরবিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছিলেন। তখন তো পুলিশবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয় নি? মাত্র কিছুদিন আগে পশ্চিম দিনাজপুরে একজন পুলিশ নিহত হন। একটি বিশেষ মুহূর্তে একটা বিশেষ ঘটনাকে উপলক্ষ করে যে অপকর্মটি ঘটানো হল, তার পিছনে একটা দীর্ঘদিনের যে পরিকল্পনা ছিল আজকে এই কথাটা বোধ হয় কেউ অস্বীকার করতে পারেন না। সম্প্রতি নিখিল ভারত পুলিশ এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীরামানন্দ তেওয়ারী কলকাতায় এসে নানা ধরণের উল্টোপাল্টা কথাই শুধু বলেন নি, যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রতি কটাক্ষ করেছেন, এবং সবচেয়ে মজার কথা, এই উপলক্ষে বরখাস্ত পুলিশদের পুনর্নিয়োগেরও দাবি জানিয়েছেন। আসলে যেন-তেন-প্রকারেণ যুক্তফ্রন্ট সরকারকে শুধু লোকচক্ষে হেয় করাই নয়, খোলাখুলি উচ্ছেদ করার একটা নেপথ্য প্রয়াস বরাবরই আছে এবং আমলাতন্ত্রের একটা বিরাট অংশ কোন-না-কোনভাবে এই চক্রান্তের অংশীদার। মনে রাখতে হবে প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হবার পর তাকে উচ্ছেদ করার মতলবে শিখদের দিয়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বাধানো হয়েছিল। এটা কোন মনগড়া কথা নয়, তদন্ত কমিশনের দ্বারা সমর্থিত। বর্তমান ঘটনাটি ওইরকমই একটি চক্রান্তের বহিঃপ্রকাশ, জ্যোতিবাবু সেদিন যদি ওভাবে রুখে না দাঁড়াতেন, এবং যদি অগ্রসরমান উত্তেজিত জনতার সঙ্গে বিধানসভায় বিদ্রোহী পুলিশদের খণ্ড-যুদ্ধ বাধত, অর্থাৎ অবস্থাটাকে যদি আরও এক ধাপ শোচনীয় করে তোলা যেত, তাহলে এখানে আইন-শৃংখলার অজুহাতে রাষ্ট্রপতির শাসন কায়েম করা যেত—চক্রান্তকারীরা বোধ হয় এই-রকমই ভেবেছিল।

চটকল ধর্মঘট

পশ্চিমবঙ্গের ৬৯টি চটকলের প্রায় আড়াই লক্ষ শ্রমিক দাবি আদায়ের জন্য লাগাতার ধর্মঘটে নেমেছে। ১৯৩৬ সালের পর বাংলাদেশের পাটশিল্পে লাগাতার ধর্মঘট এই প্রথম। এই ধর্মঘট যে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। চটশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের অবস্থা আজও পর্যন্ত যে সাবহিউম্যান স্তরে রয়েছে এ কথা নতুন করে বলার কোন প্রয়োজন নেই, অথচ এই পাটই ভারতের সবচেয়ে বেশি বৈদেশিক মুদ্রা আনয়ন করে। চটকল মালিকেরা দুদিক দিয়ে মুনাফার অংক দিনের পর দিন বাড়িয়ে গেছে, একদিকে শ্রমিক শোষণ অপর দিকে পাটচাষী শোষণ। বহু অত্যাচার সহ্য করার পর চটকল শ্রমিকেরা প্রত্যক্ষ আন্দোলনের পথে নামতে বাধ্য হয়েছেন। চটকলে নিযুক্ত সমস্ত শ্রমিক একযোগে এই আন্দোলনের সামিল হয়েছেন এবং দ্বিতীয়ত এই ধর্মঘটের পিছনে যুক্তফ্রন্ট সরকার মদত দিচ্ছেন। স্বভাবতই এই ঘটনায় কেন্দ্রের টনক নড়েছে, কেন না চটশিল্পের সঙ্গে কেন্দ্রের বৈদেশিক মুদ্রার স্বার্থ জড়িয়ে আছে। ধর্মঘট এড়ানোর জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক বাণিজ্যদপ্তরের মন্ত্রী শ্রী বি আর ভগত কলকাতায় এসেছিলেন, কিন্তু তাঁর আগমনে অবস্থার কোন পরিবর্তন হয় নি। তার মূল কারণ মালিকপক্ষের একগুঁয়েমী, অথচ শ্রমিকদের দাবির ন্যায্যতা সম্পর্কে কোন সন্দেহই নেই। চটকল ধর্মঘট অবসানকল্পে নয়াদিল্লীতে একটি বৈঠক বসেছে। পশ্চিমবঙ্গের দশজন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ওই বৈঠকে, যোগদানের জন্য দিল্লী গেছেন। কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রীর বিশেষ আমন্ত্রণে পশ্চিমবঙ্গের শ্রমমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণপদ ঘোষও দিল্লী গেছেন। যাত্রার প্রাক্কালে ট্রেড ইউনিয়নের নেতারা একটি বিবৃতিতে বলেছেন যে, সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে কেন্দ্রীয় সরকার ও মালিক সমিতির মধ্যে একটা ঐক্যমত হয়ে গেছে এবং ধর্মঘট প্রত্যাহার হবে এমন আভাষ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু শ্রমিকদের দাবি না মেটা পর্যন্ত ধর্মঘট প্রত্যাহারের কোন সম্ভাবনা নেই। এখনই উপযুক্ত পরিমাণ নগদ টাকা অন্তর্বর্তীকালীন বেতন বৃদ্ধি, বোনাস সমস্যার সমাধান এবং বাকি দাবিগুলি অবিলম্বে মেটানোর জন্য নিরপেক্ষ দ্রুত

কার্যকরী সংস্থা গঠনে মালিকপক্ষের সম্মতিদানের ওপর সমাধান নির্ভর করে।

সমবায় ব্যাঙ্ক

পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলায় কিছু সমবায় ব্যাঙ্ক কৃষকদের ঋণদানের ব্যাপারে জনবিরোধী নীতি অনুসরণ করে চলেছেন। রাজ্যের সমবায়মন্ত্রী শ্রীমতী রেণু চক্রবর্তী রাজ্য বিধানসভায় নদীয়া, উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার তিনটি সমবায় ব্যাঙ্কের তীব্র সমালোচনা করে বলেন যে, যেখানে সারা পশ্চিমবঙ্গের সমবায় ব্যাঙ্কগুলির মোট অনাদায়ী ঋণ চার কোটি তিন লক্ষ টাকা; সেখানে শুধু উপরি-উক্ত তিনটি ব্যাঙ্কের অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ দুই কোটি উননব্বই লক্ষ টাকা। সমবায়মন্ত্রী এটাকে অত্যন্ত উদ্বেগজনক অবস্থা বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি জানান যে, এত টাকা অনাদায়ী ঋণ জমে যাবার ফলে সমবায়

ইউবিআই
ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প

- ক্ষুদ্র শিল্পের বিশেষ সমস্যাগুলির সমাধানের জন্য দরকার বিশেষ ধরণের ব্যবস্থার। ইউবিআই-র সে ব্যবস্থা আছে।
- প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই গুণাগুণ বিচার করে ও প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণের দিকে লক্ষ্য রেখে অর্থ সাহায্যের প্রস্তাব বিবেচনা করা হয়।
- যদি কোন ক্ষুদ্র শিল্পের বৃহদায়তন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে উৎপন্ন দ্রব্য সরবরাহের সামর্থ্য থাকে,

অথবা

যথাযোগ্য শিক্ষা ও সামর্থ্য এবং অল্পস্বল্প পুঁজি নিয়ে যদি কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান বৃহদায়তন প্রতিষ্ঠানগুলির জন্য যন্ত্রপাতি তৈরীর ছোট কারখানা খুলতে চায়;

সে সব ক্ষেত্রে ইউবিআই প্রস্তাবগুলির সুসমন্বয় করতে এবং উপযুক্ত অর্থ সাহায্য দিতে চেষ্টা করবে।

এই ঠিকানায় লিখুন: জেনারেল ম্যানেজার

ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া

রেজিঃ ও হেড অফিস: ৪, নরেন্দ্র চন্দ্র দত্ত সরণি
(পূর্বতন: ক্লাইভ ঘাট স্ট্রীট) কলিকাতা-১

পশ্চিমবঙ্গে ১১৫টিরও অধিক শাখা অফিস আছে

ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ঋণ পাওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। এক্ষেত্রে জিজ্ঞাস্য, সমবায় ব্যাঙ্কগুলি এতকাল কাদের ঋণ দিয়েছেন এবং সেই ঋণ পরিশোধই বা করা হয় নি কেন? এই প্রশ্নের জবাবে সমবায়মন্ত্রী জানিয়েছেন যে, সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের পরিচালকমণ্ডলী ঋণ আদায়ের ব্যাপারে অত্যন্ত উদাসীন ও দায়িত্বজ্ঞানহীন। এঁদের কার্যকলাপ জনস্বার্থের প্রতিকূল, এবং স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, সমবায় ব্যাঙ্কগুলির অধিকাংশই প্রতিক্রিয়াশীল ও কায়েমী স্বার্থের কুক্ষিগত। যে গরীব কৃষককে সুদখোর মহাজনদের অত্যাচার থেকে বাঁচানোর জন্য সমবায় ব্যাঙ্কগুলির উৎপত্তি, সেই আসল উদ্দেশ্যই কার্যত পণ্ড হয়েছে। এ বিষয়ে যুক্তফ্রন্ট সরকারের নিশ্চয়ই কিছু কর্তব্য আছে।

স্বাস্থ্যদপ্তর-সমাচার

স্বাস্থ্যদপ্তরের দু'জন দুর্নীতিবাজ করণিকের বিষয়ে আমরা ইতিপূর্বে মণ্ডপদর্শনে যে সব গুরুতর অভিযোগ করেছিলাম তা নিশ্চয়ই পাঠকদের স্মরণে আছে। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হয়েছি যে, বিষয়টির প্রতি পরিষদীয় মন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্তীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল—যখন তিনি স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্যের অবর্তমানে স্বাস্থ্যদপ্তরেরও কাজকর্ম দেখাশুনা করছিলেন। সংবাদে আরও প্রকাশ যে তিনি কালবিলম্ব না করে ওই দু'জন দুর্নীতিপরায়ণ করণিককে তদ্দণ্ডে অন্যত্র সরিয়ে দেবার জন্য জনৈক ডেপুটি ডিরেক্টরকে (ইনি সুহৃদচক্রের 'নাম্বার টু' নায়ক) আদেশ দিয়েছিলেন কিন্তু উক্ত ডেপুটি ডিরেক্টর ওই আদেশ পালন করা দূরে থাক, উল্টে শ্রীচক্রবর্তী সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করেন। তিনি নাকি শ্রীচক্রবর্তীর অধিকারকে চ্যালেঞ্জ করেন এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী ফিরে এলে তাঁর মত সিনিয়র অফিসারকে অপমান করার প্রতিশোধ নেবেন বলে হুমকী দেন। (জানি না তাঁর হুমকী কতটা কার্যকর হয়েছে!) তিনি এখন প্রকাশ্যেই দৃঢ়তার সঙ্গে বলছেন যে, ওই দু'জন পরম দক্ষ কর্মচারীকে বদলী হতে তিনি দেবেন না, যতীনবাবু যতই বলুন না কেন। তাঁদের সুহৃদদা যখন (যাঁকে স্বাস্থ্যমন্ত্রীও নাকি দাদা বলছেন ইদানীং) আছেন, তখন তাঁরা কারো পরোয়া করেন না। তা ছাড়া ওই দু'জন করণিকের সংবাদ কারা আমাদের সরবরাহ করেছে, তা খুঁজে বার করার জন্য উক্ত ডেপুটি ডিরেক্টর মহোদয় উঠে-পড়ে লেগেছেন। বিষয়টি জানার পর আমরা মোটেই বিস্মিত হই নি, কেন না আমরা ভাল করেই জানি, কথা-সরিৎ-সাগরে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হাবুডুবু খাচ্ছেন, অর্থাৎ দুর্নীতিপরায়ণ আমলাদের মিষ্টিকথায় স্বাস্থ্যমন্ত্রী সর্বদাই গদগদ হয়ে আছেন—এ হেন পরিস্থিতিতে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেও স্বাস্থ্যমন্ত্রী দুর্নীতিকে দুর্নীতি বলে মনে করবেন না। এমন কি যে দুর্নীতি তাঁরই সহকর্মী, তাঁরই দলের মন্ত্রীর (যিনি তাঁরই জায়গায় অফিসিয়েট করেছেন) চোখেও ধরা পড়ে, স্বাস্থ্যমন্ত্রী তা দেখেও দেখেন না—এটা কিভাবে সম্ভবপর? এবং তাঁরই অধীনস্থ আমলার এতটা স্পর্ধাই বা কিভাবে হয়?

ভালমানুষ স্বাস্থ্যমন্ত্রী

অস্থায়ী প্রিন্সিপ্যাল ও সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডাঃ পঙ্কজ লাহিড়ীর অপসারণের দাবিতে গত ১০ই জুলাই থেকে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যাপক, হাউস স্টাফ, ছাত্র, নার্স ও অন্যান্য কর্মীরা ধর্মঘট-বিরোধীদের নানা প্ররোচনামূলক কার্যকলাপ সত্ত্বেও শান্তিপূর্ণভাবে যে ধর্মঘট (এখানে উল্লেখযোগ্য এই যে, এই ধর্মঘটে হাসপাতাল ও কলেজের ২২০০ জন কর্মীর মধ্যে ২১৭৫ জন যোগদান করেছিলেন) চালিয়ে যাচ্ছিলেন, স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীননী ভট্টাচার্যের লিখিত প্রতিশ্রুতি পেয়ে কো-অর্ডিনেশন কমিটি ১ই জুলাই রাতে সে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেওয়ায় সকলেই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে। আমরা কো-অর্ডিনেশন কমিটি ও হাসপাতালের কর্মীদের বিজয়লাভে অভিনন্দন জানাচ্ছি। উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর সময়োচিত হস্তক্ষেপের ফলেই স্বাস্থ্যমন্ত্রী অনেক জল ঘোলা করে শেষ পর্যন্ত কর্মীদের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়েছেন—এ কথা অপ্রিয় হলেও সম্পূর্ণ সত্য। কো-অর্ডিনেশন কমিটির নিকট লিখিত তাঁর সর্বশেষ চিঠি পড়লেই স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিসেবে তাঁর নিদারুণ ব্যর্থতা সকলের চোখের সামনে করুণভাবে ভেসে উঠবে।

ধর্মঘট সম্পর্কে স্বাস্থ্যদপ্তরের আগাগোড়া নির্লিপ্ত ভূমিকা, উল্টাপাল্টা বিবৃতিগুলি নিরপেক্ষ মন নিয়ে পর্যালোচনা করলে এ প্রশ্নও অনেকের মনেই জাগবে যে, স্বাস্থ্যদপ্তরের জন্য আদৌ কোন মন্ত্রী আছেন কি না। স্বাস্থ্যদপ্তরের প্রশাসনের অন্যান্য ক্ষেত্রে এই একই হাল। বারান্তরে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে।

ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের কর্মীদের ধন্যবাদ—তাঁরা নতুন করে যুক্তফ্রন্ট সরকার ও জনসাধারণের সামনে এ ভাবনা ও প্রশ্ন উপস্থিত করেছেন যে, স্বাস্থ্যদপ্তর পরিচালনায় ভালমানুষ ননীবাবু কত অসহায়, কত অস্থিরচিত্ত, কত অক্ষম। ইতিপূর্বে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ধর্মঘট ও বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজে ধর্মঘটের ব্যাপারেও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর এ অসহায় অবস্থার পরিচয় পাওয়া গেছে। আর প্রশাসনের প্রাত্যহিক কাজকর্মের ব্যাপারে আরও শোচনীয় অবস্থা। একজন জয়েন্ট ডিরেক্টর এবং তাঁর বশংবদ কয়েকজন ডেপুটি ও এ্যাসিসট্যান্ট ডিরেক্টর প্রকৃতপক্ষে স্বাস্থ্যদপ্তরের মালিক। এঁদের কল্যাণে অনাচার ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা তো অবলম্বিত হয়-ই না, বরং বহু ক্ষেত্রে দুর্নীতিবাজদের সাহায্য ও প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে। দুর্নীতির সুনির্দিষ্ট অভিযোগকে তৎপরতার সঙ্গে চেপে দেওয়া হয়েছে—এরকম ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমাদের কাছে আছে।

মুখ্যমন্ত্রী, উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দের নিকট আমাদের আবেদন—স্বাস্থ্যদপ্তরের কার্যকলাপের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখুন, অন্যথায় যে কোনো ক্ষেত্রে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের পরিস্থিতির পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে।

ভারতদর্শন

প্রধানমন্ত্রীর প্রাণনাশের হুমকী

আততায়ীর হাতে গান্ধীজী নিহত হয়েছিলেন। গান্ধীনীতির সঙ্গে ভিন্নমত হওয়ার দরুণ এই রাজনৈতিক হত্যা সম্ভব হয়েছিল। আমেরিকায় এমন অন্ধকারের জীবেরা ভিন্নমতাদর্শীদের হত্যা করে মানুষের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করেছে। এর ফলে হত্যাকারীর নীতি কিন্তু কোনকালেই মনুষ্যসমাজে গৃহীত হয় নি। বরং যিনি প্রাণ দিয়েছেন, তাঁর অসমাপ্ত কাজ সম্পন্ন করার জন্য দলে দলে সুস্থমনা নাগরিকরা আরও দৃঢ়তা ও কঠোর সঙ্কল্প নিয়ে এগিয়ে গেছেন। এ-জাতীয় হত্যা তাই হত্যাকারীর অভিলাষ-কেই পর্যুদস্ত করে। এর দ্বারা হত্যা-কারীর আকাঙ্ক্ষিত পথ প্রশস্ত না হয়ে অধিকতর সঙ্কুচিতই হয়। ভগবান যীশুকে শূলবিদ্ধ করে যে ভুল মানুষ করেছিল, তার মাশুল তাদের গুণে দিয়ে যেতে হয়েছে হাজার বছর ধরে। আবার রাজনৈতিক হত্যাকারীরা কেনেডী, গান্ধী, মার্টিন লুথার কিং-কে হত্যা করেও চূড়ান্ত মাশুল গুণে দেওয়ারই আয়োজন করেছে। সম্প্রতি প্রকাশ, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রাণনাশের হুমকী দিচ্ছে ইতিহাসে 'সু'-এর সঙ্গে একই মাটিতে বেড়ে-ওঠা একদল চিরন্তন মূর্খ কুচক্রী। বলা বাহুল্য এরা শ্রীমতী গান্ধীর যে নীতিতে অসন্তুষ্ট শ্রীমতী গান্ধীর প্রাণনাশ করে সেই নীতি ও কার্যাবলীকে স্তব্ধ করে দিতে এরাও পারবে না। তবু অন্ধকারাচ্ছন্ন মানুষের প্রতিশোধস্পৃহা অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা করে না। তাই শ্রীমতী গান্ধীর প্রাণনাশের যে হুমকী তিনি সম্প্রতি পেয়েছেন, তা জেনে স্বভাবতই দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত হয়ে পড়েছেন ভারতের জনসাধারণ। সম্মুখ সমরে পরাস্ত হয়ে যারা গুপ্ত-হত্যায় প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চায়; তাদের চক্রান্ত ফাঁস করার জন্য এই মুহূর্তেই সর্বত্রই চেষ্টা শুরু হওয়া দরকার এবং শ্রীমতী গান্ধীরও উচিত গুপ্তঘাতকদের থেকে সাবধানে যথেষ্ট প্রহরা এবং সতর্ক-তার মধ্যে বাস করা।

শ্রীমতী গান্ধীর অপরাধ, বাঙ্গালোর অধিবেশনে গৃহীত তাঁর প্রস্তাবিত বৈষয়িক নোটের অন্যতম কর্মসূচী ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ তিনি অন্যান্য কংগ্রেসী প্রস্তাবগুলির মতো বুলিসর্বস্ব লিপিবদ্ধ দলিল মাত্র না করে বাস্তবে রূপায়িত করেছেন। অপরাধ বৈ কি। আজ পর্যন্ত কথায় ও কাজে কংগ্রেস একই মূর্তি ধারণ করে নি। বছর বছর বুলি-সর্বস্ব প্রস্তাব পাশ করানো হয়েছে, সমাজতন্ত্রের জয়ঢাক পেটানো হয়েছে; কিন্তু কাজের বেলায় একটি অক্ষয় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেশের নাকের ডগায় নেড়ে লোলচর্ম বৃদ্ধরা ভেবে এসেছেন। একই-ভাবে তাঁরা দেশসেবায় পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে যাবেন গঙ্গাযাত্রার দিন পর্যন্ত। শ্রীমতী গান্ধীর অপরাধ, তিনি কংগ্রেসের সেই গঙ্গাযাত্রার দিনটিকে কিছু বিলম্বিত করতে চেয়েছেন মাত্র। অর্থাৎ দেশবাসীর সঙ্গে ফাটকা খেলার অপরাধে যখন কংগ্রেসকে বিক্ষুব্ধভাবে পরিত্যাগ করতে দেশবাসী বদ্ধপরিকর হয়ে উঠছেন, তখন শ্রীমতী গান্ধী চেয়েছেন কংগ্রেসের প্রতি মানুষের আস্থাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে। তাঁর এই অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থায় কিছু পুঁজি-পিশাচ জোট বেঁধে শ্রীমতী গান্ধীকে ক্ষমতাচ্যুত করবার ষড়যন্ত্রে তলে তলে লিপ্ত হচ্ছেন। এঁদের একমাত্র অস্ত্র কম্যুনিস্ট বিদ্বেষ, আর তাই তাঁরা শ্রীমতী গান্ধীকে কম্যুনিস্ট বলে চিহ্নিত করারও প্রয়াস পাচ্ছেন।

ভাবতে ঢের লোক নিজেদের কম্যুনিস্ট বলার জন্য উদ্গ্রীব। ঢের নেতা গরম বুলি আউড়ে কম্যুনিস্ট বলে নিজেকে জাহির করতে ব্যস্ত, কিন্তু কম্যুনিজমে দীক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা রাখেন এমন মানুষ অঙ্গুলিমেয়। তাই শ্রীমতী গান্ধীকে ঘিরে যাঁরা কম্যুনিস্ট আতঙ্কর সংক্রামক ভীতি প্রচারে নেমেছেন তাঁরা জ্ঞানপাপী। কম্যুনিস্ট বিদ্বেষীদের (এঁদের অধিকাংশই প্রকৃত কোনও 'ইজমে'র বোধশক্তিতে শক্তি-মান নন) শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করাই তাঁদের উদ্দেশ্য।

ভাবলে হাসি পায়, ভারতে চোদ্দটা ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এঁরা কিভাবেই মানসিক স্থৈর্য (মেণ্টাল ব্যালান্স) হারিয়ে ফেলেছেন। এই দলভুক্ত এক পার্লামেণ্ট সদস্যা (যিনি প্রধান-মন্ত্রীকে কম্যুনিস্ট আখ্যা দিয়ে বাজার গরম করছেন) শিশুর মতো অভিমানভরে বলে বসেছেন, তবে নিয়ে নাও, যা আছে সব নিয়ে নাও। যা কিছু হাতের সামনে পাচ্ছ, সব রাষ্ট্রায়ত্ত কর। এবং শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহও এমন কি কতকগুলি প্রস্তাব উত্থাপন করে যাবতীয় ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ, বিদেশী মূলধন, আমদানী রপ্তানী ব্যবস্থাদি জাতীয়করণ ইত্যাদি ও রাজন্যবর্গের ভাতা বিলোপ করার পক্ষে ক্ষিপ্ত বক্তৃতাও করছেন! তবে কি তারকেশ্বরীও কম্যুনিস্ট হয়ে গেলেন না কি? সেই শ্মশ্রু-গুম্ফাচ্ছাদিত বৃদ্ধ কার্ল মার্ক্স সাহেব স্বর্গে বসেও যে স্বস্তি পাবেন না। দুনিয়ার কম্যুনিস্ট বলবে, দোহাই মা, এভাবে আর ভূত নাচিয়ে ত্রিভুবন প্রকম্পিত করবেন না। আপনার নন্দী-ভৃঙ্গীকুল প্রলয় নর্তনে দিগ্বিদিক আকুল করে তুলবে। ক্ষ্যামা দ্যান!

বরং ভেবে দেখা উচিত, এই সুযোগে শ্রীমতী ইন্দিরা খুব পপুলার হয়ে যাওয়ার জন্য প্রাণপণ প্রয়াস শুরু করে দিয়েছেন। তাঁরা বরং ঐদিকটা সামলান।

এই তো সফদর জং রোডে সমবেত স্কুল শিক্ষকদের কাছে শ্রীমতী গান্ধী বলে বসেছেন, তিনি উচ্চপদ অধিকার করে বসে থাকা অপেক্ষা দেশের পঁচানব্বই শতাংশ মানুষের কল্যাণকামী পথ অনু-সরণে অধিকতর আগ্রহী। বুঝুন ব্যাপার। যে সে গণতন্ত্র নয়। একেবারে ভারতীয় গণতন্ত্রে যদি শ্রীমতী ইন্দিরার কথা শুনে এর পর পঁচানব্বই শতাংশ মানুষই তাঁর পেছনে মিছিল করে দাঁড়িয়ে পড়েন, বাকি পাঁচ শতাংশের হাত ধরে বুলিসর্বস্ব পুঁজি-পিশাচরা দাঁড়াবেন কোথায়? ব্যাপার গতিক খুব বেকায়দা। এখন শ্রীমতী গান্ধীর এই পপুলারিটিটাকে বরং কায়দা করার জন্য ঠাণ্ডা মাথায় পরি-কল্পনা করার সময়। তা না করে যদি কেউ দ্বিতীয় গান্ধী খুনের চক্রান্ত জেনেও চুপ করে বসে থাকেন তো বিষম বেসামাল অবস্থা হয়ে পড়বে।

যাই হোক, ভয় এই যে, কালা মা

শোনে ধর্মের কাহিনী। শ্রীমতী গান্ধীকে তাই সাবধান হতে হবে। সাবধান হতে হবে দেশের তাবৎ মানুষকেও।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের ভূমিকা

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণে যে বিশাল মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল, সেই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির প্রকৃত স্বরূপ কি? তারই ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন: রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে এখন থেকে গুরুত্ব দেওয়া হবে ঋণপ্রাপকের 'উদ্দেশ্যের ওপর', ঋণ গ্রহীতার 'যোগ্যতার ওপর নয়'। অর্থাৎ এতোদিন যে বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী ব্যাঙ্কগুলি নিয়ন্ত্রণ করছিলেন ও সেই সুবাদে একচেটিয়া ব্যবসা গড়ে তুলছিলেন সেই—সেই যুগের মক্কেক এখন থেকে সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে কাজ করবে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি সরকারের শাখা অফিসরূপে কাজ করবে। না, ব্যাঙ্কগুলো একটু সুস্থ ও যোগ্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানরূপেই কাজ করবে। ফলত সবুজ বিপ্লব গড়ে তোলার প্রচুর সম্ভাবনা দেখা দেবে, ফাটকা বাজারে টাকা নয় ছয় হবে না, দ্রব্যাদির মূল্য মুহুর্মুহু ওঠাপড়া করবে না এবং কংগ্রেসের বহুঘোষিত আধা সমাজতন্ত্রের পথে পা বাড়ানোর একটা উদ্যোগ আয়োজন করার কথা বাস্তবে ভেবে দেখার মতো অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবে।

হায়, কংগ্রেসকে ভরাডুবি থেকে বাঁচানোর জন্য, দেশের বেসামাল অর্থনীতির নড়বড়ে তক্তাটির পায়া জাতীয়করণের ফিক্সচার লাগিয়ে যথাযথ টিকিয়ে রাখার জন্য আর কোন নরম পন্থা শ্রীমতী গান্ধী হাতের কাছে পেতে পারতেন। আর তারই কি পুরস্কার শ্রীমতী গান্ধীকে দুঃস্বপ্নের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করবে! পুঁজিপিশাচদের নেহাৎ মাথা খারাপ না হলে তেমন কখনো হয়?

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে চাপ সৃষ্টির অভিযোগ

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এবার হাওয়া যেভাবে গরম হয়ে উঠেছে, 'ইন্ডিয়ান নেশন' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি সংবাদকে ঘিরে লোকসভায় তুমুল বিতণ্ডা তারই অন্যতম নজির। উক্ত পত্রিকার সংবাদে প্রকাশ, কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা না কি রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীনীলম সঞ্জীব রেড্ডিকে ভোট দেওয়ার জন্য বিহার বিধানসভার সদস্যদের ওপর চাপ (অসঙ্গত) সৃষ্টি করেছিলেন। নিজলিঙ্গাপ্পা অবশ্য এই সংবাদের প্রতিবাদ করেছেন।

লোকসভায় সংবাদটি নিয়ে যখন জোর বিতণ্ডা চলছে তখন উপাধ্যক্ষ শ্রীখাদিলকার একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। বলেছেন: বিষয়টি ভারতে সর্বোচ্চপদে নির্বাচন সংক্রান্ত। এ ব্যাপারে চাপ দেওয়া হলে সেটা খুব খারাপ হবে।

এবং এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এটাই মোদ্দা কথা। এ নিয়ে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। বস্তুত, গণতন্ত্র বলে চীৎকার করব আবার ক্ষমতারও অপব্যবহার করব, খাদিলকারের মতো কেউ-ই সে জিনিসটা সুস্থ মনে মেনে নিতে পারেন না। সংবাদ ভুল হলে নিজলিঙ্গাপ্পা মানহানি করতে পারেন, আবার সংবাদ ঠিক হলে আইনমন্ত্রী গোবিন্দ মেনন যেমন বলেছেন, ব্যাপারটাকে সুপ্রীম কোর্টে নিয়ে যাওয়া যায়। তবে তারও আগে সদস্যরা যেমন চেয়েছেন, এ বিষয়ে একটা গোয়েন্দা তদন্ত কিম্বা বিচার বিভাগীয় অনুসন্ধান চলতে পারে।

কিন্তু কোনক্রমেই আসন্ন নির্বাচনকে প্রভাবিত করে এমন কিছু করা যায় না। আর সে কারণেই লোকসভায় দাঁড়িয়ে বিতর্ককালে আইনমন্ত্রী গোবিন্দ মেননের পক্ষে এই উক্তি করাও একান্ত অসঙ্গত যে, 'সঞ্জীব রেড্ডি নির্বাচিত হতে যাচ্ছেন' বলেই কোনও বিরোধী সদস্য উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। লোকসভায় দাঁড়িয়ে এহেন নির্বাচনী প্রচার অস্বাভাবিক উত্তেজনার পরিচায়ক, যা কোন দায়িত্বশীল মন্ত্রীর ক্ষেত্রে নিতান্তই অশোভন।

স্পীকার পদে ধীলন

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সর্বসম্মতিক্রমে লোকসভার শূন্য স্পীকার-আসনে নির্বাচিত হলেন কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীগুরুদয়াল সিং ধীলন। পদটি শূন্য হয় রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী হয়ে শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি ঐ আসন থেকে পদত্যাগ করায়।

পঞ্জাবের আইনজীবী শ্রীধীলন বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অতঃপর তাঁর ৫৪ বছর বয়সে তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে ভারতের পঞ্চম স্পীকারের পদাধিকার গ্রহণ করলেন। আইন শিক্ষা সমাপন করে ধীলন যোগ দিয়েছিলেন বৃটিশের সেনাবাহিনীতে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বিদেশী প্রভুর সৈনিক হিসেবে কাজ করার চেয়ে মাতৃভূমির মুক্তিযুদ্ধের সেনারূপে আত্মদান করা শ্রেয়তর বিবেচনায় শ্রীধীলন স্বাধীনতা আন্দোলনে কিষাণদের মধ্যে কাজ করে কারাবরণ করেন। পরে ১৯৩৭ সাল থেকে ধীলন আইনজীবী ও সাংবাদিকরূপে কাজ করে আসছিলেন। স্পীকার পদে তাঁকে প্রার্থী হিসেব ঘোষণা করেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

'সিন্ডিকেট নিপাত যাক'
—শশিভূষণ

অবশেষে কংগ্রেস পরিষদীয় দলের সভায় এমন কথাও উচ্চারিত হল: সিন্ডিকেট নিপাত যাক। বললেন শশিভূষণ। উত্তেজনা এমন এক স্তরে পৌঁছলো যখন সভাপতি নিজলিঙ্গাপ্পাও সভাকে শান্ত করায় পুরোদস্তুর ব্যর্থ। ইন্দিরা-সমর্থকদের চীৎকারে শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহের আত্মপক্ষ-সমর্থন ডুবে গেছে। এবং ইন্দিরা গান্ধীও নীরব শ্রোতা।

উত্তেজনার কারণ ঘটিয়েছেন শ্রীমতী তারকেশ্বরী। বিহারের সংবাদপত্রে তাঁর যে প্রবন্ধটি পত্রস্থ হয়েছে, সেই প্রবন্ধ সরাসরি প্রধানমন্ত্রী ও কংগ্রেসের সাম্প্রতিক নীতির (বলাই বাহুল্য ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণ জাতীয় অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক) কঠোর সমালোচনা করে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছে বলে সভায় অভিযোগ উত্থাপন করেন শ্রীনীতিরাজ চৌধুরী। তারকেশ্বরী ক্ষিপ্ত হয়ে বলে ওঠেন: আপনার জন্যই (শ্রীমতী গান্ধী) দলের মধ্যে (কংগ্রেসে) কম্যুনিস্টদের অনুপ্রবেশ ঘটছে। এটা কংগ্রেসী সভা নয়, একধরণের কম্যুনিস্ট সভা।

তাঁর এহেন উক্তির প্রতিবাদে শ্রীমতী গান্ধী বলেছেন: কম্যুনিস্ট বলে সমগ্র সভাকে অপমান করছেন বক্তা।

দেখা যায়, সভায় শ্রীমতী তারকেশ্বরী 'আউট' হয়ে গেছেন। সদস্যবর্গ চীৎকারের চোটে তাঁকে কোণঠাসা করেছেন। কিন্তু এতো যে কাণ্ড ঘটে গেল তাতেও নিজলিঙ্গাপ্পা অবিচলিত। তিনি তখনও শুধু সঞ্জীব রেড্ডিকে জয়যুক্ত করার জন্য প্রচার ও আবেদন চালাচ্ছেন।

স্পষ্টতই এই সভা আরও একবার প্রমাণ করল কংগ্রেস দলে যে চিড় ধরেছে তার জোড়াতালি কেবলমাত্র চীৎকার ও পাল্টা চীৎকারেই সম্ভব হবে না। জল অনেক দূর গড়াবে। বোঝা গেল: সিন্ডিকেটের একনায়কত্বের কালও সীমিত হয়ে আসছে। শ্রীমতী তারকেশ্বরীই বর্তমানে মুহ্যমান সিন্ডিকেটিয়ানদের পক্ষে সেন্টার ফরওয়ার্ডের খেল খেলতে নেমেছেন। কিন্তু পাল্টা আক্রমণের মুখে তাঁর আয়ত্তে খেলাটিকে জমিয়ে তুলতে তিনি নাস্তানাবুদ হচ্ছেন।

আর এই সবেরই প্রেক্ষাপটে আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পটভূমি তৈরি হচ্ছে বলে উৎসাহবোধ করছেন অনেক বিরোধী নেতা-ই।

রেড্ডি না গিরি! সিন্ডিকেট না মুক্তি! দুই পক্ষেই জোর প্রচার ও তদারকী চলছে। অনেকের ধারণা রেড্ডি রাষ্ট্রপতি ভবন দখল করলে শ্রীমতী গান্ধীর আসন টলায়মান হয়ে উঠবে। লক্ষণীয় এই যে, শ্রীরেড্ডি যত না সোচ্চার, শ্রীগিরি তার চেয়ে ঢের বেশি আত্মপ্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত। 'আমি জিতবই'—গিরির এই শ্লোগান বর্তমান রোজদিনের সংবাদ। ওদিকে সিন্ডিকেটও নিশ্চেষ্ট নয়; যদিও সে চেষ্টা যথেষ্ট গণতন্ত্রসম্মত পথ গ্রহণ করছে না বলে কংগ্রেসী সদস্যরাও অভিযোগ তুলেছেন।

(৯।৮।৬৯)

রুমানিয়া ঃ

আন্তর্জাতিক

রুমানিয়ায় আটাশ ঘণ্টার 'ঐতিহাসিক' ও 'স্মরণীয়' সফর শেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিক্সন দেশে ফিরে গিয়েছেন।

'শান্তির সন্ধানে সফরে' বেরিয়ে এবার নিক্সন তেরো দিনে আটটি দেশ ঘুরেছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল রুমানিয়া সফর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর, সোভিয়েট ও মার্কিন পক্ষের মধ্যে 'ঠাণ্ডা লড়াই' শুরু হবার পর এই প্রথম কোন মার্কিন রাষ্ট্রপতি কোন কমিউনিস্ট রাষ্ট্রে সফরে এলেন।

কমিউনিস্ট দেশগুলির মধ্যে প্রথমেই রুমানিয়ায় নিক্সনের আসা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রুমানিয়া এখনও ওয়ারশ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হলেও সোভিয়েট ইউনিয়নের নিয়ন্ত্রণ থেকে সে অনেকটা মুক্ত। চীন-সোভিয়েট দ্বন্দ্বে রুমানিয়া নিরপেক্ষ, অন্য পূর্ব য়ুরোপীয় রাষ্ট্রের মত সোভিয়েট য়ুনিয়নের সমর্থক নয়। চেকোস্লোভাকিয়ায় সোভিয়েট হস্তক্ষেপ রুমানিয়া সমর্থন করে নি। দেশের কৃষি ও শিল্প এবং বাণিজ্যের নীতি নির্ধারণে রুমানিয়া সোভিয়েট খবরদারি মানতে প্রস্তুত নয়, নিজের জাতীয় স্বার্থই সেখানে তার কাছে বড়। পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে রুমানিয়া বিশেষ আগ্রহী। নানা ঘটনাকে উপলক্ষ করে ইদানীং সোভিয়েট য়ুনিয়ন ও রুমানিয়ার নেতাদের মধ্যে প্রকাশ্য বাগবিতণ্ডা হয়েছে। মস্কোয় অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিক বিশ্ব কমিউনিস্ট শীর্ষ সম্মেলনেও রুমানিয়াকে নিয়ে গোলমাল হয়েছিল। এই অবস্থায় সরকারিভাবে নিক্সনের রুমানিয়া সফর নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ।

রুমানিয়া অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে নিক্সনকে গ্রহণ করেছে। সংবাদে প্রকাশ, বুখারেস্টে নিক্সনকে রাজকীয় সম্মান দেখানো হয়েছিল। আদর-আপ্যায়নটা নেহাৎ আনুষ্ঠানিক লোকদেখানো ওপর-ওপর নয়, রুমানিয়ার মানুষ অন্তর থেকে নিক্সনকে সম্বর্ধনা জানিয়েছে। অভিভূত নিক্সন তাই বলেছেন ঃ রাজনৈতিক মত-পার্থক্য বেশিদিন বিভিন্ন দেশের মানুষকে তফাৎ করে রাখতে পারে না। রুমানিয়া সফর শেষে নিক্সন বলেছেন, তিনি ষাটটি দেশ বেড়িয়েছেন, তার মধ্যে সব চেয়ে স্মরণীয় হল তাঁর এই রুমানিয়া সফর।

২রা ও ৩রা আগস্ট, এই দু' দিনে মোট আটাশ ঘণ্টা নিক্সন রুমানিয়ায় ছিলেন। রুমানিয়ার রাষ্ট্রপতি ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্পাদক নিকোলাই সোসেসকুর সঙ্গে নিক্সন নানা বিষয়ে আলোচনা করেছেন। সংবাদে প্রকাশ, উভয় নেতার মধ্যে যে সব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে, তার মধ্যে আছে ঃ (১) চীন ও সোভিয়েট য়ুনিয়নের নীতি, চীন-সোভিয়েট বিরোধ, চীন-সোভিয়েট সীমান্ত সংঘর্ষ; (২) য়ুরোপের নিরাপত্তা ও য়ুরোপের উন্নতির জন্য পারস্পরিক সহযোগিতা; (৩) পূর্ব ও পশ্চিম সম্পর্ক; (৪) নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা; (৫) ভিয়েতনাম এবং এই সম্পর্কিত প্যারিস আলোচনা; (৬) পশ্চিম এশিয়া—আরব ও ইজরায়েলের দ্বন্দ্ব; এবং (৭) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রুমানিয়ার মধ্যে ঘনিষ্ঠতর অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক।

আলোচনা শেষে নিক্সন ও সোসেস্কু দুজনেই বলেছেন, তাঁদের আলোচনা খুবই হৃদ্যতাপূর্ণ হয়েছে। নিক্সন বোঝাবার চেষ্টা করেছেন, ভিয়েতনামে শান্তিস্থাপনের উপায় উদ্ভাবনের ব্যাপারে তাঁদের মনোভাব অনমনীয় নয়। সোভিয়েট য়ুনিয়ন তথা পূর্ব য়ুরোপ সম্পর্কেও তাঁরা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছেন। ওয়ারশ গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে য়ুরোপীয় নিরাপত্তা সম্পর্কে যে সম্মেলনের প্রস্তাব করা হয়েছে, সম্ভবত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাতে সম্মতি জানাবে এবং কমিউনিস্ট প্রতিনিধিদের সঙ্গে একত্র বসে সমগ্র য়ুরোপের প্রশ্ন পুনর্বিবেচনা করবে।

উভয় দেশের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপন কূটনীতির অন্যতম উদ্দেশ্য। এবং নিক্সন প্রথম সুযোগেই রুমানিয়া এসেছেন ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপনের জন্য, এ কথাও ঠিক। কিন্তু এই সফরের উদ্দেশ্য আরও গভীর। নিক্সন এই সুযোগে কমিউনিস্ট জগতে প্রবেশের চেষ্টা করছেন। কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যম হিসাবে সে রুমানিয়াকে পেতে চায়, আবার প্রয়োজন হলে এই 'অনুপ্রবেশের' সুযোগ নিয়ে সে অন্য কমিউনিস্ট দেশের বিরুদ্ধে 'আক্রমণাত্মক কাজও' চালিয়ে যেতে পারবে।

আরও একটি বড় উদ্দেশ্যের কথা অনেকে বলছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন চীনের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসতে চায়। অবশ্যই তা 'যতটা সম্ভব' আত্ম-সম্মান বজায় রেখে। আর এই কাজে সে মধ্যস্থ হিসাবে পেতে চায় রুমানিয়াকে। রুমানিয়ার সঙ্গে চীনের ভাল সম্পর্ক রয়েছে। নিক্সন সোসেস্কুর কাছে চীনের

চ্যাসেস্কু

নিক্সন

শুক্রবার ১৫ই আগস্ট
শুভমুক্তি
কাহিনী• নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
সংলাপ• অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
পরিচালনা• দীনেন গুপ্ত
সংগীত• নীহার রায়
সঞ্চয়িতা ফিল্মসের নিবেদন

বুধবার থেকে অগ্রিম বুকিং
রূপবাণী ০ অরুণা ০ ভারতী
অশোকা ০ পার্বতী ০ মায়া ০ গৌরী
মানসী ০ মৃণালিনী ০ কল্যাণী
এবং অন্যান্য চিত্রগৃহে
বিশ্ব পরিবেশনা : পিয়ালী ফিল্মস

নেতাদের মন বোঝার চেষ্টা করেছেন। বুখারেস্টে নিক্সনের দলের লোকেদের কাছে এ বিষয়ে সরাসরি প্রশ্ন করা হলে তাঁরা কোনরূপ মন্তব্য করতে অস্বীকার করেন।

রুমানিয়ার দিক থেকে ঘনিষ্ঠতর মার্কিন বন্ধুত্ব নানা কারণে কাম্য। রুমানিয়ার অর্থনৈতিক স্বার্থে এই বন্ধুত্ব প্রয়োজন। সোভিয়েট সাহায্য ছাড়াই যাতে রুমানিয়া দাঁড়াতে পারে, তার জন্য মার্কিন সমর্থন প্রয়োজন। তাহলে সোভিয়েট য়ুনিয়নের ধমক অগ্রাহ্য করা রুমানিয়ার পক্ষে সহজ হবে। ১৯৪৮ সালে স্ট্যালিন-টিটো বিরোধের পর যুগোশ্লাভিয়ারও মার্কিন সাহায্যের প্রয়োজন হয়েছিল।

সোভিয়েট য়ুনিয়নের পক্ষে এই নতুন মার্কিন-রুমানীয় সম্পর্ক বরদাস্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। 'প্রাভদা' স্পষ্ট ভাষায় বলেছে, কোন কমিউনিস্ট রাষ্ট্র যদি বেশি স্বাধীন হবার চেষ্টা করে, তবে তা বরদাস্ত করা হবে না। লিওনিদ ব্রেজনেভ প্রবর্তিত 'নিয়ন্ত্রিত সার্বভৌমত্ব'-এর অধিকারী পূর্ব য়ুরোপের কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলি, তার বেশি নয়।

নিক্সন-সফরের মাত্র পাঁচ দিন পরে রুমানিয়া কমিউনিস্ট পার্টির দশম সম্মেলনে এই কথাই আরও একটু স্পষ্ট করে বলেছেন সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির ভ্রাতৃত্বমূলক প্রতিনিধি কনস্টানটিন কাটুসেভ। কাটুসেভ সোজা বলে দিয়েছেন, পূর্ব য়ুরোপের সঙ্গে মার্কিন সেতু স্থাপনের নতুন চেষ্টা কিছুতেই বরদাস্ত করা হবে না। কাটুসেভ আরও বলেছেন, স্বাধীনতার নাম করে যদি কোন দেশ বাড়াবাড়ি করে, এবং তার জন্য যদি সমাজতন্ত্র বিপন্ন হয়, তবে সোভিয়েট য়ুনিয়ন তথা পূর্ব য়ুরোপের কমিউনিস্ট রাষ্ট্রগুলি চুপ করে বসে থাকবে না।

নাম না করলেও বোঝা যায়, কাটুসেভের আক্রমণের লক্ষ্য খাস রুমানিয়া, আর চেকোশ্লোভাকিয়ার ঘটনার পুনরাবৃত্তি করা হবে বলে ধমক দেওয়া হচ্ছে। কাটুসেভের বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করে বক্তৃতা করেন যুগোশ্লাভিয়ার প্রতিনিধি মিজালকো টোডেরোভিক। তিনি বলেন, প্রত্যেক দেশের স্বাধীনভাবে চলার এবং নিজের মত করে সমাজতন্ত্রে অগ্রসর হবার অধিকার আছে। কারও চোখ রাঙানি চলবে না।

বলা বাহুল্য, পার্টি সম্মেলনে চোসেস্কুর নীতিই সমর্থিত হয়।

অস্ট্রেলিয়া :

'অ্যানজাস' কাউন্সিলের ১৯তম বৈঠকে যোগ দেবার জন্য মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব উইলিয়াম রজার্স ক্যানবেরা এসেছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড নিয়ে এই সামরিক জোট গঠিত।

ক্যানবেরা আসার আগে রজার্স অনেকগুলি এশীয় দেশ ঘুরে এসেছেন। নিক্সনের সফরের কিছুটা সময় রজার্স তাঁর সঙ্গে ছিলেন, তার পর তিনি নিজে কয়েকটি দেশ আলাদা করে ঘুরেছেন। তার মধ্যে দক্ষিণ কোরিয়া অন্যতম।

'অ্যানজাস' বৈঠক থেকে নিক্সনের প্রস্তাবিত নতুন প্রশান্ত মহাসাগরীয় নীতি মোটামুটি অনুমোদিত হয়েছে। বৈঠক শেষে, ৯ই আগস্ট উইলিয়াম রজার্স, অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী গর্ডন ফ্রিথ ও নিউজিল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী হোলিয়োকের পক্ষ থেকে যে যুক্ত ইস্তাহার প্রকাশ করা হয়, তাতে বলা হয়, এশিয়া তথা অস্ট্রেলিয়ার দেশগুলিকে এখন থেকে বেশি করে নিজেদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে।

'অ্যানজাস' নেতারা বিচলিত হয়েছেন ভারত মহাসাগরে সোভিয়েট যুদ্ধজাহাজের প্রবেশে। বৈঠকে এই নিয়ে তাঁরা আলোচনা করেছেন।

রজার্স এখানে বলেছেন, চীনের সঙ্গে আলোচনা শুরু করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তুত আছে। ভিয়েতনামের ব্যাপারে তিনি বলেছেন, দক্ষিণ ভিয়েতনামে কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেও তাঁদের আপত্তি নেই, তবে 'বাইরের কোন চাপ ছাড়াই' দক্ষিণ ভিয়েতনামের লোকেদের তাদের পছন্দমত সরকার গঠনের সুযোগ দিতে হবে। এই 'গণতান্ত্রিক অধিকার' আদায়ের জন্যই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এত চেষ্টা।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় নতুন মার্কিন নীতি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে 'প্রাভদা' বলেছে, 'সিয়েটো' ও 'অ্যানজাস' তুলে দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখন নতুন একটি জোট গঠনের চেষ্টা করছে। তার নাম : 'প্যাটো' (PATO), বা 'প্যাসিফিক এশিয়ান ট্রিটি অর্গানিজেশন'।

(১০-৮-৬৯)

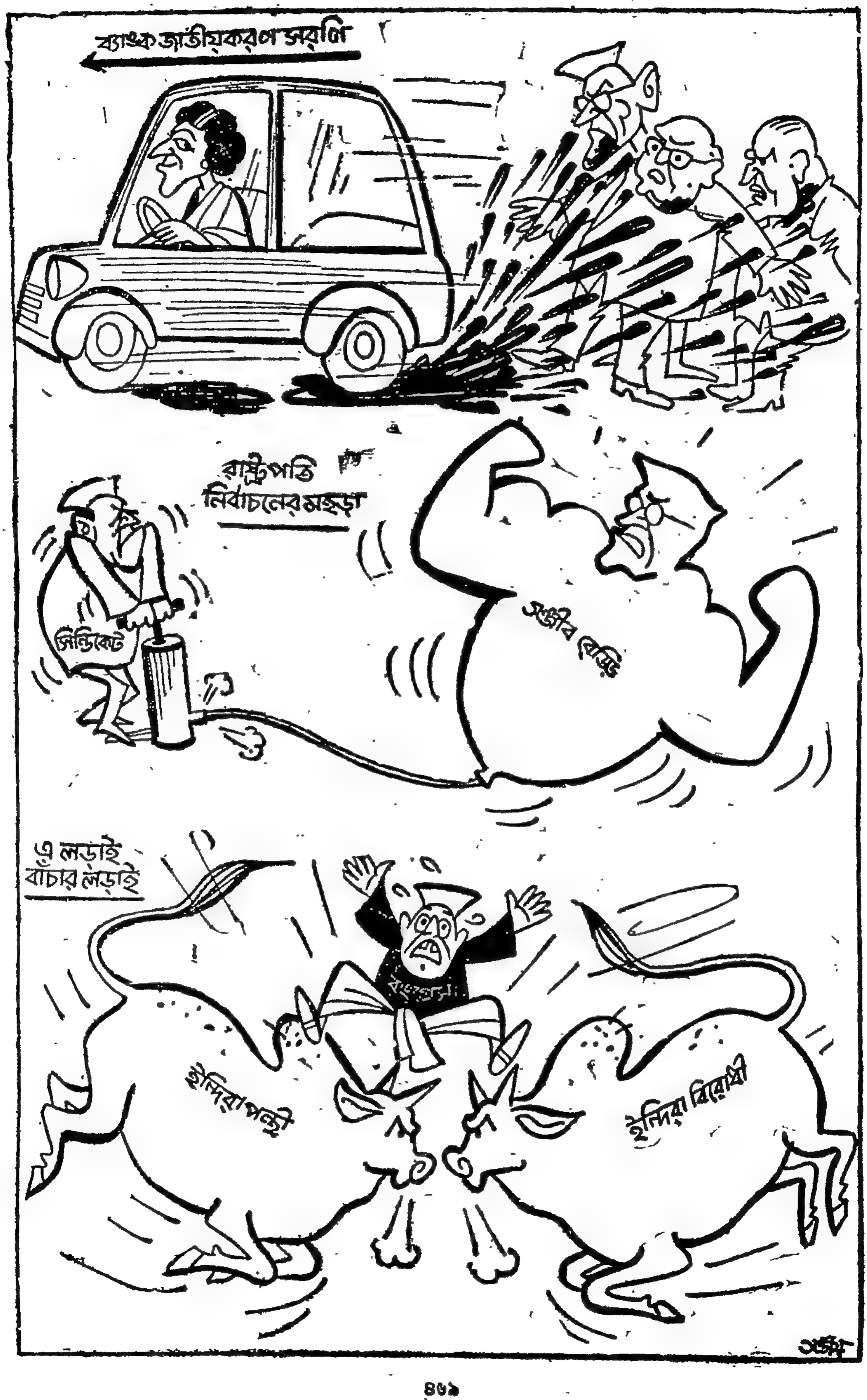
ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ সরণি
রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মহড়া
সিন্ডিকেট
সঞ্জীব রেড্ডি
এ লড়াই বাঁচার লড়াই
কংগ্রেস
ইন্দিরা পন্থী
ইন্দিরা বিরোধী

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

বিধানসভায় পুলিশের হামলা সম্পর্কে বিগত কয়েক দিনে বহু বিচিত্র তথ্য প্রকাশিত হয়েছে আর রাজ্যের জনগণের সম্মুখে পুলিশ সম্পর্কে প্রচুর গবেষণার অবকাশ সৃষ্টি হয়েছে। গত সপ্তাহেই বলেছি বিধানসভায় পুলিশী হামলা একদিকে শাপে বর হয়েছে। তার প্রথম কারণ হল, রাজ্যের যুক্তফ্রণ্ট সরকার রাজ্যের পুলিশ সম্পর্কে কি করা যায় আর কি করতে হবে এই নিয়ে বেশ একটা দ্বন্দ্বে ছিলেন। মনে-প্রাণে সকলেই অনুভব করতেন পুলিশ সম্পর্কে সরকারের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতি প্রয়োগ করতে হবে, পুলিশকে ঢেলে সাজাতে হবে। কিন্তু কিভাবে সেই কাজ হবে—সেটা ছিল খুবই চিন্তার বিষয়, বরং বলা যায় অনেকেই এই সম্পর্কে কোন কূল-কিনারা পেতেন না। অন্য আরো অসুবিধা ছিল এই যে, পুলিশ সম্পর্কে কিছু করতে গেলেই অনেক দিক থেকেই রা-রা শব্দ ওঠে—এই বুঝি পুলিশের নিরপেক্ষ ভূমিকায় হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে, এই বুঝি পুলিশকে কোন একটা দলের কোটারীতে টানবার প্রচেষ্টা শুরু হচ্ছে; ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু বিধানসভায় হামলার পর পুলিশের একটা শ্রেণী প্রকৃতপক্ষে সরকারকে পুলিশের হেঁসেলে ঢোকবার দরজা করে দিল। রাজ্য সরকার পুলিশের বিধানসভার হামলা সম্পর্কে দোষীদের খুঁজে বের করছেন। এই সঙ্গে শ্রীরঞ্জিৎ গুপ্ত কমিশন নিয়োগ করে ৩১শে জুলাই বিধানসভায় পুলিশী হামলা প্রতিরোধে পুলিশী ব্যর্থতার তদন্ত শুরু করেছেন, এ ছাড়া খুব শীঘ্র একটি পুলিশ কমিশনও নিয়োগ করা হবে। এই পুলিশ কমিশন হল লং টার্ম প্রোগ্রাম। কিন্তু অন্যগুলির ফল হাতে হাতে পাওয়া যাবে এবং বেশ কিছু ফল ইতিমধ্যেই হাতে-হাতে পাওয়া যাচ্ছে বলা যায়। যাহোক অন্য সব কথা বলার আগে সেইদিন বিধানসভায় পুলিশ হামলা সম্পর্কে যে সব প্রশ্ন জনমনে প্রবল উত্তেজনা ও নানা প্রশ্নের অবতারণা করেছে, সেইগুলি বলা দরকার ও বোঝা দরকার।

৩১শে জুলাই-এর ঘটনার পর প্রধান লক্ষ্যণীয় বিষয় হল—এতবড় ঘটনার দায়িত্ব নিয়ে কোন অফিসারই বলছেন না, ত্রুটি বা দোষ আমার অথবা অমুকের। সকলেই চাইছেন কোনক্রমে নিজের কাঁধ থেকে দায়িত্ব নামিয়ে অন্যের কাঁধে চাপাতে ও নিজের প্রাণ রক্ষা করতে। এই অবস্থার ফলশ্রুতি হল এই যে, দেখা যাচ্ছে পুলিশ দপ্তরের ঠাট-বাট যাই থাকুক না কেন, পুলিশ দপ্তরের ডিসিপ্লিন সম্পর্কে আমাদের সাধারণ মানুষের যত উচ্চ ধারণাই থাকুক না কেন, আসলে পুলিশ দপ্তরও আর পাঁচটা ঘুন-ধরা ফোঁপরা দপ্তরের মত একটি দপ্তর। এর জন্য দায়ী কে—এই কথা বলার আগে অন্য আরো অনেক কথা বলতে হয়, কিন্তু সেই সব কথায় যেতে চাই না। সব কিছুর মান নেমে যাবে, সব কিছু গোল্লায় যাবে আর তার মধ্যে পুলিশ দপ্তর একেবারে ঘড়ির কাঁটায় চলবে এটা মনে করা অন্যায়। বৃটিশ সরকার পুলিশকে তৈরি করেছিল নিজের স্বার্থে একটি বিশ্বস্ত বাহিনীরূপে। শাসক জাতি ও তার প্রতিনিধিদের সেবা, তাদের স্বার্থ রক্ষাই ছিল পুলিশবাহিনীর একমাত্র কাজ আর এই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে পুলিশের সমস্ত আচরণ, সমস্ত কর্মসূচী, সমস্ত ন্যায়-নীতি পরিচালিত হত। ইংরেজ চলে যাবার পর একটা জাতি চলে গেল, কিন্তু সাদা চামড়ার বদলে কিছু সাদা টুপির সেবা করা হল পুলিশের কাজ। ফলে দুশো বছরের ইংরেজ শাসনে যে ধারা ছিল, কংগ্রেস শাসনে সেই ধারাই বহাল থাকল; অর্থাৎ জনগণ বা তাঁদের স্বার্থ পুলিশের কাছে কখনই প্রাধান্য পেল না। কিন্তু দেশ স্বাধীন হবার পর দীর্ঘ বহু বৎসরে অবস্থার অনেক পরিবর্তন হল। পরিবর্তন দুই দিকেই হল—একদিকে জনগণ স্বাধীনতার পূর্ণ স্বাদ পেয়ে নিজেদের জীবনে তার প্রতিফলন চাইল, অপরদিকে পুলিশও তার চিরাচরিত অবস্থা থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে লাগল।

পুলিশ সম্পর্কে আমাদের অভিযোগ অনেক, পুলিশ সম্পর্কে কথা বলতে আমরা বহু সময় দুই গ্রাস ভাত বেশি খাই, কিন্তু একটি কথা—আমরা কি কখনও মনে করেছি যে, আমরাও যেমন স্বাধীনতার পরিপূর্ণ ফল ভোগ করতে চাই, ঐ খাকী পোষাক পরা মানুষগুলির মনেও একই আশা, একই আকাঙ্ক্ষা ধ্বনিত হয়। একটা কথা কেন আমরা মনে করি না—পুলিশের চাকরিতে যারা যায়, তারা আমাদেরই মত গরীব মধ্যবিত্ত সাধারণ ঘরের ছেলে। একটা কথা কেন আমরা মনে রাখি না, বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ভাল ভাল ছাত্র পুলিশের চাকরি নিয়েছে, যারা জীবনের অন্য ক্ষেত্রে থাকলে অন্যরূপে বড় হতে পারত। সেই সঙ্গে আরো একটা প্রশ্ন—পুলিশকে আমরা অজস্র ঘৃণা করেছি, তাদের কাজের প্রতি বিক্ষোভ প্রকাশ করেছি, কিন্তু কখনও কি একটু খতিয়ে দেখেছি যে, পুলিশ যে কাজ করে, সেটা একটা নীতি রূপায়ণে করে। কোন কাজের জন্য একটা পুলিশবাহিনী বা ব্যক্তিগতভাবে একজন পুলিশ যতটা দায়ী, তার চেয়ে বেশি দায়ী, যারা পুলিশদের নীতি-নিয়ামক। আমরা বরাবরই গাছকে দেখি না, তার শিকড় দেখি না; আমরা শুধু গাছের পাতা ও ডাল দেখি। আমরা কতজন জানি যে, পুলিশ কর্মচারীরা তাদের চাকুরিজীবনে কি নিদারুণ হেনস্থা ও নির্যাতন ভোগ করে? শীতে প্রতি পাঁচজনে একটা গরম কোট, বর্ষায় প্রতি সাতজনে একটি বর্ষাতি ভাগ করে পরা আর পুলিশ লাইনে যে নিদারুণ অনাচার চলে, যে নিদারুণ মানসিক নির্যাতন চলে, তার কতটা খোঁজ আমরা রাখি। একটা চৌকিদার এখনও মাসে ১৫ টাকা মাইনেতে জীবনধারণ করে—এই কথাটা কি আমরা কখনও বিচার করেছি? আমার সর্বশেষ কথা হল—আমরা এত আন্দোলন করেছি, এত দাবি আদায়ের সংগ্রাম করেছি, কিন্তু কখনও কি পুলিশের মান উন্নয়ন, তাদের বেতন ভাতা বৃদ্ধির দাবিকে আমাদের পাঁচটা দাবির সঙ্গে যুক্ত করেছি? আমরা কি পুলিশকেও আর পাঁচটা জীবন-জীবিকার সংগ্রামে সাথী করার চেষ্টা করেছি? সমাজজীবনে হোক আর রাজনৈতিক সংগ্রামে হোক, পুলিশকে কি কখনও আমাদের সঙ্গে নিয়ে চলবার চেষ্টা করেছি—বরং পুলিশ নামের একটা শ্রেণীকে আমরা বরাবরই অচ্ছুৎ করেই রেখেছি। এই কথাগুলি বলে নিলাম এই কারণে যে, পুলিশ যদি আজ জনজীবনের আর পাঁচটা অঙ্গের মত একটা অঙ্গ হত, তবে সেই অঙ্গে গ্যাংরিং

হওয়ায় আজ সমস্ত সমাজদেহ যন্ত্রণায় কাতর হত না। কাজেই আজ পুলিশের আচরণের যে ফল সমাজকে ভোগ করতে হচ্ছে তার জন্য ব্যক্তিগতভাবে পুলিশকে দায়ী করার সময় এই সমাজব্যবস্থার কথাটাও মনে রাখা দরকার।

যাহোক আবার বিধানসভার কথায় ফিরে আসা যাক্। সমগ্র পুলিশী ব্যবস্থা, প্রশাসন—এই সব কথা আর দায়িত্ব পালনের কথা এক করে দেখা উচিত নয়। সামগ্রিক পরিবর্তনের সংগ্রামের সংগে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের সংগ্রামকে এক করা সংগত নয়। এই বিচারেই বিধানসভার ঘটনার বিচার করতে হবে। ৩১শে জুলাই বিধানসভায় হামলার পরে স্পীকার শ্রীবিজয় বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষোভ করে বলেছিলেন—রোজ তো বিধানসভায় যাওয়া ও আসার পথে দশজন সিপাই পাহারাদার সেজে-গুজে পাহারা দিয়ে নিয়ে যায়, রোজ তো একশগণ্ডা সেলাম পাই। কিন্তু ও মশায়। সময়কালে তো কাউকে পেলাম না। স্পীকার শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়কে শ্রীকৃপাসিন্ধু সাহা আর শ্রীজগদানন্দ রায়, শ্রীজয়নাল আবেদিন জানালা দিয়ে বের করে দিয়েছিলেন। প্রশ্ন শুধু স্পীকারের ক্ষেত্রেই নয়—একটু গোড়া থেকে হিসাব করলে দেখা যাবে, রাজ্যের মন্ত্রী অথবা স্পীকার অথবা অন্য যে কেউ হোন না কেন, তাঁদের নিরাপত্তা রক্ষার সরকারী ব্যবস্থা কেন যেন সময়-মত বিকল হয়ে যায়, কেন যেন বিবাদ-কালে নিপাত্তা হয়ে যায়। এ শুধু আজই নয় বা বিধানসভার ঘটনাতেই প্রথম নয়। ১৯৬৭ সালে খোদ মহাকরণে একদিন যখন বেশ কিছু সরকারী কর্মচারী রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কে লাঞ্ছিত করেছিলেন, তখনও দেখেছি মাত্র একজন পুলিশ কর্মচারীকে এদিক-ওদিক দৌড়োদৌড়ি করতে। সেই দিনও যদি খুব একটা অঘটন ঘটতো, তবে সেইদিনও পুলিশ বা নিরাপত্তা-বাহিনীর প্রচেষ্টায় কোন নিরাপত্তা রক্ষিত হত না। ৩১শে জুলাই ঠিক এই একই ঘটনা দেখা গেল। ৩১শে জুলাই-য়ের ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতে চাই না বা শ্রীরঞ্জিৎ গুপ্ত যখন তদন্ত করছেন, তখন অন্য কোন নির্দিষ্ট কথা বলতে চাই না; কিন্তু এই কথা কি সত্য নয় যে, ৩১শে জুলাইয়ের ঘটনার পুরো প্রস্তুতি ৩০শে জুলাই থেকেই চব্বিশ পরগনা পুলিশ লাইনে বা এ্যান্ডারসন হাউসে সুরু হয়েছিল। এই কথা কি সত্য যে:

(১) ৩০শে জুলাই ৫টার পর এ্যান্ডারসন হাউসে পুলিশ ক্যান্টিন হলে একটা সভা হয়েছিল?

(২) ৩১শে জুলাই ভোরবেলাতেই পুলিশ লাইনে এসে কিছু ব্যক্তি, পুলিশ লাইনে এসে মৃত পুলিশের দেহ নিয়ে শোভাযাত্রার ব্যাপারে অনেকের সংগে গোপন সলা-পরামর্শ করে যান?

(৩) ফিঙ্গার প্রিন্টিং ব্যুরোতে ৩১শে জুলাই বেলা দুটো থেকে কোন কোন অফিসার গোপন সভায় মিলিত হয়েছিল কি না?

এতগুলি গোপন সভা-সমাবেশ, আর এ ছাড়া প্রকাশ্যে যা কিছু হয়েছে, সেই-গুলি পুলিশের কোন প্রকারে অজ্ঞাত ছিল না। এই গোপন ও প্রকাশ্য ঘটনা সবই ঘটলো এ্যান্ডারসন হাউসের সামনে, আর এই এ্যান্ডারসন হাউসে কম করে ছয়জন বড় পুলিশ অফিসার থাকেন ও ছিলেন। কথা হল, এই অফিসাররা ঘটনা সম্পর্কে কি প্রতি-রোধমূলক ব্যবস্থা করেছেন? ২য় পর্যায় হল, যখন মৃত পুলিশের দেহ নিয়ে শোভাযাত্রা বের হল। আলিপুরে ২৪ পরগনা এস পি অফিস তছনছ করে এমন কি এস, পি-কে হত্যার চেষ্টা করে যে শোভাযাত্রার যাত্রা সুরু হল, সেই শোভাযাত্রা সম্পর্কে কলকাতা পুলিশ কি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে-ছিলেন?

(১) এই কথা কি সত্য যে, শোভা-যাত্রার সংগে বেতার গাড়ি রাখার সিদ্ধান্ত কোন একজন অফিসারের নির্দেশে বন্ধ করা হয়?

(২) এই কথা কি সত্য যে, এস বি দপ্তরের একজন অফিসার শোভাযাত্রার মতি-গতি ভাল নয়—এই কথা পুলিশের উর্ধ্বতম মহলকে দশবারের বেশি জানিয়েছিলেন?

(৩) এই কথা কি সত্য যে, পুলিশ শোভাযাত্রা বিধানসভা ভবনে প্রবেশে কোনপ্রকার বাধার সম্মুখীন হয় নি?

(৪) এ কথা কি সত্য যে, পুলিশ

মহাত্মা গান্ধী-শতবর্ষ

সুলেখা প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

(সারা ভারত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য)

বিষয়:

ইংরেজী: মহাত্মাজী ইন ফরেন আইজ

বাংলা: মহাত্মাজী ও সাম্যবাদ

হিন্দী: মহাত্মাজী কা সমাজ দর্শন

বিচারকমণ্ডলীর সভাপতি:

ইংরেজী: অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য

বাংলা: ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

হিন্দী: অধ্যাপক কে, এম, লোড়া

প্রতিযোগিতার জন্য প্রবন্ধ দাখিলের শেষ তারিখ ২রা অক্টোবর, ১৯৬৯। প্রতিযোগিতার কমিটির বিচারই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

পুরস্কার

প্রথম: প্রতিটি বিষয়ে একটি স্বর্ণ পদক: প্রতিমাসে ১৬ টাকা করে বারো মাস স্টাইপেন্ড ও গান্ধীজীর নির্বাচিত রচনাবলী।

দ্বিতীয়: একটি স্বর্ণখচিত রৌপ্য পদক: প্রতিমাসে ১২ টাকা করে বারো মাস স্টাইপেন্ড ও গান্ধীজীর নির্বাচিত রচনাবলী।

তৃতীয়: প্রতিটি বিষয়ে: একটি রৌপ্য পদক: ৮ টাকা করে বারো মাস স্টাইপেন্ড ও গান্ধীজীর নির্বাচিত রচনাবলী।

এতদ্ব্যতীত প্রতিটি বিষয়ে অতিরিক্ত ১০টি সার্টিফিকেট অব মেরিট ও ২৫ টাকা নগদ পুরস্কার ও গান্ধীজীর নির্বাচিত রচনাবলী।

এনরোলমেণ্ট ফরমের জন্য লিখুন:

মহাত্মা গান্ধী-শতবর্ষ

সুলেখা প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা কমিটি

সুলেখা পার্ক: যাদবপুর, কলিকাতা-৩২

বেশধারী তাণ্ডবকারীরা 'জ্যোতি বসুর মুণ্ডু চাই' বলে ধ্বনি তুলে বিধানসভায় প্রবেশ ও হন্যে হয়ে খুঁজে তাঁর ঘর বের করা—সব মিলিয়ে প্রায় ৩ ঘণ্টা কেটে গেলেও পুলিশ এসে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নি?

(৫) এ কথা কি সত্য যে, বিধানসভায় উপস্থিত পুলিশরা, যারা বিধানসভার গেট থেকে সুরু করে শ্রীজ্যোতি বসুর ঘর পর্যন্ত সর্বত্র ছিল, তারা কেউই জীবন বিপন্ন করে হামলাকারীদের অবরোধের চেষ্টা করে নি?

(৬) এ কথা কি সত্য যে, লালবাজার থেকে পুলিশ আসবার পরও এই হামলাকারীদের পাণ্ডাদের বা যারা স্পীকার ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর জীবননাশের চেষ্টা করেছিল, তাদের সম্পর্কে বা মিছিল সংগঠনকারীদের সম্পর্কে উপযুক্ত তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়-নি?

(৭) একথা কি সত্য যে, একজন ডি সি লালবাজারকে পূর্বেই শ্রীজ্যোতি বসুর নিরাপত্তা সম্পর্কে সতর্ক করলে ধমক খান—পরে সেই ডি সি টেলিফোনে শ্রীমুর্শেদকে জানিয়ে দেন যে, জ্যোতিবাবু যেন বিক্ষোভকারীদের সামনে না আসেন?

(৮) একথা কি সত্য যে, শ্রীবসুকে শোভাযাত্রা বিধানসভায় আসার আগে কোন কোন অফিসার অন্যত্র নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, এমন কি চারটে বাজার কিছু আগে শ্রীবসু জনৈক ডি-এম-এর সঙ্গে বিধানসভা ভবন ছেড়ে গেছিলেন, কিন্তু নিজেই পরে ফিরে আসেন?

(৯) এই কথা কি সত্য যে, শোভাযাত্রীরা কোনক্রমে জ্যোতিবাবুকে তাঁর ঘরের বাইরে ভিড়ের মধ্যে নিয়ে আসতে চেয়েছিল একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে?

(১০) এই কথা কি সত্য যে, যে সমস্ত পদচ্যুত পুলিশকে রাজ্য সরকার নতুন করে নিয়োগ করেছেন, তার মধ্যে আটজন হাওড়ায় নকশালপন্থী হয়ে গেছেন এবং তাঁরা সকলেই এই শোভাযাত্রা সংগঠনে গোড়া থেকে ছিলেন ও বিধানসভায় শোভাযাত্রা করেছিলেন?

(১১) নিক্সনের ভারত আগমন উপলক্ষে বিক্ষোভপ্রদর্শন ও শ্রী ভি ভি গিরির কলকাতা আগমন—পর পর দুই দিনের এই কর্মসূচীর মধ্যে পুলিশের এই তাণ্ডব ঘটলো, সে কি শুধু পুলিশের কারণেই?

(১২) সর্বশেষ প্রশ্ন—পুলিশের কর্মকর্তাদের নিয়ে যখন কোন তোলপাড় হয়, তখন একটা করে টাইম বোমা ফাটে কেন? কিছুদিন আগে একইভাবে লালবাজারে লিফটের মধ্যে টাইম বোমা ফাটলো তখনও পুলিশ নিয়ে তোলপাড় চলছিল—আবার শুক্রবার টাইম বোমা ফাটলো জি· পি· ও-তে।

প্রশ্নে প্রশ্ন আসে—পুলিশ বিদ্রোহ করছে করবে—এই তথ্য কি একেবারে অজ্ঞাত ছিল সকলের? বৃহস্পতিবার পুলিশ বিদ্রোহ (?) করল, কিন্তু রাজ্যের কোন একটি পত্রিকা এই বিদ্রোহের সম্ভাবনার কথা এবং কেমন করে এই বিদ্রোহ হবে সেই কথা কম করে পাঁচদিন আগে বলে দিয়েছিল। সেই পত্রিকা বৃহস্পতিবারের ঘটনার পাঁচদিন আগে রবিবার লিখলো: "পুলিশের সর্বস্তরে বিদ্রোহের প্রস্তুতি, অপেক্ষা শুধু আঘাতের।" সেই সংবাদে লেখা হয়েছিল "কারো গায়ে হাত পড়লে চুনোপুঁটি, রুই কাতলারা প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ঘোষণা করবেন বলে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে।" শুধু ইঙ্গিত নয়, চার কলাম হেডিং-এর কালো অক্ষরগুলি দুই দিনের মধ্যে জীবন্ত হয়ে উঠলো। অর্থাৎ এই সংবাদ বেরুবার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে একজন পুলিশের গায়ে হাত পড়লো অর্থাৎ খুন হল আর তার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে পুলিশ বিদ্রোহ ঘটলো। এর পরও কি কেউ বলবেন যে, যে পুলিশরা বিধানসভায় ঢুকে তাণ্ডব করল, তাদের মনের কথা তাদের গোপন চক্রান্তের কথা কেউ জানতেন না। প্রশ্ন তাই—বিধানসভায় পুলিশী হামলা যেমন হঠাৎ ঘটা কোন ঘটনা নয়, তেমনি শত প্রকার প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ব্যর্থ হওয়াও কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। যে পুলিশ রাত্রে উর্দি পরে বিদ্রোহের ধ্বজা উড়িয়েছিল, তাদের কাণ্ডজ্ঞান ও আচরণের হয়ত কোন জবাব হতে পারে। কারণ কেউ পাগল হয়ে গেলে তার আচরণকে স্বাভাবিক মানুষের আচরণের তুলাদণ্ডে বিচার করা সঙ্গত নয়, কাজেই সেই পাগলাদের কাজের যদিও কোন অর্থ পাওয়া যায়, কিন্তু অর্থ পাওয়া যায় না তাঁদের কাজের—যাঁরা ঠাণ্ডা মাথায় রাইটার্স, লালবাজার, লর্ড সিংহ রোড, এ্যাণ্ডারসন হাউসে বসে আছেন। উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য যে পুলিশরা দায়ী, উচ্ছৃঙ্খলতা দমনে যাঁরা ব্যর্থ, তাঁদের দায়িত্বও কম নয়। বিধানসভায় হামলা অপরাধ, কিন্তু সেই প্রতিরোধের ব্যর্থতাও লঘু করে দেখার ব্যাপার নয়।

শুধু পুলিশ পুলিশ বলেই, কিন্তু এই ঘটনার সব দায়িত্ব সাধারণ পুলিশের ওপর চাপিয়ে আপাত লাভ দেখে কোন মঙ্গল হবে না। সরকারের পুলিশ সম্পর্কে নীতি—তাও কি ভেবে দেখবার অবকাশ রাখে না? যুক্তফ্রন্ট সরকার শাদির পয়লা রাতে বিড়াল বধ করতে ব্যর্থ হয়েছেন, সেই কথা অনেকবার বলেছি। কিন্তু সরকার আরো একটি কাজ করেছেন, সেই কাজ হল—

"বাঘের ভয়ে উঠলাম গাছে
ভূত বলে আহা যাকে চাই পেলাম কাছে।"

রাজ্যের জনগণ এক শ্রেণীর পুলিশ অফিসারের হাত থেকে বাঁচতে গাছে উঠে প্রাণ রক্ষা করতে চাইল, কিন্তু দেখা গেল যুক্তফ্রন্টরূপী গাছ আগেই সেখানে ভূতকে আশ্রয় দিয়ে রেখেছে। বাঘ থাবা মেরে ধরে, হাড় মাংস খায়—ভূত ঘাড় মটকে মারে।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন

শ্রীরতনমণি চট্টোপাধ্যায়, °প্রিয়রঞ্জন সেন, শ্রীনির্মলকুমার বসু
গান্ধীমানস (গান্ধীচর্চার ক্ষেত্রে নতুন সংযোজন) ৩·০০
শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় ২·০০ দি হাউস অফ্ দি টেগোরস। ডক্টর শিবপ্রসাদ [illegible] ৫·০০ পদাবলীর তত্ত্বসৌন্দর্য ও কবি রবীন্দ্রনাথ। ডক্টর প্রবাসজীবন চৌধুরী ১০·০০ স্টাডিজ ইন এস্থেটিক্স। ৮·৫০ টেগোর অন লিটারেচার অ্যাণ্ড এস্থেটিক্স। °গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫·০০ সঙ্গীতচন্দ্রিকা। ডক্টর ননীলাল সেন ১৫·০০ এ ক্রিটিক অফ দি থিওরিজ অফ বিপর্যয়। ডক্টর ধীরেন্দ্র দেবনাথ ৬·০০ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত্যু। ডক্টর মানস রায়চৌধুরী ১৫·০০ স্টাডিজ ইন আর্টিস্টিক ক্রিয়েটিভিটি। শ্রীবালকৃষ্ণ মেনন ২৫·০০ ইণ্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল ডান্সেস। ডক্টর অমিতাভ মুখোপাধ্যায় ১৬·৫০ রিফর্ম অ্যাণ্ড রিজেনারেশন ইন বেঙ্গল, ১৭৭৪—১৮২৩। রবীন্দ্র-রচনার উদ্ধৃতিসম্ভার ১২·০০ রবীন্দ্র-সুভাষিত। ডক্টর শোভনলাল মুখোপাধ্যায় ১৪·৫০ সোসিওলজি অফ প্ল্যানিং। শিল্পতত্ত্ব বেনিডেটো ক্রোচের 'শিল্পরস' ও 'শিল্পতত্ত্বের ইতিহাস' ১৫·০০ ডক্টর সাধনকুমার ভট্টাচার্য অনূদিত। এস্থেটিক্স-চর্চার মৌল-আলোচনা।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। ৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা—৭
পরিবেশক : জিজ্ঞাসা। ১এ, কলেজ রো ও ১৩৩এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

"ইউরোপীয়ান ক্লাব" আক্রমণের প্রস্তুতি

চট্টগ্রাম জেলায় ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের ঘাঁটিগুলি বিধ্বস্ত করার পরিকল্পনা নিয়ে মাস্টারদারা প্রস্তুত হচ্ছিলেন। ল্যান্ড-মাইন ও ডিনামাইটের সাহায্যে এই পরিকল্পনাকে ব্যাপক রূপদানের উদ্দেশ্যে একযোগে জেলের ভেতরে ও বাইরে আমাদের তৎপরতা সমানেই চলেছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে এই পরিকল্পনাটি কার্যে পরিণত হওয়ার পূর্বেই প্রস্তুতির পথে শত্রুর আক্রমণে বিনষ্ট হয়। তারপর জালিয়ানওয়ালাবাগের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধে মাস্টারদার নেতৃত্বে পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের পরিকল্পনা গৃহীত হয়। নির্মলদাও মাস্টারদার সঙ্গে আত্মগোপন করে আছেন এবং তিনিও এই ক্লাব-আক্রমণ প্রচেষ্টাটিকে সাফল্যমণ্ডিত করবার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু বাধা এলো। "গোপন-সংবাদ" পেয়ে শত্রুপক্ষ ক্যাপ্টেন্ কেমারনের নেতৃত্বে ধলঘাট গ্রামের যে বাড়িতে মাস্টারদা, নির্মলদা, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ও আমাদের যুবক-বন্ধু অপূর্ব সেন আত্মগোপন করেছিলেন সে বাড়ীটি ঘিরে ফেললো। এখানে খণ্ড-যুদ্ধে ক্যাপ্টেন্ কেমারন নিহত হলেন এবং নির্মলদাকেও প্রাণ দিতে হল। পলায়নের পথে অপূর্ব সেনও শত্রুর রাইফেলের গুলীতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলো। পুলিশ ও মিলিটারীর বেড়াজাল ভেদ করে প্রীতিলতা ও মাস্টারদা নিরাপদ স্থানে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। ইউরোপীয়ান-ক্লাব আক্রমণের প্রস্তুতির পথে এইরূপ একটা বাধার সৃষ্টি হওয়াতে মাস্টারদা প্ল্যানটি সাময়িকভাবে স্থগিত রাখতে বাধ্য হলেন।

পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান-ক্লাব আক্রমণের নেতৃত্ব প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার গ্রহণ করবে—এটা আগেই সাব্যস্ত ছিল। কিন্তু ধলঘাটের খণ্ড-যুদ্ধের পরে সাময়িকভাবে পরিকল্পনাটি স্থগিত রাখা হলে মাস্টারদার নির্দেশে প্রীতিলতা বাড়িতে ফিরে যায় ও তার সেই বালিকা-বিদ্যালয়ের প্রধানা-শিক্ষয়িত্রীর পদটিতেই আবার যোগ দেয়। ইতিপূর্বে কল্পনা দত্তও বাড়ি ছেড়ে গোপনে মাস্টারদার সঙ্গে দেখা করেছিল এবং ক্লাব-আক্রমণে তারও সক্রিয় অংশ গ্রহণের কথা ছিল। প্রীতিলতা ও কল্পনার জন্য একই রকমের বিশেষ ধরণের দু'টি পোষাক তৈরি হয়। ধলঘাটের বাড়িতে সশস্ত্র সংঘর্ষের পর তল্লাসীকালে পুলিশ অন্যান্য জিনিষের সঙ্গে ওই দু'টি পোষাকের একটি উদ্ধার করে। বিশেষ ধরণের পোষাক দু'টিতে ছিল—চেক্ সার্ট, মালকোঁচা দিয়ে পরার জন্য দু'টি ধুতি আর একজোড়া সাদা পাগ্ড়ী। অনেক জল্পনা করেও কেন এবং কে এই পোষাক ব্যবহার করবে পুলিশ তার কোন হিসেব লাগাতে পারে নি।

কল্পনা দত্ত মাস্টারদার সঙ্গে প্রথম যখন দেখা করে তখন সে বি· এস্‌সি, ফাইন্যাল ইয়ারের টেস্ট পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। মাস্টারদা তাকেও খুব শান্ত ও নিরীহ ছাত্রী হিসেবে চট্টগ্রাম কলেজে পড়াশোনা করবার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন প্রয়োজনে কল্পনাকে তিনি ডেকে নেবেন। নির্মলদার অবর্তমানে নানা অসুবিধার মধ্যে নতুনভাবে ক্লাব আক্রমণের প্রস্তুতি শেষ করবার দায়িত্ব মাস্টারদার ওপরেই এসে পড়লো। এই সময় সংগঠনের সব কাজে তারকেশ্বর দস্তিদার ছিল মাস্টারদার ডান হাত। ক্লাব আক্রমণের তখনও বিলম্ব ছিল। কাজেই দলের কর্মীদের মনে সাহস ও উৎসাহ জাগিয়ে রাখবার উদ্দেশ্যে অন্যান্য জেলার মত চট্টগ্রাম শাখায় বিপ্লবীদেরও একটার পর একটা এ্যাক্‌শনে নিযুক্ত থাকা উচিত—এই ভেবে মিঃ ডুর্ন-এর ওপরে আক্রমণ চালানো হয়। ঢাকায় সরোজকান্তি গুহের রিভলভারের গুলীতে ডুর্ন সাহেব গুরুতর আহত হলেন। কুমিল্লায় শৈলেশ রায়ের গুলীতে মিঃ এলিসন প্রাণ হারালেন। নির্মলদার জীবনের বিনিময়ে ক্যাপ্টেন্ কেমারনকে প্রাণ দিতে হল আর ধলঘাট-যুদ্ধের শহীদ অপূর্ব সেনের রক্তের ঋণ এলিসন সাহেবকে তাঁর বুকের রক্তে পরিশোধ করতে হল। মাস্টারদার সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংশ্লিষ্ট চট্টগ্রামের বিপ্লবী দলের প্রথম শ্রেণীর সংগঠকেরা ভিন্ন এই দু'টি বৈপ্লবিক এ্যাক্‌শন্ কাদের নেতৃত্বে সংঘটিত হয়েছে হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও পুলিশ বা জনসাধারণ কেউই জানতে পারলো না। পুলিশের সব চাতুরী ব্যর্থ করে ঐ দু'টি আক্রমণাত্মক ঘটনা

সাফল্যমণ্ডিত হওয়াতে সংগঠকদের উৎসাহ-উদ্দীপনা শত গুণ বেড়ে গেল। এর পর মাস্টারদা বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের প্ল্যানটি ত্বরান্বিত করতে সচেষ্ট হলেন।

ধলঘাট-সংঘর্ষের পরে সেই বাড়ির সাবিত্রী মাসীমা ও তাঁর পুত্র রামকৃষ্ণ এবং কন্যা স্নেহলতা পুলিশের হাতে গ্রেফ্‌তার হন। সাবিত্রী মাসীমার পুত্র রামকৃষ্ণ জেলে অম্লানবদনে পুলিশের শত অত্যাচার ও নিপীড়নে জর্জরিত হয়ে প্রাণ ত্যাগ করে। সাবিত্রী মাসীমাও অবিচলিতচিত্তে সমস্ত অত্যাচার সহ্য করে যান। মাতা-পুত্রের দৃঢ় বিপ্লবী চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল মেয়েটির মানসিক গঠন। সে পুলিশের কাছে সম্পূর্ণ স্বীকারোক্তি দিতে একটুও দ্বিধা করলো না উপরন্তু ভাই ও মায়ের বিরুদ্ধে মামলায় সাক্ষী দিতেও কসুর করে নি। এই মেয়েটির বিবরণ থেকেই পুলিশ জানতে পেরেছিল মাস্টারদার সংগে বিপ্লবী দলের একজন সদস্যাও পুলিশের বেড়াজাল ভেদ করে পালাতে সক্ষম হয়েছে। ঐরূপ একটি অদ্ভুত পোষাক এবং একটি বিপ্লবী মেয়ের সেই বাড়িতে উপস্থিত ও পলায়ন সম্বন্ধে পুলিশ স্বভাবতই হিসেব লাগাতে সচেষ্ট হল—কে সেই বিপ্লবী সদস্যা? পুলিশের সন্দেহ-ভাজন ব্যক্তিদের তালিকায় অন্যান্য মেয়েদের মধ্যে প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ও কল্পনা দত্তের নামও ছিল। সেই কারণেই এই দুজনের ওপর কড়া নজর রাখতে সুরু করলো পুলিশ এবং পুলিশের গতিবিধি দেখে কল্পনা ও প্রীতি সন্দেহ করছিলো যে কোন সময়ে পুলিশ তাদের বন্দী করতে পারে। মাস্টারদাকে বার বার তারা খবর পাঠালো যে, আর বাইরে থাকা নিরাপদ বলে মনে হচ্ছে না তিনি যেন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের বাড়ি ছেড়ে আত্মগোপনের নির্দেশ পাঠান বা কোন উপযুক্ত নিরাপদ আশ্রয়স্থলে তাদের থাকার ব্যবস্থা করে দেন।

মাস্টারদা নিজেও তাঁদের নিরাপত্তার কথা ভাবছিলেন। আর দেরি না করে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে মাস্টারদা মণি দত্তকে পাঠালেন কল্পনা ও প্রীতির কাছে। কল্পনাকে জানালেন—শান্তি চক্রবর্তী তার সংগে আলোচনা করে স্থির করবে কিভাবে ও কোন্ পথে সে কল্পনাকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে আসবে। মণি দত্তকে মাস্টারদা করে স্থির করতে প্রীতিলতাকে সে কখন কিভাবে নিরাপদ আশ্রয়ে পৌঁছে ভার দিলেন প্রীতিলতার সংগে আলোচনা দেবে। মাস্টারদার আদেশ অনুযায়ী মণি দত্ত কল্পনাকে মাস্টারদার নির্দেশ জানালো এবং প্রীতিলতার সংগে দেখা করে মাস্টারদার নির্দেশমতই সে প্রীতিকে সংগে নিয়ে যেতে এসেছে জানালো।

মাস্টারদার নির্দেশ পেয়ে প্রীতিলতার সে কি অবর্ণনীয় আনন্দ! স্কুলের প্রধানা-শিক্ষয়িত্রীপদের মায়া তাকে এতটুকু বিচলিত করলো না, বাড়ির আকর্ষণ তার কাছে অতি তুচ্ছ!! ভাই-বোনের স্নেহ-ভালোবাসা, মা-বাবার অপরিসীম স্নেহ—কিছুই তাঁকে বেঁধে রাখতে সক্ষম হল না। বৃথা কালক্ষয় না করে প্রীতি সেই মুহূর্তেই মণি দত্তের সংগে বাড়ি ছাড়তে প্রস্তুত হতে লাগলো। মণি দত্ত স্কুলের ছাত্র—প্রীতির চেয়ে বয়সে বেশ ছোট। মাস্টারদার নির্দেশ শোনামাত্রই প্রীতিলতা মণিকে বললো—"তুমি ভাই একটু বস—খেয়ে নেবে, তারপরেই আমরা বেরিয়ে যাবো। ইতিমধ্যে আমি সব গোছগাছ করে নিচ্ছি। আমি একটু ভেতরে যাই, তুমি বস...।"

বাড়িতে মা-বাবার একান্ত স্নেহের পাত্রী প্রীতিলতা। ছোটবেলা থেকেই সে মেধাবী ছাত্রী—প্রতিবারে পড়াশোনায় ফার্স্ট হয়ে স্কলারশিপ পেয়ে পাশ করেছে। এখন সে এম. এ. পাশ করে নন্দনকানন বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী। এমন একটি মেধাবী ও উজ্জ্বল ভবিষ্যৎসম্পন্না কৃতী কন্যার প্রতি মা-বাবার অগাধ বিশ্বাস ও নির্ভরতা। তবু পুলিশের আনাগোনা ও বিভিন্ন প্রশ্নাদির জন্য তাঁরা অত্যন্ত শঙ্কিতচিত্তে দিন কাটাচ্ছিলেন। প্রীতিলতার এক মামা সব সময় প্রীতির ওপর শ্যেনদৃষ্টি রাখতেন যাতে কোন ছাত্র-যুবক প্রীতির সংগে কোন সময়েই দেখা করতে না পারে। প্রীতির সংগে কোন ছাত্র-যুবককে আলাপ করতে দেখলেই তিনি তাকে বিপ্লবী বলে সন্দেহ করতেন। মণি দত্তের আগমন ও প্রীতির সংগে তার কথাবার্তা এবং তারপর প্রীতির একটু অস্বাভাবিক ব্যস্ততা দেখে মামা বিচলিত হলেন। তিনি রেগে তক্ষুণি মণি দত্তকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বললেন এবং না গেলে তিনি পুলিশে খবর দেবেন বলেও জানিয়ে দিলেন। মামার তর্জন-গর্জন—"এক্ষুণি বার করে দিচ্ছি" শুনে প্রীতিলতাও সেদিন একেবারে ক্ষেপে গেল। কোমরে আঁচল বেঁধে হাতে লাঠি নিয়ে মণি দত্ত যে ঘরে বসেছিল প্রীতিলতা সেই ঘরের দরজা আটকে দাঁড়ালো এবং উচ্চকণ্ঠে চ্যালেঞ্জ করলো—"দেখি কার সাহস্ আছে এগোও! আমার কাছে এসেছে এমন কাউকে বাড়ি থেকে বার করে দেবার অধিকার কারও নেই। বার যদি করতেই হয় তবে আমাকেও বার করে দিতে হবে।" এইরূপ আকস্মিক পরিস্থিতির জন্য বাড়ির কেউই প্রস্তুত ছিল না। প্রীতির বাবা এই জটিল অবস্থা কিছুটা মোলায়েম করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মণি দত্তকে এগিয়ে দিতে প্রীতিলতা তার সংগে গেল। প্রীতির এগিয়ে দেবার বিরুদ্ধে বাবা কিছুই বললেন না। প্রীতি মণি দত্তকে এগিয়ে দিতে গিয়ে আর বাড়ি ফিরলো না। মণি দত্তের সংগে দূর গ্রামে মাস্টারদার গোপন নিরাপদ আশ্রয়স্থলে এসে পৌঁছলো প্রীতিলতা।

মাস্টারদার মনে ইচ্ছে ছিল প্রীতিলতার নেতৃত্বেই ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ পরিকল্পনাটি পরিচালিত হোক্ এবং এতে বাংলার মেয়েদের মধ্যে বৈপ্লবিক উদ্দীপনা ও উৎসাহ আরও প্রখরতর হয়ে দেখা দিক। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত তখনও তিনি চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করেন নি। প্রীতিলতার অবর্তমানেই পাহাড়তলীর ইউরোপীয়ান ক্লাবটি বিধ্বস্ত করার প্ল্যানটি দ্রুত সমাপ্ত করতে মাস্টারদা উপযুক্ত বিপ্লবী কর্মীদের ডেকে নিয়ে প্রস্তুতির পথে এগোচ্ছিলেন।

মাস্টারদা বিভিন্ন সময়ে প্রথম সারির নিম্নলিখিত সাথীদের ডেকে পাঠালেন—

(১) শৈলেশ্বর চক্রবর্তী
(২) কালী দে
(৩) মহেন্দ্র চৌধুরী
(৪) সুশীল দে
(৫) বীরেশ্বর রায় (পরইকোড়া গ্রামের)
(৬) পান্না (লেখক অনন্ত সিংহের সমবয়সী—প্রথম থেকেই চট্টগ্রাম বিপ্লবী শাখার সদস্য)
(৭) শান্তি চক্রবর্তী (সমুদ্রতীরে কাট্টলী গ্রামে বাড়ি)
(৮) প্রফুল্ল দাস (বাড়ি কাট্টলী গ্রামে)

ওপরোক্ত দায়িত্বশীল সদস্যদের সংবাদ সংগ্রহ, বিভিন্ন পথে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যাওয়া, কাট্টলী গ্রামটিকে আক্রমণের অগ্রবর্তী ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহারের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করা, ক্লাবের খুব কাছে কতকগুলি গোপন স্থান স্থির করা, কে কিভাবে ও কোন্ পোষাকে সজ্জিত হবে, ইত্যাদি বিভিন্ন নির্দেশ দিলেন মাস্টারদা। সর্বোপরি এই সমস্ত ব্যাপারটি তদারকের ভার ন্যস্ত হল তারকেশ্বর দস্তিদারের ওপর।

এ হ'ল

বিনাকা শর্টহেড

এর নাম দেওয়া উচিৎ ছিল

'ন্যারোহেড'

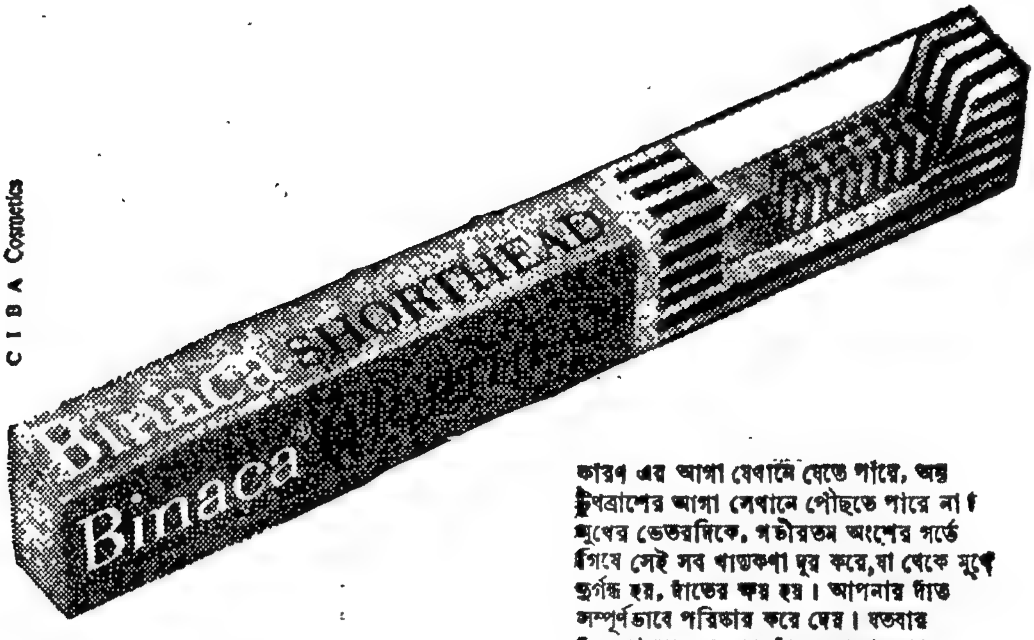

C I B A Cosmetics

কারণ এর আগা যেখানে যেতে পারে, অন্য টুথব্রাশের আগা সেখানে পৌছতে পারে না। মুখের ভেতরদিকে, গভীরতম অংশের গর্তে গিয়ে সেই সব খাদ্যকণা দূর করে, যা থেকে মুখে দুর্গন্ধ হয়, দাঁতের ক্ষয় হয়। আপনার দাঁত সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার করে দেয়। যতবার দাঁত মাজেন, দেখবেন দাঁত যেন প্রত্যেকবার পরিষ্কার হয়।

তার জন্যে বিনাকা শর্টহেড ব্যবহার করুন, আজই—রোজই।

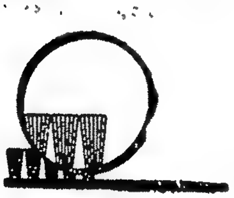

বিনাকা টুথব্রাশের কুঁচিগুলো সুগোল বলে মাড়ী ছড়ে যায় না।

ULKA CTF 64 BEN

সম্প্রতীরে কাট্টলী গ্রামটি ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের অগ্রবর্তী ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করাও স্থির হল। কারণ, এই গ্রামের দু'-এক মাইলের মধ্যেই ক্লাবটি অবস্থিত। কর্ণফুলী নদীর উত্তরে বিভিন্ন গ্রামে মাস্টারদার প্রধান হেড-কোয়ার্টারের কার্যালয়। সেই স্থান থেকে প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ মাইল দূরে কাট্টলী গ্রাম। অত দূর থেকে এই আক্রমণ চালাতে হবে বলেই পাহাড়তলীর নিকটে একটি অগ্রবর্তী ঘাঁটি অপরিহার্য হয়ে পড়েছিল। তাই কাট্টলী গ্রামটির সুযোগ নেওয়া হল। এই ক্লাবটির বিভিন্ন প্রকোষ্ঠ, জানলা-দরজা লোকজন, ইত্যাদির পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ সংগ্রহে দলের সাথীরা আত্মনিয়োগ করলো। এই সব তথ্যাদি সংগ্রহে ব্যাপৃত থাকাকালীন কোন এক সুযোগে ক্লাবটির এক বেয়ারার সঙ্গে তারা সংযোগ স্থাপন করে। এই বেয়ারার ভূমিকার বিশেষ মূল্য আমরা কেউই অস্বীকার করতে পারবো না। এর নাম অজানার অন্ধকারে রাখা চলবে না। সেই বেয়ারাটির নাম—যোগেশ মজুমদার। আমাদের বন্ধু এই বেয়ারা কালী দে-র কাকা নিশি দে-র শ্যালক। রাজনৈতিক জ্ঞান বলে তার কিছুই ছিল না। আমাদেরই বা রাজনৈতিক জ্ঞান তখন কতটুকু ছিল? মোটকথা আমরা বুঝতাম সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়তে হবে—যখন যেভাবে পারি তাদের হত্যা করতে হবে—ভারত থেকে দূর করে দিতে হবে! সেই যুগে বিপ্লবের এই মোদ্দা কথাটি বুঝতে পারলেই আমরা যথেষ্ট বলে মনে করতাম। আমাদের বেয়ারা-বন্ধু যোগেশকেও এই বৈপ্লবিক মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছিল। যোগেশ নিষ্ঠার সঙ্গে এই পরিকল্পনাকে কাজে পরিণত করতে প্রয়োজনমত সব রকম সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিল এবং শেষ পর্যন্ত তার দায়িত্ব সে ত্রুটিহীনভাবেই পালন করেছে।

যোগেশের দায়িত্ব ছিল ক্লাব-গৃহের বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের সাথীদের জানানো। সাহেবেরা কখন বা কোনদিন বিশেষ অনুষ্ঠানে মিলিত হয়, প্রতিদিন কতজন সাহেব-মেম নাচ-গান ও মদ্যপানে রত থাকে, অতর্কিত আক্রমণের প্রকৃষ্ট সময় কখন, কিভাবে অন্যের দৃষ্টির সম্পূর্ণ অগোচরে কোন্ কোন্ পথে ক্লাব-গৃহে এগোন যায় এবং কোন্ কোন্ দরজার আড়ালে থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে হাত-বোমা নিক্ষেপ করা যায়—ক্লাব-গৃহের এইসব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ তথ্যগুলি জানাবার ভার যোগেশকে দেওয়া হয়েছিল। আরও দুটি বিশেষ দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত হল। প্রথম—সাহেবরা যে সময়ে চূড়ান্ত উন্মত্ত অবস্থায় প্রায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ে থাকে সেই সময়টি যোগেশ আলোর সংকেতে আক্রমণকারী বিপ্লবীদের জানিয়ে দেবে। দ্বিতীয়টি হল—কাট্টলীর বাড়ি থেকে বিপ্লবীরা বেরিয়ে আসবার পর কোন একটি বিশেষ স্থান থেকে পথের নির্দেশ দিয়ে আক্রমণকারীরা যাতে আলোর সংকেত দেখতে পায়, ক্লাব-গৃহের খুব কাছাকাছি এইরকম কোন একটা গোপন স্থানে যোগেশ তাদের নিয়ে যাবে।

এই প্রস্তুতিপর্ব প্রসঙ্গে আর একটি বিশেষ তথ্য এবং আরও একজন বিশেষ বন্ধুর পরিচয় প্রকাশ না করলে আমার এই লেখায় ত্রুটি থেকে যাবে। মাস্টারদা এবং আরও অন্যান্য আত্মগোপনকারী সংগঠকদের প্রায়ই নদীপথে সাম্পানে (চট্টগ্রামের বিশেষ ধরণের নৌকা) করে যাতায়াত করতে হত। কেবল নদীপথে যাতায়াতের জন্যই যে নৌকার প্রয়োজন ছিল তা' নয়, সাম্পানে করে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে অস্ত্রশস্ত্রও নিয়ে যেতে হত। নৌকার অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তার অভাব মিটিয়েছিল তারিণী মাঝি। তারিণী মাঝির বলিষ্ঠ দেহ সবল বাহু ঝড়-জল ও দুর্যোগের ঘনঘটা উপেক্ষা করে বিপ্লবীদের নিয়ে সাম্পানে নদী পাড়ি দিতে কখনও দ্বিধা করে নি। সব সময় জোয়ার-ভাটার গতি অনুসরণ করে তারিণী মাঝির সাম্পান চলতো না, বিন্দুমাত্র প্রয়োজনবোধে উজান বেয়ে বিপ্লবীদের নিয়ে সে বহুবার কর্ণফুলী পাড়ি দিয়েছে।

মাস্টারদার নির্দেশে কল্পনা এসে পৌঁছলো এবং প্রীতিলতা বাড়ি ছেড়ে চলে আসবার আগেই পাহাড়তলী ক্লাব আক্রমণের পরিকল্পনা সমাপ্ত হয়েছিল। দিন ঘনিয়ে এলো। পূর্বলিখিত আটজন নওজোয়ানের জন্য উপযুক্ত পোষাকের ব্যবস্থা হল। প্রত্যেকের পায়ে কেট্‌স্। কর্তৃপক্ষের কঠোর মিলিটারী ব্যবস্থা অবলম্বনে চট্টগ্রামে বাস্তব অবস্থার পরিবর্তন হয়েছিল বলেই এই ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণকারীদের ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিকান আর্মির খাকী ইউনিফর্ম ব্যবহার না করাই সাব্যস্ত হয়েছিল। সকলের জন্য অস্ত্রের ব্যবস্থা করা হল। প্রত্যেককে হাত-বোমা ও রিভলভার দেওয়া হল এবং আত্মরক্ষার্থে আর একটি জিনিস সকলেই সঙ্গে রাখলো—তীব্র বিষ পটাসিয়াম সায়ানাইড। এই ক্ষুদ্র দলটির পরিচালন-ভার ন্যস্ত হয়েছিল শৈলেশ্বর চক্রবর্তীর ওপর।

আমাদের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শৈলেশ্বরের কথা "চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ" ১ম খণ্ডে আমি সামান্য উল্লেখ করেছি। শৈলেশ্বর চক্রবর্তী বি এসসি পাশ মেধাবী ছাত্র। ১৯৩০ সালে একদিন শৈলেশ্বর রিভলভারের এক বাক্স কার্তুজ মাথার নীচে রেখে সারারাত ঘুমোতে পারে নি পাছে কার্তুজগুলো আকস্মিকভাবে ফেটে তাকে আহত করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমি দেখতে চেয়েছিলাম প্রখ্যাত ব্যারিস্টার দেশনেতা শরৎচন্দ্র বসু বিন্দুমাত্র আতঙ্কগ্রস্ত না হয়ে কত সহজে নিজের সুটকেসে পাঁচটি তাজা বোমা নিয়ে মাস্টারদাকে উপহার দেবার অভিপ্রায়ে কলকাতা থেকে চট্টগ্রামে যান। দু' বছর আগে যে শৈলেশ্বরকে নিজের কাছে কার্তুজ রেখে অত আতঙ্কিত ও ভীত হতে দেখেছি, সেই শৈলেশ্বরই আবার রিভলভার ও তাজা বোমা হাতে নিয়ে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে যাচ্ছে। আমার নিজস্ব বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, এমন একজনও বিপ্লবী সাথী আমি দেখি নি যে নিজের প্রচেষ্টায় subjectively নিজেকে প্রস্তুত করতে পাবে নি এবং মানসিক দুর্বলতা ও ভয় থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয় নি। কোন কারণে আপাতদৃষ্টিতে যাদের দুর্বল ও ভীরু মনে হয়েছে subjective ও practical training-এর মাধ্যমে তাদেরই যে আবার পুরোপুরি Death-defiant করে তোলা যায় সে সম্বন্ধে আমি নিঃসন্দেহ।

শৈলেশ্বর মৃত্যুভয়হীন প্রথম শ্রেণীর যোদ্ধা। বৈপ্লবিক কর্মসূচী কার্যে পরিণত করার বিলম্ব হেতু সে অধীর হয়ে উঠেছিল। মাঝে মাঝে শৈলেশ্বর আত্মহত্যার জন্য অস্থির হয়ে উঠতো। আত্মহত্যার বিশেষ কি কারণ ছিল সুস্পষ্টভাবে সে কাউকেই তা বলে নি। শৈলেশ্বরকে বিশেষভাবে জানতো এমন বহু সাথীকে প্রশ্ন করে শৈলেশ্বরের এই আত্মহত্যা-প্রবণতার কারণ আমি জানতে পারি নি। এইটুকুই মাত্র জেনেছি যে, সে যখন আত্মহত্যার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছিল মাস্টারদাই তাকে নিবৃত্ত করেছিলেন। এইরূপ একজন মৃত্যু-পাগল সৈনিকের হাতেই মাস্টারদা পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের দায়িত্ব তুলে দিলেন।

[ক্রমশ]

পুরশ্চরণ রসোল্লাস :
(দুর্লভ তান্ত্রিক গ্রন্থ। মূল সংস্কৃত ও বঙ্গানুবাদ।) মূল্য—৩'০০ টাকা।
পঞ্চতীর্থ মাহাত্ম্য :
শ্রীকাশীমাহাত্ম্যম্, শ্রীগয়ামাহাত্ম্যম্, শ্রীবৈদ্যনাথ মাহাত্ম্যম্, শ্রীপ্রয়াগ মাহাত্ম্যম্, শ্রীবৃন্দাবন মাহাত্ম্যম্। মূল সংস্কৃত ও পণ্ডিতপ্রবর শ্রীকালীপ্রসন্নকৃত বঙ্গানুবাদ। মূল্য—৩'০০ টাকা।
বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা—১২

কোন কংগ্রেস আগস্ট আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছিল?

শ্রীসর্বদর্শী

কংগ্রেসের ছাত্র প্রতিষ্ঠান 'ছাত্র পরিষদ' এ বছর ৯ই আগস্ট দিবস উপলক্ষে পোস্টার দিয়েছেন—"ইংরেজকে আমরাই রুখেছি, ফ্যাসিবাদকে আমরাই রুখবো।" বলা বাহুল্য, ছাত্র পরিষদের এই ফ্যাসিবাদ বলতে যুক্তফ্রন্ট সরকারকেই বোঝানো হয়েছে।

৯ই আগস্টের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনের উত্তরাধিকারিত্ব এভাবে ছাত্র পরিষদ দাবি করছে। যাদের শাখা সংগঠন ছাত্র পরিষদ, সেই মূল সংগঠন কংগ্রেস গত কয়েক বৎসর ধরে তারস্বরে আগস্ট বিপ্লবের কৃতিত্ব দাবি করে আসছেন আর সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন ভূমিকাকে নিন্দা করে পরোক্ষভাবে সমস্ত বামপন্থী দলকে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে জুড়ে দেবার জন্য সূক্ষ্ম প্রচারকার্য চালাচ্ছেন।

অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, স্বাধীনতা-লাভের বাইশ বছর পরেও স্বাধীনতা আন্দোলনের কোন পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজও রচিত হল না। এমন কি বিশেষ কোন একটি আন্দোলনেরও বিজ্ঞান-সম্মত এবং বস্তুনিষ্ঠ কোন ইতিহাস রচিত হয় নি। "স্বাধীনতা আনলো কে—কংগ্রেস, আবার কে"—এই স্লোগান আমরা গত কয়েকটি সাধারণ নির্বাচনের প্রাক্কালে নির্বাচনী প্রচারে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের কণ্ঠে ধ্বনিত হতে শুনেছি। শুনেছি আগস্ট বিপ্লব উপলক্ষে কমিউনিস্ট পার্টির বিশ্বাস-ঘাতকতার কথা। অথচ পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করে এই সব আন্দোলনের কতটা কৃতিত্ব বর্তমান দিনের কংগ্রেস দাবি করতে পারে, তা জনসমক্ষে হাজির করা হয় নি। বরং বলা যায়, সামগ্রিকভাবে স্বাধীনতা আন্দোলন এবং বিশেষ করে আগস্ট বিপ্লবের বস্তুনিষ্ঠ বিজ্ঞান-সম্মত ইতিহাস রচনার কাজে কংগ্রেস সরকার উৎসাহ দেওয়া দূরের কথা, এতদিন পর্যন্ত বাধাই সৃষ্টি করে এসেছেন।

তাই স্বাভাবিক। কারণ, আজকের কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে ঐ আন্দোলনের ইতিহাস মুছে ফেলাই বেশি লাভজনক। না হলে দেখা যাবে, সেদিনকার কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের যাঁরা আজ ভারতের ভাগ্যবিধাতা, তাদের সেদিনকার ভূমিকা কমিউনিস্ট পার্টির সেদিনের ভূমিকারই সমতুল্য। বরং আরও সুস্পষ্টভাবে বলা চলে, কমিউনিস্ট পার্টি আর কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব আগস্ট বিপ্লব প্রচেষ্টাকে একটা ব্যর্থ বিদ্রোহের পর্যায়ে পর্যবসিত করার জন্য সমানভাবে দায়ী।

একথা ঠিক, ঐতিহাসিক "ভারত ছাড়" প্রস্তাবের মধ্যে সেদিন সারা ভারতের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কোটি কোটি মেহনতী মানুষের পরাধীনতার শেকল ছেঁড়ার আকুল কামনা প্রতিফলিত হয়েছিল। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ঐ প্রস্তাব গ্রহণের পূর্বে মহাত্মাজী দিনের পর দিন 'হরিজন' পত্রিকায় যে-সব প্রবন্ধ লিখেছিলেন, তার মধ্যে ভারতের অন্তরাত্মার কথাই প্রতিফলিত হয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব সত্যই কি "ভারত ছাড়" আন্দোলনকে তার স্বাভাবিক পরিণতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন?

তাহলে তো সাংগঠনিক প্রস্তুতি থাকত। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদকে তার দুর্দিনে শেষ আঘাত হেনে ভারত ছাড়তে বাধ্য করতে হলে শুধু প্রস্তাব পাশ করলেই যে হবে না, কংগ্রেস নেতৃত্ব নিশ্চয়ই সে-কথা জানতেন। তা সত্ত্বেও আন্দোলনকে সুষ্ঠু পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কর্মসূচী ছিল না কেন? এ-আই-সি-সি মণ্ডপ থেকে প্রস্তাব পাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নেতৃবৃন্দ ধরা পড়বেন জানতেন। তবু, তারপর কি—সেই নির্দেশ এবং তা পালনের জন্য সংগঠন গড়া হয় নি কেন?

স্বাধীনতা আন্দোলনের আপোষ-কামী কংগ্রেস নেতৃত্ব তার পূর্ব পর্যন্ত প্রতিটি আন্দোলনকে কিভাবে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষ করার পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছিলেন, এই প্রবন্ধে তা আলোচনার সুযোগ নেই। কিভাবে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব কমিউনিস্ট পার্টির সহযোগিতায় সুভাষ-চন্দ্রের নেতৃত্বাধীন আপোষ-বিরোধী সংগ্রামকে বারংবার বানচাল করতে চেষ্টা করেছিলেন তার বিস্তৃত ইতিহাস বিবৃত করার সুযোগও এখানে নেই।

তবে একটি কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে, ১৯৪০-৪৩ সালে পর্যন্ত, এমন কি তার পরেও কিছুদিন পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির যে ভূমিকা ছিল, ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েও কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব সেই একই ভূমিকার গৌরবের দাবিদার হতে পারেন—তার বেশি নয়।

"নাহি দিব এক পাই, নাহি দিব এক ভাই"—সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের উক্ত পর্যায়ে কংগ্রেস নেতৃত্ব যতটা অগ্রসর হয়েছিলেন, কমিউনিস্ট পার্টিও ততটা এগিয়েছিল। কংগ্রেস নেতৃত্ব সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনকে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পরিসমাপ্তির দিকে এগিয়ে না এনে ভারতের ধনিকশ্রেণীর স্বার্থে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষের মনোভাব দ্বারা চালিত হয়েছিলেন। আর অন্যদিকে কমিউনিস্ট পার্টি ফ্যাসিবাদকে বৃহত্তর শত্রু বলে পরিগণিত করে সোভিয়েট রাশিয়ার পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে ভারতের আন্দোলনকে গাঁটছড়া বেঁধে চলেছিলেন। ফলে দুই পক্ষের চলার পথ একই দিকে প্রসারিত হয়েছিল।

নেতাজীকে 'কুইসলিং' বলার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি যতটা দোষী, ঠিক ততটা দোষী ছিলেন গান্ধীজীর মন্ত্র-শিষ্য পণ্ডিত নেহরু, যখন তিনি "তরবারির নিয়ে নেতাজীর সম্মুখীন হওয়ার" কথা ঘোষণা করেছিলেন। ভারতের কোটি কোটি মানুষের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মনোভাবকে তার পরিণতির দিকে এগিয়ে না নিয়ে যাওয়ার দায়-দায়িত্ব ঐ উভয় পক্ষেরই। অবশ্য ভিন্ন উদ্দেশ্যে।

তাই '৪২-'৪৩ সালে অর্ধচন্দ্র লাঞ্ছিত মুসলিম লীগের পতাকা আর তেরঙ্গা ঝাণ্ডার মিলনের জন্য তৎকালীন লাল ঝাণ্ডার দাবিদারদের যে আন্দোলন চলছিল, তার দায় কংগ্রেস নেতৃত্বও এড়াতে পারেন না।

গান্ধীজীর অন্য সব দানের কথা বাদ দিলেও শুধু "করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে" আর "ভারত ছাড়" এই দুটি স্লোগানের

স্রষ্টা হিসেবেই গান্ধীজী অমর। নেতাজীর বিশ্লেষণ ছিল অমোঘ সত্য। ভারতের মাটি প্রস্তুত ছিল। তাই গান্ধীজীর মুখ থেকে ঐ দুটি স্লোগান উৎসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত সাধারণ মানুষের মধ্যে উত্তাল তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। নেতৃত্বহীন, সংগঠনহীন, পরিকল্পনাহীন আন্দোলন একমাত্র জনগণের আকুতিতে প্রচণ্ড বেগের সৃষ্টি করে। জয়প্রকাশ-অচ্যুত পট্টবর্ধন-অরুণা আসফ আলীর নেতৃত্বাধীন সমাজতন্ত্রী দল, সুভাষচন্দ্রের নবগঠিত ফরোয়ার্ড ব্লক, যোগেশ চ্যাটার্জি-ত্রিদিব চৌধুরীর নেতৃত্বাধীনে নবগঠিত আর এস পি এবং আরও কয়েকটি আঞ্চলিক দলের কর্মীরা নিজ নিজ দলের আঞ্চলিক প্রভাবানুসারে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সারা ভারতের সাধারণ কৃষক, ছাত্র আর যুবক, দিগ্বিদিক বিচার না করে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কিন্তু একমাত্র মেদিনীপুর জেলা ছাড়া আর কোথাও কংগ্রেসের তৎকালীন দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব ঐসব আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন নি।

বরং আন্দোলনের ঝাপটা থেমে গেল। হাজার হাজার মানুষ সারা ভারতের বিভিন্ন এলাকার জেলে বসে যখন ইংরেজকে ভারত থেকে তাড়ানোর স্বপ্ন ভুলতে পারছেন না তখন আকস্মিকভাবে তাঁরা মর্মাহত হয়ে শুনলেন—রেল ওপড়ানো, থানা পোড়ানো আন্দোলনের সঙ্গে কংগ্রেসের নাকি কোন সম্পর্ক নেই।

তবু কংগ্রেস আগস্ট আন্দোলনের "সোল এজেন্ট"। আর সব দোষ কমিউনিস্ট পার্টির। সেদিনের ইতিহাস যাঁরা ভোলেন নি, তাঁদের নিশ্চয়ই মনে পড়ে, '৪৩-উত্তর কয়েকটি বছরে যখন বাংলাদেশের হাজার হাজার মানুষ জেলে, তখন প্রতিটি এলাকায় কংগ্রেস সংগঠনের নেতৃত্ব করছেন যৌথভাবে কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা আর নেতাজী বিরোধী এ্যাড-হকী কংগ্রেসীরা। এমন কি আগস্ট বিপ্লবীরা জেল থেকে মুক্ত হয়ে এসে কংগ্রেসের সদস্যপদ পর্যন্ত পেতে পারেন নি।

আজকের কংগ্রেস নেতাদের একটা হিসেব করতে বলি। আজও যাঁরা কংগ্রেসের নেতৃত্বে আছেন তাঁদের মধ্যে কতজন আগস্ট আন্দোলনের অংশীদার ছিলেন?

এই আন্দোলনের কৃতিত্ব কংগ্রেস দাবি করবেন একথা সেদিনের আন্দোলনের অংশীদাররা জানতেন। দেশের বিপ্লবীরা ১৯৪০ সাল থেকেই জেলে আটকা ছিলেন। তাঁদের ভাবধারায় অনুপ্রাণিত লক্ষ লক্ষ যুবক সেই অগ্নিঝরা দিনগুলিতে নতুন ইতিহাসের পত্তন করতে চেয়েছিলেন। এঁদের সম্মুখ সারির কর্মীদের কাছে ভবিষ্যৎ একেবারে অস্পষ্ট ছিল না। তাই ভগৎ সিংহের যোগ্য উত্তরাধিকারী উত্তরপ্রদেশের আর-এস-পির তরুণ নেতা শহীদ রাজনারায়ণ মিশ্র ফাঁসির দড়ি গলায় স্বহস্তে বেঁধে নেওয়ার সময় ঘোষণা করেছিলেন তাঁর অগণিত সহকর্মী আর দেশবাসীর কাছে—"কমরেড, আমাদের এই আত্মদান সাম্রাজ্যবাদকে নিঃশেষ করার জন্য। শুধু দেখবেন ভবিষ্যতে এই আত্মদানকে যেন ভারতের মেহনতী মানুষের শত্রু ভারতের ধনিকশ্রেণী তাঁদের নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে না পারে।"

রাজনারায়ণের এই সতর্কবাণীকে তাঁর কমরেডরা সংগঠনের দুর্বলতার জন্য কাজে লাগাতে পারে নি। তাই কংগ্রেসের তৎকালীন দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের অনুগামী আজকের কংগ্রেসীরা এবং তাদের বিভিন্ন গণ সংগঠন আজও দাবি করতে সাহস করে, "ইংরেজকে আমরা রুখেছি।"

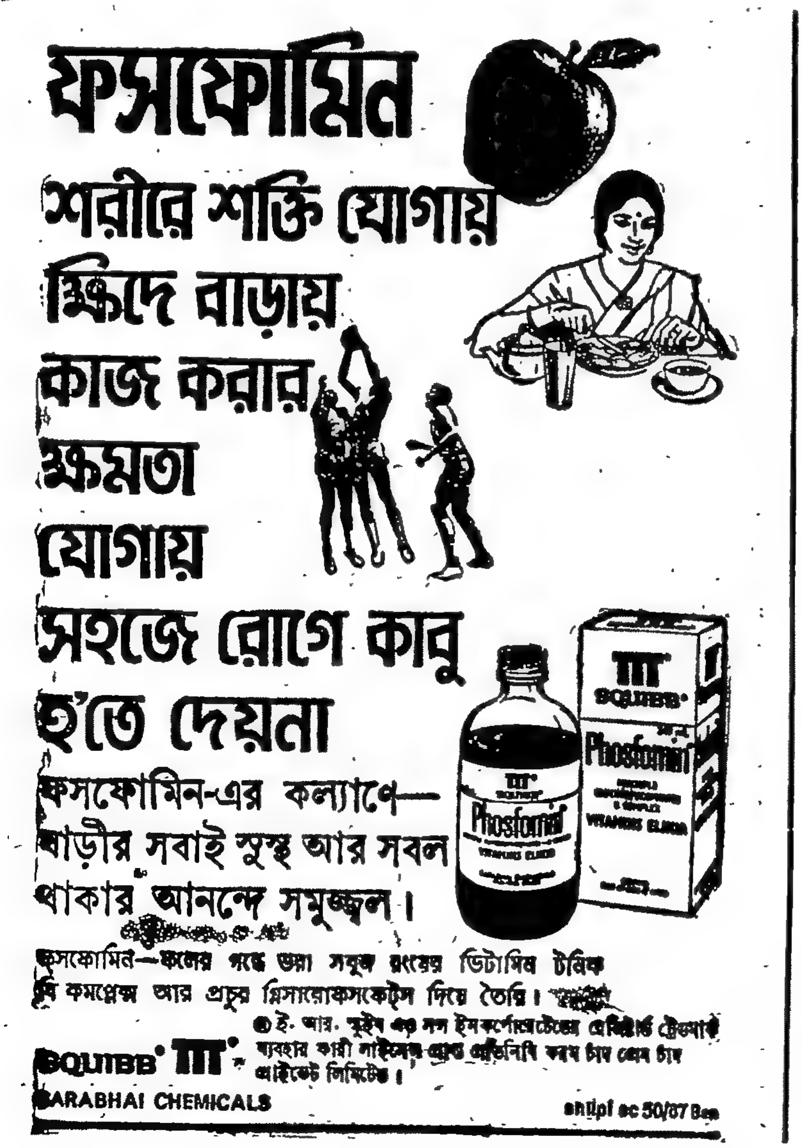

তেইশ বছর পাড়ি দিয়ে

নরেন ভট্টাচার্য

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর একটি সাম্প্রতিক উক্তি দিয়েই বর্তমান নিবন্ধের অবতারণা করছি। গত ৫ই আগস্ট তারিখে একটি সমাবেশে তিনি বলেছেন, আমি কাউকে চ্যালেঞ্জও করি না, শাসানিও দিই না, কিন্তু আমাকে শাসানো হলে চুপ করে থাকতেও পারি না। জনগণের জন্য সংগ্রাম যদি অপরিহার্য হয়ে পড়ে, তবে আমি পিছু হটব না এবং বৃহত্তর স্বার্থে মুষ্টিমেয়ের বিরুদ্ধে লড়াই করব। জনগণের স্বার্থে একটিমাত্র কল্যাণমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনে (অর্থাৎ ব্যাঙ্ক জাতীয়করণে) যদি এত হৈ-চৈ পড়ে যায়, তাহলে আরও কল্যাণকর ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করলে আমার বিরোধীরা কি বলবেন? সরকারী শিল্প ও ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের সম্পর্কে যাঁরা সমালোচনা করছেন, তাঁরা কি বেসরকারী শিল্প সংস্থায় ব্যাপকভাবে তদন্ত করাতে রাজী আছেন? ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের মত একটা ছোট ব্যবস্থা গ্রহণে যাঁরা এত হৈ-চৈ করছেন, বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলিতে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হলে তাঁদের অবস্থাটা কি হবে? আমাকে আমার বিরোধীরা কমিউনিস্ট আখ্যা দিচ্ছেন। স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থ বলতে আমি বুঝি, মজুর তার পরিবারকে পেট ভরে খেতে দিতে পারবে, কৃষক তার সন্তানসন্ততিদের শিক্ষাদানের সুযোগ পাবে। এই সামর্থ্য আমরা যতদিন না গড়ে তুলতে পারছি, ততদিন ভারতকে সত্যিকারের একটা স্বাধীন দেশ বলে আমি মনে করি না।

স্বাধীন ভারতবর্ষ যখন তেইশ বছরে পদার্পণ করল, ঠিক সেই সময় প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যটি শুধু যে রাজনৈতিক দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ তা নয়, এই উক্তিটির মধ্যেই ভারতবর্ষের বর্তমান চিত্রটিকে নিখুঁতভাবে আঁকা হয়েছে। গত বাইশ বছরে ভারতের পুঁজিপতিদের বিলক্ষণ উন্নতি হয়েছে, ভারতবর্ষ সুবিধাভোগী শ্রেণীর স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে, কিন্তু বৃহত্তর জনসাধারণের কোন কল্যাণই হয় নি. অন্ধকার থেকে তারা আরও অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে। এমন কি ছিটেফোঁটা যৎসামান্য কল্যাণকর কাজও যদি করার প্রচেষ্টা হয়েছে, কায়েমী স্বার্থ তাতে বাধা দিয়েছে, গণতন্ত্র বিপন্ন বলে হৈ-চৈ বাধিয়েছে। সুবিধাভোগী শ্রেণীর স্বার্থে সামান্যতম ঘা লাগলেই তাদের অনুগত সংবাদপত্রগুলি তারস্বরে বিলাপ করতে শুরু করেছে—সব গেল, দেশটা কমিউনিস্টদের হাতে গিয়ে পড়েছে। মাত্র কয়েকদিন আগেই প্রধানমন্ত্রী ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ব্যাপারে বৃহৎ সংবাদপত্রগুলির ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেছেন। যে দেশে সামগ্রিক উৎপাদন ব্যবস্থা মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির করায়ত্ত, সে দেশে সংবাদপত্রও বৃহৎ শিল্প, সেগুলি পুঁজিপতিদেরই করায়ত্ত, এবং তাদেরই মাউথপিস। সংবাদপত্র ও সম্পাদকের স্বাধীনতা ততক্ষণই আছে যতক্ষণ তা কায়েমী স্বার্থের অনুকূলে কথা বলে।

প্রধানমন্ত্রীর উপরি-উক্ত বক্তব্য থেকে কয়েকটি তথ্য পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান বিষয়টি হচ্ছে এই যে, গত বাইশ বছরে ভারতের শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে এমন একটি উপাদান সৃষ্ট ও বর্ধিত হয়েছে, যারা সকলরকম প্রগতিমূলক অথবা সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ যে কোন ব্যবস্থা গ্রহণের পরিপন্থী, যারা খোলাখুলিভাবে পুঁজিবাদী জন-বিরোধী রাষ্ট্র চায়। পরলোকগত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরুর সমগ্র শাসনকালটাই কেটেছে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে এই প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীটির সঙ্গে তাঁর নিজের প্রগতিশীল ধ্যানধারণাগুলির একটা আপাত শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ভাবমূর্তিকে বজায় রাখতে। যতদিন সেই প্রবল ব্যক্তিত্ব কার্যকরী ছিল, ততদিন এই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি প্রকাশ্যে কিছু করে নি, কিন্তু নেপথ্যে তারা অনেক কলকাঠি নেড়েছে, প্রতিটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্যগুলিকে কৌশলে বৃহত্তর জনসাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী করে তুলেছে। নেহরুর মৃত্যুর পর থেকেই এই শক্তি নেপথ্য থেকে প্রকাশ্য হয়েছে, এবং আজ এরা নিজেদের উদ্দেশ্যকে গোপন করার কোন প্রয়োজনীয়তা বোধ করে না। এদের অন্যতম মুখ্য প্রবক্তা পাতিল সাহেব তো প্রকাশ্যেই স্বতন্ত্র, জনসংঘ প্রভৃতি অধিকতর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সঙ্গে কংগ্রেসকে মিলিয়ে দেবার ধুয়া তুলেছেন।

সামগ্রিকভাবে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস নেতৃত্ব আজ এই প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীরই দখলে, যদিও স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর অনুগামী কয়েকজন সম্প্রতি ভিন্নপথে চিন্তা করতে শুরু করেছেন। এরই ফলে একটি নতুন ধরণের সংঘাতের সৃষ্টি হয়েছে, কেন না শ্রীমতী গান্ধী অনেকটা এগিয়ে এমন একটি জায়গায় উপনীত হয়েছেন, যেখান থেকে পুনরায় পিছিয়ে যাওয়া কঠিন। ঘটনাদৃষ্টে মনে হয় যে, আপাতত শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষে কংগ্রেসের বাইরের প্রগতিশীল শক্তিগুলির ওপরই নির্ভর করতে হবে। আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন উপলক্ষে একটা চূড়ান্ত শক্তি পরীক্ষা হয়ে যাবে, হয়ত বা তারও আগে। বর্তমান রচনাটি প্রকাশিত হবার আগেই হয়ত অনেকগুলি ঘটনা ঘটে যাবে, এবং যদি ইতিমধ্যে শ্রীমতী গান্ধী নিজেকে শক্তিশালী বলে মনে করতে পেরে থাকেন, তাহলে হয় তিনি রাষ্ট্রপতিপদে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীর প্রতি লিপ্-লয়্যালটিও প্রত্যাহার করে নেবেন, না হয় তাঁকে বাধ্য করবেন প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করতে। এই অবস্থায় কোন সাহসিকতাপূর্ণ ঝুঁকি না নেওয়ার অর্থই হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে নিজের রাজনৈতিক আত্মহত্যার পথ সুগম করে দেওয়া। কেন না সঞ্জীব রেড্ডি রাষ্ট্রপতি হলে তাঁর পক্ষে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর প্রগতিমূলক কার্যকলাপকে বরদাস্ত করা কঠিন, এবং কথাটা ভাবতে অস্বস্তিকর হলেও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ভারতীয় সংবিধানের আওতায় রাষ্ট্রপতির পক্ষে ডিক্টেটার হয়ে উঠতে কোন বাধাই নেই। আমাদের সংবিধান-প্রণেতাগণ ধরেই নিয়েছিলেন যে, ভারতের রাষ্ট্রপতি বৃটিশ ঐতিহ্য অনুসরণ করে নৈবেদ্যের চূড়ার সন্দেশটির মত থাকবেন। কিন্তু তিনি যদি সেভাবে থাকতে রাজী না হন, তাহলে তাঁকে তাঁর উচ্চাকাঙ্ক্ষা থেকে প্রতিনিবৃত্ত করার উপযোগী কোন রাস্তাই সংবিধানে রাখা নেই।

বস্তুত রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী মনোনয়নের সময় কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী ঠিক এই মনোভাবের দ্বারাই চালিত হয়েছে। তারা সুনিশ্চিতভাবে জানে যে, আগামী সাধারণ নির্বাচনে কেন্দ্রে কংগ্রেসের সাফল্য দিবাস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়, কাজেই ক্ষমতায় টিকে থাকতে গেলে শেষাবেই

টিকে থাকতে হবে। এই কারণেই সমমতাবলম্বী দলগুলিকে নিয়ে (অর্থাৎ স্বতন্ত্র, জনসংঘ, বি· কে· ডি· ইত্যাদি) কোয়ালিশন গড়তে হবে, এখনই না হোক যাতে পঞ্চম নির্বাচনের পর তা করা যায় তার রাস্তা আগে থেকেই তৈরি করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে পাতিল সাহেবের অনুপ্রেরণায় প্রাথমিক প্রচেষ্টা হলেও এখনো পাকাপাকিভাবে কিছু হয় নি, সংশ্লিষ্ট অপরাপর দলগুলিও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার আগে রাজনৈতিক পরিস্থিতিটাকে আরও ভাল করে পর্যবেক্ষণ করতে চায়। আপাতত এই বিষয়ে কিছু ফয়সালা না হওয়ায় সিন্ডিকেটকে বাধ্য হয়েই রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে অধিকতর সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়েছে। মোরারজী-পাতিল-নিজলিংগাপ্পা গোষ্ঠী ভাল করেই জানেন যে, আসন্ন পঞ্চম নির্বাচনে কংগ্রেস কেন্দ্রে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারবে না। বামপন্থী প্রভাবিত কোন প্রগতিশীল গোষ্ঠীর পক্ষে কেন্দ্রে ক্ষমতা দখল এখন মোটেই অসম্ভব নয়। এই কারণে রাষ্ট্রপতির পদে তাঁরা এমন এক-জন লোককে বসাতে চান যিনি পূর্ববর্তী রাষ্ট্রপতিদের মত দলমতের ঊর্ধ্বে হবেন না, দলীয় রাজনীতির স্বার্থ যার হাতে সিদ্ধ হবার সম্ভাবনা। কেন না এখন যিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হবেন তিনি ১৯৭২ সালের পর আরও তিন বছর থাকবেন। কাজেই সেই ব্যক্তির পক্ষে সিন্ডিকেটের একান্ত বিশ্বাসভাজন হওয়া দরকার যিনি ১৯৭২ সালে বেগতিক দেখলে, অর্থাৎ পঞ্চম নির্বাচনোত্তর পরিস্থিতি পুঁজি-পতি স্বার্থের প্রতিকূল দেখলে, নির্বিকারচিত্তে বৃটিশ ঐতিহ্য লঙ্ঘন করতে পারেন, পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে একনায়কতন্ত্রের সূচনা করতে পারেন, প্রয়োজনে সমরবিভাগের কর্তাদের হাতেও দেশটাকে তুলে দিতে পারেন।

ইতিহাস এ কথাই বলে যে, ধনিক-স্বার্থ সংসদীয় গণতন্ত্রকে সেই পর্যন্তই টিকিয়ে রাখে যতক্ষণ পর্যন্ত না তা ধনিস্বার্থের প্রতিকূল কাজ করে। এবং যখনই দেখা যায় যে, সংসদীয় গণতন্ত্র এমন কোন কাজ করেছে বা করতে চলেছে যা পুঁজিপতিদের বৃহত্তর স্বার্থের বিরোধী, তখনই তারা তথাকথিত গণতন্ত্রের খোলসটিকে পরিত্যাগ করে উগ্র ধরণের একনায়কতন্ত্র স্থাপন করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করে না। ভারতেই দেখা যাচ্ছে যে, একমাত্র ব্যাঙ্ক জাতীয়-করণকে উপলক্ষ করেই গণতন্ত্র ধ্বংস হয়ে গেল এই আর্তনাদ তোলা হচ্ছে। এই একটিমাত্র, এবং বলাই বাহুল্য নামমাত্র, সংস্কার প্রচেষ্টাকে উপলক্ষ করে একটা কমিউনিস্ট-ফোবিয়া তোলা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীকেও কমিউনিস্ট আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অদৃষ্টের এমনই পরিহাস যে, এই সেদিন রাজ্যসভায় প্রধানমন্ত্রীকে এ কথা বলতে হয়েছে যে, শোষিত ও দরিদ্র জনসাধারণের স্বার্থের মুখ চেয়ে আইন প্রণয়ন করার উপদেশ গান্ধীজী দিয়ে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ, আমরা দরিদ্রের জন্য কিছু করতে চাই, এই উক্তিটি পর্যন্ত কোন কোন মহলের কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছে, এবং স্বাধীন ভারতে এই সাধারণ কথাটুকু বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মত মানুষকেও গান্ধী-জীর রেফারেন্স দিতে হচ্ছে। দেশবাসীর প্রতি ধনিস্বার্থের বাহকদের দৃষ্টি-ভঙ্গীর পরিচয় পাতিল সাহেবের একটি সাম্প্রতিক বক্তৃতাতেই প্রকাশ পেয়েছে। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের বিপক্ষে বলতে গিয়ে তিনি বলেছেন যে, এই কাজের জন্য প্রধানমন্ত্রী রিক্সাওয়ালা ও উজ-বুকদের কাছ থেকে হাততালি পাবেন। যিনি নিজেকে একজন সর্বভারতীয় নেতা বলে দাবি করেন, দেশের শতকরা নব্বই জন লোকের প্রতি তিনি যে দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিলেন, এর পর আর ইয়ান স্মিথদের লজ্জা পাবার কোন কারণ নেই।

একদিকে যেমন দক্ষিণপন্থী প্রতি-ক্রিয়াশীল শক্তিগুলি সুসংবদ্ধ হচ্ছে, শাসকদল হিসাবে কেন্দ্রীয় কংগ্রেস দুটি শিবিরে বিভক্ত হতে চলেছে, দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, সেই গতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্থায়ী বামপন্থী শক্তিগুলি সংঘবদ্ধ হতে পারছে না। যদিও এই বামপন্থী শিবির আপাতত প্রধানমন্ত্রীর স্বপক্ষে, যদিও এই শিবির ঐক্যবদ্ধভাবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে গিরিকে সমর্থন করছে, তা সত্ত্বেও বামপন্থী দলগুলির পক্ষে একে অপরের কাছে আসার যতটা প্রয়োজন আছে বাস্তবে তা ঘটছে না। বামশক্তির উৎস প্রধানত পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল, কিন্তু উভয় রাজ্যেই যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলি আত্মকলহে মগ্ন। কেরলে নেতৃস্তরেই এই বিরোধ, পশ্চিমবঙ্গে অবশ্য যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির ওপরতলার বিরোধের চেয়ে কর্মীস্তরে বিরোধের প্রাবল্যই বেশি। কিন্তু সত্যই এই বিরোধের প্রয়োজন আছে কি না সেটা ভেবে দেখা দরকার। শুধুমাত্র মার্কসবাদেই বিশ্বাস করেন, এবং মার্কসবাদই যাঁদের সকল কার্যকলাপের ভিত্তি এমন পার্টির সংখ্যা প্রায় এক ডজনের কাছাকাছি। এঁরা কেন এক হতে পারেন না সহজ বুদ্ধিতে সেটা বোঝার উপায় নেই। অবশ্য সংশ্লিষ্ট প্রতিটি দলই তাঁদের স্বতন্ত্র অস্তিত্বের উপযোগিতার সমর্থনে লম্বা-চওড়া বক্তব্য পেশ করবেন। কিন্তু আমার ধারণা, আমার স্থির বিশ্বাস, বরং বলা যায় কনভিকশন, এই বিরোধের কারণ ফ্যাকশনাল, যেগুলির পিছনে আছে ব্যক্তিগত প্রতিপত্তিলাভের উদগ্র প্রেরণা, যেটাকে আদর্শের প্রলেপ দিয়ে যুক্তি-সিদ্ধ করে নেওয়া হয়েছে, যদিও এ বক্তব্যটাকে কাগজে-কলমে কোনদিনই প্রমাণ করা যাবে না।

বস্তুত চতুর্থ নির্বাচনের পর থেকেই সর্বভারতীয় রাজনীতির গতি-প্রকৃতিতে যে পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে তা এলোমেলো অবস্থা থেকে একটা সুনির্দিষ্ট পরিণতিলাভ করতে চলেছে। আগামী পক্ষকালের মধ্যেই সেই পরি-ণতির একটা সুস্পষ্ট রূপরেখা পাওয়া যাবে এরকম আশা করা অসঙ্গত নয়। ভারতীয় রাজনীতির একটা বড় বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে ক্ষমতাসীন শাসকদলের ক্রমিক ডিসইন্টিগ্রেশন। ১৯৬৬ সালের পর থেকে সেই ভাঙনের গতি এত দ্রুত ও চমকপ্রদ যে, তার ধাক্কা সহ্য করা কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব হয় নি। অধিকাংশ রাজ্য থেকেই কংগ্রেস কার্যত উৎখাত হয়েছে। শেষ ভাঙন সন্নিকটে। শ্রীমতী গান্ধী তাঁর সমর্থকদের নিয়ে কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসবেন, অথবা সিন্ডি-কেট গোষ্ঠী কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে স্বতন্ত্র দলে গিয়ে ভিড়বেন, অথবা দুই পক্ষই আবার কিছুকালের জন্য অস্বস্তিকর সহাবস্থান করবেন, সেটা নির্ভর করছে আসন্ন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ওপর।

শংকরাচার্যের গ্রন্থমালা :

পণ্ডিতপ্রবর পঞ্চানন তর্করত্ন সম্পাদিত। সুবিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিবৃতি সন্নিবেশিত।

প্রথম খণ্ড—৫'০০ টাকা।

তৃতীয় খণ্ড—৪'০০ টাকা।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ :

(সমগ্র সপ্তকাণ্ড। কবির জীবনী-সম্বলিত)

আদি কবির মহাকাব্যের বাঙালীর সংস্করণ। সোনার বাংলার ভক্তি-অর্ঘ্য। পদানুসারে। রাজসংস্করণ। সচিত্র। রেক্সিন ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য—৮'০০ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

আলোর অভ্যুদয়

মনোরঞ্জন হাজরা

প্রজ্বলিত চিতার ধোঁয়ায় চারিদিকটা আচ্ছন্ন।

তবু কত ভয় ওদের। ঐ ধোঁয়া যদি গঙ্গার তীর থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে পাছে দেশময় ছড়িয়ে পড়ে। তাই কড়া পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সকালের সোনালি রোদ লেগেছে গঙ্গার তীরে আর শান্ত জলে। অজস্র রুপোলী মাছের চিক দেয়ার মত গঙ্গার বুকখানা ক্ষণে ক্ষণে বিচ্ছুরিত হয়ে উঠছিল এক উজ্জ্বল দীপ্তিতে। পাহারাদার সান্ত্রীদের সঙীনের ফলাতেও এসে লাগছিল সেই একই ব্যতিক্রমহীন দীপ্তির ঔজ্জ্বল্য।

এরই একদিকে সবুজ ঘাসের ওপর পড়ে আছেন মূর্চ্ছিতা মা। স্নেহের বোন মমতা শুশ্রূষা করছে তাঁর। এক-একবার মায়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ডেকে উঠছে 'মা—মাগো!' মা কোন সাড়া দিচ্ছেন না। মমতার দুই গণ্ড বেয়ে তপ্ত অশ্রু গড়িয়ে যাচ্ছে অনর্গল। দাদা বিমলজ্যোতি নির্নিমেষ নয়নে চেয়ে আছে ধোঁয়ার কুণ্ডলীর দিকে। কে জানে সে কি ভাবছে। মাথার ওপর স্বচ্ছ সুন্দর নীল আকাশ। তার মহা-অঙ্গন জুড়ে কার যেন কল্যাণ হস্তের স্পর্শ মূর্ত হয়ে উঠেছে এক নম্র পবিচ্ছন্নতায়। চৈত্রদিনের পৃথিবী। দূরে গাছে গাছে নব কিশলয়ের সমারোহ। পাখ্‌-পাখালির অবরুদ্ধ জগৎ রাত্রি শেষে বুঝি উন্মুক্ত উদার। তাদের কলরবে মুখরা পৃথিবী যেন কত গরীয়সী। বিমলজ্যোতি একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে যেন কি বলতে গেল কিন্তু পারল না বলতে। তাই কথাটা তার মনের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগল: 'বাস্তবিক, এমন প্রভাতও আসে মানুষের জীবনে!'

হ্যাঁ, আসে বলেই তো, এমনি করে জ্বলে ওঠে চিতা, এমনি করে আচ্ছন্ন করে দেয় সে চিতার ধোঁয়া সারা আকাশ আর পৃথিবীকে।

এই তো মাত্র ঘণ্টাকয়েক আগেকার কথা। তখনও রাত্রি রয়েছে অনেকখানি। আকাশে জ্বলছিল অসংখ্য নক্ষত্র। গোঁ-গোঁ করে পুলিশভ্যান এসে দাঁড়ালো তাদের বাড়ির সম্মুখে। দুজন অফিসার তা থেকে নেমে পড়েই কড়া নাড়তে লাগল জোরে। বিমলজ্যোতি সন্ত্রস্ত হাতে দরজা খুলতেই একজন বলে উঠলেন, 'হিজ এক্সেলেন্সী দি গভর্নর অফ বেঙ্গল আপনাদের প্রতি প্রসন্ন হয়েছেন!'

বিমলজ্যোতি জিজ্ঞাসুভাবে তাকিয়ে বললে, 'অর্থাৎ...?'

'এখনই যেতে হবে আপনাদের।'

বিমলজ্যোতি মাকে ডাকতে যাচ্ছিল, কিন্তু পিছন ফিরে তাকাতেই দেখলে মা সেখানেই হাজির। এমন কি বোন মমতাও। চোখে চোখে কথা হয়ে গেল, কেন না, কারণ যা-কিছু তা সবারই জানা। হিজ এক্সেলেন্সীর কি পরম প্রসন্নতা। মা আবেদন করেছিলেন মহামান্য ইংরাজ সরকারের কাছে—কাজ মিটে গেলেই পুত্রের মরদেহটি যেন তাঁকে প্রত্যর্পণ করা হয়। তাই এটি সেই প্রত্যর্পণের পালা।

ক'দিন আগে জেলের মরণ-কুঠুরীতে পুত্রের সঙ্গে তিনি শেষ দেখা করতে গিয়েছিলেন। তখন অমরজ্যোতি মাকে এইভাবে আবেদন জানাতে বলেছিল কাজেই সেই মুহূর্ত যখন সমাগত, তখন মায়ের কাছে যে সে কতখানি নির্মম ঘটনা তা সহজেই অনুমেয়। ডুকরে কেঁদে উঠলেন মা। পাশের বাড়ির প্রতিবেশীরা জেগে উঠলেন। খুটখাট, দুড়ুম দড়াম, দরজা খড়খড়ি সব খুলে যেতে লাগল পাড়ার লোকেদের। সকলের মনেই প্রশ্ন, কি হল? কি হল তা সবাইয়েরই জানা। অস্ফুট চাপা স্বরে তারা যেন সব কি বলাবলি করতে লাগল। অফিসারদের একজন দরজা থেকে সরে গিয়ে পথে নেমে সবাইকে সতর্ক করে দিলেন, 'ডোন্ট বি টু রেস্টলেস!'

এরপর উঠলেন তাঁরা সেই পুলিশের

গাড়িতে। গাড়ির ধাতব ইঞ্জিনটা গোঁ-গোঁ করতে করতে এগিয়ে যেতে লাগল। সারা গাড়িটা কাঁপছে। কাঁপছে মায়ের হৃৎপিণ্ড। বিমলজ্যোতি, মমতারও বোধ করি রেহাই নেই সে অবস্থা থেকে। শেষ দেখার দিনটা ভেসে উঠল চোখের সুমুখে। কতই বা বয়স অমরজ্যোতির। বড়জোর যোল কি সতেরো। সুন্দর সুডৌল শ্যামবর্ণ চেহারাটা অমরজ্যোতির আরও যেন উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। টক্ টক্ করছে রঙ। চোখে সপ্তসিন্ধুর গভীর রহস্য। অথচ কি চোখ ঝলসানো দীপ্তি সে চোখে। কৈশোরোত্তীর্ণ মুখখানার দুই গালে শোঁয়া-শোঁয়া নবোদ্গত কৃষ্ণকালো শ্মশ্রু। অবাক হয়ে মা চেয়েছিলেন তার দিকে। চোখের জলের বিরাম ছিল না। বুকে যন্ত্রণারও ছিল না সীমা। আশ্চর্য তাঁর ছেলে। তাঁর কাছে সে যেন স্বর্গের কোন দেবদূত। আসন্ন জীবন-দীপ নির্বাণের কোন কালিমা নেই সে মুখে, নেই কোন উদ্বেগ, কোন পিছনটান, লাভক্ষতির হিসাব অথবা কোন আক্ষেপ। সরল হাসি হেসে মাকে, দাদাকে ও দিদিকে সে বুঝিয়ে বললে, জীবনের রহস্য। এখনও মায়ের কানে সেই কথাটা বাজছে যেন: ‘তুমি তো দেখেছ মা রুদ্র বৈশাখের দিনে নদী, সাগর, পুষ্করিণী, খাল, বিল উধাও হয়ে যায় বাষ্প হয়ে। সে বাষ্প কোথায় যায় তাও তো তুমি জানো মা। কিন্তু বল তো মা, একদিন কি সেই বাষ্পরাশি আকাশের বুকে জমাট কালো মেঘে রূপান্তরিত হয়ে যায় না? আর তা থেকে কি আশীর্বাদের মত ঝরে পড়ে না জীবনের জীবন সেই বর্ষার বারিধারা? যে জলের জন্যে একদিন তোমার বুকখানা হাহাকার করে উঠেছিল,—মাগো, সেই জলের ফিরে আসায় আবার কি তোমার বুক ভরে ওঠে না? তবে, কিসের জন্যে তুমি দুঃখ করো মা? তুমি তো ক্ষুদিরামের সেই গান শুনেছো...ক্ষুদিরাম ফিরে আসবে তাই গায়ক বলছে ‘চিনতে যদি না পারো মা দেখবে গলায় ফাঁসী।’

মনে পড়ে মা বলে উঠেছিলেন, ‘থাক্ থাক্ অমু আর বলিস নি। আমি আর সহ্য করতে পারছি না!’

তখন মায়ের গলা জড়িয়ে অমু আবেগের সঙ্গে আবৃত্তি করে উঠেছিল:

“জীবন সূর্য আকাশে যখন
মিথ্যা কুটিল-ভয়,
তোমার আমার জগতে আলোর
হবেই অভ্যুদয়—
প্রাণের প্রান্তে নতুন প্রাণ
বিস্ময়ে গাঁথি মালা
সার্থক হোক্ সুন্দর হোক
জীবনের ভরা ডালা।

সেই ছেলের আজ জীবনাবসান। তারই নিষ্প্রাণ শরীরটা আজ দেয়া হবে মায়ের হাতে। ইংরেজ সরকারের প্রতিনিধি হিজ এক্সেলেন্সী দি গভর্নর অফ বেঙ্গল মায়ের আবেদনে সাড়া দিয়েছেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তাঁরা এসে পড়লেন জেল গেটে এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জেল গেটটা খুলে গেল ঘড়-ঘড় করে। তখনও সিপাই-সান্ত্রী, সশস্ত্রবাহিনী চলে যায় নি। না চলে যাবার কারণ অমরজ্যোতির মৃতদেহটা দেয়া হবে মাকে এবং তাঁরি জন্য তাদের যেতে হবে শ্মশানে, জেলের পাশেই গঙ্গার ধারে।

মা, বিমলজ্যোতি আর মমতাকে গাড়ি থেকে নামানো হল। জেল সুপার এলেন, জেলার এলেন—এলেন মেডিকেল অফিসার, গোয়েন্দাদপ্তরের বড় কর্তা, পুলিশের ইন্সপেক্টার জেনারেল। বাদ গেলেন না কেউ। তারপর চলল সইয়ের পর সই কাগজে আর খাতায়। অর্থাৎ মা বুঝে পাচ্ছেন ছেলের মৃতদেহ। কি অসীম করুণা হিজ এক্সেলেন্সীর। রাতের অন্ধকারে সশস্ত্রবাহিনীকে মোতায়েন রেখে একটা কিশোর ছেলেকে ফাঁসীতে লটকে বীরপুংগবেরা এবার মৃতছেলেকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন মায়ের কোলে। তাও সেটা যে কতখানি তা ব্যবস্থা দেখলেই বোঝা যাবে।

সরু একটা খাটিয়ায় চাদর দিয়ে মৃতদেহটাকে আনা হল জেল গেটে। মা আছড়ে পড়লেন মৃত সন্তানের বুকে। কিন্তু তৎক্ষণাৎই সশস্ত্রবাহিনীর ওপর আদেশ হল, ‘আভি লে যাও—’

পাছে এই ফাঁসীর খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে সেজন্য সর্বপ্রকার সতর্কতাই পূর্বাহ্নে অবলম্বন করা হয়েছিল। তা ছাড়া পরিকল্পনা করা হয়েছিল—যা কিছু করতে হবে, তা রাত্রির অন্ধকারেই করতে হবে। মাঝখানে শুধু ফ্যাসাদ বাধিয়েছিলেন মা। কাজেই মাকে মৃতদেহ দেয়া হলেও তা এমনভাবে ম্যানেজ করতে হবে যাতে সরকারের নিজস্ব উদ্যোগ ছাড়া আর কোন প্রকারেই তা দাহ করতে না পারা যায়। এরই নাম হিজ এক্সেলেন্সীর পরম প্রসন্নতা!

মৃতদেহ নিয়ে যাবার ব্যবস্থা হল—সামনে ও পিছনে সশস্ত্রবাহিনী। তার মধ্যে মৃতদেহ, তারপর মা, বিমলজ্যোতি ও মমতা। তাদের পিছনে আবার কয়েকজন অফিসার। আকাশে তখন নক্ষত্রগুলো জ্বল্ জ্বল্ করছিল। কে জানে তারাই হয়তো সাক্ষী রইল সেই হিংস্র রাত্রির বুকে ততোধিক হিংস্র এক ইতিহাসের।

সব পরিকল্পনা সেদিন ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল ইংরেজ সরকারের একটিমাত্র ত্রুটির জন্যে। শ্মশানে যখন চিতা সাজানো হয়েছিল—চিতার সে কাঠগুলি ছিল কাঁচা। অনেকক্ষণ ধরে ধোঁয়া-হয়ে-হয়ে যখন কাঠ আর জ্বলল না তখন পুলিশ লাইন থেকে আনা হল কেরোসিনের পর কেরোসিন। কিন্তু কেরোসিনের এমনই মজা যে যতক্ষণ তার দাহিকাশক্তি থাকে ততক্ষণ কাঠগুলো জ্বলছে মনে হয়, কিন্তু তারপরই হুস্ করে নিভে যায়। এমনি করে যখন আর কাঠগুলো জ্বলল না, তখন আবার নতুন করে চিতা সাজানো হল।

এর ফল হল এত বীভৎস যা বহু বৎসর পরে আজও ভুলতে পারে নি তারা।

আগুনে ঝলসানো অমরজ্যোতির কালো দেহটা দেখে মা আঁৎকে উঠেছিলেন ভয়ে এবং তারপরই তিনি গিয়েছিলেন অচৈতন্য হয়ে। অচৈতন্য হওয়ার ঠিক পূর্বমুহূর্তে বিমলজ্যোতি মাকে ধরে ফেলে বলেছিল, ‘ভয় পেও না মা। ওরা এমনিই। তোমার মনে নেই। ভগৎ সিংয়ের ফাঁসীর পর কিভাবে ওরা শতদ্রুর তীরে ঝলসানো মৃতদেহটা ফেলে দিয়ে এসেছিল?’

‘জানি রে জানি’, বলতে বলতে মা আর নিজেকে সামলাতে পারেন নি। কঠিন যন্ত্রণায় তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন সংজ্ঞা।

তাই নতুন করে চিতা জ্বালানো হয়। সেই চিতা জ্বালানোর পরে যদিও আর বেগ পেতে হয় নি, তবে সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছিল অনেকখানি এবং তার ফলে দিনের আলোয় চিতাগ্নির লেলিহান শিখা আর ধোঁয়ার কুণ্ডলী জনসাধারণের নজর এড়ায় নি। প্রথমত প্রতিবেশীদের মাঝখান থেকে যখন মা, বিমলজ্যোতি আর মমতাকে পুলিশ ডেকে আনতে যায় তখনই লোকে ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল। তারপর তো এই অবস্থা। শহরের লোকজন আসছে দুজন একজন করে, সাংবাদিকরা আসছেন, এদিকে-ওদিকে টেলিফোনে, জটলায় খবর রটে যাচ্ছে। বাড়ির ছাদে ছাদে, জানলায়-দরজায়, স্নানার্থীদের ভিড়ের মধ্যে—এমন কি জেলের দোতলার সেলগুলিতে রাজনৈতিক বন্দীদের মুহুর্মুহু ধ্বনিতে কিছুই আর চাপা রইল না।

একটা পরাধীন দেশের মানুষের মনে কি অপরিসীম শ্রদ্ধা তার মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি। চিতার ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে বিমলজ্যোতির দুচোখ আরও একবার যেন সিক্ত হয়ে উঠল।

ক'দিন ধরেই পকেটে তার ছোটভাইয়ের চিঠিগুলো ঘুরছিল। যখনই এই মর্মান্তিক ঘটনায় ভেঙে

আপনার জন্য
বাড়ির সকলের জন্য
ব্রিটানিয়া
থিন
এরারুট
BRITANNIA
THIN ARROWROOT
খেতে ভালো,
পুষ্টিকর—
সবাইকার
মনের মতো
ব্রিটানিয়া মানেই সেরা বিস্কুট
BBC 8887

পড়েছিল সে তখনই একবার চিঠিগুলো খুলে খুলে দেখছিল। এই তো সেই প্রথম চিঠিখানা। তাকে লিখেছিল বেশ কিছু-দিন আগে।

...আপনি তো জানেন : মাত্র বারো বছর বয়সে অমাবস্যার নিশুতি রাতে সম্পূর্ণ একাকী শ্মশানে গিয়ে আমি সাহসের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলাম। আমাদের দলের কাছে আমি সেদিন শপথ গ্রহণ করে-ছিলাম : আমাদের যদি কেউ মা থাকে তবে সে হচ্ছে আমাদের এই দেশ। আমাদের যদি কেউ ভাইবোন আত্মীয়-স্বজন থাকে, তবে সে আমার এই দেশের তেত্রিশ কোটি নরনারী এই দেশজননী আর এই দেশের এই ভাইবোন আত্মীয়স্বজন সকলেই আজ সুচতুর বলদর্পী ইংরেজের পদতলে নিষ্পিষ্ট। তাই এদেশের ললাটে স্বাধীনতার বিজয় তিলক এঁকে দেয়ার দায়িত্ব মূলত আমাদেরই। এ দায়িত্ব পালনে চিরদিন আমি নিরলস থাকব, সংসারে প্রবেশ করব না, নারীকে মাতৃবৎ মনে করে জীবনে কখনো দার পরিগ্রহ করব না, আত্মসুখের জন্য কখনো প্রলুব্ধ হব না। যে কোন ত্যাগ বিশেষ করে প্রাণ বিসর্জন করার ডাক এলে পিছিয়ে থাকব না। সহকর্মীদের প্রতি বা দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করলে তার শাস্তি হবে মৃত্যু।

আপনি নিশ্চয়ই বুঝবেন—এ শপথ গ্রহণ করার মধ্যে অসম্ভব একটা সংযমী প্রমাণও আছে। এই রোমাঞ্চকর মহাযাত্রার একজন সৈনিক হিসাবে দাদা আপনার কাছ থেকে আমি কখনো বাধা পাই নি। ছেলে-বেলায় বাবাকে হারিয়েছি। কিন্তু আপনি আমার সে অভাব পূর্ণ করেছেন সকল দিক থেকে। এমন কি বারে বারে আপনি আমাকে সঠিক পথ দেখাতেও চেয়েছেন। আমিও সে পথের যৌক্তিকতা যে স্বীকার করি নি তা নয়। কিন্তু তবুও, আমার শপথের প্রতি আমায় বিশ্বস্ত থাকতে হবে, কারণ আমি আপনারই সহোদর ভাই। আপনার কাছেই আমার শিক্ষা।

হ্যাঁ, আপনার সব কথা ঘটনা প্রসঙ্গে মিলে যাচ্ছে। দেখছি জয়পুরে, আলোয়ারে, দেখছি কাশ্মীরে আর বর্মায় বিদ্রোহের তরঙ্গ বহে চলেছে। বর্মার প্রোম রোডে বিদ্রোহী কৃষকদের নিহত মাথাকাটা দেহ-গুলি সাজিয়ে রাখতে দেখে আমি স্তম্ভিত হয়ে গেছি। সত্যিই শোলাপুরে, আপনার কথা মত শ্রমিকদের বীরত্বেরও কোন তুলনা হয় না। এ কথা কি সহজ—গোটা একটা মাস সশস্ত্রবাহিনীর হাত থেকে বীর শ্রমিকরা শহরকে মুক্ত করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল।

দাদা, আমি বুঝতে পারছি বিপ্লব মানে বোমা-পিস্তল আর রাইফেল নয়। বিপ্লব মানে আরও অনেক কিছু—বিপ্লব মানে গোটা সমাজকে আমূল বদলে দেয়ার জন্যে নির্যাতিত শ্রমিক ও কৃষক-শ্রেণীর অগ্রগামী যোদ্ধাদের দুর্বার এবং সংগঠিত অভিযান। কিন্তু.....

চিঠিখানা পড়তে পড়তে বিমল-জ্যোতির চোখ ঝাপসা হয়ে এল জলে। সত্যিই অগ্রজের সম্বন্ধে অমরের কি শ্রদ্ধা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কেন সে আর নিজের পায়েই রয়ে গেল? যদি তা না করত সে, তবে তাকে এইভাবে শহীদ হতে হত না। মাকে আর মমতাকেও এমনভাবে ভেঙে পড়তে হত না। পরক্ষণেই তার মনে হল, না না সে ঠিকই করেছে। অত্যাচারের বিরুদ্ধে, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সে রুখে দাঁড়িয়েছে। ঠিকই করেছে সে। একথাও তো সে নিজেই লিখেছে। চোখের জল মুছে সে চিঠিখানাও সে দেখতে আবার খুলে। এই তো লেখা রয়েছে...

...মারতে আমি ওকে চাই নি দাদা। এত বড় অত্যাচারী জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আপনি ধারণা করতে পারবেন না। লোকের ঘরবাড়ি জ্বালিয়েছে। ঘর অবরুদ্ধ করে দিয়ে অসহায় শিশুনারী সকলকে শীতের রাতে রাস্তায় বের করে দিয়েছে। এমন কি তার রুট অফিসারগুলোকে দিয়ে নারী ধর্ষণ পর্যন্ত করাতেও কসুর করে নি। ইংরেজ মহান জাত, সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তার শাসকশক্তি যে কত বর্বর হতে পারে তা আমরা যেমন করে বুঝেছি তেমন করে আর কে বুঝতে পেরেছে। তাই দলের থেকে ওকে ভীত-সন্ত্রস্ত করবার ভার পড়েছিল আমার ওপর। আমি তাকে ভয়ই দেখাতে চেয়ে-ছিলাম, ঠিক মারতে চাই নি। কারণ আমি জানতাম যে দুটো-একটা ইংরেজ অফিসারকে মেরে আমার দেশের স্বাধীনতা আসবে না। তার জন্য চাই সমস্ত সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জনতার সম্পূর্ণ বিদ্রোহ এবং সে বিদ্রোহের নেতৃত্ব করবে নির্যাতিত শ্রমিক-শ্রেণী। কিন্তু শুধু ভয় দেখাতে গিয়েই এই কাণ্ডটা ঘটল—আমার হাতের অব্যর্থ নিশানায় ধরাশায়ী হয়ে গেল এই জেলা ম্যাজিস্ট্রেট। ওরা ধরতে পারলে আমাকে ফাঁসীতে লটকাবে।......

আরেকটি ছোট চিঠিও ছিল। সে চিঠির কথাও ভোলার নয়। চিঠিখানা লিখেছিল মমতাকে। সেটাও একবার খুলে দেখল বিমলজ্যোতি।

পূজনীয়া দিদি,

তুমি মাকে দেখো। মা আমার জন্ম-দুঃখিনী। আমি আর জীবনে সময় পাব না। এক শহর থেকে আরেক শহরে, এক গ্রাম থেকে আরেক গ্রামে আমি কেবলই ছুটে বেড়াচ্ছি। কোনদিন আমার খাওয়া হয়, কোনদিন হয় না। হাতে পয়সাও সব সময় থাকে না। দাদার কাছেও যে চেয়ে পাঠাবো, তারও কোন উপায় নেই। কারণ আমার কোন ঠিকানা নেই। কাজেই দাদা কোথায় পাঠাবেন টাকা? খবরের কাগজে লক্ষ্য কোরো—ধরা পড়ি যদি, জেল-খানায় আমার সঙ্গে দেখা কোরো।......

হ্যাঁ ধরা একদিন সে পড়ল। বিচারও একটা হল। কিন্তু সে বিচারের মূল্য কি? পরাধীন দেশের রাজবিদ্রোহীদের বিচার কবে কোন দেশে ন্যায়বিচারের সূত্র ধরে হয়েছে? তাই তো অমরজ্যোতির এই ফাঁসীর আদেশ। তাই তো তাকে গভীর রাতে ফাঁসীতে লটকানো হয়েছে। তাই তো রাতের অন্ধকারে তাদের সম্মুখে এমনি করে তার মরদেহ প্রত্যর্পণের তামাসা!

সময়ের কাছে সবই সহজ হয়ে যায়। মায়ের সংজ্ঞাও ফিরে এল এক সময়।

সেদিন অন্ধকার রাতে পুলিশের গাড়িতে তাঁদের চুপি চুপি আনা হয়ে-ছিল জেলখানায়, আর জেলখানা থেকে শ্মশানে। কিন্তু ফিরলেন তাঁরা দিনের আলোয়। কিন্তু চুপি চুপি নয়। হাজার হাজার লোকের মহা-মিছিলে এবং একান্ত পুরোভাগে।

বছর বছর এইদিনটি ফিরে আসে। মা, বিমলজ্যোতি, মমতা সবাই একত্র হন। শুধু কি তাঁরাই? তাঁদের সঙ্গে সারা দেশও। জীবনের এপার থেকে ওপারে সবাই পাঠান নিষ্ঠার সঙ্গে আশীর্বাদ। গঙ্গার ধারে সেদিনকার সেই চিতাগ্নি জেলে দিয়েছে সারা দেশে আলো। বোধ করি সবাই মিলে এক সুরে আবৃত্তি করেন।

জীবন সূর্য আকাশে যখন
মিথ্যা কুটিল-ভরা,
তোমার আমার জগতে আলোর
হবেই অভ্যুদয়—
প্রাণের প্রান্তে নতুন প্রাণ
বিস্ময় গাঁথি মালা,
সার্থক হোক, সুন্দর হোক
জীবনের ভরা ডালা।

ভারতের স্বাধীনতা ও মাদাম কামা

অমল সেন

ভারত আজ স্বাধীন। কিন্তু যে স্বাধীনতা সংগ্রামীরা একদিন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কঠিন নাগপাশ থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য তাঁদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ দিনগুলি বিসর্জন দিয়েছিলেন, যাঁদের আত্মত্যাগ ও নির্যাতন, যাঁদের তপস্যা ও ঐকান্তিক সাধনার বলে আমরা এই স্বাধীনতা লাভ করেছি স্বাধীনতার ফল ভোগ করার সময়ে আমরা তাঁদের কথা মনে আনি না। তাঁদের আমরা ভুলে গিয়েছি। দেশমাতৃকার সেইসব অগ্নি-শিশুর জ্বলন্ত দেশপ্রেম, বলিষ্ঠ আদর্শ ও বীর্যবত্তা এখন আর আমাদের অনু-প্রাণিত করে না। কিন্তু দেশের এই বীর সন্তানদের অসাধারণ চরিত্র ও আত্মত্যাগের কথা স্বাধীনোত্তর যুগে যারা জন্মগ্রহণ করেছে আমাদের এই দেশে আজকের দিনের সেইসব কিশোর এবং তরুণদের একান্তভাবে জানা প্রয়োজন।

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম, ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহ, ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলেও ভারতবাসীর মনে তা স্বাধীনতার যে আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলেছিল বিভিন্ন সময়ে বহু ঘটনার মধ্য দিয়ে আমরা সেই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে নানাভাবে আলোড়িত এবং আন্দোলিত হতে দেখেছি। বিদ্রোহের অগ্নিশিখায় বার বার ভারতের আকাশ রাঙা হয়ে উঠেছে। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, ওহাবী আন্দোলন এবং মণিপুরের রাজা টিকেন্দ্রজিতের বিদ্রোহ তারই এক-একটি দীপ্ত অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিপ্লবীরা সশস্ত্র বিপ্লবের যে পরিকল্পনা করেছিল তারও প্রেরণা পেয়েছিল তারা প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রধানত দুটি ধারায় পরিচালিত হয়েছে—সশস্ত্র বিপ্লব আন্দোলন এবং মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত অহিংস অসহযোগ আন্দোলন। আমাদের স্বাধীনতা এই দুই বিপরীত-ধর্মী অথচ অভিন্ন লক্ষ্যে পরিচালিত সংগ্রামেরই মিলিত অবদান।

বিপ্লবের পরিকল্পনা বৈপ্লবিক সংগঠনের মাধ্যমে সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল বাংলাদেশে নয়,—মহারাষ্ট্রে আর, এই বিপ্লবের শ্রেষ্ঠ সমর্থক এবং অনুপ্রেরণার উৎস ছিলেন লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক। মহারাষ্ট্রে তিনি সর্বজনীন গণপতি পুজো ও শিবাজী উৎসবের প্রবর্তন করলেন। শিবাজী উৎসবের বাহ্যিক রূপ ছিল শরীরচর্চার নিরীহ অনুশীলন কিন্তু ভিতরে ছিল তার স্বাধীনতা লাভের দুর্জয় সংকল্পে স্থির এবং অগ্নিগর্ভ।

মহারাষ্ট্র থেকে বিপ্লবের রক্তমশাল জ্বালিয়ে নিয়ে শ্রীঅরবিন্দ এলেন বাংলা-দেশে। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে বাংলাদেশের জনমন তখন ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের মতো উন্মথিত আলোড়িত। শ্রীঅরবিন্দ বাংলা-দেশে দেখলেন এখানকার মাটি বিপ্লবের সম্ভাবনায় সমৃদ্ধ, দেশের তরুণচিত্ত মুক্তিকামনায় উদ্বেল এবং অশান্ত। বাংলাদেশের বিপ্লবী তরুণরা বিপ্লবের প্রথম বলিষ্ঠ প্রেরণা লাভ করেছিল ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের অমর সাহিত্য "আনন্দমঠ" থেকে। "আনন্দমঠ" বিপ্লবীদের অগ্নি-বেদ। "বন্দে মাতরম্" বিপ্লবীদের যুদ্ধ-সঙ্গীত। এই "বন্দে মাতরম্" একদা হিমালয় থেকে কন্যা কুমারিকা পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষে মুক্তিমন্ত্ররূপে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হত। আমরা মুক্তিপাগল তরুণ শহীদদের এই উন্মাদনাময় মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে নির্ভয়ে এবং হাসি-মুখে ফাঁসির মঞ্চে আরোহণ করতে দেখেছি। শ্রীঅরবিন্দ এমনি একদল নিষ্কাম দেশপ্রেমিক তরুণকে দীক্ষা দিলেন বিপ্লব-মন্ত্রে, বাংলাদেশে বিপ্লবের বীজ বপন করলেন। দুটি বিপ্লবী দল গড়ে উঠলো বাংলাদেশে—অনুশীলন পার্টি এবং যুগান্তর পার্টি। শহরে ও গ্রামে বাংলা-দেশের সর্বত্র এই বিপ্লবী সংস্থা দুটির বহু শাখা ও উপশাখা স্থাপিত হল।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১৮ই এপ্রিল বোম্বাইতে স্বাধীনতা সংগ্রামের তরুণ যোদ্ধা বিপ্লবী দামোদর হরি চাপেকার ইংরেজের কারাগারে ফাঁসিতে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। ইংরেজ ভেবেছিল এইভাবে তারা বিপ্লব থামাতে পারবে, কিন্তু বিপ্লব থামলো না। বরং তা আরো দৃপ্ত তেজে ছড়িয়ে পড়লো মহারাষ্ট্র থেকে বাংলায়, বাংলা থেকে পাঞ্জাবে, পাঞ্জাব থেকে ভারতের সর্বত্র এবং ভারতের সীমানা অতিক্রম করে ব্রহ্মদেশ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং ইউরোপ মহাদেশের ইংলন্ড, ফ্রান্স, জার্মানী এবং আরো নানাস্থানে।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতের মুক্তিদূত বিপ্লবী তরুণেরা ভারতের স্বাধীনতা ও বিপ্লবের বাণী বহন করে এশিয়া, ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়েছিলেন তার বহু প্রামাণ্য দলিল ও চিঠিপত্র সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে । কিছুদিন আগে ডঃ চন্দ্র চক্রবর্তী বিভিন্ন বৈদেশিক সংবাদপত্র থেকে সংগৃহীত "ভারতের স্বাধীনতাকল্পে জার্মান-প্রবাসী হিন্দুদের ষড়যন্ত্র" সম্বন্ধে একটি যথেষ্ট মূল্যবান সংবাদ-সংকলন কলিকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগারে দান করেছেন।

বর্তমান শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে কয়েকজন ভারতীয় তরুণ বিপ্লবী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চলে গিয়ে সেখান থেকে কয়েকটি বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছিলেন এবং সেইসব রাষ্ট্রের সহায়তায় ইংরেজ-শাসনের নাগপাশ থেকে ভারতকে মুক্ত করার পরিকল্পনা করেছিলেন। এই রাষ্ট্রগুলির মধ্যে জার্মান গভর্নমেন্টের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদপত্রসমূহ থেকে সংগৃহীত এই সংবাদ-সংকলনে কয়েকজন ভারতীয় বিপ্লবী ও তাঁদের বৈদেশিক সহযোদ্ধাদের দুঃসাহসিক বিপ্লব-প্রচেষ্টার রোমাঞ্চকর এবং চমকপ্রদ বিবরণ পাওয়া গিয়েছে। ভারতীয় বিপ্লবীদের বিরুদ্ধে আনীত ষড়যন্ত্র মামলার বিচারের যে বিবরণ এই সংকলনে রয়েছে তা বিশেষ তথ্যনির্ভর এবং খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। ডঃ চক্র-বর্তী নিজেও এই ষড়যন্ত্র মামলার একজন আসামী ছিলেন। ভারতীয় বিপ্লবীরা পৃথিবীর দেশ থেকে দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়ে ভারতের স্বাধীনতার জন্য কিভাবে সংগঠন ও সংগ্রাম করেছিলেন তা নির্ভুল-ভাবে জানতে হলে এই সংকলনখানি পড়া একান্ত আবশ্যক। এই সংকলনে যেসব ফটো এবং কার্টুন দেওয়া আছে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনায় তথ্যানুসন্ধানীদের তা বিশেষভাবে সাহায্য করবে।

মার্কিন পুলিশ ভারতীয় বিপ্লবীদের গোপন কার্যকলাপ সম্বন্ধে যেসব চিঠিপত্র হস্তগত করতে পেরেছিল তার একখানি

চিঠিতে দেখা যাচ্ছে, বিপ্লবীরা লিখছেন: "আমাদের অনুরোধে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমেরিকায় এসে কাউণ্ট ওকুমা, কাউণ্ট তেরাউচি এবং আরো বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করেছেন।" এই চিঠিতে এরকম একটা কথাও আছে—ভারতীয় বিপ্লবীরা জাপানের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন এবং তাঁদের এই যোগাযোগ স্থাপনের কাজে প্রধান সাহায্যকারীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলিতে পরিচালিত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন সম্পর্কে লণ্ডন, মিলান, টোকিও এবং অন্যান্য বহু স্থান থেকে প্রকাশিত কয়েকখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকাও (Pamphlets) ডঃ চন্দ্র চক্রবর্তী আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগারে দান করেছেন।

এমনিভাবে সে যুগে যাঁরা ভারতের স্বাধীনতার বাণী বহন করে বিশ্বের নানা জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিলেন তাঁদের মধ্যে শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মার নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন বিদেশে ভারতের বিপ্লবমন্ত্রের উদ্গাতা। লণ্ডনের বুকে বসে যেমনভাবে এবং যতখানি তেজস্বিতার সঙ্গে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের বিদ্রোহ প্রচার করতে আরম্ভ করেছিলেন তাতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের রক্ষকরা রীতিমত আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়লো এবং সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ সংবাদপত্রগুলিও তাঁর বিরুদ্ধে জঘন্য অপপ্রচার শুরু করলো। ইংলণ্ডে থাকা আর নিরাপদ নয় বুঝতে পেরে তিনি প্যারিসে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। প্যারিসে তাঁর নতুন কর্মকেন্দ্র গড়ে উঠলো। বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকার, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, মানবেন্দ্রনাথ রায় এবং মাদাম ভিকাইজি কামা প্রমুখ বিপ্লবীরা তাঁর গৃহে এসে সমবেত হতেন এবং সেখানে বসেই তাঁরা বিপ্লবের পরিকল্পনা রচনা করতেন। আজ আমরা তাঁদের অনেককেই ভুলে গিয়েছি, যাঁদেরও বা মনে রেখেছি তাঁদেরও আমরা উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে স্মরণ করি না। তবুও অন্ধকার রাতে বিদ্যুতের ঝিলিকের মতো যে স্বল্পসংখ্যক বিপ্লবীর ছবি মাঝে মাঝে আমাদের স্মৃতিপটে ভাস্বর দ্যুতিতে ফুটে ওঠে শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা এবং মাদাম ভিকাইজি কামা তাঁদের অন্যতম।

মাদাম ভিকাইজি কামা!

কে ইনি?

কেউ যদি আমাকে প্রশ্ন করে—কার মতো বোন পেলে তুমি সবচেয়ে খুশি হতে? আমি সগর্বে মাথা উঁচু করে জবাব দেব, মাদাম ভিকাইজি কামার মতো। কেউ যদি আমাকে জিজ্ঞাসা করে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কোন বিপ্লবিনী নারীর অবদান সর্বশ্রেষ্ঠ? আমি তৎক্ষণাৎ বিনা দ্বিধায় বলবো, মাদাম ভিকাইজি কামা।

বস্তুত ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের যাঁরা অগ্রদূত মাদাম কামা তাঁদের একজন। বোম্বাইয়ের এই পার্শী মহিলা যে যুগে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এটা সে যুগে ছিল একটা পরম বিস্ময়কর এবং অভাবনীয় ঘটনা, কারণ সে যুগে মহিলাদের স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেবার কথা তো ভাবাই যায় না, পুরুষরাও প্রকাশ্যে মুক্তি সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানাতে ভয় পেতেন। একবার পুলিশের নজরে পড়লে তার আর সর্বনাশ হতে কিছু বাকী থাকতো না।

১৮৬১ খৃস্টাব্দের ২৪শে সেপ্টেম্বর বোম্বাইয়ের এক সম্ভ্রান্ত পার্শী ব্যবসায়ীর গৃহে মাদাম কামার জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম ছিল সোরাবজী ফ্রামজি প্যাটেল। রুস্তম কে আর কামা নামে একজন সলিসিটরের সঙ্গে ২৪ বছর বয়সে ভিকাইজির বিয়ে হয়, কিন্তু এ বিয়ে মোটেই সুখের হয় নি। ভিকাইজি কামার রাজনৈতিক আন্দোলনে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়া তাঁর স্বামী একেবারেই সমর্থন করেন নি। তিনি ছিলেন বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের একজন গোঁড়া সমর্থক, আর মাদাম কামা ছিলেন ঠিক তার বিপরীত—সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী একজন চরমপন্থী বিপ্লবী। ফলে অবস্থা শেষকালে এমন দাঁড়ালো যে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথাবার্তা পর্যন্ত বন্ধ হল।

১৮৯৩ খৃস্টাব্দে প্লেগ মহামারীরূপে সারা বোম্বাইতে ছড়িয়ে পড়লো। মাদাম কামা প্লেগের রোগীদের সেবায় আত্মনিয়োগ করে নিজের সুখ এবং আরামের কথা বিস্মৃত হলেন। এ ব্যাপারে পরিবারের সবাই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে লাগলো, ফলে তাদের সঙ্গে তাঁর ভীষণ মনকষাকষি শুরু হল।

মাদাম কামা হঠাৎ ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং ১৯০১ খৃস্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি চিকিৎসার জন্য ইংলণ্ড যাত্রা করলেন। লণ্ডনে তাঁর অপারেশন হয়ে যাবার পরে তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন। তাঁর ভারতে প্রত্যাবর্তনের দিন-তারিখ পর্যন্ত স্থির হল, কিন্তু ভারতে আর তাঁর ফেরা হল না।

একটা আকস্মিক ঘটনায় মাদাম কামার জীবনের গতিই আমূল পরিবর্তিত হল। সে ঘটনাটা হচ্ছে প্রখ্যাতনামা ভারতীয় বিপ্লবী শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার। লণ্ডনের হাইড পার্কে শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মার জ্বালাময়ী বক্তৃতা, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দেবার জন্য তাঁর উদাত্ত আহ্বান শুনে মাদাম কামার অন্তরে তাঁর উন্মাদনা জাগিয়ে তুললো।

মাদাম কামার আর স্বদেশে ফিরে যাওয়া হল না। তিনি স্বাধীনতার যুদ্ধের সৈনিক হলেন। সেই দূর বিদেশে তিনি ভারতের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন শুরু করলেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, তার অপশাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে, তার অন্যায় অত্যাচার ও উৎপীড়নের বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহ প্রচার করে বেড়াতে লাগলেন। লণ্ডনের অধিবাসীরা মাদাম কামার অগ্নিগর্ভ বক্তৃতা শুনে অবাক হত। এর আগে কখনো কোন পরাধীন দেশের মহিলাকে লণ্ডনের বুকে দাঁড়িয়ে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদেরই বিরুদ্ধে এমন সাংঘাতিক বক্তৃতা দিতে তারা দেখে নি। তারা বিস্মিতকণ্ঠে প্রশ্ন করতো,—কে ইনি? নাম কী এঁর, সভার মধ্য থেকেই কেউ একজন উত্তর দিত—ইনি ভারতের বিপ্লবী নায়িকা। এঁর নাম হচ্ছে মাদাম ভিকাইজি কামা।

লণ্ডনের কর্তাব্যক্তিদের টনক নড়লো। বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তর এবং ইণ্ডিয়া হাউসের কর্তৃপক্ষ ক্রোধে অগ্নিশর্মা হলেন, ভাবতে বসলেন মাদাম কামাকে থামানো যায় কী উপায়ে। বাইরে ক্রোধ প্রকাশ না করে তাঁরা বরং বিনীতভাবেই মাদাম কামাকে অবিলম্বে লণ্ডন পরিত্যাগ করার পরামর্শ দিলেন। কিন্তু তিনি যে তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করেছেন এমন লক্ষণ দেখা গেল না। তিনি বরং আগের চাইতে বেশি উৎসাহের সঙ্গে আরো সাংঘাতিক এবং বিদ্রোহাত্মক বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট এবার তাঁকে লণ্ডন থেকে বহিষ্কার করে দেবার হুমকি দেখালো। কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট তখন মাদাম কামার রাজনৈতিক আন্দোলন বন্ধ করার উদ্দেশ্যে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত করলো। কিন্তু বাস্তবে তারা কোনকিছু করার আগেই মাদাম কামা গোপনে ইংলণ্ড থেকে চলে গিয়ে প্যারিসে আশ্রয় নিলেন। সেখান থেকে চললো তাঁর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে বিরামহীনভাবে বিদ্রোহের অগ্নিমন্ত্র প্রচার।

ইংলণ্ডে গিয়ে পৌঁছোবার পরেই যে বরেণ্য ভারতীয় নেতার সঙ্গে মাদাম কামার প্রথম পরিচয় ঘটলো তিনি হলেন দাদাভাই নওরোজী। ইনিই পরে আরো দুজন ভারতীয় বিপ্লবী শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা ও সর্দার সিং রাওজী রাণার সঙ্গে তাঁর পরিচয় করে দেন। শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মাই প্রথম ভারতীয় বিপ্লবী যিনি ইউরোপে গিয়ে সেখানকার লোকদের কাছে ভারতের পরাধীনতার কথা, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের নির্মম শোষণ ও অত্যাচারের

সাধনা
বিউটি স্নো-এর
কোমল স্পর্শে
সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়
সাধনা বিউটি স্নো
•একটি অতি আধুনিক অঙ্গরাগ
ত্বক মালিন্যমুক্ত ও লাবণ্যযুক্ত করে। মুখশ্রীতে লালিত্যের ও তারুণ্যের আভা ফুটে ওঠে।
SADHANA Beauty Snow
SBS-2/63
সাধনা ঔষধালয় কলিকাতা-৫

কথা বলে বেড়াতে থাকেন, প্রবাসী ভারতীয়দের তিনি আহবান জানান ভারতের পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে ভারতবাসীকে দাসত্বের গ্লানি থেকে মুক্ত করার জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিতে। তাঁর এ আহবানে অভূতপূর্ব সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ভারতীয় বিপ্লবীদের নিয়ে গড়া গদর পার্টির বহু শাখা-প্রশাখা হয়েছিল।

শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃতির অধ্যাপক ছিলেন। বিপ্লব আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন বলে এ'কেও ইংলন্ড ত্যাগ করে প্যারিসে গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। পরে আবার তিনি প্যারিস ত্যাগ করে সুইজারল্যান্ডে গিয়ে বাস করতে থাকেন।

১৯০৫ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা ইংলন্ড থেকে "দি ইন্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট" নামে একখানি কাগজ বের করছিলেন এবং মাদাম কামা ছিলেন এই কাগজের নিয়মিত লেখিকা। এই পত্রিকাখানি ১৯০৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ইংলন্ড থেকে প্রকাশিত হবার পরে ১৯১৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত ফ্রান্স থেকে এবং পরে ১৯১৪ খৃস্টাব্দ থেকে জেনেভায় প্রকাশিত হতে থাকে।

১৯০৫ খৃস্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারী লন্ডনে শ্যামজী বর্মার গৃহে "ইন্ডিয়ান হোমরুল সোসাইটি" নামে ভারতীয়দের একটি সমিতি স্থাপিত হল এবং মাদাম কামা এই সমিতির একজন উৎসাহী ও সক্রিয় সদস্যরূপে পরিগণিত হলেন। ওই বছরেই ১০ই মে লন্ডনে ভারতের সিপাহী বিদ্রোহের যে স্মৃতিবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয় মাদাম কামা সেই অনুষ্ঠানে সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করেছিলেন।

মাদাম কামা ১৯০৮ খৃস্টাব্দের ২০শে আগস্ট লন্ডনের ক্যাক্স্টন হলে একটি জাতীয় সম্মেলন আহবান করেন। যেসব বিশিষ্ট ভারতীয় সেই সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে লালা লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র পাল, খাপার্দে, গোকুলচাঁদ নারাঙ, আগা খাঁ, ডাঃ জ্ঞানচাঁদ, ভি ভি এস নায়ার, ডাঃ আনন্দকুমার স্বামী এবং বীর বিনায়ক দামোদর সাভারকরের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

ইংলন্ড থেকে গোপনে প্যারিসে গিয়ে আশ্রয় নেবার পরে সেখান থেকেই চললো এই বিপ্লবী নারীর বিপ্লবের যজ্ঞ অনুষ্ঠান স্বাধীনতার অগ্নিমন্ত্র উচ্চারণ করে। প্যারিস হয়ে উঠলো মাদাম কামার দ্বিতীয় মাতৃভূমি। এখানে তিনি মাত্র দু'-একটি বছর নয়, সুদীর্ঘ ৩৫ বছর কাল, তাঁর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কাল, স্বেচ্ছায় বরণ করে নেওয়া নির্বাসিতের জীবন অতিবাহিত করেছেন। তাঁর বাসভবন বহু বিপ্লবীর কর্মকেন্দ্র তথা আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছিল। এইসব বিপ্লবীদের মধ্যে কয়েকজন ফরাসী এবং পলাতক রুশ-বিপ্লবীও ছিলেন।

বৃটিশ গভর্নমেন্ট প্রাণপণে যে বিপ্লবের আগুন নেভাবার চেষ্টা করেছিল তা দ্বিগুণ তেজে উজ্জ্বল আভায় জ্বলে উঠলো, কারণ প্যারিসে গিয়ে আশ্রয় নেবার পরে মাদাম কামা অমিততেজ ও সাহসিকতার সঙ্গে বিদ্রোহের বাণী ছড়াতে লাগলেন। তাঁর বক্তৃতায় ইংরেজের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ এবং ঘৃণা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মতো প্রচন্ড বেগে বিচ্ছুরিত বিস্ফোরিত হতে লাগলো। স্বাধীনতাকামী তরুণেরা দলে দলে এসে সমবেত হতে লাগলো তাঁর চারপাশে। তাঁকে মধ্যমণি করে প্যারিসে রীতিমতো একটি বিপ্লবী-চক্র গড়ে উঠলো। প্যারিসে মাদাম কামাকে এরূপ দুর্বার সাহস ও তেজস্বিতার সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলন চালাতে দেখে ভারতে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী উদ্বিগ্ন ও অস্থির হয়ে উঠলো। তারা স্থির করলো, যেমন করে যেভাবেই হোক মাদাম কামার কণ্ঠরুদ্ধ করতেই হবে। তাদের চাপে পড়ে বৃটিশ গভর্নমেন্ট মাদাম কামাকে প্রত্যর্পণ করার দাবি জানিয়ে ফরাসী গভর্নমেন্টের কাছে চিঠি লিখলো, কিন্তু ফরাসী গভর্নমেন্ট বৃটিশের দাবি ঘৃণার সঙ্গে অগ্রাহ্য করলো। তা যদি না হত, ফরাসী গভর্নমেন্ট যদি সেদিন মাদাম কামাকে বৃটিশের হাতে সমর্পণ করতো, তা হলে বৃটিশ শাসকগোষ্ঠী মাদাম কামার জন্য যে ফাঁসিকাঠ তৈরি করে রেখেছিল তাতেই তাঁকে প্রাণ দিতে হত, অথবা বৃটিশ হয়তো তাঁকে গুলী করে হত্যা করতো।

এইভাবে প্রত্যাঘাত হয়ে বৃটিশ গভর্নমেন্ট তখন মাদাম কামার ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে আদেশ জারী করলো। মাদাম কামাও ছেড়ে দেবার পাত্রী নন, "বন্দে মাতরম্" নামে একখানি পত্রিকা বের করে সেই পত্রিকার মাধ্যমে তার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিলেন। ফরাসী গভর্নমেন্টকে যাতে এজন্য কোনরকম অসুবিধায় পড়তে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই তিনি জেনেভা থেকে এই পত্রিকা প্রকাশ করার ব্যবস্থা করলেন। জেনেভা থেকে প্রকাশিত হয়ে "বন্দে মাতরম্" যেন আগুন ছড়াতে লাগলো। ভারতের বৃটিশ শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যে তীব্র ঘৃণা ও বিদ্বেষ, খোলাখুলি যে প্রবল আক্রমণ চললো "বন্দে মাতরম্" পত্রিকার মাধ্যমে সে যুগে সেটা ছিল কল্পনার অতীত এবং একান্ত অবিশ্বাস্য। অতি অল্পদিনের মধ্যে "বন্দে মাতরম্" পত্রিকার খ্যাতি সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়লো।

আগেই বলেছি মাদাম কামার প্যারিসের বাসভবন বিপ্লবীদের মিলন-ক্ষেত্র পরিণত হয়েছিল, নানান দেশের খ্যাত-অখ্যাত বিপ্লবীরা এখানে এসে মিলিত হতেন। তাঁরা এই ক্ষীণজীবী ক্ষুদ্রকায়া অথচ আগুনের শিখার মতো দীপ্তিময়ী ভারতীয় মহিলার মধ্যে তেজ ও প্রতিভার, সাহস ও ত্যাগের এক আশ্চর্য সংমিশ্রণ লক্ষ্য করে বিস্ময়ে হতবাক হতেন। বিশ্বের সকল নির্যাতিত নিপীড়িত পরাধীন জাতির প্রতিটি মানুষের প্রতি তাঁর অপরিসীম দরদ, তাঁদের স্বাধীনতার জন্য তাঁর আন্তরিক আগ্রহ ও প্রচেষ্টা বিশ্বের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আশায় উজ্জ্বল এক নতুন আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছিল।

১৯০৭ খৃস্টাব্দের ১৮ই আগস্ট জার্মানীর স্টুটগার্ট শহরে হের সিঙ্গারের সভাপতিত্বে যে আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী সম্মেলনের অধিবেশন হয়েছিল মাদাম কামাই ভারতের পক্ষ থেকে সেই সম্মেলনে সর্বপ্রথম ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় এক হাজার প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন। বিখ্যাত ফরাসী সমাজতন্ত্রবাদী নেতা এবং স্টুটগার্ট সম্মেলনের অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা মঁসিয়ে জাঁ জরেস এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য মাদাম কামাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তিনিই মাদাম কামাকে বক্তৃতামঞ্চে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করিয়ে পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে বলেছিলেন, "ইনি ভারতবর্ষ থেকে আগত আমাদের একজন সমধর্মী প্রতিনিধি।" সমবেত প্রতিনিধিরা বিপুল হর্ষধ্বনি করে মাদাম কামাকে সেদিন যে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন জানিয়েছিলেন আমাদের জাতীয় স্বাধীনতার ইতিহাসে তা এক অবিস্মরণীয় ঘটনা।

মাদাম ভিকাইজি কামা সেদিন সেই বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে অগ্নিবর্ষী ভাষায় যে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়েছিলেন, ভারতে ইংরেজের শোষণ, লুণ্ঠন ও অত্যাচারের যে সত্য অথচ বীভৎস চিত্র তুলে ধরেছিলেন তাতে সভার লোক যেমন স্তম্ভিত এবং অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিল তেমনি বিস্ময়-বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে যেন পরাধীন ভারতের প্রতিচ্ছবি স্পষ্ট চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছিল। মাদাম কামা সেদিন তাঁদের কাছে প্রতিভাত হয়েছিলেন শৃঙ্খলিতা লাঞ্ছিতা পরাধীন ভারতের করুণ প্রতিমূর্তিরূপে। শ্রোতারা ঘন ঘন করতালি দিয়ে উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন জানালো তাঁকে। তাঁর সঙ্গে করমর্দন করার ব্যগ্র আগ্রহে তাদের মধ্যে ভিড় ও ঠেলাঠেলি শুরু হল।

মাদাম কামা সভাকক্ষের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে ব্যথিত অন্তরে দেখলেন, সব দেশের জাতীয় পতাকা উড়ছে সেখানে, নেই শুধু পরাধীন ভারতের কোনো

জাতীয় পতাকা। সমস্ত অন্তর তাঁর এক অব্যক্ত বেদনায় দলিত-মথিত হতে লাগলো, অশ্রুতে দু' চোখ ঝাপসা হয়ে এলো। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তিনি এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলেন মনে মনে. তারপর অস্ফুটকণ্ঠে বললেন, "না, না, এ হতে পারে না, আমি কিছুতেই এটা হতে দেব না। পৃথিবীর এক পঞ্চমাংশ অধিবাসীর মাতৃভূমি ভারতেরও জাতীয় পতাকা চাই। কিন্তু কোথায় পাবো, কে দেবে আমাকে সেই জাতীয় পতাকা? কে দিতে পারে?" হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হল তাঁর নিজের পরণের দামী শাড়িখানার দিকে, তাঁর মনের সংশয় মুহূর্তের মধ্যে কেটে গেল। তিনি বলে উঠলেন, পেয়েছি, এই তো পেয়েছি। এই আমার ভারতের জাতীয় পতাকা। তারপরেই নিজের পরা সেই শাড়িকাপড়খানার ভাঁজ খুলে ফেলে এক-টানে মুহূর্তের মধ্যে তার চওড়া আঁচলখানা ছিঁড়ে হাতে নিলেন। উঁচু করে তুলে ধরলেন সেখানা, বললেন: "এই আমার দুঃখিনী জন্মভূমি, আমার প্রিয় মাতৃভূমি ভারতের জাতীয় পতাকা। ভারতের স্বাধীনতার ধারক ও বাহক এই জাতীয় পতাকার প্রতি আপনারা সকলে দৃষ্টিপাত করুন। আজ তার জন্মদিন। স্বাধীনতাকামী ভারতীয় তরুণদের রক্তে এ পতাকা পূত এবং পবিত্র। পৃথিবীর যেখানে যে স্বাধীনতার পূজারী আছেন তাঁদের-সকলকে আমি আজ এই শুভদিনে আমাদের এই জাতীয় পতাকাকে অভিবাদন করার জন্য আহবান জানাই। তার সাথে সাথে ভারতবাসীদেরও—পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশ অধিবাসীদের—আপনারা অভিবাদন করুন।"

সেই আমাদের প্রথম জাতীয় পতাকা।

সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিগণ সকলে উঠে দাঁড়ালেন, নতমস্তকে অভিবাদন করলেন আমাদের জাতীয় পতাকাকে। তুমুল হর্ষধ্বনিতে সভাকক্ষ মুখরিত হল।

এর পরে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করে মাদাম কামা যে প্রস্তাব উত্থাপন করলেন বিস্ময়ের কথা এই যে, অন্যান্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৃটিশ প্রতিনিধিও সে প্রস্তাবের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানালেন। ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা দাবি করে মাদাম কামা দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন "ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসন ভারতের পক্ষে তথা স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর পক্ষে যারপর নাই ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক। ভারতবাসীরা—সমগ্র পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশ অধিবাসীরা—বৃটিশের শোষণ ও দাসত্বের নাগপাশ থেকে মুক্তি চায়। ভারতবাসীকে পরাধীন করে রাখা বৃটিশ গভর্নমেন্টের খুবই অন্যায় কাজ। আমার সামর্থ্য থাকলে আমি আজই সমস্ত ভারতবাসীকে এই বন্দীত্ব থেকে মুক্তি দিতাম।"

এই বিপ্লবিনী মহিলার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং প্রিয়তম মন্ত্র ছিল বন্দে মাতরম, তাই তিনি পত্রিকার নামও রেখেছিলেন "বন্দে মাতরম"। এই পত্রিকাখানি ছাড়া তিনি আরও একখানা পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। সে পত্রিকার নাম ছিল "অভিনব ভারত", বিপ্লবী বীরেন চট্টোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় এই কাগজখানি বের হত। "অভিনব ভারত"-এর মন্ত্র ছিল: "ভারতের স্বাধীনতা চাই। ভারতের ঐক্য চাই। ভারতের গণতন্ত্র চাই। ভারতের জাতীয় ভাষা এবং বর্ণলিপি চাই।"

এই স্বেচ্ছায় নির্বাসিতা বিপ্লবিনী নারীর জীবনে এই সময়ে আর একটি নতুন দিগন্ত দেখা দিল। তিনি রুশ বিপ্লবীদের ঘনিষ্ঠ সংস্রবে এলেন এবং তাদের মাধ্যমে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবদরদী এবং বিপ্লবী সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গোর্কীর সঙ্গেও তাঁর পরিচয় হল। গোর্কী ছিলেন বিশ্বপ্রেমিক—বিশ্বের যেখানেই যখন মানুষ অত্যাচারে অবিচারে পশুর মতো লাঞ্ছিত হয়েছে, পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ হয়ে আর্তনাদ করেছে গোর্কী তাদের বেদনা সমস্ত অন্তর দিয়ে অনুভব করে সাহিত্যে তা প্রাণবান করে ফুটিয়ে তুলেছেন। গোর্কীর চাইতে বড় সাহিত্যিকের হয়তো পৃথিবীতে অভাব নেই, কিন্তু তিনি যতখানি দরদ দিয়ে লাঞ্ছিত নিপীড়িত মানুষের কথা বলেছেন তেমন করে আর কোন সাহিত্যিক তাঁর আগে তা বলেন নি। শুধু তাই নয়, যুগ-যুগান্তকাল যারা অত্যাচার সয়ে এসেছে, প্রতিবাদ জানায় নি, প্রতিশোধ নেয় নি, মুখ বুজে নীরবে অত্যাচার সহ্য করাকেই যারা বিধিলিপি বলে মেনে এসেছে তাদের. তিনি অত্যাচারের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে শেখালেন, বিপ্লবের পথে পরিচালিত করলেন। তাই গোর্কীর "মাদার" শুধুমাত্র একখানি শ্রেষ্ঠ বই নয়, "মাদার" বিপ্লবীদের অগ্নিবেদ।

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের জগদ্দল পাথরের তলায় চাপা পড়ে পরাধীন ভারতের মানুষরা যখন মরিয়া হয়ে স্বাধীনতার সংগ্রাম শুরু করলো গোর্কী তাঁর অন্তরের সমস্ত দরদ ও সহানুভূতি দিয়ে ভারতের সেই স্বাধীনতা সংগ্রামকে বলিষ্ঠ সমর্থন ও স্বাগত অভিনন্দন জানালেন।

ভারতের প্রতি লিও টলস্টয়ের আন্তরিকতার কথা আজ কারুর অজানা নেই। বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে ভারতীয় সাহিত্যের ওপরে গোর্কীর বিপুল প্রভাবও আমরা লক্ষ্য করে আসছি। কিন্তু গোর্কী ব্যক্তিগতভাবে ভারত সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যে ভারতীয় বিপ্লবীদের সঙ্গে সরাসরি যে সংযোগ স্থাপন করেছিলেন এবং পরাধীন ভারতের সংগ্রাম তাঁকে যে কতখানি আগ্রহান্বিত করে তুলেছিল সে সম্পর্কে আমরা অনেকেই বিশেষ কিছু জানি না।

সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে ম্যাক্সিম গোর্কীর ভারত-প্রীতি সম্পর্কে যে প্রামাণ্য তথ্য ও দলিলপত্র আবিষ্কৃত হয়েছে তা পাঠ করে ভারতের তথা ভারতবাসীর প্রতি তাঁর আন্তরিক সহানুভূতির বহু উজ্জ্বল নিদর্শন পাই।

১৯১২ খৃস্টাব্দে ম্যাক্সিম গোর্কী বিপ্লবী শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা এবং মাদাম ভিকাইজী কামার সঙ্গে চিঠিপত্রের মাধ্যমে সর্বপ্রথম যোগাযোগ স্থাপন করেন। তাঁরা দুজনেই তখন পশ্চিম ইউরোপে ছিলেন, আর গোর্কী কাজ করতেন "সোভ্রেমেনুনিক" নামে একখানি সাময়িক পত্রে, সেই পত্রের তরফ থেকে তিনি তাঁদের সঙ্গে পত্রালাপ শুরু করেন।

ভারতের প্রাচীন ও সুমহৎ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি গোর্কীর অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল। ভারতের জনসাধারণের গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষার প্রতিও ছিল তাঁর পূর্ণ সমর্থন এবং আন্তরিক সহানুভূতি। তাই বিদেশী শাসকদের অন্যায় জুলুম, নির্মম শোষণ ও অত্যাচার-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে ভারতের জনগণ তখন যে সংগ্রাম করছিল সেই সংগ্রামের আনুপূর্বিক সব বিবরণ জানবার আগ্রহে এবং তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার উদ্দেশ্যে গোর্কীর যে বিপুল উৎসাহ লক্ষ্য করা যায় সেই উৎসাহই তাঁকে ভারতের প্রতিনিধিস্থানীয় এই দুজন বিপ্লবীর সঙ্গে পত্রালাপ করতে অনুপ্রাণিত করেছিল। এ সবের মূলে ছিল তাঁর ভারতের সাহিত্য এবং স্বাধীনতাকামী গণতান্ত্রিক সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলির ভূমিকা সম্পর্কে বেশি করে সংবাদ সংগ্রহ করা।

সম্প্রতি আবিষ্কৃত এইসব দলিলপত্র ও তথ্যাদি পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, ১৯১২ খৃস্টাব্দের ১৪ই অক্টোবর মাদাম ভিকাইজী কামা ম্যাক্সিম গোর্কীর প্রাইভেট সেক্রেটারীর কাছে ভারতের বিপ্লব আন্দোলন সম্পর্কে কিছু বইপত্র যে তিনি গোর্কীর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছেন একখানি চিঠি লিখে সে খবর জানিয়ে দেন। এই চিঠিখানি পড়ে একথা মনে করা ভুল হবে না যে, মাদাম কামার

সম্পাদিত পত্রিকার গ্রাহক হবার জন্য গোর্কী বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছিলেন, কিন্তু গোর্কীকে যে "বন্দে মাতরম" পত্রিকার গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত করা সম্ভবপর হয় নি মাদাম কামার লেখা চিঠির উত্তর থেকেই তা বেশ বোঝা যায়, কারণ তার এক জায়গায় তিনি লিখেছেন "মিঃ গোর্কীকে আমি আমার "বন্দে মাতরম" পত্রিকাখানি পাঠিয়ে যেতে পারলে যারপরনাই আনন্দিত হবো।"

ম্যাক্সিম গোর্কী ভারতীয় সাময়িক সংবাদপত্রগুলি থেকে যে সব খবরাখবর, মূল্যবান তথ্য এবং উপাদান সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন সেই সব তথ্য এবং উপাদানের ওপর ভিত্তি করে তিনি তাঁর "সোভ্রেমেন্নিক" পত্রিকায় যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন তাতে তিনি বৃটিশের ঊপনিবেশিক চরিত্রের মুখোস খুলে দিয়ে বিশ্বের সামনে তা তুলে ধরেছিলেন।

এর পরে "সোভ্রেমেন্নিক" পত্রিকায় লেখা পাঠাবার জন্যে মাদাম কামা ও শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মাকে গোর্কী অনুরোধ জানিয়েছিলেন। ১৯১২ খৃস্টাব্দের নভেম্বর মাসে তিনি "সোভ্রেমেন্নিক" পত্রিকার সম্পাদক ইভ্গেনী লায়াতাস্কিকে বলেছিলেন "ভারতের বর্তমান পরিস্থিতি এবং রাশিয়া ও বৃটেন সম্পর্কে ভারতের মনোভাব কি সে বিষয়ে আমাদের পত্রিকায় একটি প্রবন্ধ লেখার জন্যে আমি শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মাকে অনুরোধ করেছি। তা ছাড়া, শ্রীমতী কামাকেও আমি "বর্তমান ভারতে নারীর স্থান এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদের ভূমিকা" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখে পাঠাবার জন্যে চিঠি লিখছি।

জাতীয় স্বাধীনতা এবং ন্যায্য অধিকার ও সুবিচারের জন্য তখন ভারতে যে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল সেই সংগ্রাম সম্পর্কে রুশ গণতন্ত্রীদের সম্যক অবহিত করানোই ছিল গোর্কীর এ সব কাজের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য এবং এই কারণেই তিনি শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা এবং মাদাম ভিকাইজী কামার কাছে প্রবন্ধ লেখার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি লিখেছিলেন।

তিনি বলতেন : "ন্যায়ের জন্য যারা যুদ্ধ করছে, সুবিচার ও বিবেক-বোধের দ্বারা চালিত হয়ে যারা সাম্প্রতিককালের মধ্যে বেঁচে থাকতে চায়, বিশ্বের সকল অশুভকে চূড়ান্তভাবে পরাস্ত করার অদম্য শক্তি অর্জনের জন্য তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়া আজকের দিনে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন।" গোর্কী চেয়েছিলেন দুটি জাতি এই বোধ থেকেই পরস্পরকে ঘনিষ্ঠভাবে জানুক। মানবদরদী সাহিত্যিক ম্যাক্সিম গোর্কীর আন্তর্জাতিক এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁর এই রুশ-ভারত সম্পর্কের উন্নতির চিন্তায় স্পষ্ট প্রতিফলিত।

ম্যাক্সিম গোর্কীর বিখ্যাত কবিতা "ঝড়ো পাখীর গান"-এর বিষয়বস্তু জানবার জন্য মাদাম কামা যে অতিশয় ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন সে সম্পর্কে রুশ প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ সুপণ্ডিত মিখাইল প্যাভলোভিস তাঁর জীবনস্মৃতিতে লিখেছেন : "আমি যখন তাঁকে (মাদাম কামাকে) ম্যাক্সিম গোর্কী রচিত কবিতাটির কথা বললাম তিনি তখনই সেই কবিতাটি সংগ্রহ করে তাঁকে ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করে দেবার জন্য আমাকে অনুরোধ করলেন। এর কিছুদিন পরে আমি তাঁর সে অনুরোধ রক্ষা করতে পেরেছিলাম। আমার অক্ষম হাতে অনুবাদ করে কবিতাটি যখন তাঁকে দিলাম, আনন্দে তাঁর দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে এলো। তাঁর সেই অশ্রুপ্লাবিত সুন্দর মুখখানি আজো যেন আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। সে দৃশ্য আজো আমার মনে দিনের আলোর মতো উজ্জ্বল হয়ে আঁকা আছে। আনন্দে অভিভূত মাদাম কামা সেদিন আমাকে বলেছিলেন, "এই কবিতা যে কোন গুরু-গম্ভীর প্রবন্ধের চেয়ে অনেক ভালো।"

"সোভ্রেমেন্নিক" পত্রিকার সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য গোর্কী মাদাম কামাকে যে অনুরোধ করেছিলেন সেই চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন : "আপনি গঙ্গার তীরে বসবাসকারী মানুষদের জীবনধারণ এবং সংগ্রাম সম্পর্কে তথা সুমহান ভারতের গণতন্ত্রী নর এবং নারীজাতির বিষয়ে রুশ গণতন্ত্রী নর এবং নারীজাতিকে অবহিত করিয়েছেন এজন্য তারা আপনার নিকট কৃতজ্ঞ।"

গোর্কীর এই চিঠি পেয়ে মাদাম কামা তার জবাবে লিখলেন : "আমার সমুদয় শক্তি-সামর্থ্য এবং সম্পূর্ণ সময় আমাদের দেশের বিরাট আদর্শ অনুসরণ এবং মুক্তি সংগ্রামেই ব্যয়িত হচ্ছে।"

মাদাম কামা ম্যাক্সিম গোর্কীর কাছে যতগুলি চিঠি লিখেছিলেন প্রতিটি চিঠির শেষে তাঁর স্বাক্ষর রয়েছে "আপনার সহোদরা প্রতিম বি আর কামা।"

মাদাম কামা নাম স্বাক্ষর করে নিজের একখানা ফটো গোর্কীকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এই ফটো পাঠানোর মধ্য দিয়ে মাদাম কামার উজ্জ্বল হৃদয়ের তথা গোর্কীর প্রতি তাঁর বিরাট শ্রদ্ধা ও গভীর প্রীতির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁদের উভয়ের মধ্যেকার আত্মিক সৌহার্দ্যের এর চাইতে বড় নিদর্শন আর কী হতে পারে আমরা জানি না।

মাদাম কামার ১৯১৭ খৃস্টাব্দে গোর্কীর নিকট লেখা শেষ চিঠিখানি তিনি মিখাইল প্যাভলোভিসের মারফৎ পাঠিয়েছিলেন এবং রাশিয়ার পত্রিকায় তা প্রকাশ করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, সে চিঠি পথে হারিয়ে যাবার ফলে গোর্কীর হাতে গিয়ে তা আর পৌঁছয় নি।

এইভাবে রুশ বিপ্লবীদের সঙ্গে মাদাম কামার এই নিবিড় পরিচয় ও ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা তাঁকে সশস্ত্র বিপ্লবে যোগদানে প্রভাবিত করলো। প্রথম জীবনে যেমন তিনি একটা বিরাট আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে সমাজ-সেবার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন তেমনিভাবেই মাদাম কামা বোমা তৈরি শিক্ষা করার মতো সাংঘাতিক একটা কাজে ব্রতী হলেন। তিনি নিজেই যে শুধু অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা নিলেন, তাই নয়, ভারতের তরুণ বিপ্লবীদেরকে বোমা তৈরি করার প্রণালী শিখিয়ে দেবার জন্য তিনি রুশ বিপ্লবীদের অনুরোধও করে পাঠালেন এবং তার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় বিপ্লবীদের উদ্দেশ করে তিনি একখানি খোলা চিঠি লিখলেন, তাদের তিনি বিপ্লবের কণ্টকাকীর্ণ রুদ্র পথে বেরিয়ে আসবার জন্যে ডাক দিলেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে তিনি তাদের উদ্বুদ্ধ করে তুলতে প্রয়াসী হলেন। মাদাম কামার এই খোলা চিঠিখানি শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মার "ইণ্ডিয়ান সোসিওলজিস্ট" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।

মাদাম কামার এই চিঠির ফল অত্যন্ত সাংঘাতিক হল, দেশের পক্ষে এর পরিণতি হল অতিশয় করুণ এবং শোকাবহ। বাংলাদেশের অগ্নিশিশুরা বোমার খেলায় মেতে উঠলো। মুরারিপুকুর বাগান আজো আছে, কিন্তু বাংলাদেশের তরুণরা মিলে সেদিন সেখানে যে যজ্ঞের হোমশিখা জ্বালিয়ে তুলেছিল আজ তার কোনো চিহ্ন সেখানে কোথাও খুঁজে পাবার উপায় নেই। কোথায় হারিয়ে গেল সেদিনকার বীর শিশুরা—কানাইলাল আর সত্যেন, উল্লাস কর আর হেমচন্দ্র কানুনগো? ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে ক্ষুদিরাম জীবনের যে জয়গান গেয়ে গেলেন দেশের লোক হয়তো কালক্রমে একদিন তা ভুলে যেতেও পারতো, কিন্তু মাদাম কামার একটা বিরাট অসমসাহসিক কাজ ক্ষুদিরামের আত্মবলিদানের কথা দেশের লোককে ভুলতে দিল না।

মহাত্মা গান্ধীর চেলারা ক্ষুদিরাম, কানাইলালের জীবনদানের মতো বিরাট ব্যাপারকে তুচ্ছ করে দেখার একটা মনো-

ভাব দেখিয়েছে। এটা কিছু নতুন বা অপ্রত্যাশিত ব্যাপার নয়, কারণ আমরা আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করেছি যে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর মাহাত্ম্যকে সর্বদাই মাত্রাতিরিক্ত প্রাধান্য দিয়ে প্রচার করা হয়েছে একমাত্র তাঁর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন ও সত্যাগ্রহই ভারতের স্বাধীনতালাভ সম্ভব করেছে, ইংরেজকে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করেছে। এবং একথা প্রচার করার জন্য কংগ্রেস গভর্নমেন্ট প্রথম থেকেই অত্যন্ত বেশি সচেষ্ট ছিলেন। সর্বময় ক্ষমতা নিজেদের করায়ত্ত রাখার জন্য গান্ধীজীর এরূপ মাহাত্ম্য প্রচার তাঁরা অস্ত্র হিসাবে যথেষ্ট ব্যবহার করেছিল। তাইতো ১৯৪৭ খৃস্টাব্দে ১৫ই আগস্ট মধ্যরাত্রে যখন দিল্লীতে সারারাত ধরে উৎসব চললো, বড় বড় নেতারা উচ্ছ্বাসের সঙ্গে দেশের লোকের কাছে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী বিবৃত করলেন, তখন তাঁদের কারুর মুখ থেকেই তো উচ্চারিত হতে শুনলাম না ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লবীদের অপরিমেয় দান আছে আর অবদান জুগিয়েছেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু এবং তাঁদের সঙ্গে অপ্রত্যাশিতভাবে হাত মিলিয়েছিলেন ভারতের নৌ-সেনারা। বোম্বাইতে নৌ-বিদ্রোহ এবং পূর্ব ভারতে নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজের স্বাধীনতা অভিযান যুগপৎ ঘটেছিল এবং শেষ পর্যন্ত ইংরেজ এই কারণেই ভারত সাম্রাজ্য শাসনের লোভ ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে কারুর এই সত্য কথাটা বলার সাহস ছিল না সেদিন। কিন্তু সত্যকে চিরকাল চেপে রাখা যায় না। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহই যে ভারতের স্বাধীনতালাভের একমাত্র কারণ তা এখন অনেকেই আর জ্যামিতিক স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নিতে চায় না, তাদের মনে আজ এ সম্বন্ধে প্রশ্ন জেগেছে এবং যে সত্য এতদিন কংগ্রেস গভর্নমেন্টের অপপ্রচারের ফলে ছাইচাপা আগুনের মতো চাপা ছিল এখন ধীরে ধীরে তা আত্মপ্রকাশ করছে। এখন অনেকেই স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয় বিপ্লবীদের অবদানের কথা স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু, শুধু আজকেই নয়, সেদিন দেশের সাধারণ মানুষ স্বাধীনতার সৈনিক বলে ক্ষুদিরামের পূজা করেছিল, তাঁকে বীরের মর্যাদা দিয়েছিল, এক অজ্ঞাত কবি তাঁর নামে গান রচনা করেছিল, আজো আমরা সেই গান "বিদায় দে' মা ঘুরে আসি" বাংলার বাউল বৈরাগীদের গেয়ে বেড়াতে শুনি।

ভারতবর্ষে যে সময়ে ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয় ঠিক সেই সময়ে মাদাম ভিকাইজি কামা স্টাটগার্টের আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতের প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। দুটো ঘটনার মধ্যে কোন যোগ নেই, অথচ একটা অদ্ভুত পারম্পর্য লক্ষ্য করে বিস্মিত না হয়ে পারি না। প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে উঠে ভারতবাসীকে ডাক দিয়ে তিনি বলেছিলেন : "ওঠ, জাগো, দেশকে জাগাও, জাতির স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা কর। অত্যাচার অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ মানেই ভগবানের পূজা।"

১৯১৪ সাল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা হঠাৎ বেজে উঠলো। মাদাম কামার রাজনৈতিক কর্মচঞ্চলতাও বহুগুণে বেড়ে গেল। বৃটিশ গভর্নমেন্ট পুনরায় একবার ফরাসী গভর্নমেন্টকে অনুরোধ করলো মাদাম কামাকে তাদের হাতে প্রত্যর্পণ করার জন্যে, কিন্তু ফরাসী গভর্নমেন্ট সে অনুরোধ অগ্রাহ্য করলো এবং প্যারিসের উপকণ্ঠে একটা প্রাচীন দুর্গে যুদ্ধ শেষ না হওয়া অবধি মাদাম কামাকে আটকে রাখলো। তিনি সেখানে নিরাপদেই ছিলেন। যুদ্ধ শেষে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পরে মাদাম কামা সেই দুর্গ থেকে ছাড়া পেলেন। ছাড়া পেয়েই আবার তিনি কর্মসাগরে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটানোই ছিল তাঁর জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এবং সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে আমৃত্যু তিনি প্রায় একাকিনীই এই যুদ্ধ চালিয়ে গিয়েছেন। এই সময়ে রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ নেতা এবং মুক্তিদূত লেনিন রাশিয়া পরিদর্শনের জন্য মাদাম কামাকে বহুবার আমন্ত্রণ করেছিলেন। কিন্তু মাদাম কামার রাশিয়ায় যাবার আর সময় হল না, ভারতের স্বাধীনতার জন্য যে জীবন তিনি উৎসর্গ করেছিলেন সে জীবনে আর কিছু করার অবসর তাঁর হয় নি। এমনিভাবে যুদ্ধ করতে করতে ৩৫টা বছর তিনি ফ্রান্সে নির্বাসিত অবস্থায় কাটিয়ে দিলেন।

তারপর স্বাস্থ্য যখন ভেঙে পড়লো, মন যখন উদাসীন, সমস্ত কাজ থেকে অবসর নেবার আকাঙ্ক্ষা যখন প্রবল তখন তাঁর মন ভারতে নিজের মাতৃভূমিতে ফিরে যাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো। কিন্তু বৃটিশ গভর্নমেন্ট তাঁর ভারতে ফিরে যাবার পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালো, বললো, ফিরে গিয়ে রাজনৈতিক কাজে আর কখনো যোগ দেবেন না এরকম লিখিত প্রতিশ্রুতি না দিলে আমরা মাদাম কামাকে ভারতে ফিরে যাবার অনুমতি কিছুতেই দেব না।

তাহলে উপায়?

ভারতে কি আর ফিরে যাওয়া হবে না?

ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন মাদাম কামা নিজে আর তাঁকে যাঁরা ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন সেই সব হিতৈষী বন্ধু-বান্ধবরা।

উপায় একটা বের করতেই হবে।

আচ্ছা, মাদাম কামা যদি একটা লিখিত প্রতিশ্রুতি দেনই বা, তাতে ক্ষতি কী? বন্ধুরা ভেবে ঠিক করলেন, হ্যাঁ তাই হবে।

কিন্তু মাদাম কামা তাদের এ প্রস্তাবে কিছুতেই রাজী হলেন না প্রথমটায়, অবশেষে অনেক সাধ্যসাধনার পর তিনি স্বাক্ষর দিয়ে দিলেন লিখিত প্রতিশ্রুতিতে।

কিন্তু বৃটিশ গভর্নমেন্টের তখন এত সব করার কিছুই দরকার ছিল না। মাদাম কামা যে শেষবারের মতো ইউরোপের মাটি ত্যাগ করে চলে যাচ্ছেন এ কথাটা বোঝবার মতো অবস্থা হয়তো তাঁর নিজের ছিল না, কিন্তু বৃটিশ গভর্নমেন্ট তা ভালো করেই জানতো। তথাপি এই নীচতার পরিচয় না দিয়ে পারে নি।

জাহাজে করে যখন তিনি বোম্বাইতে এসে পৌঁছলেন তখন তাঁর আর পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার শক্তি নেই। স্ট্রেচারে বহন করে তাঁকে নামানো হল এবং তারপর একটা অ্যাম্বুলেন্স এসে তাঁকে নিয়ে গেল হাসপাতালে। মাদাম কামা আটমাসকাল হাসপাতালে রোগশয্যায় শায়িত থেকে, তারপর একদিন নিঃশব্দে সকলের অজ্ঞাতে লোকচক্ষুর অন্তরালে অনাদৃত অবজ্ঞাত অবস্থায় ৭৫ বছর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। কেউ জানলো না, কেউ একফোঁটা চোখের জল পর্যন্ত ফেললো না তাঁর জন্য। এ কেমন মৃত্যু? এরকম মৃত্যু যেন পৃথিবীতে কেউ কারুর জন্য কামনা না করে!

বিপ্লবিনী মাদাম কামার মৃত্যুসংবাদ পেয়ে অত্যন্ত ব্যথিতহৃদয়ে শোকবিহ্বল বীর সাভারকর বলেছিলেন—

"Madam Kama died unnoticed in Bombay amidst ungrateful surrounding."

প্যারিসে থাকতে থাকতেই নিজের মৃত্যু আসন্ন জেনে মাদাম কামা তাঁর স্মৃতিফলকে খোদাই করে রাখার জন্য যে কথাগুলি লিখে রেখে গিয়েছিলেন তাই থেকেই এই মহীয়সী এবং বিপ্লবিনী নারীর জীবনের আদর্শ, কর্মনীতি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট ধরা পড়ে—

"স্বাধীনতা যে হারায়
সে তার ধর্মও হারায়।
অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহই
ভগবানের পূজা।"

বেকারদের দিকে তাকান

রেনু ঘোষ

১৯৬৩-৬৪ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ডাইরেক্টরেট অব ন্যাশনাল এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিস রাজ্যের বেকার সংখ্যা সম্পর্কে যে নমুনা সমীক্ষা চালিয়েছিলেন, তারই ভিত্তিতে হিসাব করে দেখা গেছে যে, বর্তমানে এই রাজ্যে বেকারের সংখ্যা ১৭ লক্ষ। বেকার ক্ষেত-মজুরদের সংখ্যা এই হিসাবের মধ্যে ধরা হয় নি। কৃষিক্ষেত্রে বেকারের সংখ্যা নির্ণয়ের কোন বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা রাজ্য সরকার চালু করতে পারেন নি। ন্যাশনাল এমপ্লয়মেন্ট সার্ভিসে প্রস্তুত তালিকা অনুযায়ী বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে মোট বেকারের সংখ্যা ৪ লক্ষ ৪১ হাজার। এটা প্রকৃত বেকার সংখ্যার এক-চতুর্থাংশ মাত্র। বাকী তিন-চতুর্থাংশ বেকার নানা কারণে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে নাম লেখাতে পারেন নি। নাম লেখানো বেকারদের মধ্যে মেয়েদের সংখ্যাই ৩১ হাজার।

শুধু বাংলাদেশেই নয়, সারা ভারতেই আজ বেকারের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। ভারত সরকারের ডাইরেক্টর জেনারেল অফ এমপ্লয়মেন্ট এ্যান্ড ট্রেনিং তাঁদের সাম্প্রতিক রিপোর্টে জানিয়েছেন যে, দেশে, বিশেষ করে সংগঠিত শিল্পে চাকরি-বাকরির সংখ্যা ১৯৬৭-৬৮ সালে অনেক হ্রাস পেয়েছে। ১৯৬৬-৬৭ সালে চাকরি-বাকরির সংখ্যা হ্রাস পেয়েছিল ৪·৮ শতাংশ। আর ১৯৬৭-৬৮ সালে হ্রাস পেয়েছে ১৩·৬ শতাংশ। অথচ শেষোক্ত বছর কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা বেড়েছে ৫·৬ শতাংশ। তার মধ্যে ম্যাট্রিকুলেট ১০·২ শতাংশ, আন্ডার গ্রাজুয়েট ২২·৬ শতাংশ এবং গ্রাজুয়েট ৩১·৩ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৬৭-৬৮ সালে অর্থনীতির সুসংগঠিত সেক্টরে চাকরিজীবীর সংখ্যা ছিল ১ কোটি ৬০ লক্ষ। অর্থাৎ চাকরিজীবীর সংখ্যা আগেকার বছরের তুলনায় বিশেষ বাড়ে নি। এই বছর শিল্পোৎপাদন ১·৪ শতাংশ হ্রাস পেলেও জাতীয় আয় ৯·১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিই জাতীয় আয় বৃদ্ধির প্রধান কারণ।

সব চেয়ে মজার কথা, এই বছর পশ্চিম, উত্তর এবং মধ্য ভারতে চাকরি-বাকরির সংখ্যা সামান্য কিছু বৃদ্ধি পেলেও পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতে চাকরি-বাকরির সংখ্যা ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। পূর্বাঞ্চলে ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে ব্যাপক মন্দার ফলে এই অঞ্চলে চাকরির ক্ষেত্রেও গুরুতর মন্দা দেখা দিয়েছে বলে সরকারী মহলের ধারণা।

এবার আসুন শিক্ষিত বেকারের তথ্যে। ভারতে চাকরির সংখ্যা বাড়ছে গড়ে বার্ষিক ৯ শতাংশ হারে। তা সত্ত্বেও সেকেন্ডারী স্কুল উত্তীর্ণ ৯৫ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রীই বেকার থাকতে বাধ্য হয়। শিক্ষিত বেকারের ৪০ শতাংশ আর্টস গ্রাজুয়েট, সাড়ে ১৭ শতাংশ বিজ্ঞানে গ্রাজুয়েট, ৮·২ শতাংশ কমার্স গ্রাজুয়েট এবং ৭·২ শতাংশ আইনে গ্রাজুয়েট। বাকীরা পোস্ট গ্রাজুয়েট। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে দেশে টেকনিক্যাল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং গ্রাজুয়েট সহ শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ছিল ১৫ লক্ষ। ১৯৭০ সালের মধ্যে সেই সংখ্যা ১৭ লক্ষ হবে বলে অনুমান করা যাচ্ছে।

বর্তমানে ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে বেকার সমস্যা এত তীব্র হয়ে উঠেছে যে, বহু ইঞ্জিনিয়ার চায়ের দোকান খুলে অথবা অফিস কেরানীগিরি করে জীবিকা নির্বাহ করতে বাধ্য হচ্ছেন। দঃ পূঃ রেলওয়ে তাঁদের কিছু বাড়তি ইঞ্জিনিয়ারকে সহকারী স্টেশন মাস্টারের চাকরি দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

অবশ্য তথ্য দিয়ে বেকার সমস্যার ভয়াবহতা বোঝাবার প্রচেষ্টা নিতান্তই হাস্যকর। বাংলাদেশের যে কোন পরিবারে খোঁজ নিলেই দেখা যাবে, সেখানে নানা বয়সের দুই-চারজন বেকার নরনারী চাকরির সন্ধানে জুতোর শুকতলা ক্ষয়ে মনমরা হয়ে মাসের পর মাস কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। কিন্তু চাকরি যোগাড় করতে পারছেন না। তার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম জীবনযাত্রার মান হ্রাস। স্বাধীনতার পর প্রথম দুটি পাঁচসালা পরিকল্পনার আমলে যে হারে চাকরি-বাকরির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছিল তাতে জীবনযাত্রার মান কিছুটা ঊর্ধ্বগামী হচ্ছিল, কিন্তু এখন সেটা পুনরায় নিম্নাভিমুখী। বেকাররা আত্মনির্ভরশীল হবার সুযোগ না পেয়ে রোজগেরে লোকের বাঁধা আয়ের ওপর নির্ভর করছেন। তাতে রোজগেরে লোকের ত্রাহি-ত্রাহি অবস্থা। ফলে দেশের মধ্যে একটা দম বন্ধ করা হতাশার ভাব দেখা দিয়েছে এবং শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকট হয়ে উঠছে। এই অবস্থা বেশিদিন চলতে দিলে আমাদের সমাজজীবনে যে নিদারুণ বিপর্যয় ঘনিয়ে উঠবে সে কথা বলাই বাহুল্য।

সম্প্রতি তথ্যাভিজ্ঞ মহল ভারতে বেকার সমস্যার ইতিহাস এবং বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে যে গবেষণা করেছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে, আমাদের জাতীয় আয়ের ১৪।১৫ শতাংশ উন্নয়নমূলক কাজে পুনর্লগ্নী হওয়া সত্ত্বেও দেশের অর্থনীতি take-off stage-এ (অর্থাৎ যৌবনে) পদার্পণ করতে সক্ষম হচ্ছে না।

অনগ্রসর দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সেখানকার অর্থনৈতিক কাঠামোয় রূপান্তর ঘটায়। সেখানে আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যের গুরুত্ব বাড়তে থাকে এবং গতানুগতিক সেক্টরের গুরুত্ব সমভাবে হ্রাস পেতে থাকে। কৃষক ও ক্ষেত-মজুরের সংখ্যা কমে গিয়ে শিল্প-শ্রমিকের সংখ্যা বাড়তে আরম্ভ করে এবং তার ফলেই মাথাপিছু আয় বেড়ে যায়। এটাই হচ্ছে সাধারণ নিয়ম। ১৮৮০ সালে আমেরিকায় কৃষক ও ক্ষেতমজুরের সংখ্যা ছিল মোট শ্রমজীবীর অর্ধেক। কিন্তু ১৯৩০ সালে কৃষক ও ক্ষেত-মজুরের সংখ্যা মোট শ্রমজীবীর ৩০ শতাংশে এসে দাঁড়ায়। ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড এবং পাকিস্তানের ক্ষেত্রেও এই একই চিত্র পরিলক্ষিত হয়েছে। ঐ দেশগুলো যতই অর্থনৈতিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে গেছে, ততই তাদের কৃষক ও ক্ষেতমজুরের সংখ্যার হার হ্রাস পেয়েছে। ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিপ্রকৃতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই একই নীতি প্রযোজ্য।

ভারতের প্রাপ্তব্য তথ্যাবলীর হিসাবে

দেখা যাচ্ছে, এদেশে ১৯২১ এবং ১৯৫১ সালের মধ্যে কৃষিক্ষেত্রে শ্রমজীবীর হার অতি সামান্যই (৭৬ শতাংশ থেকে ৭২ শতাংশ) হ্রাস পেয়েছে। এর দ্বারা এটাই বোঝা যাচ্ছে যে, আমাদের অর্থনৈতিক কাঠামোর বিশেষ কোন রূপান্তর হয় নি।

ভারতে আধুনিক শিল্পযুগের সূচনা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি। তখন থেকেই পাটকল এবং সুতাকলগুলোর আবির্ভাব ঘটতে আরম্ভ করে। কিন্তু অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক কারণে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতির গতি ছিল অত্যন্ত শ্লথ এবং উত্থানশক্তিরহিত। জনসংখ্যা যে-হারে বাড়ছিল, তার সঙ্গে দেশের অর্থনীতি কোন রকমে তাল রেখে চলছিল। ফলে অর্থনৈতিক কাঠামোর বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ১৯২১ সাল পর্যন্ত কৃষির ওপর নির্ভরশীলতাও বেড়েছে। ১৯৫০-৫১ থেকে পরবর্তী দশ বছর গড়ে ৪ শতাংশ হারে আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতি ঘটেছে। জাতীয় আয় বেড়েছে মোট ৪২ শতাংশ। জাতীয় আয়ের এই সামান্য বৃদ্ধি আমাদের গড়ে-ওঠা উৎপাদনী ক্ষমতার প্রকৃত চিত্র উদ্ঘাটন করতে পারে নি। জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধেক আসে কৃষি এবং তৎসংশ্লিষ্ট সেক্টর থেকে। সেই কৃষিক্ষেত্রে জাতীয় আয় বেড়েছে এক-তৃতীয়াংশ। অপর দিকে সংগঠিত শিল্পের ক্ষেত্রে আয় প্রায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। কিন্তু তাতে কৃষিজীবীর সংখ্যা হ্রাস পেয়ে কল-কারখানায় শ্রমজীবীর সংখ্যা বাড়ে নি।

উৎপাদন শিল্পে (manufacturing Industry) শ্রমিক নিয়োগের হার যথেষ্ট কম। তাতে প্রমাণ হচ্ছে যে, বিভিন্ন পরিকল্পনায় চাকরির সংখ্যা বাড়লেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় চাকরির হার বিশেষ বাড়ে নি এবং শহরের শিল্পক্ষেত্রে গ্রামের ক্ষেতমজুরেরা বিশেষ কাজকর্ম যোগাড় করতে পারে নি। তার প্রধান কারণ ভারতে শিল্পোন্নয়নের গতি তুলনায় অনেক শ্লথ। দ্বিতীয়ত আমাদের পরিকল্পনায় ভারী শিল্পের ওপর বেশি গুরুত্ব থাকায় চাকরি-বাকরির সুযোগ যথেষ্ট পরিমাণে সম্প্রসারিত হতে পারে নি। এশিয়ার অধিকাংশ অনগ্রসর দেশে ভোগ্যপণ্য শিল্পই শিল্পোন্নয়নের প্রধান চালিকাশক্তি। কিন্তু নিজস্ব প্রয়োজনে ভারতে ভারী শিল্পের ওপর বেশি প্রাধান্য আরোপ করা হয়েছিল। ভারী শিল্পে মূলধন লাগে অনেক, কিন্তু সেই তুলনায় চাকরি-বাকরির সৃষ্টি হয় অনেক কম। তৃতীয় পরিকল্পনা শেষে ভারতে বকেয়া বেকারের (আধা বেকার সহ) সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১ কোটি। পঞ্চম পরিকল্পনার শেষে সেই সংখ্যা ২ কোটিতে গিয়ে পৌঁছতে পারে।

প্রতি বছর জাতীয় আয়ের ১৪।১৫ শতাংশ অর্থনৈতিক উন্নয়নে লগ্নী হওয়া সত্ত্বেও আমরা যে বেকারদের কাজ দিতে পারছি না, তার কারণ লগ্নীর একটা বড় অংশই আমাদের ভোগে লেগে যাচ্ছে এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার তাল রাখতে পারছে না।

এই গুরুতর বেকার সমস্যার দিকে সম্প্রতি পরিকল্পনা কমিশনের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে। তাঁরা কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলোকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, তাঁরা যেন চতুর্থ পরিকল্পনার কার্যক্রমকে যথাসম্ভব চাকরি-প্রধান করে তোলেন। অর্থাৎ এমন সব প্রকল্প রচনা করেন যাতে প্রচুর লোকের চাকরি-বাকরি এবং কাজ-কর্মের সংস্থান হয়। পরিকল্পনা কমিশনের সেক্রেটারী এক পত্রে সংশ্লিষ্ট সকলকে জানিয়েছেন যে, উৎপাদনী নিয়োগের (productive employment) হার অনেক সময় অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার থেকে যথেষ্ট পেছনে পড়ে যায়। সুতরাং এমন সব উন্নয়নমূলক কাজে হাত দেওয়া উচিত, যাতে প্রচুর লোক নিয়োগের দ্বার উন্মুক্ত হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করবার জন্য এবং সামাজিক ন্যায় বিচারের সম্প্রসারণের জন্য এই রকম ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন আছে। বিভিন্ন প্রকল্পের মূল লক্ষ্য বিসর্জন না দিয়ে কি করে সেগুলোকে নিয়োগ-প্রধান করে তোলা যায়, সেটা পরীক্ষা করে দেখবার জন্য পরিকল্পনা কমিশন সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

এই প্রসঙ্গে পরিকল্পনা কমিশন মাঝারী এবং ক্ষুদ্র শিল্প সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। কমিশন বলেছেন যে, ক্ষুদ্র ও মাঝারী শিল্পে সময়মত ন্যায্য মূল্যে যথেষ্ট পরিমাণ কাঁচা মাল সরবরাহ করা দরকার এবং সরকারী শিল্পক্ষেত্রে পরিপূরক শিল্প গড়ে তোলা উচিত। বৃহৎ শিল্পের তুলনায় ক্ষুদ্র, মাঝারী এবং ভোগ্যপণ্যের শিল্পে অধিক হারে লোক নিয়োগের সুযোগ অনেক বেশি। কিন্তু এতকাল বৃহৎ শিল্পপতিদের বৃহত্তর মুনাফার প্রয়োজনে ক্ষুদ্র শিল্পের প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয়েছে। ব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য লগ্নী সংস্থার সমস্ত টাকা মেরে নিয়েছেন বৃহৎ শিল্পপতিরা। কাঁচা মালের সিংহভাগও পেয়েছেন তাঁরাই। পশ্চিমবঙ্গের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে আজ যে মন্দা দেখা দিয়েছে, তারও মূলে আছে কাঁচা মাল বণ্টনের অব্যবস্থা। প্রয়োজনীয় ঋণ এবং কাঁচা মালের অভাবেই এই রাজ্যের ছোট এবং মাঝারী শিল্পের অবস্থা মুমূর্ষু হয়ে উঠেছে। সেটা এই রাজ্যের বেকার সমস্যাকে কত তীব্রতর করেছে, তা সহজেই অনুমেয়। যাই হোক, বিলম্বে হলেও পরিকল্পনা কমিশন যে শেষ পর্যন্ত ছোট ও মাঝারী শিল্পের গুরুত্ব উপলব্ধি করছেন, সেটা সুলক্ষণ। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৪টি বড় বড় ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করে তার সম্পদ দেশোন্নয়নমূলক কাজে লগ্নী করবার কথা ঘোষণা করেছেন। যদি সত্যিই তাই করা হয়, তাহলে ছোট এবং মাঝারী শিল্পের পক্ষে ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ পাওয়া হয়ত আর কঠিন হবে না। সে ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেদের প্রয়োজনমত কারবার সম্প্রসারণ করবার সুযোগ পাবেন। তাতে বহু লোকের চাকরি-বাকরির দুয়ার খুলে যেতে পারে। এতকাল ব্যাঙ্কের সম্পদ নিয়ে মুষ্টিমেয় ধনী যে ফাটকাবাজী করতেন, সেটা বন্ধ হলেই ফলপ্রসূ শিল্প-বাণিজ্যে লগ্নীর অভাব হবে বলে মনে হয় না।

প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা অর্থনৈতিক সংস্কারের পথে এক বৃহৎ পদক্ষেপ করেছেন। তাতে আশু বেকার সমস্যা সমাধানের বিশেষ সম্ভাবনা নেই ঠিকই, তবে তিনি যদি দেশের অর্থনীতিকে একচেটিয়া কারবারীদের হাত থেকে ছিনিয়ে এনে দেশের বৃহত্তর মঙ্গলের সুস্থ ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে পারেন তাহলে বেকার সমস্যা সমাধানের পথ যে প্রশস্ত হবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে বেকার সমস্যা সমাধানের পথ সর্বাগ্রে খুঁজে নিতে হবে। সত্যিকারের কর্মপ্রার্থী যদি কাজ না পেয়ে চুপচাপ বসে থাকতে বাধ্য হয়, তাহলে ভবিষ্যতের সুদিনের দিকে আঙুল দেখিয়ে তার বিদ্রোহকে প্রতিরোধ করা যাবে না।

মাসিক ১০, টাকার কিস্তিতে লাভ করুন
অল ওয়ার্ল্ড স্ট্যাণ্ডার্ড ট্রানজিস্টর (জাপান মেক) জনপ্রিয় মূল্য ৩০০, দেশব্যাপী খ্যাতি আছে। ডবল
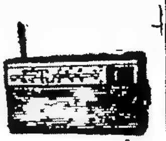
স্পীকার ৩ ব্যাণ্ড, ৮ ট্রানজিস্টর। নাইট-ল্যাম্প ফিট করা। কেবল ইংরেজী বা হিন্দিতে যোগাযোগ করুন।
Allied Trading Agencies
(B.C.) P.B. 2123, Delhi-7.

[পূর্বানুবৃত্তি]

ছেলেদের ফেলে যাওয়া অর্ধভুক্ত তিনটে পাতের সামনে আনন্দময়ী আর বসে থাকতে পারল না। উঠে গেল। মুখ দিয়ে আর একটি কথাও বার হলো না। ভাঙা মন আর ভাঙা দেহটাকে যেন কোন রকমে টেনে নিয়ে গিয়ে বিছানার আশ্রয়ে ছেড়ে দিলে।

কিছুক্ষণ আগের কলরব-মুখরতা একেবারে নিস্তব্ধ। বাইরের ঝোপ-ঝাড় বন-বাদাড় নিবিড় নীরবতা সারা বাড়ি ভরে যেন চেপে বসল। গ্রাম দেশ—রাত হয়েছে। কোথায় কতকগুলো ঝিঁঝির ঐকতান বাড়িটার আনাচে-কানাচে প্রবল হয়ে উঠল। চারদিকের স্তব্ধ নিবিড় অন্ধকার বৈঠকখানার উজ্জ্বল টেবিল ল্যাম্পের আলোটাকে ঘন বিদ্রূপ করতে লাগল।

আলোর সামনে স্তব্ধ হয়ে বসে আছে জগৎ ডাক্তার।

শুধু ছটফট করছে সানো চৌধুরী। ভেতরে—বাইরে। তার দম যেন আটকে আসছে এ বাড়ির হঠাৎ থমথমে এই শীতল স্তব্ধতায়। কেমন একটা চাপা উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে মুখ চোখ। হঠাৎ এক সময়ে ডাক্তারের সামনে এসে বলে উঠল, "আমি যাই ডাক্তার।"—বলে ঝড়ের বেগে সামনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

মাধবী কোথায় কে জানে। ডাক্তার বসে রইল একা। শূন্য চোখ—অন্যমনস্ক।

সামনের দেওয়ালে টাঙানো ভারতবর্ষের বড় একটা মানচিত্র। নিবারণ চলে যাওয়ার পর ডাক্তার ওটা কিনে এনে টাঙিয়ে দিয়েছিল দেওয়ালে। মানচিত্রের ওপরে টাঙানো নিবারণের একটা ছবি। দুটোতেই মালা ঝোলানো। কবে কি অনুষ্ঠান উপলক্ষে ওই ছবি আর মানচিত্রে মালা ঝুলিয়েছিল মাধবী, বিমল আর তার বন্ধুরা।

ডাক্তার স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে রইল মানচিত্রটার দিকে—ভারতের পূর্ব সীমানা যেখানে শেষ হয়ে গেছে হুগলী নদীর মোহনায়—জালপাই জঙ্গলের একান্তে। তারপর বঙ্গোপসাগর...আরও দূরে... আরও দূরে...ভারত মহাসাগরের বুকে কালো কালো কটা ফোঁটা। আন্দামান। সেখানেও এখন রাত্রি...এমনি শব্দহীন, ঠাণ্ডা, স্যাঁৎসেঁতে। লম্বায় চওড়ায় সীমিত ছোট একটা সেল—অপরিচ্ছন্ন, অন্ধকার। ভারী তালা হয়তো ঝুলছে দরজায়। তার ভেতর এখন কেউ কি জেগে আছে? ছটফট করছে অস্বস্তিতে? চারিদিকের পরিব্যাপ্ত ওই সুনীল সমুদ্রের একান্তে, সেই বালিয়াড়ির আশেপাশে বাদামগাছের হাতছানি, দক্ষিণ সমুদ্রের হাওয়ায় আন্দোলিত জালপাই জঙ্গলের কোল ঘেঁষে সবুজ আবাদের একটা দেশ...একটা গ্রাম ...একটা বাড়ির জন্য মন তার ছটফট করছে না!...

হাসছে—ছবিতে ছেলেটা হাসছে। সেই লোকবিরল আরণ্যক দ্বীপে, সেই অন্ধকার সেলে বসে বসে হয়তো সে এখনও হাসছে। যেমন করে বিমল হাসছিল থানায় যাওয়ার আগে, যেমন করে তার সেই দুই বন্ধু পবিত্র আর কমল হাসভরা মুখে বিদায় নিয়ে গেছে।

মনে পড়ে যায় এক কালবৈশাখীর বিকেলের কথা। কোথায় যেন রোগী দেখতে গিয়েছিল—ফেরার পথে পড়ে গেল ঝড়ের মুখে। দেখতে দেখতে সারা আকাশ কালো করে দিনের আলোর সব চিহ্ন মুছে গেল। সন্ত্রস্ত পোষ-পাখালি আর্তনাদ করতে করতে পালাতে লাগল নিরাপদ আশ্রয়ে। মাঠের গরু-বাছুর ছাগল ছুটতে লাগল ঘরের দিকে। ধুলোর চারিদিক ঘোরঘুট্টি করে—গাছ-গাছালি আছাড়ি-পিছাড়ি করে শুরু হয়ে গেল খ্যাপা ঝড়ের দাপাদাপি। দেখতে দেখতে কার ঘরের যেন একটা চালা উড়ে চলে গেল। গাছতলায় দাঁড়িয়ে একটা ছেলের সে-কী খলখল হাসি। ঝড়ের মুখে সেই খলখল হাসি সে যেন এখনও কানে লেগে আছে।

তেমনি করে হাসছে ওরা। নিবারণ ...বিমল...পবিত্র।...ঝড়ের মুখে ঘরের আলো নিভে গেল। ছক-কাটা জীবন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। বোনেদের ভেজা চোখ উজ্জ্বল বিস্ময়, মায়েরা কাঁদে, বাপেদের মুখ গম্ভীর। ওরা হাসছে সেই ছেলেটার মত:

"হাই দেখ—চালাটা ঝাপটে উড়ে চলে গেল। হাঃ—হা—হা!..."

ছেঁড়া চালার খড়কুটো, ঝরাপাতা আর সবুজ ছেঁড়াপাতা—ঝড়ের ঝাপটে সব যেন পাক খেয়ে ঘুরছে।

* *

পরের দিন ভোর না হতে হতে বড় শরিকের দেউড়িতে হাউমাউ করে আছড়ে পড়ল যাদব শীট—চৌকিদার মাধব শীটের দাদা।

ছুটে এল গোমস্তা বক্সি।

"হলো কি—এ্যাঁ!"

"মোর সর্বনাশ হয়ে গেছে বাবু গো।" যাদব শীট ডুকরে উঠল।

"তা কি সর্বনাশ হলো বলবি তো।"

"হেই সেদিন দু' মোট কাপড় নিয়ে গেলম। সামনে নবান্ন। কেচে দিয়ে যাব দু'চার দিনের মধ্যে।"

'তো কি হলো?"

"সব পুড়ে গেল।"

"পুড়ে গেল!—সব?"

"একরত্তি ট্যানাও নাই গো বাবু। মোর ঘর পর্যন্ত পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।"—যাদব কাঁদতে লাগল।

বড় শরিকের চাকরান ধোপা—তিন পুরুষ ধরে কাপড় কাচে আর চাকরান দেওয়া জমি চষে। পাল-পার্বণের আগে একটু বেশি কাপড়ই পড়ে থাকে। এবারও পড়েছিল। সামনে নবান্ন। বড় শরিক সে পার্বণ করে গ্রাম ডেকে, ধুমধাম করে। তার আগে অলক্ষুণে অগ্নিকাণ্ড ঘটে গেল।

নায়েব হরিহর জিজ্ঞেস করলে, "আগুন লাগল কি করে?"

যাদব বললে, "ঘোর রাত্তিরে কারা এসে লাগিযে দিলে বাবু। ঘুমিয়ে ছিলম—দেখি নি। পুড়ে মরে যেতম গুষ্ঠি-সুদ্ধ—ভগমানের দয়ায় বেঁচে গেছি কত্তা।"

হরিহর নায়েব চোখ পাকিয়ে বললে, "এ যে তোর নিজের ভাঁটির আগুন গিয়ে লাগে নি—তার কি প্রমাণ আছে?"

"মোর ভাঁটির আগুন থাকবে কি করে কত্তা!"—যাদব শীট চোখের জল মুছে বললে, "সে আজ দু'দিন হলো নিভে আছে। এ মোর ভাঁটির আগুন লয়—স্বচক্ষে দেখবে চল—হেই খানিক দূরে একটা কেরাসিন তেলের বোতল পড়ে আছে। এক আঁটি খড়ও পড়ে আছে বোতলের পাশে।"

কথাটা মিথ্যে নয়। সরেজমিন তদন্ত করে নায়েব গোমস্তার দল গিয়ে দেখে এল—শুধু কেরোসিন তেলের বোতল আর খড়ের আঁটি নয় দেশলাই কাঠি পর্যন্ত ছড়ানো। বোধ করি কারুর হাত ফসকে অসাবধানে পড়ে গিয়ে থাকবে। সব সাক্ষী-প্রমাণ পড়ে আছে একটা ঝোপের আড়ালে।

আশপাশে পাড়া-পড়শী নেই—গ্রামের এক প্রান্তে চৌধুরীদের এক দীঘির পাড়ে যাদব শীটের ধোপার পাট। সেই দীঘির পাড়েই তার কুঁড়ে। লোকালয়ের ঘন বসতি থেকে একেবারে সম্বন্ধহীন।

তবু হরিহর ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলে, "বলি কারুর সঙ্গে হালে তোর ঝগড়া-ঝাঁটি হয়েছিল?"

যাদব ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, "জিজ্ঞেস কর বাবু—নিজেই জিজ্ঞেস করে দেখ. কার সঙ্গে মোর ঝগড়া-ঝাঁটি হয়েছে। হেই তেপান্তরে কে আসবে মোর সঙ্গে ঝগড়া করতে বাবু?"

কৌতূহলে গাঁয়ের লোক জুটে গেছে ঢের। তারা ঝগড়া-বিবাদের কোনো খবর কেউ দিলে না।

হরিহর বললে, "তবে!"

"মোর কপাল নায়েববাবু গো।" বলে যাদব আবার ডুকরে উঠল। বললে, "ঝগড়া করব কি বাবু—গলা ফাটিয়ে ডেকে মরেছি, কেউ একটা সাড়া দেয় নি—কি এক কলসী জল নিয়ে ছুটে আসে নি।"

গাঁয়ের মানুষেরা কলরব করে উঠল।

"মোরা শুনবো কি দেখব—তবে তো ছুটে আসব!"

"হেই একেবারে ভোরবেলা শুনলম—সব পুড়ে গেছে।"

"আমিই কি জানতে পারতম গো!" যাদব কাঁপা কাঁপা গলায় বললে, ফট্‌ফাট বাঁশ ফেটে উঠতেই ঘুম ভেঙে গেল। তারপর বৌ-বেটা-বেটির হাত ধরে টেনে হেঁচড়ে কোনরকমে প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে এসেছি ঘর থেকে। হাই দেখ—সেই থেকে মোর বৌ-বেটা-বেটি বসে আছে গাছ-তলায়।"

অদূরে একটা গাছের তলায় যাদবের বৌ বসে আছে তার কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে। ওদের চোখে-মুখে তখনো লেগে আছে আকস্মিক দুর্ঘটনার সন্ত্রস্ত কালো ছায়া।

সব দেখে শুনে হরিহর নায়েব তার গোমস্তা বক্সীদের দিকে চেয়ে গলা নামিয়ে বললে, "ব্যাপারটা কিছু বুঝলে?"

তারা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল নায়েবের দিকে।

হরিহর তেমনি চাপা গলায় বললে, "আমার সন্দেহ হচ্ছে—এ সেই ভলান্টিয়াররা।"

একজন গোমস্তা বললে, "ভলান্টিয়াররা আগুন লাগাবে?"

আর একজন গোমস্তা বললে, "এমন ব্যাপার তো ওরা আর কোথাও করে নি। কোথাও শুনি নি।"

হরিহর বিরক্ত হয়ে বললে, "এখানে করার যথেষ্ট কারণ আছে।"

হরিহরের মেজাজ বুঝে গোমস্তারা আর কোনো মন্তব্য করলে না।

হরিহর বললে, "কাল ওরা মিছিল নিয়ে বিলেতী কাপড় চাইতে গিয়েছিল—মনে আছে?"

একজন গোমস্তা বললে, "তা গিয়েছিল বটে।"

"দেউড়ি থেকে লগ্‌দীরা ভাগিয়ে দিলে।" হরিহর বলল, "আমার মনে হয়—সেই রাগে রাগে যাদবের ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। আমাদের যত কাপড়—সব একসঙ্গে পুড়ে ছাই করে দিলে।"

"তা হলে তারা খবর পেয়েছে—চৌধুরীবাড়ির কাপড় কে কাচে?"

"জ্ঞাতি শত্রু।" হরিহর চোখ নাচিয়ে বললে, খবর যোগাড় করা এমন কিছু শক্ত নয়। ঠিক আছে—আমিও দেখছি।" যাদবকে বললে, "চল থানায়—ডায়রি দিবি।"

যাদব ঝপ্‌ করে হরিহরের পা চেপে ধরে বললে; "যাব নায়েববাবু। মোর চাকরান জমিটুকু যেন না কাটা যায় দেখবেন।"

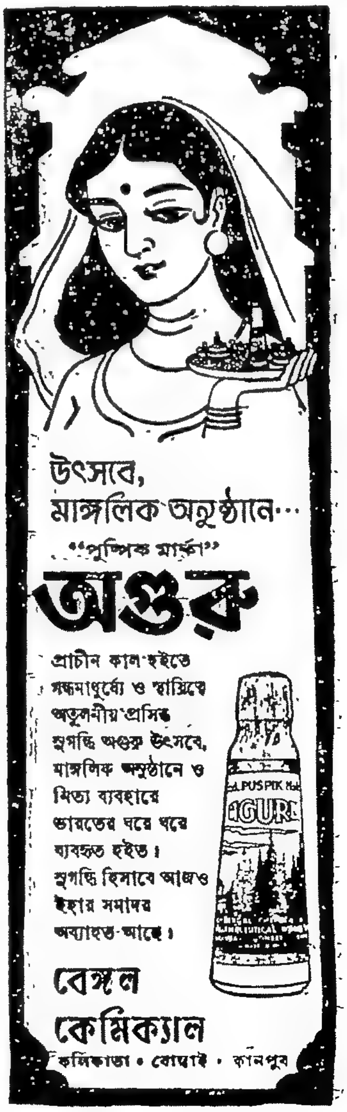

"সে হবে। আগে চল থানায়।"—

যাওয়ার পথে হরিহর যাদবকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নিয়ে গেল। বললে, "যদি দারোগা জিজ্ঞেস করে—কাকে সন্দেহ হয়, কি বলবি?"

"কার নাম করব—বলছেন?"

"নাম করার করতে হবে না—বলবি, ভলান্টিয়ারদের সন্দেহ হয়।"

"কিন্তু আমি তো কারোকে দেখি নি।"

"নাই বা দেখলি। শুধু বলবি—সন্দেহ হয়।"

হরিহর বললে, "বাকি যা বোঝাবার আমি বুঝিয়ে দেবো।"

বুঝিয়ে দিলে। থানায় গিয়ে হরিহর সেই বিলেতী কাপড় সংগ্রহের মিছিল ও তার পরের সব ঘটনার বিবরণ দিয়ে বড় দারোগাকে সব ব্যাপারটা সাজিয়ে গুছিয়ে বুঝিয়ে দিলে।

বড় দারোগা থানা হাজত থেকে তিনজন ভলান্টিয়ারকে ওদের সামনে খাড়া করে দিয়ে বললে। "দেখেন দেখি—চিনতে পারেন? এরা তো সব মিছিলে ছিল?"

"বিলক্ষণ। মিছিল যখন ছিল—ওরাও নিশ্চয়ই ছিল।" হরিহর যাদবের দিকে ফিরে বললে, "কিরে—ছিল না?"

তখনো ভয়-বিহ্বল চোখ মেলে আপাদমস্তক তিনজনকে দেখেছিল যাদব—কাটা ঠোঁট, কাটা কপাল—উড়ে উড়ে মাছি বসছে, কার ফোলা ফোলা হাতের আঙুল। দলা দলা রক্তের দাগ লাগা জামা-কাপড়—কঠিন অত্যাচারের বীভৎস নমুনা। দেখে দেখে গলা শুকিয়ে গেল যাদবের। কথা বলতে গিয়ে দাঁতে দাঁত লেগে গেল।

ওর অবস্থা দেখে তিনজন ভলান্টিয়ার নিজেদের মধ্যে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে। পবিত্র মুখ টিপে হাসল।

বিমল বললে, "বল ভাই—আমাদের দেখেছ কি-না।"

কথার কথা জড়িয়ে গেল। যাদব বলে উঠল, "আ—আমি দেখি নি।"

"অলবাৎ দেখেছিস।" চাপা ধমকে গর্জে উঠল হরিহর, "থানায় ধরলে আর তুই দেখিস নি!"

যাদব ঘাড় হেঁট করলে।

তার আন্দাজের সাফল্যে উৎফুল্ল হরিহর। বড় দারোগার দিকে চেয়ে বললে, "হেঁ হেঁ—আমার তখনি মনে হয়েছিল এই রকম একটা ব্যাপার কিছু হবে। তা ওদের কোথায় ধরলেন স্যার?"

বড় দারোগা গরগর করতে করতে বললে, "আপনাদের মহামান্য ডাক্তারবাবুর বাড়িতে।"

"লোকটা সুবিধের নয়।" হরিহর বললে, "ইঁদুরে গরীবের চালে লংকাকাণ্ড বাধিয়ে ওখানে গিয়ে সেঁধিয়েছিল বোধ করি। অত রাতে আর যাবে কোথায়!"

"আমরা ধরেছি রাত দশটা নাগাদ।" বড় দারোগা যাদবকে জিজ্ঞেস করলে, "ঘরে তোর আগুন লেগেছিল কখন?"

যাদব বললে, "দুপুরে তারা তখন পচ্ছিম দিকে ঢলে পড়েছে।"

দারোগা কপাল কুঁচকে হরিহরের দিকে তাকাল। বললে, "তার মানে?"

হরিহর নায়েব আবার চটে গেল যাদবের ওপর। ধমকে বললে, "ব্যাটা মুখ্যু ধোপা, দারোগাবাবু আগেই যদি ধরে থানায় নিয়ে এল তো তোর ঘরে আগুন দিল ওরা কখন?"

"আজ্ঞে রাত তখন দুপর গড়িয়ে গেছে অনেকক্ষণ।"

যাদব শীটের সেই এক কথা।

"দুপুরে তারা পচ্ছিমে ঢলে পড়েছে।"

হরিহর নায়েব রাগে টঙ হয়ে তাবৎ মুখ্যু ধোপা জাতের উদ্দেশ্যে মুখে যা আসে তাই বলে গালাগাল দিতে লাগল। বড় দারোগা কিন্তু চটলে না। বরং চুপ করে ভাবতে ভাবতে কপাল তার কুঁচকে উঠল। গম্ভীর গলায় আরও একবার শুধোলে যাদবকে, "ঠিক মনে করে দেখ। ভালো করে।"

যাদব কাঁদো কাঁদো গলায় বললে "সে আমি ভাল করে দেখেছি হুজুর। সামনে মোর সেই সব্বনাশ—রাঙা ধক ধক করছে। সহায় নাই—সম্বল নাই, একটা মানুষের মুখের সাড়া নাই—শব্দ নাই। ইদিকে রাত খাঁ খাঁ করছে। বৌ কাঁদছে গাছতলায় বসে। হাঁ করে চেয়ে আছি—রাত কখন ভোর হবে।"...বলতে বলতে কেঁদে ফেলল যাদব।

হরিহর বললে, "এই তো! মাথার গোলমালে দেখতে ভুল করেছিস।"

কথাটা মনকে নিল না—বড় দারোগা আস্তে আস্তে নীরবে মাথা নাড়তে লাগল। একজন সেপাইকে ডেকে হুকুম দিলে, "বোলাও সরকারবাবুকো।"

সরকারবাবু ছোট দারোগা—গত কালের এ্যাকসনের ভার ছিল তার ওপর। ছোট দারোগা সামনে এসে দাঁড়াল।

বড় দারোগা জিজ্ঞেস করলে, "কাল আর কেউ এ গ্রামে ঢুকেছে—মানে কোনো ভলান্টিয়ার?"

"আজ্ঞে না—পাহারা মোতায়েন ছিল।" ছোট দারোগা জোর দিয়ে বললে, "আর কোনো ভলান্টিয়ার ছিল না।"

"তবে!" হরিহর ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল বড় দারোগার ভ্রূকুটি-কুটিল ভারি মুখটার দিকে।

"আপনার ধোপাটা ঠিকই বলছে নায়েব মশাই।" বড় দারোগা বললে, "এ আগুন ভলান্টিয়াররা বোধ হয় লাগায় নি।"

হরিহর ভড়বড় করে বলে উঠল, "বিলেতী কাপড়ের আণ্ডিল ছিল যাদবের ঘরে। আমাদের নবান্ন উৎসবের আগে"—

বড় দারোগা থামিয়ে দিয়ে বললে, "আর কেউ লাগিয়েছে—আরও কেউ আছে। আমাদের ভালো করে সন্ধান করতে হবে।"

বিমলেরা এ ব্যাপারের কিছু জানত না—সমস্ত কথাবার্তার ভেতর দিয়ে একটু একটু করে ঘটনাটা জানতে পারল এবং তিনজন তিনজনের দিকে নীরবে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল।

ছোট দারোগার ওপর তখুনি অনুসন্ধানের কড়া নির্দেশ দিয়ে বড়-দারোগা অস্থিরভাবে সারা ঘরময় পায়চারী করতে লাগল। কপালের রেখায়—গোল গোল ড্যাবড্যাবে দুটো চোখে সেই দুশ্চিন্তার ছায়া। সব আন্দোলন বন্যার উচ্ছ্বাসের মতো তীব্র গতিতে ছুটে এসে মিলেমিশে যাচ্ছে যেন এ দেশের গভীর তলায়। কোথাকার বীজ উড়ে উড়ে এসে মাটিতে পড়ে যেন অঙ্কুরিত হয়ে উঠছে সবার অলক্ষ্যে। শেকড় চালিয়ে দিচ্ছে মাটির গভীর অভ্যন্তরে। তাকে উপড়ে ফেলতে হবে। বড় দারোগা হাতড়াতে লাগল মনে-মনে—অন্ধের মত।

(ক্রমশ)

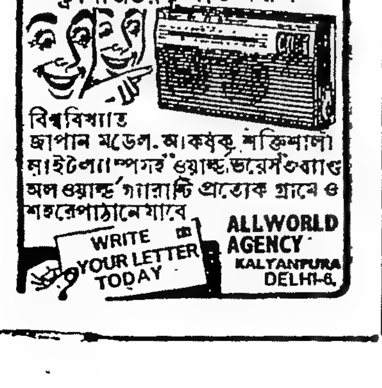

গ্রাম-বাংলায় অন্ধকার

সাগর বিশ্বাস

দু'শো বছরের ঔপনিবেশিক শাসন ও ত্রাসনের পর ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সূর্য যেদিন বঙ্গোপসাগর এবং আরবসাগরের নীলজলে তলিয়ে গেলো সেদিন সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের হাতে পড়লো এক বিরাট দায়িত্বভার। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠীর শাসন-শোষণ-ত্রাসনে জর্জরিত ভারতবর্ষের মানুষ সেদিন অপলকে তাকিয়েছিলো কংগ্রেসের দিকে। গ্রামে-শহরে সারা দেশজুড়ে তখন প্রাণের উত্তাল জোয়ার! কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গান্ধীজী বার বার স্বাধীন ভারতবর্ষকে একটি সুস্থ-সবল সার্বভৌম রাষ্ট্ররূপে গড়ে তোলবার আহবান জানিয়েছিলেন, পূর্ববাংলা এবং পশ্চিম পাঞ্জাবের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পুনর্বাসন ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, স্বপ্ন দেখেছিলেন দেশব্যাপী পঞ্চায়েত-রাজ প্রতিষ্ঠার, কথা দিয়েছিলেন নিরক্ষরতা দূরীকরণের এবং সুদূর গ্রামাঞ্চলে বিদ্যুৎশক্তি সরবরাহের! শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের একই পদ্ধতিকে তিনি সমর্থন করেন নি। কৃষি এবং কুটীর-শিল্পের প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিলো। মোটামুটিভাবে গান্ধীজীর সমাজচিন্তা ছিলো প্রধানত গ্রামভিত্তিক! তিনি বলতেন, ভারতের গ্রামই ভারতের আত্মা। উপনিষদ বলছে, আত্মানং বিদ্ধি—আত্মাকে জান। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সারাজীবনের কাব্য-সাহিত্যেও এই আত্মিক উন্নতিবিধানের কথা প্রতিফলিত। প্রাচীন ভারতের গ্রামীণ ও আশ্রমিক সমাজব্যবস্থার প্রতি দুজনেরই একটি মোহ ছিলো। অবশ্য এই মোহ নিছক কুসংস্কারমাত্র হয়ে ওঠে নি। বিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক যুগের কথা কেউই ভুলে যায় নি। যন্ত্র-শক্তির সংগে গ্রামকে অপরিচয়ের আড়ালে লুকিয়ে রাখবার কথা কেউই বলেন নি। গান্ধীজী যা চেয়েছিলেন তা হলো, বৈজ্ঞানিক চিন্তা এবং শক্তির সংগে গ্রাম্য-পরিবেশের সুস্থ সমন্বয়। শহরকে বাঁচানোর পশ্চাদ্ভূমি হিসাবে তিনি গ্রামের উন্নতি চান নি, মানুষকে বাঁচানোর জন্যই তিনি গ্রামে স্বয়ংসম্পূর্ণ unit গঠন করতে চেয়েছিলেন। গ্রাম তাঁর কাছে কৃত্রিম ছিলো না, কৃত্রিমতার আবরণে তাকে আবেষ্টন করতেও তিনি চান নি। তিনি বিশ্বাস করতেন, শহর মানুষের সৃষ্টি, আর গ্রাম সৃষ্টি বিধাতার! প্রকৃতিকে যদি বাঁচানো না যায় তাহলে মানুষের সৌকুমার্যকেও বাঁচানো যায় না। ভারতবর্ষের গ্রামের শোচনীয় অবস্থা দেখেই তাই একদা তিনি যুবশক্তিকে গ্রামে ফিরে যেতে আহবান করেছিলেন (go back to village)। শহর সম্পর্কেও তিনিই একথা বলেছিলেন যে, একদিকে নয়াদিল্লীর সুরম্য রাজপ্রাসাদ আর একদিকে অস্বাস্থ্যকর বস্তি—স্বাধীন ভারতে এই দুই বিসদৃশ বস্তু একেবারেই থাকতে দেওয়া হবে না।

১৯৪৮ সালে গান্ধীজীর মর্মান্তিক মৃত্যুর পর সদ্য-স্বাধীনতাপ্রাপ্ত ভারতবর্ষের ভার যাঁদের হাতে পড়লো, জওহরলাল নেহরু তাঁদের অন্যতম প্রধান। কিন্তু গান্ধীজীর সংগে চিন্তা ও মতবাদের ক্ষেত্রে নেহরুর কিছু মৌলিক পার্থক্য ছিল। গান্ধীর দৃষ্টি ছিলো গ্রাম তথা কৃষি ও কুটীরশিল্পের প্রতি। আর নেহরু চেয়েছিলেন দেশে দ্রুত শিল্পায়ন ঘটাতে। নেহরু ভারতবর্ষের রাজনৈতিক মঞ্চেই শুধু একটি 'কলোসাস' ছিলেন না—তিনি ছিলেন একজন আন্তর্জাতিক রাজনীতিবিদ। ফলে দেশে ভারী শিল্প গঠনের জন্য বিদেশী পুঁজির সমন্বয়ে অতি দ্রুত গড়ে উঠতে লাগলো বিরাট বিরাট শিল্প ও কল-কারখানা। লক্ষ্মীশ্রী বাড়তে থাকলো টাটা-বিড়লা, ডালমিয়া-সিংহানিয়া সাহেবদের। বিড়লা সাহেবের ত শ্রীবৃদ্ধির সীমা নেই। তখন ২৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে এখন প্রায় ৫০০ কোটির মালিক হয়ে পড়েছেন। ম্যাজিক টাচ্ আর কি।

কিন্তু শিল্পবিপ্লব হলো না। হবে কি করে? সম্পদ কেন্দ্রীভূত হতে থাকলো কিছু দেশী-বিদেশী পুঁজিপতিদের হাতে। কল-কারখানার দানবীয় আকর্ষণে মানুষ এসে জুটতে লাগলো শহর আধা-শহরের সংকীর্ণ বুকে। চিমনীর ধোঁয়া আর মানুষের নিশ্বাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইডে বাতাস উঠতে থাকলো বিষাক্ত হয়ে। অন্যদিকে কৃষি হলো অবহেলিত। লক্ষ লক্ষ একর পতিত জমি চিরপতিত হয়ে পড়ে থাকতে লাগলো।

একদিন নেহরুও গত হলেন। কিন্তু যে রাজনৈতিক বিচক্ষণতা এবং 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের' বুলি দিয়ে এতকাল ভারতের রাজনীতির হালটি ধরে কোনমতে টাল সামলে রেখেছিলেন—এইবার আর সেই টাল সামলানোর মতো ব্যক্তিত্ব পাওয়া সম্ভব হলো না। কংগ্রেসের নেতৃত্ব যাঁদের হাতে এসে পড়লো তাঁরা কথায় ও কাজে পুরোপুরি ক্যাপিটালিস্ট গ্রুপের কোলে লুটিয়ে পড়তে চাইলেন। গান্ধীর মতবাদ দিয়ে তাঁরা পড়ার ঘরের আলমারীর শোভাবর্ধন করলেন—ছবি দিয়ে সাজালেন ড্রইংরুম। খাদি শিল্প হলো ব্যবসার বিভাগীয় বস্ত্র-বিপণি। টুপির আড়ালে জপের মালায় প্রার্থনা উঠলো 'এলোমেলো করে দে মা লুটে-পুটে খাই।' কেউ ভোলে নি প্রতাপ সিং কায়রোঁর কথা—কেউ ভুলবে না মোরারজী দেশাই-কান্তি দেশাইদের কথা।

কিন্তু একটা কথা আগেই বলে নেওয়া দরকার। 'গ্রাম-বাংলায় অন্ধকার' বাংলাদেশের গ্রাম ও তার মানুষের বেদনার চিত্র। এতক্ষণ যা বললাম সে হলো পশ্চাৎপট। গ্রামের বর্তমান চেহারার কথা জানবার আগে এ পশ্চাৎপটের কথা মনে রাখবার দরকার আছে। যতদূর জানি, গান্ধীজীর পরে গ্রামের উন্নয়নের কথা এমন করে কেউ ভাবেন নি। বলেনও নি। কখনো কখনো উচ্চারণ হয়তো কেউ করেছেন। কিন্তু তাঁরা বোধহয় বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন না যে, সেগুলি নেহাৎ রাজনীতির খাতিরে নয়। নেহরুর মৃত্যুর পর ভারতবর্ষের সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। এই পরিবর্তন ও বিবর্তনের ঢেউ গ্রাম-বাংলাকেও আঘাত করেছে দারুণভাবে। পরিবর্তনের সর্বশেষ স্বরূপের সংগে এই প্রসংগে অতি সংক্ষেপে পরিচিত হতে হবে। অতঃপর আসবে সংকটের কথা—

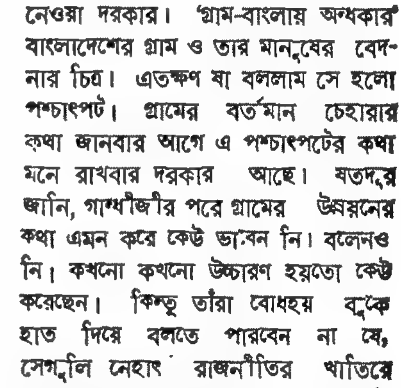

অন্ধকারের আসল চেহারা। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, যোগাযোগ, সমষ্টি-উন্নয়ন ও পঞ্চায়েত, সংস্কৃতি, সমবায় প্রভৃতির ক্ষেত্রে গ্রাম্য-মানুষের সংগে যে মর্মান্তিক পরিহাস চলে এসেছে তারই লজ্জাকর এবং বেদনাদায়ক চিত্র একে একে তুলে ধরবার চেষ্টা করবো।

পরিবর্তনের কথা বলতে গেলে প্রথমেই রাজনৈতিক পরিবর্তনের কথা এসে যাবে। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তন আজ রাজনীতির সংগে বিবর্তিত এবং সম্পর্কযুক্ত। পশ্চিমবাংলার মধ্যবর্তী নির্বাচনোত্তরকালে পল্লী-বাংলায় একটা পরিবর্তন এবং পোলারাইজেশনের খরস্রোত বইতে শুরু করেছে। বিভিন্ন অঞ্চলে রাজনৈতিক দলগুলি অভূতপূর্বভাবে কর্মতৎপর বলে মনে হচ্ছে। কে আগে কৃষকের মধ্যে সংগঠন করবে—কে আগে শ্রমিক ইউনিয়ন গঠন করবে—কে বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির নির্বাচনে আধিপত্য বিস্তার করবে তারই প্রতিযোগিতা লক্ষিত হচ্ছে গ্রামে গ্রামে। অনেকক্ষেত্রে কৃষক এ সবের মানে বোঝে না—শ্রমিক কারিগর, দোকানদার, রিক্‌সাওয়ালার কাছে সবই যেন কেমন ধোঁয়া অথচ মোহময় বলে মনে হয়। সেক্ষেত্রে গ্রাম-বাংলার তথাকথিত 'ইন্‌টেলিজেন্‌সিয়া' অর্থাৎ স্কুলের মাস্টার, সরকারী-বেসরকারী অফিসের কর্মচারি, স্কুল বা কলেজের চৌহদ্দী পেরোনো কাঁধে থলে ঝোলানো উস্কো-খুস্কো মাথায় বেকার

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী

বিদ্যাপতির সমগ্র পদ

মূল্য : চার টাকা

জ্ঞানদাসের সমগ্র পদ

মূল্য : দুই টাকা

গোবিন্দদাসের সমগ্র পদ

মূল্য : দুই টাকা

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

বসুমতী সাহিত্য মন্দির

১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

সান্যাল এণ্ড কোং

বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

পাড়ার ছেলে কিংবা কয়লার আড়ত অথবা গম ভাঙানো কলের মালিকেরা তাঁদের কাছে নানাপ্রকার জ্ঞানের অবতারণা করেন। গ্রামের নিরক্ষর চাষাভুষো মানুষের দল তাঁদের মুখে শোনে গান্ধীবাদ, মার্কসবাদ, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, শ্রেণী সংগ্রাম, সর্বহারার একনায়কতন্ত্র, হঠকারিতা, সংকীর্ণতা, শোধনবাদ, নয়া-শোধনবাদ প্রভৃতি কথাগুলির নানারকম ঘোরালো-প্যাঁচালো ব্যাখ্যা। ওরা শোনে আর আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থাকে। চৈত্রের শেষভাগেও যখন মেঘের ছায়া দেখা যায় না; জ্যৈষ্ঠের মাঝামাঝিও যখন অনাবৃষ্টির আকাশ থেকে আগুন ঠিকরে পড়তে থাকে তখন চৌচির হয়ে ফেটে-পড়া জমির রুক্ষতার চেয়ে ওঁদের নীতিবাদের বুলিকেই অত্যধিক রুক্ষ বলে মনে হয়। নির্বাচনোত্তর কালের যে পরিবর্তন ও পোলারাইজেশনের চিত্র গ্রামবাংলায় প্রকট হয়ে উঠছে তার মধ্যে রাজনৈতিক সুস্থতার চেয়ে অসুস্থতাই বেশি। নির্বাচন-পূর্বকালে যাদের দেখেছি কংগ্রেসের জন্য জীবনপণ প্রচেষ্টা চালাতে—চিরকাল যারা কংগ্রেসী বলে পরিচিত—কমিউনিজমের কথা শুনলে যারা ক্ষেপে পাকা টম্যাটোর রূপ ধারণ করতো—নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর রাত্তির না পোহাতেই যদি তারা কমিউনিস্টভক্ত (তাও মার্কস্‌বাদী) হয়ে পড়ে তবে তাকে অসুস্থ ছাড়া আর কি ভাবতে পারা যায়? জনৈক স্কুল-শিক্ষক বন্ধু (কট্টর কংগ্রেসপন্থী, কমিউনিজমের বাম-দক্ষিণ ঝোঁক সম্পর্কে যাঁর কোনো ধারণাই ছিল না) নির্বাচনের পরে নিজেকে যখন বামঘেঁষা বলে প্রচার করতে লাগলেন তখন ওই অসুস্থতার ডিগ্রী দেখে চমকিত হয়েছিলাম। কিন্তু এ ত লেখাপড়া জানা রীতিমত বিশ্ববিদ্যালয় ফেরত তথাকথিত ইন্‌টেলিজেন্‌সিয়া। অপেক্ষাকৃত কম লেখাপড়া জানা কিংবা মোটেই না জানা রোগীদেরও অভাব নেই। তারা বন্যার জলের মত্রো রাতারাতি সি পি এম বনে যাচ্ছে। জ্যোতি বসুর ছবি কিনে আনছে দোকান থেকে! 'দেশহিতৈষী'র নিয়মিত পাঠক হয়ে যাচ্ছে।

আবার অন্য চিত্র আছে। সেদিন যেমন জনৈক তাত্ত্বিক মার্কস্‌বাদী বন্ধু বলছিলিন—"দেশহিতৈষী"র পাতা খুব সস্তা হয়ে গেছে। 'ট্রাজেডি', 'ন্যাকামি' আর 'বেসাতি'র মধ্যে কার বা কাদের 'সুর' অনুসন্ধান করাই যেন ওদের ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছে।" বন্ধুটি ঘোরতর তাত্ত্বিক—কেমিস্ট্রির শিক্ষক—সি পি এম-এর একদা অন্ধ ভক্ত। কাজেই তাঁর মুখে এমনধারা কথা শুনে চমকিত হবার কথা। আমার চমক না ভাঙতেই বললেন—"আর তাছাড়া ওটা ত' একটা গ্রামোফোনের রেকর্ড-বিশেষ। যদি কেউ একবছর ধারাবাহিকভাবে পত্রিকাটি পাঠ করেন তবে পরের বছর থেকে তিনি পত্রিকা না দেখেই বলতে পারবেন তাতে কি থাকবে।" আমি কোনো মন্তব্য করি নি। একটা পত্রিকা সম্পর্কে এ-কথা গ্রহণ করা সহজ ব্যাপার নয়। বিশেষ, 'দেশহিতৈষী'র আমি নিয়মিত পাঠক নই। তবু ঘটনাটির উল্লেখ করলাম পরিবর্তনের বাস্তব চিত্র দেখানোর জন্যই। ঠিক এমনি পরিবর্তনই কতজনকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে তৃতীয় কমিউনিস্ট শিবিরের দিকে। তাঁদের মুখে ওই শ্লোগান—'যবন-জ্যোতি এক হ্যায়' 'মাও সে-তুঙের চিন্তাধারা/, ভারতবর্ষে আনলো কারা/' নক্‌শালবাড়ি আবার কারা? অথচ সেই বিপ্লবী ভদ্রলোকেরা (ভদ্রলোক বললে হয়তো ওঁরা আবার অফেন্স নেবেন, কারণ ওঁদের নেতা কানু সান্যালের মতে বিপ্লব মানবতা নয়—প্রীতিভোজের আসরও নয়—বিপ্লব হলো পাশবিকতা—অতএব পাশবিকতার মধ্যে ভদ্রতার সন্ধান অন্ততঃ করা যায় না) কি অস্বীকার করতে পারেন যে, কিছুকাল আগেও তাঁরা জ্যোতি বসুর আদর্শে পরিচালিত হয়েছেন—জ্যোতি বসুর ভরসা ছিলো তাঁদের ভরসা—জ্যোতি বসুর হাসি ছিলো তাঁদের হাসি—এমন কি জ্যোতি বসুর স্বপ্ন ছিলো তাঁদের স্বপ্ন? জ্যোতি বসুর বাক্য ছিলো বেদবাক্য। আর আজ তাঁরা সেই জ্যোতি বসুর সংগে চ্যবনজীর পার্থক্য খুঁজে পাচ্ছেন না! অসুস্থতার মাত্রা হয়তো সীমা ছাড়িয়েছে—এ তারই প্রলাপ। কিন্তু বাংলাদেশের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে আজ তাকে এমন একটা জায়গায় ঠেলে নিয়ে গেছে যে, এই উন্মত্ততার শক্তিকে উড়িয়ে দেবার উপায় নেই। বামপন্থী কমিউনিস্টরা যেন আজ আয়নায় নিজেদের মুখ দেখে নিজেরাই ভীত হয়ে উঠেছেন। তাই বোধ হয় ১নং এবং ২নং কমিউনিস্ট দল নিজেদের মধ্যে সমঝোতার প্রয়াস পাচ্ছেন। কিন্তু ওই উন্মত্ততার হাওয়া আজ গ্রাম-বাংলায় এসে পৌঁচচ্ছে (মনে রাখতে হবে, তৃতীয় কমিউনিস্ট পার্টি ঘোষণা করেছে—গ্রামই হবে তাঁদের আসল কর্মস্থল)।

বামপন্থী আন্দোলন বলতে প্রধানত যে কমিউনিস্ট আন্দোলনকে বোঝায় সেই কমিউনিস্ট আন্দোলনের অগ্রগতি যে তথাকথিত কমিউনিস্টরাই ব্যাহত কর-

হেন একথা সম্ভবত তাঁরা নিজেরাও অস্বীকার করতে পারেন না। এর জন্য একদিন হয়তো তাঁদের মানুষের কাছে জবাবদিহি করতে হবে। সে কথা আলাদা। বিভিন্ন কমিউনিস্ট গ্রুপের ক্ষমতা দখলের প্রতিযোগিতা এবং প্রভাব বিস্তারের সংগ্রাম গ্রাম-বাংলার মানুষের জীবনে আজ প্রচণ্ডভাবে আঘাত করছে। যে কথা আগেই বলেছি যে, চারিদিকে কে আগে ক্ষমতা দখল করবে—তারই প্রতিযোগিতা চলছে গ্রামের ছায়াঘেরা প্রান্তরের মধ্যে। কিন্তু চৈত্রের শেষেও যখন আকাশ থেকে জল পড়ে না তখন চাষীর কাছে দিগন্তবিস্তৃত জমির নিষ্করুণ শুষ্কতার চেয়েও রুক্ষ মনে হয় রাজনৈতিক বুলি আর ক্ষমতার লড়াই-এর একঘেয়ে কথা। মহাজনের হাত থেকে যখন চড়া সুদেও টাকা পাওয়া যায় না—সরকারী সমবায় ব্যাঙ্কগুলি যখন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে—তখন আগামীদিনের কথা ভেবে কৃষক আর কৃষকবধূর চোখের সামনে সব কিছু অন্ধকার—সবকিছু অর্থহীন হয়ে আসে। তবু অক্লান্ত অধ্যবসায়ের পরীক্ষা দিয়ে গ্রামের মানুষও আজ রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠা করেছে। সেই সরকারের কাছে তাদের অনেক চাওয়ার আছে। গ্রামের ওই শীর্ণ মানুষগুলি তাই আজ অপলকে তাকিয়ে আছে বাংলার নতুন সরকারের দিকে। তাদের অনেক চাওয়ার বিনিময়ে হয়তো সামান্যই পাওয়া যাবে—তবু সে পাওয়া যেন ওই সরকারী জি· আর· দেবার মতো দাক্ষিণ্যের বিড়ম্বনা হয়ে না দাঁড়ায়।

গ্রামের অসহায় মানুষদের জন্য যাঁরা গভর্নমেন্ট রিলিফ-এর প্রচলন করেছিলেন তাঁরা নিশ্চয়ই সদাশয় মানুষ ছিলেন। তা না হলে, অসহায় অক্ষম মানুষদের নিয়ে এতবড়ো মর্মান্তিক ব্যঙ্গ সাধারণ মানুষে করতে পারে না। বুভুক্ষু মানুষের অনির্বাণ ক্ষুধার সামনে বিনা মূল্যে রুটির টুকরো দিয়ে তাঁরা হয়তো সদাশয়ের পরিচয় দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু একবারও তাঁরা খতিয়ে দেখতে চান নি, ওই অনুগ্রহের মুষ্টিভিক্ষায় তাদের ক্ষুন্নিবৃত্তি হওয়া সম্ভব কি না। জি· আর· মাথাপিছু দেওয়া হতো না—দেওয়া হতো পরিবারপিছু। আর একটা [illegible] কিংবা ধরে নিলাম একটি মানুষের যদি এক কিলো বা দু' কিলো খাদ্যশস্যে এক পক্ষকাল চালাতে হয় তবে তাকে ক্ষুন্নিবৃত্তি বলে না—সে হয় বুভুক্ষুর সুপ্ত ক্ষুধাকে জাগিয়ে দেওয়া! আর প্রতি পক্ষেই জি· আর· দেওয়া হয়েছে এমন নজির সম্ভবত বাংলাদেশের কোনো ব্লকেই পাওয়া যাবে না! তাছাড়া এটা কি কেউ কখনো জানতে চেয়েছেন যে, জি· অর·-এর খাদ্যশস্য যথারীতি যথাস্থানে পৌঁচচ্ছে কি না? জি· আর· প্রাপকদের যে তালিকা ব্লকে ব্লকে তৈরি হতো, আঞ্চলিক পরিষদ কর্তৃক, তার আয়তন নেহাৎ ছোট ছিলো না কখনই। কিন্তু যথাস্থানে যথারীতি যদি সে মাল না পৌঁছোয় তাহলে সেগুলি কোথায় যায়? এটাও কি কেউ কখনো দেখতে চেয়েছেন যে, সেই তালিকায় যাদের নাম লেখা তারা সকলেই জি· আর· পাবার উপযুক্ত কি না! যদি না হয়, আর যদি সকলে নিয়মিত জি· আর· না পায়, তাহলে খাদ্যশস্যের বাড়তি অংশটা যায় কোথায় এ প্রশ্ন কেউ করেন নি—কেউ জানতেও চান নি সরকারী সদাশয়তার অন্তরালের চলচ্চিত্রের কথা।

রাজ্যে যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠার পর এই সামান্যসংখ্যক (সম্ভবত ·২%) মানুষকে নিয়মিত জি· আর· দেওয়া হয়েছে জানতে পারলে সুখী হতাম কি না সে প্রশ্ন আলাদা; কিন্তু সত্য হলো তাও হয় নি সর্বত্র। এ নিবন্ধ যখন লিখছি তখন আমি যে মহকুমায় বাস করি সেই মহকুমার শাসকের নিকট গণ-ডেপুটেশন গেছে কৃষিঋণ, জি· অ.র· এবং মাথাপিছু রেশনের কোটা বৃদ্ধির দাবিতে। গ্রাম-বাংলায় রেশনের পরিমাণ সম্পর্কে সকলেরই জানা আছে। চিনি বস্তুটির কেবল অস্তিত্বটুকুই প্রতি মাসে একবার গ্রামের মানুষকে মনে করিয়ে দেওয়া হয় মাথাপিছু ৫০ গ্রাম করে দিয়ে। সম্প্রতি নাকি চালের পরিমাণ বেড়ে ৫০০ গ্রাম (প্রতি ইউনিটে) এবং গমের পরিমাণ ১ কিলো হবে। তাহলে মোট পরিমাণ দাঁড়াবে ১৫০০ গ্রাম, মাথাপিছু প্রতিদিন তাহলে পড়ে ২১৪ গ্রাম। অর্থাৎ একবেলায় একজন মানুষের খাদ্য ১০৭ গ্রাম। প্রাতরাশ এবং বৈকালিক খাবারের কথা ছেড়েই দিলাম। অথচ গ্রামের মানুষ শ্রমজীবী—তাদের খাদ্যেরও প্রয়োজন বেশি। তাহলে? একটা কথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায়—গ্রামের মানুষের জমি-জমা আছে—তাতে ফসল হয়—অতএব তাদের জন্য বেশি রেশনের প্রয়োজন কি? কিন্তু একথা যদি সত্য হয় তাহলে সরকারী পরিসংখ্যানে এত ভূমিহীন মানুষ এলো কোত্থেকে? আর জমির আন্দোলনই বা কাদের জন্য? আসল কথা হলো দীর্ঘ বাইশ বৎসর যেভাবে গ্রাম-বাংলাকে শোষণ করা হয়েছে আজও তার ব্যত্যয় হবে না। আমি বলছি না রাতারাতি একটা আমূল পরিবর্তন সাধিত হবে। কিন্তু গ্রামের ওই শীর্ণ মানুষগুলির যে আসুরিক শক্তি রাজ্যে জনগণের সরকার প্রতিষ্ঠা করলো তাদের সামনে কিছু আশার আলো ধরতে না পারলে তাদের চোখের মায়াঞ্জন মুছতে সহস্র রজনী লাগবে না কি? আজও মানুষ জানলো না নতুন সরকারের ভূমি-সংস্কার নীতি কি? শিক্ষার পরিবর্তন কিভাবে হবে? খাদ্যনীতির মূল বক্তব্য কোথায়? অথচ চোখের সামনে দিয়ে সেই সনাতন পদ্ধতিতে চাল পাচার হয়ে যাচ্ছে শহরে—গ্রামে চালের দর বৃদ্ধি হচ্ছে ১·৩০, ১·৪০, ১·৫০, ১·৬০, ১·৭০, এইভাবে। সেই পুলিশ আছে—এন· ভি· এফ. বাহিনী আছে—মন্ত্রীদের প্রেস বিজ্ঞপ্তি আছে—সব ঠিক আছে—নেই কেবল মৌলিক পরিবর্তন। সমাজবিরোধীরা সেদিনও ছিলো—আজও আছে। আজও তারা চোরা-গোপ্তা পথে খাদ্যশস্যের কালোবাজারী করে যাচ্ছে—সেকথা বারান্তরে বলবো। আজ এই কথা বলেই শেষ করতে চাই যে, খাদ্যে, বস্ত্রে, শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে যদি মৃতপ্রায় গ্রাম-বাংলাকে ওই অন্ধকূপ থেকে উদ্ধার করা না যায়, তবে একদিন তার শ্যামল বনান্তরে যে জমাট অন্ধকার ঘনীভূত হবে—তারই মধ্যে সকলকে সেদিন পথ হাতড়ে মরতে হবে।

কিস্তিতে ট্রানজিস্টার

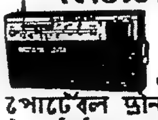

HAVA

৩ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টর মাসিক ৫ টাকা কিস্তিতে। প্রত্যেক গ্রাম ও শহরে পাঠান যাইতে পারে।

HAVA SALES (39) SHAKTI NAGAR, DELHI-7

তিমির প্রান্ত ডুয়ার্স

অগ্নিবর্ণ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ ঊনত্রিশ ॥

চাঁদের রূপালী আলোর জ্যোৎস্নাতে যেন বান ডেকে যাচ্ছে পৃথিবীতে। একটা রাত-জাগা পাখি প্রাণপণে ডেকে যাচ্ছে সেই কখন থেকে। ডেকে-ডেকে যেন পাগল হয়ে উঠছে। এই সব রাত্রি-গুলিতে ঘুম আসে না শিবব্রতবাবুর। কিছুতেই ঘুম আসে না। বিছানায় শুয়ে থেকে-থেকে যেন চঞ্চল হয়ে ওঠেন। ওই পাখিটার ডাকের সঙ্গে সঙ্গে যেন সমস্ত স্নায়ুগুলি চঞ্চল হয়ে উঠছে। ছিঁড়েখুঁড়ে যাচ্ছে থেকে থেকে। ভয়ংকর এক অবস্থা। চোখ বুজে বুজে সাদা মনে ঘুমোতে চেষ্টা করলেন শিবব্রতবাবু। কিন্তু নাঃ, সব চেষ্টাই নিষ্ফল। এইসব রাত্রিগুলিতে ঘুমোবার চেষ্টা করাই যেন বৃথা। এইসব রাত্রে ঘুমোবার কোন মানে হয় না।

শিবব্রতবাবু উঠে পড়লেন ঘুম থেকে। মশারি গুঁজে শুয়ে পড়েছিলেন। মস্ত বড় পালংকে ঘুমোবার ব্যবস্থা। ধবধবে সাদা বিছানা। মস্ত ঝালরওয়ালা বালিশ। দুটো কোল বালিশ। নরম তোষক। ডানলোপিলোর গদি। বিছানা থেকে বেরিয়ে এলেন অন্ধকারেই। বেড্-সুইচ আছে। নিতান্ত জরুরী প্রয়োজনে জ্বালাবার জন্যে। রাত্রে যদি কখনো ওঠবার দরকার হয় সেজন্যে।

ব্যবস্থা সবই আছে। কিন্তু দরকার হয় না শিবব্রতের। রাত্রে মোটামুটি তিনি নির্বিঘ্ন নিদ্রা দিতে অভ্যস্ত। আজ অনেক বয়স হয়েছে তাঁর। বুঝতে পারেন দেহে আর আগের মত সুস্থ নন তিনি। বেন নড়বড়ে হয়েছে কল-কব্জা। নিয়মমাফিক চলতে চায় না। কাজেও আর আগের মত চটপটে ভাব অনুভব করেন না। কখনো খানিকটা দুর্বলতা অনুভব করেন। এই দুর্বলতা হয়তো দেহস্থিত কোন গোলমালের জন্য। যান্ত্রিক ত্রুটি ঘটছে অভ্যন্তরে। বয়স হয়ে গেল আশি বছরের কাছা-কাছি।

কিন্তু বাইরে থেকে দেখলে কোন অস্বাভাবিকতা নেই। ঘড়ি-ধরা জীবন তাঁর। পরিণত জীবনে সুমধুর বিশ্রামের প্রয়োজন। কিন্তু বিশ্রাম নেই তাঁর। সারা জীবন অফুরন্ত পরিশ্রম করেছেন। খেটেছেন যন্ত্রের মত। রুটিন-মাফিক জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন তিনি। কম পরিশ্রম করেছেন নাকি? জীবন সুরু করেছিলেন একরকম শূন্য হাতে। কিছুই ছিল না তাঁর। ছোটবেলায় বাবা মরে গেল। কাকারা উদাসীন। মামারা দেখতে পারতেন। দেখেন নি। মা-কে পরের বাড়ি রাঁধুনীবৃত্তি পর্যন্ত করতে হচ্ছিল। একটা ছেলে ও একটা মেয়েকে মানুষ করতে কী ভয়ংকর উদভ্রান্ত খাটুনী। ভোর থেকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত। কেউ দেখে নি তাঁদের। ডেকে ভালো একটা কথা পর্যন্ত বলে নি কেউ। ইস্কুলে ভর্তি হওয়া তো দূরের কথা। কে ভর্তি করে দেবে? কে নেবে দায়িত্ব? সমাজ অবশ্য একটা ছিল। চিরকাল আছে। তারা খবরদারী করে, কিন্তু কারোর দায়িত্ব গ্রহণ করে না। সবই মুখোসের কারবার একটা। বড়লোকের মোসাহেবী করে সবাই। গরীবের দিকে চেয়ে কেউ দেখে না।

বড় বিপর্যয়ের সময় কেউ দাঁড়ায় নি পাশে। ভাগ্যিস পৈতৃক ভিটেখানা ছিল। জীর্ণ একটেরে ঘরে কাটিয়ে দিলেন সারা কৈশোরটা। তারপর বোনটা মরল জ্বর-বিকারে। খুব জ্বর হত তখন। দেশ-গাঁ ম্যালেরিয়ায় উচ্ছন্নে যাচ্ছিল। গা-কে গাঁ মরেহেজে যাচ্ছিল। যাদের অর্থ ছিল তারা চিকিৎসা করাচ্ছিল।

অবশ্য চিকিৎসার ব্যবস্থাও ছিল না তখন বিশেষকিছু। কবিরাজের বড়িতে জ্বর ছাড়ত না। কুইনিনের বড়ি গিলত সবাই। সে-বড়িও গরীবের জন্য নয়। গঞ্জে গাঁয় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের হাসপাতালে ছিলেন দু-একজন সরকারী ডাক্তার। তাঁরা টাকা দিলে আসতেন। ওষুধের বিধান করতেন। তিনিও খুবই জ্বরে ভুগেছেন ছোটবেলায়। কিন্তু মরেন নি। মরলে কি আর আজকের লক্ষপতি ধনী শিবব্রতকে দেখতে পেত মানুষ। ডুয়ার্সের মানুষ একডাকে যাঁকে চেনে।

মনে একটা অদ্ভুত তৃপ্তি অনুভব করেন শিবব্রত আগের সেই কথা ভাবতে গেলে। আজকের এই মোজেইক করা গুপ্তিভিলার প্রাসাদোপম অট্টালিকা দেখে কে ভাববে সে-কথা। এ-বাড়ির ঐশ্বর্য এ-কালের প্রবাদ। দুটো-চারটে পাঁচটে গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে বাড়ির সামনে। নানা ধরণের গাড়ি। লেটেস্ট মডেল পর্যন্ত আছে। এদের অধিকাংশই বাগানের গাড়ি। চা-বাগানের।

আজকের শিবব্রতবাবুর পরিচয় টি-ম্যাগনেট। পরিণত জীবনে এখন তিনি সুপ্রতিষ্ঠিত। ঠাকুর-চাকর, দাস-দাসীতে সর্বক্ষণ গম্ গম্ করছে বাড়ি। আত্মীয়-স্বজন। ভিতর-বাড়িতে যেন একটা হোটেল চলেছে। দিনে প্রায় এক শ'-দেড় শ' পাতা পড়ে রোজ। দু'-তিনটে ঠাকুরে মিলে সব কাজ সামলে উঠতে পারে না।

সব কাজ ঠিকঠাকমত তবু তদারক করছেন সুখলতা। শিবব্রতবাবুর স্ত্রী। বাতে একটু অশক্ত হয়ে পড়েছেন। মাঝে মাঝে বিশ্রাম নিতে হয় বিছানায়। ডুয়ার্সের শীত-বসন্ত তাঁর পক্ষে ভয়ংকর কষ্টকর। আজকাল অবশ্য স্ত্রীকে তিনি যেখানে-সেখানে রেখে দিতে পারেন। মেয়েদের বিয়ে-থা হয়েছে তারাও আছে নানা দিকে। জামাইরা কৃতী সব। সুখলতা অবশ্য তাঁদের কাছে জুড়োতে যেতে নারাজ। তাঁর এক কথা, না, বাপু, জামাই-বাড়ি থাকতে পারব না। সে আমাকে বলো না বাপু।

—তাহলে পুরীই যাও।

—সে দেখা যাবে।

আসলে সুখলতা কোথাও যেতে নারাজ। এখানেই কাটালেন দেশ থেকে আসবার পর গোটা জীবনটা। প্রায়

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে

শিলালি

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অনন্যা

সুজাতা—এতটাই যখন জেনেছেন তখন বাকীটা না শুনলে আপনার সম্পূর্ণ ভুল ধারণা হবে। আপনি শুনে আশ্চর্য হবেন যে, সাহিত্যিক অভিজিৎ গুপ্তের সঙ্গে আমার কখনও মৌখিক আলাপ হয় নি আজ পর্যন্ত।

সুরমা—(বিস্ময়ের সঙ্গে) সে কি! আমি ভেবেছিলাম—

সুজাতা—আপনি কিভাবে ভেবেছিলেন সে আমি বুঝেছি। কিন্তু এ ব্যাপারটা একেবারেই সেরকম নয়। অভিজিৎ গুপ্ত এখানে আসছেন——কিন্তু আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য নয়। I don't think he is even aware of my existence.

সুরমা—আপনার সঙ্গে তাঁর পরিচয় নেই।

সুজাতা—পরিচয় আছে বলতে পারি না। কিন্তু আমি তাঁকে জানি—এবং এমনভাবে জানি যেভাবে অন্য কেউ তাঁকে জানে না।

সুরমা—ব্যাপারটা যে আরও হেঁয়ালীর মত মনে হচ্ছে—আপনি ঠাট্টা করছেন না তো?

সুজাতা—I am desperately serious. এর থেকে serious কিছু আমার জীবনে ঘটে নি।

সুরমা—মিঃ গুপ্ত কি আপনাকে বলেছিলেন যে এখানে আসবেন? না, তাই বা কি করে হবে—আপনাদের তো মৌখিক পরিচয়ই নেই। অবশ্য লিখে জানাতে পারেন—

সুজাতা—না, লেখেন নি—আমি বলে যে কেউ আছি তাই তিনি জানেন না।

সুরমা—তাহলে আপনি বোধহয় কোনরকমে জানতে পেরেছিলেন যে উনি এখানে আসছেন?

সুজাতা—অনেকটা তাই বটে। বিলেত থেকে জাহাজে দেশে ফিরছিলাম। ডেক চেয়ারে শুয়ে শুয়ে আধ ঘুমে, আধ জাগরণে সময় কাটাতাম। খালি মনে হোত অভিজিৎ গুপ্ত অত্যন্ত মর্মাহত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন, কাজ করবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছেন, চিন্তা করবার শক্তি পর্যন্ত নেই......

সুরমা—আপনার কথা আমার ক্রমশ দুর্বোধ্য মনে হচ্ছে। আপনি বলছিলেন ভদ্রলোক বিবাহিত—ওঁর স্ত্রী এখন কোথায়?

সুজাতা—বিবাহিত জীবনে ওঁরা সুখী হতে পারেন নি। তারপর separated হয়ে যান—কবে এবং কিভাবে এটা ঘটল তা আমার অজ্ঞাত। কিন্তু একথা আমি জানতে পেরেছি যে, ওঁরা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই এখানে আসছেন—একবার শেষ চেষ্টা করতে, নিজেদের ভেতরকার সমস্ত গোলমাল মিটিয়ে ফেলা যায় কিনা দেখতে। লোকবিরল এই পরিবেশেই নিজেদের যাচাই করে নেওয়াটা সব দিক দিয়ে সুবিধার হবে এই বোধ হয় ওঁদের মনের ভাব।

সুরমা—অভিজিৎ গুপ্তের নাম এক সময় শুনেছিলাম—কিন্তু তারপর ভদ্রলোক যেন একদিন অদৃশ্য হয়ে গেলেন সাহিত্যজগৎ থেকে।

সুজাতা—অনেক দিন ধরে কোন বড় কাজ তিনি শেষ করেন নি—আরম্ভ করেন, খানিকটা লেখেন, ছেড়ে দেন।

সুরমা—ওঁর একটা নাটক এক সময় দেখেছিলাম—বেশ মনে পড়ছে দর্শকমহলে এক বিরাট আলোড়ন এনেছিল নাটকটি—কিন্তু আমার যেন কিসের একটা অভাব লাগছিল লেখার ভেতর।

সুজাতা—এ পর্যন্ত ওঁর সব লেখার ভেতরই সেই অভাবটা আছে। রচনার কারিগরি দিকটা ওঁর হয় নিখুঁৎ। কিন্তু নিজের সত্যিকার প্রতিভাকে—দু-চারটি লেখায় ছাড়া—উনি এখনও ঠিকভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। আসলে ওঁর হৃদয়টা হচ্ছে অত্যন্ত উপবাসী। যে নারীর সাহচর্যে ওঁর হৃদয়-বীণার সমস্ত তারগুলো বেজে উঠবে, তার দেখা উনি আজও পর্যন্ত পান নি। সৃষ্টির আগে শিল্পীর মনে যে Composure-এর দরকার, তার অভাব হয় বলেই উনি লেখার সময় ঠিকমত ভাষা খুঁজে পান না, ঠিকমত মনোভাবকে প্রকাশ করতে পারেন না। মনের মধ্যে সব সময় একটা অশান্তি, অল্পেতেই রেগে যান, লোকের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন—অথচ পরে এর জন্য অনুতপ্ত হন। জীবনের সঙ্গে সহজভাবে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন না বলেই he becomes dominated by terrible, bitter, black moods. অনেক ক্ষেত্রেই আমি দেখেছি (থেমে যাবে)......

সুরমা—(একটু বাদে) বলুন।

সুজাতা—না, থাক—এভাবে আলোচনা করাটা বোধহয় ঠিক হচ্ছে না।

সুরমা—অথচ মিঃ গুপ্ত আপনার সম্বন্ধে একটা কথাও জানেন না—সামান্য মৌখিক পরিচয়ও আপনাদের মধ্যে হয় নি? আমি সত্যিই আশ্চর্য হয়ে গেছি মিস্ সেন......

সুজাতা—আমি বুঝতে পেরেছি মিস মল্লিক। এ ব্যাপারে এত কথা বলাটাই আমার উচিত হয় নি—

সুরমা—তা হয়তো বলেছেন—কিন্তু ব্যাপারটা স্পষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, যেন আরও বেশি জটিল হয়ে উঠেছে।

সুজাতা—আমাকে ক্ষমা করবেন—এর বেশি এখন আর আমি বলতে পারব না।

সুরমা—আমার এত বয়স হওয়া সত্ত্বেও আজও অবধি আপনার মত রহস্যময়ী নারীর সংস্পর্শে আমি আর কখনও আসি নি।

সুজাতা—(অল্প হেসে) এ আপনার ভুল ধারণা। আর পাঁচজন মেয়ের সঙ্গে আমার কোনোই অমিল নেই। আমার শুধু কি ভেবে আশ্চর্য লাগে জানেন। মানুষের জীবন যতোটা সহজ-সরল আমরা ভাবি, তার থেকে সেটা অনেক বেশি জটিল, অনেক বেশি রহস্যঘন (হঠাৎ উঠে দাঁড়াবে)।

সুরমা—কি হোল?

সুজাতা—অভিজিৎ এসেছে।

সুরমা—সে কি—কই?

সুজাতা—আমি জানি সে এসেছে।

সুরমা—আচ্ছা আমি গিয়ে দেখে আসছি।

[সুরমা বাইরের দিকে চলে যাবেন। কিছুক্ষণ সব চুপচাপ থাকবে—সুজাতা ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোর দিকে পেছন করে বসে পড়বে। ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোর ওপারে এসে অভিজিৎ গুপ্ত দাঁড়াবে। সুরমা পাশের দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকবেন।]

সুরমা—কাউকে তো দেখলাম না—(হঠাৎ ফ্রেঞ্চ উইণ্ডোর দিকে নজর পড়বে এবং অভিজিৎকে দেখে চমকে উঠে বলবেন)—কে?

সুজাতা—(ফিরে পেছন দিকে চেয়ে অস্ফুটস্বরে বলবে) অভিজিৎ।

অভিজিৎ—(ঘরে ঢুকতে ঢুকতে) অলকা, তুমি আমার আগেই এসে গেছ? আমি ভাবতে পারি নি (সুজাতার কাছে এগিয়ে এসে নিজের ভুল বুঝতে পেরে) দেখুন, ক্ষমা করবেন—দূর থেকে আপনাকে দেখে আমার স্ত্রীর

সঙ্গে ভুল করেছি। তাঁরও এখানে আসবার কথা—

[সুজাতা উঠে দাঁড়াবে এবং কিছুক্ষণ দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে থাকবে।]

দেখুন, আপনি হয়তো আমার ব্যবহারে খুবই বিরক্ত হচ্ছেন—কিন্তু আমাদের নিশ্চয় আগে কোথাও আলাপ হয়েছে।

সুজাতা—আপনি আবার ভুল করছেন—(দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে।)

[অভিজিৎ কিছুক্ষণ তার যাবার পথের দিকে চেয়ে থাকবে, তারপর সুরমা মল্লিকের দিকে চাইবে।]

সুরমা—মিস্টার অভিজিৎ গুপ্ত।

অভিজিৎ—ঠিকই ধরেছেন।

সুরমা—আমি সুরমা মল্লিক।

অভিজিৎ—(অন্যমনস্কভাবে) নমস্কার। কিন্তু কি আশ্চর্য ব্যাপার! (বিহ্বল ভাব কাটিয়ে উঠে) ওই ভদ্রমহিলার নামটা কি বলতে পারেন?

সুরমা—ও'র নাম সুজাতা সেন।

অভিজিৎ—সুজাতা সেন? আগে ঐ নামের কারুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে বলে তো মনে পড়ছে না। হয়তো কোথাও দেখে থাকব।

সুরমা—না, আপনি আগে মিস সেনকে দেখেন নি।

অভিজিৎ—আপনি কি করে জানলেন?

সুরমা—একটু আগেই মিস সেন আমাকে বলছিলেন যে আগে আপনাদের দেখা হয় নি।

অভিজিৎ—আমার কথা উনি বলছিলেন? কখন?

সুরমা—আপনি আসার একটু আগে।

অভিজিৎ—কি বলছিলেন?

সুরমা—যে আপনি এখানে আসবেন?

অভিজিৎ—আশ্চর্য!

[অনাদি দত্ত ঘরে ঢুকবেন।]

অনাদি—আপনার লাগেজ আমি আপনার ঘরে পাঠিয়ে দিয়েছি—চার নম্বর ঘর। আমার অফিস থেকে চাবি নিয়ে যাবেন।

অভিজিৎ—ধন্যবাদ।

অনাদি—আপনাকে কি এখন চা পাঠিয়ে দেব?

অভিজিৎ—একটু বাদে আপনাকে খবর দেব।

অনাদি—আচ্ছা, নমস্কার [প্রস্থান।]

অভিজিৎ—দেখুন এবার বুঝতে পেরেছি। মিস সেনের বোধহয় আমার স্ত্রী অলকার সঙ্গে পরিচয় আছে।

সুরমা—আমার মনে হয় না সুজাতা দেবী আপনার স্ত্রীকে চেনেন।

অভিজিৎ—বুঝতে পারছি না উনি কি করে জানলেন আমি এখানে আসব।

সুরমা—আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম। তবে একটা কথা আপনাকে বলি—, She's rather an extraordinary young woman.

অভিজিৎ—(তাচ্ছিল্যের সঙ্গে) বটে!

সুরমা—আচ্ছা, আমি একটু বেরুচ্ছি—পরে দেখা হবে। [প্রস্থান।]

অভিজিৎ—(কিছুক্ষণ অস্থিরভাবে পায়চারি করবে) আশ্চর্য! আমার সঙ্গে আলাপ নেই—অলকাকে চেনে না—তাছাড়া আমি যে এখানে আসব সে কথাই বা কি করে জানতে পারলে?

[বেল টিপবেন। ধীরে ধীরে সুজাতা সেন ঘরে এসে ঢুকবেন—]

আসুন মিস সেন। বসুন।

[সুজাতা এসে ও'র ডান দিকের সোফায় বসবে। বয় এসে দাঁড়াবে—]

মিস সেন! আপনার জন্য কফি বা চা আনতে বলবো?

সুজাতা—না, ধন্যবাদ। একটু আগেই আমার ও-পর্ব সারা হয়ে গেছে।

বয়—এ সময় আমরা কফি সার্ভ করি না।

অভিজিৎ—(চড়া গলায়) তার মানে?

সুজাতা—(তীক্ষ্নস্বরে) মিস্টার গুপ্ত।

অভিজিৎ—(নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে) আচ্ছা, আমার জন্য চা নিয়ে এস।

[বয়ের প্রস্থান।]

লোকটার কথা বলার ভঙ্গিটা আমি পছন্দ করি নি। আপনি থামিয়ে না দিলে—

সুজাতা—আমি জানতাম ক্রমশ আপনার মেজাজ চড়ে উঠবে—এবং তার ফলে শেষ পর্যন্ত বেচারাকে হয়তো চড়-চাপড় দিয়ে বসবেন।

অভিজিৎ—আমি স্বীকার করছি আমার মেজাজ হঠাৎ হঠাৎ চড়ে যায়। কিন্তু আপনিও কি সম্পূর্ণ অপরিচিত লোককে এভাবে চেক্ করবার চেষ্টা করেন।

সুজাতা—অন্যের বেলায় করি না।

অভিজিৎ—(একটু চুপচাপ থাকার পর হাঠাৎ) ঐ মহিলাকে—মানে মিস মল্লিককে আপনি বলেছেন যে, আমাদের আগে কখনও দেখাসাক্ষাৎ হয় নি।

সুজাতা—তা বলেছি।

অভিজিৎ—কেন?

সুজাতা—সেটাই সত্যি কথা বলে।

অভিজিৎ—ও'কে একথাও বলেছেন যে, আমি এখানে থাকতে আসছি?

সুজাতা—মিস মল্লিক আবার সেকথা আপনাকে জানাতে গেলেন কেন?

অভিজিৎ—আপনি কি করে জানলেন যে আমি এখানে আসছি?

সুজাতা—যেভাবেই হোক আমি জানতে পেরেছিলাম।

অভিজিৎ—আমাকে বলতে আপত্তি কি?

সুজাতা—(একটু থেমে) আপনার মুখ থেকেই আমি শুনতে পেয়েছিলাম।

অভিজিৎ—আমার মুখ থেকে কবে? কোথায়?

সুজাতা—আপনি long distance-এ কথা বলছিলেন—বম্বে থেকে কলকাতায়......

অভিজিৎ—বম্বে থেকে আমি টেলিফোন করছিলাম। কিন্তু......

সুজাতা—Please অভিজিৎ—don't drive me so hard!

অভিজিৎ—(বিস্মিতভাবে) অভিজিৎ!

সুজাতা—(বিহ্বলভাবে) আমি অত্যন্ত লজ্জিত। হঠাৎ যে ওভাবে কেন আপনার নাম ধরে সম্বোধন করলাম জানি না। আপনার যে নাটকগুলো মঞ্চস্থ হয়েছে সেগুলো আমি অনেকবার করে দেখেছি। তাছাড়া আপনার সব লেখাই আমি বার বার পড়েছি। আপনার নামটা আমার এত পরিচিত এই জন্যই বোধ হয় হঠাৎ ওভাবে মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেছে—আমি অত্যন্ত দুঃখিত।

অভিজিৎ—এতে লজ্জিত হবার কিছু নেই। হয়তো আপনি যেভাবে বললেন, তাই ঠিক—কিন্তু সত্যিই কি তাই? আপনার বলবার ভঙ্গিটা কিন্তু ছিল অন্যরকম। যাক্ আপনার অনেক কথাই আমার সম্পূর্ণ হেঁয়ালীর মত লাগছে।

[অনাদিবাবু ঢুকবেন।]

অনাদি—আপনার মালপত্রের ভেতর একটা বাক্স যা ভারী ছিল—বোধ হয় বইয়ে ভর্তি?

অভিজিৎ—বই, আর আমার কয়েকটি manuscript আছে ঐ বাক্সটায়।

অনাদি—এখানে নিরিবিলিতে বুঝি লেখার কাজ করবেন।

অভিজিৎ—চার বছর আগে একটা নাটক লিখি—লেখাটা ঠিক মনের মত না হওয়াতে ফেলে রেখেছিলাম। কিছু-দিন ধরে সেটাকে নিয়েই মাজাঘসা করছি।

সুজাতা—(আত্মবিস্মৃতভাবে, কৌতূহল এবং আনন্দের সঙ্গে) 'দুর্গম হয় পন্থা' নাটকটা?

অভিজিৎ—হ্যাঁ, ঐ নাটকটাই।

সুজাতা—আমি জানতাম ঐ নাটকটায় আপনাকে আবার একদিন হাত দিতে হবে।

অভিজিৎ—নাটকটা লিখতে সুরু করেছিলাম প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে—শেষও করলাম। কিন্তু মন ভরলো না। বড্ড abstract লাগল—প্রাণবন্ততার অভাব...

সুজাতা—আমি জানি......

অভিজিৎ—আপনি জানেন?

সুজাতা—মানে......

অনাদি—মিস্ সেন নিজেও শিল্পী—উনি ছবি আঁকেন।

অভিজিৎ—বটে। তাহলে আপনি আমার তখনকার মনের অবস্থা বুঝবেন।

সুজাতা—(ঔৎসুক্যভরে) নিশ্চয়ই। তবে এখন কিন্তু নাটকটার প্রাণ আসছে।

অভিজিৎ—ঠিকই বলেছেন। চার বছরে আমার অবশ্য অভিজ্ঞতাও অনেক বেড়েছে। নাটকটার পাণ্ডুলিপি সঙ্গেই এনেছি—এখানে একটু নির্জনতা, একটু মনের শান্তি পেলেই 'দুর্গম হয় পন্থা'কে প্রথম শ্রেণীর নাটক হিসাবে তৈরি করে ফেলতে পারবো।

সুজাতা—(আবেগের সঙ্গে) আমিও সব সময়েই তাই ভেবেছি (থেমে যাবে)।

অভিজিৎ—(সুজাতা দেবীর চোখের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে) একথা আপনিও সব সময়েই ভেবেছেন।

সুজাতা—না, ও কিছু না......

অভিজিৎ—(ঈষৎ বিরক্তভাবে অনাদি-বাবুর দিকে চেয়ে) মিস্টার দত্তের কি এখানে কোন কাজ আছে?

অনাদি—(অপ্রস্তুতভাবে) আজ্ঞে না—আমি যাচ্ছি।] প্রস্থান। [

সুজাতা—(একটু ভীতভাবে) এখানে আমরা ডিনার একটু আগেই খাই—আমি একটু উঠছি।

অভিজিৎ—বসুন মিস সেন। একটা কথা আমার মনে পড়ল—আপনি নিজে থেকেই 'দুর্গম হয় পন্থা' নাটকটির নাম বললেন।

সুজাতা—(নার্ভাসভাবে) তাই বুঝি?

অভিজিৎ—হ্যাঁ, তাই। চার বছর আগে যখন নাটকটি লিখে বাক্সে আটকে রাখি—তখন থেকে আজও পর্যন্ত কারো কাছে এর সম্বন্ধে কোনো উচ্চবাচ্যই আমি করি নি। আপনি কি করে এর নাম জানতে পারলেন আমি বুঝে পাচ্ছি না।

[সুজাতা কোনো উত্তর দেবে না।]

আচ্ছা, এই হোটেলে আপনি ক'দিন ধরে আছেন?

সুজাতা—দিন চারেক।

অভিজিৎ—তার আগে?

সুজাতা—লণ্ডন থেকে জাহাজে যেদিন বম্বে আসি, সেদিনই ফ্লাই করে কলকাতা পৌঁছই। এক রাত্রি কলকাতায় থেকে পরদিন এখানে আসি।

অভিজিৎ—তাহলে দিন সাতেক আগে আপনি ছিলেন সমুদ্রের বুকে জাহাজে?

সুজাতা—ঠিকই বলেছেন।

অভিজিৎ—আমি যখন long distance telephone-এ বম্বে থেকে কলকাতায় অলকার সঙ্গে—অর্থাৎ আমার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলছিলাম—তাকে জানাচ্ছিলাম যে, শিলং-এ এসে আমরা meet করবো, তখন আপনি জাহাজে সমুদ্রের ওপর রয়েছেন। অথচ আপনি একটু আগে বললেন যে, You heard me talking on the telephone about this trip.

সুজাতা—আমি সত্যি কথাই বলেছি।

অভিজিৎ—(বিরক্তভাবে) দেখুন মিস সেন, আমি বুঝতে পারছি না, আপনি আমাকে নিয়ে ঠাট্টা করছেন, না পাগলের মত আবোলতাবোল বকছেন।

সুজাতা—(অস্ফুটভাবে) বিশ্বাস করুন, আমি আবোলতাবোল বকছি না।

অভিজিৎ—তবে আমাকে সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলুন।

সুজাতা—এখানে আসাটাই আমার ভুল হয়ে গেছে।

অভিজিৎ—(ওর উত্তর সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে) এবং বেশ বিশদভাবে সমস্তটা বুঝিয়ে দিন।

সুজাতা—যেভাবে সমস্ত ব্যাপারটাকে বিচার করছেন তারপর আমার উত্তর দেবার কিছু থাকে না। দয়া করে আমাকে যেতে দিন মিঃ গুপ্ত।

অভিজিৎ—(ওর দুটি হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে—কোমলভাবে) আমি তো সমস্ত ব্যাপারটা ভালভাবে বুঝতে চাইছি মিস সেন। আপনার ওপর জোর খাটাবো সে অধিকার তো আমার নেই।

[অলকা গুপ্ত ঘরে ঢুকে এদের এই অবস্থায় দেখবে। তারপর—]

অলকা—অভিজিৎ!

অভিজিৎ—(চমকে উঠে হাত সরিয়ে নেবে এবং ফিরে তার দিকে চেয়ে—) অলকা!

অলকা—তোমার বান্ধবীর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেবে না?

অভিজিৎ—হ্যাঁ, তা তো বটেই—মিস সুজাতা সেন—আমার স্ত্রী অলকা গুপ্ত।

[দুজনে দুজনকে নমস্কার করবে। সুজাতা ভেতরের দিকে যেতে যেতে ফিরে দাঁড়িয়ে—]

সুজাতা—ভাবছিলাম কালই এখান থেকে চলে যাব। কিন্তু এখন সবদিক বিবেচনা করে মনে হচ্ছে এখানে থেকে যাওয়াটাই সবার পক্ষে ভুল হবে (সুজাতা চলে যাবে এবং এরা দুজনে সেদিকে চেয়ে থাকবে)।

ধীরে ধীরে যবনিকা পড়বে।

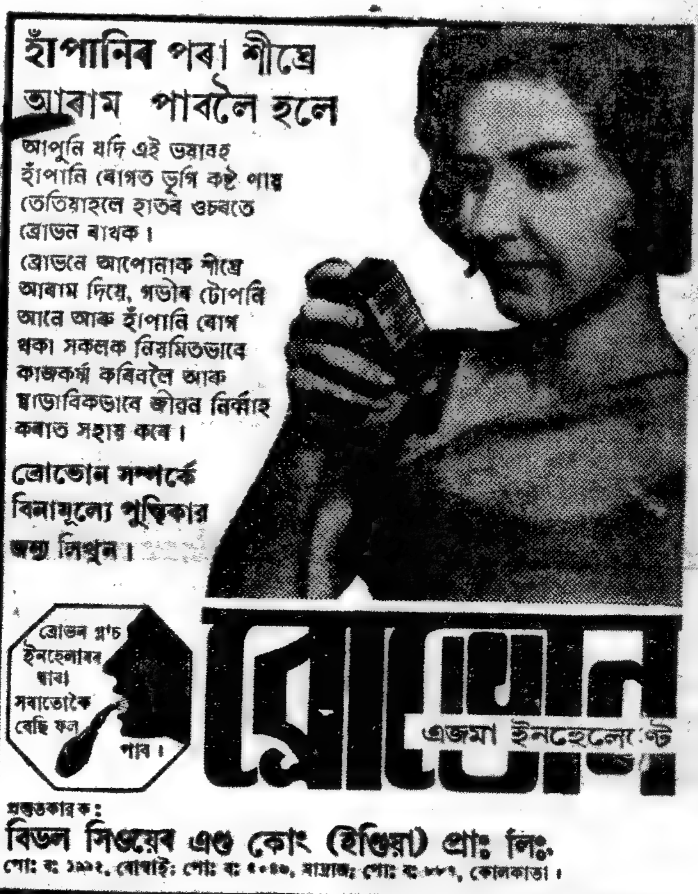

VAPL-88-788

রংঢং

খোসলা কমিটির রিপোর্ট

ফিল্ম সেন্সরশিপ তদন্ত কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। পাঞ্জাব হাই-কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি শ্রী জি, ডি, খোসলা ছিলেন এই তদন্ত কমিটির সভাপতি। এই তদন্ত কমিটির রায়ের প্রতি চলচ্চিত্র জগতের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। আমরা সম্পূর্ণ রিপোর্ট পড়বার সুযোগ পাই নি। সংবাদপত্রে যা প্রকাশিত হয়েছে তাতে শিল্পী ও পরিচালকের মৌল অধিকারে হস্তক্ষেপ না করা এবং সংবিধানের ১৯ ও ২নং ধারা যতে ক্ষুণ্ণ না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে সেন্সর বিধি প্রণয়নের কথা সুপারিশ করা হয়েছে। কমিটি সেন্সরের ব্যাপারে উদারনীতি অনুসরণের পক্ষপাতী, কথাটা চুম্বন ও নগ্নদেহ প্রদর্শনের ব্যাপারেও প্রযোজ্য। তবে এই সঙ্গে কমিটি বলেছেন, যদি সমগ্রভাবে কোন ছবিকে ওই ধরণের দৃশ্যের জন্য কুরুচিপূর্ণ ও অসুস্থ মনে হয়, তবে সেন্সর কর্তৃপক্ষ ছবিটিকে নিষিদ্ধ করে দিতে পারে। কমিটির বক্তব্যের আসল কথা মননশীল পরিচালকের পক্ষে শিল্পচিত্রের কাজ সহজতর করা, এবং সেন্সর-কোড যেন বাঁধাধরা, আক্ষরিক আইনের চেহারা নিয়ে বিচারবোধ খাটাবার সুযোগ খণ্ডিত না করে।

কমিটির এই রায় যুক্তির দিক থেকে সমর্থনযোগ্য। কিন্তু কমিটি বোধ হয় এদিকটা উপেক্ষা করেছেন যে, ভারতবর্ষ একটি ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার দেশ এবং এদেশে ছবি নির্মিত হয় শিল্পবোধ থেকে নয়, ব্যবসা হিসাবে। এদেশে যাঁরা পরিচালক তাঁরা যতটা না শিল্পচিন্তায় উদ্বুদ্ধ তার চেয়ে বেশি অর্থ উপার্জনের একটা উপায় হিসাবে এপথে আসেন। সুতরাং যে সমাজবোধ ও শিল্প-চেতনা একজন শিল্পীর থাকা উচিত তা এঁদের থাকে না, উপরন্তু থাকে কেবলমাত্র ব্যবসা-বুদ্ধিটুকু। সেন্সরের যে উদারতার কথা কমিটি উল্লেখ করেছে, সে উদারতার অন্তর্নিহিত অর্থ কমিটি বিচার করে নি। ধনতান্ত্রিক দেশে টেলিভিশনের প্রতিযোগিতার একপাশে সরে গিয়ে চলচ্চিত্র শেষ পর্যন্ত নগ্নতা ও শৃঙ্গার দৃশ্য পর্যন্ত পর্দায় প্রতিফলিত করে বাঁচার শেষ চেষ্টা করছে। সেসব দেশের সেন্সর কর্তারা বিদেশী অর্থ উপার্জনের আশায় উদারতার শেষ সীমায় পৌঁছেছেন। কিন্তু ভারতবর্ষ ধনতান্ত্রিক দেশ হলেও এদেশে টেলিভিশনের প্রতিযোগিতা নেই এবং যুদ্ধ ও ধনতান্ত্রিক সঙ্কটজনিত কারণে মানুষের স্নায়ু এখনো এত শিথিল হয়ে যায় নি যে, চুম্বন ও নগ্নদেহ দেখিয়ে উত্তেজিত করতে হবে। দুঃখের বিষয় প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীখোসলা দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ঐতিহ্যগত দিকটার প্রতি লক্ষ্য রাখেন নি। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির আমদানীকৃত বিদেশী ছবিগুলির কথা মনে রেখেই তিনি হয়ত সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন।

নগ্নদেহ ও চুম্বন সম্পর্কে আমার কোন রক্ষণশীল ধরণা নেই। আমি অজন্তা বা সূর্যমন্দিরের চিত্রের বিরোধী নই। কিন্তু চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীদের রুচি ও ধূর্ততাকে আমি ভাল করে জানি। জানি বলেই বোম্বাই ছবির স্থূলতায় পীড়িত। তদন্ত কমিটির রিপোর্টে ইতিমধ্যে কোন কোন মহলে উল্লাস দেখা দিয়েছে। তপন সিংহ প্রমুখ এই রিপোর্টকে অভিনন্দন জানিয়ে আদিরসাত্মক দিকটি সমর্থন করেছেন। উত্তমকুমার তাঁর বক্তব্যে শালীনতাটুকু বোধ হয় রাখতে পারেন নি। সমগ্র রিপোর্টের মধ্যে এই একটি-মাত্র অংশকে নিয়ে এত মাতামাতি, পত্রিকাওয়ালাদের ইন্টারভিউ ইত্যাদি কেন? একথা চিন্তা করলেই মনে হয় যতই শিল্পের দোহাই দেওয়া হোক না কেন, ছবির ব্যবসায়ীরা এই রায়কে কাজে লাগাতে একটুও দ্বিধা করবে না। সুতরাং বাংলায় না হলেও হিন্দী ছবিতে তার সুযোগ গ্রহণের দেরি হবে না।

—সুজন

'তমন্না' চিত্রে মালা সিন্হা

চিত্র আলোচনা

কুরোসাওয়ার "ইকিরু" এবং তিনটি জাপানী ছবি

গত ১লা থেকে ৪ঠা আগস্ট অপেরা সিনেমায় জাপানী চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। উৎসব উদ্বোধন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়। এই উৎসবে চারটি ছবি ইকিরু দেখান হয়েছে।

এই চারটি ছবির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পরিচালক আকিরা কুরোসাওয়ার "ইকিরু"। এক শহরের পৌরসভার নাগরিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ওয়াতানাবের জীবনকে কেন্দ্র করে এই ছবির কাহিনী। ত্রিশ বছর

চাকরির পরে সে জানতে পারলো তার ক্যান্সার হয়েছে, জীবনের পরমায়ু নির্দিষ্ট কয়েক মাসের। এই ধারণা নিয়ে বাড়ি ফিরে সে শুনতে পেল তার পুত্র এবং পুত্রবধূ আলোচনা করছে তারই সারা জীবনের সঞ্চিত অর্থ সম্পর্কে। ওয়াতানাবের মনে ভীষণ রকমের এক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হল এবং নিজেকে অসহায় বোধ করল। সে গা ভাসিয়ে দিল শহরের বারে আর নাইট ক্লাবে। হঠাৎ একদিন অফিসের তরুণী কর্মীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হল। সেই তরুণীকে নিয়ে সে কয়েকটি শহরের নানাস্থানে বেড়ালো; মেয়েটির সারল্য, উদ্দীপনার উৎস কোথায় এই জিজ্ঞাসা জাগল তার মনে। প্রশ্ন করে জানতে পারল—শিশুদের জন্য খেলনা তৈরি করে সে; কাজটা তার বড় ভাল লাগে, মনে করে তার হাতের তৈরি জিনিস খেলনা শতসহস্র শিশুর মুখে হাসি ফোটাচ্ছে—সে যেন সেই শিশুদের সঙ্গী। এই উত্তর ওয়াতানাবের অসহায় মানসিকতাকে পরিবর্তন করে দিল তার মনে পড়ল অনেক বছর আগে এক উপেক্ষিত বস্তির মা-রা পৌরসভায় আবেদন করেছিল একটা ছোট্ট পার্কের জন্য। সেই আবেদন দীর্ঘদিন ফাইলের নিচে চাপা পড়ে আছে। ওয়াতানাবে কাজে যোগ দিল এবং সেই আবেদনটি উদ্ধার করে ছেলেদের জন্য পার্ক করার কাজে লেগে গেল। অনেক প্রতিবন্ধকতার মধ্যে অবশেষে পার্কটি তৈরি হল, এবং সেদিনই রাত্রে ওয়াতানাবের মৃত্যু হল।

ছবির বক্তব্যঃ মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী, জীবনের দিনগুলি মানুষের মঙ্গলের জন্যই নিয়োজিত হওয়া উচিত। মরতে যখন হবে তখন কিছু ভাল কাজ করেই মরা ভাল। কুয়োসাওয়া এই কথাগুলি বক্তব্যের ভঙ্গিতে বলেন নি; ওয়াতানাবের মৃত্যুর পর তার সহকর্মীরা যে

কুয়োসাওয়ার 'ইকিরু' ছবির একটি দৃশ্য

আলোচনা করছে; কেন ওয়াতানাবে জীবনের শেষ দিনগুলিতে একটা পার্কের পেছনে লেগে থাকলো এই জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজতে গিয়ে কথাগুলি দর্শকমনে একে একে উদয় হচ্ছে। কুয়োসাওয়া সাহিত্যিকের মত বর্ণনাভঙ্গিতে এবং চিত্রকল্প সৃষ্টি করে বক্তব্য উপস্থিত করেছেন। ছবিটি সকলের হৃদয় স্পর্শ করে।

"ইকিরু"-তে ওয়াতানাবের চরিত্রে তাকাশি সিমুরার অভিনয় চমৎকার। ছোট্ট একটা নিরীহ মানুষ ক্রমে কি রকম একটা শক্তির অধিকারী হয়ে উঠল, অথচ সেই শক্তিতে দম্ভ নেই, নিজেকে জাহির করার লোভ নেই, আছে কেবল একটা নিরীহ মানুষের কর্তব্যবোধ, যে ভাবছে মানুষের জন্য কিছুই তো করে যেতে পারলাম না এবং একটা সৎ কাজের মধ্যে যে ডুবে থাকতে চায় জীবনের নির্দিষ্ট কয়টি দিন।

ইয়াসিজিরো ওজুর "লেট অটাম" ছবিটি সকলের ভাল লেগেছে। ওজু একজন প্রবীণ পরিচালক। কিন্তু তাঁর ছবিতে তারুণ্যে তাজা দৃষ্টি রয়েছে। বন্ধুর কন্যাকে বিয়ে দেবার ব্যাপার নিয়েঃ জাপানী পারিবারিক জীবনবোধের ভিত্তিতে ছবিটি পরিণতি লাভ করেছে, এতে নবীন ও প্রবীন দুই মানসিকতা প্রতিফলিত হয়েছে। বন্ধু-কন্যা বিয়ে করতে অনিচ্ছুক—মায়ের নিঃসঙ্গতার কথা ভেবে। বাপের তিন বন্ধু এমন এক জাল বিস্তার করল যাতে মা-মেয়েতে ভুল বোঝাবুঝি হল। সেই জালের জটিলতার গ্রন্থিগুলি খুললো তার বান্ধবী। ইতিমধ্যে মানসিক ধাক্কায় সে বিয়ের দিকে অগ্রসর হয়ে গেছে। হাল্কা মেজাজ, হাসির সংলাপ এবং সুন্দর দৃশ্যে ছবিটি উপভোগ্য। ছবির রঙ আর সঙ্গীতের কাজ খুবই প্রশংসনীয়।

হিদেও ওহবার "এনর‍্যাপচারড" একটি নর্তকীর হৃদয়ে প্রেমের জন্মকথা। জাপানী ট্রাডিশনাল নোহ্ নাচ অবলম্বন করে কাহিনী বিস্তার লাভ করেছে এবং নাচের ব্যবহারে নাটকীয়তা সৃষ্টি হয়েছে।

কেই কুমাইর "টানেল টু দি সান"-এর বিষয়বস্তু দুরারোহ পর্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়ে সুরঙ্গ তৈরি করে দুটি অঞ্চলের দূরত্ব কমিয়ে আনার এক পরিকল্পনাকে কার্যকরী করতে গিয়ে এক ইঞ্জিনীয়ার এবং সাধারণ শ্রমিকরা কি বীরত্বের পরিচয় দিল। অনেক শ্রমিক প্রাণ দিল, কিন্তু সুযোগ্য পরিচালনায় অনর্থক প্রাণহানি বন্ধ করা যায়। কাজ সম্পন্ন হয় কেবলমাত্র বুদ্ধি ও কারিগরি সরঞ্জামের দ্বারা নয়, চাই মানুষের শ্রমশক্তি ও উৎসাহিত কর্মশক্তি। যেদিন সুড়ঙ্গের কাজ শেষ হল, সেদিন ইঞ্জিনীয়ারের কন্যার মৃত্যু হল ক্যান্সার রোগে। কিন্তু ইঞ্জিনীয়ার অবিচলিত; তিনি অভিনন্দন জানালেন মানুষের শ্রমশক্তিকে।

এই চারটি জাপানী ছবির মধ্যে দুটি 'লেট অটাম' এবং 'এনর‍্যাপচারড' রঙিন। অপর দুটি সাদা-কালোয়। অপূর্ব শিল্প-

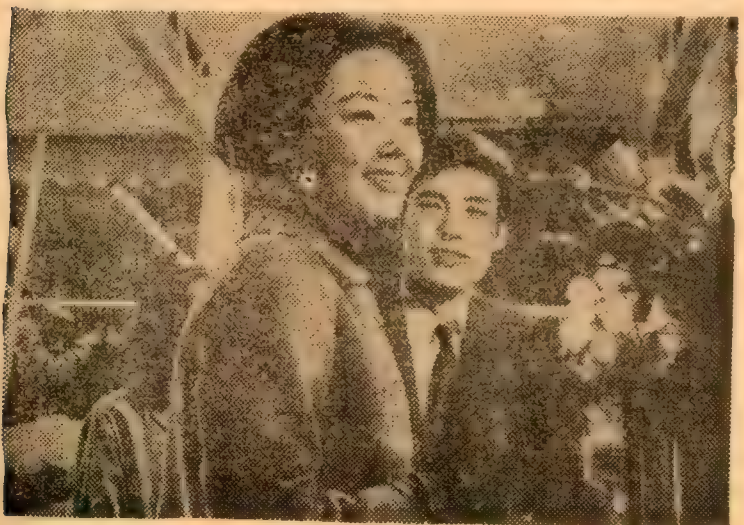

'তাইফু টো কাবুরো' ছবির একটি দৃশ্য

বোধ, রঙের পরিমিত ব্যবহার, পরিমিত সঙ্গীত, চমৎকার দৃশ্যাবলী ও অভিনয়ে ছবিগুলি চলচ্চিত্রশিল্পে জাপানী বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ। জাপানে ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্যে পণ্যচিত্রের বাজারের জন্য ছবি তৈরি করেও, কিভাবে বিষয়-বৈচিত্র্যে ছবিকে সুন্দর করা যায় এই ছবিগুলি দেখে আমাদের চলচ্চিত্র নির্মাতারা তা শিখতে পারেন। উপযুক্ত শিল্পবোধ ও সমাজ-চেতনা এবং মানুষের প্রতি কর্তব্যবোধ থেকেই ভাল ছবির জন্ম।

এই উৎসবের জন্য নির্দিষ্ট পঞ্চম ছবি "ওইফ্‌ টো ফাকুরো" আগামী ১৮ই ও ১৯শে আগস্ট একাডেমি অব ফাইন আর্টস ভবনে দেখান হবে।

ইন্দর সেন পরিচালিত 'প্রথম কদম ফুল' ছবিতে সৌমিত্র ও তনুজা

নাটকের কথা

গর্ভবতী জননী

বিজন ভট্টাচার্যের নতুন নাটক 'গর্ভবতী জননী' ক্যালকাটা থিয়েটারের প্রযোজনায় অভিনীত হচ্ছে। বাদা অঞ্চলের আদিবাসী বেদেদের কুসংস্কারাচ্ছন্ন জীবনযাত্রার নিখুঁত বাস্তব ছবি এই নাটক। প্রকৃতির আদিম সত্তার অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রতিকূল আবহাওয়ার বিরুদ্ধে ক্রমাগত ব্যর্থ সংগ্রাম। জীবনের আলোকময় সম্ভাবনার ওপরে বার বার মৃত্যুর খড়্গাঘাত নামে। মঙ্গলের নিশ্চিন্ত ঘরে দুঃখের ঝড় বয়ে যায়। মঙ্গলাচরণের মন্ত্রে বাধা পড়ে অশিব, অসুন্দরের আবির্ভাবে। মানুষ অন্ধকারের আবর্তে তলিয়ে আশ্রয় খোঁজে নিজেদের সৃষ্ট ওঝা-গুণীদের ঝাড়ফুঁক মন্ত্রতন্ত্রের জগতে। মানুষ আচ্ছন্ন হতে চায় ভুলে থাকার অন্য কোন উপায় না পেলে। কিন্তু সেই সাময়িক আচ্ছন্নতাই শেষ কথা নয়। এক সময় ঘোর কেটে গেলে আচ্ছন্ন অবস্থায় কৃতপ্রায় পাশবিক আচরণ থামিয়ে তারা আকাশের দিকে দল বেঁধে তাকায়, তাকায় এ-ওর মুখে। ওরা বলেছিল জননী গর্ভবতী হচ্ছেন, কিন্তু জননী যে মৃত! জননীর মৃত্যু মানে কি জীবনেরও মৃত্যু? যে বৃদ্ধ এতকাল তাদের স্তোকবাক্যে ভুলিয়ে রেখেছে, সে দেখায় একগুচ্ছ ধানের শিষ। একমুঠো সবুজ জীবন—মাটি যাকে ভালোবেসে জন্ম দিয়েছে। এই শাশ্বত মাতৃত্বের মৃত্যু নেই। নাটকের শেষ অংশে সেই মাটির শরীরে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম জানায় বিহ্বল অথচ প্রায় সচেতন হয়ে ওঠা একদল অসহায় মানুষ।

সংলাপ, চরিত্র, পটভূমি সমস্তই বাস্তব-ঘেঁষা হলেও একে প্রতীকধর্মী নাটক বলেই চিহ্নিত করা উচিত। তবে প্রতীকের পাশে মূল কাহিনী প্রায়ই নিষ্প্রভ। নিখুঁত অভিনয়ে অধিকাংশ চরিত্রে তার নিজস্ব মানবিক সত্তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে নৈর্ব্যক্তিক গুণাবলী। এ কারণে অভিনয়ের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মঞ্চে ফুটিয়ে তোলা জগৎ আমাদের জগতের মতই স্পষ্ট, সত্য, বাস্তব। দলগত অভিনয় নাটকটির বৈশিষ্ট্য এবং এজন্য সকলেই অভিনন্দনযোগ্য।

ব্রত, পাঁচালী, যাগযজ্ঞের রীতিনীতি, লোকগীতিতে নাট্যকার নিষ্ঠার সঙ্গে বাদা অঞ্চলের মানুষের জীবনের খুঁটিনাটি মূর্ত করে তুলেছেন। এ জগৎ রূপকথার মত অথচ রূপক নয়। প্রথম থেকে এই সুরে নাটকটি বাঁধা।

নাটকটি পরিচালনা করেছেন বিজন ভট্টাচার্য।

স্টুডিও খবর

রক্তের রঙ লাল

নিও ফিল্মস্ শৈলেশ দে-র 'বিনয়-বাদল-দীনেশ' অবলম্বনে একটি ছবির কাজে হাত দিয়েছে। ছবিটি পরিচালনা করছে দীপক গুপ্ত। ত্রিশ দশকের বাংলায় বিপ্লবী প্রচেষ্টাকে অবলম্বন করে এই চিত্র-কাহিনীতে তিনজন যুবকের প্রাণদানের কথা বলা হবে।

শোক-সংবাদ

হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের জীবনাবসান

পশ্চিমবঙ্গ চলচ্চিত্র কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায় গত ৪ঠা আগস্ট রাত্রিতে হাসপাতালে মারা গিয়েছেন। তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ যকৃতের রোগে ভুগছিলেন; শেষ পর্যন্ত এই রোগ যকৃতের ক্যান্সার বলে নির্ণীত হয়। চিকিৎসার জন্য তিনি মস্কো গিয়েছিলেন কিন্তু সেখানে আরোগ্য লাভ করেন নি। শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু-সংবাদে চলচ্চিত্র জগতে শোকের ছায়া পড়ে। দলে দলে সিনেমা কর্মচারীরা ইউনিয়ন অফিসে উপস্থিত হয়ে শোক প্রকাশ করেন। সিনেমা প্রযোজক, শিল্পী, স্টুডিও কর্মী থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, যুব ও ছাত্র সংগঠনের সদস্যরা এবং তাঁর অগণিত বন্ধু উপস্থিত হয়ে বিরাট শোকমিছিল সহকারে কেওড়াতলায় অন্ত্যেষ্টি কাজ সম্পন্ন করেন। ৫ই আগস্ট কলকাতার সমস্ত সিনেমা বন্ধ রেখে শোক প্রকাশ করা হয়।

ইতিহাসের পাতা থেকে

নতুন জীবন—নতুন নায়ক

॥ বাইশ ॥

অপরদিকে 'বিগ লাইফ'-এর (চিত্রনাট্য) পাবেল নিলিন, পরিচালক লিওনিড লুকভ

'তীরভূমি' ছবিতে মাধবী মুখার্জী ও রুমা গুহঠাকুরতা।

১৯৩৯) নায়ক এক তরুণ খনি-শ্রমিক বালুন; তার জীবনের অভিজ্ঞতা নেহাৎ কম। সবেমাত্র সে জীবনপথে যাত্রা শুরু করেছে। বোরিশ আন্দ্রেয়েভ এই চরিত্রে অভিনয় করেছে এক উদ্দীপনাপূর্ণ, স্বতঃস্ফূরিত উৎসাহে ভরা যুবক, চারপাশে কি ঘটছে তা নিয়ে ওর তেমন মাথাব্যথা নেই, নিজের সমস্যা নিয়েও মাথা ঘামায় না। কিন্তু খনির ভেতরে এক জটিল পরিস্থিতি চলছে, সেখানে নতুন ও আধুনিক কাজের ব্যবস্থা চালু হয়েছে। পরিস্থিতি বালুনের পরিবর্তন ঘটায়, সে বুঝতে পারে সমাজের জন্য কিছু করা দরকার, কারণ এই সমাজের সে-ও একজন; পরিস্থিতি তাকে নিজের কর্তব্য হৃদয়ংগম করতে সাহায্য করে।

এই দুটি ছবিতে দেখা যায় সোভিয়েত সমাজে মৌলিক পরিবর্তনে কিভাবে নতুন চরিত্র সৃষ্টি হচ্ছে। এ সময় সেগেই গেরাসিমভ এবং ইউলি রেইসম্যান সমসাময়িক বিষয়ের ওপর উল্লেখযোগ্য কাজ করেন। তাঁরা নতুন চরিত্রগুলির ওপর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, যে চরিত্রগুলি নতুন সমাজে জন্ম নিচ্ছে নতুন নৈতিক চেতনা থেকে। গেরাসিমভের "দি ডেয়ারিং সেভেন" (১৯৩৬) ছবি আর্কটিক অভিযানের সদস্যদের নিয়ে। পরিচালক আর্কটিকের শীতে সদস্যদের সেখানে থাকতে অসুবিধার ওপর জোর দেন নি; এই ছোট্ট দলটা যে বিচ্ছিন্ন জীবন কাটাচ্ছে তার ওপরও জোর দেন নি, অথবা তাদের জীবনে যে দুর্ভাগ্য নেমে এসেছে সে-কথাও দেখান নি। তাঁকে উৎসাহ যুগিয়েছে অন্য জিনিস; পরস্পরের দায়িত্ববোধ, যে দায়িত্ববোধ এই লোকগুলিকে এক জায়গায় এক বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবারের মত ঐক্যবদ্ধ করেছে; অসুবিধা এবং দুঃখকে অনায়াসে সহ্য করার ক্ষমতা জুগিয়েছে। অত্যন্ত সতর্কভাবে চরিত্রগুলির মনের ভিতরের কথা প্রকাশ করা, অর্থপূর্ণ সংলাপে মনের গভীরতা ও তাদের অনুভূতিকে তুলে ধরার মধ্যে গেরাসিমভ এবং তাঁর তরুণ অভিনেতারা (তামারা মাকারোভা, নিকোলাই বোগোলাইয়োবভ, পিয়তর এলেইনিকভ, ওলেগ ঝাকভ, অন্দ্রেই এপসোলন, ইভান কুজনেৎসব এবং ইভান নভোসেলৎসেভ) সোভিয়েত যুবমানসের যৌথ জীবন-চেতনা প্রকাশ করেছেন। যারা মাত্র পাঁচ বছর পরে যুদ্ধের ভয়াবহ যন্ত্রণা ও বোঝা বহন করেছে। সংযত শিল্পবোধ ও বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপে এই ছবি সোভিয়েত দর্শকদের কাছে আজো আকর্ষণীয় হয়ে আছে।

গেরাসিমভ একই প্রশ্ন তুলেছেন ভিন্ন বিষয় নির্ভর করে তাঁর "কমসোমলস্ক (১৯৩৮)" এবং "দি টিচার" (১৯৩৯) ছবিতে। একটি ছবির বিষয়—একদল তরুণ দূরপ্রাচ্যের অহল্যাভূমি টাইগায় গেছে এক নতুন শিল্পশহর গড়ে তুলতে। অপর ছবিটির কাহিনী এক কৃষক তরুণীর সংগে (তামারা মাকারোভা) এক যুবক শিক্ষকের সম্পর্ক নিয়ে, যে শিক্ষক গ্রামাঞ্চলে কাজ করতে গিয়েছিল (বোরিশ চিরকভ)।

ইউলি রেইসম্যানের কাব্যধর্মী অবদান এবং মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণশক্তি প্রথম প্রকাশ পেল তাঁর "ফ্লায়ার্স" (১৯৩৫) ছবিতে। এই ছবির কাহিনী—এক বিমান চালনা শিক্ষার্থিনী তরুণীকে নিয়ে (ইয়েভগেনিয়া মেলনিকোভা), যে তার শিক্ষকের (ইভান কোভাল-সামবরস্কি) প্রেমে পড়েছিল, শিক্ষকটি ছিল নিজেকে জাহির করা এবং আত্মপ্রচারে ওস্তাদ। ক্রমে তরুণীর ভুল ভাঙল এবং তার মধ্যে শিক্ষায়তনের প্রধান সম্পর্কে এক নতুন চেতনার উদ্ভব হল (বোরিশ শচুকিন)। যাঁর যথেষ্ট বয়স হয়েছে এবং তাঁর পেছনে বীরত্বের কোন ছাপ নেই বা বড়াই করার মত কিছু নেই। পরিচালক কেবলমাত্র এই মানুষগুলির পরস্পর সম্পর্কের মধ্যে কাহিনীকে আবদ্ধ রাখেন নি, তিনি বিমান চালকদের জীবন দেখিয়েছেন, যে জীবন এবং পরিস্থিতিতে এরূপ নায়িকাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা যায়।

রেইসম্যানের "মাশেন্কা" নির্মিত হয়েছে ইয়েভগেনি গাব্রিলোভিচ-এর চিত্রনাট্য অবলম্বনে। এই ছবিটি আরো বেশি সাফল্য লাভ করেছে। চিত্রগ্রহণ আরম্ভ হয় ১৯৪১ সালের শুরুতে এবং শেষ হয় যুদ্ধের সময়ে। 'মাশেনকা' ছবিতে অভিনেত্রী ভালেনটিনা কারাভায়েভা অসাধারণ নৈতিক শক্তি এবং অতুলনীয় সৌন্দর্যের এক চিত্রকল্প সৃষ্টি করেন। শুরুতে মাশেনকাকে মনে হয় বোকা, অনাধুনিক, এমন কি গ্রাম্য ভাবভঙ্গির জন্য কিছুটা হাস্যকর। কিন্তু ক্রমে দর্শক উপলব্ধি করবেন এই বোকা-সোকা ভাবের মধ্যে রয়েছে এক শক্তিশালী নৈতিক শক্তি এবং সততা; এমন এক চরিত্র যে আদর্শের সংগে আপোষ করে চলতে পারে না। ছবির শেষে যখন এই ছোট্ট, কৃশকায়া তরুণীকে সৈনিকদের ঢিলেঢালা পোশাকে দেখা যায়, তখন কারো মনে সন্দেহ জাগে না যে, এই তরুণী যে-কোনরকম দুঃসাহসিক কাজ করতে পারে। —ক, স, গ।

৮ই আগস্ট শুভমুক্তি

সংসার-সমুদ্রে দিকহারা এক
নাবিকের তীরের অনুসন্ধিৎসা—

উত্তরা : পূরবী : উজ্জলা
পদ্মশ্রী : অশোকা : যোগমায়া
মায়াপুরী : জয়শ্রী : শ্রীকৃষ্ণ
মীনা : শ্রীরামপুর টকীজ
নৈহাটী সিনেমা

সুপার লীগ

সুপার লীগের খেলা অনেক দূর এগিয়ে গেছে—শুধু তাই নয়, লীগ ফুটবলের আসর প্রায় শেষ হয়েও এলো। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল, বি এন আর, বাটা আর পোর্ট কমিশনার্স সুপার লীগের খেলাকে কেন্দ্র করে নিজেদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল। যাই হোক নমো নমো করে ফুল-বেলপাতা দিয়ে পুজো সারার মতো এবারের ফুটবল মরশুমও শেষ পর্যন্ত শেষ হলে বাঁচি। আর যাই হোক তাহলে অন্তত যে অন্তিম অবস্থার মধ্যে দিয়ে কলকাতার ফুটবল দিন কাটাচ্ছিলো তার হাত থেকে তো রেহাই পায়। অবশ্য আখেরে যে কি হবে তাও কেউ কল্পনাও করতে পারে না। লীগের পালা যদি শেষ পর্যন্ত ভালোয় ভালোয় চুকে যায় তাহলে লীগ ফুটবলের পরে আই এফ এ শীল্ডের ভাগ্যে যে কি ঘটবে কে জানে! এ ভয়ের কারণও অসংগত নয়, কারণ কলকাতা ময়দানে গত দু'তিন বছর লীগ আর শীল্ডের খেলা নিয়ে যে সব কাণ্ড-কারখানা ঘটে গেছে তার কথা যে ফুটবলরসিকরা কোনদিনই ভুলতে পারবেন না। আর সেইজন্যেই সেই সব ঘটনা আবার ঘটার আশংকায় শংকিত হয়ে আছেন বাংলাদেশের ফুটবলরসিকরা। কারণ ঐ সব ঘটনাগুলো ভারতীয় ফুটবল জগতে বাংলাকে অনেক নিচে নামিয়ে এনেছে। ভারতীয় ফুটবলে বাংলা আজো অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু বাংলা দেশের এই শ্রেষ্ঠত্ব আর বেশিদিন থাকবে বলে মনে হয় না—কারণ বাংলাদেশে ফুটবল খেলা নিয়ে রীতিমত ছেলেখেলা শুরু হয়েছে। আর এই ধারা যদি আরো কিছুদিন অব্যাহত থাকে তাহলে আর দেখতে হবে না। কিন্তু এই অবস্থা পরিবর্তনের জন্যে এখনো যে কিছুই করা হচ্ছে না। করবে আর হবে? আদৌ হবে কি? সকলেই আছেন নিজের স্বার্থ নিয়ে। ফলে আসল কাজটাই বাদ থেকে যাচ্ছে। অথচ ঠিক এমনটি তো হবার কথা নয়। আসলে এখন সব বিষয়েই আন্তরিকতার অভাব। তবে ফুটবল খেলায় এই অভাব বোধটা বড় বিশ্রী ভাবে প্রকট হয়ে উঠেছে। খেলোয়াড়দের খেলায় আন্তরিকতার অভাব, পরিচালকদের পরিচালনায় নেই এতটুকুও আন্তরিকতার ছাপ এমন কি দর্শকদের মধ্যে থেকেও ফুটবল খেলার ওপরে সেই আন্তরিক টানের জায়গায় এসে স্থান নিয়েছে উগ্র ক্লাবপ্রীতি। ফলে ভালো খেলা খারাপ খেলার প্রশ্ন উঠে গিয়ে আজ জয়-পরাজয়ই আসল হয়ে দাঁড়িয়েছে। খেলার মানও তাই দিনের পর দিন নেমেই যাচ্ছে। কিন্তু এই অবস্থার পরিবর্তন যদি না ঘটে তাহলেই তো সর্বনাশ। ফুটবল খেলাতেও বাংলা এখনই পিছিয়ে পড়ছে আর এই অবস্থা যদি চলতে থাকে তাহলে আর দেখতে হবে না—ভারতীয় ফুটবলে বাংলা আরো বিশ্রীভাবে পিছিয়ে পড়বে। কিন্তু সে দিকে নজর দেবার মতো অবসর আজ কারো নেই। সকলেই আজ নিজের ধান্দায় ব্যস্ত। ফলে বাংলাদেশের ফুটবলের অবস্থা এখন অনেকটা সেই দড়ি ছেঁড়া গরুর মতো। কিন্তু এভাবে আর কতোদিন চলবে—আর কতোদিন এইভাবে চলতে দেওয়া হবে ভারতীয় ফুটবলের পিঠস্থান, বাংলাদেশের ফুটবল খেলাকে? —শান্তিপ্রিয়

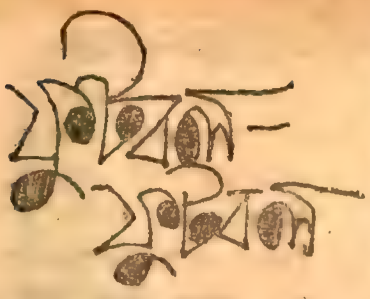

অনেক টানা-হেঁচড়ার পর সুপার লীগের খেলা শেষ হয়েছে। আর এতোদিনে সেই খেলা প্রায় শেষও হয়ে এলো। পাঁচটি দলের লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপের প্রশ্ন নিয়ে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায় ময়দানী ফুটবলের সেরা দুটি দল—মোহনবাগান আর ইস্টবেংগল আছে। আর লীগ চ্যাম্পিয়নশীপের প্রশ্নও ছিল এই দুটি দলকে ঘিরেই।

কিন্তু প্রথম খেলাতেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাব পোর্ট কমিশনার্স দলের কাছে একটা পয়েণ্ট নষ্ট করে সুপার লীগের যাত্রাপথে প্রথমেই এক ধাপ পিছিয়ে পড়েছে। প্রথম খেলাতেই পয়েণ্ট নষ্ট করা রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। শুধু তাই নয়—পেনাল্টির সুযোগ পেয়েও গোল করতে পারেনি ইস্টবেঙ্গল। অথচ পরিমল দে-ই নিয়েছিলেন পেনাল্টি কিকটা। সাংঘাতিক পেনাল্টি কিক করতে পারেন বলে পরিমলের যথেষ্ট নাম আছে। পরিমল দে-র পেনাল্টি কিক ঠেকানো এক রকম অসম্ভবই। সকলেই জানেন যে পরিমল দে একশ'টা শর্ট করলে তার মধ্যে নব্বুইটা গোল হয়—থংগরাজের মতো নামী গোলরক্ষকও পারেন না পি দে-র পেনাল্টি কিক বাঁচাতে। সেই পরিমল দে-ই পারলেন না অমন একটা সময়ে পেনাল্টি কিক থেকে গোল করতে। ফলে সুপার লীগের প্রথম খেলাতেই পোর্ট কমিশনার্স-এর কাছে ইস্টবেংগল হারলো একটা পয়েণ্ট।

সেদিক দিয়ে মোহনবাগানের সূচনা ভালোই হয়েছে। বি এন আর চিরদিনই মোহনবাগানের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে তোলে। এবারও অর্থাৎ সুপার লীগের খেলাতেও বাদ যায় নি। প্রথম থেকেই বি এন আর তীব্র আক্রমণী মনোভাবের পরিচয় দিয়ে খেলতে থাকে। মোহনবাগানর নিরঙ্কুশ প্রাধান্য বজায় থাকলেও প্রথম গোলটি করার জন্যে মোহনবাগানকে যেমন অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে থাকতে হয়েছিলো তেমনি গোলটি করার জন্যে খেলোয়াড়দের হিমসিম খেয়ে যেতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত মোহনবাগান দুগোলে হারিয়ে দিলো বি এন আর-কে।

সুপার লীগের খেলা যতোটা আকর্ষণীয় হবে বলে কর্তৃপক্ষ আশা করেছিলেন ঠিক ততোটা হচ্ছে কি? মনে তো হয় না—সুপার লীগের খেলার যতো আকর্ষণ তা ঐ মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গলের খেলাকে ঘিরেই। শহর ভেঙে দর্শকরা আসেন ঐ দুটি দলের খেলা থাকলে—অন্য খেলাগুলোর কথা তো ভাবাই যায় না। একবার ভেবেই দেখা যাক না যে বাটা বনাম পোর্ট কমিশনার্স দলের খেলার আকর্ষণ সাধারণ দর্শকদের কাছে আর কতোটুকুই বা হতে পারে।

তাহলে সুপার লীগের খেলার সার্থকতা কোথায়? এর চেয়ে তো ডাবল লীগের খেলা অনেক ভালো ছিল। অথচ ফুটবল কর্তৃপক্ষের বদ্ধমূল ধারণা যে, বাংলাদেশের ফুটবল খেলার মান উন্নত করতে হলে সুপার লীগের খেলার প্রয়োজন সব থেকে বেশি।

এই প্রসংগে আমরা শুধু একটা প্রশ্নই করতে চাই—এতে লাভটা হচ্ছে কি? এতোটুকুও লাভ হয়েছে বা হচ্ছে বলে তো আমাদের মনে হয় না। ফুটবল কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের তাই বিনীত নিবেদন, এইসব সুপার লীগ-টীগের দিকে বেশি নজর না দিয়ে, গোড়ার গলদগুলো দূর করার জন্যে চেষ্টা করুন আপনারা। ময়দানী ফুটবল এখন আর সোজা পথে চলছে না—তাকে এবার সোজা পথে চলার ব্যবস্থা করে দিন। যা করার তা করুন আন্তরিকভাবে—আপনাদের আন্তরিকতার ছাপ যেন সকলের ওপরেই পড়ে, একমাত্র তাহলেই বাংলাদেশের ফুটবল খেলার মান উন্নত হতে পারে—আর ভারতীয় ফুটবল জগতে বাংলা ফিরে পেতে পারে তাদের হারানো সম্মান। আর সময় নেই, এখনই কাজ শুরু করতে হবে—আর সে কাজ শুরু করার প্রয়োজন একেবারে প্রথম থেকেই।

সুপার লীগে মোহনবাগান বনাম বি· এন· আর দলের খেলায় রেল দলের গোলরক্ষক বি· সাধুখাঁকে মোহনবাগানের প্রণব গাঙ্গুলীর পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একটি নিশ্চিৎ গোল রক্ষা করতে দেখা যাচ্ছে।

রণজিৎ ভট্টাচার্য (গৌহাটি, আসাম)

প্রশ্ন : আই এফ এ শীল্ড, রোভার্স ও ডুরাণ্ড কাপ কোন্ বছর থেকে আরম্ভ হয়। এই প্রতিযোগিতাগুলির উদ্বোধনী বছরে কোন্ কোন্ দল লাভ করেছিল বিজয়ীর সম্মান।

উত্তর : আই এফ এ শীল্ড,
১৮৯৩ সালে—রয়াল আইরিশ রাইফেল দল।
রোভার্স কাপ,
১৮৯১ সালে—১ম উস্টার্স রেজিঃ
ডুরাণ্ড কাপ,
১৮৮৮ সালে—রয়াল স্কট ফ্যুসিঃ

অজয় মুখোপাধ্যায় (টাকী, ২৪-পরগনা)

প্রশ্ন : টেস্ট খেলায় একটি দলের পক্ষে একটি খেলায় সবচেয়ে বেশি সেঞ্চুরীর খতিয়ান কি?

উত্তর : ১৯৫৪-৫৫ সালে কিংসটনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়ার ৫ জন খেলোয়াড় সেঞ্চুরী করেছিলেন।

ম্যাকডোনাল্ড—১২৭ রান
হার্ভে —২০৪ রান
মিলার —১০৯ রান
আরচার —১২৮ রান
বেনো —১২১ রান

সেই খেলায় অস্ট্রেলিয়া ৮ উইকেটের বিনিময়ে করেছিল ৭৫৮ রান।

দেবাশীষ মুখোপাধ্যায় (করলবাগ, নেউদিল্লী)

প্রশ্ন : একটি মরশুমে সবচেয়ে বেশি শূন্য করার রেকর্ড কে করেছেন? কোন্ সালে কোন্ দলের বিরুদ্ধে।

উত্তর : পঙ্কজ রায় ১৯৫২ সালে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে ৭টি ইনিংসের মধ্যে শূন্য রানে আউট হয়েছিলেন ৫ বার

সোমেন ঘোষ ও পদ্মারাণী ঘোষ (আড়িয়াদহ, কলকাতা)

প্রশ্ন : এক মরশুমে সবচেয়ে বেশি ডাবল সেঞ্চুরী করেছেন কে কে? এঁদের মধ্যে কোন ভারতীয় আছেন কি?

প্রশ্ন উত্তর

বাবলু মুখার্জী ও প্রাণগোপাল সরকার (কৃষ্ণনগর, নদীয়া)

প্রশ্ন : ১৯৫০ সাল থেকে বিশ্বকাপের ফলাফল জানতে চাই। প্রতিযোগিতার স্থান ও অংশগ্রহণকারী দেশের সংখ্যাও জানাবেন।

উত্তর :

সাল	বিজয়ী	রানার্স	স্থান	দেশের সংখ্যা
১৯৫০	উরুগুয়ে	ব্রেজিল	ব্রেজিল	৩৩
১৯৫৪	পঃ জার্মানী	হাঙ্গেরী	সুইজারল্যাণ্ড	৩৮
১৯৫৮	ব্রেজিল	সুইডেন	সুইডেন	৫৩
১৯৬২	ব্রেজিল	চেকোশ্লোভাকিয়া	চিলি	৫৬
১৯৬৬	ইংল্যাণ্ড	জার্মানী	ইংলণ্ড	৪৩

পরিতোষ নাগ (বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি)

উত্তর : তোমার অনেকগুলো চিঠি আমাদের কাছে জমে আছে। কিন্তু প্রত্যেক সংখ্যায় কিম্বা বার বার তো একজনের চিঠির উত্তর দেওয়া সংগত নয়—তাই। আশা করি আমাদের অসুবিধাটা তুমি বুঝবে। যাই হোক সুকল্যাণের ওপর কোন লেখা এখন আর পাঠিও না। কারণ ওঁকে নিয়ে তো সাপ্তাহিক বসুমতীতে লেখা হয়েছে। তুমি অন্য কোন লেখা পাঠিও কেমন!

যাই হোক তুমি যাদের বোলিং এ্যাভারেজ জানতে চেয়েছো তাঁদের নাম নীচে দেওয়া হলো—

নাম	টেষ্ট	বল	মেডেন	রান	উইঃ	গড়
রামাধীন	৪৩	১৩,৯৩৯	৮১৩	৪,৫৭৭	১৫৮	২৮,৯৬
সুভাষ গুপ্ত	৩৬	১১,২৮৪	৫৯৯	৪,৪০২	১৪৯	২৯'৫৪
ফজল মামুদ	৩৪	৯,৮৭০	৫৪৪	৩.৪৪০	১৩৯	২৪'০২
ট্রুম্যান	৬৭	১৫,১৭৮	৫২২	৬,৬২৫	৩০৭	২১'৫৭
লিণ্ডওয়াল	৬১	১৩,৬৬৬	৪১৮	৫,২৫৭	২২৮	২৩'০৫
ডেভিডসন	৪৪	১১,৬৬৫	৪৩২	৩,৮২৮	১৮৬	২০'৫৮

[illegible] দাশ (দাশনগর, হাওড়া)

প্রশ্ন : ১৯১১ সালে আই এফ এ শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগান দলের খেলোয়াড়দের নাম জানতে চাই।

উত্তর : শিবদাস ভাদুড়ী (অধিনায়ক), জ্যোতিরিন্দ্রনাথ রায় (কানুবাবু), হাবুল সরকার, অভিলাষ ঘোষ, বিজয়দাস ভাদুড়ী, রাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, নীলমাধব ভট্টাচার্য, হীরালাল মুখার্জী, মনমোহন ঘোষ, সুধীর চ্যাটার্জী ও এ সুকুল।

অমিতাভ চক্রবর্তী (গড়িয়াহাটা রোড, সাউথ, কলকাতা-৩১)

প্রশ্ন : সাপ্তাহিক বসুমতীর খেলাধুলোর বিভাগটা মনে হয় সব থেকে ভালো—অন্তত আমার তো তাই মনে হয়। খেলাধুলোর ওপর আপনাদের সম্পাদকীয় মন্তব্যের তুলনা হয় না। আমাদের মনের কথাটাই আপনারা পাঠকদের সামনে তুলে ধরেন। তা ছাড়া 'গল্প হলেও সত্যি' ও 'প্রশ্ন-উত্তর' বিভাগ দুটিও আমাদের খুব ভালো লাগে।

উত্তর : আপনার চিঠি পেয়ে আমরা উৎসাহিত হয়েছি আর আপনাকেও জানাচ্ছি আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

উত্তর :

৬ বার—ব্র্যাডম্যান (১৯৩০ সালে)—৩৩৪, ২৫৪, ২৫২*, ২৩৬, ২৩২ ও ২০৫* রান
৫ বার—রণজি সিংজী (১৯০০ সালে)—২৭৫, ২২২, ২২০, ২১৫* ও ২০২ রান
৫ বার—উইকস (১৯৫০ সালে)—২৩২, ৩০৪*, ২৭৯, ২৪৬* ও ২০০ রান
৪ বার—সি ফ্রাই (১৯০১ সালে)—২৪৪, ২৪১, ২১৯* ও ২০৯ রান
৪ বার—ই হেনড্রেন (১৯২৯—৩০)—২৫৪*, ২২৩*, ২১১*, ও ২০৫* রান
৪ বার—হ্যামণ্ড (১৯৩৩ সালে)—২৬৪*, ২৩৯, ৩২১, ও ২০৬, রান
৪ বার—হ্যামণ্ড (১৯৩৪ সালে)—৩০২*, ২৯০, ২৬৫* ও ২১৭, রান
৪ বার—ভিমারচেণ্ট (১৯৪৪—৪৫ সালে)—২২১*, ২১৭, ২৭৮, ও ২০১, রান

(*নট আউট)

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতী

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে [illegible]
মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা

প্রধানমন্ত্রী ও সিন্ডিকেট-গোষ্ঠীর বিরোধ
চূড়ান্ত পর্যায়ে

৪ বর্ষ ঃ ৯ম সংখ্যা. বৃহস্পতিবার, ৪ঠা ভাদ্র, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [74 year, No. 9, 21st Aug.,

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৫১৫
আজকের মানুষ		৫১৬
সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	শঙ্করীপ্রসাদ বসু	৫১৭
বই-বহাই—বাংলা বইয়ের মেলা	হরপ্রসাদ মিত্র	৫২১
বঙ্গদর্শন		৫২৫
ভারতদর্শন		৫২৮
আন্তর্জাতিক		৫৩১
সপ্তাহের বোকা	কৃত্তিবাস ওঝা	৫৩৩
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	অনন্ত সিংহ	৫৩৫
সাগর সংগমে (ধারাবাহিক-উপন্যাস)	সুশীল জানা	৫৩৮
শহর কলকাতা	শহরদর্শী	৫৪২

যে কোন

গয়না

আর

আ স ল

গ্র হ র ত্ন

কেনার

দক্ষিণ কোলকাতায়

নামকরা প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সন অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ডসন্স অব

এম. বি. সরকার

এ. সরকার এণ্ড সন্স

৯৩।১৭ রাসবিহারী এভিনিউ

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ (প্রবন্ধ)	তুষার চট্টোপাধ্যায়	৫৪৩
মৃত্যের প্রার্থনা (কবিতা)	ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়	৫৪৬
পুলিশ! পুলিশ! (কবিতা)	উলূখড়	৫৪৬
তালপাতার সেপাই (গল্প)	অশোককুমার সেনগুপ্ত	৫৪৭
পূর্ববঙ্গের কবি (প্রবন্ধ)	অমিয়কুমার হাটি	৫৫১
তিমিরপ্রান্ত তুর্গ	অগ্নিবর্ণ	৫৫৫
সুন্দরবন উন্নয়ন পরিকল্পনা ঃ কয়েকটি প্রস্তাব	মাখনলাল ঘোষ	৫৬০
গ্রন্থমেলা		৫৬৩
রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে	শিলাজি	৫৬৪
রূপজগৎ		৫৬৭
পাঠকমন		৫৭১
খেলাধূলা	শান্তিপ্রিয়	৫৭২

॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥

বহুকাল পরে আবার পাওয়া যাচ্ছে।

ম হা ক বি

গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচনাবলী

প্রথম খণ্ড ঃ প্রফুল্ল, ম্যাকবেথ, ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে চারটি প্রবন্ধ, তিনখানি গীতিনাট্য ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১২। মূল্য দশ টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড ঃ সিরাজউদ্দৌলা ; ব্যায়সা কা ত্যায়সা ; জনা ; দোললীলা ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫৮। মূল্য দশ টাকা।

তৃতীয় খণ্ড ঃ পাণ্ডবগৌরব, বলিদান, আবুহোসেন ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫২। মূল্য দশ টাকা।

চতুর্থ খণ্ড ঃ চৈতন্যলীলা, ভ্রান্তি, মীলনাবিকাশ, হীরার ফুল, বিবিধ রচনা ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০২। মূল্য দশ টাকা।

পরমহংসদেব শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত-শিরোমণি অতি প্রিয় নোটো গিরিশকে বলেছিলেন, —"অভিনয়ের প্রয়োজন আছে বৈ-কি—ওতে লোকশিক্ষা হবে। আর তোমার লেখা—ও যে ভারি ভাল হয়েছে।"

[illegible] খণ্ড বোর্ডে বাঁধাই। মূল্যবান কাগজে ছাপা।

রচনাবলী সম্পাদনা ঃ শ্রীরমেন চৌধুরী

অবিলম্বে অর্ডার পেশ করুন।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ঃ ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

CENTRAL LIBRARY
UNIVERSITY

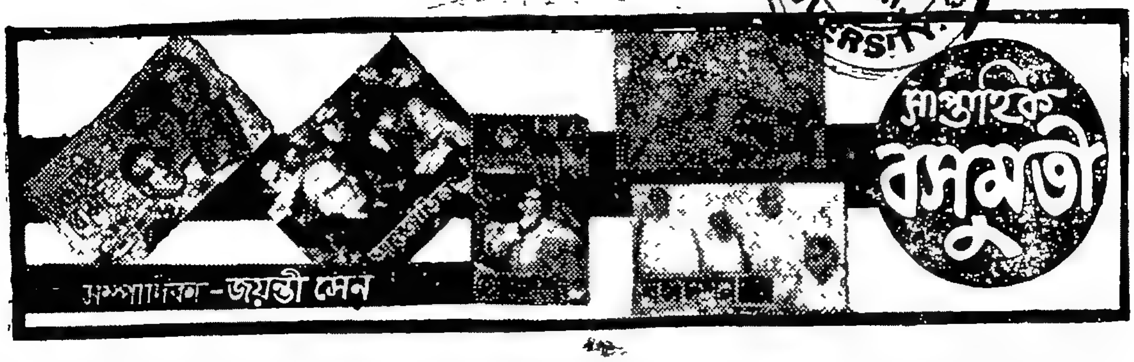

৭৪ বর্ষ ঃ ৯ম সংখ্যা—মূল্য ঃ ৩০ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ৪ঠা ভাদ্র, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 21st August, 1969

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ও কংগ্রেস

কংগ্রেস আজ চরম সঙ্কটের মুখে। এই দল আজ দ্বিধাবিভক্ত। একদিকে সিন্ডিকেটপন্থী, অন্যদিকে সিন্ডিকেট-বিরোধী ; এই দুই উপদলের লড়াই দেশের সর্বোচ্চ পদটিকেও স্পর্শ করেছে।

সিন্ডিকেটপন্থীদের প্রধান হচ্ছেন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা, তাঁকে মদত দিচ্ছেন শ্রীপাতিল, শ্রীদেশাই প্রমুখ দক্ষিণপন্থী দিকপালরা। অপরদিকে প্রগতিমূলক কাজের দ্বারা জনগণের পাশে থেকে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবার স্বার্থে বলিষ্ঠ ও দ্বিধাহীন নেতৃত্ব দিচ্ছেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দক্ষিণ-পন্থীদের প্রথম বিবাদের শুরু ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ নিয়ে। সমস্ত রকম ভেদ-বুদ্ধি ও ব্যক্তিগত কুৎসা তুচ্ছ করে প্রধান-মন্ত্রী ব্যাঙ্ক জাতীয়করণে জয়ী হলে গোপনে শুরু হয় 'ইন্দিরা হটাও' অভি-যান। এবং কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাষ্ট্র-পতি নির্বাচনে প্রার্থী দাঁড় করানোর প্রশ্নে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে পরাজিত করা হয় ও সিন্ডিকেট মনোনীত প্রার্থী শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি ঐ পদের যোগ্য বিবেচিত হন। ফলে, এতদিন উপ-রাষ্ট্রপতিকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করার যে নজীর চলে আসছিল, সিন্ডিকেটের অঙ্গুলি-হেলনে তাও নস্যাৎ করে দেওয়া হয়। শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি প্রধানমন্ত্রীর প্রার্থিত প্রার্থী না হলেও শেষ পর্যন্ত তিনি সৌজন্যের খাতিরে দলের মনোনীত প্রার্থীর সমর্থনেই এগিয়ে আসেন।

রাজনীতি সম্ভবত কোনো ভদ্রতার ধার ধারে না—যদি সেই রাজনীতি দুর্বিধাবাদের দোসর হয়। তাই শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে তলে তলে অভিযান শুরু হয়। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র দলের মতো চরম প্রতিক্রিয়াশীল দল-গুলির সঙ্গে গোপনে শলা-পরামর্শ শুরু করেন—যার মূল উদ্দেশ্য শ্রীরেড্ডির পক্ষে একমাত্র ভোট ভিক্ষাই নয়, শ্রীমতী গান্ধীকে সরিয়ে তাদের সঙ্গে জোট বেঁধে কেন্দ্রে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠন।

কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বিরোধী দল-গুলির বরাবর অভিযোগ এই যে, সাম্প্র-দায়িক হাঙ্গামা, পুঁজিপতিদের সম্পদ বৃদ্ধি—এ সবের মূলে কংগ্রেস সরকার-গুলির পরোক্ষ সমর্থন না থাকলে স্বাধীনতা লাভের পর এসব কবে উৎখাত হয়ে যেত। এখন শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা কংগ্রেস সভাপতি হিসেবে সাম্প্রদায়িক ও পুঁজিপতিদের সমর্থক দলগুলির সঙ্গে গোপনে গাঁটছড়া বাঁধার যে পরিকল্পনা করেছেন, তা বিরোধী দলগুলির পুরা-তন বুলিকেই সমর্থন করে। শ্রীমতী গান্ধীরও নিজলিঙ্গাপ্পার বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ এই যে, তিনি জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র দলগুলির সঙ্গে যেভাবে ঐক্য স্থাপন করছেন, তা জাতীয় কংগ্রেসের মূলগত আদর্শের বিরোধী। উপরন্তু দেশের সর্বোচ্চ পদের নির্বাচনে কংগ্রেস সভাপতি যেভাবে বাধ্যতামূলক ভোট দানের জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন, তিনি ছিলেন তারও বিরোধী।

বলা বাহুল্য, শ্রীমতী গান্ধী প্রথম যখন দক্ষিণপন্থী নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করেন, তখন সিন্ডি-কেট-ভীত বহু কংগ্রেস নেতাই নীরবতা পালন করেছিলেন। পরে দেখা গেল, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের দিন অর্থাৎ ষোলই আগস্ট ও তার আগে কংগ্রেসের প্রগতি-বাদী নেতারা বিবেকের নির্দেশে ভোট দানের দাবি করলেন এবং ঐ ক্ষেত্রে কংগ্রেস সভাপতির হুইপ অর্থাৎ বাধ্যতা-মূলক ভোট দানের নির্দেশ বহু কংগ্রেস এম-পি ও এম-এল-এ'রা সগর্বে অগ্রাহ্য করলেন। পশ্চিমবঙ্গে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল, তাতে বিবদমান কংগ্রেসের দুটি দল হাতাহাতি পর্যন্ত করলেন। একদল বিবেকের নির্দেশে ভোটদানের সপক্ষে, অন্যদল অর্থাৎ ক্ষুদ্রতম গোষ্ঠীটি কংগ্রেস সভাপতির হুইপের সপক্ষে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যক্তি-গত কুৎসা করে বললেন যে, তিনি নাকি সিন্ডিকেটের পা ধরে প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভ করেছেন!

কেন্দ্রে, পশ্চিমবঙ্গে ও অন্যান্য রাজ্যগুলিতে কংগ্রেসের এই ধরণের পরিণতি সম্ভাব্য ছিল। কিন্তু এখন আসল প্রশ্ন, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর কংগ্রেসের অবস্থা কি হবে?

কংগ্রেসে স্পষ্টতই আজ দুটি দল। এখন ভিতরে ভিতরে এই চেষ্টা হবে যে, জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র এই দলকে সঙ্গে নিয়ে দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসীরা কিভাবে কেন্দ্রে নিজেদের শাসন কায়েম করতে পারে। নির্বাচনের আগেই শ্রীনিজ-লিঙ্গাপ্পা প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে যেভাবে কথা বলেছেন—তাতে অনুমান করা কঠিন ছিল না যে, শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণে তিনি বদ্ধ-পরিকর। অপরপক্ষে বামঘেঁষা কংগ্রেসীরা নিজলিঙ্গাপ্পাকে কংগ্রেস সভাপতির পদ থেকে সরাবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ফলে কংগ্রেসের ঘর টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ার অবস্থায়, বনিয়াদ ধসে পড়ার সামিল। এতদ্‌সত্ত্বেও একথা সত্য যে, কংগ্রেসকে ভিটে ছাড়া করাও অসম্ভব। কারণ কংগ্রেসের মধ্যে এখনও একটি শক্তি রয়েছে, যাঁরা শ্রীমতী গান্ধীর হাত শক্ত করতে পারেন এবং প্রগতিমূলক চিন্তাধারায়- জনজীবনের সঙ্গে একাত্ম হয়ে সমস্ত প্রগতিশীল জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে কর্মগত ঐক্যে নবভারত রচনায় অগ্রসর হতে পারেন। রাষ্ট্রপতি সমগ্র দেশের মহৎ কর্মযজ্ঞের পুরোধা হোন—এই আমাদের কামনা ; তিনি রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ থেকে দূরে থাকুন।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

বিপদ মানুষের জন্যে অপেক্ষা করে, না বিপদের জন্যে মানুষ? আত্মবিশ্বাস যাঁর প্রচণ্ড রকমের, নিজের শক্তি ও মনোবলের ওপর যাঁর অগাধ আস্থা, চোখ-কান খোলা রেখে যিনি চলেন, যিনি পরিণামদর্শী তিনি প্রতি মুহূর্তের বেঁচে থাকাটাকেই একটা বিপজ্জনক অস্তিত্ব বলে মনে করেন এবং সেভাবেই যে-কোন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্যে নিজেকে তৈরি রাখেন। কিন্তু যাঁরা দুর্বল, যাঁরা দিগন্তের অগ্নি-শিখাকে আকাশে সিঁদুর-খেলা বলে ভাবতে ভালবাসেন, সেসব কল্পনাবিলাসী লোক বিপদের মুখে কী করেন? হয় শত্রুর কাছে পুরোপুরি আত্মসমর্পণ, নয়তো মরিয়া হয়ে শত্রুকে রোখার জন্যে দুর্মর প্রচেষ্টা। পাঞ্চেন লামা শেষের শ্রেণীর প্রতিনিধি।

সংবাদে প্রকাশ, চীন থেকে পাঞ্চেন লামা পালিয়েছেন। পালিয়ে কোথায় গেছেন, কী করে গেছেন, বা কেন গেছেন—সংক্ষিপ্ত খবরে তার উল্লেখ নেই, শুধু এটুকু বলা হয়েছে তিনি চীন ত্যাগ করে গেছেন।

সংবাদটি ছোট্ট হলেও তার গুরুত্ব অপরিসীম। পাঞ্চেন লামার ভক্তদের পক্ষে সান্ত্বনা এখানে যে, পাঁচ বছর বাদে তবুও তাদের গুরুর যা-হোক একটা সংবাদ মিললো। এতদিন তিনি যে বেঁচেছিলেন তা-ই তো জানার উপায় ছিল না। চীনের বংশবেষ্টনী ভেদ করে পাঞ্চেন লামার কোনো সংবাদই তো এপারে চুইয়ে আসার অবকাশ ছিল না। এখন তবু খবর পাওয়া গেল যে, তিনি বেঁচেবর্তে আছেন, নইলে পালালেন কী করে?

তিব্বতের দু' নম্বর গুরু পাঞ্চেন লামা, দালাই লামার পরেই তাঁর স্থান। কিন্তু ধর্মভীরু, সরল প্রকৃতির তিব্বতী-দের জীবনে প্রথম ধাক্কা এলো সেদিন, যেদিন চীন দাবি করে বসল যে, তিব্বত চীনেরই একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। দালাই লামা আশঙ্কা করেছিলেন, ধর্মদ্বেষী কমিউনিস্ট চীনে দালাই লামার মর্যাদার আসনটি অকম্পিত থাকবে না। তাই তিনি কিছু ভক্ত নিয়ে ১৯৫৯ সালের মার্চের শেষে পাড়ি জমালেন ভারতবর্ষে, ভারত সরকার, প্রধানমন্ত্রী নেহরু দালাই লামাকে রাজনৈতিক আশ্রয় দিয়েছিলেন। পাঞ্চেন লামারও সেদিন পালাবার যথেষ্ট

পাঞ্চেন লামা

সুযোগ ছিল। কিন্তু তাঁকে হয়তো ক্ষমতার মোহে পেয়ে বসবে। ধর্মীয় গুরু দালাই লামা হলেও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে পাঞ্চেন লামাই ছিলেন প্রধান। তিনি সেদিন ভাবলেন, দালাই লামার অবর্তমানে তিনিই হবেন গোটা তিব্বত রাজ্যের হর্তাকর্তাবিধাতা। তাই দালাই লামার পথ অনুসরণ না করে পাঞ্চেন লামা তিব্বতেই রয়ে গেলেন, চীনা নেতাদের অনুগ্রহ পাবার চেষ্টা করলেন।

চীন পাঞ্চেন লামাকে অবশ্যই টোপ গিলিয়েছিল, তাঁকে পুরস্কৃত করার ভান করেছিল। তাঁকে করা হলো তিব্বতের স্বয়ংশাসিত রাজ্যের প্রস্তুতি কমিটির অস্থায়ী চেয়ারম্যান। কিছুদিন এই চলল, কিন্তু তিব্বতে যখন থেকে-থেকে চীনা শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আত্ম-প্রকাশ ঘটতে থাকলো, তখন চীন সরকার পাঞ্চেন লামাকে তিব্বতে রাখা নিরাপদ মনে করলেন না। তাঁকে চালান দেওয়া হল চীনে। তাছাড়া তাঁর মগজ ধোলাইয়ের ব্যবস্থা করাও প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

গোড়ার দিকে পাঞ্চেন লামাকে চীন সরকার খানিকটা খাতিরও করেছিলেন। তিনিও ক্ষমতা পেয়ে যেন অভিভূত হয়ে কিংবা চৈনিক নেতাদের খুশি করার জন্যে অস্থায়ী চেয়ারম্যান হিসেবে তাঁর প্রথম ভাষণে বলেছিলেন: একত্রে বাস করার, শেখবার এবং উন্নতি লাভ করার জন্যে আমাদের চীনের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এককাট্টা হতে হবে। পিকিঙে তাঁর সম্মানার্থে প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই যে ভোজসভার আয়োজন করেছিলেন সেখানে পাঞ্চেন লামা আরও বিগলিত হয়ে বলেছিলেন: বিদ্রোহীদের মোকা-বিলা করার জন্যে আমরা জাতীয় মুক্তি ফৌজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা বজায় রেখে চলছি। এর পরে জাতীয় গণ-কংগ্রেসে আরও এক ধাপ এগিয়ে পাঞ্চেন লামা ভারতের প্রতিক্রিয়াশীলদের সম্প্রসারণবাদী নীতির উল্লেখ করেছিলেন।

কিন্তু পাঞ্চেন লামার বর্তমান পালানোর সংবাদ যদি সত্যি হয়ে থাকে, তবে বুঝতে হবে, সেই চীন-গত প্রাণ বিকল হয়েছে। বুঝতে হবে এতদিনে পাঞ্চেন লামার মোহমুক্তি ঘটেছে, যার জন্যে সেদিন পূর্ণ আত্মসমর্পণ করলেও আজ মরিয়া হয়ে জীবন বিপন্ন করে চীনা প্রহরীর রক্তচক্ষুকে ফাঁকি দিয়ে তিনি সীমানা পেরিয়ে এসেছেন।

কিন্তু কেন পালালেন। গুজব যে, চীনা নেতারা নাকি ৩২ বছর বয়স্ক পাঞ্চেন লামাকে একটি চীনা তরুণীর পাণিপীড়নের জন্যে চাপ দিচ্ছিলেন। কিন্তু বিবাহবন্ধন, না মতাদর্শনের বন্ধন থেকে অব্যাহতি পাবার জন্যে পাঞ্চেন লামা পালালেন, সে-রহস্য আজও অনাবিষ্কৃত।

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

রাশিয়া সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র ও মেঘনাদ সাহার দৃষ্টিভঙ্গির তুলনা

প্রথমেই বলে নেওয়া ভাল, রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র বা মেঘনাদ সাহা কেউই কমিউনিস্ট নন। রবীন্দ্রনাথ স্বাধীন মানবতাবাদী, কোনো ইজম-এ ধরা দেওয়া স্বভাবে নেই। উপযোগিতাবাদে তিনি আটক পড়েন না কারণ চরম আদর্শ-বাদী কিন্তু তাঁর আদর্শ এতখানি স্থাণু নয় যে, মানুষের প্রয়োজনসিদ্ধি কোনো একটি বিশেষ উপায়েই মাত্র ঘটবে এই বিশ্বাসকে আঁকড়ে বসে থাকবে। তাই বারে বারে নতুনকে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন, রাশিয়ার নব আদর্শের সাফল্যকে বরণ করতে তাঁর বাধে নি, যদিও তার ত্রুটি যথেষ্ট দেখেছিলেন।

সুভাষচন্দ্র কমিউনিস্ট নন, আগেই দেখেছি; কমিউনিজমের বিরুদ্ধে তাঁর আপত্তির বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয়েছে; কিন্তু তিনি নিজেকে প্র্যাগম্যাটিক বলে দাবি করতেন এবং তাঁর মনে হয়েছিল রাশিয়ার পদ্ধতি ভারতের পক্ষে সেইকালে সর্বাধিক পরিমাণে অনুসরণীয় —রাশিয়ার সমাজতন্ত্র ও পরিকল্পিত শিল্পায়ন থেকে পার্টির একনায়কত্ব পর্যন্ত। আর একটি ক্ষেত্রে রাশিয়া তাঁর কাছে পরম বাঞ্ছিত রাষ্ট্র মনে হয়েছিল—তিনি মনে করেছিলেন আপাতত না হলেও শেষ পর্যন্ত ইংরেজের চরম শত্রু রাশিয়া। ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যবাদ ইংলণ্ডের ধনতন্ত্রের উপর নির্ভরশীল, সুতরাং ধনতন্ত্রের সত্যকার বিরোধী যে সেই-যে ইংলণ্ডের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে তাতে তাঁর সন্দেহ ছিল না। এ কথা তিনি হরিপুরা ভাষণে বলেছিলেন। রাশিয়া আত্মরক্ষায় গুটিয়ে থাকলেও এমন একদিন আসবে যেদিন সে ধনতান্ত্রিক ইংলণ্ডের সঙ্গে সম্মুখ সমরে নামবে, সুভাষচন্দ্র তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন এবং সেই ভরসায় ভারত থেকে পলায়নের পরে রাশিয়ার আশ্রয় চেয়েছিলেন। সুভাষচন্দ্রের প্রত্যাশিত কাল পূর্ণ হয় নি বলে (!) রাশিয়া তাঁকে আশ্রয় দেয় নি, সুতরাং অগত্যা ইংলণ্ডের সাক্ষাৎ-শত্রু জার্মানীর আশ্রয় গ্রহণ, কিন্তু জানতেন (বা ভাবতেন) কালে রাশিয়া তাঁর ভরসাস্থল হবে, যদি যুদ্ধ শেষেও ভারত পরাধীন থাকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের পরে সেই আশা তিনি প্রকাশ করেছিলেন ব্যাঙ্কক থেকে ২১ মে, ১৯৪৫ সালে প্রদত্ত এক বক্তৃতায়। তিনি বলেছিলেন, জার্মানীর পতনের ফলে ইউরোপীয় রাজনীতিতে নূতন শক্তি সোভিয়েট রাশিয়ার আবির্ভাব। এই শক্তি আমাদের শত্রুর কাছে (ইঙ্গ-আমেরিকা) জার্মানীর চেয়েও বিপজ্জনক। যুদ্ধোত্তরকাল ভয়াবহ কঠিন হয়ে উঠবে এই দুই শক্তিগোষ্ঠীর সংঘাত।'

১ রাশিয়ার হাতে জার্মানীর পরাজয় যুদ্ধের এক মহা বিস্ময়, একথা বলার পরে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন—

"But there are more surprises to come, and some of these surprises will not be welcome to our enemies. You know very well that I have been always of the opinion that if Germany collapsed, it would be a signal for the outbreak of an acute conflict between the Soviets and the Anglo-Americans. That conflict has already broken out and it will be intensified in the days to come. The time is not far off when our enemies will realise that though they have succeeded in overthrowing Germany, they have indirectly helped to bring into the arena of European politics another power, Soviet Russia, that may prove to be a greater menace to British and American Imperialism than Germany was.....

"It is clear by now that the war aims of the Soviet Union are quite different from these of the Anglo-Americans, although they had common enemy in Germany.

রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের তুলনায় মেঘনাদ সাহার পক্ষে আরও অধিকভাবে রাশিয়ার সমর্থক হওয়া সম্ভব ছিল, অন্তত বস্তুবাদী দর্শনকে তিনি ঐ দুইজনের চেয়ে সহজে গ্রহণ করতে পারতেন, গ্রহণ করেছিলেনও। তবু দেখি, নাস্তিক-বৈজ্ঞানিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি ধর্মবিষয়ে রাশিয়ার নীতিকে মনেপ্রাণে মেনে নিতে পারেন নি এবং রাশিয়ার অতি বস্তুপ্রীতি এই কাব্যরসিক বৈজ্ঞানিকের কাছে কিছু শ্বাসরোধী মনে হয়েছিল। তাছাড়া সম্পত্তিতে ব্যক্তির অধিকার একেবারে দূর করাতেও তাঁর সম্পূর্ণ সায় ছিল না এবং জাতীয়তাবাদের প্রতি প্রীতিও তাঁর যথেষ্ট ছিল,

---

This has been further confirmed at the San Francisco Conference where the Soviet Foreign Commissar M. Molotov refused to submit to the Anglo-American demands. In fact, M. Molotov went so far as to challenge the credentials of the puppets of Britain and America who came to represent India and the Philippines respectively. The differences that became visible at the San Francisco Conference are only a precursor of a much wider and deeper conflict between the Soviet and the Anglo-Americans which the future has in store for the world."

(*Soviet support for India* : পাবলিকেশন ডিভিশন-প্রকাশিত *Selected Speeches of Subhas Chandra Bose* গ্রন্থ থেকে)

এই বক্তৃতার চারদিন পরে সিঙ্গাপুর থেকে প্রদত্ত বক্তৃতায় (*The German Defeat*) সুভাষচন্দ্র পূর্বোক্ত বক্তব্য আরও স্পষ্টভাবে উপস্থিত করেছিলেন। তিনি অকৃতজ্ঞ ছিলেন না, সুতরাং জার্মানী ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামে যে সহানুভূতি ও সমর্থন জানিয়েছিল, তার জন্য ধন্যবাদ দিয়েছিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে জানাতে ভোলেন নি, সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধে নামাই জার্মানীর পতনের কারণ। জার্মানীর পরাজয়, তাঁর মতে, তার সমরশক্তির পরাজয় নয়, রাজনৈতিক ভ্রান্তির খেসারত। বিসমার্ক জার্মানীকে দুই ফ্রন্টে যুদ্ধ বাধাতে নিষেধ করেছিলেন; তা না শোনার ফলে দুটি বিশ্বযুদ্ধে জার্মানীর পরাজয়। "১৯৪০ সালে সোভিয়েট পররাষ্ট্রমন্ত্রী মঁসিয়ে মলোটোভের বার্লিন গমনের সময়ই ইউরোপীয় পরিস্থিতির বাঁক নেওয়ার কাল। এই সময়ে জার্মানীর রাজনৈতিক প্রস্তাব সর্বোচ্চে উন্নীত হওয়ার প্রয়োজন ছিল, যে-কোনো উপায়ে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে তার বোঝাপড়ায় আসা উচিত ছিল। যদি বিসমার্ক বেঁচে থাকতেন, তিনি তাই করতেন।" জার্মানীর পরাজয়ের ফলে ইউরোপীয় রাজনীতিতে সোভিয়েট রাশিয়ার অভ্যুদয়ের বিষয়টি এই বক্তৃতাতেও সুভাষচন্দ্র তোলেন। সোভিয়েট জনগণ ও সৈন্যবাহিনীর বীরত্ব, যুদ্ধবার ক্ষমতা ও আত্মত্যাগের প্রশংসা করার পরে তিনি বলেন, জার্মানীর পরাজয় প্রধানত সোভিয়েট শক্তিই ঘটিয়েছে; ফলে বিপুল ক্ষমতা তার আয়ত্তে; অতঃপর নিশ্চয়ই সে যুদ্ধোত্তর ইউরোপের পুনর্গঠনের কর্তৃত্বভার ইঙ্গ-আমেরিকান শক্তিগোষ্ঠীর হাতে ছেড়ে দিতে পারে না, দেবেও না। যুদ্ধ-পূর্ব ইউরোপের রাজনৈতিক অবস্থা বিশৃঙ্খলায় পূর্ণ ছিল। যুদ্ধের ঠিক আগের পাঁচ বছরে জঙ্গী জার্মানী অবশ্য একটি বিশেষ নীতিতে ইউরোপের পুনঃসংগঠনের কাজ শুরু করেছিল, জার্মানীর পরাজয়ের ফলে তার সমাপ্তি। যুদ্ধের পরে সেই সংগঠনের কাজ রাশিয়া আরম্ভ করবে, কারণ তারও একটি বিশেষ নীতি আছে। পরবর্তী কয়েক দশকে ইউরোপের ভাগ্য মার্শাল স্ট্যালিনের মুঠিতে।

—"Now with the collapse of Germany, that plan has come to naught. In post war Europe there is only one other power that has a plan which is worth a trial, and that power is the Soviet Union. If there is one man in Europe today who holds in his hands the destinies of the European nations for the next few decades, that man is Marshal Stalin."

বিশ্ব ইতিহাসে সোভিয়েট রাশিয়ার বিরাট প্রগতিশীল ভূমিকা সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের দৃঢ় বিশ্বাসের পক্ষে বিপক্ষে নানা কথা উঠতে পারে, বর্তমানে সে প্রসঙ্গ আলোচনার প্রয়োজন নেই, এখানে শুধু দেখিয়ে দিতে চাই, ঐ বিশ্বাসের জন্য সুভাষচন্দ্র কতখানি মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিলেন। অক্ষশক্তির কাছে সাহায্যপ্রার্থী হয়ে সুভাষচন্দ্র রোমে পৌঁছবার অল্পদিন পরেই জার্মানী রাশিয়া আক্রমণ করে। সুভাষচন্দ্র অবিলম্বে তাঁর প্রতিক্রিয়ার কথা লিখে পাঠিয়েছিলেন জার্মান দপ্তরে। তাঁর মনোভাব একেবারেই জার্মানীর আচরণের অনুকূলে ছিল না। থাকা সম্ভবও ছিল না, কারণ তিনি অক্ষশক্তির সমর্থক বলে জার্মানী যান নি, গিয়েছিলেন ভারতের স্বাধীনতার জন্য; বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের সকল বিরোধীর কাছেই তিনি সাহায্যপ্রার্থী; নীতিগতভাবে সমর্থক যদি তিনি কোনো পক্ষের হন সে পক্ষ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ও সোস্যালিস্ট একসঙ্গে, অর্থাৎ সোভিয়েট রাশিয়া। জার্মানীর সঙ্গে রাশিয়ার অনাক্রমণ চুক্তি সুভাষচন্দ্রের পক্ষে অতীব সহায়ক হয়েছিল এবং সেই চুক্তির স্থায়িত্ব তাঁর থেকে বেশি কেউ চান নি। ১৯৪১ সালের এপ্রিল ও মে মাসে তিনি জার্মান সরকারের কাছে দুটি মেমোরেন্ডাম (অন্তত দুটি আমরা পেয়েছি) দাখিল করেন। দ্বিতীয় মেমোরেন্ডামটিতে (৩-৫-৪১) তিনি জার্মানী ও রাশিয়ার মধ্যে অনাক্রমণ চুক্তি বলবৎ রাখার উপর বিশেষ জোর দিয়ে-

...ন্যর সমর্থন তিনি রাশিয়ার চেয়ে তৎকালীন চীনের মধ্যেই অধিক পেয়েছিলেন। রাশিয়ার প্রতি তাঁর আকর্ষণের মূলে রাশিয়ার পরিকল্পিত শিল্পায়ন; তাদের ছাঁচেই বৈজ্ঞানিক একাডেমী গড়ে রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায় ঐ একাডেমীকে ব্যবহারের পক্ষপাতী। কিন্তু একটা ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি অস্পষ্ট, বিষয়টিকে তিনি এড়িয়ে গেছেন নিজে রাজনৈতিক নন বলে। প্রশ্ন হল—পরিকল্পিত শিল্পায়ন কি স্বাধীনতার পূর্বে সম্ভব? অথচ স্বাধীনতার আগেই সেই পথে চলতে তিনি আহবান করছেন দেশকে। যদি বলা যায়, তিনি স্বাধীনতা-উত্তরকালের জন্য দেশের মনকে প্রস্তুত করতে

ছিলেন। জার্মানীর কাছে মেমোরেন্ডাম দেওয়ার সময়ে বলাই বাহুল্য তিনি তাঁর সমাজতান্ত্রিক ব্যাকুলতাকে অগ্রাধিকার দেন নি, বাস্তববাদী রাজনৈতিক হিসাবে জার্মানী যে-ভাষা বুঝতে সমর্থ, সেই ভাষাই প্রয়োগ করেছিলেন। বলেছিলেন, অক্ষশক্তি অবিলম্বে আরব দেশসমূহ এবং ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে ঘোষণা করুক এবং সাহায্য করুক। "বর্তমান যুদ্ধ আরম্ভের আগে আরব দেশসমূহে এবং ভারতবর্ষে বিপুল আকারে সোভিয়েট-সমর্থনের মনোভাব থাকলেও একথা বোঝা গেছে যে, অক্ষশক্তিই (সোভিয়েট নয়) বৃটিশ শাসন থেকে মুক্তির ব্যাপারে কার্যকরী সাহায্য করতে সমর্থ।" অক্ষশক্তি সেই সাহায্য করলে "ভবিষ্যতে যদি সত্যই জার্মানীর সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়া বা তুরস্কের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে তাহলে জার্মানী সকল প্রাচ্য দেশের সহানুভূতি পাবে।" ভারত ও আরব দেশসমূহের স্বাধীনতার পক্ষে জার্মানীর মুক্তি ঘোষণার জন্য সুভাষচন্দ্র চাপ দিচ্ছিলেন এবং রাশিয়ার সঙ্গে সম্ভাব্য সংঘর্ষের ক্ষেত্রে ভারত ও আরব দেশগুলির সহানুভূতিকে মূল্য হিসাবে এগিয়ে দিয়েছিলেন; কিন্তু তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল জার্মানীর সঙ্গে রাশিয়ার অনাক্রমণ চুক্তিপর্বকে টিকিয়ে রাখা,—জার্মানীর তুলনায় সোভিয়েট রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁর অধিক সহানুভূতি ছিল বলে তো নিশ্চয়ই, সেইসঙ্গে এও বলা যায়, তিনি জার্মানীকে মূলে বিশ্বাস করতেন না; ভেবেছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত হয়ত রাশিয়ার সাহায্যই তাঁর প্রয়োজন হবে এবং সে পথ বন্ধ করতে চাইছিলেন না। তাছাড়া, ইউরোপ থেকে ভারতের সঙ্গে যোগস্থাপনের জন্য রাশিয়ার মধ্যবর্তী পথকেই অনুকূল বলে মনে করেছিলেন। চারটি সম্ভাব্য পথের উল্লেখ করবার পরে বলেছিলেন, "এক নম্বর রুটই (অর্থাৎ জার্মানী-রাশিয়া-আফগানিস্থান-ভারতবর্ষ) আমার মতে সবচেয়ে সুবিধাজনক।" এই পরিস্থিতিতে, সুভাষচন্দ্রের অনুরোধ—রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কের বর্তমান রূপকে যেন অব্যাহত রাখা হয়।

—"If in the meantime a conflict with Turkey or the Soviet breaks out before the above proposal is given effect to, then Germany will probably lose the sympathy of the Oriental countries which she has gained because of her fight against British Imperialism.

"For the success of the task of exterminating British power and influence from the countries of the Near and Middle East, it is desirable that the status quo between Germany and Soviet Russia should be maintaned."

বলাই বাহুল্য জার্মানী সুভাষচন্দ্রের যুক্তি শুনতে বাধ্য বা বদ্ধপ্রতিজ্ঞ ছিল না। পঞ্চাশ দিনের মধ্যে (২২ জুন) সে রাশিয়া আক্রমণ করেছিল। এর ফলে সুভাষচন্দ্রের পরিকল্পনা কঠিনতম আঘাত পায়। জার্মানীর এই কাজকে সুভাষচন্দ্র যে পরবর্তীকালে চরম রাজনৈতিক বুদ্ধিভ্রান্তির কাজ বলে অভিহিত করেছেন,—তা আমরা আগে দেখে এসেছি। ভারতবর্ষে স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রেও জার্মানীর ঐ কীর্তি কতখানি প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে তা বুঝতে তাঁর দেরি হয় নি। ক্ষুদ্র অথচ সুসংগঠিত কম্যুনিস্ট দল, ভারতে ট্রেড ইউনিয়নগুলির উপর যার বিশেষ আধিপত্য ছিল, যে-দল ধর্মঘটের দ্বারা যুদ্ধের উৎপাদনে ব্যাঘাত সৃষ্টি করতে সমর্থ ছিল (গোড়ায় ব্যাঘাত সৃষ্টি করছিলও), সেই দলভুক্তদের সক্রিয় সহানুভূতি ও সাহায্য যে অবিলম্বে সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন পেয়ে যাবে তা বুঝেছিলেন, সেইসঙ্গে জহরলাল প্রমুখ কংগ্রেসীদেরও হাত শক্ত হবে, যাঁরা যুদ্ধকালে যে কোনো ক্ষেত্রেই জার্মানীর বিরুদ্ধে ইংরেজকে সাহায্য করতে ব্যস্ত ছিলেন। তাছাড়া, যে সশস্ত্র মুক্তিবাহিনীকে ভারতে নিয়ে যাবার পরিকল্পনা তিনি করছিলেন, রাশিয়ার বিরোধিতা থাকলে তার পথে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা সৃষ্টি হবে; তাও বুঝেছিলেন। সর্বোপরি, নাজী জার্মানীর আসল চেহারা তাঁর জানা ছিল; জানতেন যে, ভারতের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত-চিত্ত সে কদাপি নয়, হতেও পারে না; সুভাষচন্দ্র যুদ্ধপরিস্থিতির সুযোগে কার্যোদ্ধার করতেই চাইছিলেন. জার্মানী ও রাশিয়ার শক্তি-সংঘাতের মধ্যে উপস্থিত থেকে তারই সুযোগে জার্মানীকে ভবিষ্যতে দেখিয়ে দেবার ইচ্ছা করেছিলেন, জার্মানী যদি সাহায্যের হাত গুটিয়ে নেয়, রাশিয়ার সাহায্য প্রস্তুত আছে। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে সহায়সম্বলহীন (কিংবা ভারতীয় জনগণের উপর কিছু প্রভাবসম্বল) সুভাষচন্দ্র খুবই সরু সুতোর উপর দিয়ে হাঁটছিলেন। সুভাষচন্দ্রের প্রতিভা এইখানে, ঐ সরু সুতোটি ছিঁড়ে যাবার পরেও তিনি অন্য একটি সেতু নির্মাণে সমর্থ হয়েছিলেন।

যাই হোক, জার্মানী রাশিয়া আক্রমণ করলে সুভাষচন্দ্র কতখানি আশাহত হয়েছিলেন, সেকথা অবিলম্বে জার্মান পররাষ্ট্রদপ্তরে জানিয়ে দেন। ঐ কালে তিনি রোমে ছিলেন। তার পরেই বার্লিনে ফিরে আসেন। সুভাষচন্দ্রের মনো-

এসব কথা বলেছেন, তাহলে উত্তরে বলা যায়, স্বাধীনতা-উত্তরকালে গান্ধীপন্থায় যদি দেশ নাও চলে রাশিয়ার পন্থায় যে চলবে তারই বা নিশ্চয়তা কি? শিল্পায়ন ঘটতে পারে, কিন্তু রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রণে তা নাও ঘটতে তো পারে! মনে হয় ডঃ সাহা ভাবী রাষ্ট্রব্যবস্থা সম্বন্ধে নিজের উত্তরকে পরোক্ষে দিয়ে দিয়েছিলেন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের কথা বলে—সমাজতান্ত্রিক না হলে সাধারণভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পায়ন হয় না। কিন্তু ডঃ সাহা তো স্পষ্ট কথার কারবারী, এখানে এত বুদ্ধিমানের সাবধানতা অবলম্বন করলেন কেন?

[ক্রমশ]

ভাব জার্মান পররাষ্ট্রদপ্তরের নিশ্চয় ভালো লাগে নি। আরও ভাল করে তাঁর মন জানার দরকার হয়েছিল। জার্মান পররাষ্ট্রদপ্তরের অন্যতম সেক্রেটারী অব স্টেট হের উয়েরম্যানের (Herr Woermann) সঙ্গে তাঁর ঐ সূত্রে যে সাক্ষাৎকার ও আলোচনা হয়, তার বিবরণ উয়েরম্যান পররাষ্ট্র দপ্তরে পাঠিয়েছিলেন। তার মূল অংশ এই: "বসু প্রথমে ভারতবর্ষের জনমনের উপর রুশ-জার্মান যুদ্ধের প্রতিক্রিয়া সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে বললেন। সোভিয়েট ইউনিয়ন ভারতবর্ষে জনপ্রিয়, বিশেষত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে, যাদের ভিতর থেকে নেতারা আসেন। ভারতে মনে করা হয়, সোভিয়েট ইউনিয়ন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শক্তি, সেইজন্য সে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ভারতের বন্ধু হবে। ১৯৩৯ সালের রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি ভারতের কাছে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ছিল। এর ফলেই যে সব বুদ্ধিজীবী জঙ্গী মতের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল তাদের পক্ষে মনে করা সম্ভব হয়েছিল যে, জার্মানী ও ইটালী এমন দুই শক্তি যারা সোভিয়েট ইউনিয়নের সঙ্গে বন্ধুত্ব রেখে ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান ঘটাবে—যদিও বৃটিশ প্রচারযন্ত্র এই কালে ভারতের অধিকাংশ জায়গায় অক্ষশক্তির বিরুদ্ধে শত্রুমনোভাব জাগ্রত রাখতে সমর্থ হয়েছিল। রুশ-জার্মান যুদ্ধে ভারতীয় জনগণের সহানুভূতি একেবারে পরিষ্কারভাবে রাশিয়ার পক্ষে, কারণ তারা সুনিশ্চিতভাবে অনুভব করে যে, জার্মানীই আক্রমণকারী, সুতরাং সে ভারতের পক্ষে আর একটি মারাত্মক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। জার্মানী যদি রাশিয়াকে সম্পূর্ণ পরাভূত করেও, তবু এ-ব্যাপারে ভারতের জনমতকে পরিবর্তিত করা কঠিন হবে।

"একই সঙ্গে বসুর ধারণা—লণ্ডন থেকে প্রাপ্ত রিপোর্টের দ্বারা তাঁর ধারণা সমর্থিত—ইংলণ্ড ভারতে শাসন-সংস্কার ঘটাতে যাচ্ছে, যার ফলে ভারতীয় জনগণের যে-অংশ সর্বদা আপোষের পক্ষপাতী ইংলণ্ডের পক্ষে বাজি ধরে রাখতে তারা উৎসাহ পাবে; সেই সঙ্গে ভারতের উপর জার্মান আক্রমণের আশঙ্কাকে জনগণের সামনে তুলে ধরা হবে—যে-আক্রমণের উদ্দেশ্য ভারতের মুক্তি নয়, বৃটিশ শাসনের বদলে জার্মান-শাসন কায়েম করা।

"বসুর ধারণা—ভারতবর্ষ পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী পরিমাণে ইংরেজের সামরিক সম্প্রসারণের কেন্দ্রভূমি হবে। তিনি মনে করেন, খুব সম্ভবতঃ ইংলণ্ড আফগানিস্থান দিয়ে না এগিয়ে ইরানের মধ্য দিয়ে এগোবে, যাতে সে প্রথমে তৈল অঞ্চল অধিকার করতে পারে, তারপর ককেশাসের দিকে সোভিয়েট ভূমির কাছে উপস্থিত হতে পারে।

"বসুর কথাবার্তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, বার্লিন থেকে বহু দূরে থাকার জন্য রুশ-জার্মান সংঘর্ষের উৎপত্তি সম্বন্ধে তিনি সোভিয়েট বক্তব্যের দ্বারা অতি গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। সুতরাং আমাদের অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য হবে, এ-বিষয়ে তাঁকে সঠিক ধারণা দিয়ে দেওয়া। "বসুকে বললাম, স্বাধীন ভারত সম্বন্ধে ঘোষণার আমাদের মনোভাব দৃঢ়ই আছে; তবে অবশ্যই উপযুক্ত সময়ের অপেক্ষা করতে হবে।

"এই ব্যাপারে বসু খুবই জোর দিলেন, বললেন—যত শীঘ্র সম্ভব জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে যেন ঐ ঘোষণা করতে বলা হয়। যতক্ষণ তা না করা হচ্ছে, প্রতিটি দিন ইংলণ্ডের সুবিধা বাড়াবে যেহেতু সে শাসনসংস্কার ব্যাপারটা সামনে ঝুলিয়ে রাখছে। বসু ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণাকে স্থগিত রাখার কোনই হেতু দেখছেন না। তিনি অবশ্য স্বীকার করলেন, সমস্ত পরিস্থিতির বিবেচনা করেই ঘোষণার তারিখ নির্ধারণ করতে হবে।

"এই সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারের মধ্যে আমি অপরাপর চলতি বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা করেছিলুম, বিশেষতঃ প্রস্তাবিত ফ্রি ইণ্ডিয়া সেণ্টারের কথা। স্পষ্টই দেখা গেল, ওসব জিনিস বসুর কাছে গৌণ ব্যাপার, যতক্ষণ না তিনি স্বাধীন ভারত সম্বন্ধে ঘোষণার ব্যাপারে স্থির নিশ্চয় হচ্ছেন।" (বক্রলিপি লেখক নির্দেশে। ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগলের ১৯৬৭ সালের সংস্করণে এই দলিলগুলি মুদ্রিত আছে)।

নাজী জার্মানী অত্যন্ত নৃশংস, ন্যায়ধর্মহীন—একথা বহুভাবে প্রচারিত হয়েছে। এই প্রচার, ধরে নেওয়া যেতে পারে, সত্যাভিত্তিক। তা যদি হয়, তাহলে অবশ্যই মেনে নিতে হবে, আশ্চর্য সাহসী মানুষ ছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু, যার তুলনা ভারতীয় নেতাদের মধ্যে অল্পই দেখা গেছে। দানবরাজ্যে বসে (ইংরেজ-ফরাসীর সঙ্গে জার্মানী-ইটালীর লড়াই নাকি দেব-দানবের লড়াই, কোনো কোনো ভারতীয় আধ্যাত্মিক পুরুষের মতে!) সেই দানবেরা যখন মরণপণে লড়ছে দেবতা-শত্রুদের সঙ্গে, যখন তারা যুদ্ধের ব্যাপারে একটি সন্দেহজনক সিদ্ধান্ত করেছে, যার ফলাফল অনিশ্চিত, তার জন্য তারা প্রতিবাদ-অসহিষ্ণু, ক্রুর, কঠিন—তখন সেই সিদ্ধান্তটি যে অন্যায় একথা তাদেরই মুখের উপর জানিয়ে দিলেন একজন ব্যক্তি, যিনি আশ্রয়প্রার্থী ছাড়া আর কিছু নন। জার্মানীতে বসে জার্মানীর রাশিয়া আক্রমণের অনৌচিত্যের কথা সুভাষচন্দ্রের পক্ষেই, হাঁ, একমাত্র সুভাষচন্দ্রের পক্ষেই বলা সম্ভব।

হরপ্রসাদ মিত্র

বই-বাছাই বাংলা বইয়ের মেলা

[পূর্বানুবৃত্ত]

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ প্রবেশ-পথ

আনন্দ বলেছিল—আমাদের ভাষাগত প্রয়াসের দিক থেকে উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরের অনেকটাই কেবল শ্রম, স্বেদ দেহপাত,—কিংবা বলতে পারো বাংলা বইয়ের রাজ্যে সে-পর্বটিতে পোষাকই বড়ো, —মানুষ পোষাকের আড়ালে ঢাকা পড়েছে।

আমি বললুম—আনন্দ, বসন্ত রায়ের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলায় ঐ রকম এক উপমা বা রূপক ব্যবহার করেছিলেন বলে মনে পড়ছে, সেটা কিন্তু এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

সে বললে—কেন? কেন প্রযোজ্য নয়?

আমি বললুম—১২৮৯ সালের শ্রাবণের 'ভারতী'তে বসন্ত রায় আর বিদ্যাপতি একই ব্যক্তি কি না, সেই প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়েই রবীন্দ্রনাথ 'ব্রজবুলি'-র (তাঁর নিজের ভাষায়—'ব্রজভাষা') প্রয়োগ সম্বন্ধে লেখেন—'ভাবে বোধ হয়, যেন, ব্রজভাষা আমাদের প্রাচীন কবিদের কবিতার আফিসের বস্ত্র ছিল। শ্যামের বিষয় বর্ণনা করিতে হইলেই অমনি সে আটপৌরে ধুতি চাদর ছাড়িয়া বৃন্দাবনী চাপকানে বত্রিশটা বোতাম আঁটিত ও বৃন্দাবনী শামলা মাথায় চড়াইয়া একটা বোঝা বহিয়া বেড়াইত। রায় বসন্ত ইহা বরদাস্ত করিতে পারিতেন না।'

বসন্ত রায়ের কবিপ্রাণের স্বাধীনতা সম্বন্ধে সে রবীন্দ্রনাথের কথাতেই আরো একটু বললে—'তিনি খানিকক্ষণ বৃন্দাবনী পোষাক পরিয়াই অমনি—'দূর দূর' বলিয়া ফেলিতেন।'

আমি বললুম—এ তুমি কোন্ কথা থেকে কোথায় এনে ফেললে! উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরের বাংলার অসংখ্য পরিশ্রমী সাহিত্যপ্রয়াসীকে তুমি পোষাকসর্বস্ব বললে কেন?

—কারণ, রবীন্দ্রনাথের ঐ কথাটা অন্য প্রসঙ্গে বলা হলেও এই মুহূর্তে আমার সেটাই মনে এলো। তিনি বলেছিলেন—'এমন মানুষও সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের দেখিলে মনে হয়, মানুষটা পোষাক পরে নাই, পোষাকটাই মানুষ পরিয়া বসিয়াছে।'

আচ্ছা, বসন্ত রায় বা ব্রজবুলির প্রসঙ্গ ভুলে যাও,—কিন্তু উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরের বাংলায় লেখা গদ্য-পদ্য-নাটকের কিংবা ইতিহাস-বিজ্ঞান-ভূগোলের যা-কিছু বই চোখে পড়ে, সবই কেমন যেন কৃত্রিম, উদ্ভট, বানানো মনে হয় না?

আমি বললুম—না, সবই যে বানানো ভঙ্গি,—তা আমার মনে হয় নি। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, ঈশ্বর গুপ্ত, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়,—এঁরা তো ছিলেন—এঁদের আগে রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার,—তারপর কেরির 'ডায়া-লগস্'—রামারাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্রে'র মাত্র মাসখানেক পরে ১৮০১ খ্রীস্টাব্দে যে বইখানা বেরোয়, সে-সবের মধ্যে আমি বানানো ভঙ্গি দেখতে পাই না।

আনন্দ বললে—আমরা আগেই স্থির করেছিলুম—সন-তারিখের ঝামেলা কিংবা টীকা-টিপ্পনীর বাড়াবাড়ি থেকে এ-আলোচনাকে মুক্ত রাখতে হবে, কিন্তু তুমি কেবলি সেই দিকে ঝুঁকছো। এই বই-বাছাইয়ের কাজ বড়ো শক্ত মনে হচ্ছে—আমি এ-ভাবে বাছাইয়ের কথা ভাবি নি। তাছাড়া বাংলা বইয়ের ব্যাপারে উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছর আমার কাছে খুবই নীরস অর্থে ইস্কুল-কলেজের সামিল মনে হয়। ওটা অধ্যাপক-ক্ষেত্র।

—তাহলে অন্তত এই অংশের জন্যে অন্য কাউকে—একজন অধ্যাপককেই বরং ডাকতে হয়?

—না, না,—অধ্যাপক ডেকো না, ভাই। চুপি চুপি একটি কথা আমাকে বলতে দাও।—বাংলা সাহিত্যে অধ্যাপক-রচিত প্রবন্ধ পড়তে পড়তে কী যে অ্যালার্জি হয়েছে আমার! মন খুলে বলতেও পারি না সব কথা। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে তাঁরা আজও শুধু হাসির বা দেশপ্রেমের নয়,—তাঁর যাবতীয় কবিতার সার্থক কবি বলেন,—দ্বিজেন্দ্রনাথের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' তাঁদের কাছে পরম কাব্য বলে মনে হয়,—হাঁ, আজকের দিনেও; রবীন্দ্রনাথের বাল্য-স্মৃতির আবেগে এঁরা একদা বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়েছিলেন—এখনো তাঁর সে-সব কথার সত্যিকার শ্রদ্ধাচিহ্নিত অথচ যুক্তিনিষ্ঠ প্রতিবাদ হলো না। আমাদের নবীন অধ্যাপকরা বাংলায় এম-এ পরীক্ষা দিতে গিয়ে যে-সব নোট বা নোটবই পড়েছেন, অনেকেই সেইসব কিছুর গুছিয়ে নিয়ে সমালোচনার বই ছেপেছেন।—কিন্তু আমরা তো তাঁদের ছাত্র নই,—কাজেকাজেই বলতে ইচ্ছে করে, অনেক বই তাঁরা যদি না পড়তেন—অথবা পড়লেও সে-বিষয়ে কিছু যদি না লিখতেন, তাহলে ভাল হতো। যাঁরা সৎ পাঠক, তাঁরা স্বাধীনভাবে পড়বার সুযোগ পেতেন।

এসব কথা জনমতের বিরুদ্ধে যেতে পারে বলেই বলতে ভয় হয়,—কিন্তু সত্যিকার জনস্বার্থেই এসব বলা দরকার,—যাক্, আমি এসব বলতে চাই না, বরং নন্দিতাই এসব বলতে পারে।

—কিন্তু সেকালের কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য থেকে একালের নাম-করা সমালোচকদের অনেকেই তো অধ্যাপক। এ'রা তোমার ও-রকম মনোভাবে কি সন্তুষ্ট হবেন?—তা ছাড়া তুমি যা বল্‌লে, সাধারণভাবে সে-কথা সবটাই যদিও অমূলক নয়,—তবু তো ব্যতিক্রম আছে? ধরো, শ্রীকুমার-বাবুর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' বইটির বঙ্কিমচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত আলোচনা এবং আরো কোনো কোনো প্রসঙ্গ তো সত্যিই ভাল হয়েছে?

সে বল্‌লে—নিশ্চয় ব্যতিক্রম আছে,—এবং আমি অধ্যাপকজাতির বিরুদ্ধে কিছু বলবো কেন? তাঁরা অসন্তুষ্ট হলে আমি খুবই দুঃখিত হবো। সে যাই হোক্,—আমি যথার্থই বিনয়ী পাঠক—আমি কাউকে অকারণে আঘাত দেবো কেন?

আমি তাড়াতাড়ি বললুম—আরো অনেকের নাম করা যায়—দীনেশচন্দ্র সেন, শশাঙ্কমোহন সেন......

আনন্দ বললে—ভাই, আমাদের এই ব্যক্তিগত আলাপে কারও মানহানি ঘটবে না তো—যদি বলি সেনেরা—তা তাঁরা কায়স্থই হোন আর বৈদ্যই হোন, এই বাংলাদেশে অনেক পরিশ্রমের কাজ করেছেন, কিন্তু বাংলা বইয়ের রসানুভূতির দিকটা এখনো তাঁদের বেশ অধিকারে আসে নি—যদিও ব্যতিক্রম হিসেবে কয়েকটি নাম আমার এই মুহূর্তেই মনে আসছে—যেমন, রবীন্দ্রনাথের মন্তব্যেই শুনেছি সাহিত্যের সাত-সমুদ্রের নাবিক প্রিয়নাথ সেনের কথা,—তারপর দীনেশচন্দ্র সেনও স্মরণীয় মানুষ,—আর একালের অচিন্ত্যকুমার সেন-গুপ্তের কয়েকটি গল্প আমার তো চিরস্মরণীয় মনে হয়।—যাক্, যে-কথা হচ্ছিল সেই কথাতেই ফিরে যাই,—শোনো, যদি এসব কখনো ছাপা হয়, তাহলে জানিয়ে দিও—আমি বড়োই নিরীহ মানুষ,—আমার কোনো মন্তব্য শুনে যদি কেউ কষ্ট পান তাহলে আমি বিনাশর্তে এই মুহূর্তেই সব প্রত্যাহার করলুম।

সে বল্‌লে—মোহিতলালের কবিতা খুব যে দীর্ঘস্থায়ী হবে, তা আমার কখনোই মনে হয় নি। কিন্তু তাঁর সমালোচনায় ইন্দ্রিয় ছিল। এখানে তাঁর কথা মনে আসছে এই জন্যে যে, উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরের বাংলা রচনায় কোনো সূক্ষ্ম অনুভূতি ছাপ রেখে গেছে কি না—সে-বিষয়ে তিনি নীরব। অথচ তিনি ব্রজেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাসের বন্ধু ছিলেন, বাংলা গদ্যের গঠনপর্ব সম্বন্ধে অধ্যাপক হিসেবে তাঁর নিশ্চয় আগ্রহ ছিল,—ঈশ্বর গুপ্তের কথা তিনি বলেছেন,—রামমোহনের কথাও তিনি লিখেছেন, কিন্তু সে-সব অন্য চিন্তা, ভিন্ন প্রসঙ্গ।

আমি বললুম—তাই যদি হয়, তাহলে এই পর্ব সম্বন্ধে এমন এক বা একাধিক পাঠকের মতামত পাওয়া দরকার, যাঁরা স্বাধীনভাবে এসব রচনা পড়বার সময় পেয়েছেন।

আনন্দ বল্‌লে—ঠিক এই দিক থেকেই আমি নন্দিতার কথা ভাবছিলুম। তার সঙ্গে একটি সাক্ষাৎই যথেষ্ট।

আমি জিগেস করলুম—নন্দিতা কে? তার কথা তো আগে কোনোদিন শুনি নি তোমার মুখে।

সে বল্‌লে—নন্দিতা একটি অসাধারণ মেয়ে—বাংলাদেশে ঠিক এই মুহূর্তে এইরকম একটি রমণী-মন যদি সাহিত্যে আত্মপ্রকাশে উদ্যত হোতো, তাহলে তা বড়ো সুখের হোতো। কিন্তু নন্দিতা দু-একখানি চিঠি এবং দরখাস্ত ছাড়া আর যা লিখে থাকে, সে তাদের বাজারের ফর্দ কিংবা ডাক্তারবাবুর কাছে কোনো পারিবারিক সংবাদ।

—সে কি বাংলা-সাহিত্যের ছাত্রী? তিনি কি অধ্যাপিকা?

—না,—এবং না। কয়েক বছর আগে নন্দিতার বাবা মারা গেছেন তার জন্যে দু' লাখ টাকা এবং ড্রাইভার-সমেত একখানি মসৃণ মোটরগাড়ি রেখে। সেই দু' লাখ টাকার একমাত্র শর্ত এই যে, নন্দিতা চাকরি করবে না, বিয়ে করবে না, সন্ন্যাসিনী হবে না অথবা রাজনীতি করবে না—সে খুশিমাফিক বাংলা বই পড়বে এবং উনিশ শ' আশি খৃস্টাব্দে তার যখন চল্লিশ বছর বয়স হবে, তখন সে হ্যালহেডের আমল থেকে পরবর্তী দু'শ' বছরের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে একখানি বই লিখবে। সে-বই পাঁচ বছরের মধ্যে লেখা শেষ হওয়া চাই এবং প্রকাশকের হাতে পাণ্ডুলিপি তুলে দিয়ে ঐ দু' লাখ টাকার সুদ-আসল নিয়ে যা বাকি থাকবে, সবটাই সে তার প্রবাস-জীবনের পাথেয় হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে। হাঁ, বইটা প্রকাশিত হবার আগেই তাকে তার ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্যে সমুদ্রপারের কোনো দেশে চলে যেতে হবে। তার স্বাধীন মতামত ব্যক্তিগত ক্রোধে বিদ্বেষে যেন প্রভাবিত না হয়,—কিন্তু সে তার নিজের পাঠিকা-বিবেক দিয়ে যা উচিত মনে করবে তাই বলবে,—তাতে কোনো দিক থেকে কোনো বাধা এলে তার বারায় একদল লাঠিয়ালের ওপর সে-সব নিষ্পত্তির ভার দেওয়া আছে। তাদের জন্যেও তিনি হাজার পঞ্চাশেক রেখে গেছেন শুনেছি।

আনন্দের মুখে এই সব শুনে আমি ভয়ার্ত একটা অব্যয় শব্দ উচ্চারণ করেছিলুম বলে মনে হচ্ছে।

সে বল্‌লে—নন্দিতাই আমাকে সরোজ আচার্যের 'বই-পড়া' বইখানা পড়তে দিয়েছিল। বাঙালী লেখকদের মধ্যে পরিমল গোস্বামীকে সে বেশ পছন্দ করে। কালো ফ্রেমের চশমা, কোনো-একরকম বেগুনী জংলা ধরনের শাড়ি এবং আশ্চর্য বড়ো খোঁপা দেখলেই কলকাতার কোনো-না-কোনো লাইব্রেরিতে তুমি তাকে চিনতে পারবে।

আমি বললুম—আনন্দ, এরকম পিতৃভাগ্য সত্যিই সম্ভব? যাক্, সে ভালই হবে। নন্দিতা আসুক। দুটি পুরুষ-মানুষের মেহনতে সে কাজ থেকে থেকে বেধে যাচ্ছে, একটি রমণীর স্নিগ্ধতায় তা অতঃপর মসৃণ হবে।

—মসৃণ হবে কি না জানি না,—নন্দিতা আমাকে ১৩৬৭ সালে প্রকাশিত সরোজ আচার্যের ঐ 'বই-পড়া' বই থেকে সেদিন তাঁর 'কী বই পড়ি নি' প্রবন্ধের এই শেষ বাক্যটি শুনিয়েছিল—সরোজবাবু লিখেছিলেন—'কী পড়েছি বলতে যাওয়ায় যেমন অনর্থের সম্ভাবনা, কী পড়িনি স্বীকার করাতেও তাই। স্থান কাল পাত্র অনুযায়ী তাই ভেবে-চিন্তে বলতে হবে কী বই পড়িনি আর কী বই পড়েছি।'

—তাহলে নন্দিতা কি বলবে যে উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরের বাংলা বই সে কিছুই পড়ে নি?

—না, তোমার-আমার কাছে তা বলবে-না, মনে হয় ডক্টর সুকুমার সেন কি ঐরকম আর কোনো ব্যক্তির সামনে সে কিন্তু ঐ কথাই বলবে।

—অর্থাৎ নিজের মন্তব্যের কোনো দায় নেই তার?

—দায় আছে, কিন্তু সরোজ আচার্যের মতেই সে বলে যে প্রত্যেক বইয়েরই একটা নৈর্ব্যক্তিক দিক আছে—'ভাল হোক, মন্দ হোক, লেখকমাত্রেরই বোধ হয় একটা মৌল নির্লজ্জতা আছে—সে হল লেখবার, নিজেকে, নিজের মত প্রকাশ করবার নির্লজ্জতা।' এবং সে নিজে তার সঙ্গে এইটুকু যোগ করে দেয় যে—প্রত্যেক পাঠকেরই একটা মৌল অধিকার আছে,—সে-বই ভাল লাগছে কি না লাগছে, সে-কথা প্রকাশ করবার অধিকার। সেই অধিকারেই সে বলে থাকে—

কথাটা অসমাপ্ত রেখে আনন্দ বললে—থাক্ সে-সব নন্দিতার কথা,—নন্দিতা নিজেই সে-সব বলবে। আমি বরং উনিশ শতকের ঐ খ্রীস্টীয় লেখকদের এবং তাঁদের আশ্রিত অন্যান্য লেখকদের প্রসঙ্গ স্থগিত রেখে, আজ ঐ সময়ের অন্য এক ব্যক্তিত্বের দিকে চোখ ফেরাই।

আমি বললুম—তাতে আলোচনার ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়বে না তো?

সে বললে—না।

—কার কথা ভাবছো

—রামমোহন রায়।

কেরি আর রামমোহন—শতাব্দীর প্রথম তিরিশ বছরের কেন্দ্রীয় ব্যক্তি বলতে এই দুজনকেই বোঝায় বটে। রামমোহন সম্বন্ধে অনেকের অনেক লেখা আমরা পড়েছি। রবীন্দ্রনাথের বিশেষ একটি প্রবন্ধ আমরা অনেকবার পড়েছি। আনন্দ সেদিন অন্যান্য বইয়ের প্রসঙ্গ না তুলে কিন্তু মোহিতলালের একটি লেখার কথাই তুললো। আমি আমার প্রবীণ বন্ধু প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের রামমোহন-সম্পর্কিত কয়েকটি মত তাকে জানাই। সে চুপ করে শুনলো,—তারপর মোহিতলালের কথা-প্রসঙ্গেই 'বাংলার নবযুগ' (নূতন সংস্করণ, ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৮৭৯ শকাব্দ) নামে মোহিতলালের বইখানিই সে আমাকে বার বার পড়তে বললে। মোহিতবাবু তাঁর জীবনের প্রায় শেষ প্রহরে যখন বাগনানে বাস করেন, এই বইয়ের 'ভূমিকা' লেখা হয় সেই সময়ে। মোহিতলালের সেই ভূমিকায় উনিশ শতকের বাংলার নবজাগরণ সম্বন্ধে সর্বাধিক গবেষক হিসেবে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশংসা ছিল। উনিশ শতকের কথা-প্রসঙ্গে তিনি লেখেন—

> 'আশ্চর্যের বিষয়, এই সদ্যোবিগত কালের ইতিহাসও ইতিমধ্যে গুরুতর গবেষণার বিষয় হইয়া উঠিয়াছে; কারণ, সেকালের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তির জীবন ও কীর্তিবিষয়ক প্রামাণ্য কাগজপত্র হয় লুপ্ত হইয়াছে, নয় খুঁজিয়া উদ্ধার করা দুঃসাধ্য। এই কাজ যতদূর সাধ্য ও সম্ভব তাহা কেবল একজন ব্যক্তির দ্বারা সম্পন্ন হইয়াছে—শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় অতিশয় দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ও কীটদষ্ট গলিত পত্রিকারাশি হইতে সে যুগ-সম্পর্কিত যে তথ্যরাজি সংগ্রহ ও সুসজ্জিত করিয়া দিয়াছেন, তাহাতেই ইতিহাসের একখানি কাঠামো খাড়া করা যাইবে।'

এ-বিষয়ে তাঁর নিজের গ্রন্থ-রচনায় উৎসাহ-উদ্যমের সীমা দেখিয়ে তিনি লেখেন—

> 'আমি ঐতিহাসিক নই, এ গ্রন্থও ইতিহাস নয়। আমি যে সূত্র ধরিয়া বাঙালীর সেই নব-জাগরণের কাহিনী রচনা করিয়াছি তাহাতে সে যুগের কয়েকটি বিরাট পুরুষকে নাটকীয় চরিত্র বা পাত্রের মত কালক্রমিক যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া নাটকের অঙ্কগুলি উদ্ঘাটিত করিয়াছি মাত্র।'

তাঁর এই আলোচনায় রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ—এই ছ'জনের নেতৃত্বের কথা এবং সেই সঙ্গে বইখানির 'পরিশিষ্ট' অংশে কেশবচন্দ্রের প্রসঙ্গও আলোচিত হয়। তাঁর বিশ্বাস এই ছিল যে, উনিশ শতকে এইসব মনীষী এদেশে নতুন এক 'জাতীয়তাবোধ' জাগিয়ে গেলেন। 'বাঙালীর জীবনে ভাব-চিন্তার প্রভাবই সবচেয়ে বেশি'—এ মন্তব্যও মোহিতলালের সেই ভূমিকার অন্তর্ভুক্ত। তাঁর মতে রামমোহনের 'যুগ'—'নবযুগের সূচনামাত্র'। তিনি রামমোহনকেই 'সমগ্র যুগের প্রবর্তক' বল'তে অসম্মত। রামমোহনের 'স্বাতন্ত্র্যনিষ্ঠা',—তাঁর বুদ্ধির প্রাখর্য,—সমাজ-সংস্কারে তাঁর নানা উদ্যম—এসবই মোহিতলাল স্বীকার করেন। তিনি লেখেন—

> 'তাঁহার প্রতিভার প্রধান লক্ষণ—স্বাধীন বিচারবুদ্ধি ও মনকে মুক্ত রাখিবার শক্তি। ইহারই বলে তিনি তৎকালীন জড়তাগ্রস্ত সমাজের অঙ্গে যে আঘাত করিয়াছিলেন তাহাতেই সুপ্তিভঙ্গের সূচনা হয়—ইহা খাঁটি ঐতিহাসিক তথ্য, এবং ইহার জন্য রামমোহনের যে গৌরব তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না।

কিন্তু জাগরণের সূচনা হইলেও তাহার ক্রম বা ধারা রামমোহনের অভিলষিত পথে অগ্রসর হয় নাই—তাঁহার ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির অনুরূপ হয় নাই।'

রামমোহন সম্বন্ধে তাঁর দ্বিতীয় কথা এই ছিল যে 'রামমোহন একজন অসাধারণ পুরুষ ছিলেন বটে, কিন্তু—তাঁহার ভাব-চিন্তার যে মৌলিকতা দাবি করা হয়, তাহা বিচারসাপেক্ষ।' রামমোহন তন্ত্রশাস্ত্রের আলোচনা করে গেছেন এবং তন্ত্রের দীক্ষিতও তিনি। এই বিশেষ দিকটি উল্লেখ করে মোহিতলাল লেখেন—

'তন্ত্রের শিক্ষা যে কি, তাহা যে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সমাজবিধির কত বিরোধী, তাহা প্রায় সকলেই অবগত নহেন; যাঁহারা সে বিষয়ে কিছু সংবাদ রাখেন তাঁহারাই বুঝিতে পারিবেন, রামমোহনের ঐ মতবাদ ও মনোভাব মৌলিক বলিয়া আশ্চর্যজনক নহে।'

তৃতীয় কথা—রামমোহন জাতির বুদ্ধিকে জাগিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু—

'তাহাতে আর কিছু না হউক একটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু পূর্ণ-জাগরণের স্বরূপ বা গভীরতর কারণ, এবং সেই জাগরণের ফলে পরবর্তী-কালে জটিলতর সমস্যা ও তাহার সমাধান—এ সকলের কিছুই তিনি যে নিরূপণ করিতে পারেন নাই, তাহার প্রকৃষ্ট ও প্রচুর প্রমাণ ঐ যুগের ক্রম-পরিণতি লক্ষ্য করিলেই মিলিবে।'

এইসব উক্তির ফাঁকে ফাঁকে মোহিতবাবুর যে বিশেষ কথাটি উঁকি দিয়ে গেছে, সেটি হলো—'আমি রামমোহনের একটা অমূলক ও অনাবশ্যক মহিমাবৃদ্ধির চেষ্টা করি নাই।'

আমি বললুম—আনন্দ, রামমোহন যে অসাধারণ শক্তিমান ব্যক্তি ছিলেন, তাতে আমার সন্দেহ নেই। সেকালের হাওয়ায় অবশ্য অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রতি আনুকূল্যের অভাব ছিল না।

সে বললে—কীরকম?

আমি তখন এই কথাগুলি শোনালুম—

রামমোহনের মৃত্যুর প্রায় চোদ্দ বছর পরে ১৭৬৯ শকের আশ্বিনসংখ্যায় 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধ থেকে জানা যায় যে, রংপুর থেকে কলকাতায় এসে রামমোহন যখন ব্রহ্মোপাসনার তত্ত্ব আলোচনায় নিযুক্ত হন, তখন দেশের গণ্যমান্য অনেকেই তাঁর কাছে—'সর্বদা গমনাগমন করিতেন, এবং তাঁহার যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা করিতেন।' এই গণ্যমান্যদের মধ্যে ছিলেন গোপীমোহন ঠাকুর, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, জয়কৃষ্ণ সিংহ, কাশীনাথ মল্লিক, বৃন্দাবনচন্দ্র মিত্র, গোপীনাথ মুন্সী, রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, রাজা বদনচন্দ্র রায়, দ্বারিকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর ইত্যাদি। কিন্তু—'রাজা পৌত্তলিক ধর্মের অনাদরপূর্বক যখন সর্বত্র তত্ত্বজ্ঞানের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, তখন অনেকেই তাঁহার সংসর্গে বিরক্ত হইয়া তাঁহার সহবাস ও আলাপাদি পর্যন্ত পরিত্যাগ করিলেন। কেবল শ্রীযুক্ত দ্বারিকানাথ ঠাকুর, রাজা কালীশঙ্কর ঘোষাল, জয়কৃষ্ণ সিংহ ও গোপীনাথ মুন্সীর সহিত তাঁহার হৃদ্যতা স্থিরতর রহিল।'

এই 'স্থির হৃদ্যতা'ও সবক্ষেত্রে বেশিদিন স্থির থাকতে পাবে নি। ১৭৩৭ শকে (১৮১৫ খৃঃ) 'আত্মীয়সভা' স্থাপিত করে রামমোহন সেখানে বেদ-পাঠ ও ব্রহ্মসংগীতের ব্যবস্থা করেন। ব্রজমোহন মজুমদার, রাজনারায়ণ সেন, রামনৃসিংহ মুখোপাধ্যায়, দয়ালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হলধর বসু, নন্দকিশোর বসু এবং মদনমোহন মজুমদার—"ব্রহ্মোপাসনা রূপ পরম ধর্মকে অবলম্বন" করেন। ফলে, তাঁরা 'স্বেচ্ছাচারী', 'নাস্তিক' ইত্যাদি অভিযোগে লোকনিন্দিত হন। রামমোহনের প্রতি আগে যাঁদের যথার্থ হৃদ্যতা ছিল, তাঁদের মধ্যে জয়কৃষ্ণ সিংহের নাম করা হয়েছে। সেই জয়কৃষ্ণও—"তাঁহার দ্বেষী হইয়া এমত অসত্য অপবাদ প্রচার করিতেন যে, আত্মীয়-সভাতে গোহত্যা হইয়া থাকে।" আবার প্রচ্ছন্ন বিরোধী ছিলেন অনেকে,—তাঁরা প্রকাশ্যে মিত্রবৎ আচরণ করতেন,—ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে বিশ্বাস দেখাতেন,—কিন্তু ভেতরে ভেতরে তাঁদের পথ ছিল পৃথক। এঁদের মধ্যে রামমোহনের 'আত্মীয়-সভার'-ই নির্বাহক বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার' সেই সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয় যে, তাঁর ব্যবহার খুবই 'কপট' ছিল—"তিনি রাজার সম্মুখে ব্রাহ্মধর্মে অচলা ভক্তি জনাইতেন, অথচ শ্রীযুক্ত হরিমোহন ঠাকুরের নিকট প্রত্যহ গমন করিয়া বৈষ্ণব ধর্মে দৃঢ় শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতেন।" অনেকেই এরকম কাপট্যে অভ্যস্ত ছিলেন।

আমি বললুম—শোনো আনন্দ, 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সেই প্রবন্ধেই আরো দেখা যায়—"শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নন্দকুমার বিদ্যালঙ্কার যিনি সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী কুলাবধৌত নামে খ্যাত হয়েন, তিনি যদিও রাজার সন্নিধানে ছায়াবৎ অনুগত ছিলেন, কিন্তু তিনি তন্ত্রোক্ত সাধন বামাচারে রত ছিলেন, বেদান্ত প্রতিপাদ্য ব্রহ্মজ্ঞান অনুশীলনে তাঁহার নিষ্ঠামাত্রছিল না।"

রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ নিজে রামমোহনের চিন্তার গুণগ্রাহী ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁরও লোকভয় ছিল—"সহমরণ নিবারণের ব্যবস্থা প্রচার হইলে তাহা রহিত করিবার জন্য প্রবর্তকপক্ষরা রাজবিচারালয়ে যে আবেদন-পত্র প্রদান করিয়াছিলেন তাহাতে বিদ্যাবাগীশ লোকভয়ে স্বাক্ষর করিয়াছিলেন, ইহাতে রাজা রামমোহন রায় তাঁহার প্রতি বিরাগ প্রকাশ করেন।"

আনন্দ বললে—রাজা রামমোহন আর উইলিয়ম কেরির প্রসঙ্গ অনেকটা সময় নেবে। নন্দিতা এসব বিষয়ে কি ভাবছে জানি না। পাঠকরাই বা কি ভাবছেন? বিনয় ঘোষ মশায়ের 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজ-চিত্র' বইয়ে এসব কথা আজকাল অনেকেরই চোখে পড়েছে নিশ্চয়।

বঙ্গ দর্শন

সংবাদপত্রের এখন একমাত্র খবর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন। এই বিষয়টির গুরুত্ব এত বেশি যে, তারই চাপে অপরাপর সংবাদগুলি একান্তই গৌণ হয়ে গেছে, যদিও দেশে ঘটনার কোন কমতি নেই। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গেরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে, এখন এই বঙ্গদর্শন লেখার সময় পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলি রাষ্ট্রপতি পদে শ্রীযুক্ত গিরিকে ভোট দেবে, এবং এই বিষয়ে কংগ্রেস দল দ্বিধাবিভক্ত, এই পর্যন্ত সংবাদ আমরা জানি; এই সংখ্যার বঙ্গদর্শন যখন প্রকাশিত হবে তখন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হয়ে গেছে, কাজেই এ প্রসঙ্গ এখানেই শেষ করে দেওয়া ভাল।

গত সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গে এমন কোন চাঞ্চল্যকর কিংবা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটে নি যার ওপর ভিত্তি করে বঙ্গদর্শনের প্রথম নিবন্ধটি লেখা চলে। বিধানসভায় বিদ্রোহী পুলিশদের বিষয়টা এখন তদন্তাধীন, সাম্প্রতিক সংবাদ পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক শ্রীসুবোধ দত্তকে বরখাস্ত করা হয়েছে। আরও একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ হল ধর্মঘটী চটকল শ্রমিকেরা সাফল্য লাভ করেছেন, যা সম্ভবপর হয়েছে দুটি কারণে, প্রথমটি হচ্ছে চটকল শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম যা নানা কারণে শিক্ষণীয় এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে এ-বিষয়ে ক্ষমতাসীন যুক্তফ্রন্ট সরকারের অকুণ্ঠ সমর্থন। বিগত সপ্তাহের আরও একটি উল্লেখযোগ্য সংবাদ হচ্ছে, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের কর্মীদের একমাসের ধর্মঘটের অবসান, যা আমাদের শিক্ষা দেয় মন্ত্রী ব্যক্তিত্বহীন হলে কত তুচ্ছ বিষয় কত অনর্থ ঘটাতে পারে।

*

পর পর কয়েকটি বৈঠকের পর সম্প্রতি যুক্তফ্রন্টের শরিকী সংঘর্ষ নিবারণের দলিল সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। পঞ্চপ্রধান রচিত দলিলে কয়েকটি সামান্য সংশোধনের ভিত্তিতেই এই দলিল রচিত হয়েছে। এই দলিলে মুখ্যত বলা হয়েছে যে ফ্রন্টের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুক্ত সংগ্রাম পরিচালনা করতে পারলেই শরিকী সংঘর্ষ কমবে, তাই স্থির হয়েছে কায়েমী স্বার্থ ও ফ্রন্ট শত্রুদের বিরুদ্ধে সর্বস্তরে সংগ্রাম পরিচালনার জন্য স্থানীয় ভিত্তিতে ফ্রন্ট ও ফ্রন্টের গণসংগঠনসমূহের কমিটি গড়ে তুলে নির্দিষ্ট কর্মসূচীর ভিত্তিতে সংগ্রাম পরিচালনা করা হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, যুক্তফ্রন্টের ওপরতলায় ঐক্য থাকলেও কর্মীস্তরে অনৈক্যের ব্যবধান এত বেশি যে, শুধু প্রস্তাব গ্রহণ করে কোন কাজ হবে না।

*

কলকাতা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের বিভিন্ন ব্যাপারে তদন্তের জন্য রাজ্য সরকার অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শ্রীরেণুপদ মুখার্জীকে নিয়ে একজনের তদন্ত কমিটি গঠন করেছেন। আগস্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে তদন্ত

কয়েকখানি বিখ্যাত বাংলা অনুবাদ

এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ		
কেনেডি	—সোরেন সেন	৩.০০
চিরজীবী গ্রন্থালয়	—এলামার রাইস	৫.০০
সপ্তডিঙা	—ইউজিন ও'নিল	৩.০০
উদারপন্থী বিবেক	—চেস্টার বোলজ	৫.০০
রূপা অ্যান্ড কোং		
আদর্শ নুর্স	—প্যাডোভার	৪.৫০
প্রেসিডেন্ট নিক্সন	—মেজো ও হেস	৩.৫০
এশিয়া পাবলিশিং কোং		
মানব ইতিহাসের সন্ধানে (দুইখণ্ড)	—কার্লটন এস কুন—প্রতি খণ্ড	৬.০০
আমেরিকার কাহিনী (তিন খণ্ড)	—জনসন—প্রতি খণ্ড	২.৫০
আত্মকাহিনী	—ইলিনর রুজভেল্ট	২.৫০
বিশ্ব মিযানের সন্ধানে	—গার্ডনার	৩.০০
বন থেকে শহরে	—আইফার্ট	৩.৫০
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি ব্যবস্থা	—ভুরিশ	৪.৫০
অ্যাকাডেমিক পাবলিশার্স		
কিভাবে গড়ে ওঠে রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতি	—বারডিং	১.৭৫
বসুধারা প্রকাশনী		
শান্তির দূত	—মেয়ার	২.০০
মহান রুজভেল্ট	—পিয়ার	৩.০০
হোমশিখা প্রকাশনী, কৃষ্ণনগর		
সেই বালক ডানবার	—জিন গুল্ড	১.০০
জাজ গানের রাজা লুই আর্মস্ট্রং	—ইটন	১.০০
ওয়াশিংটন আর্ভিং	—সেটন	১.০০
সাহিত্যায়ন		
ইতিহাসের স্বর্ণসাক্ষর	—পিটি	৪.০০
পুনর্মিলন	—সানসা	২.০০
সাদা হরিণ	—থারবার	৩.০০
শান্তি যোদ্ধা মার্টিন লুথার কিং	—ক্লেটন	২.২৫

নানা বিষয়ে আরো অনেক বই : পুস্তক বিক্রেতাদের উচ্চ কমিশন
তালিকা চেয়ে পাঠান : আজই অর্ডার দিন

এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ : ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলি-১২

কমিটি গঠনের একটা প্রতিশ্রুতি আগে থেকেই দেওয়া ছিল। ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজের জাতীয়করণের আগের এক বছর থেকে এখনো পর্যন্ত যে নানাবিধ দুর্নীতি ও অনাচারের অভিযোগগুলি হচ্ছে, সেগুলিই কমিটির বিচার্য বিষয়। তদন্ত কমিটি দু'মাসের মধ্যে রিপোর্ট পেশ করবেন।

*

কলকাতা ময়দান থেকে লর্ড কার্জনের প্রতিমূর্তিটি অপসারণের সঙ্গে সঙ্গে এ পর্যায়ের প্রথম পর্বের কাজ শেষ হল। স্বাধীনতা উৎসবের প্রাক্কালে সাম্রাজ্যবাদের প্রতিভূ বলে বর্ণিত এইসব বিদেশীদের মূর্তিগুলি একে একে অপসারিত হবার পর একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাজ্যের পূর্তমন্ত্রী শ্রীসুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেন যে, দেশের জনগণের সঙ্গে যাঁদের গভীর সম্পর্ক ছিল, যাঁদের আদর্শে দেশবাসী অনুপ্রাণিত হবে, তাঁদের মূর্তিই ময়দানে প্রতিষ্ঠিত হবে।

*

সরকারী স্তরে এমন কি বিধানসভার কাজকর্মও বাংলা ভাষায় চালু করা সম্পর্কিত একটি বে-সরকারী প্রস্তাব বিধানসভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়েছে। প্রস্তাবটি উত্থাপন করে আর এস পি সদস্য অমরেন্দ্র রায় বলেন, বাংলাদেশের পক্ষে লজ্জার কথা যে, বাংলা ভাষা এখনো পর্যন্ত সরকারী ভাষা হিসাবে স্বীকৃতি পায় নি। ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীতে প্রগতিশীল ভাষা হিসাবে বাংলা ভাষা মর্যাদা পেয়েছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়টি খুবই বেদনাদায়ক। কংগ্রেস দলের ডেপুটি লীডার শ্রীআবদুস সাত্তার এই প্রস্তাব সমর্থন করে বলেন, পরিভাষা সহজ করতে হবে যাতে গাঁয়ের লোক বোঝে। তথ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি ভট্টাচার্য বলেন, অতীতের সমালোচনা করে লাভ নেই। তবে দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। চিন্তার জড়ত্বই আসল বাধা।

*

গত কয়েকদিনের বৃষ্টির ফলে পশ্চিমবঙ্গের বহু এলাকায় প্লাবন দেখা দেওয়ার যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে সেই সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী, উপ-মুখ্যমন্ত্রী, ত্রাণমন্ত্রী ও কৃষিমন্ত্রী একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে স্থির করেন যে, সাধারণ ত্রাণখাতে বাজেটের অতিরিক্ত ব্যয় করতে হবে। যে সব ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে সরকারী খাস জমি বিলি করা হয়েছে তাদের চাষের জন্য ঋণ দেওয়া হবে। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এই বৈঠকে গ্রহণ করা হয়েছে। এযাবৎ ভেড়িগুলির বাঁধ রক্ষণাবেক্ষণ করতেন মালিকেরা। অনেক ভেড়ি মালিকদের হাত থেকে চলে যাওয়ায় এখন রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব কেউ নিচ্ছেন না। এই বাঁধগুলি বিরাট এলাকাকে বিপন্ন করে তুলেছে। তাই স্থির হয়েছে রাজ্য সরকারের ত্রাণদপ্তর এই বাঁধগুলি মেরামতের জন্য যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন তা খরচ করবেন। এছাড়া সরকারের কাছে খবর এসেছে নদীর ক্ষয়ের জন্য মুর্শিদাবাদের আওরঙ্গাবাদ শহর বিপন্ন। পশ্চিম দিনাজপুরেও এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে মালদহ জেলার কিছু অংশ, মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমা, হুগলী জেলার আরামবাগ ও খানাকুল এবং চব্বিশ পরগনা জেলার বহু এলাকা শস্যহানির মুখে। এই সব এলাকার ঋণের জন্য অর্থ ব্যয়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শিক্ষানীতি

শিক্ষামন্ত্রীর পদে যিনিই আসুন না কেন, এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির ওপর এক্সপেরিমেণ্ট করার লোভ তিনি ত্যাগ করতে পারেন না এবং তার ফলে চরম মূল্য দিতে হয় হতভাগ্য ছাত্র-ছাত্রীদেরই। সত্যপ্রিয়বাবু শিক্ষামন্ত্রী হয়ে আসার পর এটাই আশা করা গিয়েছিল যে একজন যথার্থ শিক্ষক অতঃপর শিক্ষামন্ত্রী হওয়ায় পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাকেন্দ্রের বর্তমান নৈরাশ্য দূর হবে। কিন্তু কার্যত তা হয় নি।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার সবচেয়ে বড় গলদ হচ্ছে প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে মাধ্যমিক শিক্ষকদের শিক্ষার কোন সমন্বয় নেই, মাধ্যমিক শিক্ষার সঙ্গে কলেজী শিক্ষা সম্পর্কশূন্য। এবং সামগ্রিকভাবে শিক্ষাব্যবস্থার ধরণটা এমন যে, তা ছাত্রদের কাছে মোটেই চিত্তাকর্ষক নয়, শিক্ষা ব্যাপারটাই একটা বিভীষিকা, কেন না তা সহজে গ্রহণযোগ্য নয়, যে কারণে ফেলের সংখ্যা প্রতি বছরেই ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিভাবে একটি পর্যায়ের সঙ্গে আর একটি পর্যায়ের সমন্বয় ঘটানো যায়, কিভাবে আজকের যুগের নবতর জ্ঞান-বিজ্ঞানের শিক্ষণীয় বিষয় করে তোলা যায় এবং সর্বোপরি তা কিভাবে ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট আকর্ষণীয় করে তোলা যায় সেটাই শিক্ষানীতির মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

বোধহয় নতুন কিছু একটা করতে হবে এই উদ্দেশ্যেই সত্যপ্রিয়বাবু মন্ত্রী হবার পরেই এগারো ক্লাসের বদলে বারো ক্লাস প্রবর্তনের কথা বলেছিলেন, কিন্তু তাঁর এই পরিকল্পনা যুক্তফ্রন্টের শরিক দলগুলির নিকট বোধহয় তেমন সমর্থন পায় নি, কাজেই এ নিয়ে এখন আর বিশেষ হৈ-চৈ হচ্ছে না। দশ ক্লাস বাড়িয়ে এগারো ক্লাস করে শিক্ষারাজ্যে কি পরিবর্তন এসেছে জানি না, কিন্তু তার ফলে যে বিন্দুমাত্র লাভ হয়েছে একথা বোধহয় কেউই বলতে রাজী হবেন না। যে বিষয়গুলি আগে কলেজে পড়ানো হত, তা স্কুলের পাঠ্যক্রমের মধ্যে অত্যন্ত খাপছাড়াভাবে নিয়ে আসা হয়েছে যা অপরিণতবুদ্ধি ছাত্রদের গ্রহণ করা কার্যত অসম্ভব হয়ে উঠেছে। হায়ার সেকেণ্ডারী পরীক্ষায় পাশ হয়ত অনেকে করে, কিন্তু অধীতব্য বিষয়গুলি কে কতটা শিখতে পারে তাতে বিলক্ষণ সন্দেহের কারণ আছে। আগেকার ক্লাস টেন স্কুল বরং ভাল ছিল। ছেলেরা স্কুল ফাইন্যাল পাশ করার পর কলেজ স্তরে গিয়ে অভিরুচি অনুযায়ী বিষয় বেছে নিতে পারত। এখন ক্লাস নাইন থেকেই তা বাছতে হচ্ছে এবং এই বাছাটা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সঠিক হচ্ছে না, যার খেসারত দিতে হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের।

এই দিক থেকে দেখলে আগের দশ ক্লাস ব্যবস্থাতেই প্রত্যাবর্তন করা যুক্তিসঙ্গত এবং কলেজগুলিতে পুনরায় ইণ্টারমিডিয়েট কোর্স চালু করা দরকার। বৃটিশ আমলের শিক্ষাব্যবস্থায় এক পর্যায়ের সঙ্গে আর এক পর্যায়ের সুষ্ঠু সমন্বয় না থাকলেও সমন্বয়ের একান্ত

রামদয়াল মজুমদার প্রণীত

শ্রীগীতা

তিন খণ্ডে পুনর্মুদ্রিত হইতেছে। ইহাতে মূল, সার সংগ্রহ, টীকা অন্বয় ও বঙ্গানুবাদ আছে,—আর আছে কৃষ্ণার্জুনের প্রশ্নোত্তরছলে সকল শাস্ত্রের সমন্বয় করিয়া প্রতিশ্লোকের তাৎপর্য ব্যাখ্যা। এই শেষোক্ত ব্যাপারটাই মনস্বী রামদয়াল মহারাজের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। সংস্কৃত টীকায় শঙ্করাচার্য্য, শ্রীধর স্বামী, মধুসূদন সরস্বতী, আনন্দগিরি, বলদেব বিদ্যাভূষণ, নীলকণ্ঠ, বিশ্বনাথ, হনুমৎস্বামী যামুনাচার্য্যের ভাষ্য ও টীকার সারাংশ চয়ন করিয়া রামদয়াল মহারাজ অপূর্ব্ব মালা গাঁথিয়াছেন।

মূল্য প্রতি খণ্ড ১৫·০০ টাকা। যাঁহারা ভাদ্র ১৩৭৬ মধ্যে অগ্রিম টাকা জমা দিয়া নাম তালিকাভুক্ত করাইবেন তাঁহারা ১২·০০ টাকায় পাইবেন। কার্ত্তিক মাসের মধ্যে প্রথম খণ্ড বাহির হইবে। নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

কিঙ্কর বিমলানন্দ, আর্য্যশাস্ত্র কার্যালয়
৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬
ফোন : ৩৪-৪৪০৮

অভাব ছিল না। যদি আদৌ কোন পরিবর্তন করতে হয় তাহলে অষ্টম শ্রেণীর পর একটি সার্বিক পরীক্ষা গ্রহণ করা উচিত। পঞ্চম থেকে অষ্টম এই চার বছর মাধ্যমিক, এবং নবম ও দশম শ্রেণীকে উচ্চমাধ্যমিক আখ্যা দেওয়া উচিত। যারা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পড়ার পর মাধ্যমিক পাশ করবে, তাদের সেই সার্টিফিকেটই সাধারণ স্তরের কাজকর্মের পক্ষে পর্যাপ্ত হিসাবে গণ্য করতে হবে, আজকের স্কুল ফাইন্যাল বা হায়ার সেকেন্ডারীর মত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক করে দেবেন বলে ঘোষণা করেছেন, তা তখনই সার্থক হতে পারে যদি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার কোন বাজারমূল্য থাকে।

বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতি ছাত্রদের যে মোটেই আকর্ষণ করতে পারে না তার একমাত্র কারণ হচ্ছে এই যে, ইংরাজীর জন্য ছাত্রদের সময়ের অধিকাংশই ব্যয়িত হয়, এতটা সময় এবং শক্তি নষ্ট করেও তাতে অভীষ্ট লাভ হয় না। এটা সত্যিই আশ্চর্য মনে হয় যখন দেখা যায় ফিজিক্সে বা ইতিহাসে যে ছেলে ষাট-সত্তর নম্বর পায়, ইংরাজীতে তার তিরিশের কোটা পেরোতেই প্রাণান্ত। এর জন্য ইংরাজীর বর্তমান সিলেবাসই সর্বাংশে দায়ী। পঞ্চম থেকে একাদশ শ্রেণী পর্যন্ত যেভাবে ইংরাজী পড়ানো হয় তাতে কার্যত ইংরাজী শিক্ষা অসম্ভব। আমাদের বক্তব্য ইংরাজীকে এক্ষেত্রে একেবারেই বাদ দেওয়া হোক। তাতে এমন কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। সংস্কৃত, হিন্দী এগুলিও বাদ হোক। একেবারে বাদ দেবার কথা বলছি না, এগুলি রাখা হোক ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে, যার পছন্দ সে পড়বে, যার পছন্দ নয় সে পড়বে না। বিভিন্ন ভাষার জন্য পৃথক সার্টিফিকেটের বন্দোবস্ত রাখলেই চলবে। এইভাবে যারা স্বেচ্ছায় ইংরাজী শিখবে তারা জেনে বুঝেই শিখবে। এবং ভালভাবে একটা ভাষা শিক্ষার জন্য তিন বছরই পর্যাপ্ত সময়। কেন না কলকাতায় ফরাসী, জার্মান ইত্যাদি শেখার জন্য যে কোর্সগুলি আছে, সবগুলিই তিন বছরের কোর্স। টোলে সংস্কৃত তিন বছরে ভালই শেখানো হয়। অথচ ট্র্যাজেডি এমনই যে, ইস্কুলের এগারো বছর এবং কলেজের তিন বছর এই চোদ্দ বছরেও ইংরাজী শেখা যায় না, পাঁচ বছর স্কুলে সংস্কৃত পড়েও সংস্কৃত ছাত্রের নিকট একটা বিভীষিকা হয়ে থাকে। কাজেই এই সব ভার থেকে ছাত্রছাত্রীদের যতদূর শীঘ্র সম্ভব মুক্ত করে দেওয়া উচিত, যার দরকার সে নিজে শিখে নেবে, তবে তার ব্যবস্থা রাখা উচিত।

চিরন্তন সমস্যা

হুগলী জেলার দ্বারকেশ্বর নদে জলোচ্ছ্বাসের ফলে আরামবাগ ও খানাকুল এলাকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। প্রবল বর্ষা এবং ডি-ভি-সি ব্যারেজ ও পাঞ্চেত বাঁধ থেকে জল ছাড়ার ফলে এই বন্যার সূত্রপাত ঘটেছে। রামনগর ও দক্ষিণ মাণিকপোতে কয়েকটি বাঁধ ভেঙে যাবার ফলে বন্যার জলে কৃষিজমি সমেত বিভিন্ন গ্রাম নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ঘাটালে শিলাই নদীতে জলস্ফীতির ফলে নাড়াজোলের বাঁধ ভেঙে গ্রামে জল প্রবেশ করেছে। মেদিনীপুর জেলায় শিলাবতী ছাড়াও সুবর্ণরেখা, কাঁসাই প্রভৃতি নদীতে ব্যাপক জলোচ্ছ্বাসের লক্ষণ দেখা গেছে। নদীগুলি এখন এমনই বিপদসীমায় রয়েছে যে, আরও অধিক বর্ষণ হলে এবং বাঁধ থেকে বেশি জল ছাড়া হলে অবস্থা সাংঘাতিক হয়ে উঠবে। সরকারী মহলের ধারণা যে ডি-ভি-সি'র জল ছাড়া হলে হুগলীর আরামবাগ অঞ্চল, মেদিনীপুরের ঘাটাল এলাকা এবং হাওড়ার কিছু কিছু অংশে জলপ্লাবন ঘটবে। সেচমন্ত্রী ডি-ভি-সি কর্তৃপক্ষকে নাকি জল ছাড়ার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করার জন্য ইতিমধ্যেই খবর পাঠিয়েছেন। সেচমন্ত্রীর মতে, দ্বারকেশ্বর ও শিলাবতী নদীর কয়েকটি অংশের যে বাঁধগুলিতে ভাঙন ধরেছে, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে সেচ দপ্তরের নয়। ত্রিশ বছর আগে এই বাঁধগুলি পরিত্যক্ত বলে ঘোষিত হয়। জমিদারী দখলের পর এই ধরণের বহু বাঁধ সরকারের হাতে আসে। এই বাঁধগুলি মাত্র গত বছর সেচ দপ্তরের হাতে এসেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সুন্দরবন এলাকাতেই বাইশ শো মাইল এমন বাঁধ আছে। এই ধরণের বাঁধগুলিকে নির্দিষ্ট মানে গড়ে তুলতে গেলে একশো কোটি টাকারও বেশি অর্থ প্রয়োজন। শোনা গেল যে, বন্যা নিয়ন্ত্রণের কাজে কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গে কেলেঘাই ও কাটাখালি পরিকল্পনায় এক কোটি চোদ্দ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করেছেন যেখানে রাজ্য সরকারের দাবি ছিল তিন কোটি টাকা। সেচমন্ত্রী জানিয়েছেন যে, এতে আপাতত কাজ আরম্ভ করতে পারা যাবে। তিনি আরও জানিয়েছেন যে, রাজ্যের নিম্নাংশে দুবদা বেসিন ও নিম্ন দামোদর ড্রেনেজের ব্যাপারে সরকার যথেষ্ট উদ্বিগ্ন রয়েছেন। কিন্তু এই দুটি পরিকল্পনা সম্পর্কে কেন্দ্র এখনো কোন অর্থ মঞ্জুর করেন নি। (১৬-৮-৬৯)

আগামী সংখ্যার বিশেষ আকর্ষণ

কয়েকদিন পূর্বে খোদ রাইটার্স বিল্ডিংসে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ঘরের খুব কাছাকাছি হেলথ ডিরেক্টরেটের জনৈক পদস্থ আমলার ('সুহৃদ-চক্রের' নায়ক এই ভদ্রলোক স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন) ঘরে বিকেলের দিকে যে মদের আসর বসেছিল, (যাতে দুটি মেডিক্যাল কলেজের দুজন প্রাক্তন অধ্যক্ষও নাকি অংশ গ্রহণ করেছিলেন); সে সম্পর্কে চাঞ্চল্যকর সংবাদ আমাদের দপ্তরে এসে পৌঁছেছে। আগামী সংখ্যায় এ বিষয়ে বিশেষ আলোচনা প্রকাশিত হবে।

সম্প্রতি হেলথ ডিরেক্টরেটের কয়েকজন অফিসারকে পুনর্নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে—এ ব্যাপারে সরকারী নিয়ম-কানুন, বিশেষ করে ফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সাম্প্রতিক আদেশকেও লঙ্ঘন করা হয়েছে উপরোক্ত পদস্থ আমলার স্বার্থে। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ভূমিকাও এ ব্যাপারে খুব গৌরবজনক নয় বলে অভিযোগ হয়েছে। এ বিষয়েও আগামী সংখ্যায় আলোকপাত করা হবে।

বসুমতীর
যাবতীয়
গ্রন্থ ও
গ্রন্থাবলীর
প্রাপ্তিস্থান
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ
কলিকাতা—১২
এবং
সান্যাল এণ্ড কোং
১/১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা—১২.

ভারত দর্শন

স্বাধীনতা দিবসের ঘোষণা

আজ আলোকোজ্জ্বল পুণ্য প্রত্যূষে লালকেল্লার নিচে সমবেত সহস্র সহস্র ভারতবাসী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে স্বাধীনতা দিবসের ঘোষণাকে আকাশে-বাতাসে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করলেন : জয় হিন্দ্।

জনগণের জয় তামাম হিন্দুস্থান, ভারতবর্ষের জয়। তাই 'জয়হিন্দ্'।, এই কথাটি ইতিপূর্বে বোধ হয় লালকেল্লা থেকে এমন তাৎপর্যমণ্ডিতভাবে আর কখনো উচ্চারিত হতে শোনা যায় নি। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী জনগণের কণ্ঠরোধকারী এক নেপথ্য শক্তির বিরুদ্ধে ভারতবাসীকে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার উন্মুক্ত আহ্বান জানালেন। বললেন, গণশক্তিই জাতির একমাত্র ভরসা। সেই জনগণের স্বার্থে তিনি তাঁর সরকারের নীতি ও ইতিকর্তব্য সংহত ও পুনর্বিন্যস্ত করার জন্য প্রস্তুত। তাঁর বিশ্বাস, জনগণের আশীর্বাদ তাঁকে তাঁর গণস্বার্থে উদ্বুদ্ধ কর্তব্য পালনে এগিয়ে যেতে সর্বতোভাবে সহায়তা করবে। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই লক্ষ হাতের করতালি তাঁর প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করল।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে এমনভাবে এক নেপথ্য প্রতিপক্ষের কথা সচেতনভাবে মনে রেখে স্বাধীনতা দিবসের ভাষণ দান করতে ভারতবাসী ইতিপূর্বে শোনে নি। অশোকচক্র-অন্তস্থ তেরঙ্গা পতাকার মতো আবেগে প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠস্বরও কি কেঁপেছিল? না, প্রত্যয়দৃঢ় নিরুদ্বেগকণ্ঠে প্রধানমন্ত্রী তাঁর দীর্ঘ ভাষণ শেষ করলেন। যেন গণস্বাধীনতার সৈনিকদের সামনে এক অকুতোভয় নেত্রী আগামীদিনের সংগ্রামে জনগণকে জয়যুক্ত হওয়ার প্রেরণা দিচ্ছেন। জনতা আবেগে স্ফুরিত হচ্ছিলেন, সন্দেহ নেই। স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে এ এক অভূতপূর্ব গণশপথ গ্রহণের দিন। মনে রইল, ১৫ই আগস্ট, ১৯৬৯-এর এই অভূতপূর্ব পরিবেশ যা সমগ্র দেশে বিপুল ছায়াপাত করেছে, যা প্রতিটি সচেতন মানুষকে ব্যগ্র উন্মুখ ও সতর্ক করে রেখেছে।

আজ দেশের সমগ্র রাজনৈতিক পরিবেশ এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণে ঝটিকাপূর্ব মুহূর্তের ঘোর ঘনঘটা সৃষ্টি করেছে। ক্রিয়া না প্রতিক্রিয়া; জীবনদায়িনী চিরচঞ্চলা নদীর মতো অবাধ পুলকিত গতির প্রগতি, না কোনো কর্দমাক্ত ডোবার স্তব্ধতা? এই প্রশ্নে এসে সমগ্র জাতীয় জীবন ব্যারেকের জন্যে থমকে দাঁড়িয়েছে। পথ তাকে বেছে নিতেই হবে। সে চলবে, এগোবে, নাকি আবহমানের কর্দমে ডুবে ডুবে পচে মরবে! প্রধানমন্ত্রী বললেন, আসুন আমরা এগিয়ে চলি। যাঁদের উত্তরাধিকার নিয়ে আজ আমরা পথ হাঁটছি তাঁদের কাছেও আমরা পেয়েছি এগিয়ে চলারই নির্দেশ।

এগিয়ে চলা ছাড়া উপায় নেই। ভারতীয় ঋষিবাক্যও ঐ প্রগতির পথে অমোঘ নির্দেশ রেখেছে, এগিয়ে চল, এগিয়ে চল; চরৈবেতি, চরৈবেতি।

কিন্তু আজ, স্বাধীনতার একুশ বছর পরে এই এগিয়ে চলার কথায় এমন তরঙ্গভঙ্গ কেন? বিগত একুশটি বছর কি আমরা প্রস্তরমূর্তির মতো স্তম্ভীভূত ছিলাম? আজই কি আমাদের পথ চলার প্রথম সূত্রপাত কিম্বা তদর্থে আমাদের কাছে দিল্লীর লালকেল্লা থেকে আহ্বান এসেছে?

ঠিক এই প্রশ্নই তো আজকের প্রশ্ন। স্বাধীনতার পরেও আমরা পথ হেঁটেছি। বস্তুত পরিশ্রমও কম হয় নি। ভারতের জনগণ গভীর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সঙ্গে অশোকচক্রবিমণ্ডিত তেরঙ্গার নিচে সমবেত হয়ে নওজওয়ানের শপথই গ্রহণ করেছে। ঘরে-বাইরে স্বাধীনতার শত্রুদের বিরুদ্ধে লড়েছে বীরের মতো, ঢেলে দিয়েছে বুকের উত্তপ্ত রুধিরস্রোত। মা দিয়েছেন যাঁর ছেলের মাথায় সমস্ত শুভেচ্ছা আর আশীর্বাদের দূর্বাধান। প্রেয়সী এঁকেছেন যাঁর দয়িতের কপালে জাতিরক্ষার শোণিতরাঙা শপথের জয়টীকা। তবে, আজ নতুন করে কোন ধর্মযুদ্ধের আবাহন? আজই যুগান্তরের প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে নতুন পদবিক্ষেপে এগিয়ে যাওয়ার এ কোন্ প্রস্তুতি।

সত্য বটে থেমে আমরা থাকি নি। জীবনধারা থেমে থাকে না। ইতিহাস অথর্ব হতে জানে না। আমরা চলছিলাম, কিন্তু সে চলা ছিল বোঝাবাহী 'রানার'-এর ভারবাহী আত্মসম্পর্কবিহীন অন্যতাড়িত নৃত্যে পথপরিক্রমা। ভারতের সেই গণরানার পিঠে বোঝা বেঁধে যে সংবাদ বহন করে হাঁটছিল তার সঙ্গে সে ছিল প্রায় নিঃসম্পর্কিত। একগুচ্ছ মানুষের একচেটিয়া সমৃদ্ধির নিত্য-নতুন খবরদারি বহন করে ক্লান্ত আর ক্লান্ত হওয়ার বিচিত্র অভিযানে সে ছিল লাঞ্ছিত পদাতিক। যে স্বাধীনতার শপথবাক্য বাইশ বছর ধরে উচ্চারিত হয়ে আসছে, সেই স্বাধীনতার সঙ্গে বস্তুত কোনো মুক্তির স্বপ্ন সেই ক্লান্ত যুবক রানার-এর চোখে আনন্দাঞ্জন রেখা টেনে দিতে পারে নি। বণিকের রাজদণ্ড বণিকেরই হাতে শাসনদণ্ড-রূপে শোভিত হয়ে এসেছে। দণ্ডধারীর চামড়ার রঙে শুধু ফারাক। পূর্বসূরীর গায়ের রঙ ছিল সাদা, উত্তরসূরীর গাত্রচর্ম কালো। তাতে সেই শাসকতাড়িত দুর্ভাগা রানার পদাতিকের সামান্যই অবস্থার উনিশ-বিশ হয়েছে। সে মার খেয়েছে; রাস্তার ওপর রুধিরাক্ত দেহে মুখ থুবড়ে পড়েছে; আবার গা ঝাড়া দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করেছে।

এলো উনিশ শ' সাতষট্টির নির্বাচন। লাঞ্ছিত রানার কোথাও কোথাও তার বোঝার মাত্রা হাল্কা করার জন্য বেঁকে বসলো। শাসকের উদ্ধত দণ্ড নাড়া খেল। প্রাসাদে জাগল উত্তেজনা আর আতঙ্কের ঘূর্ণি হওয়ার দাপট। প্রাসাদ-প্রকোষ্ঠে যাঁরা অত্যাচারের অসহায় নীরব দর্শক ছিলেন, সুযোগের অভাবে যাঁরা উচ্চারণ করতে পারেন নি প্রতিবাদ ও অসন্তোষের ভাষা, তাঁদের কেউ কেউ অস্ফুট শীৎকারধ্বনি করেছিলেন বলেই ১৯৬৭-র পূর্বেই তাঁদের গলাধাক্কা দিয়ে প্রাসাদচ্যুত করা হল। তাঁরাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। ঐ গলাধাক্কার প্রয়োজন ছিল, না হলে সাহস করে নিজের দায়িত্বে বুঝিবা তাঁরা প্রাসাদ ছেড়ে জনগণের সঙ্গে নেমে আসতে ভরসা পাচ্ছিলেন না। ১৯৬৭-র নির্বাচন পর্বের পর সেই বোঝাবাহী রানার-এর চোখে-মুখে বিস্ময়ের দীপ্তি প্রস্ফুটিত হল। বিশ্বাস হল নিজের ক্ষমতায়; আর ঐ নড়বড়ে প্রাসাদের ভিত্তিভূমি পর্যন্ত যেন প্রচণ্ড ধাক্কায় টাল খেয়ে সমুদ্রবক্ষে ক্ষুদ্র তরণীর মতো দোদুল্যমান হয়ে উঠল।

সেই আঘাতেরই ঢেউ আজ নতুন জীবনের জয়গানে স্ফুরিত হয়ে উঠছে!

প্রাসাদের প্রস্তর প্রাচীরে নবজীবনরসপুত সংগীত-ঝঙ্কারে যাঁরা সচেতন হয়েছেন, তাঁরা বুঝেছেন, লাঞ্ছিত রানার-এর ঘুম ভাঙছে। আর মুহূর্ত কয়েক দেরি সইবে না। নতুন প্রস্তুতি, নতুন পথনির্দেশের অমোঘ আদেশ তাঁরা শুনতে পেয়েছেন। আজকের স্বাধীনতা দিবসে সেই পথে চলারই ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী।

খর বায়ু বইছে। এখন শুধু কাণ্ডারী হুঁসিয়ার। এখন হাল ধরতে হবে, পাল বাঁধতে হবে, কারণ পালা বদলের হাওয়া লেগেছে পালে।

স্বাধীনতার ঘোষণা তাই নতুন তাৎপর্য নিয়েছে। আজ জনতার কণ্ঠে কণ্ঠদান করে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং জয়ধ্বনি করেছেন : জয় হিন্দ্!

ইতিহাস চলছে, চলবে। যাঁরা কদমে কদম ফেলতে অক্ষম, তাঁরা সেই অনস্বীকার্য চলার পথে পিছিয়ে পড়বেন। ইতিহাস তাঁদের পেছনে ফেলেই এগোবে। আর এই ইতিহাসের গতি নির্ণয়ের অধিকারী কোন রাষ্ট্রপতির সিংহ আসন নয়। সে আসনে যিনিই সমাসীন হোন না কেন, ইতিহাস তার পদক্ষেপ রুখতে জানে না, রুখতে শেখে নি। ঐ 'জয় হিন্দ্' ধ্বনিতে কণ্ঠদানকারীরা সেই অনিবার্য পথ ধরে অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে যাবে। চলাই যে ধর্ম। আজকের স্বাধীনতা দিবসে সেই ধর্মযুদ্ধেরই ঘোষণা।

১৬ই আগস্ট

আগামীকাল সেই দিন ভারতের ইতিহাসে যে দিন একটি বিশেষ স্থান করে নিতে যাচ্ছে। তামাম ভারতে যে কংগ্রেস একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তার করেছিল, ১৯৬৭-র পর দেশের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তনের ঢেউ সে কংগ্রেসকে শতধা বিচ্ছিন্ন করেছে। কংগ্রেসের মধ্যে চিরকালই প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার পরস্পর টাগ অব ওয়ার চলে এসেছে। কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচন নিয়েও দুই শিবিরে গোল বেধেছে। কংগ্রেস অধিবেশনেও এই গণ্ডগোলের পরিচিতি বারম্বার পুনর্লিখিত হয়েছে, কিন্তু রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এবার যা হল তা ঐতিহাসিক স্বাতন্ত্র্য দাবি করে। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর সমর্থকবৃন্দ কংগ্রেস সভাপতির নির্দেশ অমান্য করলেন প্রকাশ্যে। সভাপতি নিজলিঙ্গাপ্পার ও কংগ্রেস সিণ্ডিকেটের প্রার্থী নীলম সঞ্জীব রেড্ডিকে জয়যুক্ত করতে মতাদর্শের ভিত্তিতে গররাজি হলেন এবং নির্ভয়ে সে মনোভাব প্রকাশ করতে কুণ্ঠিত হলেন না, প্রধানমন্ত্রী তথা ভি ভি গিরির সমর্থকবৃন্দ। ফলত কংগ্রেস এই নির্বাচনকে সামনে রেখে আগামী ১৬ই আগস্টই সুস্পষ্ট দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেল। নিজলিঙ্গাপ্পার শিবিরকে মদত দিতে এগিয়ে এলো ভারতের দুটি চরম দক্ষিণপন্থী দল স্বতন্ত্র ও জনসংঘ।

এই বিরোধের সূত্রপাত অবশ্য আজ নয়, নেহরু আমলেই। কংগ্রেসের ঘোষিত আধাসমাজতন্ত্রকে নেহরুজী রূপায়িত করার জন্য আজীবন নিজের দলে সতীর্থদের সঙ্গে সংগ্রাম করে এসেছেন। কিন্তু পারেন নি পুঁজিপিশাচ শ্রেণীর কবল থেকে সাচ্চা কংগ্রেসীদের পৃথক করে পাল্টা শিবিরের শক্তি প্রদর্শন করতে। সেই সময়ই শুধু নেহরুজীর ঘোষিত আধাসমাজতন্ত্রের স্বপ্ন লিখিত আকার গ্রহণ করছে দেখে রাজাগোপাল-কৃপালনীরা দল ছেড়েছিলেন। যাঁরা সেদিন কংগ্রেস না ছেড়ে কংগ্রেসী ছাপ নিয়েই কংগ্রেসের শোষিত নীতিকে বাস্তবায়িত করার পথে বারম্বার কাঁটাতারের বেড়া বুনবার জন্য রয়ে গেছলেন আজ তাঁরা দেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক আবহাওয়ায় নিঃসন্দেহে প্রমাদ গুণছেন। তাঁদের সিণ্ডিকেটকে মানতে অস্বীকার করেছেন সেই সমুদয় কংগ্রেসী, যাঁরা চান কথায় ও কাজে কংগ্রেস জনগণের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হোক, জনতার হৃত বিশ্বাস ফিরে আসুক কংগ্রেস সংগঠনের প্রতি।

এমন এক কংগ্রেসী সেদিন উত্তেজিত কণ্ঠে শ্লোগান দিয়েছেন, সিণ্ডিকেট নিপাত যাক, নরকে যাক। আজ আর এক কংগ্রেসী নেতা বিজয় সিং নাহারের বক্তব্য পড়লাম সংবাদপত্রে। তিনি বললেন, দরকার হলে সিণ্ডিকেটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের পরিষদীয় নেতা সিদ্ধার্থশঙ্কর বললেন, সঞ্জীব রেড্ডিকে আর কংগ্রেস প্রার্থী বলা যায় না। এখন তিনি স্বতন্ত্র জনসংঘ জোটেরই প্রার্থী। অর্জুন অরোরা সেই সিণ্ডিকেট-স্বতন্ত্র-জনসংঘ জোটের আহ্বায়ক নিজলিঙ্গাপ্পাকে (ইনি সঞ্জীব রেড্ডিকে জয়যুক্ত করার জন্য ঐ দুই দলসহ পি এস পি'র সঙ্গেও সংযোগ স্থাপনে আপত্তিকর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন বলে অভিযোগ) পাততাড়ি গুটিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে পরামর্শ দিলেন। প্রত্যুত্তরে কংগ্রেস সভাপতি নিজলিঙ্গাপ্পাও তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করে বললেন, আপনাকে কেন দল থেকে বহিষ্কৃত করা হবে না তার কারণ দর্শান। রাজ্যসভার কংগ্রেসী সদস্য অর্জুন অরোরা কংগ্রেস সভাপতির দ্বারা সাসপেণ্ড হলেন। অবশ্য রক্ষণশীল কংগ্রেসী নেতৃত্বের দ্বারা স্পষ্টবাদী সাচ্চা মানুষের বহিষ্কার এই প্রথম নয়, ইদানীংকালে অজয় মুখুজ্যে, কৃষ্ণমেননের মতো অনেকেই বহিষ্কৃত। তবে সেদিন ওঁরা যতখানি একা ছিলেন অর্জুন অরোরা আজ ততটা একা নন, তাঁর সঙ্গে আছেন কংগ্রেসের এক বিরাট অংশ। আর সেকারণেই অরোরা ও শশিভূষণদের রক্ষণশীলরা এতোকাল সহ্যও করে আসছিলেন; যেমন ইন্দিরার কাছে হেরে গিয়েও মোরারজী

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দিতে যাবার সময়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কয়েকজন সংসদ সদস্যকে তাঁর মনোভাব বুঝিয়ে দিচ্ছেন।

পাতিলকে মেনে নিতে হয়েছিল শ্রীমতী ইন্দিরার নেতৃত্ব। আজ বাগত হয়ে কর্তব্য-জ্ঞানহারা যে কোন ভুঁইফোঁড় নেতাই বলুন, শ্রীমতী গান্ধী কারো কারো "পায়ে ধরে" প্রধানমন্ত্রীর গদিতে বসেছেন (এই উক্তি পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সভাপতি ডঃ প্রতাপ চন্দ্র মহাশয়ের), একথা অনস্বীকার্য কেন্দ্রীয় কংগ্রেসের সিণ্ডিকেটের এছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। আর যাই হোক প্রধানমন্ত্রীর গদি যে "পায়ে ধরে" পাওয়া যায় না তা রাজনীতির দুধের খোকাও বোঝে। অন্ততঃ প্রতাপবাবু তো ভোটাধিকারীও নন।

শ্রীমতী গান্ধীর ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পরই কংগ্রেসে যাঁদের মুখোস খুলে পড়ল, যাঁরা স্বতন্ত্র, জনসঙ্ঘের দুয়ারে ছুটলেন বাঁচাও বাঁচাও রব তুলে তাঁরাই সঞ্জীব রেড্ডির সমর্থক। অথচ দেশের আপামর জনসাধারণ তো একবাক্যে ইন্দিরা গান্ধীর ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের সমর্থক। তাহলে সঞ্জীব রেড্ডি যদি জয়যুক্তও হন, তবে কি তিনি দেশের অধিকাংশের সমর্থনপুষ্ট হয়ে দেশের সর্বোচ্চ মর্যাদার আসনটি অলঙ্কৃত করছেন বলে গণ্য করা সম্ভব। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের যে ব্যবস্থা তাতে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি যে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের কাম্য ব্যক্তি এমন প্রমাণিত হয় না। প্রধানমন্ত্রীর যে কাজের দরুণ আজ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে গোল বেধেছে সে কাজ যদি অধিকাংশ মানুষের সমর্থনপুষ্ট হয়ে থাকে, তবে তাঁর প্রার্থীই হতে পারেন ভারতবাসীর কাম্য রাষ্ট্রপতি। এই রচনা যখন প্রকাশিত হবে তখন নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির নাম সকলেই জেনে যাবে। ২১শে আগস্ট সে নাম জানবে সমগ্র পৃথিবী। যে নামই ঘোষিত হোক, ব্যক্তি হিসেবে তিনি যিনিই হোন সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতির আসন-অধিকারী রূপে তাঁকে আমরা পূর্বাহ্নে অভিনন্দন জ্ঞাপন করে রাখছি। এবং আজকের পরিস্থিতি আলোচনার সঙ্গে তাঁকে যুক্ত করছি না। আজ এই সংকট ও সংবিধানের প্রশ্ন আলোচনায় যে জিজ্ঞাসা মনকে নাড়া দিচ্ছে, তাই লিপিবদ্ধ করবার মৌলিক অধিকারটুকু গ্রহণ করছি মাত্র।

যাই হোক বেশ বোঝা যাচ্ছে, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী তথা গিরির পক্ষে এক বিরাট সংখ্যক কংগ্রেসী দাঁড়িয়ে গেছেন এবং এই প্রশ্নে কংগ্রেসে প্রত্যক্ষ ভাঙন অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠেছে। সিদ্ধার্থবাবু যেমন বলেছেন, বস্তুতপক্ষে আজ কংগ্রেস ও স্বতন্ত্র-জনসঙ্ঘ জোট এই দুই শিবিরে কংগ্রেস বিভক্ত হ'ল। আরও আগেই এটা করবার জন্য পাতিল প্রমুখ রক্ষণশীল নেতারা 'লাইক মাইণ্ডেড' বা সমমতাবলম্বী দলের সঙ্গে আঁতাতের ধুয়ো তুলেছিলেন। আজ সেই আঁতাত রূপ গ্রহণ করতে চলল। স্বতন্ত্র-জনসঙ্ঘই আজ ভাবতে বসেছে দেশমুখকে ভোট দিয়ে ভোট নষ্ট করে রেড্ডির দোদুল্যমান অবস্থাকে জিইয়ে রাখা আর উচিত হবে কি না। অবস্থা এমনই যে, হয়ত ও'রা নিজের প্রার্থীকে পথে বসিয়ে কংগ্রেস (অর্থাৎ সিণ্ডিকেট মনোনীত) নীলম রেড্ডিকেই একক ভোট দান করে বসবেন। দেশমুখের ভাগ্য-বিড়ম্বনায় সহানুভূতি জানাবার জন্য হয়ত বা সমাজতন্ত্রী বলে কথিত একদল মানুষই (এস এস পি) শুধু অবশিষ্ট থাকবেন। গাছে তুলে মই কাড়ার এহেন দৃষ্টান্ত অবশ্যই বিরল বলে গণ্য হবে সেক্ষেত্রে। হ্যাঁ, এই এসন এমন পি'র কাণ্ডটা দেখে (পি এস পি'র কথা কবেই বরবাদ হয়ে গেছে) চক্ষু স্থির হয়ে গেছে। এ'রা নাকি সমাজতন্ত্রের ধ্বজাধারী। রাজনীতিতে সবই হয়। সমাজতন্ত্রও করব আবার স্বতন্ত্র প্রার্থীর বাক্সে ভোটও দেব। এমন ভেল্কি বিশ শতকেও চলে, ভারতের মানুষ অতি অল্পই শিক্ষিত এ কারণেই।

রাজ্যে রাজ্যে ভাঙন

উড়িষ্যা, মহারাষ্ট্র ও অন্ধ্রের কংগ্রেসীরা এবং কেরলা ও তামিলনাড়ুর মুষ্টিমেয় কংগ্রেসী এম এল এ ছাড়া রেড্ডির পক্ষে সার্বিক কংগ্রেসী সমর্থন কোথাও দেখা যাচ্ছে না। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসে হামলা হ'ল। বিহারে প্রায় হাতাহাতি। ওখানে রেড্ডির পক্ষে হুইপ মানতে চাইলেন না যাঁরা তাঁদের কেউ কেউ নেতার সামনেই সে হুইপ ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললেন। উত্তরপ্রদেশে সি বি গুপ্ত একজন জবরদস্ত সিণ্ডিকেট সমর্থক; কিন্তু কমলাপতি ত্রিপাঠী প্রকাশ্যেই গিরিকে সমর্থন করবেন বলে ঘোষণা করলেন। উত্তরপ্রদেশ থেকে বিরাট সংখ্যক ভোট টানবেন গিরিই। জম্মু-কাশ্মীর ঘোষণা করেছে ওখানকার কংগ্রেসী ভোট গিরিই পাচ্ছেন। হরিয়ানা রেড্ডির পক্ষে হুইপ দিলেও ভাঙন সেখানেও তীব্র। পাঞ্জাবের আকালী দল শুধু প্রথম পছন্দের ভোটই দেবেন আর তা যাবে ভি ভি গিরির পক্ষে। পাঞ্জাব কংগ্রেসীরাও হুইপ মানতে অস্বীকৃত। মধ্যপ্রদেশেও ভাঙন। কেরালা পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশই পাচ্ছেন গিরি।

সংসদের কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির দুই শিবিরে জোর তৎপরতা। ১৪ই আগস্ট পর্যন্ত সংগৃহীত স্বাক্ষরে অবাধ ভোটাধিকারের দাবিদাররা (অবশ্যই এ'রা গিরির পক্ষে) ২৬৯—২৯০ সংখ্যায় লীড করছেন বলে সংবাদ। এই সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে।

অবশ্যই এর দ্বারা জয়-পরাজয়ের কোন সুনিশ্চিত চিত্র আমাদের সামনে নেই।

আমাদের প্রার্থনা : জয় হোক ভারতের। জয় হোক জনগণেশের। জয় হোক নির্জিত, সর্বহারা, অগণিত সংখ্যাভারী ভারতবাসীর। আর সেই জয়মাল্য গলায় পরে উপযুক্ত ব্যক্তি অলঙ্কৃত করুন ভারতের সর্বোচ্চ মর্যাদার আসন, রাষ্ট্রপতির আসন। আর সেই সঙ্গে অবসিত হোক দ্বেষ হিংসা ও ক্রুদ্ধ উত্তেজনা।

উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ডামাডোলের মধ্যে পাদপ্রদীপের সম্মুখ থেকে আপাতত সরে আছে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সমস্যা। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের মত ক্ষেত্রেও যে এমন ভয়ানক গোলমাল সৃষ্টি হবে তা নয়, তবে সেখানেও আগে আগে যেমন হয়েছে, কংগ্রেস টেনে নিয়ে যাবে অনায়াসে মেজরিটি, এমনটি হওয়ার সম্ভাবনা কম। এবার প্রার্থী ছ'জন। প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে দুজনে। কংগ্রেস প্রার্থী শ্রী জি এস পাঠকের সঙ্গে পি এস পি প্রার্থী শ্রীহরিবিষ্ণু কামাথের। কামাথ নিজেও পি এস পি'রই নেতা এবং ভারতীয় রাজনীতিতে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা তাঁর ৭৩ বছরের জীবনকে বর্ণাঢ্য করে রেখেছে। জি এস পাঠকের অবশ্য রাজনীতিবিদ হিসেবে তেমন নামডাক নেই। ইনি ছিলেন এলাহাবাদের নামকরা আইনজীবী, পরে বিচারপতি। নেহরুজী পাঠককে দক্ষিণ আমেরিকায় বিশেষ দূতরূপে প্রেরণ করেছিলেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘেও ইনি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। সুপ্রীম কোর্টে প্র্যাকটিশ ও পরে মহীশূর রাজ্যের রাজ্যপালরূপেই তাঁর পরিচিতি। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় কিছুকাল তিনি আইনমন্ত্রীর পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন।

কামাথ ছিলেন সিভিলিয়ান, তবে ১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে কংগ্রেসে যোগদান করেন আবার তাঁর সঙ্গেই ত্রিপুরী কংগ্রেসে ভাঙনের পর কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে এসে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রথম সাধারণ সম্পাদক হন। ১৯৫৫ সালে কামাথ যোগ দিলেন পি এস পি দলে। ৭২ বছর বয়সের কামাথ একজন সক্রিয় পার্লামেন্টারিয়ান হিসেবে সবার পরিচিত। কামথের নাম প্রস্তাব করেন নির্দলীয় জে বি কৃপালনী, সমর্থক বি কে ভিন্ন হুমায়ুন কবির এবং কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলনের নেতা বক্সী গোলাম মহম্মদ।

পাঠকের নাম শ্রীমতী গান্ধীই প্রস্তাব করেছিলেন এবং সিণ্ডিকেটও তা মেনে নিয়েছিলেন। তথাপি অন্যান্য নামও প্রসঙ্গত উঠেছিল। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হোল বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীভোলা পাশোয়ান শাস্ত্রীর নাম। শাস্ত্রী বর্তমানে অকংগ্রেসী। তবুও তাঁর নাম উঠেছিল সম্ভবত বিহারে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠনের পথ প্রশস্ত করার জন্যই।

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর পরিস্থিতি কেমন দাঁড়ায় তার ওপর উপরাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচনের আবহাওয়া অনেকাংশে নির্ভর করছে। (১৯-৮-৬৯)

আন্তর্জাতিক

চীন-সোভিয়েট সংঘর্ষ

গত ১৩ই আগস্ট রুশ-চীন সীমান্ত-রক্ষীদের মধ্যে এক প্রচন্ড সংঘর্ষের ফলে উভয় পক্ষেই যথেষ্ট সৈন্য হতাহত হয়েছে। ঘটনাটা ঘটেছে সোভিয়েটের কাজাকস্তান এবং চীনের সিনকিয়াং প্রদেশের মধ্যবর্তী আন্তর্জাতিক সীমা-রেখায়। যুদ্ধক্ষেত্রটি নাকি চীনের পারমাণবিক পরীক্ষা কেন্দ্রের পাঁচ শত মাইলের মধ্যেই পড়েছে। এই সংঘর্ষের জন্য চীন এবং সোভিয়েট রাশিয়া উভয়েই পরস্পরের ওপর দোষারোপ করে পরস্পরের কাছে প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছেন। ঘটনার সোভিয়েট ভাষ্যে বলা হয়েছে যে, সশস্ত্র চীনা সৈন্যদের বেশ কয়েকটি দল সীমানা অতিক্রম করে সোভিয়েট ইউ-নিয়নের ৭০০ মিটার অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। সোভিয়েট সীমান্তরক্ষীরা তাদের চ্যালেঞ্জ করার সঙ্গে সঙ্গে সাব মেসিনগান চালিয়ে দেয়। তখন সোভিয়েট রক্ষীদের পাল্টা আক্রমণ না করে উপায় থাকে না। তাতে বেশ কয়েকজন চীনা সৈন্য নিহত হয়। হানাদার চীনা সৈন্যরা তখন পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। তাদের ফেলে যাওয়া জিনিষপত্রের মধ্যে দুটো মাইন ক্যামেরা (চলচ্চিত্র তোলবার ক্যামেরা) এবং একটা স্টীল ক্যামেরা পাওয়া গেছে। চীনারা নাকি মতলব করে এসেছিল সোভিয়েট সীমান্তরক্ষীদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণ চালিয়েই ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া সোভিয়েট সৈন্যদের চলচ্চিত্র তুলে নিয়ে সারা দুনিয়ায় "সোভিয়েটের সামরিক পরাজয়ের" ছবি দেখিয়ে বেড়াবে। সোভিয়েট-বিরোধীর কুৎসা প্রচারে সেটা হবে মস্ত হাতিয়ার। কিন্তু সোভিয়েট সীমান্তরক্ষীদের মারমুখো অবস্থায় দেখে তাদের ছবি তোলা চীনাদের পক্ষে আর সম্ভব হয় নি। তারা কোন রকমে পালিয়ে প্রাণ বাঁচিয়েছে।

এই সংঘর্ষ সম্পর্কে চীনাদের বক্তব্য যে একেবারেই উল্টো হবে, সে কথা বলাই বাহুল্য। তারা বলেছে যে, ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ি এবং হেলিকপ্টারের সহায়তায় সোভিয়েট সৈন্যরা সীমান্ত অতিক্রম করে চীনের সিনকিয়াং এলাকায় ঢুকে পড়ে এবং বহু সংখ্যক চীনা সৈন্য তাদের হাতে নিহত হয়েছে।

রুশ প্রতিবাদপত্রে চীনাদের সশস্ত্র উস্কানীর বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে বলা হয়েছে যে, সোভিয়েটভূমিতে হস্তক্ষেপের সমুচিত জবাব দেওয়া হবে। চীনও তার প্রতিবাদপত্রে একই ধরণের সতর্কবাণী করেছে।

সোভিয়েট বিবৃতি থেকে বোঝা যায় যে, এই সীমান্তে কিছুকাল যাবৎ উভয় পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। বিষয়টা আলোচনার জন্য সোভিয়েট সীমান্তরক্ষী অফিসাররা সীমানা পারের চীনা অফিসারদের এক বৈঠকে আহবান করেছিলেন, কিন্তু চীনারা সে আহবানে কর্ণপাত না করে নিজেদের সেনাবাহিনীর শক্তি বৃদ্ধি করে এবং সীমানা পেরিয়ে এগিয়ে আসে। সোভিয়েট রক্ষীরা তখন তাদের সোভি-য়েটভূমি ছেড়ে যাবার নির্দেশ দেয়। চীনারা সে নির্দেশ অগ্রাহ্য করে এবং সংঘর্ষ বেধে যায়।

পিকিং বেতারে অভিযোগ করা হয়েছে যে, সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির কর্মকর্তা ব্রেজনেভ এবং অন্যান্য সোভিয়েট নেতারা নাকি চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের পরিকল্পনা ছকবার জন্য সম্প্রতি ভ্লাডিভোস্টক এবং কিহাবারোভস্ক (বর্তমান রণক্ষেত্র) পরিদর্শনে এসে-ছিলেন। চীনাদের ভারত অভিযানের পর এই ধরণের দায়িত্বজ্ঞানহীন অভিযোগ কেউ সহজে বিশ্বাস করতে পারবেন বলে মনে হয় না।

যাই হোক, এবারের রুশ-চীন সীমান্ত বিরোধের তথ্যাবলী বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে সোভিয়েট সীমান্ত-রক্ষীদের হাতে চীনা সৈন্যরা বেদম প্রহার খেয়েছে। দুজন চীনা অফিসার এবং কিছু সৈন্য সোভিয়েটের হাতে বন্দীও হয়েছে। স্থানীয় সোভিয়েট সেনাবাহি-নীর অধ্যক্ষ লেঃ কঃ নিকিতেঙ্কো এই লড়াইয়ে সাফল্য অর্জন করে সম্মানজনক সামরিক পদক পেয়েছেন। চীনাদের ভাব-গতিক দেখে এখনও তাঁরা ভরসা পাচ্ছেন না, তাই সমগ্র কাজাকস্তানে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে যে কোন আক্রমণ প্রতিরোধের প্রস্তুতি চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

চীনের সঙ্গে সোভিয়েটের সাধারণ সীমারেখার দৈর্ঘ্য প্রায় ১০ হাজার কিলো-মিটার। এ বছর সেই সীমানার একাধিক স্থানে উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে গুরুতর সংঘর্ষ হয়েছে। তার মধ্যে আমুর নদীর গোল্ডিনস্কাই দ্বীপ, দামানস্কি দ্বীপ এবং উসুরী দ্বীপের সংঘর্ষ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গত ১১ই জুন উভয় পক্ষের সৈন্যদের মধ্যে শেষ সংঘর্ষ হয় সিনকিয়াং প্রদেশের ইউমিনের পার্বত্য এলাকায়।

সিনকিয়াং প্রদেশ চীনের একেবারে পশ্চিমে। এই প্রদেশের লোপ নোরেই চীনের পারমাণবিক অস্ত্র এবং ক্ষেপণাস্ত্র পরীক্ষা কেন্দ্র অবস্থিত।

বর্তমান সংঘর্ষের জন্য কে দায়ী তা বাইরের পর্যবেক্ষকের পক্ষে সঠিক-ভাবে নির্ণয় করা কঠিন। তবে সারা দুনিয়ায় হুজ্জত-হাঙ্গামা বাধিয়ে সেই সুযোগে নিজের ঘর গুছিয়ে নেবার যে মতলব নিয়ে চীন চলেছে, তাতে প্রকৃত অপরাধী কে তা অনুমান করতে কোন কষ্ট নেই।

চীনের মূল ভূখণ্ডে এখনও বেশ কিছু এলাকা বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা শাসিত। মার্কিন সেনাবাহিনীর নিরাপদ আশ্রয়ে থেকে চিয়াংকাইশেক এখনও চীনের বৃহত্তম দ্বীপ ফরমোসার ওপর প্রভুত্ব করছেন। চীন মুখে আস্ফালন করলেও সেখানে দন্তস্ফুট করবার সাহস পাচ্ছেন না। কিন্তু দুর্বল তিব্বতের দখল নিতে অথবা ভারত সীমান্তের জমি গ্রাস করতে তার বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয় নি। চীনের কম্যুনিজম বরাবরই উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং সুবিধাবাদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। সেই সুবিধাবাদ চীনকে সোভি-য়েটের শত্রু এবং আমেরিকার বন্ধু বানিয়ে ফেলেছে। কাগজে-কলমে না হলেও কার্যত। সাম্রাজ্যবাদকে চীন তার প্রধান শত্রু বলে ঘোষণা করলেও, সোভিয়েট রাশিয়াকে আগে ঘায়েল না করে চীন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নামতে রাজী নয় বলেই মনে হয়। চীন-সোভিয়েট সীমান্ত সংঘর্ষগুলো তারই পূর্বাভাস হতে পারে। জাপানী সংবাদ-পত্রে প্রকাশ পেয়েছে যে, সোভিয়েটের বিরুদ্ধে "আত্মরক্ষামূলক" লড়াই চালাবার জন্য চীন সিনকিয়াং সীমান্তে ৫ লক্ষ সৈন্য মোতায়েন করেছে এবং আরও সৈন্য পেছনে মজুত রেখেছে। তাতে বোঝা যাচ্ছে, সোভিয়েটের সঙ্গে বড় রকমের লড়াইয়ের জন্য চীন প্রস্তুত হয়ে আছে। কিন্তু সে রকম কোন সংঘর্ষে চীন লাভবান হবে কি? হাজার হলেও সোভিয়েট রাশিয়া তো তিব্বত নয়। আর কোসিগিনও দালাই লামা নন।

চীন-সোভিয়েট সংঘর্ষ পশ্চিমী দুনিয়ায় যথেষ্ট আনন্দের সঞ্চার করেছে। মার্কিন পররাষ্ট্রদপ্তরের ধারণা চীন-সোভিয়েট বিবাদ মীমাংসার কোন সম্ভাবনা আর নেই। তাঁরা অনুমান করছেন যে, সংঘর্ষ তীব্রতর হলে সোভিয়েট ইউনিয়ন চীনের পারমাণবিক অস্ত্রাগারেও বোমাবর্ষণ করতে পারে। এই সুযোগে আমেরিকা চীনের সঙ্গে তার ঝগড়া মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে। গত ১৫ই আগস্ট মার্কিন পররাষ্ট্র-দপ্তরের মুখপাত্র বলেন যে, চীনের সঙ্গে উন্নততর সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আমেরিকা নতুন প্রচেষ্টা সুরু করার কথা চিন্তা করছে, তবে সে সম্পর্কে এখনও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নি। পররাষ্ট্র-দপ্তরের মুখপাত্র রবার্ট ম্যাকক্লসকি বলেছেন যে, মার্কিন শিক্ষক এবং ব্যবসায়ীদের চীন ভ্রমণের সুযোগ দেবার ব্যবস্থা হচ্ছে। এর আগে মার্কিন পর্যটকদের চীনা দ্রব্য ক্রয়ের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। গত ৮ই আগস্ট মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব উইলিয়াম রোজার্স অস্ট্রেলিয়ায় ঘোষণা করেছিলেন যে, আমেরিকা শীঘ্রই চীনের সঙ্গে পুনরায় কূটনৈতিক আলোচনা সুরু করার চেষ্টা করবে। চীনের সঙ্গে সোভিয়েটের লড়াই লেগে গেলে আমেরিকার পোয়াবারো। কাজেই ঘটনার গতি সেই দিকে ঠেলে দেবার জন্য সে যে আপ্রাণ চেষ্টা করবে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ভারতীয় সংবাদদাতারা মস্কো থেকে সাম্প্রতিক চীন-সোভিয়েট সংঘর্ষ সম্পর্কে যে সংবাদ পাঠিয়েছেন, তাতে দেখা যাচ্ছে, সাত বছর আগে চীনারা যে কৌশলে ভারত আক্রমণ করেছিল, এবারও সেই কৌশলে তারা কাজাকস্তানে ঢুকে পড়ে। সোভিয়েট সীমান্তের অভ্যন্তরে সৈন্য পাঠাবার আগে তারা মাকি কিছু গরু-বাছুর এবং কৃষককে সেখানে ঢুকিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু রুশ সৈন্যদের তৎপরতায় সেই অনুপ্রবেশ ব্যর্থ হয়।

আয়ার্ল্যাণ্ডে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা

গত সপ্তাহে উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডে ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্টাণ্ট সম্প্রদায়ের (উভয় পক্ষই খৃস্টান) মধ্যে প্রচণ্ড সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বেধে যায়। এই সংঘর্ষে পাঁচদিনে ৮ জন বন্দুকের গুলীতে নিহত এবং ৩১০ জন জখম হয়েছেন। বৃটিশ সৈন্য বেলফাস্টের দাঙ্গাবিধ্বস্ত এলাকার পথে পথে টহল দিচ্ছে। দাঙ্গার ধরণ দেখে মনে হয় উগ্রপন্থী প্রোটেস্টাণ্টরা ক্যাথলিকদের ওপর সুসংবদ্ধ আক্রমণ চালাচ্ছে। আয়ার্ল্যাণ্ডের দক্ষিণাংশ স্বাধীনতা লাভ করলেও উত্তরাংশ এখনও বৃটিশ কর্তৃত্বাধীনে। বর্তমানে দাঙ্গার উগ্রতা হ্রাস পেলেও উত্তেজনা পুরোমাত্রায় বজায় আছে এবং ইতস্তত মারপিট খুন-জখম চলছে। বেলফাস্টের বিপর্যস্ত ক্যাথলিকরা গৃহহারা হয়ে আইরিশ প্রজাতন্ত্রের সীমানা অভিমুখে চলে যাচ্ছেন। এদিকে দুই আয়ার্ল্যাণ্ডের ঐক্যকামী আইরিশ রিপাবলিকান আর্মি নামক সংগঠনের লোকেরা যাতে এই সুযোগে বৃটিশ নিয়ন্ত্রিত আয়ার্ল্যাণ্ডে ঢুকে পড়তে না পারে, সেজন্য আলস্টারের পুলিশ ইউনিট সীমান্তের ওপর কড়া নজর রেখেছে। সরকারী মহলের ধারণা রিপাবলিকান আর্মির ৩০০ লোক ইতিমধ্যেই বৃটিশ নিয়ন্ত্রিত এলাকায় ঢুকে পড়েছে। এই দলটি আগে থেকেই বে-আইনী ঘোষিত। এদের সদস্য সংখ্যা দু' হাজার। এবং এই গৃহযুদ্ধের সুযোগে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনে বদ্ধপরিকর। উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের পুলিশ ইতিমধ্যেই এই দলের ২৪ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।

বৃটিশ গভর্নমেণ্ট উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডে সেনাবাহিনী প্রেরণ করায় আইরিশ প্রজাতন্ত্রও সেনা সমাবেশের ব্যবস্থা করেছে। উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের পলায়ন ক্যাথলিকদের গ্রহণ করবার জন্য সীমান্ত এলাকায় ক্যাম্প এবং হাসপাতাল খোলা হয়েছে। আইরিশ প্রজাতন্ত্র বৃটিশ নিয়ন্ত্রিত আয়ার্ল্যাণ্ডে রাষ্ট্রসংঘের শান্তিরক্ষী সেনাবাহিনী মোতায়েনের প্রস্তাব করেছে। কিন্তু বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছেন। ১৯২০ সালের গভর্নমেণ্ট অফ আয়ার্ল্যাণ্ড আইন অনুযায়ী গ্রেট বৃটেন ইচ্ছে করলে সমগ্র উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের কর্তৃত্ব গ্রহণ করতে পারে। উইলসন সম্ভবত তেমন কিছু চিন্তা করছেন।

এদিকে উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডের ক্যাথলিকদের সাহায্য করবার জন্য নিউ ইয়র্ক, বোস্টন এবং সানফ্রানসিস্কোর আইরিশ সম্প্রদায় কমিটি গঠন করছেন। উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডে বৃটিশ সেনাবাহিনীর হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে প্রথমোক্ত দুটি শহরের বৃটিশ কনসুলেট অফিসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়েছে।

পোপ পল উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডে রোমান ক্যাথলিক নাগরিকদের সমানাধিকারের দাবি সমর্থন করেছেন, কিন্তু হিংসাত্মক আন্দোলনের মাধ্যমে সেই দাবি আদায়ের পদ্ধতি তাঁর মনঃপূত হয় নি।

পাকিস্তানে প্রশাসনিক রদবদল

পাকিস্তানে ইয়াহিয়া খাঁর সামরিক ডিক্টেটরী শাসন যতই পুরনো হচ্ছে, ততই তার বিরুদ্ধে জনমত প্রবলতর হয়ে উঠছে। চারদিকে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ দেখে ডিক্টেটর ইয়াহিয়া ছাত্রদের দমন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। প্রথম ধাপ হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সভা-সমিতি নিষিদ্ধ হয়েছে। এ ছাড়া ইয়াহিয়া খাঁ পাকিস্তানে কিছু প্রশাসনিক রদবদলের দ্বারা নিজের কর্তৃত্ব স্থিতিশীল করবার চেষ্টা করছেন। সেই উদ্দেশ্যে তাঁর সব চেয়ে শক্তিশালী সহযোগী এয়ার মার্শাল নূর খাঁকে পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর নিয়োগ করা হয়েছে। আর ভাইস এডমিরাল সৈয়দ মহম্মদ আহসানকে করা হয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর। নূর খাঁর জায়গায় বিমানবাহিনীর অধ্যক্ষ হয়েছেন ভাইস মার্শাল রহিম খাঁ এবং নৌ-বাহিনীর অধ্যক্ষ হয়েছেন রিয়ার এডমিরাল মুজাফ্ফর হাসান। কিন্তু ইয়াহিয়া খাঁ সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ পদ ত্যাগ করেন নি। (১৭।৮।৬৯)

সদ্য প্রকাশিত হইল !

বাঙলা সাহিত্যের অদ্বিতীয় হাস্যরসিক

শিবরাম চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত

(১) মনের মত বৌ
(২) মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি
(৩) প্রেমের পথ ঘোরালো
(৪) প্রেমের বিচিত্র গতি
(৫) রক্তের টান
(৬) যখন তারা কথা বলবে

পৃষ্ঠা ২৪০

মূল্য মাত্র চার টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলকাতা-১২

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

"কংগ্রেস গেল"। বৃহস্পতিবার কংগ্রেস সংগ্রাম পরিষদের কর্মীরা কংগ্রেস ভবনের দরজা ঠেলে ঢুকে কংগ্রেস পরিষদ দলের সভা ভেঙে দিলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময় শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন এই কথা কটি বলেছিলেন। কিন্তু এই দিকে আর এক মুস্কিল দেখা দিয়েছে, সেটাও কম মুস্কিল নয়। তিন সপ্তাহ আগে সপ্তাহের বোঝায় প্রতিবেদন সুরু করলাম যে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রসঙ্গে কয়েক সপ্তাহ লিখব। হঠাৎ ৩১শে জুলাই বিধানসভায় পুলিশী হামলা হাওয়ায় দ্রুত বিষয় পরিবর্তন করে 'বিধানসভায় পুলিশী হামলা' নিয়ে লিখতে সুরু করলাম। ইচ্ছে ছিল চার সপ্তাহ রাজ্যের পুলিশ আর প্রশাসন নিয়ে লিখব, কিন্তু আকস্মিকভাবে কংগ্রেস ভবনে কংগ্রেস সংগ্রাম পরিষদের হামলা ঘটায় আবার বিষয় পরিবর্তন করতে হল। অর্থাৎ হামলা আমাকে বিষয় পরিবর্তনে বাধ্য করল। এক হামলা ঘটেছিল বিধানসভায়, সেটাও ছিল বৃহস্পতিবার আর কংগ্রেস ভবনে আর এক হামলা ঘটল, সেটাও বৃহস্পতিবার। এই দুটো হামলার মধ্যে কিন্তু মিল আছে, অনেক মিল আছে দৃশ্যে—মিল আছে চরিত্রগতভাবে। কংগ্রেস ভবনে হামলার পর শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বলেছিলেন—বিধানসভায় পুলিশের হামলা দেখি নি, কিন্তু কংগ্রেস ভবনের হামলা দেখে বুঝলাম হামলা কি বস্তু। বিধানসভা ও কংগ্রেস ভবনে হামলার মধ্যে যেগুলির মিল আছে, তার মধ্যে প্রধান মিল হল শ্রীমতী আভা মাইতি—যিনি বিধানসভায় হামলার সময় হামলাকারী পুলিশদের কাছে হামলার লক্ষ্য ছিলেন না আর কংগ্রেস ভবনেও শ্রীমতী মাইতি হামলাকারীদের কাছে লক্ষ্য হন নি। দুই স্থানেই শ্রীমতী মাইতি একমাত্র মহিলা, যিনি বিধানসভা সদস্যা হিসাবে দুই পক্ষের কাছেই আক্রান্ত হয়েছেন। আরও মিল হল বিধানসভা ভবনে হামলার লক্ষ্য ছিলেন শ্রীজ্যোতি বসু—একজন ব্যারিস্টার; কংগ্রেস ভবনেও হামলার লক্ষ্য শ্রীসিদ্ধার্থ-শঙ্কর রায়—একজন ব্যারিস্টার। বয়সেও উভয়েই প্রায় সমান, মেজাজেও তাই। আরও একটা লক্ষণীয় মিল হল বিধান-সভায় হামলায় পুলিশরা যেমন কোন কোন বিধানসভা সদস্যের সঙ্গে কথা বলেছে, ভাল ব্যবহার করেছে, অপর এক-পক্ষের ওপর হয়েছে মারমুখী—এখানেও তাই। শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র প্রমুখের সঙ্গে হামলাকারীরা কথা বলতে 'হিয়ার', 'হিয়ার' ধ্বনি তুলেছে আর শ্রীসিদ্ধার্থ-শঙ্কর রায়কে দেখেই মারমুখী হয়েছে। সবচেয়ে বড় মিল হল পুলিশ বিধান-সভা ভবনে ঢুকে হামলা করে গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছিল, এখানে কংগ্রেস ভবনে ঢুকেও একইভাবে বিধান-সভার কংগ্রেস সদস্যদের কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছিল। কংগ্রেস সদস্যদের হামলার লক্ষ্য ছিল কংগ্রেস সদস্যগণ—যাঁরা বিবেকমত চলতে চেয়েছিলেন, তাঁদের বিবেকের গতিরুদ্ধ করা। বিধানসভায় পুলিশ হামলা করে যেমন পুলিশের স্বার্থ কিছু রক্ষা করতে পারে নি, বরং কংগ্রেসের স্বার্থ বিঘ্নিত করেছে—এই ক্ষেত্রেও কংগ্রেস ভবনে হামলা করে হামলা-কারীরা কংগ্রেসের স্বার্থ রক্ষা করতে পারে নি, বরং কংগ্রেসের স্বার্থ বিঘ্নিত করেছে। সর্বশেষ মিল হল বিধানসভায় পুলিশী হামলার পর একজন যুক্তফ্রন্ট সদস্য অভিযোগ করেছিল — হামলাকারীদের সঙ্গে বিধানসভার কোন কোন কংগ্রেসী সদস্যের যোগ আছে আর কংগ্রেস ভবনে হামলার ব্যাপারে ডাঃ জয়নাল আবেদিন অভিযোগ করলেন—হামলাকারীদের স্বয়ং কংগ্রেস সভাপতি অধ্যাপক প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র পাঠিয়েছেন। গত ২৫শে মে ঠিক এমনি করে আর একবার একটা অভিযোগ উঠেছিল। সেইদিন রাজ্য কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির সদস্যরা কংগ্রেস ভবনে এসে ঢুকতে পারলেন না একদল হামলাকারীর পথ অবরোধে। সেইদিন শ্রীসিদ্ধার্থ-শঙ্কর রায় বলেছিলেন—এদের বদুবাবু (শ্রীনির্মলেন্দু দে কংগ্রেসের ক্ষমতা-চ্যুত গোষ্ঠীর নেতা ও প্রাক্তন সম্পাদক) পাঠিয়েছেন। এই নিয়ে বারবার, তিনবার কংগ্রেস ভবনে হামলা হল। সদস্যরা হামলাকারীদের মোকাবিলা করতে বাধ্য হলেন। এই হামলাটা হল, যে হামলা দেখে শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন বলেছিলেন—কংগ্রেস গেল। এর পিছনের ইতিহাস কিন্তু বেশ দীর্ঘ আর এটা শুধু পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কংগ্রেসের রাজনীতির ফলশ্রুতি নয়—এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে সারা ভারতের কংগ্রেসী রাজনীতি, যার উদ্ভব রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে শ্রীমতী ইন্দিরার সঙ্গে সিন্ডিকেট শিবিরের সংঘাত থেকে। রাজ্য কংগ্রেসের বর্তমান নেতৃত্ব কিভাবে ক্ষমতা দখল করেছেন, সেই ইতিহাস কারো অজ্ঞাত নয়। কিন্তু বর্তমান নেতৃত্বের তিন প্রধান শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, শ্রীবিজয়সিংহ নাহার ও শ্রীকৃষ্ণকুমার শুক্লা পশ্চিমবঙ্গে যে কে কিভাবে সিন্ডিকেটের সঙ্গে লড়ছেন, সেই তথ্য হয়ত সকলের জানা নেই। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের এই অংশ রাজ্য কংগ্রেসে সিন্ডিকেটের নেতা শ্রীঅতুল্য ঘোষের দল-বলকে ধরাশায়ী করে দিল্লী পর্যন্ত তাঁদের কর্মক্ষেত্র বিস্তার করেছেন, সেই ইতিহাসও কম সুখপাঠ্য নয়। প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সারা ভারতে যে ঝড় ও ইস্যুগুলি উঠেছে, সেইখানে পশ্চিমবঙ্গের কয়েকজন কংগ্রেস নেতার অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যেমন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র দলের নেতাদের সঙ্গে দেখা করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে সাহায্য প্রার্থনা করে ঠিক কাজ করেন নি—এই কথাটা সর্বপ্রথম প্রতিবাদ আকারে চিঠি লিখে কংগ্রেস সভাপতিকে পাঠান রাজ্য কংগ্রেস সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণকুমার শুক্লা। তারপর এই ইস্যু নিয়েই দিল্লীতে কত চিঠি চালাচালি হল, কত তর্ক-বিতর্কের ঝড় উঠলো—সেই কথা আজ সারা ভারতের রাজনীতির ইতিহাসে আছে। কিন্তু মূল ইস্যুটা সৃষ্টি হল পশ্চিম-বঙ্গ থেকে। তারপর সেই চিঠির অনু-লিপি পকেটে করে নিয়ে গেলেন দিল্লীতে শ্রীবিজয়সিংহ নাহার ও পরে শ্রীসিদ্ধার্থ-শঙ্কর রায়। এই একই ইস্যু নিয়ে শ্রীজগজীবন রাম ও শ্রীফকরুদ্দিন আলি আমেদ কংগ্রেস সভাপতিকে চিঠি লিখলেন, যে চিঠির মূলকথা হল—কংগ্রেস সভাপতি জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র দলের সঙ্গে যোগসাজস করে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জয়ী হতে চান, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে গদী থেকে হটাতে চান আর শ্রীজগজীবন রাম ও শ্রীফকরুদ্দিনের চিঠিখানি প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে বসে

মুসাবিদা করে দিয়েছিলেন শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। আবার ১৪ই আগস্ট বেলা দুটোর সময় বিধানসভা ভবনে টেলিফোন বেজে উঠলো—কি ব্যাপার? না, কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা কথা বলবেন শ্রীবিজয়সিংহ নাহারের সঙ্গে। কংগ্রেস সভাপতি শ্রীবিজয়সিংহ নাহারকে বললেন—পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের সদস্যরা যেন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে শ্রীসঞ্জীব রেড্ডিকে ভোট দেন। শ্রীনাহার জানিয়ে দিলেন—তাঁর পক্ষে রেড্ডিকে ভোট দেওয়া সম্ভব নয়। তাঁর বিবেক বাধা দিচ্ছে। শ্রীনাহার বললেন—আজকের লড়াই হল প্রগতি বনাম প্রতিক্রিয়ার, এই লড়াইয়ে পশ্চিমবঙ্গ প্রগতির পক্ষেই থাকবে। শ্রীনাহার আরো বললেন—পশ্চিমবঙ্গ কখনও কারো সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে নি, দরকার হলে বিদ্রোহ করেছে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, নেতাজী সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন, আজও বিদ্রোহ করবে।

হ্যাঁ, সেই বিদ্রোহ দেখা দিল ১৪ই আগস্ট কংগ্রেস ভবনে কংগ্রেস বিধানসভা সদস্যদের সভায়। বিদ্রোহ দেখা দিল দিল্লীতে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস সদস্যদের মধ্যে। দিল্লীতে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি কংগ্রেস প্রার্থী ন'ন এই কথা যাঁরা বললেন ও বিবেকমত ভোট দেবার অধিকার দাবি করলেন, তার মধ্যে রাজ্যের লোকসভা সদস্যদের মাত্র তিনজন ছাড়া সকলেই ছিলেন। অন্য কারো কথা বাদ দিলেও রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীপরিমল ঘোষও শ্রীঅতুল্য ঘোষের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে শ্রীমতী ইন্দিরার পক্ষে গেলেন—এর চেয়ে বিস্ময়ের কথা আর কি হতে পারে? আর পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস পরিষদ দলের সভায় ১৪ই আগস্ট যে বারোজন বক্তা বক্তৃতা দিলেন, তার মধ্যে আটজন বললেন—তাঁরা বিবেকমত ভোট দিতে চান। এবং এই আটজনের মধ্যে তিনজন শ্রীবিজয়সিংহ নাহার, মহম্মদ ইসাক ও শ্রীপীযূষ মুখার্জী কোনরকম সংকোচ না রেখে বললেন—তাঁরা শ্রীগিরিকে সমর্থন করতে চান। সভায় দীর্ঘ সময় আলোচনা চলে। যখন বেশির ভাগ সদস্য বিবেকমত ভোটদানের পক্ষে মত দেন ও চূড়ান্ত মতামতের জন্য যখন ভোট গ্রহণ সুরু হবে তখনই কংগ্রেস সভাপতি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। কংগ্রেস সংগ্রাম পরিষদের নামে বেশ কিছু কংগ্রেস কর্মী সন্ধ্যা থেকেই কংগ্রেস ভবনের দরজা-সিঁড়ি আগলে দাঁড়িয়েছিল, তাদের ধ্বনি ছিল—কংগ্রেস পরিষদ দলের সভায় শ্রীরেড্ডির পক্ষে ভোট দানের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই বিক্ষোভকারীরা অধ্যাপক চন্দ্রকে ঘিরে ধরলেন আর অধ্যাপক চন্দ্র সভায় কি বলে এসেছেন সেই কথাগুলি বিক্ষোভকারীদের শোনালেন। অধ্যাপক চন্দ্র বললেন অনেক কথা। তার মধ্যে সারকথা হল—শ্রীমতী গান্ধী জগজীবন রামকে রাষ্ট্রপতিপদে প্রার্থী করতে চেয়েছিলেন, শ্রীমতী গান্ধী সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয় নিয়েছিলেন। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ এতদিন শ্রীমতী গান্ধীর কারণে আটকে ছিল, নইলে তিন বছর আগে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ হয়ে যেত এই কথা শ্রীঅশোক মেহতা ফাঁস করে দিয়েছেন আর শ্রীমতী গান্ধী সিণ্ডিকেটের পা ধরেই প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। জোরালো বক্তৃতা শেষ করে অধ্যাপক চন্দ্র চলে গেলেন। বিক্ষোভকারীদের কারো বুঝতে বাকি রইল না ঘরের মধ্যে ভোট গ্রহণ সুরু হয়েছে এবং ভোটে কংগ্রেস সদস্যরা বিবেকমত ভোটদানের অধিকারই পেয়ে যাবেন। ব্যস, মুহূর্তে মধ্যে দরজা ঠেলে সভাস্থলে ঢুকে পড়লো কংগ্রেস সংগ্রাম পরিষদের সংগ্রামীরা আর সংগ্রামও সুরু হয়ে গেল মুহূর্তের মধ্যে। বিধানসভার পুলিশী হামলায় যে কংগ্রেসীরা হামলাকারীদের হাত থেকে রেহাই পেতে পলায়নের তালিম নিয়ে নিয়েছিলেন, এখানে দ্বিতীয়বার তার প্রয়োগ করলেন। কেউ গেলেন লাইব্রেরী ঘরে, কেউ প্রস্রাবখানায়, কেউ সিঁড়ি বেয়ে একেবারে পথে। ছাত্র পরিষদের কয়েকজন নেতা এগিয়ে এসে শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে আগলাতে চেষ্টা করল, কিন্তু তাদের মেরে পাটপাট করা হল। শ্রীআবদুস সাত্তার সহ কয়েকজন মাননীয় সদস্যও রেহাই পেলেন না আক্রমণের হাত থেকে। বিক্ষোভকারীদের শ্লোগানের মধ্যে অন্যতম ছিল—"সিদ্ধার্থ রায়ের গিরির দালালী চলবে না"। আর শ্রীসিদ্ধার্থ রায় চোখের চশমা খুলে বুকে ক্রস এঁকে (শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় উত্তেজিত হলে চোখের চশমা খোলেন আর হাত একবার কপালে একবার বুকে ছোঁয়ান) বললেন—আই উইল ক্রাস দি সিণ্ডিকেট, আই উইল ক্রাস। এই কথার ঠিক রেখেছেন সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। ১৫ই আগস্ট বিধানসভা ভবনে কংগ্রেস পরিষদ দলের সভায় বিপুল ভোটে বিবেকমত ভোটদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাতে পেরেছেন তিনি, এবং পশ্চিমবঙ্গে ধরাশায়ী হয়েছে সিণ্ডিকেটপন্থীরা। পশ্চিমবঙ্গে সিণ্ডিকেটপন্থীদের সঙ্গে যদি কেউ থাকেন, তবে খুব বেশি হলে শ্রীমতী আভা মাইতি, শ্রীহংসধ্বজ ধাড়ার নেতৃত্বে ৫৫ জনের মধ্যে সাত থেকে নয়জন। ১৫ই আগস্ট মহম্মদ আলি পার্কে কংগ্রেসের সভা ভেঙে গেল, শ্রীবিজয়সিংহ নাহার ও শ্রীসিদ্ধার্থ রায়কে বলতে দেওয়া হল না। মাইকের তার কেটে দেওয়া হল। এখানেও লঙ্কাকাণ্ড। এখানে রেড্ডি-গিরি লড়াই—এখানেও ভাঙন, এখানেও এক পক্ষের আর পক্ষকে আক্রমণ। এই লেখা যখন প্রকাশিত হবে, তখন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন শেষ হয়ে যাবে, জয়-পরাজয়ও নির্ধারিত হয়ে যাবে—সারা ভারতের রাজনীতি নতুন গতিপথ নেবে আর পশ্চিমবঙ্গেও কংগ্রেসী রাজনীতির একই গতি পরিবর্তন হবে। কিন্তু সবকিছুর মধ্যে বোধ হয় শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের কথাই সত্য—শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি জয়ী হোন আর শ্রীগিরি জয়ী হোন, পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের শেষ। তবে কোন শেষই শেষ নয়—বহু শেষ আবার সুরুর পথ রচনা করে। সারা ভারতের সঙ্গে কংগ্রেসের নতুন যাত্রাপথ সুরু হওয়াও অসম্ভব নয়। এই কথার জবাব আগামী দিনে পাওয়া যাবে।

উপনিষদ গ্রন্থাবলী :

১ম খণ্ড : ঐতরেয়, কৈবল্য, কাঠক ও নৃসিংহতাপনী।

২য় খণ্ড : শ্বেতাশ্বতর, পরমহংস, সন্ন্যাস, নীলরুদ্রচুলিক, আরুণেয়, কণ্ঠশ্রুতি, জাবাল, পিণ্ড, আত্ম, ষটচক্র, ভৃগু, শিক্ষা, ব্রহ্মবিদ, নারদ, পরিব্রাজক, পৈঙ্গল, তুরীয়াতীত, বাসুদেব, শাণ্ডিল্য, নারায়ণ (ক), নারায়ণ (খ)।

৩য় খণ্ড : ঈশ, কেন, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, পাশুপত-ব্রহ্ম, প্রাণাগ্নিহোত্র, ভাবন, গরুড়, শ্রীরামপূর্বতাপনীয়, শ্রীরামোত্তরতাপনীয়, পঞ্চব্রহ্ম, কালাগ্নিরুদ্র, যাজ্ঞবল্ক্য, রামরহস্য, গোপালপূর্বতাপনীয়, গোপালোত্তরতাপনীয়, কৌষীতক্য, অমৃতবিন্দু, কালিকা, সর্বসার ও অমৃতনাদ। কাপড় ও বোর্ডে বাঁধা। মূল্য : প্রতি খণ্ড—৪'০০ টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২.

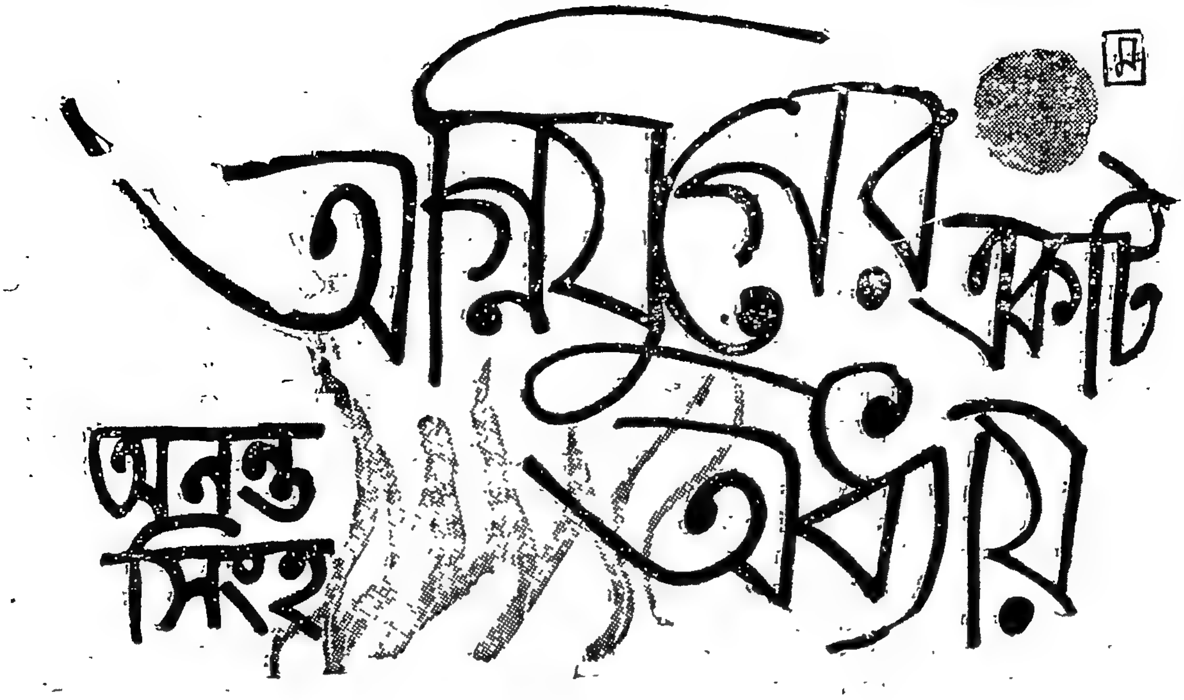

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

শেষ পরিণতি !

প্রীতিলতার নেতৃত্বেই যে পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান-ক্লাব আক্রমণের ঘটনা ঘটেছিল জনসাধারণের তা অজ্ঞাত নেই। সেই বাস্তব ঘটনার প্রায় দু'মাস আগে সবরকম ব্যবস্থা ও বন্দোবস্ত করে শৈলেশ্বর চক্রবর্তীর নেতৃত্বে একটি ছোট দল ঐ ক্লাবটি আক্রমণের উদ্দেশ্যে গিয়েছিল। ক্লাবের বেয়ারা যোগেশ মজুমদার আমাদের বন্ধু। যোগেশ ক্লাবের Management-এর অধীনে চাকরি করতো। সময়মত টর্চ লাইটের আলো দেখিয়ে সঙ্কেত দেবার ভার ছিল এই যোগেশের উপর। তারকেশ্বর দস্তিদার (ফুটুদা) যোগেশের নাম দিয়েছিল—"জয়দ্রথ।" যোগেশের কি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখে তারকেশ্বর "জয়দ্রথ" নামটি রেখেছিল তা আমি আজ আর বলতে পারছি না। কথা ছিল—বন্ধু জয়দ্রথের সঙ্কেত পাওয়ার পর ক্লাবগৃহ আক্রমণ করতে যাওয়ার সময় তারা চার রকমের বিষয়বস্তু-সম্বলিত মুদ্রিত প্রচারপত্রগুলি চট্টগ্রাম শহরে বিলি করার জন্য একজন সাথীকে নির্দেশ দিয়ে যাবে। এ্যাক্‌শনের সার্থকতার কথা ভেবে আক্রমণের সঠিক সময়ের পূর্বে প্রচারপত্র বিলি করা যে কোনমতেই যুক্তি-সংগত নয় এটা সহজেই বোধগম্য। তাই শেষ মুহূর্তে নির্দেশ পাওয়ার জন্য একজন সাথী—দীনবন্ধু মজুমদার, এই দলের সঙ্গে উপস্থিত ছিল।

রাত প্রায় ন'টার সময় জয়দ্রথ ক্লাব-গৃহের অবস্থা বুঝে আলো দেখিয়ে সঙ্কেত দিল। ক্লাবে তখন উপস্থিত ইংরেজ নরনারীরা খাওয়া-দাওয়া, মদ্যপান, নাচ-গান ও হৈ-হুল্লোড়ে মত্ত ছিলেন। একটুও সময় নষ্ট না করে দ্বিধাশূন্যচিত্তে আক্রমণের উদ্দেশ্যে এখনি ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত। কিন্তু ঠিক এই সময়েই বিপ্লবীদের মধ্যে গুঞ্জন উঠলো—কেউ বললো, 'ক্লাব-কম্পাউণ্ডের প্রবেশপথে দু'-একটা মোটর গাড়ি দেখা যাচ্ছে' কেউ বললো, 'সাহেবেরা ক্লাবঘরের বারান্দায় বেরিয়ে এসেছে'; আবার কেউ বললো, 'আরও একটু দেরি করলে ভাল হয়।' ক্রমেই দ্বিধাগ্রস্ত মনের সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি প্রকাশ পেল—সেদিন তাদের আক্রমণ চালানো স্থগিত রাখা উচিত।

মরণ-পাগল শৈলেশ্বর এই সিদ্ধান্ত কোনমতেই মেনে নিতে পারছিল না। সে অন্যান্য সাথীদের কাছে প্রতিবাদ জানালো। সকলকেই বললো যে, কাজ সম্পূর্ণ না করে ফেরা কোনমতেই উচিত হবে না এবং আক্রমণে এগিয়ে যেতে সকলকে বার বার অনুরোধ জানালো। কিন্তু কোনই ফল হল না, সকলের একই উত্তর—অবস্থা আজ আমাদের অনুকূলে নয়; কাজেই আক্রমণ আজ স্থগিত রাখা হোক।' মোটকথা ক্লাবে ইংরেজদের দৈনন্দিন উৎসব উপভোগের অবাধ সুযোগ দিয়ে বিপ্লবী দলটি সেদিন-কার মত বিদায় নিল। তারপর তারা দু'টি ছোট দলে বিভক্ত হয়ে দু'টি ভিন্ন পথে তাদের নিরাপদ আশ্রয়ের দিকে এগোল। প্রায় দু'ঘণ্টা পরে যে বাড়িতে শৈলেশ্বর, কালী দে ও শান্তি চক্রবর্তী থাকতো, সেই বাড়ির কাছাকাছি একটি পুকুরের ধারে এসে দু'টি দলই আবার একত্রে মিলিত হল। যে দু'-একজন শহর থেকে এসেছিল তারা পদব্রজেই শহরে ফিরে গেল। মহেন্দ্র চৌধুরী ও সুশীল দেকে উত্তরের গ্রামে ফিরে যাবার জন্য নদীর ঘাটে নিয়ে নৌকার ব্যবস্থা করে দিল শান্তি চক্রবর্তী। এরা গ্রামে গিয়ে মাস্টারদাকে এই অকৃত-কার্যতার সংবাদ জানাবে স্থির হল।

মহেন্দ্র ও সুশীল নৌকাযোগে যে গ্রাম হতে মাস্টারদার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল সেই গ্রামটির নাম 'পতেঙ্গা'। পতেঙ্গা গ্রামের নদীটির অপর পারে 'বন্দর' নামক স্থানে ফুটুদা (তারকেশ্বর দস্তিদার) অপেক্ষা করছিল। তাকে সেই স্থানে ইউরোপীয়ান-ক্লাব আক্রমণের ফলাফল জানাবার কথা। ফুটুদাকে এই অক্ষমতার বিবরণ জানাতে শান্তি চক্রবর্তী নিজেই গেল। পূর্ব ব্যবস্থানুযায়ী শৈলেশ্বর ও কালী দে

কিস্তিতে ট্রানজিস্টার

মাসিক ১০্ কিস্তিতে গ্যারাণ্টিযুক্ত বিশ্ব-বিখ্যাত ন্যাশানাল—৭০ ৩ ব্যাণ্ড, অল ওয়ার্ল্ড, পোর্টেবল ট্রানজিস্টার

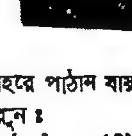

লউন। প্রতি গ্রামে এবং শহরে পাঠান যায়।

আবেদন করুন :

Music & Sound (—' —10)

P.B. 1576, Delhi—6.

রাত কাটাবার জন্য নিজেদের নিরাপদ আশ্রয়ে ফিরে গেল। ফটুদাকে রিপোর্ট দিয়ে শান্তি চক্রবর্তীরও সেখানে ফেরবার কথা।

এত সুপরিকল্পিত আয়োজন করে শৈলেশ্বরের নেতৃত্বাধীনে গিয়ে ইউরোপীয়ান-ক্লাব আক্রমণ না করেই বন্ধুরা সবাই ফিরে আসাতে শৈলেশ্বর খুব মর্মাহত হয় এবং সমস্ত ব্যাপারটিতে সে অত্যন্ত বিরক্ত বোধ করে। কিছুদিন আগে থেকেই "আত্মহত্যা করবো", "এই পৃথিবীতে আর থাকবো না," "কোনকিছুই ভাল লাগছে না," "শহীদেরা হাতছানি দিচ্ছে", ইত্যাদি নানা কথা কখনও অতি উচ্ছ্বাসের সঙ্গে আবার কখনও বা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে শৈলেশ্বর বারেবারেই বলছিল। তাকে প্রশ্ন করে বা তার এই সব "দুর্বোধ্য" অভিব্যক্তি থেকে মাস্টারদা বা ঘনিষ্ঠ সাথীরা কেউই চেষ্টা করেও এই সব উক্তির যথার্থ কারণ বুঝতে পারে নি এবং সে নিজেও কখনও কোন কথা খুলে বলে নি। তবে শৈলেশ্বর যে মর্মপীড়া বা কোনপ্রকার মানসিক অসুস্থতায় ভুগছিল তাতে সন্দেহ নেই। কালী (কালীকিঙ্কর দে) ও শৈলেশ্বর ইউরোপীয়ান-ক্লাবের দরজা থেকেই সবার সঙ্গে ফিরে এসেছে—তখন থেকেই দুজনে একসঙ্গে আছে। কালী সর্বক্ষণ শৈলেশ্বরকে লক্ষ্য করছিল এবং তার মনে হচ্ছিল শৈলেশ্বর স্বাভাবিক অবস্থার একেবারেই বাইরে। শৈলেশ্বর মাঝে মাঝে সুস্পষ্ট ইংরেজী ও বাংলায় বলছিল—

"Mother-country did not want that I should die at her altar—but I can't live any-more ...না, আমার পক্ষে বেঁচে থাকা অসম্ভব ... আমায় মরতেই হবে—আমি মরবো.....।"

শৈলেশ্বরের এই ধরণের কথা কালী আগেও শুনেছে, কিন্তু ইউরোপীয়ান-ক্লাবের অ্যাকশন না করে ফেরার পথে যেভাবে সে উদ্‌ভ্রান্তের মত এইসব কথা বলছিল, তাতে কালীর মনে হয়েছিল শৈলেশ্বরের ধৈর্যের সীমা অতিক্রান্ত হয়েছে। কালী দে দু'-একবার শৈলেশ্বরকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো—অধীর ও অস্থির না হতে এবং মনোবল ফেরাবার চেষ্টা করতে অনুরোধ জানালো। কিন্তু এতে শৈলেশ্বরের বিশেষ কোন পরিবর্তন দেখা গেল না।

রাত পার একটা। কালী ও শৈলেশ্বর বিশ্রামের জন্য নিজের নিজের বিছানায় শুয়ে পড়লো। শৈলেশ্বর খাটের উপরে আর খাটের পাশে মেঝেতে বিছানা পেতে কালী দে-র শোবার ব্যবস্থা। কালী দে-র মনে হচ্ছিল এত পরিশ্রান্ত থাকা সত্ত্বেও যেন শৈলেশ্বর ঘুমোতে পারছে না। শ্রান্ত-ক্লান্ত কালী অবসন্ন শরীরে কোনও একসময় ঘুমিয়ে পড়লো। কিছুক্ষণের মধ্যেই শৈলেশ্বর কালী দে-র ঘুম ভাঙিয়ে বললো—"একটু জল দাও, আর একটুকরো কাগজ ও একটা কলম আমাকে দাও"।

কালী—"এত রাত্রে কাগজ-কলম আপনার কোন্ কাজে লাগছে?" একটু বিরক্ত হয়েই শৈলেশ্বর বললো—"অত কথায় তোমার কাজ কি? একটু কষ্ট করে একটুকরো কাগজ আর কলম দেবে এতেই তোমার আপত্তি?" পাছে শৈলেশ্বর আরও বিরক্ত হয় তাই কালী আর দ্বিরুক্তি না করে তাকে একগেলাস জল ও তার চাহিদা অনুযায়ী কাগজ-কলম এনে দিল। কালী তখন ভেবেছিল শৈলেশ্বর হয়ত মাস্টারদার কাছে এই ব্যর্থতার রিপোর্টটি লিখে পাঠাবে আর নয়ত সে কোন pamphlet প্রভৃতির draft তৈরি করবে। শৈলেশ্বর শিক্ষিত—বি, এ, পাশ যুবক; তার লেখার হাতও খুব ভালো। ক্লাবগৃহ আক্রমণের পর বিলি করার জন্য যে চার রকমের প্রচারপত্র লেখা হয়েছিল তার একটি শৈলেশ্বরের লেখা। কাজেই শৈলেশ্বর অত রাতে কাগজ-কলম চাওয়াতে কালী স্বাভাবিকভাবেই মনে করেছিল, শৈলেশ্বর নিজেদের শোচনীয় ব্যর্থতার কারণ সমালোচনা করে কিছু লিখবে। কালী আবার বিছানায় গেল—ঘুমে তার চোখ বন্ধ হয়ে আসছিল। সে দেখলো শৈলেশ্বর কাগজ-কলম নিয়ে বসেছে—কিছু লিখবে। কালী ঘুমিয়ে পড়লো। আবার কিছুক্ষণ পরে শৈলেশ্বর কালী দে-র ঘুম ভাঙালো—"এখন রাত কত—কটা বেজেছে?" অত রাতে অকারণে এই অস্বাভাবিক প্রশ্ন শুনে কালী একটু চিন্তিত হয়েছিল, কিন্তু এই অস্বাভাবিকতার পেছনে অসম্ভব কিছু ঘটতে পারে বলে মনে করা কালীর পক্ষে

প্রথমবার, না দ্বিতীয়বার?

দার্জিলিঙে হয়তো আপনি
আগেও এসেছেন।
তাতে কিছু আসে-যায়
না। দার্জিলিঙ আপনার কাছে
কোনদিনই পুরানো হবার নয়।
সকালে প্রসন্ন সূর্যোদয়
এবং দেবদারু-বনের গন্ধময়
বাতাস। সারা দিন ধ'রে
দ্রষ্টব্য-স্থান পরিক্রমণ। সন্ধ্যায়
দোকানে-বাজারে
কেনাকাটা সারা।

দার্জিলিঙে এটা আপনার
প্রথম অথবা দ্বিতীয়বার,
যাই হোক না কেন,
ওখানে থাকার অদ্বিতীয় জায়গা
হচ্ছে: 'লাক্সারি ট্যুরিস্ট লজ'
(ফোন: ৬৫৬)। লাউঞ্জ ও
রুম-সার্ভিসের উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা
আছে। ঘর থেকেই আপনি
দেখতে পাবেন কাঞ্চনজঙ্ঘার
অবিস্মরণীয় দৃশ্য। আর
অপেক্ষাকৃত স্বল্প ব্যয়ে যদি
থাকতে চান, তাহলে
'শৈলাবাসে' উঠুন (ফোন ৬৮৪)।
কালিম্পঙেও আমাদের একটি
'লাক্সারি ট্যুরিস্ট লজ' আছে
(ফোন: কালিম্পঙ ৬৪)।

বুকিং-এর জন্যে লজের
ম্যানেজারদের সঙ্গে অথবা
নীচের যে-কোন ঠিকানায়
যোগাযোগ করুন:

ট্যুরিস্ট ব্যুরো
দার্জিলিঙ (টেলিগ্রাম: DARTOUR)
৩/২, ডালহৌসি স্কোয়ার ইষ্ট
কলিকাতা-১ ফোন: ২৩-৮২৭১
টেলিগ্রাম: TRAVELTIPS

কলিকাতা ট্যুরিস্ট ব্যুরোতে নির্দিষ্ট তারিখের
১৫ দিন আগে বুকিং বন্ধ হয়

সম্ভব ছিল না। কালী বললো—"আপনি এখনও জেগে আছেন? ঘুমিয়ে পড়ুন..." এই বলে কালী আবার ঘুমিয়ে পড়লো।

ভোর হয়ে এলো। ঘড়িতে তখন প্রায় ৪-৩০ মিনিট। শৈলেশ্বর আবার কালীকে ডাক দিল। এই তার শেষ ডাক। ডেকে বললো—"চিঠি রইল, আমি চললাম।" এই কথা ক'টি বলার সঙ্গে সঙ্গেই সে উগ্র বিষ পটাসিয়াম-সায়ানাইড গলাধঃকরণ করলো। কালী শুনেছে এবং আমরাও শুনেছি পটাসিয়াম-সায়ানাইড খেলে মানুষ মুহূর্তে প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু শৈলেশ্বরের বিষ পানের পর কালীর এক নিদারুণ অভিজ্ঞতা হল। শৈলেশ্বরের তখনও প্রাণ আছে—গলায় ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হচ্ছিল। সে এক বিকট আওয়াজ—কোনমতেই থামানো যাচ্ছিল না। আশেপাশে ও রাস্তায় কেউ থাকলেই ওই আওয়াজে নিশ্চয়ই আকৃষ্ট হোত। শৈলেশ্বরকে নিয়ে কালী ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লো। কি করবে, কিসে তাকে একটু আরাম দেবে কালী ভেবেই পাচ্ছিল না। শৈলেশ্বর তখন চির-বিদায়ের পথে—তার কাছে পার্থিব সেবা-যত্নের কোন মূল্যই তখন নেই। তার গলা থেকে অনবরত সেই ভয়ানক আওয়াজ ঘরটিকে যেন কাঁপিয়ে তুলছিল। পাছে সেই আওয়াজে আকৃষ্ট হয়ে কেউ ঘরে এসে পড়ে সেই ভয়ে কালী তখন ভীষণ আতঙ্কিত।

প্রায় আধঘন্টা পরে ধীরে ধীরে সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। বিছানার একপাশে কালি-কলম ও অন্য পাশে একটি খাতার পৃষ্ঠায় মাস্টারদাকে ইংরেজীতে লেখা একটি চিঠি নিয়ে শৈলেশ্বরের প্রাণহীন নিশ্চল দেহটি বিছানায় পড়ে রইল। এই চিঠিটি কালী দে দেখতে পায়। আত্মহত্যার আগের মুহূর্তে লেখা চিঠির বিষয়বস্তু কি ছিল আজ প্রায় আটত্রিশ বছর পরে কালী তা পুরো মনে করতে না পারলেও সেই চিঠির ইংরেজী একটি লাইন তার আজও মনে আছে এবং সেটি কালী আমাকে বলেছে। সেই লাইনটি আমি এখানে উদ্ধৃত করছি—

"...Days are dull. Life is growing more and more anomalous day by day. Mind is absolutely vague and vacant..."

শৈলেশ্বরের মৃতদেহ সামনে নিয়ে কালী হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে—কি যে করবে বুঝে উঠতে পারছিল না। ইতিমধ্যে ক্লাব-আক্রমণ ব্যাপারে ফটুদাকে খবর দিয়ে শান্তি চক্রবর্তী এই বাড়িতেই ফিরে এলো। বাড়ি ফিরেই যে এইরূপ একটি নিদারুণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে তা সে ভাবতেই পারে নি। কি করেই বা ভাববে—কি করেই বা জানবে যে কিসের দুঃখে কার প্রতি অভিমানে শৈলেশ্বর চিরকালের জন্য সবাইকে ছেড়ে এ ভাবে চলে যাবে? ফেরারী জীবনে গোপন আস্তানায় শান্তিরই বা কতটুকু কি করবার ক্ষমতা? তবু বিপ্লবীকে হাল ছাড়লে চলবে না। শান্তি বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ যুবক। সে শৈলেশ্বরের দেহ পরীক্ষা করে দেখলো। গলায় খুব ক্ষীণ ঘড়্ ঘড়্ শব্দ তখনও যেন দু'-একবার শোনা গেল। বুকের স্পন্দনও যেন একেবারে স্তব্ধ হয় নি। শোনা যায় পটাসিয়াম-সায়ানাইড বিষ জিহ্বাতে স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যু ঘটে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে পুরো ব্যতিক্রম দেখা গেল—পটাসিয়াম-সায়ানাইডের ক্রিয়ার তৎক্ষণাৎ শৈলেশ্বরের মৃত্যু ঘটে নি। শৈলেশ্বরের অবস্থা দেখে কালী ও শান্তির মনে তাই ক্ষীণ আশা জেগেছিল—হয়ত শৈলেশ্বরকে বাঁচানো যাবে।

কাটলী গ্রামে শান্তির বিশেষ পরিচিত একজন ডাক্তার ছিলেন। কিন্তু ডাক্তারবাবু যদি শৈলেশ্বরকে চিকিৎসা করার পরিবর্তে আত্মহত্যার ব্যাপারটা পুলিশকে জানিয়ে দেন তবেই বিপদ। তবু বিপদের ঝুঁকি নিয়েও শান্তি ডাক্তার ডাকতে ছুটলো—শেষ চেষ্টা করে দেখবে, যদি শৈলেশ্বরকে বাঁচানো যায়।

১৯২৩ সালে 'নাগারখানা যুদ্ধে' শ্রান্ত-ক্লান্ত ও অবসন্ন মাস্টারদা, অম্বিকাদা ও রাজেন দাস শত্রুর হাতে জীবন্ত ধরা না দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই তীব্র পটাসিয়াম-সায়ানাইড বিষ পান করেছিলেন—এই বাস্তব ঘটনা ১৯২৮-৩০ সালে আমাদের দলের প্রায় সব সাথীরাই জানতো। আশ্চর্য! এই উগ্র বিষপানে মাস্টারদাদের কারও জীবনান্ত ঘটে নি। সেই জন্য মাস্টারদাকে আমরা কোন কোন সময়ে "নীলকণ্ঠ" বলে অভিহিত করতাম। তাঁরা তিনজন বিষ খেয়ে বিষ হজম করেছিলেন—কি অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য ঘটনা! সবই তখন "মায়ের লীলা" বলে মনে হয়েছিল। তাই শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে ছুটে গিয়েছিলাম ঐশ্বরিক প্রভাবের গূঢ় রহস্য আবিষ্কারে। ১৯৩০ সালেও আমাদের দলের সদস্যেরা সকলেই "মায়ের" প্রতি অটুট বিশ্বাস ও ভক্তি নিয়ে চলেছিল। পটাসিয়াম-সায়ানাইড খোলা অবস্থায় থাকলে বা বোতলের অগ্রভাগের কিছুটা oxidised হয়ে গেলে বাতাসের সংস্পর্শে এসে বিষের গুণ হারানো যে সম্ভব—এই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের দিকে "ভগবানে বিশ্বাসী মনের" যাওয়া সম্ভব নয়। কাজেই, শৈলেশ্বরও যদি "মায়ের করুণা ও কৃপা" হতে বঞ্চিত না হয় তবে বিষ খেয়েও হয়ত সে বেঁচে যাবে। এক-নিমেষেই শান্তির মনে এত সব কথার উদয় হল। আর কোনরূপ দ্বিধা না করে শেষ চেষ্টা করে দেখবে বলে শান্তি ডাক্তার নিয়ে এলো।

ডাক্তার এলেন। সামান্য একটু পরীক্ষা করেই নিঃসন্দেহ হলেন শৈলেশ্বর আর বেঁচে নেই। তারপরেই সমস্যা হল—মৃতদেহের চিহ্নমাত্র যাতে না থাকে কালী ও শান্তিকে তার সবরকম ব্যবস্থা করতে হবে। শান্তি আরও দু'-চারজন সাথীকে খবর দিল। ব্যবস্থা অনুযায়ী তারা রাত্রিবেলা এসে উপস্থিত হল।

মহরমের রাত। সাথীরা অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে মিছিলের বিভিন্ন পথ পরিহার করে গোপনে সমুদ্রতীরে মৃতদেহ বয়ে আনলো। বঙ্গোপসাগরের বেলাভূমিতে বালুকারাশির গভীরে শৈলেশ্বরের শেষ শয্যা রচিত হল। জাতীয় পতাকায় সযত্নে আবৃত শবদেহে পুষ্পার্ঘ্য দান করে অন্তরের বিপ্লবী অভিনন্দন জানিয়ে ভারাক্রান্ত মনে সাথীরা বিদায় নিল।

স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে পর্দার অন্তরালে এইরূপ বহু শোচনীয় ঘটনা ঘটে গেছে। অনেকেই তা জানবার সুযোগ পায় নি। বিরাট প্রশ্ন রইলো কি ভাবে ও কি মন নিয়ে শৈলেশ্বরের এই আত্মহত্যাকে ভবিষ্যতের তরুণ বিপ্লবীরা দেখবে? প্রশ্নের শিক্ষামূলক উত্তর পাওয়াই প্রয়োজন। [ক্রমশ]

সপ্তম বর্ষ, তৃতীয় সংখ্যা
শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৩৭৬
রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা
সম্পাদক । রমেন্দ্রনাথ মল্লিক

লেখকসূচী । রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (চিঠিপত্র), ভূদেব চৌধুরী (রবীন্দ্র-কবিপ্রতিভার উন্মেষপরিচয় : 'প্রভাতসংগীত'), হরেন্দ্রচন্দ্র পাল (কবি মির্জা গালিবের জীবন-আলেখ্য), সাধনকুমার ভট্টাচার্য (ক্রোচের শিল্পতত্ত্ব), হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় (ভারতদূত রবীন্দ্রনাথ), রমা চৌধুরী ('সন্তানুপপত্তি'-খণ্ডন), দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় (সংগীত ও বাংলার নাট্যশালা : গিরিশ যুগ), অমিয়ভূষণ মজুমদার (আলোচনা : 'প্রাচীন কোচবিহার : ভাষা ও সংস্কৃতিচর্চা'), ভবতোষ দত্ত ও অজিতকুমার ঘোষ (গ্রন্থসমালোচনা)। চিত্রসূচী । গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর (চিত্রিত)।
ত্রৈমাসিক সাহিত্যপত্র । প্রতি সংখ্যার মূল্য এক টাকা।
বার্ষিক চাঁদা চার টাকা (সাধারণ ডাকে) ও সাত টাকা (রেজিস্ট্রি ডাকে)।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় । ৬/৪ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা - ৭

[পূর্বানুবৃত্তি]

॥ এগার ॥

গোপন অগ্নিশিখা নেচে উঠেছে।

সে যে কোথায় কখন দপ্ করে জ্বলে উঠছে তার ঠিক নেই। পূবে-পশ্চিমে, উত্তরে-দক্ষিণে—এক থানা থেকে আর এক থানায়। অন্ধকারে জ্বলে ওঠা আলেয়ার মত—বিভ্রান্তিকর। তার সূত্র গভীর গোপন অন্ধকারে ঢাকা। থানা তাকে ভয় পায়।

ভলান্টিয়ারদের বিলেতী কাপড়ের মিছিল, স্বদেশী গান—কি হাটে-বাজারে তার প্রকাশ্য বহ্ন্যুৎসব—এ ধারার সঙ্গে থানা পরিচিত। এর ধারা ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ্য। কিন্তু যে গোপন অগ্নিশিখা অতর্কিতে তার প্রলয়ঙ্করী রূপ নিয়ে সহসা দেখা দিয়ে—কয়েক মুহূর্তের মধ্যে সব কিছু জ্বালিয়ে দিয়ে যায়, তার উৎস শুধু গোপনই নয়—গভীরে এবং থানার চোখে তার পরিণাম ভয়ংকর। সে যেন ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির মত—দৃষ্টির অন্তরালে কোথায় লুকানো আছে জ্বলন্ত অভিশাপ—উত্তপ্ত লাভাপ্রবাহ। মাঝে মাঝে জেগে উঠে জানিয়ে দিয়ে যায়—সে মরে নি, সে ঘুমিয়ে আছে মাত্র। এ থানার সঙ্গে তার পরিচয় ইতিমধ্যেই কয়েকবার ঘটে গেছে। কিন্তু সূত্রের উদ্ঘাটন একবারও হয় নি।

বড় দারোগা অস্থির—চঞ্চল। চোখের সামনে ভেসে ওঠে চরের চাষাভুষো, গ্রামের মানুষের নিরুত্তাপ বোকা বোকা মুখগুলো। ভাষার বিকৃত উচ্চারণ, যেন সবে কথা শিখেছে। চেহারায় স্রষ্টার শিল্পনৈপুণ্যের কোনো পরিচয় বহন করে না। নোংরা—অর্ধ বর্বর। মানুষ নামধারী সে লোকগুলোর জন্যে বড় দারোগার ঘৃণা ছাড়া আর কিছু নেই। সেখানে আগুন আছে কোথায়?

হরিহর নায়েব চলে যাওয়ার পর বড় দারোগা তিনজন ভলান্টিয়ারকে নিয়ে আবার উঠে পড়ে লাগল—যদি কোনো সূত্রের সন্ধান পাওয়া যায়।

বড় দারোগা বললে, "এ আগুন তোমরাই লাগিয়েছ।"

ভলান্টিয়ার তিনজন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। বুঝতে পারল—এ আবার একটা নতুন জুলুমের সূত্রপাত হতে যাচ্ছে। ঠোঁট চেপে বসল, কঠিন হয়ে উঠল মুখের রেখা—চোখের দৃষ্টি। শরীরের সমস্ত স্নায়ুগুলোকে সজাগ করে ওরা যেন প্রস্তুত হয়ে নিল মনে মনে। আবার একটা ঝাপ্টা আসছে।

কথা বলল বিমল। বললে, "তার আগেই আমরা আপনার থানা হাজতে বন্দী। লোকটি তো বলেই গেল—আগুন লেগেছে রাতদুপুরের পরে।"

"তোমরা মানে তোমাদের দলের লোক।" বড় দারোগা বললে, "তোমাদের ধরে আনার খবর পাওয়ার পর তারা আগুন লাগিয়ে প্রতিশোধ নিয়েছে।"

"ওই জাতের প্রতিশোধ নেওয়া আমার বন্ধুদের আদর্শ নয়।" বিমল বললে "বিলেতী কাপড়ে আমরা আগুন লাগাচ্ছি ঠিকই—কিন্তু ধোপার পাট বা কাপড়ের দোকানে নয়। কাপড় আমরা চেয়ে বেড়াই—যিনি স্বেচ্ছায় দেন—নিই। জুলুম করি না। এ আপনি ভাল করেই জানেন।"

জানে—বড় দারোগা জানে। এবং জানে বলেই বড় দারোগা ভয়ানক চটে গেল। মনের চাপা প্রশ্নটা ছিট্কে বেরিয়ে এল হুংকার করে; "তবে এ আগুন লাগল কি করে? কে লাগাল?"

বিমল শুধু ছোট্ট করে বললে, "জানি না।"

"জানো না?" বড় দারোগা দাঁতে দাঁত চেপে গর্ গর্ করে উঠল খ্যাপা জানোয়ারের মত। বললে, "এই অগ্নিকাণ্ডের আসামী করে তোমাদের জেলে পাঠাতে পারি—জানো?"

"পাঠান। জেলের ভয় নিয়ে আমরা এ পথে আসি নি—এ তো আপনি জানেন।" বিমল ম্লান হেসে বললে, "কিন্তু তাতে আপনার আসল অপরাধী কি শাস্তি পাবে?"

তা যে পারে না—বড় দারোগা তা-ও ভালো করে জানে। কিন্তু সে অপরাধী কে? এই গ্রাম—এই বুনো চর—ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির মত ঝিম্ মেরে আছে। তার কোন অতল থেকে ছিটকে ছিটকে আসছে অতর্কিতে অগ্নিশিখা।

বড় দারোগা বললে, "অপরাধী কে—তোমরা তা জানো।"

"আমরা!"

"হ্যাঁ—তোমরা। তোমরা জানো।" বড় দারোগা বললে, "তাদের সক্কলকে

৫০ পয়সা লাভ!

ষ্টক থাকা পর্য্যন্ত

প্রতি টিনে বোর্নভিটার পরিমাপ আগের মতনই রয়েছে (৪৫০ গ্রাম নীট)

শক্তি, উৎসাহ ও স্বাদের জন্য— ক্যাডবেরিস্ বোর্নভিটা!

Bensons-2536 Ben

তোমরা চেন। তোমাদের পেছনে পেছনে—আড়ালে আড়ালে চলেছে তারা। আমি সব বুঝি।"

বিমল চুপ করে রইল।

"যখনই তোমাদের ধর-পাকড় হচ্ছে—তখনই পাল্টা এই রকম একটা ঘটনা ঘটছে। নুনের সময় দোকান লুঠ হয়ে গেল। আবগারী আন্দোলনে দোকান পুড়ে ছাই হয়ে গেল। তারপর এই বিলেতী কাপড়। কোথায় গাউলি ধোপার পাট—সেখানেও আগুন।" বড় দারোগা হুংকার দিয়ে উঠল, "তারা কারা—নাম বলো।"

"আমরা জানি না।"

ধাই করে পড়ল একটা রুলের বাড়ি—বিমলের বাঁ হাতটা ফুলে গেল। আশ্চর্যভাবে ফুলন্ত হাতটা কাঁপতে লাগল থর্ থর্ করে।

আবার রুল উঠেছে তেরছা হয়ে।

বড় দারোগা ফুঁসে উঠে বললে, 'বলো নাম।"

ধীর অবিচলিত কণ্ঠে বিমল শুধু বললে, "জানি না।"

"এখনও বলবে না!"

দারোগা চেয়ার ছেড়ে খাড়া হয়ে দাঁড়াল।

বিমল কঠিন মুখে নীরবে দাঁড়িয়ে রইল।

দারোগার রক্তচক্ষু পর পর তিনটে কঠিন মুখের ওপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে এল। মুখ ওদের শক্ত হয়ে উঠেছে। সমস্ত শরীর ঋজু—কঠিন। ওরা প্রস্তুত। দারোগা জানে—জ্ঞান হারাবার আগে পর্যন্ত ও মুখগুলো থেকে আর একটা আর্তনাদও বের হবে না। হতাশ হয়ে আবার চেয়ারে বসে পড়ল। কয়েক মুহূর্ত ওদের পাথুরে মুখগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে দারোগা অন্য পথ ধরলে। আস্তে আস্তে বললে, "তোমরা স্বীকার করো আর না করো—ডাক্তারের ডিসপেনসারি তোমাদের একটা গোপন ঘাঁটি। অনেক দিন আগেই অবিশ্যি আমি খবর পেয়েছি।" বলে মৃদু মৃদু হাসতে হাসতে ওদের মুখের ভাবান্তর লক্ষ্য করতে লাগল দারোগা। কিন্তু সেখানে সামান্য মাত্র ভাবান্তরও চোখে পড়ল না। ওরা তেমনি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

দারোগা জোর করে একটু হাসল—যেন সব ব্যাপারটা ধরা পড়ে গেছে। বললে, "চৌধুরী বাড়িতে তাড়া খেয়ে তোমরা ওখানে গিয়েছিলে মতলব আঁটতে। কেমন কি না?"

ওরা তিনজন তখনো তেমনি মুখ বুজে রইল।

দারোগা বললে, "কি—চুপ করে রইলে যে!" একটু থেমে আবার বললে, "অবিশ্যি তোমাদের বলার আর কিছু নেই। তোমাদের দোষও আমি দিচ্ছি না—কারণ, এইরকম একটা অগ্নিকাণ্ডের মতলব তোমাদের আদর্শের অনুকূলে নয়। তবে এমন ভয়ংকর মতলব ডাক্তার বা তার বন্ধু সানো চৌধুরীর আদর্শ বা উদ্দেশ্যে বাধে না। বাধবে কেন? ওরা তো আর তোমার দলের লোক নয়!"

ওদের নীরবতার সুযোগে ব্যাপারটাকে অন্য আর একভাবে খাড়া করে তুলতে দেখে বিমল আর কথা না বলে পারল না। বলে উঠল, "আপনার অনুমান ভুল।"

"ভুল! তাই নাকি?" কথায় বিদ্রূপ মেশানো।

বিমল আবার পাথরের মত মুখ করে চুপ করে রইল।

দারোগা জিজ্ঞেস করলে, "তবে তোমরা ওখানে গিয়েছিলে কেন? চুপ করে থেকে লাভ নেই—কথার জবাব দাও।"

বিমল বললে, "আমাদের হাতেকাটা সুতোর কাপড় দিতে গিয়েছিলাম ডাক্তারবাবুকে।"

দারোগা বললে, "আমি যতোদূর জানি—তিনি ওসব পরেন না। তিনি তো দেশী ও বিলাতীর এক খিচুড়ি সাহেব।"

"আজ স্বেচ্ছায় তিনি সে-সব খুলে ফেলেছেন।"

"বলো কী! তবে তো তোমাদের দলে ভিড়ে গেলেন।" দারোগা হেসে বললে, "ছেলে তো আগেই বোমা-পিস্তল করে দ্বীপান্তরে। সানো চৌধুরীর ছেলেও জেলে। তোমাদের অনুগামী তা হলে বাড়ছে। তা ভালো।"

বিমল 'হাঁ-না' কিছুই বললে না।

"সেখানে আর কে কে ছিল?"

বিমল চুপ।

"চরের চাবাভুষোরা?"

"ডাক্তারের রোগী।"

"কতজন তেমন রোগী ছিল?"

বিমল নীরব।

"বলো বলো—দশ-বিশ-পঞ্চাশ! কতজন?"

"গুণে দেখি নি।"

"কে কে ছিল? সেই নুনের সময় থেকে তুমি সকলকেই তো চেন। তারা সবাই ছিল?"

বিমল আবার চুপ করে গেল।

পবিত্র আর কমলের দিকে চেয়ে দারোগা বললে, "কে কে ছিল?"

ওরা বললে, "আমরা কাউকেই চিনি না।"

"কি বিমলবাবু—কে কে ছিল?"

বিমল কোনো জবাব দিলে না।

দারোগা চেয়ে চেয়ে দেখলে—সেই বোবা পাথর মুখ—যে মুখ থেকে কোনো কথাই বের হবার নয়।

রাগে গরগর করতে করতে বড় দারোগা বাকিটুকু সুসম্পন্ন করবার জন্যে বিমলকে আলাদা করে একজন কড়া সাব-ইনস্পেক্টারের জিম্মা করে দিলে।

তাতে আঘাতের সংখ্যা কিছু বাড়লো বটে—কিন্তু কথা কিছুই বার হলো না। থানার পেছনে বুড়ো আমগাছের গুঁড়ির সঙ্গে দু-হাত টান করে বাঁধা, যেন দৃঢ় আলিঙ্গনাবদ্ধ—পিঠের জামা গুটিয়ে তোলা ঘাড় পর্যন্ত। তারপর চিকন চামড়ার ওপরে ফুটে ওঠা একের পর এক বেতের দাগ। রক্তিম। সরল।

আশ্চর্য! লোকটা মুখে একটু শব্দও করছে না! মুখ গুঁজে দিয়েছে আমগাছে। যাদব শীটের ভাই মাধব শীট সকৌতূহলে উঁকি মেরে দেখতে গিয়েছিল—যদি অপরাধীর নামটা শোনা যায়। বেতের শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনতে পেল না। ভয়ে চোখ বুজলো। পালিয়ে এল।

তারপর একবারে থানা থেকে রাস্তায়।

খানিকটা এগিয়েই চরের কয়েকজন ছোকরার সঙ্গে দেখা—বেরিয়ে এল ধানক্ষেতের ভেতর থেকে। সেই হাবু, যুগল, বংশী—মায় মুকুন্দ। হাতে লম্বা লম্বা ছিপ—সেই সকাল থেকে থানার আশ-পাশে আবাদে জলায় ঘুর ঘুর করছে। মাছ ধরছে ছিপ নাচিয়ে নাচিয়ে—কান খাড়া আছে থানার দিকে।

মাধবকে দেখে ওরা ঘিরে ধরলে।

যুগল জিজ্ঞেস করলে, "তোমার ভায়ের ঘরে আগুন লাগাতে যেয়ে তিনটে লোক নাকি ধরা পড়েছে কাল রাতের বেলা?"

"আরে ধ্যেৎ। কোথায় কি?" সেই

তরুণ অপেরা কর্তৃক
আগামী ৩রা সেপ্টেম্বর ৬টায়
মহাজাতি সদনে
শম্ভু বাগ রচিত
"হিটলার"
আ-গা-মী আ-ক-র্ষ-ণ
সৌরীন চট্টোপাধ্যায় রচিত
"রাজা রামমোহন"
শম্ভু বাগ রচিত
"লেনিন"
পরিচালনায় লেঃ অমর ঘোষ
ফোন : ৫৫-৭১২১
যাত্রাজগৎ পড়ুন

আমগাছে বাঁধা লোকটার কথা মনে করে মাধব শিউরে উঠল—বললে, "অরা মানুষ নয়।"

"কেন।"

"আবার জিগেস্ করছ—কেন?" মাধব বললে, "সে ছোট দারোগা যা করছে—চোখে দেখা যায় না। এর চেয়ে মোর সেই ধোপার কাজ ভালো।" বিড় বিড় করতে করতে মাধব যাওয়ার জন্যে পা বাড়ালো।

"খুব মারছে?"

"সে বুকের পাটা থাকলে দেখ যেয়ে—হোই থানার পিছনে—আমগাছে বেঁধে। —শালার মানুষ নয়...অরা মানুষ নয়।"

থানার ত্রিসীমানা থেকে লোকটা পালাতে পারলে যেন বাঁচে। গজ্ গজ্ করতে করতে চলে গেল হন হন করে।

"ই শালা এখন চাপ এসে পড়বে মোদের ওপরে। হ্যান করো শালা—ত্যান করো শালা। ধ্যুৎ। এর চেয়ে মোর ধোপার কাজ ভালো—ঢের ভালো"...

চরের ছোকরারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে। থানার ভেতরের খবর পাওয়া গেছে। ওদের মাছ ধরা সাংগ হলো—ছিপ্ গুটিয়ে ফিরে চললো চরের দিকে। কারুর মুখে আর কথা নেই। মুখ ওদের পাথর হয়ে গেছে।

মাঝখানে শুধু একটা রাত। পরের দিন ভোরবেলা থানায় খবর এল—বাজারে ক'টা কাপড়ের দোকান আগুন লেগে পুড়ে গেছে।

বড় দারোগা হিস্টিরিয়াগ্রস্তের মত টেবিল চাপড়ে চেঁচামেচি করতে লাগল। সেই একই ধারার পুনরাবৃত্তি।

"আমি জানি...আমি জানি"...

কিন্তু কোথায় লুকিয়ে আছে এই আগুনে-হাত—সেইটে শুধু বড় দারোগার জানা নেই। সাজ সাজ রব পড়ে গেল থানায়।

বড় দারোগা হুংকার দিলে, "বোলাও শালা চৌকিদারদের।"

হুদ্দার চৌকিদাররা কাঁপতে কাঁপতে এসে জমা হলো থানার বারান্দায়। অপেক্ষা করতে লাগল আসন্ন ঝড়ের। মাধব শীট গুটিসুটি হয়ে বসেছিল ভলুর পিছনে। ফিস্ফিস্ করে বললে, "ই শালা আমি তখনি জানতাম—তখনি জানতাম। এর চেয়ে মোর ধোপার কাজ..."

চাপা গলায় ভলু ধমকে উঠল, "চোপ্।"

বড় দারোগা বেটন হাতে ছিট্কে বেরিয়ে এল বারান্দায়। বেটন ঘুরিয়ে বললে, "আগুনের পর আগুন লাগবে—আর তোমরা শালা বসে বসে মাইনে খাবে!"

চৌকিদাররা গোবেচারী মুখ করে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

"কি—কথা নেই কেন!" বড় দারোগা গর্জে উঠল, "কাল রাতে কোথায় ছিলি শালারা—আগুন লাগালে কে!"

একজন মিন মিন করে বললে, "মোরা যে যার হুদ্দায় ছিলাম হুজুর।"

"বাজারের হুদ্দা কার?"

লোকটা ভয়ে আসে নি।

অন্য সব চৌকিদার চুপ। শুধু একজন বললে, "কাল থেকে তার বেদম জ্বর হুজুর। একেবারে বেহুঁস।"

লোকটার গালে ঠাস করে চড় পড়ল। বড় দারোগা দাঁত খিঁচিয়ে বললে, "তুমি শালা তার কে! শালা শাউখুড়ি করতে এসেছ—শুয়োরকা বাচ্চা।" ব্যর্থতার সমস্ত আক্রোশ যেন গিয়ে পড়ল লোকটার ওপরে। তার কান টেনে ধরে দাঁড় করিয়ে দিলে সামনে। তারপর আবার একটা চড়। লোকটা হাত জোড় করে থর্ থর্ করে কাঁপতে লাগল। এবং কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়ল। বসে পা জড়িয়ে ধরলে বড় দারোগার।

বড় দারোগা অন্য সব ভ্যাবাচ্যাকা খাওয়া চৌকিদারদের দিকে বেটন আস্ফালন করে বললে, "কে বা কারা এই আগুন লাগিয়ে বেড়াচ্ছে—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে খুঁজে বার করতে হবে। আমি তাদের দেখতে চাই। যেখান থেকে পারিস—ধরে আন। আমি দেখতে চাই শয়তানগুলোকে।"—

ক্রোধে, ব্যর্থতায়, নিষ্ফল আক্রোশে টগ্‌বগ্ করে ফুটতে ফুটতে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসে পড়ল বড় দারোগা—হাতের বেটনটাকে ছুঁড়ে ফেললে টেবিলের ওপরে। [ক্রমশ]

নির্বাচনী ফল ?

শহর কলকাতা

ততোক্ষণে চাঁদে পৌঁছতে পারি

আপনার মর্মান্তিক এবং নিদারুণ অভিজ্ঞতা হবে, যে অভিজ্ঞতা বোধ হয় এই ভূলোকের চন্দ্রগামী যাত্রীরাও লাভ করেন নি। মাঝেরহাট ব্রীজ থেকে বেহালা পর্যন্ত একবার গেলেই সেই অভিজ্ঞতার অধিকারী হবেন আপনি—যা সেখানের অবহেলিত, অসহায় ও নিরুপায় অধিবাসীরা নিয়মিত ভোগ করছেন। ওখানের রাস্তা মেরামত কোনোদিনই শেষ হয় না; রাস্তা চওড়া করার সংবাদ স্বাধীনতা লাভের প্রথম দিনটি থেকেই শোনা গেছে, তিন কোটি টাকা বরাদ্দও হয়েছিল—যা নাকি পরে আরামবাগের রাস্তায় ঢালা হয়েছে, ট্রাম আউটলাইনড্ হওয়া নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। তদুপরি কোম্পানী প্রথম যখন ট্রাম লাইন পেতেছিল তখন থেকেই বেহালার ট্রাম টারমিনাস হাস্যকর ও দ্রুতগতিসম্পন্ন শহর-কলকাতার বুকে লজ্জার বিষয়। এতো সব অসুবিধার মাথায় আছেন রাজ্য পরিবহনের অ-নিয়মে পরিচালিত সীমিত বাস। একমাত্র এখানেই সব সময় টপ আওয়ার্স এ কথা হলপ করেই বলা যায়। সুতরাং যতক্ষণে বেহালা পৌঁছবার আপনি আশা রাখেন, ততোক্ষণে চাঁদে পৌঁছবার প্রত্যাশাও করতে পারেন।

গামছা বিক্রেতা

জনৈক বন্ধুর কাছেই এই বিবরণ শোনা। তিনি আমাদের আপিসের কাছাকাছি ফুটপাথের এক ফেরিঅলার কাছে গামছা কিনতে গেছিলেন।

ফেরিঅলার কাছে একখানা গামছার দর শুনে তিনি মুখ ফেরালেন। ফেরিঅলা বললেন, আপনি এখানে না নিতে পারেন। কিন্তু যা দাম চাওয়া হয়েছে, তার চাইতে কেউ বেশি বললে দয়া করে এখানে আসবেন।

বন্ধুটি অন্যত্র যাওয়া নিষ্প্রয়োজন ভেবে গামছাটা কিনে নিলেন। তিনি ধরে নিলেন, দাম যদি বেশিই নেয়, নিশ্চয়ই দু-চার আনার বেশি তো নয়।

গামছাটি দিয়ে ফেরিঅলা বললেন, তবু আপনি দামটা দু'-এক জায়গায় যাচাই করে নেবেন।

বন্ধুটি চলে যাচ্ছিলেন। ফেরিঅলার কথায় তাঁকে থামতে হল।

এরপরের ঘটনার সঙ্গে গামছার দরের কোনো সম্পর্ক নেই। ব্যাপারটা ফেরিঅলার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। তবু ঘটনাটা বোধ হয় মহামারী আকারে আজ চারদিকে দেখা যাচ্ছে।

ফেরিঅলা মজ্জাগত ফেরিঅলা নন। কারখানায় তিনি কাজ করতেন। তারপর সেখানে ছাঁটাই-এর আঘাতে একেবারে ফুটপাথে এসে পড়েন। সামান্য পুঁজিপাটা—যা তার ছিল তাই নিয়ে জামা-কাপড় বিক্রি করতে থাকেন। কম লাভে বিক্রি করেন, তবু চোখ ঝলসানো দোকানের দিকেই ক্রেতাদের আকর্ষণ বেশি। অবস্থাগতিকে কাপড় বিক্রির পাট বন্ধ। কারণ তখন কাচ্চা-বাচ্চা দু' মুঠো খাওয়াতে পুঁজিতে হাত পড়েছে। এখন তিনি গামছার ফেরিঅলা।

উপসংহারটা কী হবে—কলকাতা শহরের উদার ফুটপাথই হয়তো তা বলতে পারে।

কার্জন বিদায় নিলেন

ইংরেজ রাজত্ব গেলেও কলকাতার বুকে ইংরেজ রাজত্বের নিষ্ঠুর মুখগুলি বুক ফুলিয়ে ঘোড়ার পিঠে বাইশ বছর ধরে শোভা পাচ্ছিল। ভারতবাসী হিসেবে তাতে আমাদের লজ্জা হয় নি। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকার ওদের সরালেন এবং ময়দানে শেষ যে মূর্তিটি শোভা পাচ্ছিল সেটি ছিল কার্জনের। আর তিনি ছিলেন বঙ্গভঙ্গের প্রধান সাকরেদ।

ইংরেজ শাসকদের দেখে দেখে যাদের গা সওয়া হয়ে গেছিল এখন তাদের একটু কষ্ট হতে পারে বৈকি। তবে এতকাল যাদের হাতে হাল ছিল এবং মূর্তিগুলিকে বহাল ভবিষ্যতে রেখেছিলেন ময়দানের বুকে, তাদের হয়ে কেউ কেউ বাহাদুরি নিতে যাচ্ছেন। যেন—আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান, তারি লাগি তাড়াতাড়ি।

শহীদ মিনারে পতাকা উত্তোলন পর্বে সেই ঘটনা ঘটলো। কিন্তু এমনই দুর্ভাগ্য সারা ময়দানের বুকে কার্জন তখন ঘটনাটা একা দেখলেও তিনি অসহায়।

১৪ই আগস্ট তিনিও বিদায় নিলেন, কিন্তু ইতিহাসের এমনই পরিহাস—বিভক্ত বঙ্গ থেকেই।

* * *

টিকিট। টিকিট।

আপিস থেকে বাড়ি ফিরতেই রাজা ছুটে এল, ছোটকু, তুমি ট্রামে চড়ো না বাসে?

—বাসে। কেন বলতো? জামা ছাড়তে ছাড়তে প্রশ্ন করলাম।

—তোমার বাসের টিকিটটা দাও তো —হাত বাড়াল রাজা।

—আছে কি কাছে। দেখি, বলে পকেট হাতড়ে টিকিটটি বার করে দিলাম।

সেই থেকে রোজ। বাড়ির যে যখনি বাড়ি ফিরবে ছুটে আসবে রাজা। টিকিট দাও, টিকিট।

দিনকতক বাদে সে কয়েক বাণ্ডিল টিকিট নিয়ে উপস্থিত। বললাম, এরি মধ্যে এত টিকিট জমিয়ে ফেলেছিস?

—দেখ ছোটকু, এ দুটো দশ পয়সার বাণ্ডিল, এটা পনেরোর, ওটা কুড়ির—ঠিক কন্‌ডাক্‌টরদের মতন গোছা গোছা করে বাঁধা। সুতো দিয়ে মধ্যে সেলাই করা।

—ছোটকু, আমার না তিরিশ পয়সার টিকিট মোটে দুটো—তুমি আমাকে তিরিশ পয়সার কয়েকটা টিকিট এনে দিও তো।

মনে মনে হাসলাম। জিজ্ঞেস করলাম, এই এতো টিকিট নিয়ে কি করবি?

—কেন, বড় হয়ে তো আমি বাসের টিকিট কাটব। তখন—

টিকিটের গোছা নিয়ে রাজা চলে গেল।

* * *

আমাদের সরকারী বাস কন্‌ডাক্‌টরদের মধ্যে রাজার মতন লোক কেউ নেই তো? থাকলে—

* * *

খবরে প্রকাশ। স্টেট বাসে লোকসান বেড়েই চলেছে। ভরতুকি না দিলে সি, এস, টি, সি, পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হবে।

—শহরদর্শী

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ

তুষার চট্টোপাধ্যায়

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের প্রশ্নে দেশের জনমতের শতকরা ৯০ ভাগই এই ব্যবস্থাকে স্বাগত জানিয়েছে। সাধারণ মেহনতী মানুষের সমর্থন তো আছেই, শিল্পব্যবসায়ের এক বড় অংশও এতে সমর্থন জানিয়েছে। এ-ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হয়েছে একমাত্র তারাই, যারা বড় পুঁজিপতি গোষ্ঠীর লোক এবং তাদের স্বার্থরক্ষায় ব্যস্ত। রাজনৈতিক দল হিসাবে একমাত্র স্বতন্ত্র পার্টি ও জনসংঘই একেবারে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে এ-ব্যবস্থায়, কেন না, তারা বরাবর একচেটিয়া পুঁজিপতির পক্ষেই ওকালতী করে এসেছে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এ-ব্যবস্থার প্রতি আনুষ্ঠানিক সমর্থন জানালেও, যে দক্ষিণপন্থী গোষ্ঠী মোরারজী-পাতিল-নিজলিঙ্গাপ্পা প্রমুখের নেতৃত্বে তৈরি হয়েছে তাদের প্রবল বিরোধ যে এ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আছে, তা নানাভাবে প্রকাশিত। নিজেরা আড়ালে থেকে অন্যদের দিয়ে তারা কোমর বেঁধে লেগেছে নানা কৌশল অবলম্বন করে এ-ব্যবস্থাকে বানচাল করে দিতে। লোকসভায় যেদিন ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের বিল উপস্থিত করা হয়, সেদিন মোরারজী, পাতিল, কামরাজ প্রমুখ অনুপস্থিত ছিলেন। তাঁদের অনুপস্থিতি নিশ্চয়ই এটা জানানর জন্য যে, এ-ব্যবস্থার সত্যিকার সমর্থক তাঁরা নন। তারকেশ্বরী সিংহ, সুচেতা কৃপালনী, সারদা মুখার্জী প্রমুখ অনেকে লোকসভায় সরকারী প্রস্তাবের বিরুদ্ধে এমন কোমর বেঁধে লড়াই চালিয়েছিলেন যে, তা থেকে মোরারজী গ্রুপের সঙ্গে অন্য অংশের সংঘাতটা বেশ স্পষ্টই হয়ে উঠেছে সকলের কাছে। মোটের ওপর ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ প্রস্তাবটিকে উপলক্ষ করে এমন স্পষ্ট দুই শিবির তৈরি হয়ে গিয়েছে দেশে, যা এতদিনকার দ্বন্দ্বের মধ্যে প্রকট হয় নি এবং এই দুই শিবিরের সংঘাতও ক্রমশ গভীর হয়ে উঠেছে। এই সংঘাতই রূপ নিয়েছে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়। যারা ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের বিরোধী তারাই যেন-তেন-প্রকারেণ সঞ্জীব রেড্ডিকে জয়ী করতে চেয়েছিল। স্বতন্ত্র, জনসংঘ ও বি-কে-ডি'র পক্ষ থেকে তৃতীয় প্রার্থী দাঁড় করানো এই উদ্দেশ্যেই। অন্যদিকে, ভি, ভি, গিরির পক্ষ শুধু বামপন্থী ও অ-কংগ্রেসী গণতান্ত্রিক দলগুলির সমর্থন ছিল শুধু তাই নয়, কংগ্রেসের মধ্যেকার মোরারজী-বিরোধী অংশেরও বিপুল সমর্থন ছিল। রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে সিন্ডিকেট বনাম ইন্দিরা গান্ধী-গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব এমন পর্যায়ে উঠেছে, যা কোনোদিন ভাবা যায় নি। কংগ্রেস-সভাপতির নির্দেশের বিরুদ্ধে শত শত কংগ্রেসীর প্রকাশ্য বিদ্রোহ এমন একটা ঘটনা, যা শুধু কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্বই নয়, তার চেয়ে বেশি। এর পেছনে রয়েছে একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থের সঙ্গে অন্যদের বিরোধ। মোটের ওপর, এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, একচেটিয়া পুঁজির সঙ্গে একচেটিয়া পুঁজি-বিরোধিতার সংঘাত আজ দেশের রাজনীতিক্ষেত্রে এক চূড়ান্ত সংঘাতের রূপ নিয়েছে।

একটা কথা এখানে বলে রাখা উচিত। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের প্রশ্নে সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণও বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেছেন। একচেটিয়া পুঁজির পক্ষ-সমর্থনকারী কাগজগুলো এ-সংবাদকে অত্যন্ত ফলাও করে ছেপেছে। জয়প্রকাশ নারায়ণকে কেউ একচেটিয়া পুঁজির সমর্থক বলে জানে না, জানে সর্বোদয় সমাজের প্রচারক হিসাবেই। তবে তিনিও ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের বিরুদ্ধে বললেন কেন? এটা বোঝা যায় যে, তাঁর সর্বোদয় সমাজের ধারণার সঙ্গে রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব বাড়ার চেয়ে অর্থনীতির পূর্ণ বিকেন্দ্রীকরণই সামঞ্জস্য-পূর্ণ এবং সেই হিসাবে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ সে-ধারণার বিরোধী। যদি সেই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তিনি বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করে থাকেন, তবে তার একটা অর্থ হয়। কিন্তু তিনি তার দৃষ্টিভঙ্গিকে স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেন নি এবং তাই তাঁর বক্তব্য একচেটিয়া পুঁজির সমর্থকরাই কাজে লাগিয়েছে। বাস্তব রাজনীতি থেকে দূরে থাকার ফলেই জয়প্রকাশ নারায়ণের এই স্ব-বিরোধী ভূমিকা প্রকট হয়ে উঠেছে। অথচ গান্ধীবাদী হয়েও যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে দেশের রাজনীতি রূপায়ণে রত আছেন, তাঁরা কেউ জয়প্রকাশের সুরে কথা বলেন নি। বাস্তব অবস্থার দিকে চেয়ে তাঁদের অধিকাংশই ব্যাঙ্ক জাতীয়করণকে স্বাগত জানিয়েছেন।

কেন ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পক্ষে দেশের জনমত এত বিপুলভাবে ব্যক্ত হয়েছে? কেনই বা একচেটিয়া-বিরোধী শিবির আজ এত প্রসারিত? এ-দাবি তো ছিল শুধু মাত্র বামপন্থী দলগুলির দাবি। অ-বামপন্থী কোনো দল তো ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের দাবি নিয়ে কোনোদিন বিশেষ সোরগোল করে নি। তবে আজ বামপন্থী-অ-বামপন্থী এবং কংগ্রেসী-অ-কংগ্রেসী সকলের কণ্ঠেই কেন ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের সমর্থন ধ্বনিত? তার কারণ, দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় আজকের সর্বব্যাপী সংকট। এ-সংকট ছেয়ে গিয়েছে সর্বক্ষেত্রে। ছোট শিল্প সংকট, কৃষিক্ষেত্রে সংকট, কর্মসংস্থানে সংকট, পরিকল্পনা চালু করতে সংকট, মুদ্রাস্ফীতি। এই সব সংকটেরই মূলে রয়েছে অর্থনীতি-ব্যবস্থার মূল চাবিকাঠি। পুঁজির ওপর মুষ্টিমেয় কয়েকটি বৃহৎ পুঁজিপতির দখল। এবং এই পুঁজি করায়ত্ত হয়ে আছে ব্যাঙ্ক মারফৎ। এই মূলে জায়গাটাতে স্পর্শ না করায় পুঁজির কেন্দ্রীভবন বন্ধ করার সমস্ত কথাই কাগজে-কলমে থেকে গিয়েছে, কোনো ব্যবস্থারই বিশেষ কিছু ফল হয় নি। আর অন্যদিকে সংকট বেড়েই চলেছে এবং একটা ক্ষেত্র থেকে আরেকটা ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছে। সর্বব্যাপী সংকটের ধাক্কায় তাই আজ ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের প্রশ্ন বামপন্থী দলের বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে এবং এক অভিন্ন জাতীয় দাবি হিসাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

রাণীধূপ
বয়কার প্রডাক্টস

ব্যাঙ্কের মাধ্যমে কিভাবে পুঁজির ওপর একচেটিয়াদের দখল আসে?

প্রথমেই বোঝা দরকার যে, ব্যাঙ্ক-মালিকরা জনসাধারণের টাকা নিয়েই নিজেদের কাজে লাগায়। সি ডি দেশমুখ প্রমুখ কেউ কেউ বলেছেন, পুঁজিপতিরা তাদের পুঁজির জোরে যদি ব্যাঙ্ক চালায়, তাতে বাধা দেবার কি কারণ থাকতে পারে? এ কথাটা আগাগোড়া ধাপ্পা। ব্যাঙ্কের শেয়ার-হোল্ডারদের টাকা আর কতটুকু? আসল টাকা তো আমানতকারীর (depositors)। একটা হিসাব থেকেই অবস্থাটা বোঝা যাবে। যে ১৪টি ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ হয়েছে তাদের মোট প্রদত্ত মূলধন হচ্ছে ২৮·০১ কোটি টাকা। আর তাদের মোট আমানত হচ্ছে ২৭৪১·৭৬ কোটি টাকা, যা বাজারে খাটানো যায়। অর্থাৎ, এই ব্যাঙ্কগুলির মালিকরা তাদের নিজেদের টাকার প্রায় ১০০ গুণ বেশি টাকার ওপর কর্তৃত্ব করছে। এটাই হচ্ছে আসল ব্যাপার এবং এইজন্যই ব্যাঙ্ক শিল্পের মাধ্যমেই একচেটিয়া পুঁজিপতিদের আধিপত্য গড়ে ওঠে অর্থনীতি ব্যবস্থার ওপর। এবং এইজন্যই ব্যাঙ্ক জাতীয়করণে একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থের মূলে ঘা লাগে।

মোট আমানতের টাকার কি বিরাট অংশ কেন্দ্রীভূত হয়েছে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে, তা বোঝা যাবে ১৪টি বড় ব্যাঙ্কের সঙ্গে মোট শিডিউল্ড ব্যাঙ্কগুলির আমানতের অনুপাত দেখলে। ৫৮টি শিডিউল্ড ব্যাঙ্কের মোট আমানত হচ্ছে ৩৭৯২ কোটি টাকা। তার মধ্যে ১৪টি জাতীয়কৃত ব্যাঙ্কের হাতেই রয়েছে ২৭৪১·৭৬ কোটি, অর্থাৎ শতকরা প্রায় ৭৫ ভাগ। ব্যাঙ্কের টাকা থেকে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের হাতে advance দেওয়ার দিক থেকেও ১৪টি ব্যাঙ্কের অনুপাত প্রায় একই রকম। ১৯৬৮-তে শিডিউল্ড ব্যাঙ্কগুলির মোট এ্যাডভান্স দেওয়ার হিসাব হচ্ছে ২৬৮৩ কোটি টাকা, তার মধ্যে ১৪টি ব্যাঙ্কের এ্যাডভান্স হচ্ছে ১৭৪৩·৬৬ কোটি। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে ব্যাঙ্কের মালিকানার জোরে দেশের লোকের সঞ্চিত অর্থের অধিকাংশ ব্যবহার করছে কিছুসংখ্যক বড় পুঁজিপতি।

কিস্তিতে ট্রানজিস্টার
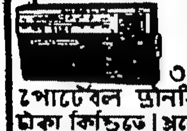
HAVA
৩ব্যান্ড অলওয়ার্ল্ড
পোর্টেবল ট্রানজিস্টর মাসিক ৫
টাকা কিস্তিতে। প্রত্যেক গ্রাম ও শহরে
পাঠান যাইতে পারে।
HAVA SALES (39) SHAKTI NAGAR, DELHI-7

কি কাজে এই এ্যাডভান্স ব্যবহৃত হয় তাও দেখা যাক। প্রয়োজনীয় পুঁজির অভাবে দেশের বিরাট কৃষিক্ষেত্রের উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে, এ কথা সকলেই জানেন। জাতীয় স্বার্থে জনসাধারণের সঞ্চিত অর্থ ব্যবহার করতে হলে ব্যাঙ্কের টাকার একটা বড় অংশ কৃষিক্ষেত্রে নিয়োগ করা উচিত। কিন্তু ১৯৬৫-র হিসাব থেকে দেখা যায় যে, শিল্প ও ব্যবসায় ছাড়িয়ে কৃষিক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের অর্থ গিয়ে পৌঁচেছে মাত্র শতকরা ০·২ ভাগ।

তার মানে কিন্তু এই নয় যে, ব্যাঙ্কের টাকায় দেশের শিল্প ও ব্যবসায়ের সর্বাঙ্গীণ বিস্তার ও উন্নতি হয়েছে। পিছিয়ে থাকা শিল্পোদ্যোগে সাহায্য হয় নি এই টাকায়। দেশে মোট ১ লাখ মাঝারী ও ক্ষুদ্র শিল্প আছে। তাদের মধ্যে ৫০ হাজারেরও বেশি ব্যাঙ্কের কাছ থেকে কোনো ঋণ পায় নি। ব্যাঙ্কের টাকা গিয়েছে তেলা মাথায় তেল দিতে। কেন না, বড় ব্যাঙ্কগুলি সবই এমন কয়েকজন মাত্র বড় পুঁজিপতির দখলে, যারা একই সঙ্গে দেশের সমস্ত বড় বড় শিল্পের মালিক। বড় ব্যাঙ্ক ও বড় শিল্পের মধ্যে এমন গাঁটছড়া বাঁধা যে, ব্যাঙ্কগুলির প্রধান কাজই হয়ে দাঁড়িয়েছে এই বড় শিল্পগুলিতে আরো অর্থ ঢালা ও এমনি করে একচেটিয়া পুঁজির সাম্রাজ্যের আরো বিস্তার ও শক্তিবৃদ্ধি করা। এক হিসাবে দেখা যায় যে, ২০টি বড় ব্যাঙ্কের যে ১৮৮ জন ডিরেক্টার আছে, তাদেরই হাতে রয়েছে অন্য বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসায়ে মোট ১৬৪০টি ডিরেক্টারী। এর মানে হচ্ছে, ঐ ব্যাঙ্কগুলির টাকা প্রধানত এ্যাডভান্স দেওয়া হয় এই কোম্পানীগুলিকেই। এই এ্যাডভান্সের ব্যাপারে কতরকম পদ্ধতি যে নেওয়া হয় তার ঠিকানা নেই। ১৯৬২-৬৩-র এক হিসাবে পাওয়া যায় যে, ব্যাঙ্কের ডিরেক্টাররা যে সব কোম্পানীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, সেগুলিতে ঋণ দেওয়া হয় ১৯৭·৪৩ কোটি টাকা। ভূতপূর্ব কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী কৃষ্ণমাচারীর এক কথায় এক সময় জানা যায় যে, একটি ব্যাঙ্ক ১৩ কোটি টাকা আলাদা করে রেখেছিল শুধু নিজেদের হাতের কোম্পানীগুলিকে ঋণ দেবার জন্য। এরকম কথাও তিনি একবার বলেছিলেন যে, একজন শিল্পপতি এক কোটি 'ওভার ড্রাফট' পেয়েছে, যা বহুদিন পর্যন্ত অপরিশোধিত ছিল। সাম্প্রতিক এক খবরে জানা যায় যে, ইণ্ডিয়ান আয়রন এ্যাণ্ড স্টীল কোম্পানীর ওপর দখল আনার জন্য বিড়লাগোষ্ঠী এই কোম্পানীর অনেক শেয়ার কেনেন এবং এর জন্য টাকা সরবরাহ হয় বিড়লার নিজের ব্যাঙ্ক ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক থেকে।

এইভাবে মালিকানার জোরে ইচ্ছামতো ব্যাঙ্কের টাকা ব্যবহার করার ফলে শুধু যে একচেটিয়া গোষ্ঠীই ফুলে উঠছে তাই নয়, দেশের মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধিও তার একটা ফল। কেন না, এই টাকার একটা বড় অংশ হচ্ছে অপ্রয়োজনীয় টাকা, অর্থাৎ, শিল্প-ব্যবসায়ের প্রকৃত প্রয়োজনের অতিরিক্ত টাকা। অর্থনীতির নিয়ম অনুসারেই এর ফলে মুদ্রাস্ফীতি ও মূল্যবৃদ্ধি হবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অভ্ ইণ্ডিয়ার রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ব্যাঙ্কের ঋণ অনেক বেড়ে গিয়েছে এবং ন্যায্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত অনেক অপ্রয়োজনীয় কাজে তা দেওয়া হয়েছে। 'ন্যায্য প্রয়োজনের বাইরে ঋণ দেওয়া' মানেই হচ্ছে ফাটকাবাজারীর উদ্দেশ্যে এই ঋণ ব্যবহার করা। এর ফলে কাঁচা মাল ও শিল্পজাত দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি হবেই।

এই সমস্ত পদ্ধতির দ্বারা ব্যাঙ্ক-মালিকরা বিপুল পরিমাণ মুনাফা করছে। যে ৩৮টি প্রাইভেট ব্যাঙ্কের কথা আগে বলা হয়েছে, অর্থাৎ যেগুলি ৪১·৬৪ কোটি টাকার প্রদত্ত মূলধনের ভিত্তিতে ৪২৩৭·৩৩ কোটি টাকার আমানতের ওপর কর্তৃত্ব করে, তাদের মুনাফা হয়েছে ১৯৬৮-তে ১০·২৩ কোটি টাকা। অর্থাৎ, প্রদত্ত মূলধনের শতকরা ২৫ ভাগ। ১৪টি জাতীয়কৃত ব্যাঙ্কের ২৮·০১ কোটি টাকার প্রদত্ত মূলধনের ভিত্তিতে মুনাফা হয়েছে ৬·৬৫ কোটি টাকা, অর্থাৎ প্রায় শতকরা ২০ ভাগ। প্রধানত জনসাধারণের অর্থ খাটিয়ে এই বিপুল পরিমাণ মুনাফা লুটেছে একচেটিয়া পুঁজিপতিরা।

ব্যক্তিগত মালিকানার অধীনে ব্যাঙ্ক থাকার কুফল সবচেয়ে বেশি ভোগ করেছে কৃষক। কৃষি-উন্নতির জন্য দরকার কৃষকের হাতে টাকা, যার দ্বারা সেচ, সার, বীজ ও অন্যান্য ব্যবস্থা করতে পারে পশ্চাৎপদ অবস্থার কৃষকরা। গ্রাম-ভারতের এটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় সমস্যা। কিন্তু জনসাধারণেরই যে টাকা দিয়ে ব্যাঙ্কশিল্প কারবার করে, তার মাত্র ০·২% কৃষিক্ষেত্রে এসেছে। কারণ, লাভজনক ক্ষেত্র ছাড়া ঋণ দেওয়া ব্যক্তিগত মালিকানাধীন ব্যাঙ্ক করবে না। যে সামান্য টাকা কৃষিঋণ হিসাবে ব্যাঙ্ক ছাড়ে, তাও ধনী চাষী ছাড়া প্রকৃত অভাবগ্রস্ত চাষীর জন্য নয়। এই অবস্থার জন্যই অনেক পরিকল্পনা সত্ত্বেও কৃষিক্ষেত্রের বিশেষ কিছু উন্নতি হয় নি। এই যে সমস্যা, এটা ২০ বছর আগে কংগ্রেসেরই তৈরি 'কৃষি-সংস্কার কমিটি'ও অনুধাবন করেছিল। ১৯৪৯-এ এই কমিটির রিপোর্টেই কৃষি-উন্নতির প্রধান অন্তরায় হিসাবে বলা হয়েছিল যে,

ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা আছে কি না তা দেখে তবে কৃষককে ঋণ দেওয়া হবে—এ রকম নিয়মের পরিবর্তন হওয়া দরকার। ১৯৫৪-এ 'ক্ষুদ্র শিল্প কমিটির' রিপোর্টেও বলা হয়েছিল যে, ব্যবসায়ী ব্যাঙ্কগুলি ছোট শিল্পে টাকা সরবরাহ করতে অনিচ্ছুক হওয়াতেই ছোট শিল্পগুলির উন্নতি হচ্ছে না।

পশ্চিমবঙ্গের অভিজ্ঞতা থেকেই দেখা যায় যে, গ্রামাঞ্চলের কৃষি, সমবায় ও অন্যান্য বহু প্রয়োজনের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রের কাছে অর্থ চাইলে অর্থ পাওয়া যায় না। অজুহাত শোনা যায় অর্থাভাব। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঋণ দেওয়ার অক্ষমতা জানায়। বন্যা-নিরোধ প্ল্যান বন্ধ হয়ে থাকে অর্থের অভাবে, অন্য বহু প্রকল্প বন্ধ হয়ে থাকে অর্থের অভাবে। সমস্ত দেশের দিক থেকেই সমগ্র চতুর্থ পরিকল্পনাকেই কাটছাঁট করতে হয়েছে অর্থের অভাবে। মার্কিনী টাকা ছাড়া কোনো কিছু উন্নতির পদক্ষেপই হয় না। কলকাতা উন্নয়ন স্কীমের জন্যও দরকার হয় মার্কিনী টাকা। একদিকে এই অবস্থা, অন্যদিকে ব্যাঙ্কগুলির হাতে এত টাকা এসে জমছে, যা ভাবলে অবাক হয়ে যেতে হয়। ১৯৬৮-র ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ব্যাঙ্কগুলির কাছে মোট আমানত এসেছে প্রায় ৪২২৩ কোটি টাকা। এ টাকা জনসাধারণেরই টাকা। ভারতের বাজারে এখন যে টাকা ঘুরছে তার পরিমাণ হচ্ছে ৭৪৬০ কোটি। অর্থাৎ, দেশের মধ্যে চলতি টাকার তুলনায় তার অর্ধেকেরও বেশি পরিমাণ টাকা ব্যাঙ্কগুলির দখলে। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ যদি ব্যক্তিগত মুনাফার ও একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থে ব্যবহৃত না হয়ে দেশের সামগ্রিক উন্নতির জন্য ব্যবহৃত হয়, তা হলে কত কিছু করা যায়।

কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যাঙ্কের 'সামাজিক নিয়ন্ত্রণ' করেছিল। জাতীয়করণের দাবির ব্যাপকতা দেখেই এসেছিল এই 'সামাজিক নিয়ন্ত্রণের' প্রস্তাব। এখনও মোরারজী দেশাই প্রমুখ একচেটিয়া পুঁজিপতির অনুচরেরা বলতে চান যে, সামাজিক নিয়ন্ত্রণই যথেষ্ট ছিল দেশের স্বার্থের দিক থেকে। কিন্তু এই 'সামাজিক নিয়ন্ত্রণ'টা যে জাতীয়করণকে আটকানোর জন্যই, তা বুঝতে খুব অসুবিধা হয় না। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ মানে টাকার ওপর মালিকানা-কর্তৃত্বের অবসান নয়, টাকা ব্যবহারের পদ্ধতি পরিবর্তন নয়, লোকদেখানো কিছুটা বাহ্য পরিবর্তন, অথচ ভিতরের দিকটা ঠিক রাখা। শিল্পপতিদের স্থলে কিছু সরকার মনোনীত ব্যক্তি ডিরেক্টার বোর্ডে নেওয়ার কথা এতে আছে। টাটা-বিড়লারা নিজেরা সরাসরি ডিরেক্টার বোর্ডে না থেকে, যদি মোরারজী প্রমুখ ব্যক্তিদের মারফৎ তাঁদের বিশ্বাসভাজন লোকদের দিয়ে ডিরেক্টার-বোর্ড নিয়ন্ত্রণ করেন, তবে তাতে তাঁদের দখল একটুও কমে না, বরং তাতে জনসাধারণকে ধোঁকা দেওয়া আরও সহজ হয়। কিছু শর্ত আরোপ করে ব্যাঙ্কের টাকা কৃষিক্ষেত্রে নিয়োগের বিধানও আছে। কিন্তু শর্তটা এমনই যে, টাকার প্রকৃত প্রয়োজন কাদের সে বিচার ছেড়ে দেওয়া হয়েছে মালিকদের ওপর। সুতরাং কৃষিক্ষেত্রে টাকা নিয়োগের নামে কৃষি থেকে মৎস্য চাষ পর্যন্ত, ঠাণ্ডাঘর থেকে বিপণন-ব্যবস্থা পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে ধনী কৃষকদের মাধ্যমে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের এক বিরাট জাল বিস্তার হবে। অধিকন্তু মনে রাখা দরকার যে, সামাজিক নিয়ন্ত্রণের নামে ব্যাঙ্ক সংশোধনী আইনে ব্যাঙ্ক-কর্মচারীদের ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার খর্ব করা হয়েছে। মোটের ওপর, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ একটা নিছক ধাপ্পা মাত্র, যার মাধ্যমে একচেটিয়া পুঁজির রাজত্বই আরো প্রসারিত হবার সুযোগ করা হয়েছিল। তাই যদি না হত, অর্থাৎ, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ আর জাতীয়করণে মূলগত তফাৎ যদি নাই থাকত, তাহলে মোরারজী-পাতিল থেকে আরম্ভ করে স্বতন্ত্র-জনসংঘ পর্যন্ত, টাটা-বিড়লা থেকে আরম্ভ করে বড় চেম্বার অফ কমার্সগুলি পর্যন্ত এত ক্ষিপ্ত হয়েছেন কেন?

সুতরাং, দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে প্রধান সমস্যা যে একচেটিয়া পুঁজির আধিপত্য, সেই সমস্যা সমাধানের পথে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ এমন একটা দৃঢ় পদক্ষেপ, যা আজ যদি না নেওয়া হত, তাহলে পরে নেওয়া আরো কঠিন হত। কেন না, দেশের ক্ষমতা ভারসাম্যের দ্রুত পরিবর্তনের অবস্থায় আজ একচেটিয়া গোষ্ঠীও কোমর বেঁধে লেগেছে ক্ষমতার সমস্ত আট-ঘাট ভাল করে বেঁধে নিতে। কংগ্রেসের মধ্যে একচেটিয়া গোষ্ঠীর সমর্থকদের চক্র আগের চেয়ে অনেক বেশি সংগঠিত ও সংকল্পবদ্ধ। ফরিদাবাদ কংগ্রেস তারই পরিচয়। স্বতন্ত্র-জনসংঘ-বি কে ডি প্রভৃতির জোটবন্ধন ও দক্ষিণ-পন্থী কংগ্রেস-নেতৃত্বের সঙ্গে তাদের আঁতাত বেড়েছে। কংগ্রেসের মধ্যে যারা একটু প্রগতিশীল অর্থনৈতিক রাস্তা নিতে চাইছে, তাদের বিরুদ্ধে দক্ষিণী-নেতৃত্বের জেহাদও বেড়েছে। সমস্ত দিক দিয়েই অবস্থাটা এমন যে, একচেটিয়া স্বার্থের বিরুদ্ধে একটা দৃঢ় ব্যবস্থা এখনই দরকার ছিল। সেই জন্যই জনমত শুধু ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত সমর্থন জানিয়েই ক্ষান্ত হয় নি, এই পথ অনুসরণের পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসাবে যে ইন্দিরা গান্ধী-বিরোধী দক্ষিণ-প্রতিক্রিয়ার চক্রান্ত, তাকেও প্রতিরোধ করতে সংকল্পবদ্ধ হয়েছে।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে রাখা দরকার যে, ঘটনা যা ঘটেছে এবং যতটা ঘটেছে, তার ওপর নির্ভর করে থাকাটা মোটেই যথেষ্ট নয়। প্রথমত, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের বর্তমান ব্যবস্থা হলেই সব হয়ে গেল না। ১৪টি বৃহত্তম ব্যাঙ্কের জাতীয়করণ ছাড়াও বিদেশী ব্যাঙ্কের জাতীয়করণও দরকার। তা না হলে বিদেশী পুঁজির নিয়ন্ত্রণ থেকেই যাবে। সেই জায়গায় হস্তক্ষেপ না করলে দেশের স্বাধীন অর্থনীতি গড়ে ওঠার পথে নানা বাধা আসবে। ১৪টি বৃহত্তম ব্যাঙ্ক ছাড়াও আরো যে-সব বড় ব্যাঙ্কের মাধ্যমে বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠীর কাজ চলে, সেই ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব আনা দরকার। তাছাড়া, আসল কাজ প্রকৃত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে জাতীয়করণের আওতায় আনা ব্যাঙ্কগুলির পরিচালনা হবে কি না, সে প্রশ্ন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেন না, জনসাধারণের একটা সাধারণ প্রতিক্রিয়া আছে যে, সরকারী কর্তৃত্বে কাজ ভাল হবার বদলে দুর্নীতি বাড়ে। বিভিন্ন রাষ্ট্রাধীন সংস্থার কাজকর্ম দেখে এই ধারণা হয়েছে। কিন্তু তবু এ প্রতিক্রিয়ার চেয়ে অনুকূল প্রতিক্রিয়াই বড় কেন? কারণ, ব্যক্তিগত মালিকানার সংস্থা জনসাধারণের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে, আইনের এক্তিয়ারের বাইরে। আর, রাষ্ট্রাধীন সংস্থার সমস্ত খুঁটিনাটির ওপর জনসাধারণ তদারক করতে পারে, দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রবল গণ-আন্দোলন করতে পারে, পদ্ধতি পরিবর্তনের জন্য চাপ দিতে পারে এবং গণতান্ত্রিক শক্তির প্রাধান্য অনুযায়ী এ সংস্থা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। একটা উদাহরণই দিই। পঃ বাংলার আজকের পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতে এবং গণতান্ত্রিক শক্তির প্রাধান্যের অবস্থায় দুর্গাপুর প্রভৃতির রাষ্ট্র-পরিচালিত সংস্থার কর্মপদ্ধতির ওপর নজর রাখা

মৃতের প্রার্থনা

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়

শীতের সন্ধ্যায় এই মলিন শয্যার দুইপাশে
দাঁড়িয়ে এখন মৃদু গদগদ ভাবে
এই যে শুধুই কিছু মার্জিত বিলাপ, কিছু শোক,—
এই মুহূর্তেই এই সব বন্ধ হোক।
এবং এই যে কিছু পুষ্পের স্তবক, মাল্যদান
এবং তৎসহ এই নিতান্ত নিষ্প্রাণ
স্বল্প-আয়ু প্রশংসায় নিজেদের উদার অবাক
হৃদয়ের প্রদর্শন—তা-ও বন্ধ থাক।
যেহেতু এ ঘটনাটা দৈবাধীন আকস্মিক নয়,—
দিনে দিনে তিলে তিলে ঘটেছে এ ক্ষয়,
সেই হেতু সবিনয়ে এটুকুই বলতে চাই আমি
বড়ই অসহ্য এই শিক্ষিত ন্যাকামি।

এবং আপনারা যাঁরা ধূমায়িত চায়ের আসরে
সব দোষ কঙ্কালের কাঁধে ন্যস্ত করে,
কর্তব্যচ্যুতির দায় স্খালনের চেষ্টায় তৎপর—
তাদের এ-প্রচেষ্টাও বড় হাস্যকর।

তার চেয়ে কাছে এসে আমার হাতটা একবার
সাগ্রহে ধরুন, আমি হয়তো আবার
মাথা তুলে দাঁড়াতেও পারি। আমি আগামী বর্ষার
অবারিত বৃষ্টি পেলে হয়তো আবার
শস্যের সৌরভ মেখে অনায়াসে হেঁটে যেতে পারি।
আমি ফিরে আসতে—আমি ফিরে আসতে পারি॥

'পুলিশ! পুলিশ!'

উলুখড়

ঘুমের মধ্যেও যেন দলবেঁধে বীভৎস শকুন
স্বপ্নগুলি ছিঁড়ে ফেলে; সুরু হয় প্রচণ্ড তাণ্ডব
চতুর্দিকে। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, নগরে, বন্দরে
স্তূপাকার পড়ে থাকে ছিন্নভিন্ন সভ্যতার শব;

আর তার পূতিগন্ধে পিশাচেরা হৈ হৈ উৎসবে
মেতে ওঠে বেপরোয়া; যেন শূদ্রতার সদ্য ধ্বনে
তাদের বাহবা! যেন তৃপ্ত আজ নরকের সভা
ঘুমের মধ্যেও সেই ভয়ঙ্কর হাততালি শুনে।

এবং দুর্নীতি-রোধের চেষ্টা করা আগের দিনের চেয়ে বেশি সম্ভব হচ্ছে নাকি? এটাই হচ্ছে রাষ্ট্রীকরণের সুবিধা। এটা একটা দিক-পরিবর্তন, যার সঙ্গে জন-শক্তির জোরের সম্পর্ক। সেই জন্যই সীমিত ক্ষেত্রে হলেও ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ ব্যবস্থাকে জনসাধারণ তাদের আন্দোলনেরই প্রাথমিক সাফল্য বলে মনে করে। এটাও লক্ষণীয় যে, এই ব্যবস্থায় যে উপদেষ্টা কমিটি ঠিক হয়েছে তাতে ব্যাঙ্ককর্মী ও কৃষকের প্রতিনিধি নেওয়া হচ্ছে। এর আগেও তো অনেক রাষ্ট্রাধীন সংস্থা তৈরি হয়েছে, জীবনবীমা জাতীয়করণ হয়েছে, কিন্তু কর্মীদের প্রতিনিধি উপদেষ্টা কমিটিতে নেওয়ার কথা কোনদিন স্বীকৃত হয়েছে কি? আজ যে এটা হয়েছে, তা দেশের অগ্রসর জনশক্তির জন্যই। এই জনশক্তির চাপেই এই সংস্থার কার্যপদ্ধতির গণতন্ত্রীকরণ করতে হবে, তার জন্য আইন সভার ভিতরে ও বাইরে আন্দোলন করতে হবে, সংগ্রাম করতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ ব্যবস্থাকে দেখা উচিত।

দ্বিতীয়ত, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ ব্যবস্থা গ্রহণ মানেই যে শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে, কংগ্রেসের মধ্যে একাংশের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে, এমন কথা মনে করার কোনো কারণ নেই। একচেটিয়া পুঁজির স্বার্থ বনাম সে-স্বার্থের বিরোধিতা, এই সংঘাত এই ঘটনার মধ্যে প্রতিফলিত নিশ্চয়ই; কিন্তু তবু এ সংঘাত প্রগতির পথকে একেবারে স্থিরনিশ্চিত করে দিয়েছে এ কথা বলা যায় না। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও তাঁর সমর্থকরা এখনও সেই কংগ্রেসের পরিধির মধ্যে থেকেই সংঘাতের অংশীদার, যে কংগ্রেসের সামগ্রিক নীতি ও ব্যবস্থা পুঁজিপতি-স্বার্থের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সেই নীতি ও ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন না হলে ব্যাঙ্ক-জাতীয়করণের আসল উদ্দেশ্য সার্থক হতে পারে না। তাই যতক্ষণ না কংগ্রেসের ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসার দৃঢ়তা ইন্দিরা গান্ধী গোষ্ঠী দেখাতে পারছেন, ততক্ষণ দেশের আজকের প্রতিক্রিয়া বনাম প্রগতির দ্বন্দ্বে প্রগতির শিবিরে তাঁদের অবস্থান প্রকৃত ও স্থায়ী কখনই হতে পারে না। কিন্তু তবু সংঘাতের তাৎপর্যটা বিরাট আজকের অবস্থায়। কংগ্রেসের মধ্যে 'সিণ্ডিকেট' বনাম সিণ্ডিকেট-বিরোধীর দ্বন্দ্ব এমন তীব্র হয়ে উঠেছে এবং রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনকে উপলক্ষ করে তা যেভাবে পরস্পরের বিরুদ্ধে শক্তি-পরীক্ষায় অবতীর্ণ, তাতে প্রতিক্রিয়া প্রগতির সংঘাতের একটা নতুন পরিপ্রেক্ষিতই যেন উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছে। রাষ্ট্রপতি-নির্বাচনের ফল যাই হোক না কেন, এই পরিপ্রেক্ষিত দেশের শক্তি-বিন্যাসে বেশ কিছু নতুন উপাদানের সংযোগ করবে, যা প্রগতির শিবিরকেই শক্তিশালী করবে। এই দিকে লক্ষ্য রেখেই গণতান্ত্রিক শিবিরকে চলতে হবে প্রতি-পদে উপযুক্ত কর্মকৌশল নিয়ে, যার এক-মাত্র উদ্দেশ্য হবে গণতান্ত্রিক শিবিরকে আরো প্রসারিত করা, আরো দুর্বার করা।

মাসিক ১০, টাকার কিস্তিতে লাভ করুন
অল ওয়ার্ল্ড স্ট্যাণ্ডার্ড ট্রানজিস্টর (জাপান মেক) জনপ্রিয় মূল্য ৩০০,। দেশব্যাপী খ্যাতি আছে। ডবল স্পীকার ৩ ব্যাণ্ড, ৮ ট্রানজিস্টর। নাইট-ল্যাম্প ফিট করা। কেবল ইংরেজী বা হিন্দিতে যোগাযোগ করুন।
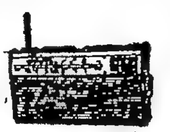
Allied Trading Agencies
(B.C.) P.B. 2128, Delhi-7.

তালপাতার সেপাই

অশোক কুমার সেনগুপ্ত

হ্যা রে রে রে রে, এসে গেইছেক। তালপাতার সিপাই এসে গেইছেক। লিয়ে যাও ছুটু ছুটু খুকা-খুকুরা। হাত ছুঁড়বেক। পা ছুঁড়বেক এই! এই! হাতের আঙুলের কাঠিখানাকে নাড়া দিতে দিতে মুখটায় বেশ বড় একটা হাঁয়ের ভংগি করে, অবাক হয়ে যাওয়ার মত দু' চোখ তার ওপর রেখে চিৎকার করতে থাকে কানু, চুর আগুলবেক। পুতোল ঘরের চুর ধরে দিবেক। লিয়ে যাও। লিয়ে যাও। হ্যা রে রে রে। এসে গেইছেক। পুনের পয়সা মাইনে লাগবেক। থামা নেই, বিরতি নেই, মুখে-চোখে অদ্ভুত ভংগি করে যেন আঙুলে সে সত্যি-কারের জীবন্ত সিপাইকে নাচাচ্ছে এমন করে কানু একটানা গলার স্বর উচ্চ-গ্রামে তুলে আওয়াজ ছুঁড়তে থাকল মেলার মানুষদের উদ্দেশে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েকে মা-বাপের হাত ধরে যেতে দেখলেই তার মধ্যে চোখের ইসারাও চালাতে থাকল, কাঁদ খুকা-খুকু তালপাতার সিপাই লিবার লেগে কাঁদ। তেবে ত' মা-বাপ কিনবেক।

সামনে গোটাকয়েক সাঁওতাল পুরুষ-রমণী উলঙ্গ শিশু বড় বড় চোখ মেলে তালপাতার সিপাইয়ের নাচ দেখছে। কোমরে হাত দিয়ে সাদা চুলের এক বুড়োও ড্যাবড্যাবে চোখে চেয়ে আছে। ওপাশে চানাচুরওয়ালা চানাচুর গরম গরম ভাজা বলতে বলতে আড়চোখে দেখছে। হ্যা রে রে রে শব্দে পাশ দিয়ে পার হবার সময় সবারই দৃষ্টি একবার করে পড়ছে কানুর ওপর। কিন্তু খদ্দের নেই। দু'-একজন এর মধ্যে নেড়ে-চেড়ে দেখে কৌতূহল মিটিয়ে আবার হাতে ফেরত দিয়ে দিয়েছে। যারা সামনে দাঁড়িয়ে তাদের লক্ষ্যবস্তু তালপাতার সিপাই যেন নয়, কানু নামক মানুষটি। তার চোখ নাচান, মুখে শব্দ করা, হাতের নানান ভংগিমার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছে। কানুর কাঁধে ব্যাগ, পায়ে হাওয়াই চপ্পল, পাজামা, গায়ে বুক খোলা নীলরঙের সার্ট। রোগাটে। চেহারা, মুখটা রোদপোড়া। বিন্দু বিন্দু ঘাম যেন দাড়ি-গোঁফের মাঝে জমেছে।

এদিকে ছেঁড়া তাঁবুর চটঘেরা সিনেমা হাউসের মাইকে একটানা ঘোষণা, আসুন, আসুন। উনিশ পয়সায় মাটি, পঞ্চাশ পয়সায়......। ওদিকে সার্কাসের জোকার বাঁশের উঁচু প্লাটফর্মে ঢাউস পাজামা আর জামা পরে ড্রাম বাজাচ্ছে। বাঘের ছবি, দড়ির খেলা... প্রজাপতির মত উড়ন্ত মেয়েমানুষের ছবি, বুকে নেওয়া হাতীর ছবি হাওয়ায় পতপত করছে। পাশাপাশি জীবন্ত নরক, মৎস্যগন্ধা, মৃত্যুকূপের খেলা আর নাগরদোলা। মাঠের মধ্যে এলোপাথাড়ি চানাচুর চানাচুর গরম গরম ভাজা, পাঁপড় পাঁপড়, ঝুমঝুমি, বাঁশের বাঁশি। তার-পরই পিচঢালা পথ। তার ওপাশে শুধু দোকান আর দোকান। অজস্র রঙীন খেলনার, খাবারের, কাচের চুড়ির, মাটির হাঁড়ির, কাঠের চেয়ার-টেবিল দরজা-জানলার, বাসনপত্রের দোকান আর দোকান। সারি বেঁধে খাঁ-খাঁ করা মাঠের ওপর চটের পুরনো টিনের একচিলতে করে সব দোকান। আশেপাশে বাড়ি নেই। ছাড়িয়ে-ছিটিয়ে কয়েকটা গাছ। ও-দিকে একরাশ মন্দির। সব পাশাপাশি। বট-অশ্বত্থের গাছ তার গায়ে গায়ে।

এখনও সন্ধ্যা নামে নি। ওদিকে পশ্চিমের আকাশ লাল টকটকে করে সূর্য স্থির হয়ে আছে। সাদা মেঘের পাশে রঙবাহার। এখানে-ওখানে মাটিতে লালচে রোদের ছিটেফোঁটা। অজস্র কাক এঁটো পাতায় এখানে-ওখানে ওড়াউড়ি করছে। পথের কুকুর লেজ গুটিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

মেলা এখন ভরপুর। দুকূল ছাপানো নদীর মত যেন বার বার কূল ভেঙে যাচ্ছে। ভরদুপুরের ঝিমুনি কাটিয়ে যেন আড়মোড়া ভেঙে খাঁ-খাঁ করা এই মাঠের মধ্যে উল্লাসের বিপুল ধ্বনি ছুঁড়ে মারছে। আর হুড়হুড় করে জলপ্রপাতের শব্দের মত অবিরল মেলার জমাট ঘন একটা শব্দ। স্পষ্ট করে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। মানুষের কোলাহল এমন একটা পর্যায়ে উঠেছে যেখানে কোন শব্দ না, সমস্ত শব্দ, মাইকের চিৎকার, ড্রামের চোঙার, বাঁশির, ব্যাঙের চামড়ার ডুগডুগির একাকার হয়ে নীল আকাশের সামিয়ানার

নিচে চাপ হয়ে অদ্ভুত শব্দ গুমরে গুমরে বের করে দিচ্ছে।

কানুর চোখ বনবন করে ঘুরছিল। মানুষ আর মানুষ। ছেলে-মেয়ে যুবক-যুবতী বৃদ্ধ-বৃদ্ধা নানান বয়সের নানান জামা-কাপড়ের নানান চেহারা কোথা থেকে যেন এসে হুড়হুড় করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। শহুরে গাড়ি আসছে মানুষবোঝাই করে? পিচঢালা পথটার ওপর একটা জিপগাড়ি দাঁড়িয়ে হর্ন বাজাচ্ছে।

খদ্দের নেই? কি আশ্চর্য! এত মানুষ, কেউ এসে কিনছে না কেন তালপাতার সেপাই? কানু হাতের সামনে তালপাতা কেটে কালিতে আঁকা মুখ-চোখের সেপাইকে দেখল। অন্যহাতের মুঠোয় আরও গোটাকয়েক রয়েছে। না, রঙ করা গোটাকয়েক পাখাও আনলে হত। তৈরি করে ঘরের কুলুঙ্গিতেই তো তোলা রয়েছে। বড় ভুল হয়েছে। আসলে রাগ। রাগে মাথার ঠিক ছিল না। খাওয়া পর্যন্ত হয় নি। হনহন করে পাঁচ মাইল হেঁটে রাগে-জ্বলা শরীরে এসে হাজির হয়েছে এখানে। এখন বড় ক্লান্ত লাগছে নিজেকে তাই। গা ঘামছে। গলাও শুকনো। একটানা চিৎকারে শুকনো ভাবটা বেশ কষ্ট দিচ্ছে। চোখ জ্বালা জ্বালা করছে। বুকটা ওঠানামা করছে।

না, রাগ করে বেরিয়ে না এলে ভাল হত। ঘরে কি হচ্ছে কে জানে? চাল তো দশটা পর্যন্ত জোটে নি। কানু বলেছিল, ধার করে আনতে। বৌ তাতেই গেল ক্ষেপে। টুকরো তাল-পাতা, কালি, তুলি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে খনখনে গলায় বলে উঠল, খেতে দিবার মুরোদ নাই। অমন পুরুষের মুখে ছাই।

তা ওকথা কি কানু কোনদিন শোনে নি? শুনেছে বৈকি! দিনরাত্রি অভাব, হা হা দে দে, চাল নেই, নুন নেই, তেল নেই। রোজগার বলতে তো এই। সুতরাং অহরহই শুনতে হয়। তবু কি যে হয়ে গেল। হন হন করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল রাগ-জ্বলা শরীর নিয়ে। না বেরুলে ফাটাফাটি হয়ে যেত। মাথার শিরায় চিড়িক্ চিড়িক্ করে একটা উষ্ণ দাপানি এমন করে তুলল যে, তখন তো নিজের মাথা ফাটিয়ে আরও পাঁচটা মাথা ফাটানোর দুর্বার ইচ্ছে বুকের মধ্যে পাক খাচ্ছিল।

পকেট থেকে বিড়ি বের করে ফস্ করে যেই দেশলাই জ্বেলেছে কানু, অমনি শুনল তার কানের পাশে ডাক, আরে ওস্তাদ! সঙ্গে সঙ্গে একটা হাত কাঁধের ওপর রেখে নিবিড় অন্তরঙ্গতা। শরীর যেন অন্য শরীরে এলিয়ে দেওয়া।

কানু ভয় পাওয়ার মত চট করে সরে দাঁড়াল। ত্রস্তে ঘাড় বেঁকিয়ে ঘাড়ের পাশ দেখে নিল। কালো রোগা ঈষৎ লম্বাটে মুখের এক ছোকরা। মুখে সিগারেট। খুব ভাল করে গোঁফ কামানো। ঠোঁট ওল্টানো। গায়ে ডোরাকাটা চকচকে বুক খোলা ছোট্ট জামা, কালো প্যান্ট।

আরে ওস্তাদ, চিনতে লারছ মনে হচ্ছে। ঠোঁটে যেন আঠা লাগানো, এমন করে সিগারেট ঝুলিয়ে সারা মুখমণ্ডলে ফিকে হাসির আভা ছড়িয়ে চোখ কুঁচকে বলল, মুখে যে রা নাই ওস্তাদ।

কানু তবু শব্দহীন। এদিকে মেলায় শব্দের বন্যা বাড়ছে, মানুষ বাড়ছে। আশেপাশের গাঁ গঞ্জ থেকে দিনান্তে মানুষজন মেলায় এসে জমায়েত হচ্ছে। সূর্য আর দেখা যাচ্ছে না। সন্ধ্যা পুরোপুরি নামে নি। এখনও সব কিছু স্পষ্ট। শেষ দিবসের আলোয় সার্কাস, সিনেমার ছেঁড়া তাঁবু, ছবি, দোকান-পাট, বট-অশ্বত্থের মাঝে মন্দিরের দেওয়াল, চূড়ো সব কিছু দেখা যাচ্ছে। সিনেমায় ডায়নামো ভট্-ভট্ করছে। চানাচুরওয়ালা ডাকছে। পাঁপড় ডাকছে। সার্কাসের জোকার নেচে চলেছে। ওপাশের খাবারের দোকান থেকে ঘিয়ের গন্ধ, মিষ্টির গন্ধ। কাক—কুকুরের মানুষের মাঝে ঘোরাফেরা। ওখানে মানুষের জটলা। কিসের যেন গোলমাল লেগেছে। একজন হাত ছুঁড়ে গলা ফাটিয়ে কি যেন বলে যাচ্ছে।

শরীর ধরে নাড়া দিল ছোকরা। তারপর ঠোঁটের সিগারেটে জোরালো একটা টান মেরে ঠোঁট থেকে সরিয়ে দু' আঙুলের ফাঁকে রেখে বলল, দিল্লাগী করছ ওস্তাদ।

না, না। কানু কেন বলল ভেবে পেল না। হাতের মধ্যে তালপাতার সেপাই নিয়ে মাথা নাড়া দিল।

দু'-চারজন যে কানুর সামনে দাঁড়িয়ে তালপাতার সেপাইয়ের নাচন, কানুর কথা বলা চোখনাচানো দেখছিল, তারা কেউ সরল না। দু'জনের কথা শুনতে থাকল।

এসো ওস্তাদ। এসো। হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল ছোকরা। পিচঢালা রাস্তা মানুষে গিসগিস করছে। পাশ কাটিয়ে ধাক্কা খেয়ে ছোকরা কানুকে চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসালো, তারপর বলল, এ ভাই, দু' কাপ চা বানাও। আর কি খাবে ওস্তাদ?

কানুর খোঁচা-খোঁচা গোঁফ-দাড়ি ভর্তি মুখখানা ভয়ে পাংশু। বুকের ভিতর যেন সমগ্র মেলার বিপুল ধ্বনি আকুলি-বিকুলি করছে। খালি পেটে তেলেভাজার ঘিয়ের খাবারের গন্ধ পাক খেয়ে খেয়ে ফিরছে।

খালি গায়ে কালো রোগা একটা ছেলে সামনে এসে দাঁড়াল, চপ দুব বাবু?

দে। দে। দুখানা করে চপ দে। ছোকরা নড়েচড়ে বেঞ্চে ঘুরে বসল। কানুর চোখে চোখ রেখে মুখোমুখি হয়ে বলল, চেহারা একেবারে পালটিয়ে ফেলেছ ওস্তাদ। কিন্তু আমি বাবা ঠিক চিনতে পেরেছি। একসাথে এক বছর ঘর করেছি ওস্তাদ, চেনার কি ভুল হয়? তা খবর কি ওস্তাদ?

ভাল। শুকনো গলায় বলল কানু।

তালপাতার সেপাই বেচছ! ছিঃ, ছিঃ, ওস্তাদ! লাজে মরি। ঘাড় দোলাল ছোকরা। আড়চোখে দেখল ওদিককার বেঞ্চে বিড়ি ধরিয়েছে একটা লাল শাড়ি-পরা বয়সী মেয়ে। তার পাশে হাঁটুর ওপর কাপড় তোলা বুড়ো। অবাক চোখে তাদের দেখছে সামনের পথ ধরে হেঁটে যাচ্ছে। চায়ের দোকানের জল পড়ে সামনেটা কাদা, ছেঁড়া কাগজ, শুকনো এঁটো শালপাতা চিটিয়ে আছে তাতে। উল্টোদিকে কাচের চুড়ির দোকান। উবু হয়ে বসে কাচের চুড়ি পরছে কালো রোগা একটা মেয়ে। চোখ দুত ঘুরিয়ে নিল ছোকরা। তারপর কানুর হাত থেকে একটা তাল-পাতার সেপাই নিয়ে নাচাতে নাচাতে বলল, ফাস্ট কিলাস ওস্তাদ। সাবাস। তোমার এত গুণ তো কোনদিন বল নাই। হল বিক্রি?

ঘাড় দোলাল কানু। তারপর বলল, না।

হোঃ হোঃ করে হাসল ছোকরা। শরীর ভাঙল, নোয়াল। বলল, তুমি ওস্তাদ মন খোলসা করে কথা বলছ নাই।

চোখ তুলে তাকাল কানু।

তুমি একদম বেলাইনের হয়ে গেইছ। ছোকরা তালপাতার সেপাই হাতে ধরেই মুখে চুকচুক শব্দ করল। তারপর এক হাতে করে খালি গায়ের ছেলেটা চপের ডিস ধরিয়ে দিতে চপটা ধরে নিয়ে কামড় বসালো। বলল, তুমি কুথাকে আমাকে জড়িয়ে ধরবে তা নাই খালি ড্যাব ড্যাব করে দেখছ। একটু থেমে চাপা গলায় বলল, তুমি সংসার করেছ ওস্তাদ?

হ্যাঁ।

বৌ তোমার সুন্দরী?

কানু কোন কথা বলতে পারল না। বৌয়ের মুখটা ভাসল। লাল ছোপ-পড়া দাঁত, মাথার শুকনো চুল, শ্যামলা মুখ। খেতে দিবার মুরোদ নাই আর বিয়ে। ই আমি কার হাতে পড়েছি গো। আঁ পাখা আর সিপাই বিচে পেট চলবেক? রুজগারের ধান্দা নাই। কানুর বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল। হাত-পা মেলে ছোট ছেলেটার গলা ফাটিয়ে

কান্নাও তার দু' কান ভরিয়ে দিল। আঃ। বিয়ের রাতে টকটকে লাল সিঁদুরে ভরা চলচলে শ্যামলা মুখখানা কি আশ্চর্য সুন্দরই না লেগেছিল। বড় বড় চোখ, লজ্জায় নত হয়ে যাওয়া সেই মুখ, পাখির শরীরের মত নরম উষ্ণ সেই ছোটখাট শরীর; তাকে কি যে সুখের নদীতে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। বৌ তু কি সোন্দর। আঃ। ধেৎ। তুকে আমার বাড়া ভাল লাগে বৌ! এ মা! লজ্জার কথা। কি খিপা গো তুমি।

ছেলেপিলে হয়েছে?

চমকে উঠে কানু। বলল, হ্যাঁ।

খুব দুঃখিতস্বরে ছোকরা বলল, আমি জানি ওস্তাদ। তারি জন্যে তুমি ফিরলে নাই। উখরো স্টেশনে তোমার লেগে ঢেক দিন দাঁড়িয়ে থেকেছি। দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, তারি জন্যে তোমার এই দশা। তালপাতার সিপাই বেচছ। পনের পয়সা দাম। মনে পড়ে ওস্তাদ শ'য়ের কম্মে তুমি হাত দিতে নাই।

কানু চোখ বড় বড় করে চেয়ে থাকল।

চপ মুখে নাড়তে নাড়তে ছোকরা বলে চলল, তখন তোমার চেহারা কি ছিল ওস্তাদ! হাতে শুনো নারকেল হয়ে যেত। ইয়া ছাতি, ইয়া বড় বড়

প্রমাণ করুন

সুপার সার্ফ দিয়ে একবার ধুলেই অন্য যে-কোনো কাপড়-কাচা পাউডার দিয়ে ২ বার ধুলে যতটা ফর্সা হয় -তার চেয়েও বেশী ফর্সা হবে।

পরীক্ষাগারে বারবার ব্যাপকভাবে পরীক্ষানিরীক্ষা করে এটি প্রমাণিত হয়েছে। সার্ফের রয়েছে অনুপম পরিষ্কার করার ক্ষমতা। তাই জামার লুকোনো ময়লাও সাফ করে দেয়। ভারতের সেরা ব্র্যাণ্ডটি কিনুনঃ সুপার সার্ফ (কেবল ছোট ও বড় প্যাকেটেই পাওয়া যায়, যার গায়ে লেখা থাকে সুপার সার্ফ)

সুপার সার্ফ সবচেয়ে বেশী সাদা ক'রে ধোয়

(নীল বা অন্য কোন পাউডার মেশাবার দরকার করে না)

লিনটাস-SU. 72-140 BG

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

চোখ। তোমাকে ভিখারী বানিয়ে দিল ওস্তাদ। ছোকরা যেন কেঁদে ফেলবে এক্ষুণি। চোখ ছলছল করে উঠল। গলার স্বর ভারী। বলল, তোমাকে তালপাতার সেপাই বেচতে অনেকক্ষণ দেখাছলাম। বিশ্বাস হচ্ছিল না ওস্তাদ। আমার বুকের ভিতর তোমার লেগে টন-টন করে উঠছিল।

কানু চপ হাতে ঠায় চেয়ে থাকল। সামনে দিয়ে পঙ্গপালের মত মানুষ যাচ্ছে, আসছে। হাসাহাসি করছে, গল্প করছে। কিন্তু কানু কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। কোন শব্দও না। চোখের সামনে সব শূন্য—শূন্য।

ওস্তাদ।

কি? ধরা গলায় কানু বলল। তাকাল না মুখের দিকে।

তুমি দলের খবর নিলে নাই।

জিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে ভ্রূ তুলে তাকাল কানু।

পটলা এখন জেলে। বুন্দা পান্ডবেশ্বরে এক মাগীর হার ছিঁড়তে গিয়ে ধরা পড়েছেক। এখন আর দল নাই ওস্তাদ। সব একা একা। গোবিন্দ এ মেলাতে এসেছে। সন্তোষ অন্ডালে থাকে। চাকরী করে। সুবলা এখন পাঁড়-মাতাল। বান্দী ঘরে পড়ে থাকে। ছোকরা কানুর মুখের দিকে তাকাল। বলল, খাও ওস্তাদ চপ খাও। তুমি ত' এখন ভদ্দর লোক হয়ে গেইছ।

কানু চপে কামড় বসাল। বড্ড খিদে। পেট জ্বলে যাচ্ছে। চক চক করে গ্লাস কতক জল খেতে পারলে হত।

দোকানে খদ্দের আরও আসছে। বেঞ্চি নাড়িয়ে বসছে। কথা বলছে। এদিকে রাত্রি নেমেছে। চারিদিকে অগণন হ্যাজাগের, গ্যাসের আলো, ইতিউতি দু'-একটা টর্চের ফোকাস পড়ছে, লম্ফ, হ্যারিকেনের ছড়াছড়ি। শব্দের বিরতি নেই। সিনেমার মাইকের ঘোষণা বন্ধ হয়েছে। গান বাজছে। চানাচুর, পাঁপড়, সিটি, বাঁশির শব্দ, ঝুমঝুমি, ব্যাঙের চামড়ার ডুগডুগি, উচ্চকিত হাসি, একে-ওকে ডাকা, জিনিস কেনাবেচার কোলাহল একখানা বিরাট ড্রামের ভিতর থেকে গমগম আওয়াজ চারপাশ ঝাঁপিয়ে অদ্ভুতভাবে ছুঁড়ে মারছে।

ওস্তাদ।

কি?

লাইনে চল ওস্তাদ। তালপাতার সিপাই বিচা ছাড়। তুমি গেলে ভাঙা দল আবার জুড়বে। দুড় দুড় করে টাকা আসবে।

কানু কথা বলল না।

চা খেয়ে কানুর হাতে সিগারেট দিয়ে ছোকরা গল্প করতে করতে তাকে মানুষের জটলা থেকে সরিয়ে নিরিবিলিতে নিয়ে গেল। দোকানের পিছন দিকে অন্ধকারে মাটির ওপর পাশাপাশি বসল। কিছুক্ষণ কোন কথা নেই। শ্বাসের শব্দ, সিগারেট টানার শব্দ। তারপর ছোকরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, তাহলে ওস্তাদ আজই লাইনে চল। থাকুক শালার মেলা পড়ে। আর ঘরে ফিরার দরকার নাই। টাকা পাঠিয়ে দেবে।

কানু নীরব।

কি তুমি কথা বলছ নাই? পয়সার অভাবে তোমার দশা তো দেখতে পাচ্ছি। তুমি মরে গেইছ ওস্তাদ। মেয়েমানুষের জালে পড়ে তোমার জীবন শেষ হয়ে গেইছে।

কানু এবারও নীরব।

ওস্তাদ! চাপা অথচ রাগতস্বরে ডাকল ছোকরা।

কি?

তুমি কি যাবে নাই লাইনে?

কুথা?

লাইনে ওস্তাদ। পুরান লাইনে তোমার উখরা-পান্ডবেশ্বর লাইন। দাঁত চেপে বলল ছোকরা।

না।

কেনে ওস্তাদ? মেয়েমানুষ বুঝিয়েছে চুরি করা পাপ। চাপা হাসি ছুঁড়ল ছোকরা। বিদ্রূপের ভঙ্গিতে তারপর বলল, তুমি মেয়েমানুষ হয়ে গেইছ।

কানু দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

সুখে আছ ওস্তাদ?

না।

দুবেলা খেতে পাও?

না।

হাতে টাকা জমেছে?

না।

ছোকরা যেন গুম হয়ে গেল। ঘন ঘন মুখে একটা শব্দ করে সিগারেট টানতে থাকল। কোন কথা বলল না। অন্ধকারে চেয়ে থাকল কিছুক্ষণ।

ওস্তাদ।

কি?

তুমি সুখ চাও না? দুবেলা খেতে চাও না পেট পুরে? ছেলে-বৌকে খেতে দিতে, সুখ দিতে মন হয় না? তুমি টাকা চাও না? ছোকরা উত্তেজিত-স্বরে কানুর শরীর ধরে নাড়া দিয়ে বলল, তোমার সেই ছুরিটা ওস্তাদ, যা দিয়ে একরাতে তুমি দু'খানা লাশ ফেলেছিলে সেটা আমার কাছে আছে। তুমি নেবে ওস্তাদ?

না।

তুমি যাবে না?

না।

ছোকরা হাতের জ্বলন্ত সিগারেট-খানা দূরের অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলে দিল। তারপর দু'হাতে কলার চেপে ধরল কানুর। গলায় চাপ হয়ে বসে গেল। একটা জোয়ালো ঝাঁকুনি দিয়ে দাঁতের ওপর দাঁত চেপে বলল, ওষুধ দিতে হবে তোমাকে।

আঃ।

দু'জনেই উঠে পড়ল। কানু ছাড়াবার আপ্রাণ চেষ্টা করল।

যাবে। তুমি যাবে ওস্তাদ।

না। একটা গোঙানি বেরুল কানুর।

শালা একদম তালপাতার সিপাই বনে গেইছ। বিড়বিড় করল ছোকরা।

কানু গলায় তীব্র চাপ পেয়ে পশুর মত ঝাঁপিয়ে পড়ল ছোকরার ওপর। অন্ধকার মাঠের মধ্যে দু'টি শরীর তারপর ডানার শব্দ তুলে তীক্ষ্ম চঞ্চু নিয়ে দুটো চিলের মত ঝাপ্টাঝাপ্টি ওলোট-পালট খেতে থাকল। মাঝে মাঝে গোঙানি, হাঁসফাঁস শব্দ।

ছোকরা কানুকে আরশোলার মত চিৎ করে বুকে বসে হাঁফাতে হাঁফাতে গোটাকয়েক ঘুষি উন্মাদের মত মেরে বসল। তারপর উঠে পড়ল দ্রুত। একছুটে অন্ধকার পার হয়ে মেলার মধ্যে মিশে গেল।

কানু মুখে কপালে ঠোঁটে দাঁতের গোড়ায় তীব্র যন্ত্রণা নিয়ে গোঙাতে থাকল। মাথার শিরা যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে। নাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। অসম্ভব-অসহ্য যন্ত্রণা। পায়ের আঙুল থেকে মাথার চুল পর্যন্ত যেন যন্ত্রণার রেখা এই মাঠ এই অন্ধকার এই মেলার চাপা বিপুল ধ্বনি নিয়ে তাকে দূরে বহুদূরে নিয়ে যাচ্ছে। কানু এতক্ষণে অনুভব করতে পারছিল ছোকরাটা ভুল করেছে। তাকে চিনতে পারে নি। ওর ওস্তাদ সে নয়। সে কানু। তালপাতার সেপাই, পাখা, রঙীন পাল্কি বেচে সে সংসার চালায়। বড় জ্বালা। বড় জ্বালা। দুবেলা ভাত জোটে না। ছেলে কাঁদে, বৌ দাপায়, মা রাগে গরগর করে। জন-মজুরের কাজ এখন নেই। পরের দেওয়া পুরনো পাজামা, জামা, হাওয়াই চপ্পল পরে তালপাতার সেপাই বুকে নিয়ে তাকে ঘুরে বেড়াতে হয়। উখরা পান্ডবেশ্বর লাইন, টাকা, গয়না, চুরি, টাকা, টাকা, চুরি, আঃ আঃ।

তালপাতার সেপাই! সে সত্যিই তালপাতার সেপাই হয়ে গিয়েছে। শুধু হাত ছোঁড়া আর পা ছোঁড়া। কানু অন্ধকার মাঠের মধ্যে উঁচু-নিচু মাটিতে তীব্র যন্ত্রণা নিয়ে হাড়-মাংস-মেদ-মজ্জার শরীর নিয়ে দুমড়ে-মুচড়ে পড়ে থাকা গোঙানির মধ্যেও ভয় পাচ্ছিল। অন্ত সুখের ডাককেও ভয়।

কানু পড়ে থাকল। যেন উঠে পড়লেই ছোকরাটা ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে চলে যাবে।

পূর্ববঙ্গের কবি

অমিয় কুমার হাটি

সিকান্দার আবু জাফর

সিকান্দার আবু জাফর পূর্ববঙ্গের এমন একজন কবি, যিনি যুগ ও জীবনকে তাঁর সহজ স্বচ্ছ কবিতায় প্রতিফলিত করেছেন; কাব্যের আসরে সুর ও ছন্দের ঝঙ্কার তুলে আনন্দ বেদনার বীণাবাদন করেছেন; মাটি ও মানুষকে ভালবেসে তাদের সঙ্গে একাত্ম হতে চেয়েছেন; প্রাণ প্রেম ও প্রেরণা তাঁর উপলব্ধিতে বৈচিত্র্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছে এবং সেই উপলব্ধির ভাগ সরল সুন্দর অপূর্ব ভাষায় তিনি পাঠকদের বিতরণ করেছেন। পরিশীলিত এই কবির কাব্য পাঠ করতে বসে পাঠক অনতিবিলম্বে কবির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেন। পূর্ববঙ্গে প্রতিষ্ঠিত, খ্যাতিসম্পন্ন স্বনামধন্য কবিকুলের মধ্যে তিনি অন্যতম।

জন্ম ১৯১৯ খৃস্টাব্দে। একাধারে কবি, ঔপন্যাসিক এবং সাংবাদিক। বিখ্যাত "সমকাল" পত্রিকার তিনি সম্পাদক। পূর্ববঙ্গের কাব্য তথা সাহিত্য আন্দোলনে 'সমকাল'-এর যুগোপযোগী জীবন্ত ও জাগ্রত ভূমিকা ইতোমধ্যেই ঐতিহাসিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। 'নতুন সকাল', 'পূরবী' তাঁর উপন্যাসগ্রন্থ। 'মাটি আর অশ্রু' গল্পগ্রন্থ। 'জয়ের পথে' শিশুপাঠ্য উপন্যাস।

১৯৬৫ খৃস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে একই সঙ্গে তাঁর তিনখণ্ড কাব্য-পুস্তক প্রকাশিত হয়—(১) প্রসন্ন প্রহর, (২) তিমিরান্তিক ও (৩) বৈরীবৃষ্টিতে। সম্ভবত এই তিনটি তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ। 'প্রসন্ন প্রহর' ও 'তিমিরান্তিক' কাব্যগ্রন্থ দুটিতে যথাক্রমে ২৯ ও ৩৪টি কবিতা আছে। রচনাকাল ১৩৪৬ থেকে ১৩৬০ বঙ্গাব্দ। 'বৈরীবৃষ্টিতে' আমাদের হস্তগত হয় নি। উক্ত গ্রন্থে ১৩৭১ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত রচিত কবিতা স্থান পেয়েছে। কালের দিক দিয়ে বিচার করলে এক যুগেরও আগের লেখা এই কবিতাগুলি। অবশ্য সঙ্কলিত হয়েছে বলে একত্রে পেয়েছি। এত আগের লেখা কবিতা আলোচনার কারণ নতুন করে পূর্ববঙ্গের কাব্য আন্দোলন সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গে যে জিজ্ঞাসা জেগেছে, তার কিছু উত্তর দেবার চেষ্টা করা। স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি যে, সেখানকার কাব্য আন্দোলন এক দিনেই গজিয়ে ওঠে নি, ভুঁইফোঁড় নয়। কবি দীর্ঘদিন ধরে তাঁর সাধনা অব্যাহত রেখেছেন। প্রথম গ্রন্থের কবিতাগুলির রচনাকাল দেশ ভাগের আগে। দেশ অবিভক্ত থাকলে অন্য দেশের কবি বলে সেক্ষেত্রে তাঁর পরিচয় দিতে হতো না। কবি তাঁর কবিতার-মালাতেই সাংস্কৃতিক যোগসূত্র রচনা করেছেন। কবিতা বা সাহিত্যের সার্থকতাই এইখানে। দেশ-কাল-পাত্রের ব্যবধান ঘুচে যায়, মুছে যায়। ঐ তিনটি ছাড়া তাঁর কোন নতুন কাব্যগ্রন্থ অধুনা প্রকাশিত হয়েছে কি না জানা নেই। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অবশ্য সিকান্দার আবু জাফর-এর সাম্প্রতিক কিছু কবিতা আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করেছি। এই সব উপকরণের ভিত্তিতে তাঁর কবি-প্রতিভার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে অগ্রসর হয়েছি। একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, এই আলোচনা কখনই সম্পূর্ণ নয়। সে দাবিও তুলছি না। বস্তুত তেমন কোন কবির সমস্ত কাব্য সামনে পেলেও তাঁর সম্বন্ধে যতই পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচনা করা হোক না কেন, তা পূর্ণাঙ্গ হয় না। অন্যদিকে, অনেক সময় আবার বিন্দুতেও সিন্ধুদর্শন সম্ভব।

কবিতা লেখার ব্যাপারে কবির নিজস্ব বক্তব্য : 'আমি কবিতা লিখি অনায়াসে। যেমন সকলেরই ক্ষেত্রে, জীবনের আশেপাশে অসংখ্য সুলভ দুর্লভ মুহূর্ত নানারূপে অনাবৃত হয়েছে আমার সামনে। আমি কোন কোন সময়ে সেই সব মুহূর্তের স্বাক্ষর লিপিবদ্ধ করেছি সত্যের বিচ্যুতি না ঘটিয়ে। সেই আমার কবিতা। মুহূর্তের রৌদ্রে উদ্ভাসিত হয়েছি, মুহূর্তের বৃষ্টিতে সিক্ত হয়েছি, মুহূর্তের অন্ধকারে বিভ্রান্ত হয়েছি এবং সেই আমার কবিতা। সব মুহূর্তই সোজাপথে হেঁটে আমার কাছে আসে নি। কেউ এসেছে ধারালো ক্ষুরের উপর দিয়ে সতর্ক পা ফেলে। তবু এসেছে এবং আমি তাকে তাই সুদুর্লভ জেনেছি। আর তার জন্যে আমার সমস্ত অস্তিত্ব অখণ্ড আলিঙ্গন হয়ে উঠেছে। হয়ত পক্ষপাতিত্বে আমি তখন বাঙ্ময় হয়েছি। তবু সেই আমার বাঞ্ছিত কবিতা এবং কাব্য বিচারের সর্ত উপেক্ষা করেও। রসানুভূতি আনন্দস্বভাবে গিয়ে পৌঁছবে না জৈবিক ও সামাজিক বাসনার ক্ষেত্রে নেমে আসবে সৃষ্টকাব্য নন্দনতত্ত্বের অভিজ্ঞতা-প্রসূত না উচ্চতর পর্যায়ের অভিজ্ঞতা সম্পর্কিত জ্ঞানাগ্রয়ী হবে, নন্দনতত্ত্বের অভিজ্ঞতা বিজ্ঞানসম্মত হবে না দর্শনানুগ হবে? 'Metaphysical Hedonistic, Moral, Intellectual Expressionistic, Psychological, কোন্ সূত্রে তা' নির্ণীত হবে, আমার আকাঙ্ক্ষিত মুহূর্তের মুখোমুখি বসে এসব গবেষণা করি নি।' কবির কৈফিয়ৎ মনে রেখেও বলতে হয়, সিকান্দার আবু জাফর-এর কবিতা পড়লে সর্বাগ্রে এই কথাই মনে আসে যে, কবিতা তাঁর প্রাণবিন্দু থেকে স্বতোৎসারিত, অথচ প্রচলিত অর্থে যাকে স্বভাবকবি বলি আমরা, তার থেকে অনেক উঁচুদরের কবি তিনি—অভিজাত রুচি, পরিচ্ছন্ন বুদ্ধিবৃত্তি, মার্জিত হৃদয়াবেগ—এই তিনের অদ্ভুত সংমিশ্রণে তাঁর কবিতা-লক্ষ্মী অনন্য দীপ্তিতে উদ্ভাসিত।

আরপাশ্বিক সম্বন্ধে গভীরভাবে সচেতন এই কবি।

স্বপ্নের এক আদর্শ সুন্দর জগৎ কবির চিত্তলোক জুড়ে রয়েছে। 'অতীত যুগের ঝলোমলো দিনগুলি' তিনি চাপা দিয়ে রাখেন 'বেদনার শিলাতলে'—

'মারণমন্ত্রে মুখর কই বোমারু
বিমানগুলি
সেদিন আকাশে হয় নি হাজার
তারা।
সেদিন ছিল না জীবনধাত্রী-ধরা
নির্মম এতোখানি,
মানুষের ছিল বুকভরা প্রীতি,
প্রেম।' ('ফাল্গুনে হত গান')

'এপার ওপার' কবিতায়—

'উত্তরণ অন্য এক' মানুষের দেশে।

সে দেশের মত নরনারী,
অনাস্বাদ সৌহার্দ্যের ইঙ্গিত
প্রসারি
বিস্মিত আমার কণ্ঠে মালা দিলো
এসে
যত হর্ষে, যত গর্বে, হয়ত বা
তার চেয়ে বেশি ভালবেসে।'

কিম্বা, 'দুই ধারা' কবিতায়—

অবারিত স্নেহাঞ্চল ভরে
যেখানে নিস্তব্ধ দিনে সূর্যের
সুবর্ণ পড়ে ঝরে,
যেখানে প্রশান্ত রাতে শঙ্কাহীন
তারকারা চলে
আকাশের ছায়াপথ তলে।
যেখানে বন্ধন নেই, নেই কোন
পাষাণ শৃঙ্খল
শুধু মুক্তি শুধু গান উদ্দাম
চঞ্চল।
যেখানে প্রাচীর নেই, আছে শুধু
আমন্ত্রণ নীরবে ছড়ানো,
যেখানে আঘাত নেই, আছে শুধু
তৃণে তৃণে মমতা জড়ানো।
সেই মন, সে আমার, সুন্দরের
পুণ্যতীর্থ ভূমি।'

কিন্তু, বাস্তবজগতে কবি কি দেখছেন? 'ভেঙে ভেঙে গেছে যত স্বপ্নের ধূসর শৈলতনু' ('গোধূলির কবিতা')। বুকভরা প্রীতি, প্রেম, অনাস্বাদ সৌহার্দ্য, ভালবাসা, গান, মমতা, মুক্তি—মানুষ এই সমস্ত কিছু থেকেই দূরে সরে যাচ্ছে। তাই তো পবিত্র 'ঈদের দিন'-এতেও—

'খুশীর সওদা নিয়ে তবু দেখি
সুচতুর দরাদরির
প্রথার গর্বে প্রাণ থেকে প্রাণে
বহু ব্যবধান টানি।'

সর্বত্র আজ 'আকাল'—অদৃষ্টের প্রকারই যেন অক্ষমের সান্ত্বনা—

'কোনমতে প্রাণটাকে রাখবার/প্রত্যহ নুনমাখা পান্তা,/দেহের তুচ্ছ লাজ ঢাকবার/একটুকু আবরণ কন্থা/অদৃষ্ট নাইবা যদি জুটলো,/পশুর সামান্য কিছু ঊর্ধ্বে/মানুষের মাঝে বেঁচে থাকবার/ন্যূনতম মৌলিক স্বত্ব/নাই যদি জোটে নাই জুটলো/অদৃষ্টে যা আছে তা' ঘটবেই।'

দেখছেন কবি বিষাক্ত জীবন, গলিত সমাজচিত্র—

'দেখেছি সে শর্বরীর আরণ্য আঁধারে/সম্ভ্রমের বিনিময়ে সুবর্ণ সান্ত্বনা./বিপণির পণ্যসম নর্ম কারাগারে। বধূ ভগ্নী জননীর পাশব লাঞ্ছনা।/ক্ষুধাহীন যৌবনের ঘৃণিত আশ্লেষে/ভেঙে গেছে কুমারীর মর্যাদার বাঁধ/মিটেছে সে নিশীথের নগ্ন পরিবেশে/অনিবার্য কুক্কুরের শোণিতের সাধ। ('সেই রাত্রি')

এই সব অবিচার, অসাম্য অনাচারের আঘাতে কবিচিত্ত অসহিষ্ণু—তাঁর 'ঘুম ভেঙে যায়', খুঁজে বেড়ান—

'কোথায় তাহলে সেই অবিচ্ছেদ আনন্দের ধারা,/মৃত্যুহীন সুন্দরের একান্ত ইশারা?' কারণ, কবি জানেন, দৃঢ়বিশ্বাস তাঁর আছে, এইরকম বঞ্চনা আর চলতে পারে না, বঞ্চিত মানুষের জীবন-ইতিহাসে শুভদিন সমাসন্ন—

'সকল পাপের শেষ হবে সমারোহে
অবমন্তা ঋণমুক্ত হবে অপমানে,
নিশান্তের স্বপ্ন আঁকা সুবর্ণ সম্মোহে
নূতন দিনের সূর্য সম্ভাষণ আনে।'
('এদিনের পাখা')

চেয়েছেন—সংশয় থেকে মুক্তি—

'এ মাটির ভাগী শুধুই ক'জন!/বাকী শত কোটি মানবপুত্র চিরজীবনের চির অভাজন?/মানসিকতার অর্থবিহীন দ্বন্দ্বের থেকে আমাকে বাঁচাও—/আমাকে বাঁচাও, সংশয় থেকে মুক্তি দাও/না হয় আমাকে মৃত্যু দাও।' ('দাহ')

কবি অস্তিত্ববাদী। নাস্তিতে তাঁর আস্থা নেই। সুন্দর জীবনের তিনি পূজারী। সেই জীবনকে যারা পঙ্কিল ও দুঃখ ভারাক্রান্ত করে তুলতে চায়, তাদের বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রাম ক্ষমাহীন। 'মানুষ' কবিতায় তিনি বলছেন—

'দুর্গম বন্ধুর পথ এবার সমাপ্ত হবে/সীমাহীন দিগন্তের তীরে,...দুর্গমের যাত্রাকালে মানুষ চলেছে দিগ্বিজয়ে।'

দুর্জয় অজ মানুষের সঙ্কল্প—কোন পীড়নের কাছেই সে মাথা নত করবে না—

'বুক থেকে দেহ থেকে/খুলে নাও হাড়গুলো/ঘাড় ভেঙে আরো নাও রক্ত/রক্ত হাড়ের স্বাদে তোমাদের জিহ্বা/তার সাথে সবটুকু কলজে/পাথরের মত হবে শক্ত।' ('নিষ্কর্ষ')

শীগ্গিরই আসছে হিসাব-নিকাশ নেবার চরমতম দিনটি,—

'হিসাব নেবার দিন এখনো আসে নি/
তাই আরো সহ্য করে যাবো;/
কারণ নিশ্চিত জানি একদিন/
সহ্যের সীমানা অতিক্রান্ত হবে।
('তেরশ' যাট')

একটি অপূর্ব সুন্দর কবিতা 'ভূমিকায়' কবি লেখেছেন কিভাবে 'ধুলো-মাটিকাদালেপা আবর্জনা ঘাঁটা' ক্লান্ত ম্লান শীর্ণ ভীরু দুটি হাত, সাধারণ হাত একদিন রাক্ষস নিধন করে—

...'একদিন
রাক্ষসের আবির্ভাবে সন্ত্রস্ত যখন
মানুষ মৃত্তিকা
তীক্ষ্ণধার মারণাস্ত্র সহসা নৃশংস হল
এই দুটি সাধারণ হাতে
এ-হাত ঘাতক হয়ে মেনে নিল
জীবনের অনিবার্য দাবী।'

সিকান্দার আবু জাফর মানুষের সভ্যতার অগ্রগতিতে এবং প্রগতিতে বিশ্বাসী প্রচণ্ড আশাবাদী কবি। তিনি নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে জীবনের জয়গান গেয়েছেন। 'এদিনের পাখা', 'অমরত্ব', 'প্রভাত', 'দুইধারা', 'আগামী দিনের স্বপ্ন', 'আলো চাই', 'মৃত্যু নেই', 'নবাঙ্কুর', 'যাত্রী', 'একুশে ফেব্রুয়ারী' প্রভৃতি কবিতায় তাঁর বলিষ্ঠ জীবনাদর্শের অকুণ্ঠ প্রকাশ দেখতে পাই অপরূপ ভঙ্গিমায়। 'আলো চাই' কবিতায়—

'রুদ্ধদার হৃদয়ের কাছে/
অনুনয় করি বারংবার ঃ
আলো চাই আরো আলো,
অন্তরের তীব্রতম আলো।'

প্রসাদগুণ সমন্বিত 'নবাঙ্কুর' কবিতায় কবির দিব্যদৃষ্টি—

'অন্ধকার ফাটলের লক্ষ লক্ষ মুখে—
অজ্ঞাত বীজের বুকের
প্রভাতের জেগেছে অঙ্কুর
প্রদীপ্ত মধ্যাহ্ন সূর্য নহে বেশি দূর।'

'নিষ্কর্ষ' কবিতায় তাই কবির দৃপ্ত ঘোষণা—উৎপীড়নে পাথরের মত শক্ত হয়েছে যে কলজে, সেই পাথর—

'পৃথিবীর মরা ডাঙা মাটিতে/
পাথরের গুঁড়ো হবে ছড়ানো/
সেই দামী সার পেয়ে ধরণী/
সবুজ ফসলে হবে জড়ানো।'

মানুষের ধর্মে বিশ্বাসী এই কবির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাবিরোধী ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গুন্ডা ভাড়া করে যারা দাঙ্গা বাধায়, তাদের উদ্দেশে লিখিত তাঁর একটি বিখ্যাত কবিতা 'কুকুরগুলোকে'—

'শিকারী তোমার কুকুরগুলো রোখো/
জঙ্গলে আজ জন্তুরা চিন্তিত।/
...কুকুরের দাঁতে ক্ষত বিক্ষত/ হৃদয়
চেতনা সাধ/ ভাগাড়ে যখন শকুন

ভক্ষ্য/ একাকার শবদেহ,/ তখনি মানুষ ছেড়েছে নগর গ্রাম,/ জঙ্গল তবু ভাগাড়ের চেয়ে ভালো।/ শিকারী তাহলে কুকুরগুলোকে রোখো/ অন্তত বোঝো পশুদের দুর্দশা।'

সিকান্দার আবু জাফর-এর কাব্য-ধারার আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, সাংস্কৃতিক প্রবহমানতা তিনি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। কোন দেশ ও জাতির সংস্কৃতি তার অতীত ও বর্তমানকে নিয়ে ভবিষ্যতের আকাশে কিশলয়িত হয়। এই কবির কবিতায় হাজার বছরের বাংলার রাধার কবিমানসী হিসাবে উপস্থিতি তাই একান্ত উল্লেখ্য—

'এতদিনে রাধা এলে।/ অনেক রাতের নির্জন মদে প্রমত্ত চাঁদ/ এড়িয়ে সুকৌশলে।/ বাতিনেভা বাতায়নে/ অনেক তারার কৌতূহলের শব/ মাড়িয়ে চরণতলে/ ব্যর্থ বাসনা আকাশের বিস্মৃতি/ বাধা পার হয়ে বহুস্বপ্নের রাধা/ রাধা হয়ে তবে এতদিন পরে এলে।'
('অবহেলায় রাধা'),

এইরকম, ঐতিহাসিক চেতনা-সমন্বিত 'একুশে ফেব্রুয়ারী' কবিতায় দেখি—

'এই স্মৃতিস্তম্ভের পরিচয় পেয়েছি/ ইতিহাসের বিশেষ অধ্যায়ঃ জালিয়ানওয়ালা বাগে/ পলাশী প্রান্তরে/ উধুয়া নালায়/ আজাদীর জন্যে যারা রক্ত দিয়ে গেছে/ তাদের স্মৃতিস্তম্ভ/ শ্রদ্ধায় মাথা নত করেছি।'

'রবীন্দ্রনাথ' কবিতায় কবি মহাকবির প্রতি ঋণ স্বীকার করেছেন—

'সমস্ত শব্দের নদী বেয়ে/ তোমার সুরের ঢেউ আর আমার প্রাণের কূল থেকে/ অনুভূতি থেকে/ তোমারই ভাষণ তার প্রতিধ্বনি শুনে। আমি শুধু কম্পমান ম্লান।/ বারবার মৃত্যু মেনে নিয়া/ অপৌরুষ জানি—/ তবুতো পারিনি/ হাজার মৃত্যু থেকে নিজেকে বাঁচাতে।'

গ্রাম বাংলার চিত্র একেবারে অনুপস্থিত নেই এই কবির কাব্যে। শীর্ণ পাঁজর' কবিতায় গ্রামের কথা আমাদের মনে পড়ে যায়। এই কবিতায় রয়েছে দিগন্ত মাঠ, সোনালী ধান, ভাঙা বালুতট, গোধূলির সুর। পল্লীর একটি সহজ সরল চিত্র অনবদ্য হয়ে ফুটে উঠেছে 'তেতলার মেয়েটি' কবিতায়—

'ডোরাকাটা রঙীন পাঁচহাতি গামছা চাষাবৌয়ের আধখানা শরীর—; যেমন করে জড়িয়ে থাকে...

'আকাশ' কবিতায় গ্রামের রূপ—

'অকস্মাৎ আশ্বিনের হিমঝরা রাতে/ উন্মুখর শেফালীর আনন্দের মত/ যে আকাশ জড়িয়ে রেখেছি/ হৃদয়ের সমস্ত জগতে,.../ আরো ঊর্ধ্বে মেলে রাখে পথের ঠিকানা নিশ্চিহ্ন আকাশ।'

তাঁর প্রেমের কবিতা বিষণ্ণ মধুর, রোম্যান্টিক আমেজ মাখানো। কোন বিকৃত রুচির দ্বারা কবিচিত্ত আক্রান্ত নয়। প্রেম তাঁর কাছে মূল্যবান, জীবনের মূলধন। অনেক সময় প্রেমের কবিতাগুলি গীতিকবিতার প্রসাদগুণ পেয়েছে। কখনো বলছেন, প্রেমের প্রসাদ সমভাবে বণ্টন করে নেবেন,... 'যা হবার হবে—আছি তো আমরা দুজনে/ ভাগ করে নেবো দুজনেই'—('দুজনে')। জানেন, প্রেম তাঁর নিত্য সঙ্গী, 'প্রতি পদক্ষেপে তবু চতুর্দিক ঘিরে/ তুমি সঙ্গে ছিলে।' প্রেমের মধ্যে পেয়েছেন গতির অপরূপ সন্ধান,—'আমার প্রেমের পাখী অবিশ্রান্ত গতি/ পক্ষে তার কণ্ঠে তার সুরের মিনতি।' ('জিজ্ঞাসা') মান, অভিমান, কলহ—সব নিয়েই প্রেম, তার চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে 'প্রিয়তমাকে' কবিতায়। ভালবাসা তাঁর অনন্য, ভালবাসা তাঁর বুকভরা, তবু একটা ব্যর্থতার হাহাকার, প্রচ্ছন্ন বেদনাবোধ—'যত ফাগুনের আয়োজন ছিল/ এখন বিবর্ণম্লান/ দিনরাত্রির অযাচিত ব্যর্থতা/ নীরব করেছে ভাষা/ অন্তরে তবু জীবনের রসে এখনো সঞ্জীবিত/ বঞ্চিত ভালবাসা।' ('কাহিনী') হয়ত প্রত্যাখান ছিল, বিরহ কি তাই মৃতস্বপ্ন দেখছে?—'ফিরে গেছ তুমি প্রাণের প্রান্ত হতে/ তবুও কি যেন রোমাঞ্চ ডাকে/ ক্লান্ত মনের পাখী/ ফিরে গেছ তুমি বিস্মরণের স্রোতে/ তবু বিস্ময় এখনো তোমাকে ডাকি।'

প্রেম, প্রয়োজন ও বর্তমান জীবনের কথা লিখেছেন 'স্বপ্নের দিন' কবিতায়। ভালবেসেই তাঁর সুখ, তাঁর আনন্দ, তাঁর দুঃখ। প্রতিদান তিনি চান নি। যুগবন্ত্রণা মথিত প্রেমের বিচিত্র ছবি এঁকেছেন কতকগুলি কবিতায়। অনমনা হলেও প্রেমিকার প্রতি প্রেমিকের খেদ নেই, সেই প্রেমিকার জন্যেই রেখে গেছেন 'এ প্রাণের সমস্ত সঞ্চয়' ('আমার যাকিছু ছিল')। কথার সেতুর শেষে প্রেমের কি শেষ?—'একদিন শেষে ফুরিয়ে গিয়েছে কথা;/ আমাদের দু'টি প্রাণের ভুবন ঘিরে/ নেমেছে সুপ্ত রাত্রির নীরবতা।' ('শেষ হযে গেছে কথা')।

'গতানুগতিক' কবিতায় প্রেমিকাকে প্রেম নিবেদন করেছিল নায়ক। হাঁ না কিছু সে দয়িতা বলে নি। জন্মদিনে দয়িতাকে দেখা গেল অন্য বন্ধুর গাড়িতে। নায়ক কিন্তু অভিযোগ করছে না—

'তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছি কি না?/ না।/ আমরা যে সমাজের জীব/ তারই ধারায় তুমি ভাসমান তৃণ।/ ইতিহাস পরিবর্তনের দিন এলে/ হৃদয় নিষে তুমি খেলবে না/ আমি জানি।'

'আকাশ' কবিতায় একই আকাশ প্রেমিক-প্রেমিকার কাছে দু'রকমভাবে প্রতিভাত। কল্পনার অভিনবত্ব এখানে লক্ষণীয়। একালের নায়িকা সাংসারিক দুর্দশাগ্রস্ত—'তুমি এক ভাঙা ঘরের ঘরণী—/ ফাঁকা অস্থির শীর্ণ কাঠামো নিয়ে/ ব্যাধি দীনতার সমুদ্রতলে/ জীবন খুঁজেতে চির নিষ্ফল/ নিয়ত জীবন-দিয়ে।' ('নায়িকা')। এ যুগের দুঃখ-কষ্ট সমভাবে সইতে হবে—সুখ-বৈভবে রাখতে পারবে না দয়িত তার দয়িতাকে। 'আমার সঙ্গে' কবিতায় তাই বলছেন,—'তোমাকে কখনো সুখ-বৈভবে/ রাখতে যে পারব না।/ নিত্য নূতন দুঃখের গ্লানি/ বারবার ডেকে আনব,/ কান্না মোছার আগেই হয়ত/

কিস্তিতে ট্রানজিস্টার
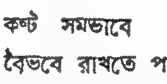
BAZA
৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড
৫ পোর্টেবল ট্রানজিস্টর মাসিক ৫ টাকা কিস্তিতে। প্রত্যেক গ্রাম ও শহরে পাঠান যাইতে পারে।
HIND AGENCIES (F7) KOLHAPUR ROAD, DELHI-7

নূতন অশ্রুজলে/ দুই চোখ যাবে ভেসে/ যদি সইতে পারো তবে এসো/ আমার সঙ্গে এসো।'

রবীন্দ্র প্রভাব তাঁর কাব্যে লক্ষ্য করা যায়। 'বৈশাখ' কবিতায় ('ক্লান্তিহীন অবিশ্রান্ত বেগে/ সময়ের বলাকারা উড়ে চলে উন্মত্ত আবেগে'); 'বলাকা'র কথা মনে পড়ে। 'সব পেয়েছির দেশ' মনে পড়ে যায় আবু জাফর-এর 'আর কোন দেশে' পড়তে পড়তে—

'কীটাণুকীর্ণ অতীতের পাকে পাকে/ বর্তমানের পুষ্পবৃন্ত ঢাকা/ এখানে কখনো হবে না সূর্যোদয়/ ভরবে না ফুলে ভবিষ্যতের শাখা।/ ...হে পাখী আবার চলো তবে আজ ফিরে/ আর কোনো দেশে কোনো প্রভাতের তীরে।'

পূর্ববঙ্গের অনেক কবির মতোই সিকান্দার আবু জাফর-এর কবিতায় আবেগের উষ্ণতা দেখা যায়। সংযত আবেগ কাব্যকে অধিক গুণান্বিত করে, একথা স্বীকার করলেও বলতে হয়, আবেগ সেইখানেই থাকে, যেখানে থাকে প্রাণ প্রেম এবং প্রেরণা। কষ্ট-কল্পিত কতকগুলো শব্দের উদ্ভট সমাহার নয় তাঁর কবিতা। গঠন-প্রকৃতি ও ছন্দের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখেছেন কবি। তাঁর কোন কোন কবিতার ২।১টি পংক্তি চকিত বিদ্যুতের মতো মনকে নাড়া দেয়—

(১) 'আলেয়ার হাসি ছড়ায় আজিকে প্রেত;
অসম্মানের বীতংস ধৃত সুন্দর কল্যাণ'
('ফাল্গুন হ'ত গান')

(২) 'আগামীকালের শিল্পী শোণিত স্বাক্ষরে—
হৃদয়ের প্রেক্ষাপটে এঁকো সেই কথা'
('সেই রাত্রি')

(৩) 'অবমন্তা ঋণমুক্ত হবে অপমানে'
('এদিনের পাখা').

(৪) 'নিস্তব্ধ প্রশান্তি নিয়ে রাত্রি আসে অলস পাখায়
চেতনার সমস্ত শাখায়।'
('ঘুম ভেঙে যায়')

(৫) 'ভেঙে ভেঙে গেছে যত স্বপ্নের ধূসর শৈলতনু'
('গোধূলির কবিতা')

(৬) 'তোমার চোখের প্রশ্রয় পড়ে পড়ে/ কেটে গেছে কত বেলা'
('কাহিনী')

(৭) 'অবগাঢ় শর্বরীর গ্রন্থের পাতায়/ কথায় গাথায়'
('রাত্রির কাহিনী')

প্রভৃতি।

একটি সুন্দর উপমা—'কোনক্রমে আত্মনিবেদন/ প্রথম দেখা বাঘের গায়ে/ নতুন শিকারীর আচ্ছন্ন তীর-ন্দাজী'। উপরোক্ত উদাহরণগুলোর (১) ও (৩) নম্বরে রয়েছে সুধীন দত্তের মত অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দ প্রয়োগের প্রচেষ্টা। (৪) নম্বরে দেখতে পাচ্ছি—সুন্দর একটি সমাসোক্তি। কতকগুলো উল্লেখ্য চিত্রকল্প—'ভিক্ষুকেরা বাস করে অন্তহীন নৈরাশ্য বিছিয়ে' (যাত্রী), 'নৈরাশ্যের কীটদষ্ট স্বপ্নের প্রাসাদে' (প্রভাত); 'ব্যাঘ্র কপিশ অগ্নি চোখের' (দাহ), কুঁড়ির গর্ভে কুসুম বেদনা তোমাকে আনতে হবে' ('নির্বাণ'), 'স্বপ্নের আকাশে ইঙ্গিতের ডানা মেলা দুটি নীল পাখী' (অশ্রুর স্বাক্ষর), 'মৃতশিল্প হৃদয়ের একান্ত দীনতা' (মৃত্যু নেই), ইত্যাদি। কবি স্বপ্ন দেখছেন অনেকভাবে—'যেমন স্বপ্ন পাখী উড়ে যায়' (দুই ধারা), 'রাত্রির তিমিরে স্বপ্নেরা জাগে/ কুসুমের কোলাহলে' (শীর্ণ পাঁজর), বলছেন, 'দেখি তোমার কালো চোখ/ স্বপ্নের আলোকে/ ইঙ্গিতের ডানা মেলা দুটি পাখী' ('অশ্রুর স্বাক্ষর') আবার—'আমার স্বপ্নেরা নীলে পাখা মেলেছিল/' যত বাসনারা ('নির্বাণ')। একটি কবিতার নামই 'আগামী দিনের স্বপ্ন।'

সিকান্দার আবু জাফর প্রগতি-বিশ্বাসী, সত্যসন্ধ কবি। সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর একটি কবিতা উদ্ধৃত করে এই আলোচনার আপাত যবনিকা টানছি। 'ইতিহাসের নীলাম' শীর্ষক কবিতাটিতে পূর্ববাংলার কোটি কোটি মানুষের বুকের ভাষা মুখর হয়ে উঠেছে—

'যতই মুখোশ নাও না মহারাজ
ধুলোর দামে বিকিয়ে যাচ্ছে তাজ।
সঙ্গী সাঙাৎ যাকেই ডাকে পাশে,
কিলবিলিয়ে শ্মশান পাড়ার
বাসিন্দারাই আসে;
মানুষ কোথা?
মানুষ ওসব তোমার পোষা—
মানুষখেকোর পেটে।
অমনি ভয়ে দুয়ারে খিল এঁটে—
গন্ধ গোকুল
ঢাকতে কটু গন্ধ যতই
মাখছ মৃগনাভি
চেয়ে দেখছো অপর হাতে
তোমার প্রাণের চাবি।
তোমার ছোঁয়ায় খরায় পুড়ে
গোটা দেশটা মাঠ হয়েছে আজ
সেই মাঠেতেই নীলাম হচ্ছে
তোমার মাথার তাজ।
হয়ত এখন বর্গী মুখের আদল
নিজের মুখে চিনতে পেরে—
বুকে বাজছে বিসর্জনের মাদল।
ভীম পাহারা ঘরের ছাদে
টিকটিকিটার ল্যাজ
লিকলিকিয়ে যেই উঠছে নড়ি
অমনি চোখে ভাসছে ফাঁসির দড়ি!
পালিয়ে যাবে?
রাস্তা কোথায় বলো?
তোমার মাথায় টাল রাখতে
সব রাস্তায় তোমার তোলা
দেয়াল টলোমলো।
জানলে মহারাজ—
সেই একুশের চুলোয় যারা—
পুড়িয়ে ফেলে ব্যর্থ প্রাণের লাজ
রঙ দিয়েছে রক্তজবা কৃষ্ণচূড়ার ঠোঁটে
আজও যাদের নামের আজান
আকাশ আগলে ঠেলে
কালবোশেখীর ঝঞ্ঝা হয়ে উঠে
লাখো তাদের ভাইবোনেরা
পথে পথে মুখোশ দিচ্ছে ছিঁড়ে
মুখ লুকোবে?
জায়গা কোথায়—
এত চোখের ভিড়ে?
ইতিহাসের সর্বনাশা নীলাম ডাকে আজ
ধুলোর দামে বিকিয়ে যাচ্ছে
নকল সোনার তাজ।'*

---

* উপকরণ সংগ্রহে সহায়তার জন্য শ্রীমতী অর্চনা চৌধুরী ও সাহিত্যিক বন্ধু শ্রীরঞ্জত রায়চৌধুরীকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তাঁদের কাছে লেখকের ঋণ অপরিশোধ্য।

সাধনা
বিউটি স্নো-এর
কোমল স্পর্শে
সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়
সাধনা বিউটি স্নো
একটি অতি আধুনিক অঙ্গরাগ
ত্বক মালিন্যমুক্ত ও লাবণ্যযুক্ত করে। মুখশ্রীতে লালিত্যের ও তারুণ্যের আভা ফুটে ওঠে।
সাধনা ঔষধালয় কলিকাতা-৫
SADHANA
Beauty

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ ত্রিশ ॥

রাত-জাগা পাখিটা আবার ডেকে উঠেছে।

যেন আরো কাছে। দূরে নয়, বনের ভিতরে নয়, যেন বা কাছেই, মনের ভিতরেই একটা জোরালো শিস্ দিয়ে ডেকে উঠেছে।

চিন্তার সূত্রটা আবার এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। একটা ভাবনা দানা বেঁধে উঠেছিল। ছিঁড়ে গেল হঠাৎ।

শরীরের ভিতরে শিরায় শিরায় যেন ছেয়ে গেল ডাকটা। সমস্ত অচ্ছন্ন চেতনায় মাখামাখি হয়ে গেল। পাখিটার যেন তীব্র কী একটা কথা আছে। এই গভীর রাত্রে কাউকে যেন ডেকে ডেকে শোনাতে চায়।

হতে পারে কোন কথা আছে। পাখির কী কথা থাকতে পারে জানা যায় না। লোকালয়ের মানুষদের কাছে বোধগম্য নয় সে ভাষা। শিবব্রতবাবুর মনে হয়, এমন যদি কোন উপায় থাকত, মানুষ যদি পড়তে পারত পাখি-পাখালির জীবজন্তুর মনের ভাষা তাহলে বেশ হত। এক-এক সময় মনে হয়, মানুষের ভাষাগুলি বড়ো বেশি ব্যবহারিক, বড়ো বেশি কাজের ভাষা হয়ে গেছে। সারা জীবন কেটে গেল সেই ভাষা ব্যবহার করে করে। ব্যবসার প্রয়োজনে। লাভ-লোকসানের প্রয়োজনের নিরিখে শব্দগর্ভ কথা ব্যবহার করে করে। কল-কারখানা, হিসেব-নিকেশ, লেজার-ফাইলের যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগের কাটাকাটিতে।

ওঃ সে কী কম দিনের কথা! কম দিন এসেছেন পৃথিবীতে। একটা-দুটো দিনের কথা। যেন বা যুগ-যুগ জন্ম-জন্মান্তর কেটে গেল। জন্মানোর পর থেকে কী কম দিন আছেন পৃথিবীতে!

একটা শালপ্রাংশু মহাবৃক্ষের মত যেন শাখায়-শিকড়ে ঝুরিতে পরগাছায় অনন্ত আয়ুষ্কাল নিয়ে কাটালেন এই-খানে। এই ডুয়ার্সের মাটিতেই কেটে গেল কতগুলি বছর। কত না দীর্ঘ চিন্তা ভাব-ভাবনার দ্বারা আকীর্ণ বিস্তর সময়। পুঞ্জীভূত কাল।

অথচ এর ভিতরের দিকে তাকিয়ে দেখলেন না কোনোদিন। দেখতে সময়ই পেলেন না যেন। মানুষের একটা গোটা জন্মই যেন যুদ্ধের মত সংঘাত-জর্জরতায় পার হয়ে গেল। অথচ এই গাছপালা, এই প্রাকৃতিক সংসার তেমনি-দাঁড়ানো আছে। দাঁড়ানো রইল চিরকাল চারদিকে। তাকিয়ে দেখতেই পেলেন না। সময়ই পেলেন না যেন। আজ মাঝে মাঝে জীবনকে বড়ো বেশি ক্লান্ত মনে হয়। এইসব রাতে।

আশ্চর্য রাত্রি এই ডুয়ার্সের। খোলা জানালার বাইরে নির্মেঘ আকাশে মস্ত একটা সোনালি থালার মত স্বপ্নমাখা চাঁদ। রাশি রাশি মেঘ আকাশে। চাঁদ যেন একটা দেবশিশুর মত। আকাশের সোনালি স্বপ্নের মধ্যে সাঁতার কেটে চলেছে আপনমনে। খেয়ালি নেশার ঝোঁকে। গাছপালা দাঁড়িয়ে রয়েছে এই রাত্রে। নিঃশব্দ উপকথামালার মত জগৎ। সমস্ত কর্মকোলাহল মুখরতার অবসান হয়েছে। দিবালোকের সব চঞ্চলতার ঢেউ ফুরিয়ে গেছে। রাত হলে অদ্ভুত দেখায় আকাশ। গাছ-গাছালি। পাখি-পাখালি। এক বিচিত্র স্বপ্নলোক যেন। তার মধ্যে ডুবে হারিয়ে আছে পৃথিবী। মানুষ ঘুমোচ্ছে। সব কলকথা স্তব্ধ। সব শান্ত স্থির। ঘুম পাড়িয়ে রেখেছে যেন সবকিছুকে।

ওই যে ওদিকে কুলী-ব্যারাকের দৃশ্য। সেখানে কেউ জেগে নেই। এত রাত্রে তাহলে ওই বাঁশীর শব্দ ওঠে কোথা থেকে? নিশ্চয়ই কেউ জেগে আছে। যার চোখে ঘুম নেই। যার হাতে ওই আশ্চর্য বাঁশের বাঁশীর শব্দ উঠছে। কুলীদেরই কেউ হবে। শাল-গাছের মাথার ওপরে গোল চাঁদ। আজ কি পূর্ণিমা? নিশ্চয়ই পূর্ণিমা। না হলে ওই গোল চাঁদ উঠবে কেন পরি-পূর্ণ থালার মত। পূর্ণিমা রাত্রিই। নিটোল চাঁদের জ্যোৎস্নায় গাঢ় ঘুম পাড়িয়ে দিচ্ছে পৃথিবীকে।

আর ওই ঘুমন্ত পৃথিবীর মধ্যেও কেউ কেউ জেগে থাকে যাদের চোখে ঘুম নেই। যারা দিনরাত্রির সমস্ত কার্যকলাপ সব একঘেয়েমির ঊর্ধ্বে জেলে রাখে প্রাণের প্রদীপ। রাত হলে সবাই ঘুমোতে গেলে নিঃসঙ্গ জ্যোৎস্নার ভিতরে অফুরান শিল্পী যার বুকের ভিতরে চন্‌ন্‌ করে ওঠে।

কান পেতে শুনতে চেষ্টা করেন শিবব্রত। রাত কত হল? কত কে জানে। এই মুহূর্তে দেয়ালের বড় ক্লকটার দিকেও দৃষ্টি ফেরাতে উদাসীন শিবব্রত। বাঁশী সর্বদা শোনা যাচ্ছে না। হাওয়া বড়ো বেশি নেই। মাঝে মাঝে ঝিমিয়ে পড়ছে হাওয়া। তখন আর সুর শোনা যায় না। হাজার আগ্রহ নিয়ে কান পাতলেও।

আসলে দুঃখের ভিতরেই সব আছে। শিবব্রত জানেন ওই কুলী-ব্যারাকের মানুষগুলির জীবনে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ভীষণতম অভাব। দারিদ্র্য তাদের নিত্য সহচর। অভাব আছেই। বংশের পর বংশ কেটে গেল ওদের ওই নিয়মে। ওই ছোট-ছোট ঘরগুলির মধ্যেই একই নিয়মে আসে জন্ম-মৃত্যু। জীবনধারণের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই ওদের। গ্রাসাচ্ছাদনের উপ-যুক্ত ব্যবস্থাও ওদের জন্য করতে পারে নি কেউ। না—তিনিও না। সারাজীবন নিজের ভাবনাই ভেবেছেন। তাকান নি ওদের দিকে। ওরা তাঁর ওপরে ওঠবার সিঁড়ি। জীবিকার প্রয়োজনে তারা দাসত্ব নিয়েছেন। তাদের তিনি নিংড়ে নিয়েছেন। রক্ত জলকরা পরিশ্রমের পণ্যে কী ওরা পেয়েছে। কিছুই না। দারিদ্র্য ওদের নিত্যসহচর। অভাব ওদের আজীবন। তিক্ততা ওদের জীবনব্যাপী। মুখ বুজে ওরা খাটে। খেটেছে চিরকাল। আজকাল অবশ্য ওরা মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করে। আগের মত আর বিশ্বস্ত নেই। এই ত' সেদিন বাগানের ম্যানেজার কাশীকান্তবাবুর সঙ্গে কথা হচ্ছিল।

কাশীকান্তবাবু প্রায় ছাব্বিশ বছর তাঁর এই বাগানের ম্যানেজার। অত্যন্ত কর্মী পুরুষ। নিজে দেখে বাছাই করে ওঁকে কাজে নিয়েছিলেন একজীবনে।

কাশীকান্তবাবু বলেছিলেন, আর বলবেন না ওদের কথা! দিনকে দিন ওরা যেন বাঘের মত হিংস্র হয়ে উঠছে!

শুনে চিন্তিত হয়েছিলেন শিবব্রত। বাগানের এ-সব খবর তিনি রাখেন না আর আজকাল। স্বেচ্ছায়ই বাপকে অবসর দিয়েছে কল্যাণ। তাঁদের আরো ক'টি বাগানের কর্তৃত্ব আছে। সে সব দিকে দেখাশোনা করে কল্যাণ। বাগানের ম্যানেজারদের সঙ্গে পরামর্শ-ক্রমে চালায়। তিনি বিশেষ খোঁজও রাখেন না এ-সবের। যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে উপদেশের প্রয়োজন হয়, ছেলে আসে বাপের সঙ্গে আলোচনা করতে। তিনিও ইণ্টারফেয়ার করেন না। ভালোই তো চালাচ্ছে ছেলে। এখন ওদেরই বয়স। ওরাই দেখাশোনা করুক। তিনি সারাজীবন বিস্তর খেটেছেন। বিস্তর পরিশ্রম করেছেন। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ফেলে আজকের চেহারায় এনে দিয়েছেন। কিন্তু তাই বলে নিরীহ শান্তিপ্রিয় কুলী-শ্রমিকদেরও এত পরিবর্তন হয়েছে তিনি ভাবতেও পারেন না।

দেশ-কালই পাল্টে গেছে। কী আর করা যাবে স্যার? কাশীকান্তবাবু খুব ধীরে ধীরে কথা বলছিলেন। খানিকটা দূরে সোফায় বসেছেন তিনি। খাটো-মানুষ। চওড়া কপাল। পরনে খাকী হাফ-প্যাণ্ট। হাফ সার্ট। বলছিলেন, ওরা আজকাল আর মালিককে মালিক বলেই মনে করে না।

শুনে অবাক হচ্ছিলেন শিবব্রত। এক-আধটু পরিবর্তন স্বাভাবিক। যুগ-জীবনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলাই ধর্ম।

ওদের ইউনিয়ন, ওদের পার্টি-লীডারই ওদের কাছে সব। তাদেরকেই মানে তারা। কাশীকান্ত বলছিলেন।

কে ওদের লীডার? জানবার জন্য উন্মুখ হয়েছিলেন শিবব্রত।

লীডার ওদের অনেক। আর ইউ-নিয়নই কি একটা? এ্যাদ্দিন ছিল দু' পার্টির দু'টো। এখন আবার লক্ষণ দেখে মনে হচ্ছে সেটাও ভাঙবে।

সেটা তো ভালো নয়, শিবব্রত স্পষ্টই চিন্তিত হচ্ছিলেন। তাঁর কপালে ভাঁজ পড়েছিল। সাদা ভ্রূতে। ওদের ইউনিয়নের লীডার নিশ্চয়ই চাই। সেটা ওদের অধিকার। আমরাই বা তাদের সে-অধিকার হরণ করব কেন? তবে কি না—ইউনিয়ন যদি একটা না হয়, তাহলে তো নিজেদেরই মধ্যে মারামারি-কাটাকাটি বেধে যাবে?

সে তো একশ'বার। এরই মধ্যে তার লক্ষণ দেখা দিয়েছে। কাশীকান্তবাবুর মুখ থম্‌থম্‌ করছিল।

সেদিন ঘণ্টাখানেক থেকে গিয়েছিলেন কাশীকান্ত। তাঁর সঙ্গে অনেকক্ষণ নানা বিষয় নিয়ে অল্প-অল্প আলোচনা করেছিলেন শিবব্রতবাবু। কাশীকান্ত চলে যেতে আবার নিজের মনে বিষয়গুলি নিয়ে চিন্তা করতে করতে গম্ভীর হয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

তাহলে বাগান-ব্যাপারেও আর শান্তি নেই। শান্তি অবশ্য তেমন থাকারও কথা নয়। এতবড় একটা ব্যাপার। এত লোকজন কর্মচারী। কর্মচারীরাও নিশ্চয়ই সবাই সন্তুষ্ট নন।

কিন্তু কেন এই অসন্তুষ্টি? শ্রমিক-মালিক-সম্পর্ক চিরকাল ছিল। একটা গোটা মানুষের তো একাকী কোনকিছু গড়ে তোলবার ক্ষমতা নেই। এ-ব্যাপারে সকলেরই সহানুভূতি চাই। শুভবুদ্ধির যোগ চাই। আমি মালিক। আমি নিজে যেমন বুদ্ধি দিয়ে মূলধন জুগিয়ে পরিচালনার ঝুঁকি নিয়ে সব কিছু গড়ে তোলবার ব্যবস্থা করছি, তেমনি যারা কর্মী তারাও নিশ্চয়ই তাদের নিজের-নিজের শক্তি-বুদ্ধি-যোগ্যতা দিয়ে কাজের সহায়তা করবে। এই তো চির-কাল হয়ে আসছে। তবে কেন অসন্তোষ? সবাইকে খুশি রাখতে হবে। অন্তত জীবনধারণের জন্য যা-কিছু প্রয়োজন তা নিশ্চয়ই দেওয়া হচ্ছে।

খেতে বসে দুপুরবেলা কল্যাণের সঙ্গে কথা হচ্ছিল এই নিয়ে। কল্যাণ অবশ্য খায় না বাপের সঙ্গে। সে তার নিজের সময়মত ব্রেকফাস্ট-লাঞ্চে অভ্যস্ত। তবে বাবার আহারের সময়টা ইদানীং কাছে আসছে সে। বসছে বিশ-পঁচিশ মিনিট। মা এখানে থাকলে অবশ্য করতে হত না। ইদানীং দিন-কতকের জন্য সুখলতা গেছেন ছোট মেয়ের ওখানে। তার শরীরটা ভালো যাচ্ছে না। দিল্লীতে ছোট জামাতা এক-জন পদস্থ আমলা। তাঁর ওখানে নেহাৎ কর্তব্যবোধেই গেছেন সুখলতা। তিনিও যেতে সম্মতি দিয়েছেন। তোমার শরীরটাও যদি এই সুযোগে খানিকটা সারে। কোথাও তো যাও না। তিনি বলেছিলেন স্ত্রীকে।

সুখলতার ইচ্ছে ছিল তিনিও যান। ডাক্তারের নির্দেশে কিন্তু বাদ দিতে হয়েছে। ছোট ছেলেকে নিয়ে গেলেন কলকাতা থেকে। সে ওখানকার বড় একটা বিদেশী ফার্মের ছোট ম্যানেজার। বিলেত থেকে ঘুরে এসেছে গেল বছরে। বলতে কি ওই ফার্মের সঙ্গে তাদেরও একটা গোপন যোগাযোগ আছে। সেই সূত্রেই কর্মপ্রাপ্তি। বাগান ভালো লাগে না তাঁর। এমন কি কলকাতার জীবনেও ঘোরতর অস্বস্তি। মেম বিয়ে করে এনেছেন।

খেতে বসে কল্যাণকে বলছিলেন শিবব্রত, লেবারদের প্রতি কি তোমরা যথেষ্ট উদার ব্যবহার করছ না?

কল্যাণ অবাক হয়েছিল।

মানে, আমি বলছিলাম কি, খেতে-খেতে শিবব্রত বলেছিলেন, ওদের নাকি অনেক কটা ইউনিয়ন হয়ে গেছে? আর ওরাও নাকি আজকাল আর আগের মত ভালো ব্যবহার করে না? ক্রমশ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে?

কল্যাণ বলল, উদারতার কথা নয় বাবা। এ-যুগটাই যে এমনি। সর্বদাই কারণে-অকারণে রেগে আছে। আন্‌রেস্ট-হুলিগানিজম লেগেই আছে। ইন-ডিসিপ্লিন্ ইন্‌সাবর্ডিনেশন তুমি কল্পনাও করতে পার না। দরাজ হাতে ঢেলেই কি এর মীমাংসা হবে?

শুনতে শুনতে তিনি চুপ করে গিয়েছিলেন।

আজ চাঁদ-গলা রূপালী জ্যোৎস্না-ভরা রাত্রে কুলী-বস্তির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে আপনমনে তিনি অতীতের কথা ভেবে উঠলেন। কত-দূরেই বা ফেলে এলেন সেইসব দিন-গুলিকে। সেই ইংরাজ আমলের কাল। গ্রাম থেকে পালিয়ে প্রথম ডুয়ার্সে এলেন। কলকাতায় কিছুদিন কাটিয়ে। কে আসে তখন এখানে। কিন্তু একটা যেমন-তেমন চাকরির ব্যবস্থা তাঁর চাই-ই। তারপর দেশ থেকে আনবেন মা-কে।

চাকরি জুটল অবশ্য। রেনী সাহেবের কাছে গিয়েছিলেন ভয়ে ভয়ে কাজ করতে। হয়ে গেল। আসগর সাহেব ছিলেন রেনী সাহেবের বিশ্বস্ত কর্মচারী। আসগর আলী মিঞা। তাঁকে ছোট ভাইয়ের মত ভালবাসতেন। তিনি না দেখলে সে-দিনগুলিতে বাঁচাই কঠিন হত। ভাই বল বন্ধু বল শুভার্থী বল সবই ছিলেন আসগর আলী সাহেব। কুড়িগ্রাম না গাইবান্ধায় ছিল বাড়ি। বিয়ে-থা করেন নি। থাকবার মধ্যে ছিল এক ভাই-পো আর তার বৌ। তাদের নামে টাকা পাঠাতেন। কিন্তু কোনদিন যেতেন না কোথাও। মুখে বলতেন, যাবো কোথায় রে পাগল? আছেটা কে আমার, যার কাছে গিয়ে ক'টা দিন জুড়োবো?

কেন? ওই যে আপনার ভাই-পো না কে আছে?

দূরে দূরে! তারা কেন আশ্রয় দেবে জংলী চাচাকে? বলে হাসতেন। বলতেন, আমার এই জঙ্গলই ভালো। দেখিস্ না কি রকম জঙ্গল? তাছাড়া আমাকে দু সেকেন্ড না-দেখলে যে রেনী সাহেব দু চোখে অন্ধকার দেখবে! বুঝলি সাহেবের ওই যে ঘোড়া আর আমি তার মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা লাগিয়ে দিলে দেখবি কে ভালো বাহন?

আজো মনে পড়ে সেইসব কথা। সত্যি, আসগর আলী না থাকলে তিনি থাকতেই পারতেন না সেখানে। সে কী এই আজকের ডুয়ার্স! ডুয়ার্স তখন দুঃস্বপ্ন। জলা-জংলা, ভয়ংকর বাদাবন। হোগলা আর কাশিয়ার রাজত্ব। জঙ্গলের মধ্যে ভয়ংকর বাঘের দাপট। মানুষ-জন নেই। নিরাপত্তা নেই একবিন্দু। সন্ধ্যা হবার অনেক আগেই ফুরিয়ে যেত বেলা। বনের সীমা পেরিয়ে আলো ভিতরেই আসতে পথ পেত না। এক-ধার অসাবধান হলে আর রক্ষে নেই। কুলী বস্তি থেকে তো হামেশা গরু, বাছুর, মানুষজনকে বাঘে লুফে নিয়ে যেত। সারারাত্রি ক্যানেস্তারা বাজিয়ে আগুন জ্বালিয়ে রেখে ভয়ে-ভয়ে বাঁচতে হত। রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুম আসত না। শিউরে উঠতেন থেকে থেকে। ভয়ংকর বাঘের গর্জনে আঁৎকে উঠত শরীরের রোমকূপগুলি।

তাছাড়া ছিল ভয়ংকর জঙ্গলে মশা। মশার কী দাপট! সে যে কী মশা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। আজ সেইসব উপকথা হয়ে গেছে। গত যুগের কথা। কেউ বিশ্বাসই করতে চাইবে না হয়তো।

জানালার দিকে তাকিয়ে দেখছেন শিবব্রত আজ নতুনযুগের কুলী বস্তি। করোগেট টিনের চাল চকচক্ করছে রূপলী জ্যোৎস্নায়। এই তো তাঁর সামনেই নিয়ন লাইটের আলো পিছলে পড়েছে চকচকে রাস্তায়। এ্যাসফল্টের বাঁধানো রাস্তা। দুধারে কাঁটাতারের বেড়া। সমান ও স্বচ্ছন্দ সমান্তরাল চা-বাগানের সারি। যতদূরে চোখ চলে জ্বলছে নীলচে রঙের নকল চাঁদের আলোগুলি। ওদিকে ঝক্‌ঝক্ করছে পাওয়ার হাউসের ডাইনামো। এটা চা-তৈরির সীজন। ওদিকে শিশুদের জন্য ক্রীজ। মস্ত লম্বা সাদা দালান চলে গেছে ওদিকে। লম্বা হলঘরের মত। দক্ষিণে ও পশ্চিমে হাসপাতাল। সারি সারি পামগাছগুলি দাঁড়িয়ে আছে। ডাক্তার নার্স।

নতুন যুগের ব্যস্ততা চারদিকে। রাত্রি হলেও সভ্য পৃথিবীর প্রাণের সাড়া উপলব্ধি করতে অসুবিধে হয় না। মানুষ এসেছিল একদিন অসহায় হয়ে এই পৃথিবীতে। পর্বতে-প্রান্তরে নিরাশ্রয়। বনে-জঙ্গলে। অতিকায় জীব-জন্তুদের হাতে প্রতি পদে পদে তাদের জীবন ছিল অনিশ্চিত। গুহায় কাটাতে হত। খোলা মাঠে কাটাতো। কিন্তু সেই মানুষই কনিষ্ঠ হয়ে এসে সমস্ত পৃথিবী জয় করল। আজ পৃথিবী শাসন করছে মানুষ। মানুষের চাইতে বড়ো কিছু নেই। মানুষই ভগবান। দুর্ধর্ষ শক্তিধর। ডুয়ার্সের এই প্রান্তেও তার প্রমাণ সর্বত্র। যেদিকে তাকাও মাল মেটেলি নাগ্রাকাটা, ধূপগুড়ি, মাদারিহাট, কালচিনি, কুমারগ্রাম, ময়না-গুড়ি, আলিপুরদুয়ার—সারা ডুয়ার্স জুড়ে আজ গড়ে উঠেছে নতুন নতুন রাস্তাঘাট, বাজার-বন্দর। লোকালয়, ইস্কুল, কাছারি কত কি। সেদিন কিন্তু কিছুই ছিল না। চারদিকেই ত্রাস। অনিশ্চয়তা পদে পদে।

বয়সে ছিলেন তরুণ। তাই সেদিন সেসব অসম্ভবকে সয়েছেন প্রাণপণে। মশার কথা আগেই বলেছি। ভাবতেও হৃৎকম্প হয়। ডুয়ার্সের সেই ভয়ংকর গোটা গোটা রয়্যাল-সংস্করণের মশা।

চিন্তামণি সান্যালের গল্প মনে পড়ে। কিছুদিন ছিলেন রেনী সাহেবের বাগানে। পরে অ্যাসিস্টান্ট ম্যানেজার হয়ে চলে যান আসামে। কিন্তু সে তো পরের কথা। থাকতেন মেসে। আরেক-জন বরিশালের লোক ছিলেন ও-দিককার ঘরে। সকালে একদিন উপস্থিত আস-গর সাহেবের ওখানে। আসগর বললেন, তোমার গল্পটা একে শোনাও দেখি ভায়া।

শোনো নি নাকি? তাহলে শোনো গল্প।

চিন্তামণি সান্যাল তৎক্ষণি প্রস্তুত। ক্যাম্বিসের চেয়ারটায় বসতে বসতে বললেন, একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে নিজেকে দেখে খুব তাজা আর তাগড়াই মনে হচ্ছে। কী ব্যাপার? রাতারাতি এত ভালো হয়ে গেল স্বাস্থ্য? হাঁটতে যাই জুতোয় পা ঢোকে না। জামার পকেটে শলাই-বিড়ি খুঁজব তা হাতই ঢুকছে না। ব্যাপার কি বাপু? পকেটের চাইতে হাত মোটা হয়ে গেছে। সে যাই হোক, অনেক কষ্টে শলাই-বিড়ি তো বার করলাম, টিউবওয়েলে হাত-মুখ ধুতে যাব। লে শালা। গেছি দরজায় আটকিয়ে।

বলেন কী! গম্ভীর গলায় গল্প শুনতে শুনতে স্তম্ভিত হয়ে গেছি।

অবস্থাটা শোনো একবার। বলি কী সেটা পরে বিচার করবে। দরজার গেছি আটকে। অর্থাৎ কি না দরজার ফ্রেমের সঙ্গে একেবারে হাতে-বহরে টাইট। ছট্‌ফট্ করছি। না-পারি এদিকে যেতে না-ওদিকে। এইভাবে গোটা দশটা বেলা নাগাদ আটকে থাকলাম। ডাকতেও পারি না কাউকে। শেষে পাশের ঘরের নেত্যদা ঘুম থেকে উঠে আমার ওই দৃশ্য দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। তার দোষ কী। আমাকে চিনতে পারলে তো বাঁচাবার জন্যে এগোবে। শেষে আমি করুণ গলায় চেঁচিয়ে উঠতে সেই কুড়োল নিয়ে দরজার কাঠ চ্যালা করে তবে আমাকে বাঁচালো! বুঝতে পার একবার ব্যাপারখানা?

খুব বুঝতে পারছি। ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে। বললাম, হয়েছিল কি এখন বলুন দয়া করে চিন্তামণিদা।'

চিন্তামণিদা বললেন, হাঁদারাম। আছো ডুয়ার্সে, আর এই কথাটা ধরতে পারলে না ভাই। মশা, মশা। সারারাত ছেঁড়া মশারির ফুটো দিয়ে ভেতরে ঢুকে কামড়ে একরাত্রেই আমাকে মোটা করে দিয়েছিল। বুঝতে পেরে তখন আমিও হাসি। সেই সঙ্গে আসগর সাহেব এবং উনিও।

বাস্তবিক ভয়ানক মশা ছিল ডুয়ার্সে। আর তাদের দংশনে কী জ্বালা! ওই যে কী বলেছে, সে-দংশনে আর যাই থাকুক স্বেদ-কম্প ইত্যাদি বিভূতি হত না।

আর সেই সঙ্গে বৃষ্টি বৃষ্টি! রাতদিন বৃষ্টি। আকাশ ভাসিয়ে পৃথিবী যেন ডুবিয়ে-ছাপিয়ে একাকার করে দিয়ে নামছে বৃষ্টির ধারা। সে বৃষ্টির আর বিরাম নেই। আরম্ভ হল তো একনাগাড়ে চলল মাসের পর মাস। পৃথিবী অন্ধকার। দুনিয়া আছে কী নেই বুঝবার সাধ্য নেই। মশার ক্রমাগত গুঞ্জন এবং দংশনের মধ্যে ভয়ে ভয়ে কেরোসিনের লণ্ঠন জ্বালিয়ে মশারির মধ্যে শুয়ে শুয়ে ফাইলপত্র দেখতে হয়েছে কতদিন। রাত্রি জেগে কাজ করছেন। আবার দিনের বেলা অফুরন্ত বর্ষণ তুচ্ছ করে তার মধ্যে কাজ করতে হয়েছে তাদের। নতুন আবাদ বসছে। সাহেব নিজেও আসতেন তাদের সঙ্গে। একান্ত তেজিয়াল ঘোড়াটা বেঁধে রাখতেন কোন একটা গাছের ডালে। নিজে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাগান দেখতেন। কাজ দেখতেন।

কী উল্লাসই যে ছিল তখন। কাজকে কাজ বলে মনে হয় নি।

চলে গেল চাকরির দিনগুলি। তার পর নিজের হাতে নতুন বাগানের পত্তন। সাহেবরা বাঙালীবাবুদের খাস জমি দিতে চান না। যদিও সাহেবদের বেলা মুক্তহস্ত। কিন্তু তাঁরা ক্ষেপে গিয়েছিলেন। নিজেদের বাগান কর-বেনই করবেন। কত উৎসাহ কত

আনন্দ। দেশীয়তার জাতীয়তার প্রবল চেতনা এসে গেছে তখন দেশে।

মনে মনে সেই দিনগুলি ভাবেন শিবব্রত। ভাবেন তাঁদের আমলের ডুয়ার্সের কথা। বদলে গিয়েছে ডুয়ার্স। অপরিচিতা রহস্যাবগুণ্ঠন অনাবৃত করেছে আজ। কত নিশ্চিন্ত। কত কাজ করবার আছে। আরো নতুন উদ্যমে।

একটা নিশ্বাস ফেললেন শিবব্রত। হঠাৎ তাঁর অজ্ঞাতেই বুঝি ফেললেন। রাতে শুয়ে ঘুম আসে না আজ। তাঁদের দিন ফুরিয়ে গেল। এখন আব কত-দিনই বা বাঁচবেন। চোখের সামনে এখনো আছে আকাশের আলো। ওই তো পাখিটা আবার শিস্ দিয়ে উঠছে। অদ্ভুত পাখিব ডাক! বুকের ভেতরে কেমন ছ্যাঁত করে উঠল। সব ভুলে গেলেন শিবব্রত। এক মুহূর্তে। হঠাৎ মনে হল এটা বসন্ত। ডুয়ার্সে এসে পড়েছে চির পরিচিত বসন্তকাল। কতকাল বার হন নি যেন ঘর থেকে। বাইরে বেরিয়ে দেখেন নি চারদিকে। কোথায় ডাকছে পাখিটা? বসে বসে দ্বিতীয় ডাকের অপেক্ষা করতে লাগলেন।

[ক্রমশ]

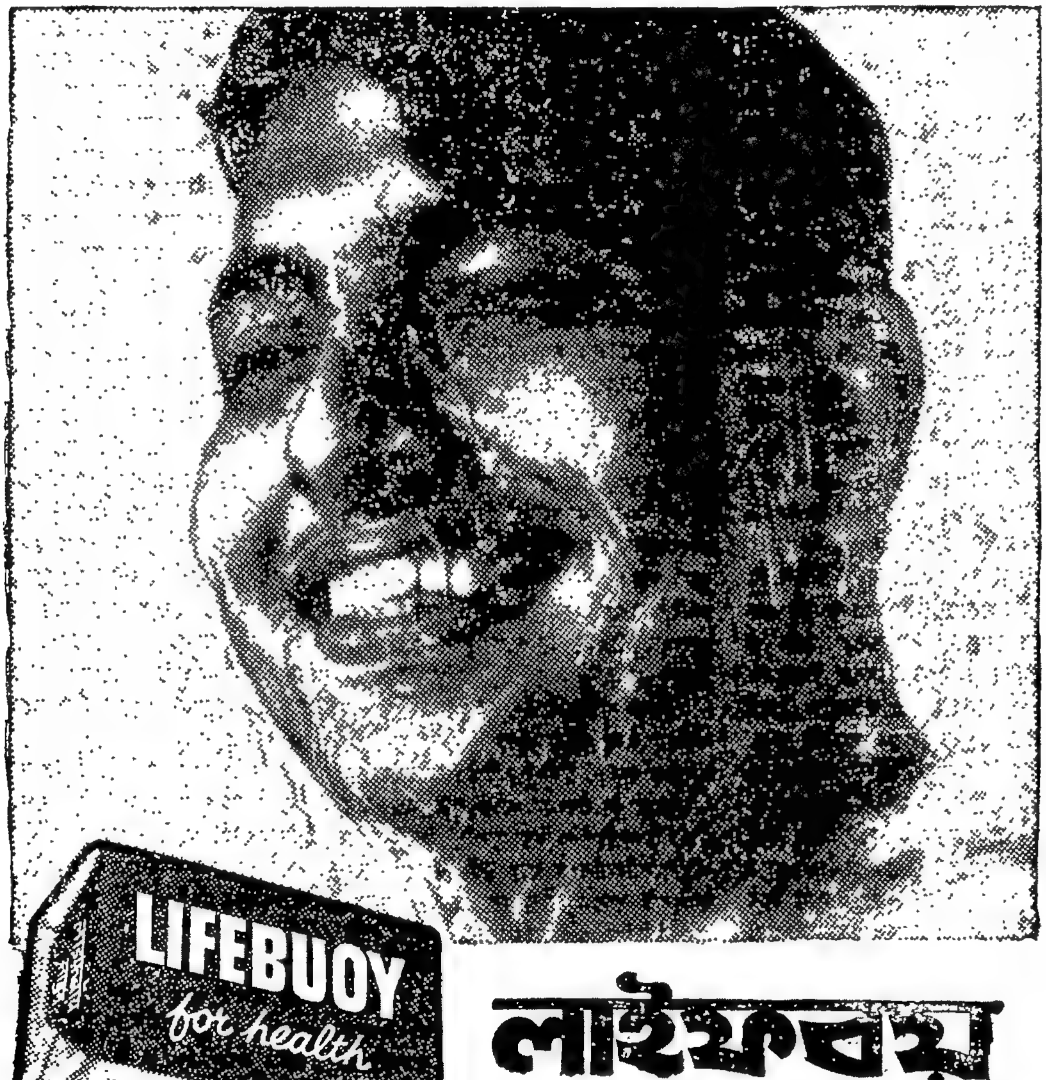

লাইফবয়
যেখানে
স্বাস্থ্যও সেখানে

লাইফবয় মেখে স্নান করলেই তাজা ঝরঝরে হবেন। এই চমৎকার সুস্থ পরিচ্ছন্ন ভাব থেকেই বুঝবেন ভাল সাবানের সবকিছু গুণ তো আছেই লাইফবয়ে, তারচেয়ে বেশীও কী যেন আছে!

লাইফবয় ধুলোময়লার রোগবীজাণু ধুয়ে দেয়

হিন্দুস্থান লিভারের তৈরী

L. 51-140

সুন্দরবন উন্নয়ন পরিকল্পনা : কয়েকটি প্রস্তাব

মাখনলাল ঘোষ

চব্বিশ পরগনা জেলার সুন্দরবন অঞ্চলকে 'আবাদ' অঞ্চলও বলা হয়। শহরের লোকদের মনে এই সুন্দরবন সম্বন্ধে একটি অহেতুক ভীতি রয়েছে। এখানকার অধিবাসীকে তাঁরা জংলী ও অশিক্ষিত মনে করেন। অথচ এই সুন্দরবন অঞ্চলের জমিতে রেকর্ড পরিমাণ ধান উৎপন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গের শস্যভাণ্ডারও বলা চলে। তাছাড়া খুব কম লোকই খুঁজে পাওয়া যাবে, যে এখানকার মাছ খায় নি বা খাবার জন্য লালায়িত নয়। এহেন সুন্দরবন অঞ্চলের উন্নতির জন্য কোন সার্বিক পরিকল্পনা আজ পর্যন্ত হয় নি।

সুন্দরবন উন্নয়নের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার ৭৫ কোটি টাকা ব্যয়ের এক পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছেন। বাঁধ ও রাস্তা নির্মাণ এবং চাষাবাদের উন্নয়নের জন্য এই পরিকল্পনা করা হয়েছে। রাজ্য উন্নয়ন দপ্তর কর্তৃক বিমান সমীক্ষা করে বিস্তারিত পরিকল্পনাটি চতুর্থ যোজনায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য রাষ্ট্রপতির শাসনকালে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পেশ করা হয়েছিল। আপাতত ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে এই পরিকল্পনার কাজ শুরু করা হবে বলে সরকারী মহলে আশা প্রকাশ করা হয়েছিল। এই পরিকল্পনা কার্যকরী হলে এই এলাকায় প্রায় ১ লাখ ২৫ হাজার একর জমিতে চাষাবাদের উন্নতি হবে।

সরকার গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিষয়ের (বাঁধ, রাস্তা, কৃষি) উপরই জোর দিয়েছেন। তাই, আমি, কয়েকটি নতুন প্রস্তাব সহ ঐ তিনটি বিষয়ের উপর মোটামুটি আলোচনা করবো।

সুন্দরবন মূলত কৃষিপ্রধান অঞ্চল। অথচ কৃষিঋণ, উন্নত সার, বীজ প্রভৃতি চাষের অপরিহার্য জিনিসপত্র সরবরাহের ব্যাপারে সরকারী ঔদাসীন্য কৃষিজীবীদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করেছে। সরকারী কৃষি-বিভাগ প্রচারের ত্রুটি করেন না, কিন্তু সময়োচিত সাহায্যের প্রত্যাশা তাঁদের কাছ থেকেও নিষ্ফল হয়ে ফিরে আসে। প্রাচীর বিলম্বিত বিজ্ঞাপনের রঙের খেলায় সরকারী সহায়তার সদম্ভ ঘোষণা বাস্তব ক্ষেত্রে কৃষকের কাছে কল্পনার বস্তুই থেকে যায়।

সরকারী কৃষিঋণ ঠিকমতো যারা পায় না এবং যারা একেবারেই পায় না, তারা বাধ্য হয় মহাজনের শ্বারস্থ হতে। এই সব মহাজনরা উচ্চ সুদের হারে ঋণদান করে এবং চক্রবৃদ্ধি হারে কৃষকদের কাছে পাওনা আদায় করে। কিন্তু চক্রবৃদ্ধি হারে কৃষক তার ঋণ শোধ করতে পারে না। শেষে মহাজনের সিন্দুকে চাষীর জোতজমি, ঘর-বাড়ি, ঘটি-বাটি সব বিক্রি হয়ে যায়। তাই দিন দিন ভূমিহীন চাষীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। তাই এদের অবস্থার উন্নতি না-হলে কৃষিরও উন্নতি সম্ভব নয়।

বিংশ শতাব্দীতেও কৃষককে জমি চাষ করবার জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয়। কিন্তু বৃষ্টির অভাবে চাষ না হবার যে বেদনা কৃষক ছাড়া তা আর কেউ উপলব্ধি করতে পারবে না। যাঁরা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে শুধু পরিকল্পনাই করেন তাঁরা সুন্দরবনের কৃষকদের অবস্থা ও মনোবেদনা কোনদিনই বুঝতে পারবেন না। এখানে নদী থেকে জলসেচের কোন সম্ভাবনাই নেই. কেন না এখানকার নদীর জল লোনা, তাই এখানে জলসেচের জন্য গভীর নলকূপের প্রয়োজন। সুন্দরবনের দুর্ভাগ্য যে; রাজ্য সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ৪০ হাজার অগভীর নলকূপের একটিও এদিকে পড়ে নি। যদি এখানে ব্যাপকভাবে গভীর নলকূপ বসানো হয়, তবে হাজার হাজার বিঘা (উঁচু)-জমিতে জলসেচ করে অধিক ফসল ফলানো যেতে পারে। এর চেয়েও বড় কথা অনাবৃষ্টির ফলে শস্য না হওয়ার ভয় থাকবে না।

সুন্দরবন অঞ্চলের দ্রুত উন্নয়ন যে পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক উন্নতি ও স্থানীয় অধিবাসীদের স্বাচ্ছন্দ্য ও কল্যাণের জন্য আবশ্যক, সে কথা কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার উপলব্ধি করলেও সুন্দরবনের উন্নতির জন্য এযাবৎ যা করা হয়েছে, তা একান্তভাবেই তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর।

পর পর তিনটে পরিকল্পনায় চব্বিশ পরগনা জেলার এই বিশাল দক্ষিণ অঞ্চলে যথাক্রমে ৮৬ মাইল, ১৬৭ মাইল ও মাত্র ২৬ মাইল রাস্তা নির্মিত হয়েছে, যা প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। এমন অভিযোগও উঠেছিল যে, কয়েকটি রাস্তা নির্মাণের কাজ প্রয়োজনের গুরুত্বের সঙ্গে তাল রেখে অগ্রসর হয় নি। এছাড়া টাকী-আড়বেলিয়া রোডে একটি সেতু নির্মাণের কাজ শেষ হতে ৮ বছর সময় লেগেছে, ফ্রেজারগঞ্জ-নামখানা রোডের একটি সেতু স্বাভাবিক অবস্থান থেকে সরে গেছে। এমন অভিযোগও করা হয়েছে যে, প্রকল্পের অভাবে (!) তিনটি পরিকল্পনাকালে সুন্দরবনের জন্য বরাদ্দ অর্থের বহু অংশ ব্যয় করা সম্ভব হয় নি।

এখানে রাস্তার যে কত অভাব তার প্রমাণ মিলবে মধ্যবর্তী নির্বাচনের তারিখ পিছানোর মধ্য দিয়ে। পক্ষ সমর্থকরা অভিযোগ তুলেছেন যে, সুন্দরবন অঞ্চলের ভোটারদের পক্ষে নভেম্বরে ভোট দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ ঐ সময়ে এখানকার অধিকাংশ রাস্তা জলে ডুবে থাকে এবং অন্যান্য রাস্তায় কাদা থাকে। এতদ্ব্যতীত এখানকার এক গ্রাম থেকে আর এক গ্রামের মধ্যে বেশির ভাগই যোগাযোগ অর্থাৎ যাতায়াতের মাধ্যম ধানক্ষেত। তাই এই সুন্দরবন অঞ্চলে যেমন আরও নতুন নতুন (পাকা)-রাস্তা তৈরি করা দরকার, তেমনি দরকার পুরাতন রাস্তাগুলি সংস্কার করা ও পাকা করা।

এখানকার নদীবাঁধের উপরেই মূলত সুন্দরবনের চাষাবাদ নির্ভর করে। অথচ এখানকার নদী থেকে কৃষিজমিতে জলসেচের কোন সম্ভাবনাই নেই. কেন না এখানকার নদীর জল লোনা। তাই নদীবাঁধ ভেঙে লোনাজলের একবার অনুপ্রবেশ ঘটলে তিন বছরের জন্য চাষের দফা রফা। এই জন্যই সুন্দরবনের কৃষকদের এই ২২ হাজার মাইল দীর্ঘ নদীবাঁধের দিকে সব সময় লক্ষ্য রাখতে হয়। কিন্তু তাদের করার কিছু নেই—সেচবিভাগের উপরেই এর দায়িত্ব রয়েছে।

অথচ সুন্দরবন পশ্চিমবাংলার শস্যভাণ্ডার। এ-এলাকায় সোনা ফলে অতি সহজে। শুধু ধান নয়, সুন্দরবন সরবরাহ করে কলকাতার বাজারে নিত্য নতুন শাকসব্জী ও তরিতরকারী। কিন্তু আমাদের কৃষি দপ্তরের কৃপায় সুন্দরবনই সব চাইতে অবহেলিত। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় সামান্য সাফল্য লাভের পর থেকে আত্মপ্রসাদে এ-দপ্তরের কর্মকর্তারা একেবারে মশগুল হয়ে আছেন। কাজ

আর কোন দিক দিয়েই অগ্রসর হচ্ছে না আশানুরূপ গতিতে। রাজ্যের অপরাপর অংশের চাষীদের মতই সুন্দরবনের চাষীরা মান্ধাতার আমলের লাঙল সম্বল করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে যেটুকু শস্য উৎপাদন করে, তাও সেচ দপ্তরের ঔদাসীন্যে ভেসে যায় বাঁধ ভাঙা জোয়ারের জলে। প্রতি বছরই কোন-না-কোন এলাকায় নদী-বাঁধ ভেঙে শস্যহানি হয়ে যাওয়ার ঘটনা যেন চিরাচরিত প্রথা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পূর্ববঙ্গের পদ্মানদীর মত এখানকার নদীগুলির পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহ রাতারাতি ব্যাপকভাবে ফাটলের সৃষ্টি হয়ে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায় না। এখানকার নদীবাঁধ লোনাজলের দাপটে ক্রমান্বয়ে ক্ষয় হয়ে জীর্ণ-শীর্ণ হয়, পরে মেরামতির অভাবে ভেঙে বা ধ্বসে প্লাবন ঘটায়। বর্তমানে বাঁধে যে মাটি দেওয়া হয়ে থাকে তা বর্ষাকাল ছাড়া অন্য সময় দেওয়া হয় না।

সুন্দরবনবাসীদের মতে, জমিদার আমলের মত যদি শীতকালে নতুন ফসল উঠে যাবার পরেই বাঁধ মেরামতির ব্যবস্থা হয় তাহলে বাঁধও সুদৃঢ় হয় ও নানাভাবে সরকারী অর্থেরও অপচয় হয় না। অভিযোগ উঠলে ভিজিলেন্স কর্তাব্যক্তিদের পক্ষে মাটি কাটার চৌকাগুলো পরিমাপ করাব পক্ষে সুবিধা হবে। সবচেয়ে ভাল হয়, যদি প্রত্যেক বছর অল্প অল্প করে সমস্ত বাঁধকে পাকা করে ফেলা যায়।

অনেকের মতে, এই বাঁধ মেরামতির জন্য সমবায় সমিতিকে (শ্রম) কাজে লাগানো যেতে পারে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় যে সমস্ত রেজেস্ট্রিকৃত শ্রম সমবায় সমিতি রয়েছে, সেগুলিকে ঠিকাদার তালিকাভুক্ত করে সরকাবের নির্ধারিত টাকাব টেন্ডার দেওয়া যেতে পারে। তাতে নদীবাঁধ মেরামতির কাজ ভালই হবে।

সুন্দববনে হাজার হাজাব বর্গাদার কৃষক ও ভূমিহীন কৃষক (যাবা ক্ষেতমজুর নামেও পরিচিত) রয়েছে। এরা বছবে মাত্র ৫/৬ মাস কাজ করে বা কাজ পায়, বাকি ৬/৭ মাস তারা বেকার জীবন কাটায়—কাটাতে বাধ্য হয়। তাই তাদের আর্থিক সমস্যাটাই বড হয়ে দেখা দেয়। তাই এদেব আয়বৃদ্ধিব জন্য প্রয়োজন গ্রামের ধ্বংসপ্রাপ্ত কুটিরশিল্পেব পুনরুজ্জীবন ও নতুন শিল্পেব প্রবর্তন কবা। যাতে তারা সেখানে অবসর সময়ে নিজেকে নিয়োগ কবে কিছু উপার্জন করতে পাবে। যেখানে মানুষ সংখ্যায় বহু, সে দেশে মানুষের কর্মসংস্থানেব জন্য প্রয়োজন হয এমন শিল্প যে-শিল্পে যন্ত্র তেমন এগোতে পারে নি।

ক্ষুদ্র বা কুটিরশিল্পের জন্য বৃহৎ যন্ত্র বা বেশি মূলধনের প্রয়োজন নেই। বিদ্যুতের প্রয়োজনও অল্প ক্ষেত্রেই হয়। কিন্তু স্বাধীনতার বিশ বছর পরেও আমরা গ্রামকে আলোকিত করতে পারি নি। মাদ্রাজের কথা তো বাদ দিলাম, এ বিষয়ে পার্শ্ববর্তী রাজ্য বিহার থেকেও আমরা পিছিয়ে। সুন্দরবন তো আরো অন্ধকারে।

অথচ সুন্দরবন অঞ্চল ক্ষুদ্র এবং কুটিরশিল্প গড়ে তোলার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। সুন্দরবন অঞ্চল যখন কৃষি (ধান) অঞ্চল তখন এখানে একটি প্যাকিং কাগজ তৈরির কেন্দ্র খোলা যেতে পারে। কেন না প্যাকিং কাগজ তৈরি করতে খড়ের প্রয়োজন হয়। এখানে বাঁশের অন্তহীন প্রাচুর্য এবং অল্পবিস্তর পাট চাষও হয়ে থাকে। সুতরাং এই বাঁশ ও পাটকাঠি থেকেও যে কাগজ তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাও কাজে লাগান যেতে পারে। এই ব্যাপারে প্রফুল্লচন্দ্র সেনের মন্ত্রিত্বকালে একটি পরিকল্পনা করা হয়েছিল। ঠিক হয়েছিল, পশ্চিমবঙ্গ খাদি ও গ্রামীণ শিল্প পরিষদের তত্ত্বাবধানে শীঘ্রই সুন্দরবনে একটি প্যাকিং কাগজ তৈরির কেন্দ্র খোলা হবে। মূল পরিকল্পনাটি ছিল ১৪ লক্ষ ৮২ হাজার টাকার। বোম্বাইতে কেন্দ্রীয় খাদি ও গ্রামীণ শিল্প কমিশন তাকে কলমের এক খোঁচায় কেটে দিয়ে ১ লক্ষ ২২ হাজার টাকা মাত্র মঞ্জুর করেছিলেন। তবে, কাজ চালু হলে ভবিষ্যতে আরও টাকা মঞ্জুরীর প্রতিশ্রুতি কমিশনের কাছ থেকে পাওয়া গিয়েছিল। মূল পরিকল্পনা অনুযায়ী তখন ধাপে ধাপে টাকার অঙ্ক বাড়িয়ে কেন্দ্রটির কলেবর বৃদ্ধি করা হবে। আপাতত ৬০ জন স্থানীয় বাসিন্দাকে কাজে নিয়োগ করা হবে বলেও ঠিক হয়েছিল। কিন্তু ১৯৬৮ সালেও তা কাজে পরিণত হতে পারলো না।

সুন্দরবন অঞ্চলে প্রায় ৮০০ বর্গ-মাইলে যে জঙ্গল আছে তাব একটি বিরাট অংশকে 'নিউজ প্রিন্ট' কাগজ উৎপাদনেব কাজে লাগানো যেতে পারে। এতে অন্তত ৩০০ লক্ষ টন কাঁচামাল উৎপাদন করা সম্ভব।

লবণে এখনও এ-রাজ্য ঘাটতি এলাকা। এই সুন্দরবনেব নদীব তীবে লবণেব কারখানা খোলা যেতে পাবে। শতবর্ষ পূর্বে এখানে ব্যাপকভাবে লবণ তৈরি হত এখানকারই নদী থেকে। তখন একশ্রেণীর অধিবাসীদের বলা হত মালঙ্গী, কারণ এদের একমাত্র জীবিকা ছিল লবণ প্রস্তুত করা। এতদ্ব্যতীত এখানে জল-বিদ্যুতের কাবখানা গড়ে তোলবারও সম্ভাবনা রয়েছে। জোয়ারের সময় বঙ্গোপ-সাগবের যে জলস্ফীতি হয় তাব থেকে জলবিদ্যুৎ সংগ্রহ কবা সম্ভব। যখন, লবণ ও বিদ্যুৎ—দুটোই—পশ্চিমবাংলাব পক্ষে অত্যধিক প্রয়োজন।

আর একটি প্রস্তাব করা যেতে পারে যে, গ্রামাঞ্চলে জি আর প্রভৃতি নামে নানা সময়ে গ্রামের গরীবদের (?) যে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়ে থাকে, সেই টাকা এক বছর (পরীক্ষামূলকভাবে) গ্রামের গরীবদের না দিয়ে সেই টাকায় এখানে যে কোন কুটির বা ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে অথবা শিল্পে নিয়োগ করা যেতে পারে। কেন না "দানের দ্বারা দারিদ্র্য দূর হয় না, বরঞ্চ তা' পাকা হয়ে ওঠে।" (রবীন্দ্রনাথ)। অথচ সুন্দরবনে ধনীর সংখ্যা কম নেই। কিন্তু এখানকার ধনীরা দারিদ্র্য পাকা করে রাখতে চায়, যাতে সেই পাকা পথে তাদের সমৃদ্ধির রথ গড়গড় করে চলতে পারে। দারিদ্র্যই যদি না ঘুচলো, তবে কিসের গণতন্ত্র আর কিসের স্বাধীনতা?

তাই আমাদের দেশের গণতন্ত্রের সব-চেয়ে বড় বিপদ হল গ্রামের ক্ষুদ্র, দরিদ্র ও মেহনতী মানুষের হতাশা। যেখানে আমাদের প্রকৃত বাংলাদেশ তথা ভারতবর্ষ বাস করে, সেই গ্রামই রয়েছে আজও অবহেলিত।

সুন্দরবন অঞ্চলে 'সুন্দরবন উন্নয়ন বোর্ড' নামে একটি সংস্থা আছে। কিন্তু ঐ বোর্ডের কাজকর্ম গত দু' বছর ধরে একরকম বন্ধ আছে, তার ফলে সুন্দবনের সামগ্রিক উন্নয়নও ব্যাহত হচ্ছে। এমন কি সুন্দরবনে কৃষিভিত্তিক শিল্প তৈরির যে-সব প্রকল্প হয়েছিল সেগুলি পর্যন্ত ধামা চাপা পড়ে রয়েছে।

প্রকাশ, সুন্দরবন উন্নয়ন বোর্ডের নাকি গত তিন বৎসবে একটি বৈঠকও ডাকা হয় নি। যুক্তফ্রন্টেব শাসনকালে (১৯৬৭ সালে) সুন্দবন উন্নয়ন বোর্ডের পুনর্বিন্যাসের প্রস্তাব উঠেছিল। কিন্তু তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় এ-সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেন নি। পি ডি এফ-কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা চলাকালীন সুন্দরবন উন্নযন বোর্ডকে পুনর্জীবিত করার আবার প্রস্তাব হয়, কিন্তু তা কাজে পরিণত হয নি।

এব পরে রাজ্যপাল শ্রীধর্মবীরের কাছে এই বোর্ডকে পুনর্গঠিত করার জন্য আবার প্রস্তাব গিয়েছিল। প্রস্তাবক ২৪ পরগনার প্রশাসন কর্তৃপক্ষ। সুন্দরবন উন্নয়ন বোর্ড এ-পর্যন্ত যে যে প্রকল্পগুলি সুপারিশ করেছিলেন, সেগুলি হল,—(ক) ব্যাপকহারে নারিকেল গাছ রোপণ, (খ) সুপারি চাষের উন্নয়ন, (গ) মৎস্য চাষ, (ঘ) কৃত্রিম শিল্পের উন্নয়ন ও বিদ্যুৎশক্তির উন্নয়ন।

সুন্দববনে গত কয়েক বৎসরে প্রায় তিন লক্ষ নারিকেল চারা রোপণ করা হয়। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে শতকরা ৯৫ ভাগ নারিকেল চারাই বেঁচেছে। সুপারি-গাছ বেঁচেছে শতকরা ৮০ ভাগ। সুতরাং

সুন্দরবনের মাটি যে এই চাষের উপযোগী তা প্রমাণিত হল। শুধু তাই নয়, ইজরায়েলের একটি প্রতিষ্ঠান নাকি সুন্দরবন থেকে ২০০ টন করে নারিকেল কিনতে রাজীও হয়েছে।

কিন্তু সুন্দরবন উন্নয়ন বোর্ড—যারা সুন্দরবনের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের রূপরেখা রচনা করবেন—আইনত সেটি এখন বাতিল কমিটি। কারণ আইনত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এই বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন।

প্রাচীনকাল হতে ২৪ পরগনার অস্তিত্ব পাওয়া যায় পৌরাণিক কাহিনীতে। আজও প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষকদের ২৪ পরগনার প্রাগৈতিহাসিককালের সভ্যতা অনুসন্ধানের বিষয়বস্তু। সেই বিস্তৃত সভ্যতার ধারক এককালে এখান থেকে জাহাজে পাড়ি দিত আরব-লোহিত সাগরের দূর-দূরান্তের দেশগুলিতে। স্বাধীনোত্তরকালে আবার চেষ্টা চলেছে সেই গৌরবময় ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনবার। জেলার দক্ষিণ-প্রান্তে সুন্দরবন অঞ্চলে পড়ে আছে সে সম্ভাবনা। ক্যানিং-এর টৈলেক্প কি সে সম্ভাবনার প্রতীক নয়।

এবার সুন্দরবনের মৎস্য সম্পদ সম্পর্কে আলোচনা করব। পূর্বেই বলেছি, মাছের জন্য সুন্দরবন বিখ্যাত। সুন্দরবনের মাছের সুনাম আছে—তাজা, জ্যান্ত মাছ কলকাতার বাজারে যেতো এই সুন্দরবন থেকেই। এখনও অবশ্য যায়, কিন্তু পরিমাণে কম। তাই আজকাল এই সুন্দরবন এলাকার মানুষই মাছ খেতে পাচ্ছে না। বাঙালীর মাছ না হলে চলতে চায় না। আঁশটানি গন্ধ পেলেই লোভ সম্বরণ করা শক্ত হয়ে পড়ে।

সুন্দরবনের জেলেদের সমস্যা কৃষকদেরই মত। তারাও মাছ ধরার জন্য আড়তদার, অতি মুনাফালোভী পাইকারদের কাছ থেকে টাকা দাদন পেয়ে থাকে। ফলে জেলেরা তাদের সব মাছই এদের কাছে বিক্রি করতে বাধ্য থাকে। এর উপর রয়েছে মাছের 'ঘেরী' মালিকদের চক্রান্ত। এই ঘেরী মালিকরাই প্রফুল্ল সেনের মন্ত্রিত্বকালে মৎস্যমন্ত্রী ফজলুর রহমানকে একবার খেল দেখিয়েছিল। যখন মাছের দর বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। এখনও এদেরই কব্জায় সমস্ত মাছের বাজার। এই ঘেরীর মালিকরা বাজারে অল্প মাছ আমদানী করে কৃত্রিম অভাবের সৃষ্টি করে বেশি মুনাফার আশায়। তাছাড়া এরা আরও নানারকম দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে। তাই একবার দাবি উঠেছিল—সরকার মাছের ঘেরীগুলির মালিক হোন। এছাড়া এখানকার খালে, বিলে ও নদীনালাতে যে মাছ রয়েছে তা ধরে বাজারে পাঠাবার ব্যবস্থাটাও অন্তত সরকার করতে পারেন। জেলেদের সমবায় সমিতি গঠন করেই হোক অথবা অন্য কোন উপায়ে জেলেদের হাতে নৌকা, জাল ও কিছু টাকা দাদন দিলেই একাজ করা অসম্ভব হয় না। নতুবা আড়তদার ও পাইকারদের খপ্পর থেকে মাছ আসবে না। এরা সরকারের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে প্রতিদিন কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে চলেছে।

তবে আশার কথা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মৎস্য দপ্তর রাজ্যে মাছের চাষের উন্নতি এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এক ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী রাজ্যের বিভিন্ন স্থানের পতিত জলাভূমি, বিল, বাওড়, পুকুর এবং দীঘির উন্নয়ন ও পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। তা ছাড়া যে সব খাল সংস্কার করা সম্ভব, সেগুলিও সংস্কার করে মাছের চাষের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তাই সুন্দরবনের কয়েকটি স্থানে পরীক্ষামূলকভাবে গবেষণা করার কথা হয়েছে। সেহেতু একটি বিশেষজ্ঞ দল এ-ব্যাপারে সুন্দরবনের কয়েকটি অঞ্চলে আসছেন বলেও সংবাদ পাওয়া গেছে। এই দলটিতে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কয়েকজন প্রতিনিধি ও বিশেষজ্ঞ থাকবেন।

কিন্তু বরফের জন্যই প্রধানত জেলেরা (পক্ষান্তরে মৎস্য-ব্যবসায়ীরাও) সবচেয়ে বেশি মার খায়। জেলেদের গড়ে ২০/২২ মাইল জলপথ অতিক্রম করে বাজারে আসতে হয়। এতে সহজে পচনশীল মাছই পচে বেশি। উদাহরণ স্বরূপ ১৩৭১ সালের ইলিশ মাছের কথা বলা যেতে পারে। কল্পনায় যা কুলোয় না, বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে যা বিশ্বাস করা যায় না তাও ঘটে। ক্যানিং টাউনের মেছোহাটায় তেমনি অঘটনই ঘটেছিল। আমাদের মৎস্য দপ্তরের বড়কর্তাদের, অতি মুনাফালোভী পাইকার ও আড়তদারদের নোটিশ না দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে সমুদ্র থেকে ইলিশ মাছ উঠে এসে ধরা দিয়েছিল গোসাবা ও বাসন্তী অঞ্চলের জেলেদের জালে। পর্যাপ্ত বরফের অভাবে তাদের কলকাতার ঠাণ্ডাঘরে পাঠানো সম্ভব হয় নি। পচে উঠতেই আড়তদারেরা বাজারে ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। এবং ঐ মাছ বিক্রি হয়েছিল প্রতি কিলোগ্রাম ৬ থেকে ১০ পয়সা দরে। প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে নিজেও সেদিনের কথা কোনদিন ভুলতে পারব না।

সকলের ভোগে কিন্তু সেদিনের মাছ আসে নি। কলকাতার মানুষদের এক আনার ভোগেও আসে নি। হাঁক-ডাক কানে যেতেই স্থানীয় স্বাস্থ্য দপ্তরের পরিদর্শক গিয়ে হাজির হয়েছিলেন বাজারে। আশেপাশের বাড়ির আনাচে-কানাচে হানা দিয়ে পচা মাছ বের করে এনেছিলেন। তখনও আড়তে পচা মাছ ছিল প্রচুর। খবরে প্রকাশ, একশ' বিশ মণ পচা মাছ পরে নদীর চরে নিয়ে কেরোসিন সহযোগে পোড়াতে হয়েছে। ব্যবসায়ীদের মতে আরও বেশি। তাই রাজ্য সরকার সুন্দরবনের জেলেদের কথাটা একটু ভাবতে পারলে জেলেদেরও উদরের চিন্তা যেমন কিছুটা লাঘব হত, তেমনি কলকাতার মানুষ প্রাণভরে দুদিন দুটো মাছ খেতে পারতো।

তাই সুন্দরবনের জেলেদের ও মৎস্য-ব্যবসায়ীদের অনেক দিনের দাবি সুন্দরবনে বরফ-কল ও ঠাণ্ডাঘর প্রতিষ্ঠার। অবশ্য ঐ ইলিশ মাছের ঘটনার পর সরকারের কিছুটা চৈতন্যোদয় হয়েছিল এবং তারা এ-সম্বন্ধে প্রকল্পও রচনা করেছিলেন। তাই ক্যানিং-এ প্রায় ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি বরফ-কল ও হিমঘর স্থাপনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। ক্যানিং-এর হিমঘরে প্রতিদিন ১০ টন পর্যন্ত মাছ রাখার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এইটি নির্মিত হলে এখানকার জেলেদের অনেকদিনের অনেকগুলি দাবির মধ্যে অন্তত একটি পূরণ হবে। কিন্তু পরিকল্পনা করার কাল থেকে আজ পর্যন্ত অনেকদিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরেও আজও তা কার্যকরী হলো না।

সরকারের আর্থিক অসুবিধা থাকলে বনগাঁর মতো এখানেও সমবায়ের মাধ্যমে বরফ-কল ও হিমঘর স্থাপন করা যেতে পারে। সুন্দরবন অঞ্চলে বহু খাল, বিল, নালা অকেজো অবস্থায় পড়ে রয়েছে। অনেকের মতে, ঐগুলি সমবায় সমিতিকে বন্দোবস্ত দেবারও ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে এবং সরকার হতে উক্ত খাল-বিল-নালাগুলি সংস্কারের জন্য সমবায় সমিতিগুলিকে প্রয়োজনীয় স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেবার নীতি গ্রহণ করা যেতে পারে। এতদ্ব্যতীত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সভ্যদের জাল, নৌকা প্রভৃতি ক্রয় করবার জন্য সমিতির মাধ্যমে ব্যক্তিগত জামিনে ঋণ দেবার ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।

সুন্দরবন এলাকার বিরাট সম্ভাবনাকে কাজে লাগাবার জন্য রাজ্য সরকার আজ সচেতন হয়েছেন দেখে মনে আশা জাগছে। যা হোক, সমগ্র রাজ্যের কল্যাণের স্বার্থেই চির-উপেক্ষিত সুন্দরবন অঞ্চলের উন্নয়নের কাজ যথার্থ তৎপরতা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সুরু করা হবে, হিতব্রতী রাষ্ট্রের শাসকদের কাছে, জনগণের সরকার যুক্তফ্রন্টের কাছে এ-প্রত্যাশা আমরা—সুন্দরবনবাসীরা—সঙ্গত কারণেই করতে পারি।

যুগের আলো (মার্কসবাদের গোড়ার কথা) ঃ অনল রায়। মৈত্র প্রকাশনী, ২৬।২ বি, বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯ মূল্য ঃ নয় টাকা

বাংলা ভাষায় মার্কসবাদ সম্পর্কে এত ভাল গ্রন্থ সাম্প্রতিককালে চোখে পড়ে নি। লেখক ইতিহাস ও দর্শনশাস্ত্রে যে একজন প্রকৃত পন্ডিত, এই গ্রন্থখানিতে তার প্রমাণ সর্বত্র। ভারতীয় সমাজ, সংস্কার, ধর্ম ও সাহিত্য প্রভৃতি থেকে মার্কসবাদ আলোচনা প্রসঙ্গে নানা উদাহরণ তিনি দিয়েছেন। এর ফলে সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষও মার্কসবাদের মূল বক্তব্যটি সহজেই ধরতে পারবেন বলে মনে করি।

লেখকের আলোচনা যথেষ্ট ব্যাপক। বুদ্ধিজীবী ও ছাত্রমহল গ্রন্থখানি পাঠ করে যথেষ্ট আনন্দ পাবেন এ কথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে। ১৮টি অধ্যায়ে গ্রন্থটি বিভক্ত। 'ভাববাদ ও বস্তুবাদ', 'দ্বন্দ্বাত্মক বস্তুবাদ', 'সমাজ বিবর্তনের ধারা', 'শ্রেণী সহযোগ', 'বুর্জোয়া গণতন্ত্র', 'শ্রমিকের একনায়কত্ব' প্রভৃতি অধ্যায়গুলি এককথায় অপূর্ব রচনা।

গ্রন্থকারের ভাষা তীক্ষ্ম। এ-ধরণের ভাষার ব্যবহার ভিন্ন সম্ভবত গ্রন্থখানি এত সুখপাঠ্য হত না। গ্রন্থটি পাঠ করতে সুরু করলে শেষ না করে পাঠকের রেহাই নেই।

বর্তমান ভারতীয় শিক্ষিতসমাজে বিদেশী ডিগ্রিধারীদের মুখোশ খুলে দিয়ে লেখক একটি অতি পবিত্র কর্তব্য পালন করেছেন। সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও সভ্যতা ধনতান্ত্রিক সমাজ ও সভ্যতার বিপরীত, এ কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজ ও "নতুন সভ্যতা আপনা থেকে আলোর মুখ দেখবে না। বিপ্লবের পথে, বহু দুঃখ-কষ্ট ত্যাগ স্বীকার করে নতুনকে আহ্বান করে আনতে হবে।" এ বক্তব্যের যাথার্থ সম্পর্কে কোনও প্রশ্নই ওঠে না। ভারতবর্ষে বর্তমান অস্থির রাজনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এই বহু কথিত সত্যটি যত বলা যায় ততই ভাল।

গ্রন্থটির বহুল প্রচার কাম্য। বিশেষ করে বর্তমান মুহূর্তে।

প্রকাশক গ্রন্থটির মূল্য একটু বেশি ধরেছেন। নিম্নবিত্তের পাঠক, যাঁরা আজ মার্কসবাদ সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বেশি উৎসাহী, তাঁদের ক্রয়-ক্ষমতার দিকে দৃষ্টি রেখেই গ্রন্থের মূল্য নির্ধারণ করলে ভাল হত। ছাপা ভাল।

বেনেট সাহেবের বাংলো—নিরূপ মিত্র। প্রকাশক—এস্‌ গুপ্ত এন্ড ব্রাদার্স। ৫৮ বিধান সরণী, কলকাতা—৬। মূল্য ঃ তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

বাংলা ছোট গল্প নিয়ে হাল আমলে

যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, তেমন বুঝি এ-সাহিত্যের আর কোনো শাখা নিয়েই নয়। প্রখ্যাত বা প্রবীণরা তো বটেই, অখ্যাত বা নবীনরাও এ পরীক্ষা-নিরীক্ষার আজ অংশীদার। নবীনদের মধ্যে প্রধানত দুটো শ্রেণী চোখে পড়ে। এক শ্রেণী আত্মকথনের ভঙ্গিতে বিশেষ কিছু মূর্ত বা বিমূর্ত ভাবকে তুলে ধরার প্রয়াসী। অপর শ্রেণী সরাসরি প্রথাবিরুদ্ধ পথে না গিয়ে প্রবীণদের সঙ্গে কম-বেশি যোগাযোগ রেখে চলার পক্ষপাতী। এ-গ্রন্থের লেখক নিরূপ মিত্র এই শেষোক্ত শ্রেণীতে পড়েন; এবং পড়েন বলেই 'বেনেট সাহেবের বাংলো'তে দুঃসাহসের মায়াজাল কিছু না থাকলেও সৎসাহসের প্রমাণ বেশ কয়েকটি গল্পে আছে। এই গল্পগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'বেনেট সাহেবের বাংলো', 'সাত সমুদ্দুর', 'আমি বাঁচতে চাই', 'প্রেম ও বিবাহ', 'ভুল অঙ্ক', 'আশাবাদী', 'ভোর হয়ে এলো' ইত্যাদি।

লেখকের ভাষা পরিচ্ছন্ন, সংলাপ সুন্দর ও সাবলীল। তাঁর এই ছোট গল্প-সংকলনটি পাঠকমহলে সমাদৃত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

পাতার বাঁশী ঃ শ্যামাপ্রসাদ সরকার সম্পাদিত এবং রঘুনাথ গোস্বামী কর্তৃক চিত্রিত ঃ প্রকাশক ঃ শ্রীবিভূতিভূষণ ঘোষ, এভারেস্ট বুক হাউস, এ ১২এ, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা ১২। মূল্য ঃ ৩ টাকা।

উপেন্দ্রকিশোরের 'কুঁজের গল্প', অবনীন্দ্রনাথের 'চট জলদী কবিতা', রবীন্দ্রনাথের 'শিকার কাহিনী', মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'নটু আর পরী' এবং সুকুমার রায়ের 'ভীষ্ম' একসঙ্গে করে সম্পাদক শিশু এবং কিশোর পাঠকদের একটি সুন্দর গ্রন্থ উপহার দিয়েছেন। এছাড়া প্রেমেন্দ্র মিত্র, অমিয় চক্রবর্তী, লীলা মজুমদার, জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায় এবং অন্যান্য কয়েকজন লেখক ও লেখিকার রচনা এই গ্রন্থটিকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলেছে। প্রতিটি রচনাই অত্যন্ত সুখপাঠ্য এবং বয়স্ক পাঠক হিসাবেও খুব ভাল লেগেছে। বাংলাদেশের অল্পবয়স্ক ছেলেমেয়েদের এই বইটি ভাল লাগবে বলে মনে হয়।

এপিক থিয়েটার (মে-দিবস সংখ্যা) ঃ জার্নাল অব্‌ দি ব্রেশ্‌ট্‌ সোসাইটি অব্‌ ইণ্ডিয়া ঃ সম্পাদক—উৎপল দত্ত। প্রকাশক ঃ ব্রেশ্‌ট্‌ সোসাইটি: ১৪০/২৪, নেতাজী সুভাষ বসু রোড, কলকাতা—৪০। মূল্য ঃ এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

শিকাগোর শ্রমিকদের মে-দিবস আজ সারা দুনিয়ার মেহনতী মানুষের আত্মনিরীক্ষার দিবস। এ ছাড়া, ব্রেশ্‌ট্‌ এ-যুগের আত্মনিরীক্ষাব্রতী মহৎ শিল্পীদের অন্যতম। তাই মে-দিবস উপলক্ষে প্রকাশিত ব্রেশ্‌ট্‌ সমিতির এই বিশেষ সংখ্যাটি সমাজ-সচেতন সাহিত্যরসিকদের কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এতে সুন্দর কয়েকটি প্রবন্ধ, নাটক ও কবিতা স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কণিষ্ক সিংহের 'মে-দিবস স্মরণে ব্রেশ্‌ট্‌/গোর্কী' এবং অশোক সেন-এর 'ব্রেশ্‌ট্‌ ডায়ালগ—১৯৬৮।' নির্মল ব্রহ্মচারীর 'মে-দিবসের ডাক' কবিতাটি সুলিখিত। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'শয়তান-দর্পণ' নাটকটি নাট্যরসিক সুধী-সমাজের কাছে তো বটেই, জনসাধারণের কাছেও আদৃত হবে। এ-ছাড়া উৎপল দত্তের পথ-নাটিকা 'ময়না তদন্ত' এ-সংখ্যার আর একটি বিশিষ্ট আকর্ষণ।

সব দিক মিলিয়ে দেখলে সন্দেহ থাকে না যে, আজকের দিনের বিকৃত-রুচির পত্র-পত্রিকার যুগে এ-সংখ্যাটি সত্যিকারের এক মহৎ জীবনাদর্শকে প্রতিফলিত করতে সক্ষম হয়েছে এবং সেই সঙ্গে সক্ষম হয়েছে যথার্থ কিছু প্রগতি-ধর্মী রচনা উপহার দিয়ে আধুনিক বাংলা নাট্য-আন্দোলনকে অনুপ্রাণিত করতে।

রঙ্গমঞ্চ ওদেশে
শিল্পী এবং এদেশে

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অনন্যা

— দ্বিতীয় অঙ্ক —

[পরের দিন সকালে—ঐ একই ঘরে। অভিজিৎ ও অলকা।]

অলকা—ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমরা যাই ঠিক করি না কেন—তোমার এই ব্যাপারটা কোনো রকমেই ক্ষমা করা যায় না।

অভিজিৎ—তার মানে।

অলকা—এইখানে ঐ মহিলাকে নিয়ে আসা—

অভিজিৎ—মহিলাকে আমি এখানে নিয়ে আসি নি। আমি এখানে এসেছিলাম তোমাকে মিট করতে আমাদের আগেকার ব্যবস্থামত।

অলকা—(উগ্রভাবে) তবে ও মেয়েটি কে?

অভিজিৎ—(ঠাট্টার সুরে) কাল রাত্রেই বলেছি ওঁর নাম সুজাতা সেন—আর ওঁর পেশা হচ্ছে ছবি আঁকা।

অলকা—(একটু চুপ করে থেকে) তারপর?

অভিজিৎ—তারপর আর বলতে পারবো না। আমি ঐ পর্যন্তই জানি।

অলকা—আমি এবার একটা কথা বলবো?

অভিজিৎ—নিশ্চয় বলবে—এতে আর আমি কি আপত্তি করতে পারি।

অলকা—আমি বেশ বুঝতে পারছি মেয়েটির সঙ্গে এখন তোমার অনেকদিন বাদে দেখা হোল। কিন্তু এক সময় দুজনের খুবই ভাব ছিল—তখন কিন্তু সব সময়েই দেখা হোত। আমাদের বিয়ের সময় অবধি বোধহয় এই ঘনিষ্ঠতাটা ছিল। এই সব কারণেই এর নাম পর্যন্ত কোনোদিন আমার কাছে করো নি। অন্য মেয়েদের সম্বন্ধে তো কখনও কোনো গোপনতা করতে দেখি নি—তার কারণ বোধহয় তাদের সঙ্গে তোমার সম্পর্কটা ছিল হাল্কা ধরণের এবং ঠাট্টা-ইয়ার্কির। এর ব্যাপারটা বোধহয় আরও গভীর—তাই এত গোপনতা—কি বল?

অভিজিৎ—তোমার অদ্ভুত কল্পনাশক্তির তারিফ না করে পারছি না—কখন এসব তথ্য আবিষ্কার করলে বলতো?

অলকা—যে মুহূর্তে কাল রাত্রে এই ঘরে ঢুকে দেখলাম দুজনে দুজনের হাত ধরে দাঁড়িয়ে আছ।

অভিজিৎ—কাল তো এ বিষয়ে কিছু বলো নি।

অলকা—আমি আশা করেছিলাম তুমি নিজে থেকেই সমস্ত ব্যাপারটা আমাকে খুলে বলবে। (অল্প সময় কেউ কোনো কথা বলবে না। তারপর—) আমরা যখন বিয়ে করবো ঠিক করছি—সেই সময় থেকেই আমার কেমন মনে হোত—বাইরে প্রকাশ না করলেও এমন একজন কোনো বান্ধবী তোমার আছে, যার কাছে গিয়ে তুমি নির্বিচারে তোমার মনের সব গোপন কথা বল—যেসব কথা এমন কি আমার কাছে বলতেও তুমি রাজী নও। এরপর আমাদের বিয়ে হোল—এই সময়টায় কিছুদিনের জন্য তোমার জীবন থেকে সে সরে গেল। আর জন্যই বিয়ের পর প্রথম দিকটায় আমাদের এত আনন্দে কেটেছে। তারপর আবার তার চিন্তা তোমাকে পেয়ে বসল। এখন তো সে নিজেই এসে হাজির হয়েছে—নিশ্চয় তোমার কাছ থেকেই খবর পেয়েছে। এক্ষেত্রে প্ল্যান করে আমাকে এখানে ডেকে এনে অপমান করার অর্থ কি বলতে পার?

অভিজিৎ—আমি তোমার এই উদ্ভট কল্পনাশক্তি দেখে যে কি চমৎকৃত হয়েছি অলকা!

অলকা—চুপ করো! এখানে আসবার আগে আমাদের মধ্যে কি ঠিক হয়েছিল—

অভিজিৎ—যা ঠিক হয়েছিল তার কোনো ব্যতিক্রম তো হয় নি। শোনো অলকা, আমি এখন 'দুর্গম হয় পন্থা' বলে একটি নাটকে হাত দিয়েছি। চার বছর আগে এটাকে শেষ করে ফেলে রেখেছিলাম—আমার মনোমত হয় নি বলে এ লেখাটি সম্বন্ধে আমি কারোকেই কিছু বলি নি। আচ্ছা, এ রচনাটি সম্বন্ধে তুমি কিছু জানতে?

অলকা—কিছুই না, কিন্তু এখন এ প্রশ্ন কেন?

অভিজিৎ—অথচ নাটকটি সম্বন্ধে সুজাতা সেন কিন্তু সব কথাই জানে।

অলকা—(তিক্তভাবে) তাহলে শুধু নর্ম-সহচরী নয় সঙ্গে সঙ্গে কর্মসহচরীও?

অভিজিৎ—কি বলতে চাইছি, আর তুমি কিভাবে তার মানে করছ। আজও পর্যন্ত তুমি আমাকে ঠিকমত বোঝবার চেষ্টা করলে না।

অলকা—অথচ সুজাতা দেবীর সঙ্গে তোমার কি চমৎকার understanding রয়েছে—না?

অভিজিৎ—কি আজে বাজে কথা বলছ। তুমি জান কবে এবং কখন ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে?

অলকা—জানি না এবং জানতে চাইও না। তোমাদের সম্বন্ধে আমি কি মনে করি তা তো একটু আগেই বললাম।

অভিজিৎ—(রাগের সঙ্গে) You have told me a lot of rubbish.

অলকা—(ক্লান্তিভরে) বেশ বল। কোথায় এবং কবে ওই মহিলার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে।

অভিজিৎ—দেখা হয়েছে মাত্র কাল সন্ধ্যায় এবং এই ঘরে।

অলকা—একথা আমি বিশ্বাস করতে পারি না। তুমিই তো এইমাত্র বললে তোমার সমস্ত লুকিয়ে রাখা নাটকটি সম্বন্ধেও সব খবর রাখেন এই মিস সুজাতা সেন।

অভিজিৎ—(বিরক্তির সঙ্গে) আমি এ বিষয়ে এতটুকুও বানিয়ে বলি নি। শুনলে আশ্চর্য হবে, আমি যে এখানে আসছি সে কথাও সুজাতা সেন এখানকার অন্য মহিলা বোর্ডার সুরমা দেবীকে আগে থেকেই জানিয়েছিলেন। এমন কি আমি যখন তোমাকে বম্বে থেকে long distance-এ কলকাতার ফোন করছিলাম, তাও মিস সেন শুনেছিলেন—যদিও সেই সময়টায় তিনি ছিলেন সমুদ্রের বুকে জাহাজের ওপর। (একটু থেমে) কাল এই ঘরে ঢুকে প্রথমটা তোমার সঙ্গে ওঁকে ভুল করলাম। ভগবান জানেন কেন এই ধরণের ভুল হোলো। তারপর আমার মনে হোল নিশ্চয় কোথাও সুজাতা সেনের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। পরে জানলাম আমার এ ধারণাও ঠিক নয়—ওঁর সঙ্গে আগে আমার কখনও মৌখিক আলাপ হয় নি। সমস্ত ব্যাপারটাই যেন কেমন উদ্ভট এবং রহস্যে ভরা বলে মনে হতে লাগল। ওঁর কাছ থেকে যখন এই রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করছি, তুমি এসে ঘরে ঢুকলে আর সব দিলে পণ্ড করে।

অলকা—তোমার কথাই যদি সত্যি হয়—

অভিজিৎ—(বিরক্তিভরে) কতবার বলব যে আমি একটি কথাও বানিয়ে বলি নি। মেয়েটি আমার সম্পূর্ণ অপরিচিতা। ওঁর কত বয়স, কোথায় উনি থাকেন কিছুই আমি জানি না।

অলকা—কিন্তু কাল ঘরে ঢোকবার সঙ্গে

সঙ্গে আমারই বা কেন মনে হোল যে ওই মহিলা তোমাকে অনেকদিন থেকে জানেন। আমি আসতেই—

অভিজিৎ—তুমি যদি ঠিক সে সময়টায় না আসতে, আমি ব্যাপারটার খানিকটা হদিস পেতাম—

অলকা—(বিরক্তভাবে) অর্থাৎ যেমন সব ক্ষেত্রে হয়ে থাকে—সব দোষটাই আমার।

অভিজিৎ—(অসহিষ্ণুভাবে) আহা, সে কথা তো বলছি না! আসল কথাটা বাদ দিয়ে—

অলকা—(হঠাৎ স্মরণ হওয়াতে) আচ্ছা মিস সেন কাল এ ঘর থেকে যাবার আগে বললেন যে, উনি আগে ভাবছিলেন এখান থেকে চলে যাবেন, কিন্তু সব দিক দেখে ঠিক করলেন থেকে যাওয়াটাই সবার পক্ষে ভাল হবে।

অভিজিৎ—(বিরক্তিভরে) আমি তো telepathy জানি না যে ওঁর মনে কি হয়েছিল সে কথা তোমাকে বলব।

[থেমে যাবে, কারণ সুরমা মল্লিক ঘরে ঢুকবেন।]

সুরমা—এই যে মিস্টার গুপ্ত—আপনাদের ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে—আমি তো সেরে নিলাম—

অভিজিৎ—আমরা এইবার যাব। মিস মল্লিক এই আমার স্ত্রী অলকা—

[দুজনে দুজনকে নমস্কার করবে।]

সুরমা—ভারি সুন্দর সকালটা—এখনি বেড়াতে বের হব—সারাদিন আজ বাইরেই থাকব। আপনারা বেরোবেন না?

অলকা—আমার শরীরটা বিশেষ ভাল নেই। (একটু ইতস্তত করে) মিস মল্লিক, আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করবো—

সুরমা—(আড়চোখে দুজনের দিকে চেয়ে) বুঝতে পেরেছি! সুজাতা সেন সম্বন্ধে তো?

অলকা—(বিস্ময়ের সঙ্গে) ও, হ্যাঁ...ঠিকই ধরেছেন।

সুরমা—(গাম্ভীর্যের সঙ্গে) কি জানতে চান বলুন? আমিও ওঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানি না—তবে গত চারদিন একসঙ্গে থাকবার পর—

অলকা—(কুণ্ঠার সঙ্গে) মানে...অভিজিতের কাছে যে সব কথা শুনলাম...আমার ঠিক বিশ্বাস হয় না যে উনি সত্যি কথা বলছেন।

সুরমা—সারাজীবন হেডমিসট্রেসের কাজ করেছি—অনেক মেয়ের সংস্পর্শে আমাকে আসতে হয়েছে মিসেস গুপ্ত ক্ষেত্রেই আমি ধরতে পারি কে সত্যি কথা বলছে আর কে বলছে না। মিস সেন যে মিথ্যে কথা বলছেন না এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

অলকা—কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা কি রকম অদ্ভুত মনে হয় না।

সুরমা—অদ্ভুত ব্যাপার তো অহরহই আমাদের চারপাশে ঘটতে দেখছি। কাল আপনারা আসবার আগে সুজাতা দেবীর সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল। উনি অনেক সময়েই এমন সব লোককে দেখতে পান—

অভিজিৎ—আপনিও তো ব্যাপারটা হেঁয়ালী করে তুলছেন। কাদের দেখতে পান?

সুরমা—সাধারণে যাদের মনে করে মৃত বা অতীতের মানুষ—

অলকা—আপনি কি অশরীরী আত্মাদের কথা বলছেন।

সুরমা—মিস সেনের মতে এরা হচ্ছে কতকগুলো impressionss—যেমন পায়ের ছাপ বা আঙুলের ছাপ—যা এক সময়ের জীবিত লোকেরা রেখে গেছেন প্রকৃতির বুকে। এ ছাড়াও অতীত এবং ভবিষ্যতের, অর্থাৎ যা ঘটে গেছে বা পরে ঘটবে এমন অনেক ঘটনাও উনি চোখের সামনে স্পষ্টভাবে দেখতে পান। আমাকেও এ সব বিষয়ে যে সব কথা বলেছেন, বুদ্ধি দিয়ে তার ঠিক ব্যাখ্যা করা চলে না। সব দেখে শুনে আমার মনে হয় ওঁর মনটা একটা বিশেষ ছাঁচে তৈরি, আর পাঁচজনের সঙ্গে ওঁর ঠিক তুলনা করা যায় না।

অভিজিৎ—(তিক্তভাবে) না হয় আপনার কথাই মানলাম। কিন্তু এর সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে ফেলার অর্থ কি বলতে পারেন।

সুরমা—আমি তো তা বলতে পারি না। অবশ্য আমারও খুবই জানবার কৌতূহল। শুধু এইটুকুই জানি যে আপনার বিষয় অনেক কথাই মিস সেন জানেন।

[অনাদিবাবু ঘরে ঢুকবেন।]

অনাদি—জার্ডিন সাহেবের মোটর কারখানায় টেলিফোন করে দিয়েছি যে, ড্রাইভার দিয়ে আপনার জন্য একটা গাড়ি পাঠিয়ে দিতে। পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যেই এসে পড়বে।

সুরমা—আচ্ছা আমি এখানেই অপেক্ষা করছি অনাদিবাবু।

অনাদি—মিসেস গুপ্ত, আমার স্ত্রী বলছিলেন আপনাদের ব্রেকফাস্ট তৈরি আছে।

অলকা—আচ্ছা আমরা যাচ্ছি; চল অভিজিৎ—

অভিজিৎ—তাই চল।

[দুজনে ভেতরের দিকে যাবে।]

ত্বকের রুক্ষতা ঢেকে দেবে
নবীন লাবণ্যে। বর্ণে আনবে
স্নিগ্ধ সুষমা। চন্দনের
গন্ধ-বিহ্বল দিনের প্রতিটি
মুহূর্ত মনে হবে স্বপ্নের মতো সুন্দর
আজ থেকেই ব্যবহার করুন
বেঙ্গল কেমিক্যালের
গোল্ডেন
স্যাণ্ডালউড সে

সুরমা—অনাদিবাবু, সুজাতা দেবী কোথায়?

অনাদি—একটু আগে বাগানের দিক থেকে আসছিলাম—দক্ষিণ দিকের বেঞ্চিটার কাছাকাছি এসে দেখি মিস সেন অন্যমনে আকাশের দিকে চেয়ে আছেন—পাশে একটা বই পড়ে আছে আর দু' চোখ দিয়ে জল পড়ছে। পাছে আমাকে দেখলে লজ্জা পান এইজন্য অন্য দিক দিয়ে ঘরে এলাম।

সুরমা—আপনার মত সত্যিকার ভদ্রতাজ্ঞান আমাদের দেশে খুব কম লোকেরই আছে।

[এবার সুজাতা সেন ঘরে ঢুকবে—তাকে অত্যন্ত শ্রান্ত এবং ফ্যাকাশে দেখাবে।]

এই যে মিস সেন! বাইরে যাব বলে গাড়ির জন্য অপেক্ষা করছি। তবে জার্ডিন সাহেবের গাড়ি কতক্ষণে আসে কে জানে।

অনাদি—(যেতে যেতে) আচ্ছা, আমি আবার গিয়ে ফোনে তাড়া দিচ্ছি।

সুরমা—কোনো দরকার নেই অনাদিবাবু। গাড়িটা এলে আমাকে শুধু খবর দেবেন।

অনাদি—আচ্ছা। [প্রস্থান।]

সুরমা—আসুন, এখানে এসে স্থির হয়ে বসুন সুজাতা দেবী।

সুজাতা—আমার মনটা আজ বড়ই চঞ্চল মিস মল্লিক।

সুরমা—আপত্তি না থাকলে আমার সঙ্গে চলুন না—সারাটা দিন বাইরে কাটিয়ে ...া যাবে।

সুজাতা—(অল্প হাসির সঙ্গে) আপনি ভারি ভাল—কিন্তু আমার পক্ষে যাওয়া (মাথা নেড়ে বোঝাবে অসম্ভব)—

সুরমা—আমি ভাবছিলাম কিছুক্ষণের জন্য এ পরিবেশ থেকে পালিয়ে বাঁচবেন।

সুজাতা—আমিও কালকে প্রথমটায় ভেবেছিলাম এখান থেকে দূরে সরে যাব। কিন্তু তার পরেই বুঝলাম এভাবে এ সমস্যার সমাধান হবে না।

সুরমা—একটু আগে মিসেস গুপ্তের সঙ্গে আলাপ হ'ল। বড্ড মুষড়ে পড়েছেন—বেচারীকে কোন দোষও দেওয়া যায় না।

সুজাতা—ওঁর জন্য আমিও সত্যিই খুব feel করি।

সুরমা—(ইতস্তত করে) সুজাতা দেবী, এ প্রশ্ন আমাকে করতেই হবে—বিরক্ত হ'বেন না—জানবেন আমি আপনার সত্যিকার বন্ধু। সত্যি করে বলুন তো—আপনি কি অভিজিৎ গুপ্তকে ভালবাসেন?

সুজাতা—(অল্প হাসির সঙ্গে) দেখুন ভালবাসা বলতে কি বোঝায় জানি না—আমার যখন বছর পনের বয়স পাড়ার এক বড়লোকের ছেলের প্রেমে পড়েছিলাম—তার কারণ তার একটা সুন্দর লাল রংয়ের স্পোর্টস কার ছিল। (জোরে হেসে উঠে) দু' বছর বাদে আরও বেশি প্রেমে পড়লাম আমার এক পিসতুতো বোনের দেওরের সঙ্গে—সে ছিল প্রচণ্ড ব্যায়ামবিদ—পরে ঘেন্না ধরে গেল যখন দেখলাম বা'র তিনেক চেষ্টা করেও সে বি এ পাশ করতে পারল না।

সুরমা—আমার প্রশ্নের এই কি উত্তর হোল মিস সেন?

সুজাতা—দেখুন মিস মল্লিক প্রেম বলতে আমরা সাধারণত যা বুঝি, তা হচ্ছে যৌবনের অজ্ঞতাপ্রসূত খানিকটা ভাবপ্রবণতা। কিন্তু কেউ যখন এমনভাবে একজনকে জানে, যেভা'ব ...ন্য কেউ তাকে জানে না, তার বিশেষ ...রঙ্গ বন্ধুরাও তাকে অত নিবিড়- ...বোঝে না বা বুঝতে পা'র না— ... হৃদয়-মন যখন সম্পূর্ণ ...গিয়ে একই ধারায় বইতে ... সুখ, দুঃখ, আনন্দ, ... ওপর প্রক্ষিপ্ত হয়ে ... বিচলিত করে ...t's a whole ...g in love. ...ন্য ধরণের ... ...নার

সুজাতা—পরিচয় নেই! যার জীবনের সঙ্গে আমি গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে বাঁধা হয়ে গেছি—যার মনের প্রতি সূক্ষ্ম চিন্তাধারা, গোপন ধ্যান-ধারণার সঙ্গে আমার নিবিড় আত্মিক পরিচয়—তাকে কি অপরিচিত মনে করতে পারি?

সুরমা—(ইতস্তত করে) আমি বুঝতে পারছি এসব আপনার গভীর অনুভূতির ফল—কিন্তু এর অনেকটাই কি অত্যধিক কল্পনাপ্রবণতা নয়। আপনাদের এই সম্পর্কটা—একে ঠিক কি বলব? Clairvoyant relationship?

সুজাতা—সে প্রশ্ন কি আমিই নিজেকে করি নি! নিজের জীবনের যে এই পরিণতি হবে, এ কি আমিই চেয়েছিলাম? আমাদের এই সম্পর্কটা—এটা আমার মনের একটা উদ্ভট কল্পনা—এই ভেবে এটাকে কাটিয়ে ওঠবার জন্য আমি কি কম struggle করেছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাকে পরাজয় মানতে হয়েছে—কারণ ব্যাপারটাকে এত তীব্র, এত গভীরভাবে অনুভব করেছি, আর এত প্রমাণ পেয়েছি যে, আর অবিশ্বাস করতে পারি নি। দেখুন না, অভিজিৎ যে এখানে আসছে সে কথা তো আমি আগেই জানতে পেরেছিলাম। বম্বে থেকে সে যখন কলকাতায় টেলিফোন করছিল সে তো আমি স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলাম—যদিও তখন আমি ছিলাম সমুদ্রের ওপর জাহাজে। এসব তো আর আমার কল্পনাপ্রসূত কথা নয়—তার প্রমাণও তো আপনি পে'য়েছেন। আমি পরিষ্কার দেখেছিলাম তার মনে তীব্র অশান্তি—সে এখানে একবার শেষ চেষ্টা করতে আসছে স্ত্রীর সঙ্গে মিটমাট ক'রে নিতে—

[অনাদিবাবু ঢুকলেন।]

অনাদি—আপনার গাড়ি এসে গেছে মিস মল্লিক।

সুরমা—আমি থাকলে যদি আপনার ভাল লাগে—

সুজাতা—ধন্যবাদ মিস মল্লিক—না, আপনি যান—এখন একটু একলা থাকলেই ভাল লাগবে।

সুরমা—আচ্ছা, সন্ধ্যাবেলায় দেখা হবে।

[প্রস্থান।]

সুজাতা—আমি একটু হেঁটে আসি।

অনাদি—অল্প বৃষ্টি শুরু হয়েছে কিন্তু।

সুজাতা—ওতে কিছু হবে না।

রঙ্গজগৎ

সিনেমায় বোমা

সম্প্রতি কলকাতার কোন এক সিনেমায় টাইম বোমা পাওয়া গেছে। এই খবর শহরের সিনেমা দর্শকদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে। সিনেমা মালিকরা ভীত। শহরবাসীদের মধ্যে প্রশ্ন সিনেমায় বোমা কেন? বাস্তবিক বুঝে ওঠা কষ্টকর সিনেমায় টাইম বোমা রাখার কারণ কি এবং কারা একাজ করেছে। আপাতত নানা গুজব শোনা যাচ্ছে। কেউ বলে সিনেমা কর্তৃপক্ষকে জব্দ করার জন্য কোন দুষ্ট লোকের কাজ। হয়ত কোন স্বার্থসিদ্ধির মতলব। কেউ বলে বিদেশী গোয়েন্দা ও যৌনতামূলক ছবির প্রদর্শন বন্ধ করার জন্য কেউ একাজ করেছে। আসল কারণ কি সেটা পুলিশের গোয়েন্দা দপ্তর খুঁজে বার করবেন। কিন্তু বোমা যদি ফাটত তা হলে কি হত! সিনেমা মালিকের কি ক্ষতি হত সেটা পরের কথা, কিন্তু কিছু নিরপরাধ দর্শক হতাহত হতেন। আনন্দ উপভোগ করতে এসে হত বা আহত হলে ভয়ানক দুঃখজনক ঘটনা হত। যারা একাজ করেছে তাদের কেউ ক্ষমা করবে না। একাজ শুধু নিন্দনীয়ই নয়, সমাজ-বিরোধী।

সিনেমা দেখতে যায় মানুষ আনন্দের জন্য। সুস্থ মানুষ আশা করে সে আনন্দ হবে নির্মল। সিনেমা দেখতে আসার সময় কোন দুর্ঘটনার কথা কেউ ভেবে আসে না। জীবনের প্রতি মুহূর্তে মানুষকে সংগ্রাম করতে হচ্ছে। জীবন-সংগ্রাম বেঁচে থাকার জন্য ; এবং সমাজের মন্দের বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করতে হয়। অশালীন সিনেমা সমাজের এক মন্দ দিক থেকেই তৈরি হয়। যারা যৌনরসের ছবি তৈরি করে তাদের টাকার লোভের দিকটাই বড়। এরকম ছবির পেছনে একটা রাজনৈতিক দুরভিসন্ধিও থাকে। সাধারণ দর্শকরা অত ভাবে না, তারা আনন্দের নামে সেই নোংরা আনন্দে অবগাহন করে ক্ষণিকের উত্তেজনা লাভ করে মাত্র। সে আনন্দ সত্যিকার আনন্দ নয়। আত্মাকে যা সুন্দর করে না, মনকে যা পবিত্র করে না তা কখনো সত্যিকার আনন্দ হতে পারে না। এ সব নোংরা ছবির জন্য দর্শকরা ততটা দায়ী নয় যতটা নির্মাতা এবং পরিবেশকরা দায়ী। আর দায়ী সেন্সার কর্তৃপক্ষ। সেন্সার করার জন্য দেশের শিক্ষিত লোকরাই নির্বাচিত হন, তাঁরা কি করে জাতি ও দেশের ঐতিহ্য এবং স্বার্থের কথা না ভেবে এ সব ছবির ছাড়পত্র দেন সে কৈফিয়ৎ তাঁদের কাছে দাবি করা দরকার।

এ সব ছবি মানবসমাজে একরকম আদিম মনের প্রকাশ। মানুষ যখন চাঁদে পৌঁছেছে, মঙ্গল ও শুক্রগ্রহের দিকে যাত্রা করার উদ্যোগ করছে, সমগ্র মানবসমাজকে সুন্দর ও মহৎ করার জন্য সংগ্রাম করছে, সে-সময় যাঁরা নারীর নগ্ন দেহ দেখে আনন্দ পান, যৌন বিকারের ছবি দেখার জন্য ভিড় করেন তাঁরা সমাজে এখনো আদিম মানসিকতার স্তরে রয়েছেন। আর যারা ছবিতে নারীকে নগ্ন দেখিয়ে পয়সা রোজগার করার কথা ভাবে তাদের মানসিক গঠন যে বর্বর যুগের, সে-কথায় আর সন্দেহের অবকাশ কোথায়। সভ্য মানুষের পক্ষে আজ চিন্তা করা কষ্টকর যে এই মহাকাশ অভিযানের যুগে যখন নারী অভিকাশ যাত্রা করেছে তখন নারীদেহ পর্দায় দেখিয়ে বা দেখে মানুষ কিভাবে আনন্দ লাভ করতে পারে।

কিন্তু কুৎসিত রসের ও বক্তব্যের ছবির বিরুদ্ধে শুধু বিক্ষোভ নয় চাই ব্যাপক প্রচার। সেন্সর বোর্ডের কাছে বিক্ষোভ জানাবার সঙ্গে সঙ্গে পত্র-পত্রিকায় লেখা এবং আলোচনা করা দরকার। দর্শকদের সজ্জবদ্ধ হওয়া দরকার যাতে আমাদের দেশে এই বিদেশী কুৎসিত পশ্য-চিত্রগুলি প্রদর্শিত না হয় এবং দর্শকরা যাতে না দেখে। দর্শকদের মনে করে দেওয়া দরকার যে, স্পাই সিরিজের বিদেশী ছবিগুলি আসলে মানবতার ও সভ্যতার বিরুদ্ধে অবমাননা।

সিনেমায় বোমা কেন রাখা হয়েছিল সেকথা এখনো জানা যায় নি। যে কারণেই রাখুন সেকাজ নিন্দনীয়। দর্শকদের নিরাপত্তা বিবেচনায় সকলেই তার নিন্দা করবে। —সা

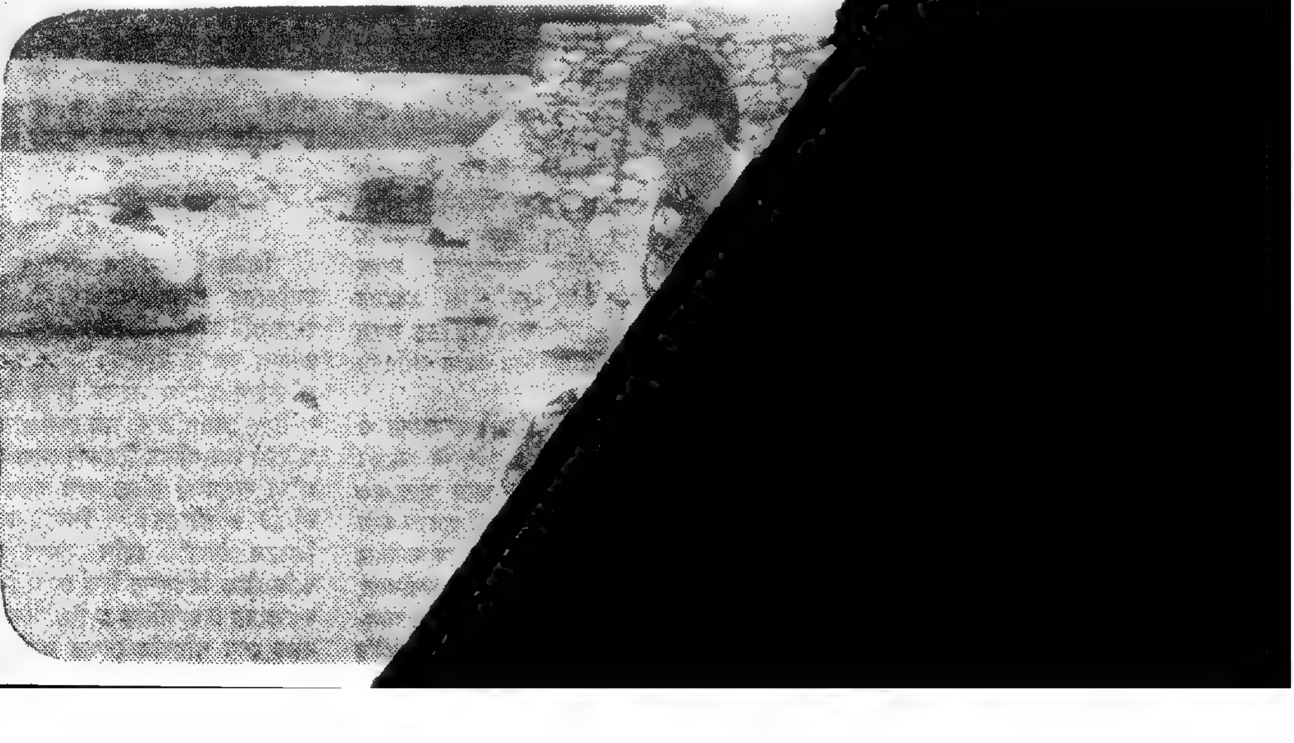

'সতী সাবিত্রী সত্যবান' ছবিতে নাগেশ্বর রাও ও বরলক্ষ্মী

চিত্র-আলোচনা

তীরভূমি

চিত্রভারতী নিবেদিত ও গুরু বাগচী পরিচালিত 'তীরভূমি'তে পারিবারিক জীবনের রহস্য এবং জ্বালা-যন্ত্রণা চিত্রা- ...হে। তীরভূমি কাহিনীর ... এবং সেই ... দায়িত্ব ... াইলট ... কে ... ক

... বিয়ে করার। তিনি রাজী হলেন না। মিঃ মুখাজীও দেশে ফিরেছেন। ইতিমধ্যে রোজীর গর্ভে এসেছে সোমা, ধর্মত যে মুখাজীরই মেয়ে।

চব্বিশ বছর পর সোমাকে কাছে পেয়ে যেন মিঃ মুখাজী নেলীর গর্ভজাত কন্যাসন্তানের মৃত্যুশোক ভুলতে চেয়েছিলেন কিন্তু বাদ সাধলো নেলীর অভিপ্রায়। তিনি অগ্নিমূর্তি ধারণ করে মিঃ মুখাজীর অবিবাহিতা বিদেশিনী স্ত্রীর কন্যা সোমা মুখাজীকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। মিঃ মুখাজী সোমাকে কলকাতায় নিয়ে গেলে—সেখানে কিছুদিন পর পুত্র গৌতমকে সংগে নিয়ে নেলী মুখাজী উপস্থিত হলে অবস্থা চরমে ওঠে—যদিও একবার নিজের মেমসাহেবীনা মনের ইচ্ছায় নেলী মৃতকন্যার প্রতিরূপ হিসেবে সোমাকে স্বীকার করে নিতে চেয়েছিল।

অবশ্য চিত্রনাট্যানুযায়ী ঐ হচ্ছে ...ল কাহিনী। মূল কাহিনীর পরি- ...তে দেখা যাবে একান্ত ভারতীয় ...র্যের সংসারে অনুপমের সংগে ...বিয়ে এবং জেঠতুতো বোনের ...জিতের (যে ধনীপুত্রের কাছে ...ও চাকরির জন্যে গেছিল)

... কাহিনীতে সমস্যা ও ...নোর চেষ্টা আছে। ... কাছে আর এক ...থ্য প্রকাশ হয়ে ... যে সমস্যার ... উপস্থিত, ... অবি- ...জীর ...া

সে ভয় দূরীভূত হয়, যখন জানা যায় যে, বিদেশে তিনি মিসেস মুখাজী হয়েই আছেন এবং এদেশে তিনি অর্থের লোভে আসছেন না।

সোমা বিদেশে লালিতপালিত, এতদ্‌সত্ত্বেও সে আচারে ব্যবহারে, পোষাক-পরিচ্ছদে সম্পূর্ণ ভারতীয়। এই ধরণের মেয়েকে বিদেশী আচারানুষ্ঠানে অভ্যস্ত করার জন্য নেলী মুখাজীর আপ্রাণ চেষ্টা এবং ব্যর্থকাম হওয়ার পর মানসিক বিভ্রান্তিজনিত উন্মাদপ্রায় হওয়া এবং সোমার সন্তানের অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণে অভিশাপ দেওয়া দর্শকমনে অবশ্যই প্রশ্ন সৃষ্টি করে।

ভারতীয় নারী নেলী বিদেশী চালচলনের প্রতি কী রকম মোহমুগ্ধ। অপরদিকে সোমা ও সোমার মা কী আশ্চর্যরকমে ভারতীয়বোধে উদ্বুদ্ধ। সোমা এই বোধেই কলকাতার পাশের বাড়ির অনুপমকে ভালোবাসতে পেরেছিল ইত্যাদি।

"তীরভূমি"র সর্বাপেক্ষা বেদনাদায়ক মানুষ মিঃ মুখাজী। এই চরিত্রে রূপদান করেছেন বিকাশ রায়। সোমা চরিত্রে মাধবী মুখাজী সহজ ও ভাবগম্ভীর। কিন্তু তাঁকে দেখলে মনে হয় না তিনি বিদেশিনীর গর্ভজাত সন্তান। এ ধরণের ত্রুটি অবাঞ্ছনীয় ছিল। অনুপমের ও অভিজিতের ভূমিকায় অনিল চ্যাটাজী ও রবি ঘোষ আশানুরূপ। নেলীর ক্রোধ, হিংসা আবার আর একদিকে মমতাবোধ ফুটিয়ে তুলেছেন মঞ্জু দে। অন্যান্য চরিত্রগুলির রূপায়ণ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। কাহিনীর প্রথমাংশে গতির অভাব অনুভূত হয়েছে। দ্বিতীয়াংশে সে ক্ষতির পূরণ হয়েছে। সংগীত পরিচালনায় বিজন পাল প্রশংসনীয়। আবহসঙ্গীত ও কণ্ঠসংগীত কাহিনীর উৎকর্ষ সাধন করেছে।

হীরের প্রজাপতি

লিটল সিনেমা বাংলাদেশে শিশু চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে অগ্রগামী। এঁদের প্রত্যেকটি ছবি রাষ্ট্রীয় এবং জনসাধারণের প্রশংসা অর্জন করেছে। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠান তাঁদের নবতম শিশু চলচ্চিত্র "হীরের প্রজাপতি"র কাজ শেষ করেছেন। 'হীরের প্রজাপতি'র চিত্রনাট্য লেখা হয়েছে লীলা মজুমদার রচিত গল্প অবলম্বনে। ছবিটি ৮ রীলের। শিশু চলচ্চিত্র হিসাবে দৈর্ঘ্য বেশি মনে হলেও কাহিনীকে বিকাশের দিক থেকে কিশোর দর্শকদের দৈর্ঘ্যজনিত ক্লান্তি আসবে না, বরঞ্চ শেষ পরিণতি দেখার জন্য উদ্বেগ নিয়ে অপেক্ষা করবে

পিসিমার একটা হীরের প্রজাপতি ছিল। সেটা লুকিয়ে রাখতে গিয়ে যত গণ্ডগোল বাধল। তিনি যে ফুলের টবে রেখেছিলেন সেটা অন্য বাড়িতে চালান হবার পথে গেল ভেঙে। তারপরে কি করে প্রজাপতিটা হাত বদল হতে হতে শেষ পর্যন্ত কেকের মধ্যে গেল সে ঘটনাগুলি দেখা গেছে ছবিতে। অথচ এত হাত বদলের মধ্যেও কেউ জানল না, যে প্রজাপতিটা তারা খুঁজছে, সেটা তাদের কাছে কাছেই রয়েছে। আরো কিছু মজার ব্যাপার রয়েছে সখের গোয়েন্দাকে নিয়ে। শেষ পর্যন্ত প্রজাপতি পাওয়া গেল, পিসিমার মুখে হাসি ফুটল, কিন্তু তাঁর বিশ্বাস তাঁর গুরুজীর কেরামতিতেই সব হয়েছে।

কিশোর মনের গল্প শোনার ঔৎসুক্য রক্ষা করে সহজ রীতিতে কাহিনী অগ্রসর হয়েছে। যতই কাহিনী অগ্রসর হবে ততই ছেলেমেয়েরা মজা পাবে। কিশোর-কিশোরীদের উপযোগী কাহিনী-চিত্র হিসাবে ছবিটি সার্থক। ছবিটি কিশোর দর্শকদের কাছে আরো আকর্ষণীয় হবে, তার কারণ ছবিতে বিভিন্ন ভূমিকায় যাঁরা অভিনয় করেছেন তাঁদের নাম বাড়িতে আলাপ আলোচনায় শুনে থাকে। শিল্পীদের মধ্যে আছেন—রাজলক্ষ্মী দেবী, জহর রায়, রবি ঘোষ, অনুপকুমার, শেখর চ্যাটার্জী, সুব্রতা চ্যাটার্জী, বিনতা রায়, সাধনা রায়চৌধুরী (চ্যাটার্জী), শিশুশিল্পী সুমিতা রায় এবং আরো অনেকে।

ছবিটি পরিচালনা করেছেন শান্তিপ্রসাদ চৌধুরী। শিশুদের জন্য ছবি নির্মাতা হিসাবে শান্তিপ্রসাদের দক্ষতা এ ছবিতেও পরিস্ফুট।

ইনকোয়াই ম্যারি

এই সঙ্গে আরো দু'টি স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি [illegible] গেল। এ দু'টি ছবি প্রতিটি এক রীল করে। প্রথম ছবি 'ইনকোয়াই ম্যারি' প্রাণবন্ত শিল্পচিত্র। অজন্তার শিল্পের পটভূমিতে শিল্পীর জিজ্ঞাসা এতে প্রকাশিত হয়েছে। ছবিটি গত বছর রাষ্ট্রপতির পুরস্কার লাভ করেছে শিল্প-চিত্রের পর্যায়ে।

দ্বিতীয় ছবি "আজকের শিল্পী"। পরিতোষ সেনের শিল্পরীতির বিকাশ, কিভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে শিল্পী একটা পরিণতিতে এসে পৌঁচেছেন স্বল্প দৈর্ঘ্যের এই ছবি তার পরিচয় দিয়েছে। সাধারণ দর্শকদের কাছে দেশের একজন শিল্পীকে পরিচিত করার কাজে এই ছবিটি খুবই সহায়ক। এরূপ ছবির যথেষ্ট প্রয়োজন আছে এবং এ-ধরণের ছবি যত তৈরি হবে ততই দেশের শিল্প-ঐতিহ্য এবং শিল্পীদের যথার্থভাবে পরিচিত করার সহায়তা করা হবে।

সংবাদ-কনা

ফরাসী চলচ্চিত্র উৎসব

১৫ই আগস্ট সাড়ম্বরে ফরাসী চলচ্চিত্র উৎসব উদ্বোধন করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়। উৎসবের বৈশিষ্ট্য জানিয়ে দর্শকদের স্বাগত জানান তথ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য। ভারত-ফরাসী সাংস্কৃতিক বিনিময়ের সাফল্য কামনা করে বক্তৃতা দেন ফরাসী কনসাল জেনারেল। এই উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছে লাইট হাউস সিনেমায়।

ফরাসী চলচ্চিত্র উৎসব ভারত-ফরাসী সাংস্কৃতিক বিনিময়সূচী অনুসারে সরকারিভাবে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই উৎসবে সাতটি ফরাসী পূর্ণাঙ্গ কাহিনীচিত্র এবং স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি দেখান হচ্ছে। সাধারণ দর্শকদের জন্য টিকেট কেটে ছবিগুলি দেখার ব্যবস্থা হয়েছে। ফলে দর্শকের মধ্যে এই ফরাসী ছবি দেখার জন্য বেশ আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। ইতিপূর্বে দিল্লীতে এই ছবিগুলি দেখান হয়েছে এবং দু-একটি ছবি একশ্রেণীর দর্শকদের কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় হওয়ার সংবাদ পত্রিকায় পড়ে এখানেও আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। টিকেটের উচ্চমূল্যে চোরাকারবারের খবরও পাওয়া গেছে। সাংস্কৃতিক বিনিময় চুক্তির ক্ষেত্রে এরূপ ছবি ফিল্ম ফেডারেশনের মাধ্যমে দেখান হলে যে সুফল হত এরূপে ব্যবস্থায় তা হয় না। বর্তমান ব্যবস্থায় ফরাসী ছবির শিল্পরীতি ও বিকাশ বুঝতে আগ্রহী অপেক্ষা

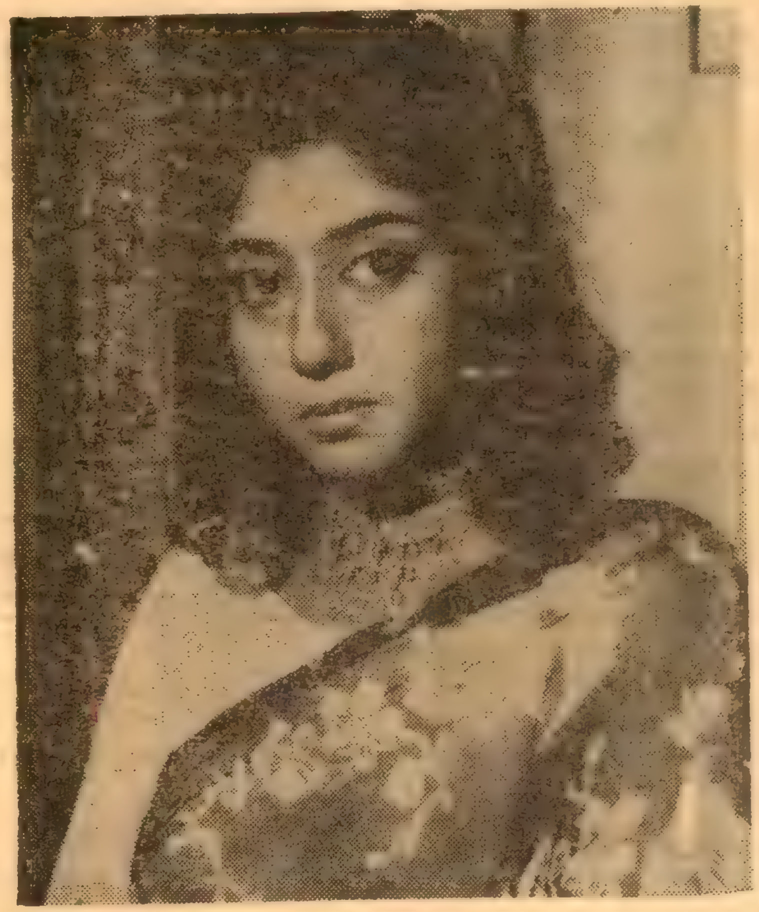

'শান্তি' ছবিতে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

ফরাসী ছবি 'দি গ্রেট লাভ'-এ পিয়ারে এতেক্স ও নিকোলে কাফান

বিনামজুরীকৃত ছবির দর্শক বৃদ্ধি হয় মাত্র।

'ডিসকভারী অব্ ইন্ডিয়া'

সম্প্রতি হিন্দী হাই স্কুল হলে নৃত্যাভিনেতা হিরণ্ময় এক নতুন ফিচার পরিবেশন করলেন। এই ফিচার ৬টি পরিকল্পনায় সম্বলিত। প্রথম 'প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা' মানব যখন আগুনের ব্যবহার জানত না, কাঁচা মাংস খেয়ে

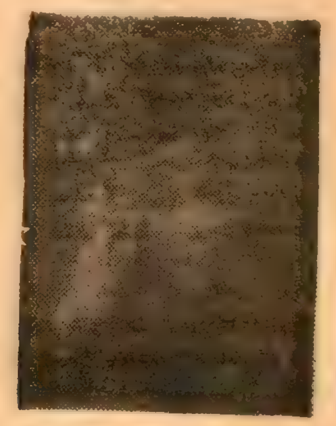

নৃত্যাভিনেতা হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায়

থাকত। তারপর সভ্যতার বিকাশ লাভ হল, আগুনের ব্যবহার জানল। তারপর 'রামায়ণ ও মহাভারতের যুগ' এ যুগে পিতৃভক্তি ও পতিভক্তির নিদর্শন ও ধর্মযুদ্ধে অধর্মের বিনাশ। 'বৌদ্ধযুগ' শান্তি ও মৈত্রের প্রতীক। জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুতে পীড়িত মানবের কাছে পথ দেখালেন বুদ্ধদেব। 'মোগল যুগ' হিংস্রতার প্রকট নিদর্শন। 'ব্রিটিশ যুগ' অত্যাচারী ও শোষণের নিদর্শন। এল '৪২'-এর আন্দোলন ও মন্বন্তর। নিপীড়িত মানবের কান্না। 'শেষের দৃশ্যটি এই 'স্বাধীন যুগ' অনেক স্বপ্নের এই স্বাধীনতা। বহু পরিকল্পনা হচ্ছে কিন্তু বেকারত্ব বেড়েই চলেছে। তাই শিক্ষিত বেকারের ফিচারটি দেখিয়ে শেষ হল 'ডিসকভারী অব্ ইন্ডিয়া'। শিল্পী হিরণ্ময়ের ফিচারটি প্রশংসার দাবি রাখে। আলোকসম্পাতে ছিলেন বিমল দাস।

পান্নালাল ঘোষ মেমোরিয়াল সোসাইটি

গত ১০ই আগস্ট, রবিবার ১০/১ হিন্দুস্থান রোডে, স্বর্গীয় পান্নালাল ঘোষের ৫৮তম জন্মবার্ষিকী প্রতিপালিত হয়।

সম্পাদক শ্রীসুনীল ঘোষ তাঁর ভাষণে বলেন, সকল সঙ্গীতানুরাগীদের নিকট একান্ত প্রার্থনা যে, তাঁরা যেন এই সোসাইটির উদ্দেশ্যগুলি সাফল্যমণ্ডিত করতে সর্বতোভাবে সহায়তা করেন।

এরপর উদীয়মান শিল্পী মনোজশঙ্কর সেতারে দেশ রাগ (বিলম্বিত ও দ্রুত) বাজিয়ে শোনান। তাঁর সঙ্গে তবলা সংগত করেন শ্রীদুলাল রায়। তাঁদের অনুষ্ঠানটি অতি সুমধুর হয়েছিল। এরপর প্রখ্যাত গায়িকা শ্রীমতী অপর্ণা চক্রবর্তী নট বেহাগ রাগে তাঁর স্বকীয় ভঙ্গিতে খেয়াল গান করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। তবলা সংগতে ছিলেন শ্রীঅরুণ ঘোষ এবং সারেঙ্গীতে রামনাথ মিশ্র। তিনি পরেও বাগেশ্রী রাগে একটি খেয়াল পরিবেশন করেন। অবশেষে শ্রীঅমর বসুমজুমদারের পান্নালাল ঘোষ সম্বন্ধে একটি কবিতা পাঠের পরই অনুষ্ঠান শেষ হয়।

পাঠক মন

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ
প্রসঙ্গে

আপনার পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত রচনা 'সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ' আমাদের খুব ভালো লাগছে। রচনাটি নিঃসন্দেহে তথ্যপূর্ণ ও যুগোপযোগী। সুভাষচন্দ্র-কালীন ভারতবর্ষের নিখুঁত একটি চিত্র উপস্থাপনের লেখক সার্থক। নামকরণের পরিবর্তন আমাদের বিশেষভাবে খুশি করেছে। কিন্তু এ রচনার একটি বিষয় সম্পর্কে লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন মনে করি।

লেখক সেকালীন ঘটনাগুলির নিখুঁত এবং বিশ্বস্ত বিবরণ উপস্থাপনের জন্য তৎকালীন নানা পত্রিকার সংবাদ ও সম্পাদকীয়ের সাহায্য গ্রহণ করেছেন—সেগুলি অধিকাংশই ইংরাজী ভাষায় রচিত। এমন কি এক-একটি সংখ্যা পুরোপুরি ইংরাজী ভাষাতেই রচিত বলা যেতে পারে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, ঐ বিদেশী ভাষাটির সংগে অন্তরংগতা এদেশের বহু মানুষেরই নেই এবং তাঁরা যে পাঠক হিসাবে অপাংক্তেয় এ কথাও কেউ বলতে পারেন না। পত্রিকাগুলির কঠিন ইংরাজী এবং প্রত্যক্ষ পরিস্থিতির বর্ণনা তাই রচনাটিকে সেইসব সাধারণ মানুষের কাছে ক্রমশই বিরক্তিকর ও ক্লান্তিকর করে তুলছে। যদি উদ্ধৃত অংশগুলি স্বচ্ছ বাংলায় অনুবাদ করে দেওয়া থাকে তবে সাধারণ পাঠকের রচনাটি আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারে।

বাংলাদেশের প্রাণের মানুষ সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে সকল তথ্য এবং সকল মন্তব্য জানার আগ্রহ এদেশের ইংরাজী-না-জানা অসংখ্য মানুষের মনেও সমান রয়েছে। সেদিকে দৃষ্টি রেখে যদি রচনাগুলির অনুবাদ করে দেওয়া সম্ভব হয় তবে লেখক অসংখ্য পাঠকের আন্তরিক শুভেচ্ছা পাবেন।

—শ্রীমতী মায়া ভট্টাচার্য
ও
—শ্রীমতী লিলি ভট্টাচার্য
৩, রায়পাড়া বাইলেন।
॥ সিঁথি ॥ কলিঃ—৫০

লেখকের কৈফিয়ৎ

শ্রীমতী মায়া ভট্টাচার্য এবং শ্রীমতী লিলি ভট্টাচার্য আমার লেখার বিষয়ে সাধারণভাবে যে সন্তোষপ্রকাশ করেছেন, তার জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে তাঁরা কিছু সমালোচনাও করেছেন, তার জন্যও তাঁরা ধন্যবাদের পাত্রী, কারণ সেই সমালোচনার সূত্রে সকল পাঠকের কাছে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার করে নেওয়ার সুযোগ আমি পাচ্ছি।

ভট্টাচার্য মহোদয়ারা আমার লেখায় ইংরেজীর বাহুল্য বিষয়ে আপত্তি জানিয়ে বলেছেন, তার ফলে সাধারণ পাঠকের লেখাটি 'ক্লান্তিকর ও বিরক্তিকর' ঠেকছে। তাঁদের এই নিন্দা আমি মাথা পেতে নিচ্ছি। এই সঙ্গে একথা আমি জানাতে পারি, কোনো বাংলা রচনায় ইংরেজী উদ্ধৃতির বাহুল্য সম্বন্ধে তাঁদের অপেক্ষা আমার মনোভাব কঠোরতর। এ ব্যাপারে পত্র লেখিকারা আমার লেখার বিরুদ্ধে যে অভিযোগ করেছেন, অন্যের লেখা সম্বন্ধে অনুরূপ ক্ষেত্রে আমিও একই অভিযোগ করতাম; এবং—নিজের কাছেও নিজের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ করেছি। তবু ঐ আকারে ইংরেজী উদ্ধৃতিগুলি রেখেছি কেন?

মূল কারণ, উদ্ধৃতিগুলিকে আমি ঠিক এক্ষেত্রে উদ্ধৃতি বলতে ইচ্ছুক নই—উপাদান বলাই সঙ্গত। আমি সুভাষচন্দ্রের কোনো সাধারণ জীবনী লিখছি না; তাঁর সম্বন্ধে তথ্যসন্ধান (বা গবেষণা, যা বলেন) করছি, এবং বহু তথ্য সংগ্রহও করেছি। এই তথ্যগুলিকে সুভাষচন্দ্রের জীবনীর পক্ষে, তাঁর বিষয়ে মননমূলক রচনার পক্ষে, সমসাময়িক ইতিহাসের পক্ষেও মূল্যবান মনে করি। সেই কারণে ঐ সব তথ্যের যথাযথ পরিবেশনও দরকার, যাতে বর্তমানে বা ভবিষ্যতে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে যাঁরা লিখতে যাবেন, অথচ এই ধরণের তথ্য সংগ্রহের পরিশ্রম করবেন না—তাঁরা তথ্যগুলি থেকে সাহায্য নিতে পারবেন। একথা ঠিক, ইংরেজী কাগজের উদ্ধৃতগুলির বাংলা করে দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সর্বক্ষেত্রে বাংলা করলে অসুবিধাও ঘটতে পারত। প্রথমত, আমার অনুবাদে ভুল হতে পারে (অবশ্যই তা থাকে), দ্বিতীয়ত, অনুবাদকালে আমি ইচ্ছাকৃতভাবে তথ্যবিকৃতি ঘটাতেও পারি। এ সব ক্ষেত্রে মূল উদ্ধৃত করাই ভালো। আরও একটি বিষয় আমার মনে উঠেছিল। কলকাতার কাছে থাকার জন্য জাতীয় গ্রন্থাগারে পুরাতন সংবাদপত্র আমরা ইচ্ছামত দেখতে সমর্থ। কিন্তু যাঁরা দূরে আছেন তাঁদের সে সুযোগ নেই। দূরদর্শী কেউ সুভাষচন্দ্র বিষয়ে ইংরেজীতে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে উদ্ধৃতিগুলি ব্যবহার করতে চাইতে পারেন। সেক্ষেত্রে ইংরেজী সংবাদপত্রগুলির দরকারী অংশ মূলে পেলে তাঁদের সুবিধা হবে।

ইংরেজী উদ্ধৃতি যখন অতিরিক্ত পরিমাণে দিচ্ছিলাম, তখন ঐ সব কথা ভেবে নিজের সঙ্কোচ জয় করেছি। তাহলেও ব্যাপারটা মনে খোঁচা দিচ্ছিল; শেষের দিকে তাই ইংরেজী উদ্ধৃতিগুলিতে যথাসম্ভব ফুটনোটে ঠেলে দিয়েছি, যা ইংরেজী না-জানা বা ইংরেজী-বিরক্ত পাঠক স্বচ্ছন্দে বাদ দিয়ে যেতে পারেন। তাছাড়া অধিকাংশক্ষেত্রে আমি ইংরেজী উদ্ধৃতি দেওয়ার আগে উদ্ধৃতিগত বিষয়ের একটি চুম্বক দিয়ে দিয়েছি।

পত্রলেখিকারা শুধু ইংরেজী উদ্ধৃতির বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে আপত্তি করেছেন, আরও একটি আপত্তি এই সঙ্গে করতে পারতেন—আলোচ্য লেখায় ফুটনোটের সংখ্যা ও আকার যে কোন ভদ্র পরিমাপ ছাড়িয়ে গেছে। এক্ষেত্রেও আমার কিছু কৈফিয়ৎ আছে। আমার হাতে এত বেশি তথ্য জমে গিয়েছে, যেগুলি মূল রচনায় প্রবেশ করানো যায় না, অথচ একেবারে অপ্রাসঙ্গিক নয়। সেগুলি ফুটনোটে ঠেসে দিতে হচ্ছে, যদিও জানি, তার ফলে লেখার গতি হ্রাস হচ্ছে। এখানেও উপায়ান্তরহীন হয়েই তা করছি। এবং তা করছি সাপ্তাহিক বসুমতীর উদার আতিথ্যের সুযোগ নিয়ে। পাঠক-পাঠিকাকে ভরসা দিয়ে বলতে পারি, ইংরেজী উদ্ধৃতি ও ফুটনোট প্রভৃতির দ্বারা আমার বক্তব্যের প্রামাণিকতা যখন স্বীকৃত হয়ে যাবে, তারপরে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় লেখাটি থেকে যথাসম্ভব ইংরেজী উদ্ধৃতি বাদ দেব বা সংক্ষেপ করব এবং ফুটনোটের সংখ্যা ও আকার কমাতেও সচেষ্ট থাকব।

অকপটে আমার বক্তব্য জানালাম। এই সুযোগ দেবার জন্য পত্রলেখিকা দুজনের কাছে পুনশ্চ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

—শঙ্করীপ্রসাদ বসু

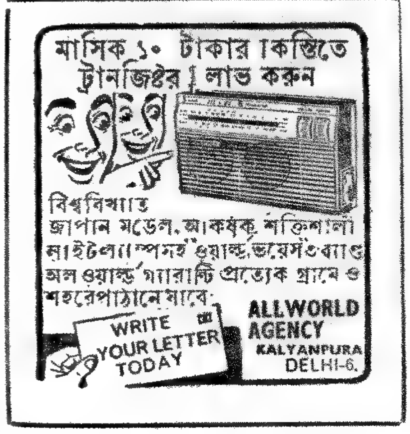

খেলাধুলা

ফুটবল পরিস্থিতি

ফুটবল খেলায় সমস্ত বিশ্ব যখন এগিয়ে চলেছে, যখন এশিয়ার প্রতিটি দেশ ফুটবল খেলায় হয় যথেষ্ট উন্নতি করে ফেলেছে, না হয়তো উন্নতি করার জন্যে অপ্রাণ চেষ্টা করছে তখনো আমরা বসে আছি হাত গুটিয়ে। আমাদের ভাবখানা এই যে, যেন আর কিছুই করার নেই, সব করা হয়ে গেছে—এখন বাকী শুধু বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশীপের সম্মান অর্জন করা! তাও বোধহয় হয়ে যাবে! আসছে বছর তো বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার আসর বসছে মেক্সিকো শহরে। জুলে রিমে কাপটা না হয় সেই থেকেই বয়ে আনবেন ভারতীয় খেলোয়াড়রা! হাসছেন? হাসি পাবারই কথা বটে। কিন্তু এর চেয়ে নির্মম ঠাট্টা আর কি হতে পারে। এই ঠাট্টাটা একবার আমাদের ফুটবল কর্তৃপক্ষর কাছে করে দেখাবেন ওঁরাও হাসবেন। তবে ওঁরা হাসবেন এমনভাবে যাতে ঐ হাসি দিয়েই বুঝিয়ে দেওয়া যায় যে একটা অত্যন্ত হাল্কা ধরণের গুরুত্বহীন প্রশ্ন করা হয়েছে। আর ঐ ঠাট্টাটা যদি কোন খেলোয়াড়ের কাছে করা হয় তাহলে তিনি নির্ঘাৎ কষে গাট্টা লাগাবেন ঠাট্টাকারীর মাথায়। কারণ খেলোয়াড়দের কাছে ঐ প্রশ্ন শুধুমাত্র অসম্ভবই নয় অমূলকও বটে। কারণ বাস্তব তো দূরের কথা—স্বপ্নেও বোধহয় তাঁরা ও কথা ভাবতে পারতেন না। অথচ ঠিক এমনটি তো হবার কথা নয়। ফুটবল খেলায় ভারতের আরো অনেকখানি উন্নতি করার প্রয়োজন। আর যাই হোক বিশ্ব ফুটবল কাপের খেলায় অদূর ভবিষ্যতে ভারতের যোগদানের সম্ভাবনা যে এতটুকুও নেই—সে কথা বোধহয় যে কেউই হলপ করে বলতে পারেন। বিশ্ব কাপের কথা না হয় থাক। কিন্তু এশিয়া তথা বিশ্ব ফুটবলের এই অগ্রগতির দিনে ভারত যে কেন পিছিয়ে পড়ছে তার কারণ খুঁজে বের করতে হবে। খোঁজারই বা কি আছে—এ কথা তো সবারই জানা যে আমাদের স্বার্থসর্বস্ব কর্তৃপক্ষের অসহায়তা আর খেলোয়াড়দের আন্তরিকতার অভাবের জন্যে বাংলা তথা ভারতীয় ফুটবল দিনের পর দিন পিছিয়ে পড়ছে। অথচ সেদিকে নজর দেবার মতো সময় বোধহয় কারো হাতেই নেই, কিম্বা কেউ হয়তো এ ব্যাপারে সময় নষ্ট করতে চান না বলেই চুপ করে থাকেন। আর সেই চুপ করে থাকার সুযোগ নিয়ে নিজেদের অবস্থাটা ভালোভাবে গুছিয়ে নিতে সমর্থ হয়েছে অনেক দেশই। তাই ছোট ছোট অনেকগুলি দেশ ফুটবল খেলায় অনেক এগিয়ে গেছে! শুধু তাই নয় তারা এখন বলে বলে ভারতকে গোল করতে পারে। আর ভারত যেখানে ছিল আজো সেইখানেই আছে। এ কথা বললেও বোধহয় ভুল করা হবে—বরং বলতে হবে যে ভারতীয় ফুটবলের মান শুধু নেমেই যায় নি—ইচ্ছে করে অনেকখানি নামিয়ে আনা হয়েছে। এর জন্যে কর্তৃপক্ষের সংগে সমান অংশে খেলোয়াড়রাই দায়ী। খেলোয়াড়রা এখন শুধু নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত। ফলে যা হওয়ার তাই হয়েছে। স্বার্থেভরা খেলোয়াড়দের মধ্যে আন্তরিকতার অভাব বড় বেশি। তাই খেলার ধারা যেমন বদলে যাচ্ছে খেলার মানও যাচ্ছে নেমে। অথচ খেলোয়াড়রা আজকাল কতো সুযোগই না পাচ্ছেন। চাকরির সুবিধে, খেলার সুবিধে আরো কতো সুবিধে পাচ্ছেন তাঁরা। শুধু তাই নয়—কারো কারো পকেটে আবার ডলারও থাকছে। সুতরাং......সুতরাং এ কথা আজ মেনে নিতেই হবে যে, আমরা পড়ে পড়ে শুধু মার খাবো আর দেখবো অন্য দেশগুলোর এগিয়ে যাওয়া। —শান্তিপ্রিয়

ফুটবল ফুটবল

এবছরের লীগ ফুটবলের আসর প্রায় শেষ হয়ে গেলো। শনিবার দিন মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের মধ্যের সুপার লীগের খেলার ফলাফলেই লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপের প্রশ্ন এক রকম মিটে গেছে।

শনিবারের খেলার আগে মোহনবাগান হারিয়েছিল বি· এন· আর-কে, হারিয়েছিল পোর্ট কমিশনার্সকে আর হারিয়েছিল বাটাকে। পক্ষান্তরে পোর্টের কাছে একটা পয়েন্ট খোয়ানোর পরে ইস্টবেঙ্গল বাটাকে পরাজিত করে মোহনবাগানের থেকে এক পয়েন্ট পিছিয়ে ছিল। বি এন আর বনাম ইস্টবেঙ্গলের খেলাটা নির্ধারিত দিনে অনুষ্ঠিত হয় নি।

লীগের পর শীল্ডের খেলা নিয়ে কলকাতার ফুটবল জগৎ এখন সরগরম। ২৭শে অগস্ট থেকে আরম্ভ হচ্ছে আই এফ এ শীল্ডের খেলা। এ বছরের আই এফ এ শীল্ডে যোগদানকারী বাইরের দলগুলোর মধ্যে আছে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, পাঞ্জাবের লীডারস ক্লাব, দেরাদুনের গুর্খা রেজিমেন্ট, বম্বের মফতলাল গ্রুপ মিলস, অন্ধ্রপ্রদেশ একাদশ, ইন্ডিয়ান নেভী, গোয়ার ভাস্কো ক্লাব, ব্যাঙ্গালোরের ই এম ই সেন্টার প্রভৃতি।

২৭শে আগস্ট খেলা আরম্ভ হবে। কলকাতার প্রধান দল মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গল মাঠে নামবে সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে। আই এফ এ শীল্ডে ফাইন্যাল খেলার দিন ঠিক হয়েছে ১৮ই সেপ্টেম্বর।

আই এফ এ শীল্ডের খেলা প্রতি অর্ধে ৪৫ মিনিট করে মোট ৯০ মিনিট অনুষ্ঠিত হবে।

গত দু'বছর আই এফ এ শীল্ডের খেলা শেষ হয় নি। তাই এ বছর বাইরের অনেকগুলো নাম করা দল শীল্ডের খেলায় যোগদানে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে। শুধু তাই নয়, ভারতের শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা আই এফ এ শীল্ড এখনকার পরিচালকদের পাল্লায় পড়ে তার পুরনো ঐতিহ্য হারাতে বসেছে। তাই ফুটবল-রসিকরা সকলেই চাইছেন যে, এ বছর অন্তত আই এফ এ শীল্ডের খেলা শেষ পর্যন্ত শেষ হোক।

কলকাতার মহামেডান স্পোর্টিং দলও আই এফ এ শীল্ডের খেলায় যোগ দিয়েছে। তবে তারা আগে ঘোষণা করেছিল যে, কলকাতার খেলোয়াড়দের পরিচালনায় তারা আর খেলবে না। তবে কি তাদের মতের পরিবর্তন হয়েছে?

নিচে আই এফ এ শীল্ড খেলার সম্পূর্ণ ফিক্সচার দেওয়া হলো :

প্রথম রাউন্ড

(ক) কুমারটুলী ইনঃ : হাওড়া জেলা এসোঃ

(খ) ২৪ পরগনা জেলা এসোঃ : চন্দননগর জেলা এসোঃ

দ্বিতীয় রাউন্ড

(১) বিজয়ী (ক) : স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাব

(২) দিল্লী ফুটবল এসোঃ : বি এন আর রিক্রিঃ

(৩) বালী প্রতিভা : রাজস্থান ক্লাব

(৪) জামালপুর স্পোর্টিং এসোঃ : মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব

(৫) কালীঘাট ক্লাব : এয়ার ফোর্স এস সি

(৬) ৫৮শ গুর্খা রেজিমেন্টাল সেন্টার দেরাদুন : বাটা স্পোর্টস

(৭) হরিয়ানা এফ এ : জর্জ টেলিগ্রাফ ইনঃ

(৮) কটক সম্মিলিত দল : উয়াড়ী এ সি

(৯) এ এস সি সেন্টার সাউথ (ব্যাঙ্গালোর) : পোর্ট কমিশনার্স

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল শ্রী ডি· এন· সিংহ শনিবার খেলার আগে মোহনবাগানের গোলরক্ষক বলাই দে'র সঙ্গে করমর্দন করছেন। পাশে আই· এফ· এ'র সভাপতি মাননীয় বিচারপতি শ্রী এন· সি· তালুকদারকে দেখা যাচ্ছে।

(১০) মধ্যপ্রদেশ এফ এ : এরিয়ান্স ক্লাব
(১১) করণপুর ইউনাইটেড ক্লাব : খিদিরপুর স্পোর্টিং ক্লাব
(১২) বিজয়ী (খ) : ইস্টার্ন রেলওয়ে এস সি

তৃতীয় রাউণ্ড

(গ) বিজয়ী (১) : মোহনবাগান ক্লাব
(ঘ) বিজয়ী (২) : বিজয়ী (৩)
(ঙ) বিজয়ী (৪) : বিজয়ী (৫)
(চ) বিজয়ী (৬) : স্টেট ব্যাঙ্ক (বোম্বাই)
(ছ) বিজয়ী (৭) : ইস্টবেঙ্গল ক্লাব
(জ) বিজয়ী (৮) : বিজয়ী (৯)
(ঝ) বিজয়ী (১০) : বিজয়ী (১১)
(ঞ) বিজয়ী (১২) : পাঞ্জাব এফ এ

ক্রিকেটের খবর

প্রথমে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আর পরে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে খেলার ধারা দেখে মনে হচ্ছে ইংলণ্ড বুঝি ফিরে পেতে চলেছে তাদের হারিয়ে যাওয়া শ্রেষ্ঠত্বের সম্মান। তবে একথা ঠিক যে, সমস্ত বিশ্বে এখন ক্রিকেট খেলার মান কিছুটা নিম্নমুখী, আর তার মধ্যে ইংলণ্ড মোটামুটিভাবে স্টেডি আছে।

দ্বৈত সফরে এসে ইংলণ্ডের কাছে রাবার খুইয়ে গেছে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ। আর এবার হারাতে চলেছে নিউজিল্যাণ্ড। প্রথম টেস্টে হেরে যাবার পর, দ্বিতীয় টেস্টে নিউজিল্যাণ্ড বৃষ্টির হাত থেকে রেহাই পেয়েছে। ইংলণ্ড এখন তাই ১—০ টেস্টে এগিয়ে আছে।

যাই হোক নিউজিল্যাণ্ডের ব্যাটসম্যানরা মোটামুটি ভালোই খেলেছিলেন প্রথম ইনিংসে। হেসটিংস ৮৩, কংডন ৬৬, হ্যাডলে ৩৫ নঃ আঃ, মারে ২৩, ওয়ারড্সওয়ার্থ ২১ রান করায় ইংলণ্ডের রান সংখ্যা ২৯৪-এ গিয়ে দাঁড়ায়। ইংলণ্ডের ওয়ারড ৪টি উইকেট পেয়েছিলেন ৬১ রানের বিনিময়ে।

ইংলণ্ডের ওপেনিং ব্যাটসম্যান বয়কট শূন্য রানে মজের বলে আউট হলে কি হবে—জন এডরিচ আর জিম শার্প দু সহজেই ঘুরিয়ে দিলেন খেলার মোড়। এডরিচ আর শার্প দুজনেই সেঞ্চুরী করলেন। কিন্তু বৃষ্টির জন্যে খেলার ধারা ব্যাহত হতে লাগলো বিশ্রীভাবে। দ্বিতীয় টেস্টের তৃতীয় দিনে খেলা হলো মাত্র ১৮ মিনিট।

গল্প হলেও সত্যি

বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা শুরু হবার সময় আবার হয়ে এলো। আবার জুলে রিমে কাপের খেলা নিয়ে পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশের ফুটবল রসিকরা আশা-নিরাশার দোলায় দুলবেন। জয়-পরাজয়ের আনন্দে আর দুঃখে ভরে উঠবে অনেকের মন।

এই ফাঁকে আমারও তাই একবার ১৯৬৬ সালের বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার আয়-ব্যয়ের হিসেবের ওপর চোখ বুলিয়ে নিই। একটি মাত্র প্রতিযোগিতার জন্যে বোধহয় এতো টাকার হিসেব আর কোন খেলাতেই করতে হয় না।

১৯৬৬ সালের বিশ্ব কাপের খেলা থেকে মোট আয় হয়েছিল—৪ কোটি ২৭ লক্ষ ২৬ হাজার ৪১৫ টাকা।

খেলাগুলোর জন্যে উদ্যোক্তারা খরচ করেছিলেন—১ কোটি ২৬ লক্ষ ৪২ হাজার ৬৫ টাকা আর তাঁদের লাভ হয়েছিল—২ কোটি ৯১ লক্ষ ৮৪ হাজার ৪৩০ টাকা।

মূল প্রতিযোগিতার ৩২টি খেলায় উপস্থিত ছিলেন—১৫ লক্ষ ১৪ হাজার ৬৭৭ জন দর্শক।

ফুটবল খেলা নিয়ে এমন একটা এলাহি কাণ্ডের কথা ভাবতেও অবাক লাগে। কোটি কোটি টাকার হিসেবের দিকে তাকালে ঠিক যেন বিশ্বাসও হতে চায় না। হবেই বা কি করে—বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার মতো এলাহি কাণ্ডের কোন ধারণাই যে নেই আমাদের...।

শেষ পর্যন্ত বৃষ্টির মধ্যে খেলে ইংলণ্ড তাদের প্রথম ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করলো ৮ উইকেটে ৪৫১ রানের মাথায়। এর মধ্যে এডরিচ করলেন ১৫৫ রান, শার্প ১১১। নিউজিল্যাণ্ড ১ উইকেটের বিনিময়ে ৬৬ রান করার পর খেলার সময় পার হয়ে যায়।

সমাচার দর্পণ

মেয়েদের গোলা ছোড়ায় রাশিয়ার মেয়ে নাফেজফা শিজোভা নতুন বিশ্ব রেকর্ড স্থাপন করেছেন। পোল্যাণ্ডের চেরজোর অনুষ্ঠিত পোল্যাণ্ড পূর্ব জার্মানি ও রাশিয়ার মিলিত স্পোর্টস অনুষ্ঠানে শিজোভা ৬৫ ফুট ১১ ইঞ্চি অর্থাৎ ২০·০৯ মিটার দূরে গোলা ফেলে নতুন রেকর্ড স্থাপন করেছেন। অবশ্য বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী ছিলেন শিজোভা নিজেই।

* * *

আগামী সেপ্টেম্বর মাসে আসামে অনুষ্ঠিত হবে এবারের জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা—সন্তোষ ট্রফির খেলা। কোথায় খেলা হবে তা এখনো পাকা না হলেও, গৌহাটিতে যাতে প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয় তার জন্যে সকলেই চেষ্টা করছেন।

* * *

দারা সিং-কে আবার বোধহয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতে হবে। এবার তাঁকে লড়াই-এ আহ্বান জানিয়েছেন পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার ৩৫ বছরের জোয়ান গুরুমেল সিং। গুরুমেল সিং জানিয়েছেন যে, তিনি দারা সিং-এর সংগে ভারতের যে-কোন স্থানেই লড়তে রাজী আছেন।

* * *

দাঙ্গা-হাঙ্গামার জন্যে এবারকার মারডেকা ফুটবল প্রতিযোগিতা অনেকদিন পিছিয়ে গেছে। এই প্রতিযোগিতা কুয়ালালামপুরে অনুষ্ঠিত হবে অক্টোবর মাসের ৩০ তারিখ থেকে নভেম্বর মাসের ১০ তারিখ পর্যন্ত। এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করবে বলে ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছে ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া, সিংগাপুর, থাইল্যাণ্ড ও ইন্দোনেশিয়া।

পরিচিতিতে

নবীন ও প্রবীণ

খেলোয়াড়দের

অনুপ্রেরণা স্যার স্ট্যানলী

ম্যাথিউজ

খবরটা পেয়ে স্ট্যানলী থ। ঠিক যেন বিশ্বাস করতে পারছিলেন না।

বার্কেটের পায়ে চোট লেগেছে, তাই তাঁর স্থানে ইংলন্ড দলের রাইট উইং-এ খেলার জন্য তাঁকেই মনোনীত করেছেন কর্তৃপক্ষ। দুর্ধর্ষ জার্মানীর বিরুদ্ধে খেলবে তরুণ খেলোয়াড় স্ট্যানলী ম্যাথিউজ। চিন্তা আর ভাবনায় অস্থির হয়ে উঠলেন স্ট্যানলী। অমন শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে অতো বড় খেলায় সে কি ঠিকমতো খেলতে পারবে? অথচ এতবড় সুযোগ আর হয়তো সে কোনদিনই পাবে না। তবু ভয় কাটে না।

দেখতে দেখতে এসে গেল সেই দিনটি। ১৯৩৫ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর। প্রকাণ্ড উইম্বেলে স্টেডিয়ামে হিটলারের জার্মানীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হলো ইংলন্ড।

ম্যাথিউজ কিন্তু খুব একটা সুবিধে করতে পারছিলেন না। জার্মানীর লেফট ব্যাক মুয়েনজেনবার্গের সামনে বার বার অসহায় হয়ে পড়ছিলেন তিনি। আর মুয়েনজেনবার্গও খুব সহজেই তাঁর পা থেকে বল কেড়ে নিচ্ছিলেন। মুয়েনজেনবার্গের সামনে এলেই ম্যাথিউজের সব কিছু কেমন যেন গুলিয়ে যাচ্ছিলো। ম্যাথিউজের মনে হচ্ছিলো যে তাঁর সামনে মুয়েনজেনবার্গ ঠিক যেন চীনের প্রাচীরের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছেন। হাজার চেষ্টা করেও মুয়েনজেনবার্গ-রূপ সেই প্রাচীর ডিঙিয়ে বল নিয়ে গিয়ে হাজির হতে পারলেন না জার্মানীর গোলের সামনে।

শেষ পর্যন্ত বুদ্ধি খাটিয়ে ম্যাথিউজ বল নিয়ে ছুটতে শুরু করলেন মুয়েনজেনবার্গের দৃষ্টি এড়িয়ে। সকলকে কাটিয়ে একেবারে গোলের মুখে গিয়ে পৌঁছুলেন স্ট্যানলী। সামনে শুধু গোলরক্ষক। একা এবং অসহায়। নির্ঘাৎ গোল। শুধু শটটা নিলেই হলো। জার্মানীর গোলরক্ষক কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন দেখে নিয়ে শট করলেন ম্যাথিউজ। কিন্তু ও কি হলো! তাঁর শটের সংগে সংগে খানিকটা ঘাস ছিঁড়ে এলো আর ধুলো উড়লো—সেই সংগে বলটাও গড়াতে গড়াতে গিয়ে পৌঁছুলো গোলরক্ষকের হাতে। ম্যাথিউজ চোখে অন্ধকার দেখলেন আর কানে তাঁর ভেসে এলো হাজার হাজার দর্শকের নিরাশ-ধ্বনি।

লজ্জায় যেন মাটির সংগে মিশে যেতে চাইলেন তিনি। মুখ তুলে তাকাবার ক্ষমতাও যেন নেই। এ কি হলো...এ কি খেললেন তিনি? এতোদিনের এতো সাধনার, এতো পরিশ্রমের এই কি প্রতিফল? সেই খেলায় ইংলন্ড তিন গোলে জিতেছিলো। কিন্তু বিজয় উৎসব এড়িয়ে ট্রেনে চেপে বাড়ি ফিরে এলেন স্ট্যানলী ম্যাথিউজ। লজ্জায় বাবার সংগে পর্যন্ত কথা বলতে পারলেন না তিনি।

সে যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মুষ্টিযোদ্ধা জ্যাক ম্যাথিউজকে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে আসতে হলো ছেলের ভাঙা মনে সমবেদনার প্রলেপ লাগাতে। জ্যাক একটু একটু করে বোঝাতে লাগলেন স্ট্যানলীর ব্যর্থতার কারণগুলো। তিনি বললেন, কোন সময়ই মনোবল হারালে চলবে না, কিছুতেই চলবে না কোন খেলোয়াড়কেই তোমার ওপর প্রাধান্য বিস্তার করার সুযোগ দেওয়া।

বাবার উৎসাহ, বাবার অনুপ্রেরণায় স্ট্যানলী নতুন মনোবল নিয়ে আবার খেলতে শুরু করলেন। আর তার পরই দেখতে দেখতে ফুটবল প্রতিভায় ভাস্বর হয়ে উঠলেন স্ট্যানলী ম্যাথিউজ।

ছোটবেলা থেকে জ্যাকের তীক্ষ্ণ নজর ছিল ছেলে স্ট্যানলীর ওপর। প্রথম থেকেই স্ট্যানলীকে গড়ে-পিটে মানুষ করছিলেন তিনি। ভোরে উঠে রোজ তাঁকে ব্যায়াম করতেই হতো আর হাঁটতে হতো দীর্ঘ পথ। তাই পঞ্চাশ বছর বয়সেও স্ট্যানলী খেলে গেছেন তরুণ যুবকের মতো। শরীরের ওপর পড়ে নি তাঁর এতটুকুও বার্ধক্যের ছাপ।

পনেরো বছর বয়স থেকে স্টোক সিটি ক্লাবের পক্ষে খেলতে শুরু করেন স্ট্যানলী। ষোল বছর একনাগাড়ে ঐ ক্লাবের পক্ষে খেললেন তিনি। তারপর মতের মিল না হওয়ায় তিনি চলে গেলেন ব্লাকপুল ক্লাবে। সেখানেও খেললেন একটানা চোদ্দ বছর। আবার পুরোন ক্লাবে ফিরে গেলেন তিনি। আড়াই হাজার পাউন্ড ট্রান্সফার ফি দিয়ে স্ট্যানলীকে আবার ফিরিয়ে আনলেন স্টোক সিটি ক্লাব।

পঞ্চাশের ওপর বয়েস তখন স্ট্যানলী ম্যাথিউজের। কিন্তু ফুটবল মাঠে তিনি তখনো বিশ বছরের দীপ্ত যুবক। তবু আর খেলতে চাইলেন না তিনি। ১৯৬৫ সালে অবসর নিলেন ম্যাথিউজ। তখন তাঁর নাম ফুটবলের যাদুকর।

আর সেই যাদুকরকে সম্মানিত করতে এগিয়ে এলেন ইংলন্ডের রাণী এলিজাবেথ। বিশ্বের বিস্ময়, ফুটবলের যাদুকর, চিরনবীন স্ট্যানলী ম্যাথিউজ হয়ে গেলেন স্যার স্ট্যানলী ম্যাথিউজ। পেশাদার খেলোয়াড় হওয়া সত্ত্বেও অকল্পনীয় জনপ্রিয়তার সূত্রে ম্যাথিউজই প্রথম পেলেন 'স্যার' উপাধি। ম্যাথিউজের মতো চিরকাল ভালো আর বোধহয় কোন খেলোয়াড়ই খেলতে পারেন নি। ম্যাথিউজের নামে তাই শুধু নবীন নয়, প্রবীণ খেলোয়াড়রাও উৎসাহ পান।

প্রশ্ন উত্তর

স্বপনকুমার ও [illegible] (আসানসোল)

উত্তর : আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দু' একটি সংখ্যা আগেই প্রকাশিত হয়েছে। দেখেছেন নিশ্চয়ই।

প্রবীরকুমার ঘোষ (নতুনবাজার, বসিরহাট)

উত্তর : তোমার চিঠির উত্তর ব্যক্তিগতভাবে দিয়েছি। এতোদিনে নিশ্চয়ই পেয়েছো।

অমিত দত্ত (রায়গঞ্জ, পঃ দিনাজপুর)

উত্তর : আপনি কোন্ খেলা ভালোবাসেন জানালে আপনার অনুরোধ রাখার চেষ্টা করবো।

জীবনকুমার দত্ত (নিউ ব্যারাকপুর, ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন : ১৯৬৪, '৬৫, '৬৬ ও '৬৭ সালে ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের সাক্ষাৎকারের ফলাফল জানতে চাই।

উত্তর : দু'-এক সংখ্যা আগেই আপনার প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ করা হয়েছে দেখেছেন নিশ্চয়ই।

হিমাদ্রীকান্ত ব্যানার্জী (কাঁটালগুড়ি চা-বাগান জলপাইগুড়ি)

উত্তর : আপনার চিঠির কিছু অংশ তুলে দিলাম ঃ

"বলতে পারেন, ভিনু মানকাদ আজো কেন পেলেন না পদ্মভূষণ নিদেনপক্ষে পদ্মশ্রী খেতাব। অথচ কতোই না কৃতিত্বের অধিকারী এই মানুষটি। টেস্ট খেলায় প্রথম উইকেটে বিশ্ব রেকর্ডের সংগে তাঁর নাম জড়িত। সবচেয়ে কম খেলে সহস্র রান ও শত উইকেট লাভের কৃতিত্বও তাঁর। তিনিই ভারতবর্ষের একমাত্র খেলোয়াড় যিনি টেস্ট খেলায় করেছেন দ্বি-সহস্রাধিক রান ও নিয়েছেন দেড় শতাধিক উইকেট। টেস্টে ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে সব চেয়ে বেশি রান করার কৃতিত্বও তাঁর, টেস্ট খেলায় তিনি দু'বার করেছেন ডাবল সেঞ্চুরী। কিন্তু এই কৃতী মানুষটিকে উপযুক্ত সম্মান দিতে এত কার্পণ্য কেন ভারত সরকারের... ? ..."

সুভাষরঞ্জন দত্ত (নেতাজী বিদ্যাপীঠ, শ্রীপল্লীর কলোনী, পাণ্ডু)

প্রশ্ন : মহামেডান স্পোর্টিং দল বাংলাদেশের বাইরের রেফারী দিয়ে তাদের খেলাগুলো না খেলালে তারা খেলতে অসম্মতি জানিয়েছে। কিন্তু এর বিরুদ্ধে কি আই· এফ· এ অতিশয় কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন না?

উত্তর : কি জানি... ?

হীরেন্দ্রমোহন ভদ্র (সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি)

প্রশ্ন : ফুটবল খেলায় পেনাল্টি কিক করার পর বলটা গোল পোস্ট কিংবা গোলরক্ষকের হাতে লেগে ফিরে আসার পর অন্য একজন খেলোয়াড় গোল শট করে গোল করেন। এক্ষেত্রে গোল হবে কি?

উত্তর : হবে।

বলেনচন্দ্র রায় (আর· পি-এস· এফ·, নিউ জলপাইগুড়ি)

প্রশ্ন : বর্তমানে ফুটবল খেলায় পৃথিবীর মধ্যে ভারতের স্থান কোথায়?

উত্তর : কোথাও নয়...!

ভালো ফুটবল খেলোয়াড় হতে হলে প্রচুর পরিশ্রম করে খেলা শিখতে হবে আর অনুশীলন করতে হবে।

গুরুপ্রসাদ নাগ (দুর্গাপুর—৪, বর্ধমান)

প্রশ্ন : গত ২৬শে জুলাই '৬৯, ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের খেলায় ইস্টবেঙ্গলের পক্ষে শ্রীঅশোক চ্যাটার্জী যে গোল করেন তা নিয়ে যথেষ্ট বাক-বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে আপনার মত কি?

উত্তর : কিছু না...!

ঐ বিষয়ে অনেক জল তো ঘোলা হয়েছে, আর কেন?

তপন গুহরায় (অশোকনগর, ২৪ পরগনা) ও **তাপসকুমার বসু** (গারুলিয়া, দক্ষিণপাড়া, ২৪ পরগনা)

উত্তর : আপনাদের দুজনের চিঠি একই রকম এবং দু'জনে ঠিকই লিখেছেন। আপনাদের চিঠি অনুযায়ী মাঠের বাইরে থেকে খেলায় অংশ গ্রহণ করা এবং গোল করা সম্ভব। কিন্তু যার খেলায় যোগদানের কোন প্রশ্ন ওঠে না এবং খেলোয়াড় তালিকায় যার নামও নেই তার পক্ষে তো আর ঐভাবে গোল করা সম্ভব নয়। আমাদের উত্তরটি ছিল ঐ রকমই।

আপনারা যে বই-এর কথা উল্লেখ করেছেন—সেখানে ঠিকই লেখা আছে এবং ঐ নিয়মটির কোন পরিবর্তন হয় নি।

চিঠির জন্যে আপনাদের দু'জনকে ধন্যবাদ জানাই।

উত্তম সরকার (ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি)

প্রশ্ন : প্রথম ডিভিসন ফুটবলের সমস্ত দলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক কে? তিনি কোন দলে খেলেন?

উত্তর : আমার মতে ইস্টবেঙ্গলের থঙ্গরাজ।

অজয় বর্মণ (গৌহাটি, ছাত্রীবাড়ি রোড—৮)

প্রশ্ন : লীগের খেলায় ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের প্রথম সাক্ষাৎকারে কোন দল জিতেছিল? কয় গোলে?

উত্তর : ১৯২৫ সালে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগানের প্রথম সাক্ষাৎকারে ইস্টবেঙ্গল এক গোলে মোহনবাগানকে হারিয়ে দিয়েছিল।

একটির বেশি প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়।

মঞ্জুরঞ্জন দত্ত (জগাছা, হাওড়া)

উত্তর : খেলাধুলোর বিষয় ছাড়া অন্য কোন প্রশ্নের উত্তর এই বিভাগে দেওয়া হয় না।

দীপককুমার চৌধুরী (হিলা চা-বাগান, নাগ্রাকাটা, জলপাইগুড়ি)

প্রশ্ন : ১৯৬৬ ও ১৯৬৭ সালে ডুরাণ্ড কাপ বিজয়ী দল কোনটি?

উত্তর : ১৯৬৬—গুর্খা ব্রিগেড

 ১৯৬৭—ইস্টবেঙ্গল।

স্বরূপকান্তি সরকার (ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর)

প্রশ্ন : ক্রিকেট খেলায় ব্যাটিং এবং বোলিং এ্যাভারেজ কি করে করা হয়?

উত্তর : ব্যাটিং-এর ক্ষেত্রে মোট খেলা, মোট ইনিংস আর মোট রানের গড় হিসেব করে। সেই সংগে বসিয়ে দেওয়া হয় কতবার অপরাজিত ছিলেন ব্যাটসম্যান আর সর্বোচ্চ কত রান করেছেন তিনি।

আর বোলিং-এর ক্ষেত্রে ওভার, রান আর উইকেটের গড় হিসেব করে নিতে হয়।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাপ্তাহিক বসুমতী

ঐতিহাসিক বিজয়ের পর

৭৪ বর্ষঃ ১০ম সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১১ই ভাদ্র, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [74 year, No. 10, 28th Aug.,

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৫৭৯
আজকের মানুষ		৫৮০
সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	শঙ্করীপ্রসাদ বসু	৫৮১
দুঃস্বপ্নগুলি ভীষণ (কবিতা)	বেণু দত্তরায়	৫৮৪
স্মৃতির স্টেশন (কবিতা)	জয়ন্তী সেন	৫৮৪
বই-র ছাই—বাংলা বইয়ের মেলা	হরপ্রসাদ মিত্র	৫৮৫
প্রেম (কবিতা)	শক্তিব্রত ঘোষ	৫৮৭
চাঁদের কপালে টিপ (কবিতা)	শচীন দত্ত	৫৮৭
রঙ্গদর্শন		৫৮৮
স্মরণীয়		৫৯১
আন্তর্জাতিক		৫৯৩
সপ্তাহের বোঝা	কৃত্তিবাস ওঝা	৫৯৫
যশোবন্ত সরকার সমীপেষু	সর্বদর্শী	৫৯৭
পশ্চিমবঙ্গের একটি অধ্যায়	অনন্ত সিংহ	৫৯৮

যে কোন

গয়না

আর

আ স ল

গ্র হ র ত্ন

কেনার

দক্ষিণ কোলকাতায়

নামকরা প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সন অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ডসন্স অব লেট

এম. বি. সরকার

এ. সরকার এণ্ড সন্স

৭১।১৭ রাসবিহারী এভিন্যু কলিকাতা

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
আইন ও শৃঙ্খলা :		
পুলিশের ভূমিকা—কয়েকটি অভিমত ...	— সাগর বিশ্বাস	৬০২
সাগর সংগমে (ধারাবাহিক উপন্যাস) ...	— সুশীল জানা	৬০৫
রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আনুপূর্বিক ইতিহাস ...	— সুনীল ঘোষ	৬০৮
পাঠ্যসূচী বহির্ভূত শিক্ষা (প্রবন্ধ) ...	— প্রিয়দর্শন সেনশর্মা	৬১৩
ঘুম নেই-র কবি (প্রবন্ধ) ...	— সুখরঞ্জন চক্রবর্তী	৬১৬
তিমিরপ্রান্ত ভস্মার্ঘ ...	— অগ্নিবর্ণ	৬১৮
নিহত গোলাপ (গল্প) ...	— জীবন সরকার	৬২১
শিল্প-বাণিজ্য-অর্থনীতি ...	— প্রদ্যোতকুমার রায়	৬২৫
চিত্রলেখা ...	— শিলাদিত্য	৬২৮
রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে ...	— শিলালি	৬২৯
রূপজগৎ ...	... ...	৬৩২
ভারতীয় দল ও অধিনায়ক প্রসঙ্গে ...	— শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	৬৩৬
খেলাধূলা ...	— শান্তিপ্রিয়	৬৩৮

—সদ্য প্রকাশিত হইয়াছে ॥—

বহুকাল পরে পুনর্মুদ্রণ

"নবীনবাবু বর্ণনা এবং গীতিতে একপ্রকার মন্ত্রসিদ্ধ। .... এই সকল বিষয়ে তাঁহার লিপিপ্রণালীর সঙ্গে বায়রনের লিপিপ্রণালীর বিশেষ সাদৃশ্য দেখা যায়।...... বায়রনের ন্যায় নবীনবাবু বর্ণনায় অত্যন্ত ক্ষমতাশালী।.... নবীনবাবুর যখন স্বদেশবাৎসল্য স্রোতঃ উচ্ছলিত হয়, তখন তিনিও রাখিয়া ঢাকিয়া বলিতে জানেন না।"—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মহাকবি

নবীনচন্দ্র সেনের গ্রন্থাবলী

রৈবতক কাব্য ॥ কুরুক্ষেত্র প্রভাস

গ্রন্থের পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫০৮ ।

মূল্য মাত্র সাত টাকা।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা—১২

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

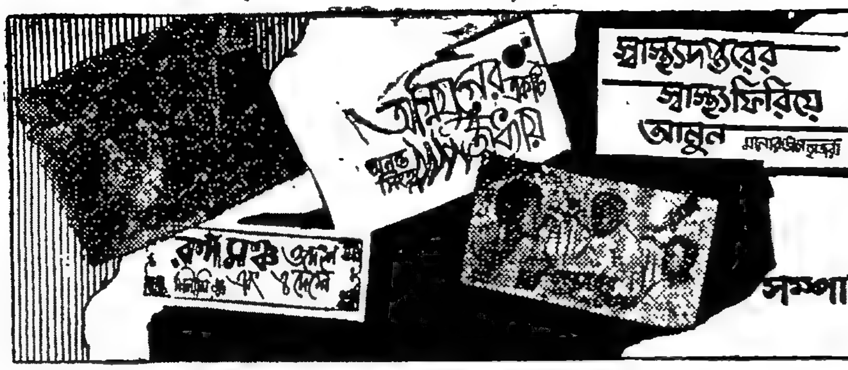

সাপ্তাহিক বসুমতী
সম্পাদিকা-জয়ন্তী সেন

৭৪ বর্ষ ঃ ১০ম সংখ্যা—মূল্য ঃ ৩০ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ১১ই ভাদ্র, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 28th August, 1969

শ্রীগিরির কার্যভার গ্রহণ

অতঃপর শ্রীগিরি ২৪শে আগস্ট রাষ্ট্রপতির কার্যভার গ্রহণ করলেন। আমরা আশা করি, ঐ দিন থেকে ভারতের ইতিহাস নতুন পথে যাত্রা সুরু করল।

বস্তুত রাষ্ট্রপতির পদটি নিয়ে এতোদিন এ রকম মাথাব্যথা ছিল না এবং এমন একটা ধারণা ছিল যে, তিনি সাংবিধানিক প্রধান মাত্র। রাষ্ট্রের কর্মপরিচালনার ক্ষেত্রে তাঁর সে রকম কোনো ভূমিকা লাভের স্থান নেই। কিন্তু ভারতের ন্যায় রাষ্ট্র, যেখানে গণতন্ত্রের কঠিন পরীক্ষা সুরু হয়েছে, সেখানে রাষ্ট্রপতির মুখ্য ভূমিকা যে একদিন প্রয়োজনীয় হতে পারে, এখন তা মনে হওয়ার কারণ এই, ১৯৭২ সালে অনুষ্ঠিতব্য সাধারণ নির্বাচন—যে নির্বাচনে কংগ্রেস কেন্দ্রে সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ না করলে নানা দলীয় শাসনে রাষ্ট্রপতির ভূমিকা প্রয়োজনীয় মনে হতে পারে। আরো যে ঘটনা ঘটতে চলেছে, তাতে আমাদের ধারণা আগামী নির্বাচনে নানা দলীয় শাসনের আশঙ্কা অপেক্ষা তৎপূর্বেই কংগ্রেসের ভাঙনের ফলে কেন্দ্রে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। ঐ জটিল অবস্থার সৃষ্টি হবে দক্ষিণপন্থী কংগ্রেস, জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র দলগুলির প্রতিক্রিয়াশীল জোটের ফলে, যা নাকি আগেই হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে পদচ্যুত করার এবং রাষ্ট্রপতির বিগত নির্বাচনে শ্রীগিরিকে পরাজিত করার উদ্দেশ্যে। জোটবদ্ধ দক্ষিণপন্থী দলগুলি নির্বাচনের সময় শ্রীগিরিকে সর্বতোভাবে ত্যাগ করেছে, তা প্রমাণিত হয়েছে; এতদ্‌সত্ত্বেও শ্রীগিরি জয়লাভ করেছেন। তাঁর জয়লাভের পর আমরা আশা করেছিলাম, কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা ক্ষান্ত হবেন, তিনি যে তিনজনের বিরুদ্ধে শো কজের নোটিশ দিয়েছেন, তা প্রত্যাহার করে নেবেন এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দেবার সমস্ত রকম গোপন ষড়যন্ত্র ও আঁতাতকে অতীতের গহ্বরে জলাঞ্জলি দিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে ঐক্য সাধন করে ভবিষ্যৎ-এর পথ পরিষ্কার করবেন। কিন্তু সে-ইচ্ছা বা আশা বোধ হয় বৃথাই। কারণ দল থেকে যিনি নেতৃত্ব পেয়ে প্রধানমন্ত্রিত্ব করছেন, তাঁর অপেক্ষা বোধ হয় কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের মতোই দলের পাণ্ডার হুকুমের জোরই বেশি। শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা এমন কথা পর্যন্ত বলেছেন যে, ১৯৭২ সাল পর্যন্ত শ্রীমতী গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকবেন কি না সে ব্যাপারে তিনি আর কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না। অবশ্য তাঁর এই কথার পর শ্রীমতী গান্ধীর সপক্ষে ২৪৮ জন পার্লামেন্ট-সদস্য এগিয়ে এসেছেন। তাছাড়া কংগ্রেসের যে ক'জন মুখ্যমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় ইন্দিরা-বিরোধিতা করেছেন, তাঁরাও নিজলিঙ্গাপ্পাকে অনুরোধ করেছেন বিরোধ মিটিয়ে নিয়ে কংগ্রেসে ঐক্য সাধন করতে। এ সব প্রচেষ্টায় কোনো ফল হবে কি? সুফলের আশা সুদূরপরাহত। অতএব ভবিষ্যৎ-পরিণতির কথা না ভেবে আমাদের উপায় নেই। কারণ কংগ্রেসের একদল নেতা, যাঁদের সঙ্গে জনসাধারণের কোনো যোগ এখন আর আছে বলে মনে হয় না, তাঁরা শ্রীমতী গান্ধীকে অপদস্থ করার জন্য গভীর সঙ্কট সৃষ্টি করবেন। আর তাঁদের সঙ্গে হাত মেলাবে জনসঙ্ঘ ও স্বতন্ত্র দল। এই ধরণের সঙ্কটে ইন্দিরা গান্ধীর পতন যদি কার্যকর হয় (এমন আশঙ্কার কারণ, এদেশে বড় বড় নেতারাও জনজনসাধারণের কল্যাণ বিরোধী কাজ কোটিপতিদেরই এজেন্ট হিসেবে কাজ করছেন গোপনে) তাহলে সেই মুহূর্তে আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রপতির ভূমিকা বিশেষ প্রয়োজনীয় হয়ে উঠবে। একমাত্র তিনিই যোগ্যতার সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীলদের হাত থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করে তাদের ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারেন।

রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব ও কার্যভার গ্রহণ উপলক্ষে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে শ্রীগিরি তাঁর পূর্বের তিনজন রাষ্ট্রপতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এ কথাই বলতে চেয়েছেন যে, পূর্বসূরীরা তাঁর চেয়ে জ্ঞানে গুণে শ্রেয়, এবং তিনি সহজাত প্রবৃত্তি, কাজ ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে নিজেকে দেশের কাজে উৎসর্গ করেছেন। তাছাড়া সারা জীবন শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় তিনি দেশের সুযোগ বঞ্চিত জনসাধারণের পক্ষেই। দেশের সর্বসাধারণের শৃঙ্খলাবোধ, এ দেশের গণতন্ত্র ও বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা' রাষ্ট্রের কল্যাণের স্বার্থেই। আমরা মনে করি, বর্তমান সঙ্কটের সময় শ্রীগিরিই রাষ্ট্রপতিরূপে রাষ্ট্রের সংবিধানের মর্যাদা রক্ষার পক্ষে উপযুক্ত ব্যক্তি।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

বরাহগিরি ভেঙ্কটগিরি। যেমন ব্যঞ্জনাময়, তেমনি ছন্দোবদ্ধ। 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' কথাগুলোর মধ্যে যেমন একটা সপ্রাণ গতি, একটা উন্মাদনা আছে, তেমনি বরাহগিরি ভেঙ্কটগিরির মাঝেও যেন একটা যাদু আছে। সে-যাদুবলেই যেন তিনি প্রবল প্রতাপান্বিত সিণ্ডিকেট গ্রুপকে হতবাক করে দিয়ে ভারতের চতুর্থ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন।

গণতান্ত্রিক দেশের গণতান্ত্রিক শাসনপদ্ধতিতে কোনো পদে কারো হক আছে বললে গণতন্ত্রেরই অমর্যাদা করা হয়। কিন্তু তবু অস্বীকার করার উপায় নেই রাষ্ট্রপতির গদি শ্রীগিরির কাছে পুরনো হয়ে গিয়েছে। দুমাসের জন্যেই হোক আর দুদণ্ডের তরেই হোক, গদি তিনি অলংকৃত করেছেন। ডঃ জাকির হোসেনের মৃত্যুতে রাষ্ট্রপতির শূন্য আসন উপরাষ্ট্রপতি শ্রীগিরিই পূর্ণ করেছিলেন ভারতের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে। এখন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হবার ফলে পুরো মেয়াদের জন্যে ও-গদির হকদারিটা তাঁরই জন্মালো নাকি?

বরাহগিরি ভেঙ্কটগিরি ভারত রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আসনটি দখল করার মানসে নিজেকে যেন ছোটবেলা থেকেই তৈরি করছিলেন। কিন্তু তাই বলে তাঁকে উচ্চাভিলাষী, দূরাকাঙ্ক্ষী বলে চিত্রিত করা সংগত হবে না। মাত্র বারো বছর বয়সে—যে-বয়সে ছেলেরা পড়ার বই শিকেয় তুলে লুকিয়ে ডিটেকটিভ থ্রিলার রহস্যোপন্যাসে নিজেকে ডুবিয়ে রাখে—সে বয়সে গিরি প্রকাশ্যে আন্দোলনে নামেন। না কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন নয়, সাংস্কৃতিক, গঠনমূলক আন্দোলন। ভারতবর্ষে লাইব্রেরী আন্দোলন বলতে তখন কিছুই ছিল না, শ্রীগিরিকেই এ-আন্দোলনের জনক বলা চলে।

তবে রাজনীতি মিশে গিয়েছিল তাঁর প্রতিটি রক্তকণিকায়। বর্তমান ওড়িষা ও তদানীন্তন মাদ্রাজের গঞ্জাম জেলার বহরমপুরে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে ১৮৯৪ সালের ১০ই আগস্ট শ্রীভেঙ্কটগিরির জন্ম। বাবা ছিলেন এখানকার লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকিল. তার ওপর আবার প্রদেশের নামকরা রাজনৈতিক নেতা। তাঁর বাবা জোগিয়া গিরির কৃতিত্ব এখানে যে, কংগ্রেসের কি প্রাদেশিক, কি জাতীয় অধিবেশন—এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনই তাঁর অনুপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয় নি। সম্পূর্ণ কংগ্রেসী বা রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যে শ্রীগিরির শৈশব কেটেছে, তিনি কৈশোরে উপনীত হয়েছেন।

তাহলেও এবং তখন বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলনে সারা ভারত আন্দোলিত-আলোড়িত হলেও শ্রীগিরি তখনো প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে অংশ নেন নি। সিনিয়ার

শ্রীগিরি

কেমব্রিজ পাশ করার পর তাঁকে ১৯১৩ সালে পাঠানো হল বিলেতে আইন অধ্যয়ন করার জন্য। আয়াল্যাণ্ডের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যাবস্থায় শ্রীগিরি ডাবলিন-এ ভারতীয় ছাত্র সংস্থা গঠন করে তার সম্পাদক নির্বাচিত হন। আয়াল্যাণ্ডের রাজনৈতিক চরিত্র ভারতের অনুরূপ হওয়ায় দুটো দেশের মধ্যে তখন থেকেই একটা আত্মিক যোগাযোগ ছিল, শ্রীগিরি সে-বন্ধনকে দৃঢ়তর করতে সচেষ্ট ছিলেন।

পরবর্তীকালে শ্রীগিরি যে শ্রমিক আন্দোলনে নিজেকে ঢেলে দিয়েছিলেন তার শিক্ষা ও সূচনা ঘটেছিল আয়াল্যাণ্ডেই। তাঁর বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও তাঁর গতিবিধিই ইংরেজ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। তাই সরকার তাঁর পাঠ অসমাপ্ত জেনেও তাঁকে বৃটেন থেকে বহিষ্কার আদেশ দিলেন। ডক্টরেট আর পাওয়া হল না গিরির। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন ১৯১৬ সালে দেশে ফিরলেন গিরি, মাদ্রাজের প্রখ্যাত রাজনৈতিক নেতা ও ব্যবহারজীবী শ্রী টি প্রকাশমের জুনিয়র হিসেবে ওকালতি সুরু করেন।

আয়াল্যাণ্ডে থাকাকালীনই শ্রীগিরি দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের সংবাদ সাগ্রহে পাঠ করতেন এবং প্রেরণা লাভ করতেন। কিন্তু যুদ্ধে যোগদানের পুরস্কারস্বরূপ বৃটিশ সরকার ভারতবর্ষকে স্বায়ত্তশাসনাধিকার দেবে বলে তিনি কখনই বিশ্বাস করে নিতে পারেন নি। তিনি বিশ্বাস করতেন, সশস্ত্র সংগ্রামের পথেই ভারতের স্বাধীনতা আসবে। তাই গান্ধীজীর অনুরোধে প্রথমে রেড ক্রস-এ যোগদান করলেও অল্পদিন বাদেই শ্রীগিরি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সঙ্গে সমস্ত যোগাযোগ ছিন্ন করেন।

শ্রমিক আন্দোলনে যোগ দিয়ে শ্রীগিরি ১৯২৪ সালে নিখিল ভারত রেলকর্মী ফেডারেশন গঠন করেন, দুবছর বাদে তিনি এ-আই-টি-ইউ-সি'র সভাপতি নির্বাচিত হন। কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন তিনি ১৯৩৫ সালে, তার পরে মাদ্রাজের রাজা গোপালাচারী মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য। স্বাধীন ভারতের প্রতিনিধিত্ব করে শ্রীগিরি হন সিংহলের প্রথম রাষ্ট্রদূত। ১৯৫২ সনে তিনি নেহরু ক্যাবিনেটে শ্রমদপ্তর পেলেন। ১৯৫৭ সালে শ্রীগিরিকে দেওয়া হয় উত্তরপ্রদেশের রাজ্যপালের পদ, পরে এক এক করে মহীশূর ও কেরালার রাজ্যপালের দায়িত্ব। ১৯৬৭ সালে তিনি উপ-রাষ্ট্রপতির পদ লাভ করেন।

রাষ্ট্রপতি পদের নির্বাচনে শ্রী ভি ভি গিরির জয়লাভ ঐতিহাসিক। গত ১৯ বছরের ইতিহাসে এই পদে ইতিপূর্বে কংগ্রেসপ্রার্থীর পরাজয় আর হয় নি, নির্দল প্রার্থী হিসেবে শ্রীগিরিই জবরদস্ত সিণ্ডিকেট গ্রুপ মনোনীত কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীসঞ্জীব রেড্ডিকে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হারিয়ে দিলেন। শ্রীগিরির জয়লাভে ভারতের প্রগতিশীল শক্তিরই অভূতপূর্ব সাফল্য সূচিত হল। তিনি নির্দল—অর্থাৎ শ্রীগিরি কংগ্রেস, কমিউনিস্ট সোস্যালিস্ট—ভা র তে র সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী লাখ লাখ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক।

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং—(৭)

রাশিয়া সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ, সুভাষচন্দ্র ও মেঘনাদ সাহার দৃষ্টিভঙ্গির তুলনা—(২)

রাশিয়ার কোন্ কোন্ নীতি বা নীতির সাফল্য ভারতের পক্ষে অনুসরণীয় সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র ও সাহার আপেক্ষিক মতপার্থক্য আছে। শিক্ষা কৃষি ও যন্ত্র, এই তিন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার বিপুল প্রয়াস লক্ষ্য করলেও মনোযোগী পাঠক 'রাশিয়ার চিঠি' পাঠান্তে দেখবেন, শিক্ষা ও কৃষি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ যতখানি আগ্রহী, যন্ত্র সম্বন্ধে ততখানি নন। তাঁর নিজের স্বীকারোক্তি অনুযায়ী তিনি রাশিয়ায় গিয়েছিলেন তাদের শিক্ষাপ্রচেষ্টার রূপ দেখতে। আমরা এও জানি, রবীন্দ্রনাথের দেশচিন্তার প্রধান অংশকে গ্রাস করেছিল তাঁর পল্লীবিষয়ক চিন্তা। পরাধীন দেশের মানুষ হিসাবে রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন, ব্যাপক শিক্ষাবিস্তার ছাড়া দেশের আত্মচেতনা আনা সম্ভব নয় এবং পরাধীনতার মধ্যেও শিক্ষাপ্রচেষ্টা অন্তত কিছু পরিমাণে চালানো যায়। শিক্ষার সম্বন্ধে তাঁর আপেক্ষিক অধিক আগ্রহের হেতু এই। একই কারণে তিনি কৃষিতে আগ্রহী কারণ ভারত প্রধানত কৃষিপ্রধান, দ্বিতীয়ত, সহৃদয় জমিদাররূপে কৃষকের সমস্যা তিনি ঘনিষ্ঠভাবে জানেন; তৃতীয়ত, পরাধীন দেশে যন্ত্রশিল্পের উন্নয়ন তখনি সম্ভব নয়। তাছাড়া, কবি রবীন্দ্রনাথের একটা আন্তরিক বিতৃষ্ণা ছিল যন্ত্রের সম্বন্ধে, যদিও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পক্ষে শিল্পায়নের প্রয়োজনীয়তা তিনি বুঝতেন এবং চমৎকার উপমার সাহায্যে রাশিয়ার যান্ত্রিক কৃষিব্যবস্থার প্রশংসা করেছেন। এক জায়গায় তিনি ইংরেজের শোষণের রূপ উদ্ঘাটন করতে গিয়ে বলেছেন, শিল্পবিপ্লবের ফলে যখন ভারতে কুটীরশিল্প প্রতিযোগিতায় ধ্বংস হয়ে গেল, তখন শিল্পজীবীদের বাঁচাবার পথ ছিল যন্ত্রশিল্পের বিস্তারের মধ্যে, কিন্তু ইংরেজ নিজ স্বার্থে ভারতের শিল্পায়ন ঘটতে দিল না। এই উক্তির দ্বারা রবীন্দ্রনাথ স্বীকার করে নিয়েছেন, ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতি শিল্পের পথে আসবে এবং কালগতে ক্ষুদ্র যন্ত্র বৃহৎ যন্ত্র হয়ে পড়বে। তবু বোঝা যায়, যন্ত্রের কথা বলার কালে তাঁর উৎসাহের পরিমাণ সর্বাধিক নয়।

বৃত্তিমুখী শিক্ষার বিস্তার, সমবায় প্রথায় যান্ত্রিক কৃষির প্রবর্তন সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতকে গ্রহণ করতে বাধা ছিল না সুভাষচন্দ্রের; কিন্তু বাস্তববাদী আধুনিক মানুষরূপে যন্ত্রশিল্পায়নের প্রতি বেশি জোর দেবার তিনি পক্ষপাতী। ভারতের সম্পূর্ণ শিল্পায়ন ছাড়া যে ভারতের দারিদ্র্যনাশ ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি সম্ভবপর নয় সে-বিষয়ে তাঁর সংশয় ছিল না। তিনি, রবীন্দ্রনাথের মতই মনে করতেন, এই শিল্পকে ব্যক্তিস্বার্থে নিয়োগ না করে সমষ্টিস্বার্থে নিয়োগ করতে হবে। কিন্তু মূল প্রশ্ন এই, ব্যষ্টি ও সমষ্টি স্বার্থের সমন্বয় ঘটানো যাবে কি করে? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন সমন্বয় ঘটানো উচিত, সুভাষচন্দ্রেরও তাই মত, কিন্তু বাস্তববাদী কর্মী বলে সুভাষচন্দ্র ঐ সমন্বয়ের ভিত্তিরূপে সমাজতন্ত্রকে ধরেছেন—রবীন্দ্রনাথ কোনো স্পষ্ট উত্তর দেন নি। মেঘনাদ সাহার উত্তরও স্পষ্ট নয়।

এই সমন্বয় প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্রের ধারণাগত ঐক্য সর্বাধিক পরিমাণে দেখতে পাব, আবার সমন্বয়ের প্রকৃতি বিষয়ে তাঁদের মধ্যে অনৈক্যও যথেষ্ট।

রাজনৈতিক সমন্বয়তত্ত্ব উপস্থিত করতে গিয়ে সুভাষচন্দ্র যা বলেছিলেন তা নিশ্চয় আমাদের স্মরণ আছে। তাঁর মতে, কোনো একটি ইজম্‌কে চরম কথা বলে স্বীকার করলে ইতিহাসকে গতিহারা বলে মেনে নেওয়া হয়। মার্ক্সবাদ সুভাষচন্দ্রের কাছে মার্ক্সবেদ নয়। রবীন্দ্রনাথও আমরা দেখলাম, মার্ক্সীয় অর্থনীতিকে শেষ সত্যরূপে স্বীকার করতে অনিচ্ছুক। অন্তত, মার্ক্সীয় অর্থনীতিক অস্ত্রের জোরে 'সত্য' করার বিশেষ বিরোধী। তিনি সোভিয়েট বিপ্লবকে, যার প্রতি উৎসাহযুক্ত সমর্থন জানিয়েছেন, তাকেও অসুস্থ অবস্থার চিকিৎসাব্যবস্থা বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ এবং সুভাষচন্দ্র উভয়েই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরবর্তী আদর্শের অভ্যুদয়ে বিশ্বাসী, এবং উভয়েই মনে করতেন, ভারতবর্ষই সেই নতুন আদর্শের ধাত্রীভূমি হবে।

বিচিত্র কথা, বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহাও কার্যত তাই ভাবতে চেয়েছেন।

এই পরবর্তী আদর্শ সুভাষচন্দ্রের মতে ভারতের সমন্বয়বাদ। রবীন্দ্রনাথও প্রায় সেই কথাই বলেছেন।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমন্বয় এবং সুভাষচন্দ্রের সমন্বয়ে

প্রচুর পার্থক্য। বলা উচিত অবশ্যম্ভাবী পার্থক্য। সুভাষচন্দ্র রাজনৈতিককর্মী, সে হিসাবে, কতকগুলি স্পষ্ট ধারণাকে স্পষ্টভাবে কার্যকরী করাই তাঁর দায়িত্ব, অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ কবি, বাস্তববাদী হবার চেষ্টা সত্ত্বেও মূলে ভাববাদী। রাজনৈতিকের মতো নিজের পরিকল্পনা বা ভাবনার বাস্তব প্রয়োগের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তাঁর নেই, সুতরাং তিনি তাঁর তত্ত্বকে কল্পনার মুক্তি দিতে পারেন, নৈতিক বিশুদ্ধির উচ্চতম শিখরে স্থাপিত করতেও তাঁর বাধা নেই। মানবতাবাদীরূপে তিনি যেমন রাশিয়ার সাফল্যে উচ্ছ্বসিত হয়েছেন, তেমনি, রাশিয়ার ত্রুটির সমালোচনায় মুক্তকণ্ঠ হতেও বাধে নি। সুভাষচন্দ্রের অবস্থা এক জাতীয় নয়। তিনি যখন কোনো বিষয়ে রাশিয়ার সাফল্য দেখেছেন, তখনি তাঁকে ভাবতে হয়েছে কোন্ কোন্ উপায়ের দ্বারা রাশিয়া ঐ সাফল্য অর্জন করেছে এবং ভারতের ক্ষেত্রে সেই উপায়গুলিকে দোষশূন্য করে, তা সম্পূর্ণ সম্ভব না হলে অনিবার্য দোষস্পর্শ রেখেই, কিভাবে সেগুলির প্রয়োগ করা যায়। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে রাশিয়ায় সাম্প্রদায়িকতা দূরীকরণ, শিক্ষার বিস্তার, ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ, নতুন কৃষিব্যবস্থার প্রবর্তন, ব্যক্তিস্বার্থহীন শিল্পায়ন প্রভৃতির প্রশংসার পরে, তা ঘটাবার জন্য রাশিয়ার পার্টিশাসন, একনায়কত্ব, জবরদস্তি প্রভৃতির নিন্দা করা সম্ভবপর, কারণ সত্যসত্যই প্রথম ব্যাপারগুলি প্রশংসনীয় এবং পরবর্তী ব্যাপারগুলি নিন্দনীয়। কিন্তু সুভাষচন্দ্রকে জানতে হয়েছিল যে—ঐ জানাটা তাঁর দেশসাধনার অন্তর্গত ব্যাপার—মানব-প্রকৃতির মধ্যে যেহেতু স্বার্থপরতা এবং চিন্তাগত দুর্বলতা আছে, সেই দুর্বলতা বাড়াবার জন্য স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল যেহেতু সতত সক্রিয়, সে কারণে ঐ সকল অভূতপূর্ব রুশীয় সাফল্য পার্টিশাসন, একনায়কতা, কিছু জবরদস্তির শাসন ছাড়া সম্ভব করা সম্ভব নয়—রাশিয়ায় সম্ভব নয়—রাশিয়ার বাইরেও অনুরূপ অবস্থায় সম্ভব নয়। সেই কারণেই তিনি স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে কিছু সময়ের জন্য একপার্টির শাসন বহাল রাখার পক্ষপাতী; ব্যষ্টি ও সমষ্টির স্বার্থসংঘর্ষের ব্যাপারে বেশি সূক্ষ্ম বিচারে না গিয়ে সমষ্টির প্রতি সুবিচারের প্রয়াসী। ভারতবর্ষে যদি রাশিয়ার অনুরূপ ব্যাপার ঘটত, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র নিশ্চয়ই মেনে নিতেন, ব্যাপারটা চিকিৎসা জাতীয় এবং সেটা চিরস্থায়ী হওয়া উচিত নয়। সুভাষচন্দ্র তা মেনে নিতেনই, কারণ সুভাষচন্দ্রের মহাপ্রাণতা অনাবশ্যক হিংসার বিরোধী, তাঁর অভিজাত মর্যাদাবোধ গণতন্ত্রের প্রতি সর্বোচ্চভাবে শ্রদ্ধাশীল। তাহলেও ঐ সম্ভাব্য দোষের আশঙ্কায় তিনি ব্যাপারটা ঘটাবার ক্ষেত্রে পেছিয়ে যেতেন না।

ধর্ম সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রের মতৈক্য লক্ষণীয়। আনুষ্ঠানিক ধর্ম সম্বন্ধে সুগভীর বিদ্বেষ সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তিজীবনে ধর্মকে অস্বীকার করেন নি, শেষ জীবনে মানবধর্মকেই নিজ ধর্ম বলে ঘোষণা করলেও (রবীন্দ্রনাথের মানবধর্মের বিশেষ অর্থ আছে) রবীন্দ্রনাথ নাস্তিক ছিলেন না। অথচ ধর্মের প্রচলিত রূপের মধ্যে প্রগতিহীনতার রূপ দেখে তাঁকে বলতে হয়েছিল, কিছু সময়ের জন্য নাস্তিকতাও ভাল। এটা রবীন্দ্রনাথের চরম কথা নয়, এটাও চিকিৎসাব্যবস্থা, কারণ তিনি মনে করতেন, ভারতবর্ষীয় স্বভাব কখনো চিরদিনের জন্য নাস্তিকতাকে বরণ করতে পারে না। রোমাঁ রোলাঁর সঙ্গে আলোচনায় এই কথা তিনি বলেছিলেন। সুভাষচন্দ্রও ব্যক্তিজীবনে পরম অধ্যাত্মবাদী, তা সত্ত্বেও তিনি জানতেন রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধর্মের আমদানী বিপজ্জনক। ইতিহাসের ব্যাখ্যার ব্যাপারে বস্তুবাদকে যে-সুভাষচন্দ্র গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন, রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে তিনিই সরকারিভাবে অধ্যাত্মবাদকে আনতে গররাজি। রবীন্দ্রনাথ যে বলেছেন, কিছু সময়ের জন্য ভারতীয় মানুষের পক্ষে নাস্তিকতার প্রয়োজন আছে, রাষ্ট্রনেতা সুভাষচন্দ্রের কাছে ঐ নাস্তিকতার অর্থ রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা। ব্যক্তিগতভাবে মানুষ নাস্তিক হবে, কি আস্তিক হবে, সে সিদ্ধান্তের দায়িত্ব তিনি নিতে চান নি।

ধর্ম ব্যাপারে মেঘনাদ সাহা পুরোপুরি নেতিকর্মী। বিজ্ঞানকে তিনি ধর্মবিরোধী মনে করতেন।

এখানে প্রশ্ন উঠবে—রাষ্ট্রনেতারা কি কেবল কর্মী হবেন, দার্শনিক হবেন না? যদি দার্শনিক না হন, বিপ্লবী হবেন কিভাবে? সুভাষচন্দ্র যদি রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা চান এবং সেই ইচ্ছা যদি ধর্মের ব্যবহারিক ক্ষতিকারকতার বোধ থেকে উৎপন্ন হয়, তাহলে বিপ্লবীরূপে নাস্তিকতার দর্শন প্রচার করাই কি তাঁর পক্ষে যুক্তিযুক্ত হত না?

এর উত্তর আগেই দেওয়া হয়েছে, সুভাষচন্দ্রেরও একটা দর্শন ছিল, তা সমন্বয়দর্শন, সেই দর্শন অনুযায়ী তিনি চলতে চেয়েছেন,—তাঁর সমন্বয়দর্শন ব্যক্তিজীবনে ধর্ম ও সংস্কৃতির ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতার পক্ষপাতী এবং সেই জন্যই রাষ্ট্র-চেষ্টার মধ্যে ধর্ম সম্পর্কীয় নিরপেক্ষতাকে মাত্র সে গ্রহণ করেছে।

এই প্রসঙ্গে গান্ধীজীর ধারণা উল্লেখ করা প্রয়োজন। গান্ধীজী রাজনীতিতে এনেছিলেন ধর্মভাবনা। বলা চলে, ধর্মের সার্বজনীন রূপ, যা কোনো সম্প্রদায়কেই আঘাত করে না, তাই ছিল তাঁর প্রবর্তনের বস্তু।

সুভাষচন্দ্র, রাজনীতিতে যে-কোনো প্রকার ধর্মভাবনার বিরোধী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথও তাই। গান্ধী-নেতৃত্ব এবং গান্ধী-আন্দোলনের ধর্মঘেঁষা রূপ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রতিবাদ যথেষ্টভাবে পূর্বে উদ্ধৃত করেছি। সুভাষচন্দ্রের মতে, রাজনীতিতে ধর্ম থাকলে যত নিরপেক্ষ বাঁটোয়ারাই করা হোক না কেন, ঈশ্বর ও আল্লার বরাদ্দ নিয়ে গোলযোগ হবেই। গান্ধীজী ধার্মিকের ব্যক্তিগত আচরণকে রাজনীতিতে প্রতিফলিত করতে চাইছেন—এই ব্যাপারটা কখনো অন্যান্যদের মত সুভাষচন্দ্রকে অভিভূত করে নি। তার কারণ, সুভাষচন্দ্র ধর্মকে জানতেন ও মানতেন, ভারতের কোনো রাজনীতিকের চেয়ে কম পরিমাণে নয়, সুভাষচন্দ্রের ব্যক্তিজীবনের শুচিতা ও সৌন্দর্য ঐ একান্ত ধর্মসাধনা থেকে এসেছে, সুতরাং গান্ধীজীর ধর্মীয় স্বভাবের দ্বারা অযথা আকৃষ্ট হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। সুভাষচন্দ্র গান্ধীজীর মধ্যযুগীয় সন্তসুলভ নিছক নিস্পৃহ নৈতিকতা

অপেক্ষা বিবেকানন্দের ডায়ন্যামিক ধর্মকে অন্তরঙ্গ বোধ করেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের পূর্ণাঙ্গিক যোগদর্শনও তাঁর দার্শনিক মনের কাছে গ্রহণীয় মনে হয়েছিল।

প্রশ্ন হবে গান্ধীজীর রাজনৈতিক ধর্মাদর্শের বিরুদ্ধে আপত্তির কারণ কি, যদি সত্যই ধর্মের শুভাদর্শকে রাজনীতির মতো সন্দেহজনক চরিত্রকে শোধন করবার কাজে ব্যবহার করা হয়? সুভাষচন্দ্রের পক্ষে উত্তর,—আপত্তি এই জন্য যে, তা অসম্ভব। অসম্ভবের জন্য যে-কেউ ব্যক্তি-জীবনে সংগ্রাম করতে পারেন, আপত্তি নেই, কিন্তু যদি কেউ রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রে নিজের ব্যক্তিগত আদর্শকে জাতিকে দিয়ে পালন করিয়ে নেবার দুশ্চেষ্টা করে যান, যার ফলে জনগণের মুক্তিপ্রাপ্তি ক্রমেই বিলম্বিত হয়ে ওঠে,—সে-বিষয় সুভাষচন্দ্রের ধৈর্য ছিল না। বৈধ হিংসাকে যতক্ষণ পৃথিবীর সমাজ অন্যায়ের দমনে স্বীকার করে নিয়েছে, ততক্ষণ ঐ বৈধ হিংসাকে ব্যবহার করতে সুভাষচন্দ্র কুণ্ঠাহীন, বিশেষত বহুর প্রতি ভালবাসাই যখন ঐ তথাকথিত হিংসার মূলে। সুভাষচন্দ্র কয়েকজন অন্যায়কারীর মৃত্যুকে বহু পীড়িতের জীবনের বিনিময়ে কিনতে প্রস্তুত ছিলেন। চরিত্র শুদ্ধ করে আন্দোলনে নামতে হয় যদি, সেক্ষেত্রে শুদ্ধ চরিত্রবানদের সেই আন্দোলন রাজনীতিতে কোনোদিন শুরু হবে কি-না সন্দেহ। মতিভ্রম যেখানে মুনিদেরও হয় সেখানে না-মুনিদের কা কথা। মুনিদের আত্মশুদ্ধির কঠোর দায়িত্ব কদাপি সাধারণ মানুষের উপর চাপানো উচিত নয় বলেই সুভাষচন্দ্র মনে করতেন। সেই কারণে চৌরিচৌরার দুর্ঘটনার পরে গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহার করলে তিনি কঠোর মনোভাব পোষণ করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র আরও জানতেন, পুলিশের লাঠি-বৃষ্টির সামনে মাথা পেতে দিচ্ছে যেসব সত্যাগ্রহীরা, তাদের সঙ্গে গুলীবৃষ্টির সম্মুখীন সশস্ত্র আদর্শবাদী সৈনিকদের কোনোই পার্থক্য নেই, কারণ উভয়পক্ষই উত্তেজনার অধীন, একটি অহিংসার উত্তেজনা, অন্যটি হিংসার।

সুতরাং 'হিংসা' ও 'অহিংসা' এই শব্দ দুটির উপর সুভাষচন্দ্র বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন নি। তিনি চেয়েছিলেন সংগ্রাম, যখন যেভাবে হোক। ভারতে যখন সহিংস সংগ্রাম সম্ভব নয়, তখন হোক সত্যাগ্রহ। এবং সম্ভবপর ক্ষেত্রে সশস্ত্র বিদ্রোহ ও বিপ্লব।

সুভাষচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল, প্রথমত রাজনৈতিক স্বাধীনতা, দ্বিতীয়ত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা।২ রাজ-

---

২ সুভাষচন্দ্র 'বিদ্রোহী' না 'বিপ্লবী'? শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের একটি চিঠির সূত্রে কথাটা মনে উঠছে। ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিতরায়কে শরৎচন্দ্র ১০ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৬ তারিখে লিখেছিলেন: "বিপ্লব এবং বিদ্রোহ এক বস্তু নয়। কোথাও দেখেছ কি বিপ্লব দিয়ে পরাধীন দেশ স্বাধীন হয়েছে? ইতিহাসে কোথাও এর নজির আছে? বিপ্লবের মধ্য দিয়ে স্বাধীন দেশেই গভর্ণমেন্টের ফর্ম অথবা সামাজিক নীতিরও পরিবর্তন করা যায়, কিন্তু বিপ্লব দিয়ে পরাধীন দেশকে স্বাধীন করা যায় বলে আমার মনে হয় না। ......বিপ্লবের সাথে আছে ক্লাস ওয়ার, বিপ্লবের মাঝে আছে সিভিল ওয়ার। আত্মকলহ ও গৃহবিচ্ছেদ দিয়ে আর যাই কেন করা যাক, দেশের চরম শত্রুকে পরাভূত করা যাবে না। বিপ্লব ঐক্যের পরিপন্থী।" মূল্যবান কথাগুলি, চিন্তাবেদ্য এবং তর্কযোগ্য। তর্ক উঠেছিলও, 'শরৎচন্দ্র' (৩য়) গ্রন্থের সম্পাদক শ্রীগোপালচন্দ্র রায় তার কিছু সংগ্রহ দিয়েছেন। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের বক্তব্যের উত্তরে লিখেছিলেন, "সিভিল ওয়ার, আত্মকলহ, গৃহবিচ্ছেদ প্রভৃতি অভদ্র জিনিসগুলো শুধু যে বিপ্লবের মধ্যে গজায় তা নয়, খাঁটি বিদ্রোহের মধ্যেও তাদের অভাব হয় না।" উপেন্দ্রনাথের কথা 'আপাততঃ' নিশ্চয় সত্য—ঐ কালের বাংলাদেশের ইতিহাসই তার সাক্ষী। সেনগুপ্ত-সুভাষ বিরোধ, তার তিক্ত সংঘর্ষ, যার সঙ্গে স্বয়ং শরৎচন্দ্র অল্পাধিক জড়িত ছিলেন—সেখানে 'বিপ্লবে'র আত্মকলহ যথেষ্ট দেখা গিয়েছিল। তা হলেও শরৎচন্দ্রের কথা 'মূলতঃ' সত্য। স্বাধীনতার জন্য দলমত-নির্বিশেষে সমগ্র দেশবাসীর প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয়। সুভাষচন্দ্র তা জানতেন, সেইজন্য গান্ধী-নীতির সমূহ বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও গান্ধী-নেতৃত্ব মেনে নিয়ে কংগ্রেসে ছিলেন, বিতাড়িত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত। এই দিক থেকে, শরৎচন্দ্রের ভাষায় সুভাষচন্দ্র বিদ্রোহী। কিন্তু একইসঙ্গে কিসের জন্য তিনি তথাকথিত আত্মকলহাদিতে এক পক্ষের নেতৃত্ব করেছেন? তাঁর ঐ বিপ্লবী স্বভাবের জন্যই। তিনি নিছক রাজনৈতিক স্বাধীনতা চাইতেন না, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক স্বাধীনতাও চেয়েছেন। ঐ সামাজিক এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে সফল করতে সমর্থ ছিল না গান্ধী-নেতৃত্ব বা সেই নেতৃত্বের ভক্ত অনুগামীরা। তাই তিনি গান্ধীজী বা তাঁর অনুগতদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ জাগিয়ে রেখেছিলেন। সিভিল ওয়ার বা ক্লাস ওয়ার সুভাষচন্দ্র স্বতঃই চাইতেন না, কিন্তু উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তার প্রয়োজন হলে পিছিয়ে যাবার পাত্রও ছিলেন না। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সুভাষচন্দ্র পার্টি গঠন করতে চেয়েছিলেন, সেই পার্টি দেশে অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতির পরিবর্তন ঘটাবে এই ছিল তাঁর অভিপ্রায়: ঐ পার্টি কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সংগঠিত হবে, কারণ সে রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য জাতীয় ঐক্যকে মূল্যদান করে, কিন্তু ঐ পার্টি সংগ্রাম ও সংগঠনের মধ্য দিয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে স্বাধীনতার পরেই তথাকথিত ঐক্যের ক্ষীণ আচরণকে ছিঁড়ে ফেলে ক্ষমতা গ্রহণ করবে। এইভাবে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের প্রয়োজন একই সঙ্গে সিদ্ধ হবে। এই সুভাষচন্দ্রকে, তাঁর প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল শরৎচন্দ্র কি চিনতে পেরেছিলেন? ঠিক বলতে পারব না। তবে শরৎচন্দ্রের মত গভীরস্বভাব সাহিত্যিকের অন্তশ্চেতনায় সুভাষচন্দ্রের এই আকার ধরা পড়ে নি বিশ্বাস হয় না।

দৃশ্যগুলি ভীষণ

বেণু দত্তরায়

মশাই একটু হাসুন
হাসুন অথবা কাঁদুন,
একেবারে চুপচাপ থাকলে আপনাকে মানায় না।
নিজেরই বিকট আয়না
সঙ্গে রাখুন, দেখতে পাবেন—
কাউকেই দেখা যায় না
হাসলেও না কাঁদলেও না।

মশাই বড়ো দমে গেছেন—
দেখে শুনে দৃশ্য
আটকে গেছে চোয়াল?
মস্ত রাঘববোয়াল
হাঁ করছে না গলায়?
ওসব বুজরুকি রাখুন মশাই
এ সব অনেক মশাই
দেখা আছে।

দয়া করে কাছে
আসুন
মশাই একটু হাসুন, কিংবা কাঁদুন
দৃশ্যগুলি ভীষণ
দেখতে লাগে? সিংহ-শেয়াল-হায়না
মূর্তি করে পান ধরেছে। আপনাকে মানায় না
বেমালুম চুপ করে থাকা।
একটু হাসুন
মশাই, হাসুন অথবা কাঁদুন।

স্মৃতির ফেস্টুন

জয়ন্তী সেন

শৈশব রোজ নদীর মতো সরে সরে যায়।
অভ্যাসের বশে জলে নামতে গিয়ে মৃত পাথরের
গায়ে আছড়ে পড়ি।
স্নিগ্ধতার বদলে জ্বালা, শুধুই জ্বালা,
আর প্রচণ্ড শূন্যতা।
স্মৃতির ফেস্টুন ওড়ে, লাল নীল শখে
হাওয়া উঠলেই সব বাগান উসখুশ করে,

আশ্চর্য এখনও সেই মান্ধাতা যুগের
ফুলগুলো টিকে আছে—যাদের গন্ধে
ভালোবাসার প্রাচীন ঘ্রাণ।
শৈশব ক্রমশ দূরে সরে যাওয়ার মুহূর্তে
আমাকে ভিজে মাটি মাড়িয়ে সুখ খুঁজতে হয়—
কারণ নদী না পেলে রৌদ্র আর
আলো নয়—শুধু উত্তাপ।
স্মৃতির ফেস্টুন ওড়ে—দুই চোখে তারাই সান্ত্বনা।

নৈতিক স্বাধীনতার ব্যাপারে তিনি যেমন ইংরেজের 'বড়ো আমির' উপর বেশি আস্থা রাখেন নি, তেমনি ভারতীয় ব্যবসায়ী সমাজের বড়ো আমিত্বেও তাঁর আস্থা ছিল না।৩

[ক্রমশ]

---

৩ ইংরেজের এই 'বড়ো-আমি'র পরিচয় দিয়েছেন ১৯৬২ সালে লণ্ডনের ভারতীয় হাইকমিশনার শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীমতী পণ্ডিতের বিবরণ বেরিয়েছিল 'ডেইলি এক্সপ্রেসে'। —"শ্রীমতী পণ্ডিতের মতে—বিকেলে আমরা বৃটিশ ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে ব্যাডমিন্টন খেলেছি, পরের দিন সকালে সত্যাগ্রহ করতে গেছি। রবিবার সত্যাগ্রহ বন্ধ। কারণ বাপুজীর বারণ। সাহেবরা খৃস্টান, রবিবার তাদের গীর্জায় প্রার্থনার দিন, সুতরাং রবিবার সত্যাগ্রহ করে সাহেবদের ধর্মকর্মের ব্যাঘাত করা বাপুজীর মতে নীতিবিরোধী কাজ। সকালে আইনভঙ্গের অপরাধে পুলিশ আমাদের গ্রেপ্তার করেছে, আর বিকালে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কুঠি থেকে কারাগারে আমাদের জন্য চা এসেছে।" [দর্পণ—১ জুন, ১৯৬২]

এই অপূর্ব আন্দোলনের মর্মার্থ নাকি অ-বৃটিশ জনসাধারণ এবং আফ্রিকার নিগ্রোরা ধরতে পারে না। তাদের প্রশ্ন, এই যদি গণ-আন্দোলন হয়, তবে গণ-আন্দোলনের সঙ্গে দাদু-নাতনীর কানামাছি খেলার তফাৎ কি? আমাদের মনে হয় বাপুজী-নীতির অনুরাগিণী শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী এক্ষেত্রে কিছু পলিটিক্সের খেলা দেখিয়েছিলেন। ইংরাজদের মন জয় করে সুবিধা আদায় করাই হাইকমিশনের উদ্দেশ্য। সামান্য ইংরেজস্তুতিতে কাজটা যদি হয়ে যায় ক্ষতি কি? তার জন্য ভারতের জাতীয় আন্দোলন কানামাছি খেলায় রূপান্তরিত হলেও দোষ নেই। অধিকন্তু, জাতীয় স্বার্থের জন্য এ-ব্যাপারে শ্রীমতী পণ্ডিতের সেন্টিমেন্ট ত্যাগও লক্ষ্য করবার মতো জিনিস। তাঁর সর্বজনশ্রদ্ধেয়া মাতা স্বর্গতা স্বরূপরাণীর গায়ে নাকি পুলিশের লাঠি পড়েছিল—শ্রীমতী পণ্ডিত ব্যাডমিন্টন খেলার আনন্দে তা কিভাবে ভুলে গেছেন।।

হরপ্রসাদ মিত্র

বই-বাছাই

বাংলা বইয়ের মেলা

[পূর্বানুবৃত্তি]

আমি বললুম—রামমোহন যে এক অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই, সে-প্রসঙ্গে আগেও দু'-একটি ঘটনা স্মরণ করা গেছে, আবার অনেক উদাহরণ দিতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু আমাদের এ-আলোচনার লক্ষ্য তো সেকালের বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিত্বের বিশদ বিশ্লেষণ নয়; অতএব সে-চেষ্টা থাক। অতঃপর এই পর্বের কয়েকখানি বইয়ের নাম করতে হবে,—এই পঞ্চাশ বছরের বাংলা বই-বাছাইয়ের ফল হবে সেই তালিকা। কি বলো?

আনন্দ বল্‌লে—সেই উদ্দেশ্যেই তো এই সব ব্যক্তির বিশেষত্ব,—তাঁদের পৃথক পৃথক অভিপ্রায় এবং সামর্থ্য ভেবে দেখতে হচ্ছে। দ্যাখো—কেরি এবং রামমোহন,—এই দু'জনকেই আমি উনিশ শতকের প্রথম তিরিশ বছরের কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব বলেছি বটে,—কিন্তু বাংলা ভাষার চাল-চলন নিয়ন্ত্রণের দিক থেকে ভেবে দেখলে রামরাম বসুর চেষ্টা,—মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের কৃতিত্ব, ভবানীচরণ বন্দ্যো-পাধ্যায়ের দক্ষতা,—এসব কি ভুলে থাকা যায়?

আমি বললুম—গদ্য পদ্য সবরকম লেখার কথাই যদি কর্তব্য হয়, তাহলে কবিওয়ালাদের এবং ঈশ্বর গুপ্তের কথাও কি এইসূত্রে ভোলা যায়?

—ঈশ্বর গুপ্তের প্রসঙ্গ শতাব্দীর প্রথম তিরিশ বছরের আলোচনায় না-ওঠাই সঙ্গত, কারণ ঈশ্বর গুপ্তের সাপ্তাহিক 'সংবাদ-প্রভাকর' প্রথম বেরিয়েছিল ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দের ২৮-এ জানুয়ারি,—তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র উনিশ বছর। আর, কবিওয়ালাদের প্রসঙ্গে,—তাঁদের আলাদা বই-বাছাইয়ের সুযোগ কোথায়? ঈশ্বর গুপ্তের কথা সূত্রেই তাঁদের কথা ভাববার সুযোগ পাওয়া যাবে—সে-কথা আমার মনে আছে।

—তাহলে ১৮০১ থেকে ১৮৩০-এর মধ্যে দশজন লেখকের যে তেরখানা বইয়ের তালিকা এর আগেই দেওয়া হয়েছে, সে-বাছাই চূড়ান্ত নয়?

—না, সে তো 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র লেখক-সম্পাদকদের মত। এই সব নানা মতামত দেখতে দেখতে আমাদের নিজেদের সিদ্ধান্তের দিকে এগুতে হবে। সে-তালিকা ছাড়াও আরো সব বইয়ের কথা তাঁরা বলেছেন। যেমন কেরির ব্যাকরণ—এবং তাঁর নানা ভাষার অভিধান,—তাঁর 'ইতিহাসমালা' এবং 'কথোপকথনমালা'—প্রথম দুটিকে বাংলা বই বলতে যদি আপত্তি হয়, শেষ দুটির সম্বন্ধে সে-আপত্তি মোটেই টিকবে না,—কি বলো?

থাক্ সে কথা—এখন উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরের দুটি ভাগ করে নিয়ে, প্রথম তিরিশ বছর,—এবং পরবর্তী কুড়ি বছর,—এই পর্ব-দুটির দিকে নজর রাখলে প্রথম পর্বে কেরি এবং রামমোহনের সঙ্গে মৃত্যুঞ্জয় প্রভৃতি আরো কয়েকজনের কথা মনে আসে। মৃত্যুঞ্জয় সম্বন্ধে এই কথাটি মনে রাখা দরকার যে, তাঁর 'বত্রিশ সিংহাসন' বেরিয়ে-ছিল ১৮০২ খ্রীস্টাব্দে এবং তাঁর 'বেদান্ত-চন্দ্রিকা' বেরোয় ১৮১৭-তে। এই ষোলো বছরের মধ্যে তাঁকে তাঁর সমস্ত রচনাই লিখতে হয়েছে। তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রশংসা সর্ববাদি-সম্মত। কেরি তাঁর কাছে পড়েছেন—এজন্য কলকাতায় প্রতিদিন দু'তিন ঘণ্টা সময় দিতে হয়েছে মৃত্যুঞ্জয়কে। ১৮১৭ সালে বাগবাজারে তাঁর চতুষ্পাঠী ছিল। তিনি ন্যায়ের চর্চা করেছেন,—বেদান্তে অধিকারী ছিলেন। রাম-মোহনের 'বেদান্ত গ্রন্থ' এবং 'বেদান্তসার' বেরোয় ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে। মৃত্যুঞ্জয়ের 'বেদান্ত-চন্দ্রিকা' সেই 'বেদান্তসার'-এর উত্তর।

মৃত্যুঞ্জয়ের চেহারা ছিল ভারি-সারি, শক্ত ধবনের,—মার্শমান তাঁর 'দি লাইফ অ্যান্ড টাইমস্ অফ কেরি, মার্শমান অ্যান্ড ওয়ার্ড' (১৮৫৯) বইখানিতে তাঁর চেহারা সম্বন্ধে লিখেছেন—'rough features and unwieldy figure'। ১২৮৭-র ফাল্গুন সংখ্যার 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বাঙ্গালা সাহিত্য' সম্পর্কে আলোচনায় তাঁকে উৎকল-সন্তান বলা হয়। পরে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-পাধ্যায় অনেক পুঁথিপত্র ঘেঁটে তাঁকে মেদিনীপুর-নিবাসী কুলীন ব্রাহ্মণ চট্টোপাধ্যায়-পরিবারের সন্তান বলে স্থির করেন। তিনি কোনোমতেই 'তর্কালঙ্কার' নন,—'বিদ্যা-লঙ্কার'। ব্রজেন্দ্রনাথ এ-দিকটিরও বিভ্রান্তি দূর করে রাখেন—

> "মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের নাম লইয়াও অনেক লেখক ও গবেষক বরাবর ভুল করিয়া আসিতেছেন—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (ইং ১৮৫৪) এই ভুলের প্রবর্তক এবং 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (ইং ১৮৭৩) গ্রন্থের লেখক রামগতি ন্যায়রত্ন প্রধান প্রচারক।"

'নবজীবন'-সম্পাদক অক্ষয়চন্দ্র সরকার ১২৯৫ সালের মাঘ-সংখ্যা 'নবজীবন'-পত্রিকায় 'মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার' নামে যে-প্রবন্ধ লেখেন, তাতে মৃত্যুঞ্জয়ের জন্ম-সন দেখানো হয় ১৭৬২-৬৩; আর বলা হয় যে, মৃত্যুঞ্জয়ের জন্ম মেদিনী-

পরে, অধ্যয়ন নাটোরের সভাপণ্ডিতের কাছে। যৌবনে তিনি নাটোর ছেড়ে কলকাতায় এসেছিলেন। কলকাতা তখন আমাদের সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে উঠছে—গ্রাম থেকে শহরে আসছে আমাদের মন।

১৮০১ খ্রীস্টাব্দে কেরির অধীনে তিনি যে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে বাংলার প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হন, সে-কথা সকলেই জানেন। কলেজের ছাত্রপাঠ্য বইয়ের অভাব দূর করবার জন্যেই তিনি 'বত্রিশ সিংহাসন' লিখেছিলেন। ১৮০৫ থেকে কলেজে সিবিলিয়নদের সংস্কৃত শেখাবার দায়িত্বও তাঁকে নিতে হয়। ১৮১৬ সালের ৯ই জুলাই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কাজে ইস্তফা দিয়ে তিনি সুপ্রীম কোর্টের পণ্ডিত হন। এই পদটির নাম ছিল জজ-পণ্ডিতের পদ। তখন বিচারপতি ছিলেন স্যার ফ্রান্সিস ম্যাক্‌নটেন। ১৮১৭-তে যখন 'স্কুল-বুক-সোসাইটি' হয়, তখন মৃত্যুঞ্জয় সেই সমিতির পরিচালক-সদস্য হন। ১৮১৮ সালের শেষদিকে তিনি তীর্থভ্রমণে বেরোন এবং ১৮১৯ সালের মাঝামাঝি কোনো সময়ে মুর্শিদাবাদের কাছাকাছি এক জায়গায় তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি তাঁর যে-বইগুলির লেখক হিসেবে সাহিত্যের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন, সেগুলি হোলো—'বত্রিশ সিংহাসন' (১৮০২); 'হিতোপদেশ' (১৮০৮); 'রাজাবলি' (১৮০৮); 'বেদান্ত-চন্দ্রিকা' [ইংরেজি অনুবাদ সমেত] (১৮১৭); 'প্রবোধচন্দ্রিকা' (১৮৩৩)। এই শেষ বইখানির রচনাকাল সম্ভবত ১৮১৩। পরে, আমাদেব এই নিকটকালে রঞ্জন প্রকাশালয় থেকে 'মৃত্যুঞ্জয়-গ্রন্থাবলী' বেরিয়েছে। এই সংগ্রহটির জন্যে শ্রীযুক্ত বিনয়রঞ্জন সেন, আই-সি-এস,—ঝাড়গ্রামের জমিদার কুমার নরসিংহ মল্লদেব,—সাহিত্য-সাধক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—এবং সজনীকান্ত দাস—প্রধানত এই চারজনকে ধন্যবাদ জানাতে হয়।

আনন্দ বল্‌লে—শতাব্দীর প্রথম তিরিশ বছরের বই-বাছাইয়েব কাজে—একালের পাঠকের সংগ্রহে থাকবার মতো বই হিসেবে আমি আগেই এই বইখানি বেছে রাখলুম।

আমি তাকে সজনীকান্ত দাসের 'বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস' থেকে এই অংশটি পড়ে শোনালুম—

রামমোহন রায়ের সাক্ষ্য হইতে জানা যায়, সে-যুগে মৃত্যুঞ্জয় উপনিষদ ও বেদান্তদর্শন রীতিমত চর্চা করিতেন। রাজপুরুষেরা তাঁহার নিকটে নানা-বিধ সামাজিক ও আইনঘটিত ব্যাপারেও বিধান লইতেন। তন্মধ্যে সহমরণ বিষয়ক বিধান সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মৃত্যুঞ্জয় ১৮১৭ সনেই বিধান দিয়াছিলেন যে,—'চিতারোহণ' অপরিহার্য নয়,—ইচ্ছাধীন বিষয় মাত্র। অনুগমন এবং ধর্ম-জীবনযাপন, এই উভয়ের মধ্যে শেষটিই শ্রেয়তর। যে স্ত্রী অনুমৃতা না হয় অথবা অনুগমনের সংকল্প হইতে বিচ্যুত হয় তাহার কোন দোষ বর্তে না। ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে রামমোহনের সহমরণ বিষয়ক প্রথম পুস্তিকা প্রকাশিত হয়।

মৃত্যুঞ্জয়ের যে পাঁচখানি বইয়ের কথা বলা হয়েছে, সজনীবাবু তাঁর আলোচনায় সেগুলির নাম উল্লেখ করে আরো লিখেছেন—

'ইহা ছাড়া তিনি উইলিয়ম কেরীকে তাঁহার কথোপকথন, সংস্কৃত হিতোপদেশ ও সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনায় সহায়তা করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রামজয় তর্কালঙ্কারের 'সাংখ্য ভাষ্য সংগ্রহ' পুস্তকের রচনাতেও মৃত্যুঞ্জয়ের যথেষ্ট হাত ছিল।'

তিনি আরো দেখিয়েছেন যে, লঙ্‌ সাহেব ১৮০৫ সালে প্রকাশিত মৃত্যুঞ্জয়ের 'দায়রত্নাবলী'র উল্লেখ করে গেছেন, কিন্তু সে বই পাওয়া যায় নি—

'ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের কাগজপত্রে ব্রজেন্দ্রবাবু Literary Notices বিভাগে হিন্দুদিগের আচার-ব্যবহার সম্পর্কে লিখিত মৃত্যুঞ্জয়ের একটি পুস্তকের নাম পাইয়াছেন। সে পুস্তকের উল্লেখও তিনি অন্যত্র দেখেন নাই।'

যুক্তিপ্রধান দার্শনিক রচনায় বাংলার গদ্য-সাহিত্যের ধারায় মৃত্যুঞ্জয় যে রামমোহনের পূর্বগামী লেখক, এই-কথাটি ব্রজেন্দ্রনাথ-সজনীকান্তের বিশেষ কথা। এবং শুধু এই কথাই নয়,—রবীন্দ্রনাথ যে বিদ্যাসাগরকেই বাংলা গদ্যের প্রথম শিল্পীর সম্মান দিয়ে গেছেন,—এবং সে-সম্মান যে মৃত্যুঞ্জয়েরই প্রাপ্য—এ কথাও তাঁরা বলতে চেয়েছেন।

আনন্দ বল্‌লে—এই কারণেই মৃত্যুঞ্জয়ের বই বিশেষ-ভাবে স্মরণযোগ্য।

রবীন্দ্রনাথ মৃত্যুঞ্জয়ের লেখা যদি দেখতে পেতেন, তাহলে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসার কিছু কিছু যে মৃত্যুঞ্জয়ও পেতেন, তাতে সন্দেহ নেই। কারণ, ভাষা যখন প্রস্তুত হয় নি, সেই সূচনাপর্বে, প্রকাশের পথ যাঁদের তৈরি করে নিতে হয়েছে, মৃত্যুঞ্জয় ছিলেন সেই দলেরই অগ্রণী। তাঁর ভাষা সর্বত্র সাহিত্যগুণে ধনী নয় বটে, কিন্তু তিনি যে আন্তরিক অনুভূতির গুণে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংস্কৃতের বন্ধন থেকে সত্যিই আত্মরক্ষা করতে পেরেছিলেন, সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই।

আমি বললুম—তাহলে তুমি আরো একখানি বইয়ের কথা ভাবতে পারো। সুরেন্দ্রনাথ সেন 'প্রাচীন বাংলা পত্র-সংকলন' সম্পাদনা করেছিলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সে বই প্রকাশিত হয় ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে। তাতে যেসব বাংলা চিঠি ছাপা হয়েছে, সেসবও তো প্রকাশের পথ তৈরীর উদাহরণ?

সে বল্‌লে—সে-বইও স্মরণযোগ্য বটে, কিন্তু তাতে শুধু পুরোনো আমলের বৈষয়িক বাংলা গদ্যের নমুনা আছে,—যে-গদ্য আমাদের নানা চিঠিপত্রে দেখা দিয়ে গেছে,—মৃত্যুঞ্জয়ের দাবি আরো উন্নত আদর্শের গদ্যস্রষ্টার দাবি। কিছু কিছু উদাহরণ তুলে দেখাতে ইচ্ছে হয়—কারণ,

প্রেম

শক্তিব্রত ঘোষ

চন্দ্রোদয় থাক পরাগরেণু ওষ্ঠাধরে,
দন্তরালের রাত্রিবাসর অলকধামে;
দীক্ষিত চূর্ণ-ব্যথার অঙ্গুরীয়
রক্তে আছে?
আকাশভরা কবিতাষার লাজুক কামে
দীপ্তি আছে?

তোমরা সবাই প্রকাশিত ফুলের ঘরে,
কল্যাণীরা স্নেহ-রস কিটস্ স্বপ্নের ঘ্রাণে;
অনাত্মীয় চৈতী ফসল তবু মাঠে
বেঁচে আছে?

তবে এসো : দু'হাত ধরি স্পর্শহীনা
তবে এসো : বিনিময়ে ঐকিকতা,
তবে এসো : অনৈতিকী আধ্যাত্মিকা,
তবে এসো : অনভিজ্ঞ মৌলিকতা।

চাঁদের কপালে টিপ

শচীন দত্ত

দূর-আশার ভেলায় সুর--আশার স্বপ্নেরা
আজ
সত্য থেকে মহাসত্যে, ভাঙাগড়ার
সময়-সমুদ্রে, কাল মহাকালের ব্যবধান
ঘুচিয়ে নাস্তি থেকে অস্তি—
শূন্যে,
মহাশূন্যের সীমানার সীমান্ত-প্রহরা
ছটিয়ে যুগ-যুগান্তের রহস্য-বন্দী
জ্ঞানবৃদ্ধা প্রপিতামহীর রহস্য ছিঁড়ে
জয়ধ্বনি তুললো—
জয়ধ্বনি মানুষের ; বন্দী-মুক্তির
প্রাণচেতনার উন্মুখর।

স্বপ্ন-সফল সুপ্তির অন্ধকার আজ
আলোকিত। নতুন গান ঘুমপাড়ানির
মায়েদের কণ্ঠে
: চাঁদের কপালে চাঁদ টিপ দিতে যা।

মানুষ আজ মানুষের সাথী
মাটির, চাঁদের॥

উদাহরণ ব্যতিরেকে এ-সত্য কি বোঝানো যায়? মনে পড়ছে, ১৮৭৮ খ্রীস্টাব্দে রাজনারায়ণ বসু তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা'য় মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্যের বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন। তাঁর হাতে ছিল মৃত্যুঞ্জয়ের 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র বিশেষ এক জায়গার কথার, কৃত্রিম গদ্য। সে-সব উল্লেখ করে ব্রজেন্দ্রনাথ লিখেছেন—

"আসলে যে মৃত্যুঞ্জয় মধ্যমপ্রাণাক্ষরবহুলা বাণীর উদাহরণস্বরূপই উক্ত বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, এই সামান্য তথ্যটি কেহ হিসাবের মধ্যে আনেন নাই।"

এই বলে হাসতে হাসতে রাজনারায়ণের উদ্ধৃত মৃত্যুঞ্জয়ের সেই বাক্যটি আনন্দ শুনিয়ে দিল—'কোকিলকুলকলাপবাচাল যে মলয়াচলানিল সে উচ্ছলচ্ছীকরাত্যচ্ছনির্ঝরাম্ভঃ কণাচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে।'

আনন্দ বললে—রাজনারায়ণ যে ভুল করেছিলেন, সে ভুল হতে দেওয়া অসম্ভব। মৃত্যুঞ্জয় যে যথার্থ গদ্যশিল্পী ছিলেন, ব্রজেন্দ্রনাথ ঐ 'মৃত্যুঞ্জয়-গ্রন্থাবলী'র ভূমিকায় তা দেখিয়ে দিয়েছেন। সংস্কৃত-সাহিত্যের ভাষ্যকারদের রচনা-পদ্ধতি মৃত্যুঞ্জয়কে কখনোই চিরকালের মতো বন্দী করে নি; 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র বা 'বেদান্তগ্রন্থে'র কৃত্রিম, আড়ষ্ট গদ্য তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন।

১৩২১ সালে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতি প্রমথ চৌধুরী এই দিকটি দেখিয়ে দেন। তিনি লেখেন—কালের হিসাবে এবং ক্ষমতার হিসাবে মৃত্যুঞ্জয়ই পণ্ডিত-শ্রেণীর লেখকদের অগ্রগণ্য। 'প্রবোধচন্দ্রিকা'র গদ্য সম্বন্ধে প্রমথ চৌধুরীর কথা ছিল—

'দণ্ডীর কাব্যাদর্শ প্রভৃতি গ্রন্থের সংস্কৃত গদ্যকে ছন্দমুক্ত এবং বিভক্তিচ্যুত করিয়া তর্কালঙ্কার [বিদ্যালঙ্কার] মহাশয় এই কিম্ভূতকিমাকার গদ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন।'

কিন্তু প্রমথ চৌধুরীই তাঁর সেই প্রবন্ধে লেখেন যে মৃত্যুঞ্জয়—

"নিজে কখনই এরূপ রচনাকে গদ্যের আদর্শ মনে করেন নাই। সংস্কৃত পদ্যের ছন্দপাত করিলে তাহা যে বাঙ্গালা গদ্যে পরিণত হয়, এরূপ ধারণা যে তাঁহার মনে ছিল, একথা বিশ্বাস করা কঠিন। কেন না, তিনি একদিকে যেমন সাধুভাষার আদি লেখক—অপরদিকে তিনি তেমনি চলতি-ভাষারও আদর্শ লেখক।"

অর্থাৎ তাঁর শুধু শাস্ত্রচর্চার অধ্যবসায় ছিল না, যথার্থ শিল্পীর কানও ছিল।

[ক্রমশ]

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ব্যাপারে শ্রীগিরি গত পয়লা আগস্ট হাওড়া স্টেশনে পৌঁছলে বামপন্থী সমর্থকেরা তাঁকে সম্বর্ধনা জানায়

সাম্প্রতিক সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা রাষ্ট্রপতিপদে শ্রীবরাহগিরি ভেঙ্কটগিরির নির্বাচন। শ্রীগিরির এই উল্লেখযোগ্য সাফল্যের মূলে পশ্চিমবঙ্গের অবদান যে সর্বাধিক এটা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। সংবাদে প্রকাশ যে, সদ্য নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি তুলনামূলকভাবে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সর্বাধিক ভোট লাভ করায় তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর নিকট তাঁব কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। শ্রীগিরির জয়লাভের অর্থ প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে প্রগতিশীলতার জয়লাভ এবং পশিচমবঙ্গ গর্বোন্নত বুকে এই বিজয়ের অংশীদারত্ব বহন করেছে। শ্রীগিরিব জয়লাভের সংবাদ প্রকাশিত হওয়া মাত্রই সারা পশ্চিমবঙ্গে আনন্দের শিহরণ জেগে ওঠে। অবিশ্রান্ত বর্ষণকে উপেক্ষা করে রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে কলকাতার রাস্তায অপেক্ষারত জনতা শ্রীগিবির জয়ধ্বনিতে সারা শহব কাঁপিয়ে তোলে। শহরতলীতে এবং দূব গ্রামেও ঐই একই ঘটনা ঘটেছে। ওই দিনই যুক্তফ্রন্টের একটি সভা শেষে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিগণ শ্রীগিরিব বিজয়ের সংবাদ পেয়ে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে ওঠেন।

পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে শ্রীগিরির জয়লাভের তাৎপর্য একান্তই সুদূরপ্রসারী। এই রাজ্যে বামপন্থী যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হবাব পব থেকেই ভারতজোড়া প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি তার পতন ঘটানোর জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। যে কোন একটা অছিলায় যুক্তফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করার জন্য এক শ্রেণীর নেতা মরিয়া হয়ে উঠেছেন। যে কোন একটা অজুহাত পেলেই, এমন কি তা জলসার মত একটা অতি তুচ্ছ বিষয় হলেও, তাঁরা পশ্চিমবঙ্গের জন্য রাষ্ট্রপতির শাসন দাবি করে বসছেন। মাত্র কিছুদিন আগে অধুনা বিতাড়িত ও ধিকৃত প্রাক্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই কলকাতায় এসে যুক্তফ্রন্ট-বিরোধীদের একটি সভায় বলেছিলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের প্রতি তিনি ঠিকই নজর রাখছেন, সুযোগ বুঝে তিনি যাতে এই সরকার বাতিল হয় তার ব্যবস্থা করবেন। শ্রীগিরির জয়লাভের দ্বারা শুধু যে যুক্তফ্রন্টের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারী এই বিশেষ গোষ্ঠীটিরই শিরদাঁড়া ভেঙে গেল তাই নয়, যুক্তফ্রন্টের ভবিষ্যৎও অনেকটা নিরাপদ হল।

অতঃপর আমরা অবশ্যই আশা করতে পারি যে, চির-অবহেলিত পশ্চিমবঙ্গের প্রতি এবার কেন্দ্রীয় সরকার দৃষ্টি দেবেন। বস্তুত কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আজ একটা নতুন প্রগতিশীল শক্তির উদ্ভব হতে চলেছে। এই শক্তির অভ্যুত্থান কতটা সার্থক হবে এবং তা সমাজতান্ত্রিক আদর্শেব সঙ্গে কতটা সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে সেটা নির্ভর করে তাঁর নেতৃত্ব শেষ পর্যন্ত কতটা বলিষ্ঠ থাকে তার ওপর। যেহেতু পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর আনুগত্য বিশেষভাবে সমাজতান্ত্রিক আদর্শগুলির প্রতি, আগামী নতুন কেন্দ্রীয় সরকার যদি ওই আদর্শগুলির প্রতি সত্যই বিশ্বাসী হন, তাহলে পারস্পরিক লাভ ছাড়া ক্ষতির কোন আশংকাই নেই। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করে প্রধানমন্ত্রী বৃহত্তর জনসাধারণের প্রতি যে মমত্ববোধের পরিচয় দিয়েছেন, সেই পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর জীবনের চরম রাজনৈতিক সংকটকালে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্ট সরকারের কাছ থেকে তিনি অকুণ্ঠিত সমর্থন পেয়েছেন। এই সমর্থনটা যাতে রেসিপ্রোকাল বা পারস্পরিক হয় সেটা দেখা কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তব্য, এবং তা যদি সত্যিই বজায় রাখতে পারা যায় তাহলে সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যেও যুক্তফ্রন্ট সরকার অনেকটাই কাজ করতে পারবে।

চা-বাগিচায় ধর্মঘট

কিছুদিন আগে চটকল শ্রমিকেরা সমবেতভাবে বিভিন্ন দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে লাগাতর ধর্মঘটে নেমেছিলেন। এই ধর্মঘটে শ্রমিকদের দাবি-দাওয়াগুলির ন্যায্যতার প্রতি যুক্তফ্রন্ট সরকারের অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল। তা ছাড়া পাটের সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রার সম্পর্ক খুব নিবিড় বলে কেন্দ্রীয় সরকারেরও টনক নড়েছিল। ফলে সেই ধর্মঘট পুরোপুরি সাফল্যমণ্ডিত হয়, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের প্রধান দাবিগুলি মেনে নিতে বাধ্য হন।

পাটের পর চা। বলা বাহুল্য এই চা-ও ভারত সরকারের জন্য অনেক বৈদেশিক মুদ্রা এনে দেয়, অথচ প্রদীপের তলায় যেমন অন্ধকার, চা-শ্রমিকদের অবস্থা আজও ঊনবিংশ শতকের চৌহদ্দি পেরোয় নি। এই চা-কে অবলম্বন করে চা-বাগিচার মালিক থেকে শুরু করে চা-শিল্পের কর্তৃপক্ষগণ কোটিপতি হচ্ছেন অথচ চা-শ্রমিকের অবস্থার বিন্দুমাত্র উন্নতি হয় নি। চা-বাগিচায় জগতের কোন আইনই খাটে না, শ্রম-আইন তো অনেক দূরের কথা। কংগ্রেসী আমলে চা-শ্রমিকদের উন্নতির বিশেষ কোন চেষ্টা হয় নি।

যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকশ্রেণী শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়াবার সুযোগ পেয়েছেন। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে কায়েমী স্বার্থ ক্রমাগত অপপ্রচার চালাচ্ছে, যার ফলে অনেকেই বিভ্রান্ত হয়েছেন। কিন্তু এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, যুক্তফ্রন্ট সরকারকে আপাতত হটানো অসম্ভব, এবং এ সরকারকে দিয়ে এমন কোন কাজ করানো চলবে না যা শ্রমিক-স্বার্থের প্রতিকূল। পাটশিল্পের মত চা-শিল্পের ক্ষেত্রেও, যুক্তফ্রন্ট সরকার তাঁর নিজ শ্রম-নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে, শ্রমিকের স্বার্থরক্ষাতেই এগিয়ে এসেছেন। এ ছাড়া পাটশিল্প-ধর্মঘটের সঙ্গে বর্তমান ধর্মঘটের আরও একটি সাদৃশ্য আছে। তা হচ্ছে সকল শ্রমিকই একসঙ্গে ধর্মঘট করেছেন। এখানেও পরস্পরবিরোধী দুটো ইউনিয়ন পূর্ব ধর্মঘটের ক্ষেত্রে যা করেছিল তাই-ই করছে, অর্থাৎ একযোগে কাজ করছে, কাজেই এ ধর্মঘট সাফল্য-লাভ করবেই।

ধর্মঘট শান্তিপূর্ণভাবে চলছে, এবং এখনো পর্যন্ত মালিকপক্ষ, অভ্যাস ও ঐতিহ্যমত, মীমাংসার জন্য এগিয়ে আসে নি। কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রী জে এল হাতী বলেছেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার এই ধর্মঘটে হস্তক্ষেপ করতে চান না, কেন না বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এলাকাভুক্ত। এভাবে দায়িত্ব এড়িয়ে কেন্দ্রীয় সরকার সুবুদ্ধির পরিচয় দিচ্ছেন বলে মনে হয় না। রাজ্যসভায় বিরোধী সদস্যরা চা-বাগিচা শিল্পকে রাষ্ট্রের পরি-চালনাধীনে আনবার জন্য দাবি জানিয়ে বলেছেন যে, চা বছরে প্রায় চল্লিশ লক্ষ টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে থাকে এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের দিক থেকে চা দ্বিতীয় বৃহত্তম পণ্য হিসাবে পরিগণিত। এই দাবি সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত।

প্রায় তিনশো চা-বাগিচার দুই লক্ষ শ্রমিক দশ দফা দাবির ভিত্তিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট শুরু করেছেন। তাঁদের প্রধান দাবি, বেতন বাড়াতে হবে, এবং আবাদী জমিতে ১৯৫৬ সালের হারে শ্রমিক নিয়োগ করতে হবে। চা-শ্রমিক ধর্মঘট প্রসঙ্গ লোকসভাতেও উঠেছে, কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রীও তাঁদের দাবির যৌক্তিকতা স্বীকার করেছেন। কিন্তু মালিকপক্ষ তাঁদের চিরন্তন যুক্তিই প্রয়োগ করছেন যে, শ্রমিকদের দাবি মেটাতে গেলে লোকসান হবে। কিন্তু এই যুক্তির মূলে কোন সত্যতা নেই। কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রীও একথা স্বীকার করেছেন, এবং এ মন্তব্যও করেছেন যে, মালিকপক্ষ গোড়াতেই সচেতন হলে এ অবস্থা হত না। কিন্তু একথা বলা সত্ত্বেও এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের আরও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়া উচিত ছিল। এই নিবন্ধ রচনার সময়, ধর্মঘটী শ্রমিকদের তরফ থেকে দুজন প্রতিনিধি নয়াদিল্লীতে আহূত হয়েছেন। চাপে পড়ে মালিকপক্ষ কতটা নামতে রাজী হন, তারই ওপর ধর্মঘটের সাফল্য নির্ভর করে।

বন্যা-সমস্যা

বিগত সপ্তাহের বঙ্গদর্শনে 'চিরন্তন সমস্যা' এই শিরোনামায় পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে বন্যাজনিত ক্ষয়-ক্ষতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তার আগের কয়েকটি সংখ্যায় উত্তরবঙ্গের সাম্প্রতিক বন্যার কথা বলা হয়েছে। বর্তমান সপ্তাহের উল্লেখযোগ্য সংবাদ মালদহ ও মুর্শিদাবাদে বন্যা। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে বন্যা এখন বাৎসরিক বিষয় হয়ে গেছে, এবং বন্যাজনিত ক্ষয়ক্ষতির মোট পরিমাণটাও বড় অল্প নয়। শুধু যে ফসল ও অপরাপর সম্পত্তিরই ক্ষতি হচ্ছে তাই নয়, প্রচুর প্রাণহানির সংবাদও আসছে। অথচ এ বছরে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছে এমন কথা কেউ নিশ্চয়ই বলবেন না, বরং বলা যায় যে, এবারে প্রয়োজনের তুলনায় বৃষ্টির পরিমাণ কম। অল্প বর্ষণেই যদি নদী তার দুকূল ভাসিয়ে দেয়, তাহলে এই সিদ্ধান্তেই আসা সম্ভব যে, নদীগুলি তাদের জল পরিবহন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে, রিভার-বেড উঁচু হয়ে গেছে। এটা হয়েছে দীর্ঘকালীন অবহেলার ফলে। কাজেই যদি বন্যা-সমস্যার সমাধান করতে হয় তার জন্য নদীগুলির সংস্কার সাধন করা বিশেষ প্রয়োজন, সেগুলির জল বহনের ক্ষমতা বাড়ানো দরকার। তা না হলে প্রতিবছর একই দৃশ্যের অবতারণা হবে। এবারে অবশ্য যুক্তফ্রন্ট সরকারের তৎপরতায় বন্যাক্লিষ্টদের সাহায্য পাঠানোর ব্যাপারটা বেশ সন্তোষজনক দ্রুতগতিতে হচ্ছে, কিন্তু এভাবে শুধু ত্রাণখাতের ওপর নির্ভর না করে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা মারফৎ বন্যা নিয়ন্ত্রণ করাটাই সবচেয়ে সমীচীন কাজ হবে। আশা করি সেচমন্ত্রী মহাশয় এদিকে বিশেষ দৃষ্টি দেবেন।

ভারতের
আদিতম
রসায়ন

চ্যবনপ্রাশ

আয়ুর্ব্বেদোক্ত বিশুদ্ধ উপাদানে প্রস্তুত

চ্যবনপ্রাশ নূতন ও পুরাতন সর্দ্দি কাশি, স্বরভঙ্গ ও শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় বিশেষ উপকারী।

টনিক হিসাবে নিয়মিত ব্যবহারে দেহের দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা দূর করে ও শরীরের পুষ্টি সাধন করিয়া স্বাস্থ্যশ্রীর পুনরুদ্ধার করে।

বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা বোম্বাই কানপুর

স্বাস্থ্যদপ্তর সংবাদ

আমরা একথা বারবার উল্লেখ করেছি যে, পশ্চিমবঙ্গের স্বাস্থ্যদপ্তর কয়েকজন অসাধু, অকর্মণ্য ও চরিত্রভ্রষ্ট আমলার হাতে পড়ে শুধু সরকারী ব্যবস্থাপনাকেই লোকচক্ষে হেয় করছে না, স্বাস্থ্যদপ্তর ও তার সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলি সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে ভীতি ও হতাশার সৃষ্টি করেছে। স্বাস্থ্যদপ্তরে সৎ, কর্মঠ ও যোগ্য লোক নিশ্চয়ই আছেন, কিন্তু তাঁরা অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একান্ত অসহায়, বিশেষ করে বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দুর্বলচিত্ততার সুযোগ নিয়ে স্বাস্থ্যদপ্তর 'দুষ্টচক্রের' কয়েক ব্যক্তির ব্যক্তিগত সাম্রাজ্যে পরিণত হয়েছে। যারা এই দুর্নীতির নায়ক তারা শুধু রাইটার্স বিল্ডিংসেই নয়, প্রতিটি সরকারী হাসপাতালে নিজেদের কয়েকটি করে পাপেট বসিয়ে সেখানে অসাধুতা, দুর্নীতি ও অনাচারের সৃষ্টি করেছে। এই সরিৎ-ধারার ঘূর্ণাবর্তটিকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট আমাদের সাংবাদিকতার এলাকার মধ্যে যতদূর সম্ভব চিনিয়ে দিয়েছিলাম ; কিন্তু আশ্চর্য, কি কংগ্রেস আমলে কি যুক্তফ্রন্টের আমলে এঁরা বহাল তবিয়তে শুধু যে টিকে আছেন তাই নয়, খোদ স্বাস্থ্যমন্ত্রীকেই ওই আবর্তে হাবুডুবু খাওয়াচ্ছেন।

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অবস্থাটা বড় অ্যানাক্রনিক। জনসভায় তিনি বুক ফুলিয়ে বলেন যে, স্বাস্থ্যদপ্তর থেকে তিনি দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ না করে ছাড়বেন না, তিনি চান সহযোগিতা। অথচ আমরা হাড়ে হাড়ে জানি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সহযোগিতা করতে গেলে অবস্থাটা কি দাঁড়ায়। গত কয়েক মাসে একটা নয়, দুটো নয়, কমসে কম ত্রিশটা স্পেসিফিক কেস আমরা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সামনে তুলে ধরেছি, কিন্তু ফল অষ্টরম্ভা; যেহেতু আমাদের কেসগুলি তাঁর একান্ত আস্থাভাজনদের বিপক্ষে যায়। অতএব তিনি আমাদের লেখার পিছনে কোন স্বার্থ বা উদ্দেশ্য আছে কিনা সে বিষয়ে গবেষণা করতে বসেন।

আর উপক্রমণিকা দীর্ঘায়িত না করে আমাদের বক্তব্যগুলিকে সরাসরিভাবে তুলে ধরছি। আশা করি স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় ক্রুদ্ধ হবেন না। আমার প্রথমেই স্বাস্থ্যদপ্তরের ভারপ্রাপ্ত সচিব শ্রী এস আর দাস কর্তৃক প্রচারিত একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তির প্রতি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আশা করি, স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয় বিজ্ঞপ্তিটি দেখেছেন ও বিজ্ঞপ্তিটির বিষয়ে অবহিত আছেন, কেন না মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তমতই ঐ বিজ্ঞপ্তিটি তৈরি করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিটি নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো।

"In the last Cabinet meeting we were informed that in cases of re-employment where Cabinet approval is required the proposal must be placed before the Cabinet before the actual re-employment begins. In case the proposal cannot be put up in proper time the incumbent must be released on the date of superannuation for the date on which his re-employment ends (in case of a re-employed officer). This may be brought to the notice of all concerned.

An order may be issued to expedite the disposal of re-employment cases. All files dealing with such cases should be flagged prominently with the legend "re-employment cases" for immediate disposal.

This also may be brought to the notice of all concerned."

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নিকট অতঃপর জিজ্ঞাস্য : এই যদি নিয়ম হয়, তবে চাকরীর মেয়াদ পার হয়ে যাবার পরও তাঁর দপ্তরের অধীনে কর্মরত তিনজন অফিসার বহাল তবিয়তে কাজ করে যাচ্ছেন কি করে? শোনা যাচ্ছে, এঁদের নাম ডঃ দত্তগুপ্ত, ডঃ সেন ও ডঃ আচার্য এবং এঁরা কেউই পুনর্নিয়োগের জন্য যথাসময়ে আবেদন করেন নি। যদি তর্কচ্ছলে ধরেও নেওয়া যায় যে, যথাবিহিতভাবেই তাঁদের পুনর্নিযুক্ত করা হয়েছে, তা হলেও তা আবার অপর একটি সরকারী নির্দেশের পরিপন্থী হয়ে যায়। তা হলো : No re-employment will be given unless they agree to accept appointment at a place situated outside the head-quarter. অতএব স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহাশয়ের নিকট পুনরায় জিজ্ঞাস্য : এঁরা কিভাবে আজও পর্যন্ত খোদ রাইটার্স বিল্ডিংসের ভিতরেই রয়ে গেলেন?

মদের আসর?

গত সপ্তাহে হেলথ ডিরেক্টরেটের জনৈক পদস্থ আমলার (এই ভদ্রলোক স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অতি বিশ্বাসভাজন। এঁর পদোন্নতির অলৌকিক (?) কাহিনী সম্ভবত সাপ্তাহিক বসুমতীর পাঠক-সাধারণের স্মরণে আছে। ১৯৬৭ সালের নভেম্বর মাসে যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করার প্রতিবাদে স্বতঃস্ফূর্ত গণবিক্ষোভকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য যখন কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় নৃশংস পুলিশী তাণ্ডব চলছিল, তখন এই ভদ্রলোক স্বাস্থ্যদপ্তরের একটি গাড়িতে চেপে রিপন স্ট্রীটের একটি বাড়িতে চুপি চুপি এসে কিভাবে ব্যাক ডেট দিয়ে তাঁর প্রোমোশনের অর্ডারে সই করিয়ে নিয়েছিলেন—অতীতে অবিশ্বাস্য ও চাঞ্চল্যকর সেই ঘটনার বিবরণ আমরা বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করেছি।) ঘরে বিকেলের দিকে মদের আসর বসার যে ছোট্ট সংবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে বিভিন্ন মহলে দারুণ বিস্ময় ও আলোড়নের সৃষ্টি হলেও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদ্বয়ের নাকি 'কুছ পরোয়া নেহি' মনোভাব!

স্বাস্থ্যদপ্তরের দুজন অফিসার সহ বহু কর্মী বঙ্গদর্শনের ছোট্ট সংবাদটির প্রতি শুধু সমর্থনই জানান নি, আরও কিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য দিয়ে গেছেন। তাঁদের অভিযোগ—মদের আসর অতীতেও বসেছে এবং তার জন্যে সরকারী অর্থও ব্যয় করা হয়েছে। বারান্তরে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ সহ এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা প্রকাশ করা হবে।

অভিযোগসমূহের বিষয়বস্তু অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও গুরুতর ধরনের। তাই এ সম্পর্কে প্রত্যক্ষদর্শী ও ওয়াকিবহাল ব্যক্তিদের অবিলম্বে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করছি। তাঁরা নির্ভয়ে, নিশ্চিন্তে, বিনা দ্বিধায় আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, সমস্ত ব্যাপারে গোপনীয়তা রক্ষা করা হবে—এ প্রতিশ্রুতি তাঁদের আমরা দিচ্ছি।

মাসিক ১০, টাকার কিস্তিতে লাভ করুন অল ওয়ার্ল্ড স্ট্যাণ্ডার্ড ট্রানজিস্টর (জাপান মেক) জনপ্রিয় মূল্য ৩০০,। দেশব্যাপী খ্যাতি আছে। ডবল স্পীকার ৩ ব্যাণ্ড, ৮ ট্রানজিস্টর। নাইট-ল্যাম্প ফিট করা। কেবল ইংরেজী বা হিন্দিতে যোগাযোগ করুন।

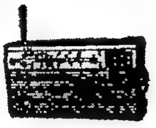

Allied Trading Agencies
(B.C.) P.B. 2123, Delhi-7.

ভারত দর্শন

রাষ্ট্রপতির আসনে জনগণের প্রতিনিধি

গত পনেরই আগস্ট লিখিত ভারত-দর্শন প্রবন্ধে আমাদের প্রার্থনা ছিল, জয় হোক ভারতের, জয় জনগণেশের। সে প্রার্থনা পূর্ণ হয়েছে, আসমুদ্র হিমাচলের সমস্ত উত্তেজনা শুভেচ্ছা এবং আশাপূরণের বিজয়দুন্দুভি বাজিয়ে রাষ্ট্রপতির আসন অলঙ্কৃত করেছেন শ্রীবরাহ গিরি ভেঙ্কট গিরি। সিণ্ডিকেট-স্বতন্ত্র-জনসঙ্ঘের সম্মিলিত প্রয়াসকে পরাস্ত করে ভারতের গণ-আশীর্বাদ নিয়ে এই প্রথম একজন রাষ্ট্রপতি ভবন দখল করলেন। ভারতের ইতিহাসে যে ঘটনা একটি যুগান্তরের সীমায় চিহ্নিত হয়ে রইল। বরাহ গিরি ভেঙ্কট গিরিই আজ প্রকৃত জনপ্রতিনিধি, নামে মাত্র নির্দল নন, যেমন নামে মাত্র দলহীন ছিলেন সঞ্জীব রেড্ডি সংসদের অধ্যক্ষের পদে নির্বাচিত হওয়ার পর কংগ্রেসের সদস্যপদ ত্যাগ করেও।

অন্ধ্র প্রদেশের ভোট গণনাকাল থেকেই গিরির সাফল্য উদ্‌গ্রীব জনসাধারণকে বিপুল উত্তেজনায় আন্দোলিত করতে থাকে। আসামে যখন পক্ষে ৪৮, বিপক্ষে ৫৭ এম এল এ-র সমর্থন তখনও গিরির সাফল্যই সূচিত হচ্ছে। কেন না অন্ধ্রে ১৩১ এম এল এ-কে পক্ষে টানা যেমন, আসামে ৪৮ এম এল এ-র সমর্থনও তেমনিই উৎসাহব্যঞ্জক। বিহারের গণনায় ১১১-র ওপর ১৬৫ গরিষ্ঠতা সেই উল্লাসকে তীব্রতর করেছে; এমন সময় কট্টর দক্ষিণী এলাকা গুজরাটের সংবাদ (পক্ষে মাত্র ১২, বিপক্ষে ১০২) সেই উৎসাহে সাধারণ মানুষের মনে ক্ষণিকের মেঘ-মেদুরতা সৃষ্টি করলেও রাজনীতি-অভিজ্ঞ মানুষ তাকে স্বাভাবিক ফলশ্রুতি বলেই গ্রহণ করছেন। তাঁরা তখন উদগ্রীব তামিলনাড়ুর ফলাফল জানার জন্য যেখানে গিরির পক্ষে ঢালাও ভোট পড়ার সম্ভাবনা। তাঁরা অপেক্ষায় আছেন কেরল ও জম্মু-কাশ্মীরের জন্য। হরিয়ানা থেকে এলো পাঁচজনের অধিকতর সমর্থন। কেরালা দিল ১০৩—১৫, জম্মু-কাশ্মীর ৫৮—৮। মধ্যপ্রদেশের ফলাফলও চমৎকার। পক্ষে ৯০৩—বিপক্ষে ১১২। কিন্তু মহীশূরের প্রত্যেকটি কংগ্রেসী ভোট এবং মহারাষ্ট্রে ২০৪ জন কংগ্রেসী এম এল এ-র ২০১টি ভোটই পকেটস্থ করে কংগ্রেস প্রার্থী রেড্ডি অপেক্ষারত শ্রোতৃবর্গকে ম্রিয়মাণ করে দিলেন। গুজরাট, মহীশূর ও মহারাষ্ট্রের রেড্ডির প্রতি বিপুল কংগ্রেসী সমর্থন হাওয়া যেন পালটে দিল। কিন্তু গিরি স্টেডী ব্যাটসম্যানের মতো ক্ষতিপূরণ করে চললেন পরবর্তী রাজ্যগুলি থেকে। যেমন, নাগাল্যাণ্ড দিল ৩৮—৪; উড়িষ্যা ৬৭—১৫; পাঞ্জাব ৮০—১০; রাজস্থান ৩৫—৯৮ কিন্তু ভোট মূল্যের আধিক্য স্বল্পতা হেতু শ্রীগিরির অগ্রগামিতা এই সমুদয় রাজ্যের উল্লেখযোগ্য সমর্থন পাওয়ার পরও খুবই ক্ষীণ। তার পরই যুক্ত হল তামিলনাড়ুর ১৪২—৫৪। গিরি যেন অনেকটা সামলে উঠেছেন। উত্তর প্রদেশের ফলাফল তখন সবচেয়ে উৎকণ্ঠিত প্রতীক্ষা সামনে ধরে রেখেছে। এখানে উনিশ-বিশে অনেক আসে যায়। এখানেই ভোট মূল্য অনেক। এ রাজ্যেরই অন্যতম বৃহৎ দল বি কে ডি দেশমুখের প্রতি প্রথম পছন্দ প্রদান করবেন বলে ঘোষণা। সেই উত্তর প্রদেশ ১৮১—১৩৮ ভোটে গিরির জয়লাভের পথকে প্রশস্ত করে দিল। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ? পশ্চিমবঙ্গের সমর্থন এমন বিপুল যে আশা হল, বোধ হয় গিরির জয়লাভ একটি নিশ্চিত লক্ষ্যের দিকে স্থিরভাবে এগিয়ে যাবে এবার। পশ্চিমবঙ্গ গিরিকে দিল ২৪৮ ভোট যার মূল্য ৩১ হাজার। যদিও পশ্চিমবঙ্গ থেকে আরও কিছু বেশি ভোট আশা করা একেবারে অযৌক্তিক ছিল না। অনেকের ধারণা ছিল রেড্ডি খুব জোর ১১টি এম এল এ-র ভোট টানবেন। কিন্তু রেড্ডি টানলেন ২৫টি। সংসদের কংগ্রেস এম পি-র সংখ্যা ৪৩২। মোট সদস্য সংখ্যা ৭৭৭। এঁদের মধ্যে ৩৫১ জনের ভোট গিরির পক্ষে এবং রেড্ডির পক্ষে পড়ে ২৬৮টি ভোট। সর্বসাকুল্যে শ্রীগিরি গরিষ্ঠতা অর্জন করলেও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য তখনও দ্বিতীয় পছন্দের ভোট অন্ততপক্ষে ১৬,৬৫৪টি (ভোট মূল্য) প্রয়োজন ছিল। উত্তর প্রদেশ এবং বি কে ডি-কে ধন্যবাদ, শ্রীগিরি তাও পেলেন। জয়ী হলেন বরাহ গিরি ভেঙ্কট গিরি।

গণনার ফলাফল—

গিরি—১ম, ৪,০১,৫১৫; ১ম ও ২য় মোট—৪,২০,০৭৭। রেড্ডি—১ম, ৩,১৩,৫৪৮; ১ম ও ২য় মোট—৪,০৫,৪২৭।

দেশমুখের পক্ষে প্রথম পছন্দ ভোট মূল্য—১,১২,৭৬৯।

দ্বিতীয় পছন্দের সিদ্ধান্তকারী ভোট

যে দ্বিতীয় পছন্দের ভোট অবশেষে মুশকিল আসান করল তা সঞ্জীব রেড্ডির অনুকূলে ৯০ হাজারটি প্রদত্ত হলেও, দেশমুখের ভোটপত্রগুলি থেকে গিরিও টেনে নিলেন, ১৮,৪৩৭টি ভোট অর্থাৎ প্রদত্ত ভোটের মূল্য।

নির্দলীয় রাষ্ট্রপতি ও গণতন্ত্র

একমাত্র স্বতন্ত্র-জনসঙ্ঘকে বাদ দিলে শ্রীগিরি ভারতের সর্বমতাদর্শানুযায়ী জনগণেরই আস্থা ও সমর্থন লাভে সমর্থ হয়েছেন, ইতিপূর্বে তাঁর পূর্বসূরী আর তিন রাষ্ট্রপতির মধ্যে কেউ যা কখনও পান নি। প্রকৃত গণতান্ত্রিক কর্ণধাররূপে সে হিসেবে শ্রীযুত গিরির নির্বাচন ভারতের ইতিহাসে অভূতপূর্ব। শ্রীগিরি কংগ্রেস সংগঠনের অন্যতম, প্রবীণতম কর্মী ও নেতা। সিণ্ডিকেটের ক্ষমতার লড়াই-এর (প্রধানমন্ত্রীকে সামনে রেখে শোষিত জনগণের সঙ্গে লড়াই) কূট কৌশল শ্রীগিরিকে কংগ্রেস সংগঠনের চৌহদ্দির বাইরে নিক্ষেপ করেছে। বলা বাহুল্য, সেজন্যই তিনি কিন্তু রাতারাতি জনগণের প্রতিনিধিতে পরিণত হন নি। ভারতের রাজনীতিতে যে জনগণেশ তাঁর শুণ্ড আন্দোলিত করেছিলেন ১৯৬৭-র রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর থেকে; যাঁরা রুখে দাঁড়াতে চাইছিলেন মুষ্টিমেয় শোষণকারী ও মুনাফাশিকারী রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে, তাঁরা বর্তমান পরিস্থিতিতে চতুর্দিকে অবলম্বন খুঁজে বেড়াচ্ছেন, শক্তি সংগ্রহে উন্মুখ হয়ে উঠেছেন, অতীতের হতাশা অনেক পাতলা হয়ে আসতে আরম্ভ করেছে। শয়তান যেমন নিজের কবর নিজেই খোঁড়ে, গণ-নিপীড়করাও তেমনি আপন ক্ষমতালোভের উদগ্র লালসায় নিজের সর্বনাশ নিজেরাই ডেকে আনেন। এই আস্তিক নিয়মেই কংগ্রেসের সেই নিপীড়নকারী মুষ্টি যতই

বজ্রআঁটুনি কঠোর হয়েছে, ফস্কা গেরোয় ততই তা শ্লথতর হয়ে পড়ছে। শ্রীযুত গিরিও সেই ফস্কা গেরোরই ফলশ্রুতি। গিরি নির্দলীয় রূপে বার হয়ে এলেন আর মুমুক্ষু সাধারণ এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য তাঁকে মাথায় তুলে নিলেন। সাধারণের পাশে এসে দাঁড়াতে হল প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকেও। তিনিও এলেন। অপেক্ষাকৃত রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কংগ্রেসী নেতৃত্ব তাঁর হাত শক্ত করার জন্য পাশে এসে দাঁড়ালেন সেই মন্ত্র সামনে রেখে : সর্বনাশে সমুৎপন্নে অর্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ। হ্যাঁ, বস্তুতপক্ষে ক্ষমতাশিকারীদের হাতে কংগ্রেস গোল্লায় যেতে বসেছিল। একটি ভুভারত-বিস্তৃত সংগঠন হয়ে পড়ছিল কতকগুলি গণ-বিরোধী ষড়যন্ত্রীর খেলার ময়দান। সেই ময়দানে প্রায় প্রত্যক্ষ এবং সর্বশেষ ষড়যন্ত্র চলছিল শ্রীমতী গান্ধীকে কংগ্রেস সংসদীয় দলের নেতৃপদ থেকে অপসারণের প্রয়াসকে কেন্দ্র করে, পরিণত প্রত্যক্ষ রূপ প্রকট হয়ে পড়ল বাঙ্গালোর কংগ্রেসে সঞ্জীব রেড্ডির নাম তাড়াহুড়ো করে সিণ্ডিকেটের ভোটে বার করে আনার ব্যাপারে। সংঘর্ষ অনিবার্য দেখে প্রমাদ গণনা করলেন প্রধান-মন্ত্রী। ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের প্রগতিশীল রাজনীতির পথে পা বাড়িয়ে শ্রীমতী গান্ধী শোষণকামী গোষ্ঠীর বিরাগভাজন হয়েছেন। সে বিরাগ এতো তীব্র যে তা আর আপোষের ধৈর্য ধারণ করতে নারাজ। প্রধানমন্ত্রী বুঝলেন, প্রধানমন্ত্রিরূপেও গণমঙ্গলের জন্য শোষক-শিবির থেকে একটি পা-ও বাইরে পাতার ক্ষমতা ভারতের প্রধানমন্ত্রী ভোগ করেন না। অথচ জনগণ আজ আর সেই মান্ধাতার আমলের সর্বংসহ নির্বিবাদী সংখ্যা মাত্র নয়। অনুভব করলেন, আজকের জন-জাগরণের শুভ-মুহূর্তকে কাজে লাগাতে হলে তাঁদেরই আশীর্বাদ নিয়ে তাঁর তথা কংগ্রেসের রাজনৈতিক জীবনকে নতনভাবে শুরু করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীগিরির নাম একবারও উচ্চারণ না করেও, বিবেকানুযায়ী ভোট দানের স্বাধীনতা দাবি করে কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে রেড্ডির পক্ষে যুক্ত বিবৃতি দানের ভ্রান্ত পথ বরণে সরাসরি অস্বীকার করে কার্যত গিরির সমর্থক হয়ে কড়া নেতৃত্বের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। তাঁর এই ঘোষণার জন্য তিনি ধীরভাবে সময় গ্রহণ করেছেন, দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতিকে লক্ষ্য করেছেন মানুষ আত্মিকের দৃষ্টিকোণ থেকে। ঘোষণা এলো ঠিক রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পূর্বমুহূর্তে। এ সময় তাঁর শিবির পাকাপোক্ত হয়ে গেছে। বিভিন্ন রাজ্যে প্রধানমন্ত্রীর সমর্থকবৃন্দ প্রকাশ্য বিবৃতির মাধ্যমে তাঁকে ক্ষমতা দান করেছেন। ম্রিয়মাণ হয়ে পড়লেও সিণ্ডিকেট তখনও বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতা সম্যক উপলব্ধি করেন নি বা করতে চান নি। কংগ্রেস সভাপতি প্রধানমন্ত্রী, শ্রীরাম, আমেদ, কমলাপতি ত্রিপাঠী প্রমুখ নেতৃবৃন্দের কাছে জবাবদিহি চাইছেন, গদির সুবাদে। কংগ্রেসে চূড়ান্ত শিবির স্থাপনা তার দ্বারাই স্থিরীকৃত হয়ে গেল। ভারতের জনসমুদ্রে প্রচণ্ড আলোড়ন ও তরঙ্গাভঙ্গ। তরঙ্গমালিকা সোৎসাহে ধেয়ে চলল শ্রীমতী ইন্দিরাকে জাতীয় নেতৃত্বের তুঙ্গ-সীমায় তুলে নেওয়ার জন্য। গিরির সাফল্য, বস্তুতপক্ষে শ্রীমতী গান্ধীরই জয়। গান্ধীগোষ্ঠীর বিপুল সমর্থন ভিন্ন শ্রীযুক্ত গিরির পক্ষে বিজয়ী হয়ে আসা ছিল অসম্ভব, এবং গিরির পরাজয় ছিল শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষে চূড়ান্ত পরাভব।

আবার গিরির সাফল্যে শ্রীমতী গান্ধীর যে সাফল্য সূচিত হল, সে সাফল্য এসেছে ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন তথা দিকে দিকে জনসাধারণের মাধ্যমে। এই পরিস্থিতি দেখা না দিলে শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষে এমন শক্ত শিবির খাড়া করাই ছিল অসম্ভব কল্পনা। যা ভারতের জনপ্রিয় নেতা জওহরলাল নেহরু পারেন নি, তাঁর কন্যা তাকেই যে সম্ভব করলেন তার বাস্তব কারণ ভারতের গণ-জাগরণ। শ্রীমতী গান্ধী ও গিরি আজ তাই সমস্ত শক্তির উৎস স্বরূপ জনগণের কাছে নৈতিক ও বাস্তবিকভাবে কৃতজ্ঞ থাকবেন ; কেন না আজ জনগণের পূর্ণ সহযোগিতায় ভারতের কর্ণধারদ্বয় ক্ষমতাভোগী। বিপুল গণ-উত্থানের পরিপ্রেক্ষিতেই ক্ষীণতর হয়ে পড়ছে মুষ্টিমেয়-স্বার্থের শিবিররক্ষী ক্ষমতাগ্রাসীরা।

আজ তাই একথা বলা যেতে পারে, এই মুহূর্তে, ভারতীয় গণতন্ত্র অন্তত সাধারণ সুস্থ চেহারা নিয়েছে। প্রধান-মন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতি এই দুই মর্যাদার আসন আজ অলংকৃত করে আছেন দেশের বৃহৎ সংখ্যক মানুষের সমর্থনপুষ্ট দুই জন-প্রতিনিধি।

কিন্তু তারপর ?

তার আর পর নেই। যে গাড়ি চলতে সুরু করেছে তা চলবেই। তবে এখন চড়াই-এর পথ। কষ্ট হবে। সামনে ঝুঁকি আর বিপদ লক্ষ্যে রেখে তাই চালককে সতর্ক এবং কুশলী হতে হবে। কিন্তু ঐ পথ। একম্ এবং বর্তমান ব্যবস্থায় অদ্বিতীয়ম্। প্রত্যাবর্তনের উপায় নেই।

এই অমোঘ পথ-নির্দেশকেই এতোকালে বোধ হয় হৃদয়ঙ্গম করতে পারছেন সিণ্ডিকেট-চূড়ামণি শ্রীযুত নিজলিঙ্গাপ্পা মহোদয়।

বিভিন্ন রাজ্য থেকে তাঁর কাছে অবিরত অনুরোধ যাচ্ছে, দল দ্বিখণ্ডিতকরণের অবাস্তব পরিকল্পনা ত্যাগ করুন। প্রত্যাহার করুন ভীতিপ্রদর্শনের পথ। মিটিয়ে নিন বিবাদ। একই সুরে সুর সংযোজনা করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চ্যবনও চালাচ্ছেন জোর দূতিয়ালী। কিন্তু রথের চাকা যখন গড়াতে শুরু করেছে তখন কুরুক্ষেত্র রুখবে কে। এতোদিন যাঁরা জনগণের বুকের ওপর রথ চালাতে অভ্যস্ত তাঁরা রাজপথ ছেড়ে দেবেন কি জনতার শোভাযাত্রার জন্য। ইতিপূর্বে এই শিবিরের কেউ যেন বলেছিলেন, লাভ নেই। ক্ষমতাই যখন যেতে বসেছে, কি হবে পার্টি রেখে। ভেঙে দাও আর হাত মেলাও সমমতাবলম্বীদের সঙ্গে। সংখ্যায় যারা এখনও কিছু কম নয়। দেশমুখ পক্ষে ভোটের বন্দনাই তার বড় প্রমাণ। সেই সঙ্গে রয়েছে সিণ্ডিকেট সমর্থক কংগ্রেসীরা, রেড্ডির পক্ষাবলম্বী যাঁরা। এই দেশমুখ সমর্থকদের ভোটের পরিমাণ আগেই বলা হয়েছে। এখন রেড্ডি সমর্থক কংগ্রেসের চেহারার দিকে নজর দেওয়া যাক। ভোটের ফলাফলে দেখা গেছে শ্রীরেড্ডি নির্বাচনী কলেজের মোট ভোটারদের এক-তৃতীয়াংশের সমর্থনও লাভ করেন নি। নিচের তালিকায় রেড্ডির পক্ষে কংগ্রেসী ভোটের চিত্র এই রকম—

	কংগ্রেস প্রার্থীর ভোট	বংগ্রেসের শক্তি
অন্ধ্র	১১৮	১৯৬
আসাম	৫৭	৭১
বিহার	১১১	১১৫
গুজরাট	১০২	১০০
হরিয়ানা	৩২	৪০
জম্মু ও কাশ্মীর	৮	৬১
মহারাষ্ট্র	২০১	২০৪
নাগাভূমি	৪	—
ওড়িষ্যা	১৫	৩১
পাঞ্জাব	১০	৩৩
রাজস্থান	৯৮	১১১
তামিলনাড়ু	৫৪	৪৯
উত্তরপ্রদেশ	১৩৮	২১৬
পশ্চিমবংগ	১৫	৫৫
কেরল	১৫	৯
মধ্যপ্রদেশ	১১২	১৭৩
মহীশূর	১০৫	১৩৫
সংসদ	২৬৮	৪৩১

গুজরাট, মহীশূর ও মহারাষ্ট্র রেড্ডিকে অর্থাৎ সিণ্ডিকেট প্রার্থীকে দিয়েছেন সর্বোচ্চ পরিমাণ কংগ্রেসী ভোট।

কিন্তু কেবলমাত্র এঁদের ওপর ভরসা করেও এবং অন্যান্য রাজ্যের সমর্থনের দিকে তাকিয়েও যদি সিণ্ডিকেট প্রধান-মন্ত্রী ও কংগ্রেসের স্বাধীন ভোটাধিকারের দাবিদারদের প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে যান, তবে সঞ্জীব রেড্ডিকে তাড়াহুড়ো করে দলীয় প্রার্থী খাড়া করার মতোই অবিবেচনা প্রসূত কাজের জন্য পরিতাপ অনিবার্য হয়ে উঠবে সিণ্ডিকেট মহারথীদের পক্ষে।

বেলফাস্টের রাস্তায় বৃটিশ সৈন্যদের স্টেনগান সহ টহল দিতে দেখা যাচ্ছে

আলস্টার ঃ

আলস্টার বা উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডে প্রোটেস্টাণ্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে দাঙ্গা-হাঙ্গামা সাময়িকভাবে থামলেও, এখনও সেখানে থমথমে অবস্থা বিরাজ করছে। এক সপ্তাহের দাঙ্গায় লণ্ডনডেরীতে ন' জন মারা গেছে, পাঁচশ' জনের ওপব আহত হয়েছে। এদের সবাই প্রায় ক্যাথলিক। এ ছাড়া বেলফাস্টেও বড় রকমের দাঙ্গা হয়েছে। উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড সরকারের পুলিশ দাঙ্গা দমনে ব্যর্থ হয়েছে। শেষ পর্যন্ত বৃটিশ সৈন্য এসে অবস্থা আয়ত্তে এনেছে।

উত্তব আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রোটেস্টাণ্ট-ক্যাথলিক বিরোধ আজ নতুন নয়। কয়েক শত বৎসর ধরে এই বিবোধ চলে আসছে। বৃটিশ-অধিকৃত আয়ার্ল্যাণ্ডে স্বাধীনতা আন্দোলন শক্তিশালী হবার পর সুচতুর বৃটিশ সবকার বিভেদনীতির আশ্রয় গ্রহণ কবে দেশবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে ১৯২০ সালে আয়ার্ল্যাণ্ড ভাগ করে। অবশ্য ভারত ভাগের সময় যেমন তারা মুসলমান সমাজের একাংশেব সমর্থনকে অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করেছিল, ঠিক তেমনি তারা আয়ার্ল্যাণ্ড ভাগ করার সময়েও উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ডেব এক দল প্রোটেস্টাণ্টেব সমর্থন পেয়েছিল। শেষ পর্যন্ত উত্তরের আলস্টারকে বাদ দিয়ে দক্ষিণ আয়ার্ল্যাণ্ডকে স্বাধীনতা দেয়া হয়, এবং ১৯২১ সালে স্বাধীন প্রজাতন্ত্ররূপে 'আইরিশ ফ্রি স্টেটে'র জন্ম হয়। আলস্টারকে নিয়ে পৃথক 'উত্তর আয়ার্ল্যাণ্ড' গঠন করা হয়, এবং এই অঞ্চল বৃটিশ শাসনের অধীনে একটি স্বয়ং-শাসিত এলাকা রূপে স্বীকৃত হয। কিন্তু এতে সমস্যার সমাধান না হয়ে আরও বেড়ে যায়। আয়ার্ল্যাণ্ড বা 'আইরিশ ফ্রি স্টেট' পূর্ণ একীকবণ অর্থাৎ আলস্টারের আয়ার্ল্যাণ্ডভুক্তির দাবি জানাতে থাকে। আলস্টারের পাঁচ লক্ষ ক্যাথলিক এই দাবির সমর্থক। বিপরীত দিকে আলস্টাবের সংখ্যাগরিষ্ঠ দশ লক্ষ প্রোটেস্টাণ্টের অধিকাংশের দাবি ঃ আলস্টারকে পুরোপুরি যুক্তরাজ্য বা বৃটেনেব অংশরূপে গণ্য কবা হোক। তাই এখানকার প্রোটেস্টাণ্ট ও ক্যাথলিকদের ঝগড়া অংশত ধর্মের, আর অংশত রাজনীতির।

প্রোটেস্টাণ্টদের দল য়ুনিয়ন পার্টির একটানা শাসনে আলস্টারের সংখ্যালঘু ক্যাথলিকদের ওপব নানারূপ অবিচার করা হয়েছে। বাসস্থান, কর্মসংস্থান, ভোটাধিকার, প্রতি ব্যাপারেই ক্যাথলিকদের প্রতি বৈষম্য করা হয়েছে। নাগরিক অধিকারের দাবিতে তাই ক্যাথলিকদের সংগ্রাম ক্রমেই শক্তিশালী হয়ে ওঠে। গত এক বৎসর ধরে এই দাবিতে জোর সংগ্রাম চলছে। আর এই সংগ্রামকে ব্যর্থ করার জন্য যেমন চলছে সরকারী দমননীতি, তেমনি চলছে উগ্রপন্থী প্রোটেস্টাণ্টদের হামলাবাজি। কিছু উদারনীতিক প্রোটেস্টাণ্ট নাগরিক অধিকার সম্প্রসারণের পক্ষপাতী হলেও তাঁদের সৎ-প্রচেষ্টা বিশেষ কার্যকরী হয় নি। উত্তব আয়ার্ল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী ক্যাপ্টেন টেরেন্স ও'নীল প্রোটেস্টাণ্টদের আস্থাভাজন হওযা সত্ত্বেও ক্যাথলিকদের সামান্য নাগরিক অধিকাব দিতে আগ্রহী হওয়ায় উগ্রপন্থী প্রোটেস্টাণ্টদের চাপে তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়। ও'নীলের জাযগায় নতুন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন মেজর জেম্‌স্‌ চিসেস্টার-ক্লার্ক।

ক্যাথলিকবা যাতে অধিকারের দাবি কবতে না পারে, তার জন্য তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে উগ্রপন্থী প্রোটেস্টাণ্টদের হামলা অব্যাহত রযেছে। আর এ ব্যাপারে সবচেয়ে উদ্যোগী আধা-ফ্যাসিস্ট সংগঠন 'অরেঞ্জ অরডাব'। এই 'অরেঞ্জ অরডাবের' লোকেরাই অস্ত্র-সজ্জিত হয়ে বোমা-বন্দুক নিয়ে লণ্ডনডেরী শহরেব ক্যাথলিক অধ্যুষিত বস্তি এলাকা বগসাইড আক্রমণ করে। গ্যাসোলিন-বোমার সাহায্যে তারা শত শত বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। ক্যাথলিকরা অবশ্য সাহসের সঙ্গে এই হামলা প্রতিরোধে এগিয়ে আসে। বাইশ বছরের

ক্যাথলিক নেত্রী বৃটিশ পার্লামেন্টের নবনির্বাচিত সদস্যা – বার্নাডেটে ডেভ্‌লিন নিজে এই প্রতিরোধের নেতৃত্ব দেন। ইতস্তত এখানে-ওখানে দু'পক্ষের মধ্যে লড়াই সুরু হয়ে যায়। বেলফাস্ট শহরেও দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে।

চিসেস্টার-ক্লার্ক সরকার প্রথমে রয়েল আলস্টার কনস্টেবলরীর সাহায্যে দাঙ্গা থামানোর চেষ্টা করেন। পরে বিশেষ সহায়ক পুলিশবাহিনী বা 'বি' স্পেশ্যাল পুলিশ নিয়োগ করা হয়। ক্যাথলিকরা 'বি' স্পেশ্যাল পুলিশ নিয়োগে তীব্র আপত্তি জানায়। এই পুলিশের অধিকাংশই উগ্রপন্থী প্রোটেস্টান্ট। শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছা-সত্ত্বেও চিসেস্টার-ক্লার্ক বৃটিশ সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করেন। বৃটেনের প্রধান-মন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন সিসিলী দ্বীপে অবসরযাপন করছিলেন। আলস্টারের জরুরী বার্তা পেয়ে তিনি তাড়াতাড়ি লণ্ডন ফিরে আসেন, এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কালাঘানকে সঙ্গে নিয়ে বৃটিশ নৌবহরের ঘাঁটি সেণ্ট মাগওয়ালে যান। বৃটিশ সরকার আলস্টারে সৈন্য প্রেরণের সিম্ধান্ত করেন। প্রথমে লণ্ডনডেরীতে ৩০০ এবং বেলফাস্টে ৬০০ বৃটিশ সৈন্য পাঠানো হয়। তারা ১৪ই আগস্ট এই দু'টি শহরের দায়িত্ব গ্রহণ করে। এদের আগমনের পরই অবস্থা আয়ত্তে আসে। পরে আরও এক হাজার বৃটিশ সৈন্য এসেছে। আলস্টারের আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে এদের ব্যবহার করা হবে। এবং আপাতত কিছুদিন এরা এখানে থাকবে।

প্রধানমন্ত্রী মেজর জেম্‌স্‌ চিসেস্টার-ক্লার্ক দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য শান্তি সম্মেলন আহ্বান করেছেন। এই সম্মেলনে ধর্মসংঘ, ট্রেড য়ুনিয়ন, বিশ্ববিদ্যালয়, রাজনৈতিক দল প্রভৃতির প্রতিনিধি ও বিশিষ্ট নেতাদের ডাকা হয়েছে।

সংখ্যালঘু ক্যাথলিকরা এখনও আশ্বস্ত বোধ করতে পারছে না। পরিপূর্ণ নাগরিক অধিকার ও সমান ভোটাধিকার না পাওয়া পর্যন্ত তারা আশ্বস্ত হবে না। নতুন করে তারা আলস্টারের আয়াল্যাণ্ডভুক্তির কথাও ভাবছে, যদিও তা খুব সোচ্চার নয়।

আলস্টারের ক্যাথলিকরা খুব জোরের সঙ্গে মিলনের কথা না বলতে পারলেও, আয়াল্যাণ্ড (আয়ার) সরকার দৃঢ়তার সঙ্গেই এই দাবি করেছে। আয়াল্যাণ্ডের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ প্যাট্রিক হিলারী লণ্ডন থেকে ঘুরে এসে দাবি করেছেন ঃ ১৯২০ সালের দেশ বিভাগের প্রশ্নটি পুনরায় বিবেচনা করতে হবে। তাঁরা বাধ্য হয়ে বর্তমান অবস্থা মেনে চলছেন, কিন্তু আয়াল্যাণ্ড-বিভাগকে কখনও তাঁরা মনের দিক থেকে মেনে নেন নি। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, স্বাধীন আয়াল্যাণ্ডের সংবিধানে ৩৬টি কাউণ্টির কথা বলা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে আয়াল্যাণ্ডে রয়েছে মাত্র ২৬টি কাউণ্টি, বাকি ১০টি কাউণ্টি রয়েছে বর্তমানে 'উত্তর আয়াল্যাণ্ড' বা আলস্টারে। এই ১০টি কাউণ্টিকে আযারল্যাণ্ডবাসী নিজেদের দেশের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলেই মনে করে। প্যাট্রিক হিলারী পরিষ্কার বলেছেন, "আলস্টার আমাদের দেশের অংশ, সেখানকার জনসাধারণ আইরিশ জনসাধারণের অংশ।"

প্যাট্রিক হিলারী ১৭ই আগস্ট লণ্ডন গিয়েছিলেন আলস্টারের দাঙ্গাহাঙ্গামার ব্যাপারে বৃটিশ সরকারের মন্ত্রীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্য। দু'জন বৃটিশ মন্ত্রী লর্ড স্যাফণ্ট ও লর্ড স্টোনহোমের সঙ্গে তিনি আলোচনা করেছেন। আইরিশ সরকারের পক্ষ থেকে তিনি দাবি করেন ঃ (১) আলস্টারে শান্তি রক্ষার জন্য বৃটেন ও আয়াল্যাণ্ডের যুক্ত শান্তি সেনা পাঠাতে হবে; (২) অবিলম্বে সাংবিধানিক আলোচনা সুরু করতে হবে; (৩) নাগরিক অধিকারের ব্যাপারে সংস্কারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে; (৪) বিশেষ সহায়ক পুলিশবাহিনী ভেঙে দিতে হবে। বলতে গেলে, বৃটিশ সরকার সব ক'টি দাবিই প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্যাট্রিক হিলারী নিজেই আলোচনাশেষে বলেছেন, বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় তিনি সন্তুষ্ট হন নি।

এখন আয়াল্যাণ্ড আলস্টারের ব্যাপারে রাষ্ট্রসঙ্ঘের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করেছে। বৃটিশ সরকারের ওপর তাদের কোন আস্থা নেই। আয়াল্যাণ্ডের প্রধানমন্ত্রী জ্যাক লিন্‌চ্‌ আলস্টারে শান্তি রক্ষার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘ শান্তি-বাহিনী প্রেরণের প্রস্তাব করেছেন।

ইজরায়েল ঃ

ক'দিন আগে তেল আভিভে ক্ষমতাসীন দল য়ুনাইটেড লেবার পার্টির সম্মেলন হয়ে গেল। আগামী সাধারণ নির্বাচনের জন্য দলের নির্বাচনী ইস্তাহার সম্মেলনে গৃহীত হয়।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী মশে ডায়ানের নেতৃত্বে উগ্রপন্থীরা তাদের পছন্দমত ইস্তাহার রচনায় সফল হয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বা এবান কিছুটা নরম হবার চেষ্টা করে এই উগ্রপন্থীদের হাতে নিগৃহীত হয়েছেন।

এই নির্বাচনী ইস্তাহারে ঘোষণা করা হয়েছে, ইজরায়েলের অধিকৃত এলাকার এক ইঞ্চি জমিও ছাড়া হবে না। এই সঙ্গে ইজরায়েলের যে নতুন মানচিত্র সংযোজন করা হয়, তাতে বর্তমান অধিকৃত এলাকা ছাড়াও বিভিন্ন আরব-রাষ্ট্রের আরও কিছু এলাকা ইজরায়েলের বলে দেখানো হয়েছে।

পর্যবেক্ষকরা এই ইস্তাহার ও সম্মেলনের কথা আলোচনা করতে গিয়ে বলছেন, আরব-ইজরায়েল বিরোধ মীমাংসার যেটুকু সামান্য সম্ভাবনা ছিল, তাও দূর হয়ে গেল। যুদ্ধবাদীরা পুরোপুরি প্রাধান্য বিস্তার করেছে।

জুন যুদ্ধের বিজয়ী বীর মশে ডায়ান মনে করেন, আরবদের বিরুদ্ধে জঙ্গী মনোভাব বজায় রাখাই শ্রেয়। সামরিক বাহিনীর অধিকাংশ এবং যুবকদের মধ্যে অনেকেই ডায়ানের সমর্থক।

অনেকেরই ধারণা, সাধারণ নির্বাচনে ডায়ানকে হঠানো খুব সহজ হবে না। বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গোল্ডা মেয়ার ও দলের প্রবীণ নেতারা অবশ্য ডায়ানকে পছন্দ করেন না।

এদিকে আবার আরব নেতারাও চরম অবস্থার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সেনাবাহিনীর প্রধান লেফটেনাণ্ট জেনারেল মোহম্মদ ফৌজি ঘোষণা করেছেন, এই বৎসর হবে আরবদের "মুক্তি বর্ষ"। তাঁরা ইজরায়েলের হাত থেকে দখলকারী আরবভূমি উদ্ধার করতে বদ্ধপরিকর। এই প্রসঙ্গে তিনি আরব সেনাদের ব্যাপক শিক্ষাগ্রহণের কথা বলেন। তিনি সোভিয়েট য়ুনিয়নের প্রতি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। সোভিয়েট য়ুনিয়ন আরবদের অস্ত্র সাহায্য করছে।

কেবল সামরিক শক্তি নয়, জনগণের প্রতিরোধ ক্ষমতার ওপরও আরব নেতারা বিশেষ জোর দিচ্ছেন।

(২৪।৮।৬৯)

বসুমতীর
যাবতীয়
গ্রন্থ ও
গ্রন্থাবলীর
প্রাপ্তিস্থান
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ
কলিকাতা—১২
এবং
সন্ন্যাল এন্ড কোং
১/১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট
কলিকাতা—১২

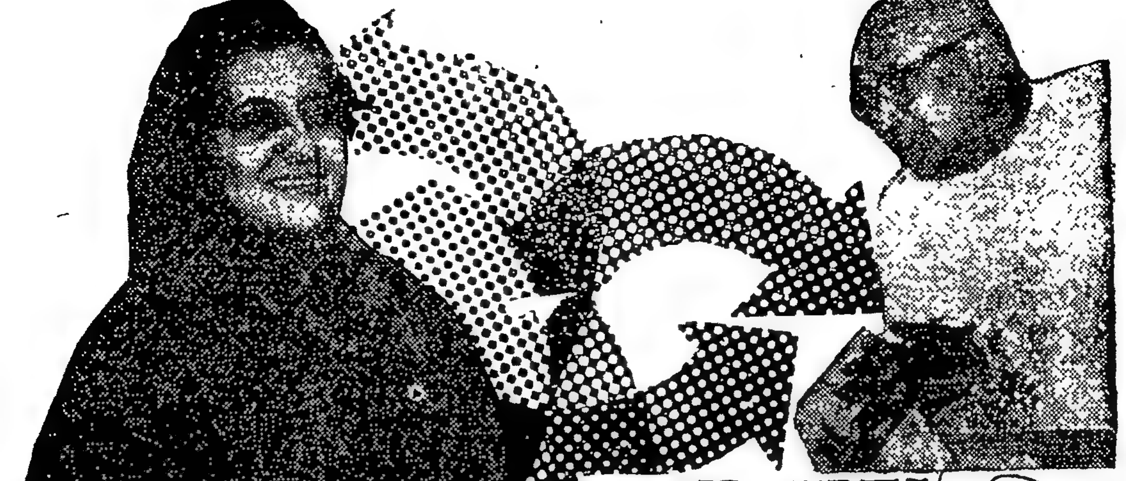

সপ্তাহের বোঝা/কৃত্তিবাস ওঝা

কোন কোন যুদ্ধ থাকে, যে যুদ্ধে কোন পক্ষের হার-জিতে যুদ্ধের মীমাংসা হয় না, সন্ধি করলেও যুদ্ধ শেষ হয় না। এই যুদ্ধে যে হেরে যাবে, তাকেও যুদ্ধ চালাতে হবে, থামলে চলবে না—আবার যে জয়ী হবে, তাকেও যুদ্ধ চালাতে হবে, থামলে চলবে না। এই যুদ্ধ একমাত্র শেষ হয় প্রতিপক্ষ শেষ হলে, নিঃশেষ হলে, নিশ্চিহ্ন হলে। এমনি যুদ্ধের সম্মুখীন কোন দেশ সহজে হয় না আর এমন যুদ্ধ সচরাচর খুব ঘটে না—বহু বহু যুগ অন্তর এমনি যুদ্ধের অবকাশ ঘটে। কাজেই এমনি কোন যুদ্ধের দর্শক হওয়াও কম সৌভাগ্যের নয়; আমরা যারা বর্তমান যুগের মানুষ তারা এমনি এক দুর্লভ সৌভাগ্যের অধিকারী হলাম। তবে এর মধ্যে একটা চোখের প্রশ্ন আছে। চোখ থাকলেই মানুষ সব দেখতে পায় এমন নয়। অনেক দিনকানা থাকে, যারা দেখেও দেখতে পায় না, তাদের কথা এখানে উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, আমি শুধু চক্ষুষ্মান ব্যক্তিদের কথা বলছি। এই দিনকানারা ১৯৬৫ সালে যখন পশ্চিমবঙ্গে শ্রীঅজয় মুখার্জী নামক একজন অতি সাধারণ কংগ্রেস নেতাকে কলকাতা কুমার সিংহ হল থেকে একটি চাদর বগলে নিয়ে বেরিয়ে যেতে দেখেছিল, তখন কি বুঝেছিল এই সহায়-সম্বলহীন ব্রাহ্মণ চাণক্যের মত নন্দবংশ ধ্বংস করবেন। না বুঝতে পারেন নি, পারলে সেই সভায় উপস্থিত দুই ব্যক্তি শ্রীঅতুল্য ঘোষ ও শ্রীরামসুভগ সিং—যাঁরা আজ দিল্লীতে দল রক্ষায় হিমসিম খাচ্ছেন, তাঁরা অন্তত বুঝতে পারতেন—তাঁরা কি করছেন? তাঁরা কি সেইদিন বুঝেছিলেন শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়ের সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহে বারাকপুর লাট-বাগানে শ্রীমঙ্গল পাণ্ডের এনফিল্ড টোটার কাজ করবে। ভারতের পূর্ব-প্রান্তের বারাকপুরের শ্রীমঙ্গল পাণ্ডের কাজ সারা ভারতে সিপাহী যুদ্ধের সৃষ্টি করেছিল—ভাবীকালে যে যুদ্ধে শরিক হয়েছিলেন ঝান্সীর রাণী লক্ষ্মীবাঈ, তাঁতিয়া তোপী, নানা সাহেব, কুনায়ার সিং এমন কি দিল্লীর সম্রাট বাহাদুর শাহ্। কাজেই সেইদিন যারা মঙ্গল পাণ্ডেকে বারাকপুর মণিরামপুরে ফাঁসিতে ঝুলিয়েছিল, তারা কি ভেবেছিল তাঁতিয়া তোপী, নানা সাহেব কুনায়ার সিং—এই যুদ্ধের নায়ক হবেন, এমন কি স্বয়ং বাহাদুর শাহ্ এই যুদ্ধে নিজেকে শরিক করবেন? কিন্তু তাই হল, সেই দিনের শ্রীঅজয় মুখার্জী সারা ভারতে নতুন স্ফুলিঙ্গ ছড়িয়ে দিলেন—যে স্ফুলিঙ্গে দেখা দিল—চৌধুরী চরণ সিং, মহামায়াপ্রসাদ সিং, গুরনাম সিং, গোবিন্দনারায়ণ সিং আর আজ অন্য কেউ নয়. স্বয়ং বাহাদুর শাহের মত দিল্লীশ্বরী শ্রীমতী ইন্দিরা—গান্ধীও যিনি সিন্ডিকেট-বিরোধী যুদ্ধে নেমেছেন। কিন্তু সেই কথা পরে—তাই দিনকানাদের কথা বলে নিই।

১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গের যুক্তফ্রন্টের সরকারকে রাতারাতি খারিজ করে যাঁরা ভেবেছিলেন দিলাম শেষ করে যুক্তফ্রন্টকে, তাঁরা কি তখন ভেবেছিলেন যাঁরা জনগণকে সঙ্গে না নিয়ে শুধু আইনের কারসাজিতে যুক্তফ্রন্টের সরকারকে হটালেন, জনগণ একদিন তাঁদের ওপর চরম প্রতিশোধ গ্রহণ করবে? শুধু প্রতিশোধ গ্রহণ নয়. সারা ভারতের রাজনীতিতে মোড় ঘুরিয়ে দেবে। সেই দিনের দিনকানারা এই কথা বোঝেন নি, কিন্তু, আজ বুঝছেন: তাই তো শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দিল্লীতে সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমে বারে বারে বলছেন—এরা, এরাই অজয় মুখার্জীকে তাড়িয়েছে, এরাই পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসের হাতছাড়া করিয়েছে। হ্যাঁ, পশ্চিমবঙ্গই আজও ভারতের রাজনীতিতে কিছু দেবার ক্ষমতা ও যোগ্যতা রাখে—তাই তো বারে বারে পশ্চিমবঙ্গের নাম উচ্চারিত হয়। পশ্চিমবঙ্গই তো একটি রাজ্য, যা রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আনুপাতিকভাবে শ্রীগিরিকে সবচেয়ে বেশি ভোট দিয়েছে, একটিও দ্বিতীয় প্রেফারেন্সের ভোট দেয় নি। পশ্চিমবঙ্গেই কংগ্রেসের ৫৩ জন বিধানসভার সদস্যের মধ্যে ২৮ জন কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন।

দিনকানারা বুঝতে পারলেন না—এই সেই দিন বাঙ্গালোরে যখন শুধু সংখ্যাধিক্যের জোরে শ্রীমতী গান্ধীর রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে শ্রীজগজীবন রামকে মনোনীত করার প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে ভাবলেন—এই তো শেষ, এই তো জয়ী হলাম, একা ইন্দিরা কি করবে, আমরা শক্তিশালী সিন্ডিকেটে রয়েছি, আমাদের সঙ্গে রয়েছে শ্রীকামরাজ, শ্রীপাতিল, শ্রীদেশাই, শ্রীঅতুল্য ঘোষ, শ্রীসঞ্জীব রেড্ডি, শ্রী সি· বি· গুপ্ত, শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা ও আরো কতজন—আর কে পারবে আমাদের সঙ্গে? তারপর শ্রীগিরি একজন নির্দল প্রার্থিরূপে যখন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রার্থী হবেন বলে ঘোষণা করলেন, তখনও দিনকানারা ভাবল—ছো, কি করবে গিরি, ও একা, ও নির্দল আর আমরা...... তারপর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন হয়ে গেল, কিন্তু শেষ কি হল যুদ্ধের? শেষ কি হল সব দ্বন্দ্বের অথবা চোখ খুলে গেল কি সবার? রাষ্ট্রপতি পদে জয়ী হয়েছেন শ্রীগিরি,—বেশ তো, এইখানেই তো শেষ হতে পারতো যুদ্ধের। যাঁরা জয়ী হয়েছেন, তাঁরা বিজয়ের মালা পরে ফিরে যান নিজের চৌহদ্দিতে; যাঁরা পরাজিত হয়েছেন. তাঁরা পরাজয় মেনে নিয়েই না

হয় ফিরে যান নিজেদের গোঠে। না, সেটা সম্ভব নয়—কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তাই তো আগেই বলেছি কোন কোন যুদ্ধ আছে, যে যুদ্ধে কেউ থামতে পারে না। বেশ তো, সিন্ডিকেট তো এই বলে থামতে পারত যে, কংগ্রেস সংগঠনের মালিক আমরা, আমরা পারি নি ঠিকমত নেতৃত্ব দিতে—তাই তো কংগ্রেস ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে। রাজ্য কংগ্রেস সামগ্রিকভাবে হোক আর একজন বিধানসভা সদস্য এককভাবে হোক অগ্রাহ্য করেছেন নিখিল ভারত কংগ্রেসের যন্তর মন্তর রোডের ফরমান, লোকসভার সদস্য থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা পর্যন্ত অগ্রাহ্য করেছেন কংগ্রেস সভাপতির নির্দেশ, কিন্তু কেন? কোন্ ভুল, কোন্ গলদ দলকে এমনভাবে ভাঙনের মুখে নিয়ে এসেছে। তলোয়ার ঘুরিয়ে শ্রীমতী গান্ধীর মাথা কাটার আগে নিজেদের মাথা ঠাণ্ডা করে এই কথাটা ভাবা দরকার ছিল। কিন্তু না, থামবার অবকাশ নেই। এই সব ভাঙনের কথা ছাড়া আরো একটা গুরুতর প্রশ্নও দেখা দিয়েছে শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা ও শ্রীমতী গান্ধীর দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে। গণতান্ত্রিক সমাজবাদের আদর্শের কংগ্রেস, পরিষদীয় গণতন্ত্রকেই বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ গণতন্ত্ররূপে আখ্যা দিয়ে থাকে। ভারতবর্ষের কংগ্রেস দল চীন বা সোভিয়েট কোন দেশেরই ভক্ত হতে পারে নি, কারণ এই দেশগুলি হল পার্টি কর্তৃত্বে পরিচালিত দেশ। একদা সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র থেকে শ্রীবুলগানিন ও শ্রীক্রুশ্চেভ ভারতে এসেছিলেন। সেইদিন অনেকেই বুঝতে পারেন নি অথবা যাঁরা বুঝেছিলেন, তাঁদের ভাল লাগে নি—এটা কি রকম ব্যাপার! একজন হল প্রধানমন্ত্রী আর একজন হল পার্টি প্রধান—দুজনের সমান মর্যাদা এক হয় কি করে। শুধু তাই নয়, আমাদের ভারতবর্ষের গণতান্ত্রিক ধারায় পরিচালিত কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এতদিন ধরে চীন বা সোভিয়েট রাশিয়া সম্পর্কে যে প্রধান অভিযোগ আনতেন বা বলতেন, সেটা হল—এই সব দেশে গণতন্ত্র নেই, এই সব দেশে পার্টি হল প্রধান। পার্টিকে প্রশাসনের শীর্ষে স্থান দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ভারত এই পথে যাবে না। ভারত পরিষদীয় গণতন্ত্রকেই শীর্ষে স্থান দেয়। তবে আজ মন্ত্রার মুখে অন্য কথা কেন? আজ কেন পার্টির কথাকেই সবার ওপরে স্থাপনের জন্য প্রাণান্তকর চেষ্টা হচ্ছে। আমরা তো ভারতে গ্রেট বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিষদীয় কাঠামোর অনেক কিছুকে গ্রহণ করেছি। এই গ্রহণের মধ্যে পরিষদ ও দলের স্থান কি হবে সেটাও নির্ধারিত হয়ে আছে। গ্রেট বৃটেনে লেবার পার্টি, কনজারভেটিভ পার্টি আছে, কিন্তু ক'জন এই সব দল ও দলনেতাদের নাম জানেন? খুব বেশি কেউ জানেন না, জানার দরকারও হয় নি। সকলেই জানেন, বিভান, উইলসন, এঁদেরই নাম। একইভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে ডেমোক্র্যাটিক ও রিপাবলিকান পার্টি। ক'জন জানেন এই দলের নেতা কে? সভাপতি বা সম্পাদক কে? আমরা সকলেই অনেক বেশি জানি কেনেডি, নিকসন, হ্যামফ্রের নাম। কোনদিন শোনা যায় নি ভারতের কোন কংগ্রেস নেতা দুঃখ করছেন যে, সোভিয়েট রাশিয়া ও চীনে পার্টি-প্রধানরাই প্রধান—বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পার্টি-প্রধানদের নাম শোনা যায় না। কিন্তু আজ মূল প্রশ্ন, ভারতের ক্ষেত্রে এসেছে বা আনা হয়েছে এইভাবে যে, নির্ধারণ করতে হবে কে বড়—প্রধানমন্ত্রী, না কংগ্রেস সভাপতি? যাঁরা এতকাল 'পার্টি-বস'রা বড় বলে চিৎকার করে চীন-সোভিয়েটকে দুয়ো দিতেন, তাঁরাই আজ 'পার্টি-বস'কে ওপরে স্থান দেবার জন্য ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। কাজেই সব কিছুর মধ্যে এটাও একটা গুরুতর প্রশ্ন—যার সম্মুখীন ভারতবর্ষ হয়েছে ও যার মীমাংসা প্রয়োজন। কে বড়,—দলনেতা বা দল, না পরিষদীয় নেতা বা পরিষদ। দ্বিতীয় মৌল প্রশ্ন দেখা দিয়েছে—সব তো হল কিন্তু তার পর? শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা চান শ্রীমতী গান্ধীকে তাড়াতে আর শ্রীমতী গান্ধী চাইবেন শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পাকে তাড়াতে, কিন্তু তার পর কি হবে? কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার ভেঙে গেলে কে আসবে সেখানে? শ্রীমতী গান্ধীকে বাদ দিয়ে শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা যাকে নিয়েই ক্ষমতা রাখবার চেষ্টা করুন, থাকবে না। আর শ্রীমতী গান্ধী নিজলিঙ্গাপ্পাকে বাদ দিয়ে যে অন্য কারো কাঁধে পা রেখে ক্ষমতা রাখবেন—সেটাও হবে না। ভারতের বামপন্থীরা কংগ্রেস ভাঙতে চায়, তাই শ্রীমতী গান্ধী ও সিন্ডিকেটের দ্বন্দ্বে ধুয়ো দিচ্ছে, উৎসাহ দিচ্ছে, হয়তো আরো মদতও দেবে। কিন্তু এই বামপন্থীরা শ্রীমতী গান্ধীকে প্রধানমন্ত্রী করে রাখবেন, এটা কোন পাগলও স্বপ্নে দেখতে চাইবে না। এর পর তাহলে কি হবে? গান্ধীর বিদায় মানে কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের বিদায়—কিন্তু তার পর কে আসবেন? এককভাবে হোক বা যৌথ ভাবেই হোক, কেন্দ্রে ক্ষমতা ধরে রাখবার ক্ষমতা কারো হবে না। ভারতবর্ষ পাকিস্তান নয় যে, রাতারাতি গণেশ উল্টিয়েও সরকার থাকবে—কাজেই প্রশ্ন এখন কোথায় যাচ্ছি আমরা? (চলবে)

শিক্ষাবিজ্ঞানের কয়েকটি অতুলনীয় বই!!

বি-এ (শিক্ষা), বি-টি, বি-এড, বুনিয়াদী শিক্ষণ স্তরের জন্য

অধ্যাপক অরুণ ঘোষ প্রণীত

১। শিক্ষাশ্রয়ী মনোবিজ্ঞান (৮ম সং) ১৩.০০

২। শিক্ষাবিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব (৮ম সং) ১০.০০

৩। ভারতীয় শিক্ষার সাম্প্রতিক রূপ ও সমস্যা ১১.০০

বি-টি তৃতীয় পত্রের সর্বাধুনিক পাঠ্যগ্রন্থ।

৪। শিক্ষার ভাবধারা, পদ্ধতি ও সমস্যার ইতিহাস—(৪র্থ সং) ১৩.০০

বি-টি চতুর্থ পত্রের বহুল-প্রশংসিত পাঠ্যগ্রন্থ।

৫। সাধারণ পদ্ধতি, বিদ্যালয় সংগঠন ও স্বাস্থ্যশিক্ষা ১১.০০

বি-এ শিক্ষার তৃতীয় পত্রের সর্বাধুনিক তথ্যসম্পন্ন

৬। মানসিক স্বাস্থ্যবিজ্ঞান (Mental Hygiene) ৮.০০

৭। অস্বাভাবিক মনোবিজ্ঞান (Abnormal Psychology) ৯.০০

৮। ইংলণ্ডে শিক্ষার ইতিহাস (২য় সং) ৭.৬৬

৯। ভারতে শিক্ষার ইতিহাস (৪র্থ সং) ৬.০০

10. Modern Educational Theories 14.00

এডুকেশনাল এণ্টারপ্রাইজার্স, ৫।১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলি-৯

যুক্তফ্রন্ট সরকার সমীপেষু

আন্তঃরাজ্য পাপ ব্যবসায়ের একটি ঘাঁটি সম্প্রতি উত্তর কলকাতায় ধরা পড়েছে। অল্পদিনের মধ্যে দু'বার হানা দিয়ে উত্তর-কলকাতার একটা বাড়ি থেকে কয়েকটি মেয়েকে উদ্ধার করা হয়েছে। এই ব্যবসায়ের নায়ক জনৈক বঙ্গসন্তান সম্পর্কে অনেক কাহিনী লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হচ্ছে।

পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ-ও এই ঘাঁটিটি সম্পর্কে অনেক তথ্য যোগাড় করেছেন। এই ব্যক্তি কলকাতাতেই কয়েকটি খালিকুঠির মালিক। অন্যান্য রাজ্যেও এই পাপ ব্যবসায়ের ঘাঁটি আছে বলে জানা গেছে। এই ব্যবসায়ের সংগে অন্যান্য রাজ্যের কয়েকজন কুখ্যাত নরনারীও জড়িত। গোয়েন্দা দপ্তরের খবর এই বিশেষ ব্যক্তিটি নাকি নিজের ব্যবসা ও নিজেকে নিরাপদ রাখার জন্য থানা থেকে সুরু করে পুলিশের উচ্চপদস্থ বহু অফিসারকে নিয়মিত টাকা দিয়ে থাকে। এ ছাড়া আরো অনেক প্রভাবশালী ব্যক্তিও এই ব্যক্তিটিকে আশ্রয় দিয়ে থাকেন অর্থ ও অন্যান্য জিনিষের বিনিময়ে।

উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু স্বয়ং খবর পেয়ে উত্তর কলকাতার উক্ত বাড়িটিতে পুলিশ পাঠান। অনেক লোক ধরাও পড়ে। কিন্তু ঐ বিশেষ ব্যক্তিটিকে আটকানো গেল না।

ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা ছিল। বিচারালয় থেকে সে জামিনের ব্যবস্থা করে। শোনা যায়, গোয়েন্দা বিভাগ নাকি তাঁকে পি-ডি এ্যাক্টে গ্রেপ্তার করার জন্য প্রস্তুত ছিল। কিন্তু কোর্ট থেকে সে নাকি সব্বাইকে ফাঁকি দিয়ে হাওয়া। অথচ এই মহাশয় ব্যক্তি এখনো স্বচ্ছন্দে ঘোরাফিরা করছেন। কয়েকটি সংবাদপত্র দপ্তরেও নাকি তিনি হানা দিচ্ছেন। উদ্দেশ্য মহৎ—তাঁর সম্পর্কিত খবরাখবর যাতে জনসাধারণের সামনে হাজির না করা হয়।

এই কাহিনীর সংগে আরো অনেক কথা লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হচ্ছে। এমন কি মন্ত্রিসভার দু'-একজন সদস্য, দু-একজন প্রভাবশালী সাংবাদিক এবং বেশ কয়েকজন পদস্থ সরকারী কর্মচারীর নাম জড়িত হয়ে পড়ছে এই ব্যক্তির নিরাপদ পলায়নের ব্যাপারে।

অবিলম্বে এই ঘটনার পূর্ণ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। কিভাবে পুলিশের চোখ এড়িয়ে ঐ ব্যক্তিটি চলে গেল তা নিশ্চয়ই বিস্ময়কর। সর্ষের মধ্যে ভূত না থাকলে এটা সম্ভব নয়।

যে সব পদস্থ অফিসার জড়িত, তাঁরাই মন্ত্রিসভার কোন কোন সদস্যের নাম জড়িয়ে ফেলতে পারেন। এভাবে তাঁরা নিজেরা আত্মরক্ষা করতে চান, অন্যদিকে শরিক দলের মধ্যে বিদ্বেষও বাড়িয়ে তুলতে চেষ্টা করেন। যাই হোক আজ যে সব নাম কানাঘুষার মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে, অবিলম্বে একটা কোন ব্যবস্থা না করলে সেই সব কুৎসা আরো জোরদার হয়ে পড়বে। কাজেই এই ধরণের কুৎসিত ব্যাপারের সংগে যে-সব প্রভাবশালী ব্যক্তির নাম জড়ানো হচ্ছে তাঁদের স্বার্থেই দ্রুত একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই ধরণের কুৎসার নিয়মই হচ্ছে লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়া। কাজেই সরকারের অবিলম্বে একটা কোনো ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

প্রসঙ্গক্রমে এই পাপ ব্যবসা দমনের প্রশ্নও আসে। যুক্তফ্রন্ট সরকার ইতোপূর্বে এ সম্বন্ধে কোন উৎসাহ দেখান নি।

আশার কথা উপ-মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং অগ্রণী হয়েছেন। তবে বিষয়টি যেন এক ব্যক্তিকে দমনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ না থাকে। নারীদেহ নিয়ে ব্যবসা করার নীতি নিয়ে এখানে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করতে চাই না। কিভাবে পতিতাবৃত্তি চিরদিনের মত দূর করা যায় তাও আজকের আলোচ্য বিষয় নয়। এ নিয়ে পণ্ডিতেরা মাথা ঘামাচ্ছেন। অনেকে মনে করেন বর্তমান সমাজব্যবস্থার মধ্যেই পতিতাবৃত্তির বীজ অঙ্কুরিত আছে। সমাজব্যবস্থা ভেঙে নতুন সমাজব্যবস্থা পত্তন না করা পর্যন্ত এই বৃত্তি দূর হবে না।

অভাবে পড়ে কিংবা নানারকম সামাজিক কারণে এই বৃত্তি অবলম্বন করতে যারা বাধ্য হয় তাদের সম্পর্কে নিশ্চয়ই উপরোক্ত বক্তব্য প্রযোজ্য। কিন্তু মানুষের দুর্বলতা ও চরম দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে ব্যবসা চালিয়ে সমাজে যারা প্রতিপত্তি বজায় রাখছে তাদের সম্পর্কে নিশ্চয়ই কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করা উচিত নয়। অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা জানেন বর্তমানে পতিতাবৃত্তি নিবারণের জন্যে যে আইন আছে তাতে রয়েছে অনেক ফাঁক ও ফাঁকি। আইনটির আমূল পরিবর্তন করা প্রয়োজন। যুক্তফ্রন্ট সরকারের সমাজকল্যাণ দপ্তর এ নিয়ে এখন পর্যন্ত মাথা ঘামানোর প্রয়োজনীয়তা বোধ করেন নি।

কান টানলে যেমন মাথা আসে ঠিক একইভাবে এই পাপ ব্যবসার সংগে জড়িয়ে থাকে আরো নানারকমের অপরাধজনক বৃত্তি। চোলাই মদ, ও অন্যান্য মাদক দ্রব্যের আন্তঃরাজ্য এমন কি আন্তর্জাতিক কারবারও এই আখড়া থেকে পরিচালিত হয়। এঁদের সংগে পুলিশ দপ্তরের যোগাযোগের কথাও প্রায় প্রবাদে পরিণত। তাই এই অপরাধকে কমাতে হলে সরকারকে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যে সব বড় বড় আড্ডা আছে তার পরিচালকদের ধরার ব্যবস্থা করা দরকার। সকলেই জানেন এরা এত বেশি সতর্ক ও প্রভাবশালী, এদের সংগে ওপরের তলায় বহু বিশিষ্ট মানুষ এমনভাবে জড়িত যে, সাধারণ দণ্ডবিধির কোন ধারায় এদের আটকানো মুসকিল। তাই দ্বিধাহীন হয়ে এদের বিরুদ্ধে পি-ডি এ্যাক্ট প্রয়োগ করা দরকার। আমরা আশা করি উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসুর কঠোর ব্যবস্থা যারা বানচাল করার চেষ্টা করছে, তাদের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তিনি দ্বিধা করবেন না। —শ্রীসর্বদর্শী

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

আবার আক্রমণের প্রস্তুতি

পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে ব্যর্থতার পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর মাস্টারদার কাছে পৌঁছলে তিনি ধীর-স্থিরভাবেই সমস্ত শুনেছিলেন। আমি সেখানে উপস্থিত না থাকলেও খবর-বার্তা শুনে মাস্টারদার মনের জিজ্ঞাসা কি ছিল তা আমি অনুমান করতে পারি। তাঁর কর্ম-জীবনের সংগে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ও ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিলাম বলেই ছোটখাটো অক্ষমতা ও ব্যর্থতায় তাঁর মানসিক প্রতিক্রিয়ার রূপটি আমার বিশেষভাবে জানা ছিল। কোন বাধাকেই মাস্টারদা বড় করে দেখতেন না—অন্তরের প্রবল প্রতিরোধশক্তিতে সকল বিফলতাকেই সহজভাবে গ্রহণের ক্ষমতা তিনি রাখতেন। সকল অকৃতকার্যতা ও নিষ্ফলতার বাস্তব কারণ নির্ধারণে আত্মনিয়োগ করে অবিচল নিষ্ঠায় মাস্টারদা সাংগঠনিক দায়িত্ব পালন করতেন।

ক্লাব আক্রমণে অপ্রত্যাশিত অকৃতকার্যতার কথা শুনে মাস্টারদা যখন চিন্তামগ্ন, তখনি আবার সংবাদ এলো—শৈলেশ্বর বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। সংগ্রামের কণ্টকাকীর্ণ বন্ধুর পথ অতিক্রম করে ধীর পদক্ষেপে সম্মুখ-পানেই চলতে হবে—মাঝ পথে নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চল হয়ে থেমে যাওয়া কোন বিপ্লবী নেতার পক্ষেই সম্ভব নয়। মাস্টারদার কাছেই শিখেছি—বাধা-বিপত্তি ও নিষ্ফলতার বিরুদ্ধে শত-সহস্রগুণ বেশি দৃঢ়তার সংগে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে হবে—সমস্ত বাধা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে বারে বারে প্রস্তুত হতে হবে—আঘাতের পর আঘাতে শত্রুকে বিপর্যস্ত করে তুলতে হবে—পরাজয়ের মনোভাব ছাড়তে হবে; তবেই একনিষ্ঠ বিপ্লবীর কাছে সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর ঔদ্ধত্য আত্মসমর্পণ করবে। পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে প্রথম প্রচেষ্টার ব্যর্থতার কারণ খুঁজে পেতে মাস্টারদার একটুও দেরি হয় নি। কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য আবার প্রস্তুত হতে হবে—বিলম্ব করা চলবে না। পূর্বে আটজন বিপ্লবী যুবক নিয়ে যে দলটিকে প্রস্তুত করা হয়েছিল তদের ভিতর এখন শৈলেশ্বর নেই। পরিকল্পনা একবার বানচাল হলে আবার প্রস্তুত করতে সময়ের প্রয়োজন। ব্যর্থতার বিরুদ্ধে পূর্ণ উদ্যমে আবার সাংগঠনিক অভিযান শুরু হোল।

প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার ও কল্পনা দত্ত পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে অংশ গ্রহণ করবে—মাস্টারদা ও নির্মলদার এই পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু ধলঘাট যুদ্ধে অপূর্ব সেন ও নির্মলদার মৃত্যুতে অনিবার্যভাবেই সাংগঠনিক দুর্বলতা দেখা দিল। মাস্টারদা কল্পনা ও প্রীতিলতাকে বাড়িতে ফিরে গিয়ে স্বাভাবিক জীবনযাপনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই নতুন পরিস্থিতিতে প্রীতি ও কল্পনার জন্য অপেক্ষা করে ক্লাব আক্রমণে বিলম্ব ঘটানো মাস্টারদা বাঞ্ছনীয় মনে করেন নি। তাই শৈলেশ্বরের নেতৃত্বেই ক্লাব আক্রমণের নির্দেশ দিয়েছিলেন মাস্টারদা।

আমার মনে হয় মাস্টারদা শৈলেশ্বরের "আত্মহত্যা-প্রবণতার" মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করে হয়ত ভেবেছিলেন—মৃত্যু-ভয়হীন মরণ-পাগল বিপ্লবী, যে সর্বদাই আত্মবিনাশে প্রস্তুত, প্রাণ দেবার সংকল্পে সে নিশ্চয়ই স্থিরচিত্তে যুদ্ধ-ক্ষেত্রে অগ্রবর্তী হবে—নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা থাকলেও ফিরে না এসে শত্রুর সংগে সম্মুখ-যুদ্ধে প্রাণ দিতে দ্বিধা করবে না। এই ভেবে শৈলেশ্বরকে আত্মহত্যা হতে বিরত করবার উদ্দেশ্যেই হয়ত মাস্টারদা তার নেতৃত্বে ক্লাব আক্রমণ করতে পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। গণ-তন্ত্রবাহিনীর চট্টগ্রাম শাখার সাংগঠনিক ও সংগ্রামী অগ্র-গতির পথে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে মাস্টারদার পাশে পাশে থেকে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিপ্লবী সভ্যদের ব্যাপারে, তাদের সম্পূর্ণ অজ্ঞান্তেই আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।

অনেক ক্ষেত্রে কেউ কেউ নিজ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য দলের মধ্যে সমস্যা সৃষ্টি করেছে—নানাভাবে তাদের নিবৃত্ত করতে হয়েছে। আবার কেউ কেউ হয়ত কোন সুযোগে রিভলভার, পিস্তল প্রভৃতি করায়ত্ত করে নিজের একটি "স্বাধীন চক্র" সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন—তাঁদের প্রতি আমাদের একান্ত বিশ্বাস ও নির্ভরতা আছে একথা বুঝিয়ে তাঁদের বিভ্রান্ত করেছি। ব্যক্তিগত জীবনে বন্ধুদের পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সমস্যা যখন দেখা দিয়েছে তখন তাদের মনস্তাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়ার পরিপ্রেক্ষিতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়েছে। জালালাবাদ যুদ্ধের পর সাথীদের মনস্তত্ত্ব বুঝে তাদের অনেকের থেকে নানা অজুহাতে মাস্টারদা রিভলভার, পিস্তল ইত্যাদি ফেরং নিয়েছেন। হিংসা ও আত্মঘাতী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যারা সর্বনাশের পথে এগিয়ে চলেছিল তাদের চট্টগ্রাম জেলার বাইরে স্থানান্তরিত করে কাজের সুযোগ করে দিয়েছিলেন মাস্টারদা। সকল সংগঠন ও সকল দলের মধ্যেই এই নীতি আবহমান কাল হতে প্রচলিত আছে। কিন্তু কথা হোল কতখানি সার্থকতার সঙ্গে নেতৃবৃন্দ ও সংগঠকেরা সেই সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক নীতি প্রয়োগ করতে পারেন।

সাথীদের মধ্যে Team Spirit যাতে গড়ে ওঠে তার প্রতি মাস্টারদার সর্ব সময়েই লক্ষ্য ছিল। কোন এ্যাক্শানের জন্য দল গঠিত হলে তাদের মধ্যে একজনকে নেতৃত্বের দায়িত্ব দিতে হয়। এ্যাক্শান পরিচালনার্থে Artificial Leader নিয়োগে সুফলের আশা খুব কমই থাকে। Natural Leader-এর নেতৃত্বেই সফলতার সম্ভাবনা বেশি।

ক্লাব আক্রমণে প্রথম অকৃতকার্যতার পর দ্বিতীয়বার আক্রমণের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য মাস্টারদা এমন একজন নেতার কথা চিন্তা করেছিলেন, যিনি দলের সকলেরই আস্থাভাজন ও বিপ্লবী দলটিকে দৃঢ়তার সঙ্গে পরিচালনায় সক্ষম এবং সকলেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিনা দ্বিধায় সকল নির্দেশ মেনে নিয়ে যাঁকে আনুগত্য দিতে প্রস্তুত।

মাস্টারদা প্রীতিলতা ও কল্পনাকে আবার গোপন আশ্রয়স্থলে ডেকে পাঠালেন ও প্রীতিকে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণকারী দলটির নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য নির্বাচিত করলেন। "প্রীতিদি" দলের সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্রী এবং তার বিপ্লবী মনের দৃঢ়তা ও কর্মশক্তিতে সকলেই আস্থাবান। সাহসের পরীক্ষায় ও বিপ্লবী জীবনের কঠোর আত্মত্যাগে আমাদের দেশের নারীরাও যে পুরুষের সমকক্ষ তা প্রথম নারী শহীদ প্রীতিলতা তার জীবন উৎসর্গ করে প্রমাণ করেছে।

চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানের পর থেকেই আমাদের সশস্ত্র অভিযানে অংশ গ্রহণ করতে বিপ্লবী বোনেদের আমরা কেন আহ্বান করি নি—এই প্রশ্ন বাংলার বিপ্লবীদের মন আলোড়িত করে তুলেছিল। চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহে মেয়েরা কেন যোগ দেন নি সে বিষয়ে আমার আগের তিনখানি ("অগ্নিগর্ভ চট্টগ্রাম", "চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ" ১ম খণ্ড ও "চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহ" ২য় খণ্ড) গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় এই বইতে তার পুনরাবৃত্তি আর করলাম না।

বাংলার নারীসমাজের প্রতি আমাদের অবজ্ঞার কোনই কারণ ছিল না। সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর বিরুদ্ধে ভাইদের পাশে দাঁড়িয়ে বোনেরা যুদ্ধ করতে পারবে না—আমাদের মনে এইরূপ অবাস্তব চিন্তাধারার কোন স্থান ছিল না। সাংগঠনিক সমস্যার কথা ভেবে ও সময় স্বল্পতার জন্য সার্বিক শিক্ষার অসম্পূর্ণতায় বিপ্লবী ভাই-বোনেদের একত্র অভিযান পাছে সফল করে তোলা না যায়, সেই ভয়েই প্রথম আক্রমণে বোনেদের সঙ্গে নিতে আমরা সাহস করি নি।

আমরা জানতাম, বোনেরা আমাদের ভুল বুঝবে না। তারা যে সত্যিই ভুল বোঝে নি তার প্রমাণও আমরা পেয়েছি। তাছাড়া পরবর্তীকালে বোনেরা বাস্তবেও দেখেছে যে, তাদের প্রতি কোন prejudice বা তাদের উপেক্ষা করার মনোবৃত্তি অথবা তাদের যোগ্যতা সম্বন্ধে সংশয়—এর কোনটাই আমাদের ছিল না।

মাস্টারদা ও নির্মলদা চেয়েছিলেন শ্বেতাঙ্গ বর্বরেরা বাংলার যে নারীসমাজকে নির্যাতন অপমানে পদে পদে লাঞ্ছিত করেছে, সেই নারীসমাজই সাম্রাজ্যবাদী শাসকের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করুক। গতিশীল জগতের বৃহৎ পরিধি হতে বিচ্ছিন্ন—অন্ধকার গৃহকোণে বন্দিনী নারীসমাজ একবার যদি বিপ্লবী প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয় তাহলে তারাও অসাধ্য সাধন করতে পারে—এ বিষয়ে মাস্টারদা ও নির্মলদা সচেতন ছিলেন। তাই তাঁরা চেয়েছিলেন লাঞ্ছিত নারীসমাজের প্রতীকস্বরূপ প্রীতি ও কল্পনা পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণে নেতৃত্বভার গ্রহণ করবে—পিছনে পড়ে না থেকে সশস্ত্র সংগ্রামে ভাইদের পাশে এসে দাঁড়াতে ভারতের নারীসমাজকে অস্ত্র-ঝন্ঝনায় তারা ডাক দিয়ে যাবে।

পাহাড়তলী ক্লাব আক্রমণ পরিকল্পনার প্রথম ব্যর্থতার পর দ্বিতীয় দফা আক্রমণ প্রস্তুতি দ্রুত শুরু হোল। এই দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় মাস্টারদাকে বহু নতুন নতুন বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে।

দ্বিতীয়বার আক্রমণের পরিকল্পনা অনুযায়ী কল্পনা দত্ত তার অন্যান্য সাথীদের সঙ্গে একত্রে training নিতে পুরুষবেশে বিপ্লবী সাথী শান্তি চক্রবর্তীর সঙ্গে কাট্টলী গ্রাম অভিমুখে যাচ্ছিল। কিন্তু এই পুরুষবেশে পথচারীদের চোখে ধুলো দেওয়া শেষ পর্যন্ত সম্ভব হোল না। পাহাড়তলীর কাছাকাছি দেওয়ানহাট নামক স্থানে কতিপয় অবাঞ্ছিত লোক কল্পনাকে মহিলা বলে সন্দেহ করে এবং তার পথ অবরোধ করে দাঁড়ায়। দেখতে দেখতে অবস্থা ঘোরালো হয়ে উঠলো। এই পরিস্থিতিতে কোন উপায় না দেখে কল্পনা নিকটবর্তী থানাতে গিয়ে উপস্থিত হয়ে, নিজের পরিচয় দিল এবং জানালো সে দেওয়ানহাটের স্থানীয় ডাক্তার জ্ঞান ঘোষ মহাশয়ের পরিচিতা। কল্পনা ডাক্তারবাবুর ছেলের সহপাঠী এবং সেই সূত্রেই ডাক্তারবাবুর পরিবারের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল।

কল্পনার পুরুষবেশের এই চাঞ্চল্যকর সংবাদটি চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। এই ঘটনা সম্বন্ধে শ্রীমান আনন্দ গুপ্তের লেখা থেকে সামান্য উদ্ধৃতি দিলাম—

"১৭-৯-৩২ তারিখে পুরুষবেশে তিনটি লোক ট্যাক্সি-

যোগে পাহাড়তলীর দিকে যাইতেছিল। দেওয়ানহাটের নিকটে তাহাদের কথাবার্তা শুনিয়া একটি লোকের সন্দেহ হয় যে, ইহাদের মধ্যে একজন রমণী আছে। অপর এক ড্রাইভার শেখ দেওয়ান তাহাদের দেখিয়াছে এবং কল্পনাকে সনাক্ত করিয়াছে। তাহাদিগকে অনুসরণ করিয়া সে ভেলুয়া-দীঘির উত্তরে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া সুরেন ডাক্তারের কাছে লইয়া যায় এবং পুলিশকে খবর দেয়। পুলিশ যাইয়া সেখানে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করে। কল্পনাকে Suppresion of terrorist Act মতে সোপর্দ করা হয়। সে জামিনে মুক্ত হইয়া নিরুদ্দিষ্ট হয়,"—(পাঞ্চজন্য থেকে উদ্ধৃত)।

দুর্ঘটনা খুব সামান্য হলেও সংগঠনের চলার পথে এই সব বাধাও প্রস্তুতির গতি ব্যাহত ও মন্থর করে। পুরুষ-বেশী কল্পনাকে থানায় বন্দী হতে হোল। পুলিশের বড়-কর্তারা প্রাণপণে জানতে চেষ্টা করলেন কল্পনা এই বেশে কি উদ্দেশ্যে কোথায় যাচ্ছিল। পুলিশকে অবশ্য শেষ পর্যন্ত কল্পনার কাছ থেকে কিছু জানবার দুরাশা পরিত্যাগ করতে হয়েছিল। চট্টগ্রামের দৈনিক "পাঞ্চজন্য" কাগজে "সুরেন ডাক্তারবাবু" বলে সংবাদটি পরিবেশিত হয়েছে। কিন্তু আমি কল্পনার মুখে যা শুনেছি তাই এখানে লিখেছি। পুলিশের রিপোর্ট বা সংবাদপত্রের খবরের চাইতে আমাদের প্রত্যক্ষ রিপোর্টে সত্যতা অনেক বেশি—তাই আমার লেখাতে সর্বত্রই নিজেদের জানা বিবরণগুলিরই অগ্রাধিকার।

১৯৩২ সালের ১৭ই ও ১৮ই সেপ্টেম্বর কল্পনাকে জেল-হাজতে রাখা হোল। কল্পনার বাবা তখন সরকারী চাকরীতে অন্য জেলায় কর্তব্যরত ছিলেন। টেলিগ্রাম পেয়ে তিনি ছুটে এলেন। কল্পনাকে জামিনে মুক্ত করে আনবার চেষ্টা চলতে লাগলো।

এদিকে পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের পরিকল্পনা সম্পূর্ণ। ইতিমধ্যে প্রীতিলতা বাড়ি ছেড়ে চলে এসেছে। আক্রমণকারী দলটিও সম্পূর্ণ প্রস্তুত। আর বিলম্ব করা উচিত হবে না—বিলম্বে আরও কোন বাধা আসতে পারে। মাস্টারদার নির্দেশ অনুসারে ১৯৩২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর রাত দশটায় পাহাড়তলী ক্লাব আক্রমণের সময় ধার্য হোল। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনান্তে আক্রমণকারী দলের ও দলনেত্রীর পরিচ্ছদ স্থির করা হয়। এই সময় পুলিশ ও মিলিটারীর তাণ্ডব-লীলায় চট্টগ্রাম সশঙ্কিত, বিপর্যস্ত। স্থানে স্থানে ক্যাম্প, যখন তখন সৈন্যদলের টহলদারী, যেখানে সেখানে চেকপোস্ট। সেই অবস্থায় চট্টগ্রাম-অভ্যুত্থানের রাতের মত সামরিক পোশাক ব্যবহার মাস্টারদা সমীচীন মনে করেন নি। সকলেই সার্ট গায়ে, মালকোচা দিয়ে ধুতি পরে ও রবার সোলের জুতো পায়ে এ্যাকশানে যাবে স্থির হোল। প্রীতিলতার পোশাক কিরূপ হবে সে প্রশ্নের সমাধানও মাস্টারদাই করেছিলেন। আটজন সাথীর সঙ্গে মিলিটারী ইউনিফর্মে যাওয়ার অর্থ অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। গেরিলা যুদ্ধ পদ্ধতিতে যেন অতর্কিতে শত্রুকে আক্রমণ করা যায়, সেদিকে লক্ষ্য রেখে স্থির হোল প্রীতি-লতাও অন্যান্য সবার মত ধুতি-সার্ট ও রবার সোলের জুতো পরবে। মাথার চুল ঢেকে রাখবার জন্য মাথায় একটা সাদা পাগড়ী শোভা পাবে। প্রীতির সার্টটি চেক কাপড় দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল।

মাস্টারদার নির্দেশেই প্রীতি এই এ্যাকশানের নেত্রী। প্রীতি মাস্টারদাকে প্রশ্ন করেছিল অতজন উপযুক্ত ভাই থাকতে এই গুরুভার বহনের সম্মান তাকে কেন দেওয়া হচ্ছে? মাস্টারদা যুক্তি দিয়ে প্রীতিকে বুঝিয়েছিলেন—সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ অনুচরেরা ভারতীয় নারীসমাজের প্রতি তাদের উৎপীড়ন, নিপীড়ন ও অপমানের প্রায়শ্চিত্ত করবে ভারতীয় বিপ্লবী রমণীর বোমা ও রিভলভারের প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার মুখে। দ্বিতীয়ত, মাস্টারদা তাঁর অভিমত প্রকাশ করেছিলেন—"আমি চাই ভারতীয় নারী-সমাজ তাদের স্বাধীনসত্তা নিয়ে সমান অধিকারে পুরুষের পাশে এসে দাঁড়াক। তোমার সাহস ও চরম আত্মত্যাগের আদর্শ ভারতের নারীসমাজের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি করুক—এই আমার ইচ্ছা......।" —পরে বিশেষ বিশেষ উদ্ধৃতি দিয়ে আমি এই সম্বন্ধে প্রামাণ্য তথ্য প্রকাশ করবো।

প্রীতিলতাকে আটজন বিপ্লবী যুবকের ছোট দলটির নেত্রীপদের দায়িত্ব দিয়ে মাস্টারদা দলটির সামনে প্রীতির নাম ঘোষণা করলেন। এই ঘোষণায় সবাই উৎফুল্ল—সবাই প্রীতিদির নির্দেশ পালনে স্থিরপ্রতিজ্ঞ—বীর কদমে এক-সঙ্গে প্রীতিদিকে অনুসরণ করে সবাই ইউরোপীয়ান ক্লাবের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে এবং বোমা ও গুলীবর্ষণে সাম্রাজ্য-বাদী পাশবিকতার উপযুক্ত প্রতিশোধ নেবে।

প্রথমবার এই আক্রমণ পরিকল্পনা চলাকালে শৈলেশ্বর মানসিক প্রতিক্রিয়ায় ভুগছিল। সাথীদের কাছে বহুবার সে প্রকাশ করেছে—সে আর বাঁচতে চায় না, তাকে মরতেই হবে, ইত্যাদি, ইত্যাদি এবং সত্যি সত্যিই সে আর বাঁচলো না—বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলো। প্রীতিলতাও ক্লাব আক্রমণ করতে যাওয়ার পূর্বে নিকটতম সাথীদের ও মাস্টারদাকে বার বার বলেছে— সে আর ফিরবে না, তাকে এই অভিযানেই প্রাণ দিতে হবে। ভাইয়েরা অনেক বুঝিয়েছে, মাস্টারদাও প্রীতিকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন যে, প্রীতির এই মনোভাব সুস্থ নয়—ঠিক নয়। "মরতেই হবে"—এ কথা মনে করবে কেন? যুদ্ধে যদি মরণ আসে, তবে তাকে আলিঙ্গন করতেই হবে। কিন্তু বাঁচবার চেষ্টা না করে স্বেচ্ছায় প্রাণ দেওয়ার যৌক্তিকতা কোথায়? প্রীতির এক কথা, সে সবাইকে বলতো—"আমাকে নিয়ে তোমাদের আত্মগোপন করে থাকা কত অসুবিধা। আমার জন্য তোমাদের নিরাপত্তা অনেকখানি ব্যাহত হচ্ছে। কি জানি মাস্টারদা হয়ত আমার জন্যই ধরা পড়ে যাবেন—না, না, আমার বেঁচে থাকা হবে না। নির্মলদা, রামকৃষ্ণ ও অন্যান্য শহীদেরা আমাকে ডাকছে—তাদের কাছেই আমার স্থান। শত্রুর রিভলভারের গুলীতে আমি যদি নাও মরি তবু আমাকে স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করতে হবে। আমার কাছে বিষ থাকবে—প্রাণ থাকতে আমি ধরা দেব না—আমি বেঁচে ফিরে আসবো না।"

অগ্নিযুগের তরুণ-তরুণীদের ভাবপ্রবণতার ইতিহাসে

এইরূপ বহু ঘটনা আছে। ২৪শে সেপ্টেম্বর সকাল থেকেই সাথীরা প্রীতিকে তার ঐরূপ সংকল্প পরিত্যাগের জন্য অনেক বুঝিয়েছে। তারকেশ্বর ও মাস্টারদা প্রীতিকে স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণের সংকল্প থেকে বিরত করবার জন্য সস্নেহে বহুপ্রকার যুক্তি-তর্কের অবতারণা করেছেন। কিন্তু অচল অটল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রীতিকে তার সংকল্প থেকে কেউ বিচ্যুত করতে পারলো না।

প্রীতি মাস্টারদার কাছে বিদায় নিল—"মাস্টারদা, শৈশব থেকেই আপনাকে ভক্তি করে এসেছি। আশীর্বাদ করুন আপনার দেওয়া এই গুরুদায়িত্ব পালনে যেন সফল হই। আপনার আশীর্বাদে পুরুষেরা যা' পারে নারী বলে তাতে যেন আমি অপারগ না হই। অমাকে শক্তি দেবেন—আমি যেন সংকল্পে দৃঢ় থাকি...।"

মাস্টারদা নীরব রইলেন। অন্তরের অব্যক্ত গভীর ভাষাতেই মাস্টারদা আশীর্বাদ করলেন। একে একে আটজন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিপ্লবী সৈনিক মাস্টারদার আশীর্বাদ নিয়ে রাত্রের দক্ষযজ্ঞে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হোল।

[ক্রমশ]

আইন ও শৃঙ্খলা: পুলিশের ভূমিকা—

কয়েকটি অভিমত

সাগর বিশ্বাস

সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে (আসলে সমগ্র ভারতবর্ষে) আইন ও শৃঙ্খলা বা Law and order—এই দুটি শব্দ এবং প্রতিশব্দ সুদূর গ্রামাঞ্চলের নিরক্ষর চাষীর কাছেও পারিচিতি লাভ করেছে। ১৯৬৭ সাল থেকে এই দুটি শব্দ নিয়ে এত আলোচনা, এত তদন্ত, এত সম্পাদকীয় মন্তব্য, এত বেতার ভাষণ হয়ে গেছে (হবেও কত!) যে, তার প্রচারের ক্ষেত্র শুধু বাংলাদেশেই সীমাবদ্ধ থাকে নি। একটি রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার সংগে সেই রাজ্যের প্রশাসনযন্ত্র এবং পুলিশ বিভাগের কার্যাবলীর প্রশ্ন খুব স্বাভাবিকভাবেই জড়িয়ে থাকে। ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হবার পর রাজ্যের কিছু কিছু শিল্পপতি এবং প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠী তথাকথিত কিছু 'জাতীয়তাবাদী' এবং 'সর্বাধিক প্রচারিত' পত্র-পত্রিকার সহায়তায় একটি গগনভেদী চীৎকার তুলতে সক্ষম হয়েছিল। সেই চীৎকারের তিনটি ধারা হলো—(১) রাজ্যের পুলিশ নিষ্ক্রিয়, (২) রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা বলতে কিছু নেই এবং (৩) এ রাজ্যের শিল্পে মূলধন লগ্নী বিপজ্জনক। '৬৭ সালের সেই আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্নে স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহল এবং সংবাদপত্র জগতে যে গগনভেদী চীৎকার উঠেছিল, তদানীন্তন কেন্দ্রীয় উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীদেশাই তাতেও খুশি হন নি। তিনি কলকাতায় উড়ে এসে স্পষ্টতই আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্নে সংবাদপত্রসমূহের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলেছিলেন যে, কেবল মাত্র বাংলাদেশেই নয়, চতুর্থ সাধারণ নির্বাচনের পরে অকংগ্রেসী সরকার শাসিত সকল রাজ্যের সংবাদপত্রই জনতার গন্ডগোলের 'কঠোর সমালোচনা' করবার 'সৎসাহস' হারিয়ে ফেলেছিলেন'। তারপর এই পূর্বাঞ্চল থেকে দিল্লীমসনদ পর্যন্ত কেমন করে 'গেল' 'গেল' রবে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছিলো, সেকথা আজও সকলের মনে আছে। তার পুনরালোচনা করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আমি শুধু মনে করিয়ে দিতে চাই—সেই রব আবার উঠেছে, সেই মৃত-কণ্ঠ আবার সজীব হয়ে কথা কইছে। যা হোক সে-বারের কোলাহলের সংগে এবারের একটু মাত্রাগত অমিল হলো, এবার নাকি কোথাও কোথাও পুলিশ একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের স্বার্থে সক্রিয় (জানি না ভেড়ী কিংবা জমি দখলকারী জনতার ওপর হামলা করে সেই রাজনৈতিক দলের স্বার্থরক্ষা করা হয় কিনা)।

এই প্রসংগে অনিবার্যভাবে কিছু প্রশ্ন এসে যায়। পুলিশের সক্রিয়তা-নিষ্ক্রিয়তা নির্ধারণের মানদন্ড কি? বিক্ষুব্ধ কিংবা ঘেরাওকারী জনতাকে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করতে পারলেই কি তাঁদের সক্রিয়তার চরম নিদর্শন রাখা হয়? অন্যথায় তারা চরম নিষ্ক্রিয় বলে পরিগণিত হবে? ৩১শে জুলাই-এর ঘটনা কি নিষ্ক্রিয়তার পরিচয় বহন করে? বৃটিশ ভারতে 'পুলিশ' ছিলো একটি সন্ত্রাসমূলক শব্দ; একথা কি কেউ বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন যে, স্বাধীনতোত্তর ভারতে তার সামান্য রকমফের ছাড়া কোনো পরিবর্তন হয়েছে? স্বাধীন ভারতে পুলিশের সংগে জনগণের সম্পর্ক সমাজসেবী-বন্ধুর সম্পর্ক হবে বলেই ত' সকলের কাম্য ছিলো। কিন্তু একথা কি সত্য নয় যে, পুলিশ-জনগণ সম্পর্কে দিন দিন তিক্ত থেকে তিক্ততর হয়েছে? অথচ এ কথাও সত্য, আজ যাঁরা পুলিশ বা পুলিশের পদস্থ অফিসার, তাঁরা আমাদেরই ভাই, বন্ধু, না হয় আত্মীয়। তবু খেলার মাঠে সীতেশ রায়ের পিঠে লাঠি ভাঙে, তবু ইন্দ্রপ্রস্থ ভবনে মানুষ মরে, তবু গড়ের মাঠে মন্ত্রীরাও রেহাই পান না, তবু কাশীপুরে রাজিয়া-অঞ্জলিদের সিঁথির সিঁদুর অকালে কপাল থেকে মুছে যায়! কেন? এর কারণ কি এই নয় যে, দেশ স্বাধীন হলেও পুলিশকে একটি বিশেষ শ্রেণীস্বার্থে যে শিক্ষায় শিক্ষিত করা হয়, তা সেই বৃটিশ ঔপনিবেশিক প্রতিক্রিয়াশীল শিক্ষা ছাড়া আর কিছু নয়? কিন্তু ওই যে শ্রমজীবী মানুষগুলি জীবন হারালো, যে তরুণী বধূর চোখের সামনে দীর্ঘ ভবিষ্যৎ একটি ঘন অন্ধকারে তলিয়ে গেলো—তাদের পরিজনেরা কিংবা তারা যদি আইন-শৃঙ্খলার পূর্ণ ব্যাখ্যা দাবি করে বসে তাহলে আইন-শৃঙ্খলার তথাকথিত অভিভাবকেরা কি জবাব দেবেন?

একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে, স্বাধীন ভারতে পুলিশ জনকল্যাণমূলক কাজের চেয়ে শ্রেণীস্বার্থমূলক কাজেই নিয়োজিত হয়েছে বেশি। তাই দিনের পর দিন গোটা দেশটি দুর্নীতির অতলে তলিয়ে গেছে। দুষ্টের দমন না করে পালনের নির্লজ্জ ভূমিকাই গ্রহণ করেছে পুলিশ। সমাজে তাই পুলিশের ছোঁয়া বাঘের ছোঁয়া থেকেও ভয়ংকর বলে প্রবাদবাক্য প্রচলিত হয়েছে। স্মাগলিং, খুন, ডাকাতি, রাহাজানি, সমাজবিরোধী ব্যবসায় আগেও ছিল, আজও আছে। সেদিনও পুলিশ এর প্রতিরোধে এগিয়ে আসে নি—কখন ব্যক্তিস্বার্থে, কখন শ্রেণীস্বার্থে তার সমস্ত নীতিবাদের সমাধি হয়েছে। আজও কি একথা কেউ জোর করে বলতে পারেন যে, সামগ্রিকভাবে পুলিশ এইসব সমাজ ও মানবতাবিরোধী কাজের প্রতিকার কিংবা প্রতিরোধে এগিয়ে এসেছে? আজ কিংবা ১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকার কি কখনও নিষ্ক্রিয়তা অবলম্বন করবার নির্দেশ দিয়েছে? তবে? তবে পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকে কেন? সে কি ওই শ্রমজীবী মানুষের বাঁচার সংগ্রামের ওপর যথেচ্ছ অত্যাচার করবার সনাতন রীতিকে খর্ব করা হয়েছে বলে?

আমার বর্তমান ধারাবাহিক রচনার এই হলো সংক্ষিপ্ত পটভূমি। এই পটভূমিতেই রাজ্যের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি তথা পুলিশী কার্যকলাপ, এবং সরকারী মনোভাব নিয়ে পুলিশ বিভাগ সহ বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট মানুষের সংগে আলোচনার সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু প্রকাশ করব। তাঁদের ধারণার কথা পৃথক পৃথকভাবে জনসাধারণের সামনে একে একে তুলে ধরবো।

ডঃ রমেশচন্দ্র ঘোষ—অধ্যাপক (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ রমেশচন্দ্র ঘোষ রাজ্যের বুদ্ধিজীবী সমাজের অন্যতম। সেদিন দীর্ঘসময় ধরে তাঁর সংগে রাজ্যের সাম্প্রতিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা করছিলাম। জানতে চেয়েছিলাম সারা রাজ্যে পুলিশের ভূমিকা নিয়ে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে সে সম্পর্কে তাঁর নিজের অভিমত কি। উত্তরে তিনি জানিয়েছিলেন : পুলিশের ক্রিয়াকলাপ নিয়ে এই বিতর্ক আগেও ছিলো, এখনো আছে। কিন্তু একটা কথা আমরা প্রায়শই ভুলে যাই—পুলিশও মানুষ। সাধারণ পুলিশের অনেক অসুবিধা, তারা ত' যন্ত্রবিশেষ। যেখানে রাজনৈতিক উত্তেজনা acute নয় সেখানে পুলিশ smoothly কাজ করতে পারে। পুলিশের কাজ policy-making নয়, তার কাজ হলো law and order-কে uphold করা। কিন্তু গণতন্ত্রে law and order-কে uphold করা আর policy execute করা এ দুয়ের মধ্যে distinction নির্দেশ করা খুবই মুস্কিল। অর্থাৎ যেখানে political parties in power এবং parties in opposition কিছু general principles of law and constitutional morality-কে অবিসংবাদিতভাবে commonly গ্রহণ করে না, সেখানে পুলিশের ভূমিকা খুবই শক্ত। এই কারণেই মাঝে মাঝে আমরা পুলিশের impulsive activities দেখতে পাই। কোথাও তার যা করা উচিত তা করে না—আবার কোথাও তার যা করা উচিত নয়—তাই করে বসে। একথা সত্য যে, পুলিশ তার Social feeling-কে আজও develop করতে পারে নি।

—স্বাধীন ভারতে পুলিশের ভূমিকা যেমন হওয়া উচিত ছিল—তেমন হয়েছে বলে আপনার মনে হয় কি?

—না হয় নি। বৃটিশ আমলে পুলিশকে ব্যবহার করা হতো সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশজাতিরই স্বার্থে। জনসাধারণের ওপর তারা চালাতো অত্যাচার। আজও সেই tradition বজায় আছে। পুলিশ জনসাধারণকে বন্ধুর মতো সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে এমন Healthy perspective-এর সত্যই অভাব। এজন্য অবশ্য সাধারণ পুলিশের low-pay এবং training system-ই বহুলাংশে দায়ী। আর একটা কথা আমার মনে হয়, পুলিশ law and order রক্ষা করতে পারে না, যদি জনসাধারণের মধ্যে যারা আইন ভাঙছে তাদের বিরুদ্ধে পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করে আইনকে রক্ষা করবার ইচ্ছা না জাগে।

—এজন্য কি পুলিশ বিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসারদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন প্রয়োজন বলে আপনার মনে হয়?

—নিশ্চয়ই। এতকাল ওই দৃষ্টিভঙ্গীই ত' পুলিশ-জনগণের সম্পর্ক বিষিয়ে তুলেছে।

—কোনো কোনো মহল বলছেন, এ রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে, এমন কি একটি নৈরাজ্যময় অবস্থার উদ্ভব হয়েছে। আপনার কি মনে হয়?

—আমার মনে হয় এটা অতিরঞ্জিত। শিল্পক্ষেত্রে অবশ্য একটু উত্তেজনা চলছে। কিন্তু ভারতবর্ষের বর্তমান অর্থনৈতিক দুরবস্থার দিনে এটা অস্বাভাবিক নয়। নৈরাজ্য একে বলে না।

—আপনার কি কখনো মনে হয়েছে পুলিশকে ক্ষমতাসীন কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে?

—না। এই অভিযোগ করবার কোনো *sufficient evidence* নেই। আপাতদৃষ্টিতে যা সামান্য ঘটনা দেখে এটা কখনো কখনো বলা হয়ে থাকে—আসলে তা সকল *regime*-এই ঘটে থাকে। প্রফুল্ল ঘোষ সরকারের আমলেও তা দেখা গেছে।

* * *

শ্রীসুকুমার রায়—সহ-সভাপতি, বাংলা কংগ্রেস।

—আইন-শৃঙ্খলার প্রশ্নে রাজ্যে নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়েছে বলে কি আপনার মনে হয়?

—না। *Law and order* আছে। ক্ষেত্র বিশেষে যে সামান্য সংঘর্ষ হচ্ছে, তা আগেও হতো, ভবিষ্যতেও হবে। বর্তমানে কয়েকটি বিশেষ কারণে স্থানে স্থানে যে সংঘর্ষ হচ্ছে, সেটা দলগত সংঘর্ষ বলে আমি মনে করি—সেটা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার। এর সঙ্গে সাধারণ *Law and order*-এর সম্পর্ক নেই।

—রাজ্যের পুলিশ কি নিষ্ক্রিয়তা অবলম্বন করছে বলে আপনার মনে হয়?

—ক্ষেত্রবিশেষে যদিও এমন অভিযোগ আসছে, তথাপি সেটা অনুসন্ধানসাপেক্ষ। আমি আশা করব এই অভিযোগের সত্যাসত্য যুক্তফ্রন্ট নিরূপণ করবে এবং উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

—আপনার কি কখনো মনে হয়েছে পুলিশ একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের স্বার্থে কাজ করছে?

—এরূপ কিছু কিছু অভিযোগ পেয়েছি বটে। কিন্তু যতক্ষণ না এর সত্যাসত্য নির্ধারিত হচ্ছে, ততক্ষণ কিছু বলা ঠিক হবে না।

—উপমুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, পুলিশের একাংশ যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বিপদে ফেলবার জন্য চেষ্টা করছে। এ কথা কতদূর সত্য বলে আপনি মনে করেন?

—শুধু পুলিশ নয়, আমি জানি ১৯৬৭ সালে কিছু উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। এবারেও তাঁদের নিশ্চুপ থাকবার কথা নয়।

—এ দেশে পুলিশ ও জনসাধারণের সম্পর্ক স্বাভাবিক নয়—এর কারণ কি?

—পুলিশের ভিতর সৎ ও আদর্শবান কর্মী থাকলেও এখনো তাদের ভিতর উচ্চপর্যায়ের এবং কিছু কিছু মধ্য পর্যায়ের অফিসার সেই ইংরাজী আমলের মনোভাব বদলায় নি। কারণ গত বিশ বৎসরের কংগ্রেসী শাসনে পুলিশকে জনসাধারণের সেবক হিসাবে শিক্ষা দেওয়া হয় নি। ওই সকল উচ্চপদস্থ কর্মচারী সম্বন্ধে যুক্তফ্রন্ট তথা যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিশেষ সতর্ক দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। এবং তাদের সম্পর্কে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য যুক্তফ্রন্টের সভায় আশু কার্যকরী নীতি নির্ধারণ করা আবশ্যক।

—কাশীপুরের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠক হয়েছিলো, কিন্তু রাজ্যে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ থাকবে কি থাকবে না, এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত হয় নি। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

—এটা মন্ত্রিসভার ব্যাপার। এর জবাব দেবেন রাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

—বিভিন্ন স্থান থেকে ভেড়ী কিংবা জমি দখলকারী জনতার ওপর পুলিশের অত্যাচারের খবর পাওয়া যাচ্ছে। এগুলি সরকারী নীতির বিরোধিতার পরিচায়ক নয় কি?

—এ সম্পর্কে যুক্তফ্রন্টের মধ্যে আলোচনা হচ্ছে।

—পি-ডি-এফ সরকারের আমলে পুলিশ কোনো কোনো প্রাক্তন মন্ত্রীকে পর্যন্ত ময়দানে প্রহার করায় রাজ্যে খুব চাঞ্চল্যের

৩রা সেপ্টেম্বর '৬৯ সন্ধ্যা ৬৷৷টায়

তরুণ অপেরা কর্তৃক

একালের বলিষ্ঠ নাটক
হিটলার
আগামী নাটক
রাজা রামমোহন
লেনিন
১১৩, রবীন্দ্র সরণীতে টিকিট
৫৫-৭১২১
মহাজাতি সদন

যাত্রাজগৎ পড়ুন।

সৃষ্টি হয়েছিলো। সংশ্লিষ্ট পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে কোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিলো, কি?

—ময়দানের ঘটনার judicial enquiry শুরু হয়েছে। কাজেই এ সম্পর্কে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

—ঘেরাও সম্পর্কে যুক্তফ্রন্টের নীতির পরিবর্তন হচ্ছে কি? এ সম্পর্কে আপনার দলের বক্তব্য কি?

—অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সকল নীতিরই কিছু পরিবর্তন সব সময়ই হতে পারে। ঘেরাও সম্পর্কে আমাদের দলের বক্তব্য মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং স্পষ্ট করেই রেখেছেন। এর পরে আমার আর কি বলার থাকতে পারে? তবে ঘেরাও বন্ধ হওয়া উচিত, কিন্তু সেই সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর ওপর শিল্পপতিদের শোষণনীতি বন্ধ করতে হবে।

* * *

শ্রীমনোরঞ্জন রায়—সাধারণ সম্পাদক, অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বাংলা শাখা।

—রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটেছে বলে কি আপনি মনে করেন?

—এতদিন *Law and order* বলতে পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষাই বোঝাতো। সেখানে শ্রমিক এবং কৃষকের ওপর অত্যাচার করতে পারলেই আইন-শৃঙ্খলার পরাকাষ্ঠা মনে করা হতো। পরাধীন দেশে পুলিশের যে ভূমিকা ছিল সেই কাজই কংগ্রেস সরকার গত ২২ বছর ধরে পুলিশকে দিয়ে করিয়েছে। যুক্তফ্রন্ট সরকার পুলিশকে জনস্বার্থের বিরুদ্ধে ব্যবহার করছেন না। তাই ওদের আভিধানিক অর্থে আইন-শৃঙ্খলার গঙ্গাযাত্রা হয়ে গেছে।

—পুলিশ কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের স্বার্থরক্ষা করছে বলে কি আপনার মনে হয়?

—Unfortunately সেই বিশেষ রাজনৈতিক দলের সংগঠন আজ গ্রামে গ্রামে প্রসারিত এবং সেই সংগঠনের ছায়ায় থেকে গ্রামের কৃষক জমির লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। এই মন্তব্য হলো সেই বিশেষ রাজনৈতিক দল থেকে শ্রমিক কৃষককে আলাদা করবার উদ্দেশ্যে প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের এক প্ররোচনামূলক চক্রান্ত।

—ভেড়ী এবং জমি দখলকারী জনতার ওপর পুলিশের অত্যাচার কি সরকারী নীতির বিরোধিতার নামান্তর নয়?

—না। ভেড়ী এবং জমি দখল এক কথা নয়। যে ভেড়ীর ওপর মালিকের ন্যায্য স্বত্ব আরোপিত আছে সেটা দখল করা বে-আইনী। সেক্ষেত্রে পুলিশ যদি জনতাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করে থাকে তবে সেটা সরকারী নীতির পরিপন্থী হতে পারে না। আর কৃত্রিম ভেড়ী অর্থাৎ যে সকল জমিতে জল ঢুকিয়ে ভেড়ী তৈরি করা হয়েছে সেটা দখল করা আসলে কিন্তু জমি দখল করা।

—একজন Trade-unionist হিসেবে ঘেরাও সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি? ঘেরাও-প্রশ্নে যুক্তফ্রন্টের নীতির পরিবর্তন হয়েছে বলে কি আপনি মনে করেন?

—আমি মনে করি না। *Trade-unionist* হিসাবে আমি বলতে চাই ঘেরাও শ্রমিকের মৌলিক দাবি-দাওয়ার সমাধান করতে পারে না। তার মানে অবশ্যই এ নয় যে, ঘেরাওকে আইন করে বন্ধ করতে হবে। ঘেরাও কেন হয় এর কারণ অনুসন্ধান করলে আমরা দেখবো—বর্তমান আর্থিক পরিস্থিতিতে এ অবশ্যম্ভাবী। কোন সরকারই শ্রমিক-শ্রেণীর এই অনিবার্য আন্দোলনকে রুদ্ধ করতে পারে না। কাজেই ঘেরাও ছিলো—ঘেরাও থাকবে। তবে সবক্ষেত্রে ঘেরাও না হওয়াই ভালো।

* * *

শ্রীঅশোক ঘোষ—সম্পাদক, ফরোয়ার্ড ব্লক।

—রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে বলে সম্প্রতি যা বলা হচ্ছে সে সম্পর্কে আপনার অভিমত জানতে চাই।

—আমরা মনে করি না যে, যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার পর এ রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। দীর্ঘ বিশ বছর ধরে কংগ্রেসী আমলে যেভাবে পুলিশ-বাহিনী তথা সরকারী শাসনযন্ত্রকে রাজ্যের শোষিত মানুষের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়েছে, যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠনের পর কেউ যদি আশা করেন সেই একই অবস্থা চলতে থাকবে, তাহলে তাঁরা ভুল করবেন। আর সেই কারণেই শিল্পপতি, জোতদার ও জমিদারা তারস্বরে চীৎকার করতে শুরু করেছেন যে, পশ্চিমবাংলায় আইনের শাসন আর থাকলো না।

—১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হতো যে, তাঁরা নাকি পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিলেন। এবারেও কি পুলিশ নিষ্ক্রিয় বলে মনে হয়?

—১৯৬৭ সালে পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রাখার অভিযোগ সত্য ছিল না। যাঁদের স্বার্থে ঘা লেগেছিলো তাঁরাই একথা প্রচার করে যুক্তফ্রন্টবিরোধী আওয়াজ সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। এবারেও সরকার কোথাও পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রাখতে চায় নি। অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে সরকারী নির্দেশ ব্যতিরেকেই তো আদালত সর্বত্র পুলিশ পাঠাবার নির্দেশ দিচ্ছে।

—পুলিশের সক্রিয়তা কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের স্বার্থে বলে আপনি মনে করেন কি?

—কোনো দলবিশেষের স্বার্থে পুলিশকে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে যে অভিযোগ উঠেছে তা সত্য নয়; তবে স্বাভাবিকভাবে পুলিশের বড়কর্তাদের একটি অংশ স্বরাষ্ট্র বিভাগটি যে দলের অধীন হাতে পড়েছে, সেই দলকে প্রীতি উৎসাহ নিয়ে সাহায্য করতে ব্যস্ত থাকেন। বৃটিশ আমল থেকে কংগ্রেসী আমল পর্যন্ত এই-ভাবে পুলিশের বড়কর্তা থেকে শুরু করে থানার দারোগাবাবুরা পর্যন্ত শাসকদলের মনস্তুষ্টি করে চলার যেসব পদ্ধতি আয়ত্ত করেছে, স্বাভাবিকভাবেই যুক্তফ্রন্টের আমলে পুলিশ বিভাগ যে দলের হাতে পড়েছে সেই দলকে তারা সেইভাবেই সেবা করতে চাইছে।

—এদেশে পুলিশ ও জনসাধারণের সম্পর্ক স্বাভাবিক নয় কেন?

—ইংরেজ আমলে যে উদ্দেশ্যে পুলিশ-বাহিনীকে ব্যবহার করা হতো—স্বাধীন-তার পরে কংগ্রেসী আমলেও তার পরি-বর্তন হয় নি। এই কারণে পুলিশের সঙ্গে জনসাধারণের সম্পর্ক স্বাভাবিক-ভাবে গড়ে ওঠে নি।

—সাধারণভাবে একটি ধারণা প্রচলিত হয়েছে যে, পুলিশ যুক্তফ্রন্ট সরকার-বিরোধী। ইউনিয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশের সরকার-বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণের আশংকা করেন কি?

—সাধারণত শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্ত সমাজের ছেলেরাই সাধারণ পুলিশ হিসাবে যোগদান করে। কিন্তু এরাই আবার শ্রমিক-কৃষক-মধ্যবিত্তের বাঁচার আন্দোলনের ওপর অত্যাচার চালায়। এটা কেন হয়? এর কারণ হলো সমগ্র মেশিনারীটা গঠিত পুঁজিবাদীদের স্বার্থে এবং সেই স্বার্থরক্ষা করাই ছিলো পুলিশের এক-মাত্র নীতি। যুক্তফ্রন্ট সরকার এই নীতির মৌলিক পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তাটাই পুলিশবাহিনীর সামনে তুলে ধরতে চায়। আমরা আশা করি পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি যুক্তফ্রন্ট সরকার-বিরোধী একটা আন্দোলন গঠন করতে প্রয়াসী হয়েছে—তাদের সে প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যাবেই।

—বিভিন্ন স্থান থেকে ভেড়ী কিংবা জমি দখলকারী মানুষের ওপর পুলিশের হামলার খবর পাওয়া যাচ্ছে। এগুলি কি সরকারী নীতির পরিপন্থী নয়?

—এমন ঘটনা সম্পর্কে আমি ওয়াকিবহাল নই। ভেড়ী বা বেনামী জমি দখল করার জন্য সংগ্রামী কৃষকশ্রেণী যে আন্দোলন শুরু করেছে, তার বিরুদ্ধে কোনো অবস্থাতেই পুলিশ নিয়োগ করা যুক্তফ্রন্ট সরকারের নীতি নয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হাইকোর্টের নির্দেশে সরকারকে পুলিশ পোস্টিং-এর ব্যবস্থা করতে হয়েছে।

(চলবে)

[পূর্বানুবৃত্তি]

এমন সুযোগ ভলু মাঝি হাতছাড়া করলে না। সেই দিনই সন্ধ্যের পরে গিয়ে হাজির হলো চরের দক্ষিণে—ছোট একটা কুঁড়ের সামনে। বাঁশ কুটো তালের পাতা দিয়ে যেমন তেমন করে খাড়া করা একটা টঙের মত। কোনো রকমে মাথা গোঁজার একটা ঠাঁই। আশপাশে জনবসতির চিহ্ন-মাত্র নেই। জনবসতি—কিষাণপাড়া এখান থেকে ঢের দূরে। তার ওপরে হুগলী নদী থেকে তেড়েফুঁড়ে একটা খাল পূবের জালপাই জঙ্গলের পাশ দিয়ে উঠে এসে চলে গেছে কুঁড়ের পাশ দিয়ে। তাতে এ অংশটা একেবারে আলাদা হয়ে গেছে।

কুঁড়ের দরোজা খোলা—ভেতরে টিম-টিম করে একটা আলো জ্বলছে। কিন্তু মানুষজনের কোনো সাড়া নেই।

ভলু ডাকলো, "যমুনা।"

"কে গো!" যমুনা উঁকি দিয়ে দেখে চমকে উঠল। ওর সেই ঝকঝকে কাচের মত উজ্জ্বল চোখ দুটো আজ আর ঝিলিক দিয়ে উঠল না। নিটোল ঠোঁটে ছলকে-ওঠা হাসি উছলে উঠল না। বরং কেমন রসকষহীন গলায় বললে, "চৌকিদার!"

"এলম যমুনা।" ভলু দাঁত বের করে হাসল। বললে, "তোর নতুন ঘরে তো আসি নি। তো ভাবলম আজ—ঢের দিন দেখি নি, যাই দেখা করে।"

যমুনা বসতেও বললে না। হঠাৎ যেন জবুথবু হয়ে দরোজা আগলে দাঁড়িয়ে

ভলু হেসে বলল, "এলম কদ্দিন পরে—তা একটু বসতেও দিবি নি?"

যমুনা দরজা ছেড়ে দাঁড়াল। ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ছেড়ে বললে, "আর কি সে ঘর-দোর মোর আছে চৌকিদার যে লোকজন এলে বসতে বলবো। এসো—ভিতরে এসে বসো।"

মাথা বাঁচিয়ে ঘাড় হেঁট করে ভলু কুড়ের ভেতর ঢুকে চেপে বসল।

তার ধরণ-ধারণ দেখে যমুনা বললে, "তা কি মতলবে হঠাৎ এসে হাজির হলে বলো দেখি।"

কাটা কাটা কথা। সে পুরনো আমেজ নেই। খানিক চুপ করে থেকে ভলু বোধ করি মনে মনে নিজেকে প্রস্তুত করে নিলে। বললে, "না—মতলব আর কি। এমনি মনটা কেমন কেমন করছিল—তাই চলে এলম। সবই তো জানিস যমুনা।" বলে ফোঁস করে একটা দীর্ঘ-শ্বাস ফেললে। বললে, "মোর মনটা পড়ে থাকে এই চরে। বুকের ভিতরটা মোর খাঁ খাঁ করে।"

যমুনা চুপ করে রইল।

ভলু বললে, "নয়নের সঙ্গে দেখা-টেখা হয়?"

"মুকুন্দের হাতে কি মরতে যাব চৌকিদার!" যমুনা বললে, "ওদিকে আর পা মাড়াই নি কোনোদিন। নয়ন কি আর বলে নি সব কথা? মুকুন্দ নিশ্চয় সব জেনে গেছে।"

তারপর দুজনেই চুপচাপ বসে থাকে কিছুক্ষণ।

আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে মুকুন্দ বললে, "তাস্ত-টাস্ত নাই যমুনা?"

"আবার তাস্ত!" যমুনা বললে, "ও পাট আর নাই চৌকিদার। খাবে কে?"

"কেন—তোর খরিদ্দার?"

"সে পাটও আর নাই চৌকিদার।"

"কেন মিছা কথা বলু রে যমুনা।" ভলু হেসে বলল, "হেই সেদিন রাতের বেলায় দেখলম কিস্টদাসকে আসতে!"

যমুনা থতোমতো খেয়ে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বলল, "সে অন্য কাজে।"

কি কাজ—সে আর ভলু জিজ্ঞেস করল না।

তবু যমুনা বললে, "কাজ পড়লে তখন যমুনাকে সকলের মনে পড়ে। বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া হলে তবে কিস্টদাস আসে।"

ভলু বললে, "তামুক থাকলে দে এক ছিলিম খাই।"

"তাও নাই।"

"বিড়ি?"

যমুনা বুঝলে—ভলু সহসা উঠবে না। একটা বিড়ি আর দেশলাই বের করে দিয়ে বললে, "হেই লাও।"

বিড়ি ধরিয়ে একটা লম্বা সুখ-টান দিয়ে ভলু বলল, "তা এ দিকের খবর-টবর তো শুনছি খুব জবর যমুনা!"

যমুনা নিরাসক্তভাবে বলল, "জবর খবর আর কি আছে চৌকিদার। ভিখারী

ষণ্ডম—নিজের ধান্ধায় ঘুরি। জবর খবর কি জান না।"

ভলু বললে, "ডাক্তারখানার পিছনে নাকি কাপড়ের দোকান হবে।"

যমুনা সহজভাবে বলল, "দোকান তো লয়—তাঁতঘর।"

ভলু সজোরে মাথা নেড়ে বলল, "তুই জানিস নি—কাপড়ের দোকান হবে।"

"আমি শুনেছি—তাঁত বসবে।" যমুনা সহজভাবে প্রতিবাদ করে বলল, "কাটা সুতোর তাঁত। চরখায় সুতো কাটা হবে।"

"সুতো কাটবে কে?"

"হেই যে চরের সাগর খুড়ী—সে নাকি ভাল সুতো কাটতে জানে। সে সব মেয়্যাদের শিখিয়ে দিবে।"

"তাঁত চালাবে কে?"

"সাগর খুড়ীর ভাই।" যমুনা বলল, "হেই পছছিমে তাঁতিসাই—সে ফের দূরে। সেখান থেকে নাকি এসেছে।"

"লোকটাকে দেখেছি—আধবুড়ো মতো।" ভলু বলল, "নুতন মুখ দেখে ভেবেছিলম—কে না কে! সে হলো তা হলে হাবু মণ্ডলের মামু।" তারপর একটু থেমে সোৎসাহে বলে উঠল, "একবারে জমজমাট কাণ্ড যমুনা। এ তল্লাটে এতদিন যা ছিল নি—তাই হতে যাচ্ছে। ই জবর খবর লয়!"

যমুনা মরা মরা গলায় বলল, "মোর মত বৈরাগী ফকীরের তাতে কি আসে যায় বল।"

"তা বটে।"

তারপর বিড়িতে আবার একটা লম্বা সুখ-টান দিয়ে ভলু খুব সন্তর্পণে, আফশোষ ভরা গলায় বললে, "কি ছিল তোর রে যমুনা—কি হয়ে গেল!" আস্তে আস্তে বললে, "তবু আস্তাটা থাকলে হতো—দু' দণ্ড এসে জুড়িয়ে যেতম পরানটা।"

যমুনা ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, "আবার বিপদ ডেকে আনবো! আর লয় চৌকিদার।"

ভলু সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝাঁকি দিয়ে বলল, "কেন! আমি ছিলম, মোর থানা ছিল, ছোট দারোগা ছিল, বড় দারোগা ছিল"—

"তারা এখনও আছে চৌকিদার—কিন্তু মোর ঘরটা পুড়বার বেলা কে-উ ছিল নি গো! চোখের সামনে—দেখতে দেখতে মোর সব শেষ হয়ে গেল। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ভেঙেচুরে মোকে একেবারে খালের পার করে দিল—চরের বার করে দিল।" গলা কেঁপে চোখ ছলছলিয়ে এল যমুনার।

পরের ধাপের কথা পাড়বার জন্যে ভলু মাঝি নীরবে বিড়ি টানতে লাগল। যমুনার পুরাতন শোক উথলে উঠেছে। তার ঘর—মানুষের সেই একটি আশ্রয়ের আদিম উদ্বেগ। চোখের কোণে জল এসে গিয়েছিল। আঁচলে মুছে বললে, "বড় চৌধুরীদের গমস্তার হাতেপায়ে ধরে এই খালের ধারে আবার একটু মাথা গুঁজবার টঙ বেঁধেছি চৌকিদার।" একটু থেমে, অনেক দিনের হারানো কথা ভাবতে ভাবতে নিজের মনেই বলতে লাগল, "এই চরে জন্মেছি, এই চরে মোকে রেখে মা মরেছে মোর, এই চরে এত বড়টা হলম। আর যাব কোথাকে বল!"

"কোথা আর যাবি!" দরদ-ভরা গলায় বললে ভলু। সঙ্গে সঙ্গে একটা ফোঁস করে নিশ্বাসও ফেললে। তারপর সুকৌশলে কথাটা পাড়লে—বললে, "মোর বিশ্বাস—সবের গোড়ায় সেই মুকুন্দ পাইক।"

কেমন উদাসভাবে বললে যমুনা, "সে আর মোর কি করেছে। বরং তোমার জন্যে আমি তার বউকে ঘরের বার করতে গেছলম। কে জানে—সেই পাপে হয়তো"—

কথা শেষ হলো না—ভলু চটপট বলে উঠল, "তবে অদের সেই ছোটমণ্ডল—অদের বাড়ুয়া। সেই অদের বিচার বুদ্ধি দেয়।"

"বিচার! তার বিচারের মুখে মারি সাত ঝাঁটা।" ছোট মণ্ডলের কথায় দপ করে জ্বলে উঠল যমুনা, ঝলকে উঠল চোখ। ফেটে পড়ল ক্ষোভে। বলল, "তুমি তো জানো নি সে কথা চৌকিদার—তার পায়ে পড়ে পড়ে ফের কেঁদেছি, বলেছি—বিচার কর। তা উল্টে মোকে আর মোর সেই মরা মায়ের নাম ধরে কি না বলে গাল দিলে! বলল—'বেরো হারামজাদী ডাইনী মাগী। এ পাড়ায় আর কোনোদিন দেখতে পেলে ঠ্যাং ভেঙে দিব।' এই হলো তার বিচার!"

"এই কথা বলেছিল!" ভলু মাঝি উৎসাহে খাড়া হয়ে বসল।

"বলেছিল। আরও সেসব কত কথা।"

"তবে?" ভলু জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে রইল যমুনার দিকে।

দুঃখে ক্ষোভে আবার বুঝি চোখে জল এসে পড়েছিল—যমুনা নীরবে আঁচলে চোখ মুছতে লাগল।

ভলু বলল, "তবেই ব্যাপারটা বুঝে লে নিজে।" জোর দিয়ে বলল ভলু, "এ আমি তোকে বলে দিলাম যমুনা—ওই মুকুন্দ আর ছোট মণ্ডল, অরাই তোর সর্বনাশ করেছে। তা না হলে এ রকম কথা বলে!"

যমুনা চুপ করে বসে রইল।

"হেই দ্যাখ আবার"—ভলু উত্তেজিত গলায় বলল, "মোদের চৌকিদার মাধব শীটের ভাই যাদব শীট—তার ঘরেও আগুন লাগিয়ে দিলে।"

"কে?"

"মোর সন্দেহ হয়—ওই মুকুন্দ আর ছোট মণ্ডলের দল।"

"তার ঘরে অরা আগুন দিল কেন?"

"রাগে।" ভলু বলল, "ভলান্টিয়ারদের সঙ্গে অদের যোগ আছে সেই নুনের সময় থেকে। মনে নাই—মুকুন্দের বাপ চালান হয়ে গেল?"

সভয়ে যমুনা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

ভলু বলল, "বিলাতী কাপড় পুড়াতে এসে তিনজন ভলান্টিয়ার ধরা পড়ল রাত এক পহরে আর হেই দ্যাখ, রাত দু' পহরের পর আগুন জ্বলে গেল যাদব শীটের ঘরে।"

"তো যাদব শীট অদের কি করল?"

"নবান্নের আগে বড় চৌধুরীদের কত কাপড় যেয়ে পড়ে ধোপার ঘরে—একবার ভেবে দ্যাখ। হেই তোমার ভাল ভাল ধুতি, শাড়ি। সব বিলাতী। তো অরা ছাড়া এ-খবর আর কে জানবে বলো?"

যমুনা বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল। বললে, "আগুন লাগিয়ে দিলে!"

"সব।" ভলু বললে, "একদম পুড়ে ছাই। শুধু তাই? কোথা সেই এক কোশ—দু' কোশ তফাৎ, বাজারের দুটো দোকানে যেয়ে আগুন ধরিয়ে দিলে।"

যমুনা ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

ভলু এবার কাজের কথা পাড়লে। বললে, "তাই বলছিলম—তোর বিত্তান্তটা থানায় যেয়ে বল, সব বাছাধন ধরা পড়ে যাবে যমুনা। ধরা না পড়ে পড়ে অদের সব সাহস বেড়ে গেছে।"

কিন্তু ফল হলো উল্টো। যমুনা বললে, "এত কাণ্ডের পর মোকে থানায় যেতে বল?"

ভলু তার দুর্বল জায়গাটায় খোঁচা দিয়ে বলল, "ছোট মণ্ডল তোর উপরে কি অত্যাচারটা করেছে—একবার ভেবে দেখ।"

"থানায় আমি যাব নি চৌকিদার।" যমুনা ঘন ঘন মাথা নাড়তে নাড়তে বললে, "ধরো—অরাই যদি হয় তাহলে এই টঙটুকুও মোর যাবে। এ চরে অরা মোকে টিকতে দিবে নি।"

"কেন, মোরা আছি।" ভলু সাহস দিয়ে বলল।

কিন্তু যমুনার সহজ সোজা প্রশ্ন: "তোমরা আছ তো যাদব শীটের ঘর পুড়ল কি করে বল? সেই বাজারের দোকানেই বা আগুন লাগল কি করে?"

তার জবাব নেই। ভলু মাঝিও হঠাৎ সুবিধে মত কথা খুঁজে না পেয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলে মুখ-ফোঁড় মেয়েটার দিকে। আজ সে আর চটল না—বরং

নরম গলায় বলল, "ধরা ওরা পড়বেই—হেই থানা উঠে-পড়ে লেগেছে। তুই যেয়ে বললে কাজটা সহজ হতো।"

"থানায় আমি যাব নি চৌকিদার।"

থানা পুলিশকে যমুনার চিরদিনের ভয়। গাঁউলি-ছিঁচকে চুরি-চামারির ঢের বদনাম তার। কে জানে—তাকেই আটক করে দেবে কি-না। বলল, "সেই স্যানো চৌধুরীর কথা মোর খুব মনে আছে। জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে ঝগড়া করে বাঁচবো?"

হঠাৎ সানো চৌধুরীর কথায় ভলু আবার সিধে হয়ে বসল। প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে জিজ্ঞাসা করল, "সানো চৌধুরী? সানো চৌধুরী বলেছিল এ কথা? কবে?"

কথার মারপ্যাঁচ অতো কি জানে যমুনা? সরলভাবে বলে ফেললে, "বলেছিল সেই মোর ঘর পুড়ে যাওয়ার সময়। তারপর ঢের ভেবেছি। কথাটা ঠিক বলেছিল। জ্ঞানী লোক।"

ভলু মাঝি গুম্ হয়ে বসে রইল এবং মনে মনে এ চরের অনেক ঘটনা—অনেক মানুষ আর কথাকে বোধ করি নীরবে গেঁথে তুলতে লাগল। তারপর আস্তে আস্তে টেনে টেনে শেষ চেষ্টা করে বললে, "তুই একবার থানায় যেয়ে এসব বললে ভাল হত যমুনা।"

যমুনা আর সাড়াও দিল না—শব্দও দিল না, কাঠ মেরে বসে রইল।

অগত্যা ভলু গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। বলল, "রাত হল—আজ তবে যাই যমুনা।"

যমুনার টঙ থেকে বেরিয়ে সারা পথটা যেতে যেতে ভাবতে লাগল ভলু মাঝি—এই মেয়েটাকে যদি সে ভুলিয়ে-ভালিয়ে থানায় একবার হাজির করতে পারত! বড় দারোগার সামনে সব কথা একবার কবুল করাতে পারত!

তার বড় দুঃখ—বড় দারোগা তার কথায় আর বিশ্বাস করে না। বলে—ব্যাটা বড্ড ফড়-ফড় করে। সেই নুনের চোরাই কারখানা খুঁজে বার করতে গিয়ে সেপাই শান্ত্রী ঢের নাকাল হয়েছে—শেষকালে বেরুলো ইয়া লম্বা তেঁতুলে খরিস! মহেশ মণ্ডল আর মুকুন্দের মুখ থেকেও কিছুই কবুল করাতে পারে নি।

তবু তার দৃঢ় বিশ্বাস, যমুনার কাছ থেকে যতোটা কথা সে আজ বার করতে পেরেছে—তার গুরুত্ব কম নয়। গ্রাম্য, অশিক্ষিত কিন্তু চতুর ও ধূর্ত এই লোকটার কেবলই মনে হতে লাগল—এই আগুনে কাণ্ডকারখানার সমস্ত দলটাকে সে ধরে ফেলেছে।

কিন্তু বড় দারোগাকে সব কথা সে বিশ্বাস করাতে পারবে কি? তার কথা মতো বড় দারোগা আর কাজ করবে কি? নিজের নষ্ট মর্যাদা ফিরে পাওয়ার আশায় মনে মনে সে ছটফট করতে লাগল এবং দারুণ একটা অস্বস্তিতে কোনরকমে রাতটা পার করে পরের দিন ভোর ভোর গিয়ে হাজির হলো থানায়।

গিয়ে শুনল—বড় দারোগার নেতৃত্বে সেপাই-শান্ত্রীরা সেই ভোর রাত থেকে দুই দলে বেরিয়ে গেছে দুই দিকে। এক-দল গেছে যাদব শীটের গ্রামে আর একদল সেই বাজারের দিকে।

বড় দারোগা আর অপেক্ষা করে নি। অধীর—চঞ্চল—ক্ষিপ্ত। অযথা আর সময় নষ্ট না করে, অপদার্থ অকর্মণ্য চৌকিদার দফাদারদের ওপর ভরসা না রেখে দলবল সাজিয়ে বেরিয়ে গেছে স্বয়ং বাজারের দিকে। এইটাই সে এতদিন জেনে এসেছে—প্রতিবিধানটা গরম গরম হওয়া চাই, নইলে মানুষের মনে থাকে না।

আর সে পন্থা তার সিধে এবং ভোঁতা। দোষী-নির্দোষের বালাই নেই—বেটন এবং লাঠির মুখে সোজাসুজি সওয়াল। অগ্নি-কাণ্ডের আশপাশের গ্রামগুলোকে ঘেরাও করে নির্বিচার পীড়নের যেন একটা ঝড় বয়ে গেল। ভীত-সন্ত্রস্ত গাঁয়ের মানুষ অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগল। কাচ্চা-বাচ্চা মেয়ে-মরদের আর্তনাদে গ্রামদেশের সাড়া-শব্দহীন প্রশান্ত প্রভাত যেন শিউরে শিউরে উঠতে লাগল। ঘর-গেরস্থি, ধান-চাল, গ্রামের মানুষের সামান্য সম্বল—সব ফেলে ছড়িয়ে লণ্ডভণ্ড। যে পালাতে পারল—বাঁচল। যে যা খেল সে মাটিতে মুখ থুবড়ে যন্ত্রণায় গোঙাতে লাগল। যে ধরা পড়ল—তাকে থানায় টেনে এনে বেপরোয়া ধোলাই দিয়ে বড় দারোগা কর্তব্য শেষ করল।

এতবড় একটা সফল অভিযান এবং এ্যাকসনের পর বড় দারোগা পরিশ্রান্ত। ভুঁড়ির ওপর চওড়া বেল্টটা অনেকক্ষণ থেকে কষে বসে আছে—খোঁচা দিচ্ছে। ধপ্ করে নিজের চেয়ারে বসে পড়ে বেল্টটা আলগা করে দিলে। মাথার আগুন তখনো নেভে নি। দাঁতে দাঁত চেপে বললে, "বাপের জন্মে শালারা আর ভুলতে পারবে না।"

বারান্দার থামের আড়ালে ভলু মাঝি বসে বসে সব দেখল এবং ফোঁস করে একটা নিশ্বাস ফেলল। এ না-হক দিক-দারী। আসল লোকগুলোর গায়ে হাতও পড়ল না। কিন্তু এই মুখে বড় দারোগার সামনে যেতে তার সাহসও হলো না। বারান্দার এক কোণে আড়ালে বসে সে অপেক্ষা করতে লাগল।

এক সময়ে গোলমাল হৈ-চৈ থামলে ধীরে ধীরে সে গিয়ে হাজির হলো জমা-দার দীনদয়াল সিংয়ের দরবারে। বললে, "সেলাম সিংজী।"

সিংজী জিজ্ঞেস করল, "কেয়া খবর! কছু বলবি?"

কানপটি চুলকে ভলু বললে, "ই সব তো হলো—কিন্তু আসল আদমীদের গায়ে হাতও পড়ল না।"

"কেয়া!" সিংজী বড় বড় চোখ করে তাকাল।

"সাচা কথা বলছি সিংজী।"

"তো উও আসলি আদমি কাঁহা?"

"সেই চরে। ওই চরের চাষীদের মধ্যে—"

জমাদার দীনদয়াল দাবড়ে উঠল, "ফিন শালার সেই সাঁপ—সেই পিসাব—"

"মাইরি বলছি সিংজী—এই তোমার পা ছুঁয়ে—" ভলু ঝপ্ করে জমাদারের পায়ে হাত দিয়ে বললে, "মোর তিন দফা খবর আছে—সব শোনো।"

"তো যা—বড়বাবুকে বোল্।"

"আরি ব্বাপ! সে মোর সামনে যেতে ভয় লাগছে।" ভলু বললে, "আমি সব বলছি তোমাকে। তুমি গিয়ে কানে তোলো। বা যা ভাল হয় করো। সরকারের নিমক খাই—যা জেনেছি তা মোকে বলতে হবেই। তোমাকে আমি বলে যাচ্ছি।"

ওর জেদ দেখে দীনদয়াল বললে, "তো বোল্।"

ভলু বললে, "তোমার ওই এক লম্বর হলো সেই মহেশ মণ্ডল, দু'লম্বর সানো চৌধুরী আর তিন লম্বর একজন তাঁতী সাহির তাঁতী—হাবু মণ্ডলের মামু, তার নামটা জানতে পারি নি।"

"তাঁতীসাহির তাঁতী!" দীনদয়ালের চোখ যেন একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, "সেই যেখানে পয়লা লম্বর আগ্ জ্বলেছিল!"

"ঠিক। সেই তাঁতীসাহির তাঁতী। শালা এখানে এসে জুটেছে—ছিপিয়ে আছে।"

ভলু মাঝি একে একে সবিস্তারে সব কথা বলে গেল। মায় দিশী কাপড়ের তাঁত বসাবার উদ্যোগ আয়োজন—চরকা, সুতো কাটা।

দীনদয়াল জিজ্ঞেস করল, "এর পিছানে ভলান্টিয়ার কোন্ আছে?"

প্রথমটা থতমত খেয়ে গেল ভলু। কোনো ভলান্টিয়ারের নাম সে শোনে নি। তারপর বুদ্ধি খরচ করে সামলে নিয়ে বললে, "ভলান্টিয়ার আছে বৈকি—নিশ্চয়ই আছে। তবে মনে হয়—বড়বাবু তাদের দু'জনকে আগেই চালান দিয়ে দিয়েছে।"

"এখন?"

"চরসুদ্ধ সব্বাই ভলান্টিয়ার হয়ে গেছে।"

দীনদয়াল সিং তার কথা শুনে হাঁ করে চেয়ে রইল।

[ক্রমশ]

রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের আনুপূর্বিক ইতিহাস

সুনীল ঘোষ

ভারতবর্ষের স্বাধীনতালাভের বাইশ বছর পূর্তি উৎসবের পরদিন (১৬ই আগস্ট) অনুষ্ঠিত নির্বাচনে কংগ্রেস-প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ সিন্ডিকেট গোষ্ঠীর প্রার্থী শ্রীসঞ্জীব রেড্ডিকে পরাজিত করে নির্দল প্রার্থী ডঃ ভি ভি গিরি ভারতের চতুর্থ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন। ডঃ গিরির এই জয়লাভ নানা কারণে আধুনিক ভারতের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে এই প্রথম কংগ্রেস দলের পরাজয় তো ঘটলই, উপরন্তু এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভারতীয় রাজনীতিতে একাধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত বিশাল কংগ্রেস দলও ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল। দেশী-বিদেশী একচেটিয়া পুঁজিবাদের দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত প্রতিক্রিয়াশীল দক্ষিণপন্থীরা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের যে চক্রান্ত করেছিল, তাও আপাতত কিছুকালের জন্য প্রতিহত হল।

পৃথিবীতে কোন ঘটনাই আকস্মিকভাবে ঘটে না। আপাতদৃষ্টিতে আকস্মিক মনে হলেও, প্রত্যেক ঘটনারই একটি কার্য-কারণ সম্পর্ক এবং একটা ইতিহাস থাকে। ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে এই যুগান্তকারী পট-পরিবর্তনের ইতিহাসও সুদীর্ঘ।

কংগ্রেস দল কোনকালেই একটা সুসংবদ্ধ পার্টি ছিল না। কংগ্রেস ছিল সমস্ত মুক্তিকামী মানুষের সমাবেশকেন্দ্র। নানা মত এবং নানা পথের লোক কংগ্রেসকে প্ল্যাটফর্ম হিসাবে গ্রহণ করে তার মাধ্যমে মুক্তি-সংগ্রামে ব্রতী হয়েছিলেন। কালক্রমে কংগ্রেসী সদস্যরা মোটামুটি দুটি শিবিরে বিভক্ত হয়ে পড়েন। একদল চাইছিলেন আপোষের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা আনতে, আর অপর দল চাইছিলেন, সংগ্রামের মাধ্যমে দেশের স্বাধীনতা আদায় করতে। আপোষকামীদের নেতা ছিলেন বল্লভভাই প্যাটেল, ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রমুখ নেতারা। আর সংগ্রামকামীদের নেতা ছিলেন নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, জওহরলাল নেহরু এবং জয়প্রকাশ প্রমুখ নেতারা। গান্ধীজী ছিলেন দুই বিরোধী শিবিরের যোগসূত্র। আপোষকামী নেতারা, দেশে ইংরেজ শাসনের অবসান ঘটিয়ে গতানুগতিক রক্ষণশীল পন্থায় দেশ শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন। ইংরাজ শাসকদের জায়গায় ভারতীয় শাসক বসিয়ে দেওয়াই ছিল তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। তার বেশি আর কিছু নয়। অপর দিকে আপোষ-বিরোধী এবং সংগ্রামকামী নেতারা স্বাধীনতা সংগ্রামের মধ্য দিয়ে দেশে সমাজ-বিপ্লব ঘটিয়ে শ্রেণীহীন সমাজ গঠন করতে চেয়েছিলেন। দেশকে দ্রুত সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য তাঁরা সমাজতন্ত্রের পথে অগ্রসর হবার কথা চিন্তা করেছিলেন।

গান্ধীজী এই দুই পরস্পর-বিরোধী মতবাদ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হয়ে স্বাধীনতালাভের প্রাক্কালে কংগ্রেস দল ভেঙে দেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, সর্দার প্যাটেল আর পণ্ডিত নেহরুর নেতৃত্বে কংগ্রেস দল দুভাগে ভাগ হয়ে দুটো পৃথক দল গড়ে তুলুক। কিন্তু দুই শিবিরের নেতারাই তখন ক্ষমতালাভের জন্য এমন ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলেন যে, গান্ধীজীর পরামর্শে কর্ণপাত করেন নি। কারণ তাঁরা বুঝেছিলেন যে, ওভাবে ভাগ হলে একদলের পক্ষে আশু ক্ষমতা লাভ অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাই স্বাধীনতার পর কংগ্রেসের দুই পরস্পর-বিরোধী গোষ্ঠী যৌথভাবেই দেশ শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে বাহ্যিক ঐক্য বজায় থাকলেও ভিতরে ভিতরে আদর্শের সংঘাত চলছিল। নেহরুর অসাধারণ জনপ্রিয়তা ছিল কংগ্রেসের তথাকথিত ঐক্যের আধার। দক্ষিণপন্থীরা নিজেদের স্বার্থে নেহরুর নেতৃত্ব মেনে নিয়ে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার ফল আস্বাদনে মত্ত ছিলেন। নেহরুর প্রভাবাধীন কংগ্রেস দল সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গঠনে অঙ্গীকারবদ্ধ এবং সেই পথে এগোবার প্রথম ধাপ হিসাবে রাষ্ট্রের মালিকানা এবং তত্ত্বাবধানে এ-দেশে বেশ কয়েকটি শিল্প-বাণিজ্যও গড়ে উঠেছে, কিন্তু তারই পাশাপাশি এদেশের বৃহৎ বণিকশ্রেণী তিনটি পাঁচসালা পরিকল্পনার কল্যাণে প্রায় রাতারাতি বিরাট বিরাট শিল্প-বাণিজ্য সাম্রাজ্যের মালিক হয়ে একচেটিয়া কারবারের দিকে ঝুঁকেছে। নেহরু তাঁর জীবিতকালেই বণিক ও জোতদারশ্রেণীর অস্বাভাবিক সমৃদ্ধি লক্ষ্য করেছিলেন, কিন্তু কংগ্রেস দলের মধ্যে দক্ষিণপন্থী এবং বণিকশ্রেণীর অনুচররা এত শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল যে, নেহরু তাদের গায়ে হাত দিতে সাহস পাচ্ছিলেন না। ক্ষমতা-সচেতন দক্ষিণপন্থীরা যখন নেহরুর ক্ষমতা চ্যালেঞ্জ করার মতলব ভাঁজছে, ঠিক সেই সময় মাওয়ের চেলারা ভারত সীমান্ত আক্রমণ করে দক্ষিণপন্থীদের হাতে সেই সুযোগ তুলে দেয়। তৎকালীন প্রতিরক্ষামন্ত্রী কৃষ্ণমেননকে বরখাস্ত করার দাবির ওপর দক্ষিণপন্থীরা জোট বেঁধে নেহরুকে চ্যালেঞ্জ করে। চীন সীমান্তের যুদ্ধে নিদারুণ বিপর্যয়ের ফলে নেহরুর অবস্থা তখন খুব কাহিল। তিনি তখন দক্ষিণপন্থীদের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন। নেহরু বুঝতে পারেন যে, বৃহৎ বণিকশ্রেণীর অস্বাভাবিক সমৃদ্ধি কংগ্রেসের অভ্যন্তরে দক্ষিণপন্থীর শক্তি এত বাড়িয়ে দিয়েছে যে, সরাসরি লড়াইয়ে তাদের ঘায়েল করা যাবে না। তিনি তখন সুকৌশলে এগোবার পন্থা অবলম্বন করেন। বণিকশ্রেণীর ক্ষমতা-লোলুপতার প্রকৃত ঘটনা ফাঁস করবার জন্য তিনি ১৯৬৪ সালে মনোপলিজ কমিশন গঠন করেন।

নেহরুর পর দেশের শাসনভার দক্ষিণপন্থীদের হাতে তুলে দেবার জন্য

মোরারজী দেশাইকে পার্লামেন্টে কংগ্রেস দলের ডেপুটি লীডার করবার চেষ্টা করা হয়, কিন্তু নেহরু সেই চেষ্টা বানচাল করে দেন। তিনি বলেন যে, প্রধানমন্ত্রী মারা গেলে ডেপুটি লীডার সরাসরি প্রধানমন্ত্রী হয়ে যাবেন—এমন কোন নিয়ম নেই। তাতে মোরারজী এবং তাঁর পৃষ্ঠপোষকরা দস্তুরমত মুষড়ে পড়েন এবং ডেপুটি লীডার হবার চেষ্টা থেকে বিরত থাকেন।

এই ধাক্কা খাবার পর কয়েকজন দক্ষিণপন্থী নেতা অতুল্য ঘোষ, সঞ্জীব রেড্ডি, নিজলিংগাপ্পা, কামরাজ আর শ্রীনিবাস মাল্লাইয়া সকলের অজ্ঞাতসারে দক্ষিণ ভারতের তিরুপতি শহরে এক গোপন বৈঠকে সমবেত হয়ে নেহরুর মৃত্যুর পর ক্ষমতা দখলের এক চক্রান্ত করেন। এই গোষ্ঠীই সিন্ডিকেট নামে পরিচিত। সেখানে স্থির হয় যে, নেহরুর মৃত্যু আসন্ন। তাঁর মৃত্যুর পর প্রধানমন্ত্রীর পদ সমসাময়িক কংগ্রেস সভাপতির হাতে তুলে দেওয়া হবে। সুতরাং কাকে কংগ্রেস সভাপতি করা হবে, সেই প্রশ্নই তাঁদের প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। মোরারজী দেশাই অত্যন্ত একগুঁয়ে এবং স্বমতাবলম্বী বলে তাঁর নামটা প্রথমেই বাদ পড়ে যায়। তখন তাঁরা নরম, মধ্যপন্থী, অজাতশত্রু অথচ রক্ষণশীল লালবাহাদুর শাস্ত্রীকেই ঐ পদের জন্য বাছাই করে রাখেন। শাস্ত্রী রাজী না হলে কামরাজ।

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পথে কাঁটা দেওয়াটাই ছিল এই সিদ্ধান্তের প্রধান উদ্দেশ্য এবং সিন্ডিকেটের একজন সদস্য দেশাইয়ের কাছে গিয়ে সে কথা প্রকাশ করে বলেন, "আমরা মনে করি শ্রীমতী গান্ধীর পথে কাঁটা দেবার এটাই একমাত্র পথ।"

শেষ পর্যন্ত নেহরুর প্রস্তাব অনুযায়ী কামরাজ কংগ্রেসের সভাপতি হন। ইতিমধ্যে বোম্বাইয়ের পাতিল আর উড়িষ্যার বিজু পট্টনায়ক সিন্ডিকেটের দলে গিয়ে নাম লেখান। চীনা যুদ্ধের সময় যে-সমস্ত দক্ষিণপন্থী নেতা নেহরুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন, কামরাজ পরিকল্পনায় নেহরু তাঁদের সকলকেই ক্ষমতাচ্যুত করেন। তাঁরা সকলেই ক্রোধে এবং আক্রোশে ফুঁসতে থাকেন, কিন্তু নেহরুর বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সাহস পান না। নেহরুর মৃত্যুর আগে ভুবনেশ্বর কংগ্রেসে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

নেহরুর মৃত্যুর পর সিন্ডিকেটের পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কামরাজ শাস্ত্রীকে প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসাতে সক্ষম হন। শাস্ত্রী সমাজতন্ত্রে অবিশ্বাসী কয়েকজন আই-সি-এস অফিসারকে তাঁর পরামর্শদাতা নিয়োগ করে সিন্ডিকেটের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন এবং কামরাজও মন্ত্রীদের আবার মন্ত্রিসভায় ফিরিয়ে আনেন। দেশের অর্থনীতিকে পুরোপুরি দক্ষিণপন্থার দিকে ঠেলে দেবার জন্য কৃষ্ণমাচারীকে অর্থমন্ত্রণালয় থেকে সরিয়ে তাঁর জায়গায় ভারতের বৃহৎ বণিকশ্রেণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট শচীন চৌধুরীকে অর্থমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন নি বলে মোরারজী মন্ত্রিসভার বাইরেই অবস্থান করেন।

অল্পকাল প্রধানমন্ত্রিত্ব করবার পর তাসখন্দে শাস্ত্রীজীর অকালমৃত্যু ঘটে। মোরারজী আবার প্রধানমন্ত্রী হবার চেষ্টা করেন, কিন্তু সিন্ডিকেট তাঁকে ঐ পদ দিতে অনিচ্ছুক হওয়ায় শেষ পর্যন্ত সিন্ডিকেটের সমর্থনে ইন্দিরা গান্ধীই প্রধানমন্ত্রী হয়ে যান। সিন্ডিকেটের মতলব ছিল, ইন্দিরাকে সামনে রেখে তাঁরাই ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিচালনা করবেন। ইন্দিরা গান্ধী গোড়ায় সিন্ডিকেটের সঙ্গে আপোষ করেই চলছিলেন, কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব ক্রমেই সিন্ডিকেটের দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে উঠতে থাকে।

১৯৬৭ সালের নির্বাচনে জনগণ কংগ্রেস দলকে তো ঘায়েল করেই, উপরন্তু সিন্ডিকেটের বড় বড় নেতাদের (অতুল্য-কামরাজ-পাতিল-পট্টনায়ক) একেবারে ইতিহাসের আবর্জনাস্তূপে নিক্ষেপ করে। ভারতের আটটি রাজ্যে অ-কংগ্রেসী গভর্নমেন্ট গঠিত হয় এবং পার্লামেন্টেও কংগ্রেস দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সাংঘাতিক হ্রাস পায়।

মোরারজী আবার প্রধানমন্ত্রী হবার চেষ্টা করেন, কিন্তু দলীয় নির্বাচনে হেরে যাবার আশঙ্কায় শেষ পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধীর ডেপুটি হতে রাজী হয়ে যান। শ্রীমতী গান্ধী পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে দেশকে আবার প্রগতির পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতে থাকেন, কিন্তু দক্ষিণপন্থীরা পদে পদে বাধা সৃষ্টি করতে থাকে। মোরারজী অর্থমন্ত্রণালয়কে তাঁর স্বায়ত্তশাসিত সংস্থায় পরিণত করে বৃহৎ বণিকশ্রেণীর সমৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করতে থাকেন। সিন্ডিকেট নিজের অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখবার জন্য দীর্ঘকালের বিরূপতা ভুলে মোরারজীকে আঁকড়ে ধরেন। তাঁদের দ্বিতীয় অবলম্বন হয়ে দাঁড়ান প্রাক্তন সোস্যালিস্ট অশোক মেটা। ইন্দিরাকে কিভাবে গদিচ্যুত করা যায় সেটাই হয়ে দাঁড়ায় তাঁদের মূল লক্ষ্য।

সেই কাজে সহায়তার জন্য তাঁরা নিজলিঙ্গাপ্পাকে মহীশূরের মুখ্যমন্ত্রিত্ব থেকে সরিয়ে এনে কংগ্রেসের সভাপতি করেন।

ইতিমধ্যে পাতিল রটাতে আরম্ভ করেন যে, সমমতাবলম্বী দলগুলোর সঙ্গে একযোগে কেন্দ্রে কোয়ালিশন গঠন করার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে। সমমতাবলম্বী বলতে তিনি যে সমাজতন্ত্রের শত্রু স্বতন্ত্র পার্টি এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদী জনসঙ্ঘের কথাই বলছেন, সেটা বুঝতে কারও কষ্ট হয় নি। একই সঙ্গে পাতিল, নিজলিঙ্গাপ্পা প্রমুখ সিন্ডিকেটের নায়করা রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের কুৎসা ও বে-সরকারী শিল্প-বাণিজ্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন। কোম্পানির তহবিল থেকে রাজনৈতিক দলগুলোকে চাঁদা দেওয়া বন্ধ করবার জন্য পার্লামেন্টে যে বিল আসে, সিন্ডিকেটের নেতৃত্বে কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থীরা তার বিরোধিতা করতে থাকেন। ভারতের বৃহৎ বণিকরা সিন্ডিকেটের পেছনে থাকায় দেশের অধিকাংশ সংবাদপত্র ইন্দিরা উচ্ছেদ চক্রান্তে সিন্ডিকেটকে মদৎ যোগায়। সিন্ডিকেট মাথা গুনতি করে দেখতে পায়, কংগ্রেসে তাদের অনুগত সদস্যরা দল থেকে বেরিয়ে এসে স্বতন্ত্র এবং জনসঙ্ঘের সঙ্গে একযোগে কোয়ালিশন করলেও গভর্নমেন্ট গঠনের মত সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। তাই তাঁরা সময় এবং সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকেন। চেকোশ্লোভাক সঙ্কটের সময় হঠাৎ সেই সুযোগের আবির্ভাব ঘটে। চেকোশ্লোভাকিয়ার ব্যাপার নিয়ে সোভিয়েটের সঙ্গে ঝগড়া বাধাবার জন্য দক্ষিণপন্থীরা ইন্দিরার ওপর দারুণ চাপ সৃষ্টি করতে থাকেন। তাঁরা ঠিক করেছিলেন, ঐ প্রশ্নে মন্ত্রিসভা থেকে তাঁদের অনুগত সদস্যদের পদত্যাগ করিয়ে একটা সঙ্কট সৃষ্টি করবেন। তখন ইন্দিরা গভর্নমেন্ট পদত্যাগ করতে বাধ্য হবেন। তদনুযায়ী অশোক মেটা মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন, কিন্তু অন্য কোন মন্ত্রী পদত্যাগের ঝুঁকি নিতে সাহস পান না। সঙ্কট সৃষ্টির চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টির কার্যকরী সমিতির একদল সদস্য রটাতে শুরু করেন যে, পার্লামেন্টারী পার্টিতে ইন্দিরা আর সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থাভাজন নন। কাজেই তাঁর পদত্যাগ করা উচিত। ইন্দিরা তাঁদের কথায় কর্ণপাত করেন না বটে, তবে বেশ বুঝতে পারেন যে, তাঁকে হঠাবার চক্রান্ত হচ্ছে।

রাষ্ট্রপতি ডঃ জাকির হোসেনের মৃত্যুতে সিন্ডিকেটের নেতৃত্বে দক্ষিণপন্থীরা ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে চূড়ান্ত শক্তিপরীক্ষার সুযোগ পেয়ে যায়। আমাদের সংবিধান রচয়িতারা রাষ্ট্রপতি ও গভর্নরের পদগুলোকে আনুষ্ঠানিক পদ হিসাবে গণ্য করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা স্থির করেছিলেন, কাগজে-কলমে রাষ্ট্রপতি এবং গভর্নরের যত ক্ষমতাই থাক, সেই ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীদের পরামর্শ ছাড়া প্রয়োগ করা হবে না। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা প্রয়োগের প্রধান কর্তা হবেন নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীরা। কিন্তু কয়েকটি রাজ্যে অকংগ্রেসী সরকার উচ্ছেদের জন্য হঠাৎ গভর্নরদের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী করে সংবিধানের গঙ্গাযাত্রার পথ প্রশস্ত করা হয় এবং দক্ষিণপন্থীরা প্রচার করতে শুরু করেন যে, রাষ্ট্রপতিও সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। তিনি ইচ্ছে করলে যখন-তখন মন্ত্রিসভা ভেঙে যা খুশি করতে পারেন। সিন্ডিকেট তখন মতলব আঁটেন যে, রাষ্ট্রপতি পদে নিজেদের লোক বসিয়ে তাঁরা ইন্দিরাকে 'টাইট' দেবেন। তদনুযায়ী তাঁরা সিন্ডিকেটের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সঞ্জীব রেড্ডিকে ঐ পদের জন্য মনোনীত করেন। কিন্তু কংগ্রেস পার্লামেন্টারী বোর্ডে চ্যবন এবং মোরারজীর সমর্থন না পেলে রেড্ডির অনুকূলে মনোনয়ন আদায় করা সম্ভব নয়। তাই তাঁরা নাকি প্রস্তাব করেন যে, ইন্দিরাকে হটিয়ে সেই জায়গায় প্রধানমন্ত্রী করা হবে মোরারজীকে এবং ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী চ্যবনকে। তবে ১৯৭২ সালের নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রী হবেন চ্যবন।

ইন্দিরা গান্ধী গোপন সূত্রে এই সংবাদ আগেই জানতে পেরেছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে, এবার রুখে না দাঁড়ালে তিনি নিজেও বাঁচবেন না এবং কংগ্রেসের সমাজতান্ত্রিক পন্থারও সমাধি রচিত হবে। তাই তিনিও চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হলেন।

জাপান এবং ইন্দোনেশিয়া সফর সেরে দিল্লীতে পৌঁছেই প্রধানমন্ত্রী তাঁর কর্তব্য স্থির করে ফেলেন। ৯ই জুলাই বাঙ্গালোরের এ-আই-সি-সি অধিবেশনে ইন্দিরা গান্ধী তাঁর বৈপ্লবিক অর্থনৈতিক সংস্কারের প্রস্তাব পাঠিয়ে দিলেন। তাতে ব্যাঙ্ক এবং আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্য রাষ্ট্রায়ত্তকরণের ওপর জোর দেওয়া হয়। প্রস্তাব দেখেই পাতিল-মোরারজী এবং তাঁদের সাঙ্গোপাঙ্গরা তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলেন। কিন্তু চ্যবন আর কামরাজ নিজেদের প্রগতিশীল 'ইমেজ' নষ্ট করতে রাজী হলেন না। তাঁদের মধ্যস্থতায় স্থির হল যে, ইন্দিরার প্রস্তাব প্রয়োগের ভার প্রধানমন্ত্রীর ওপরই অর্পণ করা হবে এবং শেষ পর্যন্ত তা-ই করা হল।

কিন্তু এত বড় আঘাতের জন্য সিন্ডিকেট এবং দক্ষিণপন্থীরা তৈরি ছিলেন না। প্রথম রাউন্ডে পরাজিত হয়ে তাঁরা দ্বিতীয় রাউন্ডে ইন্দিরাকে ঘায়েল করার মতলব আঁটলেন। ১২ই জুলাই কংগ্রেস পার্লামেন্টারি বোর্ডের বৈঠকে শ্রীমতী গান্ধীর আপত্তি সত্ত্বেও ৪-২ ভোটে সঞ্জীব রেড্ডিকে রাষ্ট্রপতি পদের জন্য মনোনয়ন দিয়ে দিলেন। মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে তাড়াহুড়ো করে এই মনোনয়নপর্ব সমাধা হয়ে গেল এ[illegible] দেখা গেল যে, চ্যবন আর মোরারজী সঞ্জীব রেড্ডিকেই সমর্থন করেছেন। পাল্টা আঘাত আসবে তা ইন্দিরা জানতেন, কিন্তু চ্যবন আর মোরারজীর ভূমিকায় তিনি অবাক হয়ে গেলেন। কারণ এই ঘটনার কিছুক্ষণ আগে মোরারজীর সঙ্গে বিষয়টা নিয়ে তাঁর আলোচনা হয়েছিল। ইন্দিরা রাষ্ট্রপতি পদের জন্য একজন হরিজন-প্রার্থী মনোনয়নের প্রস্তাব করেছিলেন এবং তাতে মোরারজী সম্মতি জানিয়েছিলেন। অথচ ইন্দিরা যখন বোর্ডের সভায় জগজীবন রামের নাম প্রস্তাব করেন, তখন মোরারজী সরাসরি তাঁর বিরোধিতা করে বসলেন। সুতরাং যে চক্রান্তের কথা এতকাল কানাঘুষোয় শোনা যাচ্ছিল, সেটা এক মুহূর্তেই প্রকাশ হয়ে পড়ল।

রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে মিলমিশ না থাকলে দেশের শাসনকার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থীর মনোনয়নের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এমন একজনকে মনোনয়ন দেওয়া হল, যাঁকে প্রধানমন্ত্রী একদম পছন্দ করেন না। সেইদিনই ইন্দিরা ঘোষণা করলেন, এই সিদ্ধান্তের পরিণাম নেতারা টের পাবেন।

পরদিনই (১৩ই জুলাই) অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ডঃ ভি ভি গিরি ঘোষণা করলেন যে, তিনিও রাষ্ট্রপতি পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। গিরির নামটা অবশ্য কংগ্রেস দলে আগেই বিবেচিত হয়েছিল, কারণ তিনি কংগ্রেস দলের প্রার্থী হিসাবেই ভাইস-প্রেসিডেন্ট

কিস্তিতে ট্রানজিস্টার
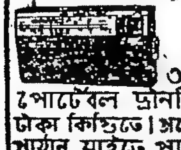
HAVA
৩ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড
পোর্টেবল ট্রানজিস্টর মাসিক ৫ টাকা কিস্তিতে। প্রত্যেক গ্রাম ও শহরে পার্সেল যাইতে পারে।
HAVA SALES (34) SHAKTI NAGAR, DELHI-7

হয়েছিলেন। কিন্তু গিরি ট্রেড ইউনিয়ন নেতা হিসাবেই সমধিক পারিচত এবং তিনি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। সেটা সিন্ডিকেট বরদাস্ত করতে রাজী ছিলেন না। গিরি বুড়ো হয়ে গেছেন এবং দল ও রাজনীতির সঙ্গে দীর্ঘকাল তাঁর কোন সম্পর্ক নেই—এইসব অজুহাত দিয়ে গিরির নাম তাঁরা বাতিল করে দেন। তাঁরা বলতে আরম্ভ করেন যে, ১৯৭২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নাও পেতে পারে। তখন কেন্দ্রে মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতিকে অনেক গুরুতর রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সুতরাং রাষ্ট্রপতি পদে দলের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত মার্কামারা লোক ছাড়া আর কাউকে দাঁড় করানো ঠিক হবে না। শ্রীমতী গান্ধী বলেছিলেন, সকল দলের সঙ্গে মোটামুটি পরামর্শ করে একজন প্রার্থী মনোনয়ন করাই ভাল। তাঁর সে সৎ পরামর্শে কান দেবার কোন প্রয়োজন সিন্ডিকেট বোধ করেন নি। চ্যবন আর মোরারজীকে দলে পেয়ে সিন্ডিকেট ইন্দিরার সঙ্গে পাঞ্জা কষাকষিতে আর বিলম্ব করতে রাজী ছিল না।

গিরি রাষ্ট্রপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বদ্ধপরিকর বলে ঘোষণা করার সঙ্গে সঙ্গে সিন্ডিকেট রটাতে আরম্ভ করল যে, তিনি ইন্দিরার প্রার্থী। পশ্চিমবঙ্গের প্রতাপ চন্দ্র (অতুল্য ঘোষ গোষ্ঠীর নব্য নেতা) বললেন, গিরি ডিফেক্টর।

১৬ই জুলাই শ্রীমতী গান্ধী মোরারজীকে অর্থমন্ত্রণালয়ের মন্ত্রিত্ব থেকে বরখাস্ত করেন, কিন্তু তার সহকারী প্রধানমন্ত্রিত্বের পদটি অটুট থাকে। মোরারজী রাগ করে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দেন। সঙ্গে সঙ্গে সিন্ডিকেট মহলে গেল গেল রব ওঠে এবং তাঁরা বলতে আরম্ভ করেন যে, প্রধানমন্ত্রী প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্য মোরারজীকে বরখাস্ত করেছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, কংগ্রেসে গৃহীত অর্থনৈতিক সংস্কারের নীতি প্রয়োগ করতে হলে, অর্থমন্ত্রণালয়ের ভার তাঁর হাতে থাকা দরকার। সেই কারণেই তিনি ঐ মন্ত্রণালয়ের ভার নিজের হাতে গ্রহণ করেছেন।

১৮ই জুলাই ইন্দিরা গান্ধী ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ অর্ডিন্যান্স জারী করে আধুনিক ভারতে এক নতুন ইতিহাস রচনা করেন। সিন্ডিকেটের সদস্যরা ক্রোধে ক্ষোভে দিশাহারা হয়ে ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে সরবে কুৎসা রটাতে সুরু করে দেন। এ ব্যাপারে তাঁদের মদৎ যোগায় স্বতন্ত্র এবং জনসঙ্ঘ। তাঁদের মধ্যে একদল বলতে থাকেন যে, ইন্দিরা গান্ধী কম্যুনিস্ট, অপর দল বলতে থাকেন, ইন্দিরা হযু হিটলার। পাতিল, সুচেতা কৃপালনী এবং তারকেশ্বরী সিংহ প্রকাশ্যেই ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের বিরোধিতায় পঞ্চমুখ হয়ে ওঠেন এবং তাঁরা দাবি করতে থাকেন যে, মোরারজীকে আবার অর্থমন্ত্রণালয়ে ফিরিয়ে নিতে হবে। তার জবাবে ৫ই আগস্ট ইন্দিরা গান্ধী ঘোষণা করলেন যে, সমালোচকদের সঙ্গে চূড়ান্ত লড়াইয়ের জন্য তিনি প্রস্তুত হয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি জনগণকে বৃহত্তর সংগ্রামের জন্য তৈরি হবার আহ্বান জানালেন। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের সিদ্ধান্তে জনগণের মধ্যে অভূতপূর্ব উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হওয়ায় সিন্ডিকেটপন্থীরা দমে গেলেন, কিন্তু হাল ছাড়লেন না। তাঁরা সমাজতন্ত্রের শত্রু স্বতন্ত্র এবং জনসঙ্ঘ দলের সঙ্গে গোপনে গোপনে এক চক্রান্তে লিপ্ত হলেন। ৩০শে জুলাই 'লন্ডন টাইমস' পত্রিকায় সেই চাঞ্চল্যকর ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস হয়ে গেল। তাতে দেখা গেল, ইন্দিরা গভর্নমেন্টকে উচ্ছেদ করে স্বতন্ত্র এবং জনসঙ্ঘের পছন্দসই গভর্নমেন্ট গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজলিঙ্গাপ্পা সঞ্জীব রেড্ডির জন্য ঐ দুই দলের ভোট সংগ্রহ করেছেন। শোনা যাচ্ছে নিজলিঙ্গাপ্পারণ কথোপকথন নাকি টেপ রেকর্ডে ধরা আছে। এই ষড়যন্ত্রের কাহিনী যখন দেশের পথে-ঘাটে আলোচিত হতে লাগল তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জগজীবন রাম আর ফকরুদ্দীন আলি আমেদ নিজলিঙ্গাপ্পাকে লিখে পাঠালেন যে, সিন্ডিকেট গোষ্ঠী যখন কারও সঙ্গে পরামর্শ না করে জনসঙ্ঘ এবং স্বতন্ত্র পার্টির সঙ্গে গোপন আঁতাত করেছেন, তখন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তথাকথিত কংগ্রেসপ্রার্থীকে ভোট দেবার বাধ্যবাধকতা আর তাঁদের নেই। তাঁরা নিজেদের বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী ভোট দেবেন। সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের এক বিরাট অংশ বিবেকবুদ্ধি অনুযায়ী ভোট দেবার দাবি জানালেন। অর্জুন অরোরা প্রকাশ্যে ঘোষণা করলেন যে, তিনি গিরিকে ভোট দেবেন। দুদিন বাদে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাও সেকথা জানিয়ে দিলেন নিজলিঙ্গাপ্পাকে। তার পরই গিরির অনুকূলে কংগ্রেস দলে ধস নামল। শাস্তির হুমকী উপেক্ষা করে কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীরা গিরির পক্ষে ভোট দেবেন বলে প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে লাগলেন।

ঐতিহাসিক নির্বাচনের তারিখ ১৬ই আগস্ট এগিয়ে এল। গিরি ৪২০,০৭৭ ভোট পেয়ে ভারতের চতুর্থ রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলেন। রেড্ডি পেলেন ৪০৫,৪২৭ ভোট। এই প্রথম একজন কংগ্রেসপ্রার্থী (সিন্ডিকেটপ্রার্থী বললেও চলে) রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে পরাজিত হলেন। ১৭টি রাজ্যের মধ্যে ১১টি রাজ্য গিরির পক্ষে রায় দিলেন। দেখা গেল ভারতের উত্তর, পূর্ব এবং দক্ষিণাঞ্চল (একমাত্র আসাম বাদ) গিরিকে সমর্থন করেছেন। আর রেড্ডিকে সমর্থন করেছেন প্রধানত পশ্চিম ভারত (গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং মধ্যভারতের কিছু অংশ)। গিরি রাজ্য এবং পার্লামেন্ট উভয় কেন্দ্রেই রেড্ডির চেয়ে অনেক বেশি ভোট পান। কিন্তু তিনি পঞ্চাশ শতাংশের বেশি ভোট পান নি বলে দ্বিতীয় গণনার প্রয়োজন হয়। সেই গণনায় তিনি ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পেয়ে যান। কংগ্রেসের প্রতিক্রিয়াশীল সিন্ডিকেট গোষ্ঠী চূড়ান্ত লড়াইয়ে শোচনীয় পরাজয় বরণ করে হতমান হয়ে পড়েন, কিন্তু এখনও তাঁরা হাল ছাড়েন নি। ইন্দিরাকে জব্দ করবার জন্য তাঁরা নানা মতলব ভাঁজছেন। কিন্তু ইতিহাসের ধারা যে পথে এগোচ্ছে, তাতে সিন্ডিকেটের ভরাডুবি আসন্ন বলেই মনে হয়। প্রধানমন্ত্রিত্বলাভের আশ্বাস পেয়ে চ্যবন সিন্ডিকেটের দলে ভিড়েছিলেন, কিন্তু এখন তিনি নিজের বিপদ বুঝে মিটমাটের পথ খুঁজছেন। কংগ্রেস দলে সুবিধাবাদীর প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ থাকায় মিটমাটের পথ খুঁজে নেওয়া খুব কঠিন হবে না। তবে সেই মিটমাটে সিন্ডিকেট সদস্যদের মাথা হেঁট করেই থাকতে হবে। আর ইন্দিরা গান্ধী তাঁর কয়েকটি কাজের দ্বারা জনগণের মধ্যে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছেন, পরবর্তী ব্যবস্থার দ্বারা সেই ধারা বজায় রাখতে না পারলে, তাঁর নিজের নেতৃত্বও বিপন্ন হবে। এক ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের তরঙ্গে তিনি প্রায় রাতারাতি স্বর্গীয় জওহরলাল নেহরুর মত জনপ্রিয় জাতীয় জননায়ক হয়ে উঠেছেন। সেই ভূমিকা বজায় রাখতে হলে দেশকে সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার পথ তাঁকে প্রশস্ত করতে হবে। নচেৎ এই যুগান্তকারী বিরোধ ব্যক্তিত্বের বিরোধ হিসাবেই ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকবে।

যাদুর খেলা
রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের প্রার্থী বাছাই
কংগ্রেস বাঁচাও
পার্টি হুইপ
জনসংঘ
স্বতন্ত্র দল
রেড্ডিকে ভোট দিন
নির্বাচনী ফল
ভোট গণনার দিন দিল্লীতে ভূমিকম্প
—সংবাদ
সিন্ডিকেট

পাঠ্যসূচীবহির্ভূত শিক্ষা

প্রিয়দর্শন সেনশর্মা

বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই শিক্ষাবিদরা অনুভব করছিলেন যে, কেবলমাত্র পাঠ্যশিক্ষাসূচী পড়িয়েই একটি ছাত্রের ব্যক্তিত্বকে পূর্ণাঙ্গ বিকশিত করা সম্ভব নয়। একটি ছাত্রকে দায়িত্বশীল নাগরিক করে গড়ে তুলতে পাঠ্যসূচী বহির্ভূত অনেক শিক্ষারই প্রয়োজন। কৈশোর-যৌবনের যুগসন্ধিক্ষণে সামরিক শিক্ষা ছাত্রদের চরিত্রগঠনে যে কতটা আবশ্যক তাও তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন।

পরাধীন ভারতবর্ষে ভারতীয় শিক্ষাবিদদের পক্ষে সম্ভব হয় নি তখনকার ভারতীয় ছাত্রদের সামরিক শিক্ষাদানের জন্য বিশেষ কোন বন্দোবস্ত করা। অবশ্য তাঁদের আগ্রহে খুব অল্পসংখ্যক ভারতীয় ছাত্রকে অতি নিম্নমানের সামরিক শিক্ষা দেবার জন্য 'ইউনিভার্সিটি অফিসার্স ট্রেনিং কোর' (ইউ, ও টি, সি,) খোলা হয়েছিল। কিন্তু বৃটিশ সরকারের অনুরক্ত ও বিশ্বাসভাজন পরিবারের ছেলে না হলে ঐ ট্রেনিং কোরে ঢোকা সম্ভব হত না।

দেশ স্বাধীন হবার পর পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরুর নেতৃত্বে ও জওহরলাল নেহরুর পৃষ্ঠপোষকতায় 'জাতীয় সমর শিক্ষার্থী বাহিনী' বা 'ন্যাশন্যাল ক্যাডেট কোর' (এন-সি-সি) সৃষ্টি করে অবস্থার অনেক পরিবর্তন করা হয়। ১৯৪৮ খৃস্টাব্দে এন-সি-সি দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে একটি বহু-বাঞ্ছিত নতুন শিক্ষার পথ খুলে দিল।

অথচ এই শিক্ষাধারাটিকে নিয়ে দেশময়, বিশেষ করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাভুক্ত কলেজগুলোতে কি প্রহসনই না চলছে।

শুরু থেকেই এন-সি-সি বাঙালী ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিশেষ উদ্দীপনার সঞ্চার করে। তারা দলে দলে এগিয়ে এল এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে। ভারতীয় সামরিক বাহিনীতে কোন বাঙালী পল্টন নেই, সেইজন্যই হয়ত বাঙালী ছেলেরা তাদের সামরিক কুশলতা প্রমাণ করার আগ্রহে শক্ত হাতে আঁকড়ে ধরেছিল এন-সি-সি'কে। বিভিন্ন জাতীয় শুটিং প্রতিযোগিতায় বাঙালী ছাত্ররা পেতে লাগল বহুবিধ পুরস্কার। ১৯৫৪ খৃস্টাব্দে প্রজাতন্ত্রদিবস উপলক্ষে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় এন-সি-সি ক্যাম্পে বাংলার শিক্ষার্থীরা সামগ্রিকভাবে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হল এবং তাদের নেতা ক্যাডেট-কোম্পানী-সার্জেন্ট মেজর বিধুভূষণ ভট্টাচার্য গ্রহণ করলেন তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর হাত থেকে শ্রেষ্ঠত্বের ব্যানার বা পতাকা।

আশ্চর্যের বিষয় একদল শিক্ষাবিদ কিন্তু ছাত্রদরদের আধিক্যে এবং একশ্রেণীর রাজনীতিক তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য গোড়া থেকেই এন-সি-সির বিরুদ্ধে ছিলেন। অবশ্য তাঁরা বাংলার জাগ্রত ছাত্রশক্তিকে সেদিন নিবৃত্ত করতে পারেন নি।

কিছুদিনের মধ্যেই এন-সি-সির ছাত্র-ছাত্রীদের চলনে-বলনে প্রকট হয়ে ফুটে উঠতে লাগল দৃঢ় আত্মবিশ্বাস, গভীর কর্তব্যবোধ এবং কঠিন শৃঙ্খলাজ্ঞান। শিক্ষায়তনের পরিচালকরা এন-সি-সি সম্বন্ধে উৎসাহিত হয়ে উঠলেন এবং চাইতে লাগলেন আরও বেশি সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী এন-সি-সির শিক্ষার্থী হোক। এন-সি-সির নিয়ম অনুসারে শিক্ষায়তনগুলির প্রধানদেরও এন-সি-সি সম্বন্ধে কিছু দায়িত্ব নিতে হয়। দেখা গেল আগ্রহ থাকলেও কিন্তু উৎসাহী পরিচালকদের মধ্যেও খুব অল্প সংখ্যক ব্যক্তিই বাস্তবক্ষেত্রে এগিয়ে এলেন দায়িত্ব নিয়ে এন-সি-সিকে সার্থক রূপ নিতে সাহায্য করতে। মৌখিক বা লিখিত প্রশংসা, উৎসাহ ও আশীর্বাণী পাঠিয়েই তাঁরা তাঁদের কর্তব্য সমাধা করলেন।

এন-সি-সি সম্পর্কে শিক্ষায়তনের পরিচালকদের মধ্যে আরেকবার উৎসাহের জোয়ার এল ১৯৬২ খৃস্টাব্দে চীন-ভারত সংঘর্ষের সময়। তখন আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডের মিটিং-এ ভারতের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা স্থির করলেন যে পরবর্তী শিক্ষা-বছর (অর্থাৎ ১৯৬৩ খৃস্টাব্দের জুন মাস) থেকে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলির সমস্ত সুস্থদেহী ভারতীয় পুরুষ ছাত্রদের জন্য এন-সি-সির শিক্ষা বাধ্যতামূলক হবে। যে সব ছাত্রদরদী (?) শিক্ষাবিদরা কোনকালেই এন-সি-সি'কে সুনজরে দেখতে পারেন নি তাঁরাও কিন্তু তখন নীরব রইলেন—খুব সম্ভব সে সময় আপামর জনসাধারণের মধ্যে স্বাদেশিকতাবোধ যে পর্যায়ে উঠেছিল তাই দেখে বাধ্যতামূলক এন-সি-সি শিক্ষার বিরুদ্ধাচরণ করতে তাঁরা ভীত হয়ে পড়েছিলেন। রাজনৈতিক দলগুলিও চুপ করেছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ইউরোপ, আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার প্রায় সব দেশেই যুবকদের (ছাত্র এবং অছাত্র নির্বিশেষে) জন্য সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক।

এন-সি-সি'র শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত নিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ, কিন্তু তাকে বাস্তবে রূপায়িত করার দায়িত্ব ন্যস্ত হল এন-সি-সি'র ডিরেক্টার জেনারেলের উপর। তখন এন-সি-সি'র ডিরেক্টার জেনারেল মেজর জেনারেল বীরেন্দ্র সিংহ এবং পশ্চিমবাংলার এন-সি-সি'র ডিরেক্টার ছিলেন ব্রিগেডিয়ার জ্ঞানেন্দ্র সরকার। এঁরা অফুরন্ত কর্মশক্তি ও তীক্ষ্ম বাস্তববুদ্ধি নিয়ে এগিয়ে এলেন বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার বিরাট কর্মসূচী বাস্তবে রূপায়িত করতে। ১৯৬২ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাস থেকে ১৯৬৩ খৃস্টাব্দের মে মাস পর্যন্ত অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাঁরা মোটামুটিভাবে তৈরি হলেন।

বাধ্যতামূলক এন-সি-সি শিক্ষাসূচীর বাস্তব রূপায়ণ যে কত কঠিন তা সহজে বোঝার জন্য কয়েকটি পরিসংখ্যান এখানে দেওয়া হল ঃ—

১৯৬২ সালে পশ্চিমবঙ্গে এন-সি-সি ব্যাটালিয়নের সংখ্যা ছিল ১৬টি (তার মধ্যে কোনটি চার কোম্পানীর, কোনটি বা তিন কোম্পানীর, কোনটি বা দুই কোম্পানীর), ১৯৬৩ সালে সেই ব্যাটালিয়নের সংখ্যা দাঁড়াল প্রায় ৮০টিতে এবং ব্যাটালিয়নগুলির ক্যাডেটের সংখ্যা হল ১৬০০ থেকে ২৪০০; পশ্চিম বাংলার কলেজগুলোতে ১৯৬২ খৃস্টাব্দে মোট ক্যাডেটের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩০,০০০, কিন্তু ১৯৬৩ খৃস্টাব্দে সেই ক্যাডেটের সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় এক লক্ষ দশ হাজারে। এই এক লক্ষ দশ হাজার ছাত্রও কলেজে ভর্তি হওয়ার সংগে সংগেই এন-সি-সি'র ক্যাডেট হয়ে গেল, কিন্তু এন-সি-সি'র অধিকর্তাকে এদের দিতে হয়েছিল য়ুনিফর্ম, রাইফেল এবং সামরিক শিক্ষার

অন্যান্য সরঞ্জাম, এদের জন্য খুঁজে পেতে হয়েছিল প্যারেড গ্রাউণ্ড এবং ইনস্ট্রাক্টর।

কোন শিক্ষা বাধ্যতামূলক হলেই একদল শিক্ষার্থীর মধ্যে ঐ শিক্ষার বিরুদ্ধে একটা মনোভাব গড়ে ওঠে। এন-সি-সি'র শিক্ষার বেলাতেও তার ব্যতিক্রম না হওয়াটাই স্বাভাবিক, তবু কিন্তু ১৯৬৩ খৃস্টাব্দে প্রায় ৯০-৯৫% শিক্ষার্থী রোজ প্যারেডে আসত।

উৎসাহের আতিশয্যে ১৯৬২ খৃস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা এন-সি-সি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার সিদ্ধান্ত নিলেও কিন্তু পরবর্তী ঘটনাগুলি থেকে মনে হয় যে, তাঁরা কোন দিনই ভেবে দেখেন নি যে তাঁদের বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজগুলির সব ছাত্রের পক্ষে বাস্তব পরিস্থিতিতে ঐ শিক্ষাগ্রহণ করা সম্ভব কিনা, অর্থাৎ আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও কোন দিকে কোন ক্ষতি না করে সকল ছাত্রের এন-সি-সি'র প্যারেড করা সম্ভব কিনা। ফলে ১৯৬৩ খৃস্টাব্দে যখন বাধ্যতামূলক এন-সি-সি শিক্ষা আরম্ভ হোল তখন ছাত্রদের সম্মুখীন হতে হোল বহুবিধ বাস্তব সমস্যার। এ সব ঘটনা শিক্ষাবিদদের দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় নিশ্চয়ই বহন করে না। পরন্তু কেউ যদি বলেন যে এ দেশের পরিণত শিক্ষাবিদরা যতটা উচ্ছ্বাসপ্রবণ ততটা কর্তব্য সচেতন নন, তাহলে কি তাঁকে অর্বাচীন বলা চলবে?

যাই হোক, যে সব ছাত্রদরদী (?) শিক্ষাবিদরা ১৯৬২ সালে চুপ করে ছিলেন ১৯৬৩ সালে বাধ্যতামূলক এন-সি-সি শিক্ষার জন্য ছাত্ররা বাস্তব সমস্যার মুখোমুখি হতেই সুযোগ বুঝে তাঁরা সোচ্চার হয়ে উঠলেন এবং রোগের ভয়াবহতা দেখে রোগীকে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়ে সক্রিয় হলেন। ১৯৬৩ খৃস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে (অর্থাৎ বাধ্যতামূলক এন-সি-সি শিক্ষা ছয় মাস চলতে না চলতেই) কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ম করে দিলেন যে, যদিও এন-সি-সি শিক্ষা বাধ্যতামূলকই থাকবে তবুও বারোটি বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্ররা ঐ শিক্ষা থেকে রেহাই পেতে পারেন। ঐ বারোটি শ্রেণী এমনই যে প্রায় প্রতিটি ছাত্রই তার কোন না কোন শ্রেণীভুক্ত, অর্থাৎ তারা ইচ্ছা করলেই এন-সি-সি ছেড়ে দিতে পারে। অনুমান করলে নিশ্চয়ই অন্যায় হবে না যে, যে-সব ছাত্রদরদী (?) শিক্ষক ঐ বারোটি বিশেষ শ্রেণী খুঁজে বের করেছিলেন তাঁরা এই সহজ সত্যটি আগেও জানতেন। শিক্ষাবিদদের এই আচরণকে শিক্ষাজগতের দুর্নীতি বলে যদি কেউ বিবেচনা করেন তাহলে কি অন্যায় হবে?

এসব সত্ত্বেও ১৯৬৪ সালে প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় এন-সি-সি ক্যাম্পে প্রতিযোগিতায় বাংলার ছেলেরা শ্রেষ্ঠতা দেখিয়ে পুনরায় শ্রেষ্ঠত্বের ব্যানার নিয়ে এল। সে বছর তাদের অধিনায়ক ছিল ক্যাডেট-আণ্ডার-অফিসার রত্নাঙ্কুর ঘোষ।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্নীতির আরো প্রমাণ আছে। বাধ্যতামূলক এন-সি-সি শিক্ষা সম্বন্ধে যদি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সত্যই আগ্রহী হতেন তাহলে ১৯৬৪ খৃস্টাব্দে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পরীক্ষার সময় এল তখন নিশ্চয়ই যে সব ছাত্র বিনা অনুমতিতেই এন-সি-সি শিক্ষা গ্রহণ করে নি তাদের পরীক্ষায় বসার অযোগ্য বলে বিবেচনা করতেন (যেমন করেন বিভিন্ন পাঠ্যবিষয়ে নির্ধারিত নিম্নসংখ্যক ক্লাশে ছাত্ররা হাজির না থাকলে)। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় সে সম্বন্ধে কোন খোঁজখবর পর্যন্ত নিলেন না। অর্থাৎ যদিও আইনত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজগুলোতে ছাত্রদের জন্য এন-সি-সি শিক্ষা বাধ্যতামূলক বলে ঘোষিত রইল, কিন্তু কোন ছাত্র যদি ঐ আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে এন-সি-সি শিক্ষা না নিয়ে থাকে তাহলেও তার কোন অপরাধ হয় না। আত্মপ্রবঞ্চনার এর চাইতে প্রকৃষ্ট প্রমাণ আর কি হতে পারে?

বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ আচরণের ফলে ১৯৬৪ খৃস্টাব্দের জুন মাস থেকে ছাত্ররা (অর্থাৎ যে ছাত্ররা ১৯৬০ সালের আগে এন-সি-সি সম্বন্ধে উৎসাহী ছিল না।) এন-সি-সি'র প্যারেডে আসা বন্ধ করে দিল। আর যে সব ছাত্ররা সত্যই এন-সি-সি সম্বন্ধে আগ্রহী ছিল তারা ব্যথার সংগে অনুভব করল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষেরা এন-সি-সি'কে কী চোখেই দেখেন।

১৯৬৫-৬৬ সালের শিক্ষা বছরের শেষদিকে পশ্চিমবঙ্গের এন-সি-সি ডিরেক্টরেট থেকে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে প্রতিটি কলেজের বাধ্যতামূলক এন-সি-সি শিক্ষার বাস্তব অবস্থা জানিয়ে দেওয়া হোল। ঐ রিপোর্টে দেখা গেল কোন কোন কলেজে শতকরা মাত্র চারজন ছেলে প্যারেড করেছে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কিন্তু তখনো নিষ্ক্রিয় রইলেন। অথচ তাঁদের ১৯৬২ সালের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বাধ্যতামূলক এন-সি-সি শিক্ষাকে বাস্তবায়িত করার জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের এই ক'বছরে কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয়ে গেছে। যদি কোন সাধারণ করদাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে প্রশ্ন করতেন কোন অধিকারে তাঁরা অতগুলো টাকা তছনছ করলেন তার কি উত্তর বিশ্ববিদ্যালয় দিতেন?

বিশ্ববিদ্যালয় এন-সি-সি সম্বন্ধে নিষ্ক্রিয় থাকলেও এন-সি-সি'র বিভিন্ন এস্টাব্লিশমেন্টের জন্য কিন্তু সরকারের তখনো প্রচুর টাকা খরচ হতে লাগল।

অবস্থা আরও খারাপ হোল যখন ডক্টর ত্রিগুণা সেন কেন্দ্রীয় সরকারে শিক্ষামন্ত্রী হলেন। তিনি ঘোষণা করলেন যে, সব ছাত্র এন-সি-সি'র বাধ্যতামূলক শিক্ষা গ্রহণ করতে পারছে না তাই এন-সি-সি'র বিকল্প হিসেবে আরো দুটি নতুন শিক্ষাধারা—ন্যাশন্যাল সার্ভিস কোর (এন-এস-সি) এবং ন্যাশন্যাল স্পোর্টস অর্গেনাইজেশন (এন-এস-ও) চালু করা হবে ১৯৬৮ খৃস্টাব্দের জুন মাস থেকে। যে সব ছাত্র খেলাধুলায় আগ্রহী তারা যাবে এন-এস-ও'তে, যাদের আগ্রহ সামরিক শিক্ষায় তারা যাবে এন-সি-সি'তে এবং বাকী ছাত্ররা যাবে এন-এস-সি'তে—এন-এস-সি'র মাধ্যমে তারা বিভিন্ন সমাজসেবার কাজে আত্মনিয়োগ করবে। শিক্ষা কমিশনও ১৯৬৭ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সুপারিশ করেছিলেন যে ঐ তিনটি ধারার মধ্যে কোন না কোন একটি ধারার শিক্ষা সব ছাত্রকেই নিতে হবে।

সরকার এই নতুন শিক্ষাধারা দুটো সম্বন্ধে সঠিক পরিকল্পনা করার আগেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরম উৎসাহী ছাত্রদরদীরা (?) ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল ২২শে জুন ১৯৬৮ তারিখে সিদ্ধান্ত নিলেন যে ১৯৬৮ সালের শিক্ষা বছর থেকে এন-সি-সি শিক্ষা আর বাধ্যতামূলক নয়। তাঁরা আরও স্থির করলেন, যে সব ছাত্র এন-সি-সি'তে ভর্তি হবে তাদেরও শিক্ষা নিতে হবে মাত্র দুবছর [রেজিস্ট্রারের পত্র নং T/CSR/52/cir/Misc-68P, তারিখ ২৬ জুলাই ১৯৬৮ দ্রষ্টব্য]। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এন-সি-সি'র শিক্ষাসূচী তিন বছরব্যাপী এবং ঐ শিক্ষাসূচী নির্ধারণ করেন এন-সি-সি'র কেন্দ্রীয় উপদেষ্টামণ্ডলী। অর্থাৎ এন-সি-সি'র শিক্ষার কালক্রম নির্ধারণ করতে গিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কতকটা অনধিকার চর্চাও করলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐ সিদ্ধান্তটিতে কিন্তু অন্য দুটি শিক্ষাধারার কোন উল্লেখ পর্যন্ত নেই।

এ সমস্ত খবর পেয়ে কিন্তু কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী সমস্ত উপাচার্যের কাছে শিক্ষা কমিশন এবং তাঁর বক্তব্য সবিস্তারে ব্যাখ্যা করে লিখলেন যে, ১৯৬৮-৬৯ শিক্ষা বছরে ঐ নতুন শিক্ষাধারা দুটি কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমিত সংখক ছাত্র নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে চালানো হবে,

অন্য ছাত্রদের জন্য এন-সি-সি শিক্ষাই বাধ্যতামূলক থাকবে ; এবং তিনি উপাচার্যদের অনুরোধ করলেন সেই মত ব্যবস্থা করতে [কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা মন্ত্রকের পত্র নং D. O. NO F10—6/67-Y.S.1. তারিখ ২৭ জুলাই, ১৯৬৮, দ্রষ্টব্য]। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু তাঁদের একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্তের কোন পরিবর্তন করলেন না। ফলে অবস্থাটা কি দাঁড়াল? সরকারের মতে এন-সি-সি শিক্ষা বাধ্যতামূলক, আর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতে নয়। এ অবস্থায় ছাত্ররা কি করবে?

এদিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এন-এস-সি বা এন-এস-ও আজ পর্যন্ত চালু হয় নি। এন-এস-সি সম্পর্কে কোন সঠিক পরিকল্পনা পর্যন্ত গৃহীত হয় নি। এখনও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন ও কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে তাঁদের পরিকল্পনা সম্পর্কে চিঠি লেখালেখি চলছে।

আমাদের মত গরীব দেশের টাকা এবং ছাত্রশক্তিকে নিয়ে শিক্ষার নামে এ রকম প্রহসন করার কি অর্থ? যুক্তিই বা কি?

প্রমাণ করুন

সুপার সার্ফ দিয়ে একবার ধুলেই অন্য যে-কোনো কাপড়-কাচা পাউডার দিয়ে ২ বার ধুলে যতটা ফর্সা হয় -তার চেয়েও বেশী ফর্সা হবে।

পরীক্ষাগারে বারবার ব্যাপকভাবে পরীক্ষানিরীক্ষা করে এটি প্রমাণিত হয়েছে। সার্ফের রয়েছে অনুপম পরিষ্কার করার ক্ষমতা। তাই জামার লুকোনো ময়লাও সাফ করে দেয়। ভারতের সেরা ব্র্যাণ্ডটি কিনুনঃ সুপার সার্ফ (কেবল ছোট ও বড় প্যাকেটেই পাওয়া যায়, যার গায়ে লেখা থাকে সুপার সার্ফ)

সুপার সার্ফ সবচেয়ে বেশী সাদা ক'রে ধোয়
(নীল বা অন্য কোন পাউডার মেশাবার দরকার করে না।)

লিনটাস-SU. 73-140 BG

হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

ঘুম নেই-র কবি

সুখরঞ্জন চক্রবর্তী

ছাড়পত্র সুপরিচিত গ্রন্থ সন্দেহ নেই। কিন্তু সুকান্ত ভট্টাচার্যের কবিমানসের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে পরিপূর্ণ ধারণা জন্মানোর দায়িত্বে পাঠকমাত্রেরই 'ঘুম নেই' কাব্যখানিও অবশ্য পঠনীয়।

সুকান্তর জীবনদর্শন 'ঘুম নেই' কাব্যগ্রন্থে যত অভ্রান্ত প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, এমনটি বোধহয় আর কোথাও হয় নি। কবিমন সর্বত্রই বিক্ষুব্ধ—আপোষহীন সংগ্রামে দৃঢ়ব্রত, সোচ্চার। কিন্তু ঘুম নেই-র বিক্ষোভ প্রথম থেকেই এত স্পষ্টভাবে উচ্চারিত যে, এমনটি আর কোথাও হয় নি। কবিকণ্ঠে কোথাও দ্বিধা নেই,—প্রত্যয় প্রকৃতই বলিষ্ঠ, সংগ্রামী ভাষণে অভিব্যক্ত—

অনেকে বিদ্রূপ, কানে দেয় হাত চাপা,
তাতেই কি হয় আসল নকল মাপা?
বিদ্রোহী মন! আজকে করো না মানা,
দেবপ্রেম আর পাব কলসীর কাণা,
দেব, প্রাণ দেব মুক্তির কোলাহলে
জোন্, জার্ক, যীশু সোক্রেটিসের দলে।
(বিক্ষোভ)

ক্রমশ বক্তব্য আরও শাণিত হয়েছে। প্রত্যয় আরও বিশিষ্টতা লাভ করেছে।

শ্বাস প্রশ্বাসে ক্লান্তি টেনে
কাঁপতে থাকবে কতকাল?
মাথায় মৃদু চাপড় আর
পিঠে হাতের স্পর্শে
কতক্ষণ ভুলে থাকবে পেটের ক্ষুধা
আর গলার শিকলকে?
কতক্ষণ নাড়তে থাকবে লেজ?

তার চেয়ে পোষমানাকে অস্বীকার
করো,
অস্বীকার করো বশ্যতাকে।

চলো, শুকনো হাড়ের বদলে
সন্ধান করি তাজা রক্তের,
তৈরী হোক লাল আগুনে ঝলসানো
আমাদের খাদ্য।
শিকলের দাগ ঢেকে দিয়ে
গজিয়ে উঠুক
সিংহের কেশর প্রত্যেকের ঘাড়ে॥
(১লা মে-র কবিতা)

তারপরও—

অরণ্যমাঝে দাবদাহ কিছু
যায় না রেখে
মনকে বাঁচাও বিপন্ন এই মৃত্যু থেকে।
(পরিখা)

ঘুম নেই চোখে সৈনিক কবি দেখেছেন—

যাদুদের ঘুম কালোছায়া আনে।—
তিক্ত মৃধির,
পৃথিবী এখনো নির্জন নয়—
জ্বলন্ত ধূপ।
সৈন্যদের তীরে তীরে আজ
প্রতীক্ষাতে
সহস্র প্রাণ বসে আছে ঘিরে
অস্ত্র হাতে॥
(পরিখা)

আর সর্বনাশের দিনে আহবান জানিয়েছেন সব্যসাচীকে—

নেমে এস—হে ফাল্গুনি,
বৈশাখের খরতপ্ত তেজে
ক্লান্ত দুবাহু তব লৌহময় হোক
বয়ে যাক শোণিতের মন্দাকিনী স্রোত;
(সব্যসাচী)

দেখেছেন—
দেশে ও বিদেশে লাগে জোয়ার,
ঘোড়সোওয়ার—
চিনে নেব পথ দৃঢ় জোয়ার
যে পথে নিত্য সূর্যোদয়
আনে প্রলয়,
সেই সীমান্তে বাতাস বয়;
তাই প্রতীক্ষা—ঘনায় দিন
স্বপ্নহীন॥
(উদ্বীক্ষণ)

গেয়েছেন বিদ্রোহের গান। কেন না তাতেই সারা দুনিয়াকে শেষ নাড়া দেওয়া যাবে। রক্তের পিছনেই ডাকবে সুখের বান।

এই বিপ্লব-চেতনাকে আরও বলিষ্ঠরূপে পাওয়া গেল "অনন্যোপায়" কবিতাটিতে। যেখানে কবি বলেছেন—

আজকে ভাঙার স্বপ্ন,—অন্যায়ের
দম্ভকে ভাঙার,
বিপদ ধ্বংসেই মুক্তি, অন্যপথ
দেখি নাকো আর।
তাই তো তন্দ্রাকে ভাঙি, ভাঙি
জীর্ণ সংস্কারের খিল,
রুদ্ধবন্দী কক্ষ ভেঙে মেলে দেই
আকাশের নীল।
নির্বিঘ্নে সৃষ্টিকে চাও? তবে ভাঙো
বিঘ্নের বেদীকে,
উদ্দাম ভাঙায় অস্ত্র ছুঁড়ে ছুঁড়ে দাও
চারিদিকে॥
(অনন্যোপায়)

এই জন্যই কবি জানিয়েছেন রক্তিম অভিবাদন। কান পেতে শুনতে পেয়েছেন জনতার মুখে ফোটে বিদ্যুদ্বাণী। জানতে চেয়েছেন—

কবে আমাদের বাহুর প্রতাপে
কোটি জনতার দুর্বার চাপে
শৃঙ্খল গত হবে?
কবে আমাদের প্রাণ কোলাহলে
কোটি জনতার জোয়ারের জলে
ভেঙে যাবে কারাগার?
(জনতার মুখে ফোটে বিদ্যুদ্বাণী)

তাই কবিতার খসড়াতে কবি লক্ষ্য করেছেন অলক্ষ্যে মহাবিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। দেখেছেন তাই মিছিল এগিয়ে চলেছে অব্যাহত গতিতে মৃত্যুকবলিত শ্মশানকে উপেক্ষা করে, অরণ্য পাহাড়কে ডিঙিয়ে, ব্যর্থ নোঙর থাকা সত্ত্বেও নদী পার হবার দুর্জয় স্বপ্নে। তাই একুশে নভেম্বরে কবি পান জাগরণের সংকেত। দেখেন দিন-বদলের পালা সমাগত। তাই তিনি নির্দ্বিধায় উচ্চারণ করেন—

তুমি ভাবো, তুমি শুধু নিতে পারো
প্রাণ,
তোমার সহায় আছে নিষ্ঠুর কামান;
জানো নাকি আমাদেরও উদ্বুদ্ধ,
রক্ত গাঢ় লাল,
পেছনে রয়েছে বিশ্ব, ইঙ্গিত দিয়েছে
মহাকাল,
স্পীডোমিটারের মতো আমাদেরও
হৃৎপিণ্ড উদ্দাম,
প্রাণে গতিবেগ আনে, ছেয়ে ফেলে
জনপদ—গ্রাম,
বুঝেছি সবাই আমরা আমাদের
কী দুঃখ নিঃসীম,
দেখো ঘরে ঘরে আজও জেগে ওঠে
এক এক ভীম।
তবুও যে তুমি আজো সিংহাসনে
আছো
সে কেবল আমাদের বিরাট ক্ষমায়।

এখানে অরণ্য স্তব্ধ, প্রতীক্ষা
উৎকীর্ণ চারিদিক,
গঙ্গায় প্লাবন নেই, হিমালয়
ধৈর্যের প্রতীক;
এ সুযোগে খুলে দাও ক্রুর শাসনের
প্রদর্শনী,
আমরা প্রহর শুধু গণি।
পৃথিবীতে যুদ্ধ শেষ, বন্ধ সৈনিকের
রক্ত ঢালা;
ভেবেছ তোমার জয়, তোমার প্রাপ্য
এ জয়মালা;
জানো না এখানে যুদ্ধ—
শুরু দিন বদলের পালা॥
(দিন বদলের পালা)

কবি শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন মুক্ত বীরদের প্রতি। সেখানেও বিপ্লবী অভিবাদনে

কোথাও কার্পণ্য নেই। সেখানেও কবির বিশ্বাস প্রগাঢ়—পদাঘাতে পদাঘাতেই ভাঙব মুক্তির শেষ দ্বার। প্রিয়তমাসু কবিতাটিতে কবির মনের আবেগ এক দানিধ্যক্ষণে স্ফটিক-শুভ্র দানা বেঁধে উঠেছে। এই কবিতাটিকে একটি মহৎ প্রেমের কবিতা বলা যেতে পারে।—একটি বিপ্লবী প্রেমিকের গৃহের স্বপ্ন, স্বদেশ বাসনা কবিতাটিতে অভিব্যক্ত—পরিণতিতে একটু বিষাদ থাকলেও প্রথমে কবির মনের কোণ কোথাও দ্বিধা নেই। বরং সুস্পষ্ট বক্তব্যে চিহ্নিত ভাষণ কবিতাটিকে এক এক স্থানে দুর্লভ মর্যাদা দান করেছে। কবি সেখানে লিখেছেন—

প্রশ্ন করো যদি এত যুদ্ধ করে পেলাম
কী? উত্তর তার—
তিউনেশিয়ায় পেয়েছি জয়,
ইতালীতে জনগণের বন্ধুত্ব,
ফ্রান্সে পেয়েছি মুক্তির মন্ত্র;
আর নিষ্কণ্টক বার্মায় পেলাম
ঘরে ফেরাব তাগাদা।
(প্রিয়তমাসু)

তারপর ছুরি, সূচনা, অবৈধ ইত্যাদিতে কবি ভাবালুতার স্বপ্ন ছেড়ে সরাসরি কর্তব্যের পথ স্থির করে নিয়েছেন। মণিপুরে রচনা করেছেন মুক্তির সংগ্রাম। মুক্তিপ্রত্যাশী সংগ্রামীদের উদ্দেশ্যে লিখেছেন—

এ আকাশ চন্দ্রাতপ, সূর্য আজ
ওদের পতাকা,
মুক্তির প্রচ্ছদপটে ওদের কাহিনী
আজ ঢাকা,
আগন্তুক ইতিহাসে ওরা আজ
প্রথম অধ্যায়
ওরা আজ পলিমাটি অবিরাম
রক্তের বন্যায়,
ওদের দু' চোখে আজ বিকশিত
আমার কামনা,
অভিনন্দন গাহে, পথের দু'পাশে
অভ্যর্থনা!
ওদের পতাকা ওড়ে গ্রামে গ্রামে
নগরে বন্দরে
মুক্তির সংগ্রাম সেরে ওরা ফেলে
স্বপ্নময় ঘরে॥
(মণিপুর)

দিকপ্রান্তে, চিরদিনের, নিভৃত (১), বৈশম্পায়ন কবিতা চতুষ্টয়েও দেখি কবির প্রত্যয় সুনির্দিষ্ট। তার মধ্যে চিরদিনের কবিতাটিতে গ্রামের মেহনতী মানুষ—কৃষাণ, মজুর, তাঁতী ইত্যাদির জীবন-যাত্রার এক অন্তরঙ্গ ছবি ফুটে উঠেছে। কবিতাটির চিত্রকল্প এক অনবদ্য এবং অন্তরঙ্গ সততায় সুচিহ্নিত হয়েছে।

ঘুম নেই কবিতাগ্রন্থের অধিকাংশেই কবির প্রবল মুক্তিস্বপ্ন আন্দোলিত। বিদেশী শাসনের শৃঙ্খলভাণ্ডার স্বপ্ন-চোখে কবি প্রতীক্ষা করেন তাই—

...হে আদিম, ক্ষতবিক্ষত জীবনের
বিস্ময়,
ছড়াও প্লাবন, দুঃসহদিন আর
বিলম্ব নয়।
সারা পৃথিবীর দুয়ারে মুক্তি,
ওখানে অন্ধকার
এখানে কখন আসন্ন হবে
বৈতরণীর পার?
(কবে)

সর্বত্রই মানবপীড়নে কবি জেগে উঠেছেন মত্ত আক্রোশে। মানবতার প্রতি কোনপ্রকারের অবমাননাই সহ্য হয় নি তাঁর। কবি তাই স্পষ্টই উচ্চারণ করেছেন—

তাই আমি যেতে চাই সেখানেই
যেখানে নিপীড়ন,
যেখানে ঝলসে উঠবে আমার
অসির কিরণ।
(মীমাংসা)

সুকান্ত আমরণ অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে লেখনী সঞ্চালন করেছেন। সংগ্রামই ছিল তাঁর কবিমানসের সাধারণ ধর্ম। কিন্তু তা কখনই আকস্মিক নয়। বিষয়টি স্পষ্ট করে বোঝাবার জন্য তাই তিনি বলেছেন—

শুনি নি স্বপ্নের ডাক;
থেকেছি আশ্চর্য নির্বাক
বিন্যস্ত করেছি প্রাণ বুভুক্ষার হাতে।

সহসা একদিন
আমার দরজায় নেমে এল
নিঃশব্দে উড়ন্ত গৃধিনীরা।

সেইদিন বসন্তের পাখি
উড়ে গেল
যেখানে দিগন্ত ঘনায়িত।

আজ মনে হয়
হেমন্তের পড়ন্ত রোদ্দুরে,
কী করে সম্ভব হল

আমার রক্তকে ভালবাসা।

সূর্যের কুয়াশা
এখনো কাটে নি
ঘোচে নি অকাল দুর্ভাবনা।
মুহূর্তের সোনা
এখনো সভয়ে ক্ষয় হয়,
এরই মধ্যে হেমন্তের পড়ন্ত রোদ্দুর,
কঠিন কাস্তেতে দেয় সুর,
অন্যমনে এ কী দুর্ঘটনা—

জনতার সঙ্গে ছাড়া কবি এক-মুহূর্তও চলতে পারেন না। ১৯৪৯ সালের—আমার একক পৃথিবী ভেসে গেল জনতার প্রবল জোয়ারে। পংক্তিটি ভোলবার নয়। আর মেহনতী জনতার প্রতি কবির এই যে দরদ, এই যে আনুগত্য তা (বলাই বাহুল্য) দেশকাল নিরপেক্ষ। মেহনতী মানুষের জন্য কবি তাই স্পষ্টতই দেখেন ১৯৪৩ সালের রোমে—

হাজার বছর ধরে দাসত্ব বেঁধেছে বাসা
রোমের দেউলে,
দিয়েছে অনেক রক্ত রোমের শ্রমিক—
তাদের শক্তির হাওয়া মুক্তির দুয়ার
দিল খুলে,
আজকে রক্তাক্ত পথ; উদ্ভাসিত দিক।

জনতার নির্যাতন দেখেছেন কবি। কিন্তু তাতে দেখেন নি তিনি হতাশার কোন কারণ। তিনি সর্বত্রই জনজাগরণে বিশ্বাসী। তাই তো কবি বলতে পারেন—

মনে হয়, যদি বাজে মুক্তি কারখানার
তীব্র শাঁখ
তবে কি হবে না জমা সেখানে
জনতা লাখে লাখ?
জনপাখীদের গানে মুখরিত হবে কি
আকাশ?
—ভাব নির্বাসিত মন,
চিরকাল অন্ধকারে বাস।
পাখীদের মাতামাতি: বুঝি
মুক্তি নয় অসম্ভব,
যদিও ওঠে নি সূর্য, তবু আজি
শুনি জনরব॥

তারপর কবির আশাবাদ আরও বলিষ্ঠভাবে উচ্চারিত হতে দেখা যায় যখন তিনি বলেন—

এ দুর্যোগ কেটে যাবে রাত আর
কতক্ষণ থাকে?
আবার সবাই মিলবে প্রত্যাসন্ন
বিপ্লবের ডাকে;

ঘুম নেই কাব্যগ্রন্থে কবি আপোষহীন সংগ্রামের কথা যেমন বলেছেন, তেমনি বলেছেন সংগ্রামে সাফল্য হবার এক পরম বিশ্বাসের কথা। কবি বলেছেন জনতার কঠোর জীবনযাত্রার কথা। কিন্তু সর্বত্রই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে সাফল্যের সম্ভাবনারও কথা। এক বলিষ্ঠ আশাবাদই ঘুম নেই-র কবি সুকান্ত উচ্চারণ করেছেন। কোনপ্রকারের নেতিবাচন নয়, হ্যাঁ-ধর্মই ঘুম নেই-র কবি সুকান্তর অন্বিষ্ট বলে ভাবা যায়।

যদিও সুকান্তর পাঠকমহলে ছাড়-পত্রের দাবিই অগ্রগণ্য তথাপি একথা কবুল করতেও কুণ্ঠা নেই যে ঘুম নেই-র মতন এত বলিষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ আর একটিও (?) তিনি রচনা করেন নি। এতে এমনই একটি উজ্জ্বল সূর্যসম আশাবাদের কথা কবি উচ্চারণ করেছেন, যার ঔজ্জ্বল্য শুধু পরলোকগত কবির কাব্যজীবনকেই উদ্ভাসিত করে না—এতে সমস্ত পৃথিবীর মেহনতী মানুষই এক পরম পবিত্রতা ও নির্মলতায় সুস্নাত হয়।

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

॥ একত্রিশ ॥

কলঘর থেকে জলের শব্দ আসছে। এখনও রাত ভোর হয় নি। অন্তত হবার কথা নয়। বেশ মনে পড়ছে ঘুমোতে চান নি শিবব্রত। অন্তত এ-সব রাত্রিগুলিতে ঘুম আসে না। আসবার নয়। জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি যেন আর জন্মের পার থেকে আসে। তারা যেন জন্ম-জন্মান্তরের। যুগ-যুগান্ত-কালের ব্যবধান থেকে যেন হঠাৎ একদিন এসে উপস্থিত হয়। বুকের রক্তের ভিতরে থাকে, স্বপ্ন মাড়িয়ে এসে চোখের সামনে দাঁড়িয়ে হাসে। তার ভিতর দিয়ে যেন খুব ঘন হয়ে দেখা দেয় দূর অতীত। খুব স্পষ্ট হয়ে ওঠে হারিয়ে-যাওয়া দিন-মুহূর্তগুলি।

আসলে একেকটা বয়স আছে। সে বয়সটা রোমন্থনের। মধ্য জলের গভীরের বাসায় নয়, অল্প জলের ওপরে বুড়-বুড়ি কাটতে, স্বচ্ছন্দে ভাসতে, কানকো নাড়তে ভালো লাগে। তখন আর সব-কিছু হারিয়ে যায়। চেনা মুখগুলি, চেনা রাস্তাগুলি। শৈশবের রাঙা মেঘের আলোতে-আলোতে আকাশ-নদী-মাঠ-ঘাট-বাট রোদ্দুরে ঝলমল করতে থাকে। সেদিনটা হঠাৎ-হঠাৎ একদিন আসে।

জ্যোৎস্না-খচিত আজ এসেছিল এমনি একটা রাত্রি। মনোরম চিকের ভিতর দিয়ে সবকিছু স্বপ্নালু মনে হয়েছিল। মনে হয়েছিল, জীবন বড়ো সুন্দর। জীবন বড়ো আনন্দদায়ক। যেন এই জীবনের মধ্যে ডুব দিতে পেরে তিনি খুশি। এখানে সমস্যা ছিল, সংঘাত ছিল। ছিল কঠোর জীবন-চর্যার বর্মে-আবৃত দিনগুলি। অভাবের ফুটো নৌকোর জল ছেঁচে ছেঁচে কেটেছে দিন। দুঃখে-দুর্যোগে। নিশ্চয়তা ছিল না। আশ্রয় ছিল না কোথাও। ভরসা দেবার ডেকে নেবার মত কেউ ছিল না।

মুখ ফেটে রক্ত ছুটেছে। জীবিকার জন্যে উদয়াস্ত ক্ষত-বিক্ষত রক্তাক্ত হতে হয়েছে আশৈশব। সবকিছু হয়েছে। কিন্তু তবু পরিণত জীবনে আজ তিনি তৃপ্ত। দেখে গেলেন জেনে গেলেন সব কিছুই। এই আনন্দ আস্বাদনের। তৃপ্তির। একটা বয়স আছে যখন মানুষ খাটে। খাটতে পারে। পরিশ্রম করতে পারে। মরুভূমির ভিতর দিয়ে পথ করে এগোতে পারে। পর্বতের চূড়ায় ওঠবার সাধনা করতে পারে। সেখানে গিয়ে সে স্থির হয়ে বসতে চায় না। আগামী দিনের জন্যে ভবিষ্যতের নিরাপত্তার জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে। সেই বয়সটা ফসলের জন্য মাটি কর্ষণের। বীজ বপনের। আজ পরিণত জীবনে শস্য সংগ্রহও নয়, শস্যের আনন্দ আস্বাদনের লগ্ন। ডুয়ার্সের টি-ম্যাগনেট্ শিবব্রত-বাবু তাই এমন রাতে ঘুমোতে চান নি। জেগে থাকতেই চেয়েছিলেন। কিন্তু কখন যে ঘুমিয়ে গিয়েছিলেন নিজের অজ্ঞাতে। এখন ঘুম থেকে জেগে উঠ-লেন তিনি কলঘরের জলের শব্দে। কলঘরে এত রাত্রে কে চান করছে? জলের ধারার উচ্ছ্বসিত শব্দে—বোধ হয় তাতেই তাঁর ঘুমটা ভেঙে গিয়েছে। আজকাল, এ-বয়সে, ঘুমটা হয় খুব পাতলা। তবু রাগ করেন না শিবব্রত-বাবু। রাগ জিনিষটা তাঁর ছিল না বললেই চলে। জানতেন যে রাগে, সে হারে।

না, হারেন নি তিনি। তাঁর আগেরও অনেক চা-শিল্পপতিরা আছেন। এই ডুয়ার্সের মাটিতে যাঁরা অনেক অনেক আগেই সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তাঁরা শিবব্রতবাবুর নমস্য। তাঁরা সক-লেই পুণ্যবান। আজ তাঁদের নাম ফেরে পথে পথে। ডুয়ার্সের পথের ধুলোয়। শিবব্রতবাবু তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। একান্তমনে কৃতজ্ঞ তিনি। তাঁরাই দেখিয়েছেন পথ। তিনি তো পথ অনু-সরণ করে পরে এসেছেন মাত্র।

তবু তাঁদের উত্তরাধিকার নেবার যোগ্যতা ছিল তাঁর। নইলে চা-বাগানে নেমে এত উন্নতি করলেন কি করে? এখনও সুখলতা আছেন। তাঁর সেই জীবনের সাক্ষ্য দিতে। সুখলতার দিকে পরিপূর্ণ আবেগে তাকান শিবব্রতবাবু আজ। অবশ্য তাঁর সঙ্গে দেখা কমই হয়। তিনি আছেন তাঁর ঠাকুরঘর নিয়ে। দেবতাদের নিয়ে। কী যে তিনি পেয়েছেন ওঁদের মধ্যে। কাচের ফটোর মধ্যে দেব-দেবতাদের মূর্তির উদ্দেশে নিবেদিত নৈবেদ্যের থালাগুলি। কাচের গায়ে লাগানো তুলসীপাতা। কোশাকুশি। মহাভারত আর রামায়ণ আছে একদিকে। কুলুঙ্গিতে একদিকে ঝুলনো সিঁদুরের কৌটো, ধূপ-ধুনো আর আগরবাতী। ছোট একটা শংখও আছে।

মোটা করে সিঁদুর লাগান সুখলতা। তাঁর সাদা চুলের সিঁথির মধ্যে পরিপাটি উজ্জ্বলতায় টক টক করে সিঁদুরের রঙ। মুখের চামড়া কুঁচকে গেছে। চোখে একটি চশমা ব্যবহার করেন পাঁচালী পড়বার সময়। সুখলতাকে দেখে বুকের মধ্যে ঢেউ অনুভব করেন শিবব্রতবাবু। যেন তাঁর চাইতেও বুড়ো হয়ে গেছেন সুখলতা। অথচ তিনি তাঁর চাইতে বারো বছরের ছোট।

কী ছেলেমানুষই না ছিলেন সুখলতা। তাঁর তোরঙ্গের মধ্যে বিয়ের পরেও নিয়ে এসেছিলেন ছেলে-বেলার খেলাঘরের দুটি-একটি পুতুল। শাড়ি পরানো থাকত ওদের। একদিন একটির গলায পুঁতির মালা সরিয়ে-ছিলেন তিনি। তাই নিয়ে কী কান্না। ছোট ঠোঁটগুলি কেবলই ফুলে ফুলে উঠেছিল। খেলাঘরের আয়না কাঁকে নিয়ে তিনি ছুট্ দিতেন। সুখলতাকে রাগিয়ে দিতে কী ভালোই না বাসতেন। কোথায গেল সে-সব দিনগুলি? বেশি দূরে যায় নি। কাছাকাছি চলে গিয়েই যেন কোথায় থেমে আছে। গলা বাড়ালে, একটু খোঁজ-খবর করলে যেন আশেপাশেই তাদের দেখতে পারেন।

অথচ সে-সব দিনই তিনি পার

হয়ে এসেছেন। এখন সব উপকথার মত মনে হয়। সুখলতা আজ কৈশোর-যৌবন পেরিয়ে বার্ধক্যের খেলাঘরে এসে বসে আছেন। সেখানেও তিনি আগের মত একা। ছেলে অবশ্য আছে কাছেই। কিন্তু সে বিষম ব্যস্ত। কল্যাণের সময়ই নেই আজকাল। তবু খানিকটা সময় করে মা'র কাছে যায়। ছেলে-বৌ রেখাও শেষ পর্যন্ত শাশুড়ির কাছে রইল না। নাতী-নাতনীদের লেখা-পড়ার কথা ভাবতেই হয়। জুয়ার্সে অবশ্য এখন ইস্কুল-কলেজ আছে, কিন্তু কলকাতার কথা আলাদা। সেখানে না-গেলে সত্যিকার মানুষ তৈরি হতে পারে না। কলকাতার মাটির আছে আলাদা জাদু। যত মানুষ বড় হলেন, প্রায় সব্বাইকে কোল দিল কলকাতা। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ। কত মানুষের কথা মনে হয়। স্যার আশুতোষ ছিলেন এই সেদিন। তাঁর ছেলে শ্যামা-প্রসাদও বাংলার বাঘের নাম রেখেছিলেন।

কলকাতায় সুখলতা যান নি। যেতে বলেছিলেন শিবব্রত। গঙ্গা আছে সেখানে। গঙ্গাস্নান তো করতে পাবে দু'বেলা? স্ত্রীকে শুধিয়েছিলেন শিব-ব্রত। সুখলতা জবাব দেন নি। দিনে দিনে নিজেকে যেন একটি বিশেষ গণ্ডীতে আবদ্ধ করে ফেলেছেন তিনি।

কলঘর থেকে দ্রুত জলপড়ার শব্দটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।...ওই শব্দ শুনেই খানিক আগে ঘুম ভেঙে গেল তাঁর। শুয়ে শুয়েই শুনছেন। এত ভোরে কে ওখানে? জলের শব্দকে ছাপিয়ে তিনি সংস্কৃত শ্লোকের আওয়াজ শুনতে পেলেন। স্পষ্ট সংস্কৃত উচ্চারণ। এখন আর ভুল করবার উপায় নেই। তেজেনের গলা। তেজেন এ বাড়িতে আশ্রিত। এখানে থেকে পড়াশুনো করছে। এখনও চাকরি-বাকরি হয় নি ওর। কিন্তু হবার সম্ভাবনা আছে। কল্যাণকে বলতে হবে তা। মনে মনে ভাবলেন শিবব্রত। এটা ভুলে গিয়ে-ছিলেন তিনি। ভারি ভালো ছেলে তেজেন। সুশ্রী শ্যামবর্ণ চেহারা। মুখে সরলতার ছাপ খুব সুস্পষ্ট।

না, ছেলেটার মধ্যে গুণ আছে। ভোরে ওঠা স্বভাব তার। যত শীতই থাকুক, ভোরে উঠবেই উঠবে। প্রাতঃস্নান করবে গায়ত্রী মন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে। সুন্দর নিখুঁত উচ্চারণ। কে জানে কি আদর্শ ওর জীবনে। একদিন ডেকে শুধোবেন ভেবেছিলেন। শুধোনো হয় নি। ভুলেই গিয়েছেন। এইসব জিনিষ কি আজো আছে? আজকাল জীবনের চারদিকে নানা কুশ্রীতা নানা গ্লানি দেখে তিনি বিষণ্ণ। মনে মনে অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে থাকেন। এই ছেলেটির মধ্যে আর যাই থাক একটি নিটোল আদর্শবাদিতা আছে। জীবনকে কেউ গভীরভাবে নিচ্ছে দেখে তিনি খুশি হন। কোথায় যেন তৃপ্তি অনুভব করেন। মনে মনে ভাবেন, তাহলে প্রাচীন জীবনচর্যার প্রতি নিষ্ঠা একে-বারে লোপ পেয়ে যায় নি দেশ থেকে।

নিজের ছোটবেলার কথা মনে হয়। বাবা খুবই ভোরে উঠতেন। ভোরে বাগানে স্থলপদ্ম ফুটত। সূর্যের সুন্দর সোনালি আলোটি থরে থরে মাখান থাকত চারদিকে। গাছে গাছে পাখি-পাখালির কিচিমিচি। জলে নির্মল সূর্যকিরণ মাখান থাকত। বাবা পুকুরে গলাজলে নেমে সূর্যমন্ত্র জপতেন। চারধারে পবিত্রতা ঝলমল করত। চান করে বাবা ফিরতেন। মা'র তখন উঠোন ঝাঁট দেওয়া হয়ে গেছে। গোবরজল ছিটোচ্ছেন। হাঁসগুলি জেগে উঠল। আরো বেলা হলে উঠোনে আবীরজবা ফুটবে। অতসীও আছে কাছাকাছি। শরৎকালে শিউলি ফুটে ঝরে থাকত আঙিনায়। শিউলি কুড়োবার কী ধুম ছিল তখন। মালা গাঁথা হত। খুবই ছোটবেলা তখন। মনে পড়ে পাঠশালায় ভর্তি করে দিয়েছিলেন বাবা। দুর্গা পণ্ডিতের পাঠশালা। কষিত কনককান্তি দুর্গা পণ্ডিতের গায়ে সাদা পৈতে ঝুলত। তারপর বাবা মরে গেলেন। তার পরই জীবনে এল একের পর এক দুঃখ। জীবনের এক-একটি আঘাত। কষ্টের পর কষ্ট।

তেজেনের মন্ত্রোচ্চারণ শুনতে শুনতে সেই দিনগুলির কথা ভাবেন শিবব্রত। যেন ফিরে গিয়েছেন অস্ফুট

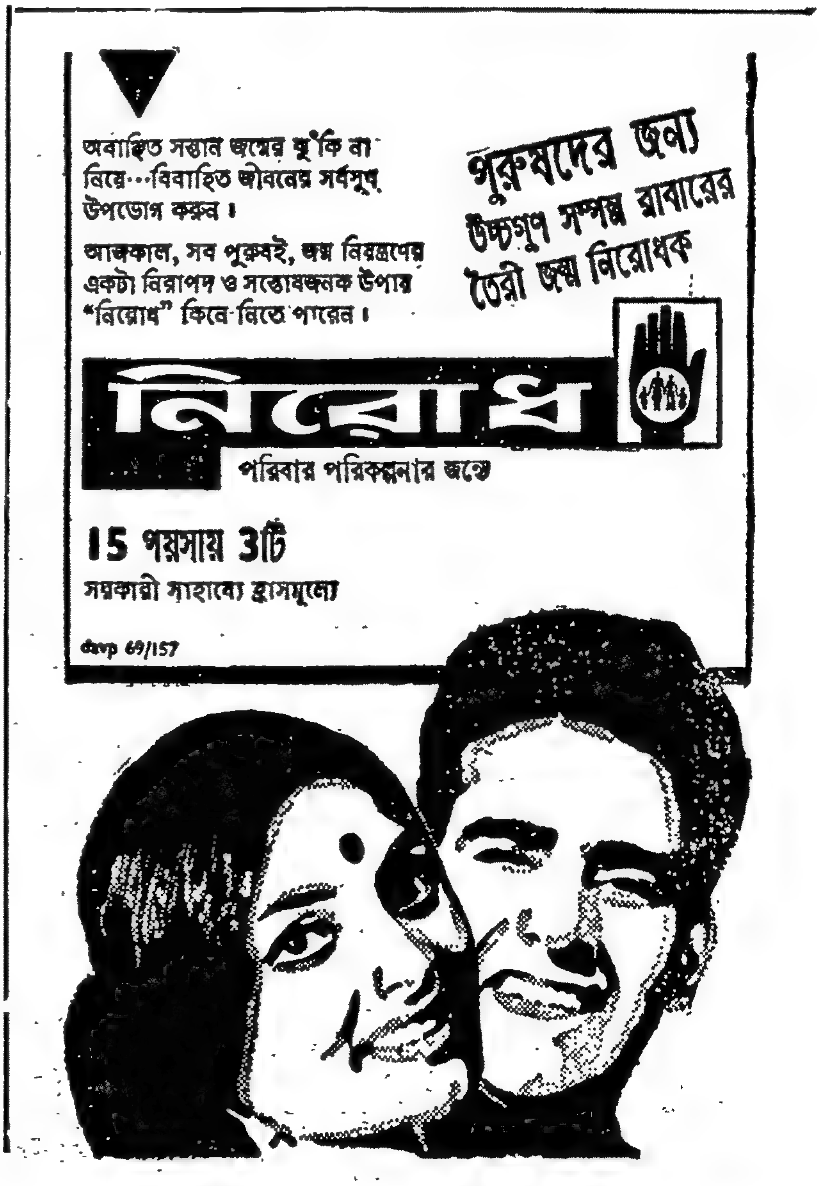

শৈশবে। মা'র দুঃখক্লিষ্ট মুখখানা মনে পড়ে। প্রায় ঝাপসা হয়ে গিয়েছে মা'র মুখ। খুব একটা দ্রুতগতি ট্রেনে উঠে যেন জীবনের এই প্রান্তে চলে এলেন। এখন আর সেসব দিনগুলি মনেই আসে না।

জলপড়ার শব্দ বন্ধ হয়ে গেছে। তেজেনের কি চান করা হয়ে গেল। সেকালে পুকুরের নির্মল জলে ছিল অবগাহনের আনন্দ। কলের জলে সে সুখ কোথায়? শুনতে শুনতে তিনি ভাবলেন, তেজেনকে যদি সংস্কৃত পড়বার জন্য কলকাতায় পাঠানো যায় তবে কেমন হয়? ছেলেটার এমন স্পষ্ট সুন্দর উচ্চারণ। আজকাল সংস্কৃত ভুলেই গেছে সব। এখন ইংরাজির যুগ। ভাবতে-ভাবতে তিনি থামলেন। না, ইংরাজিরও দিন চলে গেল। ইংরেজ চলে গেল। এখন স্বদেশীরাজ। ইংরাজির পরিবর্তে হিন্দীর আধিপত্য আজ। কল্যাণ বলছিল বটে একদিন। বলছিল, হিন্দীওয়ালাদের দাপট এখন বাবা। কে বলে দেশ স্বাধীন হয়েছে? ইংরাজের পর আবার নতুন করে আমরা হিন্দী-ওয়ালাদের অধীনস্থ হলাম। এখন হিন্দী শিখতে হবে সবাইকে।

শুনতে-শুনতে তিনি তিলেকের জন্য চিন্তা করছিলেন। আজকাল সবই পাল্টাচ্ছে। সবই বড় দ্রুত ভাঙছে। ভাঙছে, বদলাচ্ছে। আরো কত পরিবর্তন আসবে কে জানে। তিনি তখন থাকবেন না। তাঁকে আগেই যেতে হবে বলে সবটা দেখে যাওয়া হবে না।

বাইরে আবছা-আলো। জ্যোৎস্নার জেল্লা ফিকে হয়ে যাচ্ছে। রাত শেষ হয়ে গেল। জীবনের আর একটা রাত্রি। জানালার পর্দাগুলি খাটো। অল্প-অল্প কাঁপছে ভোরের হাওয়ায়। বাড়ি-ঘর-বাগান আবছা দেখা যাচ্ছে। শুয়েই তিনি থাকলেন। শুয়ে-শুয়ে বালিশে মাথা দিয়ে নিজের মনে ভাবতে লাগলেন। এখন আর তাঁর ঘুম আসবে না। রাত ভোর হয়ে যাচ্ছে। তিনিও ভোরেই ওঠেন। তবে তেজেনের মত ভোরে ওঠা নয়। প্রচণ্ড শীতের রাতেও দেখেছেন তার রুটিনের কোন নড়চড় নেই।

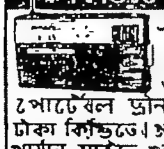
কিস্তিতে ট্রানজিস্টর
BAZA
৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড
৫ পোর্টেবল ট্রানজিস্টর মাসিক ৫ টাকা কিস্তিতে। প্রত্যেক গ্রাম ও শহরে পাঠান যাইতে পারে।
HIND AGENCIES (P7) KOLHAPUR ROAD DELHI-7

প্রথম প্রথম ভাবতেন অসুখ না করে ছেলেটার! শীতের শেষরাতের এই ঠাণ্ডা জল। ছেলেটাকে ক্লাশ সেভেনে পড়ার সময় তার বাবা রেখে গিয়েছিল ওঁর কাছে। অর্ধেন্দু। তাঁর গ্রাম-সম্পর্কে খুড়তুতো ভাই। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। মানুষ করতে পারছে না বলে দুঃখপ্রকাশ করছিল একদিন। তাঁরই সঙ্গে দেখা করতে এসে।

তোমার ছেলেমেয়ে ক'টি?

তিন মেয়ে, চার ছেলে।

একটা মোড়ার ওপরে তাঁর বিছানার কাছে বসেছিল অর্ধেন্দু। কোটরগত চোখ। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি-গোঁফ। এখনও তিনি স্পষ্ট মনে করতে পারেন। ছেলেরা লেখা-পড়া শিখছে তো? তিনি প্রশ্ন করেছিলেন।

চেষ্টা করেছিলাম। বড়টির হয় নি। অর্ধেন্দুর গলা ভারী-ভারী, তা-ছাড়া দুই মেয়ের বিয়ে দিতেই সর্বস্বান্ত হয়ে গেলাম। পড়াব কি করে! নিজের চেষ্টায় এখন একটা দোকান করেছে মেটেলীতে।

গাঢ় মনোযোগে শুনছিলেন শিবব্রত।

মেজটা পড়াশুনায় ভালো। প্রাইমারীতে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়েছিল।

বাঃ।

কিন্তু পড়াতেই বা পারছি কোত্থেকে। যা দিনকাল পড়েছে আপনি তো জানেন। ছেলে পড়িয়ে আর সংসার চলে না।

অর্ধেন্দুর কথা শুনতে শুনতে তার কোটরবন্দী চোখের ভিতর তাকিয়ে মায়া হচ্ছিল তাঁর। ময়লা জামা-কাপড়ে কী অসহায়ই না লাগছে বেচারাকে। ওর যদি কিছু উপকার করতে পারেন তো—অর্ধেন্দুকে তিনি বলেছিলেন, পরশু এসো দিকি সকালের দিকে। দেখি তোমার জন্যে কি করতে পারি।

চলে গিয়েছিল অর্ধেন্দু। ইতিমধ্যে তিনি আলোচনা করলেন কল্যাণের সঙ্গে। সে কতদিনের কথা। কল্যাণ খুশি হয় নি। বলছিল, নিজেদেরই কত ঝক্কি-ঝামেলা। তাছাড়া দুটি ছেলে তো এখানেই থেকে লেখা-পড়া করছে। আরেকজন নেবে বাবা?

পিতার মুখের দিকে চেয়েই রাজী হতে হয়েছিল শেষ পর্যন্ত কল্যাণকে। সেই থেকে তেজেন আছে এখানে। ক্লাশ সেভেন থেকে পাশ করে করে কলেজে ভর্তি হল ফার্স্ট ইয়ারে।

চিন্তায় অল্প একটু বাধা পড়ল শিবব্রতের। পাশের ঘরে টেলিফোনটা বেজে উঠেছে। তীক্ষ্ণ শব্দে। কল্যাণ হয়ত এখন ঘুমুচ্ছে পাশের ঘরে। ইস! এত ভোরে কে টেলিফোন করছে তাকে! ক্রীং-ক্রীং। পর পর বারকয়েক বাজল। বেজেই চলেছে। এ ঘরে কান পেতেছেন তিনি গভীর আগ্রহে।

এইসব হয়ে থেকে জীবনের জটিলতা বেড়েছে বহুগুণ। বিজ্ঞান অবশ্য সুবিধেও করেছে অনেক। যোগাযোগ হয়েছে অনেক দ্রুত। নিশ্চয়ই এই মুহূর্তে কারোর প্রয়োজন পড়েছে বলে ডাকতে বাধ্য হচ্ছে। মনে মনে ভাবেন শিবব্রত, তাঁদের সময় থেকে এখন কাজের ঝক্কি-ঝামেলা বেড়েছে অনেক। নানানতর সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। তাঁদের সময় এত খাটতে হত না। কল্যাণের কথা ভাবেন তিনি। ছেলেটাকে খাটতে হচ্ছে প্রচুর। তাছাড়া তার জ্ঞান-বিদ্যা-বুদ্ধিও ঢের বেশি। তবু যেন দুশ্চিন্তার একটা কাঁটা টন্‌টন্ করে রক্তমাংসে। মেদ-মজ্জার মধ্যে।

টেলিফোন বাজা বন্ধ হয়েছে। হয়ত ধরেছে কল্যাণ। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে এমনও হতে পারে কল্যাণ হয়ত বাইরে। গেস্ট হাউসে কাদের আসবার কথা ছিল কাল রাতে। কলকাতার কোন্ নামকরা মানুষের। বাগান দেখতে আসবার কথা। কে জানে তিনি এসেছেন কি না। কি দেখবেন তিনি বাগানে? তাহলে দেখা যাচ্ছে বাগানও এখন দেখবার বিষয় হচ্ছে!

ভাবতে ভালো লাগে। ঠোঁটের কোণায় সুন্দর হাসি ফুটে ওঠে তাঁর। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে কল্যাণের কথাগুলি মনে হয় তাঁর। সে বলে, তোমার বাগান নিয়ে আজ দেশে কেউ ভাবছে না বাবা।

ভাবছে না নাকি? মনে মনে তিনি ভাবেন। অবাক হন ছেলের কথায়। কল্যাণ বলে, শ্রমিকদের রক্ত শুষে শুষে তোমরা বড় হচ্ছ বাবা। যা পেয়েছ তাই নিয়ে খুশি থাকো। চা-র বাজার পড়ে যাচ্ছে, মুনাফা নেই, কিন্তু শ্রমিক-কর্মচারীদের দুঃখে দেশ জুড়ে কারোর দরদের অভাব নেই।

কথাগুলি হঠাৎ মনে আসতেই এক পলকের জন্য চোখের পাতা বুজলেন শিবব্রত। কল্যাণের মনে কি তাহলে চা-বাগানের প্রতি বিরাগ জন্মেছে? তবে কি সে বাগান-সম্পর্কে আশা করা একেবারে ছেড়ে দিয়েছে? সেটা ভাবা যায় না। না-ভাবাই ভালো। শিবব্রত আবার বাইরের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন। মাথা তুলতে ইচ্ছে করছে না। শিয়রের দিকে দেয়ালঘড়ি। টক্‌টক্ শব্দ করছে। কটা বাজছে ঘাড় না-ফিরিয়ে দেখা যায় না। দেখবার জন্যে তাঁর কোনো ব্যাকুলতাও অনুভব করা যাচ্ছে না।

[ক্রমশ]

নিহত গোলাপ

জীবন সরকার

দীপা কষ্ট পাক তা কখনোই আশা করি নি। ভাল আছে—সুখে আছে। জানতে পারলে খুশি হতাম। অথচ ওর বিপদের সময় কাছে ছিলাম না। অবিশ্যি ওদের হাব-ভাব দেখে বুঝতে পারি নি তলে তলে এরকম একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে যাবে।

কলকাতায় ফিরে এসে জানতে পারলাম সব। কেন যেন মনে হয়েছিল ওর জন্য আমিও বোধহয় কিছুটা দায়ী। আহা! ফুলের মত মেয়ে। মনটা শিশুর মত। কমলালেবুর মত গায়ের রঙ। চিরল-চিরল চোখ, নাক। আঁট-সাঁট দেহ। অদ্ভুত সুন্দরী। তুলনা হয় না। বস্তুত ওর মত সুন্দর মেয়ে আমার চোখে খুব কম পড়েছে। আহা! সেই মেয়ের কপালে শেষে এই দুর্দশা ঘটল।

ইচ্ছে করে দীপার দাদা কল্যাণকে আচ্ছা করে ধোলাই দিই। অবিশ্যি ওর কোন দোষ নেই। আসলে এই সব কিছুর অন্তরালে হচ্ছে—দীপার বৌদি। ছিঃ ছিঃ বৌদি নয়, যেন ডাইনি। সাক্ষাৎ রাক্ষসী। যমের অরুচি। গোটা মানুষ গিলে হজম করতে পারে।

বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এসে এই চরিত্রের মেয়েমানুষ দেখতে পাব আশা করি নি। দজ্জাল! দুনিয়ার হতকুৎসিত। ভুতুম পেঁচার মত চোখ। লিকলিকে দেহ। বাতাসের আগে ওড়ে, যেন পেত্নী। দেখলেই গা রি-রি করে।

কল্যাণ কি দেখে যে বিয়ে করেছিল, কে জানে! যতদূর জানি কল্যাণের বিয়ে করার কথা ছিল না। যখনি বিয়ে করার কথা উঠেছে, বলেছে—সময় হয় নি। আর একটু দাঁড়িয়ে নিই। আগে বোনেদের বিয়ে দিই। ভাল কথা—সকলেই তা মেনে নিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শেষরক্ষা করতে পারে নি। কেন? এই প্রশ্নটা গোপনই থেকে গেল—আজো কেউ তা জানতে পারল না।......

দেশ-বিভাগের পর ফরিদপুর থেকে ওরা কলকাতায় আসে। ভাগ্য ভাল—রাইটার্স বিল্ডিংসে একটা এল, ডি ক্লার্কের চাকরি পায়। কিন্তু সে টাকায় সংসার চলে না। দিবারাত্র টিউশনি করতে হ'ত। এইভাবেই কোনমতে সংসার চালিয়েছে।

এখন তো মোটামুটি অবস্থা ভাল। মাণিকতলায় বাসা নিয়েছে। অথচ সংসারে শান্তি নেই। কল্যাণ বিয়ে করতেই গোলমাল আরম্ভ হয়ে গেল।

রোজই রাত্রিবেলা ঝগড়া লাগতো—দীপা এই করেছে। সেই করেছে। বৌ যেন দীপাকে মোটেই সহ্য করতে পারে না। হাঁটতে বসতে দোষ দেখে। যা মুখে আসে তাই বলে। অশান্তি। কাঁহাতক আর সহ্য করা যায়। কিন্তু কল্যাণ এ বিষয়ে নিশ্চুপ। বৌকে কিছু বলে না। উল্টে মা-বোনকেই দু'এককথা শুনিয়ে দেয়। মা দীপাকে সান্ত্বনা দিতেন—নতুন বিয়ে করেছে—ওরকম একটু হয়। দুঃখ করিস না। কাঁদিস না। আর কি বলবে। বলার কি আছে। শেষ বয়সে আর যাবেনই বা কোথায়? সবই অদৃষ্টের লিখন।

অথচ এই কল্যাণকে দেখেছি মা, বোন বলতে অজ্ঞান। দীপার কি প্রশংসা। ওর মত সুন্দরী মেয়ে ভারতে নেই। চলন-বলন ছন্দে মাপা। লেখাপড়ায় দারুণ! বড়ভাই যে বোনের সম্পর্কে এমন বলতে পারে আমার জানা ছিল না। দীপাকে বড় ঘরে বিয়ে দেবে। কি করলে ভাল হবে। সে কি ভাবনা।

আমরা বলতাম, ভাই হয়ে বাপের কাজ করছিস। এইদিনে বড় ভাই অত করে না। সত্যি কথাই—বাপ নেই। বোনদের বুঝতেই দেয় নি। অবিশ্যি দেশে থাকতেই বড় দুই বোনের বিয়ে হয়েছিল।

মাকেও চিন্তা করতে দেয় নি। এখানে আসার পর সেজ বোনের বিয়ে দিল—তা ভাল ঘরেই। চতুর্থ বোনের বিয়ে দিতে পারে নি—তার কারণ ওর দারুণ রোগা গড়ন। এটাও একটা দুঃখজনক ঘটনা। সবার ছোট্ট দীপা। অপরূপ রূপ। একবার তাকালে সহজে চোখ ফেরানো যায় না—পারা যায় না। এই সর্বনাশা রূপের জন্যই বুঝি ওর কপালে এত লাঞ্ছনা। কল্যাণের বৌ দু'চক্ষে দেখতে পারে না। নিজের রূপ নেই। হিংসেটা বুঝি সেইখানেই।

কল্যাণকে বলেছি : তোর এই বোনকে বিয়ে দিতে বিশেষ বেগ পেতে হবে না। ওর জন্য ভাবিস না। যেমন পড়ছে—পড়ুক। যে করেই হোক ওর পড়া চালিয়ে যাস। কল্যাণেরও সেই মত।

একই দেশের লোক বলে মাঝে মধ্যেই ওদের বাড়ি যেতাম। কেন না কল্যাণের মা আমাকে ছেলের মতই স্নেহ করতেন। ঘনিষ্ঠ বন্ধু। মানে—একটা আন্তরিকতার টান ছিল। ওদের সুখ-দুঃখের কথায় নিজেকে ডুবিয়ে দিতে ভাল লাগত। হয়তো ওদের ঘরে আসবাবপত্রের প্রাচুর্য ছিল না। অভাব-অনটনের মধ্যেও কোথায় যেন একটা নিবিড় সুখ খুঁজে পেতাম যা কিনা আর কোথাও পেতাম না।

সেই সময়ে কল্যাণ কি অমানুষিক খাটুনিই না খাটতো—আমি ভাবতে পারতাম না। কষ্টকে কষ্ট মনে করে নি। সত্যি ধন্যি ছেলে—কল্যাণ। মরতে মরতে বাঁচার সাধ ভুলতে পারে নি। ওর দৃঢ়বিশ্বাস একদিন না একদিন নিশ্চয়ই দাঁড়াতে পারবে।

প্রায় দিনই কল্যাণ কাজকর্মের গল্প শোনাত। কোনদিন বোকার মত বলতাম—তুই অত খেটেছিস কি করে? অসুখ করে না? আমার কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠতো। বলতো—জানিস পেটের জ্বালা ভীষণ জ্বালা। যদি পড়তিস আমার মত অবস্থায় তা হলে ও কথা আর বলতে হত না। এখনো দুই বোনকে বিয়ে দিতে হবে। তোমার ঘাড়ে তো বোন নেই। নেই কোন সংসারের দায়-দায়িত্ব। অফিসে যাওয়া আর খাওয়া। এই তো কাজ। এর পর আর কোন কথা বলতাম না। কেন না তখন ওর চোখগুলি আগুনের মত জ্বলজ্বল করছে। মনে হতো ওর কথাগুলি বুকের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসছে।

বর্তমান বঙ্গসাহিত্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় লেখিকা

আশাপূর্ণা দেবীর
গ্রন্থাবলী
আবার একখণ্ড
প্রকাশিত হয়েছে!

তিনখানি সম্পূর্ণ উপন্যাস। সাতটি বড় গল্প

১। বলয়গ্রাস ২। প্রেম ও প্রয়োজন
৩। দুর্নিবার ৪। এক গুচ্ছ গল্প

মূল্য মাত্র সাড়ে ছয় টাকা

আগেই বেরিয়েছে আর এক খণ্ড

গ্রন্থাবলী

১। জহুরী ২। অনির্বাণ
৩। সোনালী দিনের মন
৪। এক গুচ্ছ গল্প

মূল্য মাত্র পাঁচ টাকা

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ
কলিকাতা-১২

সত্যি—এই ছেলে দীপাকে বিয়ে দিল এক বুড়োর সংগে—যার ঘাড়ে আট-নয়জন পোষ্য। উঃ ভাবতে গেলে গা শিউরে ওঠে। কি অস্বাভাবিক। কি মর্মান্তিক। আহা! ফুলের মত মেয়ের কপালে এই দুর্দশা ঘটল। অসহ্য! দেশে কি লোকজন নেই। সব মরে গেছে।

বস্তুত আমরা কেউ থাকলে—মানে যে ক'জন ওদের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলাম, কিছুতেই বিয়ে হতে দিতাম না। বিয়ে ভেঙে দিতাম। এতে যা হবার হত। ফুলের মত মেয়েটাকে নরক থেকে উদ্ধার করা যেত।

অবিশ্যি ওরা কাউকে জানায় নি। ব্যাপারটা যাতে সকলের অগোচরে হয় সেই চেষ্টাই করেছিল। কেন না কল্যাণের বৌ চায় নি কেউ জানুক। তাহলে তো এই সর্বনাশ করতে পারতো না। কি সাংঘাতিক মেয়েমানুষ রে বাবা! আবার একেই এক কথায় হঠাৎই কল্যাণ বিয়ে করেছিল। বশীকরণের বশ হয়েছিল কি-না তাই বা কে জানে। তা না হলে কোন পুরুষমানুষ এই মেয়েকে বিয়ে করতে পারে? পারে না।......

বৌয়ের যেমনি চেহারা, তেমনি মন। হিংসুটেকুবুদ্ধির ডিপো। অশান্তিকে সংগে করেই নিয়ে এসেছে। কই—বিয়ের আগে তো ওদের সংসারে অশান্তি দেখে নি। ঝগড়াঝাঁটি লাগে নি।

দুদিন যেতে না যেতেই কল্যাণের কানে মন্ত্র দিতে শুরু করল—তোমার সংসার চালান দায়।

—কেন? কল্যাণ জানতে চাইল।

—মা-বেটিতে যে হাড়ে খেতে শুরু করেছে—দুদিনেই তোমার সংসার ডকে উঠবে। কোথাকার রাজ-রাণী, দিনের মধ্যে একশোবার খেতে দিতে হবে।

—ছিঃ ছিঃ, মার সম্বন্ধে ওরকমভাবে কথা বলছো কেন? ভালভাবে বলতে পার না।

—কি বললে। আমি খারাপ। তবে রে। বলেই ঝাঁটা বা বেলুনী নিয়ে কল্যাণকে মারতে উঠত।

আহা! বেচারা কল্যাণ। কিছুই ভেবে পায় না কি করবে। বৌয়ের ভয়ে সাহস করে কিছু বলতেও পারে না। বললেই মারতে আসবে—নয়তো নিজেই বঁটি দা দিয়ে নিজের গলা কাটতে যাবে। এমন ভাব দেখাবে—মনে হবে এই বুঝি গলায় বসিয়ে দিল। আর গালাগালি চিৎকার করে বাড়ি মাথায় করে ফেলবে ওগো! কে আছ গো! আমাকে বাঁচাও। মেরে ফেললে। কাঁদো কাঁদো স্বরে এমন-

৫০ পয়সা লাভ!
ষ্টক থাকা পর্য্যন্ত
৬০ পয়সা দামের
নতুন ডিজাইনের প্লাস্টিকের গেলাস
এখন মাত্র ১০ পয়সায়
এই টিনের ভেতরে পাবেন।
Bournvita
Cadbury's
Bournvita
OFFER!
Plastic Tumbler
ideal food drink
ngth and vigour
450g
net
প্রতি টিনে বোর্নভিটার পরিমাপ আগের মতনই রয়েছে (৪৫০ গ্রাম নীট)
শক্তি, উৎসাহ ও স্বাদের জন্য—ক্যাডবেরিস্ বোর্নভিটা!
Bensons-2536 Ben

ভাবে চেঁচাবে যে, বাড়ির অন্যান্য ভাড়াটিয়ারা এসে জড়ো হবে। কেলেঙ্কারীর একশেষ। শয়তান—এক নম্বরের শয়তান। স্বভাবই ঐ রকম।

কল্যাণ এইসব দেখে আর মানুষের মধ্যে নেই। বুদ্ধি থাকতেও বুদ্ধি নেই। এত লোক দেখে এল—এরকম মেয়েলোক আর দেখে নি। বজ্জাত! শেষমেষ এই অলক্ষ্মী কপালে এসে জুটবে ভাবতে পারে নি। ইচ্ছে করে বাড়ি থেকে চলে যায়। পারে না। সর্বদিকে হাত-পা বাঁধা।

আর একদিন বৌ বললে—দীপা ভীষণ পাজি। বিয়ে দিয়ে দাও। সারাদিন পাউডার, স্নো মাখবে। মিছিমিছি কলেজে যায়। খারাপ ছেলেদের সংগে মিশে। প্রেম করে। স্বভাব ভাল নয়। দুখবে একদিন ভরা তরী ডোবাবে। তুমি ওকে বাড়ি থেকে বিদায় করে দাও যেমন করে হোক।

—কেন?

—আমার আদেশ। বলেই এমনভাবে চেঁচাল, মনে হল দেওয়াল ফেটে গেল।

কল্যাণ ভাবল—মাথা নিশ্চয়ই গোলমাল হয়ে গেছে। পাগল হয়ে গেল না তো! প্রতিদিন কেন তবে এই সব যা-তা কথা বলে। স্নেহের ছোট বোন দীপা ভাল কাপড় পরতে পারবে না। চুল আঁচড়াতে পারবে না। কারোর সংগে কথা বলতে পারবে না। কোন ব্যতিক্রম হলেই খ্যাচখ্যাচ আরম্ভ হয়ে যাবে। শেষ নোটিশ—বাড়ি থেকে বার করে দিতে হবে। মহা ঝামেলা—কেন এরকম করে কিছুই বুঝতে পারল না। এখন কি জবাব দেবে, তা-ও ভেবে পেল না।

—কি চুপ করে রইলে যে। ওকে যদি বার না কর, তবে গায়ে কেরোসিন ঢেলে পুড়িয়ে মারবো। চেন না আমাকে। —ওকে আমি খেতে দিতে পারবো না।

কি সাংঘাতিক কথা। মানুষ না জানোয়ার, বলে কি! কল্যাণ গুম হয়ে গেল। কোন কথাই বলল না। মা'র সংগে যে বুদ্ধি-পরামর্শ করবে তারও উপায় নেই। সব সময় চোখে চোখে রাখে। ভীষণ চতুর। মা বলেছিল—শুধু দীপার সংগেই খারাপ ব্যবহার করে তা নয়, বাড়িতে কোন মেয়েমানুষ এলেই হল। আর সে যদি সুন্দরী হয়, তবে তো কথাই নেই। বৌ এমনভাবে তাকাবে মনে হবে সতীনকে দেখছে। মুখটা ঘুরিয়ে নিয়ে বলবে—কি সেজেছে। এখানে কেন? পাড়ায় গেলেই হয়।

আশ্চর্য ব্যাপার! কোন পুরুষমানুষ গেলে কোন কিছু বলে না। বেশ সহজভাবে হেসে হেসে কথা বলে—চা করে দেয়। বসতে বলে। কুশলসংবাদ নেয়।

যত রাগ মেয়েদের ওপর। নিজে কুৎসিত বলে অন্য কোন মেয়েকে সহ্য করতে পারে না। ওর কাছে দুনিয়ার সব মেয়েরাই খারাপ। ভাল শুধু নিজে। আয়নার সামনে নিজের মুখ দেখলেই মনে হয় ঘৃণা জাগে—কি জঘন্য। আর ভাবে আমার স্বামী এই বুঝি কোন সুন্দরী মেয়েমানুষের প্রতি আসক্ত হল। ওর ধারণা পুরুষ মাত্রই বেইমান, বিশ্বাসঘাতক।

এই ধারণার জন্যই কল্যাণকে কোন মেয়ের সংগে কথা বলতে দেয় না, মিশতে দেয় না। কোন মেয়েমানুষ বাসায় আসুক তাও চায় না। সব সময় সন্দেহ এই বুঝি কোন মেয়ের সংগে প্রেম করছে। এই বুঝি হাতছাড়া হয়ে গেল।

সেই জন্যেই বেশ কিছুদিন যাবৎ দীপার সংগে ও লেগেছে। বিশ্বাস করতে পারছে না। অকারণেই গালাগালি দেয়, পারে তো এই মারে কি মারে। দীপা কল্যাণের সংগে কথা বলুক—তাও সহ্য হয় না। কি সাংঘাতিক নোংরা মন। অনবরতই বলছে দীপা ভাল না—বিয়ে দাও, বাড়ি থেকে বের করে দাও। চরিত্র খারাপ।

এই সব কথাবার্তা শুনে মা-বোনে কাঁদে। এ ছাড়া তো আর কোন পথ নেই। কার কাছে যাবে। দিনরাত ঐ সব বাজে কথা শুনে চোখ-কান বুজে কোনরকমে দিন-রাত্রি শেষ করতে হয়।

কল্যাণকে বলে দেখেছে—কোন ফল হয় নি।

কল্যাণ অতিষ্ঠ হয়ে দু'চারজন বন্ধুকে বলল—ছেলে পাওয়া যায় কি না, দীপাকে বিয়ে দেবে। আমি ভাবলাম কল্যাণ আগের মতই রয়ে গেছে। একটুও পাল্টায় নি। এবার হয়তো দীপার একটা সুরাহা হবে। সেই আনন্দে আমিও দু-একজনকে বলেছি—মেয়েটার বিয়ে হলে নরকযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে। সুখ বলে কি জিনিষ তা তো দেখল না। আমার মনে যে কোন দুর্বলতা ছিল না এমন নয় অথচ বলতে পারি নি; বোধহয় ওদেরও ইচ্ছেটা তাই ছিল, কিন্তু বলে নি।

দীপার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেল। বৌদি চক্রান্ত করে বেনামী চিঠি লিখে কলেজে রটিয়ে দিল। দীপা খারাপ মেয়ে, তার স্বভাবচরিত্র ভাল নয় ইত্যাদি ইত্যাদি। কলেজের অধ্যক্ষ ডেকে দীপাকে সাবধান করে দিল। দীপা আর কি করবে, চোখের জলে বালিশ ভেজাল। এই নরকযন্ত্রণা দিন দিন বেড়েই চলল। দাদার কাছে কোন কথাই বলল না। কেন না ও জানে সে দাদা আর নেই। বৌদি ভিন্ন আর কিছুই জানে না।

শেষ পর্যন্ত ঝগড়াঝাটি সহ্য করতে না পেরে সেই বুড়োটার গলায় মালা দিতে বাধ্য করল দাদা। দীপার কান্না কেউ শুনতে পেল না। নিঃশব্দে মায়ের চোখের জল মুছে চলে গেল। ভাবল মাকে নিয়ে যাবে। কিছুদিনের জন্য তো বৌদির অত্যাচার সহ্য করতে হবে না।

দীপা আর কোনদিন এল না। রেখে গেল না কোন ঠিকানা। চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেল।

দীপা চলে যাওয়ার পর স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল কল্যাণের বৌ। দীর্ঘদিন পর আমাকে দেখে কান্নায় ভেঙে পড়ল কল্যাণ। যেন দীপাকে বিসর্জন দিয়ে সে সুখে নেই। দুঃখে প্রাণ যায় যায়।

যার চোখে কোনদিন জল দেখি নি। আজ হঠাৎ এ দৃশ্য দেখবো—ভাবতে পারি নি। নিশ্চয়ই অভিনয়। কেন না চোখের ভাষা বলতে চাইছে—দেখ কে জিতেছে, তুমি না আমি।

ঘরময় কয়েকটি কথা, কয়েকটি শব্দ প্রতিধ্বনিত হল। মনে হল দীপার কণ্ঠস্বর। অস্ফুট স্বরে ফিসফিসিয়ে কে যেন বলছে—মরে গেছি। আমি মরে গেছি। শালাজদা,—আমি যে বাঁচতে চেয়েছিলাম। আমি—আমি। ......

আর শোনা গেল না। কানের পাশে শিরাগুলি দপ-দপিয়ে উঠল। বুকের ভিতরে বহুকালের একটা ব্যথা কঁকিয়ে সারা দেহে ছড়িয়ে গেল। শরীরে বিন্দু বিন্দু ঘাম। চোখে যেন সব কিছু ঝাপসা দেখছি। অস্বস্তি—কেমন যেন লাগছে। বুঝতে পারছি না।

অবশ অবশ পা নিয়ে রাস্তায় এলাম—ভেতর থেকে সহসা কে যেন সদর দরজা বন্ধ করে দিল।

ভারতে এই প্রথম

৩৫ মিঃ মিঃ বাড়ীর জন্য সিনে প্রোজেক্টর বাড়ীতে বসিয়া আসল সিনেমা দেখার আনন্দ উপভোগ করুন। আপনার পছন্দমত চলচ্চিত্র সাধারণ ঘরের ভিতর পর্দায় টর্চ অথবা ইলেকট্রিক উভয়ের সাহায্যেই দেখিতে পারিবেন। আপনি যেরূপ সিনেমা হলে দেখেন সেইরূপ পুরা মাপের ছবি পর্দার উপর নড়িবে

অভিনয় করিবে এবং নাচিবে। স্পেশাল কোয়ালিটি ৪০ টাকা বিনামূল্যে ১ রীল ফিল্ম, অতিরিক্ত ফিল্ম প্রতি মিটার ১ টাকা।

Rolex India (B. C.—44)
P. Box. 1574, Delhi-6.

শিল্প-বাণিজ্য-অর্থনীতি

রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক

জওহরলাল নেহরু ও কংগ্রেস দল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশের অর্থনীতি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। কংগ্রেস দলের ওপর দক্ষিণপন্থীদের প্রভাব বেশি থাকায় অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় বেসরকারী ব্যবসায়ীদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। যার ফলে ভারতের অর্থনীতিকে মিশ্র অর্থনীতি বলা হয়ে থাকে। সমাজতন্ত্রের আদর্শ ভারত সরকার গ্রহণ করলেও দক্ষিণপন্থীদের প্রবল চাপে সেই আদর্শকে যথাযথভাবে কার্যে রূপায়িত করা কংগ্রেস সরকারের পক্ষে সম্ভব হয় নি। পণ্ডিতজী সর্দার প্যাটেলকে ভয় পেতেন। মোরারজী-কেও তাঁকে স্বীকার করে নিতে হয়েছিল। সিণ্ডিকেটের প্রতিনিধি হিসাবে প্যাটেল বা মোরারজী শ্রেণীর ব্যক্তিরা কেন্দ্রীয় সরকারে থেকে দক্ষিণপন্থী স্বার্থরক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। মিশ্র অর্থনীতির পথ ধরে ভারতবর্ষের একচেটিয়া কারবার এমনভাবে প্রসারিত হয়েছে, যার ফলে সমগ্র অর্থনীতি প্রকৃতপক্ষে তাঁদের স্বার্থেই পরিচালিত হচ্ছে। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের সিদ্ধান্তকে কার্যে রূপায়িত করে ইন্দিরাজী কংগ্রেসের একটি বহু পুরাতন সিদ্ধান্তকে বাস্তবে রূপ দিলেন। দক্ষিণপন্থী কংগ্রেসীরা দলের বামপন্থীদের সমুচিত শিক্ষা দেবার চেষ্টা করছেন ও আগামী দিনেও করবেন। যা হোক সে আলোচনা বন্ধ রেখে কয়েকটি ব্যবসায়ী পরিবারের কর্মকুশলতার দিকে নজর দেওয়া যাক।

টাটা পরিবারের হাতে শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যাঙ্ক ও বীমা কোম্পানী নিয়ে মোট ১৫০টি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া (আমানতের পরিমাণ ২৩৩ কোটি টাকা) ও ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া (আমানত ১০০ কোটি টাকার ওপর) টাটা পরিবারের কর্তৃত্বাধীনে। এ ছাড়া ব্যাঙ্ক অব বরোদাতেও এঁদের শেয়ার আছে। নিউ ইণ্ডিয়া অ্যাসিওরেন্স কোম্পানীর মালিকও এই পরিবারটি। এখানে মনে রাখতে হবে যে, এই অ্যাসিওরেন্স কোম্পানীটি মোট সাধারণ বীমা ব্যবসায়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ দখল করে আছে।

বিড়লা পরিবারও কিছু কম নয়। এঁদের অধীনে বিভিন্ন ধরণের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রায় ৩০০। ইউনাইটেড কমার্সিয়াল ব্যাঙ্ক বিড়লা পরিবারের কর্তৃত্বে পরিচালিত। ব্যাঙ্ক অব বরোদাতেও এঁদের প্রচুর শেয়ার আছে।

ডালমিয়া, জৈন প্রকৃতপক্ষে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের মালিক। ওয়ালচাঁদ হীরাচাঁদের সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া, ব্যাঙ্ক অব বরোদা প্রভৃতির ওপর প্রভাব যথেষ্ট। এমনি দেখা যাবে যে, ভারতের বৃহৎ শিল্পপতিরা কোনও না কোনও ব্যাঙ্ক বা অ্যাসিওরেন্স কোম্পানীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত এবং ঐ সব প্রতিষ্ঠানের আমানতের সাহায্যে দেশ জুড়ে একচেটিয়া কারবারের জাল পেতে ফেলেছেন। শুধু তাই নয়, ফাট্‌কা কারবারে কোটি কোটি টাকা নিয়োগ করে অহেতুক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করিয়ে দীর্ঘকাল ধরে জনসাধারণকে শোষণ করছেন। যে চোদ্দটি ব্যাঙ্ক ভারত সরকার জাতীয়করণ করলেন, তাদের ৩১-১২-৬৮ তারিখের মোটামুটি অবস্থা ছিল এইরূপঃ

1	2	3	4	5	6
Name of Banks	No. of offices	Deposits & other Accounts (in Crores)	Bills dis-counted & Purchased (in crores)	Loans & Advance (in crores)	Bank credit (4+5) in crores
1. Central Bank of India	504	433	55	241	296
2. Bank of India	250	395	34	219	253
3. Punjab National Bank	544	356	34	175	209
4. Bank of Baroda	333	314	30	166	196
5. United Commercial Bank	323	241	39	105	144
6. Canara Bank	302	146	23	74	97
7. United Bank of India	178	144	14	86	100
8. Dena Bank	214	122	15	59	74
9. Union Bank of India	213	115	18	51	69
10. Allahabad Bank	128	113	7	63	70
11. Syndicate Bank	254	112	12	59	71
12. Indian Overseas Bank	188	93	24	34	58
13. Indian Bank	190	85	14	43	57
14 Bank of Maharashtra	140	73	4	46	50
	3761	2742	323	1421	1744

এর থেকে পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, কী পরিমাণ অর্থ একশ্রেণীর ব্যবসায়ীকুলের হাতে ছিল এবং যার অধিকাংশই ফাটকা কারবারে ব্যবহৃত হয়েছে।

ইন্দিরাজী বাঙ্গালোর কংগ্রেসে অর্থনীতি পুনর্গঠনের জন্য ৪টি বিষয়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

(১) বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ, (২) একটি কমিশন গঠন করে একচেটিয়া কারবার সম্পর্কে যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন, (৩) কৃষিশ্রমিকের ন্যায্য অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ ও (৪) ব্যক্তিমালিকানায় কতটা জমি থাকবে তার সীমা নির্ধারণ। বলা বাহুল্য বর্তমান অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে উঠতে হলে ন্যূনতম ঐ সিদ্ধান্তগুলিকে যথাযথভাবে কার্যে প্রয়োগ করতে না পারলে সাধারণের দুর্গতির সীমা থাকবে না। ১৯শে জুলাই প্রধানমন্ত্রী জাতির উদ্দেশে তাঁর ভাষণে বললেন:

Certainly, public ownership of the major banks will help to eliminate the use of bank credit for speculative and unproductive purposes, particularly to the extent that it is encouraged at present by the association of a few leading groups with some of our major banks.

প্রধানমন্ত্রীর উক্তি থেকে এ কথা পরিষ্কার যে, কতিপয় শিল্পপতি বড় বড় বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির আমানত ঋণ হিসাবে সংগ্রহ করে ফাটকা কারবারে ও নিজেদের সঙ্কীর্ণ স্বার্থে খাটিয়েছেন যা বন্ধ করতে হলে এবং দেশের পুঁজি সাধারণের স্বার্থে নিয়োগ করতে হলে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা ছাড়া গত্যন্তর নেই।

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের মূল লক্ষ্য হল জনগণের সঞ্চয় সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট পরিকল্পনানুসারে ঐ সঞ্চয়কে জাতীয় স্বার্থে উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা। কৃষির দ্রুত উন্নতি, মাঝারি ও ছোট শিল্পের উন্নতি, রপ্তানীবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, নতুন ব্যবসায়ীদের উৎসাহ ও সুযোগদান, অনুন্নত অঞ্চলকে অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নত করা সর্বাংশে না হলেও কিছু পরিমাণ সম্ভব হবে বলে এখন আশা করা যেতে পারে।

আমাদের দেশের কিছু কিছু অর্থনীতির পণ্ডিতদের চিন্তা অন্য খাতে বয়। তার একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। লেখক বা পুস্তকের নাম উহ্য রাখাই যুক্তিসঙ্গত।

Comprehensive plan of nationalisation of all commercial banks would also be open to a serious objection. Such a step would sound the death-knell of an independent race of bankers whose advice and service are worth having. If, however, the Govt. are wedded to a general policy of socialisation and the banks have to be nationalised, such nationalisation should follow, and not precede the socialisation of the major trades and industries.

মাননীয় অধ্যাপক ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ীদের উচ্ছেদের সম্ভাবনায় শঙ্কিত হয়েছেন। এঁদের উপদেশ ও সেবা বহু মূল্যবান বলে মনে করেছেন। শুধু তাই নয়, প্রধান প্রধান ব্যবসা ও শিল্প জাতীয়করণ না করে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত করা অনুচিত বলে উপদেশামৃত বর্ষণ করেছেন। পণ্ডিতদেব বক্তব্য পাঠ ও পরীক্ষায় খাতায় উদ্গিরণ করা ছাড়া পরীক্ষায় পাশ করা যায় না। সেদিক থেকে এ সব পণ্ডিতদের বক্তব্যের মূল্য আছে।

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের বিপক্ষে যে সব বক্তব্য রাখা হয় তা একান্তই মামুলী। ব্যক্তি সঞ্চয় ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সঞ্চয় সাধারণত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলিতে থাকে। সরকার যদি এই ব্যাঙ্কগুলির মালিক হন, তাহলে সঞ্চয় সম্বন্ধে যে গোপনীয়তা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি অবলম্বন করত—তার কোন অর্থই থাকবে না। আয়কর বিভাগ রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি থেকে সহজেই প্রয়োজনীয় খবর সংগ্রহ করতে পারবে। অর্থবানদের এইটেই সবচেয়ে বড় ভয়। ঈশ্বরের করুণায় জনগণকে শোষণ করে আয়কর ফাঁকি দিয়ে তাঁরা যে সঞ্চয় করেছেন তার খবরই যদি সরকার পেয়ে যান —তাহলে তাঁদের মতে পবিত্র স্বাধীনতা খর্ব হল বৈকি!

ব্যাঙ্ক এ্যাকাউণ্ট সম্পর্কে গোপনীয়তা অবলম্বন করবে, কী করবে না, সেই প্রশ্নের সঙ্গে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের প্রশ্নকে এক করে দেখার যথার্থই কি কোনও অর্থ আছে? যুক্তিবলে গোপনীয়তার প্রশ্ন সম্পূর্ণ আলাদা করে দেখাই সঙ্গত।

ঋণ দেবার ব্যাপারে পূর্বের ন্যায়নীতি চালু থাকবে—এ কথা এখন না ভাবাই ভাল। পরিকল্পিত অর্থনীতিতে ফাটকা কারবারে অর্থ বিনিয়োগ যত কম হয় দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। সমাজতন্ত্রকে আদর্শ হিসাবে ধরলে এ কথা স্বীকার না করে উপায় নেই যে, জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে দেশের অর্থনৈতিক জীবন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় মূল দায়িত্ব সরকারের। রাজনীতির দ্বারা অর্থনীতি প্রভাবিত হওয়া উচিত নয় বলে যাঁরা মনে করেন—তাঁদের এ কথা স্পষ্টভাবে বোঝা উচিত যে, পরিকল্পনার মাধ্যমে উৎপাদনের ক্ষেত্রেও যেমন সুস্পষ্ট নির্দেশ থাকবে, তেমনি লগ্নীর ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট নীতি ও আদর্শ থাকবে। তা না হলে জাতীয় সঞ্চয় ব্যবসায়ীদের খেয়াল-খুশি মত বিনিয়োগ করতে দিলে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য। ভারতবর্ষের মিশ্র অর্থনীতিতে সে সত্য প্রকাশ পেয়েছে বলে বিশ্বাস করি।

অধ্যাপক জি ডি এইচ কোল তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Money—Its Present and Future-এ বলেছেন, "....a planned economic system implies public control over the Commercial Banks...."

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে দক্ষিণপন্থী রাজনীতিকদের অনুপ্রবেশ বন্ধ হওয়া সর্বাগ্রে আবশ্যক। বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীর প্রতিনিধি হিসেবে এইসব খ্যাতিমান ব্যক্তি নিজেদের প্রভাব খাটিয়ে আপনাপন প্রভুর সেবায় জাতীয় সঞ্চয় ব্যবহারের চেষ্টা করতে পারেন। পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হলেও যে সকল বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সরকারী শ্রমনীতিকে পুরোপুরি মেনে নেবেন না—ঐ সব প্রতিষ্ঠানেও কোনওরূপ অর্থ সাহায্য করা উচিত হবে না। এর ফলে কিছু উত্তাপের সৃষ্টি হলেও হতে পারে। বিশেষ শ্রেণীর সম্পদ আহরণের এতে যদি কিছু ব্যাঘাত ঘটে তাতে জনগণের কিছু যায় আসে না।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত হওয়ায় জনসাধারণের সঞ্চয় এখন সম্পূর্ণ নিরাপদ হল। যে সুদের হারে পূর্বে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে ঋণ দিত এখন তা থেকে কম সুদেই ঋণ দেওয়া সম্ভব হবে। কারণ এখন আশা করা যায় ব্যাঙ্ককে অনেক কম ঝুঁকি নিতে হবে।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির পরিচালন ব্যবস্থা উন্নততর হওয়া বাঞ্ছনীয়। ১৪টি ব্যাঙ্ককে একত্রিত করে একটি অতি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করা সম্ভবত ঠিক হবে না। এতে 'লাল ফিতে'র উপদ্রব বাড়বে। যে সুনাম ও দক্ষতার সাথে এই ব্যাঙ্কগুলি এতকাল কাজ করে এসেছে—তা কিছুতেই নষ্ট হতে দেওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। প্রধানমন্ত্রী সম্ভবত সেই কথা স্মরণে রেখেই সর্বাগ্রে ব্যাঙ্ক কর্মীদের সহযোগিতা

কামনা করেছেন। বর্তমানে তাঁদের সম্মুখে যে চ্যালেঞ্জ এসেছে সেই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে প্রধানমন্ত্রী আহ্বান জানিয়েছেন।

ব্যাঙ্কগুলির পরিচালন ব্যবস্থা কেমন হবে তা এখনই বলা সম্ভব নয়। 'ব্যাঙ্কিং কমিশন' এ-বিষয় নিয়ে চিন্তা করছেন। কমিশনের সুচিন্তিত অভিমতের ভিত্তিতে সরকার যথাবিহিত ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন। তবে আপাতত ঠিক করা হয়েছে যে, প্রতিটি ব্যাঙ্কই তার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলবে। এবং ব্যাঙ্কের যিনি প্রধান কর্মকর্তা তিনিই কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীনে ব্যাঙ্ক পরিচালনা করবেন। জাতীয়করণের পূর্বে ব্যাঙ্কগুলির যে সব পরিচালক সমিতি ছিল—তা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। তার পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সরকার পরামর্শদাতা সমিতি নিয়োগ করেছেন।

একচেটিয়া কারবারীদের ভয় হয়েছে তাঁরা প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য ঐ ব্যাঙ্কগুলি থেকে পাবেন না। এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, সরকার ঐসব কারবারীদের ঋণ না দেবার নীতি কিছু ঘোষণা করেন নি। তবে ফাটকা কারবারের জন্য ঋণ দেওয়া সম্ভবত হবে না। এখন এই ব্যবসায়িকুলের বক্তব্য যে, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ফলে আগামী দিনে ভারতীয় অর্থনীতি বন্ধ্যা অবস্থাপ্রাপ্ত হবে। কারণ সরকার-নিয়ন্ত্রিত অলাভজনক শিল্পপ্রতিষ্ঠানে বেশি অর্থনিয়োগ হবে। এবং ব্যাঙ্কগুলি ঐ সব প্রতিষ্ঠানগুলিকে যে ঋণ দেবে তা আর ফিরে পাবে না। এক কথায় এই সম্প্রদায়ের বক্তব্য হল ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ফলে সরকার শুধু জাতীয় সঞ্চয় নষ্ট করবেন।

বর্তমানে সরকারী ব্যাঙ্ক থেকে অর্থ ঋণ হিসাবে পেতে কিছু অসুবিধা হলে বড় বড় ব্যবসায়ীরা সরাসরিভাবে জনসাধারণের কাছ থেকে টাকা জমা নিয়ে তাঁদের ব্যবসায়ের কার্যকরী মূলধন সংগ্রহ করতে চেষ্টা করতে পারেন। কাজেই সরকারের উচিত হবে দেশের সর্বত্র ব্যাঙ্কের শাখা খুলে জনসাধারণের সঞ্চয় সংগ্রহ করার চেষ্টা করা।

মহাজন সম্প্রদায় দীর্ঘকাল ধরে ব্যাঙ্কের কাজ করে আসছেন। টাকা ধার দেবার যথেষ্ট সুযোগ থাকার ফলে এই সম্প্রদায় জনসাধারণের কাছ থেকে সঞ্চয় সংগ্রহ করতে বিশেষ উৎসাহবোধ করবে। এ-সব নানা রকম কথাই এখন শোনা যাচ্ছে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় গত এক মাস ধরে নানারকম মতামত বেরোচ্ছে। ধনিকশ্রেণীর মুখপাত্র চেম্বার অব কমার্সগুলি সরকারী নীতিকে স্বাগত জানাতে পারেন নি। অবশ্য তাঁদের পক্ষে এটাই স্বাভাবিক। ব্যতিক্রম যে নেই তা নয়। ভূপাল চেম্বার অব কমার্স-এর সভাপতি শ্রীনাথুমল জৈন বলেছেন, বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি রাষ্ট্রায়ত্ত হবার ফলে ফাটকা কারবারের জন্য ঋণ পাওয়া শক্ত হবে এবং জিনিসপত্রের দামও কমবে।

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ফলে সরকারের হাতে চোদ্দটি ব্যাঙ্কের আমানত প্রায় ২৭০০ কোটি টাকা এল। যেহেতু ঐ অর্থের অধিকাংশই বিভিন্ন কারবারে নিয়োগ করা হয়েছে, সেহেতু সরকার প্রকৃতপক্ষে এখনই হাতে কিছু পাচ্ছেন না। তবে প্রতি বছর ঐ ব্যাঙ্কগুলিতে প্রায় ৬০০ কোটি টাকার মত নতুন আমানত আসে। কাজেই ঐ অর্থ সরকার পরিকল্পনা মাফিক নিয়োগ করতে পারবেন। নিউ স্টেটসম্যান পত্রিকা Ten days that shook India নামক প্রবন্ধে বলেছেন ঃ

With the leading banks nationalised, more than 20,000 m. rupees will be available for investment in national development at the Govt.'s discretion.

ধনতান্ত্রিক দেশেও বড় বড় ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করা হয়েছে, কিন্তু তার ফলে সেই সব দেশে ধনতন্ত্র বিলুপ্ত হয় নি। উদাহরণস্বরূপ ফরাসী দেশের নাম করা যেতে পারে। আসল কথা হল, ঋণ দেবার নীতি যদি সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি লক্ষ্য রেখে নির্ধারিত না হয় তাহলে ব্যাঙ্ক বা ঐ ধরণের প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করলে দেশে সমাজতন্ত্র এসে যায় না। আমাদের দেশে জীবনবীমা কোম্পানীগুলি ও ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রায়ত্ত হয়েছে বেশ কিছুদিন আগেই। কিন্তু এই সব প্রতিষ্ঠানগুলি এখনও বড় কারবারীদেরই বেশি ঋণ দিয়ে থাকেন। কাজেই একচেটিয়া কারবার অপ্রতিহত গতিতে এদেশে বেড়ে ওঠবার সুযোগ পেয়েছে। অবশ্য তাদের এই ক্রমবর্ধমান শক্তি সঞ্চয় করতে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির সহযোগিতা ছিল প্রধান। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের ফলে সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে আজ যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে তাকে সার্থক করে তুলতে হলে ছোট ও মাঝারি ব্যবসায়ীদের আর্থিক প্রয়োজন সর্বাগ্রে মেটাতে হবে। কৃষির উন্নতির জন্য যথাযথ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে এবং লক্ষ্য রাখতে হবে যে, একচেটিয়া কারবার যেন আর প্রসারিত হতে না পারে। সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে কৃষি উৎপাদন বাড়াবার চেষ্টা এদেশে দীর্ঘকাল ধরে হচ্ছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই যে, বড় বড় জোতদাররাই সমবায় ব্যাঙ্কগুলি থেকে বেশি ঋণ পান। সামগ্রিকভাবে এতে চাষীর উন্নতি হয় কি? ঋণদান ব্যবস্থা নতুন করে ঢেলে সাজাতে হবে। সমাজতান্ত্রিক নীতির যথার্থ প্রয়োগ এক্ষেত্রে অনতিবিলম্বে করার প্রয়োজনীয়তা সর্বাধিক।

সারা ভারতের প্রগতিশীল শক্তি ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন। অনেকে ইন্দিরা-সরকারের এই সিদ্ধান্তকে ভারতের অর্থনীতির ক্ষেত্রে একটি দৃঢ় পদক্ষেপ বলে বর্ণনা করেছেন। এখানে একটি কথা বলতে চাই। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদের ওপর ফেবিয়ান সোস্যালিস্ট ও লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকস-এর প্রভাবই বেশি।

ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ ও রাষ্ট্রপতি নির্বাচন নিয়ে দিল্লীর রাজনৈতিক আবহাওয়া এখন খুবই তপ্ত। প্রগতি ও প্রতিক্রিয়া—এই দুই শিবিরে সংগ্রাম প্রতি মুহূর্তেই অনিবার্য হয়ে উঠছে। বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা প্রত্যয়ের সঙ্গে বলা চলে যে, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি আজ নিজের অন্তর্দ্বন্দ্বেই গভীর সমস্যার সম্মুখীন। চিরকালের মত স্তব্ধ হবার আগে এই শক্তি হয়তো শেষবারের মত টিকে থাকার চেষ্টা করবে। তবে সেই সংগ্রামে, ইতিহাস বলে ঃ জনগণের জয় নিশ্চিত।

—প্রদ্যোতকুমার রায়

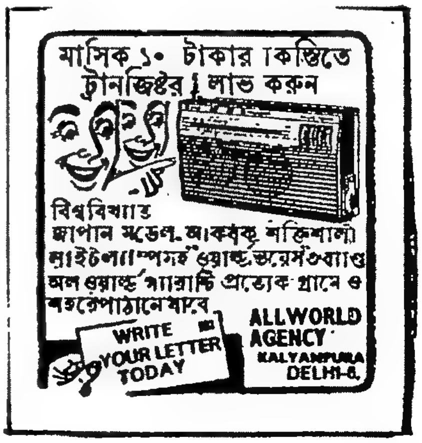

শিল্পী-মিছিল

১লা আগস্ট '৬৯, শহরের দুটি দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশ (আনন্দবাজার ও গণশক্তি) "শিল্পীদের গণডেপুটেশন"। গত ৩১শে জুলাই চারুকলা নামক এক-শিল্পসংস্থা ১১ দফা দাবির ভিত্তিতে এক শিল্পী মিছিল বার করেন। মিছিলটি প্রথমে বিধানসভা ভবন ও পরে মহাকরণ পরিভ্রমণ করেন এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর কাছে তাঁরা তাঁদের ১১ দফা দাবির বিষয় আলোচনা করেন। চারুকলা সংস্থার বিভিন্ন দাবিগুলির মধ্যে আছে বেকার শিল্পীদের কর্মসংস্থান, কলকাতায় স্থায়ী চিত্রশালা, শিক্ষকদের মাসিক মাহিনার হার নির্ণয়, আকাদেমী অফ ফাইন আর্টসের দুর্নীতির তদন্ত; ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজকে সরকারী আওতায় আনা ইত্যাদি ইত্যাদি।

বিগত '৬৭-র ১৪ই মে, আকাদেমী অফ ফাইন আর্টসের বেনামাদারীতে "অল ইণ্ডিয়া ফেডারেশন অফ ওয়ার্কিং আর্টিস্ট" নামক এক শিল্পসংস্থা বিভিন্ন দাবির ভিত্তিতে শিল্পী মিছিল সংগঠন করে মহাকরণ গিয়েছিলেন। এই সংস্থার উল্লেখিত শিল্পীরা হলেন শ্রীনীরোদ মজুমদার, রথীন মৈত্র, গণেশ হালুই প্রমুখ।

ঐ বছরই '৬৭-র ১৪ই জুলাই আর একটি—"ওয়েস্ট বেঙ্গল আর্টিস্ট ইউনিয়ন" নামে এক বৃহৎ গণতান্ত্রিক শিল্পীসংস্থা, শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়, বিজন চৌধুরী ও বারীন দে'র নেতৃত্বে এক মহতী শিল্পী শোভাযাত্রা সংগঠন করে সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার থেকে শুরু করে বিধানসভা ও পরে আকাদেমী অফ ফাইন আর্টসের সামনে পথসভা করেন। ওয়েস্ট বেঙ্গল আর্টিস্ট ইউনিয়নের দাবি ছিল মোট ১৬টি।

(১) চিত্ররচনার উপকরণ সংগ্রহের সমস্যার সমাধান।

(২) শিল্পীদের জীবিকানির্বাহের সুযোগ সন্ধান।

(৩) স্থায়ী চিত্রশালা নির্মাণ।

(৪) শিল্পবিদ্যায় শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন।

(৫) গত ১০০ বছরের শিল্পীদের কাজ ও শিল্পের ইতিহাস রচনা প্রকাশ।

(৬) শিল্পীদের জন্য "শিল্পপল্লী" রচনা।

(৭) শিল্পীদের সু-চিকিৎসার সুব্যবস্থা।

(৮) কেন্দ্রীয় এবং স্থানীয় সমকালীন চিত্রশালার জন্য কলাবস্তু ক্রয় সমিতি স্থাপন।

(৯) শিল্প শিক্ষার ডিপ্লোমার মান নির্ণয়।

(১০) জরিপ ও অন্যান্য কারুকর্মে নিযুক্তদের মাসিক মাহিনার মান নির্ণয়।

(১১) শিল্প শিক্ষকদের মাসিক মাহিনার মান নির্ণয়।

(১২) সরকারী কলা বিদ্যালয়ে ছাত্রদের আরো সুযোগ-সুবিধার বিধি-ব্যবস্থা।

(১৩) ইণ্ডিয়ান আর্ট কলেজকে সরকারী আওতায় আনা।

(১৪) মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিল্প শিক্ষকদের মাসিক মাহিনার হার নির্ণয়।

(১৫) বিজ্ঞাপন-ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত শিল্পীদের সমস্যার সমাধান।

(১৬) আকাদেমী অফ ফাইন আর্টসের পরিচালকবৃন্দের দুর্নীতির পোষণ ও ধনিক তোষণের বিরুদ্ধে তদন্ত।

এই ওয়েস্ট বেঙ্গল আর্টিস্ট ইউনিয়ন যথেষ্ট সম্ভাবনা নিয়ে শুরু হলেও যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতনের সঙ্গে সঙ্গে তা ভেঙে যায়।

এই নিয়ে মোট তিনটি শিল্পী প্রতিনিধি দল গেল যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীদের কাছে, তাঁদের পক্ষ থেকে অবশ্য পালনীয় কয়েকটি সাংস্কৃতিক দায়িত্ব সম্বন্ধে সজ্ঞান করে দিতে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিল্পী প্রতিনিধি দলের দাবির মূল বক্তব্য প্রায় এক। শুধু সময় ও পরিস্থিতি অনুসরণে স্বল্প কিছুটা অদল-বদল করা হয়েছে। বাংলায় যুক্তফ্রন্ট সরকার কায়েম হলেও ঐ সব কলা ও সাংস্কৃতিক দাবিগুলি আজও অপূর্ণ রয়ে গেছে। তাই এমন শিল্পীদের অভিযান আরো অনেক এবং বারে বারে সংগঠিত হওয়ার প্রয়োজন আছে, যতদিন না ঐ অবশ্য পালনীয় দাবিগুলি পূরণ হচ্ছে।

তবে এবারের এই 'চারুকলা' গোষ্ঠী সংগঠিত শিল্পী অভিযানের একটা বৈচিত্র্য আছে। এতদিন বাংলার বিভিন্ন বামপন্থী রাজনৈতিক দলগুলির সমবেত চেষ্টায় সংগঠিত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার কাছে যে-সব শিল্পী দল (বিশেষ করে দ্বিতীয় প্রতিনিধি দলটি) যাঁরা বাংলার শিল্পীদের বাঁচার দাবি নিয়ে হাজির হয়েছিলেন, তাঁরা সবাই বিভিন্ন দলমত পোষিত শিল্পিবৃন্দ। আর বর্তমানে আলোচ্য প্রতিনিধি দলটি হল একটি বিশেষ বামপন্থী রাজনৈতিক ভাবধারায় বিশ্বাসী ও একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলপুষ্ট শিল্পিবৃন্দ।

ঘটনাক্রমে এবারের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় ঐ বিশেষ রাজনৈতিক দলটিই সবচেয়ে শক্তিসম্পন্ন দল। স্বভাবতই (স্ব-দলের) "চারুকলা" গোষ্ঠীর এই প্রতিনিধি অভিযানটি অন্তত কয়েকজন প্রভাবশালী মন্ত্রীর নেকনজরে পড়লেও পড়তে পারে। এর আগের সমবেত প্রচেষ্টাগুলি ব্যর্থ হয়েছে, প্রবীণ শিল্পীদের অনুরোধ-উপরোধ ব্যর্থ হয়েছে, এবার দলীয় স্বার্থে যদি এইসব অবশ্য পালনীয় সাংস্কৃতিক দায়িত্ব পালনে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা এগিয়ে আসেন তাহলে এখন সীমিত গোষ্ঠিস্বার্থ, সচেতন প্রচেষ্টাকেও রসিকবৃন্দ স্বাগত জানাবে, কারণ—এমন প্রচেষ্টার সাফল্য দল-মত নির্বিশেষে সমগ্র দেশ ও জাতির ওপর বর্তায়। —শিলাদিত্য

রঙ্গমঞ্চ স্বদেশে এবং বিদেশে

শিলালিপি

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অনন্যা

দ্বিতীয় অঙ্ক

[আগে সুজাতা এবং তার পেছনে অনাদি বেরিয়ে যাবে। অল্পক্ষণ স্টেজ খালি থাকবে। তারপর উত্তেজিতভাবে কথা কাটাকাটি করতে করতে অভিজিৎ ও অলকা ঢুকবে।]

অলকা—তোমার জন্য একটু শান্তিতে ব্রেকফাস্টটাও খেতে পারলাম না।

অভিজিৎ—বেশ তো ফিরে যাও—গিয়ে এইবার একলা বসে আর একবার খেয়ে এস। যে মেয়েকে চিনিই না—তার সম্বন্ধে ঐ একঘেয়ে অভিযোগ শুনব আর ব্রেকফাস্টও খাব, এ আমার ধাতে সয় না—

অলকা—তাই বলে না খেয়ে উঠে আসবে?

অভিজিৎ—তোমাকে তো বললাম, ফিরে গিয়ে খাওয়া শেষ করে এস।

অলকা—আমি এখানে খেতে আসি নি—আমার এখানে আসার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তোমার সঙ্গে কতকগুলো বিষয়ে কথা বলা।

অভিজিৎ—তাহলে অনুগ্রহ করে খাওয়ার বিষয়ে আলোচনা না করে, কথাই বল। এখন এ-ঘরে কেউ নেই-ও—সুতরাং তোমার কথা বলার কোনো বাধা নেই। [পেছনের দিকে গিয়ে জানলা দিয়ে বাইরের বস্তির দিকে দেখবে তারপর বিরক্তভাবে বলতে থাকবে।] বম্বে ছেড়ে এখানে আসাটাই ভুল হয়ে গেছে।

অলকা—কোনো বিষয়েই তোমার এতটুকু ধৈর্য নেই। এই জন্যেই নিজেও শান্তি পাও না অন্যকেও শান্তিতে থাকতে দাও না।

অভিজিৎ—আমাকে চমৎকার বুঝেছ! গত কুড়ি বছর ধরে I am feeling within my bones যে অনেক কথা আমাকে বলতে হবে লেখার ভেতর দিয়ে—কেন জানি না নিজের বক্তব্য ফুটিয়ে তুলতে পারি না ভাষায়—কিসের একটা অভাবে আমার সব যেন পন্ড হয়ে গেছে—আর তুমি এসেছ উপদেশ দিতে, ধৈর্য ধরতে।

অলকা—আমি তোমাকে বুঝতে পারি নি একথা তো বহুবার বলেছ। যাই হোক অযথা আমাকে যা তা বলে, বা এই জায়গাটার ওপর দোষারোপ করে তো লাভ নেই। এখানে আসবার কথা তো তুমিই suggest করেছিলে।

অভিজিৎ—তার মানে, যেহেতু এ জায়গাটা আমিই বেছেছি, সুতরাং আমাকে বলতে হবে এখানকার সব কিছুই ভাল—এখানকার বিশ্রী ব্রেকফাস্ট অতি চমৎকার খেতে—এখানকার এই পচা বস্তিটি অতি সুন্দর—কি বল?

অলকা—(হেসে উঠে) শোন অভিজিৎ।

অভিজিৎ—বল।

অলকা—নিজেদের মধ্যে খোলাখুলিভাবে আলোচনা করবার এমন সুযোগ হঠাৎ পাওয়া যাবে না—এখানে যখন এসেইছি—

অভিজিৎ—বেশ তো। শুরু কর—

অলকা—আচ্ছা, কাল যখন এখানে এসে পৌঁছলে তখনও কি তোমার মনটা এমনি তিক্ততায় ভরা ছিল?

অভিজিৎ—মোটেই না। গত দু' মাস আমি বেশ ভাল ছিলাম। ভাবলাম এখানে এসে নিজেদের মধ্যে একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা করতে হবে। I wanted either to mend it—or end it. ভেবেছিলাম একটা কিছু ঠিক হয়ে গেলে পর, নিশ্চিন্তভাবে আমার কাজ শুরু করতে পারবো।

অলকা—আমিও এই ভেবেই এসেছিলাম। আর আশা করেছিলাম—সেইটেই আমার বোকামি—কিন্তু সত্যিই আশা করেছিলাম......

অভিজিৎ—যাই হোক.........কি বলতে যাচ্ছিলে?

অলকা—এখানে আসা পর্যন্ত তোমার মনে যদি বেশ শান্তিই ছিল, তবে হঠাৎ এই পরিবর্তনটা এল কেন?

অভিজিৎ—(বিরক্তির সঙ্গে) ঘুরেফিরে আবার কিন্তু আমাদের আলোচনাটা গিয়ে পর্যবসিত হবে সুজাতা সেনের ওপর।

অলকা—বোধহয় তুমি ঠিকই বলেছ।

অভিজিৎ—তুমি নিশ্চয় সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি করতে চাও না যে, আমি বহুদিন থেকে সুজাতা সেনকে চিনি।

অলকা—তুমি যখন বলছ, আমি মেনে নিচ্ছি তোমাদের আগে পরিচয় ছিল না। কিন্তু একথা নিশ্চয় অস্বীকার করবে না যে, মিস্ সেনকে দেখবার পর থেকে তোমার মধ্যে একটা change এসেছে?

অভিজিৎ—সেটা আর কিছু নয়—আমি শুধু জানতে চাই মিস্ সেন আমার জীবনের এত সব গোপন খবর জানতে পারলেন কি করে!

অলকা (ইতস্তত করে)—রাগ কোরো না ......আমার ভেতর থেকে কে যেন সাবধান করে দিচ্ছে......তোমাদের দুজনের ভেতর এমন একটা কিছু আছে......

অভিজিৎ (রূঢ়ভাবে)—এ আলোচনা কিন্তু আগেই একবার হয়ে গেছে।

অলকা—অভিজিৎ! হয়তো আমি বোকার মত কথা বলছি—তবু বিশ্বাস করো, আমি মনে মনে যা উপলব্ধি করছি তাই তোমাকে বললাম। তোমার আমার মাঝে এরই অদৃশ্য presence আমি যেন বরাবর অনুভব করেছি। এরই ভয়ে আমি সব সময়ে সন্ত্রস্ত হয়ে রয়েছি।

অভিজিৎ—কিসের ভয়?

অলকা—যে শেষ পর্যন্ত এ এসে তোমাকে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। [ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠবে।]

অভিজিৎ—This is unfair অলকা!

[অনাদিবাবু ঘরে ঢুকবেন।]

অনাদি—মিস্টার গুপ্ত!

অভিজিৎ (রাগতস্বরে)—আপনার জ্বালায় কি মশায় আমরা নিজেরা বসে একটু আলোচনা করতেও পারবো না।

অনাদি (বিরক্তির সঙ্গে) আমি জিজ্ঞেস করতে এসেছিলাম লাঞ্চে আপনাদের জন্য বিশেষভাবে কিছু করতে হবে কি-না।

অভিজিৎ—মহাকর্তব্যজ্ঞান দেখাতে এসেছেন। অন্যের কথা শোনবার এত কৌতূহল কেন মশায়?

অনাদি—সিটিংরুমটা গোপন কথা বলবার জায়গা নয় মিস্টার গুপ্ত—নিজেদের ঘরে বসে আলোচনা করলেই পারতেন।

অভিজিৎ—(উত্তেজিতভাবে) আমাকে উপদেশ দিতে আসবেন না—

অনাদি—দেখুন, ভদ্রভাবে কথা বলুন—আপনার ওই চোখরাঙানোকে আমি ভয় করি না—ভাল না লাগলে অন্য হোটেলে যান।

অভিজিৎ—কি বললেন? সামান্য হোটেলওয়ালা (এগিয়ে আসবে)......

অনাদি—মারবেন নাকি?

অভিজিৎ—দরকার হলে—(আরও এগিয়ে এসে অনাদিবাবুর দুই কাঁধ হাত দিয়ে চেপে ধরবে।)

[দরজার ওপার থেকে সুজাতার গলা শোনা যাবে।]

সুজাতা—অভিজিৎ! ফাদার আরমিয়ারের উপদেশ ভুলে যেও না।

[চমকে উঠে অভিজিৎ অনাদিবাবুর কাঁধ থেকে হাত সরিয়ে নেবে—সঙ্গে সঙ্গে সুজাতাও ঘরে ঢুকবে।]

অভিজিৎ—ফাদার ভারমিয়ার। সে-কথা তুমি.....আপনি কি করে জানলেন?

সুজাতা—(এ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে) অনাদিবাবু, দয়া করে আপনি ভেতরে যান।

অনাদি—শুনলেন তো? কি বিশ্রীভাবে...

সুজাতা—আমি ও'র হয়ে ক্ষমা চাইছি—কিছু মনে করবেন না—পরে আপনার সঙ্গে কথা বলব।

[অনাদিবাবু চলে যাবেন। অলকা ও অভিজিৎ বিস্ময়ভরে সুজাতার দিকে চেয়ে থাকবে।]

অলকা—(অভিজিৎকে) ফাদার ভারমিয়ার ......উনি তোমাকে কি বলছিলেন তাঁর বিষয়ে?

অভিজিৎ—ছেলেবেলায় St. Xavier's School-এ পড়তাম। একজন সহপাঠী আমাকে একদিন অপমান করে—রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে এমনভাবে তার গলা টিপে ধরেছিলাম যে, ফাদার ভারমিয়ার এসে ছাড়িয়ে না দিলে সেদিন ব্যাপারটা মারাত্মক হয়ে দাঁড়াতে পারতো। (হঠাৎ সুজাতার দিকে ফিরে) তারপর কি হয়েছিল? বলতে পারেন তার পরের কথা? আপনি তো সর্বজ্ঞ!

সুজাতা—(যেন স্বপ্নাবেশে বলছে) তাঁর চেহারা ছিল খুব লম্বা এবং যোয়ান। দুই হাত দিয়ে আপনার কাঁধ ধরে প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়েছিলেন এই বৃদ্ধ মানুষটি—আপনার দুরন্ত রাগ কোথায় মিলিয়ে গিয়েছিল এবং ভয়ে আপনি শিউরে উঠেছিলেন—

অভিজিৎ—(ধীরে ধীরে) তিনি সেদিন বলেছিলেন—তোমার মনের ভেতর একটা পাগলা কুকুর বাস করছে গুপ্ত—এটাকে যদি বাইরে আসতে দাও তবে তোমার মহা সর্বনাশ ঘটবে—সব সময় একথা স্মরণ রেখে নিজেকে সংযত করবে। (সুজাতার প্রতি) ফাদার ভারমিয়ার কি একথা আপনাকে বলেছিলেন? আপনি নিশ্চয় তাঁকে জানতেন?

সুজাতা—(শান্তভাবে) না—আমি একবার তাঁকে দেখতে পেয়েছিলাম—ঐ অবস্থায় আপনার কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিতে।

অভিজিৎ—(অধৈর্যভাবে) সে কি করে সম্ভব?

সুজাতা—এই ঘটনাটার কথা আপনি ভাবছিলেন—দিল্লীতে একটি হোটেলে সিটিংরুমে বসে—তার আগেই হোটেলের একটি কর্মচারীর ব্যবহারে আপনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন—

অভিজিৎ—তিন বছর আগে?

সুজাতা—হ্যাঁ, তিন বছর আগে।

অভিজিৎ—(ওর দিকে মুখোমুখি হয়ে বসে) এ নিয়ে আমাদের বিশেষভাবে আলোচনা হওয়া দরকার—কোনো ওজর-আপত্তি দেখিয়ে এড়িয়ে গেলে চলবে না—আপনি বিশদভাবে আমাকে বুঝিয়ে বলুন।

অলকা—না, না, অভিজিৎ। চল আমরা এখান থেকে চলে যাই। কোন দরকার নেই ওই সব কথা আলোচনার।

অভিজিৎ—(অত্যন্ত বিরক্তির সঙ্গে) আঃ, বাধা দিও না অলকা—তুমি এখান থেকে যাও।

[অলকা দু'হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠবে।]

সুজাতা—(সহানুভূতিভরে) মিসেস গুপ্ত!

অলকা—(হতাশভাবে) আপনি সব সময় আমাদের মাঝে অদৃশ্যভাবে এসে দাঁড়িয়েছেন—দু'জনের মধ্যে একটা ব্যবধান সৃষ্টি করেছেন।

সুজাতা—(ধীরে ধীরে) এ আপনার ভুল ধারণা।

অভিজিৎ—(অসহিষ্ণুভাবে) অলকা, দোহাই তোমার, এখান থেকে যাও—আমাকে ব্যাপারটা স্পষ্টভাবে বুঝতে হবে।

[অলকা কাঁদতে কাঁদতে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবে।]

সুজাতা—আমারই উচিত ছিল এখান থেকে চলে যাওয়া।

অভিজিৎ—তাহলে আমাকেও সেই সঙ্গে যেতে হোত—কারণ আমাকে এই ব্যাপারটা ভালভাবে বুঝতে হবে। আমার সম্বন্ধে এমন অনেক কথাই আপনি জানেন যা আর কেউ জানে না। কি করে এটা সম্ভব হল? এ কি কোনোরকম অলৌকিক ব্যাপার—clairvoyance বা telepathy?

সুজাতা—আমি এর নাম দিয়েছি পর্যবেক্ষণ। সাধারণ চোখে দেখার সঙ্গে এর তফাৎ আছে—এই পর্যবেক্ষণের ভেতর দিয়ে শব্দ, গন্ধ, স্পর্শ, ভাবাবেগ, চিন্তাধারা সব কিছুকেই অনুভব করা যায়।

অভিজিৎ—দূর থেকেও কি এই পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব।

সুজাতা—সময় সময় অনেক, অনেক দূর থেকেও এভাবে দেখা যায়। এমন কি দূর অতীত বা অনাগত ভবিষ্যতের ছবিও স্পষ্টভাবে ভেসে ওঠে চোখের পর্দায়।

অভিজিৎ—আপনার এই যে দেখবার ক্ষমতা এটা তো সবকিছুর বেলায়ই প্রযোজ্য হওয়া উচিত—তবে আমাকেই বিশেষভাবে কেন্দ্র করে আপনার এই দৃষ্টিশক্তি জাগ্রত হয়ে উঠেছে কেন বলতে পারেন?

সুজাতা—এ প্রশ্ন আমার মনেও এসেছে। Perhaps it began as a mere accident—like—like telephone wires getting Crossed. অথবা এও হতে পারে আমাদের এই পৃথিবী বা এই পার্থিব সময়ের গণ্ডীর বাইরে এমন একটা মহাজগৎ এবং মহাকালের অস্তিত্ব আছে যেখানে আমাদের দুজনের মধ্যে একটা আত্মিক যোগ রয়েছে। আমার জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে এটুকু বেশ স্পষ্টভাবে বুঝতে শিখেছি যে, মানুষের সত্তার একটা বড় অংশই আমাদের এই পৃথিবীর স্থান-কালের বাইরে অবস্থান করছে।

অভিজিৎ—আচ্ছা, এ-বিষয় আপনার প্রথম অনুভূতির কথা বলুন।

সুজাতা—পাঁচ বছর আগে একবার আমার বিশ্রী রকমের ফ্লু হয়। জ্বর কমবার পর—কিন্তু তখনও ভালভাবে সেরে উঠি নি—নাট্যাচার্য পরিচালিত আপনার একটি নাটক দেখতে যাই—

অভিজিৎ—আপনি কি ড্রামা-ক্রিটিক?

সুজাতা—না—এ সম্বন্ধে আমার যা জ্ঞান তা আপনার নাটক পড়ে এবং অভিনয় দেখে—

অভিজিৎ—সত্যিই মনে হচ্ছে যেন আপনার সঙ্গে কতকালের পরিচয়!

সুজাতা—আপনার নাটকটির নাম ছিল 'বারিদবরণ'। প্রথম অভিনয় রাত্রে দর্শকেরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলো। অন্য এক নাট্যালয়ের বিখ্যাত মোটা স্বত্বাধিকারী মিস্টার মজুমদার আপনাকে dinner-এ নেমন্তন্ন করেছিলেন কলকাতার এক নাম করা হোটেলে। তিনি আপনাকে বোঝাবার চেষ্টা করছিলেন যে, নাট্যাচার্যের সঙ্গে থাকলে আপনার বইয়ের commercial success হবে না। কিন্তু ও'র স্টেজে প্রতিটি নাটক ৬০০।৭০০ রজনী চলে—সুতরাং আপনার ও'র কাছেই চলে আসা উচিত।

অভিজিৎ—আমি এর প্রতিবাদ করি।

সুজাতা—জানি। এর পর উনি আপনাকে টাকার লোভ দেখান—

অভিজিৎ—আমি ও'কে যাচ্ছেতাইভাবে গালাগাল দিই এবং বলি যে, নাট্যাচার্যের মঞ্চে আমার নাটক একরাত্রি অভিনয় হওয়াটাকেও আমি ও'র মঞ্চে সাতশো রজনী অভিনয়ের থেকে গৌরবের কথা বলে মনে করি।

সুজাতা—এরপর অনেক রাত্রে আপনি বাড়ি ফিরে আসেন—ঘুম আসে না—লেখবার টেবিলে বসে বসে চিন্তা

[illegible] থাকেন—মনটা তখন আপনার গভীর বিষাদে ভরা......

অভিজিৎ—আপনি এত কথা কি করে জানতে পারলেন।

সুজাতা—ঐ থিয়েটার থেকে ফিরে এসে আমি একটা ইজি চেয়ারে শুয়ে শুয়ে আপনার নাটকটি সম্বন্ধে চিন্তা করছিলাম—সেই প্রথম—একের পর এক এইসব দৃশ্যগুলো আমার চোখের ওপর ভেসে উঠলো—

অভিজিৎ—আপনি ঠিকই বলেছেন— সে রাত্রে বাড়িতে ফিরে আমার মনটা বিষাদে ভরে গেছিল—কি কারণে এটা হয়েছিল বলতে পারেন ?

সুজাতা—(হেসে উঠে) মোটা স্বত্বাধিকারীর সঙ্গে ঝগড়া করবার জন্য নয়—সম্পূর্ণ অন্য কারণে।

অভিজিৎ—(অসহিষ্ণুভাবে) সেই কারণটাই জানতে চাইছি।

সুজাতা—বলছি। সে রাত্রে আপনার নাটক যথেষ্ট প্রশংসা পেয়েছিল দর্শক ও সমালোচকদের কাছ থেকে। আপনি নিজে কিন্তু বুঝতে পেরেছিলেন এ সাফল্যের মূলে ছিল নাট্যাচার্যের অভিনয়। আসলে আপনার কাছে স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে, নাটকটির ভেতর অনেক defects রয়ে গেছে।

অভিজিৎ—(ওর দিকে অবাক হয়ে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকবে) আশ্চর্য! আপনি যা বললেন তা একেবারে খাঁটি সত্যি কথা। কিন্তু আমার এই মনের ভাবটা তো আমি কাউকে বলি নি—সুতরাং অন্যের কাছ থেকে একথা জানা আপনার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

সুজাতা—এইভাবেই আমার প্রথম অনুভূতি শুরু হয়।

অভিজিৎ—এর পরে আমার সম্বন্ধে আর কি কি ঘটনা দেখেছেন ?

সুজাতা—এত দেখেছি যা এক-আধ দিনে বলে শেষ করা যাবে না। তবে এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, তিন বছর ক্রমান্বয়ে প্রতিদিন আপনার জীবনের অনেক ছবিই আমার চোখের ওপর ভেসে উঠেছে।

অভিজিৎ—কি একটা বিশ্রী ধরণের জীবন আমাকে কাটাতে হবে এখন থেকে! যা বলব, যা করবো, যা ভাববো সব প্রকাশিত হয়ে পড়বে সম্পূর্ণ একজন অপরিচিতার কাছে।

সুজাতা—(কোমলভাবে) আমি তো তোমার অপরিচিতা নই অভিজিৎ।

অভিজিৎ—(নিজের অজান্তেই সে যেন সুজাতার অনেক কাছের মানুষ হয়ে আসবে) তুমি ঠিকই বলেছ সুজাতা। বহুদিন পাশাপাশি থেকেও একজন মানুষ অপরজনকে এতটুকুও চিনতে শেখে না। আবার এক-একজনকে দেখবার পর থেকেই মনে হয় এ আমার মনের মানুষ।

সুজাতা—আচ্ছা আমাকে কি তুমি একেবারেই চিনতে পার নি ?

অভিজিৎ—আমার সব কিছু যেন কেমন গুলিয়ে যাচ্ছে। গতরাত্রে এ-ঘরে ঢুকে প্রথমটায় তোমাকে অলকা বলে ভুল করলাম। তারপর মনে হোল তোমার সঙ্গে আগে কোথাও আলাপ হয়েছে। তোমাকে অলকার সঙ্গে ভুল করলাম কেন বলতে পার ?

সুজাতা—এমনও তো হতে পারে যে, আগাগোড়া অলকাকেই আমার সঙ্গে ভুল করে চলেছ ?

অভিজিৎ—তাই কি! এ তুমি কি বলছ!

সুজাতা—না, না, একথা আমি বলতে চাই নি। আমি বলতে চাইছিলাম তুমিও যেন মাঝে মাঝে ব্যাকুলভাবে আমাকে আহ্বান করতে।

অভিজিৎ—তাই কি তুমি এখানে এসেছ ?

সুজাতা—অনেকটা তাই। দু' বছর আগে তুমি যখন অলকাকে বিয়ে করলে—আমি কঠিন পণ করলাম যে, এবার তোমার জীবন থেকে সরে যেতে হবে অনেক দূরে। এই জন্যই লণ্ডনে গেলাম—প্রথমটায় কষ্ট হলেও আস্তে আস্তে নিজের মনকে সম্পূর্ণ মুক্ত করে ফেললাম তোমার সম্পর্কে। এতটা সহজ হলাম যে, দেশে রওনা হবার আগে তোমার কথা মনে আসাতে এতটুকু ভয় পেলাম না। কারণ তখন আমি নিশ্চিন্ত যে, আগেকার মত আর আমি তোমার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ব না।

অভিজিৎ—এ সঙ্কল্প রাখতে পেরেছিলে ?

সুজাতা—তাই যদি পারতাম তাহলে কি তোমার ওই টেলিফোনে এখানে আসবার কথা জানতে পারতাম ?

অভিজিৎ—আচ্ছা, আমি তোমার presence-টা কখনও feel করি নি কেন ?

সুজাতা—তুমি কি সত্যিই তাই মনে কর ?

অভিজিৎ—নিশ্চয়ই!

সুজাতা—বছর তিনেক আগের একটা ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিই। বেশ গভীর রাত্রে তুমি বসে বসে তোমার 'দিগন্তের মায়া' নাটকটি লিখছিলে—কিন্তু শেষ অঙ্কে চরিত্রগুলোকে সামলাতে পারছিলে না—শেষে লেখা ছেড়ে ইজিচেয়ারে গিয়ে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলে—এর মধ্যে একবার উঠে ঘরের আলো নিভিয়ে দিলে—কিন্তু সে রাত্রিটা ছিল পূর্ণিমার রাত্রি—জানলা দিয়ে আলো এসে পড়েছিল তোমার মুখে—তুমি ভারি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলে—চেষ্টা করেও ঘুম আসছিল না।

অভিজিৎ—তারপর ?

সুজাতা—তোমার এই অবস্থাটা আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম নিজের ঘরে বসে। হঠাৎ যেন আমার মনে হোল আমি নিজের ঘরে নেই—তোমার মাথার কাছে দাঁড়িয়ে আছি—তারপর তোমার মাথায় আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে তোমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিলাম।

অভিজিৎ—এ তুমি কি বলছ ? অথচ এখন আমার সে রাত্রির কথা স্পষ্ট মনে হচ্ছে—তুমি আমার মাথায় হাত বুলোতে লাগলে—আমি তোমার হাতটা কপালে চেপে ধরে রাখলাম কিছুক্ষণ। পরে কখন ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন ঘুম ভাঙল মনে হোল সমস্ত ব্যাপারটাই স্বপ্নে দেখেছিলাম।

সুজাতা—এক ধরণের স্বপ্নই একে বলতে পার।

অভিজিৎ—না, না, স্বপ্ন নয়—তুমিই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সত্য সুজাতা। এখন আমি বুঝতে পারছি তোমার অভাবটাই আমাকে জীবনে কখনও স্থিরভাবে কিছু করতে দেয় নি—তাই আমার লেখার ভেতর এতকাল স্পষ্ট করে তুলতে পারি নি নিজের স্বপ্নলোকের আলোছায়ার খেলাকে। আজ তোমাকে পেয়েছি—আর আমার চিন্তা নেই সুজাতা—নতুনভাবে আবার আমি লেখা শুরু করবো—সবাইকে দেখিয়ে দেব আমার আসল শক্তি কতোটা। জান সুজাতা, অনেক কিছু বড় কাজ আমার করবার আছে—

সুজাতা—জানি, কিন্তু আমাকে তুমি মুক্তি দাও অভিজিৎ—

অভিজিৎ—এখন আর তা হয় না সুজাতা——চল আমরা দুজনে আজই এখান থেকে কোথাও দূরে চলে যাই—

সুজাতা—কিন্তু অলকা ?

অভিজিৎ—তাকে বলবো আমাদের মধ্যে মিটমাট হওয়াটা সম্ভব নয়—সুতরাং we must end this relationship. তারপর একটা গাড়ির বন্দোবস্ত করতে হবে। তুমিও তোমার জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও—

সুজাতা—সেজন্য আমার সময় লাগবে না।

[অভিজিৎ টেলিফোন তুলে কথা বলতে থাকবে—]

অভিজিৎ—কে ? অনাদিবাবু! হ্যাঁ, শুনুন, আমি অভিজিৎ গুপ্ত—লাঞ্চের পরই আমরা চলে যাব—না, আগে ঠিক ছিল না। হ্যাঁ, এখনই ঠিক করলাম—শুনুন অনাদিবাবু—একটা ট্যাক্সির বন্দোবস্ত করবেন আর.....

[কথা বলতে থাকবে এবং ধীরে ধীরে যবনিকা]

রংঢং

সৌজন্যবোধের অভাব

গত ১৫ই আগস্ট সকাল দশটায় ভারতী সিনেমায় 'বনজ্যোৎস্না' ছবির ট্রেড শো'র ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই ধরণের শো'তে সংবাদপত্রের চলচ্চিত্র পর্যালোচক এবং চলচ্চিত্রের ব্যবসায়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করা হয়। ছবি নির্মাণের সঙ্গে যাঁরা জড়িত তাঁরাতো আমন্ত্রিত হবেনই। পৃথিবীর সব দেশেই এই ব্যবস্থা রয়েছে। ছবির প্রাক-মুক্তি অথবা মুক্তির দিন এই শো'কে একটা উৎসব বলা যেতে পারে। আসলে এরূপ শো' এক ধরণের প্রচার। সবচেয়ে কার্যকরী প্রচার। কারণ চিত্রতারকারা আসেন, সংবাদপত্রের লোক আসেন, কাহিনীকার, পরিচালক, টেকনিশিয়ান ও প্রযোজক আসেন। সকলের দেখা-সাক্ষাৎ হয়, কথাবার্তা হয়; মতামত বিনিময়ের ফল ছবির পক্ষেই আসে। সংবাদপত্রের পর্যালোচকদের ওপর প্রভাব সৃষ্টি করার পক্ষে এ ধরণের শো'কে একটি কার্যকরী উপায় বলে মনে করা হয়। আর এক দিকে, এই তারকা, কাহিনীকার, টেকনিশিয়ান ও সাংবাদিক সম্মেলন দেখার জন্য রাস্তায় যাঁরা ভিড় করেন তাঁদের মুখে মুখে ছড়িয়ে যায় ছবির কথা। সুতরাং ট্রেড শো'গুলি ছবির প্রযোজকরা যে করেন তা তাঁদের ব্যবসায়ের সাফল্যের উদ্দেশ্যেই করে থাকেন। যেখানে মুনাফার জন্য কাজ হয় সেখানের প্রতিটি কাজের পেছনে উদ্দেশ্য থাকে। সেই উদ্দেশ্যের জন্যই ট্রেড শো', সাংবাদিকদের ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ করা, তারকাদের উপস্থিত করে চমক সৃষ্টি করার চেষ্টা ইত্যাদি।

কিন্তু ১৫ তারিখে ভারতী সিনেমায় যা ঘটেছে তাতে সেই প্রবাদবাক্যের কথা স্মরণ করে দিয়েছে।...কার নিমন্ত্রণ নাকি না আঁচালে বিশ্বাস নেই। সেদিন কোন চলচ্চিত্র সমালোচক প্রেক্ষাগৃহে ঢোকবার সুযোগ পান নি। যাঁরা প্রেক্ষাগৃহে ঢুকেছেন তাঁরাও বসবার জন্য আসন পান নি। চিত্র-পর্যালোচকরা বসবার জায়গা পাচ্ছেন কি পাচ্ছেন না তা দেখবার মত কাউকেই দেখা যায় নি; এমন কি তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করার মত আমন্ত্রণকারীদের সৌজন্যবোধ দেখা যায় নি। যেখানে বসবার আসন আছে এক হাজার সেখানে দুই হাজারেরও বেশি আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবকে উপস্থিত করে আমন্ত্রণকারীরা তখন ফটো তুলে আত্মপ্রচারের কাজে ব্যস্ত ছিলেন। যাঁদের আমন্ত্রণ করেছেন তাঁদের সুবিধা-অসুবিধার দিকে দেখবার সময় কোথায়? পরিচালক দীনেন গুপ্ত সবেমাত্র দুটি ছবি করেছেন। এই দুটি ছবিতেই তাঁর মেজাজ এমন চড়া হয়ে যাওয়ার কথা নয় যে, যাঁর কাহিনী অবলম্বন করে তিনি আজ খ্যাতির আসন লাভের স্বপ্ন দেখছেন সেই প্রখ্যাত সাহিত্যিক উপেক্ষিত হবেন। কাহিনীকার প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সেদিকে তাকাবার ফুরসৎ পরিচালকের ছিল না। তিনি কি তখন তারকাদের সঙ্গে ছবি তুলতে ব্যস্ত থাকতে পারেন? সাহিত্যিক শ্রীনারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীমতী আশা দেবী এবং তাঁদের পুত্র প্রযোজকের একান্ত অনুরোধেই ছবি দেখতে গিয়েছিলেন, বিশেষ করে তাঁর কাহিনীকে কিভাবে চলচ্চিত্র রূপ দিয়েছে তা তাঁকে দেখানো প্রযোজকের কর্তব্য। কিন্তু নারায়ণবাবুরা প্রেক্ষাগৃহে ঢুকতেই পারলেন না। তিনি যে গেছেন তা অনেকের নজরে পড়েছে, এবং আমন্ত্রিত দর্শকদের মধ্যে তাই অনেকেই তাঁদের আসন দেবার জন্য চেষ্টা করছিলেন; কিন্তু আমন্ত্রণকারীরা তখন তারকাদের সঙ্গে ছবি তুলতে ব্যস্ত! নারায়ণবাবুরা আসন না পেয়ে ফিরে যাওয়া যে প্রযোজক-পরিচালকের পক্ষে কত বড় অমর্যাদাকর ব্যাপার, সে-কথা বোঝার মত সংস্কৃতি এই সংস্কৃতি-স্রষ্টাদের আছে কি না জানি না। কারণ সংস্কৃতি ব্যাপারটা এ'দের কাছে বেচা-কেনার ব্যাপার মাত্র, বাজারের পণ্য।

আমন্ত্রণকারীরা হয়ত বলবেন এত লোক এসে গেছেন যে, তাঁরা কি করবেন। তার জবাবে বলা যায়, এত লোককে আমন্ত্রণ করা হয় কেন? সংবাদপত্রের পর্যালোচক, কাহিনীকার ও চিত্র নির্মাণের ব্যাপারে দায়িত্বশীলদের জন্য আসনগুলি সংরক্ষিত রাখা যেত না কি? আমন্ত্রিতরা যে ফিরে গেছেন তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করার মত সৌজন্যবোধেরই বা অভাব কেন?

এই অসৌজন্যের জন্য সেদিন অনেকে ক্ষুব্ধ হয়ে ফিরে এসেছেন। যদিও এরূপ ঘটনা বড় একটা হয় না, কিন্তু সেদিনের ব্যাপারটা চলচ্চিত্র-শিল্পে নিন্দনীয় নজির হয়ে থাকল। চলচ্চিত্র শিল্পে যাঁরা শালীনতাবোধসম্পন্ন, তাঁরা সকলেই এই ব্যাপারে দুঃখিত হবেন।

—সুজন

'হ্যাপি আলেকজান্দার' ফরাসী ছবিতে ফ্রানকইসে রিয়ন

চিত্র-আলোচনা

ফরাসী চলচ্চিত্র

গত ১৫ই থেকে ২০শে আগস্ট কলকাতায় লাইটহাউস সিনেমায় ফরাসী চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই উৎসব উদ্বোধন করেছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়। ভারত-ফরাসী সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচী অনুসারে সরকারী উদ্যোগে এই উৎসব সংগঠিত হয়েছে। ফরাসী ছবি দেখার জন্য চিত্রামোদীদের মধ্যে দারুণ চাঞ্চল্য দেখা গেছিল। টিকেট করে ছবি দেখার ব্যবস্থা সর্বসাধারণের জন্য মুক্ত ছিল। সকালে চলচ্চিত্র সমিতিগুলির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। সমিতির সদস্যরা একটি করে ছবি দেখার সুযোগ পেয়েছেন।

ফরাসী ছবি দেখার আগ্রহের সুযোগ নেবার জন্য টিকেটের চোরা কারবার হয়েছে শোনা যায়। ছবিগুলি আন-সেন্সার্ড শুনে একশ্রেণীর দর্শক অধীর হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তাঁরা একেবারে নিরাশ হয়েছেন। আন-সেন্সর্ড দৃশ্যের যে চিত্র তাঁরা কল্পনা দেখেছিলেন তেমন কোন দৃশ্য তো ছিলই না, উপরন্তু ব্রাসো ও রেনে'র ছবি ছিল বুদ্ধি দিয়ে বিচার করবার মত। সুতরাং স্থূল রুচির দর্শকদের চিৎকারে দর্শকদের অসুবিধা হয়েছে।

প্রদর্শিত ছবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য রবার্ট ব্রাসোর "মৌচেৎ" আর আলা রেনে'র "আই লাভ ইউ, আই লাভ ইউ"। ব্রাসোর মৌচেৎ এক ১৪ বছরের বালিকা। অনাদর ও উপেক্ষার মধ্যে তার জীবন চলছে। বাড়িতে পীড়িত মা'র সেবায় ক্লান্ত, স্কুলে রূঢ় ব্যবহারে অপমানিতা।

হিন্দী ছবি 'মন কা মীত' ছবিতে লীনা

ফরাসী চলচ্চিত্র উৎসবে প্রদর্শিত রবার্ট ব্রাসোর 'মৌচেৎ'-এ নাদিন নরটিয়ের।

সহানুভূতিহীনতায় সে ক্লান্ত, বিষণ্ণ। একদিন বাড়ি ফেরার পথে রাস্তা হারিয়ে সে সারারাত বনে থেকে যায়। মত্ত বনরক্ষীর নজরে পড়ে এবং বালিকার সরলতার সুযোগ নিয়ে সে তাকে বলাৎকার করে। বাড়িতে এসে দেখে তার মা'র মৃত্যু হয়েছে। সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় দুধ আনতে কিন্তু পথে তার মনের অবস্থার পরিবর্তন ঘটে ; সে তার বিষণ্ণ জীবনের সমাপ্তি ঘটায়। সহানুভূতিহীনতা ও উপেক্ষার প্রতিক্রিয়া বোঝাবার জন্য ব্রাসো অনেক চমৎকার চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন। সরলগতি এই ছবিটি উচ্চ শিল্পবোধের প্রকাশ।

আলা রেনে' আমাদের দেশে 'হিরোসীমা মন-আমোর'-এ বাজীমাৎ করেছেন। তার পরে 'যুদ্ধ শেষ' একশ্রেণীর শিল্পবোদ্ধাকে আনন্দ দিয়েছেন। রেনে'র বক্তব্য প্রকাশের মাধ্যম যৌনকেলী। এবার তিনি এবসার্ড নাটকাশ্রয়ী হয়েছেন তাঁর "আই লাভ ইউ, আই লাভ ইউ" ছবিতে। জটিল আঙ্গিকে সহজ জিজ্ঞাসাকে দেখতে

জাতীয় সিনেমার শিশু চলচ্চিত্র হীরের প্রজাপতি'তে গণেশ বাগচী, সুচিত্রা রায় ও রাজলক্ষ্মী দেবী

কেমন লাগে রেনে' যেন তাই এখানে পরীক্ষা করে দেখতে চেয়েছেন। তাই তিনি বর্তমানে এবসার্ড ধর্মিতার পথে গেছেন। এককালের কমিউনিস্ট রেনে'র এবসার্ডে গিয়ে পৌঁছনো, সহজকে জটিল করা এবং শেষ পর্যন্ত একটা অনাস্থার ভাবকে শিল্পের আবরণে মহৎ করার চেষ্টা এই ছবিগুলিতে রয়েছে। এই ছবিতে ভালবাসা, ভালবাসার জিজ্ঞাসা এবং প্রেম সম্পর্কে মানুষের তৃপ্তি অতৃপ্তিকে নিয়ে খণ্ড খণ্ড ঘটনায় স্মৃতিচারণের মাধ্যমে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে। ছবির নায়ক আত্মহত্যায় ব্যর্থ হয়ে হাসপাতালে যায়, ছাড়া পেলে এক-দল ডাক্তার তাকে এক পরীক্ষাকেন্দ্রে নিয়ে আসে। পরীক্ষায় তার মনের গতি এবং অতীতের কথা জানা যায়, যে অতীত তাকে বিব্রত করছে তা দিয়ে সে নিজের মূল্যায়ন করে।

ক্লডে বেরীর "দি ওল্ড ম্যান এণ্ড দি চাইল্ড" এক মানবিকতার ছবি। যুদ্ধের সময় এক ইহুদী দম্পতি তাদের শিশু-পুত্রকে বাঁচাবার জন্য দূরাঞ্চলে এক খৃস্টান বৃদ্ধের কাছে পাঠিয়েছিল। বুড়ো-বুড়ীর সংসারে ছেলেটি খুব আদর-যত্নে ছিল। বুড়ো মানবিক হলেও ভয়ানক ইহুদী ও কমিউনিস্ট বিদ্বেষী। মার্শাল পেঁতাকে সমর্থন করা যে নাৎসী আধি-পত্যকে স্বীকার করে নেওয়া সে বোধ তাঁর ছিল না। এক সাধারণ মানুষের মধ্যে নাৎসী প্রচার যে কিরকম বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে এই বুড়ো তার এক নিদর্শন।

পিয়েরে এতেৎ-এর ছবি 'দি গ্রেট লাভ' প্রধানত তিনটি চরিত্রকে কেন্দ্র করে মানুষের ভেতর আর বাইরের জীবনের একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছে। কৌতুকের রসে ছবিটি তার ঘটনা বিস্তার করেছে। পিয়েরে বিয়ে করতে এসে নিজেকে জিজ্ঞাসা করে ফ্লেরেসকে বিয়ে করছি কেন—আরো কত মেয়ে তো তার জীবনে এসেছে তাদের যে কোন একজনকে বিয়ে করতে পারত। কেনই বা ধর্মযাজক থেকে আরো যে কোন পেশায় না গিয়ে সে শ্বশুরের ব্যবসায় একজন পরিচালক হল। আসলে মানুষের ভালবাসা বা পেশা সবই ঘটনার ফলশ্রুতি। অফিসের সেক্রেটারী অ্যাগনেসকে দেখে সে মুগ্ধ তাকে সে ভালবাসা জানাতে গিয়ে হাস্যাস্পদ হল। আসলে ভালবাসা স্থিতিশীল কিছু নয়—সঙ্গ, চপলতা, উন্মামতা মানুষকে আসক্ত করে। জীবন যদি গতিহীন ও গতানুগতিক হয় তবে একঘেয়েমী এসে গ্রাস করবে। পিয়েরের মত মনে হবে সে যেন ফ্লোরেসের পরি-বর্তে তার মা'র সঙ্গ লাভ করেছে। ফ্লোরেসের সাময়িক অনুপস্থিতির পর এক তরুণের সঙ্গে তার ফিরে আসা পিয়েরের মনে ঈর্ষা সৃষ্টি করে এবং তার-পরে ওরা নিজেদের জীবনকে ফিরে পায়।

'হ্যাপি আলেকজান্দার'-এ জীবনের ওপর অন্যের আধিপত্য এবং তা থেকে মুক্তি পাবার কথা বলা হয়েছে। সাধারণত পুরুষ নারীদের ওপর আধিপত্য করে, এখানে নারীর আধিপত্য দেখান হয়েছে। আলেকজান্দার এক খাটিয়ে কৃষক (ছবিতে মনে হয়েছে জমিদার)। স্ত্রীর কাছে তার কোন ব্যক্তিত্ব নেই। স্ত্রীর কড়া শাসনে তার সুকুমার প্রবৃত্তিগুলিও চাপা পড়ে গেছে। তার এক কুকুর পোষা নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে মত বিরোধ হল, সেদিন অনেক দিনের পোষমানা আলেকজান্দার বিদ্রোহ করল। তার কয়েকদিন পরে স্ত্রী মারা যায়। এবার যেন সে অবসর পেল। পুরো দু'মাস সে শুয়ে কাটায়। ইতিমধ্যে নানা ঘটনার মধ্যে দোকানী মেয়ে আগাথার প্রতি সে আসক্ত হয়। বিয়ে করতে গীর্জায় এসে সে অনুভব করল আগাথার মধ্যেও সেই অনুশাসনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। অমনি সে গীর্জা থেকে সরে যায় একমাত্র সঙ্গী কুকুরটিকে নিয়ে, অনির্দিষ্টের পথে। ছবিটি পরিচালনা করেছেন ইভস রবার্ট।

এই উৎসবে প্রদর্শিত আর দুটি ছবি "সুইমিং পুল" এবং "প্রফেসনাল হ্যাজার্ডস"।

দুস্থ যাত্রাশিল্পীদের সাহায্য

যাত্রাসংস্থা তরুণ অপেরার কর্তৃপক্ষ দুস্থ যাত্রাশিল্পীদের সাহায্যার্থে আগামী তেসরা সেপ্টেম্বর মহাজাতি সদনে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিগত তেসরা জুন অভিনীত 'হিটলার' পালার বিক্রয়লব্ধ অর্থের সমস্তটাই শিল্পীদের প্রিয়জনদের হাতে তুলে দেবেন, এদিনেও সেই সুখ্যাত পালা 'হিটলার'-এর পুনরভিনয়ের আয়োজন আছে, অনুষ্ঠানে সভাপতিরূপে থাকছেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। অনুষ্ঠান শুরু ছ'টায়। অভিনয় সাড়ে ছ'টায়।

সংবাদকণী

মধু বসু অসুস্থ

প্রখ্যাত চিত্র পরিচালক, নাটক ও সংস্কৃতি জগতের অন্যতম পুরোধা শ্রীমধু বসু গুরুতর অসুস্থ হয়েছেন। তিনি কিছুকাল পর্যন্ত অসুস্থ রয়েছেন। প্রকাশ, রাজ্যপাল শ্রীবসুর অসুস্থতার খবর শুনে উদ্বিগ্ন হয়েছেন এবং তাঁর চিকিৎসার জন্য এক হাজার টাকার চেক পাঠিয়েছেন। শ্রীমধু বসুর স্ত্রী শ্রীমতী সাধনা বসুও দীর্ঘদিন যাবৎ অসুস্থা রয়েছেন।

'দি ব্রাদার কারামাঝভ'-এর চিত্ররূপ

চিরায়ত সাহিত্যরচয়িতা ডস্টয়েভস্কির সাহিত্যের চিত্ররূপ দেওয়া কঠিন কাজ। সোভিয়েট ইউনিয়নের সুপরিচিত চলচ্চিত্র পরিচালক ইভান পিরিয়েভ এক দশক আগে ডস্টয়েভস্কির "ইডিয়ট"-এর চিত্ররূপ দিয়েছিলেন। সেই চিত্ররূপ দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে। এবার তিনি চিত্ররূপ দিলেন 'ব্রাদার কারামাঝভ'—বিশ্ব সাহিত্যে সর্বাধিক জটিল যে সাহিত্য।

পিরিয়েভের জীবনে এটিই শেষ ছবি। বহির্দৃশ্যে ছবির কাজ করতে করতে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তিনি মারা যান। হঠাৎ মারা যাওয়ায় তিনটি কাজ তিনি অসমাপ্ত রেখে গেছেন। 'মোক্রেয়ীর ঘটনা;—যখন ডিমিট্রি আসবে গ্রুশেনকাকে নেবার জন্য। "দি ট্রায়াল" এবং "দি টক উইথ দি ডেভিল" এই কাজগুলি শেষ পর্যন্ত শেষ করেছেন মিখেইল উলিয়ানভ (ডিমিট্রি) এবং কিরিল লাভ্রোভ (ইভান কারামাঝভ)।

পিরিয়েভের আগে এই বিখ্যাত উপন্যাসের তিনটি চলচ্চিত্ররূপ হয়েছে। সবাক চিত্রের প্রথম বছরে জার্মানীতে একটা উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই ছবির পরিচালক এফ, ওটসেপ। তার পরে ইতালীয় জেনতিলুওমো ১৯৪৭ সালে আর একটি ছবি করেন। পিরিয়েভ যখন 'ইডিয়ট' ছবিতে কাজ করছেন তখন আমেরিকান পরিচালক আর, ব্রুকসের "ব্রাদার কারামাঝভ" পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দেখান হচ্ছে। এই ছবিটি নিয়ে অনেক বিতর্ক উঠেছিল, সমালোচকদের মতে ছবিটিতে গোয়েন্দা কাহিনীর অংশে বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। ছবিতে অভিনয় করেছেন জার্মান অভিনেত্রী মারিয়া শেল এবং হলিউডের অভিনেতা ইয়ুল ব্রাইনার।

পিরিয়েভের ছবি ৭০ এম, এম পর্দার উপযোগী এবং দেখতে সময় লাগবে ৩ ঘণ্টা ৪৫ মিনিট। "সত্য কি? এবং সাধারণভাবে সত্যের অস্তিত্ব কি আছে?" এই জিজ্ঞাসাকে কেন্দ্র করে ছবি অগ্রসর হয়েছে। মৃত্যুর কিছুদিন আগে এক সাক্ষাৎকারে পিরিয়েভ বলেছিলেন: 'ইডিয়ট'-এর কাজ চলার সময়েই আমি 'কারামাঝভ' নির্মাণের কথা ভাবি। ডস্টয়েভস্কির প্রতি আমার আকর্ষণ দীর্ঘদিনের, শিল্পগত রসোত্তীর্ণতায় এমন করে দুর্ভাগ্যকে দেখাতে আর কেউ পারে না। রাশিয়ার প্রতি তাঁর ভালবাসা অসীম। গণতন্ত্রের ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান এবং জীবনের প্রতি এমন ভালবাসা আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমাদের কাজ উপন্যাসের মনস্তাত্ত্বিক দিকটা ছবিতে প্রতিফলিত করা এবং "স্মেরদিয়াকভইজম" ও "কারামাঝভইজম"-কে দেখানো। যা আমাদের মধ্যে এখনো দেখা যায়।

নিউ এম্পায়ারে 'দি ফক্স' ছবিতে স্যাণ্ডি ডেনিস।

পান্না-হীরে-চুনী' ছবিতে সুখেন দাস, অনুপকুমার ও জ্যোৎস্না বিশ্বাস

ভারতীয় দল ও অধিনায়ক প্রসঙ্গে

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

ভারতীয় দল এবং অধিনায়ক প্রসংগে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। পত্র-পত্রিকায় মন্তব্যের যেন আর শেষ নেই। তার অবশ্য সংগত কারণও আছে। মাঝে তো মাত্র আর কয়েকটা দিন। তারপরই নিউজিল্যাণ্ড ক্রিকেট দল ইংলণ্ড সফর শেষ করে ফিরতি পথে এসে হাজির হবে ভারতে। আর এই ভরা বর্ষাকালে সেপ্টেম্বর মাসের ২৪ তারিখে আমেদাবাদে আরম্ভ হবে ভারত বনাম নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম টেস্ট ম্যাচ। সুতরাং পত্র-পত্রিকায় যে আলোচনা আরম্ভ হবে, এতে আর অবাক হবার কি আছে।

তবে একটি ইংরেজী দৈনিক পত্রিকায় তাদের ক্রিকেট বিশেষজ্ঞের সাম্প্রতিক দুটি লেখা আমাদের এই আলোচনার চক্রে টেনে এনেছে। তাঁদের সেই সুদীর্ঘ প্রবন্ধের অনেক বিষয়ের সংগে আমরা একমত হতে পারি নি। অবশ্য তাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু সেই প্রবন্ধের একটি বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই। সেটি হলো সব থেকে প্রয়োজনীয় এবং সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ—ভারতীয় দলের অধিনায়ক প্রসংগে।

॥ জয়সীমা ॥

জয়সীমা নিজেও কি পতৌদির স্থানে অধিনায়ক হবার কথা চিন্তা করেছেন কোনদিন;

ওঁদের সুপারিশ ভারতীয় দলের নেতৃত্বের ভার পতৌদির নবাবের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তুলে দেওয়া হোক জয়সীমার হাতে! হায়রে, আর কাউকে খুঁজে না পেয়ে শেষকালে জয়সীমা......! আর এই জয়সীমাই মাত্র ক'বছর আগে অ-খেলোয়াড়ী মনোভাবের এবং আচরণের জন্যে ভারতীয় দল থেকে বাদ পড়েছিলেন।

জয়সীমার বিরুদ্ধে আমার নিজের অন্তত বিশেষ কিছু বলার নেই, কারণ জয়সীমা আমার প্রিয় খেলোয়াড়দের

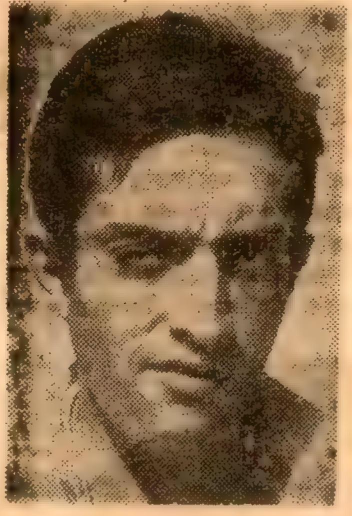

॥ পতৌদি ॥

ভারতীয় দলের অধিনায়ক হিসেবে পতৌদির স্থানে জয়সীমার প্রশ্ন তোলার কোন যৌক্তিকতা আছে কি?

অন্যতম। কিন্তু অধিনায়ক প্রসংগে জয়সীমার পক্ষেও বেশি কিছু বলা বোধহয় যে কোন ক্রিকেটরসিকের পক্ষে রীতিমত মুস্কিল। জয়সীমা দলে থাকুন। জয়সীমা যদি একটু মন দিয়ে খেলেন তাহলে তিনি অনেক রান করতে পারেন, অনেক ভালো বোলিং করতে পারবেন, এমন কি ফিল্ডিং-এও তিনি কম যাবেন না।

কিন্তু সত্যি-সত্যিই কি জয়সীমা সব সময় মনোযোগী? না. তা তিনি নন। জয়সীমার চরিত্রের মধ্যে অদ্ভুত একটা খোলা-মেলা স্বভাব আছে। জয়সীমা অনেক বিষয়েই সিরিয়াস নন। বিরাট বড়লোকের ছেলে হলে যা হয় আর কি! এই শেষ নয়—জয়সীমার খারাপ খেলার সব থেকে বড় কারণ, তাঁর 'ওভার কনফিডেন্স'। এই 'ওভার কনফিডেন্সই' জয়সীমাকে বার বার খারাপ খেলার মুখে ঠেলে দিয়েছে। এই শেষ নয়—ওভার কনফিডেন্সের সংগে 'ইরেসপনসিবল' কথাটাও যোগ করতে হবে। 'ওভার কনফিডেন্ট ইরেসপনসিবল' জয়সীমা অতিবড় প্রয়োজনের মুহূর্তেও তাই বার বার ভারতকে ডুবিয়েছেন।

জয়সীমার মাঠের বাইরের আচার-ব্যবহার এবং আচরণের সম্বন্ধেও প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। এই বিষয়টা অবশ্য সকলেরই জানা—তাই আর নতুন করে না আলোচনা করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

তাই বুঝতে পারছি না ঐ ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ সব জেনে-শুনেও জয়সীমার কাঁধে ভারতীয় দল পরিচালনার ভার তুলে দেবার সুপারিশ জানালেন কেন।

তবে এ-কথাও অস্বীকার করবো না যে, পতৌদির নবাবও কিছু আর ধোয়া তুলসী পাতা নন। তাঁরও অনেক দোষ ছিল, আজো অনেক দোষ আছে।

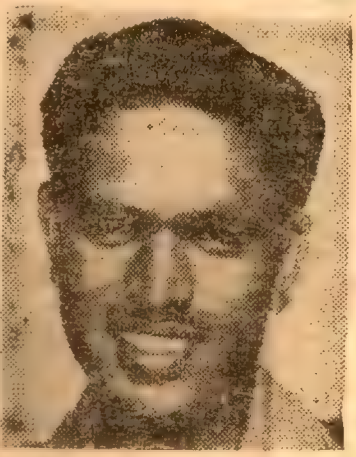

॥ বোরদে ॥

বোরদের বোধহয় অবসর গ্রহণ করার সময় হয়ে গেছে।

কিন্তু দোষ-গুণ মিলেই মানুষ। সুতরাং...।

সুতরাং পতৌদির কাছ থেকে অধিনায়কের দায়িত্ব কিভাবে নিয়ে নেবার প্রশ্ন উঠতে পারে জানি না। সত্যি কথা বলতে কি, একটি মাত্র চোখ নিয়ে পতৌদি আর যেভাবে ব্যাটিং করেন, যেমন নিখুঁতভাবে ফিল্ডিং করেন তার তুলনা মেলা ভার।

কথায় বলে 'ওয়ান রান সেভড, ওয়ান রান মেড' কথাটা যে কতো সত্যি তার পরিচয় নিশ্চয়ই নতুন করে ক্রিকেট-রসিকদের দেবার প্রয়োজন নেই। খেলার মাঠে ফিল্ডিং করার সময় কভার পয়েন্ট কিম্বা এক্সট্রা কভার অঞ্চলে দাঁড়িয়ে ভারতের অধিনায়ক পতৌদি যে কতো রান বাঁচান তার হিসেব করাও বোধ হয় মুস্কিল।

আর ব্যাটিং! পতৌদি যেটুকু সময় খেলেন ততক্ষণ দর্শকদের আনন্দ দেওয়াই বোধহয় তাঁর সব থেকে বড় কাজ বলে তিনি মনে করেন। প্রয়োজনের সময়ও পতৌদি খেলেন তাঁর আক্রমণী মনোভাব নিয়ে।

শুধু তাই নয়—অধিনায়ক হিসেবে পতৌদি ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের একান্ত আপনারজন এবং খুবই প্রিয়। পতৌদির পরিচালনায় ভারতীয় খেলোয়াড়রা কোন সময়েই খেলতে অনীহা প্রকাশ করেন নি—বরঞ্চ পতৌদিকে নানাভাবে সাহায্যই করেছেন তাঁরা। বিদেশের মাটিতে এবং স্বদেশেও ভারতীয় খেলোয়াড়রা ভালো খেলতে পারেন নি—কিন্তু সে দোষ তো পতৌদির একার নয়।

বিদেশে গিয়ে ভারতীয় খেলোয়াড়রা নাকি বড় বেশি উচ্ছৃঙ্খল হয়ে ওঠেন—কিন্তু তাঁদের সামলাবার দায়িত্ব অধিনায়কের একার নয়—দলের ম্যানেজারেরও বটে। সত্যি কথা বলতে কি, সব ব্যাপারের জন্যে ম্যানেজারই আসল ব্যক্তি যাঁকে দায়ী করা যেতে পারে।

পতৌদিরও অনেক দোষ আছে। শর্মিলাকে নিয়ে তিনি রীতিমত বাড়াবাড়ি শুরু করেছিলেন। আমরা নিজেদের চোখে দেখেছি সে বাড়াবাড়িকে মাত্রা ছাড়িয়ে যেতে। কিন্তু সে পর্ব এখন চুকেছে। তাই আশা করা যায়, পতৌদি এবার হয়তো খেলোয়াড়দের বেসামাল হবার রাশ শক্ত হাতে টেনে ধরতে পারবেন।

এই প্রসংগে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের অধিনায়ক সোবার্সের কথাও এসে যায়। সোবার্স নিজে বে-সামাল, তাই দলের খেলোয়াড়দের তিনি এখন আর সামলাতে পারছেন না। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের নাজেহাল হবার পেছনে এই কারণটাও বড় কম নয়।

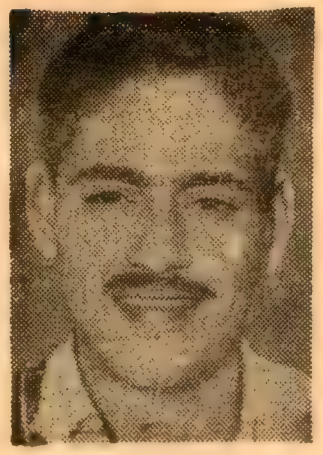

॥ চন্দ্রশেখর ॥

চোখের অসুখ সারার পর চন্দ্রশেখর এ বছর কেমন খেলেন সেটাই দেখার বিষয়।

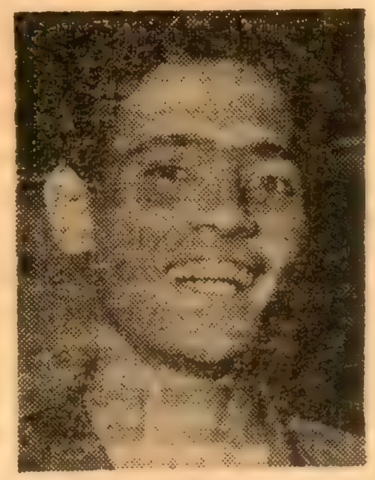

॥ অম্বর রায় ॥

অম্বর রায়ের ভাগ্যে এবার টেস্ট খেলায় সুযোগ আসার সম্ভাবনা খুব বেশি।

॥ দিলীপ দোসী ॥

দিলীপ দোসী টেস্ট খেলার সুযোগ পাবেন বলে অনেকেই আশাবাদী। কিন্তু সে আশা শেষ পর্যন্ত কি বাস্তবে পরিণত হবে?

তাই আশা করতে দোষ কি যে, পতৌদি অন্তত সোবার্স এবং ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি থেকে আসল শিক্ষাটুকু গ্রহণ করতে সক্ষম হবেন। দেখা যাক শেষ পর্যন্ত কি হয়।

তবে এ কথা ঠিক, যে-পত্রিকাই যাই লিখুন না কেন এবারও পতৌদির নবাবের ওপরই পড়বে ভারতীয় দল পরিচালনার ভার। ঠাণ্ডা মাথায় একবার চিন্তা করে দেখলেই বোঝা যাবে যে, পতৌদি ছাড়া এমন বিশেষ কেউই ভারতীয় দলে নেই যিনি অভিজ্ঞতা এবং যোগ্যতায় পতৌদির চেয়ে শ্রেষ্ঠ।

যাই হোক অধিনায়ক প্রসংগের পরে ভারতীয় দলের খেলোয়াড়দের নিয়ে আলোচনায় আসা যাক। বর্তমানে ভারতের বাইরে আছেন ইঞ্জিনিয়ার, প্রসন্ন আর সুর্তি। এঁরা তিনজন ভারতীয় দলের পক্ষে মনোনীত হবেনই। তবে নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে খেলার সময় এঁদের সকলের ডাক নাও পড়তে পারে।

তবে ভারতীয় দলে এবার দু'-একটি নতুন মুখ দেখার আশা এ বছর অনেকেই করছেন। মনে হয় দেখা যাবেও। এই নতুনদের তালিকায় কারা স্থান পাবেন—সেইটাই এখন আলোচনার বিষয়। চন্দ্রশেখর চোখের অসুখে ভুগছিলেন গত দু' বছর ধরে। এখন তিনি মোটামুটি ভালোই আছেন। ভারতীয় দলে স্থান পেতে হলে তাঁকে এ বছর ভালো খেলতেই হবে।

পুরনো খেলোয়াড়দের মধ্যে জয়সীমা, সরদেশাই, হনুমন্ত সিং, কুন্দরন, ভেঙ্কট রাঘবন, সুব্রত গুহ, অজিত ওয়াদেকার প্রমুখ খেলোয়াড়দের মধ্যে থেকে নিউজিল্যাণ্ড এবং অস্ট্রেলিয়া দলের বিরুদ্ধে খেলার জন্যে ভারতীয় দলের খেলোয়াড় নির্বাচন করা হবে।

ভারতীয় প্রবীণ এবং চৌখস খেলোয়াড় চান্দু বোরদের টেস্ট দলে চান্স পাবার সম্ভাবনা এ বছর খুবই কম। বরঞ্চ দল থেকে বাদ পড়ার সম্ভাবনাই তাঁর সব থেকে বেশি। তবে তিনি যদি হঠাৎ সাংঘাতিক একটা কিছু করে ফেলেন—সে কথা আলাদা।

দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কি হয়! সব কিছুই তো নির্ভর করছে ভারতীয় দল নির্বাচক কমিটির ওপর। নির্বাচক কমিটিতে আছেন—বিজয় মারচেণ্ট (চেয়ারম্যান), এম· দত্তরায়, সি· ডি· গোপীনাথ ও এইচ টি দানী।

খেলাধুলা

আই. এফ. এ শীল্ডের অনিশ্চিত অবস্থা

তবে কি শেষ পর্যন্ত ময়দানী ফুটবলের ওপর থেকে শনির দশা কাটলো? এবারের লীগ ফুটবলের আসর শেষ হয়েছে। ভালোয় ভালোয় চুকেছে একক এবং সুপার লীগের ফুটবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা। গত ক'বছর ধরে কলকাতার ফুটবল নিয়ে যে সব কাণ্ড-কারখানা ঘটছিল, যেভাবে মাঝপথে খেলা বন্ধ হয়ে গিয়ে ফুটবল খেলার ভাগ্যে নেমে আসছিল কালো অন্ধকার—এবার অন্তত সেই অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করার হাত থেকে কলকাতা ফুটবল রেহাই পেয়েছে, আর সেইজন্যেই মনে হচ্ছে যে, কলকাতার ফুটবলের ওপর থেকে বোধহয় শনির দশা এবার কেটে গেলো। লীগ ফুটবলের আসর এবার ভালোয় ভালোয় শেষ হয়েছে বটে, কিন্তু শীল্ডের খেলা এখনো বাকী। জানি নে আই· এফ· এ শীল্ডের খেলা গত বছরের মতো হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাবে কি না! কারণ আর যাই হোক কলকাতার ফুটবল জগতের এখানকার হাল-চাল এমনই যে, প্রতি মুহূর্তে শংকিত থেকে বলতে হয়, 'না আঁচালে বিশ্বাস নেই।' অর্থাৎ যতোক্ষণ না শেষ হয়ে যাবে প্রতিযোগিতার চূড়ান্ততম খেলাটি ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিযোগিতার ভাগ্য সম্বন্ধে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাবে না। যাই হোক কলকাতার ফুটবলের হাল কিন্তু এখন বড়ই কাহিল। বেশি দূরে যাবার দরকার নেই, এবারের আই· এফ· এ শীল্ডের দিকেই তাকানো যাক। ভারতের শ্রেষ্ঠ ফুটবল প্রতিযোগিতা আজ রীতিমত সঙ্গীন অবস্থার সম্মুখীন। আই· এফ· এ শীল্ডের খেলায় অংশ গ্রহণ করার জন্যে বাংলার বাইরের দলগুলো আগে হা-পিত্যেশে বসে থাকতো। আই· এফ· এ শীল্ডের খেলায় খেলতে পারা ছিল ফুটবল খেলোয়াড়দের কাছে রীতিমত সম্মানজনক। কিন্তু আজ? আজ আমাদের বাংলাদেশের ফুটবল পরিচালকদের যোগ্য পরিচালনায় আই· এ· এ শীল্ড ভারতীয় ফুটবল জগতে অপাংক্তেয় হয়ে পড়েছে! এক অজানা কারণে বাইরের দলগুলো কলকাতায় এসে আই· এফ· এ শীল্ডের খেলায় অংশ গ্রহণ করতে খুব একটা উৎসাহ পায় না। ফলে দিনে দিনে আই· এফ· এ শীল্ডে বহিরাগত নামী দলের সংখ্যা কমেই চলেছে। এবারও তার ব্যতিক্রম হয় নি। এবারও আই· এফ· এ শীল্ডে যোগদানকারী বহিরাগত দলের সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু কেন এমন হচ্ছে? কেন এইভাবে ভারতীয় ফুটবলের দরবারে বাংলাদেশকে ছোট করা হচ্ছে? জানি এ প্রশ্নের উত্তর কেউ কোনদিনই দেবেন না। কিন্তু আজ আমরা বাংলাদেশের ফুটবল খেলার বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে একটা প্রশ্নই শুধু তুলে ধরতে চাই—দিল্লীর ডুরান্ড আর বম্বের রোভার্সের সংগে তুলনামূলক বিচারে কলকাতার আই· এফ· এ শীল্ড যে তার পুরনো ঐতিহ্য হারাচ্ছে, আই· এফ· এ শীল্ড যে তার কৌলীন্য হারাচ্ছে—সে দিকে কি নজর দেবার মতো, সেই বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করার মতো সময় এবং অবসর আমাদের ফুটবল কর্তৃপক্ষের নেই? আছে বলে অবশ্য মনে হয় না। থাকলে আর যাই হোক, বাংলাদেশের ফুটবল খেলা ঠিক আজকের অবস্থায় এসে পৌঁছুতো না। তবে কি এর কোন প্রতিকার নেই? —শান্তিপ্রিয়

লীগ ফুটবল প্রসংগে

এবারের সুপার লীগে মোহনবাগান আর ইস্টবেংগল ছাড়া বাকী দলগুলোর মধ্যে খেলার আকর্ষণ ধরতে গেলে ছিলই না। মোহনবাগান কিম্বা ইস্টবেংগলের খেলা থাকলে কলকাতার ময়দান জমজম করতো। সেদিন থাকতো মাঠ ভরা লোক। কিন্তু অন্য খেলাগুলোয়—যেমন বাটা বনাম পোর্ট কমিশনার্স কিম্বা বি-এন-আর বনাম বাটা প্রভৃতি খেলাগুলোর কথা একবার ভেবে দেখুন।

সুপার লীগ খেলার হাল যদি এমনই হবে তাহলে সুপার লীগের সার্থকতা কোথায়? তার চেয়ে বরং ডাবল লীগ ভালো ছিল। খেলার সংখ্যা যেমন বেশি থাকতো, তেমনি এক-একটা পয়েন্টের জন্যেই ছোট-বড় সব দলগুলোর মধ্যেই চলত তুমুল সংগ্রাম। লীগের খেলার তখন একটা আলাদা আকর্ষণ ছিল। প্রাণ ছিল খেলায়।

তখন মোহনবাগান-ইস্টবেংগল প্রভৃতি দলগুলো একটা পয়েন্ট হারাতেও ভয় পেতো। পাছে ঐ এক পয়েন্টের ব্যবধানে অপর দলটি লাভ করে বসে লীগ চ্যাম্পিয়ানশীপের সম্মান। আর ছোট দলগুলোর সামনে ছিল নেমে যাবার ভয়। তাই ডাবল লীগের প্রায় সব খেলাগুলোই জমতো খুব।

অপ্রাসংগিক হলেও এই আলোচনা প্রসংগে আর একটি প্রশ্ন তুলছি। আমরা আমাদের বহু সংখ্যক পাঠক-পাঠিকাদের কাছ থেকে এই মর্মে চিঠি পেয়েছি এবং পাচ্ছি যে—লীগের খেলায় অশিষ্ট আচরণ করার জন্যে মহামেডান স্পোর্টিং দলের বিরুদ্ধে কোনরকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি না...!

মহামেডান স্পোর্টিং জেদ ধরেছিল যে, কলকাতার রেফারীদের পরিচালনায় তারা কোন খেলায় অংশ গ্রহণ করবে না। শেষ পর্যন্ত তারা করেও নি। কিন্তু আই· এফ· এ শীল্ডের খেলায় তারা যোগ দিয়েছে, অর্থাৎ কলকাতার রেফারীদের পরিচালনায় মহামেডান স্পোর্টিংকে অন্তত কয়েকটি খেলায় খেলতেই হবে। আই· এফ·এ শীল্ডের খেলা পরিচালনা করার জন্যে ভিন্ন প্রদেশ থেকে অবশ্য কয়েকজন রেফারী কলকাতায় আসেন। কিন্তু তাঁরা আসেন প্রতিযোগিতার শেষের দিকে। সুতরাং...!

কিন্তু ব্যাপারটা গুরুতর। এর সংগে কলকাতার ফুটবলের শৃঙ্খলার প্রশ্ন জড়িত। এইসব ছোট-খাটো ঘটনাকে গুরুত্ব না দেবার জন্যেই কলকাতার ফুটবল খেলার মান দিন দিন নেমে যাচ্ছে। আর এর হাত থেকে বাংলা-

দেশের ফুটবল খেলাকে বাঁচাতে হলে শুধু মাত্র আই· এফ· এ কর্তৃপক্ষকেই কঠোর হলে চলবে না অন্য দলগুলোকেও আই· এফ· এ-র সংগে সহযোগিতা করার জন্যে এগিয়ে আসতে হবে। মহামেডান স্পোর্টিং-এরও চুপ করে বসে থাকা চলবে না। তাদেরও সকলের সংগে হাতে হাত মিলিয়ে চলা চাই।

ভারতীয় ফুটবলাংগনে বাংলাদেশের হারানো সম্মান ফিরিয়ে আনার জন্যে আজ তাই সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে। আই· এফ· এ এবং ক্লাব কর্তৃপক্ষের সংগে খেলোয়াড়—এমন কি দর্শকদেরও আর পিছিয়ে থাকা চলবে না। সকলের সমবেত প্রচেষ্টাতেই বাংলাদেশের ফুটবল খেলা আবার ফিরে পাবে তাদের হারানো সম্মান। আর সেই চেষ্টাই এখন আমাদের করা উচিত সকলের আগে।

যাই হোক নিচে সুপার লীগ ফুটবল প্রতিযোগিতার সম্পূর্ণ ফলাফল দেওয়া হলো ঃ

	খেঃ	জয়	ড্র	পরাঃ	স্বঃ	বিঃ	পয়েন্ট
মোহনবাগান ঃ	৪	৩	১	০	৯	১	৭
ইস্টবেংগল ঃ	৪	১	৩	০	২	১	৫
বি· এন· আর ঃ	৪	১	৩	২	৩	৪	৩
বাটা ঃ	৪	১	১	২	৪	৬	৩
পোর্ট কমিশনার্স ঃ	৪	০	২	২	১	৬	২

বৈদ্যনাথ এবারও প্রথম

ভারতের সেরা দূরপাল্লার সাঁতারু বৈদ্যনাথ নাথ এ বছরও গংগাবক্ষে দীর্ঘতম সাঁতার প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করেছেন। বৈদ্যনাথের কাছে এ সম্মান নতুন নয়। এর আগে ১৯৬৬ ও ১৯৬৭ সালে তিনি এই দূরপাল্লার সাঁতারে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছিলেন। গত বছর একটি বিশেষ কারণে এই প্রতিযোগিতাটি অনুষ্ঠিত হয় নি।

জংগীপুর থেকে বহরমপুর পর্যন্ত ৭২ কিলো মিটার সাঁতার প্রতিযোগিতায় এবার দশ জন সাঁতারু অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ৯ ঘন্টা ৮ মিনিট ২৫ সেকেণ্ড সাঁতার কেটে বৈদ্যনাথ নাথ ৭২ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেন এবং ঐ প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান লাভ করেন।

এই প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছেন বি এন আর দলের লক্ষ্মীনারায়ণ ভৌমিক এবং তৃতীয় স্থান পেয়েছেন ত্রিপুরার রতিরঞ্জন ধর।

ঐ দিন ৭২ কিলোমিটার সাঁতার প্রতিযোগিতার সংগে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯ কিলোমিটারের আর এক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিলেন ৩০ জন সাঁতারু। এঁদের মধ্যে ২ ঘন্টা ১৬ মিনিট ৪২ সেকেণ্ডে ঐ দূরত্ব অতিক্রম করে পরমেশ দাশ প্রথম স্থান লাভ করেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করেছেন সুনীল মিত্র ও বিশ্বনাথ ঘোষ।

সময়টা ছিল ১৯৫১-৫২ সাল। এডিলেডে তখন চলছিল অস্ট্রেলিয়া আর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ব্যাটে বলে লড়াই। খেলার প্রথম দিনের ঘটনা। মাত্র ৮৮ রানে অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ইনিংস শেষ হল। প্রত্যুত্তরে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ করল ১০৫ রান। এর পর দিনের শেষে অস্ট্রেলিয়া ব্যাট ধরে দ্বিতীয় ইনিংসে করল ২ উইকেট হারিয়ে ২০ রান। ফলে টেস্ট খেলার ইতিহাসে সৃষ্টি হলো একদিনে ২২টি উইকেট পড়ার একটি রেকর্ড।

গুপীনাথ ঘোষ, বিশ্বনাথ ঘোষ, রামচন্দ্র ঘোষ ও অভিজিৎ গুহ (বিদ্যাসাগর পাড়া, কলকাতা—৪৭)

প্রশ্ন : ভারতের শ্রেষ্ঠ গোলরক্ষক কে? ইন্দার সিং কি ভারতের শ্রেষ্ঠ সেণ্টার ফরোয়ার্ড?

উত্তর : থঙ্গরাজ। না।

খোকন সরকার (বারবিশা)

উত্তর : দু' দলের মধ্যে খেলায় এক দল যদি মাঠে না আসেন তাহলে রেফারী নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করবার পর অন্য দলটিকে ওয়াক ওভার দিয়ে চলে যাবেন।

সব্যসাচী ভট্টাচার্য (শংকর বসু রোড, কলকাতা—২৭)

উত্তর : আপনার প্রশ্নের উত্তর হিসেবে অঞ্জন ব্যানার্জীর উত্তরটা দেখুন।

স্বরাজ সেনগুপ্ত (চক্রধরপুর, সিংভূম, বিহার)

প্রশ্ন : কোন বোলার কোন দলের বিরুদ্ধে সব চেয়ে কম রান দিয়ে এক ওভারে সব চেয়ে বেশি উইকেট লাভ করেছেন?

উত্তর : ১৯২৫ সালে নর্থথামটন দলের এস এ্যাডাম প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় ডুবলিন দলের বিরুদ্ধে তাঁর প্রথম ওভারের প্রথম দু'টি বলে দু'টি ও বাকী চার বলে তিনটি উইকেট দখল করেছিলেন। এই ৫টি উইকেট দখল করার বিনিময়ে তিনি দিয়েছিলেন মাত্র ১টি রান।

প্রণবকুমার চক্রবর্তী ও পান্নার চক্রবর্তী (ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি)

প্রশ্ন : টেস্ট খেলায় ভারতীয় খেলোয়াড়দের মধ্যে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি সেঞ্চুরী করেছেন কে? কত মিনিটে?

উত্তর : ডি· এন· সারদেশাই ১০৬ রান : ১৯৬৪-৬৫ সালে ভারত বনাম নিউজিল্যাণ্ডের দিল্লী টেস্টে। সময় লেগেছিল ১২৮ মিনিট।

হীরেন্দ্রমোহন ভদ্র (সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি)

প্রশ্ন : বিশ্বের কোন্ বোলার সর্বপ্রথম টেস্ট ক্রিকেট ম্যাচে হ্যাট্রিক করেছেন? কোন্ দেশের বিরুদ্ধে এবং কত্যো সালে?

উত্তর : ১৮৭৮-৭৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার এফ· স্পফোর্থ মেলবোর্ন টেস্টে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলায় বিশ্বের সর্বপ্রথম হ্যাট্রিক করেছিলেন।

অঞ্জন, দেবব্রত ও টুনু (ব্যানার্জীপাড়া রোড, কলকাতা—৪১)

উত্তর : আপনারা যাঁদের বোলিং ও

প্রশ্ন উত্তর

ব্যাটিং এ্যাভারেজ জানতে চেয়েছেন তাঁদের উত্তর কয়েক সংখ্যা আগে প্রকাশিত হয়েছে। দেখেছেন নিশ্চয়ই।

চন্দন ব্যানার্জী খেলা ছেড়ে দেন নি।

বিতানকুমার ঘোষ (বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি)

প্রশ্ন : এক ম্যাচে কোন ফিল্ডার (উইকেটরক্ষক ছাড়া) সবচেয়ে বেশি ক্যাচ লুফেছেন? কোন্ সালে এবং কতোগুলি?

উত্তর : ১৯২৮ স্যালে—ডব্লিউ হ্যামণ্ড—

'গল্প হলেও সত্যি' প্রসংগে

[আমরা অত্যন্ত দুঃখের সংগে জানাচ্ছি যে, 'গল্প হলেও সত্যি' বিভাগে আমাদের পাঠক-পাঠিকাদের বেশ কয়েকটি লেখার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ এসেছে। ঐ খেলাগুলো নাকি কিছু সংখ্যক পত্র-পত্রিকা এবং বই থেকে হুবহু তুলে দেওয়া হয়েছে। এই অভিযোগ অত্যন্ত গুরুতর এবং দুঃখ ও পরিতাপের বিষয়। তাই বাধ্য হয়েই আমাদের এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে যে, 'গল্প হলেও সত্যি' বিভাগে আর পাঠক-পাঠিকাদের লেখা প্রকাশ করা হবে না। আশা করি আমাদের অসুবিধাটুকু আপনারা বুঝবেন। —ক্রীড়া সম্পাদক]

গ্লাস্টারশায়ার বনাম সায়ের খেলায় ১০টা ক্যাচ লুফেছিলেন।

অরবিন্দ মুখার্জী (স্কুল রোড, পশুপতি পার্ক, গুলান্সার—৬)

উত্তর : ঐ ক্ষেত্রে রেফারীর রিপোর্টের ওপর নির্ভর করেই কমিটি সিদ্ধান্ত নেবেন। তবে ঐ ক্ষেত্রে রেফারীর অফসাইডই ধরা উচিত।

পেছন থেকে ল্যাং মারলে নিশ্চয়ই ফাউল হবে।

অরুণকুমার ঘোষ ও সাগরকুমার ঘোষ (হাসনাবাদ, ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন : মিহির সেনের ঠিকানা জানতে চাই?

উত্তর : শ্রীমিহির সেন, সাইট নং১০, ১এ, জাজেস কোর্ট রোড, কলি—২৭

শুভেন্দুরঞ্জন ঘোষ (পাঠ ভবন ছাত্রাবাস, শান্তিনিকেতন)

উত্তর : আপনার চিঠির কিছু অংশ তুলে দিলাম—

"গত ৭৪ বর্ষ প্রথম সংখ্যায় আপনি সর্বোচ্চ গোলদাতাদের তালিকায় ১৯৬৬ সালের সর্বোচ্চ গোলদাতা হিসেবে রাজেন্দ্রমোহনের নাম লিখেছেন। আসলে ওটা হবে মোহনবাগানের অসীম মৌলিকের।

সুভাষচন্দ্র শীল (ঘুটিয়াবাজার, হুগলী)

উত্তর : আকাশবাণীতে চিঠি পৌঁছুবে যদি আপনি ঐ দু'টি ঠিকানার যে কোন একটিতেই লেখেন অর্থাৎ দু'টো ঠিকানাই ঠিক।

অজিত, দিলীপ ও দুলাল (কালীঘাট রোড, কুচবিহার)

উত্তর : সুপার লীগের পয়েন্ট গোনার হিসেবটা আশা করি এতোদিনে বুঝে গেছেন।

নিম্নোক্ত পাঠক-পাঠিকার চিঠি আমরা পেয়েছি। কিন্তু প্রশ্নের উত্তর হয় প্রকাশিত হয়েছে, না হয় প্রশ্নগুলির উত্তর দেবার আর প্রয়োজন নেই। তাই নাম ছাপিয়ে চিঠির প্রাপ্তি স্বীকার করা হলো :

রঞ্জন ভট্টাচার্য (বাগবাজার, চন্দননগর), **পরিতোষ নাগ** (বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি), **ভবেন্দ্রনাথ দত্ত** (মাইথন এরিয়া), **অসিত ঘটক** (ঘটকগ্রাম, বাঁকুড়া), **প্রদীপকুমার বিশ্বাস** (গুলমা চা-বাগান, দার্জিলিং), **সোমনাথ গাঙ্গুলী** (গোলাবাড়ি, হালিশহর), **দিলীপ দত্ত** (আহিরীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা—৫), **অর্ধেন্দু ব্যানার্জী ও নারায়ণ মুখার্জী** (কলাবাড়ি চা-বাগান, জলপাইগুড়ি), **নির্মলচন্দ্র চ্যাটার্জী** (বি, কে পাল এ্যাভিনিউ, কলকাতা—৫), **স্বপন গুপ্ত** (দমদম), **সতীন্দ্রচন্দ্র নন্দী, অতনু নন্দী ও রুমা নন্দী** (কলাবাড়ি চা-বাগান), **কমল রায়** (গড়িয়া), **দিলীপ দত্ত** (কাছাড় হাইস্কুল, শিলচর), **মিতান মুখোপাধ্যায়** (আর, বি ঘোষ রোড, বর্ধমান) **অলোক রায়চৌধুরী** (বনগ্রাম মতিগঞ্জ, ২৪ পরগনা), **অমলকুমার চ্যাটার্জী** (বি, কে পাল এ্যাভিনিউ, কলকাতা—৫)

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার মজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

বসুমতী

পশ্চিমবঙ্গে সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় প্রমুখ সিন্ডিকেট-বিরোধীরা বুঝে নিয়েছেন যে, আর আপোষের পথে নয়, পথ বদলের সময় এসেছে।......কাজেই একটা লাইন অফ ডিমার্কেশন রক্ষা করতে হবে। সেই চেষ্টারই অংগ হলো প্রদেশ কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে অভ্যর্থনা সমিতির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানানো, প্রধানমন্ত্রীর সভায় অতুল্য ঘোষকে আসতে না দেওয়া।

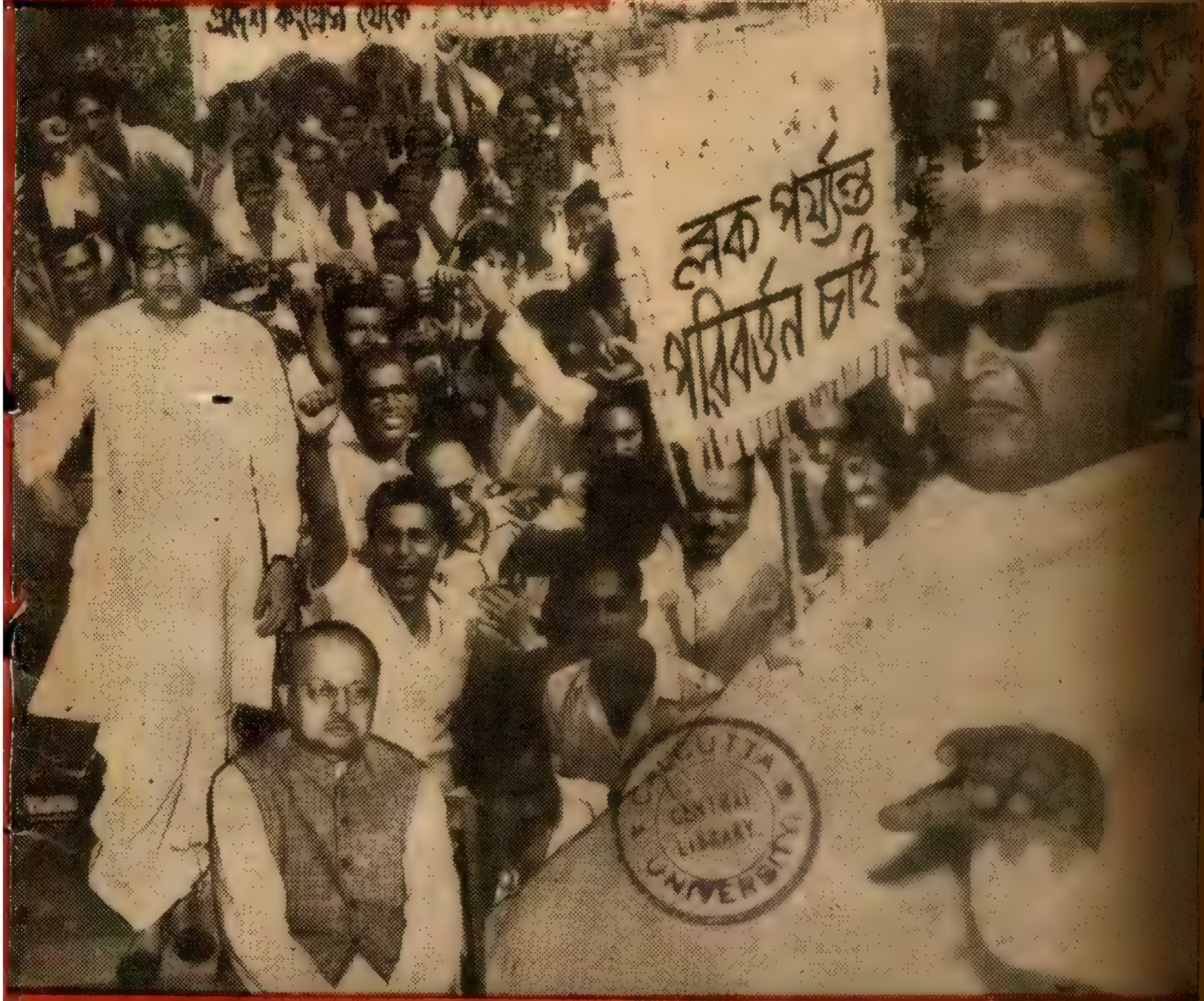

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

৭৪ বর্ষ ঃ ১১শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ১৮ই ভাদ্র, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [74 year, No. 11, 4th Sept., 1

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৬৪৩
আজকের মানুষ		৬৪৪
সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	— শঙ্করীপ্রসাদ বসু	৬৪৫
মানুষকে ভালোবাসা (কবিতা)	— কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়	৬৪৭
বুই-ব ছাই—বাংলা বইয়ের মেলা	— হরপ্রসাদ মিত্র	৬৪৮
বঙ্গদর্শন		৬৫১
ভারতদর্শন		৬৫৪
আন্তর্জাতিক		৬৫৬
সপ্তাহের বোঝা	— কৃত্তিবাস ওঝা	৬৫৮
যুক্তফ্রন্ট সরকার সমীপেষু	— শ্রীসর্বদর্শী	৬৬০

যে কোন
গয়না
আর
আ স ল
গ্র হ র ত্ন
কেনার
দক্ষিণ কোলকাতায়
নামকরা প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৪৬-৬২৫৮

সন অ্যান্ড গ্র্যান্ডসন্স অব লেট
এম. বি. সরকার

এ.সরকার এন্ড সন্স
রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়	অনন্ত সিংহ	৬৬১
চাঁদ-কাহিনী	বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	৬৬৫
সাগর সংগমে (ধারাবাহিক উপন্যাস)	সুশীল জানা	৬৬৯
বিহঙ্গ-জননী (গল্প)	গৌরীশঙ্কর চন্দ্র	৬৭৩
আইন ও শৃঙ্খলা : পুলিশের ভূমিকা—কয়েকটি অভিমত	সাগর বিশ্বাস	৬৮১
গ্রন্থমেলা		৬৮৫
লোকসংগীতের একাল না আকাল?	মুর্শিদ	৬৮৮
পাঠকমন		৬৯২
রঙ্গমঞ্চ ওদেশে এবং এদেশে	শিলাদিত্য	৬৯৩
রঙ্গজগৎ		৬৯৬
খেলাধুলা	শান্তিপ্রিয়	৭০০

সদ্য বেরিয়েছে ॥ বহুকাল পরে পুনর্মুদ্রণ ॥ নামমাত্র মূল্য

দীনবন্ধু মিত্রের গ্রন্থাবলী

১ম ভাগ : নীলদর্পণ। জামাই বারিক। বিয়ে পাগলা বুড়ো। নবীন তপস্বিনী। কমলে কামিনী॥ ২য় ভাগ : সধবার একাদশী। যমালয়ে জীবন্ত মানুষ। পোড়া মহেশ্বর। কুড়ে গরুর ভিন্ন গোঠ। লীলাবতী। সুরধুনী কাব্য। দ্বাদশ কবিতা। পদ্য সংগ্রহ। তৎসহ লেখকের জীবনী ও ভূমিকা॥

(দুই ভাগে সম্পূর্ণ)

মূল্য প্রতি ভাগ চার টাকা॥

বিদ্যারণ্য মুনি রচিত
বিবরণ-প্রমেয়-সংগ্রহ
মূল্য চার টাকা

—০—

স্তবকবচমালা
মূল্য আট টাকা

—০—

যোগশাস্ত্র
মূল্য পাঁচ টাকা

—০—

শিবায়ন
মূল্য তিন টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা-১২

সাপ্তাহিক বসুমতী

সম্পাদিকা-জয়ন্তী সেন

৭৪ বর্ষ ঃ ১১শ সংখ্যা—মূল্য ঃ ৩০ পয়সা | বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত সাপ্তাহিক পত্রিকা | PRICE : 30 Paise

বৃহস্পতিবার, ১৮ই ভাদ্র, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ | Thursday, 4th September, 1969

বিধ্বংসী বন্যায় পশ্চিমবঙ্গ

অন্য বছরের তুলনায় বর্ষার প্রকোপ এবারে পশ্চিমে খুব বেশি নয়, কিন্তু বন্যার প্রলয়ঙ্কর গ্রাসে ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গের বহু অঞ্চল পড়েছে। এ বছরের বর্ষার প্রথমদিকে উত্তরবঙ্গে বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। গত বছর বহু প্রাণ সেখানে গেছে, বহু সম্পদ জলে ভেসে গেছে। সেই বন্যায় জীবননাশ ও ক্ষয়ক্ষতির মূলে ছিল সরকারী ব্যবস্থাপনার ত্রুটি। তাছাড়া সতর্কতাজ্ঞাপক নির্দেশ পর্যন্ত জনসাধারণকে সময়মত জানানো হয় নি। এবার যুক্তফ্রন্ট সে-ব্যাপারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন এবং বন্যার প্রকোপ থেকে জনসাধারণকে বাঁচাবার জন্য যথাসাধ্য অর্থব্যয় করেছেন। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সে ব্যয় নগণ্য বলা যেতে পারে। অথচ গত বছরের বন্যার পর প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও তদানীন্তন উপ-প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই বন্যা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে অর্থ ব্যয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, সেই প্রতিশ্রুতি পুরোপুরি রক্ষা করা সম্ভব হলে পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের সদাসর্বদা বন্যার আতঙ্কে বাস করতে হত না।

এ যুগে কারিগরী বিদ্যায় কোন অগ্রসর দেশে বন্যার ভয়ে দিন কাটানোর মত লজ্জাকর ব্যাপার বোধ হয় আর কিছু নেই। বৃষ্টি হলেই নদীতে বান আসবে—এ তো নতুন কথা নয়। কিন্তু বর্তমান যুগে প্রকৃতির ওপর মানুষের আধিপত্য সর্বস্বীকৃত। এতদ্‌সত্ত্বেও আমাদের দেশের মানুষ বন্যার কাছে এখনও নিরুপায়। অথচ বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে চাকুরিয়াদের বেকার করে দিতে অটোমেশন স্থাপনের জন্য একশ্রেণীর মানুষের দ্বিধা হয় না। দুর্ভাগ্যের কথা, জনসাধারণের বিপদ নিবারণের জন্য বিজ্ঞানের সহায়শক্তি গ্রহণের কথা উঠলেই অর্থাভাব গতিরোধ করে।

আমরা মনে করি, স্বাধীনত্ব লাভের আগে যা সম্ভব হয় নি, সেই প্রাথমিক কাজে হাত দেওয়া উচিত ছিল সরকারের। আর সে কাজটি হচ্ছে—বন্যা প্রতিরোধ। উত্তরবঙ্গের মত পার্বত্য অঞ্চলে প্রথমেই সে কাজ শুরু হওয়া উচিত ছিল। সরকারের অর্থ ব্যয় তো নানাদিকেই নানা কারণে হয়েছে, বন্যা প্রতিরোধের জন্য এখন সরকারের সর্বাগ্রে এগিয়ে আসা উচিত। অবশ্য যুক্তফ্রন্ট সরকার বন্যা সম্পর্কে সচেতন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অর্থের জন্য আবেদন জানিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এই আবেদনে কেন যে তৎপর হতে পারছেন না, তা আমরা ভেবে পাচ্ছি না।

উত্তরবঙ্গের বন্যা নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনার পর্যায়ে পড়লেও পশ্চিমবঙ্গের নিম্নাঞ্চলগুলিতে বিশেষ বিশেষ সময়ে বন্যা আসে আর তাতে যে সর্বনাশ হয়, তা কল্পনার বাইরে। সাধারণ মানুষের সহায়-সম্বল অতি সামান্য, বন্যার জলে তাও এক নিমেষে ভেসে যায়। মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, মালদহ প্রভৃতি অঞ্চলে, (এখন পর্যন্ত যে খবর পাওয়া গেছে তাতে জানা গেছে) এবার ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। শুধু মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুর অঞ্চলেই চাল্লিশ হাজার লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে প্রকাশ।

বন্যার হাত থেকে এদের বাঁচানো সম্ভব হয় নি। তাই বন্যাগ্রস্তদের সাহায্যের জন্য এখন তোড়জোড় শুরু হয়েছে। অবশ্য গত বাইশ বছরে যা সম্ভব হয় নি তা যুক্তফ্রন্ট সরকার এক বছরের মধ্যে করে দেবেন—এটাও অসম্ভব। কিন্তু একথা অনেকেই মনে করেন, রাজনীতির উদ্দেশ্যে আগেকার দিনে বন্যাকে মূলধন করা হত। আমরা মনে করি, এখন সে ধরণের নিন্দনীয় অভিপ্রায় কারও নেই।

যাই হোক, মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় বন্যার্তদের মুক্তহস্তে দান করার জন্য জনসাধারণের কাছে আবেদন জানিয়েছেন এবং প্রধানমন্ত্রী নিজস্ব তহবিল থেকে বত্রিশ হাজার টাকা বন্যার্তদের সাহায্যের জন্য পাঠিয়েছেন, যা তিনটি জেলায় ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ঐ পরিমাণ সামান্য অর্থে সহস্র সহস্র লোকের দুর্দশা নিবারণ সম্ভব নয়। তবে প্রধানমন্ত্রীর শুভেচ্ছা প্রশংসনীয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কিছুদিনের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে আসছেন। তাঁর এই সফরের সময় পশ্চিমবঙ্গের মানুষগুলিকে বন্যা থেকে স্থায়িভাবে রক্ষা করার জন্য যুক্তফ্রন্ট সরকার পুনরায় আবেদন পেশ করুন। আমরা আশা করি, দেশের পরিবর্তিত রাজনৈতিক অবস্থায় প্রধানমন্ত্রী যথোপযুক্ত সাড়া দিয়ে জনগণের কল্যাণের উদ্দেশ্যে বন্যা নিয়ন্ত্রণে কেন্দ্রীয় সরকারের কোষাগার থেকে অর্থ সাহায্য দিতে কোনরকম কার্পণ্য প্রদর্শন করবেন না।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

সেদিন ছিলেন angry young-man, ক্রুদ্ধ যুবক, আজ তাঁকে বলা উচিত বিজ্ঞ যুবকটি। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে কংগ্রেস সভাপতির হুইপ অন্ধের মত মেনে নিতে অস্বীকার করে এবং ভোটদানে বিবেকের স্বাধীনতা দাবি করে শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় রাজ্যের কংগ্রেসী রাজনীতিতে রীতিমত চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছেন। বিবেকের স্বাধীনতা সিদ্ধার্থশংকর কেবল নিজেরই জন্যে চান নি, কংগ্রেস পরিষদীয় দলের প্রভাবশালী নেতা হিসেবে এবং পাকা কৌঁসুলির মত বিরুদ্ধ-মতাবলম্বীদেরও আপন মতে টানতে সক্ষম হয়েছেন।

নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে অবশ্যি সিদ্ধার্থশংকরের এ-ভূমিকাকে স্টান্ট বা চমক সৃষ্টির প্রচেষ্টা বলেই অভিহিত করতে হয়।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এ-নেতৃত্ব দেবার আগে সিদ্ধার্থশংকরকে নেতার আসনে দেখা গিয়েছে অন্য ক্ষেত্রে। আর পারিবারিক ঐতিহ্যগত কারণেই যেন তাঁর রাজনীতিতে যোগদান ছিল অবধারিত। ১৯২০ সালে কলকাতার ভবানীপুরের এক কৃষ্টিসম্পন্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে সিদ্ধার্থশংকরের জন্ম। বাবা সুধীরচন্দ্র রায় ছিলেন সে-যুগের নামকরা ব্যবহারজীবী, তার ওপর স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম শরিক। মা অপর্ণা দেবী ছিলেন বিখ্যাত দেশনেতা সি আর দাশের জ্যেষ্ঠা কন্যা। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের দৌহিত্র রাজনীতি করবেন না তো করবে কে? নিত্য-নতুন চমক সৃষ্টি তো তিনি করবেনই।

বলছিলাম, নেতৃত্বের শিক্ষানবিশী হিসেবে কেটেছে তাঁর দীর্ঘকাল। লরেটো কনভেন্ট, সেন্ট জেভিয়ার্স, মিত্র ইনস্টিটিউশন—এই তিনটি স্কুলে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা নেবার পর সিদ্ধার্থশংকর গেলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে। ছাত্র সিদ্ধার্থশংকর প্রথম জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন বাগ্মী হিসেবে, তার্কিক হিসেবে। অচিরে তিনি বিতর্কসভা গড়ে তুললেন এবং তাঁর সেক্রেটারী ও পরে কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক হন।

ছাত্রনেতা হিসেবে সিদ্ধার্থশংকর আরো নাম ও যশ কুড়ালেন যখন দরিদ্র ছাত্র সাহায্য ভাণ্ডার, সমাজসেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নির্ভুল নেতৃত্ব দিয়ে তিনি জনদরদী বলে নিজেকে প্রতিপন্ন করলেন, খেলাধুলার ক্ষেত্রে কলেজের সুনাম বৃদ্ধি করেন। কলেজের ফুটবল এবং ক্রিকেট টিমের তিনিই ছিলেন ক্যাপ্টেন এবং তাঁরই পরিচালনা ও নেতৃত্বে প্রেসিডেন্সি কলেজ পর পর বহু বিজয়-মাল্য অর্জন করেছে। টেনিসেও তিনি

সিদ্ধার্থশংকর রায়

পাকা খেলোয়াড় হয়ে উঠেছিলেন। সিদ্ধার্থশংকরের ক্রীড়ানৈপুণ্যের স্বীকৃতি মিলেছে তাঁর বিশ্ববিদ্যালয় ব্লু সম্মানলাভের মধ্যে।

কিন্তু পড়া শেষ করার আগেই তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটায় সিদ্ধার্থশংকরকে সংসারের ভার নিতে হয়। সামান্য ২৫০ টাকা বেতনে তাঁর কর্মজীবনের সূচনা একটা ফ্যাক্টরীতে লেবার ওয়েলফেয়ার বিভাগের সহকারী হিসাবে। এখানে কাজ করতে করতেই তিনি আইন পাশ করেন, বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়ার প্রয়োজনীয় টাকা জমান। যথাসময়ে তিনি ব্যারিস্টারি পাশ করেও আসেন।

আইন ব্যবসায় পসার জমাতে তাঁকে বেগ পেতে হয় নি, ১৯৫৪ সালে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম জুনিয়র কাউন্সেল নিযুক্ত হন। এর পরেই ১৯৫৬ সালে এল মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের সেই আহ্বান। ১৯৫৭ সালে নির্বাচনে জয়ী হয়ে বিধানসভার সদস্য হলেন তিনি, ডাঃ রায়ের ক্যাবিনেটে বিচারমন্ত্রীর পদও পেলেন। কিন্তু পরের বছরেই খাদ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেনের সঙ্গে মতের অমিল হওয়ায় সিদ্ধার্থশংকর নির্দ্বিধায় মন্ত্রিত্বে ইস্তফা দিলেন। সেদিন এই ক্রুদ্ধ যুবককে ঘিরে বহু উপকথা মুখে মুখে প্রচারিত হয়েছে, তাঁর স্বাধীনচেতা মনোভাবের কারণে তিনি অর্জন করেছেন অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও ভালবাসা। কংগ্রেসের টিকিটে নির্বাচিত হয়ে বিধানসভায় আসন গ্রহণ করাকে তিনি অমর্যাদার বিষয় বলে মনে করলেন, উপনির্বাচনে বামপন্থী সমর্থিত প্রার্থী হিসেবে তিনি কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাজিত করে বিধানসভায় পুনর্নির্বাচিত হলেন।

এর পর থেকে তিনি বামপন্থী মহলে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা অর্জন করলেন।

১৯৬২ সালের নির্বাচনেও তিনি বামপন্থী সমর্থিত নির্দল প্রার্থী হিসেবে জয়যুক্ত হলেন। কিন্তু তার পরেই দিলেন আর একটা স্টান্ট। বিধানসভার বামপন্থী আঙিনা ডিঙিয়ে সিদ্ধার্থশংকর আবার ফিরে গেলেন কংগ্রেসের চত্বরে। ১৯৬৭ সালেও তিনি কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে জয়ী হয়েছেন, '৬৯ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনেও তাই। যুক্তফ্রন্ট আবার ক্ষমতায় ফিরে আসায় ফলে বিধানসভায় সিদ্ধার্থশংকরের ওপর নতুন দায়িত্ব এসে পড়লো—বিরোধী দলের নেতা। এবং এ-দায়িত্ব তিনি কৃতিত্বের সঙ্গেই পালন করে আসছেন।

সিন্ডিকেট গ্রুপের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষ সমর্থন করে আর একটা স্টান্ট দিলেন, সরকারী কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থন করার বাধ্যবাধকতা অস্বীকার করে।

সিদ্ধার্থশংকরকে অনেকে সুবিধেবাদী, সুযোগসন্ধানী বলে আখ্যাত করেছেন, বলেছেন তিনি নিজের ক্যারিয়ার গোছাতেই ব্যস্ত। ভবিষ্যৎ প্রমাণ দেবে কেন তিনি এটা করলেন এবং সেটা করলেন না।

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং—(৮)

রবীন্দ্রনাথের 'বৈজ্ঞানিক' গল্পগুলি

১৯৩০ সালে রাশিয়া দর্শন থেকে ১৯৩৮ সালে সুভাষচন্দ্র-প্রবর্তিত জাতীয় পরিকল্পনায় সক্রিয় আগ্রহ বোধ করা পর্যন্ত সময়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির আলোচনা করলে দেখতে পাব, তিনি উত্তরোত্তর বৈজ্ঞানিক মনোভাবের দিকে ঝুঁকেছেন। মেঘনাদ সাহা শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন এইকালে; ছাত্রদের কাছে তিনি কী চাঞ্চল্যকর বক্তৃতা করেছিলেন তা আগে যথেষ্টভাবে দেখেছি। ব্যক্তিগত আলাপে ডঃ সাহা ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং সম্বন্ধে তাঁকে বিস্তারিত বলেছিলেন। এর কিছুদিন আগে সুভাষচন্দ্র শিল্পমন্ত্রীদের সম্মেলনে প্ল্যানিং সম্বন্ধে যা বলেন, রবীন্দ্রনাথ মনে হয় তার বিষয়ে কিছুটা অবহিত ছিলেন। ডঃ সাহার সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পরে (১৩ বা ১৪ নভেম্বর) ব্যাপারটি তাঁর কাছে আরও পরিষ্কার হয়, তিনি এ-সম্বন্ধে উৎসাহী হয়ে ওঠেন, এবং সাহা ও সুভাষচন্দ্রের অভিপ্রায়মত জহরলালের সক্রিয় সমর্থন চেয়ে তাঁকে চিঠি লেখেন। ১৯ নভেম্বর, ১৯৩৮, তারিখে জহরলালকে লিখেছিলেন—

"এই সেদিন ভারতীয় শ্রমশিল্পের বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা নিয়ে ডঃ মেঘনাদ সাহার সঙ্গে দীর্ঘ এবং চমৎকার এক আলোচনা হল। আমি এর গুরুত্ব সম্বন্ধে স্থিরনিশ্চয়। তুমি সুভাষ-গঠিত কমিটির সভাপতি হতে রাজী হয়েছ বলে এ সম্পর্কে তোমার অভিমত জানতে চাই।"

(পত্রগুচ্ছ, ২৩৫ পত্র)

২৮ নভেম্বর তারিখে রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারী শ্রীঅনিলকুমার চন্দ জহরলালকে যে-চিঠি লেখেন তার মধ্যেও ডঃ সাহার পরিকল্পনায় রবীন্দ্রনাথের আগ্রহের কথা ছিল—

"তিনি (রবীন্দ্রনাথ) ডঃ সাহার যন্ত্রিযন্ত্রের পরিকল্পনার দ্বারা আকৃষ্ট এবং কমিটির কাছ থেকে তিনি অনেক আশা করছেন। আপনি অন্য কাজ নেবার আগেই তিনি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান, পাছে ঘটনার তাগিদে আপনি পরিকল্পনা কমিটির কাজ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। এইটেই তাঁর আপনার সঙ্গে দেখা করার ব্যাকুলতার প্রধান কারণ।"

বৈজ্ঞানিক চেতনা এবং বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে গোটাগুটি প্রবন্ধ লেখার মত শারীরিক বা মানসিক অবস্থায় এইকালে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না, কিন্তু বিষয়টি কিভাবে তাঁর মনের গভীরে প্রবেশ করে গিয়েছিল তা দেখা যায় এই সময়ের কয়েকটি গল্প পড়লে। প্রবন্ধে নয় গল্পে রবীন্দ্রনাথ মনের কথা প্রকাশ করেছেন—সেটা দেখিয়ে দেয় এ ব্যাপারে তিনি কতখানি উদ্বেজিত, কারণ সাহিত্যিকের বুদ্ধির স্তর থেকে কোনো কিছু চেতনার স্তরের মধ্যে প্রবেশ করলেই তবে সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব হয়।

রবীন্দ্রনাথের তিনটি বিজ্ঞানঠাসা গল্প—'রবিবার', 'শেষকথা' ও 'ল্যাবরেটরী'—রচিত হয়েছিল পরবর্তী ৬ মাস থেকে এক বছরের মধ্যে। মেঘনাদ সাহার দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গল্পগুলির নায়কদের দৃষ্টিভঙ্গির যথেষ্ট ঐক্য আছে দেখতে পাই। মেঘনাদ সাহার সঙ্গে আলোচনার ফলেই রবীন্দ্রনাথ গল্পগুলি লিখেছিলেন, একথা বলছি না, আলোচনা না হলেও তিনি হয়তো লিখতেন, কিন্তু তাঁদের আলোচনা, প্ল্যানিংয়ে সুভাষচন্দ্রের সাহসী সংগঠন এবং জহরলালের অংশগ্রহণ প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের মনকে নাড়া দিয়েছিল বিশেষভাবে, এ তথ্য অস্বীকার করা যায় না।

'গল্পগুচ্ছে'র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে, পাঠক লক্ষ্য করবেন, 'তিন সঙ্গী'র (ঐ তিনটি গল্প যে-গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত) রবীন্দ্রনাথের কী দুস্তর পার্থক্য। এখন আর নদীশ্যামলা মাতৃভূমির কথাকাব্য নয়, এখন নগরসভ্যতার পাথর-বাঁধানো রাজপথে যন্ত্রযানে উধাও গতি কিংবা লোকবর্জিত আরণ্যক আদিমতার মধ্যে খনিজ শক্তিসন্ধান।

রবীন্দ্রনাথ রাশিয়ার চিঠিতে বলেছিলেন, কিছু সময়ের জন্য নাস্তিকতা-শল্য চাই ধর্মান্ধতা কাটাতে। 'রবিবা'র'র অভীককুমার তাই 'পবিত্র নাস্তিক'। 'আচারনিষ্ঠ বৈদিক ব্রাহ্মণের বংশে' সে 'দুর্দান্ত কালাপাহাড়'। তার চেহারা বিলিতি ছাঁদের, চোখা কটা, নাক তীক্ষ্ণ, প্রতিবাদের ভঙ্গিতে ঝুঁকে-পড়া চিবুক, হাতে মুষ্টিযোগের অমোঘ প্রতিশ্রুতি। চেহারার বর্ণনাতেও বাঙালীর 'অমিত'-লাবণ্যের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের নাস্তিকতা। বলা চলে, অভীক গোরার নাস্তিক আধুনিক সংস্করণ।

অভীক যেহেতু 'অদ্ভুত' এবং 'সৃষ্টিকর্তার অট্টহাসি', তাই 'তার জীবনে দুটো উল্টোজাতের শখ ছিল, এক, কলকারখানা জোড়াতাড়া দেওয়া, আর-এক ছবি আঁকা।' বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার জাতীয় জীবনে এই অদ্ভুত সমন্বয়

হটতে রবীন্দ্রনাথ দেখে এসেছেন, যেখানে কারখানা ও কলাশিল্পের প্রতি যুগপৎ আগ্রহ বর্তমান।

রাশিয়ায় রবীন্দ্রনাথ অধিকন্তু দেখেছিলেন, ধর্মকে দূর করে সকল মানবের মধ্যে মিলনসাধনের চেষ্টা। ধর্ম মেনে যদি মানুষ মিলিত না হতে পারে, ধর্ম ভেঙে তাহলে মানুষ মিলিত হোক। অভীকেরও তাই বক্তব্য।

"অভীক দরজার কাছ থেকে ফিরে এসে বললে, দেখো দাদা, তুমি প্রচণ্ড ন্যাশন্যালিস্ট। ভারতবর্ষে ঐক্য-স্থাপনের স্বপ্ন দেখ। কিন্তু যে দেশে দিনরাত্রি ধর্ম নিয়ে খুনোখুনি সে দেশে সব ধর্মকে মেলাবার পুণ্যব্রত আমার মত নাস্তিকেরই। আমিই ভারতবর্ষের ত্রাণকর্তা।"

আনন্দদায়ক মহাবীরত্ব। রবীন্দ্রনাথ তাঁর এই গল্প-নায়কের বিরাট ঘোষণা নিয়ে নিশ্চয় কিছুটা কৌতুকবোধ করেছিলেন; অভীকের ঐ উচ্চভাবণের কাহিনীগত কারণও ছিল, বিভান্বিত হয়েই অভীক কথাগুলি বলেছিল; তাহলেও অভীকের বক্তব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের ঐক্যও অস্বীকার করা যায় না।

কারখানা জোড়াদেওয়া ও ছবি-আঁকা—এই দুই কাজকে অভীক মাত্র শখের জিনিস করেছিল, আসল অধ্যবসায় ছিল 'কাঁটাওয়ালা' নাস্তিকতা-চর্চায়, (যা শেষ পর্যন্ত অবশ্য প্রেম-ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণের আস্তিকতায় পরিণতি পেয়েছিল)—কিন্তু 'শখ' নয়, যন্ত্রবিদ্যা 'সাধনা' যাঁর কাছে, তাঁর চেহারা রবীন্দ্রনাথ ফুটিয়েছেন 'শেষ কথা' গল্পে। শেষ কথার নায়ক নবীনমাধব, ভূতপূর্ব বিপ্লবী, বর্তমানে—নির্মোহ বিজ্ঞানী।[১]

বিপ্লবী নবীনমাধব বিজ্ঞানী হয়ে ধিক্কার দিয়েছে নিজের মন্ত্রমুগ্ধ অকৃতকার্য অতীতকে। চিরকুমার সভার অমর স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ তাঁর কৌমারহর কবিব্রত অনুসরণ করে নবীনমাধবের যৌবনের কর্মযোগ ও সন্ন্যাসের 'শক্ত করে বাঁধা আগলকে' অবশ্যই আলগা করে দিয়েছেন 'নারীপ্রভাবের ম্যাগনেটিজমের' দ্বারা—তা করাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক, সেটাই গল্পের উপজীব্য, কিন্তু তা আমাদের আলোচনার বিষয় নয়,—নবীনমাধবের আত্মকথার মধ্যে আমাদের পক্ষে প্রয়োজনীয় অ-গাল্পিক কিছু বিষয়বস্তু আছে, সেই দিকে মনোযোগ দিতে পারি। ঐ ভূতপূর্ব বিপ্লবীর স্বীকারোক্তি নিম্নোক্ত প্রকারঃ

"আমি বাংলাদেশের বিপ্লবীদলের একজন। বৃটিশ সাম্রাজ্যের মহাকর্ষশক্তি আণ্ডামানতীরের খুব কাছাকাছি টান মেরেছিল। নানা বাঁকা পথে সি, আই, ডি-র ফাঁস এড়িয়ে এড়িয়ে গিয়েছিলুম আফগানিস্থান পর্যন্ত। অবশেষে পৌচেছি আমেরিকায় খালাসির কাজ নিয়ে। পূর্ববঙ্গীয় জেদ ছিল মজ্জায়, একদিনও ভুলিনি যে, ভারতবর্ষের হাতে-পায়ের শিকলে উখো ঘষতে হবে দিনরাত যতদিন বেঁচে থাকি। কিন্তু বিদেশে কিছুদিন থাকতেই একটা কথা নিশ্চিত বুঝেছিলুম, আমরা যে-প্রণালীতে বিপ্লবের পালা শুরু করেছিলুম, সে যেন আতসবাজিতে পটকা ছোড়ার মত, তাতে নিজের পোড়াকপাল পুড়িয়েছি অনেকবার, দাগ পড়েনি বৃটিশ রাজতক্তে। আগুনের উপর পতঙ্গের অন্ধ আসক্তি। যখন সদর্পে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলুম তখন বুঝতে পারিনি, সেটাতে ইতিহাসের যজ্ঞানল জ্বালানো হচ্ছে না, জ্বালাচ্ছি নিজেদের খুব ছোটো ছোটো চিতানল। ইতিমধ্যে ইউরোপীয় মহাসমরের ভীষণ প্রলয়রূপ তার অতি বিপুল আয়োজন সমেত চোখের সামনে দেখা দিয়েছিল—এই যুগান্তরসাধিনী সর্বনাশাকে আমাদের খোড়োঘরের চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিষ্ঠা করতে পারব সে দুরাশা মন থেকে লুপ্ত হয়ে গেল; সমারোহ করে আত্মহত্যা করবার মতও আয়োজন ঘরে নেই। তখন ঠিক করলুম ন্যাশন্যাল দুর্গের গোড়া পাকা করতে হবে। স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলুম, বাঁচতে যদি চাই আদিম যুগের হাত দুখানায় যে-কটা নখ আছে তা দিয়ে লড়াই করা চলবে না। এ-যুগে যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রের দিতে হবে পাল্লা; যেমন-তেমন করে মরা সহজ, কিন্তু বিশ্ব-কর্মার চেলাগিরি করা সহজ নয়। অধীর হয়ে ফল নেই, গোড়া থেকেই কাজ শুরু করতে হবে—পথ দীর্ঘ, সাধনা কঠিন।"

ভূতপূর্ব বিপ্লবীর কঠিন আত্মশোধন—একেবারে কালা-পাহাড়ী পদ্ধতিতে। সি আই ডি-র হাত এড়িয়ে, বেঁচে থেকে, আমেরিকায় পৌঁছে তিনি বুঝেছিলেন, যেমন-তেমন করে মরা সহজ, কিন্তু বিশ্বকর্মার চেলাগিরি সহজ নয়। ফোর্ডের কারখানায় ঢুকে তিনি সেই কঠিন চেলাগিরি শিখতে লাগলেন। কিছুদিন পরে দেখলেন, এও যথেষ্ট কঠিন নয়, আরও মূলে যাওয়া চাই—

"এই উপলক্ষে একটা বিষয়ে চোখ খুলে গেল, সে হচ্ছে এই যে, যন্ত্রবিদ্যাশিক্ষার আরও গোড়ায় যাওয়া চাই; যন্ত্রের মালমশলা-সংগ্রহ শিখতে হবে। ধরণী শক্তিমানের জন্য

---

১ বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহা প্রথম জীবন একেবারে বিপ্লবী না হলেও বিপ্লবী দলের কাছ ঘেঁষে ছিলেন। তাঁর বাল্যবন্ধু অধ্যাপক এন আর সেন তাঁর স্মৃতিকথায় (*Reminiscences of the School and College Days with Professor M. N. Saha*) জানিয়েছেন, ১৯০৫ সালে 'স্বদেশী' করার জন্য সাহা ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। জাতীয় বীরকাহিনী বাল্যবয়সে সাহাকে কি রকম উদ্দীপিত করত, এবং তাঁর ইতিহাসপ্রীতি কতদূর প্রবল ছিল, সে বিষয়ে অধ্যাপক সেন লিখেছেন—"স্কুলে, পরে কলেজ জীবনেও, সাহার প্রাণ-মন-কাড়া আকর্ষণের বস্তু ছিল গণিত। তাঁর দ্বিতীয় ভালবাসার বস্তু ইতিহাস। স্কুলে টডের রাজস্থান, এবং অন্যান্য রাজপুত ও মারাঠা বীরকাহিনী পড়ে ফেলেছিলেন; ঐ সব কাহিনী সেসব দিনে জাতীয়ভাবে আন্দোলিত তরুণ বাঙালীমনে বিপুল সাড়া জাগাত। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের প্রতি সাহার আকর্ষণ কখনো যায় নি।"

(*Professor Meghnad Saha* গ্রন্থ থেকে)

মানুষকে ভালোবাসা

কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়

মানুষকে ভালোবাসা মানুষের কাছ থেকে
মানুষেরই দূরে সরে যাওয়া,
মানুষের বিশ্বাস সহস্র বছর ধরে
মানুষেরই দরজায় মাথা কুটে মরে,
অথচ মানুষ তবু মানুষেরই কাছ থেকে
দূরে সরে যায়, যেতে ভালোবাসে,
মানুষের বিশ্বাস সৃষ্টির আদিযুগ থেকে
অন্যসব মানুষের দরজায় কাঁদে,
ঈশ্বর, ভালোবাসা বিশ্বাস এও কি দূরের?

কাছে চেয়ে ভালোবাসা অন্ধ ক্লান্ত যেন,
ইতিহাস খুঁজে ফেরে শূন্যময় বোধ;
স্নেহ প্রেম দূরত্বের শুধু দূরত্বের,
বিশ্বাস হেঁটে যাওয়া একা ত্রস্ত পায়ে,
মরুভূমি জুড়ে পথ রুদ্ধ ইতিহাস,
কে কবে বেদনাবোধে একবার ভালোবেসেছিলো?

সম্রাট, বিশ্বাস হারিয়ে গেছে বোধ বড় ম্লান,
হাঁটবার শিক্ষা দাও আরো যতদূর পারি
একা হেঁটে যেতে।

জমা করে রেখেছেন তাঁর দুর্গম জঠরে কঠিন খনিজ পদার্থ, এই নিয়ে দিগ্বিজয় করেছে তারা, আর গরিবদের জন্য রয়েছে তার উপরের স্তরে ফসল—হাড় বেরিয়েছে তাদের পাঁজরায়, চুপসে গেছে তাদের পেট। আমি লেগে গেলুম খনিজবিদ্যা শিখতে।"

এই নূতন উপলব্ধি ও প্রতিজ্ঞার বাধাবন্ধহারা আনন্দে রবীন্দ্রনাথের নবীনমাধব প্রাণ খুলে বলে উঠলেন—

"জামশেদ টাটাকে সেলাম করেছি সমুদ্রের ওপার থেকে। ঠিক করেছি আমার কাজ পটকা ছোঁড়া নয়। সিঁধ কাটতে যাব পাতালপুরীর পাথরের প্রাচীরে। মায়ের আঁচলধরা বুড়ো খোকাদের দলে মিশে 'মা মা' ধ্বনিতে মন্তর পড়ব না, আর দেশের দরিদ্রকে অক্ষম অভুক্ত অশিক্ষিত দরিদ্র বলেই মানব, 'দরিদ্রনারায়ণ' বুলি দিয়ে তার নামে মন্তর বানাব না। প্রথম বয়সে এরকম বচনের পুতুলগড়া খেলা অনেক খেলেছি —কবিদের কুমোরবাড়িতে স্বদেশের যে রাংতা-লাগানো প্রতিমা গড়া হয়; তারই সামনে বসে বসে অনেক চোখের জল ফেলেছি। কিন্তু আর নয়, এই জাগ্রত বুদ্ধির দেশে এসে বাস্তবকে বাস্তব বলে জেনেই শুকনো চোখে কোমর বেঁধে কাজ করতে শিখেছি। এবার গিয়ে বেরিয়ে পড়বে এই বিজ্ঞানী বাঙাল কোদাল নিয়ে কুড়ুল নিয়ে হাতুড়ি নিয়ে দেশের গুপ্তধনের তল্লাসে, এই কাজটাকে কবির গদগদকণ্ঠের চেলারা দেশমাতৃকার পুজো বলে চিনতেই পারবে না।"

'শেষকথা'র নবীনমাধব এই পর্যন্ত। প্রথমে পেয়েছিলাম পবিত্র নাস্তিক এক নায়ককে, যাঁর কিছু কারখানার শখ আছে। পরবর্তী নায়ক প্রথমে ইঞ্জিনীয়ার পরে জিয়লজিস্ট। আমাদের আলোচ্য সর্বশেষ নায়কও ইঞ্জিনীয়ার, তবে একই সঙ্গে ল্যাবরেটরী বানিয়ে গবেষণা করেন। এই তিন নায়ককে উপস্থিত করে রবীন্দ্রনাথ তাঁর নতুন প্রতীতির গোটা চেহারাকে উপস্থিত করেছেন। শেষের গল্পটিতে (ল্যাবরেটরী) নায়ক বৈজ্ঞানিককে যথার্থ সহধর্মিণী দান করে বিজ্ঞান-সাধনায় ভারতীয় নারীজাতির ভাবী ভূমিকার প্রস্তাবনা কবি করে গিয়েছেন।

ল্যাবরেটরী গল্পের দুই পর্বের প্রথম পর্বে নায়ক নন্দকিশোরকে পাই যিনি 'লণ্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে পাশ করা ইঞ্জিনীয়ার', ছাত্রজীবনে 'দেদীপ্যমান' পরবর্তীকালে হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন 'বিজ্ঞানের পাগলামিতে' পাওয়া সৃষ্টি-ছাড়া জীব। নন্দকিশোর দেশ-বিদেশ থেকে যন্ত্র যোগাড় করে কারখানা বানান, তার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ যোগাড় করেন দেশ থেকেই, তবে চোরাগলি পথে। নন্দকিশোর 'অসবর্ণ বিবাহ' পছন্দ করেন না, সেই পছন্দের মর্যাদাও রক্ষা পেয়েছিল, সঙ্গে জুটে গিয়েছিলেন যে পাঞ্জাবী মেয়েটি, তাঁর জন্মস্থানে 'শয়তানের দৃষ্টি', তাঁর গায়ে দাগ কিন্তু মনে ছাপ নেই, ভিতরে ঝক্‌ঝক্‌ করছিল 'ক্যারেক্‌টরের তেজ'—মেয়েটির নাম সোহিনী।

কোনো 'দুঃসাহসিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার অপঘাতে' প্রৌঢ় বয়সে নন্দকিশোর মারা গেলে তাঁর বহু সাধনার ল্যাবরেটরীকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন তাঁর উক্ত সহধর্মিণী সোহিনী। বিজ্ঞানের অধ্যাপক মন্মথ চৌধুরীর সহায়তাকে সোহিনী অর্জন করেছিলেন তাঁর 'ক্যারেকটরের তেজে' এবং কিছু নিষ্কাম চুম্বনের বিনিময়ে। মন্মথ চৌধুরীর মধ্যেও ছিল ঝক্‌ঝকে মন, বাংলাদেশের ভাবালুতার বিরুদ্ধে তাঁর প্রচণ্ড বিদ্রূপ: "মা মা শব্দে হাম্বাধ্বনি আর কোনো দেশের পুরুষমহলে শুনেছ কি?" বাংলাদেশের মেট্রিয়ার্কি বৎসদের রক্তের মধ্যে হাম্বাধ্বনি জাগিয়ে তুলে তাদের হতবুদ্ধি করে ফেলে—সেহেন বাংলাদেশের ভিতর থেকে একটি যথার্থ বৈজ্ঞানিক প্রতিভাকে উদ্ধার করবার চেষ্টা করেছিলেন দুজনে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁরা সফল হন নি, কারণ আইজ্যাক নিউটনের বাঙালী সংস্করণ শ্রীযুক্ত রেবতী ভট্টাচার্যের চির আশ্রয় পিসিমার 'নন্‌-কম্‌বাস্টিব্‌ল্‌ আঁচলে।'

[ক্রমশ]

হরপ্রসাদ মিত্র

বই-বাছাই

বাংলা বইয়ের মেলা

[পূর্বানুবৃত্তি]

বত্রিশ সিংহাসন', 'হিতোপদেশ', 'রাজাবলি' ইত্যাদি বইয়ে তো বটেই,—বিশেষভাবে 'প্রবোধ-চন্দ্রিকা'য় মৃত্যুঞ্জয়ের নানা পরীক্ষার উদাহরণ পাওয়া যায়। মৃত্যুঞ্জয়-গ্রন্থাবলীর 'শিল্পী মৃত্যুঞ্জয়' অংশে সম্পাদক লিখেছেন—

ভাষার ব্যাকরণ অভিধানও যখন সুষ্ঠুভাবে রচিত ও সংকলিত হয় নাই, মৃত্যুঞ্জয় তখনই কতকগুলি অপ্রচলিত ও পঙ্গু শব্দ পরস্পর যোজনা করিয়া নানা বিচিত্র রস উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার চেষ্টা আংশিক ফলবতী হইয়াছিল।

এই মন্তব্যের পরে মৃত্যুঞ্জয়ের 'হিতোপদেশ' থেকে এই অংশটি আমি পড়ে শোনালুম—

পূর্ব্বেতে সুন্দোপসুন্দ নামা অতিবড় দৈত্য দুইজন ত্রিভুবনাভিলাষেতে অত্যন্ত ক্লেশেতে বহুতর কাল মহাদেবের আরাধনা করিল অনন্তর তাহারদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন তোমরা বর প্রার্থনা কর তাহাতে পার্ব্বতী প্রার্থনীয়া ইহা অন্তঃকরণে করাইলেন তাহার পর সুন্দ উপসুন্দ কহিল যদ্যপি আমারদিগকে আপনি সন্তুষ্ট হইয়াছেন তবে হে পরমেশ্বর নিজ পত্নী গৌরীকে দেও।

আনন্দ বললে—'বেদান্ত-গ্রন্থের' তুলনায় এ গদ্য সত্যিই দুরূহ।

আমি বললুম—শোনো আর একটু—

অনন্তর ভগবান ক্রুদ্ধ হইয়া বরদানের আবশ্যকত্ব-হেতুক বিচারমূর্খ সুন্দোপসুন্দকে উমার ন্যায় এক স্ত্রী নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন তাহার পর সংসারনাশক ও অজ্ঞানান্ধ সুন্দোপসুন্দ অন্তঃকরণের উৎসাহেতে পার্ব্বতীতুল্য সৌন্দর্য্যেতে লুব্ধ হইয়া আমার এ আমার এ এই পরস্পর বিবাদ করিয়া কোন মধ্যস্থ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করি এই বুদ্ধি করিলে পর সেই ভগবান বৃদ্ধ ব্রাহ্মণরূপ হইয়া আসিয়া সেই স্থানে উপনীত হইলেন।

আনন্দ বললে—'প্রবোধচন্দ্রিকা' সম্বন্ধে যে দুর্বোধ্যতা বা বন্ধুরতার অভিযোগ শোনা যায়, সেটা একটা ক্ষীণভিত্তি জনমত মাত্র। ব্রজেন্দ্রনাথ মৃত্যুঞ্জয়ের গদ্য সম্বন্ধে যা বলেছেন এবং সজনীকান্ত তাঁর 'বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস' সম্পর্কিত আলোচনায় যা লিখেছেন, সে-সব খুবই সঙ্গত কথা। বইখানির বিন্যাস-প্রকৃতিও প্রশংসার যোগ্য—পর পর চারটি 'স্তবকে',—প্রথম তিনটি স্তবকের প্রত্যেকটি পাঁচ-পাঁচ 'কুসুমে',—আর চতুর্থটি ছয় 'কুসুমে' ভাগ করা হয়েছে। কিন্তু রামমোহনের গদ্যও কি তুচ্ছ?

আমার হাত থেকে বই তুলে নিয়ে সে বললে—প্রথম স্তবকের চতুর্থ কুসুমে যেখানে তিনি বাক্য-প্রকৃতি দেখাচ্ছেন, সেখানে লিখেছেন—

অর্থবিশিষ্ট যে পদসমূহ সেই বাক্য হয়। পদ দুই প্রকার হয়। তিঙন্ত ও সুবন্ত কর্ম্মাকাঙ্ক্ষী গমন ভোজনাদি ক্রিয়ার বোধক ও কর্ম্মনিরাকাঙ্ক্ষ শয়ন জাগরণাদি ক্রিয়ার বোধক যে তিঙন্ত পদ তাহাকে ক্রিয়াপদ বলি।

আরো শোনো, এই স্তবকেরই পঞ্চম কুসুমে গদ্যের আরো পরিচয় আছে—

পাদকৃত বিচ্ছেদশূন্য যে ক্রিয়া কারকাদি পদ প্রবাহাত্মক গদ্য সে দ্বিবিধ হয় এক আখ্যায়িকা অন্য কথা অর্থাৎ বাক্যপ্রবন্ধ কল্পনা। দণ্ডিকৃত কাব্যাদর্শ গ্রন্থেতে কথা ও আখ্যায়িকার যে ভেদ সে এইরূপ আপনাদের কিংবা অন্যের জ্ঞাত যে বিষয় তদর্থক যে গদ্যসমূহ সে আখ্যায়িকা হয় বিশিষ্টার্থ তাৎপর্য্যক স্বকপোলকল্পিত যে বিষয় তদর্থক যে গদ্যসমূহ সে কথা হয়।

আনন্দ বললে—এইবার শোনো রামমোহনের গদ্যের ধ্বনি—তাঁর 'বেদান্ত-গ্রন্থ' থেকে পড়ছি—

মনুষ্যের হৃদয়পরিমাণে অঙ্গুষ্ঠমাত্র করিয়া ঈশ্বরকে বেদে কহিয়াছেন হস্তী কিম্বা পিপীলিকার হৃদয়ের অভিপ্রায়ে কহেন নাই যেহেতু মনুষ্যেতে শাস্ত্রের অধিকার হয়॥২৫

আমি বললুম—আনন্দ এ গদ্য মৃত্যুঞ্জয়ের তুলনায় অনেক বেশি বন্ধুর;

—তাহলে শোনা অন্য এক নমুনা—

ব্রহ্মের রূপ কোন প্রকারে নাই যেহেতু যাবৎ শ্রুতিতে ব্রহ্মের নির্গুণত্বকে প্রধান করিয়া কহিয়াছেন তবে সগুণ প্রভৃতি যে সে কেবল ব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তি বর্ণন মাত্র। ১৭

—কেমন, এ গদ্য অনেক বেশি মসৃণ তো?

—হাঁ।

—তবে আর একটু দৃষ্টান্ত শোনো—'ঈশোপনিষৎ'-এর মুখবন্ধ থেকে পড়ছি—

এই সকল উপনিষদের দ্বারা ব্যক্ত হইবেক যে

পরমেশ্বরের একমাত্র সর্বব্যাপী আমাদের ইন্দ্রিয়ের এবং বুদ্ধির অগোচর হয়েন তাঁহারি উপাসনা প্রধান এবং মন্ত্রের প্রতি কারণ হয় আর নাম রূপ সকল মায়ার কার্য হয়।

আমি বললুম—দ্যাখো, পাঠক যদি ইতিমধ্যে বিচলিত বোধ করেন, তাহলে তা মোটেই অসংগত বলা চলবে না। বড়ো বেশি উদ্ধৃতি এসে যাচ্ছে। রামমোহনের গদ্যের প্রশংসা তো সুপরিচিত। আর, একথাও অজানা নয় যে, তাঁর গদ্য-নিবন্ধগুলি বিতর্কধর্মী—তাঁর সমসাময়িক পাণ্ডিতদের সঙ্গে তর্কে নামতে হয়েছিল তাঁকে।

—বেদান্তগ্রন্থ কিন্তু বিতর্কমূলক রচনা নয়।

—না, কিন্তু ধরো, 'চারি প্রশ্নের উত্তর', 'পাষণ্ড পীড়ন' ইত্যাদি সংঘাত-সংঘর্ষ তো ঐতিহাসিক সত্য? আর 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' তো নিঃসন্দেহে আমাদের সেকালের বাংলা ভাষার খুঁটিনাটি বিচার-সম্পর্কিত চমৎকার বই। রামমোহনকে অনেক কাজ করে যেতে হয়েছে—অনেক দিকে তাঁর মন নিযুক্ত ছিল।

—সে বিষয়ে কোনো মতানৈক্যের সম্ভাবনা নেই। কিন্তু এখানে আমরা মৃত্যুঞ্জয় আর রামমোহনের গদ্যরীতির কটি উদাহরণ দেখলুম শুধু। আরো কথা আছে—সেসব পরে বলা যাবে। অতঃপর পাঠকদের যাতে অসুবিধা না ঘটে, সেদিকে নজর রেখে এ-প্রসঙ্গ এখন স্থগিত থাক। শুধু গৌড়ীয় ব্যাকরণের কথা তুমি তুললে বলেই বলা দরকার যে রামমোহনের বাংলা ব্যাকরণ আসলে ইংরেজিতে লেখা হয়েছিল। ১৮২৬ খ্রীস্টাব্দে তারই বাংলা অনুবাদ বেরোয়।

সে বললে—ইংরেজিতে লেখা মূলের অনুবাদ সেই বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশের বছর তিনেক আগে চমৎকার একখানি বই বেরোয় বাংলায়। সে বইয়ের লেখক মৃত্যুঞ্জয়ও নন, রামমোহনও নন। 'রঞ্জন পাবলিশিং হাউস' থেকে ১৩৪৪ সালে ভবানীচরণের 'নববাবুবিলাস'-এর নতুন সংস্করণ বেরোয়। মূল রচনার প্রথম প্রকাশের তারিখ ছিল ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি। 'রঞ্জন পাবলিশিং হাউস'-এর পক্ষ থেকে এই নতুন সংস্করণে সজনীকান্ত দাস তাঁর 'প্রকাশকের নিবেদনে' লেখেন—

'নববাবুবিলাস' ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি প্রথম প্রকাশিত হইলেও আমরা ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বটতলা সংস্করণ মাত্র দেখিতে পাইয়াছি। এই সংস্করণটি মুদ্রাকরপ্রমাদে পরিপূর্ণ; বহু অনুসন্ধান করিয়া এবং নানা সাময়িক-পত্রে বিজ্ঞাপন দিয়াও আমরা ইহার অন্য সংস্করণের সন্ধান পাই নাই—পাঠ-নির্দ্ধারণে সম্পাদক মহাশয়ের বহু যত্ন সত্ত্বেও এই পুস্তকের পাঠে অনেক গোলযোগ থাকা সম্ভব।

তিনি আরো খবর দিয়েছিলেন—

'১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের সংস্করণের কপি উত্তরপাড়া পাবলিক লাইব্রেরি ও আগ্রা বাঙ্গালা লাইব্রেরিতে আছে।'

সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন সংস্করণে তাঁর ভূমিকায় 'নববাবুবিলাস'-এর সঙ্গে 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর সম্পর্ক বা সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। 'আলালের ঘরের দুলাল' বই হয়ে বেরোয় ১৮৫৮-তে। তার প্রায় চল্লিশ বছর আগে থেকেই—"বাংলা সাহিত্যে বিদ্রূপ ও হাস্যরসপূর্ণ সামাজিক চিত্রের" ধারা চলে এসেছে। অতএব 'আলালের ঘরের দুলাল' যে আমাদের সাহিত্যে হঠাৎ দেখা দিয়েছিল,—তা বলা যায় না। এই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপময় সমাজচিত্র রচনার প্রেরণাটি তাঁর মতে —পাশ্চাত্য,—অর্থাৎ ইংরেজি সাহিত্যেরই দান। তাঁর নিজের কথায় দেখা যায়—

'যে পর্যবেক্ষণশক্তি ও সাহিত্যিক প্রেরণা এতদিন পর্যন্ত সামাজিক ব্যঙ্গচিত্রে স্ফূর্তি পাইতেছিল, বিদেশী দৃষ্টান্তে—বিশেষ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজী উপন্যাসের দৃষ্টান্তে, সেই শক্তি এবং সেই অনুভূতিই 'আলালে' রূপান্তরিত হইয়া প্রথা দিয়াছিল।'

কিন্তু শুধু বিদেশী উপন্যাসের কলম কেটে এনে বাংলার মাটিতে বসানো হয়েছিল বললে কি 'আলাল'-সম্পর্কিত বিচার সম্পূর্ণ হয়। এ প্রশ্ন মনে দেখা দেওয়া খুবই স্বাভাবিক। ব্রজেন্দ্রনাথের মনেও এ প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। এ বিষয়ে তিনি লেখেন—

"'আলালের' পূর্ববর্তী যুগের ব্যঙ্গরচনার সন্ধান লইলে দেখা যায়, পূর্বগামীদের সহিত প্যারীচাঁদের বেশ একটা ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। ইহার জন্য প্যারীচাঁদের মৌলিকতা খর্ব হইবে না। তিনিই সর্বপ্রথম বাঙালীর ঘরের কথা লইয়া উপন্যাস রচনা করেন, একথা খুবই সত্য। কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বলা প্রয়োজন, যে উপাদান লইয়া তিনি উপন্যাস রচনা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার নিজস্ব আবিষ্কার নয়। 'আলাল' প্রকাশের বহু পূর্বেই বাংলাদেশের লৌকিক সাহিত্যে এই ধরনের বিষয়বস্তুর অবতারণা হইয়াছিল। এই সাহিত্যই প্রকৃত প্রস্তাবে বাংলা সামাজিক উপন্যাসের অগ্রদূত।"

এই তুলনাসূত্রেই ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর এ অনুমানও জানিয়েছিলেন যে, 'আলাল' ছিল বাংলাদেশে—"ইংরাজী শিক্ষা ভাল করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্বেকার যুগের অর্ধশিক্ষিত বাঙালীবাবু।" এই আলাল-টাইপ সম্বন্ধেও ব্রজেন্দ্রনাথের একটি মন্তব্য পাওয়া যায় সেই ভূমিকায়। তিনি লেখেন—"এই বিচিত্র চরিত্রটি আমাদের দেশে উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিকে ইংরেজ শাসনতন্ত্র ও বাণিজ্যের ছায়ায় বর্ধিত নূতন ধনী-সম্প্রদায়ের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিয়াছিল।"

আনন্দ বললে—ব্রজেনবাবু এইসব কথাসূত্রেই আরো একটি ব্যাপার দেখিয়ে গেছেন। তিনি মনে করেন যে, ইংরেজি শিক্ষা এবং ইংরেজি সাহিত্যের প্রভাব এদেশে সংক্রামিত হবার আগেও আমাদের সাহিত্যে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ কিছু কম ছিল না। তিনি বলেন—

"ইহার দৃষ্টান্ত হিসাবে স্ত্রীগণের পতিনিন্দা, সতীনের ঝগড়া, ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু এই সকল পুরাতন ব্যঙ্গচিত্র কতকগুলি বাঁধা-ধরা ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যেই আবদ্ধ। উহার মধ্যে খুব বেশি বৈচিত্র্য নাই।"

অতীতে এই ধরনের যে সব রচনা পাওয়া যায়, সেগুলিতে বৈচিত্র্য যে নেই,—তার কারণ, আগে আমাদের সমাজ ছিল অপেক্ষাকৃত স্থিতিশীল,—পরে,—অর্থাৎ ইংরেজ আসার পরেই সেই স্থিতি ভেঙে গিয়ে, অস্থিরতা দেখা দেয়। সেই অস্থিরতার যুগে,—মনের দ্বন্দ্বচেতনার ফলে—প্রাচীন এবং নবীন, দুই দলেই দেখা দেয় ব্যঙ্গ-রচনার দিকে আগ্রহ।

উনিশ শতকের প্রথম পঞ্চাশ বছরের বাংলা সাহিত্যের চিন্তায় ব্রজেন্দ্রনাথের নিজের সেই কথাগুলি এখানে বিশেষ-ভাবে মনে পড়ে। তিনি লেখেন—

পূর্বেকার যুগে যে বিদ্রূপ সহজ পরিহাসমাত্র ছিল, পরবর্তী যুগে ধর্ম ও সমাজ সংক্রান্ত একটা বিবাদের মধ্যে পড়িয়া উহা তীক্ষ্ম 'সেটায়ারে' পরিণত হইল। এই কারণেই ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের সাময়িক-পত্রাদিতে ব্যঙ্গ-রচনার বহু নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।

১৮২১ সালের ২৪এ ফেব্রুয়ারি এবং ১ই জুন তারিখের দুটি পৃথক সংখ্যায় 'সমাচার দর্পণ' পত্রিকায়—প্রচ্ছন্নরূপে কোন অজ্ঞাত লোকের' প্রেরিত 'বাবু'র উপাখ্যান ছাপা হয়। এই উপাখ্যানের সঙ্গে 'নববাবুবিলাস'-এর 'বাবু'-চরিত্রের মিল দেখে ব্রজেন্দ্রনাথ বলেন—'হয়তো বা দুইটিই একই লেখকের রচনা।' বাংলা ব্যঙ্গ-সাহিত্য প্রসঙ্গে সংস্কৃত-সাহিত্যের 'হাস্যার্ণব' এবং 'কৌতুকসর্বস্ব' নাটক দুটির আদর্শ দেখিয়ে, রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' (১৭৮০ শকাব্দ, চৈত্র) যা লেখা হয়, ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর এই ভূমিকায় প্রাসঙ্গিক সে-উদ্ধৃতি ব্যবহার করেন।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র 'নববাবুবিলাস' এবং 'নব বীবী বিলাস'—দুটি বইকেই অশ্লীলতাদুষ্ট মনে করেছিলেন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দূতীবিলাস'-এরও উল্লেখ ছিল রাজেন্দ্রলালের রচনায়। অশ্লীলতা,—এবং কবিত্বের অভাব—দুইই তিনি সে-বইয়ে লক্ষ্য করেন। তারপর 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর কথা ওঠে। কিন্তু 'বিবিধার্থ সংগ্রহে'র অন্যত্র সে-বইখানি সম্পর্কে আলোচনা 'বিবৃত' হয় বলেই এখানে 'আলাল' সম্বন্ধে কেবল এই তুলনাটুকুই জানানো হয় —"ঐ প্রবন্ধের আদর্শ নববাবুবিলাস কেবল বাবুবিলাসের অশ্লীলতা তাহাতে নাই, এবং নব্য শ্লেষবাক্যে বাবুবিলাস হইতে বিশেষ প্রোজ্জ্বল হইয়াছে।"

আনন্দ বললে—এ প্রসঙ্গটি পাঠকরা পছন্দ করবেন, কারণ এ তো একটি চিরকালের সমস্যা,—কোন্‌টা শ্লীল আর কী যে অশ্লীল, সাহিত্যে সে-চিন্তা বার বার দেখা দেয়। এতক্ষণ ব্যাকরণ, ধর্মশাস্ত্র আর গম্ভীর সব অন্যান্য প্রসঙ্গের চাপে কেমন যেন দম আটকে আসছিল। এইবার একটু হাঁপ ছাড়বার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। তবে, সমালোচনার কাজটি রাজেন্দ্রলালই সুসম্পন্ন করে গেছেন—ও-বিষয়ে নতুন আর কিছু কি বলবার আছে?

—সময়ের ক্রম বজায় রেখেই ভবানীচরণের প্রসঙ্গে এগিয়ে আসা গেল। তবে, রামমোহনের কথা এখনো কিছু বাকি আছে।

সে বললে—তাই তো। তা তো বটেই।

[ক্রমশ]

"চন্দ্র"গ্রহণ

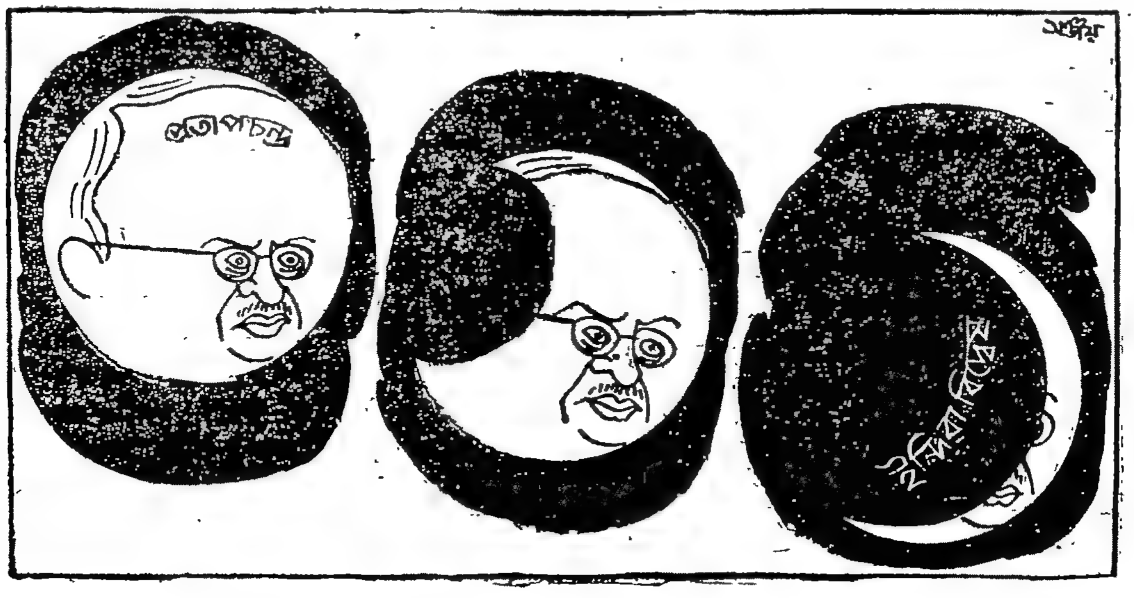

বঙ্গদর্শন

কেন্দ্রীয় তহবিল হতে রাজ্যগুলির প্রাপ্য অর্থ বণ্টনের নীতি ও হার নির্ধারণের জন্য গঠিত পঞ্চম অর্থ কমিশনের রিপোর্টের যে অংশ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে তার প্রকৃত অর্থভেদ করা কঠিন। কেন না, তাঁদের সুপারিশ অনুযায়ী কোন্ রাজ্য কি পরিমাণ টাকা পাবে তাও সঠিক বোধগম্য হচ্ছে না, কিন্তু এটুকু স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, পঞ্চম অর্থ কমিশনও পশ্চিমবঙ্গকে পথে বসিয়েছেন। কারণ, কেন্দ্রীয় তহবিল বণ্টনের যে নীতি পঞ্চম অর্থ কমিশন সুপারিশ করেছেন, তাতে আনুপাতিক হারে পশ্চিমবঙ্গের বরাদ্দ এবার অনেক হ্রাস পাবে বলেই আশংকা করা হচ্ছে। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে অর্থ বণ্টিত হয়, যথা আয়করের একটা অংশ, উৎপাদন শুল্কের একটা অংশ এবং অতিরিক্ত উৎপাদন শুল্কের একটা অংশ রাজ্যগুলিকে দেওয়া হয়।— তাছাড়া সাহায্য খাতেও কিছু টাকা দেওয়া হয়। চতুর্থ অর্থ কমিশন শেষোক্ত সাহায্য খাতে পশ্চিমবঙ্গকে এক কপর্দকও দেন নি, পঞ্চম অর্থ কমিশন এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গকে সাহায্য খাতে ৭২ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা দিয়েছেন। এতে কিন্তু উৎফুল্ল হবার কোন কারণ নেই, কেন না, এ টাকাটা বাড়তি দিলেও অন্যান্য খাতে টাকার পরিমাণ কেন্দ্রীয় সরকার অনেক কমিয়ে দিয়েছেন।—যার ফলে পশ্চিমবঙ্গের মোট অর্থপ্রাপ্তির পরিমাণ চতুর্থ কমিশনের প্রদত্ত অর্থের পরিমাণের চেয়ে অনেক কম হবে। উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটাকে আরও একটু প্রাঞ্জল করার প্রয়োজনীয়তা আছে। চতুর্থ অর্থ কমিশনের সুপারিশে পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল বণ্টনযোগ্য আয়করের ১০·৯১ শতাংশ। এবার তা কমিয়ে করা হয়েছে ৯·১১ শতাংশ। চতুর্থ অর্থ কমিশনের সুপারিশে পশ্চিমবঙ্গের জন্য বরাদ্দ হয়েছিল উৎপাদন শুল্কের ৭·৫১ শতাংশ, পঞ্চম অর্থ কমিশন তা ছেঁটে করেছেন ৬·৮৪ শতাংশ, অনুরূপভাবে অতিরিক্ত উৎপাদন শুল্কের থেকে পশ্চিমবঙ্গের প্রাপ্তির হার ১১·৯৩ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৮·৭৫ শতাংশে দাঁড় করানো হয়েছে। অর্থাৎ গতবারের অর্থ কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ যা পেয়েছিল পঞ্চম অর্থ কমিশন তা থেকে প্রায় ৬ শতাংশ কমিয়ে দিয়েছেন।

বলাই বাহুল্য, এই সুপারিশ পশ্চিমবঙ্গের সরকারী মহলে দারুণ হতাশার সৃষ্টি করেছে। এটুকু বোঝা গেছে যে, রাজ্য সরকারের চতুর্থ প্রকল্পকালে পরিকল্পনা বহির্ভূত কাজের জন্য যেখানে রাজস্ব ঘাটতি ছিল ৬২৭ কোটি টাকা সেখানে কেন্দ্রীয় সরকার দিতে চেয়েছেন মাত্র ৩৬৯ কোটি টাকা। এর ফলে রাজ্য সরকারকে বাধ্য হয়েই উন্নয়নমূলক কাজ ছাঁটাই করতে হবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার কমিশনের নিকট পেশ করা স্মারকলিপিতে যে অর্থ বরাদ্দের দাবি তুলেছিলেন, কমিশন তা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেছেন। রাজ্য সরকার আয়কর বণ্টনের যে নীতি চালু করার প্রস্তাব করেছিলেন, তাতে বলা হয়েছিল যে, রাজ্য থেকে যে পরিমাণ আয়কর আদায় হয়, তারই ভিত্তিতে সেই আয়করের ভাগ রাজ্যগুলিকে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। সেই হিসাবে আয়করের অর্থ বণ্টন করা হলে পশ্চিমবঙ্গের ভাগে পাওনা অনেক বেশি হত, কারণ আয়কর আদায়ের দিক দিয়ে এই রাজ্য ভারতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে। কিন্তু পঞ্চম অর্থ কমিশন একেবারে উল্টো নীতি সুপারিশ করেছেন। তাঁরা আদায় ভিত্তিক বণ্টনের পরিমাণ কুড়ি শতাংশ থেকে কমিয়ে দশ শতাংশে দাঁড় করিয়েছেন। কেন্দ্রীয় সাহায্য বাবদ যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে, তা পশ্চিমবঙ্গের চাহিদার তুলনায় একেবারেই অপ্রতুল। যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই তাঁরা কেন্দ্রীয় তহবিল হতে রাজ্যের বরাদ্দ বৃদ্ধির দাবি করে আসছেন। তাঁদের বক্তব্য, রাজ্য সরকারের সামাজিক দায়দায়িত্ব যে হারে বাড়ছে, সেই তুলনায় আয় বাড়াবার কোন পথ পাওয়া যাচ্ছে না। তার ফলে উন্নয়নমূলক কাজগুলিতে ব্যাঘাত ঘটছে। এই অবস্থায় রাজ্যগুলির হাতে হয় অতিরিক্ত আর্থিক ক্ষমতা থাকা দরকার, না হয়, কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে রাজ্যগুলিকে আরও বেশি অর্থ সাহায্য করা উচিত। পঞ্চম অর্থ কমিশনের সুপারিশে কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতিরিক্ত অর্থলাভের আশা তিরোহিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবশ্য বিষয়টিকে নিয়ে পুনরায় কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দরবার করার কথা চিন্তা করছেন। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় বলেছেন যে, প্রধানমন্ত্রী কলকাতায় এলে তিনি তাঁর কাছে পশ্চিমবঙ্গের দাবি আর একবার তুলে ধরবেন বলে জানিয়েছেন। বর্তমানের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের প্রতি চিরপরিচিত ব্যবহারের ব্যতিক্রম ঘটবে কিনা সেটা আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করার বিষয়।

বন্যার্ত রাষ্ট্রে

গঙ্গা ও কালিন্দীর অভূতপূর্ব বন্যায় এ পর্যন্ত মালদহ জেলার প্রায় চারশো বর্গমাইল এলাকার ৩৪ হাজার ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে এবং ৬৫ হাজার একরেরও বেশি জমি এখনো জলের তলায়। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত মৃতদেহের সংখ্যা ২২টি। মহানন্দা ও পুনর্ভবার জল এখনো বাড়ছে। মাণিকচক, কালিয়াচক ও ইংলিশ বাজারের মাইলের পর মাইল কেবল জল। রতুয়া, হরিশ্চন্দ্রপুর, হবিবপুর ও মালদহ থানার ৭২টি ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের প্রায় পৌনে তিন লক্ষ লোক বন্যার আক্রমণের শিকার হয়েছে। গঙ্গা ও কালিন্দীর মাঝখানে মাণিকচক থানার বিস্তীর্ণ চর এলাকার লোকেরাই এই বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। দুই নদীর জল দুই দিক দিয়ে ওই অঞ্চলের মানুষদের গ্রাস করেছে। প্লাবনের ফলে গঙ্গা ও কালিন্দী এক হয়ে যাওয়ায় ওই চর এলাকার লোকদের উদ্ধার করাও বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

খেজুরিয়াঘাটের সঙ্গে মালদহের সড়ক সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার ফলে ত্রাণ ব্যবস্থায় সবচেয়ে বেশি বিঘ্ন দেখা দিয়েছে। খেজুরিয়াঘাটে ত্রাণের মাল নিয়ে যে লরীগুলি আটক হয়ে আছে সেগুলিকে কালিয়াচকে নিয়ে আসা একেবারেই অসম্ভব। ফলে ত্রাণ সম্ভার রাজ্য সরকার বিমানে পাঠাতে বাধ্য

হচ্ছেন। সামরিক বাহিনীর নৌকা যদিও উদ্ধার ও ত্রাণের কাজের জন্য জলে নামানো হয়েছে, কিন্তু প্রবল স্রোতে এই নৌকাগুলি কার্যকরী নয়। দেশী নৌকা সংগ্রহ করাও দুঃসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। মালদহের প্লাবিত অঞ্চলে পানীয় জলের অভাব দেখা দিয়েছে। টিউবওয়েলগুলি জলে ডুবে যাওয়ায় প্লাবিত অঞ্চলের বহু লোকই নদীর জল পান করতে বাধ্য হচ্ছে।

মুর্শিদাবাদ জেলায় বন্যার জলবৃদ্ধির হার কমেছে। এখানে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত লোকের সংখ্যা প্রায় ৯৫,০০০। ৯০০ বাড়ি ধ্বংস হয়েছে। জঙ্গীপুর মহকুমার ফরাক্কা, সুতী সমসেরগঞ্জ ও রঘুনাথগঞ্জ থানা, লালবাগ মহকুমার নবগ্রাম, লালগোলা, ভগবানগোলা ও আমোরিগঞ্জ থানা, কাঁদি মহকুমার ভরতপুর, বড়ঞা ও খড়গ্রাম থানা এবং ডোমকল ও সদর মহকুমার কিয়দংশও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলার বন্যা নতুন এলাকায় আর বিস্তৃত হয় নি। এ পর্যন্ত মুর্শিদাবাদ জেলায় বন্যার জলে আটক পাঁচ হাজার লোককে উদ্ধার করা হয়েছে। সুখের বিষয়, গঙ্গা বা কালিন্দী গত বছরের তিস্তার মত অতর্কিত আক্রমণ করে নি।

পর পর কয়েক সপ্তাহ ধরেই পশ্চিমবঙ্গে নানা স্থানে বন্যা চলছে। রাজ্য সরকার এ বিষয়ে আগাগোড়া সতর্ক আছেন বলেই অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হয় নি। গত বছরের জলপাইগুড়ির বন্যার স্মৃতি মানুষের মন থেকে এখনো অন্তর্হিত হয় নি। প্রতিটি ক্ষেত্রে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়ার ফলে পরিস্থিতি এখন আয়ত্তাধীন। সরকারী সাহায্য ছাড়াও আঞ্চলিক বে-সরকারী সাহায্যও যতদূর সম্ভব দেবার চেষ্টা হচ্ছে। রাজ্য সরকার দফায় দফায় বিমান মারফৎ সাহায্য পাঠাচ্ছেন। প্লাবিত অঞ্চলের লোকেদের মহামারী প্রতিষেধক ইনজেকশন দেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু এ সবই সাময়িক ব্যবস্থা। আস্তে আস্তে বন্যার জল কমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রে আর বন্যাপরিস্থিতি উল্লেখিত হবে না। সাহায্যের পরিসরও স্বল্প থেকে স্বল্পতর হবে। হৃতসর্বস্ব মানুষগুলির অর্থনৈতিক পুনর্বাসনের কোন ব্যবস্থাই হবে না। আর তাছাড়া রাজ্য সরকারের ত্রাণ খাতের সামান্য ওই টাকা দিয়ে কার্যত কিছুই করা সম্ভব নয়, যদি না কেন্দ্র এদিকে এগিয়ে আসে। গত বছরের জলপাইগুড়ির বন্যার সময় দেখা গেছে, কেন্দ্রীয় সরকার, অনেক তাগাদা পাবার পর, একটা

মদের আসর প্রসংগে

একটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল ও সুপারিনটেনডেন্ট আমাদের জানিয়েছেন, "হেলথ ডিরেক্টরেটের জনৈক পদস্থ আমলার ঘরে অনুষ্ঠিত মদের আসরে আমি যোগদান করি নি। তবে মদের আসর বসেছিল ঠিকই এবং জেনেছি একজন মহিলাও কিছুক্ষণের জন্য আসরে উপস্থিত ছিলেন। ১২ই আগস্ট বিকেল সাড়ে তিন-চারটার মধ্যে মদের আসর বসে এবং দু'জন প্রাক্তন প্রিন্সিপালও তাতে যোগদান করেন। সেণ্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর্সের সংগে সংশ্লিষ্ট জনৈক ব্যক্তির আনুকূল্যে মদের বোতলগুলি পাওয়া যায়। হেলথ ডিরেক্টরেটের একজন এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ডিরেক্টর (যিনি সম্প্রতি চাকরিতে পুনর্নিয়োগের আশ্বাস পেয়েছেন) আনুষঙ্গিক খাদ্যদ্রব্যের যোগান দেন। এ সম্পর্কে একটি ফাইলের নং...... আপনাদের দিলাম, খোঁজ করলে স্তম্ভিত হয়ে যাবেন।

"অনুগ্রহ করে আমার নামটি প্রকাশ করবেন না—তাহলে আমার সমূহ বিপদ হবে। জেনে রাখুন—বাইরে থেকে যাই শুনে থাকুন না কেন, আমি সুরক্ষ-চক্রের লোক নই। সেদিন টেলিফোনে ত' সবই বলেছি। কিছুতেই যেন আমার নাম প্রকাশ হয়ে না পড়ে।......

"আর একটা কথা, পদস্থ আমলার ঘরটি স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ঘরের কাছাকাছি নয়—কোথায় তা সম্ভবত এতদিনে জেনে গেছেন। মন্ত্রী মশায়ও জানেন, তবে তাতে লাভ কি?"

বহু তথ্য পেয়েও স্থানাভাববশত এ সংখ্যায় 'মদের আসর'-এর প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করা গেল না। আগামী সংখ্যায় এই প্রসঙ্গে এবং কল্যাণী জওহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল হাসপাতালের প্রাক্তন সুপারিনটেনডেন্টের বিরুদ্ধে আনীত গুরুতর অভিযোগসমূহ সম্পর্কে ভিজিল্যান্স কমিশন যে তদন্ত সুরু করেছিলেন, তা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য যে জঘন্য প্রচেষ্টা চলছে—সে সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশ করা হবে।

স্টাডি টীম পাঠিয়েছিলেন। সেই টীম বন্যার্তদের সাহায্যার্থে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে দেবার জন্য যে পরিমাণ টাকা সুপারিশ করেছিলেন, তা ছিল প্রয়োজনের তুলনায় হাস্যকর ধরণের কম। কিন্তু সে টাকাও শেষ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি।

ধরে নেওয়া গেল এবার না হয় যুক্তফ্রন্ট সরকার 'আন্দোলন' করেই কেন্দ্রের কাছ থেকে কিছু বার করলেন। কিন্তু তাতেই বা কি হবে। আবার তো আসছে বছর বন্যা হবে। কাজেই এমন একটা ব্যবস্থা করা দরকার, যাতে বন্যাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সদিচ্ছা থাকলে এ কাজটা করা এমন কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। গত বছরের জলপাইগুড়ির বন্যা উপলক্ষে আমরা সাপ্তাহিক বসুমতীর একটি বিশেষ বন্যা সংখ্যা প্রকাশ করেছিলাম, যাতে বাংলাদেশের কয়েকজন নদী বিশেষজ্ঞের প্রবন্ধ ছিল এবং সকলেই একবাক্যে বলেছিলেন যে, একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অবলম্বনে পশ্চিমবঙ্গের নদী শাসন এমন কিছু অসম্ভব ব্যাপার নয়। শোনা যায় সেচমন্ত্রীরও এইরকম একটা পরিকল্পনা আছে, কিন্তু অর্থাভাবই তাতে একমাত্র বাধা, এবং এই বন্ধ তালাটি একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের চাবিতেই খুলতে পারে। কাজেই যে কোন উপায়েই হোক এ বিষয়ে কেন্দ্রের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করতে না পারলে কিছুই করা যাবে না।

চুঁচুড়া সদর হাসপাতাল—(১)

আমরা বেশ কিছুকাল ধরে কল্যাণী জহরলাল নেহরু হাসপাতাল সম্পর্কে প্রচুর লেখালেখি করার পর রাষ্ট্রপতিশাসনকালে সরকারের টনক নড়েছিল, এবং ওই হাসপাতালের তৎকালীন সুপারিন্টেন্ডেন্ট সাহেবকে শেষ পর্যন্ত সরে যেতে হয়েছে, বর্তমানে ওই হাসপাতালের অবস্থা আগের চেয়ে অনেক উন্নত হয়েছে। কিন্তু দুর্নীতির বটের চারা ওপর থেকে বিনষ্ট হলেও তার শেকড় এখনো ভেতরে রয়ে গেছে, দু-চারজন সাগরেদ এখনো আছে এবং তাদেরও নানা অপকীর্তির দু-চারটে নমুনা আমরা বঙ্গদর্শনে ইতিপূর্বে পেশ করেছি।

আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয় হচ্ছে চুঁচুড়া সদর হাসপাতাল। এই হাসপাতালের কীর্তিত্বের কাহিনী মহাভারততুল্য, কাজেই তা পরিবেশনে অনেক সময় ও অনেকগুলি পৃষ্ঠা লাগবে, কাজেই উপন্যাসের মত তা ধারাবাহিকভাবেই প্রকাশ করা সঙ্গত। অতএব

বর্তমান সংখ্যায় শুধু জেনারেল ডেসক্রিপশন থাকবে। কেন না এই হাসপাতালটির জমিদারীর পরিসর বড় কম নয়, সমগ্র হুগলী জেলা তো বটেই, চব্বিশ পরগনা ও নদীয়া জেলার অনেকখানি অংশও এই জমিদারীর অন্তর্গত। গঙ্গার তীরে অবস্থিত চুঁচুড়ার ঠিক অপর পারেই নৈহাটি নামক একটি শিল্পাঞ্চল বর্তমান, এবং নৈহাটি-চুঁচুড়া লঞ্চ সার্ভিসের নাকি সৃষ্টিই হয়েছে নৈহাটি থেকে আগত চুঁচুড়া সদর হাসপাতালের রোগীদের স্বার্থে। কেন না দেখবেন, লঞ্চঘাটের এপারের এবং ওপারের বুকিং অফিসে সারি সারি স্ট্রেচার সাজিয়ে রাখা আছে, কাছাকাছি বাঁশের দোকানও আছে, শুধু একটা শ্মশান থাকলেই সর্বাঙ্গসুন্দর হত।

চুঁচুড়া শহরটি খানদানী শহর, কেন না এটা একটা ডিস্ট্রিক্ট হেড কোয়ার্টার, জজ, ম্যাজিস্ট্রেট, এস-ডি-ও থেকে শুরু করে অসংখ্য অফিসার, পুলিশের বড়-কর্তারা, বড় বড় উকিল-মোক্তার, সরকারী কলেজের অধ্যাপক, ব্যবসায়ী, কন্ট্রাক্টর এই শহরের অলিতে-গলিতে আছেন। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও স্পেশালিস্টদের সঙ্গে এঁদের সম্পর্ক হলায় গলায়, অর্থাৎ এঁরা সকলেই একই সোসাল ক্লাসের অন্তর্গত। ঘটনাচক্রে এঁদের কোন রোগী যদি হাসপাতালে পায়ের ধুলো দেন তাঁর সেবার কোন ত্রুটি হবে না এবং এই হাসপাতালটি সম্পর্কে ভাল সার্টিফিকেট দিতে তাঁরা কদাপি কার্পণ্য করবেন না। পক্ষান্তরে হাসপাতালের কাজো সম্পর্কে আপনার কোন অভিযোগ করার থাকলে সে অভিযোগ গ্রহণ করার মত কোন কর্তাব্যক্তিকেই আপনি পাবেন না।

হাসপাতালের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে আপনার একটু দেরি হবে। চুঁচুড়া ঘড়ির মোড় থেকে আপনাকে হাঁটতে হবে সোজা উত্তর দিকে। দুমিনিট হাঁটলেই ডানদিকে চোখে পড়বে গামগাছে ঘেরা একটি আশ্চর্য সুন্দর পশু চিকিৎসালয়, আপনি যদি রোগী হন তাহলে ভাববেন কেন আপনি পশু হয়ে জন্মগ্রহণ করেন নি। আরও তিন মিনিট ওই একই পথে এগিয়ে যান, ভাঙাচোরা পিচের রাস্তা, স্থানে স্থানে গর্ত, চুঁচুড়া পৌরসভা যে কী চীজ তা ওতেই বুঝবেন। তার পরেই দেখবেন আপনার চোখের সামনে চুঁচুড়া সদর হাসপাতাল, যার আর এক নাম ইমামবাড়া হাসপাতাল। আর বাঁদিকে দেখবেন সারি সারি দোকানের মেলা।

শুধু একটা রাস্তাই আপনাকে অনেক জ্ঞান দেবে। বাঁদিকের দোকানগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। প্রথমেই আপনার চোখে পড়বে পর পর কয়েকটি চায়ের দোকান। আপনি হয়ত বিস্মিত হবেন হঠাৎ চায়ের দোকানের কথা উঠছে কেন। হাসপাতালের সামনে চায়ের দোকান থাকাটা আশ্চর্য নয়, রোগীর আত্মীয়-স্বজন হয়ত মাঝে মাঝে পান করবেন এইটাই তো স্বাভাবিক। না, চায়ের দোকানগুলি থাকাতে আপত্তির কোন কারণ নেই। কিন্তু সংবাদটা দিয়ে রাখা ভাল, ওই চায়ের দোকানগুলির চা তৈরি করতে যে দুধের যোগান লাগে সেটি আসে চুঁচুড়া সদর হাসপাতাল থেকেই। অর্থাৎ রোগীদের বরাদ্দ দুধের একটা মোটা অংশই এই দোকানগুলিতে পাচার হয়ে যায়। তারপরেই আপনার চোখে পড়বে পাঁচ-সাত গজ অন্তর অন্তর একটা করে ওষুধের দোকান। হাসপাতালে বোতল ভর্তি লাল-নীল জল ছাড়া আর কোন ওষুধই কার্যত দেওয়া হয় না, সর্বদাই শোনা যায় স্টকে নেই। ওষুধ বা ইনজেকশান বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাইরে থেকে কিনতে হয়। আপাতদৃষ্টিতে যখন বাইরে থেকে ওষুধ কিনতেই হয় তখন হাসপাতালের কাছাকাছিই ওষুধের দোকান থাকাটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু মজাটা হচ্ছে এই যে, কোন কোন ডাক্তার এমন সমস্ত ওষুধ প্রেসক্রাইব করেন, যেগুলির জন্য ওই দোকানগুলি ছাড়া গত্যন্তর নেই। যেমন সানওয়েজ কোম্পানীর ওষুধ ওই মহল্লার একটি দোকানই স্টক করে এবং কোন কোন ডাক্তার ওই কোম্পানীর ওষুধ ভিন্ন আর কোন ওষুধ প্রেসক্রাইবই করেন না। এরপর আপনার চোখে পড়বে পর পর কয়েকটি এক্স-রে ক্লিনিক। এগুলির অস্তিত্বের কারণ ব্যাখ্যা করতেও বিশেষ বেগ পেতে হয় না। রোগীদের বলা হয় যে, হাসপাতালের এক্স-রের কল বিকল হয়ে গেছে, কিম্বা ফিল্ম ফুরিয়ে গেছে, কাজেই ওটা বাইরে থেকে করিয়ে নেওয়াই সঙ্গত। ফলে মাত্র দু'বছরের মধ্যেই দু'জন এক্স-রেওয়ালা ওই পাড়াতেই তেতলা বাড়ি হাঁকিয়েছেন।

হাসপাতালের সামনের রাস্তাটুকুই যদি এতটা ইতিহাস ব্যক্ত করতে পারে, তাহলে এবার কল্পনা করুন হাসপাতালের ভেতরে গেলে কি পাওয়া যাবে। আজ রাস্তাতেই অপেক্ষা করুন, অতবড় জমিদারীর অন্দরমহলে কি একদিনেই ঢোকা যায়?

কয়েকখানি বিখ্যাত বাংলা অনুবাদ

এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ

সপ্তডিঙা	—ইউজিন ও'নিল	৩·০০
চিরঞ্জীবী রূপালয়	—এলমার রাইস	৫·০০
উদারপন্থী বিবেক	—চেস্টার বোলজ	৫·০০
রবার্ট ফ্রস্টের কবিতা	—রবার্ট ফ্রস্ট	৩·০০
কার্ল স্যান্ডবার্গের এক মুঠো	—কার্ল স্যান্ডবার্গ	২·০০

এশিয়া পাবলিশিং কোং

মানুষের অধিকার	—ডগলাস	২·০০
ভারত ও পাশ্চাত্ত্য	—বারবারা ওয়ার্ড	৪·০০
আমেরিকার কাহিনী (তিন খণ্ড)	—জনসন (প্রতি খণ্ড)	২·৫০
বাপীর গল্প	—ক্লারেন্স ডে	৩·০০
আত্মকাহিনী	—ইলিনর রুজভেল্ট	২·৫০

১ টাকা সিরিজের জীবনী গ্রন্থঃ—
হেনরী জেমস, টমাস উল্ফ, মারক টোয়েন, নাথানিয়েল হথর্ন, ক্যাথরিন অ্যান পোরটার, ওয়াশিংটন আরভিং

সাহিত্যায়ন

পলাতকা	—পার্ল বাক	৩·০০
অতৃপ্তির অমানিশা	—স্টাইন বেক	৩·০০

অভ্যুদয় প্রকাশ মন্দির

সবাই যেথা স্বাধীন	—মিডাক্রফট	২·৫০
অ্যাডভেঞ্চারস অব হাকলবেরি ফিন	—মারক টোয়েন	৫·০০
মানুষের কাহিনী	—ভ্যান লুন	৭·৫০

পরিচয় পাবলিসার্স

কৃষি ও কমিউনিজম	—ওয়াল্‌সটন	১·৫০
জ্যাক লন্ডনের শ্রেষ্ঠ ছোট গল্প সংকলন	—জ্যাক লন্ডন	৩·০০

নানা বিষয়ে আরো অনেক বই : পুস্তক বিক্রেতাদের উচ্চ কমিশন
তালিকা চেয়ে পাঠান : আজই অর্ডার দিন

এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ : ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট : কলি-১২

ভারত দর্শন

ওয়ার্কিং কমিটির 'দেখনহাসি'

কংগ্রেসের দুই শিবিরে একটা জোড়াতালি লাগল বলে সংবাদ। দুই শিবিরের অনেকেই গোমড়া মুখ খোলসা করে হেসেছেন—যাকে বলে, 'দেখনহাসি'।

ভি ভি গিরি না সঞ্জীব রেড্ডি, এই নিয়ে দেশ জুড়ে যা হয়ে গেল তাকে ভয়ঙ্কর সঙ্কট বলে অনেকেই চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন। খুব স্বাভাবিক। সম্মুখ সমর দেখলে সঙ্কট-সমাগত বলে বোধ হয় বৈকি। বিশেষ যাঁরা একচক্ষু হরিণ কিম্বা উটপাখী তাঁদের পক্ষে সঙ্কট ঘাড়ের ওপর না-এসে পড়া পর্যন্ত চৈতন্য লাভ ঘটে ওঠে না। কিন্তু এই সঙ্কট যে সমাগত সে খবর বহুকাল চাউর হয়েই ছিল। মোরারজী দেশাই মন্ত্রিসভায় থাকলেও সঙ্কট থাকত. ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ না হলেও সঙ্কট থাকত, এবং ভি ভি গিরিকে নিয়ে দুটি শিবির কোমর না বাঁধলেও সঙ্কট বাড়ত বই কমত না। সঙ্কটের মেঘ জমেছিল. একটি বর্ষণে আকাশ কিছুটা ফর্সা হয়েছে মাত্র. বিদ্যুৎ চমকে ক্ষান্তি হয় নি। এখন আশাবাদীরা সব দেখে শুনে বলছেন, এ আর এমন কি! এর আগেও কংগ্রেস এমনধারা সঙ্কটের সম্মুখীন হয়েছে. ফের সব মিটে গেছে। এই প্রসঙ্গে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেস থেকে বিদায় নেওয়ার মুহূর্তটিকেও স্মরণ করেছেন অনেকে। মোদ্দা উদ্দেশ্য এ কথাই প্রমাণ করা যে, বিপ্লবীয়ানা ইতিপর্বেও ঢের হয়েছে শেষ পর্যন্ত টেকে নি। ইন্দিরা গান্ধীও কি শেষ পর্যন্ত টিকবেন ?

এ প্রশ্নের একটাই জবাব এবং মুখের মতো জবাব হল. কোনো নেতার টিকে থাকাটা তাঁর ব্যক্তিগত রাজনৈতিক বুদ্ধিমত্তার ওপরই একমাত্র নির্ভরশীল নয়. দেশীয় পরিস্থিতিই নেতাকে তোলে এবং টিকিয়ে রাখে। কংগ্রেসে কর্তাপন্থীরা যে এতোকাল বহালতবিয়তে টিকেছিলেন, তার কারণ দেশে অনুকূল জনজাগরণ দেখা দেয় নি কোন ১৯৬৭-র পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় নি। আজ গণচেতনা তাঁদের বে-কায়দা করেছে, পালে হাওয়া লক্ষ্য করে এখন যিনি হাল ধরবেন তিনিই কাণ্ডারী। তাঁর পক্ষে স্থিতাবস্থা লক্ষ্য করে হাওয়ার বিপরীতে তরণী ফেরালেই ভরাডুবির আশঙ্কা। ওয়ার্কিং কমিটিতে ঝেড়ে বর্ষণ হয়ে গেলেই ভালো হত। তা না হওয়ায় 'দেখনহাসি' শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষে আশঙ্কার মেঘ পুনরায় রচনা করবার সুযোগ পাবে। শুধু শ্রীমতী গান্ধীই নন, যে ঝড় বইছিল তাতে কংগ্রেসের জমে-ওঠা ময়লা সাফ হয়ে যেতে পারত। গান্ধীর সঙ্গে সমতালে কংগ্রেসের পপুলারিটিও ফেরত আসত। অন্ততপক্ষে ওয়ার্কিং কমিটিতে একটি প্রদর্শনী গণ্ডগোলও জনসমক্ষে আশার দীপশিখাটির সলতে উস্কে দিতে পারত। কিন্তু নাটক তুঙ্গে এসে নির্জীব হয়ে পড়ায় সেই এ্যাণ্টি-ক্লাইম্যাক্সের ধাক্কা কংগ্রেসের দ্রুত পুনরুজ্জীবনে আশানুরূপ সাড়া জাগাতে একরকম ব্যর্থই হবে। এখন টেম্পো বজায় রাখতে হলে শ্রীমতী গান্ধীকে পরের পর জনকল্যাণমূলক কাজ করতেই হবে: কারণ ওয়ার্কিং কমিটিতে 'দেখনহাসি'র নিরুত্তাপ জনমনে একরকম হতাশাই সৃষ্টি করেছে। তাঁরা ভেবেছিলেন. এসপার ওসপার একটা কিছু হবেই। সেই উৎসাহে জলের ছিটে পড়ল। ফলে বামপন্থী দলগুলিও যে কোমর বাঁধছিলেন, তাঁদেরও কিছুটা হতাশ হতে হল। উত্তাপ কমলে সাধারণকে তাতাতে তাঁরা কসুর করবেন না।

ওপারের কৃপালনী, এপারের প্রফুল্ল সেন প্রমুখ কয়েকজন বলেছেন, জানতাম, এমনটাই হবে। কিন্তু বস্তুতই কি তাই? প্রত্যেকেই কি জেনেছিলেন, এমনটাই হবে? সিণ্ডিকেটও বোধ হয় ভাবতে পারেন নি, এমন নমঃ নমঃ করে সারতে হবে। কারণ শেষ মুহূর্তে অতুল্য ঘোষ পাতিলও যে চ্যবন সাহেবের পাশে দুদিকে ঠেকনো দিয়ে দাঁড়াবেন, নিজলিঙ্গাপ্পা. কামরাজ, মোরারজী হয়ত অতটা ভাবেন নি। বিশেষ পাতিলসাহেব একরকম মুঠ কেড়ে নিয়ে রণে ভঙ্গ দিয়ে বম্বে পাড়ি দিলেন। চ্যবনসাহেব হাওয়ার গতি বুঝে হেলেছেন। রেড্ডির সমর্থনে যথাশক্তি নিযুক্ত করেও যখন হতাশ হতে হল. তখন বিবাদভঞ্জনের দূতরাজগী ছাড়া অধিকতর রিস্ক নিতে উনি আর রাজী হলেন না। চ্যবনসাহেবের অসহায় অবস্থাটাই শেষে সংক্রামিত হয়েছে 'সমমনোভাবাপন্ন'-সন্ধানী সর্বদামুখর পাতিলসাহেবের মধ্যে। বড় অস্বাভাবিক রকমের শান্তশিষ্ট ভালোমানুষটি বনে গেলেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গের বিপুল সমর্থনের চেহারা দেখে অতুল্যবাবুর পক্ষেও আর বড় কদম ফেলার সুযোগ রইল না। তবে সিণ্ডিকেটকে স্বতন্ত্র জনসঙ্ঘও কম হতাশ করে নি। নিজলিঙ্গাপ্পার ডাকে ওঁরা তেমন করে আর সাড়া দিলেন কৈ। বৈঠকে নিজলিঙ্গাপ্পার মুখরক্ষা করে অবশ্য বলা হল, অকংগ্রেসী দক্ষিণী দলগুলির সঙ্গে (পি-এস-পি সমেত) কংগ্রেস সভাপতির বার্তালাপের মধ্যে কোয়ালিশন সরকার গঠনের কোন প্রসঙ্গ ছিল না, ব্যাপারটা সম্পূর্ণ একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে। বলা বাহুল্য এই জবাবদিহির কোন প্রতিবাদ না হওয়ায় এর সত্যতা মেনে নেওয়া খুবই সঙ্গত। অন্যদিকে ইন্দিরাগোষ্ঠীর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা অবলম্বনের হুমকি ঢোক গিলে হজম করে নেওয়া হয়। সম্পূর্ণ ব্যাপারটাই এমন মিহি সুরে ঘটে যায় যে, অনেকেই বলতে বাধ্য হলেন, কংগ্রেসের চিরাচরিত ভাঁওতাপূর্ণ আর একটি প্রদর্শনী ম্যাচ যথেষ্ট পারদর্শিতার সঙ্গে খেলে কংগ্রেসের দুই শিবিরের খেলোয়াড়বৃন্দ প্যাভিলিয়নে জলপানের জন্য প্রত্যাবর্তন করলেন। সোমবারের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের নিরুত্তাপ মঙ্গলবারের প্রভাতী পত্রেই প্রতিভাত হল। হেড লাইন আর ডিসপ্লের কোথাও এতোটুকু বাড়াবাড়ির প্রয়োজন হল না। সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠার চেহারাই বলে দিল, সব ঠিক হ্যায়। মিটমাট হয়ে গেছে। কংগ্রেস জানে কেমনভাবে বিবাদ মেটাতে হয়।

প্রধানমন্ত্রী নিজেও বললেন : কংগ্রেস দল এখনও সাধারণ মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার জাজ্বল্যমান প্রতীক। জনগণের সঙ্গে এক হয়ে বিপরীত বিষয়ে সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষমতা আজও সে সংগঠনের আছে।

ভালো কথা। কিন্তু বাস্তব ঘটনা যদি তাই হবে, যদি কংগ্রেসের টম ডিক হ্যারি প্রত্যেকেই এমনভাবে হাওয়ার গতিতে হেলবেন, তবে পরবর্তী কয়েক-দিনের ঘটনাবলীও তো অন্যতর হত। অর্থাৎ কলনে দুই শিবির গঙ্গাস্নান সেরে রাখিবন্ধন করতেন। বাস্তব পরিস্থিতি কিন্তু ঠিক তার উল্টো। শ্রীমতী গান্ধী তাঁর প্রাসাদের সামনে জমায়েত অত্যুৎসাহী সমাবেশের উদ্দেশ্যে বলছেন, সতর্ক থাকুন। যাঁরা ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের প্রস্তাবের সঙ্গে বিরোধিতা করেছিলেন তাঁদের হৃদয় অর্থাৎ মনোভঙ্গির কোনও পরিবর্তন হয় নি। সুযোগ পেলেই ওঁরা করবেন প্রচন্ড প্রত্যাঘাত।

বলা বাহুল্য, এ ইঙ্গিত কি মোরারজী দেশাই গোষ্ঠীর প্রতি নয়?

অপরদিকে নিজলিঙ্গাপ্পাও ধরে বসে আছেন, মোরারজী প্রসঙ্গে এখনো সমাপ্তির রেখা টানা হয় নি। শৃঙ্খলাভঙ্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের চিন্তাও পরিত্যক্ত হয় নি।

তবে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে প্রধান-মন্ত্রী আর কংগ্রেস সভাপতির মর্যাদা রক্ষা করে যে দুটি পাল্টি প্রস্তাব গৃহীত হল, সে দুটি কী?

'দেখনহাসি'। আবার কি।

প্রধানমন্ত্রীর উভয়সঙ্কট

কিন্তু রাজনীতিটা যেহেতু 'ইয়ারকি' নয়, তাই অতঃপর একটি সঠিক পথ গ্রহণ করতেই হবে প্রধানমন্ত্রীকে, না হলে তাঁর পক্ষে স্বেচ্ছায় এবং চাপে-পড়ে গ্রহণ করা মহান দায়িত্ব পালন করে নিজ শিবিরকে বিপন্মুক্ত রাখা কষ্টকর।

প্রধানমন্ত্রীর অবস্থাটা সিন্ডিকেট অপেক্ষাও করুণ, যদিও আপাতদৃষ্টিতে জনগণ তাঁরই পাশে। সিন্ডিকেটের পাশে জনগণ নেই; এই জনগণকে সিন্ডিকেট কখনও একটা কার্যকরী শক্তি হিসেবে গণনা করে নি। তবু সিন্ডিকেটের মজা এই যে, দেশের সামগ্রিক দায়িত্বটা তাঁদের ওপরে নেই। দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর। আগে মন্ত্রিসভার ভেতর থেকেই যথেচ্ছ অন্তর্বাটিপুনী দিয়ে প্রগতির পথে বাধা-রোপের যে চেষ্টা চলত, মোরারজী দেশাইয়ের বিদায়ের পর সে জোর কিছুটা কমলেও সাংগঠনিক অন্তর্বাটিপুনী সমতালেই চলবে। প্রধানমন্ত্রী সংগঠনের ওপরও তাঁর শক্তি পূর্ণভাবে প্রোথিত করার প্রাথমিক সুযোগটা, বলতে গেলে, নরম হয়েই হারিয়েছেন। এখন হয় তাঁকে আবও শক্তি সঞ্চয় করে ফেলতে হবে, নয় সাংগঠনিক নেতা নির্বাচনকাল পর্যন্ত ধীর ও সতর্কভাবে অপেক্ষা করতে হবে। এই সময় প্রধানমন্ত্রীকে অনিবার্যভাবেই উভয় সঙ্কট সামলে চলতে হবে। অভ্যন্তরে বিপরীত শিবিরের ষড়যন্ত্র যেমন চলবে, তেমনিই ধনিক সম্প্রদায় ও শোষকগোষ্ঠীর নিরন্তর প্রচেষ্টা হবে দিল্লীর তখ্‌ত তাঁদের পূর্ণ শোষণের সহায়ক কোনো শক্তির করায়ত্ত করা। এক-দিকে এই, অপরদিকে বামপন্থী দলগুলি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতায় আসতে অতঃপর ইতস্তত করবেন। কারণ, তাঁর ভাষণে তিনি যেমনই বলুন, শ্রীমতী গান্ধীর কংগ্রেসের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে সমঝোতা করে চলার প্রবণতাকে মদত জানাতে বামপন্থীরা রাজনৈতিক কৌশলগত কারণেও ইতস্তত করতে বাধ্য হবেন। তাতে তাঁদের রাজনৈতিক ইমেজ নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। দিন যতই এগোবে বামপন্থী সমর্থন ততই শিথিল হবে, যদি না শ্রীমতী গান্ধী একের পর এক বৈপ্লবিক কর্মপন্থা গ্রহণ করে প্রগতি-শীল রাজনীতির সঙ্গে তাঁর ঐকান্তিকতাকে প্রতি পদে প্রমাণ করে চলতে পারেন। বলা বাহুল্য, দুদিকে সমান সম-ঝোতা বাস্তবে অসম্ভব। আর শ্রীমতী গান্ধীও যে সে অসুবিধা টের না পাচ্ছেন এমনও নয়। তিনি তাই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতির সঙ্গে অতঃপর কল্যাণমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রতিজ্ঞাকে মিলিয়ে-মিশিয়ে এক করে দিচ্ছেন। ক'দিন যাবৎ তাঁকে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের কথাই বলতে শোনা যাচ্ছে। এবং বস্তুতপক্ষে এই মুহূর্তে যা করা সম্ভব তা ঐ কল্যাণমূলক রাষ্ট্র ও প্রশাসন চালু করার চেষ্টা ছাড়া আর কিছু নয়। বর্তমান ভারতীয় রাজনীতির ঝোঁকও নানাভাবে সমঝোতা করে সেই পথেই পা বাড়াচ্ছে। আজ বাইশ বছর স্বাধীনতার পরেও ভারত যে প্রকৃতঅর্থে কল্যাণমূলক রাষ্ট্রেই পরিণত হয় নি, সেই ভুলের সংশোধন সম্ভবপর করে তুলতে পারলেও শ্রীমতী গান্ধী তাঁর জনপ্রিয়তা বাড়িয়ে যেতে পারবেন, সন্দেহ নেই।

বং[illegible]

(৩০-৮-৬৯)

আন্তর্জাতিক

ইজরায়েল :

জেরুজালেমের আল আক্‌সা মসজিদে অগ্নিসংযোগের ঘটনা আরব-ইজরায়েল বিরোধে নতুন উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে।

মুসলমানদের তৃতীয় পবিত্রতম ধর্মক্ষেত্র হল এই আল আক্‌সা মসজিদ, মক্কা ও মদিনার পরই এর স্থান। এই পবিত্র মসজিদ পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আগুন লাগার খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জেরুজালেমের আরব যুবকরা বিক্ষোভ সুরু করে এবং বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে ইজরায়েলী পুলিশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়। অগ্নিসংযোগের সংবাদে সমগ্র আরব জগৎ প্রচন্ড ক্রোধে ফেটে পড়ে। তারা অভিযোগ করে, ইজরায়েলীরাই এই কান্ড করেছে। ইজরায়েলের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য ক্ষুব্ধ আরবরা জেহাদ ঘোষণা করেছে।

ইজরায়েল আল আক্‌সার ব্যাপার নিয়ে খুবই বিব্রতবোধ করছে। সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়েছে, এই ঘটনার সঙ্গে ইজরায়েলী সরকারের কোন সম্পর্ক নেই। সরকারের পক্ষ থেকে এই কাজের নিন্দা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গোল্ডা মেয়ার মন্ত্রিসভার জরুরী বৈঠক ডেকে সমগ্র পরিস্থিতি বিবেচনা করেছেন। আগুন লাগার কয়েক ঘন্টার মধ্যে প্রতিরক্ষামন্ত্রী মশে ডায়ান আল আক্‌সা মসজিদে এসে উপস্থিত হয়েছেন। অবশ্য মসজিদে উপস্থিত আরব মুসলমানরা মশে ডায়ানকে অপমান করতে ছাড়ে নি। প্রকৃত অপরাধীর বিচার এবং মসজিদের ক্ষতিপূরণের কথাও ইজরায়েলী সরকার ঘোষণা করেছেন। যদি মসজিদ পুনর্নির্মাণের জন্য বাইরে থেকে কোন আরব স্থপতি আসতে চান, তবে ইজরায়েল সরকার তাঁর আসার ও কাজ করার সুযোগ দেবেন।

মাইকেল ডেনিস উইলিয়াম রোহান নামে ২৮ বৎসর বয়স্ক এক অস্ট্রেলীয় পর্যটক নিজে স্বীকার করেছে যে, সেই মসজিদে অগ্নিসংযোগ করেছে। বর্তমানে রোহান বন্দী অবস্থায় জেরুজালেমের জেলে। রোহানের বিচার তথা সমগ্র অগ্নিসংযোগের বিষয়ে তদন্ত করার জন্য ইজরায়েল সরকার পাঁচজনের এক কমিশন গঠন করেছেন। কমিশনের সদস্যদের মধ্যে দুজন আরব আছেন—একজন মুসলমান, আর একজন নাজারেথের ক্রিশ্চিয়ান-মেয়র।

ইজরায়েলের এই সব কৈফিয়ৎ ও ব্যবস্থায় আরবরা সন্তুষ্ট নয়। তাদের নিশ্চিত ধারণা, এই অগ্নিকান্ডের পেছনে ইজরায়েল সরকারের প্রত্যক্ষ হাত রয়েছে। হাতের মুঠোয় পেয়ে উগ্রপন্থী ধর্মান্ধ ইহুদীরা আরব তথা মুসলমানদের অপমান করছে, তাদের ধর্মস্থান নষ্ট করছে। আরববিরোধী সংঘর্ষে আঘাতের এও এক কায়দা।

কেবল আরবরা নয়, বিশ্বের সকল মুসলমান আল আক্‌সার ঘটনায় ক্ষুব্ধ। কেবল মুসলমানই বা কেন, অন্যান্য ধর্মের মানুষও এতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছে। অধিকাংশ দেশ থেকে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। ইজরায়েলের আক্রমণাত্মক মনোভাবের পাশাপাশি, মার্কিন নীতিরও সমালোচনা হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রকাশ্যে মসজিদে অগ্নিসংযোগের নিন্দা করলেও মার্কিন শক্তির সমর্থন ভিন্ন ইজরায়েলের পক্ষে একদিনও টিকে থাকা শক্ত, তাই এই ঘটনাকে উপলক্ষ করে নতুন করে আবার আরবদের মধ্যে মার্কিনবিরোধী মনোভাব তীব্র হয়েছে।

জর্ডানের রাজা হুসেন আরব শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তাব করেছিলেন। ২৭শে আগস্ট কায়রোতে আরব লীগের বৈঠকে উপস্থিত ১৪টি আরব দেশের প্রতিনিধি মসজিদে অগ্নিসংযোগ ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য অবিলম্বে ঐস্লামিক রাষ্ট্রগুলির এক শীর্ষ সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব করেছেন। এই ব্যাপারে সৌদি আরবের রাজা ফয়জাল ও মরোক্কোর রাজা হোসেনের ওপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ২৩টি রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এই বিষয় আলোচনার জন্য রাষ্ট্রসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক আহ্বানের প্রস্তাবও করা হয়েছে।

আল আক্‌সা মসজিদ জেরুজালেমের আরব অঞ্চলে অবস্থিত। এই এলাকা ইজরায়েলের অন্তর্ভুক্ত নয়, এখানকার শাসনব্যবস্থা পৃথক। কিন্তু গত বৎসরের জুন মাসে ইজরায়েল জোর করে এই অঞ্চল দখল করে নেয়, এবং পরে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে, বিশ্ব জনমত অগ্রাহ্য করে আরব অঞ্চলটিকে ইজরায়েলের অন্তর্ভুক্ত এলাকা রূপে ঘোষণা করে।

আলস্টার :

আলস্টার বা উত্তর আয়াল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী মেজর জেম্‌স চিসেস্টার-ক্লার্ক বা তাঁর সরকারের বিশেষ ইচ্ছা ছিল না বৃটিশ সরকারের সাহায্য গ্রহণ করার। নেহাৎ নিরুপায় হয়েই তাঁরা হ্যারল্ড উইলসনের সাহায্যপ্রার্থী হয়েছেন। যখন দেখা গেল, রয়্যাল আলস্টার কনস্টেবুলেরী বা 'বি' স্পেশাল পুলিশ কারও পক্ষেই লন্ডনডেরী ও বেলফাস্টের দাঙ্গা থামানো সম্ভব হচ্ছে না, তখনই চিসেস্টার-ক্লার্ক বৃটিশ সরকারের সাহায্য গ্রহণ করেন।

বৃটিশ সরকারও সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য প্রেরণ করেন। বৃটিশ সৈন্য এসে পৌঁছবার পর আলস্টারের সর্বত্র শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বর্তমানে এখানে ছ' হাজার বৃটিশ সৈন্য রয়েছে।

চিসেস্টার-ক্লার্ক তাঁর মন্ত্রিসভার আরও দুজন সদস্যকে সঙ্গে নিয়ে লন্ডন গিয়েছিলেন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসনের সঙ্গে আলোচনার জন্য। শোনা যাচ্ছে, উইলসন তাঁদের আচ্ছা করে ধমকেছেন। চিসেস্টার-ক্লার্ক সরকার শান্তি প্রতিষ্ঠায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। আলোচনার পর ঠিক হয়েছে, শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার পূর্ণ দায়িত্ব এখন আলস্টারে প্রেরিত বৃটিশ সেনাবাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল স্যার ইয়ান

তরুণ অপেরা কর্তৃক
৭ই সেপ্টেম্বর "মহাজাতি সদনে"
৬-৩০টায়
সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের
'রাজা রামমোহন'
পরিচালনায় :—সমর ঘোষ
নাম ভূমিকায় :—শান্তিগোপাল
অনুষ্ঠান প্রারম্ভে বৈকাল ৫-৩০টায় রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত ডি, লিট্, উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী মহাশয়কে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হবে। সভাপতিত্ব করবেন শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। মহাজাতি সদনে ও তরুণ অপেরায় টিকিট পাওয়া যাচ্ছে। ফোন : ৫৫-৭১২১
॥ যাত্রাজগৎ পড়ুন ॥

ফ্রিল্যাণ্ডের হাতে থাকবে। রয়্যাল কনস্টেবুলেরী যথারীতি থাকলেও, 'বি' স্পেশাল পুলিশের ৮,৫০০-এর হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হবে। তা ছাড়া, আলস্টারে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কারের কাজে সাহায্য করার জন্য বৃটিশ সরকারের দু'জন প্রবীণ পদস্থ কর্মচারীকে পাঠানো হবে। ইতিমধ্যেই ঘোষণা করা হয়েছে, ডেনমার্কের প্রাক্তন বৃটিশ রাষ্ট্রদূত এবং বহু কূটনৈতিক ব্যাপারে হ্যারল্ড উইলসনের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি অলিভার রাইট আলস্টার মন্ত্রিসভার পরামর্শদাতা রূপে কাজ করবেন।

আলস্টারের উগ্রপন্থী প্রোটেস্টান্টরা লণ্ডন আলোচনার বিবরণ শুনে রাগে ফেটে পড়েছে। তারা একে চিসেস্টার-ক্লার্ক সরকারের আত্মসমর্পণ বলে আখ্যা দিয়েছে। প্রোটেস্টান্টদের প্রধান নেতা রেভারেণ্ড ইয়ান পেস্‌লে সরকারের পদত্যাগ দাবি করেছেন, এবং এই দাবিতে প্রোটেস্টান্টদের সংগ্রাম চালিয়ে যেতে আহ্বান করেছেন। একই দাবি করেছেন আলস্টারের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম ক্রেগ। বিশেষ করে এঁরা চটেছেন 'বি' স্পেশাল পুলিশের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নেবার প্রস্তাবে।

সংখ্যালঘু ক্যাথলিকরাও চিসেস্টার-ক্লার্ক সরকারের পদত্যাগ দাবি করেছে। তবে তাদের যুক্তি ভিন্ন। দাঙ্গা দমনে সরকার ব্যর্থ হয়েছেন। তাছাড়া বৃটিশ সৈন্যের অবস্থিতি এই কথাই প্রমাণ করছে যে, দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার কোন ক্ষমতা নেই বর্তমান সরকারের। সুতরাং, এই সরকারের গদিতে বসে থাকার কোন অধিকার নেই। তবে ক্যাথলিকরা বৃটিশ সৈন্যের উপস্থিতিতে আশ্বস্তবোধ করছে।

ক্যাথলিক নেত্রী বার্নাডেটে ডেভ্‌লিন নিউ ইয়র্ক গিয়েছেন। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য, দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত ক্যাথলিকদের সাহায্যের জন্য দশ লক্ষ ডলার সংগ্রহ করা। তাছাড়া এই সুযোগে তিনি বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের কাছে আলস্টারের বর্তমান অবস্থার কথা জানাবেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র:

মার্কিন সরকার যে কমিউনিস্ট চীনের সঙ্গে নতুন সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য বিশেষ আগ্রহী, নানা সূত্র থেকে এই সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। সম্প্রতি মার্কিন রাষ্ট্রপতি রিচার্ড নিকসন রুমানিয়ায় গিয়ে সেখানকার রাষ্ট্রপতি ও কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক নিকোলাই সোসেস্‌কুর সঙ্গেও এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

রুমানিয়ার সঙ্গে চীনের ভাল সম্পর্ক রয়েছে। তাই অনেকেরই ধারণা, রুমানিয়া চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটা মীমাংসার ব্যাপারে মধ্যস্থের ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

শোনা যাচ্ছে, শীগ্‌গিরই স্টকহোলমে চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা এক বৈঠকে মিলিত হবেন। এর আগেও কয়েকবার তাঁরা নানা জায়গায় মিলিত হয়েছেন।

চীন-মার্কিন আপোষপ্রচেষ্টার প্রয়াসের সংবাদে সোভিয়েট য়ুনিয়ন ক্ষুব্ধ। সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'প্রাভদা'য় স্পষ্টই বলা হয়েছে, কট্টর মাওবাদী চীন ও সাম্রাজ্যবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েট বিরোধিতার জন্যই মিলতে চায়।

৩১-৮-৬৯

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ শেষ। বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র পান্ডবদের বিজয় ও পৌরুষে পরম সন্তোষ প্রকাশ করে বললেন যে, এমন বীর ভীম—সে হল আমার আদরের পান্ডুর ছেলে, আমার স্নেহের দুলাল, ও রে তোরা ভীমকে একটু আমার বুকে এনে দে—আমি ভীমকে বুকে নিয়ে একবার আমার বুকটা শীতল করি।

ধৃতরাষ্ট্রের মনের এই বাসনা শুনে পান্ডব ভ্রাতাগণ বড়ই সন্তোষ অনুভব করলেন। আহা, যার পুত্রগণ দুর্যোধন দুঃশাসন আমাদের হাতে মৃত্যুবরণ করেছে, বংশে বাতি দিতে বড় কেউ নেই, সেই বৃদ্ধ আমাদের বীরত্বে পুত্র-শোক ভুলে গেছে। চল ভাই সব জ্যাঠা-মশায়ের বুকে গিয়ে অন্ধের বুক ঠান্ডা করি। চতুর কুলচূড়ামণি কৃষ্ণ কিন্তু এত সহজে এই প্রস্তাবে সায় দিতে পারলেন না। তিনি বললেন—বোস, একটা লোহার ভীম তৈরি করে নিয়ে যাও সংগে করে। ধৃতরাষ্ট্র স্নেহে আদরে ভীমকে বুকে নিতে চাইলে ঐ লোহার ভীম এগিয়ে দেবে। শ্রীকৃষ্ণের কথামত পান্ডব-ভ্রাতারা অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের কাছে গেল, অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র স্নেহে উদ্বেগাকুল হয়ে বললেন, কই ভীম কই? আয় আমার বুকে আয় ওরে! তোর বীরত্বে আমাদের বংশ ধন্য হল। ধৃতরাষ্ট্র দুই হাত বাড়িয়ে ভীমকে আদর করতে চাইলে লোহার ভীম এগিয়ে দেওয়া হল, আর লোহার ভীম বুকে পেয়ে দেখা গেল মুহূর্তে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের রূপ পরিবর্তন হয়ে গেছে—এবার স্নেহে পাগল ধৃতরাষ্ট্র নন, পুত্র-বিয়োগে ক্রুদ্ধ নৃশংস ধৃতরাষ্ট্র। লোহার ভীমকে বুকে পেয়ে মুহূর্তে সেই ভীমকে গুঁড়ো করে দিলেন আর লোহার ভীমকে গুঁড়ো করবার পর বোঝা গেল ধৃতরাষ্ট্র ভীমকে তার বীরত্বের জন্য আদর করতে চান নি—ভীমকে হত্যা করে তাঁর পুত্র দুর্যোধন দুঃশাসনের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিলেন। কারণ এই ভীমই দুর্যোধনের উরুভংগ করে ছিল, দুঃশাসনের বক্ষরক্ত পান করে সেই রক্তে পাঞ্চালীর কেশবিন্যাস করেছিল। কিন্তু একটু সতর্কতায় ভীম বেঁচে গেল, ধৃতরাষ্ট্রের ভীমকে হত্যা করা হল না।

মহাভারতের কাহিনী সম্পর্কে কৃত্তিবাসের জ্ঞান সীমিত—অবশ্য মহা-ভারত কেন, সব কিছুতেই অন্য পাঁচ-জন অপেক্ষা জ্ঞান কম। তাই সব সময় হয়ত সঠিক উদ্ধৃতি দিতে পারি না, আর সোজা ঘটনাকে ঠিক সোজাভাবে বুঝতে পারি না। বুদ্ধি যেখানে কম, কৌতূহল সেখানে বেশি—এই কথা সকলেরই জানা—তাই দিল্লীতে ইন্দিরা-সিন্ডিকেট যুদ্ধের পর অথবা পশ্চিমবংগে সিন্ডিকেটপন্থীদের সংগে সিন্ডিকেট-বিরোধীদের যুদ্ধের পর যেমন সর্বত্র বুকে নিয়ে আদরের ঘটা পড়ে গেছে, তাতে আমার ঐ মহাভারতের ধৃতরাষ্ট্রের ভীমকে আদর করার কথাই বারে বারে মনে পড়ছে। শ্রীমতী গান্ধীর ন্যাটা হাতের চড়ে ধরাশায়ী সিন্ডিকেট-পন্থী বীরেরা এখন সর্বত্র ধৃতরাষ্ট্রের মত ভীমকে আদর করতে চাইছেন। কিন্তু সেইকালের কৃষ্ণের মত শেয়ানাও একালে অনেকে আছেন—যাঁরা ধরে ফেলেছেন এই আদর আদর নয়, এ হল স্বজনহারা পুত্রহারা পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ গ্রহণ।

সেটা বুঝে ফেলেছেন দিল্লীতে শ্রীমতী ইন্দিরা, বুঝে ফেলেছেন শ্রীজগ-জীবন আর শ্রীফকরুদ্দিন আলি, বুঝে ফেলেছেন পশ্চিমবঙ্গের শ্রীবিজয়সিংহ নাহার, শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। তাই তো শ্রীমতী গান্ধী কলকাতা আসছেন এই কথা শোনা মাত্রই রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র তারবার্তা পাঠালেন শ্রীমতী গান্ধীর কাছে—হে মহান দেশনেত্রী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী! আপনি কলকাতা আসছেন শুনে আমাদের হৃদয় ময়ূরের মত নাচছে—আপনার আগমনসংবাদ শুনেই আমরা কলকাতা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে সভার আয়োজন করছি, আপনার সংগে বৈঠকের জন্য দিকে দিকে বার্তা পাঠিয়ে দিচ্ছি। বৈঠক হবে বুদ্ধি-জীবীদের, বৈঠক হবে ছাত্র যুব সংস্কৃতি-কর্মী আইনজীবীদের, যেখানে আপনি আপনার মহান সমাজতন্ত্রের যাত্রাপথের বর্ণনা করবেন।

শ্রীঅতুল্য ঘোষ কলকাতায় এসেছেন তাঁর জন্মদিনকে উপলক্ষ করে—থাকবেনও বেশ কিছুদিন। জন্মদিন বিগত কয়েক বছরে একজন মানুষেরই পশ্চিমবংগে হয়ে আসছে—সে হল শ্রীঅতুল্য ঘোষের জন্মদিন। ২৮শে আগস্ট শ্রীঅতুল্য ঘোষের জন্মদিন। কত আগে থাকতে বার্তা চলে যায় দূর-দূরান্তে। ভক্তজনেরা চলে আসেন সেই সকাল হবার অনেক আগে, প্রতি-যোগিতা পড়ে যায় কে কতদূর থেকে কত কষ্ট করে এসেছে তার বর্ণনা দিতে। খালি হাতে কেউ আসে না, কেউ আনে নাড়ু, কেউ সন্দেশ, কেউ ফুল—গাড়ির লাইন পড়ে যায় কারবালা ট্যাঙ্ক লেনের এক পাশ থেকে আর এক পাশ পর্যন্ত। সিঁড়ি বেয়ে অর্ধশায়িত দাদাকে প্রণাম জানাতে সে কি উৎসাহ, সে কি উদ্দীপনা! তার পর আসেন কোন কোন ভি· আই· পি—শ্রীপাতিল, শ্রীকামরাজ এমনি কেউ না কেউ। সর্ব-শেষে খবরের কাগজগুলোতে হৈ হৈ পড়ে যায়—কেবা আগে প্রাণ করিবেক দান। জন্মদিনের দিন কাগজে সংবাদ থাকে, প্রকাশিত হয় বিশেষ নিবন্ধ, সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা সর্বসময়ের জন্য নোট-বই হাতে নিয়ে বসে থাকেন ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে। কিন্তু এবার? জন্মদিনের দুই দিন আগে শ্রীঘোষ দিল্লীর যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কলকাতা এলেন, জন্মদিনও হল—কিন্তু অধিকাংশ সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশিত হল না। শুধু তাই নয়, কংগ্রেস ভবনে এই দিন ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হল—ছাত্র পরিষদের জন্মদিন আর শ্রীঅতুল্য ঘোষের জন্মদিন সম্ভবত একদিনে; কিন্তু সেইখানেও কেউ একবার জন্মদিন ছিল বলে কংগ্রেস ভবন যাঁর বুকের পাঁজরে সৃষ্টি, তাঁর নাম উচ্চারণ করলো না। এ যেন দেহপট সনে নট সকলি হারায়।

গন্ধর্ব প্রযোজিত

একা নয়—দুর্গাপুরে
একা নয়—শিবপুরে
একা নয়—সম্বলপুরে
একা নয়—ব্যান্ডেলে
একা নয়—কল্যাণীতে
একা নয়—মুক্ত অঙ্গনে
১০ই সেপ্টেম্বরঃ সন্ধ্যা ৭টায়

কিন্তু এই কথা বলবার জন্য এত লেখা নয়, মূল কথা হল—দুষ্টু কৃষ্ণের চেলারা এই শ্রীঅতুল্য ঘোষের জন্মদিনে একটি কাজ করলো, যে কাজ অচিন্তনীয়। সেই কাজ হল—শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় ২৮শে আগস্ট বৃহস্পতিবার দুপুরবেলা টেলিফোনে শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্রকে জানিয়ে দিলেন, প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে আপনাদের তিনটি কাজ করতে হবে। একটি প্রধান কাজ হল ময়দানে শ্রীমতী গান্ধীর সভায় শ্রীঅতুল্য ঘোষ যেন না আসেন তার ব্যবস্থা করা।

অনেক দিন আগে এই 'সপ্তাহের বোঝা'তে শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় সম্পর্কে লিখেছিলাম—"ব্রুটাশ তুমিও!" সেই কথা যাঁদের মনে আছে তাঁরা বুঝতে পারবেন—শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় আজ যা করছেন, সেটা কোন হঠাৎ তৈরি কাজ নয়—সেই কাজের পিছনে দীর্ঘ ইতিহাস আছে। যা হোক, প্রধানমন্ত্রীর আগমন-সংবাদে অধ্যাপক প্রতাপচন্দ্র চন্দ্রের টেলিগ্রাম পাঠাবার পরই সিণ্ডিকেট বিরোধীরা বুঝতে পারলেন ধৃতরাষ্ট্রের এই ভীমকে আদর করার ব্যাপারটা তো সোজা নয়। প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক কাজে অধ্যাপক প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যে সকল কথা বলেছেন, এমন কথা সম্ভবত ভারতের একমাত্র শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহই ছাড়া আর কেউ বলেন নি। শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহকে বোঝা যায়—কারণ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় সিণ্ডিকেট বীরদের পতন ও মূর্ছার পর একমাত্র শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহ নিজের স্ট্যাণ্ড ঠিক রেখেছেন। একটি গল্পও এই সম্পর্কে চালু হয়েছে। সেটাও বলতে চাই—গল্পের কতটা সত্য, কতটা রং চড়ানো সেটা জানি না। গল্পটা হল এই যে, ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যখন প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে কোন টু শব্দটি কেউ করল না—এমন কি শ্রী এস কে পাতিলও না, তখন পরের দিন শ্রীসিংহ নাকি একখানি শাড়ি কিনে নিয়ে লোকসভার সেন্ট্রাল হলের চারিধারে শ্রীপাতিলকে খুঁজে বেড়িয়েছিলেন—উদ্দেশ্য শাড়িখানি তিনি শ্রীপাতিলকে উপহার দেবেন। হ্যাঁ, এই শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহকে বোঝা যায়। প্রথমেও তিনি যা বলেছেন, পরেও সেই একই কথা বলেছেন। শ্রীমতী সিংহ শ্রীপাতিল ও শ্রীঅতুল্য ঘোষকে বিশ্বাসঘাতক বলেছেন. কারণ তাঁরা নাকি ওয়ার্কিং কমিটির সভার দিন বেলা ১২টা পর্যন্ত বলেছেন—শ্রীমতী গান্ধী সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবেই। কিন্তু অধ্যাপক চন্দ্র? তিনিও প্রধানমন্ত্রী সম্পর্কে কি না বলেছেন? বলেছেন—শ্রীমতী ইন্দিরা অমুকের পা ধরে (ক্যানিং লেনের বাড়িতে চৌকির ওপরে বসে) প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন, শ্রীমতী ইন্দিরা স্বৈরতন্ত্র চালু করার চেষ্টা করছেন, ব্যাঙ্ক জাতীয়করণে নতুনত্ব কিছু নেই, বরং তাঁর জন্যই কয়েক বৎসর আগে ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ সম্ভব হয় নি। এমনি অনেক কথা—সর্বোপরি যাঁরা বিবেক মত গিরিকে ভোট দিয়েছেন (অর্থাৎ শ্রীমতী ইন্দিরা ও শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় প্রমুখ), তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে তিনি ওঁদের সঙ্গে একসঙ্গে দল করবেন না—অর্থাৎ কংগ্রেস ত্যাগ করবেন। কিন্তু তার পর কি হল? হঠাৎ ডিসিপ্লিনড কংগ্রেস ওয়ার্কার নিজেকে সব দায় থেকে মুক্ত করলেন আর বোঝাতে চাইলেন: যা হবার হয়ে গেছে, প্রধানমন্ত্রী আসছেন—আমি কংগ্রেস সভাপতি, আমি তো সব করব। প্রধানমন্ত্রীকে টেলিগ্রাম করে দেশের লোককে বোঝাতে চাইলেন—দেখ, আমে দুধে মিশে গেছে—আদাড়ের আঁটি আদাড়ে গেছে? আমি আর প্রধানমন্ত্রী বা পশ্চিমবঙ্গ সিণ্ডিকেটপন্থী কংগ্রেস আর প্রধানমন্ত্রী এক হয়ে গেছে, সিদ্ধার্থ, শুক্লা, বিজয়—তারা যেখানে ছিল সেখানে আছে। ময়দানে সভা হবে, সভাপতিত্ব করবে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। ব্যস, তারপর আর কি চাই—কে মনে রাখবে দু'দিনের আগের বলা কথা।

কিন্তু ব্যাপারটা ধরা পড়ল শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, শ্রীবিজয়সিং নাহার, শ্রীজয়নাল আবেদিন ও শ্রীকৃষ্ণকুমার শুক্লার কাছে। তাঁরা বুঝলেন—এ তো ধৃতরাষ্ট্রের ভীমকে আদর করা, অতএব বানাও লোহার ভীম। ২৮শে আগস্ট রাত্রে বিজয়সিং নাহারের বাড়িতে সভা, তার আগে হল কংগ্রেস ভবনে ছাত্র পরিষদের সভা। ছাত্র পরিষদের সভায় অধ্যাপক প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র সভাপতি এবং শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় প্রধান অতিথি। শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বললেন—সিণ্ডিকেট আর কোটারী ভেঙে গুঁড়ো করে দিতে হবে আর যারা দু'দিন আগেও প্রধানমন্ত্রীর নামে কটূক্তি করেছে, তাদের সেই সব কথা প্রত্যাহার করতে হবে। এর পর শ্রীবিজয়সিং নাহারের বাড়িতে বসে গঠিত হল অভ্যর্থনা সমিতি—যার সভাপতি শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়। তাই ময়দানের সভায় প্রধানমন্ত্রীর সভায় সভাপতিত্ব করবেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়, প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র নয়। পশ্চিমবঙ্গে সিণ্ডিকেট-বিরোধীরা বুঝে নিয়েছেন যে, আর আপোষের পথে নয় বা দাদা বলে গাল পাড়ার পথে নয়—পথ বদলের সময় এসেছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর বর্তমান ভূমিকাকে যদি সিণ্ডিকেটপন্থীদের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয়, তবে কোন ফয়দাই তাঁরা পাবেন না। কাজেই একটা লাইন অফ ডিমারকেশন রক্ষা করতে হবে। সেই চেষ্টারই অঙ্গ হল—প্রদেশ কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে অভ্যর্থনা সমিতির মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানানো, প্রধানমন্ত্রীর ময়দানের সভা পরিচালনা করা এবং শ্রীঅতুল্য ঘোষকে সভায় যোগদান করতে না দেওয়া। এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর আগামী দিনের কলকাতা ভ্রমণের পেছনে একটি ইতিহাস আছে, যে ইতিহাস রচনা হয়েছে দিল্লীতে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে, সেইদিন রাত ১২টায়—যে দিন শ্রীজগজীবন রাম ও শ্রীফকরুদ্দিন আলি আমেদ কংগ্রেস সভাপতিকে পত্র দিলেন—কেন তিনি জনসংঘ ও স্বতন্ত্র দলের সঙ্গে কথা বলেছেন। পত্রের পরেই সিণ্ডিকেট ও সিণ্ডিকেট-বিরোধীদের দ্বন্দ্ব প্রকাশ্য রূপ নিল। সেই দিন রাত্রের কথা পরে বলব। [চলবে]

রাণীধূপ
কাকার প্রডাক্টস

যুক্তফ্রণ্ট সরকার সমীপেষু

যুক্তফ্রণ্ট সরকারের আমলে রাজ্যের শিল্পের প্রসারের পক্ষে বাধা সৃষ্টি করে, কর্মসংস্থানের সুযোগ নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে বলে কয়েকটি মহল থেকে যে সব অভিযোগ উঠেছিল, তা ধোপে টেকে নি। যুক্তফ্রণ্ট সরকার বিগত ছয় মাসের মধ্যে এমন কোন বৈপ্লবিক শিল্পনীতি গ্রহণ করেন নি, যা থেকে শিল্পপতিরা নিজেদের বিপন্নবোধ করতে পারেন। বিনা ক্ষতিপূরণে বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণের আওয়াজ যুক্তফ্রণ্ট সরকার তুলেছেন বলে ফ্রণ্ট সরকারের অতি বড় শত্রুও অভিযোগ করতে পারবেন না। এমন কি মার্কসবাদী কম্যুনিস্ট পার্টিও ও-ধরণের দাবি তুলেছেন বলে কেউ বলতে পারবেন না।

পশ্চিম বাংলা থেকে পুঁজি অন্য রাজ্যে সরে যাচ্ছে বলেও খুব চেঁচামেচি শুরু হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সে সব অভিযোগের পক্ষেও কেউ তথ্য পেশ করতে পারেন নি। বরং রাজ্য সরকার তথ্য পেশ করে ঐসব অভিযোগ খন্ডন করেছেন।

কাজেই স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহলের অভিযোগ ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দার দায় যাঁরা যুক্তফ্রণ্ট সরকারের ঘাড়ে চাপাতে চান, তাঁরাও প্রকৃত ঘটনাকে নিঃসন্দেহে বিকৃত করছেন। বরং একথা বলা যায় যে, বর্তমান যুক্তফ্রণ্ট সরকারের আমলে ঘেরাও কমেছে।

এবার যুক্তফ্রণ্ট সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকে মুখ্যমন্ত্রী, উপ-মুখ্যমন্ত্রী, শিল্পমন্ত্রী বারংবার শিল্পপতিদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। শিল্পপতিরাও এবার বুঝতে পেরেছেন যে, এই সরকারকে কোন চক্রান্ত করেই হটানো যাবে না। তাই তাঁরাও ফ্রণ্ট সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করার মনোভাব প্রকাশ করেছেন। আইন ও শৃংখলা এবং শ্রম-বিরোধের প্রশ্ন বাদ দিলেও শিল্পপতিরা এমন অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হয়, যেগুলো অতিক্রম করতে রাজ্য সরকারের সাহায্য একান্ত অপরিহার্য। যুক্তফ্রণ্ট সরকারের পক্ষ থেকে সেসব সাহায্যের আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, কিন্তু শিল্পদপ্তর এখন পর্যন্ত এ ব্যাপারে কি কিছুটা অগ্রসর হয়েছেন।

বৃহৎ শিল্পপতিদের কথা না হয় বাদই দিলাম। একচেটিয়া পুঁজির প্রতিনিধিরা মুখে যে কথা বলুন না কেন, যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে তাঁরা পছন্দ করতে পারেন না। কিন্তু মাঝারী ও ক্ষুদ্রশিল্পের মালিকদের পক্ষে সেকথা নিশ্চয়-ই প্রযোজ্য নয়। আর শিল্পের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করতে হলে তো মাঝারি এবং ক্ষুদ্র শিল্পের ওপর নির্ভর করতেই হবে।

পশ্চিম বাংলার মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্প সুযোগের অভাবে বাড়তে পারছে না। কাঁচা মালের অভাব একটা চিরন্তন সমস্যা হয়ে রয়েছে। যে সব কাঁচামাল বিদেশ থেকে আনতে হয়, সে সব মালের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিমবঙ্গের যে কোটা নির্ধারণ করে দিয়েছেন তার দিকে নজর দিলেই বোঝা যাবে, পশ্চিম বাংলার প্রতি কি ভয়াবহ বৈষম্যমূলক আচরণ করা হচ্ছে। শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীসুশীল ধাড়া বলতে পারবেন কি তাঁর দপ্তর এ ব্যাপারে কেন্দ্রের ওপর কতটা চাপ সৃষ্টি করতে পেরেছেন।

পশ্চিম বাংলার ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্প মন্দা অতিক্রম করে ধাপের পর ধাপ এগিয়ে চলেছে। উৎপাদনের হার বেড়ে গিয়েছে অনেক। এই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে বাঙালীর সংখ্যা বেশি। ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের প্রসারে একদিকে রাজ্যের সন্তানদের কর্মসংস্থান বাড়বে, অন্যদিকে রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির সুযোগ এনে দেবে।

সবিনয়ে যুক্তফ্রণ্ট সরকারের শিল্প ও বাণিজ্যদপ্তরের কাছে কি এই প্রশ্ন রাখতে পারি, ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের প্রসারে সাহায্য করার জন্য কোন পরিকল্পনা করার দিকে কি তাঁরা অগ্রসর হয়েছেন।

নতুন নতুন শিল্প গড়তে হলে সর্বপ্রথম দরকার কেন্দ্রের কাছ থেকে লাইসেন্সপ্রাপ্তি। সকলেই জানেন কোন শিল্পপতির পক্ষে সেই লাইসেন্স আদায় করা কি কষ্টসাধ্য। শিল্পের ক্ষেত্রে উন্নয়নশীল রাজ্যগুলির সরকার দিল্লী থেকে লাইসেন্স বের করে আনার জন্য সর্বপ্রকার সহযোগিতা করে থাকেন। আর পশ্চিম বাংলা সরকার এতদিনে দিল্লীতে একজন সংযোগকারী অফিসার নিযুক্ত করেছেন মাত্র। সে অফিসারের সৎ বলে পরিচিতি আছে। কিন্তু দিল্লীর দরবার থেকে দাবি আদায়ের জন্য প্রয়োজন একজন চৌকস অফিসারের, যিনি দিল্লীর কর্তাদের প্রভাবান্বিত করতে পারবেন আর পারবেন পশ্চিম বাংলার জন্য লবী সৃষ্টি করতে। উক্ত অফিসারের সেই গুণগুলি আছে কি না সন্দেহ।

তারপর রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্যদপ্তরের মধ্যে এখন পর্যন্ত কোনো তৎপরতা সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নি। অন্যান্য রাজ্য যেখানে নতুন শিল্প গড়ার জন্য সব রকম সুযোগ দিচ্ছেন—আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন নিজেরা, সেখানে আমাদের রাজ্যের শিল্পদপ্তর এখন পর্যন্ত নির্বিকার।

দুর্গাপুরে বা হলদিয়াতে কোন নতুন শিল্প স্থাপন করা সম্ভব কি না তার জন্য খোঁজ নিতে এসে হয়রান হয়ে যেতে হয়। কোন দপ্তর কোন সংবাদ দিতে পারেন না।

শিল্পমন্ত্রী কি বলতে পারেন তিনি এ পর্যন্ত রাজ্যের একটি শিল্প সংস্থার কাছে শিল্পের প্রসারের জন্য কোন প্রস্তাব করেছেন? মাঝারি ও ক্ষুদ্র শিল্পের যে সব সংস্থা আছে তাদের কাছে কি জানতে চাওয়া হয়েছে, শিল্পের প্রসারের পক্ষে তাঁরা কি কি বাধার সম্মুখীন। বরং আমরা জানি এ পর্যন্ত যে কয়টি স্মারকলিপি এ দপ্তরে এসেছে তার একটির প্রতিও দৃষ্টি দেওয়া হয় নি—অবশ্য শিল্পের প্রসারের জন্য নির্দিষ্ট দাবি নিয়ে যে স্মারকলিপি পেশ করা হয়েছে আমি তার কথাই উল্লেখ করছি।

বরং দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে মাঝারি শিল্পের মালিকদের মধ্যে অভিযোগ ধূমায়িত হয়ে উঠছে যে, বৃহৎ শিল্পের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখেই তাদের দিকে যথাপ্রয়োজনীয় দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে না। এই অভিযোগ মারাত্মক।

যুক্তফ্রণ্ট সরকার বিভিন্ন বিষয়ে তাঁদের নীতি ও পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন। কিন্তু শিল্প সম্পর্কে ৩২ দফা কর্মসূচীর মধ্যে নীতি-নির্দেশক শ্লোগান ছাড়া এখন পর্যন্ত সুষ্ঠু কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন বলে জানি না। এ দায় শুধু শিল্পমন্ত্রীর নয়—সমগ্র যুক্তফ্রণ্ট সরকারের এবং যুক্তফ্রণ্টকেই এই দায়ের অংশভাগী হতে হবে। এমন কি যুক্তফ্রণ্টের যে যে শরিকদল বেকার ভাতার দাবিতে রাজপথে আন্দোলন করতে চান—রাইটার্স বিল্ডিংসের সামনে মিছিল নিয়ে নিজ দলের মন্ত্রীকে পর্যন্ত বিব্রত করতে দ্বিধা করেন না, সেই দল-ও কি একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনা পেশ করেছেন।

শুধু ফাঁকা কথা দিয়ে এই দাবি পূরণ করা যাবে না—রাজ্যের উন্নয়ন ও বেকার সমস্যার সমাধানও হবে না। কেন্দ্রের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে বা শিল্পপতি ও কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে চক্রান্তের অভিযোগ এনে সকলকে চুপ করানো যাবে না। জনসাধারণ সরকারের কাছে পরিকল্পনা চায় আর চায় সেই পরিকল্পনাকে কার্যকরী করার উদ্যম। তাতে যদি বাধা আসে সে বাধা অতিক্রম করার পথে পশ্চিম বাংলার মানুষ যুক্তফ্রণ্টের সাথী।

কিন্তু হাতে যেটুকু ক্ষমতা আছে তা প্রয়োগ না করার বাধা কোথায়, জনসাধারণের নিশ্চয়ই সেকথা জানার অধিকার আছে।

—শ্রীসর্বদর্শী

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

বৈপ্লবিক প্রেরণা ও যুক্তিবাদ

শহরের সীমানা হতে মাইল দুই দূরে কাট্টলী গ্রাম সংলগ্ন পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব। অন্ধকারে মাঠের ওপর দিয়ে পুলিশ ও মিলিটারীর অজ্ঞাতে ক্লাবটির একেবারে কাছাকাছি পর্যন্ত আসা যায় এবং বেশ কিছুক্ষণ সেখানে নিরাপদে অপেক্ষাও করা যায়। আক্রমণের ঠিক আগের মুহূর্তে গেরিলা সৈন্যদলের—শুধু গেরিলা সৈন্যদল নয়—যে কোন যুদ্ধার্থী সৈন্যদলেরই একটি নির্দিষ্ট স্থানে মিলিত হওয়ার নিয়ম। সামরিক শিক্ষাগ্রন্থে এই স্থানকে 'Rendezvous' (রাঁদেভু) বলা হয়। নিকটতম দূরত্ব হতে আক্রমণ যাত্রার পূর্ব মুহূর্তেও প্রয়োজনীয় আদেশ-নির্দেশ দেবার বা নেবার সুবিধার্থে উপযুক্ত স্থানে হেড-কোয়ার্টার স্থাপন করতে হয়। ক্লাব আক্রমণে তাই কাট্টলী গ্রামেই ফিল্ড হেড-কোয়ার্টার করা হয়েছিল।

শৈলেশ্বরের নেতৃত্বে প্রথমবার ক্লাব আক্রমণকালে কাট্টলীতে মাস্টারদার পরিবর্তে তারকেশ্বর দস্তিদার উপস্থিত ছিল। প্রীতিলতার নেতৃত্বে দ্বিতীয়বারে পাহাড়তলী ক্লাব আক্রমণ অনেক বেশি দৃঢ়তার সঙ্গে পরিচালিত করার উদ্দেশ্যে মাস্টারদা স্বয়ং কাট্টলী গ্রামের ফিল্ড হেড-কোয়ার্টারে উপস্থিত হলেন।

অগ্নিযুগের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে প্রবল ভাবপ্রবণতার অসংখ্য বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। বৈপ্লবিক অন্তরে ভাবপ্রবণতা না থাকলে শত্রুর প্রতি চরম ঘৃণা পোষণ করা সম্ভব নয়। যে ভাবপ্রবণতার তীব্র উন্মাদনায় বিপ্লবীরা মরণকে তুচ্ছ করে হাসতে হাসতে ফাঁসির দড়ি গলায় পরে, দু' হাত বাড়িয়ে রাইফেলের বুলেটকে অভিনন্দন জানায়, অমৃতের সুধাধারা বোধে তীব্র বিষ পটাসিয়াম-সায়ানাইড যারা আকণ্ঠ পান করে, সেই সব মরণ-পাগল "বিদ্রোহী বীরেরা" তাদের অন্তরের প্রেরণা-হৃদয়ের আবেগ উপেক্ষা করবে কি করে? ভাবপ্রবণ হৃদয়ের আবেগে অন্তরের প্রেরণায় তারা বিপ্লবের একটা অর্থ মনে মনে বুঝে নিয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলো—যুক্তিবাদের ভিত্তিতে "বিপ্লব কি" তখন তারা তা হৃদয়ঙ্গম করে নি। যুক্তিবাদ অনুশীলনের মাধ্যমে বিপ্লবের বৈজ্ঞানিক অর্থ বা রূপ বুঝেছেন বলে আজ যাঁরা মনে করেন, আমার মতে, সেই সব বিষয়বস্তু যদি তাঁরা sentiment দিয়ে—প্রেরণা দিয়ে গ্রহণ করতে না পারেন তবে তাঁদের বোঝাটা কেবল 'বাহ্যিক বোঝার' গণ্ডীতেই নিবদ্ধ থাকবে। বিপ্লবী sentiment ও বিপ্লবী প্রেরণার যেখানে অভাব, সেখানে যুক্তিবাদের অবতারণার অর্থই হচ্ছে নিজেদের দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেবার গোপন প্রয়াস মাত্র।

বিপ্লবী মনের আবেগ ও ভাবপ্রবণতা সর্বযুগে সর্বকালে বিপ্লবীদের মৌলিক ও অপরিহার্য গুণ। এই সত্য অস্বীকার করা কোন প্রকৃত বিপ্লবীর পক্ষেই সম্ভব নয়।

ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ প্রস্তুতির আরম্ভ ও ব্যর্থতার ইতিহাসের পিছনে যে ভাবপ্রবণতার অধ্যায়টি রচিত হয়েছিল তাকে বাদ দিয়ে কেবল অস্ত্র সংঘাতের ঘটনার বিবরণ দিলে অগ্নিযুগের সেই বিশেষ মনস্তাত্ত্বিক অধ্যায়টির গুরুত্ব অবহেলিত হবে বলেই আমার বিশ্বাস। তাই ইতিপূর্বে আবেগ ও ভাবপ্রবণতার দিকটিই প্রকাশ করবার চেষ্টা করেছি। এখন সাংগঠনিক দিকটির কথা বলি।

কালী দে-র মামা দীনবন্ধু মজুমদার (এই বেয়াবা দীনবন্ধু মজুমদারই ভ্রমক্রমে পূর্বে যোগেশ মজুমদার নামে

উল্লিখিত হয়েছে) ক্লাবে বেয়ারার পদে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি কাট্টলী গ্রামে কোন একজন সমর্থকের বাড়ি যোগাড় করেন। অ্যাকশানের ঠিক আগের দিন মাস্টারদা এ বাড়িতে আসেন। তারকেশ্বরও এই বাড়িতেই উপস্থিত ছিল। ক্লাব আক্রমণে যাত্রার পূর্বে বাকি আটজন "সৈনিকও" এখানে এসে মিলিত হলো। বর্তমানে এই আটজনের মধ্যে ব্যতিক্রম—শৈলেশ্বর নেই! শৈলেশ্বরের পরিবর্তে নেতৃত্ব প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদারের।

মাস্টারদা প্রত্যেককে অস্ত্র দিলেন—প্রীতিলতা ও কালী দে-র হাতে রিভলভার, মহেন্দ্র চৌধুরীর হাতে পুলিশ-মাস্কেট, সুশীল দে, বীরেশ্বর রায়, পান্না সেন ও প্রফুল্ল দাস প্রমুখের হাতে অনুরূপ মাস্কেট্রি। সরকারী অস্ত্রাগার থেকে আমরা যেসব পুলিশ-মাস্কেট্রি হস্তগত করেছিলাম, সেই সব মাস্কেট্রির নল কেটে আকারে ছোট করা হয়। মাস্কেট্রির গুলীর পাল্লা রাইফেল অপেক্ষা অনেক কম। নল কেটে ফেলার দরুণ যদিও মাস্কেট্রির গুলীর পাল্লা আরও অনেকটা কমে গিয়েছিল, তবু, নিকট থেকে point blank fire-এর আশানুরূপ সুফল পাওয়া সম্বন্ধে কোন সংশয় ছিল না। যেহেতু খুব কাছাকাছি, আড়ালে দাঁড়িয়ে "ক্লাব-গৃহের মধ্যে গুলী চালাতে হবে, তাতে এইরূপ ছোট আকারের মাস্কেট্রি নেওয়াতে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোনরূপ ব্যাঘাত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। সদা জাগ্রত সতর্ক দৃষ্টি অসংখ্য পুলিশ ও মিলিটারীকে প্রবঞ্চনা করে চলার জন্যই মাস্কেট্রির আকার এইরূপে ছোট করা হয়েছিল। ক্লাব আক্রমণকারী আটজন বিপ্লবী সৈনিকের মধ্যে সাত-জনকে দুটো রিভলভার ও পাঁচটি ছোট মাস্কেট্রি এবং শান্তি চক্রবর্তীকে একটি কৃপাণ দেওয়া হোল। এ ছাড়া আটজনের মধ্যে বাছাই করা ছজনের সঙ্গে দেওয়া হোল হাতবোমা। শান্তি চক্রবর্তী, বীরেশ্বর রায় ও প্রফুল্ল দাস—এই তিন-জনের প্রত্যেকের কাছে দুটি করে হাতবোমা ছিল। মাস্টারদা কর্তৃক যোগ্যতা অনুসারে নির্বাচিত এই অভিযানে অংশ-গ্রহণকারীদের সামান্য একটু পরিচয় এখানে দিচ্ছি—

(১) প্রীতিলতাকে নেতৃত্বের অধিকার দেওয়া সম্বন্ধে আমি আগেই লিখেছি।

(২) কালী দে—১৮ই এপ্রিল রাত্রে চট্টগ্রাম অভ্যুত্থানে অংশ গ্রহণ করেছিল, ২২শে এপ্রিল স্মরণীয় জালালাবাদ যুদ্ধে ইংরেজ সৈন্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে এবং পরে ল্যান্ড-মাইন প্রস্তুত ও তার ব্যবহার কার্যে কালী দে সম্পূর্ণভাবে জড়িত ছিল। তাই ক্লাব আক্রমণে কালীর মত নির্ভীক ও অভিজ্ঞ "সৈনিকের" নির্বাচন যে নির্ভুল হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।

(৩) মহেন্দ্র চৌধুরীও কালী দে-র মতই ১৮ই ও ২২শে এপ্রিল চট্টগ্রাম সশস্ত্র যুববিদ্রোহে বীরত্বের সঙ্গে অংশ গ্রহণ করেছিল। তাই এইরূপ সাহসী ও বিচক্ষণ বিপ্লবী সৈনিকের মনোনয়ন সম্বন্ধে কোন প্রশ্নের অবকাশ নেই।

(৪) পান্না সেন আমাদেরই বয়সী। মাস্টারদার নেতৃত্বে গোড়া থেকেই সে বিপ্লবী দলের প্রথম শ্রেণীর সদস্য ছিল। কাজেই ক্লাব আক্রমণে তার অংশ গ্রহণের যোগ্যতা সম্বন্ধে কারও কোন দ্বিমত থাকতে পারে না।

(৫) বলিষ্ঠ ও সুগঠিত দেহ প্রফুল্ল দাস—সকলেই তাকে "গামা" বলে সম্বোধন করতো। ব্যক্তিগতভাবে প্রফুল্ল দাসের সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল না বলেই তার সম্বন্ধে শোনা কথায় আমি আর বেশি কিছু লিখলাম না। তবে তার "গামা" নামকরণ থেকেই আমরা ধরে নিতে পারি সেই "গামাকে" এই অ্যাকশানের যথার্থ উপযুক্ত সৈনিক বোধেই মাস্টারদা নির্বাচিত করেছিলেন।

(৬) শরীরচর্চায় বিশেষ পারদর্শী বলিষ্ঠ দেহ সুশীল দেকে আমি আগে থেকেই জানতাম। সে গ্রামেই থাকতো। ১৮ই এপ্রিল যুব-বিদ্রোহে অংশ গ্রহণে যদিও সে নির্বাচিত হয় নি, তবু, পরের দিনে—১৯শে এপ্রিল আরও অনেকের সঙ্গে এসে ইন্ডিয়ান রিপাবলিকান আর্মির চট্টগ্রাম শাখায় তার সক্রিয়ভাবে যোগ দেবার ব্যবস্থা ছিল। "ক্লাব" আক্রমণে সুশীল দে-র নির্বাচনও পুরোপুরি সমর্থনযোগ্য।

(৭) বীরেশ্বর রায়—ব্যক্তিগতভাবে এই তরুণ সাথীটি সম্বন্ধে আমার কিছু জানবার সুযোগ হয় নি। জেল হতে বাইরে এসেও তার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি। কাজেই বীরেশ্বরের সম্বন্ধে মাত্র এইটুকু বলেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে, মাস্টারদা তার হাতে মাস্কেট্রি ও দুটি হাতবোমা দিয়েছিলেন। অভিজ্ঞতা দিয়ে বলতে চাই—মাস্টারদা যাকে দুটি হাতবোমা ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন তার শারীরিক ও মানসিক গঠন সম্বন্ধে আস্থা-সম্পন্ন না হলে তিনি তা কখনই দিতেন না।

(৮) চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের আগে শান্তি চক্রবর্তীকে আমি দেখি নি। শান্তি চক্রবর্তী কাট্টলী গ্রামের ছেলে। আন্দামান সেলুলার জেলেই শান্তির সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। কালী দে ও সুশীল দে—এই দুজনের সঙ্গে একত্রে আন্দামান সেলুলার জেলে আমি ছিলাম। মহেন্দ্রকে আগে থেকেই জানতাম—১৮ই এপ্রিল যুব-বিদ্রোহের রাত্রেও আমরা একত্রে শহর দখলে অংশ গ্রহণ করেছি। মহেন্দ্র অবশ্য আন্দামানে নির্বাসনে যায় নি। পাহাড়তলী ক্লাব আক্রমণে অংশগ্রহণকারী কালী, সুশীল ও শান্তি—এই তিনজনেই আন্দামানে গিয়েছিল এবং এদের প্রত্যেকের কাছ থেকেই এই আক্রমণের বিশদ বিবরণ আমি সংগ্রহ করেছি। ক্লাব আক্রমণের পর অন্যান্যদের মত শান্তি চক্রবর্তী বিভিন্ন বৈপ্লবিক কাজে লিপ্ত ছিল। ১৯৩৩ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী, গৈড়লা গ্রামে শান্তি, কল্পনা ও মণি দত্ত মাস্টারদার সঙ্গে একই বাড়িতে আত্মগোপন করে ছিল। নিশীথ রাত্রে মিলিটারীরা হঠাৎ এই বাড়ি ঘেরাও করে মাস্টারদাকে বন্দী করে। শান্তি, কল্পনা ও মণি দত্ত সৈন্যবেষ্টনী ভেদ করে পালাবার সময় রাইফেলের একটি বুলেট শান্তির বুকের একটু ওপরে এফোঁড়-ওফোঁড় করে চলে যায়। গুরুতর আহত অবস্থায় হাবিলাসদ্বীপ গ্রামে আমাদের দরদী সাহায্যদাতা রমণী চৌধুরীর বাড়িতে শান্তি আশ্রয় গ্রহণ করে। মাস্টারদা এই আশ্রয়প্রস্থলটির নাম দিয়েছিলেন—"Amiable shelter". শান্তি এই আশ্রয়-

৫০ পয়সা লাভ!
ষ্টক থাকা পর্য্যন্ত
৬০ পয়সা দামের
নতুন ডিজাইনের প্লাষ্টিকের গেলাস
এখন মাত্র ১০ পয়সায়
এই টিনের ভেতরে পাবেন।
Bournvita
Cadbury's
Bournvita
OFFER!
450g net
প্রতি টিনে বোর্নভিটার পরিমাণ আগের মতনই রয়েছে (৪৫০ গ্রাম নীট)
শক্তি, উৎসাহ ও স্বাদের জন্য— ক্যাডবেরিস্ বোর্নভিটা!
Bensons-2536 Ben

স্থলে এসে ক্রমে সুস্থ হয়ে ওঠে এবং পুনরায় পূর্ণোদ্যমে কাজে লেগে যায়। মাস্টারদার গ্রেফতারের সাত মাস পরে ফেরারী অবস্থায় এই "Amiablé shelter"-এই শান্তি ধরা পড়ে এবং "Arms Act" প্রভৃতি বিভিন্ন ধারায় সাত বছরের জন্য দণ্ডিত হয়ে আন্দামানে যায়। পাহাড়তলী ক্লাব আক্রমণে অংশগ্রহণকারীদের সম্বন্ধে পুলিশ বিভাগ শেষ পর্যন্ত ঘুণাক্ষরেও কিছু জানতে পারে নি। এই বিবরণটুকুই বুঝতে সাহায্য করবে যে, শান্তিকে তরবারি ও দুটো তাজা হাতবোমা দেওয়ার সিদ্ধান্ত একান্তই নির্ভুল ছিল।

পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের প্ল্যানটি ছিল এইরূপ—ক্লাবের তিন দিক থেকেই একসঙ্গে আক্রমণ চালানো হবে। আটজন আক্রমণকারী তিনটি বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ক্লাবগৃহে প্রবেশ করবে। পূব দিকের মেইন গেট দিয়ে প্রবেশ করবে প্রীতি, কালী ও শান্তি। প্রীতি ও কালীর হাতে থাকবে দুটো আর্মি-রিভলভার এবং শান্তি চক্রবর্তীর সঙ্গে দুটো তাজা বোমা ও উন্মুক্ত কৃপাণ। দ্বিতীয় দলে—সুশীল দে ও মহেন্দ্র চৌধুরী দক্ষিণ দ্বার দিয়ে ক্লাবের ভিতরে প্রবেশ করে আক্রমণ চালাবে। ক্লাবের উত্তরে কোন দরজা ছিল না। দরজার পরিবর্তে সেখানে মস্ত বড় এক খোলা জানালা। বিলিয়ার্ড খেলার বড় ঘরটি এই জানালারই সংলগ্ন। তৃতীয় দলে, বীরেশ্বর, পান্না ও "গামা" উত্তরের এই জানালা দিয়ে আক্রমণ চালাবে।

এ পর্যন্ত আমি কেবল উপযুক্ত সৈনিক নির্বাচন ও আক্রমণ চালাবার সুষ্ঠু ব্যবস্থা সম্বন্ধেই বললাম। কিন্তু এই ক্লাব আক্রমণ অভিযানের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকও আছে। একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই মাস্টারদা এই ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেছিলেন এবং বাংলার জনসাধারণ ও বিপ্লবী তরুণদেরও আক্রমণের সেই বিশেষ "বৈপ্লবিক রাজনৈতিক উদ্দেশ্যটি" সম্বন্ধে অবহিত করা বিশেষ প্রয়োজন বলেই মনে করেছিলেন। সেই জন্যই প্রথমবার আক্রমণের সময় যেমন চার ধরণের মুদ্রিত প্রচারপত্র বিলি করার ব্যবস্থা ছিল এবারেও তদনুরূপ ব্যবস্থা করা হোল। একটি প্রচারপত্রে প্রীতিলতার নিজে লেখা একটি বীরত্বপূর্ণ বিবৃতি ছিল। দ্বিতীয়টি হিজলী জেলের হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে ও আসানুল্লা হত্যার পর চট্টগ্রামে যে নৃশংস অত্যাচার ও নিপীড়ন চলেছিল তারই বিরুদ্ধে এই ক্লাব আক্রমণ অভিযানটিকে সমর্থন করে শৈলেশ্বরের নিজের হাতে লেখা। ১৮ই এপ্রিল চট্টগ্রাম যুব-বিদ্রোহের রাত্রে ইংরেজ চরদের জীবিত বা মৃত—যে কোন অবস্থায় বিপ্লবী সরকারের কাছে উপস্থিত করলে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুরস্কৃত করা হবে বলে যেরূপ ঘোষণা ছিল, ক্লাব আক্রমণের তৃতীয় প্রচারপত্রটিও সেইভাবেই রচিত। ছাত্র, যুবক, শিক্ষক ও অধ্যাপকেরা সকলেই যেন বিপ্লবের অগ্রগতিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন—এই অনুরোধ জানিয়ে মাস্টারদা নিজেই চতুর্থ প্রচারপত্রটি রচনা করেন।

এই চারটি প্রচারপত্রই ইংরেজীতে লেখা ও মুদ্রিত। যতদূর সম্ভব, গোপনীয়তা বজায় রেখে নিজেদের গোপন আস্তানায় ছোট্ট গোপন প্রেসে এইগুলি ছাপানো হয়। সহজেই বোধগম্য যে, এই প্রচারপত্র যদি অ্যাকশানের আগেই শত্রুপক্ষের হস্তগত হোত, তবে সংগঠনকে অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হতে হোত। মাস্টারদার সাংগঠনিক নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্যই ছিল যে, দলে সুরঙ্গ পথে কোন বিভীষণের প্রবেশ একেবারেই সম্ভব ছিল না।

যুদ্ধের নীতি অনুযায়ী সেনাপতিরা যে কেবল আক্রমণের প্ল্যানই করেন তা নয়—আক্রমণ বা যুদ্ধ সমাপ্তির পরে সৈন্যেরা কে কোথায় যাবে বা কিভাবে পজিশান নেবে তার ব্যবস্থা। তাঁরাই আগে থেকে করে রাখেন। মাস্টারদা সবার জন্য পরবর্তী কার্যকৌশল ও নিরাপদ পথে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যাওয়ার সুব্যবস্থাও রেখেছিলেন।

রাত দশটা—ক্লাব আক্রমণের নির্ধারিত Zero hour I. ক্লাব আক্রমণের প্রায় দু' ঘণ্টা আগে বাড়ি থেকে অস্ত্রশস্ত্র সুসজ্জিত হয়ে আক্রমণকারী সৈনিকদের যাত্রা করার কথা। আগেও বলেছি, এখনও বলছি—অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা ভাবপ্রবণতা ও বিপ্লবী প্রেরণা দিয়েই পরিচালিত হোত। আজ তারা চলেছে ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ চালাতে—তাদের কাছে রিভলভার-পিস্তল নিশ্চয়ই থাকবে। এই পরিস্থিতিতে তারা যে নিশ্চিত মৃত্যুপণ সংঘর্ষে লিপ্ত হবে তার ভয়াবহ রূপটি এই বিপ্লবী সৈনিকেরা অন্তরে অনুভব করছিল। জীবনের হয়ত এইখানেই শেষ—কিছুক্ষণের মধ্যেই হয়ত পরস্পরের কাছ হতে চির বিদায় নিতে হবে! জীবনমৃত্যুর এই সন্ধিক্ষণে বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে এই বিপ্লবী সৈনিকেরা মা-কালীর আশীর্বাদ প্রার্থনা না করে পারে নি।

একটি ঘরে বেদীর ওপরে ফ্রেমে বাঁধানো মা-কালীর ছবি। ক্লাব আক্রমণকারী আটজন তরুণ বিপ্লবী সৈনিক প্রত্যেকে তাদের রাইফেল, বোমা, রিভলভার, শাণিত তরবারি প্রভৃতি মায়ের পাদমূলে সাজিয়ে রাখলো। সে এক অপূর্ব দৃশ্য! মা আজ তাঁর বিপ্লবী সন্তানদের কাছ হতে ফুল বেলপাতার অর্ঘ্য পেলেন না—মা পেলেন তাদের অন্তরের অর্ঘ্য—তাদের সব চাইতে প্রিয় সাথী অস্ত্রের অর্ঘ্য।

সৈনিকেরা আটজন, তারকেশ্বর ও মাস্টারদা সারিবদ্ধ হয়ে নীরবে মায়ের সামনে দাঁড়ালেন—মায়ের চরণে নিবেদিত হোল গভীর অন্তরের নীরব প্রার্থনা—খেটক খর্পরধারিণী মহাকালী! তোমার সন্তানদের শত্রুনিধনে জয়যুক্ত কর!

এই অনুষ্ঠানের পর আটজন নির্ভীক বিপ্লবী সৈনিক মাস্টারদা ও তারকেশ্বরের কাছ হতে বিদায় নিয়ে রক্তকরা বন্ধুর গন্তব্য পথে এগিয়ে গেল। পূর্ব ব্যবস্থানুযায়ী মাস্টারদাও তারকেশ্বরকে সঙ্গে নিয়ে নৌকাযোগে কাটলী গ্রাম পরিত্যাগ করে নদীর অপর পারে "বন্দর" নামক স্থানে ক্লাব আক্রমণের ফলাফলের সংবাদের প্রতীক্ষায় রইলেন।

[ক্রমশ]

চাঁদ-কাহিনী

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

কাহিনী অনেক তো জড়ো হল। চাঁদকে ঘিরে অনেক জড়ো হল সংবাদ। আবার কেন? বিশেষজ্ঞরা বলবেন, আবার এইজন্যে যে, সম্প্রতি চাঁদ-সম্পর্কে নতুন কিছু সংবাদ পেয়েছি আমরা। ঘরে ফিরে-আসা অ্যাপোলো-১১'র অভিযাত্রী-দের দৌলতে আমরা জেনেছি, প্রতিবেশী উপগ্রহটি সম্পর্কে অনেক কিছু নতুন খবর। ঐ খবরগুলো নিয়ে একটু-আধটু নাড়াচাড়া যদি না করি তো এতদিন ধরে এত আলাপ-আলোচনার আর জল্পনা-কল্পনার উপসংহারটাই বাদ থেকে যায় যে।

আমরা বলি, তা বটে। অল্পের জন্যে উপসংহারকে সংহার করে আর লাভ কী। তার চেয়ে শেষ-কথাটা শুনবো বলে সাবধানে কান পাতি বরং।

এদিকে কান পাততে গিয়েও বিপদ। মার্কিন মহাকাশ-গবেষণা-কেন্দ্র থেকে খবর আসছে তো আসছেই।

চাঁদের জীবন ও মৃত্যু

এই সেদিন এলো নতুন খবর। মাত্র এই সেদিন জানা গেল, চাঁদের জৈবনিক মৃত্যু হয়েছে কবেই; কিন্তু ভূতাত্ত্বিক মৃত্যু আজও হয় নি।

—হয় নি?—খবর শুনে আকাশ থেকে পড়ি আমরা। শুধোই,—মৃত্যু ক'রকমের তবে?

—দু'রকমের,—জানান বিশেষজ্ঞরা। ওঁরা বলেন,—প্রতিটি গ্রহ-উপগ্রহেরই মৃত্যু দু' রকমের। প্রাণের কোনো চিহ্ন ওদের মধ্যে যদি না থাকে তো বলবো, জৈবনিক মৃত্যু হয়েছে ওদের। আর যদি দেখি, প্রাণ নেই, কিন্তু ওদের ভেতরটা জীবিত প্রাণীর মতোই ধুকধুক করছে এখনও, এখনও সতেজ ও সক্রিয় থেকে নড়াচড়া করতে চাইছে তো বলবো, আসল মৃত্যু (বা বিজ্ঞানীর পরিভাষায় ভূতাত্ত্বিক মৃত্যু) এখনও ওদের হয় নি।

তাহলে দেখা যাচ্ছে, 'চাঁদের ভূতাত্ত্বিক মৃত্যু এখনও হয় নি,' কথাটার মানে, চাঁদ ভেতরে ভেতরে সক্রিয় আছে এখনও। এখনও জীবনের অন্যতম লক্ষণ যে উত্তাপ, সেই উত্তাপকে সে তার জঠরের মধ্যে পরম যত্নে লালন করে চলছে।

চাঁদের এই লালন-প্রবৃত্তির খবরটা কিন্তু একেবারে নতুন। কেন না, জীব-জন্তু, পোকামাকড়, গাছপালা বা কোনো-প্রকার জীবাণু যে ওখানে নেই, বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন আগে থেকেই সে-সম্পর্কে একরকম নিশ্চিন্ত ছিলেন। ওঁদের সন্দেহ ছিল শুধু চাঁদের অন্দর-মহল সম্পর্কে। কোনোরকম কম্পন সেখানে চলে কি না, সেখানকার সম্পদ ফুটন্ত, গলন্ত না স্তব্ধ অবস্থায় আছে, সে-সম্বন্ধে ওঁরা প্রায় কিছুই জানতেন না এতদিন। এমন কি নোবেল-পুরস্কারপ্রাপ্ত মহাবিজ্ঞানী হ্যারল্ড্ সি ইউরে, যিনি চাঁদ-বিষয়ক তথ্যাদির একটি খনি বলে সর্বজনবিদিত, তিনি পর্যন্ত জানতেন না, চাঁদের ভেতরটা আসলে কীরকম! ঠাণ্ডা? না গরম?

বরং তাঁর ধারণাটা এতদিন উল্টো-রকমেরই ছিল। অর্থাৎ, চাঁদের ভেতর-টাকে এতদিন ঠাণ্ডা, স্তব্ধ ও মৃত বলেই ভাবতেন তিনি।

কিন্তু সম্প্রতি তাঁর ভাবনা ভুল প্রমাণিত হয়েছে। মহাকাশচারীরা চাঁদ থেকে যে মাটি আর পাথর নিয়ে এসেছেন এবং চাঁদের দেশে রেখে এসেছেন যে কম্পন-পরিমাপক যন্ত্র, তা' থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে, পৃথিবীর অভ্যন্ত-রের মতোই চাঁদও 'জীবিত', চাঁদের জঠ-রেও উত্তাপ আছে ঠিক, গলিত ধাতুপিণ্ড আছে, আছে অগ্ন্যুৎপাত ও কম্পন-সৃষ্টির উপযোগী মাল-মশলা।

সুদূর অতীতে কম্পন হামেশাই সৃষ্টি হত চাঁদের দেশে এবং অল্প পরিমাণে হলেও আজও তা' হয়।

কিন্তু কম্পন সৃষ্টি হয় সেখানকার মাটি আর পাথর-জাতীয় জড়-পদার্থে। প্রাণ-পদার্থে আদৌ তা' হয় কি?

বিশেষজ্ঞরা বলছেন,—না, হয় না। কারণ, চাঁদ থেকে নিয়ে আসা মাটিকে বিভিন্ন রকম বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখা গেছে, প্রাণের চিহ্নমাত্র নেই সেখানে; প্রাণ-পদার্থের আদিতম কোনো নিদর্শনও নেই।

কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় তবু। প্রাণ-

পদার্থের এমন কোনো নিদর্শন যদি সেখানে থাকে, আমরা যা'র সঙ্গে একেবারেই অপরিচিত? যা' মারাত্মক জীবাণুর আকারে অপরিসীম ক্ষতি করতে পারে আমাদের?

এ সব প্রশ্নেরও জবাব অনেকদূর অবধি মিলেছে এরই মধ্যে। চাঁদের ধূলোবালিকে ইঁদুরের দেহে প্রবেশ করিয়ে এরই মধ্যে আমরা জেনেছি,—না, কোনোরকম জীবাণু আদৌ সেখানে নেই। ইঁদুরদের কোনো ক্ষতি হয় নি চাঁদের ধূলোবালি থেকে।

অবিশ্যি এই ক্ষতি সম্বন্ধে সন্দেহ-বাতিকগ্রস্ত বিজ্ঞানীরা শেষ-কথা এখনও বলেন নি। ওঁরা বরং বলেছেন, আরও কয়েক মাস অপেক্ষা করা যাক আপাতত। দেখা যাক, শেষ অবধি কী দাঁড়ায়।

এদিকে চাঁদ-অভিযাত্রীরা বহাল তবিয়তেই আছেন। ২১ দিন বিচ্ছিন্ন থাকবার পর সুস্থ দেহেই আবার স্বাভাবিক কাজকর্ম সুরু করেছেন ওঁরা। ওঁদের দেহে বিরূপ কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে নি।

চাঁদের মাটি

প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে বরং চাঁদের মাটি। দেহে নয়, বিজ্ঞানীদের মনে সৃষ্টি করেছে প্রতিক্রিয়া। এরই মধ্যে প্রমাণিত হয়েছে যে, চাঁদ থেকে নিয়ে আসা ২০৫ কিলোগ্রাম (৪৫ পাউন্ড) মাটি বা পাথরের সবটুকুই 'আগ্নেয়'।

'আগ্নেয়' বলতে আগ্নেয়গিরিসঞ্জাত লাভা-জাতীয় বস্তুকে বুঝি আমরা। বুঝি এমন সব বস্তুকে, যারা সচরাচর-দৃষ্ট পৃথিবীর শিলার মতোই অভ্যন্তর থেকে উৎক্ষিপ্ত; অর্থাৎ, যারা গলন্ত ছিল এক সময়ে এবং পরবর্তী সময়ে যারা জমাট বেঁধে কঠিন হয়েছে।

এই যদি হয় তো না মেনে উপায় নেই যে, চাঁদের যে-সব মাটি আর পাথর আমরা নিয়ে এসেছি, এক সময়ে ওরা চাঁদের উত্তপ্ত গর্ভে ছিল এবং এক সময়ে ভূমিকম্প বা অগ্ন্যুৎপাতের ফলে গর্ভ থেকে মুক্তি পেয়েছিল ওরা।

এদিকে ঐ সব মাটি বা পাথরের টুকরোর আকৃতি-প্রকৃতি নিয়েও গবেষণা অনেক হল। আমরা জানলাম, নানা আকৃতির ওরা। ওদের কোনোটা নুড়ির মতো দেখতে; কোনোটা আবার খোয়ার মতো। এ ছাড়া রঙ ওদের গাঢ় ধূসর।

এই ধূসরতা স্ফটিকাকার শিলা-দেহের ওপর অস্পষ্ট ছাপ ফেলেছে কোথাও; কোথাও আবার ইলিয়াম-জাতীয় ধাতব পদার্থের ওপর স্পষ্ট ছাপ ফেলেছে।

এই ইলিয়াম নামক যৌগিক পদার্থটি পৃথিবীতেও প্রচুর পাওয়া যায়। এ হল টাইটানিয়াম-এর আকর।

এ ছাড়া চাঁদ থেকে আনা নুড়ি বা খোয়াগুলোতে আরও কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা গেল। ওদের অধিকাংশেরই গায়ে দেখা গেল অসংখ্য গর্ত। কিন্তু আশ্চর্য! অতি সূক্ষ্ম পাউডার-জাতীয় ধূলো ঐ সব গর্তের গায়ে যে পরিমাণে লেগে আছে, তার চেয়ে বেশি লেগে আছে গর্তের পার্শ্ববর্তী মসৃণ জায়গা-গুলোতে।

এই পাউডার-জাতীয় ধূলোর কথা চাঁদ-অভিযাত্রীরা আগেও বলেছেন। চাঁদে নেমেই সংবাদ দিয়েছেন ওঁরা যে, এই ধূলোয় কম-বেশি পরিমাণে ও দেশটা আচ্ছন্ন।

প্রশ্ন উঠল, এরা আসলে কী?

বিজ্ঞানীরা বললেন,—দেখা যাক, কী এরা!—বলেই অণুবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে পরীক্ষা সুরু করলেন। পরীক্ষায় দেখা গেল, এই পাউডার-জাতীয় পদার্থের এক-তৃতীয়াংশই দণ্ড বা রড্ গোছের পদার্থ দিয়ে গড়া। এই পদার্থগুলো আবার জেম্-স্টোনের মতো আলোর ঝলক ছড়ায়।

আলোর ঝলকের কথা ধরতে পারেন নি আর্মস্ট্রং। কিন্তু এরা যে পিচ্ছিল, চাঁদের মাটিতে পা দিয়েই তা' টের পেয়েছিলেন তিনি।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, পিচ্ছিল তো এরা হবেই। রড্ গোছের পদার্থ দিয়ে গড়া বলেই এরা পিচ্ছিল।

এদিকে বাক্স খোলবার সময় চাঁদের মাটি ও পাথর থেকে যে সব গ্যাস বেরিয়ে এসেছিল, তাদের ধরে রাখা হল কয়েকটি কাচের আধারে।

ঐ সব গ্যাস পরীক্ষা করে দেখা গেল, ওরা হচ্ছে সৌর-বায়ুর অবশেষ—অর্থাৎ, এটা হচ্ছে সেই পারমাণবিক পদার্থ, সূর্য থেকে ফুটতে ফুটতে, ছুটতে ছুটতে যারা বেরিয়ে এসেছে। সৌর-বায়ুর উল্লেখযোগ্য দুটি উপাদান আরগন ও হিলিয়ম পাওয়া গেছে ওদের মধ্যে।

কিন্তু ওদের মধ্যে ধরা পড়ে নি চাঁদের যে-সব রহস্য, তাদেরও কোনো কোনোটিকে ধরবার আয়োজন চাঁদ-অভিযাত্রীরা করেছেন; এবং এ অসাধ্য-সাধন ওঁরা করেছেন যন্ত্রের সাহায্যে।

চাঁদ থেকে নিয়ে আসা একটি শিলাখণ্ড

গিরিশ রচনাবলী

নাট্যাচার্য গিরিশচন্দ্র ঘোষের সমগ্র রচনা—নাটক, উপন্যাস, গল্প, কবিতা, গান, স্বরলিপি, প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রপত্রিকা থেকে যা-কিছু পাওয়া সম্ভব সমস্তই আমরা সংগ্রহ করে চার খণ্ডে প্রকাশ করছি। প্রতি খণ্ডে যে-সব রচনা সন্নিবিষ্ট হচ্ছে, তার তালিকা দেওয়া হল। প্রথম খণ্ড সম্পাদনা করেছেন ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় ও ডঃ দেবীপদ ভট্টাচার্য এবং এই খণ্ডে সংযোজিত গিরিশচন্দ্রের জীবনী ও সাহিত্যকীর্তি আলোচনা করেছেন ডঃ ভট্টাচার্য। অন্য খণ্ডগুলিতে যে-সব রচনা সন্নিবিষ্ট হবে তার সম্পাদনা ও সাহিত্যকীর্তি আলোচনা করবেন ডঃ ভট্টাচার্য। প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হল। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হবে বর্তমান বৎসরের শেষের দিকে এবং বাকি দুটি খণ্ড, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ড আশা করি ১৯৭০ সনের মধ্যেই প্রকাশিত হবে।

এখানে উল্লেখ্য, গিরিশচন্দ্রের কিছু রচনা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য ছিল এবং বাজেয়াপ্ত ছিল, আমরা বহু আয়াসে তা সংগ্রহ করে বিভিন্ন খণ্ডে সন্নিবিষ্ট করছি।

যাঁরা পরবর্তী খণ্ডগুলি পাওয়া সম্পর্কে সুনিশ্চিত হতে চান, তাঁদের নাম-ঠিকানা আমাদের অফিসে পাঠাতে অনুরোধ করছি। পর পর খণ্ডগুলি যখন প্রকাশিত হবে, আমরা পত্রদ্বারা তাঁদের সে বিষয়ে অবগত করব। এ ছাড়াও বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশন-ঘোষণা বিজ্ঞাপিত হবে।

মুদ্রণে ব্যয়াধিক্যের জন্য প্রথম খণ্ডের মূল্য কুড়ি টাকার কম ধার্য করা সম্ভব হল না। অন্য খণ্ডগুলিরও আনুপাতিক মূল্য ধার্য করা হবে।

আশা করি, গিরিশচন্দ্রের সমগ্র রচনা প্রকাশনের আমাদের এ প্রচেষ্টা পাঠকসাধারণের সমাদর লাভ করবে।

প্রথম খণ্ডে সন্নিবিষ্ট রচনা

নাটক : ১। অকালবোধন ২। দোল-লীলা ৩। সীতার বনবাস ৪। সীতাহরণ ৫। নল-দময়ন্তী ৬। বেল্লিকবাজার ৭। পূর্ণচন্দ্র ৮। বিবাদ ৯। হারানিধি ১০। কমলে কামিনী ১১। মলিনা-বিকাশ ১২। নিমাই সন্ন্যাস ১৩। জনা ১৪। আবু হোসেন বা হঠাৎ বাদসাই ১৫। আলাদিন বা আশ্চর্য্য প্রদীপ ১৬। ফণীর মণি ১৭। পারস্য-প্রসূন বা পারিসানা ১৮। পাণ্ডবগৌরব ১৯। সিরাজদ্দৌলা ২০। বলিদান ২১। য্যায়সা-কা-ত্যায়সা

গদ্যরচনা : ১। পৌরাণিক নাটক ২। নটের আবেদন ৩। রঙ্গালয় ৪। বর্তমান রঙ্গভূমি ৫। নাট্য-মন্দির ৬। নাট্যকার ৭। কাব্য ও দৃশ্য

দ্বিতীয় খণ্ডে সন্নিবিষ্ট রচনা

নাটক : ১। আগমনী ২। দক্ষযজ্ঞ ৩। সীতার বিবাহ ৪। ব্রজ বিহার ৫। মণিহরণ ৬। রাবণবধ ৭। অভিমন্যুবধ ৮। মেঘনাদ বধ (নাট্যরূপ) ৯। করমেতি বাঈ ১০। চৈতন্যলীলা ১১। বুদ্ধদেব চরিত ১২। মীর কাসিম ১৩। ভ্রান্তি ১৪। অশ্রুধারা ১৫। দেলদার ১৬। মায়াতরু ১৭। মুকুল মুঞ্জরা ১৮। শাস্তি ১৯। আয়না ২০। পাঁচ কণে ২১। সভ্যতার পাণ্ডা ২২। হীরার ফুল

উপন্যাস : ১। ঝালোয়ার দুহিতা ২। লীলা

গল্প : ১। হাবা ২। বাচের বাজী ৩। বাঙ্গাল ৪। গোবরা ৫। বড় বউ ৬। ভূতির বিয়ে ৭। সই

প্রবন্ধ : ১। কবিবর স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র সেন। ২। নবীনচন্দ্র ৩। কবিবর রজনীকান্ত সেন ৪। সমাজ সংস্কার ৫। স্ত্রীশিক্ষা ৬। ইংরাজ রাজত্বে বাঙলা ৭। গরুড় ৮। পুরুষ অংশে নারী অভিনেত্রী ৯। অভিনেত্রী সমালোচনা ১০। কেমন করিয়া বড় অভিনেত্রী হইতে হয় ১১। অভিনয় ও অভিনেতা ১২। বহুরূপী বিদ্যা ১৩। নৃত্যকলা ১৪। সম্পাদক ১৫। ভারতবর্ষের পথ ১৬। রাজনৈতিক আলোচনা

কবিতা : ১। প্রতিধ্বনি

তৃতীয় খণ্ডে সন্নিবিষ্ট রচনা

নাটক : ১। অভিশাপ ২। ধ্রুবচরিত্র ৩। নন্দদুলাল ৪। পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাস ৫। প্রহ্লাদচরিত্র ৬। লক্ষ্মণবর্জন ৭। হর-গৌরী ৮। রূপসনাতন ৯। কালাপাহাড় ১০। শঙ্করাচার্য্য ১১। ছত্রপতি শিবাজী ১২। আনন্দরহো (খণ্ড) ১৩। প্রফুল্ল ১৪। অশোক ১৫। বাসর ১৬ মনের মতন ১৭। মলিনমালা ১৮। হীরক জুবিলী ১৯। যামিনী চন্দ্রমাহীনা গোপন চুম্বন ২০। ভোট মণ্ডল ২১। সপ্তমীতে বিসর্জন

উপন্যাস : ১। চন্দ্রা

প্রবন্ধ : ১। রঙ্গালয়ে নেপেন ২। স্বর্গীয় অর্ধেন্দুশেখর মুস্তফি ৩। স্বর্গীয় মহেন্দ্রলাল বসু ৪। স্বর্গীয় বিহারীলাল চট্টোপাধ্যায় ৫। স্বর্গীয় অঘোরনাথ পাঠক ৬। নাট্যশিল্পী ধর্মদাস ৭। স্বর্গীয় অমৃতলাল মিত্র ৮। বিনোদিনী দাসী

কবিতা : ১। গীতাবলী (প্রথম খণ্ড)

চতুর্থ খণ্ডে সন্নিবিষ্ট রচনা

নাটক : ১। তপোবল ২। প্রভাসযজ্ঞ ৩। শ্রীবৎসচিন্তা ৪ রামের বনবাস ৫। বৃষকেতু ৬। স্বপ্নের ফুল ৭। নসীরাম ৮। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর ৯। সৎনাম ১০। রাণা প্রতাপ ১১। মায়াবসান ১২। ম্যাকবেথ ১৩। শাস্তি ও শান্তি ১৪। গৃহলক্ষ্মী ১৫। মহাপূজা ১৬। মোহিনী প্রতিমা ১৭। স্বপ্নের ফুল ১৮। বড়দিনের বখশিশ ১৯। ছটাকী

গল্প : ১। একধর্ম ২। নসে ৩। কর্জনার মাঠ ৪। পূজার তত্ত্ব ৫। প্রায়শ্চিত্ত ৬। টাকের ঔষধ বা ধর্মদাস ৭। পিতৃ প্রায়শ্চিত্ত ৮। সাধের বউ

প্রবন্ধ : ১। ঈশজ্ঞান ২। ধর্ম ৩। তাও বটে, তাই বটে!!! ৪। ধর্মস্থাপক ও ধর্মযাজক ৫। ধর্ম ৬। গুরুর প্রয়োজন ৭। প্রলাপ না সত্য ৮। নিশ্চেষ্ট অবস্থা ৯। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ ১০। রামদাদা ১১। স্বামী বিবেকানন্দ বা শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের সহিত স্বামী বিবেকানন্দের সম্বন্ধ ১২। পরমহংসদেবের শিষ্যস্নেহ ১৩। বিবেকানন্দ ও বঙ্গীয় যুবকগণ ১৪। ধ্রুব-তারা ১৫। শান্তি ১৬। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ১৭। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেব ১৮। স্বামী বিবেকানন্দের সাধনফল ১৯ রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসী ২০। বিশ্বাস ২১। বিজ্ঞান ও কল্পনা ২২। গ্রহফল ২৩। দীননাথ ২৪। পাখী গাও ২৫। ফুলের হার

কবিতা : ২। গীতাবলী (২য় খণ্ড)

সাহিত্য সংসদ

৩২এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড :: কলিঃ-৯

তিনটি যন্ত্র

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার উদ্দেশ্যে মোট তিনটি যন্ত্র নিয়ে যাওয়া হয় চাঁদে। এদের মধ্যে একটি সুইসদের প্রদত্ত। আবহাওয়াহীন চাঁদের সৌর-বায়ুর সংঘাত-পরিমাপের উদ্দেশ্যেই এ যন্ত্রটিকে চাঁদ-অভিযাত্রীদের সঙ্গে দেন ওরা। এবং এটিকে চাঁদ থেকে ফিরে আসবার সময় অভিযাত্রীরা সঙ্গে করে নিয়ে আসেন। এ-যন্ত্রটি এখন সুইসদের কাছে রয়েছে; এবং এ থেকে সৌর-বায়ু সংক্রান্ত রিপোর্ট এখনও আমারদের হাতে এসে পৌঁছয় নি।

দ্বিতীয় যন্ত্রটি হল এক সিস্‌মোমিটার। কম্পন-পরিমাপের উদ্দেশ্যে চাঁদেই রেখে আসা হয়েছে তাকে; এবং এরই মধ্যে ৩০ বারেরও বেশি কম্পন-সংবাদ পাঠিয়েছে সে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই সংবাদগুলোর মধ্যে তিনটি অন্তত চাঁদের দেশে ভূমিকম্পের সংবাদ।

গত ৩০শে জুলাই তারিখে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যামণ্ট্‌ জিওফিজিক্যাল অবজারভেটরী চাঁদের ভূমিকম্পের যে সংবাদ পেয়েছে, তা' থেকে বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন, আমাদের ঐ প্রতিবেশী গ্রহটির উত্তপ্ত গর্ভ এখনও তার পৃষ্ঠদেশের ওপর চাপ দিচ্ছে। বিজ্ঞানী ডঃ ল্যারী গ্যান্থাম বলেছেন, এই চাপের শক্তি দেখে মনে হয়, চাঁদের পৃষ্ঠদেশ ১৫ কিলোমিটার (৯·৩ মাইল) পুরু। অবিশ্যি এর তলাতেও আর একটা আবরণ আছে চাঁদের এবং এই আবরণের তলায় আছে গলিত পদার্থে পূর্ণ তার উত্তপ্ত গর্ভদেশ।

তবে শুধুমাত্র চাঁদগর্ভের খবরই নয়, চাঁদ এবং পৃথিবীর সঠিক দূরত্বও নির্ণয় করা যাবে এইবার থেকে। কারণ, অভিযাত্রী আর্মস্ট্রং ও অলড্রিন চাঁদে রেখে এসেছেন একটি 'হানিকোম রিফ্লেক্‌টার'। এই 'রিফ্লেক্‌টার'টির সাহায্যে গত ১লা আগস্ট ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের লিক্‌-অবজারভেটরী চাঁদ ও পৃথিবীর দূরত্ব প্রায় নির্ভুলভাবে নির্ণয় করেছে এবং ঐ দূরত্ব দাঁড়িয়েছে ৩ লক্ষ ৬৫ হাজার ১৯৬·২ কিলোমিটার (২ লক্ষ ২৬ হাজার ৯৭০·৯ মাইল)। বিজ্ঞানীদের মতে, লিক্‌-অব্‌জারভেটরী'র এই হিসেবে ৪৫ মিটারের (১৫০ ফুট) বেশি ভুল থাকতে পারে না। কিন্তু এতদিন এই ভুলের মাত্রাটা এ-তুলনায় খুব বেশিই ছিল। ১·৫ কিলোমিটার (০·৯৩ মাইল) অবধি ভুল ছিল এতদিন।

মাসিক ১০, টাকার কিস্তিতে লাভ করুন

অল ওয়ার্ল্ড স্ট্যাণ্ডার্ড ট্রানজিস্টর (জাপান মেক) জনপ্রিয় মূল্য ৩০০, দেশব্যাপী খ্যাতি আছে। ডবল স্পীকার ৩ ব্যাণ্ড, ৮ ট্রানজিস্টর। নাইট-ল্যাম্প ফিট করা। কেবল ইংরেজী বা হিন্দিতে যোগাযোগ করুন।

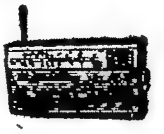

Allied Trading Agencies
(B.C.) P.B. 2123, Delhi-7.

নতুন অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি

তাহলে এত সব উদ্যোগ-আয়োজনের পর শেষ অবধি কী দাঁড়াল? চাঁদের উদ্ভব ও জন্মরহস্য সম্বন্ধে নতুন কী জানা গেল?

বিজ্ঞানীরা বলছেন,—বিশেষ কিছু গেল না জানা। সঠিক কিছুর হদিস পাওয়া গেল না। বরং চাঁদের জন্ম সম্বন্ধে আমাদের আগেকার ধারণাটাই বদ্ধমূল হল আরও। আগেকার ধারণা, অর্থাৎ ঠিক পৃথিবীর জন্মলগ্নেই চাঁদেরও জন্ম; সৌর-পরিবারের বিশিষ্ট একটি শরিক হিসেবে ঠিক পৃথিবীরই মতো চাঁদেরও আবির্ভাব। এবং আবির্ভাব সেই আদ্যিকালে, সূর্য যখন দুরন্ত বেগে ঘুরছিল এবং যখন তার দেহ থেকে মহাকাশে ছিটকে এসে পড়েছিল কিছু মালমশলা। ঐ সব মালমশলা থেকেই অন্য সব গ্রহদের মতো চাঁদেরও সৃষ্টি; এবং চাঁদ ঠাণ্ডা হতে হতে এখন যে অবস্থায় এসেছে, তার সঙ্গে মিল আছে পৃথিবীর।

এদিকে পৃথিবী থেকে চাঁদের-জন্ম—এই মতবাদে যাঁরা বিশ্বাসী, তাঁদেরও হতাশ হবার কিছু নেই। তাঁরা এখনও স্বচ্ছন্দে ভাবতে পারেন যে, প্রশান্ত মহাসাগর থেকেই একদিন ছিটকে বেরিয়ে গেছে চাঁদ। কারণ, চাঁদের শিলা পরীক্ষা করে দেখা গেছে, পৃথিবীর শিলার সঙ্গে ওদের বিশেষ কোনো পার্থক্য নেই।

কিন্তু শিলার কথা বা চাঁদের বয়সের কথা থাক আপাতত। আপাতত বরং চাঁদ-প্রত্যাগত মহাকাশচারীদের অভিজ্ঞতার কথা পর্যালোচনা করা যাক।

সাংবাদিক-বৈঠকে চাঁদ-অভিযাত্রীরা

সম্প্রতি এক সাংবাদিক-বৈঠকে অভিযাত্রী নীল আর্মস্ট্রং, এডুইন অলড্রিন এবং মাইকেল কলিন্‌স্‌ তাঁদের বিস্ময়কর চাঁদ-সফরের বর্ণনা দিয়েছেন।

চাঁদে গিয়ে তাঁদের নানারকম অসুবিধায় পড়তে হবে, যাত্রার আগে একথা বার বার বলা হয়েছিল। কিন্তু আসলে তা' হয় নি।

এ-সম্পর্কে মিঃ আর্মস্ট্রং স্পষ্টই বলেছেন, "চাঁদের অভিকর্ষ, আবহাওয়া ও পরিবেশ ভিন্ন। তাই চাঁদে যাঁরা নামবেন, তাঁদের হয়তো অজস্ররকমের অসুবিধায় পড়তে হবে—অনেকেই এ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। কিন্তু এই ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয় নি। বরং চাঁদে নামবার পর তার অভিকর্ষের আওতায় এসে আমরা বেশ আরামেই ছিলাম। আমাদের তখনকার অবস্থা ভারশূন্য এলাকার বা পৃথিবীর অভিকর্ষ-এলাকার অবস্থার তুলনায় অনেক আরামপ্রদ ছিল।"

এ ছাড়া চান্দ্রযান সম্পর্কে মিঃ আর্মস্ট্রং মন্তব্য করেন,—"চাঁদে নেমে আসার সময় এর পাদানি চাঁদের মাটিতে ঢুকে যেতে পারে বলে অনেকে আশঙ্কা করেছিলেন। কিন্তু কার্যত তা' হয় নি। কোনোরকম ক্ষতি হয় নি যানটির। সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় সে চাঁদের মাটিতে দাঁড়িয়েছিল। তার ডান দিকের জানালা দিয়ে তাকাতেই চাঁদকে বিরাট এক সমতল-প্রান্তর বলে মনে হয়েছে। কিন্তু বাম দিক থেকে তাকিয়ে মনে হয়েছে, এ-প্রান্তের বিশাল ঢেউ-খেলানো প্রান্তরের সঙ্গে ডান দিকের দৃশ্যের কোনো মিলই নেই।"

চাঁদ-অভিযাত্রীরা আরও জানান যে, অবতরণের জন্যে নির্দিষ্ট স্থানটি থেকে খানিকটা দূরে ওঁরা অবতরণ করেছিলেন। প্রায় ৩০ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট একটি গহ্বরের কাছে নেমে এসেছিল ওঁদের ঈগল। এই গহ্বরটির ছবি ওঁরা তুলেছেন; এবং এ ছাড়া আরও প্রায় ১ হাজার ছবি তুলেছেন ওঁরা।

ছবি তুলে এবং অন্যান্য কাজকর্ম শেষ করে চান্দ্রযানে ওঠবার সময় ওঁরা দেখেন যে, ওঁদের পিঠে অক্‌সিজেনের যে ভাণ্ডার ছিল তা' প্রায় অর্ধেক হয়ে এসেছে। আর ঠাণ্ডা রাখার জন্যে ছিল যে জল, তা' আরও কমে গিয়েছে।

চাঁদে যাবার আগে যদিও সে-দেশের অভিকর্ষ ও আলোক সৃষ্টি করে অভিযাত্রীদের নিয়ে মহড়া হয়েছে, তবুও অভিযাত্রীরা যথার্থই যখন চাঁদে অবতরণ করলেন তখন তাঁদের মনে হয়েছিল, এমন দৃশ্য জীবনে আর কখনও তাঁরা দেখেন নি; আলো-আঁধারে ঘেরা এমন অদ্ভুত-আশ্চর্য প্রকৃতিরও তাঁরা সম্মুখীন হন নি কোনোদিন।

সেখানে অসংখ্য কাজ করবার ছিল ওঁদের। কিন্তু হাতে সময় ছিল খুবই কম। তাই ওঁদের অবস্থাটা দাঁড়িয়েছিল (আর্মস্ট্রং-এর ভাষায়) "মিষ্টির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ছোট্ট এক বালকের মতো—এক জিনিস, কোন্‌টা খাব?"

আর্মস্ট্রং-এর সঙ্গে আমরা একমত। আমাদেরও প্রায় একই রকম বক্তব্য,—এত রহস্য, এত বিস্ময় বিশ্ব-ভুবন জুড়ে! কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টার খবর নেবো?

[পূর্বানুবৃত্তি]

সুযোগ বুঝে ভলু প্রথম যার নাম করল—সে মকুন্দ। তার সঙ্গে বেপরোয়া আরও কয়েকটা নাম জুড়ে দিলে। বললে, "ওরা সব বেনামী ভলান্টিয়ার জমাদার সাহব। সব ভলান্টিয়ার হয়ে গেছে। সব শালা গিয়ে জুটেছে সেই তাঁতঘরে—খুব জোর কাজকর্ম চলছে। আজ বোধ হয় এতক্ষণ চালায় খড় বসানো হয়ে গেল।"

"ঐ সব করাচ্ছে কে!"

ভলু বললে, "আমার মালুম হয়—মহেশ মণ্ডল, সানো চৌধুরী। তার প্রমাণ আছে।"—শেষ পর্যন্ত ভলু মরিয়া হয়ে সাফাই সাক্ষীর নাম করে দিলে, এবং প্রস্তাব করলে, "চরের যমুনা বোষ্টমীকে একবার থানায় ডাকিয়ে আনা হোক—কবুলে কবুবে। সে সব জানে।"

জমাদার দীনদয়াল সিং বললে, "তো যা—বোষ্টমীকে ধরে আন। একদম বড়োবাবুর কাছে খাড়া করে দিব।"

"ও বহুৎ হারামজাদী হ্যায় সিংজী।" ভলু বললে, "ঢের বুঝিয়েছি, ফুসলানী দিয়েছি। কিছুতেই ভিড়তে চায় না। অকে সেপাই দিয়ে ধরিয়ে আনা হোক। আমি গেলে সবটা ঘাঁটা-ঘাঁটি হয়ে যাবে। আসামীরা ছিপিয়ে যাবে।"

ভলু মাঝি মরিয়া। তার জেদ, তার প্রতিহিংসা তাকে ক্ষেপিয়ে তুলেছে। বললে, "যমুনা ভিক্ষেটিক্ষে করে সন্ধ্যে নাগাদ ফিরে আসে। সেই সময়ে গিয়ে ধরে আনা সুবিধে। চরের কেউ জানবেও না।"

গোঁফ পাকাতে পাকাতে সিংজী জিজ্ঞেস করলে, "যোমুনার উমর কত?"

"তা—তা—তা"—মিচকি হেসে ভলু বললে, "হবে পাঁচ-ছ' গণ্ডা।"

সব খবরাখবর দিয়ে সিংজীর মুখের দিকে চেয়ে ভলু মাঝি উত্তরের অপেক্ষা করতে লাগল।

সিংজী ভাবছিল। বললে "ঠিক আছে। বড়বাবুকে আমি বলব। কিন্তু শেষকালে ঝুটমুট হয়ে যাবে না তো—সেই আগুলিবারের মতো?"

ভলু নিজের একটা কান ধরে বললে, "তবে ই কান আমি এখেনে কেটে রেখে যাব। যা আমি জেনেছি সব বলে গেলুম। যমুনাকে ডাকিয়ে এনে আপনারা মোকাবিলা করে লেন। আমি মুখ্যুসুখ্যু মানুষ—সব কথা হয়তো বার করতে পারি নি। আপনারা হয়তো আরও ঢের কথা বার করে ফেলবেন সিংজী।"

সিংজী বললে, "ঠিক আছে।"

ভলু হাত যোড়করে বললে, "তবে দোহাই সিংজী—আগেই ঘাঁটাঘাঁটি না হয়ে যায়। খবর লিবেন চেপেচুপে—তার পরে একেবারে সব ক'টাকে ক্যাঁক্ করে—"

ভলু চোখের ইঙ্গিত করলে।

খুশি মনে ভলু সেদিন থানা থেকে বিদায় নিলে। এবং আরও হাজার রকমের প্যাঁচ কষতে কষতে বাড়ি ফিরে গেল।

তবে চেপেচুপে কাজ করা—বড়বাবুর ধাত নয়। আর থানার কাজ-কর্মে যদি দাপটই না রইল তবে আর অফিসার কি! আর এই বুনো দেশের মানুষগুলো ভয়ই বা পাবে কেন। লোকটা দেখতে যেমন গাঁট্টাগোট্টা, কাঁধ চওড়া—বৃষস্কন্ধ, চৌকো চিবুক—অতিরিক্ত রকমের স্থূল, স্পষ্ট এবং একগুঁয়ে, তেমনি তার কাজকর্ম; সেখানেও চাপাচুপি অস্পষ্টতা নেই।

হুকুম দিলে, "হারামজাদীকো অভি পাকড়কে লাও।"

তখন সকাল।

দীনদয়াল সিং অবাক হয়ে বললে, "এখন যাবে বড়বাবু! সব তো ঘাঁটাঘাঁটি জানাজানি হয়ে যাবে, আসুলি আদমি সব ছিপিয়ে যাবে।"

বড় দারোগার চালাও হুকুম, "সব শালাকে পাকড়াও—আউর লাগাও ধোলাই।"

"কবুল তো কেউ করবে না বড়বাবু।"

"তবে! তবে তুমি কি বলো?"

"ওই দলসুদ্ধ ধরতে হলে একটু চেপে কাজ করতে হবে বড়বাবু।"

"হুম।" ক্ষিপ্ত বড় দারোগা শুধু একটা শব্দ করলো।

সেদিন সকালের হুকুমটা কোনো-রকমে চাপা পড়ল। সন্ধ্যের পরে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে দুজন সেপাই গিয়ে দাঁড়াল যমুনার কুঁড়ের সামনে।

সারা দিন কোথায় না কোথায় ভিক্ষে-সিক্ষে সেরে যমুনা তখন সবে ঘরে ফিরেছে।

ঘরের বাইরে ডাক পড়ল, "এ যোমুনা!"

"কে গ'!"

দরোজার সামনে এসে যমুনা থমকে দাঁড়াল।

'থানার ডাক আছে।"—

সেপাই আরও কি বলতে যাচ্ছিল—তার আগেই যমুনার কুঁড়ের বাঁশের আগড় ঝপ্ করে চেপে বন্ধ হয়ে গেল। নিমেষেই সে বুঝতে পারল—এ সেই ভলু মাঝির কাণ্ড।

সেপাই দুজনও হকচকিয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলে। তাদের ওপর হুকুম—ডেকে নিয়ে যাওয়ার। কিন্তু ডেকে নিয়ে যাবে কি—ঘরের ভেতর থেকে যমুনার কোনো সাড়াও নেই, শব্দও নেই।

তবু ঠাণ্ডা মাথায় বাঁশের আগড়ে ধাক্কাধাক্কি করে সেপাইরা ডাকাডাকি করতে লাগল, "আরে এ যোমুনা! বাত্ তো শুনো।"

কে কার কথা শোনে।

"দরোয়াজা তোড় দিব?"

তবু সাড়া নেই।

এবার লাথি পড়ল। বাঁশের আগড় মচ্‌মচ্ করে উঠল।

যমুনা এবার প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল, "হেই...মোকে মেরে ফেলালে গো!... কে কোথায় আছ ছুটে এস গো!"—

কিন্তু কেউ কোথাও নেই। মেয়েলি গলার তীক্ষ্ম আর্তনাদ চরের জমাট নীরবতার মাঝখানে মাথা কুটে কুটে কোথায় হারিয়ে গেল। কেউ তার ক্ষীণ রেশটুকুও শুনতে পেল না। চরের কিষাণপাড়া এখান থেকে ঢের দূর। আর শুনতে পেলেও একদিন যারা তাকে তাদের ত্রিসীমানা থেকে উপড়ে তুলে এই নির্জন লোকালয়হীন প্রান্তে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে তারা ছুটে আসতো কি না কে জানে। তবু যমুনা প্রাণপণে চেঁচাতে লাগল।

"হেই কে আছ মোকে বাঁচাও..."

এই চেঁচামেচি থানার মানুষের আর কতক্ষণ সহ্য হবে! জুলুম করে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ নেই, কিন্তু জুলুম হয়ে গেল। দমাদ্দম গোটাকয়েক লাথির সঙ্গে সঙ্গে বাঁশের আগড় কোথায় ছিটকে গেল। টর্চ ফেলে টঙের ভেতরে ঢুকে সেপাই দুজন দু'দিক থেকে যমুনাকে চেপে ধরল।

যমুনার চেঁচানি তুঙ্গে উঠল।

"গলা টিপে দিব হারামজাদী। চিল্লাও মৎ।"

দুই সেপাই দু' হাত ধরে ঘষটাতে ঘষটাতে যমুনাকে বাইরে বের করে আনলে। টেনে দাঁড় করাতে চাইল। যমুনা মাটিতে বসে পড়ল। চেঁচানির তার বিরাম নেই—সুরু হলো ভলু মাঝি আর সেপাইদের চোদ্দপুরুষের উদ্দেশ্যে বিচিত্র সব সম্ভাষণ। থানার মানুষের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল।

কোথায় চেপেচুপে খবর সংগ্রহ আর কোথায় কি—যেমন দারোগা তার তেমন সেপাই। টানা-হেঁচড়া, হাঁকা-হাঁকি, গালাগালি তো পাল্টা গালাগালি—চর থেকে সড়ক, সড়ক থেকে থানা। চারদিকে সাড়া জাগিয়ে যমুনাকে হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে থানায় টেনে নিয়ে গেল। চরের মানুষ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখলে। ডাক্তারখানায় নানা গাঁয়ের রোগী ভিড় করে দাঁড়াল। তাঁতঘরের ঘরামীরা—হাবুর দল, যমুনার ডাক-পাড়া চেঁচানি উৎকর্ণ হয়ে শুনতে শুনতে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করতে লাগল।

ভলু মাঝির মতলব ভেস্তে গেল। কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে গিয়ে হাজির জমাদার সিংজীর কাছে। বললে, "ই কি কাণ্ড সিংজী!"

সিংজী তার ভারী মুখ আর গোল চোখ মেলে জিজ্ঞেস করলে "কি হৈল?"

"আর কি হৈল—সারা রাত উজাগর হৈল!" ভলু বললে, "শালার সেপাইরা যেয়ে যমুনাকে কিলাতে কিলাতে আনছে। ই তো সব হুঁশিয়ার হয়ে যাবে!"

সিংজী আশ্বাস দিলে, "ঘাবড়াও মৎ। দেখো না—"

বাকী যেটুকু দেখার ছিল—দেখা হয়ে গেল যমুনা থানায় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। তাকে একেবারে সোজা নিয়ে গিয়ে খাড়া করে দেওয়া হলো বড় দারোগার সামনে।

দীনদয়াল বললে, "এই সেই যোমুনা বড়বাবু!"

"বটে!" বড় দারোগা রক্তচক্ষু মেলে তাকালো যমুনার দিকে। আপাদমস্তক দেখে নিলে যুবতী মেয়েটাকে—আঁট-সাঁট চেহারা, সেপাইদের টানা-হেঁচড়ায় আলুথালু বেশবাস, মুখের ওপর উড়ে পড়েছে মাথার চুল। হাঁপাচ্ছে।

বড় দারোগা ধমক দিয়ে বললে, "কি জানিস বল।"

কিছু বলার আগে যমুনা ছুটে গিয়ে বড় দারোগার পা জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।

বড় দারোগা ধমকে উঠল আবার, "কাঁদিস পরে। আগে যা জানিস বল।"

"আমি কিছু জানি না হুজুর।" বলে যমুনা ফোঁপাতে লাগল।

"চারদিকে এত আগুন লাগছে—তোর নিজের ঘরও আগুনে পুড়ে গেল, আর তুই কিছু জানিস না?" হুংকার দিলে দারোগা, "মিথ্যে বললে তোর জিভ টেনে ছিঁড়ে ফেলবো হারামজাদী।"

যমুনা সভয়ে নীরবে চেয়ে রইল।

"লাগাচ্ছে কারা?" বলে বড় দারোগা তীব্রদৃষ্টিতে যমুনার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

যমুনা বলল, "তার আম কিচ্ছু জানি না হুজুর।"

"জানিস না!" দারোগা বললে, "এই যে ভলু মাঝিকে বলেছিস—কারা যেন সব করে বেড়াচ্ছে।"

বড় দারোগা নাম ক'টা বলে গেল, "মহেশ মণ্ডল, মুকুন্দ পাইক—সানো চৌধুরী আর কে একটা তাঁতী।"

"আজ্ঞে আমি কিচ্ছুটি বলি নাই হুজুর।" যমুনা বললে, "উ সব বানিয়ে বলেছে।"

"বানিয়ে বলেছে!" মোকাবিলার জন্য দারোগা একজন সেপাইকে হুকুম দিলে, "এ্যাই—বোলাও ভলু মাঝিকো।"

কিসে যেন কি হয়ে গেল! মনে মনে আটঘাট কষা সব ফন্দি-ফিকির পরিকল্পনা ভেস্তে যাওয়ার মাথায়। ভলু মাঝির তখন মাথার চুল টেনে ছেঁড়বার অবস্থা। তবু সামনে এসে দাঁড়াল। তাকে দেখে যমুনার চোখ হঠাৎ জ্বলে উঠল। তার যতো দুর্দশার মূল এই লোকটাকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে কোথায় গেল তার ফোঁপানি আর কোথায় গেল তার ভয়-ডর। হঠাৎ যেন সে খোঁচা খাওয়া বাঘিনীর মত গর্ গর্ করে উঠল। বললে, "তাঁতীকে এখনো আমি চোখে দেখি নি হুজুর। আর সানো কত্তা মানী লোক—মোর পাপ মুখে তার নাম করবার সাহস নাই। ও লোচ্চার যত রাগ ওই মহেশ মণ্ডল আর মুকুন্দ পাইকের ওপরে। ও ঢের দিন থেকে মোকে শুধু যেয়ে যেয়ে ভজাচ্ছে—অদের নামে যাতে থানায় এসে বলি। এই ক'দিন আগে যেয়েও বলেছে। এই অর সামনেই বলছি।"—

ঘটনার এমন একটা পরিণতি হবে—ভলু মনেও ভাবে নি। প্রথমটা সে হকচকিয়ে গেল। সামলে নিয়ে নরম গলায় বলল, "তোর নিজের ঘর পুড়ে যাওয়ার পর চরের মহেশ মণ্ডল তোকে কি বলেছিল—বড়বাবুকে বল। তুই কেন মিছে মোর নামে দোষ দিচ্ছিস!"

"মিছে দোষ দিচ্ছি গুলামের ব্যাটা গুলাম?" যমুনা ক্ষেপে গেল, "তুই লোচ্চা মুকুন্দের বৌকে ফুসলে বার করে আনবার জন্য মোকে লাগাস নি? তুই মড়াখাগীর ব্যাটা তাকে ভাঙ খাইয়ে অজ্ঞান করে ফেলতে মতলব দিস নি? তুই তাকে মিছে কয়েদ করে মোর কাছে যেয়ে বলিস নি? তুই তাকে মেরে ফেলবার জন্যে রাত-বিরাতে ঘুরু ঘুরু করছিস না?" বলতে বলতে সে আবার ছুটে গিয়ে বড় দারোগার পা জড়িয়ে ধরে হাউমাউ করে বললে, "মুকুন্দের বৌয়ের দিকে অর ঢেরদিন থেকে লজর হুজুর। শেষকালে মোকে পর্যন্ত বিপদে

ফেলানে। মা গো—" বলে পা ছড়িয়ে ডাক ছেড়ে কাঁদতে বসলো।

মেয়েলোক নিয়ে এমন ধকমারি এ থানায় কোনোদিন হয় নি। মেয়ে-লোকের এই কানফাটানো মড়া-কান্নার সঙ্গে যুগপৎ বিচিত্র সব গালাগালে—সেপাই-সান্ত্রী হতচকিত। জমাদার দীনদয়াল সিংয়ের মুখে রা নেই। বড় দারোগা তাকাল কটমট করে। হতমান সিংজী মুখ নিচু করল। দুর্বল স্থানে ঘা লাগলে অতি-সাহসীরও সাহসের অভাব ঘটে। ভলু মাঝি এক পা পিছু হটল। একজোড়া রক্তচক্ষু স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে তার দিকে। আবার এক পা।

"শালা লোচ্চার জন্যে আমার থানা-পুলিশ হয়রান হবে! ফেরেববাজ—হারামীর বাচ্চা!"

একপাটি ভারী বুট সাঁ করে ছুটে এল ভলুর মাথা লক্ষ্য করে। মাথা নুইয়ে কোনোরকমে আঘাত বাঁচিয়ে ভলু এক লাফে বারান্দা থেকে থানা কম্পাউন্ডের মাঠে—তারপর মাঠ থেকে একেবারে কম্পাউন্ডের বাইরে।

davp 69/106

তার সুদূর স্বর্গলোকবাসিনী জননীর কানের কাছে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে ইহলোকের নানা দুঃখ-দুর্দশার ফিরিস্তি যমুনা তখনো ত্রাহি ত্রাহি চিৎকারে দাখিল করে চলেছে।

বড় দারোগা সেপাইদের দিকে হুংকার ছাড়লে, "এ হারামজাদাকে গলা টিপে বার করে দে। আভি নিকালো।

এই গেঁয়ো চৌকিদারগুলো যে একেবারেই অকর্মণ্য, মিথ্যাবাদী এবং ফাঁকিবাজ—এ সম্পর্কে বড় দারোগার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। জমাদার দীন-দয়াল সিংকে সেই কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে বড় দারোগা বললে, "শালাদের কথায় বিশ্বাস করলে হয়রানির এক-শেষ। দেখলে তো সিংজী। ওদের আমি বহু আগেই চিনেছি।"

লাঞ্ছনা আর অপমানের জ্বালা নিয়ে ভলু মাঝি ছটফট করে বেড়াতে লাগল। ঘরে ফিরতে আর মন উঠল না—পায়ে পায়ে চলে গেল তার হুন্দায়। জনবসতি এড়িয়ে ভূতের মতো ঘুরে বেড়াতে লাগল এদিক-ওদিক। কখনো বা থমকে দাঁড়িয়ে উদ্‌ভ্রান্ত চোখে চেয়ে রইল জনবসতির লাল ফুটকীর মত আলোগুলোর দিকে। ওই কম্পমান লাল বিন্দুগুলো যেন আজ তার চোখে চোখ রেখে হাসছে—উপহাস করছে।

ওদিক থেকে জোর করে মুখ ঘুরিয়ে সড়ক ছেড়ে, চরে ঢুকলো। জমির ঘেরি বাঁধ ধরে এঁকে বেঁকে এগিয়ে চলল সোজা পূবে—একেবারে সেই নদীর কিনার বাঁধে। উঁচু এমব্যাংকমেন্ট কালভার্ট। বাঁধের ওপরে উঠতেই চোখের সামনে দুলে উঠল ভাগীরথীর দিকচিহ্নহীন অগাধ জলরাশি—আলো-আঁধারিতে ধীর মুখর গৈরিক কলোচ্ছ্বাস। মুখের ওপর—বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্‌টা। ভলু বাঁধের ওপর বসে পড়ল।

হুন্দা তার বসতি-বিরল—কিন্তু বিস্তীর্ণ। পশ্চিমে সেই জেলা বোর্ডের সড়ক—আর পূবে ভাগীরথীর কিনার-বাঁধ; মাঝখানে উত্তরে-দক্ষিণে প্রসারিত নিরবচ্ছিন্ন সুদীর্ঘ আবাদ এলাকা একেবারে নিঃসাড় নিঝ্‌ঝুম। ভাগীরথীর নিরবিচ্ছিন্ন কলোচ্ছ্বাস ছাড়া কোথাও এতটুকু আর সাড়া নেই, শব্দ নেই। মেঘমুক্ত হেমন্তের আকাশ। এক-ফালি চাঁদ পশ্চিম দিগন্তে তখন একটু একটু করে ঝুঁকে পড়ছে। ফিকে জ্যোৎস্নার আলো সারা চরের ওপরে যেন একটা বিষণ্ণ আবরণ টেনে দিয়েছে।

চরজোড়া এই নিঃসাড় বিষণ্ণতা যেন গুঁড়ি মেরে ভলুর মনের মধ্যে ঢুকে তাকে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন করে দিলে।

কতক্ষণ সে এইরকম আচ্ছন্নের মত বসেছিল তার খেয়াল নেই। অস্তোন্মুখ আধখানা চাঁদের সঙ্গে সঙ্গে সামনের প্রসারিত জলরাশি একটু একটু করে কালো হয়ে আসছিল। অদূরে জালপাই জঙ্গলের কোথায় একপাল শেয়াল ডেকে উঠে স্তব্ধ রাত্রির ঘনায়মান গভীরতাকে যেন জানিয়ে দিয়ে থেমে গেল। চারদিকের নিঃশব্দতা যেন আপন গভীরতায় আবার ঝিম্‌ ঝিম্‌ করতে লাগল।

সহসা ভলু মাঝি চমকে উঠল। দুটো মানুষের গলা যেন কানে এসে লাগল। উৎকর্ণ হয়ে উঠল। চারদিকে ফিরে তাকালে—কিছুই দেখতে পেল না। তবু তার স্পষ্ট মনে হলো—কারা যেন কোথায় কথা বলছে।

উঁচু কিনার-বাঁধের কোল থেকেই ধান-ক্ষেত শুরু—গলা সমান উঁচু ধান গাছ ফসলের ভারে ঈষৎ নুয়ে পড়েছে। ধান গাছের আড়ালে ভাল দেখা না গেলেও ভলুর মনে হলো— সেই ক্ষেতের ভেতরে কে যেন কার সঙ্গে কথা বলছে। ম্লান জ্যোৎস্নায় হঠাৎ সে দেখতে পেল—দুটো লোক নিচু ঘেরি বাঁধ দিয়ে কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছে উঁচু কিনার-বাঁধের দিকেই। উঁচু বাঁধে উঠল।

তারা ভলুকে দেখতে পেল না—একটা বুনো ঝাউয়ের ঝোপ আড়াল করে দিয়েছে তাকে। উৎকর্ণ হয়ে সে শুনতে লাগল লোক দুটির কথাবার্তা। একজন আর একজনকে রাস্তা চিনিয়ে দিচ্ছে। কথা বলছে বাঁধে দাঁড়িয়ে।

"চিনতে তোমার কষ্ট হবেনি। হেই এখানে দাঁড়িয়ে মোদের চরের দিকে চোখ চালাও—দেখতে পাবে মোর জোড়া নারকেল গাছ।"

জোড়া নারকেল গাছ। কথাটা শোনা-মাত্র শিকারী কুকুরের মত সমস্ত স্নায়ু সজাগ হয়ে উঠল ভলুর। সন্তর্পণে উঁকি মেরে দেখল। জোড়া নারকেল গাছ হাবুর।

অন্য লোকটা তাহলে কে? তার মামু? অস্তোন্মুখ চাঁদের ঝাপ্‌সা আলোয় ভালো করে দেখা যায় না—চেনা যায় না।

"আর এদিকে নদীর বাঁধে বাঁধে সোজা দক্ষিণ। চলো।"

লোকটা কি তবে পালাচ্ছে? না পালাবে তো জেলা বোর্ডের সড়ক ছেড়ে এ রাস্তায় কেন? সেই আগুন। সেই তাঁতী-সাহির তাঁতী। নানা কথা ভিড় করে এল ভলুর মনে। তর মনের বিষণ্ণতা কেটে গেল। একটা নতুন উৎসাহ তাকে সজাগ—সজীব করে তুলল। মারুক জুতো বড় দারোগা—এ লোকটাকে সে ধরে দেবে। প্রমাণ করে দেবে—তার অনুমান মিথ্যা নয়। একটা থিতিয়ে যাওয়া বিক্ষোভ সর্বাঙ্গে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। কানে এসে লাগল আর একটা কথা:

"এখন কদিন গা ঢাকা দিয়ে থাক।"

ভলু মাঝির বুকের রক্ত ছলাৎ করে উঠল।

তার একবার মনে হলো—এখুনি গিয়ে লোকটাকে জাপটে ধরে। কিন্তু যদি ছুটে পালায়। সামনে জালপাই জংগল—একবার ঢুকে গেলে আর ধরা যাবে না। ওদিকে পশ্চিমে চাঁদ ডুবু ডুবু। তা ছাড়া ওরা দুজন।

নিজেকে সংযত করে সে ঝোপের আড়ালে সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগল। দুটি লোক নদীর বাঁধে বাঁধে সোজা এগিয়ে চলল দক্ষিণে। তারা বেশ খানিকটা এগিয়ে যাওয়ার পর ভলু বেরিয়ে এল ঝোপের আড়াল থেকে। চেয়ে দেখল সামনে—অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি দুটোকে দেখা যাচ্ছে আবছা আবছা, তাদের মৃদু কথা-বার্তা কানে এসে লাগছে অল্প অল্প। ভলু নিঃশব্দে তাদের অনুসরণ করতে লাগল দূর থেকে।

কিছুটা যেতে না যেতে হঠাৎ যেন মনে হলো—লোক দুটো দাঁড়িয়ে পড়েছে। বোধ করি সন্দেহ হয়ে থাকবে। চট করে বাঁধের পাশে সরে গিয়ে ভলু বসে পড়ল। ঘাপটি মেরে অপেক্ষা করতে লাগল।

ছায়ামূর্তি দুটো আবার চলতে শুরু করেছে। মনে হলো—বার বার ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন ফিরে দেখছে। বাঁধের ওপর দিয়ে যেতে ভলুর আর নিরাপদ মনে হলো না। প্রায় নেড়া বাঁধ—দুপাশে ঝোপ-ঝাড় নেই বললেই হয়। দু-একটা বাবলা গাছ কি দু-একটা দেশী ঝাউয়ের বিরল ঝোপ দূরে দূরে ছড়ানো। ঝাপসা আলোয় তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে সেই বিরল গাছপালার আড়াল আশ্রয় করে ভলু তাদের অনুসরণ করতে লাগল।

খানিক বাদে পশ্চিমের ঘন বনসীমার অন্ধকারে চাঁদ আড়াল হয়ে গেল। ভলু একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে। সারা চর ব্যাপ্ত করে নেমে এল ঘন অন্ধকারের যবনিকা। সামনের ছায়ামূর্তি কোথায় হারিয়ে গেল সেই অন্ধকারে। ভলু দ্রুত লঘু পায়ে এগিয়ে গেল আগের দিকে—ব্যবধান কমিয়ে নিলে। [ক্রমশ]

কিস্তিতে ট্রানজিস্টার

BAZA
৩ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড
পোর্টেবল ট্রানজিস্টর মাসিক ৫ টাকা কিস্তিতে। প্রত্যেক গ্রাম ও শহরে পাঠান যাইতে পারে।
HIND AGENCIES (47) KOLHAPUR ROAD, DELHI-7

বিহঙ্গ দিনলী

গৌরীশঙ্কর চন্দ্র

রংচটা টিনের স্যুটকেশটা টেনে নিয়ে ঝাড়তে বসল এবার সর্বাণী।

এ স্যুটকেশটা সঙ্গে নিতেই হবে। এটা ওর সুখ-দুঃখের চিরসাথী। ওর বুকের বল। আর যত আসবাবপত্র সব শুধুই বোঝা, জীবনের জঞ্জাল। পাবলে এসব জঞ্জাল ঝেড়ে ফেলে দেয় সর্বাণী। দিয়েছেও অনেক কিছু হাল্কা করে। পালঙ্ক, টেবিল, চেয়ার, সোফাসেট, আলমারী ইত্যাদি যাবতীয় পোষাকী আসবাবপত্র ও বেচে দিয়েছে। এ-সবের দরকার ওর কোনদিন ছিল না, আজও নেই। একখানি মাত্র বস্তির কুঁড়েঘরে নিয়ে গিয়ে রাখবেই বা কোথায় এসব।

আর যা টুকিটাকি নিত্যব্যবহারের সামগ্রী সেসব গোছান হয়ে গেছে। কালই ও ছেড়ে চলে যাচ্ছে এ ফ্ল্যাটবাড়ি। ফিরে যাচ্ছে ও আবার সেই উল্টোডাঙার খালপারের স্যাঁৎসেতে একটা বস্তি-ঘরে। বছর তিনেকের এই আমিরী বিলাস আর অফুরন্ত অবসরের অলস জীবনে ছেদ টেনে আবার ফিরে যাবে ওর কৃচ্ছ্রসাধনের অভ্যস্ত জীবনে। এ তিনটে বছর ধরে ও যেন এক অপরাধ করে আসছিল—শ্রম থেকে পলায়নী-বৃত্তির অপরাধ। নিজেকে ও ছোট করেছে এই অপরাধের মধ্যে দিয়ে। এবার শোধরাতে হবে। কাজই জীবন।

অলস হাতে নাড়তে-চাড়তে এক এক করে সবই গোছান হয়ে গেছে—ক'টাই বা জিনিষ। বাকী ছিল এই স্যুটকেশটা। হতাদরে পড়েছিল এটা উঁচু তাকের ওপর এক কোণে। এমনি করেই বোধ-হয় মানুষ অসময়ের বন্ধুকে সুসময়ে, ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছেয় হোক, হতাদর করে।

বহুদিনের জমা ধুলো ছড়িয়ে আছে স্যুটকেশটার সর্বাঙ্গে। একটুকরো ন্যাকড়া দিয়ে ঝেড়ে-মুছে পূর্বের হাল ফিরিয়ে আনতে চাইছে সর্বাণী—সেই সঙ্গে পুরনো সম্পর্কটাও। এতদিন পর ওর যত্নের স্পর্শ পেয়ে ওই মূক বস্তুটা যেন নীরব আবৃত্তিতে শোনাতে চাইছে সর্বাণীকে তারই ব্যথাভরা জীবনকাব্য। ঝাপসা হয়ে উঠছে বারবার সর্বাণীর চোখের দৃষ্টি। মাঝে মাঝে তাই ও হাতের কাজ থামিয়ে চোখ দু'টোকে মেলে দিতে চাইছে জানালার বাইরে দূরে—বহু দূরে।

কিন্তু উধাও করে দেওয়ার মত বহু দূরে দৃষ্টি মেলার জো নেই। আকাশছোঁয়া স্পর্ধায় নতুন নতুন সব বাড়ি উঠেছে এ-অঞ্চলে। হলদে, লাল, সাদা, ধোঁয়াটে, নানা রং-এর নানা ঢং-এর সব ইমারত দাঁড়িয়ে গেছে গা

ঘেঁসাঘেঁসি করে—নিখুঁত জ্যেমিতিক ছবি। সবুজের তরল উচ্ছ্বাসের জন্যে কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। ফাঁকি নেই একটু সুনীল অবকাশের। ঘাড়ে ব্যথা ধরিয়ে জোর করে ওপর দিকে চাইতে পারলে, হয়ত চোখে পড়বে একচিলতে

আকাশ। হয়ত রাতের আঁধারে সেই কালি দেওয়া তরমুজের একটুকরো খোলার মত আকাশে চোখোচোখি হবে গুটিকয় তারার সাথে—জেল গারদের মধ্যে থেকে সাক্ষাৎকামী আত্মীয়ের সাথে সজল চোখের দৃষ্টি বিনিময়ের মত।

মানুষের দৃষ্টিকে এখানে কয়েদ করে রাখে চারিদিক থেকে এই সব আকাশভেদী সৌধমালা নিশ্চল সান্ত্রীর মত।

সর্বাণীর ঘর থেকে ওই জানালা দিয়ে বাইরে চোখ মেললে দৃষ্টি হেথা হোথা টলতে খেতে খেতে একবারে আটকে যায় একটা ধূসর রং-এর অপেক্ষাকৃত পুরনো বাড়ির দেওয়ালে। বাড়িটার ছাদের কার্নিশে একজোড়া পায়রাকে লক্ষ্য করত সর্বাণী—সেই যবে থেকে এসেছে ও এই ফ্ল্যাটে। চেয়ে চেয়ে দেখত তাদের দ্বন্দ্ব-জীবন। কি নিবিড় তাদের দাম্পত্য বোঝাপড়া। কি গভীর তাদের ভালবাসা।

কচি কচি দুটি ছানা তাদের সবে যখন বাসা থেকে মাথা উঁচিয়ে চিঁ চিঁ শব্দে আহার চাইতে শিখেছে, এমন সময় একদিন কোন এক দুরন্ত মানবের গুলতির ঘায়ে অক্কা পেয়েছিল 'নর' পায়রাটা। মেয়ে পায়রাটাকে কিন্তু শোকে মুহ্যমান হয়ে থাকতে দেখে নি সর্বাণী। বরং তার দু-এক দিন পর থেকেই দেখেছে দু-একটা উটকো 'নর' এসে মেয়ে পায়রাটার সামনে গলা ফুলিয়ে বক বকম করে ঘুরে ঘুরে নাচ জুড়েছে। মেয়ে পায়রাটা অবশ্য তাদের আমল দেয় নি মোটে। অপত্যস্নেহের নেশায় সে তখন বুঁদ হয়ে আছে, তখন চিন্তার অবসর নেই। দিনে দিনে নিজে সে কেমন শীর্ণ হয়ে পড়েছে, তবু ভ্রূক্ষেপ নেই তাতে। অসহায় শাবকেরা সাবালক না হওয়া পর্যন্ত নিজের ক্ষুৎ-পিপাসা গৌণ।

শেষে বাচ্চা দুটো উড়তে শিখে হঠাৎ একদিন সেই যে কোথায় উধাও হয়ে গেল, আর এলো না ফিরে।

এমনিই হয়।

আলস্যভরে এখন একবার সেই কার্নিশটার দিকে চাইল সর্বাণী। দেখা যাচ্ছে না সে পায়রাটাকে—হয়ত পেটের ধান্ধায় বেরিয়েছে; হয়ত বা ছেড়ে চলে গেছে ও বাসা চিরতরে।

সর্বাণীও ছেড়ে চলে যাচ্ছে এ বাসা। ইচ্ছে করেই ছেড়ে দিচ্ছে এই সুপরিসর, আলো-হাওয়া খোলা অভিজাত-পল্লীর ফ্ল্যাটবাড়ি। নইলে, রতন ওকে এ বাসাতেই থাকতে লিখেছে, মাসে মাসে নিয়মিত টাকা পাঠানোর কোন ব্যত্যয় হবে না, সে আশ্বাসও দিয়েছে রতন ওই একই চিঠিতে।

মরা-মরা একটুকরো হাসি খেলে যায় সর্বাণীর চাপা ঠোঁট দুটোর কিনারে। আশ্বাস! এমন আশ্বাসই চেয়েছিল বটে সর্বাণী। ফ্ল্যাটখানা ওর জন্যেই কি ভাড়া নেওয়া হয়েছিল? না, ওর ইচ্ছেয়?

: সারাটা জীবন এই স্যাঁৎসেতে এঁদো বস্তিতে থেকে কষ্ট তো অনেকই করেছো, মা, এবার কিন্তু আমি একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করেছি।

: নাই চড়তে এক কাঁদি নাকি রে রতন। এই তো ক'টা দিন হলো বহাল হয়েছিস চাকরিতে—একটা মাসের মাইনেও হাতে পাস নি, এরই মধ্যে ওইসব করতে লাগলি?

: আমার চাকরির ওপর ভরসা রাখতে পারছো না, তাই না, মা?

কেমন আনমনা হয়ে গিয়েছিল সর্বাণী। ভয়-ভরসার কথাই নয়, ওর সেই রতন যে আবার একদিন সমর্থ জওয়ান হয়ে উঠবে, আর পাঁচটা মানুষের মত রোজগার করতে শিখবে, এতোখানি আশাই কোনদিন করতে পারে নি ও। ওর অন্তরে সেদিন যে কতো বড় আনন্দ সে ও কাউকে বোঝাতে পারবে না। ওর এই আশাতীত পাওয়ার পিছনে ওর যে কঠোর সাধনা, যে বিষাদ স্মৃতি তা যেন সেদিন ওকে নতুন করে উদ্বেলিত করে তুলেছিল। একটা দীর্ঘশ্বাস লুকোবার ব্যর্থ চেষ্টা করে রতনকে ও বলেছিল,

: ভরসা কেন করবো না, বাবা! কিন্তু সে কথা তো নয়, বলছিলুম, দু'-এক মাস একটু সামলে-সুমলে নিয়ে এসব করলে পারতিস। তাছাড়া, সবই তো তুই বুঝিস বাছা, সেই সব ভদ্র-পল্লীর ফ্ল্যাটবাড়িতে থেকে আমার এই কাজকর্ম কি শোভা পাবে? না, তোর মর্যাদা তাতে......

আহতস্বরে রতন ওকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল,

: চুপ করো তুমি, মা। মিথ্যে কোন মর্যাদার চেয়ে আমার মা আমার কাছে কতো বড় তা আমি জানি, মা। তুমি নিষেধ করলে, ও বাড়ি-নেওয়া বাতিল করে দেবো, কিন্তু কোন মর্যাদার প্রশ্নে কখনই নয়। আর দ্বিতীয় কথা, কাজ-কর্ম তোমায় এখনও করে যেতে হবে, এ কথা কেমন করে তুমি ভাবতে পারছ মা? জানি, প্রয়োজন তোমার কোন কিছুরই নেই, তবু আমাকেও তো দুটো অঞ্জলি দেওয়ার সুযোগ দেবে?

নতুন একটা অনুভূতি সর্বাণীর মুখের ভাষা রুদ্ধ করে দিয়েছিল। বহুদিনের সঞ্চিত ক্ষোভ, অভিমান, নির্ভরহীনতার মরুদাহ সব যেন সেদিন কোন এক গ্রহের আকর্ষণে ফেঁপে ফুলে উথলে-উথলে উঠেছিল ওর বুকের মধ্যে। ও চেয়ে রাখতে পারছিল না সারা জীবনের রুদ্ধ অশ্রু। মনের সাধ মিটিয়ে সেদিন ও ফুলে ফুলে কেঁদেছিল—বাঁধভাঙা চোখের জল দিয়ে ঝিল ধোয়ার মত করে ধুয়ে দিতে চেয়েছিল জীবনের যত জ্বালা।

এর আগে ছেলের সামনে চোখের জল ফেলতে কেমন সংকোচ হোত। কিন্তু সেদিন কেবলই মনে হচ্ছিল, ওর নারী-সত্তা যেন ছোট্ট একটি কন্যার মত ওই রতনের অভিভাবকত্বের কোলে মুখ গুঁজে প্রাণভরে একটু কেঁদে নিতে চায়। ডুবে যেতে চায় এক পরম নির্ভরতায়।

অন্তরের এই অচেনা আর্তিতে অবাকও হয়েছিল সেদিন সর্বাণী। তলতলে এক তাল কাদার মত সেদিনের সেই মানবকটিকে বুকের রক্ত দিয়ে ও যে তিল তিল করে মানুষ করে তুলেছে, সে কি তাহলে নিছক মমতা পরবশ হয়ে নয়? সেই আকুতি, সেই বিহ্বলতা, দুরু দুরু শশক-হৃদয়ে সেই ব্যাকুল কামনা, পক্ষপুটে ঢেকে ঢেকে ঝড়-ঝঞ্ঝা থেকে রক্ষা করবার সেই ছটফটানি—এ সবের পিছনে কি কুণ্ডলিনীর মত ঘুমিয়ে ছিল ভবি... আশা! পাখীরা ঐকান্তিক ... কঠোর পরিশ্রমে, একটি একটি ... কুড়িয়ে কুড়িয়ে গড়ে তোলে ... বাসা—বাসার প্রতি মমতাবশে ... নিজেরই একটা উষ্ণ আশ্রয়ের তাগিদে। রতনকে মানুষ করে তোলাও ওর কি ঠিক তেমনি! রক্তচক্ষু সংশয় প্রকাণ্ড একটা জিজ্ঞাসা-চিহ্নের মত ঝুলে ছিলো সেদিন ওর মনের পর্দায়।

তবু আর কোন কথাই বলতে পারে নি সেদিন রতনকে। জেদ ধরতে পারে নি যে ওর কাজকর্ম ওকে চালিয়ে যেতেই হবে নিজের জীবিকার জন্যে। আজ ভাবলে বিস্ময় লাগে ওর মত একরোখা মেয়ে সেদিন কেমন করে চুপ-করে মেনে নিল রতনের কথা। সেদিন যেন মনে হয়েছিল ও খু-ব ক্লান্ত। সারাটা দেহমনে একটা পাষাণচাপা জড়তা, একটা তুহিন অবসাদ, ঘুমজড়ানো নিশ্চেষ্টতা। আর মনে হয়েছিল রতন যেন মায়ের এই শ্রান্তি-ক্লান্তি অন্তর দিয়ে জানতে পেরেই ওকে একটু বিশ্রাম দিতে চেয়েছে। মায়ের জন্যে সে ভাল বাসা ভাড়া করেছে,—তা করুক। যা তার প্রাণ চায় করুক, সর্বাণী বাধা দেবে না।

তাছাড়া, আর ক'টা দিন বাদে ওকেই

তো দিতে হোত এমনিতর একটা পরামর্শ। ছেলেকে মানুষ করেছে, এবার সংসারী করতে হবে না? ওর মনেও তো স্বপ্ন আছে, আছে বুকভরা সাধ। মনের মত একটি লক্ষ্মী লক্ষ্মী পুত্রবধূ, ফুলের মত একটি ফুটফুটে নাতি-নাতনী চঞ্চল হয়ে খেলে বেড়াবে। এসব স্বপ্ন ও দেখে বৈকি। কর্তব্যের বোঝা মাথায় চলতে চলতে এ সব স্বপ্নও ওর মনের আঙিনায় ফুল ফুটিয়ে যায় চৈতী হাওয়ার মত।

হ্যাঁ, তখন আবার আসবে নতুনতর এক কর্ম-উদ্দীপনা, নতুন স্বাদে নতুন গন্ধে ভরা। ওর ঊষর জীবনের ঘাট-মাঠ-বাট সবুজ শোভায় ঝলমল করে উঠবে। আসলের চেয়ে সুদ মিষ্টি; রতনের চেয়ে রাতনেয়। স্বপ্ন তার মধুতর!

মাঝে এই ক'টা দিন ও এই অব-সাদটাকে একটু প্রশ্রয় দিতে চায়—একটু আবেস, একটু তন্দ্রার আমেজ, একটু আলস্যের নেশা।

মায়ের—এই তন্ময়তা দেখে রতন একটু আড়াল হয়ে গিয়েছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে দাওয়ার একপাশে একটা মোড়ার ওপর বসে গুনগুন করে সে মনের সাথে কথা বলছিল,

ঃ ক্লান্তি আমার ক্ষমা করো, প্রভু...

চোখ দু'টো আবার জলে ভরে ওঠে সর্বাণীর। টিনের বাক্সটার ওপর আলতো হাত রেখে বাইরের পানে চোখ ফেরায় সে আর একবার। ওই তো, সেই মেয়ে পায়রাটা কোথেকে উড়ে এসে বসল কার্নিশের ওপর। সাথীহারা, অবলম্বনহারা বিবাগী উদাস ভাব। সর্বাণীর মনে হয় ওই বিহঙ্গিনীটার সাথে ওর যেন কেমন একাত্মতা জন্মে গেছে। আগে মায়া হোত ওটার জন্যে; এখন মনে হয় ওটাকে বুকে জড়িয়ে নীরবে অন্তর্বেদনা দেওয়া-নেওয়া করে ওটার সাথে।

কিন্তু, সত্যিই কি সর্বাণীর অন্ত-র্বেদনার কিছু আছে?

দু-দন্ডের সুখস্বপ্নের মত তিনটে-বছর ও কাটালো প্রিন্স আনোয়ার শা রোডের এই সুদৃশ্য সুপরিসর ফ্ল্যাটে। বিলাসই বলা চলে ওর অতীত জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে। কিন্তু কোন আকাঙ্ক্ষা ছিলো না ওর এর জন্যে, আজও কোন মোহ নেই এর প্রতি। উল্টোডাঙার বস্তিঘরে থাকতে কোনদিন ওর মনে হয় নি যে, সেটা কোন অসন্তোষ বা অগৌরবের ছিলো ওর কাছে।

তবু আসতে হয়েছিল। চাকরি-সূত্রে অনেক গণ্যমান্য লোক আসত রতনের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করতে। বস্তিঘরে থাকা রতনের পক্ষে অশোভন। রতন উঠে এসেছে এ বাসায়, সর্বাণীকেও আসতে হয়েছে, কাজকর্মও ছাড়তে হয়েছে ওকে।

তারপর বছর দেড়েক যে কিভাবে কোথা দিয়ে কেটেছে টেরও পায় নি সর্বাণী। রতনের উচ্ছলতার স্রোতে ওর দিনগুলোও কেমন তরতর করে বয়ে যাচ্ছিল। একে একে ঝকঝকে-তকতকে দামী আসবাবপত্র এসে ঘর ভর্তি হয়েছে। তার চাপে এই টিনের স্যুটকেশটা যেমন চাপা পড়ে গিয়েছিল, তেমনিই চাপা পড়ে গিয়েছিল ওর অতীত জীবনের স্মৃতি রতনের নতুন জীবনের চোখধাঁধান চটকে। ওরা হারায় নি কেউ—হারায় না কোনদিন। না এই স্যুটকেশ, না সেই জীবনস্মৃতি।

স্যুটকেশটা ঝাড়তে বসে তাই- ওর জীবনস্মৃতির জীর্ণ পুঁথিখানা যেন খুলে গেছে। আর ও তারই এক-একটা অধ্যায়ের ওপর চোখ বুলিয়ে যাচ্ছে একটা বাস্তবধর্মী গল্প পড়ার মত করে।

এই স্যুটকেশ, একটা মাঝারি আকারের বালতি, ছোট্ট একটা জল-চৌকি, আর একখানা চট, সময়বিশেষে আবার একটা ছাতা, এই ছিল সর্বাণীর কারবারের তৈজসপত্র। ডালহৌসী পাড়ায় ঘন পাতায় ছাওয়া প্রকান্ড একটা বকুলগাছের তলায় এই সব তৈজসপত্র বিছিয়ে খিলিপানের ব্যবসায় করতো সর্বাণী। স্যুটকেশের মধ্যে থাকতো, দু'টো লোটায় করে চুন আর গোলা খয়ের; কৌটোয় করে হরেক রকম পানমসলা, জর্দা, দোক্তা, সুর্তি; শিশিতে করে মিঠে আতর; আর সামান্য কিছু বিড়ি-সিগারেট-দিয়াশলাই। বালতিতে থাকতো জলে ভেজানো পানপাতা। চটের ওপর বসে জলচৌকির ওপর পান সাজাতো সর্বাণী নানা খদ্দেরের রকমারী বায়নাক্কা মত—কারও সাদা, কারো মিঠে, কারো বা জর্দা, গুন্ডি।

প্রথম প্রথম সইতে হয়েছে লজ্জা-সংকোচ, মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত। সেই রাতভোরে উঠে সবরকম গৃহকর্ম, রান্নাবান্না সেরে, ছেলেকে মুখ-হাত ধুইয়ে জলখাবার খাইয়ে পাঠিয়ে দিত করপোরেশন পাঠশালে। কানে কানে মন্ত্র দিতো—স্কুলে কারও সাথে ঝগড়া-মারামারি করো না, মাস্টারমশায়দের কথা শুনো, ছুটি হলে সোজা বাড়ি এসে জল তোলা থাকবে, ভাত বাড়া থাকবে, নেয়ে-খেয়ে নিও, তারপর একটু জিরিয়ে নিয়ে লেখাপড়া করো, বিকেল হলে খেলতে বেরিও, বেশি দূর কোথাও যেও না. সন্ধ্যে না হতেই আমি চলে আসবো। ইত্যাদ। তারপর নিজে বেরু হত স্যুটকেশ, চট আর জলচৌকি মাথায় করে, হাতে বালতি ঝুলিয়ে। উল্টো-ডাঙা থেকে ডালহৌসী হেঁটেই পাড়ি দিত সর্বাণী। ঠিক ঠিক হাজিরে দিত বেলা দশটায়। বড়ো সাহেবের কাছে লেট এটেন্ডেন্সের কৈফিয়ৎ দিতে হয় না, কিন্তু গরজ বড় বালাই; বড়ো সাহেবের চেয়ে অনেক বড়।

ঠায় বসে থাকতে হত সেই সন্ধ্যে ছ'টা অবধি। চার্চের ঘড়িতে বিলম্বিত লয়ে ঢং-ঢং ঘন্টা বাজতো, অমনি ঝাঁপ গুটিয়ে উঠে পড়ত সর্বাণী—প্রাণটা ছট-ফট করত কতক্ষণে বাড়ি পৌঁছে ছেলের মুখ দেখবে। সারাটা দিন কাজের ফাঁকেও মন পড়ে থাকতো ছেলের চারধারে। মা কাছে থাকলে যে ছেলে দুরন্তের একশেষ, মায়ের অনুপ-স্থিতিতে সেই যেন কেমন অন্য প্রকৃতির হয়ে যেত। অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতো মায়ের অনুজ্ঞা। যে বেটি সতীনে পড়ে/তারে বিধি ভিন্ন গড়ে। সর্বাণীর মনে হত, যার কেউ নেই, তার আছে অনাথ-নাথ। ঈশ্বরই তার রতনের সুমতি যোগায়, তাকে পরিচালিত করে। তবু মায়ের প্রাণে উদ্বেগের অন্ত নেই—কেবলই মনে হয়, হয়ত বাড়ি গিয়ে দেখবে রতন কোন বিপদ বাধিয়ে বসে আছে, হয়ত গাড়ির তলায়......উঃ, ওর নয়নের মণি, সর্বহারা জীবনে আশা-আকাঙ্ক্ষার ক্ষীণ প্রদীপ......হয়ত নিভে গেছে...

ওর মানসিক সংগ্রামের এই ছিল একটা দিক। আর একটা দিক, সে ওই ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে। প্রথম দিকে অপরিচিত পুরুষমানুষের সাথে চোখাচোখি তাকিয়ে কথা বলতে ও সংকোচে এতটুকু হয়ে যেত। অথচ লোকগুলোও সব এমনি, কথা ওকে দিয়ে বলাবেই,—

ঃ কই গো মেয়ে, একটা পান দাও দেখি।

কেন রে বাবা, সঙ্গে সঙ্গে বলে দিলেই হয়, কী পান! তা নয়, 'পান দাও'। জিজ্ঞেস না করে উপায় নেই। চোখ নামিয়েই ও জিজ্ঞেস করে,

ঃ জর্দা, না, মিঠে, বাবু?

ঃ আরে তোমার হাতের সব পানই মিঠে গো মেয়ে। আর জর্দার ঘোর সে তো বিলক্ষণই আছে! তা দাও, সাদা পানই একটা দাও।

আধো ঘোমটা আরও একটু টেনে দিয়ে ও লাল হয়ে ওঠে। বলে কি বেহায়া লোকটা! বিনা বাক্যব্যয়ে ও পান সেজে দেয়—সাদা পান। মানে, শুধুই চুন, খয়ের, সুপারী আর এলাচ-দানা।

ক্রমে দ্বিধা-সংকোচ কাটাতে হয়েছে—নাচতে নেমে ঘোমটা টানার অর্থ নেই। একটু একটু করে সলাজ চোখের ভারী পাতাজোড়া তুলে ও লোকের সাথে কথা বলতে শিখেছে। কিন্তু যা দেখেছে তাতে ও থ হয়ে গেছে। পনের আনা লোকের চোখে সে কি লোলুপ দৃষ্টি। গা ঘিন ঘিন করে। তবু কিন্তু গায়ে মাখলে চলে না। ওকে বাঁচতে হবে, বাঁচাতে হবে ওর রতনকে, তাকে মানুষ করতে হবে। ওর পণ ওকে পূরণ করতেই হবে।

তাই সেসব দৃষ্টি শুধু সহ্য করা নয়, একটু-আধটু হালকা ইন্ধনও যোগাতে হয় সর্বাণীকে। ও লক্ষ্য করেছে কেমন করে কাছে-ভিতের দোকানগুলো থেকে খদ্দের ভেঙে এসে একে একে জুটেছে ওর কাছে—টাই বাঁধা দিশি সাহেব থেকে শুরু করে টিকি বাঁধা আরদালি পর্যন্ত, অনেক। আর তেমনটা যে হতে পেরেছে, সে ওর পানের কোন চমৎকারিত্বের জন্যে নয়; অন্যতর চমকের জন্যে। ও বিলক্ষণ বোঝে, সে চমক ওর পঁচিশ হেমন্তের শিশিরপুষ্ট যৌবনের; তাজা চন্দ্রোসী গমের মত দেহকান্তির; টানা টানা উজ্জ্বল চোখ, টিকোলো নাক, পাতলা চাপা ঠোঁট, এক-রাশ কালো রেশম চুল, ইঞ্চি চওড়া কস্তা পেড়ে ধপধপে সাদা শাড়ি—এসবের। এসব চটক খদ্দের টানে—ময়রার দোকানে মাছি-মৌমাছি-বোলতার মত। খিলি-প্যানের ওপর মিঠে আতর বোলানর সঙ্গে ব্যবসায়ীদের মার্জার-বিনয়ের মত যদি আবার চাপা ঠোঁটের মুচকি হাসি একটু বুলিয়ে দিতে পারে, তাহলে তো আর কথাই নেই, সে খদ্দের যৌবনের মত কেনা হয়ে যায়!

এসব করতে হয়েছে সর্বাণীকে দিনের পর দিন। তারপর দিনান্তে ঠাটবাট গুটিয়ে যখন বাসার দিকে পা বাড়িয়েছে তখন মনে আর কোন গ্লানি লেগে থাকে নি। সারাদিন জলে পাঁকে চরে বেড়ান হাঁসের মত ডানা ঝাড়া দিয়ে উঠে এসেছে, কোথাও জলের ছিটে-ফোঁটা নেই, নেই কোথাও এতটুকু পাঁকের দাগ।

সার্থক হয়েছে সর্বাণীর এসব করা। ব্যবসায় ফলাও হয়েছে। অঢেল বিক্রি—দিয়ে সারতে পারে না। অন্য দোকানের খদ্দের ছুটে এসেছে, যারা কোনকালে পান খেতো না তারা পান খাওয়া ধরেছে দু'-এক খিলি করে, যারা দিনে দু'-খিলি খেতো তারা পাঁচ খিলিতে উঠেছে। লাভের অঙ্ক ওর নিদাঘ দুপুরের তাপমান যন্ত্রের পারার মত চরচর করে ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে। ওদিকে ওর স্নেহের দুলাল রতন কর্পোরেশন পাঠশালা ছেড়ে হাইস্কুল, সেখান থেকে কলেজ, সেখান থেকে শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে পাড়ি জমিয়েছে কুশলী নাবিকের মত। তার সব আর্থিক দায় মিটিয়েছে সর্বাণী ওর এই তুচ্ছ ব্যবসায় থেকে।

আর রতন? সেও ওর তপস্যা-করা ছেলে। মায়ের অন্তরের কামনাটিকে, তার সাধনার গৌরবটিকে ঠিক ঠিক হৃদয়ঙ্গম করে নিজের যত্নকে তীব্র হতে তীব্রতর করেছে। বিনিময়ে ভগবতী তাকে বিমুখ করে নি। ক্রমাগত পুরস্কৃত করেছে তার নিষ্ঠার যোগ্য মূল্য দিয়ে।

রতনের ছেদবিহীন সফলতায় সর্বাণীর বুকখানা গর্বে ফুলে উঠেছে। ওর মায়ের প্রাণ ডানা মেলে উড়ে বেড়িয়েছে স্বপ্নময় নীল আকাশের তলে; একবারও মনে জাগে নি সেই নোঙরা পঙ্কিল জলার পাড় যেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সারাদিন ধরে ওকে শিকারের আশায় উদ্গ্রীব থাকতে হয়। ওর কাছে তখন এই ডানা মেলে চলা সত্য, আলো সত্য, সত্য ওই নীলাকাশ; শিকার মিথ্যে, প্রতীক্ষা মিথ্যে, মিথ্যে যত দুনিয়ার পাঁক!

এই সব মিথ্যের গ্লানি ও ভুলে যায়, যখন চোখের সামনে ওর ঈপ্সিত স্বপন-কুমারকে ধাপে ধাপে, পলে পলে মূর্ত হয়ে উঠতে দেখে; যখন মনে হয় এ ওরই রচনা—একান্ত ওর। অতীতের ক্ষোভ ওর মুছে যায়, ঝরে যায় বর্ত-মানের যা কিছু কৃচ্ছ্রসাধনের ক্লেদ, যা কিছু অবমাননার গ্লানি। ওই সব পল্লবগ্রাহী স্থূল রসের রসিক খদ্দের-রূপী জনতা, যারা সাধনা পন্ড করার জন্যে ভূত-প্রেতের মত এসে উৎপাত করতে চায়, তারা কোথায় উবে যায়, কোথাও চিহ্ন থাকে না তাদের মনের তপোভূমিতে।

সর্বাণীর মন থেকে শুধু যে তারাই সরে যায় তাই নয়, সরে যায় আরও দু'-একজন, যারা উৎপাত করতে চায় নি কোনদিন, কোনদিন উত্ত্যক্ত করে নি সর্বাণীর চিন্তাকে। তারা বরং এমন এক জগতের দিকে হাতছানি দিয়েছে যেখানে রতনের বাপ ওকে কখনো নিয়ে যেতে পারে নি, নিয়ে যেত চায় নি। যদি সব ফেলে সর্বাণী সেই হাতছানিতে সাড়া দিতে পারতো, ওর জীবন ভরে উঠতো কানায় কানায় আর এক রং-এ, আর এক মাধুর্যে।

শ্যামলবাবু। ডালহৌসী পাড়ায় কাপড়ের বোধহয় করতো একটা কিছু, তার ঠিকানা জানে না সর্বাণী, দরকারই বা কি জানার, দু'-একটা সিগারেটের খদ্দের বৈ তো নয়। অগোছাল বেশ-বাস, এলোমেলো চুল, শিশুর মত সরল অথচ উজ্জ্বল মুখভাব, গভীর কালো চোখ। প্রায় নিত্য এসে লোকটা দু'-এক ঘণ্টা করে আলাপ জমাতো। কতো রং-এর, কতো ছাঁদের সে আলাপ, কি মিষ্টি তার সুর। চোখের চাউনি তারও সহজ ছিলো না, তবু সর্বাণী জানে তা আলাদা জাতের—ছুঁচোবাজির শয়তানির আগুন নেই তাতে; তাতে আছে অতল গভীরতা, ডুব দেওয়ার লোভ হয়, সেই সঙ্গে ভয় হয়, একবার ডুবলে বুঝি আর ওঠা যাবে না।

সহজ সপ্রতিভ সুরে কথা বলতো লোকটা, হাসতো দিগ্‌বিদিক কাঁপিয়ে। ওকে সে ডাকত তাম্বুলকন্যে বলে। প্রথম প্রথম রাগ হোত সর্বাণীর। একদিন ও বলেছিল—

: আপনার কি কাজকর্ম নেই অফিসে? রোজ রোজ এতক্ষণ করে এখানে আড্ডা দেন, বিবেকে বাধে না?

: কোন মানুষই নিরবচ্ছিন্ন কাজ করে না। অন্যেরা একটু করে কাজ করে, একটু করে জিরোয় নানা অছিলায়, আমি একটানা কাজ সেরে একটানা জিরোই, বাইরে ঘুরি। বন্ধ ঘর অসহ্য।

: কিন্তু অন্য কোথাও তো যেতে দেখি না?

: হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, ও, এই কথা? দ্যাখো, এর জবাবে আমি কম করে একশোটা পদ আউড়ে যেতে পারি বৈষ্ণবপদাবলী থেকে। কিন্তু আমার কথা মাত্র দুটি—ভালো লাগে, তাই এখানেই আসি। তুমি না চাইলেও আসবো, দূরে দাঁড়িয়ে থাকবো, তোমায় বিরক্ত করবো না।

মড়মড়িয়ে উঠেছিল সর্বাণীর বুক-খানা। তবু মুখে ও কিছুই বলতে পারে নি। আরও একদিন কথায় কথায় শ্যামলবাবুর সংসারের কথা উঠতে সে বলেছিল—

: মনের মত মানুষই পেলাম না, ঘর বাঁধবে কে?

: সেকি? দুনিয়ায় এতো লোক থাকতে আপনি মনের মত মানুষ খুঁজে পেলেন না?

: খুঁজি নি তো কোনদিন। এমনি যাদের আশপাশে এসে গেছি তাদের মধ্যে তেমনটা পাই নি—মানে, এতোদিন পাই নি। তবে এবার পেয়েছি একজনের দিশারা, কিন্তু তার মন জানি নে।

লুব্ধ মনটাকে কড়কে দিয়েছিল সর্বাণী। আর এগোতে দেয় নি এই সর্বনেশে আলোচনা। না, ওর তপস্যা

কঠোর জীবনে কোন প্রলোভনের প্রশ্রয় নেই।

আরও একজন মানুষ মৃগাঙ্কবাবু—উল্টোডাঙা ব্র্যাঞ্চ পোস্ট অফিসের কর্মচারী। সেভিংস একাউন্ট খুলতে গিয়ে লোকটার সাথে আলাপ। লোকটাই যত্ন করে করে দিয়েছিল একাউন্ট খোলার যাবতীয় ইতিকর্তব্য। তারপর মাঝে মাঝেই যাতায়াত করতে হয় পোস্ট অফিসে, দেখা হয় লোকটার সাথে। রঙ্গ রসিকতা এ লোকটাও করত সর্বাণীর সাথে। ভালো লাগত না ওর, তবু লোকটার সহায়তা ওকে কিছুটা যেন কৃতজ্ঞতার বাঁধনে বেঁধেছিল। শেষে একদিন তার রসিকতা স্খলতা শ্লীলতার গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল.

ঃ খিলি পানের ব্যবসা তো চুটিয়ে চালাচ্ছে দেখি, তা দিনের কর্মক্ষেত্র না হয় ডালহৌসী, রাতেরটা কি বাসাতেই!

ঃ ছিঃ......

—ক্ষোভে অপমানে চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছিল সর্বাণীর, রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলেছিল.

ঃ আমার ধারণা ছিলো নোংরা সন্দেহ, কুৎসিত অনুমান—এসব ইতর লোকদেরই একচেটে। নাকি. দরিদ্র অসহায় মেয়েদের বেওয়ারিস কৌতুকের জীব ভেবে খোঁচা মেরে মেরে অশ্লীল উল্লাসে বড় মজা পান আপনারা?

মুখে-চুন-পড়া জোঁকের মত কুঁকড়ে গিয়েছিল লোকটার উৎসাহ। কয়েক পল পরেই কিন্তু আবার সামলে নিয়ে যে সুরে কথা বলেছিল সর্বাণীর কাঙাল মন তাকেই ভয় করে সবচেয়ে বেশি,

ঃ দ্যাখো, ক্ষমা-টমা চাওয়ার অভ্যেস তো আমার নেই, তবে নিজের ভুল স্বীকার করতে আমি লজ্জা পাইনে। আসলে বক্তব্যে পৌঁছতে গৌরচন্দ্রিকেটা আমার নিতান্তই ছ্যাবলামি রকমের হয়ে গেছে। যদি ভরসা দাও, এবার সোজাসুজি বলে ফেলি আমার আসল বক্তব্যটা।

কোন জবাব দেয় নি সর্বাণী। লোকটা হয়ত দৃষ্টিতে নিষেধের কিছু খুঁজে পায় নি, তাই ভরসা করে বলে চলেছিল,

ঃ সেই প্রথমদিন থেকেই তোমায় কেমন ভাল লেগে গেছে। অবশ্য ভালবাসা টাসা আমি আবার ঠিক বুঝি নে। তবে একটা বেয়াড়া উপসর্গ জুটেছে, একা থাকলেই, তোমার ভাবনা মন জুড়ে থাকে। ভাবতে আমার কষ্ট হয়, তোমার মত মেয়ে কেমন করে নামতে পারল এমন একটা উঞ্ছবৃত্তিতে। পান বেচা, মাছবেচা, আলুবেচা মেয়েমানুষদের সম্পর্কে ধারণা তো এদেশে মোটেই উঁচু নয় কারো। মনের মধ্যে তাই অহরহ একটা স্বপ্ন ছিলো। তারপর সব স্বপ্ন ঘুচিয়ে মরিয়া হয়ে উঠেছিলুম, ভেবেছিলুম, তোমায় ডাক দেবো শ্লাঘ্যতর এক জীবনে। আচ্ছা, পারো না কি তুমি অতীত মুছে দিয়ে বর্তমানকে আর একভাবে চালাতে......

ঃ না, না, না, আমার অতীত মোছা যায় না...

—নিজের ইতিহাস, নিজের ব্রত সবই উজাড় করে বলেছিল সর্বাণী লোকটাকে। জানিয়েছিল, ওর স্বপ্ন, ওর সাধনা ও কোন প্রলোভনেই ত্যাগ করতে পারবে না। একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে লোকটা বলেছিল—

ঃ বেশ, মানুষ করো তোমার ছেলেকে, তোমার সাধনায় বিঘ্ন ঘটাবো এতোটা স্বার্থপর আমি নই, তবে তোমার রতন মানুষ হওয়া অবধি যদি প্রতীক্ষা করি?

খিল খিল করে হেসে উঠেছিল সর্বাণী।

ঃ বুড়ো বয়সে চুড়ো বাঁধার সখ আবার থাকে নাকি মানুষের!

ঃ বয়সটা এখনই কি কম হল আমার? এতোদিন ওদিকটা খেয়াল ছিলো না, এই সামান্য চাকরি করি, আর যক্ষের মত উল্টোডাঙায় বাপের ভিটে-কোঠা আর কিছু ব্যাঙ্ক ব্যালান্স আগলাই। কোন উৎসবও নেই, উপদ্রবও নেই। জীবনটা বয়ে চলেছে—নদীর মত নয়, করপোরেশনের পাইপ ওয়াটারের মত—নিশ্চিন্ত, নির্ঝঞ্ঝাট। হঠাৎ তোমার উদয় হতে...যাকগে, নেশা জাগলে বয়েসে কিবা আসে যায়?

ঃ নেশা ততদিনে ছুটে যাবে।

ঃ যদি আসো কোনদিন, দেখবে। আজ আর বৃথা বড়াই করতে চাই নে। হ্যাঁ, একটা অনুরোধ,—এই ঠিকানাটা রাখো, কবে কোনদিন হুট করে অন্য অফিসে ঠেলে দেবে, তখন আর দেখা হবে না। কখনো কিছু দরকার পড়লে নিঃসংকোচে এই ঠিকানায় তলব ক'রো—সংসারে আপন বলতে তো তোমারও কেউ নেই, আমারও কেউ নেই।

পরে সত্যিই একদিন বদলি হয়ে গেছিল লোকটা। বার দুই দরকারও তাকে পড়েছিল সর্বাণীর—একবার টাকা তুলতে ঝামেলায় পড়ে; আর একবার রতনকে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ভর্তি করতে। ভর্তির ফরমে অভিভাবকের নাম-ধাম-পেশা লেখাতে ফাঁপরে পড়েছিল সর্বাণী—মিথ্যে লিখতে রুচি হয় নি, সত্য লিখতে ভরসা কোথায়—'পানবেচা' মেয়েমানুষ সম্পর্কে কারই বা শ্রদ্ধা আছে! ও ছুটে গিয়েছিল মৃগাঙ্কবাবুর পরামর্শ চাইতে। অবলীলাক্রমে রতনের খুড়োমশায় সেজে মৃগাঙ্কবাবু ফরমের মধ্যে পূরণ করে দিয়েছিল নিজের নাম-ধাম-আয়ের উৎস।

ওই ওরা বয়ে এনেছিল আর এক জীবনের সন্দেশ।

কিন্তু ঠাঁই নেই, ওদের ঠাঁই নেই সর্বাণীর জীবনে। তার সবখানি জুড়ে বসে আছে রতন। কিংবা রতনও বোধহয় নয়: তাকে ঘিরে ওর স্বপ্ন, তাকে মানুষের মত মানুষ করে তোলার একটা পণ। একটা নেশা, একটা জেদ, একটা ধনুকভাঙা পণ ওকে অনন্যমনা করে তাড়িয়ে নিয়ে চলছিল সংযম, ত্যাগ আর কঠোর শ্রমসাধনের বন্ধুর পথে। রতন যদি এমনিভাবে ধাপে ধাপে ওর কল্পিত পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যেতে না পারত, তাহলে তাকে এমন করে আঁকড়ে ধরত না ও মনপ্রাণ দিয়ে। রতনের চেয়ে তাকে নিয়ে ওর যে কঠিন পণ, সেটা ওর প্রিয়তর।

তাই তো এক-একটা সাফল্যলাভ করে তার অভিজ্ঞানপত্রখানা নিয়ে এসে ওর পায়ের কাছে রেখে রতন যখন বলতো,—'এই নাও মা, আমার মাতৃপুজোর আর একটি ফুল,' তখন গর্বে আনন্দে বুকখানা ওর দশহাত হয়ে উঠত। ওর চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করতো সেই মানুষটার উদ্দেশ্যে,—'খুব তো বিদ্রূপ করে অট্টহাসি হেসেছিলে, এখন দেখে যাও তোমার রতনকে কেমন মানুষ করছি, আর কীভাবেই বা তা করছি।'

সর্বাণীর ওই একটাই দুঃখ তখন ছিলো—মানুষটা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে চলে গেছে; ও তাকে হিড়হিড় করে টেনে এনে দেখাতে পারছে না ওর সাধনার সাফল্য। শোনাতে পারছে না, ওর কণ্ঠের সেদিনের সেই আশাবরী ঝংকার আজও কেমন অনাহত।

আশাবরী। তাছাড়া আর তো কোন রাগিণী নেই সর্বাণীর জীবনে। সে মানুষটাও প্রকারান্তরে সেই কথাই জানিয়ে গেছিল। সে জানতো তার জন্যে বেহাগের তান ধরতে ওর না মিলবে অবসর, না থাকবে কোন তাগিদ। বেঁচে থাকতে দুটো দিনও শান্তিতে সংসার করে নি মানুষটা, করতে দেয় নি সর্বাণীকে। কারখানায় মিস্তিরীগিরি করতো সে—লোকে বলতো যন্ত্রবিদ্যায় তার মাথা ছিলো নাকি স্বয়ং বিশ্বকর্মার মত। পয়সাও তাই কামাতো দুহাতে। কিন্তু ফুটো কলসীতে ঢালা জলের মত সে সব বেরিয়ে যেত শুঁড়ির দোকানে আর জুয়োর

আড্ডায়। সংসারের বেলায় বস্তিতে বাস, আর কায়ক্লেশে দিন গুজরান।

সর্বাণীর ক্ষোভ ছিলো, কিন্তু স্বেচ্ছার প্রতিবাদ ছিলো না। চরিত্র-শুদ্ধির গুরুগিরি করতে তো ও আসে নি। যে যার মর্জিমত, রুচিমত চলুক। নিতান্ত অসহ্য হলে নিজের নিজের পথ দেখাই ভালো।

কিন্তু মন উপবাসী থাকলেও যে লোকটার তোয়াক্কা থাকে না, তার জৈব ক্ষুধার ইন্ধন যোগাতে হয় নিঃশব্দে। তারই অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে রতন আসে কোল জুড়ে—আসে মায়া-মমতার শতেক গ্রন্থির বাঁধন নিয়ে।

অসহায় শিশুটার জন্যে ভাবতে হয় সর্বাণীকে। দাবি জানাতে হয় মানুষটার কাছে—আজ বেবীফুড চাই, কাল ডাক্তার-ওষুধ, পরশু জামা-কাপড়-খেলনা। মেজাজ ভালো থাকলো তো ভাল নইলে খেঁকিয়ে উঠত লোকটা—'কারখানার মজুরের ব্যাটার আবার অতো লবাবী কিসের? হবে না ওসব।' ওই এক ছেলের জন্যে মারধোরও খেতে হয়েছে সর্বাণীকে সেই গোঁয়ার লোকটার কাছে।

শেষে কঠিন এক আন্ত্রিক ব্যাধি নিয়ে নিজেই শয্যা নিলো লোকটা। ঘরে এমন দুটো পয়সার সংস্থান নেই যা দিয়ে সংসার চালানো যায়, রোগীর ওষুধপত্র কোন ছার। সোনাদানা যা এক-আধটু ছিলো, তাই বেচে দিয়ে সংসার চালিয়েও ডাক্তার-ওষুধ কিছু কিছু করেছিল সর্বাণী। তাতেও মানুষটার সে কি হাড়জ্বালানো হাসি,—'হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, তুই কি পতিসেবা করে সতীত্ব ফলাচ্ছিস, সব্বো? তার চেয়ে বাঁচিয়ে খরচ কর। টেঁসে তো যাবই দুদিন বাদ, তখন খাবি কি তোরা?'

তারপর সত্যি সত্যিই যেদিন চোখ বুজবে মানুষটা, সেদিন বলে কি—

ঃ দ্যাখ সব্বো, আমি তো শালা সটকে পড়ছি, তুই কিন্তু মাইরি আমার জন্যে ওই লোকদ্যাখানি হাঁকপাড়াপাড়ি করবি নি। হ্যাঁ, বরং গালমন্দ দুটো করতে পারিস, তোদের ভাত-কাপড়ের সেগে রেখে তো কিছু যেতে পারলুম না।

ঃ থেকেই বড্ডো সে ভাবনা তুমি ভেবেছো!

ঃ আরে দুঃ! বয়েই গেছে আমার ওসব সাত-সতের ভাবতে। ভাবনা-টাবনা শালা এক বদখদ জিনিষ, জীবনে ফুর্তির বারোটা বাজিয়ে দেয়।

ঃ তবে এখন আবার ও কুমীরি কান্না কেন?

ঃ না, আর কুমীরি কান্না কাঁদবো না....এক এক সময় কেমন মিইয়ে পড়ি, তখন কি মনে হয় জানিস? বাপটা তোর কেমনধারা মানুষ ছিলো র‍্যা, মেয়েটাকে জলে না ফেলে দিয়ে আমার মত একটা হাড়-হাভাতের হাতে তুলে দিলে? তা সে যাগ্‌গে, দেখিস দুধ-ধান্দা করে যদি ওই শুয়োরের বাচ্চাটাকে একটু ডাঁটো করতে পারিস তখন ওই তোকে ভাত-কাপড় দেবে।

ঃ বললুম তো, ঘাটে বসে তোমার ওসব না ভাবলেও চলবে। শুয়োরের বাচ্চার মা রইল—সেই তাকে মানুষ করবে; মানুষের মতই মানুষ করবে, দেখে নিও, সে তার বাপের মত হবে না।

ঃ হাঃ হাঃ হাঃ, সে দেমাক তুই করতে পারিস সব্বো, তোর রূপ আছে—ঢলঢল যৌবন আছে...

ঃ থাম তুমি, যেতে বসেও মুখের লাগাম নেই তোমার। লজ্জা করে না নিজের বউ সম্বন্ধে...

ঃ আরে রাখ, রাখ, আমার মত জানোয়ারের আবার বউ, তার আবার ইজ্জৎ......

ঃ তোমার বউ-এর চেয়ে রতনের মায়ের পরিচয় বড়, তার ইজ্জৎ আছেই। রতনের মা রতনকে সার্থকনামা করে তুলবে—ভদ্র, শোভন পথে থেকেই তা করবে, করবে, করবে...

ঃ হাঃ হাঃ হাঃ-হাঃ হাঃ, ও—হো হো হো, কি বললি, র‍্যাঁ, ভদ্দোর, শো—শো—ভ—ন্ ন্...হাঃ হাঃ—

উঃ সে কি বিকট হাসি। সেই উৎকট অট্টহাসি হাসতে হাসতে জোর একটা হিক্কা উঠেছিল। তার দমক আর সামলাতে পারে নি লোকটা—চোখ বুজেছিল চিরকালের মত। অনেক মরণ সর্বাণী দেখেছে, কিন্তু এমনটা দেখে নি কখনো। জীবনটাকে উপহাস করতে করতে লোকটা যেন রঙ্গমঞ্চ থেকে উইংসের পাশ দিয়ে সুট করে বেরিয়ে গেল। সার্কাস দলের একটা কিম্ভুত ক্লাউন। তার মরা মুখখানাতে পর্যন্ত না আছে যন্ত্রণার চিহ্ন, না হিসেব চুকানোর প্রশান্তি; শুধু শঙ্করমাছের চাবুকের মত তীব্র একটা বিদ্রূপ আর বিজাতীয় শ্লেষ সেখানে ছাপ মেরে বসে আছে। সারা দুনিয়াটাকে সেই মরণ-শীতল পাথুরে মুখখানা যেন ভেঙচি কাটছে।

কিন্তু প্রতিব্যঙ্গ নয়, কোন আক্রোশ নয়, সর্বাণী একবার শুধু যদি লোকটাকে ডেকে দেখাতে পারতো ওর নিষ্ঠার ফলশ্রুতি, ওর সৎ-শ্রমের পুরস্কার, তাহলে......কী তাহলে? আজও কি ও বুক ফুলিয়ে বলতে পারে,—'যা পেয়েছি তার তুলনা নেই'?

বুকের ভিতরটা খুঁজে দেখতে গিয়ে চোখের জলে বুক ভেসে যায় সর্বাণীর।

কি বিচিত্র! মেয়েপায়রাটা এক পায়ে ভর দিয়ে অমন নিঝুম মেরে দাঁড়িয়ে আছে কেন? ঠোঁট দুটোকে বুকের মাখনপেলব পালকের মধ্যে ডুবিয়ে দিয়েছে, চোখ দুটো হয়ত বন্ধই করে রেখেছে—এত দূর থেকে বোঝা যায় না। কি করছে ওটা ওভাবে? ওরই মত খুঁজে দেখছে কি নিজের বুকের ভিতরটা?

আজ যদি ও রতনের বাপের আত্মাকে শুনিয়ে শুনিয়ে না বলতে পারে,—'যা সেধেছি, যা পেয়েছি তা সকলই আমার আনন্দ', তাহলে সে গ্লানি ওর সমগ্র সাধনাকে লজ্জা দেবে। লোকটার আত্মা আবারো অট্টহাসি হেসে বলবে,—'কী দিতে পারল তোকে তোর ওই ভদ্দোর পথ, তোর শোভনতা?'

কিন্তু আজ ও সে কথা বলতে পারছে না-ই বা কেন। আত্মসুখের জন্যে তো ও রতনগোপালের সেবা করে নি। যা কিছু করেছে, সব ওর সেই ছেলেবেলার পুতুলখেলার মত, নিজের ইচ্ছাকে নিয়ে সাজানো-গোছানো, খাওয়ানো-শোয়ানো। নিজেকে ও মিলিয়ে দিয়েছিল, বিলিয়ে দিয়েছিল সেই খেলার সাথে—ফিরে তো কিছু ও চায় নি।

তবে কেন আজও টিকিয়ে রাখতে পারবে না ওর সেদিনের আনন্দ—ঠিক যেমন আনন্দে বুক ভরেছিল দু' বছর আগে পর্যন্ত। যখন রতন পড়াশোনা সাঙ্গ করেছে যশের মুকুট নিয়ে, বনেদি কোম্পানীতে চাকরি পেয়েছে শাঁসালো, তার দর বেড়েছে বিয়ের বাজারে, কদর বেড়েছে আলোক পাওয়া অভিজাত সমাজে।

যখন সদ্যফোটা ফুলের মত তার চারধারে মেয়ে প্রজাপতির ঝাঁক এসে আসর জমাতো নানান অছিলায়।

তাদের কাউকে খারাপ লাগত না সর্বাণীর। সহজ আকর্ষণকে সহজ স্বীকৃতি দেওয়াই তো সুস্থতার লক্ষণ। ওরা সবাই শিক্ষিত, মার্জিত, সুরুচি-সম্পন্না—সমাজে অসুস্থতা আনতে পারে এমন কোন অসংযম ওদের থেকে আশংকা করে না সর্বাণী।

অরুন্ধতী নামে মেয়েটি। যেমন মিষ্টি গড়ন, সুরেলা কথাবার্তা। বড়ো ভাল লাগত সর্বাণীর। শিক্ষা আছে, রুচি আছে, আছে নম্র ঋজুতা, নিরহঙ্কার মর্যাদাবোধ। রতনের মনও বোধহয় সে

আক্রমণের লক্ষ্য আপনার দাঁত

(বিনাকা ফ্লুয়োরাইড দ্বারা প্রতিরোধ করুন)

আপনার দাঁত সদাসর্বদা এসিড-দ্বারা আক্রান্ত হচ্ছে। শেষকালে দাঁতের গর্ত যখন আপনাকে ভোগায়, তখনই বুঝতে পারেন যে এনামেল বিদীর্ণ হয়ে আপনার দন্তকোষ জীবাণুর কবলে পড়েছে।

সাম্প্রতিক গবেষণায় এটাই প্রমাণিত হয়েছে যে বিনাকা ফ্লুয়োরাইড-এর অত্যন্ত কার্যকরী ফ্লুয়োরাইড উপাদান, সোডিয়াম্‌-মনো—ফ্লুরোফস্‌ফেট (এস্‌-এম-এফ্‌-পি) দাঁতের এনামেলের সাথে মিশে গিয়ে তাকে সুদৃঢ় করে তোলে এবং ত্রি-বিধ প্রতিরোধে দন্তক্ষয় বন্ধ করে।

C I B A
Cosmetics

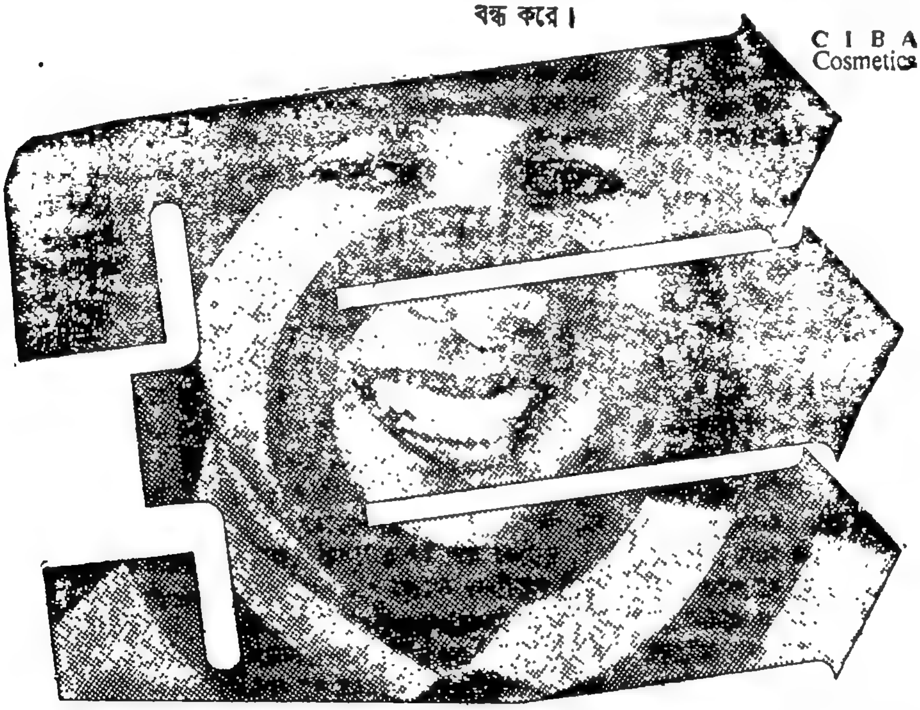

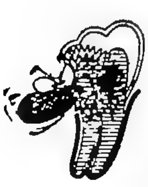

দাঁতের ক্ষয় সুরু হয় খাদ্যকণা থেকে উৎপাদিত এসিড থেকে। এই এসিড দাঁতের এনামেল নষ্ট করে দন্তকোষ বিদীর্ণ করে। সজীব প্রাণু বীজাণু দ্বারা আক্রান্ত হবে গর্ত সৃষ্টি করে।

বিনাকা ফ্লুয়োরাইড-এর উপরোক্ত উপাদান এস্‌-এম-এফ-পি দাঁতের এনামেলের সহিত একত্র হয়ে, এসিড-জনিত ক্ষয় প্রতিরোধ করে।

একই উপাদান, এস্‌-এম-এফ-পি মুখের মধ্যে এসিড উৎপাদনও রোধ করে যা এনামেলের প্রতিরক্ষায় সাহায্য করে।

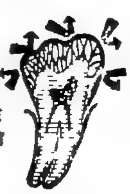

প্রাথমিক ক্ষয়ে বিনাকা ফ্লুয়োরাইড-এর একই উপাদান, এস্‌-এম-এফ-পি এনামেলের ক্ষতি নিরাময় করে।

(যন্ত্রণাদায়ক গর্ত ও দাঁতের ক্ষয়ে ত্রি-বিধ প্রতিরোধের জন্য

CIBA/CF-23 BEN

জয় করেছিল। তাই তো রতন তাকে শাসিয়েছিল,—'আমার মাকে যদি গ্রহণ করতে পারো অকৃত্রিম আর অকৃপণ ভক্তি-শ্রদ্ধা দিয়ে, তবেই এসো আমরা এগোই। নতুবা, এখানেই থামা ভালো।'

রতনের ওপর রাগ হয়েছিল সর্বাণীর—যে মেয়ে মুহূর্তে সকলকে আপন করতে জানে; তার ওপর ওই সব মৌখিক সর্তের অত্যাচার কেন? অরু নিজেই দীপ্তিমতী, বাইরে থেকে মশাল ধরে তাকে পথ দেখাতে চাওয়া অন্যায়। সর্বাণী সর্বান্তঃকরণে চেয়েছিল অরুকে ঘরে আনতে।

এমনি করে সর্বাণীর বঞ্চনাবিক্ষুব্ধ জীবন যখন একটি সর্বাঙ্গসুন্দর পরিণতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, যখন ওর মাতৃহৃদয় অসীম কৃতজ্ঞতায় সনির্বন্ধ একটি প্রণাম হয়ে লুটিয়ে পড়তে চাচ্ছিল জীবনদেবতার পাদমূলে, তখন কোথা দিয়ে যেন কি হয়ে গেল।

শিশুর হাতের হাওয়া-ভর্তি বেলুনের মত ফেটে গিয়ে সব চুপসে যেন এতোটুকুন হয়ে গেল।

ওর স্বপ্ন টুটে গেল।

আর, সাধনা?

কি বলবে?...ব্যর্থ হয়ে গেল?......

নু না ঃ, তা কেন।

হঠাৎ রতন একদিন এসে বললে—

ঃ জানো, মা-মণি, একটা ট্রেনিং-এর জন্যে কোম্পানী আমায় বন নগরীতে পাঠাতে চায়। মূল প্রতিষ্ঠান তো ওদের সেখানেই, কাজেই সেখানকার অফিসে বদলী করে ট্রেনিং-এর সুযোগটা ওরা দিতে চায়। সব খরচপত্র ওদেরই, পরন্তু ওভার সীজ ভাতা দেবে বাড়তি। আর, জানো মা-মণি, কৃতিত্ব যদি একটু দেখাতে পারি ট্রেনিং-এ, তাহলে আর পায় কে, চারগুণ মাইনে, অনেক উঁচু পদ, বাংলো, গাড়ি...

ভেতরটা কেমন হু-হু করে উঠেছিল সর্বাণীর। মনে মনে ও বলেছিল,—'কি দরকার আরও অনেক মাইনের, বাবা? তোর ওই বিজয়রথের চাকাগুলোকে এবার একটু থামা তো, গোপাল! এ যে শুধুই ছোটার নেশা; দম ফুরিয়ে আসে! যা আশা করি নি আমি তাই পেয়েছি দু'হাত ভরে। আর কেন? আর তো আমি পারি নে, বাবা, তোর ওই ছোটা-আর-ছোটার সাথে তাল রাখতে!'—মা-সর্বাণী এ কথাগুলোই বলতে চেয়েছিল আকুল স্বরে। কিন্তু সাধিকা-সর্বাণী মা-সর্বাণীকে দাবিয়ে দিয়ে বলেছিল—

ঃ বেশ তো বাবা, তোর যাতে ভাল হবে বুঝবি, তাই করবি। আমাকে আর জিজ্ঞেস করার কি আছে বাছা?

ঃ না, মা, তুমি হাসিমুখে অনুমতি না দিলে, আমি স্বর্গেও যেতে চাই নে।

সর্বাণীর ঠোঁট দু'টো হেসেছিল। কনটিনেন্টের মদির স্বপ্ন দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে না রাখলে রতন দেখতে পেতো সে হাসি কান্নারই নামান্তর। সর্বাণী জানতে চেয়েছিল—

ঃ যাচ্ছিস তো, কিন্তু কবে ফিরবি? অরু-র্যার কথা মনে আছে তো?

ঃ বছরখানেক বৈ নয় মা। তারও বিশেষ অমত দেখি নি।

রতন পাড়ি দিয়েছিল পশ্চিম জার্মানী।

প্রতীক্ষার দিন গুণছিল সর্বাণী। কোম্পানী থেকে টাকা, বন শহর থেকে চিঠি আর দক্ষিণ কলকাতা থেকে অরুন্ধতী আসতো নিয়মিত।

ক্রমে রতনের চিঠি আসা কমতে লাগল। আগে মাসে দু'খানা আসতো—দীর্ঘ তিন-চার পাতার চিঠি—জননীর জন্যে, জন্মভূমির জন্যে উচ্ছ্বাসে ভরা। ক্রমশ দুই চিঠির মাঝখানে সময়ের ব্যবধান বাড়তে লাগল, চিঠির কলেবর কমতে লাগল, বক্তব্যে সে দেশের কথা মরুভূমির করাল প্রসারের মত এদেশের কথাকে গ্রাস করতে করতে কয়েক ছত্রে কোণঠাসা করে ফেলল।

অনেক কষ্ট জীবনে সয়েছে সর্বাণী। কিন্তু রতনের এ ঔদাসীন্য অসহ্য! অভিমান করে নিজে চিঠি দিতে দেরি করে দেখেছে রতনের কোন অনুযোগ নেই।

অরুন্ধতীর মুখ দেখে মনে হয়, নিষ্ঠুর ছেলের অনীহা তাকেও রেহাই দেয় নি। সে একদিন বলেই ফেলল—

ঃ অনেক দিন তার চিঠি পাই নি মা, আপনাকে কিছু জানিয়েছে?

রতনের হয়ে মিথ্যে ছলনা করতে চেষ্টা করেছিল সর্বাণী—

ঃ নু না...হ্যাঁ,...মানে, শরীরটা তেমন ভাল যাচ্ছে না লিখেছে। কাজের চাপও বেড়েছে...মানে অবসর বড় কম...

চোখের জল কোনরকমে লুকিয়ে বাড়ি পালিয়েছিল অরুন্ধতী। ছলনার ব্যর্থ চেষ্টায় সর্বাণীকে বিব্রত করতে আর আসে নি সে।

সর্বাণী একখানা চিঠিতে লিখেছিল—

ঃ বছর তো ঘুরে গেল, রতন, এবার ফিরে আয়, বাবা।

তার অনেকদিন পর চিঠি একখানা এল রতনের। তাতে সে-দেশের কথা অনেক ছিল, ছিল সেখানকার মানুষের মুখর প্রশংসা, আর ছিল সেখানকার কোন এক তরুণীর রূপ-গুণের প্রগল্ভ প্রশস্তি। যা ছিল না, সে শুধু সর্বাণীর ব্যাকুল প্রার্থনার কোন সঠিক জবাব। তবে, তবে কি রতন আর ফিরে আসতে চায় না? না, না, তা কি হয়।

তারও পর সুদীর্ঘ পাঁচ-ছয় মাস কেটে গেছে, রতনের কোন চিঠি সর্বাণী পায় নি। শেষে এই দিন কয় হল এসেছে তার চিঠি—

ঃ এখানকার অফিসেই এক দায়িত্বপূর্ণ পদে কোম্পানী বহাল করেছে। শীঘ্র দেশে ফেরা হয়ে উঠছে না। এ-দেশের মানুষগুলি প্রাণপ্রাচুর্যে উচ্ছল—আনন্দ দিতে জানে, আনন্দ উপভোগ করতে জানে। এদের ছেড়ে যেতে মন চায় না। আর এক বাধা—যে তরুণীটির কথা তোমায় আগে লিখেছিলুম, সে আর তোমার পর নেই। তার ইচ্ছে আমি এখানেই স্থায়ী হয়ে যাই।

তবু একবার দেশ ঘুরে আসার চেষ্টায় আছি, যত তাড়াতাড়ি পারি যাওয়ার ইচ্ছে আছে। ইতি—

পুনঃ তুমি যেন আবার সেই বস্তিঘরে ফিরে যেও না। নোংরা পরিবেশে মন নোংরা হয়ে যায়। এখান থেকেই নিয়মিত টাকা পাঠাবো। কোন চিন্তা করো না। ইতি

চোখ দু'টো ভাল করে মুছে নিয়ে ব্যালকনীতে গিয়ে দাঁড়াল সর্বাণী। মেয়েপায়রাটা এখনও তেমনি নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওর গলা দিয়ে অস্ফুট আর্তনাদ বেরিয়ে এল—

ঃ বল কপোতি, বল, সেদিন যখন তোর পাঁজরাছেঁড়া শাবকজোড়া উড়তে শিখেই উধাও হয়েছিল তোর চোখের মণি দু'টো উপড়ে নিয়ে—পাড়ি জমিয়েছিল অচিন দেশে—হারিয়ে গিয়েছিল নীল আকাশের নিঃসীমতায়—সেদিন তোর সামনেও কি নেমে এসেছিল এক অসীম অতল আঁধার সায়র? নেমে এসেছিল ঊষর মরুর হাহাকার? গুমরে উঠেছিল কি এমনিতর অশ্রু-ফল্গুর বোবা উতরোল?

নিচে রাস্তায় কয়েকটি কলেজ-ফেরতা কিশোর আলোচনা করছিল,—এ্যাপোলো—চাঁদের পৃষ্ঠা ছুঁই-ছুঁই করেছে।

সর্বাণীর মনে হল, ও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে—দলে দলে মানুষ গ্রহান্তরে পাড়ি দিচ্ছে, আর আসছে না ফিরে। মৌন ধরিত্রী এক হাতে চোখ মুছছে, আর হাতে গুছিয়ে যাচ্ছে মানুষের গ্রহান্তর যাত্রার সব আয়োজন।

আইন ও শৃঙ্খলা: পুলিশের ভূমিকা

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

কয়েকটি অভিমত

সাগর বিশ্বাস

শ্রীপ্রমোদ দাশগুপ্ত—সম্পাদক, কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)

—সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলার অবনতি হয়েছে, এমন কি একটি নৈরাজ্যময় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে বলে কোনো কোনো মহল মনে করছেন। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

—আমরা জানি যখনই শ্রমিক-কৃষক-মেহনতী মানুষ তাদের বাঁচার দাবিতে আন্দোলন করে, তখনই সেই বিশেষ মহলের চোখে আইন-শৃঙ্খলা থাকে না। অথচ দিনের পর দিন যখন কল-কারখানায় তাঁরা ছাঁটাই-লে-অফ-লক আউট চালিয়ে যান, তখন আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে না। মেহনতী মানুষের ওপর শোষণ চালিয়ে যাবার অসুবিধা দেখা দিলেই নৈরাজ্যময় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। অথচ মজা হলো তেলেঙ্গানা কিংবা মহারাষ্ট্রের শিবসেনার তান্ডবে নৈরাজ্যময় পরিস্থিতির উদ্ভব হয় না।

—১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে পুলিশকে নিষ্ক্রিয় রাখার অভিযোগ করা হতো। এবারেও কি পুলিশ নিষ্ক্রিয় বলে আপনার মনে হয়?

—না। 'ভেস্টেড ইন্টারেস্ট'-এর পক্ষে পুলিশকে সক্রিয় রাখা হয় নি বলেই বিশেষ মহল থেকে এমন অভিযোগ করা হয়ে থাকে।

—তাহলে পুলিশ কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের স্বার্থে সক্রিয় বলে আপনি মনে করেন কি?

—যে আমলাতন্ত্রের সৃষ্টি বৃটিশ ঔপনিবেশিক সরকার এদেশে করেছিলো, স্বাধীনতার পরে ২২ বছর ধরে কংগ্রেস সেই আমলাতন্ত্রেরই ঐতিহ্য বহন করেছে। যুক্তফ্রন্টের ৩২ দফা কর্মসূচীতে এই আমলাতন্ত্রের সমাধি রচনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। কাজেই চিরাচরিত নিয়মের কিছু ব্যতিক্রম ঘটবে এটাই স্বাভাবিক। এই ব্যতিক্রমই 'ভেস্টেড ইন্টারেস্ট'-এর দুর্ভাবনার কারণ। তবে পুলিশ দপ্তর সি পি এম-এর হাতে—এজন্য যদি পুলিশ সি পি এম-এর স্বার্থসিদ্ধি করে বলে বলা হয়, তাহলে প্রশ্ন ওঠে যে অন্যান্য দপ্তর যে সকল দলের হাতে—তারা কি সেই সকল দলের স্বার্থেই কাজ করছে?

—ভারতের মতো একটি রাষ্ট্রে যেখানে কিছুটা যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো বর্তমান এবং যেখানে চরম সামরিক ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে, সেখানে প্রতিটি রাজ্যে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ ('সি আর পি') মোতায়েন রাখা কি খুবই প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন?

—মিলিটারী তো প্রতিরক্ষার জন্য। আভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পুলিশের। রিজার্ভ পুলিশ রাখবার ব্যাপারে আমাদের সুস্পষ্ট অভিমত হলো রিজার্ভ পুলিশ থাকতে পারে। কিন্তু তাকে 'আন্ডার স্টেট কন্ট্রোল' থাকতে হবে।

—আভ্যন্তরীণ আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারেও তো সামরিক বাহিনীর কখনো কখনো প্রয়োজন হয়?

—সেটা যখন রাজ্য সরকার ডাকবে।

—আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতিতে রাজ্য সরকার ডাকলেই যখন সামরিক শক্তি পেতে পারেন, তখন রিজার্ভ পুলিশ মোতায়েন রাখাটা কি অনিবার্য?

—সেটা কেন্দ্র জানে।

—১৯৬৭ সালে পুলিশ যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলো। ময়দানে পুলিশের হাতে নিগৃহীত হয়ে জনৈক মন্ত্রী বলেছিলেন আবার ক্ষমতায় এসে তাঁরা এর মোকাবিলা করবেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বয়ং বলছেন পুলিশ যুক্তফ্রন্ট সরকারকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করছে। এগুলি 'ফ্যাক্টস'। অথচ এটাও 'ফ্যাক্ট' যে, দুষ্কৃতকারী পুলিশ বা পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে সরকার কোনো 'বোল্ড স্টেপ' নিতে পারেন নি। এদিক থেকে সরকারকে কি 'প্রিজনার অফ ইনডিসিশান' বলা যায়?

—এ প্রশ্ন আমাকে কেন, সরকারকেই করুন না। একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসার বেশির ভাগই 'সেন্ট্রাল ক্যাডার'-এর, রাজ্য সরকারের এক্তিয়ার বহির্ভূত। তাছাড়া আমরা যখন গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশ ব্যবহারের বিরুদ্ধাচরণ করছি, তখনই আদালত থেকে সেখানে পুলিশকে ব্যবহার করার নির্দেশ দেওয়া হয়। তাঁদের ইচ্ছে পুলিশ কায়েমী স্বার্থের সেবাতেই নিয়োজিত থাকুক। কাজেই এ প্রশ্ন আমাকে না করে আদালতকে করা উচিত।

—কিন্তু আপনার বোধ হয় স্মরণ থাকতে পারে ১৯৬৪ সালে কমিউনিস্টদের বন্দী করবার সময় গুলজারীলাল নন্দের শ্বেতপত্র রচনায় 'মেটেরিয়ালস সাপ্লাই' করেছিলেন জনৈক ঊর্ধ্বতন পুলিশ অফিসার, যে সম্পর্কে 'গণশক্তি'তে একটি প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়েছিলো। অথচ সেই কুখ্যাত পুলিশ অফিসারকে নাকি সম্প্রতি বাইরে থেকে এনে কলকাতায় যথোপযুক্ত আসনে বসানো হয়েছে। এগুলিও কি রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারের বাইরে?

—স্বরাষ্ট্র দপ্তরকে জিজ্ঞেস করুন।

—পুলিশ ইউনিয়ন বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে সরকার-বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে পারে বলে আপনার মনে হয় কি?

—এসব প্রশ্ন আমাকে করবার উদ্দেশ্য কি? পুলিশ ইউনিয়নকেই জিজ্ঞেস করবেন। তবে এটা ঠিক পুলিশ ইউনিয়ন আজ, যা বলছে, বিগত ২২ বছরে তা কোনদিনই বলে নি। আজ তারা ৫৩ দফা দাবি জানাচ্ছে, কিন্তু বাইশ বছরে একটি দাবিও তাদের ছিলো না। আর এটাও ঠিক যুক্তফ্রন্ট সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করতে তারা চেষ্টার ত্রুটি করবে না। সুবোধ দত্তের ব্যাপারে তাদের চরিত্র তো অনেকটা স্পষ্ট হয়েছে। একটা কথা বলতে পারি—এই অর্গানাইজেশনটাও একটা 'পিকিউলিয়ার' অর্গানাইজেশন। একই সঙ্গে গেজেটেড এবং নন-গেজেটেড স্টাফ একমাত্র এই ইউনিয়নেই আছে।

—পুলিশের ক্রিয়াকলাপ এবং সরকারের বলিষ্ঠ সিদ্ধান্তের অভাব যুক্তফ্রন্টের ভাবমূর্তিকে কিছুটা ম্লান করে দিচ্ছে বলে আপনার মনে হয় কি?

—এসব প্রশ্নের উত্তরও কি আমাকে দিতে হবে? আমি তো বুঝি না 'হোয়াই অল দিজ কোয়েশ্চানস টু মি'। আর এই 'ইন্টারভিউ'-এর তাৎপর্যই বা কি? 'ইনডিসিশন'-এর প্রশ্নই ওঠে না—কারণ সেখানে নানারকম 'কোড' পরিবর্তনের প্রয়োজন আছে।

* * *

শ্রীমতী অনিলা দেবী—সাধারণ সম্পাদিকা, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি।

—আপনার কি মনে হয় সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি হয়েছে?

—কোনো কোনো মহল থেকে এরকম বলা হচ্ছে বটে। কিন্তু তা উদ্দেশ্য-প্রণোদিত। অবশ্য স্থানে স্থানে সমাজ-বিরোধী শক্তি গণ্ডগোল করছে এ সম্পর্কে সন্দেহ নেই। আর সেই সুযোগে প্রতি-ক্রিয়াশীল শক্তি সরকারকে হেয় প্রতিপন্ন করবার জন্য এই প্রকার প্রচার চালাচ্ছে।

—সরকার কি পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে বলে আপনি মনে করেন?

—না। অবশ্য পেটানোটা যদি পুলিশের সক্রিয়তার পরিচায়ক হয়, তাহলে আলাদা কথা।

—পুলিশকে কোনো বিশেষ একটি রাজনৈতিক দলের স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন কি?

—আমি বিশ্বাস করি না।

—আমাদের দেশে পুলিশ ও জনগণের সম্পর্ক স্বাভাবিক নয়—এর কারণ কি?

—পুলিশকে আমাদের দেশের শাসকেরা কেবল নিপীড়নের যন্ত্র হিসাবেই ব্যবহার করেছে—তাই।

—গণতন্ত্রে পুলিশের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত?

—জনসাধারণের সঙ্গে তাদের পূর্ণ সহযোগিতা এবং সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক থাকা উচিত।

—বৃটিশ আমলে এদেশে পুলিশের যে চরিত্র ছিল স্বাধীনতার পরে তার কোনো মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে বলে আপনার মনে হয় কি?

—সাধারণভাবে পুলিশের মধ্যে কোনো মৌলিক পরিবর্তন হয় নি। তবে এই বিভাগেও সামান্য কিছু লোক যে তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা বোঝেন এতে আমার সন্দেহ নেই।

—পুলিশ ইউনিয়ন বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে সরকার-বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে পারে নাকি?

—পুলিশ তার ন্যায্য দাবি অবশ্যই জানাবে। সেও তো নাগরিক।

—১৯৬৭ সালে পুলিশ যুক্তফ্রন্ট সর-কারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলো—এবারেও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, পুলিশের একাংশ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এই পরিপ্রেক্ষিতে দুর্নীতিপরায়ণ পুলিশ ও পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে সরকার 'প্রিজনার অফ ইনডিসিশন' বলে আপনি মনে করেন কি?

—যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার পর এমন একটি অবস্থার মধ্য দিয়ে সরকারকে চলতে হচ্ছে যে, সকল সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। পুলিশের ওপরতলা দুর্নীতি-পরায়ণ—সরকার নিশ্চয়ই তা জানেন। কিন্তু 'ড্রাস্টিক' কোনো 'চেঞ্জ' করবার আগে নিশ্চয়ই চারিদিক থেকে ভেবে দেখতে হবে। কাজেই সরকার 'ইনডিসি-শন'-এর কবলে পড়ে আছেন বলে মনে করা যায় না।

* * *

শ্রীনীহার মুখার্জী—সম্পাদক, এস ইউ সি।

—বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি হয়েছে বলে কোনো কোনো মহল মনে করছেন। এমন কি রাজ্যে একটি নৈরাজ্যময় পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে বলে বলা হচ্ছে। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

—আমার মনে হয় এর মধ্যে একটা আপেক্ষিকতা আছে। তবে আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার সামান্য ব্যতিক্রম হলে সমাজের কিছুসংখ্যক মানুষের এমন মনে হতে পারে। এরা অবশ্য 'ভেরি ইনোসেন্টলী' এটা ভেবে থাকে। কিন্তু 'ভেস্টেড ক্লাস' বা পুঁজিবাদী প্রতিক্রিয়া-শীল গোষ্ঠী অতি সামান্যতম ব্যতিক্রম দেখে যে সোরগোল তোলে, সেটা 'মোটিভেটেড'—একটা বিরাট উদ্দেশ্য তার পেছনে কাজ করে। যদিও যুক্তফ্রন্টের কোনো কোনো শরিকদল, বিশেষ করে সি পি এম কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে রকম আচরণ করছে তা সমালোচনার যোগ্য, তথাপি নৈরাজ্যময় পরিস্থিতি বলতে যা বোঝায় পশ্চিমবঙ্গে তেমন অবস্থার সৃষ্টি হয় নি।

—এ দেশে পুলিশ ও জনসাধারণের সম্পর্ক স্বাভাবিক নয়। এর 'কজ্যাল ফ্যাক্টর'গুলি কি কি বলে আপনি মনে করেন?

—অল্পকথায় বলতে গেলে বর্তমান সমাজের যে অর্থনৈতিক ভিত—যাকে আমরা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা বলি তার রাষ্ট্রকাঠামো রক্ষকের ভূমিকায় আমাদের দেশের পুলিশ বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শাসনের আমল থেকে যে পদ্ধতি এবং মানসিকতা নিয়ে চালিত হয়েছে—স্বাধীন-তার পরে দীর্ঘ ২২ বছরে কংগ্রেসী শাসনেও সেই একই পদ্ধতি এবং মান-সিকতা নিয়ে পুঁজিবাদ ও কায়েমী স্বার্থের তল্পী বহন করেছে এবং সাধারণ মানুষের বাঁচার দাবিকে অগ্রাহ্য করে তাদের ওপর কেবল নিপীড়নই করেছে। এই কারণেই জনসাধারণের সঙ্গে পুলিশের স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে নি।

—১৯৬৭ সালে যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়ে-ছিলো বলে অভিযোগ করা হতো। এবারেও কি পুলিশ নিষ্ক্রিয় রয়েছে আপনার মনে হয়?

—আমার মতে ১৯৬৭ সালে পুলিশ নিষ্ক্রিয় ছিল না—এবারেও তারা নিষ্ক্রিয় নয়। পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছে বলে কায়েমী স্বার্থ এবং পুঁজিবাদী মহল থেকে যে সোরগোল তোলা হয়েছিলো, তার মূল কারণ হলো এতকালের প্রথামত সেদিন পুলিশকে কায়েমী স্বার্থ রক্ষায় এগিয়ে যেতে দেওয়া হয় নি। এখনো জন-গণের ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক আন্দোলনে পুলিশের হস্তক্ষেপ বন্ধ করাই যুক্তফ্রন্টের নীতি, যে নীতির উদ্গাতা এবং প্রবক্তা আমাদের দল। বিগত যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে বাংলাদেশে এই নীতি গ্রহণের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন শ্রমিক-কৃষক-মধ্য-বিত্তের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দ্বার উন্মুক্ত হয়েছে তেমনি আবার এর সুদূর-প্রসারী তাৎপর্য যুক্তফ্রন্টের কিছু বাম-পন্থী শরিকদল পর্যন্ত সুষ্ঠুভাবে অনু-ধাবন না করতে পারায়, সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে তাকে ব্যবহার কিংবা বাড়াবাড়ি করে কায়েমী স্বার্থের হাতে এই নীতির বিরুদ্ধে অপপ্রচারের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে। যুক্তফ্রন্টের শরিকদলগুলি এর তাৎপর্য অনুধাবন করতে না পারলে মালিক বা কায়েমী স্বার্থের কর্ণধারেরা তাদের শ্রেণীস্বার্থের তাগিদে এই নীতির সুদূর তাৎপর্য বুঝে শুরুতেই একে পর্যুদস্ত করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টায় তৎপর হয়ে ওঠে এবং 'পুলিশ নিষ্ক্রিয়' কিংবা 'ঘেরাও-ঘেরাও' করে সোরগোল তোলে। বর্তমান সমাজ-কাঠামোর মধ্যে পুলিশের যে ভূমিকা তা থেকে যুক্তফ্রন্ট কোন সময়েই তাকে নিষ্ক্রিয় করে রাখে নি।

—পুলিশকে কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে বলে আপনি মনে করেন কি?

—হচ্ছে, তবে এর কিছু 'ফ্যাক্টর' আছে। একটি ক্ষমতাসীন দলের স্বার্থে পুলিশ নীতিগত দিক থেকে তার 'স্ট্যাটিউটরি ডিউটি' বর্জন করতে পারে না। তবু 'ট্রাডিশন' হলো তাদের প্রভুর সেবা করা। ইংরেজ আমলে ইংরেজের সেবা করেছে—স্বাধীনতার পরে করেছে কংগ্রেসী প্রভুদের। সেই একই মানসিকতায় তারা যুক্তফ্রন্টের বৃহত্তম দলের আনুগত্য বহন করছে। স্বভাবতই সেই ক্ষমতাসীন দলকে সেবা করেই তারা 'ট্রাডিশন' বজায় রাখবে এতে আর আশ্চর্য কি? কিন্তু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী নির্দেশ দিন আর না দিন পুলিশের এই মানসিকতার কথা সকলেরই জানা আছে। পুলিশ যাতে দলীয় স্বার্থে ব্যবহৃত না হয়, তার জন্য যুক্তফ্রন্টের নীতি যেভাবে 'প্রোজেক্ট' করার দরকার ছিলো তা হয় নি। এই সুযোগ নিয়ে পুলিশেরও একটা

অংশের সদস্য ব্যক্তিরা একটা বিশেষ দলকে 'সার্ভ' করার মাধ্যমেই তাদের 'স্বে'-টা 'প্রোজেক্ট' করছে। এ ছাড়াও বিভিন্ন ক্ষেত্রে পুলিশকে ব্যবহার করে একটি বিশেষ দল তাদের দলীয় প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়াবার চেষ্টা করছে।

—পুলিশ ইউনিয়ন বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ভবিষ্যতে সরকার-বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে পারে নাকি?

—পুলিশের অ্যাসোসিয়েশন গঠন করবার অধিকারকে ন্যায়সঙ্গত গণতান্ত্রিক অধিকার বলে আমরা মনে করি। কোনো সরকার যদি তাদের ন্যায়সঙ্গত অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে চায়, স্বভাবতই তারা আন্দোলনের অধিকারী।

—ভেড়ী অথবা জমি দখলকারী জনতার ওপর পুলিশের হস্তক্ষেপ কি সরকারী নীতির বিরোধিতার পরিচায়ক বলে আপনার মনে হয়?

—সরকারী নীতি হলো গণতান্ত্রিক চাষী আন্দোলনের মাধ্যমে বেনামী জমি উদ্ধার করা। সেখানে পুলিশের হস্তক্ষেপ বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু এর বাইরে লুঠ বা অনুরূপ কিছু হলে হস্তক্ষেপ অবাঞ্ছনীয় নয়।

* * *

শ্রীমনোজ বসু, সাহিত্যিক।

—একটি গণতান্ত্রিক দেশে পুলিশের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত?

—পুলিশ-হবে জনগণের সেবক। জনসাধারণের সঙ্গে থাকবে একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ—বন্ধুত্ব ও প্রীতির সম্পর্ক। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে পুলিশ সর্বতোভাবে চেষ্টা করবে। 'আমিই কর্তা' এই জাতীয় উন্নাসিক মনোভাব থাকবে না।

—কোন উপনিবেশে পুলিশকে কি সে দেশের জনস্বার্থে ব্যবহার করা হয়।

—না। সেখানে শোষকশ্রেণীর স্বার্থেই পুলিশকে অধিকতর ব্যবহার করা হয়।

—একটি ঔপনিবেশিক দেশের চরিত্র-বিশিষ্ট পুলিশ একটি স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশেব মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারে কি?

—খুবই শক্ত। পুলিশ যদি চরিত্র বদল করে নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, তাহলেই এটা সম্ভব হতে পারে। অন্যথায় ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এটা এক প্রকার অসম্ভব। বহুকালের অভ্যাস ও মনোবৃত্তি পরিত্যাগ করা সহজ নয়।

—বৃটিশ-ভারতে পুলিশের কাজ এবং চরিত্র যেমন ছিল—স্বাধীনতার পরে তার কোনো মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে বলে আপনার মনে হয় কি?

—সামান্য কিছু নিশ্চয়ই হয়েছে। তবে খুব লক্ষণীয়ভাবে এখনো কোনো পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না।

—স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে পুলিশ কি তার ভূমিকা যথাযথ পালন করেছে? যদি না করে থাকে, তবে কেন করে নি বা করতে পারে নি বলে আপনার মনে হয়?

—করে নি। কারণ কংগ্রেস বাস্তবিকপক্ষে বৃটিশের শাসন কাঠামোর মধ্যে পদস্থাপনা করেই কর্তৃত্ব করতে আসেন। ক্ষমতার মদমত্ততায় কংগ্রেসের নীতিভ্রষ্ট হতে দেরি হলো না। তাছাড়া গোড়া থেকেই দেশ খণ্ডনের ব্যবস্থা করে ভুল করে এসেছেন। আমাদের দারিদ্র্য এবং সার্বিক নীতিভ্রষ্টতা, অনাচার, কুশাসন প্রভৃতির জন্য এই দেশ খণ্ডন অনেকটা দায়ী। এমনিভাবে স্বাধীনতার বাইশ বছরে আমরা সর্বনাশের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছি। একটি সমস্যারও বোধ হয় সমাধান হয় নি—বরং দিন কে দিন তা বেড়েই চলেছে। কর্তৃপক্ষের মধ্যে যখন এমনিই অনাচার তখন তাদেরই হুকুম-বরদার পুলিশের কাছে আর কি প্রত্যাশা করা যেতে পারে? আজকে দিকে দিকে জনজাগরণের নানা পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। প্রত্যাশা করব, পুলিশও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করে নবমর্যাদায় মহিমান্বিত হয়ে উঠবে।

—পুলিশ ইউনিয়ন বিভিন্ন দাবি-দাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সরকার-বিরোধী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করতে পারে নাকি?

—অসম্ভব নয়। কিন্তু সরকার সহানুভূতিশীল হলে এ অবস্থা ঘটবে না। পুলিশের মধ্যে ইদানীং বহু শিক্ষিত এবং দেশ ও জাতির প্রতি প্রীতিসম্পন্ন ব্যক্তি গেছেন। তাঁরা নিশ্চয়ই অবস্থা সম্যক অনুধাবন করবেন এবং অকারণ বিরোধের সৃষ্টি করে দেশ পরিগঠনের বাধা হবেন না।

—বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি হয়েছে বলে কোনো কোনো মহল মনে করছেন। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

—আমার ধারণা—তেমন কিছু নয়। যা সব ঘটছে, এরূপ ব্যাপারের সঙ্গে দীর্ঘকাল ধরেই আমরা অভ্যস্ত। সাম্প্রতিককালে এমন কিছু অভাবনীয় অঘটন ঘটে নি। সম্প্রতি আমি দিল্লী এবং কাশ্মীর ঘুরে এসেছি এবং সেখানকার বহু শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান লোকের সঙ্গে মেলামেশা করেছি, দেখেছি নানা আজগুবি রটনার প্রভাবে তাঁদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের আইন-শৃঙ্খলার অবনতি সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে উঠেছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি তার প্রতিবাদ জানিয়েছি। কিন্তু একক ক্ষমতায় তাঁদের সে ধারণা কতটুকু নিরাকরণ করা সম্ভব?

* * *

একজন প্রাক্তন ডি-এস-পি।

একদিন দেখা করলাম একজন প্রাক্তন ডি, এস, পি-র সঙ্গে। দীর্ঘকাল পুলিশ বিভাগে চাকরি করে কলকাতার উপকণ্ঠে অবসর জীবনযাপন করছেন। পুলিশ এবং পুলিশের চাকরি সম্পর্কে একজন সুস্থ চিন্তাশীল ব্যক্তি হিসেবে তাঁকে জানতাম। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কে তাঁর ধারণার কথা জানতে চাইলে তিনি বললেন,

—ইদানীং আইন-শৃঙ্খলার অবনতি সম্পর্কে কিছু রাজনৈতিক দল এবং কিছু কিছু সংবাদপত্র অতিমাত্রায় সোরগোল তুলছে। কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু হাঙ্গামা হচ্ছে। সে-সব হাঙ্গামার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোই দায়ী। যুক্তফ্রন্টের শরিকী সংঘর্ষ অনেক ক্ষেত্রে এ ধরণের প্রচারের সুযোগ করে দিচ্ছে। পুলিশের পক্ষে সবক্ষেত্রে শান্তি-রক্ষা করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায় ওই শরিকী সংঘর্ষের কারণেই। কোনো একটি সংঘর্ষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি পুলিশ সর্বদা উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে না। কারণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা কোনো রাজনৈতিক দলের অনুগত হলে—সেই দলের পক্ষ থেকে স্বাভাবিকভাবেই পুলিশকে 'ইনফ্লুয়েন্স' করবার চেষ্টা হয়। এর ফলে পুলিশ অনেক ক্ষেত্রে তার কর্তব্য পালন করতে পারে না। তখনই বিপরীত পক্ষ থেকে পুলিশ নিষ্ক্রিয় বলে অভিযোগ ওঠে। অভিযোগ ওঠে সেই সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের প্রতি পুলিশের পক্ষপাতিত্বের। কিন্তু প্রশাসনিক ক্ষেত্রে পুলিশ একপ্রকারের যন্ত্রবিশেষ। রাজনৈতিক দলগুলি পুলিশের এই বাস্তব অসুবিধার কথা অনুধাবন না করলে পুলিশকে খুব স্বাভাবিক কারণেই 'ন যযৌ ন তস্থৌ' অবস্থায় নিন্দাভাজন হতে হবে। তবুও পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলার ক্ষেত্রে এখনো কোনো ঐতিহাসিক অবনতি ঘটে নি। 'নৈরাজ্য' বললে অনেক বাড়িয়ে বলা হয়।

—কিন্তু স্বাধীন ভারতে পুলিশ কি তার কর্তব্য যথাযথ পালন করেছে বলে আপনার মনে হয়?

—না। করতে পারে নি। স্বাধীনতার পরে পুলিশ বিভাগের রুলস এবং শিক্ষণ-ব্যবস্থাকে যতটা র‍্যাশনালাইজ করবার দরকার ছিল, তা করা হয় নি। পুলিশকে দেশের কোটি কোটি মানুষের নিকট থেকে আলাদা করে রাখা হয়েছিলো। ফলে জনসাধারণের সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক বন্ধুত্ব-সংলগ্ন হতে পারে নি। বরং দিন দিন পুলিশ সাধারণ মানুষের কাছ থেকে আরও দূরে সরে গেছে।

—কিভাবে পুলিশ ও জনগণের সম্পর্ক

স্বাভাবিক হতে পারে বলে আপনি মনে করেন?

—অল্প কথায় বোধহয় এর উত্তর দেওয়া যায় না। তবু এ ব্যাপারে সরকারের দায়িত্বই বেশি। পুলিশ কোডের পরিবর্তন এবং সুষ্ঠু প্রগতিশীল প্রশিক্ষণ-ব্যবস্থার মাধ্যমে পুলিশকে জনসাধারণের সেবক হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। অনেক ক্ষেত্রেই বিভাগের নিম্নতম কর্মচারীদের 'ইম্প্রিটারেসি' গন্ডগোলের মৌলিক কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই পুলিশ বিভাগের নিচুতলা থেকে 'ইম্প্রিটারেসি'-কে সমূলে ধ্বংস করা প্রয়োজন। এর ফলে তার সূক্ষ্ম মানবিক অনুভূতি এবং 'সেন্স অব ডিউটি'-র উৎকর্ষতা লাভ হবে। আর একটা জিনিস অবিলম্বে বন্ধ হওয়া উচিত বলে মনে করি। সেটা হলো একটি রাজ্যের পুলিশ অন্য রাজ্যে পাঠানো এবং একটি রাজ্যে অন্য রাজ্যের অধিবাসীকে পুলিশ বিভাগে নিয়োগ। একথা আজ অস্বীকার করে লাভ নেই যে, সারা ভারত জুড়ে উগ্র প্রাদেশিকতার হাওয়া মানুষের মনকে বিষাক্ত করে তুলেছে। এই অশুভ পরিবেশ থেকে যতদিন দেশ মুক্ত না হয় ততদিন একটি রাজ্যের পুলিশ অন্য রাজ্যে দুই-ভাবে জনসাধারণের ক্ষতি করতে পারে। একদিকে ভয়ে ভয়ে কর্তব্যে ত্রুটি ঘটতে পারে—অন্যদিকে স্বাভাবিক বিদ্বেষবশে সুযোগ পেলেই সে রাজ্যের জনতার ওপর অত্যাচার চালাতে পারে। কারণ পুলিশও সমাজবহির্ভূত কোনো জীব নয়।

* * *

একজন এ-এস-আই

কথা হচ্ছিলো কলকাতা পুলিশের জনৈক এ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টরের সঙ্গে। একটা মর্মান্তিক বিক্ষোভের সুরে ভদ্রলোক বলছিলেন—জানেন, আমার যদি কোনরকমের বিকল্প কোনো উপায় থাকতো তাহলে পুলিশ বিভাগে আমি চাকরি করতাম না। এত বড় নোংরা, দুর্নীতি-পরায়ণ এবং অমানবিক বিভাগ ভারত-বর্ষের প্রশাসনব্যবস্থায় আর নেই। এমন একটি বিভাগ যেখানে চাকরি করলে মানুষ তার সকল প্রকার সুকুমার প্রবৃত্তি এবং সূক্ষ্ম অনুভূতি হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হয়। অথচ আমরাও মানুষ—আমাদেরও আত্মীয় বিয়োগের বেদনা থাকতে পারে—আমাদেরও র‍্যাশনালিটি থাকবার কথা ছিলো। কিন্তু তবুও এদেশে 'পুলিশ' বলতে যেন মনুষ্যেতর কোন জীব বোঝায়। আমার চার বছরের পুলিশ-জীবনে এটুকু বুঝেছি পুলিশ চোখে ঠুলি বাঁধা এবং পিঠে বোঝা চাপিয়ে দেওয়া একপ্রকার জন্তুর মতো।

ভদ্রলোক একটু থেমে গেলেন—আমি কিন্তু পুলিশের নিচের তলার কর্মচারীদের কথাই বলছি। এই বোঝা আরো না পারি সইতে না পারি বইতে—কেবল বোঝার ভারে কুঁজো হয়ে যাচ্ছি। কিছুই করবার নেই, কেন না কোনো উপায় নেই। এক-জনকে জানতাম, যে বইতে পারতো, কিন্তু সইতে পারে নি। কানন ঘটক। একটা আপোষহীন সত্তা। পুলিশ বিভাগ তথা সুপিরিয়রদের বিরুদ্ধে কয়েকদফা অভি-যোগ এনে হায়ার অথরিটির মুখের ওপর পদত্যাগপত্র ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলেন। তাঁর সেদিনের সেই দৃপ্ত ভঙ্গীতে 'চললাম' বলা এবং চলে যাওয়ার চিত্র আজও আমার স্পষ্ট মনে পড়ে। আমার যেন মনে হতো—এ-ছেলে পুলিশী করবার জন্য জন্মায় নি।

তিনি একটু চুপ করলেন। ফাঁক পেয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম—আচ্ছা, পুলিশ বিভাগের প্রতি আপনার এই বীতশ্রদ্ধ হবার কারণ কি?

—কারণ অনেক। সে-সব আপনারাও অনেক জানেন। হয়ত সবকিছু জানেন না। জানি না আমরাও। কারণ আমরাও নিচের তলার মানুষ—আদার ব্যাপারী—জাহাজের খবর পাবার কথা আমাদের নয়। তবু একথা তো ঠিক যে, স্বজন-পোষণ, পক্ষপাতিত্ব, দুর্নীতি, ঘুষ ও ঘুসির কারবারে স্বাধীন ভারতে এই বিভাগটিই সর্বোচ্চ স্থান লাভ করেছে। সাধারণ পুলিশ বা কনেস্টবল পদস্থ অফিসারদের হাতে যে কত অসহায় সে কেবল আমরাই যথার্থ জানি। জীবন বিপন্ন করে যারা ক্রিমিনাল ধরলো—প্রমোশন কিংবা পুর-স্কারের অধিকারী তারা হয় না। আবার 'স্যার, স্যার' কিংবা অয়েলিং-এর জোরে অনেক ঠুঁটো জগন্নাথেরও কপাল খুলে যায়। ডাকাতির ঘটনা রাতারাতি সাধারণ চুরি-কেসে পরিণত হতে পারে একমাত্র এই বিভাগেই। বড়কর্তাদের পকেট-রঞ্জনের কোটা যে হতভাগারা পূরণ করতে ব্যর্থ হয়—তাদের নিপীড়নের অন্ত থাকে না। অবশ্যই সে নিপীড়নের কোনো কোর্ট-কেস হতে পারে না। অনেক ক্ষেত্রে তাদের চাকরীর নিরাপত্তা পর্যন্ত ওঁদেরই হাতে মর্টগেজড হয়ে যায়। তাই যারা আদর্শ নিয়ে এই বিভাগে প্রবেশ করে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের সে আদর্শ বেশিদিন থাকে না।

—আচ্ছা, আমাদের দেশে জনসাধারণের সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক ভালো নয় কেন? আমি জিজ্ঞেস করলাম।

—পুলিশকে জনসাধারণের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রাখা হয়েছে বলে অনেকে বলে থাকেন। একথা আমিও অস্বীকার করি নে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলতে চাই—এদেশের জনসাধারণও ভালো নয়। অধিকারটুকু ভোগ করবো, অথচ কর্তব্যের বেলায় চোখ বুজে থাকবো—এ মনোবৃত্তি মারাত্মক। অনেক ক্ষেত্রেই জন-সাধারণ পুলিশের প্রতি অবিচার করে থাকেন। তাঁরা ভুলে যান যে আমরাও মানুষ।

—পুলিশ ও জনসাধারণের সম্পর্কের উন্নতি কিভাবে হতে পারে?

—জনসাধারণকে সহানুভূতির সঙ্গে পুলিশকে বিচার করতে হবে। পুলিশেরও বোঝার সময় এসেছে যে, এতকাল যেভাবে চলেছে সেভাবে আর চলছে না। তাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে পরিবর্তন আনতে হবে। জনসাধারণেরও একচোখা মনোভাবের পরি-বর্তন দরকার। একটা স্বাধীন দেশের মানুষের প্রত্যাশা হয়তো এদেশের পুলিশ পূরণ করতে পারে নি, কিন্তু একটা স্বাধীন দেশের নাগরিকের যে সমাজ-চেতনা থাকার দরকার ছিলো—তাও সামগ্রিকভাবে এদেশের মানুষের গড়ে ওঠে নি। তার জন্য দায়ী পুলিশ নয়।

—কোনো রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের সঙ্গে পুলিশের আনুগত্য পরিবর্তন হওয়া উচিত কি?

—না। এ মনোভাবে পুলিশকে তার নীতি থেকে বিচ্যুত করে।

—আপনার নিশ্চয়ই '৬৭ সালের কথা মনে আছে, যখন পুলিশ অত্যন্ত পরি-কল্পিতভাবে যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধা-চরণ করেছিলো। এবারেও এই সরকারের প্রতি তাদের পূর্ণ আনুগত্য আছে বলে আপনি মনে করেন কি?

—নিচুতলার পুলিশদের পূর্ণ আনু-গত্য আছে বলে আমি মনে করি। ওপর-তলাটি চিরকালই নানারকম রাজনৈতিক ব্যাধিতে ভোগে যেটা নিচুতলায় নেই।

—পুলিশ এ্যাসোসিয়েশনের ৫৩ দফা দাবিতে কি সরকারের প্রতি তাদের আনু-গত্যের প্রতিফলন ঘটেছে?

—এই দাবিপত্র নিশ্চয়ই কনস্টেবল বা আমাদের মত এ এস আই-রা রচনা করেন না। সেখানে রাজনীতির দাপটটাই বেশি।

—সব শেষে জিজ্ঞেস করলাম—বর্তমানে রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলার কি খুবই অবনতি হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

—না। কারণ কিছু কিছু ঘটনা যা ঘটেছে, তা আগেও ঘটতো—পরেও ঘটবে। সেদিক থেকে দেখলে চিরকালই আইন-শৃঙ্খলার অবনতি থাকবে।

—আসবার সময় বললাম—আপনার সঙ্গে এই কথাবার্তা যদি পত্রিকায় ছাপি? উনি একটু ভীত হয়ে বললেন—'না, না, যে বিভাগে চাকরী করি—তাতে আমার চাকরী চলে যাবে। অথচ বেকার হলে কয়েকটি মানুষ সমেত আমি মারা যাবো।

বললাম—আচ্ছা, আপনার যাতে কোনো বিপদ না হয়, সেইভাবে লিখবো—আপত্তি নেই তো? একটু হেসে উনি বললেন—দেখবেন, যেন মারা না পড়ি।

[চলবে]

সূর্য কাঁদলে সোনা—প্রেমেন্দ্র মিত্র।
গ্রন্থ প্রকাশ, ১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য ঃ পনের টাকা।

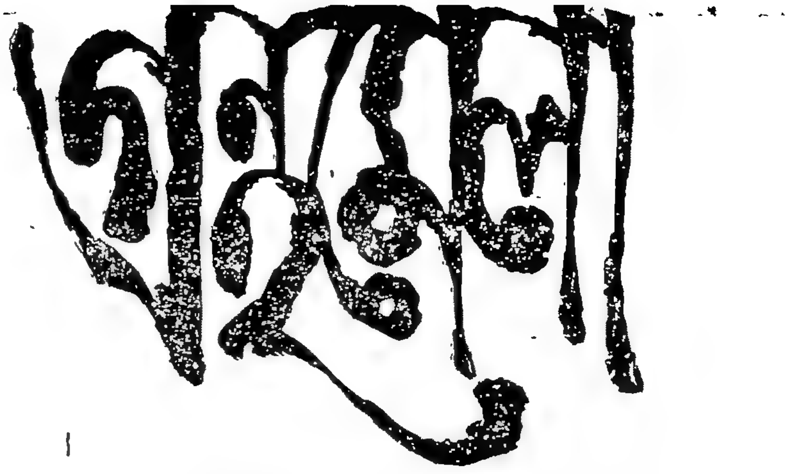

হ্রদ, সরোবর বা জলাশয়, যাই বলা যাক্ না কেন, তারই তীরে নাতিবৃহৎ একটি গাছের তলায় নিয়মিত সান্ধ্যসভা বসত। সভার সভ্যরা হচ্ছেন—মর্মর-মসৃণ-মস্তক শিবপদবাবু, মেদভারে যিনি হস্তীর মতন বিপুল সেই সদা প্রসন্ন ভবতারণবাবু, কুম্ভের মতন উদরদেশ যার স্ফীত সেই ভোজনবিলাসী রামশরণবাবু, আর প্রেমেন্দ্র মিত্রের মানসপুত্র ঘনশ্যাম দাস—যিনি প্রেমেন্দ্র মিত্রের বহু গল্প-উপন্যাসে ঘনাদা নামে সুপরিচিত। ঘনশ্যাম দাসকে কেন্দ্র করে বৃদ্ধদের সান্ধ্য-মজলিস যখন জমে উঠত, তখন ঘনশ্যামের কাল্পনিক এবং ঐতিহাসিক ইতিবৃত্ত শুনতেন অন্যান্য সভ্যরা। সমগ্র উপন্যাসে ঘনশ্যামের মুখ দিয়ে লেখক একটি ঐতিহাসিক এবং কাল্পনিক ঘটনাপুঞ্জ পাঠকদের সামনে মেলে ধরেছেন।

ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে লেখা এটি এক অসাধারণ উপন্যাস। তবে ঠিক ঐতিহাসিক উপন্যাসও নয়। কারণ উপন্যাসের বহুস্থানে কল্পনার সাহায্য নেওয়া হয়েছে। সমগ্র উপন্যাসটি এক নিগূঢ় রহস্যে ভরা। সেদিক থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের এই উপন্যাসটি পৃথিবীর বহু শ্রেষ্ঠ রহস্য উপন্যাসকেও হার মানায়। তা হলে কি এই উপন্যাসটিকে রহস্য উপন্যাস বলা যেতে পারে? না—তাও নয়। কারণ এই উপন্যাসে রহস্যকে ঘনীভূত করা হয়েছে একটা অদ্ভুত সাস্‌পেন্স বা ঔৎসুক্যকে পাঠকের মনের মধ্যে জিইয়ে রাখার জন্য। উপন্যাসটি আধুনিক প্রেমের উপন্যাসও নয়, যদিও দুটি মাত্র নারী চরিত্রের, আনা ও কয়া, উপস্থাপনা কিছুটা স্নিগ্ধ প্রেমের আস্বাদন মেটায়। আনা ও কয়া দুটিই কাল্পনিক চরিত্র। আনা চপলা বিধবা যুবতী। গানাদোর প্রতি তীব্রভাবে আসক্তা। উপন্যাসের পরের অংশে দেখা যায়, মার্কুইস গন্‌জালেস দে সোলিসকে বিয়ে করে মার্সনেস হয়েছে। প্রেমের খেলায় প্রত্যাখ্যাতা আনা ঈর্ষা আর প্রতিহিংসার জ্বালায় উন্মাদ হয়ে গানাদো বা ঘনরামের উপর চরম প্রতিশোধ নিতে উদ্যত হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় তার শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে। কয়া পিজারো সৈনিকের দ্বারা লুণ্ঠিতা এক সূর্য সেবিকা। পেরুতে ইংকা সম্রাজ্ঞীদের নাম কয়া। গানাদো এই সূর্য সেবিকাকে উদ্ধার করে নাম রাখেন কয়া। কয়াকে এই উপন্যাসে একটি স্নিগ্ধ অথচ অকুতোভয় নারী চরিত্রের প্রতীক হিসাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। যথাযথ বিচারে এটি প্রেমের উপন্যাসের পর্যায়েও পড়ে না। তা হলে এটি কি ধরণের উপন্যাস? বলা যেতে পারে, লেখকের এটি একটি নতুন জাতের, নতুন স্বাদের সার্থকতম বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা। এই ধরণের উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে বা ভারতীয় সাহিত্যে এর পূর্বে দেখা যায় নি। বিদেশী সাহিত্যেও এ ধরণের উপন্যাসের সন্ধান বিশেষ পাওয়া যায় না। সেদিক থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্র পাঠকদের ধন্যবাদার্হ।

এই উপন্যাসটিকে যদি দিবানিদ্রার ঔষধ হিসেবে ধরা হয়, তা হলে মস্ত ভুল করা হবে। উপন্যাসটি আগাগোড়া রহস্যে ভরা এবং কাল্পনিক ও ঐতিহাসিক উপাদানে গঠিত। বাজার চলতি উপন্যাসের ঊর্ধ্বে বলেই একথা জোর দিয়ে বলা উচিত, সচেতনভাবে মনঃসংযোগ করে না পড়লে এই অপূর্ব উপন্যাসের রস যথার্থ উপলব্ধি করা সম্ভব হবে না।

গল্পের মূল কাহিনী শুরু হয়েছে ঘনাদার আদি পুরুষ ঘনরাম দাস বা গানাদোকে নিয়ে—যিনি ক্রীতদাস রূপে এই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছেন। ঘনরাম দাসত্ব-শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেয়ে কর্টেজের ছাড়পত্র নিয়ে ফিরছিলেন এক জাহাজে। এই জাহাজেই স্পেনের এক ঈর্ষাপরায়ণ সৈনিক সোরাবিয়ার সংগে জুয়া খেলায় জড়িয়ে পড়েন এবং অদ্ভুত এই জুয়া খেলায় গানাদোর কাছে হেরে গিয়ে হিংসায় আক্রোশে সোরাবিয়া প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। এমন কি শেষ পর্যন্ত গানাদোর বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করবার জন্য এমন কাজ নেই যা সে করে নি।

এই উপন্যাসের মূল কাহিনী,—পিজারো কর্তৃক সূর্য কাঁদলে সোনার দেশ বা পেরু বিজয়। এই অভিযানে ঘনরাম বা গানাদো ছিলেন পিজারোর সহচর। পেরু সাম্রাজ্যের সম্রাটকে বলা হ'ত ইংকা। ইংকারা নিজেদের সূর্যের সন্তান বলে জানতেন। তাঁদের উপাস্য দেবতা ছিলেন ভীরাকোচা বা পাচাকামাক। তদানীন্তন পেরু সম্রাট আতাহুয়ালপা বেশ সাদরেই পিজারো এবং তার অনুচরদের অভ্যর্থনা জানান। কিন্তু সোনার লোভে আতাহুয়ালপার আতিথেয়তার সুযোগ নিয়ে কিভাবে তাকে বন্দী করা হয় সেই কাহিনী এই উপন্যাসে বর্ণিত। ঘনরাম বা গানাদো পিজারোর সহচর হয়ে অভিযানের একটা অংশ রূপে গিয়েছিলেন ইংকা সম্রাটের দেশে। কিন্তু সম্রাট এবং তাঁর সহচরদের উপর অহেতুক বর্বরোচিত অত্যাচার এবং অসূর্যম্পশ্যা রাজকুমারীর উপর নারীমাংসলোলুপ নরপশুদের অত্যাচার দেখে গানাদোর পক্ষে শেষ পর্যন্ত পিজারোকে সমর্থন করা সম্ভব হয় নি। আতাহুয়ালপাকে উদ্ধার করে পেরু সাম্রাজ্যকে লুণ্ঠনের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য গানাদোর যে প্রয়াস, তাও এই উপন্যাসের শেষের দিকে অতি সুনিপুণ রহস্যের মধ্য দিয়ে বলা হয়েছে।

'সূর্য কাঁদলে সোনা' ইতিহাসের এক আশ্চর্য যুগের কাহিনী। ইতিহাসের বহু বিচিত্র এবং কষ্টসাধ্য উচ্চারণের নাম এই উপন্যাসে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। ইতিহাসকে বিকৃত করা লেখকের উদ্দেশ্য নয়। তাই ঐতিহাসিক ঐ নামগুলোকে লেখক যথাযথভাবে ব্যবহার করেছেন, এমন কি যেখানে প্রয়োজন সাল তারিখ পর্যন্ত পাঠকের সুবিধের জন্য বিরক্তি উৎপাদন না করে লেখক অতি সুকৌশলে নানা জায়গায় ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

সান্ধ্য-মজলিসের বিশেষ সভাটিতে ঘনশ্যাম দাসের মুখ দিয়ে প্রায় সমস্ত কাহিনীটি বলা হয়েছে। উপন্যাসের মাঝে মাঝে এই মজলিসের অবতারণা আছে। মূল কাহিনীর সংগে সংগে যাতে পাঠকের বিরক্তি উৎপাদন না করে বা উপন্যাসটি একঘেয়েমি দোষে দুষ্ট না হয় সেদিকে দৃষ্টি রেখেই লেখক মাঝে মাঝে এই মজলিসের উপস্থাপনা করেছেন এবং এখানেই লেখকের সুনিপুণ মুন্সী-

য়ানা এবং কৃতিত্বের পরিচয় মেলে।

পেরু বিজয়ের প্রায় অবিশ্বাস্য ইতিহাস ও কাহিনীকে কেন্দ্র করে প্রেমেন্দ্র মিত্রের মানসপুত্র ঘনশ্যাম দাস বা পাঠকের বহুপরিচিত ঘনাদার রসঘন কল্পনা এক পরমাশ্চর্য সাহিত্যের সৃষ্টি করেছে ইতিহাসে যার তুলনা মেলে না। ঘটনার ঠাসবুনোনি এবং স্বচ্ছ সাবলীল ভাষায় সেই কাহিনীর বর্ণনা সমগ্র উপন্যাসটিকে এক অলৌকিক মর্যাদা দান করেছে। কোন একটা বিশেষ পরিচ্ছেদ পড়তে পড়তে পাঠকের মন দ্রুত ছুটে চলে যায় 'তারপরে কি হ'ল' জানবার জন্য। লেখক সুকৌশলে পাঠকের জানবার এই ইচ্ছেটাকে উদ্দীপ্ত করে দিয়ে নিমেষেই অন্য প্রসংগে চলে যান। পাঠকের জানবার বাসনা কিন্তু সমানই থেকে যায়। এই যে একটা কি হয় কি হয় ভাব, এটা সমগ্র উপন্যাসে ছড়িয়ে আছে এবং এখানেই লেখকের চরম সাফল্য। আর এই সাফল্যই সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করেছে 'সূর্য কাঁদলেই সোনা' বাস্তবিকই 'A Novel for the novelists', যা রুচিবান ও মননশীল পাঠকদের মনও গভীরভাবে আলোড়িত করবে।

সর্বাংগসুন্দর এই উপন্যাসটির ছাপা এবং বাঁধাই আরো কিছুটা উন্নত ধরণের হলে ভালো হ'ত।

Bankim Rachanavali: Bankim Chandra Chatterjee: Edited by Shri Jogesh Chandra Bagal: Sahitya Samsad, 32A, Acharya Prafulla Chandra Road, Calcutta-9. Price Rs. 15.

বাঙালী পাঠকের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের নতুন করে পরিচয় দেবার কোন প্রয়োজন নেই। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জনকস্থানীয় এই বিরাট পুরুষ আমাদের সাহিত্যে যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, পরবর্তীকালে তা সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে বিশ্বসাহিত্য এক অতি মর্যাদাময় স্থান লাভ করে। অনেকেই জানেন যে, শ্রীঅরবিন্দ বন্দিত এই ঋষি তাঁর প্রথম রচনাটি ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করেছিলেন। এটির নাম Rajmohan's wife. ইংরাজী ভাষায় রচিত এই উপন্যাসটি পড়তে পড়তে বোঝা যায় যে, পরবর্তীকালে কেন এটির লেখক অসংখ্য উচ্চ শ্রেণীর উপন্যাস রচনা করতে পেরেছিলেন। তৎকালীন সমাজ-ব্যবস্থা, সে যুগের নানাবিধ সংস্কার এবং চরিত্র-চিত্রণে মুন্সীয়ানা ইংরাজী ভাষাতেও সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর রসবোধের একাধিক নমুনা এই উপন্যাসটিতে রয়েছে। নবম পৃষ্ঠায় রাজমোহনের স্ত্রীকে শাসন করতে গিয়ে যে ভাষা প্রয়োগ করেছিলেন সে বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কটাক্ষ করেছেন—

It is unnecessary to try the patience of my readers by reproducing all of his Billingsgate.

এক জায়গায় মাতঙ্গিনী রাজমোহনকে বলছেন—

'You are right', she said. 'I love him—deeply do I love him; long loved I and I loved him so. I will also tell you that words have I uttered which, but for the uncontrolled —uncontrolable madness of a love you cannot understand....'

দুর্গেশনন্দিনীর লেখকের পক্ষেই এ-ভাষা লেখা সম্ভব। এসব কারণে আগাগোড়া বইটির সম্পর্কে ঔৎসুক্য বজায় থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরাজী প্রবন্ধ এবং পত্রগুলির মধ্যে যে বিদগ্ধ এবং স্বদেশ-প্রেমিক মানুষটিকে খুঁজে পাওয়া যায় তিনিই আমাদের জাতিকে 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছিলেন। হিন্দুদের নানাবিধ পার্বণ, বাংলার লোকপ্রিয় সাহিত্য, বাংলাদেশের বিভিন্ন কবি, বৌদ্ধধর্ম এবং সাংখ্যদর্শন, নব্য বংলার এক যুবকের স্বীকৃতি, হিন্দু দর্শন পাঠ প্রসঙ্গে এবং বৈদিক সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর প্রবন্ধাবলী যেমন তথ্যসমৃদ্ধ তেমনই সুখপাঠ্য।

পত্রাবলীর মধ্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে লিখিত পত্রগুলি, Statesman পত্রিকায় লিখিত পত্রগুচ্ছ এবং Letters on Hindnism এককথায় অনবদ্য। দেবী চৌধুরাণীর শেষ কয়েকটি অধ্যায়ের অনুবাদ পাঠকদের বিশেষভবে আকৃষ্ট করবে বলেই আমরা মনে করি। প্রবীণ সাহিত্যিক যোগেশচন্দ্র বাগল দৃষ্টিশক্তি হারিয়েও এই অমূল্য গ্রন্থটির সম্পাদনা করে তাঁর সাহিত্যপ্রেমের যথার্থ পরিচয় দিয়েছেন।

লেনিন ও ভারতবর্ষ: চিন্মোহন সেহানবীশ: কালান্তর প্রকাশনী, ১৯, শরৎ ব্যানার্জী রোড, কলকাতা-১। মূল্য: ৩০ পয়সা।

সেহানবীশ মহাশয়ের এই রচনাটি বাংলার রাজনৈতিক গ্রন্থের জগতে একটি মূল্যবান সংযোজন। লেনিনের রচনার সঙ্গে যাঁরা বিশেষভাবে পরিচিত নন তাঁরা এই গ্রন্থটি পাঠ করলে দেখতে পাবেন বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ এই মহান নেতা আমাদের দেশের কত বড় একজন বন্ধু ছিলেন। লেনিনের রচনাবলীতে ভারতবর্ষ সম্পর্কে যা কিছু রয়েছে, সেগুলিকে তিনটি পর্বে ভুক্ত করা চলে। লেখকের ভাষায়—'প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে পর্যন্ত প্রথম পর্ব—সেখানে ভারতবর্ষের ওপর নির্মম অত্যাচার ও শোষণ আর তার প্রতিবাদে প্রাথমিক আন্দোলনের কথা পরিস্ফুট। দ্বিতীয় পর্বের সূত্রপাত বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় থেকে। সাম্রাজ্যবাদের চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে নতুন বিশ্লেষণ ও উপলব্ধি তাঁকে এই পর্বে সজাগ করেছে পরাধীন দেশের জাতীয় মুক্তির চরিত্র ও তার আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি বিষয়ে।...... তৃতীয় পর্বের কাল, নভেম্বর বিপ্লব থেকে ১৯২৪ সনে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত।' মানবেন্দ্রনাথ রায়, অবনীনাথ মুখোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রমুখ বিপ্লবীদের সাথে লেনিনের সাক্ষাৎকারের বিবরণী এবং তাঁর ব্যক্তিগত গ্রন্থাগারে ভারত সম্পর্কে যেসব গ্রন্থ ছিল, তা থেকেই বোঝা যায় সত্যিই তিনি আমাদের দেশ সম্পর্কে কতটা আগ্রহশীল ছিলেন।

বাংলা সংগীতের রূপ: সুকুমার রায়: এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিঃ, ২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ১২। মূল্য: ৮ টাকা

পূর্বাভাষের অংশটি বাদ দিয়ে এই গ্রন্থটি সাতটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এছাড়া একটি পরিশিষ্ট সংযোজিত আছে। সুকুমারবাবু একই সাথে সংগীতের ইতিহাস, ব্যাকরণ ও বিজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। অতীত ও বর্তমানের গানের জগতে প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতি, রীতিনীতি, রাগরূপ এবং রাগের বিকাশ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিকে সুস্পষ্টভাবে উদ্ঘাটিত করেছে। গ্রন্থ-পরিচিতিতে স্বামী প্রজ্ঞানন্দ যথার্থই বলেছেন যে, 'বিচক্ষণ গ্রন্থকার ঐতিহাসিক ক্রম ও উপাদানের উপস্থাপনের জন্য আগ্রহশীল না হলেও অতীতে বর্তমান বাংলাদেশের সমাজে বাংলা গানের রূপায়ণ ও বিকাশ কিভাবে হয়েছে ও আছে তারই একটি পরিচ্ছন্ন ও সুস্পষ্ট বিবরণ সর্বসাধারণের কাছে তুলে ধরেছেন—যা পরীক্ষা-নিরীক্ষাসেবী সংগীতশিল্পী, সংগীতসেবী ও সাধারণ মানুষের কাছে কার্যকরী হবে।'

প্রাচীন ধর্মীয় সংগীতের সমীক্ষায় মধ্যযুগের গান, কীর্তন, শ্যামাবিষয়ক সংগীত এবং ভজন সম্পর্কে লেখক বিস্তারিত আলোচনা করেছেন বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টি নিয়ে। এছাড়া রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ ও নজরুল প্রমুখ সুরকারদের রচনারীতির ব্যাখ্যা এবং তাঁদের ভাবনায় সংগীতের যে রূপে প্রকাশিত হয়েছে তাও অতি

সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করেছেন তিনি। পল্লীগীতির বস্তুবিচার, কলারূপ বনাম মৌলিক পল্লীগীতি, পল্লীসুর, পল্লীগীতির ছন্দ ও গায়ন পদ্ধতি এবং পল্লীসংগীতে নৃত্য প্রভৃতি আলোচনাগুলি এই গ্রন্থটিকে অদ্ভুত তথ্যসমৃদ্ধ করে তুলেছে। বাংলা গানে রাগসংগীতের প্রভাবের আলোচনা প্রসঙ্গে রাগসংগীতের রীতিপদ্ধতি, ধ্রুপদী প্রভাব, খেয়াল ও বাংলা গান, টপ্পা, ঠুমরী, তাল ও ছন্দ বিষয়ে সহজ ও সরল ভাষায় তিনি যেসব কথা লিখেছেন সকল শ্রেণীর পাঠকের তা ভাল লাগবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। পূর্বসূরীদের সম্পর্কে লেখকের শ্রদ্ধার ভাবটি সহজেই চোখে পড়ে। স্বল্প পরিসরে নিধুবাবু থেকে আরম্ভ করে দ্বিজেন্দ্রলালপকুমার রায় পর্যন্ত আমাদের শ্রেষ্ঠ সুরকার এবং সংগীতাচার্যগণের মতামত অতি সুন্দরভাবে উপস্থাপিত করে লেখক নিজের বৈজ্ঞানিক অপক্ষপাত ও বিশ্লেষণী মনের পরিচয় দিয়েছেন। এ গ্রন্থটি সংগীতের জগতে বিশেষ সমাদৃত হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

হারেমের নায়িকা (বৈশাখ, ১৩৭৬) সুভাষ সমাজদার। সাহিত্য প্রকাশ। ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট। কলকাতা—৯। দাম—ছ' টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

সুলেখক সুভাষ সমাজদার তাঁর "হারেমের নায়িকা" বইটিতে আগ্রার মোঘল বাদশাহী হারেম সহ মিশর, তুরস্ক ও মধ্য এশিয়ার মুসলমানপ্রধান দেশগুলোর শাসকদের হারেম বা নিষিদ্ধ-স্থান বা জেনানামহলের প্রেম-গীতি বিরাগ-বিদ্বেষ স্বার্থ-সংঘাত ও প্রতি-হিংসার বিচিত্র ইতিহাস, কাহিনী ও উপকথা তুলে ধরেছেন। লেখককে এর জন্যে পরিশ্রমও করতে হয়েছে প্রচুর। উল্লেখ করেছেন স্মিথ সাহেবের, হুমায়ুনের আত্মজীবনীর, আবুল ফজলের আকবরনামার, উল্লেখ আছে পেঞ্জারের লেখা টার্কিশ হারেম, ই. ডবলিউ লেন-এর লেখা ম্যানারস এ্যান্ড কাস্টমস অব ইজিপসিয়ানস, স্যার ক্যাসিনের রোমান্স অব এ হারেম, আইজ্যাক মিডেলজোর ফরাসী ভাষায় লেখা "প্রাচ্যে দাস ব্যবসার ইতিবৃত্ত" এবং উইমেন অব হিল রিয়াস আস মালাটিন প্রভৃতি গ্রন্থের।

হারেমের বিস্ময়কর বিচিত্র চরিত্রগুলি লেখকের অনবদ্য লেখার গুণে পাঠকের মনে স্পষ্ট ছাপ রেখে যায়। কত বিচিত্র নারী-পুরুষের সমাবেশ ও সমারোহ! সেলিমের রাজপুত্রমহিষী দুর্ভাগিনী যোধবাঈ বেগমের কাহিনী, তুরস্কের হারেমের সেরা সুন্দরী সোফিয়ার প্রতি সুলতান হালিমের অদ্ভুত আসক্তি, বাঁদী লতিফা ও খোজা করিম শেখের প্রেমের করুণ পরিণতির ইতিবৃত্ত, বর্ধমানের মেয়ে দৃপ্ত চরিত্র সর্বসুন্দরী ওরফে নুরজাহানের জুলেখাবাঁদীর মর্মস্পর্শী ঘটনাবলী, সেনাপতি মহব্বতের প্রেমিকা ভুরী বাঁদীর দেশপ্রেম, আকবরের হারেমের হালিদা, নসীবন আর লালখাঁ কথাবন্তের ত্রিভুজ প্রেমের ব্যাপার, দুর্ভাগিনী বিষকন্যা হাসুবানুর কাহিনী, কিভাবে একবার মোঘলের বিরুদ্ধাচরণ করতে গিয়েও মনসিং ভৈরবীবেশিনী নর্তকী ইস্কান্দর বিবির যৌনাসক্ত হয়ে সংকল্পভ্রষ্ট হন তার ঘটনা, শায়েস্তা খাঁর আদরের কন্যা মতিয়া কীভাবে সপ্তগ্রামের মেয়ে রাধাকে লোলুপ ফৌজদার মুজিবরের হাত থেকে রক্ষা করেন তার [illegible]

অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য আছে। একটি নগরের মত বাদশাহী হারেমে কোথাও কোথাও ৫০০০-এরও বেশি সুন্দরী থাকতো। খোজাদের ইতিহাস বিবৃত করতে গিয়ে বলেছেন, মধ্য আফ্রিকার উত্তর প্রান্তে বাজিরসি জেলায় ছিল খোজা ব্যবসার প্রচলন।

আবার শুধু প্রেম প্রতিহিংসা নিয়েই নয়, গুলবদন বা জেবউন্নিসার মত অনেক বিদুষী হারেমবাসিনী সাহিত্য চর্চা করতেন মনপ্রাণ দিয়ে। এই হারেমের মধ্যেই মমতাজ বা যোধপুরী বেগমের মত চরিত্র রাজ্যের সুশাসন নিয়েও মাথা ঘামাতো।

হারেমের রোমহর্ষক সব কাহিনীর সংগে লেখক মুন্সিয়ানার সঙ্গে এনেছেন আধুনিক যুগের কতকগুলি চরিত্র—ঊর্মিলা, প্রফেসর নীতীশ রায়, তনিমা, সুদর্শন, ডঃ কুলোশ্রেট এবং তাঁর কন্যা তপতী। এদের করুণ জীবনবৃত্তান্তও পাঠকদের মনে করুণার সঞ্চার করে।

লেখকের বর্ণনাভঙ্গি ভাল। ২।১টি জায়গায় অবশ্য একঘেয়েমি আছে। ঘটনাগুলি উপস্থাপনার মধ্যে কৃতিত্ব রয়েছে।

ফেরারী (মহালয়া, ১৩৭৫) শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়। সুদেশা, ৩২, গণেশচন্দ্র এভিনিউ। কলকাতা—১৩ দাম—দু' টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

সৈন্য বিভাগের কয়েকটি বিচিত্র চরিত্র নিয়ে একটি ছোট্ট বিয়োগান্ত উপন্যাস "ফেরারী"। ঘটনার কেন্দ্রস্থল একটি মিলিটারী ক্যান্টনমেন্ট। মেজর লাহিড়ীর কন্যা শিরিন-এর সঙ্গে লেখক বাঙালী যুবক রায়-এর পরিচয় ও প্রেম বরদাস্ত করতে পারল না শিরিনের প্রতি আসক্ত ক্যাপ্টেন রামস্বামী। একটির পর একটি চক্রান্ত করে সে শিরিনকে কুক্ষিগত করতে চাচ্ছিল। ডলি একটি অদ্ভুত চরিত্র—সে একদিকে ভালবাসে রামস্বামীকে, অন্যদিকে রামস্বামীর কাছে শিরিনের প্রতি অন্যায় অশালীন আচরণের জবাবদিহির মুহূর্তে কী ঘৃণা তার ওই কুচক্রী পশুটার ওপর। চরিত্রগুলি জীবন্ত। ভাষা সাবলীল, রচনায় মমতা ও মাধুর্যের স্পর্শ আছে।

দোলাগঙ্গা : শৈলেন্দ্রনাথ সমাদ্দার : স্ট্যাণ্ডার্ড বুক কোম্পানী, ১০।১, জি টি রোড, হাওড়া ১। মূল্যঃ তিন টাকা পঞ্চাশ পয়সা।

কাহিনীর নায়ক কুন্তল। জীবনে অনেক কিছু সে দেখেছে। "দীর্ঘ তার পরিক্রমা,—এই দীর্ঘদিন, দীর্ঘ বরষ মাস। দেশ থেকে দেশান্তর। দূর থেকে দূরান্তর। ভিতর থেকে বাহির। বাহির থেকে ভিতর। দেখছে, দেখছে কুন্তলঃ কোন্ ভুলে হেমাঙ্গিনীরা ভানুমতী হয়, কোন্ ভুলে কুন্তলরা রিক্ত ভোলার তিক্ততায় জ্বলে মরে।"

জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়ে পৃথিবীটাকে চোখ মেলে সে দেখেছে। তাই দুঃখী পৃথিবীর মানুষদের দিকে সে অসীম প্রেমের দৃষ্টিতে তাকায়। সে জীবনকে ভালবাসতে শিখেছে। পাপীকে ক্ষমা করতেও শিখেছে। কারণ, তার কাছে মন্ত্রের চেয়ে মন অনেক বড়। মানুষ অসীম এবং সুন্দর। হেমাঙ্গিনীর সাথে তার প্রেমের বিচিত্র কাহিনী পাঠকের মনকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়ে যায়। গতানুগতিক প্রেমের গল্পের উপাদানে এ কাহিনী গঠিত নয়। গভীরতর চিন্তার পরিচয় এটির সর্বত্র রয়েছে।

বসুমতীর
যাবতীয়
গ্রন্থ ও
গ্রন্থাবলীর
প্রাপ্তিস্থান
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ
কলিকাতা—১২
এবং
সান্যাল এণ্ড কোং
১/১এ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

লোকসঙ্গীতের একাল না অকাল?

মুরশিদ

একালের কথা কবি জসিমউদ্দীনকে বলতে গিয়ে বঙ্গসংস্কৃতির কেন্দ্র—তাঁদের সময়কার কলকাতা, আর আমাদের এই কলকাতার ফারাকটা কি ও কোথায় সেটা অল্প কথায় বোঝাবার চেষ্টা করছি। বাঙালীর আধুনিক পপ্ গান, 'রাগী' কবিতা বিবস্ত্র উপন্যাস, অশোককুমার নাইট বা মন্তমেলার 'জীবন দর্শনের' বিকার না বুঝলে লোকসঙ্গীতের বিকৃতিও বোঝা সম্ভব নয়। মুরশিদের আগের লেখায় তার কিছু বর্ণনা আছে। কিন্তু কবি তা উপলব্ধি করতে পেরেছেন বলে মুরশিদের মনে হলো না। কবি, রবীন্দ্র সদন, রবীন্দ্রভারতী, বিশ্ববিদ্যালয়, আকাশবাণী প্রভৃতি বহুস্থানে বক্তৃতা দিয়েছেন, কিন্তু কোথায়ও লোকসংস্কৃতিকে আজকের এই ব্যবসায়িক হামলা থেকে রক্ষার জন্য একটি ক্ষীণ আবেদনও জানালেন না। কোনো শিল্পী বা সংগঠন বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে তিনি বলবেন তা আমরা চাই নি। আমরা শুধু চেয়েছিলাম তিনি মূল বিপদ সম্বন্ধে সাধারণভাবে শ্রোতাদের কিছু সতর্কবাণী শোনাবেন। কিন্তু মুরশিদকে তিনি হতাশ করলেন।

তিনিও কি সময়ের পিছনে পড়ে গেলেন, না এটা তাঁর সুবিধাবাদ?

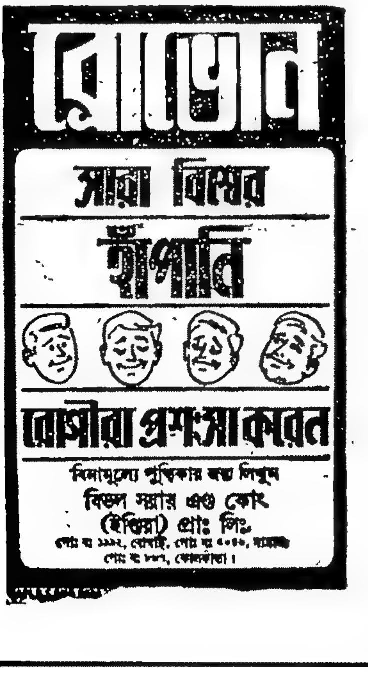

ব্যক্তিগতভাবে মুরশিদের মোকামে ফেলে-আসা গ্রামের মাটির সুবাস পেয়েছেন বলে যাবার আগে তিনি মুরশিদকে এক প্রশংসাপত্র দিয়ে গেছেন। তার জন্য মুরশিদ কৃতজ্ঞ। কিন্তু মুরশিদ তো চায় নি—মুরশিদ চেয়েছিল আজকের লোকসঙ্গীতের বিকৃতির বিরুদ্ধে মুরশিদের সংগ্রামে তিনি মদত জোগাচ্ছেন।

এ যুগে কোনো কবি কলকাতায় এমন সম্মান পান নি। কিন্তু তাঁর প্রতি এতো লোকের এতো মরম কেন? শুধু তাঁর অতীতের দানের জন্যই নয়; বর্তমানেও বিচ্ছিন্নতায় বন্দী কলকাতার বুদ্ধিজীবীরা তাঁকে সম্মান জানাবার অছিলায় জনজীবনে যাবার নিজেদের অক্ষতার আক্ষেপের কথাই জানিয়েছিলেন। তাঁদের সামনে লোকসংস্কৃতিই যে জনজীবনে যাবার কাদা-মাটির পথের একমাত্র সাঁকো সে কথা বলবার সবচেয়ে বড়ো অধিকার ছিল কবি জসিমউদ্দীনেরই। আর সেই বেত-বাঁশের সাঁকোটির ওপর দিয়ে যাঁরা আজ হাওয়াগাড়ি চালিয়ে গ্রামে যেতে চান তাঁদের অপচেষ্টার নিন্দা করবেন এটুকুই তাঁর কাছ থেকে চেয়েছিলাম। কোনো রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ তাঁর কাছ থেকে আমরা চাই নি—সেটা আশাও করি নি। কিন্ত পশ্চিমবঙ্গের "সাংস্কৃতিক জাগরণে" উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি নাকি ভাগীরথীর পার থেকে পদ্মার পারে ফিরে গেছেন।

এটাও কি তাঁর উদারতা? না অন্য কিছু? পূর্ব-পাকিস্তানের বুকের লহু আজ টগবগ করে ফুটছে। কিন্তু কবির মধ্যে তার কোনো উত্তাপ পেলাম না। মুরশিদের এই আক্ষেপ। পূর্ব-পাকিস্তান এখন ভিন্ন দেশ: কাজেই কূটনৈতিক সাবধানতা এবং কোনো কোনো বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন—নিশ্চয়ই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু উত্তাপ তো কথার জিনিস নয়, পরশের জিনিস।

যাহোক একটি বিষয়ে মুরশিদ কবির মত পাল্টাতে পেরেছিলেন। সে বিষয়টাই আজ লিখছি।

প্রথম দিনের আলাপেই তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম কয়েক মাস আগে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের দাবিতে পূর্ব-পাকিস্তানের সারা কালো মাটিতে যে রুধিরের বান ডেকেছিল—লোকসঙ্গীতের ক্ষেতে কি তা কোনো ফসল ফলায় নি? সেই ফসলের কোনো খবর তাঁর কাছে না পেয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম—যদি কোনো পল্লীরচয়িতা লৌকিক সুরে ও কথায় সেই গৌরবের কাহিনী গানে বা পালাগানে লিপিবদ্ধ করে থাকেন তবে কি আপনি তাকে লোক-সঙ্গীত হিসাবে স্বীকার করে নেবেন? আমার কাছে ছিল এটা একটা মৌলিক প্রশ্ন—যার উত্তরের ওপর নির্ভর করছে আজকের লোকসঙ্গীতের বিকাশের ঠিকানা আর ভবিষ্যতের নিশানা। আমার প্রশ্নের সরাসরি কোনো জবাব দিলেন না। তিনি Encyclopædia Britanica-তে দেওয়া লোকসঙ্গীতের সংজ্ঞার কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন 'যদি তার ভাষা সুর ও প্রকাশভঙ্গী লৌকিক হয় এবং স্বতঃস্ফূর্ত হয়—ওপর থেকে কোনো রাজনৈতিক প্রোপাগান্ডার তাগিদে রচিত না হয়ে থাকে—ইত্যাদি বহু 'যদি' দিয়ে নিজেকে ঘেরাও করে দ্বিধা-গ্রস্ত জবাব দিয়েছিলেন। আমি বলে-ছিলাম লোকসঙ্গীতের সংজ্ঞার পূর্বসর্ত—সুর, ঢঙ, ভাষা, বাচনভঙ্গী এবং আরেকটি বড়ো জিনিস জনসাধারণ কর্তৃক গ্রহণ—ইত্যাদি বিষয়ে কবির সঙ্গে মুরশিদের কোনো মতপার্থক্য নেই। কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ততা সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে আমার মতপার্থক্য দেখা দেয়।

যে আন্দোলনে লক্ষ লক্ষ লোকের মনে এমন দোলা লাগায়, শত শতাব্দীর কৃষি-ভিত্তিক সমাজে শোষকশ্রেণীর আত্ম-সমর্পণের এবং খোদার দরবারে নালিশ জানানোর জীবনদর্শনের মূল উৎপাটিত করে—আত্মপ্রতিষ্ঠা ও প্রত্যাঘাতের প্রেরণায় নসিবের দোহাই ছেড়ে শোষকের দরবারে হানা দিতে শেখায়—সেটায় কি স্বতঃস্ফূর্ত থাকে না? আত্মসমর্থনেই জীবনদর্শনে শোষণ ও অত্যাচারকে 'নসিব' বলে মেনে নিয়ে গ্রামের সর্বহারা কৃষক যখন দেহের অনিত্যতা ও সংসারের অসারতার গান গেয়ে সান্ত্বনা লাভ করে—তখন সে লোকসঙ্গীতে রাজনীতি থাকে না—সেটা হয় স্বতঃস্ফূর্ত। আর সেই অসহনীয় অবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেই তা হয় 'রাজনীতি'—কাজেই তাতে স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে না—ওপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া জিনিস—কাজেই লোকসঙ্গীত নয় ভাবায় সুরে বাচন-ভঙ্গীতে লৌকিক হলেও কিংবা লক্ষ লক্ষ জনসাধারণ সেই গানে মাতোয়ারা হলেও। এহেন যুক্তি ও গোঁড়ামী আমাদের দেশের অধিকাংশ লোকসঙ্গীত গবেষকের মধ্যে দেখেছি। কাজেই কবি জসিমউদ্দীনের দ্বিধার কারণও বুঝতে আমার কষ্ট হচ্ছিল না।

গত শতাব্দীতে ও এই শতাব্দীর প্রথম দিকে সারা ভারতে বৃটিশ শাসক ও আশ্রিত ভূম্যাধিকারী ও মহাজন শ্রেণীর বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্ত অসংখ্য কৃষক-বিদ্রোহ ঘটেছিল। সে সময় স্বতঃস্ফূর্ত ছড়া ও

সাধনা
বিউটি স্নো-এর
কোমল স্পর্শে
সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়
সাধনা বিউটি স্নো
•একটি অতি আধুনিক অঙ্গরাগ
ত্বক মালিন্যমুক্ত ও লাবণ্যযুক্ত করে। মুখশ্রীতে লালিত্যের ও তারুণ্যের আভা ফুটে ওঠে।
SADHANA
Beauty
সাধনা ঔষধালয় কলিকাতা-৫

গান জন্মেছিল, কিন্তু গবেষকদের গোঁড়ামীতে এসব লোকসঙ্গীতের স্বীকৃতি পায় নি। এসব গানের সংগ্রহ ও সংরক্ষণের কোনো চেষ্টাই তেমন করা হয় নি। তাই লোকসঙ্গীতের এই গৌরবময় ঐতিহ্যের অনেক নিদর্শন আজ অবলুপ্ত ও দুষ্প্রাপ্য।

বিদ্রোহ করেছে কিন্তু বারে বারে পরাজিত হয়েছে আমাদের জনসাধারণ। তাই বিফলতার এবং বঞ্চনার করুণ সুরটাই বেশি করে ধ্বনিত হয়ে উঠেছে আমাদের লোকসংগীতে। এই লোক-সংগীতগুলি জনতার জীবনের ট্র্যাজেডিরই দর্পণ।

কবি জসিমউদ্দীনের আত্মজীবনীমূলক "স্মৃতির পটে" 'আঙুল কাটিয়া কলম বানাইয়া নয়নের জলের কালী' দিয়ে এমন কয়েকটি জমিজিরাতহীন গ্রাম্য শিল্পীর মরমী ছবি এঁকেছেন—যা শুধু তাঁর পক্ষেই সম্ভব। তাঁদের মধ্যেই এক সময় তিনি ঘুরেছেন—তাঁদের শূন্য-ঘর থেকেই লোকসংগীতের সম্পদ আহরণ করেছেন। চরভদ্রাসনের আইজদ্দীর বউটিকে তিনি ভুলতে পারেন নি—মুর্শিদও ভুলতে পারছে না। উপোস করে মরলো কিন্তু ইজ্জৎ বিক্রি করলো না।

"শাকপাতা নুন ফেন খাওয়া আইজদ্দীর বউ-এর 'বুহিব দুধ' শুকাইয়া গেছে—কাঁচ ছাওয়ালটারে চাইলের গুঁড়া পানিত বলক দিয়া খাওয়াইয়া বাঁচাইয়া রাখছে—কেবল কবির 'দোওয়ায়'। কবি তো সাধারণ লোক নন—পীর মুর্শিদেরও বড়। .. আইজদ্দী ডুকরাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, 'কবি সাব, ক্ষিধার সময় ও যহন কান্দে তহন মনে অয় ও যদি না এত তাই যেন্ বাল ছিল।' .... আমাগো গরিবির পুলাপান না অওযাই বাল। ..

বারে মুর্শিদা গানের আসর বসিল। একপাশে আইজদ্দী বসিয়া। গানের পর গান চলিতেছে,—

'দুবলার শিষে যেমন নিহারের পানি
কোনজনা বেইমানে কইছে এই দেহ
আপনি।

বড়ঘর বাইনদাছ সোনা ভাই
বড় করছাও আশা
রজনী প্রভাতের কালে পংখী ছাড়বে
বাসা।

গান শুনিতে শুনিতে ভাবিতেছিলাম, জীবনে যাহারা কিছুই পাইল না, পৃথিবীর সুন্দর ভোগের পাত্রখানি যাহাদের কাছে চিরকালের মতই রুদ্ধ, এই বৈরাগ্যের গান তাহাদিগকে কে শিখাইল।

কি হালে কিভাবে রাখছরে দয়ালচান
তুই আমারে
যেভাবে রাইখাছ ওরে দয়ালচান
আমি তাইতি সুখী আছি রে।
তুমি কার দিছাও দালান কোঠা
আমার ভাঙ্গা কুইড়ারে
তুমি কারে খাওয়াও চিনি সন্দেশ
আমার খুদের জাউরে।

এই গান উহাদের কে শিখাইল?...... কিন্তু আজ খুদের জাউও যে তাহাদের নিকট হইতে অপসারিত হইয়াছে, দয়াল আল্লা আজ কি সান্ত্বনা তাহাদের দিবেন? .... যাহারা বড় ঘর বান্ধিয়া, বড় আশা করিয়া আছে, রজনী প্রভাতের কালে পংখী বাসা ছাড়িয়া যাইবে এই অভিশাপের বাণী শুনিয়া সেই বড় লোকেরা কি এক মুহূর্তের জন্যও এই সব অনাহারী ভাইবোনদের কথা একবারও চিন্তা করিবে? ....

গানের মজলিশে সবার চোখের পানির সঙ্গে আমারও চোখের পানি মিশাইয়া এই কথারই মীমাংসা খুঁজিতেছিলাম।...... মুর্শিদা গানের করুণ সুরের ওপর পা ফেলিয়া আইজদ্দীর সেই সুন্দর বউটি যেন তার কঙ্কালসার পুত্রটিকে কোলে লইয়া ডুকরিয়া ডুকরিয়া কাঁদিয়া ফিরিতেছে।"

লোকসংগীতের স্রষ্টা যাঁরা তাঁদের সৃষ্টিশীল উপোসী আত্মার এমন ছবি কেবল জসিমউদ্দীনই আঁকতে পেরেছেন। এ ছবি যাঁদের চোখের সামনে থাকে না তাঁরা কোনদিন আবেগ দিয়ে লোকসংগীত গাইতে পারেন না। একথাটাই আমি কলকাতার লোকসংগীত গায়কদের অনেকবার বলবার চেষ্টা করেছি। আবেগ ধার করা যায় না। আবেগ অনুশীলনের জিনিস নয়। আবেগ আসে জীবনে জীবন মেলানো থেকে।

এই পশ্চাৎপট মনে নিয়েই কবি জসিমউদ্দীনকে বলেছিলাম—"আপনার আইজদ্দীরই দোসর" জমছেউদ্দীন, বা রসিদউদ্দীনরা যখন নেত্রকোণায় সর্বভারত সম্মেলনের লক্ষাধিক জমায়েতে গেয়ে ওঠেন,

"আমার দুঃখের অন্ত নাই
দুঃখ কার কাছে জানাই
সুখের স্বপন ভাঙলোরে
চরাইবাজারে।
ও ভাইরে ভাই—তেরশ' পঞ্চাশের কথা
মনে কি কেউর পড়ে রে
মনে কি কেউর পড়ে
ক্ষুধার জ্বালায় বুকের ছাওয়াল
মায়ে বিক্রি করে রে
চরাইবাজারে।
....

কালোবাজারীদের বিরুদ্ধে লক্ষ লোককে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার আবেদন জানিয়ে জমছেউদ্দীন তাঁর দীর্ঘ গানের পালা শেষ করেন। কৃষক সভার আন্দোলনের ঢেউ-এ পাল তুলে আপনার আইজদ্দীর জীবনের ভাঙা নাও নিয়ে উজান বেয়ে নতুন প্রাণ ও স্বাধিকার চেতনায় উদ্বুদ্ধ তাঁরই একজন দোসর—জীবন-বন্দরে পৌঁছবার জন্য বৈঠা হাতে তুলে নিয়েছিল। এটা কি লোকসংগীত নয়? কৃষকের একমাত্র বিলাস—পান-সুপারী ও তামাক। সেই পান ও তামাকের ওপর যখন ট্যাক্স বসলো তখন সিলেটের আবদুল শফ্ফার প্রচণ্ড শ্লেষ ও বিদ্রূপে গান লিখেন:

সর্কার, গুয়া খাছো টেক্স লাগিল নি—
বাটার উপর পইলো ঠাটা
গাল ভরি পান খাইতায় নি॥
টেক্স দিও বিয়া বইলে
টেক্স দিও পুয়া হইলে
মইলে পরে টেক্স দিয়া
চিতার আগুনে জ্বলবায় নি॥
তাবার টেক্সীর তেল জুগাইয়া
আমরা মরি টেক্স বইয়া
ভূতের বেগার খাটি মইলাম
মইলে ভূত রইমু নি॥

(গুয়া—সুপারী। ঠাটা—বাজ। পুয়া—ছেলে। সব মটর গাড়িকেই গ্রামে 'টেক্সী' বলে। নি—মানে কি। খাটি—খাটিয়া)।

এই গানখানা পুরো গাওয়া হবার পর কবি এই রচনার তারিফ করেন পঞ্চমুখে। এটা যে লোকসংগীত—নতুন ভাবের; একথা কবি জসিমউদ্দীন অস্বীকার করতে পারলেন না।

"সাবধানে গুরুজীর নাম লইও রে—
সাধুভাই
সাবধানে গুরুজীর নাম লইও।"

এই সারিগানের ধারা বেয়েই যদি একজন আজকের রচয়িতা লিখেন—

"তোমার কাস্তেটারে দিও জোরে শাণ
কিষাণ ভাইও—
কাস্তেটারে দিও জোরে শাণ
ফসল কাটার সময় এলে কাটবে
সোনার ধান
দস্যু যদি লুটতে আসে কাটবে
তাহার জান-রে
কাস্তেটারে দিও জোরে শাণ॥
ইত্যাদি........

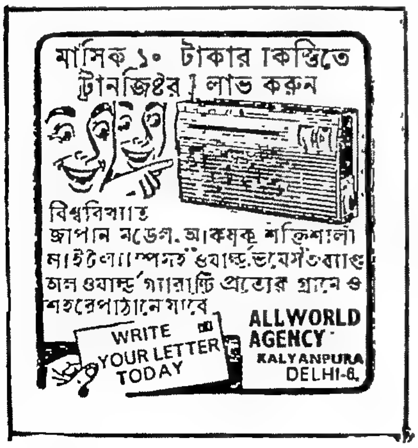

এই গান যখন বাংলার গ্রামে গ্রামে লক্ষ লক্ষ কৃষকের কণ্ঠে, ঘাটে, পথে, জমায়েতে, ধানের ক্ষেতে ধ্বনিত হতে শুনি তখন কি তা লোকসংগীত হয় না? —যেহেতু কান্নার কথা নেই—আছে লড়াই-র কথা?

বলা বাহুল্য, আমি লোকসংগীতে গণনাট্য আন্দোলনের অধ্যায়ের কথাই তাঁকে বলছিলাম। কবি জসিমউদ্দীনরা লোকসংগীতকে পুনঃসঞ্জীবিত করেছিল—কিন্তু সারা ভারতে গণনাট্য আন্দোলন লোকসংগীতকে পুনঃসঞ্জীবিত করেছিল নতুন ভাবসম্পদে—শ্রেণী-সংগ্রামের চেতনায়।

গণনাট্য আন্দোলনে প্রধানত দু'ধারায় গীত রচিত হয়েছিল। একটি ডি, এল, রায়, রবীন্দ্র, নজরুল, অতুলপ্রসাদী স্বদেশী গানের ধারায়। যার নাম হলো গণসংগীত। আরেকটি প্রবহমাণ বিভিন্ন আঞ্চলিক লোকসংগীতের ধারায়—এগুলি কৃষক আন্দোলনের গান বলে সেদিন পরিচিত হলেও—ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে লোক-সংগীতে শীর্ণ স্রোতে আনে নতুন ভাবের বন্যা। রচনায়, সুরে, জনগ্রাহ্যতায় তা হলো লোকসংগীতের ক্ষেতে একেবারে নতুন সোনালী ফসল।

আমি একথা বলছি না যে, সে সময়-কার সব গানই সার্থক হয়েছিল। আমাদের প্রাচীন লোকসংগীতেও বহু অসার্থক গান আছে—দেহতত্ত্বের কিংবা কানাই বলাই-এর পুনঃপৌনিকতায় একেবারে রচনার শিথিল গ্রন্থিতে অত্যন্ত দুর্বল। গণনাট্য গানেও তেমনি হয়েছে অনেক। লোকসংগীতের কাব্যমাধুর্য অনেকেই বজায় রাখতে পারেন নি। তাছাড়া শত শত বৎসরের যে জীবন-দর্শনে জনজীবন আচ্ছন্ন সেখানে লোক-কবির যদি কোন নতুন জীবনদর্শনে মনের গভীরে দানা না বাঁধে—তবে তাঁর প্রকাশ-ভংগী অনেক সময় যান্ত্রিক হয়। কবি রমেশ শীলকে একবার জিজ্ঞাসা করে-ছিলাম—আপনার মাইজভাণ্ডারের দেহ-তত্ত্বের গানগুলিতে যে কাব্যগুলি পাই—কৃষক আন্দোলনের গানগুলিতে তা পাই না কেন? তাঁর সঙ্গে আলোচনার অভিজ্ঞতা থেকেই আমি একথাগুলি বলছি। তবু পূর্ববঙ্গের কবিয়ালের ঐতিহ্য অনুসরণ করে রমেশ শীল যখন 'মাউন্টবেটনী স্বাধীনতা'-র স্বরূপ সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন—

'কুদিন গেল, সুদিন এল
বড় সুখের কথা—
বসন্তেব বাতাসে কেনে
ঝরে গাছের পাতা?
দেশের কি স্বাধীনতা আসিল?

তখন রমেশ শীল অগণিত মানুষের মনের কথাটাকে প্রকাশ করে, আজকের যুগের কবিয়ালের মহান দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গণনাট্য আন্দোলনের প্রেরণায় সেদিনের লেখা বহু গান লোক-সংগীতের ভাণ্ডারে অমূল্যসম্পদ হয়ে জমা হয়েছে। আজ রেডিও বা রেকর্ড কোম্পানী বা কিছু গোঁড়া লোকসংগীত গবেষক সেগুলিকে বাদ দিতে চাইলেই তা বাদ হয়ে যাবে না—জনসাধারণের মনের মণিকোঠায় জমা হয়ে থাকবে। কিন্তু এ ধরণের গান হবার পর—পূর্বপাকিস্তানের—তথা বাংলা ভাষার মোড় ফেরানো ঘটনা ২১শে ফেব্রুয়ারীকে কেন্দ্র করে—ময়মন-সিংহের চারণ সুরে রচিত ব্যালাড "ঢাকার ঢাক" কবি জসিমুদ্দীনকে মুরশিদের সহযোগী শিল্পীরা শোনালেন—। সমস্ত অন্তর তাঁরা সেদিন ঐ গানে ঢাকার প্রতিনিধির সামনে ঢেলে দিয়েছিলেন।

শোন দেশের ভাইভগিনী
শোন আচানক কাহিনী
কান্দে বাংলা জননী
ঢাকার শহরে॥
ভাই রে ভাই—বুড়িগংগার মরাপানি—
তার বুকে কে আনলো যোয়ানী—রে
কা'ব কইলজার খুনে বয় উজানী
শুকনা বালুর চরে।
ভাইরে ভাই—
২১শে ফেব্রুয়ারী দিনে
খুশির মধু নয়া ফাগুনে রে
হঠাৎ দিনদুপুরে অমানিশার
ঢাকলো অন্ধকারে॥
....
ভাইরে ভাই—
যে ভাষায় আমাব ফুটে বুলি
ফুটে আমার প্রাণের কলি—রে
সে গুলবাগে চালাইল গুলি
নিতে সেই ফুল ছিঁড়ে॥
....

ভাষা আন্দোলনেব ঘটনাব ও শহীদদের আত্মদানের বর্ণনা সুরের আশ্রয়ে যে পরি-বেশ সৃষ্টি করেছিল—তাতে কবি জসিম-উদ্দীন একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েন। গান এগিয়ে চলেছিল—

কাইন্দ না মা কাইন্দ না
আর বঙ্গ জননী।
....
যে ভাষায় আমি কান্দি হাসি ভাষা
আমাব জান—
যে ভাষায় রাখাল বাজায় বাঁশী
মাঝি ধরে টান—
আজ মেশিনগান কি রুখতে পারে
আমার বাংলা গান—
জান যাবে তো যাবে না জবানী॥
শহীদস্তম্ভ ভাঙে কার সাধ্য আছে
কার
মোদের সিনায় সিনায় ওঠে শহীদের
মিনার
সেই মিনারে মোয়াজ্জীনের
নয়া জমানার
শোন ভোরের শোন আজান ধ্বনি॥

গান শেষ হবার পর অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে কবি মুখর হয়ে ওঠেন। তিনি বলেন লৌকিক ঢঙে যে এই বিষয় নিয়ে এমন গান তৈরি হতে পারে—তিনি তা ভাবতে পারেন নি। —দেশে ফিরে তিনিও চেষ্টা করবেন এ ধরণেব গান রচনা কবতে। কবির এই উচ্ছ্বসিত স্বীকৃতি মুরশিদের একটা বড়ো জয়।

সত্যিই কি কবি জসিমউদ্দীন নিজে একাজে হাত দেবেন? পূর্ববঙ্গ থেকে যে সব কবিতা আসছে তাতে নতুন জীবন স্পন্দন আমরা পাচ্ছি—যা পশ্চিমবঙ্গের বাংলা কবিতায় নেই। কিন্তু একটা জিনিস অনুভব করছিলাম পূর্ববঙ্গেব কবিরা জনসাধারণের ভাষায় কথা বলতে পারছেন না। লৌকিক ভাষার অনুপম কাব্যমাধুর্য ও চিত্রকল্পে সাধারণেব বোধগম্য কবিতা লিখতে পারছেন না। জসিমউদ্দীন এ কাজে হাত দিলে—অভিনব লোককাব্য—ছয়শত গ্রাম্য শহীদ যে কাব্যে কথা বলবে—তা পেতাম। —কিন্তু সত্যিই কি সেকাজে তিনি হাত দিতে পারবেন?

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে
বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী
বিদ্যাপতির সমগ্র পদ
মূল্য: চার টাকা
জ্ঞানদাসের সমগ্র পদ
মূল্য: দুই টাকা
গোবিন্দদাসের সমগ্র পদ
মূল্য: দুই টাকা
॥ প্রাপ্তিস্থান ॥
বসুমতী সাহিত্য মন্দির
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২
সান্যাল এণ্ড কোং
বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

পাঠক মন

সাপ্তাহিক বসুমতী প্রসঙ্গে

আপনার সম্পাদিত 'সাপ্তাহিক বসুমতী' পত্রিকার নির্ভীক, যুগোপযোগী ও যুক্তিবাদী মতামতের জন্য তরুণ বয়সেই পাঠক হয়েছি। এর দু'-একটি বিভাগ আমার বিচার-বুদ্ধির ঊর্ধ্বে হলেও অধিকাংশ বিভাগেই আমার চিন্তাধারার সাথে একমত। পত্রিকায় প্রচারিত 'পাঠকমন'-কে আমি অগ্রাধিকার দিই, কেন না জনকল্যাণের দিকে দৃষ্টি রেখে বিভাগীয় লেখকেরা আবেগের আতিশয্যে কখনও দু'-একটি ত্রুটিপূর্ণ কথা লিখলেও পরে যখন পাঠকমনে সমালোচিত হয়, তখন তাঁরা অকপটে স্বীকার করে নেন বলে।

বেশ কিছুদিন ধরে পত্রিকায় 'গ্রাম বাংলার কথা'য় গ্রাম বাংলার যে ছবি তুলে ধরা হচ্ছে, গ্রামের মানুষেরা নিশ্চয়ই তার জন্য আমার মত গর্বিত। কিন্তু লেখক শ্রীঅসীম মুখোপাধ্যায়কে অনুরোধ—শুধু শহরতলীর গ্রামগুলিতে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করলে চলবে না, তাঁকে যেতে হবে উত্তর সীমান্তে, নেমে আসতে হবে দক্ষিণে। যেখানকার মানুষগুলো যোগাযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন, সভ্যতার দীপালোক হতে বঞ্চিত। তাঁদের বিড়ম্বিত জীবনকাহিনী তুলে ধরতে হবে জনমানসে।

'সপ্তাহের বোঝা'র লেখক শ্রীকৃত্তিবাস ওঝাকেও আরও চাঙ্গা হতে হবে। বোঝার ভারে আমরা ক্রমশ যে নুয়ে পড়ছি মাটির কাছে—তার ছবি তাঁকে আঁকতে হবে তাঁরই বলিষ্ঠ লেখনীর জীবন্ত অক্ষরে এই 'সাপ্তাহিক বসুমতী'তে প্রতিটি সপ্তাহে।

এরপর, উন্নত জাতি গঠনের জন্য যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের প্রয়োজন, সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রেখে এই প্রগতিশীল পত্রিকাটি দুর্নীতির যে সব চিত্র তুলে ধরে তা প্রশংসনীয়।

সর্বশেষে আপনার নিকট অনুরোধ—দেশবন্ধু নামে যিনি খ্যাত, সেই বঙ্গবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের জীবনীচরিত্র 'সাপ্তাহিক বসুমতী'তে প্রচারিত হোক, তাতে আপনার সম্পাদিত আমাদের এই পত্রিকাটির গৌরব আরও বৃদ্ধি পাবে, তরুণসমাজ তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হবে। যেমন করে বর্তমানে প্রকাশিত 'অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়' উদ্বুদ্ধ করছে।

—শ্রীশুভ্রাংশুশেখর পতি
ডুমুরিয়া, পোঃ পাথরা
(মেদিনীপুর)

যাত্রায় রীতিবিরুদ্ধ কাজ

চিৎপুরের যাত্রাপাড়ায় বর্তমানে এক ধরণের অবাঞ্ছিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিচ্ছে। একই বিষয়ের ওপর লেখা পালা নিয়ে কয়েকটি দল অভিনয় করতে চলেছেন। নীতির দিক দিয়ে তা পরিহার করা উচিত।

বছরখানেক আগে থেকেই একটি দলের "রাজা রামমোহন" পালা আসরস্থ করার বিজ্ঞাপন প্রচারিত হয়েছে। এ বৎসর হঠাৎ আরেকটি দলও ঐ নাটকটি আসরস্থ করার বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। এর ফলে সমব্যবসায়ীদের মধ্যে এক ধরণের অকাম্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেবে। এটি রীতিবিরুদ্ধও বটে। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করছি যে, একসময়ে গিরিশচন্দ্র রাণা প্রতাপকে নিয়ে নাটক লিখতে শুরু করেন। কিন্তু দু'অঙ্ক লেখার পর তিনি শোনেন যে, স্টার থিয়েটারে দ্বিজেন্দ্রলালের রাণা প্রতাপ নাটকটি রিহার্সেল দেওয়া হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজের লেখা বন্ধ করে দেন। যাত্রাসম্প্রদায়গুলিরও কি এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিত নয়?

—শিব ভট্টাচার্য
৩।১ কেদার দত্ত লেন
কলকাতা-৬

"দুই বাংলা : একজন কবি" প্রসঙ্গে

সাপ্তাহিক বসুমতীর ৭৪ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যায় (ইংরেজী ৩১শে জুলাই ১৯৬৯) বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "দুই বাংলা : একজন কবি" আলেখ্যটিতে কয়েকটা ভুল তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। অত্যন্ত আকস্মিকভাবেই রবীন্দ্র সদনে কবির সম্বর্ধনা সভার সেই অনুষ্ঠানটিতে উপস্থিত হবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। কবি জসিমুদ্দীন সেখানে কখনও একথা বলেন নি যে, বিজয় সরকার (কবিয়াল) রবীন্দ্রনাথের গানে নিজে সুর আরোপ করে—সেই গান গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দিচ্ছে। কবির মূল বক্তব্য ছিল, "বিজয়ের গানে রবীন্দ্রনাথের গানের ভাবধারা ফুটে উঠেছে। সে রবীন্দ্রনাথের রচনা পড়ে এবং সেই ভাবধারায় রচনা করে গান। তার সেই গান পূর্ব বাংলার প্রতিটি জেলার প্রত্যেক গ্রামে সমাদৃত।" এ কথার অর্থ কখনও এমন দাঁড়ায় না যে, বিজয় সরকার রবীন্দ্রনাথের গানে নিজে সুর আরোপ করে সেই গান গ্রাম বাংলায় ছড়িয়ে দিচ্ছে। আর বিজয়ের সম্পর্কে কবির উক্তিও সম্পূর্ণ সত্য। কারণ যতদূর জানা গেছে তাতে জানি যে বিজয় সরকার অন্যান্য অধিকাংশ গ্রাম্য কবিদের মত সম্পূর্ণ অশিক্ষিত নয়। ফলে তার পক্ষে বিভিন্ন মনীষীদের রচনা থেকে ভাবধারা সংগ্রহ করা মোটেই কষ্টকর ব্যাপার নয়। এবং তার মধ্যে এই শিক্ষার আলোক থাকার জন্যই তার গানের ভাষাও অনেক পরিমার্জিত। অজ্ঞ লোক-কবিদের রচিত গানে এমন অনেক কথা পাওয়া যাবে, যার অর্থ আমাদের শিক্ষিতসমাজে আদৌ বোধগম্য হবে না। কিন্তু বিজয়ের রচনার শব্দসম্ভার শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকলের কাছেই বোধগম্য।

লোকসংগীতের চর্চাকারী ও সংগ্রাহক হিসাবে বিজয়েরও বহু গান আমার সংগ্রহে আছে। নিম্নের গানখানি থেকেই বিজয়ের রচনা কুশলতার একটা মোটামুটি ধারণা পাওয়া যাবে।

কি সাপে কামড়াল আমারে
ও সাপুড়িয়া রে—আমি—
জ্বলিয়া পুড়িয়া মইলাম রে বিষে।

হাসনাহানা হাসতেছিল
সন্ধ্যারি আঁধারে
আমি তখন দাঁড়িয়ে ছিলেম
তাহারি দুয়ারে
সেই সাপ ছিল ঐ ঝোপের আড়ে
আমি আগে পাই নাই দিশে (রে)॥

কাল বরণ সাপরে ও তার
মাথায় মাণিক দোলে
হাসনা ফুলের গন্ধেরে সাপ
ছিল তাহার তলে
এখন বিশগুণে উঠেছে ঐ বিষ
আমার রক্তের সনে মিশে (রে)॥

আগে যদি জানতাম সখি
বিষের এত তাপ
ঘর বাঁধিতাম হাওয়াই দ্বীপে
যেখানে নাই সাপ
আমি এড়াইতাম এই বিষের জ্বালা
লইয়া ওঝার পরামিশে (রে)॥

বিজয় বলে সাপের লেখা
এড়ান না যায়
বনের বাঘে খায় না তোরে
মনের বাঘে খায়
এমন দংশিছে অনেকের হিয়ায়
কভু আশীবিষে (রে)॥

আশা করি এর থেকেই বিজয়ের রচনা-বৈশিষ্ট্য পরিষ্কার হয়ে যাবে। অবশ্য আমি একথা বলছি না যে, শ্রীচট্টোপাধ্যায় ইচ্ছাকৃতভাবেই এই ভুল তথ্য তুলে ধরেছেন। এটা ঘটেছে নিতান্ত অমনযোগিতার জন্য এবং কবির উক্তির যথার্থ অর্থ না বুঝে লেখার জন্য। কিন্তু একটু সতর্ক হলে এগুলোকে এড়ান সম্ভব। নইলে এই ধরণের তথ্য পরিবেশিত হলে আমরা যেমন অবিচার করব রবীন্দ্রনাথের ওপর, ঠিক তেমনই অবিচার করা হবে লোক-কবিদের ওপরেও।

—নীলরতন কাইয়া
ভালুকা ব্লক, কাটিহার
(বিহার)

রঙ্গমঞ্চ ও শিল্পী স্বদেশে এবং বিদেশে

(পূর্ব-প্রকাশিতের পর)

অনন্যা

তৃতীয় অঙ্ক

[আগেকার অঙ্কের যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে এ অঙ্কের শুরু—অভিজিৎ ফোনে কথা বলছে।]

অভিজিৎ—আচ্ছা, ধন্যবাদ অনাদিবাবু।

[ফোন রেখে দেবে।]

সুজাতা—অনাদিবাবুর সঙ্গে একটু আগে কি খারাপ ব্যবহারটাই করলে।

অভিজিৎ—আচ্ছা, যাবার সময় মাপ চেয়ে নেব।

সুজাতা—এই একটা জিনিস তোমার বড় খারাপ। অনাদিবাবুর কথা ছেড়ে দাও—তোমার রাগ হোলে তার ফল ভুগতে হয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে গাড়ির ড্রাইভার, হোটেলের ওয়েটার বা স্টেশনের কুলিদের।

অভিজিৎ—এর জন্য আমি নিজের ওপরেও কম বিরক্ত হই না—তাছাড়া এসব ক্ষেত্রে অন্যায় ব্যবহার করবার পরই, অন্যভাবে সেটা পুষিয়ে দিতে চেষ্টা করি—

সুজাতা—বেশি করে বকশিস দিয়ে, এই তো? (হেসে উঠবে)—কিন্তু কেন ভুলে যাও যে এরাও তোমার আমার মত মানুষ।

অভিজিৎ—এবার থেকে দেখবে আমি সম্পূর্ণ বদলে গেছি—তুমি পাশে থাকলে আমার real self-কে খুঁজে পাবো—আমার সমস্ত মন থাকবে লেখার ভেতর—আর তুমিও নিশ্চয় এবার থেকে খুব ভাল ভাল ছবি আঁকতে পারবে।

সুজাতা—(উৎসাহভরে) পারব বৈকি! আমি কি তোমার থেকে পেছিয়ে থাকবো মনে কর?

অভিজিৎ—আচ্ছা এখান থেকে আমরা কোথায় যাব প্রথম......

সুজাতা—(হেসে উঠে) কেন? আমরা যাব নিরুদ্দেশ যাত্রায়!

অভিজিৎ—(আবৃত্তির সুরে)—

"যখন প্রথম ডেকেছিলে তুমি
'কে যাবে সাথে'
চাহিনু বারেক তোমার নয়নে
নবীন প্রাতে।
দেখালে সমুখে প্রসারিয়া কর
পশ্চিমপানে অসীম সাগর,
চঞ্চল আলো আশার মতন
কাঁপিছে জলে।
তরীতে উঠিয়া শুধানু তখন
আছে কি হোথায় নবীন জীবন,
আশার স্বপন ফলে কি হোথায়
সোনার ফলে?
মুখপানে চেয়ে হাসিলে কেবল
কথা না বলে।"

ঠিকই বলেছ—প্রথমটা হবে নিরুদ্দেশ যাত্রা—অর্থাৎ গাড়িতে বসে যেখানে মনে হবে, সেইখানেই যাব।

সুজাতা—পাহাড় থেকে নেমে স্টেশনে গিয়ে যে নামটা মনে আসবে সেখানকারই টিকিট নিয়ে গাড়িতে উঠে বসব।

অভিজিৎ—Agreed—আমি সম্পূর্ণ একমত।

[এবার অলকা এসে ঘরে ঢুকবে। এরা দুজনেই থমকে যাবে।]

অলকা—(অভিজিৎকে) এতক্ষণে নিশ্চয় রহস্যের সমাধান হয়ে গেছে?

অভিজিৎ—(একটু ইতস্তত করে) শোনো অলকা! (থেমে যাবে)।

অলকা—বল, কি বলতে চাও?

সুজাতা—আচ্ছা, আমি বলছি......

অলকা—থাক, যা শোনবার আমি আমার স্বামীর মুখ থেকেই শুনতে চাই।

অভিজিৎ—(সমস্ত দুর্বলতা কাটিয়ে উঠে) আমরা এখানে এসেছিলাম finally settle করতে যে ভবিষ্যতে স্বামী-স্ত্রী হিসাবে আমরা কাটাতে পারবো কি-না—ভেবে দেখলাম তা আর সম্ভব নয়—একটু বাদেই আমি শিলং ছেড়ে চলে যাব......

অলকা—একলা—না......

সুজাতা—আমিও সঙ্গে যাব।

অলকা—আগেকার বন্দোবস্ত অনুসারেই বোধ হয় এটা হয়েছে?

অভিজিৎ—(চটে উঠে) আগেকার বন্দোবস্ত! তুমি কি মনে কর ব্যাপারটা এতই হাল্কা!

অলকা—তাছাড়া কি মনে করবো? আধ ঘণ্টা আগেও তো এমন ভাব দেখাচ্ছিলে যে কেউ কারোকে চেনো না।

অভিজিৎ—(রেগে উঠে) যা বোঝ না সে বিষয়ে কথা বলতে এস না।

অলকা—(বিদ্রূপের সঙ্গে) না—আমি তো কিছুই বুঝি না?

অভিজিৎ—(চিৎকার করে উঠবে) অলকা!

সুজাতা—অভিজিৎ তুমি এখান থেকে যাও—আমি অলকার সঙ্গে কথা বলছি।

অভিজিৎ—কিন্তু—

সুজাতা—আমি তোমাকে অনুরোধ করছি অভিজিৎ—তুমি জিনিসপত্র গুছিয়ে নাও—গাড়ির বন্দোবস্ত কর—আমি ততক্ষণে অলকাকে সব বুঝিয়ে বলছি......

[বিরক্তিভরে অভিজিৎ ঘর থেকে চলে যাবে।]

অলকা—আপনি যদি মনে করে থাকেন যে আপনার কথায় ভুলে ওকে আমি আপনার সঙ্গে চলে যেতে দেব, তবে ভুল করছেন। (একটু থেমে) গত কয়েক মাস আমরা আলাদাভাবে ছিলাম—কারণ, দেখছিলাম আমার সঙ্গটা ও কিছুতেই সহ্য করতে পারছে না, আর তাতে ওর কাজের ক্ষতি হচ্ছে। কিন্তু এখানে আসবার আগে আমি ঠিক করে এসেছিলাম যে, মিটমাট আমাদের করতেই হবে—ডিভোর্সের ব্যাপারে আমি কিছুতেই রাজী হব না।

সুজাতা—(শান্তভাবে) কিন্তু কেন?

অলকা—কারণ আমি সনাতন হিন্দুধর্মে বিশ্বাস করি—স্বামী-স্ত্রীর বিবাহ-বন্ধন অচ্ছেদ্য বলে মানি।

সুজাতা—আপনি কি বুঝতে পারছেন না যে, অভিজিৎ আর পাঁচজন মানুষের মত নয়—অনেক কিছু বড় কাজ করবার শক্তি ওর আছে। আপনার সংস্পর্শে থাকলে কোনোকিছুই ও করতে পারবে না। এভাবে ওর জীবনটাকে নষ্ট করে দেবার কি অধিকার আপনার আছে?

অলকা—আমার কাছ থেকে এ কৈফিয়ৎ চাইবারই বা আপনার কি অধিকার আছে?

সুজাতা—আছে বই কি! আমি অভিজিৎকে শ্রদ্ধা করি, ওর বিরাট প্রতিভা সম্বন্ধে জানি—আর সবার ওপর (একটু থেকে) আমি ওকে ভালবাসি।

অলকা—আপনার এখানে আসার উদ্দেশ্য বুঝি ছিল আমার কাছ থেকে ওকে ছিনিয়ে নিয়ে যাওয়া?

সুজাতা—না, সেজন্য আমি এখানে আসি নি। ও এখানে আসছে অত্যন্ত বিষাদভরা মন নিয়ে—এইটেই জানতাম। গত দু'বছর আমি লণ্ডনে ছিলাম এবং ওর কোনো খবরও রাখতাম না। এখানে এসে দেখলাম, আমাকে ওর দরকার—আমাকে কাছে না পেলে ওর ভেতরকার শিল্পীকে

বাঁচিয়ে রাখা যাবে না—কোনো কিছু সৃষ্টি করবার প্রেরণাও ও পাবে না।

অলকা—কি করে জানলেন?

সুজাতা—বললেও আপনি ঠিক বুঝতে পারবেন না। অলকাদেবী, আমার বা আপনার বিষয় চিন্তা না করে অভিজিতের কথা ভাবুন। ও সত্যিকার জাত শিল্পী—আর প্রতিভা থাকলেই যা হয়—ওর মনটা অত্যন্ত sensitive, অত্যন্ত delicate—ওকে প্রেরণা দিতে হলে শুধু নিজের কথা ভাবলে চলবে না—

অলকা—আমাকে উপদেশ দিচ্ছেন, কিন্তু আপনিও তো খালি নিজের কথাটাই ভাবছেন।

সুজাতা—তার মানে?

অলকা—তার মানে অত্যন্ত সহজ। অভিজিৎকে ভালবাসেন, তাই তাকে আমার কাছ থেকে কেড়ে নিতে চাইছেন। তার ফলে আমার জীবনটা একেবারে শেষ হয়ে যাবে।

সুজাতা—কিন্তু বিবাহিত জীবনে আপনারা তো সুখী হতে পারেন নি।

অলকা—এ আপনার সম্পূর্ণ ভুল ধারণা—বিয়ের পর প্রথমটায় আমরা খুবই আনন্দে কাটিয়েছি। তখন সব কিছুই মধুর, সব কিছুই সুন্দর, সব কিছুই আলোয় ভরা বলে মনে হোত।

সুজাতা—তাই যদি হয়, তবে কিছুক্ষণ আগে যে আমাকে বললেন আমি অদৃশ্যভাবে আপনাদের মাঝে এসে দাঁড়িয়ে ব্যবধান সৃষ্টি করতাম?

অলকা—(হতচকিতভাবে) বলেছি, না? পরে এই কথাটাই মনে হোত—মনে হোত আমাদের দুজনের মাঝে যেন একটা ছায়া এসে পড়েছে—যেন কেউ একজন অদৃশ্যভাবে থেকে আমাদের ওয়াচ করছে। কিন্ত সত্যিই বিশ্বাস করুন এই ছায়াশরীরীর আবির্ভাবের আগে আমরা যে কি আনন্দে কাটিয়েছি।

সুজাতা—আমার মনে হয় আমি সত্যিই আপনাকে ভুল বুঝেছিলাম।

অলকা—(দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে) অভিজিৎও আমাকে আজকাল বুঝতে পারে না। হয়তো এর জন্য আমি নিজেই বেশি অপরাধী। আমি যে তার ওপর কতোটা নির্ভরশীল সে কথা কখনও বুঝতে দিই নি। ভেবেছি এর ফলে ওর কাছে আমার চার্ম যাবে নষ্ট হয়ে। ক্রমশ ও যখন আমাদের সম্বন্ধটাকে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগল—আমিও এমন ভাব দেখালামণ যেন আমারও ওই একই সন্দেহ। দুজনে ঠিক করলাম আলাদাভাবে কিছুদিন থাকবো—তারপর দুজনে আলোচনা করে ঠিক করবো কোন পথে যাব। অথচ, জান সুজাতা, ওর থেকে দূরে থাকতে গিয়ে প্রতিটি মুহূর্ত আমি নরকযন্ত্রণা ভোগ করেছি—এর থেকে বড় শাস্তি যে কিছু হতে পারে, তা আমি কল্পনা করতে পারি না। আজ যদি ও আমার কাছ থেকে চিরকালের মত দূরে চলে যায়, তারপর কি নিয়ে বেঁচে থাকবো বলতে পার?

সুজাতা—তুমি যে অভিজিৎকে এতোটা গভীরভাবে ভালবাস, তা সে জানে না অলকা!

অলকা—আমি স্বীকার করছি সুজাতা—ওইখানেই আমার ভুল হয়েছে—নিজের মনটা ওর কাছে সম্পূর্ণভাবে খুলে ধরি নি।

সুজাতা—সত্যিই তুমি ভুল পথে গিয়েছিলে অলকা।

অলকা—আমি বুঝতে পারছি ওর ওপর তোমার অনেক বেশি প্রভাব—কিন্তু আমি তোমার কাছে ওকে ভিক্ষে চাইছি সুজাতা। আমার এমন কোন আকর্ষণ করবার ক্ষমতা নেই—আমি বিদগ্ধ নই, ইনটেলেকচুয়াল নই, শিল্পী নই—অত্যন্ত সাদাসিধে।

সুজাতা—সত্যিই যদি তাই মনে কর—(ইতস্তত করবে)

অলকা—আমি বুঝতে পেরেছি তুমি কি বলতে চাও। অর্থাৎ আমার কাছ থেকে ও কি প্রত্যাশা করবে? (খুব আস্তে আস্তে এবং থেমে থেমে) কিন্ত ভেবে দেখ—ও যদি জানতে পারে ওর ওপর আমি কতটা নির্ভরশীল, ওর থেকে আলাদাভাবে আমার নিজস্ব কোনো সত্তা নেই। ওর ভালবাসা পেলে তবেই আমার জীবন সার্থক হয়ে উঠবে—তখনও কি অভিজিৎ আমাকে ভালবাসতে পারবে না? আমি বলছি, প্রথমটায় হয়তো ওর অনুকম্পা হবে—কিন্ত শেষ পর্যন্ত ওকে ভালবাসতেই হবে। আর আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি—আমি ওকে সুখী করবো—ওর মনে শান্তি ফিরিয়ে আনব—ও আবার সৃষ্টির আনন্দে মেতে উঠবে।

সুজাতা—সত্যিই কি তুমি তা পারবে?

অলকা—(শেষ আবেদনের সুরে) আমি জানি আমার এ দাবির পেছনে কোনো যুক্তি নেই। তুমি সব দিক থেকে আমার চেয়ে অনেক বেশি যোগ্য—কিন্তু অভিজিৎকে বাদ দিয়েও তোমার জীবনের আর একটা দিক আছে—আমি তোমার ছবি আঁকা নিয়েই সব কিছু ভুলে থাকতে পার।

সুজাতা—তা হয়তো পারি।

অলকা—আর তোমাদের ভেতর যদি কোনো অদৃশ্য বন্ধন থেকে থাকে—সে তো চিরকালই অক্ষুন্ন থাকবে। সে বন্ধন ছিন্ন করবো এমন শক্তি আমি কোথায় পাব বল?

সুজাতা—তুমি সত্যি কথাই বলেছ। (জানলার দিকে চেয়ে) ঐ অভিজিৎ আসছে। তুমি অন্যদিকের দরজা দিয়ে চলে যাও—জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে অভিজিতের সঙ্গে চলে যাবার জন্য তৈরি হও গিয়ে। দেরি কোরো না।

অলকা—(অবিশ্বাসভরে) তুমি তাহলে সত্যিই আমার কথায় রাজী হলে—

সুজাতা—আঃ, দেরি কোরো না অলকা—চলে যাও।

অলকা—অনেক ধন্যবাদ সুজাতা।

[দ্রুত বেরিয়ে যাবে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অভিজিৎ ঘরে ঢুকবে। অভিজিৎ ও সুজাতা কিছুক্ষণ দুজনে দুজনের দিকে চেয়ে থাকবে।]

অভিজিৎ—আমি বুঝতে পেরেছি সুজাতা তুমি অলকার চোখের জল দেখে ভুলে গেছ—You have let me down.

সুজাতা—আমাকে ভুল বুঝো না অভিজিৎ—

অভিজিৎ—এই একটু আগে আমাকে আশার আলো দেখিয়ে উত্তেজিত করে তুললে—আর, তার পরমুহূর্তেই আবার টেনে নিয়ে এলে তিমির অন্ধকারে—কেনই বা এতসব কথা আমাকে বললে—

সুজাতা—বলতে তো আমি চাই নি অভিজিৎ—তুমিই তো আমাকে বাধ্য করলে বলতে?

অভিজিৎ—বেশ তোমার কথা আমি মেনে নিলাম। কিন্তু সব জানার পর কি করে আমি তোমাকে ছেড়ে যাব বলতে পার?

সুজাতা—দেখ একটু আগে পর্যন্ত অলকার মনের আসল পরিচয়টা আমি জানতাম না। আর তুমি এখনও ওকে ঠিকমত চিনে উঠতে পার নি।

অভিজিৎ—স্বামী-স্ত্রী হিসাবে এতদিন বাস করার পরেও আমি ওকে চিনে উঠতে পারি নি আর এই অল্পক্ষণের আলাপে তুমি ওকে পরিষ্কার বুঝে ফেললে?

সুজাতা—একটা ভুল ধারণার বশে ও তোমার কাছে নিজের মনটা ঠিক খুলে ধরে নি অভিজিৎ। তোমাকে বাদ দিয়ে ও নিজের অস্তিত্ব ভাবতেই পারে না—

অভিজিৎ—তুমি বোধ হয় জান না যে, আমার মত ও-ও যথেষ্ট সন্দিহান হয়ে উঠেছিল আমাদের এই দাম্পত্যজীবনে—আমরা দুজনে এই একই উদ্দেশ্য নিয়ে এখানে এসেছিলাম যে, হয় আমরা মিটমাট করবো, আর না হয় এ সম্পর্কের অবসান ঘটাব বিবাহ-বিচ্ছেদ করে।

সুজাতা—মুখে ওকথা বললেও সে মনে মনে জানতো তোমাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। She is entirely dependent on you.

অভিজিৎ—তুমি ভুল করছ না ত সুজাতা? আমার কাছে ওর মনের আসল পরিচয়টা গোপন করে রাখার উদ্দেশ্য কি?

সুজাতা—ওর বোধ হয় মনে হয়েছিল নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বুঝতে দিলে তোমার কাছে ও পুরোনো হয়ে যাবে। অলকার সঙ্গে তুলনায় আমরা দুজনেই অনেক বেশি শক্ত—কারণ দুজনেরই আছে একটা শিল্পচর্চার দিক। ওর যে তা নেই—তোমাকে নিয়েই তো ওর জীবন!

অভিজিৎ—(চিন্তামগ্নভাবে) তুমি ঠিকই বলেছ। সত্যিই কখনও ওর মনের আসল চেহারাটা বোঝবার চেষ্টা করি নি। কিন্তু এও বলবো সুজাতা—নতুনভাবে আমাদের সম্পর্কটাকে গড়ে তোলবার চেষ্টাটাও খুব সহজ হবে না।

সুজাতা—দেখ অভিজিৎ, তোমাদের পুরোনো দিনগুলো তোমরা ভুলে যাও। এ অলকা আর সেই আগের অলকা থাকবে না—আমাদের এই দেখাশোনা আর খোলাখুলি কথাবার্তার পর তুমিও হয়ে যাবে অন্য মানুষ।

অভিজিৎ—হয়তো তোমার কথাই ঠিক, আমরা প্রত্যেকেই এবার অনেক বদলে যাব—তবু তোমাকে এমন আকস্মিকভাবে খুঁজে পাব এবং এমনভাবে আবার হারাবো এ আমি ভাবতেও পারি নি।

সুজাতা—হারাবে কেন অভিজিৎ—এদিকে এস (আয়নাটার কাছে দুজনে এসে দাঁড়াবে)—ওখানে কি দেখছ?

অভিজিৎ—(হেসে) কি আবার দেখব! দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছি।

সুজাতা—(পাশে সরে গিয়ে) এবার দেখ আমার reflection আর পড়ছে না কিন্তু তাই বলে কি আমি তোমার কাছে নেই? পার্থিব জীবনে হয়তো আমরা পাশাপাশি থাকবো না অভিজিৎ—কিন্তু সে জীবনটা তো ওই আয়নার ওপরকার প্রতিবিম্বের মতন—এই দেখা যাচ্ছে আর পরমুহূর্তেই মিলিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যেখানে আমাদের আত্মার সম্বন্ধ সেখানে তো কোনো বাধা এসে আমাদের মিলনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াতে পারবে না—

[অনাদিবাবু এসে ঢুকবেন।]

অনাদি—আপনার গাড়ি এখুনি এসে যাবে মিস্টার গুপ্ত—আপনার বিলটা—

অভিজিৎ—আমার ঘরে পাঠিয়ে দিতে বলুন।

[অনাদিবাবু বেরিয়ে যাবেন।]

সুজাতা—আর দেরি কোরো না অভিজিৎ—তৈরি হও গিয়ে—

অভিজিৎ—Goodbye সুজাতা।

সুজাতা—Goodbye.

[অভিজিৎ ভেতরের দিকে যাবে—কিছুক্ষণ সব চুপচাপ থাকবে—এবার সুরমা মল্লিক ঘরে ঢুকবেন।]

সুরমা—ওঃ, সারাটা দিন খুব ঘোরা গেল—আমার এক বান্ধবী বলছিলেন তিনিও একবার এই হোটেলে উঠে কয়েকবার ঐ ছাই রংয়ের পোশাক পরা মেমসাহেবকে দেখেছেন—তারপর থেকে আর কখনও শিলং-এ এসে—

[কথা শেষ হবার আগেই যবনিকা নেমে আসবে।]

= সমাপ্ত =

আপনার কেশগুচ্ছ
দীর্ঘ সুন্দর ক'রে
আপনাকে রূপ-লাবণ্যে
উজ্জ্বল করবে
বেঙ্গল কেমিক্যালের
সুবাসিত—
তিল তৈল

বেঙ্গল
কেমিক্যাল
কলিকাতা • বোম্বাই
কানপুর • দিল্লী

সরকারী নির্দেশের পরিণতি

পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেক সিনেমায় বাংলা ছবি দেখাতে হবে, এমন একটা কাগজে নির্দেশের সংবাদ পড়েছিলাম। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই নির্দেশ জারী করেছিলেন। এই সংবাদ কাগজে প্রকাশের পর বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় টুকিটাকি মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল। কারো কারো মনে হয়ত একটা স্বস্তির ভাব এসেছিল, ভেবেছিলেন এবার বাংলার ছবির প্রদর্শনক্ষেত্র বাড়বে। পশ্চিমবঙ্গে যদি বাংলা ছবির প্রদর্শন-ক্ষেত্র বাড়ে তা হলে স্টুডিওগুলিও তেজী হয়ে উঠবে। ছবির চাহিদা বাড়বে। নতুন বিষয় নিয়ে ছবি করার সাহস হবে। কিন্তু এই রঙিন দৃশ্য সিনেমার ঘটনার মতই মিলিয়ে গেল। নির্দেশ কেবল কাগজপত্রের নির্দেশেই থেকে গেল। সিনেমাগুলিতে যথারীতি হিন্দী ছবি চলছে। হিন্দী ছবি দেখানো হত যে-সব সিনেমায় তার মধ্যে কয়েকটিতে ইংরেজী দেখানো হচ্ছে, কিন্তু বাংলা ছবি দেখানো হচ্ছে না। রাজ্যপালের সময় বহু নতুন সিনেমার জন্য লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। লাইসেন্সের আবেদনের সময় আবেদনকারীরা হয়ত বিনীতভাবে বলেছিল, তারা বাংলা ছবির পৃষ্ঠ-পোষকতার উদ্দেশ্যেই লাইসেন্স প্রার্থনা করছে। কিন্তু সিনেমা খোলার পর আবেদনকারীর সেই বিনীতভাব আর নেই। এখন সে-সব সিনেমায় বোম্বাই ছবির পুরো পৃষ্ঠপোষকতা চলছে। অর্থাৎ বোম্বাইয়ের ছবি দেখাবার ক্ষেত্র আরো সম্প্রসারিত হল।

এন্টালী মার্কেটের পাশে "জেম" নামে একটি নতুন সিনেমা খোলা হয়েছে। উদ্বোধনের সময় মালিকরা বাংলা ছবির প্রতি কি মমতার কথাই না বলে-ছিলেন। তারপরে পুরনো ছবি 'চন্দ্র-নাথ' দেখিয়ে কর্তব্য সম্পাদন করেছেন। সম্ভবত পাড়ার বাঙালী দর্শকদের অসন্তোষ চাপা দেবার উদ্দেশ্যে। স্থানীয় লোকের ধারণা ছিল হিন্দী এবং বাংলা পালাক্রমে দেখানো হবে। দক্ষিণ কলকাতার বাঙালী পাড়ায় "প্রিয়া" সিনেমার অবস্থিতি। কিন্তু মালিক কিরকম নিষ্ঠার সংগে হিন্দী ছবি দেখিয়ে বাঙালী পাড়ার দর্শকদের হিন্দী

বোম্বাই-এর চলচ্চিত্র অভিনেত্রী ববিতা

ভাবধারার সংগে পরিচিত করছে। একই মালিক 'গুপী গাইন বাঘা বাইন'-এর প্রযোজক। কিন্তু নিজেদের ছবিটিও তাঁদের সিনেমায় দেখান নি। এ'রাই আবার সময়মত বাংলা চলচ্চিত্রের পক্ষে কথা বলেন। বাঙালীর বসুশ্রী, বীণা কয়েক বছর আগেই হিন্দী ছবির পৃষ্ঠ-পোষকতা করছে। এই দুটি সিনেমায় এখন আর বাংলা ছবি দেখানো হয় না।

কলকাতা ছেড়ে শহরতলী বা জেলা শহরে গেলে অবস্থা আরো ভয়াবহ মনে হয়। হিন্দী ছবি যত বেশি তত বাংলা ছবি দেখবার সুযোগ পাওয়া যায় না। পাড়াগাঁয়ে পর্যন্ত হিন্দী ছবির সম্প্রসারণ হয়েছে। ছেলেমেয়েরা হিন্দী গানের কলি গুনগুন করছে শোনা যাবে।

হিন্দী ছবির এই ব্যাপকতায় বাঙালী প্রযোজকদের ধারণা হয়েছে, হিন্দীর মত করে ছবি করলেই বুঝি লাভ বেশি হবে। ফলে না হচ্ছে বাংলা ছবি, না হিন্দী। দেশ, কালের পরিচয়-হীন কিছু ঘটনা পর্দায় দেখা যাচ্ছে।

এখন যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রিত্ব। জাতীয় চলচ্চিত্র সম্পর্কে তাঁরা সচেতন—এই ধারণা করা স্বাভাবিক। চলচ্চিত্র উপ-দেষ্টা কমিটি গঠন ইত্যাদিতে চলচ্চিত্র শিল্পের যুক্তফ্রন্ট সরকারের আগ্রহের প্রমাণ পাওয়া গেছে। প্রত্যেক সিনেমায় বাংলা ছবি প্রদর্শনের যে নির্দেশ, তা কার্যকরী করার পথে সমস্ত বাধা দূর করবে যুক্তফ্রন্ট সরকার এই আশা করা যায়। চলচ্চিত্র উপদেষ্টা কমিটি এ-ব্যাপারে কার্যকরী পন্থা গ্রহণ করার পরামর্শ দিতে পারে। যাতে পশ্চিম-বঙ্গে প্রত্যেক সিনেমায় একটা নির্দিষ্ট সময় বাংলা ছবি প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করা যায়। নতুবা বাংলার চলচ্চিত্র-শিল্প আরো পিছু হটবে। —সুজন

চিত্র-আলোচনা

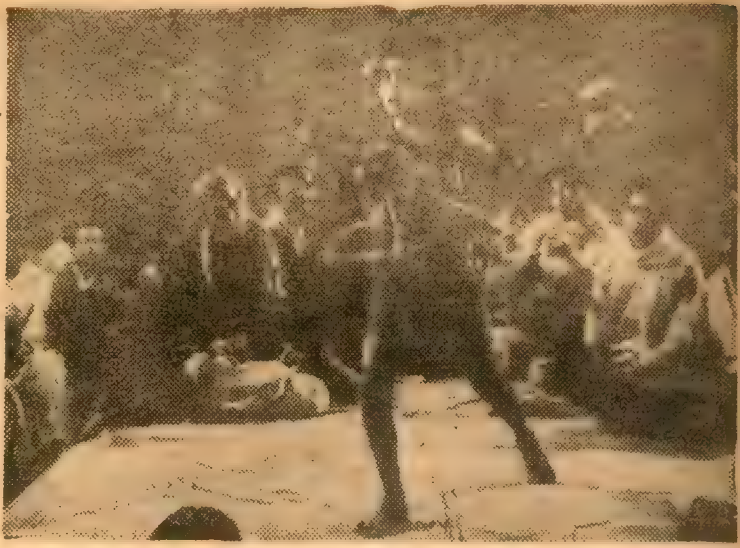

তীর্থভারতীর 'বালক গদাধর' ছবির একটি দৃশ্যে মাঃ সৌমিত্র। ছবিটির পরিচালনা করছেন হিরণ্ময় সেন।

পান্না হীরে চুনী

[পরিচালনা—অমল দত্ত]

দীনেশ চিত্রমের 'পান্না হীরে চুনী' শহরের সিনেমায় মুক্তিলাভ করেছে। যাত্রাদলের তরুণ গায়ক গোপাল সহকর্মীদের উৎসাহে কলকাতায় আসে বৃহত্তর সুযোগ পাবার আশায়। সৌভাগ্যক্রমে কয়েকজন সহৃদয় লোকের সাহচর্য লাভ করে সংগীতসাধনার পথে অগ্রসর হয়। কিন্তু যে তাকে অচেনা কলকাতার পথ থেকে ডেকে এনে ঘরে ঠাঁই দিয়েছিল, মিথ্যা অভিযোগে তাকে জেলে যেতে হয়, আর গোপাল দুর্ঘটনায় পড়ে অন্ধ হয়ে যায়। চঞ্চল মেয়ে টগর আর তার দাদা ভোলার আশ্রয়ে থাকে সে। এমন সময় বন্ধুরূপে নিশীথ সান্যাল উপস্থিত হয়ে তাকে জলসায় গান গাওয়ার সুযোগ দেয়, তাতে ওর নাম হয়, কিন্তু অন্ধ গোপালের পারিশ্রমিকটা নিজে আত্মসাৎ করে।

তারপরে একদিন কালো মেঘ সরে যাওয়ার মত গোপাল সমস্ত বুঝতে পারে। সে নিশীথের আশ্রয় থেকে আবার ভোলার বাড়িতে চলে আসে। তার চোখ ফিরে পায়; দৃষ্টি নিয়ে টগরের পাশে দাঁড়ায়।

এই কাহিনীর মধ্যে আর একটা উপকাহিনী আছে টগরের। টগরের বন্ধুরা সব রকের ছেলে। তাদের নিয়ে সে রকবাজী করে। মাঝরাতে দলবেঁধে পানওয়ালার কাছ থেকে গোপালের মেডেলটি পুনরুদ্ধার করে। ঘরে শান্ত, অথচ বাইরে রকবাজ। এরকম বোম্বেটে মেয়ে যে কলকাতায় আছে ছবিটি দেখে সে খবর পাওয়া গেল!

শুরুতে যাত্রাগানের অভিনয় ও গান থেকে সারা ছবিটিকে গানে গানে উপভোগ্য করার চেষ্টা হয়েছে। সেই সঙ্গে কাহিনীতে আবেগময় দৃশ্য সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে, অন্ধ হয়ে যাওয়া, রবির জেলে যাওয়া, ভোলার ভালমানুষী ইত্যাদিতে। সিনেমার ফর্মুলা মাফিক একজন ভিলেনও উপস্থিত হয়েছে। আর মিঠে-তেতোর মাঝখানে ঝালের মত এসেছে টগরের

ইন্দর সেন পরিচালিত 'প্রথম কদমফুল' ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও তনুজা

গীয়ত। শিক্ষিত-মনে এর কোন আবেদনই নেই. কিন্তু শতকরা পঁচাত্তরজন অশিক্ষিত ; তাঁদের কাছে এরূপ কাহিনীর অবশ্য আবেদন আছে।

পরিচালক নতুন এবং বয়সেও নবীন। তাই তাঁর আরো সতর্কতার প্রয়োজন ছিল। ঘটনাগুলিতে সময়জ্ঞান বা টাইম ফেক্টরকে একেবারে গ্রাহ্য করা হয় নি। শুকসারী ছবির বিজ্ঞাপন দেখতে দেখতে নায়কের কলকাতা আসা। আর এই ক'মাসের মধ্যেই সমস্ত ব্যাপার ঘটে গেল। চোখ অপারেশনের পরে ফ্ল্যাশে ছবি তোলা ইত্যাদিও অসতর্কতার লক্ষণ। গতানুগতিক ছক বাঁধা কাহিনী হলেও সময়জ্ঞান এবং খুঁটিনাটি বিষয়ে সতর্কতার ফলে ছবির কাহিনী বিশ্বাস্য হয়ে ওঠে। তবে এখানে ক্যামেরার কাজ পরিচ্ছন্ন। ফটোগ্রাফাদির পরিচ্ছন্নতা ছবিটিকে যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

পান্না হীরে চুনী-র সবচেয়ে বড় উপভোগ্য হচ্ছে গান। এই গানের সুর দিয়েছেন অজয় দাস। প্রথম সংগীত সম্মেলনের দৃশ্যটি অবশ্য বিশ্বাস্য হয়ে ওঠে নি। আর চন্দ্রানী মুখার্জীর গাওয়া গানটিও ভাল লাগে নি।

স্টার থিয়েটারের অভিনেতা সুখেন দাস রচিত কাহিনী এবং দেবনারায়ণ গুপ্ত লিখিত চিত্রনাট্য এই ছবির অবলম্বন।

শান্তিপ্রসাদ চৌধুরী পরিচালিত 'আজকের শিল্পী পরিতোষ সেন'

নাটকের কথা

ছুটির খেলা

রুমানিয়া প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ২৫তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে পঞ্চমিত্রম্ নাট্য সংস্থা রবীন্দ্র সদনে একটি নাটক অভিনয়ের আয়োজন করেছিল। গত ২৭শে মে সন্ধ্যায় 'ছুটির খেলা' নাটকটি অভিনীত হয়েছে। রুমানিয়ার নাট্যকার মিখাইল সেবাস্তিয়ানের 'হলিডে গেম' নাটকটি অবলম্বনে শ্রীমতী অমিতা রায় 'ছুটির খেলা' রচনা করেছেন। শ্রীমতী রায় ইতিপূর্বে মিখাইল সেবাস্তিয়ানের আরো একটি নাটক বাংলার দর্শকদের উপভোগ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। মিখাইল সেবাস্তিয়ান রুমানিয়ার একজন খ্যাত নাট্যকার। তাঁর নাটকে যে কাব্যিক মেজাজ ও বুদ্ধিদীপ্ত সংলাপ পাওয়া যায় শ্রীমতী রায়ের বাংলা নাট্যরূপে সেই কাব্যিক মেজাজ ও সংলাপের চমৎকারিত্ব অক্ষুণ্ণ রয়েছে। বরঞ্চ মাঝেমাঝে রবীন্দ্র নাটকের মত মেজাজ দেখে চমক লাগে।

পঞ্চমিত্রম্ প্রযোজিত "ছুটির খেলা" একটি কাব্যরসের জমাট নাটক। নাটকটি একটিমাত্র দৃশ্যে সারাক্ষণ যেরকম সংলাপ নির্ভর, তাকে দর্শকদের গ্রহণযোগ্যরূপে উপস্থিত করা খুবই কঠিন কাজ। একঘেয়েমী আসার সম্ভাবনা প্রতি মুহূর্তেই ছিল। কিন্তু সুনীল ব্যানার্জীর পরিচলনার গুণে সেই সম্ভাবনা থেকে মুক্ত হয়েছে। অবশ্য তার জন্য সুনীল ব্যানার্জী এবং মমতা চ্যাটার্জীর অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের অভিনয়ের কৃতিত্ব অনেকখানি। একজন সর্বক্ষণ এক রহস্যময় পরিস্থিতি রচনা করে আর একজন প্রাণোচ্ছ্বাস ও অন্তঃসলিলা প্রেমের রসে সাসপেন্স সৃষ্টি করে রেখেছে। এই দু-জনের একজনও যদি অভিনয় কৃতিত্ব দেখাতে না পারতেন তাহলে নাটকটি সম্পূর্ণ ব্যর্থ হতো। এই সঙ্গে বরেনবাবু (দীপক সেনগুপ্ত), কুন্তলা (ছবি তালুকদার), বাবলু (শ্যামল সেন), উকিল (তপন ভৌমিক), মিস্ত্রি (মাস্চারক) প্রমুখ দলগত কাজে সাহায্য করেছেন এবং সময় সময় রিলিফ দিয়েছেন।

নাটকের ঘটনাস্থল এক পাহাড়ী অঞ্চলের স্বাস্থ্যনিবাসে। ত্রিশদিনের ছুটি কাটাতে এসেছে এই কয়েকজন নরনারী। ছুটি কাটাতে-এলেও প্রত্যেকেই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে শহরজীবনের জের। রেডিও, টেলিফোন, তারিখ, দিনের হিসাব রাখা থেকে চিঠির যোগাযোগ আর শহরজীবনের স্মৃতি-রোমন্থন পর্যন্ত। রঞ্জন এদের মধ্যে ব্যতিক্রম। সে চায় দৈনন্দিন গতানুগতিক জীবন থেকে ছুটি। যে ছুটির রাজ্যে শহরজীবনের প্রাত্যহিক ঝামেলা প্রবেশ করতে পারবে না। এমনিতর পরিস্থিতি রচনার মধ্যে সৃষ্টি হল এক কাব্যিক জগৎ। যেখানে শুধু রঞ্জন, করুণা নয় বরেনবাবু থেকে বাবলু পর্যন্ত সকলেই নতুন জীবনের স্বাদ পেল। তাদের মধ্যে নতুন করে প্রেমের অনুভূতি জন্মাল। কিন্তু সে প্রেম অন্তরে থাকাতেই যে আনন্দ বাইরের জগতে—প্রকাশের আগেই করুণা বিদায় নিল তার বাস্তব-জীবনে ; রেখে গেল বিষাদের ছায়া। বিষাদের মধ্যেই একে একে সকলকে চলে যেতে হবে। যে নতুন অস্তিত্ব তারা অনুভব করেছিল সে অস্থায়ী এবং তাদেরই সৃষ্টি।

নাটকটি কাব্যিক মেজাজে বাঁধা। তবে মাঝখানে দুটি ভদ্রলোকের চরিত্র বলে যা দেখান হয়েছে তাতে কিছুটা ছন্দঃপতন ঘটেছে। যদিও কেবলমাত্র সংলাপ-নির্ভর নাটকের সম্ভাব্য একঘেয়েমী কাটাবার জন্য এ-দুটি চরিত্রের সৃষ্টি ; কিন্তু এত কৃত্রিম না হলে বোধহয় সংগতি থাকত ভাল। এ দুটি চরিত্রে সরিৎ ঘোষ ও অনিল ব্যানার্জী পরিচালকের নির্দেশমত যথার্থ অভিনয় করেছেন।

'ছুটির খেলা' নাটকে আলোর কাজে স্বরূপ মুখার্জী যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। বিশেষ করে জ্যোৎস্না রাতের দৃশ্যটি চমৎকার। নাটকের সার্থকতার পথে তাঁর আলোর কাজ সহায়ক হয়েছে। এই সঙ্গে সময় সময় টুকরো টুকরো সঙ্গীতের চয়ন ও সংযোজন প্রশংসনীয়। মঞ্চসজ্জায় রুচিবোধের পরিচয় রয়েছে। নাটকটি সার্থক ; তবে আরো ঘনগ্রথিত বা কমপ্যাক্ট হলে দর্শকরা বেশি খুশি হতেন।

পান্থশালা

ছাত্র সমিতির ৪৭তম পুনর্মিলন উৎসবে রমেন লাহিড়ীর 'পান্থশালা' নাটক অভিনীত হয়েছে। নাটক পরিচালনা করেছেন বিভূতি দাস। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেছেন কলকাতার পৌরপ্রধান শ্রীপ্রশান্ত সুর।

স্টুডিও খবর

মহামায়ার দান

গত ১৪ই আগস্ট সন্ধ্যায় ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ কনক প্রোডাকসন্স প্রাঃ লিঃ-এর প্রথম ছবি "মহামায়ার দান" ছবির জন্যে কয়েকটা গান রেকর্ড করা হয়েছে সংগীত পরিচালক অমল মুখার্জীর সুরে। মিণ্টু ঘোষ রচিত গানগুলিতে কণ্ঠদান করেছেন—হেমন্ত মুখার্জী, প্রতিমা ব্যানার্জী ও বনশ্রী সেনগুপ্ত, কণক মুখার্জী ছবিটির কাহিনীকার ও পরিচালক। "মহামায়ার দান"-এর চিত্রগ্রহণ শীঘ্রই সুরু হচ্ছে।

পার্থপ্রতিম চৌধুরীর পরবর্তী ছবি—"যদুবংশ"

পার্থপ্রতিম চৌধুরীর পরবর্তী ছবির নাম "যদুবংশ"। বিমল দের কাহিনী অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা করেছেন পরিচালক পার্থপ্রতিম চৌধুরী। আশীষ রায়ের প্রযোজনায় এলিট মুভীজের পতাকাতলে ছবিটির চিত্রগ্রহণ সম্প্রতি সুরু হয়েছে।

ছবিটির প্রধান দুটি চরিত্রে রূপদান করছেন শমিত ভঞ্জ ও অপর্ণা সেন। ছবিটির কয়েকটা গানও ইতিমধ্যে রেকর্ড করা হয়েছে।

চাঞ্চল্যকর অপেরার উদ্বোধন

ক্রিস্টফ পেনডেরেৎকির গীতিনাট্য 'দি ডেভিল অফ লাউডন' একটি চাঞ্চল্যকর অপেরা। যাজক ও সন্ন্যাসিনীদের নগ্ন প্রেমের কাহিনীঘেরা এই গীতিনাট্যে অলৌকিক ডাকিনীবিদ্যার ভয়াবহ রূপ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। হামবুর্গে ৪৩তম বিশ্ব সংগীত উৎসব উপলক্ষে এই গীতিনাট্যের উদ্বোধনের দিনে এটি একাধারে দর্শকদের প্রশংসা ও ধিক্কার লাভ করেছে।

সংবাদ-কনা

নাট্যোৎসব

স্টুডেণ্টস হেলথ হোমের উদ্যোগে আগামী ৮ই থেকে ১৪ই সেপ্টেম্বর নাট্যোৎসবের আয়োজন হয়েছে। সেক্সপীয়র সরণির সংগীতকলা মন্দিরে এই উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এই উৎসবে রূপকার, শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘ, অনামিকা, নান্দিকার, বহুরূপী, চলাচল প্রমুখ দল অংশগ্রহণ করবে।

আমি মন্ত্রী হব

রঙমহল থিয়েটারে ৩রা সেপ্টেম্বর থেকে নতুন নাটকের অভিনয় শুরু হয়েছে। নাটকের নাম 'আমি মন্ত্রী হব'। নাটকটি লিখেছেন সুনীল চক্রবর্তী। এই নাটকটি হাসির, তবে তার সঙ্গে ব্যঙ্গ মিশ্রিত। অভিনয় করছেন জহর রায়, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিধন, বাসবী নন্দী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, রত্না ঘোষাল, নন্দিতা দে, সরযূ দেবী, অজিত চট্টোপাধ্যায়, মৃণাল মুখোপাধ্যায় প্রমুখ।

ইউথ পাপেট্ থিয়েটার

যথারীতি এ-বছরও ইউথ পাপেট্ থিয়েটার আয়োজিত ছোট ছেলেমেয়েদের প্রতিযোগিতার আসর বসছে আগামী ৬ই ও ৭ই সেপ্টেম্বর সেন্ট লরেন্স হাই স্কুলে। বিষয়—অঙ্কন, প্রবন্ধ ও কণ্ঠসঙ্গীত।

গান্ধী শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রবন্ধের বিষয়—"মহাত্মা গান্ধীর জীবনী।" এবারকার উল্লেখ্য সংবাদ, ১৮ বছর অবধি ছেলেমেয়েদের তিন ভাগে বিভক্ত করে রবীন্দ্র, নজরুল ও লোকসংগীত, প্রবন্ধ ও অঙ্কন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করেছে। যোগাযোগের ঠিকানাঃ ২, সেবক বৈদ্য স্ট্রীট, কলিকাতা-২৯। ফোনঃ ৪৭-৬৮৪১।

সিনে সোসাইটি—কালনা

সম্প্রতি কালনা শহরের সিনে সোসাইটি—কালনার উদ্যোগে তিনটি সোভিয়েট ছবি প্রদর্শিত হয়েছে। ছবিগুলি যথাক্রমে 'ব্যাটলসিপ পটেমকিন' 'মাইলস অব ফায়ার' 'স্টোরিস অব লেনিন'।

পশ্চিম জার্মানীতে চাঞ্চল্যকর অপেরা 'দি ডেভিল অব লাউডন'-এর একটি দৃশ্য

সঙ্গীত কথা

সুরঙ্গনার অনুষ্ঠান

সুরঙ্গনার প্রথম সম্মেলন গত ১৭ই আগস্ট সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়। এই সংগীতচিত্রটি নতুন হলেও গতানুগতিক ধারা অনুযায়ী চলবে না। প্রখ্যাত শিল্পীদের অনুষ্ঠান ছাড়াও নবাগতদের গুণিজনের আসরে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই আয়োজন। এর প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে আছেন শ্রীমতী কল্যাণী রায়, শ্রীমতী লাল, শ্রীমতী নীহারকণা মুখার্জী, শ্রীঅদ্রিজানাথ মুখার্জী। এর সম্পাদিকাদ্বয় হচ্ছেন শ্রীমল্লিকা রায়মুখোপাধ্যায় ও শ্রীছন্দা বসু। শ্রীমতী শীলা মৈত্র কোষাধ্যক্ষা।

সুরঙ্গনার প্রথম অধিবেশন শুরু হল শ্রীমতী কল্যাণী রায় ও শ্রীমাণিক দাসের সম্বর্ধনার মাধ্যমে। সম্প্রতি এঁরা দঃ পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সংগীতের সুনাম প্রতিষ্ঠা করে এসেছেন। শ্রীমতী রায় যে সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করেছিলেন তা অপূর্ব। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন ডাঃ প্রতুলচন্দ্র মজুমদার।

খেলা ধুলা

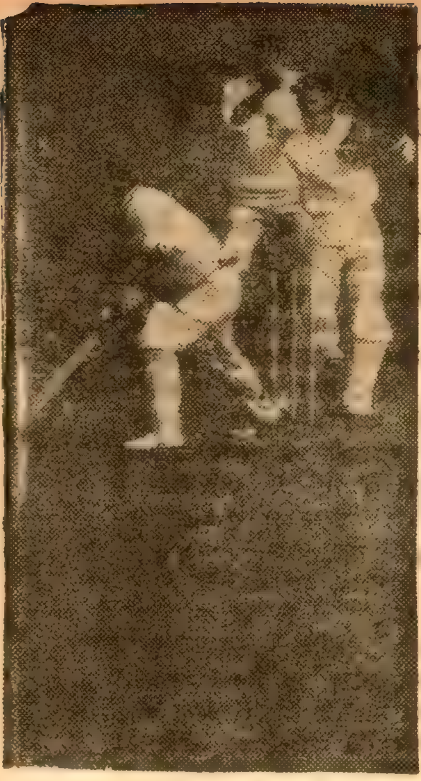

কি হলো

অনেকদিন পরে আবার সেই পুরনো প্রসংগে ফিরে আসতে হলো। এই প্রসংগের কিম্বা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর হয়তো আমরা পাবো না। তবু রাজ্য সরকারের ক্রীড়ামন্ত্রীকে তাঁরই দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলোকে আর একবার স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যেই আজ সেই পুরনো প্রসংগের অবতারণা করতে বসেছি। ক্রীড়ামন্ত্রী পদটি আমাদের দেশে নতুন হলেও অনেকদিন আগে থেকেই আমরা সরকারী শাসনযন্ত্রে এমনই একটি দপ্তরের আশায় ছিলাম। তাই যুক্তফ্রন্ট সরকার যখন তাঁদের মন্ত্রিসভায় ক্রীড়ামন্ত্রীর পদ সৃষ্টি করে খেলাধুলোর জন্যে একটা আলাদা দপ্তর করলেন তখন আনন্দ-হাসি-গানে ভরে উঠেছিল আমাদের মতো সাধারণ ক্রীড়ারসিকদের মন। ক্রীড়ামন্ত্রী তাঁর কার্যসূচীতে অনেক কথাই বলেছিলেন। বলেছিলেন (১) কুড়ি মাসের মধ্যে কলকাতায় পূর্ণাঙ্গ ফুটবল স্টেডিয়াম বানিয়ে দেবেন, (২) কলকাতা ময়দানের বাস্তুঘুঘুদের বাসা তিনি ভেঙে তছনছ করে দেবেন, (৩) গ্রামে গ্রামে খেলাধুলো প্রসারের ব্যবস্থা তিনি খুব তাড়াতাড়ি করবেন—এই তিনটি বিষয় ছাড়াও তিনি বলেছিলেন অনেক কথা। সে সব কথা আজ না হয় থাক। তাঁর কার্যসূচীর প্রধান তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করলেই বোঝা যাবে যে, রাজ্য সরকারের ক্রীড়াদপ্তরের মাধ্যমে আমরা কতোদূর এগিয়েছি আর খুশি মনে অনেক আশায় আশায় আমরা দিন গুণেছিলাম যার প্রত্যাশায়—সেই প্রত্যাশাগুলো গত বাইশ বছরের মতো আবারও আলেয়ার মতো হাতছানি দিয়ে আবার গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে সরকারী দপ্তরের লাল ফিতেয় বাঁধা ফাইলের মধ্যে। বোধ করি সেই ফাইলগুলোর ওপর এতোদিনে ইঞ্চি পরিমাণ ধুলোও জমে উঠেছে। অর্থাৎ গত বাইশ বছর ধরে যে খেলা আমরা দেখেছি এখনো আমাদের সেই একই অভিনয়ের পুনরাবৃত্তিই দেখতে হবে। খেলার মাঠে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের 'প' দেখার সৌভাগ্যও বোধহয় আমাদের কোনদিন হবে না।

যাই হোক ক্রীড়ামন্ত্রীর কথামতো প্রথমেই স্টেডিয়াম প্রসঙ্গে আসা যাক। এ্যালেনবরা রেস কোর্সে কিম্বা অন্য কোথাও পূর্ণাঙ্গ স্টেডিয়াম তৈরির বিষয়টি ভুলে গিয়ে সরকারী ক্রীড়াদপ্তর প্রথমেই পড়লেন ইডেন উদ্যান নিয়ে। ইডেনে ফুটবল আর ক্রিকেট এক সংগে খেলাবার জন্যে কম্পোজিট স্টেডিয়াম তৈরি করা হবে। সংগে সংগে সরকারী তরফ থেকে ইডেন উদ্যান দখল করেও নেওয়া হলো। কিন্তু ফুটবল-ক্রিকেট এক মাঠে খেলবার বিষয়ে যেই টেকনিক্যাল অসুবিধার কথা উঠলো অমনি সব চুপ। অবশ্য মাঝে মাঝে অনেক কথাই শোনা গেল। কিন্তু বর্তমান অবস্থাটা কি? অস্ট্রেলিয়ার সংগে ভারতের চতুর্থ টেস্ট অনুষ্ঠিত হবে ইডেন উদ্যানে ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে। অথচ সি. এ. বি-র সংগে রাজ্য সরকারের ক্রীড়াদপ্তরের কোন আলোচনাই হয় নি ইডেন উদ্যান নিয়ে। ইডেন উদ্যান বর্তমানে সরকারের হেপাজতে অথচ টেস্ট খেলাবার ভার সি· এ· বি-কে নিতে হবে। তাই এই ব্যাপারটা নিয়ে সি· এ· বি কর্তৃপক্ষ খুব মুশকিলের এবং অনিশ্চয়তার মধ্যে আছেন। এদিকে টেস্ট ম্যাচের সময়ও এগিয়ে আসছে। কি যে করবেন ওঁরা কিছুই বুঝতে পারছেন না। যাই হোক ক্রীড়ামন্ত্রীর কথামতো কলকাতার ফুটবল স্টেডিয়াম কুড়ি মাসের মধ্যে তৈরি হবার আর এতটুকুও সম্ভাবনা আছে কি না সন্দেহ! জানি নে ক্রীড়ামন্ত্রীর মতে কলকাতা ময়দানের বাস্তুঘুঘু কারা? যাঁরাই হোন না কেন—তাঁরা যখন এই সাত-আট মাস বহাল তবিয়তে থাকতে পেরেছেন তখন যে বাকী সময়েও থাকতে পারবেন—সে বিষয়েও আমাদের আর বিশেষ সন্দেহ নেই। আর বাংলা দেশের গ্রামে গ্রামে খেলাধুলোর প্রসারের কতোটা কি হলো? আমরা যতোদূর জানি তাতে মনে হয় বিশেষ কিছুই হয় নি। আর হবে বলেও মনে হয় না। কারণ শুধু কথায় চিঁড়ে ভেজে না। কোনদিন ভেজে নি, কোনদিন ভিজবেও না। —শান্তিপ্রিয়।

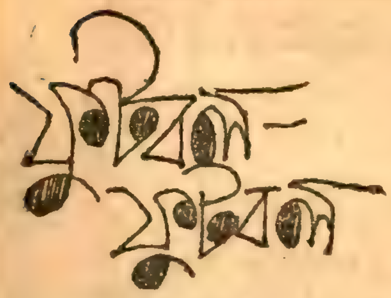

আই· এফ· এ শীল্ড

শেষ পর্যন্ত দিন-ক্ষণ দেখে পুজো-টুজো করে শুরু করতে হলো এবারের আই· এফ· এ শীল্ড ফুটবল প্রতিযোগিতা। তাও আবার বেশ ভয়ে ভয়ে, কারণ শেষ পর্যন্ত বার বার তিনবার না ভেস্তে যায় আই· এফ· এ শীল্ডের খেলা। তাই দুর্গা নাম করে ওঁরা করছেন ওঁদের যাত্রা শুরু। কারণ আই· এফ· এ কর্তৃপক্ষের মনে সংশয়ের ঘনঘটা। যার শেষ ভালো তার সব ভালো—এখন ভালোয় ভালোয় শীল্ডের খেলা শেষ হলে হয়।

আই· এফ· এ শীল্ডের পুরনো ঐতিহ্য এখন আর নেই। নানা কারণে আর কলকাতার ফুটবলের অস্বস্তিকর পরিবেশের জন্যে বাংলা দেশের বাইরের দলগুলো আই· এফ· এ শীল্ড ফুটবল প্রতিযোগিতায় যোগ দিতে এখন যেন আর ঠিক আগের মতো উৎসাহ পায় না।

বেশি দূরে যাবার দরকার নেই, এবারের কথাই ধরা যাক। এ বছর অনেক নামকরা দলই কলকাতায় খেলতে এলো না। আই· এফ· এ শীল্ডে অংশ গ্রহণকারী দলগুলোর তালিকায় একবার চোখ বুলোলে দেখা যাবে যে, হায়দ্রাবাদ থেকে একটা দলও এবার আসে নি. আসে নি এখনকার নামকরা দল গুর্খা ব্রিগেড, জলন্ধরের লীডার্স ক্লাব, বোম্বাই-এর মফৎলাল গ্রুপ, টাটা স্পোর্টস, এমন কি গোয়ার দলগুলো পর্যন্ত এবার কলকাতায় এলো না আই· এফ· এ শীল্ডের খেলায় অংশ গ্রহণ করতে।

এখন একটা বিষয় বেশ পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে, কলকাতার আই· এফ· এ শীল্ডকে পেছনে ফেলে দিল্লীর ডুরাণ্ড আর বম্বের রোভার্স কাপ আকর্ষণের দিক দিয়ে অনেক এগিয়ে গেছে। তাই ভারতের সেরা দলগুলো এখন দিল্লী কিম্বা বম্বে ছোটে—কলকাতায় তারা আর আসতেই চায় না।

তাদের মতে, বর্ষাকালে কলকাতার নরম মাটির জল-কাদার মাঠে তারা যেন ঠিক সুবিধে করতে পারে না। তাছাড়া বাইরের কয়েকটি দলের কর্তৃপক্ষের সংগেও কথা বলে বুঝেছি যে, কলকাতার পরিচালনা ও পরিচালন-ব্যবস্থা ঠিক যেন তাদের মনঃপূত নয়। সেই সংগে আছে গত দু'বছর আই· এফ· এ শীল্ডের খেলা শেষ না হওয়া।

গত বছর আই· এফ· এ শীল্ডের খেলা মাঝপথে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আদালতের নির্দেশে আর তার আগের বছর শীল্ড ফাইন্যাল খেলার নিষ্পত্তি হয় নি অর্থাৎ অসমাপ্ত থেকে গিয়েছিল খেলা। তাই এ বছরও যে শেষ পর্যন্ত শীল্ডের খেলা শেষ হবে—তার কোন নিশ্চয়তা নেই, তাই হয়তো বা বাইরের দলগুলো এ বছর কলকাতায় খেলতে আসতে খুব একটা উৎসাহ পায় নি।

কিন্তু এই রকম অবস্থা তো বেশি-দিন চলত দেওয়া ঠিক নয়। এইভাবে চললে আই· এফ· এ শীল্ড খুব শীঘ্রই তার পুরনো ঐতিহ্য আর কৌলীন্য হারিয়ে বসবে। তাই এখনই সাবধান হতে হবে. এখনই এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে আই· এফ· এ শীল্ড ফুটবল প্রতিযোগিতা বাইরের দলগুলোর কাছে খুব আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। কিন্তু সে কাজ করবে কে? সেদিকে আই· এফ· এ কর্তৃপক্ষের এতটুকুও নজর আছে বলে মনে হয় না। অথচ আই· এফ· এ শীল্ডকে গৌরবজনক অবস্থায় বাঁচিয়ে রাখতে হলে এখনই একটা কিছু করা দরকার।

ক্রিকেটের খবর

ইংলণ্ডের রাবার জয়

নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ইংলণ্ড যে রাবার জিতে নেবে সেটা এমন কিছু আর বেশি কথা নয়। কিন্তু এই মরশুমে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ আর নিউজিল্যাণ্ডের মতো দলের বিরুদ্ধে মোট ছটি টেস্ট ম্যাচের মধ্যে একটাতেও না পরাজিত হয়ে ৪টে টেস্টে জেতা খুব একটা সহজ ব্যাপার নয়। ইংলণ্ডের নতুন অধিনায়ক রে ইলিংওয়ার্থ এদিক দিয়ে যথেষ্ট কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন।

যাই হোক নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় ও শেষ টেস্ট ম্যাচে ইংলণ্ড ৮ উইকেটে জয়লাভ করেছে। এর আগে প্রথম টেস্টে ইংলণ্ড হারিয়ে দিয়েছিল নিউজিল্যাণ্ডকে। দ্বিতীয় টেস্ট শেষ হলো অমীমাংসিতভাবে। ফলে তৃতীয় টেস্টে জেতায় ইংলণ্ড রাবার লাভ করলো।

খেলার শুরু থেকেই শেষ টেস্ট ম্যাচের বিশেষ কোন আকর্ষণ ছিলো না। যখন মাত্র ১৫০ রানে শেষ হয়ে গেলো নিউজিল্যাণ্ডের প্রথম ইনিংস তখনই মোটামুটিভাবে বোঝা গিয়েছিল, খেলার ফলাফল কি হবে। প্রথম ইনিংসেই ২৪২ রান করে ইংলণ্ড বেশ কিছুটা এগিয়ে গেলো।

॥ ভেঙ্কটরাঘবন ॥

ইরানী ট্রফির খেলায় বোলিং-এ ভেল্কি দেখিয়েছেন ভেঙ্কটরাঘবন।

দ্বিতীয় ইনিংসে নিউজিল্যাণ্ডের খেলোয়াড়রা চেষ্টা করেছিলেন দলের রান সংখ্যা বাড়াতে। তাতেও কিন্তু খুব একটা সুবিধে হয়েছিল বলে মনে হয় না, কারণ প্রাণপণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও দ্বিতীয় ইনিংসে নিউজিল্যাণ্ড করতে পারলো না ২২৯-এর বেশি রান।

ফলে জয়লাভ করা এসে গেলো ইংলণ্ডের হাতের মুঠোর মধ্যে। দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ১৩৭ রান করতে পারলে দু' দলের রান সংখ্যা সমান হবে, আর তার ওপর একটা রান করতে পারলেই ইংলণ্ড জিতবে। শেষ পর্যন্ত হলোও তাই। দ্বিতীয় ইনিংসে ইংলণ্ড মাত্র ২টি উইকেট হারিয়ে করে ফেললো জয়লাভের জন্যে প্রয়োজনীয় ১৩৮ রান। ফলে তৃতীয় ও শেষ টেস্ট ম্যাচে ইংলণ্ড ৮ উইকেটে হারিয়ে দিলো নিউজিল্যাণ্ড দলকে।

লেডি ব্রাবোর্ন কলেজের মেয়েরা ফুটবল-ক্রিকেট খেলার অনুমতি না পেলে আন্দোলনে নামবেন বলে জানিয়েছেন। তাঁদের দাবি পৃথিবীর অন্য দেশে মেয়েরা যখন ফুটবল-ক্রিকেট খেলছে তখন আমরাই বা খেলবো না কেন? ছবিতে পশ্চিম জার্মানীর রাইন অঞ্চলের মেয়েদের ফুটবল খেলতে দেখা যাচ্ছে।

[৭০০ পৃষ্ঠার শেষাংশ]

চুনী গোস্বামীর অমন অ-খেলোয়াড়ী আচরণের জন্যে।

এই জঘন্য অপরাধের জন্যে জানি নে টোকিও থেকে ফিরে আসার পর এ'দের ওপর কোনরকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে কি না। আইনের চোখে ওঁরা অপরাধী, আইন তাই ওঁদের রেহাই দেবে বলে মনে হয় না। পি· কে এবং চুনী দু'জনেই একরকম সরকারী কর্মচারী—তাই ওঁদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও আজ সকলে শঙ্কিত।

তাছাড়া বিদেশ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে দেশে ফিরে এসে এ'রা দু'জন সেই শিক্ষার কতোটা প্রসার করতে সক্ষম হবেন তাও জানি না। কারণ চুনী ও পি· কে লোকচক্ষে এখন অনেক ছোট হয়ে গেছেন।

পাঠকের কলম থেকে

অনেকদিন আগের কথা। প্রায় একশ' বছরের কাছাকাছি। সেই সময় ভারত সরকারের বৈদেশিক দপ্তরের সেক্রেটারী ছিলেন স্যর হেনরী মার্টিমার ডুরান্ড। তিনি ফুটবল খেলায় খুব উৎসাহী ছিলেন। তিনিই ভারতবর্ষের মাটিতে নক্-আউট ফুটবল খেলার ভিত্তি স্থাপনা করেন। তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায় ডুরান্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতা ১৮৮৮ সালে আরম্ভ হয়। তখন নিয়ম ছিল যে, যদি কোন দল পর পর তিন বছর ডুরান্ড কাপ জিততে পারে তাহলে তারা সেই কাপটি বরাবরের জন্যে পাবে। এই নিয়ম অনুযায়ী হাইল্যান্ড লাইট ইন্ফ্যান্ট্রি—সামরিক দলটি উপর্যুপরি তিন বছর (১৮৯৩—৯৫) ডুরান্ড কাপ পেয়ে যায়। ফলে মার্টিমার ডুরান্ডকে দ্বিতীয়বার আর একটি কাপ দিতে হলো। কিন্তু এই কাপও বেহাত হয়ে যায় ১৮৯৯ সালে। উপর্যুপরি তিন বছর (১৮৯৭—৯৯) ডুরান্ড কাপ জয়লাভের স্বীকৃতি স্বরূপ ব্ল্যাক ওয়াচ সামরিক দলকে বরাবরের জন্যে ডুরান্ড কাপটি ছেড়ে দিতে হলো। ফলে যে সমস্যার উদয় হয় তা থেকে উদ্ধার পেতে প্রতিযোগিতার পরিচালকমণ্ডলীকে কোন বেগ পেতে হয় নি। মার্টিমার ডুরান্ড ভারতীয় ফুটবল খেলার সংস্পর্শে এসে যে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলেন, তারই স্বীকৃতি হিসাবে তিনি তৃতীয় বার আর একটি কাপ দান করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন নি। ভারতীয় ফুটবল খেলার ইতিহাসে মার্টিমার ডুরান্ডের নাম চিরস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে ১৮৯৯ সালে প্রতিযোগিতায় এই নিয়ম করা হয় যে, উপর্যুপরি তিনবার ডুরান্ড কাপ বিজয়ী দলকে চিরদিনের জন্য আর ডুরান্ড কাপ দিয়ে দেওয়া হবে না।

—পরিতোষ নাগ
বেলাকোবা, জলপাইগুড়ি

খেলা ও খেলোয়াড়ী মনোভাব

সন্তোষকুমার শীল

নিয়মানুবর্তিতা খেলোয়াড় জীবনের অন্যতম প্রধান গুণ হওয়া উচিত। ভাল খেলোয়াড়দের অনুরাগী আর অনুগামীরা সর্বদাই তাদের মাঠের খুঁটিনাটি ব্যবহার অনুকরণে প্রয়াসী হয়। কাজেই খেলোয়াড় জীবনের উন্নতির সংগে সংগে খেলোয়াড়দের মাঠের ভেতরের ও বাইরের ব্যবহারকে সুসংহত করবার প্রয়োজন সব থেকে বেশি।

কিন্তু সেদিকে এতটুকুও নজর নেই আমাদের দেশের তথাকথিত বড় খেলোয়াড়দের। তাই তাঁদের কেন্দ্র করে আকছারই এমন সব অশোভন কাজ-কর্মের সংবাদ পাওয়া যায় যা শুধুমাত্র অকল্পনীয়ই নয়, অভাবনীয়ও বটে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের কাছে নামী খেলোয়াড়রা আদর্শস্বরূপ। কিন্তু আমাদের দেশের নামী ও দামী খেলোয়াড়রা সে কথাটা বেমালুম ভুলে গিয়ে রাস্তা-ঘাটে, খেলার মাঠে কিম্বা অন্য কোথাও এমন সব আচরণ করেন তাকে শুধুমাত্র লজ্জাজনকই বলা চলে।

বেশি দূরে যাবার দরকার নেই—বছর দুয়েক আগের একটা ঘটনার কথা ধরা যাক। সেবার বিদেশ থেকে ভারতীয় ফুটবল দলের খেলোয়াড়রা একাধিক বিদেশী সামগ্রী সমেত ধরা পড়ে বাধিয়ে বসলেন কেলেঙ্কারী কাণ্ড। শেষ পর্যন্ত অনেক জল ঘোলা হবার পর সব চুকে গেলো অর্থাৎ কোনক্রমে ঝামেলার হাত থেকে রেহাই পেলেন বাংলা দেশের ছেলে-মেয়েদের আদর্শস্বরূপ কয়েকজন নামকরা ফুটবল খেলোয়াড়।

শুধু তাই নয়, বছর কয়েক আগে গড়ের মাঠে জনৈক নামী ফুটবল খেলোয়াড়কে বেসামাল অবস্থায় এবং লজ্জাজনক পরিস্থিতিতে পুলিশের হাতে ধরা পড়তে হয়েছিল।

মাঝে মাঝে তাঁরা আরো এমন সব ঘটনার নায়ক হয়ে বসেন যা সাধারণ ক্রীড়ারসিকদের কাছে একেবারেই অকল্পনীয়।

সর্বভারতীয় স্পোর্টস কাউন্সিলের সদস্য ও পূর্বতন ফুটবল অধিনায়ক চুনী গোস্বামী আমাদের অত্যন্ত প্রিয় খেলোয়াড়। বেশ কিছুদিন আগে বাংলা দেশের বাইরে কোন একটি ফুটবল প্রতিযোগিতায় তিনি হাত দিয়ে গোল করেছিলেন, রেফারীর সজাগ দৃষ্টির ফাঁকে। তাঁর স্বপক্ষে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল, রেফারীর চোখকে ফাঁকি দেওয়া একজন খেলোয়াড়ের কৃতিত্বের বিষয়। যেহেতু রেফারীর দায়িত্ব খেলোয়াড় এবং খেলার প্রতি নজর রাখা। অদ্ভুত যুক্তি সন্দেহ নেই। তবে, সেই সময়ে অনেকে এই তথ্যটি স্বীকার করেছিলেন, অনেকে আবার করেন নি।

অর্জুন পুরস্কার হচ্ছে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ী পুরস্কার। ভারতের দুই প্রাক্তন অধিনায়ক চুনী গোস্বামী ও প্রদীপকুমার ব্যানার্জী উভয়েই এই সর্বোচ্চ সম্মানের অধিকারী।

আর তারই সুযোগ নিয়ে গত ১৫ই জুলাই দমদম বিমানবন্দরে উভয়েই ধরা পড়লেন বিদেশী মুদ্রা পাচারের অভিযোগে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই দুই খেলোয়াড় টোকিওতে যাচ্ছিলেন বিখ্যাত জার্মান কোচ ডেটমার ক্রামারের ফুটবল ক্যাম্পে তিন মাসের জন্য ফুটবল সেমিনারে। শেষ পর্যন্ত, যাই হোক দুই ব্যক্তির সহায়তায় তাঁরা টোকিওর পথে যাত্রা করেছেন।

সম্প্রতি চুনী গোস্বামী ও পি· কে· ব্যানার্জীকে কেন্দ্র করে যা ঘটে গেল তার তুলনা মেলা ভার। আমাদের দেশে এমন ঘটনা এর আগে কখনো ঘটে নি। অথচ চুনী আর পি· কে ছিলেন জনপ্রিয়তার শীর্ষে এবং শুধুমাত্র বাংলা নয়, সমস্ত ভারতবর্ষে তাঁদের একটা আলাদা ইমেজ ছিলো। খেলোয়াড় হিসাবে তাঁরা ছিলেন সম্মানের পাত্র। সকলেই তাঁদের একটু অন্য চোখে দেখতে অভ্যস্ত।

এই ব্যাপারটিকে কেন্দ্র করে সারা ভারতবর্ষে তুমুল আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। সারা দেশের ক্রীড়ানুরাগীরা চাইছেন যে, এই ব্যাপারে তদন্ত করা হোক এবং অপরাধীরা দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁদের কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক। যাতে ভবিষ্যতে আর কোন খেলোয়াড় এইরকমভাবে বিপথে পা না বাড়ান।

এই দুই দিকপাল ফুটবল খেলোয়াড়ের ক্রীড়াদক্ষতা, ভদ্র আচরণ এবং সর্বোপরি তাঁদের খেলোয়াড়োচিত মনোভাবের কথা ভারতবর্ষের প্রতিটি ফুটবল অনুরাগী জানেন। সেই জন্য তাঁরাই সব চেয়ে বেশি মর্মাহত হয়েছেন। পি· কে· ব্যানার্জী এবং

[শেষাংশ ৭০২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

প্রশ্ন উত্তর

হীরেন্দ্রমোহন ভদ্র (সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি)

উত্তর : আপনার চিঠি ও পত্রিকা আমরা পেয়েছি। পত্রিকা খুব ভালো হয়েছে। খুব শীঘ্রই আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি দিচ্ছি।

প্রণবকুমার চক্রবর্তী (ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি)

প্রশ্ন : ভারতীয় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মধ্যে টেস্ট খেলায় সব চেয়ে বেশি উইকেট লাভ করেছেন কে এবং কতো?

উত্তর ভিনু মানকাদ—১৬২টি উইকেট লাভ করেছেন ৪৪টি টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করে।

অসীমকুমার চট্টোপাধ্যায় (চন্দননগর বয়েজ স্পোর্টিং ক্লাব, চন্দননগর)

উত্তর : গত ২৫শে আষাঢ়ের সাপ্তাহিক বসুমতীতে প্রকাশিত পেনাল্টি কিক সম্বন্ধে আমরা শুধু এইটুকুই বলতে চাই যে, প্রশ্নটা ছিল বলটা গোলরক্ষকের হাতে নয়, গোল পোস্টে লেগে ফিরে আসার পর যদি অন্য কেউ খেলার আগে কিককারী পুনরায় খেলেন তাহলে কি হবে? আশা করি ব্যাপারটা আপনি বুঝতে পেরেছেন।

টুলু চ্যাটার্জী (বিশরপাড়া, সপ্তগ্রাম, ২৪ পরগনা)

উত্তর : আপনি থঙ্গরাজকে C/o. ইস্টবেঙ্গল ক্লাব টেন্ট, কলকাতা ময়দান, কলকাতা—২১ এই ঠিকানায় এবং কোচ শ্রীঅমল দত্তকে C/o. মোহনবাগান ক্লাব টেন্ট, কলকাতা ময়দান, কলকাতা—২১ এই ঠিকানা খাম কিম্বা ইনল্যান্ড সংগে দিয়ে চিঠি লিখতে পারেন।

দীপককুমার দাশ ও সুভাষ মহলানবীশ (হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদহ)

প্রশ্ন : কোন খেলোয়াড় একটি খেলার দুটি ইনিংসে সর্বাধিক রান করে বিশ্ব রেকর্ড করেছেন। সেই রানের সংখ্যা কতো কতো? তিনি কোন দলের পক্ষে কতো সালে কোন দলের বিরুদ্ধে এই রেকর্ড করেছিলেন?

উত্তর : ১৯৩৮ সালে কেন্ট বনাম এসেক্স দলের খেলায় কেন্টের এ ফাগ প্রথম ইনিংসে ২৪৪ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ২০২* রান করে এই রেকর্ড করেছিলেন।

সুখময় কুন্ডু (হাসপাতাল রোড, টাংলা, দরং আসাম)

প্রশ্ন : জীবনের প্রথম টেস্ট খেলায় কোন্ খেলোয়াড় কি এক ইনিংসে ডাবল সেঞ্চুরী ও অপর ইনিংসে শূন্য রান করেছেন?

উত্তর : না।

হীরালাল দত্ত [বাবলু] (আজাদগড়, কলকাতা—৪০)

উত্তর : মুস্তাফা নন, থঙ্গরাজের পরেই বলাই দে'র স্থান।

সুব্রত হাজরা, চাঁদু (হাওড়া)

উত্তর : ক্রিকেট ব্যাট লম্বায় ৩৮ ইঞ্চিই তো! ৮৩ ইঞ্চি যদি ছাপা হয়ে থাকে তাহলে সেটা ছাপার ভুল।

তপনকুমার রায়চৌধুরী (পানিহাটী, ২৪ পরগনা)

প্রশ্ন : রনজী ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতা কবে আরম্ভ হয়? বাংলা কতো সালে এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে ও কতোবার চ্যাম্পিয়ানশীপ লাভ করেছে?

উত্তর : ১৯৩৪-৩৫ সাল থেকে আরম্ভ হয় রনজী ট্রফি প্রতিযোগিতা। প্রথম বছর থেকেই সম্ভবত বাংলা এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করছে। বাংলা এ পর্যন্ত মাত্র একবারই ১৯৩৮-৩৯ সালে রনজী ট্রফি বিজয়ের পুরস্কার প্রতিয়ালার মহারাজার দেওয়া সোনার কাপটি জয় করে নিজের প্রদেশে এনেছিল।

হীরেন্দ্রমোহন ভদ্র (সুভাষপল্লী, শিলিগুড়ি)

উত্তর : তুমি নিচের ঠিকানায় চিঠি লেখ : শ্রীঅজয় বসু, C/o. যুগান্তর, আনন্দ চ্যাটার্জী লেন, কলকাতা-৩ ও শ্রীপুষ্পেন সরকার C/o. আনন্দবাজার পত্রিকা, সুতারকিন স্ট্রীট, কলকাতা—১।

রবিন সিনহা (কলকাতা—৬)

প্রশ্ন : বিগত বিশ্ব কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলায় ইংলণ্ডের খেলোয়াড় হার্স্ট কয়টি গোল করেছিলেন?

উত্তর : তিনটি!

বিনোদ রায় (উকিলপাড়া, রায়গঞ্জ, পঃ দিনাজপুর)

প্রশ্ন : ১৯৬০ সাল থেকে ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত আই· এফ· এ শীল্ডের ফলাফল জানতে চাই। এই সময়ের মধ্যে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের মধ্যে কে বেশিবার শীল্ড পেয়েছে?

উত্তর : চ্যাম্পিয়ান—রানার্স

১৯৬০—মোহনবাগান—ইন্ডিয়ান নেভী
১৯৬১—মোহনবাগান—ইস্টবেঙ্গল (যুগ্ম বিজয়ী)
১৯৬২—মোহনবাগান—হায়দ্রাবাদ
১৯৬৩—বি· এন· আর—মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৬৪—খেলা পরিত্যক্ত (ফাইন্যালে মোহনবাগান—ইস্টবেঙ্গল)
১৯৬৫—ইস্টবেঙ্গল—মোহনবাগান
১৯৬৬—ইস্টবেঙ্গল—বি· এন· আর
১৯৬৭—খেলা পরিত্যক্ত
১৯৬৮—খেলা পরিত্যক্ত

এবার হিসেব করে নিন কে বেশিবার শীল্ড জিতেছে।

নিশিকান্ত সিংহ (কমলপুর, পশ্চিম দিনাজপুর)

উত্তর : কয়েক সংখ্যা আগে বব বিমনের ওপর 'স্মরণীয় স্মৃতি' নামে একটা লেখা প্রকাশ করা হয়েছিল। আশা করি আপনি দেখেছেন। আপনার প্রশ্নের উত্তর সেইখানেই পাবেন।

অরুণ কর্মকার (তেজগঞ্জ, বর্ধমান)

প্রশ্ন : রামবাহাদুরকে আর খেলতে দেখা যায় না কেন? তিনি কি অবসর গ্রহণ করেছেন?

উত্তর : বলতে পারেন...!

রাম দা ও মঙ্গল পাল (বেলঘরিয়া, কলকাতা—৫৫)

প্রশ্ন : আই· এফ· এ শীল্ড ও লীগের খেলায় প্রত্যেক বছরে ইস্টবেঙ্গল এবং মহামেডান স্পোর্টিং দলের সাক্ষাৎকারের বিবরণ জানতে চাই।

উত্তর : অতো জায়গা কোথায় পাবো বলুন! আপনারা অন্য প্রশ্ন করুন।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সাপ্তাহিক বসুমতী

ইতিহাস-পুরুষ হো চি মিন

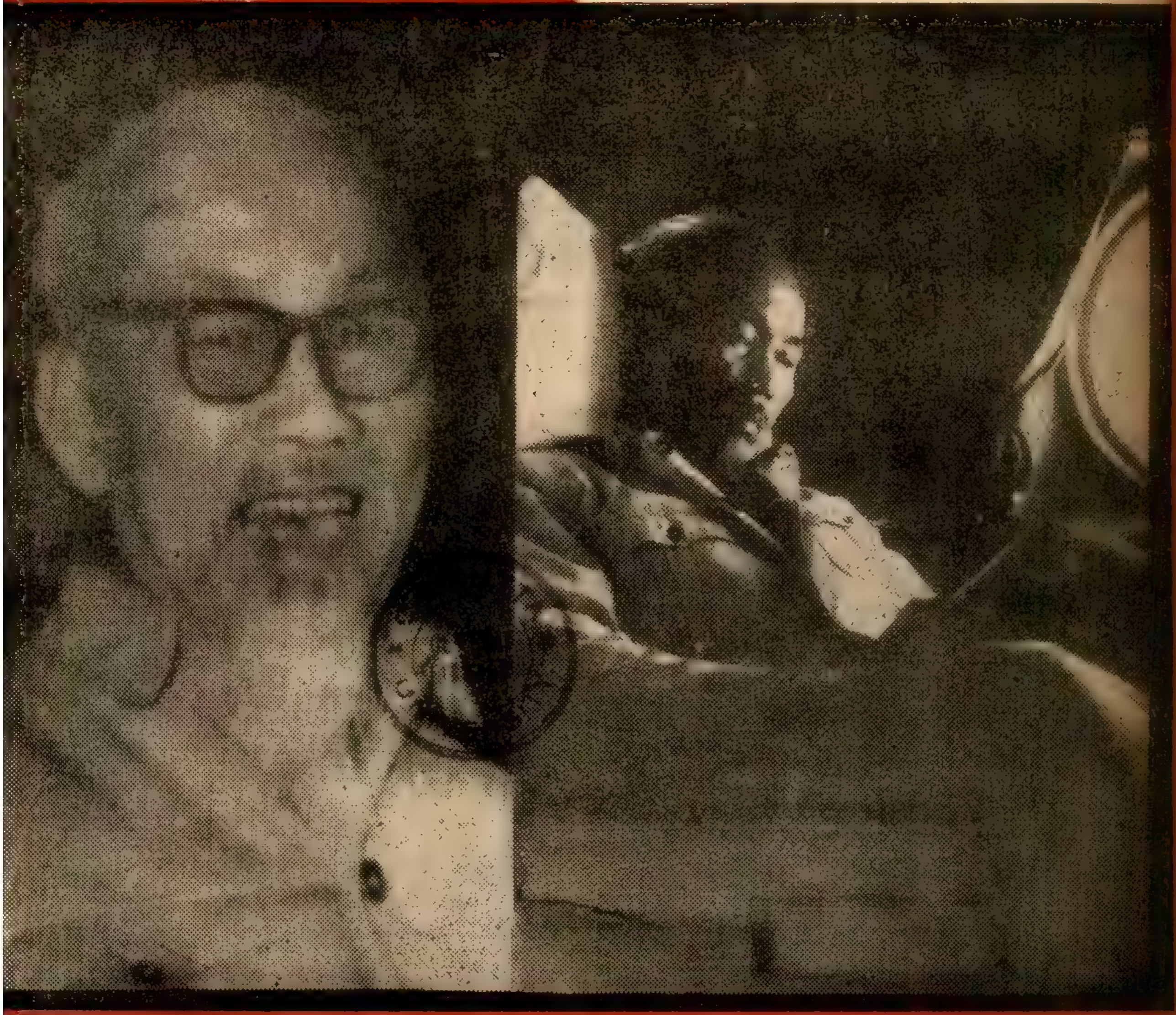

র্ষঃ ১২শ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ২৫শে ভাদ্র, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ] OLDEST WEEKLY OF NORTH INDIA [74 year, No. 12, 11th Sept., 1

সূচীপত্র

CALCUTTA UNIVERSITY
CENTRAL LIBRARY

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়		৭০৭
আজকের মানুষ		৭০৮
সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ (ধারাবাহিক প্রবন্ধ)	শঙ্করীপ্রসাদ বসু	৭০৯
শত বাধা দাও (কবিতা)	সুধাংশু সরকার	৭১২
বই-র হাট—বাংলা বইয়ের মেলা	হরপ্রসাদ মিত্র	৭১৩
ইতিহাস পুরুষ	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়	৭১৬
রঙ্গদর্শন		৭১৭
ভারতদর্শন		৭২১
আন্তর্জাতিক		৭২৩
গ্রন্থমেলা		৭২৫
সপ্তাহের বোঝা	কৃত্তিবাস ওঝা	৭২৬
যদুকুণ্ড সরকার সমীপেষু	শ্রীসর্বদর্শী	৭২৮
[illegible] একটি অধ্যায়	অনন্ত সিংহ	৭২৯

যে কোন
গয়না
আর
আসল
গ্রহরত্ন
কেনার
দক্ষিণ কোলকাতায়
নামকরা প্রতিষ্ঠান
ফোন ঃ ৪৬-৬২৫৮

সন অ্যাণ্ড গ্র্যাণ্ডসন্স অব লেট
এম. বি. সরকার

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
হো চি মিনের কবিতা		৭৩৩
হো চি মিনের মৃত্যু নেই	— সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার	৭৩৪
আমার দেখা হো চি মিন	— সুনীল ঘোষ	৭৩৭
আইন ও শৃঙ্খলা :		
পুলিশের ভূমিকা—কয়েকটি অভিমত	— সাগর বিশ্বাস	৭৩৯
তিমিরপ্রান্ত ভয়ার্ল	— অগ্নিবর্ণ	৭৪২
অন্য এক মেয়ে (গল্প)	— জীবন দে	৭৪৫
তীব্র গরলে জর্জরিত ভিয়েৎনাম	(অনুবাদ-প্রবন্ধ) ... ললিত হাজরা	৭৪৮
সাগর সংগমে (ধারাবাহিক উপন্যাস)	— সুশীল জানা	৭৫০
শিল্প-বাণিজ্য-অর্থনীতি :		
পুঁজিবাদের শোষণচিত্র	— রমানাথ ঘোষ	৭৫৪
রঙ্গজগৎ		৭৫৯
পাঠকমন		৭৬৩
দলনেতা পাতৌদি ও ভারতীয় দল	— শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	৭৬৪
খেলাধুলা	— শান্তিপ্রিয়	৭৬৬

॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥ নাটক ॥

বহুকাল পরে আবার পাওয়া যাচ্ছে।

ম হা ক বি

গিরিশচন্দ্র ঘোষের রচনাবলী

প্রথম খণ্ড : প্রফুল্ল, ম্যাকবেথ, ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব ও স্বামী বিবেকানন্দ সম্পর্কে চারটি প্রবন্ধ, তিনখানি গীতিনাট্য ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৪১২। মূল্য দশ টাকা।

দ্বিতীয় খণ্ড : সিরাজউদ্দৌলা ; য্যায়সা কা ত্যায়সা ; জনা : দোললীলা ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫৪। মূল্য দশ টাকা।

তৃতীয় খণ্ড : পাণ্ডবগৌরব, বলিদান, আবুহোসেন ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫২। মূল্য দশ টাকা।

চতুর্থ খণ্ড : চৈতন্যলীলা, ভ্রান্তি, মলিনাবিকাশ, হীরার ফুল, বিবিধ রচনা ও গ্রন্থপরিচয়। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩০২। মূল্য দশ টাকা।

পরমহংসদেব শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর ভক্ত-শিরোমণি অতি প্রিয় নোটো গিরিশকে বলেছিলেন, —"অভিনয়ের প্রয়োজন আছে বৈ-কি—ওতে লোকশিক্ষা হবে। আর তোমার লেখা—ও যে ভারি ভাল হয়েছে।"

প্রতিটি খণ্ড বোর্ডে বাঁধাই। মূল্যবান কাগজে ছাপা।

রচনাবলী সম্পাদনা : শ্রীরমেন চৌধুরী

অবিলম্বে অর্ডার পেশ করুন।

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

৭৪ বর্ষ ঃ ১২শ সংখ্যা—মূল্য ঃ ৩০ পয়সা
বৃহস্পতিবার, ২৫শে ভাদ্র, ১৩৭৬ বঙ্গাব্দ

বাংলা ভাষায় দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রচারিত
সাপ্তাহিক পত্রিকা

PRICE : 30 Paise
Thursday, 11th September, 1969

হো চি মিন

গত ৩রা সেপ্টেম্বর হো চি মিন হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেছেন। তাঁকে কোনো বিশেষ বিশেষণে ভূষিত করার মতো ভাষা আমাদের নেই। ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে ও গণ-বিপ্লবের জন্য আমরণ সংগ্রামী এই নেতার মৃত্যুশোকে আমরা শোকগ্রস্ত। জীবনের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত যিনি আদর্শে অটুট ছিলেন এবং সত্য ও ন্যায়ের জন্য যিনি আপোষহীন মানুষ ছিলেন, তাঁর মতো ব্যক্তিত্ব ইতিহাসে বিরল। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ছিল অনাড়ম্বর ও সরল—যদিও উত্তর ভিয়েৎনামের সর্বোচ্চ পদে তিনি আসীন ছিলেন। তিনি শুধুমাত্র আদর্শবোধের দ্বারা পরিচালিত-ই হন নি, সমকালের ও আগামীকালের মানুষকে নিজের জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করতে পেরেছেন। বিশেষত নিপীড়িত ও দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত এশিয়া, আফ্রিকা প্রভৃতি দেশগুলির কাছে যুগাতীত কাল ধরে তিনি স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। রাষ্ট্রপতি শ্রীগিরি বলেছেন, "তিনি (হো চি মিন) ছিলেন তাঁর দেশের জনগণের স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক। তাঁর জীবন ছিল আত্মোৎসর্গ ও দৃঢ়সঙ্কল্পময়। তাঁর মৃত্যুতে এশিয়া তথা বিশ্বের অপূরণীয় ক্ষতি হোল।" প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন, "প্রেসিডেন্ট হো চি মিনের মর্মন্তুদ মৃত্যু সংবাদে আমরা শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়েছি। তিনি আজ বেঁচে নেই, কিন্তু তাঁর দেশের লোকদের মতই তিনি অবিনশ্বর। তাঁর দয়ালুতা, সরলতা, মানবসমাজের প্রতি তাঁর প্রীতি, আত্মত্যাগ এবং নির্ভীকতা ভবিষ্যৎ বংশধরদের অনুপ্রাণিত করবে।"

হো চি মিন জন্মগ্রহণ করেছিলেন অতি দরিদ্র পরিবারে। তিনি তাঁর পিতার অনুপ্রেরণা বলেই ভিয়েৎনামের তদানীন্তন উৎপীড়ক শাসক ফরাসীদের বিরোধী হয়ে ওঠেন। স্বভাবতই ফরাসী শাসকের রক্তচক্ষু গিয়ে পড়ে হো চি মিনের ওপর এবং তাদের বিরুদ্ধাচরণে হো-কে কিছুদিন পর বিদ্যায়তনে প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। এরপর ছদ্মনাম গ্রহণ করে জাহাজের সাধারণ রাঁধুনির চাকরি নিয়ে তিনি কৌশলে লণ্ডনে গিয়ে পৌঁছন। এখানে দু' বছর থাকাকালেই একটি হোটেলে চাকরি করতেন এবং কবিতা লিখতেন। তখনো পর্যন্ত কোনো বিশেষ "ইজমে" তিনি দীক্ষা নেন নি—যদিও স্বাভাবিক চেতনাবশত ঔপনিবেশিকতাবাদ ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে তাঁর মন বিপ্লবী হয়ে উঠেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্যারিসে অবস্থানকালেই তিনি লাঞ্ছিত, নির্যাতিত ও শোষিত মানুষের মুক্তির পথের সন্ধান পান। এ সময় তিনি কখনো ফটোগ্রাফের রিটাচার, কখনো বা রঙ মাখাবার কাজ করতেন। তাঁর অন্যতম প্রিয় কাজ ছিল—ফরাসী ঔপনিবেশিকতাবাদের দালালদের বিরুদ্ধে লিখিত পত্রিকাগুলি বিলি করা। এই সময়েই তিনি স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশেই লেনিনের নামে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হলেন। তারপর যোগ দিলেন তিনি ফরাসী সমাজবাদী দলে এবং পদ্ধতি ও প্রয়োগ সম্পর্কিত বিশেষ বিতর্ক মুহূর্তে কোনো এক বন্ধুর পরামর্শে লেনিনের "থিসিস অন দি ন্যাশনাল এণ্ড কলোনিয়াল কোয়েশ্চনস" পড়তে পড়তে তিনি যেন বিশ্বদর্শন করলেন, তাঁর জ্ঞানচক্ষু যেন উন্মীলিত হয় এবং তিনিও যেন ইউরেকা ইউরেকার মতো বলে ওঠেন, শোষণ-মুক্তির পথের সন্ধান তিনি পেয়েছেন। অবশ্য "দি পাথ হুইচ লেড মি টু লেনিনিজম" প্রবন্ধটিতে তিনি মার্শেল ক্যাচিন, ভ্যালিয়্যান্ট কুটিউরিয়ার, মোনমুসো প্রমুখের কাছে শিক্ষাগ্রহণের ব্যাপারে ঋণ স্বীকার করেছেন। কিন্তু আগে দেশপ্রেম, তারপর সাম্যবাদ—তাঁর মধ্যে এই চেতনা সৃষ্টির জন্য তাঁর চিত্তে লেনিন স্থায়ী আসন গ্রহণ করলেন। এরপর মার্ক্সিজম ও লেনিনিজম শিক্ষালাভের পর এই বিশ্বাস তাঁর মধ্যে সুদৃঢ় হোল যে, শুধু সমাজবাদ ও সাম্যবাদ নিপীড়িত জাতিগুলিকে ও সর্বহারা শ্রমিকশ্রেণীকে মুক্তি দিতে পারে।

রাজনীতি ছাড়া হো চি মিন ছিলেন বহুভাষাবিদ, এবং মানবদরদী ও প্রকৃতি-প্রেমিক প্রথম শ্রেণীর কবি।

কোনো বিশেষ দেশ আজ স্বীকার করুক বা না করুক, হো চি মিনের মতো ব্যক্তিই হলেন যথার্থ ইতিহাস-পুরুষ। তিনি প্রবল পরাক্রমশালী ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করেই শুধু ক্ষান্ত ছিলেন না। এর পরের ঘটনা সবাই জানেন—কিভাবে তাঁর দেশ দ্বিখণ্ডিত হয় এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনামে সাম্রাজ্যবাদীদের মদতে দালাল সরকারের প্রতিষ্ঠা হয়। তারপর দালাল সরকারের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্য কিভাবে দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে ভিয়েৎকঙরা হো চি মিনের নেতৃত্বে লড়াই করে আসছেন তা বিশ্বময় বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। এবং আমরা আজ নিশ্চয়ই ধরে নিতে পারি যে, রাষ্ট্রপতি হো চি মিন দেশের সামগ্রিক মুক্তি ও কল্যাণের জন্য সেই ছিটেবেড়ার কুটিরটিতেই প্রাণত্যাগ করে দেশের সংগ্রামী সাধারণ মানুষের প্রাণে অক্ষয় শক্তি সঞ্চার করে গেছেন।

হো চি মিন আজ আর নেই। তাঁর ছদ্মনামের (আসল নামঃ এনগুয়েন ভ্যান থান।) অভিধানানুযায়ী শুধু নয়, বাস্তবক্ষেত্রেও তিনি "আলো দেখেছেন" এবং বিশ্বের লাঞ্ছিত, নিপীড়িত ও শোষিত মানুষদের আলো দেখিয়েছেন—যে আলোকে সত্য ও মিথ্যার ভেদ এ যুগে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রমাণিত। আজ এবং আগামীকালের মানুষ শুধু সত্যের জন্য হো চি মিনের আদর্শে সংগ্রাম করে তাদের মুক্তি ফিরিয়ে আনবে। হো চি মিনের মৃত্যু, তাই, দৈহিক হলেও, তাঁর আদর্শ অবিনশ্বর।

সম্পাদকীয়

আজকের মানুষ

ডঃ হো চি মিনের মৃত্যুতে সমগ্র এশিয়ায় যে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হলো, তা সহজে পূরণ হবার নয়, উত্তর ভিয়েৎনামের প্রেসিডেণ্টের পদে হোর উত্তরাধিকারী হিসেবে যিনিই আসুন না কেন। কারণ হো চি মিনের মত সাদা সরল অথচ প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ আজ কোথায়? ডঃ হো দু'যুগ ধরে এশিয়া-আফ্রিকা আমেরিকার কোটি কোটি নিপীড়িত মানুষকে সংগ্রামের, বেঁচে থাকার প্রেরণা যুগিয়ে এসেছেন। অত বিরাট ব্যক্তিত্বের পুরুষ হয়তো ভিয়েতনামে আর কখনই দেখা যাবে না, কিন্তু তাই বলে যে-সুকঠোর দায়িত্ব তিনি রেখে গিয়েছেন, তাকে পালন না করলে চলবে কেন? তাই উত্তর ভিয়েতনামে গঠিত হয়েছে ২৬ জনের এক কমিটি, আপাতত যার কাজ হলো রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় পরলোকগত নেতার অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন করা। এবং সে কমিটির প্রধান পদ দেওয়া হয়েছে লে দুয়ানকে।

উত্তর ভিয়েতনামের ওয়ার্কার্স (কমিউনিস্ট) পার্টির ফার্স্ট সেক্রেটারি লে দুয়ান। সে-সুবাদেই এবং দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার কারণেই হয়তো হো উত্তর দেশের সামনে আশু কর্তব্যে পৌরোহিত্য করার ভার দেওয়া হলো লে দুয়ানকে। ডঃ হো চি মিনের অবর্তমানে দেশে উত্তরাধিকারের লড়াই লেগে যাবে বলে যাঁরা আশা করেন, তাঁদের হয়তো হতাশই হতে হবে। কারণ, পার্টি এবং সরকারী নেতৃত্বে আজ যাঁরা রয়েছেন তাঁরা প্রায় সকলেই দীর্ঘদিন ধরে ডঃ হোর সহকর্মী হিসেবে কাজ করে আসছেন, তাঁর শিক্ষা এখন এ'দের জীবনের সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে। লে দুয়ানের কমিটি প্রধানের পদপ্রাপ্তির পেছনে ক্ষমতার লড়াইয়ের ইতিহাস নেই, সর্বজনগ্রাহ্য ও শ্রদ্ধেয় নেতা হিসেবেই তাঁকে প্রধানের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আসলে উত্তর ভিয়েতনামের প্রেসিডেণ্ট বা পার্টির চেয়ারম্যান কে হবেন, সেটা এখনো অনিশ্চিত।

হোর আর পাঁচজন সহচরের মত লে দুয়ানেরও কৃতিত্ব রয়েছে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদবিরোধী সংগ্রামে সর্বস্ব পণ করার। জাপান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যেমন তিনি লড়েছেন, তেমনি লড়েছেন

লে দুয়ান

ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এবং আজ মার্কিন উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে। উত্তর ভিয়েতনামের অধিবাসীদের কাছে লে দুয়ানের জনপ্রিয়তাও কিছু কম নয়। এখানকার ঘরে ঘরে প্রিয় নেতা চাচা হোর ছবি—কিন্তু সে ছবিতে রয়েছে ডঃ হোর দু'পাশে প্রধানমন্ত্রী ফাম ভান দঙ এবং পার্টির প্রধান সেক্রেটারি লে দুয়ানের প্রতিকৃতি। তবে ভিয়েতনামের ভৌগোলিক সীমানা ছাড়িয়ে বহির্বিশ্বে যদি লে দুয়ানের বিশেষ পরিচিতি না থাকে তো তার জন্যে তাঁকে দোষারোপ করা যাবে না। বস্তুত বাইরের জগৎ ডঃ হো চি মিন এবং দিয়েন ভিয়েনফু-যুদ্ধখ্যাত জেনারেল গিয়াপ ছাড়া কজন নেতার নাম জানে?

পশ্চিমী পর্যবেক্ষকদের মতে লে দুয়ান একজন মস্কোপন্থী নেতা। তা তিনি হতে পারেন। তিনি মনে করেন না যে চীনের কৌশল ও নীতি ভিয়েতনামেও সফল হতে পারে। ডঃ হোর মত লে দুয়ানেরও ধারণা ভিয়েতনামের পারিপার্শ্বিক অবস্থায় যে কৌশলটা সবচেয়ে উপযুক্ত তাই তাঁদের গ্রহণ করা উচিত। অন্যদিকে সোভিয়েট শোধনবাদকে আক্রমণ করতেও লে দুয়ানকে দেখা গিয়েছে।

খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে কি চাষীদের হাতে ব্যক্তিগত জমি থাকা দরকার? —এ প্রশ্নটা একদিন উত্তর ভিয়েতনামে বড় করে দেখা দিয়েছিল এবং প্রাক্তন মন্ত্রী ট্রাওঙ চিন মনে করতেন যে, জমির ব্যক্তিগত মালিকানা একদিন পুঁজিবাদকে আমন্ত্রণ করবে। কিন্তু চিন-এর জবরদস্তিমূলক যৌথখামারের মাধ্যমে উৎপাদন নীতি ব্যর্থ হওয়ায় লে দুয়ানের চাষীদের ব্যক্তিগত জমির মালিকানা দেবার দাবির সার্থকতা প্রমাণিত হয়েছিল।

লে দুয়ানের জন্ম মধ্য আনামে, এখন যেটা দক্ষিণ ভিয়েতনামের সর্ব উত্তর প্রান্তে অবস্থিত। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে ইন্দোচীনকে মুক্ত করার কঠোর সংগ্রামে লে দুয়ানও বিশ্বস্ত সৈনিকের মত ডঃ হোর পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। ফরাসীবিরোধী আন্দোলনে যুক্ত থাকার কারণে তাঁকে দু'বার কারাবরণ করতে হয়েছিল। ফরাসীদের বিরুদ্ধে ইন্দোচীনের চূড়ান্ত যুদ্ধে লে দুয়ান ছিলেন ভিয়েতনামের দক্ষিণ প্রান্তের প্রতিরোধ বাহিনীর কমিশনার। এর পরে তিনি দক্ষিণাঞ্চলের লাও দাঙ (কমিউনিস্ট পার্টি) কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারি নিযুক্ত হন।

১৯৫৬ সালে ডঃ হো চি মিন পার্টির সেক্রেটারি-জেনারেল পদ গ্রহণ করলে লে দুয়ানের হাতেই পার্টির দায়িত্ব অর্পিত হয়। ১৯৬০ সালে লে দুয়ান পার্টির ফার্স্ট সেক্রেটারির পদ লাভ করেন। এর পরে তিনি যদি রাষ্ট্রপ্রধান হন, তাতে বিস্ময়ের কিছু থাকবে না।

সুভাষচন্দ্র ও সমকালীন ভারতবর্ষ

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং—৭

রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক গল্পগুলি

রবীন্দ্রনাথের গল্পের সাহিত্যরসের আলোচনা আমাদের উপজীব্য নয়।* ১৯৩৯—৪০ সালে লেখা কয়েকটি গল্প থেকে আমরা রবীন্দ্রনাথের মনোরূপ মাত্র দেখতে চাইছি।

গল্পের চরিত্রের বক্তব্য থেকে লেখকের বক্তব্যের সন্ধান করার বিপদ আছে। লেখক সহজেই বলতে পারেন, ওটা আমার ব্যক্তিগত কথা নয়; পাত্র বা পাত্রীর কথা। তাহলেও, যদি দেখা যায়, গল্পের পাত্র-পাত্রীর ধারণার সঙ্গে লেখকের উত্তম পুরুষে প্রকাশিত ধারণার ঐক্য আছে, সেক্ষেত্রে ঐ সকল পাত্র-পাত্রীরা লেখকের মুখের কথা কেড়ে নিয়েছেন, বলতে বাধা থাকে না। তিনসঙ্গীর ক্ষেত্রে তেমন হয়েছে কিছু পরিমাণে। রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের অতিরিক্ত বিজ্ঞানপ্রীতি, ঔষধরূপী নাস্তিকতার প্রতি আগ্রহ, ব্যবহারিক সতীত্ব অপেক্ষা ক্যারেকটরের তেজের প্রতি শ্রদ্ধা প্রভৃতি তিনসঙ্গীর মধ্যে দেখতে পাই। জাতীয় আন্দোলনের বৈপ্লবিক ধারা এবং বাঙালী পুরুষের মাতৃভাবুকতা সম্বন্ধে কিছু তিক্ত মন্তব্য আছে দুই পাত্রের মুখে—মন্তব্যগুলি বহুলাংশে রবীন্দ্রনাথেরই।

তিনসঙ্গীতে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের সঙ্গে মেঘনাদ সাহার মনোভাবের যথেষ্ট ঐক্য ছিল। মেঘনাদ সাহা ধর্মবিষয়ে যেসব মত প্রকাশ করেছেন, যার কিছু পরিচয় আগে দেখে এসেছি, তদনুযায়ী বলতে পারি, ঈশ্বরবিশ্বাসের ক্ষেত্রে সাহা নাস্তিক ছিলেন, তবে তাকে "পবিত্র" করে তোলার আড়ম্বর তাঁর নিশ্চয় পোষাত না; যা কিছু বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণসিদ্ধ নয়, তাই তাঁর কাছে স্বতঃই বাতিল। মেঘনাদ সাহার যে জীবনকথা পেয়েছি, তাতে দেখি যে, প্রথম জীবনে তিনি বিখ্যাত বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বাঘা যতীন) সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং ছাত্রাবস্থায় স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে তাতে অংশগ্রহণও করেছিলেন। পরে তিনি বোঝেন বিজ্ঞানই তাঁর স্বধর্ম, সেই বিজ্ঞানকেই বরণ করেছিলেন, এবং বিজ্ঞানের মধ্য দিয়েই দেশসেবা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। 'শেষ কথা'র নবীনমাধবের চরিত্র অনেকটা এই ধরণের। তবে নবীনমাধব রাজনৈতিক বিপ্লববাদ থেকে 'ধর্মান্তরিত' হওয়ায় উত্তেজনায় যেরকম চড়া গলার ভাষায় পূর্বতন জীবননীতির বিষয়ে বিদ্রূপ করেছিলেন, মেঘনাদ সাহা সেইরকম কিছু করেছিলেন বলে জানি না।

একটি বিষয়ে নবীনমাধবের কথা মেঘনাদ সাহা মেনে নেবেন না। হেনরি ফোর্ডের কাছ থেকে নবীনমাধব শুনেছিলেন যে, ইংরেজ জাত অকেজো। নবীনমাধব তার প্রমাণ ভারতবর্ষে দেখেছেন। "একদিন ওরা হাত লাগিয়েছিল নীলের চাষে, চায়ের চাষে আর-একদিন। সিভিলিয়ান দল দফতরখানার 'ল অ্যান্ড অর্ডর'-এর জাঁতা চালিয়ে দেশের অস্থিমজ্জা ছাতু করে বানিয়ে তুলেছে বস্তাবন্দী ভালোমানুষি, অতি মোলায়েম। সামান্য কিছু কয়লার আকর

*রবীন্দ্রনাথের এই বৈজ্ঞানিক গল্পটি কতকগুলি বৈজ্ঞানিক এবং অবৈজ্ঞানিক প্রশ্ন জাগায়। অভীককুমার তাঁর স্বাধীন চিত্রকলার প্রদর্শনী করেছিলেন, বিজ্ঞাপনে বেরিয়েছিল, 'তিনি আধুনিক ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ আর্টিস্ট .. বাঙালী টিশিয়ান।' ১৯৩৯ সালের বেপরোয়া নিয়মভাঙা শিল্পী কখনো নরম মাংসের স্বপ্নসুষমায় শ্রেষ্ঠ শিল্পী টিশিয়ান হতে পারেন? নন্দকিশোরের ল্যাবরেটরী কোন্ বিজ্ঞানের, সে প্রশ্ন উঠতে পারে। ভদ্রলোক প্রধানত ইঞ্জিনীয়ার, কিন্তু 'সকল রকম সায়ান্সেই' তাঁর মন মেতে থাকত, তার ফলে বোঝার জো নেই, তাঁর কারখানা নামক ল্যাবরেটরীর জাত কি?' নন্দকিশোরের গাছপালার ঝোঁক ছিল, যা তাঁকে বর্মা পর্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে পারত, দামী যন্ত্র সংগ্রহের নেশাও ছিল, তাঁর ল্যাবরেটরীতে একেবারে হাল কায়দায় 'গ্যালভানোমিটার' ছিল, 'মাইক্রোফটোমিটর' এবং 'ভ্যাকুয়ম পম্পও'—সে এমন ল্যাবরেটরী যাতে ম্যাগনেটিজম নিয়ে গবেষণা করতে পারে রেবতী ভট্টাচার্যের মত প্রতিভাবান বিজ্ঞানীও। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত মনে হয়, ল্যাবরেটরীটি পদার্থবিদ্যারই। অনেকে অবশ্য মনে করেন এটি প্রতীক ল্যাবরেটরী। সেকথা সহজেই মেনে নেওয়া যেত যদি লেখক অযথা কতকগুলি যন্ত্রপাতির নাম করে ব্যাপারটাকে প্রতীকের পক্ষে গুরুভার করে না ফেলতেন।

ছাড়া ভারতের অন্তর্ভাণ্ডারের সম্পদ উদ্‌ঘাটিত করতে উপেক্ষা করেছে কিংবা অক্ষমতা দেখিয়েছে।.....জামশেদজি টাটাকে সেলাম্ করেছি সমুদ্রের ওপার থেকে।"

মেঘনাদ সাহা ১৯২২ সালে এক ভাষণে উল্টো কথাই বলেছিলেন—

"কি কি কারণে আমাদের এমন দুরবস্থা ঘটল, শুধু বিদেশী গভর্নমেন্টের ঘাড়ে দোষ না চাপিয়ে একটু তলিয়ে দেখা দরকার। ইংরেজ যখন এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হলেন, তখন দেশে তাঁরা কয়লা ও লোহার সাহায্যে শক্তি উৎপাদন করে প্রকৃতিনিরপেক্ষ হাত শিখেছেন।...ভারতের খনিজ-সম্ভার, ভারতের বাণিজ্য ও কৃষিসম্পদ অফুরন্ত। এ সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হবার জন্য তাঁরা কি কি বিষয় অবলম্বন করলেন, আপনারা একবার Chambers of commerce, Geographical Survey, Trignometric survey, Agriculture and Botanical survey, Mining federation, Planters' association প্রভৃতি সরকারী, বেসরকারী সম্প্রদায়ের কার্য করিবার দিকে দৃষ্টিপাত করুন। এই সমস্ত সংঘটন করে ইংরেজ ভারতের শিল্প, কৃষি, বাণিজ্য নিজেদের হস্তগত করে রেখেছেন। আমি এঁদের দূরদর্শিতার ও কার্যতৎপরতার একটি দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। বোধ হয় ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে বা তার কিছু পূর্বে এদেশে Geological Survey ও Trignometrical Survey-র প্রতিষ্ঠা হয়, এই Geological Survey-র কর্মচারিগণ ১৮০৯ খৃষ্টাব্দ হতে ভারতের কোথায় কোন খনিজ দ্রব্য আছে তা অনুসন্ধান করে বেড়াচ্ছেন, তাঁরাই রাণীগঞ্জের কয়লা, মহীশূরের স্বর্ণখনি, ব্রহ্ম ও আসামের কেরোসিন, বরাকরের লোহা ইত্যাদি আবিষ্কার করেছেন।"—(জাতীয় উন্নতির উপায়'—মেঘনাদ রচনা সংকলন)

রবীন্দ্রনাথের গল্পে বিপ্লবী নবীনমাধব বিজ্ঞানী হয়েও শেষ পর্যন্ত চিন্তাভাবনায় কল্প-বিপ্লবীই থেকে গিয়েছিলেন। তা না হলে কেউ ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানকে ব্যক্তিগত প্রয়াসের বস্তু বলে মনে করে? মনে হয় রবীন্দ্রনাথের সামনে বিখ্যাত ভূতাত্ত্বিক প্রমথনাথ বসুর আদর্শ ছিল। নবীনমাধব না হয় কিছু আবিষ্কার করলেন—তাকে ব্যাপক উৎপাদনে প্রয়োগ করবার উপযুক্ত জামশেদ টাটাকে কোথায় পাবেন? নবীনমাধবকে অগত্যা দেশীয় রাজ্যের কথা ভাবতে হয়েছিল, কারণ ব্রিটিশ ভারতে নিরেট শাসন। নবীনমাধব দেশীয় রাজ্যে গিয়ে খনি আবিষ্কার ও কারখানা নির্মাণ পর্যন্ত করে ফেলেছিলেন। সে যাই হোক, নবীনমাধবের পক্ষে এই সহজ কথাটা বোঝা সম্ভব হয় নি—ইংরেজ যদি যথেষ্ট পরিমাণে ভারতবর্ষীয় খনিজ সম্পদ সন্ধান করে ব্যবহার না করে, তার মূলে তার অক্ষমতা নয়, পলিসি। সে সেইটুকুই মাত্র উদ্ধার করবে, যতটুকু তার নিজের বৈষয়িক স্বার্থের পক্ষে প্রয়োজন। নিজের শক্তিসামর্থ্য সম্বন্ধে তার ধারণা খুবই স্পষ্ট, আয়ত্তে রাখতে পারবে না এমন সম্পদের সন্ধানে তার প্রবৃত্তি নেই, ভারতবর্ষের সুখবৃদ্ধির জন্য সে বদ্ধপরিকর নয়, এবং সে বিশেষ আতঙ্কের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিল—সর্বপ্রকারে বাধা সৃষ্টি করা সত্ত্বেও কিভাবে কিছু কিছু ভারতীয় উৎপাদক-ব্যবসায়ী এগিয়ে যাচ্ছে। জামশেদ টাটা সম্বন্ধে ইংরেজের মন প্রসন্ন ছিল না। সুতরাং 'ভারতের অন্তর্ভাণ্ডারের সম্পদ উদ্‌ঘাটনে' তার অনিচ্ছা প্রমাণ করে না সে অক্ষম। এখানে দেখতে পাচ্ছি, নবীনমাধবের রাজনৈতিক বুদ্ধি নিতান্তই অপরিপক্ব,—যখন তিনি স্বদেশের সস্তা রাংতা-লাগানো দেশপ্রতিমার সামনে অশ্রুজল ফেলেছেন কিংবা বিদেশের দামী ইস্পাত-লাগানো কারখানা-প্রতিমার সামনে বিস্ফারিত চোখের অর্ঘ্য তুলে ধরেছেন—উভয়ক্ষেত্রেই।

একটা কথা রবীন্দ্রনাথ কিংবা মেঘনাদ সাহা প্রায়ই মনে রাখেন নি বা ভুলতে চেয়েছেন, তা হল, রাশিয়ার জাতীয় পরিকল্পনা রুশ বিপ্লবের পরেই হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র তাই পরিকল্পনাদিতে প্রচুর উৎসাহ দেখিয়েও কখনো স্বাধীনতা-প্রশ্নকে অগ্রাধিকার দিতে ভোলেন নি। আসল কথা রবীন্দ্রনাথ বিপ্লবোত্তর রাশিয়ার ভূতাত্ত্বিক সন্ধানের ব্যাপকতায় খুবই মুগ্ধ হয়েছিলেন,*৩ এবং নবীনমাধবের মধ্যে তারই কিছু প্রবেশ করিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন।

রাশিয়ার নীতিতে রবীন্দ্রনাথের এইকালে আকর্ষণের

---

৩ সাহা *Technological Revolution in Industry—How the Russians did it* প্রবন্ধে রাশিয়ার ভূতাত্ত্বিক সন্ধানকার্যের বিষয়ে কিছু সংবাদ দিয়েছেন। জার রাশিয়ায় ভূতাত্ত্বিকের সংখ্যা ছিল নগণ্য, আর তারা খনিজ দ্রব্যের জন্য সন্ধানকার্য না করে শুধু ভূতাত্ত্বিক চার্ট তৈরি করত। সোভিয়েট সরকার এসেই জিওলজিক্যাল বোর্ড স্থাপন করেন, যার উদ্দেশ্য সন্ধান ও গবেষণা। সেই সঙ্গে ভূতাত্ত্বিক শিক্ষারও ব্যবস্থা করল প্রচুরভাবে, যার ফলে অতি অল্পকালে হাজার হাজার জিওলজিস্ট রাশিয়ার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে, এবং বহুপ্রকার খনিজ দ্রব্য আবিষ্কার ক'রে প্রমাণ করে দেয় ভূগর্ভ-সম্পদে রাশিয়া পৃথিবীতে প্রথম কি দ্বিতীয় স্থানাধিকারী। সাহা জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার ডিরেক্টর ডাঃ সি এস ফক্সের ১৯৩৮ সালে লেখা প্রবন্ধ থেকে তথ্য উদ্ধৃত করেছেন: A Government with immense courage embarked upon the fullist exploitation of its mineral and other resources and established industries in the face of every kind of foreign criticism. When other countries may have 100 Geologists the Soviet had 10,000 and the whole land was searched and all mineral occurences reexamined. New discoveries were made but a vast amount of information already existed although it was not previously

একটি প্রমাণ 'শেষ কথা'র পূর্বরূপ 'ছোট গল্পে'র মধ্যে রয়েছে। নবীনমাধবকে সাহায্য করতে হেনরি ফোর্ড রাজী হন নি। ফোর্ডের অভিপ্রায়, ইংলণ্ডের অকেজো মামাতো ভাইদেব কেজো করে তুলবেন। কথা শুনে নবীনমাধব খুবই ধাক্কা খান, কারণ প্রথম মহাযুদ্ধের পরেও তাঁর বোঝ-বার ক্ষমতা হয় নি ধনতান্ত্রিক আমেরিকা ধনতান্ত্রিক ইংলণ্ডের সঙ্গে এক বিছানার বাসিন্দা। নবীনমাধবের প্রতিক্রিয়া : "অর্থাৎ অকেজো টাকাওয়ালাকে কেজো করবে কেজো টাকাওয়ালা সগোত্রের লাইন বাঁচিয়ে, আমরা থাকব চিরকাল কেজোদের হাতে কাদার পিণ্ড। তারা পুতুল বানাবে। এই দুঃখেই গিয়েছিলুম একদিন সোভিয়েটের দলে ভিড়তে। তারা আর যাই করুক কোনো নিরুপায় মানবজাতকে নিয়ে পুতুলনাচের অর্থকরী ব্যবসা করে না।"

নবীনমাধব সুতরাং সোস্যালিস্ট। তাহলেও ধর্মঘটের ব্যবসাকে তিনি সমর্থন করেন না। ইনডাস্ট্রি গড়ে ওঠার আগে ইন্ডাস্ট্রি ভাঙায় তাঁর সায় ছিল না। আমি 'ছোট গল্প' থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করছি, একালের পরিপ্রেক্ষিতে কথাগুলি অনেকের কাছে আকর্ষণীয় লাগবে।

"ইতিমধ্যে কিছু দূরে আমাদের অর্ধ সমাপ্ত কয়লার খনিতে মজুরদের হল স্ট্রাইক। ঘটালেন যিনি, এই তাঁর ব্যবসা, স্বভাব এবং অভাববশত; সমস্ত কাজের মধ্যে এইটেই সবচেয়ে সহজ। কোনো কারণ ছিল না, কেন না আমি নিজে সোস্যালিস্ট, সেখানকার বিধিবিধান আমার নিজের হাতে বাঁধা; কারও সেখানে না ছিল লোকসান, না ছিল অসম্মান।

"নূতন যন্ত্র এসেছে জর্মানি থেকে, তারই খাটাবার চেষ্টায় ব্যস্ত আছি। এমন সময় উত্তেজিতভাবে এসে উপস্থিত অচিরা। বললে, 'আপনি মোটা মাইনে নিয়ে ধনিকের নায়েবি করছেন, এদিকে গরিবের দারিদ্র্যের সুযোগ-টাকে নিয়ে আপনি—'

"চন্ করে উঠল মাথাটা। বাধা দিয়ে বললুম, 'কাজ চালাবার দায়িত্ব এবং ক্ষমতা যাদের তারাই অন্যায়কারী, আর জগতে যারা কোনো কাজই করে না, করতেও পারে না, দয়ামায়া কেবল তাদেরই—এই সহজ অহংকারের মত্ততায় সত্যমিথ্যার প্রমাণ নিতেও মন চায় না।'

"অচিরা বললে, 'সত্য নয় বলতে চান?'

"আমি বললুম, 'সত্য শব্দটা আপেক্ষিক। যা কিছু যত ভালই হোক, তার চেয়ে আরও ভালো হতেও পারে। এই দেখুন-না আমার মোটা মাইনে বটে, তার থেকে মাকে পাঠাই পঞ্চাশ, নিজে রাখি ত্রিশ, আর বাকি—সে হিসেবটা থাক। কিন্তু মার জন্য পনেরো, নিজের জন্য পাঁচ রাখলে আইডিয়ালের আরও কাছ ঘেঁষে যেত, কিন্তু একটা সীমা আছে তো।'

"অচিরা বললে, 'সীমাটা কি নিজের ইচ্ছের উপরেই নির্ভর করে।'

"আমি বললুম, 'না, অবস্থার উপরে। যে কথাটা উঠল সেটা একটু বিচার করে দেখুন। য়ুরোপে ইণ্ডাস্ট্রিয়া-লিজ্‌ম্‌ গড়ে উঠেছে দীর্ঘকাল ধরে। যাদের হাতে টাকা ছিল এবং টাকা করবার প্রতিভা ছিল তারাই এটা গড়েছে। গড়েছে নিছক টাকার লোভে, সেটা ভালো নয় তো মানি। কিন্তু ঐ ঘুষটুকু যদি না পেত তাহলে একেবারে গড়াই হত না, এতদিন পরে আজ ওখানে পড়েছে হিসেবনিকেশের তলব।'

"অচিরা বললে, 'আপনি বলতে চান পায়ে তেল শুরুতে, কানমলা তার পরে?'

"'নিশ্চয়। আমাদের দেশে ভিত-গাঁথা সবে আরম্ভ হয়েছে, এখনই যদি মার লাগাই তাহলে তা শুরুতেই হবে শেষ, সুবিধে হবে বিদেশী বণিকদের। মানছি আজ আমি লোভীদের ঘুষ দেওয়ার কাজ নিয়েছি, টাকাওয়ালার নায়েবি আমি করি। আজ সেলাম করছি বাদশার দরবারে এসে, কাল ওদের সিংহাসনের পায়ায় লাগাব কুড়ুল। ইতিহাসে তো এই দেখা গেছে।' "

নবীনমাধবের চিন্তায় যথারীতি অনেকগুলি ফাঁক থেকে গেছে। শিল্পায়নের শুরুতে ধর্মঘটের পক্ষপাতী তিনি নন। এ মত সোস্যালিস্টরা খানিক অংশে মানেন, যখন ধরে নেন, পরবর্তী বিপ্লবের জন্য ব্যাপক শিল্পায়ন ও শ্রমিক-অসন্তোষের প্রয়োজনীয়তা আছে। সে কিন্তু স্বাধীন ধনতান্ত্রিক দেশের ক্ষেত্রে। পরাধীন দেশে অধিকাংশ শিল্প যেখানে বিদেশী শাসকদের করায়ত্ত সেখানে শিল্পে শ্রমিক-অশান্তি অবশ্যই প্রয়োজন—স্বাধীনতার জন্য। তাছাড়া শিল্পায়নের জন্য ব্যক্তিগত মালিকানার আবশ্যিকতা স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক দেশ স্বীকার করে না। রাশিয়া যাত্রা আরম্ভ করেছিল ভারতের মত অবস্থা থেকেই, ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ করেও শিল্পোন্নত হতে তার আটকায় নি। সোস্যা-লিস্ট নবীনমাধব তা বুঝলেন না কেন?

আসলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের চিন্তার দুর্বলতা বা অস্পষ্টতা নবীনমাধবের মধ্যে বর্তেছিল। সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ার কতকগুলি সাফল্যে তিনি মুগ্ধ, কিন্তু ও-বস্তু যে

---

followed up. By confidence in its technological personnel and courage and enterprise the Soviet Government already in 1937 astonished all those scientists, geologists (among whom the writer was one) and engineers who visited Russia." *(Science and Culture, April, 1943)*.

ভূতাত্ত্বিক সন্ধানে সোভিয়েট রাশিয়ার অগ্রগতির বিষয়ে সংবাদ সাহার কাছ থেকে রবীন্দ্রনাথকে পেতে হয় নি, রাশিয়া থেকে রবীন্দ্রনাথের কাছে নানা সংবাদবাহী পত্রপত্রিকা পাঠানো হত নিয়মিত। এ সংবাদ আমাকে অধ্যাপক উজ্জ্বলকুমার মজুমদার দিয়েছেন।

যত বাঁধ দাও

[illegible]

পূবের আলো পশ্চিমে আসে
ফিরে গিয়ে ফের উঁকি দেয় পূবাকাশে,
যত বাঁধ দাও আকাশ আকাশ
আলো আলো রয় সুগভীর বিশ্বাসে।

বন্ধ কবাট রুদ্ধ করে না আলো
ব্যর্থ প্রয়াস বিকল লুকোচুরি,
পাখা ঝাপটায় আক্রোশে মিনাকালো
এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় সত্যের তরবারী।

তথাকথিত গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে হওয়া সম্ভব ছিল না, তা তিনি ভেবে দেখেন নি বা ভাবলেও বলেন নি। প্রগতি এবং গণতন্ত্র, উভয়ের তিনি ভক্ত, কিন্তু কিছু সময়ের জন্য প্রগতির জন্য গণতন্ত্রকে রুদ্ধ করতে হয়—রবীন্দ্রনাথের পক্ষে একথা মানা অসম্ভব ছিল। এক্ষেত্রে তাঁর দায়িত্ব ছিল, কিভাবে ডিক্টেটারীয় গণতন্ত্র বজায় রেখেও সমাজতন্ত্র আনা সম্ভবপর তা দেখিয়ে দেওয়া। কিন্তু আগেই আমরা দেখিয়েছি, রবীন্দ্রনাথ কবি হিসাবে কোথায় রাশিয়ার ভালো ও কোথায় মন্দ, তা নিরপেক্ষভাবে বলতে পারেন, কিন্তু রাজনৈতিক হিসাবে সুভাষচন্দ্র যদি কোনো কিছু ভালো বিবেচনা করেন, এবং তাকে গ্রহণ করতে মনস্থ করেন, কিছু অনিবার্য মন্দের সঙ্গেই তাকে বরণ করবেন, মন্দটুকুর বিরুদ্ধে নিন্দার ঝড় তুলবেন না।

তিন সঙ্গীর বিভিন্ন নায়কের মুখে ভারতের বৈপ্লবিক আন্দোলন এবং বাঙালীর মাতৃতান্ত্রিক স্বভাব সম্বন্ধে যে-সকল বিদ্রূপ বসানো হয়েছে, মজার কথা, সেই সকলের লক্ষ্য সহজেই হতে পারে সুভাষচন্দ্রের আচার-আচরণ। নবীনমাধব বাংলার বিপ্লব আন্দোলন সম্বন্ধে যা বলেছিলেন, সুভাষচন্দ্র নিশ্চয় তার সঙ্গে একমত হবেন না। 'যেমন-তেমন করে মরা' ব্যাপারটাকে স-জীব নবীনমাধব যতখানি সহজ করে দেখিয়েছেন, সেটা সত্যই তত সহজ ছিল না। ইতিহাসের একযুগে নিজেরা 'যেমন-তেমন করে' মরতে পেরে ও-ব্যাপারটাকে পরের যুগে সহজ ও তুচ্ছ করতে পেরেছিলেন বলেই বিপ্লবীরা নমস্য। ঐ ধরণের বিপ্লবচেষ্টার কার্যকারিতা পরবর্তীকালে হ্রাস পেয়েছে, একথা মেনে নিয়েও সুভাষচন্দ্র কখনো প্রাণ-দেওয়াকে তুচ্ছ করতে পারেন নি নবীনমাধব নামক বীর বৈজ্ঞানিকের মতো।

নবীনমাধবের নিন্দাকে শিরোধার্য করে সুভাষচন্দ্র অধিকন্তু দেশকে দেশমাতৃকা বলতেন। 'অক্ষম অভুক্ত অশিক্ষিত দরিদ্রকে' দরিদ্রনারায়ণ বলাও তাঁর অভ্যাস ছিল। স্বদেশের রাংতা-লাগানো প্রতিমার সামনে চোখের জলও তিনি ফেলতেন। দেশের কাপুরুষকুলে পুরুষ হয়েও তিনি 'মা মা হাম্বাধ্বনি' করে গেছেন সারাজীবন। ব্যাপারটা দুঃখের, তিনসঙ্গী গল্পের বৈজ্ঞানিক চরিত্রগুলির পক্ষে কিন্তু উপায় নেই, একটা গোটা দেশের সেন্টিমেন্ট নিয়ে অভদ্র ব্যঙ্গ করা সুভাষচন্দ্রের পক্ষে সম্ভব ছিল না; তিনি সত্যই দেখেছিলেন—দেশকে মা বললে তাকে মায়ের মত ভালবাসা যায়, দেশপ্রতিমার সামনে চোখ থেকে ঝরে-পড়া জলই আগুন হয়ে ওঠে, এবং দেশপ্রীতি নামক আবেগ, যা জাতীয় আন্দোলনের পক্ষে প্রয়োজনীয়, তা সহজে জেগে ওঠে জাতিগত মাতৃভাবনার মধ্য দিয়ে; দরিদ্র তার অশিক্ষা, অক্ষমতা বা বুভুক্ষার জন্য নারায়ণ নয়, অন্তর্নিহিত দেবত্বের জন্য মনুষ্যমাত্রেই নারায়ণ, সে নারায়ণকে ধনীর ও প্রতিষ্ঠাবানের মধ্যেই যখন মানুষ দেখতে অভ্যস্ত তখন তার মন ঘোরাবার, চোখ ফোটাবার জন্য দরিদ্রনারায়ণ পূজার আহ্বান, 'সর্বহারাদের' মহিমা ঘোষণার মতই সে ব্যাপার। সুভাষচন্দ্র জানতেন, মানুষকে কেন ভালবাসব তার উত্তর পৃথিবীতে নানা জনে নানাভাবে দিয়েছে, তার একটি উত্তর—মানুষ স্বরূপে দেবতা বলেই সেবাযোগ্য, এবং সেই উত্তরে যারা বিশ্বাস করে তারা ঐ মনুষ্যদেবতার সর্বাধিক দুঃখের ক্ষেত্রে তার মধ্যে দেবত্বকে সর্বাধিক পরিমাণে অনুভব করতে চায়, —তারই জন্য দরিদ্রকে দরিদ্রনারায়ণরূপে দর্শন।

সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সমাদরপুষ্ট চরিত্রগুলির সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মনোভাবের পার্থক্য যথেষ্ট। অথচ এইকালে সুভাষচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের প্রশ্রয়প্রাপ্ত একটি চরিত্র। তার কারণ, রবীন্দ্রনাথ দেখলেন, মাতৃব্যাকুল দরিদ্রনারায়ণ পূজারীদের মধ্যে সুভাষচন্দ্র অপরদিকে সর্বাধিক বৈজ্ঞানিক মনোভাবাপন্ন। হরিপুরা-ভাষণের সুভাষচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ জেনেছিলেন। স্বাধীন ভারতের পুনর্গঠন কোন্ পদ্ধতিতে হবে সে বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের স্পষ্ট প্রগতিশীল চিন্তাকে লক্ষ্য করেছিলেন। ভারতবর্ষে ধর্ম ও রাজনীতিকে জড়িয়ে ফেলার অসংশোধনীয় অভ্যাস, এবং বিজ্ঞান-বিরোধী মনোভাব প্রভৃতির বিরুদ্ধে সুভাষচন্দ্রের উদ্দীপ্ত প্রতিরোধও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। সুতরাং সুভাষচন্দ্রের জাতীয় পরিকল্পনার প্রতি তিনি সমর্থন না জানিয়ে পারেন নি, যার অর্থ, যন্ত্রশিল্পায়ন সমর্থন, এবং ভূগর্ভলুণ্ঠন—এ সবই একই রবীন্দ্রনাথের করা যিনি 'মুক্তধারা'-র স্রষ্টা।।

[ক্রমশ]

CALCUTTA UNIVERSITY LIBRARY

বই-বাজার

বাংলা বইয়ের মেলা

[পূর্বানুবৃত্তি]

রঞ্জন-পাবলিশিং হাউস থেকে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালার সপ্তম বই বেরোয়—'নববাবুবিলাস' (জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪)। সে-কথা আগেই বলা হয়েছে।

সমাচার-দর্পণে যে 'বাবু'র উপাখ্যান বেরোয়, তাতে গল্পটা এই যে, অমরাবতী নগরে রাজচক্রবর্তী নামে এক বিশেষ ধনবান কুলীন ব্রাহ্মণ ছিলেন। আইন-কানুনে অভিজ্ঞ এবং বেশ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন মানুষ তিনি,—এই পরিচয়ের ফলে-আফিমের কুঠীর দেওয়ান হন তিনি। কৌশলের গুণে, সে-কাজে তিনি আরো ধনসঞ্চয় করেন। একটি পুত্রসন্তানের জন্ম হয়। তার যখন ছ' মাস বয়স, সেই সময়ে খুবই সমারোহের সঙ্গে তার অন্নপ্রাশন হোলো। অনেকেই বললেন—নাম কি হবে? কেউ বললেন, তিলকচন্দ্র—কেউ বললেন আর কিছু। অবশেষে স্থির হোলো—নাম রাখা হোক, তিলকচন্দ্রবাবু।

বাবুর লক্ষণ কি কি? ঘুড়ী তুড়ী জস দানে আখড়া বুলবুলি মণিয়া গান। অষ্টাহে বনভোজন এই নবধা বাবুর লক্ষণ।

আদরের বাড়াবাড়িতে, শিক্ষার অভাবে ষোল বছর বয়সেই এই তিলকচন্দ্রের অপদার্থতা সুনিশ্চিত হোলো। মোসাহেবের খোসামুদির অন্ত ছিল না—

> "বৃত্তিভোগী অধ্যাপক মহাশয়েরা দর্শনশাস্ত্রাদির বিচারস্থলে বাবুকে মধ্যস্থ মানেন বাবু তাহা বুঝেন এমত ক্ষমতা কি কিন্তু শেষ করিয়া দেন ইঁহাতে পণ্ডিত ঠাকুরেরা কহেন যে বাবুজী দেবানুগৃহীত মনুষ্য॥"—

আনন্দ বললে,—তারপর নিশ্চয় দেওয়ানজীর মৃত্যু হোলো,—এবং তিলকচন্দ্র তাঁর অনেকদিনের চাল বদলাতে খুবই অসুবিধা বোধ করে আরো মিথ্যাবাদী এবং আরো সমাজ বিরোধী হয়ে উঠলেন?

—হাঁ–'বাবু'—উপাখ্যানের প্রথম খণ্ডে 'বাবু'র এইরকম সব অবস্থারই কথাই দেখা যায়। দ্বিতীয় খণ্ডেও এই-রকমই।

সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ লিখে গেছেন—"সমাচার-দর্পণে" প্রকাশিত এ-ধরনের ব্যঙ্গরচনায় যে সাহিত্যিক ধারার সূত্রপাত হয়, তাহাই 'নববাবুবিলাসে'র মধ্য দিয়া ক্রম-বিকশিত হইয়া পরিশেষে 'আলালের ঘরের দুলালে' পূর্ণ পরিণতি লাভ করে।" তিনি নিজেও একথা বলেছেন, আবার 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে' রাজেন্দ্রলাল মিত্র এই সব ব্যঙ্গ-রচনার সঙ্গে 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর সম্ভাবিত যোগ সম্বন্ধে যে-কথা লিখেছিলেন, সে-কথাগুলিও স্মরণ করেন। সে সব তো আগেই বলা হয়েছে। আর, 'দূতীবিলাস'-এর কথা-প্রসঙ্গে তিনি লেখেন—

> শ্রীভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কোন দোষী পরিবারের নিগ্রহনার্থে দূতীবিলাস নামে একখানি কাব্য প্রস্তুত করেন। তাহাতে অন্যান্য বাঙ্গালী ব্যঙ্গ-কাব্যের আদর্শে অনেক জঘন্য অশ্লীলতা আছে, অধিকন্তু তাহার কবিত্ব যৎসামান্য।

আমি বললুম,—'দূতীবিলাস' সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাবে। এখন বরং 'নববাবুবিলাস'-এর প্রসঙ্গই শেষ হোক।

—হাঁ, তাই হোক,—তখন তো 'বাবু' বলতেই এক-একটি 'কাপ্তেন' বোঝাতো। তাঁরা অনেকেই ছিলেন ঋণে আকণ্ঠ-মগ্ন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দের ৩১এ জানুয়ারি তারিখের 'ক্যালকাটা জর্নেল' পত্রিকাতেও এসব বেরিয়েছিল। ব্রজেন-বাবু লিখেছেন—

> 'নববাবুবিলাস' ও এই ধরনের অন্যান্য পুস্তক এই সকল অভ্যাসের কুফল প্রদর্শন করিয়া, বাবুদের চরিত্র সংশোধনের উদ্দেশ্যেই রচিত হয়।"

এই বই সম্বন্ধে লঙ্-সাহেবের প্রশংসা—["One of the ablest satires on the Calcutta Babu"], —'ফ্রেন্ড অফ ইণ্ডিয়া' পত্রিকার খুবই অনুকূল মন্তব্য, [Every opportunity we have enjoyed of examining the subject has confirmed us in its justness.]— এবং আরো কারো কাবো সমাদরের খবর এখন অনেকেই জানেন। শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে পৌঁছোবার মধ্যেই অনেকগুলি সংস্করণ বেরিয়ে যায় এই বইয়ের। এ-বইয়ের নাট্যরূপও বেরোয়। ব্রজেন্দ্রনাথ ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের ১১ই জুলাই তারিখের 'সংবাদ প্রভাকর' থেকে একটি বিজ্ঞাপন উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, তখনো নতুন-ভাবে—'পদ্য ও গদ্যে নাটকাকারে সুন্দররূপে'—এ-বই লেখা এবং ছাপা হয়েছে।

আনন্দ বললে—আমি যে তোমায় বলেছিলুম—ঐ সময়ের বাংলা বইয়ের ভাষা কেমন যেন বানানো মনে হয়,

—সে-বিষয়ে তোমাকে ঐ বিজ্ঞাপনটি ভালভাবে লক্ষ্য করতে অনুরোধ করি। ১৮২৩ নাগাদ যদি 'নববাবুবিলাস' লেখা হয়ে থাকে, তাহলে এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ১৮৫৭ সালেই সে-ভাষা পুরোনো হয়ে গিয়েছিল। শোনো ঐ বিজ্ঞাপনের ছত্রগুলি ছেপে দিয়ে, তার নীচেই ব্রজেন্দ্রনাথ কী লিখেছেন—

'ইহাতে নববাবুবিলাসের ভাষা ও রচনারীতি সম্বন্ধে যে অবজ্ঞা প্রকাশ করা হইয়াছে তাহা লক্ষ্য করিবার মত। ত্রিশ-প'য়ত্রিশ বৎসরব্যাপী শিক্ষা ও সামাজিক পরিবর্তনই উহার কারণ। তবু সেকালের বাবুগণের চরিত্র বর্ণনাকাজে 'বারু নাটকের' রচয়িতা নববাবুবিলাসকে আদর্শ বলিয়া গ্রহণ না করিয়া পারেন নাই। 'আলালের ঘরের দুলালে'ও এই আদর্শেরই অনুকরণ করা হইয়াছিল। প্রকৃত প্রস্তাবে 'নববাবুবিলাস'ই যে বাংলা ব্যঙ্গচিত্র ও ব্যঙ্গমূলক উপন্যাসের প্রথম নিদর্শন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।'

আগে নিরাকার ব্রহ্মের বন্দনা,—তারপর সিদ্ধিদাতা গণপতির,—তারপর বীণাপাণির,—পদ্যে এই তিন বন্দনার শেষে এই বইখানিতে অদ্ভুত সমাসভারাক্রান্ত গদ্য ভাষায় যে ভূমিকা পাওয়া যায়, তাতে কলকাতার এবং সন্নিহিত অন্যান্য অঞ্চলের [—যেমন চিৎপুর, খিদিরপুর, ভবানীপুর,—শালিকা, শিবপুর, চুঁচুড়া, শ্রীরামপুর] বাবুদের বৃত্তান্ত প্রকাশ করতে লেখক যে উদ্যোগী হয়েছিলেন,—সেই খবরটি পাওয়া যায়। তারপর, 'অঙ্কুর', 'পল্লব', 'কুসুম' এবং 'ফল'—এই চার অধ্যায়ে রামগঙ্গা-নাগের পুত্র জগদ্দুর্লভ বাবুর কাহিনী এগিয়েছে।

এক-একটি পর্ব বা অধ্যায়ের এই ধরনের বিশেষ নামকরণ 'নববিবিবিলাসে'রও রীতি। গম্ভীর সমাসবদ্ধ পদের প্রাচুর্য,—সেই সঙ্গে চলিত শব্দেরও প্রয়োগ,—দীর্ঘ বাক্যবন্ধন—এবং শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের প্রতি বেশি মনোযোগ—এইগুলিই ভবানীচরণের এই সব রচনার ভাষাভঙ্গির বিশেষত্ব। মনে হয়, শব্দের ধ্বনিগত স্বাদেই তাঁর মন অনেকটা আচ্ছন্ন ছিল। তিনি যে সব বৃত্তান্ত পরিবেষণ করেছেন, সেগুলির বাস্তব সত্যতা সম্বন্ধে সব জায়গায় ঠিক সন্দেহমুক্ত হবার উপায় নেই।

আমি বললুম,—কেন? একথা কেন?

আনন্দ বললে—দ্যাখো, সেকালে যাঁরা গুরুমশাই অর্থাৎ শিক্ষক হতেন, তাঁরা অনেকেই কায়স্থ ছিলেন,—এ-কথাটা অসত্য নাও হতে পারে;—কায়স্থদের শিক্ষকবৃত্তি অনেক দিনের ব্যাপার; কিন্তু এই সব দুঃস্থ কায়স্থ শিক্ষকরা থাকতেন কোথায়?—কোথাকার বাসিন্দা ছিলেন তাঁরা? ভবানীচরণ এক নিশ্বাসে বলে গেছেন—আনাইপুর, আদবপুর হয়েড়া হবষপুর কৈয়োড় কামালপুর সানুই শিবপুর বেগুট গগুট রাইপুর ছাঁদড় কাঁদড়......

আমি বললুম—ছাঁদড় কাঁদড় আমড়া জামড়া কাগাঁ নগাঁ—এসব গ্রাম ছিল নিশ্চয়,—হয়তো আছে এখনো। কিন্তু সে-কথা যাক্‌। 'নববাবুবিলাস' মোটামুটি 'বাবু'র উপাখ্যানেরই রকমফের। এখানে বাবুদের বাল্যশিক্ষার আয়োজনে আগে গুরুমশাই দেখা দেন,—তারপর তিন টাকা মাইনের মুন্‌শী আসেন—কর্তার পক্ষে যাঁর পাণ্ডিত্য বিচার করা অসম্ভব, কারণ কর্তা, নিজেও মূর্খ,—একজন যত্নে মাঝির ইংরেজি সার্টিফিকেট পড়ে দেখা তাঁর সামর্থ্যের বাইরে। অগত্যা, সেই মাঝিই আসে বাবুকে ফার্শী শেখাবার মুন্‌শী হয়ে। ইংরেজি শেখাবার জন্যে দেওয়া দেন—"কোন হিন্দুস্থানী বেশ্যা কিম্বা বাঙ্গালি বেশ্যা অথবা মেথরাণী গর্ভজাত একজন সাহেব...।"

এইভাবে বাবুর 'শিক্ষাপর্ব' উদ্‌যাপিত হয়। অতঃপর তাঁর বিষয়কর্ম শুরু হয়। 'অঙ্কুর'-খণ্ডের পরিসমাপ্তি এইখানেই। তারপর 'পল্লবখণ্ড'।

আমি বললুম—এই পল্লবখণ্ডে বাবু-চরিত্রের আরো সব উত্তেজনার কথা আছে। সে-সব কথা লিখতে সংকোচ ঘটেছিল প্রমথনাথ শর্মার। ভবানীচরণের ছদ্মনাম সেটি।—এই পল্লবখণ্ডেই প্রসিদ্ধ সেই লুচ্চে বৃত্তান্তটি পাওয়া যায়—বাবুজীর প্রতি প্রদত্ত নানা উপদেশের একটি দ্বিতীয় উপদেশ—

লোকে যারে বলে লুচ্চ; সে কেবল জানিবা তুচ্ছ,
লুচ্চ বিনা মজা জানে নাই।

এবং—

লুচ্চ হলে দাতা হয়, কাহারো না করে ভয়
কেবল প্রেমের বশ রয়।
যে জন শিরিতে রাখে তার প্রেমে বন্দী থাকে
তার জন্য বহু দুখ পায়।

দ্বিতীয়, চতুর্থ উপদেশাত্মক, দুটি ধারাই অশ্লীলতা-দুষ্ট। রাজেন্দ্রলাল ঠিকই বলেছিলেন।

আমি বললুম—থাক্‌ তবে, যাতে সাহিত্য নেই, শুধু অশ্লীলতা আছে, সে-সব অংশের বিশদ আলোচনার দরকার নেই। এবারে বরং ভবানীচরণের আর একটি রচনার কথায় এগিয়ে যাওয়া যাক্‌।

আনন্দ বললে—ভবানীচরণের 'কলিকাতা কমলালয়' [প্রথম তরঙ্গ] কলকাতার সমাচারচন্দ্রিকা-প্রেসে ছাপা হয় ১২৩০ সালে। রঞ্জন-পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত 'দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা'-পর্যায়ের প্রথম পুস্তিকা এটি। 'কলিকাতা কমলালয়' পুস্তিকার মলাটে রঞ্জন-পাবলিশিং হাউস থেকে এই 'দুষ্প্রাপ্য' পর্যায়ে প্রকাশিতব্য যে আরো চোদ্দখানি বইয়ের বিজ্ঞাপন ছাপা হয়, সেই গ্রন্থতালিকার মধ্যে 'কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ', 'কথোপকথন',—গোলোকনাথ শর্মার 'হিতোপদেশ',—রামরামের 'লিপিমালা', চণ্ডীচরণ মুন্সীর 'তোতা ইতিহাস' ইত্যাদি বইয়েরও নাম ছিল।

'কলিকাতা কমলালয়'-এর 'ভূমিকা'য় বইখানির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়—

"এই কলিকাতা মহানগরের স্থূলবৃত্তান্ত বিবরণ

করিয়া 'কলিকাতা কমলালয়' নামক গ্রন্থকরণে প্রবর্ত্ত হইলাম।"..."এতদ্‌গ্রন্থ পাঠে বা শ্রবণে অনায়াসে এখানকার ব্যবহার ও রীতি ও বাক্‌চাতুরী ইত্যাদি আশু জ্ঞাত হইতে পারিবেন, অধিকন্তু কলিকাতা কমলালয় হইতে বৃত্তান্তরূপ অনেক রত্নলাভ হইতে পারিবেক।"

তবে, এই রত্নলাভ সম্ভাবনার পথে কিছু কিছু বাধা যে বিদ্যমান তাও তিনি বলে গেছেন—"দোষদর্শী মূর্খরূপ কুম্ভীর নিন্দকরূপী সর্প ইহারা এ কমলালয় হইতে রত্নলাভের ব্যাঘাত করিবার নিমিত্ত স্বীয় স্বভাবদ্বারা অনেক যত্ন পাইবেক অর্থাৎ এতদ্‌গ্রন্থ গ্রহণে বা পাঠে অনেক বাধা জন্মাইবেক"—কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁর ভরসা ছিল যে, যাঁরা বিজ্ঞজন, তাঁরা মূর্খ এবং নিন্দকের সে সব প্রয়াস ব্যর্থ করে দেবেন। বইখানির গ্রন্থন-পরিকল্পনা সম্বন্ধে বলা হয় যে,—এই গ্রন্থে চারি তরঙ্গ হইবেক।"

—বইয়ের বিষয়বস্তু যাই হোক্‌, এ-বইয়ে পাঠকের প্রতি যথার্থ মনোযোগ ছিল—কি বলো? সেই মনোযোগ ছিল বলেই আজ এতদিন পরেও এসব বইয়ের মনোযোগী পাঠক আছেন,—যেমন শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী।

—কিন্তু হাঁ, পরিকল্পনা এবং উদ্দেশ্য-ব্যাখ্যা, দুই-ই ছিল,—প্রথমেই বইয়ের নামটির কী যে মানে—সেই প্রশ্ন মনে জাগে। তার উত্তর—

> "কলিকাতার সাগরের সহিত সাদৃশ্য আছে তৎপ্রযুক্ত কলিকাতা কমলালয় নাম স্থির হইল, কমলা লক্ষ্মী তাঁহার আলয় এই অর্থদ্বারা কমলালয় শব্দে যেমন সমুদ্রের উপস্থিতি হইতেছে তেমন কলিকাতার উপস্থিতিও হইতে পারে অতএব কলিকাতা কমলালয় শব্দের যৌগার্থ রহিল।"

বাইরে থেকে যাঁরা কলকাতায় আসেন, তাঁরা এই মহানগরীর চালচলন জানতে উৎসুক। একজন নগরবাসী এই ধরনের কৌতূহল তৃপ্ত করবার চেষ্টা করেন। গদ্যের সঙ্গে কিছু পদ্যও মিশে আছে এই রচনায়। এই গদ্য-পদ্যের মেলামেশা শুধু 'কলিকাতা কমলালয়'রই নয়,—ভবানীচরণের অন্যান্য বইয়েও দেখা যায়। যাই হোক, বিষয়ী ভদ্রলোকরা কীভাবে কলকাতায় দিন যাপন করেন, এই পদ্যবিবরণের মধ্যেই হঠাৎ দেখা দেয় ত্রিপদী ছন্দের উক্তি—

হয়ে বিষ্ণু পরায়ণ সবে করি একমন
পুরাণ শ্রবণে করেন স্থিরতর মতি
ভারতাদি ইতিহাস শ্রবণেতে অভিলাষ
সদা অনুরক্ত তাহে একান্ত ভকতি॥

এসব তখনকার উচ্চবিত্ত ভদ্রলোকদের বাড়ির অনুষ্ঠান। দেশে সমাজের স্তরে স্তরে তখন কর্মকাণ্ডের বাহুল্য, স্মার্ত ভট্টাচার্য মশায়রা 'জাজ্বল্যমান বসিয়া আছেন'। এসব ঘরে তখন দানসাগর হয়ে থাকে, অধ্যাপক-বিদায়ও বেশ ভালভাবেই ঘটে থাকে—"নৈয়ায়িক পণ্ডিতের বিদায় ১০০।৮০। ঘড়া গাড়ু; স্মার্ত্ত পণ্ডিত বিদায় ৫০।৩০ইং গাড়ু থাল বাটী ইত্যাদি।"

এই সব ধর্মানুষ্ঠানের কথা শুনে, বিদেশী লোকটি প্রশ্ন করেন—তাহলে কলকাতার অখ্যাতি কেন?

শোনা যায়, ইংরাজি আর ফার্শির আদর এই কলকাতায়, —এ'রা বাংলা লিখতে-পড়তে জানেন না নাকি?

—"যখন পিতামাতার পরলোকপ্রাপ্তি হয় তখন অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াকে কুৎসিত কর্ম বোধ করিয়া প্রতিনিধি দ্বারা দাহ করিয়া তর্পণ করিয়া থাকেন?"—এসব সত্যি নাকি?

নগরবাসীর সঙ্গে সেই কলকাতার বাইরে থেকে আসা লোকটির এই সব প্রশ্নোত্তরে অন্যান্য খবরের মধ্যে একথাও জানা যায় যে,—"অনেক লোক স্বজাতীয় ভাষায় অন্য ভাষা মিশ্রিত করিয়া কহিয়া থাকেন যথা কম, কবুল, কমবেশ, কয়লা, কর্জ্জ, কষাকষি, কাজিয়া ইত্যাদি।" অতঃপর প্রায় শদুয়েক শব্দের একটি তালিকা পাওয়া যায় যাতে 'যাবনিক' এবং 'সাধুভাষা' নামে দুটি কলম সাজানো হয়েছে পাশাপাশি —যেমন, যাবনিক ভাষায় 'কমিনে'—যার সাধু-প্রতিশব্দ দেওয়া হয়েছে 'অন্ত্যজ, ক্ষুদ্র, সামান্য, নীচ।' অর্থাৎ সাধু বাংলায় যোগ্য প্রতিশব্দ থাকা সত্ত্বেও অনেক বাঙালী ভদ্রলোক সে-আমলে যাবনিক-মিশ্রিত বাংলা বলতেন—এই ছিল এই তালিকাটির ইঙ্গিত। 'মুল্য' শব্দটি উপেক্ষা করে যাঁরা 'কিস্মত' বলতেন, 'প্রাণ'-এর বদলে বলতেন 'জান'—তাঁদেরই ভাষারুচির নজীর এই তালিকা।

আনন্দ বল্‌লে—দ্যাখো 'জান' আর 'প্রাণ' এখন আমাদের দুটো শব্দই দরকার হয়—দুটোর মানে মুলে যাই থাক, এখন দুটোই সমান অবর্জনীয়। কিন্তু 'সূচনা' বা 'আরম্ভ' না-বলে যাঁরা তখন 'নমুদ' বলতেন,—'অপবাদ'-এর পরিবর্তে বলতেন 'বরামদ', তাঁদের কথা আজ কেমন যেন ভাবাই যায় না।

নগরবাসী অতঃপর আর একটি তালিকা উপহার দেন, যাতে—কাছারি, কামান, কুস্তি, কোরক, খত, খাজাঞ্চী ইত্যাদি নানা শব্দ পাওয়া যায়। এগুলি এমন শব্দ যার বাংলা প্রতিশব্দ তখন ছিল না বলে ভাবা হয়েছে—"যে সকল শব্দের অর্থ বাঙ্গালা ভাষায় হয় না অথবা সেই মত শব্দ তোমার সংস্কৃত বা তদনুযায়ি শব্দেও নাই"। এই দ্বিতীয় তালিকায় এইরকম ১০৭টি 'যাবনিক' শব্দ পরিবেষণের পরে প্রধানত মামলা-মোকদ্দমা-সম্পর্কিত ২২টি ইংরেজি শব্দও দেওয়া হয়। তখনকার বাংলায় প্রচলিত ইংরেজি শব্দের সংখ্যাসীমা সেই বাইশেই শেষ হয় নি—তালিকার শেষে একটি 'ইত্যাদি' ছিল। এই তালিকার অতিরিক্ত—বইয়ের মধ্যে ব্যবহৃত 'জিউলরি' [পৃঃ ৪৩] শব্দটি এইরকম।

কলকাতার সমাজ সম্বন্ধে সুদূর পল্লীবাসী মানুষটি তখন একথাও শুনেছেন যে, ছেলের বিয়েতে ভাগ্যবান কেউ কেউ দু-তিন-চার-পাঁচ লাখ টাকাও খরচ করেন, কিন্তু ছেলের লেখাপড়ার ব্যবস্থায় তাঁদের মন ছিল না। শিক্ষার অভাবই ধ্বংসের মুল। এই বইয়েরও মুল কথা সেটা।

[ক্রমশঃ]

ইতিহাস-পুরুষ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ইতিহাস-পুরুষ হো চি মিন-এর মৃত্যু হয়েছে। তাঁর নামের অর্থ 'আলোকদর্শী'। শুধু নিজেই তিনি আলোকদ্রষ্টা ছিলেন না—শুধু উত্তর ভিয়েতনামকেই তিনি দীপ্তি দান করেন নি, আজ তাঁরই বিভক্ত স্বদেশের দক্ষিণে, পৃথিবীর হিংস্রতম শক্তির সমস্ত নখদন্তের বিরুদ্ধে মৃত্যুহীন প্রাণের যে অপরাজিত সংগ্রাম, সেখানেও তাঁরই জ্যোতির্ময় প্রেরণা।

কবি, মনীষী, নিপুণ রাজনীতিক, মহাবিপ্লবী ডক্টর হো চি মিন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর শত্রুসংখ্যা অগণিত—দিয়েন-বিয়েন-ফুর বিষের জ্বালা কি সহজে ভোলবার? আর তাঁর অনুরাগী, তাঁর ভক্ত, তাঁর সহযাত্রী? তারা হল কায়েমী শোষণ আর সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পৃথিবীর সমস্ত—সমস্ত সংগ্রামী মানুষ।

কিন্তু পরমতম শত্রুও তাঁর মৃত্যুতে আজ উল্লসিত নয়। এই মহৎ মানুষটির সামনে সমস্ত উদ্ধত মাথাও নত হয়ে আসে। একটি ক্ষুদ্র এবং দরিদ্র দেশের নায়ক তিনি, কিন্তু তাঁর আসন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নেতাদের সঙ্গে—খুব সম্ভব লেনিন ছাড়া আর কেউ এমন সর্বজনীন শ্রদ্ধা পান নি।

একদা জোসেফ স্তালিনকে দেখেছি কী অনন্য মহিমার আসনে। তারপর পুনর্বিচারের পালায় দেখি—স্তালিনবাদকে মুছে ফেলে দেখা দিল ভলগোগ্রাদ। মাও-সে-তুং—'মাও তু সি'—একদিন এশিয়ার হৃদয়ে রাজার আসন পেয়েছিলেন, আজ তিনি তিক্ততম বিতর্কের সামগ্রী। বিপ্লবী শিবিরের মাত্র দুজন নেতাকেই দেখি অতর্কিত শ্রদ্ধার পাত্র—একজন লেনিন, আর একজন হো চি মিন।

যখন জানি, জনগণের মানুষ হো চি মিন দীনতম জীবনযাত্রার মধ্য দিয়ে প্রতিটি দেশবাসীর অন্যতম, বিদেশী মহারথ রাষ্ট্র-প্রধানদের বসতে দেন বাঁশের মাচায়, নিজের হাতে তাদের চা করে দেন, বাগানে কাজ করেন, তখন দরিদ্র দেশের এই মানুষটির সঙ্গে আমার গান্ধীজীকেও মনে পড়ে যায়।

মহাত্মাজীর সঙ্গে হো চি মিনের মিলের চাইতে অনেক বেশি অমিল, তা আমরা সকলেই জানি। আমি নিজে গান্ধীবাদী নই, তাঁর সমাজতত্ত্ব, তাঁর গ্রামভিত্তিক অর্থনীতির মূল তত্ত্ব যেটুকু পড়েছি, তা আমি গ্রহণ করতে পারি নি। কিন্তু অল্প বয়সে, তাঁর মতো মানুষের পায়ের কাছে, মাত্র দেড়-দু-হাত দূরে তকলি কাটবার দুর্লভ সৌভাগ্য আমার মতো সামান্যেরও ঘটেছিল। মহাত্মাজীর রাজনীতি যেমনই হোক, একটি মানুষকে আমি অন্তত অনুভব করেছিলুম, ব্যক্তি-চরিত্রে যাঁর ফাঁকি নেই, ত্যাগে, পবিত্রতায়, শুচিতায় যাঁর অন্তর প্রদীপের মতো জ্বলছে। অমন উজ্জ্বল নির্মল দৃষ্টি এক সুভাষচন্দ্র ছাড়া আর কারুর আমি দেখি নি।

হো চি মিনকে কাছ থেকে দেখতে পাইনি আমি। কিন্তু পড়ে যা জেনেছি, তা থেকে বার বার মনে হয়েছে, তিনি যেন একসঙ্গে গান্ধীজী আর লেনিনের সমন্বয়। সেই দরিদ্র মূর্তি, নগ্ন-অর্ধনগ্ন দেশবাসীর জন্যে চীবরধারী—সন্ন্যাসী; অন্যদিকে যোদ্ধা, বীর, বিপ্লবী—যুদ্ধে গৃহযুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত স্বদেশকে যিনি শীর্ণ বাহুর বজ্রশক্তিতে সংগঠিত করছেন, সংরক্ষিত করছেন।

হো চি মিনের লৌকিক মৃত্যু ঘটেছে। কিন্তু 'আলোকদর্শী' মৃত্যুহীন।

বঙ্গদর্শন

মন্ত্রীরা এবং উচ্চ পর্যায়ের নেতারা যতই বলুন না কেন, যুক্তফ্রন্টের শরিকী সংঘর্ষ এমন একটা কুৎসিত পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে যে, কথার আড়ালে বা গালভরা বুলিসর্বস্ব প্রস্তাব পাশ করে তা ঢাকা দেওয়া যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে বৈঠক করে এ কথাটা বোঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যে, উচ্চ পর্যায়ে নেতৃবৃন্দের মধ্যে নাকি যথেষ্ট ঐক্য বিরাজিত এবং নিচুতলার কর্মীদের মধ্যে তা আনার চেষ্টা সর্বতোভাবে করা হচ্ছে। উচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ যে পারস্পরিক সমঝোতার মনোভাব নিয়ে বলেন তার প্রত্যক্ষ পরিচয় বড় অল্প, তবে গতবারের মত এবারে এখনো পর্যন্ত মন্ত্রীরা পরস্পরের বিরুদ্ধে কুৎসার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামেন নি; যদিও সাম্প্রতিক কয়েকটি ঘটনা আবার ভিন্নধর্মী গতিরও পরিচয় দিচ্ছে। আর বিভিন্ন দলের কর্মীদের কথা না বলাই ভালো, বরং স্বীকার করতে কোন বাধা নেই যে, নেতাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্ররোচনায় এক শরিকের কর্মীরা অপর শরিকের কর্মীদের ওপর যে গুণ্ডামী ও বর্বরতা প্রদর্শন করছে, তা কালক্রমে অতি দুর্যোগ ডেকে আনবে। কথাটা শুনতে খুবই খারাপ লাগে, কংগ্রেসী আমলে অন্তত পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস বিরোধী দলের কর্মীদের যে রাজনৈতিক নিষ্ঠা, সততা ও পরিপক্ক আচরণের পরিচয় পাওয়া যেত, ফ্রন্টের আমলে তা যেন যাদুমন্ত্রবলে অদৃশ্য হয়েছে। এটা কোন বিশেষ পার্টির ক্ষেত্রে সত্য নয়, সব পার্টির ক্ষেত্রেই সত্য। পার্টির নেতারা, বলতে দ্বিধা নেই, পার্টি কর্মীদের পেশাদার গুণ্ডারও অধম হবার শিক্ষায় শিক্ষিত করছেন, ক্ষেপা কুকুরের মত একে অপরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিচ্ছেন, ফলে সর্বত্রই একটা বিভীষিকার রাজত্ব চলছে, সংবাদপত্র খুললেই শরিকী সংঘর্ষের ঘটনা চোখে পড়ছে—সবগুলিই নিশ্চয় বুর্জোয়াদের অপপ্রচার নয়। ফলে অবস্থাটা এই দাঁড়িয়েছে যে, যুক্তফ্রন্টের যে কোন দলেরই কর্মীর পক্ষে যে কোন মুহূর্তে অপর কোন দলের কর্মীর হাতে নিহত হওয়াটাই স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটা কথা বলা হয় যে সকল দলেই নাকি কিছু কিছু গুণ্ডা, বদমায়েস ঢুকে পড়েছে, প্রতিটি দলের নেতাই একথা স্বীকার করেন, শুধু বলার সময় বলেন যে, আমাদের পার্টি ছাড়া অপর সকল পার্টির মধ্যেই তারা ঢুকেছে। কিন্তু এটাও কোন যুক্তি নয়। পার্টি কর্মীদের মধ্যে একটা হিস্টিরিয়া জাগিয়ে তোলা হয়েছে, এবং তারই ফলে এক দলের হাতে আর এক দলের কর্মীরা চরম নিগৃহীত হচ্ছে। এবং সবচেয়ে হাস্যকর এই বিষয়ে নেতাদের আচরণ। তাঁরা কেউই নিজেদের দলের কর্মীদের অপরাধ দেখতে চাইছেন না। একে অপরকে দোষারোপ করছেন। অর্থাৎ এঁদের দৃষ্টিভঙ্গিটাই প্রতিশোধমূলক। "ক" পার্টির কর্মী "খ" পার্টির কর্মীর দ্বারা নিহত হয়েছে, এবং তার সমর্থনে "খ" পার্টির নেতা যুক্তি দিচ্ছেন যে, পূর্বে যেহেতু "খ" পার্টির কর্মী "ক" পার্টির কর্মীর দ্বারা নিহত হয়েছিল, অতএব এক্ষেত্রে অন্যায়টা কোথায়? তোমার দোষ কেউ দেখিয়ে দিলে তা সংশোধন না করে অপরের দোষ খুঁজে তোমার দোষের যদি সাফাই গাও, তা যেমন কুযুক্তিপূর্ণ আচরণ হয়, যুক্তফ্রন্টের শরিক সকল রাজনৈতিক দলই—ঠিক এইরকম কুযুক্তির দ্বারাই চালিত হচ্ছেন। নির্ভেজাল সতী কেউই নয়, অথচ প্রত্যেকেই সতীপনা দেখাতে ব্যগ্র। জনগণ নিশ্চয়ই এটা আশা করেন নি যে, যুক্তফ্রন্টের অর্থ কিছু প্রতিহিংসাপরায়ণ জীবের পারস্পরিক নখদন্তের লড়াই। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে তাই-ই হয়েছে। যুক্তফ্রন্টের নেতারা বোধ হয় এটাই ভাবছেন যে, তাঁরা অনন্তকাল সংকীর্ণ দলবাজি করার বেপরোয়া লাইসেন্স পেয়েছেন।

পুলিশ প্রসঙ্গ

কিছুকাল আগে বিধানসভা ভবনে পুলিশী হামলা সম্পর্কে তদন্তের জন্য যে কমিটি গঠিত হয়েছিল, সেই কমিটির প্রকাশিত রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের বাঘা বাঘা অফিসারেরা কর্তব্যে গুরুতর অবহেলার জন্য অভিযুক্ত ও নিন্দিত হয়েছেন। এঁদের মধ্যে যে দুজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ অতি গুরুতর তাঁরা হলেন: প্রেসিডেন্সি রেঞ্জের ডি আই জি শ্রীদেবব্রত ধর এবং ইন্টেলিজেন্স বিভাগের ডি আই জি শ্রীরঞ্জিত গুপ্ত। শ্রীদেবব্রত ধর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, যখন ৩১শে জুলাই তারিখে উত্তেজিত পুলিশ কনস্টেবলদের হাতে চব্বিশ পরগনা পুলিশের অতিরিক্ত এস পি ঘেরাও ও নিগৃহীত হন, তখন শ্রীধর সমস্ত ঘটনাটিই বারান্দা থেকে দেখেছিলেন, কিন্তু তবু তিনি তাঁর ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে এই ঘটনার গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করেন নি। শ্রীরঞ্জিত গুপ্ত সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এতবড় একটা গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি বসে আছেন, তিনি শুধু দায়িত্বজ্ঞানহীনতারই পরিচয় দেন নি, কর্তব্যে অবহেলা করেছেন। এ ছাড়া আরও অনেক অফিসার সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য উক্ত রিপোর্টে করা হয়েছে। তদন্তের রিপোর্টে পুলিশের উচ্চপদস্থ অফিসারদের সম্বন্ধে যে তীব্র নিন্দা ও সমালোচনা করা হয়েছে, তা কয়েকজন অফিসারের ব্যক্তিগত কর্তব্যহীনতার নিদর্শনই নয়, তা আরও অনেক বেশি ইঙ্গিতবহ। এই রিপোর্ট প্রমাণ করে দিয়েছে যে, পুলিশী ব্যবস্থার ভেতরকার বর্তমান কাঠামোর আমূল পরিবর্তন করা ছাড়া পুলিশকে আদর্শপরায়ণ বা কর্তব্যনিষ্ঠ করার কোন উপায় নেই। কারণ যেখানে অত্যন্ত উচ্চপদে আসীন অফিসারদের মধ্যেই কর্তব্যহীনতা ও

তরুণ অপেরা কর্তৃক
১৩ই সেপ্টেম্বর মহাজাতি সদনে
সৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়ের

'রাজা রামমোহন'

পরিচালনায় ঃ অমর ঘোষ
নাম ভূমিকায় ঃ শান্তিগোপাল
তরুণ অপেরায় ও মহাজাতি সদনে
টিকিট পাওয়া যাচ্ছে।
ফোন ঃ ৫৫-৭২২১

বিচ্যুতি বিদ্যমান, সেখানে বাহিনীর নিচুতলায় বিচ্যুতি দেখা দিতে বাধ্য। তদন্ত কমিটি পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের সাংগঠনিক রূপ বদলের জন্য এক উল্লেখ-যোগ্য পরামর্শ দিয়েছেন। সেই পরামর্শ হল এই যে, পশ্চিমবঙ্গ এবং কলকাতা পুলিশকে পৃথকভাবে চলতে না দিয়ে এক অভিন্ন প্রশাসনের আওতায় আনা উচিত। এ ছাড়া সমগ্র পুলিশী প্রশাসন ব্যবস্থার রদবদলেরও সুপারিশ করা হয়েছে। আসলে পুলিশের সুদীর্ঘকালে গড়ে-ওঠা চরিত্রের পরিবর্তন করে তাকে যুগোপযোগী এবং জনগণের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে তুলতে হবে। কিন্তু এ কাজটা কিভাবে হবে সেটা গভীর চিন্তার বিষয়। বৃটিশ আমলে পুলিশকে শাসকগোষ্ঠীর স্বার্থে ব্যবহার করা হত। কংগ্রেসী আমলেও তার ব্যতিক্রম হয় নি এবং যুক্ত-ফ্রন্টের আমলেও যে এই বিষয়ে কোন পরিবর্তন এসেছে সেটা বিশ্বাস করার কোন কারণ দেখছি না। তদন্ত কমিটির অনুসন্ধানে যে কয়জন অফিসার তিরস্কৃত ও নিন্দিত হয়েছেন, তাঁদের বিষয়ে কি বর্তমান সরকার কোন খবরই রাখতেন না? **এমন কি এই বঙ্গদর্শনেও এই কথা পূর্বে কি লেখা হয় নি যে, ওই কালো-তালিকা-ভুক্ত অফিসারদের একজন কংগ্রেসী আমলে** **চূড়ান্ত রাজনীতি করেছেন এবং তার জন্য আই পি এস অফিসারদের একটি সভাতেও তাঁর বিরুদ্ধে একটি নিন্দা-প্রস্তাব পাশ হয় এবং যাঁর উদ্যোগে সেই প্রস্তাব পাশ হয়েছিল, সেই শ্রীএস কে সিং-এর কি শোচনীয় অবস্থা করে তোলা হয়েছিল? অথচ ওই ব্যক্তিটি ফ্রন্ট সরকার হবার পর রাতারাতি ভোল বদলে ফেলেছেন! আমরা কি এ বিষয়ে পূর্বাহ্ণে সতর্ক করে দিই নি? অপর একজন অভিযুক্ত অফিসারের নামে সাপ্তাহিক বসুমতীতে কি এই অভিযোগ আনা হয় নি যে, তিনি ছদ্মনামে একটি বিখ্যাত ইংরাজী দৈনিকে যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে রীতিমত কুৎসা প্রচার করেন?**

পুলিশ বিভাগ সম্পর্কে আমরা আরও বলিষ্ঠ ও দৃঢ় নীতি আশা করি, পুলিশকে যেন কোনক্রমেই দলীয় স্বার্থে ব্যবহার না করা হয়, যেমন করা হয়েছে কংগ্রেস আমলে। পুলিশকে দলীয় প্রয়োজনে নিয়োগ করার অর্থই হল দুর্নীতিপরায়ণ আমলাতন্ত্রের হাতে তুরুপের তাসটি তুলে দেওয়া। আশা করি উপ-মুখ্যমন্ত্রী মশায় এদিকে দৃষ্টি দেবেন।

স্বাস্থ্যদপ্তরের কথা অমৃত সমান

স্বাস্থ্যদপ্তরে মদের ফোয়ারা বইছে এই সংবাদে কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের বিরুদ্ধে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর একটি হিস্টিরিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। আমাদের কাগজে তাঁর দপ্তর সম্পর্কে কোন বিরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছে খবর পেলে তিনি চটে যান, মনে করেন আমরা বুঝি কোন স্বার্থের দ্বারা চালিত হয়ে তাঁকে অপদস্থ করার চেষ্টা করি। আর এস পি-র জনৈক প্রবীণ নেতা দুঃখ করে বলেছেন যে, সাপ্তাহিক বসুমতীর মতন পত্রিকা তাঁর দলের তথা ননীবাবুর 'ইমেজ' নষ্ট করার চেষ্টা করছেন কেন যে, তা তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না।

এ সমস্ত খুবই দুর্ভাগ্যজনক। যদি আপনার মনে এই ধারণা জন্মে গিয়ে থাকে যে, আপনাকে দেখলেই আমি মুখ ভ্যাঙাই, তাহলে আপনাকে বত্রিশ পাটি দন্তপংক্তি বিকশিত করে অভ্যর্থনা করলেও আপনি মনে করবেন যে, আপনাকে দেখে আমি মুখ বিকৃতি করছি। দুর্ভাগ্য এই যে, ননীবাবু তথা আর এস পি-র কারো কারো এই ধারণা হয়েছে। তবে তাঁদের অবগতির জন্য জানাই যে, যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় আসার বহু আগে থেকেই নব পর্যায়ে সাপ্তাহিক বসুমতী প্রকাশিত হবার দিন থেকেই, আমরা স্বাস্থ্যদপ্তর থেকে ঘুঘুর বাসা ভাঙার চেষ্টা করছি, তখন কোথায় ছিলেন ননীবাবু, কোথায় ছিল যুক্তফ্রন্ট। স্বাস্থ্যদপ্তর সম্পর্কে আমাদের আগ্রহের কারণ একটিই। এই দপ্তরটি জনজীবনের সঙ্গে অত্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। স্বাস্থ্যমন্ত্রী হবার আগে তো ননীবাবুও স্বাস্থ্যদপ্তর সম্পর্কে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত বক্তব্যগুলির তারিফ করতেন, মন্ত্রী হবার পরেও সহযোগিতা চেয়েছিলেন, এবং তা করতে গিয়েই আমরা আপাতত তাঁর বিরাগভাজন হয়েছি, কেন না তিনি এমন একজন পদস্থ আমলার ক্রীড়নক হয়ে পড়েছেন—যাঁকে আমরা মনে করি ওই বিভাগের সকল দুর্নীতির মূল এবং যাঁকে সরালে ওই দপ্তরের বারো আনা দুর্নীতিরই অবসান ঘটবে। ওই প্রতি-পত্তিশালী ব্যক্তিটি, যাঁকে আমরা 'সুহৃদ-চক্রের নায়ক' বলে অভিহিত করি, প্রাক্তন স্বাস্থ্য অধিকর্তার আমলে সর্বক্ষমতার মালিকানা দখল করেছিলেন। প্রতি স্থানে—কি ঔষধপত্র ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে, কি বিভিন্ন হাসপাতাল স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ঔষধ সরবরাহ—সর্বস্থানেই তিনি নিজের জাল বিছিয়ে বসে আছেন। নিয়োগ, বদলী, পদোন্নতি সংক্রান্ত ফাইল-পত্র যাঁরা দেখাশোনা করেন

বেকার সমস্যার সমাধান ?
সদ্য প্রকাশিত হয়েছে !!

বাঙলা দেশে বেকার সংখ্যা নাকি আনুমানিক এক কোটি। এই ভয়াবহ বেকার সমস্যার সমাধানে ক্ষুদ্র মূলধনের ব্যবসা হিসাবে মুর্গী উৎপাদন বা পোলট্রি ফার্মিং অধুনা অত্যন্ত লাভজনক ব্যবসায় রূপান্তরিত হয়েছে—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে। বেকার ব্যক্তিদের পোলট্রি ফার্মিং ব্যবসা পরিচালনার বিশদ নির্দেশলাভের সুবিধার জন্য বসুমতী থেকে আত্মপ্রকাশ করলো।

রয়েল পেডিগ্রী পোলট্রি ফার্মের অধিকর্তা
শ্রীসমরেন্দ্রনাথ রায়
জি, পি (আমেরিকা), এফ, এস, পি, আই, পি, এইচ (লণ্ডন)
লিখিত সচিত্র
আধুনিক পোলট্রি ফার্মিং

মূল্য মাত্র চার টাকা। ডাকমাশুল এক টাকা।
অবিলম্বে অর্ডার পেশ করুন

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ ॥ কলিকাতা-১২

তাঁদের প্রত্যেককে তিনি কব্জায় রেখেছেন এবং দুর্ভাগ্যক্রমে বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রীও তাঁর ফাঁদে পা দিয়েছেন। কাজেই এই কথা লেখার জন্য আর এস পি দলের প্রবীণ নেতার ক্রুদ্ধ হওয়া বা দুঃখ করার কোন কারণই থাকা উচিত নয়।

দু-একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। কিছুকাল আগে আমরা দুজন দুর্নীতি-পরায়ণ করণিকের কথা লিখেছিলাম। তাঁরা হেলথ ডিরেক্টরেটের এ্যাডমিনিস্ট্রেশন ব্রাঞ্চের কর্মচারী, বহাল তবিয়তে হাজার হাজার কালো টাকা কামাচ্ছেন। তখন স্বাস্থ্য বিভাগের এক্টিং মন্ত্রী ছিলেন আর এস পি-রই প্রখ্যাত ট্রেড ইউনিয়ন নেতা শ্রীযতীন চক্রবর্তী, ননীবাবুর অনুপস্থিতিতে। ঐ সংবাদে তিনি আমাদের ওপর ক্রুদ্ধ হওয়া দূরে থাক, নিজে খোঁজখবর নিয়ে আমাদের বক্তব্যের যথার্থতা সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে তাদের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দিতে ননীবাবুকে বলেন এবং এও বলেন যে, যেন ওই তদন্ত অন্য কোন ডিপার্টমেন্টের কোন অফিসারকে দিয়ে করানো হয়। কেন না ঘরের লোককে দিয়ে করালে সত্যকে চাপাই দেওয়া হয়। যতীনবাবুর এই নির্দেশ অবশ্য কার্যকরী করা হয় নি, একজন ডেপুটি ডিরেক্টরকে দিয়ে তদন্ত করানো হচ্ছে এবং সেই তদন্তের ফলাফল যে কি হবে তা আমরা এখানেই লিখে দিতে পারি। আবার মজা হচ্ছে এই যে, উক্ত দুর্নীতিপরায়ণ করণিকদ্বয় যে এ্যাসোসিয়েশনের সদস্য, তাতে আবার আর এস পি-র কেউ কেউ আছেন এবং এ্যাসোসিয়েশনের জনৈক কর্মকর্তা একথা জোর গলায় বলেছেন যে, কোনক্রমেই তাদের (দুর্নীতিবাজ করণিকদের) ওখান থেকে সরানো হবে না, কাগজপত্রে যতই লেখালেখি হোক না কেন। এই দুর্নীতির প্যাটার্ন যদি আমরা উদ্ঘাটিত করে থাকি, তাহলে অপরাধটা কি করা হল? এর দ্বারা কিভাবেই বা ননীবাবুর চরিত্রহনন করা হল?

আসলে ননীবাবুর গাইড হচ্ছেন তাঁর জনৈক বিশ্বস্ত সহকারী, যাঁর পরামর্শে ননীবাবু উক্ত সুহৃদচক্রের নায়ককে মাথায় করে রাখছেন। এই দুর্নীতিপরায়ণ বিশ্বস্ত কর্মচারীটির প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি কথা অনিবার্যভাবে চলে আসে। ননীবাবু কি অস্বীকার করতে পারেন যে, প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে উক্ত বিশ্বস্ত কর্মচারীটির প্ররোচনায় তারই সম্পর্কিত ভ্রাতাকে রাতারাতি মেডিক্যাল কলেজের একটি বিভাগে অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং তদানীন্তন বিভাগীয় কর্তাকে বিনা দোষে বাঁকুড়ায় পাঠানো হয়েছিল? ননীবাবু কি অস্বীকার করতে পারেন যে, সম্প্রতি উক্ত ব্যক্তিরই প্ররোচনায় একটা মোটা অঙ্কের টাকার অবৈধ লেন-দেনের পর, দুই ব্যক্তিকে ডায়েট সাপ্লাইয়ের কন্ট্রাক্ট দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল, কিন্তু বিষয়টি পরে ফাঁস হয়ে যাওয়ায় এবং এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট অভিযোগ যাবার পর, শেষ পর্যন্ত ওই কন্ট্রাক্ট বাতিল করতে হয়? ব্যক্তিগতভাবে ননীবাবুর বিরুদ্ধে আমাদের কোনই বক্তব্য নেই, ব্যক্তিগতভাবে তিনি একজন আদর্শ-চরিত্র নিখাদ ব্যক্তি, কিন্তু তাঁর ঘাড়ের ওপরে বন্দুক রেখে অনেকেই গুলী চালিয়ে যাচ্ছে এবং এ কথাটা স্পষ্ট করে বলার জন্য আমাদের অপরাধটা কোথায় হয়েছে?

কল্যাণী জওহরলাল নেহরু মেমোরিয়াল হাসপাতালের প্রাক্তন সুপারিন্টেণ্ডেন্টকে বাঁচাবার জন্য সুহৃদচক্র যে চেষ্টা

সংবাদ ও সাহিত্যে অদ্বিতীয়

শারদীয়

সাপ্তাহিক বসুমতী

(১৩৭৬)

॥ বিদগ্ধ ও সাধারণ পাঠক-পাঠিকার সর্বোৎকৃষ্ট আকর্ষণ ॥

বাংলাদেশের তিনজন দিকপাল ঔপন্যাসিকের সুবৃহৎ তিনটি উপন্যাস

শ্রেষ্ঠ লেখক-লেখিকাদের শ্রেষ্ঠ গল্প

গল্পের চেয়েও বিস্ময়কর স্মৃতিচারণে এদেশে বিপ্লবের ভূমিকা ও বিপ্লবীযুগ

উদ্দীপ্ত হাসির ছটায় দীপ্ত গল্প

বহুখ্যাত লেখকদের অজ্ঞাতপূর্ব রোমাঞ্চকর অন্তরঙ্গ জীবন

একটি দুর্লভ কাব্যকাহিনী

তামিল বনাম সংস্কৃত ভাষার অভিভাবকত্ব নির্ধারণে বিশ্ববরেণ্য ভাষাবিদের (অপ্রকাশিত) তীক্ষ্ণ বিচার ও মৌলিক সিদ্ধান্ত

সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, মনস্তত্ত্ব, রাজনীতি এবং যুগ-সমীক্ষায় সমাজ ও সংস্কৃতি

প্রচুর ছবিসহ বিশেষ আকর্ষণীয় বিবিধ রসাল নিবন্ধে নাটক ও নাট্যকার, অভিনয় জগৎ-অভিনেতা ও অভিনেত্রী. আর খেলাধুলা

সাংবাদিকের স্মৃতিকথায় তিক্তমধুর অভিজ্ঞতা

মহাকাশের চিকিৎসাবিধি

এছাড়া

পূর্ববঙ্গের কবিতাসহ থাকছে সুনির্বাচিত অন্য কয়েকটি কবিতা

॥ আরো বহু রচনার বিবরণ ক্রমশ প্রকাশ্য॥

দাম: তিন টাকা

বিজ্ঞাপনদাতা, গ্রাহক ও এজেন্টগণ সত্বর যোগাযোগ করুন

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড

১৬৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,

কলিকাতা-১২

করে যাচ্ছে, ননীবাবুও কি তার শরিক হয়ে পড়ছেন না? তাঁর বিরুদ্ধে দু'দফা গুরুতর অভিযোগসমূহ আনীত হয়েছে, যার বিবরণ আমরা বঙ্গদর্শনে পূর্বে দিয়েছি। অথচ তা সত্ত্বেও এখনো তিনি বহাল তবিয়তে রয়েছেন। সম্প্রতি স্বাস্থ্যদপ্তরের সচিব শ্রী এস আর দাস তাঁকে তৃতীয় দফার চার্জসীট দিয়েছেন এবং ভিজিল্যান্স কমিশনকে এই ব্যাপারে তদন্ত করবার জন্য অনুরোধ করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে দুই দফায় আনীত অভিযোগগুলির শুনানীর সময় সুহৃদচক্র তা বানচাল করার চেষ্টা করেছিল. সে কাহিনীও আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি এবং তদানীন্তন এ্যাক্টিং স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীযতীন চক্রবর্তীর প্রশংসনীয় তৎপরতায় সে চক্রান্ত ব্যর্থ হয়। এবার পুনরায় তাঁর বিরুদ্ধে তৃতীয় দফায় প্রচুর অভিযোগ আনা হয়েছে এবং নেপথ্যে তা বানচাল করার জঘন্য চক্রান্ত চলছে, সে কথা যদি আমরা বলি তাহলে সাংবাদিক হিসাবে আমাদের অন্যায়টা কোথায়?

কাজেই স্বাস্থ্যদপ্তরে পদস্থ আমলার ঘরে যে মদের আসর বসেছিল, যাতে দুটি মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল, যাঁরা সুপারনিউমারি ডিউটিতে আছেন, অর্থাৎ যাঁদের কোন কাজই দেওয়া হয় না, সুহৃদচক্রের ওই নায়ক পদস্থ আমলার সঙ্গে বোতলের পর বোতল উজাড় করেছিলেন—এই অভিযোগের দ্বারা স্বাস্থ্যমন্ত্রীর চরিত্রহনন কিভাবে করা হয় তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। মদ যে কোন

****

স্থানাভাববশত এবার চুঁচুড়া সদর হাসপাতালের কথা বলা হল না। আগামী সংখ্যায় তা আবার আলোচিত হবে।

****

লোক খেতে পারেন, তাতে আমাদের আপত্তি করার অধিকার হয়তো নেই। তবে স্বাস্থ্যদপ্তরের ওঁরা যদি ওঁদের রীতি অনু- ওই 'মধুচক্রটি' কল্যাণী, কি শ্রীরামপুর, কি চন্দননগর, কি বাঙ্গুর হাসপাতালে বসাতেন, (আগে এই সব স্থানগুলি তাঁদের ওই সব কর্মের জন্য বরাদ্দ ছিল), আমাদের আপত্তির কিছু ছিল না। কিন্তু খোদ রাইটার্স বিল্ডিংসে? যুক্তফ্রন্টের শাসনকালে! আর সেই মদ এলো কিনা সেন্ট্রাল মেডিক্যাল স্টোর্সের জনৈক কন্ট্রাক্টর মহাশয়ের আত্মীয়ের হাত দিয়ে! একথা প্রকাশ করে যদি আমরা কোন অন্যায় করে থাকি এবং তা যদি ননীবাবু ও তাঁর দলের কেউ মনে করেন, তবে আমরা নাচার।

পরলোকে নিরঞ্জন সেনগুপ্ত

ত্রাণ ও পুনর্বাসনমন্ত্রী শ্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্তের অকালমৃত্যুতে আমরা আত্মীয়-বিয়োগ ব্যাথা অনুভব করছি। স্বাধীনতা সংগ্রামের যোদ্ধা, প্রবীণ কমিউনিস্ট নেতা নিরঞ্জন সেনগুপ্তের মৃত্যুতে পশ্চিমবঙ্গ একজন অক্লান্ত কর্মী দেশসেবককে চিরকালের মত হারাল। শ্রীনিরঞ্জন সেনগুপ্ত ১৯০৪ সালে বরিশাল জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। বরিশাল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি কলকাতার রিপন কলেজে এবং বহরমপুরের কৃষ্ণনাথ কলেজে শিক্ষালাভ করেন। অনুশীলন সমিতির এবং ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত থাকায় ১৯২৬ সালে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৯২৯ সালে মেছুয়াবাজার বোমার মামলায় আবার কারারুদ্ধ হন এবং আন্দামানে নির্বাসিত হন। ১৯৩৮ সাল থেকেই তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ও বিধানসভার সদস্যপদ তিনি প্রথম লাভ করেন ১৯৫৭ সালে। তিনি নিখিল বঙ্গ ছাত্র অ্যাসোসিয়েশনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং দি স্টুডেন্ট পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক ছিলেন। ১৯৬৭ সালে গঠিত যুক্তফ্রন্ট সরকারের তিনি ছিলেন উদ্বাস্তু, ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ এবং স্বরাষ্ট্র বিভাগের কারা শাখার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। ১৯৬৯ সালে তিনি ওই দপ্তরগুলিরই আবার মন্ত্রী হন। শ্রীসেনগুপ্ত আজীবন স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। রাজ্যের উদ্বাস্তুদের মঙ্গলের জন্য তিনি অবিশ্রান্তভাবে কাজ করেছেন। রাজ্যের কারাগারগুলিতে তিনি মঙ্গলজনক সংস্কার প্রবর্তন করেছেন। বহু জনহিতকর কার্যের সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। তাঁর পরিবারবর্গকে আমরা আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাচ্ছি। (৫।৯।৬৯)

নিরঞ্জন সেনগুপ্তের মরদেহ নিয়ে শোকযাত্রা কেওড়াতলা মহাশ্মশানের দিকে এগিয়ে চলেছে।

ভারত দর্শন

CALCU CENTRAL LIBRARY UNIVERSI

পাতিল দর্শন

পাতিল সাহেব খুব বিপদাপন্ন। বিগত কংগ্রেস কার্যকরী কমিটির সভায় ইন্দিরা-সিন্ডিকেট যুদ্ধে পাতিল সাহেবের ভূমিকায় তাঁরই কট্টর বন্ধুরা ক্ষুব্ধ হয়েছেন যার-পর-নাই। অপবাধ, যে পাতিল চরম দক্ষিণীরূপে 'বনস্কান্ত' নির্বাচনী এলাকার দক্ষিণপন্থী নাগরিকদের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে লোকসভায় প্রত্যাবর্তন করেন স্রেফ লড়কে লেঙ্গে মনোভাব নিয়ে, সেই পাতিল সাহেবই শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা না করে ঠান্ডা মেরে গেলেন ওয়ার্কিং কমিটির মিটিং-এ। বনস্কান্তের কট্টরপন্থীরা এবং গুজরাট কংগ্রেসের সিন্ডিকেট-সমর্থকরা পাতিল সাহেবের এহেন পশ্চাদপসরণে ভীতিবিরক্ত। পাতিল এ জাতীয় অভিযোগেব উত্তরে বলেছিলেন যে, তিনি চুপ মেরে ছিলেন কথাটা সত্য নয়, তিনি 'গর্জন করে ওঠেন ও সর্বদা গর্জনই করেন'। পাতিল সাহেবেব এই বক্তব্য সংবাদপত্রে নাকি আরও একটু পালিশ ঝকঝকে হয়ে এইভাবে প্রকাশিত হয়ঃ 'পাতিল সিংহের মতো গর্জিয়া ওঠেন'। পাতিল সাহেব অবশ্য অস্বীকার করে বলেন যে, তিনি শুধুই গর্জন করেছেন (কথাটা তিনি মজা করেই বলেন), সিংহের মতো কথাটি সাংবাদিকের উদ্ভট কল্পনার সৃষ্টি।

কিন্তু পাতিল দর্শনে সিন্ডিকেট-পন্থীরা বিস্মিত। তর্ক যাই থাক, সিন্ডিকেটপন্থীরা এতদিনে সিংহপ্রতিম পাতিলকে আজ শশকসদৃশ বলেই মনে করছেন। কারণ, তাঁরা আশা করেছিলেন, ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে রোষ-কষায়িত নেত্রে শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবেন পাতিল সাহেব। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তিনি উলেব বলের মত নরম হয়ে গেলেন। 'চিপকাট নট' এবং নীরবে প্রত্যাবর্তন করে ভেস্তে দিলেন গাপ্পা-পরিকল্পনা। এহেন পাতিলের ওপর কাজে-কাজেই গুজরাট খাপ্পা। মুখ্যমন্ত্রী শ্রীহিতেন্দ্র দেশাই-এর কাছে গুজরাটী কংগ্রেসীদের বিশেষ বনস্কান্ত থেকে তাড়া-তাড়া বিক্ষুব্ধ চিঠি এসে পৌঁচচ্ছে। পাতিলের রূপবিবর্তনে তাঁরা বিস্মিত, ক্ষুব্ধ, মর্মাহত। এ-ও শোনা যাচ্ছে যে, গুজরাটের পরিষদীয় কংগ্রেসী সদস্যরা পাতিলের কাছে এহেন 'সমার সল্ট' প্রদর্শনের জবাবদিহি চাইবেন। অন্তত পাতিলকে প্রমাণ করতে হবে গুজরাটের সমর্থনপুষ্ট মোরারজী দেশাইয়ের পাশে পাশে তিনি সিংহনাদ করতে করতে ভবিষ্যৎ লড়াইয়ে এগিয়ে যাবেন। গুজরাট এখনও মোরারজী-প্রশ্নকে আঁকড়ে থাকতে বদ্ধপরিকর। গুজরাট প্রদেশ কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট জনসভায় বলে বেড়াচ্ছেন, ওয়ার্কিং কমিটির তুষ্ণীম্ভাব একটা সাময়িক অবস্থা নিয়ন্ত্রণ মাত্র, শৃঙ্খলার প্রশ্ন এখনও সজীব। এ্যাকসন অবশ্যই নিতে হবে।

সিন্ডিকেট তাই পুনশ্চ শিবির সাজাচ্ছেন আগামী এ,আই,সি,সি, অধিবেশনে সম্ভাব্য বদলা নেওয়ার জন্য।

সমস্যা পাতিল সাহেব, অতুল্য ঘোষ মহাশয় এবং চ্যবন সাহেবদের নিয়ে। ওঁদের চেহারাটা সুস্পষ্ট নয়। সিন্ডিকেট-সমর্থকরাও তাই সন্দিহান। অপরপক্ষে বাঁকা হাসি ফিস-ফিস করে পরস্পরেব মধ্যে বলাবলি করছেঃ পশ্য সিংহ মদোন্মত্ত শশকেন নিপাতিত!

> এশিয়ার মহান বিপ্লবী নেতা ডঃ হো চি মিন ১৯৬৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর প্রাতঃ ৯-৪৫ মিঃ কালে হিংসা-স্বার্থক্লিষ্ট পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করে লোকান্তর যাত্রা করেছেন। ভারতের মাটিতে ডঃ হো, চাচা হো-রূপে আপামর জনসাধারণের অশেষ শ্রদ্ধাভাজন। ভারতের জননায়ক স্বর্গত প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু একদিন এই বিশ্ববরেণ্য এশীয় নেতাকে ভারতের মাটিতে সশ্রদ্ধ সম্ভাষণ জানিয়েছেন। 'ভারত-দর্শন' চাচা হো-র প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের কালে ভিয়েৎনামী ভাইবোনদের বিপ্লবী জয়যাত্রার সাফল্য কামনা করে।

কংগ্রেসে ছাঁটাই লক-আউট!

ইন্দিরাপন্থীদের শায়েস্তা করার জন্য কংগ্রেস সংগঠনে ছাঁটাই লক-আউট ঘোষণা কররেন বলে সম্প্রতি ঘোষণা রেখেছেন দলীয় সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা। ইন্দিরাপন্থীদের প্রগতিশীল কর্মসূচীর প্রতি আগ্রহকে সভাপতি অবশ্য কম্যুনিস্ট অনুপ্রবেশ বলেই চিহ্নিত করেছেন। কর্ণাটক সাংবাদিক সম্মেলনে অবশ্য প্রশ্নবিদ্ধ হলে শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা বলেন, শ্রীমতী গান্ধীকে তিনি কম্যুনিস্ট বা সে ধরণের কোন কিছু (ভয়াবহ প্রাণী?) ভাববার কারণ দেখছেন না। তবে পঞ্চাশ পয়সা চাঁদা দিয়ে কম্যুনিস্টরা কংগ্রেস সংগঠনে ঢুকে পড়ছেন বলে তাঁর বিশ্বাস।

সর্বজনো সুখীনো ভবন্তু!

শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা বলেন, কংগ্রেসে গণতন্ত্র, সমাজবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী সকলেরই যোগদান কাম্য। সমাজবাদ বলতে তিনি 'সর্বজনো সুখীনো ভবন্তু' কথাটির উল্লেখ করেন। আর সেজন্যই সম্ভবত তিনি চান বেসরকারী উদ্যোগের বাড়-বাড়ন্ত। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ নাকি কংগ্রেস সভাপতিরও আকাঙ্ক্ষিত পথ, তবে তিনি চেয়েছেন এসব কাজ ধাপে ধাপে অগ্রসর হোক। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শ্রীদেশাইয়ের বক্তব্যও ছিল, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়ারই একটা পথ।

কম্যুনিস্ট হইতে সাবধান

কংগ্রেস সভাপতি পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালা সম্পর্কে উদ্বিগ্ন। তিনি বলেন, দেশে গণতন্ত্র-বিরোধী কোন দলকে 'প্রশ্রয় দেওয়া হবে না।' বলা বাহুল্য, তাঁর লক্ষ্য, কম্যুনিস্টরা। নীতির ঘরে যখন শূন্যতার সৃষ্টি হয় তখনই একটি দল শুধু নেতিবাচক লক্ষ্য ঘোষণা করে এগোতে চায়। সিন্ডিকেটের অবস্থাও তদ্রূপ। তাঁদের দেওয়ার মত কিছু নেই বলেই সঠিক লক্ষ্যও নেই। তাঁরা তাই নেতিবাচক পথই বেছে নিয়েছেন। 'কম্যুনিস্ট-খেদাও' শ্লোগান দিয়ে জনজাগরণের দুঃস্বপ্ন দেখছেন। নিজের গদির সুব্যবস্থা করার জন্য কম্যুনিস্ট নামাঙ্কিত করে নিজলিঙ্গাপ্পারা রাম-শ্যাম-যদু-মধু যাঁকেই বিতাড়িত করুন না কেন, তাতে জনগণের স্বার্থে এতটুকু উনিশ-বিশ নেই, সাধারণ কংগ্রেসীদেরই বা কি লাভালাভ আছে। তাই ঐ ফালতু

পথে রাজনীতি ব্যবসায়ের দিন যে চলে গেছে নিজলিঙ্গাপ্পারা যত তাড়াতাড়ি তা উপলব্ধি করবেন, কংগ্রেসের পক্ষে ততই মঙ্গল।

বাজে কথায় কান দেবেন না
—প্রধানমন্ত্রী

ওদিকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী স্পষ্ট ভাষায় বলেছেনঃ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের পর শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা বা শ্রী এস কে পাতিল কি মন্তব্য করছেন বা তা কোন সুস্থ পরিণতির দিকে এগোচ্ছে কি না,—এইসব অকিঞ্চিৎকর বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ অনুচিত।

প্রধানমন্ত্রীর কাছে তাহলে আজ মহান্ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি কি? শ্রীগিরির নির্বাচন এবং ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের ধ্বজা ধরে তো আর চিরকাল দেশ বসে থাকবে না। তাকে এগোতে হবে, কবে ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের ফলাফল জানা যাবে, তার জন্যও অপেক্ষায় থাকা চলে না। প্রধানমন্ত্রীকে নতুনতর পদক্ষেপ করতে হবে। সেই পদক্ষেপ কি?

কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন

শ্রীনগরে সংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি যেটুকু আভাষ দিয়েছেন, তাতে মনে হচ্ছে, অতঃপর প্রধানমন্ত্রীর মূল লক্ষ্য, কংগ্রেসে সেই সব প্রাক্তন কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দকে ফিরিয়ে আনা, যাঁরা কংগ্রেসী গোষ্ঠীতন্ত্রের দ্বারা এককালে নিগৃহীত হয়েছেন। বলা বাহুল্য, এ কাজটা তাঁর সাংগঠনিক উপকারার্থে যথেষ্ট বটে, তবে এর সঙ্গে সাধারণ নিপীড়িত মানুষের এক কাণাকড়িরও সম্পর্ক নেই। প্রধানমন্ত্রীর পাশে বিরাট জনসমর্থন এ কারণে গড়ে ওঠে নি। কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার জন্য সাধারণের তিলমাত্র মাথা ব্যথা নেই। তারা চায় সুস্থ স্বাভাবিক জীবন। দারিদ্র্য, বেকারী, অশিক্ষা থেকে মুক্তি। তারা রাজনীতি বোঝে না, রাজনৈতিক দলাদলি তাদের কাছে কিছুমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নয়। দেশের অন্যাবিধ মঙ্গলের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী বহু-উচ্চারিত সমাজতন্ত্রের গালভরা শ্লোগানের আশ্রয় নিয়েছেন। সাধারণে চায় কথায় না বড় হয়ে তিনি যদি প্রকৃতই কাজে বড় হতে চান, তারই জন্য সমুচিত ব্যবস্থাদি দ্রুত গৃহীত হোক। অগ্রগতির পথে গালভরা গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের বুলিই যেন শেষ পর্যন্ত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি করে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।

যাঁরা কংগ্রেস ছেড়েছেন তাঁরা কংগ্রেসে প্রত্যাবর্তন করলে সাধারণের লোকসান বই লাভ নেই। কারণ, কংগ্রেসে যেই নিঃশঙ্ক রক্তপ্রবাহ শুরু হবে, সেইমাত্র জনগণ তার লক্ষ্যের অগোচরে অবহেলিত হবেন। দায়ে পড়ে জনহিতৈষণা ততকালই সম্ভব, যতকাল রাজনৈতিক দলগুলি আপনি দুর্বল থেকে জনগণের মুখাপেক্ষী থাকবে। এ কারণেই কোন ব্যক্তি বা দলের হাতে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা তুলে দেওয়া সাধারণ স্বার্থের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। জনগণকেই অধিকতর ক্ষমতা গ্রহণ করতে হবে। তারই জন্য আজ চাপ সৃষ্টির দ্বারা জনস্বার্থের অনুকূলে ব্যবস্থাদি গ্রহণের প্রয়োজন। প্রয়োজন, জনপ্রতিনিধিদের হঠকারিতার মুড়ো মুড়োনোর জন্য 'রিকল' প্রথা প্রবর্তনের দাবি তোলা। প্রয়োজন রাজ্যের হাতে অধিকতর ক্ষমতা গ্রহণের দাবির সামিল হওয়া। কোন ব্যক্তি বা দলের প্রতি মোহ. বিমুগ্ধতা এবং বশ্যতা তাই গণতন্ত্রের পক্ষে বিপদস্বরূপ। জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচন করেন জনস্বার্থে কাজ করিয়ে নেওয়ার জন্য। জনপ্রতিনিধি হিসেবে এই চেতনা আজ সকলেরই থাকা দরকার। প্রধানমন্ত্রী গণতন্ত্র সম্পর্কেও চিন্তিত। গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে হলে তাই জনগণের হাতে অধিকতর ক্ষমতা তুলে দেওয়ার দিকেই নজর দিতে হবে প্রধানমন্ত্রীকে এবং তাঁর নিজের ভাঙা দল গড়ার চাইতে এ কাজের বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেন না তিনিই ঘোষণা করেছেন, প্রধানমন্ত্রী আগে জনসেবক, পরে দলসেবক। অর্থাৎ তিনি প্রথমে পার্লামেন্টের কাছেই দায়াবদ্ধ। এবং পার্লামেন্ট বিভিন্ন দলীয় জনপ্রতিনিধিদের সভা; আর তাই জনকল্যাণই প্রধানমন্ত্রীর প্রধান কর্তব্য, নিজের ভাঙা দল গড়া নয়।

—৬।৯।৬৯

জুজু'র ভ:—

আন্তর্জাতিক

লিবিয়া ঃ

১লা সেপ্টেম্বর এক সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে লিবিয়ায় রাজতন্ত্রের অবসান ও প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে।

আশি বছরের বৃদ্ধ রাজা ইদ্রিস আল সেনুসি তুরস্কে অবসর যাপন ও তাঁর রিউমাটিক রোগের চিকিৎসা করাচ্ছিলেন। এমন সময় খবর এল তাঁর সেনাবাহিনীর অফিসাররা ক্ষমতা দখল করেছে এবং রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করেছে। এমন কি, রাজার অনুপস্থিতিতে যিনি অস্থায়ী রাজার দায়িত্ব পালন করছিলেন, সেই রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র রাজার উত্তরাধিকারী ক্রাউন প্রিন্স হাসান আল রেদাও এই রাজনৈতিক পরিবর্তনকে মেনে নিয়েছেন এবং তিনি নিজে ত্রিপলি রেডিও থেকে প্রদত্ত ভাষণে জনগণকে শান্তভাবে নতুন শাসকদের সংগে সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

রাজা ইদ্রিস প্রথমে অভ্যুত্থানের কথা বিশ্বাস করতে পারেন নি। তাঁর বিশ্বস্ত প্রজারা তাঁর বিরুদ্ধে যাবে, তাই কি হয়! তিনি শীগ্‌গিরই দেশে ফিরবেন এবং বিদ্রোহ দমন করবেন, এমন কথা রাজা ঘোষণা করেন। কিন্তু পরে বুঝলেন, অবস্থা সুবিধের নয়। তাই তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন মূলতুবী রেখে আরও চিকিৎসার জন্য গ্রীসে রওনা হলেন। ইতিমধ্যে তিনি য়ুরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রের সংগে যোগাযোগ করেছেন, তাঁর রাজশক্তি ফিরে পাবার ব্যাপারে তাদের সাহায্যের জন্য। কিন্তু কেউই এগোতে রাজী হয় নি। রাজার ব্যক্তিগত প্রতিনিধি ওমর আল্ সেল্‌হি লণ্ডনে গিয়ে ব্রিটেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মাইকেল স্টুয়ার্টের সংগে কথা বলেছেন। কিন্তু ব্রিটিশ সরকারও রাজাকে সাহায্য করতে প্রস্তুত নন। ১৯৫৩ সালে ব্রিটিশ-লিবিয়া চুক্তি অনুসারে ব্রিটেন লিবিয়ার বিপদে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, কিন্তু তা বিদেশী আক্রমণের ক্ষেত্রে, আভ্যন্তরীণ কোন ব্যাপারে নয়। ব্রিটেনের মতেও বর্তমান রাজনৈতিক পরিবর্তন লিবিয়ার নিজস্ব ঘরোয়া ব্যাপার।

প্রায় বলতে গেলে বিনা প্রতিবাদে, ন্যূনতম প্রতিরোধ ছাড়াই বিদ্রোহীরা লিবিয়ার ক্ষমতা দখল করেছে। একেবারে রক্তপাতহীন বিপ্লব। ক্ষমতা দখলের পর বিদ্রোহীরা একটি বিপ্লবী পরিষদ গঠন করেছে এবং এই পরিষদের সভাপতিরূপে কর্নেল সাদুদ্দিন আল্ সোরের শাসনক্ষমতা পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

বিপ্লবী পরিষদের আদেশবলে পুরনো সংবিধান ও জাতীয় আইনসভা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। রাজকীয় সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল সউসুজি সাম নাদন ও নিরাপত্তা বাহিনীর প্রধান জেনারেল সালেম বেন জালিবকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বিপ্লবী পরিষদের পক্ষ থেকে আরও ঘোষণা করা হয়েছে, তাঁরা সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য কাজ করছেন। তবে এই সমাজতন্ত্র কোন বিশেষ ধরণের মতবাদের দ্বারা প্রভাবিত নয়। লিবিয়ার নতুন নামকরণ করা হয়েছে 'লিবিয়া আরব প্রজাতন্ত্র'। রাষ্ট্রসংঘ কর্তৃপক্ষ এবং অন্যান্য রাষ্ট্রকে এই খবর জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

স্থলবাহিনী ও বিমানবাহিনীর বামপন্থী অফিসাররা এই 'বিপ্লবের নায়ক'। এঁদের অনেকেই ইরাকের বাথ সোস্যালিস্ট পার্টির আদর্শে অনুপ্রাণিত। তবে ব্যক্তিগতভাবে আবার নাসেরের প্রভাবও এঁদের মধ্যে যথেষ্ট।

সিরিয়া, ইরাক, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, সুদান প্রভৃতি অভ্যুত্থানের প্রায় সংগে সংগেই নতুন প্রজাতান্ত্রিক শাসনকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ব্রিটেন ও ফ্রান্সও মেনে নিয়েছে। এখনও যারা প্রকাশ্যে স্বীকৃতি ঘোষণা করে নি, তার মধ্যে অন্যতম হল ভারত।

মাত্র সাড়ে পাঁচ লক্ষ লোকের দেশ লিবিয়া। শতকরা নব্বই ভাগই মরুভূমি। তবু তৈল-সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ এই দেশ। ভূমধ্য-সাগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত লিবিয়ার অবস্থানগত গুরুত্বও কম নয়। বর্তমান এখানে মার্কিন ও ব্রিটিশ সামরিক বিমান ঘাঁটি রয়েছে। মার্কিন, ব্রিটিশ, ইতালীয়, জাপানী ও ফরাসী তেল কোম্পানীগুলি রাজার সংগে যোগসাজসে অবাধ লুণ্ঠন চালাচ্ছে।

আরব জগতের অন্যান্য দেশের সংগে লিবিয়ার রাজনৈতিক মিল বিশেষ নেই। অন্যান্য আরব দেশ ইজরায়েলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যেরূপ অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে, লিবিয়া তা নেয় নি। প্যালেস্টাইনের গেরিলাদের সাহায্যের জন্য আরব রাষ্ট্রগুলি প্রচুর অর্থ ব্যয় করলেও ধনী লিবিয়া বিশেষ কোন সাহায্য করে নি। আরবরা সাধারণভাবে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরোধী, কিন্তু লিবিয়া তাদের সংগে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রক্ষা করে চলছে। তাছাড়া এদেশে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্য অত্যন্ত বেশি।

এইসব কারণে স্বাভাবিকভাবেই জন-সাধারণের এক বিপুল অংশের মধ্যে রাজকীয় শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দীর্ঘদিন ধরে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে। বিদ্রোহী সেনা-নায়কেরা এই বিক্ষোভকেই রূপ দিয়েছেন। তাই সমর্থনও তাঁরা পেয়েছেন জনসাধারণের।

সমাজতন্ত্রের পথে কতটা নতুন শাসকরা যেতে পারবেন তা পরের কথা, তবে আপাতত তাঁরা তিনটি প্রধান কাজ করবেন বলে ঘোষণা করেছেন ঃ (১) ধনবৈষম্যের অপসারণ ; (২) শাসক ও শাসিতের মধ্যে বর্তমানে যে ব্যবধান রয়েছে, তার দূরীকরণ ; এবং (৩) বৈদেশিক নীতির পরিবর্তন।

বৈদেশিক নীতির-ক্ষেত্রে নতুন শাসক-গোষ্ঠী ইজরায়েলবিরোধী জঙ্গী মনোভাব গ্রহণ করবে এবং আরব জাতীয়তাবাদের মূল ধারার সামিল হবে।

লিবিয়ায় রাজতন্ত্রের অবসানের পর এখন আর মাত্র তিনটি আরব রাজ্যে রাজতন্ত্র রইল। এরা হল ঃ সৌদি আরব, মরক্কো ও জর্ডান।

ঘানা ঃ

ব্রিটিশ আধিপত্য থেকে মুক্তিলাভ করে ১৯৫৭ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর এই প্রথম ঘানায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। একদা সব অত্যন্ত জনপ্রিয় ও বামপন্থীঘেঁষা নেতা কোয়ামে নক্রুমা একটানা ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত দেশ শাসনের পর ক্ষমতাচ্যুত হন। বর্তমানে তিনি বিদেশে।

ছেষট্টি সাল থেকে সামরিক নেতারা দেশ শাসন করছেন। বহুবার তাঁরা বলেছেন, ক্ষমতা ধরে রাখার কোন ইচ্ছা তাঁদের নেই। যত শীঘ্র সম্ভব বেসামরিক লোকদের হাতে শাসনক্ষমতা ফিরিয়ে দিতে চান তাঁরা। জাতীয় মুক্তি পরিষদের বর্তমান সভাপতি ব্রিগেডিয়ার আকওয়াসি আফ্রিফা জুন মাসে

কিস্তিতে ট্রানজিস্টার

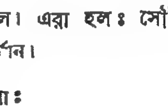

HAVA

৩ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড পোর্টেবল ট্রানজিস্টর মাসিক ৫ টাকা কিস্তিতে। প্রত্যেক গ্রাম ও শহরে পার্শ্বেল যাইতে পারে।

HAVA SALES (34) SHAKTI NAGAR, DELHI-7

একটি ভিন্ন স্বাদের বই
মহৎ অনুপ্রেরণায় দিব্য অনুভূতিতে লেখা
পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব সম্পর্কে বহু
অনুদ্ঘাটিত তথ্যে সমৃদ্ধ

"Out of a handful of dust lacs of Vivekananda can be made by him—This Ramkrishna."
—Swami Vivekananda.

ঠাকুর পরমহংসদেবের
আবির্ভাবের পূর্বাভাষ

ঘরে ঘরে রাখবার, প্রত্যেকের পড়বার মত বই
শ্রীজীবনকৃষ্ণ মাইতি রচিত
মূল্য মাত্র দশ টাকা

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ
কলিকাতা-১২

ঘোষণা করেছিলেন, ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে নতুন সংবিধান অনুসারে নতুন নির্বাচন করবেন। এবং নতুন গণতান্ত্রিক সরকার গঠিত হবে।

তাই হয়েছে। ২৯শে আগস্ট ঘানার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৩৫০ জন সদস্যের এক গণপরিষদ প্রায় এক বৎসর ধরে যে সংবিধান করেছে, সেই সংবিধান অনুযায়ীই নির্বাচন হয়েছে। দশ লক্ষ ভোটদাতা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেছে।

জাতীয় আইনসভার ১৪০টি আসনের জন্য মোট ৪৮০ জন প্রার্থী ও পাঁচ-ছটি দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও, আসল লড়াই হয়েছে দুটি প্রধান দলের মধ্যে। ডঃ কোফি বুসিয়ার 'প্রোগ্রেস পার্টি' ও কোমলা গবেডেমার 'ন্যাশনাল অ্যালায়েন্স অব লিবারেলসের' মধ্যেই মুখ্যত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আবদ্ধ ছিল। গবেডেমা এককালে নক্রুমার ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ও ১৯৬১ পর্যন্ত ঘানার অর্থমন্ত্রী ছিলেন। সাধারণত নক্রুমাপন্থীরা গবেডেমার দলে যোগ দিয়েছেন। নক্রুমার অপর সহকর্মী ডাঃ উইলি লুটেরোডটের 'পিপ্‌লস পপুলার পার্টিকে' প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেওয়া হয় নি।

নির্বাচনে বুসিয়ার প্রোগ্রেস পার্টির জয় হয়েছে। আইনসভার ১৪০টি আসনের মধ্যে ১০টিতে জয়লাভ করে এই দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছে।

ডাঃ কোফি বুসিয়া ঘানার নতুন প্রধানমন্ত্রী হবেন। বুসিয়া স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছেন। তখন তিনি ছিলেন য়ুনাইটেড পার্টির নেতা। নক্রুমার বিরোধী ছিলেন তিনি এবং তিনিই ছিলেন বিরোধী দলের নেতা। পন্ডিত ব্যক্তি বলে বুসিয়ার খ্যাতি আছে। তবে রাজনীতিতে তিনি রক্ষণশীল ও নরমপন্থী।

ঘানার এই নির্বাচনকে উপলক্ষ করে সামরিক নেতারা গণতন্ত্রের মহিমা প্রচার করলেও, আসলে খুব একটা গণতান্ত্রিক শাসনের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে না। নতুন ব্যবস্থায় সংবিধান অনুসারে তিনজন সদস্যকে নিয়ে এক 'রাষ্ট্রপতি-কমিশনের' ব্যবস্থা করা হয়েছে। তিন বছর এই কমিশন থাকবে, এবং রাষ্ট্র শাসনের সর্বোচ্চ ক্ষমতা থাকবে এই কমিশনের হাতে। প্রধানমন্ত্রী ও আইনসভা এই কমিশনের অধীনে থেকে কাজ করবেন। তিন বছর শেষ হবার পরও প্রয়োজন হলে এই কমিশনের কার্যকাল বাড়ানো হবে।

সংবিধানেই ঠিক করে দেওয়া হয়েছে, রাষ্ট্রপতি-কমিশনের তিনজন সদস্য হবেন: বর্তমান জাতীয় মুক্তি পরিষদের সভাপতি ব্রিগেডিয়ার আকওয়াসি আফ্রিফা, পুলিশের ইন্‌স্‌পেক্টর জেনারেল হারলে ও সেনাবাহিনীর প্রধান মেজর জেনারেল ওকরান।

(৭-৯-৬৯)

গ্রন্থমেলা

বিক্ষুব্ধ পাকিস্তান—কল্হন। প্রকাশক—সাহিত্য প্রকাশ, ৫।১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলকাতা-৯। দাম—বারো টাকা।

বিক্ষোভ আজ দেশে দেশে। নিরস্ত্র নিরস্ত্র মানুষের ওপর হিংস্র ও বর্বর ক্ষমতালোভীরা দেশে দেশে আজ জঘন্য আক্রমণে উদ্যত। কিন্তু তবু, সত্যের খাতিরে একথা আজ অস্বীকার করার উপায় নেই যে, অন্য সব দেশের সঙ্গে আমাদের আত্মিক যোগ যতটা, পাকিস্তানের সঙ্গে যোগ তার চেয়ে কিছুটা বেশি। কারণ, এক দেশকে কেটে দুই করা যায়; কিন্তু এক হৃৎপিণ্ডকে দুই করা যায় না। এবং যায় না বলেই হৃৎপিণ্ডের একদিকে যখন রক্ত টগবগ করে ফোটে, অন্যদিকে তখন তার প্রতিক্রিয়া ঠিক ছড়িয়ে পড়ে। ঠিক তখন হৃৎপিণ্ডের অন্য অংশটাও বেদনায় আর সহানুভূতিতে টগবগ করে ওঠে।

পাকিস্তানের গণ-আন্দোলনের প্রতি আমাদের সহানুভূতি এই এক ও অভিন্ন হৃৎপিণ্ডের সহানুভূতি। তাই পাকিস্তান সম্পর্কে লেখা কোনো বই হাতের কাছে পেলে আমরা হুমড়ি খেয়ে পড়ি, বইয়ের কালো হরফগুলোর মধ্যে নিজেদের বুকের স্পন্দন খুঁজে বেড়াই।

কিন্তু দুর্ভাগ্য, অনেক খোঁজেও এতকাল পাকিস্তান সম্পর্কে অনেক কিছুই জানতে পারি নি আমরা। এমন একটি বইও আমরা পাই নি, যাকে পাকিস্তানের গণ-আন্দোলনের বিশ্বস্ত দলিল বলে গণ্য করা যায়।

সুখের কথা, এতদিনের এই অভাব দূর করলেন কল্হন। বিক্ষুব্ধ পাকিস্তানে আমাদেরই বন্ধু সাড়ে এগারো কোটি পাকিস্তানীর বেদনাকে অমর করে রাখলেন।

এক কল্হন 'রাজতরঙ্গিণী' লিখে অমর হয়েছেন হারানো কাশ্মীর-কাহিনীকে মহাকালের বজ্রমুষ্টি থেকে উদ্ধার করে; আর এই আর এক কল্হন অমরত্বের দাবি নিয়ে এসেছেন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা পাকিস্তানী শহীদদের তাজা লাল রক্তকে সংহত করে।

শেষোক্ত কলহনকে বাংলা ভাষাভাষী মাত্রেই সকৃতজ্ঞ সাধুবাদ জানাবেন নিশ্চয়। নিশ্চয় সভ্য দুনিয়া রক্তের অক্ষরে লেখা তাঁর 'বিক্ষুব্ধ পাকিস্তান' পড়ে স্তম্ভিত হবে। কারণ, সভ্য মানুষদের তো জানবার কথা নয় যে, স্বাধীন দেশের নাগরিকরাও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার চাইলে বুলেট উপহার পায়, মাতৃভাষার মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইলে বেয়োনেটের খোঁচা আর মেসিন-গানের সম্বর্ধনা পায়।

কল্হন এগ্রন্থে পাকিস্তানী গণ-আন্দোলনের সামগ্রিক আলেখ্যটিকে সার্থকভাবেই ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। তাঁর লেখা পড়তে পড়তে অদ্ভুত-আশ্চর্য এক জগতে ঘুরে বেড়াই আমরা। যেন স্পষ্ট দেখতে পাই, বলিষ্ঠ বালুচদের ওপর নির্মম অত্যাচার চলছে; পাকিস্তানী শাসনকর্তারা বোমা ফেলে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছে গ্রামের পর গ্রাম।......দেখতে পাই, সংগ্রামী পাখতুনরা এগিয়ে আসছে; রক্ত নিয়ে হোলি খেলতে খেলতেও ওরা বলছে, আমরা অপরাজিত।......আর দেখি, পূর্ব পাকিস্তানের মৃত্যুভয়হীন বন্ধুদের। দেখি, বুকের রক্ত দিয়ে বাংলাভাষার মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করছে ওরা; জীবন দিয়ে ওরা ইস্কান্দার মির্জা, গোলাম মহম্মদ আর আয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছে।

এই প্রতিবাদের চিত্র, ন্যায্য দাবি আদায় করতে গিয়ে সাধারণ মানুষের এই আত্মাহুতির চিত্র যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক, এক কথায় তা অনবদ্য। পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলন ভাষা পেয়েছে এই গ্রন্থে, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অন্তরালবর্তী সাজানো কাহিনী এতে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর আত্মোৎসর্গের মধ্য দিয়ে বরকত, রফিক, জব্বার ও আতোয়ার পেয়েছে ধ্রুব-নক্ষত্রের মহিমা।

এ-বই পড়া শেষ করে আতোয়ার আর আলোর জন্যে কেউ যদি দু'ফোঁটা চোখের জল ফেলেন তো তাঁকে দোষ দেবো না। কারণ, লেখকেরও সহানুভূতি ঐ লক্ষ্মীছাড়া মানুষগুলোর দিকেই।

অবিশ্যি সাধারণ মানুষ যেমন, অসাধারণরাও তেমনি এখানে এসেছেন। এসেছেন ফজলুল হক, মৌলানা ভাসানী, মুজিবর রহমান এবং আজম খানের মতো মানুষেরা। কিন্তু তবু বলবো, বিশেষ কোনো মানুষ নয়, সমগ্র পাকিস্তানেরই বিক্ষোভ-বেদনার অতি বিশ্বস্ত এক দলিল এই 'বিক্ষুব্ধ পাকিস্তান'।

আধুনিক পোলট্রি ফার্মিং: শ্রীসমরেন্দ্রনাথ রায়: দি বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। মূল্য—চার টাকা।

মুর্গী পালন সম্পর্কে বিদেশী লেখকদের রচিত অসংখ্য বই রয়েছে। গ্রন্থ হিসাবে তার মধ্যে অনেকগুলিই সুলিখিত হলেও এদেশের মাটি এবং আবহাওয়ার প্রভাবে যে বিশেষ অবস্থাটি সৃষ্ট হয় তার কথা বিদেশী লেখকেরা জানেন না। অথচ এ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না থাকলে ভারতবর্ষে মুর্গী পালনের বিষয় কোন মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করা অসম্ভব।

আজকের দিনে পোলট্রি ফার্মিং-এর লোকপ্রিয়তা খুবই বেশি। কারণ ডিম এবং মুর্গীর মাংসের মত পুষ্টিকর খাদ্য খুব বেশি নেই। এছাড়া মুর্গীজাত বস্তুর সংরক্ষণ সহজ এবং উন্নত যানবাহনের সাহায্যে সেগুলিকে এক স্থান থেকে অপর স্থানে অনায়াসেই নিয়ে যাওয়া যায়। মুর্গী প্রজনন, পালন এবং চিকিৎসার দিকগুলিও আজ বিশেষ উন্নতি লাভ করেছে।

শ্রীসমরেন্দ্রনাথ রায় তাঁর গ্রন্থটির বিষয়বস্তু সুন্দরভাবে সাজিয়েছেন এবং অসংখ্য রঙীন এবং এক-রঙা ছবির সাহায্যে নানা শ্রেণীর মুর্গীর বিষয়ে জানবার কথাগুলি জানিয়েছেন। ভারতবর্ষে মুর্গী পালনের ভবিষ্যৎ আশা, মুর্গীর শরীর, কয়েক প্রকার মুর্গীর জাত, কেমন করে মুর্গীর খামার শুরু করা উচিত, মুর্গী বাছাই, মুর্গী প্রজনন, কৃত্রিম উপায়ে শাবক ফোটান, মুর্গীর বাসা, মুর্গীর খাদ্য, মুর্গীর ব্যাধি ইত্যাদি বিষয়ে সহজ ভাষায় লেখক যেমন করে আলোচনা করেছেন তা পোলট্রি ফার্মিং-এর কাজে বিশেষভাবে সহায়তা করবে। এমন স্বল্প পরিসরে এমন তথ্যপূর্ণ গ্রন্থ বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। এ গ্রন্থ যে বিশেষভাবে সমাদৃত হবে সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

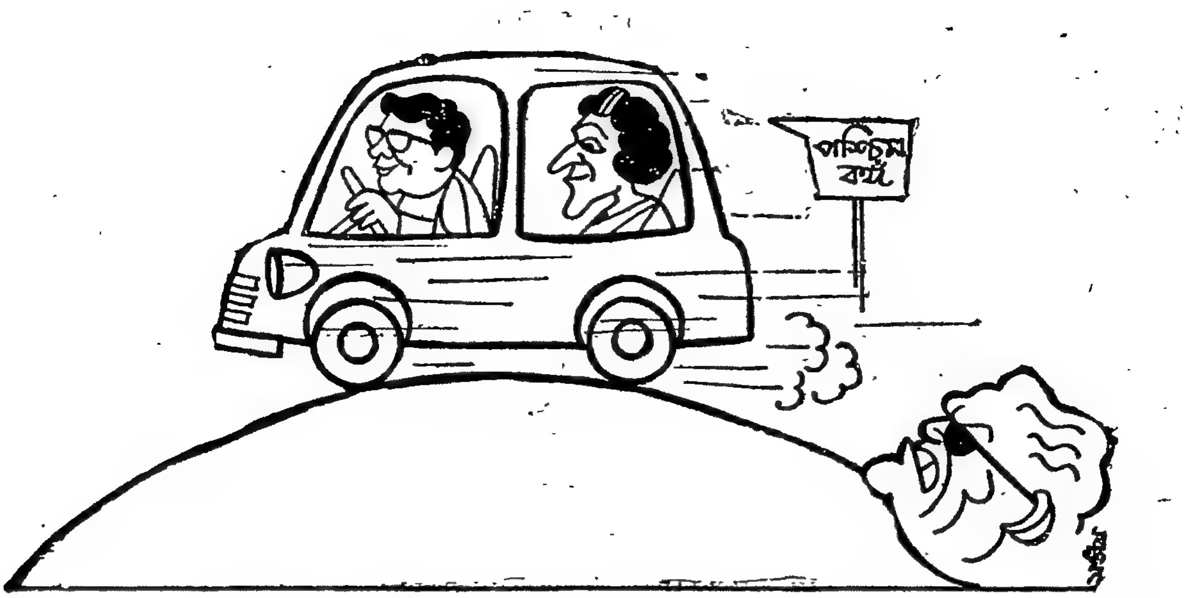

সপ্তাহের বোঝা

কৃত্তিবাস ওঝা

১১ই আগস্ট রাত ১২টার পর প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী শ্রীসিদ্ধার্থ-শঙ্কর রায়কে বললেন—আর একটু বসে যাও, দেখে যাও চিঠিখানি শ্রীনিজ-লিঙ্গাপ্পা পেয়েছেন কিনা? শ্রীরায় বসে গেলেন। পত্র-বহনকারী পিওন ফিরে আসতে আসতে আমরা বরং পিছনের দিকের কাহিনীটা বলে নিই—তাহলেই বোঝা যাবে কেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী শ্রীরায়কে মধ্যরাত্রেও বসে যেতে বললেন। ৭ই আগস্ট পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণকুমার শুক্লা, শ্রীবিজয়সিং নাহার ও শ্রীসিদ্ধার্থ-শঙ্কর রায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে নিজের নামে একখানি পত্র লিখলেন কংগ্রেস সভাপতি শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পাকে উদ্দেশ্য করে। পত্রখানি অতি সরল ও বিনীত ভঙ্গিমায় লেখা হল। লেখা হল—কংগ্রেস সভাপতি, আপনি কংগ্রেসের ভোটেই রাষ্ট্রপতি পদে শ্রীরেড্ডির জয় সুনিশ্চিত জেনেও কেন জনসঙ্ঘ, স্বতন্ত্র দলের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন, যে স্বতন্ত্র ও জনসঙ্ঘ দল ব্যাঙ্ক জাতীয়-করণের বিরোধিতা করছে, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর বিরুদ্ধে দিবারাত্র জেহাদ ঘোষণা করছে ও তাঁর পদত্যাগ দাবি করছে। কংগ্রেসকর্মীদের অনেকে এই প্রসঙ্গে নানা প্রশ্ন করায় এই পত্র লেখা হল। অনুগ্রহ করে আপনার বক্তব্য জানাবেন, যাতে কংগ্রেসকর্মীদের বুঝিয়ে বলতে পারি, নইলে আপনার সঙ্গে জন-সঙ্ঘ-স্বতন্ত্র দলের শলা-পরামর্শের সঠিক জবাব দেওয়া যাচ্ছে না। পত্রখানি যখন দিল্লী চলে গেল, তখন শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর শ্রীবিজয়সিং নাহারকে বললেন—আপনি বরং একবার দিল্লী যান, প্রকৃত ব্যাপারটি বুঝে আসুন। আপনি শনিবার চলে যান, আমি রবিবার যাচ্ছি। শ্রীবিজয়সিং নাহার শনিবার সকালে চলে গেলেন। যাবার সময় পকেটে করে শ্রীশুক্লার চিঠির একখানি অনুলিপি নিয়ে গেলেন।

দিল্লীতে গিয়ে শ্রীনাহার দেখলেন, সব, বুঝলেনও সব—ইতিমধ্যে শ্রীরায়ও দিল্লী গিয়ে পৌঁছলেন। শ্রীনাহার ও শ্রীরায় আবার পরামর্শ করলেন ও হিসাব করলেন যে, অবস্থা যা, তাতে রেড্ডির জয় নিশ্চিত। এর ব্যতিক্রম ঘটাতে হলে চাই বড় রকমের ভাঙন। শ্রীনাহার ও শ্রীরায় অনেকের সঙ্গে দেখা করলেন। আলাপ করলেন, বুঝলেন শ্রীগিরির পক্ষে এক ফিসফিস গুঞ্জন আছে, সেই গুঞ্জনকে সরব করতে না পারলে শ্রীরেড্ডি জয়ী হবেনই। তাই তাঁরা দুইজন শ্রীগিরির প্রতি সমর্থনকারীদের জানিয়ে দিলেন—এই-ভাবে শ্রীগিরির জয় হবে না। আর এই ফিসফিস-কারবারে তাঁরা নেই। যদি প্রকাশ্যে শ্রীগিরিকে জয়ী করার ঝুঁকি নেওয়া না হয়, তবে সকলে মিলে শ্রীরেড্ডিকে জয়ী করাই উচিত—তারপর যা হবার হবে। এইরকম দোমনা অবস্থার মধ্যে শ্রীনাহার কলকাতায় চলে এলেন। সোমবার পরিষদীয় কার্যকরী সমিতির সভা বসল—সেখানে শ্রীনাহার যাঁর বাড়ির অতিথি হয়েছিলেন, সেই শ্রীদুগার সভায় খুব ঘটা করে বললেন—পশ্চিমবঙ্গের শ্রীবিজয়সিং নাহার তাঁকে বলে গেছেন যে, শ্রীরেড্ডির জয় হবেই, পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেস সদস্যরা শ্রীরেড্ডিকেই ভোট দেবেন। এই সভাতে শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর উপস্থিত ছিলেন, তাঁর কাছ থেকেও অনুরূপ বিবৃতি দাবি করা হয়। কিন্তু শ্রীরায় বলেন—তিনি কিছুই বলতে রাজী নন, তিনি রাজ্য বিধানসভার কংগ্রেস সদস্যদের সভা ১৪ই তারিখে আহ্বান করেছেন, সেই সভার পর যা বলার বলবেন। অনেক পীড়াপীড়ি করেও শ্রীরায়ের কাছ থেকে কোন কথা আদায় করা গেল না। শ্রীরায় তখনও ভাবছেন পরিস্থিতির পরিবর্তন করা যায় কি না।

শ্রীরায় সোজা চলে গেলেন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে। শ্রীমতী গান্ধীকে বললেন—শ্রীবিজয়সিং নাহার যা বুঝেছেন, তার মধ্যে ভুল নেই। শ্রীরায় বললেন—শ্রীনাহার রাজনীতিতে হাত পাকিয়েছেন স্বর্গত কিরণশঙ্কর রায়ের কাছে, আর শ্রীঅতুল্য ঘোষের পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস দখলে তিনিই ছিলেন প্রধান ব্যক্তি। ১১৫ ই, ধর্মতলা স্ট্রীটের কংগ্রেস ভবন দখল করে শ্রীঅতুল্য ঘোষকে উপহার দেওয়াই নয়—শ্রীঅতুল্য ঘোষ যখন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি, তখন ছয় বৎসর রাজ্য কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীনাহার। কাজেই সিন্ডিকেট ও তার মধ্যমণি শ্রীঅতুল্য ঘোষের আঁটঘাট যতটা শ্রীনাহার বোঝেন, ততটা কেউ বোঝেন না। শ্রীমতী গান্ধী সব শুনে কি করা যায়, এই প্রশ্ন রাখলেন। শ্রীমতী গান্ধীও সব বুঝেছেন—বুঝেছেন তিনি

স্বপ্নে ভঙ্গ দিলেও অপর পক্ষ কখনও দেবেন না। কারণ বাঙ্গালোরে বেশির ভাগ সদস্যের ভোটে শ্রীরেড্ডি যখন রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী মনোনীত হলেন, তখন তাঁর সেই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া ছাড়া পথ ছিল না। পথ ছিল না বলেই তিনি দিল্লী এসে রাষ্ট্রপতি পদে শ্রীরেড্ডিকে মেনে নিয়েই কাজ করছিলেন, যাতে তাঁর মেনে নেওয়ার মত তাঁর কাজকেও সিন্ডিকেট মেনে নেয়। কিন্তু তাঁর প্রতি সিন্ডিকেটের সন্দেহ তো যাচ্ছে না। তাই তাঁকে দিয়েও রাষ্ট্রপতির পদে শ্রীরেড্ডির নামে একখানা মনোনয়নপত্রে স্বাক্ষর করা হল। বেশ সেই কাজও তিনি করেছেন, কিন্তু সন্দেহ এমন স্তরে গেছে যে, যে প্রার্থীর হয়ে তিনি মনোনয়নপত্র সই করেছেন, তার নামে প্রকাশ্যে হুইপ বা বিবৃতি দেবার জন্য চাপ দেওয়া হচ্ছে। কারণ মনোনয়নপত্র সই করিয়েও সিন্ডিকেট তাঁকে বিশ্বাস করছেন না। অর্থাৎ তাঁদের ধারণা প্রধানমন্ত্রী যাঁর মনোনয়নপত্র সমর্থন করেছেন, ভোটে তাঁর বিরোধিতা করবেন। কেন এত অবিশ্বাস? আর এই অবিশ্বাসের কারণেই তো শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা ছুটে গেছেন জনসঙ্ঘ-স্বতন্ত্র দলের কাছে। ভাবখানা এই, প্রধানমন্ত্রী যদি কিছু ভোট নিয়ে সরে যান, তাঁরা যেন সেটা পূরণ করেন। তা না হলে যে দুটো পার্টি প্রধানমন্ত্রীর প্রতি সতত অনাস্থা আনছে, তাঁর ব্যাঙ্ক রাষ্ট্রীয়করণের প্রস্তাবের বিরোধিতা করছে—তাদের কাছে কংগ্রেস সভাপতি যাবেন কেন?

দীর্ঘ আলোচনার পর ঠিক হল আজ রাত্রেই শেষ আঘাত হানতে হবে। পরামর্শ করে ঠিক হল, কংগ্রেস সভাপতিকে একখানি পত্র লেখা হবে, যে পত্রে কয়েকজন বিশিষ্ট সদস্য সই করবেন। কিন্তু কারা সই করবেন? শ্রীরায় আলোচনা করতে ছুটলেন শ্রীফকরুদ্দিন আলি আমেদের বাড়ি। শ্রীফকরুদ্দিন সব কথা শুনে বললেন, তিনি পত্রে সই করতে রাজী। বাবু-সাহেব অর্থাৎ শ্রীজগজীবন রাম সহ আরও কয়েক জনের সই থাকলে ভাল হয়। শ্রীরায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে জানালেন শ্রীফকরুদ্দিন আলি সাহেব রাজী, কিন্তু বাবুসাহেবকে রাজী করাতে হবে। শ্রীমতী গান্ধী শ্রীজগজীবন রামের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বললেন. তারপর রওনা হলেন শ্রীজগজীবন রামের গৃহে। শ্রীজগজীবন রাম শ্রীরায়ের কথা শুনে শ্রীরায়কে ১৮টি নামের একটি তালিকা তৈবি করে দিলেন, অর্থাৎ এই ১৮ জন সই করে চিঠি দেবে। আবার শ্রীরায় চলে এলেন

বন্যার্ত

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর কাছে এবং শ্রীজগজীবন রামের দেওয়া নামগুলি নিয়ে হিসাব করা হল। দেখা গেল, বিভিন্ন প্রদেশের এই সব নেতাদের নাম এক করাও সোজা নয়, আর একমত করাও সোজা নয়—তা ছাড়া এর দ্বারা শুরুতেই সবকিছু প্রকাশ হয়ে যাবার সম্ভাবনা। তাই ঠিক হল, চিঠিতে বেশি নাম নয়, মাত্র শ্রীজগজীবন রাম ও শ্রীফকরুদ্দিন আলি আমেদেরই সই থাকবে। শ্রীরায় শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পাকে লেখা পত্রের বয়ান রচনা করলেন। এই সময় আরও কয়েকজন এসে জুটেছেন প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে। প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মনিয়ম চিঠির দুই-একটি লাইন বদলও করলেন আলোচনা করে। তার পর পত্র নিয়ে শ্রীরায় রওনা হলেন শ্রীফকরুদ্দিন আলি আমেদ ও শ্রীজগজীবন রামের বাড়ি—সঙ্গে রয়েছেন শ্রীমতী নন্দিনী সৎপতি। পত্রে শ্রীফকরুদ্দিন আলি ও শ্রীজগজীবন-রামের সই করিয়ে শ্রীরায় যখন প্রধানমন্ত্রীব বাসভবনে ফিরে এলেন, তখন ঘড়ির কাঁটা প্রায় মধ্য রাত্রিতে। খামে এঁটে চিঠি নিয়ে রওনা হল পিওন। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন উপস্থিত সকলের সঙ্গে শ্রীরায় ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী। এই সময় শ্রীরায় বললেন—এইবার আমি উঠি। প্রধানমন্ত্রী তখন বললেন—না আর একটু বসে যাও। অর্থাৎ পিওন ফিরে এলে তুমি যেও।

পিওন ফিরে এল—পত্র প্রাপ্তির রসিদে সই করিয়ে এনেছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী রসিদে কার সই ভাল কবে দেখে নিলেন। হ্যাঁ, কংগ্রেস সভাপতিই সই করেছেন "এন গাপ্পা"। রসিদখানি এগিয়ে দিলেন শ্রীরায়কে. শ্রীরাযও দেখলেন রসিদখানি। রাত বাবোটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী বললেন—সিদ্ধার্থ, তুমি যা করলে, বল তুমি কি চাও? শ্রীরায় কি চাইবেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী দিতে চাইছেন—কি চাইবেন তিনি? আমি কিছু চাই না, অন্য কোন বিনয়ও নয়—সোজা প্রশ্নের সোজা জবাব দিলেন শ্রীরায়। বললেন—আমি চাই আপনি বাংলাদেশে চলুন—আমি চাই আপনি বাংবাদেশে চলুন, থাকুন, আমি চাই আপনি কলকাতা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে সভা করুন। প্রধানমন্ত্রী বললেন—বেশ তাই হবে, আমি বাংলাদেশে যাব, ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে সভা করব।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীরায়ের চাওয়া পূরণ করলেন। আগামী ১৩ই সেপ্টেম্বর কলকাতা ব্রিগেড প্যাবেড গ্রাউন্ডে যে সভা হবে,. সে সভায় প্রধানমন্ত্রী ভাষণ দেবেন। এই হল সেই সভা, যে সভা হল একটি চাওয়া ও পাওয়ার কাহিনীতে রচিত হয়েছে। তাই তো যখন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শ্রীপ্রতাপচন্দ্র চন্দ্র পত্র লিখে প্রধানমন্ত্রীকে জানালেন—প্রদেশ কংগ্রেস আপনার অভ্যর্থনার আয়োজন করছে, আপনাব জন্য কর্মসূচী রচনা করছে, তখন শ্রীমতী গান্ধী শ্রীচন্দ্রকে জানিয়ে দিলেন যে, তিনি পশ্চিমবঙ্গে যাচ্ছেন শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের আমন্ত্রণে—কাজেই কার্যসূচী যা করবার, শ্রীরায়ই করবেন। এই হল সেই দিন ১১ই আগষ্ট রাত ও তার পরের ঐতিহাসিক ঘটনার নেপথ্য চিত্র।

৫ই সেপ্টেম্বর, '৬৯

যুক্তফ্রন্ট সরকার সমীপেষু

বিধানসভায় পুলিশী হামলা সম্পর্কে আর গুপ্ত কমিশনের রিপোর্ট ইতোমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। রাজ্য সরকার এখন পর্যন্ত ঐ রিপোর্ট সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নি। তদন্ত কমিশন গঠন করার সময় উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতি বসু একাধিকবার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন যে, দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কঠোরতম শাস্তি গ্রহণে তিনি দ্বিধা করবেন না।

রাজ্য মন্ত্রিসভা গুপ্ত কমিশনের রিপোর্ট বিবেচনা করে দেখবেন। আমরা বিধানসভায় পুলিশী হামলার অনেক আগে থেকেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে আমলাতন্ত্রের আসল ঘাঁটিগুলি সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলাম। পুলিশ বিভাগের বিশেষ বিশেষ কয়েকজনের নাম করে আমরা অভিযোগ করেছিলাম—রাতারাতি যুক্তফ্রন্টের এবং বিশেষ করে ফ্রন্টের বিশেষ কোনো শরিকের দরদী সেজে সামগ্রিকভাবে ফ্রন্ট সরকার এবং বিশেষভাবে উক্ত শরিককে অপ্রিয় করে তোলার কাজ তাঁরা নির্বিবাদে চালিয়ে যাচ্ছেন। ফ্রন্টের শরিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস সৃষ্টি করে ফ্রন্টের ভাবমূর্তিকে কলঙ্কিত করার জন্য তাঁরা অত্যন্ত সুচতুর পরিকল্পনা কার্যকরী করতে চাইছেন।

আর গুপ্ত কমিশনের রিপোর্ট আমাদের বক্তব্যকে জোরালো সমর্থন দিয়েছে। গুপ্ত কমিশনের তদন্তের এক্তিয়ার ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ বিশেষ একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে। তিনি পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী সহ ঐ দিনের ব্যাপারের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত বিষয়গুলো বিবেচনা করে তাঁর রিপোর্টে কয়েকজন অফিসারের বিরুদ্ধে মারাত্মক গাফিলতির চার্জ এনেছেন। পশ্চিমবাংলার জনসাধারণ আশা করছে দায়িত্বজ্ঞানহীনতা, কর্তব্যনিষ্ঠার অভাব, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে অক্ষমতা এবং সঠিকভাবে যে যে পদে তাঁরা আসীন আছেন সেই সব উচ্চাসন থেকে তাঁদের যে যে কাজ করার কথা, সেগুলো কার্যকরী করতে নিদারুণ ব্যর্থতার জন্য তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আমরা জানি, সংবিধানের ধারায় আমলাতন্ত্রের ঐ সব ক্যাডারদের রক্ষাকবচের ব্যবস্থা আছে। রাজ্য সরকারের হাতে এই সব অফিসারদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করার হাতিয়ার খুবই কম। আমি ইতোপূর্বে প্রেসিডেন্সী রেঞ্জের ডি আই জি এবং ডি আই জি আই বি সম্পর্কে সরকারকে সতর্ক করে দিয়েছিলাম। গুপ্ত কমিশনের রিপোর্টে এই দুজন অফিসারের ঘাড়ে সর্বাপেক্ষা বেশি দায় চাপানো হয়েছে। এই সব অফিসারকে গুপ্ত কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে দণ্ডদান করা সম্ভব কিনা জানি না। তবে এটুকু নিঃসন্দেহে বোঝা যায় যে, শুধু বদলী করলে এঁদের ক্ষান্ত করা যাবে না। বরং সচুতনতর পথে এঁরা সরকারকে বিব্রত করার পথ খোঁজার চেষ্টা করবেন। এই অবস্থায় এঁদের ভারতীয় দণ্ডবিধির কোন কোন ধারায় অভিযুক্ত করে বিচারালয়ে হাজির করা যায় কিনা রাজ্য সরকারকে আমরা সেই দিকটা ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। তা সম্ভব হলে বিচারকের রায় না বের হওয়া পর্যন্ত এঁদের সাসপেণ্ড করে রাখা যেতে পারে।

আমরা বরাবরই বলেছি নিচের তলার পুলিশবাহিনীর সাধারণ সদস্যরা দীর্ঘদিনের কায়েমীস্বার্থের পোষাক শাসনকাঠামোর মধ্যে থাকার ফলে যতটা দোষী, তার অতিরিক্ত দোষ তাদের ওপর দেওয়া যায় না। যে সব শ্রেণীর মানুষ যুক্তফ্রন্টের সমর্থক পুলিশবাহিনীর সাধারণ সদস্যরা সেই সব শ্রেণী থেকেই এসেছে। তাদের সম্পর্কে ফ্রন্ট সরকার এবং ফ্রন্টের অন্তর্ভুক্ত শরিক দলকে সহনশীলতা এবং ধৈর্য ধরে বোঝানোর মনোভাব গ্রহণ করতে হবে। বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যে সব উচ্চতর অফিসার দায়ী, তাদের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করলে নিচের তলায় শৃঙ্খলা স্বাভাবিকভাবেই ফিরে আসবে।

গুপ্ত কমিশনের আর একটি বক্তব্যের ওপর আমরা রাজ্য সরকারের এবং বিশেষ করে উপ-মুখ্যমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে একটার পর একটা চক্রান্ত চলেছে একথা ফ্রন্টের এবং ফ্রন্ট সরকারের প্রায় সব মুখপাত্রই একাধিকবার বলেছেন। বিগত ছমাসের ঘটনাবলীর দ্বারা তা প্রমাণিত-ও হয়েছে। বিধানসভায় পুলিশী হামলার ব্যাপারে একটা সুপরিকল্পিত চক্রান্তের অস্তিত্বের কথা গুপ্ত কমিশনের রিপোর্টে অস্বীকার করা হয় নি। বরং পুলিশবাহিনীর মধ্যে নানা কারণ থেকে সঞ্জাত বিক্ষোভের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ হিসেবে সেদিনের ঘটনাবলীকে কমিশন স্বীকৃতি দেন নি। সেদিনের ঘটনার পিছনে কোন সুপরিকল্পিত চক্রান্ত ছিল কিনা তা কমিশনের তদন্তভুক্ত ছিল না। তবু তিনি পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিচার-বিশ্লেষণ করে চক্রান্ত সম্পর্কে একটা ব্যাপক তদন্তের সুপারিশ করেছেন। আমরা মনে করি একদিকে কালবিলম্ব না করে সেদিনের ঘটনার ব্যাপারে গুপ্ত কমিশন যে সব অফিসারকে চূড়ান্ত ব্যর্থতার জন্য দায়ী করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করা, আর অন্যদিকে একটা ব্যাপক তদন্ত অনুষ্ঠান আজ রাজ্যের জনসাধারণের স্বার্থে একান্ত অপরিহার্য।

আমরা গভীর আশঙ্কার সঙ্গে লক্ষ্য করছি, ইতোমধ্যেই প্রভাবশালী মহল থেকে কয়েকজন অফিসার সম্পর্কে তদ্বির সুরু হয়ে গেছে। কোন কোন মহল গুপ্ত কমিশনের রিপোর্টকেও পক্ষপাতদুষ্ট বলে অভিহিত করার চেষ্টা করছেন। আমাদের বিশ্বাস আছে, ব্যক্তিগতভাবে উপ-মুখ্যমন্ত্রী এবং সামগ্রিকভাবে মন্ত্রিসভা এই সব প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ চাপের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারেন না।

এ সপ্তাহে বিদায় নেওয়ার আগে উপ-মুখ্যমন্ত্রীকে আর একটি বিষয়ে অভিনন্দন না জানিয়ে কৃতঘ্নতার দায়ে দোষী হতে হবে। দৈনিক বসুমতী ও সাপ্তাহিক বসুমতী গত কয়মাস ধরে উত্তর কলকাতার নারী-দেহ নিয়ে আন্তঃরাজ্য এক ব্যবসায়ী সম্পর্কে বার বার ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে। ঐ ব্যক্তি এবং তার কয়েকজন অনুচরকে ইতোমধ্যেই পি ডি এ্যাক্টে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। দ্রুততার সঙ্গে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে উপ-মুখ্যমন্ত্রীকে আর একবার আর একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। নারী-দেহ নিয়ে বেসাতি করার অন্যতম নায়ক খোকা গোঁসাইকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি এবং অফিসারের নাম জড়িত হয়ে পড়েছে। তাদের সম্পর্কে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। তাঁদের মধ্যে যাঁরা বিনা দোষে কলঙ্কভাজন হচ্ছেন, তাঁদের সেই কলঙ্ক থেকে মুক্ত করা এবং যাঁরা সত্য-সত্যই দোষী, তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার দায়িত্ব উপ-মুখ্যমন্ত্রীকে গ্রহণ করতে হবে।

—শ্রীসর্বদর্শী

অগ্নিযুগের একটি অধ্যায়

অনন্ত সিংহ

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

চূড়ান্ত সংঘর্ষ

অন্ধকারে গাছগাছালির আড়ালে আটজন সশস্ত্র বিপ্লবী আক্রমণ চালাবার পজিশানে প্রস্তুত। অদূরে আলো ঝলমল ক্লাবঘর। বাতাসের হিল্লোলে পিয়ানোর মধুর ঝঙ্কার। ইংরেজ নর-নারীর সান্ধ্য মিলনোৎসব নাচে গানে, সুরাসিক্ত প্রমোদ-কোলাহলে চট্টগ্রাম শহরের এই নিভৃত প্রান্তটি মুখরিত। কেবল আজই নয়—সুদীর্ঘ দিন ধরে এই ক্লাব-গৃহে ইংরেজ বড়কর্তাদের আনন্দের ব্যবস্থা। দু' শ' বছরের শাসন ও শোষণ বুনিয়াদের ওপর ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদী শাসককুলের বিলাস-ব্যসনের জন্যই এইসব ইউরোপীয়ান ক্লাবের অস্তিত্ব—এ যেন নিরন্ন দরিদ্র পরাধীন জাতির প্রতি এক নির্লজ্জ ব্যঙ্গ ও দাম্ভিক উপহাস।

প্রেম, ত্যাগ ও ক্ষমার দেশ আমাদের এই ভারতবর্ষ। বুদ্ধদেব, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রমুখ আমাদের ধর্মাবতারবৃন্দ সকলেই উদাত্তকণ্ঠে বার বার ঘোষণা করেছেন—'সর্বজীবে দয়া কর—আচণ্ডালে কোল দাও—অন্তরের বৈরিভাব ত্যাগ কর!' মহাত্মাজীর অহিংসা ধর্মও অনুরূপ কথাই বলে। এই প্রেমধর্ম, ক্ষমাধর্ম বা অহিংসাধর্মের প্রচার ভারতের পরাধীন দুর্বল জাতিকে আরও শক্তিহীন এবং আরও দুর্বল করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে সবলতার ও পরাক্রমশালী হতে সাহায্য করেছে।

সাম্রাজ্যবাদী শক্তির হিংসাত্মক প্রচণ্ড শাসন ও শোষণের কাছে যীশুখৃস্টের অমৃতময় শুভবাণী আত্মগোপন করাই শ্রেয় মনে করেছে। বুদ্ধদেবের "সর্বজীবে দয়া কর"—এই প্রেমের বাণী সাম্রাজ্যবাদী তাণ্ডবের কাছে আত্মসমর্পণে বাধ্য হয়েছে। ভারতের আধুনিক রাজনৈতিক যীশু—গান্ধীজীর অহিংসা নীতি সুশোভিত তে-রঙা ঝাণ্ডা সাম্রাজ্যবাদী মিলিটারী বুটের নিচে বার বার দলিত-নিষ্পেষিত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর স্বরূপ বুঝতে বিপ্লবীদের ভুল হয় নি। ভারতবাসী যতদিন বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য ও গান্ধীজীর প্রেম ও ক্ষমাধর্মে বিভোর থাকবে সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর পক্ষে ততই মঙ্গল—ততই তারা এই বিশাল ভারতভূমিকে পদানত রেখে নিজ স্বার্থ কায়েম করার উদ্দেশ্যে বিশাল সৈন্যবাহিনী রণসজ্জায় সজ্জিত করে তুলতে বেশি সময় ও সুযোগ পাবে। তাই গান্ধীজীর অহিংস নীতি ও শান্তির বাণী প্রচারে যীশুর বিশ্বপ্রেমের নামে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদী শক্তি বিশ্বের জনগণকে শান্ত ও ক্লীব করে রাখার প্রয়াস দেখতে পাই। এই সুযোগে তারা অ্যাটম বম তৈরি করবে, চন্দ্র-অভিযান সফল করে ফিরে আসবে অহিংসা ও প্রেমের পূজা করবার জন্য নয়—পরাধীন মানুষের "মঙ্গলের" জন্য—তাদের দাবিয়ে রেখে শোষণ করবার জন্য।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়—"চোরা কভু নাহি শোনে ধর্মের কাহিনী!" সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কাছে ধর্মের মন্ত্র, শান্তির বাণী সবই অর্থহীন—কেবল শান্তির মিথ্যা আবরণের সুযোগে তারা চায় আসুরিক শক্তির বৃদ্ধি ও বিস্তার। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এই চরিত্রের কথা ভুলে গেলে ধর্মপ্রাণ পাঠকবর্গের মনে হবে ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণ করে নির্দোষ ইংরেজ নর-নারীকে হত্যা করার নিষ্ঠুরতার যৌক্তিকতা কোথায়? সাম্রাজ্যবাদীর সমরশক্তি ও আসুরিক ক্ষমতার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার্থে ক্ষমাহীন রক্তাক্ত সংগ্রাম ছাড়া এই পরাধীন জাতির নিস্ব জনগণের আর কোন পথ নেই। "Extreme hatred towards enemy?"—শত্রুর প্রতি অপরিসীম ঘৃণার মনোভাবই এই পরাধীন অক্ষম জাতিকে সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণে সক্ষম করে তুলেছে। বিপ্লবীদের মানসিক প্রস্তুতির বিশেষ দিকটির পর্যালোচনা না হলে অগ্নিযুগের বিপ্লবীদের বৈপ্লবিক চরিত্রের প্রকৃত পরিচয় উপেক্ষিত হবে। বিপ্লবীদের

ক্লাবেরও সর্বসাধারণের মতই দয়া-মায়া-প্রেম-ভালোবাসার স্বাভাবিক উৎস বিদ্যমান। সেই স্বাভাবিক স্রোতে গা-ভাসিয়ে সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর উৎপীড়ন থেকে বাঁচা যায় না। অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিকে উৎখাত করবার জন্য নিজেদের Subjectively তৈরি করে তোলবার সাধনায় আত্মোৎসর্গ করেছেন। যাঁদের মন Subjectively প্রস্তুত হয়েছিল তাঁরাই ইংরেজ সরকারের প্রতিভূদের হত্যা করার কর্মসূচী নিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

আর বেশি দেরি নেই—জয়দ্রথ (দীনবন্ধু) আলো দেখিয়ে এখনই হয়ত সঙ্কেত দেবে। আটজন বিপ্লবী সৈনিক তাদের নিজের নিজের অস্ত্র-শস্ত্রাদি যথাযথভাবে যথাস্থানে আছে কিনা হাত বুলিয়ে দেখে নিল। এই আসন্ন আক্রমণের মুহূর্তগুলি তাদের বিচলিত করছিল—বিলম্ব তাদের উৎকণ্ঠা বাড়িয়ে দিচ্ছিল।

সময় হোল। নাচে গানে ক্লাব-গৃহ তখন মুখর। আলোর সঙ্কেত দেখা গেল। এবারে আর দ্বিধা করা চলবে না—বীরত্বের সঙ্গে এখনই ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। প্ল্যান অনুযায়ী তিনভাগে বিভক্ত হয়ে নির্দিষ্ট পথ ধরে ক্লাব-ঘরের দিকে দ্রুত পদক্ষেপে তারা এগিয়ে গেল। পূর্ব-দিকের মেইন-গেট দিয়ে প্রবেশ করলো প্রীতিলতা, শান্তি ও কালী। সুশীল ও মহেন্দ্র প্রবেশ করলো দক্ষিণের দরজা দিয়ে। উত্তরের বড় খোলা জানালায় পজিশান নিয়েছে বীরেশ্বর, পান্না ও পামা।

আন্দামান জেলে শান্তি, কালী ও সুশীল দে-র সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনায় এই আক্রমণের পুঙ্খানুপুঙ্খ বৃত্তান্ত জানবার সুযোগ পেয়েছি। প্রথম আক্রমণ বা "ফায়ার" কে করেছিল তা আমি তাদের কাছে জানতে চেয়েছিলাম। নিজের অভিজ্ঞতায় প্রথম আক্রমণ শুরু করার অর্থ বা বৈশিষ্ট্য কি তা জানতাম বলেই প্রশ্নটি করেছিলাম এবং উত্তর পেয়েছিলাম—"শান্তি চক্রবর্তী-ই প্রথম গিয়ে হাতবোমা নিক্ষেপ করে।" শান্তির নিক্ষিপ্ত বোমা ফাটা মাত্রই নিমেষের মধ্যে তিনদিক থেকে একই সঙ্গে হাতবোমা নিক্ষিপ্ত হয় এবং মুহুর্মুহু রিভলভার ও ম্যাস্কেট্রির গুলী চলে।

অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে ক্লাব-গৃহে মিলিত ইংরেজ নর-নারী সকলেই আত্মরক্ষার্থে মরিয়া হয়ে উঠলো। হাতের কাছে যে যা পেয়েছে—চায়ের কাপ, মদের বোতল, গ্লাস, ট্রে, চেয়ার প্রভৃতি ছুঁড়ে মারলো। হাতবোমার জোর শব্দ, রিভলভার-ম্যাস্কেট্রির অজস্র গুলীর আওয়াজ, চেয়ার ও মদের বোতল প্রভৃতি ছোড়াছুড়ি ও ঘন ধূম্রজাল এমনই একটা ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছিল যে, সেই সময় কতজন হত বা আহত হয়েছে বলা সম্ভব ছিল না। দরজা ও জানালার আড়ালে দাঁড়িয়ে আটজনের ক্ষুদ্র দলটি খুব ক্ষিপ্রতার সঙ্গেই আক্রমণ চালিয়েছিল। 'চারুবিকাশ দত্তের ও শ্রীআনন্দ গুপ্তের লেখা বইতে এই আক্রমণের বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁরা হয়ত এইরূপ আক্রমণের বাস্তবতা সম্বন্ধে সঠিক ধারণা করতে না পেরেই লিখেছেন যে, দুই পক্ষেই গুলীবিনিময় হয় ও প্রায় পনেরো মিনিট ধরে এই যুদ্ধ চলে।

ঝটিকাবেগে এইরূপ অতর্কিত আক্রমণ এক মিনিটের বেশি চলতেই পারে না। সকল দিকের নির্গমন পথ রুদ্ধ একটা ঘরের মধ্যে পঁচিশ-তিরিশজন ইংরেজ পুরুষ ও মহিলাকে বোমা, রিভলভার ও ম্যাস্কেট্রি নিয়ে আক্রমণ করলে, সেই আক্রমণের পরিণতিতে এক মিনিটের বেশি লাগতেই পারে না—এবং এই ক্ষেত্রে লাগেও নি। এক মিনিটের মধ্যেই যা' ঘটবার ঘটেছিল—কেউ মরলো, কেউ কেউ আহত হোল, আবার কেউ পালিয়ে প্রাণ বাঁচালো। আক্রমণ শেষ করে আমাদের বিপ্লবী দলটিও স্থান ত্যাগ করলো।

এই এক মিনিট আক্রমণ চলাকালে সবাই তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে নিজেদের ধার্য স্থান হতেই আক্রমণ চালিয়েছিল। সেই অবস্থায় সেই সময়ে নিজেদের কেউ আহত হয়েছে কিনা তারা জানতে পারে নি। ক্লাব-গৃহ ত্যাগ করে কিছুটা এগিয়ে গিয়ে তারা জানতে পারলো প্রীতিলতা আহত।

শান্তি, প্রীতিলতা ও কালী দে প্রথম থেকেই একসঙ্গে ছিল। এই অভিযানে অংশ গ্রহণের আগে থেকেই প্রীতিলতা যে স্বেচ্ছামৃত্যু বরণের অভিলাষ প্রকাশ করে আসছিল তা' পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। আলোর সঙ্কেতের পর ক্লাব অভিমুখে যাত্রাকালেও প্রীতি কালী দে-কে বলছিল—"কালীদা, আমি কিন্তু মরবই। আমি নিজের পটাশিয়াম-সায়ানাইডটুকু নিশ্চয়ই খাবো। কিন্তু কি জানি, তবু যদি প্রাণ যেতে দেরি হয় তবে আপনার ভাগের পটাশিয়ামটুকুও কিন্তু আমার মুখে দিয়ে দেবেন।" এই কথা কালী তখন শুনেছে বটে, কিন্তু খুব একটা আমল দেয় নি। মাস্টারদা, তারকেশ্বর ও বাকি সাতজন সাথী যদিও প্রীতিলতার এইরূপ স্বেচ্ছামৃত্যু বরণের সংকল্প জানতো তবু, শেষ পর্যন্ত যে প্রীতিলতা আত্মহত্যা করবেই—এটা তারা সঠিক বুঝতে পারেন নি। সকলেই ভেবেছিল অভিযান শেষ করে প্রীতিলতাও সকলের সঙ্গে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে।

ক্লাব-গৃহ থেকে পাহাড়তলী ওয়ার্কশপের ফটকের দূরত্ব প্রায় একশ' গজ। ওয়ার্কশপের ফটকের সামনে এসে প্রীতিলতা বসে পড়লো ও নিজের কাছে রক্ষিত পটাশিয়াম-সায়ানাইড গলাধঃকরণের পর সেইখানেই ঢলে পড়লো। দলের অন্যান্য সকলেই এগিয়ে গেছে—কেবলমাত্র কালী দে-কে পাশে দেখে প্রীতি বললো—"কালীদা, আমি চললাম।" প্রীতিলতার স্বেচ্ছামৃত্যুবরণ করাটা নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ছিল না। প্রীতিলতার কথা কালীর মনে ছিল। প্রীতিলতা তাকে বলেছিল—"আপনার ভাগের বিষটুকুও আমাকে দেবেন, আমি যেন কষ্ট না পাই।" প্রীতিলতাকে সেইরূপ মুমূর্ষু অবস্থায় দেখে কালী অস্থির হয়ে উঠলো এবং প্রীতির কথামত মৃত্যুকালে প্রীতির যাতে কষ্ট কম হয় সেই উদ্দেশ্যে নিজের জন্য রক্ষিত পটাশিয়ামটুকুও প্রীতির মুখে গুঁজে দিল।

ঘটনাটি পড়ে অবিশ্বাস্য ও নাটকীয় বলেই মনে হবে। কালী দে আজও সুস্থ শরীরে বর্তমান এবং তারই কথা হুবহু আমি এখানে লিপিবদ্ধ করলাম। পাঠকবর্গ হয়ত ভাবতে পারেন কালী দে নিজেই রংচং দিয়ে একটা গল্প

আপনার জন্য
বাড়ির সকলের জন্য
ব্রিটানিয়া
থিন
এরারুট
BRITANNIA
THIN
ARROWROOT
BISCUIT
BRITANNIA
THIN ARROWR
খেতে ভালো,
পুষ্টিকর—
সবাইকার
মনের মতো
ব্রিটানিয়া মানেই সেরা বিস্কুট

দাঁড়িয়েছে। এমন কি এই ক্লাব-গৃহ আক্রমণকারী কালী দে-র সাথীরাও হয়ত এই বিবরণ মিথ্যা বলে অভিহিত করতে পারে। কিন্তু আমার যতটুকু যুক্তি ও বিবেচনা-শক্তি আছে তার ওপর নির্ভর করে কালী দে-র এই বিবরণ আমি সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করি।

যে সকল সাথীদের কাছ থেকে এইসব তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, বিশেষ পদ্ধতি অনুসারে তাদের মূল্যায়ন করেছি: মাস্টারদা কাকে কতখানি বিশ্বাস করতেন, কার ওপর কতটুকু নির্ভর করতেন তার গুরুত্ব বুঝে এবং প্রত্যেকের সম্বন্ধে আমার নিজের অভিজ্ঞতা ও ক্ষমতা দিয়ে বিচার করে দেখেছি—কে কতখানি subjective বা objective বিবরণ।

কালী দে ১৮ই এপ্রিল যুব-বিদ্রোহে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে এবং জালালাবাদ রণাঙ্গনে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে—ফেরারী অবস্থায় "ডিনামাইট ষড়যন্ত্রে" লিপ্ত হয় এবং পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণকল্পে দুবারই যোগ দেয়। বিশেষ লক্ষ্য করবার কথা হোল—মাস্টারদা সেই আক্রমণে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে প্রীতিলতার হাতে একটি ও কালীর হাতে একটি রিভলভার দিয়েছিলেন। এইসব data আমার বিবেচনার বিষয় এবং কালী দে-র মিথ্যা অত্যুক্তি করার অভ্যাস আছে কিনা তাও আমার হিসেবের মধ্যে ধরে নিয়ে আমার অভিমত প্রকাশ করলাম। প্রীতিলতার মুখে কালী যে বিষটুকু গুঁজে দিয়েছিল, সে বিবরণ নাটকীয় ও অবিশ্বাস্য হলেও আমি তা' মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি। বিপ্লবীদের জীবনে এইরূপ নাটকীয় ঘটনা যদিও অদ্ভুত ও অবিশ্বাস্য, তবু তা' বাস্তব সত্য।

পরের দিন সকালে এই চাঞ্চল্যকর ঘটনা সারা বাংলা ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন সংবাদপত্রে বড় বড় শিরোনামায় প্রকাশিত হোল। অব্যাহত ও প্রচণ্ড সামরিক শাসনের মধ্যে পুলিশ ও মিলিটারীকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে এইরূপ একটি সশস্ত্র আক্রমণ কিরূপে সংঘটিত হোল তার জন্য প্রতিটি সংবাদপত্র বিস্ময় প্রকাশ করে। চট্টগ্রামে "দৈনিক পাঞ্চজন্যে" নিম্নলিখিত বিবরণটি প্রকাশিত হয়—

"২৪-৯-৩২ তারিখে রাত্রিতে পাহাড়তলী-ক্লাব আক্রান্ত হয়। সেখানে তখন whist drive খেলা চলিতেছিল। প্রায় ৪০ জন মহিলা ও পুরুষ উপস্থিত ছিল। রাত্রি দশ ঘটিকার সময় ঘরের মধ্যে হঠাৎ একটা বিস্ফোরণ হইয়া ধূম্রাচ্ছন্ন হয়। ঘরের বারান্দা ও অন্যান্য দিক হইতে গুলী বর্ষিত হইতে থাকে। মিসেস সলিভান্ হত ও ১১ জন আহত হয়; বিদ্রোহীরা পলায়ন করে।

"কিছু দূরে পুরুষ বেশে সজ্জিতা একজন রমণীর মৃতদেহ পাওয়া যায়। এই রমণী প্রীতিলতা বলিয়া সনাক্ত হইয়াছে। ডাক্তার ক্যাপ্টেন সেনগুপ্ত প্রমাণ করিয়াছেন যে, তাহার কয়েকটি আঘাত সাংঘাতিক এবং অনেকগুলি গুরুতর। তিনি প্রীতিলতা 'সাইনেড অব পটাশিয়াম' যোগে আত্মহত্যা করিয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন।......তাহার পোষাকের মধ্যে যে ঘোষণাপত্র পাওয়া যায় তাহাতে সে লিখিয়াছে যে ১৮।৪।৩০ তারিখের সংগ্রামের অনুসরণেই এই সংগ্রাম করা হয়। ('The raid was an act of war undertaken in continuation of the fight of 18.4.30.').

"সেই দিনই চারি রকমের বিপ্লব সমর্থক ইস্তাহার চট্টগ্রামে বিলি করা হয়; তাহাতে শিক্ষক, ছাত্র ও জনসাধারণকে ইংরেজ শাসন ও ইউরোপীয়ানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিতে আহ্বান করা হয়।"—('পাঞ্চজন্য' থেকে উদ্ধৃত)।

পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাব আক্রমণের মত একটি বিরাট পরিকল্পনায় সাফল্য সরকারকে বিচলিত করে তুললো। অবিশ্বাস্য তৎপরতায় আক্রমণ চালিয়ে নিমেষের মধ্যে দলের সকলে উধাও হওয়াতে পুলিশ কর্তৃপক্ষ আরও বেশি সচকিত ও শঙ্কিত হয়ে উঠলেন। প্রীতিলতার মৃতদেহ পাহাড়তলী ওয়ার্কশপের ফটকে রেখে পূর্ব নির্ধারিত পথ ধরে দুটি ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে আক্রমণকারীরা কাট্টলীতে প্রফুল্ল দাসের আশ্রয়স্থলে উপস্থিত হয়। অস্ত্রাদি সমস্তই প্রফুল্ল দাস নিজের হেফাজতে রাখে। পান্না ও বীরেশ্বর শহরে ফিরে যায়। কালী, সুশীল, শান্তি ও মহেন্দ্র পতেঙ্গার নদী-ঘাট হ'তে নৌকাযোগে মাস্টারদা ও তারকেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে পূর্ব নির্ধারিত "বন্দর" নামক স্থানে উপস্থিত হয়।

মাস্টারদা ঘটনার পূর্ণ বিবরণ শুনে তাদের কৃতকার্যতার জন্য অত্যন্ত খুশি হলেন। এই আক্রমণে ব্যবহৃত হাতবোমাগুলি striker-যুক্ত ছিল—তবে, আমরা আগে যেসব striker-যুক্ত বোমা ব্যবহার করেছি তা' থেকে এগুলি বেশি স্বয়ংক্রিয় ছিল। প্রত্যেকটি বোমা কার্যকরীভাবে বিস্ফোরিত হয় বলে তারকেশ্বরকে মাস্টারদা অভি-করে নিলেন।

এই অভিযানে সকলেই জয়ের আনন্দ উপভোগ করেছিল সত্য, কিন্তু অকালে প্রীতিলতার ঐরূপ স্বেচ্ছামৃত্যু তাদের সবার মনকে বেদনাতুর করে তুলেছিল। প্রীতিলতার মত বিপ্লবী কর্মীকে হারানো সংগঠনের অপূরণীয় ক্ষতি। ধীর শান্তভাবেই মাস্টারদা এই অপূরণীয় ক্ষতি স্বীকার করে নিলেন।

এই ঘটনার পরে পুলিশ ও মিলিটারী আরও তৎপর হয়ে উঠলো। সরকার মাস্টারদাকে ধরার জন্য পুরস্কারের টাকার অঙ্ক আরও বাড়িয়ে দিলেন। ক্লাব আক্রমণের পরে যেসব ইস্তাহার বিলি করা হয়েছিল, তা'তে ইংরেজ কর্মচারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেওয়ার সংকল্প ঘোষিত হয়। প্রীতিলতার সঙ্গে সেইরূপ ঘোষণার একটি অনুলিপি পুলিশ পেয়েছিল। সেই অনুলিপির কিয়দংশ চট্টগ্রামের দৈনিক সংবাদপত্র 'পাঞ্চজন্যে' প্রকাশিত হয়েছিল। যথা—

"সেই মহান নেতা (মাস্টারদা), যখন আমায় উক্ত আক্রমণের নেতৃত্বভার নিতে বলেন তখন আমি সঙ্কুচিত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম এত উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ ভাইরা থাকতে আমার মত একজন সামান্য বোনকে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া হোচ্ছে কেন? কিন্তু মাস্টারদার অখণ্ডনীয় যুক্তি শুনে আমি বিষয়টি ভাল করে উপলব্ধি করি। আমি তাঁর আদেশ শিরোধার্য করে সর্বময় ঈশ্বররূপে যাঁকে শৈশব থেকেই ভক্তি করে এসেছি—তাঁর কাছে আশীর্বাদ প্রার্থনা করলাম যেন

হো চি মিন-এর কবিতা

[এক আশ্চর্য তন্ময়তায় এই অমল কবির প্রতিটি কবিতা আমাদের মনুষ্যত্ববোধ-কে গভীরে আকর্ষণ করে। বন্দী জীবনের সমস্ত অন্ধকার যন্ত্রণা ও ক্লান্তিকে অতিক্রম ক'রে তারা ক্রমশই আলোর দিকে অগ্রসর হয় এবং এমন এক প্রতিরোধের সংগ্রাম আমাদের চেতনায় নিয়ে আসে যা কখনই সোচ্চার নয়, কিন্তু ভিয়েতনামের যুদ্ধের মতই যা অপরাজেয়। স্বল্পবাক, সংযত মানুষটির মত তাঁর কবিতাও সর্বপ্রকার অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে শান্ত, স্থির প্রতিবাদ।—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

জেলখানার ডায়েরী : ভূমিকা

দেহ কারাগারে বন্দী
মন পলাতক বাইরে বাঁধন-মুক্ত এ
যা কিছু মহৎ তারই বাস্তব রূপায়ণে চাই আত্মার
প্রসারতা আর ঠাণ্ডা মাথার ধৈর্য।

আশ্বিনের আগমনী
(অংশ)

রাত দশটায় পাহাড় চূড়ায় সমাসীন কালপুরুষ
ঝিঁঝিঁদের গান কাঁপে ও কোরাসে রচে আশ্বিন-স্তোত্র।

বাইরে ঋতুর পরিবর্তনে কিবা আসে যায় বন্দীর
সে শুধু একটি স্বপ্নই দেখে, কোনদিন হবে মুক্ত।

জাগ্রত ভিয়েতনাম

বরং মৃত্যু ভাল দাসত্বের চেয়ে। আমার স্বদেশে ঘরে ঘরে
লালে লাল পতাকারা আবার ঊর্ধ্বে উড়ছে।
হায়! এ সময়ে জেলখানায় বন্দী হ'য়ে দিন কাটানো!
কবে মুক্তি পাবো, কবে ঝাঁপিয়ে পড়বো যুদ্ধে?

অনুবাদ : বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অভিযান

ওরা আমার হাতে-পায়ে পরিয়েছিল লোহার শিকল
বন্দী করে আমাকে কি করবে বিকল?

পাহাড়পথে হাঁটার সময়
নিশ্চিন্তেই কিন্তু শুনি পাখির গান
আবার দেখি, অরণ্য তার গভীরতায়
কী মমতায়
ধরেছে তার
বসন্তের এ রঙবাহার।

তখন ওরা বুঝেছে কি
এই একজন
মানুষ এখন
বন্দী নয়—মুক্ত প্রাণ।

অনুবাদ : অমিয়কুমার হাটি

এসো সুরু করি

সুখ ছোঁয়া মিষ্টি হাওয়ায়,
ভেসে বেড়ায় বীণার মূর্চ্ছনা
চার দেওয়ালে আঁটা ঘরে
ধবধবে জ্যোৎস্না রাত
তরুণী নর্তকী হয়ে
হলুদ বন মাতিয়ে তোলে।
শিশির পড়ে, চৈতি বটের পাতা নড়ে।
ঝাউ কামিনীর গাছের মাঝে,
জোনাকীরা দেখায় পথ;
আর স্বপ্নের নদীটা তোলে ছন্দ।

তখনই কেমন মনে হয়,
রাতটাকে বড় বিষণ্ণ-রুগ্ন।
যেন পুত্রহারা উদ্বাস্তু বিধবা, অথবা
লাঞ্ছিতা যুবতীর মত শব্দহীন।

যার থাওয়া বোবায় ধরা দুঃখগুলো
হটিয়ে দেব অনেক দূরে, সূর্যের বজ্রাস্ত্র সংগ্রামে।
লড়াই—লড়াই, আজ শুধু বাঁচার লড়াই
রাইফেল, মর্টার এবং বারুদের বিস্ফোরণ।

অনুবাদ : ময়ূখ বসু

সসম্মানে অর্পিত দায়িত্ব পালন করতে পারি।......পুরুষরা যা পারে নারীরা তা পারবে না কেন? নারীসমাজ আজ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে তারা আর পুরুষদের পশ্চাতে পড়ে থাকবে না।............

"চট্টগ্রাম বিপ্লবীরা স্মরণীয় ১৮ই এপ্রিলে এবং তৎপরে জালালাবাদে, মাহমিরপুরে (কালার পোল) ফেণীতে, চন্দননগরে, চাঁদপুরে, ঢাকায়, কুমিল্লায় ও ধলঘাটে যে অপূর্ব বীরত্ব প্রদর্শন করেছে তাতে কেবল বাংলায় নয় সমগ্র ভারতের যুবকদের কল্পনা আকৃষ্ট হয়েছে। আমরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছি। আজকের সংগ্রামও তারই একটি অংগ।"

'পাঞ্চজন্য' পত্রিকায় আরও কিছু কিছু সংবাদ তখন পরিবেশিত হয়। প্রীতিলতার মৃতদেহের সঙ্গে পুলিশ যেসব জিনিস পেয়েছিল তার একটি তালিকাও 'পাঞ্চজন্য' কাগজে ছাপানো হয়—"প্রীতিলতার সংগে পাওয়া গিয়াছে (১) রামকৃষ্ণ বিশ্বাসের তিনটি ফটো (২) ছয় কপি ইণ্ডিয়ান রিপাব্লিক আর্মির নোটিশ (৩) পাহাড়তলী-ক্লাবের প্ল্যান (৪) শ্রীকৃষ্ণের একটি ফটো (৫) একটি চামড়ার বেল্ট (৬) তিনটি কার্তুজ (৭) একটি whistle (৮) তিনটি রিবন (৯) তাহার স্বহস্তে লিখিত একটি বর্ণনা।" —('পাঞ্চজন্য' থেকে উদ্ধৃত)।

[ক্রমশ]

হো চি মিনের মৃত্যু নেই

সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার

মানুষ হো চি মিনের জীবনের দীপ নিভে গিয়েছে প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব, কর্ম ও আদর্শ চির-ভাস্বর ধ্রুবতারার মতই মানবতার ইতিহাসে দিগন্ত নির্দেশ করবে।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন সরল, অনাড়ম্বর, নিরহঙ্কার, মানুষের প্রতি অসীম ভালবাসায় পরিপূর্ণ কুসুম-কোমল হৃদয় অথচ কর্তব্যে বজ্রকঠিন, সঙ্কল্পে হিমালয়ের মতই অটল। সংবেদনশীল কবিমন তাঁকে টেনে এনেছে মাতৃভূমির দাসত্বশৃঙ্খল মোচনের জন্য সংগ্রামের রক্তস্নাত রণক্ষেত্রে। বিজ্ঞান-সম্মত ইতিহাসদৃষ্টি তাঁর সামনে সেই সংগ্রামের যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতকে উদ্ভাসিত করে তুলেছে। তাঁর জীবনে ঘটেছে জ্ঞান ও কর্মের, মানবিকতা ও বিপ্লবীর ক্ষমাহীন দুর্জয় সঙ্কল্পের অপূর্ব সমন্বয়। আধুনিক কালের ইতিহাসে এরূপ সমন্বিত ব্যক্তিত্বের তুলনা বোধ হয় একমাত্র মহান লেনিনের সঙ্গেই করা চলে।

লেনিনের শিক্ষার আলোকে তিনি উপলব্ধি করেছেন যে, উপনিবেশবাদ-সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদের সংগ্রাম একই অচ্ছেদ্য সূত্রে গাঁথা। সে সংগ্রামের চরিত্র যুগপৎ জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক। নিজ জাতির জনগণের সর্বাঙ্গীণ মুক্তির জন্যই চাই বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত সমস্ত শক্তির সুদৃঢ় আন্তর্জাতিক সংহতি। সেই উপলব্ধি নিয়েই ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের পদানত ইন্দোচীনের এই মানুষটি ফ্রান্সে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, চীনের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সৈনিকরূপে অংশ নিয়েছেন, যোগ দিয়েছেন চীনের লালফৌজের 'লং মার্চে', কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের অধিবেশনে সমস্ত ঔপনিবেশিক ও পরাধীন দেশের জনগণের মুক্তি সংগ্রামের প্রবক্তারূপে স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নিজ দেশের মুক্তি সংগ্রামে জনগণকে তিনি ঐ আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে বৃহত্তম ঐক্য গড়ে তোলায় যে আশ্চর্য সাফল্য অর্জন করেছেন সে কাহিনী সুবিদিত। সচেতন জনগণের ঐক্যবদ্ধ শক্তির সামনে মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত সাম্রাজ্যবাদের দম্ভ কিভাবে ধুলায় লুটিয়ে পড়ে, সেই ইতিহাসে বিগত দুই দশক ধরে একটির পর একটি প্রদীপ্ত অধ্যায় রচনা করেছে ভিয়েতনামের মানুষ, হো চি মিনেরই নেতৃত্বে। একদিকে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন অন্যদিকে সমসাময়িক পরিস্থিতি সম্বন্ধে প্রখর বাস্তব-সম্মত বিশ্লেষণ, পর্বতপ্রমাণ বাধা বিপত্তির সামনে অসীম ধৈর্যের সঙ্গে রণ-কৌশল উদ্ভাবন। ঐগুলির সমন্বয়ে তিনি বিগত দুই দশক ধরে ভিয়েতনামকে গড়ে তুলেছেন নয়া-উপনিবেশবাদের হিংস্র আগ্রাসী পরিকল্পনার বিরুদ্ধে প্রতিরোধের অগ্রগামী রণক্ষেত্র-রূপে। হো চি মিনের ভিয়েতনাম ত' শুধু নিজের জন্যই সংগ্রাম করছে না। সারা বিশ্বকে নতুনভাবে দাসত্বের নাগপাশে আবদ্ধ করার জন্য বিশ্ব-সাম্রাজ্যবাদের জঘন্যতম ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে ভিয়েতনাম। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসী রণনীতির বিরুদ্ধে ভিয়েতনাম অপরাজেয় ব্যূহ রচনা করেছে।

তাই ভিয়েতনামের লড়াই আমাদের লড়াই, এশিয়া ও আফ্রিকার সদ্য স্বাধীন দেশগুলির লড়াই, এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার যে সব দেশ এখনও পরাধীন তাদের লড়াই। আর সেই জন্যই হো চি মিন শুধু একটি নাম বা একজন মানুষ নন—তিনি হয়ে দাঁড়িয়েছেন সেই সাধারণ সংগ্রামের জ্যোতির্ময় প্রতীক।

হো চি মিনের কর্মময় জীবনের কাহিনী আজ সারা বিশ্বে সুপরিচিত। কিন্তু তাঁকে আরো গভীর, আরো অন্তরঙ্গভাবে জানা যায় তাঁর রচনার মাধ্যমে। তাঁর রচনাবলীর মাত্র প্রথম খণ্ড ইংরাজীতে প্রকাশিত হয়েছে বলে জানি। তবু তার মধ্য দিয়েই হো চি মিনের ব্যক্তিত্বের কয়েকটি দিক আমাদের সামনে অনেক বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

প্রথমত দেখি, বহু বাস্তব ঘটনা ও তথ্যের সাহায্যে তিনি ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের সভ্য মুখোশ ছিঁড়ে ফেলে তার বর্বর হিংস্র রূপটিকে অনাবৃত করে তুলে ধরেছেন। আমরা যারা ব্রিটিশের গোলামীর মর্মবেদনা প্রতিদিনের বহু ছোট-বড় ঘটনার মধ্য দিয়ে অনুভব করেছি তাদের মনে হবে যে, আমাদেরই দেশের অতীত ইতিহাসের কয়েকটি পৃষ্ঠা যেন জীবন্ত হয়ে উঠেছে তাঁর স্বল্প-পরিসর প্রবন্ধগুলিতে। উপনিবেশ-বাদীদের বর্বরতার ব্যক্তিগত ও সামগ্রিক দৃষ্টান্ত এবং বিশ্বের সামনে তাদের নির্লজ্জ কপটতাপূর্ণ মিথ্যা প্রচারের মুখোশ উন্মোচনকারী ঐ রচনাগুলি সংগ্রামী সাংবাদিকতার এক-একটি উজ্জ্বল উদাহরণ।

দ্বিতীয়ত দেখি, উপনিবেশবাদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে এবং ঔপনিবেশিক জনগণের মুক্তি সংগ্রামের সমর্থনে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির দিগন্তজোড়া ব্যাপ্তি। শুধু ইন্দোচীন বা ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের অধীন দেশই নয়, সমস্ত পরাধীন দেশের ঘটনাবলী সম্বন্ধে হো চি মিনের আগ্রহ ছিল অসীম। ১৯২২—২৬ সালের মধ্যবর্তী সময়ে লিখিত প্রবন্ধগুলিতে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশের জনগণের দুর্দশা এবং সংগ্রামের তথ্যভিত্তিক বিবরণ রয়েছে। এই প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে লোভ হচ্ছে। প্রবন্ধটির শিরোনামা "রুল ব্রিটানিয়া"—চায়না, ইণ্ডিয়া, দি সুদান"। ভারতের ঘটনার উল্লেখে সময়ের দিক দিয়ে কিছু ভুল আছে ঠিকই—তখনকার অবস্থায় ভারতের ঘটনা সম্বন্ধে সঠিক তথ্য পাওয়া কোন বিদেশীর পক্ষে ছিল খুব কঠিন। কিন্তু মূল লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ১৯২৪-২৫ সালে ভারতের বুকে ব্রিটিশ দমননীতির যে তাণ্ডব নতুন করে শুরু হয় এবং বিনা বিচারে আটক আইনে সুভাষচন্দ্র প্রমুখ বহু রাজনৈতিক বন্দী কারারুদ্ধ হন, তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে এই সংগ্রামী মানুষটির কণ্ঠে।

তৃতীয়ত দেখি, ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি যে নিজ দেশের শ্রমিক আন্দোলন দমনের জন্য উপনিবেশগুলি থেকে সংগৃহীত ভাড়াটে শ্রমিক ও সৈন্য

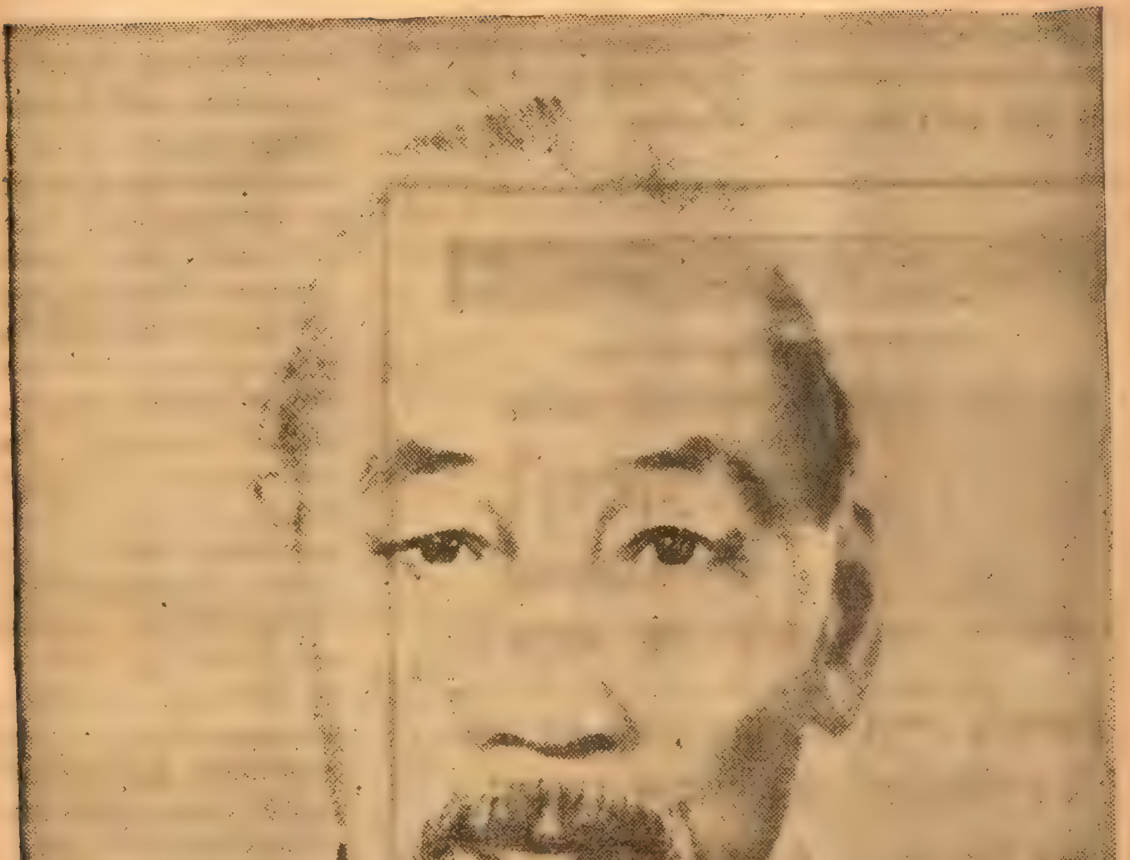

হো চি মিন

ব্যবহারে দ্বিধা করে না, সেই নীতির স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে বহু তথ্যের সাহায্যে বেশ কয়েকটি প্রবন্ধে। যে উপনিবেশবাদীরা শ্বেতকায়দের শ্রেষ্ঠত্বের তত্ত্ব প্রচার করে তারাই নিজ দেশের সাদা চামড়ার শ্রমিকদের বিরুদ্ধে কালা-বাদামী-পীত গাত্রবর্ণের শ্রমিকদের ও সৈনিকদের হাতিয়ার রূপে ব্যবহার করে, সাদা চামড়ার সৈন্যদল বিদ্রোহী হলে কৃষ্ণকায় সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে বিদ্রোহ দমন করে। এই সব ঘটনা অত্যন্ত সাদাসিধে অথচ তীক্ষ্ণভাবে তুলে ধরে হো চি মিন সাম্রাজ্যবাদী দেশের শ্রমজীবী মানুষ এবং পরাধীন দেশের জনগণকে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ হতে আহবান জানিয়েছেন।

বর্তমান বঙ্গসাহিত্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় লেখিকা

আশাপূর্ণা দেবীর
গ্রন্থাবলী
আবার একখণ্ড
প্রকাশিত হয়েছে!

তিনখানি সম্পূর্ণ উপন্যাস। সাতটি বড় গল্প

১। বলয়গ্রাস ২। প্রেম ও প্রয়োজন
৩। দুর্নিবার ৪। এক গুচ্ছ গল্প

মূল্য মাত্র সাড়ে ছয় টাকা

আগেই বেরিয়েছে আর এক খণ্ড

গ্র ন্থা ব লী

১। জহুরী ২। অনির্বাণ
৩। সোনালী দিনের মন
৪। এক গুচ্ছ গল্প

মূল্য মাত্র পাঁচ টাকা

বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ
কলিকাতা-১২

দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের সোস্যাল-ডেমোক্রেটিক নেতারা ঔপনিবেশিক জনগণের প্রতি মৌখিক সহানুভূতি জানিয়েই ক্ষান্ত থাকত। সাম্রাজ্যবাদী দেশের শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে জাতিশ্রেষ্ঠত্ব, জাতি-বিদ্বেষ, অশ্বেতকায় জনগণের প্রতি অবজ্ঞার মনোভাব ইত্যাদি বিষাক্ত ধারণার অস্তিত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ত' দূরে থাকুক, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের নেতারা বরং তাতে সহায়তা করত। স্বভাবতই একটি পরাধীন দেশের মুক্তিসৈনিক হিসাবে হো চি মিনের মনে লেনিনের সর্বহারার আন্তর্জাতিকতার নীতি বিরাট আবেদন সৃষ্টি করে। ফ্রান্সের নবগঠিত কমিউনিস্ট পার্টির সভ্য থাকাকালে এবং কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশানালের কংগ্রেসে তিনি লেনিনীয় আন্তর্জাতিকতার সমর্থনে আপোষহীনভাবে দাঁড়ান। কোন দেশের, বিশেষত সাম্রাজ্যবাদী দেশের কমিউনিস্ট পার্টির আচরণে জাতিশ্রেষ্ঠত্ব তথা উগ্রজাতীয়তাবাদের অভিব্যক্তি দেখা গেলে তিনি তার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন ক্ষমাহীনভাবে। ঐসব পার্টি যদি ঔপনিবেশিক অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে এতটুকু দ্বিধা বা উপনিবেশের জনগণের সংগ্রামের সমর্থনে দাঁড়াতে কুণ্ঠা প্রকাশ করেছে, তখনই হো চি মিন নির্মমভাবে সেই দুর্বলতার সমালোচনা করেছেন।

জয়যুক্ত সমাজতন্ত্রের দেশ সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক শিবির, পুঁজিবাদী দেশগুলির বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলন এবং ঔপনিবেশিক দেশগুলির জাতীয় মুক্তি আন্দোলন—এই তিন শক্তির অচ্ছেদ্য মৈত্রীর লেনিনীয় নীতিকে তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অবিচলভাবে আঁকড়ে ধরে থেকেছেন। সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিশ্ব-কমিউনিস্ট আন্দোলনের ভাঙন ইত্যাদি সত্ত্বেও হো চি মিনের ভিয়েতনাম ঐ তিন শক্তির মৈত্রীর অপরাজেয় দুর্গের ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

লেনিনের মৃত্যুর পর যে কথাগুলি দিয়ে হো চি মিন তাঁর প্রবন্ধ শেষ করেছিলেন তাকেই একটু বদলে নিয়ে শ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিবেদন করি—

চিরন্তন হো চি মিন চিরকাল বেঁচে রইবেন আমাদেরই কর্মের মধ্যে।

আমার দেখা হো চি মিন

সুনীল ঘোষ

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

১৯৪৬ সালের মে মাসে এক উষ্ণ মধ্যাহ্নে কম্যুনিস্ট পার্টির মুখপত্র 'স্বাধীনতা' অফিস থেকে দৈনিক বসুমতীর তৎকালীন বার্তা সম্পাদক স্বর্গত হরকিঙ্কর ভট্টাচার্য একটি টেলিফোন বার্তা পান : "ইন্দোচীন মুক্তিযুদ্ধের বিপ্লবী নায়ক হো চি মিন কলকাতায় এসেছেন। আধ ঘণ্টার মধ্যে তিনি "স্বাধীনতা" অফিস পরিদর্শন করবেন। আপনারা যদি কেউ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান, তাহলে চলে আসুন।" হো চি মিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভের এই অপ্রত্যাশিত আমন্ত্রণ পেয়ে বসুমতীর সাংবাদিকরা আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন এবং তৎক্ষণাৎ আমরা সদলবলে স্বাধীনতা অফিস অভিমুখে রওনা হয়ে গেলাম।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৬ সালের ভারতবর্ষ মুক্তি আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গে থরো থরো। আজাদ হিন্দ সৈনিকদের বিচার, নৌবিদ্রোহ এবং দেশব্যাপী গণজাগরণের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ এবং জাপানী ফ্যাসিস্টদের হাত থেকে সদ্যমুক্ত ইন্দোচীনের বিপ্লবী জননায়ক হো চি মিন তখন আমাদের কাছে মস্ত লিজেন্ড। যে দুর্ধর্ষ জাপানী ফ্যাসিস্টবাহিনীকে দমন করবার জন্য আমেরিকা হিরোসিমা-নাগাসাকিতে প্রথম পারমাণবিক বোমা ফাটিয়ে লক্ষ লক্ষ নরনারী শিশুর অকালমৃত্যু ডেকে এনেছে, হো চি মিন সেই জাপ-বাহিনীর বিরুদ্ধে শুধু হাতে লড়াই করে ইন্দোচীনের পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করেছেন। তাঁর সেই ঐতিহাসিক বীরত্ব পৃথিবীর সমস্ত পরাধীন জাতিকে নতুন সংগ্রামের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত করেছে। তিনি প্রমাণ করেছেন, শত্রু যতই শক্তিশালী হোক, মুক্তিকামী মানুষের দৃঢ় সঙ্কল্পের সামনে সেই শক্তি একেবারেই তুচ্ছ। নইলে তিন কোটি মানুষের পশ্চাৎপদ দেশ ইন্দোচীন প্রবল পরাক্রান্ত ফরাসী এবং জাপ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে নিজের স্বাধীনতা আদায় করতে পারত না।

সুতরাং ইতিহাসের সেই বীর নায়ক হো চি মিনের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ ছাড়া যে আমাদের পক্ষে আদৌ সম্ভব ছিল না, সে কথা বলাই বাহুল্য।

স্বাধীনতা অফিসে গিয়ে আমরা দেখলাম হো চি মিন তখনও আসেন নি। তাঁকে অভ্যর্থনা করবার জন্য মুজাফ্ফর আহমদ, পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী এবং অন্যান্য কম্যুনিস্ট নেতারা (সকলের নাম মনে পড়ছে না) অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। বার্তা বিভাগে একটি ছোট টেবিলের চারপাশে কয়েকটি চেয়ার সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং সেই টেবিলের ওপর একটা গোলাপের মালা।

শুনলাম, ইন্দোচীনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ফরাসী গভর্নমেন্টের সঙ্গে আলোচনা করবার জন্য হো চি মিন প্যারিস যাচ্ছেন। যানবাহনের অসুবিধায় একদিনের জন্য তাঁকে কলকাতায় থাকতে হয়েছে। তিনি উঠেছেন গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে। কলকাতায় তাঁর অবস্থান আকস্মিক বলে এখানকার লোকেরা সে সংবাদ জানতে পারে নি। হো চি মিন নিজেই কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ করে স্বাধীনতা অফিস দেখতে আসছেন।

তখন এদেশে ইংরাজ শাসন কায়েম ছিল। তাঁরা হো চি মিনের আগমন সংবাদ জানা সত্ত্বেও সেটা গোপন করে রেখেছিলেন। মার্কিন সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান এ-পি-এ হো চি মিনের গতিবিধির সংবাদ রাখতেন তাঁদের তৎকালীন প্রতিনিধি শ্রীখগেন দেসরকার (বর্তমানে আনন্দবাজারের দিল্লীস্থিত প্রতিনিধি) সংবাদ পেয়ে সকালেই গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে গিয়ে হো চি মিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তার বিবরণী সারা দুনিয়ায় প্রচার করেছিলেন। যতদূর মনে পড়ছে, খগেনবাবুর মাধ্যমেই বোধ হয় মুজাফ্ফর আহমদের সঙ্গে হো চি মিনের যোগাযোগ সম্ভব হয়েছিল।

তখন স্বাধীনতা অফিস ছিল ডেকার্স লেনে। সেখান থেকে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের দূরত্ব সামান্যই। আমরা হো চি মিনকে স্বাগত জানাবার জন্য রাস্তায় নেমে এলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই দেখা গেল একজন লম্বা-চওড়া মুণ্ডিত মস্তক ফরাসী যুবকের সঙ্গে অতি সাধারণ গোল প্যান্ট ছোট কোট পরা, ঋজুদেহ ছাগশ্মশ্রু হো চি মিন গল্প করতে করতে পায়ে পায়ে স্বাধীনতা অফিসের দিকে এগিয়ে আসছেন। বন্ধুবর মনোরঞ্জন হাজরা আমায় স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, সেই সময় হো'র পায়ে ছিল মোটর টায়ারে তৈরি একজোড়া চপ্পল।

এরকম চোখের সামনে এত কাছাকাছি তাঁকে প্রথম দেখতে পেয়ে আমার শরীরের ভেতর দিয়ে যেন এক ঝলক বিদ্যুৎ বয়ে গেল। আমরা দু' হাত তুলে তাঁকে আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম। তিনি হাসিমুখে আমাদের প্রত্যেকের হাত চেপে ধরে আলিঙ্গন করলেন।

ফ্রান্সে তখন যুদ্ধোত্তর প্রথম সাধারণ নির্বাচন হচ্ছিল। রয়টারের টেলিপ্রিণ্টারে সকাল থেকে একনাগাড়ে তারই সংবাদ আসছিল। দোতলায় উঠে হো চি মিন আগেই নির্বাচনের ফলাফল জানতে চাইলেন। তারপর বহুক্ষণ টেলিপ্রিণ্টারের সামনে দাঁড়িয়ে নির্বাচনের সংবাদ লক্ষ্য করলেন। শেষে এসে বসলেন টেবিলের সামনে। মুজাফ্ফর সাহেব তাঁর গলায় মালা পরিয়ে উপস্থিত সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

হো চি মিন বহু ভাষাবিদ। তবে ফরাসী ভাষায় তাঁর দখল বেশি। আমরা ফরাসী ভাষা জানি না বলে তিনি ইংরাজী ভাষাতেই আমাদের সঙ্গে আলাপ করলেন। তাঁর ইংরাজী উচ্চারণে ফরাসী উচ্চারণের প্রভাব ছিল। মুক্তি আন্দোলনে ইন্দোচীনের অভাবনীয় সাফল্যের ইতিহাস শোনবার জন্য আমরা উদ্‌গ্রীব হয়েছিলাম। তিনি সংক্ষেপে সেটা বর্ণনা করলেন। অতঃপর মুজাফ্ফর সাহেবের কাছে তিনি ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের তৎকালীন পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত হলেন। আলোচনার শেষে তাঁকে এক প্লেট সন্দেশ খেতে দেওয়া হয়েছিল। তিনি কিছুতেই খেতে চাইছিলেন না। আমাদের পীড়াপীড়িতে একটা সন্দেশ ভেঙে একটা টুকরো মুখে পুরে বললেন,

খুব সংবাদ। এটা কি দিয়ে তৈরি হয়েছে? গফুর সাহেব বললেন, ছানা আর চিনি। হো সন্দেশের প্রশংসা করলেন বটে, তবে এক টুকরোর বেশি খেলেন না। সঙ্গী ফরাসী যুবক বললেন, হো চি মিন খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে খুব সরল এবং সংযমী।

শুধু খাওয়া-দাওয়া নয়, সাজ-পোষাক-আলাপ-ব্যবহার—সবেতেই তিনি পরম সংযমী। তাঁর হাল্কা চেহারায় এমন এক অলৌকিক বৈরাগ্য ত্যাগের দ্যুতি ছিল যে, প্রথম দর্শনেই ভারতের প্রাচীন মুনি-ঋষির সঙ্গে তিনি তুলনীয় হয়ে ওঠেন। বিংশ শতাব্দীর বৃহত্তম সমরশক্তি যে ক্ষুদ্র মানুষটির কাছে মাথা হেঁট করতে বাধ্য হয়েছে, তাঁর পাশে বসে এক মুহূর্তের জন্য মনে হয় নি যে, তিনি আমার আপনজন নন। আমাদের রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের যে বাণী শুনিয়ে পৃথিবীর সমস্ত মানষকে মানবতায় উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন হো চি মিন সেই বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের মূর্ত প্রতীক বলেই আমার মনে হয়েছিল। ভিয়েৎনামের লড়াই, সে তো আমার ভারতেরই মুক্তি-সংগ্রাম। সমস্ত পৃথিবীর মুক্তি-সংগ্রাম। ভিয়েৎনামের নেতা সমস্ত পৃথিবীর বঞ্চিত মানুষের নেতা।

ঘণ্টাখানেক বাদে হো চি মিন সকলের সঙ্গে করমর্দন করে বিদায় নিলেন। আমরা তাঁকে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেল পর্যন্ত পৌঁছে দিলাম।

আগেই বলেছি, এ সাক্ষাৎকার ঘটেছিল ১৯৪৬ সালের মে মাসে। হো তখন প্যারিসে যাচ্ছিলেন ইন্দোচীন (ভিয়েৎনাম) সম্পর্কে চুক্তি স্বাক্ষরের আলোচনা করতে। সেই চুক্তি যথারীতি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। তাতে ইন্দোচীনের ওপর ফ্রান্সের কর্তৃত্ব চিরকালের মত অবসানের কথা। কিন্তু ফ্রান্স সেই চুক্তি ভঙ্গ করে আবার ইন্দোচীনে গিয়ে কায়েমী হয়ে বসতে চায় এবং সেখানে কিছু তাঁবেদার সংগ্রহ করাও তাদের পক্ষে অসম্ভব হয় না। হো চি মিনকে আবার লড়াইয়ে নামতে হয়। দিনের পর দিন রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর দিয়েন বিয়েন ফুর ঐতিহাসিক যুদ্ধে হো চি মিনের বীর সৈনিকরা ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী ফৌজকে চিরকালের মত কবর দিয়ে দেয়। হো চি মিন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিপ্লবী, অতুলনীয় যোদ্ধা এবং অবিস্মরণীয় মানবপ্রেমিক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেন।

অতঃপর জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী ফরাসীরা ভিয়েৎনাম থেকে বিদায় নেয়, কিন্তু বিদায়ের আগে দক্ষিণ ভিয়েৎনামটা তারা তাঁবেদারদের হাতেই তুলে দিয়ে আসে। জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী স্থির হয়, রাষ্ট্রসঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে একটি সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে দুই ভিয়েৎনাম আবার এক হয়ে যাবে।

কিন্তু নতুন বলে বলীয়ান মার্কিন সম্প্রসারণকামীরা ভিয়েৎনামে ফরাসীদের পরিত্যক্ত গদি দখলের জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে ওঠে। তারা জেনেভা চুক্তির বারোটা বাজিয়ে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের দেশদ্রোহীদের সহায়তায় সেই দেশে গিয়ে জেঁকে বসে এবং তাঁবেদারদের বকলমে নিজেদের জঙ্গী শাসন চালু করে।

হো চি মিনের নেতৃত্বে উদ্বুদ্ধ ভিয়েৎনামের মুক্তিকামী জনগণ মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে বাধ্য হন। তদবধি প্রবল পরাক্রান্ত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে ভিয়েৎনামী মানুষের অবিরাম রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছে। আমেরিকা ভেবেছিল, সে দু'দিনেই ভিয়েৎনাম যুদ্ধ ফতে করবে সমগ্র ভিয়েৎনামের প্রভু হয়ে বসবে, কিন্তু মুক্তি ফৌজের অশ্রুতপূর্ব শৌর্যবীর্যের কাছে নিদারুণ পরাজয় বরণ করে এখন সে 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' বলে পালাবার পথ খুঁজছে। ভিয়েৎনামের বীর হো চি মিন আজ ইতিহাসের অনন্য নায়ক। দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ একটি অতি ক্ষুদ্র দেশও যে আমেরিকার মত অস্ত্রবলে সর্বশক্তিমান দেশকে লড়াইয়ের ময়দানে অনায়াসে মোকাবিলা করতে পারে, হো চি মিন হাতে-কলমে সেটা প্রমাণ করেছেন। দুনিয়ার পদানত নিষ্পেষিত নিপীড়িত মানুষ আজ হো চি মিনের সঞ্জীবনী মন্ত্রে নির্ভয়। পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের শোষণযন্ত্রে রক্তশূন্য এশিয়া-আফ্রিকা-লাতিন আমেরিকার শিরায়-শিরায় হো চি মিন আবার নতুন রক্তের সঞ্চার করেছেন। তিনি দুর্বলকে, আশাহতকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, "শোষকের বিরুদ্ধে, পীড়কের বিরুদ্ধে, শয়তানের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াও। শত্রু যতই শক্তিশালী হোক, তোমার তেজ আর সঙ্কল্পের কাছে তার পরাজয় অনিবার্য।" ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ, জাপানী ফ্যাসিবাদ এবং মার্কিন সম্প্রসারণবাদের বিরুদ্ধে শুধু হাতে তিন যুগ ধরে লড়াই করেই হো চি মিন সেই সত্য প্রমাণ করেছেন।

হোর জন্ম ১৮৯০ সালে। তাঁর আসল নাম এনগুয়েন ভ্যান থান। শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতায় আপ্লুত জনগণ তাদের প্রিয়তম নেতার নাম দিয়েছে হো চি মিন অর্থাৎ সত্যদ্রষ্টা। বালক বয়স থেকেই তিনি মুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। ১৯১৮ সালে তিনি প্যারিসে গিয়ে মার্কসবাদে দীক্ষালাভ করেন। দেশের মুক্তিকেই তিনি জীবনের একমাত্র ব্রত হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং সেই পবিত্র ব্রত তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত উদ্‌যাপন করে গেছেন।

গত ৩রা সেপ্টেম্বর ৭৯ বছর বয়সে হো চি মিনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর নশ্বর দেহ বিনষ্ট হয়েছে ঠিকই, কিন্তু তিনি অমর। মানুষের ইতিহাসে তিনি মহানায়ক। তাঁর স্মৃতি পৃথিবীতে চিরকাল মহৎ কাজে প্রেরণা যোগাবে। মানুষের মনের মণিকোঠায় তিনি চিরকাল শ্রদ্ধার আসনে বিরাজ করবেন।

আমার বাইশ বছরের সাংবাদিক জীবনে দেশ-বিদেশের বহু দিক্‌পালের সঙ্গে সাক্ষাতের সুযোগ ঘটেছে। তাঁরা অনেকেই আমার বিস্মৃতির সীমা পেরিয়ে গেছেন। কিন্তু সাংবাদিক জীবন শুরু করার সময় যৌবনের প্রারম্ভে হো চি মিনের সঙ্গে ডেকার্স লেনের সেই ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে আমার সাক্ষাৎকারের ঘটনাটি আজও হৃদয়ে পরম স্মৃতি হয়ে জেগে আছে। হো চি মিন পরেও একবার কলকাতায় এসেছিলেন। তখন তিনি ভিয়েৎনামের রাষ্ট্রপতি। দূর থেকে তখনও আমি তাঁকে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। কিন্তু তাতে আমার পূর্ব স্মৃতি বিন্দুমাত্র ম্লান হয় নি। ইতিহাসের এই মহানায়কের আলিঙ্গনের উত্তাপ আজও আমার চিত্তে অনাবিল আনন্দের ঢেউ তোলে।

সদ্য প্রকাশিত হয়েছে

বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী

বিদ্যাপতির সমগ্র পদ
মূল্য : চার টাকা

জ্ঞানদাসের সমগ্র পদ
মূল্য : দুই টাকা

গোবিন্দদাসের সমগ্র পদ
মূল্য : দুই টাকা

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

বসুমতী সাহিত্য মন্দির
১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

সান্যাল এণ্ড কোং
বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

আইন ও শৃঙ্খলা : পুলিশের ভূমিকা—

কয়েকটি অভিমত

সাগর বিশ্বাস

জনৈক সাব-ইন্সপেক্টর, রেলওয়ে পুলিশ, পশ্চিমবঙ্গ।

ডানকুনি লাইনে একদিন 'ট্র্যাকশন ওয়্যার থেফট্' হলে আমার ওপর 'ইনভেস্টিগেশন'-এর ভার পড়ে। আমি যথারীতি 'পি-ও' (প্লেস অব অকারেন্স) 'ভিজিট' করতে গেছি। কিন্তু স্থানীয় লোকদের একটি কথা শুনে আমি অবাক না হয়ে পারি নি। তাঁরা আমাকে এভাবে প্রস্তুত হয়ে তদন্ত করতে যেতে দেখে অবাক হয়ে গেছেন। তাঁরা বললেন—'এ লাইনে হামেশাই এইরকম তার চুরির ঘটনা ঘটে, কিন্তু কোনো পুলিশ অফিসারকে কোনোদিন আমরা সরেজমিনে তদন্ত করতে আসতে দেখি নি। আপনাকেই প্রথম দেখলাম।' হবে হয়তো যাঁরা সেদিন একথা বলেছিলেন তাঁরা আমাকেই প্রথম দেখেছেন, কিন্তু কোনোদিন কেউ যান নি এটা হয়তো ঠিক নয়। তবুও এই সামান্য ঘটনার মধ্য দিয়ে বর্তমান পুলিশ বিভাগের শিথিল কর্মপদ্ধতির পরিচয় মেলে। একথা আমি অস্বীকার করব না যে, পুলিশ বিভাগ দুর্নীতি, স্বজনপোষণ, তাঁবেদারী, ঘুষ ও অকর্মণ্যতার যে অভিযোগে সর্বদাই অভিযুক্ত হচ্ছে তা মিথ্যে। পুলিশ বিভাগে অনেক দুর্নীতি জমেছে। কিন্তু সেজন্য দায়ী কি কেবল পুলিশ? সরকার কিংবা জনসাধারণের কি কোনো দায়িত্বই নেই! এই তো মাত্র কয়েকদিন আগে একজন রেল-পুলিশকে 'স্বাধীন নাগরিকেরা' গরু-পেটানোর মত পিটিয়ে দিল! তার অপরাধ সে ট্রেনে চোরাই চাল ধরেছিল। এমন ঘটনা হামেশাই ঘটছে। অথচ মজা হলো—সেক্ষেত্রে জনতা বর্বর হয় না, কিন্তু পুলিশ দু' ঘা দিলেই বর্বরতার পরিচয় দেওয়া হয়। কুখ্যাত ক্রিমিনালকে অ্যারেস্ট করলেও হয়তো কোনো সরকারী ভি-আই-পি'র টেলিফোন এসে পড়ে। কনভিক্‌শনের দায়ে তখনও সংশ্লিষ্ট পুলিশ বা পুলিশ অফিসারের 'ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি' অবস্থা হয়ে দাঁড়ায়! পুলিশের এগুলেও বিপদ—না এগুলেও বিপদ—শাঁখের করাত আর কি! পুলিশ কেন কর্তব্য পালনে বাধা পায় এ গবেষণা এদেশে কখনো হয় নি। জনসাধারণও পুলিশকে সহায়তা করবার উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করে নি। বরং অপরাধীর মুক্তির জন্য ঘুষের টাকা এগিয়ে দিয়েছে পুলিশের দারিদ্র্য-জর্জরিত খেয়ালের প্রতি।

এতগুলি কথা একসঙ্গে বলে চুপ করলেন রেল-পুলিশের সাব-ইন্সপেক্টর ভদ্রলোক। জিজ্ঞেস করলাম—কিন্তু জনগণের সঙ্গে পুলিশের সম্পর্ক এত তিক্ত হলো কেন? উত্তরে উনি বললেন—

কি করে ভাল হবে? বৃটিশ আমলে যেভাবে পুলিশকে প্রস্তুত করা হতো, আজও সেইভাবে হয়। তখনও পুলিশ নেটিভদের সন্দেহ করতো আর নেটিভরা পুলিশকে সন্দেহ করত। এখনও তাই, পুলিশ ও জনতা পরস্পরকে সন্দেহের চোখেই দেখে। পারস্পরিক বোঝাপড়ার সম্পর্ক নেই। শাসকশ্রেণী কখনোই এই সম্পর্ককে উন্নত করবার চেষ্টা করেন নি—আজও হচ্ছে না।

—এই সম্পর্কের উন্নতি করতে হলে সর্বপ্রথম কি কি করা দরকার বলে আপনি মনে করেন?

—একথা সকলেই স্বীকার করবেন এই পারস্পরিক সম্পর্কের উন্নতি একতরফা প্রচেষ্টায় হতে পারে না। বড় বড় বক্তৃতা—কিংবা পুলিশ ষড়যন্ত্রকারী—পুলিশের বোঝার দিন এসেছে ইত্যাদি বললেই সবটুকু বলা হয় না। বোঝার দিন এসেছে জনসাধারণেরও। সরকারেরও উচিত পুলিশের ব্যবহারিক জীবনের অসুবিধার প্রতি নজর দেওয়া। পি, আর, বি, পরিবর্তন করতে না পারলে কিংবা পুলিশের চাকরীর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে না পারলে, তাদের আর্থিক উন্নতি ঘটাতে না পারলে শুধু বড় বড় তাত্ত্বিক বক্তৃতায় তেমন সুফল ফলবে বলে মনে হয় না। নিচুতলার পুলিশের বিধিসম্মত স্বাধীনতা শুধু উঁচুতলার হাতে মর্টগেজড্ নয়—তাদের চাকরীর নিরাপত্তাটুকু পর্যন্ত তাদের মেহেরবাণীর ওপর নির্ভরশীল। কোনো উৎসাহী পুলিশ কিংবা ছোট অফিসার হয়তো জীবন বিপন্ন করে—রাত্রির বিশ্রাম পরিত্যাগ করে সমাজ-বিরোধীদের একটি গুপ্ত-ঘাঁটি আবিষ্কার করে কয়েকজনকে অ্যারেস্ট করে মামলা দায়ের করে দিলো—কিন্তু ফল হলো এই যে, প্রশংসা পাওয়া দূরের কথা, সঙ্গে সঙ্গেই ওপরওয়ালার কড়া রোষ এসে পড়লো তার ওপর। ওপরওয়ালাদের দেখে-না-দেখা ওই গুপ্ত-ঘাঁটি আবিষ্কার করার অর্বাচীনতার জন্য তাকেই হয়তো 'যাহা করিয়াছি, ভুল করিয়াছি' বলে কোনমতে চাকরীটি বাঁচাতে হয়।

—স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে পুলিশ কি তার যথাযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পেরেছে?

—একেবারেই পারে নি তা নয়। তবে শাসক সম্প্রদায় যে উদ্দেশ্যে পুলিশকে ব্যবহার করেছেন, তাতে যথাযোগ্য ভূমিকা পালনের প্রতি কোন আগ্রহই ছিল না। জনসাধারণও পুলিশকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় নি। পুলিশ তাই ঘুষ ও ঘুষির কারবারে জবরদস্ত হয়েছে। এর পরিবর্তনও রাতারাতি সম্ভব হবে না। একজন ও-সি বড়বাজারের মত থানায় পোস্টেড হবার জন্য যখন চেষ্টা করেন, তখন বুঝতে কষ্ট হয় না তাঁর উদ্দেশ টা কি? কংগ্রেস সরকার জানতেন, কিন্তু প্রতিকারের বদলে তাঁরা এর প্রশ্রয়ই দিয়েছেন। কিন্তু আমি বলতে চাই—যুক্তফ্রন্ট সরকারও কি বড়বাজারের টাকার খেলা সম্পর্কে অবহিত নন? কিন্তু তাঁরাই বা কি করছেন?

—আপনার কি মনে হয় এ রাজ্যে আইনশৃঙ্খলার খুব অবনতি হয়েছে?

—শুধু আমার নয়, এ কথা অনেকেরই মনে হয় পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি ঘটেছে। ঘটবে না-ই বা কেন? রাজনৈতিক দলের কাছে যখন জনস্বার্থের চেয়ে দলস্বার্থ বড় হয়ে দেখা দেয়, তখন সংঘর্ষ অনিবার্য। আর সে সংঘর্ষে পুলিশের ভূমিকা নিষ্ক্রিয়তার নামান্তর হয়ে পড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা থাকে। কারণ ওই দলীয় চাপ। পুলিশের তখনকার করুণ অবস্থা দেখে সত্যি কষ্ট হয়। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব মাথায় নিয়ে এক নীরব অসহায় দর্শক।

* * *

শ্রীরণেন সেন—সম্পাদক, কমিউনিস্ট পার্টি।

—বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি হয়েছে বলে কোন কোন মহল মনে করছেন। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

—এ সম্পর্কে প্রধানত তিনটি কথা বলতে চাই। প্রথমত, আইন-শৃঙ্খলার

অবনতি বললে সাধারণভাবে যে অবস্থাটা বোঝায়, কংগ্রেসের শাসনকালের তুলনায় সে অবস্থা মাত্রাগতভাবে বাড়ে নি। সংবাদপত্র তাঁদের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সামান্য ঘটনাকে ফলাও করে দেখাচ্ছেন। তুলনামূলকভাবে অপরাধ (ক্রাইম) বাড়ে নি, প্রচারযন্ত্রের দ্বারাই বাড়ানো হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, দেশের সাধারণ মানুষ অপরাধপ্রবণ নয়। পৃথিবীর সমস্ত দেশে কায়েমী স্বার্থ যে অপরাধ করে তা সাধারণত বাইরে প্রকাশ পায় না। কিন্তু সেও মারাত্মক অপরাধ। যেমন ধরুন, মানুষকে লাঠি-পেটা করা অপরাধ—কিন্তু কাউকে না খাইয়ে রাখা অপরাধ নয়। সুতরাং অপরাধের সংজ্ঞা নিয়েও ধনিক সংবাদপত্রের বক্তব্যের সংগে আমাদের বিরোধিতা আছে। একটা উদাহরণ দিই —খেছোঘেরী দখল সম্পর্কে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে কৃষকেরা অপরের সম্পত্তি হরণ করছে, কিন্তু সরকারী পরিসংখ্যানে নিশ্চয়ই দেখেছেন কত হাজার হাজার একর জমি কৃত্রিমভাবে খেছোঘেরী করে রাখা হয়েছে? এ সব খবর কিন্তু ওই সব খবরের কাগজ লেখে না। কিন্তু আজকে সেই সব জমি পুনরুদ্ধার করা অন্যায় হবে কেন? শ্রমিকের ক্ষেত্রেও এই একই ব্যাপার। এতকাল শ্রমিকের শ্রমকে পুঁজিপতিরা অপহরণ করেছে—তাকে বাঁচার মত মজুরী দেয় নি। এমন কি ভারত সরকার শ্রমিককে প্রয়োজনভিত্তিক নিম্নতম মজুরী দিতেও অস্বীকার করেছে। অথচ এটা অপরাধ নয়। অপরাধ হবে তখন, যখন শ্রমিক তার বাঁচার দাবি নিয়ে আন্দোলন করে।

তৃতীয়ত, সমগ্র ভারতে বিশেষ করে আমাদেশে মানুষের সামাজিক ও আর্থিক জীবনে একটা অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। চাকরী, জীবিকা, বাসস্থান, সামাজিক নিরাপত্তা সব কিছুর ক্ষেত্রেই একটা চরম অনিশ্চয়তা। বিক্ষোভ তাই ধীরে ধীরে পুঞ্জীভূত হচ্ছে। তাই মানুষ মাঝে মাঝে অশান্ত হয়ে উঠছে। আর যখনই কোথাও শান্তিসীমা সামান্য লঙ্ঘিত হয়, তখনই 'গেল, সব গেল' বলে চীৎকার ওঠে। একটা উদাহরণ দিয়ে বলি। রাজ্য কর্মচারী বীমা এবং শ্রমিকের প্রভিডেন্ট ফান্ড হিসাবে মালিকেরা যে কোটি কোটি টাকা কেটে রাখেন, সেটা সরকার কিংবা ট্রাস্টি বোর্ডে জমা দেবার কথা। মালিকেরা কিন্তু সেই টাকা ব্যবসায় নিয়োগ করেন। এতে যদি শ্রমিক কখনো অশান্ত হয়ে ওঠে তাহলে শান্তিভঙ্গ করে কারা?

আমার শেষ কথা হলো, জীবিকা, বাসস্থান, শিক্ষাক্ষেত্রে যে অশান্তি তার ভিত্তি হলো সামাজিক অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা। সুতরাং লাঠি-গুলী চালিয়ে শান্তি আনার প্রচেষ্টা বাতুলতা মাত্র। কোন কোন ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি হয়তো হয়, কিন্তু একটা ব্যাপক এবং গভীর সামাজিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন না আনতে পারলে চেতনার পরিবর্তন আনা মুস্কিল। আইন-শৃঙ্খলা নষ্ট হয়ে গেছে—এ কথার কোন বাস্তব ভিত্তি নেই, এটা অতিরঞ্জিত এবং উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। কলকাতার জনসংখ্যা দিল্লীর জনসংখ্যার দ্বিগুণ। কিন্তু অপরাধ কলকাতায় যা সংঘটিত হয়, দিল্লীতে হয় তার দ্বিগুণ। অথচ মজা হলো, সেখানে আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে এত সোরগোল হয় না।

—পুলিশ নিষ্ক্রিয় বলে আপনি মনে করেন কি?

—বৃটিশ-ভারতে পুলিশের যা চরিত্র ছিল, স্বাধীনতার পরে তার কোন পরিবর্তন হয় নি। ৩১শে জুলাই-এর ঘটনাটা দেখুন। এ কথা তো ঠিক—গত বাইশ বছরে পুলিশ বহু নিরপরাধ নরনারী ও শিশুহত্যা করেছে। মানুষ তাতে বিক্ষুব্ধ হয়েছে বহুবার, কিন্তু কখনো তারা বিধানসভা দখল করে মন্ত্রী বা সদস্যদের মারধোর করতে যায় নি। আর আজ একজন পুলিশ হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে পুলিশের কি রুদ্ররূপ আমরা দেখলাম? এর কারণ হলো তাদের অতীত ক্রিয়াকলাপের মনোভাবের ওপর বর্তমান সরকারের কিছু বিধিনিষেধ আরোপ। ১৯৬৭ সালের আগে কৃষক যদি জমি বা মেরী দখল করতো, তাহলে পুলিশের ভূমিকা কি হতো তা সহজেই অনুমেয়। আজ কায়েমী স্বার্থের অনুকূলে পুলিশ সেইভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে না বলেই রব উঠেছে 'পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয়েছে।'

—পুলিশের ক্রিয়াকলাপ যুক্তফ্রন্টের ভাবমূর্তিকে ম্লান করছে কি?

—করছে। যুক্তফ্রন্টকে বেঁচে থাকতে হলে অবশ্যই ষড়যন্ত্রকারী পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

—গণতন্ত্রে পুলিশের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত?

—(১) পুলিশ ও জনসাধারণে বিরোধ থাকবে না,
(২) দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনে পুলিশ সর্বশক্তি নিয়োগ করবে,
(৩) পুলিশ কোন অবস্থাতেই অত্যাচারীর পৃষ্ঠপোষকতা করবে না।

—একটি সমাজতান্ত্রিক দেশে সে ভূমিকা কেমন হবে?

—সমাজতান্ত্রিক অনেক দেশ থেকে 'পুলিশ' এই সন্ত্রাসমূলক শব্দটিকেই তুলে দেওয়া হচ্ছে। পরিবর্তে তাদের নামকরণ হচ্ছে—'পিপলস্ মিলিসিয়া', 'ওয়ার্কার্স মিলিসিয়া' কিংবা 'ন্যাশনাল মিলিসিয়া'। জনসাধারণের সেবক হিসাবে কাজ করবার জন্য যথোপযুক্ত শিক্ষায় সমাজতান্ত্রিক দেশে এই পুলিশবাহিনীকে শিক্ষিত করে তোলা হয়।

—ভারতের মত রাষ্ট্রে যেখানে কিছুটা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা বর্তমান এবং যেখানে চরম সামরিক ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে, সেখানে প্রতি রাজ্যে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ মোতায়েন রাখা কি অনিবার্য প্রয়োজন বলে আপনি মনে করবেন?

—না। নির্ভেজাল রাজনৈতিক কারণেই এই রিজার্ভ পুলিশ রাখা হয়েছে। কেন্দ্র মনে করছে ধীরে ধীরে রাজ্যগুলি হয়ত কংগ্রেসের হাতছাড়া হয়ে যাবে। কিন্তু কিছু পশ্চাদপদ রাজ্যের সাহায্যে হয়ত কেন্দ্রে ক্ষমতা রাখা যাবে—অন্তত রাখার চেষ্টা তো করতে হবে। তাই পুলিশ স্টেট সাবজেক্ট (সংবিধানের ২ নং তালিকা অনুযায়ী) হওয়া সত্ত্বেও কেন্দ্র প্রতি রাজ্যে তার নিজস্ব পুলিশবাহিনী মোতায়েন করলো। এই কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিশ এবং বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স শুধু পুলিশ নয়—এরা আধা-মিলিটারী। অথচ বর্ডার সিকিউরিটি বাহিনী সীমান্তে কত যোগ্যতার পরিচয় দেয় সে তো সকলেই জানেন। আর সংবিধানে এমন নির্দেশ নেই যে, সি আর পি-কে কেবল কেন্দ্রই ব্যবহার করবে, রাজ্য সরকারের কোন এক্তিয়ার নেই। রাজ্যের বিশেষ অবস্থায় তাদের ব্যবহার করা যেতে পারে—এইরকমই বলা হয়েছে। কিন্তু কে ব্যবহার করবে এ কথা স্পষ্ট করে বলা হয় নি। কার্যত কিন্তু কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই ব্যবহার করেন—রাজ্য সরকারকে ব্যবহার করতে দেওয়া হয় না। এতে উদ্দেশ্যটা বুঝতে কারোই কষ্ট হবার কথা নয়।

* * *

শ্রীদেবহাস ভট্টাচার্য—সম্পাদক, বঙ্গীয় প্রাদেশিক ছাত্র-ফেডারেশন।

—সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে আইন-শৃঙ্খলার চরম অবনতি হয়েছে বলে কোন কোন মহল মনে করছেন। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

—'অবজেকটিভ্ ভিউ' থেকে সমগ্র পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে আমাদের যা মনে হয়েছে তা হলো একটা অস্থিরতার অস্তিত্ব আছে। তার মানে এই নয় যে, আইন-শৃঙ্খলা নেই। 'পিপলস্ ইনিসিয়েটিভ্', যা এতকাল রুদ্ধ ছিল আজ তা মুক্তি পাবার ফলে খুব স্বাভাবিকভাবেই এটা হবে। ধর্মবীরের আমলে অসংখ্য ডাকাতি, খুন, রাহাজানি যদি আইন-শৃঙ্খলা বিপন্ন না করে থাকে, তবে আজ

সেই তুলনায় কম ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও আইন-শৃঙ্খলা জাহান্নামে গেল কিভাবে? অবশ্য সমাজবিরোধী কার্যকলাপ একেবারেই হচ্ছে না এমন কথা বলছি না। কিন্তু এগুলি এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু প্রচারের প্রকৃতিটা আসলে যুক্তফ্রন্ট-বিরোধী। ওঁরা বলেন পৈরাজ্য, আমরা বলি—'পিপলস্ ইনিসিয়েটিভ হ্যাজ বিন্ লেট লুজ'।

—কোন কোন মহল পুলিশ নিষ্ক্রিয় বলে অভিযোগ করছেন। এই অভিযোগ কতটা যথার্থ বলে মনে হয়?

—সামগ্রিকভাবে এর যা অর্থ, তার সঙ্গে আমাদের বিরোধিতা আছে। সমগ্র পুলিশ মেশিনারিটার কোন গুণগত পরিবর্তন আজ পর্যন্ত হয় নি। সেই কারণে পুলিশের ক্রিয়াকলাপ অনেকক্ষেত্রেই গণ-আন্দোলন বিরোধী। সামগ্রিকভাবে পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা হয় নি।

—পুলিশ কি যুক্তফ্রন্টের একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের স্বার্থে কাজ করছে বলে আপনার মনে হয়?

—পুলিশ সম্পর্কে যুক্তফ্রন্টের নীতি হলো—'দে (পুলিশ) হ্যাভ টু স্ট্যান্ড বাই দি পিপল'। কিন্তু আমরা বলেছি পুলিশের ভূমিকায় কোন গুণগত পরিবর্তন হয় নি। ফলে মালিক-ঘেঁষা মনোভাবটা আজো বদলায় নি। তবে এই অভিযোগ বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে কোথাও কোথাও সত্য হলেও, আসলে 'জেনারেল ফিচার' এটা নয়।

—পুলিশের সাম্প্রতিক ক্রিয়াকলাপ যুক্তফ্রন্টের ভাবমূর্তিকে জনমানসে ম্লান করছে বলে মনে করেন কি?

—নিশ্চয়ই করছে। নিশ্চয়ই করেছে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে, করেছে দুর্গাপুর এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয়ই করেছে ৩১ জুলাই তারিখে বিধানসভার ঘটনায়। অথচ পুলিশের চিরাচরিত ট্রেন্ডকে দমন করে যথার্থ টেন্ড-এর উন্মেষ ঘটানোর কোনো চেষ্টাই হচ্ছে না।

—একটি গণতান্ত্রিক দেশে পুলিশের ভূমিকা কেমন হওয়া উচিত?

—এক কথায় সামগ্রিকভাবে পুলিশের ভূমিকা জনস্বার্থমূলক হবে। কিন্তু গণতন্ত্রে যেহেতু সত্যিকারের গণতন্ত্র নেই, সেহেতু গণতান্ত্রিক দেশের পুলিশের ভূমিকা নিয়ন্ত্রিত হয় সেই দেশে যে সরকার ক্ষমতায় আসে তার নীতির ওপর।

—আমাদের দেশে পুলিশ এবং ছাত্র-সমাজের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক নয়। এর 'কজ্যাল ফ্যাক্টর'গুলি কি কি বলে আপনি মনে করেন?

—বৃটিশ আমল থেকে স্বাধীন ভারতের পুলিশের চরিত্রের কোনো পরিবর্তন হয় নি। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামোয় পুলিশকে ধনিকশ্রেণীর স্বার্থে এবং সাধারণ মানুষের গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে নিয়োজিত রাখা হয়। ভারতবর্ষের গণ-আন্দোলনে ছাত্রসমাজের বরাবরই একটা অগ্রগণ্য ভূমিকা ছিল। কলকাতার ট্রাম আন্দোলন, সারা বাংলাদেশের খাদ্য আন্দোলনে আমরাই আগে ঝাঁপিয়ে পড়েছি। স্বাধীনতা আন্দোলনে ছাত্র-সমাজের ভূমিকাও ইতিহাস বিস্মৃত হয় নি। শিক্ষায় অনগ্রসর একটি দেশে ছাত্র-আন্দোলনের গুরুত্ব সম্পর্কে শাসক ও শোষকশ্রেণী সচেতন ছিল। তাই ছাত্র-সমাজের সকল আন্দোলনকেই পুলিশ দিয়ে ব্যর্থ করে দেবার চেষ্টা হয়েছে। খুব স্বাভাবিকভাবেই তাই পুলিশের সঙ্গে ছাত্রদের সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবে গড়ে ওঠে নি।

(চলবে)

সমষ্টি উন্নয়ন, পঞ্চায়তী রাজ এবং সমবায়ের উপর

অল ইণ্ডিয়া ফটোগ্রাফ প্রতিযোগিতা

১৯৬৯

সমষ্টি উন্নয়ন, পঞ্চায়তী রাজ ও সমবায়ের উপর সারা ভারত ফটোগ্রাফ প্রতিযোগিতার (শাদা ও কালো) জন্য এণ্ট্রি আহবান করা হইতেছে। ফটোগ্রাফগুলির মধ্যে সমষ্টি উন্নয়ন, পঞ্চায়তী রাজ ও সমবায় কর্মসূচীর মূল আদর্শ ও কর্মোদ্যম প্রতিফলিত হওয়া চাই এবং তাহাতে এই সমস্ত বিষয়ের কাজকর্ম চিত্রায়িত হওয়া আবশ্যক : (ক) সমষ্টি উন্নয়ন ও সমবায়ের কর্মসূচী যাহাতে ক্ষুদ্র চাষীরা উপকৃত হন; (খ) সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচী অধীনে মহিলা ও শিশুদের যত্ন লওয়া; (গ) মহিলাদের যাবতীয় পঞ্চায়েত কাজকর্ম; (ঘ) এপ্লায়েড নিউট্রিশন কর্মসূচী অধীনে খাদ্য প্রদান; (ঙ) পঞ্চায়েত এবং ছোট-খাটো সেচ; (চ) মার্কেটিং ও প্রসেসিং সমবায় অধীনে কাজকর্ম; (ছ) নেতৃবর্গের সমবায়—কর্মরত; (জ) মৎসজীবীদের সমবায়।

মনোনীত এণ্ট্রিগুলির জন্য নিম্নলিখিত মতে নয়টি পুরস্কার দেওয়া হইবে : প্রথম পুরস্কার ৪০০ টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ৩০০ টাকা, তৃতীয় পুরস্কার ২০০ টাকা এবং ৬টি সান্ত্বনা পুরস্কার প্রত্যেকটি ৫০ টাকা।

প্রত্যেক এণ্টির দুইটি কপি নেগেটিভ সহ পাঠাইতে হইবে। ফটোগ্রাফগুলি রিপ্রডাকশনের উপযোগী ২৫ সিএম×৩০ সিএম আকারের গ্লসি প্রিন্ট হইতে হইবে। প্রত্যেক ফটোগ্রাফের বিপরীত দিকে প্রতিযোগীর নাম ও ঠিকানা বিশদ বিবরণ যথা—স্থান (গ্রাম, ব্লক/পঞ্চায়েত, জেলা ও রাজ্য) বিষয়, ফটো তোলার তারিখ ইত্যাদি উল্লেখে বিশদ ক্যাপশন (হাতে লেখা অথবা পৃথক কাগজে টাইপ করিয়া ফটোগ্রাফের পিছন দিকে সাঁটিয়া দেওয়া) থাকা চাই। প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী যে কোন ফটোগ্রাফ এবং ইহার নেগেটিভ, পুরস্কার পাক অথবা নাই পাক, আলোকচিত্র প্রদর্শনীতেও রাখার জন্য ব্যবহার করা যাইবে। পুরস্কারপ্রাপ্ত ফটোগ্রাফগুলি এবং ইহার নেগেটিভগুলি ভারত সরকারের সম্পত্তি হইবে এবং যে কোনভাবে এবং যে কোন উদ্দেশ্যে ঐগুলি রিপ্রডাকশনের অধিকার ভারত সরকারের উপর বর্তাইবে।

ফটোগ্রাফগুলি ফ্ল্যাটভাবে প্যাক করিতে হইবে। ঐগুলির হারাইয়া যাওয়া বা ক্ষতি হওয়ার জন্য ভারত সরকার দায়ী হইবেন না।

কোন ব্যক্তিই একাধিক পুরস্কারের অধিকারী হইবেন না। অবশ্য যে কোন ব্যক্তি একাধিক এণ্ট্রি পাঠাতে পারেন। কোন এণ্ট্রি ফী নাই।

মতভেদের সমস্ত ক্ষেত্র ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া ধার্য হইবে। এণ্ট্রিগুলি এই ঠিকানায় পাঠানো অনাবশ্যক :—

ডিরেক্টর (বেসিক লিটেরেচার)

মিনিস্ট্রি অব ফুড, এগ্রিকালচার, কমিউনিটি ডেভালপমেন্ট এন্ড কোঅপারেশন

(ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিটি ডেভালপমেন্ট এন্ড কো অপারেশন)

কৃষি ভবন, নয়া দিল্লী-১

এণ্টি পাঠাইবার শেষ তারিখ : ২ অক্টোবর, ১৯৬৯

ডিএভিপি ৬৯/২০৩

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

॥ বত্রিশ ॥

ঘুম আসছে না কল্যাণের। আজকাল প্রায়ই এমনটা হচ্ছে। দু'চোখের পাতা জুড়তে পারা যাচ্ছে না। একটা নিশ্চিন্ত নিশ্ছিদ্র নিরেট ঘুম যেন উধাও হয়ে গিয়েছে চোখ থেকে। চিন্তার কীট কুরেকুরে খাচ্ছে মাথাটা। একটা অসুখী অসুস্থতা যেন কোন্ অন্ধকার থেকে ধীরে ধীরে মাথা তুলছে।

পাশের ঘরে বাবা হয়ত এতক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছেন। বাইরে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। জানালা গলে ভেতরে এসেছে। অনেকক্ষণ আলোময় করে দিয়েছে ঘর। ঘুমের জন্য তপস্যা করে করে বিফল হ'ল।

রেডিয়াম ডায়ালের ঘড়িতে রাত দেড়টা। সময়ের সুস্পষ্ট নির্দেশ। ঘড়িটা হাতে বেঁধে শোয়াই তার চিরা-চরিত অভ্যাস। মশারির ভেতর থেকে বাইরে এল কল্যাণ। দুগ্ধধবল বিছানা। বিছানায় বেড্‌সুইচ্। টিপলেই আলো জ্বলে উঠে মুহূর্তে সব ঘর ভাসিয়ে দেবে।

কিন্তু তা করতে চায় না কল্যাণ। আলো জ্বালতে দেখলেই পাশের ঘর থেকে ত্রস্তব্যস্তে ছুটে আসবে তেওয়ারি। বুড়ো মানুষটা। পশ্চিমে কোথায় বাড়ি ছিল। বাবার কাছে প্রথম চাকরিতে হাতেখড়ি হয়। শিবব্রতের কাছে। সমস্ত জীবনটাই তার কেটে গিয়েছে একটানা সেবায় ও পরিশ্রমে। বাবার চাইতে বয়সে কিছু ছোটই হবে, কিন্তু এখনো বিশ্বস্তভাবে কাজ করেই যাচ্ছে। মাঝেমাঝে ভাবে কল্যাণ আর না, এবার ওকে ছুটি দেওয়াই উচিত। একজন নতুন লোক খুঁজে নেবে। সেটা এমন কিছু কঠিন নয়। প্রতিদিন ঢের লোক আসছে তার কাছে কাজের তাগিদ নিয়ে।

স্লিপ পাঠিয়ে দিচ্ছে প্রথমে। এই-টেই রীতি। বাঙালী বাগানের কর্তা হলেও এই ইংরেজি রীতিটা অনুসরণ করতে চাইছে কল্যাণ। তার কাজ বেশি। সময় কম। নিতান্তই কম। বাবাকে মুক্তি দিয়েছে অনেকদিন। এত বেশি কাজের চাপে বাবা আর পেরে উঠছিলেন না। বয়স হয়েছে অনেক। সারাজীবনই ত' খাটলেন। এক হিসেবে তাদের এই প্রতিষ্ঠা, কর্মজীবনে একক বাবারই নিরলস প্রচেষ্টার ফল।

সারাটা জীবন ধরে অমানুষিক খাটতে খাটতে বাবা ক্লান্ত হয়ে উঠে-ছিলেন। অবশেষে বাবাকে রেহাই দিল। বাবা এখন সম্পূর্ণ তারই ওপরে নির্ভর করেন। তাঁর সঙ্গে অবশ্য প্রয়োজনে পরামর্শ করে কল্যাণ। কিন্তু ডিসিসন নেয় অন্যদের সঙ্গে মিলিতভাবে। সময় ও সুযোগমত পরামর্শ করতে যায় জলপাইগুড়িতে। সেখানে বড়ো বড়ো চা-শিল্পপতিরা আছেন। ডুয়ার্সে যে ক'জন উঠতি শিল্পপতি আছেন তাঁদের মধ্যে তাঁরাও আছেন। তবে আজকাল চিন্তিত হয়ে পড়েছে চা-বাগানগুলির ভবিষ্যৎ নিয়ে। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা বড়ো দ্রুতগতিতে পাল্টে যাচ্ছে। কী হবে ভাবনা হয়। বড়ো দ্রুত চার-দিক ভাঙছে এবং পাল্টাচ্ছে। বাগানে-বাগানে ইউনিয়ন। নানা প্রতিদ্বন্দ্বী ইউনিয়ন। কথায় কথায় হরতাল। সব-কিছুতেই যেন অনিশ্চয়তা। চোরাবালির চর যেন তলিয়ে যাচ্ছে। এতে করে কিছু নিশ্চিন্ত হ'য়ে করা যায় না, চলা যায় না। অনেক বুঝে-শুনে অনেক চিন্তা করে প্রতিটি পা ফেলতে হয়। পাশাপাশি অনেকগুলি বাগানে স্ট্রাইক চলছে। তাদের বাগানে নানাভাবে ঠেকিয়ে রাখছে। এদিকে বিদেশে ভারতীয় চা-এর বাজারে মন্দা। বিশেষত ডুয়ার্সের চা তো বটেই। এখানে আবাদ বেশি বটে, কিন্তু দার্জিলিং-এর চা-এর কোয়ালিটি নয়।

বিদেশ আবার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামছে। নতুন চা-শিল্প গড়ে উঠছে। নতুন চা-বাগানের আবাদ ঘটছে। তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হ'তে গেলে নানা উদ্যোগ-আয়োজন চাই। চাই অনু-শীলনী চর্চার। ভারত সরকার সে-তুলনায় সম্পূর্ণভাবে নীরব। অথচ কোটি কোটি টাকা সরকারকে যোগাচ্ছে এই শিল্পগুলি।

বড়ো বড়ো শিল্পপতিরা বিষণ্ণ। চিন্তাকুল বিষণ্ণ মুখ। তাঁদের দিকে তাকিয়ে আরো বেশি দুশ্চিন্তা হয়। কি হবে তাদের অবস্থা কে জানে। তবু প্রাণপণ প্রচেষ্টায় নিজেকে সজাগ ও সক্রিয় রেখে চলেছে কল্যাণ। ধীর এবং শান্তভাবে সমস্ত অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে চলছে।

খুব ভোর থেকেই নানা মানুষজন আসতে সুরু করে। তার আগেই এক-কাপ কফি ও দু'টো ভাজা ডিমে প্রাতরাশ সম্পন্ন করে নেয় কল্যাণ। হাফ-প্যান্ট পরণে। হাফ সার্ট। বিলাসিতার মধ্যে দামী পার্কার পেন একটি। অনেকদিন আগেকার কেনা। বাবা উপহার দিয়ে-ছিলেন তার বি-এ ক্লাশে। সেইটে এখনো নতুনই আছে।

টেবিলে রক্ষিত স্লিপগুলি সযতনে সাজিয়ে রেখে গেছে তেওয়ারি। বাইরে অপেক্ষা করছে সে। কলিং বেল টিপলেই ছুটে ভেতরে আসবে। সদা ব্যস্ত। হুকুম তামিল করবার জন্য উদ্‌গ্রীব। স্লিপ দেখে ধীরে ধীরে ডাকে একজনের পর একজনকে।

কি চাই আপনার?

আজ্ঞে...

আমার সময় খুবই কম। স্পষ্ট করে বলুন—

আজ্ঞে, স্যার—

সোজাসুজি তাকিয়ে থাকছে কল্যাণ। লোকটি ভ্যাবাচ্যাকা খাচ্ছে। গুছিয়ে বলতে পারছে না। কথা বলতে গিয়ে থতমত খাচ্ছে। হাত কচলাচ্ছে ঘন-ঘন।

আজ্ঞে একটা চাকরি যদি দিতেন—

হায় রে চাকরি! বড়ো দুঃখে কল্যাণের হাসি আসতে চায়। কোথায় চাকরি? দেখুন, আপাতত আমাদের কোন ভেকেন্সী নেই-

গলাটা গম্ভীর করে তুলতে চায়।

'গত তিন-চারদিন একেবারে না-খেয়ে আছি, স্যার।

.শ্বাস করে কল্যাণ। লোকটির মুখভাবে বেদনার ছাপ স্পষ্ট। অনেক অনাহারের ছাপ। মুখখানা কেমন যেন ফোলা-ফোলা। চোখের দৃষ্টি হলদেটে। দেখুন, চাকরি তো দিতে পারছি না—

যদি কোনরকম একটা চাকরি—

ব্যবসার অবস্থা বড়ো মন্দা। যাঁরা আছেন তাঁদেরই যে কি অবস্থা হবে। বলতে গিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে কল্যাণ। বিশ্বাস করে তাদের করণীয় কিছু নেই। বিশ-বাইশ বছরের কংগ্রেস শাসনই সব শেষ করে দিয়েছে। বড়ো আশা করে স্বাধীনতার সুপ্রভাতকে বরণ করে নিয়েছিলেন। চা-বাগানেও। পাশের সাহেব বাগানগুলিও অবশ্য অন্ধকারে থাকে নি। তারাও এসেছিল অনুষ্ঠানে। লোক-দেখানো আড়ম্বরে যোগ দিয়েছিল। মনে মনে যদিও খুবই ক্ষুণ্ণ হয়েছিল।

কিন্তু তাঁদের কথা ছিল একেবারে আলাদা। তাঁরা সত্যি আনন্দিত হয়েছিলেন। এতদিনের স্বপ্ন সফল হতে চলেছে তাহলে। লালকেল্লার উড়ছে স্বাধীনতার তেরঙা পতাকা। কামানের নির্ঘোষ। রেডিও থেকে ভেসে এসেছিল নেহরুর গলা। রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সংগীত ও বন্দেমাতরম সংগীত শ্রুত হয়েছিল তারপর।

বিশ-বাইশ বছর আগের কথা। তখনো শিবব্রত কর্মক্ষম। তিনিই সব দেখাশুনা করছেন। পাশ করে বাবার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে কল্যাণ। বাবার মুখ ঝলমল করে উঠেছিল আনন্দে স্বাধীনতার অনুষ্ঠানে কত ধূপ-দীপ জ্বলেছিল। তাঁদের বাগানে কত আলোর প্রদীপমালা জ্বলেছিল। নৃত্য-গীত। অনেক টাকা খরচ করে খাওয়া-দাওয়া হয়েছিল।

বিশ-বাইশ বছরে আজ তার কিছুই নেই। কর্পূরের মত উবে গিয়েছে সব। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সে-সুফল বহন করে আনতে পারে নি। আনতে পারে নি সে প্রত্যাশিত আশীর্বাদ। আজ তাই দিকে দিকে অবসাদ। অবসাদ থেকে তিক্ততা। তাঁদের অবস্থা হয় তো তত খারাপ হয় নি। কিন্তু তা বলে আশাতীত উন্নতিও হয় নি। বড়ো শিল্পপতিদের কথা আলাদা। সাধারণ মানুষদের অবস্থা হয়েছে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর।

ইতিহাসের এই শিক্ষায় মোটামুটিভাবে বিশ্বাসী কল্যাণ। তাঁর লেখাপড়া আছে বিস্তর। কার্ল মার্ক্স পড়া আছে, ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞানও কিছু কিছু পড়েছে। আর পড়েছে গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্র ইত্যাদি।

রবীন্দ্রনাথের সভ্যতার সংকটের কথাগুলি মনে হয়। মনে পড়ে সব চাইতে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের কথাগুলি। মনে মনে সে সুভাষচন্দ্রের বড়ো সমর্থক। এই দরিদ্র দুর্ভাগা দেশে সুভাষচন্দ্র ছিলেন মস্ত বড়ো প্রতিশ্রুতি। তাঁদের ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা আছে, উচ্চাশা আছে। লাভ-লোকসানের হিসাব করতে হয়। যোগ-বিয়োগ গুণ ভাগ। সুভাষচন্দ্রের কাছে নিজের একান্ত ব্যক্তিগত কিছু ছিল না। Give me blood and I will give you freedom. একথা শুধু তিনিই বলতে পারেন। সেই সুভাষচন্দ্রকে পেল না দেশ। তাহলে পাল্টে যেত দেশের চেহারা। কে জানে আজ তিনি জীবিত কি মৃত।

এই সেদিন শৌলমারী নিয়ে কত কথা হয়ে গেল। শৌলমারী এই ডুয়ার্সেরই ফালাকাটার কাছে। শৌলমারীর শক্তিমান সাধুকে নিয়ে দেশে-দেশে কী চঞ্চলতা ব্যগ্রতা। অসাধারণ এই যোগীকে দেশ-দেশান্তর থেকে দেখতে ছুটে এসেছিল মানুষ। তিনি নিজেও ছুটে গিয়েছিলেন। বারবার দু-তিনবার গিয়েছিলেন। মনের মধ্যে দুঃসহ দ্বন্দ্ব।

আজ আবার সব শান্ত হয়ে গিয়েছে। অসাধারণ যোগী চলে গিয়েছেন শৌলমারী থেকে। হরিদ্বারে না কোথায়। শৌলমারীর কথা আর শোনা যায় না। যদিও শৌলমারী খ্যাতি পেয়েছে আন্তর্জাতিক।

প্রায় দু'যুগের মত ঘনিয়ে এল স্বাধীনতার পর। এমন করে নাকি স্বাধীনতা আসে না। কখনো আসে নি কোন দেশে। তাই ভাগ হয়ে গেল দেশ।

মধ্যে কুৎসিত রাজনীতি আছে। কার্জনের বঙ্গভঙ্গ তাহলে হলই। ছিল স্বদেশ, সে হল বিদেশ। আপন হ'ল প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মানুষ। বিস্তর ফারাক। সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজেরই এইসব চক্রান্ত।

মনেপ্রাণে এইসব ভাবে কল্যাণ। কিন্তু আজকাল ভাবনা-চিন্তা সব কিছুই ছেড়ে দিয়েছে। এই অল্প ক'টি বছরেই ক্লান্ত। ভীষণ ক্লান্ত লাগে। কংগ্রেসের দিন চলে গেল। তা যাক, ক্ষতি নেই। কিন্তু দেশের কথা চিন্তা করছে না কেউ। —ইনকিলাব জিন্দাবাদ! মেহনতিরাজ চাই। শ্রমিকদের দাবি। মেজাজ গরম হয় কল্যাণের। দাবির কথায় যতটা সোচ্চার, কাজে তত নয়। চা-বাগান নয় যেন আগুনের রাজ্যে বাস করছে আজকাল। যেন একটা ফুটন্ত আগ্নেয়গিরির ওপরে বসে আছে। চারিদিকে লেলিহান শিখা গ্রাস করতে আসছে। তাদের পায়ের তলায় নিশ্চয়তা কেটে যাচ্ছে দ্রুত। এমনভাবে বাঁচা চলতে পারে না।

নতুন কিছু করার কথা ভাবে কল্যাণ। নতুন কিছু গড়ার কথা। না, না। চা-বাগান দিয়ে আর হবে না। পালিয়ে যেতে না-পারলে আর রক্ষে নেই। ত্রাস, ত্রাস। ভয়ংকর ত্রাস। রাতে শুয়ে ঘুম আসে না। আজ কিছুদিন থেকে একেবারেই ঘুম নেই। দুশ্চিন্তার পীড়নে ফেটে যাচ্ছে মাথাটা।

বাবার কথা মনে হয়। বড়ো বেশি বুড়ো হয়ে পড়েছেন বাবা। তাঁর সঙ্গে এ-সব আলোচনা করাও কঠিন। হয়তো তাঁকে আরো বেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত উদ্ব্যস্ত করে তোলা। বার্ধক্য দ্বিতীয় শৈশব। সেই শৈশবে পৌঁচেছেন বাবা। এখানে তাঁর নিজের রোপিত শস্যের ফল আস্বাদ করবেন। শান্তভাবে বাঁচবেন। কেনই বা তাঁকে আবার চিন্তিত করে তোলা! তাই তাঁর কাছে সবকিছু লুকিয়েই চলেছে। এখন তার পালা। একক বহন করতে হবে সংগ্রামের সেই দায়িত্ব।

মাসিক ১০, টাকার কিস্তিতে লাভ করুন অল ওয়ার্ল্ড স্ট্যান্ডার্ড ট্রানজিস্টর (জাপান মেক) জনপ্রিয় মূল্য ৩০০, । দেশব্যাপী খ্যাতি আছে। ডবল স্পীকার ৩ ব্যান্ড, ৮ ট্রানজিস্টর। নাইট-ল্যাম্প ফিট করা। কেবল ইংরেজী বা হিন্দিতে যোগাযোগ করুন।

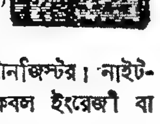

Allied Trading Agencies
(B.C.) P.B. 2123, Delhi-7.

একটা বিরাট সংসার তার মুখের দিকে তাকিয়ে। তাদের দায়িত্ব বহন করতে হয়। সংসারের ছেলেমেয়েরা লেখা-পড়া করছে। কাকার বড় ছেলে সত্যপতি গেছে আমেরিকায় পড়াশুনো করতে। আরেক ভাই আছে জার্মানীতে। তাদেরও দায়িত্বের বোঝা কাঁধে রয়েছে। সংসারের বড়ো মেয়ে রুমি এম· এ পাশ করে বেরোল। মেজ মেয়েও তাকে ছুঁই-ছুঁই করছে। বড়ো মেয়ের বিয়ের ভাবনা ভাবতে হচ্ছে। ডুয়ার্সে থেকে সর্বদিক দেখাশোনা করা অসম্ভব। তাই বাড়ি করতে হয়েছে কলকাতায়। স্ত্রীকে রেখে দিয়েছে সেখানে। ডুয়ার্সে তা হতে পারে না।

সমস্যার সমাধান রেখা নিজেই করেছিল। বলেছিল, এক কাজ করা যাক। আমিই না হয় ওদের নিয়ে কলকাতায় যাই।

স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে অনেক দ্বিধা অনেক সংকোচের পর বলেছিল।

কল্যাণ বলেছিল, তুমি?

তাহলে আর কে যাবে? মেয়েদের আমি একা ছেড়ে দিতে পারি না।

যা ভালো বোঝ তুমি—

খুবই নিষ্প্রাণ নেতানো গলা মনে হয়েছিল কল্যাণের।

আর তাছাড়া আমি এখানে থেকেই বা কী কাজে আসছি তোমার? রেখা শান্ত গলায় বলেছিল, তোমার কাজ নিয়ে তোমাকে সর্বদাই ব্যস্ত থাকতে হয়। ভেতর বাড়িতে আসই বা কখন, সময়ই বা কোথায়।

রেখার গলায় অভিযোগ শোনে নি কল্যাণ। রেখা অভিযোগ করতে জানে না। হয়তো তার মত স্বামীর সঙ্গে বিয়ে হয়ে থেকে বেচারীর জীবনটা অপূর্ণই রয়ে গেল।

ইংরাজিতে ফার্স্ট ক্লাশ অনার্স নিয়ে পাশ দিয়েছিল রেখা। তার কলেজ জীবনে ঢের বেশি স্বপ্ন ছিল। উচ্চাশা ছিল। গোল্ডমাইনের ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন শ্বশুরমশাই। মেয়েকে লেখা-পড়া শেখাতে তাঁর ইচ্ছে ও আগ্রহের অভাব ছিল না। রেখারও ছিল সেই স্বপ্ন। কবিতাও লিখত রেখা। তারপর সব ওলট-পালট হয়ে গেল। পুরীর সমুদ্রতীরে দেখা ও পরিচয় থেকে উভয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা ও বিবাহ।

সে-সব দিনগুলি আজ উপকথা। কতদিন হয়ে গেল। আজ পরস্পর থেকে কতদূরে থাকতে হচ্ছে। রেখার কথাগুলি অবশ্য ঠিক। বিশ্রামের অবকাশ তার নিতান্তই কম। দায়-দায়িত্ব বেশি। কর্মের জোয়ালের মধ্যে বাঁধা হয়ে গেছে আজ। মাঝে মাঝে কলকাতা ছুটতে হয়। সেখানেও কাজ। রেখা হাসে, বলে, কিগো কাল সকালেই ফিরছ নাকি বাগানে?

ঘুম আসে না কল্যাণের। দেয়াল-ঘড়ির টিকটিক শব্দ। চলে যাচ্ছে সময়। দ্রুত চলে যাচ্ছে। ডুয়ার্সের ইতিহাস-ও মোড় নিচ্ছে। ডুয়ার্স কি বাইরের পৃথিবী থেকে আলাদা? তা নয়। সারা দেশের একই উত্থান-পতনের ছন্দ তার হৃদয়ে। তারই দোলা। এক হিসেবে ভেবে দেখতে গেলে ভাঙনের মধ্য দিয়েই তো নবজন্মের উপকূলে পৌঁছতে হয়। আজ পৃথিবী ভাঙছে। ভাঙছে-চুরছে। সেই সঙ্গে ভাঙার তাণ্ডব সুরু হয়েছে ডুয়ার্সেও।

বাগান আর রাখা যাবে না। আজ বিকালেও বলছিল মালহোট্রা। তার বন্ধু। মিঃ মালহোট্রা ঝিলভিউ বাগানের ম্যানেজার। নামে ইংরাজি বাগান। সাহেবদেরই বাগান ছিল এক-কালে। মালহোট্রার মেটারন্যাস-আংকল কিনে নিয়েছিল। সেই থেকে বাগানে ম্যানেজার হয়ে আছে মালহোট্রা। ফর্সা ঝকঝকে সুন্দর মানুষটি। প্রখর ব্যক্তিত্ব। ডুয়ার্সে অনেকদিন থাকার কল্যাণে বাংলাভাষা বুঝতে পারেন কিন্তু বলতে পারেন না। পাইপ টানেন ঘন ঘন। মুখ থেকে নামাতেই চান না। বাগান ছাড়া তামাক-টানা আর বই পড়া তাঁর কাজ।

দিনকাল আদৌ ভালো যাচ্ছে না। Worst days ahead.

মিঃ মালহোট্রা বলছিল। গলা থমথম করছিল। বিষণ্ণতা। বাঁ-হাতের পাইপে টান পড়ল।

ভাবছি বাগান ছেড়ে দিয়ে চলে যাব।

তাহলে আপনিও ভাবছেন!

অবকোর্স! আই য়্যাম থিংকিং।

রাত দুপুরে যেন বিক্ষুব্ধ ঝড়ের গর্জন শোনে কল্যাণ। ভাঙছে, ভাঙছে। সব ভাঙছে। কিছুই রাখা যাবে না। জানালার ধারে এসে দাঁড়ায়। একটা বিক্ষুব্ধ অসন্তোষ যেন দিক-দিগন্তরে ছড়িয়ে পড়ছে। বড় বড় শিল্পপতি-দেরও সেই ভাবনা। এমন করে সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে চলে যাবার আগে বড়ো ভাবনা হয়। রাত্রির নিশুতি প্রহরগুলি চিন্তায়-চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠছে। জানালার পর্দাটা সরিয়ে দেয় কল্যাণ। আকাশে ফুটফুটে জ্যোৎস্না। কিন্তু একফোঁটা হাওয়া নেই।

[ক্রমশ]

ন থেকে নেমে হাত-মুখ ধুয়েই খেতে বসে মুক্তি। মা আজ পরিবেশনে নেই। তদারকিতে ব্যস্ত। জলের গ্লাসটা যিনি এগিয়ে দিলেন, তাঁর দিকে চাইতেই মুক্তি বিষম খেল একটা।

কি হলো? জল মুখে দে। মা ব্যস্ত হয়ে বলেন—তোর নতুন কাকিমা। করযোড়ে নমস্কার জানায় মুক্তি। ভাতের থালা এসে গেছে তখন। পৃথিবীর ম্যাপ খুঁজে শিলিগুড়ি শহরটা আবিষ্কারের মতোই ঝুঁকে পড়ে সে। চিনেছি বললে ভুল হবে। আবার একদম অপরিচিতাই বা বলে কিভাবে? ভারসাম্যবিহীন মহাকাশ বিচরণকারীর দশা পেয়ে বসল তাকে।

এ-কি ভাজা নিচ্ছিস, তেতো খাবি কখন? মা'র নজর বড় কড়া।

কি বিপদেই না পড়া গেছে। ঠিক ধরেছি উপঞ্চাশ কি পঞ্চাশ সালের কথা।

কি ধরলি হঠাৎ? দু' চোখ কপালে তুলে চেয়ে থাকেন মা।

যাবার কথা। লম্বা লোকদের বুদ্ধি কম হবেই আর মুক্তিটা তো নিরেট গর্দভ। বলতেন না সব সময়ে?

বাবার কথায় মা কেমন আনমনা হয়ে পড়েন। একটা নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। সবই আমার বরাত, যোগ করে দিলেন তার সংগে।

আচ্ছা মা, সত্যি কি বরাতটা খুব খারাপ তোমার?

যা।, বাজে বকিস নে। খেয়ে নে। তারপর কাকিমার সাথে গল্প করবি। তোর কাকার কাছে আমিই কি কম বকুনি খেয়েছি তোর জন্য?

তখন অর্থ বুঝি নি মা কাকামণি যা সব বলতেন। আজ আর মনেও নেই সব। কিন্তু প্রতিটি কথার মধ্যেই ছিল অসম্ভব একটা জ্বালা। অনেক কিছুর সাথেই যার কোন মিল ছিল না।......

ঘাবড়াস নে মুক্তি, যে যা বলে বলতে দে। এমন সব লড়াই আছে যার কয়েক রাউন্ড লড়তেই দেখবি তুই কেমন বদলে গেছিস। জীবনটা তো আসলে সংগ্রামেরই সমষ্টি। সৈনিক জীবনে কিন্তু লোভ-মোহ-ভয়, তিন থাকতে নয়। কষ্ট পাবি ঠিকই, অপার আনন্দবিভোর সে কষ্ট। কাকা ছিলেন তার জীবনের শ্রেষ্ঠ সুহৃদ। হাজার অনুরোধ-উপরোধ যাকে এক পা নড়াতে পারে নি, সামান্য একটা ইঙ্গিতেই যুদ্ধের ঘোড়াব বেগে ছুটে চলত সে। হট যাও, হট যাও, সামনেওয়ালে হট যাও হাঁক তুলে। সেই কাকারই দেখা পাবার কথা আজ। কিন্তু তিনি নেই। যিনি আছেন তিনি কাকিমা। তার মানে......।

এত যারা ভাবুক কিংবা লাজুক, তাদের লেখক হওয়া উচিত ছিল। কাকিমা মুখ খোলেন। গোর্কী আর লেনিন কি এক?

তাড়াতাড়ি খেয়ে উঠে পড়ে মুক্তি। কোন গোলমাল নেই। দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট। ইনিই হলেন তিনি। ব্যবহারিক প্রয়োগের বাইরে জীবনের

আর সব তাৎপর্যই যেখানে বাহুল্য। স্টেইনলেস একটুকরো ইস্পাতের মতোই কাকিমার মূর্তিখানা তার সামনে তখন চকচক করছে। কিন্তু কাকিমা কি পারবেন সত্যি-সত্যি মা'র মতোই সংসারজীবন যাপন করতে? না-কি এটাও একটা অভিনয়? মুক্তির চিন্তা-জগতে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়।

......মুক্তি, শুয়ে পড়েছিস মুক্তি?

একান্ত সাদাসিধে গৃহপালিত জীব তখন সে। শীতের আমেজে ঘুমও এসে পড়ে দেখতে দেখতেই। দিব্যি বাবার হোটেলে খাও আর রামগিরি গাও। গোপনে 'চরিত্রহীন' নয়তো 'পথের দাবী'র পাতাও উল্টে যেতে পার।

মুক্তি ঘুমিয়ে পড়লি? দরজায় আঘাত করেন কান্তিবাবু—তার কাকা।

কোন সাড়া-শব্দ নেই। জানালা দিয়ে হাত গলিয়ে মশারিতে টান দিলেন তখন।

ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে মুক্তি—কে?

দরজা খোল। একটা বই নেব তোর ঘর থেকে।

এ্যালজাবরা? দরজা খুলেই সামনে দাঁড়ায় মুক্তি। বীজগণিত কিছুতেই তার মাথায় ঢুকতে চায় না।

ভলিয়্যুমটা একেবারে শূন্যে নামিয়ে দিলেন কাকা। বই নয়। একটা কাজ করতে হবে। চটপট তৈরি হয়ে নে। খুব সাবধানে সফল হয়ে ফিরে আসা চাই। ধরা পড়লে মাথা উড়ে যাবে। ন'টা দশে গাড়ি। হাতীপোতার মধ্য দিয়ে হাঁসখাওয়া পৌঁছে দিবি একজনকে। তার পর একটু থেমে বললেন ট্রেনের যাত্রী তোরা—মামাবাড়ি যাচ্ছিস। কেবিনরুমের কাছেই আছে জলের কল।

ভারতে এই প্রথম

৩৫ মিঃ মিঃ বাড়ীর জন্য সিনে প্রোজেক্টর বাড়ীতে বসিয়া আসল সিনেমা দেখার আনন্দ উপভোগ করুন। আপনার পছন্দমত চলচ্চিত্র সাধারণ ঘরের ভিতর পর্দায় টর্চ অথবা ইলেকট্রিক উভয়ের সাহায্যেই দেখিতে পারিবেন। আপনি যেরূপ সিনেমা হলে দেখেন সেইরূপ পূরা মাপের ছবি পর্দার উপর নড়িবে অভিনয় করিবে এবং নাচিবে। স্পেশাল কোয়ালিটি ৪০্ টাকা বিনামূল্যে ১ রীল ফিল্ম, অতিরিক্ত ফিল্ম প্রতি মিটার ১্ টাকা।

Rolex India (B. C.—44)
P. Box. 1574, Delhi-6.

হাত-মুখ ধুয়ে নিবি তাতে। একটা কালো রুমালে মুখ মুছতেই সে তোর কাছে এসে দাঁড়াবে। চোখে রোল্ড-গোল্ডের চশমা। ক'টা বাজে বলতে পারেন? প্রশ্ন করবে তোকে। তখন বুঝবি এই তোর লোক। সঙ্গী একজন থাকবে। কোন প্রয়োজন নেই তাকে দিয়ে। ঘড়ি দেখে বলবি দশটা বাজে নি। হাতীপোতায় খুব সাবধান। জোতদার পুলিশের প্রহরা এড়িয়ে যেতে হবে। ধরা পড়লেই পুঁতে ফেলবে একদম। একটানা বলে গেলেন তিনি।

দোটানায় পড়ে হাবুডুবু খেয়ে চলল মুক্তি। যত সৃষ্টিছাড়া কাজ, সব তার কাকার। এতদিন ছিল বে-আইনী বইয়ের কারবারে, কিংবা থানার গায়ে গোপনে পোস্টার সাঁটা, আজ সোজা বে-আইনী মানুষ। যাক বাবা, কাজ দিয়ে কথা। যার খুশি সে মাথা ঘামাক গিয়ে।

এই নে টর্চ, রুমাল আর ঘড়ি। স্টেশনে গিয়ে অপেক্ষা কর।

কালবিলম্ব না করেই ছুটতে শুরু করল মনে আছে তার। পথটা হ্রস্ব কি দীর্ঘ, আলো কিংবা অন্ধকার খেয়াল করবার পূর্বেই ফুরিয়ে গেল। তবে প্রচন্ড একটা কৌতূহল দ্রুত থেকে দ্রুততর গতিতে টেনে নিয়ে যায় তাকে। কি লোক, বাড়ি কোথায়, জেল-পলাতক কি না তাই বা কে জানে? স্বদেশী ডাকাত তো নয়?

ক'টা বাজে? মুক্তির ঘড়িটা লক্ষ্য করেই কে একজন প্রশ্ন করে। রুমালটা হাতে ধরে হাঁ করে চেয়ে থাকে মুক্তি। এ যে দেখছি মহিলা? তবেই সেরেছে! দশটা এখনও বাজে নি, কথাটা বলতেই ঘাম বেরিয়ে গেল তার। আধা-ঘোমটার আড়াল থেকে যতটুকু দেখতে পাওয়া যায়; চকচকে একজোড়া সোনালী চশমা সেখানে জ্বল জ্বল করছে। বহু কষ্টে নিজেকে সামলে নিল সে।

একটু যদি এগিয়ে দিতেন। মহিলা অনুরোধ করেন।

চলুন। বেশ লম্বা দেখতে। ঘোমটার জন্য একটু বেশি-বেশিই মনে হয়। সঙ্গীটি ঐ ট্রেনেই উঠে পড়ে গিয়ে। গার্ডের হুকুম মিলতেই যা এইমাত্র ছেড়ে দিল। রাস্তাঘাট খুব একটা নেই। জংলী, অসমতল। উঁচু-নিচু খাড়াই-উতরাই। পাহাড়ের ঢিবিও আছে এখানে-সেখানে।

স্টেশন ছেড়ে আধ মাইল যেতে না যেতেই কারা সব পিছু নেয়। বেশ টের পাওয়া গেল। একটু দূরে দূরে থেকেই অনুসরণ করে তারা। বাঁকটা ঘুরতেই সোজা রাস্তায় সামনে এসে দাঁড়ায় কয়েকজন। সাদা টুপি, হাতে কলম আছে প্রত্যেকের। কিন্তু মহিলা দেখতেই পথ মুক্ত করে দিল।

সাহসে ভর দিয়ে পা চালায় মুক্তি। যার নাম হাতীপোতা। ধরা পড়লে পুঁতে ফেলতে কোন বাধা নেই। মিথ্যে বলেন নি কাকা। স্যান্ডেল খুলে জোরে পা চালান দরকার। সঙ্গিনীকে লক্ষ্য করে তাগিদ দিল সে। যত রাত, ততই বিপদ। বৃষ্টি হতে পারে। শীত শীত মনে হয়। মেঘলা দিনের শীত। আবার সর্বাঙ্গ ঘামে ভেজার দরুণও হতে পারে। একটা খস্ খস্ শব্দে চমকে ওঠে তারা। শেয়াল-টেয়াল হবে। সাহস সঞ্চয়ের জন্য মুক্তি বলল।

কে যায়? অন্ধকারের বুক চিরে কোথায় যেন বজ্রপাত ঘটল।

আমরা। মুক্তি জবাব দিল।

আমরা কারা? ডবল রেটে পাল্টা ধমক প্রতিধ্বনি তোলে। অন্ধকারের বুক চিরে নীরব জংলী পথে আসন্ন সংকট মাথা চাড়া দেয়।

হল্ট। একদম মিলিটারীমার্কা হুকুম। যা শুনলে আপনা থেকেই বুকের স্পন্দন বন্ধ হয়ে আসে। ডানা-ঝাপটে একটা পেঁচা হঠাৎ উড়ে গেল। লক্ষ্মী না অলক্ষ্মী তা কে বলবে? বেগতিক ইঙ্গিতটা সেও ধরতে পেরেছে। অনেকগুলো পাতা ঝরে পড়ল তার সাথে।

স্টেশনের যাত্রী। জবাব দিল মুক্তি। আট-দশটা টর্চের আলো এসে আচমকা আছড়ে পড়ে এক সঙ্গে। উপরে-নিচে, ডানে-বাঁয়ে কেবল আলোর মেলা। ঝপ্ করে গাছ থেকে লাফ দিয়ে পড়ল আর একজন। বন্দুকধারী সে। হ্যান্ডস্ আপ্। একটা বাজখাঁই গলায় কম্যান্ড করে যে।

দম বন্ধ হয়ে আসছে মুক্তির। দু'হাত তুলে গৌরাঙ্গ অবতার ধারণ করেও পরের চিন্তা পেয়ে বসে তাকে। ডান্ডা দিয়েই মাথাটা দু'ভাগ করে, না চোখ দু'টোই উপড়ে নেয়, তা কে বলতে পারে? চোখের কোণে জল এসে গেল তার। কেঁদেই ফেললে এর পর আর একটু হলে। সংগ্রাম না অনাসক্তি যত। কাকার তো আর কাজ নেই। এখন উপায়?

কোথায় যাবেন আপনারা সত্যি করে বলুন।

হাঁসখাওয়া। মামাবাড়ি। ভাঙা গলায় মুক্তি জবাব দেয়।

এত রাত্রে কেন? আরো একটা প্রশ্ন হলো।

গাড়িই তো আসে ন'টার পর। রাস্তায় তো কোন দেরি করি নি। আরো কি সব জবাবদিহি করার চেষ্টা করে সে। কিন্তু হয়ে ওঠে না।

মিনষে একটু চেঁচা না রে। এই গাঁয়ে কি ভদ্দরলোকও নেই, পথে-ঘাটে যারা মা-বোনেদের ইজ্জৎ রক্ষা করতে পারে? অকস্মাৎ ফেটে পড়লেন মহিলা।

মাইন বিস্ফোরণের মতোই বিপর্যয় ঘটলো এতক্ষণে। হাতের টর্চ মাটিতে পড়ে যায় একজনের। সাপ দেখে ভয় পাবার মতোই ছিটকে পড়ে তারা। এ যে দেখছি মহিলা! বলেই ফেলল একজন।

সেটা বলবেন তো! কম্যান্ডার আপশোস করে বলেন। ইনি আপনার স্ত্রী?

মুক্তিকে ছাড়াই অনায়াসে তার মাথাটা নড়তে থাকে তখন। ভাবজগতে যার সহজ অর্থ দাঁড়ায় হ্যাঁ। মুখের শব্দ তখন বন্ধ হয়ে গেছে। তালুতে টান ধরেছে গিয়ে।

আমরা মনে করলাম এত যখন লম্বা, তখন কিছুতেই পুরুষ না হয়ে পারে না। নিশ্চয়ই পালিয়ে যাচ্ছে কেউ। যান আপনারা। এই গ্রামে আর কোন ভয় নেই আপনাদের। হুইসিল বাজতেই দুটি যুবক এসে স্যালুট করে দাঁড়ায়। হাঁসখাওয়া পৌঁছে দিয়ে আসবে। অর্ডার হলো তাদের প্রতি।

হাত নামাব কি? প্রশ্ন করে মুক্তি।

ওঃ নিশ্চয় নিশ্চয়! ভুল হয়ে গেছে। অধিনায়ক দুঃখ প্রকাশ করেন। মনে কিছু করবেন না। অযথা হয়রান হলেন আপনারা। যা দিনকাল দেখতেই পাচ্ছেন।

নমস্কার। আমার মামার নাম......।

থাক থাক সে আর বলতে হবে না। দলনেতা পিছু হটলেন এর পর। আগে-পিছে প্রহরার মধ্যে চলতে থাকে তারা। মুক্তি এবং তার সহধর্মিণীরূপী পথের সঙ্গী।

স্যাণ্ডেল পায়ে দিন। বলল প্রহরীদের একজন। এভাবে দেখলে আর অভিযোগের অন্ত থাকবে না। আমরাই বাধ্য করেছি মেয়েদের পর্যন্ত খালি পায়ে চলতে—প্রচার চালাবে ওরা। যা সব মিথ্যে কথা রটায় ভাবতেও পারবেন না আপনারা।

তা বলুক গিয়ে। আপনারা তো সত্যি সত্যি খারাপ ব্যবহার করেন নি।

মুক্তি সায় দিয়ে বলল, এই গ্রাম দুটোতে খুব মারামারি তাই না?

মারামারি কি বলেন? খুনোখুনি বলুন। আমরা সাদা টুপি, ওরা লাল। আমরা বলি জমি যার, লাঙল তার—ওরা বলবে লাঙল যার জমি তার। আমরা বলব সমস্ত জোতদার এক হও, ওরা বলবে সমস্ত চাষী এক হও। সুতরাং বুঝতেই পারেন—কে যে কাকে খতম করে নিশ্চয়তা নেই। যাচ্ছেন যখন সবই দেখতে পাবেন। অন্ধকারে একটা তীর এসে লাগলেই হলো। আর যাব না আমরা। এটাই সীমানা।

পিছু হটে তারা।

কে যায়? সাঁই সাঁই শব্দে কয়েকটা তীর পাশ কেটে চলে যায়। হিস্ হিস্ শব্দ হতে থাকে কানের মধ্যে। মুক্তি দাঁড়িয়ে পড়ল। হাঁসখাওয়া থেকে এগিয়ে আসে কয়েকজন। লাঠি হাতে লাল টুপির দল। চকমকি ঠুকে মশাল ধরায় তারা।

কমরেড! মাথার ঘোমটা ফেলে দিলেন মহিলা। কপালে সিঁদুর দূরের কথা একগাছা চুড়িও নেই হাতে। মুক্তি তিন পা পিছু হটে দাঁড়ায়। হাজার হোক মায়ের জাত, মহিলা তো!

লাল সেলাম কমরেড। অভিনন্দন জানায় আগন্তুকের দল দলনেত্রীকে দেখতেই।

লাল সেলাম। দলনেত্রী জবাব দিলেন পাল্টা অভিনন্দনে।

নির্বিঘ্নেই আসতে পারলেন? আমাদের ভয়ের অন্ত ছিল না। খুন করে ঝরণার জলে ভাসিয়ে দিত টের পেলে পর।

তা দিত। এখন তৈরি হয়ে নিন। আজ রাত্রেই পুলিশী অপারেশন ঘটবে। স্টেশনটা ছেয়ে গেছে সশস্ত্র পুলিশ-বাহিনীতে। এক গাড়িতেই এলাম। হোক যুদ্ধ, যুদ্ধ করেই তো বেঁচে আছি। অভিনয়ের সুযোগ ছিল না সেখানে। তবু চেষ্টা করে দেখলাম, সুযোগ মিলতেই। তাতেও পাশ করেছি বলা চলে। কি বলেন? মুক্তিকে লক্ষ্য করে বললেন।

বোবা বনে গেছে মুক্তি। কোন সাড়া-শব্দ নেই তার। আর্টিস্টিক চেহারা, মাইক ফিটিং গলা। যাকে বলে তীরন্দাজ মেয়ে। ইনিই শ্রীমতী সেন, বিখ্যাত বিপ্লবী?

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

তীব্র গরলে জর্জরিত ভিয়েৎনাম

এ্যাডাম হপ্‌কিন্স

(কম্যুনিস্টদের হাত থেকে গণতন্ত্রকে রক্ষার নামে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের অতি বিশ্বস্ত পেন্টাগন দক্ষিণ ভিয়েতনামে উদ্ভিজ্জ, বনজ ও জলজ সম্পদের কি সর্বনাশ করেছে তার ভয়াবহ কাহিনী মার্কিন বিজ্ঞানীদ্বয় গর্ডন ওরিয়ান্স ও এগবার্ট ফাইফার সম্প্রতি মার্কিন দেশের "সায়েন্টিফিক রিসার্চ" পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। তাঁদের কাহিনীর মোটামুটি অংশ বৃটিশ সাংবাদিক মিঃ এ্যাডাম্ হপ্‌কিন্স্ লন্ডনের "দি সানডে টাইমস্" পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। মিঃ হপ্‌কিন্সের রিপোর্তাজটির বাংলা তর্জমা করা হয়েছে। —অনুবাদক)

ভিয়েতনামে মার্কিন স্প্রে অর্থাৎ সূক্ষ্ম কুয়াশাচ্ছন্ন নলাকারে সেচন করার জন্য বিমানগুলো সব সময়েই লতা, গুল্ম ও বৃক্ষ ধ্বংসকারী তরল বিষে বোঝাই থাকে। এসব বিষের নাম হলো "অরেঞ্জ", "ব্লু" অথবা "হোয়াইট"। অরেঞ্জ দামে সস্তা বলে খুবই জনপ্রিয়। খুব সকালে এগুলো ছিটানোর প্রশস্ত সময়, কারণ এ সময়ে রোদের তেজও থাকে কম আর হাওয়াও বয় ঝিরঝিরে। ঠিক এই সময়েই বিমান হতে এই সব গরল ছিটিয়ে দিলে লক্ষ্যস্থলে ভাল কাজই হয়। লক্ষ্যস্থলের বাইরে ক্ষতি হয় না। এ সবের লক্ষ্যস্থল হলো গভীর বন-জঙ্গল। কেন না, এইসব জায়গায় ভিয়েতকঙ্ বাহিনীর লোকজনেরা লুকিয়ে থাকে। বন-জঙ্গলের ওপরে দু'-তিন মাত্রা গরল ছিটিয়ে দিলে পাতা এ বিষ শুষে নেয়। দিনকয়েক পরেই জঙ্গলের ঝোপঝাড় আর বড় বড় গাছ মরতে শুরু করে। ঘাস আর ধান খুব তাড়াতাড়ি মরে যায়।

এসব হলো খোলাখুলি ব্যাপার। মার্কিন সামরিক বিভাগের যুক্তি হলো—বৎসর দেড়েকের মধ্যে আবার এসব গাছ গুল্ম লতা জেগে উঠবে। তাদের মতে এতে নাকি সরাসরি মানুষ ও পশুর কোন ক্ষতি হয় না। মার্কিন বিজ্ঞানীদ্বয় গর্ডন ওরিয়ান্স এবং এগবার্ট ফাইফার এক পক্ষকাল দক্ষিণ ভিয়েতনামের ক্ষতিগ্রস্ত এলাকাগুলো ঘুরে এই সিদ্ধান্ত করেছেন যে, সামরিক বিভাগের স্বীকৃতির চেয়ে ক্ষতির পরিমাণ অনেক-অনেক বেশি।

এক-একটি স্প্রে বিমানের ট্যাংকে এক হাজার গ্যালন গরল থাকে। উড়ন্ত বিমানে কোন বিঘ্ন ঘটলে বিমান চালক ত্রিশ সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যেই ট্যাংক হতে এই হলাহল উজাড় করে নিচে ফেলে দিতে পারে। বিজ্ঞানীদ্বয় এক সর্বনাশা অভিযানকালে লক্ষ্য করে দেখেছিলেন যে, বিমানের হোস্ পাইপ্ খারাপ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিমান চালক নিমেষের মধ্যেই ট্যাংক হতে গরল নিঃশেষ করে ফেলে দেয়। বাতাস জোরে বইলে এ গরল ছিটানো নিষিদ্ধ করা হলেও অধিকাংশ বিমানচালক এতে কান দেয় না।

এই গরল ছিটানোর ফলে যে ক্ষতি হয়েছে তার হিসাব কষে বিজ্ঞানীদ্বয় বলেছেন—"সায়গনের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে যে বিপুল অরণ্য-সম্পদ রয়েছে তার ওপরে বারকয়েক গরল ছিটানোর ফলে অরণ্যের সম্ভবত ২০ হতে ২৫ শতাংশ অঞ্চল ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আর এখানকার ৫০ শতাংশ সেগুন গাছ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। সামরিক বাহিনী অস্বীকার করলেও এখানকার রবার গাছেরও ভীষণ ক্ষতি হয়েছে। বেন্ কুই অঞ্চলের আড়াইশো একর জমির যাবতীয় রবার গাছ ১৯৬৫ সালেই ধ্বংস করা হয়েছে। ফলে গোটা দেশের রবার উৎপাদনের পরিমাণ ১৯৬০ সালে প্রতি একরে যেখানে ছিল ২৩৪৫ পাউন্ড ১৯৬৬ সালে হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ১৬৬৮ পাউন্ড।"

আমবাগানের ক্ষতি করা হয়েছে সর্বাধিক। মার্কিন মুল্লুকে শিক্ষণপ্রাপ্ত জনৈক জীববিৎ বলেছেন একটি আমবাগানের গাছে তিন বৎসর আগে বিষ ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিন বৎসর পরেও এসব গাছে মুকুল ধরে নি বা নতুন পাতাও গজায় নি। জলা জায়গায় ভিয়েতকঙ্ বাহিনীর লোকজনেরা যাতে লুকিয়ে থাকতে না পারে তার জন্য লতানে গাছের পাতা বহু আগেই নষ্ট করা হয়েছিল, কিন্তু আজও এসব গাছে নতুন পাতা গজায় নি।

বিজ্ঞানীদ্বয় বলেছেন—লতাপাতাহীন এলাকায় মানুষের অবস্থাও মর্মান্তিক হয়ে উঠেছে। এ সব অঞ্চল হতে জাতীয় মুক্তিবাহিনীর জনাকয়েককে ধরে নিয়ে আসা হলে দেখা গিয়েছে খাদ্যের অভাবে এদের দেহ কংকালসার হয়ে গিয়েছে। জাতীয় মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে মার্কিন বাহিনী যে "সম্পদে বঞ্চনা" কার্যক্রম নিয়েছিল এই গরল তা' সার্থকনামা করেছে। গোটা অঞ্চলের নর-নারী-শিশু কংকালসার হয়ে উঠেছে।

নিঃপাতা অভিযানে জীব-জন্তুর প্রত্যক্ষ ক্ষতি হয় না বলে মার্কিন-বাহিনী দাবি করেন, কিন্তু বিজ্ঞানীদ্বয় এ দাবি সম্পর্কে পুরোপুরি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা একদা বন্য জন্তুর আস্তানা বলে পরিচিত সায়গন নদীর ব-দ্বীপের বিল ধরে পাহারাদারী নৌকোযোগে যাচ্ছিলেন। লক্ষ্য করে দেখলেন—এই বিলে একটিও পোকা-মাকড় ও ফলভোজী পাখী নেই। বিলে বিচরণ করছে উত্তর হতে উড়ে আসা বসন্তের সোয়ালো পাখী। আর রয়েছে এক বিরাট কুমীর।

নদী-নালা-পুকুরে কোথাও মাছ নেই। এক অজ্ঞাতনামা রোগের আক্রমণে মরে উজাড় হয়ে যাচ্ছে। এ যে কি রোগ আর এর প্রতিকারই বা কি—কেউই তা' ঠিক করতে পারছেন না। খাদ্যের তীব্র অভাবের জ্বালায় গাঁয়ের গরীব মানুষ এসব মাছ খেতে বিস্বাদ হলেও খেতে বাধ্য হচ্ছে।

হলাহল নিয়ে খেলা করতে গিয়ে ভিয়েতনামে বাস করার মত সুস্থ পরিবেশই নষ্ট করা হয়েছে। বিজ্ঞানী-

ন্বয় চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন যে, সায়গনকে শহর বানাতে গিয়ে যা' করা হয়েছে তার ফলে এখানকার বাতাস হয়েছে বিশ্রী দুর্গন্ধে দূষিত। প্রধান প্রধান সড়কগুলোর দু' ধারের গাছ মরে গিয়েছে ও মরে যাচ্ছে।

বি-৫২ বিমানের সাহায্যে গ্রামদেশে বোমা ফেলে ক্ষেত-খামারে পথে ৩০ ফুট গভীর আর ৫৪ ফুট চওড়া গর্ত করে দেওয়া হয়েছে। এ ধরণের গর্তের সংখ্যা হলো প্রায় ২৬ হাজার। ১৯৬৮ সালেই এই গর্তগুলো করে দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞানীদ্বয় বলেছেন যে, সরকার হতে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে বাঘ শিকার নিষিদ্ধ করায় বাঘের বংশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত ২৪ বৎসর ধরে এই জন্তুগুলো গোলাগুলির শব্দের সঙ্গে বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছে। কামান, রাইফেলের শব্দ শুনে এরা উল্লসিত হয়। বুঝেছে যুদ্ধ চলছে। মানুষ মরবে। তাদের শবদেহের মাংস খেতে পাবে। খাদ্যের অভাব হচ্ছে না। যথারীতি বংশ বৃদ্ধি হচ্ছে।

সর্বাপেক্ষা ভয়াবহ সংবাদ হলো—সায়গন সরকার অথবা মার্কিনবাহিনীর অফিসারেরা কেউই ভিয়েতনামীদের আজও বলে নি—কী ধরণের বিষ তারা ভিয়েতনামে ছিটিয়ে দিচ্ছে আর এর পরিণামই বা কি।

অনুবাদ : শ্রীললিত হাজরা

লিপটনের
হিমালয়ান
গোল্ডেন ডাস্ট
গুঁড়ো চা

হিমালয়ান গোল্ডেন ডাস্ট গুঁড়ো চা যে খেয়েছে সেই মজেছে। যেমনি রংদার গাঢ় লিকার, তেমনি স্বাদে গন্ধে ভরপুর। চা হবে কাপের পর কাপ। খেয়ে তৃপ্তি, খাইয়ে তৃপ্তি।
অন্য সব গুঁড়ো চা-কে টেক্কা দেয় হিমালয়ান গোল্ডেন ডাস্ট।

LIPTON
লিপটন বলতেই ভালো চা

LHGC-8BEN

[পূর্বানুবৃত্তি]

এঁকেবেঁকে চলে গেছে নদীর কিনার বাঁধ আবাদের পাশে পাশে—কখনো বা পুবের নদীঘেঁষা জালপাই জঙ্গল ছুঁয়ে, কখনো বা ঢুকে পড়েছে জঙ্গলে। কখনো বা বাদাবনের পাশ দিয়ে। শিকারী কুকুরের তীক্ষ্ণদৃষ্টি নিয়ে সামনের দুটি মানুষকে একভাবে অনুসরণ করে চলেছে ভলু। প্রায় ক্রোশখানেক পার হয়ে গেল। ভলুর হুন্দার সীমানা শেষ হয়ে গেল। তবু চলার বিরাম নেই। ভলুর কানে এসে লাগছে সামনের লোক দুটির নিচু গলার আলাপ—অস্পষ্ট, জড়ানো। ওদের মধ্যে কে সেই তাঁতীসাহির তাঁতী—বোঝবার উপায় নেই। এদিকে অন্ধকার যেন ক্রমশ গাঢ় হয়ে আসছে। দিগন্তের বনসীমায় অন্তর্হিত খণ্ডচাঁদ বোধ করি আকাশে ছড়ানো কৃপণ ফিকে আলোটুকুও তখন গুটিয়ে নিচ্ছে।

প্রায় ক্রোশ দেড়েক এসে সামনের লোক দুটি থামল। কিনার বাঁধ থেকে ডানহাতি আর একটা ভেড়ি বাঁধ চলে গেছে চরের ভেতরে।

একজন বলল, "এইখানে। এই রাস্তা। সাবধানে নামো।"

পেছনে এক ঝোপের আড়াল থেকে ভলু মাঝি লক্ষ্য করতে লাগল ওদের গতিবিধি। উঁচু কিনার বাঁধ থেকে ওরা নিচু ভেড়ি বাঁধে নামল। বাঁধে বাঁধে এগিয়ে চলল চরের ভেতরে। ঝোপের আড়ালে ভলু অপেক্ষা করতে লাগল। সামনের লোক দুটি যখন বেশ একটা নিরাপদ দূরত্বে চলে গেল, তখন আড়াল থেকে বেরিয়ে সে-ও ভেড়ি বাঁধে নামল। জায়গা তার সবই চেনা। বৌমাবির চর। অন্ধকারে লোকালয়—কিষাণ বসতি কিছুই দেখা যায় না, বাঁধের দু' পাশে ছড়ানো ধেনো আবাদ। সামনের লোক দুটির গতিবিধি দেখে সে সহজেই বুঝতে পেরেছে—ওরা চলেছে চরের কিষাণ বসতির দিকে। সন্তর্পণে সে অনুসরণ করে চললো। তার মতলব—আজ শুধু সে অলক্ষ্যে ওদের আস্তাটা দেখে যাবে। যা হওয়ার—কাল হবে।

কিন্তু প্রতি মুহূর্তেই তার ভয় হচ্ছিল—এই বুঝি তাকে দেখে ফেলে। ভেড়ি বাঁধে আড়ালের কোনো ঝোপঝাড় নেই। কচিৎ কখনো দু-একটা বাবলাগাছ তার শীর্ণ ডালপালা মেলে দাঁড়িয়ে আছে। তাতে আড়ালের কোনো সুবিধে নেই। বাঁধের কোলে ধানক্ষেত—কিন্তু সেখানেও হেমন্তের ধানগাছ নুয়ে পড়েছে ফসলের ভারে। লম্বা ছ' ফুটের ওপর শরীরটাকে সেখানেও আড়াল করবার সুবিধে নেই। তবু সে বাঁধ থেকে নেমে বাঁধের ঢালু গায় গায় ক্ষেতের পাশ দিয়ে তার লম্বা লাঠিতে ভর দিয়ে এগোতে লাগল সন্তর্পণে। যেন গুঁড়ি মারা জাগুয়ার।

চাঁদ বোধ করি ডুবে গেছে। একেবারে ঘুটঘুটি অন্ধকার। সামনের লোক দুটো যেন ক্রমশ মিশে যাচ্ছে অন্ধকারে—শুধু শাদা কাপড়ের আভাসটুকু ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। সামনে ভেড়ি বাঁধ বেঁকে গেছে উত্তরে—সেই বাঁকের কাছে এসে লোক দুটোকে আর দেখাই গেল না। শুধু কানে ভেসে এল—পায়ে জল কাটার ছপ্‌ছপ্‌ শব্দ। ভলু বুঝতে পারল—লোক দুটো কোথাও সামনে জলে নেমেছে।

জলনিকাশীর জন্য চাষীরা বোধ করি বর্ষার সময় ভেড়ি বাঁধ কেটে দিয়েছে এক জায়গায়। সেই কাটানের কাছে এসে ভলু থমকে দাঁড়াল। জলে পা দেওয়ার আগে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে দেখলে—লোক দুটো যেন ক্রমশ অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ব্যস্ত হয়ে সন্তর্পণে সে জলে পা দিল। জলটুকু পার হতে গিয়ে ছপাৎ ছপাৎ করে শব্দ উঠল। সে শব্দ নিঃসাড় নিঝ্‌ঝুম রাতকে যেন চম্‌কে দিলে।

চম্‌কে উঠল সামনের দুটো লোকও। আগেও একবার তাদের মনে হয়েছিল—কে যেন পেছনে আসছে। এবারে পায়ে জল ভাঙার শব্দ শুনে তারা থমকে দাঁড়াল। ধানগাছের আড়াল থেকে ঝুঁকে ঝুঁকে দেখতে লাগল। দেখতে পেল। বাঁধের কোলে কোলে ধানক্ষেতের পাশ দিয়ে গুঁড়ি মেরে আসছে কে যেন।

"কে! কে ওখানে!"

ভলু ঘাবড়ে গিয়ে বসে পড়ল।

ওরা দেখতে পেয়েছে। বলল, "বসে পড়ল!"

"ব্যাপার সুবিধার নয়।"

চাপা গলায় কি যেন ওরা বলাবলি করল। তারপর ছুট।

শেষ রক্ষা হলো না—সব মতলব ভেস্তে গেল। লুকোচুরি আর নিষ্ফল

সাধনা
বিউটি স্নো-এর
কোমল স্পর্শে
সৌন্দর্য্য বিকশিত হয়
সাধনা বিউটি স্নো
•একটি অতি আধুনিক অঙ্গরাগ
ত্বক মালিন্যমুক্ত ও লাবণ্যযুক্ত
করে। মুখশ্রীতে লালিত্যের ও
তারুণ্যের আভা ফুটে ওঠে।
SBS-2/69
সাধনা ঔষধালয় কলিকাতা-৫
SADHANA
Beauty
Snow

ভেবে ভলু লাঠি বাগিয়ে লাফ দিয়ে বাঁধে উঠল। পেছন থেকে হাঁকড়ে উঠল, "হেই —খাড়াও'।"

কেউ খাড়া হলো না। হাঁকড়ানো শুনে অন্তত একজন চিনে ফেলেছে—পেছনে তাদের কে তাড়া করে আসছে। ওরা প্রাণপণে ছুটতে লাগল। তিন জোড়া পায়ের শব্দে নিঃসাড় আবাদ সহসা সচকিত হয়ে উঠল।

লোকালয়—কিষাণ বসতি তখনো অনেক দূরে। বাঁধে বাঁধে সেদিকে ছুটে যাওয়া নিরাপদ নয়। প্রতি মুহূর্তে যেন মাঝখানের ব্যবধান কমিয়ে আনছে পেছনের লোকটা। তার চেয়ে নদীর কিনার বাঁধ—জালপাই জঙ্গল আর বাদাবন কাছে। সামনের লোক দুটো সেই দিকে বাঁক নিল। বাঁধে বাঁধে তাড়া খেয়ে পেছনের লোকটার সামনে সামনে কতক্ষণ ছুটবে। তার ওপর একজন হাঁপিয়ে পড়ছে। একটু একটু করে পেছিয়ে পড়ছে। তার বয়স হয়েছে। এখন আড়াল দরকার।

"নেমে যাও—জলায় নেমে যাও!"

একজন সর্‌সর্‌ করে জলায় নেমে ধানগাছের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর একজন ছুটে বেরিয়ে গেল কিনার বাঁধের দিকে।

অন্ধকারে দেখা যায় না ভালো করে। ভলুর মনে হলো—উঁচু কিনার বাঁধের ওপরে ছায়ামূর্তির মত শুধু একটা লোককেই যেন দেখতে পেল। তার পরনের শাদা কাপড়ের নিশানাটুকু সোজা ছুটে চলেছে কিনার বাঁধ ধরে আবার উত্তরে —যেখানে জালপাই জংগল এসে ছুঁয়েছে কিনার বাঁধ। দেখতে দেখতে সে যেন বনের অন্ধকারে কোথায় মিলিয়ে গেল—বাঁধের ওপরে দুপ্‌-দাপ্‌ পায়ের শব্দও আর শোনা গেল না।

কিন্তু আর একটা লোক কোথায় গেল? সে যেন চরের অন্ধকারে কোথায় মিলিয়ে গেছে। উঁচু কিনার বাঁধের ওপরে দাঁড়িয়ে ভলু মাঝি ভালো করে চোখ চারিয়ে দেখতে লাগল।

না, কোথাও সাড়া নেই—শব্দ নেই, ছায়া নেই, বাতাস নেই। আলো নেই। যত দূরে চোখ যায়—শুধু আবাদ আর আবাদ। সারা বৌমারির চর নিশুতি রাত্রির কোলে যেন ঘুমোচ্ছে।

তাকে বোকা বানিয়ে হাতের শিকার হাত-ছাড়া হয়ে গেল। ভাগ্যের পুরস্কার একেবারে হাতের মুঠোয় এসে ভোজবাজির মত কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। রাগে ভলুর চোখ জ্বলতে লাগল, কপালের শিরা দপ্‌ দপ্‌ করতে লাগল। হিংস্র ক্ষুধার্ত চিতার মতো উঁচু কিনার বাঁধের ওপরে দাঁড়িয়ে রাগে ক্ষোভে গর্‌গর্‌ করতে লাগল।

তার ধারণা হলো—যে ছুটতে পারে সে ছুটে পালিয়ে গেছে। আর যে ছুটতে ছুটতে পেছিয়ে পড়েছিল একটু—সে নিশ্চয়ই ওই আবাদের মধ্যে, ধানের শীষের ভারে নুয়ে পড়া ধানগাছের ঝোপের আড়ালে কোথাও না কোথাও লুকিয়ে আছে। কারণ উঁচু বাঁধের ওপর দিয়ে সে একজনকেই স্পষ্ট ছুটে যেতে দেখেছে।

খানিকটা সরে গিয়ে সে ঘাপটি মেরে বসে রইল। চোখ-কান তার তীক্ষ্ণ—সজাগ। এ যেন তার ধৈর্যের চরম পরীক্ষা। অনেকক্ষণ কেটে গেল—না সাড়া পেল জংগলের দিক থেকে, না আবাদের দিক থেকে।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর হঠাৎ সমস্ত স্নায়ু শিরা তার সজাগ হয়ে উঠল—বুকের রক্ত ছলকে উঠল। কোথায় যেন আবাদের মধ্যে ধানগাছগুলো নাড়া খেয়ে সর্‌সর্‌ করে উঠলো।

ধৈর্য ধরে সে অপেক্ষা করতে লাগল।

হেমন্তের রাত। এক ফোঁটা বাতাস নেই। কিন্তু ধানগাছগুলো কোথায় যেন নাড়া খেয়ে খেয়ে, গায়ে গায়ে ঘষটা লেগে মর্মর করে উঠছে ধীরে ধীরে। অন্ধকারে ভালো করে দেখা যায় না। আকাশে মেঘ নেই—তবু আলো বড় কম। মাথার ওপরে অসংখ্য তারার জমাট ফিকে আলোকপিণ্ড একটা মাটির কুয়াশাকে যেন আরও ঘন-ঘোর করে তুলেছে।

ভলুর মনে হলো—ধানগাছের সেই মর্মর শব্দটা যেন আরও দূরে সরে যাচ্ছে। ক্রমশ দক্ষিণে। ক্রমশ দূরে। গুঁড়ি মেরে ঘষ্‌টে ঘষ্‌টে সে উঁচু কিনার বাঁধের ঢালু বেয়ে আবাদের ভেড়ি বাঁধে এসে নামলো। শব্দ লক্ষ্য করে ভেড়ি বাঁধ ধরে ক্রমশ সে আবাদের ভেতরের দিকে এগিয়ে গেল।

কিছুটা গিয়ে থম্‌কে দাঁড়াল। দেখতে পেয়েছে। নাড়া খাওয়া ধানগাছগুলো একটা রেখার মত এগিয়ে যাচ্ছে ক্রমশ দক্ষিণে—তারপর উঁচু কিনার বাঁধের দিকে। লোকটার উদ্দেশ্য সে বুঝতে পেরেছে। ঘাপ্‌টি মেরে ভলু সুযোগের অপেক্ষা করতে লাগল। ভেড়ি বাঁধ ধরে সে-ও সন্তর্পণে একটু একটু করে এগোতে লাগল।

খানিক পরে সেই মিন্‌মিনে আলোয় সে পুরো মানুষটাকে দেখতে পেল। হামা-গুড়ি দিয়ে লোকটা ধানক্ষেত থেকে বেরিয়ে উঁচু কিনার বাঁধের ঢালু বেয়ে ওপরে উঠছে। ওপরে উঠল। বোধ করি চেয়ে চেয়ে দেখলে—সেই অন্ধকারে একাকার হয়ে যাওয়া জালপাই জংগলের দিকে, যেদিকে একজন অনেকক্ষণ আগে ছুটে গেছে। তার কোনো সাড়া নেই—শব্দ নেই—ইঙ্গিত নেই। সহসা সে দেখতে পেল—নিচে ভেড়ি বাঁধে আর একটা লোক মাত্র হাত কয়েক দূরে ঝুঁকে ঝুঁকে আসছে। আবার সে ছুটল—সোজা দক্ষিণে।

ভলুও ছুটল পেছনে। দেখতে দেখতে লোকটা যেন নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। রাগে গর্‌গর্‌ করতে করতে ভলু তার হাতের লম্বা লাঠিটা অদ্ভুত কৌশলে ঘুরিয়ে সামনের লোকটাকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিলে। লাগল না। লাঠিটা চরকীর মত ঘুরতে ঘুরতে লোকটার বাঁ পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। প্রাণভয়ে লোকটা উঁচু বাঁধের ডানদিকের ঢালু দিয়ে তর্‌তর্‌ করে নেমে গেল আবার ধানক্ষেতের মধ্যে।

লাঠিটা কুড়িয়ে নিয়ে ভলুও তাড়া করে নেমে গেল ধানক্ষেতের ভেতরে।

এখানে ছোটার সুবিধে নেই। ছুটতে গেলেই নিটোল ধানের শীষ চোখে-মুখে ছিট্‌কে এসে লাগে চাবুকের মত। তারই মধ্যে দুটো মানুষ যেন জীবন-মরণ পণ করে এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করছে।

সদ্য প্রকাশিত হইল।

বাঙলা সাহিত্যের অদ্বিতীয় হাস্যরসিক

শিবরাম চক্রবর্তীর গ্রন্থাবলী

গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত

(১) মনের মত বৌ
(২) মস্কো বনাম পণ্ডিচেরি
(৩) প্রেমের পথ ঘোরালো
(৪) প্রেমের বিচিত্র গতি
(৫) রক্তের টান
(৬) যখন তারা কথা বলবে

পৃষ্ঠা ২৪০

মূল্য মাত্র চার টাকা

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড ॥ কলিকাতা-১২

সামনের লোকটা এদিক-ওদিক ছুটতে ছুটতে হঠাৎ সামনে একটা ভেড়ি বাঁধ পেয়ে গেল। ছোটার সুবিধে পেয়ে দুদ্দাড় করে এগিয়ে গেল আরও দক্ষিণে। ধান-গাছের ঝোপ সরিয়ে আসতে আসতে ভলু পড়ে গেল অনেক পেছনে।

লোকটা ছুটতে ছুটতে এসে পড়ল এক ভেড়ি বাঁধের তেমাথায়। বাঁদিক গিয়ে মিশেছে নদীর কিনার বাঁধে, ডানদিক চলে গেছে চরের আরও গভীরে। লোকটা কিনার বাঁধের দিকে যেতে আর সাহস পেল না—বেঁকে গেল ডানদিকে। খানিকটা এসে দূরে দেখতে পেল একটা পুকুর। মনে হলো লোকালয় কাছে। ভেড়ি বাঁধ ছেড়ে সরু একটা আল-পথ ধরে পুকুরের পাড়ে এসে দাঁড়াল। উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগল—কোথাও কোনো শব্দ শোনা যায় কি-না।

না, বাঁধের ওপরে তাড়া করে আসা কারুর পায়ের কোনো সাড়া-শব্দ নেই। পুকুরের আশপাশে ঝোপ-ঝোপ আছে, দু-চারটে বাবলা গাছ গাঢ় অন্ধকার মাথায় করে এদিক-ওদিকে ছড়িয়ে আছে। লোকটা একটা ঝোপের আড়ালে এসে আশ্রয় নিলে। তার চওড়া বুকের খাঁচাটা তখনো হাপরের মতো ওঠানামা করছে। ভোঁতা নাকটা যেন নিশ্বাসের চাপে ফুলে ফুলে উঠছে ঘোড়ার মত। এমন ঠান্ডা হিমেল রাতেও সর্বাঙ্গ তার নেয়ে উঠেছে ঘামে।

ঝোপের আড়ালে অনেকক্ষণ সে উৎকর্ণ হয়ে রইল, ভেড়ি বাঁধের চিকন নোনা মাটির দিকে সতর্ক দৃষ্টি মেলে রাখল। যদি কোনো কালো ছায়া পড়ে সেখানে। না, কোনো ছায়াই সে দেখতে পেল না।

সামনে পুকুরের কাকচক্ষু জল নিঃশব্দে তাকে যেন হাতছানি দিতে লাগল। তার মনে হলো তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে। এমন তৃষ্ণা—জল খাওয়ার এমন ইচ্ছা যেন তার জীবনে কখনো আর হয় নি।

ঠোঁট দুটো শুকিয়ে গেছে—জিভ দিয়ে চাটল। কিন্তু জিভটাও শুকনো। পুকুরের জলের দিকে সে সতৃষ্ণ চোখে চেয়ে রইল। অপূর্ব একটি শান্ত রাতের ছায়া পড়েছে পুকুরের জলে। প্রশান্ত তারা-ভরা আকাশ চেয়ে আছে স্বচ্ছ জলের ভেতর থেকে। চারিদিকের স্তব্ধ হিমেল অন্ধকার যেন গলে জল হয়ে গেছে ওখানে। তার স্নিগ্ধ শীতল বিরামহীন ইসারা ধীরে ধীরে তাকে ঝোপের আড়াল থেকে টেনে বের করে আনল। এখানে প্রকৃতি বড় শান্ত। কোথাও এতটুকু বিরোধ—এতটুকু বিপদের চিহ্নমাত্র নেই।

আকণ্ঠ তৃষ্ণা নিবে লোকটা সন্তর্পণে জলের দিকে এগিয়ে চলল।

হঠাৎ বাতাস-কাটা একটা বনবন শব্দে সে চমকে উঠল এবং চারিদিকের জমাট অন্ধকারে শব্দের উৎসটাকে খুঁজে বার করবার আগেই জলের কিনারে লুটিয়ে পড়ল। একটা সুতীব্র আর্তনাদ লোকটার অবরুদ্ধ গলার কাছে এসে আটকে গেল। একটা লম্বা লাঠি চরকির মতো ঘুরতে ঘুরতে এসে লোকটাকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে পুকুরের জলে ছিটকে পড়ল।

না, এবার আর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি। এবার সিধে একেবারে শিরদাঁড়া ভেঙে দিয়ে গেছে।

খ্যাপা জানোয়ারের মত লাফাতে লাফাতে ছুটে এল ভলু মাঝি। মুখে দাঁত চাপা আস্ফালন, "জন্মের মত তোর ছোটার সাধ ঘুচিয়ে দেবো শালা।"

কিন্তু মুখ থুবড়ে পড়া লোকটার কাছ থেকে না এল কোনো সাড়া—না এল কোনো শব্দ। কাছে এসে ভলু লোক-টাকে চিৎ করে দিলে। আকাশের মিনমিনে আলোয় তার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ল। এবং লোকটাকে চিনতে পেরে আনন্দে বুকের রক্ত তার চঞ্চল হয়ে উঠল। এই লোকটাকে—তাঁতীসাহির এই আধবুড়ো লোকটাকেই সে চেয়েছিল।

পেয়ে গেল। কিন্তু অসাড়।

মুখ দিয়ে ওগুলো কালো মতো কি বেরিয়ে আসছে? ঝুঁকে দেখল আবার। রক্ত। অন্ধকারে রক্তের রঙ কি কালো দেখায়! লোকটা শেষবারের মত বোধ হয় একবার হাঁ করল। আবার এক ঝলক রক্ত।

ভলু আঁজলা করে জল এনে ওর মুখে দিল। কিন্তু লোকটা আর হাঁ-ও করল না। কাঠ হয়ে পড়ে রইল। আঁজলা আঁজলা জল এনে ওর মুখে চোখে ছিটিয়ে দিলে। ওর হাঁ করা মুখে আবার খানিকটা জল দিলে—জলটুকু বেরিয়ে এল। বন্ধ চোখের পাতা জোর করে টেনে খুলে দিলে—ঘোলাটে স্থির মণির ওপরে পলক আর পড়ল না। বুকের ওপরে কান পেতে শুনলে—বৌমারির চরের স্তব্ধ আকাশ আর নিঃসাড় আবাদের মত, সব সেখানে যেন নিথর হয়ে গেছে।

ভলু হতাশ হয়ে বসে পড়ল। লোক-টাকে জ্যান্ত সে পেল না। সৌভাগ্য হাতের মুঠোয় এসে উবে গেল। একেবারে বমাল সমেত বড় দারোগার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারল না। অনেকক্ষণ বসে বসে সে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল।

লাসটাকে এভাবে এখানে ফেলে রেখে যেতে তার সাহস হলো না। সকালে কাক চিল উড়বে—শকুন উড়বে। চরের মানুষ ঘোঁট পাকিয়ে তুলতে পারে। তাই—ভিনদেশী এ লোকটার সব চিহ্নকে একে-বারে মুছে দেওয়ার জন্য সে তৈরি হলো। হাঁটু গেড়ে বসে লোকটাকে সে কাঁধে তুলে নিলে। তারপর তার লাঠিগাছাটা এক হাতে চেপে ধরে যে পথে এসেছিল সেই পথে ফিরে চলল।

এ জায়গার পথঘাট সব তার চেনা। চরের ভেতরে ভেতরে ভেড়ি বাঁধ ধরে আরও খানিকটা দক্ষিণে এগিয়ে গিয়ে এসে পড়ল সে একটা খালের ধারে। খালের পাশে পাশে এগিয়ে গেল নদীর দিকে।

নদীতে তখন ভাটির টান। অথৈ জলরাশি উন্দাম বেগে ছুটে চলেছে সমুদ্রের দিকে। কাঁধের অনাবশ্যক বোঝাটাকে ভলু মাঝি সবলে ছুঁড়ে দিলে সেই খর-স্রোতের মাঝখানে। দেহটা একবার চিতিয়ে উঠে দুর্নিবার সেই জলস্রোতের মধ্যে কোথায় তলিয়ে গেল।

কাঁধে লাঠি ফেলে চলল ভলু মাঝি খালের ধারে ধারে সোজা পশ্চিমে সেই জেলা বোর্ডের সড়কের দিকে। পেছনে পড়ে রইল বৌমারির চর—ঘুমন্ত, নিঝঝুম।

কোথায় কতকগুলো শেয়াল ডেকে উঠে দুপুর রাতের ঘণ্টা দিয়ে গেল। কুয়াশায় জমজমাট হেমন্তের রাত। অন্ধকার গাঢ়তর।

জালপাই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এল একটা লোক। সন্তর্পণে ফিরে এল আবার সেই অন্ধকার চরের মাঝখানে। চোখ চারিয়ে চারিয়ে খুঁজতে লাগল কাকে। ভেড়ি বাঁধের এপাশ-ওপাশ ঘুরে ঘুরে, কখনো বা আবাদের ভেতরে নেমে সরু আল পথে পথে চাপা গলায় ডেকে বেড়াতে লাগল, "মামু!"......

কেউ সাড়া দিল না।

যে জায়গায় লোকটাকে ফেলে গিয়ে-ছিল তার মনে আছে। বৃথাই সে খানিক-ক্ষণ খোঁজাখুঁজি করলে। তারপর দু' হাতের তালু মুখের কাছে ঢেকে হাঁক পাড়ল, "মা...মু..."

প্রতিধ্বনি শুধু দিগন্তে সাড়া জাগিয়ে তুলল।

এপাশ-ওপাশ অনেক হাঁকডাকের পর উদ্বিগ্ন উৎকণ্ঠিত মন নিয়ে সে ফিরে চলল তার চরের দিকে।

[ক্রমশ]

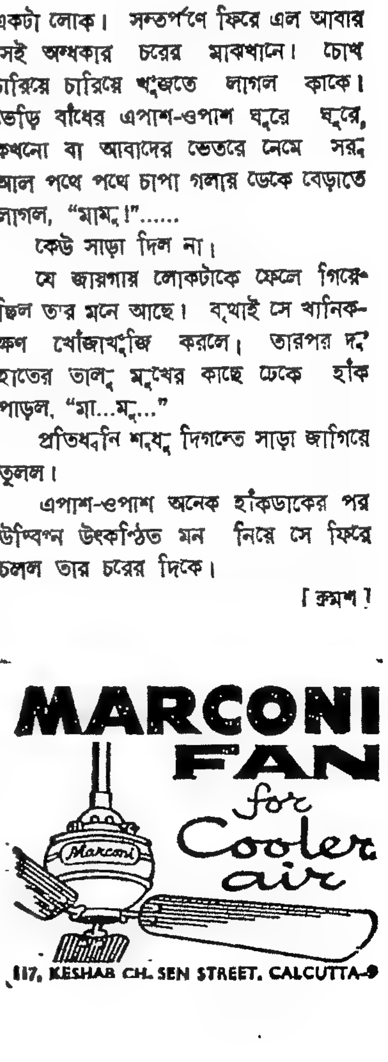

শিল্প • বাণিজ্য • অর্থনীতি

পুঁজিবাদের শোষণচিত্র

গত বাইশ বছরে ভারতবর্ষে বেসরকারী শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি অভূতপূর্বভাবে তাদের মূলধন এবং সম্পত্তি বহুগুণ বাড়িয়ে নিয়েছে। জাতীয় আয়ের যে গাণিতিক আয় বৃদ্ধি মাথাপিছু ধরা হয়, তার বহুগুণ আয় করে নিচ্ছে মনোপলি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানগুলি। সমস্ত ভারতবর্ষে যত বৃহৎ শিল্পোদ্যোগ আছে, তার প্রথম ১০১টি সংস্থার ১৯৬৬-৬৭ এবং ১৯৬৭-৬৮ সালের সম্পত্তির হিসাব নিকাশের একটি ছবি তুলে ধরা হয়েছে। এই হিসাব মত দেখা যায় যে, এই ১০১টি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ১৯৬৬-৬৭ সালে মোট বিক্রয় পরিমাণ ছিল ২১৪৮ কোটি টাকা, ১৯৬৭-৬৮ সালে তা' দাঁড়িয়েছে ২৩৪৫ কোটি টাকায় অর্থাৎ এক বছরেই গড়পড়তায় শতকরা ৯.২ ভাগ বিক্রয় বেড়ে গিয়েছে। আমেরিকা এবং ইউরোপ অথবা জাপানের মত অত্যন্ত অগ্রসর শিল্পপ্রধান দেশগুলিতেও সেইসব দেশের প্রথম সারির শিল্পোদ্যোগগুলিও এত বেশি বিক্রয় বাড়াতে পারে না। কারণ এসব দেশের শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি মোটামুটিভাবে মনোপলি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নয়। অবশ্য এই দেশগুলিতে এমন কয়েকটি সংস্থা আছে যাদের বার্ষিক বিক্রয় আমাদের দেশের ১০১টি প্রথম সারির শিল্পপ্রতিষ্ঠানের মোট বার্ষিক বিক্রয় সংখ্যার চেয়েও বেশি।

বিদেশীয় বৃহৎ শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির বাজার প্রায় সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে। বিদেশী মুদ্রা অর্জন করে এরা এদের প্রতিষ্ঠানকে বড় তো করবেই এবং নিজের নিজের দেশের জাতীয় সমৃদ্ধিকে সামনের দিকে নিয়ে যায়। আমাদের দেশের শিল্পোদ্যোগগুলির কোন বিশেষ চেষ্টা নেই পৃথিবীর বাজারে ঝাঁপিয়ে পড়বার। তার সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে যে, ভারতবর্ষে প্রায় সমস্ত বৃহৎশিল্পের সঙ্গে মার্কিন, বৃটেন, পঃ জার্মানীর পুঁজিবাদী সংস্থাগুলির স্বার্থ ও তৎপরতা জড়াজড়ি করে আছে। এরা কখনই চাইবে না যে, ভারতবর্ষের মত সম্ভারপূর্ণ দেশ ভাল জিনিষ তৈরি করুক প্রভূত পরিমাণে। উৎপাদন যত ভাল এবং বেশি পরিমাণে হবে ততই পড়তা পড়বে কম। উৎপাদনে যদি পড়তা কম হয় এবং জিনিষ ভাল হয় তবে পৃথিবীর বাজারে বিদেশী সংস্থাগুলির সঙ্গে ভারতীয় শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলি মুখোমুখি প্রতিযোগিতায় নামতে পারে। কিন্তু তা' হয় নি এবং হবেও না, যতদিন ভারতবর্ষের শিল্পবিপ্লবের চাবিকাঠিগুলি থাকবে আমেরিকা, বৃটেন, পঃ জার্মানীর মত ভয়ংকর পুঁজিবাদী দেশের অত্যন্ত বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠীর হাতে। এদের সঙ্গে সখ্যতা ও মিত্রতার দোসরে গলাগলি করে শোষণ করে চলেছে দেশী পুঁজিবাদ। বিদেশী পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানগুলি তার যথাযথ ভাগ পাচ্ছে।

প্রথম শ্রেণীর যে ১০১টি শিল্পোদ্যোগের সালতামামি দেওয়া হলো তার মধ্যে টাটা প্রতিষ্ঠান নয়টি কোম্পানীর পরিচালনা করে, এই প্রতিষ্ঠানগুলির সম্পত্তির পরিমাণ হচ্ছে ৪৪২ কোটি টাকা। বিড়লা গোষ্ঠীর হাতে আছে ১১টি কোম্পানী, যার মোট সম্পত্তির পরিমাণ হচ্ছে ৩০৪ কোটি টাকা। এই দুটি প্রতিষ্ঠান একত্রে সমস্ত ভারতের ১০১টি প্রথম সারির শিল্পোদ্যোগের শতকরা ৩০ ভাগ সম্পত্তির মালিকানা ভোগ করে। পৃথিবীতে কোন পুঁজিবাদী দেশেও এইরকম কেন্দ্রীভূত মূলধন একটি কি দুটি পরিবার ভোগ করে না। এই অর্থনৈতিক চিত্রটিই প্রমাণ করছে যে, আমাদের দেশেই পুঁজিবাদের শোষণ সবচেয়ে নির্মম এবং ভয়ংকর। ভারতে কাঁচামাল প্রচুর এবং প্রভূত পরিমাণে আছে। আকরিক ধাতু এদেশে এত বেশি যে, তা' দ্বারা প্রথম শ্রেণীর ইঞ্জিনিয়ারিং, লৌহ ও লৌহেতর শিল্প পৃথিবীর বাজারে যে কোন দেশের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে। কিন্তু তা' হচ্ছে না, কারণ তাতে বিদেশী পুঁজিবাদের ক্ষতি। সেই জন্য তারা দেশী পুঁজিবাদকে ছিটে-ফোঁটা টেকনিকাল কোলাবরেশনের শান্তি-জল দিয়ে শোষণের ভাগ দিচ্ছে। দেশী পুঁজিবাদ হচ্ছে বিদেশীয় পুঁজিবাদের চাটুকার ও স্তাবক। এরাই পরাধীন ভারতবর্ষে ইংরাজের স্তাবক ছিল। এরাই জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে বরাবর বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। স্যার, নাইটহুড, রায়বাহাদুর পদবী দ্বারা ইংরাজ কর্তৃক আপ্যায়িত হয়েছে। আবার এরাই প্রচন্ডভাবে কংগ্রেস সমর্থক হয়ে পড়ে ১৯৪৭ থেকে।

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্ল্যাটফর্মে যারা থাকে, তাদের যদি সমঝোতাটি ঠিক হয়ে যায় তবে ভাগাভাগির প্রশ্নে ভুল বোঝাবুঝি হয় না। সেইজন্যই দেখা যাচ্ছে যে, আমাদের দেশে অর্থনৈতিক প্ল্যাটফর্মের নেতৃত্ব রয়েছে দেশী পুঁজিবাদীদের হাতে এবং এদের চালনা করবে বিদেশী পুঁজিবাদী সংস্থাগুলি। নিচের যে, ১০১টি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সালতামামি দেওয়া হলো সেই প্রত্যেকটি উদ্যোগের সঙ্গে বিদেশী পুঁজিবাদীরা প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে মিলেমিশে রয়েছে।

সংস্থার নাম	১৯৬৭-৬৮ ক্রমিক স্থান	১৯৬৭-৬৮ সম্পত্তি (কোটি টাকা)	১৯৬৬-৬৭ ক্রমিক স্থান	১৯৬৬-৬৭ সম্পত্তি (কোটি টাকা)
টাটা স্টিল—	১	১৮০-১	১	১৭৬-৪
ইণ্ডিয়ান আয়রন—	২	১২০-০	২	১১১-৯
টাটা ইঞ্জিনীয়ারিং ও লোকো (টেলকো)—	৩	১০০-৭	৩	৯২-৫
অবেস ইণ্ডিয়া—	৪	৮৪-৫		
এ্যাসোসিয়েটেড সিমেন্ট—	৫	৮৩-৬	৪	৭২-২

সংস্থার নাম	১৯৬৭-৬৮ ক্রমিক স্থান	১৯৬৭-৬৮ সম্পত্তি (কোটি টাকা)	১৯৬৬-৬৭ ক্রমিক স্থান	১৯৬৬-৬৭ সম্পত্তি (কোটি টাকা)
দিল্লী কুথ মিলস (D. C. M-) –	৬	৭৭-৭	৬	৫১-১
হিন্দ মোটরস—	৭	৬৪-৯	৮	৪৯-২
সিন্ধিয়া স্টিম—	৮	৬০-৭	৫	৬০-৩
হিন্দ এ্যালুমিনিয়াম—	৯	৫৪-৬	৭	৪৯-৪
ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো—	১০	৪০-৫	১০	৩৫-০
গেস্ট কীন উইলিয়ামস—	১১	৩৭-৪	১৩	৩২-৯
টাটা পাওয়ার—	১২	৩৭-৪	৯	৩৫-২
ভলটাস—	১৩	৩৫-৮	২১	২৭-৩
ইণ্ডিয়ান এ্যালুমিনিয়াম—	১৪	৩২-২	১৭	২৯-৪
ইউনিয়ন কারবাইড—	১৫	৩২-১	১৯	২৮-১
ওরিয়েণ্ট পেপার—	১৬	৩১-৭	১৪	৩২-৫
ডানলপ—	১৭	৩১-৩	১৮	২৯-২
হিন্দুস্থান লিভার—	১৮	৩০-৩	১২	৩৩-১
সেঞ্চুরী স্পিনিং—	১৯	২৯-৬	২২	২৬-২
এসসো স্ট্যাণ্ডার্ড অয়েল—	২০	২৮-৮	২০	২৭-৩
প্রিমিয়ার অটোমোবাইলস—	২১	২৮-২	১৫	৩১-৬
ক্যালিকো মিলস—	২২	২৭-৯	২৫	২৩-৬
গ্রেট ইস্টার্ন সিপিং—	২৩	২৭-৩	২৬	২৩-৪
বর্মা সেল—	২৪	[illegible]-৮	১১	৩৪-৩
গোয়ালিয়র রেয়ন—	২৫	২৫-৩	২৪	২৪-২
আমেদাবাদ ইলেকট্রিক	২৬	২৪-৬	২৭	২২-৭
ই আই ডি প্যারী—	২৭	২৩-৫	২৮	২১-৮
লারসেন টুবরো—	২৮	২২-৮	২৯	২১-২
সাউথ ইণ্ডিয়া সিপিং—	২৯	২২-৪		
অশোক লেল্যাণ্ড—	৩১	২২-১	৩২	১৮-৫
ইণ্ডিয়ান টিউব—	৩১	২১-৬	২৩	২৫-০
ফিলিপস ইণ্ডিয়া—	৩২	২০-৬	৩৬	১৮-৩
মহীন্দ্র এণ্ড মহীন্দ্র—	৩৩	২০-৫	৩৭	১৮-২
সিমেন্স ইণ্ডিয়া—	৩৪	২০-০	৪৭	১৬-০
ব্রুক বণ্ড—	৩৫	১৯-৭		
অন্ধ্র ভ্যালী—	৩৬	১৯-৭	৩৫	১৮-৪
এ সি সি ভাইকারস—	৩৭	১৯-৬	৪১	১৭-৬
জেসপ এ্যাণ্ড কোং—	৩৮	১৯-৬	৩০	১৯-৯
টেক্সম্যাকো—	৩৯	১৯-৬	৩১	১৮-৯
বম্বে ডাইং—	৪০	১৯-৫	৪৪	১৬-৯
মাদুরা মিলস—	৪১	১৯-৪	৫০	১৫-৭
কেশোরাম—	৪২	১৯-১	৩৩	১৮-৫
সিনথেটিকস এ্যাণ্ড কেমি:—	৪৩	১৮-৮	৩৮	১৮-২
মাদ্রাজ এ্যালুমিনিয়াম—	৪৪	১৮-৭		
অতুল প্রোডাকটস—	৪৫	১৮-৫	৪২	১৭-৫
জিয়াজিরাও কটন মিল—	৪৬	১৮-০	৫৬	১৫-০
ইণ্ডিয়া সিমেন্টস	৪৭	১৭-৭	৫৩	১৫-৩

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

সংস্থার নাম	১৯৬৭-৬৮ ক্রমিক স্থান	১৯৬৭-৬৮ সম্পত্তি (কোটি টাকা)	১৯৬৬-৬৭ ক্রমিক স্থান	১৯৬৬-৬৭ সম্পত্তি (কোটি টাকা)
বিড়লা জুট মিলস—	৪৮	১৭-৭	৩৪	১৮-৪
মেটাল বক্স—	৪৯	১৭-৫	৩৯	১৮-১
এসকর্টস—	৫০	১৭-১	৬০	১৪-৬
ক্যালটেক্স—	৫১	১৭-১	৪০	১৭-৯
ন্যাশনাল রেয়ন—	৫২	১৭-১	৪৩	১৭-০
ইণ্ডিয়ান অক্সিজেন—	৫৩	১৬-৯	৪৬	১৬-১
স্ট্যাণ্ডার্ড মিলস—	৫৪	১৬-৬	৮৬	১০-৬
নিউ সেণ্ট্রাল জুট মিলস—	৫৫	১৬-৫	৪৫	১৬-২
ইণ্ডিয়া স্টিমসিপ—	৫৬	১৬-৩	৪৮	১৫-৯
কিলোর্সকার অয়েল ইঞ্জিন—	৫৭	১৬-১	৬৬	১৩-৩
র‍্যালিস ইণ্ডিয়া—	৫৮	১৬-০	৬৮	১২-৯
টাটা হাইড্রো ইলেঃ—	৫৯	১৫-৮	৫৮	১৪-৭
রোটাস ইণ্ডাস্ট্রিস—	৬০	১৫-৭	৫২	১৫-৪
মোদী স্পিনিং—	৬১	১৫-৫	৬১	১৪-৫
সাইনন কারভস—	৬২	১৫-৪		
টাটা কেমিক্যালস—	৬৩	১৫-৪	৫৯	১৪-৬
হিন্দুস্থান কনস্ট্রাকশন—	৬৪	১৫-৩	৪৯	১৫-৭
টাটা অয়েল (টমকো)—	৬৫	১৫-১	৫১	১৫-৫
বম্বে স্যুবারবন্ ইলেঃ—	৬৬	১৪-৯	৬৪	১৩-৮
গ্ল্যাক্সো ইণ্ডিয়া—	৬৭	১৪-৮		
এ্যালকালি এণ্ড কেমিক্যালস—	৬৮	১৪-৫	৫৪	১৫-২
টিটাগড় পেপার মিলস—	৬৯	১৪-৩	৫৭	১৪-৮
মুকুন্দ আয়রন—	৭০	১৪-২	৬৯	১২-৬
ইণ্ডিয়ান কপার—	৭১	১৩-৫	৬৩	১৩-৯
স্বদেশী কটন মিলস—	৭২	১৩-৪	৭৬	১১-৭
বাকিংহাম কর্ণাটিক মিলস—	৭৩	১৩-৩	৮০	১১-৩
সমাজী মিলস্—	৭৪	১৩-৩	৬৭	১৩-২
ইণ্ডিয়ান কেবলস্—	৭৫	১৩-৩	৫৫	১৫-২
অম্বিকা কটন মিলস—	৭৬	১৩-০	৮৩	১১-১
কে, সি, পি, লিঃ—	৭৭	১৩-০	৭২	১২-৪
সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া মেসিনারীজ—	৭৮	১২-৯	৬৫	১৩-৫
বৃটিশ ইণ্ডিয়া কর্পোঃ—	৭৯	১২-৯	৬২	১৪-১
টিউব ইনভেস্‌মেণ্টস্—	৮০	১২-৮	৭৮	১১-৪
নিউ সরবং কটন মিঃ—	৮১	১২-৮	৭৪	১১-৯
বাল্লারপুর পেপার মিলস—	৮২	১২-৫	৭১	১২-৪
দিগ্বিজয় সিমেণ্টস্—	৮৩	১২-৫	৮৪	১০-৮
জে, কে, সিন্থেটিক্‌স্—	৮৪	১২-৫		
মফৎলাল ফাইন কটন—	৮৫	১২-৪	৯০	১০-২
ন্যাশনাল মেসিনারী—	৮৬	১২-৩	৭৭	১১-৫
এ্যালুমিনিয়াম ইণ্ডাস্ট্রিজ—	৮৭	১২-২	৯১	১০-১
গ্রিভস ক্রম্পটন—	৮৮	১২-০	৮১	১১-১
গ্রিভস কটন—	৮৯	১১-৯	৭০	১২-৫

সংস্থার নাম	১৯৬৭-৬৮ ক্রমিক স্থান	১৯৬৭-৬৮ সম্পত্তি (কোটি টাকা)	১৯৬৬-৬৭ ক্রমিক স্থান	১৯৬৬-৬৭ সম্পত্তি (কোটি টাকা)
ইণ্ডিয়ান এক্সপ্লোসিভস—	৯০	১১-৭	৯৩	৯-৯
বার্ন এণ্ড কোং—	৯১	১১-৬	৭৫	১১-৯
ইণ্ডিয়ান ডাইস্টাফ—	৯২	১১-৫	৮২	১১-১
হিন্দুস্থান ব্রাউন ব্রোভেরী—	৯৩	১১-৫	৭৯	১১-৩
ফোর্ট গ্লস্টার—	৯৪	১১-৩	৭৩	১২-০
পি, ফাইজার—	৯৫	১১-২		
মোহন মেকিন্‌স—	৯৬	১১-২	৮৯	১০-৩
গুডইয়ার টায়ার কোং—	৯৭	১১-১	৮৭	১০-৫
বেঙ্গল কোল—	৯৮	১১-০	৮৮	১০-৫
সিম্পসন ইণ্ডাস্ট্রিজ—	৯৯	১০-৮	৮৫	১০-৮
মেটিব ইণ্ডাস্ট্রিজ—	১০০	১০-৫		
সিরপুর পেপার—	১০১	১০-২		

ওপরে যে ১০১টি শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ছবি তুলে ধরা হলো এরা ভারতের সমস্ত বে-সরকারী শিল্পোদ্যোগগুলির ৪০ শতাংশ মূলধন ও সম্পত্তির ভাগীদার। ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর রূপটিকে এরা যথেচ্ছভাবে চালনা করে নিজেদের ব্যক্তিস্বার্থ এবং গোষ্ঠীস্বার্থকে নিরাপদ রাখার জন্য। মাঝে মাঝে এদের সঙ্গে কায়েমী প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলগুলির সঙ্গে সম্পদের ভাগাভাগি নিয়ে কোঁদল বাধে। "শাসন করা তারই সাজে, সোহাগ করে যে গো"—অর্থনৈতিক প্ল্যাটফর্মের নেতৃবৃন্দ অর্থাৎ দেশীয় পুঁজিবাদীরা বিদেশী পুঁজিবাদীদের নির্দেশে ও হুকুমে এরা প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মকে শাসন করে, কারণ এদের প্রত্যেকেরই সম্পর্ক হচ্ছে সোহাগের। এরা দেশকে ভালবাসে না, ভালবাসে নিজেদের দম্ভ, অহংকার ও ব্যক্তিস্বার্থ এবং সর্বোপরি গোষ্ঠী-স্বার্থকে। শোষণই হচ্ছে যেন এদের ধর্ম। যে জনসাধারণকে শোষণ করে এদের অর্থনৈতিক বনিয়াদ, সেই জনসাধারণকে ভিখারীর মত মাঝে মাঝে দান করে এক-একটি ধর্মশালা, মন্দির বা তথাকথিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। মোটামুটিভাবে নয়টি ব্যবসায়ী পরিবার এই ১০১টি সংস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করে।

গত কুড়ি বছরে এরাই শোষণের স্বাধীনতা পেয়েছে। এই নয়টি পরিবার হলো—

সংস্থা (গোষ্ঠীগতভাবে)	প্রতিষ্ঠানের মালিকানা	১০১টি বৃহৎ শিল্পের সম্পত্তি মালিকানা
টাটা—	৯	১৭-৫ ভাগ
বিড়লা—	১১	১২-১ "
মার্টিন বার্ন—	২	৫-২ "
এ্যাসোসিয়েটেড সিমেন্টস—	২	৪-১ "
সফৎলাল—	৪	২-১ "
কিলিক ইণ্ডাস্ট্রিজ—	২	১-৬ "
করমচাঁদ থাপার—	৩	১-৫ "
সাহু জৈন—	২	১-৩ "
বাংগুর ব্রাদার্স—	২	১-০ "
অন্যান্য—	৩৪	২৫-৮ "
বিদেশী সংস্থাসমূহ—	৩০	৫৭-৮ "
মোট—	১০১	১০১-০ "

প্রভৃত সম্পত্তি এদের হাতে থাকার জন্য খুব সহজেই এরা অর্থনৈতিক মানচিত্রকে নিজেদের খুশিমত চালনা করে। এরাই শিক্ষিতশ্রেণীকে বেকার রাখে, এরাই সাধারণ মানুষের অন্নের গ্রাস কেড়ে নেয়, পরনের বস্ত্রকে লুট করে। জনসাধারণের জয়যাত্রাকে ষড়যন্ত্র করে বিপথগামী করবার জন্য আঞ্চলিকতাবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ, প্রাদেশিকতাবাদ এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদী দলগুলিকে অঢেল অর্থ দেয়। ফলে সৃষ্টি হয় শিবসেনার তাণ্ডবনৃত্য, তেলেঙ্গানার দাবি, হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা এবং প্রদেশে প্রদেশে জঘন্য প্রাদেশিকতা। এদের নির্মম শোষণের জন্যই হয় খাদ্যাভাব, চোরাকারবার, মূল্যস্ফীতি।

এদের অর্থনৈতিক শোষণের সঙ্গে মিতালী করে আছে কায়েমী রাজনৈতিক গোষ্ঠীর পুলিশী অত্যাচার। এই ভয়ংকর এবং নির্মম জাঁতাকলে পিষ্ট হচ্ছি আমরা। শরীরে রক্ত নেই, হাড়-পাঁজরা গুঁড়ো গুঁড়ো হতে চলেছে এক-একটি চাপে। পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ধসে পড়ছে এদের অর্থনৈতিক ফাটকাবাজীর খেলায়। কে কত লুট করতে পারে তারই প্রতিযোগিতা হচ্ছে দেশী ও বিদেশী পুঁজিবাদ এবং প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে। লুটের ভাগ নিয়ে এদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয়, ঝগড়া হয় না। এই শোষণ ও শাসন থেকে বাঁচবার পথ হলো মিলিত সংগ্রাম। কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, ছোট ব্যবসায়ীকে এক হতে হবে। সমাজতন্ত্রবাদই হবে মূল লক্ষ্য। সমস্ত সম্পদ জনসাধারণের জন্য। ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা রাষ্ট্র শোষণ করবে না, আহরণ করবে সমস্ত সম্পদ সর্বমানুষের কল্যাণের জন্য। মূল লক্ষ্যকে ঠিক রেখে ধাপে ধাপে বাঁচবার লড়াইকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে তীব্র সংগ্রামমুখী করে যা কিছু অন্যায়, যা কিছু অসত্য, যা কিছু মানবতাবিরোধী—সে সমস্তকে বিপ্লবের অগ্নিশিখায় ছাই করে ফেলতে হবে। তবেই আমরা মুক্ত, তবেই আমরা স্বাধীন। দেশ বাঁচবে, মানুষ বাঁচবে।

—রমানাথ ঘোষ

দৃশ্যকাব্য-পরিচয়

সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়
দাম : দশ টাকা

বাংলা নাট্যসাহিত্যের প্রাচীন ও আধুনিককালের সম্পূর্ণ ইতিহাস, প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মনীষীর তুলাদণ্ডে বিচারিত। বি-এ ও এম-এ পরীক্ষার্থীর অবশ্য পাঠ্য গ্রন্থ।

লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক ও নাট্যসমালোচক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায় এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধে বলেছেন : —

"• • তথাকথিত জ্যেষ্ঠতাত জাতীয় অকালপক্ক এবং বিচারশক্তিহীন আত্মহারা ও প্রিয়ভাষী সমালোচকদের নিয়ে এতদিন বড়ই অস্বস্তি বোধ করছিলুম। এতদিন পরে এই বিভাগে দুইখানি অমূল্য গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হয়েছে। প্রথমখানির কথা 'দৈনিক বসুমতী'তে ইতিমধ্যেই আলোচনা হয়ে গেছে • • দ্বিতীয়খানির নাম 'দৃশ্যকাব্য-পরিচয়' রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত সত্যজীবন মুখোপাধ্যায়। বইখানির আকার বিপুল। বাংলা নাটক নিয়ে এমনভাবে মস্তিষ্কচালনা করবার মানুষ যে আমাদের দেশে আছেন, এ তথ্য আমার কাছে ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। সুদীর্ঘকালের সাধনা ছাড়া এমন গ্রন্থ কেউ রচনা করতে পারেন না। • • অথচ বাঙালীর সৃষ্ট নাট্যসাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস এতদিন কেউ রচনা করেন নি। হালে শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু সেই চেষ্টা করেছেন এবং দৃশ্যকাব্যের পরিচয় দিতে গিয়ে সত্যজীবনবাবু অগ্রসর হয়েছেন অধিকতর। • • যাঁরা জ্যেষ্ঠতাতের ভূমিকায় অভিনয় করতে ইচ্ছুক নন, এই পুস্তকখানি পাঠ করলে তাঁরা বাংলা দেশের সমগ্র নাট্যসাহিত্য সম্বন্ধে একটি বিশদ ধারণা করতে পারবেন।— এত খুঁটিয়া খুঁটিয়া আর কোন লেখকই বাঙালীর নাট্যসাহিত্য নিয়ে আলোচনা করতে পারেন নি। এইটিই হ'ল আলোচ্য গ্রন্থের প্রধান গৌরব। • • তাঁর সমালোচনাও পরম উপভোগ্য। সমালোচকের উপযোগী সূক্ষ্ম দৃষ্টি নিরপেক্ষতা ও যুক্তিযুক্ত মনের পরিচয় দিয়ে তিনি আমাদের আনন্দিত করেছেন। তিনি কেবল গুণই দেখেন নি, দোষও দেখেছেন। কোথাও তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে অতিরিক্ত বাক্য ব্যয় করে বক্তব্য বিষয়কে করে তোলেন নি ধোঁয়াটে। • • যাঁরা বাংলা নাটকের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করবেন, এই গ্রন্থখানি তাঁদের পক্ষে অবশ্য পাঠ্য। • • যাঁদের লাইব্রেরী আছে, এই বইখানি না থাকলে তাঁদের সংগ্রহ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। • •"

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাংলা অনুবাদক সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত পতঞ্জলি ভট্টাচার্য এম-এ মহোদয় এই গ্রন্থখানি সম্বন্ধে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া লিখিয়াছেন—

"• • বাংলা নাটকের ইতিহাস সম্বন্ধে এই ধরণের বই বাংলা ভাষায় আর আছে কিনা জানি না, থাকিলেও খুব কমই আছে। গ্রন্থকার শুধু ঐতিহাসিকের দৃষ্টি দিয়াই তাঁহার আলোচ্য বিষয় দেখেন নাই। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁহার সমালোচনা-শক্তিও পূর্ণ ব্যবহার করিয়াছেন। প্রত্যেকটি উল্লেখযোগ্য নাটকের গুণাগুণ তিনি বিচার করিয়াছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই উভয় নাট্যাদর্শ সম্মুখে রাখিয়া তিনি এই বিচার করিয়াছেন। বইখানিতে যেমন তাঁহার অসাধারণ পরিশ্রম ও অধ্যবসায়, তেমন তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। শিক্ষার্থীদের পক্ষে এই বই অবশ্য পাঠ্য। অন্য সাহিত্য-পিপাসুরাও এই বই হইতে বহু জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিবেন। ভাষা এই ধরণের বই-এর সম্পূর্ণ উপযোগী—গাম্ভীর্যপূর্ণ ও প্রাঞ্জল।"

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বর্তমান সম্পাদক, নাট্যশালার ইতিহাসলেখক ও নাটকীয় পরিসংখ্যানবিদ শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন :—

"এই বিরাট গ্রন্থে বাংলা দৃশ্যকাব্যগুলির ইতিহাস সঙ্কলিত হইয়াছে। কেবল জীবিত লেখকগণকে বাদ দেওয়া হইয়াছে। • • সত্যজীবনবাবুর পক্ষে শ্লাঘার বিষয় এই যে, তাঁহারই অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে অভিনীত দৃশ্যকাব্যগুলির সমালোচনা একত্রে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। • • 'দৃশ্যকাব্য-পরিচয়' বাস্তবিকই আমাদের একটা বহুদিনের অভাব বিদূরিত করিয়াছে। এজন্য লেখক সাহিত্যামোদিগণের কৃতজ্ঞতা দাবী করিতে পারেন।"

বসুমতী প্রাইভেট লিমিটেড : ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলি-১২

রঙ্গজগৎ

পূর্ব জার্মানীর অভিনেত্রী হাইডেমারী ভেনৎসেল

তারকার কারাদণ্ড

চলচ্চিত্র তারকাদের আয়কর ফাঁকি দেওয়ার ব্যাপার নিয়ে অনেক সংবাদ ইতিপূর্বে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। খবরগুলি যথেষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। কোন শিল্পপতির কর ফাঁকি দেওয়া আর চলচ্চিত্র তারকার কর ফাঁকি দেওয়া এক কথা নয়। চিত্রতারকারা এত জনপ্রিয় যে—ওদের কর ফাঁকি দেওয়াটা নৈতিক দিক থেকে কেউ আশা করে না। কিন্তু তারকারা যখন কর ফাঁকি দেয় তখন ভক্তদের কাছে তা দুর্নীতি বলে মনে হয় না। তাঁরা কৌতুক অনুভব করেন। যেন এও একটা অভিনয়। সিনেমা পত্রিকাগুলি সে সব খবর কিছুটা রসালো করে পরিবেশন করে বেশ দু' পয়সা কামিয়ে নেয়। কিন্তু কর ফাঁকি দেওয়া যে অপরাধ এবং দুর্নীতি এ কথাটা মনে করে দেওয়া কর্তব্য মনে করে না। কারণ তা হলে যে তারকা-ভক্তদের মনে লাগবে, এবং তারকারা রুষ্ট হলে পত্রিকা ব্যবসায়ে মন্দা লাগবে। তাই এতদিন কর ফাঁকির তালিকায় তারকাদের নাম দেখে কারো গায়ে লাগে নি, তারকাদের জনপ্রিয়তা একটুকুও কমে নি।

কিন্তু এবার ব্যাপারটা একটু যেন বেশি গড়িয়ে গেল। এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা আয়ের কর ফাঁকি দেবার জন্য অভিনেতা কিশোরকুমারের দু' মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড হয়েছে। অবশ্য কারাদণ্ডাদেশ হলেই যে জেল খাটতে হবে এখনো তা বলা যায় না। কারণ আপীল ইত্যাদির পথও রয়েছে। তবে দণ্ডাদেশ হওয়াটা এক ভয়ানক ব্যাপার—বিশেষ করে কোন শিল্পী বা সাহিত্যিকের পক্ষে। কারণ সমাজের সাধারণ মানুষ এদের চুরি-বাটপাড়ির ঊর্ধ্বে মনে করে।

কিন্তু মানুষ ভুলে যায় যে, এই শিল্পীরাও এই সমাজের মানুষ। আর আমাদের সমাজটা ফাঁকি, মিথ্যা আর শোষণের দ্বারা পরিচালিত। ওঁদের তারকা নামটাও মিথ্যা। এই মিথ্যা নামটার মোহ সৃষ্টি করে শিল্পীদের যেমন বেলুনের মত ফুলিয়ে তোলে তেমনি মানুষের মনেও মোহ সৃষ্টি করে। এ-সব করে একদল ব্যবসায়ী। ব্যবসার জন্য তারা রাতারাতি সাধারণ একজন মহিলা বা পুরুষকে তারকার আসনে প্রতিষ্ঠা দেয় তাদের প্রযোজিত ছবিকে বাজারে চালাবার জন্য। আর এ কাজে সহায়ক রয়েছেন এক শ্রেণীর কলমজীবী, যাঁরা দু'টো পয়সার লোভে মানুষের গায়ে তারকা ছাপ দিয়ে মোহ সৃষ্টি করছেন: নানা সত্য-মিথ্যা খবর পরিবেশন করে বিভ্রান্ত করছেন। আসলে ওরা ত' সাধারণ মানুষ। যে লোকটি আজ তারকা হয়েছে সে এসেছে কোন অফিসের কেরানী, বাস কণ্ডাক্টর, পুলিশ কনস্টেবল বা দোকান কর্মচারীর কাজ ছেড়ে। সমাজে শিল্পপতি, উকিল, ব্যারিস্টার থেকে মদীর দোকানদার পর্যন্ত যে সব দুর্নীতির সংগে জড়িত, এরাও সেইভাবে জড়িত। তবে এরা জনপ্রিয়তার সুযোগ অন্যদের চেয়ে বেশি নিতে পারে।

কর ফাঁকির জন্য কিশোরকুমারের জেল হয়েছে: কিন্তু কঠোরভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে চিত্রজগতের আরো রথী-মহারথী তারকার ইতিপূর্বেই জেল খাটার কথা ছিল; এবং এখনো জেল খাটার মত অপরাধী তারকা খুব কম নেই। শুধু কি কর ফাঁকি—ছবিতে অভিনয়ের জন্য তিন লক্ষ টাকা মজুরী নিয়ে এক লক্ষ টাকার দলিল করার ঘটনা ত' হামেশাই ঘটছে। এসব কথা তো কারো অজানা নয়। আসলে এই ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থা যেখানে মানুষকে মানুষ শোষণ করে সেখানে কর ফাঁকি থেকে লুণ্ঠন একই চক্রে বাঁধা ব্যাপার।

তথাপি, শিল্পীদের এই অপরাধী পর্যায়ে দেখলে ব্যথিত হওয়া স্বাভাবিক। কারণ শিল্পীদের [illegible] সংস্কৃতির পূজারী মনে করে। তারা সাধারণ মানুষ হলেও সাংস্কৃতিক শিক্ষায় দুর্নীতিকে জয় করতে পারুক মানুষ তাই কামনা করে।

—সজ্জন

চলচ্চিত্র উৎসবের স্বরূপ

বিখ্যাত সোভিয়েট চলচ্চিত্র পরিচালক মিঃ সের্গেই গেরাসিমভ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব সম্পর্কে বলেছেন, কানস এবং ভেনিস উৎসবের প্রধান লক্ষণ হয়ে উঠেছে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে নির্মিত ছবির সমাবেশ। এই উৎসবগুলিতে চাঞ্চল্যকর কাহিনী এবং প্রচারের কথাটা খুব জোরের সঙ্গে বলা হয় এবং তা হয়ে ওঠে সাফল্যের প্রধান কথা। বুর্জোয়া চলচ্চিত্র উৎসবগুলিতে এখন খুব সংকট যাচ্ছে। আন্তর্জাতিক ফেডারেশন অব সিনেমাটোগ্রাফিক প্রেস এই সংকট সম্পর্কে আলোচনা করেছেন এবং তাঁরা উৎসবগুলিকে গণতান্ত্রিক করার জন্য আবেদন করেছেন। এই সঙ্গে উৎসবগুলি কমার্শিয়াল আর্টের মেলা থেকে মুক্ত করার কথাও বলেছেন।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অনেক পরিচালকের মনেও এই প্রশ্ন এসেছে। বিখ্যাত ইতালীয় পরিচালক এন্টোনিওনির মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি হলিউডের "জাব্রিস্কি পয়েন্ট" ছবিটির কাজ শেষ করে বলেছেন—'যদি কোন আদর্শ না থাকে তবে সুন্দর কল্পনার সার্থকতা থাকে না।' এই প্রসঙ্গে এন্টোনিওনি যা বলেছেন তাতে মনে হচ্ছে অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যে এন্টনিওনিকে আজ দেখছি তিনি গত দিনের এন্টনিওনি নন। জীবনের জটিলতার সঙ্গে বুঝবার জন্য তিনি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছেন। এই অবস্থা এন্টনিওনির একার নয়। শিল্প কেবল শিল্পের জন্য এমন কথা আজকাল বলার মত কেউ আছেন ভাবা যায় না। রাজনৈতিক এবং মানবিক সমস্যাকে বাদ দিয়ে কোন শিল্প ভাবা যায় না।

অভিনেত্রী হাইডেমারী ভেনৎসেল

অভিনেত্রী হাইডেমারী ভেনৎসেল এর বয়স এখন তেইশ। তিন বছর আগে বার্লিনের নাট্য-শিল্পের রাষ্ট্রীয় কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়েছে। নাট্যজগতে পা দিয়েই বড়ো রকমের জায়গা করে নিয়েছে রোস্টকে ও গ্রাইফসভাল্টের থিয়েটারে। বিভিন্ন নাটকে আকর্ষণীয় ভূমিকা তার : স্ট্রিন্ডবার্গের 'ক্রোয়েকেন যুলি' নাটকে যুলি, শেক্সপীয়রের হ্যামলেট-এ ওফেলিয়া, ও-কেসির 'তারা হয়ে যায় লাল' নাটকে জুলিয়া।

অরণ্যের দিনরাত্রি ছবিতে রবি ঘোষ ও সমিত ভঞ্জ

হাইডেমারী ভেনৎসেল হালে জড়িয়ে পড়েছে চলচ্চিত্রের সঙ্গে, প্রায় সমস্ত সময় তাতেই চলে যায়। আরো কিছুকাল যাবে। ইওহানেস আর বেষার-এর উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত ডেফা চলচ্চিত্রের 'আবসীড'-এ (বিদায়) ফ্যাসির ভূমিকায় অভিনয় করেছে। জি, ডি, আর টেলিভিশন নাটকেও অংশ গ্রহণ করে থাকে। ভেনৎসেলকে দেখা যাবে 'নেৎসভেৎ' ছবিতে।

হাঙ্গেরীর এক কল্পনাশ্রয়ী ছবির লোকেশন সুটিং-এ এই তরুণী অভিনেত্রী চমৎকার কাজ করেছে। অল্প বয়েসী রোমান্টিক মেয়ের ভূমিকায় তাকে মানায় ভাল। বাস্তবজীবনেও হাইডেমারী আত্মপ্রত্যয়ী, হাসিখুশি ও রসিকা। কিন্তু কোনক্রমেই আবেগপ্রবণ নয়।

স্টুডিও খবর

"দুটি মন" ছবির চিত্রগ্রহণ সুরু

গত ২৭শে আগস্ট এস· এস· ফিল্মস্-এর প্রথম প্রয়াস "দুটি মন" ছবির চিত্রগ্রহণ কলকাতা মুভিটোন স্টুডিওতে সুরু হয়েছে। বিনয় চ্যাটার্জী রচিত কাহিনী অবলম্বনে ছবিটির চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা করছেন—পীযূষ বসু। সুরসৃষ্টির দায়িত্ব নিয়েছেন—হেমন্তকুমার মুখার্জী। চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও শিল্প-নির্দেশনায় আছেন যথাক্রমে—দিলীপরঞ্জন মুখার্জী, বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জী ও প্রসাদ মিত্র। শ্রীমতী সুপর্ণা সেন প্রযোজিত ছবিটির নায়ক-নায়িকা হলেন—দ্বৈতভূমিকায় উত্তমকুমার ও সুপর্ণা সেন। অন্যান্য বিশিষ্ট চরিত্রে আছেন—ছায়া দেবী, অসিতবরণ, পদ্মা দেবী প্রমুখ।

অপ্সরা ফিল্মস্ ছবিটির পরিবেশক।

আলেয়ার আলো

মঙ্গল চক্রবর্তী পরিচালিত ইউনিট্ প্রোডাকসন্স অব্ ইণ্ডিয়ার প্রথম ছবি "আলেয়ার আলো"র চিত্রগ্রহণ সমাপ্তপ্রায়। গোপেন মল্লিক ছবিটির সুরকার। নেপথ্যে কণ্ঠদান করেছেন—সন্ধ্যা মুখার্জী ও হেমন্ত মুখার্জী।

চরিত্রচিত্রণে আছেন—সৌমিত্র চ্যাটার্জী, অনুপকুমার, সন্ধ্যারাণী, কালী ব্যানার্জী, ভানু ব্যানার্জী, মঞ্জু দে, শেখর চ্যাটার্জী, বনানী চৌধুরী, জ্যোৎস্না বিশ্বাস, অজিতেশ ব্যানার্জী, মৃণাল মুখার্জী, সাধনা রায়চৌধুরী, জ্যোৎস্না ব্যানার্জী, অমিয় দাস ও রাধামোহন ভট্টাচার্য। ধানবাদ, ঝরিয়া, ঘুরুন্ডী, ব্রজরাজনগর, পোড়ারমা এবং রাজাউলি ফরেস্ট-এ ছবিটির বহির্দৃশ্য গৃহীত হয়েছে। বিহারের রাজ্যপাল ডঃ নিত্যানন্দ কানুনগো ছবিটির বহির্দৃশ্য গ্রহণে যাতে কোন অসুবিধা না হয় তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেন এবং শিল্পী ও কলাকুশলীদের উৎসাহ দেন।

চিত্রগ্রহণ ও সম্পাদনায় আছেন যথাক্রমে—রামানন্দ সেনগুপ্ত ও বিশ্বনাথ নায়ক।

বি· পি· পিকচার্স ছবিটির পরিবেশক।

সংবাদ কণা

সোভিয়েট ছবির পঞ্চাশ বছর

সিনে সেণ্ট্রাল ক্যালকাটা গত ১লা সেপ্টেম্বর সোভিয়েট চলচ্চিত্রের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল। একাডেমি অফ ফাইন আর্টস ভবনে এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন নাট্যকার শ্রীমন্মথ রায়। সোভিয়েট ভাইস কন্সাল মিঃ এ, এস, পেরাসতোফ সোভিয়েট ছবির পঞ্চাশ বছরের সাফল্য সম্পর্কে ভাষণ দেন। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্যমন্ত্রী শ্রীজ্যোতিভূষণ ভট্টাচার্য। তিনি ধনতান্ত্রিক জগতের ছবির সঙ্গে সোভিয়েট ছবির তফাৎ এবং সোভিয়েট ছবির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলেন। তিনি বলেন, সোভিয়েট ছবিতে বাস্তবতা এক বিপ্লবী ভাবধারায় প্রকাশ লাভ করেছে। অনুষ্ঠানের শেষে সের্গেই আইজেনস্টাইনের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ছবি 'ব্যাটলসিপ পটেমকিন' দেখান হয়। প্রায় চল্লিশ বছর পরেও এই ছবিটি নতুনের আবেদনে দর্শকদের মুগ্ধ করে। আঙ্গিক বৈশিষ্ট্যে, সম্পাদনা কৃতিত্বে এবং ঘটনার ঐতিহাসিক মূল্যে এই ছবি চলচ্চিত্র শিল্পের জগতে একটি নজির হয়ে আছে। আরো উল্লেখযোগ্য, 'ব্যাটলসিপ পটেমকিন'-এর সংগীত। এমন তাৎপর্যময় সঙ্গীত ইতিপূর্বে কোন ছবিতে শোনা যায় নি।

এই অনুষ্ঠান উপলক্ষে 'সিনে সেণ্ট্রাল—ক্যালকাটা'-র মাসিক পত্রিকা 'চিত্র বীক্ষণ'-এর এক বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। এই সংখ্যা বহু ছবি, সুন্দর প্রচ্ছদসজ্জা এবং মূল্যবান প্রবন্ধে আকর্ষণীয়। যাঁরা সোভিয়েট ছবির ইতিহাস ও তাৎপর্য জানতে চান তাঁদের পক্ষে এই সংখ্যাটি সংগ্রহ করা অবশ্য প্রয়োজন।

রবীন্দ্র সদনে যাত্রা উৎসব

রবীন্দ্র সদন পরিচালক সমিতি রবীন্দ্র সদনকে কেবলমাত্র একটি ভাড়া দেওয়া মঞ্চে পরিণত হওয়ার হাত থেকে মুক্ত করে বিভিন্ন শিল্পাঙ্গের মানোন্নয়ন, শিল্পোদ্যোগে সহায়তা, অতীত সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে ব্রতী হয়েছেন। সমিতি নিজস্ব উদ্যোগে ও পরিকল্পনায় আগে যেমন নাট্যোৎসব, নৃত্যনাট্যোৎসব, শিশুনাট্যোৎসব, রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী, নজরুল জন্মোৎসব ইত্যাদির আয়োজন করে রবীন্দ্র সদনকে সংস্কৃতি-কেন্দ্রে পরিণত করার প্রয়াসী হয়েছেন। ঠিক তেমনি শহর ও শহরতলী নাট্যামোদীদের জন্য আয়োজিত হয়েছে যাত্রা উৎসব। না লাভ না ক্ষতি এই ভিত্তিতে ১৬ দিনব্যাপী এই উৎসব শুরু হচ্ছে আগামী ১৬ই সেপ্টেম্বর থেকে। উৎসবে যোগ দিচ্ছেন পেশাদারী যাত্রাজগতের ১৬টি প্রতিষ্ঠান।

রবীন্দ্র সদন পরিচালক সমিতির

'প্যার কা সপ্না' ছবিতে মালা সিন্হা

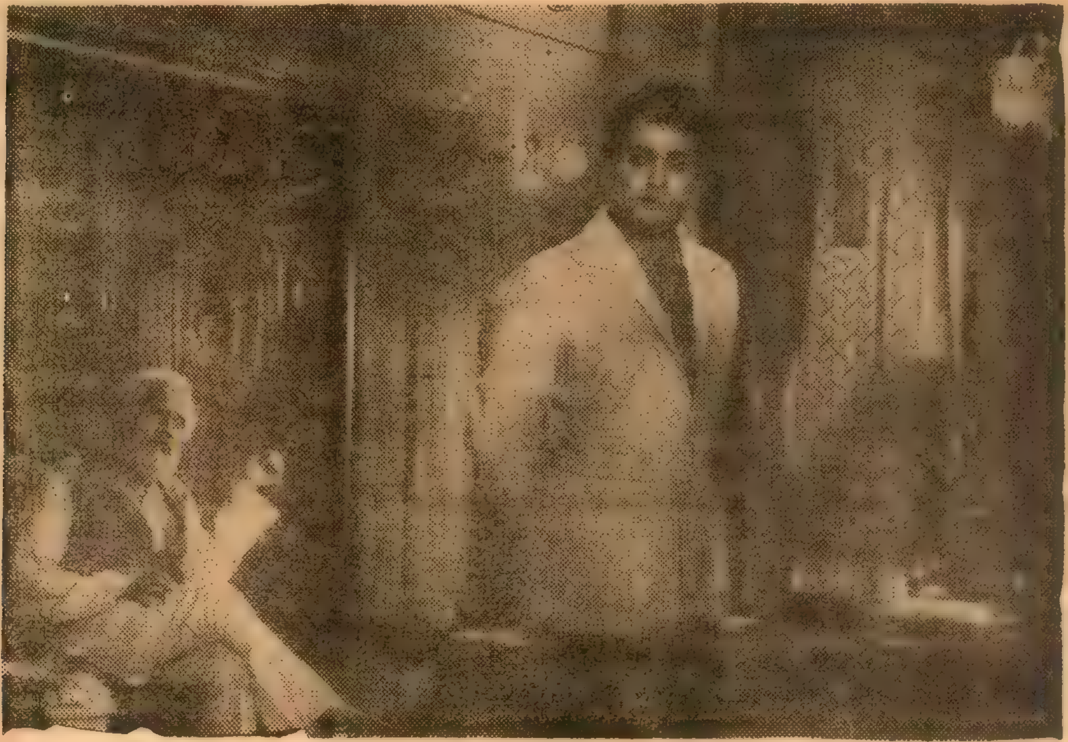

[illegible] ছবিতে বিশ্বজিৎ ও বসন্ত চৌধুরী

পক্ষ থেকে এই সংবাদ জানিয়ে আরো বলা হয়, সংগীত মনে করে এরূপ উৎসবে যাত্রার মানোন্নয়নে সহায়তা করা হবে। যেসকল দল যাত্রাভিনয় করবে তাদের কাছ থেকে কোন ভাড়া নেওয়া হবে না। উৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার রবীন্দ্র সদন বহন করবে। প্রতিদিনের বিক্রিত অর্থের ৩০% এই ব্যয় হিসাবে রেখে বাকি ৭০% অংশ গ্রহণকারী দলকে দেওয়া হবে। যাত্রা দলগুলির পক্ষে এই ব্যবস্থা মরশুমের শুরুতে খুবই উৎসাহজনক হবে।

যাত্রা উৎসবে অভিনীত হবে তরুণ অপেরার 'হিটলার', জনতা অপেরার 'ফাঁসির মঞ্চে', শ্রীরাধা নাট্য কোম্পানীর 'পথের ছেলে', নবরঞ্জন অপেরার 'মাইকেল মধুসূদন', নিউ প্রভাস অপেরার 'বারুদ', সত্যম্বর অপেরার 'দিগ্বিজয়', অম্বিকা নাট্য কোম্পানীর 'চন্ডীতলার মন্দির', নিউ আর্য অপেরার 'নেতাজী সুভাষ-চন্দ্র', ভারতী অপেরার 'মৃত্যুঞ্জয়ী সূর্য সেন', মাধবী নাট্য কোম্পানীর 'আগুন নিয়ে খেলা', সুশীল নাট্য কোম্পানীর 'রক্তে রাঙা', নিউ গণেশ অপেরার 'মরেও যারা মরে না', বৈকুণ্ঠ যাত্রাসমাজের 'পতিঘাতিনী সতী', নিউ রয়্যাল বীণা-পাণির 'এক টুকরো রুটি', নাট্য ভারতীর 'আন্দোলন', নট্ট কোম্পানীর 'শ্রীরামকৃষ্ণ সারদামণি'।

পাপুর ছবি

'পাপুর বই'-এর শিশু লেখক এবং শিল্পী পাপু আজ বাংলাদেশের পাঠক সাধারণের কাছে সুপরিচিত। ভাল নাম ছিল তার সুব্রত সরকার। মাত্র সাড়ে আট বছর বেঁচেছিল সে এই পৃথিবীতে। তার আঁকা প্রায় পাঁচ শ' ছবি থেকে ৮০খানা নিয়ে এক প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন একাডেমি অব ফাইন আর্টস তাঁদের গ্যালারিতে। প্রদর্শনী শুরু হবে ১৩ সেপ্টেম্বর। চলবে ১৯ সেপ্টে-ম্বর পর্যন্ত।

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার বক্তৃতামালা

বারুইপুরের 'নাট্যজিজ্ঞাসা', নাট্য-কর্মী ও দর্শকদের প্রয়োজন এবং আগ্রহের কথা মনে রেখে 'নাট্যাচার্য শিশিরকুমার বক্তৃতামালা' পর্যায়ে নাটক, প্রযোজনা, পরিচালনা, অভিনয়, আলো, মঞ্চ, রূপসজ্জা, ধ্বনি, সঙ্গীত, বাংলা থিয়েটার ঃ গিরিশ ও শিশিরযুগ, নব-নাট্য আন্দোলন ও জাতীয় নাট্যশালা এই বারোটি বিষয়ে বারোটি বক্তৃতার আয়োজন করেছেন। বেসরকারী প্রচে-ষ্টায় সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী অভিনয়কলা বিষয়ক প্রতিটি বিষয়ে প্রতিনিধিস্থানীয় গুণিজন ভাষণ দেবেন স্থির হয়েছে এবং ইতিমধ্যে 'আলো' এবং 'অভিনয়' সম্পর্কে প্রথম ও দ্বিতীয় বক্তৃতা দিয়েছেন রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিষয়দ্বয়ের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকা যথাক্রমে শ্রীঅমর ঘোষ এবং শ্রীমতী নিবেদিতা দাস।

'নন্দ ডাকাত' ছবিতে বোম্বের ইন্দ্রাণী মুখার্জী

তরুণ অপেরার প্রশংসনীয় প্রয়াস

বারুইপুরের 'নাট্যজিজ্ঞাসা' নাট্য-নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। হিটলার পালার সূচনা থেকে তরুণ অপের শিল্পীরা যথাক্রমে নতুন সাজে সাজানে প্রয়াস করে এসেছেন। শুধু কাহিন বক্তব্য আর আঙ্গিকের উপস্থাপনাই ন শিল্পীকে মর্যাদা তরুণ অপেরাই প্রথ দিলেন যাত্রাজগতে। হিটলার নাটকে দেড়শত রজনী অভিনয়ে এঁরাই প্র শিল্পীদের হাতে তুলে দিলে পুরস্কার। শুধু নিজের দলের শিল্প রাই নয়, দুস্থ এবং পঙ্গু শিল্পীদের এঁরা সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে এঁরা সাহায্য করলেন পরলোকগত শিল্প প্রভাত মিত্র ও বিভোর বসুর পরিবা বর্গকে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত পঙ্গু শিল্প শ্রীগৌরীশঙ্কর বর্মণ এবং শ্রীজয়নারা মুখার্জীকে আর্থিক সাহায্য করছে তরুণ অপেরা। এই সাহায্যদান ক হয়েছে ওরা জুনের "হিটলার" পাল বিক্রয়লব্ধ অর্থ থেকে। মোট সাহায অঙ্ক বারো শ' চার টাকা।

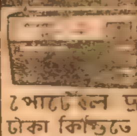
BAZA
১ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড
পোর্টেবল ট্রানজিস্টর মাত্রিক ৫
টাকা কিস্তিতে। প্রত্যেক গ্রাম ও শহরে
পাঠান যাইতে পারে।
HIND AGENCIES (47) KOLHAPUR ROAD. DELHI-7

পাঠক মন

স্বাস্থ্যদপ্তর ও মেহনতী মানুষ

মি আপনাদের "সাপ্তাহিক বসু- নিয়মিত পাঠক। সেই হিসাবে য়েকটি সংখ্যায় প্রকাশিত স্বাস্থ্য- কীর্তিকলাপের সংবাদের প্রতি মাকৃষ্ট হয়েছে। আমি একজন লোক এবং যুক্তফ্রন্টের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য আছে। আশা াম যে, সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে অন্তত মেহনতী মানুষের সুখ- সাথী হবে এবং একটা পরিচ্ছন্ন দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসন গড়ে তুলবেন, মাধ্যমে সাধারণ মানুষ অন্তত ার মধ্যেও কিছুটা আশার আলো ত পাবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই স্পেসিফিক কতকগুলো কেস াদের সাপ্তাহিক পত্রিকার মাধ্যমে ্যদপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেও ারা ব্যর্থ হয়েছেন এবং কেসগুলোর র্ নজর না দিয়ে বরং স্বাস্থ্য- নাকি আপনাদের লেখার পেছনে উদ্দেশ্য আছে কি-না সে বিষয়েই া করতে বসেন। আপনাদের অভিযোগ, যারা এই দুর্নীতির , তারা শুধু রাইটার্স বিল্ডিংসেই প্রতিটি সরকারী হাসপাতালে নিজে- কয়েকটি করে পাপেট বসিয়ে ন অসাধুতা, দুর্নীতি ও অনাচার করেছে। শুধু তাই নয়, স্বয়ং মন্ত্রীর ঘরের সামনেই নাকি লের দিকে মদের আসর বসে এবং জন্যে সরকারী অর্থও নাকি ব্যয় হয়ে থাকে, যে অর্থ মেহনতী মেরই দেওয়া করের একটা অংশ। র তথ্য যদি সত্যি হয়, তবে দেখতে জনসাধারণের ওপর করের বোঝা য় ভোগবিলাসের জন্যে অর্থের য় করবার অধিকার সরকারের কি-না। অবশ্য সে সরকার যদি র মেহনতী জনসাধারণের প্রতিষ্ঠিত ার হয়। কারণ যুক্তফ্রন্টের কর্ম- র দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে আছে যে, ারী ও বেসরকারী উভয়ক্ষেত্রে ষ্ট সরকারী দুর্নীতি ও স্বজন- ার বিরুদ্ধে লড়বে।" আর প্রথম ছেদে আছে, "...প্রশাসন ক্ষেত্রে দক্ষতা, িয়তা এবং বৈষম্যহীনতার চতকরণ হবে যুক্তফ্রন্টের লক্ষ্য।" আপনাদের পত্রিকায় প্রকাশিত অভিযোগ যদি সত্যি হয়, তবে ধরে নিতে হবে যে, ফ্রন্ট লক্ষ্যভ্রষ্ট হ'তে চলেছে।

আরো একটি ব্যাপার হচ্ছে এই যে, স্বাস্থ্যমন্ত্রী জনসভায় স্বাস্থ্যদপ্তরের দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করতে যখন সকল স্তরের লোকের কাছে সহযোগিতা আহবান করেন, তখন যদি তাঁরা দপ্তর সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল কেউ কোন স্পেসি- ফিক অভিযোগ আনেন, এবং তাঁর সঙ্গে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেন, তবে তবে তা স্বাগত না জানিয়ে তার পেছনে কোন স্বার্থ বা উদ্দেশ্য আছে কিনা তা দেখতে এত ব্যস্ত হন কেন? জানি না এর পেছনে কোন দলীয় স্বার্থ আছে কিনা! কিন্তু তাঁরা যে জনসাধারণের সেবক রূপে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, এ প্রতিশ্রুতির কথা যদি ভুলে গিয়ে থাকেন, তবে একদিন কংগ্রেসের মত এঁরাও বাংলাদেশ থেকে মুছে যাবেন। এখনও যদি এসব ব্যাপারে দৃষ্টি দেওয়া না হয় এবং জন- সাধারণকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি ভুলে যান তবে, আগামী দিনের ইতিহাস তা কখনও ক্ষমা করবে না।

সম্পাদিকা মহাশয়াকে অনুরোধ তিনি যেন আমার ঠিকানা সম্পূর্ণ প্রকাশ না করেন।

—অমলেন্দু রায়চৌধুরী
কলিকাতা—১৪

সিনেমাতে চুম্বন প্রসঙ্গে

ফিল্ম সেন্সর রিপোর্টে খোসলা কমিটির প্রস্তাবিত 'সিনেমাতে চুম্বন ও নগ্নদেহ' প্রদর্শন প্রসঙ্গে সিনেমা- মহলে চাঞ্চল্য এসেছে। প্রস্তাবটি ধন্যবাদার্হ। কেন না, শিল্প-প্রকাশের তাগিদে অনেক সময় 'চুম্বন ও নগ্নদেহ'- এর প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কিন্তু বর্তমান ভারতীয় সেন্সর নীতিতে তা আইন- বিরুদ্ধ হওয়ায় তাকে কাঁচি-কাটা করা হয়। এদিক দিয়ে আজকের ভারতীয় চলচ্চিত্র নির্মাতার নিকট হতে একটি প্রাচীর তুলে নেওয়ার সুপ্রয়াস করা হয়েছে। কিন্তু আসল প্রশ্নটি থেকে যায় 'শিল্প-প্রকাশ' এই কথাটির মধ্যে। যার উল্লেখ সত্যজিৎ রায়ের এই সম্পর্কে মন্তব্যের মধ্যে খুঁজে পাই। পৃথিবীতে দিক্ নির্ণয়কারী বহু ছবি নগ্নদৃশ্য সহযোগে বিশ্ববাসীর নিকট পরিবেশিত হয়েছে এবং শিল্পসম্মত হিসাবে স্বীকৃতি আদায় করেছে ঐ সমস্ত দৃশ্য। বার্গ- ম্যানের 'সাইলেন্স'-এর মধ্যে চরম নগ্নতাই তাঁর সাইকোলজিক্যাল ট্রিট- মেন্ট-এর শৈল্পিক প্রকাশ-মাধ্যম। এই দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে এই প্রস্তাব সম্পর্কে কোন বিরুদ্ধ বক্তব্য থাকে না। কিন্তু সন্দেহ জাগে আমাদের দেশের জন- সাধারণ ও সেন্সর-এর নিকট এর ব্যাখ্যা নিয়েই। আমাদের দেশে যে কয়টি শিল্পগুণ বিশিষ্ট ছবি আমরা দেখেছি তার কোনটিরই মধ্যে আমাদের সেন্সর নীতি অন্তর্গত 'দেহ প্রদর্শনের' সুযোগ গ্রহণ করতে দেখি নি। অথচ বোম্বাই-এ নির্মিত ছবিতে এবং অধুনা দু'-একটি কলকাতার ছবিতে এর পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতে দেখা যায়। এই সমস্ত ছবির কোনটাই শিল্পসম্মত তো নয়ই, বরং অত্যন্ত নিম্নমানের পরিচায়ক হিসাবেই দর্শকদের নিকট হতে চিহ্নিত হয়েছে। তাই এ বিষয়ে এই পরি- স্থিতি দাঁড়াবে, যাঁরা এখন ঐসব নিম্ন- মানের ছবি তৈরি করছেন তাঁরাই 'চুম্বন ও নগ্নদেহ'তে ভরা সমস্ত ছবি তৈরি কবার কাজেই উৎসাহী হবেন, গুণী পরিচালকরা ও-কাজে ব্রতী হবেন না—এই অন্তর্গত গুটিকয় পরিচালক ঐরূপ ইচ্ছার অনুগামী হলে ইতো- পূর্বেই 'আইনসম্মত' ঐ সমস্ত সুযোগ গ্রহণে নিরত থাকতেন না। এই চাঞ্চল্য আনয়নকারী প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে শিল্প- গুণ-বিশিষ্ট ছবি করার পথ সুগম হল—এই ধারণা ভ্রান্ত। কেন না, সর্বো- পরি, 'শিল্পসম্মত' এই কথাটির বিচারের ভার এসে যায় সেন্সরের ওপর—যারা কিনা 'দিবারাত্রির কাব্য'-কে "এ" এবং 'সঙ্গম', 'ইত্তেফাক' জাতীয় ছবিকে "ইউ" উপাধি দান করেন।

—কিরীটি মণ্ডল
৪৯।১ বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

দলনেতা পাতৌদি ও ভারতীয় দল

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রত্যাশাই সঠিক প্রমাণিত হল্যো। আর এই প্রত্যাশা সম্বন্ধে অধিকাংশ ক্রিকেটরসিকই ছিলেন একমত। মধ্যে পড়ে দু'-চারটে সংবাদপত্রই শুধু অন্য মত পোষণ করেছিল। সেই অবশ্য শেষ নয়। খোদ ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডেও এমন কয়েকজন আছেন যাঁরা চেয়েছিলেন একটু অন্যকিছু।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত অন্য স্তরের সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সিলেকশান কমিটি পাতৌদির নবাব মনসুর আলী খাঁকেই ভারতের অধিনায়ক মনোনীত করলেন। নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে তিনটে টেস্ট ম্যাচেই পাতৌদি থাকবেন ভারতের অধিনায়ক—আর নিউজিল্যাণ্ডের পর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধেও তিনি যে ভারতীয় দলের নেতৃত্ব করবেন সে বিষয়ে আজ আর কোন সন্দেহ নেই।

সে সন্দেহের অবসান ঘটেছে যখন মাত্র পাঁচ মিনিটের মধ্যে বিজয় মারচেণ্টের সভাপতিত্বে ভারতীয় সিলেকশান কমিটি পাতৌদিকে অধিনায়ক মনোনীত করে ফেললেন।

মাত্র একুশ বছর বয়েসে পাতৌদির ওপর পড়েছিল ভারতীয় দলের পরিচালনার ভার। ভারতীয় দলের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণের সময় দলের অধিনায়ক নরী কণ্ট্রাক্টর ভীষণভাবে আহত হয়ে পড়ার পর সহ-অধিনায়ক পাতৌদির নবাবের ওপর পড়ল ভারতীয় দলের নেতৃত্বের ভার। তখন অবশ্য বর্ষীয়ান-খেলোয়াড় পলি উমরিগড় ছিলেন পাতৌদির পাশে।

তখন পাতৌদির বয়স মাত্র একুশ। তারপর কেটে গেছে বেশ কয়েকটা বছর। দেশে এবং দেশের বাইরে পাতৌদির অধিনায়কত্বে ভারত খেলেছে একাধিক টেস্ট ম্যাচ। কোনটাতে ভারত হেরেছে আবার কোনটাতে ভারত জিতেছেও।

বয়সের হিসেবে পাতৌদি আজ উনত্রিশে পা দিতে চলেছেন—বর্তমানে তাঁর বয়েস ২৮ বছর ৮ মাসের কাছাকাছি। অর্থাৎ ২১ থেকে ২৮ পর্যন্ত ভারতীয় দলের অধিনায়ক থাকায় পাতৌদি আজ নিপুণ নেতা। দল পরিচালনায় তাঁর যোগ্যতা এবং দক্ষতা আজ তাই অনস্বীকার্য।

শুধুমাত্র দল পরিচালনাতেই নয়, ব্যক্তিগত নৈপুণ্যের দিক দিয়েও পাতৌদি

॥ দলনেতা পাতৌদি ॥

পাতৌদি এ পর্যন্ত ভারতের পক্ষে ৩১টি টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করেছেন। এর মধ্যে ২৮টিতে তিনি ছিলেন ভারতীয় দলের অধিনায়ক। তিনি ১১টি ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ৬টি, ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ৬টি আর নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ৮টি টেস্ট খেলেছেন। টেস্ট খেলায় পাতৌদি করেছেন ২,২০৩ রান গড়ে আর ইনিংস প্রতি হিসেব দাঁড়ায় ৪০-৭১। ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ রান করেছেন ২০৩।

কোন অংশে কম যান না। তাঁর ব আজো ভারতীয় দলের পরম ভরসা। তাঁর ফিল্ডিং-এর কথা না তোলাই ভা বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফিল্ডারদের তালি ওপরের দিকেই আজো উঠবে ভারতী দলের অধিনায়ক পাতৌদির নবাবের না

অথচ পাতৌদির একটা চোখ নেই শুধুমাত্র বাঁ চোখের ওপর নির্ভর ক অমন মনভোলানো ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শ করা সত্যিই বিস্ময়কর।

তাই আশা করা যায় যে, পাতৌদি ওপর থেকে দল-নেতৃত্বের ভার চট নিয়ে নেওয়া হবে না। কারণ, পাতৌদির মতো যোগ্যতা এবং অভিজ্ঞ সম্পন্ন খেলোয়াড় ভারতে খুব একটা নে কয়েকজন অবশ্য একজন তরুণের ও ভারতীয় দলের পরিচালনার দায়িত্ব দি চেয়েছিলেন। কিন্তু অনেক খোঁজা-খুঁজি পর তাঁরা করলেন অজিত ওয়াদেকা নাম। বয়সের হিসেবে পাতৌদি কিন্ ওয়াদেকারের চেয়ে ছোট।

তবে একথা ঠিক যে, পাতৌদির ভারতীয় দলের অধিনায়ক নির্বাচন র মত কঠিন হয়ে পড়বে। তবে হনুমন্ত যদি এখন থেকে মোটামুটিভাবে যেতে পারেন, তাহলে তিনিও এক ভারতীয় দলের নেতা নির্বাচিত হ পারেন।

যাই হোক, ও-কথা না হয় এখন থাক আর মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে নিউজি ল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ভারত টেস্ট খেলতে আর প্রথম টেস্ট ম্যাচের জন্যে খেলোয়া নির্বাচনের আসর বসবেও খুব শীগ্গিরই এখন তাই সেই দিকেই একবার চো ফেরানো যাক।

ভারতীয় দলে অন্তত নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে আশা করা যায় দু'-একটি ন মুখ দেখা যাবে। বাংলার অম্বর রা একার নাকি টেস্ট খেলার সম্ভাবনা ব বেশি। কিন্তু বম্বের সোলকার কি নায়েকেরও খেলার সম্ভাবনাও যে এতো কম নয়—এ কথাও হলপ করে বলা য বাংলার দিলীপ দোসীকে নিয়ে যাঁরা লাফালাফি করছিলেন তাঁদের বো এবার হতাশ হতে হবে। কারণ ভারত

ন প্রসন্ন এবং ভেংকটরাঘবন স্থান ন্‌ই। চন্দ্রশেখরকেও বোধহয় উপেক্ষা হবে না। তাছাড়া জয়সীমা আর র্ও স্পিন বোলিং করতে পারেন। মনে হয় যে, এ'দের মধ্যে থেকে স্থান ণ নেওয়া বোধহয় দোসীর পক্ষে রীতি- র কণ্টকর হবে।

তবে সুব্রত গুহর সে ভয় আর নেই। ত হয়তো এমনিতেই চান্স পেতেন ওপর আবার ইরানী ট্রফির খেলায় র বোলিং সাফল্য তাঁকে আরো অনেক- ন এগিয়ে দিয়েছে।

নতুন ছাড়া আর যাঁরা ভারতীয় দলে ন পাবেনই তাঁরা হলেনঃ জয়সীমা, দেশাই, হনুমন্ত সিং, ইঞ্জিনীয়ার, স, সুর্তি, ওয়াদেকার, আবিদ আলী খেরা। তবে সুর্তিকে বোধহয় উজিল্যান্ড দলের বিরুদ্ধে খেলার জন্যে ওয়া যাবে না। তবে অস্ট্রেলিয়ার ুদ্ধে সুর্তি ভারতীয় দলের অবশ্য াজনীয়।

কারণ সুর্তি এখন খেলছেন অস্ট্রে- য়ায়। সেখানকার খেলার ধারা খেলার ন থেকে আরম্ভ করে অস্ট্রেলিয়ার লোয়াড়দের ব্যক্তিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি- লো পর্যন্ত তাঁর জানা। তাই আশা যায় যে, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সুর্তি ু নিজেই ভাল খেলবেন না—ভারতীয় ভাল খেলতে তিনি সাহায্য করতে হবেন। আর সেই জন্যেই কয়েক-

॥ নরী কন্ট্রাক্টর ॥

য়েস্ট ইণ্ডিজ ভ্রমণের সময় ভারতীয় লের অধিনায়ক কন্ট্রাক্টর ভীষণভাবে হত হয়ে পড়েছিলেন গ্রিফিথের বলের তে। ফলে দল পরিচালনার দায়িত্ব পড়েছিল সহ-অধিনায়ক পাতৌদির বাবের হাতে।

মাস আগেই পাতৌদি বলে রেখেছিলেন, যে, নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খেলার জন্যে বিদেশ থেকে প্রসন্ন, ইঞ্জিনীয়ার এবং সুর্তিকে আনাতেই হবে।

কারণ নিউজিল্যান্ড এখন আর আগের মতো শক্তিহীন নয়। হয়তো ভারত এবারও জিতবে ওদের বিরুদ্ধে, রাবার নিজেদের দখলে রাখতে হবে তবু যতদূর মনে হয়

॥ প... উমরিগড় ॥

মাত্র একুশ বছর বয়সে পাতৌদি যখন অধিনায়কের দায়িত্ব নেন তখন অভিজ্ঞ খেলোয়াড় উমরিগড় ছিলেন তাঁর পাশে।

যে, এবার ভারতকে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হতে হবে। নিউজিল্যান্ড দলের ব্যাটস-ম্যানরা যদি একটু বেশি রান করতে পারেন তাহলে ভারতকে যথেষ্ট বিপদে পড়তে হতে পারে। কারণ, নিউজিল্যান্ডে কয়েকজন পেসবোলার আছেন তাঁরা সময় পেলেই ছোবল মারতে কসুর করবেন না।

তবু নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারত না হয় মোটামুটি খেলতে পারবে, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে? অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারতকে যদি ভাল খেলতে হয় তাহলে দলের প্রত্যেকটি খেলোয়াড়কে জান লড়িয়ে খেলতে হবে।

বোলিং, ফিল্ডিং এবং ব্যাটিং—এই তিনটি বিষয়ে ভারতীয় খেলোয়াড়দের প্রথম থেকেই যত্নবান হতে হবে, তা না-হলে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ভারত মোটে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতেই পারবে না।

অথচ ব্যক্তিগত ক্রীড়ানৈপুণ্যের আলোকে ভারতীয় খেলোয়াড় কোন অংশেই কম যান না। একটু খোলা মনে চিন্তা করলে বোঝা যাবে যে, পাতৌদির মতো খেলোয়াড়ের সংখ্যা বর্তমান ক্রিকেট জগতে খুব একটা বেশি নেই। ইঞ্জিনীয়ারের মতো উইকেটরক্ষক, ব্যাটসম্যান, কিম্বা জয়সীমার মতো আগাগ ছাড়া খেলোয়াড়, ওয়াদেকারের মতো নিপুণ লেফট্‌হ্যান্ডার, প্রসন্ন কিম্বা ভেংকটরাঘবনের মত বোলার খুব একটা বেশি নেই একথা না বললেও চলে।

সুতরাং এইসব খেলোয়াড়রা যদি প্রথম থেকে সত্যি-সত্যিই মন দিয়ে খেলতে শুরু করেন, তাহলে আর যাই হোক ভারত অন্তত অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সমানে সমান প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালাতে পারবে।

অস্ট্রেলিয়া দুর্ধর্ষ দল ঠিক, কিন্তু দেশের মাটিতে ভারতও কিছু আর কম নয়। ভারতীয় দলের খেলোয়াড় নির্বাচন যদি ঠিক হয় এবং তাঁরা যদি মোটামুটিও খেলতে পারেন, তাহলে পাতৌদির অধি-নায়কত্বে ভারত অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে খুব সহজে কাত হবে বলে মনে হয় না।

দেখা যাক, শেষ পর্যন্ত কি হয়! তবে আমরা আশা করবো, ভারত ভাল খেলবে এবং আমরা অনেকদিন পরে সত্যিকারের ভাল খেলা দেখার সুযোগ পাব। তাই সকলেই আজ আশা করছেন যে, খুব শীগ্‌গিরই হয়তো ক্রিকেটানন্দে ভারতের আকাশ-বাতাস মুখর হয়ে উঠবে। সেই দিনটির দিকে তাকিয়ে আজ বসে আছেন ভারতের ক্রিকেটরসিকরা। কারণ, দিন আগত ঐ—এই সেপ্টেম্বরেই ভারতে বসছে টেস্ট ক্রিকেটের আসর।

॥ ফ্রাঙ্ক ওরেল ॥

তখন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের অধিনায়ক ছিলেন ফ্রাঙ্ক ওরেল। কন্ট্রাক্টর আহত হলে ভারতীয় খেলোয়াড়দের সংগে ওরেল নিজেও এগিয়ে এসেছিলেন রক্ত দিয়ে কন্ট্রাক্টরকে বাঁচিয়ে তুলতে। ভারতীয় খেলোয়াড়দের সংগে তিনিও জেগেছিলেন রাতের পর রাত।

খেলাধুলা

তাড়াহুড়ো

সব ব্যাপারেই আমাদের স্বভাব তাড়াহুড়ো করা। একটু আগে থেকে শুরু করলে যে কাজ ধীরে সুস্থে করা যায়—সেই কাজ শেষ মুহূর্তে না করে আমরা যেন শান্তি পাই না। পরীক্ষা নাকের ডগায় এসে গেলে তবে আমরা বই নিয়ে বসি, ট্রেন ধরতে গেলে শেষ মুহূর্তে স্টেশনে গিয়ে হাজির হই, সিনেমায় গেলে নিউজ রীল দেখার সৌভাগ্য ধরতে গেলে কোনদিনই হয় না—এমন কি খেলার মাঠে খেলা দেখতে গেলে হাজার চেষ্টা করা সত্ত্বেও খেলা আরম্ভ হবার আগে কিছুতেই আমরা মাঠে পৌঁছুতে পারি না। অর্থাৎ শেষ মুহূর্তে সব বিষয়ে আমাদের তাড়াহুড়ো করতেই হবে। আমাদের সেই তাড়াহুড়ো করা স্বভাবের আর একটি পরিচয় পাওয়া গেলো-মাত্র কিছুদিন আগে দলীপ ট্রফি ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় যোগদানকারী পূর্ব অঞ্চল দলের খেলোয়াড় নির্বাচন প্রসংগকে কেন্দ্র করে। খেলোয়াড় নির্বাচক কমিটি এবার যেভাবে তাড়াহুড়ো করে দল গঠন করেছেন তার তুলনা মেলা ভার। দলের কর্মকর্তা নির্বাচন প্রসংগটাও রীতিমত চমকপ্রদ। এই বিষয়ে আমাদের অভিযোগ অত্যন্ত পুরনো এবং সেই একই রকমের। অন্যান্য দেশের সংগে তুলনা করলে এই সব বিষয়ে আমরা যে কতো পিছিয়ে আছি তা সহজেই প্রমাণিত হতে পারে। খেলোয়াড় নির্বা[চ]নে নিয়ে ... সব দেশেই রাজনীতি চলে। ইংল... অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ কিম্বা ... কোন দেশই বাদ যায় না। বেশি দ... যাবার দরকার নেই, এ বছর কাউ... জায়গায় গ্রেভনীকে অধিনায়ক না ক... বিষয়টা একবার খোলা মনে চিন্তা ... দেখলেই বোঝা যায় ব্যাপারটা। গ্রেভন... দাবিই ছিল বেশি। কিন্তু সিলেক... কমিটির কয়েকজনের সংগে একটু গো... মাল থাকায় তাঁর জায়গায় অধিনায়ক কর... হলো ইলিংওয়ার্থকে। খেলোয়াড় মনো... নয়ন নিয়ে রাজনীতি করা অত্য... পুরনো ব্যাপার। তাই ও বিষয় নিয়ে জল ঘোলা না করাই ভালো।

কিন্তু একটা বিষয় আমরা কিছুতেই বুঝতে পারি না। খেলোয়াড়দের ভালো খেলা না খেলা সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে তাঁদের ব্যক্তিগত নৈপুণ্য ও দক্ষতার ওপর। কিন্তু অনুশীলন ছাড়া এই দক্ষতা বজায় রাখা একেবারেই অসম্ভব। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি কিম্বা অন্য যে কোন খেলাই হোক না কেন, অনুশীলন ছাড়া হাজার চেষ্টা করলেও খেলোয়াড়রা এতটুকুও ভাল খেলতে পারবেন না। অথচ আমাদের দেশে এই অনুশীলনের ওপরে এতটুকুও নজর দেওয়া হয় না... ফলে স্টেজে নেমে বাজীবাং করতে যাওয়ার মতো খেলাতে নেমে খেলার মাঠে আমাদের দেশের খেলোয়াড়রা একেবারেই অস... হয়ে পড়েন। ফুটবল খেলার অনুশীলনে খুব একটা অসুবিধে হয় না—জল-কাদায় দিব্বি খেলা যায়। কিন্তু মুশকিল হ... ক্রিকেট খেলা নিয়ে। বর্ষাকালে ক্রিকেটের অনুশীলন একরকম অসম্ভবই। বর্ষাকালে শীত ছাড়া অবশ্য অন্য সময় ক্রিকেট খেলা... অনুশীলনের জন্যে দরকার ঢাকা মাঠ। সি এ বি-র কাছে আমরা এই বিষয়ে আবেদন জানিয়েছি একাধিকবার। কিন্তু লক্ষ ল... টাকা উদ্বৃত্ত থাকা সত্ত্বেও কাজের কাজ কিছুই হয় নি। তাই আজ আমরা এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ক্রীড়ামন্ত্রীর দৃষ্টি আক... করতে চাই। আমরা চাই রাজ্য সরকারের আনুকূল্যে এখনই সারা বছর ক্রিকেট অনুশীলনের মতো একটা ঢাকা মাঠ তৈরি ... হোক—ক্রিকেট খেলোয়াড়রা যেখানে দিনে এবং রাতে অনুশীলন করতে পারবেন। তাহলে আর যাই হোক, দল গঠন ... অনুশীলনের জন্যে এই রকমভাবে এ বছরের মতো তাড়াহুড়ো করতে হবে না। এ বিষয়ে একটু সহৃদয় নজর দেবার জ... আমরা সি এ বি কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য সরকারের কাছে আবার অনুরোধ জানাচ্ছি। —শান্তিপ্রিয়

॥ ভবানী রায় ॥

হনবাগান ক্লাবের রক্ষণভাগের এই োয়াড়টি এ বছর কলকাতার টেরান্স ক্লাবের নির্বাচনে বছরের া খেলোয়াড় মনোনীত হবার অমূল্য সম্মান অর্জন করেছেন।

ফুটবল-ফুটবল

ফুটবল খেলার খবরের কথা বলতে গেলে এখন প্রথমেই বলতে হবে লকাতার আই· এফ· এ শীল্ড কিম্বা কে অনুষ্ঠিত ছোটদের জাতীয় ফুট- প্রতিযোগিতার কথা। আই· এফ· এ ল্ডের খেলাগুলো এখন গুটি গুটি য়ে চলেছে। যতোদিন পর্যন্ত না কাতা ময়দানের তিন প্রধান হনবাগান, ইস্টবেঙ্গল কিম্বা মহা- ডান স্পোর্টিং মাঠে নামে ততদিন খলা যেন ঠিক জমতে চায় না, ভরা মাঠে খেলা চলার আকর্ষণই যে আলাদা। কিন্তু কলকাতার দর্শকরা নিজেদের প্রিয় দল ছাড়া অন্য দলগুলোর খেলা ধরতে গেলে দেখতেই চান না। তাই বাইরের দলগুলোর খেলায় মাঠ প্রায় ফাঁকাই পড়ে থাকে।

তবে যাই হোক না কেন, আশা করা যায় যে, সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই আই· এফ· এ শীল্ডের খেলা শেষ হয়ে যাবে। তবে নির্ধারিত দিনে ফাইন্যাল খেলা নুষ্ঠিত হবে বলে মনে হয় না। রণ খেলার সময়সূচী প্রায় প্রতিদিনই লাতে হচ্ছে।

আমাদের মনে হয় যে, আই· এফ· এ ীল্ডের খেলার সময় বদলানো রকার আজ সব থেকে বেশি। এই প্রতিযোগিতাকে আকর্ষণীয় করে তোলার জন্যে এই পরিবর্তন অবশ্য প্রয়োজনীয়। হয় পুজোর পর, না হয় তো লীগের খেলা আরম্ভ হবার আগে আরম্ভ করা উচিত এই প্রতিযোগিতা। তা-হলে জল-কাদার মাঠে খেলার সমস্যা বাইরের দলগুলোর আর থাকবে না। আর এই প্রধান সমস্যাটা দূরীভূত হওয়ায় আই· এফ· এ শীল্ড ফুটবল প্রতি- যোগিতা আরো জনপ্রিয় হয়ে উঠবে এবং বাইরে থেকে অন্য দলগুলো নতুন পরিবেশে শীল্ড খেলতে আসার জন্যে উৎসাহ প্রকাশ করবে। আমরা এই বিষয়ে আই· এফ· এ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই।

ক্রিকেটের খবর

সমস্ত ভারত জুড়ে এখন বসেছে ক্রিকেটের আসর। এবার সবই আগে আগে। তাই সেপ্টেম্বর মাসের ভরা বর্ষায় ভারতবর্ষের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত চলেছে ক্রিকেট লড়াই। আর মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই নিউজিল্যান্ড আসছে ভারত ভ্রমণে। এই মাসের শেষাশেষি আরম্ভ হবে নিউজিল্যান্ডের সংগে ভারতের প্রথম টেস্ট ম্যাচ।

তাই ভারতীয় দলের খেলোয়াড় নির্বাচন নিয়ে ক্রিকেট কনট্রোল বোর্ডের সিলেকশান কমিটির মাথাব্যথার অন্ত নেই। দলীপ ট্রফির খেলাগুলো আরম্ভ হয়েছে। তাই খেলোয়াড় নির্বাচক- মণ্ডলীর সদস্যরা ভাগাভাগি করে দলীপ ট্রফির খেলাগুলো দেখছেন।

দলীপ ট্রফির খেলাতে এবার তাই অঞ্চলীর দলগুলোর খেলোয়াড়দের কাছে রীতিমত পরীক্ষাই। এই পরীক্ষার ফলাফলের ওপরই নির্ভর করছে সব কিছু—টেস্ট খেলায় সুযোগ পাওয়া কিম্বা না-পাওয়ার প্রশ্ন। তাই মনে হয় যে, দলীপ ট্রফির খেলাগুলোতে এ বছর ব্যক্তিগত ক্রীড়ানৈপুণ্যের প্রাধান্যই বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হবে।

আমাদের পূর্বাঞ্চলের সংগে মধ্যাঞ্চ- লের খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে। এ লেখা যখন আপনাদের হাতে পৌঁছুবে ততোদিনে খেলার ফলাফল ও মীমাংসা হয়ে যাবে। তাই সে বিষয়ে বেশি কিছু না বলাই ভালো। তবে এ কথা ঠিক যে, এই খেলাটা আমাদের অম্বর রায়, দিলীপ দোসী কিম্বা রমেশ সাকসেনার কাছে রীতিমত পরীক্ষা। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওঁদের টেস্ট খেলায় সুযোগ পাওয়া বা না পাওয়া নির্ভর করছে এই খেলায় ভালো খেলার ওপর। সে দিক দিয়ে সুব্রত গুহ অবশ্য কিছুটা নিশ্চিন্ত।

তাই মনে হয় ব্যক্তিগত ক্রীড়া- নৈপুণ্যে এ বছর দলীপ ট্রফির খেলা- গুলো জমে উঠবে।

॥ ভবিষ্যতের স্বপ্ন ॥

লেডী ব্রাবোর্ন কলেজের মেয়েরা ফুটবল-ক্রিকেট খেলতে চাইছেন। হয়তো একদিন খেলবেনও। তবে সাগরপারের দেশগুলোতে মেয়েদের ফুটবল আর ক্রিকেট খেলা চালু হয়েছে অনেকদিনই। এখন বাকী শুধু ছেলেদের সংগে মেয়েদের ম্যাচ। তাও হয়তো হবে। অন্তত ছবিটি দেখে সেই কথাই তো মনে হয়। ছবিতে কলিন কাউড্রেকে ইংলণ্ডের মেয়ে ক্রিকেটারদের সংগে খেলতে দেখা যাচ্ছে।

নিম্নলিখিত প্রশ্নকর্তার চিঠি প্রাপ্তিস্বীকার করা হচ্ছে :

দীপককুমার চৌধুরী (হিলা চা) বাগান, জলপাইগুড়ি), মঞ্জুরঞ্জন দত্ত (জগাছা, হাওড়া), বিনোদ রায় (রায়গঞ্জ), শুভেন্দু, শান্তনু, তাপস ও সুব্রত নন্দী (কেলবাড়ি চা-বাগান), তড়িৎকুমার চৌধুরী ও স্বপনকুমার চক্রবর্তী (টোংলা, দরং, আসাম) হীরেন্দ্রমোহন ভদ্র (সুভাষ-পল্লী, জলপাইগুড়ি), অলোক রায়চৌধুরী (বনগ্রাম, মতিগঞ্জ, চব্বিশ পরগনা), সুশান্ত, ভানু, সমীর ও কালিদাস (হালিশহর), মোহিতকুমার বিষ্ণু (নজী-হাট), দেবাশীষ দাস ও প্রবাল মুখো-পাধ্যায় (বাণীবন, উলুবেড়িয়া, হাওড়া), জয়ন্ত ও রমেন ব্যানার্জী (ঠিকানা নেই), অঞ্জন ও টুনু (ব্যানার্জীপাড়া রোড, কলকাতা—৪১), জীবনজ্যোতি ঘোষ (জোড়হাট—২, আসাম), প্রণব ও পদ্মা মিশ্র (কাঁথি), প্রণব ও পল্লব চক্রবর্তী

শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু,

মহাশয়,

আমি আপনাদের পত্রিকার একজন নিয়মিত পাঠক, এই সপ্তাহের পত্রিকায় আমি দেখলাম যে, আপনারা "গল্প হলেও সত্যি" এই বিভাগটি আর প্রকাশ করবেন না; সেজন্য আমি খুবই দুঃখিত।

আপনার অভিযোগ শুনলাম। কিন্তু ঐ অভিযোগের ভেতরে কোন যুক্তি আছে কি না সন্দেহ। যাঁরা বলেছেন যে, ঐ বিভাগে যে সব লেখা প্রকাশ করা হয় সেইগুলি কোন বই থেকে কপি করা। তাঁরা কেন যে এই সব যুক্তিহীন কথা বলেন ভেবে পাই না। কারণ অনেক পাঠক আছেন যাঁরা এই গল্পগুলি সম্বন্ধে কিছুই জানেন না বা ঐরূপে ঘটনা কোন বইতেও পড়েন নি, তাঁদের পক্ষে কি ঐ কাহিনী-গুলি আনন্দদায়ক নয়?

যাঁরা ঐ সব গল্প সংগ্রহ করে আপনাদের পত্রিকায় পাঠান, তাঁদের উৎসাহ দেওয়াও তো আপনাদের কর্তব্য। সেইজন্য আমি মনে করি যে, আপনি পুনরায় ঐ কাহিনী চালু করে আমাদের আনন্দ দেবেন—ইতি

—খোকন মল্লিক,
কলকাতা।

প্রশ্ন উত্তর

(ধূপগুড়ি, জলপাইগুড়ি), অমিত বসু, শুভেন্দু ঘোষ ও ভাস্করেন্দু (শান্তি-নিকেতন), সুশান্ত বিশ্বাস, অনিল পাল ও সুবল দাস (তেজপুর), অঞ্জন ব্যানার্জী (সোনাগাছি চা-বাগান, মাল, জলপাইগুড়ি), বিমল সরকার (মেজিয়া, বাঁকুড়া)।

বুদ্ধদেব নাগ (কামডহরি, বিবেক পার্ক, বুদ্ধদেব নাগ (কামডহরি, বিবেক পার্ক, গড়িয়া), নারায়ণ ব্যানার্জী ও অর্ধেন্দু ব্যানার্জী (কলাবাড়ি চা-বাগান, জলপাই-গুড়ি), অরিন্দম দাশগুপ্ত (ডাংগলপাড়া, সিউড়ী, বীরভূম), সোমনাথ গঙ্গো-পাধ্যায় (হালিশহর, গোলাবাড়ি), প্রণব চৌধুরী (হিমো চা-বাগান, নাগ্রাকাটা), জয়ন্ত হালদার (নরেন্দ্রনগর কলকাতা—৫৬), অরূপকুমার বিশ্বাস (অভয়নগর, নদীয়া), শ্যামলকুমার চট্টোপাধ্যায় (কৈলাস বসু লেন, হাওড়া—১), হিমাদ্রীকান্ত ব্যানার্জী (কাটালগুড়ি চা-বাগান, জলপাইগুড়ি), পরিমল দে (কল্যাণগড়), সমীরকুমার চ্যাটার্জী (হকড়া, বর্ধমান), মিঠু গুই (নিরালয়, বীরভূম), পরিতোষ নাগ (বেল্যাকোবা, জলপাইগুড়ি)।

অমলকুমার চ্যাটার্জী (আহেরীটোলা স্ট্রীট, কলকাতা—৫)

উত্তর : বিশেষ কোন খেলোয়াড়ের খেলা এবার সত্যিকারের ভালো লাগার মতো লাগে নি। তাছাড়া এ বছর খেলার মানও খুব একটা ভালো ছিল না। আশা করি আপনার সংগে আমার মতের অমিল হলো না।

বিজন সেন (পান্ডাপাড়া, জলপাই-গুড়ি)

উত্তর : আপনি এই ঠিকানায় লিখুন : সুকল্যাণ ঘোষদস্তিদার C/o.

মোহনবাগান ক্লাব টেন্ট, কলকাত ময়দান, কলকাতা—২১।

প্রভাত সোম (ধূপগুড়ি, জলপাই গুড়ি)

উত্তর : আপনি পরিমল দে'কে ইস বেঙ্গল ক্লাবের ঠিকানায় চি লিখতে পারেন।

চুম্বক

শান্তিব্রত সমাদ্দার

১৯৩৮ সালে ওভাল মাঠে শুরু হলো অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে ইংলন্ডের টেস্ট লড়াই। ইংলন্ড অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ব্যাট করছে। ইনিংস শেষে স্কোর বোর্ডের দিকে তাকিয়ে চোখ চড়কগাছ। রান উঠেছে ৭ উইকেটে ৯০৩। এক ইনিংসে সবচেয়ে বেশি রানের রেকর্ড।

বেশি-র সঙ্গে যেন প্রতি-যোগিতা করে কম-এর রেকর্ড সৃষ্টি হয়েছে। এতেও পাত্রযুগল ইংলন্ড ও অস্ট্রেলিয়া। ১৯০২ সালের এজবাসটন মাঠ। এবার ব্যাট ধরেছে অস্ট্রেলিয়া। ইংলণ্ডের বোলিং-এর বিরুদ্ধে তারা মাঠে এলো আর লাইন করে প্যাভেলিয়নে ফিরে গেলো। সে এক সাংঘাতিক বিপর্যয়। এক ইনিংসে এখন পর্যন্ত সব চেয়ে কম রানের নজীর মাত্র ২৬ রান।

* * *

পাকিস্তানের সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত দ্বিতীয় ইনিংসটির কথা অনেকেরই মনে আছে। পাকিস্তানের ইনিংস না বলে সেটিকে হানিফের ইনিংস বললেই বোধ হয় ঠিক বলা হবে। টেস্ট ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি সময় ক্রীজে দাঁড়িয়ে রইলেন হানিফ মহম্মদ। ১৯৫৮ সালে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ১৬ ঘণ্টা ১৩ মিনিট ধরে ব্যাট করে তিনি করলেন ৩৩৭ রান। সবচেয়ে দীর্ঘস্থায়ী টেস্ট ইনিংসের অধিকারী হলেন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ব্রিজটাউনের টেস্ট ম্যাচে স্থাপিত হয়েছিল এই রেকর্ডটা।

সম্পাদিকা—জয়ন্তী সেন
বসুমতী (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ১৬৬, বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১২
বসুমতী প্রেস হইতে শ্রীসুকুমার গুহমজুমদার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।